শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত

(ছয় খণ্ড একত্রে)

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

প্রাপ্তিস্থান

কামিনী প্রকাশালয়

৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন,

কলকাতা-৭০০ ০০৯

নিবেদন

পরম ভাগবত মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের জীবনদর্শনে জারিত মনোহর গ্রন্থ শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত বৈষ্ণব রসপিপাসুদের অতি প্রিয় গ্রন্থ।

শ্রীহরিগত প্রাণ লেখকের দীর্ঘ শ্রম, উদ্যম, নিষ্ঠা, ভক্তি এই গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত হয়েছে।

মূলতঃ নিখিল রসামৃতমূর্তি চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন কাহিনী হলেও লেখকের আন্তরিকতা ও সুদক্ষ লেখনীগুণে এটি ধর্মগ্রন্থ ও দার্শনিক গ্রন্থের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

মনোহর সরল ও সাবলীল ভাষায় মহাজীবনের লীলাবিবরণেব পাশাপাশি লেখকের দূরূহ তত্ত্ববিচার ও রসবিচার রসজ্ঞ পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে। যে কারণে এ গ্রন্থ ভক্ত ও বিদগ্ধ পাঠকমাত্রেই অতীব আদরের গ্রন্থ।

সহৃদয় পাঠকদের আন্তরিক আগ্রহ ও উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে আমরা এই লীলামৃত গ্রন্থ প্রকাশে ব্রতী হয়েছি। গ্রন্থটিকে পাঠকদের নিকট গ্রহণযোগ্য ও আদরণীয় করে তোলার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। সকলের ক্রয়ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে গ্রন্থের ন্যূনতম মূল্য ধার্য হয়েছে।

আশাকরি আমাদের এই উদ্যম ও প্রয়াস সুধী পাঠকবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করবে।

বিনীত
শ্যামাপদ সরকার

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ডের সূচনা

য় খণ্ডের সূচনা

তৃতীয় খণ্ডের সূচনা

চতুর্থ খণ্ডের সূচনা

পঞ্চম খণ্ডের সূচনা

ষষ্ঠ খণ্ডের সূচনা

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত।। প্রথম খণ্ড

শ্রীমঙ্গলাচরণ

সর্বাগ্রে সেই সর্বজীবের প্রাণ শ্রীশ্রীভগবানের পাদপদ্মে আমি আমার অভিন্নকলেবর শ্রীবলরাম দাসের দু'টি পদ অর্পণ করিয়া প্রণাম করিব।

।। ১।।

জ্ঞানাতীত মায়াতীত তোমা ব'লে থাকে।
তবে কি এ ক্ষুদ্র জীব পাবে না তোমাকে?
ভক্তি ও স্নেহেতে যদি না ভুলিবে তুমি।
তবে "প্রিয়" বলি কি আর না ডাকিব আমি?
প্রাণনাথ পিতা সখা সম্বন্ধ মধুর।
বড় হয়ে সে সব কি করে' দিবে দূর?
মায়া মিশাইয়া এসো প্রভু ভগবান্।
দুটো কথা কহি তবে জুড়াইব প্রাণ।।
জ্ঞানাতীত মায়াতীত হয়ে যদি রবে।
কিরূপেতে বলরাম তোমা লাগ পাবে?

।। ২।।

আমি আর শ্রীগৌরাঙ্গ

তপ্ত বালুকায় আছিনু শুইয়া
চকিতের মত এলো।
শীতল নিকুঞ্জে, যথা ভৃঙ্গ গুঞ্জে
গৌর আমায় নিয়ে গেল।
কি গুণে আইল, কেন দয়া হলো,
কিছু আমি নাহি জানি।
সরল বলিতে গৌরাঙ্গ আমার
অসাধন চিন্তামণি।।
কুঞ্জে নিয়া গেল অঙ্গ জুড়াইল
আমি ইতি উতি চাই।
সুন্দর এমন, শীতল কানন,
কভু আমি দেখি নাই।।
এ ভবে আসিয়া, বেড়াই ভাসিয়া,
সদা হাবুডুবু খাই।
বুঝিলাম মনে, পানু এত দিনে,
প্রাণ জুড়াবার ঠাঁই।।
মনে বিচারিনু, যা হইতে পাইনু
দুঃখ-মাঝে সুখ এত।

সব তেযাগিয়া, নিশ্চিত হইয়া,
তাঁহারে সঁপিব চিত।।
মনে মনে বলি, "শুন মোর সখা,
আমি দাস, তুমি প্রভু।
সম্পদে বিপদে, রেখো রাঙ্গা পদে,
তোমা নাহি ভুলি কভু।।"
গৌরলীলা গুণ, শ্রবণ পঠন,
করি প্রাণ এলাইল।
গৌরাঙ্গ কৃপায়, গৌরাঙ্গ ভাবিতে,
নয়নে আইল জল।।
বৈষ্ণব দেখিলে, আনন্দ উথলে,
ভাবি এরা নিজ জন।
যাঁরে আমি ভজি, আমার শ্রীগৌর
ইহারা তাঁহারি গণ।।
খোল করতাল— ধ্বনি কানে গেলে,
শ্রীগৌরাঙ্গ পড়ে মনে।
আনন্দিত মনে, ধ্বনি লক্ষ্য করি,
ধেয়ে যাই সেই স্থানে।।
বৈষ্ণবের পুঁথি, চরিতামৃতাদি,
দেখিলে বুকেতে করি।
পড়িতে না পারি সূচীপত্র হেরি,
কান্দিয়া কান্দিয়া মরি।।
পুস্তক-বিক্রেতা, পুঁথি শিরে করি,
পথে পথে যথা ভ্রমে।
তার পিছু পিছু, ঘুরিয়া বেড়াই,
চেয়ে থাকি পুঁথি পানে।।
বটতলা যাই দু'ধারেতে চাই,
বৈষ্ণবের পুঁথি আছে।
ইহাই ভাবিয়া, থাকি দাঁড়াইয়া
সেই দোকানের কাছে।।
সেই সব কথা, কি হবে কহিয়া,
কহিতে বুক ফেটে যায়।
মনে মনে কত, দারুণ প্রতিজ্ঞা,
করেছিনু প্রভু-পায়।।
বলেছিনু, "প্রভু, অকারণে তুমি,
করুণা করেছ মোরে।
রাখিব যতনে, তোমারে আদরে,
হৃদয়ের রাজা করে।।
যেন উপকার, আপনি করিলে,
আমি শোধ দিব ধার।

এই জগত মাঝে, গৌর গুণ গাব,
যত দিন বাঁচি আব।।
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা, লিখিয়া লিখিয়া,
আগে জানাইব জীবে।
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা, কর্ণেতে পশিলে,
অবশ্য তোমার হবে।।
এমন পাষাণ, ত্রিজগতে নাই,
যে গৌরাঙ্গ-লীলা পড়ি।
ধৈর্য্য ধরি রবে, মোটে না কান্দিবে,
না দিবে সে গড়াগড়ি।।
লীলা পড়ি জীবে, নির্মল হইবে,
তখন কৌপীন পরি।
গৌর-গুণ কথা, দুঃখী জনে কব,
জনে জনে গলা ধরি।।"
এই সব সাধ, মনে হয়ে ছিল
নব অনুরাগ কালে।
তখন সদাই গৌর গুণ গাই,
ভাসি প্রেমানন্দ জলে।।
সেই অনুরাগ গৌরাঙ্গ-সোহাগ,
পীরিতি অঙ্কুর আর।
কেন বা আইল, কেবা নিয়ে গেল,
এখন হুতাশ সার।।
"মনে পড়ে প্রভু, তোমায় আমায়,
কহি[illegible] কত কথা।
তোমা বিনা আর কহি নাই কারু
আমার মনের ব্যথা।।
সেই সুখ দিন সুখের মালঞ্চ,
কি দোষে ভাঙ্গিলে প্রভু।
সে চাঁদ বদন, সজল-নয়ন
আর কি দেখিব কভু?"
সুখের পাথার, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার,
তাহে করিতাম খেলা।
সে সুখ সম্পত্তি আজি দুষ্ট-বিধি,
কোথা হরি নিয়া গেলা।।
"বৃথা ভক্ত আমি, জন্মিনু তোমার
সেবা না পাইয়া তুমি।
অনাথ করিয়া গিয়াছ ফেলিয়া,
কি করিতে পারি আমি।।
মোর অধিকার, অপরাধ করা,
তোমার করিতে ক্ষমা।

চির দিন হতে, যুগে আর যুগে,
এ সম্পর্ক তোমা আমা।।
তুমি যদি আজ, ফেলি যাও মোরে,
আর কার কাছে যাব।
অন্তর্য্যামী তুমি, বল দেখি কার,
কাছে গিয়া সুখ পাব?''
আবার কখন, ভাবি মনে মনে,
তোমাতে পীরিতি নাই।
কৃতজ্ঞতা পাশে, আবদ্ধ হয়েছি,
তাই তোমা-গুণ গাই।।
পেয়ে উপকার, হয়েছি তোমার,
এ সম্বন্ধ তোমা সনে।
তোমাতে আমাতে বন্ধন যেমন,
খাতক ও মহাজনে।।
নিঃস্বার্থ পীরিতি, যায় তোমা প্রতি
সেই তো তোমারে পায়।
আমি ভজি তোমা, স্বার্থের লাগিয়া,
কাটাইতে ভব ভয়।।
ইহা সব সত্য, কিন্তু ক্ষুদ্র জীব,
আপদ-সাগরে থাকে।
বিপদে পড়িলে, স্বভাব দিয়াছ,
সহজে তোমারে ডাকে।।
এরূপ ডাকিয়া, তোমা দুঃখ দেই,
ক্ষম মোর অপরাধ।
তোমা মনোমত, অবশ্য হইব,
কর তুমি আশীর্বাদ।।
হে মধু-মূরতি! নয়ন-আনন্দ,
নয়ন উপরে বসো।
ওহে প্রাণেশ্বর! শীতল আনন্দ,
হৃদয়ে কর হে বাস।।
হে পরশমণি! বিমল আনন্দ,
শ্রীকর মাথায় ধর।
হে ভুবনবন্ধো! জগত-আনন্দ
জগত শীতল কর।।
ভীষণ আন্ধারে, ঘেরিল সংসারে,
উর নবদ্বীপ-চাঁদ।
তিমির ঘুচাও, কৃপায় পুরাও,
বলরাম দাস-সাধ।।

উৎসর্গ পত্র

শ্রীল হেমন্তকুমার ঘোষের প্রতি—

মেজদাদা! তুমি আমাকে এই জড়-জগতে রাখিয়া গোলকধামে গমন করিলে, তাহার কয়েক দিবস পরে আমি 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি প্রকাশ করিয়াছিলাম—

"কয়েক বৎসর গত হইল, আমরা দুই ভাই একটি শোক পাইয়া ব্যথিত হই। তখন আমরা ভবিলাম যে, যখন সকলকেই মরিতে হইবে, তখন মরিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু কি করিব, কোথায় যাইব? মরিবার জন্য প্রস্তুত কিরূপে হইতে হয়? ইহা লইয়া দুই ভাই চিন্তা ও বিচার করিতে লাগিলাম।"

পরিশেষে ইহা স্থির হইল যে, মুক্ত হইবার দুইটি পথ আছে। এক জ্ঞান-পথ, আর এক ভক্তি-পথ। কিন্তু ইহার কোন্‌টি ভাল? কোন পথে আমরা যাইব? তখন এ সম্বন্ধে কোনরূপ সাব্যস্ত করিতে না পারিয়া দুই ভাই দুইটি পথ ভাগ করিয়া লইলাম। মেজদাদা লইলেন ভক্তি-পথ, আমি লইলাম জ্ঞান-পথ। এইরূপ ভাবে আমরা কেহই অসন্তুষ্ট হইলাম না। কারণ আমার মেজদাদা মধুর প্রকৃতি, ভক্তিময় ও সর্বজীবে দয়ালু, আর আমি জ্ঞানাভিমানী তেজীয়ান, ভক্তিহীন ও হৃদয়-শূন্য!

মেজদাদার আমার অপেক্ষা অনেক সুবিধা ছিল। কারণ ভক্তি-পথ শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সে পথ দিয়া অন্ধ লোকেও যাইতে পারে। অতএব তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ অতি মনোযোগের সহিত অনুশীলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়িলাম। জ্ঞান-পথের গুরু কোথায়?

অগ্রে আমার কথা কিছু বলিয়া লই। আমি যখন ব্যাকুল হইয়া জ্ঞান-পথের অনুসন্ধান করিতেছি, তখন শুনিলাম বোম্বাই নগরে আমেরিকা হইতে ব্ল্যাভাটস্কী নাম্নী একটি মেম ও অলকট নামক এক সাহেব আসিয়াছেন। ইঁহারা পরম যোগী সিদ্ধপুরুষ, অনেক অলৌকিক ক্রিয়াও করিতে পারেন। এই কথা শুনিয়া আমি বোম্বাই নগরে তাঁহাদের নিকট যাত্রা করিলাম ও তিন সপ্তাহকাল তাঁহাদের গৃহে বাস করিলাম। তাঁহাদের নিকট কিছু কিছু দেখিলাম ও কিছু কিছু শিখিলাম। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া যোগাভ্যাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু দেহ অপটু আর কলিকাতা জনাকীর্ণ স্থান। এই নিমিত্ত কৃষ্ণনগর জেলায় চূর্ণীনদীর ধারে, হাঁসখালি গ্রামে একটি পরিত্যক্ত নীলকুঠিয়ালের বাড়ী ভাড়া লইয়া সেখানে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলাম। আর সেখানে নির্জনে কিছু কিছু মনঃসংযমের কার্য্যও অভ্যাস করিতে লাগিলাম।

এদিকে আমার মেজদাদা মহাশয় আমাদের জন্মস্থান যশোহর জেলাস্থ মাগুরা (অমৃতবাজার) গ্রামে, সপরিবারে থাকিয়া ভক্তি-চর্চা করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রামস্থ লোক লইয়া একটি হরিসংকীর্তনের দল করিলেন। সন্ধ্যাকালে হরি-সংকীর্তন করেন, আর অন্যান্য সময়ে ভক্তিগ্রন্থানুশীলন করেন। মেজদাদা মহাশয়ের ভক্তিরস ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিল ও তাঁহার সঙ্গগুণে গ্রামস্থ অনেক লোকও ভক্তিমান্‌ হইতে লাগিলেন।

ক্রমে সংকীর্তনের তেজ বাড়িয়া উঠিল। প্রথমে একবার করিয়া সন্ধ্যাকালে হইতেছিল, পরে প্রাতে এবং অবশেষে আবার অপরাহ্নেও সংকীর্তন হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মেজদাদা প্রায় অহর্নিশ সংকীর্তন করিতে লাগিলেন।

গ্রামস্থ লোক সেই তরঙ্গে ডুবিয়া গেলেন; এমন কি, অনেকে আপনাদের সাংসারিক কার্য্য করিতে অপারগ হইতে লাগিলেন। শেষে সংকীর্তনের বিবিধ দলের সৃষ্টি হইতে লাগিল। বালকেরা একদল হইল, এবং স্ত্রীলোকেরাও কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমার মেজদাদা মহাশয় তখন সংকীর্তনে 'দশা' প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। আর তখন তিনি সমুদায় বিষয়-কার্য্য বিসর্জন দিয়া কেবল ভক্তিতরঙ্গে সন্তরণ দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

আমাদের প্রায় দুই মাস দেখাশুনা নাই। কিন্তু মেজদাদা সমস্ত দিবস কিরূপে যাপন করেন, তাহা প্রত্যহ আমাকে লিখেন। আমিও প্রত্যহ পত্র লিখি। কিন্তু আমার লিখিবার কিছু নাই, সুতরাং বিষয়-কথা ব্যতীত পরমার্থকথা কিছুই লিখি না। এমন সময় আমাকে দেখিবার নিমিত্ত, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া মেজদাদা মহাশয় হাঁসখালিতে শুভাগমন করিলেন।

দেখি মেজদাদা মালা ধারণ করিয়াছেন। মুখের আকৃতির কিছু পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন হৃদয়ে ময়লা মাত্র নাই। নয়ন দেখিয়া বোধ হইল যেন অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ খেলিতেছে। মেজদাদার এই পরিবর্তন দেখিয়া আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম; ভাবিলাম, মেজদাদা যে পথ লইয়াছেন, ইহাতে অবশ্য কিছু আছে।

মেজদাদাকে দর্শন করিয়া বড় সুখ বোধ হইল। তিনি তখন এক সন্ধ্যা আহার করেন, মৎস্যাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন। আমি যত্ন করিয়া তাঁহার নিমিত্ত বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইলাম। মাংস রহিল না বটে, কিন্তু মৎস্যাদি বহু প্রকার রহিল। দুই ভ্রাতা ভোজন করিতে বসিলাম। মেজদাদার থালে মোটা চিংড়িমাছের দুটি ভাজা মাথা ছিল। মেজদাদা আসনে বসিলেন। কিন্তু চিংড়ির মাথা ও অন্যান্য মৎস্যের ব্যঞ্জন দেখিয়া কাতরভাবে আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, বৈষ্ণবগণ মৎস্যাদি খাইয়া থাকেন, তুমি কেন খাইবে না? তাহার পর বলিলাম, যে ধর্মে খাইলে ধর্ম যায়, না খাইলে ধর্ম হয়, অর্থাৎ খাওয়ার সঙ্গে যে ধর্মের ভাল-মন্দ সম্বন্ধ আছে, সে ধর্ম আমি মানি না।

মেজদাদা কোন উত্তর না দিয়া কাতরভাবে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন আমি হাসিয়া বলিলাম, ভণ্ডামি করিতে হয় বাহিরে করিও আমার এখানে কেন? তবু মেজদাদা থালায় হাত দিলেন না। তখন আমি বলিলাম, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ যত্ন করিয়া অতি ভক্তিপূর্বক তোমার নিমিত্ত স্বীয় হস্তে পাক করিয়াছে। তুমি ভক্তিবৎসলের পূজা কর, ভক্তের দ্রব্য কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে? ইহাই বলিয়া একটু মৎস্য হাতে করিয়া মেজদাদার মুখে দিলাম। আমি যখন নিজহস্তে তাহার মুখে মৎস্য দিতে গেলাম মেজদাদা তখন হাঁ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এইরূপে আমি মেজদাদার ধর্ম নষ্ট করিলাম।

দেখা অবধি আমাদের দুইজনে কথা চলিতেছে। এক মুহূর্ত ফাঁক নাই। কখন সুখ-দুঃখের কথা বলিতেছি। ধর্মের কথা আরম্ভ হইলে ঘোর তর্ক বাধিয়া গেল। এইরূপে সারাদিন তর্কে গেল। আমি মেজদাদাকে বলিলাম, "তোমার গৌর আমার বড় প্রিয় বস্তু। যদিও তাঁহার মতের সহিত আমার সমুদায় মিলে না, তবু তাঁহার নাম করিলে আমার আনন্দ হয়। তিনি যে ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন, সে স্ত্রীলোকের, কি দুর্বলচেতা মনুয্যের জন্য? তেজস্বী পুরুষের স্ত্রীলোকের মত কান্দিলে চলিবে কেন? পুরুষ জ্ঞানচর্চা করিতে পারিলে আর কান্নাকাটির মধ্যে কেন যাইবে?"

ভক্ত পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতেছেন যে তখন আমার শ্রীগৌরাঙ্গে বিশ্বাস ছিল না। এমন কি মেজদাদা যদিও হরিনামে উন্মত্ত হইয়াছিলেন তবু তিনিও তখন শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতেন না। সে যাহা হউক, জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়, এই কথা লইয়া তর্ক হইল। আমি বলি জ্ঞান বড়, মেজদাদা বলেন ভক্তি বড়। কিন্তু মেজদাদা আমার সহিত কখন তর্কে পারিতেন না। তবে আমার আন্তরিক টান বরাবরই ভক্তির দিকে ছিল।

মেজদাদা যদিও তর্কে পারিলেন না কিন্তু আমি মনে মনে বুঝিলাম যে তিনি অগ্রবর্তী হইয়াছেন, আর আমি পাছে পড়িয়া গিয়াছি! ফল কথা, মেজদাদাকে দেখিয়া আমি বেশ বুঝিলাম, তিনি আমার অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছেন। এমন কি আমি তাঁহার মত হই নাই বলিয়া মনে মনে বড় দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু মুখে আমি তাহা স্বীকার করিলাম না, ইহা আমার মনে মনে রহিল। মুখে আস্ফালন করিতেছিলাম কিন্তু মনে মনে বেশ বুঝিলাম যে, তিনি আমার অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছেন, আর গৌরাঙ্গের মতই ভাল।

বিকালে দুই ভাই গাড়ীতে বেড়াইতে গেলাম। গাড়ীতেও ঐ কথা। ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইল। তখন গাড়ীর মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হইল, মেজদাদা আপনার ভাবে রহিলেন, আমি আমার ভাবে রহিলাম।

একটু পরে মেজদাদা গুন্ গুন্ করিয়া একটি গীত গাহিতে লাগিলেন। গীতটির সমুদায় কথা বুঝিতে পারিলাম না কিন্তু কথা বুঝিবার প্রয়োজন হইল না। সেই গীতটি আমার হৃদয় কোমল ও শ্রবণ তৃপ্ত করিতে লাগিল। ফল কথা, ভক্তের কণ্ঠস্বর একরূপ মদ্যবিশেষ। ভক্তের শুদ্ধ কণ্ঠস্বরেই জীবমাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করে।

মেজদাদা গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছেন, আর আমার বোধ হইতেছে যেন শ্রীভগবান্ আমার হৃদয়ে বসিয়া করুণস্বরে রোদন করিতেছেন। আমি মনোনিবেশপূর্বক সেই করুণ ও মধুর স্বর শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে উহা আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, আর ক্রমে আমাকে অস্থির করিতে লাগিল। সেই গুন্ গুন্ স্বরটি শেষে হৃদয়ে রহিয়া গেল,—অদ্যাপিও আছে।

মেজদাদা যে গীতটা গাহিতেছিলেন তাহা আমি পরে শিখিয়াছিলাম। সে গীতটি তাঁহার নিজের কৃত। সেটি এই—

"হা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলি, ধূলায় পড়িল গোরা।
ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ, দুনয়নে বহে ধারা।।
(গোরা) ক্ষণেক চেতনা পায়, বলে আমার কৃষ্ণ নাই,
এই ছিল, কোথা গিয়া, লুকাইল মনচোরা।।
হা হরি, হরি হরি, হরি তুমি কোথায় হে,
তুমি আমার প্রাণধন, তুমি আমার নয়ন-তারা।।"

শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-ঘটিত গীত পূর্বে মহাজনগণ কিছু কিছু রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে প্রথা একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল। সেই প্রথা মেজদাদা কর্তৃক পুনর্জীবিত হইল। এখন উল্লিখিত আদি গীতটিব দেখাদেখি গৌরাঙ্গলীলা-ঘটিত কত শত পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

সে যাহা হউক, পর দিবস মেজদাদা বাড়ী চলিয়া গেলেন। তিনি গেলেন বটে কিন্তু কিছু রাখিয়া গেলেন। তাঁহার সেই করুণ স্বরটুকু আমার হৃদয়ে রহিয়া গেল। মেজদাদা বাড়ী যাইয়া আমাকে এক পত্র লিখিলেন, তাহার ভাবার্থ এই,—'শিশির! আমি জুড়াইবার নিমিত্ত তোমার কাছে গিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে জুড়াও নাই।'

মেজদাদার এই পত্রে আমি মর্মাহত হইলাম, কারণ আমি বুঝিলাম মেজদাদা যে কথা লিখিয়াছেন, তাহা সমুদায় ন্যায্য। আমি আগেও বুঝিয়াছিলাম, তখন আরো বুঝিলাম যে, আমি বৃথা জ্ঞানের কথা বলিয়া মেজদাদার হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছি। তখন হৃদয়-মাঝারে সেই গুন্ গুন্ শব্দটি আরো যেন কান্দিয়া উঠিল।

তখন ভাবিলাম, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার প্রিয় বস্তু, আমার মেজদাদাও আমার প্রিয় বস্তু। এ উভয়ের অনুরোধে আমার শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা কিছু জানা কর্তব্য। পূর্বেও শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম এবং শুনিয়া উহার প্রতি বড় লোভ জন্মিয়াছিল। যখনই গৌরাঙ্গ-লীলা শুনিতাম, তখনই উহা আমার নিকট মধু হইতে মধুতর বোধ হইত।

আর বিলম্ব না করিয়া কলিকাতা হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ পাঠাইতে লিখিলাম, আর মেজদাদার পত্রের উত্তর দিলাম। মেজদাদাকে যাহা লিখিলাম, তাহার ভাবার্থ এই,—'এবার তুমি আমার সঙ্গে যে দুঃখ পাইয়াছ, অন্যবারে আমি তাহা দূর করিব। বিচিত্র কি, হয়ত আমিও তোমার মত হরিবোলা হইব।'

শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানি আসিল। আমি উহার প্যাকেট খুলিলাম। পুস্তকখানি হাতে করিলাম, আর কি জানি কেন, আমার অঙ্গ দিয়া যেন একটি আনন্দের লহরী চলিয়া গেল। পিপাসাতুরের

জল পান করিয়া যেরূপ অঙ্গ শীতল হয়, পুস্তকখানি স্পর্শ করিয়া সেইরূপ আমার তাপিত হৃদয় শীতল হইল। আমি চৈতন্যভাগবত অল্প অল্প করিয়া পড়িতে লাগিলাম। অল্প অল্প বলি কেন, না, অতি অল্পেই আমার হৃদয় ভরিয়া যাইতে লাগিল।

মেজদাদা মহাশয় কখন কখন আবিষ্ট হইতেন, ও আবিষ্ট হইয়া আমাকে পত্র লিখিতেন। সে সমুদায় পত্রগুলি যেন তাঁহার হৃদয়ে কেহ প্রবেশ করিয়া লেখাইতেন। সেই আবিষ্ট অবস্থার আদেশগুলি আমি বড় মান্য করিতাম। পূর্বে বলিয়াছি যে, মেজদাদাকে আমি পত্র লিখিয়াছিলাম যে, পুনর্বার সাক্ষাৎ হইলে আর তাঁহাকে দুঃখ দিব না। সে পত্রের উত্তর আসিল।

তখন সকাল বেলা, প্রায় আটটার সময়। আমি ঘরে একেলা আছি। আমার ঘরের মেঝে বাঁশের চাঁচ দ্বারা মণ্ডিত। মেজদাদার পত্রখানি খুলিলাম, তাহাতে যাহা লেখা ছিল তাহার ভাবার্থ এই ঃ—শিশির! কোন্ দেবতা, আমি তাঁহাকে চিনি না, আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বলিলেন যে, তোমার কনিষ্ঠ শিশির, ওটি শ্রীগৌরাঙ্গের চিহ্নিত দাস। ঐ দেহ দ্বারা মহাপ্রভু অনেক কার্য সাধন করিবেন।

এই পত্রখানি পড়িয়া আমি সেই চাঁচের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

একটু পরে উঠিয়া বসিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। আমি এই মাত্র বলিয়াছি যে, মেজদাদা এইরূপ আবিষ্ট হইয়া আমাকে যে উপদেশগুলি পাঠাইতেন, আমি তাহা বিশ্বাস করিতাম। সুতরাং মেজদাদার পত্রে যাহা লেখা ছিল, তাহা আমি বিশ্বাস করিলাম! কিন্তু আমি মনে মনে এইরূপ ভাবিতাম, 'এ আবার শ্রীভগবানের কি লীলা। প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য কি আর দেহ মিলিল না। আমি কঠিন, কর্কশ, ভক্তিশূন্য, রাজনীতি লইয়া বিব্রত, ইংরাজী পড়িয়া এক প্রকার নাস্তিক হইয়াছি।' আবার ভাবিলাম, "আমা দ্বারা শ্রীভগবান্ প্রেমভক্তি প্রচারের কার্য করিবেন, তাহা তাঁহার পক্ষে বৈচিত্র কি?" তিনি ইচ্ছা করিলে অন্ধের দিব্যচক্ষু হয়। তাঁহার ইচ্ছা হইলে এই পাষাণবৎ হৃদয়ে ভক্তির অঙ্কুর হইবে বৈচিত্র কি?

আমার এখন বোধ হয় যে, সে পত্রখানি দ্বারা মেজদাদা মহাশয় আমাতে শক্তি-সঞ্চার করিয়াছিলেন।

আমি তখন অতি কাতর ভাবে করজোড়ে শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করিলাম যে, 'ভগবান্! যদি তুমি অসাধনে কেবল আমার দুর্দশা দেখিয়া দয়ালু হইয়া, নিজ গুণে, আমার প্রতি কৃপা কর, তবে আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যথাসাধ্য সরল মনে, তোমার চরণ ভজন ও জগতে তোমার গুণগান করিব।"

উপরি উক্ত প্রস্তাবটি ১২৯৯ সালে চৈত্রের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। "মেজদাদা! তুমি আবিষ্ট হইয়া পত্রে আমাকে যাহা যাহা লিখিয়াছিলে, তাহা আমি লজ্জাক্রমে সব প্রকাশ করিতে পারিলাম না।"

আমি শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা লিখিব, কি তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, ইহা যখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, তখন তুমিই আমাকে বলিয়াছিলে যে আমার ভাগ্যে সে ফল লেখা আছে। সেই তোমার শ্রীমুখের বাক্য এখন সফল হইতেছে। অতএব তোমার কনিষ্ঠের এ পরিশ্রমের ধন আর কাহাকে দিব। তুমিই গ্রহণ কর।

তুমি যদি এ জড়জগতে এখন থাকিতে, তবে এই গ্রন্থের প্রতি অক্ষর লইয়া আমার সহিত বিচার করিতে। তুমি আমি দু'জনে একত্র হইয়া ভজন করিতাম। এখন তুমি নাই, কাজেই ব্যথার ব্যথী নাই, আমার ভজনও নাই। যখন হৃদয় শুষ্ক হইত, তখন তোমার মুখপানে চাহিলে আমার রসের উদয় হইত। এখন আমার সে সম্পত্তি কিছুই নাই। একে রোগে জীর্ণদেহ, তাহাতে তোমার বিরহে হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। তবু যে আমি লিখিতেছি, তাহার কারণ এই যে, আমি আর এ জগতে এরূপ একটি কাব্য ব্যতীত কিরূপে সময় যাপন করিব?

এই গ্রন্থ লিখিবার সময় তুমি এ জগতে ছিলে না, কাজেই আমার এ গ্রন্থ সম্বন্ধে সমুদয় কথা তোমাকে বলিতে পারি নাই, তাহা এখন বলিতেছি।

শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত কি ভগবান্, তাহা লইয়া বিচার করিবার এখানে আবশ্যক নাই। যে জন অন্তরের সহিত শ্রীভগবান্‌কে করুণাময় বলেন, তাঁহার নিকট শ্রীভগবানের অবতার অসম্ভব নয়। যাঁহারা মুখে তাঁহাকে করুণাময় বলেন, মনে মনে ভাবেন যে, এ ক্ষুদ্র নর-সমাজে তিনি আসিবেন কেন, তাঁহারা অবশ্য অবতার মানিতে পারেন না। যাঁহারা মনের সহিত বিশ্বাস করেন যে শ্রীভগবান্ দয়াল; তাঁহাদের এ কথা বিশ্বাস করিতে আপত্তি কি যে, তিনি আমাদের মধ্যে আসিয়া থাকেন? বিশেষতঃ তাঁহার সহিত যদি মিলন প্রয়োজন হয়, তবে যখন আমরা তাঁহার মত বড় হইতে পারি না, কি আমরা তাঁহার কাছে যাইতে পারি না, তখন তাঁহারই আমাদের মত ছোট হইয়া আমাদের কাছে আসিতে হয়।

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারেন, তাঁহারা তাঁহার লীলা পড়িয়া সম্ভবতঃ এই তিনটি কথা বুঝিতে পারিবেন যে--

১। শ্রীভগবান্ আছেন।

২। তিনি গুণের নিধি।

৩। তাঁহাকে পাওয়া যায়।

এ তিনটি বিশ্বাস যাঁহার আছে তাঁহার আর দুঃখ থাকে না।

জগতে যতগুলি অবতার উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেবল শ্রীগৌরাঙ্গই স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়া পূজিত। অতএব তাঁহার লীলা সকলেরই, বিশেষতঃ বাঙ্গালী মাত্রেরই জানা কর্তব্য। আর জগতে যত যত অবতারের উদয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে কেবল গৌরলীলাই প্রমাণের আয়ত্ত। ঐ লীলা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সাধুগণ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থে যে লীলা সন্নিবেশিত করিলাম, উহা প্রামাণিক গ্রন্থ ও মহাজনের পদ হইতে গৃহীত হইল। অল্প দুই একটি লীলা জনশ্রুতি হইতেও লওয়া হইয়াছে।

প্রামাণিক গ্রন্থে সূত্ররূপে যে সমস্ত লীলা সংক্ষেপে লেখা আছে, আমি তাহা বিস্তার করিয়াছি। তবে এই বিস্তার কল্পনা-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া করি নাই। লীলাগুলি পরিষ্কাররূপে দেখাইবার জন্য এইরূপ মধ্যে মধ্যে করিতে হইয়াছে। যেখানে কোন লীলা সূত্র দেখিয়া বুঝিতে না পারিয়াছি, সেখানে অন্যান্য গ্রন্থ এ লীলা দ্বারা উহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। যেখানে তাহাও না পারিয়াছি, সেখানে কাতর হইয়া ভগবানের পূজা করিয়াছি। এইরূপে কাতর হইয়া নিবেদন করিতে করিতে আমার মনে যেরূপ স্ফুরতি হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়াছি। পাঠকের পড়িতে রসভঙ্গ হইবে বলিয়া আমি কথায় কথায় প্রমাণ দেখাইয়া দিই নাই।

প্রথম খণ্ডে রস-বিস্তারের চেষ্টা করি নাই এবং লীলাগুলি কিছু সংক্ষেপে লিখিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, রস-শাস্ত্রে রস বিস্তার ক্রমে ক্রমে করিতে হয়। একেবারে রস প্রস্ফুটিত করিলে উহা কেহ আস্বাদন করিতে পারেন না। অনেক সময় অনিষ্টও হয়। যেমন অগ্রে তিক্ত খাইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়া শেষে পায়স খাইতে হয়, অগ্রেই পায়স খাইতে নাই,—রসাস্বাদের নিয়মও সেইরূপ। দ্বিতীয় খণ্ডে আমি রস-বিস্তারে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি। আর এক কথা, প্রভুর আদিলীলা কোথাও বিস্তার করিয়া বর্ণিত হয় নাই। প্রকৃত কথা, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড না পড়িলে সকলে শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার ধর্ম কি; তাহা সম্যকরূপে আস্বাদন করিতে পারিবেন না। যিনি গৌরলীলা-রসে সাঁতার দিতে চাহেন তাঁহাকে দ্বিতীয় খণ্ডও পড়িতে হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু ইহা লইয়া আমি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে কিছু বিচার করি নাই। তবে যাঁহারা তাঁহার পূর্ণ ভক্ত নহেন, তাঁহাদের নিমিত্ত তাহাও স্থানে স্থানে করিয়াছি। সম্ভবতঃ সেই নিমিত্ত দুই একস্থানে গৌরভক্তগণের কিছু কিছু ক্লেশ হইতে পারে। কিন্তু সীতাকে যখন পরীক্ষা করা হইয়াছিল,

তখন হনুমান প্রভৃতি ভক্তগণের একবারও এ সন্দেহ হয় নাই যে জনক-দুহিতা পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না।

হে গৌরভক্তগণ! শ্রীগৌরাঙ্গ সত্য বস্তু। যিনি যতই পরীক্ষা করুন না কেন, সত্য বস্তুর তাহাতে ভয় কি? সোনা যত অগ্নিতে দগ্ধ কর, ততই নির্মল হইবে। গৌরলীলা লইয়া যিনি যত চর্চা করিবেন, তিনি ততই শ্রীগৌরচরণে আকৃষ্ট হইবেন।

উপক্রমণিকা

চারশত বৎসর হইল, আমাদের এই বাংলা দেশের নবদ্বীপ নগরে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই কয়েকটি নামে সচরাচর বিখ্যাত, যথা—নিমাই, বিশ্বম্ভর, গৌরহরি, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, মহাপ্রভু ইত্যাদি। এখন ভাগীরথীর পশ্চিম পারে নবদ্বীপ নামে যে গ্রাম আছে, তাহারই অপর পারে তখনকার নবদ্বীপ ছিল; বর্তমান নবদ্বীপকে তখন কুলিয়া বলিত।

এই সময়ে বাংলার স্বাধীনতা লুপ্তপ্রায়। রাজা ছিলেন যবন, আর যদিও কখন কখন হিন্দু রাজা হইতেন, কিন্তু তিনি হয় কার্যগতিকে. কি, রাজ্য-লোভে, নিজেই মুসলমান হইয়া যাইতেন, না হয় মুসলমান সেনাপতি বা ভৃত্য কর্তৃক পদচ্যুত হইতেন। একাদিক্রমে তিন পুরুষ হিন্দুরাজা তখনকার কালে আর হয় নাই।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে সুবুদ্ধি রায় গৌড়ের রাজা ছিলেন। হোসেন খাঁ নামক এক পাঠান তাঁহার একজন প্রিয় ভৃত্য ছিল। এই ভৃত্য রাজ-আজ্ঞায় একটি দীঘি কাটাইবার ভার প্রাপ্ত হইয়া রাজ-অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। রাজা তাহার অপরাধের নিমিত্ত তাহার পৃষ্ঠে চাবুক মারিয়াছিলেন। হোসেন খাঁ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া যড়যন্ত্র করে এবং সুবুদ্ধি রায়কে পদচ্যুত করিয়া আপনি রাজা হয়। সুবুদ্ধি রায় হোসেন খাঁর বন্দী হইলেন। আর হোসেন খাঁর স্ত্রী সুবুদ্ধি রায়কে বধ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু হোসেন খাঁ পূর্বে প্রভুরপ্রাণদণ্ড না করিয়া, বলপূর্বক তাঁহাকে যবনের জল পান করাইল। সুবুদ্ধি রায় এই নিমিত্ত হিন্দুসমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। গৌড়ীয় পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিলেন যে, তপ্ত ঘৃত পান করিয়া কি তুষানল করিয়া প্রাণত্যাগ করাই তাঁহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। সুবুদ্ধি এরূপ ক্লেশকর প্রায়শ্চিত্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত ও নতুন ব্যবস্থা পাইবার আশায়, বারাণসীতে পণ্ডিতগণের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারাও ঐরূপ ব্যবস্থা দিলেন। সেই সময়ে তিনি হঠাৎ শুনিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ বারাণসী ধামে আগমন করিয়াছেন। তখন কোন সুযোগে তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন। পড়িয়া আপনার পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা পাইয়াছেন তাহা বলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু করুণার্দ্র হইয়া বলিলেন যে, "প্রাণত্যাগ তমোধর্ম। তুমি বৃন্দাবনে যাও, কৃষ্ণনাম কর, তোমার চিরদিনের যে পাপ আছে সমুদয় নষ্ট হইয়া অন্তিমে তাঁহার পাদপদ্ম পাইবে।" সুবুদ্ধি রায় প্রভুর এইরূপ আদেশ পাইয়া বৃন্দাবনে বাস করিলেন।

হোসেন খাঁ সাহ উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়ের রাজা হইলেন; তাঁহার অধীনে স্থানে স্থানে এক একজন কাজি রাখিলেন। ঐ সকল কাজি সৈন্য সামন্তে পরিবেষ্টিত থাকিতেন, রাজ্যশাসন বড় একটা করিতেন না। রাজ্যশাসন তাঁহাদের অধীনে হিন্দুরাজগণ করিতেন। ইঁহারা হিন্দুরাজগণের নিকট কর আদায় করিয়া আপনারা কিছু রাখিতেন, আর কিছু গৌড়ে পাঠাইতেন। এই তাঁহাদের প্রধান কার্য ছিল। আর যদি কখন তাঁহাদের নিকট কোন অভিযোগ হইত, তবে তাহার বিচারও করিতেন। কিন্তু অভিযোগ প্রায় হইত না। হিন্দুরাজগণ প্রকৃত রাজ্যশাসন করিতেন। আর কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তি, কি গ্রামের দুষ্ট লোক দমন প্রভৃতি সামান্য কার্য লোকেরা আপনা আপনিই করিত। পানিহাটী গ্রামে এইরূপ একজন কাজি বাস করিতেন। শ্রীনবদ্বীপে চাঁদ খাঁ নামে এক কাজি ছিলেন। তাঁহার বাস নবদ্বীপের এক অংশে বেলপুখুরিয়া গ্রামে ছিল। আর একজন কাজি

শান্তিপুরের নিকট গঙ্গার ধারে থাকিতেন, তাঁহার নাম ছিল মুলুক। তাঁহার গোরাই নামে একজন অমাত্য ছিল। সে গোঁড়া মুসলমান বলিয়া হিন্দুগণের প্রতি বড় অত্যাচার করিত।

সেই সময়কার হিন্দু-জমিদারগণের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম পাওয়া যায়। যেমন নবদ্বীপে বুদ্ধিমন্ত খাঁ। অম্বিকা কালনার নিকটে হরিপুর গ্রামে গোবর্ধন দাস; ইনি বার লক্ষের জমিদার ছিলেন। বর্ধমানের নিকট কুলীনগ্রামে মালাধর বসুর বংশীয়গণ। রাজসাহীতে খেঁতুর গ্রামে কৃষ্ণানন্দ দত্ত। ইহারা সকলেই কায়স্থ। আবুল ফজেল আইন-ই-আকবরীতে লিখিয়াছেন যে, বাংলার সমস্ত জমিদারই কায়স্থ ছিলেন। ইঁহারা সকলেই কার্যদক্ষ ছিলেন ও নিয়মিতরূপে কর দিতেন বলিয়া কায়স্থ বাদসাহের বিশ্বাসপাত্র হইয়াছিলেন। আবুল ফজেল তখনকার মুসলমান ইতিহাস-লেখক। ইহাতে বোধ হয়, তখন সমুদয় জমিদারী কার্য কায়স্থগণই করিতেন।

যে ব্রাহ্মণেরা বিষয়-কার্য করিতেন, তাঁহারা রাজসরকারের চাকরি করিতেন। ইঁহারা সমাজে কিছু অপদস্থ থাকিতেন। কায়স্থগণ জমিদার ছিলেন বলিয়া যে ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত ছিলেন তাহা নহে। তখন ব্রাহ্মণগণের মর্যাদার সীমা ছিল না। কায়স্থগণ তাঁহাদের নিকট করজোড়ে থাকিতেন। নবশাকগণের ত কথাই নাই। ব্রাহ্মণগণ নবশাকগণের জল পান করিলে, তাহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত। তাহাদিগকে মন্ত্র দীক্ষা দিলে, কি আমন্ত্রিত হইয়া তাহাদিগের বাটীতে গেলে, ব্রাহ্মণগণ পতিত হইতেন। সুতরাং নবশাকগণ আপন আপন জাতীয় ব্রাহ্মণগণের নিকট মন্ত্র লইতেন। তবে ইহাদের নিকট ব্রাহ্মণগণের যে কিছু প্রাপ্তি ছিল না, তাহা নহে। নানা উপলক্ষে তাহাদিগকে ব্যবস্থা দিয়া অধ্যাপকগণ অর্থ উপার্জন করিতেন এবং ধনী নবশাকগণ কোন ক্রিয়াকর্ম কবিলে ব্রাহ্মণের বাড়া গিয়া পূজা করিতেন। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের বিষয়-কার্য কি চাকরি করা বড় প্রয়োজন হইত না। তাঁহারা প্রায়ই বিদ্যা-চর্চা এবং ধর্ম-চর্চা করিতেন। অন্যান্য জাতিরা তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। তবে সকলের অপেক্ষা বৈদ্যজাতি সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেন। তাঁহারা চাকুরী কি বিষয়-কার্য কিছুই করিতেন না, জাতি-বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। সেই বৃত্তির জন্যই সমাজে, এমন কি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের নিকটও আদৃত হইতেন। ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা চাকরি করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে গৌড়ীয় বাদসাহের মন্ত্রী দবীর খাস ও সাকের মল্লিক নামক দুইজন ব্রাহ্মণ কুমারের কথা শুনে যায়। নবদ্বীপে যাঁহারা কোটাল ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যেও দুইজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা শুদ্ধশ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, নাম শ্রীজগন্নাথ রায় ও শ্রীমাধব রায়। ইঁহারাই জগাই মাধাই নামে বিখ্যাত।

নবদ্বীপ নগরে তখন ঐশ্বর্যের অবধি ছিল না। শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে যে, গঙ্গার এক এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিত। নগরে সকল জাতীর বসতি ছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাক প্রভৃতি পাড়া পাড়া বিলি করিয়া বাস করিতেন। এইরূপে শঙ্খবণিকের নগর, কংস্যবণিকের নগর ও তন্তুবায়ের নগর ছিল। আর এক পাড়ায় গোয়লাগণ বাস করিত। তখন গন্ধবণিকগণ সমাজে আদৃত ছিলেন। কিন্তু, সুবর্ণবণিকগণ সমাজে অত্যন্ত অপদস্থ ছিলেন। নবদ্বীপে যে তাঁহাদের স্থান ছিল, এরূপ বোধ হয় না।

লোকের জীবিকা-নির্বাহ স্বচ্ছন্দে চলিত। এখনকার মতন লোকের প্রয়োজন অধিক ছিল না, দুটি অন্ন পাইলেই চলিয়া যাইত। বিশেষতঃ, তখন মোকদ্দমার ব্যয় ছিল না, কি কোন বলবৎ করও ছিল না। যাহাদের সম্পত্তি ছিল, তাঁহারা অতিথি অভ্যাগত ও দীন-দুঃখীর সাহায্যে কিছুমাত্র কৃপণতা করিতেন না। অতিথি ফিরাইলে সমাজে কলঙ্কিত হইতে হইত। ব্রাহ্মণগণ প্রায় কায়স্থ জমিদারগণ কর্তৃক প্রতিপালিত হইতেন। এইরূপে একা হরিপুরের গোবর্ধন দাসই নবদ্বীপে বহুতর ব্রাহ্মণের প্রতিপালক ছিলেন।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিদ্বজ্জনের সমাজ বলিয়াই নবদ্বীপের প্রাধান্য ছিল। সে কথা পরে বলিতেছি। ধর্মার্জন করা তখন লোকের প্রধান কর্ম ছিল। প্রভাত হইলেই নবদ্বীপবাসীগণ গঙ্গাস্নানে গমন

করিয়া দলে দলে পূজা করিতে বসিতেন; আব গঙ্গা পুষ্পময় হইত। সন্ধ্যা হইলে ঐরূপ আবার লক্ষ লক্ষ লোকে গঙ্গার ধারে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন। গঙ্গা পুলিনের ধারে ধারে প্রশস্ত পথে ফল-পুষ্প সুশোভিত নানাজাতীয় বৃক্ষশ্রেণী ছিল। সেই সকল বৃক্ষতলে বসিয়া পণ্ডিতগণ বিদ্যাচর্চা করিতেন। তখনকার কালে অনেকে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতেন। আর তীর্থ-পর্যটন ভদ্রলোকের অবশ্য কর্তব্য কার্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। এমন কি তীর্থ-দর্শন কুলীনগণের একটা কুল-লক্ষণ ছিল। অথচ তীর্থ-পর্যটন কষ্টকর ছিল, পথ ঘাট বড় ছিল না, বিশেষতঃ অরাজকতার নিমিত্ত সকল স্থানেই দস্যুভয় ছিল। তখন লোক সমুদয় এখন অপেক্ষা সুস্থ, বলিষ্ঠ ও ক্লেশ-সহিষ্ণু ছিল। তখনকার বাঙ্গালীরা এখনকার অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ ছিলেন। ভদ্রলোকেরা অনেকে যুদ্ধে পটু ছিলেন না; কেননা বিদ্যা ও ধর্ম উপার্জনে বিব্রত থাকায় রক্তারক্তিতে তাঁহাদের স্পৃহা ছিল না। যদিও তখন পথ দুর্গম ছিল, তবু বহুতর লোক তীর্থ ভ্রমণ করিতেন। ক্লেশ সহ্য করা এমন অভ্যাস ছিল যে, দুই চারিদিনের উপবাসেও কেহ বিশেষ ক্লিষ্ট হইতেন না।

গৌড়দেশ হইতে যাঁহারা তীর্থে গমন করিতেন, তাঁহারা প্রায় দক্ষিণ দেশেই যাইতেন। তাহার কারণ, তখন পশ্চিমে হিন্দু-মুসলমানে সর্বত্রই বিবাদ চলিতেছিল, কাজেই যাতায়াতের পথ বন্ধ ছিল। এমন যে শ্রীবৃন্দাবন, তাহাও মুসলমানদের উৎপাতে জঙ্গলময় হইয়াছিল, সুতরাং তখন প্রায় কেহই বৃন্দাবনে যাইতেন না। তখন যাঁহারা তীর্থে যাইতেন তাঁহারা শ্রীক্ষেত্র হইয়া বিষ্ণুকাঞ্চী, শিবকাঞ্চী প্রভৃতি দর্শন করিয়া কন্যাকুমারী যাইতেন। পরে সেখান হইতে নাসিক, পাণ্ডুপুর, সৌরাষ্ট্র, দ্বারকা দর্শন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিতেন।

পূজা অর্চনার মধ্যে প্রায় ভদ্রলোক মাত্রেরই বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, কি বৈদ্য, প্রায় সকলেই শাক্ত ছিলেন। কেহ কেহ রামমন্ত্র উপাসকও ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অল্প ছিল। ভদ্রলোকের মধ্যে কেহ বৈষ্ণব ছিলেন না বলিলেও চলে। এমন কি যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত আদর করিয়া পাঠ করিতেন, তাঁহারাও অনেকে শ্রীকৃষ্ণকে মানিতেন না। নবশাকদের মধ্যে কেহ-কেহ বৈষ্ণব ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আপন জাতীয় ব্রাহ্মণের নিকট হইতে মন্ত্র লইতেন, তাঁহাদের বিশেষ কোনরূপ বৈষ্ণব-লক্ষণ ছিল না। তবে অতি অল্প সংখ্যক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে গোস্বামী বলিতেন ও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা দিতেন। পূর্বে বলিয়াছি নবশাকগণের অবস্থা অতি মন্দ ছিল, সুতরাং তাঁহারা যে কি উপাসনা করিতেন ও তাঁহাদের বৈষ্ণবধর্ম কিরূপ ছিল, তাহা এখন জানা যায় না।

ইহার মধ্যে একদল তন্ত্রসাধন করিতেন। ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল যাগ যজ্ঞ মন্ত্র প্রভৃতি নানারূপ ক্রিয়ার দ্বারা দেবতা কি অপদেবতাগণকে বশ করা।* ইঁহারা মদ্যপান, মাংসাহার, সর্ববর্ণ একত্রে ভোজন প্রভৃতি সমাজবিরুদ্ধ আচারে লিপ্ত থাকায়, তামসী নিশিতে নির্জনে আপনাদের সাধনা করিতেন।

সমাজের কর্তা ছিলেন অধ্যাপকগণ। ইঁহারা বহু পরিশ্রমে বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জন করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই তাঁহাদের ধর্মের উপর আস্থা কমিয়া যাইত। এই অধ্যাপকগণ মধ্যে নৈয়ায়িকগণ আবার সকলের উপর প্রভুত্ব করিতেন। তাঁহারা অগাধ বিদ্যাবলে, বুদ্ধির চাতুর্যে, তর্কের ছটায় ও বাক্‌জালবিন্যাসে, সমস্ত দেশ স্তম্ভিত করিতেন। ক্ষোভের মধ্যে এই যে, ধর্মের প্রতি ইঁহাদের আন্তরিক আস্থা প্রায়ই ছিল না।

যখনকার কথা বলিতেছি, সেই সময় ন্যায়শাস্ত্রের চর্চার নিমিত্ত নবদ্বীপ সমুদয় ভারতে বিখ্যাত হইয়াছিল। এ ন্যায়শাস্ত্র পূর্বে নবদ্বীপে ছিল না; ইহার চর্চা মিথিলায় হইত; আর ন্যায় পড়িতে

* কেহ কেহ বলেন যে, তন্ত্রসাধনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ভারতবর্ষ যবন অধিকার হইতে উদ্ধার করা। কিন্তু সে কথা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

হইলে নবদ্বীপের ও অন্যান্য স্থানের পড়ুয়াগণকে মিথিলায় গমন করিতে হইত। মিথিলাবাসী পণ্ডিতগণ গৌড়ীয় পড়ুয়ার বুদ্ধি-তীক্ষ্ণতা দেখিয়া সশঙ্কিত ছিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক তাঁহাদের আধিপত্য নষ্ট হইবে। এই আধিপত্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারা গৌড়ীয় কোন ছাত্রকে ন্যায়ের কোন পুস্তক সঙ্গে আনিতে দিতেন না। কাজেই পুস্তক অভাবে নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল হইতে পারিত না।

ইহার কিছুকাল পূর্বের কথা শ্রবণ করুন। সর্বপ্রথমে রামভদ্র ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে একটি সামান্য প্রকার ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন। নবদ্বীপে রামচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশের সমকালে প্রধান অধ্যাপক দুইজনের নাম শুনা যায়, যথা মহেশ্বর বিশারদ ও নীলাম্বর চক্রবর্তী। নীলাম্বর চক্রবর্তী শ্রীগৌরাঙ্গের মাতামহ। বিশারদের বাড়ী নবদ্বীপের বিদ্যানগরে। তাঁহার দুই পুত্র সার্বভৌম ও বাচস্পতি। ইঁহারা দুই জনে রামভদ্রের টোলে ন্যায় অভ্যাস করিতে লাগিলেন। বিশারদের যেরূপ সতেজ বুদ্ধি, তাঁহার দুই পুত্রেরও সেইরূপ; তবে বোধ হয়, সার্বভৌমের ন্যায় (ইঁহার নাম বাসুদেব) বুদ্ধিমান্ তখন ভারতে কেহ ছিল না। রামভদ্র ন্যায়শাস্ত্র পড়ান বটে, কিন্তু গ্রন্থ অভাবে পদে পদে পদস্খলন হয়। ইহা দেখিয়া আর পড়িতে অনেক কষ্ট পাইয়া, বাসুদেব মনোমধ্যে একটি সংকল্প করিলেন। সেটি এই যে, তিনি যে গতিতেই হউক মিথিলা হইতে ন্যায়ের গ্রন্থ নবদ্বীপে আনয়ন করিবেন। এই মনস্থ করিয়া আর পাঠ সমাপ্তির নিমিত্ত, বাসুদেব মিথিলায় গমন করিলেন। কিছুকাল পরে ন্যায়ের বৃহৎ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া বাসুদেব সার্বভৌম নবদ্বীপে আসিলেন। এই অমানুষিক ব্যাপারের নিমিত্ত বঙ্গদেশ চিরকাল বাসুদেবের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই প্রথম নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল স্থাপিত হইল।

এইরূপে বাসুদেব সার্বভৌম ন্যায়ের গ্রন্থ নবদ্বীপে আনিলেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মিথিলার একাধিপত্য লোপ হইয়া নবদ্বীপে আসিল। সার্বভৌমের খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল, এবং পড়ুয়াগণ ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহার টোলে আসিয়া শ্রীনবদ্বীপ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। এই উপলক্ষে নবদ্বীপের সৌভাগ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল।

বিবেচনা করিতে গেলে নবদ্বীপের প্রতিপত্তি, বাণিজ্যের স্থান, কি রাজধানী বলিয়া ছিল না। সর্বদেশেই রাজার কি বাণিজ্যের স্থান বলিয়া নগরের সৃষ্টি হয়। কিন্তু নবদ্বীপে বাণিজ্যের তাদৃশ সুবিধা বা বিস্তার ছিল না, নবদ্বীপ তখন রাজধানীও নহে,—নবদ্বীপের বাণিজ্য কেবল বিদ্যা লইয়া। নবদ্বীপে ভদ্রলোক মাত্রেই বিদ্যারসে একেবারে উন্মত্ত ছিলেন। কি বৃদ্ধ কি বালক, কি নর কি নারী, সকলেরই মধ্যে শাস্ত্রালাপ ব্যতীত আর প্রায় কোন কার্যই ছিল না।

নবদ্বীপের তখন যে অবস্থা হইল, তাহা কোথাও কোন কালে দেখা যায় নাই। কোন নগর কখন যুদ্ধের নিমিত্ত উন্মত্ত হয়, কখন বা নাগরিকগণ ধনোপার্জনের নূতন কোন পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় উন্মত্ত হয় আবার কখন বা কোন নূতন ধর্ম লইয়া, কি কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তন লইয়া উন্মত্ত হয়। কিন্তু নবদ্বীপ নগর বিদ্যা লইয়া উন্মত্ত হইল। ভদ্রলোক অন্যান্য চিন্তা একেবারে ছাড়িয়া দিল। সকলেরই মনের ভাব যে বিদ্যা উপার্জনই জীবের প্রধান সাধন। যে পণ্ডিত, তাহারই জীবন সার্থক। যে পণ্ডিত সেই মনুষ্য, সেই রূপবান; সেই কুলীন, এবং সেই সুখী। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই বিদ্যা উপার্জনের চেষ্টা আরম্ভ হইত। মাতার একমাত্র ইচ্ছা পুত্র পণ্ডিত হয়, পিতার ত হইবেই। যাহার কন্যা থাকিত, তিনি পণ্ডিত জামাইকে কন্যা দান করিতেন। ধনী লোকে বিদ্বান্ লোক প্রতিপালনের নিমিত্ত ধন ব্যয় করিতেন। বিদ্বান লোক পথে দেখিলে সকলে একপাশ হইতেন। এইরূপে সহস্র সহস্র লোকে দিবানিশি বিদ্যাচর্চা করায় নবদ্বীপের আকৃতি প্রকৃতি অন্য নগর হইতে পৃথক হইয়া গেল। স্ত্রীলোকেরা ঘাটে শাস্ত্র-চর্চা করিতেছে; বালকগণ স্থানে স্থানে বিদ্যা-যুদ্ধ করিতেছে, আর পড়ুয়াগণ নগর একেবারে অধিকার করিয়া লইয়াছে। পড়ুয়াগণ দলে দলে নগরে বেড়াইতেছে, গঙ্গাতীরে স্থানে স্থানে মণ্ডলী করিয়া সহস্র

পড়ুয়া বিদ্যাচর্চা করিতেছে। প্রত্যহ সহস্র সহস্র পড়ুয়া নানা স্থান হইতে নগরে প্রবেশ করিতেছে। সকলেরই বাম হাতে পুঁথি, পুঁথি ছাড়িয়া, পড়ুয়াগণের বাইরে যাইবার যো নাই। পুঁথি তাহাদের ভূষণ, তাহাদের সঙ্গী, বন্ধু ও বল।

প্রত্যেক গলিতে টোল, প্রত্যেক টোলে সহস্র সহস্র পড়ুয়া। স্নান করিবার সময় ঘাটে পড়ুয়ায় পড়ুয়ায় দেখাদেখি হইত, আর বিদ্যাচর্চা ও তর্ক আরম্ভ হইত। এক অধ্যাপকের ছাত্রের সঙ্গে অন্য অধ্যাপকের ছাত্রের বিবাদ বাধিত, কখন কখন এই যুদ্ধে মারামারি পর্যন্ত হইত; কেহ বা সন্তরণ দিয়া ওপারে পলায়ন করিত। স্নানের সময় পড়ুয়ার উৎপাতে গঙ্গা কর্দমময় হইত।

নবদ্বীপে বহুতর লোকের বাসাবাড়ী ছিল। কেহ বা পুত্রকে অধ্যয়ন করাইবার নিমিত্ত এবং কেহ বা বিদ্যাচর্চা করিতে কি শুনিতে নবদ্বীপে থাকিতেন। আবার কেহ কেহ বিখ্যাত অধ্যাপকগণকে দর্শন করিতেও আসিতেন। নবদ্বীপে না পড়িলে কাহারও বিদ্যার সমাপ্তি হইত না।

যদি কোন দেশে কেহ পণ্ডিত হইতেন, তবে তিনি নবদ্বীপে পরীক্ষা দিতে বা দণ্ড করিয়া জয়লাভ করিতে আসিতেন, এবং নগরে তখন হুলস্থুল পড়িয়া যাইত। বিদ্যাই ছিল নবদ্বীপের একমাত্র উৎসব ও আনন্দ।

এইরূপ যখন নবদ্বীপের অবস্থা, সেই সময় সার্বভৌম ন্যায় গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া টোল স্থাপন করিলেন। ভগবানের একটি নিয়ম আছে যে, তাঁহার কাছে একান্ত মনে যাহা চাও, তিনি তাহাই দিয়া থাকেন। নবদ্বীপের লোক যেমন বিদ্যা বিদ্যা করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন, তেমনি এই অদ্ভুত নগরে বিদ্যা শিখিবার লোকের সৃষ্টি ও আবির্ভাব হইতে লাগিল। সার্বভৌম যখন টোল বসাইলেন, তখন রঘুনাথ, রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি ছাত্রগণ সেখানে বিদ্যা উপার্জন করিতেছিলেন, এবং সার্বভৌম টোল করিলেই উহারা সকলেই তাঁহার টোলে প্রবেশ করিলেন।

রঘুনাথ—ইনি দিধীতির গ্রন্থকার। ন্যায়ের এরূপ গ্রন্থ আর নাই। তাঁহার ন্যায় নৈয়ায়িক জগতে আর সৃষ্ট হয় নাই।

ভবানন্দ—ইনি রঘুনাথের সমকক্ষ জগদীশের গুরু। ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, পণ্ডিত জগদীশের নামে ন্যায়শাস্ত্রকে জাগদিশী বলে।

রঘুনন্দন—ইনি স্মার্ত ভট্টাচার্য। ইনি স্মৃতি অষ্টবিংশতি অধ্যায়ে বিভাগ করিয়া যে স্মৃতি-তত্ত্বের সৃষ্টি করেন, তাহা অদ্যাবধি বাংলায় রাজত্ব করিতেছে।

কৃষ্ণানন্দ—ইনি তন্ত্রসার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইনি তন্ত্রসারের রাজা।

এই সকল লোক চিরদিন পূজিত থাকিবেন। ইঁহাদের ন্যায় পণ্ডিত বঙ্গদেশে প্রায় কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইহারা যে কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাবধি দেদীপ্যমান রহিয়াছে; আর যতদিন সংস্কৃত ভাষা থাকিবে, ততদিন ইঁহাদের কীর্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ইঁহারাই নবদ্বীপের, বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের ভূষণ স্বরূপ। ইঁহাদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, তাহা বিচার করা দুষ্কর ও নিষ্প্রয়োজন। এই সময়ে এই সমস্ত ছাত্র পরিবেষ্টিত হইয়া সার্বভৌম বিরাজ করিতেছিলেন।

এই টোলে কিছুকালের জন্য আর একটি ছাত্র পড়িয়াছিলেন। উপরে যে সকল জগদ্বিখ্যাত পড়ুয়াগণের নাম করা গেল, তাঁহারা সকলেই এই ছাত্রটিকে ভয় করিতেন। ইঁহার নিকটে সকলেরই প্রতিভা লোপ পাইয়াছিল। ইঁহারই কথা এই গ্রন্থে লিখিব।

এইরূপে বাসুদেব কর্তৃক নবদ্বীপে নব্য ন্যায়ের সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু তাঁহার আর বেশী দিন নবদ্বীপে বাস করা হইল না। তখন উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গজপতি। এই রাজার দোর্দণ্ড প্রতাপে মুসলমানগণ তাঁহার সুবিস্তৃত রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। তিনি সার্বভৌমের যশ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সমাদর করিয়া এবং বৃত্তি দিয়া নিজের রাজধানীতে লইয়া গিয়া স্থাপন করিলেন। তখন সার্বভৌমের টোল নীলাচল পুরীতে হইল। কিন্তু তাহাতে নবদ্বীপের বড় ক্ষতি হইল না। কেন না, যেমন সার্বভৌম নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন, তেমনি রঘুনাথ রহিলেন, ভবানন্দ

রহিলেন, রঘুনন্দন রহিলেন ও সার্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতি রহিলেন। সার্বভৌম নীলাচল গিয়াছেন শুনিয়া ভারতের তাবৎ স্থান হইতে পড়ুয়াগণ সেখানে জুটিতে লাগিল। সার্বভৌম শুদ্ধ যে ন্যায়শাস্ত্র পড়াইতেন তাহা নহে, বেদ বেদান্ত এবং দণ্ডীদিগের উপযোগী অন্যান্য শাস্ত্রও পড়াইতেন; বহুতর দণ্ডী তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

জগন্নাথ মিশ্র নামক একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ, এই সার্বভৌমের সমাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি উপেন্দ্র মিশ্রের তনয়। নিবাস ছিল শ্রীহট্টের মধ্যে ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে। উপেন্দ্র মিশ্রের সাত পুত্র, জগন্নাথ তৃতীয়। এই জগন্নাথ নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে আসেন, আসিয়া পরম পাণ্ডিত্য লাভ করেন। দেখিতে পরম সুন্দর; এমন কি, নবদ্বীপে তিনি একজন অদ্বিতীয় রূপবান ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। শুধু তাহা নহে, জাত্যংশেও কুলীন, ভরদ্বাজ* বংশজাত। পূর্বে বলিয়াছি যে, নীলাম্বর চক্রবর্তী, সার্বভৌমের পিতা বিশারদ ও গুরু রামভদ্র, এক সময়ের লোক। এই নীলাম্বর চক্রবর্তীর দুই পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম শচী। এই শচীদেবীর সহিত নীলাম্বর জগন্নাথ মিশ্রের রূপ গুণ দেখিয়া বিবাহ দিলেন। জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত পুরন্দর আখ্যা পাইয়াছিলেন। তিনি নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া, অন্যান্য শ্রীহট্টিয়াদের নদীয়ার যে পাড়ায় বসতি ছিল, সেই পাড়ায় বাস করিয়া শচীদেবীকে লইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। এই জগন্নাথ ও শচী আমাদের নিমাইয়ের পিতা ও মাতা। নীলাম্বর তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যরত্নকে দান করেন। চন্দ্রশেখর জগন্নাথের বাড়ীর নিকটে বাস করিতেন।

জগন্নাথ মিশ্র আর শ্রীহট্টে ফিরিয়া গেলেন না। যদিও দরিদ্র, তবু তাঁহার সংসারযাত্রা অনায়াসেই নির্বাহ হইত। জগন্নাথের উপর্যুপরি আট কন্যা হয় এবং সবগুলিই নষ্ট হয়। তাহার পরে এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম রাখেন বিশ্বরূপ। এই পুত্র দম্পতির সর্বস্ব-ধন ছিল। বিশ্বরূপ রূপে গুণে অতুলনীয় ছিলেন। পুত্রের বয়স আন্দাজ আট বৎসর, তখন জগন্নাথের পিতামাতার নিকট হইতে আজ্ঞাপত্র আসিল; তাহাতে লেখা ছিল যে তিনি যেন স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে সত্বর তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আসেন। পিতামাতার এই আজ্ঞাপত্র আসিলে শচীদেবীও শ্বশুর শাশুড়ীকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তাঁহারা দুইজনে তখন পুত্রটিকে লইয়া যাত্রা করিয়া, ক্রমে শ্রীহট্টে নিজ গৃহে পৌঁছিলেন।

ইহা ১৪০৬ শকের কথা। ঐ শকের মাঘ মাসে শচীদেবীর আবার গর্ভ হইল। তখন বিশ্বরূপের বয়ঃক্রম নয় কি দশ বৎসর! কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই যে জগন্নাথের ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না; তবে তাঁহার মাতা শোভাদেবীর আদেশক্রমে তিনি স্ত্রী-পুত্র লইয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন। শোভাদেবী রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন যে, কোন মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন যে, তাঁহার পুত্রবধূর গর্ভে শ্রীভগবানচন্দ্র স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছেন, অতএব তিনি যেন শীঘ্রই ইঁহাদিগকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেন। এইজন্য শোভাদেবী জগন্নাথকে শীঘ্র নবদ্বীপে গমন করিতে আদেশ করেন।

দশহরার সময় গঙ্গাস্নানের যাত্রিগণ সমভিব্যাহারে, জগন্নাথ স্ত্রী-পুত্র লইয়া নবদ্বীপের বাড়ীতে ফিরিলেন। শচীর গর্ভ দশম মাস উত্তীর্ণ হইল তবু পুত্র কন্যা কিছুই হইল না। ক্রমে একাদশ মাসও উত্তীর্ণ হইল। মাঘ মাসে গর্ভ হইয়াছিল, আবার মাঘ মাস আসিল, তবু শচী প্রসব করিলেন না। পরে ফাল্গুন মাস আসিল, তখন জগন্নাথ ব্যস্ত হইয়া শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্তীকে ডাকাইলেন; তিনি বিখ্যাত গণক। নীলাম্বর গণনা করিয়া দেখিলেন, অতি সত্বর শচী প্রসব করিবেন এবং তাঁহার গর্ভে কোন এক মহাপুরুষ জন্ম লইবেন। এই কথা শুনিয়া সকলে সুস্থির হইলেন।

* অমৃত বাজার পত্রিকা অফিস হইতে মুদ্রিত মুরারি গুপ্তের কড়চায় মহাপ্রভু বাৎস্যগোত্রীয় বলিয়া জানা যায়; কিন্তু প্রাচীন বৈদিক ঘটকদিগের কারিকায় তিনি ভরদ্বাজগোত্রীয় বলিয়া লিখিত আছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জ্যোতিষপ্রকাশ গ্রন্থকার এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

চৌদ্দ শত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড বর্গ অষ্ট বর্গ সর্ব শুভক্ষণ॥

এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মপত্রিকা দিয়াছেন, দিয়া তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। জ্যোতিষশাস্ত্র যে সত্য ইহাই প্রমাণ করিবার নিমিত্ত, গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মপত্রিকা দ্বারা দেখাইয়াছেন। অন্যান্য বহুতর জ্যোতিষিগণও এই জন্মপত্রিকা বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ইহাই সাব্যস্ত করিয়াছেন যে এরূপ 'সর্ব শুভক্ষণ' হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট।

প্রথম অধ্যায়

১৪০৭ শকে, পবিত্র জাহ্নবীতীরস্থ বিদ্বজ্জনপরিশোভিত নবদ্বীপ নগরে মনোহর ফাল্গুন মাসে, নির্মল পূর্ণিমা নিশিথে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইলেন। যেমন সন্ধ্যার সময় পূর্বদিকে একখানি সোনার থালার ন্যায় চন্দ্র উদয় হইলেন, অমনি শ্রীগৌরাঙ্গ, সিংহ রাশিতে পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রে, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। সেই সময় আবার চন্দ্রগ্রহণ হইল এবং নবদ্বীপ নগরে সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। গৌরভক্তগণ এই সমুদয় ঘটনা লইয়া নানা কথা বলিয়া থাকেন। শ্রীপাদ কবি কর্ণপুর বলেন যে, চন্দ্রগ্রহণ হইবার আর কোন কারণ ছিল না। বিধি দেখিলেন যখন অকলঙ্ক চন্দ্রস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ উদয় হইলেন, তখন আর সকলঙ্ক চন্দ্রের প্রয়োজন নাই। ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত বিধির ইচ্ছাক্রমে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিল। অন্য কেহ বলেন যে, শ্রীগৌরা অবতীর্ণ হইলে, সেই মহাব্যাপার ঘোষণা করিবার নিমিত্ত গ্রহণ হইল, যেহেতু গ্রহণ হইলে লো মাত্রেই হরিধ্বনি করিবে। প্রকৃত কথা, যেই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন, অমনি নবদ্বীপবাসী স প্রফুল্ল অন্তঃকরণে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সে যাহা হউক, এইরূপে হরিধ্বনির সহিত শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যে নগরে লোক কেবল বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা করিয়া উন্মত্ত, যে সমাজে সূচ্যগ্রভাগাপেক্ষা তী বুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিত লোক বিদ্যমান, যে ন্যায়শাস্ত্রে ভগবান্‌কে স্থাপন করিতেছে ও আবার খণ্ডন করিতেছে, সেই নগরে সেই সমাজে সেই তর্ক-তরঙ্গের মাঝে শ্রীগৌরাঙ্গ উদিত হইলেন। ইহাতে গৌরভক্তগণের মনে নানা ভাব উঠিতে পারে। এরূপ মনে হইতে পারে যে, সমস্ত বিদ্যাচর্চার চরম ফল কি, তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যাচর্চার ফলস্বরূপ স্বয়ং উদয় হইলেন। এরূপও কেহ কেহ ভাবিতে পারেন, পাছে লোকে এ কথা বলে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কেবল নির্বোধ লোককে ভুলাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি সময় বাছিয়া সার্বভৌমের সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতি প্রখর বুদ্ধিমান লোক, যাহাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, যাঁহারা তর্কশাস্ত্র পড়িয়া স্বভাবতঃ আপনাদিগকে সর্বোচ্চ স্থানে আসীন ভাবেন, এমন কি শ্রীভগবানের আধিপত্য পর্যন্ত স্বীকার করিতে গ্লানি মনে করেন, তাঁহারা একপ্রকার দৈত্য, তাঁহাদের ভয়ে দেবগণ পর্য্যন্ত কম্পিত হয়েন এবং যত শুভ সমুদয় লুকাইয়া থাকে। যখন হিরণ্যকশিপু বিরাজমান, তখন তাহার দ্বৈতভাব জগতে আধিপত্য করিত, আর যাহা কিছু ভাল লুকাইয়া ছিল। সেই সময় শ্রীভগবান নৃসিংহরূপে অকুতোভয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেইরূপই কি শ্রীগৌরাঙ্গ, যখন জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ রঘুনাথ বিরাজ করিতেছিলেন, সেইকালে তাঁহার উদয় হইবার উপযুক্ত সময় ভাবিয়াছিলেন? এ সমস্ত নিগূঢ় কথা আমরা ক্ষুদ্র জীব কিরূপে বুঝিব?

শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে একটি বৃহৎ নিম্ববৃক্ষ ছিল, তাহারই তলাতে আঁতুড় ঘরে শ্রীগৌরাঙ্গ

ভূমিষ্ঠ হইলেন। ধাত্রী দেখিলেন যে, শিশুটির জীবনের চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। তখন তাঁহাকে জীবিত করিবার জন্য সকলে যত্ন করিতে লাগিলেন। একটু পরে শিশুটির নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল দেখিয়া সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। শিশুর শরীরটি অপেক্ষাকৃত কিছু বড়, কারণ ইনি ত্রয়োদশ মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন। বর্ণ একেবারে কাঁচা সোনার ন্যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীহট্টিয়গণ যে পাড়ায় বাস করিতেন, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র সেই পাড়ায় গৃহ নির্মাণ করেন। এই পাড়ায় শ্রীমুরারি গুপ্ত বৈদ্যের বাস ছিল। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখন মুরারির বয়স আন্দাজ পনর বৎসর। এই মুরারি গুপ্ত কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা লিখিত হয় এবং ঐ গ্রন্থকে মুরারি গুপ্তের কড়চা বলে। অনন্ত সংহিতা অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। সেই গ্রন্থে এবং মুরারির কড়চায় শ্রীগৌরাঙ্গের আদিলীলা লিখিত আছে। জগন্নাথ পুত্রের নাম রাখিলেন বিশ্বম্ভর। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ও বয়স্যগণ তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতেন, কিন্তু তাঁহার জননী তাঁহাকে নিমাই বলিয়া ডাকিতেন। আর পরিশেষে সেই নামে তিনি নবদ্বীপে সর্বসাধারণের নিকট বিখ্যাত হন। তাঁহার সূতিকাগৃহ নিম্ববৃক্ষতলে ছিল বলিয়া এই নামের সৃষ্টি হয়; কিম্বা নিম্ব তিত, এই জন্য নিমাইকে যমের নিকট তিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার জননী তাঁহাকে নিমাই বলিয়া ডাকিতেন, তাহা লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। উপবীতকালে তাঁহার আর একটি নাম হয় "গৌরহরি"। তাহার বৃত্তান্ত পরে বিবৃত হইবে। ভক্তগণ তাঁহার "শ্রীগৌরাঙ্গ" কি "গৌর" নাম রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বশেষের নাম "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"

এই যে শিশুটি শচী ও জগন্নাথ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি ঠিক অন্য শিশুর ন্যায় নহে। প্রথমতঃ যেরূপ বয়স, তাহা অপেক্ষা তাঁহার শরীর অনেক বড়, সেই শরীরে রোগমাত্র নাই; আর শিশু এরূপ বলবান ও চঞ্চল যে নারীগণ তাঁহাকে কোলে করিয়া রাখিতে পারেন না। শিশুর আর একটি প্রকৃতি দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শিশু স্বভাবে যখন রোদন করে, তখন হরিনাম শুনাইলেই চুপ করে। অন্য রমণীর কোলে আঙ্গিনায় নিমাই রোদন করিতেছে, শচীরাণী ঘরে রন্ধন করিতেছেন, রমণী নিমাইকে থামাইতে পারিতেছেন না; তখন শচী তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "তুই হরি হরি বল, ছেলে থামিবে এখন।" বাস্তবিক তাহাই হইত। রোরুদ্যমান শিশু সঙ্গীত-যন্ত্রের ধ্বনি শুনিলেই যেরূপ চুপ করে, হরিনাম শুনিলে রোরুদ্যমান নিমাই সেইরূপ অমনি চুপ করিত। এদিকে নিমাই কোলে থাকিবে না, নামিয়া পড়িবে। তখন হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছে, কোল হইতে নামিয়াই জানুযোগে দ্রুতগতিতে চলিবে। অন্যমনস্ক হইলেই কোথায় পলাইবে ঠিকানা নাই। এই জন্য নিমাইকে আঙ্গিনায় নামাইয়া প্রতিক্ষণ তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইত। একটু ফাঁক পাইলেই নিমাই আঙ্গিনা ছাড়িয়া রাজপথে উপস্থিত হইল, কি গঙ্গামুখে চলিল; আর যদি দেখিল তাহাকে কেহ ধরিতে আসিতেছে, তবে জানু পাতিয়া দ্রুতবেগে পলাইতে লাগিল। নিমাই যখন এইরূপ হামাগুড়ি দিয়া চলিত, তখন তাহার এক অপূর্ব শোভা হইত। এই শোভা দর্শন করিবার নিমিত্ত শচী তাহাকে আঙ্গিনায় ছাড়িয়া দিতেন এবং তাঁহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া তাহা দর্শন করিতেন। পদ-কর্তা বাসুদেব ঘোষ নিমাইয়ের হামাগুড়ি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

এক মুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচীবালা।।
লালে মুখ ঝরঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্ব-ফল জিনি সুন্দর অধর।।
অঙ্গদ বলয় শোভে সুবাহু যুগলে।
চরণে মগরা খাড় বাঘ নখ গলে।।
সোনার শিকলি পিঠে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপনা।।

নিমাই যখন হাঁটিতে শিখিল, তখন তাহাকে লইয়া জগন্নাথ, শচী ও বিশ্বরূপ, এবং আত্মীয় প্রতিবাসিগণ, সকলেই শশব্যস্ত হইলেন। কোথা কোন্ দিক হইতে নিমাই ছুটিয়া পলাইবে, আর নগরে হারাইয়া যাইবে সকলেরই এই ভয়। বিশেষতঃ একদিন নিমাই একটি সর্প ধরায় তাঁহারা আর বিশ্বাস করিতেন না। আর একদিন এইরূপ আর একটি বিপদ হয়।

এক দিবস মেঘমালী (শিবগীতা গ্রন্থ) নামক একজন চৌর শিশুটিকে এইরূপে পথে সহায়হীন ও স্বর্ণ আভরণে ভূষিত দেখিয়া লোভপ্রযুক্ত তাহাকে লইয়া পলাইল। বাড়ীর সকলে হঠাৎ নিমাইকে না দেখিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কত শত লোক পথ দিয়া যাইতেছে, কে কাহার তল্লাস করে? নিমাইয়ের উদ্দেশ্য না পাইয়া সকলে যখন চিন্তাসাগরে মগ্ন হইয়াছেন, তখন নিমাই দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া পিতার কোলে উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে কে একজন তাহাকে লইয়া গিয়াছিল, আর সেই রাখিয়া গেল। এই মেঘমালীর কথা এখন শ্রবণ করুন। এই দস্যু নিমাইকে স্কন্ধে করিবামাত্র বালকটির প্রতি তাহার গাঢ় স্নেহ ও আকর্ষণ হইল। এই শিশুটিকে বধ করিতে হইবে, এই কথা মনে করিয়া তাহার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। তখন সে কিরূপ নৃশংস ও দুরাচার তাহা মনে বুঝিতে পারিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে প্রথমে নিমাইকে দ্বারে রাখিয়া চলিয়া গেল, পরে তাহার হৃদয়ে ঔদাস্যের উদয় হইল, এবং সেইক্ষণ হইতে মেঘমালী সংসার ত্যাগ করিয়া পরম সাধু হইলেন।

পূর্বে বলিয়াছি শিশুটির আকৃতি মনুষ্যের মত হইলেও, ঠিক অন্যান্য শিশুর মত ছিল না। মনুষ্যের এরূপ গলিত কাঞ্চনের ন্যায় অঙ্গের বর্ণ হয়, ইহা কবিগণ বর্ণনা করিতেন বটে, কিন্তু এই শিশুতেই প্রথমে সকলে উহা প্রত্যক্ষ করিলেন। হস্ততল ও পদতল যেন হিঙ্গুল দিয়া রঞ্জিত। যখন আঙ্গিনা দিয়া শিশুটি হাঁটিয়া যাইত, তখন বোধ হইত যেন পদতল দিয়া শোণিত ঝরিয়া পড়িতেছে। অঙ্গের গঠন সুঠাম। প্রতি অঙ্গের চলন, প্রতি অঙ্গের গতি, নয়নের দৃষ্টি, মুখের হাসি এবং কথা—সমুদয়ই লাবণ্যময়। প্রফুল্ল বদন যেন কুঁদেকাটা,—একেবারে দোষশূন্য। ঠোঁট দু'খানি পক্ক বিম্বের মত। কিন্তু বোধ হয় নয়ন দু'টিই সর্বাপেক্ষা মনোহর। দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের এরূপ আঁখি হইতে পারে, ইহা শিশুকে দেখিবার পূর্বে কেহই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। নয়ন দু'টি পদ্মফুলের ন্যায় দীঘল ছাদের, তাহাতে ঈষৎ রক্তবর্ণের আভা প্রকাশ পাইতেছে, যেন তাহার মধ্যে করুণা-রূপ মকরন্দ টলমল করিতেছে। শিশুটি যাহার প্রতি চাহিত, তাহারই চিত্ত, তদ্দণ্ডে হরণ করিয়া লইত। তাহাকে যে দেখিত, তাহারই মনে কি একটি নূতন ভাবের উদয় হইত। সে ভাবটি এই যে—এইটি কি মনুষ্য-শিশু না দেব-শিশু?

নিমাইয়ের আর একটি অপ্রাকৃতিক গুণ দেখা যাইত, তাহাকে কোলে লইলেই শরীর আনন্দে পুলকিত হইত। কি পুরুষ কি নারী নিমাইকে কোলে করিলে, আর ছাড়িতেন না। সুতরাং শচী আর পুত্রকে কোলে করিবার বড় একটা অবকাশ পাইতেন না।

ইহা ব্যতীত শিশুর জন্ম হইতে শচী, জগন্নাথ ও অন্যান্য নিজ জনে অনেকরূপ অলৌকিক ঘটনা দেখিতে লাগিলেন, শিশু যখন নিদ্রা যাইতেছে তখন কেহ দেখিল যে তাহার হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় কি জ্বলিতেছে। কখন দেখিল সর্বাঙ্গ বিদ্যুৎ দ্বারা আবৃত। আবার কখন শচীদেবী গৃহমধ্যে বহুতর জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখিতে পাইতেন, তখন ভয় পাইয়া জগন্নাথ মিশ্রকে ডাকিতেন। কখন ভাবিতেন এ সব চৌর, আবার কখন ভাবিতেন ইহারা ডাকিনী। ডাকিনী ভাবিয়া শচীদেবী পুত্রের মাথায় রক্ষা বান্ধিয়া দিতেন ও সর্বাঙ্গে থুথু দিয়া মন্ত্র পড়িয়া পুত্রের প্রতি-অঙ্গ জনার্দনকে সঁপিয়া দিতেন।

এক দিবস রজনীযোগে শচীর কোলে শিশু ঘুমাইয়া আছে, শচীদেবী দেখিলেন যে, নানাবিধ জ্যোতির্ময় মূর্তি তাঁহার পুত্রকে ঘেরিয়া কি করিতেছেন। এইরূপ অলৌকিক ব্যাপার মধ্যে মধ্যে দেখিয়া শচীদেবীর তখন একটু সাহস হইয়াছে। তখন তিনি ব্যস্ত হইয়া নিমাইকে ডাকিয়া বলিলেন,

"তুমি তোমার পিতার ঘরে গিয়া শুইয়া থাক।" মনের ভাব এই, পিতার কাছে শুইলে পুত্রের বিপদ্ হইবে না। আর জগন্নাথ মিশ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে, নিমাই তাঁহার ঘরে যাইতেছে, তিনি অগ্রবর্তী হইয়া তাহাকে ঘরে লইয়া যান। নিমাই মায়ের কথা শুনিয়া আঙ্গিনা দিয়া তাহার পিতার ঘরে যাইতেছে, এমন সময় শচী অতি মধুর নূপুরধ্বনি শুনিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া নিমাইয়ের কাছে গেলেন এবং দেখিলেন জগন্নাথ অগ্রবর্তী হইয়া পুত্রকে লইতে আসিতেছেন। এইরূপে উভয়েই পুত্রের শূন্য পায়ে অতি মধুর নূপুরধ্বনি শুনিলেন। পরে নিমাইকে ঘুম পাড়াইয়া দুইজনে পুত্রের কথা কহিতে লাগিলেন। জগন্নাথ বলিলেন, "এ পুত্রের দেহে গোপাল বিরাজ করেন।" বাৎসল্য স্নেহে অভিভূত শচী, ইহাতে আপনাকে কিছুমাত্র গৌরবান্বিত মনে না করিয়া বলিতেছেন "যিনিই থাকুন, যেন আমার পুত্রের কোন অমঙ্গল না হয়।"

গৃহের ভিতর যাহাই হউক, যখন নিমাই খেলা করে, তখন ঠিক সামান্য বালকের মত। নিমাই সমস্ত দিন খেলায় উন্মত্ত। যদিও তাহার পিতা তাহার হাতে খড়ি দিয়াছেন, কিন্তু লেখাপড়ায় শিশুর কিছুমাত্র মন নাই।

বয়স্য শিশুদের সঙ্গে মিলিয়া নিমাই সমস্ত দিন খেলায় উন্মত্ত থাকায় শচী অনেক সময় দুঃখ পাইতেন। যশোদা যেমন নীলমণিকে সাজাইতেন সেইরূপ শচী নিমাইকে সাজাইয়া ছাড়িয়া দিতেন, অমনি নিমাই খেলায় মাতিয়া সর্বাঙ্গে ধূলা মাখিত। শচী ধরিয়া অঙ্গ মুছাইয়া দিতেন, কিন্তু চঞ্চল নিমাই তদ্দণ্ডে আবার যাহা তাহাই হইত! খেলার মত্ততায় নিমাই-এর ক্ষুধা বোধ নাই, রৌদ্র জ্ঞান নাই। ক্ষুধা ও পিপাসায় মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, রৌদ্রে বদন ঘামিয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্ম পড়িতেছে, শচী অনেক তল্লাসে নিমাইয়ের লাগ পাইয়া তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিতেছেন "ওরে অবোধ ছেলে! তোর কি ক্ষুধাও লাগে না? রৌদ্রে তোর সোনার অঙ্গ কালী হইল, তোর কবে জ্ঞান হবে!" কিন্তু নিমাই খেলা ফেলিয়া আসিবে না। তখন কোনদিন শচী জোর করিয়া ধরিয়া আনিতেন; আবার কোন দিন মা ধরিতে আসিতেছেন দেখিয়া নিমাই পালইত। নিমাই পলাইলে ধরেন, শচীদেবীর এমন সাধ্য ছিল না। তখন শচীদেবী কান্দিতেন, আর মায়ের চোখের জল দেখিলে অত্যন্ত কাতর হইয়া নিমাই দৌড়িয়া আসিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিত।

সন্ধ্যা হইলে নিমাইয়ের ঘুমাইবার পূর্বে ক্ষণেক কাল শচী আনন্দ-সাগরে ভাসিতেন। সেই সময় নিমাইকে লইয়া তিনি খেলা করিতেন, এবং নিমাই মায়ের সঙ্গে খেলা করিত।

ঐ সময়ের লোক, পদকর্তা শ্রীবাসুদেব ঘোষ, নিমাইয়ের মায়ের সঙ্গে খেলা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়।।
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু।।
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে।।
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি এই জগ-মন-লোভা।।

আবার চৈতন্যমঙ্গলে ঃ

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে খটী করে।
ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে।।
শচীমা'র স্তনযুগে দু' পা রাখিয়ে।
সোনার লতিকা দোলে যেন বায়ু পেয়ে।।

একদিবস নিমাইচাঁদ একটি কুকুরের ছানা বাড়ী আনিয়া উপস্থিত। সেটিকে পিঁড়ায় তুলিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিল। অতি শুদ্ধা শচী দেবী পুত্রের এই কাণ্ড দেখিয়া কুকুরের ছানা ত্যাগ করিবার নিমিত্ত নিমাইকে অনুনয় ও তাড়না করিলেন, কিন্তু নিমাই কোন ক্রমেই শুনিল না। যাহা হউক নিমাইয়ের অগোচরে তাহার মাতা সেই কুকুরছানা ছাড়িয়া দিলেন। এমন সময় নিমাইয়ের একটি বয়স্য দৌড়িয়া গিয়া তাহকে সংবাদ দিল যে, তাহার মা তাহার কুকুরছানা ছাড়িয়া দিয়াছেন। নিমাইচাঁদ এ কথা শুনিয়া বাড়ীতে দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল যে সত্য সত্যই কুকুরছানা নাই। তখন সে ক্রোধে ও দুঃখে রোদন করিতে করিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। শচীদেবী, আর একটি ভাল ছানা আনিয়া দিব বলিয়া, এবং অনেক যত্ন করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

এইখানে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তুমি এ কুকুরের ছানার কথা কেন লেখ? উত্তর এই যে, যাঁহারা নিমাইচাঁদকে গোলকপতি ভাবেন, তাঁহারা, সেই পরম বস্তু, কুকুর-শাবকের নিমিত্ত ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, ইহা মনে করিয়া একটি অতি মধুর রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। আর কৃপাময় পাঠক! নিমাইচাঁদের সহিত আর একটু পরিচয় হইলে, আপনিও সম্ভবতঃ এ সমুদয় কাহিনী মনে করিয়া সুখ পাইবেন।

শ্রীনিমাইচাঁদের আর একটি অপ্রাকৃতিক শক্তি ছিল। পূর্বে বলিয়াছি, শচীর অগ্রে নাচিবার সময়, নিমাই মধুর অঙ্গভঙ্গি করিয়া নাচিত। কিন্তু নিমাই যে শুধু শচীর অগ্রেই এরূপ নাচিত এমন নহে। তাহার মধুর নৃত্য দেখিবার নিমিত্ত পাড়ার সকলে যত্ন করিত, এবং নাচাইবার নিমিত্ত তাহাকে সন্দেশ ও কলা দিত। নিমাই এক হাতে সন্দেশ ও এক হাতে কদলী লইয়া বাহু তুলিয়া এমন নার্চিত যে, সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। বোধ হইত নিমাই আপনি নাচিতেছে না, কে যেন তাহাকে নাচাইতেছে। নৃত্য দেখিলে, নিমাই যে স্ববশে নাই, তাহা স্পষ্ট বোধ হইত। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্যের কথা, যে সেই শিশুর নৃত্য দেখিতে দেখিতে দর্শকের সংসারে ঔদাস্যের উদয় হইত, মন আর্দ্র হইত, ভক্তিতে শরীর পুলকিত হইত, আর হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ খেলিয়া আনন্দাশ্রু পড়িত। এমন কি, যাঁহারা দেখিতেন তাঁহাদেরও সেই সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে ইচ্ছা করিত, তবে লজ্জায় নাচিতে পারিতেন না।

নৃত্য অঙ্গভঙ্গি মাত্র, তাহাতে এত শক্তি কেন? অন্য একজন অঙ্গভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেছে, তাহাতে দর্শকের কেন সুখের উদয় হয়? নৃত্য কি অদ্ভুত বিদ্যা! ইহার শাস্ত্রও আছে। নৃত্যের কি অদ্ভুত শক্তি তাহা বালক নিমাই দেখাইতেন। চারি বৎসরের শিশু, সর্বাঙ্গ সুন্দর শরীরে কখনও রোগ নাই, সর্বাঙ্গ সুগঠিত বদন যেন পূর্ণিমার চাঁদ, বর্ণ যেন সোন কুসুমের ন্যায়, হৃদয় প্রসর, কটী ক্ষীণ। শচী আঁটিয়া কাপড় পরাইয়া দিয়াছেন, মুখখানি মুছিয়া উহা অলকাবৃত করিয়াছেন, কেশসংস্কার করিয়া মাথায় চূড়া বান্ধিয়া দিয়াছেন, আর সেই চূড়ায় সুবর্ণ ফুল ঝুলিতেছে,—নিমাই শচীর আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছে। আর শচী ও অন্যান্য রমণীগণ হাতে তালি দিতেছেন। নিমাই দুলিতেছে, আর সেইসঙ্গে রমণীগণের হৃদয়ও দুলিতেছে। নিমাই নাচিতেছে, আর তাঁহাদের হৃদয়ও নাচিতেছে। দেখিতে দেখিতে দর্শকগণের নয়নে আনন্দাশ্রু আসিল, বাহ্যদৃষ্টি একটু কমিয়া গেল। তখন তাঁহারা দেখিতেছেন যেন শচীর আঙ্গিনায় একটি অপরূপ সোনার পুতুল নাচিতেছে। ইহাতে জগৎ সুখময় বোধ হইতেছে আর মনে হইতেছে যে, শ্রীভগবান্ পূর্ণানন্দ, তাঁহার রাজ্য সদানন্দ ও তাহার সাক্ষী—নিমাইচাঁদ।

এইরূপে নিমাই কখন কখন বয়স্যগণের মধ্যে আপনি আপনি নৃত্য করিত। নিমাইকে মুখে হরিবোল বলিয়া, দুই বাহু তুলিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে দেখিয়া, বয়স্যগণ তাহাকে ঘিরিয়া হাতে তালি দিত। ক্রমে তাহারাও উন্মত্ত হইয়া "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিত। যথা বাসু ঘোষের পদ ঃ

কিয়ে হাম পেখনু কনক পুতুলিয়া।
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধূলি ধূসরিয়া।।
চৌদিকে দিগম্বর বালকে বেড়িয়া।
তার মাঝে গোরা নাচে হরি হরি বলিয়া।।

কখন নিমাই নাচিতে নাচিতে ধূলায় গড়াগড়ি দিত, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে বয়স্যগণের মধ্যেও কেহ কেহ ধূলায় গড়াগড়ি দিত। যাহার উন্মত্ততা কিছু কম, নিমাই তাহাকে স্পর্শ কি আলিঙ্গন করিবামাত্র সেও, কেন কি জানি, তদ্দণ্ডে উন্মত্ত হইত। এইরূপে "হরিবোল" ধ্বনি শুনিলে শচী তখনই বুঝিতেন যে, এ নিমাইয়েব কাজ; আর দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া অঙ্গ মুছাইতে মুছাইতে বাড়ী লইয়া যাইতেন।

একদিনকার এইরূপ নৃত্য কিছু বড় রকমের হয়। তখন নিমাইয়ের বয়ঃক্রম আন্দাজ চার বৎসর। এই ঘটনাটি আমার অভিন্ন কলেবর শ্রীবলরাম দাস, প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন কবিয়া, কবিতায় যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহ এখানে দিলাম ঃ

সব শিশু মেলি গলে বনমালা পরেছে।
করতালি দিয়া হরি হরি বলে' নাচিছে।। ধ্রু।।

শিশু ধরি কোলে, নিমাই আধ বোলে,
বলে "বোল হরিবোল।"
আলিঙ্গন পেয়ে, উঠিয়ে মাতয়ে,
নাচে, বলে হরিবোল।।
মাঝে গড়ি যায়, নিমাই ধূলায়,
হরি বলে উভরায়।
নিমা'য়েরে ঘিরি, কর-ধরাধরি
শিশুরা নাচিয়া যায়।।
বৃদ্ধ গরবিত, প্রবীণ পণ্ডিত,
পথে যায় সেই কালে।
হাসিবার মন, উলটা ঘটন
সান্ধাইল সেই দলে।।
বৃদ্ধ শিশু সনে, আবিষ্ট হইয়া,
নাচে আর হরি বলে।
লজ্জা নাহি করে, সুখে নৃত্য করে,
ঊর্দ্ধ দুই বাহু তুলে।।
কলসী লইয়া, নাগরিয়াগণ,
নাচিবারে মন ধায়।
দাঁড়াইয়া দেখে, জল বহে চোখে,
দারুণ কুলের দায়।।
হরিধ্বনি শুনি, বুঝিলেন শচী,
এ সব নিমাই-কর্ম।
ধাইয়া আইলা, ভর্ৎসিতে লাগিলা,
"এই কি তোদের ধর্ম।
ক্ষেপা ছেলে পেয়ে, পাগল করিয়ে,
পাইছ মনেতে সুখ।

পর পুত্র লয়ে, এরূপ করিছ,
বুঝ না পরের দুঃখ।।"
ভর্ৎসনা শুনিল, চেতন পাইল,
বিজ্ঞজন ভাবে মনে।
একি অকস্মাৎ কি ভাব হইল,
মতিচ্ছন্ন হ'ল কেনে।।
ঘরে গেল শচী, পুত্র কোলে করি,
বনমালা গলে দোলে।
শচী-কোল হ'তে, আনন্দিত চিতে,
বলাই লইল কোলে।।

শচীর মনে বিশ্বাস যে তাঁহার পুত্রটি খুব ভাল, তবে কু-লোকে কি দুষ্ট বয়স্যগণ তাহাকে পাগল করে। নিশিযোগে নিমাইকে ঘুম পাড়াইতেছেন, নিমাই ঘুমাইতেছে না। নিমাই ক্রমে মায়ের বুকের উপর উঠিয়া দুই স্তনে পা দিয়া ও মায়ের হাত ধরিয়া দুলিতে লাগিল। শচী বলিতেছেন, "বাপ! পাগলামী করিস্ কেন? তুই কি আমার পাগল?"

নিমাই বলিতেছে, "মা, আমিই কেবল পাগল না, আমি ছাড়া আর সবাই পাগল।" এইরূপে মাঝে মাঝে পুত্রের মুখে পাকা পাকা কথা শুনিয়া শচী বিস্মিত হইতেন। অমনি শচী জগন্নাথকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "শুন শুন, তোমার পাগল নিমাই বলে কি! বলে যে, সে ছাড়া আর সকলেই পাগল।।"

আবার ননী না পাইয়া নিমাই রোদন করিত। আর ননী পাইলে হাতে করিয়া নৃত্য করিত। লোচনের এই গীতটি তাহার সাক্ষী ঃ

দেখ দেখ আসি যত নদে-বাসী
আমার নিমাইচাঁদে।
প্রভাতে উঠিয়া বসন ধরিয়া
ননী দে মা বলে কান্দে।।
পুরাণে শুনিল যা নয়নে দেখিল তা।। ধুয়া।।
নাচিছে অঙ্গনে শিশুগণ সনে
নয়নে গলয়ে লোর।
কহয়ে লোচনে শচীর ভবনে
বাসনা পুরিল মোর।।

বয়স্য বালকগণ লইয়া নিমাইয়ের নৃত্য ও হরিকীর্তন বাসুঘোষ এই সুন্দর পদে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া।
চৌদিকে বালক মেলি দেই ঘন করতালি
হরিবোল হরিবোল বলিয়া।। ধ্রু।।
সুরঙ্গ চতুনা মাথে গলায় সোনার কাঠি
সাধ করিয়া মায়ে পরায়েছে ধড়া গাছটি আঁটি।।
সুন্দর চাঁচর কেশ সুললিত তনু।
ভুবনমোহন বেশ ভুরু কামধনু।।
রজত কাঞ্চন নানা আভরণ,
অঙ্গে মনোহর সাজে।

বাজে উৎপল চরণ যুগল,
তুলিতে নূপুর বাজে।।
শচীর অঙ্গনে নাচয়ে সঘনে,
বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেব ঘোষ বলে, ধর ধর কর কোলে,
গোরা মোর পরাণের পবাণি।।

নিমাইয়ের বয়স তখন পাঁচ বৎসরও নয়। ক্রমে নিমাই গঙ্গাতীরে বালুকায় শিশুগণের সহিত খেলা করিতে লাগিল। পাঠে একটু মাত্র মন নাই। পিতামাতাকে ভয় নাই। এক দিবস জগন্নাথ ক্রোধ করিয়া হাতে সাট লইয়া পুত্রকে প্রহার করিতে গঙ্গাতীরে চলিলেন। শচী জগন্নাথের ক্রোধ দেখিয়া, আলুথালু হইয়া পাছে পাছে নিমাইকে রক্ষা করিতে দৌড়িলেন। জগন্নাথের হাতে সাট দেখিয়া নিমাই জননীর কোলে লুকাইল। জগন্নাথ নিমাইয়ের প্রতি তর্জন গর্জন করিয়া শচীকে বলিতেছেন, "তুমি ওকে ছেড়ে দাও। তুমিইত ওকে নষ্ট করিলে।" শচী বলিতেছেন, "তুমি কর কি? ছেলে ডরাইয়া ম'লো। লেখাপড়া ক'রে কি হ'বে। দেখ না ভয়ে কাঁপিতেছে। ছি, হাতের ছড়ি ফেলে দাও।" ইহা বলিয়া ছড়িগাছি কাড়িয়া লইলেন। তখন জগন্নাথও যে জোর করিয়া ছড়ি ধরিয়া রাখিলেন তাহা নহে। নিমাই তখন একটু কান্দিল, ইহা দেখিয়া জগন্নাথের আর ধৈর্য রহিল না। অমনি বাহু প্রসারিয়া নিমাইকে কোলে করিয়া মুখে শত চুম্বন দিয়া কান্দিতে লাগিলেন। আর বলিতেছেন, "আমি কি নিষ্ঠুর! নিমাইকে কান্দাইলাম।"

কাজেই নিমাই আর পড়িত না; কিন্তু তবু নিমাই পিতাকে একটু শঙ্কা করিত। মাতার প্রতি শঙ্কার লেশমাত্র ছিল না। দিবানিশি তাঁহাকে লইয়া, যেন বুঝিয়া সুঝিয়া খেলা করিত। নিমাইয়ের বয়স পাঁচ বৎসর, কিন্তু কোন কোন কার্যের দ্বারা এরূপ বুঝাইত যেন নিমাই সব বুঝে। তখন এইরূপ বোধ হইত যে, তাহার বাল্য-চপলতা সমুদয় কপটতা, আর তাহার মাতার সহিত যত চপলতা করিত, সে সমুদয় সম্পূর্ণ সজ্ঞানে। শচীদেবীর বড় শুচিবাই, এই নিমিত্ত নিমাই সর্বদা জননীকে যন্ত্রণা দিত। যাহা ছুঁইলে দোষ, শচীকে দেখাইয়া দেখাইয়া তাহাই স্পর্শ করিত, আর শচী হাহাকার করিতেন। আর ইহাই বলিয়া নিমাইকে তিরস্কার করিতেন "তুই ব্রাহ্মণের ছেলে, তোর আচার জ্ঞান হ'লো না?" এক দিবস নিমাই উচ্ছিষ্ট ও ত্যজ্য হাঁড়ির উপর হাঁড়ি রাখিয়া তাহার উপর দাঁড়াইল। শচী এই কাণ্ড দেখিয়া পুত্রকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন, "তুই একেবারে মজালি, তোকে ব্রাহ্মণ-পুত্র কে বলবে?" তখন নিমাইচাঁদ অতি গম্ভীর হইয়া বলিতেছেন, যথা মুরারি গুপ্তের কড়চা (৬ষ্ঠ সর্গ) ঃ

শৃণু শুচিরশুচির্বা কল্পনামাত্রমেতৎ,
ক্ষিতিজলপবনাগ্নিব্যোমচিত্তং জগদ্ধি।
বিততবিভবপূর্ণাদ্বৈতপাদজ্জ একো,
হরিরিহ করুণার্বিভাতি ন্যান্যৎ প্রতীহি।।১৬।।

অস্যার্থ ঃ —হে মাতঃ! শ্রবণ করুন। ক্ষিতি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, চিত্ত, জগৎ, শুচি বা অশুচি এই সকলই কল্পনা মাত্র। একমাত্র সেই পরিপূর্ণতম অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীহরির পাদপদ্মের অনন্ত ঐশ্বর্যই সেই ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া জানিবে। তিনি ভিন্ন আর অন্য কিছুই নাই।

এইরূপ ভাবের কথা শুনিয়া শচী বিস্মিত হইলেন। তখন আর নিমাইকে পাঁচ বৎসরের শিশু বলিয়া বোধ হইল না, যেন একজন পরম জ্ঞানী পুরুষ তাঁহার সহিত কথা বলিতেছেন। সেই মুহূর্তে শচীর বোধ হইল যে, তিনি একজন অবোধিনী রমণী ও নিমাই তাঁহার পরম উপদেষ্টা। কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ রহিল না। তদ্দণ্ডে নিমাইয়ের বাল্য-চাপল্য দেখিয়া সব ভুলিয়া গেলেন।

শচী সুবিধা পাইলেই নিমেষহারা হইয়া নিমাইয়ের চন্দ্রমুখ দেখিতেন। কখন কখন নিমাই শচীর সেই ভাব দেখিয়া পিছু ফিরিয়া দাঁড়াইত। মনের ভাব, আপনার মুখ জননীকে দেখিতে দিবে না। শচী ভাবিলেন, পুত্র অন্যমনস্ক হইয়া এরূপ করিতেছে, ইহাই ভাবিয়া তিনি ধীরে ধীরে আবার আগে গিয়া দাঁড়াইলেন। নিমাই অমনি আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন শচী বুঝিলেন, তিনি যে নিমাইয়ের মুখ দেখিতে সতৃষ্ণ, আর উহা দেখিতেছেন, তাহা সে জানিতে পারিয়াছে ও জানিতে পারিয়া দুষ্টুমি করিয়া উহা দেখিতে দিতেছে না। তখন শচী রাগ করিলেন।

নিমাইয়ের বচন অতি মধুর, যখন সে দুই একটি কথা বলে, তখন যেন অমৃত বর্ষণ করে। শচীর ইচ্ছা যে নিমাই কথা বলে, আর তিনি তাহাই বসিয়া শুনেন। নিমাইকে কথা কহাইবার নিমিত্ত কত ছল করিতেছেন। নিমাই জননীর মনের ভাব জানিতে পারিয়া আর মোটেই কথা কহিতেছেন না। শচী বুঝিলেন যে, নিমাই বুঝিয়া তাহার সহিত দুষ্টুমি করিতেছে। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, "তুই এখন আমার সহিত কথা কহিতে চাহিতছিস না, আমার শেষকালে তুই আমাকে ভাত দিবি না।" নিমাই তবু মুখ বুজিয়া রহিল। তখন শচী বলিতেছেন, "তুই আমার সহিত কথা বলিস না। আমি ম'রে যাব, আর তুই পথে পথে মা মা ক'রে কেন্দে বেড়াবি।" নিমাই তবু মুখ বুজিয়া রহিল। তখন স্বভাবতঃ শচী ক্রোধ করিয়া হতে সাট লইয়া পুত্রকে মারিতে উদ্যত হইলেন, এবং নিমাই দৌড়িয়া পলাইল। এই ঘটনা আমার অভিন্ন কলেবর শ্রীবলরাম দাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

মধুর বচন নিমাই বদনে।
সাধ নাহি মিটে বারে বারে শুনে।।
শচী মা জননী বচন শুনিতে।
নিমা'য়ের সনে কত ছল পাতে।।
চতুর নিমাই জানিতে পারিয়া।
চুপ করি থাকে উত্তর না দিয়া।।
"মুখ বুজে বাপ রহিলে বা কেনে?"
নিমাই কহয়ে "শুনিতে পাইনে।।"
চেঁচাইয়া শচী কহে তব কথা।
"কিছুই শুনিতে পাই না গো মাতা।।"
আরো চেঁচাইয়া শচী মা কহয়ে।
নিমাই মাথা নাড়ে কথা নাহি কহে।।
সে ভাব দেখিয়া শচী মা রুষিল।
ঠেঙ্গা হাতে দেখি নিমাই পলাল।।
পাছে পাছে ধায় ঠেঙ্গা হাতে করি।
নিমাই বসিল যথা ঝুঁটা হাঁড়ি।।
নিশ্চিন্ত হইয়া তথা বসি রহে।
মাতা গালি দেয় সে দিকে না চাহে।।
বাম করোপরে নিজ গণ্ড রেখে।
গুন্ গুন্ করি গাহিতেছে সুখে।।
আড় চ'খে চাহ মায়ে দেখি হাসে।
তাহা দেখি শচী অতিশয় রোষে।।
কিন্তু কি করিবে ঝুঁটায় বসিয়া।
ধরিতে নারিয়া বলিছে তুষিয়া।।

"এস বাপ ধন মায়ে দুঃখে পায়।
ভালবাসা নাহি তোমার হৃদয়।।"
তখন নিমাই ধাইয়া আসিল।
বাহু পসারিয়া শচী কোলে নিল।।
ঝুটাতে নিমাই বলাই ভাবিয়া।
ধরিতে নারিয়া আছে দাঁড়াইয়া।

এরূপে ক্রুদ্ধ হইয়া কখন কখন শচী পুত্রকে ধরিতে যাইতেন। তখন পুত্র দৌড়িয়া পলাইত। কখন আস্তাকুড়ে যাইয়া দাঁড়াইত, আর শচী সেখানে যাইতে পারিতেন না। কখন জননী ধরিতে আসিলে অঙ্গে ভাত মাখিত। এইরূপ অশুচি অঙ্গে মাখিয়া পরিশেষে শচীকে তাড়াইত। শচী তখন হাতের ছড়ি ফেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারে খিল দিতেন।

আবার নিমাইয়ের যে সব খেলা, তাহার প্রায় একটিও শচীর ভাল লাগিত না। কারণ এ সব খেলায় নিমাইয়ের অঙ্গে ধূলা, রৌদ্রের তাপ ও কখন কখন ব্যথা লাগিত। নিমাইয়ের এক খেলা বৃক্ষ-পল্লব লইয়া বয়স্যদের সহিত মারামারি। নিমাইয়ের অঙ্গে বয়স্যগণ পল্লবের বাড়ি মারে, ইহা শচীর সহ্য হয় না, কিন্তু নিমাইকে তিনি বাধ্য করিতে পারেন না।

যাহা হউক, শচী বুঝিলেন, তাঁহার পুত্র অন্যের পুত্রের মত নহে। হয় এ পাগল—বুদ্ধি মাত্র নাই, নয় কোন দেবাবিষ্ট। জগন্নাথের বাড়ীর নিকট জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্যভাগবত নামে দুইজন ব্রাহ্মণের বাড়ী ছিল। কোন এক একাদশী দিনে নিমাইচাঁদ কান্দিতে লাগিল। নিমাইচাঁদ কান্দিলেই সকলে ভয় পাইতেন, কারণ নিমাই কান্দিতে আরম্ভ করিলে একটি বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইত। কান্দিবার সময় তাহার এত নয়নজল পড়িত যে তাহা দেখিয়া সকলে ভীত হইতেন। কখন বা কান্দিতে কান্দিতে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত। সে দিবস হরিনামেও নিমাইয়ের রোদন থামিল না। তখন শচী কাতরভাবে বলিলেন, "তুমি কান্দ কেন? তুমি যাহা চাহ তাহাই দিব।" ইহাতে নিমাই বলিল, "হিরণ্যভাগবত ও জগদীশের বাড়ীতে যে একাদশীর নৈবেদ্য আছে, তাহা যদি খাইতে দাও, তবে আর কান্দিব না।"

ইহাতে সকলে জিভ কাটিয়া বলিলেন যে, ঠাকুরের দ্রব্য অমন করিয়া চাহিতে নাই, ঐ সব দ্রব্য বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া দেওয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইবে না; নিমাইয়ের জিদ যে, ঐ দুই ব্রাহ্মণের নৈবেদ্য তাহার চাই, নতুবা স্থির হইবে না।

এই কথা সেই দুই ব্রাহ্মণ শুনিলেন ও তাঁহারা দৌড়িয়া রহস্য দেখিতে আসিলেন। তখন নিমাইকে দেখিয়া তাঁহাদের বোধ হইল যে, এরূপ শিশুর এরূপ বুদ্ধি হইতে পারে না। অদ্য একাদশী সে কিরূপে জানিল। তাহাকে পরম সুন্দর দেখিয়া গোপাল এ দেহে বিরাজ করিতেছেন, আর তিনিই নৈবেদ্য চাহিতেছেন এইরূপ মনে হওয়ায়, তাঁহাদের অঙ্গ পুলকিত হইল। তখন তাঁহারা দুইজনে গিয়া সমুদয় নৈবেদ্য আনিয়া নিমাইয়ের সম্মুখে দিয়া বলিলেন, "তুমিই গোপাল, তুমি খাইলেই গোপালের খাওয়া হইবে।" তখন নিমাই সেই নৈবেদ্য লইয়া কতক খাইল, কতক ফেলিল, কতক বিলাইয়া দিল, আর কতক অঙ্গে মাখিল। শচী ভাবিতেছেন, তাঁহার পুত্রটি কি প্রকৃতই ক্ষেপা? তখন তাঁহার ভগিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভগিনী আসিলে তাঁহাকে বলিলেন যে, এমন সুন্দর ছেলে—এ কেন ক্ষেপা হইল, সেই নিমিত্ত চিন্তিত হইয়া তোমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে তোমাকে ডাকিয়াছি। শচীর ভগিনী পাড়ার দু'চারিজন গৃহিণীকে ডাকিতে বলিলেন।

তখন পাড়ার দুই চারিজন বিজ্ঞ গৃহিণীকে ডাকাইয়া আনা হইল। তাঁহারা সকলে আসিয়া বসিলেন। সকলেই দিবানিশি শাস্ত্রালাপ শুনিতেছেন; আর শুনিয়া শুনিয়া, কিছু বুঝুন না বুঝুন, বুঝেন এরূপ সকলেরই অভিমান আছে। সকলেরই স্বামী পণ্ডিত, সুতরাং তাঁহারা ভাবেন তাঁহাদেরও পরামর্শ দিবার অধিকার আছে।

শচী তাঁহাদের নিকট আপনার দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন যে, "অন্য ছেলের মত তাঁহার পুত্রের মায়াদয়া বেশ আছে, বুদ্ধিও বেশ আছে। ঘরের হাঁড়ি ভাঙ্গে বটে, তাহাতেও দোষ নাই। কিন্তু দেবতা মানে না, দেবতার দ্রব্য খাইতে চায়। উচ্ছিষ্ট মানে না, মুচিকে ছুঁইয়া দেয়, আবার নিষেধ করিলে বলে যে, "আমি দেবতা, আমি যদি অশুচি ছুঁই, তবে সে শুচি হয়।" এইরূপে নিমাইয়ের বহুতর দোষ কীর্তন করিলেন।

তখন রমণীগণ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ পীড়া কত দিন হয়েছে?" শচী বলিলেন, "এক দিন নিশিযোগে ঘরে অনেক জ্যোতির্ময় মানুষের আকার দেখিলাম, যেন তাহারা নিমাইকে লইয়া খেলা করিতেছে, আর সেই দিন হইতে সে যেন আরও চঞ্চল হইয়াছে।" ইহাতে বিজ্ঞ রমণীগণ বলিলেন, "এ নিতান্তই অপদেবতার কর্ম।" এমন সময় নিমাই সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া এই রমণীসভার যিনি প্রধানা, তিনি বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি ব্রাহ্মণের কুমার, পণ্ডিতের পুত্র, তুমি নাকি দেবতা মান না?" নিমাই মুখ ভেঙ্গচাইয়া বলিল, "আমি আবার কোন্ দেবতাকে মানিব? আমাকে সকলে মানিবে।"

ইহা শুনিয়া শচী বলিতেছেন, "ঐ শুন কি বলে! এই সব কথা শুনিয়া আমার ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া যায়। সব দেবতা আমার মাথার মণি।" তখন শচী ঊর্ধ্বমুখে ও করজোড়ে দেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ঠাকুর! আমার উপর সদয় হইয়া, আমার ক্ষেপা ছেলের অপরাধ লইও না।" ইহা বলিয়াই রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বিজ্ঞ রমণীগণ অনেক বিচারের পর সাব্যস্ত করিলেন যে, এ সমুদয় অপদেবতার কর্ম। অতএব একটি ভাল শান্তিস্বস্ত্যয়ন করিতে হইবে, আর যত্ন করিয়া ষষ্ঠী ঠাকুরাণীকে বাধ্য করিতে হইবে। ষষ্ঠীর ভাল করিয়া পূজা দিলে তিনি নিমাইকে রক্ষা করিবেন।

শচী তাহাই সাব্যস্ত করিলেন। কিন্তু নিমাই যদি জানিতে পারে, তবে ষষ্ঠীর সমুদয় দ্রব্যই খাইয়া ফেলিবে, আর তাহা হইলে ষষ্ঠী তুষ্ট ত হবেনই না, বরং রুষ্ট হইয়া তাঁহার মাথা খাইবেন। শচী ইহাই ভাবিয়া অতি গোপনে নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ বিষয়ের আমি বিস্তার করিব না, এই ষষ্ঠীর পূজার কাহিনী ঘটিত আমার অভিন্ন কলেবর শ্রীবলরাম দাসের একটি কবিতা দিব। যথা—

বেলা বহু হ'ল পুত্র না আইল
খেলা করে গঙ্গাতীরে।
হাতে সাট শচী, ধায় গঙ্গাতীরে,
পুত্র আনিবার তরে।।
হাতে সাট দেখি, নিমাই কুপিল,
ধেয়ে এল নিজ ঘরে।
যত ভাণ্ড ছিল, ক্রোধেতে ভাঙ্গিল
ঘরের দ্রব্য ফেলে দূরে।।
পুত্র ব্যবহার, দেখিয়া জননী,
মুখে না নিঃস্বরে বাণী।
মলিন বদনে চাহে পুত্র পানে,
নয়নে বহিছে পানি।।
জননী ক্রন্দন, দেখিয়া নিমাই,
নমিত বদনে কান্দে।
ভয় পেয়ে শচী, কোলেতে লইল,
মুছাইল মুখ চান্দে।।

যখন নিমাই কবয়ে ক্রন্দন,
শান্ত কবা মহাদায়।
কখন কখন, কান্দিতে কান্দিতে,
ভূমে পড়ি মূরছয়।।
চরিত্র বিচিত্র, দেখি নিজ পুত্র
ডাকি আনি নাবী সবে।
শচী বলে দুঃখে, "যুক্তি বল মোকে,
কিসে পুত্র ভাল হবে।।
এ হেন নন্দন, পাগল মতন,
ঝুটা মাখে নিজ গায়।
শাসন করিলে, ক্রোধ করি বলে,
মাগো তোর জ্ঞান নাই।।"
পণ্ডিতের নারী, সবে বড় জ্ঞানী,
শচীবে উপায় বলে।
"ষষ্ঠী ঠাকুরাণী, পূজ পদখানি,
ভাল হবে তোর ছেলে।।"
যুক্তি কবি সার, ষষ্ঠী পূজিবাব,
শচী আয়োজন করে।
নিমাই দেখিলে, ব্যাঘাত হইবে,
এই ভয়ে শচী মরে।।
বাহিরে নিমাই, আনন্দে খেলিছে,
গুপ্ত পথে শচী যায়।
নৈবেদ্য লইয়া, আঁচলে ঝাঁপিয়া
যায় আর ফিরে চায়।।
বহু দূরে গেছে, শচী মা ভাবিছে,
"নিমা'য়ে দিয়াছি ফাঁকি।"
বলিতে বলিতে, নিমাই সম্মুখে,
বলে "মা আঁচলে কি?"
বিপদে শচী মা, ডাকিছে গোঁসাই
"আজি পরিত্রাণ কর।"
পুত্রেরে বুঝায়, "শুন বাপ ধন,
তুমি ফিরি যাও ঘর।।"
নিমাই বলিছে, "আঁচলে কি আছে,
আগে দেখি পরে যাব।
খাবার লইয়ে, চলিছ লুকায়ে,
আমি উহা সব খাব।।"
জিভ কাটি শচী, বলে "বাপধন
উহা ত বলিতে নাই।
পূজা করি আগে, যাইবার বেলা,
দিব সন্দেশ কলা খৈ।।"

"সে অনেক দেরি, এবে ভুখে মরি"
বলি নিমাই হাত দিয়ে।
নৈবেদ্য লইয়া, চলিল ধাইয়া,
খায় মা'য়ে চেয়ে চেয়ে।।
শচী কোপে ভয়ে, কহিছে তনয়ে,
"বামুনের পুত্র তুই।
কি দুঃখ আমার, কি বলিব আর,
গঙ্গা প্রবেশিব মুই।।"
কহিছে নিমাই, "অবোধিনী তুই,
পুনঃ মোরে দেহ গালি।
আমি যদি খাই, ষষ্ঠী তুষ্ট হয়,
সার কথা তোরে বলি।।"
"শুনিলে শুনিলে," শচী তবে বলে,
যত সঙ্গী নারী প্রতি।
"শুনিলে, শুনিলে, মোর ক্ষেপা ছেলে,
কি কথা করিল উক্তি?"
ষষ্ঠী কাছে গিয়া, শচী মা কান্দিয়া,
বলে "ক্ষম ক্ষেপা ছেলে"।
শচীর তরাসে, ষষ্ঠী মনে হাসে,
আনন্দে বলাই বলে।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, নিমাইয়ের পীড়া যেরূপ হইয়াছিল সেইরূপই রহিল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী কিছু ভাল করিতে পারিলেন না। শান্তি-স্বস্ত্যয়নেও কিছু হইল না।

মুরারি গুপ্তের কথা পূর্বে বলিয়াছি। ইঁহার বাড়ী শ্রীহট্টে, নবদ্বীপে বাস। সেই জন্য ও অন্যান্য নানা কারণে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সহিত সৌহৃদ্য এবং উভয়ের এক পাড়ায় বাস। মুরারির বয়ঃক্রম তখন আন্দাজ বিংশতি বৎসর, পরম পণ্ডিত, গঙ্গাদাসের টোলে ব্যাকরণ পড়েন, আবার চিকিৎসা ব্যবসাও করেন; এই অল্প বয়সেই নবদ্বীপে খ্যাতিপন্ন হইয়াছেন। চরিত্র নির্মল, জীবে অতি দয়া। তবে যোগবাশিষ্ঠ পড়েন, আপনাকে ভগবানের সহিত অভেদ মানেন, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি মানেন না।

এক দিবস মুরারি কয়েকজন বয়স্য সমভিব্যাহারে যোগবাশিষ্ঠের চর্চা করিতে করিতে চলিয়াছেন। অত্যন্ত অন্যমনস্ক—হাত নাড়িতেছেন, মুখ নাড়িতেছেন ও মাথা নাড়িতেছেন। এইরূপে বয়স্যগণকে মনের ভাব বুঝাইবার নিমিত্ত একান্ত চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় পশ্চাতে হাস্যরব শুনিতে পাইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখেন যে, তাঁহার গতি, অঙ্গভঙ্গী ও কথা অনুকরণ করিয়া নিমাই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, আর বালকগণ তাই দেখিয়া হাসিতেছে। নিমাইয়ের কাণ্ড দেখিয়া মুরারির ক্রোধ হইল, কিন্তু অতীব গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া তিনি সহ্য করিয়া রহিলেন এবং পুনরায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। নিমাইও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যাখ্যা অনুকরণ করিয়া হাতমুখ নাড়িতে লাগিল। ইহাতে বালকগণ আবার হাসিয়া উঠিল। এবার মুরারি সহ্য করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "জগন্নাথের একটি অকালকুষ্মাণ্ড জন্মিয়াছে, ইহাকে ভাল কে বলে?" বলরাম দাসের নিকট আবার ঋণ করিতে বাধ্য হইতেছি। তিনি উপরি উক্ত ঘটনাটি নিম্নোদ্ধৃত পদে বর্ণনা করিয়াছেন। দামোদর পণ্ডিতের জিজ্ঞাসা মতে মুরারি বৈদ্য বলিতেছেন ঃ

বৈদ্য বলে শ্রীহট্টিয়া মিশ্র জগন্নাথ।
আমি শ্রীহট্টিয়া পিরীতি তাঁর সাথ।।
নূতন বয়স মোর বিদ্যার গৌরব।
সর্ব নবদ্বীপময় আমার সৌরভ।।
আপনাকে করি আমি জ্ঞানী অভিমানী।
বাশিষ্ট পড়িয়া ভক্তি আদৌ নাহি মানি।।
একদিন জন কত বন্ধু সঙ্গে করি।
পথে যাই, জ্ঞান কই, হাত নাড়ি নাড়ি।।
সেই পথে শচী-সুত ধূলায় ধূসর।
শিশু সনে খেলা করে হয়ে দিগম্বর।।
"সোঽহং" বুঝাইয়া যাইতে যাইতে।
শচী-সুত মোর পিছে আসে ভেংচাইতে।।
চলিছি, কহিছি, হাত নাড়িছি যেমন।
আসিতেছে শচী-সুত করিয়া তেমন।।
কটাক্ষে দেখিয়া কিছু না কনু বচন।
পুনঃ ব্যাখ্যা করি আমি যোগ আর জ্ঞান।।
যেইরূপ ব্যাখ্যা করি সেই মত করে।
যেন হাত মুখ নাড়ি সেই মত নাড়ে।।
শিশুগণ হাসিতেছে দেখে ক্রোধ হ'ল।
"হারে জগন্নাথ-সুত কুষ্মান্ড অকাল।।
জগন্নাথ ঘরে দুরাচার এ জন্মেছে।
বাপের আদরে ক্রমে দ্বিগুণ বাড়িছে"।।
ভ্রূকুটি করিয়া নিমাই বলে "যাও চ'লে।
তোমা ভাল শিক্ষা দিব ভোজনের কালে।।"
মধ্যাহ্ন ভোজনে আমি এমন সময়।
অতীব গম্ভীর স্বরে ডাকে কে আমায়।।
শুনিতে পুছিতে নিমাই আইল সম্মুখে।
আমি খাই তথা সেই দাঁড়াইয়া দেখে।।
তার পর মোর থালে প্রস্রাব করিল।
"ছি ছি" বলি উঠি আমি, বড় ক্রোধ হ'ল।।
হেন কালে নিমাই মোরে চাহিয়া কহিল।
নয়নে আগুন জ্বলে দেখে ভয় হ'ল।।
"হাত নাড়া মাথা নাড়া ছাড় হে মুরারি।
জ্ঞান ও বক্তৃতা ছাড় ভজহে শ্রীহরি।।
জীব আর ভগবানে ভিন্ন যে না করে।
প্রস্রাব করি আমি তার থালের উপরে।।"
বলিয়া চকিতের মত কোথা চ'লে গেল।
ক্ষণেকের মত মোর অঙ্গ স্তব্ধ হ'ল।।
পুলকে পুরিল অঙ্গ সে কথা শুনিয়া।
আনন্দে পূরিল অঙ্গ রাগ না হইয়া।।

পাছে ধাই গেনু জগন্নাথ-মিশ্র ঘরে।
প্রণমিনু শচী-সুতে লোটাইয়া শিরে।।
আমাকে দেখিয়া তখন ধূর্ত শিরোমণি।
জননী-অঞ্চলে লুকাইল মুখখানি।।
জগন্নাথ বলে "তুমি কি কাজ করিলে!
অকল্যাণ হবে মোর সুতে প্রণমিলে?"
তখন কহিনু "মিশ্র কিছু দিন পরে।
জানিবে কে জন্মিয়াছে তোমরা মন্দিরে।।'
ভোজন ব্যাঘাত ভাবি দাঁড়াইয়া ছিল।
দাঁড়া'বার হেতু বলাই ইহাই বুঝিল।।

*মুরারি গুপ্তের ঘর, গেলা নিজ অভ্যন্তর, ভোজন করয়ে বৈদ্যরাজ।
মেঘগম্ভীর নাদে, নিজ মন পরসাদে, মুরারি বলিয়া দিল ডাক।।
স্বর শুনি স্মরিল, বিশ্বম্ভর যে বলিল, গুপ্তবেজা চমকিত চিত।
হেনকালে গৌরহরি, কি কর কি কর বলি, সেইখানে হইল উপনীত।।
তরস্ত না হও তুমি, এইখানে আছি আমি, ভোজন করহ'বাণী বৈল।
মধ্যাহ্ন ভোজন বেলা, ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেলা থাল ভরি এমত মূতিল।।
কি কি বলি ছিছি করি, উঠিল সে মুরারি, করতালি দিয়া বোলে গোরা।।
কর শির নাড়িয়া, ভক্তিযোগ ছাড়িয়া, তর্জা বোল এই অভিপারা।।
—চৈতন্যমঙ্গল, আদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্বে শ্রীনিমাইচাঁদের দাদা শ্রীবিশ্বরূপের নামের উল্লেখমাত্র করিয়াছি। তাঁহার বিষয় এখন সবিশেষ বলিব। পূর্বে বলিয়াছি যে, বৈষ্ণবের সংখ্যা সে সময় অতি অল্প ছিল। কমলাক্ষ মিশ্র নামক একজন বারেন্দ্র দেশীয় ব্রাহ্মণ শান্তিপুরে বাস করিতেন। ইনি অল্প বয়সে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া মাধবেন্দ্র পুরী নামক একজন শ্রীকৃষ্ণভক্তের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। পরে যোগ, তপস্যা, সাধন, ভজন প্রভৃতি দ্বারা শক্তিসম্পন্ন হইয়া সর্বলোকের পূজ্য হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় তখন তাহার মত পণ্ডিত কেহ ছিলেন না। তিনি অল্পসংখ্যক বৈষ্ণব-পার্ষদ লইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম যাজন করিতেন। সেই সময়ে যে অল্পসংখ্যক বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহারা সমাজে বড় অপদস্ত থাকিতেন। তাঁহারা কমলাক্ষের সভায় বসিয়া আপনাদের সম্প্রদায়ের হীনাবস্থার নিমিত্ত দুঃখ করিতেন। কমলাক্ষ তখন হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিতেন, "তোমরা স্থির হও, আমার প্রভু শ্রীনন্দনন্দন সত্বরই নয়নগোচর হইবেন।" শুধু যে ভক্তগণকে বলিয়া বুঝাইতেন তাহা নয়, আপনিও সেই সঙ্কল্প করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেন। গঙ্গাজল আর তুলসী দিয়া শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম পূজা করিতেন আর বলিতেন, "প্রভো! সত্বর আগমন কর, আর বিলম্ব করিও না। জীব অধোগতির শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। তোমা বই জীবের আর উদ্ধারের উপায় নাই।" এইরূপে স্তব করিতেন আর হুঙ্কার ছাড়িতেন। এই কমলাক্ষ মিশ্র পরিশেষে অদ্বৈতাচার্য্য নামে পরিচিত হয়েন। ইঁহার বাড়ী শান্তিপুরে বটে, কিন্তু নবদ্বীপেও আর একটি বাড়ী ছিল, এবং সেখানেই সর্বদা থাকিতেন। নিমাইচাঁদের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ এই অদ্বৈত আচার্য্যের সঙ্গ পাইলেন।

যখন বিশ্বরূপের বয়ঃক্রম আন্দাজ দশ বৎসর, তখন নিমাই অবতীর্ণ হয়েন। এতদিন বিশ্বরূপ একা ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা কি ভগিনী না থাকায় তাঁহার যত ভ্রাতৃস্নেহ লোকনাথকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই লোকনাথ তাঁহার মাতুলতনয়, তাঁহার সমবয়স্ক। তাঁহার মাতামহ নীলাম্বরের

নিবাস নবদ্বীপের বেলপুখুরিয়া পাড়ায় ছিল। নীলাম্বরের দুই পুত্র,—যজ্ঞেশ্বর ও হিরণ্য; আর দুই কন্যার কথা পূর্বে বলিয়াছি। লোকনাথ ও বিশ্বরূপে অতিশয় প্রণয়, দুইজনে একত্র পর্যটন ও একত্র পঠন করেন। যখন নিমাই অবতীর্ণ হইলেন, তখন বিশ্বরূপ আনন্দে পুলকিত হইয়া সুতিকা গৃহে যাইয়া কনিষ্ঠকে কোলে করিলেন।

বিশ্বরূপের রূপ ও গুণের তুলনা ছিল না। বুদ্ধি এত সতেজ যে, অতি অল্প বয়সে সমস্ত শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন। ছোট ভাইকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন। কিন্তু দিবানিশি শাস্ত্রাভ্যাসে নিযুক্ত থাকায় তাহার প্রতি তত দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না। কাজেই নিমাইয়ের চাঞ্চল্য আরও বাড়িয়া যাইত। একে পিতা জগন্নাথ অকুলান সংসারের ব্যয় কুলাইবার নিমিত্ত সর্বদা বাড়ী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন, তাহাতে বিশ্বরূপ টোলে, কি বাড়ীতে যেখানেই থাকুন কেবল পুস্তক লইয়া থাকিতেন, কাজেই নিমাইকে দেখিবার লোক কেহ ছিল না। কিন্তু দাদার নিকট নিমাই বড় নম্র থাকিত। নিমাই দাদাকে যত সম্মান করিত, এমন কি পিতাকেও তত করিত না।

ইতিমধ্যে অদ্বৈতাচার্যের সহিত বিশ্বরূপের মিলন হইল। বিশ্বরূপকে দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত ও তাঁহার সভাসদ্গণ বড় মুগ্ধ হইলেন। বিশ্বরূপও অদ্বৈতের সভায় বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতত্ত্ব শুনিয়া বড় সুখ পাইলেন। তাঁহার পাঠের সঙ্গিগণের মধ্যে কেহ জ্ঞান, কেহ তন্ত্র, কেহ বা মায়াবাদ চর্চা করিতেন। এ সকলের আলোচনায় বিশ্বরূপ দিবানিশি ক্লেশ পাইতেন, এখন অদ্বৈতের সভায় শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তির আলোচনায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া সেখানেই সর্বদা থাকিতেন।

যখন বিশ্বরূপ টোলে পড়িতেন, তখন অপরাহ্নে গৃহে থাকিতেন। যখন অদ্বৈত-সভায় প্রবেশ করিলেন তখন হইতে প্রায় দিবানিশি সেইখানেই থাকিতে লাগিলেন। এমন কি, বাড়ীতে মধ্যাহ্নে খাইতে আসিতেও মনে থাকিত না। মধ্যে মধ্যে শচী নিমাইকে অদ্বৈত-সভা হইতে তাহার দাদাকে আনিতে পাঠাইতেন। যখন নিমাই অদ্বৈতসভায় দাদাকে ডাকিতে যাইতেন, তখন সভাস্থ সকলে একদৃষ্টে নিমাইয়ের রূপ-লাবণ্য দর্শন করিতেন। অদ্বৈত বলিতেন, "এ শিশুটি আমার চিত্ত এরূপে কেন হরণ করে? এটি কি বস্তু?" বলরাম দাসের আর একটি পদ উদ্ধৃত করিব ঃ

যৌবন আরম্ভ ষোল বৎসর বয়স।
অঙ্গেতে লাবণ্য-লীলা বদনে উদাস।।
মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘশ্বাস সুখ নাহি তায়।
বসিয়াছেন বিশ্বরূপ অদ্বৈত-সভায়।।
মলিন বদন-শশী দেখিয়া অদ্বৈত।
বলিছেন "স্থির হও, শান্ত কর চিত।।
সত্বর আসিবে কৃষ্ণ জীব উদ্ধারিতে।
আর না হইবে বাপ তোমায় কান্দিতে।।"
বলিতেই আঙ্গিনায় নিমাই আসিল।
দেখি বিশ্বরূপ মুখ প্রফুল্ল হইল।।
ত্রিভুবনে বিশ্বরূপের সুখ কিছু নাই।
একমাত্র সুখ নিমাই-চাঁদ ছোট ভাই।।
দিগম্বর আঙ্গিনায় বলিছে নিমাই।
"ভাত খাবার লাগি দাদা ডাকিছেন মা'য়"।।
সবে বলে কি সুন্দর কথা ও মুরতি।
শুনি তাহা বিশ্বরূপ মনে সুখী অতি।।
দক্ষিণ হস্তে বস্ত্র ধরি নিমাই চলিছে।
দাদা বাম হাতে তার গলাটি ধরিছে।।

চলিছে নিমাই বাস চিবাতে চিবাতে।
দাদা বলে "নিমাই উহা না হয় করিতে"।।
"কেন দাদা কাপড় চিবালে কিবা দোষ"?
দাদা বলে "ঠাকুর উহাতে করেন রোষ"।।
এইরূপ ভা'য়ে কোলে করি আধা-পথে।
দুই ভাই চলিলেন কথাতে কথাতে।।
বিশ্বরূপ বসিলেন ভোজন করিতে।
ছোট ভাই দিগম্বর বসিলেন সাথে।।
মা'য়ে খাওয়াইলে দ্বন্দ্ব প্রতি গ্রাসে গ্রাসে।
সুশান্ত হইয়া খায় দেখি শচী হাসে।।
বিশ্বরূপ বিশ্বাস করেন নিজ চিতে।
নিমায়ের মত শিশু নাই ত্রিজগতে।।
মূর্খ লোক নিমায়ের চাঞ্চল্য দেখিয়া।
নিন্দা করে বিশ্বরূপ দুঃখ পান হিয়া।।
বলে "ভাই চাঞ্চল্য না কর শিশু সনে।
লোকে নিন্দা করে বড় ব্যথা পাই মনে।।
চুরি করি খাও তুমি অন্য বাড়ী যাও।
আমি তোমা আনি দিব যাহা তুমি চাও।।
যদি কেহ ছোট ভাই থাকিত তোমার।
তবে সে বুঝিতে তুমি কি দুঃখ দাদার"।।
দাদার বচনে হেঁট নিমাই বদন।
"বল ভাই আর না সে করিবে এমন?"
"করিব না" নিমাইচাঁদ বলিবারে গেল।
কণ্ঠরোধ হয়ে গেল বলিতে নারিল।।
সুধাংশু বদনে বহে মুকুতার ধারা।
হেঁট বদনেতে আছে ভিজে গেল ধরা।।
ভাব দেখি বিশ্বরূপ আঁখি ছল ছল।
অঙ্গ কাঁপে থর থর নিমাই মুরছিল।।
ব্যস্ত হয়ে নয়নেতে জলছাটি মারে।
"নিমাই" "নিমাই" বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।।
নয়ন মেলিল নিমাই বুকেতে করিল।
আপনার কান্ধের পরে বদন রাখিল।।
কান্দিতে লাগিল নিমাই করণার স্বরে।
বিশ্বরূপ মাতা পিতা সবে শান্ত করে।।
অঙ্গ কাঁপে থর থর দাঁতে দাঁত লাগে।
নিমাই নিমাই বলি বিশ্বরূপ ডাকে।।
ক্রমে ঘুমাইল দেখি ধীরে শোয়াইল।
বিশ্বরূপ বসি মুখ দেখিতে লাগিল।।
বদন লাবণ্যময় তাহে মৃদু হাস।
ভ্রাত-স্নেহে ভাগ্যবান বলরাম দাস।।

জগন্নাথ মিশ্র দরিদ্র, অন্নচিন্তায় বিব্রত থাকিতেন, এবং বিশ্বরূপ দিবানিশি অদ্বৈত-সভায় থাকিতেন। সুতরাং পিতা পুত্রে বড় একটা দেখাশুনা হইত না। একদিবস রাজপথে জগন্নাথ বিশ্বরূপকে দর্শন করিয়া পুত্রের বিবাহোযোগী বয়স দেখিয়া, তাহার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং বাটী আসিয়া শচীদেবীর সহিত যুক্তি করিতে লাগিলেন। বিশ্বরূপ ইহা জানিতে পারিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

তাঁহার হৃদয়ে তখন বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইবেন না, ইহা তখন স্থির করিয়াছেন। এদিকে তাঁহার গুরুজনের প্রতি ভক্তির ইয়ত্তা ছিল না। পিতা কি মাতা যদি তাহাকে বিবাহ করিতে আজ্ঞা করেন, তবে সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে তিনি গুরুজনদ্রোহী হইয়া পতিত হইবেন। এমন স্থলে কি কর্ত্তব্য? বিশ্বরূপ ভাবিলেন তাঁহার গৃহত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

অবশ্য গৃহত্যাগ করিলে সন্তানবৎসল মাতাপিতা মর্ম্মাহত হইবেন। কিন্তু যদি তাঁহারা আপাতত দুঃখ পান, পরিণামে তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। কারণ শাস্ত্রে আছে, যে কুলে একজন সন্ন্যাসী হয়েন, সে কুল উদ্ধার হইয়া যায়। আবার ভাবিলেন যে, গৃহত্যাগ করিলে নিমাইয়ের উপায় কি হইবে? কে তাহাকে বিদ্যাশিক্ষা দিবে, কেই বা তাহার তত্ত্বাবধান করিবে? কিন্তু গৃহত্যাগ করিতেই হইবে, নতুবা সংসারে আবদ্ধ হইতে হইবে। তখন নিমাইয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে একটি কথা স্থির করিলেন। শচীদেবীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা! আমার একটি কথা রাখিতে হইবে। নিমাই যখন বড় হইবে তখন তাহাকে এই পুঁথিখানি দিবে। বলিও তোমার দাদা তোমাকে এই পুঁথিখানি পড়িতে দিয়াছেন। অবশ্য তুমি আমার এ কথা রাখিবে।" ইহাই বলিয়া শচীদেবীর হস্তে একখানি পুঁথি দিতে গেলেন। ইহাতে শচী অবাক্ হইয়া বলিলেন, "তুমি ত নিজেই দিতে পারিতে?"

বিশ্বরূপ বলিলেন, "যদি আমি দিতে পারি, তাহা হইলে তোমার দিতে হইবে না; কিন্তু মা! মরণ বাঁচনের কথা কিছুই বলা যায় না। অতএব মা আমার এ কথাটি রক্ষা করিও।" শচী অগত্যা উহা স্বীকার করিলেন এবং পুস্তকখানি নিকটে রাখিলেন।

বিশ্বরূপ ও লোকনাথ যদিও সমবয়স্ক, সমাধ্যায়ী ও পরস্পর ভ্রাতৃসম্পর্কীয় তত্রাচ লোকনাথ বিশ্বরূপকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। ইহা বিচিত্র নহে, যেহেতু রূপে গুণে বিশ্বরূপ দেবতার ন্যায় ছিলেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিবেন লোকনাথকে বলিলেন। লোকনাথও তদ্দণ্ডে বলিলেন যে, বিশ্বরূপ যেখানে যাইবেন, তিনি তাঁহার পশ্চাৎ ছাড়িবেন না। বিশ্বরূপ কাজেই লোকনাথকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন।

বিশ্বরূপের বয়ঃক্রম তখন ষোল বৎসর মাত্র। বালক বলিলেই হয়, লোকনাথ তাহার ছোট। এই দুই জনে রজনীতে জগন্নাথের বাড়ীতে শয়ন করিয়া রহিলেন। শীতকাল। রজনী আন্দাজ এক প্রহর থাকিতে দুই জনে উঠিলেন। সম্বলের মধ্যে একখানি গ্রন্থ সঙ্গে লইলেন। আঙ্গিনায় আসিয়া নিদ্রিত মাতাপিতাকে প্রণাম করিলেন আর নিমাইকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া দ্রুতপদে গঙ্গাভিমুখে চলিলেন। এত রাত্রে পার হইবার কোন উপায় ছিল না। সুতরাং বাম হস্তে পুঁথিখানি উর্দ্ধ করিয়া ধরিয়া, অন্য হস্ত দ্বারা সাঁতার দিয়া গঙ্গাপার হইলেন এবং সেই শীতকালে আর্দ্র বস্ত্রে পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে একজন পুরীসম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। নাম হইল শঙ্করারণ্যপুরী। বিশ্বরূপ যেই মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, লোকনাথও তৎক্ষণাৎ তাঁহার (বিশ্বরূপের) নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া গুরুর দণ্ডকমণ্ডলুধারী হইলেন। সংসারে যখন দুঃখের মুখ দেখেন নাই, এমন দুইজন তরুণ বালক এইরূপে দণ্ডকমণ্ডলুধারী হইয়া অনন্ত-পথের পথিক হইলেন।

পর দিবস আহারের সময় অতীত হইল, বিশ্বরূপ অদ্বৈত-সভা হইতে আসিলেন না। সেখানে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল বিশ্বরূপ সেখানে যান নাই। বেলপুখুরিয়ায় অনুসন্ধান করা হইল, বিশ্বরূপ বা লোকনাথ দুইজনের কেহই সেখানে নাই। ক্রমে শচী জগন্নাথ শুনিলেন যে বিশ্বরূপ

তাঁহাদের ও তাঁহার কনিষ্ঠের মায়া-বন্ধন ছেদন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিতে গিয়াছেন। যদি পুত্র নিজের সুখের নিমিত্ত, কি নির্মমতায়, কি অন্য কোন ক্ষুদ্র কারণে ছাড়িয়া যায়, তবে তাহা সহ্য করা যায়। এমন পুত্রকে নিষ্ঠুর কি অকৃতজ্ঞ বলা যায়? কিন্তু সংসারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সমস্ত মধুর বন্ধন ছেদন করিয়া, যদি কোন প্রিয়জন শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত বনে গমন করে, তবে তাহার বিরহ অসহনীয় হয়। সুতরাং শচী জগন্নাথের শুধু পুত্রশোক নহে, আরও কিছু। আমার পুত্র মদনমোহন, আমার পুত্র নদীয়া-জয়ী, আবার আমার পুত্র নির্মল ও সাধু। পিতা মাতা ইহা মনে করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা অমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন।

অতি সুন্দর, সুবোধ, পিতৃ-মাতৃ-অনুগত, ভ্রাতৃবৎসল, পরম জ্ঞানী ও ভক্ত; অল্পবয়স্ক বালক বৃক্ষতলবাসী হইল, এই কথা ভাবিয়া নদীয়ার লোকে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন,—শচী জগন্নাথের ত কথাই নাই। জগন্নাথের কর্তব্য শচীকে প্রবোধ দেওয়া, কিন্তু তাহা তিনি পারিলেন না। বন্ধুবান্ধবে বুঝাইতে লাগিলেন যে তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের পুত্র ধন্য, তাঁহাদের পুত্র হইতে কল উজ্জ্বল হইল। ইহা শুনিয়া তাঁহারা শান্ত হইতে পারিলেন না। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহারা পুত্রকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন? সে বাসনা বিন্দুমাত্রও তাঁহদের মনে ছিল না। ষোল বৎসরের পুত্র না বুঝিয়া সন্ন্যাস করিয়াছে। তুমি আমি হইলে তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া, তাহাকে বুঝাইয়া পুনরায় সংসারে প্রবেশ করাইতাম। আর শ্রীভগবানের নিকট ইহাই বলিয়া কাঁদিতাম যে, "হে নাথ! এই বালক বাল্য-চাপল্যে সন্ন্যাস লইয়া, ধর্ম ত্যাগ করিয়া আবার সংসারী হইয়া যে ঘোর অপরাধ করিয়াছে, তাহা তুমি ক্ষমা কর।" কিন্তু জগন্নাথ তাহা করিলেন না। তিনি শ্রীভগবানের নিকট অন্যরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

অয়ং বয়োনূতনমেব সংশ্রিতো
বতাধিশিশ্রায় যতিত্বমেব যৎ।
তদা বিধাতাঃ করুণা বিধীয়তাং
সদাত্র ধর্মে নিরতো ভবেদ্ যথা।। ২য়, সর্গ ৯৬।।

জগন্নাথ এই প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার পুত্র ধর্ম নষ্ট করিয়া যেন গৃহে ফিরিয়া না আইসেন। শচীদেবীও কোন সময়ে এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কাজেই নিমাই, শচী-জগন্নাথের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা এরূপ ভক্ত না হইলে শ্রীনিমাইয়ের ন্যায় পুত্র তাঁহাদের কেন লাভ হইবে?

নিমাইয়ের বয়স তখন ছয় বৎসর। সে খেলায় বাইরে ছিল। বাড়ীতে রোদনধ্বনি শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল। বাড়ীতে আসিয়া শুনিল যে তাহার দাদা সন্ন্যাস করিতে গিয়াছেন। নিমাই বুঝিল দাদা আর আসিবেন না, দাদাকে আর দেখিতে পাইবে না, এই কথা বুঝিয়া নিমাই মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

তখনই শচী ও জগন্নাথ ক্ষণকালের নিমিত্ত বিশ্বরূপকে ভুলিলেন, এবং অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নিমাইয়ের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনেক সন্তর্পণে নিমাই চেতনা পাইল। তখন শচী ও জগন্নাথ নিমাইয়ের গাঢ় ভ্রাতৃ-স্নেহ দেখিয়া তাঁহাদের নিজের শোক কিঞ্চিত বিস্মৃত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহাদের নিজের শোক না করিয়া শোকাকুল নিমাইকে সান্ত্বনা করাই কর্তব্য। ইহাই ভাবিয়া পুত্রকে নানামতে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, এবং শতবার তাহার মুখচুম্বন করিলেন। সেই অবধি নিমাই চাঞ্চল্য ছাড়িল। নিমাই যদিও দুগ্ধপোষ্য শিশু, তবু মাতাপিতাকে গদ্‌গদ হইয়া বলিল "বাবা মা, তোমরা শান্ত হও। আমি তোমাদিগকে পালন করিব।"

বিশ্বরূপ ষোড়শ বৎসরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পুনা নগরের নিকট পাণ্ডুপুর নগরে অতি অলৌকিকরূপে অদর্শন হয়েন।

যথা, কর্ণপুরকৃত "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা" গ্রন্থে—

যদা বিশ্বরূপোঽয়ং তিরোভূত সনাতনঃ
নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদা স্থিতঃ।।
ততোঽবধূতো ভগবান্ বলাত্মা ভবন্ সদা বৈষ্ণববর্গ মধ্যে।
জজ্বাল তিগ্মাংশু সহস্রতেজা ইতি ব্রুবন্ মে জনকো ননর্ত্ত।।৬৩।।

যথা, ভক্তমালগ্রন্থে—

"শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপ মতি।
দার পরিগ্রহ নাহি কৈল, হৈলা যতি।।
শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরীতে নিজ শক্তি।
অর্পি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি।।
নিত্যানন্দ প্রভু এক শক্তি সঞ্চারিলা।
ভক্তগণ মধ্যে তেজঃপুঞ্জ রূপ হৈলা।
সহস্র সূর্য্যের তেজ ধারণ করিলা।
শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিলা।।"

ইহার ষোল বৎসর পরে নিমাই তাঁহার জ্যেষ্ঠের অদর্শন স্থান দেখিতে গিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সমস্ত পূর্ব চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া নিমাই মনোযোগপূর্বক পড়িতে লাগিল। এমন কি তিলার্দ্ধও মাতাপিতাকে ছাড়িত না। পাছে নয়নের অন্তরালে গমন করিলে মাতাপিতার মনে বিশ্বরূপের শোক পুনরুদ্দীপিত হয়, ইহাই ভাবিয়া গৃহে বসিয়া পিতার নিকট পাঠাভ্যাস করিত। নিমাইকে কোলে করিয়া জগন্নাথ পড়াইতেন, আর শচী নিকটে বসিয়া আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া পুত্রমুখ দেখিতেন। নিমাইয়ের মধুর চরিত্রে শচী ও জগন্নাথ অনেক সান্ত্বনা পাইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে একটী অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হইল।

এক দিবস ঠাকুর-পূজার নৈবেদ্যের তাম্বুল লইয়া নিমাই খাইল, আর তদ্দণ্ডে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। নিমাইয়ের অজ্ঞান অবস্থা তাঁহার মাতাপিতা বহুবার দেখিয়া উহার নিমিত্ত তখন আর ভয় পাইতেন না। তাঁহারা নিমাইকে চেতন করিবার নিমিত্ত নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই নিমাই চেতন পাইল; চেতন পাইয়া একটি অদ্ভুত কথা বলিল। নিমাই বলিতেছে, "বাবা, মা, একটি কথা শুন। দাদা আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। আর আমাকে বলিলেন, তুমি আমার মত সন্ন্যাসী হও।" তখন আমি দাদাকে বলিলাম, "আমার বয়স এখন অল্প, আমি এখন সন্ন্যাসের কথা কি বুঝিব? আমি ঘরে থাকিয়া মাতাপিতার সেবা করিব। তাহা হইলে লক্ষ্মী-জনার্দন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন।" এই কথা শুনিয়া দাদা বলিলেন, "ভাল, তবে তুমি যাও, যাইয়া মাতাপিতাকে আমার কোটী নমস্কার জানাইও।"

এই কথা শুনিয়া শচী-জগন্নাথের হর্ষে বিষাদ হইল। এইরূপে দৈবযোগে পুত্রের সংবাদ পাইয়া, আর সে যে তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হয় নাই শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহারা অত্যন্ত ভীতও হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, বিশ্বরূপ কি নিমাইকেও ঘরের বাহির করিবে নাকি?

শচী এই ভয়ের কথা অল্পদিন মধ্যেই ভুলিয়া গেলেন, কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র ভুলিলেন না। তিনি দিবানিশি ঐ কথা ভাবিতে লাগিলেন। শেষে মনে মনে একরূপ স্থির করিলেন যে, একটা ছেলে পড়িয়া শুনিয়া জানিল যে সংসার অনিত্য, আর ঘরের বাহির হইল। আর এটাকেও পড়াইলে ঠিক তাহাই হইবে। অতএব নিমাইকে পড়িতে না দেওয়াই ভাল। মূর্খ হইবে, কিন্তু তবু ত ঘরে থাকিবে; দুটি অন্ন বিধাতা অবশ্যই নিমাইকে দিবেন। সমস্ত রাত্রি এই কথা ভাবিয়া প্রভাতে জগন্নাথ যখন

গৃহের বাহিরে গমন করেন তখন নিমাইকে ডাকিলেন। আর নিমাই আসিলে বলিলেন, "বিশ্বম্ভর! আজ হইতে তোমার পাঠ বন্ধ। আমার দিব্য লাগে, যদি তুমি ইহার অন্যথা কর।"

নিমাই পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল না। পাঠ বন্ধ করিয়া পুনরায় খেলায় উন্মত্ত হইল। পূর্বে খেলা হয় বাড়ীর ভেতরে, না হয় বাড়ীর নিকটে হইত, এখন এ-পাড়ায় সে-পাড়ায় হইতে লাগিল। পূর্বেকার খেলা শিশুর মত ছিল, এখন বালকের মত আরম্ভ হইল। সুরধুনীতে স্নান করিতে গমন করিয়া নিমাই এখন আর বহুক্ষণ বাড়ী আসিত না। তাহার জলকেলির প্রতাপে ভব্যলোক অস্থির হইয়া পড়িলেন। নিমাই কখন ডুব দিয়া কাহার পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়, কখন পূজার ফুল লইয়া আপনি পূজা করিতে বসে, কখন বা পূজার নৈবেদ্য লইয়া আপনি আহার করে। ক্রমেই জগন্নাথ মিশ্রের নিকট নিমাইয়ের নামে নানা অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। জগন্নাথ পুত্রের সকল উপদ্রবই সহিয়া থাকিতেন, আর যাহারা অভিযোগ করিতে আসিত তাঁহাদিগকে তিনি মিনতি করিয়া শান্ত করিয়া বিদায় করিতেন। এইরূপে রমণীগণও শচীদেবীর সমীপে অভিযোগ করিতে লাগিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়া বিদায় দিতেন। কখনও শচীদেবী নিমাইকে ধমকাইতেন। তাহতে নিমাই এই উত্তর করিত, "তোমরা আমাকে পড়িতে দিবে না, কাজেই আমি মূর্খের মত ব্যবহার করিব না ত কি করিব?" ইহাতে শচী আবার পুত্রকে পড়াইবার নিমিত্ত কখন কখন জগন্নাথের নিকট অনুনয় করিতেন। আর বলিতেন যে, পুত্র পড়িতে পায় না বলিয়া দুঃখিত এবং সেইজন্য উপদ্রব করে। কিন্তু জগন্নাথ পড়াইবার কথায় সম্মত হইতেন না। বিশ্বরূপ তাঁহাকে যে ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনে ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছে যে, নিমাই পড়িলেই সংসার ছাড়িয়া যাইবে। নিমাইয়ের উপদ্রব বর্ণনা করিয়া বলরাম দাস এই কবিতাটি লিখিয়াছেন ঃ

শচী প্রতি যত নিমাই করে অত্যাচার।
সে সব শচীর কাছে সুখের পাথার।।
যেই মাত্র সাজায়েন সোণার তনয়ে।
অমনি মায়েরে হেসে ধূলা মাখে গায়ে।।
সারাদিন খেলি বেড়ায় গঙ্গার বালিতে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা রৌদ্র বোধ নাহি নিমাই-চিতে।।
ধরিবারে গেলে দ্রুত পলাইয়া যায়।
উদ্দেশ না পেয়ে শচী খুঁজিয়া বেড়ায়।।
পড়সীর ক্ষতি করে নিমাই দুরন্ত।
তারা মা'য়ে আসি বলে সকল বৃত্তান্ত।।
চপল নিমাই এমনি করে অপচয়।
রাগ না হৈয়া তাহে আরো হাসি পায়।।
ঘরে শিশু শুয়ে আছে নিমাই যাইয়া।
ধীরে গিয়া মুখে চিত্র করে কালি দিয়া।।
কারো ঘরে দুধ খেয়ে পলা'বার বেলা।
চেঁচাইয়া বলে, 'তোদের দুধ খেয়ে গেলা'।
হাসি শচীর কাছে বলে নিমাই-অত্যাচারে।
লজ্জা পেয়ে শচী দুটী করে ধরে।।
কখন কখন শচীর মনে রাগ হয়।
সাট হাতে করি পুত্রে মারিবারে যায়।।
ক্ষণ পরে মাতা-পুত্রে দ্বন্দ্ব মিটি যায়।
মা'য়ে পুত্রে পিরীতের অবধি না হয়।।

যবে সাট হাতে শচী মারিবারে যান।
তখন নিমা'য়ের আছে পলা'বার স্থান।।
এটো হাঁড়ি প'ড়ে আছে বাড়ীর বাহিরে।
তখন নিমাই যায় তাহার মাঝারে।।
অতি শুদ্ধা শচী সেথা যাইতে না পারে।
তর্জ্জে গর্জ্জে নিমাই হাসে মা'র মুখ হেরে।।
কখন না নিমাই রাগ শোধ নিবার তরে।
সরলা জননী সহ নানা খেলা করে।।
অঙ্গে ঝুটা মাখি মা'র আগেতে দাঁড়ায়।
মা'য়ে ছুঁতে যায় শচী ভয়েতে পলায়।।
মুচী বাড়ী এলে নিমাই পরশিয়া তারে।
মায়ে ছুঁতে যায়, শচী সরি যায় ডরে।।
"বল মাতা আর কভু না মারিবি মোরে।
নতুবা আজ এই ছুয়ে দিব তোরে।।"
স্বীকার করেন শচী ভয়ে বার বার।
"আজ ক্ষম বাপ কিছু বলিব না আর।।"
কখন গম্ভীর হয়ে মা'র প্রতি কয়।
"এঁটো ঝুটো মন-ভ্রান্তি আর কিছু নয়।।"
সে সময়ে শচী বড় মনে পান ভয়।
ভাবে নিমাই পুত্ররূপে কোন্ মহাশয়।।

এক দিবস নিমাই সেই এঁটো হাঁড়ির স্থানে উপস্থিত। হাঁড়ির উপরে হাঁড়ি বসাইয়া উচ্চ করিয়া তাহার উপর বসিল। শচী পূর্বেকার মত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই নিমাই ভুলিল না। শেষে নিমাই বলিল, "যদি তোমরা আমাকে পড়িতে না দাও, তাহা হইলে আমি এ স্থান ত্যাগ করিব না।" তখন সেখানে আরও দুই চারি জন রমণী জুটিয়াছিলেন। তাঁহারা নিমাইয়ের পক্ষ হইয়া শচীদেবীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "নিমাই যে দুরন্তপনা করে, তাহাতে তাহার কোন দোষ নাই। বালকে স্ব-ইচ্ছায় পড়িতে চায় না। তোমাদের সৌভাগ্য যে পুত্র না পড়িতে পাইয়া দুঃখ বোধ করিতেছে।" তখন শচী নিমাইয়ের কাছে প্রতিশ্রুত হইলেন যে তাহার পিতার কাছে বলিয়া তাহার পড়ার বিষয় অনুমতি করাইয়া দিবেন।

শচীর ও পাড়ার বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে জগন্নাথ নিমাইকে আবার পড়িতে দিলেন। নিমাই তখনই সমস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া পড়ায় আবার মনোনিবেশ করিল। নিমাইয়ের বুদ্ধিতে সকলেই চমকিত। একবার পড়িলেই পরিষ্কার বুঝিয়া লয়। আবার তাহার উপর নানা তর্ক করে। পড়াতে তাহার মন এত যে, যে সময় সমবয়স্ক বালকেরা খেলা করে, সে তখন নির্জনে বসিয়া পাঠ অভ্যাস করে।

এইরূপে নিমাইয়ের নয় বৎসর বয়স হইল। তখন জগন্নাথ পুত্রের উপবীত দিবার পরামর্শ করিলেন। তাঁহাদের গুরু ও পুরোহিত বিষ্ণু পণ্ডিত ও সুদর্শন প্রভৃতি অনেক অধ্যাপক আমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। নানাবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল, নিমাইকে তেল-হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করান হইল, নিমাইয়ের রূপ তাহাতে যেন অঙ্গ বহিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর নিয়মানুসারে নিমাইয়ের মস্তক মুণ্ডন করান হইল। তখন জগন্নাথ পুত্রের কর্ণে গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করিলেন।

এই সময়ে একটি অদ্ভুত ঘটনা হইল। নিমাইয়ের মস্তক মুণ্ডনের পর যখন তাঁহাকে রক্তবস্ত্র পরানো হইল, তখন সেই নবীন ব্রহ্মচারীর কিরূপ লাবণ্য হইল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু

যখন পিতা কর্ণে মন্ত্র দিলেন, তখন নিমাই আবিষ্ট হইয়া প্রথমেই হুঙ্কার ও গর্জন করিল, এবং কিছুকাল পরে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। সকলে দেখেন যে, সমস্ত অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে ও সর্বাঙ্গ হইতে অমানুষিক তেজ বাহির হইতেছে, আর নয়ন হইতে ধারা বহিয়া পৃথিবী ভিজিয়া যাইতেছে। তখন সকলে আস্তে আস্তে সন্তর্পণে নিমাইকে চেতন করিলেন। নিমাই চেতন পাইয়া আর কিছু বলিল না। তখন তাহার মুখের ভঙ্গী এরূপ গম্ভীর বোধ হইল যে, তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহস হইল না। তখনই নিমাই পিতার হস্ত ধরিয়া নিয়মমত নিভৃত স্থানে যাইয়া বসিলেন।

উপস্থিত পণ্ডিতগণ নিমাইয়ের এই আবেশ ভাব দেখিয়া অবাক হইলেন। তাহার শরীরে যে কোন দেবতার আবেশ হইয়াছিল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন। অনেকে ইহাই অনুমান করিলেন যে, এই সুন্দর বালকের দেহে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিয়া থাকেন। সেই দিন হইতে নিমাইয়ের আর একটি নাম হইল "গৌর-হরি।" এবং সেই অবধি কেহ কেহ তাঁহাকে "গৌর-হরি" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

নিমাই নিভৃত স্থানে নিয়মমত থাকিয়া বাহিরে আসিলেন, এবং যাঁহার যেরূপ অভিরুচি তিনি সেইরূপ ভিক্ষা দিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া সকলে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ নিমাইকে একটি সুপারি দিলেন। তিনি সেই সুপারি তখনই খাইলেন, খাইতে খাইতে অতি গম্ভীর স্বরে জননীকে ডাকিলেন। শচীদেবী আসিয়া দেখেন যে, নিমাইয়ের আকৃতি প্রকৃতি সমস্ত পরিবর্তিত হইয়াছে। যেন কোন পরম জ্ঞানী পুরুষ বসিয়া আছেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় তেজ বাহির হইতেছে, আর সেই আলোকে তাঁহার চতুষ্পার্শ আলোকিত হইয়াছে। শচী পুত্রের নিকট আসিয়া ভয়ে তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইলেন। পুত্রের ভাব দেখিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তখন নিমাই গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মা, তুমি আর একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ করিও না।" ইহাতে শচীদেবী অতিশয় অপরাধিনীর ন্যায় বলিলেন, "আমি অদ্যাবধি তোমার আজ্ঞা পালন করিব।" শচীর তখন নিমাইকে পুত্র বলিয়া বোধ ছিল না। কাজেই নিমাইয়ের 'ইচ্ছা" তখন তাঁহার নিকট "আজ্ঞা" বলিয়া বোধ হইল। নিমাই শচীদেবীকে বিদায় করিয়া দিলেন।

একটু পরে নিমাই আবার জননীকে ডাকিলেন। শচী দ্রুতপদে আসিলে তিনি বলিলেন, "মা! আমি এই দেহ এখন ত্যাগ করিয়া চলিলাম, সময়মত আসিব। এই যে দেহটী রহিল, এইটী তোমার পুত্র, ইহা যত্ন করিয়া পালন করিও।" এই কথা বলিয়া নিমাইচাঁদ যেমন জননীকে প্রণাম করিতে গেলেন, অমনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শচী ব্যস্ত হইয়া নিমাইয়ের মুখে জলের ছাট মারিতে লাগিলেন। অনেক সন্তর্পণে একটু পরে নিমাই চেতন পাইলেন। তখন শচী দেখিলেন যে, একটু পূর্বে নিমাই যে বস্তু ছিলেন, এখন আর সে বস্তু নাই; অঙ্গের সে তেজ আর নাই, এখন অঙ্গ-লাবণ্য পূর্বেরই মত। বদনে আর সে গাম্ভীর্য নাই, এখন আমার সেই নিমাইচাঁদেরই চাঁদ-মুখ।

এই ঘটনাটি মুরারি গুপ্ত তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছিলেন। আর এ সম্বন্ধে তিনি কিছু বিচারও করিয়াছেন। অর্থাৎ শচীর পুত্র নিমাই বা কে, আর যিনি আসিয়া আবার চলিয়া গেলেন তিনিই বা কে? গুপ্তের অভিপ্রায় কি, সে বিষয়ে আমরা এখানে কোনও বিচার করিব না। তবে এই ঘটনার দ্বারা সুবোধ ও বিচক্ষণ লোকে অবতার প্রকরণটি কি, তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন। যিনি বলিলেন, "আমি এখন যাই পরে আবার আসিব", তিনি পরে আসিয়াছিলেন এবং তখন তাঁহার পরিচয় দিয়াছিলেন। যথা মুরারি গুপ্তের কড়চা-(৭ম সর্গ)

নিবেদিতং পুগফলাদিকং যৎ দ্বিজেন ভুক্ত্বা পুনরব্রবীত্তাম্।
ব্রজামি দেহং পরিপালয়স্ব সুতস্য নিশ্চেষ্টগতং ক্ষণাদ্ধম্।। ২১
ইত্যুক্তা সহসোত্থায় দণ্ডবচ্চাপতদ্ভুবি।। ২২

অস্যার্থ ঃ—কোনও ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিবেদিত একটি সুপারি খাইয়া তিনি আবার তাঁহার মাতাকে বলিয়াছিলেন, "আমি এখন চলিলাম; আপনার পুত্রের স্পন্দনহীন দেহটিকে আপনি পালন করুন।"

এই বলিয়া সহসা উঠিয়া দণ্ডবৎ করিতে গিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন*।

জগন্নাথ মিশ্র এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিমাই, তুই কি অদ্য বলিয়াছিলি যে, আমি যাই, তোমার পুত্র রহিল?" শিশু নিমাই অবাক হইয়া বলিলেন, "কবে? কি ব'লেছিলাম? আমি ত কিছু বলি নাই—" জগন্নাথ দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র নিমাই এই কাণ্ডের তথ্য কিছুমাত্র জানে না।

এখন হইতে জগন্নাথের দিন বড় সুখে যাইতে লাগিল। অধ্যয়ন ব্যতীত নিমাইয়ের আর কোন কার্য নাই। আর তাহার পূর্বেকার মত দুরন্তপনা নাই, লোকে নিমাইয়ের সুখ্যাতি বই নিন্দা করে না। নিমাই সুদর্শন ও বিষ্ণু পণ্ডিতের নিকট পাঠ করেন। অধ্যাপকগণ বলেন ত্রিভুবনে এমত বুদ্ধিমান্ ছাত্র আর নাই। নিমাইয়ের রূপও ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছে। জগন্নাথ এক দিবস গোপনে গৃহের ঠাকুর রঘুনাথের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, নিমাই ঘরে থাকিয়া যেন সংসার করে, আর চিরজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকে। দৈবাৎ নিমাই এ কথা শুনিয়া চুপ করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন জগন্নাথ নিমাইয়ের রূপ লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, তাহাকে যেন "ডাকিনী স্পর্শ না করে", তখন নিমাই লজ্জা পাইয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

নিমাইয়ের বয়ঃক্রম তখন আন্দাজ একাদশ ও শচীর আন্দাজ পঞ্চান্ন সুতরাং জগন্নাথ তখন বৃদ্ধ। এই সময় তাঁহার হইল জ্বর। জ্বর দেখিয়া সকলে ভয় পাইলেন। শেষে জগন্নাথের অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে, শচী ক্রন্দন করিবার উপক্রম করিলেন। তখন নিমাই মাতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন যে, রোদন পরে হইবে, এখন পিতার অন্তিমের শুভ দেখিতে হইবে। ইহাই বলিয়া, খাটের উপর করিয়া, মাতা-পুত্রে শায়িত জগন্নাথকে লইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে সুরধুনী তীরে গমন করিলেন। বন্ধুবান্ধব সঙ্গে চলিলেও পিতাকে বহন করিবার ভার নিমাই কাহাকেও দিলেন না। তিনি স্বয়ং ও তাঁহার জননী তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

জগন্নাথের শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হইল। তখন নিমাই ধৈর্য হারাইলেন এবং পিতার দুটি চরণ হৃদয়ে ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন "বাবা, আজ অবধি আমার বাবা বলা ফুরাইল, তুমি আমাকে কাহার হাতে সঁপিয়া যাইতেছ? কে আমাকে যত্ন করিয়া পড়াইবে?"

তখন জগন্নাথ একটু সজীব হইয়া নিমাইকে বুকের উপর লইলেন ও বলিলেন, "নিমাই, আমার মনের সকল সাধ পুরিল না, তোমাকে আমি রঘুনাথের হাতে সঁপিয়া গেলাম। বাপ, তুমি আমাকে ভুলিও না।" ইহাই বলিয়া জগন্নাথ আর কথা কহিলেন না; তখন জগন্নাথ মিশ্র "আধনাভি গঙ্গাজলে" রঘুনাথের নাম অস্ফুট-স্বরে জপিতে জপিতে মর্ত্যলীলা সম্বরণ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

শচী দ্বাদশবর্ষীয় পিতৃহীন বালকটীকে লইয়া আপনাকে এরূপ সহায়হীনা ভাবিতে লাগিলেন যে, পতিশোকের নিমিত্ত ভাল করিয়া ক্রন্দনও করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ অনেক ঘটনা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, নিমাইয়ের অন্তর ভালবাসায় পূর্ণ, তিনি কান্দিলে পুত্রের পিতৃশোক উথলিয়া উঠিবে এবং নিমাই অন্তরে ভয় পাইবে। শচী মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, নিমাই যে পিতৃহীন, কাঙ্গাল ও সহায়শূন্য হইয়াছে, ইহা তাহাকে সাধ্যমত জানিতে দিবেন না। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া শচী পতিশোক সহ্য করিয়া একান্তমনে কেবল পুত্রের সেবা করিতে লাগিলেন। সংসারের ব্যয় অতি অল্পই ছিল, একপ্রকারে চলিয়া যাইত। তবে তিনি স্ত্রীলোক, সহায়হীনা, পুত্রটীকে কিরূপে পড়াইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া

* এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ইহার সুমীমাংসা স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে।

পুত্রটিকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ী লইয়া গেলেন।

গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য ব্যাকরণে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার স্বভাব অতি নির্মল ছিল। বাটীর অভ্যন্তরে যাইয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া অন্তরাল হইতে ক্রন্দন করিতে করিতে শচী বলিলেন, "আমি এই পিতৃহীন বালকটিকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তুমি কৃপা করিয়া ইহাকে আপন পুত্র ভাবিয়া বিদ্যাভ্যাস করাইয়া যশ ও ধর্ম উপার্জন কর। অন্যান্য ছাত্রকে পড়াইলে তোমার যে যশ ও ধর্ম হইবে, নিমাইকে পড়াইলে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে, কারণ এ বালক পিতৃহীন—অসহায়।" এই বলিয়া শচী নিমাইয়ের হাত ধরিয়া গঙ্গাদাসকে দিলেন।

গঙ্গাদাস বলিলেন, "নিমাইয়ের মত শিষ্য বহুভাগ্যে মিলে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যথাসাধ্য ইহাকে পড়াইব। আর ইহার পিতা নাই বলিয়া ইহার পড়ার কিছু ব্যাঘাত হইবে না।"

তখন নিমাই গুরুর চরণে প্রণাম করিলেন, আর গঙ্গাদাস আশীর্বাদ করিলেন, "তোমার বিদ্যালাভ হউক।"

এখন হইতে নিমাই নিয়মমত গঙ্গাদাসের টোলে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের বুদ্ধি অমানুষিক, পাঠ দেওয়া মাত্র বুঝিতে পারেন। নিমাই তখন এরূপ মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন যে, অতি অল্পকাল মধ্যে টোলের সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিলেন। নিমাইয়ের বয়ঃক্রম তখন চতুর্দশ বর্ষের অধিক হইবে না। কিন্তু গঙ্গাদাসের টোলে ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়সের ছাত্রও পাঠ করিতেন; অলঙ্কারে অদ্বিতীয় কমলাকান্ত ও তন্ত্রসারকর্তা কৃষ্ণানন্দ পড়িতেন, আর সেই টোলে মুরারি গুপ্তও পড়িতেন। নিমাই তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতে যান। তাঁহারা শিশু-জ্ঞানে নিমাইয়ের সহিত তর্ক করিতে চাহেন না নিমাই ছাড়েন না। ক্রমে মুরারির সহিত তর্কযুদ্ধ বাধিয়া গেল, মুরারি পরাস্ত হইলেন। তখন নিমাই ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার গাত্রে হস্ত দিলেন, তদ্দণ্ডে মুরারির দেহ আপাদমস্তক আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। মুরারি ইহাতে বিস্মিত হইলেন। তখন বালককালে নিমাইয়ের সহিত তাঁহার যে কাণ্ড হয়, তাহা তাঁহার মনে পড়িল। সে অদ্ভুত ঘটনা তিনি সময়ে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন সেই কথাটি মনে হওয়ায় নিমাইয়ের মুখপানে চাহিলেন। দেখেন যে, চন্দ্রের ন্যায় বদনে কমলদলের ন্যায় দুটি চক্ষু টল টল করিতেছে। তখন ভাবিতেছেন, এ বস্তুটি কি? এটী কি মানুষ?

প্রাতঃকালে নিমাই চতুষ্পাঠীতে পাঠ করেন। ভোজনান্তে আবার পুস্তক লইয়া বসেন। বিকালে সুরধুনী তীরে বহুতর পণ্ডিতের সহিত দেখাশুনা হয়; সেখানেও শাস্ত্রালাপ করেন। যখন গঙ্গায় স্নান করিতে যান, তখন অন্যান্য টোলের পড়ুয়াদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাহাদের সহিত শাস্ত্রযুদ্ধ করেন। এক ঘাটে ক্ষণেক যুদ্ধ করিয়া অন্য ঘাটে সন্তরণ দিয়া যান। কোন কোন দিন বা এই যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গঙ্গাপার হইয়া ওপারে কুলিয়ার ঘাটে উপস্থিত হন। পথে কাহার সহিত দেখা হইলে, তাহার সহিতও শাস্ত্রালাপ করেন।

কিন্তু নিমাই সকল পড়ুয়ার সহিত সমান ব্যবহার করিতেন না। যাহারা বৈষ্ণব, তাঁহাদের উপর যেন একটু অধিক আক্রোশ। বৈষ্ণব পাইলে, তাঁহার পিতার বয়সের লোক হইলেও তাঁহাকে ছাড়িতেন না। আশ্চর্য এই, ছেলেবেলায় নিমাইয়ের সহিত যাঁহার যত বিবাদ হইয়াছিল, পরে তাঁহার সহিত তত প্রণয় হয়। কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মুরারি ও নিমাই একত্রে পড়েন, কলহ প্রায় মুরারির সহিত হইত, কিন্তু কৃষ্ণানন্দের সহিত কখনও হইত না।

এই অতি অল্প বয়সে ঘরে বসিয়া নিমাই একখানি ব্যাকরণের টিপ্পনী করিয়াছিলেন। উহা তখন ক্রমে ক্রমে সমাজে আদৃত হইতেছিল। নবদ্বীপে কোন গ্রন্থ চালান অতি কঠিন ব্যাপার, কিন্তু নিমাইয়ের টিপ্পনী নবদ্বীপে প্রচার হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্য সমাজেও প্রবেশ করিল।

ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত হইলে, নিমাইয়ের ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার ইচ্ছা হইল। তিনি তখন বাসুদেব সার্বভৌমের টোলে প্রবেশ করিলেন।

একে নিমাই বালক, তাহাতে অল্পদিন তাঁহার টোলে ছিলেন বলিয়া বাসুদেব তাঁহাকে তত লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু পড়ুয়াগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে বিলক্ষণ লক্ষ্য করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দীধিতির গ্রন্থকর্তা রঘুনাথ একজন; নিমাইকে পাইয়া রঘুনাথের হর্ষে বিষাদ হইল। কোন একটী অপরূপ বস্তু দেখিলেই জীবের আনন্দ হয়; নিমাইকে দেখিয়া রঘুনাথের সেইরূপ আনন্দ হইল। কিন্তু নিমাইয়ের প্রতিভায় তিনি মলিন হইয়া গেলেন। রঘুনাথ জানিতেন যে, তিনি জগতে সর্বপ্রধান হইবেন। তাঁহার জীবনের লক্ষ্যও তাহাই ছিল। কিন্তু নিমাইকে দেখিয়া সে আশা ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল। নিমাইয়ের সঙ্গে যতই আলাপ করেন, ততই সে আশা শুকাইয়া যায়। তবে নিমাইয়ের মধুর চরিত্র বলিয়া উভয়ে প্রণয়ও ছিল। এই দুই জনের একদিনকার কথা লইয়া বলরাম দাস একটি কবিতা রচনা করেন। পূর্বে বলিয়াছি, চৌপাঠিতে নিমাইয়ের নাম 'বিশ্বম্ভর' ছিল। যথা—

নাম রঘুনাথ, অদ্যাপি বিখ্যাত।
পড়ে চৌপাঠীতে, নিমাইয়ের সাথ।
রঘু তীক্ষ্ণ বুদ্ধে, ন'দে চমকিত।
কেবল নিমাই, নিকটে স্তম্ভিত।।
রঘুনাথ পড়ে, মনোযোগ দিয়া।
নিমাই বেড়ায়, অতি চঞ্চলিয়া।।
কখন যে পড়ে, কেহ নাহি জানে।
তবু রঘুনাথ, নারে তার সনে।।
রঘুনাথ বলে, "শুনরে নিমাই।
লুকায়ে রজনী, পড় কার ঠাঁই"।।
নিমাই বলিল, "সরস্বতী পাশে।"
ইহাই বলিয়া, দুই জনে হাসে।।
রঘুনাথ-গুরু, রঘুকে ডাকিয়া।
ফাঁকি এক দিল, পূরণ লাগিয়া।।
কঠিন সে ফাঁকি, সারাদিন গেল।
ভাবিতে ভাবিতে, কিছু না খাইল।।
ফাঁকির উত্তর, বৈকালেতে হ'লো।
গুরুকে বলিয়া, রান্ধিতে বসিল।।
এমন সময়, নিমাই আসিল।
রন্ধন বিলম্ব, কারণ পুছিল।।
রঘু বলে, "ভাই, গুরু ফাঁকি দিল।
ভাবিতে ভাবিতে, সারাদিন গেল।।
এখনি উত্তর, গুরুকে কহিল।
তাহাতে বিলম্ব, রান্ধিতে হইল।।"
হাসিয়া নিমাই কহে, "রঘু শুন।
তোমার ভাবিতে, গেল সারাদিন।।
অবশ্য সে ফাঁকি, কতই কঠিন।
শুনিতে আমার, কুতূহল মন।।"
শুনি রঘু ফাঁকি, নিমায়ে বলিল।
শুনি মাত্র নিমাই, উত্তর করিল।।

অবাক্ হইয়া রঘু, চাহিয়া রহিল।
উঠিয়া নিমাই, দু'কর ধরিল।।
বলে "বিশ্বম্ভর, ভাঁড়াইস্ না মোরে।
তুই কি মানুষ, না দেব বিশ্বম্ভরে?"

নিমাই ন্যায় পড়িতে আরম্ভ করিয়াই একখানি ন্যায়ের টিপ্পনী লিখিতে আরম্ভ করিলেন। রঘুনাথও সেই সময় তাঁহার দীধিতি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রঘুনাথ কোনরূপে শুনিলেন, বিশ্বম্ভরও একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ লিখিতেছেন। একথা শুনিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। চৌপাঠিতে বিশ্বম্ভরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাই, তুমি নাকি একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ লিখিতেছ?" বিশ্বম্ভর বলিলেন, "হাঁ, একটু একটু লিখিয়া থাকি বটে, তুমি কিরূপে জানিলে?" রঘুনাথ বলিলেন, "ভাই, তোমার সে পুঁথিখানা আমাকে কি একবার দেখাইব?" নিমাই বলিলেন, "তাহার আর বিচিত্র কি? কল্য যখন চৌপাঠীতে আসিব পুঁথিখানা সঙ্গে করিয়া আনিব, আব যখন গঙ্গা পার হইব, তখন নৌকার উপর তোমাকে পড়িয়া শুনাইব।"

তৎপর দিন নিমাই ও রঘুনাথ নৌকায় পার হইবার সময় সেই গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। নিমাই তাঁহার নিজের পুস্তক পড়িতে লাগিলেন, আর রঘুনাথ শুনিতে লাগিলেন। রঘুনাথের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের আশা অতি বলবতী! তিনি যে ভারতবর্ষে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবেন তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার একমাত্র কণ্টক বিশ্বম্ভর। তিনি ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, বিশ্বম্ভর আর তিনি এক পথে গমন করিলে তাঁহার সে প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে না। তিনি যে ন্যায়ের গ্রন্থখানি লিখিতেছেন, তাহা যে জগতে আদৃত হইবে তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু বিশ্বম্ভর আবার আর একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ লিখিতেছেন, এই জন্য তিনি চিন্তিত মনে নিমাইয়ের গ্রন্থ শুনিতে লাগিলেন।

গ্রন্থ পাঠারম্ভ মাত্র রঘুনাথের মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, যে ভাব ব্যক্ত করিতে তাঁহার দশ পাতা লিখিতে হইয়াছে, নিমাই তাহা দুই এক ছত্রে অতি পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন। নিমাই যতই পড়িতে লাগিলেন, ততই রঘুনাথ ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তিনি তখন বেশ বুঝিলেন যে, সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের আশা তাঁহার কিছুমাত্র নাই। শেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া দুই হস্তে চক্ষু আবরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ইহাতে নিমাই পাঠ বন্ধ রাখিয়া অতি ব্যস্তভাবে বাহু প্রসারিয়া রঘুনাথকে ধরিলেন এবং গদ্‌গদভাবে বলিতে লাগিলেন, "একি ভাই, কি হইল? তুমি রোদন কর কেন?"

তখন রঘুনাথ কান্দিতে কান্দিতে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "ভাই বিশ্বম্ভর! তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, আমার সাধ ছিল আমি সকলের চেয়ে বড় পণ্ডিত হইব এবং আমি যে গ্রন্থ লিখিয়াছি তাহা জগতে চলিবে। এই নিমিত্ত দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলাম। আজ আমার সকল আশা ফুরাইল। কারণ তোমার এ গ্রন্থ থাকিতে আমার গ্রন্থ কে পড়িবে?"

তখন নিমাইয়ের নয়নে জল আসিল। তিনি রঘুর গলায় হাত দিয়া তাহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, "এ অতি সামান্য কথা! তুমি রোধন সম্বরণ কর। এ অফল শাস্ত্র, ইহার আবার ভাল মন্দ কি?" ইহাই বলিয়া নিজকৃত গ্রন্থখানি গঙ্গায় টানিয়া ফেলিয়া দিলেন। আর সেই অফল শাস্ত্রের চর্চাও ছাড়িয়া দিলেন।

নিমাইয়ের সেই হইতে ন্যায় পড়া সমাপ্ত হইল এবং টোলে পড়াও শেষ হইল। তখন আপনি টোল করিলেন। মুকুন্দ সঞ্জয় নামক একজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। নিমাইয়ের নিজ বাড়ীতে স্থান না হওয়ায়, সেই চণ্ডীমণ্ডপে টোলের স্থান হইল। তখন তাঁহার বয়স সবে ষোল বৎসর। এত অল্প বয়সে কেহ কখন টোল করিতে পারেন নাই,—বিশেষতঃ নবদ্বীপে! যদিও

নবদ্বীপে বড় বড পণ্ডিতের বড় বড় টোলের অবধি ছিল না, তবু নিমাইয়ের টোলের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এই টোল হইবার কিছুকাল পরে বনমালী নামক একজন ব্রাহ্মণ ঘটক নিমাইয়ের বিবাহের সম্বন্ধ আনিলেন। বল্লভাচার্যের লক্ষ্মী নামে পরমা সুন্দরী এক কন্যা ছিলেন। বনমালী আচার্য এই সম্বন্ধের কথা শচীদেবীর নিকট উত্থাপন করিলেন। সম্বন্ধ স্থির করিয়া শচীদেবী পুত্রকে বিবাহের কথা বলিলেন এবং মাতাপুত্রে পরামর্শ করিয়া যথাসাধ্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের অঙ্গে তৈল হরিদ্রা মাখান হইল। শচীর বাড়ীতে বহুদিবস পরে আবার আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। শচী তখন সব দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছেন, পতির শোক ভুলিয়াছেন। শোক ভুলিয়া অভ্যাগতা রমণীগণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিতেছেন। শচী রমণীগণকে বলিতেছেন, "বাছা, তোমরা কিছু মনে করিও না। আমরা কাঙ্গাল, পুত্র বালক, তাহাতে পিতৃহীন। তোমাদের যথাযোগ্য সমাদর করি আমাদের এমন কি সাধ্য?" রমণীগণও তাহার যথোপযুক্ত উত্তর দিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ সকলে দেখেন যে, নিমাই মস্তক অবনত করিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতেছেন, আর মলিন বদন বহিয়া ধারার উপর ধারা পড়িতেছে।

তখন শচী মর্মাহত হইয়া বলিলেন, "নিমাই, ও কি হ'লো? তুই কান্দিস কেন? এ শুভদিনে কি কান্দিতে আছে?" কিন্তু নিমাই শান্ত হইলেন না, নয়নে আরও জলধারা পড়িতে লাগিল। তখন শচী কাতর হইয়া আঁচল দিয়া পুত্রের নয়ন মুছাইয়া বলিলেন, "বাছা, এ শুভ দিনে কান্দিয়া অমঙ্গল করিতেছ কেন? আমার সুখের দিনে তোমার মুখ মলিন দেখিলে আমার প্রাণ কি করে একবার ভাবিয়া দেখ।"

তখন নিমাই অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরিয়া বলিলেন, "মা, তোমাকে দুঃখ দিয়া ভাল করি নাই। কিন্তু মা, তুমি অজ্ঞান, কিছু বুঝ না। আমার এই বিবাহের দিনে আমার পিতা ও ভ্রাতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে, তাহাতে আমার ধৈর্য ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহারা থাকিলে বড় সুখী হইতেন; এই কথা মনে হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।"

অনন্তর নিমাই বিবাহ করিয়া বাড়ীতে ঘরণী আনিয়া সংসারী হইলেন। নিমাই পণ্ডিত দীর্ঘকায়, সুগঠিত অঙ্গ, শরীরে জীবনাবধি কখন রোগ হয় নাই, অসীম শক্তি;—তাঁহার মত চঞ্চল নবদ্বীপে কেহ ছিল না, তিনি প্রত্যহ দুই বেলা গঙ্গায় সন্তরণ দিয়া অনায়াসে এপার-ওপার হইতেন। অধ্যাপনা সমাপ্ত হইলে, শিষ্যগণ লইয়া যখন গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিতেন তখন লোকে অস্থির হইত। কেহ বা মন্দ বলিত, কেহ বা গালি দিত, কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের শরীরে ক্রোধ ছিল না। পথে সর্বদাই দ্রুতগতিতে চলিতেন। তখন যদিও অধ্যাপক হইয়াছেন, তবু রাজপথে দৌড়াদৌড়ি করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। যাহারা কখন নিমাই পণ্ডিতকে দেখে নাই, তাহারা তাঁহার ভাবগতিকে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিত, "এই নিমাই পণ্ডিত? এ দেখি চাঞ্চল্যের শিরোমণি, যেরূপ চঞ্চল তাহাতে পাঠে মন কিরূপে দেয়!" কিন্তু উচিত কথা বলিতে কি, যখন নিমাই পণ্ডিত টোলে বসিতেন, তখন তিনি অটল ও গম্ভীর; কাহার সাধ্য তাঁহার সহিত তখন চপলতা করে? অতি বৃদ্ধ ও অতি বিখ্যাত অধ্যাপক তাঁহার কাছে আসিয়া ভয়ে ভয়ে বসিতেন।

নিমাই পণ্ডিত নিজে শ্রীহট্টিয়, আর বহুতর শ্রীহট্টিয় নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিত। নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগকে দেখিলেই তাহাদের শ্রীহট্টিয়া কথা অনুকরণ করিয়া বিদ্রুপ করিতেন। তাহারা রাগে গরগর হইয়া বলিত, তুমি যে ঠাট্টা কর তোমার বাড়ী কোথায়? কিন্তু নিমাই পণ্ডিত এ সকল কথায় কর্ণপাতও করিতেন না, আরও ঠাট্টা করিতেন। শেষে তাহারা ঠেঙ্গা হাতে করিয়া অধ্যাপক শিরোমণি নিমাই পণ্ডিতকে তাড়া করিত। তখন নিমাই পণ্ডিত দৌড় মারিতেন। দৌড় মারিতে যে তিনি চিরকাল বড়ই মজবুত, তাহা তাঁহার ভক্তগণের বিশেষরূপে জানা ছিল। নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগকে ঠাট্টা করিয়াছেন বলিয়া, তাহারা কখনও কখনও দেওয়ানে নালিশ করিত, কখনও বা

পেয়াদাও আসিত, আরও দারোগা অন্যায় করিয়া, নিমাই পণ্ডিতের দিকে হইয়া, উল্‌টিয়া বাদিগণকে ঠাট্টা করিত। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। নিজদেশীয় ব্যতীত অন্য কোন দেশীয় বালকগণকে তিনি কখন ঠাট্টা করিতেন না। পূর্বেই বলিয়াছি বৈষ্ণব ব্যতীত কাহারও সঙ্গে তিনি শাস্ত্রযুদ্ধ করিতেন না। এ সকল কথা একত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে।

মুকুন্দ দত্ত নামে একজন চট্টগ্রামবাসী বৈদ্যকুমার নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতেন। ইনি পরম বৈষ্ণব ও সুগায়ক ছিলেন, এবং অদ্বৈত-সভায় কীর্তন গান করিতেন। ইঁহাকে পাইলে নিমাই অল্পে ছাড়িতেন না। এক দিবস চঞ্চল নিমাই, চঞ্চল পড়ুয়াগণের সহিত রাজপথে চাঞ্চল্য করিতে করিতে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, মুকুন্দ তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে একপাশ হইতেছেন। নিমাই শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা বলিতে পার, ওটা আমাকে দেখিলে পলায় কেন?" শিষ্যগণ উত্তর করিল, "বোধ হয়, অন্য কোন কাজ আছে।" নিমাই বলিলেন, "তা নয়। তোমরা বুঝিতেছ না। ওটা বৈষ্ণব, আর বৈষ্ণবের শাস্ত্র পড়ে, আমার সঙ্গে বৃথা শাস্ত্রের কচ্‌কচি করিতে চাহে না, আমাকে পাষণ্ড ভাবে।" ইহাই বলিয়া হাসিতে হাসিতে মুকুন্দকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "তুই পলা'স্‌ কোথা? আমার হাত হ'তে তুই কখনই পলা'তে পারবি না। কিছুকাল পরে তোকে এমন করে বাঁধব যে, তুই চিরকাল আমার নিকট আবদ্ধ থাক্‌বি।" তাহার পরে শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ভাই সব, আমি ঠিক কথা বলছি, তোমরা দেখ্‌বে আমিও বৈষ্ণব হ'ব, কিন্তু উহার মত হ'ব না। আমি এমনই বৈষ্ণব হ'ব স্বয়ং শিব আমার দ্বারস্থ হ'বেন।" ইহা বলিয়া আপনি হাসিলেন, শিষ্যগণও হাসিতে লাগিল। কেহ বা ইহাই ভাবিল, নিমাই পণ্ডিত নাস্তিক, মহাদেবকে মানেন না।

মাধব মিশ্রের তনয় গদাধর মিশ্র নিমাই অপেক্ষা ছোট। দেখিতে অতি সুন্দর, চরিত্র অতি মধুর, ন্যায় পাঠ করেন। তাঁহাকে দেখিলেই অমনি নিমাই তাঁহার দুইখানি হাত ধরিয়া শাস্ত্রযুদ্ধ করেন। শেযে গদাধর নিতান্ত কাতর হইয়া অনুনয় বিনয় করিয়া মুক্তি পান। নিমাই বলিতেছেন, "গদাধর, কল্য যেন আবার তোমার দেখা পাই।" গদাধর ভাবিতেছেন, এইবার পলা'তে পারলে বাঁচি।

এই সময়ে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিলেন। ইনি বৈদ্য কি কায়স্থ বংশীয়, হালিসহরের একাংশ কুমারহট্টে ইঁহার পূর্বনিবাস। ইনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। মাধবেন্দ্রপুরীর কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

মাধবেন্দ্রর অন্তর্ধানকালে তাঁহার শিষ্য ঈশ্বরপুরী তাঁহার বড় সেবা করেন। তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সমুদয় প্রেম ঈশ্বরপুরীকে অর্পণ করিয়া যান। মাধবেন্দ্রপুরী এই শ্লোকটি মৃত্যুকালে রচনা করিয়া উচ্চারণ করিতে করিতে অপ্রকট হয়েন; যথা ঃ—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।

ঈশ্বরপুরী সর্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল। তিনি একখানি রাধাকৃষ্ণরসঘটিত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত নামক কাব্যগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ নিশিতে গদাধরকে লইয়া সেই গ্রন্থ পর্যালোচনা করেন।

এক দিবস ঈশ্বরপুরীর সহিত পথে নিমাইয়ের দেখা হইল। নিমাই তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিলেন। ঈশ্বরপুরী শুনিলেন ইনি নিমাই পণ্ডিত। তিনি নিমাইকে বড় পণ্ডিত বলিয়া জানিতেন, কিন্তু বোধ হয় চঞ্চল বলিয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন নাই। এখন নিমাইকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। একদৃষ্টে তাঁহার আপাদমস্তক দর্শন করিতে লাগিলেন, আর মনে ভাবিতেছেন, "এ বালক যেন যোগসিদ্ধ পুরুষ। এ বস্তুটি কি?" নিমাই একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদের আমার ওখানে অদ্য ভিক্ষা করিতে হইবে। তাহা হইলে এখন যেরূপ আমাকে দেখিতেছেন, তখন

সারাদিন আমাকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইবেন।" উভয়ে ইহাতে একটু হাসিলেন। ঈশ্বরপুরী আগ্রহ করিয়া সেই ভিক্ষা স্বীকার করিলেন।

নিমাইয়ের সহিত ঈশ্বরপুরীর এই প্রথম পরিচয়। তদবধি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গদাধর ও নিমাই শ্রবণ করেন এবং ঈশ্বরপুরী তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করেন। ঈশ্বরপুরী বলিতেছেন, "পণ্ডিত, আমার গ্রন্থখানি তুমি শ্রবণ কর এবং ইহাতে যে দোষ আছে তাহা সরলভাবে বলিয়া দাও, আমি সংশোধন করি।" তাহাতে নিমাই বলিলেন, "কৃষ্ণের কথা, ভক্তের বর্ণন, তা'তে দোষ ধরে এমন সাহস কা'র?" সে যাহা হউক, এক দিবস গ্রন্থ পাঠের সময় নিমাই একটি শ্লোকের ধাতু লাগে না বলিয়া ভুল ধরিলেন। ঈশ্বরপুরী তখন উত্তর করিতে পারিলেন না। সারা নিশি ভাবিয়া তাহার পরদিন নিমাইকে বলিতেছেন, "তুমি যাহা পরস্মৈপদী করিয়াছ, আমি তাহা আত্মনেপদী করিয়াছি।" নিমাই হার মানিলেন। কিছুকাল পরে ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এইরূপে নিমাই পণ্ডিত অহর্নিশ বিদ্যাচর্চা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার টোলের ক্রমশই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে হঠাৎ একদিন তিনি অপ্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ বিহ্বল হইয়া কখন হাস্য, কখন রোদন করিতেন, কখন বা মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকিতেন। শচী ব্যস্ত হইয়া নিমাইয়ের সহজ জ্ঞান উদয় করিবার নিমিত্ত নানা উপায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, নিমাই যেরূপ সেইরূপই রহিলেন। তখন পাড়ায় যাঁহারা পরমাত্মীয় ছিলেন, তাঁহাদিগকে ডাকিয়া শচী তাঁহার বিপদের কথা বলিলেন। তাঁহারা আসিয়া নিমাইয়ের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে ইহাই স্থির করিলেন যে, নিমাইয়ের বায়ুরোগ হইয়াছে, তাঁহাকে বিষ্ণুতৈল মাখাইতে হইবে। বিষ্ণুতৈল সংগৃহীত হইল, আর নিমাইকে ঐ তৈল দ্বারা উত্তমরূপে সকলে মর্দন করিতে লাগিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে নিমাইয়ের সে ভাব সারিয়া গেল। আরোগ্য হইলেও, মায়ের অনুরোধে নিমাই বিষ্ণুতৈল মাখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার পীড়া আর ছিল না। পাঠক কৃপা করিয়া এই ঘটনাটি স্মরণ রাখিবেন। পরে এই ঘটনা লইয়া কিছু বিচার করিবার ইচ্ছা রহিল।

এখন নিমাইয়ের যৌবনারম্ভ। কিছুকাল পরে ইচ্ছা হইল পূর্বদেশে গমন করিবেন। এই অভিপ্রায় মায়ের কাছে ব্যক্ত করিলেন। জননী নিমাইকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। কিন্তু নিমাই তাঁহাকে নানাবিধ প্রবোধ দিয়া পূর্বাঞ্চলে গমনের উদ্যোগ করিলেন। আপনার ঘরণী লক্ষ্মীদেবীকে মায়ের কাছে রাখিয়া, সঙ্গে কয়েকটি শিষ্য লইয়া, একেবারে পদ্মার ধারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাহার পর পদ্মা পার হইয়া কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছিলেন তাহা স্থির করা যায় না। কেহ কেহ বলেন, এই উদ্যোগে তিনি শ্রীহট্টে নিজ পিতামহের বাটীতে গিয়াছিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের জ্যাষ্ঠতাত-তনয় শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র কর্তৃক প্রণীত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রোদয়াবলী' গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, তিনি তখন সেখানে যান নাই।

যখন নিমাই পণ্ডিত পূর্বাঞ্চলে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সঙ্গিগণ দেখিলেন যে, তাঁহার যশ তাঁহার আগমনের পূর্বেই পূর্বদেশে ব্যাপিয়াছে। নিমাই পণ্ডিত আসিয়াছেন শুনিয়া পূর্বাঞ্চলের পড়ুয়াগণ মহা আনন্দিত হইয়া দলে দলে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। তাহারা বলিল যে, তাহারা তাঁহার টিপ্পনি দেখিয়া ব্যাকরণ অভ্যাস করিয়া থাকে। আর তাহাদের বহু ভাগ্য যে, তিনি এখন স্বয়ং তাহাদের দেশে আগমন করিয়াছেন।

যে নিমাই পণ্ডিত এত চঞ্চল, যিনি বিদ্যারসে দিবানিশি উন্মত্ত, যিনি বৈষ্ণব দেখিলে বিদ্রূপ করিতেন, সেই নিমাই পণ্ডিত, পূর্বাঞ্চলে কয়েকমাস মাত্র বাস করিয়া, তাহারই মধ্যে সেই দেশ হরিনামে উন্মত্ত করিলেন। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থকার বলেন যে, নিমাই পণ্ডিত কয়েকমাস পূর্বাঞ্চলে থাকায়, ঐ প্রদেশ একেবারে উদ্ধার হইয়াছিল।

চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থকার বলেন যে, সেই সময় তিনি হরিনামের নৌকা সাজাইয়া সজ্জন দুর্জন, আচারী বিচারী, পতিত ও অধম সকলকে পার করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, যখন নবদ্বীপে ছিলেন, তখন তাঁহার এ ভাব কিছুই ছিল না; আবার নবদ্বীপে যখন প্রত্যাবর্তন করিলেন তখনও এ ভাব কিছুই রহিল না।

এই পূর্বাঞ্চলে থাকিবার সময় তপন মিশ্র নামক একজন অতি সাধু ব্রাহ্মণ নিমাই পণ্ডিতের নিকট আসিয়া সর্বসমক্ষে দণ্ডবৎ হইয়া বলিলেন,—তিনি স্বপ্নে জানিয়াছেন যে, নিমাই পণ্ডিত পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। অতএব তিনি তাঁহার নিকট উদ্ধার পাইতে আসিয়াছেন। ইহা শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন, "এ কথা বলিতে নাই, জীবে ভগবৎ বুদ্ধি মহাপাপ।" ইহাই বলিয়া তাঁহাকে "হরে কৃষ্ণ" মন্ত্র জপ করিতে উপদেশ দিলেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত কথা বলিলেন। সে কথাটি এই,—"তুমি কাশীতে গিয়া বাস কর, সেখানে তোমার সহিত আমার দেখা হইবে।" যথা শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি খণ্ডে—

মিশ্র কহে আজ্ঞা হয় আমি সঙ্গে আসি।
প্রভু কহে তুমি শীঘ্র যাহ বারাণসী।
তথায় আমার সঙ্গে হইবে মিলন।
কহিব সকল তত্ত্ব সাধ্য ও সাধন।।

এই আজ্ঞা পাইয়া তপন মিশ্র সস্ত্রীক অনতিবিলম্বে বারাণসীতে গমন করিলেন। সেখানে তপন পথ চাহিয়া রহিলেন, আর দশ বৎসর পরে নিমাইকে দেখিতে পাইলেন।

কয়েকমাস পরে নিমাই পণ্ডিত পূর্বদেশ হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার সময় বাড়ী পৌঁছিলেন। সঙ্গে বহুতর দ্রব্যাদি আনিয়াছিলেন। সমস্তই জননী চরণে রাখিয়া তাঁহাকে অন্ন প্রস্তুত করিতে বলিয়া সঙ্গিসহ গঙ্গাস্নানে গেলেন।

ফিরিয়া আসিয়া নিমাই পণ্ডিত ভোজন করিলেন; করিয়া বহির্দ্বারে আসিলে তাঁহার আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি বহুলোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। ইহাদিগের নিকট তিনি পূর্বাঞ্চল-বাসের বিবরণ বলিতে লাগিলেন। আর যে যে বাঙ্গালিয়া কথা শুনিয়াছেন ও শিখিয়া আসিয়াছেন তাহা একে একে শ্রোতৃবর্গকে শুনাইতে লাগিলেন। তাঁহার অনুকরণের পারিপাট্য দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন। নিমাই আপনিও হাসিলেন।

তাহার পর নিমাই বাড়ীর ভিতরে গেলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত আত্মীয়গণও চলিলেন। তখনই জননীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, তোমার মুখ মলিন কেন? বিদেশ হইতে আমি বাড়ী আসিলাম, ইহাতে তুমি আনন্দিত না হইয়া দুঃখিতের মত রহিয়াছ কেন?" এই কথা শুনিয়া শচী কান্দিয়া উঠিলেন। জননীর রোদন শুনিয়া নিমাই বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "মা, তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমার বোধ হয় তোমার বধূর কোন অমঙ্গল হইয়া থাকিবে।" তখন সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা বলিলেন, "তাহাই বটে। তোমার ঘরণী বৈকুণ্ঠলাভ করিয়াছেন। তাঁহার সর্পাঘাত হইয়াছিল, আর বহু চেষ্টায়ও তাহার প্রতিকার হয় নাই।"

তখন নিমাই বদন হেঁট করিলেন ও নীরবে অল্পক্ষণ রোদন করিলেন। একটু পরে ধৈর্য ধরিয়া জননীকে বলিলেন, "মা, তুমি কি শুন নাই, যে স্ত্রীলোক স্বামীর আগে দেহত্যাগ করে সে বড় ভাগ্যবতী? সে উত্তম ভাগ্য পাইয়াছে, আমাদের ক্ষোভ করা কর্তব্য নহে।" ইহাই বলিয়া আপনি ধৈর্যাবলম্বন করিলেন।

নিমাই-পণ্ডিত যখন নবদ্বীপে আসিলেন, তখন পূর্বদেশ হইতে বহুতর শিষ্য তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে আসিল। পূর্বকার তাঁহার যে সকল পড়ুয়া ছিল, আর নবাগত পড়ুয়া লইয়া তিনি পুনরায় মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল বসাইলেন। নিমাই পণ্ডিত অল্প বয়সে অধ্যাপক, এই জন্য তাঁহার বড় মহিমা। তাহার পর বিদ্যা ও বুদ্ধিতে তাঁহার যশ সমস্ত দেশ

ব্যাপিয়াছে। চরিত্র অতি নির্মল, শিষ্যের সহিত, কি অন্যান্য লোকের সহিত ব্যবহার অতি মধুর। পড়ুয়াগণ তাঁহার নিকট পড়া মহাভাগ্য বলিয়া মনে করিত। পূর্বদেশে গোপনে গোপনে প্রেমভক্তি বিতরণরূপ যে একটি কাণ্ড করিয়া আসিয়াছেন, নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার সে ভাবের চিহ্নমাত্রও নাই। নিমাই পূর্বাঞ্চল যখন পরিত্যাগ করেন, তখন সে দেশের লোকেরা কি বলিতে লাগিল তাহা চৈতন্যমঙ্গলে এইরূপ বর্ণিত আছে—

ঐ শোন আমার নিমাই ডাকে রে।
কে যাবি আয় ভবসাগর পারে।। ধ্রু।।
চণ্ডাল পতিত কিংবা সজ্জন দুর্জন।
সবারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম।।
শুচি বা অশুচি কি বা আচার বিচার।
নাম দিয়া সবারে কৈল ভবপার।।
নাম-সংকীর্তন প্রভু নৌকা সাজাইয়া।
পার কৈল সর্ব লোক আপনি যাচিয়া।।
যে জনারে পায় তারে ধরি কোলে করি।
ভবনদী পার করে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।
এ হেন করুণা নাহি শুনি কোন যুগে।
কোন্ অবতারে কোথা কে বা পাপ মাগে।।
সভারে পবিত্র কৈল সমভাব করি।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের করিল অধিকারী।।
দয়ার সাগর প্রভু সর্বলোক-গতি।
করুণা প্রকাশি লোকের কৈল শুদ্ধ মতি।

বস্তুতঃ নিমাই পূর্ববঙ্গে আর যান নাই। কিন্তু সেখানে অধিকাংশ লোক তাঁহার ভক্ত। অতএব যে শক্তিতে নিমাই ঐ দেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন, তাহা অননুভবনীয়।

নিমাইয়ের বয়স তখন অষ্টাদশ, ব্যাকরণ পড়াইয়া থাকেন। তাঁহার কথায় তপন মিশ্র দেশত্যাগ করিবেন কেন? কিন্তু তাহা তিনি করিলেন। আবার নিমাই ভবিষ্যতে বারাণসীতে যাইবেন, তাহা তিনি জানিতেন, নতুবা একথা কিরূপে বলেন যে, তোমায় আমায় বারাণসীতে দেখা হইবে? আর তপন এই আশায় দশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

ভাল, তপন মিশ্র না হয় নিকটে আসিয়া নিমাইকে দর্শন কি স্পর্শ করিয়া উদ্ধার হইলেন। কিন্তু সমস্ত পূর্বাঞ্চলকে সেই ব্যাকরণের শিশু অধ্যাপক নিমাই কিরূপে হরিনামে উন্মত্ত করিলেন?

চণ্ডাল পতিত কিবা সজ্জন দুর্জন।
সবারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম।।

কেন করিলেন তাহার কারণ লেখা আছে—

দয়ার সাগর প্রভু সর্বলোক-গতি।
করুণা প্রকাশি লোকের কৈল শুদ্ধ মতি।।

কিন্তু কিরূপে করিলেন, তাহা বলিতে পারি না।

নিমাই পড়াইতে এরূপ তৎপর যে, তাঁহার নিকট পড়িলে পড়ুয়ার ক্লেশ হইত না, আর অতি অল্প সময়ে পাঠ অভ্যাস হইত। সুতরাং নিমাই পণ্ডিতের টোল ক্রমেই শ্রীসম্পন্ন হইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ হইতে এই কয়েক চরণ উদ্ধৃত করিলাম।—

কত বা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই।
কত বা মণ্ডলী হয়ে পড়ে ঠাই ঠাই।।

প্রতিদিন দশ বিশ ব্রাহ্মণ-কুমার।
আসিয়া প্রভুর পায়ে করে নমস্কার।।

এখন আর শচীর ঘরে দারিদ্র্য নাই, এখন নিমাই নবদ্বীপের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। বড় বড় বিষয়িগণ নিমাই পণ্ডিতকে রাজপথে দেখিলেই, অমনি দোলা হইতে নামিয়া তাঁহাকে নমস্কার করেন। যেখানে ক্রিয়া-কর্ম হয় তাহার উপহার অবশ্যই তাঁহার বাড়ীতে আসে। কিন্তু নিমাই বড় ব্যয়শীল বলিয়া ধনসঞ্চয় হইত না। অতিথি পাইলেই তাঁহাকে যত্ন করিয়া আহার করাইতেন। সাধু দেখিলেই তদ্দণ্ডে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। এইরূপে শচীদেবীকে প্রত্যহ দশ বিশটি অতিথির সেবা করিতে হইত। এই সময় কেশব কাশ্মিরী নামক একজন মহাপণ্ডিত নবদ্বীপে আসিলেন।

পণ্ডিত কেশব কাশ্মীর দেশীয়, দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেছেন। ভারতবর্ষে যেখানে যেখানে পণ্ডিতের স্থান আছে, সব স্থান জয় করিয়া শেষে নবদ্বীপে আগমন করিলেন। এই নবদ্বীপ জয় করিতে পারিলেই তিনি অদ্বিতীয় হইবেন। চাল-চলন খুব বড় মানুষের মত। সঙ্গে হাতী ঘোড়া লোক জন বিস্তর আছে। তিনি 'আটোপ টঙ্কারে' বলিলেন, "এই নবদ্বীপে যদি কোন পণ্ডিত সাহসী থাকেন, তবে আসিয়া আমার সহিত বিচার করুন, নতুবা আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিউন।" বিচারে যদি তিনি জয়লাভ করিতে পারেন, তবে নবদ্বীপ-সমাজ হইতে তাঁহাকে উপহার দিতে হইবে। যদি তিনি পরাজিত হয়েন, তবে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নবদ্বীপবাসিগণের হইবে।

নবদ্বীপে জয় করা তখন সহজ ব্যাপার ছিল না। যেহেতু রঘুনাথ, রঘুনন্দন, নিমাই পণ্ডিত প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী তখন নবদ্বীপে বিরাজিত ছিলেন। কিন্তু কেশবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা প্রচার হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, তিনি সরস্বতীর বরপুত্র। সরস্বতী স্বয়ং কেশবের জিহ্বায় বসিয়া বিচার করেন, তাঁহাকে পরাজিত করিবার কাহারও সম্ভাবনা নাই। এই জনরবে বিশ্বাস হওয়াতে, সমস্ত প্রধান পণ্ডিতের মুখ শুকাইয়া গেল। সরস্বতীর সহিত কে যুদ্ধ করিবে? যিনি যত বড় পণ্ডিত হউন, তাঁহার সহিত নবদ্বীপের পণ্ডিতের বিচার করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু সরস্বতীর সহিত কে বিচার করিবে? সকলে মহা-চিন্তিত হইয়া, কিরূপে নবদ্বীপেব মান থাকে তাহার নানাবিধ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এমন সময় কেশব কাশ্মিরীর সহিত নিমাই পণ্ডিতের দেখা হইল।

সে এইরূপে। গ্রীষ্মকাল, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। নিমাই পণ্ডিত বহুতর শিষ্য সহ সুরধুনীতীরে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন, কৌতুক-রহস্যও চলিতেছে। এমন সময় সেই পথ দিয়া কেশব কাশ্মিরী যাইতেছিলেন। বহুতর পড়ুয়া দেখিয়া এবং অন্তর হইতে নিমাই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া একটু কৌতূহলী হইয়া অধ্যাপকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন নিমাই পণ্ডিত। নিমাই পণ্ডিত বড় পণ্ডিতের মধ্যে একজন। কেশব ভাবিলেন যে, ইনি কি বস্তু জানিয়া যাইবেন। তাঁহার কোথাও যাইতে দ্বিধা কি ভয় নাই, কারণ তিনি দিগ্বিজয়ী।

তখন কেশব সেই সভায় প্রবেশ করিয়া নিজ জন দ্বারা আপনার পরিচয় দিলেন। এই কথা শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত শিষ্যগণের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া মহা-সমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পরে সকলে বসিলে কেশব বলিতেছেন, "তুমি নিমাই পণ্ডিত?" নিমাই কোন কথা কহিলেন না। কেশব নিমাইকে অতি বালক দেখিয়া একটু মুরুব্বিপনা ভাবে বলিতেছেন, "তোমার বয়স অল্প, কিন্তু তোমার ব্যাকরণে বড় প্রতিষ্ঠা এ কথা আমি শুনিয়াছি।" তাহাতে নিমাই পণ্ডিত বলিলেন "আমি ব্যাকরণ পড়াই বটে, কিন্তু সে আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। আমিও বুঝি না, আমার শিষ্যেরাও বুঝে না। কোথায় আপনি প্রবীণ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, আর কোথায় আমি বালক—অজ্ঞ।" কেশব ইহার সমুচিত উত্তর দিলেন। তখন নিমাই পণ্ডিত বলিতেছেন, "এই গঙ্গা সম্মুখে, আপনি কিঞ্চিৎ গঙ্গাস্তব প্রস্তুত করিয়া

আমাদিগকে শ্রবণ করান, আমরা শুনিয়া তৃপ্ত হই ও আমাদের পাপও অন্তর্হিত হউক।" ইহাতে কেশব "তাহাই হউক" বলিয়া স্তব পড়িতে লাগিলেন।

কেশব স্তব পড়িতেছেন, কিরূপে—না ঝড়ের ন্যায়। একবারও চিন্তা করিতেছেন না। একটি শ্লোক যেই শেষ হইতেছে অমনি আর একটি আওড়াইতেছেন।

স্তব শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত। মুহূর্ত মধ্যে এরূপ একটি স্তব প্রস্তুত করা মনুষ্যের সাধ্য নয় বলিয়া সকলের বোধ হইল। ছাত্রগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, "হরি হরি" স্মরণ করিতে লাগিলেন। নিমাই পণ্ডিতের উপর তাঁহাদের অতীব ভক্তি। কিন্তু কেশবের পাণ্ডিত্য দেখিয়া মনে এই ভয় হইল যে তাঁহাদের নবীন অধ্যাপক এরূপ পণ্ডিতের সহিত বিচারে পারিবেন কি না।

কিন্তু নিমাই সেরূপ আশ্চর্যান্বিত হইলেন না; না হইয়া দিগ্বিজয়ীর বহুল প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, "আপনার ন্যায় কবি জগতে দুর্লভ। আপনার শক্তি অমানুষিকী। এখন আমার একটি বিনীত নিবেদন আছে। শ্লোকের দোষগুণ বিচার না করিলে উহা ভালরূপ আস্বাদন করা যায় না। অতএব আপনি যে শ্লোকগুলি পাঠ করিলেন, ইহার একটি লইয়া বিচার করিয়া আমাদের কর্ণ তৃপ্ত করুন।"

তখন দিগ্বিজয়ী বলিলেন, "কোন্ শ্লোকটি লইয়া আমি বিচার করিব বল, আমি তাহার অর্থ করিতেছি। ইহাতে নিমাই পণ্ডিত কেশবের পঠিত শ্লোকের মধ্যে একটি আওড়াইলেন। সেটি এইঃ—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাম্
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবতাদ্ভুতগুণা।।

ইহা শুনিযা কেশব বিস্মিত হইলেন, হইয়া বলিতেছেন, "আমি ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় শ্লোক পড়িয়া গেলাম, তুমি ইহার মধ্যে একটি কিরূপে কণ্ঠস্থ করিলে?" দিগ্বিজয়ীর মনের ভাব যে, নিমাই পণ্ডিত সম্ভবতঃ শ্রুতিধর হইবেন। নিমাই পণ্ডিত কেশবের মনের ভাব বুঝিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, উত্তব করিলেন, "কেহ বা সরস্বতীর বরে কবি হয়, কেহ বা তাঁহার বরে শ্রুতিধর হয়।" এই কথায় কেশবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, নিমাই পণ্ডিত নিশ্চয়ই শ্রুতিধর হইবেন। ইহাই ভাবিয়া নিমাইয়ের প্রতি ভক্তি হইল। তখন একটু পরিশ্রম করিয়া সেই শ্লোকের গুণ বিচার করিতে লাগিলেন। গুণ বিচার সমাপ্ত হইলে নিমাই পণ্ডিত বলিতেছেন, "আপনি যেরূপ গুণ বিচার করিলেন, ইহাতে নিতান্ত কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে ঐ শ্লোকে কি কি দোষ আছে বলুন।"

বিচাব করিযা দিগ্বিজয়ীর জিগীষাবৃত্তিটা অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছিল। নিমাই পণ্ডিতের মুখে "শ্লোকের কি দোষ আছে" এই কথাটা শুনিয়াই কেশব ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন বলিতেছেন, "তুমি বৈয়াকরণ, কিন্তু শ্লোকের দোষ গুণ বিচার করা অলঙ্কার শাস্ত্রের কার্য। তুমি ব্যাকরণ শিশু-শাস্ত্র পড়িয়াছ, অলঙ্কার পড় নাই, তুমি শ্লোকের দোষ-গুণ-বিচার কি বুঝিবে?"

নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "আমি অলঙ্কার পড়ি নাই, কিন্তু শুনিয়াছি, তাহাতেই শ্লোকের যে যে দোষ বলিতেছি।" এই বলিয়া নিমাই শ্লোকের দোষ বিচার করিতে লাগিলেন। যাঁহারা এই বিচার ভাল করিয়া পর্যালোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পড়িবেন। সেই গ্রন্থে নিমাই পণ্ডিত কোন্ 'ন'র কি দোষ ধরিলেন, তাহা সমস্তই পরিষ্কাররূপে লেখা আছে। নিমাই পণ্ডিত শ্লোকের দোষ ধরিতে থাকিলে কেশব উহার অপর পক্ষ সমর্থন করিতে গেলেন কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। তাঁহার সমুদয় প্রতিভা নষ্ট হইয়া গেল। শেষে সংজ্ঞাহারা লোকের ন্যায় প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। দিগ্বিজয়ী বালক অধ্যাপকের নিকট, সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে এরূপ অপদস্থ হওয়ায় ঘৃণা, লজ্জা ও অপমানে তাঁহার সহজ জ্ঞান একেবারে লোপ পাইল। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া নিমাইয়ের কোন কোন শিষ্য হাসিতে লাগিলেন।

নিমাই পণ্ডিত তখন রুক্ষভাবে সেই সকল পড়ুয়াকে নিবারণ করিলেন। পরে কেশবকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেছেন, "কবিত্বে দোষ থাকা কোন গ্লানির কথা নহে, কালিদাস ও ভবভূতিতেও দোষ আছে। কবিত্বশক্তি থাকাই ভাগ্যের কথা, তাহা আপনার প্রচুর পরিমাণে আছে। অতএব কোন শ্লোকে যদি কিছু দোষ থাকে, তাহাতে আপনার কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে, গৃহে গমন করুন; কল্য আপনার সহিত ভাল করিয়া বিচার করিব।"

দিগ্বিজয়ী নিমাইয়ের মধুর বাক্যে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ধীরে ধীরে বাসায় গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না, সমস্ত রাত্রি দুঃখে সরস্বতীর স্তব পড়িতে লাগিলেন। প্রত্যূষে একেবারে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। নিমাই শয়ন ঘর হইতে যেমন বাহিরে আসিলেন, অমনি কেশব তাঁহার চরণে পড়িলেন। ইহা দেখিয়া নিমাই পণ্ডিত দুই বাহু ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। উঠাইয়া বলিলেন, "আপনি প্রবীণ পণ্ডিত, আমি বালক। আমার নিকট এরূপ দীন হইয়া কেন আমাকে অপরাধী করিতেছেন?" তখন কেশব বলিতেছেন, "আপনি আমার কাহিনী অগ্রে শ্রবণ করুন। আমি আপনার নিকট অপদস্থ হইয়া সারা রাত্রি সরস্বতীর স্তব করিয়াছিলাম। অল্প রজনী থাকিতে একটু তন্দ্রা আইসে। তখন সরস্বতী দেবী আমাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, 'তুমি যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছ, তাঁহার অগ্রে আমি লজ্জায় যাইতে পারি না। তাঁহার সম্মুখে আমার কিছু স্ফুর্তি হয় না। তিনি আমার কান্ত। তুমি এতদিন আমাকে সেবা করিয়া যাহা মনুষ্যের পুরুষার্থ তাহা পাইয়াছ। তুমি অতি প্রত্যূষে তাঁহার নিকট গিয়া আত্মসমর্পণ করিও।' এই আজ্ঞা পাইয়া এখন আমি আপনার চরণে শরণ লইলাম। সর্বদা বিচার-যুদ্ধ করিয়া আমার কু-প্রবৃত্তিসকল অতিশয় বলবতী হইয়াছে। এখন আপনি কৃপা করিয়া আমার সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া দিউন।" ইহা বলিয়া দিগ্বিজয়ী কান্দিতে কান্দিতে নিমাইয়ের চরণে আবার পড়িলেন। তখন নিমাই পণ্ডিত তাঁহাকে দুই চারিটি কথা বলিলেন,—কি বলিলেন তাহা জানা যায় না। তবে কেশব তদ্দণ্ডে বাসায় প্রত্যাবর্তন করিয়া আপনার যে সম্পত্তি ছিল সমুদয় বিতরণ করিলেন এবং দণ্ডকমণ্ডলুধারী হইয়া ও কৌপীন পরিয়া জন্মের মত সংসার ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

কৌতুক রহস্য সদা ভক্ত সঙ্গে। সাঁতারে আনন্দে গঙ্গার তরঙ্গে।।
নগরে ভ্রমণ চঞ্চলের মত। নৌকা-বিহারাদি দৌড়াদৌড়ি রত।।
আমার গৌরাঙ্গ বড়ই চঞ্চল। সেই গুণে মোর পরাণ হরিল।।

—শ্রীবলরাম দাসের গৌরাঙ্গাষ্টক

নিমাই পূর্ববঙ্গে যাহাই করুন, আর কাহারও কাহারও কাছে যাহাই বলুন, নবদ্বীপের রাজপথে তিনি যেরূপ চঞ্চল ছিলেন, সেইরূপই রহিলেন। টোলের মধ্যে তিনি নিতান্ত গম্ভীর কিন্তু বাহিরে আসিলে সে গাম্ভীর্য্যের লেশমাত্র থাকিত না। নিমাই পণ্ডিতের যশ পূর্বেই প্রচুর পরিমাণে ছিল, তাহার পর দিগ্বিজয়ীকে জয় করায় স্বভাবতঃ যশ আরও বাড়িয়া গেল। তখন তাঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া যাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিত তাহারা বলিতে লাগিল যে, নিমাই পণ্ডিতের মত পণ্ডিত জগতে আর নাই; তিনি এবার নবদ্বীপের মানরক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় নিমাই পণ্ডিতের অন্যান্য অধ্যাপকের ন্যায় গম্ভীর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তাহা হইলেন কি?

এই সময় তাঁহার বয়স ঊনবিংশতি বৎসর। পট্টবস্ত্র পরিয়া, বামহস্তে পুঁথি লইয়া, তাম্বুল চর্বণ করিতে করিতে নিমাই পণ্ডিত কয়েকটি ছাত্র সঙ্গে করিয়া নগর-ভ্রমণে বাহির হইতেন। তাঁহার অমানুষিক রূপ, কমললোচন ও নূতন যৌবন। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত পথে লোক জমিত। কিন্তু তিনি তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া হাস্যকৌতুক করিতে করিতে যাইতেন। একদিন পথে

শ্রীবাসের সহিত তাঁহার দেখা হইল। শ্রীবাস পরম বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে অদ্বৈত আচার্য ব্যতীত আর সকলেরই প্রধান। নিমাই পণ্ডিতের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল এবং তাঁহার ঘরণী মালিনীর সহিতও শচীদেবীর অত্যন্ত প্রীতি ছিল। শ্রীবাস ও মালিনী নিমাই পণ্ডিতকে ছেলেবেলায় কোলে করিয়াছেন। সুতরাং তখন হইতেই নিমাইকে ইঁহারা বাৎসল্য বা স্নেহ-চক্ষে দেখিতেন। শ্রীবাস দেখিতে পাইলেন যে, নিমাই পণ্ডিত শিষ্যগণ সঙ্গে করিয়া হাসিতে হাসিতে দক্ষিণ হস্ত দোলাইয়া দ্রুতগমনে আসিতেছেন। তখন শ্রীবাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কোথা যাইতেছ উদ্ধতের শিরোমণি?"

নিমাইপণ্ডিত শ্রীবাসকে নমস্কার করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। মুখখানি দেখিয়া মনে হইল, যেন হাসি আসিতেছে, কেবল শ্রীবাসের মান রক্ষার জন্য অনেক কষ্টে গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীবাস তাঁহার ভাব দেখিয়া বলিলেন, "নিমাই, তুমি পরম পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান। তুমি জান যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রাপ্তি জীবনের চরম উদ্দেশ্য। আমাকে বুঝাইয়া বল দেখি, শ্রীভগবচ্চরণ ভজন না করিয়া এই যে দিবানিশি বিদ্যাচর্চা করিতেছ তাহাতে তোমার কি লাভ হইবে?"

ইহাতে নিমাই সেই কপট গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত! আমি বালক বলিয়া আমাকে কেহ গ্রাহ্য করে না। আর কিছুকাল পড়িলে, লোকে আমাকে মানিবে ও চিনিবে। তখন আমি একটি ভাল দেখিয়া বৈষ্ণব খুঁজিয়া লইব এবং নিজে এরূপ বৈষ্ণব হইব যে, আপনারা পর্যন্ত অবাক হইয়া যাইবেন। পণ্ডিত! আমি আপনাকে মনের কথা বলিতেছি, আমি এরূপ বৈষ্ণব হইব যে, অজ ভব পর্যন্ত আমার দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত লইবেন।" ইহাই বলিযা নিমাই পণ্ডিত গাম্ভীর্য হারাইয়া হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীবাসও হাসিলেন, আর আপনা আপনি বলিলেন, "ভাল চঞ্চলকে আমি ধর্ম উপদেশ দিতে আসিয়াছি।" তৎপরে প্রকাশ্যে বলিলেন, "নিমাই, তুমি কি দেবতা ব্রাহ্মণ মান না।" ইহাতে নিমাই উত্তর করিলেন, "সোঽহং। শ্রীভগবান যিনি, আমিও তিনি, তবে আর কাহাকে মানিব?" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিলেন। শ্রীবাসও হাসিলেন বটে, কিন্তু সে দুঃখের সহিত; কারণ নিমাই তাঁহার স্নেহের পাত্র, তাঁহার মুখে এইরূপ মূঢ় নাস্তিক-তত্ত্ব শুনিয়া তাঁহার দুঃখিত হইবারও কথা। তাহার পরে শ্রীবাসের মনে একটি আশাও ছিল। সেটি এই যে,—নিমাইপণ্ডিত বৈষ্ণবের পুত্র অবশ্য বৈষ্ণব হইবেন। আর নিমাইপণ্ডিতের ন্যায় যদি কোন শক্তিধর বৈষ্ণব-সমাজে প্রবেশ করে, তবে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। সে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অল্প দেখিয়াও শ্রীবাস দুঃখিত হইলেন। শ্রীবাসকে দেখিয়া কপট দীনতার সহিত নিমাই যে ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইতেন, কি কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেন, কি কখন কখন নিতান্ত চঞ্চলের ন্যায় "আমি সেই" বলিয়া তাঁহার মনে ভয় জন্মাইয়া দিতেন—এই সকল কথা ইহার কয়েক বৎসর পরে মনে করিয়া শ্রীবাস বড় সুখ পাইতেন।

নিমাইয়ের আর একটি চাঞ্চল্যের কথা বলিব। স্ত্রীলোকেরা হাবভাব ও কটাক্ষে পুরুষকে ভুলাইয়া থাকে—এ অধিকার তাহাদের সর্বদেশে আছে। এই হাবভাবে পুরুষকে বাধ্য করিয়া, স্ত্রীলোকে রঙ্গ দেখে। নিমাইও এইরূপ হাবভাব ও কটাক্ষে বাধ্য করিতেন, কিন্তু স্ত্রীলোককে নয়—পুরুষকে! নিমাইয়ের নবদ্বীপে এই গুণের বড় সুখ্যাতি ছিল। নিমাই পথে স্ত্রীলোক দেখিলেই, মস্তক নত করিয়া পাশ দিতেন । কুলবালাগণ পথে পুরুষ মানুষ দেখিলে যেরূপ কুণ্ঠিত হন, নিমাইও স্ত্রীলোক দেখিলে সেইরূপ হইতেন। কিন্তু পুরুষের নিকট তাঁহার আর এক ভাব ছিল। তাঁহার কি একটি অমানুষিক শক্তি ছিল যে ইচ্ছা করিলে যাহাকে তাহাকে সেইরূপ বাধ্য করিতে পারিতেন। তপন মিশ্রকে একটি কথা দ্বারা সস্ত্রীক বারাণসী পাঠাইলেন। ইচ্ছামত কেশব কাশ্মিরীকে উদাসীন করিলেন। আবার একদিন পড়ুয়াগণকে বলিলেন, "চল বাজারে যাই, সংসারে অনেক দ্রব্যাদির প্রয়োজন আছে।" পড়ুয়াগণ বলিল, "পণ্ডিত! বাজারে চলিলেন, কড়ি ত লইলেন না?"

নিমাই বলিলেন, "গৃহে সম্বল মাত্র নাই। চল যাই দেখি, যদি দুটো মিষ্টি কথা বলিয়া কিছু আনিতে পারি।"

নিমাই প্রথমে তাম্বুলিয়ার দোকানে গমন করিলেন। তাম্বুলিয়া নিমাইকে দেখিয়া বলিতেছে, "ঠাকুর, একটু অপেক্ষা করুন। আমি অতি উত্তম খিলি প্রস্তুত করিতেছি।" তাহার পরে নিমাইয়ের হস্তে একটি খিলি দিলে তিনি ঈষৎ হাসিয়া উহা গ্রহণ করিলেন ও চর্বণ করিতে লাগিলেন। নিমাই বলিতেছেন, "তুমি ত পান দিলে, আমার কিন্তু সম্বলমাত্র নাই।" তাম্বুলিয়া বলিতেছে, "আপনি কড়ি দিলে আমি লইব কেন? আপনি তাম্বুল খাইলেন ইহাই আমার পরম লাভ।" তাহার পরে নিমাই সঙ্গিগণ লইয়া তন্তুবায়ের দোকানে গমন করিলেন। দোকানী সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসাইল। নিমাই বলিতেছেন, "কিছু ভাল কাপড় বাহির কর।" তন্তুবায় কাপড় বাহির করিল। নিমাই কাপড় দেখিতে দেখিতে বলিতেছেন, "এই জোড়া আমার মনোমত বটে, কত মূল্য লইবে?" আবার বলিতেছেন, "মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়াই বা কি করিব, হস্তে কপর্দকও নাই।"

তন্তুবায় নিমাইয়ের মুখপানে চাহিতেছে। ইচ্ছা হইতেছে যে বস্ত্রজোড়া অমনি দেয়, কিন্তু অত্যন্ত কৃপণস্বভাব, একেবারে কাপড় ছাড়িয়া দিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তখন মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা স্থির করিয়া বলিতেছে, "ঠাকুর! তা মূল্যের জন্য ভাবনা কি? এখন না হয় পরে দিবেন।"

নিমাই বলিতেছেন, "ঋণ করিয়া লওয়া আমার নিতান্ত অনিচ্ছা। পারতপক্ষে ঋণ করিতেও নাই। তবে অদ্য থাকুক, অন্য একদিবস সম্বল সঙ্গে করিয়া আসিব।" ইহাতে তন্তুবায় ব্যস্ত হইয়া বলিতেছে, "ঠাকুর, তোমার ঋণ করিতে হইবে না! তুমি ব্রাহ্মণ ঠাকুর, তোমার গা দিয়া ব্রাহ্মণের তেজ বাহির হইতেছে। ঠাকুর! তুমি মূল্য মোটেই দিও না, অমনি গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমার মঙ্গল হইবে।" নিমাই কাপড় আনিয়া পথে পড়ুয়াদিগকে দেখাইয়া হাসিতে লাগিলেন, পড়ুয়াগণও হাসিতে লাগিল। এইরূপে নিমাই নানা পসারে গমন করিলেন। শেষে প্রকাণ্ড একবস্তা সওদা হইল। অথচ হস্তে এক কড়াও ছিল না, সওদা করিতে ঋণও করেন নাই।

কেহ কেহ এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, "নিমাই এইরূপে লোককে ভুলাইয়া দ্রব্যাদি লইতেন, একি ভাল কার্য হইত?" ইহার উত্তর এই যে, তাঁহাকে দেখিয়া যদি কেহ মুগ্ধ হইয়া কিছু দিত, তাহা তিনি লইতেন, তাহাতে দোষ কি? আর তিনি মূল্য যে দিতেন না, তাহারও প্রমাণ নাই। আর যদি মূল্য না দিয়াও থাকেন, তবুও সে কার্যের দোষ গুণ বিচার করিবার অধিকার যাঁহাদের অন্যের অপেক্ষা বেশী আছে, তাঁহারা ইহা দোষ বলেন না। যে তন্তুবায়গণ নিমাই পণ্ডিতকে বস্ত্র, যে গন্ধবণিকগণ তাঁহাকে গন্ধদ্রব্য দিয়াছিলেন, তাঁহারা পুরুষ-পুরুষানুক্রমে সে কথা মনে করিযা আনন্দে ও গৌরবে অদ্যাপি নয়নজল ফেলিয়া থাকেন। আর এক কথা। নবশাক কি সুবর্ণবণিকের এখনকার যে পদমর্যাদা তাহা এই নিমাই পণ্ডিতের দ্বারাই হয়।

শ্রীধর নামে একজন পসারী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ বাজারে কলার খোলার পাত্র ও থোড় মোচা বিক্রয় করিতেন। স্বভাব নিতান্ত সাধুর ন্যায়। ঐরূপ ব্যবসায় যৎকিঞ্চিৎ যাহা আয় হইত, তাহা দ্বারা নিজের সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন, এবং যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা ঠাকুরদেবতাকে দিতেন। তিনি দিবানিশি উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম জপ করিতেন। তাঁহার নাম জপিবার উপদ্রবে ভব্যলোকে নিদ্রা যাইতে পারিত না। স্থূল কথা, শ্রীধর একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সুতরাং নিমাই পণ্ডিতের তাঁহার উপর নিতান্ত আক্রোশ। নিমাই কখন কখন বাজারে যাইতেন, আর তাঁহাকে দেখিলেই শ্রীধরের মুখ শুকাইয়া যাইত। নিমাই বাজারে আসিয়াই প্রথমে শ্রীধরের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীধর ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন, "ঠাকুর! কাড়াকাড়ি করিবেন না, আমি যা মূল্য বলিব তাহার কম লইব না। আপনি আমার নির্ধারিত মূল্য দিয়াই লইয়া যান, নতুবা অন্য পসারীর নিকট ক্রয় করুন।" নিমাই বলিতেছেন, "আমি যোগানিয়া ছাড়ি না। সে যাহা হউক, শ্রীধর তুমি যেরূপ

কৃপণ, তোমার অনেক টাকা আছে।" শ্রীধর বলিতেছেন, "ঠাকুর তোমার পায়ে পড়ি, দ্বন্দ্ব করিও না। আমি দরিদ্র, টাকা কোথা পাব?" তখন নিমাই পণ্ডিত শ্রীধর যে মূল্য বলিল, তাহাব অর্দ্ধেক বলিয়া হাতে করিয়া দ্রব্য উঠাইলেন। আর শ্রীধর অমনি দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অন্য পসারীব কাছে যাও।"

তখন নিমাই কৃত্রিম কোপ করিয়া বলিতেছেন "তুমি যে আমার হাতের দ্রব্য কাড়িয়া লও, এ কাজ কি তুমি ভাল করিতেছ? জান, তুমি যে গঙ্গাকে প্রত্যহ নৈবেদ্য দাও, আমি তাহার পিতা?" ইহাতে শ্রীধর শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিয়া, দুই কর্ণে হাত দিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত! বয়স হইলে লোক ক্রমে ধীর হয়, কিন্তু তুমি ক্রমেই চঞ্চল হইতেছ! তোমার কি গঙ্গাকে কিছু ভয় নাই।"

নিমাই বলিতেছেন, "ভাল, তুমি দেবতাকে বিনা মূল্যে প্রত্যহ উপহার দিয়া থাক, আমাকে না হয় অল্প মূল্যে কিছু ছাড়িয়া দিলে।" তখন শ্রীধর বলিতেছেন, "ঠাকুর! আমি হার মানিলাম, কিন্তু আমি মূল্য কমাইব না। তবে তুমি নিতান্তই যদি না ছাড়, তবে তোমাকে প্রত্যহ একখণ্ড থোড় ও আহাব করিবার খোলার পাত্র বিনামূল্যে দিব, কিন্তু আমার সহিত দ্বন্দ্ব করিও না।" তখন নিমাই বলিতেছেন, "বেশ, এই কথা। তবে আর বিবাদ কি?" এই শ্রীধরের খোলায় নিমাই প্রত্যহ ব্যঞ্জন ভোজন করিতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গ যিনি লাখবালা সোণা।
—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

শচী যখন গঙ্গাস্নানে গমন করেন, তখন দেখেন যে, একটি বালিকা বিনীত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করে। কন্যাটি অতি সুশ্রী, বিবাহ হয় নাই। প্রথমে তিনি তাহার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু প্রত্যহ এইরূপে ঘাটে তাঁহার সহিত দেখা হইলেই সে অগ্রবর্তী হইয়া নমস্কাব করে দেখিয়া তাহার প্রতি শচী ক্রমেই আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। বালিকাটি এমনি লাজুক যে, নমস্কার করিয়া তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইয়া থাকে মুখ উঠায় না। শচী তাহাকে এই নিমিত্ত প্রাণের সহিত আশীর্বাদ করেন। শচী বলেন, "বাছা। তুমি জন্ম-এয়োস্ত্রী হও। তোমার সুন্দর বর হউক।" আর অমনি বালিকাটি লজ্জায় অভিভূত হয়।

একদিন শচী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা! তুমি কা'র মেয়ে?" কন্যাটি বলিল যে, তাহার বাপের নাম সনাতন মিশ্র। শচী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা! তোমার নাম কি?" কন্যাটি বলিল, "বিষ্ণুপ্রিয়া।"

শচী দেখিলেন কন্যাটি শুধু সুশ্রী ও লজ্জাশীলা নয়, বড় ভক্তিসম্পন্নাও বটে। সে প্রত্যহ তিনবার গঙ্গায় স্নান করে, আর তীরে বসিয়া বালিকাদের যে পূজা তাহা করে। শচী মনে ভাবিতেছেন, "এটি সনাতন মিশ্রের কন্যা, অবিবাহিতা, পরমা সুন্দরীও বটে। দেখিতে যেমন সুশ্রী, চরিত্রও তেমনি মধুর, আমার ভাগ্যে কি উহা হইবে?"

সনাতন মিশ্র রাজপণ্ডিত, ধনবান্ লোক, বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও শচীর আদান-প্রদানের ঘর। শচী ভাবিতেছেন যে, কন্যাটি যদি পান তবে নিমাইয়ের সহিত বিবাহ দেন। কিন্তু উহা কিরূপে ঘটিবে? সনাতন বড় মানুষ ও বড় কুলীন। তাঁহার ন্যায় লোক আমার ন্যায় দরিদ্রের ঘরে, পিতৃহীন বালককে কন্যাদান কেন করিবেন?

যাহা হউক, শচী কাশী মিশ্র ঘটককে ডাকাইলেন এবং তাহাকে মনের কথা জানাইয়া শেষে বলিলেন, "তুমি ঐ কন্যাটি আমার ঘরে আনিয়া দাও। মেয়েটির উপর আমার বড় মায়া হইয়াছে। তাহাকে দেখিলেই আমার কোলে করিতে ইচ্ছা করে।" কাশী মিশ্র এই আদেশ পাইয়া সনাতন মিশ্রের বাটিতে গমন করিয়া আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে সমুদয় কথা তাঁহাকে জানাইলেন ও শেষে বলিলেন, "তা যাহাই বলুন মহাশয়, নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় সুপাত্র নবদ্বীপে নাই।"

সনাতন 'হাঁ' কি 'না' কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আপনি একটু বসুন, আমি আসিতেছি।" ইহাই বলিয়া দ্রুতপদে ভিতর বাটিতে গমন করিলেন। যাইয়া তাঁহার ঘরণীর নিকট অতি প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন; "এতদিনে বিধি সুপ্রসন্ন হইলেন।"

সনাতন মিশ্রের এক কন্যা ও এক পুত্র। কন্যাটি বড়, নাম বিষ্ণুপ্রিয়া; পুত্রের নাম যাদব। কন্যাটি পরমা-রূপসী ও সুচরিত্রা, পিতামাতার প্রাণ। তাহাকে সুপাত্রে দান করিবেন, ইহা মনের স্থির-সঙ্কল্প; কিন্তু সুপাত্র পাবেন কোথা? বৈদিক-শ্রেণী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্প, তাঁহার আদান-প্রদানের ঘর আরও অল্প। কন্যাটির বিবাহের নিমিত্ত এই কারণে তিনি দিবানিশি চিন্তিত। নিমাই পণ্ডিতের যশ যখন প্রচার হইতে লাগিল, তখন নবদ্বীপের সকলে তাঁহাকে জানিলেন,—সনাতনও তাঁহার নাম শুনিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের ঘরের সহিত তাঁহার আদান-প্রদান চলে সুতরাং নিমাইকে কন্যাদান করিবার কথা স্বভাবতঃই তাঁহার মনের মধ্যে উদয় হইত।

এদিকে নিমাই পণ্ডিতের যশ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আবার যখন দ্বিগ্বিজয়ীকে জয় করিলেন; তখন তাঁহার প্রশংসায় নবদ্বীপ পরিপূর্ণ হইল। নবদ্বীপে বিদ্বৎজন-সমাজ, সেখানে বিদ্যা লইয়া লোকের ছোট বড় বিচার। যাঁহারা ধনবান্ তাঁহারা পণ্ডিতগণের দ্বারস্থ। যিনি মহাপণ্ডিত তাঁহার কিছুমাত্র অভাব নাই, সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবহ, তিনিই সমাজের কর্তা। ধনবান্ দোলা করিয়া যাইতেছেন, পথে যদি কোন পণ্ডিতকে দর্শন করিলেন, অমনি দোলা হইতে নামিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন।

শচীদেবী ভাবেন যে, নিমাই কাঙ্গাল ও বালক এবং একটু পাগল, তাহাকে সনাতন কেন কন্যাদান করিবেন? কিন্তু সনাতন তাহা ভাবেন না। তিনি ভাবেন যে, নিমাই নবদ্বীপের মধ্যে বিদ্বজ্জন সমাজের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত, তিনি তাঁহার কন্যা কেন গ্রহণ করিবেন?

নিমাইকেও তিনি দেখিয়াছেন। যাঁহারা সরল, তাঁহারা নিমাইকে দেখিলে জন্মের মত আকৃষ্ট হইতেন। সনাতন অতি সরল, নিমাইকে দেখিয়া তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, এটি ত মনুষ্য নয়, কোন দেবতা কি স্বয়ং মদন। ইনি কি তাঁহার কন্যা গ্রহণ করিবেন? দিবানিশি মনে মনে এই নিমিত্ত দেবতার নিকট নিমাই পণ্ডিতকে জামাতারূপে কামনা করেন। ঘরণীও এই কথা বলিয়াছিলেন, আর ইহা কিরূপে সংঘটন হইবে, দুইজনে বসিয়া বসিয়া তাহাই যুক্তি করিতেন। এমন সময় কাশী মিশ্র আসিয়া সনাতনকে বলিলেন, "শচীদেবীর ইচ্ছা তোমার কন্যাকে তাঁহার পুত্রবধূ করেন।" ইহাতে সনাতন আনন্দে কিছু বলিতে পারিলেন না, উঠিয়া দৌড়িয়া ঘরণীকে শুভসংবাদ দিতে গেলেন।

এখন সেই কন্যাটির কথা শুনুন। বালিকাটির রূপ অতি মনোহর কিন্তু তাঁহার রূপ অপেক্ষাও গুণ অধিক, আবার হৃদয়ে ভক্তি থাকায় সেই রূপ যেন আরও প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে লজ্জা, বিনয় ও ভক্তি, বাহিরের সুগঠন, কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, হিঙ্গুলের ন্যায় অধর, কমলের ন্যায় নয়ন ও কুন্দেকাটা বদন। কন্যাটি তাঁহাকে প্রণাম করিলে শচী তাহাকে শুধু আশীর্বাদ করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, নিকটে রাখিয়া তাহার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিতেন। কন্যাটিও যেন তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না। শচী মনে মনে ভাবিতেন, "মা, আমি যদি তোমাকে ঘরে আনিতে পারি, তবেই আমার নদীয়া-বসতি সার্থক হয়।"

এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ রমণী স্নান করে, কে কাহাকে চিনে? সেখানে সেই কন্যাটি, এত রমণী থাকিতে, যাঁহার সহিত কোন সম্পর্কও নাই এমন যে শচী দেবী, তাঁহাকে বাছিয়া প্রত্যহ ভক্তিপূর্বক কেন প্রণাম করেন? শুধু তাহা নয়। বালিকার বয়ঃক্রম একাদশের ঊর্ধ্ব নয়, কিন্তু তবু প্রত্যহ তিনবার গঙ্গাস্নান করেন ও দিবানিশি ঘরের ঠাকুরসেবায় রত থাকেন, ইহারই বা কারণ কি?

নিমাইয়ের পার্ষদ মুকুন্দ পণ্ডিত, তাঁহার "শ্রীগৌরাঙ্গ উদয়" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, শ্রীনিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে উদয় হয়েন, তাহাতে তিনি নবানুরাগে পাগলিনীর মত হয়েন। চৈতন্যভাগবত

এই সম্বন্ধে একটু আভাস দিয়া বলিয়াছেন যে, কন্যাটি দেবভক্তিতে সর্বদা রত থাকিতেন; তিনবার গঙ্গাস্নান করিতেন ও শচীদেবীকে দেখিলেই প্রণাম করিতেন। সে যাহা হউক, নিমাই পণ্ডিতই স্বপ্নে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করুন, কি তিনি নিমাইকে গঙ্গার ঘাটে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হউন, ইহা নিশ্চয় যে, শচীদেবী তাঁহার নিকট বড় মিষ্ট লাগিতেন। আর শচী দেবী মিষ্ট কেন লাগিতেন, না নিমাই পণ্ডিতের মা বলিয়া।

কন্যাকালে নিমাই পণ্ডিতকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়া বালিকাটি বড় ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। মুহুর্মুহুঃ গঙ্গাস্নান করিতে আসেন; মনে আশা—তাঁহার বরকে দেখিতে পাইবেন। আবার, শচীকে দেখিলে ইচ্ছা করে যে, তাঁহার নিকট গমন করেন। কিন্তু কি বলিয়া যাইবেন? এক উপলক্ষ্য—প্রণাম করা। তাই শচীকে দেখিলেই ধীরে ধীরে গমন করিয়া ভক্তিপূর্বক প্রণাম করেন, আর প্রণাম করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া থাকেন;—শচীকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। মনে মনে কি ভাবেন জানি না; বোধ হয় ভাবেন, "তুমি আমার মা, আমাকে ঘরে লইয়া যাও। আমি চিরজীবন তোমার সেবা করিব।" দেবতাগণের নিকট ঠাকুর-ঘরে দিবানিশি যাপন করেন। সেখানেও ঐরূপ কিছু মনে ভাবেন, এবং ঠাকুরদিগের নিকট মনে মনে নিবেদন করেন।

সনাতন মিশ্র আনন্দে ডগমগ হইয়া কাশী মিশ্রের প্রস্তাব আপনার ঘরণীকে শুনাইলেন। তাহাতে তিনিও আনন্দে পুলকিত হইলেন। এ সংবাদ বিষ্ণুপ্রিয়াও শুনিলেন। সেদিন তাঁহার তিনবার গঙ্গাস্নান, দেবদেবীর পূজা, ঘরের ঠাকুর অর্চনা ও ভাবী শ্বাশুড়ী শচীদেবীকে প্রণাম করা, সমুদয় সফল হইল। সুতরাং তখন তাঁহার কি ভাব হইল, তাহা পাঠক হৃদয়ঙ্গম করুন, আমরা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব না। সনাতন মিশ্র বাহিরে ফিরিয়া আসিয়া কাশী মিশ্রকে বলিলেন, "এ কার্য অবশ্য কর্তব্য, বহুভাগ্যে নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় জামাতা মিলে। আপনি শচীদেবীকে গিয়া বলিবেন যে, তিনি আমার কন্যাটিকে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া আমাকে ও আমার গোষ্ঠীকে কৃতার্থ করিলেন।" কাশী মিশ্রও এই শুভ-সংবাদ শচীদেবীকে জানাইলেন।

সনাতন মিশ্র ধনবান, কন্যাটি তাঁহার প্রাণ, নিমাই পণ্ডিত তাঁহার জামাতা হইবেন, এই সমস্ত কারণেই পণ্ডিত মিশ্র আহ্লাদে সংজ্ঞাহারা হইলেন। তিনি এই বিবাহ উপলক্ষ্যে সর্বস্ব দান করিবেন, স্থির করিলেন। তখন স্বর্ণকার ডাকাইয়া নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ও বিবাহের অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে দিলেন। "শুভস্য শীঘ্রং" ভাবিয়া এই কার্য যাহাতে অনতিবিলম্বে নির্বাহ হয়, তাহার নিমিত্ত লগ্ন স্থির করিতে এক গণককে ডাকাইলেন।

গণক সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে আসিতেছেন, এমন সময় পথে চঞ্চল নিমাই পণ্ডিতের সহিত তাঁহার দেখা হইল। তখন গণক হাসিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত! জান, আমি কোথায় যাইতেছি?" নিমাই বলিলেন, "না, আমি জানি না।" গণক বলিলেন, "আমি সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে বিবাহের লগ্ন স্থির করিতে যাইতেছি।" নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার বিবাহ?" গণক উত্তর করিলেন, "তোমার, আর কাহার?" ইহাতে নিমাই পণ্ডিত অত্যন্ত হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমার বিবাহ? কৈ আমি ত তাহার কিছুই জানি না।" ইহা বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

গণক সনাতনের বাড়ীতে আসিলে, সনাতন তাঁহাকে লগ্ন স্থির করিতে বলিলেন। শুনিয়া গণক গম্ভীরভাবে বলিলেন যে, নিমাই পণ্ডিতের সহিত একটু পূর্বে তাঁহার দেখা হইয়াছিল, আর বিবাহ সম্বন্ধে দুই একটি কথাও হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল যেন তাঁহার এ বিবাহে মত নাই।

সনাতন ভাবিলেন যে, বিবাহের কথাবার্তা শচীদেবীর সহিত হইয়াছে। তিনি বৃদ্ধা, পুত্র বড় হইয়াছে। নিমাই পণ্ডিতের এখন স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করাই সম্ভব। যখন নিমাইয়ের মত নাই, তখন শচীদেবীর মতে কি হইবে? এই ভাবিয়া সনাতন মর্মাহত হইয়া অধোবদনে রহিলেন। ক্রমে এ কথা তাঁহার ঘরণীর কর্ণে উঠিল, তিনি হাহাকার করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও শুনিলেন, তখন তাঁহার কি অবস্থা হইল তাহা বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। সনাতন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে

ডাকাইলেন ও সমুদয় কথা বলিলেন। কিন্তু পাত্রের যখন বিবাহে মত নাই তখন বন্ধুবান্ধব আর কি পরামর্শ দিবেন? এইরূপে সনাতন মিশ্র কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একথা নিমাই পণ্ডিত শুনিলেন। তিনি কেন যে গণকের কাছে ওরূপ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বিচার করা নিস্ফল। তাঁহার মাতা তাঁহার প্রতি শিশু সন্তানের মত ব্যবহার করিতেন। নিমাইও সংসারের কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না—জননীই সংসারের কর্ত্রী। তিনি যখন যে অর্থ উপার্জন করিতেন, জননীর শ্রীচরণে রাখিয়া অবসর লইতেন। শচী আপন ইচ্ছামত সংসার চালাইতেন। পুত্রের বিবাহ দেওয়া তাঁহার নিজের কাজ, ইহাই ভাবিয়া শচী আপনি কন্যা দেখিলেন, বর দেখিলেন, সম্বন্ধ নির্ণয় করিলেন। আবার আপনা-আপনিই বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নিমাইকে আবার এ সম্বন্ধে কি বলিবেন? সুতরাং একথাও হইতে পারে যে, প্রকৃতই নিমাই বিবাহ সম্বন্ধে কিছু জানিতেন না, তাই গণককে ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

আবার ইহাও হইতে পারে যে, সকল বিষয় উপেক্ষা করা নিমাইয়ের মজ্জাগত স্বভাব ছিল হঠাৎ কাহারও করস্থ হইতেন না। কারণ যদিও তাঁহার বয়ঃক্রম তখন বিংশতি বৎসরের বেশী নহে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অতি তেজীয়ান পুরুষ। তিনি উপেক্ষা করিলে, উপেক্ষিতের তাঁহার উপর আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পাইত;—সনাতন মিশ্র সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিল। সনাতন মিশ্র ও তাঁহার গোষ্ঠী নিমাই কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন।

যেখানে প্রীতি গাঢ়, সেখানে উপেক্ষায় উহা বর্ধিত হয়, যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে উপেক্ষা করিলেন, তখন শ্রীমতী অচেতন হইয়া পড়িলেন, চেতন পাইয়া চর্তুদিকে কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণও আবার উপেক্ষা করিয়া বড় ক্লেশ পাইলেন। তাঁহার উপেক্ষায় শ্রীমতী মর্মাহত হইবেন ভাবিয়া তিনি নিকুঞ্জবনে শয়ন কবিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। সেইরূপ যেমন সনাতন হাহাকার করিতে লাগিলেন, নিমাইও একথা শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তখন ব্যস্ত হইয়া একজন সুহৃদকে সনাতন মিশ্রের নিকট পাঠাইলেন।

নিমাই পণ্ডিতের প্রেরিত লোক আসিয়া সনাতনকে বলিলেন, "নিমাই পণ্ডিত জননীর আজ্ঞাবহ। জননী যাহা স্থির করিয়াছেন তাহাই তাঁহার শিরোধার্য্য। অতএব আপনি দিন স্থির করিয়া বিবাহের উদ্যোগ করুন।" ইহাতে সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে পুনরায় আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল।

এদিকে নিমাই পণ্ডিতের আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব ও পড়ুয়াগণ শুনিলেন যে, সনাতন মিশ্রের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়াছে; এই কথা শুনিয়া সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। কায়স্থ জমিদার বুদ্ধিমন্ত খাঁ বলিলেন যে, বিবাহের সমুদয় ব্যয়ভার তিনি একাকী বহন করিবেন। ইহাতে নিমাই পণ্ডিত যে মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাড়ীতে টোল করিয়াছিলেন তিনি আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, তিনিও ব্যয়ভারের অংশ লইবেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁ তখনই ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন,—এ বামুনের বিবাহ নয়, তিনি নিমাই পণ্ডিতের বিবাহ এরূপ সমারোহের সহিত দিবেন যে, রাজপুত্রের বিবাহও সেরূপ হয় না। যাহা হউক, বুদ্ধিমন্ত খাঁ, মুকুন্দ সঞ্জয় এবং নিমাইয়ের পড়ুয়াগণ সকলে একত্র হইয়া বিবাহের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। উদ্যোগও প্রকাণ্ডরূপে হইতে লাগিল।*

* অল্পদিন হইল একখানি সংস্কৃত পুস্তকে বুদ্ধিমন্ত খানের মহিমা জানিলাম। গ্রন্থখানির নাম "বল্লাল চরিত"। প্রণেতার নাম শ্রীমৎ আনন্দ ভট্ট। গ্রন্থকর্তা বুদ্ধিমন্ত খানের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। তিনি খান মহাশয়কে নদীয়ার রাজা বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। ইহাতে নদীয়ার রাজা দুইজন হইলেন,—"জগাই মাধাই আর বুদ্ধিমন্ত'। জগাই মাধাই কোটাল, সুতরাং রাজা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। আর বুদ্ধিমন্ত খান প্রকৃতপক্ষে রাজা অর্থাৎ জমিদার ও ধনী বলিয়া। নিমাইয়ের বয়স যখন বিংশতির ন্যূন ব্যতীত উর্দ্ধ হইবে না, তিনি তখন প্রকাশ পায়েন নাই; অথচ বুদ্ধিমন্ত তাঁহার ভৃত্য—ইহাতে বুদ্ধিমন্তের কি শক্তি ছিল, পাঠক তাহা কতক বুঝিবেন।

এখনকার আর তখনকার বিবাহের উৎসব প্রায় একই রূপ। বিবাহের নিমিত্ত নবদ্বীপের সমস্ত ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও অন্যান্য জাতির মধ্যে যাঁহারা প্রধান তাঁহারা সকলে নিমন্ত্রিত হইলেন। বিবাহের উদ্যোগও সেইরূপ হইতে লাগিল। নিমাইয়ের বাড়ী চন্দ্রাতপে, নিশানে, কদলীবৃক্ষে, আম্রসারে সুসজ্জিত হইল। নারীগণ সমস্ত বাড়ীতে আলিপনা দিলেন। বিবাহের নিমিত্ত বিস্তর আহারীয় দ্রব্য সংগৃহীত হইল। ভোজ্য ও বস্ত্র সমস্ত নবদ্বীপে বিতরিত হইল। সনাতন মিশ্র অধিবাস করিতে লোক পাঠাইলেন। শচীদেবীও অধিবাস করিতে সনাতন মিশ্রের বাড়ী লোক পাঠাইলেন। বিবাহের যেরূপ সমারোহ হইল, নবদ্বীপে সেরূপ সমারোহের বিবাহ কেহ কখনও দেখে নাই। চৈতন্যভাগবত বলেন যে, যে সমুদয় দ্রব্য পড়িয়া রহিল, তাহা দ্বারা পাঁচটি উত্তম বিবাহ সম্পন্ন হয়। চৈতন্যভাগবত আরও বলিয়াছেন যে, নিমাইয়ের অলৌকিক শক্তিতে দ্রব্যাদি অফুরন্ত হইয়াছিল। শচী মহানন্দে জল সওয়া, ষষ্ঠীপূজা প্রভৃতি নারীদিগের নিয়মিত সমুদয় কার্য করাইলেন।

নিমাই স্নানাদি করিতে বসিলেন। এয়োগণ তাঁহার অঙ্গ মার্জনা, পদদ্বয় পরিষ্কার, কেশ বিন্যাস করিতে লাগিলেন। সর্বাঙ্গ মার্জনা করিয়া পরিশেষে তৈল আমলকী ও হরিদ্রা মাখাইলেন। যে রমণীগণ নিমাইয়ের অঙ্গ মার্জনা করিতেছেন, কিম্বা সেখানে দাঁড়াইয়া যাঁহারা দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইতেছে।

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর যুবা পুরুষের ঐরূপ অঙ্গ মার্জনা করিতে গেলে কোন কোন রমণীর মন বিচলিত হইবার কথা। কিন্তু যাঁহারা নিমাইয়ের সেবা করিতেছিলেন তাঁহাদের মনের মধ্যে কোন কুভাব উদয় হইল না। যে ভাবের উদয় হইল, তাহাতে কেবল বিমলানন্দ উঠিতে লাগিল। নিমাইয়ের এই শক্তির কথা পূর্বেও বলিয়াছি। নিমাইকে দর্শন করিয়া যাঁহারা মুগ্ধ হইতেন, তাঁহাদের সেই সঙ্গে সঙ্গে মনও নির্মল হইত।

তাহার পর, অন্যান্য নিয়মিত কার্য সমাধা হইয়া গেলে, নিমাইয়ের বয়স্যগণ তাহার বেশভূষা করিতে বসিলেন। কপালে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনের ফোঁটা দিয়া, উহার মধ্যস্থলে মৃগমদবিন্দু দেওয়া হইল। সমস্ত মুখ অলকাবৃত ও নয়নে কজ্জল দেওয়া হইল। গলায় ফুলের মালার উপর মতির মালা দুলিতে লাগিল। বাহুতে রত্ন-বাজু ও কর্ণে কুণ্ডল পরান হইল। নিমাই কটী আঁটিয়া পীত ও পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন। গাত্রে পট্ট চাদর দেওয়া এবং মস্তকে মুকুট পরানো হইল। নিমাই তখন উঠিয়া জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া, অতি ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিলেন; আর শচীদেবী ধানদূর্বা দিয়া আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া আশীর্বাদ করিলেন।

নিমাই গোধূলি লগ্নে বয়স্যগণ সহ দোলায় আরোহণ করিলেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁর পদাতিক ঘিরিয়া চলিল। নানাবিধ বাদ্যের সঙ্গে নিমাই প্রথমে সুরধুনী তীরাভিমুখে চলিলেন। তখন এখনকার মত ঢোল ছিল না। ঢোলের পরিবর্তে মৃদঙ্গ, মাদল, জয়ঢাক ও বীরঢাক প্রভৃতি বাদ্য ছিল। নাচওয়ালারা নাচিয়া ও কাচুকেরা কাচ-কাচিয়া, সঙ্গী লোকসমূহের আমোদ-বিধান করিতে করিতে চলিল। তাহাদের রঙ্গ দেখিয়া নিমাই হয় ত একবার হাসিলেন। এইরূপে নিজ ঘাটে কিছুকাল বিবিধপ্রকার বাদ্যে ও বাজীতে বাড়ীর নিকটস্থ লোক সকলকে আনন্দিত করিয়া নিমাই সনাতন মিশ্রের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

সনাতনের বাড়ীতেও ঐরূপ উদ্যোগ। সনাতন বাদ্যের সমভিব্যাহারে অগ্রবর্তী হইয়া জামাতাকে লইতে আসিলেন। আপনি কোলে করিয়া জামাতাকে দোলা হইতে উঠাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি ও খইবৃষ্টি হইতে লাগিল, আর শত শত স্ত্রীলোক হুলুধ্বনি ও শঙ্খবাদ্য দ্বারা মঙ্গল ঘোষণা করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিতেছেন—

"তবে সর্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়ায় আনিলেন সভায় ধরিয়া।।"

যখন বিষ্ণুপ্রিয়া সভায় আসিলেন, তখন সভাস্থ লোক কিরূপ দেখিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গ জিনি লাখবালা সোণা।
ঝলমল করে যেন তড়িৎ প্রতিমা।।"

বিষ্ণুপ্রিয়াকে শুভদৃষ্টির নিমিত্ত, নিমাইয়ের অগ্রে পিঁড়ির উপর বসাইয়া সকলে উচ্চ করিয়া ধরিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জায় অভিভূতা হইয়া বদন অবনত করিয়া রহিলেন। তখন বর কন্যা উভয়ের মুখ একখানি বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করা হইল। সকলে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নয়ন মেলিয়া বরের মুখ দেখিতে কহিলেন। কিন্তু লজ্জায় তিনি তাহা পারিলেন না। তখন সকলে বলিলেন যে, বরের মুখ দেখিতে হয়, না দেখিলে দোষ। কাজেই বিষ্ণুপ্রিয়া নয়ন মেলিলেন। তখন নিমাইয়ের দুই চক্ষে আর বিষ্ণুপ্রিয়ার দুই চক্ষে মিলন হইল। এ মিলন চকিতের মত হইয়া গেল। কিন্তু এই নিমিষের মধ্যে চারি চক্ষে চারিটি কথা হইল, তাহা এই, "তুমি আমার, আমি তোমার!" তাহার পরে উভয়ে উভয়ের গলায় মাল্য দিলেন ও ফুল ফেলাফেলি করিতে লাগিলেন। পরে বরকন্যা একত্রে দাঁড়াইলেন। সেই সময়ের ছবিটী বলরাম দাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

"ঘোমটা আড়ালে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। আড় চোখে হেরে পতি-মুখ ছবি।।
ভাবিছেন মনে কি সুন্দর মুখ। কি তপেতে বিধি দিল এত সুখ।।
এই যে লোভের সামগ্রী দক্ষিণে। কারু অধিকার নাহি এই ধনে।।
দক্ষিণে দাঁড়ায়ে এটী মোর বর। এ ধন আমার কেবল আমার।।
মুখ হেট করি হেরিছে চরণ। আপনারে চির করিছে অর্পণ।।
বিধি সাক্ষী করি কহিছেন মনে। আমি ত বালিকা কহিতে জানিনে।।
মোর যত সুখ ধর তুমি করে। তোমার যে দুঃখ দাও মোর শিরে।।
দুখে কিবা সুখে যেন রাখ মোরে। ওই চন্দ্রমুখ যেন মোরে স্ফুরে।।
শত অপরাধ করিব চরণে। ক্ষমিবা সকল তুমি নিজ গুণে।।"

বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গের বামে দাঁড়াইয়া নানা ছলে অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে বরের মুখ দেখিতেছেন। কখনও বা চারি চক্ষে মিলন হইতেছে, আর বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জায় একেবারে জড়ীভূতা হইতেছেন। এই বরটীকে বিবাহের পূর্বে চিত্ত সমর্পণ করিয়া বালা বিষ্ণুপ্রিয়া নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। আবার গণকের সেদিনকার কথা মনে করিয়া ভাবিলেন যে, তাঁহাকে পাইতে পাইতে হারাইতে ছিলেন। অদ্য তাঁহার সেই সাধনের ধন তাহার দক্ষিণে পাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার কিছু মাত্র বাহ্যজ্ঞান নাই। কখন ভাবিতেছেন—'এ স্বপ্ন' কখন ভাবিতেছেন—'এ কাহার বিবাহ?' 'এ কাহার বিবাহ, কাহার সহিত হইতেছে?' কখন নয়নজলে তারা ডুবিয়া যাইতেছে, কিছু দেখিতে পাইতেছেন না। কখন বা বরের অঙ্গ-স্পর্শ সুখ অনুভব করিতেছেন। ভাবিতেছেন, 'কি মিষ্ট! কি সুখের সামগ্রী!' আবার তদ্দণ্ডে ভাবিতেছেন—'এত সুখ কি থাকিবে?' আর ভয়ে মুখ শুকাইয়া যাইতেছে।

তারপর বরকন্যা বাসরঘরে চলিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গ একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছে, চলিতে পারিতেছেন না। নিমাই এক প্রকার তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। এমন সময় ঝনাৎ করিয়া একটি শব্দ হইল,—বিষ্ণুপ্রিয়ার দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠে উছট লাগিল। তিনি দারুণ ব্যথা পাইলেন ও রক্ত পড়িতে লাগিল।*

কিন্তু তখনি একটি কথা মনে হওয়ায় ব্যথিত বিষ্ণুপ্রিয়ার আর ব্যথার কথা মনে থাকিল না। তিনি ভাবিলেন,—'বাসরঘরে যাইতে এ কি অমঙ্গল!' অমনি সকল সুখ ফুরাইয়া গেল, আর তখন তাঁহার নূতন আশ্রয়, সেই বরের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন।

* শ্রীখণ্ডের গোস্বামীগণ বলেন, লোচন তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন, আর সেই সময়ে ঐ গ্রন্থে উপরি উক্ত ঘটনা লিখেন নাই বলিয়া ক্ষোভ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার পায়ে উছট লাগিবামাত্র জানিতে পারিলেন, আর তাঁহার নব-প্রিয়ার দুঃখ ও ভয় দেখিয়া আপনার পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিলেন। এই প্রথমে বরকন্যার আলাপ হইল। যদিও এ আলাপ অঙ্গুষ্ঠে অঙ্গুষ্ঠে, তবুও উভয়েব মনের ভাব উভয়ে বুঝিতে পারিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের ভাব এই যে, 'হে বর! হে নব-পরিচিত! হে আশ্রয়! আমি বিপদাপন্ন, আমাকে আশ্রয় দাও'। আর নিমাইয়ের মনের ভাব, 'হে দুর্বলে! হে প্রিয়ে! এই ত আমি আছি।' নিমাইয়ের অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শে বিষ্ণুপ্রিয়ার সমুদয় বেদনা গেল, শোণিত-ক্ষরণ বন্ধ হইল।

পরদিবস নিমাই যুগল হইয়া গুরুজনকে প্রণাম করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সনাতন তাঁহার পুত্র যাদবকে নিমাইয়েব হস্তে সঁপিয়া দিয়া; শেষে কন্যাটীর হস্ত লইয়া নিমাইয়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, "আমার কন্যা তোমার দাসীর যোগ্যা নয়, তবে তুমি নিজগুণে ইহাকে কৃপা করিবে।" নিমাই মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। সনাতনের নয়নে জল পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ধৈর্য হারাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের আঁখিও ছল ছল করিতে লাগিল। সনাতন আপনার পুত্রটিকে দেখাইয়া বলিলেন, "আমার এই পুত্রটিকে পালন করিবে।" নিমাই সম্মত হইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে সনাতন সান্ত্বনা করিলেন। তখন বহুতর দান সামগ্রী লইয়া নিমাই নববধূসহ বাড়ীতে আসিলেন। শচী অগ্রবর্তী হইয়া বধূমাতাকে কোলে করিয়া মুখে শত চুম্বন দিলেন ও জ্ঞানহাবা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—

"বধূ কোলে করি তবে শচীর নাচন।"

সপ্তম অধ্যায়

"যে প্রভু আছিলা অতি পরম গভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

এইরূপে আন্দাজ দুই বৎসর গত হইল। এই দুই বৎসরে নিমাই কিঞ্চিৎ স্থির হইলেন। এই দুই বৎসর শচীর আনন্দের সীমা ছিল না। এক দিবস নিমাই শচীর নিকট গয়াক্ষেত্রে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। পিতৃঋণ শোধ করিতে যাইবেন, শচী নিমাইকে নিষেধ করিতে পারিলেন না। তবে সঙ্গে নিমাইয়ের মেসো চন্দ্রশেখর চলিলেন এবং নিমাইয়ের অনেক শিষ্যও চলিলেন। আশ্বিন মাসে বাড়ীর বাহির হইলেন; গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়া মন্দারে আসিয়া নিমাইয়ের জ্বর হইল। এই নিমাইয়ের প্রথম পীড়া, শেষ পীড়াও বটে। ইহাতে সকলে চিন্তিত হইলেন। চিন্তিত হইবার কারণও ছিল, জ্বর কিছু কঠিন বলিয়া বোধ হইল। তখন নিমাই তাঁহার নিজের চিকিৎসা নিজে করিলেন। তিনি বলিলেন যে, সেখানকার ব্রাহ্মণের পাদোদক আনা হউক। তাহাই করা হইল, আর উহা পান করিবামাত্র তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গেল।

নিমাইয়ের এই পীড়া লইয়া মহাজনগণ কিছু বিচার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, সে দেশের ব্রাহ্মণের আচার দেখিয়া নিমাইয়ের কোন সঙ্গী মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিলেন। নিমাই ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য এই রঙ্গ করিলেন। কেহ কেহ এ রোগের কারণ অন্যরূপ বলেন। জ্বরের উদ্দেশ্যে শরীর-যন্ত্রকে পরিষ্কৃত করা। নিমাইয়ের দেহযন্ত্রে কোন ময়লা ছিল না। কিন্তু তিনি পৃথিবীতে আসিয়া এ জগতের নিয়মাধীন হইয়াছেন। এই পৃথিবীর ময়লাতে সেই যন্ত্রটিতে কিছু ময়লা হইয়াছিল, আর জ্বর হইয়া উহা পূর্বের ন্যায় বিশুদ্ধ হইল। এ কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, এই জ্বরের অল্পকাল পরেই তিনি আর একরূপ হইলেন, নিমাই পণ্ডিত আর পূর্বের মত রহিলেন না।

গয়ায় গমন করিয়া নিমাই দুইকর জুড়িয়া গয়াধামকে প্রণাম করিলেন। তখন নিমাইয়ের চাঞ্চল্য নাই, দ্রুতগমন নাই, হাস্য-কৌতুক নাই। ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন, অতি গম্ভীরভাবে সমুদয় কার্য করিতেছেন। ভক্তি-উদ্দীপক যাহা দেখিতেছেন, তাহাই প্রণাম করিতেছেন। ক্রমে গয়ার সমুদয় কার্য করিতে লাগিলেন।

পিতৃকার্য করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে আবার স্নান করিলেন, তাহার পর চক্রবেড় আসিয়া শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে চলিলেন। এখানে গয়াসুরের মস্তকে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম দিয়াছিলেন, আর সেই পদের চিহ্ন বর্তমান আছে। সেই গদাধরের পদচিহ্নকে ব্রাহ্মণগণ স্তব করিতেছেন; আর যাত্রিগণকে শুনাইয়া বলিতেছেন, "দেখ, শ্রীভগবানের পদচিহ্ন দেখ; যে শ্রীভগবানের পদনখ-জ্যোতিঃ সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যায় দর্শন পাওয়া যায় না, তাঁহার কৃপা দর্শন কর। দেখ, তিনি কত করুণাময়! ঐ পদ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, ঐ শ্রীপদের নিমিত্ত মহাদেব উন্মত্ত!"

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিয়াই নিমাই স্তম্ভিত হইলেন। নিমাই একদৃষ্টে সেই পদপানে স্পন্দনহীন হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ঠোঁট দুটি কাঁপিতে লাগিল। যেন নিমাইয়ের নয়নে জল আসিতেছে, আর তিনি নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। শেষে নিমাইয়ের বড় বড় দুটি নয়নতারা জলে ডুবিয়া গেল। নয়ন-জল নয়নে স্থান পাইল না,—না পাইয়া বহিয়া বদনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে নূতন জলধারার সৃষ্টি হইল। উহা আবার নয়নে স্থান না পাইয়া বদনে আসিল। সুতরাং পূর্বকার নয়ন-জলধারা আর বদনে থাকিতে পারিল না, বহিয়া বুকে আসিতে লাগিল। তখন প্রশস্ত বুকেও উহার স্থান হইল না, ত্রিধারা হইয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল। ক্রমে আঁখিবারির বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অগ্রে অপাঙ্গ হইতে একটি ধারা পড়িতেছিল, ক্রমে নাসিকার কোণ হইতে আর একটি ধারার সৃষ্টি হইল। সে ধারা স্বতন্ত্র পথ ধরিয়া মৃত্তিকা পর্যন্ত আসিল। আর সেই পথ দিয়া জল বহিতে লাগিল। নয়ন-জলের বেগ আরও বাড়িয়া উঠিল, তখন নয়নের মধ্যস্থান দিয়া আর একটি ধারার সৃষ্টি হইল। পরে সমুদয় ধারাগুলি মিশিয়া গেল; তখন সমস্ত নয়ন বহিয়া বদন জুড়িয়া একটিমাত্র ধারা পড়িতে লাগিল; ইহাতে নিমাইয়ের উপবীত ভিজিয়া গেল, উত্তরীয় ভিজিয়া গেল, বসন ভিজিয়া তাঁহার নয়ন-জলে সে স্থান জলমগ্ন হইল।

নিমাইয়ের বদনে বাক্য নাই, কণ্ঠে শব্দ নাই, বিম্বৌষ্ঠ দুইখানি মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে। বদন-চন্দ্রমা এত প্রফুল্লিত হইয়াছে যে, দর্শকগণ নিমিষহারা হইয়া উহার সুধা পান করিতেছেন। সমস্ত অঙ্গ অল্প অল্প কাঁপিতেছে, পড়িতে পড়িতে পড়িতেছেন না। কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শ করে এমন সাহসও কাহার হইতেছে না। দর্শকগণের মধ্যে ঈশ্বরপুরীও ছিলেন। তিনিও শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সেই সময় গয়ায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি নিমাইকে দেখিয়াছেন, কিন্তু নিমাই তাঁহাকে দেখেন নাই। তিনি নিমাইয়ের ভাব একদৃষ্টে দর্শন করিতেছেন। তিনিও ঐ রসের রসিক সুতরাং নিমাইয়ের শ্রীবদনে যে তরঙ্গ খেলিতেছে, তিনি উহার মাধুর্য আস্বাদন করিতেছেন। এরূপ দৃশ্য পূর্বে কখনও তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। শুধু তাহা নয়,—মনুষ্যের যে এরূপ গাঢ় ভাব উদয় হইতে পারে, তাহাও তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। মেঘ দেখিলে মাধবেন্দ্রের কৃষ্ণ স্ফূর্তি হইত, হইয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইতেন।

নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া ঈশ্বরপুরী বুঝিলেন, উহা অমানুষিক। তিনি অধিকক্ষণ এই দর্শনসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না; কারণ তিনি দেখিলেন নিমাই মূর্চ্ছিত হইতেছেন। নিমাইয়ের অবস্থা দেখিয়া ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে ধরিলেন। তখন নিমাইয়ের বাহ্যজ্ঞান হইল; ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলেন, আর পুরী গোসাঞি অমনি তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিলেন। উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া প্রেমবারিতে উভয়ে উভয়কে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

নিমাই চৈতন্য পাইয়া বলিতেছেন, "আজি আমার গয়া যাত্রা সফল হইল, আজি আমার জনম সফল হইল, আজি আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস হইলাম,—যেহেতু তোমার অমূল্য চরণ দর্শন করিলাম। গোঁসাই, আমি ভবসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি; তুমি দয়াময়, আমাকে উদ্ধার কর। আমার এই দেহ আমি একেবারে তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। তুমি আমার উপর এরূপ শুভ দৃষ্টিপাত কর, যেন আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসুধা পান করিতে পারি।"

ঈশ্বরপুরী বলিলেন, "পণ্ডিত! যে অবধি আমি তোমাকে নবদ্বীপে দর্শন করিয়াছি, সেই অবধি তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছ। আমি তোমাকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া, অবিচ্ছিন্ন সুখভোগ করিতেছি। এখন আমি স্ববশে নহি, তোমারই অধীন। তুমি যেরূপ আজ্ঞা করিবে, আমি তাহাই করিব।"

নিমাই বিদায় লইয়া বাসায় আসিলেন, আসিয়া রন্ধন করিতে বসিলেন। রন্ধন প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় সেখানে ঈশ্বরপুরী আসিয়া উপস্থিত। ঈশ্বরপুরী আর নিমাইকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছেন না। ঈশ্বরপুরী সকল বন্ধন ছেদন করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া, শেষে নিমাইয়ের বন্ধনে পড়িয়াছেন। তাই আবার নিমাইয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত। নিমাই ইহাতে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঈশ্বরপুরী রহস্য করিয়া বলিলেন, "তোমার বন্ধন সমাপ্ত হইল, আমিও ক্ষুধার্ত হইয়া তোমার নিকটে আসিলাম আমার বড় ভাগ্য।"

নিমাই বলিলেন, "রন্ধন সমাপ্ত হইয়াছে, তুমি কৃপা করিয়া ভোজন কর।" ঈশ্বরপুরী বলিলেন, "আমি ভোজন করিব, তুমি কি খাইবে? বরং যে অন্ন রন্ধন করিয়াছ, আইস—আমরা দুই জনে ভাগ করিয়া তাহাই আহার করি।" নিমাই সে কথা শুনিলেন না। অতি যত্ন করিয়া সমস্ত অন্নই ঈশ্বরপুরীকে ভুঞ্জাইলেন। ঈশ্বরপুরীকে ভোজন করাইয়া তাঁহার অঙ্গে চন্দন লিপ্ত করিয়া, গলে ফুলের মালা দিলেন। পরে আপনি রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেন।

তৎপরে শুভদিনে শুভক্ষণে ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের কর্ণে মন্ত্র দিলেন। মন্ত্রটি দশাক্ষরী, "গোপীজন বল্লভে"। মন্ত্র দিয়া নিমাই পণ্ডিতকে আলিঙ্গন করিলেন, আর উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। এখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কথাটী স্মরণ করুন, যথা, "মাধবেন্দ্র যে অঙ্কুর রোপন করিয়াছিলেন, তাহার বৃক্ষ গৌরাঙ্গ ঠাকুর হইলেন।"

ঈশ্বপুরীর সহিত পণ্ডিতের এই শেষ দেখা। তিনি কেন, কোথায় গমন করিলেন, আর নিমাই বা কেন তাঁহাকে যাইতে দিলেন, এই সমস্ত কাহিনী আমরা জানি না। তবে নবদ্বীপে নিমাইকে দেখিয়া ঈশ্বরপুরীর মনে হইয়াছিল যে,—এ বস্তুটি কি? গয়াতে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মনের সন্দেহ গেল। তিনি স্থির করিলেন যে, নিমাই বস্তুটি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। সেই নিমাই তাঁহার নিকট মন্ত্র লইলেন, ইহাতে তিনি পূর্ণকাম হইলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার অন্য একটী দুঃখের সৃষ্টি হইল। সেটী এই যে—শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে গুরুরূপে প্রণাম করিতে লাগিলেন। নিমাই গুরুকে প্রণাম করেন, তাহা না করিলে আচারবিরুদ্ধ কার্য হয়। নিমাই কখনও আচারবিরুদ্ধ কার্য করিতেন না। আবার পুরীও বা কিরূপে—যাঁহাকে তিনি শ্রীভগবান বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করিতে দিবেন? ইহা কেহই পারে না! পুরীও পারিলেন না,—কাজেই নিমাইয়ের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। তখন তিনি নিমাইয়ের মধুর রূপ হৃদয়ে পুরিয়া ও জন্মের মত অঙ্কিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনাবধি নিমাইয়ের প্রকৃতি ক্রমেই পরিবর্তিত হইতেছে,—দিন দিন ভক্তি বাড়িতেছে। নিমাই বাক্যালাপ ছাড়িলেন,—দেহ চেষ্টা ছাড়িলেন। তখন ঊর্ধ্বমুখ হইয়া নিমেষ হারাইয়া কখনও চাহিয়া থাকেন, কখন-বা আপনা আপনি কথা বলেন, আবার কখন-বা বিরলে বসিয়া কি ভাবিয়া রোদন করেন। নিমাইয়ের সঙ্গীগণ তাঁহার ভাব কিছুই বুঝিতে পারেন না। কিছু

জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর পান না। তাঁহারা দেখেন যে নিমাইয়ের হৃদয়ে কি প্রবল তরঙ্গ খেলিতেছে, আর উহা বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সেটী কি?*

একদিন নিমাই গয়াধামে নিভৃতে বসিয়া, তাঁহার গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতেছেন, এমন সময় "কৃষ্ণ আমার বাপ, কোথায়?" বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন সঙ্গীগণ আস্তে ব্যস্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি চেতন পাইয়া উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু আবার তাঁহার অঙ্গ এলাইয়া ভূমিতে পড়িল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "কৃষ্ণ বাপ! আমার প্রাণ! আমি তোমা বিনা আর জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না। আমি অতি কষ্টে ধৈর্য ধরিয়াছিলাম; কিন্তু আর পারি না, তুমি আর লুকাইয়া থাকিও না। তুমি দয়াময়, দর্শন দিয়া আমার প্রাণ রাখ। আমি তোমা বিহনে ভুবন অন্ধকার দেখিতেছি।" এইরূপে কাতরধ্বনি করিতে করিতে নিমাই ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সকলে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু কে প্রবোধ মানে? নিমাই তখন আর নিমাই নাই। যাঁহারা প্রবোধ দেন, তাঁহারা প্রবোধ দিতে আসিয়া আপনারাই ধৈর্যহারা হইলেন। নিমাইয়ের সেই করুণ রোদন, সেই আর্তি, বদনের সেই কাতর ভাব আর নয়নের সেই অবিশ্রান্ত ধারা দেখিয়া সকলেই তাঁহার সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন।

নিমাই বলিলেন, "তোমরা বাড়ী যাও। আমি আর বাড়ী যাইব না, আমি কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন চলিলাম। আমার জননীকে তোমরা সান্ত্বনা করিও,—বলিও যে, নিমাই কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনে গিয়াছে।" ইহাই বলিয়া নিমাই ক্ষিপ্তের ন্যায় বৃন্দাবন অভিমুখে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন।

তখন চন্দ্রশেখর ও নিমাইয়ের শিষ্যগণ বড় বিপদে পড়িলেন। শেষে নিমাইকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে লইয়া গৃহাভিমুখে ফিরিলেন, এবং পৌষ মাসের শেষে সকলে নবদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিলেন।

নিমাই আসিতেছেন শুনিয়া নদীয়াবাসী অনেকে অগ্রবর্তী হইয়া তাঁহাকে আনিতে চলিলেন। শচী এই শুভ-সংবাদ শুনিয়া আহ্লাদে জ্ঞানহারা হইয়া বাহিরে আসিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও ধৈর্যহারা হইয়া পতিমুখ দর্শন আশায় সলজ্জভাবে দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইলেন। এমন সময় নিমাই আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং জননীকে বহির্দারের সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার চরণদুটি ধরিয়া প্রণাম করিলেন। শচী আর আনন্দে কথা কহিতে পারিলেন না। নিমাইয়ের আগমন সংবাদ দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপময় প্রচারিত হইল; সনাতন মিশ্র ও তাঁহার পত্নী শুনিয়া মহাহর্ষে মগ্ন হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়

"গয়াধামে ঈশ্বরপুরী কিবা মন্ত্র দিল।
সেই হতে নিমাই আমার পাগল হইল।।"

নিমাই গৃহে আসিলে তাঁহার আত্মীয়-কুটুম্ব শিষ্য-সেবক সকলে দেখিলেন যে, তাঁহার আর পূর্বভাবের কোন চিহ্ন নাই, একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে; এমন কি, যেন তাঁহাকে চেনা

*এখানে চণ্ডীদাসের একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম, যথা—
রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে না শুনে কাহারও কথা।।
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে, না চলে নয়ন-তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে, যেমন যোগিনী পারা।।

যাইতেছে না। সে উদ্ধত স্বভাব নাই, সে বিদ্রুপাত্মক মুখভাবও নাই; নিমাই তখন বিনয়ের অবতার হইয়াছেন; যেন সকলের অধীন, কি সকলের নিকট অপরাধী; অল্প অল্প হাসিতেছেন, কিন্তু মুখখানি মলিন, যেন সর্বদা অন্যমনস্ক; এক কহিতে আর বলেন, কথা কহিতে যেন নিতান্ত অনিচ্ছা, তবে বাধ্য হইয়া কথা কহেন। অনবরত যেন নয়নে জল আসিতেছে; আর কষ্টে তাহা নিবারণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে নয়ন জলে তারা ডুবিয়া যাইতেছে, আর সেই বেগ গোপন করিবার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি নয়ন মুছিতেছেন। এদিকে কিন্তু শবীর হইতে তেজ বাহির হইতেছে, আর সেই বিপুল শরীর যেন পূর্বাপেক্ষা আরও সুবলিত হইয়াছে।

নিমাইয়ের বিনয় ও ভাব দেখিয়া সকলে মুগ্ধ ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। যাঁহারা গুরুজন তাঁহারা মনের সহিত আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা সখা তাঁহারা আকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। কি গুরুজন, কি সখাগণ, সকলেই যেন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবার শক্তি হারাইলেন। তখন নিমাই সকলকে মধুর বাক্যে বিদায় করিলেন।

বিকালে বহির্বাটীতে নিমাই তাঁহার তিনটি বন্ধু লইয়া তীর্থকথা কহিতে বসিলেন। সে তিন জনের নাম—শ্রীমান পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ ও মুবারি গুপ্ত। এই মুরারি গুপ্তেরই থালে শিশুবেলো নিমাইয়ের কীর্তি, আর ইনিই নিমাইয়ের আদিলীলা বর্ণনা করিয়াছেন।

তীর্থের কথা বলিতে বলিতে নিমাই গয়াসুরের আখ্যান তুলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে গয়াসুরের শিরে পাদপদ্ম দিয়াছিলেন, আর সেই চিহ্ন যে গয়াতে অদ্যাপি আছে,তাহাই বলিয়া পরে নিমাই বলিতেছেন, "ভাই, আমি শ্রীপাদপদ্ম দেখিতে গেলাম। দেখি ব্রাহ্মণগণ পাদপদ্মের মাহাত্ম্য বন্দনা কবিতেছেন। আমি সেই কৃষ্ণের পাদপদ্ম —" ইহাই বলিতে বলিতে নিমাই নীরব হইলেন। মুরারি প্রভৃতি ইহাতে নিমাইয়ের মুখপানে ভাল করিয়া চাহিলেন; দেখেন যে, তাঁহার চক্ষু নিমেষশূন্য এবং তারা স্থির হইয়াছে। একটী মহাজনের পদের দ্বারা নিমাইয়ের কি ভাব হইল তাহা ব্যক্ত করিতেছি। শ্রীমতী রাধা ললিতার নিকট কৃষ্ণকথা বলিতেছেন। বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন ললিতা ব্যস্ত হইয়া বিশাখাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "বিশাখা, শীঘ্র আয়; দেখে যা আমাদের রাধা কেমন হ'য়ে প'লো।" বিশাখা আসিয়া শ্রীমতীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "একি হ'লো?" তখন ললিতা বলিতেছেন—

"এই যে ধনী কৃষ্ণ-কথা কহিতেছিল।
কথা কইতে কইতে নীরব হ'লো।।"

সেইরূপ কৃষ্ণকথা কহিতে গিয়া নিমাইয়ের হৃদয়ে যে তরঙ্গ উঠিল তাহা বাহির হইতে পথ না পাওয়ায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, এবং দেখিতে দেখিতে মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন সকলে ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিলেন ও তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। একটু পরে চৈতন্য পাইয়া নিমাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই নয়ন-জলে সেখানে যে পুষ্পের বাগান ছিল, তাহা ভিজিয়া যাইতে লাগিল।

মুরারি প্রভৃতি নিমাইয়ের তখন যেরূপ ভাব দেখিলেন, এরূপ ভাব পূর্বে কাহারও কখন দেখেন নাই। মনুষ্যের যে এত নয়ন-জল পড়ে, ইহা তাঁহারা চক্ষে ত দেখেনই নাই, কর্ণেও শুনেন নাই। তাঁহারা তখন নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন। কেহ ভাবিতেছেন—'ইহার কি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ঘটিয়াছে?' কেহ চুপে চুপে আর একজনের নিকটে বলিতেছেন,—"কি আশ্চর্য্য! তিনমাস পূর্বে কে বলিতে পারিত যে, নিমাই পণ্ডিত এরূপ অদ্ভুত ভক্ত হইবেন।" অনেক ক্লেশে নিমাইকে তাঁহারা একটু শান্ত করিলেন। তখন নিমাই গদগদ ভাবে বলিতেছেন, "ভাই, তোমরা আমার চিরসুহৃদ, আমার মনের ব্যথা আর কাহাকে বলিব? কল্য সকালে তোমরা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী যাইও, আমিও সেখানে যাইব, যাইয়া আমার সমুদয় কথা তোমাদিগকে বলিব।" তাহার পরে মুরারি প্রভৃতি উঠিয়া গেলেন, নিমাইও অভ্যন্তরে গমন করিলেন।

শচী নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইলেন; তাহার বিশেষ কারণ এই যে, নিমাইয়ের এ অবস্থার হেতু কিছুই তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

রজনীতে নিমাই শয়ন করিতে গেলেন, প্রিয়ার সহিত দু'একটী কথা বলিলেন, বলিতে বলিতে কণ্ঠরোধ হইল। এতক্ষণ বহিরঙ্গ সম্ভাষে ধৈর্য বাঁধিয়াছিলেন, প্রিয়ার কাছে আসিয়া ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তখন মস্তক অবনত করিয়া অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন।

অন্যের রোদন দর্শনে মন কোমল হয়। বলবান পুরুষের রোদন দর্শনে দুর্বলা স্ত্রীলোকের মনে বড়ই আঘাত লাগে। আবার সেই পুরুষ যদি স্বামী হন, তবে স্ত্রীর কি ভাব হয়, তাহা অনুভব করুন; কারণ উহা বর্ণনা করা অসাধ্য। বিশেষতঃ, তাঁহার স্বামী কেন কাঁন্দিতেছেন? তাঁহার কি দুঃখ? তিনি কিসে শান্ত হইবেন? শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ইহার তথ্য কিছুই জানেন না।

বিষ্ণুপ্রিয়া সেই ভাবহিল্লোল দেখিয়া কাজেই বড় বিকল হইলেন। তখন তাঁহার কাঁদিবার সময় নয়, তখন তাঁহার কর্তব্য সান্ত্বনা করা। কিন্তু বয়সে বালিকা, সান্ত্বনা করিতে জানেন না, সাহসও হইল না। তিনি ভীত ও ব্যস্ত হইয়া শাশুড়ীর কাছে দৌড়াইলেন। শাশুড়ীর ঘরে যাইয়া দুয়ারে আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "মা উঠ, শীঘ্র উঠ।"

শচী ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দ্বার খুলিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "মা! একবার এই ঘরে এসো।" শচী ব্যস্ত হইয়া দ্রুতগমনে পুত্রের ঘরে গিয়া দেখেন, নিমাই নয়ন মুদিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, নীরবে রোদন করিতেছেন, আর তাঁহার বদন বহিয়া শত শত ধারা পড়িতেছে। শচী তখন ব্যস্ত হইয়া পুত্রের মাথায় হাত দিয়া বলিতেছেন, "বাপ নিমাই, তুমি কান্দ কেন?" কিন্তু শচী যদিও অতি ব্যস্ত হইয়া নিমাইকে সম্বোধন করিলেন, কিন্তু সে স্বর নিমাইয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল না। শচী তখন আরও ব্যগ্র হইয়া, "নিমাই কান্দ কেন" বলিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে নিমাইয়ের কর্ণে মাতার আকুল ধ্বনি গেল। তখন মাতার দুঃখ নিবারণ নিমিত্ত তিনি বেগ সম্বরণ করিতে গেলেন, কিন্তু তাহাতে সে বেগ আরও বৃদ্ধি পাইল।

তখন শচী বলিতেছেন, "বাপ আমার! তুমি বড় জ্ঞানবান, তোমার মত পণ্ডিত নদীয়ায় নাই। বাপ! তুমি অত উতলা কেন হইলে? অন্যে উতলা হইলে তুমি শান্ত কর, তোমাকে কে শান্ত করিবে? বাপ! তুমি এত গম্ভীর, তুমি এত ব্যাকুল কেন?" যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—

"বিস্মিত হইয়া শচী বিশ্বম্ভরে পুছে।
কি লাগিয়া কান্দ বাপ, তোর দুঃখ কিসে?"

পুনঃ যথা শ্রীচৈতন্যচরিত কাব্যে ঃ—

কিমু তাত! রোদিতি ভবানবদৎ।"

নিমাই অতি কষ্টে মনের বেগ কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া বলিতেছেন, "মা! আমি রোদন করিতেছি ভাবিয়া তুমি দুঃখ পাইও না। আমি এই মাত্র স্বপ্নে অতি রূপবান শ্যামবর্ণ বনমালাধারী একজন নবীন পুরুষকে দেখিয়া এত আনন্দ পাইলাম যে, আমার আঁখি দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মা! এমন মধুর রূপ আমি আর কখনও দেখি নাই, রূপখানি আমার হৃদয়ে জাগিতেছে।" নিমাই ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন, আর দেবীদ্বয় শুনিতে লাগিলেন। এইরূপ কৃষ্ণকথায় প্রথম রজনী গত হইল। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া গদ্গদ হইয়া সেই অপূর্ব কথা শুনিলেন এবং আনন্দে সারা নিশি কাটাইলেন।

অতি প্রত্যুষে শ্রীমান পণ্ডিত শ্রীবাসের বাড়ী কুসুম চয়ন করিতে গিয়াছেন। শ্রীবাসের নাম পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইনি জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু, তাঁহার সমবয়স্ক ও পরম বৈষ্ণব। ইঁহার বাড়ীতে কুন্দ পুষ্পের একটী ঝাড় ছিল। ইহাতে অপর্যাপ্ত ফুল ফুটিত, পাড়ার সকলে সেই ফুল তুলিতে যাইতেন। শ্রীমান পণ্ডিত ফুল তুলিতে গিয়া কাজেই সেখানে অনেককে দেখিতে পাইলেন।

সকলে ফুল তুলিতেছেন। শ্রীমান পণ্ডিতও ফুল তুলিতেছেন, আর মন্দ মন্দ হাসিতেছেন।

নিমাই পণ্ডিতের পূর্ব দিনের কথা মনে করিয়া তিনি সারা নিশি আনন্দে যাপন করিয়াছেন। তখনও আনন্দ রহিয়াছে, তাহা লুকাইতে পারিতেছেন না। আবার যাহা দেখিয়াছেন, তাহা সকলকে বলিতেও নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে।

শ্রীবাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় যে হাসি দেখিতেছি।" শ্রীমান বলিতেছেন, "অবশ্য কারণ আছে।" শ্রীবাস বলিতেছেন, "কারণ কি শুনি?" তখন শ্রীমান বলিলেন, "তোমরা শুনেছ, নিমাই পণ্ডিত পরম বৈষ্ণব হইয়াছেন? গয়া হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া কল্য বিকালে আমরা কয়েকজন দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখি যে, এমন নম্র পুরুষ বুঝি জগতে আর নাই। সে নম্র ভাব দেখিলেই চিত্ত আকর্ষণ করে। আমাদের নিকট তীর্থের কথা বলিতে বলিতে গদাধর-পাদপদ্মের কথা বলিতে গেলেন, কিন্তু পাদপদ্মের নাম করিবামাত্র আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পরে যে কাণ্ড দেখিলাম, সেরূপ চক্ষে ত দেখি নাই, কর্ণেও শুনি নাই,—তাহার বর্ণনা করাও আমার সাধ্য নহে। মূল কথা, নিমাই পণ্ডিতের যেরূপ চরিত্র দেখিলাম, তাহাতে আমার আর তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় নাই।"

এই কথা শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন যে, ইহা বড় শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই। একজন উগ্র স্বভাবের বৈষ্ণব বলিয়া উঠিলেন, "নিমাই পণ্ডিত যদি বৈষ্ণব হয়, তবে আমাদের বিদ্বেষী মহাশয়দিগকে এইবার দেখিব।" শ্রীবাস বলিলেন, "আজ বড় শুভ সংবাদ শুনিলাম। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ এত দিনে আমার মনস্কামনা সিদ্ধি করিলেন। শ্রীভগবান্ আমাদের বৈষ্ণব পরিবার বৃদ্ধি করুন।"

শ্রীমান পণ্ডিত বলিলেন, "নিমাই পণ্ডিত চেতনা পাইয়া আমাদিগকে অদ্য প্রাতে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী যাইতে বলিয়াছেন, সেখানে তাঁহাব মনের দুঃখ ও আর কি কি বলিবেন। আমি ফুল তুলিয়া সেখানে যাইব।"

শ্রীমান পণ্ডিত পুষ্প তুলিয়া তাড়াতাড়ি গঙ্গাতীরে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী গেলেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে গদাধর পণ্ডিতও ফুল তুলিতেছিলেন। তিনিও এই কথা শুনিয়া শুক্লাম্বরের বাড়ী গেলেন, কিন্তু তাঁহার সেখানে থাকিতে অনুমতি ছিল না বলিয়া গৃহের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। ক্রমে সদাশিব ও মুরারি আসিলেন এবং সকলে বসিয়া নিমাই পণ্ডিতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে তাঁহারা দেখেন, নিমাই পণ্ডিত আসিতেছেন। অতি দীর্ঘকায় সবল পুরুষটী চলিতেছেন, কিন্তু প্রতি পদে পদস্খলন হইতেছে। মুখ পানে চাহিয়া দেখেন যে, নয়ন দিয়া অজস্র ধারা পড়িতেছে, ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না, আর বাহ্যজ্ঞান অতি অল্প মাত্র আছে, তাহাতেই পদস্খলন হইতেছে। নিমাই পিঁড়ায় উঠিয়া বন্ধুগণকে দেখিয়া আপনার যেটুকু বাহ্যজ্ঞান ছিল তাহাও রাখিতে পারিলেন না। "হা কৃষ্ণ" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িবার সময় পিঁড়ার একটি খুঁটি ধরিয়াছিলেন, উহার সহিত মৃত্তিকাপরে পড়িয়া গেলেন।

নিমাই মৃত্তিকায় পড়িলে, আস্তে আস্তে মুরারি প্রভৃতি সকলে বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। দেখেন, জীবনের চিহ্নমাত্র নাই, চক্ষু স্থির হইয়াছে, মুখ দিয়া লালা পড়িতেছে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ। তখন তাঁহার মুখে জল সিঞ্চন করিতে করিতে, নিমাইয়ের অর্ধ-চেতন হইল। একটু চেতন পাইয়া নিমাই "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া অতি করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে "আমার কৃষ্ণ নাই" এই বলিয়া মনের ক্লেশে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এইরূপ গড়াগড়ি দিতে দিতে নিমাইয়ের সোনার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইল। তাঁহার সঙ্গিগণ অনেক যত্নে তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন, কিন্তু তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। এইরূপ মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে একটু চৈতন্য হইতেছে, আর বলিতেছেন, "এই যে কৃষ্ণ এখানে ছিলেন, তিনি কোথা গেলেন?" কখন-বা ক্ষণিক চেতনা পাইয়া অতি কাতরে বলিতেছেন, "আমার কৃষ্ণ নাই!" সে সময় তাঁহার মুখ দেখিলে, কি স্বর শুনিলে, পাষাণও বিদীর্ণ হয়। এই

অবস্থার বর্ণনা করিয়া আমার মেজদাদা শ্রীল হেমন্তকুমার ঘোষ একটী গীত রচনা করেন, সেটী এই—

"হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ধূলায় পড়িল গোরা।
ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ দু'নয়নে বহে ধারা।।
ক্ষণেক চেতন পায়, বলে আমার কৃষ্ণ নাই,
এই ছিল কোথা গিয়া লুকাইল মনচোরা।
হা হরি হরি হরি, হরি তুমি কোথা হে,
তুমি সর্বস্ব ধন তুমি নয়নের তারা।।

অপরাহ্ন উপস্থিত হইল, কিন্তু সে জ্ঞান কাহারও নাই। নিমাই পণ্ডিত যে তরঙ্গে ডুবিয়াছেন, তাঁহারাও সকলে তাহাতে নিমগ্ন হইয়াছেন; এবং ভক্তিতে গদ্গদ হইয়া সকলেই রোদন করিতেছেন। আর নিমাই করিতেছেন কি, না মুরারির গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "মুরারি! শ্রীকৃষ্ণ ভজ। শ্রীকৃষ্ণ কি ভজিবে না? মুরারি! কৃষ্ণ আমার বড় মধুর। সদাশিব, তুমি ও আমি দুইজনে মুকুন্দ ভজন করিব। কেমন?" নিমাই এইরূপে প্রলাপ বকিতেছেন, এমন সময় তাঁহার কর্ণকুহরে রোদনধ্বনি গেল। কান পাতিয়া শুনিলেন যে, ঘরের মধ্যে কে রোদন করিতেছে। তখন একটু বাহ্যজ্ঞান পাইয়া বলিতেছেন, "ঘরের মধ্যে কে উনি?"

মুরারি বলিলেন, "তোমার গদাধর।" "তোমার গদাধর" ইহার অর্থ এই যে, গদাধর নিমাইয়ের ছায়ার স্বরূপ সর্বদা বেড়াইতেন। নিমাই বড়, গদাধর ছোট। গদাধর পরম রূপবান, শিশুকাল হইতেই ভক্তিপথের পথিক, গদাধরের চরিত্র মধু হইতেও মধুতর। পাঠক, ক্রমে তাঁহার পরিচয় পাইবেন।

তখন নিমাই গদাধরকে ডাকিলেন এবং বাহির হইলে বলিলেন, "গদাধর! তুমিই সার্থক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তুমি শিশুকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতেছ; আর আমার জীবন কেবল বৃথা-রসে গেল।" এই কথা শুনিয়া গদাধর নিমাইচাঁদের চরণে পড়িলেন। তখন নিমাই বলিতেছেন, "গদাধর। আমি কৃষ্ণকে পাইয়াছিলাম, আবার নিজের দোষে হারাইয়াছি। আমার যে কি দুঃখ তাহা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। শুন—" ইহাই বলিয়া কি বলিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না,—একেবারে মৃত ব্যক্তির ন্যায় আবার ধূলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার সময় নিমাই ঢুলিতে ঢুলিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন। সমস্ত দিবস স্নানাহার হয় নাই। শচী যত্ন করিয়া স্নানাহার করাইলেন। মুরারি গদাধর প্রভৃতি আপনাপন গৃহে গমন করিলেন। সকলেই একেবারে বিস্মিত! নিমাইয়ের ভক্তির উদয় হইয়াছে, ইহা বিচিত্র নহে; কিন্তু এরূপ ভক্তি কি মনুষ্যের হইতে পারে? শাস্ত্রেও এরূপ ভক্তির কথা শুনা যায় না। নিমাই কি মনুষ্য? এ শক্তি নিমাই পণ্ডিত কোথা হইতে পাইলেন? মনুষ্যের এত শক্তি ত সম্ভবে না? পরস্পরে এইরূপ কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে নিমাইয়ের কথা চারিদিকে প্রচার হইতে লাগিল। নবদ্বীপ একটি প্রকাণ্ড নগর, সেখানে কে কাহার সন্ধান রাখে, কিন্তু তবু অনেক ভাগবত শুনিলেন যে, নিমাই পণ্ডিত অদ্ভুত ভক্ত হইয়াছেন। কেহ বা এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিবেন স্থির করিলেন।

এদিকে পড়ুয়াগণ নিমাই পণ্ডিতকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া নিমাইয়ের প্রথম স্মরণ হইল যে, তাঁহার অধ্যয়ন করান একটি কার্য আছে। ইহাতে গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কথাও মনে পড়িল। নিমাই তখন শিষ্যদের সঙ্গে করিয়া গঙ্গাদাসের বাড়ী গমন করিলেন এবং গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

গঙ্গাদাস অতিশয় আনন্দিত হইয়া নিমাইকে "বিদ্যালাভ হউক" বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তুমি কুশলে পিতৃকার্য করিয়া আসিয়াছ, ইহা কেবল আমার সুহৃদ, তোমার পিতা

জগন্নাথ মিশ্রের পুণ্যবলে। বহু দিবস বৃথা গিয়াছে, আর পাঠ বন্ধ করা উচিত নহে। পড়া অল্প ক্ষান্ত দিলেই অনভ্যাস হইয়া যায়। তোমার পড়ুয়াগণ তোমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানে না। তুমি যে অবধি গিয়াছ, সেই অবধি তাহারা পুঁথিতে ডোর দিয়া বসিয়া আছে। তাহারা বলে যে, যদি পড়ে, তবে তোমার নিকট পড়িবে, তাহাদের আর কাহারও কাছে পড়িয়া তৃপ্তি হয় না।"

সেখান হইতে নিমাই পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের বাড়ী গেলেন। পূর্বে বলিয়াছি, তাঁহারই চণ্ডীমণ্ডপে নিমাইয়ের টোল ছিল। নিমাই চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিলেন।

পুরুষোত্তমের পুত্র মুকুন্দ সঞ্জয় নিমাইয়ের শিষ্য, তিনি নিমাইকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। নিমাই তখন বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে কোলে করিলেন, করিয়া স্নেহে আর্দ্র হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

পণ্ডিত আসিতেছেন শুনিয়া, নারীগণ আনন্দে হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি কবিতে লাগিলেন। এইরূপে যেখানে যেখানে যাওয়া প্রয়োজন সেই সমুদায় স্থানে ভ্রমণ করিয়া নিমাই গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

নবম অধ্যায়

"কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়।"

—শ্রীচৈতন্যভাগবত।

পরদিবস প্রত্যূষে নিমাই গঙ্গাস্নান করিয়া টোলে পড়াইতে গেলেন। নিমাই আসিলেন, আর শত শত পড়ুয়া উপস্থিত হইল। যাহারা প্রবীণ তাহারা নিকটে বসিল। গ্রন্থ সমুদয় ডোর দিয়া বান্ধা। হরি হরি বলিয়া পড়ুয়াগণ পুস্তকের ডোর খুলিল। সেই হরিধ্বনি নিমাইয়ের কর্ণে প্রবেশ করাতে তাঁহার অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইল। তখন নিমাই বলিতেছেন, "কি মধুর নাম। শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগের মঙ্গল করুন। তোমরা অনর্থক বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত এত চেষ্টা করিতেছ কেন? শ্রীভগবচ্চরণ-প্রাপ্তিই জীবনের পরম পুরুষার্থ।" পড়ুয়াগণ অধ্যাপকের পানে চাহিয়া রহিল, আর নিমাই আবিষ্ট হইয়া পরমার্থ কথা কহিতে লাগিলেন।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন যে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, নিমাই পণ্ডিত তাহা বুঝাইতে লাগিলেন, আর ছাত্রগণ একচিত্তে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। নিমাই বলিতে বলিতে হঠাৎ চুপ করিলেন। কেন করিলেন তাহার কারণ বলিতেছি। তিনি ছাত্রগণকে পড়াইতে টোলে আসিয়াছেন। পাঠ দিবেন এমন সময় হরিধ্বনি শুনিয়া, কোথায় কি করিতে আসিয়াছেন, সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, তিনি আবিষ্ট হইয়া ভগবদ্‌গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল, তখন কি করিতে আসিয়া কি করিতেছেন, ইহা মনে উদয় হওয়ায়, অত্যন্ত লজ্জা পাইলেন, এবং নীরব হইয়া অপরাধীর ন্যায় মস্তক অবনত করিলেন। ক্ষণকাল পরে নিমাই ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "অদ্য মঙ্গলাচরণ করিয়া ক্ষান্ত দেওয়া গেল। এখন চল সকলে গঙ্গাস্নানে যাই, কল্য হইতে পাঠারম্ভ হইবে।" এইরূপে নিমাই পণ্ডিত প্রথম দিন কাটাইলেন।

দ্বিতীয় দিন নিমাই গৃহ হইতে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলেন অদ্য ভাল করিয়া পাঠ দিবেন। কিন্তু টোলে বসিয়া আবার বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন, এবং নিয়মিত পাঠ না দিয়া ভগবদ্‌গুণ কীর্তন করিতে লাগিলেন। সে দিবসও পাঠ বন্ধ হইল। কিন্তু ছাত্রগণ ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত হইল না। কারণ, নিমাইয়ের মুখে কৃষ্ণকথা অতি মধুর লাগিতেছিল। এইরূপে তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষ হইতে দুই প্রহর পর্যন্ত যে কৃষ্ণকথা বলেন, পড়ুয়াগণ তাহা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া শ্রবণ করে। যখন নিমাই কৃষ্ণকথা বলেন, তখন তিনি অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দেন। পড়ুয়াগণ দেখে যে, নিমাইয়ের আবিষ্টচিত্ত—বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। অথচ তাঁহার বাক্যের ছটা যেরূপ, তাহা মানুষে সম্ভব নহে। সুতরাং যাহারা বিদ্যানুরাগী তাহারা নিমাইয়ের কৃষ্ণ-কথায় বিদ্যার পরিচয় পাইয়া,

যাহারা কবিতানুরাগী তাহারা কবিত্বের আস্বাদ পাইয়া, যাহারা ভক্ত তাহারা ভক্তি দেখিয়া, যাহারা প্রেমিক তাঁহারা প্রেমতরঙ্গে ডুবিয়া সাত দিবস পর্যন্ত এইরূপে নিমাইয়ের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিল। তবে ইহার মধ্যে দুই পাঁচ জন পড়ুয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

কেহ বলিল, "আমরা বাড়ী ছাড়িয়া দূর দেশে বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত আসিয়াছি, কৃষ্ণকথা শুনিতে নহে। অধ্যাপকের এ কি দশা হইল?" কেহ বলিল, "পণ্ডিতের স্কন্ধে আবার কি প্রাচীন বায়ু ভর করিল?" এইরূপ কথাবার্তার পর তাহারা পরামর্শ করিয়া কয়েকজন জুটিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ী গেল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আপনাদের দুর্দশার কথা বলিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল, "নিমাইপণ্ডিতের ন্যায় অধ্যাপক ত্রিজগতে আর নাই। আমরাও তাঁহাকে শ্রীভগবানের ন্যায় ভক্তি ও পিতার ন্যায় মান্য করিয়া থাকি। কিন্তু গয়া হইতে আসা অবধি তিনি পড়ান একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। টোলে আসিয়া কেবল 'শ্রীকৃষ্ণ ভজ, শ্রীকৃষ্ণ ভজ' এই কথা বলেন। আপনি তাঁহাকে ডাকিয়া, যাহাতে তিনি আমাদিগকে ভাল করিয়া পাঠ দেন, সেই মত বলিয়া দিউন।"

গঙ্গাদাস একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, কিন্তু কার্যে এক প্রকার নাস্তিক। তাঁহার বিবেচনায় শাস্ত্রাভ্যাসই জীবের একমাত্র প্রধান কর্ম। তিনি নিমাইয়ের এইরূপ আচরণের কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, আর বলিলেন "বটে, নিমাই ইহার মধ্যে 'হরিবোলা' হইয়াছে! আচ্ছা, তাহাকে তোমরা এখানে লইয়া আইস, আমি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব।"

পরদিবস প্রাতে আবার নিমাই পড়াইতে আসিয়াছেন, আবার আবিষ্ট হইয়া ছাত্রগণকে পাঠ না দিয়া, তাহাদের নিকট শ্রীভগবদ্‌গুণ কীর্তন করিতেছেন, আর সকলে স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছেন। এমন সময় নিমাইয়ের চেতন হইল। তিনি যে ছাত্রগণকে পাঠ না দিয়া কৃষ্ণকথা কহিতেছেন, তাহা মনে উদয় হওয়াতে লজ্জায় অধোবদন হইলেন। অন্যান্য দিন এরূপ অবস্থায় শীঘ্র শীঘ্র টোল ভাঙ্গিয়া স্নানে যাইতেন। কিন্তু সে দিবস তাহা না করিয়া, প্রধান ছাত্রগণের মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আমাকে সত্য করিয়া বল দেখি, আমি ব্যাখ্যা কিরূপ করিলাম?" ইহাতে ছাত্রগণ কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া থাকিল। তখন নিমাই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কিরূপ পড়াইতেছি, সরলভাবে বল। আমার বোধ হয়, তোমাদের ভালরূপ পাঠ হইতেছে না।" তখন একজন প্রধান শিষ্য বলিলেন, "গুরুদেব। আপনি যেরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহাই ঠিক। আপনার শক্তির অবধি নাই। যে শব্দের যেরূপ অর্থ করিতে ইচ্ছা হয়, আপনি তাহাই করিতে পারেন। যে আপনাকে যে পাঠ জিজ্ঞাসা করে, আপনি তাহারই অর্থে কেবল হরি নাম ব্যাখ্যা করেন। আপনি যে অর্থ করেন, তাহাই ঠিক। তবে আমরা যে উদ্দেশ্যে পড়িতে আসিয়াছি, তাহা সিদ্ধ হইতেছে না। এবার গয়া হইতে আসা অবধি আপনি একদিনও সচেতনে পুঁথির অর্থ করেন নাই।"

তখন নিমাই লজ্জায় একেবারে অভিভূত হইলেন, বলিলেন, "ভাই সকল! আমার কি হইয়াছে, আমি কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর কিছু পড়াইতে পারি না।" একটু নীরব থাকিয়া আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমাদের নিকট সরল কথা বলাই ভাল। বল দেখি, আমার কি আবার সেই পূর্বের বায়ুরোগ উপস্থিত হইল?"

শিষ্যগণ বলিলেন, "বায়ুরোগ কি করিয়া বলি? আপনার অর্থ খণ্ডন করে এরূপ লোক জগতে নাই। আপনার যেরূপ ভক্তি এরূপ কেহ কখন দেখে নাই। বায়ুরোগ হইলে আপনার কথা এত মধুর কেন হইবে?"

তখন নিমাই ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "একটি অতি গোপনীয় কথা তোমাদিগকে বলিব। এ কথা অন্যত্র অকথ্য। তোমরা নিজ জন বলিয়া বলিতেছি। আমি যখন পড়াইতে আসি, তখন মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করি যে, অদ্য ভাল করিয়া পড়াইব। কিন্তু তখনই একটি পরম সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ শিশু

আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বাঁশী বাজাইতে থাকেন, তাহাতে আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ এবং অঙ্গ অবশ হয়।" ইহা বলিতেই নিমাইয়েব অঙ্গ অবশ হইল, কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরিয়া টোল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বিকালে গঙ্গাদাসের আদেশক্রমে ছাত্রগণ সমভিব্যাহারে নিমাই তাঁহার বাড়ীতে গেলেন। নিমাই প্রণাম করিলেন। গঙ্গাদাস 'বিদ্যা লাভ হউক', বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "বিশ্বম্ভর! অনেক জন্মের তপস্যায় একজন অধ্যাপক হয়। তুমি নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র, জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। তোমার মাতামহ ও পিতা বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তোমাকে আমি পরিশ্রম করিয়া পড়াইয়াছিলাম, তুমিও আমার নাম রাখিয়াছ। সমস্ত গৌড়দেশে তোমার যশ ব্যাপিয়াছে। তোমার ব্যাকরণের টিপ্পনী ক্রমে সমাজে আদৃত হইতেছে। তুমি নাকি এ সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া এখন হরি-ভজা হইতেছ? ভাল, তোমার পিতা ও মাতামহ, ইঁহারা কি নরকে যাইবেন? এ সমস্ত পাগলামি ছাড়িয়া দিয়া মনোযোগপূর্বক পাঠ দাও। তোমার শিষ্যগণ আর কাহারও কাছে পড়িবে না, তোমার কাছেও পড়িতে পাইতেছে না। তাহারা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া রহিয়াছে। পাগলামি ছাড়িয়া দাও, দিয়া—আমার মাথা খাও—ভাল করিয়া পড়াইতে আরম্ভ কর।"

নিমাই লজ্জিত হইয়া নিজ অপরাধ স্বীকার করিলেন। গঙ্গাদাসের নিকট "ক্ষমা করুন" বলিয়া করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আর এই অবধি ভাল করিয়া পড়াইবেন স্বীকার করিলেন। তখন সকলে বিদ্যাচর্চা করিতে করিতে রত্নগর্ভ আচার্যের দুয়ারে আসিয়া বসিলেন। রত্নগর্ভ শুধু শ্রীহট্টের লোক নহেন, জগন্নাথ মিশ্রের এক গ্রামের লোক। সেখানে তাঁহার বাহির দুয়ারে যোগপট্ট ছাঁদের চাদর বাঁধিয়া, শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বসিয়া নিমাই শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন। চারিদণ্ড রাত্রি হইয়াছে, শিষ্যগণ বিস্মিত হইয়া নিমাইয়ের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য অনুভব করিতেছেন, এমন সময় পূর্বোক্ত রত্নগর্ভ অতি সুস্বরে শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন, যথা—

শ্যামং হিরণ্যপয়িধিং বনমাল্যবর্হধাতু প্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জম্ কর্ণোৎপলালকপোলমুখাব্জলাসন্।
(১০ম স্কন্ধ ২৩ অধ্যায় ২২ শ্লোক)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার এই শ্লোকটি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ছাত্রগণ তাঁহার এরূপ ভাব আর কখন দেখেন নাই। তাহার কারণ, ছাত্রগণ বাহিরের লোক। আর পাছে তাহাদিগের নিকট কোনরূপ ভাবের উদয় হয়, এই নিমিত্ত নিমাইপণ্ডিত অত্যন্ত সশঙ্ক ও সতর্ক থাকিতেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি হঠাৎ শুনিয়া আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না, বাণবিদ্ধ পক্ষীর ন্যায় মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন।

ইহা দেখিয়া শিষ্যগণ আস্তে আস্তে তাঁহাকে ধরিলেন। দেখেন যে, জীবনের চিহ্নমাত্র নাই। তখন সকলে অত্যন্ত ভীত হইয়া মুখে জলের ছিটা মারিতে লাগিলেন। অনেক পরে নিমাই চৈতন্যলাভ করিলেন। তখন নয়ন দিয়া প্রেমধারা বহিতে লাগিল। নিমাই প্রেমতরঙ্গে স্থির থাকিতে না পারিয়া মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। নয়ন জলে সে স্থান কর্দ্দমময় হইয়া গেল। সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন। নগরের লোক যাঁহারা যাইতেছেন, তাঁহারাও দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। কেহ কেহ নিমাইকে প্রণামও করিতেছেন। এমন সময় নিমাই গড়াগড়ি দিতে দিতে বলিয়া উঠিলেন, "শ্লোক বল"। রত্নগর্ভ আবার সেই শ্লোক পড়িলেন। শ্লোক শুনিতে শুনিতে নিমাই উঠিয়া বসিলেন, পরক্ষণেই আবার মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। পড়িয়া যাইয়া আবার বলিতে গেলেন "শ্লোক পড়", কিন্তু তাহা বলিতে পারিলেন না; কেবল "বোল" "বোল" বলিতে লাগিলেন। রত্নগর্ভের প্রতি শ্লোক পড়িবার আদেশ হইতেছে বুঝিয়া তিনি আবার শ্লোক পড়িলেন। তখন নিমাই উঠিয়া আনন্দে রত্নগর্ভকে আলিঙ্গন করিলেন। রত্নগর্ভ আলিঙ্গন পাইয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। রত্নগর্ভ নিমাইয়ের প্রথম কৃপাপাত্র।

তখন রত্নগর্ভ একবার নিমাইয়ের চরণ ধরিতেছেন, একবার রোদন করিতেছেন, একবার শ্লোক পড়িতেছেন। সেখানে অবশ্য গদাধর ছিলেন। কারণ যেখানে নিমাই, সেইখানেই গদাধর। তিনি দেখিলেন, রত্নগর্ভ যত শ্লোক পড়িতেছেন, নিমাই ততই অস্থির হইতেছেন। নিমাই যে ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন, ইহাতে গদাধরের হৃদয়ে দুঃখ হইতেছে, তাই তিনি তখন রত্নগর্ভকে শ্লোক পড়িতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং যদিও নিমাই "বোল" "বোল" বলিতে লাগিলেন, কিন্তু রত্নগর্ভ আর শ্লোক পড়িলেন না।

একটু পরে নিমাই অল্প চেতন পাইলেন। তখন সেই সোনার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইয়াছে। ক্রমে সম্পূর্ণ চেতন পাইয়া নিমাই আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া লজ্জিতভাবে বলিতেছেন, "ভাই সকল! আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম, বল দেখি?" কেহ কোন উত্তর করিলেন না। তখন সকলে তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন।

পর দিবস প্রাতে, নিমাই ছাত্রগণ পরিবেষ্টিত টোলে আসিয়া বসিলেন। ছাত্রগণ পূর্ব দিনের অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া আনন্দে নিশিযাপন করিয়াছেন। নিমাইয়ের পূর্ব নিশির ভাব দর্শনে তাঁহাদের মনে যে ভক্তির উদয় হইয়াছিল, তাহা তখন সম্পূর্ণভাবে রহিয়াছে। পড়ুয়াগণ দেখিতেছেন, তাঁহাদের নবীন অধ্যাপক তাঁহার উপবেশন স্থানে যোগাসনে বসিয়া আছেন, আর তাঁহার সোনার সুবলিত অঙ্গ দিয়া মহাপুরুষের ন্যায় তেজ বাহির হইতেছে। সরল ও সুন্দর বদন— মলিন, কিন্তু আনন্দময় পদ্মচক্ষু কান্দিয়া কান্দিয়া রক্তবর্ণ হইয়াছে, নবীন অধ্যাপক চেষ্টা করিয়াও নয়ন-জল নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। শিষ্যগণ স্তব্ধ হইয়া সেই অপরূপ মূর্তি দেখিতেছেন। নিমাইয়ের চরিত্র, বিশেষতঃ তাঁহার পূর্বরাত্রের ব্যবহার দেখিয়া তাঁহারা এই স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহাদের অধ্যাপক শুক কি প্রহ্লাদ, কিংবা স্বয়ং নর-নারায়ণ হইবেন; ঠিক তাঁহাদের ন্যায় মনুষ্য নহেন। নিমাই যে পরমানন্দরসে নিমগ্ন হইয়া আছেন, তাহা ভঙ্গ করিয়া তাঁহার নিকট সামান্য পাঠ জিজ্ঞাসা করিতে কোন শিষ্যের প্রবৃত্তি হইতেছে না। এমন সময় নিমাই চেতন পাইয়া আবার লজ্জিত হইলেন। তখন শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল, এরূপ করিয়া আর তোমাদিগকে বঞ্চনা করিতে পারি না। আমার এখন তোমাদিগের কাছে একটি ভিক্ষা আছে। আমাকে তোমরা কৃপা করিয়া মুক্তি দাও; আমি তোমাদিগকে আর পড়াইতে পারিব না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি পড়াইতে গেলেই দেখিতে পাই, একটি কৃষ্ণবর্ণ শিশু মুরলী বাজাইতেছেন, তখন আমার সকল বুদ্ধি লোপ পায়; আর তখন আমার মুখে কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর কিছু আসে না। সুতরাং আমার কাছে এখন তোমাদের পড়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। কাজেই আমি সরল মনে তোমাদিগকে অনুমতি দিতেছি, তোমাদের যাহার কাছে ইচ্ছা গিয়া পাঠ কর, আর আমাকে মুক্তি দাও।" ইহা বলিয়া অধোমুখ হইয়া রোদন করিতে করিতে নিমাই পুস্তকে ডোর দিতে লাগিলেন।

শত শত শিষ্য একাগ্রচিত্তে নবীন অধ্যাপকের কথা শুনিতেছেন। করুণ স্বরে নিমাই যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহার প্রতি অক্ষর তাহাদের হৃদয়ে বিষ-শরের মত বিন্ধিতেছে। আর অধ্যাপকের সজল-নয়ন দেখিয়া তাহাদের সমুদয় অঙ্গ এলাইয়া পড়িতেছে। তাঁহারা আর ধৈর্য ধরিতে পরিলেন না। সকলেই কাঁন্দিয়া উঠিলেন। তখন একজন প্রধান শিষ্য কান্দিতে কান্দিতে করজোড়ে কহিলেন, "গুরুদেব! তোমাকে ছাড়িয়া আমরা আর কাহার কাছে পড়িব? আর কাহারও কাছে পড়িতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? কে আর আমাদিগকে তোমার মত স্নেহ ও যত্ন করিয়া পড়াইবে? তোমার কাছে যাহা পড়িলাম, সেই বিস্তর। তুমি আশীর্বাদ কর, তাহাই হৃদয়ে থাকুক। তবে তোমার সহিত দিবানিশি বাস করিতাম, অদ্যাবধি আর তাহা হইবে না, এই দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।" এই কথা বলাতে সকল শিষ্য অতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, আর কেহ কেহ কান্দিতে কান্দিতে পুস্তকে ডোর

দিতে লাগিলেন।

তখন নবীন অধ্যাপক, সম্মুখে যে শিষ্যটি ছিল, তাহাকে দুই হাত দিয়া কোলে করিয়া তাহার মস্তক আঘ্রণ করিলেন; এবং যত শিষ্য ছিল, সকলকে আরও নিকটে আসিতে বলিলেন। নবীন অধ্যাপকের কণ্ঠরোধ হইয়াছে, আর কথা কহিতে পারিতেছেন না। তখন প্রত্যেককে ধরিয়া আলিঙ্গন, মস্তক আঘ্রণ ও মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। শত শত পড়ুয়ার ক্রন্দন রবে সে স্থান ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অনেক কষ্টে কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধরিয়া নিমাই বলিতেছেন, "ভাই সকল! আমি তোমাদের অধ্যাপক, আশীর্বাদ করিবার আমার অধিকার আছে। আমি মনের সহিত তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছি, যদি আমি একদিনও শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া থাকি, তবে তোমাদের হৃদয়ে বিদ্যার স্ফূর্তি হউক। আর বিদ্যারই বা প্রয়োজন কি? শ্রীকৃষ্ণের শরণ লও, তাঁহার গুণগান কর ও তাঁহার নাম শ্রবণ কর। যাহা পড়িয়াছ যথেষ্ট হইয়াছে, এখন এস সকলে মিলিয়া কৃষ্ণ-গুণ গান করি।" শিষ্যগণ অধোমুখে রোদন করিতেছেন, আর নিমাই অতি কষ্টে হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। একটু থামিয়া নিমাই বলিলেন, "ভাই সকল! এতদিন একত্র হইয়া পড়িলাম, শুনিলাম, এখন আমাকে কৃতার্থ কর,—একবার কৃষ্ণ-কীর্তন করিয়া আমার হৃদয় শীতল ও সাধ পূর্ণ কর।" শিষ্যগণ তখন ভক্তি-সাগরে ডুবিয়াছেন। তাঁহাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, ঐ রূপ একটা কিছু করিয়া মনের বেগ শান্ত করেন। সুতরাং নিমাইয়ের ঐ কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, "গুরুদেব, তাহাই ভাল, আমরা কৃষ্ণ-কীর্তন করিব, কিন্তু কৃষ্ণ-কীর্তন কিরূপ তাহা জানি না, আমাদের শিখাইয়া দাও।"

তখন নিমাই বলিলেন, "এস আমরা কৃষ্ণ-কীর্তন করি।" এই বলিয়া নিমাই হাতে তালি দিয়া তাল দেখাইয়া শিষ্যদিগকে এই গীতটি শিখাইতে লাগিলেন—

কেদার রাগ

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
(যাদবায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ।)
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।।

নিমাই মধ্যস্থানে বসিয়া গাইতেছেন, আর শিষ্যগণ চারিদিকে বসিয়া হাতে তালি দিয়া তাঁহার সহিত গাইতেছেন। ক্রমে প্রেমের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল এবং সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, কেহ গড়াগড়ি দিতে, কেহ-বা নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে মহা কলরব হইল, আর লোকে কৌতুক দেখিতে ধাইয়া আসিল। কিন্তু সম্মুখের কাণ্ড দেখিয়া রহস্যবাঞ্ছা আর রহিল না, সকলে তখন ভক্তিতে গদগদ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিল, আর নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, "জগতে যে এরূপ ভক্তি আছে, ইহা পূর্বে কাহারও জানা ছিল না।"

শ্রীনবদ্বীপে এই প্রথম শুভ শ্রীনাম-কীর্তনের সৃষ্টি হইল। নাচিয়া গাহিয়া যে শ্রীভগবানের চরণলাভ করা যায়, তাহা নিমাই আপনি নাচিয়া ও গাহিয়া জীবকে প্রথম দেখাইলেন। একটি প্রাচীন পদে শ্রীনিমাইকে সম্বোধন করিয়া পদকর্তা বাসুঘোষ বলিতেছেন, যথা—

"আমার পরশমণির কি দিব তুলনা।
পরশমণির গুণে জগতের জীবগণে,
নাচিয়া গাহিয়া হৈল সোনা।।"

শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত যাগ, যজ্ঞ, পূজা, অর্চনা, তপস্যা, প্রার্থনা, প্রভৃতি নানাবিধ উপায় পূর্বাবধি ছিল। এই প্রথমে নিমাই ভজিয়া দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান আনন্দময়, আর তাঁহার ভজনাও আনন্দময়। এই "হরি হরয়ে নমঃ" কীর্তন ১৪৩০ শকে গীত হইয়াছিল। অদ্যাপিও সেই সুরে সেই গীত শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণ গাহিয়া থাকেন। শ্রীনিমাইয়ের কণ্ঠ হইতে এই গীতটি যে শক্তি পাইয়াছিল, অদ্যাপিও উহাতে সেই শক্তি সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনেক পরিমাণে আছে।

অদ্যাপিও এই গীত গাহিয়া শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণ আনন্দে নৃত্য ও গড়াগড়ি দিয়া থাকেন, কেহ কেহ মূর্চ্ছা প্রাপ্তও হন। নিমাইয়ের অনেক শিষ্য সেইদিন হইতে তাঁহার ভক্ত হইলেন, আবার অনেকে উদাসীন পথও অবলম্বন করিলেন।

দশম অধ্যায়

"বাপ নিমাই, কি হয়েছে, কেন দিবানিশি কান্দ?"—বলরাম দাস।

নিমাইয়ের তখন কিরূপ অবস্থা তাহা বিবরিয়া বলিতেছি। বহিরঙ্গ লোকে দেখিলে অতিকষ্টে ভাব সংবরণ করেন। যখন ভাব সংবরণ করিতে না পারেন তখন গৃহে লুকান। অন্তরঙ্গের মধ্যে থাকিলে ভাব সংবরণ করেন না। নিতান্ত নিজজন দেখিলে তাহার গলা ধরিয়া রোদন করেন, আর যদি কথা কহেন, তবে কেবল বলেন, "কৃষ্ণ কোথা, তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? তিনি কি আমাকে দেখা দিবেন?" নয়ন সর্বদাই কান্দিয়া কান্দিয়া অরুণ হইয়াছে, আর নয়ন হইতে অবিরত বারিধারা পড়িতেছে, ইহার বিরাম নাই। আত্মীয়গণ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে হয় কোন উত্তর দেন না, না হয় এক কথার আর এক উত্তর দেন।

পুত্রের দশা দেখিয়া শচী নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিলে অনেক সময় উত্তর পান না; যদি কখন পান, তাহা বুঝিতে পারেন না। নিমাই কখন বলেন, "মা। আমার কি পীড়া হইয়াছে আমি বলিতে পারি না, আমার কেবল কান্দিতে ইচ্ছা করে।"

কখন বলেন, "মা! আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি কৃষ্ণের অন্বেষণে বৃন্দাবনে যাই।" কখন একেবারে পাগলের মত শচীদেবীকে "মা যশোদা" বলিয়া আহ্বান করিয়া বালকের মত হাসেন।

শচীর ইচ্ছা নিমাই অন্যান্য যুবকের মত আমোদ আহ্লাদ করেন, অন্ততঃ অন্য লোকের মত চেতন অবস্থায় কথা বলেন। শচীর বয়ঃক্রম তখন সম্ভবতঃ ৬৭ বছর। স্বামী নাই, আর পুত্র নাই, কন্যাও নাই। সম্বলের মধ্যে পুত্র নিমাই, আর বালিকা বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া। পুত্রের চরিত্রের কথা সকলের নিকট বলিতে প্রবৃত্তি হয় না, আর না বলিয়াও থাকিতে পারেন না। দিবানিশি পুত্রকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত তিনি যেমন বুঝেন সেইরূপ চেষ্টা করিতে থাকেন। কখন সংসারের কথা বলেন, কখন বন্ধুর কথা বলেন, কখন রাগ করেন, কখন বা রোদন করিয়া নিমাইকে চেতন করিবার চেষ্টা করেন। যখন নিমাই ভোজন করিতে বসেন, সেই শচীদেবীর বড় সুযোগ। নিমাইয়ের সন্তোষের জন্য তখন বধূর দ্বারা অন্ন পরিবেশন করান, আর আপনি অগ্রে বসিয়া নিমাইকে আনমনা করেন। নিমাইয়ের মন ভাবে বিভোর, কেবল অভ্যাসবশতঃ ভোজন করেন মাত্র। একদিন শচী পুত্রের অগ্রে বসিয়া তাঁহাকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু নিমাইয়ের বিভোর ভাব কিছুতেই যাইতেছে না। যথা—

"যত কিছু বোলে শচী পুত্রের উত্তর।
কৃষ্ণ বহি নাহি কিছু বোলে বিশ্বম্ভর।।"

শচী বলিতেছেন, "নিমাই আজ কি পড়িলে?"

নিমাই। কৃষ্ণনাম পড়িলাম।

শচী। আমি তা বলিতেছি না, আজ কি বিচার করিলে?

নিমাই। রাধা-কৃষ্ণ।

শচী। তা না; নিমাই আমার মাথা খাস, ভাল কোরে কথা ক'।

নিমাই তখন চৈতন্য পাইয়া লজ্জিত হইয়া বলিতেছেন, "মা, আমি আর এক কথা ভাবিতেছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর।"

শচী একে চিন্তায় ব্যাকুল, আবার পাড়ার নির্বোধ লোক তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। তাহারা বলে, "তোমার পুত্র পাগল হ'য়েছে, উহাকে বান্ধিয়া রাখ।" এই সমুদয় কথা শুনিয়া শচী

আর নিমাইয়ের কথা গোপন রাখিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার পতির পরম আত্মীয় শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে লোক পাঠাইয়া সমুদয় কথা বলিলেন। নিমাই পরমভক্ত হইয়াছেন শুনিয়া শ্রীবাস তাঁহাকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু যে কারণেই হউক এ পর্যন্ত আইসেন নাই। এখন শচীর লোকের মুখে নিমাইয়ের ভাবের কথা শুনিয়া তখনই তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন।

নিমাই পণ্ডিতের বাটীতে গিয়া শ্রীবাস দেখিলেন, নিমাই করজোড়ে তুলসীতরু প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আর নয়নজলে সে স্থান ভিজিয়া যাইতেছে। শ্রীবাস পরমভক্ত, তাঁহাকে দেখিয়া নিমাইয়ের কৃষ্ণ-ভক্তি একেবারে উথলিয়া উঠিল। তিনি শ্রীবাসকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না,—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। পরে অনেক চেষ্টায় নিমাই চেতন পাইলেন,—চেতন পাইয়াই "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের এই সমস্ত অপূর্ব ভাব শ্রীবাস বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমে নিমাই সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান পাইলেন, তখন শ্রীবাসকে আবার প্রণাম করিলেন। শ্রীবাস তাঁহাদিগের আত্মীয়, নিমাই সেই ভাবেই তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "পণ্ডিত! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, এখন আমার কি করা কর্তব্য বলিয়া দাও। আমি কোনক্রমে নয়নজল নিবারণ করিতে পারিতেছি না, আমার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতেছে। লোকে বলে যে, আমার বায়ুরোগ হইয়াছে। কেহ বা এরূপও বলে যে, আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়া শিবাদি ঘৃত প্রয়োগ করিতে হইবে। আমার মা অবশ্য বড় ব্যাকুল হইয়াছেন। আমিও যে কি করিব কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আমি আমার স্ববশে নাই। বহু চেষ্টা করিয়াও আমি আমার চিত্তকে স্ববশে আনিতে পারিতেছি না।"

শ্রীবাস একটু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "নিমাই, তোমার যে বায়ু দেখিতেছি, এ বায়ু ব্রহ্মা প্রভৃতি বাঞ্ছা করেন। তুমি তোমার ঐ বায়ু একটু আমাকে দাও, এই আমার ভিক্ষা। তুমি পরম ভাগ্যবান, ত্রিজগতে তোমার মত ভাগ্যবান আর নাই। তোমাতে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ কৃপা হইয়াছে। তোমার যেরূপ ভক্তি দেখিলাম, এরূপ ভক্তি যে জীবে সম্ভবে ইহা জানিতাম না।" শচী দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছেন,—কতক বুঝিতে পারিতেছেন, কতক পারিতেছেন না।

শ্রীবাসের মুখে এই কথা শুনিয়া, নিমাই তখনি তাঁকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। আর বলিলেন, "সকলে বলিতেছে বায়ু। আমি কেবল তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। তুমিও যদি আমাকে বায়ুরোগগ্রস্ত বলিতে, তাহা হইলে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। তুমি আশ্বাস দিয়া আমার ও আমার জননীর বড় উপকার করিলে।" নিমাইয়ের আলিঙ্গন পাইয়া শ্রীবাসের অঙ্গ পরমানন্দে পুলকিত হইল। তিনি শচীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি নির্বোধ লোকের কথা শুনিয়া উতলা হইও না। তোমার পুত্রের বায়ুরোগ নহে, ইহা কৃষ্ণ-প্রেম। তবে এরূপ প্রেম জীবে সম্ভবে বলিয়া পূর্বে জানা ছিল না। তুমি স্থির হইয়া থাক, কাহাকেও কিছু বলিও না, কৃষ্ণের কত রহস্য ক্রমে দেখিবে।"

তাহার পর নিমাইকে বলিলেন, "নিমাই। যাহার যাহা ইচ্ছা বলুক, তাহা তোমার শুনিবার প্রয়োজন কি? এসো, এখন হইতে তোমার সহিত আমরা সকলে মিলিয়া আমার বাড়ীতে সংকীর্তন করি।" নিমাই ইহা স্বীকার করিলেন, ইহাতে শচীও কতকটা শান্ত হইলেন। তাঁহার ভয় তবু একেবারে গেল না, কারণ বিশ্বরূপের কথা তিনি ভুলেন নাই। তিনি নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, হয় ত নিমাইও সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে।

এই গেল নিমাইয়ের আভ্যন্তরিক ভাব। বাইরে নিমাইয়ের ভাব আর একরূপ। প্রত্যুষে যখন তিনি গঙ্গাস্নান করিতে যান, তখনই বাহিরের লোকের সহিত দেখা হয়। অন্য সময় প্রায় নির্জনে থাকেন। সে অবস্থায় নিজ-জন ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গ তাঁহার ভাল লাগে না। গঙ্গাস্নানের সময় যখন বাহির হন, তখন গদাধর প্রভৃতি দুই একটি বয়স্য তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার

নিমিত্ত তাঁহার সঙ্গে থাকেন। বহিরঙ্গ লোক দেখিলে নিমাই একপাশ হন; কিন্তু ভক্ত দেখিলে লুকান না বটে, তবে অন্তরের ভাব গোপন করিয়া নয়নজল মুছেন এবং নিকটে গিয়া কাহাকে নমস্কার, কাহাকেও বা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। তখন "কর কি? কর কি?" বলিয়া অবশ্য তাঁহারা নিবারণ করেন। যে নবদ্বীপে বিদ্যা লইয়া রাজ্য, তাহার রাজা নিমাইপণ্ডিত, ঐরূপ দীনভাবে ক্ষুদ্র লোককে প্রণাম করিলেন, কাজেই তাহার কুণ্ঠিত হইবার কথা। কিন্তু নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া তাহাদের সেই কুণ্ঠিতভাব তখনই অপগত হয়, আর হৃদয়ে কারুণ্যরস উছলিয়া উঠে, তখন কেহ বা রোদন করিয়া ফেলেন। কারণ, নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া সকলে বুঝিতে পারে যে, তিনি বিনয়ের আকর। প্রকৃতই তিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা নীচ মনে করিয়া অন্যের চরণ ধরেন। এইরূপে কখন নিমাই কাহার হস্ত হইতে ফুলের সাজি লইয়া আপনি বহিয়া চলিলেন। কাহারও বস্ত্র আপনার হস্তে লইলেন। কাহারও স্নান হইলে তাহার বস্ত্র নিংড়াইয়া দিলেন। ইহাতে সকলে দুঃখ প্রকাশ করিয়া নিষেধ করেন। তখন নিমাই উত্তর করেন, "আমি শুনিয়াছি, ভক্তের সেবা করিলে কৃষ্ণের কৃপা হয়, সুতরাং কেন আপনারা আপনাদের সেবারূপ মহাভাগ্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতেছেন।" দীনভাব দেখিলেই লোকের মন কোমল হয়। আবার এই দীনভাব যখন তেজস্বী লোকের হৃদয়ে উদিত হয়, তখন তিনি অপরের হৃদয় ও চিত্ত মোহিত করেন। সুতরাং নিমাইয়ের দৈন্য দেখিয়া সকলের হৃদয় যে দ্রব হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি?

কখন কখন ভক্তগণ বলেন, "কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করুন।" উত্তরে নিমাই বলিলেন, "আপনাদের যখন আমার প্রতি এত কৃপা, তখন আমার বোধ হয়, আমার ভাগ্যে ভালই আছে।" নিমাইয়ের ন্যায় পদস্থ লোকের এরূপ দৈন্য দেখিয়া কি ভক্ত কি অভক্ত, সকলেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে লাগিলেন।

ক্রমেই নিমাই পণ্ডিতের কথা লইয়া নানা স্থানে তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। যে সকল পণ্ডিত নিমাইয়ের প্রতিভায় স্তম্ভিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্রুপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু যিনিই বিদ্রুপ করুন, নিমাইকে দর্শন করিলে—তাঁহার সরল, স্বচ্ছন্দ আনন্দপূর্ণ কারুণ্য-উদ্দীপক চন্দ্রবদন দেখিলে—তাঁহার আর সে ভাব থাকে না।

যাঁহারা বৈষ্ণব-ভক্ত, তাঁহারা বড় আনন্দিত হইলেন। ক্রমে এ কথা অদ্বৈতের সভায় উপস্থিত হইল। পূর্বে বলিয়াছি, শ্রীঅদ্বৈত তখন বৈষ্ণবগণের প্রধান, আর তাঁহার সভায় বৈষ্ণবগণ যাইয়া গ্রন্থ পাঠ এবং কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও কীর্তন করিতেন। সেখানে একদিন ভরপুর সভার মধ্যে একজন নিমাইয়ের কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন যে, যে নিমাইপণ্ডিত পাণ্ডিত্যে জগৎ জয় করিয়া পৃথিবীকে সরার ন্যায় জ্ঞান করিতেন, ভক্ত কি বৈষ্ণব দেখিলে তাহাকে বিদ্রুপ করিতেন,—আজ সেই নিমাইকে দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি দীনহীন কাঙ্গাল। তাঁহার ভক্তি দেখিলে শুক কি প্রহ্লাদ বলিয়া জ্ঞান হয়। সকলে তাঁহার নিগূঢ় ভাব দেখিতে পায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহার সে ভাব দেখিয়াছে, তাহার আর তখন তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ থাকে না।

শ্রীঅদ্বৈত তখন গদগদ হইয়া বলিলেন, "গত নিশি শেষে আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা তোমাদের কথা শুনিয়া, তোমাদিগকে বলিতে হইল। আমি গীতার এক স্থানের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কল্য রাত্রি উপবাস করিয়া পড়িয়াছিলাম। শেষরাত্রে দেখি যেন কেহ আসিয়া আমাকে ডাকিতেছেন, আর বলিতেছেন, "আচার্য উঠ। তুমি যে শ্লোক বুঝিতে পার নাই, তাহার অর্থ এই। আর কেন তুমি দুঃখ করিতেছ? তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে, আমি স্বয়ং আসিয়াছি। এখন শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন আরম্ভ হইবে ও জীবগণ উদ্ধার পাইবে।"

"আমি এই সব কথা শুনিয়া নয়ন মেলিলাম, দেখি যে বিশ্বম্ভর কথা কহিতেছেন! দেখিতে দেখিতে তিনি অদর্শন হইলেন। সেই অবধি আমার অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইয়া রহিয়াছে। বাল্যকালে এই বিশ্বম্ভর যখন উহার ভাই বিশ্বরূপকে ডাকিতে আমার এখানে আসিত, তখন সেই দিগম্বর

শিশু আমার চিত্ত আকর্ষণ করিত। আমি ভাবিতাম, এ বস্তুটী কি? আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস, আমার চিত্ত এ বালক এরূপে কেন অধিকার করে? নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র, জগন্নাথের পুত্র, বিশ্বরূপের ভাই, নিজ দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিত,—এ হেন বস্তুর যখন ভক্তির উদয় হইয়াছে তখন আমাদের পরম মঙ্গলের কথা। আর যদি তিনি কোন বিশেষ বস্তুই হয়েন তবে এ দাসের বাড়ীতে একবার আসিতেই হইবে, আমার সহিত এরূপ কথা আছে।"

অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত। তিনি ভাবিলেন, "যদি তিনি সত্যই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে অগ্রে আমার নিকট আসিবেনই আসিবেন।" শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের বয়ঃক্রম তখন সপ্ততি বৎসরেরও অধিক। ত্রিভুবনে তাঁহার ন্যায় শ্রীভগবানের ভক্ত আর নাই। কিন্তু তবু তিনি একটী দুঃখে বড় কাতর! সে দুঃখ প্রকৃত ভক্তমাত্রেরই হইয়া থাকে। জীবগণের প্রতি কৃপার্ত হইয়া শ্রীভগবান্ ভক্তকে এই দুঃখটী দিয়াছেন। জীবগণ যে শ্রীভগবানের অভয় চরণ ভুলিয়া দুঃখ পায়, শ্রীঅদ্বৈতের মনে এই বড় দুঃখ। তিনি আপন পার্ষদগণের নিকট সর্বদা এই দুঃখের কথা বলিতেন। তিনি বলিতেন যে, জীবগণ যেরূপ মলিন হইয়াছে, তাহাতে স্বয়ং তিনি ব্যতীত আর কেহ তাহাদিগকে উদ্ধার কবিতে পারিবে না। কখন ইহাও বলিতেন, "তোমরা চুপ করিয়া থাক, তিনি সত্বর আসিবেন, আসিয়া সর্ব-নয়নগোচর হইবেন।" কখন 'এসো' 'এসো' বলিয়া এরূপ হুঙ্কার করিতেন যে, পার্ষদগণ কাঁপিযা উঠিতেন। আবার গোপনে শাস্ত্র বিধানানুসারে দিবানিশি গঙ্গাজল তুলসী দিয়া সেই কামনা করিয়া ভজনা করিতেন, বলিতেন যে, "প্রভু শ্রীভগবান, তুমি এসো। তুমি আসিয়া তোমার জীবগণকে উদ্ধার কর।" এইরূপে দিবানিশি শ্রীভগবান্‌কে আকর্ষণ করিতেন। শ্রীভগবান্ স্বপ্নযোগে তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হয়েন যে তিনি আসিবেন। সুতরাং এই যে নানা জনে নিমাইকে লইয়া নানারূপ অনুভব করিতেছিলেন, ইহার মধ্যে কেহ কেহ মনে মনে ইহাও ভাবিতে লাগিলেন যে, এ বস্তুটি কি স্বয়ং তিনি?—সেই সর্বপ্রাণীর প্রাণ, মনের মানুষ, আরাধনার ধন, ভক্তের ভগবান?

একদিন শ্রীনিমাই গদাধরের সহিত নবদ্বীপে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের বাসাবাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত। দেখেন যে, আচার্য তুলসী সেবা করিতেছেন। অদ্বৈত ভক্তশিরোমণি, তাঁহাকে দেখিয়া নিমাইয়ের হৃদয়-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, তিনি তখনই সেখানে হুঙ্কার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অদ্বৈত মুখ ফিরাইয়া সমুদয় দেখিতেছিলেন। নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, তিনি নিমাইয়ের নিকট আসিয়া তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের ভাব ও রূপ দেখিয়া তাঁহার চিত্ত প্রগাঢ়রূপে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি নিমেষ-শূন্য হইয়া যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, "তুমি কে গো? সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া যাঁহাকে বিচলিত করা যায় না, সেই তুমি কি আজ আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? তা বিচিত্র কি! তোমার কাজই এইরূপ। আহা! কি সুন্দর মুখ! এরূপ মুখ তোমা ব্যতীত আর কাহারও সম্ভবে না। এই কি তোমার রূপ? তুমি না কাল? আর তুমি যে এখন আসিবে, তাহা ত শাস্ত্রে দেখিতে পাই না? তা তুমি শাস্ত্রের অতীত। তুমি না হলে আমাকে প্রাণের সহিত এরূপ টানিতেছ কেন? আজ আমার কি শুভদিন!" শ্রীঅদ্বৈতের মনে এইরূপ নানাবিধ অননুভবনীয় ভাব-তরঙ্গ খেলিতেছে। সেই তরঙ্গে তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতেছে; শেষে অবিশ্বাস একেবারে গেল। তিনি মনে মনে নিশ্চিত বুঝিলেন যে, যাহাকে তিনি গঙ্গাজল তুলসী দিয়া আকর্ষণ করিতেছিলেন, সেই বস্তু এই,—তাঁহার সম্মুখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন! তখন তিনি ব্যস্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া গঙ্গাজল, তুলসী, চন্দন, আনিলেন। আনিয়া নিমাইচাঁদের সুন্দর পা দুখানি প্রথমতঃ গঙ্গাজল দিয়া ধুইলেন। তৎপরে তুলসী পত্রে চন্দন লিপ্ত করিয়া নিমাইচাঁদের পাদপদ্মে এই শ্লোক পড়িয়া অর্পণ করিতে লাগিলেন। যথা—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

এই শ্লোক পড়িয়া চরণে তুলসী দিতেছেন, আর প্রণাম করিতেছেন। গদাধর এই সমুদয় ব্যাপার দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। গদাধর নিমাইয়ের সহিত সর্বদা ভ্রমণ করেন, নিমাইকে প্রাণের অপেক্ষা প্রীতি ও প্রাগাঢ় ভক্তি করেন। আর অদ্বৈতকে মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন। সেই অদ্বৈত তুলসী গঙ্গাজল লইয়া নিমাইয়ের চরণ পূজা করিতেছেন দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। নিমাইয়ের প্রতি গদাধরের যে প্রেম তাহার সীমা ছিল না, সুতরাং শ্রীঅদ্বৈতকে নিমাইয়ের চরণ-পূজা করিতে দেখিয়া পাছে তাঁহার সখা নিমাইয়ের কোন অকল্যাণ হয় ইহা ভাবিয়া, ভয়ে ব্যাকুল হইয়া অদ্বৈতকে বলিতেছেন, "গোসাঞি, করেন কি? নিমাইপণ্ডিত বালক, উনি আপনার কাছে কি অপরাধ করিয়াছেন যে আপনি চরণ-পূজা করিয়া উহার অকল্যাণ করিতেছেন?" তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু গদাধরের দিকে চাহিয়া এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "নিমাইপণ্ডিত কিরূপ বালক, তুমি তাহা ক্রমে জানিতে পারিবে।" ইহা শুনিয়াই গদাধরের মনে হইল যে, নিমাইপণ্ডিত কি সত্যই শ্রীভগবান্? ইহাতে যুগপৎ আনন্দ এবং ভয় উদিত হইল। আনন্দ কেন হইল তাহার হেতু বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভয় কেন হইল বলিতেছি। এতদিন নিমাই পণ্ডিত তাঁহারই ছিলেন। যদি তিনি শ্রীভগবান্ হন, তবে কি আর তাঁহার থাকিবেন,—তিনি না তখন সকলের হইবেন? ইহা ভাবিয়া গদাধর ত্রস্ত হইয়া নিমাই হইতে দুই-এক পা সরিয়া দাঁড়াইলেন।

এমন সময় নিমাই চেতন পাইলেন, আর শ্রীঅদ্বৈতকে আপনার চরণের নিকটে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "গোসাঞি। আমি ভবসাগরে হাবুডুবু খাইতেছি। তুমি দয়াময়, আমাকে উদ্ধার কর। আমার এই অপবিত্র দেহ তোমাকে দিলাম, তুমি আমার মস্তকে চরণ স্পর্শ করিয়া আমাকে পবিত্র কর। তোমাকে দর্শন করিব মনে বড় সাধ ছিল, আজি আমার ভাগ্যের উদয় হইয়াছে, তোমার চরণ দর্শন পাইলাম।"

তখন অদ্বৈত একটু সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। ভাবিলেন "উনি যদি সত্যই শ্রীভগবান্ হইবেন, তবে আমার নিকট কেন গুপ্ত হইতেছেন, আর আমার নিকট এত দৈন্যই বা কেন করিতেছেন?" অদ্বৈত কিন্তু নিজ মনোভাব ব্যক্ত না করিয়া নিমাই যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার সহজ উত্তর দিলেন। বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি আমার বন্ধু জগন্নাথের পুত্র, আর আমার সুহৃদ্ বিশ্বরূপের ভাই, সুতরাং তুমি আমার অতি প্রিয়। বৈষ্ণবগণের মুখে শুনিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম যে, তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ কৃপা হইয়াছে। এখন সকলে মিলিয়া স্বচ্ছন্দে কীর্তন করিব।"

নিমাইয়ের দৈন্য দেখিয়া, তাঁহার উপর অদ্বৈতের যে সন্দেহ হয়, তাহা ক্রমে বর্ধিত হইতে থাকে। "এ বস্তু কি সত্যই ভগবান?" এই চিন্তায় তিনি অহোরহঃ নিমগ্ন থাকিতেন। কিছুদিন পরে ভাবিলেন যে, যদি তিনি শ্রীভগবান হয়েন, তবে অবশ্য তাঁহার সন্ধান লইবেন। ইহাই ভাবিয়া নিমাইকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ফেলিয়া ও নদীয়া ছাড়িয়া শান্তিপুরে নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। ইহাতে শ্রীঅদ্বৈতের মহিমা একবার অনুভব করুন।

একাদশ অধ্যায়

"শ্রীবাসের আঙ্গিনায় গোরা রায়, নাচে হরি বোলে।
নাচে হরি বোলে, দুটি বাহু তুলে।"

শ্রীবাস যত্ন করিয়া নিমাইকে আপনার বাড়ীতে কীর্তন করিতে লইয়া গেলেন। তাঁহার চারি ভাই সকলেই কীর্তন করেন। অপূর্ব কীর্তনীয়া মুকুন্দ দত্ত, এবং মুরারি, সদাশিব, গদাধর প্রভৃতি

অন্যান্য ভক্তগণও মিলিত হইলেন। যখন সকলে নিমাইকে ঘিরিয়া বসিলেন, তখন তিনি কি বলিতে যাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংকীর্তন আর হইল না,—সংকীর্তনের প্রয়োজনও হইল না। একি নিমাইয়ের সঙ্গগুণ? সহচরগণ সকলে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। যখন নিমাই কান্দিতে থাকেন, সে করুণস্বরে পাষাণও দ্রব হয়। তাহার পর নিমাই যখন হাসিতে লাগিলেন, এ হাস্যের বিরাম নাই। সে হাস্যের ধর্মই এই যে অন্যকে হাস্যরসে মুগ্ধ করে। কখন নিমাই এমন কাঁপিতে থাকেন যে, সকলে ধরিয়া তাঁহার কম্পন নিবারণ করিতে পারেন না। কখন কাহারও গলা ধরিয়া তিনি কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই, কৃষ্ণ আনিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।" কখন বলেন, "ভাই, কৃষ্ণ ভজ, এমন দয়াল ঠাকুর আর নাই।"

এ সমুদয়ই নিমাই আবিষ্ট অবস্থায় করিতেছেন, কিন্তু যখন যাহা করিতেছেন, তাহাই সুন্দর। ঘরের মধ্যে স্ত্রীলোক, বাহিরে ভক্তগণ;—সকলেই আনন্দে উন্মত্ত অবস্থায় সমুদয় দর্শন করিতেছিলেন। হঠাৎ নিমাই চেতনা পাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'ভাই সকল, আমার কৃষ্ণকে পাইয়াছিলাম, পাইয়া আবার হারাইয়াছি।" তাহার পব বলিতে লাগিলেন "গয়া হইতে আসিবার সময় গৌড়ের নিকট কানাই-নাট্যশালা গ্রামে প্রাতঃকালে একটি ভুবনমোহন পরমসুন্দর কৃষ্ণবর্ণ শিশু নৃত্য করিতে করিতে আমার নিকট আসিয়াছিলেন, তাঁহার শ্রীপাদে নূপুর বাজিতেছিল। তিনি অতি চঞ্চলের ন্যায় হাসিতে হাসিতে আমার নিকট আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া অমনি অদর্শন হইলেন। তিনি কোথায় গেলেন?" ইহাই বলিয়া নিমাই আবার অচেতন হইয়া পড়িলেন। এই কাহিনী বলিবেন মনে করিয়া নিমাই প্রথমে শুক্লাম্বরের বাড়িতে মুরারি প্রভৃতিকে পূর্বে যাইতে বলিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "ভাই সকল, কল্য প্রাতে আমার দুঃখের কথা তোমাদিগকে বলিব।" সেদিনও বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বলিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এইরূপে দেখিতে দেখিতে সুখের নিশি পোহাইয়া গেল। অপূর্ব দর্শনে লোক মুগ্ধ হয়, কিন্তু নিমাইয়ের সঙ্গীগণ যে শুদ্ধ দেখিয়া শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, তাহা নয়। যেন নিমাইয়ের ভাবে, ভঙ্গীতে, স্পর্শে, কথায়, রোদনে এমন কি একটা শক্তি আছে, যাহাতে উপস্থিত ভক্তগণ বিবশ হইতে লাগিলেন, আর নিমাইয়ের রোদনে রোদন, হাস্যে হাস্য, আর আনন্দে আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।

'এ ব্যাপারটা কি', সকলে ভাবিতে লাগিলেন। একি তাহাদের জাগরণ অবস্থা, না নিদ্রার অবস্থা? একি পৃথিবী, না বৈকুণ্ঠ? তাহারা দেবতা, না মনুষ্য? নিমাই কি শুকদেব, প্রহ্লাদ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ? সে রজনীতে যে যে ব্যক্তি নিমাইযের সে ভাব দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের হৃদয়ই নিমাই জুড়িয়া বসিলেন। অন্য কথা, অন্য ধ্যান, অন্য চিন্তা করিবার শক্তি—কি পুরুষ, কি স্ত্রী—কাহারও রহিল না। সকলের অন্তরেই কেবল 'নিমাই' জাগিতে লাগিলেন।

নিমাই প্রভাতে বাড়ী গেলেন। তখন তাঁহার নবানুরাগের সময়। নবানুরাগ বড় সুখের সময়। তখন যাহার যেরূপ অনুরাগের গভীরতা তাহার সেইরূপ অবস্থার পরিবর্তন হয়। নিমাইয়ের তখন আর বাহ্যজ্ঞান প্রায় হইত না, সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমানন্দে মত্ত থাকিতেন। এই সময় মুরারি গুপ্ত তাঁহার নিয়ত পার্ষদ। তাঁহার করচা গ্রন্থ হইতে কবিকর্ণপুর যে চৈতন্যচরিত মহাকাব্য লিখেন সেই কাব্য হইতে, সেই সময়ে নিমাইয়ের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা কিছু বর্ণনা করিতেছি। যথা, চৈতন্যচরিত কাব্যের পঞ্চম সর্গের শ্লোকের অনুবাদ—

"প্রাতঃকালে মহাপ্রভু (নিমাই) উচ্চৈঃস্বরে বিনয়ের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত দিন কাটিল এবং ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল। তখন তিনি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এ কি দিন হইল, ইহাই বলিয়া তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ১০।।"

"আবার সন্ধ্যাকালে বিমুক্তকণ্ঠ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে বলিলেন,

'একি প্রভাত হইল, কারণ আলো দেখিতেছি।' এইরূপে গৌরহরির সময়ের জ্ঞান রহিত হইল। ১১।।"

"মহাপ্রভুর কর্ণকুহরে যখন একটি বার (শ্রীকৃষ্ণ কি শ্রীহরি) নাম প্রবিষ্ট হয়, তখন তিনি ভূমিতে পড়িয়া বলপূর্বক লুণ্ঠন করেন, তাঁহার কম্প হয় ও অতিবেগে দীর্ঘনিঃশ্বাস ও বহুতর নেত্রজল পড়িতে থাকে। ১২।।"

নিমাইয়ের নয়ন-ধারার আর বিরাম নাই। তবে বহিরঙ্গ লোক দেখিলে কষ্টে-সৃষ্টে উহা নিবারণ করেন মাত্র। মনুষ্যের নয়ন হইতে যে এত জল পড়িতে পারে ইহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। বাড়ীর মধ্যে পিঁড়ায় বসিয়া নিমাই বাম হস্তে মুখ রাখিয়া চুপি চুপি রোদন করিতেছেন। কাহারও প্রতি বাক্যালাপ নাই। যদি কখন একটু চেতনা লাভ করেন, তখন সম্মুখে যাঁহাকে দেখেন, তাঁহাকে অতি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কৃষ্ণ কোথায় গেলেন?" নিমাই প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিলেন, প্রেমানন্দে ধারা পড়িতে লাগিল। নিমাই বদন প্রক্ষালন করিতেছেন আর নয়নে ধারা পড়িতেছে। নিমাই আহার করিতে বসিয়াছেন, প্রেমে আহার করিতে পারিতেছেন না, আর শচী সাধ্যসাধনা করিয়া আহার করাইতেছেন। দিবাভাগে শয়ন করিতে গেলেন, নয়নধারায় শয্যা ভিজিয়া গেল।

একদিন গদাধর নিমাইয়ের নিমিত্ত হস্তে তাম্বুল লইয়া তাঁহার কাছে আসিলে, নিমাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গদাধর! কৃষ্ণ কোথায় গেলেন?" তখন গদাধর উত্তর করিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ আর কোথায় যাইবেন, তোমার হৃদয়-মাঝে আছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র নিমাই ভাবিলেন, তবে আর কি, কৃষ্ণকে এতদিন পরে নিকটে পাইয়াছেন, এখন ধরিবেন; ইহাই ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বটে? হৃদয় মাঝে?" যেমন এই কথা বলিলেন, অমনি দুই হস্তের নখ দিয়া হৃদয় চিরিতে গেলেন। তখন আস্তে ব্যস্তে গদাধর তাঁহার দুইখানি হাত ধরিলেন। শচীও হাত ধরিলেন এবং সকলে নিমাইকে স্বান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তখন শচী বলিতেছেন, গদাধর। তুমি বড় সুবোধ ছেলে, তুমি না থাকিলে আজ আমার নিমাই প্রাণে মরিত। শচীর এ কথা বলিবার কারণ এই যে, তখন নিজ নখাঘাতে নিমাইয়ের হৃদয় বিদারিয়া শোণিত পড়িতেছিল।

সন্ধ্যা হইলে ভক্তগণ একে একে আসিয়া নিমাইয়ের বাড়িতে মিলিত হইতে লাগিলেন, শ্রীবাসের বাড়ী আর যাওয়া হইল না, নিমাইয়ের গৃহেই প্রেমানন্দের তরঙ্গ উঠিতে আরম্ভ করিল। যদিও সকলে সংকীর্তন করিতে বসিলেন, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে তখনও সংকীর্তন আরম্ভ হয় নাই। ভক্তগণ কেবল নিমাইকে লইয়া আনন্দে নিশি জাগরণ করেন।

পূর্বে বলিয়াছি, নিমাইয়ের এই নব অনুরাগের কাল। সাধন-ভজন করিলে জীবের যেরূপ অবস্থা হয়, নিমাইয়ের পর পর সেই সমুদয় অবস্থা হইতে লাগিল। তবে এই সমুদয় লক্ষণ অন্যে কিয়ৎপরিমাণে, আর নিমাইয়ের সম্পূর্ণ পরিমাণে দেখা দিতেছে। নবানুরাগের অবস্থা কি তাহা চণ্ডীদাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। "নবানুরাগিণী বালা মনের ব্যথা যে কি, তাহা ভাল করিয়া বলিতে পারেন না। তাঁহার ব্যাধি 'অকথন', অর্থাৎ তাঁহার যে কি কি ব্যাধি তাহা তিনি আপনি বলিতে পারেন না। তবে তিনি তাঁহার বন্ধুর নাম শুনিবামাত্র আনন্দে পুলকিত কি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। আর কি হয়, না তাঁহার নয়ন দিয়া অহেতুক আনন্দধারা পড়িতে থাকে।" নিমাইয়ের সেই অবস্থা গয়াধামে প্রথম হয়। কানাই নাট্যশালাতে এই অনুরাগ প্রথমে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তখন তিনি শয়নে-স্বপনে, জলে-আকাশে, সমস্ত সংসারে কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। এই যে চতুর্দিকে তিনি কৃষ্ণময় দেখিতেছেন, ইহার মধ্যে কখন কৃষ্ণের সঙ্গে আহ্লাদে কথা বলিতেছেন, কখন তাঁহার রূপ দেখিয়া নয়নজল ফেলিতেছেন, কখন বা কৃষ্ণকে না দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছেন। বাহিরের লোকের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। তখন তিনি আর তাঁহার কৃষ্ণ, এই দুইজন ব্যতীত ত্রিজগতে আর কেহ যে আছে, কি কাহারও

থাকিবার প্রয়োজন আছে, এ বোধ তাঁহার নাই। তাঁহার ভাব দেখিয়া বাহিরের লোক তাঁহাকে বুঝিতে পারিত না; এমন কি, কেহ কেহ তাঁহাকে পাগল ভাবিত। তিনিও বাহিরের লোকের কথা শুনিতে পাইতেন না; শুনিতে পাইলেও বুঝিতে পারিতেন না। যখন নিমাইয়ের চেতনা হইত, তখন হয় তাঁহার এই সমুদয় কথা কিছুই মনে থাকিত না, কি স্বপ্নের মত কিছু মনে থাকিত। যদি কিছু মনে থাকিত তবে চেতন অবস্থায় সঙ্গিগণকে বলিতেন, "ভাই",—কি জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, "মা—আমি যদি কিছু প্রলাপ বলিয়া থাকি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি আমার স্ববশে নাই।" সকলেই বলিতেন, "কৈ তুমি ত কিছু প্রলাপ বল নাই"।

এই অবস্থায় শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ নিমাইকে লইয়া সংকীর্তন করিতে বসেন। কিন্তু নিমাই তখন ভাবে জর জর, সম্পূর্ণ ভাবের বশীভূত; ভাব তখন তাঁহার বশীভূত হয় নাই, সুতরাং তিনি তখন স্ববশে নাই। সংকীর্তন করিতে বসিলেই তাঁহার দেহে নানাবিধ ভাব প্রকাশ পায়।

সে ভাবগুলি কি তাহা এখন শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিয়া বিবরিয়া বলিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ,—হাস্য, রোদন প্রভৃতি কেবল "অষ্ট সাত্ত্বিক" ভাবের কথা আছে; কিন্তু নিমাইয়ের অঙ্গে বহুতর ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কখন নিমাই মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতেছেন ও ক্রন্দন করিতেছেন, –এইরূপ এক প্রহরেও ক্রন্দন থামিতেছে না। কখন ক্রন্দন থামিয়া, ঠিক তাহার বিপরীত ভাবের উদয় হইতেছে, অর্থাৎ হাস্য করিতেছেন; যত ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তত হাস্য করিতেছেন। কখন অঙ্গ দিয়া এত ঘর্ম নির্গত হইতেছে যে "মূর্তিমতী গঙ্গা যেন আইল শরীরে।" আবার কখনও কখনও অঙ্গ অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত হইতেছে, জল দিলেই শুষিয়া লইতেছে, চন্দন দিবামাত্র শুকাইয়া যাইতেছে। কখনও এমন কম্প হইতেছে আর দন্তে-দন্তে এরূপ জোরে আঘাত হইতেছে যে, বোধ হইতেছে যেন সমুদয় দন্ত বুঝি ভাঙ্গিয়া গেল। কখনও সম্পূর্ণ মূর্চ্ছা, উত্তান নয়ন, জীবনের চিহ্নমাত্র নাই, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ, মুখ বাহিয়া ফেনা পড়িতেছে। মূর্চ্ছিত অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়, আবার কখন সেই অবস্থায় এরূপ বেগে শ্বাস বহিতে থাকে— যেন ঝড় বহিতেছে, তখন উহার সম্মুখে থাকে কার সাধ্য। কখন অঙ্গ এরূপ ভারী হয় যে, কেহ উহা উঠাইতে পারে না। আবার কখন কখন সেই অঙ্গ এরূপ লঘু হয় যে, ভক্তগণ জনে জনে, অনায়াসে তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া আঙ্গিনায় নৃত্য করেন। শুধু তাহা নয়, কখন আপনি শূন্য-ভরে ক্ষণিক নৃত্য করিয়া যান। কখন-বা পদ মস্তকে সংলগ্ন হয়, হইয়া সমস্ত দেহটী চক্রের আকার ধারণ করে,—এইরূপে আঙ্গিনায় চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকেন। কখন ঘোরতর হিক্কা হয়, আর সেই নিমিত্ত স্থির হইয়া বসিতে পারেন না। কখন অঙ্গের গৌরবর্ণ যাইয়া শ্বেত কি অন্য কোন বর্ণ হয়। কখন চক্ষের বর্ণ পরিবর্তন হয়, কখন বা দুই চক্ষের পৃথক বর্ণ হয়। কখন অঙ্গে ব্রণের ন্যায় স্ফোটক হয়, আর কখন উহা হইতে শোণিত নির্গত হইতে থাকে। কখন অঙ্গ এরূপ শক্ত হয় যে, কাহারও উহা নোয়াইতে সাধ্য হয় না। কখন বা এমন কোমল হয় যে, বোধ হয় যেন অঙ্গে অস্থিমাত্র নাই। ইহা ব্যতীত ভাবে কখন উদ্দণ্ড, কখন-বা মধুর নৃত্য করেন।

"ক্ষণে হয় বাল্যভাব পরম চঞ্চল। মুখ বাদ্য করে যেন ছাওয়াল সকল।।
চরণ নাচয়ে ক্ষণে খল খল হাসে। জানু গতি চলে ক্ষণে বালক আবেশে।"

নিমাই ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। মুকুন্দ সুকণ্ঠে শ্যামগুণ গান আরম্ভ করিলেন আর অমনি নিমাইয়ের অঙ্গে নানাবিধ অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। কীর্তন বন্ধ হইয়া গেল, ভক্তগণ তখন নিমাইকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন,—কখন তাঁহার কথা বা রোদন শুনিতেছেন, কখন বা তাঁহার অদ্ভুত ভাব দর্শন করিতেছেন। এইরূপ করিতে করিতে নিশি পোহাইয়া গেল। নিশি যে কিরূপে এত শীঘ্র শেষ হইল কেহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না, যেহেতু নিমাইয়ের সঙ্গগুণে সকলে আনন্দে বিভোর।

ক্রমে নিমাইয়ের দেহ অন্য ভাব ধারণ করিল। প্রথমে দেহ ভাবের অধীন ছিল, এখন কিঞ্চিত পরিমাণে ভাব দেহের অধীন হইতে লাগিল। এক দিবস শ্যামগুণ গান আরম্ভ হইলে নিমাই আনন্দে নাচিতে লাগিলেন, কিন্তু সে নৃত্য মধুর নয়—উদ্দণ্ড, সে নৃত্যভরে পৃথিবী যেন কাঁপিতে লাগিল। নিমাই একটু নৃত্য করিয়াই অচেতন হইয়া আছাড় খাইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। আর শচী হাহাকার করিয়া রোদন করিতে করিতে নিমাইকে ধরিতে গেলেন। "বাছার আমার হাড়-গোড় ভাঙ্গিয়া গেল, তোমরা কীর্তনে ক্ষান্ত দাও," ইহাই ভক্তগণের নিকট শচী নিবেদন করিলেন। নিমাই আবার উঠিয়া বসিলেন, আর তাঁহার অস্থি ভাঙ্গে নাই দেখিয়া, জননী শান্ত হইলেন। তখন শচী ভক্তগণকে অতি কাতরভাবে কহিতেছেন "তোমরা নিমাইকে ঘিরিয়া থাকিও, আর যখন ঢলিয়া পড়ে তখন সকলে তাহাকে ধরিও—মাটিতে যেন তাহার কোমল অঙ্গ না পড়ে।" যথা—

"থেকো রে বাপ নরহরি, চাঁদ-গৌরের কাছে।
রাধা-ভাবে গড়া তনু ধূলায় পড়ে পাছে।"

ক্রমে নিমাইয়ের ভাব দেহের আরও অধীন হইল এবং তাঁহার নৃত্য অতি মধুর হইতে লাগিল।

নিমাই নৃত্য করিতেন কেন? সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, যিনি পৃথিবীকে সরা জ্ঞান করিতেন, যিনি চিরদিন অন্যকে বিদ্রুপ করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি নৃত্যরূপ চঞ্চলতা করিয়া লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না কেন? ইহার উত্তর আমরা কি দিব? নিমাইয়ের সহজ জ্ঞান ছিল না। নিমাই ভক্তভাবে আনন্দে নাচিতেছেন, শরীরে এত আনন্দ হইয়াছে যে, উহা শরীরে ধরিতেছে না, তাই উঠিয়া আহ্লাদে নাচিতেছেন। আপনারা কি শুনেন নাই যে, মনুষ্য অতি আহ্লাদে নাচিয়া থাকে? অতি আনন্দের একটি প্রধান লক্ষণ নৃত্য করা। নিমাইয়ের অতি আনন্দ হইয়াছে, তাই নৃত্য করিতেছেন।

নিমাইয়ের অতিশয় আনন্দ কেন হইয়াছে? শ্রীভগবানের নাম কি গুণ কীর্তন শুনিয়া এই আনন্দ হইয়াছে। নিমাইয়ের আনন্দের পরিমাণ কি? সে আনন্দের পরিমাণ এই যে, যে ব্যক্তি বিদ্বজ্জন-সমাজে সর্বপ্রধান ও অতিশয় অভিমানী সেই পণ্ডিত, সর্বসমক্ষে, লজ্জা পরিহার করিয়া, বালকের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। নিমাইয়ের এ আনন্দে শ্রীভগবানের কি পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে শ্রবণ করুন। এটি চণ্ডীদাসের গান—

"কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।
* * * *
নামের প্রতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।।"

নিমাইয়ের নৃত্যে শ্রীভগবানের এই পরিচয় পাইতেছি যে, ভগবানের নাম শ্রবণে ভক্তগণকে আনন্দে পাগল করে, অতএব তিনি স্বয়ং কত না মধুর!

এখন পদকর্ত বাসুঘোষের পদের অর্থ পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন। নিমাইয়ের গুণ বর্ণনা করিয়া বাসুদেব বলিতেছেন—

"আমার পরশমণির কি দিব তুলনা—
কলুষিত জীবগণে পরশমণির গুণে
নাচিয়া গাইয়া হৈল সোনা।।"

পরশমণি কাহাকে বলি, না যাহার পরশে লৌহ সোনা হয়। এই নিমাই আমার পরশমণি। যেহেতু নিমাইয়ের পরশ দ্বারা লৌহ সদৃশ কঠিন ও মলিন জীব সোনার ন্যায় সুন্দর উজ্জ্বল

হইতেছে। সাধুগণ চিরকালই এইরূপ লৌহরূপ জীবকে সোনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা লৌহকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সোনা করেন, আর তারপর পোড়াইয়া নির্মল করেন। কিন্তু বাসুদেব ঘোষ বলিতেছেন যে, "পরশমণির স্বরূপ যে আমার নিমাইচাঁদ, তিনি জীবকে দুঃখ না দিয়া অর্থাৎ উপবাস, কঠোর সাধনা, তপস্যা প্রভৃতি না করাইয়া, নাচাইয়া ও গাওয়াইয়া, অর্থাৎ আনন্দে নিমগ্ন করিয়া, সোনা করিতেছেন।"

শ্রীভগবান্ আনন্দময়, সুতরাং নৃত্যকারী; তিনি যেমন আনন্দময়, তাঁহার সেবাও তেমনি সুখময়; ইহা জীবগণ নিমাইয়ের কাছে শিখিল। বাসুঘোষ ইহাই বলিতছেন, আর কিছু নয়।

বাসুদেব সার্বভৌমের কথা পূর্বে বলিয়াছি। সেই শুষ্ক মহাজ্ঞানী পুরুষ, হঠাৎ নিমাইয়ের নিকট কৃপা পাইয়া, তাঁহাকে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যেমন স্পর্শমণি যে পর্যন্ত লৌহকে সুবর্ণ না করে, সে পর্যন্ত তাহাকে দেখিলেও কেহ চিনিতে পারে না; সেইরূপ যখন গৌরচন্দ্র তাঁহার লৌহের ন্যায় কঠিন অন্তর গলাইয়া তাঁহাকে সোনা করিলেন তখন সার্বভৌম বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীনিমাই তাহার ভগবান্ ও হৃদয়স্পর্শমণি।

সেই যে নিমাই উদ্দণ্ড ও মধুর নৃত্য করিয়াছেন, তাঁহার নিকট শুনিয়া বৈষ্ণবগণ ও অন্য লোকে কখনও কখনও সংকীর্তনে নৃত্য করিয়া থাকেন। তবে নিমাই আনন্দে নৃত্য করিতেন, এখন অনেকে নৃত্য করিয়া আনন্দ ভোগ করেন। অর্থাৎ নিমাইয়ের অগ্রে আনন্দ পরে নৃত্য, এখনকার অনেকের অগ্রে নৃত্য পরে আনন্দ। নিমাই যখন মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে সংকীর্তন আরম্ভ হইল।

এখন যেরূপ সংকীর্তন হইয়া থাকে, তখন সেরূপ ছিল না। এখন বৈষ্ণবগণ নিমাইয়ের কিংবা নিতাইয়ের লীলা-গান করিয়া নৃত্য করেন, যথা—

"হরি ব'লে আমার গৌব নাচে।"

কিম্বা—"সুরধনী তীরে হরি বলে কে। বুঝি প্রেম-দাতা নিতাই এসেছে।।"

অবশ্য তখন এ সব কিছুই ছিল না। তখনকাব সংকীর্তন কেবল নামগান, যথা—

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।"

এইরূপ গীত হইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে খোলবাদ্য এবং করতাল ও মন্দিরায় তাল দেওয়া হইতেছে। অমনি নিমাই আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, আর ভক্তগণও আনন্দে উন্মত্ত হইয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিমাই দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর মুখে কেবল "হরিবোল" "হরিবোল", কি শুধু "বোল" বলিতেছেন। ক্রমে গান থামিয়া গেল, আর সকলে বাদ্যের সহিত "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলের পায়েই নূপুর—ইহাতে ঝুমুর ঝুমুর শব্দ হইতেছে। কেহ আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, কেহ কাহার পায়ে ধরিতেছেন, কেহ-বা ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন।

নানাবিধ উপকরণের সহিত উত্তম সঙ্গীত ও ব্যাদ্যাদি করিয়াও লোকে এখন নৃত্য করিবার মত আনন্দ পান না। আর তখন তাঁহারা—নিমাই ও তাঁহার পার্ষদগণ—কিরূপে শুধু 'নামে' আনন্দ পাইতেন? তাঁহার উত্তর—নিমাইয়ের কৃপা। নিমাইয়ের সঙ্গিগণ নিমাইয়ের প্রদত্ত আনন্দ উপভোগ করিতেন।

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শত শত লোক নৃত্য করিতেছেন, আর মৃদঙ্গ করতাল বাজাইতেছেন। কেহ-বা "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতেছেন, কেহ-বা রোদন করিতেছেন, কেহ-বা গড়াগড়ি দিতেছেন, আবার কেহ-বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। কে কার উদ্দেশ লয়?—সকলেই বিভোর। এদিকে ঘরের ভিতর রমণীগণ হুলুধ্বনি এ শঙ্খধ্বনি করিতেছেন। আবার কখন-বা উন্মত্ত হইয়া "হরি হরি" বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। বাহিরে ভক্তগণের যেরূপ ভাব হইতেছে, ঘরের ভিতর রমণীদিগেরও সেইরূপ ভাব হইতেছে। প্রভাত হইলে, সুখের নিশি পোহাইল বলিয়া সকলে মহা

দুঃখিত হইয়া সংকীর্তন ভঙ্গ করিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। এইরূপে প্রত্যহ নিশি-যাপন হইতে লাগিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

গৌর না হ'ত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা, প্রেম-রস-সীমা, জগতে জানাত কে।।
মধুর বৃন্দা, বিপিন মাধুরী, প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী, রসের আরতি, শকতি হইত কার।।
গাও গাও পুনঃ, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল করিয়া মন।
এ ভব সাগরে, এমন দয়াল, না দেখি একজন।।
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেল গলিয়া, কেমনে সেধেছে সিধি।
বাসুদেব হিয়া, পাষাণে মিশিয়া, গড়েছে কোন্-বা বিধি।।

ভক্তগণ তখন একটি অপরূপ জ্ঞান লাভ করিলেন। সেটী এই যে, "কৃষ্ণ-প্রেম" একটী কল্পিত দ্রব্য নয়, ইহা মদ্যের ন্যায় অতি তেজস্বর সামগ্রী! আর নিমাই ইচ্ছা করিলেই ইহা জড়-দ্রব্যের ন্যায় অন্যকে বিলাইতে পারেন। তখন ভক্তগণ নিমাইয়ের নিকট প্রেম-ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন কি এক দিবস শচী নিমাইকে বলিতেছেন, "বাপু! তুমি যেখানে যাহা পাও আমাকে আনিয়া দাও। আমি শুনিলাম, তুমি গয়া হইতে কৃষ্ণপ্রেম আনিয়াছ, কই তা তো মাকে একটু দিলে না?" নিমাই বলিলেন, "মা, তুমি বৈষ্ণব-কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম পাইবে।"

গদাধর নিমাইয়ের দিবানিশির সাথী। তিনি দিবানিশি নিমাইয়ের সেবা করেন। নিমাইয়েব বিছানা করেন, পান সাজিয়া দেন, বায়ু ব্যজন করেন, পদতলে শয়ন করিয়া থাকেন। সুতরাং গদাধর, কাজের গতিকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার পরম শত্রু। গদাধর কেবল আজ্ঞাপালন করেন, নিমাইয়ের দিকে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস পান না। গদাধরের মনে বড় একটা সাধ রহিয়াছে, তিনি নিমাইয়ের নিকট কৃষ্ণপ্রেম চাহিয়া লইবেন। কিন্তু বলিতে সাহস হয় না।

একদিন কীর্তনান্তে শেষরাত্রে উভয়ে শয়ন করিলেন; তখন গদাধর সাহস করিয়া নিমাইয়ের পা ধরিয়া কান্দিয়া পড়িলেন। "গদাধর কান্দ কেন?"—বলিয়াই নিমাই উঠিয়া বসিলেন। গদাধর ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "ত্রিজগৎ উদ্ধার হইয়া গেল, আমি কি একাই কৃষ্ণপ্রেম হইতে বঞ্চিত থাকিব?" তাহাতে নিমাই হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমিও পাইবে। কল্য প্রত্যূষে তুমি যেই গঙ্গাস্নান করিবে, অমনি কৃষ্ণপ্রেম পাইবে।" গদাধরের আনন্দে আর নিদ্রা হইল না। ভোরে গঙ্গাস্নান করিলেন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

"অতি হৃষ্ট মনে স্নান কবি গঙ্গাজলে।
প্রেমায় অবশ তনু টল মল করে।।"

প্রভুর পিঁড়ায় বসিয়া ভক্তগণ দেখিতেছেন, গদাধর টলিতে টলিতে আসিতেছেন। নয়ন কান্দিয়া কান্দিয়া অরুণ বর্ণ হইয়াছে, অজস্র প্রেমধারা মুখ বাহিয়া পড়িয়া বুক ভাসিয়া যাইতেছে। গদাধর আসিয়া গলায় বসন দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে শির লোটাইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিতেছেন, "গদাধর পাইয়াছ ত?" গদাধর নয়ন-জলে প্রভুর চরণ ধৌত করিয়া তাহার উত্তর করিলেন,—মুখে কিছু বলিলেন না। এইরূপে গদাধর প্রেম পাইলেন। যখন নিমাই নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন, তখন গদাধরের হস্ত ধরিয়া লন। গদাধর অমনি আনন্দে এলাইয়া পড়েন।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী গঙ্গাতীরে ও নিমাইয়ের বাড়ীর নিকট। নিমাই বাল্যকাল অবধি সেই স্থানে যাতায়াত করিতেন, এখনও করেন। শুক্লাম্বর মহাতপস্বী, নিমাইকে পুত্রের ন্যায় সেবা করেন। নিমাইয়ের নয়ন মুছাইয়া দেন, নাসিকার ধারা আপন হস্ত দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দেন, অঙ্গের ধূলা

ঝাড়িয়া দেন, ইত্যাদি। ক্রমে শুক্লাম্বর বুঝিলেন, এ যাবৎ তাঁহার কাল বিফল চেষ্টায় গিয়াছে; প্রেমই পরম-পদার্থ, আর নিমাই উহা দিতে পারেন । তখন একদিবস কাতর হইয়া শুক্লাম্বর শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট প্রেম-ভিক্ষা চাহিলেন। বলিতেছেন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

"নানা তীর্থ পর্যটন করিয়াছি আমি।
অনেক যন্ত্রণা দুঃখ কিছুই না জানি।।
মধুপুরী দ্বারাবতী কৈলু পর্যটন।
দুঃখিত হইনু মুঞি, দেহ প্রেমধন।।

শুক্লাম্বর বড় তপস্বী ও অনেক তীর্থ পর্যটন করিয়াছেন বলিয়া প্রেম পাইবার উপযুক্ত, এইরূপ দম্ভের সহিত প্রেম-ভিক্ষা করায়, প্রভু উত্তর করিতেছেন, "দ্বারাবতী ও মধুপুরে কি কুক্কুর শৃগাল নাই?" যথা (চৈতন্যচরিত কাব্য, ষষ্ঠ সর্গ)—

"কিং তত্র সন্তি ন শৃগালচয়াস্ততঃ কিম্
তেষাং ভবেৎ কিমথ তে ন পুনঃ শৃগালাঃ!
ইত্যুক্তাবতর্থ্য বিভৌ দ্বিজপঙ্গুবোঽয়-
মুচ্চৈঃ পপাত ভুবি দণ্ডবদুৎসুকাত্মা।।৮।।"

এই কথা শুনিয়া শুক্লাম্বর তাঁহার দোষ বুঝিয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া রোদন করতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া নিমাই কি করিলেন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

"অনুগত আর্তি প্রভু সহিবারে নারে।
করুণ অরুণ ভেল গৌর কলেবরে।।
'প্রেম দিনু', 'প্রেম দিনু' ডাকে আত্মনাদে।
শুক্লাম্বর দ্বিজ পাইল প্রেম পরসাদে।।
ততক্ষণ হৈল প্রেম কম্প-কলেবর।
পুলকিত অঙ্গে বহে নয়নের ধার।।"

এই সময় শুক্লাম্বরের স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি, তিনি ভিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ঝুলিতে ধানমিশ্রিত খুদ ও তণ্ডুল। শুক্লাম্বর প্রেম পাইয়া আনন্দে সেই ঝুলি স্কন্দে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া নিমাই এবং অপর সকলে হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। নিমাই তাঁহার ঝুলি হইতে সেই ধান-মিশ্রিত তণ্ডুল লইয়া খাইতে লাগিলেন। তখন শুক্লাম্বর "মনু, মনু, ইহাতে ধান," বলিয়া নিমাইয়ের হাত ধরিলেন।

এইরূপে জনে জনে নিমাইয়ের ইচ্ছামত প্রেমধন পাইতে লাগিলেন। আর কীর্তনের দল ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

এদিকে শ্রীনবদ্বীপে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত। শ্রীবাস-ভবনে গীতবাদ্য প্রভৃতি কলরব শুনিয়া সকল লোক তাহা দেখিতে শুনিতে আসিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীরের দ্বার বন্ধ, আর সেখানে একজন ভক্ত (গঙ্গাদাস) দ্বার রক্ষা করিতেছেন। সংকীর্তনের আরম্ভের পূর্বেই দৃঢ় করিয়া বন্ধ করা হইয়াছে। যাঁহারা অগ্রে আসিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন। যাঁহারা পরে আসিয়াছেন, ভক্ত বা নিমাইয়ের নিতান্ত নিজ-জন হইলেও তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারাই অগ্রে আসিতেন, আর যদি কার্যগতিকে কেহ সময়ে আসিতে না পারিতেন তবে তিনি মোটেই আসিতেন না।

কীর্তনের কলরব শুনিয়া বাহিরের লোক দেখিতে আসিয়াছে এবং দ্বার বন্ধ দেখিয়া 'দুয়ার খোল' বলিয়া সজোরে আঘাত করিতেছে। কিন্তু কেহ তাহাদের উদ্দেশও লইতেছেন না। তাহারা বহিরে দাঁড়াইয়া ভিতরের মহাকলরব শুনিতেছে। এই কাণ্ড প্রত্যহই হইতেছে। ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া এই সমুদয় বাহিরের লোক অবশ্য ক্রুদ্ধ হইতেছে ও 'এ ব্যাপার

কি?'বলিয়াই নানাবিধ চর্চা কবিতেছে। ক্রমে অনেকে নানাবিধ কুৎসাও রটাইতে লাগিল। যাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, বাড়ীর মধ্যে সংকীর্তন হইতেছে, তাঁহারা বলিলেন যে, এ আবার কিরূপ ভজন? নাচিয়া গাহিয়া ভজন করা ত কখনও শুনি নাই। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীভগবান হৃদয়ে আছেন, লোক দেখাইয়া না ডাকিয়া মনে মনে তাঁহাকে ডাকিলেই ত হয়? কেহ কেহ বলিলেন, ভগবান নিদ্রিত অবস্থায় হৃদয়ে আছেন, তাঁহাকে অমন করিয়া জাগাইলে তিনি ক্রোধ করিবেন এবং ভগবানের ক্রোধ হইলে আর ধান্য হইবে না, কাজেই সব লোক না খাইয়া মরিয়া যাইবে। আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিল, নিমাইপণ্ডিত আগে ভাল ছিল, এখন আবার নূতন মত চালাইতে লাগিল নাকি? কতকগুলি লোক বলিতে লাগিল যে, নদীয়া নগরে অন্য মত আর চালাইতে হয় না; বিশেষতঃ মুসলমান রাজা, তাহারা এ কথা শুনিলে গ্রাম লুঠ করিবে। তাহাতে কেহ কেহ বলিল, এত গণ্ডগোলের প্রয়োজন কি? সকলে মিলিয়া এই মাতালগুলির ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়াই কর্তব্য। আর একজন বলিল, চল কল্যই কাজির কাছে যাইয়া বেটাদের জব্দ করা যাউক। একজন পরমপণ্ডিত ও পরমজ্ঞানী বলিলেন,—যেখানেই গোপন, সেখানেই জানিবে অপরাধ। যখন ইহারা দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোপনে এই সকল কাজ করিতেছে, তখন ইহারা নিশ্চয়ই কুকাণ্ড করিতেছে। যদি ইহাদের সদভিপ্রায় থাকিবে, তবে গোপন করিবে কেন? কেহ কেহ বলিল, ইহারা মদ্যপায়ী তান্ত্রিক, মদ্য, মাংস ও স্ত্রীলোক লইয়া নানাবিধ কুকর্ম করে, আর জাতি যাইবার ভয়ে এই সমস্ত কাণ্ড গুপ্তভাবে করিয়া থাকে।

তাহার পর কেহ কেহ অঙ্গের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া কাজির কাছে গিয়া নালিশ করিল। তাহাদের নালিশের মর্ম এই যে, নিমাই পণ্ডিত কতকগুলি সঙ্গী লইয়া হিন্দুধর্ম নষ্ট করিতেছে। ইহারা প্রথমতঃ উচ্চৈঃস্বরে 'হরি' বলিয়া ডাকে। ইহাতে যে শ্রীভগবান হৃদয়ে নিদ্রিত আছেন, তিনি জাগরিত হইবেন আর জাগিলেই তাঁহার রাগ হইবে এবং তাঁহার রাগ হইলেই দেশেব সর্বনাশ, লোকে 'হা অন্ন, হা অন্ন' করিয়া মারা যাইবে। কাজি উত্তর করিলেন যে, তিনি কীর্তন বন্ধ করিয়া দিবেন।

মাঘ মাসে কীর্তন আরম্ভ হয়, ফাল্গুন মাসে প্রকৃত প্রস্তাবে কীর্তন হইতেছিল। চৈত্র মাসের শেষে এই কীর্তন লইয়া সমস্ত গৌড়দেশবাসী চর্চা করিতে লাগিলেন। ক্রমেই নিমাইয়ের দল প্রবল হইতে লাগিল। ক্রমেই বড় বড় লোক সেই দলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তখন এই কীর্তন লইয়া এত গোলযোগ হইয়াছে যে, কুলোকে জনরব তুলিল যে, গৌড়ের বাদশা হোসেন শা, নিমাইপণ্ডিত ও তাঁহার পার্ষদগণকে ধরিবার জন্য সসৈন্যে নৌকাপথে একজন সেনাপতি পাঠাইতেছেন। আর এই কথা অনেকে বিশ্বাসও করিল। ক্রমে জনরব পরিস্ফুটিত ও পরিবর্ধিত হইল। লোকে বলিতে লাগিল যে, যবন-সৈন্য গঙ্গা বাহিয়া নিমাইপণ্ডিত ও তাঁহার অনুচরগণকে ধরিতে আসিতেছে! এই কথা লইয়া সমস্ত নবদ্বীপে আন্দোলন হইতে লাগিল। নিমাইয়ের সঙ্গিগণ এই কথা শুনিলেন, কেহ ভয়ও পাইলেন ও বলিতে লাগিলেন, 'সংকীর্তন ঘরে বসিয়া আপনা আপনি করাই ভাল। শত শত জন জুটিয়া লোকের বিরক্তিভাজন হইয়া সংকীর্তন করার প্রয়োজন কি?'

এই জনরব নিমাইও শুনিলেন। কিরূপে শুনিলেন বলিতেছি। নিমাই তখন একটু স্থির হইয়াছেন। বাহিরে আসিয়া তখন সহচরগণ সঙ্গে বৈকালে নগরভ্রমণ কি গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া থাকেন। নিমাইয়ের বয়স তখন তেইশ বৎসর, রূপ আরও প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তিনি পট্টবস্ত্র অথবা অতিসূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিয়া বেড়াইতেছেন, সর্বাঙ্গ চন্দনে লিপ্ত, মুখে তাম্বুল। নির্মল আনন্দময় মুখ প্রেমে টলটল করিতেছে। ভাল লোকের সহিত দেখা হইলে দু'একটি কথা বলেন, মন্দ লোক দেখিলে দূরে দূরে থাকেন। তবু কেহ কেহ তাঁহাকে কখন কখন বিরক্তও করে। একদিন একজন

অধ্যাপক নিমাইপণ্ডিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'পণ্ডিত! তুমি যে স্বচ্ছন্দচিত্তে বেড়াইতেছ? তুমি কি শুন নাই? যাহারা চাক্ষুষ দেখিয়াছে তাহারাই বলিতেছে যে, যবনসৈন্য আগতপ্রায়। আর তাহারা অগ্রে তোমাকেই ধরিবে। তুমি বুদ্ধিমান্ তোমার কর্তব্য এই গ্রাম ছাড়িয়া দূরদেশে পরিবার লইয়া পলায়ন করা।' যে অধ্যাপক নিমাইকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য নিমাইয়ের উপকার করা নয়, তাঁহাকে একটু ভয় দেখান মাত্র। নিমাই যে এত ভয়ের কথা শুনিয়াও নির্ভয়ে বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা দেখিয়া কোন কোন দুষ্টলোক ঈর্ষান্বিত হইয়া যাহাতে নিমাই ভয় পান, সেইরূপ কথা বলিত ।

নিমাই সেই অধ্যাপককে সম্বোধন করিয়া অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হাঁ মহাশয়। আমাকে ধরিতে আসিতেছে, একথা আমিও শুনিয়াছি। কিন্তু পলায়ন করিয়া কোথায় যাইব? সমস্ত দেশই ত রাজার। আর পলাইব বা কেন? দেখুন মহাশয়! অতি অল্প বয়সে আমি পাঠ সমাপ্ত করিয়াছি। এই নবদ্বীপে আমাকে কেহ জিজ্ঞাসাও করে না। যদি রাজা আমাকে লইয়া যান তাহা হইলে আমার নাম জগৎময় প্রচার হইবে, আর তাহা হইলে আমি কি পড়িলাম, শুনিলাম তাঁহার কাছে পরিচয় দিব। রাজা সম্মান করিলে, আপনারাও তখন আমাকে সম্মান করিবেন।"

অধ্যাপক বলিলেন, 'তুমি বল কি? রাজা যবন, সে তোমার শাস্ত্রের কি ধার ধারে? সেখানে চালাকি খাটিবে না, ধরিয়া লইয়া যাইবে এবং একটা অনর্থ করিবে। আমি তোমাকে বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতেছি। তুমি এখনি পালাও।"

নিমাই বলিলেন, "রাজা গৌড় হইতে সৈন্য পাঠাইয়া, আমাকে লইয়া যাইবেন, আমি এ ভাগ্য কেন ছাড়িব?" অধ্যাপক নিমাইকে ভয় দেখাইতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া ইহাই বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন, "দেখা যাবে, আগে সৈন্যগুলো আসুক, তখন কত অহঙ্কার বুঝা যাইবে।" যখন ভাল-লোকে এই ভয়ের কথা উল্লেখ করেন, তখন নিমাই অল্প অল্প হাস্য করেন, কিছুর উত্তর করেন না। নিমাইয়ের এমনি তেজ যে তাঁহার নিকটে যাইয়া কথা কাটাকাটি করে ভক্ত কি অভক্ত, কাহারও এরূপ সাধ্য ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীবাস প্রভৃতি নিমাইয়ের নিজ জনেরাও মনে মনে ভয় পাইলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কলিঘোর তিমির গরাসিল ত্রিজগত
ধরম করম গেল দূর।
অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর।

—বাসুদেব ঘোষ

বৈশাখের শেষে কি জৈষ্ঠের প্রথমে, এক দিবস বেলা দুই প্রহরের পূর্বে,শ্রীবাস তাঁহার ঠাকুরঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া তাঁহার ভজনীয় বস্তু শ্রীনৃসিংহদেবের ধ্যান করিতেছেন। এমন সময় কে আসিয়া ঠাকুর ঘরের পিঁড়ায় উঠিয়া তাঁহার দ্বারে আঘাত করিয়া বলিল, "শ্রীবাস! শীঘ্র দ্বার খোল।" শ্রীবাস একটু বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" তাহাতে বাহিরের লোক উত্তর করিলেন, "তুমি যাহাকে ধ্যান করিতেছ।" এই কথা শুনিয়া শ্রীবাস কতক বিরক্ত, কতক কৌতূহলী হইয়া দ্বার উদঘাটন করিয়া দেখেন যে—নিমাইপণ্ডিত। তখন নিমাইপণ্ডিত ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং বিষ্ণুখট্টায় যে শালগ্রাম ছিলেন, তাহা একপার্শ্বে সরাইয়া আপনি উহার উপর বসিলেন। নিমাইপণ্ডিতকে দেখিয়া শ্রীবাস একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কারণ তিনি দেখিতেছেন যে, নিমাইপণ্ডিত যদিও সর্ব অবয়বে ঠিক নিমাইপণ্ডিতই আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সর্বাঙ্গ দিয়া এত তেজ বাহির হইতেছে যে, উহা সূর্যের তেজকে খর্ব করিতেছ। শ্রীবাস স্তম্ভিত! কোন কথা

কহিতে পারিলেন না। তখন নিমাইপণ্ডিত বলিলেন, "শ্রীবাস! আমি আসিয়াছি। তুমি আমাকে অভিষেক কর।"

নিমাইকে দেখিয়া এই "আমি" যে 'শ্রীভগবান' শ্রীবাস তাহাই বুঝিলেন। শ্রীবাসের অবস্থা এখন স্থিরচিত্তে বিবেচনা করুন। শ্রীবাস দেখিতেছেন যে, তাঁহার সম্মুখে শ্রীভগবান। শ্রীভগবান যাঁহার সম্মুখে তাঁহার সর্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে এবং সমুদয় বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। সমুদয় বাসনা পূর্ণ হইলে সে হতভাগ্যের মরণ বাঁচন সমান হইয়া যায়। এইজন্য জীবের মঙ্গল কামনা করিয়া, শ্রীভগবান জীবের নিকট দুর্লভ হইয়া আছেন। আর যদি তখন দর্শন দেন, তবে জীবগণ যাহাতে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে, তাহার উপায় করিয়া দিয়াছেন।

এ বিষয়ে আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। বড় লোকের কথা শুনিলে প্রথমে লোকে উহা হৃদয়ে ধারণা ক রতে পারে না। সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মরণ সম্ভব, এবং অধিক পরিমাণে পারিলে, সে তখনই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। শুনিবামাত্র লোকে উহা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না। তাহার অনেক কারণও আছে, প্রথমতঃ শুনিবামাত্র অনেক পরিমাণে সংজ্ঞা লোপ পায়, দ্বিতীয়তঃ শুনিবামাত্র অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না।

যেমন, লোকে যদি শ্রবণ করে যে, তাহার পুত্র বিয়োগ হইয়াছে তবে সে অনেক সময় ভাবে ইহা মিথ্যা কথা। অধিক আনন্দের উদয় হইলেও (আর শ্রীভগবদ্দর্শন অপেক্ষা জীবের অধিকতর আনন্দ হইতেই পারে না) ঠিক ঐরূপ অবস্থাই হয়। ইহাতে কাহার মৃত্যু, না হয় মূর্চ্ছা, না হয় কিয়ৎ পরিমাণে সংজ্ঞা লোপ হয়। শ্রীবাস যখন মনে বুঝিলেন যে শ্রীভগবান সম্মুখে, তখন আনন্দে তাঁহার সংজ্ঞা অনেকটা লুপ্ত হইল আবার বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার মনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানা তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। ভাবিতেছেন, "শ্রীভগবান? একি সম্ভব? কখনই না। এ আমি স্বপ্ন দেখিতেছি।" আবার ভাবিতেছেন, "এই যে সম্মুখে, ইনি কে? আর আমিই বা কে? আমি কি শ্রীবাস? ইনি কি সেই ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর ধন?" এই যে সন্দেহ, ইহা জীবমাত্রের মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। ইহা পরম-উপকারী ধন, ইহাতেই জীব শ্রীভগবান্‌কে আস্বাদ করিবার অবকাশ পায়। নীল কাঁচে যেরূপ সূর্য-দর্শন আয়ত্তাধীন হয়, সেইরূপ অবিশ্বাসে শ্রীভগবানের তেজ লঘু করিয়া তাঁহাকে জীবের দর্শন সম্ভব করে। অতএব যাঁহার অবিশ্বাস আছে, তিনি ভাগ্যহীন নহেন। জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীভগবান তাহাদিগকে অবিশ্বাস দিয়াছেন। যেমন নরম মাটিতে খুঁটি প্রোথিত করা ও উত্তোলন করা সহজ, তেমনি যাহাদের শীঘ্র বিশ্বাস হয়, তাহাদের সেইরূপ শীঘ্র বিশ্বাস যায়। এ সমুদয় রহস্যের তাৎপর্য পাঠক ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শ্রীবাস এইরূপে ভাব তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অধিকক্ষণ এ অবস্থায় থাকিতে হইল না। যেহেতু তাঁহার প্রতি অভিষেকের আজ্ঞা হইয়াছে, আর শীঘ্র সেই আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত তখনি চীৎকার করিয়া নিজ সহোদরগণকে, বাড়ীর মহিলাগণকে ও দাস-দাসীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাহারা আসিলে শ্রীবাস বলিলেন, "শ্রীভগবান আসিয়াছেন, তাঁহাকে অভিষেক করিতে হইবে। তোমরা শীঘ্র নতুন কলসী ক্রয় করিয়া একশত ঘট গঙ্গাজল লইয়া আইস।" ইহা শুনিয়া বাড়ীর সকলে পাগলের মত হইয়া গঙ্গায় জল আনিতে ছুটিলেন। নিমাই বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট আছেন, আর শ্রীবাস করযোড়ে তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্রমে ক্রমে গদাধর প্রভৃতি দু' একটি ভক্ত সংবাদ পাইয়া দৌড়িয়া আসিলেন। আর গঙ্গাজলপূর্ণ একশত ঘট শ্রীবাসের আঙ্গিনায় ক্রমে সারি সারি রাখা হইল। শ্রীবাসের বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ কিরূপে জল বহিয়া আনিতেছেন, তাহা প্রেমদাসের অনুবাদিত 'চন্দ্রোদয় নাটকে' এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"গৌরাঙ্গের কথা পথে চলে কয়ে কয়ে।
কহিতে আনন্দ ধারা বহে নেত্র দিয়ে।।
খসিয়ে পড়য়ে বেণী তাহা না সম্বরে।
কপোল রোমাঞ্চ গাত্র ভাব ভরে।।

শ্রীবাসের পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এই অভিনব অবস্থাটি হঠাৎ আসিয়াছিল এরূপ নহে। এরূপ একটা কিছু হইবে তাহা তাঁহারা পূর্বাবধি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দিবানিশি তাঁহারা শ্রীনিমাইয়ের সঙ্গগুণে প্রেমহিল্লোলে ভাসিতেছিলেন। শ্রীভগবান যে অতি প্রিয়জন এবং তিনি অতি নিকটে, এমন কি আগতপ্রায়, এরূপ ভাবে তখন সকলে অভিভূত। শ্রীনিমাই সেই ভগবান কিনা, সকলে ইহা মনে মনে তর্ক করিতেছিলেন। এইরূপ অবস্থায় সকলে শুনিলেন যে, শ্রীভগবান আসিয়াছেন, এবং তিনি আর কেহ নহেন—শ্রীনিমাই, সকলে মনে মনে ইচ্ছা যাহা করিয়াছিলেন সম্পূর্ণভাবে তাহাই হইল!

জ্যৈষ্ঠ মাসেব প্রথম, দুই প্রহর বেলা, আঙ্গিনার মধ্যস্থলে শ্রীপ্রভু প্রশস্ত পিঁড়ির উপর বসিলেন ও তাহার মস্তকে শত শত কলসী জল ঢালা হইল। যাঁহারা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই পাগলের মত হইয়াছেন। কাহারও বাহ্যজ্ঞান নাই। যিনি পাবিতেছেন, তিনিই জলের কলসী লইয়া মহাপ্রভুর মস্তকে ঢালিতেছেন। নিমাইয়ের অঙ্গ ধুইয়া যে জল বাহিয়া পড়িতেছে, তাহাতে তাঁহার অঙ্গের তেজ মিশিয়া গিয়াছে। সেই জল আঙ্গিনাময় হইয়া সোনার জলেব ন্যায় ঝলমল করিতেছে। অতি সূক্ষ্ম ও শুভ্র বস্ত্র দ্বারা তাঁহার অঙ্গ মার্জিত হইল। তাহাতে ঐ বস্ত্রে কিরণমালা লাগিয়া উহা কিঙ্খাপের ন্যায় ঝলমল করিতে লাগিল। তাহার পর তাঁহাকে সূক্ষ্ম ও শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া আবার ঠাকুরঘরে আনা হইল।

ঠাকুরঘরে আসিয়া তিনি পুনরায় বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন। ঠাকুরঘর বেড়া দিয়া ঘেরা ছিল। তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া বিষ্ণুখট্টায বসিলেন, আর ভক্তগণ কেহ পিঁড়ায়, কেহ বা আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সকলেই দেখিতে লাগিলেন, যে, সেই ঘর তেজোময় হইয়া গিয়াছে এবং সেই ঘরের বেড়ার সমস্ত ছিদ্র দিয়া তেজ বাহির হইতেছে। যথা—কবিকর্ণপুর-লিখিত চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, ৫ম সর্গে—

"অপ্রাপ্যাবসরমমুষ্য বেশ্ম মধ্যে।
তেজোভির্বহিরপি সন্ধিভির্ব্যভেদি।। ৫০।।

সেই তেজের কত শক্তি তাহা ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, জ্যৈষ্ঠ মাসের দুই প্রহরের রৌদ্রের তেজকেও উহা খর্ব করিয়াছিল। একটু পরে যাহারা বাহিরে ছিলেন, তাঁহারা ঐ গৃহের মধ্য হইতে মুহুর্মুহুঃ মুরলী-ধ্বনি শুনিতে লাগিলেন এবং বাহির হইতে এই সুধা পান করিতে করিতে সুখে একেবারে জড়বৎ হইলেন। এমন সময় গৃহাভ্যন্তর হইতে শ্রীনিমাই 'শ্রীবাস' বলিয়া ডাকিলেন। নিমাই ইহার পূর্বে শ্রীবাসকে কখনও এরূপ স্বরে নাম ধরিয়া ডাকেন নাই—

শ্রীবাস ঘরে প্রবেশ করিলে নিমাই বলিতেছেন, "শ্রীবাস! তোমার গৃহে আমার স্থান কর; আমি তোমার গৃহে যাইব।" এই আজ্ঞা শুনিয়া সকলে মহাব্যস্ত হইলেন। শ্রীবাস শ্রীগদাধরকে বলিলেন, "তুমি বিষ্ণুখট্টা আমার ঘরে লইয়া আইস।" নিমাই খট্টা হইতে নামিয়া অন্য আসনে বসিলেন, আর সেই খট্টা শ্রীবাসের ঘরে লইয়া যাওয়া হইল।

শ্রীবাসের ভ্রাতাগণ সেই গৃহের ভিতর চাঁদোয়া খাটাইলেন ও সেই খট্টার উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাতিলেন। আর ঘরে সূর্যতেজ যাহাতে না যাইতে পারে এই জন্য দ্বারে পর্দা দিলেন।

তখন শ্রীনিমাই দেবগৃহ হইতে শ্রীবাসের শয়নগৃহে গমন করিলেন। ভক্তগণ দেখিলেন, প্রভু শত কোটি সৌদামিনী বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। এমন কি, সেই তেজে জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্ন-সূর্যতেজও লঘু হইয়া গেল। যথা,—চৈতন্যচরিত মহাকাব্য, ৫ম সর্গে—

"গৌরাঙ্গস্তদথ গৃহং ব্রজন্ বিরেজে তেজোভির্লঘু তিরয়ন্ বিবস্বদোজঃ।
শম্পানাং শত শতকোটিকোটিবৎ স প্রোন্মীল্য ক্ষিতিমিব সংশ্রিতশ্চকান্তি।। ৫৭।।

প্রভু শ্রীবাসের শয়নঘরে খট্টায় বসিলে পরম তেজে গৃহ আলোকিত হইল। বোধ হইতে লাগিল, নিমাইয়ের অঙ্গ রক্তমাংসে গঠিত নয়, সুবর্ণ বর্ণের তেজে গঠিত। সে তেজ যদিও সূর্যের তেজ হইতে উজ্জ্বল, তবু উহা শীতল, আর উহা নয়নানন্দ। উহার পানে চাহিলে, চক্ষু না ঝলসিয়া বরং শীতল আনন্দ বারিতে ডুবিয়া যায়।

তখন গদাধর শ্রীনিমাইয়ের সর্বাঙ্গ ফুলে সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। ফুলের অঙ্গুরীয় গাঁথিয়া আঙ্গুলে, বালা তাড় ও বাজু গাঁথিয়া বাহুদ্বয়ে এবং মালা গাঁথিয়া গলদেশে দিলেন। আর মাথায় চূড়া বান্ধিয়া উহাতে ফুলের মালা বেড়িয়া দিলেন। তারপর সর্বাঙ্গে চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও কেশর লেপিয়া দিলেন। কেহ চামর ব্যজন, কেহ করযোড়ে স্তব, কেহ আনন্দে গড়াগড়ি, কেহ বা নিমাইয়ের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানকে প্রিয়-বস্তু বলিয়া ভজন করা, আর সর্বশক্তিসম্পন্ন বদান্য পুরুষ বলিয়াও অনুভব করা যাইতে পারে। গীতায় লিখিত আছে, শ্রীভগবানকে যিনি যেরূপ ভজন করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সেইরূপ ভজন করিয়া থাকেন। তুমি তাঁহাকে শক্তিসম্পন্ন দাতা বলিয়া ভজনা কর, তিনি শঙ্খ-চক্র প্রভৃতি হস্তে করিয়া বর দিতে আসিবেন; নিজ জন বলিয়া ভজন কর, তিনি সমস্ত বিভূতি ফেলিয়া তোমারই মত হইয়া আসিবেন; ঢাল কি তরবারি লইয়া কেহ স্ত্রী পুত্রের নিকট যায় না। আবার যে নিজ-জন, সেও স্বার্থের নিমিত্ত ভজন করে না।

মনে ভাবুন, চিরবিরহিনী সতী রমণীর নিকট তাঁহার অশরণ ও হারান স্বামী আসিয়াছেন। তখন কি তিনি তাঁহার স্বামীকে একথা বলেন, "হে নাথ। টাকা কই, বসন কই, ভূষণ কই?" তবে তিনি কি করেন—না, গ্রীষ্মকাল হইলে বায়ু ব্যজন করেন, এবং যত্ন করিয়া তাঁহাকে ভোজন করান ও শয়ন করাইয়া পদসেবা করেন। গদাধর প্রভৃতি শ্রীভগবানকে সেইরূপে সেবা করিতে লাগিলেন।

কেহ হয়ত বলিবেন, শ্রীভগবানকে এরূপ তুচ্ছ সেবা কেন? হস্তে তাম্বুল দেওয়া, গলায় মালা পরান, শ্রীভগবানের সঙ্গে এরূপ বালকের খেলা কেন? কিন্তু বিবেচনা করুন, তিনি যদিও ভগবান, কিন্তু যাহারা সেবা করে, তাহারা ত জীব? মনুষ্যের যাহা সাধ্য, মনুষ্য সেই সেবা করিতে পারে বই নয়। যদি শ্রীভগবান কোন পক্ষীকে দর্শন দেন, আর তাঁহাকে সেবা করিতে সেই পক্ষীর ইচ্ছা হয়, তবে সে ঠোঁটে করিয়া কীড়া আনিয়া তাঁহার শ্রীবদনে অর্পণ করিবে। মনুষ্যে তাম্বুল ও ফুলের মালা ব্যতীত আর কি দিবে? যদি বল শ্রীভগবানের সেবা কর কেন, তাঁহার অভাব কি? স্বামীর দাস দাসী থাকিলে কি পত্নী তাঁহার সেবা করেন না? প্রিয়া জনকে সেবা করায় মহা আনন্দ আছে, আর তাই শ্রীভগবান্ সর্বশক্তিসম্পন্ন হইলেও, ভক্তের সেবা লইয়া থাকেন, আর ভক্তগণও তাঁহাকে সেবা করিয়া থাকেন।

গদাধর প্রভৃতি সকলে এইরূপে শ্রীভগবান্‌কে সেবা করিতেছেন। তখন নিমাই বলিলেন, "আমি কে, তাহার পরিচয় পাইয়াছ? আমি সেই, যিনি তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন। আমি জীবের দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত আসিয়াছি। আমি এবার দণ্ড না করিয়া, শুধু প্রেম ও ভক্তি দান করিয়া, সকলের দুঃখ দূর করিব—তোমরা কোন ভয় করিও না। যবন-রাজা তোমাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।"

তখন শ্রীবাস যদিও জড়বৎ হইয়াছেন, তবুও কষ্টে সৃষ্টে বলিলেন, "তুমি আমার বাড়ীতে, আমার আবার ভয় কি? তুমি দয়াময় বলিয়া সাধু মুখে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার যে এত দয়া পূর্বে তাহা জানিতাম না।" শ্রীনিমাই বলিতেছেন, "যদি আমি যবন রাজার কাছে যাই, তবে তাহাকে দণ্ড করিব না, তাহার হৃদয় দ্রব্য করাইয়া তাহাকে শোধন করাইব—কিরূপে তাহা

দেখাইতেছি।" এই কথা বলিয়া শ্রীনিমাই, "নারায়ণী" বলিয়া ডাক দিলেন। নারায়ণী, শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা, বয়ঃক্রম মোটে চারি বৎসর। নারায়ণী ঘরে আসিল। সে আসিলে প্রভু তাহাকে বলিলেন, "নারায়ণী, আমার বরে তোমার কৃষ্ণপ্রেম হউক।" এই কথা বলিবামাত্র সেই চারি বৎসরের কন্যা "হা কৃষ্ণ" বলিয়া প্রেমে মৃত্তিকায় ঢলিয়া পড়িয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন শ্রীনিমাই ঈষৎ হাসিয়া বলিতেছেন, "আমি রাজার নিকট গমন করিলে তাহারও এই দশা হইবে। কিন্তু তাহার ও ভাগ্য হইতে এখনও অনেক দেরী আছে।"

যে অলৌকিক ব্যাপার হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে সেখানে যাঁহারা ছিলেন সকলেই একেবারে দিশাহারা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কে কোথায় কি করিতেছেন, ঠিক করিতে পারিতেছেন না। কখন স্বপ্ন ভাবিতেছেন, কখন সত্য ভাবিতেছেন। নিমাইয়েব এই দিনকার প্রকাশ অল্পক্ষণ ছিল। এ প্রকাশের উদ্দেশ্য কেবল শ্রীবাস প্রভৃতি কয়েকজন অতি মর্ম্মী-ভক্তকে অভয় প্রদান করা, আর কিছুই নহে। সে দিবস অধিক কথাও হয় নাই।

নিমাই যখন শ্রীবাসের সহিত কথা কহিতেছেন, গদাধর তখন মুহুর্মুহুঃ শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈত যে বলিয়াছিলেন, "নিমাই কেমন বালক অল্পদিনে জানিতে পারিবে"— সে কথা গদাধরের তখন মনে পড়িল। কিন্তু তিনি কোন কথা না বলিয়া নিমাইকে সেবা কবিতেছেন। এমন সময় শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী ও তাঁহার তিন ভ্রাতার তিন স্ত্রী, এই চারিজনে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সমস্ত ঘর আলো করিয়া নিমাই গৃহাভ্যন্তরে বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া আছেন। দ্বারে পর্দা, পিঁড়ায় ঐ চারিজন রমণী দাঁড়াইয়া, তাঁহার মধ্যে তিনজন নিতান্ত কুলবধূ, নিমাইয়ের সম্মুখে কখন আসিতেন না।

তাঁহারা স্ত্রীলোক বলিয়া ভয়ে ঘরের মধ্যে যাইতে পারিতেছেন না, অথচ ঘরের মধ্যে স্বয়ং শ্রীভগবান্ বসিয়া! তাঁহারা উপায়হীন হইয়া তখন শ্রীবাসের সর্বকনিষ্ঠ শ্রীকান্তকে 'অতি কাতর' হইয়া বলিতেছেন, "তুমি একবার আমাদের হইয়া ঠাকুরের কাছে নিবেদন কর। আমরা স্ত্রীলোক বলিয়া কি তাঁহার চরণ দর্শন পাব না?" শ্রীকান্ত ইহার কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় পিঁড়া হইতে কাতরধ্বনি লক্ষ্য করিয়া নিমাই বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া বলিতেছেন, "যাঁহারা আমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পিঁড়ায় দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে আসিতে পারেন,— আসিয়া দর্শন করুন।" এই আজ্ঞা পাইয়া সেই কুলবতীগণ ব্যগ্র হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হর্ষ, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি নানাবিধ ভাবে জড়ীভূত ও অভিভূত হইয়া তাঁহারা মস্তক উঠাইলেন এবং অর্দ্ধ অবগুণ্ঠন হইতে শ্রীনিমাইয়ের চন্দ্রবদন দর্শন করিতে লাগিলেন। একটু দর্শন করিয়া ভক্তিতে গদগদ হইলেন ও ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া শ্রীচরণপ্রান্তে পতিত হইলেন। তখন শ্রীনিমাই কৃপার্ত্ত হইয়া তাঁহাদের বেণী ও সুবর্ণালঙ্কারভূষিত মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া, এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক"। যথা চৈতন্যচরিত মহাকাব্য, ৫ম সর্গে—

> আবিশ্য প্রকটিত সৎ প্রকাশ রম্যং তং দৃষ্ট্বামুদমতুলামভূতপূর্বাং।
> সংপ্রাপুর্ভুবি চ নিপেতুরাত্ততোষা স্তৎপাদম্বুজমপি নির্ভরং প্রপন্নাঃ।। ৭২।।
> মচ্চিত্তা ভবতঃ সদেত্যভীক্ষ্ণ মুক্ত্বা সর্বাসাং শিরসি পদারবিন্দ যুগ্মং।
> কারুণ্যামৃত রসসেচনাতি সার্দ্রঃ শ্রীগৌরঃ পরমগুণাম্বুধির্ব্যধত্ত।। ৭৩।।

ইহার অর্থ এই—

অনন্তর তাঁহারা প্রবেশপূর্বক প্রকটিত সৎপ্রকাশ দ্বারা রম্যমূর্তি গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিয়া অতুল ও অদ্ভুতপূর্ব হর্ষ লাভ করিলেন এবং পরিতোষ প্রাপ্তি হেতু তদীয় চরণারবিন্দে প্রপন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন।। ৭২।।

অনন্তর "তোমরা সকলে মৎপরায়ণা হও" এই বলিয়া মহাগুণনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ ঐসকল

স্ত্রীগণের প্রতি কারুণামৃতরস সেচন করতঃ আর্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাদের মস্তকে পাদপদ্ম সমর্পণ করিলেন।।৭৩।।

নিমাইচাঁদ পরমসুন্দর নবীন-পুরুষ। তিনি কুলবতীগণকে বলিলেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক।" ইহা বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। কুলবতীগণও ইহা শুনিয়া কুণ্ঠিত হইলেন না, তাঁহাদের স্বামীগণও শুনিয়া ক্রোধ করিলেন না। কারণ, যাহার সহিতই যেরূপ সম্বন্ধ হউক না কেন, শ্রীভগবানের সহিত যত নিকট সম্বন্ধ, তত আর কাহারও সহিত নয়।।

একটু পরে শ্রীনিমাইচাঁদ বিষ্ণুখট্টা হইতে "আমি এখন যাই, উপযুক্ত সময়ে আবার আসিব" বলিয়া উঠিলেন ও হুঙ্কার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন হাহাকার করিয়া সকলে তাঁহাকে ধরিলেন। তাঁহারা দেখেন যে, জীবনের চিহ্নমাত্র নাই। অনেক চেষ্টায় নিমাই চেতন পাইলেন। তখন তিনি ঠিক নিমাইপণ্ডিত, অঙ্গ মনুষ্যের মত, সে তেজ আর নাই। সম্পূর্ণ চেতন পাইয়া নিমাই শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত! আমি এখানে কিরূপে আসিলাম? আমি কি নিদ্রা গিয়াছিলাম? আমি যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম? পণ্ডিত কৃপা করিয়া বল, আমি ত কোন চাঞ্চল্য করি নাই?" শ্রীবাস, শ্রীরাম ও গদাধর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন; আর সকলে বলিলেন, "না, কিছু চাঞ্চল্য কর নাই।" নিমাই তখন ধীরে ধীরে গৃহে গমন করিলেন।

পূর্বে উপবীত সময়ে একবার নিমাই তাঁহার জননীকে বলিয়াছিলেন, "আমি এখন যাই, পরে আসিব।" আজ আবার শ্রীবাসকে বলিলেন, "আমি এখন যাই, পরে আবার আসিব।" এই যে, "আমি যাই" বলিলেন ইনি কে? একথা পরে বিচার করা যাইবে!

শ্রীবাসের বাড়ী আনন্দময় হইল। পরদিন প্রাতে নিমাইকে আবার সকলে দেখিলেন, কিন্তু তখন নিমাই একজন মনুষ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়,—তবে অতি মিষ্ট ও পরমভক্ত। যে নিমাই পূর্বদিন যুবতী স্ত্রীলোকের মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক" পরদিন তিনি দন্তে তৃণ করিয়া "হে কৃষ্ণ করুণাময়, আমাকে বিষয়-বাসনা হইতে উদ্ধার কর" বলিয়া রোদন করিতেছেন। কিন্তু নিমাইয়ের এ ভাব দেখিয়া শ্রীবাস ও তাঁহার সঙ্গিগণ কেহ ভুলিলেন না; তাঁহারা শ্রীভগবান্ আসিয়াছেন জানিয়া সমস্ত জগৎ সুখময় দেখিতে লাগিলেন।

মুরারির কথা পূর্বে বলিয়াছি। নিমাই চিরকাল ইহার সহিত নানামত বিতণ্ডা করিয়া আসিয়াছেন। মুরারি নিতান্ত স্নিগ্ধ, জীবের হিতকারী, সর্বজনপ্রিয় ও পরম পণ্ডিত। তিনি এখন নিমাইয়ের নিতান্ত অনুগত হইয়াছেন। মুরারি হইতেই আমরা নিমাইয়ের আদিলীলা জানিতে পারিয়াছি। নিম্নে যে কথাগুলি বলিতেছি ইহা সমুদয় মুরারির নিজের কথা, তিনি নিজে যাহা স্বচক্ষে দেখিয়া বলিয়াছেন তাহাই লিখিতেছি।

মুরারিও শুনিয়াছেন মুসলমান সৈন্য আসিতেছে। সুতরাং শ্রীভগবান মুরারিকে আশ্বাস দেওয়া কর্তব্য ভাবিলেন। নিমাইয়ের দেহ তখন কাঁচের স্বরূপ হইয়াছে। কাঁচ পাত্রে যে দ্রব্য রাখ, উহা সেই দ্রব্যের বর্ণ ধারণ করে। সেইরূপ নিমাইয়ের দেহ মুহুর্মুহুঃ নানা আকার ধারণ করিতেছে। ঐ গৌরবর্ণ দেহ শ্রীভগবানের। যে দেহে শ্রীভগবান বিরাজ করেন, তাহাতে ত্রিলোকের সকলেই প্রকাশ হইতে পারেন। পূর্ণের দেহে অংশের প্রকাশ পাইতে কোন বাধা হইতে পারে না। যখন ব্রহ্মার স্তব শুনিলেন, তখন নিমাইয়ের ব্রহ্মার ভাব হইল এবং ব্রহ্মা হইয়া তিনি ভূতলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। শিবের কথা শুনিয়া তাঁহার শিবের ভাব হইল, মুখ-বাদ্য প্রভৃতি শিবের যত ভাব সমস্তই তাঁহার দেহে প্রকাশ পাইতে লাগিল। একদিবস শ্রীবাসের বাটিতে বরাহ অবতারের একটি শ্লোক শুনিয়া নিমাই হুঙ্কার করিয়া দ্রুতবেগে মুরারির বাড়ীতে গমন করিলেন। মুরারি বাড়ীতে ছিলেন, কিন্তু নিমাই তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া দেবগৃহে প্রবেশ করিলেন। মুরারি পশ্চাতে চলিলেন ও দেবগৃহের দ্বার হইতে নিমাইয়ের কাণ্ড

দেখিতে লাগিলেন। শ্রীনিমাই ঘর হইতে বলিতে লাগিলেন, "একি! এ যে প্রকাণ্ড পর্বতাকার শূকর; ইনি যে বড় বলবান দেখিতেছি; ইনি যে দন্তাগ্রে পৃথিবী ধরিয়াছেন; ইনি যে বিশাল দন্তদ্বারা আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়া ব্যথা দিতেছেন।" ইহাই বলিয়া নিমাই যেন সেই প্রকাণ্ড বরাহের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত পশ্চাতে হাঁটিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই একপদ পশ্চাতে যাইতেই ববাহ যে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, আর তখন নিমাই অচেতন হইয়া ভূমিতে হস্ত ও পদে বরাহের ন্যায় হাঁটিতে লাগিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে সম্মুখে একটি বৃহৎ পিতলের জলপাত্র ছিল তাহা দন্তের দ্বারা ধরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

মুরারি নিমাইকে দেখিতেছেন, যেন কতক বরাহ-আকার, কতক মনুষ্য আকার। তিনি জড়বৎ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। সেই বরাহ আকার তখন ভীষণ হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। তাহার পর সেই নর-বরাহ মুরারিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "আমি জীবকে ভক্তি ও ধর্ম শিখাইতে আসিয়াছি। তুমি ভয় করিও না। তুমি আমার স্বাভাবিক রূপ বর্ণনা কর।"

মুরারি কথা কহিতে পারিলেন না, তখনি পূর্বকার কথা মনে পড়িল। সেই পঞ্চমবর্ষের নিমাই তাঁহাকে কি উপদেশ দিয়াছিলেন এবং সেই অবধি এপর্যন্ত তাঁহার সমুদয় লীলা একেবারে তাঁহার মনে উদিত হইল। তখন তিনি বুঝিলেন যে, যিনি তাঁহার সম্মুখে তিনি আর নিমাই নাই, তিনি শ্রীভগবান্। কিন্তু মুরারি তাঁহার ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখিয়া ও বিশাল হুঙ্কার শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, কোন কথাও কহিতে পারিলেন না! কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, গলায় বসন দিয়া কেবল বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলেন।

মুরারির অবস্থা দেখিয়া, তাঁহাকে সচেতন ও নিশ্চিন্ত করিবার নিমিত্ত নর বরাহ বলিতেছেন "মুরারি, তুমি নিশ্চিন্ত হও, তুমি আমার অতি প্রিয়। তুমি বড় বেদ মান। কিন্তু বেদ অন্ধ, বেদ আমার তত্ত্ব কি জানে?" আবার একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, "কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী বেদের আচার্য। সে বেদ পড়াইয়া কুশিক্ষা দ্বারা আমার অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিতেছে। মুরারি! তুমি সে সমুদয় চর্চা পরিত্যাগ কর।"

মুরারির তখন কথা ফুটিল। তিনি বলিলেন, "প্রভু, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড তোমার লোমকূপে। তোমাকে বেদে কিরূপে জানিবে? তুমিই কেবল জান, তুমি কি পদার্থ। আমরা কি জানি? আমরা যাহা জানি তাহা এই করিতেছি।" ইহা বলিয়া মুরারি তাঁহার চরণে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তখন নর-বরাহ বলিতেছেন, "আমি যাই"। ইহাই বলিয়া নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুরারি অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে চেতন করাইলেন। তখন নিমাই নিদ্রোত্থিতের ন্যায় বলিতেছেন, "মুরারি, আমি বুঝি অচেতন হইয়াছিলাম? নতুবা এখানে কিরূপে আসিলাম? আমি শ্রীবাসের বাড়ীতে অবতারের স্তব শুনিতেছিলাম। আমি ত কিছু চাপল্য করি নাই?" মুরারি কোন উত্তর না দিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

এইরূপে নিমাইয়ের নিজ-জন তাঁহাকে নানারূপে দেখিতে লাগিলেন। কেহ চতুর্ভুজ, কেহ কৃষ্ণের ন্যায়, কেহ বা মহাদেবের ন্যায় দেখিয়া ভক্তগণ কেবল যে মুসলমান ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন তাহা নয়, আনন্দে দিবারাত্রির ভেদ ভুলিয়া গেলেন। ঘর-পরিবার ফেলিয়া সকলে দিবানিশি নিমাইয়ের নিকটেই রহিলেন। তাঁহারা বিনা কারণে হাস্য করেন, বিনা কারণে রোদন করেন, বিনা কারণে নৃত্য করেন। এইরূপে আনন্দে সকলে পাগলের মত হইলেন। একথা আর গোপন রহিল না; ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনবদ্বীপে শচীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

নিমাইয়ের দুই ভাব হইত, ভক্ত-ভাব ও ভগবান-ভাব। গয়া হইতে যখন আসিলেন তখন ভক্ত-ভাব হইয়াছিল। শ্রীবাসের বাড়ীর ঘটনা হইতে শ্রীভগবান-ভাব হইতে লাগিল। সেই অবধি অনেক সময়, শ্রীভগবান-ভাবে থাকিতেন। পূর্বে রজনীতে কীর্তন হইত, এখন দিবসেও কীর্তন

হইতে লাগিল। দিবানিশি নিমাই ও তাঁহার ভক্তগণ প্রেমে মজিয়া রহিলেন। নিমাইয়ের যখন চেতনাবস্থা, অর্থাৎ ভক্ত-ভাব, তখন তাঁহাকে কেহ ভগবান্ বলিতে সাহস পাইতেন না। এমন কি, নিমাই ভগবানাবস্থায় যাহা করিতেন কি বলিতেন, ভক্তগণ তাহা তাঁহাকে কিছু বলিতেও সাহস পাইতেন না। চেতনাবস্থায় নিমাই দাস্যভাবে আপনাকে দীনের দীন ও পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম ভাবিয়া প্রত্যেকের কাছে অতি করুণ স্বরে কান্দিয়া কান্দিয়া কৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা মাগিতেন, আর বলিতেন, "তোরা কৃষ্ণের দাস, আমার কিসে শ্রীকৃষ্ণে মতি হয় বলিয়া দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।" তবে নিমাই তখন তাঁহার সঙ্গী-ভক্তগণের আর পায়ে ধরিতেন না। তিনি পায়ে ধরিলে তাঁহার ভক্তগণ বড় ব্যথা পান দেখিয়া তিনি শুধু করজোড়ে তাঁহাদের নিকট নিবেদন করিতেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

"নানা বর্ণে বস্ত্রে পাগ রুদ্রাক্ষ তুলসী গলে
নাকে নথ কর্ণেতে কুণ্ডল
হাসিয়া চলেছে পথে পায়েতে নূপুর বাজে
কেগো তুমি যেন মাতোয়াল?"
"আমারে চেন না ভাই বাড়ী এবে নদীয়ায়
সদা নাচি তাহে নূপুর পায়।
শুনেছ নদে অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ নাম যার
আমি নিতাই তার বড় ভাই।।"

—শ্রীবলরাম দাস।

এই জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিলেন। বর্ধমান একচাকা গ্রামে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ অতি অল্প বয়সেই গৃহত্যাগ করেন। একজন সন্ন্যাসী তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হয়েন। শ্রীনিত্যানন্দকে তাঁহার পিতামাতার নিকট ভিক্ষা করিয়া লইয়া যান। পুত্রকে ভিক্ষা চাহিলে পিতামাতা যে তাহাকে দান করিতে পারেন, এ কালের জীবের নিকট ইহা অননুভবনীয়। একটি প্রবাদ আছে, যে সন্ন্যাসী তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া লইয়া যান, তিনি আর কেহ নহেন,—শ্রীবিশ্বরূপ, শ্রীনিমাইয়ের দাদা। কিন্তু এ প্রবাদের কোন প্রামাণিক মূল পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দ এইরূপে বিংশতি বৎসর বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। সেখানে শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখনকার বৃন্দাবন জঙ্গলময়, আর সেই জঙ্গলময় স্থানে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। শ্রীঈশ্বরপুরী তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি নিতাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি কাহাকে খুঁজিতেছ? শ্রীকৃষ্ণ এখানে নাই, তিনি শ্রীনবদ্বীপে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখন তাঁহার নাম নিমাইপণ্ডিত। তুমি যদি তাঁহাকে চাও ত সেখানে যাও।" নিতাই এ কথা শুনিয়া তীরের মত নবদ্বীপমুখো ছুটিলেন। নবদ্বীপে যাইয়া নিমাইপণ্ডিতের বাড়ী খুঁজিতে খুঁজিতে চলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম কুবের। তাঁহার আনন্দ নিত্য বলিয়া গুরুর নিকট নিত্যানন্দ নাম প্রাপ্ত হয়েন। এই অবতারে তিনি বলরাম। পথে আসিতে আসিতে সেই বলরামভাবে বিভোর হইয়া নিতাই ভাবিতেছেন যে, তাঁহার অতি স্নেহের কনিষ্ঠ সেই শ্রীকৃষ্ণকে বহুকাল দেখেন নাই, তবে অতি শীঘ্র দেখিবেন। ইহা ভাবিতেছেন, আর আনন্দের তরঙ্গ উঠিতেছে এবং পথে নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছেন। কখন বা জোরে লম্ফ দিতেছেন, কখন বা আনন্দে মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতেছেন। পথের লোক ভাবিতেছে, এটী পাগল সন্ন্যাসী। কিন্তু নিত্যানন্দের লোকাপেক্ষা কোন কালে নাই, আর তখন ত না থাকিবারই কথা। নিতাই নবদ্বীপে আসিয়া নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী খুঁজিতেছেন। যথা চৈতন্যমঙ্গল গীতে—

"নিমাই পণ্ডিতের কোন্ বাড়ী তোরা বল। ধূয়া
ক্ষণে যুগ পদ করি (নিতাই) লাফে লাফে যায়।
এক কয় আর বলে, (কথা) বুঝা নাহি যায়।
উর্ধ্ব-বাহু হয়ে নিতাই প্রেম-ভরে ধায়।"

যে কারণেই হউক, নিতাই, নিমাইয়ের বাড়ীতে না যাইয়া শ্রীনন্দন আচার্যের বাড়ী যাইয়া অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। নন্দন আচার্য্য একটী অতি তেজস্কর সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ আসিলেন ।এদিকে নবদ্বীপের কথা শ্রবণ করুন। নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আসিবার তিন চারিদিন পূর্বে নিমাই ভক্তগণকে বলিয়াছেন যে, এক মহাপুরুষ নদীয়ায় আসিতেছেন। যে দিন নিত্যানন্দ নবদ্বীপে উপনীত হইলেন, সেই দিন প্রাতে নিমাই পার্ষদগণকে বলিতেছেন, "আমি গত রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি, এই নগরে সেই মহাপুরুষ আসিয়াছেন। তাঁহাকে তোমরা তল্লাস করিয়া লইয়া আইস। তাঁহাকে শ্রীবলরাম বলিয়া বোধ হয়।" ইহাই বলিবামাত্র নিমাইয়ের বলরাম আবেশ হইল। তখন তিনি হুঙ্কার করিয়া "মদ আনো", "মদ আনো" বলিয়া আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, আর বলরামের মত কথা কহিতে লাগিলেন। "মদ আনো" এ আজ্ঞা কিরূপে পালন করিবেন, ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া ভক্তগণ ব্যস্ত হইলেন। শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু মদ ত তোমার কাছে আছে, তুমি যে মদ চাহিতেছ, তাহা আমরা কোথায় পাইব?" এই কথা বলিতে বলিতে নিমাইয়ের আবার স্বাভাবিক অবস্থা হইল। তখন তিনি বলিতেছেন, "তোমরা যাও, তাঁহাকে তল্লাস করিয়া লইয়া আইস। আমি তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছি।" এই কথা শুনিয়া মুরারি, শ্রীবাস, মুকুন্দ ও নারায়ণ, চারিজন তাঁহাকে তল্লাস করিতে চারিদিকে ছুটিলেন। অপরাহ্নে সকলে আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা সমস্ত নগর তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করিয়া কোন মহাপুরুষকে খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন নিমাই বলিলেন, "চল সকলে যাই, তাঁহাকে তল্লাস করিয়া লইয়া আসি।" একথা শুনিয়া সকলে চলিলেন। মধ্যস্থানে নিমাই, চতুষ্পাশে ভক্তগণ। নিমাই একেবারে শ্রীনন্দন আচার্যের বাটী যাইয়া উঠিলেন। সকলে দেখেন যে, বাহির বাটীতে একটি সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। তাঁহার শরীর প্রকাণ্ড, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পদ্ম চক্ষু, বয়ঃক্রম ৩০ কি ৩২, মস্তকে নীল বস্ত্র, পরিধানেও নীল বস্ত্র। তিনি বসিয়া আপনা-আপনি হাস্য করিতেছেন। ইনিই নিত্যানন্দ।

বিশ্বম্ভর অর্থাৎ নিমাই ভক্তগণসহ প্রণাম করিয়া তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইলেন। বিশ্বম্ভরকে তখন কিরূপ দেখাইতেছে, চৈতন্যভাগবত তাহা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"বিশ্বম্ভর মূর্তি যেন মদন সমান।
দিব্য গন্ধ-মাল্য বাস পরিধান।।
কি হয় কনক-দ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চাঁদের সাধ লাগে।।
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ন।
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান।।
সে আজানু দুই ভুজ হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে যজ্ঞসূত্র অতি সূক্ষ্ম ক্ষীণ।।

নিমাইয়ের অতি সুন্দর নাগর বেশ। নিত্যানন্দ নিমাইয়ের বদন নিরীক্ষণ করিবামাত্র পলক হারাইলেন, যেন, চক্ষু, দিয়া নিমাইয়ের রূপসুধা পান করিতেছেন; আনন্দে জড়বৎ স্তব্ধ হইলেন। ক্রমে নিতাইয়ের চক্ষু দিয়া আনন্দ বারি পড়িতে লাগিল। তাঁহার মনের ভাব—যেন উঠিয়া নিমাইকে হৃদয়ে পুরিয়া ফেলেন কিন্তু অবশ হওয়ায় উঠিতে পারিতেছেন না।

নিমাইয়ের নাগর বেশ, ভক্তি উদ্রেকের বেশ নয়, পরিধান ডোর-কৌপীন নহে, হস্তে দণ্ডকমণ্ডুল নাই; আর নিতাই স্বয়ং সন্ন্যাসী। তবে নিমাইকে দেখিয়া তাঁহার এরূপ ভাব হইল কেন? তাঁহার কারণ, নিমাইকে দেখিয়া নিতাইয়ের ভক্তির উদয় হইল না, প্রেমের উদয় হইল। ভক্তি ও প্রেম এক বস্তু নয়, ভক্তি ছোট ও প্রেম বড়। বৈষ্ণব ধর্মে ও অন্যান্য ধর্মে, এই একটি অতি বড় প্রভেদ। বৈষ্ণবগণের ঠাকুরের হস্তে অস্ত্র নাই, মোহন-মুরলী আছে—ভয়ের কিছুই নাই, সমুদয় সুন্দর। সে ঠাকুরের স্থান, পত্র-পুষ্প-ময়ূর-কোকিল পরিশোভিত বৃন্দাবনের যমুনা পুলিনে, আর সে ঠাকুরকে পূর্ণিমার রজনীতে নাচিয়া গাইয়া ভজন করিতে এবং কেবল ভালবাসিয়া বাধ্য করিতে হয়।

চুপ করিয়া এইরূপে খানিক চাওয়া-চাওয়ির পর, নিতাইয়ের হৃদয় দ্বার উদ্‌ঘাটিত করাইবার নিমিত্ত, নিমাই শ্রীবাসকে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিয়া একটি শ্লোক পড়িতে বলিলেন। শ্রীবাস সেই শ্লোকটি পড়িলেন, যেটি রত্নগর্ভ শ্রীনিমাইকে শুনান, আর তিনি শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

যেমন পরিপূর্ণ জলাশয়ের বাঁধে অল্প একটু নালা কাটিয়া দিলে ক্রমে অতি বেগে জল বাহির হইতে থাকে, আর সমুদয় বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়; এই শ্লোক শুনিয়া নিতাইয়ের সেইরূপ হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গেল। নিতাইয়ের প্রেমের তরঙ্গ ও বেগ দেখিয়া ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন। ভক্তগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন ক্রমে নিতাইকে স্থির করিতে পারিলেন না। তখন নিমাই তাঁহাকে যেমন স্পর্শ করিলেন, অমনি নিতাই স্পন্দহীন হইলেন, আর নিমাই তাঁহাকে কোলে করিয়া বসিলেন।

নিমাইয়ের কোলে নিতাই স্পন্দহীন হইয়া বসিয়া, উভয়ে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। একটু পরে উভয়ে শান্ত হইয়া বসিলেন। তখন নিমাই বলিতেছেন, "আমি এতদিনে বুঝিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে উদ্ধার করিবেন, নতুবা তোমার ন্যায় ভক্ত আমাকে কেন মিলাইয়া দিলেন। আজি আমার শুভদিন যে, তোমার শ্রীচরণ দর্শন করিলাম। তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, তুমি-ইচ্ছামাত্র চতুর্দশ ভুবন পবিত্র করিতে পার। তোমার আশ্রয় অমূল্য। যে তোমার আশ্রয় লয়, তাহার আর কোন কালে বিপদ নাই। আমি যে তোমার কৃপাপ্রার্থী, আমাকে কৃপা করিতে তুমি যে দয়াময়, তাহার পরিচয় দাও।"

স্তুতি শুনিলেই ভক্তগণ লজ্জিত হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ নিমাইয়ের মুখে এইরূপ স্তুতি শুনিয়া নিতাই লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিলেন। পরে ধীরে ধীরে অতি নম্র হইয়া বলিতেছেন, "আমি সমুদয় কৃষ্ণের স্থান দর্শন করিয়াছি, দেখিলাম সিংহাসন শূন্য আছে, কৃষ্ণ নাই। তখন ভাল লোকের মুখে শুনিলাম শ্রীকৃষ্ণ এখন শ্রীনবদ্বীপে আছেন। তাই শুনিয়া বড় আশা করিয়া আসিয়াছি। আর শুনিলাম যে, নবদ্বীপে বড় হরিসংকীর্তনের ঘটা হইতেছে। কেহ বা ইহাও বলেন যে, স্বয়ং শ্রীভগবান্ সেই সংকীর্তনে মিশিয়া ভুবনমোহন নৃত্য করিয়া থাকেন। আরও শুনিলাম যে, নবদ্বীপের মত এমন পাতকী উদ্ধারের স্থান আর নাই। আমি তাহাতে আশাতুর হইয়া এখানে আসিয়াছি, এখন আমার অদৃষ্টের পরীক্ষা করিব।

তাহার পরে "ঠারে ঠোরে" দুইজনে কিছু কথা হইল, তাহা চৈতন্যমঙ্গল গীতে এইরূপ বর্ণিত আছে। শ্রীনিমাইচাঁদ দাঁড়াইয়া, নিমাই ও নিতায়ের চারি চক্ষে মিলন হইয়াছে। বহুদিন পরে চির-সুহৃদের মিলন হইলে যেমন হয়, উভয়েরই এই দর্শনে সেইরূপ হইল। উভয়েই উভয়ের মুখপানে চাহিয়া ঝুরিতে লাগিলেন।

চারি চক্ষে মিলন হইলে নিতাই পলক হারাইয়া নিমাইয়ের মুখ ঠাহুরিয়া দেখিতেছেন। ভক্তগণ উভয়ের এই অপরূপ ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। মনে হইল, যেন তাঁহারা গোপনে আলাপ করিবেন, কিন্তু সকলে উপস্থিত থাকায় পারিতেছেন না। ইহাতে সকলে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু সমুদয় কথা শুনিতে লাগিলেন। নিতাই দেখেন যে, নিমাইয়ের অঙ্গের বর্ণ তাঁহার কানাইয়ের মত কাল নহে, তাঁহার মাথায় চূড়া নাই, বদনে মুরলী নাই তবে নয়ন দু'টি কেবল সেইরূপ। ইহাতে বলিতেছেন, (নিতাই একটু তোতলা)—

কা-কা-কানায়ে না কি তুই রে! ধ্রু
কই তোর চূড়া বাঁশরী?
ইহাতে নিমাই উত্তর করিতেছেন—
কি পুছসি ভাই আমার। ধ্রু।
ব্রজের খেলা দৌড়াদৌড়ি।
এবারে, নদের খেলা (ধূলায়) গড়াগড়ি।।
ব্রজের খেলা বাঁশীর তান।
নদের খেলা হরি গান।।
ব্রজের বেশ ধড়া চূড়া।
নদের বেশ কৌপীন পরা।

এইরূপ ঠারে ঠোরে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া উভয়ে ভাব সম্বরণ করিলেন। তখন নিমাই বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আমাদের বড় ভাগ্য যে নবদ্বীপের প্রতি আপনার করুণা হইয়াছে। এখন গাত্রোত্থান করুন।" নিতাই এই অবধি নিমাইয়ের পশ্চাৎ চলিলেন। প্রকৃত কথা, তখন নিতাইয়ের তাঁহার দেহ ব্যতীত আর কিছু বহিল না। তিনি তখন নিমাইকে আপনার মন প্রাণ একেবারে দিয়াছেন।

নিমাই নিত্যানন্দকে বলিতেছেন, "শ্রীপাদ। কল্য পূর্ণিমা, ব্যাসপূজার দিন; আপনার ব্যাসপূজা কোথা হইবে?" নিত্যানন্দ নিমাইয়ের এই ইঙ্গিত পাইয়া শ্রীবাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "আমার ব্যাসপূজা এই বাম্‌নার ঘরে হইবে।" ইহাতে নিমাই শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! ব্যাসপূজা তোমার বাড়ীতে হইলে তোমার ঘাড়ে বড় বোঝা পড়িবে।" তাহাতে শ্রীবাস বলিতেছেন, "তোমার কৃপায় আমার তাহাতে কষ্ট হইবে না, ঘরে ঘৃত দুগ্ধ প্রভৃতি সমুদয়ই আছে, তবে পূজার পদ্ধতি-পুস্তক নাই, তাহা মাগিয়া আনিব।"এইরূপ কথা বলিতে বলিতে সকলে শ্রীবাসের বাড়ীতে গমন করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিবামাত্র দ্বারে কপাট পড়িল, আর সকলে আনন্দে নিমগ্ন হইলেন। সংকীর্তন আরম্ভ হইল, আর নিতাই ও নিমাই কর ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গের বলরাম-ভাব হইল, এবং তিনি নৃত্য ছাড়িয়া বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন। বসিয়া, "মদ আনো", "মদ আনো" বলিয়া আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। কিরূপে নিমাইয়ের এই আজ্ঞা পালন করিবেন ইহা লইয়া সকলে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিলেন। পরে শ্রীবাস একটি উপায় স্থির করিয়া এক পাত্র গঙ্গাজল নিমাইয়ের হস্তে দিলেন। নিমাই তাহাই মদ্য বলিয়া পান করিলেন। তদ্দণ্ডে নিমাইয়ের আবার শ্রীভগবানের আবেশ হইল, তখম বলিতেছেন, "অদ্য আমার আনন্দ পরিপূর্ণ হইল, অদ্য আমার নিত্যানন্দ আসিয়াছেন, কিন্তু নাড়া কোথায়? নাড়া আমাকে কেন ফেলিয়া গেল? নাড়া হুঙ্কার করিয়া আমাকে আনিল, এখন যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল, এ ত নাড়ার উচিত নয়।" সকলে আপনা-আপনি নাড়া ব্যক্তিকে বিচার করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস শেষে সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "—প্রভু! আপনি 'নাড়া' কাহাকে বলিতেছেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না।" তাহাতে নিমাই বলিলেন, "আমার অদ্বৈতকে আমি 'নাড়া' বলিয়া থাকি। তাহার নিমিত্তই আমার এ অবতার। আমি এবার ব্রহ্মার দুর্লভ যে শ্রীভগবদ্ভক্তি, তাহা অতি ক্ষুদ্র অধম জীবকেও বিলাইব।" একটু পরে শ্রীগৌরাঙ্গ বাহ্যজ্ঞান পাইয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! আমি কি প্রলাপ বকিতেছিলাম?" শ্রীবাস বলিলেন, "কই কিছুই না, তুমি ত যেমন তেমনই আছ।" তখন নিমাই আস্তে আস্তে বলিতেছেন, "আমি অবোধ বালক, যদি কিছু অপরাধ করিয়া থাকি, তোমরা কৃপা করিয়া আমার অপরাধ লইও না।"

নিতাই প্রথমে নিমাইয়ের দর্শনে প্রায় সমুদয় জ্ঞান হারাইয়াছিলেন। যাহা একটু ছিল, তাহাও

সংকীর্তন ও প্রভুর শ্রীভগবান্-আবেশ দর্শনে গেল। নিশিযোগে কি মনে ভাবিয়া তিনি আপনার দণ্ডকমণ্ডুলু ভাঙিয়া ফেলিলেন।

দ্বাদশ বর্ষ বয়সে নিতাই ঘর ছাড়িয়া, বিংশতি বৎসর দণ্ডকমণ্ডুলু লইয়া কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে বহু দিন তল্লাস করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। কমণ্ডুলু ও দণ্ড শুষ্ক সন্ন্যাস-ধর্মের চিহ্নমাত্র। এখন নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার অভিলষিত বস্তু লাভ করিলেন। এখন আর দণ্ডকমণ্ডুলুর প্রয়োজন কি? কাজেই সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিলেন।

প্রাতে শ্রীবাস দেখেন, নিতাইয়ের কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান নাই। তখন ব্যস্ত ভাবে শ্রীনিমাইকে এই কথা জানাইলেন। প্রভু এই দণ্ডকমণ্ডুলু ভাঙার কথা শুনিয়া দ্রুত আসিলেন; আসিয়া দেখেন, নিত্যানন্দ আপনা-আপনি কথা বলিতেছেন, আর হাসিতেছেন। বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। নিমাই আসিলে নিতাই তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। তখন নিতাইকে লইয়া সকলে গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন, আর নিমাই নিজ হস্তে নিতাইয়ের দণ্ডকমণ্ডুলু জলে ভাসাইয়া দিলেন।

স্নানের পর শ্রীবাসের বাড়ীতে ব্যাসপূজা আরম্ভ হইল। শ্রীবাস স্বয়ং পূজা করিতেছেন, আর ভক্তগণ মধুর নৃত্য করিতেছেন ও গীত গাহিতেছেন। পূজা সমাপ্ত হইলে, ফুলের মালা লইয়া নিত্যানন্দের হাতে দিয়া শ্রীবাস বলিলেন, "এই মালা ধর, ও মন্ত্র পড়িয়া ব্যাসদেবকে ইহা অর্পণ কর।" কিন্তু নিতাই মালা গ্রহণ করিলেন না। তখন শ্রীবাস বলিতেছেন, "শাস্ত্রের বিধান—স্বহস্তে মালা দিতে হয়, তাহা হইলে ব্যাস তুষ্ট হয়েন ও শ্রীকৃষ্ণ প্রেমধন দেন। আমি দিলে হইবে না। অতএব মালা ধরুন।" নিতাই অবশেষে মালা ধরিলেন। তখন শ্রীবাস বলিতেছেন, "বলুন, নমো ব্যাসায়।" নিতাই বলিলেন, "হুঁ"। শ্রীবাস বলিতেছেন, "হুঁ কি?—বলুন, নমো ব্যাসায়।" তবু নিতাই বলিলেন, "হুঁ", আর মালা হাতে করিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন।

তাহার কারণ, শ্রীগৌরাঙ্গ তখন আঙ্গিনার অন্যদিকে নৃত্য করিতেছেন। নিমাইকে নিতাই দেখিতে পাইতেছেন না, তাই নিমাইকে হারাইয়া চারিদিকে চাহিতেছেন। শ্রীবাস বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! এদিকে ওদিকে চাহিতেছেন কেন? মনোযোগ দিউন, মন্ত্র পড়ুন।" তবু নিতাই এদিকে ওদিকে চাহিতেছেন, এবং চাহিতে চাহিতে আবার বলিলেন, "হুঁ"। বড় পীড়াপীড়ি করিলে নিতাই বিড়বিড় করিয়া কি বলিলেন, তাহা নিতাই জানেন; আর কেহ বুঝিতে পারিলেন না। তখন শ্রীবাস নিরুপায় হইয়া উচ্চৈস্বরে শ্রীনিমাইকে বলিতে লাগিলেন। "প্রভু! একবার এদিকে আসিতে আজ্ঞা হয়!" তখন ভক্তগণ নিমাইকে প্রভু বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। "প্রভু! একবার এদিকে আসিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীপাদ ব্যাসপূজা করিতেছেন না, শুনিতেছেন না, আর কি বলিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।" নিমাই এই কথা শুনিয়া দৌড়িয়া আসিলেন, আসিয়া নিতাইকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! ব্যাসপূজা করুন।" তখন ব্যাসপূজা হইতেছে, কি, কি, হইতেছে, তাহা নিতাইয়ের জ্ঞান নাই! সম্মুখে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের লইয়া নিতাইয়ের কি হইবে? নিতাই কেবল নিমাইকে ভাবিতেছেন, মনে আর কোন ভাব নাই। নিতাই দেখিলেন, যাঁহাকে ক্ষণকালের জন্য চক্ষে হারাইয়া সমস্ত আঙ্গিনায় চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া খুঁজিতেছিলেন, সেই নিমাই সম্মুখে। তখন নিতাইয়ের আর আনন্দের সীমা রহিল না, হাতে যে ব্যাসপূজার নিমিত্ত মালা ছিল তাড়াতাড়ি তাহা নিমাইয়ের গলে দিলেন। তদ্দণ্ডে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। নিমাই তদ্দণ্ডে ষড়ভুজ হইলেন। নিমাইয়ের এই ষড়ভুজমূর্তি শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম পরে দর্শন করিয়াছিলেন; এবং দর্শন করিয়া সেই মূর্তি তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সেই মূর্তি অদ্যাপিও সেখানে আছেন।

নিতাই নিমাইয়ের পানে চাহিয়াছিলেন, ষড়ভুজ দেখিয়া পুলক হারাইলেন, কাঁপিতে লাগিলেন ও পরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন নিমাই তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন, বসিয়া তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলাইতে লাগিলেন। শ্রীহস্তের স্পর্শে নিতাই একটু চেতনা পাইলেন কিন্তু তবু পড়িয়া রহিলেন।

নিমাই নিতাইয়ের অঙ্গে হস্ত বুলাইতে বুলাতেই বলিতে লাগিলেন, "শ্রীনিত্যানন্দ উঠ, সংকীর্তন কর, জীবকে প্রেমদান কবিয়া উদ্ধার কর। তুমি যাহাকে ইচ্ছা প্রেম বিলাও। তোমার ত সমুদয় বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আর কি চাও?" পাঠক! নিতাইয়ের সমুদয় বাসনা কি বুঝিয়া লউন। তাঁহার "সমুদয় বাসনা" এই যে, জীবগণ উদ্ধার হউক। পরে কীর্তন করিয়া ও মহানন্দে প্রসাদ পাইয়া সে'দিনের লীলা শেষ হইল।

পরদিন নিমাই নিতাইকে নিজ বাড়ী লইয়া গেলেন; এবং মা মা বলিয়া ডাকিলেন, শচী আসিলেন। তখন নিমাই বলিতেছেন, "মা তোমার আর একটি পুত্র, আমার বড় ভাইকে আনিয়াছি। ইনি তোমার বিশ্বরূপ জানিবা।" শচী নিতাইয়ের মুখপানে চাহিলেন, দেখিলেন ঠিক যেন বিশ্বরূপ! প্রকৃতপক্ষে বিশ্বরূপই নিতাইয়ের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শচী নিতাইকে দেখিয়া ভাবিতেছেন, এ কি বিশ্বরূপ? আমার সেই হারান ধন? তখন শচী ছলছল আঁখিতে নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, নিমাই বলিতেছে তুমি আমার পুত্র। এ কি সত্য?" নিতাই বলিলেন, "হ্যাঁ, মা আমি তোমার বিশ্বরূপ।" তখন নিতাই তাঁহার বিশ্বরূপ এই ধ্রুব জ্ঞান হওয়ায় শচী "বাপ" "বাপ" বলিয়া তাঁহাকে কোলে লইলেন। নিতাইকে কোলে করিয়া তাঁহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন, আর কান্দিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "হলো ভাল, আমার ক্ষেপা নিমাই এতদিন সহায়হীন ছিল, এখন তুমি ভাইটিকে যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিও। আজ আমার নিমাইয়ের জন্য দুর্ভাবনা দূর হইল।" চৈতন্য-মঙ্গলের এই কয়েকটি পদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম ঃ

নিত্যানন্দের মাতৃভাব পাই শচীরাণী।
নয়নে গলয়ে নীর গদগদ বাণী।।
এই মত স্নেহ-রসে সব গরগর।
দুই পুত্র দেখি শচী জুড়ায় অন্তর।।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সত্য কি সজনি যমুনা পুলিনে
দেখিনু নীরদ কানু?
সত্য কি আমারে চাহিয়া চাহিয়া
বাজায়েছিল সে বেণু?
পাঠাইনু তারে প্রেমের পত্রিকা
পেয়েছিল সে কি করে?
সত্য কি সজনি আমি কোন দিন
আনন্দে মিলিব তারে?
স্বপন দেখেছি দিবস-রজনী
ভাবিয়া ভাবিয়া মরি।
সত্য কি বলাই মরণের কালে
পাইবে চরণ-তরি?

শ্রীবাসের বাড়ীতে প্রকাশ অবধি নিমাইয়ের মুহুর্মুহুঃ শ্রীভগবান্-ভাব হইতে লাগিল। উপরিউক্ত ঘটনার দুই এক দিন পরে, নিমাই ভগবান্ আবেশে শ্রীবাসের কনিষ্ঠ শ্রীরামকে শান্তিপুরে যাইতে আজ্ঞা করিলেন; বলিলেন, "শ্রীরাম! তুমি শান্তিপুরে যাও; যাইয়া অদ্বৈতাচার্যকে বলিবে—যাঁহার লাগিয়া তিনি কঠোর উপবাস, তপস্যা ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাকে এই ধরাধামে আনিবার নিমিত্ত ভক্তিভাবে পূজা করিয়াছিলেন, সেই তিনিই আমি, তাঁহার আকর্ষণে আসিয়াছি। অদ্বৈত এখন সস্ত্রীকআসুন, আসিয়া আমার আনন্দ বর্ধন করুন।"

রামাই এই আজ্ঞা পাইয়া শান্তিপুরে দৌড়াইলেন। শ্রীভগবানের আজ্ঞা পাইয়া যাইতেছেন, কাজেই শ্রীরামের আনন্দে বাহ্যজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈতের কাছে যাইয়া তিনি আহ্লাদে কথা কহিতে পারিতেছেন না; অদ্বৈতের পানে চাহিতেছেন; একটু হাসিতেছেন, কিন্তু কথা বাহির হইতেছে না। শ্রীভগবান্ আসিয়াছেন, এই আহ্লাদে শ্রীনিমাইয়ের সঙ্গীগণ দিবানিশি গলিয়া আছেন। নবদ্বীপে যে প্রকাণ্ড কাণ্ড হইতেছে, তাহা অদ্বৈত শুনিয়াছেন। শ্রীবাস, শ্রীরাম প্রভৃতি যে নিমাইকে লইয়া একেবারে মজিয়া গিয়াছেন, তাহাও তিনি জানেন। এখন শ্রীরামের আগমনে ও ভাবে বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন। তখন অদ্বৈত বলিতেছেন, "আমাকে বুঝি লইতে আসিয়াছ? আমি কেন যাব? আমি কি বস্তু তোর দাদা শ্রীবাস জানে। তোরা একটা বালককে লইয়া মত্ত হইয়াছিস, আমি ত তোদের মত নির্বোধ না, যে আমিও মাতিব। তোদের আবার অবতার! কোন শাস্ত্রে তোদের আবার অবতারে রে?"

শ্রীরামের হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিতেছে, কাজেই অদ্বৈতের এই দুর্বাক্য সেখানে আদপে স্থান পাইল না, বরং এই কথা শুনিয়া তিনি খলখল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, "শাস্ত্র তুমি জান, আমি কি জানি? তবে শ্রীভগবান্ কি বলিয়া দিয়াছেন তাহা শুন। তুমি যাঁহার নিমিত্ত এত ক্লেশ পাইয়াছ, তিনি তোমার আকর্ষণে গোলক ছাড়িয়া জীবের মলিন দশা দেখিয়া, কৃপার্ত হইয়া জীব উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন।" ইহা বলিতে বলিতে রামাইয়ের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। রামাইয়ের দুটি আঁখি ঝুরিতেছে, আর তিনি বলিতেছেন, "এখন তোমার স্ত্রীর সহিত চল, তোমাকে তিনি ডাকিয়াছেন।"

বোধ হয় এই কথাগুলির মধ্যে শক্তি দিয়া নিমাই রামাইকে পাঠাইয়াছিলেন। কারণ উহা শুনিবামাত্র শ্রীঅদ্বৈতের হৃদয় দ্রব্য হইল, আর তিনি কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন, "তিনি এসেছেন? তিনি এসেছেন? সত্য তিনি এসেছেন? আমাদের মধ্যে এসেছেন? এ কি সত্য?" তাহার পরে, "এনেছি, এনেছি" বলিয়া আনন্দে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত-ঘরণী সীতাও এ কথা শুনিলেন, তিনিও কান্দিতে লাগিলেন। তখনি নদীয়ায় যাওয়ার উদ্যোগ হইল। শ্রীভগবানের পূজার প্রকাণ্ড সজ্জা করা হইল, আর শ্রীঅদ্বৈত, সীতা ও রামাই তিন জনে শ্রীনবদ্বীপে চলিলেন।

পথে যাইতে যাইতে শ্রীঅদ্বৈতের মনে একটু খট্‌কা হইল। রামাইকে বলিতেছেন, "আমি নন্দন আচার্যের বাড়ীতে লুকাইয়া থাকিব। শ্রীরাম, তুমি তাঁহাকে ইহা বলিও না। তুমি যাইয়া বল যে অদ্বৈত আচার্য আসিলেন না। দেখি, তিনি কি করেন। আমার মাথায় পা তুলিয়া দিতে যদি নিমাই পণ্ডিতের সাহস হয়, তবেই বুঝিব তিনি আমার ঠাকুর!" শ্রীরাম বলিতেছেন, "তাহাই ভাল, ভাবিতেছ প্রভু জানিতে পারিবেন না? একবার কাছে চল, তখন বুঝিতে পারিবে।"

এদিকে অদ্বৈত আসিতেছেন, শ্রীনিমাই অন্তরে জানিয়া শ্রীবাসের বাড়ী গমন করিলেন, করিয়া বিষ্ণুখট্টায় ভগবান্-আবেশে বসিলেন। তখন শ্রীভগবানের প্রকাশ দেখিয়া, ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া সেবায় নিযুক্ত হইলেন। নিত্যানন্দ মস্তকে ছত্র ধরিলেন, গদাধর তাম্বুল যোগাইতে লাগিলেন, নরহরি চামর ঢুলাইতে লাগিলেন, শ্রীবাস, মুরারি ও মুকুন্দ করজোড়ে সম্মুখে রহিলেন। সকলে নীরব, ভয়ে কাহারও কথাটি কহিবার শক্তি নাই। তখন প্রভু বলিতেছেন, "অদ্বৈত আচার্য আসিয়া আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নন্দন আচার্যের বাড়িতে লুকাইয়া আছেন, তাঁহাকে শীঘ্র লইয়া আইস।"

রামাই বাড়ীতে না পঁহুছিতেই শ্রীঅদ্বৈতের নিকট আজ্ঞা আসিল। অদ্বৈত বুঝিলেন যে, নন্দন আচার্যের বাড়ীতে তিনি লুকাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা নিমাইয়ের গোচর হইয়াছে। তখন আবার শ্রীনিমাইয়ের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস একটু সজীব হইল। তখন পূজার সজ্জা লইয়া প্রভুকে দর্শন করিতে সস্ত্রীক চলিলেন। কিন্তু গৃহত্যাগ করিয়াই বিহ্বল হইলেন। সত্য কি ভগবান্ আমাকে ডাকিতেছেন? যখন এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈতের বুক দুর্‌দুর্ করিতে লাগিল।

যতই অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে লাগিল ও ক্রমেই অচেতন হইতে লাগিলেন। অদ্য তাঁহার জীবন সার্থক হইবে, অদ্য তাঁহার ব্রত সিদ্ধ হইবে, যেহেতু শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে চলিয়াছেন। দর্শন লালসায় ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন, আবার আনন্দে নিজ ঘরণী শ্রীসীতাদেবীর অঙ্গে ঢলিয়া পড়িতেছেন। যাইয়া কি করিবেন, কি বলিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে তাঁহারা শ্রীবাসের বাড়ী প্রবেশ করিলেন, কষ্টে-সৃষ্টে পিঁড়ায় উঠিলেন, ঘরে আর প্রবেশ করিতে পারেন না। সকলে অদ্বৈতকে ধরিয়া পিঁড়া হইতে ঘরে লইয়া চলিলেন। তখন তাঁহারা যুগল হইয়া প্রণাম করিতে করিতে প্রভুর সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন। অভ্যন্তরে যাইয়া নয়ন মেলিলেন। নয়ন মেলিয়া দেখেন যে, শ্রীবাসের সে ঘর নাই, নিমাইও সেখানে নাই। তবে কি দেখিলেন, তাহা শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতের কথায় বলি। শ্রীনিমাই বিষ্ণুখট্টার উপর—

'জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনকসুন্দর কলেবর।।
প্রসন্নবদন কোটি-চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর।।

—আর দেখিতেছেন, সর্ব্বাঙ্গ মনিমাণিক্য ভূষিত। আর কি দেখিতেছেন—

কিবা প্রভু কিবা ভক্তগণ কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় বহি কিছু নাহি দেখে আর।।

অর্থাৎ শুদ্ধ যে সমুদয় ঘর জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে তাহা নয়, ঘরে যাঁহারা আছেন, কি যে যে দ্রব্য আছে, সমুদয় জ্যোতির্ম্ময়!

অদ্বৈত পরে দেখিতেছেন যে, চারিদিকে অনন্ত কোটি পরম সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ শ্রীনিমাইকে স্তুতি করিতেছেন, আর ঋষিগণ করযোড়ে বেদ পড়িতেছেন। যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করেন সেই দিকেই দেখেন ঋষিগণ ও দেবদেবিগণ শ্রীনিমাইরূপ ভগবানকে সেবা করিতেছেন।

ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে।
দেখে পড়িয়াছে মহাঋষিগণ পাশে।।

অদ্বৈত সম্মুখের ব্যাপার দেখিয়া সস্ত্রীক জড়বৎ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। প্রথমে প্রণাম করিতেছিলেন, তখন প্রণামে ক্ষান্ত দিলেন। দেখিলেন শ্রীভগবান অতি প্রকাণ্ড বস্তু। ভাবিলেন, তাঁহার প্রণাম শ্রীভগবানের গোচর হইবে কেন? কত কোটি দেবগণ শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করিতেছেন, তিনি ক্ষুদ্র কীট, তিনি প্রণাম করিলে আর অধিক কি হইবে? শ্রীভগবান্‌কে তিনি প্রণাম করিলেই বা কি, আর না করিলেই বা কি? শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য দেখিলে জীবগণ তাহা হইতে দূরে যাইয়া পড়ে। শ্রীঅদ্বৈত এই ঐশ্বর্য দেখিলেন, কারণ তিনি উহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে নিতান্ত সন্দেহ, বালক নিমাই—যাহাকে কল্য উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতে দেখিয়াছেন, কিরূপে শ্রীভগবান্ হইতে পারেন? আর তাঁহার মনে তর্ক হইতেছিল যে, যদি নিমাই শ্রীভগবান্ হয়েন, তবে নিশ্চয় তাঁহার অসীম ক্ষমতা আছে, এবং নিমাইয়ের সেই অসীম ক্ষমতা দেখিলেই তিনি তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিবেন। তাই শ্রীঅদ্বৈত ঐশ্বর্য দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া এই ঐশ্বর্য দেখিলেন, দেখিয়া শ্রীভগবান্‌কে দুর্লভ, অর্থাৎ পাওয়া অসম্ভব ভাবিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা পর্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন এবং নিরাশ হইয়া দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

কিন্তু অদ্বৈতের প্রতি শ্রীভগবানের করুণা প্রচুর। তখন শ্রীভগবান্ শ্রীঅদ্বৈতের ভাব দেখিয়া সমুদয় ঐশ্বর্য সম্বরণ করিলেন, করিয়া শুধু জ্যোতির্ম্ময়ের পরমসুন্দর নবীন পুরুষরূপে তাঁহাকে দেখা দিলেন এবং অতি মধুর হাস্য করিয়া নিকটে ডাকিলেন। এই আশ্বাস বাক্য শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত নিকটে আসিলেন। তখন শ্রীভগবান্ বলিলেন "ওহে অদ্বৈত আচার্য! তুমি জীবের দুঃখে দুঃখিত

হইয়া জীব উদ্ধারের নিমিত্ত আমাকে আনিতে কঠোর আরাধনা করিয়াছ। তোমার আকর্ষণে আমি আসিয়াছি। এখন তুমি অকাতরে জীবকে ভক্তি ও প্রেমধন বিতরণ কর।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত আশ্বাসিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং করযোড়ে কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, " প্রভু, আমি তোমাকে আনিয়াছি এ কথা বলিলে কে শুনিবে বা প্রত্যয় করিবে? তুমি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছা না হইলে তোমাকে কি কেহ আনিতে পারে? জীব সমুদয় তোমার সন্তান, তাহাদের দুঃখে তুমি যত দুঃখিত, অন্যে তাহা সম্ভবে না। তুমি তাহাদের দুঃখ দেখিয়া, দয়ার্দ্র হইয়া আপনি আসিয়াছ। আমি কীটানুকীট, আমি তোমাকে কিরূপে আনিব? তবে জীব উদ্ধার করিতে তোমার আগমন হওয়ায়, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রজনের যাহা কখন সম্ভবপর ছিল না, তাহা হইল,—তোমার দর্শনলাভ হইল। এখন যদি অনুমতি কর, তোমার চরণ পূজা করি, করিয়া জনম সফল করি।" ইহাই বলিয়া সস্ত্রীক শ্রীচরণাগ্রে বসিলেন। প্রথমে গঙ্গাজলে শ্রীচরণ ধৌত করিলেন, শেষে গন্ধ ও পুষ্পে চরণ পূজা করিলেন। চরণ পূজা করিয়া "নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়" শ্লোক পড়িয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর সস্ত্রীক উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া আরত্রিক করিলেন, পরে বস্ত্র অলঙ্কার ইত্যাদি যোড়শোপচারে পূজা সাঙ্গ করিলেন। তাহার পর স্ত্রীকে বামে করিয়া শ্রীচরণাগ্রে বসিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন, স্তুতি করিয়া স্ত্রী-পুরুষ যুগল হইয়া শ্রীভগবানকে প্রণাম করিলেন।

শ্রীভগবান্ তখন তাঁহাদের স্ত্রী- পুরুষের মস্তকে শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত মনে মনে যাহা বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইল।

তখন শ্রীভগবান্ রহস্য করিয়া বলিতেছেন, "নাড়া, একবার নৃত্য কর, আমি দর্শন করি।" এ আজ্ঞা পালন করা তখন অদ্বৈতের পক্ষে কঠিন ছিল না, কারণ তখন তিনি আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন। অদ্বৈত নাচিতে লাগিলেন, আর সকলে কীর্তন করিতে লাগিলেন। এই অদ্বৈত, যিনি মহাজ্ঞানী, ঘোর তাপস যাজক ও ধ্যানপরায়ণ ভক্ত, তাঁহাকে নিমাইরূপ "পরশমণি" এইরূপে "নাচাইয়া গাওয়াইয়া" "সোনা" করিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত তপস্যা দূরে ফেলিয়া নৃত্য-গীতরূপ ভজন অবলম্বন করিলেন।

তখন শ্রীভগবান্ অদ্বৈতকে বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা বর চাও"। শ্রীঅদ্বৈত বড় বিপদে পড়িলেন। শ্রীভগবান্ সম্মুখে আসিয়া যদি বলেন "তোমার যাহা ইচ্ছা বর চাও," তবে মহাবিপদ। শ্রীভগবানের কাছে যে কি বর চাওয়া কর্তব্য তাহা অবধারণ করা জীবের পক্ষে বড় কঠিন। কারণ যত প্রকার বর চাহিতে ইচ্ছা করা যায়, প্রায় সমুদয়েই কিছু না কিছু দোষ আছে, বিশুদ্ধ মঙ্গল কি, তাহা ঠিক করা জীবের পক্ষে কঠিন । যে ব্যক্তি উপযুক্ত বর চাহিতে পারে, তাহার নিকট শ্রীভগবান্ কি বস্তু ও জীবনের কি উদ্দেশ্য, তাহা তদ্দণ্ডে স্ফূর্তি হয়। শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "তুমি সম্মুখে, আর কি বর চাহিব?" শ্রীভগবান্ বলিলেন, "আমার ইচ্ছা ব্যর্থ হইবে না, তুমি অবশ্য বর চাহিবে।" তখন শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "প্রভু! এই বর দাও যে, তুমি যে প্রেমভক্তি বিলাইবে, তাহা নীচ বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া সকলকেই বিতরণ করিবে।" এই অপরূপ বর প্রার্থনা শুনিয়া সকলে জয় জয় করিয়া উঠিলেন। শ্রীভগবানও তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুমি যেরূপ ভক্ত তাহাতে অন্যরূপ অফল ও তোমার অনুপযুক্তবর কেন চাহিবে?"

ষোড়শ অধ্যায়

গৌর জানা নাহি ছিল তখন আছিনু ভাল
কাল কাটাইতাম আমি সুখে।
গৌরনাম কর্ণে গেল কেবা কাণে মন্ত্র দিল
হুতাশে পিয়াসে মরি দুঃখে।।

যারা গুণের সঙ্গী ছিল তারা ফেলে পলাইল
কাহারে কহিব মন ব্যথা।
কেবা দুঃখ ভাগ নিবে সঙ্গে সঙ্গে কে কান্দিবে
কে শুনাবে মনমত কথা।।
হৃদয়ে গৌরাঙ্গ ছিল এবে কোথা লুকাইল
আগে মোর চিত্ত করি চুরি।
আপনি মোরে ডাকিল মন আমার ভুলে গেল
এবে করে মো সনে চাতুরি।।
আমি পাছে পাছে যাই মোরে দেখিয়া পলায়
এবে আমার শক্তি নাই অঙ্গে।
রোগে শোকে অভিভূত ক্রমেতে আত্মবিস্মৃত
ক্লান্ত চিত্ত বিশ্রাম সে মাগে।।
আর ত চলিতে নারি লহ মোর হাত ধরি
যদি কেহ থাক নিজ জন।
এই ছিল মোর ভাগ্যে ধরণী বিদায় মাগে
বলরাম দাস আকিঞ্চন।।

শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে ফিরিয়া গেলেন। পূর্বে বলিয়াছি, শ্রীঅদ্বৈতের চরিত্র বুদ্ধির অগম্য। শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার মনে নিমাইয়ের প্রতি আবার একটু অবিশ্বাস হইল। তখন আবার একটি সঙ্কল্প করিয়া নবদ্বীপে চলিলেন। ভাবিলেন, এবার যাইয়া মনের সন্দেহ নিশ্চয় দূর করিবেন। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি প্রাতে শান্তিপুর ছাড়িয়া প্রহরেক বেলার সময়ে নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাড়ী আসিলেন। দেখেন, প্রভু ভক্তগণ বেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণকথা-রসে আছেন শ্রীঅদ্বৈতকে দেখিয়া সকলে মহা আনন্দিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। স্বয়ং প্রভুও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করিলেন, প্রভুও শ্রীঅদ্বৈতকে প্রণাম করিলেন। পরে সকলে উপবেশন করিলেন।

সকলে বসিলে প্রভু বলিলেন, "এখন সীতাপতি আসিলেন, আর আমাদের শমন ভয় থাকিবে না।" শ্রীঅদ্বৈতের ঘরণীর নাম সীতা, সেই উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে শ্রীরামচন্দ্র সাব্যস্ত করিয়া এই কথা বলিলেন। শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "কই, এখানে রঘুনাথ কোথা? এখানে বরং যদুনাথ আছেন।" প্রভু এ কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিতেছেন, "আপনি আমাকে ফেলিয়া শান্তিপুরে থাকেন ইহাতে আমি বড় দুঃখ পাই।" শ্রীঅদ্বৈত উত্তর করিবার পূর্বে শ্রীবাস বলিলেন, "শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে থাকেন বটে, কিন্তু এখন তোমার আর্বিভাবে নবদ্বীপে আকৃষ্ট হইয়াছেন। আর তোমার আবির্ভাবে এই নবদ্বীপে এখন নিত্যানন্দের অবস্থিতি হইতেছে।" ইহার তাৎপর্য এই যে, অদ্বৈত প্রভু প্রথমে শান্তরসে মুগ্ধ ছিলেন, এখন নবদ্বীপ স্বরূপ যে নববিধ-ভক্তি সেই নবদ্বীপেই আকৃষ্ট হইয়াছেন, আর সেই নিমিত্ত নিত্যই আনন্দ ভোগ করিতেছেন।

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "সেই নিমিত্ত শ্রীবাস এখানে আছেন, তাহাতেই লোকে যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই পায়।" শ্রী শব্দে লক্ষ্মী, সুতরাং অদ্বৈত বলিতেছেন, যেখানে লক্ষ্মী বাস করেন, সেখানে লোকের অভাব নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম ঘরণীর নাম "লক্ষ্মী" তাহা পাঠক জানেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীবাস বলিতেছেন, "লক্ষ্মী এখানে আর এখন কোথায়? লক্ষ্মী ত' অন্তর্ধান করিয়াছেন।"

ইহাতে গৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "শ্রী শব্দে ভক্তি। তোমরা সকলে যেখানে বর্তমান, সেখানে শ্রী

অন্তর্ধান করিয়াছেন ইহা হইতেই পারে না।"

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "অবশ্য শ্রী নবদ্বীপে আছেন, আর তিনি এখন বিষ্ণুপ্রিয়া হইয়াছেন।" ইহার এক অর্থ এই যে, ভক্তিদেবী বিষ্ণুর প্রিয়া হইয়াছেন। আর এক অর্থ যে, প্রভুর ঘরণী যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, তিনিই ভক্তিমূর্তি দেবী।

শ্রীগৌরাঙ্গ দ্বিতীয় অর্থ যেন না শুনিয়া, প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন, "তাহা বটে, ভক্তি প্রকৃতই বিষ্ণুপ্রিয়া। অর্থাৎ ভক্তিকে শ্রীভগবান্ ভালবাসেন।"

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন "সেই নিমিত্ত সেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে তুমি আপন করিয়া লইয়াছে।"

এইরূপ শ্লেষাত্মক রহস্য হইতেছে, এমন সময় একজন লোক আসিয়া বলিলেন, "শচীদেবী আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অদ্য শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ঠাকুরকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদি ভাগ্যবশতঃ আচার্য ঠাকুর আসিয়াছেন, তবে অদ্য তাঁহার শচীদেবীর ওখানে বিশ্রাম করিতে হইবে।"

শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "জগজ্জননী আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, ইহা আমার বড় ভাগ্যের কথা, আমি শ্রীভগবানের সহিত অদ্য সুখে ভোজন করিব।"

শ্রীবাস বলিতেছেন, "আমি কি এ সুখবিলাস দেখিতে পাইব না? ভগবান অবশ্য অদ্য আমার নিমিত্ত মাপিবেন। আর যদি নিতান্ত না মাপেন, তবে জগজ্জননীর নিকট মাগিয়া লইব।"

এদিকে শ্রীঅদ্বৈতের সহিত প্রভুর গোষ্ঠীর আহার ব্যবহার ছিল না। সেই নিমিত্ত অদ্বৈতের মন জানিবার নিমিত্ত প্রভু শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "তুমি দুটো অন্ন খাইবে তাহাতে বড় দুঃখ নাই, কিন্তু তাহা হইলে দুইজনের নিমিত্ত রন্ধন করিতে আচার্যের অধিক পরিশ্রম হইবে।"

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "জগজ্জননীর বাড়ী যাইয়া আমায় রন্ধন করিয়া খাইতে হইবে, ইহা আমার দুরাদৃষ্ট বই নয়। জননী যদি পরিশ্রমের ভয়ে দুটো অন্ন রাঁধিয়া না দেন তবে আর কি করিব?"

এই ইঙ্গিত পাইয়া লোক যাইয়া শচীদেবীকে রন্ধন করিতে বলিল। এদিকে সকলে হাস্যকৌতুকে আছেন, এমন সময় শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসের কানে কানে কি বলিলেন। প্রভু হাসিয়া বলিতেছেন, "তোমরা কানে কানে কি পরামর্শ করিতেছ, আমি কি শুনিতে পাব না?"

শ্রীবাস বলিলেন, "আচার্য বলিতেছেন যে, তুমি শ্রীনিত্যানন্দকে যে রূপ দেখাইয়াছিলে, সেই রূপ দেখিতে না পাইয়া তিনি দুঃখিত হওয়ায় তুমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলে ও বলিয়াছিলে যে, তাঁহাকে সে রূপ দেখাইবে। ইহা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে দেখাও নাই, তাহাতেই শ্রীঅদ্বৈত দুঃখিত আছেন, আর সেই কথা আমার কানে কানে বলিতেছেন।"

ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন, "এই যে আমাকে দেখিতেছেন এই আমার প্রকৃত রূপ। আর অন্য শ্রীঅদ্বৈতের ইহাই প্রিয় রূপ।"

শ্রীঅদ্বৈত ইহাতে কিছু বিপদে পড়িলেন। যদি স্বীকার করেন যে, গৌর-রূপই তাঁহার প্রিয়, তবে আর অন্য রূপ দেখা হয় না আবার ভাবিতেছেন,

ঐ কথার উত্তরে যদি আবার অন্য রূপ দেখিতে চান, তবে গৌররূপের প্রতি অনাদর করা হয়। এইরূপ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া শ্রীঅদ্বৈত কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু, তুমি যা বলিয়াছ ঠিক, গৌররূপের মত প্রিয় আমাদের আর কোন রূপই নয়! তবে তুমি নিজ মুখে স্বীকার করিয়া এখন দেখাও না, এইজন্য শ্রীঅদ্বৈত দুঃখিত হইতেছেন।"

ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে বলিলেন, "পণ্ডিত! কবে কি অবস্থায় আমি আচার্যকে কি বলিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ হয় না! আবার পণ্ডিত, তুমি ভাবিয়া দেখ, উন্মাদ অবস্থায় কে না প্রলাপ করে, সে কথা লইয়া সহজ অবস্থায় তাহাকে পেষণ করা কর্তব্য হয় না।"

শ্রীবাস বলিতেছেন, "লোকে উন্মাদগ্রস্ত হয়, সে একরূপ ব্যাধি। তাহা দেখিলেই লোকের ভয়, ঘৃণা এবং পীড়া হয়। তোমার উন্মাদ দশা দেখিলে লোকের আনন্দ হয় এবং সমস্ত ভয় ও রোগ দূর হয়। অতএব তুমি যাহা উন্মাদ প্রলাপ বল, সেই তোমার হৃদয়ের কথা; আর তুমি যাহা এখনকার মত সহজ জ্ঞানে বল, সে তোমার সমুদয় বাহ্য!"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "পণ্ডিত, তোমাকে আমি স্বরূপ কথা বলিতেছি। কোন রূপ কি কোন বৈভব দর্শন করান আমার ইচ্ছাধীন নহে। কিরূপে কি হয় আমি জানি না। অতএব আমি শ্যামসুন্দর রূপ কিরূপে দেখাইব? যদি আচার্যের ঐ রূপ দেখিতে বাসনা হইয়া থাকে, তবে নয়ন মুদিয়া ধ্যানে বসুন, হয়ত শ্রীকৃষ্ণ নিজ রূপ তাঁহাকে দেখাইবেন।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত, কতক কৌতুকে, কতক মনোগত ভাবে, নয়ন মুদিয়া ধ্যানে বসিলেন, আর ভক্তগণও ঐরূপ মনের ভাবে নীরব হইয়া কি হয় দেখিতে লাগিলেন। যদিও শ্রীগৌরাঙ্গ যেন রহস্য করিয়া এই কথা বলিলেন, তবু ভক্তগণ ভাবিলেন যে, অবশ্যই কিছু গূঢ় রহস্য প্রকাশ পাইবে সন্দেহ নাই। এই জন্য সকলে শ্রীঅদ্বৈতের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

দেখেন কি, শ্রীঅদ্বৈত বসিতে বসিতে অচেতন হইলেন; এমন কি, তাঁহার শ্বাস পর্যন্ত রুদ্ধ হইল, জীবন্ত মনুষ্যের কোন লক্ষণই রহিল না। ভক্তগণ ইহাতে ভয় পাইলেন; কিন্তু দেখিতেছেন, তাঁহার সর্বাঙ্গে পুলকাবলী দেখা যাইতেছে। ইহাতে দেহে প্রাণ আছে বুঝিলেন। তখন শ্রীবাস একটু ব্যস্ত হইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "প্রভু! আচার্যের একি দশা হইল?"

প্রভু বলিতেছেন, "আর কিছু নয়, বোধ হয় হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন, আর সেই আনন্দে স্পন্দনহীন হইয়াছেন।"

শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু! আমরা অভাগা, আমাদিগকে তোমার শ্যামসুন্দর রূপ দেখাইবে না বলিয়া গোপনে আচার্যকে দেখাইলে। তাহা না দেখাইলে, তাহাতে আমার কিছু দুঃখ নাই, গৌর রূপই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তবে তুমি এখন আচার্যকে চেতন করিয়া দাও।"

প্রভু বলিলেন, "আমি কিরূপে চেতন করাইয়া দিব? দেখ, আচার্যের আপনিই চৈতন্য হইবে।" ইহা বলিতে বলিতে আচার্য চেতন পাইলেন। চেতন পাইয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায় অর্ধবাহ্য দৃষ্টে এদিকে ওদিকে চাহিতে লাগিলেন। যেন কি দেখিতেছিলেন, আর দেখিতে পাইতেছেন না। পরে আপনিই বলিতেছেন, "এই যে শ্যামবর্ণ অতি সুন্দর উজ্জ্বল মূর্তি দেখিতেছিলাম, তিনি কোথায় গেলেন? তাঁহার আপাদমস্তক ও গলে বনমালা; সেই আমার নয়নানন্দ কোথা?" এইরূপে বিভোর হইয়া শ্রীঅদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত যখন শ্রীকৃষ্ণের রূপ গদগদ হইয়া বর্ণনা করিতেছেন, তখন যেন সুধাবর্ষণ করিতেছেন। অদ্বৈতের যেন তখন শত মুখ হইল, আর শতমুখ দিয়া সুধা ক্ষরিতে লাগিল। সকলে মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা শুনিতেছেন, এমন সময় শ্রীবাস বলিলেন, "তুমি কি দেখিলে, কারে দেখিলে, স্পষ্ট করিয়া বল।"

এই কথায় শ্রীঅদ্বৈত বাহ্যজ্ঞান পাইয়া বলিতেছেন, "কারে আর দেখিব? এই সম্মুখে যিনি বসিয়া আছেন ইঁহারই সমুদয় কার্য। আমি যে মাত্র নয়ন মুদিলাম, অমনি এই বস্তু (শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখাইয়া) আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। তখন শ্যামরূপ ধরিয়া আমার নয়নে আনন্দ দিতেছিলেন। পরে আবার নিজ রূপ লইয়া বাহিরে আসিলেন, আর আমার বাহ্যজ্ঞান হইল।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "তুমি বসিয়া নিদ্রা গেলে আর স্বপ্ন দেখিলে, এখন আমি দোষের ভাগী হইলাম?"

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "আমি স্বপ্ন দেখিলাম? আমি স্পষ্ট দেখিলাম তুমি হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, আবার বাহিরে আসিলে। এখন আমাকে ভুলাইতেছ? প্রভু আমাকে আর কত দিন ভাঁড়াইবে? আমি যাহাকে ভজনা করি সে-তুমি!"

এই যে শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার প্রাণনাথকে চিনিলেন, সে চেনা চিরদিন সমান রহিল না। অল্পকাল পরে আবার তাঁহার মনে খট্‌কা উপস্থিত হইল। সেটি জীবের সৃষ্টি হইতে আবহমানকালের পুরাতন "অবিশ্বাস",—অর্থাৎ নিমাই কি সত্যই তাঁহার প্রাণেশ্বর, সেই শ্রীকৃষ্ণ? লোকে ইচ্ছা করিলেও মনে এই বিশ্বাস আনিতে পারে না। চাক্ষুষ দেখিলেও অনেক সময় বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস আনয়ন করিতে হইলে মনের একটি অবস্থা বিশেষের প্রয়োজন। কাহারও এই অবস্থা শীঘ্র, কাহারও বা বিলম্বে হয়। ব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাস হয় নাই, ইন্দ্রেরও হয় নাই, সুতরাং অদ্বৈতের যে নিমাইয়ের প্রতি সন্দেহ হইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি? আবার এমনও হইতে পারে যে, এ অবিশ্বাস এই লীলার একটি অঙ্গ।

সপ্তদশ অধ্যায়

রাগিনী—কুকুভ।
উদয় হও হে, হও হে, নদিয়া-চন্দ্রমা।
ভুবন আঁধার বিনা তোমা।।
জীবনে মরণে গতি, তুমি আমার প্রাণপতি
এ সম্পর্ক তোমা-আমা।
অনাথ হইয়া, বেড়াই ঘুরিয়া,
হাঁসখালি গ্রামে পানু তোমা।
কোথা তুমি, কোথা আমি,
আমার প্রাণের প্রাণ তুমি,
ডাকে বলরাম।।

একদিবস শ্রীনিমাই শ্রীভগবদ্ভাবে "পুণ্ডরীক", "পুণ্ডরীক" বলিয়া ব্যাকুল হইলেন। ক্রমে প্রভু উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। যেমন স্ত্রীলোক বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দে, সেইরূপ—"পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বাপ, আমি আর তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছি না, তুমি নিদয় হইয়া আমাকে ফেলিয়া রহিয়াছ। কবে তোমাকে দর্শন করিয়া আমি নয়ন ও হৃদয় শীতল করিব।" ইত্যাদি নানারূপ কাতরোক্তি করিয়া প্রভু অতি করুণস্বরে কান্দিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ পুণ্ডরীকের নিমিত্ত এই যে স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছেন, ইহাতে একটি রহস্য আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে অবশ্য শ্রীমতী রাধা প্রকাশ পাইতেন; আর পুণ্ডরীকের দেহে শ্রীমতীর পিতা বৃষভানুর আবির্ভাব হইত। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে, কাজেই স্ত্রীলোকের মত, "পুণ্ডরীক বাপ" বলিয়া রোদন করিলেন। যখন "পুণ্ডরীক বাপ" বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইল, যেন একটি স্ত্রীলোক তাঁহার পিতার শোকে বিকল হইয়া রোদন করিতেছেন। এ সমস্ত ভাবের নিগূঢ় তাৎপর্য সাধক ক্রমে জানিতে পারিবেন।

নিমাইয়ের করুণ রোদন শুনিবামাত্র পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হৃদয় ফাটিয়া যাইত; সুতরাং ভক্তগণ এই রোদন শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুণ্ডরীক কে? শ্রীকৃষ্ণের এক নাম পুণ্ডরীক, কিন্তু প্রভু আবার "বিদ্যানিধি" বলিতেছেন। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া একজনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! আপনি যাঁহার নিমিত্ত রোদন করিতেছেন, সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে?" তখন নিমাই একটু চেতন পাইয়া বলিতেছেন, "তোমরা সেই ভাগ্যবান ব্যক্তির কথা জানিতে চাহিতেছ? তাঁহার বাড়ী চট্টগ্রামে, এখানেও বাড়ী আছে। ধনবান লোক, চালচলন ও বাস ধনবান লোকেরই মত, সুতরাং সাধারণ লোকে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মহত্ত্ব জানিতে পারে না। কিন্তু এমন ভক্ত ত্রিজগতে দুর্লভ। তাঁহাকে না দেখিয়া আমি স্বস্তি পাইতেছি না। তোমরা সকলে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে এখানে লইয়া

আইস।'' ইহাই বলিতে বলিতে নিমাই আবার বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ''বাপ পুণ্ডরীক'' বলিয়া অতি কাতরস্বরে কান্দিতে লাগিলেন।

তাহার কিছুদিন পরে পুণ্ডরীক চট্টগ্রাম হইতে শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে বহুতর ব্রাহ্মণ-শিষ্য আবও অনেক লোক। বিদ্যানিধি মস্ত ভোগী, ঠিক বড় বিষয়ী লোকের মত। মুকুন্দ দত্তের বাড়ীও চট্টগ্রামে, বিদ্যানিধির একই গ্রামে। কাজেই পুণ্ডরীকের সহিত তাঁহার পূর্ব পবিচয় ছিল। সুতরাং তাঁহার আগমন মুকুন্দ জানিলেন। যে দিবস প্রভু ''পুণ্ডরীক'' বলিয়া রোদন করেন, সে দিবস মুকুন্দ সেখানে ছিলেন না। বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আসিলে মুকুন্দের বড় ইচ্ছা হইল যে, তাঁহাকে প্রভুর নিকট লইয়া আসিয়া পরিচয় করাইয়া দেন। ইহাই ভাবিয়া তিনি পুণ্ডরীকের সহিত দেখা করিতে চলিলেন। গদাধরের সহিত তাঁহাব অত্যন্ত প্রণয়, সুতরাং তাঁহাকে বলিলেন, ''ভাই, আমাদের গ্রামের একজন বড় ভক্ত আসিয়াছেন, দেখা করিতে যাবে?'' গদাধর বলিলেন, ''এ বড় ভাগ্যের কথা, চল যাই।''

এইরূপে দুইজনে গমন করিলেন। যাইয়া দেখেন, পুণ্ডরীক অতি বড় লোক। খট্টায় দুগ্ধফেননিভ শয্যা, চারিপার্শ্বে বালিশ ও তাহার মধ্যস্থানে তিনি বসিয়া। দেখিতে পরম সুন্দর, আবার ভক্তির চর্চা করিয়া সৌন্দর্য আরও বাড়িয়া গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠমাস, অতিশয় গ্রীষ্ম। দুইপার্শ্বে দুইজন ভৃত্য ময়ূরপুচ্ছের পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে। মুকুন্দ ও গদাধর গমন করিলে বিদ্যানিধি অতি আদর করিয়া তাঁহাদিগকে বসাইলেন। বিদ্যানিধি গদাধরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে মুকুন্দ বলিলেন, ''ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র, ন্যায় পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু সে ইঁহার গৌরব নহে। শিশুকাল হইতে ইনি পবম ভক্ত, আব চির-কুমার থাকিবেন ইহাই ইচ্ছা করিয়াছেন।''

গদাধরের বয়ঃক্রম তখন দ্বাবিংশতি বৎসব; রূপ প্রায় নিমাইয়ের মত; বদন সরল ও স্নিগ্ধ, দেখিলেই মন আকর্ষণ করে। তাহাতে আবার নবপ্রেম স্পর্শ করায় গদাধবের সর্বাঙ্গে অমানুষিক জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। বিদ্যানিধি অনিমেষলোচনে গদাধরকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর যতই দেখিতেছেন, ততই তাঁহাতে আকৃষ্ট হইতেছেন।

গদাধরও বক্র-নয়নে এক এক বার বিদ্যানিধিকে দেখিতেছেন; কিন্তু যতই দেখিতেছেন ততই ব্যাজার হইতেছেন। গদাধর চিরদিন বিষয় সুখে বিরক্ত, দেখেন বিদ্যানিধি চুলে সুগন্ধী আমলকী মাখিয়া উত্তম করিয়া ইহা বিন্যাস করিয়াছেন। প্রকাণ্ড বাটায় পান রহিয়াছে, তাহা মুহুর্মুহুঃ চর্বণ করিতেছেন। গদাধর ভাবিতেছেন, ''ভাল ভক্ত দেখিতে আসিয়াছি। এখন এখান হইতে পালাইতে পারিলে বাঁচি।'' গদাধরের ভাব বুঝিয়া মুকুন্দ মনে মনে হাসিতেছেন। পরে বিদ্যানিধির গৌরব দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ একটি শ্লোক সুস্বরে উচ্চারণ করিলেন। শ্লোকটি এই ঃ অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।

লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম।।

পুতনা লোকবালঘ্নাং রাক্ষসী রুধিরাশনা।

জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপি সদ্গতিম।।

অস্যার্থঃ—''দুষ্টা পুতনা রাক্ষসী সে কৃষ্ণকে জিঘাংসাবশতঃ কালকূট মিশ্রিত স্তনপান করাইয়াও ধাত্রীযোগ্য সদ্গতি লাভ করিয়াছে, সেই দয়াময় হরি ভিন্ন অপর কাহার আশ্রয় লইব?''

এই শ্লোক শুনিবামাত্র বিদ্যানিধি মূর্চ্ছিত হইয়া খট্টা হইতে ধূলায় পড়িয়া গেলেন। তখন আস্তে আস্তে মুকুন্দ গদাধর প্রভৃতি সকলে বিদ্যানিধিকে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি চেতন পাইয়া দাস্যভাবে অতি করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিযা কান্দিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে—

''শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর মোর কৃষ্ণ মোর প্রাণ।
মোরে সে করিলে কাষ্ঠ পাযাণ সমান।।''

বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ! হে পিতা! হে আমার বাপের ঠাকুর! আমার মত দীনহীনকে তুমি কবে উদ্ধার করিবে? হে কাঙ্গালের ঠাকুর! আমার কঠিন হৃদয়ে ভক্তির লেশমাত্র নাই। আমার চিত্ত তোমাতে গেল না, তাই বলে বাপ, তুমি আমাকে ত্যাগ করিও না।" এই সমুদয় কথা বলিয়া কান্দিতেছেন, আর গড়াগড়ি দিতেছেন। গদাধর দেখিতেছেন, পরিধানে উত্তম বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সেই সুগন্ধিলিপ্ত কেশ ধূলায় মাখামাখি হইল। আর সেই রূপবান্ পুরুষ বিদ্যানিধি, ধূলায় ধূসরিত হইলেন। তখন গদাধর বুঝিলেন যে, কৌপীন পরিলেই ভক্ত হয় না, আর মস্তকে সুগন্ধি তৈল দিলেই পাষণ্ড হয় না। ইহা বুঝিয়া গদাধর মহা ভয় পাইলেন। ভাবিতেছেন, আমি একি অপরাধ করিলাম! ভক্তদ্রোহী হইলাম। আমার এ অপরাধ কিসে যায়? তখন মুকুন্দকে কোলে করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "তুমি ভক্ত দর্শন করাইয়া আমার নয়ন সার্থক করাইলে, কিন্তু এখন আমার উপায় কি বল? আমি উহার বাহ্য ভোগ ও বিলাস দেখিয়া উহার প্রতি মনে মনে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম! মুকুন্দ, আমি এখন মনে একটি বিষয় স্থির করিয়াছি। আমি এই বিদ্যানিধি ঠাকুরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিব। তাহা হইলে তাঁহাকে যে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা তিনি অবশ্য ক্ষমা করিবেন।" একথা শুনিয়া মুকুন্দ বলিলেন, "বড় উত্তম পরামর্শ করিয়াছ।"

বহুক্ষণ পরে বিদ্যানিধি চৈতন্য পাইলেন। দেখেন, গদাধরের বদন দিয়া শত শত প্রেমধারা বহিতেছে। ইহা দেখিয়া নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া গদাধরকে দুই বাহু দিয়া ধরিয়া আপনার কোলে টানিয়া লইলেন ও তাঁহার নয়ন মুছাইতে লাগিলেন। ইহাতে গদাধরের অশ্রু ধারার বেগ আরও বাড়িয়া চলিল। তখন মুকুন্দ আনুপূর্বিক সমুদয় ব্যাপার বলিলেন। কিরূপে গদাধর পূর্বে তাঁহার ভোগ ও বিলাস দেখিয়া মনে মনে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন ও পরে সেই অপরাধ স্খালনের নিমিত্ত তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবেন স্থির করিয়াছেন। বিদ্যানিধি এ কথা শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। বলিতেছেন, "বটে, ইনি আমার নিকট দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন? বহু পুণ্যে এরূপ শিষ্য মিলে। এই সম্মুখে শুক্লাদ্বাদশী আসিতেছে, সেই দিন অবশ্য ইঁহার সঙ্কল্প স্থির করিব।" তখন গদাধর ও মুকুন্দ বিদ্যানিধিকে প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, এবং প্রভুকে বিদ্যানিধির কথা বলিলেন।

সেদিন নিশিযোগে বিদ্যানিধি একাকী মলিন বস্ত্র পরিয়া নিমাইকে দর্শন করিতে চলিলেন। বিদ্যানিধি নবদ্বীপ-অবতারের জনরব মাত্র শুনিয়াছেন, তাঁহাকে কখনো দেখেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে দেখেন নাই, কি তাঁহার সহিত কোন পরিচয় নাই বলিয়া, বিদ্যানিধির মনে এই অবতার সম্বন্ধে একবারও দ্বিধা হয় নাই। নিমাই সেই পূর্ণব্রহ্ম, সেই শ্রীকৃষ্ণ—ইহাই মনে জানিয়া বিদ্যানিধি তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিয়াছেন। সুতরাং ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেছেন,—মনে তাঁহার অনুতাপানল জ্বলিতেছে। ভাবিতেছেন,—তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র হইবার কিছুই করেন নাই। এইরূপ ভাবিয়া মনে মনে অতি দীনভাবে, "প্রভু আমাকে ক্ষমা কর" বলিতে বলিতে প্রভুর সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত। পুণ্ডরীকের অপরূপ মনের অবস্থা এখন ভক্তপাঠক ভাবিয়া দেখুন। তিনি শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সুখ নাই। তাঁহার মনের ভাব এইরূপ—, "শ্রীভগবানকে দর্শন করা আর বিচিত্রতা কি? দর্শন করিলেই ত হয়? কিন্তু তাঁহাকে দর্শনে সুখ কি? অথবা তাঁহাকে কোন্ মুখে দেখিতে যাইব? যিনি আমার সর্বস্ব, তাঁহাকে একেবারে ভুলিয়া আছি। আর এখন তিনি নিকটে আসিয়াছেন বলিয়া দেখা করিতে দৌড়িয়াছি। অবশ্য তিনি দয়াময়, আমাকে মধুর বাক্য ব্যতীত কখনই কর্কশ বাক্য বলিবেন না, কিন্তু আমি নির্লজ্জ!"

পুণ্ডরীক মস্তক অবনত করিয়া প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইলেন। মুখ উঠাইয়া প্রভুকে দেখিবার অবকাশ পাইলেন না, কি সাহস হইল না! প্রভুর নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না, অমনি পড়িয়া গেলেন। একটু সম্বিত পাইয়া করজোড়ে বলিতেছেন, যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে—

"কৃষ্ণরে পরাণ মোর কৃষ্ণ মোর বাপ!
মুঞি অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ।।
সর্ব জগতের বাপ উদ্ধার করিলে।
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলে।।

বিদ্যানিধির এইরূপ আর্তনাদ শুনিয়া উপস্থিত ভক্তগণ কান্দিয়া উঠিলেন। কিন্তু এ ব্যক্তি কে, ইহার নাম কি, তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না। তাঁহার মর্মভেদী আর্তি দেখিয়াই সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

এদিকে ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গ, বিদ্যানিধিকে ভূমে পতিত হইতে দেখিয়া আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করিলেন, আর যদিও তাঁহার সহিত বিদ্যানিধির কখন চাক্ষুষ আলাপ নাই, তবুও যেন তিনি তাঁহার চির-পরিচিত এইরূপে "বাপ এসেছ", "বাপ এসেছ" বলিয়া অগ্রবর্তী হইলেন, এবং বিদ্যানিধিকে হৃদয়ে ধরিয়া, "আজ আমার বাপ পুণ্ডরীককে দেখিলাম, আজ আমার নয়ন জুড়াইল, আজ আমার বাপ আমার হৃদয়ে আসিয়া আমার তাপিত হৃদয় শীতল করিলেন,—" ইহাই বলিতে বলিতে উভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ভক্তগণ দেখিতেছেন যে,—ভগবান পুণ্ডরীকের হৃদয়-মাঝে ছিলেন, অদ্য তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া, যেন সেই ঋণ শোধ দিবার নিমিত্ত, আপনার হৃদয়ে তাঁহাকে ধরিলেন।

উভয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। তাহার পর উভয়ে বাহ্যজ্ঞান পাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "অদ্য আমার বাঞ্ছা সিদ্ধ হইল, আমার বাপকে স্বচক্ষে দেখিলাম।" পুণ্ডরীকও চেতন পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পড়িয়া স্তব করিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া শান্ত করিলেন এবং তৎপরে ভক্তগণের সহিত জনে জনে মিলাইয়া দিলেন। গদাধর তখন সর্বসমক্ষে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি কিরূপে মনে মনে বিদ্যানিধির প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহার পর শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিলেন, "প্রভু, তুমি যদি অনুমতি কর, তবে আমি ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করি!" প্রভু সর্বান্তঃকরণে ইহা অনুমোদন করিলেন। বিদ্যানিধির মহিমা আরকি বলিব! তিনি পুরুষোত্তম আচার্যের সখা ও গদাধরের গুরু। এই পুরুষোত্তমের পরিচয় পরে দিব।

অষ্টাদশ অধ্যায়

কি কহব রে সখি আজুক ভাব। অযতনে মোরে হোয়ল বহুলাভ।।
একলি আছিনু হাম বনাইতে বেশ। মুকুরে নিরিখ মুখ বান্ধল কেশ।।
তৈখনি মিলল গোরা নটরাজ। ধৈরজ ভাঙ্গল কুলবতী লাজ।
দরশনে পুলকে পুরল তনু মোর। বাসুদেব ঘোষ কহে করলহি কোর।

শ্রীনিমাইয়ের ভক্তভাবে ও ভগবদ্ভাবে বহুতর বিভিন্নতা। যখন নিমাইয়ের ভক্তভাব, তখন তিনি দীনের দীন, দাস্যভক্তিতে অভিভূত। গঙ্গায় স্নান করিতে যান, অগ্রে ভক্তিপূর্বক গঙ্গাকে প্রণাম করেন, প্রত্যহ তুলসী প্রদক্ষিণ করেন, ভক্ত দেখিলেই নমস্কার করেন। আবার যখন তাঁহার ভগবদ্ভাব, তখন ভক্তজন সেই গঙ্গাজল দিয়া তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া তুলসী চন্দন লইয়া পূজা করেন, নিমাই কিছুই বলেন না। যখন ভক্ত-ভাব তখন নিমাই ভক্তগণের জনে জনের গলা ধরিয়া, কি অদ্বৈতের চরণ ধরিয়া কাতরভাবে নিবেদন করেন, "আমি কিরূপে উদ্ধার পাইব, শ্রীকৃষ্ণে আমার কিরূপে মতি হইবে, তোমরা বলিয়া দাও।" ভক্তভাবে নিমাই জানু পাতিয়া ভক্তের নিকট দাস্যভক্তি প্রার্থনা করেন। আবার সেই নিমাই ভগবদ্ভাবে শ্রীমূর্তি সমুদয় একপাশে রাখিয়া দিয়া স্বয়ং বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করেন ও তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তগণ চন্দন-তুলসী দিয়া ভগবান বলিয়া পূজা করেন, কিন্তু তাহাতে তিনি আপত্তি না করিয়া বরং সন্তোষ প্রকাশ করেন, এবং আপনি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া

অদ্বৈতের ন্যাড়া মস্তকে শ্রীপাদ তুলিয়া দেন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ভক্তগণ যখন নিমাইকে ভগবান্ বলিয়া জানিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা আবার তাঁহাকে কিরূপে মনুষ্য বলিয়া ভাবিয়া তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতেন? এই প্রকাশের প্রকৃত অবস্থা বিবরিয়া বলিতেছি। যখন নিমাই ভগবান্‌রূপে প্রকাশ পাইতেন, তখন ভক্তগণ তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেন,—তখন তাঁহার দেহ জ্যোতির্ময় হইত। এই জ্যোতিঃ কখন তেজরূপে প্রকাশ পাইত, কখন বা অতি মৃদুভাবে দেখা দিত—এমন কি হঠাৎ উহা লক্ষ্য করা যাইত না। তখন তাঁহার আকার প্রকার ও বদনের ভাব এরূপ ভক্তি-উদ্দীপক হইত যে, তাঁহাকে যে দেখিত তাহারই তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া মনে বিশ্বাস হইত। আবার এমনও হইত যে, নিমাই সামান্য আসনে গদাধর কি নরহরির অঙ্গে হেলান দিয়া ভক্তদের সহিত একত্রে বসিয়া আছেন,—দেহের জ্যোতিঃ অতি মৃদু। ষড়ভুজ কি চতুর্ভুজ কি অন্যান্য বিভব দেখাইতেছেন না, তবুও বাহ্য কি আন্তরিক ভঙ্গী এরূপ হইয়াছে যে, নিকটে যিনি আছেন, তিনিই তাঁহাকে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি বলিয়া দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করিতেছেন।

একটু পরে নিমাই তাঁহার ভগবদ্ভাব লুকাইলেন। তখন নিমাই আর ভগবান রহিলেন না, একজন পরম ভক্তরূপে প্রকাশ হইলেন; আর "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া এমন করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন যে, যাঁহারা উহা শুনিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, সে কাতরধ্বনি শুনিলে পাষাণ পর্যন্ত গলিয়া যাইত। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তখন তিনি এরূপ কাতর হইতেন যে, সদ্য পুত্র-শোকার্তও তত কাতর হইতে পারেন না। তখন তাঁহার মূর্চ্ছার উপর মূর্চ্ছা হইতেছে, কথায় কথায় দাঁত লাগিতেছে, কথায় কথায় নিশ্বাস রুদ্ধ হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার নিমিত্ত তিনি যেরূপ করিতেন, তাহা দেখিয়া বোধ হইত যে, শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে তদ্দণ্ডেই তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। তিনি তখন ভক্তগণের গলা ধরিয়া কান্দিয়া বলিতেন, "কৃষ্ণ আনিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও,—আমার প্রাণ যায়! আমাকে বুঝি তোমরা আর প্রাণে বাঁচাইতে পারিলে না!" ভক্তগণও তখন প্রভুর প্রাণ বাহির হইল বলিয়া মহাব্যস্ত হইতেন। প্রভুর এইরূপ ভাব যদিও তাঁহারা প্রত্যহ দেখিতেন, তবুও প্রত্যহই ভাবিতেন,—'আজ বুঝি প্রভু আর বাঁচিলেন না!' যদি কোন ব্যক্তি নিমাইয়ের অপ্রকাশ অবস্থায় তাঁহাকে ভগবানের ন্যায় কি অতিরিক্ত ভক্তি করিতেন, তবে তিনি এত ক্লেশ পাইতেন যে, তাঁহাকে কোন ব্যক্তি কোনরূপ অসম্ভব শ্রদ্ধা দেখাইতে সাহসী হইতেন না।

অপ্রকাশ অবস্থায় নিমাই এরূপ ভাব দেখাইতেন যে, তিনি প্রকাশ অবস্থায় যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহা যেন তাঁহার কিছুই স্মরণ নাই, কি স্বপ্নের মত কিছু কিছু মনে আছে। কারণ, তিনি প্রকাশ অবস্থার পরেই প্রায় ভক্তগণকে ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "ভাই! তোমরা আমার চিরসুহৃদ! অচেতন হইয়া আমি ত কোন প্রলাপ বকি নাই? আমি যদি অচেতন অবস্থায় তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকি তোমরা কৃপা করিয়া ক্ষমা করিবে,—আমার এ দেহ তোমাদের। আর যদি আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণে কোন অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন তোমরা আমাকে সতর্ক করিও, যেন আমার কোনরূপ কুমতি না হয়,—কারণ আমি আমার স্ববশে নাই।" ইহাতে বোধ হইত তাঁহার কিছু কিছু মনে থাকিত। "কুমতি না হয়" ইহার অর্থ এই যে, "আমি কৃষ্ণ" এরূপ অভিমান যেন আমার কখন না হয়।

ভক্তগণ সকল কথা গোপন করিয়া বলিতেন যে, তিনি কিছু চাঞ্চল্য করেন নাই। তাঁহারা নিমাইয়ের তখনকার সেই আর্তি দেখিয়া ভাবিতেন যে, যদি তাঁহারা নিমাইকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলেন, অর্থাৎ তিনি বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া ভগবানের পূজা লইয়াছেন, এ কথা জ্ঞাত করেন, তবে অনর্থ ঘটিবে,—হয়ত নিমাই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। এই সব ভাবিয়া নিমাইয়ের অপ্রকাশ অবস্থায় সকলে তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন বটে, কিন্তু ভগবান্‌রূপে ভক্তি করিতেন

না। কেহ কেহ বা প্রকাশ অবস্থায় তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া ভাবিতেন, আবার অপ্রকাশ অবস্থায় তাহা ভুলিয়া যাইয়া, তাঁহাকে শুদ্ধ একজন ভক্তমাত্র মনে করিতেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণলীলার একটি কাহিনী মনে উদয় হইতেছে।

শ্রীনন্দের কোলে শ্রীকৃষ্ণ ঘুমাইয়া। নন্দের নিদ্রা হইতেছে না, তিনি তাঁহার পুত্রের শিশুকালাবধি সমুদয় অলৌকিক কার্যের কথা ভাবিতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে তিনি দিব্য বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার শিশুপুত্র তাঁহার পুত্র নহেন, স্বয়ং শ্রীভগবান্। মনে এই ভাব হইবামাত্র তাঁহার ভয় হইল, তখন উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিবেন ইহারই উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ সমুদয় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ভুলাইবার নিমিত্ত একটি ছল পাতিলেন। ঠিক সেই সময় একটি বিড়াল ডাকিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ সেই ডাক লক্ষ্য করিয়া যেন ভয় পাইয়া "বাবা ও কি ডাকে, আমার ভয় করে" বলিয়া নন্দকে জড়াইয়া ধরিলেন। নন্দ অমনি সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। তখন কৃষ্ণকে কোলে করিয়া বলিতেছেন, "ভয় কি বাপ? এই যে আমি আছি।"

এইরূপে ভক্তগণ নিমাইয়ের প্রকাশাবস্থায় তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিয়া, তাঁহার অপ্রকাশাবস্থায় পূর্বেকার কথা ভুলিয়া যাইতেন। কেহ অল্প ভুলিতেন, কেহ অধিক ভুলিতেন, কেহ বা একেবারে ভুলিতেন। যথা, শচীমা নিমাইকে গর্ভে ধারণ ও পালন করিয়াছিলেন, তিনি নিমাইয়ের ঐশ্বর্য দেখিয়া ক্ষণিক ভুলিতেন মাত্র, আবার তাঁহার নিমাইয়ের উপর বাৎসল্য ভাবের উদয় হইত। যাঁহারা অল্প ভুলিতেন, তাঁহারা মনে মনে তর্ক করিতেন যে, নিমাই কি সত্যই শ্রীভগবান্? না স্বপ্নে দেখিলাম? যাঁহারা অধিক ভুলিতেন, তাঁহারা মনে সাব্যস্ত করিতেন যে, নিমাইয়ের অদ্ভুত শক্তি, যেন স্বয়ং শ্রীভগবান্। শ্রীঅদ্বৈতের মনের ভাব বহুকাল ধরিয়া এইরূপই ছিল। যখন তিনি নিমাইয়ের সম্মুখে আসিতেন তখন শ্রীভগবান্ বলিয়া পূজা করিতেন; কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে দূরে গিয়া মনের মধ্যে নানাবিধ তর্ক দ্বারা সাব্যস্ত করিতেন যে, কল্যকার নিমাই, জগন্নাথের পুত্র সে কিরূপে শ্রীভগবান্ হইবে? মুকুন্দও এইরূপ একজন ছিলেন। নিমাই আম্র-মহোৎসব করিতেন। একটি আম্রের আঁটি সম্মুখে রাখিয়া জোরে করতালি দিতেন। দেখিতে দেখিতে ঐ আঁটি হইতে বৃক্ষ হইত ও ঐ বৃক্ষে প্রায় দুইশত উত্তম আম্রফল ধরিত, আর ভক্তগণ ঐ ফলগুলি শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতেন। এইরূপ প্রত্যহ আম্র-মহোৎসব হইত। একদিন শ্রীনিমাই শ্রীভগবদ্ভাবে মুচকি হাসিয়া মুকুন্দকে বলিতেছেন, "মুকুন্দ! তুমি নাকি এই আম্র-মহোৎসবকে ইন্দ্রজাল বল?" মকুন্দ লজ্জা পাইয়া "আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ নিমাইয়ের অপ্রকাশ সময়ে তাঁহাকে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন মাত্র ভাবিতেন। কিন্তু প্রকাশের সময় ঐরূপ ভাবিতে কাহারও সাধ্য হইত না। এমন কি, তখন অনায়াসে গঙ্গাজল লইয়া তাঁহার চরণ ধুতে কাহারও শঙ্কা হইত না। তাঁহারা যে শ্রীনিমাইয়ের পদে গঙ্গাজল-তুলসী দিয়া পূজা করিতেন, ইহাই অব্যর্থ প্রমাণ যে, তখন নিমাইয়ের ভগবত্তায় তাঁহাদের তিলমাত্র সন্দেহ থাকিত না।

এখন আর এক কথা হইতেছে। নিমাই কি অসরল? তাহা না হইলে—একবার "আমি সেই" বলিয়া, আবার মুহূর্ত পরে ভক্তগণের নিকট দীনভাবে "কৃষ্ণ পাইলাম না" বলিয়া, রোদন করিতেন কেন? নিমাই অসরল নহেন। অসরল হইলে এইরূপ বঞ্চনা বরাবর চলিত না। যখন নিমাই বলিতেন, "আমি সেই", তখন ভক্তগণ বুঝিতেন, নিমাই সরল ভাবেই বলিতেছেন। আবার যখন বলিতেন, "আমাকে কৃষ্ণ দিয়া প্রাণে বাঁচাও", তখনও ভক্তগণ মুখ দেখিয়া বুঝিতেন, নিমাই সরল ভাবেই আর্তি করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, শ্রীনিমাই যখন ভগবদ্ভাব লুকাইতেন, তখন ঐশ্বর্যভাবও চলিয়া যাইত, এবং নিমাই ভক্তভাবে দীন হীন কাঙ্গালের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে রোদন করিতেন।

একদিন সকালে স্নানাহ্নিকের পর নিমাই শ্রীবাসের বাড়ীতে বসিয়া আছেন। ভক্তগণ একে একে আসিয়া মিলিলেন। সকলে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন, শ্রীনিমাই ভগবদ্ভাবে প্রকাশ পাইয়াছেন। তখন সকলে সভয়ে প্রভুর বদন পানে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে প্রভু কীর্তন করিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন সকলে কীর্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে দিবসে একটি অদ্ভুত ঘটনা হইল, যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে—

"অন্য অন্য দিন প্রভু নাচে দাস্যভাবে।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য প্রকাশিয়া পুনঃ ভাঙ্গে।।
সকল ভক্তের ভাগ্যে এ দিন নাচিতে।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে।।
আর সব দিনে প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া।।
সাত প্রহরিয়া ভাবে ছাড়ি সর্ব মায়া।
বসিলা প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হৈয়া।।"

ইহার তাৎপর্য এই যে, অন্যান্য দিন নিমাই পূর্বে অচেতন হইতেন ও সেই অবস্থায় বিষ্ণুখট্টায় বসিতেন। কিন্তু সে দিবস যেমন বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছিলেন, অমনি আস্তে আস্তে উঠিয়া সচেতন অবস্থায় খট্টায় বসিলেন।

সেদিন শ্রীভগবান্ সাত প্রহর প্রকাশ ছিলেন। অন্যান্য দিন অল্পক্ষণ প্রকাশ হইয়া লুকাইতেন, কিন্তু সে দিবস প্রভু প্রাতে এক প্রহরের সময় প্রকাশ হইয়া, পর দিবস সূর্যোদয়ের পূর্বে অপ্রকাশ হইলেন। ইহাকে "সাত প্রহরিয়া ভাব" বা "মহাপ্রকাশ" বলে।

তখন প্রভুর বহুতর ভক্ত হইয়াছেন। সকলে সমুদয় কার্য ছাড়িয়া তাঁহার নিকট দিবানিশি থাকেন। খট্টায় বসিয়া প্রভু আপনাকে অভিষেক করিতে ভক্তগণকে আজ্ঞা করিলেন। সকলে গঙ্গায় জল আনিতে দৌড়িলেন। শত শত ঘট জল আসিয়া শ্রীবাসের আঙ্গিনা পুরিয়া গেল। স্ত্রী পুরুষে, দাস দাসীতে জল আনিতেছে। প্রভু উত্তম পিঁড়ির উপরে স্নান-মণ্ডপে বসিয়া আছেন। গদাধর ও মুরারি এবং গর্বিতা নারীগণ তাঁহাকে সুগন্ধি তৈল মাখাইতেছেন। পাছে শ্রীভগবানের মস্তকে রৌদ্র লাগে, এই নিমিত্ত নিত্যানন্দ ছত্র ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীবাসের দাসী 'দুঃখী' শীঘ্র জল বহিয়া আনিতেছে, কলসী রাখিয়া পরিশ্রমে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়িতেছে, প্রভুর বদন দেখিতেছে, ও নয়ন জলে ভাসিয়া যাইতেছে। প্রভু কৃপা করিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণকে বলিলেন,—"অদ্যাবধি আমি উহার নাম 'দুঃখী' স্থানে 'সুখী' রাখিলাম"। সকলে আনন্দিত হইয়া দুঃখীর ভাগ্যকে শ্লাঘা করিতে লাগিলেন। সুখী লজ্জা পাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কান্দিয়া আবার জল আনিতে গেল। পরে বাদ্য-কোলাহলের, অভিষেকের গীতের ও নারীগণের হুলুধ্বনির মধ্যে নিমাইয়ের মস্তকে সকলে জল-সেচন করিলেন। বাসুঘোষ সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বর্ণনা শ্রবণ করুন ঃ

"তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কুম কস্তুরী।
গোরা অঙ্গে লেপন করে নব নব নারী।।
সুবাসিত জল আনি কলসী পূরিয়া।
সুগন্ধি চন্দন আনি তাহে মিশাইয়া।।
জয় জয় ধ্বনি দিয়া ঢালে গোরা গায়।
শ্রীঅঙ্গ মুছাএগ্রা কেহ বসন পরায়।।
সিনান মণ্ডপে দেখ গোরা নটরায়।
মনের হরিষে বাসুদেব ঘোষ গায়।।

আর একটি গীত শ্রবণ করুন ঃ

"শঙ্খ দুন্দুভি বাজায়ে সুস্বরে।
গোরাচাঁদের অভিষেক করে সহচরে।।
গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ দীপ জ্বালি।
নগরের নারীগণ আনে অর্ঘ্যথালি।।
নদীয়ার লোক যত দেখে আনন্দিত।
ঘন জয় জয় দিয়া সবে গায় গীত।।
গোরাচাঁদের মুখ সবে করে নিরীক্ষণে।
গোরা অভিষেক রস বাসুঘোষ ভণে।।"

এই সময় প্রধান লোকের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের যে বহুতর ভক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম করিতেছি, যথা—দুই প্রভু (নিতাই ও অদ্বৈত), গদাধর, শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ, নরহরি, গঙ্গাদাস, প্রভুর মাসীপতি চন্দ্রশেখর, প্রভুর চিরদিনের সঙ্গী পুরুষোত্তম আচার্য (স্বরূপ দামোদর), বক্রেশ্বর, দামোদর, জগদানন্দ, গোবিন্দ, মাধব, বাসুঘোষ সারঙ্গ ইত্যাদি। হরিদাসও তখন প্রভুর শরণাগত হইয়াছেন। হরিদাসের কাহিনী এখানে কিছু বলিতেছি ঃ

হরিদাসের বাড়ী ছিল এখনকার বনগ্রাম মহকুমার অধীন বুঢ়ন গ্রামে। ইনি ব্রাহ্মণের পুত্র,— পিতৃ-মাতৃহীন বলিয়া মুসলমান কর্তৃক প্রতিপালিত কাজেই হরিদাস মুসলমান। কিন্তু হরিদাস ক্রমে পরম সাধু হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভজন হইল, উচ্চ করিয়া প্রায় দিবানিশি কেবল হরিনাম জপ করা। হরিনামে তাঁহার ভক্তির কথা কি বলিব! তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস, যে কোন ব্যক্তি কোন গতিকে হরিনাম করিলেই তরিয়া যাইবে। নাম-জপ করা ত দূরের কথা, তাঁহার বিশ্বাস, নাম শুনিলেও জীব উদ্ধার হইয়া যাইবে,—শুদ্ধ মনুষ্য নয়, জীবমাত্রেই। এইজন্য তিনি উচ্চ করিয়া নাম জপিতেন। তিনি বেনাপোলের জঙ্গলে (বনগ্রামের নিকট, এখন যেখানে রেলওয়ে ষ্টেশন) কুটির বান্ধিয়া এইরূপে নামগ্রহণ করিতেন। তাঁহার কঠোর ভজন দেখিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য সেখানকার দুষ্ট জমিদারের ইচ্ছা হইল। এই নিমিত্ত সে একজন বেশ্যাকে তাঁহার নিকট পাঠাইল। বেশ্যা আসিয়া হরিদাসকে দেখিবামাত্র তাহার মন নির্মল হইল। তখন সে হরিদাসের চরণে শরণ হইল। হরিদাস তাহাকে কুটীরে বাস করাইয়া ও হরিনাম করিবার উপদেশ দিয়া, সেই দুষ্ট জমিদারের অধিকার ছাড়িয়া স্থানান্তরে গেলেন।

এদিকে মুসলমান কাজী মুলুকপতির কর্ণে এ কথা গেল যে, হরিদাস মুসলমান-ধর্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু হইয়াছেন। কাজী ইহা শুনিয়া ঠাকুর হরিদাসকে ধরিয়া লইয়া গেল। হরিদাস মুলুকপতির মন দ্রব করিলেন। কিন্তু তাহার মন্ত্রী গোরাই কাজীর মন বজ্র-সমান কঠিন রহিল। এই গোরাই কাজী মুলুকপতিকে বলিল, "হরিদাসকে যদি দণ্ড না করেন, তবে মুসলমানদিগের বড় অপমান হইবে।" মুলুকপতি শেষে বাধ্য হইয়া হরিদাসকে দণ্ড দিতে স্বীকার করিলেন। দণ্ডাজ্ঞা হইল প্রাণবধ, কিন্তু যেন তেন প্রকারে প্রাণবধ নয়—তাঁহাকে বাইশ বাজারে লইয়া প্রত্যেক বাজারে বেত্রাঘাত করিতে হইবে, এবং এইরূপ বেত্রাঘাতে তাঁহার প্রাণবধ করিতে হইবে। এ দণ্ড এমন কঠোর যে, দুই তিন বাজারে বেত মারিতে মারিতেই অপরাধীর প্রাণ বাহির হইয়া যাইত।

তখন গোরাই কাজী হরিদাসকে বলিল, "যদি তুমি এখনও কলমা পড় আর হরিনাম ছাড়, তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব, আর সম্মানের সহিত রাজ সরকারে রাখিব।" হরিদাস সদর্পে বলিলেন, যথা চৈতন্যভাগবতে— "খণ্ড খণ্ড হয়ে যদি যায় দেহপ্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম।।"

তখন হরিদাসকে বেত্রাঘাত করিতে লইয়া চলিল। হরিদাস হরিনাম করিতে লাগিলেন। হরিদাসের অঙ্গে বেত্রাঘাত হইতে লাগিল। কিন্তু পাঠক মহাশয় মনে ক্লেশ পাইবেন না, হরিদাসের

পৃষ্ঠে বেত্র পড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি একটুও দুঃখ পাইতেছিলেন না। হরিদাস শ্রীভগবানের বড় প্রিয়। এই অবতারে তাঁহার এক একজন ভক্তদ্বারা এক এক ভজনাঙ্গের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছিলেন। নাম মাহাত্ম্য হরিদাস দ্বারা দর্শাইয়াছিলেন। সেই হরিনামের নিমিত্ত তিনি বেত্র খাইতেছেন, তাঁহার আনন্দের অবধি নাই। কাজেই বেত্রের আঘাতে তাঁহার অঙ্গে ব্যথা লাগিতেছে না। স্ত্রী-পুত্রকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি অঙ্গে আঘাত লাগে, তাহাতে ব্যথা লাগে না। হরিদাসের নিকট হরিনাম স্ত্রী পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়। বিশেষতঃ হরিদাসের যে অবস্থা, ইহাতে তিনি বেদনা পাইলে শ্রীহরিকে কে ভজনা করিবে? অনেকে ভগবানের নাম করিয়া প্রাণ দিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে ভগবানের জন্য নহে। শ্রীভগবানের নিমিত্ত প্রাণ দেওয়া যায় না, কারণ প্রাণ দিতে গেলেই তিনি রক্ষা করেন। দেখা যায়, যাঁহারা ভগবানের নামে প্রাণ দিয়াছেন, সে ভগবানের নিমিত্ত নয়, দণ্ড কি অহঙ্কারের জন্য।

হরিদাস ভাবিতেছেন, "এরা কি মহাপাপী! আমি ত ইহাদের কাছে কোন অপরাধ করি নাই তবে আমাকে এরূপ নির্দয়তার সহিত প্রহার কেন করিতেছে? ইহাদের উপায় কি হইবে?" তখ "ইহাদের উপায় কি হইবে" ভাবিয়া হরিদাস এরূপ অভিভূত হইয়াছেন যে, তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। তিনি সেই বেত্রধারী হত্যাকারিগণের মঙ্গল কামনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরির নিকট এইরূপ নিবেদন করিতে লাগিলেন,—"প্রভু! আমাকে মারিয়া ইহারা কুকর্ম করিতেছে। এই কুকর্মে ইহাদের দুর্গতির একশেষ হইবে। প্রভু, ইহাদের দুর্গতির আমিই কারণ হইলাম। প্রভু, তোমাকে ভজন করাব কি এই ফল? তুমি কৃপা করিয়া তোমার এই নির্বোধ জীবগণকে পরিত্রাণ কর।"

এরূপ অদ্ভুত প্রার্থনা করাতে, যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল এবং যাহারা তাঁহাকে প্রহার করিতেছিল, সকলেই স্তম্ভিত হইল। শ্রীভগবান্ হরিদাসের প্রতি কৃপার্ত হইয়া তাঁহাকে ধ্যানানন্দ দিলেন ও সেই আনন্দে হরিদাস অচেতন হইলেন। মুসলমানগণ তখন তাঁহাকে মৃত ভাবিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া চলিয়া গেল। হরিদাস চেতনা পাইয়া তীরে উঠিলেন। তাহার পর শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গ পাইয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিলেন। ক্রমে নিমাইয়ের কথা শুনিয়া নবদ্বীপে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। হরিদাস ভুবনবিখ্যাত ভক্ত, সকলে তাঁহার নাম শুনিয়াছেন। হরিদাস আসিলে ভক্তগণ তাঁহাকে নিমাইয়ের নিকট লইয়া গেলেন। নিমাই তাঁহাকে দেখিয়া অতি আদর করিয়া বসিতে আসন দিলেন। যদিচ তখন হরিদাস সম্পূর্ণরূপে নিমাইকে আত্মসমর্পণ করেন নাই, তবু তিনি আসনে কোন ক্রমে বসিলেন না, বরং সেই আসন মস্তকে ধরিলেন। পরে নিমাই তাঁহাকে উত্তম করিয়া ভোজন করাইলেন, করাইয়া স্বহস্তে তাঁহার অঙ্গে চন্দন ও গলায় ফুলের মালা দিলেন। নিমাই হরিদাসকে সেবা করিলেন বটে, কিন্তু হরিদাসও সেই সময় নিমাইয়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন।

এইরূপে যেখানে যত ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা যত বড়ই হউন না কেন, সকলে আসিয়া সেই তেইশ বৎসরের ব্রাহ্মণকুমারকে মন প্রাণ দেহ অর্পণ করিলেন। এই হরিদাসের চরিত্র স্বরণে ভুবন পবিত্র হয়। তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়াছিলেন। আবার শ্রীঅদ্বৈত হরিদাসকে লইয়া নবীন ব্রাহ্মণকুমারের শরণ লইলেন। যেমন ক্ষুদ্র নদী বড় নদীতে প্রবেশ করে, আর বড় নদী এইরূপ অনেক ক্ষুদ্র নদীসহ সাগরে প্রবেশ করে,—সেইরূপ তখনকার বৈষ্ণবগণের রাজা শ্রীঅদ্বৈত, হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণকে লইয়া, সেই ব্রাহ্মণবালক শচীনন্দনের চরণে আশ্রয় লইলেন। সেই মহাপ্রকাশের দিন অদ্বৈত ও হরিদাস সেখানে উপস্থিত।

প্রভুর স্নান হইলে অতি সূক্ষ্ম ধৌতবস্ত্রে তাঁহার অঙ্গ মুছিয়া দেওয়া হইল। তখন সকলে প্রভুকে উত্তমবস্ত্র পরাইয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে পূর্বেই বিষ্ণুখট্টা রাখা হইয়াছে, আর উহাতে মনোহর দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাতা রহিয়াছে। নিমাই সেই খট্টায় বসিলেন। ঘরে পর্দা দেওয়ায়

অভ্যন্তরে একটু অন্ধকার হইয়াছে, তবে তাঁহার অঙ্গের আভায় ঘর প্রায় দিবার ন্যায় আলোকিত। অঙ্গের তেজ দিবাকরের ন্যায় প্রখর হইলেও উহা লক্ষ চন্দ্রের কিরণের ন্যায় সুশীতল। যেমন সকলে অভিষেকানন্দে উন্মত্ত, গদাধর তখন ফুলের মালা ও ভূষণ প্রস্তুত করিতেছেন। নিমাই খট্টায় বসিলে, তিনি তাঁহার মুখ তিলকে সুশোভিত করিলেন। পরে তাঁহার মস্তকে ও গলায় ফুলের মালা, অঙ্গুলিতে ফুলের অঙ্গুরী, বাহুযুগলে ফুলের তোড়া দিয়া নিমাইকে সাজাইলেন। নিত্যানন্দ শিরে ছত্র ধরিলেন এবং শ্রীখণ্ডের নরহরি চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন।

মনে ভাবুন, যদি অতি ঐশ্বর্যসম্পন্ন কোন মহারাজা হঠাৎ কোন দরিদ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েন, তবে সেই কাঙ্গাল শ্রীমহারাজকে কিরূপে সেবা করিবে ভাবিয়া দিশেহারা হয়। সে ব্যস্ত হইয়া মাদুর পাতিয়া দেয়, আর ভগ্ন পাখা দ্বারা তাঁহাকে বাতাস দিতে থাকে। ঘরে যদি চিপিটক কি মুড়ি থাকে, তবে উহা আনিয়া সম্মুখে ধরে। তখন সেই মহারাজ যদি মহাশয় ব্যক্তি হয়েন, তবে তিনি এ কথা বলেন না যে, "ছি! আমি এরূপ মাদুরে কিরূপে বসিব, কিংবা আমি মুড়ি কিরূপে খাইব?" তাহা না করিয়া তিনি সেই মাদুরে উপবিষ্ট হয়েন, হইয়া সেই দরিদ্রকে বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করেন যে, মাদুরে বসিয়া তিনি বড় আরাম পাইতেছেন। সেইরূপ শ্রীভগবান্ অতি বড় মহাশয়। শুনিয়াছি দুর্বল জীবে তাঁহাকে যে সমস্ত সেবা করে তাহা দেখিলে তাঁহার হৃদয় দ্রব হয় ও তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন।

আবার দরিদ্র ব্যক্তি যদি ধনবান লোককে নিমন্ত্রণ করেন, তবে কি তিনি উহা গ্রহণ করেন না? তখন কি তিনি বলেন, "আমাব অভাব কি যে তোমার বাড়ী ভোজন করিতে যাইব?" তিনি কি বাড়ীতে উত্তম দ্রব্য ভোজন করেন বলিয়া দরিদ্রের অন্ন গ্রহণ করিয়া মুখ বিকৃত করেন? ধনবান ব্যক্তি যদি মহাশয় হযেন, তবে তিনি দরিদ্রের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, আর তাহার সেই সামান্য ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া অতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কিন্তু যিনি যত বড় মহাশয় হউন, শ্রীভগবানের ন্যায় মহাশয় ত্রিজগতে আব কেহ নাই। সুতরাং জীবগণ তাঁহাকে যথাসাধ্য সেবা করিলে, তিনি তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া একথা বলেন না যে, "তোমরা আমায় কি আর দিবে? এ সমুদয় ত আমারই দ্রব্য।" কারণ তিনি ত্রিজগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মহাশয়, মধুর-প্রকৃতি ও মধুর-ভাষী।

খট্টায় উপরে উত্তম শয্যায় নিমাই বসিয়া চন্দ্রমুখে মধুর হাসিয়া ভক্তগণকে শুধু যে অভয় দিতেছেন এরূপ নহে, একেবারে তাহাদের চিত্ত হরণ করিতেছেন। নিমাই যাহার পানে চাহিতেছেন, তাহার চিত্ত কাড়িয়া লইতেছেন। আর সেই ব্যক্তি আপন চিত্তকে তল্লাস করিতে গিয়া দেখিতেছেন যে, খট্টায় যিনি বসিয়া আছেন, তিনি বাহিরেও বসিয়া আছেন, আবার তাঁহার হৃদয়ের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছেন।

ভক্তগণ পরমানন্দে ভাসিতেছেন। শ্রীভগবান্ সম্মুখে বসিয়া। সকলের তাঁহাকে পূজা করিতে ইচ্ছা হইল। তুলসী, চন্দন, ফুল, বস্ত্র, স্বর্ণ, ধাতুপাত্র দিয়া যাঁহারা যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ পূজা করিতে লাগিলেন।

"পরম প্রকট রূপ প্রভুর প্রকাশ।
দেখি পরমানন্দে ডুবিলেন সর্বদাস।।
সর্বমায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র।
শ্রীচরণ দিলেন—পূজয়ে ভক্তবৃন্দ।।
দিব্য গন্ধ আনি কেহ লেপে শ্রীচরণে।
তুলসী কমলে মেলি পূজে কোন জনে।।
কেহ রত্ন সুবর্ণ রজত অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া দিয়া করে নমস্কার।।

পট্ট, নেত, শুক্ল, নীল, সুপীত বসন।
পাদপদ্মে দিয়া নমস্কারে সর্বজন।।"—চৈতন্যভাগবত।

এইরূপে শত শত জনে শ্রীচরণে ফুল ঢালিতেছেন, আর গলায় ফুলের মালা দিতেছেন। শত শত জনে মন্ত্র পড়িতেছেন, কি স্তব করিতেছেন; কিন্তু পরস্পরে হুড়াহুড়ি হইতেছে না। সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত এই যে, পরস্পরে কেহ কাহারও সংবাদ লইতেছে না। সকলেরই অচেতন অবস্থা। পার্শ্বে যে তাঁহার সহচরগণ আছেন, তাহা কাহারও লক্ষ্য নাই। সকলেই ভাবিতেছেন, ঘরে কেবল তিনি আর শ্রীভগবান্, শুধু তা নয়, তিনি ভগবানের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, আর ভগবান্ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। এত লোক যে কলরব করিতেছে, ইহা কেহ শুনিতেই পাইতেছেন না; শত জনে কথা বলিতেছেন, আর শতজনেরই সহিত যেন শ্রীভগবান্ কথা বলিতেছেন।

যাঁহার যেরূপ স্ফূর্তি হইতেছে, তিনি সেইরূপ প্রভুকে আহ্বান করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, "প্রভু!" কেহ বলিতেছেন, "নাথ!" কেহ বলিতেছেন, "ঠাকুর!" কেহ ফুলের মালা হাতে করিয়া বলিতেছেন, "ফুলের মালা ধর, গলায় পর।" তখন প্রভু, তাঁহার গলায় যে মালা ছিল তাহা সেই ভক্তকে নিজ হস্তে পরাইতেছেন, আর আপনি মস্তক অবনত করিয়া ভক্তকে মালা পরাইতে দিতেছেন। কেহ দৌড়িয়া বাজার হইতে একখানি উত্তম পট্টবস্ত্র ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। শ্রীনিমাইকে উহা দিয়া সেই ভক্ত বলিতেছেন, "এই বস্ত্র পরিধান কর।" নিমাইয়ের পরিধানও পট্টবস্ত্র। তিনি সেই বস্ত্রখানি পরিধান করিতেছেন, আর পরিধেয় বস্ত্রখানি সেই ভক্তকে দিতেছেন। ভক্ত সেই বস্ত্র-প্রসাদ পাইয়া মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এইরূপে ভক্তগণ যেমন উপহার দিতেছেন, তেমনি উপহার পাইতেছেন। যেমন উপহার উপস্থিত হইতেছে, প্রভু অমনি উহা বিতরণ করিতেছেন। শ্রীভগবান কাহারও নিকট ঋণী থাকিতেছেন না।

অনেকে আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছেন, নিবেদন করিয়াও দিতেছেন। কিন্তু তাহাদের ইচ্ছা যে, শ্রীভগবান্ তাঁহাদের সাক্ষাতে উহা ভোজন করেন। তখন নিমাই হাত পাতিয়া আহার চাহিলেন, আর ভক্তগণ যেন বাঁচিলেন। এ পর্যন্ত কিরূপে ভগবানের সেবা করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া সকলে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে ভক্তগণ খাওয়াইতে লাগিলেন। প্রভু ভোজন করিবেন শুনিয়া অনেকে নগরে দৌড়িলেন। যিনি যে ভাল দ্রব্য পাইলেন, অমনি তাহা প্রভুর নিমিত্ত ক্রয় করিলেন। জ্যৈষ্ঠমাস, ফলের অভাব নাই; আবার নদীয়া নগরে সন্দেশ, দুগ্ধ, ক্ষীর, দধি, ছানারও অভাব নাই। যদিও নারিকেল তত সুলভ নয়, তবুও জ্যৈষ্ঠমাসের দুই প্রহরের সময় নারিকেলের জলে শর্করা মিশাইয়া প্রভুকে পান করাইতে সকলেরই ইচ্ছা হইতেছে। এই নিমিত্ত শত শত ডাব উপস্থিত। উত্তম সুপক্বকত শত চাঁপা কলার কাঁদি, ঝুড়ি ঝুড়ি আমি ইত্যাদি আনা হইল। বলা বাহুল্য, শ্রীবাসের ঘর এইরূপে পুরিয়া গেল। যিনি যাহা আনিয়াছেন, তাহার ইচ্ছা প্রভুকে উহা সমুদয় খাওয়াইবেন; প্রভু একটুও রাখিতে পারিবেন না;—রাখিলে ভক্ত মাথা কুটিয়া মরিবেন। একজন আম কাটিয়া প্রভুর হস্তে দিলেন, প্রভু তাহা খাইলেন। একজন একটী ক্ষীরের পাত্র ধরিলেন, প্রভু খাইলেন। একজন পাথরের বাটি করিয়া ডাবের জল দিলেন, প্রভু পান করিলেন। এখন বিবেচনা করুন, ভগবান্-কাচ-কাচন সহজ ব্যাপার নহে। নিমাই তখন ভগবান্, কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারেন না।

"দেখিয়া প্রভুর অতি আনন্দ প্রকাশ।
দশ বার পাঁচ বার দেয় কোন দাস।।"চৈতন্যভাগবত।

মনে ভাবুন, শ্রীভগবান্ বসিয়া ভক্তগণ পরিবেষ্টিত। একজনের দ্রব্য লইবেন, আর একজনের লইবেন না,—ইহা সম্ভব নয়। তিনি ত জগন্নাথ। সকল জগতের নাথ। কাজেই নিমাই কাহাকেও 'না' বলিতে পারেন না। আবার একজন সন্দেশ খাওয়াইয়া পরে আম দিতেছেন। মানুষে কি মিষ্টি খাইয়া টক খাইতে পারে। আমরা তোমরা তোমরা হইলে বলিতাম, "আমাকে ক্ষমা দাও, আমি আর খাইতে পারি না," কি "এই মিষ্ট খাইলাম, আবার কিরূপে আম খাইব? আমাকে কত

খাওয়াইবে? আমার উদরে কত ধরিবে?" কিন্তু ভগাবন, যিনি বিশ্বম্ভর, তিনি কিরূপে বলিবেন, "আমি আর খাইতে পারি না?" আবার ভক্ত কোন দ্রব্য হাতে দিলে তাহা তিনি কিরূপে ফেলিয়া দিবেন? তাহা হইলে তাঁহার ভক্তবৎসল নামে কলঙ্ক হয়, সুতরাং যিনি যাহা দিতেছেন, নিমাই সমুদয় ভোজন করিতেছেন। যথা চৈতন্যভাগবতে--

সহস্র সহস্র ভাণ্ডে দধি ক্ষীব দুগ্ধ।
সহস্র সহস্র কান্দি কলা কত মুদ্গ।।
কতেক বা সন্দেশ কতেক বা ফলমূল।
কতেক সহস্র বাটা কর্পূর তাম্বুল।।
কি অপূর্ব শক্তি প্রকাশিলা গৌবচন্দ্র।
কেমনে খায়েন নাহি জানে ভক্তবৃন্দ।।"

কোন ভক্ত সেখানে উপস্থিত না থাকিলে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিতেছেন। কখন আনন্দে পবিপূর্ণ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, কিছুই করিতেছেন না, কাহাবও প্রতি দৃষ্টিপাত কবিতেছেন না, এবং কাহারও বাক্য শ্রবণ করিতেছেন না। তখন ভক্তগণ যাঁহার যাহা ইচ্ছা করিতেছেন। আনন্দে পরিপূর্ণ বলি কেন? না, যাঁহারা বদন দেখিতেছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই বস্তু, বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া আছেন, ইঁহার কোন দুঃখ নাই, কেবল আনন্দ। আর সে আনন্দের ক্ষয় নাই, অন্ত নাই। ভক্তগণ দেখিতেছেন, যেমন সমুদ্রের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আইসে, সেইরূপ প্রভুর বদনে আনন্দের উপর আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে, আর সেই আনন্দে যেন তিনি টলমল করিতেছেন। তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন তিনি কত আদরের ধন; আর তিনি যে আদরের ধন তাহা তিনি জানেন। কখন মুরলীর রব করিতেছেন, আব ভক্তগণের প্রেমানন্দ ধাবা পড়িতেছে। যখন ভগবান্ কোন কথা বলিতেছেন, তখন সকলে নীরব হইয়া কাণ পাতিয়া শ্রবণ কবিতেছেন। সে কথা সঙ্গীত হইতেও মধুর।

মহাপ্রকাশের দিনে শ্রীভগবানের যে আনন্দ প্রকাশ হয়, ইহা কবি কর্ণপূর তাঁহার নাটকে বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকে ভাবিতে পারেন যে, শ্রীভগবান্ বসিয়া বসিয়া কি করেন? তাঁহার নিদ্রাও নাই, আর কোন কার্যও নাই, তবে তিনি দিন যাপন কিরূপে করেন? কেহ একথাও ভাবিতে পারেন যে, জীবগণ পরকালে যাইয়া কিরূপে সময় যাপন করে? শ্রীভগবানের যে কিরূপে দিন যায়, মহাপ্রকাশের দিনে তাহার কতক আভাস ভক্তগণ পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান রূপে আনন্দের তরঙ্গে ভাসিতেছেন। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিতেছে, আর যেন সেই তরঙ্গ শ্রীভগবান্‌কে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে।

ভক্তগণ যেন চিরদিনের সুহৃদ পাইলেন! শুধু তাহাও নয়, যেন চিরদিনের সুহৃদ হারাইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে আবার পাইয়াছেন। শুধু তাহাও নয়, ভক্তগণ দেখিতেছেন, সম্মুখের বস্তুটি বড় চিত্তাকর্ষক, বড় চক্ষু ও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর। বস্তুটির আপাদমস্তক সুগঠিত, সুঠাম ও লাবণ্যে আবৃত। আবার দেখিতেছেন, তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ নিখুঁত ও মনোহর। সেই নিমিত্ত যখন যে অঙ্গে দৃষ্টি পড়িতেছে, চক্ষু সেইখানেই থাকিতেছে, অন্য দিকে যাইতে চাহিতেছে না। সকলে ভাবিতেছেন, কোন্ কারিগর এ অপরূপ ছবিটী আঁকিল? শ্রীঅঙ্গ দিয়া এমন সুগন্ধ বাহির হইতেছে যে, উহাতে নাসিকা মাতিয়া উঠিতেছে।

ভক্তগণ ভাবিতেছেন যে, এতদিনে তাঁহাদের ইন্দ্রিয় সকলের সফলতা হইল। অতিশয় বুদ্ধিমান লোকে বুঝিলেন যে, শ্রীভগবান্ জীবকে যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, তাহার কারণ কি? তাঁহারা বুঝিলেন যে, জীবগণ তাঁহাকে আস্বাদ করিতে পারিবে এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে এ পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়াছেন। সামান্য দ্রব্য আস্বাদের নিমিত্ত উহা নহে। সামান্য দ্রব্যে ইন্দ্রিয় উদ্রেক করে, তৃপ্ত হয় না।

এমন সময় প্রভু কথা কহিলেন। সে কথার এরূপ মোহিনী শক্তি যে, সকলের চিত্ত বিমোহিত

হইল। তাহতে কি হইতেছে? না, প্রভুর প্রত্যেক অঙ্গের রূপে ও বিধির গুণে নানাদিকে টানিয়া তাহাদিগের হৃদয়কে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতেছে। ভক্তগণ নানাবিধ সেবা করিতেছেন কিন্তু মনের সাধ মিটিতেছে না। তাই কেহ বারম্বার প্রণাম, কেহ বায়ু ব্যজন, কেহ চরণ স্পর্শ করিয়া বিবিধ সুখ অনুভব করিতেছেন। কেহ কেহ ফুলের মালা পরাইয়া, কেহ ফুল ফেলিয়া মারিয়া, হৃদয়ের অগ্নি নির্বাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আবার কেহ বা সুস্বরে স্তব করিতেছেন। কেহ ভাবিতেছেন, কিরূপে প্রাণনাথকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া হৃদয় জুড়াইব। কেহ ভাবিতেছেন, কেমনে তাঁহার গলাটি ধরিয়া মুখচুম্বন করিব। কাহারও বা আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে এবং আনন্দ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নানাবিধ ভঙ্গিতে প্রভুকে দেখাইয়া দেখাইয়া নৃত্য করিতেছেন।

প্রভু শ্রীবাস্‌কে ডাকিয়া বলিলেন, "শ্রীবাস, তোমার মনে পড়ে দেবানন্দের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলে, আর তোমার প্রেমানন্দ ধারা দেখিয়া দেবানন্দের কঠিন শিষ্যগণ তোমাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়াছিল?" এইরূপ সকল কাহিনী যাহা শ্রীবাস ব্যতীত আর কেহ জানিতেন না, তাহা ক্রমে বলিতে লাগিলেন। তার পর বলিলেন, "শ্রীবাস! আমি তোমাকে যখন প্রাণদান করি, তখন নারদ মুনি তোমার শরীরে প্রবেশ করেন। তুমি নারদ, তাহা কি ভুলিয়া গেলে?" শ্রীবাস এই সকল শুনিতেছেন, আর মহানন্দে স্তব করিতেছেন।

তারপর শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেছেন, "মনে পড়ে, তুমি গীতায় যে শ্লোকের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া উপবাস করিয়াছিলে, তোমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিয়াছিলাম, তুমি চিন্তিত হইও না, আমি অদ্য তোমার সেই শ্লোকের প্রকৃত পাঠ বলিতেছি। ইহার প্রকৃত পাঠ 'সর্বতঃ পাণিপাদান্ত'। সমস্ত শ্লোকটি শ্রবণ কর তাহা হইলে উহা বুঝিতে পারিবে। যথা—

"সর্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্বতোক্ষি শিরোমুখং।
সর্বতং শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।"

এইরূপে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তখন ভক্তগণ একেবারে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। যদিও বহুতর দীপ জ্বালা হইল, কিন্তু শ্রীভগবানের অঙ্গের জ্যোতিতে সে দীপগুলি টিপ টিপ করিতে লাগিল। যে অঙ্গের শীতল আভা দিবাভাগে সূর্যের তেজে মৃদু দেখাইতেছিল, রজনীতে উহা প্রস্ফুটিত হইল। দক্ষিণে নিত্যানন্দ ছত্র ধরিয়াছিলেন; তাঁহার ও অন্যান্য ভক্তগণের অঙ্গে,—কাহার মৃদুরূপে, কাহার মৃদুতররূপে, আবার কাহার বা তেজস্কররূপে—আলোক বিরাজিত হইতেছে। আবার গৃহমধ্যস্থ দ্রব্য সকল হইতেও নানাবিধ আলোক বিকশিত হইতেছে। তখন সকলে আরতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধূপ-দীপ জ্বালিয়া আরতি করিবেন, এমন সময় শ্রীবাসের মনে একটি ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিতেছেন যে, এ আরতি প্রভুর মা শচীদেবী আসিয়া করিলেই ভাল হয়। তখন তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেছেন, "গোসাঞি! শচীঠাকুরাণীর আমাদের প্রতি বড় ক্রোধ। তাঁহার মনে বিশ্বাস, তাঁহার পুত্রটি বড় ভালমানুষ ও নির্বোধ, আমরা সকলে জুটিয়া নাচাইয়া গাওয়াইয়া তাঁহাকে পাগল করিলাম। এখন তাঁহাকে আনিয়া, তাঁহার পুত্র কেমন ভালমানুষ ও নির্বোধ, তাহা দেখান যাউক। তাঁহার পুত্রকে দেখিলে শচী দেবীর তাঁহার উপর আর পুত্রজ্ঞান থাকিবে না, আমাদের উপরও আর তিনি রাগ করিবেন না।" অদ্বৈত বলিলেন, "ভাল পরামর্শ করিয়াছ, শীঘ্র তাঁহাকে লইয়া আইস।" তখন শ্রীবাস শচীকে ডাকিয়া তাঁহার পুত্র যে ঘরে আছেন, সেই ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমার পুত্র দেখ।"

শচী দেখিতেছেন, তাঁহার নিমাই বটে, তবে নিমাই তাঁহার পুত্র নহেন স্বয়ং শ্রীভগবান্! ইহা দেখিয়া শচী সুখী না হইয়া কাতর হইলেন। তাঁহার কাতর হইবার অনেক কারণ ছিল। যখন বুঝিলেন যে, নিমাই তাঁহার পুত্র নহেন, তখন চারিদিকে শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। চিরদিন পুত্রটিকে লালন-পালন করিয়াছেন, তাঁহার আর কেহ নাই, আর পুত্রটি রূপে গুণে অতুল্য। কাজেই তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন। এখন দেখেন যে, সেই প্রিয় বস্তুটি তাঁহার নিজস্ব ধন নহে,

ত্রিজগতের সকলেই তাঁহার উপর দাবী রাখে। সেটী বহুবল্লভ। তিনি পুত্রের এক মাত্র সম্বল নহেন, পুত্রটির সম্বল ত্রিজগতের তাবল্লোক। একে সেই চিরদিনের হৃদয়ের প্রাণ-পুত্তলিটি চলিয়া যাইতেছে, আবার সেই শ্রীভগবান্‌কে পুত্রভ্রমে নানারূপে শাসন করিয়াছেন,—এইরূপ বিবিধ ভাবে অভিভূত হইয়া, শচীদেবী একেবারে জড়বৎ হইয়া পড়িলেন।

তখন শ্রীবাস বলিতেছেন, "ভগবান্! এই যে জগজ্জননী, ইনি তোমাকে দর্শন করিয়া নানাবিধ ভাবে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু তুমি কৃপা করিয়া ইঁহার গর্ভে জন্ম লইয়াছ, অতএব ইঁহাকে ডাকিয়া সম্ভাষণ কর।"

তখন নিমাইয়ের মুখে ঈষৎ হাস্যময় বিরক্তির চিহ্ন দেখা গেল। তিনি মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "ইনি আমার প্রসাদ পাইবার যোগ্য নহেন। কারণ, তোমরা আমাকে পাগল করিতেছ বলিয়া, ইনি দিবানিশি তোমাদের ন্যায় আমার ভক্তগণকে অশ্রদ্ধা করিয়াছেন। যিনি আমার ভক্তগণকে অশ্রদ্ধা করেন, তাঁহার গর্ভে জন্ম লইলেও আমি তাঁহাকে প্রসাদ করিতে পারি না।"

ইহাতে অদ্বৈত বলিতেছেন, "প্রভু, এ তোমার কি বিচার? জননী তোমার বাৎসল্য প্রেমে অন্ধ হইয়া আমাদের প্রতি বিরক্ত হইতেন, সেও কি তাঁহার অপরাধ হইল?"

তখন শ্রীবাস শচীর কর্ণে বলিতেছেন, "যাও শ্রীভগবানকে প্রণাম করিয়া এই সময় তাঁহার প্রসাদ আহরণ কর।" শচী ভয়ে ইতস্ততঃ করিতেছেন। তখন শ্রীবাস একটু অধৈর্য হইয়া বলিতেছেন, "বিলম্ব কর কেন? ইনি তোমার পুত্র নহেন, দেখিতেছ না? যাও শীঘ্র প্রণাম কর।"

তখন সেই বৃদ্ধা-রমণী শচী, গললগ্নীকৃতবাস হইয়া, যাহাকে তিনি নিজ পুত্র বলিয়া জানিতেন, সেই শ্রীনিমাইয়ের চরণে পতিত হইলেন।

নিমাই তখন তাঁহার কঠিন ভাব পরিত্যাগ করিয়া, প্রসন্ন বদনে শ্রীশচীর মস্তকে শ্রীচরণ দিয়া বলিলেন, "তোমার বৈষ্ণব-অপরাধ ক্ষয় হউক।" যথা চৈতন্যচরিতে—

ইত্যুক্তে সতি সহসা মহাশয়োঽস্য মূর্দ্ধি শ্রীযুত পদপঙ্কজং স নাথঃ।
আধায় প্রার্থিত কৃপস্তথৈব তস্যৈ
কারুণ্যং পরিকলয়ন্ উবাচ হৃষ্টঃ।।

ভগবানের এই আশ্বাসিত বাক্য শুনিয়া শচী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং দেবকী সদ্যোজাত শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া যে শ্লোকটী বলিয়াছিলেন, সেই শ্লোকটি বারম্বার পাঠ করিতে লাগিলেন, যথা—

তথা পরমহংসানং মুনীনামমনাত্মনাম্।
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেমহি স্ত্রিয়ঃ।।

বলা বাহুল্য, শচী লেখাপড়া জানিতেন না। উপরি উক্ত শ্লোক পড়িয়া শচী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীভগবানের ইঙ্গিত পাইয়া ভক্তগণ শচীকে অনেক যত্নে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত ও শান্ত করিলেন। যখন যুবতীগণের মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া প্রভু বলিয়াছিলেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক", তখন নিমাই কি অন্য কেহ কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এখন নিমাই যে সাতষট্টি বৎসরের বৃদ্ধা জননী শচীর মস্তকে শ্রীপাদ প্রদান করিলেন, ইহাতেও তিনি কি অন্য কেহ কুণ্ঠিত হইলেন না। কারণ, যখন শ্রীনিমাই যুবতীগণকে বর প্রদান করেন, তখন তিনি একজন সামান্য নবীন পুরুষভাবে উহা করেন নাই। যখন তিনি বর প্রদান করেন, তখন তিনি শ্রীভগবান, সর্বজগতের প্রধান। আর সেইরূপে, যখন তিনি শ্রীশচীর মস্তকে পদার্পণ করেন, তখন তিনি উহা শচীনন্দন ভাবে করেন নাই, তখন তিনি সকল জগতের পিতা, শচীরও বটে।

ভক্তগণ শচীদেবীকে তাঁহার পুত্রের আরতি করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন শচী শ্রীচরণস্পর্শে প্রেমধন পাইয়া, নির্ভয় ও আনন্দোন্মত্ত হইয়াছেন। শচী আরতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সঙ্গীগণকে ডাকিলেন। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী প্রভৃতি মহিলারা আসিলেন। ভক্তগণ কেহ আরত্রিকের গীত

গাহিতে লাগিলেন, কেহ মৃদঙ্গ, শঙ্খ, মন্দিরা, করতাল বাজাইতে লাগিলেন। আর স্ত্রীগণ হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই "মহাপ্রকাশ" সাত প্রহর ছিল। ভক্তমাত্রেই ইহা দর্শন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পদকর্তা বাসু, মাধব ও গোবিন্দ তিন ভাই একত্র হইয়া এই মহাপ্রকাশ দর্শন করেন, এবং তাঁহারা চক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার আমূল বৃত্তান্ত "মহাপ্রকাশ" নামক পদে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা ঃ

তাম্বুল ভক্ষণ করি বসিলা সিংহাসনে।
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে।।
পঞ্চদীপ জ্বালি তিঁহ আরত্রি করিল।
নির্মঞ্ছন করি শিরে ধানদূর্বা দিল।।
ভক্তগণ সবে করে পুষ্প বরিষণ।
অদ্বৈত আচার্য দেন তুলসী চন্দন।।
দেখিতে আইসে দেব নরে এক সঙ্গে।
নিত্যানন্দ ডাহিনে বসিয়া দেখে রঙ্গে।।
গোরা অভিষেক এই অপরূপ লীলা।
গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিয়া।।

আরত্রিক হইলে নিমাইয়ের ইচ্ছাক্রমে ভক্তগণ শচীকে বাড়ী পাঠাইলেন। তখন শ্রীভগবান বলিতেছেন, "শ্রীধরকে লইয়া আইস।" ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীধর কে?" প্রভু বলিলেন, যে শ্রীধর তাঁহাকে কলাপাতা ও খোলা যোগাইয়া থাকেন। কয়েকজন ভক্ত অমনি ছুটিয়া গেলেন। সেই চঞ্চল ব্রাহ্মণকুমার, যিনি তাহার সঙ্গে কলার পাতা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেন, শ্রীধর আর তাঁহাকে তখন দেখিতে পান না। শুনিয়াছেন, তিনি পরম ভক্ত হইয়াছেন। ইহাও শুনিয়াছেন, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু শ্রীধর অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, সাহস করিয়া দেখিতে আসিতে পারেন না। নিশিযোগে শ্রীধর বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম জপ করিতেছেন, এমন সময় কয়েক জন ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "শচীর উদরে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম লইয়াছেন। অদ্য প্রকাশ হইয়া তোমাকে ডাকিতেছেন।" দরিদ্র শ্রীধর খোলা বেচেন, শ্রীনবদ্বীপে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্থানে তিনি নিতান্ত ঘৃণ্য ব্যক্তি। তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ ডাকিতেছেন, ইহা ভাবিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তখন ভক্তগণ বেগতিক দেখিয়া সকলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া চলিলেন। নদীয়ার অন্য লোকে দেখিয়া অবশ্য কৌতুক করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে শ্রীধরের বাহক-ভক্তগণের কি? পরমানন্দে তাঁহাদের তিলমাত্র বাহ্যাপেক্ষা নাই। এইরূপে শ্রীধরকে সকলে ধরিয়া নিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

তখন প্রভু বলিতেছেন, "ওহে শ্রীধর উঠ। তোমার প্রতি আমার বড় স্নেহ। তাহা না হইলে তোমার দ্রব্য কেন কাড়িয়া লইব। আমাকে দর্শন কর।" শ্রীধর সেই মধুর বাক্যে চেতন পাইলেন। চেতন পাইয়া দেখেন যে, তাঁহার সেই চঞ্চল ব্রাহ্মণকুমার বটে। দেখিতে দেখিতে সেই নিমাই শ্রীধরের নিকট শ্যামসুন্দরের রসকূপ হইলেন। শ্রীধর দেখিতেছেন যে, কত কোটী দেবদেবী তাঁহাকে স্তুতি করিতেছেন। শ্রীধরের আবার অচেতন হইবার উপক্রম হইল, এমন সময় প্রভু তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "তুমি চিরদিন দুঃখ পাইয়াছ, এখন আর তোমার দুঃখ থাকিবে না।" শ্রীধর করযোড়ে বলিতেছেন, "প্রভু, তোমার দোষ নাই। আমি মূর্খ, নিজদোষে ফাঁকিতে পড়িয়াছি। তুমি না আমাকে বার বার নিজ পরিচয় দিয়াছিলে? তুমিই ত আমাকে বলিয়াছিলে—তুই যে গঙ্গাপূজা করিস, আমি তার বাপ? তবু আমি মূঢ়মতি তোমাকে চিনিতে পারি নাই।" তখন নিমাই বলিতেছেন,

"তুমি আমাকে না চিনিতে পার, আমি তোমাকে বরাবর চিনি।"

শ্রীধর বলিতেছেন, "আমার খোলা বেচা সার্থক হইল। কুব্জা তুলসীচন্দন দিয়া তোমার চরণ পাইয়াছিল, আমি কলার খোল দিয়া তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিলাম।"

শ্রীভগবান ইহাতে হাসিয়া বলিলেন, "শ্রীধর! তুমি ঠিক কথা বল নাই। তুমি আমাকে খোলা ও পাতা কবে দিয়াছিলে? আমি না কাড়িয়া লইয়াছিলাম? কিন্তু করি কি, তুমি কোন মতে দিবে না। তবে তুমি নিশ্চিত জানিও, আমি ভক্তের দ্রব্য এইরূপে চিরকাল কাড়িয়া লইয়া থাকি। আমার মনে ধ্রুব বিশ্বাস যে, ভক্তের দ্রব্যে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এখন শ্রীধর শুন। তুমি চিরদিন দুঃখ পাইয়াছ। অদ্য তোমাকে অষ্টসিদ্ধি দিব, দিয়া তোমার দারিদ্র্য ঘুচাইবে।"

শ্রীধর বলিলেন, "অষ্টসিদ্ধি নিয়া কি করিব? আমি মহাজনকে পাইয়াছি, আমি ধন কেন নিব?" তখন প্রভু বলিতেছেন, "তুমি-চিরদিনের দরিদ্র, তুমি যদি অষ্টাসিদ্ধিরূপ প্রসাদ না লও, আমি তোমাকে একটি সাম্রাজ্যের রাজা করিব। তাহা হইলে তুমি পরম সুখে থাকিবে।"

শ্রীধর বলিতেছেন, "ঠাকুর আমি রাজ্য চাহি না। আমি অন্যের উপর প্রভুত্ব করিতে চাহি না। আমি তোমার কাছে কিছুই চাহি না।"

তখন প্রভু বলিতেছেন, "সে কি? আমার দর্শন ব্যর্থ হইতে পারে না। তোমাকে অবশ্য বর মাগিতে হইবে।"

তখন শ্রীধর বলিতেছেন, "আমি ত খুঁজিয়া পাই না কি বর মাগিব। তবে যদি তোমার আজ্ঞায় বর মাগিতে হয়, তবে এই বর দাও যে, যেই চঞ্চল পরমসুন্দর প্রভূতশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুমার, আমি দুর্বল বলিয়া আমার হাতের খোলা পাতা জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেন আর কোন্দল করিতেন, তিনি চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া, এখন নিশ্চল হইয়া, আমার হৃদয়েশ্বর হইয়া থাকুন।"

ভক্তগণ শ্রীধরের প্রার্থনা শুনিয়া একেবারে বিস্মিত হইলেন।

তখন প্রভু বলিতেছেন, "তুমি দরিদ্র, কাঙ্গাল, সমাজে ঘৃণিত, আমি তোমার সম্মুখে। আমার কথা অব্যর্থ তুমি জান। আমি অষ্টসিদ্ধি দিলাম, তুমি লইলে না! সাম্রাজ্য দিতে চাহিলাম, লইলে না। তুমি ভক্ত, এ সমুদয় তুচ্ছ দ্রব্য কেন লইবে? তুমি এ সমুদয় লইবে না, তাহা আমি জানি। আমি ত তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম না, জীবগণকে আমার ভক্তের মাহাত্ম্য দেখাইবার নিমিত্ত তোমাকে প্রলোভন দেখাইলাম। এখন আমিই তোমাকে বর দিতেছি,—আমাতে তোমার প্রেম হউক!"

এই কথা বলিবামাত্র শ্রীধর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

তখন শ্রীভগবান মুরারিকে ডাকিলেন। মুরারি সভয়ে দূরে ছিলেন, এখন অগ্রবর্তী হইলেন, অগ্রবর্তী হইয়া দীঘল হইয়া চরণে পড়িলেন। মুরারি দীনতার খনি। শুধু তাহা নহে, যেমন ভক্ত, তেমন পরোপকারী। মুরারির দোষ তাঁহার একটু জ্ঞানের দিকে টান। প্রভু বলিতেছেন, "মুরারি! তুমি অধ্যাত্মচর্চা ছাড়িয়া দাও।" তখন মুরারি মুখ না তুলিয়া বলিতেছেন, "আমি অধ্যাত্মচর্চা কিরূপে করিব? কার কাছে শিখিব?" তখন নিমাই একটু অদ্বৈতকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "কেন তুমি কমলাক্ষের সঙ্গে চর্চা করিয়া থাক।" কমলাক্ষ শ্রীঅদ্বৈতের নাম। ইহাতে অদ্বৈত তাহার প্রতি একটু কটাক্ষে দেখিয়া বলিতেছেন, "প্রভু অধ্যাত্মচর্চা কি ভাল নহে?" শ্রীভগবান বলিলেন, "অধ্যাত্মচর্চা ভাল কি মন্দ তাহা আমি বলিতেছি না। তবে অধ্যাত্মচর্চা করিলে আমাকে পাইবে না, অধ্যাত্মচর্চার ফল আমি নই।" ইহার তাৎপর্য এই যে, যাঁহারা তেজ প্রভৃতি ধ্যান করেন, তাঁহাদের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে যে মধুময় ভগবান তাহা প্রাপ্তি হয় না। কারণ, শ্রীভগবানকে যিনি যেরূপে ভজনা করেন,

তিনিও তাঁহাকে সেইরূপে ভজিয়া থাকেন। এই কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত ভয়ে নীরব হইলেন।

তখন শ্রীনিমাই মুরারিকে আবার বলিতেছেন, "তুমি অধ্যাত্মচর্চা কর এ বড় আশ্চর্য, যেহেতু তুমি সাক্ষাৎ হনুমান। মুরারি, এখন মস্তক উঠাইয়া তুমি আমার প্রতি চাও।" মুরারি মস্তক উঠাইলেন। মুরারির ভজন সীতারাম। মস্তক উঠাইয়া দেখিলেন যে, বিষ্ণুখট্টায় আর নিমাই নাই,—শ্রীরামচন্দ্র বসিয়া, বামে সীতা। লক্ষ্মণ ছত্র ধরিয়াছেন, ভরত শত্রুঘ্ন চামর ব্যজন করিতেছেন। মুরারি ইহা দর্শন করিয়া অচেতন হইলেন। ফল কথা, যাঁহার যিনি ইষ্টদেবতা তখন ভক্তগণ নিমাইকে সেইরূপ দেখিতেছেন। শ্রীধর দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া, মুরারি দেখিলেন শ্রীরাম বসিয়া।

তখন "হরিদাস" "হরিদাস" বলিয়া প্রভু ডাকিলেন। হরিদাস পিঁড়ায় উপুর হইয়া পড়িয়া আছেন। হরিদাসের ন্যায় দীন জগতে আর নাই। যদিচ সর্বোচ্চ, তত্রাচ আপনাকে সরলভাবে অধমের অধম ভাবেন। প্রভু বলিতেছেন, "হরিদাস, এস আমাকে দর্শন কর।" হরিদাস বাহির হইতে বলিতেছেন, " প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর। আমাকে কেন এত কৃপা করিতেছ? আমি তোমার এত কৃপার উপযুক্ত নহি। তুমি আমাকে যত কৃপা করিতেছ, ততই আমি কিরূপ অধম তাহা বুঝিতেছি।" যাহারা ভাল হইয়া আপনাদিগকে অধম ভাবেন, শ্রীভগবান তাহাদিগকে বড় ভালবাসেন। ভগবান আবার বলিতেছেন, "হরিদাস, তোমার দৈন্যে আমি বড় দুঃখ পাই। তুমি এস, আসিয়া আমাকে দর্শন কর।" তখন হরিদাসকে সকলে ধরিয়া সম্মুখে লইয়া গেলেন।

হরিদাস যাইয়া শ্রীচরণ হইতে দূরে দীঘল হইয়া পড়িলেন। প্রভু বলিতেছেন, "হরিদাস ঃ বর মাগো।" হরিদাস বলিলেন, "প্রভু! তুমি আমার গতি। তুমিই আমার দয়াল। আমা হেন পতিতকে দয়া কর। তুমি ভক্তবৎসল, কিন্তু আমি ভক্ত নহি। তুমি দীনদয়াল, কিন্তু আমি দীনও নহি, অভিমানে আমার অন্তর পরিপূর্ণ। তবু তুমি অহেতুক দয়া করিয়া থাক। এখন তুমি সেই গুণে, আমি যে বিষকূপে পড়িয়া আছি, তাহা হইতে আমাকে উদ্ধার কর।"

প্রভু বলিতেছেন, "আমি তোমার দীনতায় তোমার নিকট চিরঋণী। এখন তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার সমুদয় দুঃখ মোচন করিব।"

হরিদাস বলিতেছেন, "প্রভু! যদি আমাকে আরও কৃপা করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহাই হউক। আমার বলিতে ভয় হয়। অভিমান যেন আমার হৃদয়ে স্থান না পায়। আমাকে দীন কর, তাহা হইলে তোমার কৃপা পাইবার উপযুক্ত হইব। প্রভু! যদি তুমি আমাকে বর দিবে, তবে যেন আমার ভাগ্যে তোমার ভক্তের প্রসাদ মিলে।"

হরিদাসের প্রার্থনা শুনিয়া সকলে "জয় হরিদাস" "জয় শচীনন্দন" বলিয়া উঠিলেন। এই জয়ধ্বনির হেতু একবার অনুভব করুন। মনে ভাবুন, শ্রীভগবান সম্মুখে! তিনি বর দিবার নিমিত্ত বিনয় করিতেছেন। কিন্তু ভক্তগণ লইতেছেন না। এরূপ যদি কেহ করেন, তিনি আমাদের ন্যায় মনুষ্য নহেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ তাহাই করিতেছেন। পাঠক মহাশয়, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি আপনার কতদূর বিশ্বাস জানি না। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি তাঁহার ভক্তগণের বিশ্বাস অটল। তাঁহারা ঠিক জানিতেন যে, তাঁহারা যে বর মাগিবেন, তাহাই পাইবেন। কিন্তু হরিদাস কিছু লইলেন না। ফল কথা, তখন কেবল হরিদাসের নহে, ভক্তমাত্রেরই এরূপ মনের অবস্থা হইয়াছে যে, অফল বর, কি ঐশ্বর্য কামনা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে।

প্রভু বলিতেছেন, "হরিদাস! তুমি যে বর মাগিলে এ তোমার উপযুক্ত হইয়াছে। আমার ঠাকুরালী তোমাদের ন্যায় ভক্ত লইয়া। হরিদাস! যখন তোমাকে দুষ্টগণ নির্দয়তার সহিত প্রহার করে, তখন আমি অবশ্য নিবারণ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমি করিলাম না, না করিয়া অলক্ষিতে তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়াছিলাম। সেই নিমিত্ত তুমি পরমানন্দে ছিলে,

বেদনা পাও নাই। তবে আমি সেই দুরাত্মাগণকে বধ করিয়া কেন তোমাকে রক্ষা করি নাই, তাহার কারণ তুমি কি বুঝ নাই? সেই নিষ্ঠুরগণ তোমাকে যতই প্রহার করিতেছিল, ততই তুমি তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত আমাকে ডাকিতেছিলে। কিন্তু আমি যদি তাহাদিগকে বধ করিতাম, তবে এ কথাটি হইত না। এই কথাটি এখন জগতে রহিল। ইহাতে লোক আমার ভক্তের মহিমা বুঝিতে পারিবে, আর লক্ষ লক্ষ জীবের মঙ্গল হইবে।" এই কথা শুনিয়া হরিদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলেন, আর ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইলেন।

তখন শ্রীভগবান বলিতেছেন, "তোমাদের যাহার যাহা ইচ্ছা সেই বর মাগো।" শ্রীভগবান সম্মুখে, সুতরাং সকলে আপনাকে পূর্ণ ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যে কিছু অভাব আছে, ইহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। তবে কেহ কেহ প্রিয় বস্তুর হিতকামনা করিয়া বর মাগিতে লাগিলেন। কেহ বলিতেছেন, "প্রভু আমার পিতা বড় কঠিন, তাঁহার হৃদয় দ্রব করাইয়া দিউন।" প্রভু বলিতেছেন, "তথাস্তু"। কেহ বলিতেছেন, "আমার স্ত্রী নিতান্ত দুর্মুখী ও সংকীর্তনের বিরোধী, তাহার চিত্ত ভাল করিয়া দিউন।" অমনি প্রভু বলিতেছেন, "তথাস্তু"।

সকলে এইরূপ আনন্দ সাগরে সন্তরণ দিতেছেন, কিন্তু একজন পিঁড়ায় পড়িয়া কান্দিতেছেন। তিনি মুকুন্দ। ইনি নিমাইয়ের নিতান্ত প্রিয় এবং নিমাইয়ের নিতান্ত প্রিয় যে গদাধর, তাঁহারও প্রিয়। মুকুন্দ সুগায়ক, এমন কি নিমাই তাঁহাকে কৃষ্ণের গায়ক বলিতেন। সেই মুকুন্দ পিঁড়ায় পড়িয়া কান্দিতেছেন—কেন ? ঘবে যাইতে পারেন নাই, যেহেতু প্রভু তাহাকে ডাকেন নাই। প্রভু পিঁড়া হইতে একে একে সকলকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার বিনা অনুমতিতে কাহাবও ভিতরে যাইবার সাধ্য নাই। তিনি মুকুন্দকে ডাকিতেছেন না, কাজেই মুকুন্দ যাইতে পারিতেছেন না, দুঃখে পিঁড়ায় পড়িয়া কান্দিতেছেন। সকলে বুঝিলেন যে, প্রভু ইচ্ছা কবিয়া মুকুন্দকে দণ্ড দিতেছেন; কিন্তু কেহ সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারিতেছেন না। অবশেষে শ্রীবাস সাহস করিয়া বলিলেন, "প্রভু! তোমার মুকুন্দ পিঁড়ায় পডিয়া কান্দিতেছেন, একবার তাঁহাকে ডাকো, ডাকিয়া প্রসাদ কর।" শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "আমার মুকুন্দ? মুকুন্দ আমার তোমাদিগকে কে বলিল?"

শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু! তুমি অবিচার করিলে বিচার কে করিবে? মুকুন্দ তোমার না, তবে কাহার? মুকুন্দের মত তোমার আর ক'টি আছে?"

প্রভু বলিলেন, "তোমরা জান না, তাই ওরূপ বলিতেছ। সম্মুখে মুকুন্দ খুব ভাল, কিন্তু যখন পণ্ডিতের দলে প্রবেশ করে, তখন পরম জ্ঞানী, ভক্তিধর্মকে ঘৃণা করে। অর্থাৎ ইহার চঞ্চল মতি, যখন যে দলে প্রবেশ করে তখন সেই মত কথা বলে। এরূপ লোক আমার দর্শন পাইতে পারে না। তোমরা উহার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিও না।" মুকুন্দ সুগায়ক, সকলের প্রিয়। প্রভুর এরূপ কঠোর আজ্ঞা শুনিয়া সকলে বিষণ্ণ হইলেন, আর কেহ উত্তর দিতে সাহস পাইলেন না। মুকুন্দ পিঁড়া হইতে সব শুনিতেছেন। তাঁহার কি দণ্ড হইল তাহাও শুনিলেন। কি অপরাধে দণ্ড হইল তাহাও শুনিলেন। তখন মুকুন্দ পিঁড়া হইতে চেঁচাইয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "ঠাকুর পণ্ডিত। আপনারা আমার নিমিত্ত প্রভুকে কিছু অনুরোধ করিবেন মা। আমাব যেরূপ অপরাধ তাহা অপেক্ষা অনেক লঘু দণ্ড হইয়াছে।" ইহা বলিয়া মুকুন্দ ভাবিতেছেন, "দণ্ড পাইলাম, ভালই হইল। প্রভু প্রিয়জন ব্যতীত দণ্ড করেন না। তবে এ দেহটি রাখা হইবে না, ইহা অপবিত্র; যেহেতু এ দেহ ভক্তি মানে নাই, না মানিয়া অতিশয় অপবিত্র। কিন্তু দেহত্যাগ করার পূর্বে একটা কথা জানিয়ে যাই"। ইহা ভাবিয়া আবার শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "ঠাকুর পণ্ডিত! আপনারা আমার নিমিত্ত অনুরোধ করিবেন না। তবে প্রভুর নিকটে আপনারা সকলে মিনতি করিয়া জিজ্ঞাসা করুন যে, আমি কি কোনকালে তাঁহার দর্শন পাইব?"

প্রভু এই কথা বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া শুনিলেন; শুনিয়া তাঁহার কমল নয়ন ছল ছল করিতে লাগিল। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "মুকুন্দ! তুমি অবশ্য আমার দর্শন পাবে কিন্তু সে এক কোটী জন্মের পরে।"

প্রভুর শ্রীমুখের এই বাক্য শুনিয়া মুকুন্দ আপনা আপনি বলিতেছেন, "দর্শন পাব ত? তা না হয় কোটী জন্ম পরে। পাব ত? তবে আর কি? পাব ত? প্রভুকে পাব ত, না হয় কিছুকাল পরে? কোটি জন্ম আর কটা দিন? প্রভুকে যখন পাব নিশ্চয় জানিলাম, তখন কোটি জন্ম এক মুহূর্ত নয়।" ইহা বলিয়া, সেই সন্তপ্ত, রোরূদ্যমান, ধূলায় ধূসরিত মুকুন্দ গাত্রোত্থান করিলেন, এবং "পাবো, পাবো" বলিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ইহা শুনিয়া গৃহভ্যন্তরে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশিত শ্রীভগবানের কমললোচন দিয়া ধারা বহিতে লাগিল। নয়ন বেগ সম্বরণ করিয়া প্রভু ভগ্নস্বরে মুকুন্দকে ডাকিতেছেন, "মুকুন্দ! ঘরে এস।" কিন্তু মুকুন্দ "পাবো, পাবো", বলিয়া অতুলানন্দে বিভোর, প্রভুর আহ্বান তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। তখন ভক্তগণ বাহিরে আসিয়া মুকুন্দকে ধরিলেন, ধরিয়া বলিতেছেন, "মুকুন্দ! শুনছ না? প্রভু তোমাকে ডাকছেন, ঘরে চল!" কিন্তু মুকুন্দের তখন অর্ধ অচেতন অবস্থা। তিনি বলিলেন, "তোমরা শুনিলে ত? আমার সর্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে। আমি কোটি জন্ম পরে প্রভুকে পাব?"

শ্রীভগবান তখনও ঘর হইতে বলিতেছেন, "মুকুন্দ! ঘরে এস।" কাজেই সকলে মুকুন্দকে ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। আর মুকুন্দ অর্ধক্ষিপ্তের ন্যায় প্রভুর অগ্রে করজোড়ে দাঁড়াইলেন। তখন প্রভু গদগদ হইয়া বলিতেছেন, "মুকুন্দ! আমার কথা অব্যর্থ, তাহা তুমি জান। জানিয়াও কোটি জন্ম পরে আমাকে পাইবে শুনিয়া তোমার সর্বার্থ সিদ্ধ হইল ভাবিতেছে। অতএব তোমা অপেক্ষা আমার নিজজন ত্রিজগতে আর কে আছে? বস্তুতঃ, আমি তোমার সহিত পরিহাস করিতেছিলাম। কেবল পরিহাসও নয়, তুমি বস্তুটি কি তাহা ভক্তগণকে দেখাইলাম।" তারপর গদগদভাবে বলিতেছেন, "মুকুন্দ! তুমি যদি কোটি অপরাধও কর, তবু কি আমি তোমাকে দণ্ড করিতে পারি? তুমি যেরূপ আমার, আমিও সেইরূপ তোমার। তুমি এখন গৃহাভ্যন্তরে আগমন করিলে, করিয়া আমার আনন্দের যে অভাব ছিল তাহা পূর্ণ করিলে।"

যখন মুকুন্দ কৃপা পাইলেন, তখন শ্রীভগবান সমস্ত ঐশ্বর্য ছাড়িয়া একেবারে মাধুর্যভাব ধরিলেন। যতক্ষণ তাঁহার ঐশ্বর্যভাব ছিল ততক্ষণ ভক্তগণ ভয়ে একটু দূরে ছিলেন। কিন্তু শ্রীভগবান মাধুর্যভাব ধরিয়া ভক্তগণকে নিকটে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সকলে মিলিয়া মধুর নৃত্য করিতে ও গীত গাহিতে লাগিলেন। এবং তাঁহাদের মনে হইল, তাঁহারা রাসমণ্ডলে শ্রীভগবানের সহিত বিহার করিতেছেন। পরে শ্রীভগবান ভক্তগণকে চর্বিত তাম্বুল প্রদান করিলেন। ইহারই সুগন্ধে ভক্তগণ উন্মত্ত হইলেন। তখন কেহ শ্রীভগবানের হস্ত ধরিয়া 'স্পর্শ-সুখ', কেহ তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিয়া 'দর্শন-সুখ', কেহ তাঁহার চরণ লেহন করিয়া 'আস্বাদন-সুখ' অনুভব করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানও তখন কাহাকে চুম্বন, কাহাকে আলিঙ্গন, কাহারও হস্ত ধরিয়া নৃত্য—এইরূপ বিবিধ বিহার করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্যচরিত মহাকাব্য (৫ম সর্গঃ) ঃ

"আশ্লেষৈঃ বতিচ তথৈব কাংশ্চিদন্যানাচুম্বে স্তদনুচ চর্বিতৈস্তথান্যান।
ইত্যেবং পরমকৃপানিধিঃ সুতৃপ্তান্, চক্রে সদ্বিলসিত লীলয়া মহত্যা।।৯২।।"

এইরূপে মধুর ভজনে সকলে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভক্তগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মনুষ্য বহুক্ষণ শ্রীভগবানের সঙ্গ করিতে পারে না। যদি ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান হয়েন, তবে এক মুহূর্তও পারে না। যদি শ্রীভগবান ঐশ্বর্য ও মাধুর্য মিশাইয়া প্রকাশিত

হয়েন, তবে কিয়ৎক্ষণ মাত্র পারে। আর যদি শুধু মাধুর্যময় ভগবান হয়েন, তবে আরও অধিকক্ষণ পারে: কিন্তু পরিশেষে মনুষ্যদেহ কাতব হইয়া পড়ে। সাধন ভজনের ফল এই যে, ইহার দ্বারা মনুষ্যের ভগবৎসঙ্গ করিবার শক্তি ক্রমে বাড়িয়া যায়। বহুক্ষণ শ্রীভগবানের সঙ্গে বিহার করিয়া ভক্তগণ একবারে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সমস্ত দিন কাহারও আহার নিদ্রা কি আরাম মাত্র হয় নাই; যাঁহার নিদ্রা আসিতেছে, তিনি নিদ্রা যাইতে পারিতেছেন না। যিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি আরাম করিতে পারিতেছেন না। শ্রীভগবানকে রাখিয়া কে ঘুমাইবেন বা আরাম করিবেন? তখন সকলে ভাবিতেছেন যে, এই বস্তুটি আবার নিমাই পণ্ডিত হইলেই ভাল হইত। যদিও ভগবান মধুর ভাবে বিরাজ করিতেছেন, তবুও তিনি ভগবান। সে ভাব, ভগবানের আলিঙ্গন পাইয়াও, তাঁহাদের মন হইতে একেবারে যাইতেছে না। তখন শ্রীঅদ্বৈত সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীভগবানকে ইহাই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, "প্রভু, আমরা ক্ষুদ্র কীট, তোমার তেজঃ সহ্য করিতে পারিতেছি না, তুমি আবার সম্পূর্ণরূপে নররূপ ধারণ কর।" যথা—

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমদাসের অনুবাদ—
"অদ্বৈত বলেন শ্রীনিবাস আদি শুন।
প্রভুর ঈশ্বরাবেশ কিসে যায় পুনঃ।।
সবে বলেন অদ্বৈত কহিলে সর্বোত্তম।
ইহা হইতে নর-লীলা সর্ব মনোরম।।
সর্বগণ বহু স্তব করি পুনর্বার।
কহে, প্রভু নিবেদন শুন মো সবার।।
যদ্যাপিহ নিত্য ভগবত ভগবত্বা।
সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ সর্বথা।।
তথাপি যে দেহ সবে করয়ে স্বীকার।
তাহার স্বভাব তত্ত্ব করহ প্রচার।।
সংপ্রহিত কৃপা করি সেইরূপ কর।
সানন্দ আবেশ প্রভু তুমি পরিহর।।"

তখন শ্রীভগবান বলিলেন, "ভাল, শীঘ্র গমন করিতেছি।" ইহাই বলিয়া তিনি হুঙ্কার করিলেন, আর শ্রীনিমাইয়ের দেহ মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন আস্তে ব্যস্তে সকলে নিমাইকে ধরিলেন, দেখেন নিমাই যে কেবল চেতনহারা হইয়াছেন তাহা নয়, তাঁহার জীবনের লক্ষণও কিছুমাত্র নাই। ডাকিলে উত্তর দান ত করিলেনই না, বরং সকলে দেখিলেন যে, তাঁহার নিশ্বাস পর্যন্ত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নাসিকায় তুলা ধরিয়া দেখিলেন, উহা কম্পিত হইল না। ভক্তগণ হস্ত পদ উঠাইয়া যেখানে যে অবস্থায় রাখিতে লাগিলেন, উহা সেখানে সেই অবস্থায় থাকিতে লাগিল। এমন কি, নিমাইকে তখন ঠিক মৃত ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যথা চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে—

ভূয়োঽয়ং মুদি চ বিলুঠ্য চত্বরান্তঃ সংমূর্চ্ছন্নিব বিররাম রম্যমূর্ত্তিঃ।
চেষ্টাদাং ন কিমপি নোত্তরঞ্চ কিঞ্চিন্নস্পন্দঃ শ্বসিত সমীরণশ্চ নৈব।।৯৮।।

চিক্ষেপ ক্ষিতিষু যথা ভুজৌ তথা তৌ
তাদৃক্ষারিব কিল তস্থতুশ্চিরায়।
তস্থৌ শ্রীপদযুগলং তথা যথাসৌ
চিক্ষেপ ক্ষণমনু বিস্মৃতাঙ্গচেষ্টঃ।।৯৯।।

দুই চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে নিমাই এইরূপ মৃতবৎ হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ অনেক চেষ্টা

করিলেন, কিছুতেই চেতনা করাইতে পারিলেন না। নিমাইয়ের এরূপ ঘোর মূর্চ্ছা কখন কেহ পূর্বে দেখেন নাই। শ্রীঅদ্বৈত মুখে জলছিটা দিয়া নিমাইয়ের নাম ধরিয়া ডাকিয়া, ঘোর হুঙ্কার করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিমাই যেমন তেমনি রহিলেন। প্রভাত হইল, নিমাই চেতন পাইলেন না। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, নিমাই তদবস্থায় রহিলেন, নিশ্বাস ফেলিলেন না। ভক্তগণ ভাবিয়াছিলেন এত পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণের পর একটু আরাম করিবেন, কিন্তু তাহা আর ঘটিল না; সকলে বিষন্ন ভাবে নিমাইকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। কেহ রোদন করিতেছেন না, সকলে একপ্রকার নীরব হইয়া বসিয়া আছেন। যখন বহুক্ষণ নিমাই চেতন পাইলেন না, তখন তাঁহাদের মনে ভয় হইল যে, হয় ত শ্রীনিমাই একেবারেই চলিয়া গিয়াছেন, তিনি আর আসিবেন না। তখন তাঁহারা সকলে এই সঙ্কল্প করিলেন যে, যদি সত্য সত্যই চলিয়া গিয়া থাকেন, আর ফিরিয়া না আসেন, তবে তাঁহারা সকলেই তাঁহার অনুগমন করিবেন। শচীদেবীকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই, শ্রীবাসের আঙ্গিনায় পূর্বদিন যে কপাট দেওয়া হইয়াছিল, আর তাহা খোলা হয় নাই।

এইরূপে বেলা দ্বিপ্রহর হইল। তখন ভক্তগণ নিশ্চয় করিলেন, আজ প্রভু সত্যই তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, আর আসিবেন না। জ্যৈষ্ঠ মাস, দুই প্রহর বেলা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাহারও ক্ষুৎপিপাসা নাই। সকলে মরিবেন এই সংকল্প করিয়া নীরব হইয়া বসিয়া আছেন। কেবল একটী কারণে নিমাইকে লইয়া এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন। নিমাইয়ের যদিও নিশ্বাস-প্রশ্বাস নাই, আর তিনি আড়াই প্রহর মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছেন, তবুও তাঁহার সুন্দর বদনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য এক বিন্দুও যায় নাই। তখন একজন মৃদুস্বরে বলিতেছেন, "আমাদের কীর্তনানন্দ প্রভুকে আমরা অনেক দিন কীর্তন করিয়া চেতনা করাইয়াছি, আজ তাহাও একটু করিয়া দেখা যাউক না কেন?" ইহাতে সকলে সম্মত হইলেন। তখন প্রভুকে ঘিরিয়া জন কয়েক মৃদুস্বরে কুঞ্জভঙ্গের গীত গাহিতে লাগিলেন। যথা "কত আর ঘুমাইবে, নিশি পোহাইয়া গেল" ইত্যাদি।

গীত গাইতেই তাঁহারা আপনারা একটু রস পাইলেন। তখন তৃতীয় প্রহর বেলা হইয়াছে। সকলে হঠাৎ দেখেন, যে, কীর্তন শ্রবণে নিমাইয়ের অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে। এ সত্য, না নয়নের ভ্রম, ইহা মীমাংসা করিবার নিমিত্ত সকলে মনোযোগপূর্বক পরীক্ষা ও তর্ক করিতে লাগিলেন। পরে সে যে প্রকৃত পুলক, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। তখন সকলের একেবারে ধৈর্য ভঙ্গ হইল এবং সকলে চীৎকার করিয়া "জয় জয়" করিয়া উঠিলেন। জয়ের উপরে জয়, গগন ভেদিয়া জয় জয়কার হইতে লাগিল।

কেহ গর্জন, কেহ হুঙ্কার, কেহ নৃত্য, কেহ লম্ফ, অর্থাৎ যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি উচ্চৈস্বরে সেইরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহিলাগণ হুলধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কেহ বলিতেছেন, শীঘ্র শচীদেবীকে সংবাদ দাও। কেহ বলিতেছেন, শীঘ্র মস্তকে জলের কলসী ঢাল। কেহ বলিতেছেন, ভাল করিয়া বাতাস দাও। কেহ শঙ্খ বাজাইতেছেন, কেহ কান্দিতেছেন, আর কেহ-বা আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন।

এই কলরবের মধ্যে নিমাইচাঁদ চক্ষু মেলিলেন। চক্ষু মেলিয়া হাই তুলিতে লাগিলেন। তখনও সম্পূর্ণ চেতন হয় নাই। ক্রমে প্রভু উঠিয়া বসিলেন, দেখেন আপনি ও ভক্তগণ ধূলায় ধূসরিত, আর বহুতর বেলা হইয়াছে। নিমাই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ব্যাপার কি? কোথায় আমি? তোমরা বসিয়া কেন? যেন অধিক বেলা হইয়াছে?" ইহাই বলিয়া নিমাই জিজ্ঞাসু হইয়া সকলের পানে চাহিতে লাগিলেন।

শ্রীবাস হাসিয়া বলিলেন, "আর ফাঁকি দিতে পারবে না, এইবার ধরা পড়িয়াছ।" নিমাই অবাক্ হইয়া বলিলেন, "সে কি? কিসের ফাঁকি? তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিতেছি না। তুমি কি আমোদ করিতেছ?" তখন শ্রীবাস সামলাইয়া বলিতেছেন, "তা নয়, তুমি কল্যাবধি অচেতন হইয়া পড়িয়া আছ, তাই তোমাকে লইয়া আমরা ঘিরিয়া বসিয়া আছি।"

এই কথা শুনিয়াই নিমাই লজ্জায় ঘাড় হেঁটে করিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "এতক্ষণ বিফলে আমার ও আমার নিমিত্ত তোমাদের সময় গিয়াছে ও কষ্ট হইয়াছে। আমাকে ক্ষমা কব।" নিতাই বলিলেন, "আর সে কথায় কাজ নাই, এখন ক্ষুৎপিপাসায় মরি। চল স্নানে যাই।"

ঊনবিংশ অধ্যায়

অবতীর্ণৌ স্বকারণৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে।।
শ্রীমুরারি গুপ্তের শ্লোক।

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাসের বাড়ী থাকিলেন। বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসর, কিন্তু স্বভাব নিতান্ত বালকের ন্যায়। শ্রীবাসের ঘরণী মালিনীকে মা বলেন। শিশুকাল হইতে বিংশতি বৎসর তীর্থ পর্যটন করিয়াছেন। এখন একেবারে মা ও বাড়ী পাইয়া মালিনীর কোলে শুইয়া পড়িলেন। আপনি ভাত মাখিয়া খাওয়া ছাড়িলেন। শুধু তাহা নয়, মালিনীর স্তন-দুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য, নিত্যানন্দ মুখ দিয়া সেই শুষ্ক স্তনে দুধ আনিয়াছিলেন। আহারাদির বিচার নাই, আহার্যের অভাব নাই, যখন ইচ্ছা তখনই আহার করেন। স্নানের সময় গঙ্গায় পড়েন, আর একবাব গঙ্গায় নামিলে, নিমাই ছাড়া কাহার সাধ্য তাঁহাকে উঠায়? নিতাই সাঁতরাইতেছেন। ভক্তগণের স্নান হইয়াছে, কিন্তু সকলেই তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা নিতাইকে ডাকিতেছেন, "শ্রীপাদ! উঠ, বেলা হইল, আর কতক্ষণ জলে থাকিবে?" নিত্যানন্দের ভ্রূক্ষেপও নাই। তখন সকলে নিমাইকে বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি একবার ডাক।" নিমাই ডাকিলেন, "শ্রীপাদ! উঠ!" আর যেরূপ গাভী হাম্বারব করিলে বৎস দৌড়িয়া আসে, নিতাই অমনি উর্ধ্বশ্বাসে তীরে উঠিলেন।

নিমাই দিবানিশি কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে বিভোর। ইহাতে শচী বড় দুঃখ পান। তাঁহার ইচ্ছা পুত্র সংসারী হউক, তিনি নদীয়ায় আনন্দে বসতি করেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নিমাই একটু আমোদ-আহ্লাদ করেন, শচীর এ নিতান্ত মনের সাধ। নিমাই তা জানেন। এই কারণে মায়ের সন্তোষের নিমিত্ত নিমাই শ্রীমতীকে লইয়া কখন কখন রজনীতে এবং কখন দিবাভাগেও বটে, কিযৎকাল আনন্দ বিহার করেন। যথা—

"মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া।।"

একদিন নিমাই দিবাভাগে বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় নিতাই আসিয়া আঙ্গিনায় দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া পরিধান কৌপীন বস্ত্রখানি খুলিলেন, খুলিয়া মস্তকে বাঁধিলেন। মস্তকে বান্ধিয়া জোরে জোরে লম্ফ দিয়া সমস্ত আঙিনায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শ্রীমতী লজ্জা পাইয়া একদিকে পলাইলেন। নিমাই দৌড়িয়া আসিয়া নিতাইকে ধরিলেন। প্রথমে চঞ্চলকে ধরিতে পারেন না; পরে ধরিয়া দেখেন, বদনে আনন্দধারা বহিতেছে, বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। নিমাই তাঁহাকে বস্ত্র পরাইলেন। এমন সময় ভক্তগণ একে একে আসিলেন। নিমাই নিতাইকে লইয়া ভক্তগণের মাঝে বসিলেন, নিতাইয়ের পা ধুয়াইলেন ও সকল ভক্তগণকে ঐ পাদোদক পান করিতে দিলেন; দিয়া বলিলেন, "নিতাইয়ের পাদোদক, ইহা পান কর, এখনি কৃষ্ণপ্রেম হইবে।" পরে নিতাইয়ের একখানা কৌপীন আনাইলেন, এবং চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া সকলকে মস্তকে বান্ধিতে দিলেন।

আর একটি ঘটনায় নিতাই তাঁহার চাঞ্চল্য পরিবর্ধন করিবার বড় অবকাশ পাইয়াছিলেন। তখন পণ্ডিত ও ভদ্রলোক মধ্যে নিমাইয়ের বহুতর ভক্ত হইয়াছেন। এই সমুদয় ভক্তগণের সঙ্গ গুণে আবার অনেকে পবিত্র হইয়া ভক্তিলাভ করিতেছেন। ক্রমেই নিমাইয়ের দল বাড়িতেছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য ব্যতীত, অন্যান্য জাতি ব্রাহ্মণের পদতলে দলিত হইতেছিলেন। নবশাখ ও স্ত্রীলোকের, ব্রাহ্মণের সেবা ব্যতীত আর কোন কর্ম আছে, ইহা কেহ স্বীকার করিতেন না। এমন

সময় শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদগণ, "যে ভক্ত, সেই ব্রাহ্মণ", এইরূপ মত প্রকারান্তরে প্রচার করিতে লাগিলেন। হরিদাস যবন, তাঁহাকে ভক্তগণ প্রণাম করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদগণের এইরূপ ব্যবহারে নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণ অতিশয় আশ্বাসিত হইয়া দলে দলে সেই ধর্মের আশ্রয় লইতে লাগিলেন। প্রকৃত কথা, শ্রীভগবান নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই কথা তখন সর্বত্র প্রচারিত হইতেছে। কেহ এ জনরব বিশ্বাস করিতেছেন, কেহ-বা করিতেছেন না। তবু দেশ বিদেশ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে বহুতর লোক আসিতেছে। একটি প্রাচীন গীত শ্রবণ করুন, যথা— "নদের চাঁদের উদয় হয়েছে।

পাপী তাপী, অন্ধ আতুর, সারি সারি আসিছে।"

এইরূপে গৌরাঙ্গের বাটীর পার্শ্বে সারাদিন কলরব। কেহ দেহ-রোগে, কেহ-বা ভবরোগে প্রপীড়িত হইয়া আরোগ্যের নিমিত্ত প্রভুর বাড়ী আসিতেছে। জনাকীর্ণ শ্রীনবদ্বীপ আরও লোকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

এদিকে নবদ্বীপ ভক্তি ও প্রেমরসে টলমল করিতেছে। শ্রীবাসের বাড়ীতে একজন যবন দরজী শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া "দেখেছি, দেখেছি" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, ও সাত দিবস পর্যন্ত পাগলের মত নগর ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে চেতন প্রাপ্ত হইল। তখন সে গৌরাঙ্গের পরম ভক্ত হইয়া উদাসীন ব্রত লইল। আর তখন যেন কি একটা তরঙ্গ আসিয়া সকলকে বিগলিত করিতে লাগিল। নানা জনে নানা স্থানে বৈভব দর্শন করিয়া প্রেমে উন্মাদ হইতে লাগিলেন। নানা স্থানে "কোলের ছেলে বাহু তুলে" হরি বলিয়া নাচিতে লাগিল। ঘোর পাষণ্ডও ভক্ত হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ কি স্ত্রীলোক লজ্জাহীন হইয়া রাজপথে নাচিতে লাগিলেন। বাসুঘোষের এই পদটিতে তখনকার অবস্থার কতক আভাস পাওয়া যায়—

"অবতার ভাল, গৌরাঙ্গ অবতার কৈল ভাল।
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুবাল।।
চাঁদ নাচে সুরয নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে বলি গোরা গোরা।।
নাচয়ে ভকতগণ হইয়া বিভোরা।
নাচে অকিঞ্চন যত প্রেমে মাতোয়ারা।।
জড় অন্ধ আতুর উদ্ধারে পতিত।
বাসুঘোষ কহে মুই হইনু বঞ্চিত।।

প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। এবং প্রায় প্রত্যেকেই দধি দুগ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ উপহার লইয়া আসিতেছে। স্ত্রীলোকেরা শ্রীগৌরাঙ্গকে গঙ্গার ঘাটে দর্শন করিতেছেন, আর তাঁহাকে শ্রীভগবান্ ভাবিয়া মনে মনে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে নানাবিধ খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া, প্রভুর নিকট পাঠাইতেছেন। সাধারণ লোকে শ্রীগৌরাঙ্গকে "নদের চাঁদ" "সোণার মানুষ" প্রভৃতি সুমধুর নাম দিতেছেন। সেই সময়কার শ্রীনিমাইয়ের ও নদীয়ার অবস্থা বর্ণনা করিয়া ঠাকুর লোচনদাস এই পদটি প্রস্তুত করেন—

"অরুণ কমল আঁখি, তারকা ভ্রমর পাখী, ডুবু ডুবু করুণা মকরন্দ।
বদন পূর্ণিমা চান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে, তাহে নব প্রেমার আরম্ভ।।
আনন্দ নদীয়া-পুরে, টলটল প্রেমভরে, শচীর দুলাল গোরা নাচে।
যখন ভাতিয়া চলে, বিজুরি ঝলমল করে, চমকিত অমর সমাজে।।
কি দিব উপমা তার, করুণা বিগ্রহ সার, হেন রূপ মোর গোরা রায়।
প্রেমায় নদীয়ার লোক, নাহি জানে দুঃখ শোক, আনন্দে লোচনদাস গায়।"

এইরূপ যখন নদীয়ার অবস্থা, তখন নিমাই ভক্তগণের দ্বারা নবদ্বীপ নগরে হরিনাম

প্রচার আরম্ভ করিলেন। এই হরিনাম বিলাইবার নিমিত্ত শ্রীহরিদাস ও নিত্যানন্দ বিশেষরূপে আদিষ্ট হইলেন। প্রভু বলিলেন, "তোমরা এই নবদ্বীপ নগরে প্রতি ঘরে ঘরে, কি মূর্খ কি পণ্ডিত, কি সাধু কি অসাধু, কি ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, সকলকেই শ্রীহরিনাম দিয়া উদ্ধার কর!" ইঁহারা দুইজনেই এই কার্যে সম্যকরূপে পারদর্শী, যেহেতু পরম করুণ ও শক্তি-সঞ্চার-সক্ষম। এই এক কারণ। দ্বিতীয় কারণ, উভয়েই সন্ন্যাসী এ বিদেশী। নবদ্বীপে নিয়মিত হরিনাম বিতরণ, এই প্রথম আরম্ভ হইল। হরিদাস ও নিত্যানন্দ প্রভাতে নাম বিলাইতে নবদ্বীপ নগরে কোন গৃহস্থের বাড়ী গিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহস্থ তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী দেখিয়া তটস্থ হইয়া চাউল ভিক্ষা দিতে আসিলেন। তখন হরিদাস ও নিত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা কৃষ্ণ বল ও কৃষ্ণ ভজ—এই আমাদের ভিক্ষা।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা ভিক্ষা না লইয়া অন্য বাড়ী চলিয়া গেলেন। এইরূপে নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, তাঁহারা দু'জনে নাম দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আবার কোথাও কোথাও বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ জীবের দুঃখে কাতর হইয়া স্বয়ং শ্রীশচীর উদরে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের আকার, বেশ ও আর্তি দেখিয়া, কেহ বা মুগ্ধ হইতেন, কেহ বা মুগ্ধ না হইয়া বিদ্রুপ করিত। এইরূপে তাঁহারা দুই প্রহর পর্যন্ত সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন।

হরিদাস ধীর ও নিত্যানন্দ চঞ্চল। কৌতুকপ্রিয় চপলের সহিত নাম বিতরণ করিতে গিয়া হরিদাসের বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। প্রথমতঃ নগর ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাভিমুখে গেলেই নিত্যানন্দের একটু সন্তরণ দিতে হইবে। আর নিত্যানন্দ যদি একবার গঙ্গায় অবতরণ করিলেন, তবে তিনি যে কখন কোথায়, এ-ঘাটে, কি ও-ঘাটে, এ-পারে কি ও-পারে উঠিবেন,—তাহার কিছুমাত্র ঠিক নাই। নিত্যানন্দ কুম্ভীরের ন্যায় নদীতে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, আর হরিদাস তীর হইতে "শ্রীপাদ! উঠ, শ্রীপাদ। উঠ" বলিয়া ডাকিতেছেন। কিন্তু শ্রীপাদ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের গ্রীষ্মে পরম সুখে গঙ্গায় ভাসিতেছেন। তিনি উঠিবেন কেন? শ্রীনিত্যানন্দের ক্ষুধার কথা পূর্বে বলিয়াছি; পথে যদি দুগ্ধবতী গাভী দেখিলেন, তবে কটির ডোর খুলিয়া, তাহার দুই পা ছাঁদিয়া দুগ্ধপান করিতে আরম্ভ করিলেন! যাহার গাভী সে কখন কখন নিত্যানন্দকে ধরিত, কিন্তু ধরিয়া সে নিত্যানন্দের কি করিবে? কেহ বা হাসিয়া উঠিত কেহ বা ধমকও দিত, কিন্তু নিত্যানন্দের কাছে হাসি ও ধমক দুই-ই সমান। চলিতে চলিতে নিত্যানন্দ পথে একটি শিশু সন্তান দেখিলেন, তখন চোখ পাকাইয়া মুখব্যাদন করিয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন! শিশু, মা কি বাবা বলিয়া কান্দিতে লাগিল। শিশুর আত্মীয় যে নিকটে ছিল দৌড়িয়া আসিল। তখন হরিদাস তাহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া নিরস্ত করিয়া দিলেন। কখন বা নিত্যানন্দ ষাঁড় দেখিয়া এক লাফে তাহার পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন। ষাঁড় লম্ফ ঝম্ফ দিয়া কখন তাঁহাকে ফেলিয়া দিল, কখন বা তাঁহাকে ঘাড়ে করিয়া দৌড়িল। যদি ষাঁড়ের উপর স্থির হইয়া বসিতে পারিলেন, তবে "আমি মহেশ" এই বলিতে বলিতে চলিলেন। পথের লোক দেখিয়া অবাক্!

সেই সময় দুইটি ব্রাহ্মণকুমার, জগাই ও মাধাই নামে ভ্রাতৃদ্বয়, নদীয়া নগরের কর্তা ছিল। ইহারা অর্থ দিয়া কাজীকে বশ করিয়া নদীয়ায় যথেচ্ছাচার করিত। ইহাদের ধর্মাধর্ম জ্ঞান ছিল না। ইহারা মদ্যপান ও কথায় কথায় নরহত্যা ও লুটপাট করিত। দুই ভাইয়ের অধীনে বহুতর অস্ত্রধারী সৈন্য থাকায়, তাহাদের সহিত কেহ পারিয়া উঠিত না। বিশেষতঃ নদীয়াবাসিগণ বিদ্যাচর্চায় ব্যস্ত, তাঁহারা সেই রসেই নিমগ্ন হইয়া সমুদয় সহিয়া থাকিতেন।

একদিন নিতাই হরিদাসকে বলিলেন, "চল, দুইজনে যাই, দুটো ভাইকে প্রভুর আজ্ঞা বলি। তারা শুনে ভাল, না শুনে আমাদের কি দায়? আমরা আজ্ঞা পালন করি বই ত নয়।" উভয়ে এই পরামর্শ করিয়া দুইজনে একেবারে দুঁই ভাইয়ের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত। দুই

ভাই মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া বসিয়া আছে। নিতাই যাইয়া বলিলেন, "ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, এই আমাদের ভিক্ষা।" এই কথা শুনিয়াই দুই ভাই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "বটে! প্রাণের ভয় নাই? আমাদের কাছে এত বড় কথা! ধর ত ঐ ভণ্ড বেটাদের?" ইহাই বলিয়া আপনারাই দৌড়িল, আর নিতাই ও হরিদাস উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া পালাইলেন। হরিদাস স্থূলকায়, দৌড়িতে পারেন না; নিতাই চঞ্চল, তাঁহাকে হড়-হড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। দুই ভাই মদ্যপানে উন্মত্ত বলিয়া দৌড়িতে পারিল না। কিন্তু নগরীয়া অনেকে এই ঘটনা দেখিয়া হাস্য করিল, আর বলিতে লাগিল, "ভণ্ড বেটাদের খুব হয়েছে।"

হরিদাস ও নিত্যানন্দ দৌড়িয়া প্রভুর নিকট যাইতেছেন। পথে হরিদাস নিতাইকে বলিতেছেন, "শ্রীপাদ, তুমি বড় চঞ্চল।"

নিতাই। কেন, আমার অপরাধ?

হরিদাস। এইরূপ মদ্যপের কাছে তোমার যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল?

নিতাই। আমি গেলাম? তুমিই ত কুপরামর্শ দিয়া আমাকে ভুলাইয়া, আমাকে দিয়া বলাইয়া, শেষে আমাকে ডাকাতদের হাতে ফেলিয়া পালাও। তুমি ত খুব সাধু!

হরিদাস। আমি তোমাকে ভুলালেম? তুমি না বল্‌লে, এ বেটাদের অবস্থা দেখিলে বুক ফেটে যায়?

নিতাই। সে কি অন্যায় বলেছি? করি কি? তোমার ঠাকুর চঞ্চল, কাজেই তাঁর বাতাস লাগিয়া আমিও চঞ্চল হয়েছি। শুন হরিদাস! প্রভু তোমার কথা বড় শুনেন। তুমি যেয়ে একেবারে ঠাকুরের পা ধরে পড়বে আর বল্‌বে যে, এ দুটোকে উদ্ধার করতেই হবে। প্রভু তোমার কথা ফেলবেন না।

হরিদাস। বুঝিলাম, এই দুইটি জীব উদ্ধার হইল। যখন তোমার ইচ্ছা হয়েছে, তখন আর উহাদের উদ্ধার কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না।

এইরূপে আমোদ করিতে করিতে ও কথায় কথায় প্রভুর নিকট আসিয়া নিত্যানন্দ তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমুদয় কাহিনী বলিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন, "আর তোমার আজ্ঞা পালন করতে যাব না। সাধুকে কৃষ্ণনাম সকলেই লওয়াতে পারে। জগাই মাধাইকে কৃষ্ণনাম লওয়াতে পার, তবে তোমার বড়াই বুঝি। এই দুই ভাইকে উদ্ধার কর, আর জগতে তোমার দয়ার পরিচয় দাও। আমি যেখানে যাই কেবল গালি খাই, লোকে কেবল দূর দূর ক'রে তাড়ায়ে আসে। তুমি ঘরে বসে খিল দিয়া যাহা কর তাতে বাহিরের লোকের কি? তোমার কাজ কিছু দেখিতে পারে না, কাজেই লোকে অনায়াসে ঠাট্টা করে, আর আমরা ঘাড় হেঁট করে সে স্থান হতে পলায়ে আসি।" প্রভু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি যখন তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন অবশ্যই তাহারা উদ্ধার পাইবে।" ইহাতে ভক্তগণ সকলে নিশ্চিত বুঝিলেন যে, জগাই মাধাই উদ্ধার পাইল। অমনি সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

জগাই মাধাইয়ের বাড়ী গঙ্গাতীরে, কিন্তু তাহারা শিবির সন্নিবেশিত করিয়া নগরের স্থানে স্থানে বাস করিত। এইরূপে উপরি-উক্ত ঘটনার অনতিবিলম্বেই শ্রীনিমাইয়ের বাটি যে পাড়ায়, সেইখানে তাহারা শিবির স্থাপন করিল। কাজেই ইহাতে পাড়ার লোক ভয়ে অভিভূত হইলেন।

সন্ধ্যা হইলে দশজন পাঁচজন একত্র না হইয়া এ-বাটি হইতে ও-বাটি যাইতে কাহারও সাহস হয় না। শ্রীবাসের বাটিতে কীর্তন হইতেছে, সেই শব্দ শুনিয়া জগাই মাধাই উহা দেখিতে আসিল। দুই ভায়ে মদ্যপানে উন্মত্ত। দ্বারে কপাট বন্ধ থাকায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিল না। বাহিরে থাকিয়া, মদ্যের আনন্দে অভ্যন্তরের কীর্তনে পরিবর্ধিত হওয়াতে

দুই ভাই নৃত্য করিতে লাগিল, এবং এইরূপে নৃত্য করিয়া সমস্ত নিশি যাপন করিল। প্রভাতে ভক্তগণ কীর্তন শেষ করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে চলিলেন; দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখেন যে সম্মুখে জগাই মাধাই! ভক্তগণ বিভীষিকা দর্শন করিয়া সশঙ্কিত হইলেন। শ্রীনিমাই এক পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন, তখন দুই ভাই তাঁহাকে ডাকিয়া কহিল, "নিমাই পণ্ডিত! এ তোমার কিসের সম্প্রদায়? এ কি তোমার মঙ্গলচণ্ডীর গীত? আমরা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমাদের ওখানে তোমার একদিন যাইয়া গাইতে হইবে।" কিন্তু শ্রীনিমাই পণ্ডিত ও অন্যান্য ভক্তগণ এ কথার উত্তর না দিয়া "ধরিল, ধরিল" এই ভয়ে দ্রুতপদে গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন।

শ্রীনিমাইকে ভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, যে তাঁহাকে ডাকে, তিনি তাহার বাটিতে যাইয়া থাকেন। জগাই মাধাই প্রভুকে তাহাদের বাড়ীতে ডাকিয়াছিল। প্রকৃতই নিমাইপণ্ডিত জগাই মাধাইয়ের বাড়ীতে গীত গাহিতে চলিলেন। সে কিরূপে বলিতেছি।

অপরাহ্নে ভক্তগণ প্রভুর নিকট বলিলেন যে, জগাই মাধাইয়ের ভয়ে তাঁহারা সকলে অস্থির। সেই সুযোগ পাইয়া নিতাই বলিলেন যে, তাঁহারও সঙ্কল্প এই যে, জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার না হইলে আর তিনি নগরে হরিনাম প্রচার করিতে যাইবেন না। নিতাই বলিতেছেন, "প্রভু, সকল লোকেই সাধু তরাইতে পারে। জগতের সর্বাপেক্ষা হীন ও কাঙ্গাল যে জগাই মাধাই, তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পতিত পাবন নামের সফলতা কর। আর আমরাও তোমার সেই কার্য নদীয়াবাসিগণকে দেখাইয়া গৌরব করি ও শ্রীনাম প্রচার করি।"

নিতাই সকল ভক্তগণকে আপনার মতে আনিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রভুর কাছে জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত দরবার করিতে উপস্থিত হইয়াছেন।

ভক্তগণ যে জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত পরামর্শ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা প্রভু বুঝিলেন। বুঝিয়া বলিতেছেন, "তোমরা সকলে যখন তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন তাহাদের উদ্ধারের আর বিলম্ব নাই। তাহাদের পাপের কথা মনে পড়িলে আমার অন্তর শুকাইয়া যায়। পরকালে তাদের কত দুঃখ হইবে, মনে করিলে হৃদয় চমকিয়া উঠে। এরূপ কঠিন রোগের একমাত্র ঔষধ হরিনাম। অতএব, যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

"আনহ যেখানে যত আছে ভক্তগণ।
মিলিয়া সকল লোক কর সংকীর্তন।।"

প্রভু আবার বলিতেছেন, "সকল ভক্তগণকে ডাকিয়া আন, সকলে একত্রে কীর্তন করিতে করিতে যাইয়া তাহাদিগকে হরিনাম দিব, দিয়া অদ্য জগতে হরিনামের শক্তি দেখাইব।" এই আজ্ঞা পাইয়া প্রভুর বাড়ীতে বহুতর ভক্ত উপস্থিত হইলেন, এবং সকলে নগর কীর্তনে প্রস্তুত হইলেন। এই তাঁহাদের প্রথম নগর-কীর্তন। তাঁহাদের কীর্তন পূর্বে বহিরঙ্গ লোকে কেহ কখন দেখে নাই। কেহ খোল, কেহ করতাল, কেহ শঙ্খ, কেহ ভেরী লইলেন। সকলে পায়ে নূপুর পরিলেন। বৈকাল বেলা, শ্রীনিতাই, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস, শ্রীগদাধর, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ, নরহরি প্রভৃতি প্রভুর বাড়ীর কপাট খুলিয়া কীর্তন করিতে করিতে বাহির হইলেন। যথা—

"নিজ ঘরে শুতি আছে জগাই মাধাই।
নিজ মদে মত্ত নিদ্রা যায় দুই ভাই।।
সেই পথে কীর্তন করিয়া প্রভু যায়।
নদীয়ার সব লোক দেখিবারে ধায়।।
করতাল মৃদঙ্গ আর কীর্তনের রোল।
চারিদিকে শুনি মাত্র হরি হরি বোল।।

আনন্দেতে ডগ মগ শ্রীশচীনন্দন।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু মধুর নর্তন।।"—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

এই সংকীর্তন দলের মধ্যে মুরারি গুপ্ত ছিলেন। অতএব তাঁহার সমুদয় স্বচক্ষে দেখা। তাঁহার কড়চার অনুসরণে চৈতন্যমঙ্গল লিখিত; সুতরাং এই জগাই-মাধাই-উদ্ধার কাহিনী চৈতন্যমঙ্গল হইতে লওয়া হইল। আর এই কাহিনীতে যে পদগুলি আছে তাহা সমুদয় সেই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপে যাইতেছেন, শ্রবণ করুন—

"শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যায় নাচিয়া নাচিয়া।
আবেশে অবশ অঙ্গ ঢলিয়া ঢলিয়া।।
চরণেতে বাজে নূপুর রুনু ঝুনু বোলে।
মালতীর মালা বিনোদিয়া গলে দোলে।।
হেলিয়া দুলিয়া গোরা নাচে রঙ্গে ঢঙ্গে।
গলিয়া গলিয়া পড়ে গদাধরেব অঙ্গে।।
ধীরে ধীরে নাচে গোরা কটি দোলাইয়া।
অনিমিখে সঙ্গীগণ দেখে তাকাইয়া।।
প্রেমে পুলকিত তনু মাতি মাতি চলে।
ভাব ভরে গরগর আঁখি নাহি মেলে।।
বাহুর হেলন কিবা ভালি গোরা রায়।
প্রতি অঙ্গের চালনে অমিয়া খসায়।।"

শ্রীনিতাই সবার আগে। নিতাই সবার আগে কেন? কারণ তিনি জগাই মাধাইয়ের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সর্বাপেক্ষা তাঁহার এরূপ দশা কেন হইল, তাহা লোচন দাস ঠাকুর এইরূপে বলিতেছেন—

"দয়ার ঠাকুর নিতাই পরঃদুখ জানে।
অবশ হইয়া পড়ে দীন দরশনে।।"

অতএব জগাই মাধাইয়ের দুঃখে নিতাইয়ের হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায়, তিনি তাহার ছোট ভাই নিমাইকে বলিয়া কহিয়া বাধ্য করিয়া, কোমর বান্ধিয়া, দুই ভাইকে উদ্ধার করিতে যাইতেছেন। নিতাইয়ের গৌরবের ও আনন্দের সীমা নাই, কাজেই নিতাই সকলের আগে। নিতাই আগে কিরূপে চলিতেছেন—

"একে ত দয়াল নিতাই আনন্দের পারা।
প্রেমে গদগদ তনু ঢলি পড়ে ধারা।।
জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণীকুমার।
পতিত উদ্ধার লাগি দুবাহু পসার।।
ডগমগ লোচন ঘুরায় নিরন্তর।
সোণার কমলে যেন ফিরিছে ভ্রমর।।
ক্ষণে 'গো' 'গো' করে, গোরা বলিতে না পারে।
গোরা রাগে রাঙ্গা আঁখি জলেতে সাঁতারে।।
সকরুণ দিষ্টে চায় শ্রীগৌরাঙ্গ পানে।
বলে উদ্ধারহ ভাই যত দীন জনে।।"

জগাই মাধাই সারানিশি মদ্যপান করিয়া অচেতন হইয়া নিদ্রা যাইতেছে, বৈকাল হইয়াছে তবু উঠে নাই। কীর্তনের বোল শুনিয়া তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন বিরক্ত হইয়া প্রহরীকে বলিতেছে, "তুই যা, যাহারা গণ্ডগোল করিতেছে তাহাদের নিবারণ কর, আমাদের আর যেন নিদ্রাভঙ্গ না হয়।" প্রহরী যাইয়া এই কথা কীর্তনোম্মত্ত ভক্তগণকে বলিল। কিন্তু

তাহাতে তাঁহারা নিরস্ত না হইয়া আবও উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। সে লোক ফিরিয়া যাইয়া জগাই মাধাইকে বলিল যে, নিমাই পণ্ডিত কীর্তন করিতে করিতে আসিতেছেন, তাঁহাদের নিষেধ করায় তাঁহারা শুনিলেন না।

জগাই মাধাইয়ের তখন মদের উন্মত্ততা ছিল না, প্রহরীর মুখে এই কথা শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইল। এলো থেলো হইয়া শুইয়া ছিল, অমনি—

"পারিতে পারিতে যায় অঙ্গের বসন। টলমল করি ধায় ক্রোধে অচেতন।।
রাঙ্গা দুনয়ন করি বলে ক্রোধ ভরে। নাশিব সকল বৈষ্ণব নদীয়া 'নগরে।।"

ইহাই বলিয়া তর্জন গর্জন করিতে করিতে তাহারা কীর্তনের দিকে আসিতে লাগিল; কিন্তু ভক্তগণ দেখিয়া ভয়ও পাইলেন না, নিরস্তও হইলেন না বরং অধিক উৎসাহের সহিত নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিলেন।

"তর্জিয়া গর্জিয়া যবে দুই ভাই চলে। বাহু তুলি ভক্তগণ হরি হরি বলে।।
দ্বিগুণ করিয়া আরো বাড়ায়ে উল্লাসে। হরি হরি বোল ধ্বনি গগনে পরশে।।

কিন্তু ইহাতে জগাই মাধাইয়ের মন কোমল হইল না, বরং ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। সাজিয়া গুজিয়া বাড়ীর উপর জোর করিয়া উদ্ধার করিতে আসিলে সকল মানুষেরই রাগ হয়, জগাই মাধাইয়ের ন্যায় লোকের ত হইবারই কথা। বিশেযতঃ জগাই মাধাইয়ের হরিনামের উপর বড় রাগ।

"হরিনাম দুই ভাই সহিবারে নারে।
বেগেতে ধায়রে তারা ভক্ত মারিবারে।।"

নিতাই সকলের আগে, কাজেই তিনি জগাই মাধাইয়ের সম্মুখে সর্বাগ্রে পড়িলেন। তাহাদের ঐ ভাবে ক্রোধে অচেতন হইয়া আসিতে দেখিয়া নিতাইয়ের ভয় কি ক্রোধ হইল না, তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল; তিনি তাহাদের দুর্গতি দেখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

"দীন দয়ার্দ্র চিত্ত নিত্যানন্দ রায়।
অশ্রুপূর্ণ লোচনেতে দুহা পানে চায়।"

দুই ভাই দেখিলেন যে, তাহাদের সেই পরিচিত সন্ন্যাসী, তাহাদের প্রতি সকরুণ দৃষ্টে চাহিয়া রোদন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাহাদের মন নরম হইল না বরং ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল।

"সে করুণ আঁখি দেখি পাপী না গলিল।
ক্রোধ ভরে দুই ভাই সম্মুখে দাঁড়াল।।"

নিতাই দুই ভাইকে সম্মুখে দেখিয়া, আর মাধাই অপেক্ষা জগাই একটু ভাল জানিয়া, কান্দিতে কান্দিতে তাহাকে বলিলেন, "জগাই হরি বল, বলিয়া আমাকে কিনিয়া লও।"

নিতাই যখন গদ গদ হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই কথা বলিলেন, তখন সে কথা জগাইয়ের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ স্পর্শ করিল, এবং সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। "জগাইয়ের মন অমনি দরবিয়া গেল। স্তম্ভিত হইয়া সে দাঁড়ায়ে রহিল।"

কিন্তু মাধাইয়ের হৃদয় জগাইয়ের অপেক্ষা শতগুণে কঠিন। মাধাইয়ের মন ভিজিল না, তাহার ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। তখন ক্রোধে আর কিছু না পাইয়া একখানা কলসী খণ্ড লইয়া নিত্যানন্দের মস্তকে অতি জোর নিক্ষেপ করিল! নিত্যানন্দের মস্তকে উহা অতি বেগে লাগিল।

"কলসীর কানা সে ফেলিয়া মারে কোপে।
নির্ভয়ে লাগিল নিত্যানন্দের মস্তকে।।"

নিত্যানন্দের মস্তকে কলসীর কানা অতি জোরে লাগিল, ও তীরের ন্যায় রক্ত ছুটিল। তখন নিতাই কি করিলেন?

"ফুটিল মুটকি শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
'গৌর' বলি নিতাই আনন্দে নৃত্য করে।।"

কেন নিতাই আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন? তাহার কারণ নিতাই তখন ভাবিলেন যে, ইহাদের আর ভাবনা নাই, ইহারা নিশ্চয়ই উদ্ধার পাইল। এই আনন্দে তিনি "গৌর" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। মাধাই ক্রোধে অন্ধ, একবার মারিয়া তাহার তৃপ্তি হইল না, আবার আর একখণ্ড কলসী লইয়া মারিতে উঠিল। অমনি জগাই তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "কর কি? বিদেশী সন্ন্যাসীকে মারিয়া পৌরুষ কি, আর ভালই বা কি হবে?" নিতাই তখন নাচিতে নাচিতে দুই ভাইকে বলিতেছেন—

"মারিলি কলসীর কানা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি।।
মেরেছিস্ মেরেছিস্ তোরা তাহে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই।।"

শ্রীনিমাই পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা ত্রিজগতকে দেখাইতেছেন। প্রভুর ইচ্ছা যে এ সমুদয় উদ্ধার কার্য শ্রীনিতাই দ্বারা সমাধা করাইবেন। তাই অগ্রে যে রক্তারক্তি হইতেছে তাহা যেন না জানিয়া পশ্চাতে নৃত্য করিতেছেন। একজন ভক্ত দৌড়িয়া গিয়া প্রভুকে সংবাদ দিল, আর তিনি ধাইয়া আইলেন। তিনি আসিয়া নিতাইকে ধরিলেন—

"নিতাইয়ের অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
আনন্দময় নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ নেহারে।।
প্রেমভরে মহাপ্রভু নিতাই কোলে নিল।
আপন বসন দিয়া রক্ত মুছাইল।।
তবে মাধাই সম্বোধিয়া বলেন কাতরে।
প্রাণের ভাই নিতাই মারিলি কিসের তরে?"

ইহা বলিতে বলিতে প্রভু ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধপূর্ণ নয়নে সেই দুই ভাইয়ের পানে চাহিয়া বলিলেন, "হারে পাপত্মাগণ! পাপ করিয়া তোদের পাপ পিপাসার শান্তি হইল না, পাপ করিয়া তোদের বিশ্রাম ইচ্ছা হইল না? চিরজীবন ঘোর পাপে রত থাকিয়া, অদ্য শ্রীনিত্যানন্দকে আহত করিয়া, তোদের পাপ ব্রতের কি প্রতিষ্ঠা করিলি?" জগাই মাধাই কখন কাহারও নিকট মস্তক নত করে নাই। তাহারা তখন আপনাদের বাড়ীতে নিজের অস্ত্রধারি লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত। দুই ভাই মনে করিলে তখনই ভক্তগণকে কটাক্ষে বধ করিতে পারে। তাহারা নদীয়ার রাজা অথচ নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগকে শাসন বাক্য বলিতেছেন, ইহা দুই ভাই কেন সহ্য করিতেছে? তাহার কারণ বলিতেছি। নিমাইকে দেখিয়াই মাধাই জড়ীভূত হইয়া পড়িল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনার ক্ষমতা পর্যন্ত রহিল না। প্রভু আবার বলিতেছেন, "হাঁরে পাপাত্মাগণ। নিত্যানন্দ তোদের কি ক্ষতি করিয়াছিলেন যে, তোরা তাঁহাকে মারিলি? বিদেশী সন্ন্যাসীকে মারিতে তোদের একটু দয়া হইল না? তোদের যদি মারিবার ইচ্ছা ছিল, তবে আমাকে মারিলি না কেন? তোদের.ও ভুবনের পরম বন্ধু, অক্রোধ ও অভিমানশূন্য নিত্যানন্দকে আহত করিয়া অদ্য তোরা তোদের পাপের ঘট পূর্ণ করিলি। এখন তোদের দণ্ড গ্রহণ কর।"

যেমন নরহত্যাকারী ব্যক্তি বিচারকের সম্মুখে থাকিয়া তাহার মুখ পানে তাকাইয়া কাঁপিতে থাকে, সেইরূপ তাহারা, তাহাদের উপর কি দণ্ড হয়, ইহা ভাবিয়া প্রভুর বদন পানে চাহিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কারণ তাহারা যে অপরাধী ও দণ্ডার্হ এবং প্রভু যে তাহাদিগকে দণ্ড করিতে সক্ষম, এ বিশ্বাস তখন তাহাদের মনকে অটলরূপে অধিকার করিয়াছে। তখন প্রভু উচ্চৈঃস্বরে "চক্র" "চক্র" বলিয়া ডাকিলেন। যখন নিমাই উচ্চৈঃস্বরে "চক্র" "চক্র" বলিয়া আহ্বান করিলেন, তখন সকলে স্তম্ভিত হইলেন। মুরারিগুপ্তের শরীরে শ্রীহনুমান প্রকাশ হইতেন। হনুমান তখন মুরারির দেহে প্রবেশ করিয়া গর্জন করিতে করিতে

বলিতেছেন, "প্রভু! সুদর্শনকে কেন স্মরণ করিতেছেন? আমাকে অনুমতি দিন, আমি এখনই দুবেটাকে যমঘব পাঠাইয়া দিই।"

যখন নিমাই "চক্র" বলিয়া ডাকিলেন, তখন নিতাই সচকিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইলেন। যখন মুবারি প্রভুর নিকট দুই ভাইকে বধ করিতে অনুমতি চাহিলেন, তখন নিতাই আপনার মাথার বেদনা ভুলিয়া গিয়া, মুরারির দুটি হাত ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, "ভাই ক্ষমা দে।" ইহাই বলিয়া নিতাই পশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখেন যে সুদর্শন চক্র অগ্নির আকার ধারণ করিয়া জগাই মাধাইয়ের দিকে আসিতেছে। তখন নিতাই ব্যস্ত হইয়া সুদর্শন চক্রকে করজোড়ে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "সুদর্শন! ক্ষমা দাও, তুমি এই দুই ভাইকে মারিও না। আমি প্রভুর চরণ ধরিয়া, এই দুই ভাইয়ের প্রাণ ভিক্ষা লইতেছি।" ইহা বলিয়া নিতাই ব্যস্ত হইয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। বলিতেছেন, "প্রভু! কর কি? সব ভুলে গেলে? তোমার এবার ত কাহাকেও দণ্ড করিবার অধিকার নাই? তুমি না বলেছিলে এই অবতারে চক্র ধরিবে না, এবার ভক্তি ও কারুণ্যরসে ডুবাইয়া মলিন জীবকে উদ্ধার করিবে? যে দুষ্ট তাহাকে যদি বধ কর, তবে উদ্ধার কাহাকে করিবে।"

নিত্যানন্দ এইরূপ বলিতেছেন, আর জগাই, মাধাই, ভক্তগণ এবং উপস্থিত বহু নাগরীয়া (যাঁহারা এই গোল দেখিয়া সেখানে আসিয়াছেন) নিশ্চল হইয়া সমস্ত ঘটনা দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন।

নিতাই, জগাই মাধাইকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "প্রভু! এই দুইটি প্রাণী আমাকে ভিক্ষা দাও। আমি এই দুইটি জীব লইয়া তোমার দীনবন্ধু ও পতিতপাবন প্রভৃতি নামের গরিমা রক্ষা করিব।" কিন্তু নিতাইয়ের অনুনয় বিনয়ে প্রভু কোমল হইতেছেন না। নিতাই প্রভুকে কঠিন দেখিয়া আবার বলিতেছেন, "প্রভু! আমার কপালে সামান্য আঘাত লাগিয়াছে, আর উহা দৈবাৎ লাগিয়াছিল, জগাই ও মাধাইয়ের আমাকে ভয় দেখানো ব্যতীত মারিবার উদ্দেশ্য ছিল না। প্রভু! আমি স্বরূপ বলিতেছি, আমি একবিন্দুও ব্যথা পাই নাই। প্রভু! মায়া ছাড়! তুমি এখন যাহা করিতেছ, এ সমুদয়ের উদ্দেশ্য আমার গৌরব বুদ্ধি ও মান রক্ষা করা। আমার মান ছারখারে যাউক, তোমার অভয় পদে এই দুই মহাদুঃখী জীবকে স্থান দাও।"

এ স্থানে চৈতন্যমঙ্গল গীত হইতে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

"সুদর্শন বলি প্রভু স্মরে বারে বার।
শুনিয়া মুরারি গুপ্ত ছাড়িয়ে হুঙ্কার।।
মুরারি কহয়ে শুন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা পাই এ দুই পাঠাই যমঘর।।
শুনি নিত্যানন্দ ধরেন মুরারির হাত।
হেনকালে সুদর্শন আইল সাক্ষাৎ।।
সুদর্শন চক্র অগ্নি প্রলয় হইয়া।
জগাই মাধাই প্রতি চলিল কুপিয়া।।
দয়ার সাগর মোর নিত্যানন্দ রায়।
না মারিহ বলি সুদর্শনকে রহায়।।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে প্রভুর চরণে।
এই দুই পতিত প্রভু মোরে দেহ দানে।।
আর যুগে যুগে দৈত্য করিলে উদ্ধার।
সশরীরে এ দুইয়ের করহ নিস্তার।।
করজোড়ি প্রভুরে বলয়ে নিত্যানন্দ।
না হ'ল নিস্তার কলি পাষণ্ড দুরন্ত।।

সংকীর্তন আরম্ভে তোমার অবতার।
কৃপায় সকল জীবের করিবে উদ্ধার।।
যে মারিবে তারে যদি করিবে সংহার।
কেমনে করিবে কলি জীবের উদ্ধার।।
শুনি নিত্যানন্দ বাণী প্রভু গৌরচন্দ্র।
কান্দিতে লাগিলা কোলে করি নিত্যানন্দ।।"

জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত নিত্যানন্দের আর্তি, বিনয়, কাকুতি মিনতি, ব্যগ্রতা, প্রাণপণ সঙ্কল্প; তাঁহার একবার উর্ধ্বপানে চাহিয়া সুদর্শনের প্রতি মিনতি, একবার দুটী হাত ধরিয়া মুরারিকে মিনতি ও একবার প্রভুর চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মিনতি দেখিয়া, তিন জন ব্যতীত, উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই অভিভূত হইয়াছেন। সে তিন জনপ্রভু স্বয়ং, আর জগাই ও মাধাই। নিতাই তাহাদের জীবন ভিক্ষার নিমিত্ত যে কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা তাহারা কর্ণেও শুনিবার অবকাশ পাইতেছে না। তাহাদের নয়ন স্থিরভাবে প্রভুর মুখপানে রহিয়াছে। তাহারা দেখিতেছে প্রভু রুদ্র অবতার, মুখে তাঁহার করুণার চিহ্নমাত্র নাই। ইহা দেখিয়া তাহারা একেবারে জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

যখন নিত্যানন্দ দেখিলেন যে, প্রভু কোমল হইতেছেন না, তখন তিনি নিরুপায় হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু! আর এক কথা বলি, তুমি এ দুটিকেই দণ্ড করিতে পার না, যেহেতু জগাই আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।"

অমনি প্রভুর মুখের কঠিন ভাব অন্তর্হিত হইল। তিনি বলিতেছেন, "জগাই তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে! সে কি?" নিতাই বলিলেন, "মাধাই যখন দ্বিতীয়বার কলসীখণ্ড দ্বারা আমাকে প্রহার করিবার উদ্যোগ করে, তখন জগাই তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে নিবারণ করে, আর তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলে যে, সে অতি নির্দয়, কারণ সে বিদেশী সন্ন্যাসীকে মারিয়াছে। তাহাতেই মাধাই আমাকে আর মারিতে পারে নাই।"

প্রভু বলিতেছেন, "তুমি বল কি? এই জগাই, মাধাইয়ের হাত ধরিয়া তোমাকে বাঁচাইয়াছে? এই জগাই? হাঁরে জগাই, তুই আমার নিত্যানন্দের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিস? তবে ত আমি তোরই হলাম। আয় তোকে প্রসাদ প্রদান করি।" ইহাই বলিয়া শ্রীনিমাই সর্বসমক্ষে সেই অস্পৃশ্য পামর, সেই শত শত নরনারী হত্যাকারী জীবাধমকে হৃদয়ে গাঢ়রূপে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। জগাই তখন কি বলিতে গেল, কিন্তু কথা ফুটিল না; অমনি ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় দীঘল হইয়া মৃত্তিকায় অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল।

মাধাই সমুদয় দেখিতেছে। প্রভুর রুদ্রমূর্তি দেখিল; আবার জগাইকে করুণা করিতেও দেখিল। দেখিল, তাহার সেই সমুদয় পাপকর্মের অর্ধভাগী ভ্রাতা শ্রীগৌরাঙ্গের দক্ষিণ পদখানি হৃদয়ে ধরিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে, আর অশ্রুজলে উহা ধৌত করিতেছে। তখন মাধাইয়ের চৈতন্য হইল, আর "আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া সে তখনি শ্রীগৌরাঙ্গের পদতলে পড়িল।

প্রভু অমনি দুই পদ পশ্চাতে হটিলেন। হটিয়া বলিতেছেন, "ওরে অধম, তুই যে ঠাকুরালীতে উন্মত্ত হইয়া জীবের উপর এত অত্যাচার করিয়াছিস্, সেই নদীয়ার ঠাকুরালী পরিত্যাগ করিয়া, আজ কেন ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছিস্? নদীয়ার রাজা হইয়া এখন ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছিস্, ইহাতে তোর লজ্জা বোধ হইতেছে না? মাধাই, আমা হইতে তোমার উদ্ধার হইবে না।"

"নবদ্বীপের রাজা হও তোমরা দুজন।
রাজা হয়ে কি কারণে কান্দহ এখন?

ইহাতে মাধাই অতি কাতর স্বরে বলিলেন, "তুমি জগতের পিতা, তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ কর, তবে আর আমি কার কাছে যাইব? প্রভু! আমরা দুই ভাই একত্রে পাপ

করিলাম; তুমি দয়াময়, জগাইকে উদ্ধার করিলে, আর আমাকে পরিত্যাগ করিবে, এত তোমার উচিত নয়।"

প্রভু বলিলেন, "জগাই আমার নিকট অপরাধী। যে আমার নিকট অপরাধী হয়, তাহার অপরাধ মোচন করিতে আমার অন্যের অপেক্ষা করিতে হয় না। কিন্তু মাধাই, তুমি নিত্যানন্দের নিকট অপরাধী। আমার ভক্তের নিকট যাহারা অপরাধী, তাহাদের অপরাধ আমি স্খালন করিতে পারি না। তাহা হইলে ভক্তদ্রোহীগণকে আমার প্রকারান্তরে উৎসাহ দেওয়া হয়। মাধাই! নৃশংস অত্যাচারী নিষ্ঠুরকে স্পর্ধা দেওয়া ত দায়ময়ের কার্য নয়। তাহাদের দণ্ড দেওয়াই দয়াময়ের কার্য।"

তখন মাধাই নিরুপায় হইয়া কহিলেন, "প্রভু! তোমার নিকট আমি করুণা প্রার্থনা করিতেছি না, কারণ আমি যে সমস্ত কুকর্ম করিয়াছি, তাহাতে ক্ষমা মাগিবার পথ বাখি নাই। তবে আমি সরলভাবে মনের কথা বলিতেছি। আমার হৃদয় হইতে আশা যাইতেছে না। তুমি যে আমাকে একেবারে ফেলিয়া দিবে, ইহা আমি কোনক্রমেই মনে ধারণা করিতে পারিতেছি না। তুমি আমাকে বলিয়া দাও, আমি কি উপায়ে উদ্ধার পাইতে পারি। আমি তাহাই করিব।"

প্রভু তখন দ্রবীভূত হইয়াছেন, মনের ভাব ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু করুণ আঁখি তাহা করিতে দিতেছে না। তখন হৃদয়ের ভাব যতদূর পারেন গোপন করিয়া বলিলেন, "মাধাই! তুমি শ্রীনিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত করিয়াছ, তুমি তাহার কাছে অপরাধী। শ্রীনিত্যানন্দ দয়াময়, তুমি তাঁহার চরণ দু'খানি ধরিয়া পড়। যদি তিনি তোমার অপরাধ মার্জনা করেন, তবে তুমি মুক্ত হইলেও হইতে পার।" এই কথা বলাতে মাধাই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ ছাড়িয়া শ্রীনিত্যানন্দের চবণ ধরিয়া পড়িলেন ও বলিলেন, "প্রভু! তুমি ক্ষমা করিলেই ভগবান্ আমাকে শ্রীচরণে স্থান দিবেন।"

শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি শ্রীনিত্যানন্দের হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি যেরূপ দয়াল, তাহাতে মাধাই ক্ষমা মাগিবার আগেই, তুমি যে তাহাকে মার্জনা করিতে প্রস্তুত, তা জগতে সকলেই জানে। কিন্তু তাহা উচিত নয়, যেহেতু তাহা হইলে, এই দুরাত্মা ইহার অপরাধরাশিকে অতি লঘু ভাবিবে। অতএব এই অধমকে রক্ষা করিতে আমি তোমার নিকট মিনতি করিতেছি, ইহা বুঝিতে পারিলে ইহার হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ইহার অপরাধ কিরূপ গুরুতর। শ্রীপাদ! তুমি মাধাইকে ক্ষমা কর, যেহেতু সাধুজন অনুতপ্ত ও চরণাশ্রিত ব্যক্তিগণকে চিরদিন ক্ষমা করিয়া থাকেন। অতএব এ অধমকে ক্ষমা করিয়া সাধু ও পাপাত্মায় কি বিভিন্নতা তাহার পরিচয় দাও।"

ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ গদ গদ হইয়া বলিলেন, "প্রভু! তুমি আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই দুইটি পাপীকে উদ্ধার করিবে তাহা আমি জানি। আমার গৌরব বাড়াইবার নিমিত্ত আমার কাছে অনুমতি চাহিতেছে। তাহাই হউক, আমি উহাকে ক্ষমা করিলাম। তাহা কেন, আমি তোমার সমক্ষে সরলভাবে বলিতেছি যে, যদি আমি কোন জন্মে কোন সৎকর্ম করিয়া থাকি, তাহা আমি সমুদয় মাধাইকে দিলাম। তুমি এই পরম দুঃখী অনুতপ্ত জীবটিকে চরণে স্থান দাও।" যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"বিশ্বম্ভর বলে শুন নিত্যানন্দ রায়।
পড়িলে চরণে কৃপা করিতে জুয়ায়।।"

তাহাতে— "নিত্যানন্দ বলে প্রভু কি বলিব মুঞি।
বৃক্ষদ্বারে কৃপা কর সেই শক্তি তুঞি।।
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিলুঁ মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত।।
মোর যত অপরাধ কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড় কৃপা কর তোমার মাধাই।।

তখন নিত্যানন্দ পদ-লুণ্ঠিত মাধাইকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ওরে নির্বোধ! সেই কৃপাময়

তোকে অগ্রেই কৃপা করিয়াছেন দেখলি না? তুই ছার, তোর নিমিত্ত শ্রীভগবান আমার নিকট অনুনয় বিনয় করিতেছেন। এস বাপ মাধাই, তোকে আলিঙ্গন করি।" ইহাই বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ মাধাইকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন, আর মাধাইও জগাইয়ের পার্শ্বে অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন দুই ভাই ধূলায় পড়িয়া রহিলেন। উত্তান-নয়ন, তাহা হইতে অল্প অল্প অশ্রু পড়িতেছে, উভয়ই স্পন্দনহীন, চেতনাশূন্য, অঙ্গে সাড়া নাই। ভক্তগণ "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

তখন সে স্থানে এত কলরব হইল, আর কি ভক্ত কি অভক্ত, নানাভাবে এমন বিবশীকৃত হইতে লাগিলেন যে, সেখানে প্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ আর থাকিতে পারিলেন না। জগাই মাধাইকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া শ্রীনিমাই ভক্তগণসহ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। প্রভু ভক্তগণ লইয়া নিজ বাটিতে প্রবেশ করিলেন। ভক্তগণ শ্রান্তিদূর করিবার নিমিত্ত কেহ পিঁড়ায়, কেহ বা আঙ্গিনায় বসিলেন। যে অদ্ভুত কাণ্ড সকলে স্বচক্ষে দেখিলেন, তাহাতে কাহারও বাক্যস্ফুট করিবার ক্ষমতা রহিল না। সকলেই আপনাপন মনের ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল; এমন সময় দ্বারে "ঠাকুর!" "ঠাকুর!" বলিয়া কে চীৎকার করিতেছে, সকলে শুনিলেন। ক্রমে অনুসন্ধানে জানিলেন যে, জগাই মাধাই দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছেন। তখন প্রভু তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিতে মুরারিকে পাঠাইলেন। মুরারি এই অবতারে হনুমান। তাঁহার শরীরে যখন হনুমান প্রবেশ করিতেন, তখন তাঁহার বলের সীমা থাকিত না। জগাই মাধাইয়ের ন্যায় বলবান আর কেহ ছিল না, তাহাদের মনে এই বড় গর্ব ছিল। মুরারি তাহাদিগকে ডাকিতে যাইয়া তাহাদের সেই বলের দর্প নাশ করিলেন। প্রভু বলিলেন, "মুরারি উহাদিগকে এখানে আন। যথা, শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে ঃ

"এখানে আমার ঠাঁই আনহ মুরারি।
আজ্ঞা পাইয়া দুহারে আনিল কোলে করি।।

মুরারি বীরের ন্যায়, দু'ভাইকে "কোলে" করিয়া আনিলেন। দু'ভাই আসিয়া প্রভুর আঙ্গিনায় অচেতন অবস্থায় দীঘল হইয়া পড়িলেন। তখন প্রভু নিত্যানন্দকে আজ্ঞা করিলেন, "শ্রীপাদ! এই দু'জনকে জাহ্নবীতীরে লইয়া যাইয়া ইহাদের কর্ণে শ্রীহরিনাম দাও।" ইহাই বলিয়া প্রভু ও ভক্তগণ জগাই ও মাধাইকে লইয়া কীর্তন করিতে করিতে জাহ্নবীতীরে চলিলেন। দুই ভাইয়ের চেতন নাই, সুতরাং তাহাদিগকে ধরাধরি করিয়া লইয়া গঙ্গাতীরে মৃতব্যক্তির ন্যায় শোয়ান হইল। তখন নদীয়া টলমল করিতেছে। সকলে জগাই মাধাইয়ের এই সংবাদ শুনিয়াছেন; শুনিয়া সেইদিকে দৌড়িয়াছেন। যেমন কোন বৃহৎ অনিষ্টকারী ব্যাঘ্র ধরা কি মারা পড়িলে দেশের লোক সমবেত হয়, সেইরূপ জগাই মাধাই ধরা পড়িয়াছে, ইহা দেখিবার নিমিত্ত নদীয়া নগরে হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল! ক্রমে নাগরিয়াগণ জুটিতেছেন ও কলরবও বৃদ্ধি পাইতেছে। যাঁহারা পূর্বে বিদ্রুপ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও দেখিতেছেন যে, যে জগাই মাধাই একটু পূর্বে নদীয়ার 'রাজা' ছিলেন, নদীয়ার যাহাকে যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেন ও করিতেন, সেই নদীয়ার রাজা অদ্য নিমেষের মধ্যে আর এক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত রাজাদ্বয় এখন ধূলায় লুণ্ঠিত।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ গভীর স্বরে, অর্থাৎ উপস্থিত তাবল্লোকে শুনিতে পায় এইরূপ করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, আমি এই দুইটি জীব আপনাকে দিলাম। আপনি ইহাদিগকে গঙ্গাস্নান করাইয়া হরিনাম দান করুন।" এই মুহূর্তের কার্য বর্ণনা করিয়া অনেক প্রাচীন পদ আছে, তাহার মধ্যে একটি নিম্নে দিলাম। নিত্যানন্দ দুই ভাইকে বলিতেছেন ঃ

"আয়রে জাহ্নবী তীরে দুটি ভাই।
আজ তোদের হরিনাম দিব রে জগাই মাধাই।। ধ্রু।।
মাধাই মার্‌লি মার্‌লি কর্‌লি ভাল রে,
এখন হরি বলে নেচে আয়।।

তুই মেরেছিস্ কলসীর খণ্ড।
আজ, হরিনাম দিয়া করিব দণ্ড।।"

জগাই মাধাই তখন অচেতন, কাজেই চলিয়া গঙ্গার মধ্যে যাইতে পারিলেন না! ভক্তগণ মহানন্দে তাঁহাদিগকে স্কন্ধে করিয়া জলে লইয়া গেলেন। যখন জলের মধ্যে দুই ভাইকে লইয়া ভক্তগণ প্রবেশ করিলেন, তখন জগাই মাধাইয়ের চেতন হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ, ভক্তগণ ও জগাই মাধাই সকলেই প্রথমে গঙ্গাস্নান করিলেন।

গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া সহস্র সহস্র লোক কৌতুক দেখিতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, সুতরাং দেখিতে কাহারও বাধা হইতেছে না। ভক্তগণ গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া, মধ্যস্থলে শ্রীগৌরাঙ্গ ও জগাই মাধাই। জগাই মাধাইয়ের হাতে তামা তুলসী দেওয়া হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ তাবল্লোকে শুনিতে পায় এরূপ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হে মাধব (মাধাই)। হে জগন্নাথ (জগাই)! তোমরা এ যাবৎ পর্যন্ত যত পাপ করিয়াছ, তাহা তামা তুলসী ও গঙ্গাজল দিয়া উৎসর্গ করিয়া আমাকে দান কর, করিয়া তোমরা নিষ্পাপ ও নির্মল হও।" ইহা বলিয়া তাহাদের পাপ লইবার জন্য প্রভু সর্বলোকের সমক্ষে অঞ্জলি পাতিলেন।

তখন জগাই মাধাই নিতান্ত কাতর হইলেন। প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভক্তগণ তোমাকে কুসুম ও চন্দন উপহার দিয়া থাকেন। আর অমরা দুই ভাই—পাপাত্মা, তোমার শ্রীকরে পাপ দান করিব! প্রভু তাহা হইবে না। আমরা অপরাধ করিয়াছি, মনসুখে দণ্ড লইব। তুমি এই কৃপা কর যে, পাপের নিমিত্ত আমরা যতই দুঃখ পাই না কেন, তোমার শ্রীচরণ যেন বিস্মৃত না হই। আমরা তোমাকে পাপ দিতে পারিব না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু আবার অঞ্জলি পাতিলেন, আর জগাই মাধাই যে কথা বলিল, তাহার উত্তর না দিয়া শুদ্ধ এই বলিলেন, "জগাই মাধাই! তোমাদের পাপ আমাকে দিয়া সুখে হরিনাম কর।" ইহাতে মাধাই বলিলেন, "প্রভু! আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমরা তোমাকে আমাদিগের পাপ দিতে পারিব না। যাবৎ চন্দ্রসূর্য থাকিবে তাবৎ লোকে বলিবে দুইটি নরাধম, জগাই মাধাই ভগবানের হস্তে তাহাদের পাপরাশি দিয়াছিল।"

ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ মাধাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মাধাই কি নির্বোধের ন্যায় বলিতেছ? শ্রীভগবানের এক নাম পতিতপাবন। অনেকে আছেন যাঁহারা বলেন, 'ভগবান সাধুর বন্ধু ও পতিতের অরি।' তিনি যে পতিতপাবন, অদ্য তোমরা দুই ভাই তাহার সাক্ষী হও। তোমরা ভাবিতেছ, তোমরা এরূপ করিলে তোমাদের কলঙ্ক হইবে; কিন্তু তোমাদের যদি কলঙ্ক হয়, শ্রীভগবানের যশ হইবে। জীবের কলঙ্ক হয় হউক, কিন্তু শ্রীভগবানের যশ হউক। শ্রীভগবানের যশ অদ্য তোমাদের দ্বারা জীবের নিকট সম্যকরূপে প্রকাশিত হউক। অতএব তোমরা তিলার্ধ বিলম্ব না করিয়া অনায়াসে প্রভুর হস্তে পাপ প্রদান কর!"

এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ আবার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "জগাই মাধাই আমি ত্রিলোক মাঝারে তোদের পাপ ভিক্ষা করিতেছি। তোদের পাপ আমাকে দিয়া তোরা নির্মল হ।" তখন শ্রীনিত্যানন্দ দান-মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। জগাই মাধাই সেই মন্ত্র পড়িয়া প্রভুর হস্তে আপনাদের পাপ উৎসর্গ করিয়া দিলেন। আর প্রভু সকলকে শুনাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"তোমাদের সমস্ত পাপ আমি গ্রহণ করিলাম।"

অন্তরঙ্গগণ তখনি দেখিলেন যে, প্রভুর সোণার বর্ণ অমনি কাল হইয়া গেল। যথা, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে—

"দুই জনের শরীরে পাতক নাই আর।
ইহা বুঝাইতে হ'লো কালিয়া আকার।।"

সকলে স্নান করিয়া আবার প্রভুর বাড়িতে আসিলেন। আসিয়া আবার কীর্তন করিতে লাগিলেন।

সেদিনকার নৃত্যের নায়ক জগাই মাধাই, প্রভু পিঁড়ায় বসিয়া দেখিতেছেন। যথা চৈতন্য-মঙ্গল গীত—

একি ঠাকুরাল, এ যে মাধাই নাচে। ধ্রু।।
জগাই নাচিলেও নাচিতে পারে, আবার মাধাই নাচে।।
নাচে হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে।।"

দুই ভাই প্রভুর আঙ্গিনায় ভক্তগণ মাঝে নৃত্য করিতেছেন। আর শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া—যাঁহারা ইহাদের ভয়ে গঙ্গায় যাইতে সশঙ্কিত ছিলেন,—অভ্যন্তর হইতে দর্শন করিতেছেন। কিন্তু জগাই মাধাইয়ের আনন্দ অধিকক্ষণ থাকিল না। একটু পরেই তাঁহারা কান্দিতে লাগিলেন, এবং সে ক্রন্দনের শান্তি কোন ক্রমেই হইল না।

তাঁহারা দুই ভাই আর গৃহে গেলেন না, ভক্তগণের বাড়ীতে থাকিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের আর্তিতে ভক্তগণ অস্থির হইলেন। দুই ভাই আহার ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের কার্য হইল, দুই লক্ষ হরিনাম জপ ও ক্রন্দন। শ্রীনিত্যানন্দের বড় বিপদ হইল। তিনি আর কোন ক্রমেই মাধাইকে সান্ত্বনা করিতে পারেন না। তিনি শত সহস্র বার বলিলেন ও বুঝাইলেন যে, তাহাদের আর পাপ নাই, কিন্তু মাধাই ও জগাই শান্ত হইলেন না।

মাধাই নিতাইকে বলিতেছেন, "প্রভু! তোমাকে আঘাত করিয়াছি, তাহাতে আমার তত দুঃখ নাই; কারণ তুমি আমার পিতা, আমি তোমার পুত্র। অবোধ পুত্রে এইরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু আমি যে কত জীবকে হিংসা করিয়াছি, তাহা আমি নিবারণ করিতে পারি না। আমার ইচ্ছা করে যে, আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের চরণ ধরিয়া ক্ষমা মাগি। কিন্তু আমি অনেককে চিনি না, মাতাল হইয়া কার কি অনিষ্ট করিয়াছি তাহা জানি না। আমি যদি সেই সব লোকগুলিকে পাই, আর তাহাদের চরণ ধরিতে পারি, তবে বোধ হয় আমার হৃদয়ের তাপ যাইতে পারে।

নিত্যানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া মাধাই নদীয়ার ঘাটে আসিয়া বসিলেন। পরিধানে একখানি ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র; উপবাস, ক্রন্দন ও অনিদ্রায় শরীর শীর্ণ। সেই নদীয়ার রাজা ঘাটের এক কোণে বসিয়া হরিনামের মালা লইয়া জপ করিতেছেন। যে কেহ ঘাটে আসিতেছেন মাধাই উঠিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কাতর স্বরে কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "আপনি কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। আমি জানিয়া, কি না জানিয়া যদি আপনাকে কোন দুঃখ দিয়া থাকি, তবে আপনি আমাকে ক্ষমা করিলে শ্রীভগবান আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

মাধাই বিচার না করিয়া, বালক, বৃদ্ধ, নর, নারী, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, প্রতি জনের পদতলে পড়িয়া, এইরূপে রোদন করিতে লাগিলেন। নদীয়ার রাজার এই দশা দেখিয়া সকলে যে কেবল মাধাইকে ক্ষমা করিলেন তাহা নহে, যিনি মাধাইয়ের অবস্থা দেখিলেন তিনিই কান্দিতে লাগিলেন।

এইরূপে মাধাইয়ের দ্বারা লোকের মন নির্মল ও নগরে হরিনাম প্রচার হইতে লাগিল।

মাধাই শ্রীবাসের বাড়ী অন্ন খাইতেছেন না। শ্রীনিত্যানন্দ আজ্ঞা করিতেছেন, তবু মাধাই অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, কেবল ক্রন্দন করিতেছেন। শেষে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গকে সংবাদ দিলেন, এবং তিনি স্বয়ং আসিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া দেখেন যে, মাধাই সম্মুখে অন্ন রাখিয়া আহার করিতেছেন না, কেবল রোদন করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন সম্মুখে বসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, "মাধাই! তোমার সমস্ত পাপ আমি গ্রহণ করিয়াছি, আমি তোমার সম্মুখে বসিয়া আছি এবং আর কিছু যদি তোমার প্রার্থনা থাকে, তাহাও তোমাকে দিতে প্রস্তুত আছি, তুমি শান্ত হও।"

ইহাতে মাধাই বলিলেন, "প্রভু! আমি সব বুঝি। তুমি যখন আমার সম্মুখে তখন আর আমি চাহিব কি? আর তুমি যখন আমার পাপ গ্রহণ করিয়াছ, তখন আমার যে পাপ নাই, তাহাও জানি। কিন্তু এখন যে, রোদন করিতেছি, এ আমার পাপ স্মরণ করিয়া নয়, তোমার করুণা স্মরণ করিয়া।

আমি অস্পৃশ্য পামর, তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তুমি আমাকে যত করুণা করিতেছ, ততই আমার আত্মগ্লানি বাড়িতেছে। এই যে তুমি আমার সম্মুখে বসিয়া আমাকে অন্ন খাওয়াইবার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিতেছ, কিন্তু তুমি বা কি, আর আমি বা কি? প্রভু! বলিতে কি, তুমি যে পরিমাণে আমাকে করুণা করিতেছ, সেই পরিমাণে আমার দুঃখ বাড়িতেছে।"

এখানে ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, ভগবান্ যখন স্বয়ং মাধাইয়ের পাপ গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার এত কাতরে রোদন কেন? ইহার উত্তর এই যে, অবশ্য ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি সকলই করিতে পারেন, কিন্তু তথাচ তিনি কখন আপনার নিয়ম আপনি লঙ্ঘন করেন না। শরীরে পাপ প্রবেশ করিলে ঐ পাপ অনুতাপানলে গলিয়া নয়ন দ্বারা বাহির হইয়া থাকে। এই তাঁহার নিয়ম, আর মাধাইয়ের তাহাই হইল। যদিও প্রভু মাধাইয়ের পাপ গ্রহণ করিলেন, তবুও তাঁহার সে পাপের কষ্ট ভোগ করিতে হইল। ভগবানের আজ্ঞা যে, পাপের ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ মাধাইয়ের পাপ নষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু সমুদয় নিয়ম ঠিক রাখিয়া। তিনি স্বেচ্ছাময় ও সর্বেশ্বর বলিয়া, বালকের মত যাহা ইচ্ছা করেন না।

তিনি যে গৌর-দেহ অবলম্বন করিলেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য ও চিন্ময় ও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা নিয়ত বিরাজ করিতেন। তবে নিমাই কেন আহার করিতেন, কেনই বা নিদ্রা যাইতেন? ঐ দেহের কি কোন রোগ হইয়াছিল? শ্রীভগবান যখন দেহ লইয়া নর-সমাজে বিরাজ করেন, তখন দেহের সমুদয় ধর্ম তাহাও সাধারণ জীবের ন্যায় পালন করিয়া থাকেন। মাধাইয়েরও সেইরূপ স্বভাবের যে নিয়ম তাহা পালন করিতে হইল।

মাধাই ব্রহ্মচর্য ব্রত লইবেন ও প্রত্যহ দুই লক্ষ হরিনাম জপিতেন। তিনি গঙ্গাতীরে থাকিয়া নিজহস্তে কোদালি দিয়া একটি ঘাট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাকে লোকে মাধাইয়ের ঘাট বলিত। এখনও নবদ্বীপে মাধাইয়ের ঘাট প্রসিদ্ধ আছে। এইটি মাধাইয়ের গান—

"তোমরা দুভাই গৌর নিতাই।
আমরা দুভাই জগাই মাধাই।।

মাধাইয়ের বংশীয়গণ অদ্যপি আছেন। তাঁহারা শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পরম বৈষ্ণব, গৌরাঙ্গ ভক্ত।

আর গুটি দুই কথা বলিয়া ও প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। শ্রীভগবান এ অবতারে যখন জীবগণকে শুধু করুণায় উদ্ধার করিবেন তখন চক্রের স্মরণ কেন করিলেন? তাহার উত্তর এই যে, কোন কোন জীব এরূপ হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, তাহাদিগকে ভয় ব্যতীত শুধু করুণায় বশীভূত করা যায় না। শুধু করুণায়, জগাই কোমল হইল, কিন্তু মাধাই হইল না। মাধাই ভয় পাইয়া, তবে আপনার দুর্দশা বুঝিতে পারিল।

আর এক কথা এই,—শ্রীগৌরাঙ্গ অচেতন দু'ভাইকে ফেলিয়া কেন চলিয়া আসিলেন? ইহার উত্তর এই যে, প্রথমতঃ সেখানে অত্যন্ত লোকের ভীড় হয়। দ্বিতীয়তঃ জোর করিয়া বাড়ী পড়িয়া কাহাকে উদ্ধার করা নিয়ম নয়। সে উদ্ধার ঠিক হয় না। নিয়ম এই যে,—কৃপাপ্রার্থী জীব অনুগত হইয়া, কৃপা, প্রার্থনা করিবে, তবে তাহার হৃদয়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহা সজীব থাকিয়া পরিবর্ধিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ জগাই মাধাইয়ের চৈতন্য উদয় করিয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন, আর তাঁহারা আসিয়া শ্রীচরণে আশ্রয় লইলেন, এবং তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের উদ্ধার ক্রিয়া আরম্ভ হইল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

শ্রী অমিয় নিমাই চরিত।। দ্বিতীয় খণ্ড

উৎসর্গ পত্র

পরলোকগত আমার দাদা শ্রীল বসন্তকুমার ঘোষের শ্রীকরকমলে—

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড অর্পণ করিলাম। কেন, তাহা বলিতেছি। আমার দাদা অতি শৈশবেই শ্রীভগবদ্ভক্তিতেই জরজর হইয়াছিলেন। সহর হইতে বহুদূরে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে আমরা বাস করিতাম। আমরা কয় ভাই ও ভগিনী বসিয়া, ছোট বড় সমুদয় কথার বিচার করিতাম। বাহিরের লোকে, কে কি বলে, তাহা লক্ষ্য করিবার অবকাশ আমাদের হইত না। আমরা যাহা কিছু লেখাপড়া শিখি, তাহাও ঐরূপে ঘরে বসিয়া। আমার বয়স তখন তের বৎসর, দাদার আঠার। সেই সময় তিনি এক দিবস কথায় কথায় আমাকে বলিলেন, "অবতারে দৃঢ় বিশ্বাস বড় ভাগ্যের কথা। তবে যদি কখন কোন অবতারে বিশ্বাস করিতে পারি, তবে ন'দের গৌরাঙ্গের শরণাগত হইব।" আমি বলিলাম, "তিনি কে?" দাদা বলিলেন, "শুন নাই? যেমন খ্রীষ্টিয়ানদের যীশুখ্রীষ্ট, তেমনি আমাদের নবদ্বীপের নিমাই,—দুজনায় অনেক মিলে।"

একখানি চিত্রপটে আমি শ্রীন'দের নিমাইকে দেখিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু তাঁহার কথা তখন ভাল করিয়া জানিতে পারি নাই। যীশুখ্রীষ্টের কথা কিন্তু অনেক জানিয়াছিলাম। লুক-লিখিত সুসমাচার নামক খ্রীষ্টিয়ানদিগের বাঙ্গালা গ্রন্থখানি পড়িয়াছিলাম, আর দাদার মুখেও যীশুখ্রীষ্টের কথা অনেক শুনিতাম। আমি বলিলাম, "যীশুখ্রীষ্ট অনেক অলৌকিক কার্য করেন, ন'দের নিমাই কি তেমন কিছু করিয়াছিলেন?" দাদা বলিলেন, "অদ্ভুত কার্য না করিলে সহজে কি লোকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া সম্মান করে?" দাদা আরও বলিলেন, "যীশুর কার্য ও নিমাইয়ের কার্য পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, শ্রীভগবানের অবতার কার্যটি সত্য। কারণ অবতার কার্যটি একেবারে কল্পিত হইলে পৃথিবীর দুই স্থানে, দুই জাতির মধ্যে, দুই সময়ে এরূপ ঠিক-একরূপ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা হইত না।" তাহার পরে দাদা আর একটি অদ্ভুত কথা বলিলেন। অর্থাৎ, "অবতার যদি কখন মানিতে পারি, তবেই আরাম পাইব।" আমি প্রশ্ন করিলাম,—"যীশুখ্রীষ্ট না মানিয়া, দাদা তুমি গৌরাঙ্গ কেন মানিবে?" দাদা বলিলেন,—"শ্রীভগবানের কার্যে ভুল নাই ও জটিলতা নাই। যে দেশের যে পীড়া, তিনি সেই দেশে তাহার ঔষধ দিয়া থাকেন। সাপের যদি ঔষধ থাকে, তবে যে দেশে সাপ আছে, সেইখানেই তাহা পাওয়া যাইবে। যদি তিনি দুই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে সাধারণতঃ য়ীহুদীর দেশের লোকের যীশুকে মানা কর্তব্য, কিন্তু আমরা বাঙ্গালী কি ভারতবর্ষীয়, আমাদিগের গৌরাঙ্গ মানিতে হইবে।"

"অবতারে বিশ্বাস ভাগ্যের কথা।" ইহার অর্থ কি তাহা আমি জানিতে চাহিলাম। দাদা বলিলেন, "শিশির! আমরা কেন কান্দিয়া বেড়াই, জান? আমরা সকলে যেন পিতৃহীন বালক, বিপদ-সাগরে পড়িয়া হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছি। ঈশ্বর বলিয়া ডাকি, কিন্তু তিনি শুনেন না শুনেন, তাহা জানি না। তিনি শুনেন, এ কথা যদি জানিতে পাই, তবেই দুঃখের লাঘব হয়। যদি আরও জানিতে পাই যে, তিনি শুধু শুনেন তাহা নয়, আমাদের প্রতি তাঁহার প্রচুর স্নেহ মমতাও আছে, তবে আর একটুও দুঃখ থাকে না। অবতার মানে এই যে, তিনি আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া, আপনি আমাদের মধ্যে আসেন, কি কোন নিজ-জনকে পাঠাইয়া দেন। সুতরাং অবতারে বিশ্বাস হইলে, সেই সঙ্গে এ বিশ্বাসও হইবে যে, শ্রীভগবান্ অতি নিজ-জন, তিনি আমাদের দুঃখে অতি কাতর। এরূপ যাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তাহার আবার

দুঃখ কি? দুঃখ হইলেও সে উহা অনায়াসে সহিয়া থাকিতে পারে।"

এ সব আন্দাজ চল্লিশ বৎসরের কথা। মনে হইতে পারে যে, আমার দাদা আঠার বৎসর বয়সে এ সমুদয় বড় বড় কথা কিরূপে শিখিলেন? কিন্তু তিনি শিশুকাল হইতে পণ্ডিত। দাদার বয়স যখন আঠার বৎসর, তখনই তিনি, আপনি আপনি ইংরাজীতে মহাপণ্ডিত হইয়াছেন, সংস্কৃত শিখিয়াছেন, গণিতশাস্ত্র শেষ করিয়াছেন, ষ্টুয়ার্ট-মিলের গ্রন্থখানির টিপ্পনি করিয়াছেন। কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্স প্রভৃতি ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র মনোযোগের সহিত পড়িতেছেন ও নানাবিধ যন্ত্র আনিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। তাহার মানসিক শক্তির কথা কি বলিব; তিনি দশ অঙ্কে দশ অঙ্কে, মনে মনে গুণ করিতে পারিতেন। কেমিষ্ট্রী ভাল করিয়া পড়িবেন বলিয়া ফরাশী ভাষা শিখিয়াছিলেন। তার পরে পারসী ভাষাও অধিকার করেন।

আমার দাদাকে আমি ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিতাম। তাঁহার একটু সন্তুষ্টির নিমিত্ত আমি শতবার প্রাণ দিতে পারিতাম। যেমন কাদা দিয়া পুতুল গড়ে, তিনি সেইরূপ আমাকে গড়িয়াছিলেন। ভালই গড়িয়াছিলেন; কিন্তু অল্প বয়সে আমাকে সংসার-স্রোতে ভাসাইয়া তিনি পরলোকগমন করেন। আমি ভাসিতে ভাসিতে রাজনীতির আবর্তে পড়িয়া গেলাম। সেই আমার দুর্গতির কারণ হইল।

আমার দাদা ভগবদ্ভক্তিতে জরজর, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। এক দিবস তিনি তাঁহার নিজ কৃত এই গীতটি নির্জনে বসিয়া গাহিতেছিলেন, যথা—

আমার বন্ধু কত রস জানে। ধ্রু।
(আমি) মনেতে ধরিতে নারি, বর্ণিব কেমনে।।
(আমি) যখন চেতন থাকি, তাঁহারি করুণা দেখি,
তাঁহারি করুণা ভুঞ্জি, নিশির স্বপনে।।

দাদা গাইতেছেন, আর তাঁহার বদন বহিয়া ধারা পড়িতেছে। এমন সময় হঠাৎ আমি সেখানে গেলাম, আর দাদার চোখে জল দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলাম,—"দাদা, তুমি কান্দ কেন?" দাদা অমনি যেন লজ্জা পাইয়া নয়ন মুছিয়া মস্তক অবনত করিলেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করায় তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আর একটু বড় হও, তখন বুঝিবে।"

প্রবল মানসিক শ্রম ও হৃদয়ের বেগ দাদার দেহ সহ্য করিতে পারিল না। শীঘ্রই তাঁহার দেহ ভগ্ন হইল। এক দিবস আমরা দুই ভাই দাঁড়াইয়া কথাবার্তা কহিতেছি, এমন সময় দাদা কাশিয়া সম্মুখে কাশ ফেলিলেন। আমি কথায় বিভোর ছিলাম, উহা লক্ষ্য করি নাই। দেখি, দাদা পা দিয়া উহা আবরণ করিলেন। তখন বুঝিলাম পাছে আমি কাশ দেখিতে পাই, তাই দাদা উহা পা দিয়া ঢাকিলেন। আমি অমনি বসিলাম, এবং দাদার বামপদ ধরিয়া বলিলাম—"পা সরাও, আমি কাশ দেখিব।" দাদা পা সরাইলেন। তখন বুঝিলাম ব্যাপার কি, আর আমার ভুবন অন্ধকার হইয়া আসিল। দাদা ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখিবে কি? ও রক্ত!" আমি রোদন করিতে লাগিলাম। দাদা তখন বসিয়া বলিলেন, "ছি! কাঁদ কেন? আমি আগে এসেছি, আগে যাব।" তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "শিশির! দেহের কষ্ট আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। ইহাতে আমার নিজের কোন দুঃখ নাই, তবে আমি ভাবিয়া থাকি, আমার বিরহে তুমি বড় দুঃখ পাইবে।"

সে ঠিক কথা; বহুদিন তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছে, কিন্তু সে বিরহঅগ্নি সমানই রহিয়াছে। এখনও শ্রীভগবানের পূজা করিতে বসিয়া আমি প্রভুকে দেখিতে পাই না,—সে স্থানে দাদাকে দেখি।

সেই আমার অগ্রজ শ্রীল বসন্তকুমার—যিনি এ জগতে থাকিলে তিনিই এই গ্রন্থ লিখিতেন, আমার এ গুরুতর ভার বহন করিতে হইত না,—আমার এই পরিশ্রমের ধন, দ্বিতীয় খণ্ডখানি, তাঁহার শ্রীকরকমলে অর্পণ করিলাম।

গৌরাঙ্গ ৪০৯ শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ

পাঠকগণের প্রতি নিবেদন

শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে জীবগণকে অগ্রে ভক্তিধর্ম ও পরে প্রেমধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পর্যন্ত প্রধানতঃ ভক্তির কথা লিখিত হইয়াছে। মহাজনগণ প্রভুর লীলার এই ভক্তির অঙ্গ বিস্তার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমি প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পর্যন্ত ভক্তিধর্ম একটু সংক্ষেপে লিখিয়াছি। আমি দেখিলাম যে, প্রভুর প্রত্যেক লীলা যদি প্রস্ফুটিত করিতে যাই, তবে এ গ্রন্থ শেষ করিতে বহুদিন যাইবে ও আমার শক্তিতেও কুলাইবে না। সেইজন্য ভক্তির কাণ্ড সংক্ষেপে লিখিয়া প্রেমের কাণ্ড বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সেই প্রেমহিল্লোলের, আমার যথাসাধ্য বর্ণনা, পাঠক দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পরে পাইবেন। জীবগণ সেই তরঙ্গে সাঁতার দিবেন, এই আমার বাসনা। তবে আমার করজোড়ে নিবেদন, পাঠক মহাশয় একেবারে অনেক দূর পড়িবেন না। কারণ যেমন ভোজনের একটি সীমা আছে, তেমনি রসাস্বাদনেরও একটি সীমা আছে। একেবারে অধিক আস্বাদ করিতে গেলে আস্বাদ-শক্তি হ্রাস হইয়া যায়।

মাধুর্য-ভজনে তিনটি অবস্থা হয়,—যথা পূর্বরাগ, মিলন ও বিরহ। শেষ ভাবই সর্বোৎকৃষ্ট, কারণ বিরহে পূর্বরাগ ও মিলন সুখ উভয়ই আছে। শ্রীনিমাই এই সমুদয় রস আপনি আস্বাদ করিয়া জীবকে আস্বাদ করাইয়াছেন। আমি এই সমুদয় রস যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়াছি বটে কিন্তু তাহাতে আমার সাধ মিটে নাই। হয়ত এই সমুদয় রস ভাষার দ্বারা সম্যক্ প্রকারে বর্ণনা করা অসাধ্য, না হয় আমার শক্তিতে কুলায় নাই। আর যাহা হউক, এ দুঃখ আমার চিরদিন থাকিবে যে, আমি হৃদয়ে যে রস আস্বাদন করিলাম, তাহার এক কণাও আমার কৃপাপরায়ণ পাঠকগণের নিমিত্ত এই গ্রন্থে রাখিতে পারিলাম না।

তবে আমার গল-লগ্নী-কৃতবাসে এই নিবেদন, যেরূপ শিক্ষা ব্যতীত "ক খ" পর্যন্ত গোচর হয় না, সেইরূপ এই সমুদয় রস, সাধন-ভজন ব্যতীত, শুদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া, কখনও পাইবার সম্ভাবনা নাই। একটু সাধন-ভজন করুন, নয়নের আবরণ আপনিই পড়িয়া যাইবে। তখন প্রথম খণ্ডে বলরাম দাস যে শীতল নিকুঞ্জ-কাননের কথা বলিয়াছেন, তাহা দেখিতে পাইবেন*

শ্রীমঙ্গলাচরণ

আমি নিম্নের চারিটি বন্দনামালা মঙ্গলময়ের শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম।

কৃষ্ণনগর জেলার হাঁসখালি গ্রামে, চূর্ণী নদীর ধারে, আমি যেরূপ হরিনাম দর্শন ও শ্রবণ করি, তাহা একটি পদে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি। তাহাই আমার প্রথম মঙ্গলাচরণ হউক।

[১]

ফাল্গুনের শেষে কৃষ্ণ-চূড়া ফুটে
বলি সেই বৃক্ষতলে।
চুরণীর ধারে বৃক্ষ শোভা করে
আছিনু আপনা ভুলে।।
পুঁথি এক হাতে গৌর-কথা তা'তে
পহিলা পড়ছি লীলা।

---

* আমি এই গ্রন্থে "আমার অভিন্ন-কলেবর" বলরাম দাসের বহুতর কবিতার সন্নিবেশ করায়, তিনি যে কে তাহা অনেকে জানিতে চাহিয়াছেন। এ বিষয়ে গোপন করিবার কিছুই নাই। পূর্ব-পূর্ব মহাজনগণ পদ বাঁধিবার সময়, আপনাদের ডাক নামের পরিবর্তে গুরুদত্ত নাম দিয়া ভনিতা দিতেন। আমারও আর এক নাম বলরাম দাস। তাই বলরাম দাসকে আমার অভিন্ন কলেবর বলিয়া জানিবেন।

আখরে আখরে কত মধু ঝরে
অঙ্গ এলাইয়া গেলা।।
এমন সময় পাখী উড়ে যায়
নামটি হলিদা পাখী।
উড়ি যায় চলে মুখে হরি বলে
ডালেতে বসিল দেখি।।
আর কত পাখী ডালেতে বসিয়া
সেই সঙ্গে হরি বলে।
অচেতন মত চিত চমকিত
চাহি দেখি মুখ তুলে।।
সব পাখী মিলে মুখে হরি বলে
আর কিছু নাহি শুনি।
ক্রমে হরি-নাম বাড়িয়া চলিল
চাবিদিকে হবিধ্বনি।।
আকাশে তাকাই দেখিবারে পাই
মোটা মোটা আখরেতে।
আকাশ ভবিয়া হরিদ্রা বর্ণের
হরি-নাম লেখা তাতে।।
শ্রবণ আমাব নাহি শুনে আর
শুধু হরি-নাম বিনে।
যেদিকে তাকাই দেখিবারে পাই
অঙ্কিত হরির নামে।।
ভাবিলাম মনে এই ত্রিভুবনে
সকলে গাইছে গুণ।
বলাই কেবল দিন গোঁয়াইল
বিষয়েতে দিয়া মন।।

কিন্তু ইহাতে আমার পিপাসা মিটিল না, বরং একটি অনিবার্য বাসনার উদয় হইল। সেই বাসনাটি আমি যে পদে প্রকাশ করি, তাহাও শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম ঃ—

[২]

জাগাইল ডাকি আঁখি মেলে দেখি
কে ডাকে উদ্দেশ নাই।
লুকায়ে রহিলে কি লাগি ডাকিলে
বৃথা ডাকে দুঃখ পাই।।
মোর দশা ভেবে দেখ হরি ধ্রু।
কোথা থাকো তুমি কিছুই না জানি
জানিলেও যাইতে নারি।।
মিলিবে মু সনে যদি থাকে মনে
তবে এক কাজ কর।
যেতে সাধ্য নাই এস মোর ঠাঁই
মানুষের রূপ ধর।।

অন্য রূপ ধরি এস যদি হরি
ভয়ে আমি পলাইব।
মোর মত হও আর কথা কও
সুখ দুখ কথা কব।।
মোর মনোব্যথা ছোট-বড় কথা
শুনিবে আপন হয়ে।
মোর দোষ যত দেখিবে হে নাথ
কৃপার নয়ন দিয়ে।।
কিছু মোর নাই যে দিব তোমায়
তুমি ত আমারে দিবে।
এই অঙ্গীকার বলরামে কর
তবে সে তোমার হবে।।

তাহার পরে শ্রীভগবান্ আমার হৃদয়ে কিরূপে ক্রমে ক্রমে স্ফুরিত হইলেন, তদ্-বর্ণিত এই দুইটি পদ শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম ঃ—

[৩]

পিঁড়ায় বসিয়ে নিমিষ হারায়ে
কুলবতীগণ লয়ে।
সোণার পুতুল আঙ্গিনায় নাচে
শচী দেখিছেন চেয়ে।।
সখাগণ বেড়ি দেয় করতালি
বাসু গাইছেন গান।
কোন কোন ভক্ত চন্দ্রমুখ চাই
রূপসুধা করে পান।।
হুলু হুলু ধ্বনি করিছে রঙ্গিণী
বাজে খোল করতাল।
ঝুমুর-ঝুমুর নূপুর বাজিছে
মিশাইয়া তালে তাল।।
আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখে বিষ্ণুপ্রিয়া
মধুর গৌরাঙ্গ-নৃত্য।
জগৎ আনন্দ করুক বর্ধন
কহে বলরাম ভৃত্য।।

[৪]

পূর্ণ চাঁদ আলা বনফুল মালা
বাতাবী ফুলের গন্ধ।
শিশির দুর্বার রস কবিতার
পদ্মফুল মকরন্দ।।
সুস্বর সুরাগ নৃত্য ও সোহাগ
সতৃষ্ণ নয়ন-বাণ।
প্রেমানন্দ ধার মধু-হাসি আর
লজ্জা আলিঙ্গন মান।।

এই আয়োজনে পূজে গোপীগণে
সর্বাঙ্গসুন্দর বরে।
বলরাম দীন নীরস কঠিন
কি দিয়া তুষিবে তাঁরে।।

প্রথম অধ্যায়

শ্রীবৃন্দাবন দাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন যে, শ্রীঅদ্বৈতের ক্রোধ "হাস্যময়;" অর্থাৎ তিনি যতই ক্রোধ করুন না কেন, তাঁহাতে কাহারও ভয় কি রাগ হইত না, বরং হাসি পাইত। তাঁহার ভর্ৎসনা কি স্তুতির প্রকৃত অর্থ কি, তাহা সকল সময়ে বুঝিয়া উঠা ভার হইত। কীর্তনান্তে দুই প্রহরের সময় ভক্তগণ গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। প্রেমানন্দে সকলেই চঞ্চল; যিনি অতি বৃদ্ধ, তিনিও তখন শিশু হইয়াছেন। সুতরাং গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া সকলেই জলকেলি আরম্ভ করিলেন। প্রথমে হাত ধরাধরি করিয়া "কয়া-কয়া" খেলিলেন। তারপর জলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরস্পরে নয়নে জল দেওয়া-দেওয়ি করিতেছেন। এইরূপে শ্রীনিমাই গদাধরের নয়নে জল দিতেছেন। যথা—

"জল-কেলি গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
পারিষদ্‌গণ সঙ্গে জলেতে নামিল।।
কার অঙ্গে কেহ জল ফেলিয়া সে মারে।
গৌরাঙ্গ ফেলিয়া জল মারে গদাধরে।।
জল-ক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে।
হুলাহুলি কোলাকুলি করে জনে জনে।।
গৌরাঙ্গচাঁদের লীলা কহনে না যায়।
বাসুদেব ঘোষ তাই গোরা গুণ গায়।।"

নিরীহ গদাধর সহিয়া আছেন, কখন বা রাগ করিয়া নিমাইয়ের আঁখিতে জল দিতে যাইতেছেন। কিন্তু চোখে জল লাগিয়া পাছে নিমাই ব্যথা পান, এই ভয়ে জল ফেলিয়া মারিতে পারিতেছেন না, কিনয়নে না মারিয়া অন্যস্থানে জল নিক্ষেপ করিতেছেন। নিতাই আর অদ্বৈতে ঘোর সমর বাধিয়া গেল। তখন অন্য সকলে জলকেলি ক্ষান্ত দিয়া, এই নিতাই-অদ্বৈতে যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। নিতাই বলবান, বয়ঃক্রম বত্রিশ; আর অদ্বৈতের উপবাস শুষ্ক শরীর, বয়ঃক্রম পঁচাত্তর; অদ্বৈত পারিবেন কেন? তিনি হারিলেন। তখন নিমাই মধ্যবর্তী হইয়া বলিতেছেন, "একবার হারিলে হারি নয়, দুইবার হারিলেই হারি।" এ কথা সকলে স্বীকার করিলেন, এবং নিতাই ও অদ্বৈত আবার যুদ্ধ বাধিল। এবার নিতাই দুই হাতে জল লইয়া অদ্বৈতের চোখে মারিতে লাগিলেন। অদ্বৈত ব্যথা পাইয়া দুই হাত দিয়া নয়ন রক্ষা করিতে করিতে বলিতেছেন, "গোঁয়ার! গোঁয়ার!" নিতাই বলিতেছেন, "তবে গোঁয়ারের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে এস কেন? ঝগড়া করিতে ত খুব পটু।" অদ্বৈত বলিতেছেন, "আমি শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, মাসে আমার ১০।১২ দিন উপবাস। তুমি সন্ন্যাসী, জীবন রক্ষার নিমিত্ত দুটি অন্ন একবার খাবে, এই সন্ন্যাসের ধর্ম। কিন্তু দিবানিশি মুখখানি চলিতেছে, তোমার সঙ্গে আমি কেমন করে পারিব?" নিতাই বলিতেছেন, "তুমি ত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, উপবাস করিয় দেহ শুষ্ক করিয়া থাক। আবার দেখিতে পাই বৎসর বৎসর একটি করিয়া সন্তানও হইতেছে।" এইরূপে কথায় কথায় বিষম ঝগড়া আরম্ভ হইল। খানিক এইরূপে উভয়ে উভয়কে দুর্বাক্য বলিয়া আবার পরস্পরে আলিঙ্গন করিলেন।

অসাক্ষাতে অদ্বৈত কখন কখন নিমাইয়ের প্রতি কিছু কিছু কটাক্ষ করিতেন। কখন বলিতেন, 'নাচন; গাওন, আবার কি ধর্ম?" কখন বলিতেন, "কলিকালে আবার অবতার কোন্ শাস্ত্রে?" কখন আবার বলিতেন, "নিমাই বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। আমি উহার সমস্ত প্রেম শুষিয়া লইব,

দেখি কিরূপে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাচেন।" কেহ কেহ অদ্বৈতের এই সমস্ত কথা বিশ্বাস করিয়া ভাবিতেন, অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া মানেন না। আবার প্রভুর প্রতি তাঁহার গাঢ় ভক্তি দেখিয়া তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। একদিন শ্রীবাস অদ্বৈতের মুখে নিমাইয়ের বিরুদ্ধে এইরূপ কিছু কথা শুনিয়া একটু কুতূহলী হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "প্রভু! অদ্বৈত কি তোমার ভক্ত?" শ্রীগৌরাঙ্গের তখন ভগবান ভাব। এ কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "শ্রীবাস, তুমি বল কি? অদ্বৈতের মত ভক্ত আমার ত্রিজগতে আর কেহ নাই।"

এক দিবস কীর্তনে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীনিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত আপনার মস্তক সেই শ্রীচরণে ঘষিতে লাগিলেন। তাহার পরে একটি তৃণ দন্তে ধরিয়া উহা নিমাইয়ের অঙ্গে আপাদমস্তক বুলাইলেন, বুলাইয়া সেই তৃণ মস্তকে করিয়া আপনার থুথুতে হস্ত দিয়া ও ভ্রূকুটি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, একটু পরে নিমাই সচেতন হইযা উঠিলেন। উঠিয়া বলিতেছেন. "আমি নৃত্য করিতে পারিতেছি না কেন? বোধ হয়, তোমরা কেহ আমার চরণধুলি লইয়াছ। কে লইয়াছ বল।" তখন সকলে চুপ করিয়া রহিলেন। অদ্বৈত ভয়ে ভয়ে অগ্রবর্তী হইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "বাপ! চরণধূলি চাহিলে যদি পাইতাম, তবে আর চুরি করিতে যাইতাম না। চাহিলে পাই না, কাজেই চুরি করিতে বাধ্য হই। তুমি যদি নিষেধ কর, তবে এরূপ কার্য আর করিব না। এবার আমাকে ক্ষমা কর।"

শ্রীগৌরাঙ্গকে অদ্বৈতের এরূপ সভয়ে কথা বলিবার কারণ বলিতেছি। শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে ভক্তি দেখাইতেন, তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। শুদ্ধ তাহা নয়, মাঝে মাঝে তাঁহার চরণধূলিও লইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এরূপ ব্যবহার শ্রীঅদ্বৈতের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি এই নিমিত্ত সরলভাবে সর্বদা দুঃখে প্রকাশ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে বলিতেছেন, "তোমার অভাব কি যে, তুমি ক্ষুদ্র ব্যক্তির স্থানে চুরি করিতে যাইবে? তা ভাল, চোরে দশদিন চুরি করে, গৃহস্থ একদিনে তাহার ধন উদ্ধার করে। এই দেখ, আমি আমার দ্রব্য উদ্ধার করিতেছি।" ইহাই বলিয়া মহাবলী নিমাই অদ্বৈতকে মৃত্তিকায় ফেলিয়া, তাঁহার চরণে মস্তক ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "এই আমি সব উদ্ধার করিলাম। এখন কি করিবে?" অদ্বৈত বলিলেন, "প্রভু, তুমি রক্ষা করিতেও পার, সংহার করিতেও পার। সুতরাং তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। তবে, বাপ! তুমি যদি শাস্তি দাও, তবে আর কার কাছে যাই।" শ্রীগৌরাঙ্গ কৃতার্থ হইয়া বলিলেন, "তুমি স্বয়ং মহাদেব, তোমার চরণধুলি সর্বাঙ্গে মাখিলে ভক্তির উদয় হয়, অতএব সকলেরই কর্তব্য তোমার চরণধূলি গ্রহণ করা।" অদ্বৈত এই কথা শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

আর এক দিন শ্রীগৌরাঙ্গ ও অদ্বৈতে আবার একটু গণ্ডগোল হইল। নৃত্য করিতে গিয়া নিমাই বলিতেছেন, "আজ আমার শরীরে আনন্দ নাই কেন? আজ আমি কেন নৃত্য করিতে পারিতেছি না? আমি কি তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি? যদি করিয়া থাকি, ক্ষমা কর, আমাকে প্রেম দাও, আমার প্রাণ যায়।" নিমাই কখন কখন এইরূপ বলিতেন। এ সম্বন্ধে দুই-একটি কাহিনী বলিতেছি। একদিন নিমাই বলিতেছেন, "আমি কেন নাচিতে পারিতেছি না? বোধ হয় এখানে ভিন্ন-লোক কেহ আছেন। যদি থাকেন তাহাকে বাহির করিয়া দাও।" দ্বার বন্ধ করিয়া নিশিযোগে শত শত ভক্ত একত্রে কীর্তন করেন। তাহার মধ্যে অন্য লোকের লুকাইয়া থাকা বিচিত্র কি? এই কথা শুনিয়া শ্রীবাস তখনি আঙ্গিনায় তল্লাস করিতে লাগিলেন; শেষে বলিলেন, "কৈ, ভিন্ন লোক ত দেখিলাম না।" তখন নিমাই আবার নাচিতে গেলেন, কিন্তু বিষণ্ণ হইয়া আবার বলিতেছেন, "কৈ, আনন্দ ত পাইতেছি না। নিশ্চয় কেহ এখানে লুকাইয়া আছেন।" তখন শ্রীবাস ঘরের মধ্যে তল্লাস করিতে যাইয়া দেখেন যে তাঁহার শাশুড়ী পিঁড়ায় ডালে মুড়ি দিয়া কীর্তন শুনিতেছেন।

অপর এক দিবস নিমাই এইরূপ নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন, "আমার হৃদয়ে প্রেম কেন শুষ্ক হইয়া গেল? অবশ্য কোন বহিরঙ্গ লোক এখানে আছেন।" তখন শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু, আমি

অপরাধ করিয়াছি। একজন সাধু কীর্তন দেখিবার জন্য অনুরোধ করায় তাঁহাকে ভাল লোক ভাবিয়া তোমার বিনা অনুমতিতে এখানে আসিতে দিয়াছি, প্রভু আমাকে ক্ষমা কর। ইনি ভাল লোক, শুধু দুগ্ধপান করেন।" নিমাই স্থির হইয়া শুনিতেছিলেন, কিন্তু শ্রীবাস যখন বলিলেন, "তিনি দুধ খাইয়া জীবন ধারণ করেন," তখন প্রভু একটু ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "দুধ খাইয়া জীবন ধারণ করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। অতএব তোমার সাধুকে এখান হইতে যাইতে বল।" প্রভুর ভাব দেখিয়া ভক্তগণ, সেই ভালমানুষ ব্রাহ্মণটীকে বলপূর্বক আঙ্গিনার বাহির করিয়া দিয়া কপাট দিলেন। কিন্তু সেই ভদ্রলোকটি এইরূপ অপমানিত হইয়াও কিছুমাত্র দুঃখ পাইলেন না। বরং তাঁহার মনে হইলে যে, বিনা অনুমতিতে আসিয়া তিনি বিশেষ অপরাধ করিয়াছেন। আবার ভাবিতেছেন, যে, "যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম ইহা অননুভবনীয়। মনুষ্য কর্তৃক এরূপ কাণ্ড হইতেই পারে না। শ্রীনিমাইপণ্ডিত যে স্বয়ং ভগবান্ তাহার সন্দেহ নাই, কারণ এত শক্তি জীবে সম্ভবে না। এখন সেবা করিয়া তাঁহার কৃপাপাত্র হইব।" ইহাই ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ মহা হৃষ্ট-মনে গমন করিতেছেন, এমন সময় পুনরায় দ্বার উদঘাটন করিয়া একজন ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রভু তোমায় ডাকিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে ভিতরে যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পড়িলেন। প্রভু বলিতেছেন, "উঠ! তোমার কিছু অপরাধ নাই। আমি তোমাকে পরীক্ষার নিমিত্ত দণ্ড করিয়াছিলাম। তুমি দণ্ড পাইয়া বিরক্ত না হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া যাহা ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলে, তাহা আমার গোচর হইয়াছে। আমি যে বলিয়াছি, 'দুগ্ধ পান করিয়া জীবন যাপন করিলে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না,' সে ঠিক কথা। তবে তুমি যে সেবা করিয়া শ্রীভগবানের চরণ লাভ করিবে সঙ্কল্প করিয়াছ সেই নিমিত্ত তোমাকে আলিঙ্গন দিব।" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দিলেন, আর ব্রাহ্মণ তদ্দণ্ডে প্রেমধন পাইয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই হইতে ব্রাহ্মণ চিরদিনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের দাস হইলেন। পাঠক! স্মরণ রাখিবেন যে, সকলে একভাবে ভাবান্বিত না হইলে, কীর্তনে কি কৃষ্ণ-কথায় তরঙ্গ উঠিবার ব্যাঘাত হয়।

এখন শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে প্রভুর গণ্ডগোলের কথা বলিতেছি। এক রজনীতে প্রভু নৃত্যে সুখ পাইতেছেন না বলিয়া কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি কি অপরাধে প্রেম হারাইলাম? অদ্য কি রাজপথে কু-লোকের সঙ্গ হইয়াছিল? না, তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি? আমি বড় দুঃখ পাইতেছি, তোমরা কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মোচন করিয়া আমাকে একটু প্রেম দাও, নতুবা আমার প্রাণ যায়।"

এই যে ভক্তগণ নৃত্য করিতেছেন, ইহা প্রেমের শক্তিতে। যাঁহার হৃদয়ে কোন কারণে প্রেম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তিনি কপট নৃত্য ব্যতীত প্রকৃত নৃত্য করিতে পারেন না। হঠাৎ কাহার হৃদয়ে কোন কারণে প্রেম শুষ্ক হইলে,—সুরামত্ত ব্যক্তির মাদকতা ছুটিলে যেরূপ দুঃখ হয়, সেই জাতীয় ক্লেশ হইয়া থাকে— তাহার প্রেম-খোঁয়ারী হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ এই কথা বলিতেছেন, সকলে ভীত ও দুঃখিত হইয়া শুনিতেছেন, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্রেমে ডগমগ হইয়া নৃত্য করিতেছেন। তখন নিমাই বিনীতভাবে শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতে লাগিলেন, "গোসাঞি! তুমি প্রেমে নৃত্য করিতেছ, কিন্তু আমি আর শ্রীবাস প্রেমধনে বঞ্চিত হইয়া ভয়ানক দুঃখে পাইতেছি। তুমি প্রেমের ভাণ্ডারী। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমার নিকট প্রেম পাইয়া নাচিতেছেন। তিলি, মালি পর্যন্ত তোমার কৃপায় প্রেম-সুখ ভোগ করিতেছে, কেবল আমি আর শ্রীবাস তোমার কৃপা পাইলাম না। গোঁসাঞি! কৃপা কর, নতুবা প্রাণ যায়।"

শ্রীঅদ্বৈত এই কথায় ভ্রূক্ষেপও না করিয়া দাড়িতে হাত দিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু কতক ব্যঙ্গ ভাবে, কতক বিরক্ত ভাবে বলিতেছেন,—"গোঁসাঞি! যদি তুমি আমাকে প্রেমধন না দাও, তবে তোমার সমুদয় প্রেম শুষিয়া লইব।" এই যে প্রেম "শুষিয়া" লইব—ইহা শ্রীঅদ্বৈতের কথা। তিনি প্রায়ই অন্তরালে বলিতেন, "বিশ্বম্ভরের প্রেম আমি শুষিয়া লইব, দেখি

কেমন করিয়া সে নাচে?" এখন প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতের সেই কথা লইয়া শ্রীঅদ্বৈতকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন, "যদি আমাকে প্রেম না দাও, তবে তোমার প্রেম শুষিয়া লইব।"

এ কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত কিছু উত্তর করিলেন, কিন্তু কি উত্তর করিলেন তাহা জানা যায় না। চৈতন্যভাগবতে এইটুকু মাত্র পাওয়া যায়—"চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য গোঁসাঞি। কি বলয়ে কি করয়ে কিছু ঠিক নাই।।"

ইহার তাৎপর্য ইহাই বলিয়া বোধ হয় যে, আচার্য গোঁসাঞি, অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত তখন প্রেমে উন্মত্ত। তিনি যখন যাহা বলিয়াছেন তাহা আর বুঝিয়া বলেন নাই। চৈতন্যভাগবত আবার বলিতেছেন—"যে ভক্তি প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে। সে যে বাক্য বলিবেক কি বিচিত্র তারে।।"

অর্থাৎ ভক্তির বলে বলীয়ান হইযা সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে বেচিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত যে সেই ভক্তি বলে শ্রীগৌরাঙ্গকে দুটা কর্কশ বাক্য বলিবেন, তাহার বিচিত্র কি? ইহাতে মনে হয়, অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে কিছু অনুচিত বাক্য বলিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের কর্কশবাক্য শুনিয়া শ্রীনিমাই আর কোন উত্তর করিলেন না, অমনি দ্বার খুলিয়া গঙ্গাভিমুখে ছুটিলেন। নিমাই বিদ্যুতের ন্যায় এই কার্যটী করিলেন, সুতরাং নিত্যানন্দ ও হরিদাস ভিন্ন আর কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। নিতাইয়ের নয়ন গৌর ছাড়া আর কোনদিকে যাইত না; তাঁহার নয়নভৃঙ্গ কেবল গৌর-মুখপদ্ম মধু পানে দিবানিশি মত্ত থাকিত। নিতাই ও হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন।

নিমাই দৌড়িয়া যাইয়াই জাহ্নবীতে ঝম্প দিলেন। কিছু পরেই নিতাই ও তাহার পরে হরিদাস ঝাঁপ দিলেন। নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া জলমগ্ন হইলেন। নিতাই ও হরিদাস ডুব দিয়া, একজন মস্তক ও একজন চরণ ধরিয়া শ্রীনিমাইকে উঠাইয়া তীরে আনিলেন। তখন নিমাই চেতনা পাইয়া বিরক্তির সহিত নিতাইকে বলিতেছেন, "তুমি কেন আমাকে উঠাইলে? আমার প্রেমশূন্য দেহ রাখিয়া কি ফল?" প্রভুর এই কথা শুনিয়া নিতাইয়ের নয়ন দিয়া ধারা পড়িতে লাগিল। নিতাইয়ের নয়নে জল দেখিয়া নিমাই ঘাড় হেঁট করিলেন। নিতাই বলিতেছেন, "সেবক যদি গরব করিয়া তোমাকে দুটা কথা বলে, তুমি কি তাই বলিয়া তাহাকে প্রাণে মারিবে?" যথা ভাগবতে— "অভিমানে সেবকেরা বলিলে বচন। প্রভু তাহে লইবে কি ভৃত্যের জীবন?"

তারপর নিতাই বলিলেন, "তুমি এরূপ করিয়া আচার্যকে প্রাণে না মারিয়া তাঁহাকে অন্য দণ্ড কর।"

তখন নিমাই লজ্জিত হইয়া বলিতেছেন, "আমি নন্দন আচার্যের বাড়ী গিয়া নিশি যাপন করি। তোমরা গৃহে যাও, কিন্তু এ ঘটনা প্রকাশ করিও না।" নিতাই ও হরিদাস প্রভুকে নন্দন আচার্যের বাড়ী রাখিয়া গৃহে গমন করিলেন। নন্দন আচার্য বাড়ীতে ছিলেন ; প্রভুকে পাইয়া গোষ্ঠীসমেত আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন শুষ্কবস্ত্র পরিলেন ও ভগবান্ আবেশে বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন। আর নন্দন আচার্য ও তাঁহার পারিষদ্বর্গ সারা-নিশি বৈকুণ্ঠের আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। প্রত্যুষে প্রভু নন্দন আচার্যকে বলিলেন, "তুমি শ্রীবাসকে একাকী আমার নিকট লইয়া আইস।" এদিকে প্রভু নিশিযোগে সংকীর্তন ত্যাগ করিয়া গেলে অনতিবিলম্বে সকলে জানিলেন যে, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। রাসের নিশিতে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অদর্শন হওয়ায় গোপীদের যে ভাব হইয়াছিল, তখন তাঁহাদের তাহাই হইল,—সমস্ত আনন্দ ফুরাইয়া গেল। সেখানে নিতাই ও হরিদাস নাই দেখিয়া সকলে ভাবিলেন যে, তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে আছেন, ইহাতে তাঁহারা একটু আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু সকলেরই মনঃকষ্টের একশেষ হইল। বিশেষতঃ শ্রীঅদ্বৈতের এরূপ কষ্ট হইল, যেন তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যায়। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া তাঁহাকে আর কেহ কিছু বলিলেন না। তিনিও আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে নিজ বাড়ীতে আসিয়া উপবাস করিয়া শুইয়া থাকিলেন।

এদিকে নন্দন আচার্যের সঙ্গে শ্রীবাস, প্রভুর অগ্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুকে দেখিয়া শ্রীবাস কাঁদিতে লাগিলেন। তখন নিমাই বলিতেছেন, "শান্ত হও, আচার্য কিরূপ আছেন বল।" শ্রীবাস বলিলেন, "আচার্য উপবাস করিয়া পড়িয়া আছেন। যেমন অপরাধ, তিনি সেইরূপ দণ্ড পাইয়াছেন।

তাঁহার যে গুরুতর অপরাধ, তাহাতে তিনি বলিয়াই আমরা সহ্য করিয়াছি, অন্য কেহ হইলে সহিতে পারিতাম না। তবে প্রভু, তুমি যেমন আমাদের প্রাণ, তাঁহারও সেইরূপ প্রাণ বটে।" যথা চৈতন্যভাগবতে - "অন্য জন হইলে কি আমরা সহি। তোমার সে সবেই জীবন প্রভু বহি।।"

শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! এখন একটি অভয় বাক্য বলিয়া অদ্বৈত আচার্যের প্রাণ রাখ।" তখন নিমাই বলিতেছেন, "চল চল অদ্বৈতের বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করি।" ইহাই বলিয়া দুইজনে তাঁহার বাড়ী চলিলেন। এইরূপে অপরাধ যদিচ আচার্যের, তবু নিমাই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে তাঁহার বাড়ী গেলেন; যাইয়া দেখেন, তিনি মড়ার মত পড়িয়া আছেন। নিমাই যাইয়া তাঁহাকে ডাকিলেন; বলিতেছেন, "উঠ আচার্য! এই আমি বিশ্বম্ভর ।" আচার্য একে অপরাধী, তারপর প্রভুর এইরূপ দৈন্য, সৌজন্য, মহত্ত্ব ও কৃপা দেখিয়া অনুতাপানলে ও লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেলেন; কথা কহিতে পারিতেছেন না। প্রভু আবার ডাকিলেন। তখন আচার্য ধীরে-ধীরে বলিলেন, "প্রভু, আমি এখন বুঝিলাম, আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য জগতে নাই। অন্য সকলকে তুমি দৈন্য দিয়াছ; তাহারা তোমার চরণসেবা করিয়া সুখে নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। আমাকে কেবল খানিক অহঙ্কার দিয়াছ। আমাকে তুমি গৌরব ও ভক্তি কর। তাহাতে আমার কেবল দম্ভের সৃষ্টি হয়। এখন আমি বুঝিলাম আর সকলে তোমার নিজ-জন, কেবল আমি তোমার বহিরঙ্গ। আমাকে যে তুমি আত্মীয়তা দেখাও, সে তোমার বাহ্য। কিন্তু তুমি আমার প্রাণ ও যথাসর্বস্ব। আমাকে এই কৃপা কর, যেন দীনভাবে তোমার চরণে থাকিতে পারি।" যথা চৈতন্যভাগবতে— "হেন কর প্রভু মোরে দাস্য ভাব দিয়া। চরণে রাখহ দাসীনন্দন করিয়া।।"

প্রভুর তখনও ভগবান-আবেশ রহিয়াছে। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমার নিজ-জন না হইলে তোমাকে দণ্ড করিতাম না। আমি আমার অনুগ্রহপাত্রকেই এইরূপে দণ্ড করিয়া থাকি।" যথা—"অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যারে দণ্ড করে। জন্মে জন্মে দাস সেই বলিনু তোমারে।।"

তখন অদ্বৈত উঠিয়া আনন্দে বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিতেছেন, "আজ আমি প্রভুর দণ্ড পাইয়া কৃষ্ণের দাস হইলাম। আজ জানিলাম, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ভুলেন নাই।"

একটি প্রবাদ আছে যে, শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"যে করে আমার আশ, তারি করি সর্বনাশ। তবু নাহি যে ছাড়ে পাশ, তার হই দাসের দাস।।"

যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-মধু আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি দুঃখ পাইলে, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বিস্মৃত হয়েন না, ইহাই মনে হইলে ভক্ত আনন্দিত হয়েন, আর তখন ভক্তের নিকট ভগবান্ হার মানেন।

মহাপ্রকাশের সময় শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার অতিবৃদ্ধা জননীর মস্তকে শ্রীপাদ দিয়াছিলেন। আবার এই প্রকাশ-অবস্থায় শ্রীনিমাই দীন হইতেও দীন। তখন তাঁহার দৈন্য ও কাতর-ভাব যিনি দেখিতেন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। তবে অপ্রকাশ অবস্থায়, তিনি বিশেষ গুরুজন ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রণাম করিতেন না। কারণ তাহা করিলে, তাঁহার ভক্তগণ ক্লেশ পাইতেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অন্য কাহাকেও তাঁহার চরণে প্রণাম করিতে দিতেন না। কেহ প্রণাম করিলে তিনিও প্রণাম করিতেন, কাজেই ভয়ে কেহ তাহাকে প্রণাম করিত না। শ্রীভগবান-আবেশে যে নিমাই অতিবৃদ্ধা জননীর মস্তকে পদ দিয়াছিলেন, অন্য অবস্থায় তাঁহার কিরূপ দৈন্য ও গুরুজন প্রতি কিরূপ ভক্তি তাহা এখন শ্রবণ করুন। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ সংকীর্তনান্তে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছিলেন এমন সময় একজন মান্যা ব্রাহ্মণ-রমণী তাঁহার সম্মুখে নিপতিত হইয়া বলিলেন, "তুমি শ্রীভগবান্, আমাকে উদ্ধার কর।"

এই কার্যে শ্রীগৌরাঙ্গ স্তম্ভিত হইলেন ও তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল। তখন তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া দ্রুতবেগে যাইয়া, গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। ভক্তগণ অনতিবিলম্বে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। কিন্তু নিমাইকে পাইলেন না। এখন বিবেচনা করুন, এ সমুদয় চকিতের মত হইয়া গেল। প্রভু যে জলে ঝম্প দিবেন, কেহ তাহা ভাবেন নাই। প্রভু ছুটিলেন; কিন্তু ভাবের

অনুগত হইয়া তিনি মুহুর্মুহুঃ এরূপ ছুটিতেন। যদি তাঁহারা বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিতেন যে, প্রভু জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছেন, তবে আর এরূপ বিপদ হইতে দিতেন না। প্রভু তীরের মত ছুটিলেন, ছুটিয়া গঙ্গায় ঝম্প দিলেন।

নিমাই পূর্বেও কয় বার জলে ঝম্প দিয়াছিলেন, কিন্তু একবারও আপনি উঠেন নাই। কারণ কয় বারই তিনি অচেতন অবস্থায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইতে হইয়াছিল।

এবারও ঐরূপ দ্রুতগতিতে আসিয়া জলে ঝম্প দিলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, প্রভু এখনই উঠিবেন, কিন্তু যখন তিনি উঠিলেন না, তখন সকলে হাহাকার করিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু স্রোতে তখন তাঁহার দেহ ঝম্পস্থান হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে, কাজেই তাঁহাকে তল্লাস করিয়া পাওয়া গেল না। এ সংবাদ দাবানলের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িল এবং চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিলেন। দুঃখিনী শচীও ইহা শুনিলেন। তিনি কি অবস্থায় ছুটিয়া আসিলেন তাহা অনুভব করুন, বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। শচী আসিয়া দেখিলেন, নিমাইকে পাওয়া যায় নাই। তখন তিনিও জলে ঝাঁপ দিতে গেলেন; কিন্তু ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন।

শচী তীরে দাঁড়াইয়া "নিমাই, নিমাই" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, বুক চাপড়াইতেছেন, আর বার বার জলে ঝাঁপ দিতে যাইতেছেন; কিন্তু সকলে নিবারণ করিতেছেন। এমন সময় নিতাই আসিলেন এবং শুনিয়াই জলে ঝাঁপ দিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে ঃ---

"জলে মগ্ন হৈল প্রভু না পাই দেখিতে।
সর্ব নিজ নিজ জন ঝাঁপ দিলেন পশ্চাতে।।
পুত্র পুত্র বলি ধেয়ে যায় শচীমাতা।
ঝাঁপ দিতে চাহে বিশ্বম্ভর হরি যথা।।
উন্মত্তা পাগলিনী শচী কান্দে উভরায়।
হা-কান্দ কান্দনে কান্দে ভূমেতে লুটায়।।
ঐছন প্রমাদ দেখি অবধৌত রায়।
প্রভুর উদ্দেশে ঝাঁপ দিলেন গঙ্গায়।।
জলমগ্ন হইয়া প্রভুর ধরিলেন হাতে।
ধরিয়া তুলিল গঙ্গাকূলে আচম্বিতে।।"

প্রভুকে ধরাধরি করিয়া তীরে উঠান হইল, এবং একটু পরে তাঁহার চেতনা হইল। তখন নিমাই নিতাইকে বলিতেছেন, "কেন তুমি আমাকে মরিতে দিলে না? আমার এ অপরাধময় দেহ রাখিয়া ফল কি? আমি জীবাধম, অতিমান্যা ব্রাহ্মণ-রমণী আমার চরণধূলি গ্রহণ করিলেন। আমি কীটাণুকীট, অথচ আমায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সম্বোধন করিলেন, ইহাতে আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণে যে অপরাধী হইলাম, তাহা হইতে নিস্তার পাইবার উপায় দেখিতেছি না। আমাকে তোমরা ছাড়িয়া দাও, আমি এই কলুষিত দেহ ত্যাগ করিব।" ইহা বলিয়া বিহুল হইয়া প্রভু রোদন করিতে লাগিলেন। সকলে নানামতে সাধ্য সাধনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই নিমাই প্রবোধ মানিলেন না। মধ্যস্থানে নিমাই রোরুদ্যমানা শচীমাতার কোলে বসিয়া অশ্রুজল ফেলিতেছেন, আর হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া রোদন করিতেছেন। সকলে যথাসাধ্য বুঝাইলেন, কিন্তু নিমাই কোনক্রমেই প্রবোধ মানিলেন না। প্রভুর হৃদয়ে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিতেছে। তৃণ দিয়া কি গঙ্গার স্রোত বন্ধ করা যায়? ভক্তগণের প্রবোধে প্রভুর তরঙ্গ নিবারিত হইল না। নিমাই "শ্রীকৃষ্ণ! বাপ! আমি অপরাধী, তুমি আমার অপরাধ মোচনের উপায় বলিয়া দাও," এই বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

নিমাইয়ের মনের ভাব অনুভব করুন। ভক্ত অবস্থায় নিমাইয়ের ন্যায় দীন ত্রিজগতে আর নাই। শ্রীকৃষ্ণে দাস্য-ভক্তি কিরূপে পাইবেন, এই নিমিত্ত যাহাকে পান, তাহার কাছে কাতর হইয়া মিনতি করেন। সেই নিমাইকে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-রমণী চরণে ধরিয়া বলিলেন, "তুমি শ্রীকৃষ্ণ, আমাকে উদ্ধার

কর।" প্রভু ভাবিতেছেন, "হইল ভাল! কোথায় আমাকে লোকে ভক্তি শিক্ষা দিবে, আমাকে কৃপা করিবে, না আমাকে শ্রীভগবান্ করিয়া তুলিল!" ইহা ভাবিয়া নিমাই অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিমাই উঠিলেন, উঠিয়া কান্দিতে কান্দিতে জ্ঞানহারা হইয়া মুরারি গুপ্তের বাড়ীর দিকে চলিলেন। অপর সকলেও তাঁহার সঙ্গে কান্দিতে কান্দিতে যাইতে লাগিলেন। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া পরে বিজয় মিশ্রের বাড়ী গেলেন। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া কান্দিতে কান্দিতে আবার হরিদাস আচার্যের বাড়ীতে গেলেন। সেখানেও তাঁহার সঙ্গে সকলে গমন করিলেন। হরিদাস আচার্যের বাড়ীতে সমস্ত নিশি রোদন করিয়া যাপন করিলেন। প্রভাত হইলে হরিদাসের বাড়ী ত্যাগ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে সুরধুনী তীরে আসিলেন ও একখানি নৌকা পাইয়া গঙ্গা পার হইয়া উত্তর তীরে গেলেন এবং সমস্ত দিন-রাত রোদন কবিয়া কাটাইলেন। ক্রমে ভক্তগণের অনুনয় বিনয়ে শান্ত হইয়া পরদিবস বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। তখন শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া এবং ভক্তগণ প্রাণ পাইলেন।

অপরাহ্নে নিমাই প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীবাসের বাড়ীতে বসিয়া বলিতেছেন, "আমি যদি আমার বৃদ্ধা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতাম, তবে লোকে আমাকে আমার জননীর প্রতি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ বলিত ও আমার কার্য দূষিত।" এই কথা শুনিয়া মুরারি উত্তর করিলেন, "তোমার শ্রীপাদপদ্ম হইতে জীবে প্রেম পাইয়া থাকে, তোমার কোন কার্যের নিমিত্ত লোকে নিন্দা করিবে না।" ভবিষ্যতে নিমাই এইরূপ "অকৃতজ্ঞ" হইবেন ও "দূষিত কার্য" করিবেন, ইহা মনে করিয়া মুরারির বাক্যে আশান্বিত হইয়া তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এই আলিঙ্গন পাইয়া মুরারির সর্বাঙ্গ পুলকিত হইল ও তখন তিনি এই শ্লোকটি পড়িলেন—

"ক্বাহং দরিদ্র পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মাবন্ধরিতিস্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ।।"

এই কথা বলিবামাত্র নিমাইয়ে শ্রীভগবান্ প্রকাশ পাইলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর "সহস্র সূর্যের ন্যায় তেজোময়" হইল। আর তিনি বলিলেন, "আমার এই দেহ 'পরম মনোজ্ঞ', 'নিত্য' 'জ্ঞান' ও 'ঘন আনন্দময়।' তোমরা নিশ্চয় জানিও, আমার শরীর ব্যতিরেকে এই ভূমণ্ডলে আর কিছুই নাই।" যথা কর্ণপুরের চৈতন্যচরিতে—

শ্রুত্বা স ইত্থমুদিতং ভগবাংস্তদৈব স্বৈশ্বর্য্যমুত্তমমুপেতং বরাজ নাথঃ।
রম্যাসনোপরি-পরিষ্ঠিত উদ্ভটেনতেজশ্চয়েন দিননাথ-সহস্রতুল্যঃ।।
ইদং শরীরং পরমং মনোজ্ঞং সচ্চিদঘনানন্দময়ং মমৈব।
জানীত যূয়ং ন হি কিঞ্চিদন্যদ্বিনাস্তি ভূমৌ স ইতীদমূচে।।

আবার একটু পরেই শ্রীভগবান অন্তর্হিত হইলেন, এবং নিমাই সহজ ভাবে কথা বলিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীভগবান্ মুহুর্মুহুঃ প্রকাশিত হইয়া আবার প্রায় তখনই লুকাইতে লাগিলেন। আরও রহস্যের বিষয় এই যে, যখন শ্রীভগবান্ প্রকাশ পাইতেন, তাহার পূর্বে কেহ কিছু জানিতে পারিতেন না। সামান্য কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় শ্রীভগবান্ প্রকাশ পাইলেন, নিমাইয়ের দেহ সহস্র সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সর্বাঙ্গ প্রগাঢ় ভক্তি-উদ্দীপক ও চিত্ত-আকর্ষক হইল, কিন্তু দুই একটি কথা বলিয়াই অন্তর্ধান করিলেন ও ক্ষণকাল পরেই নিমাইয়ের শরীর ও আকৃতি সহজ মনুষ্যের মত হইল। বিশেষ রহস্য এই, শ্রীভগবান্ প্রকাশিত হইয়া যে সমস্ত কথা কহিলেন, তাহার সহিত পূর্বের কথাবার্তার কোন সম্পর্ক নাই। যথা, (যেরূপ উপরে বলা হইল) মুরারি বলিলেন, "আমি দরিদ্র, তুমি কৃষ্ণ, আমাকে আলিঙ্গন করিলে?" অমনি শ্রীভগবান প্রকাশিত হইলেন, এবং আপনার স্বরূপ স্বম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিয়া আবার অন্তর্ধান করিলেন। এক দিবস নিমাই তাঁহার চর্বিত তাম্বুল মুরারিকে দিলেন। মুরারি দুই কর পাতিয়া প্রসাদ লইয়া কতক গ্রহণ করিলেন, কতক মস্তকে দিলেন। তখন প্রভু বলিতেছেন, "মুরারি, করিলি কি? তুই সর্বাঙ্গে ঝুঁটা মাখিলি? "ইহাই বলিতে বলিতে নিমাই ভগবানরূপে প্রকাশ পাইলেন, আর বলিলেন, "কাশীতে

প্রকাশানন্দ সরস্বতী কুশিক্ষা দিতেছে, মায়াবাদ পড়াইতেছে, আর আমার এই বিগ্রহ মানিতেছে না, ইহার সমুচিত দণ্ড পাইবে।" প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসীগণের প্রধান ছিলেন, তখন ভগবদ্ভক্তি মানিতেন না, পরে শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগত হন। এখান বিবেচনা করুন, মুরারির মাথায় তাম্বুলের ঝুঁটা, আর প্রকাশানন্দের মায়াবাদ, এ উভয়ে কোন সম্বন্ধ নাই। নিমাই রহস্য করিয়া মুরারির মাথায় ঝুঁটা লাগিল বলিতেছেন, আর ভগবানরূপে প্রকাশ পাইয়া তখনই বলিতেছেন, "প্রকাশানন্দ কুশিক্ষা দিতেছে।" একটু পরেই শ্রীভগবান্ লুকাইলেন, এবং নিমাই ও মুরারিতে পুনরায় সাধারণভাবে কথাবার্তা হইতে লাগিল। তবে মুরারি ও প্রকাশানন্দের এই মাত্র সম্বন্ধ ছিল,—মুরারিও পূর্বে বেদের বড় গোঁড়া ছিলেন, তাই বরাহভাবে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে ঐ কথা লইয়া কটাক্ষ করিয়াছিলেন। যথা—"বেদ আমার মর্ম কি জানে?"

আবার কখন কখন এইরূপে ভগবান্ প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণকে সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝাইতেন। বরাহরূপে প্রকাশ পাইয়া মুরারির বাড়িতে "বেদ অন্ধ", এই কথা বলিয়াছেন। আবার আর এক দিবস ঐ বরাহরূপে প্রকাশ পাইয়া হরের্নাম শ্লোকের অর্থ করিলেন। শ্লোকটি এই—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

এই কয়েকটি কথামাত্র লইয়া প্রভু ইহার এরূপ অর্থ করিলেন যে, সকলে চমকিত হইলেন। এই কয়েকটি কথার মধ্যে ওরূপ অর্থ আছে, ইহা কখন কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তিনি ইহার কিরূপ অর্থ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা কোন গ্রন্থে নাই, তবে সংক্ষেপে যে বর্ণনা আছে তাহা বলিতেছি।

হরিনামই স্বয়ং ভগবান্। ইনি আদিপুরুষ। এই নামরূপী আদিপুরুষ সকল সময়ে জগতে উদয় হয়েন না, কলিতেই হইয়াছেন। "কেবল" শব্দের অর্থ এই যে, এই হরি ভিন্ন অন্য কোন দেব উদ্ধার করিতে পারেন না; এবং এই কথা যে পরম সত্য ও সর্বশাস্ত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনবার 'নাস্ত্যেব' বলা হইয়াছে। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—"ইহা বলি আন দেবে মানে যেই জন। তার গতি নাই তিনবার এ বচন।।" ইহাতে ইহাই বুঝাইতেছে, কলিতে কেবল হরিনামই গতি, অন্য দেব উপাসনায় উদ্ধার নাই।

এইরূপে যে দিবস আম্রবীজ হইতে আম্র সৃষ্টি করিলেন, পরে বৃক্ষ অদৃশ্য হইল ও কেবল আম্র থাকিল, সেই দিবস সেই রহস্য দেখাইয়া নিমাই ভগবান্‌রূপে বলিতেছেন, "এস, দেখ আমার মায়া। যে উপায়ে এই ফল সৃষ্টি হইল তাহা সমুদয় চলিয়া গেল, কেবল এই ফলগুলি রহিল। এইরূপ প্রেমধনই নিত্যবস্তু, ইহা দ্বারা কৃষ্ণকে সেবা করিতে হইবে।" এই আম্রবীজ হইতে নিমাই কিরূপে আম্র প্রস্তুত করিতেন তাহা পূর্বে কিছু বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে মুরারি গুপ্তের চৈতন্যচরিত কাব্যে অর্থাৎ কড়চায় এইরূপ লিখিত আছে। নিমাই মৃত্তিকায় বসিয়া সম্মুখে একটি আম্রবীজ রাখিলেন, পরে হস্তে ঘন ঘন তালি দিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, "এই বীজ অঙ্কুরিত হইল। আবার বলিলেন, "এই দেখ অঙ্কুর হইতে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ হইল।" প্রকৃতই তাহাই হইল। এইরূপে বৃক্ষে ফল ধরিল, আর উহাতে দুই শত ফল হইয়া পরিপক্ক হইল। সেই ফল পাড়া হইলে বৃক্ষ অদৃশ্য হইল। কিন্তু ফলগুলি রহিল, আর উহা কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া সকলে প্রসাদ পাইলেন। যথা—

করতালৈর্দিশঃ প্রোচে পশ্য শৈলুষ চেষ্টিতম্।
পশ্য পশ্যাম্রবীজং মে ভূমৌ সংরোপিতং ময়া।।
পশ্য পশ্যাঙ্কুরো জাতো নিমিষেণ তরুঃ পুনঃ।
জাতং পশ্যাস্য পুষ্পৌঘং পশ্য পশ্য ফলং পুনঃ।। ইত্যাদি।

প্রভু প্রকাশাবস্থায় যেরূপ উপদেশ দিতেন, অপ্রকাশ অবস্থায়ও কখন কখন ভক্তগণকে কিছু

কিছু তত্ত্বকথা বলিতেন। এখনও সুবিধা মত তাঁহার টোলের শিষ্যগণ তাঁহার নিকট আসিয়া পাঠ করিতেন। একদিন একটি শিষ্য বলিতেছেন, "আপনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলেন, সেও একরূপ মায়া বই ত নয়।" এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অতিশয় কষ্ট পাইলেন। শুনিবামাত্র কর্ণে হস্ত দিলেন, আর মুহুর্মুহুঃ কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন ও রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার পরে বলিলেন, "চল, আমরা সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হই। কারণ কৃষ্ণ নাই—এ কথা শুনিয়া আমরা অপবিত্র হইয়াছি।" সেই শিষ্যকেও লইয়া গেলেন, তাহাকেও গঙ্গায় বহুবার ডুবাইলেন। গঙ্গায় ডুব দিতে দিতে তাহার অবিশ্বাস দূর হইয়া গেল।

এখানে এ কথাও বলি যে, প্রকাশের সময় ব্যতীত নিমাই কখনও কাহাকে অলৌকিক কার্য দেখাইয়া স্তম্ভিত করিতেন না। বস্তুত তাঁহার ভক্তগণ অলৌকিক কার্য প্রভৃতি ঘৃণা করিতেন। প্রভু নিজেও অদ্বৈতকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ইচ্ছামাত্র কাহাকে কোন "রূপ" দেখাইতে পারেন না, এবং কিরূপে কি হয়, তাহা তিনি জানেন না। তবে এক দিবস রহস্য করিয়াই হউক বা বাধ্য হইয়াই হউক, একটি অলৌকিক কার্য করিয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে সন্ধ্যাকালে সকলে কীর্তন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ঘোরতর মেঘ হইল। মেঘ দেখিয়া কীর্তন হইল না ভাবিয়া ভক্তগণ দুঃখ পাইলেন। তখন ভক্তগণের দুঃখ দেখিয়া প্রভু হস্তে এক জোড়া মন্দিরা লইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া মেঘ পানে চাহিয়া মন্দিরা বাজাইতে লাগিলেন, আর নামকীর্তন করিতে লাগিলেন। তখনি মেঘ অন্তর্হিত হইল।

যথা, মুরারি গুপ্ত কৃত চৈতন্যচরিতে—

"কদাচিদাবৃতে ব্যোম্নি ঘনৈর্গম্ভীরনিস্বনৈঃ

* * * *

বৈষ্ণব দুঃখিতা সর্বে বিঘ্নোহয়ং সমুপস্থিতঃ।

* * * *

তদা তস্মিন্ সমায়াতো গৃহিতা মন্দিরাং হরিঃ।
স্বরান্ কৃতার্থয়ন্ কৃষ্ণং জগৌ স স্বজনৈঃ সহ।।
ততৌ মরুদ্ভির্মেঘৌঘাঃ খণ্ডিতাস্তে দিগন্তরম্।"

কিছু পূর্বে প্রভুর ভক্ত-ভাবে দৈন্যের কথা বলিতেছিলাম। এখন প্রকাশ-ভাবের একটি কাহিনী শ্রবণ করুন। চাপাল-গোপাল নামে একজন বড় তেজীয়ান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, কীর্তনাদিকে বড় ঘৃণা করিতেন। এই কীর্তন শ্রীবাসের বাড়ীতে হইত বলিয়া শ্রীবাসের উপর তাঁহার বড় রাগ ও ঘৃণা ছিল। তাঁহাকে দুঃখ দিবার নিমিত্ত চাপাল-গোপাল একদা রাত্রিতে যখন শ্রীবাসের ভিতর-আঙ্গিনায় সংকীর্তন হইতেছিল, তখন বহির্বাটীতে, মদ্যপায়ী তান্ত্রিকগণ যেরূপে পূজা করিয়া থাকে, সেইরূপ সমুদয় পূজার সজ্জা করিলেন। এক ভাণ্ড মদ্যও রাখিলেন। প্রাতে শ্রীবাস উঠিয়া সেই কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলেন যে, উহা চাপাল-গোপালের কার্য। তখন পাড়ার লোককে ডাকিয়া দেখাইলেন, এবং কাহাকে কিছু না বলিয়া হাঁড়ী আনাইয়া সে স্থান লেপাইলেন।

দুই দিবস পরে চাপাল-গোপালের কুষ্ঠরোগ হইল। চাপাল-গোপাল টোলে ছাত্রগণকে পড়াইতেছেন, এমন সময় একটী ছাত্র তাঁহার অঙ্গুলি ফুলিয়াছে দেখিয়া চাপালকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চাপাল দম্ভ করিয়া বলিলেন, "তোমরা যাহা ভাবিতেছ, তাহা নয়। আমি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ শিবপূজা করিয়া থাকি, আমার কেন ব্যাধি হইবে?" কিন্তু ক্রমেই উহা বৃদ্ধি পাইল। চাপাল, স্ত্রী পুত্রকে বড় যন্ত্রণা দিতেন, তাহারা তখন তাঁহার বাসের জন্য বাহিরে একখানি চালা বাঁধিয়া দিলেন। তাঁহার স্ত্রী নাসিকায় বস্ত্র দিয়া এক মুষ্টি অন্ন দিয়া পলাইতেন। চাপাল আহার করিয়া যষ্ঠিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে আসিয়া বসিয়া থাকিতেন। জনৈক দয়ালু লোকের পরামর্শে তিনি এক দিন, নিমাই স্নান করিতে আসিলে তাঁহাকে বলিলেন, "নিমাই পণ্ডিত! আমি তোমার

গ্রামবাসী, তোমার সহিত গ্রামসম্পর্কও আছে। শুনিলাম তুমি নাকি বড় সাধু হইয়াছ, আর ব্যাধি ভাল করিতে পার। আমার ব্যাধি ভাল করিয়া দাও না?"

তখনও চাপালের সম্পূর্ণ মলিনতা ও দম্ভ রহিয়াছে। শ্রীনিমাইকে এই কথা বলিলে, শ্রীনিমাই যদি নিমাই থাকিতেন, তবে করযোড়ে বলিতেন, "ঠাকুর! আমাকে এইরূপ বলিয়া কেন অপরাধী কর?" কিন্তু চাপাল শ্রীনিমাইকে সম্বোধন করিবামাত্র, শ্রীভগবান্ প্রকাশ হইয়া বলিলেন, "তুমি ভক্তদ্রোহী, তোমার কুষ্ঠ হইয়াছে—এ সামান্য কথা, তোমায় অনেক দুঃখ পাইতে হইবে।" এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। চাপাল ইহার পরে অতিকষ্টে বারানসীতে যাইয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। বিশ্বেশ্বর স্বপ্নে বলিলেন যে নবদ্বীপে শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু-রূপে উদয় হইয়াছে। সরল ভাবে তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিলে রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। চাপাল তখন বাড়ী ফিরিয়া আইলেন; এবং পাঁচ বৎসর পরে কুলিয়া গ্রামে প্রভুর দর্শন পাইয়া, তাঁহার চরণে সকাতরে পতিত হইলেন। এ সম্বন্ধে চাপাল-গোপালের উক্তি প্রাচীন গীত শ্রবণ করুন।

"পরম করুণ হে প্রভু, নিতাই গৌর, তোমরা দু'ভাই। ধ্রু
(আমি) গিয়াছিনু কাশীপুরে, আমায় কয়ে দিলেন বিশ্বেশ্বরে,
পূর্ণব্রহ্ম শচীর ঘরে।
আমি পীড়ার জ্বালায় জ্বলে মরি। আমায় উদ্ধার কর গৌরহরি।।"

তখন শ্রীভগবান্ কৃপার্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি শ্রীবাসের নিকট অপরাধী, তাঁহার পাদোদক পান কর, আরোগ্য লাভ করিবে।" চাপাল তাহাই করিয়া ভবরোগ ও দেহরোগ হইতে উদ্ধার পাইয়া তদবধি শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত হইলেন।

আবার প্রভু কখন কখন তাঁহার কৃপাপাত্র এবং ভক্তগণকে গোপন করিয়া কাহাকেও কৃপা করিতেন। শুক্লাম্বরের খুদ কাড়িয়া খাইতেন বলিয়া ব্রহ্মচারীর মনে বড় ক্ষোভ ছিল। সেই ক্ষোভ নিবারণ করিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন তাঁহার বাড়ী যাইয়া অন্ন খাইবেন, এই অভিপ্রায় জানাইলেন। শুক্লাম্বর এই কথা শুনিয়া যেমন আনন্দিত হইলেন, তেমনি ভয়ও পাইলেন। কারণ সামাজিক নিয়মানুসারে তাঁহার অন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ ভোজন করিতে পারেন না। ইহাতে শুক্লাম্বর মিনতি করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং বলিলেন, "প্রভু, আমি অতি দীন ও মলিন, আমি আপনাকে অন্ন রন্ধন করিয়া দিব, এরূপ সাহস আমার হয় না, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা শুনিলেন না। তখন শুক্লাম্বর নিরুপায় হইয়া ভক্তগণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "শ্রীভগবানের কাছে জাতি বিচার নাই। তিনি সকলেরই অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুমি স্বচ্ছন্দে যাও, প্রভুকে ভোজন করাও।" তখন শুক্লাম্বর স্নান করিয়া পবিত্র মনে অন্ন চড়াইলেন ও তাহার সহিত একখণ্ড গর্ভথোড় দিলেন; আর হাঁড়ী ছুঁইলেন না। করযোড়ে শ্রীলক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে আহ্বান করিয়া মনে মনে তাঁহার চরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে প্রভু স্নান করিয়া ভক্তগণ সহ শুক্লাম্বরের বাড়ীতে আসিলেন। তখন শ্রীনিমাই ও নিতাই ভোজনে বসিলেন, আর সকলে দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রভু ভোজন করিতে করিতে বলিতেছেন, "এমন সুস্বাদু অন্ন জীবনে কখনও আহার করি নাই। আর গর্ভথোড় যে এত উপাদেয় হয় তাহাও জানিতাম না।" প্রভুদ্বয় ভোজন করিয়া উঠিলে, ভক্তগণ সেই উচ্ছিষ্ট অন্ন লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিলেন। তারপর সকলে সেখানে শয়ন করিলেন। শুক্লাম্বরের বাটী গঙ্গার উপর। গ্রীষ্মকাল, মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে, সকলে নিদ্রা গেলেন। প্রভুও শয়ন করিলেন, আর তাঁহার নিকট বিজয় নামক একজন কায়স্থ শয়ন করিলেন। বিজয় প্রভুর বড় প্রিয়পাত্র তাঁহার ন্যায় আখরিয়া *শ্রীনবদ্বীপে কেহ ছিলে না। তিনি প্রভুকে অনেক পুঁথি লিখিয়া

* আখরিয়া—অক্ষর লেখক। বিজয়ের হস্তাক্ষর বড় ভাল ছিল এবং তিনি দ্রুত লিখিতে পারিতেন।

দিয়াছিলেন। সকলে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার শ্রীহস্ত বিজয়ের বুকের উপর রাখিলেন। শ্রীকরস্পর্শে বিজয় নয়ন মেলিলেন, দেখেন যে, তাঁহার বুকের উপর যে বাহু রহিয়াছে, উহা চিন্ময় ও রত্নাঙ্গুরীতে খচিত। আরও দেখিলেন যে, সমস্ত জগৎ শীতলতেজে পরিপূরিত। দেখিয়া বিজয় তদ্দণ্ডে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন ও বিষম হুঙ্কার করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার হুঙ্কারে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহারা ও প্রভু স্বয়ং বিজয়কে তাঁহার হুঙ্কার ও আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু বিজয়ের তখন আনন্দে বাহ্যজ্ঞান নাই। তিনি কোন কথারই উত্তর করিতে পারিলেন না। তখন প্রভু মধুর হসিয়া বলিতেছেন, "বুঝিলাম, শুক্লাম্বরের বাটীতে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। তাঁহাকেই হয়তো বিজয় দেখিয়াছে! কিংবা ইহা গঙ্গার মাহাত্ম্য। যাহা হউক বিজয় যে কিছু বৈভব দেখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।" এইরূপে প্রভু নিজে যে এ নাট্যের গুরু, ইহা গোপন করিলেন বটে, কিন্তু বিজয়ের এ পরিবর্তনের মূল কে, ভক্তগণ তাহা কিছু কিছু মনে অনুভব করিলেন। বিজয়ের তখন কি দশা হইল, তাহা চৈতন্যভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে—"না আহার, না নিদ্রা, রহিত দেহধর্ম। ভ্রমেন বিজয়, কেহ নাহি জানে মর্ম।।"

সাত দিন পরে বিজয় চেতন পাইয়া সমুদয় কথা প্রকাশ করিলেন। নির্বোধ লোকে ধ্যানে শ্রীভগবানেব তেজ দেখিতে চাহিয়া থাকে, কিন্তু শ্রীভগবানের "চরণ-নখরছটা" দর্শন কবাবও শক্তি জীবের নাই। দর্শন করিলে, বিজয়ের যেরূপ দশা হইয়াছিল, তাহাই হয়। এইরূপে প্রভু কাহাকে কিরূপে কৃপা করিতেন, তাহা অন্য কেহ জানিতে পারিতেন না। আপনিও লুকাইবার চেষ্টা কবিতেন, কিন্তু উহা সময় সময় বিফল হইত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বন্ধু হে! কি দেখ চিবুক ধরে। ধ্রু
যে আনন্দ পাই হেরি রাঙ্গা পদ,
কেন হে বঞ্চহ মোরে।।
লজ্জাশীলা বলে, করহ বিদ্রুপ,
নিগূঢ় কব তোমারে।
লজ্জা ভাণ করে, নমিত বদনে,
পদ হেরি নয়ন ভরে।।
—বলরাম দাস।

এক দিবস নিমাই শ্রীবাসের মুখে কৃষ্ণলীলা শুনিতে শুনিতে বলিলেন, "এস, একদিন অঙ্গ-বন্ধন করিয়া, সাজিয়া-গুজিয়া, কৃষ্ণ-লীলারস আস্বাদন করা যাউক।" ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিরূপ?" নিমাই বলিলেন, "তোমরা সমুদয় কৃষ্ণলীলার সজ্জা প্রস্তুত কর। তাহার পর কিরূপ করিতে হইবে, দেখা যাইবে। কায়স্থ জমিদার বুদ্ধিমন্ত খান ও সদাশিব কবিরাজ প্রভুর বড় প্রিয়। এই দুই জনের উপর সজ্জা প্রস্তুতের ভার হইল। এই লীলার স্থান, প্রভু আপনি নির্দেশ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার মেসো চন্দ্রশেখর আচার্যরত্নের বাড়ী হইবে। তাঁহার মাসীর বাড়ী সাব্যস্ত করিবার কারণ বোধ হয় যে, সেখানে বিষ্ণুপ্রিয়া যাইতে পারিবেন।

সেখানে কি হইবে সকলে আগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে প্রভু বলিলেন, "আমি সেখানে রমণীর বেশ ধরিয়া নৃত্য করিব।" ইহাই বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের দিকে চাহিয়া, তিনি শিবাবতার এইরূপ ইঙ্গিত করিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিতেছেন, "কিন্তু আমি এরূপ রূপবতীর রূপ ধরিব যে, যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় তিনি ব্যতীত আর কেহ সেখানে যাইতে পারিবেন না।" ইহার

তাৎপর্য এই যে, মহাদেব মোহিনী দেখিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন, আর অদ্বৈত মহাদেব। ইহাতে শ্রীঅদ্বৈত,—প্রভু রহস্য করিতেছেন এইরূপে এ কথা না লইয়া,—একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "তবে আর আমার যাওয়া হইবে না, আমি জিতেন্দ্রিয় এ গৌরব আমার নাই।" এ কথা শুনিয়া শ্রীবাস বলিতেছেন, "আমারও ঐ কথা।" তখন নিমাই একটু ঠকিলেন ও হাসিয়া বলিতেছেন, "তবে হইল ভাল! তোমরা কেহ যাইবে না, তবে এ রঙ্গ কাহাকে লইয়া করিব? তা আমি ইহার একটি উপায় করিতেছি। তোমরা আমার বরে সকলে জিতেন্দ্রিয় হইবে ও আমাকে দেখিয়া মোহ পাইবে না।" এ কথা শুনিয়া আবার সকলে হাসিতে লাগিলেন।

তাহার পর সকলে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "যদি আমাদের নাট্যাভিনয় করিতে হয়, তবে কে কি সাজিবেন, আর কে কি করিবেন, কি বলিবেন, তাহা আগে ঠিক করিয়া দাও।" প্রভু বলিলেন, "আমি হইব রাধা, গদাধর হইবেন ললিতা, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ হইবেন আমার বড়াই, হরিদাস কোতোয়াল, শ্রীবাস নারদ ইত্যাদি। অদ্বৈত করযোড়ে বলিলেন, "আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়।" প্রভু বলিলেন, "সকলই তুমি, তোমাকে আর কি বাছিয়া দিব? তুমি হইবে শ্রীকৃষ্ণ।"

ইহাতে সকলে প্রভুকে বলিলেন, "কে কি বলিবে, কে কি করিবে, সমুদয় বলিয়া দিউন।" প্রভু বলিলেন, "তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। সময় হইলে, যাহার যাহা করিতে কি বলিতে হইবে, তাহা আপনি স্ফুরিত হইবে।" সুতরাং কি যে কাণ্ড হইবে, তাহা কেহ কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

এই সমুদয় কথা স্থির হইলে, সকলে উৎসাহের সহিত দ্রব্যাদি আহরণ করিতে লাগিলেন। শাড়ী, শংখ, কাঁচুলী, গোঁফ, দাড়ি প্রভৃতি নানাবিধ সজ্জা প্রস্তুত করা হইল। চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে বুদ্ধিমন্ত খান তখন বড় বড় চান্দোয়া খাটাইলেন, বসিবার শয্যা পাতিলেন, দীপের সজ্জা করিলেন। সন্ধ্যার পর সমুদয় ভক্তগণ উপস্থিত হইলেন, আর তাঁহাদের বাড়ীর স্ত্রীলোক সকলে ক্রমে আসিলেন। শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া, মালিনী ভগিনীগণ লইয়া ও মুরারির স্ত্রী আইলেন। এইরূপে বাডীব অভ্যন্তর স্ত্রীলোকে ভরিয়া গেল। সকলে আসিলে দ্বারে কবাট পড়িল। প্রভু দৃঢ়রূপে আজ্ঞা করিলেন যে, যেন আর কেহ আসিতে না পারে।

এখন কে কি ভাব প্রাপ্ত হইলেন বলিতেছি। সাজাইবার ভার পাইলেন বাসুদেব আচার্য। গায়ক হইলেন পাঁচজন,—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন (অর্থাৎ যাঁহার বাড়ী), আর শ্রীবাসের তিন ভাই। যাঁহারা সাজিবেন তাঁহারা রঙ্গগৃহে সাজিতে লাগিলেন। এদিকে সভায় গায়ক, বাদক ও সভ্যগণ রহিলেন। স্ত্রীলোকেরা কেহ ছাঁচিয়ায়, কেহ পিড়ার উপর, কেহ অভ্যন্তরে বসিলেন।

প্রথমে বাদ্য আরম্ভ হইল। তাহার পরে গায়কগণ সুস্বরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্তবের দুটী শ্লোক পড়িলেন, যথা—"জয়তি জননিবাসো" এবং "সম্পূর্ণেন্দুমুখী" ইত্যাদি। এই শ্লোকদ্বয় পাঠ হইলে সকলে আনন্দে "হরি হরি বোল" বলিয়া ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

এমন সময় হরিদাস রঙ্গভূমিতে সূত্ররূপে* উপস্থিত হইলেন। হরিদাসের মুখে মস্ত গোঁফ স্কন্ধে যষ্টি, কিন্তু দুই হস্তে কুন্দ ও মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্প। নয়নজলে বদন ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি আসিয়া সেই পুষ্প দিয়া রঙ্গস্থলকে শ্লোক পড়িয়া পূজা করিলেন। আর প্রণাম করিয়া বলিলেন, "হে রঙ্গভূমি, তুমি অদ্য বৃন্দাবন হও।" পূজা সমাপ্ত হইলে হরিদাস সভ্যগণকে বলিতেছেন, "অদ্য আমি ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলাম, দেখি সেখানে শ্রীল নারদ মুনি বসিয়া। আমি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলে, নারদ আমাকে একটি আজ্ঞা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শনের সাধ তাঁহার বহুদিন হইতে আছে। তাহার পর নাটকাকারে তাঁহাকে সেই লীলা দেখাইতে আমাকে আজ্ঞা করিলেন। আমি এখন কিরূপে নারদের আজ্ঞা পালন করিব ভাবিতেছি।"

* নাটকেব যে সূত্রপাত করে তাহাকে সূত্রধর বলা যায়; যাহার সঙ্গে কথোপকথনের ছল করিয়া সেই সূত্রপাত হয়, তাহার নাম পাবিপার্শ্বিক।

ইহাই বলিয়া হরিদাস মুখ তুলিয়া দেখেন, তাঁহার পারিপার্শ্বিক* অগ্রে দাঁড়াইয়া। ইনি মুকুন্দ। হরিদাস তাঁহার পারিপার্শ্বিক মুকুন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "নারদের আজ্ঞা শুনিলে তো? এখন তাহার উদ্যোগ কর।"

পারি। তোমার কথায় বিস্ময় জন্মিল। শ্রীল নারদ আত্মারাম। তিনি ব্রহ্মার তনয় বটে, কিন্তু অধিকারে তাঁহারই সমান। সনকাদি আত্মারাম তাঁহার অনুজ। তিনি স্বয়ং আত্মারাম হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লৌকিক লীলাতে লোভ করিবেন, এ বড় আশ্চর্য।

সূত্র। তুমি কি ভাগবতের "আত্মারাম" শ্লোক জান না? যাঁহারা আত্মারাম, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করিতে ও তাঁহার লীলারসরূপ সুধা পান করিতে সাধ করিয়া থাকেন।

পারি। আত্মারামগণ ভাল ছাড়িয়া মন্দে কেন লোভ করেন?

সূত্র। পাগল, তুমি জান না যে, ভগবানের অলৌকিক লীলা অপেক্ষা লৌকিক লীলা আরও মধুর। সৃষ্টি-প্রক্রিয়াদি ভগবানের বড় বড় কথায় রস নাই। তাই বিচার করিয়া শুকদেব শ্রীভাগবতে শ্রীভগবানের মাধুর্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা যিনি আস্বাদ করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অচিরাৎ পাইয়া থাকেন। আর শ্রীভগবান্ এই নিমিত্ত অর্থাৎ জীবগণের ভজন সুলভ করিবার নিমিত্ত, নরলীলা করিয়া থাকেন।

পারি। তা ভাল, তাই করা যাবে; কিন্তু এত ব্যস্ত কেন? নারদ ব্রহ্মলোকে, তাঁহার আসিতে ত অনেক সময় লাগিবে?

সূত্র। আরে অজ্ঞান। নারদ অন্তরীক্ষে গমনাগমন করেন। তাঁহার আসিতে কতক্ষণ লাগিবে? তুমি শীঘ্র সজ্জা কর।

পারি। যে আজ্ঞে। তবে শ্রীভগবানের কোন্ লীলা দেখাইব।

সূত্র। "দানলীলা" অভিনয় করিয়া দেখাই, ইহাই আমার ইচ্ছা।

পারি। তা হবে না। তোমার কন্যাগণ থাকিলে হইত।

সূত্র। সে কি? তাহারা ত ভাল আছে?

পারি। ভাল আছেন, তবে শ্রীবৃন্দাবনে গোপেশ্বর শিব পূজা করিতে গিয়াছেন।

সূত্র। এ ত বড় বিপদের কথা। যদি কোন কৃষ্ণলীলা না দেখাইতে পারি, তবে নারদ অভিশাপ দিবেন, এখন উপায়?

পারি। ব্যস্ত কেন? তাঁহারা শীঘ্র আসিবেন।

সূত্র। তুমি ত বল শীঘ্র আসিবেন, কিন্তু তাহারা পথ জানে না, সঙ্গে কেহ নাই, আবার সে বনে ভয় আছে শুনিয়াছি!

পারি। ভয় কি? সঙ্গে বড়াই বুড়ি আছে।

সূত্র। (হাসিয়া) বুড়ির ত খুব সাহস। চোখে দেখে না, কানে শুনে না, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর।

ইহাই বলিতে বলিতে নারদ আসিলেন। শ্রীনারদকে দেখিয়া সূত্রধর (হরিদাস) ও পারিপার্শ্বিক (মুকুন্দ) উভয়ে শীঘ্র শীঘ্র কন্যাগণকে আনিবার নিমিত্ত রঙ্গস্থল ত্যাগ করিলেন। নারদ বীণাযন্ত্র হস্তে করিয়া কৃষ্ণমঙ্গল গীত গাইতে গাইতে রঙ্গস্থলে আসিলেন, সঙ্গে তাঁহার স্নাতক, তিনি শুক্লাম্বর। দেখিয়া সকলে অবাক হইলেন। তাহার কারণ নারদ যে শ্রীবাস, ইহা সকলে জানেন কিন্তু শ্রীবাসকে কেহ চিনিতে পারিতেছেন না। শ্রীবাসের আকৃতি প্রকৃতি একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

এখানে একটি নিগূঢ় রহস্য বলিতেছি। এই যে নাটক অভিনয় হইতেছে, ইহা সভ্যগণ রঙ্গভূমিতে আসিবার পূর্বে আপনাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীবাস এখন প্রকৃতই আপনাকে নারদ ভাবিতেছেন। এমন কি, তিনি নারদরূপ ধরিয়া আসিলে শচী বিস্মিত হইয়া তাঁহার স্ত্রী মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি তোমার পণ্ডিত?" তাহাতে মালিনী বলিলেন, "শুনছি বটে, কিন্তু চিনিতে

পারিতেছি না।" শ্রীঅদ্বৈত যখন কৃষ্ণরূপ ধরিয়া আসিলেন, তখন প্রকৃতই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দেহে প্রবেশ করিয়াছেন। এই যে সকলে নাটক অভিনয় করিতেছেন, ইহাদের কথা ও কার্য পূর্বে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। ইঁহারা সকলেই উপস্থিতমত কার্য করিতেছেন ও কথা বলিতেছেন। প্রকৃত কথা, তখন যাঁহারা রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইতেছেন, তাঁহাদের দেহে অন্যে প্রবেশ করায় তাঁহাদের আকার প্রকার একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

নারদ। কই হে স্নাতক, এখানে ত নাটক কিছু দেখি না?

(সূত্রধর, পারিপার্শ্বিক প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া গোপীবেশে গদাধরের সুপ্রভা সখী সহ প্রবেশ।)

নারদ। তোমরা কাহারা?

সুপ্রভা। আমরা গোয়ালের মেয়ে, ব্রজে থাকি, গোপেশ্বর পূজিতে যাইতেছি। ঠাকুর আপনি কে?

নারদ। আমি কৃষ্ণের দাস নারদ। (সকলে নারদকে প্রণাম)

গোপী (গদাধর)। ঠাকুর, আমি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ,—যিনি গৌরচন্দ্র রূপে নবদ্বীপে উদয় হইয়াছেন,—তাঁহার চরণ পাইব? (ইহা বলিয়া কাঁদিয়া নারদের চরণে পড়িলেন।)

নারদ। তুমি অবশ্য সে চরণ পাইবে। প্রত্যহ সুরধুনিতে অঙ্গ মার্জনা করিও। (একটু পরে, গোপী কিছু শান্ত হইলে) তুমি বৃন্দাবনের গোপী, অবশ্য নৃত্য করিতে পার, একবার আমাকে তোমার নৃত্য দর্শন করাও।

গদাধরের রূপের অবধি নাই। যেই গৌরচরণ কিরূপে পাইব বলিয়া নারদের চরণে পড়িয়াছেন, অমনি প্রেমে বিভোর হইয়াছেন। গদাধরের চাঁদমুখ নয়নজলে ভাসিতেছে। তখন সুপ্রভা সখীর অঙ্গে ভর দিয়া মৃদঙ্গ মন্দিরার সহিত, তিনি মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাস স্কন্ধে যষ্টি লইয়া গোঁফ মোচড়াইতে মোচড়াইতে লম্ফ দিয়া সমস্ত আঙ্গিনা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আর অট্ট অট্ট হাসিয়া বলিতেছেন, "দিন গেল, কৃষ্ণ ভজ, এমন ঠাকুর আর পাবে না।"

সভ্যগণ হরিদাসের মুখে শুনিতেছেন "কৃষ্ণ ভজ," আর শ্রীকৃষ্ণ ভজনের ফল স্বরূপ শ্রীগদাধরকে দেখিতেছেন ও তাঁহার নৃত্য দর্শন করিতেছেন।

সুপ্রভা। (গদাধরকে) সখি, সময় গেল, পূজায় যাবে না?

গোপী। (নারদকে প্রণাম করিয়া) ঠাকুর অনুমতি কর, আমরা যাই। (গদাধর ও অন্যান্য সকলে নিষ্ক্রান্ত।)

স্নাতক। ইঁহারা সকলে বৃন্দাবনে গেলেন। চল, আমরাও সেখানে যাই, যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-রহস্য দেখিগে।

নারদ। কেন, একি বৃন্দাবন নহে?

স্নাতক। ঠাকুর একেবারে পাগল হইয়াছে, এ বৃন্দাবন কোথায়?

নারদ। পাগলই হইয়াছি বটে। কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে লোককে পাগলই করে! চল, বৃন্দাবনে যাই; আমি পথ দেখিতে পাইতেছি না, তুমি পথ দেখাইয়া চল।

প্রকৃত নারদ নয়ন-জলে ভাসিতেছেন, আর সেই নয়ন-জলে কিছু দেখিতেও পাইতেছেন না। নারদের তখন কৌতুক ভাব নাই। তিনি অতি গম্ভীর ও প্রেমে চঞ্চল হওয়ায় তাঁহার মুখের শোভা অপরূপ হইয়াছে। অগ্রে স্নাতক পথ দেখাইয়া যাইতেছেন, পশ্চাতে নারদ চলিয়াছেন।

স্নাতক। তবেই তুমি বৃন্দাবনে গিয়াছ? কৃষ্ণলীলা-রহস্য দেখা হইল না।

নারদ। কেন? কি হইয়াছে?

স্নাতক। তুমি এক পা যাইবে, দশ পা নাচিবে। এইরূপে আমরা কত দিনে বৃন্দাবনে যাইব?

নারদ। বৃন্দাবনে যাইব বলিয়া আমার অন্তরে আনন্দ ধরিতেছে না। বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের নিজের স্থান। সেখানে বৃক্ষ লতা পর্যন্ত আনন্দে ভাসিতেছে। আমার পিতা ব্রহ্মা স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি শ্রীকৃষ্ণের

নিকট বৃন্দাবনে একটু স্থান চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "হে প্রভু! বৃন্দাবনে আমাকে একটি অতি ক্ষুদ্র তৃণ কর।" তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "কেন ব্রহ্মা, তুমি বড় না হইয়া বৃন্দাবনে ছোট তৃণ হইতে চাহিতেছ?" তাহাতে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, "তোমাকে সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া মুনিগণ ধ্যানেও দর্শন করিতে পারেন না। সেই তুমি, তোমাকে গোপীগণ প্রেমবলে সর্বদা দর্শন করিতেছেন। আমি যদি বৃন্দাবনের ক্ষুদ্র তৃণ হই, তবে সেই গোপীগণের পদবজঃ সর্বদা পাইব।" স্নাতক। বৃন্দাবন এইরূপ লোভের সামগ্রী, সেখানে যাইতেছি, একটু নাচিব না?

[এমন সময়ে (নেপথ্যে) শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরব হইল]

এই যে মুরলীরব হইল, ইহাতে শুধু উপস্থিত ব্যক্তিগণ নহে, সমস্ত নবদ্বীপবাসী, এমন কি, যেন ত্রিভুবন মোহিত হইলেন। সেই রব শুনিয়া সকলের অঙ্গ শীতল হইল, সুখে যেন প্রাণ এলাইয়া পড়িল।

নারদ। ঐ শুন! ঐ শুন! তান তরঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীধ্বনি হইতেছে। এই মুরলীধ্বনি শুনিয়া কুলবতীগণের, পতির অগ্রে নীরিবন্ধন খসিয়া পড়ে। আমি এখন কি করি? অনুমানে বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন, কারণ শ্রীঅঙ্গ-গন্ধে আমার নাসিকা মাতিতেছে। চল, একটু দূরে যাই, নতুবা সংজ্ঞাহারা হইব, কিছু দেখিতে পাইব না (একটু অন্তরালে গমন)

(শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীকৃষ্ণরূপে সখাগণসহ প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণের করে মুরলী। অদ্বৈতের বয়স যদিও পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে কিন্তু এখন তাঁহাকে পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক বালক বলিয়া বোধ হইতেছে। এখন শ্রীঅদ্বৈতের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছেন, আর তাহাতে অদ্বৈতকে ঠিক কৃষ্ণের ন্যায় বোধ হইতেছে ও তাঁহার রূপমাধুরী দেখিয়া সকলের নয়ন শীতল হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলে স্ত্রীলোকেরা হুলুধ্বনি ও সভ্যগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আর সকলেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ, হাব, ভাব, ভঙ্গি দর্শন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা শ্রীদাম! দেখ দেখি বৃন্দাবনের কি শোভা হইয়াছে! ফুলের শোভায় ও গন্ধে নয়ন ও নাসিকা আমোদ করিতেছে। ত্রিজগতের মধ্যে এইটিই আমার মনোমত স্থান।

শ্রীদাম। এই বৃন্দাবন-শোভা অপেক্ষা তোমার খেলা আরও মনোহর।

শ্রীকৃষ্ণ। এখানে মধুমঙ্গলকে দেখিতেছি না কেন? তাঁহাকে তল্লাস করিয়া লইয়া আইস।

শ্রীমধুমঙ্গল ব্রাহ্মণপুত্র, শ্রীকৃষ্ণের সখা ও বিদূষক।

(এমন সময় মধুমঙ্গল ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া উপস্থিত)

মধুমঙ্গল। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, হাঁপাইতে হাঁপাইতে) পথে আজ একটি ব্রহ্মহত্যা হইতেছিল। তোমার পুণ্যবলে বাঁচিয়া আসিয়াছি। বৃন্দাবনে কতকগুলি অল্পবয়স্কা গোপবালিকার সহিত একটা বৃদ্ধা রমণীকে দেখিলাম। সেটা নিশ্চিত ডাকিনী, বোধ হয় বনে আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। আমাকে ধরিতে পারিলেই গোপেশ্বর শিবের নিকট বলি দিত।

শ্রীকৃষ্ণ। সুবল! এ ব্যাপার কি বল দেখি? মধুমঙ্গল কাহাদের দেখিয়া আসিল?

সুবল। বোধ হয় শ্রীমতী রাধা সখিগণ বেষ্টিত হইয়া বড়াই বুড়ীকে সঙ্গে করিয়া গোপেশ্বর-শিবপূজা করিতে আসিয়াছেন।

মধুমঙ্গল। (হি হি হাস্য করিয়া) যদি শ্রীমতী রাধা আসিয়া থাকেন, তবে সখার হাতে ধরা পড়িবেন।

নারদ। স্নাতক, চল আমরা অন্তরীক্ষে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শন করি। (নারদ ও স্নাতকের প্রস্থান)

(শ্রীমান্ পণ্ডিত অগ্রে মশাল ধরিয়া, এবং পশ্চাৎ বড়াই ও সখিগণ সহ শ্রীরাধিকার প্রবেশ)

ওদিকে বেশ-গৃহে নিমাই গদাধর প্রভৃতিকে বাসুদেবাচার্য স্ত্রীবেশে সাজাইতেছেন। হস্তে কঙ্কণ দিবামাত্র নিমাইয়ের রুক্মিণীর আবেশ হইল, যথা---"আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী আবেশে।"

নিমাই ভাবিতেছেন, তিনি রুক্মিণী, তাঁহার বিবাহ হইবে, সেই নিমিত্ত তাঁহাকে সাজান হইতেছে। তিনি রুক্মিণীভাবে অধোমুখে রহিয়াছেন, নয়নজলে ভাসিতেছেন, আর নখ দিয়া মৃত্তিকায় শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লিখিতেছেন। লিখিতেছেন শ্রীমদ্ভাগবতের সেই সাতটি শ্লোক, যাহা রুক্মিণী প্রণয়-লিপি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাঠান। ইহাতে রুক্মিণী লিখিয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণ! তোমার রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া আমার ত্রিতাপ দূরে গিয়াছে, আর আমি স্ত্রীলোক, নির্লজ্জ হইয়া বলিতেছি, আমার চিত্ত তোমাতে গিয়াছে। ইহাতে আমার দোষ কি? এমন কোন্ রূপবতী আছে, যে তোমার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জা ও ধর্মকে জলাঞ্জলি না দেয়? এখন আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিয়া আমাকে রাঙা চরণে স্থান দাও।"

রুক্মিণী (নিমাই) অবনত মুখে নখ দিয়া লিখিতেছেন, আর উহা প্রেমানন্দ-ধাবায় মুছিয়া যাইতেছে, আবার লিখিতেছেন। ভাবিতেছেন, যে বিপ্র দ্বাবা সেই পত্র শ্রীকৃষ্ণকে পাঠাইবেন, সে সম্মুখে। মস্তক অবনত করিয়া কল্পিত বিপ্রকে সম্বোধন করিয়া স্ত্রীলোকের স্বরে কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "বিপ্র! তুমি শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই পত্র লইয়া যাও। তাঁহার রাঙ্গা পায়ে বলিও যে, আমার প্রকৃত অবস্থা পত্রে লিখিতে পারিলাম না।

বিপ্র! তুমি আমার হইয়া তাঁহাকে সমুদয় ভাল করিয়া বলিও।"

বেশ-গৃহে এই রঙ্গ হইতেছে, আর সকলে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। বেশ সমাপ্ত হইলে নিমাইয়েব রুক্মিণীর ভাব পরিবর্তন হইয়া রাধার ভাব হইল; আর সেই ভাবে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন।

নিমাই হইয়াছেন শ্রীরাধিকা, গদাধর ললিতা ও নিত্যানন্দ বড়াই আরও দুই চারিজন গোপবালিকার বেশ ধরিয়াছেন। শ্রীনিমাই প্রকৃতই ভুবনমোহিনী রূপ ধাবণ করিয়াছেন। তিনি যে পুরুষ, তাহার কিছুমাত্র লক্ষণ তাঁহার শরীরে নাই। সেই রূপ দেখিযা, কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেরই মোহ হইল। যথা চৈতন্যমঙ্গলে-—

"পট্ট বসন পরে, নূপুর চরণ তলে, মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝ খানি।
রূপে ত্রিজগত মোহে, উপমা বা দিব কাহে, গোপীবেশে ঠাকুর আপনি।।"

গদাধরেব রূপও তদনুরূপ। নিমাই যে শুধু রূপসী হইয়াছেন, তাহা নয়। তিনি যে নিমাই, ইহাও কাহারও লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা নাই। শচীও চিনিতে পারিতেছেন-না। নিমাই যে বলিয়াছিলেন,—"আমাকে দর্শন করিলে তোমাদের মোহ হইবে,"—তাহাই হইল। সকলে সংজ্ঞালাভ করিযা হুলু, শঙ্খ ও হরি-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

শ্রীরাধা প্রবেশ করিলে, মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, "চল, আমরা কুঞ্জের আড়ালে লুকাইয়া দেখি, গোপবালিকাগণ কি করে!

(শ্রীকৃষ্ণের সখাগণসহ কুঞ্জের আড়ালে গমন)

শ্রীরাধিকা (নিমাই)। সখি ললিতে। গোপেশ্বরকে পূজিবার নিমিত্ত সকল দ্রব্যই আনিয়াছি, কেবল শুখাইবে বলিয়া পুষ্প আমি নাই।

ললিতা (গদাধর)। তাহার ভাবনা কি? বৃন্দাবনে ফুলের অভাব নাই।

শ্রীরাধিকা। ফুলের অভাব নাই বটে, কিন্তু এখানে বন্যহস্তী আছে, সেই ভয়ে আমার অঙ্গ কাঁপিতেছে।

মধুমঙ্গল। (জনান্তিকে কৃষ্ণের প্রতি) সখে! এই গোয়ালিনীদের আস্পর্ধার কথা শুনিলে ত?

শ্রীকৃষ্ণ। কি আস্পর্ধা?

মধুমঙ্গল। তোমার মত নির্বোধ ত্রিজগতে নাই। নির্বোধ না হইলে ত্রিলোকের অধিপতি হইয়া গরু চরাইতে কেন আসিবে? ঐ গোযালিনী তোমাকে বন্যহাতী বলিতেছে, তুমি বুঝিতেছ না?

শ্রীরাধা। (সখীর প্রতি) শুধু বন্যহাতীর ভয় নহে, তাহার সঙ্গে সহচর কতকগুলি গর্দভও আছে, তাহারা বড় বিরক্ত করে।

মধুমঙ্গল। সখা শুনিলে ত? এ সব কথা একটুও ভাল নহে। তুমি বন্যহাতী হও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আমি ব্রাহ্মণপুত্র, গোয়ালিনীগুলা আমাকে গাঁধা বলিবে কেন?

শ্রীরাধা। চল যাই, লবঙ্গলতিকার ফুল তুলি গিয়া।

বড়াই। নাতনি! উহা করিস্ না। এখনি কৃষ্ণের হাতে ধরা পড়্বি। সে চঞ্চল, লবঙ্গলতিকাকে বড় ভালবাসে।

ললিতা। যদি শ্রীকৃষ্ণের হাতে শ্রীরাধা ধরা পড়েন, তবে তোমাকে জামিন রাখিয়া আমরা শ্রীমতীকে খালাস করিয়া লইয়া যাইব।

ইহাই বলিয়া সকলে হাস্য করিতে করিতে কুসুমচয়ন করিতে লাগিলেন। এমন সময় একটি মধুকর শ্রীরাধার মুখের চতুষ্পার্শে গুন্ গুন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

শ্রীরাধা। ললিতে! এই ভ্রমরটি বড় ত্যক্ত করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। (অন্তরীক্ষে) ভ্রমরটার অপরাধ কি? মুখ দেখিয়া তাহার পদ্ম ভ্রম হইয়াছে।

মধুমঙ্গল। সখে! বড় সুবিধা হইয়াছে। কে ফুল তুলিতেছে বলিয়া তুমি এই সময় রাগ করিয়া গোপীগণের নিকট উপস্থিত হও।

শ্রীকৃষ্ণ! সখে! তোমার কাণ্ডজ্ঞান মাত্র নাই। এই যে গোপনে থাকিয়া আমরা শ্রীরাধার ভাব ও রূপ-লহরী দর্শন করিতেছি, এ সুখ হইতে আমি কেন বঞ্চিত হইব? আমরা প্রকাশ হইলে, ইহার কিছুই থাকিবে না। দেখিতেছ না, ভোম্‌রার ভয়ে শ্রীরাধার মুখ কি অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে? তবে তুমি বলিতেছ; আচ্ছা, আমি চলিলাম। (প্রকাশ হইয়া ললিতার প্রতি) তোমরা কারা গা? দেখিতেছি স্ত্রীলোক কিন্তু সাহস পুরুষ অপেক্ষাও বেশী। স্বচ্ছন্দে অন্যের বাগানে বলপূর্বক ফুল তুলিতেছ, ইহাতে মনে কিছু শঙ্কা হইতেছে না? তোমাদের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে, তোমবা সরল, কিন্তু ব্যবহার দেখ্ছি নিতান্ত ইতর লোকের মতন। ফুল তুলিতেছ, ফুলের ডাল ভাঙ্গিতেছ, যেন এ সম্পত্তি তোমাদেরই। থাকো, ইহার উচিত ফল পাইবে।

বড়াই। কৃষ্ণ, তুমি বড় চঞ্চল। এ বৃন্দাবন আমাদের সকলেরই, তুই আবার ইহার কর্তা হলি কবে?

মধুমঙ্গল। বুড়ি, তোর বাহাত্তরে ধরেছে। কোথা বালিকাগুলাকে নিবারণ করবি, না আরও উৎসাহ দিচ্ছিস?

বড়াই। তুই বামুনের ছেলে; কিন্তু তোর বুদ্ধি ঠিক পশুর মতন।

ললিতা। আরে কুষ্মাণ্ড! তুই যে কথা বলিস, তুই এ বনের কে?

মধুমঙ্গল। আমি কে শুনিবে? এ বনের রাজা আমার সখা কৃষ্ণ, আর, আমি তাঁর পুরোহিত ও মন্ত্রী।

বড়াই। ওরে কৃষ্ণ! এ বন গোপীদের। তাদের নিজ অধিকারে তাহারা ফুল তুলিতেছে, তুই তাহার বিরোধী না হইয়া আমি যে পরামর্শ দিই, তাহাই কর। রাধার কাছে বিনয় করিয়া ফুল ভিক্ষা কর, তাহা হইলে কৃপা করিয়া সে তোকে দুই চারিটি লবঙ্গফুল দিলেও দিতে পারে।

বুড়ি ইহাই বলিয়া, রাধিকার অঞ্চলে যত লবঙ্গফুল ছিল, অঞ্চল ধরিয়া সবগুলি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ফেলিয়া দিলেন।

শ্রীরাধা! (বসনে মুখ ঝাঁপিয়া) আর্যে! করিলে কি? দেবপূজার লাগি ফুল তুলিলাম, তাহার এ কি অবস্থা করিলে?

ললিতা। বুড়ি, তুমি কর্‌লে কি? ভয় পেয়ে এত পরিশ্রমের ফুলগুলি অপাত্রে দিলে?

বড়াই। আমরা এ দৃষ্টের সহিত পারিব কেন? চল, আমরা ঘরে যাই, এখানে থাকা নয়। (ইহা বলিয়া বড়াই শ্রীরাধার হস্ত ধরিলেন)।

শ্রীরাধা। আর্যে! পূজা করিতে আইলাম, পূজা না করিয়া কিরূপে যাই? আর পূজার দ্রব্যগুলিই

বা কোথা রাখিয়া যাই?

মধুমঙ্গল। যাবে কোথা? আগে দান দাও, তবে বাড়ী যেও।

বড়াই। আরে বামুনের পুত! দান আবার কি রে? এ দান কাহার সৃষ্টি?

সুবল। এ বনের রাজা আমাদের সখা কৃষ্ণ। তাহাকে দান না দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে কেহ আসিতে পারে না।

বড়াই। কি! কৃষ্ণ আবার রাজা হয়েছেন নাকি? ভাল। দান কিসেব নিবে? কোনও পণ্যদ্রব্য ত নাই, কেবল পূজার সজ্জা।

সুবল। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) সখা! এ কথার উত্তর তুমি দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। (অতীব গাম্ভীর্যের সহিত) আমার এ দানঘাটের এই নিয়ম যে, কুলবধূগণ এখানে আসিলে তাহাদের রত্ন-আভরণ, হাত-দোলানি, মধুর-হাস্য, নয়ন-কটাক্ষ,—এ সমুদয়ের দান দিতে হয়।

বড়াই। আমাদের কাছে কোন রত্ন-টত্ন নাই, আঁচলের মধ্যে কেবল গোপেশ্বরের পূজার দ্রব্য।

মধুমঙ্গল। গোয়ালিনীর বুদ্ধি আর কতটুকু? গোপেশ্বর আমাদের সখা কৃষ্ণ, তাঁহাকে রাখিয়া কাহাকে পূজা করতে যাচ্ছিস্?

শ্রীরাধা। (ধীরে ধীরে) এত কথার কাজ কি? পূজার সজ্জা সমুদয় দেখাও।

বড়াই। (মধুমঙ্গলের প্রতি) শোন্। তোর সখাকে আমাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিস। পাথরের বাটীতে ঘোল আর লবণ দিব, বেশ চাটিয়া খাইবে। (মধুমঙ্গলের পূজার দ্রব্য হাত দিয়া ধারণ)

শ্রীরাধা। দেখ, দেখ, পূজার দ্রব্য সব অপবিত্র করে দিল! (সব ফেলিয়া দিয়া) চল আমরা ঘরে যাই।

(শ্রীকৃষ্ণ তখন দুই হাতে আগুলিয়া দাঁড়াইলেন)

শ্রীরাধা। (বড়াইর প্রতি) পূজার দ্রব্য ত ফেলিয়া দিলাম, তবে আবার কিসের দান?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন? (যথা—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ)—

কাঞ্চন কমল মুখ অমূল্য রতন। তার পর নীল-বত্ন-পদ্ম-দুনয়ন।।
তার হেটে পদ্মরাগ অধর সুঠাম। মুক্তাবলী তার মাঝে দন্ত নিরমান।।

এই সমুদয় রত্ন দানের সামগ্রী তোমার কাছে, আরো বল, দানের দ্রব্য নাই? (ইহাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ধরিতে গেলে, বড়াই রাধাকে রক্ষা করিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন)।

বড়াই। আরে নন্দের বেটা, কুলবধূর উপর অত্যাচার করিস্? তোর ভাল হবে না।

ললিতা। তুমি কে বটে? বড় যে জোর? প্রাণে তোমার শঙ্কা নাই? কুলবধূর গায়ে হাত দিতে এসো?

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ বড়াইকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শ্রীরাধার বসন ধরিলেন। অমনি যিনি যাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সকলেই অন্তর্ধান করিলেন; অর্থাৎ যোগমায়া (বড়াই) গেলেন, নিতাই রহিলেন; শ্রীকৃষ্ণ গেলেন, অদ্বৈত রহিলেন; শ্রীরাধা গেলেন, নিমাই রহিলেন; ললিতা গেলেন, গদাধর রহিলেন ইত্যাদি। এ পর্যন্ত যে সমুদয় কাণ্ড হইল, তাহা যাঁহাদের লইয়া হইল তাঁহারা স্বয়ং আসিয়া অভিনয় করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি রাধা থাকিয়া, শ্রীকৃষ্ণরূপে অদ্বৈতের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ—"নিজ মনে চিন্তিল গৌরাঙ্গ ভগবান।। শ্রীরাধার স্বরূপ গ্রহণ করিবারে। পরম রহস্য তাহা অন্যে নাহি পারে।। এই ভাবি রাধা-রূপ ধরিলা আপনে। রুদ্ররূপে অদ্বৈতেরে আত্ম করি মানে।। অদ্বৈতের করিলেন শ্রীকৃষ্ণের বেশ।"

বস্তুতঃ শ্রীঅদ্বৈতের দেহে প্রভু স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার বলিতেছেন—"বেশ-রচনার শিল্পে এমন কি হয়।।" কিন্তু "স্বয়ং কৃষ্ণ আসি হৈল আবির্ভাব।" অর্থাৎ শুধু সাজিলে কৃষ্ণ হওয়া যায় না। শ্রীঅদ্বৈতের শরীরে কৃষ্ণ প্রকৃতই আসিয়াছিলেন। এইরূপে সকলেরই প্রকৃতি

একেবারে পরিবর্তিত হইয়াছিল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বস্ত্র ধরিলেন। কিন্তু ইহার পরের লীলা কাহাকেও দেখিতে দিবেন না বলিয়া অমনি সকলেই অন্তর্হিত হইলেন; আর যাঁহারা পূর্বে যেরূপ ছিলেন আবার ঠিক তাহাই থাকিলেন। যথা, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে—

কোপাবিষ্ট হয়ে বুড়ি কৃষ্ণকে ছাড়ায়ে। অন্তর্ধান করিলেন রাধা সঙ্গে নিয়ে।। নিজরূপ ধরিলেন প্রভু নিত্যানন্দ। নৃত্য করে সব মাঝে পরম আনন্দ।। যৈছে জল সুশীতল স্বভাব তাহার। অগ্নিতাপ দিলে তপ্ত হয় পুনর্বার।। অগ্নি ছাড়াইলে পুনঃ শীতল স্বচ্ছন্দ। এই মত যোগমায়া ছাড়ে নিত্যানন্দ।।"

অর্থাৎ শীতল জলে উত্তাপ প্রবেশ করিলে উহা উষ্ণ জল হয়, উত্তাপ গেলে আবার জল শীতল হয়। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ অদ্বৈতের শরীরে প্রবেশ করিলে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণ হইলেন, আবার শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তিনি অদ্বৈত হইলেন। আবার—"অদ্বৈত অদ্বৈত হইলে সে কৃষ্ণমূর্তি গেল কতি?"

নিমাই যেমন রাধাভাব লুকাইলেন, অমনি তাঁহাতে অন্যান্য শক্তির আবেশ হইতে লাগিল, আর সেই আবেশে তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্যভাগবতে— "কখন বলয়ে দ্বিজ কৃষ্ণ কি আইলা। তখন বুঝায় যেন বিদর্ভের বালা।। ভাবাবেশে যখন অট্ট অট্ট হাসে। মহাচণ্ডী হেন সবে বুঝেন প্রকাশে।।"

পরিশেষে নিমাই শ্রীভগবতী-ভাবে দেবগৃহে প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া হরিদাসকে শিশুর ন্যায় কোলে উঠাইয়া লইলেন। ভক্তগণ দেখিতেছেন যে, শ্রীভগবতী বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া, আর তাঁহার কোলে শ্রীহরিদাস নিশ্চেষ্ট হইয়া শুইয়া আছেন। তখন সকলে ভক্তিভাবে ভগবতীর স্তব করিতে লাগিলেন। সে কিরূপ ভাবে, না—যেরূপে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ পাইবার নিমিত্ত, শ্রীবৃন্দাবনে ভগবতীর স্তব করিয়াছিলেন। সকলে বলিতে লাগিলেন, "জননি! কৃষ্ণ-প্রেম দাও।" এইরূপ স্তব করিতে করিতে সকলেই বিহ্বল হইলেন। তখন সকলেই আপনাদিগকে শিশুবালক, আর যিনি বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া তাঁহাকে ভগবতী এবং তাঁহাদের সকলেরই গর্ভধারিণী জননী বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। হরিদাসের বয়ঃক্রম যখন ছয় মাস, তখন তাঁহার মাতা পতির সহগামিনী হইয়া, চিতায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার স্তন্যদুগ্ধ পানের সাধ মিটে নাই! এখন মাতার কোল পাইয়া স্তন্যদুগ্ধের জন্য প্রাচীন লোভের উদয় হইল, তখন তিনি স্তন খুঁজিতে লাগিলেন। এদিকে অন্যান্য ভক্তগণ হরিদাসের সেই ভাব পাইয়া জননীকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তখন স্তব ছাড়িয়া দিয়া শিশুগণ,—জননী অন্যমনস্ক হইলে যেরূপ রোদন করে,—সেইরূপ মা মা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ বা কোলে যাইবেন বলিয়া খট্টায় উঠিতে যাইতেছেন। আবার "কোলে নে" বলিয়া কেহ জননীর হস্ত, কেহ তাঁহার পদ, কেহ তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছেন। কেহ না হরিদাসকে কোল হইতে নামাইয়া আপনি উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, কেহ বা গীত গাহিতেছেন, কেহ বা নৃত্য করিতেছেন।

যখন গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের নাম পর্যন্ত শুনেন নাই, আর তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, তখন তিনি এই গীতটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যথা—

"মা যার আনন্দময়ী তার কিবা নিরানন্দ।
তবে পাপী তাপী শোকী, মিছা তুমি কেন কান্দ।।
মাঝখানে জননী বসে, সন্তানগণ চারি পাশে,
ভাসাইছেন প্রেমময়ী প্রেম নীরে।
পাপ তাপ দূরে গেল, আনন্দরস উথলিল,
বাহু তুলে মা মা বলে, নৃত্য করে সন্তানবৃন্দ।।"

যখন গ্রন্থকার এই গীতটি রচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি জানিতেন না যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকৃতই এই বলিয়া লীলা করিয়াছিলেন। আরো শুনুন, শুধু যে লীলা করিয়াছিলেন তাহা নয়, এই

লীলা বিস্তার করিয়া, গ্রন্থকার যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাহাই করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, যখন সন্তানগণ জননীকে বড় পিড়াপিড়ি করিতেছেন, তখন নিশি প্রভাত হইল। তখন সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন। যথা, চৈতন্যভাগবতে—

"গৃহ মাঝে কান্দে সব পতিব্রতাগণ। আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর ভবন।।
আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে। হেনই সময় নিশি হৈল অবসানে।।
আনন্দে না জানে লোক নিশি ভেল শেষ। দারুণ অরুণ আসি ভেল পরবেশ।।
পোহাইল নিশি সবে কান্দে উভরায়। কোটি পুত্র-শোকেও এতেক দুঃখ নয়।।
যে দুঃখ জন্মিল সব বৈষ্ণব হৃদয়ে। সে দুঃখে বৈষ্ণব সব অরুণেরে চায়ে।।
কান্দে সব ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া। পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমিতে পড়িয়া।।"

হরিদাস যখন বারংবার স্তন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তখন ভগবতী আর করেন কি, সন্তানকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া স্তন বাহির করিয়া তাঁহাকে পান করাইতে লাগিলেন। ভক্তগণের ইচ্ছা যে ঐরূপ কোলে উঠিয়া সকলে স্তন পান করেন, আর তাঁহারা সেইরূপ ব্যগ্রতাও দেখাইতে লাগিলেন। হরিদাসের স্তন পান করা হইলে, ভগবতী তাহাকে নামাইলেন, এবং আর একজনকে বাহুদ্বারা ধরিয়া কোলে লইলেন। এইরূপে দেবী পরম সুখে, জনে জনে স্তনপান করাইতে লাগিলেন। যথা চৈতন্যভাগবতে— "মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সবারে ধরিয়া, স্তন পান করায়েন পরম স্নিগ্ধ হৈয়া।।"

স্তন-পান করিয়া সকলে স্নিগ্ধ হইলেন। তখন নাটক-লীলা শেষ হইল, আর সকলে একে এক বাড়ী চলিলেন।

চন্দ্রশেখরের বাড়িতে নিমাই যে অদ্ভুত-শক্তি প্রকাশ করিলেন, সকলে বাড়ী ত্যাগ করিয়া গেলেও, সেখানে জ্যোতির্ময় আকারে জ্বলিতে লাগিল। এই তেজ সাত দিন ছিল। তখন, যে কেহ চন্দ্রশেখরের বাড়ী আইসে, সেই জিজ্ঞাসা করে, এই যে তেজ জ্বলিতেছে, এ কি? কেহই সেই তেজের আগে চক্ষু মেলিতে পারে না, যেন "চক্ষু ফুটিয়া পড়ে"। যথা মুরারি গুপ্তের কড়চায়—

"শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যরত্নবাট্যাং মহাপ্রভুঃ।
ননর্ত্ত যত্র তত্রাসীত্তেজস্তু মহদ্ভুতং।
সপ্তাহং শীতলং চন্দ্রতেজস্য সদৃশং হরিং।।
যে যে তত্রাগতা লোকা উচুস্তত্র কথং দৃশোঃ
উন্মীলনে ন শক্তাং স্ম বিদ্যুৎপ্রেক্ষাতু ভূতলে।।

যথা চৈতন্যভাগবতে— "সপ্তদিন শ্রীআচার্যরত্নের মন্দিরে। পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে।। চন্দ্র সূর্য বিদ্যুৎ একত্র যেন জ্বলে। দেখয়ে সুকৃতি সব মহা কুতুহলে।। যতেক আইসে লোক আচার্যের ঘরে। চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহ নাহি ধরে।। লোকে বলে কি কারণে আচার্যের ঘরে। দুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে।।"

আবার চৈতন্যমঙ্গলে—"আনন্দিত শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য। তাঁহার বাড়ীর কথা কহিব আশ্চর্য।। নাচিয়া আইলা পঁহু রহিল ছটাক। উদয় করিলা যেন চাঁদ লাখ লাখ।। অদ্ভুত শীতল শোভা অমৃত অধিক। চাহিতে না পারি যেন চৌদিকে তড়িত।। হৃদয় আহ্লাদ করে দেখি লাগে সাধ। আঁখি মেলিবারে নারি রূপে করে আঁধ।। চমক লাগিল সেই নদীয়ার জনে। কিবা অপরূপ সেহ দেখিলা নয়নে।। আসিয়া বৈষ্ণবগণে পুছে সর্বজন। কি জ্ঞান সন্দর্ভ কথা কহ না কখন।। সকল বৈষ্ণব বলে আমরা কি জানি। নাচিয়া আইলা গৌরচন্দ্র গুণমণি।। এই মাত্র জানি, কিছু না জানি যে আর। লোক বেদ অগোচর চরিত্র যাহার।। সাতদিন অবিচ্ছিন্ন ছিল তেজোরাশি। তেজের ছটায় নাহি জানি দিবানিশি।।"

এই লাখ লাখ চাঁদের ন্যায় শীতল-তেজ, নিমাই যখন শ্রীভগবান্ রূপে প্রকাশিত হইতেন, তখনই দেখা দিত। তিনি অপ্রকাশ হইলেও সে তেজ কিছুকাল সে-স্থানে থাকিত। চন্দ্রশেখরের

বাড়ীতে সারানিশি অধিক পরিমাণে সেই হরিদ্রা-শ্বেতবর্ণ তেজ নির্গত হয়, উহা অমনি রহিয়া যায়। আর যদিও নিমাই সেই স্থান ছাড়িলে প্রতি মুহূর্তে ঐ তেজ ক্ষয় হইতেছিল, তবু সমুদয় ক্ষয় হইতে সাত দিন লাগিয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

বারাসিয়া সুর

আমি জেনেছি পিতা, আমি তোমারি সন্তান,
আমি, জেনে শুনে বসে আছি আপন মনের কুতুহলে।
আর, কে আমারে পায়, সংসারেরি দায়, সব দূর করেছি।
এখন, চরণ সেবি, তোমার গুণ গাই কেবল সাধ মনে।
যদি কেশেতে ধর, মারিবে মার, আমার তাহে ক্ষতি কি,
ও বাপ, জেনো আমার কাছে, তোমার প্রহার মিঠে লাগে।
যদি ক্রোধ করি চাও, আমার ভয় নাহি হয়, আমি তোমারি সন্তান।
তোমার, রাগে-রাঙ্গা চক্ষুতলে বহে দেখি প্রেমসাগর।
মায়ে সন্তানে মারে, সন্তান কান্দে ফুকারে, আরো যায় কোলের ভিতরে।
ও বাপ, এবে মার, পরে দিব শত চুম্ব বদনে।।—বলরাম দাস।

শ্রীঅদ্বৈত কার্যোপলক্ষে হরিদাসকে লইয়া শান্তিপুরে চলিয়া আসিলেন। শান্তিপুরে আসিয়া বলিতেছেন, যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে—

"অদ্বৈত বলেন, ভূতে আবেশ যে করে। তা'তে আর কৃষ্ণাবেশে সমভাব ধরে।। সে দিবস কৃষ্ণাবেশে নৃত্য যে করিনু। কি করিনু কি বলিনু কিছু না জানিনু।। লোক সব সম্প্রতি যে-সব কথা কয়। তা শুনিয়া মোর হয় সন্দেহ প্রত্যয়।। অতএব বুঝিলাম এই বিশ্বম্ভর। অসীম প্রভাবশালী বুদ্ধি অগোচর।।"

যে কারণেই হউক, শ্রীঅদ্বৈত বাড়ী আসিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার ধর্ম বাহ্যে একেবারে ত্যাগ করিলেন, আর এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, বিশ্বম্ভরের অসীম ক্ষমতা সন্দেহ নাই, কিন্তু জ্ঞানচর্চা ত্যাগ করিয়া নাচন গায়ন আবার কি ধর্ম? যথা চৈতন্যভাগবতে—শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন,—"আদি অন্ত আমি পড়িলাম সর্বশাস্ত্র। বুঝিলাম সর্ব অভিপ্রায় জ্ঞান মাত্র।।" এই সব কথা বলিয়া তাঁহার শিষ্য ও অনুচরগণকে যোগবাশিষ্ঠ পড়াইতে লাগিলেন, আর ইহাও বলিতে লাগিলেন, "কলিযুগে অবতার নাই, এবং বিশ্বম্ভর যদিও বড় শক্তিধর, তবু তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলা যাইতে পারে না।" শ্রীঅদ্বৈত এরূপ কেন বলিলেন? বৃন্দাবন দাস বলেন, শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গের দাস্যভক্তি প্রয়াসী। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা না দিয়া উলটিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতেন। শ্রীঅদ্বৈতের দুঃখ যে, "বলে নাহি পারি আমি প্রভু মহাবলী। ধরিয়া ও লয় মোর চরণের ধূলি।।"

অতএব তিনি ভাবিলেন, "প্রভুর শরীরে ক্রোধ জন্মাইয়া দিয়া তিনি যে আমাকে ভক্তি করেন তাহা ঘুচাইব। ক্রোধ হইলে আমাকে দণ্ড করিবেন, আব প্রভুর দণ্ড পাইলে আমার শরীর পবিত্র হইবে।" আবার কেহ কেহ বলিলেন,—"তাহা নয়; অদ্বৈত শ্রীভগবানের জ্ঞান-অংশ, জ্ঞানে শ্রীভগবানকে পাওয়া ক্লেশকর। এই নিমিত্ত, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি, পদে পদে তাঁহার সন্দেহ হইত, আবার পদে পদে সন্দেহ যাইত। কারণ জ্ঞানের কর্মই সন্দেহ সৃষ্টি ও সন্দেহ নাশ। যদি বল শ্রীঅদ্বৈত যখন সদাশিব, তখন উহা কি প্রকারে হয়? তাহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মার ও ইন্দ্রেরও এরূপ সন্দেহ হইয়াছিল। আবার মহাদেব, কাশীরাজের পক্ষ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ পর্যন্ত করিতে গিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত যে শ্রীগৌরাঙ্গের

সহিত মাঝে মাঝে বিরোধ করিবেন, ইহা একেবারে অসম্ভব নয়। তবে তাঁহাদের মনের ভাব বিচার করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা। কিন্তু একটি কথা বিবেচনা করিতে হইবে। স্বয়ং ভগবান্ ভিন্ন নিঃসন্দেহ ভাবটী আর কাহারও সম্ভবে না। যাঁহার যতদূর বিশ্বাস হউক না কেন, তাঁহার একটু সন্দেহ থাকিবেই। জীবমাত্রেরই এই প্রকৃতি। শ্রীভগবান্ যে-কোন "রূপ" ধরিয়াই জীবের সম্মুখে আসুন, প্রথম বিস্ময় কাটিয়া গেলে জীবের মনে হইবে যে,—ইনি কি সেই, না ইহার উপর আর কেহ আছেন। এই কারণে ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্র কখন কখন শ্রীকৃষ্ণের অবতারকে ও শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত অবিশ্বাস করিতেন। অন্য স্থানে এই বিষয়ের বিশেষ বিচার করিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে যে, শ্রীঅদ্বৈত এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া জীবের মহৎ উপকার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত যে কারণেই শ্রীগৌরাঙ্গকে ত্যাগ করুন, কিন্তু তিনি যে উপদেশ দিতে লাগিলেন, তাহাতে বিয়ের উৎপত্তি হইতে লাগিল। এই উপদেশ শুনিয়া হরিদাস টলিলেন না বটে, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতের কোন কোন প্রধান শিষ্যের মন টলিয়া গেল, যেমন,—শঙ্কর, কামদেব নাগর, আগল পাগল ইত্যাদি। শ্রীঅদ্বৈতের শঙ্কর নামক শিষ্য আসামে যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মের ছায়া মাত্র প্রচার করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তন লইলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রচার করিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, "চল, শান্তিপুরে আচার্যের বাড়ী যাই।" নিত্যানন্দ অমনি প্রস্তুত। মাতাকে বলিয়া প্রত্যুষে দুই জনে শান্তিপুরাভিমুখে চলিলেন। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের মধ্যে গঙ্গার ধারে ললিতপুর গ্রাম, (তাহার ঠিকানা এখন পাওয়া যায় না)। পথের ধারে ও গঙ্গার নিকটে একখানি ঘর দেখিয়া নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী জান?" নিতাই বলিলেন, "জানি, একজন গৃহস্থ সন্ন্যাসীর।" নিমাই বলিলেন, "চল যাই, দেখি গৃহস্থ সন্ন্যাসী কেমন?" তখন নিমাইয়ের সম্পূর্ণ সহজ ভাব; তিনি যে কি বস্তু, বাহিরে তাহার লক্ষণমাত্র নাই; কেবল একজন পরম সুন্দর, তেজস্বী ও চঞ্চল ব্রাহ্মণ-যুবক, এই মাত্র। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নিতাই (তিনিও সন্ন্যাসী বলিয়া) নমস্কার করিলেন, সন্ন্যাসীও তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। নিমাই প্রণাম করিলেন, আর সন্ন্যাসী তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। সন্ন্যাসী লোকটি ভাল, অন্তরও সরল; নিমাইয়ের রূপ ও আকার দেখিয়া তাঁহাতে বড় আকৃষ্ট হইলেন। সুতরাং নিমাই প্রণাম করিলে তিনি মনের সহিত আশীর্বাদ করিলেন, বলিলেন, "তোমার ধন হউক, বিদ্যা হউক, পুত্র হউক, ভাল বিবাহ হউক" ইত্যাদি। নিমাই উঠিয়া করযোড়ে বলিলেন, "গোসাঞি! এ কি আশীর্বাদ করিলেন? আমি এ সমুদয় বিফল আশীর্বাদ কেন লইব? আপনি আশীর্বাদ করুন যে, আমি 'কৃষ্ণদাস' হই।" সন্ন্যাসী নিমাইকে প্রাণের সহিত আশীর্বাদ করিয়াছেন। "কৃষ্ণদাস" কাহাকে বলে ও ঐরূপ সমুদয় কথার কি অর্থ তাহা তিনি বড় বুঝেন না। তিনি নিমাইয়ের কথা শুনিয়া বড়ই ব্যথা পাইলেন। বলিতেছেন, "শুনা ছিল এমন লোক আছে, যাহাদের ভাল বলিলে লাঠি মারিতে আসে, আজ তাহা চক্ষে দেখিলাম। কেন বাপু, আমি তোমাকে কি মন্দ আশীর্বাদ করিলাম? ধন, বিদ্যা, সুন্দরী ভার্যা ও পুত্রলাভের বর দিলাম। ইহা অপেক্ষা প্রার্থনীয় দ্রব্য জগতে আর কি আছে?

নিমাই বলিতেছেন, "গোসাঞি, এ সমুদয় সুখ চিরস্থায়ী নয়। জরা আছে, মৃত্যু আছে, তখন আপনার আশীর্বাদে কি লাভ হইবে? বরং এরূপ আশীর্বাদ করুন, যাহাতে আমার শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়, এবং আমি চিরদিনের নিমিত্ত জরা ও মৃত্যু হইতে উদ্ধার হইতে পারি।" এ কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিতেছেন, "এ লোকটি ত মন্দ নয়? আমি সন্ন্যাসী, সমস্ত ভারতবর্ষ বেড়াইলাম, কত শত তীর্থ দেখিলাম। আজ কিনা একটি শিশু আমাকে ধর্ম উপদেশ দিতে আসিল!" নিত্যানন্দ গতিক ভাল নয় দেখিয়া বলিতেছেন, "গোসাঞি, আপনি বালকের কথা শুনিয়া কেন উগ্র হইতেছেন? আমি দর্শন মাত্রেই আপনার

মহিমা বুঝিতে পারিয়াছি।" সন্ন্যাসী ভাবিতেছেন, যুবকটি নির্বোধ, আর তাঁহার সঙ্গের এই সন্ন্যাসী উহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা ভাবিয়া ঠাণ্ডা হইয়া নিতাইকে বলিতেছেন, "যদি ভাগ্যক্রমে শুভাগমন হইয়াছে, তবে অদ্য এখানে অবস্থিতি করুন।" নিতাই বলিলেন, "আমরা ব্যস্ত আছি। কোন বিশেষ কার্যের নিমিত্ত শীঘ্রই যাইব। যদি ইচ্ছা হয় কিছু জলপান করিতে দিউন।" নিতাই উপস্থিত ত্যাগ করিবার পাত্র নহেন। ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী অভ্যন্তরে জল পানের উদ্যোগ করিতে গেলেন। তাঁহার স্ত্রী, দুইটি পরম সুন্দর যুবক অতিথি দেখিয়া, আম্র, দুগ্ধ ও কাঁটাল সজ্জা করিয়া দিলেন, নিমাই ও নিতাই স্নান করিয়া জলপানে বসিলেন। সুতরাং সে আষাঢ় মাস হইবে। অতএব উপরে নিমাইয়ের যত লীলার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা মোটে দুই এক মাসের মধ্যে হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, জলপান করিতে বসিলে সন্ন্যাসী নিতাইকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, "কিছু আনন্দ কি আনিব?" নিতাই বড় বিপদে পড়িলেন। "আনন্দ" মানে মদ। তখন বুঝিলেন, সন্ন্যাসী বামাচারী। কিন্তু কি বলেন ভাবিতেছেন, এমন সময় সন্ন্যাসীর স্ত্রী তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "তুমি কেন অতিথিকে ত্যক্ত করিতেছ, স্বচ্ছন্দে খাইতে দাও।" সন্ন্যাসী স্ত্রীর কাছে গেল, নিমাই নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আনন্দ" কাহাকে বলে? নিতাই বলিতেছেন, "আনন্দ" মানে "মদ"। তখন নিমাই শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! বলিয়া শীঘ্র আচমন করিলেন, এবং সন্ন্যাসী আসিবার আগেই ছুটিয়া পলাইলেন; এবং পাছে সন্ন্যাসী ধরেন বলিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। নিতাইও সেই সঙ্গে ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণে উভয়ে মহা পটু, শান্তিপুর দুই এক ক্রোশের মধ্যে, পথও স্রোতের দিকে, কাজেই দুই জনে ডাঙ্গায় না উঠিয়া মহানন্দে শান্তিপুর পর্যন্ত ভাসিয়া চলিলেন। এ পর্যন্ত, তাঁহারা যে কেন শান্তিপুর যাইতেছেন, নিতাই তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। গঙ্গায় ভাসিয়া অর্ধ পথ আসিলে, নিমাইয়ের শরীরে শ্রীভগবান্ প্রকাশ হইলেন, আর তাঁহার শরীর তেজোময় হইয়া উঠিল। বলিতেছেন, "নাড়া আবার জীবকে জ্ঞানশিক্ষা দিতেছে; আমিও আজ তাহাকে ভাল করিয়া জ্ঞানশিক্ষা দিব।" নিতাই কোন উত্তর না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া চলিলেন। আর, আজ কি হয় ভাবিয়া, একটু কৌতূহলী ও চিন্তিতও হইলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে অদ্বৈতের ঘাটে আসিয়া আর্দ্রবস্ত্রে অদ্বৈতের বাড়ী আসিলেন। অদ্বৈত তখন দুই একটি শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন, এমন সময় দুইজনে সম্মুখে আসিলেন। নিমাই ভগবান্‌রূপে আইলেন, যথা চৈতন্যভাগবতে—"বিশ্বম্ভর তেজ যেন কোটি সূর্যময়। দেখিয়া সবার চিত্তে উপজিল ভয়।।"

হরিদাস দেখিবামাত্র চরণে পড়িলেন, ঘরের মধ্যে অদ্বৈতের ঘরণী প্রভুর ভাব দেখিয়া চিন্তিত হইলেন, অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুত আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু প্রভু এইভাবে কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হারে নাড়া, ভক্তিকে নাকি অবহেলা করিতেছিস্?" প্রভুর তেজ দেখিয়া অদ্বৈত আপনার স্বাতন্ত্র্য রাখিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের শক্তিধর। আপনাকে একটু সামলাইয়া ও কষ্টে সৃষ্টে কিয়ৎকাল আপনাকে শ্রীভগবানের সাক্ষাতে স্বাতন্ত্র্য রাখিয়া বলিলেন, "চিরকালই জ্ঞান বড়, ভক্তি স্ত্রীলোকের ধর্ম। বিনা জ্ঞানে ভক্তিতে কি করিতে পারে?"

সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। তখন সম্পূর্ণ স্ত্রীলোকের স্বভাব পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বুড়োকে মেরো না, বুড়ো বামুনকে মেরো না। বুড়ো বামুনকে কেন মারো? বুড়োর অপরাধ কি? ওগো, তোমরা ধর গো, বুড়োকে যে মারিয়া ফেলিল! তোমরা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছ, আর বুড়ার প্রাণ যাইতেছে? ওগো, তুমি বুড়োকে মার কেন? বুড়ো যদি প্রাণে মরে? তোমার প্রাণে কি ভয় নাই? এ কি অরাজক? মারিয়া এড়াইবে ভাবিতেছ, তাহা কখন পারিবে না।"

সীতাদেবী ব্যগ্র হইয়া, সমুদয় তত্ত্ব ভুলিয়া, প্রলাপ বকিতেছেন; কিন্তু কেহ তাঁহার কথা লক্ষ্য করিতেছেন না। সকলে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া। তাঁহারা নিমাইয়ের ভাব *দেখিয়া যতটুকু অবাক হইতেছেন, অদ্বৈতের ভাব দেখিয়া সেই পরিমাণে আশ্চর্যান্বিত* হইতেছেন। শ্রীঅদ্বৈত কি করিতেছেন? তিনি প্রথমে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলেন, বাঙনিষ্পত্তি করিলেন না, বরং বোধ হইতে লাগিল যেন কিল খাইয়া বড় আরাম পাইতেছেন। ক্রমে যেন কিলের শক্তিতে তাঁহার আনন্দের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। ক্রমে যেন এলাইয়া পড়িতে লাগিলেন। যেন প্রত্যেক আঘাতে তাঁহার শরীরে ঝলকে ঝলকে আনন্দ প্রবেশ করিতেছে। প্রত্যেক আঘাতে যেন পূর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইয়া অধিক চঞ্চল হইতেছেন। পরিশেষে আর আনন্দে থাকিতে পারিলেন না, নিমাইয়ের হাত ছাড়াইয়া উঠিলেন। তখন নিমাই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া, যেন ক্লান্ত হইয়া, পিঁড়ায় বসিলেন। শ্রীঅদ্বৈত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু যেন আনন্দে দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। শেষে একটু সামলাইয়া আঙ্গিনায় দ্রুতগতিতে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার কথা ফুটিল। তখন কি করিতেছেন, না— করতালি দিতেছেন, নৃত্য করিতেছেন, এবং বলিতেছেন, "ত্রিলোকবাসী জনগণ দেখ! আমার প্রভুর দয়া দেখ! আমি প্রভুকে ছাড়িয়া আইলাম, কিন্তু প্রভু আমাকে ছাড়িলেন না। আমার বাড়ী আসিয়া আমাকে বলদ্বারা কৃপা করিলেন। প্রভুর প্রহার কি শীতল! আমার ত্রিতাপ দূর হইয়া গেল। প্রভুর শ্রীকর-কমল কি মধুময়! শ্রীকরের প্রসাদ আমাকে আনন্দে একেবারে উন্মত্ত করিতেছে। "প্রভু, আমি তোমাকে আর কি দিব? এসো তোমাকে প্রণাম করি।" ইহাই বলিয়া পিঁড়ায় প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িয়া চরণখানি উঠাইয়া মস্তকে ধরিলেন। দর্শকেরা দেখিলেন যে, শ্রীকর-প্রসাদ পাইয়া অদ্বৈতের সমুদয় আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যখন অদ্বৈত প্রহারিত হইতেছেন তখন তাঁহারা দেখিতেছেন, যেন প্রতি আঘাতে প্রভু অদ্বৈতের শরীরে সুধা প্রবেশ করাইতেছেন। যখন অদ্বৈত উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের অন্তর দ্রব হইল। যখন অদ্বৈত তাঁহার প্রভুর সুযশ বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন সকলে আনন্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

অদ্বৈত যখন প্রভুর চরণ-তলে পড়িলেন, তখন শ্রীভগবান্ লুকাইলেন। নিমাই অদ্বৈতকে চরণ-তলে পতিত দেখিয়া শ্রীবিষ্ণু! বলিয়া জিভ কাটিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "গোসাঞিও, করেন কি? আমাকে কেন এরূপ দুঃখ দিতেছেন?" এই বলিয়া আবার অদ্বৈতকে প্রণাম করিলেন; করিয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায় তাঁহাকে বলিতেছেন, "গোসাঞিও, আমি ত কিছু চপলতা করি নাই?" তাহার পরে করযোড়ে অদ্বৈতকে বলিতেছেন, "আমি তোমার শিশু-সন্তান; যেমন অচ্যুত, তেমনি আমি। আমাকে তোমার সদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।" এ কথা শুনিয়া অদ্বৈত, হরিদাস ও নিতাই পরস্পরে চাহিয়া একটু হাসিলেন। অদ্বৈত বলিলেন, "এমন কিছু অধিক চাঞ্চল্য কর নাই, অমনি অল্প সল্প। তবে বেলা হইয়াছে, দুটো অন্ন ত মুখে দিতে হইবে। চল আবার স্নানে যাই। সমস্ত অঙ্গে কর্দম লাগিয়াছে।"

নিমাই ভিজা কাপড়ে অদ্বৈতকে লইয়া আঙ্গিনায় লপ্টালপ্টি করায় অঙ্গে কাদা লাগিয়া গিয়াছে। বলিতেছেন, "চলুন, স্নানে যাই।" আবার সীতা ঠাকুরাণী দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন,

তাঁহাকে লক্ষ্য কবিয়া বলিতেছেন, "মা কোথায়? শীঘ্র কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর। বড় ক্ষুধা হইয়াছে।" ক্ষুধা হইবারই কথা। দুই ক্রোশ সাঁতার, আবার তাহার পরে আঙ্গিনায় লপ্টালপ্টি। "মা" তখন সব ভুলিয়া গিয়াছেন। মহা আনন্দিত হইয়া নানাবিধ সামগ্রী রন্ধন করিতে লাগিলেন। আর প্রভু ও নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও হরিদাস স্নানে চলিলেন। সেখানে আবার জলক্রীড়া করিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। নিমাই একেবারে ঠাকুব ঘরে গেলেন, যাইয়া সাষ্টাঙ্গে ঠাকুব প্রণাম করিলেন। তাহা দেখিয়া অদ্বৈত নিমাইয়ের চরণে পড়িলেন। হরিদাস তাহা দেখিযা অদ্বৈতের চরণে পড়িলেন। তখন কিরূপ শোভা হইল তাহা বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন; যথা—"যেন ধর্মের একটি সেতু বন্ধন হইল! প্রথমে হরিদাস, তাহার পর অদ্বৈত, তাহার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ, তাহার পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ।"

নিমাই শ্রীঅদ্বৈতকে পদতলে দেখিয়া জিভ কাটিয়া 'শ্রীবিষ্ণু!' বলিয়া উঠাইলেন। তাহার পরে তিন জনে ভোজনে বসিলেন। নিমাই যে অদ্বৈতকে প্রহার করিয়াছেন, ইহার ছন্দাংশ তিনি জানেন না। হাস্যকৌতুকে তিন জনে ভোজন করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী পরিবেশন করিতেছেন। বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল দ্রব্য নিমাইয়ের পাতে দিতেছেন। কিছুক্ষণ পূর্বে যে তিনি নিমাইকে গালি দিতেছিলেন, তখন আর তাহা কিছু মনে নাই। ভোজন শেষ না হইতেই নিতাই ঘরে অন্ন ছড়াইতে লাগিলেন। তাহার দুই কারণ। এক নিতাই চঞ্চল, দ্বিতীয় অদ্বৈত বড় শুদ্ধ-সাধ্বি লোক। নিতাই অন্ন ছড়াইয়া তাঁহার সেই শুদ্ধতাকে প্রকারান্তরে বিদ্রুপ করিতেন। অদ্বৈতের সঙ্গে আহারে বসিলেই প্রায়ই নিতাই উচ্ছিষ্ট অন্ন তাঁহার গায়ে দিতেন, আর অদ্বৈত অতিশয় ক্রোধ করিযা উঠিতেন; কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি যে, সে ক্রোধ হাস্যময়, সে ক্রোধে কেহ ভয় পাইতেন না, সকলে হাসিতেন। নিতাই এইরূপে অন্ন ছড়াইলে অদ্বৈত ক্রোধ করিয়া বস্ত্রখানি ত্যাগ করিলেন। পরস্পরে খানিক গালাগালি হইল, তাহার একটু পরে আবার মহা-প্রীতে কোলাকুলি হইল।

শান্তিপুরের ওপারে অম্বিকা-কালনা। সেখানে গৌরীদাস পণ্ডিত বাস করেন। শালিগ্রামে বাড়ী, গৃহত্যাগ করিয়া উপরোক্ত গ্রামে গঙ্গাতীরে সাধন ভজন করেন। শান্তিপুর হইতে নিমাই একাকী তাঁহার বাড়ী যাইয়া উপস্থিত। গৌরীদাস নিমাইকে চিনেন না। দেখেন যে, একজন নবীন ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার নিকট আসিতেছেন। তাঁহার রূপে চারিদিক আলো করিয়াছে। দেখিতেছেন, নিমাইয়ের স্কন্ধে একখানি নৌকার বৈঠা। গৌরীদাস নিমাইকে ও তাঁহার স্কন্ধে বৈঠা দেখিয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না। অবশ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিমাই বলিতেছেন, "আমি শান্তিপুরে আসিয়াছিলাম। হরিনদী গ্রামে নৌকায় চড়িলাম, আর এই বৈঠাখানি দিয়া বাহিয়া আসিলাম। এখন এই বৈঠাখানি ধর, ধরিয়া তাপিত জীবনকে ভবনদী পার কর।" যথা ভক্তিরত্নাকরে—"পণ্ডিতেরে কহে শান্তিপুরে গিয়াছিনু। হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িনু।। গঙ্গা পার হৈনু নৌকা বাহিয়া বৈঠায়। এই লহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায়।।"

নিমাই ইহা বলিয়া বৈঠাখানি গৌরীদাসকে দিতে গেলেন, আর গৌরীদাস পরতন্ত্রভাবে উহা লইতে হাত বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কি বস্তু? তুমি কি আমাদের সেই কাণ্ডারী?" নিমাই বলিতেছেন, "আমি নদীয়ার নিমাইপণ্ডিত।" এই কথা শুনিয়া গৌরীদাস চরণে পড়িতে গেলেন, নিমাই অমনি তাঁহাকে বক্ষে ধরিলেন এবং সেই সুযোগে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। গৌরীদাস নিমাইয়ের কথা পূর্বে শুনিয়াছিলেন মাত্র। মনে সদাই ভাবিতেন, নিমাই তাঁহার কেহ কি না? নিমাইকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই বুঝিলেন যে, এ বস্তুটি তাঁহার বড় প্রিয়। যখন শুনিলেন যে, নিমাইপণ্ডিত, তখনই বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহারই। গৌরীদাস ভাবিতেছেন যে, বৈঠা ত পাইলেন, নৌকাও চিরদিন বর্তমান, এখন

নৌকা বাহিবার শক্তি কোথায়? কিন্তু নিমাইয়ের আলিঙ্গনে সে শক্তিও তখনি পাইলেন। তখন গৌরীদাস ভাবিতেছেন, শ্রীভগবান্ কি দয়াল! নিজ হস্তে বৈঠা বিতরণ করিতেছেন। এইরূপে গৌরীদাস চিরদিন নিমাইয়ের হইলেন। শ্রীনিমাইয়ের বৈঠা অদ্যাবধি কালনায় আছে। কালনা হইতে নিমাই শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন, এবং কয়েক দিন পরে সদলে আবার নবদ্বীপে ফিরিলেন। অদ্বৈতের জ্ঞানচর্চা এই অবধি রহিত হইয়া গেল।

গৌরীদাস অপ্রকট হইলে, এই বৈঠাখানি তাঁহার শিষ্য হৃদয়চৈতন্য পাইলেন। হৃদয়চৈতন্যের শিষ্য শ্যামানন্দ। ইনি প্রায় সমস্ত উড়িষ্যাদেশ গৌরভক্ত করেন। এই বৈঠাখানির কথা একবার মনে ভাব। নিমাইয়ের বয়ঃক্রম তখন ২৩ বৎসর। তাঁহার বাল্যাবধি কার্য দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, তাঁহার সমস্ত কার্য একটি পূর্বনির্ধারিত সঙ্কল্পের পরিচয দেয়। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া মানিবেন না, তাঁহাদের অন্ততঃ এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, নিমাইয়ের কার্যের মূলাধার শ্রীভগবান্; অর্থাৎ শ্রীভগবান্ প্রত্যক্ষ নিমাইয়ের দ্বারা একটি কার্য করিতেছিলেন। সেটি কি, না—জীবকে ভক্তিধর্ম শিক্ষা প্রদান। ইহা স্বীকার করিলে প্রমাণিত হইবে যে, শ্রীভগবান্ জীবের অতি নিজজন। আবার যদি তিনি এত নিজজন, তবে তাঁহাব স্বয়ং আসিবার বা অসম্ভাবনা কি? অর্থাৎ যিনি হৃদয়ে বুঝিবেন যে, শ্রীভগবান্ নিমাইয়ের দ্বারা ভক্তি-ধর্ম প্রচার করিতেছেন, (ভক্তি-ধর্ম কাহাকে বলি, না—যাহাতে শিক্ষা দেয় যে, শ্রীভগবান্ জীবের নিজ-জন), তাঁহার একথা বুঝিতেও আর আপত্তি রহিবে না যে, সেই নিমাই শ্রীভগবান্। অর্থাৎ "আমি তোমাদের নিজ-জন" এই কথা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীভগবান্ নিমাইকে প্রেরণ করিয়াছেন, এ কথা যদি বিশ্বাস করিতে পার, তবে ইহাও বিশ্বাস করিতে আপত্তি কি যে, নিমাইকে না পাঠাইয়া তিনি আপনিই নিমাই হইযা আসিয়াছিলেন?

চতুর্থ অধ্যায়

পিরীতি বিষম জ্বালা। ধ্রু।
পাগল কৈল আমায়, চিকণকালা।।
অন্তরে প্রেমের সিন্ধু, আঁখি বহি পড়ে বিন্দু, বন্ধু, কুলশীল ধরম নিলা।।
কথা কহিবারে যায়, কণ্ঠরোধ হয়ে যায়, এতে বাঁচে কি কুলবালা।
বদন পানে চেয়ে রয়, নয়ন জলে ভেসে যায়, চাঁদবদনে চাঁদের আলা।।

—বলরাম দাস

মুরারি প্রভুর পিতৃ পিতামহের স্বদেশবাসী, তাহাতে প্রভুকে জন্মাবধি দেখিতেছেন। প্রভুর আদিলীলা তিনি লিখিয়াছেন। প্রভু বাহিরে লোকের মধ্যে সর্বাগ্রে মুরারির নিকট প্রকাশ পান। যখন নিমাই পাঁচ বৎসরের, তখনি মুরারির জ্ঞানচর্চা দূষিয়াছিলেন। নিমাইয়ের সহিত মুরারি কিছুকাল একত্রে পাঠ করেন, তখন তাঁহার সহিত অনবরত কলহ করিতেন। যে তাঁহার স্নেহের পাত্র, তাহার সহিত নিমাইয়ের এইরূপ রঙ্গই হইত। গয়া হইতে আসিয়াই প্রথমে মুরারির কাছে তীর্থযাত্রার কাহিনী বলেন। মুরারি প্রভুর বড় প্রিয়। স্বয়ং পরম পণ্ডিত, বিজ্ঞ, দয়ালু, নিরীহ, স্নিগ্ধ। মুরারির শত্রু ছিল না, বরং তিনি সকলেরই প্রিয়। তাঁহার শরীরে অপার শক্তি ছিল। আবার তাহাতে যখন আবেশ হইত, তখন তাঁহার শারীরিক বলের সীমা থাকিত না। তাঁহার দেহে হনুমান কি গরুড় প্রকাশ পাইতেন। একদিবস নিমাই, শ্রীবাসের আঙ্গিনায় ভগবান্ ভাবে "গরুড়" বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। মুরারি তাঁহার বাড়ীতে বসিয়াছিলেন। মুরারির সেখানে গরুড়-আবেশ হইল, এবং বাড়ী হইতে "এই যে আমি" বলিয়া চীৎকার করিয়া রাজপথে দৌড়িলেন। রাজপথের লোক তাঁহাকে

দেখিয়া ক্ষিপ্ত ভাবিতে লাগিল। কিন্তু মুরারির চেতনা নাই, সুতরাং লোকাপেক্ষাও নাই। মুরারি শ্রীবাসের আঙ্গিনায় আসিয়া বলিলেন, "প্রভু, কেন আমাকে স্মরণ করিয়াছেন? এই যে আমি গরুড়, তোমার চিরদিনের বাহন। কোথা লইয়া যাইব, আজ্ঞা করুন।" এই বলিয়া অনায়াসে সেই চারি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ নিমাইকে স্কন্ধে করিলেন, আর শ্রীবাসের আঙ্গিনায় দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভক্তগণ হরিধ্বনি ও স্ত্রীলোকে হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। একটু পরে উভয়ে চেতনা পাইলেন। মুরারিতে হনুমানই অধিকাংশ সময় প্রকাশ হইতেন, সুতরাং তিনি শ্রীরামের উপাসক। কাজেই তাঁহার শ্রীভগবানে দাস্য-ভক্তি ও তিনি ব্রজের নিগূঢ় রসে বঞ্চিত। প্রভু তাঁহাকে এক দিবস বলিলেন, "মুরারি, যদিও শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীরামে ভেদ নাই, তবু শ্রীকৃষ্ণলীলা বড় মধুর। তুমি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কর, তাহা হইলে ব্রজের নিগূঢ়রসের আস্বাদ পাইবে।"

প্রভুর আজ্ঞা, কাজেই মুরারি সম্মত হইলেন। সে রজনী গেল, প্রাতে মুরারি আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু! তোমার আজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজন করা, সে আজ্ঞা আমার অবশ্য পালন করা কর্তব্য। কিন্তু আমি আমার এই মাথা শ্রীরামচন্দ্রকে বেচিয়াছি, তাঁহাকে ছাড়িতে পারিলাম না। কাজেই তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারিতেছি না। অতএব সেই অপরাধে তুমি আমার প্রাণবধ কর।"

তখন নিমাই তাঁহাকে উঠাইয়া হৃদয়ে ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, "সাধু মুরারি! তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে কেন ছাড়িবে? তুমি হনুমান, তুমি ছাড়িলে শ্রীরামের আর থাকিবে কি? তবে, তুমি যে শ্রীরামচন্দ্রকে চিরদিন ভজন করিয়াছ, তাহার পুরস্কার স্বরূপ, আমার বরে তোমার হৃদয়ে ব্রজলীলারস স্ফুরিত হউক। তুমি তোমার প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে ভজন কর, অথচ ব্রজলীলাও আস্বাদন কর।" এইরূপে প্রভুর বরে মুরারির হৃদয়ে ব্রজ রসস্ফূর্তি হইল, তাহা তাঁহার এই অদ্ভুত পদে শ্রবণ করুন। যথা—

"সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও। ধ্রু। জীয়ন্তে মরিয়া যেই, আপনারে খাইয়াছে, তারে তুমি কি আর বুঝাও? নয়ান-পুতুলী করি, লইনু মোহনরূপ, হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ। পীরিতি আগুন জ্বালি, সকলি পুড়ায়েছি, জাতি কুলশীল অভিমান। না জানিয়া মূঢ় লোকে, কি জানি কি বলে মোকে, না করিয়া শ্রবণ গোচরে। স্রোত বিথার জলে, এ তনুটি ভাসায়েছি, কি করিবে কুলের কুকুরে? যাইতে শুইতে রৈতে, আন নাহি লয় চিতে, বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়। মুরারি গুপ্ত কহে, পীরিতি এমত হয়ে, তার গুণ তিন লোকে গায়।।"

এক দিবস মুরারিকৃত আটটি শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের ভজন শুনিয়া প্রভু এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহার কপালে "রামদাস" কথাটি নিজে লিখিয়া দিলেন।। "মুরারিকে প্রভু চর্বিত তাম্বুল দিলে, মুরারি কিছু গ্রহণ করিলেন, আর কিছু মস্তকে দিলেন"—এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। প্রভু তদ্দণ্ডে ভগবান-আবেশে ক্রোধ করিয়া, কাশীতে ভক্তদ্রোহী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মতকে দূষিলেন, আবার তখনি আবেশ গেল;—যথা, চৈতন্যভাগবতে—"ক্ষণেক হইল বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর। পুনঃ সে হইল প্রভু আকিঞ্চন বর।। ভাই বলি মুরারিকে কৈল আলিঙ্গন।।" মুরারি এই আলিঙ্গন পাইয়া আনন্দে ডগমগ হইয়া আপনা-আপনি হাসিতে-হাসিতে বাড়ীতে আসিলেন; আসিয়াও আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। আবার স্ত্রীকে বলিতেছেন, "ভাত দাও।" মুরারি এইভাবে আপনা-আপনি বলিতেছেন, আর হাসিতেছেন। যথা চৈতন্যভাগবতে—"এক বলে, আর করে, খলখলি হাসে।"

মুরারির স্ত্রী ভাত আনিয়া দিলে, তিনি ভোজনে বসিয়া অন্নে ঘৃত মাখিলেন, আর গ্রাসে গ্রাসে "খাও-খাও" বলিয়া যাঁহাকে হৃদয় মাঝারে দেখিতেছেন, তাঁহারই মুখে দিতেছেন। কাজেই সমুদয় অন্ন মাটিতে পড়িয়া যাইতেছে।। মুরারির স্ত্রী পতিপ্রাণা। তিনি জানেন

তাঁহার পতি কি রসে বিভোর! পতির আনন্দ দেখিয়া তিনিও সুখসাগরে ভাসিতেছেন। এইরূপে সমস্ত অন্ন মুরারি তাঁহার প্রিয়জনের মুখে দিলে, পতিব্রতা আবার অন্ন আনিয়া স্বামীকে যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন।

পর দিবস প্রাতে শ্রীনিমাই মুরারির বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া মুরারি আনন্দে উঠিয়া প্রণাম করিলেন ও বসিতে আসন দিলেন। নিমাই বসিয়া বলিতেছেন, "মুরারি, কিছু ঔষধ দাও।" মুরারি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি অসুখ?" নিমাই বলিলেন, "অজীর্ণ!" মুরারি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "অজীর্ণ হইল কেন?" নিমাই বলিলেন, "তুমি জান না, অজীর্ণ কেন হইল? কল্য ও কি করিলে? অতরাত্রে গ্রাসে-গ্রাসে ঘৃতমাখা ভাত মুখে দিলে কেন? কিন্তু ভাই, তুমি দিলে আমি ফেলি কিরূপে?" নিমাই তাঁহার ভাব দেখিয়া বুঝিলেন যে, মুরারি বিহ্বল অবস্থায় এই কাণ্ড করিয়াছেন, সেইজন্য ইহা কিছুমাত্র তাঁহার স্মরণ নাই। তখন প্রভু বলিতেছেন, "তুই জানিস না, কাল রাত্রে কি করিয়াছিলি; তুই জানিস না, তোর স্ত্রী জানে, জিজ্ঞাসা কর! তা তোর অন্ন খাইয়া যে অজীর্ণ হইয়াছে, তাহার ঔষধ তোর জল।" ইহাই বলিয়া,—মুরারি "না" "না" বলিতে না বলিতে,— সেখানে তাঁহার যে জলপাত্র ছিল, উহা হইতে নিমাই জল পান করিলেন।

মুরারি এক দিবস ভাবিতেছেন,—সুখভোগের ত একশেষ করা গেল। শ্রীভগবানের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া ক্রীড়া করিলাম। আমাকে ভাই বলেন, আলিঙ্গন করেন। কিন্তু তার পরে? ভগবান কিন্তু এই মলিন-জগতে চিরদিন রহিবেন না। যখন তিনি অপ্রকট হইবেন, তখন আমার উপায় কি হইবে? ইহার সৎপরামর্শ এই যে, আমি আগে যাইয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিব। তাহা হইলে তিনি যাইবামাত্র তাঁহার দর্শন পাইব। আমাকে আর তাঁহার বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

এই যুক্তি অতি উত্তম মনে করিয়া, মুরারি একখানি অতি ধারাল ছুরি প্রস্তুত করাইয়া ঘরে লুকাইয়া রাখিলেন; ভাবিলেন, প্রভুকে ভাল করিয়া দেখিয়া ও প্রণাম করিয়া মনে মনে বিদায় লইবেন এবং রাত্রে গলায় ছুরি দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। মুরারি এই সুযুক্তি স্থির করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রভু আসিয়া উপস্থিত। প্রভুকে দেখিয়া তটস্থ হইয়া মুরারি প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন। প্রভু বসিয়া দুই-এক কথার পর বলিলেন, "ভাই, তুমি আমার একটা কথা রাখিবে?" মুরারি,—"সে কি? আপনার কথা রাখিব না? এ দেহ ত আপনারই, তাহা ত জানেন।" নিমাই,—"এই ঠিক?" মুরারি,—"ঠিক। তাহার আবার সন্দেহ কি।" প্রভু তখন মুরারির কানে কানে বলিতেছেন, "যে ছুরিখানা প্রস্তুত করিয়াছ, সেখানি আমাকে আনিয়া দাও।" অপ্রত্যাশিত ভাবে এই কথা শুনিয়া মুরারি একটু দিশাহারা হইয়া কি বলিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া, শ্রীভগবানের নিকট পরিষ্কাররূপে মিথ্যা কথা বলিলেন,—"প্রভু! সে কি? কে তোমাকে বলিল? কৈ, আমি তো ছুরির কথা কিছু জানি না।" নিমাই তখন বলিতেছেন, "তুমি ত খুব লোক? আমাকে আবার বলিবে কে? তুমি যাহা দ্বারা এবং যে জন্যে ছুরি গড়াইয়াছ তাহা আমি জানি, আর যেখানে ছুরিখানি রাখিয়াছ তাহাও জানি।" ইহাই বলিয়া নিমাই ঘরের ভিতর গেলেন এবং ছুরিখানি আনিয়া মুরারির সম্মুখে রাখিলেন। তারপর আবেগভরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,— "মুরারি! তোমার এই কাজ?"

"মুরারি! আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইতে চাও?" মুরারি আর কি বলিবেন। তিনি অধোবদনে কান্দিতে লাগিলেন। তখন নিমাই তাঁহাকে কোলের ভিতর টানিয়া আনিয়া গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। মনের আবেগে প্রথমে কথা কহিতে পারিলেন না। বেগ সম্বরণ করিয়া একটু পরে প্রভু বলিতেছেন,

"মুরারি! তুমি এ বুদ্ধি কাহার কাছে শিখিলে? আমাকে কি অপরাধে ফেলিয়া যাইতে চাও। আমার বিরহ তুমি সহ্য করিতে পারিবে না, কিন্তু আমাকে তোমার বিরহে ফেলিয়া যাইবে! মুরারি! এই কি তোমার অহেতুকী প্রীতি? মুরারি ত নির্বাক। তখন উভয়ে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। নিমাই আবার বলিতেছেন, "মুরারি! বল আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না?" মুরারি অতি কষ্টে বলিলেন-- "না"। কিন্তু নিমাইয়ের তাহাতে তৃপ্তি হইল না। তিনি মুরারির দক্ষিণ হস্তখানি ধরিয়া আপনার মাথার উপর রাখিলেন, তারপর বলিতে লাগিলেন,—"বল মুরারি! আমার মাথা খাও, তুমি এরূপ বুদ্ধি আর করিবে না?" নিমাই বলিতেছেন, আর মুরারি ফোঁপাইযা কাঁন্দিতেছেন। মুরারির স্ত্রী দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। এ কথা শুনিয়া তিনিও কান্দিতে আর মনে মনে প্রভুকে কোটি কোটি প্রণাম করিতে লাগিলেন। মুরারি তখন প্রভুর কোল হইতে নামিয়া তাঁহার চরণতলে পড়িলেন, এবং আবেগভরে বলিলেন, "প্রভু! তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? তুমি পাছে ফেলিয়া যাও, এই চিন্তায় আমি উন্মাদ হইয়াছিলাম। প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর।"

দুধ জ্বাল দিতে থাকিলে প্রথমে পাত্র উত্তপ্ত হয়। তাহার পর দুধ বিলোড়িত হইতে থাকে। আরও উত্তাপ পাইলে উথলিয়া পড়ে। সেইরূপ তখন নদীয়াতে উথলিয়া পড়িতেছে,—কি? না—কৃষ্ণভক্তি। কিরূপে উথলিয়া পড়িতেছে তাহা এই পদটীতে প্রকাশ!—"ধর নাওসে কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয়। এ প্রেম কলসে কলসে বিলায় তবু না ফুরায়।। প্রেমে, শান্তিপুর ডুবুডুবু, ন'দে ভেসে যায়। প্রেমে দুকূল ভেঙ্গে ঢেউ লাগিছে গোরাচাঁদের গায়।।"

পদকর্তা বলিতেছেন যে, তখন প্রেমের বন্যা আসিয়া নদীয়া ভাসিয়া গিয়াছে, ও শান্তিপুর ডুবুডুবু হইয়াছে, আর মধ্যস্থলে গৌরচন্দ্র টলমল করিতেছেন। এই ভক্তি কিরূপ? না,—তরল সুধার ন্যায়। উহা নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ জীবগণকে কলসী-কলসী পান করিতে দিতেছেন। যে চাহিতেছে, তাহাকেই দিতেছেন, কিন্তু ভাণ্ডার অক্ষয়। প্রথমে শ্রীগৌরচন্দ্র স্বয়ং ভক্তি বিতরণ করিতেন। তারপর তাঁহার ভক্তগণ সেই শক্তি পাইয়া তাঁহারাও বিতরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ইচ্ছামাত্র জীবকে বিমলানন্দে মগ্ন করিতেন, আর ভক্তগণ নানা উপায়ে ঐ সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন, যথা,—কাহাকেও স্পর্শ করিয়া, কাহারও প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কাহারও সহিত সঙ্গ করিয়া, কাহাকেও আলিঙ্গন করিয়া ইত্যাদি। যে ভাগ্যবান এই সুধা পাইলেন, তাঁহার শ্রীভগবানের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ হইল। সে আকর্ষণ কিরূপ? না, তাঁহার নাম শুনিলে আনন্দ হয়;—এত আনন্দে অঙ্গ পুলকিত হয়, নয়ন দিয়া প্রেমধারা বহে, আনন্দে অহরহ নৃত্য ও গীত করিতে ইচ্ছা করে। মুরারি গুপ্ত ভোজন করিতে বসিয়া আনন্দে খলখল করিয়া হাসিতেছেন। তাঁহার আনন্দের বেগ ক্রমে অতি প্রবল হইল, অমনি তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীধর যাইতেছেন, পথে একজন ভক্তের সহিত দেখা হইল; অমনি তাঁহার হাত ধরিয়া দুই জনে, বহুতর লোকের মাঝে, কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া, নাচিতে লাগিলেন। পথের মধ্যে দুই ভক্তে দেখা হইল, পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিলেন, আর অমনি হাসিয়া গলিয়া পড়িলেন, আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইল না। উভয়ের মনের ভাব এই,—কি আনন্দে ভাসিছে হৃদয়। আনন্দেতে মন মেতেছে, হচ্ছে কত ভাবোদয়!" ন'দের এই আনন্দ বর্ণনা করিয়া লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গলে এই গীতটী সন্নিবেশিত করিয়াছেন, যথা—

> "সুখেরি পাথার নদীয়ায়, গোরাচাঁদের উদয়। ধ্রু।
> এক দিন নয়, দু দিন নয়, নিত্যই নূতন। (সুখেরি পাথার)
> মনে করি, ন'দে ভরি, এ দেহ বিছাই।
> তাহার উপরে আমার গৌরাঙ্গ নাচাই।।"

ভক্তগণের কৃপায় তখন নবদ্বীপ নিমাইয়ের গণে ভরিয়া গিয়াছে। ভক্তগণ যাহাকে পাইতেছেন টানিয়া লইতেছেন। সকলেরই তখন পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহাদের সমুদয় সাধ মিটিয়া গিয়াছে, কেবল একটি মিটে নাই। সেটী প্রার্থনায় প্রকাশ, যথা—"হে শ্রীভগবান্! আমাদের এই পরিবার বৃদ্ধি কর।" আবার ভক্তিতে হৃদয় তরল হইয়া গিয়াছে, জীবের প্রতি দয়ার তরঙ্গ হৃদয়ে অনবরত বহিতেছে। ভক্তগণের সর্বদাই মনে মনে প্রার্থনা এই,—"হে শ্রীভগবান্! তুমি যে সুখ আমাদিগকে দিয়াছ, ইহা জনে-জনে বিতরণ কর। যেন তোমার পাদপদ্ম মধুপান করিয়া সকলেই আমাদের মতন আনন্দ ভোগ করে।" নিমাইয়ের এইরূপ বহুতর ভক্ত তখন তাঁহাদের দেহধর্ম অনেকটা ভুলিয়াছেন। তাঁহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা অতি অল্প, নিদ্রাও সেইরূপ। স্ত্রীলোকেরা বাড়ী বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছেন, ও নানাবিধ উপাদেয় আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। আর পুরুষগণ ঐ ফুলের মালা ও আহারীয় দ্রব্য লইয়া প্রভুকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। প্রভুকে নাগরিকগণ কিরূপে দেখিতেছেন, তাহা তাঁহার অতি প্রিয়পার্ষদ,—মুরারি ও শিবানন্দ—এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন; যথা—"গদাধর অঙ্গে পঁহু অঙ্গ হেলাইয়া। বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া।। ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, বাহ্য নাহি জানে। রাধাভাবে আকুল প্রাণ, গোকুল পড়ে মনে।। অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি। কত কোটি চাঁদ কান্দে হেরি মুখখানি।। ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে। না জানি মুরারিগুপ্ত বঞ্চিত কোন্ দোষে।।"

আবার—"সোণার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া। প্রেমজলে ভাসাইয়া নগর নদীয়া।। পরিসর বুক বহি পড়ে প্রেমধারা। নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা।। গোবিন্দের অঙ্গে পঁহু অঙ্গ হেলাইয়া। বৃন্দাবন-গুণ শুনেন মগন হইয়া।। রাধা রাধা বলি পঁহু পড়ে মুরছিয়া। শিবানন্দ কান্দে পঁহুর ভাব না বুঝিয়া।।"

প্রভু ভক্তের নিকট হইতে ফুলের মালা গ্রহণ করিলেন, এবং আপনার গলার মালা তাহাকে দিয়া উপদেশ করিলেন,—"দিবানিশি হরেকৃষ্ণ-নাম জপ কর। আর দশে-পাঁচে মিলিয়া,—স্ত্রী, পুত্র, পিতা মাতা প্রভৃতি লইয়া বাড়ী বসিয়া কীর্তন কর।" সেই উপদেশ পাইয়া সকলে সেইরূপ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইলে নদীয়ার পাড়ায় পাড়ায়—"বল ভাই হরি ও রাম রাম। এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।।" এইরূপ সব পদ গীত হইতে লাগিল। খোল করতাল ও হরিধ্বনিতে নবদ্বীপ প্রতি রজনীতে উৎসবময় হইয়া উঠিল। নিতাই এইরূপ উৎসব। নবদ্বীপের তখনকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া বাসুঘোষ এই পদটী লিখিয়াছেন; যথা—"অবতার ভাল, গৌরাঙ্গ অবতার কৈলা ভাল। জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল।। চন্দ্র নাচে, সূর্য নাচে, আর নাচে তারা। পাতালে বাসুকী নাচে বলি গোরা গোরা।। নাচয়ে ভক্তগণ হইয়ে বিভোরা। নাচে অকিঞ্চন যত প্রেমে মাতোয়ারা।। জড় পঙ্গু আতুর আদি উদ্ধারে পতিত। বাসুঘোষ বলে মুঞি হইনু বঞ্চিত।।"

"সূর্য নাচে, চন্দ্র নাচে" ইহার ভাব পরিগ্রহ করুন। ভক্তগণের দেহ সর্বদা নাচিতে পারে না, কিন্তু তাহাদের মনে তখন যে ভাব তাহাতে কাজেই প্রাণ সর্বদাই নাচিতেছে। তাঁহারা দেখেন যে, ত্রিভুবনও আনন্দে নাচিতেছে। তাঁহাদের ভাব এই যে, ভগবান্ তাঁহার, তাঁহার তিনি; তিনিই সব, সবই তাঁহার। এই জগৎই তাঁহার, এ জগৎই তিনি। ইহাতে মনে অতীব গৌরবের সৃষ্টি হইয়াছে। পতি-সোহাগিনী নারী সর্বদা হাস্যমুখী, আদরে গলিয়া পড়েন মাটিতে পা দেন না। ভক্তেরাও সেইরূপ; তবে একটু বিভিন্নতা এই যে—ভক্তিতে উন্মাদ হইয়া যিনি গৌরবান্বিত হয়েন, তাঁহার যে বিগলিত ভাব, সে কেবলই মধুর।

আবার তখন দেশে যেন কি একটি তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। স্ত্রীলোকে পতির কোলে শুইয়া "হরি" "হরি" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন। শিশু মাতার কোলে আপনা-

আপনি হঠাৎ "হরি" "হরি" বলিয়া নাচিতে লাগিল। কেহ পথে যাইতেছে, কিছু জানে না, কখনও কৃষ্ণনাম মুখে লয়ও নাই, হঠাৎ পড়িয়া পাগলের মত "হরি" "হরি" বলিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। এই যে অভাবনীয় কাণ্ড, ইহা শুধু নবদ্বীপে নয়, দূরদেশেও হইতে লাগিল। সেই প্রবল তরঙ্গের সময় আর একটি গান গীত হইত, যথা—

"বিজয় হইল নদে নন্দঘোষের বালা। হাতে মোহন বাঁশী গলে দোলে বনমালা।।" এখন বিবেচনা করুন, শ্রীকৃষ্ণ "বালা" বলিযা অভিহিত হয়েন না। কিন্তু তখন ভক্তগণের ব্যাকরণের বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ব্যাকরণ কেন—দেহ-বন্ধন, পরিবার-বন্ধন, শাস্ত্র-বন্ধন এবং সমাজ-বন্ধন পর্যন্ত অন্তর্হিত হইযাছে।

শ্রীনিমাই সমস্ত রজনী কীর্তন করিয়া প্রত্যূযে শয়ন করিতে আসিলেন। দুই এক দণ্ড নিদ্রা যাইবার পর গঙ্গাস্নান, ঠাকুরপূজা প্রভৃতি করিয়া, আপনার গৃহে কি শ্রীবাসের বাড়িতে বসিয়া ভক্তগণসহ কৃষ্ণকথা-রসে বিভোর আছেন। প্রত্যূষ হইতে শত শত ভক্ত তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন, আর দর্শনমাত্র ভূমিতে লোটাইয়া প্রণাম করিতেছেন। নিমাই ভক্তগণের সহিত আবার স্নানে গমন করিলেন। সেখানে সকলে শিশুর ন্যায় জলকেলি করিয়া গৃহে ফিরিলেন। নিমাই ভোজনে বসিলেন, আর নিতান্ত নিজ-জন তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া পতির ভোজন দেখিতেছেন। নিমাই শাক ভালবাসেন বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া নানাবিধ শাক রন্ধন করিয়াছেন। শচী ভোজনের পাত্র পুত্রের সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইতেছেন। আর এই সুযোগে নিমাইয়ের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন। শচীর নিতান্ত ইচ্ছা, নিমাই তাঁহার সহিত অন্য লোকের মত সংসারের কথা বলেন। নিমাইয়ের মন সংসারের দিকে লইবার নিমিত্ত এই সুযোগে তিনি নিজেও ঘরকন্নার দুই একটা কথা বলেন। নিমাইয়ের মুখে সংসারের কথা শুনিলে শচী বড় সুখ পান। যদি পুত্রের কাছে বিষ্ণুপ্রিয়ার দুই একটা কথা শুনেন, তবে আর শচীর আনন্দের সীমা থাকে না। আর এই সুযোগে তিনিও বধূর দুই একটা কথা বলেন। মাতৃবৎসল নিমাই সেই সময় মাতাকে যথাসাধ্য সন্তোষও করেন।

শচী বলিতেছেন, "নিমাই, কাল আমি বড় আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিয়াছি।" ইহা বলিয়া স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে দেখিয়াছেন, তাহার বিবরণ সমস্ত বলিলেন। নিমাই বলিতেছেন, "মা! উত্তম স্বপ্ন দেখিয়াছ, আমাদের ঘরের ঠাকুর বড় জাগ্রত।।" পূর্বে বলিয়াছি, শ্রীজগন্নাথের ঘরে রঘুনাথ শালগ্রাম ঠাকুর ছিলেন। যখন নিমাই বলিলেন, "আমাদের ঘরের ঠাকুর বড় জাগ্রত," তখন উপস্থিত ভক্তগণ, শচীকে গোপন করিয়া, নিমাইয়ের পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন। কিন্তু শচী নিমাইয়ের কথার রহস্য একটুও বুঝিলেন না; না বুঝিয়া তিনিও নিমাইয়ের সঙ্গে ঘরের ঠাকুরের গৌরব করিতে লাগিলেন। নিমাই বলিতেছেন, "আমি জানিতাম, আমার ঘরের ঠাকুর বড় প্রত্যক্ষ, আজ তোমার স্বপ্ন কথা শুনিয়া আমার সে বিষয় নিঃসন্দেহ হইল।" ইহাই বলিয়া অতি গম্ভীর ভাবে মাতার পানে চাহিয়া, চুপে চুপে বলিতেছেন, "আমি তোমাকে একটি গোপনীয় কথা বলিতেছি। ঠাকুরের প্রত্যহ যে নৈবেদ্য দেওয়া হয়, তাহার অর্ধেক থাকে না। আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতাম না যে, এ অর্ধেক কে খায়। শেষে আমার মনে একটি সন্দেহ উদয় হওয়ায় আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। আমি ভাবিতাম, এ তোমার বধূর কাজ। কিন্তু এ তো প্রকাশ করিবার কথা নয়, কাজেই লজ্জায় তোমাকেও না বলিয়া মনের মধ্যে গোপন রাখিতাম। যাহা হউক আমার সে সন্দেহ এখন গেল। অর্ধেক ঠাকুরই গ্রহণ করিয়া থাকেন।" এই কথা শুনিয়া ভক্তগণের যাহার যেরূপ অধিকার তিনি সেইরূপ হাসিতে লাগিলেন,—কেহ উচ্চৈঃস্বরে, কেহ বা মৃদুস্বরে। বিষ্ণুপ্রিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া এই কথা শুনিয়া লজ্জা পাইয়া সুখে হাসিতে লাগিলেন;

যথা চৈতন্যভাগবতে—"হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে। অন্তরে থাকিয়া স্বপ্ন কথা সব শুনে।।" শচী তখন বুঝিলেন যে, নিমাই রহস্য করিতেছেন। তাই বলিতেছেন, "তুই বলিস্ কি নিমাই? বৌমা আমার স্বয়ং লক্ষ্মী। বৌমার অভাব কি যে, সে চুরি করিয়া খাইবে?"

তাহার পরে নিমাই শয়ন করিলেন। তখন তাম্বুলের বাটা হাতে করিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর পদ-সেবা করিতে গেলেন। কোন দিন বা গদাধর শ্রীমতীকে পদচ্যুত করিয়া আপনি বসিতেন। ভক্তগণ তখন স্ব স্ব গৃহে ভোজন করিতে ও কিঞ্চিৎ আরাম করিতে গমন করিলেন। অল্প একটু নিদ্রা যাইয়া নিমাই উঠিয়া আসিলেন, আর ভক্তগণও ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার সকলে কৃষ্ণ-কথায় উন্মত্ত হইলেন। অপরাহ্নে নিমাই ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নগর-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। নিমাইয়ের নগরভ্রমণের বেশ অপরূপ। পরিধানে অতি সূক্ষ্ম কার্পাস, কি অতি মনোহর পট্টবস্ত্র। নিমাইয়ের মনোহর বেশ ও মনোহর রূপ দেখিলে প্রিয়জনের আনন্দ এবং দুষ্ট লোকের ক্রোধ হয়। নিমাই নগরে ভ্রমণ করিতেছেন, চতুষ্পার্শ্ব ভক্তগণ বেষ্টিত। যাঁহারা নিজ-জন, তাঁহারা পথ হইতে সেই ভক্তদলে মিশিয়া যাইতেছেন। যাহারা বিপক্ষীয়, তাহারা নিমাইয়ের নিকটে আসিতে পারে না। তাহার দুইটি কারণ;—প্রথমতঃ নিমাই সর্বদা ভক্তগণ পরিবেষ্টিত থাকিতেন, আর দ্বিতীয়তঃ তাঁহার এরূপ তেজ ছিল যে, নিকটে যাইয়া কথাবার্তা বলে এরূপ সাহস কাহারও হইত না। যাহার বিপক্ষ তাহারা দূর হইতে রুক্ষভাবে তাঁহার প্রতি চাহিত, আর আপনারা-আপনারা তাঁহার নিন্দা করিত। এই বিপক্ষ-দলের ক্রোধ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। তাহাদের বিশ্বাস যে, কতকগুলি উন্মত্ত, কি পাষণ্ড, কি দুষ্ট লোক জুটিয়া, নিমাইপণ্ডিতকে ভগবান্ সাজাইয়া দেশ নষ্ট করিতেছে। তাহারা বলিত, "নিমাইপণ্ডিত লোক ছিল ভাল, কিন্তু দুষ্ট-লোকেরা তাহাকে ভগবান্ বানাইয়াছে! তাহার যে এত বুদ্ধি, তাহা কাজেই লোপ পাইয়া গিয়াছে। এত সুখ কে কোথা ছাড়ে? জগন্নাথের পুত্র চিরকাল ভাত-কাপড়ের কাঙ্গাল। আজি তাহার দুগ্ধে স্নান ও ঘৃতে আচমন! দেখ না,—যেন বিয়ের বরটি! নাগর সাজিয়া নগরে বেড়াইতেছে। মুখ দেখিলে বোধহয় যেন নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু সমুদয় ভণ্ডামি।" পরে ইহাদের বিপক্ষতা এত বাড়িয়া গেল যে, তাহারা কাজীর নিকটে অভিযোগ করিল।

যাহা হউক, নিমাইয়ের নিকট যাইতে কাহারও সাহস হইত না, তবে ফাঁক পাইলে কখন কখন কেহ যাইয়া নিমাইকে ত্যক্ত করিত। এক দিবস নিমাই স্নান করিতে গিয়াছেন, আর তীরে দাঁড়াইয়া ভক্তগণ একটু অন্যমনস্ক হইয়াছেন। এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত; তিনি কীর্তন দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি সাধু—অন্তত আপনাকে সাধু বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস আছে, সুতরাং মন অভিমানে পূর্ণ। তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, ইহাতে অত্যন্ত অপমানিত হইয়া ক্রোধে অভিভূত হইয়াছেন। একটু পরে গঙ্গাস্নানে যাইয়া নিমাইকে দেখিয়া তাঁহার ক্রোধ বাড়িয়া উঠিল ও তাঁহাকে ফাঁকে পাইয়া তাঁহার সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিতেছেন, "শুন নিমাই পণ্ডিত! আমি তোমার কীর্তন দেখিতে গিয়া অপমানিত হইয়া আসিয়াছি। আমি তাপস ব্রাহ্মণ, তুমি যেমন আমাকে মনোদুঃখ দিয়াছ, আমিও তেমনি তোমাকে শাপ দিতেছি যে, তুমি সংসার-সুখ হইতে বঞ্চিত হও।" ইহাই বলিয়া নিজের উপবীত টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া নিমাইয়ের চরণে নিক্ষেপ করিলেন।

বলা বাহুল্য যে, ব্রাহ্মণের সমস্তই অন্যায়, নিমাইয়ের কোন দোষ নাই। তিনি নিজের বাড়ীতে ভজন করিতেছেন, সেখানে বহিরঙ্গ লোক গেলে ভজনের ব্যাঘাত হয়। তুমি জোর করিয়া সেখানে যাইতে পার নাই বলিয়া এই নবীন যুবককে—যিনি তাঁহার বৃদ্ধা মাতার একমাত্র পুত্র ও নবীনা ভার্যার একমাত্র সম্বল—চিরদিনের তরে সংসার হইতে বাহির করিয়া বৃক্ষতলবাসী

করিবে, এ কাজ কি ভাল? তবে ব্রাহ্মণের দোষ কি? তিনি যে স্ববশে ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। এ কার্যটিও নিমাইযেব লীলাখেলার একটি অঙ্গ। যাহা হউক নিমাই তখন সেই ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের ছিন্ন উপবীত চরণ হইতে উঠাইয়া মস্তকে ধারণ করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার এই শাপ গ্রহণ করিলাম।" তখন ভক্তগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন।

একদিন নিমাই ভ্রমণ করিতে করিতে নগরের এক প্রান্তভাগে যাইয়া উপস্থিত। সেখানে শৌণ্ডিকগণ থাকে, কারণ নগরের মধ্যে তাহারা মদ্য বিক্রয় করিতে পারিত না। মদ্য সম্বন্ধে এইরূপ শাসন ছিল যে, উহা স্পর্শ করিলে গঙ্গাস্নান করিতে হইত। সেখানে যাইয়া ও মদ্যপানের স্থান দেখিয়া নিমাইয়ের বলরাম-ভাব হইল। তখন তিনি আবিষ্ট হইয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "মদ আনো, মদ আনো, শীঘ্র মদ আনো।" শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু, ক্ষমা দিউন। এখানে বহুতর ভিন্ন লোক, আপনি কি ভাবে বলিতেছে তাহা তাহারা না বুঝিয়া, কেবল কলঙ্ক করিবে।" কিন্তু বলরাম তাহা শুনিলেন না। তখন শ্রীবাস বলিলেন, "ঠাকুর, যদি তুমি এরূপ কথা এখানে বল তবে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।" তখন বলরাম একটু জব্দ হইলেন; এবং একটু হাসিয়া বলিতেছেন, "যদি তোমার ইহাতে এত দুঃখ হয়, তবে আমি উহা ছাড়িলাম।" ইহা বলিয়া নিমাই বলরাম-ভাব সম্বরণ করিলেন। উপস্থিত মাতালগণ শুনিল যে নিমাই-পণ্ডিত আসিয়াছেন। তখন তাহারা টলিতে টলিতে যাইয়া নিমাইপণ্ডিতকে ঘিরিয়া ফেলিল। কেহ বলিতেছে, "নিমাইপণ্ডিত, একটি গান গাও।" কেহ বলিতেছে, "নিমাইপণ্ডিতের বেশ গানের দল।" কেহ বলিতেছে, "নিমাই একবার নাচ দেখি?" কাহারও কাহারও নিমাইয়ের গীত কি নৃত্য করিবার দেরী সহিল না, আপনারাই নৃত্যগীত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা গাইতে ও নাচিতে উদ্যত হইলে, এক অপরূপ কাণ্ড হইল। নিমাই কৃপার্ত হইয়া তাহাদের দিকে চাহিলেন। আর অমনি তাহারা "হরি হরি" বলিয়া নাচিয়া উঠিল। তখন নিমাই চলিলেন, আর (যথা চৈতন্য-ভাগবতে)—"হরি বলি হাতে তালি দিয়া কেহ নাচে। উল্লাসে মদ্যপ কেহ যায় তাঁর পাছে।।" এইরূপে মদ্যপগণ অন্যরূপ মদের আস্বাদ পাইয়া নিমাইয়ের পশ্চাৎ চলিল, ইহাতে কি হইল,—না "আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি পরকাশ।"

সেখান হইতে ভক্তগণসহ ভ্রমণ করিতে করিতে, নিমাই নবদ্বীপের অন্য প্রান্তে সার্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালে, বিদ্যানগর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস। দেবানন্দ পরম সাধু উদাসীন ও অদ্বিতীয় ভাগবত, কিন্তু ভক্তি মানেন না। ইনি বহু পূর্বে এক দিবস ভাগবত পড়িতেছিলেন, শ্রীবাস সেখানে ছিলেন। পাঠ শুনিয়া তিনি বিচলিত হয়েন। ইহাতে দেবানন্দের পড়ুয়াগণ, "এ বামুন কান্দে কেন? ইহার ক্রন্দনে যে পাঠ শুনিতে পাই না।" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া যায়। এই কথার উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। নিমাই যাইতে যাইতে দেবানন্দকে দেখিলেন, দেখিয়াই বিচলিত হইয়া বলিতেছেন, "শ্রীবাসের প্রেমানন্দ-ধারা দেখিয়া তোমার পড়ুয়াগণ তাঁহাকে বাহিরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তুমি যেমন গুরু, তোমার শিষ্যগুলিও তেমনি। রসময় শ্রীভাগবত পড়িয়া রস পাও না, কারণ ভক্তি মান না। তোমার ভাগবত পাঠে অধিকার নাই। পুঁথিখানা দাও, আমি উহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিই।" দেবানন্দ নিমাইয়ের রুদ্রমূর্তি দেখিয়া,—যদিও সেটি তাঁহার বাড়ী ও সেখানে তিনি শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত, তথাপি—অপরাধীর ন্যায় মস্তক অবনত করিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

নিমাই এরূপ বিচলিত হইলেন কেন? পূর্বে বলিয়াছি, নিমাইয়ের যে নিজ-জন তাঁহাকে তিনি এইরূপ দণ্ড করিতেন। এই দেবানন্দ ভবিষ্যতে তাঁহার লীলার সঙ্গী হইবেন বলিয়া, এইরূপে তাঁহাকে দণ্ড করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরই, এই দেবানন্দ শ্রীনিমাইয়ের

চরণে পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ও আপনার অপরাধ ভঞ্জন করিয়া লইয়াছিলেন। আর অপরাধী জীব অদ্যাপি দেবানন্দের "অপরাধ-ভঞ্জন পাটে" অপরাধ-ভঞ্জন নিমিত্ত গড়াগড়ি দিয়া থাকেন।

এইরূপে নিমাই ভক্তগণ লইয়া নানা দিন নানারূপ ক্রীড়া করেন। কিন্তু সমস্ত ক্রীড়ারই উদ্দেশ্য এক—ভক্তিবৃত্তি পরিবর্ধন। একদিন বহু ভক্তসহ নিমাই দরিদ্র বেশে হস্তে কোদালি লইয়া হরিমন্দির মার্জনা করিতে চলিলেন। শ্রীভগবানের গৃহ-মার্জনা করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন, ইহাই সকলের প্রথম-সুখ। দ্বিতীয়-সুখ শ্রীভগবানের নিমিত্ত অতি নীচ-সেবা করিতেছেন। তৃতীয়-সুখ, শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহার জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সেই কার্য করিতেছেন। অবশ্য নানাবিধ লোকে দূর হইতে তাঁহাদিগকে বিদ্রুপ করিতেছিল। কিন্তু তাহা তাঁহারা না শুনিয়া মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্দির সমুদয় মার্জনা করিয়া, পরিশেষে গঙ্গায় অবগাহন করিতে চলিলেন!

এইরূপে আবার নৌকা-বিহারও করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ আপনি কাণ্ডারী হইয়া গোপীদিগকে নৌকায় উঠিয়াছিলেন। সেই ভাবে বিভোর হইয়া সকলে নৌকায় উঠিলেন। নিমাই শ্রীভগবান-ভাবে কর্ণধার হইয়া দাঁড়াইলেন। নিমাই যখন হস্তে "কেরুয়াল" ধরিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার রূপ যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। ভক্তগণ গোপীভাবে নিমাইয়ের রূপ দর্শন করিতেছেন, আর বলাবলি করিতেছেন,—"আমাদের নবীন-মেয়ে কি সুন্দর!" নিমাই আনন্দে ডগমগ হইয়া নৃত্য করিতেছেন, আর ভক্তগণকে নৌকায় আরোহন করিতে আহ্বান করিতেছেন। নিমাই ভক্তগণকে একে একে নৌকায় উঠাইতে লাগিলেন। ভক্তগণ ভাবিতেছেন,—ভবনদী পার হওয়া কি সুখ! আর যে নেয়ে তাহাদিগকে পার করিতেছেন, তাঁহার কি সুন্দর ও মধুর রূপ ও গুণ! নৌকায় উঠিয়া কেহ হরেকৃষ্ণ বলিয়া তালে তালে বৈঠা ফেলিতেছেন, কেহ গীত গাহিতেছেন, কেহবা নৃত্য করিতেছেন। এই নৌকা-বিহার উপলক্ষ্য করিয়া বাসুঘোষের এই পদটী দেখিতে পাই; যথা—"না জানিয়া গোরাচাঁদের কোন ভাব মনে। সুরধুনী তীরে গেল সহচর সনে।। প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া। নৌকায় চড়িল গোরা প্রেমাবেশ হৈয়া।। আপনি কাণ্ডারী হয়ে বায় নৌকাখানি। ডুবিল ডুবিল বলে সিঞ্চে সবে পানি।। পারিষদ্‌গন সবে হরি হরি বলে। পূরব স্মরিয়া কেহ ভাসে প্রেম জলে।। গদাধরের মুখ হেরি মৃদু মৃদু হাসে। বাসুদেব ঘোষ কহে মনের উল্লাসে।"

এই নৌকা-বিহারের সময় শ্রীগৌরাঙ্গ একটি বড় মধুর লীলা করেন। নদীয়ার একপার্শ্বে জাহান্নগরে শ্রীসারঙ্গদেব নামক একজন পরম সাধু শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন। ইনি উদাসীন ও প্রাচীন। ইহার কিছুকাল পূর্বে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। একদিন প্রভু সারঙ্গদেবকে বলিতেছেন যে, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, যাহাতে তাঁহার গোপীনাথের সেবা নিয়মমত চলে সেই জন্য তাঁহার একটি শিষ্য করা কর্তব্য। সারঙ্গদেব বলিলেন যে, সৎশিষ্য পাওয়া বড় দুর্ঘট, সেইজন্য তাঁহার শিষ্য করিবার ইচ্ছা নাই। তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি একজন শিষ্য গ্রহণ কর।" সারঙ্গ বলিলেন, "তবে আর কথা কি; শিষ্য বাছিয়া লইবার ক্ষমতা কিন্তু আমার নাই। কল্য প্রত্যূষে প্রথমে যাহার মুখ দেখিব তাহাকেই শিষ্য করিব।" বোধ হয় প্রভুকে একটু জব্দ করিবার নিমিত্ত সারঙ্গ এই কথা বলিলেন, কিন্তু প্রভু জব্দ হইলেন না। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তাহাই করিও।"

রজনীযোগে সারঙ্গদেবের চিন্তায় নিদ্রা হইল না। যাঁহারা উদাসীন, তাঁহাদের শিষ্যগণ তাঁহাদের হৃদয়ে পুত্র-প্রেম উদ্রেক করিয়া থাকেন। সারঙ্গ ভাবিতেছেন যে, বৃদ্ধ বয়সে প্রভু

আবার আমার ঘাড়ে কাহাকে চাপাইয়া দিবেন? অতি প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে গঙ্গাস্নান করিয়া তীরে বসিয়া নয়ন মুদিয়া, মালা জপ করিতে লাগিলেন। তখন সূর্য উদয় হইতেছে, এমন সময় যেন কি একটি বস্তু তাঁহার কোলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি নয়ন মেলিয়া দেখেন, একটি মৃতদেহ! প্রথমেই তাহাব মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায়, শব দর্শনে যেরূপ ভয় কি ঘৃণার উদয় হয়, তাহা হইল না। দেখেন যে মৃতদেহের নয়ন অর্ধমুদ্রিত, যেন নিদ্রা যাইতেছে। মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে তাহার শরীরে জীবন আছে। মৃতদেহের পানে সারঙ্গ যতই দেখিতেছেন ততই মুগ্ধ হইতেছেন। দেখেন যে মৃত ব্যক্তি একটি বালক বই না; বয়ঃক্রম ১১ কি ১২ বৎসর, দেখিতে পরম সুন্দর, মস্তক সম্প্রতি মুণ্ডিত হইয়াছে, গলায় যজ্ঞোপবীত, পরিধানে পট্টবস্ত্র। বালকটিকে দেখিবামাত্র সারঙ্গদেবের হৃদয়ে পুত্রবাৎসল্য ভাবের উদয় হইল। তখন সারঙ্গদেব যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—অর্থাৎ প্রাতে উঠিয়া প্রথমে যাহার মুখ দেখিবেন তাহাকেই মন্ত্র দিবেন,—তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যেমন তাঁহার পুত্রবাৎসল্য উপস্থিত হইল অমনি সেই প্রতিজ্ঞার কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। তখন তিনি ভাবিতেছেন, "এই বালকটীকে যদি শিষ্যরূপে পাইতাম, তবেই আমার মনোমত হইত; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এটি মৃত।" আবার ভাবিতেছেন, "আমি ত পাগল মন্দ নয়? আমার প্রতি প্রভুর আদেশ, প্রাতে উঠিযা যাহার মুখ দেখিব তাহাকে মন্ত্র দিব—জীবিত কি মৃত তাহা আমার দেখিবার আবশ্যক কি?" এই কথা ভাবিয়া মস্তক অবনত করিয়া মৃতশিশুর কর্ণে মন্ত্র দিলেন। শিশুর কর্ণে মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র মৃতদেহে জীবনের চিহ্ন লক্ষিত হইল। তখন ঘাটে বহুতর লোক স্নান করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া দর্শন করিতেছেন। শিশু ক্রমে নয়ন মেলিল, শেষে সারঙ্গকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়া বসিল। ইহা দেখিয়া সকলে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া বহুলোকের হরিধ্বনির সঙ্গে, সারঙ্গদেবের বাসস্থানে আনা হইল।

এদিকে অতি প্রত্যূষে শ্রীগৌরাঙ্গ সংকীর্তন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "চল যাই, সারঙ্গের নূতন শিষ্য দর্শন করিয়া আসি" ইহাই বলিয়া বহু ভক্ত সঙ্গে করিয়া, শিশুটিকেও যেমন সারঙ্গের স্থানে আনা হইল, প্রভুও অমনি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সারঙ্গদেবের তখন নানাবিধভাবে নয়নে ধারা বহিতেছিল। শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দেখিয়া উহা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। সারঙ্গ উঠিয়া ছিন্নমূলদ্রুমের ন্যায় প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। নিমাই আস্তে-ব্যস্তে সারঙ্গদেবকে উঠাইয়া বলিতেছেন, "সারঙ্গ, শিষ্য পাইয়াছ? শিষ্যটি ত তোমার মনোমত হইয়াছে?" সারঙ্গ তখন মনের আবেগে কথা কহিতে পারিলেন না, তিনি বালকটিকে ধরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে তাহার দ্বারা প্রণাম করাইলেন। একটু পরে সারঙ্গ বলিতেছেন, "প্রভু! এই বালকটিকে আশীর্বাদ করুন। ইহার প্রতি আমার স্নেহ উথলিয়া পড়িতেছে।" তখন নিমাই সদলবলে বসিলেন, সারঙ্গকেও বসাইলেন, আর বালকটি করযোড়ে প্রভুর অগ্রে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিল। প্রভু বালকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি কে? কিরূপে এখানে আসিলে? সমুদয় কথা ভক্তগণকে বল। তাঁহারা শুনিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন।" তখন বালক ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া, প্রভুকে ও ভক্তগণকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল,—"সরগ্রামে আমার বাড়ী। আমরা গোস্বামী বলিয়া পরিচিত। আমার সম্প্রতি যজ্ঞোপবীত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত আমার মস্তক মুণ্ডিত। আমাকে রজনীযোগে সর্পে দংশন করে। কিছুকাল পরে আমি অচেতন হইয়া পড়ি। আমার বোধহয়, আমাকে মৃত ভাবিয়া, আমাদের গ্রামের যে খড়ী নদী, তাহাতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। আর নূতন বর্ষাতে ভাসিতে ভাসিতে আমি গঙ্গায় আসিয়া পড়ি; ক্রমে ভাসিতে ভাসিতে এখানে আসিয়াছি। আমার পিতামাতা সকলে বর্তমান, আমার নাম মুরারি।" এই কথা বলিতে বলিতে মুরারির

নয়ন দিয়া জল পড়িতে লাগিল, আর উপস্থিত সকলে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। এই সরগ্রাম গুসকরা স্টেশনের নিকট, আর সেই গোস্বামী বংশীয়েরা অদ্যাপিও বর্তমান। সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকে দাহন করিতে নাই, এই নিমিত্ত বালকটিকে মৃত ভাবিয়া নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "বৎস! তোমার পিতামাতা তোমার নিমিত্ত অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন, আর তুমিও তাঁহাদের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছ। আমরা এখনি তোমাকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিতেছি!" এই কথা শুনিয়া বালকটির আরও নয়নজল পড়িতে লাগিল। সে বলিল, "পিতামাতা আমার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন বটে, কিন্তু আমি আমার এই গুরুর চরণ ছাড়িয়া যাইব না।" এই কথা শুনিয়া উপস্থিত ভক্তমাত্রেরই হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। সারঙ্গদেব অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া, দুই জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সকলে বলিতে লাগিলেন, "যেমন সারঙ্গ তেমনি শিষ্য আর যেমন সারঙ্গ তেমনি প্রভু।"

মুরারির সংবাদ পাইয়া তাঁহার পিতামাতা ও গ্রামস্থ বহুতর লোক দৌড়িয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। মৃত পুত্র পুনঃপ্রাপ্ত হইলে পিতামাতার কিরূপ আকৃতি-প্রকৃতি ও মনের ভাব হয়, নিমাইয়ের কৃপায় সকলে তাহা মহাসুখে দর্শন করিলেন। মুরারি আর পিতামাতার সঙ্গে, ফিরিয়া গেলেন না। তিনি উদাসীন ব্রত লইয়া তাঁহার গুরুর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। তাঁহার পিতামাতা প্রভৃতি অনেকে সারঙ্গদেবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। পরে একদিবস সারঙ্গ, মুরারিকে, তাঁহার পিতামাতাকে ও অন্যান্য শিষ্যগণকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপে প্রভুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।*

ক্রমে, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যতটি উৎসব আছে, নিমাই ভক্তগণকে লইয়া সমুদয়ই করিলেন। পূর্বে চন্দ্রশেখরের বাড়ী দানলীলা করিয়া ভক্তগণকে দেখাইয়াছেন। সেইরূপ ঝুলনোৎসব, নন্দোৎসব এবং শ্রীমতী রাধিকাব জন্মোৎসবও করিলেন। যখন যে উৎসব করেন, তখনই ভক্তগণ আত্মবিস্মৃত হইয়া উহা উপভোগ করেন। নবদ্বীপের নন্দোৎসবের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। নীলাচলে নিমাই এই উৎসব যেমন করিয়াছিলেন, তাহার কিছু বর্ণনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে। তাহাতে দেখা যায় যে, নিমাই তখন "প্রকাশ" হইয়াছিলেন। আর যিনি তখন নন্দরূপে আবিষ্ট হয়েন, তিনি—নন্দ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আনন্দে বিভোর হইয়া তাঁহার যথাসর্বস্ব সকলকে দান করিয়াছিলেন।

বাসু ঘোষ ঝুলন লক্ষ্য করিয়া এই পদটি রাখিয়া গিয়াছেন; যথা—"দেখ ঝুলত গৌরচন্দ্র অপরূপ দ্বিজমণিয়া। বিধির অবধি রস নিরূপম, কষিত কাঞ্চন জিনিয়া।।" ইত্যাদি।

শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে নবদ্বীপে এই "নন্দোৎসবের" যে কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে, তাহা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা—

"একদিন শ্রীবাস ভবনে একা বসি। কল্য কৃষ্ণ জন্মতিথি কহে প্রভু হাসি।।
শ্রীবাসাদি বুঝিলেন প্রভুর অন্তর। কালি নাচিবেন গোপবেশে বিশ্বম্ভর।।
পরম উল্লাসে শ্রীবাসাদি প্রিয়গণ। করিলেন সকল সামগ্রী আয়োজন।।
সে দিবস মহানন্দ শ্রীবাসের ঘরে। কৃষ্ণের জনম অভিষেক কর্ম করে।।
করি অভিষেক কিবা আবেশ হিয়ায়। সংকীর্তন-সুখে সবে রজনী গোঁয়ায়।।
নিশি পোহাইলে গৌরচন্দ্রগণ সনে। ধরে গোপবেশ সবে বসিয়া নির্জনে।।

* জাহান্নগরস্থ শ্রীশশীভূষণ পালের লিখিত "মুরাার-সারঙ্গের পাট" শীর্ষক প্রস্তাব 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

গোপবেশ নির্মাণে নিমাই 'পরবীণ'। হইলা আপনি যেন গোয়ালা নবীন।।
ধরিলেন শ্রীগৌরসুন্দর গোপবেশ। সে শোভা দেখিতে না রহে ধৈর্য লেশ।।
রামাই সুন্দরানন্দ গৌরীদাস আদি। গোপবেশ ধরে সবে শোভার অবধি।।
দধি নবনীতে ভাণ্ড ভার লই কান্ধে। প্রবেশয়ে শ্রীবাস অঙ্গনে চারু ছন্দে।।
শ্রীবাস অদ্বৈত গোপবেশে মত্ত হইয়া। দেন দধি হল্‌দি অঙ্গনে ছড়াইয়া।।
নৃত্য গীত বাদ্য মহা কৌতুক বাড়ায়। শ্রীবাস ভবন যেন নন্দের আলয়।।"

এইরূপে শ্রীরাধিকার জন্মোৎসবপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির গৃহে হইল। আবার শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সখাগণ লইয়া পুলিনভোজন করিয়াছিলেন, সেইরূপ গঙ্গার পুলিনে একদিন ভক্তগণ লইয়া মহা হরি-সংকীর্তনের মাঝে নিমাই বনভোজন করিলেন।

এই যে নবদ্বীপের সুখের পাথার হইল, ইহার প্রস্রবন শ্রীনিমাই। তিনি নবদ্বীপে কিরূপ বিচরণ করিতেছেন? যথা (নয়নানন্দের পদ)—"মুখখানি পূর্ণিমার শশী কিবা মন্ত্র জপে। বিম্ব বিড়ম্বিত ঠোঁট কেন সদা কাঁপে।।"

সদা মৃদুস্বরে 'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ' নাম-জপ করিতেছেন। অন্তরের গুপ্তপ্রেম বাহিরে কিছু প্রকাশ হওয়ায় রাঙা-ঠোঁট মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে। যাঁহাদের এ সমুদয় বিষয়ে অনুসন্ধান আছে তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে, বালক কি বালিকার মনে তরঙ্গ উঠিয়াছে অথচ উহা আবদ্ধ আছে, এরূপ হইলে ঐরূপে ঠোঁট মৃদু মৃদু কাঁপিয়া থাকে। সে দৃশ্য অতি মনোহর। আবার যাহারা অতি সরল-চেতা, তাহাদেরও মনের ভাব এইরূপে সহজে বাহিরে প্রকাশ হয়।

নবদ্বীপে তখন দিবানিশি এইরূপ কোলাহল, হাস্য, নৃত্য, গীত, উৎসব কীর্তন ও মৃদঙ্গ, শঙ্খ, করতাল, মন্দিরা ও মাদল শব্দ এবং আনন্দজনক হরি-হরি ধ্বনি হইতে লাগিল। মধ্যস্থলে চাঁদের মত একখানি মুখ ও পদ্মের মত দুইটি নয়ন—যাহার তারা প্রেমানন্দ-ধারারূপ-মকরন্দে ডুবু-ডুবু—লইয়া একটি ছবি বিহার করিতেছেন। ইহাতে জগৎ প্রফুল্ল হইল বটে, কিন্তু মন্দলোকের ক্রোধ জন্মিল;—তাহারা এরূপ ছবি কিরূপে সহ্য করিবে? চোরের কেন জ্যোৎস্না ভাল লাগিবে?

দুষ্ট মুসলমান ও হিন্দুরা জুটিয়া কাজির নিকট নালিশ করিতে লাগিল। কাজি প্রথমে এ কথা কাণে করিলেন না, কারণ তিনি মহাশয় লোক। এদিকে রাজ্যমধ্যে তাঁহার পদ অতি উচ্চ, যেহেতু তিনি গৌড়ের রাজার দৌহিত্র। নিমাইয়ের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে কাজির বিশেষ আলাপ, এমন কি গ্রাম সম্বন্ধও ছিল। নীলাম্বরকে তিনি চাচা বলিয়া ডাকিতেন। প্রথমে যখন সকলে অভিযোগ করিল, তখন কাজি "নিমাইপণ্ডিত ছেলেমানুষ, কি করিতেছে তাহার মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নাই," বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ মুসলমান কর্মচারিগণ তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে থাকিলে, কাজি বাধ্য হইয়া একদিন সদলবলে নগরে সন্ধ্যাকালে আগমন করিলেন। দেখেন যে, নদীয়ার সর্বস্থানে মৃদঙ্গ, করতাল সহযোগে হরিধ্বনি হইতেছে। তিনি কাহাকে নিবারণ করিবেন? সকলেই উন্মত্ত। তখন তাঁহার সঙ্গীরা একটি লোকের বাড়ী প্রবেশ করিয়া তাহাদের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিল, ইহাতে উপস্থিত ব্যক্তিগণ ভয়ে পলাইল। তখন তাহারা সম্মুখে যাহাকেই পাইল, তাহাকেই ধরিতে লাগিল। যথা চৈতন্যভাগবতে—"হরিনাম কোলাহল চতুর্দিকে মাত্র। শুনিয়ে স্মরয়ে কাজি আপনার শাস্ত্র।।"

"আথে ব্যথে পলাইল নাগরিয়াগণ। মহাত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন।।
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে। ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে।।"

পরিশেষে সকলকে ভয় দেখাইয়া কাজি বলিলেন, "আমার নিষেধ শুনিয়াও কাহার বলে নগরে এরূপ উৎপাত করিতেছিস্? অদ্য এই পর্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত দিলাম। আবার যদি কেহ নগরে সংকীর্তন করে তবে তাহার জাতি মারা যাইবে।" এই ভয় দেখাইয়া কাজি বাড়ী

ফিরিয়া গেলেন। ইহাতে ভক্ত-নাগরিয়াগণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তাঁহাদের আনন্দে দিবানিশি জ্ঞান নাই। তাহার মধ্যে আবার একি উৎপাত? কাজি বহুতর সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টিত, বল দ্বারা তাহাকে বশীভূত করা অসম্ভব। বিশেষ ভক্তদের সম্বল কেবল হরিনাম ও খোল করতাল। তাঁহাদের তখন সংসারে ঔদাস্য ও জীব-হিংসার প্রতি একেবারে বিরক্তি জন্মিয়াছে। তাঁহারা পাঠানসৈন্য পরিবেষ্টিত কাজিকে কিরূপে বাধ্য করিবেন? অনুনয় বিনয় করিয়া মুসলমানকে বাধ্য করিয়া হরি সংকীর্তনের অনুমতি লইবেন, তাহারও কিছুমাত্র ভরসা নাই।

তখন নাগরিয়াগণ অনন্যোপায় হইয়া শ্রীপ্রভুর নিকট আপনাদের দুঃখের কথা জানাইলেন। নিমাই আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমরা নির্ভয়ে কীর্তন কর; যদি কেহ বাধা দেয়, আমি তাহাকে দণ্ড করিব।" নাগরিয়াগণ এই কথা শুনিয়া কিছু আশ্বাসিত হইলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়। কারণ কাজি সৈন্য লইয়া প্রতি নিশিতে, যাহাতে কীর্তন না হইতে পারে, তজ্জন্য নগরে নগরে বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে হরি-সংকীর্তন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। কেহ কেহ এরূপ বলিতে লাগিলেন, "যদি কীর্তন বন্ধ হয, তবে এ দেশ ছাড়িয়া যেখানে কীর্তন করিতে পারি সেইখানে যাইব।" কেহ বা বলিতে লাগিলেন, "হুড়াহুড়ি করিয়া কৃষ্ণনাম করিবার প্রয়োজন কি? গোপনে করাই ভাল।" কাজি সৈন্যবলে বলীয়ান, আবার নগরের অধিকাংশ হিন্দু তাঁহার পক্ষ। সুতরাং নাগরিয়াগণ যে ভয় পাইলেন, ইহাতে তাঁহাদিগের বড় দোষ দেওয়া যায় না।

তখন আবার সকলে যাইয়া প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু। আমরা কীর্তন করিতে পারিতেছি না। আমাদিগকে বিদায় দাও, আমরা অন্য দেশে গমন করি।"

এই কথা শুনিয়া নিমাই রুদ্রমূর্তি ধরিলেন। মুহূর্ত মধ্যে তাঁহার সমুদয় কমনীয় ভাব লুকাইয়া ভয়ঙ্কর আকার উপস্থিত হইল। তখন তিনি বলিতেছেন, "বটে! কাজি কীর্তন বন্ধ করিবে? শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন? তবে আগে আমাকে রোধ করুক। আমি অদ্য নগরে নগরে কীর্তন করিব। অদ্য আমি কাজির দর্প চূর্ণ করিব। অদ্য আমি প্রেমবন্যায় নদীয়া ভাসাইব।" তারপর নিত্যানন্দকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! শীঘ্র অগ্রবর্তী হইয়া সর্বস্থানে ঘোষণা কর যে, অদ্য সন্ধ্যার সময় আমি নগরে নগরে কীর্তন করিব। আর, আহারাদি করিয়া সকলকে অপরাহ্নে আমার বাড়ীতে আসিতে বলিবে। আরও বলিবে, প্রত্যেকেই যেন একটি করিয়া দীপ লইয়া আসে।" তারপর নাগরিকগণকে বলিলেন, "তোমরা ভয় করিও না। আমার এই আজ্ঞা সর্বত্র ঘোষণা কর। অদ্য সন্ধ্যার সময় নগরে কীর্তন করিব।"

নিমাইয়ের সেই মূর্তি দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া নাগরিয়াগণের তখন সমুদয় ভয় দূর হইল। নিমাই যে শ্রীভগবান্ স্বয়ং, এ বিশ্বাস আবার দৃঢ়রূপে তাহাদের মনে উপস্থিত হইল। সকলেই আনন্দে ও উৎসাহে পুলকিত হইয়া প্রভুর আজ্ঞা নগরে নগরে ঘোষণা করিবার নিমিত্ত দৌড়িলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই এ কথা নদীয়ার সকল পল্লীতে প্রচারিত হইয়া পড়িল যে, নিমাই পণ্ডিত অদ্য নগরে নগরে নৃত্য করিবেন, এবং কাজির দর্প চূর্ণ করিবেন। যাঁহার কীর্তন দেখিতে ইচ্ছা হয়, তিনি যেন একটি দীপ লইয়া বিকালে প্রভুর বাটীতে যান। এই ঘোষণায় নবদ্বীপ একেবারে টলমল হইয়া উঠিল, শত্রু-মিত্র সকলেই এই সংবাদে বিচলিত হইলেন। যাঁহারা মিত্র তাঁহারা প্রভুর বাড়ী দৌড়িলেন, শত্রুগণ রঙ্গ দেখিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। আর যাঁহারা না-শত্রু না-মিত্র, তাঁহারাও কৌতূহল তৃপ্তির জন্য আগ্রহচিত্তে রহিলেন।

খাম্বাজ রাগিণী—(বংশীধ্বনি ধ্রুপদ সুরে)

কমল নয়নে বহিছে শত শত প্রেমধারা।
উর্দ্ধে চন্দ্রবদন তুলি [বলে] ঐ দেখ আমার প্রাণনাথ।

আনন্দেতে গোরার উথলিল হিয়া, উল্লাসে নাচিছে হেলিয়া দুলিয়া,
গলিয়া গলিয়া সঙ্গী কোলে পড়ে।
মিলন আশয়ে পরেছেন অঙ্গে, পট্টবস্ত্র চন্দন ফুলের মালা।

আভোগ

অলকা তিলকা চন্দ্রবদনে, চাঁচর কেশ কুসুম সুগন্ধ,
শিরে শোভিছে মোহন চূড়া।
দেখ দেখ দেখ গোরা-বিনোদিয়া বিহরিছে ছবি কি ছটা।
সঙ্গীগণ রূপ অনিমিখে চায়, গগনের চন্দ্র ভূতলে উদয়,
ঝলকে ঝলকে সুধা উগরয়।
প্রেমের তরঙ্গে নদীয়া মাতিল, চারিদিক মধুময়।।*

এখন যেরূপ নগর-কীর্তন হইয়া থাকে, উহা নিমাইয়ের নগর-কীর্তনের অনুকরণ মাত্র। একটি স্বয়ং শ্রীভগবানের ক্রিয়া, অপরটি তাঁহার ভক্তগণের। নিমাইয়ের এই নগর-কীর্তন বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই, বড় প্রয়োজন নাই। কারণ বৃন্দাবণ দাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে সুন্দররূপে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাই অবলম্বন করিয়া কিছু কিছু লিখিব এই মাত্র।†

তখনকার নদীয়া বর্তমান কলিকাতা শহর ও শহরতলি অপেক্ষাও অনেক বড় হইবে। এই বৃহৎ নগরে একেবারে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলে নানাবিধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। প্রভু কোন্ পথে গমন করেন তাহার স্থিরতা নাই। কাজেই সকলেই আপনাপন বাড়ীতে আম্র-পত্রসহ পূর্ণকুম্ভ স্থাপন, কদলীবৃক্ষ রোপন প্রভৃতি মঙ্গলকার্য করিলেন। সন্ধ্যার পর বাড়ী আলোকিত করার আয়োজনও করিলেন। স্ত্রীলোকেরা খৈ, কড়ি, বাতাসা প্রভৃতি সংগ্রহ করিলেন, আর আপনারা বেশভূষা করিতে লাগিলেন। "কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে। পূর্ণঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে।। ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর। দুধ দূর্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর।।"

প্রকৃত কথা, সন্ধ্যা না হইতেই সমগ্র-নবদ্বীপ একেবারে আলোকিত ও আনন্দময় হইয়া গেল। আর সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। যাঁহারা কীর্তনে চলিলেন, তাঁহাদের সকলেরই হাতে এক একটি দেউটি (মশাল), কটিতে তৈলের ভাণ্ড বান্ধা, গলায় ফুলের মালা, অঙ্গ চন্দনে চর্চিত। পিতা একটি দেউটি লইলেন, পুত্রও একটি লইলেন, যথা—"বাপে বান্ধিলেও পুত্রও বান্ধে আপনার।" আবার কেহ কেহ একের অধিক দীপও লইলেন। কেহ কেহ আপনি লইতেছেন, আবার ভৃত্য দ্বারাও লওয়াইতেছেন। "ইতিমধ্যে যে যে ব্যবহারে বড় হয়। সহস্রেক সাজাইয়া কোন জনে লয়।।" অর্থাৎ কোনও কোনও জন সহস্র দীপও সাজাইয়া লইবেন। অতএব—"অনন্ত অর্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার। এ দেউটি সংখ্যা করিবার শক্তি করি।।" ক্রমে লোক আসিয়া প্রভুর বাড়ী পুরিয়া

* বলরাম দাসের এই পদ অবলম্বন করিয়া আর্ট-ষ্টুডিও শ্রীপ্রভুর নগর-সংকীর্তনের ছবি অঙ্কিত করেন।

† এই বিষয় বর্ণনা করিতে যাওয়ার আর একটি কারণ আছে। এক দিবস এই কীর্তন সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে আমি স্বপ্নের ন্যায় উহার ছায়া মত কিছু দেখিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। সেই সাহসে এই নগর-কীর্তন সম্বন্ধে যথাসাধ্য কিছু বর্ণনা করিয়াছি।

গেল। তাহার পরে "কোটি কোটি লোক আসি আছয়ে দুয়ারে। পরশিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরিধ্বনি করে।।" অর্থাৎ ইহারা শ্রীনিমাইয়ের গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া, মাঝে মাঝে হরিধ্বনি করিতেছে, আর নবদ্বীপ যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। প্রভুর নিজ-জন আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া, বহিরঙ্গ নাগরিয়াগণ বাহিরে, আর নিমাই স্বয়ং গৃহের মধ্যে। সেখানে গদাধর তাঁহার বেশবিন্যাস করিতেছেন। প্রথমে প্রভুর বদন অলকা-তিলকায় আবৃত করিবার জন্য গদাধর তাঁহার ললাটের মধ্যস্থলে ফাগুবিন্দু ও চক্ষে কজ্জল দিলেন। তারপর কেশবিন্যাস করিতে লাগিলেন;—মাথায় চূড়া বান্ধিয়া দিলেন ও চূড়া বেড়িয়া মালতির মালা দিলেন; তারপর সর্বাঙ্গ চন্দনে চর্চিত করিলেন। তখন নিমাই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার আপাদ-মস্তক ঝুলাইয়া একগাছি বৃহৎ মালা গলায় পরাইলেন। নিমাই সুন্দর পট্টবস্ত্র পরিলেন ও সেইরূপ চাদর গলায় দিলেন। ভক্তগণ নিমাইয়ের পায়ে নূপুর পরাইয়া দিলেন। অঙ্গে দুই একখানি আভরণও দিলেন। শচী প্রভৃতি প্রাচীনা রমণীরা সম্মুখে থাকিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি অল্পবয়স্কা তরুণীগণ আড়ালে দাঁড়াইয়া নিমাইয়ের বেশবিন্যাস দেখিতে লাগিলেন। যখন নিমাইয়ের বেশবিন্যাস গদাধর নরহরি প্রভৃতির মনোমত হইল, তখন তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

নিমাই এইরূপে কেন সাজিলেন? তিনি কি শ্বশুরালয়ে যাইতেছেন? না,—বন্দুক ও অস্ত্রধারী পাঠান-সৈন্য পরিবেষ্টিত কাজিকে দমন করিতে যাইতেছেন? তিনি না বিপক্ষদলের মধ্যে,—যাহারা তাঁহাকে চক্ষের বিষ দেখে তাহাদের মধ্যে যাইতেছেন? তাঁহার চূড়ায়, ফুলের মালায় ও বেশভূষায় কাজি কেন মাথা হেঁট করিবেন? কথায় বলে, "চূড়া ত মথুরায় নয়, চূড়ায় কুব্জা ভুলবে না।" বিপক্ষ লোক তাঁহার সজ্জা দেখিয়া আরো ত ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিবে। কিন্তু নিমাইয়ের এই ভুবনমোহন বেশ ধারণ করিবার উদ্দেশ্য হইই বলিয়া বোধ হয় যে, তিনি এই বেশ ধারণ করিয়া দেখাইতেছেন যে, শ্রীভগবানের ভজনে দুঃখ কষ্ট নাই, ভস্মমাখা নাই, কি মাথাকুটা নাই। শ্রীভগবান্ প্রাণের প্রাণ, তাঁহার ভজনা শ্বশুরালয়ে প্রিয়দর্শন অপেক্ষাও অধিক সুখকর। সুতরাং নিমাইয়ের বেশভূষা করায় দোষ কি হইল? অবশ্য কাজি পাঠান-সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত; তাহাকে দমন করিতে হইলে অলকাতিলকা, কি আপাদ-মস্তক-লম্বিত মালতীর মালা উপযুক্ত সজ্জা নহে। কিন্তু নিমাই, পাঠানের শেল প্রভৃতি অস্ত্রশাস্ত্রের সহিত, ফুলের মালা দিয়া যুদ্ধ করিতে চলিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি দেখাইবেন—শেল ও ফুলের মালার মধ্যে কাহার কত শক্তি। তবে বিপক্ষগণ বিদ্রুপ করিতে পারে; কিন্তু তাহারা কি করিয়াছিল, পরে বলিতেছি।

নিমাই তখন ধীরে ধীরে মধ্য আঙ্গিনায় আসিলেন, আসিবার সময় সকলে দুধারে সরিয়া পথ ছাড়িয়া দিলেন। ধ্বনি হইল—প্রভু আসিয়াছেন, আর অমনি লক্ষ লক্ষ লোক হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রভুর রূপ দেখিয়া সকলে একেবারে মুগ্ধ হইলেন। সেই নটবর নাগররূপ দেখিয়া অনেকের নয়ন দিয়া অমনি প্রেমানন্দধারা বহিতে লাগিল। নিমাই যেন আদরে গলিয়া পড়িতেছেন, প্রসন্নবদনে যেন জগতের দুঃখ হরণ করিতেছেন। মধুর হাস্য করিয়া তিনি চতুষ্পার্শে চাহিলেন, আর সকলে আনন্দে গলিয়া পড়িলেন। সেই আনন্দের তরঙ্গ, লোকসাগরের শেষ সীমা পর্যন্ত চলিয়া গেল। তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না; তাই মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি করিতেছেন। আর আঙ্গিনার মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া "তিলে তিলে বাড়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস।" তাই মাঝে মাঝে "হুঙ্কার করেন প্রভু শচীর নন্দন। শব্দে পরিপূর্ণ হৈল সবার শ্রবণ।। হুহুঙ্কার শব্দে সবে হইলা বিহ্বল। হরি বলি সবে দীপ জ্বালিল সকল।।"

নিমাই তখন কয়েক সম্প্রদায়কে কীর্তন করিতে বলিলেন। এক দলের কর্তা শ্রীঅদ্বৈত, দ্বিতীয় দলের কর্তা শ্রীহরিদাস, তৃতীয় দলের কর্তা শ্রীবাস, আর চতুর্থ দলের কর্তা শ্রীনিমাই স্বয়ং। এই দলে থাকিলেন, নিতাই ও গদাধর,—নিতাই তাঁহার দক্ষিণে, আর গদাধর বামে। প্রথমে এই চারি সম্প্রদায় হইল বটে, কিন্তু ক্রমে শত শত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল।

একটু পূর্বে এখানকার সহিত সেই নগর-কীর্তনের তুলনা করিতেছিলাম। এখনকার সংকীর্তনে, পূর্বে উদ্যোগ, পরে আনন্দ আর সে সংকীর্তনে, আরম্ভেব পূর্বেই লক্ষ লক্ষ লোক আনন্দে অচেতন হইলেন, কাহাবও বাহ্যজ্ঞান মাত্র বহিল না। অনেক বিলম্ব করিয়া সকল লোককে বহু দুঃখ দিয়া, যখন লোক আর ধৈর্য ধরিতে পাবিতেছে না, সেই সময় গোধূলি আসিলেন। গোধূলি আসিতে না আসিতে সকলে দীপ জ্বালিলেন; আব নগরের প্রত্যেক বৈষ্ণবের বাড়ী আলোকিত করা হইল। একে জ্যোৎস্না রাত্রির আলো, তাহার সহিত এই লক্ষ লক্ষ দীপেব আলোতে নবদ্বীপ দিবার ন্যায় আলোকিত হইয়া গেল। তখন কীর্তন কবিতে করিতে, লক্ষ লক্ষ হরিধ্বনির মাঝে, প্রথমে শ্রীঅদ্বৈত বাহির হইলেন। ক্রমে শ্রীবাস, শ্রীহরিদাস, ও শেষে স্বয়ং শ্রীনিমাই বাহির হইলেন। জগাই-মাধাই উদ্ধারের দিবস মাত্র জনকয়েক লোক নিমাইযের কীর্তন কিরূপ দেখিয়াছিলেন—অদ্য সেই কীর্তন নবদ্বীপেব তাবৎ লোক দেখিবেন। পথের দুধারে বহু স্ত্রী পুরুষ দাঁড়াইয়া গিয়াছেন, আর যাঁহাদের অট্টালিকা আছে, তাঁহারা প্রাসাদের উপর দাঁড়াইয়াছেন। যথা—"এত যে লোকের হইল সমুচ্চয়। সরিযাও পড়িলে তল নাহি হয়।। চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে। লক্ষ কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে।। চতুর্দিকে কোটি কোটি মহাদীপ জ্বলে। কোটি কোটি লোক চতুর্দিকে হরি বলে।।"

নবদ্বীপের লোক কীর্তনের কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু কীর্তন কেহ দেখেন নাই। নিমাইকে সকলে দেখিয়াছেন, তাঁহার নৃত্য অনেকেই দেখেন নাই। শুনিয়াছেন, নিমাইয়ের কীর্তনে ব্রজরসে মূর্তিমন্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত সকলে কীর্তন দেখিতে আসিলেন। কাজেই নবদ্বীপের প্রায় সমুদয় লোক এক স্থানে একত্র হইল।

নিমাইয়ের শরীরে তখন শ্রীভগবান্ প্রকাশ পাইযাছেন। তাহাতে তাঁহার দেহ জ্যোতির্ময় হইয়াছে। নিমাই যাইতেছেন, লোকে কিরূপ দেখিতেছেন, তাহা বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায শ্রবণ করুন, যথা—

"জ্যোতির্ময় কনক বিগ্রহ দিব সার। চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার। চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা।। মধুর-মধুর হাসে জিনি সর্ব কলা।। ললাটে চন্দন শোভে ভাগুবিন্দু সনে। বাহু তুলি হরি বলে শ্রীচন্দ্রবদনে।। আজানু-লম্বিত মালা সর্ব অঙ্গে দোলে। সর্ব অঙ্গ তিতে পদ্ম-নয়নের জলে।।"

নারীগণ সঙ্গিনীদিগকে বলিতেছেন, যথা প্রাচীন পদ—"সোনার গৌরাঙ্গ নাচে, দেখ না আসিয়ে। না দেখিলে গোরা রূপ মরিবি ঝুরিয়ে।।"

ইহারা যখন যাহার বাড়ীর নিকটে আসিতেছেন, তখন পুরুষে শঙ্খধ্বনি ও হরিধ্বনি, এবং স্ত্রীলোকে হুলুধ্বনি করিতেছেন, এবং খই, বাতাসা ও ফুল ছড়াইতেছেন: আর সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছেন। যাঁহারা দর্শন করিতে আসিলেন, তাঁহারাও প্রেমভক্তিতে গদগদ হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সঙ্গে চলিলেন। বাড়ী শূন্য পাইয়া চোরে চুরি করিতে পারিত; কিন্তু এই আনন্দে, চুরি রূপ যে সুখ তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া, তাহারা কীর্তনানন্দে মত্ত হইল।

প্রথমে নাচিতে নাচিতে নিমাই নিজ ঘাটে আসিয়া খানিক নৃত্য করিলেন। শেষে সুরধুনীর তীর দিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। যথা—

"আমার গৌরাঙ্গ-সুন্দর নাচে রে। ধ্রু।
তাতা থৈয়া থৈয়া বাজে রে।।
নাচে বিশ্বম্ভর, সভার ঈশ্বর, ভাগীরথী তীরে তীরে।।
মহা হরিধ্বনি, চতুর্দিকে শুনি, মাঝে শোভে দ্বিজ-রাজে।।
সোণার কমল, করে টলমল, প্রেম সরোবর মাঝে।।
অপূর্ব বিকার, নয়নে সুধার, হুঙ্কার গর্জন শুনি।
হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীভুজ তুলিয়া, বলে হরি হরি বাণী।।

বদন সুন্দর, গৌর কলেবর, দিব্য বাস পরিধান।
চাঁচর চিকুরে, মালা মনোহরে, যেন দেখি পাঁচ বাণ।।
চন্দন চর্চিত শ্রীঅঙ্গ শোভিত, গলে দোলে বনমালা।
ঢলিয়া পড়য়ে, প্রেমে স্থির নহে, আনন্দে শচীর বালা।।"

এই যে সোণার কমল প্রেম-সরোবরে টলমল করিতে করিতে যাইতেছেন, কোথা যাইতেছেন? যাইতেছেন—সেই যে অসুর চাঁদকাজী যিনি পাঠান সৈনগণ পরিবেষ্টিত, তাঁহার দর্প চূর্ণ করিতে। আগে-পাছে বহু সম্প্রদায় গান করিতেছে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ-কৃত গান তাঁহার সম্প্রদায়ে গীত হইতেছে। যথা—"তুয়া চরণে মন লাগুহুঁরে, হে সারঙ্গধর।" অর্থাৎ, হে ভগবান্! তোমার চরণে আমার চিত্ত লাগুক। এক সম্প্রদায় গাইতেছে—"বল ভাই হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম। এই মতে নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।। (এই নদে অবতারে)।" অন্য সম্প্রদায়ে গীত হইতেছে—"বিজয় হইলা নদে নন্দঘোষের বালা। হাতে মোহন বাঁশী, গলে দোলে বনমালা।।" আর এক সম্প্রদায়ে—"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।" অন্য সম্প্রদায়ে—"হরি বল মুগ্ধ লোকে হরি বল রে," ইত্যাদি।

নিমাই "শিব" "শিব" বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। নিমাই নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, যেন অঙ্গে অস্থি মাত্র নাই। কখন বা কি ভাবিয়া মধুর হাস্য করিতেছেন, আর লোকে দেখিতেছে, যেন ঝলকে ঝলকে জ্যোৎস্না শ্রীমুখ হইতে ঝরিতেছে। সেই হাস্য দেখিয়া তাঁহাদের বোধ হইতেছে যে সুখময় এবং শ্রীভগবান্ আমাদের নিজ-জন। নিমাইয়ের পদ্মচক্ষু দিয়া শতধারা বহিয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া জীবমাত্রের হৃদয় তরল হইতেছে ও অন্য জীবের প্রতি তাহাদের স্নেহ ও করুণার উদয় হইতেছে। নিমাই অঙ্গভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর সকলের হৃদয় সেই সঙ্গে তরঙ্গায়মান হইতেছে কেহ দর্শন করিতে করিতে ক্রমে সংজ্ঞাশূন্য হইতেছেন; কেহ বা কোথায় যে দাঁড়াইয়া আছেন তাহা ভুলিয়া গিয়া ভাবিতেছেন যে, তিনি বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের নিকট দাঁড়াইয়া, তাঁহার রঙ্গ দেখিতেছেন। কাহার হৃদয় এত কঠিন যে, কখন দ্রব হয় না, আর তিনি হয়ত নিমাইয়ের ঘোর বিপক্ষ, শত্রুতা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু নিমাইয়ের নৃত্যভঙ্গী ও রূপ দেখিয়া প্রথমে তিনি স্তম্ভিত হইলেন, পরে ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহার হৃদয় দ্রব হইল ও মরুভূমি সদৃশ নয়নে জল আসিল, তিনি তখন সকল তত্ত্ব একবারে বুঝিলেন। তত্ত্বটি এই যে,—"তিনি তাঁহার" আর "তাঁহার তিনি।" কাজেই বিপক্ষ লোক চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দর্শন করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, "এ ব্যাপার কি? আকাশের চাঁদ খসিয়া পড়িয়া ভূতলে নৃত্য করিতেছে?" কেহ বলিতেছেন, "এ কি সোণার পুতুল? কোন্ কারিগরে এ পুতুল গড়িল?" কেহ বলিতেছেন, "যেমন রূপ তেমনি সেজেছেন। লোকটি রসিক বটে। এমন ছবি ত কখন দেখি নাই।"

"দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূর্ব বিকার। আনন্দে বিহ্বল সব লোক নদীয়ার।। ক্ষণে হয় প্রভু অঙ্গ সর্ব ধূলাময়। নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয়।। সে কম্প সে ঘর্ম সে বা পুলক দেখিতে। পাষণ্ডীর চিত্ত-বিত্ত লাগয়ে নাচিতে।। এই মত অপূর্ব দেখিয়া সর্বজন। সবেই বলেন এ পুরুষ নারায়ণ। কেহ বলে নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন। কেহ বলে যিনি হউন মনুষ্য নহেন।। এই মত বলে যেন যার অনুভব। অত্যন্ত তার্কিক বলে পরম বৈষ্ণব।।"

বিপক্ষ মধ্যে অনেকের নিমাইয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা ও শত্রুতা আর রহিল না। যাঁহারা সেই নাগরবেশী রূপবান যুবকের নৃত্য দেখিলেন, তাঁহাদের অনেকের উহা দেখিয়া বিরক্ত না হইয়া আনন্দ হইল, আর নিমাইয়ের প্রতি অনিবার্য আকর্ষণ হইল। অনেক বিপক্ষ বলিতে লাগিলেন,—"ধন্য জগন্নাথ মিশ্র, ধন্য শচী, যাঁহাদের এরূপ সন্তান।" কেহ এরূপও বলিলেন যে,—"ধন্য নদীয়া, যেখানে এরূপ মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে।"

উচ্চ অধিকারী ভক্তেরা ভাবিতেছেন যে, তাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত "রাসলীলা" করিতেছেন। তাঁহারা সখী, নিমাই নন্দঘোষের বালা, আর নবদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবন। তাঁহাদের মনে এই বিশ্বাস হওয়াতে তাঁহারা গাইতেছেন—"বিজয় হইয়া নদে, নন্দঘোষের বালা। হাতে মোহনবাঁশী, গলে দোলে বনমালা।।" তাঁহারা দেখিতেছেন, সেই নন্দঘোষের বালা তাঁহাদের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহারাও তাঁহার পানে চাহিয়া, তাঁহার ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এই জনতার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে কাহারও কষ্ট নাই , যেহেতু নিমাইয়ের "সবা হইতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর।" লক্ষ লক্ষ ভক্ত, যাঁহারা বাহিবে দাঁড়াইয়াছিলেন, পূর্বেই নিমাইয়ের বাড়ীতে জ্ঞানহারা হইয়াছেন; পরে সংকীর্তনের তরঙ্গে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা তখন আবিষ্ট হওয়ায়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার যেরূপ ভাব তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। যিনি কখনও গাইতে জানেন না, সেই মুহূর্তে তাঁহার সুকণ্ঠ হইয়াছে ও তিনি গাহিতেছেন। হে শ্রোতা মহাশয়! আপনি কি জানেন না যে, ভক্তি কি প্রেমের উদয় হইলে অতি কর্কশ-কণ্ঠও সুমিষ্ট হয়। যথা—"মধুকণ্ঠ হইল সর্ব ভক্তগণ। কভু নাহি গায়, সেই হইল গায়ন।।" এই সমস্ত বাহিরের ভক্ত একেবারে উন্মত্ত হইলেন। ইহাদের দশা বৃন্দাবন দাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বলে হরি। কেহ গড়াগড়ি যায় আপনা পাসরি।। কেহ কেহ নানা মত বাদ্য গায় মুখে। কেহ কার কান্ধে উঠে পরানন্দ সুখে।। কেহ কার চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে। কেহ কার চরণ আপন কেশে বান্ধে।। কেহ দণ্ডবৎ হয় কাহার চরণে। কেহ কোলাকুলি বা করয়ে কার সনে।।"

কেহ কাহারও পানে চাহিয়া, হাসিয়া গলিয়া পড়িতেছেন, কেহ মুখ বাজাইতেছেন, কেহ অলৌকিক বুলি বলিতেছেন, কেহ আনন্দে বৃক্ষে উঠিয়া ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িতেছেন, কেহ অকুতোভয়ে উচ্চস্থানে উঠিয়া লাফ দিয়া পড়িতেছেন।

কেহ-বা ভাবিতেছেন, তিনিই নিমাই পণ্ডিত; আর লোককে ডাকিয়া বলিতেছেন, "হে দুঃখী জীব! আমি আসিয়াছি, তোমাদের ভয় নাই, আমি জগৎ উদ্ধার করিব।" এই কথা শুনিয়া একজন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, "পাষণ্ডগণই জগতের অহিতকারী, আমি অদ্য জগতের সমুদয় পাষণ্ড বিনাশ করিব।" ইহা বলিয়া গাছের প্রকাণ্ড ডাল ভাঙ্গিয়া পাষণ্ড বধ করিতে চলিয়াছেন। তখন সকলেরই দেহে অসীম বল হইয়াছে,—সহজ অবস্থায় সে ডাল ভাঙ্গিতে তাহার শক্তি হয় না। কাহারও বা পাষণ্ডীর কাছে যাইতে দেরি সইল না, সেইখানেই পাষণ্ডীর নামে ভূমে কিলাইতেছেন। কেহ বলিতেছেন, "হে পাষণ্ডীগণ! নিমাইপণ্ডিত স্বয়ং ভগবান্, তিনি হরিনাম সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে ভজনা কর। নতুবা একেবারে সংহার করিব।"

কেহ বা সম্মুখে যেন যমদূত দেখিতেছেন, দেখিয়া বলিতেছেন, "ওরে যমদূত! শীঘ্র যা, তোর রাজা যমকে বলগে যে, তিনি—সেই যমের যম,—স্বয়ং আসিয়াছেন, আর রক্ষা নাই। তাঁহার লেখক চিত্রগুপ্তকে, তাহার খাতা ছিঁড়িয়া ফেলিতে বলুক। আর তোরা সকলে আসিয়া, "ভজ বিশ্বম্ভর, নহে করিব সংহার।" আবার আরো অশান্ত হইয়া দর্পের সহিত নিমাইয়ের পদতলে "যমরাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহ চলে।"

এ পর্যন্ত কাজীর কথা আর কাহারও মনে নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ কাজী দমন করিবেন বলিয়া বাহির হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা কিছুই দেখা যাইতেছে না। তিনি নটবর বেশ ধরিয়া খঞ্জনের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন। কিরূপ যাইতেছেন?

"সে তরঙ্গ দেখিতে, সে ক্রন্দন শুনিতে। পরম লম্পট পড়ে কান্দিয়া ভূমিতে।। বোল বোল বলি নাচে গৌরাঙ্গসুন্দর। সর্ব অঙ্গে শোভা করে মালা মনোহর।। যজ্ঞসূত্র, ত্রিকচ্ছ বসন পরিধান। ধূলায় ধূসর প্রভু কমলনয়ন।। মন্দাকিনী হেন প্রেম-ধারার গমন। চাঁদেরে না লয় মন দেখি সে বদন।।"

আবার—"অতি ক্ষীণ দেখি যেন মুকুতাব হার।। সুন্দর চাঁচর কেশ বিচিত্র বন্ধন। তঁহি মালতীর মালা অতি সুশোভন।।"

নিমাই নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, আর লোকে অগ্রে ফুল ছড়াইতেছেন, যথা—"পুষ্পময় পথে নাচি চলে বিশ্বম্ভর।"

নিমাই নাচিতে নাচিতে যাইতেছেন। প্রথমে গঙ্গার ধারে গিয়া নিজের ঘাটে একটু নৃত্য করিলেন। তাহার পর ঐরূপে নাচিতে নাচিতে মাধাইয়ের ঘাটে গেলেন। শেষে বারকোণা ঘাট দিয়া নগরের প্রান্তভাগে সিমলায় গমন করিলেন।

এতক্ষণ পরে নিমাই কাজীর বাড়ীমুখো চলিলেন। ইহাতে বুঝা গেল যে, প্রভু ভক্তির তরঙ্গে নৃত্য করিতেছিলেন বলিয়া কাজীর কথা ভুলেন নাই। তখন নিরপেক্ষ লোক ভাবিতে লাগিলেন, আজ একটি বিষম রক্তারক্তির কাণ্ড হইতে চলিল। আর বিপক্ষ লোক ভাবিতেছে, "কাজীর সৈন্যগণ আসিলে সমুদয় ভাবকালি লুকাইবে। আর তখন কে কোথায় পলাইবে, আর কত লোক যে প্রাণে মরিবে তাহার ঠিকানা নাই। আজ নিমাই পণ্ডিত দায় ঠেকিলেন।"

কয়েক দিন সন্ধ্যা হইতে বহুরাত্রি পর্যন্ত কাজী নগরে নগরে সৈন্য লইয়া বেড়াইতেছিলেন। তারপর আপনি আপনি কি বুঝিয়া কীর্তন রোধের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছেন। সে দিবস সন্ধ্যা হইতে তিনি বাড়ীতেই আছেন। নিমাই যে এক দিনের মধ্যে এত বড় সংকীর্তন-দল সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তিনি কিছুমাত্র জানেন না। যথা, চৈতন্যভাগবতে—

"সর্ব প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীশচী-নন্দন। দেখ তাঁর শক্তি এই ভরিয়া নয়ন। ইচ্ছামাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধি হইল। কত কোটি মহাদীপ জ্বলিতে লাগিল।। কেবা রোপিলেন কলা প্রতি ঘরে ঘরে। কেবা গায় বায়, কেবা পুষ্পবৃষ্টি করে।। হইল সকল পথ খই-কড়িময়। কেবা করে কেবা ফেলে হেন রঙ্গ হয়।।"

ফল কথা, সে নিশিতে, সেই প্রকাণ্ড নবদ্বীপ নগর খৈ, কড়ি ও পুষ্পময় হইয়া গেল। ইচ্ছামাত্র এই লোক-সমুদ্র লইয়া নিমাই চলিয়াছেন, কাজী কাজেই কিছু জানিতে পারেন নাই। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ কাজীপাড়ার পথ ধরিলেন, তখনই লোকের কাজীর কথা মনে পড়িল, "মার্ কাজী, মার্ কাজী" বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোকে চীৎকার করিয়া উঠিল। কাজীর কর্ণে এই কোলাহলের শব্দ গেলে, তিনি বাহির হইয়া দেখেন যে, নগর আলোকিত হইয়াছে। ইহাতে কাজী বড় আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং তথ্য জানিবার জন্য প্রহরীদিগকে বলিলেন, "দেখ ত কিসের গোল? এ কি, কার বিয়ে?" আবার কর্ণে যে ধ্বনি আসিতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন কীর্তন হইতেছে। ইহাতে উষ্ণ হইয়া বলিতেছেন, "এ কি বিয়ে, না ভূতের কীর্তন? নিমাই যদি আবার কীর্তন করে, তবে সকলের জাতি মারিব। তোমরা শীঘ্র যাও।"

কাজীর লোকেরা দৌড়িয়া গিয়া দেখে যে অসংখ্য লোক আলো জ্বালিয়া নৃত্য ও কীর্তন করিতে করিতে তাহাদের দিকে আসিতেছে। এদিকে কাজী দেখিতেছেন যে গণ্ডগোল ক্রমে বাড়িতেছে ও তাঁহার বাড়ীর দিকে আসিতেছে, তখন ব্যস্ত হইয়া আরো সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। এই রূপে কাজী দলে দলে সৈন্য পাঠাইতেছেন। কিন্তু অসংখ্য লোক দেখিয়া তাহারা অগ্রগামী হইতে সাহস করিতেছে না। তৎপরে যখন দেখিল যে, অনেক লোক বৃক্ষের ডাল লইয়া, "মার্ কাজী, মার্ কাজী" বলিয়া আসিতেছে, তখন তাহারা ভয়ে পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পলায়ন করা বড় কঠিন হইয়া পড়িল, কারণ তাহারা দেখিল, প্রভু যে দিকে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, সেই দিক হইতেও বহু লোক তাঁহাকে লইতে, কি সংকীর্তনে মিশিতে আসিতেছে। ইহাতে কাজীর লোকদিগের পলাইবার পথ রহিল না। কারণ তাহারা চারিদিক হইতে ঘেরা পড়িল।

এদিকে কাজী যখন শুনিলেন যে, অসংখ্য লোক তাঁহার বাড়ি আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, আর তাঁহার লোকেরা সমুদ্রে জল-বিন্দুর ন্যায় সেই লোক-সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে,—তখন তিনি

পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার বাড়ীটি দুর্গের ন্যায় পরিখা-বেষ্টিত না থাকায়, সৈন্য ব্যতীত বাড়ী রক্ষা কবিবার উপায় আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তখন সৈন্যগণ কে যে কোথায় তাহার ঠিকানা নাই। সুতরাং কাজী প্রাণের ভয়ে অন্তঃপুরে লুকাইলেন। এদিকে মুসলমান সৈন্যগণ সংকীর্তনের দলে ডুবিয়া গিয়াছে। হাতের অস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছে, তবুও আপনাদিগকে লুকাইতে পারিতেছে না। যথা—

"পুরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভর-গণে। ভয়ে পলাইতে কেহ দিক নাহি জানে।। মাথায় বান্ধিয়া পাগ কেহ সেই মেলে। অলক্ষিতে নাচে অন্তরে প্রাণে হালে।। যার দাড়ি আছে সেই হয়ে অধোমুখ। লাজে মাথা নাহি তোলে, ডরে হালে বুক।। অনন্ত অর্বুদ লোক কেবা কারে চিনে। আপনার দেহ-মাত্র কেহ নাহি জানে।।"

তখন কে মুসলমান, কে হিন্দু বাছিয়া লইবার শক্তি কাহারও ছিল না। সুতরাং পাইকগণের কোন বিপদ হইল না। দেখিতে দেখিতে লোকে চারিপাশ হইতে কাজীর বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। প্রভু কাজীর দর্প চূর্ণ করিতে যাইতেছেন; সাধারণ লোকে তাহার অর্থ ইহাই বুঝিতেছে যে, কাজীকে বধ কি প্রহার করিতে হইবে, তাহার বাড়ী ঘর ভাঙ্গিতে হইবে। প্রকৃতই লোকে যাইয়া তাহার বাহিরের ঘর ভাঙ্গিল, উদ্যান ও অন্যান্য স্থানে নানাবিধ অপচয় করিতে লাগিল। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"তর্জ গর্জ করে লোকে করে কোলাহল। গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয় পাগল।। ঔদ্ধত্যে লোকে ভাঙ্গে ঘর-পুষ্প-বন। বিস্তারি বলিয়াছেন ইহা দাস বৃন্দাবন।।"

সে বর্ণনা এই—"কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গেন দুয়ার। কেহ লাথি মারে কেহ করয়ে হুঙ্কার।। আম্র পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহ ফেলে। কেহ কদলীর বন ভাঙ্গি হরি বলে ।। পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া। উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া।। পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া। হরি বলে নাচে সব শ্রুতিমূলে দিয়া।"

নিমাই কাজীর বাড়ী আসিয়া নৃত্য ও আর সমুদয় ভাব সম্বরণ করিলেন। শান্তভাবে বাহিরের ঘরে উঠিয়া কাজী কোথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন কাজী অভ্যন্তরে লুকাইয়া আছেন। তখন অভ্যন্তরে তাঁহাকে ডাকিতে কয়েকজন ভব্যলোক পাঠাইলেন। সে সময় মুসলমান ও হিন্দুতে সমস্ত দেশে মর্মান্তিক বিবাদ চলিতেছে। কাজী অহেতুক যে সমুদয় লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন, তাহারা এখন তাঁহাকে ঘেরিয়াছে; একে কীর্তনে পাগল হইয়াছে, তাহার পরে সেই উন্মত্ততা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু নিমাই আসিয়া যেই শান্ত হইলেন। অমনি সেই লক্ষ লক্ষ লোক স্থির হইল ও তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

সে দিবস কাজীর জাতি ও প্রাণ থাকে না থাকে, এই ভয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কাজী কাঁপিতেছিলেন। এখন নিমাইপণ্ডিত তাঁহাকে ডাকিতেছেন শুনিয়া কতকটা আশ্বাসিত হইলেন। বিশেষতঃ পূর্বে যেরূপ লোকে "মার কাজী" "মার কাজী" ধ্বনি করিতেছিল, ও কাজীর ঘর-দ্বার ভাঙ্গিতেছিল, এখন তাহারা তাহা হইতে ক্ষান্ত দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাজেই সমস্ত গোল থামিয়া গিয়াছে। তখন কাজী সেই লোকদিগের সঙ্গে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিলেন এবং মস্তক অবনত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আগে করযোড়ে দাঁড়াইলেন। কাজী আসিলে নিমাই অতি সমাদরে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, এবং আপনিও বসিলেন, তাঁহাকেও বসাইলেন। তখন নিমাই কৌতুক করিয়া বলিতেছেন, "আপনার এ কিরূপ ভদ্রতা? আপনার বাড়ীতে আমরা আসিলাম, আর আপনি বাড়ীর ভিতরে লুকাইলেন?" তখন কাজী মাথা তুলিয়া নিমাইয়ের মুখপানে চাহিলেন। দেখেন ক্রোধের চিহ্নমাত্র নাই, বরং মুখখানি যেন করুণায় পূর্ণ। ইহাতে কাজী যে আশ্বাসিত হইলেন তাহা নহে, অত্যন্ত বিচলিতও হইলেন। কারণ মনে হইতে লাগিল, যেন নিমাই তাঁহার হৃদয়

ধরিয়া টানিতেছেন। কাজী বলিলেন, "আমি কীর্তনে বাধা দিই, আবার অনেক অত্যাচারও করিয়ছি। সেই জন্য তুমি রাগ করিয়া আসিতেছ ভাবিয়া লুকাইয়াছিলাম। এখন তুমি শান্ত হইয়াছ জানিয়া আসিলাম। তুমি আমর অপরাধ ক্ষমা কর, যেহেতু আমি তোমার মামা হই। নীলাম্বর চক্রবর্তী গ্রাম-সম্বন্ধে আমার চাচা (কাকা)। তিনি তোমার নানা (মাতামহ)। কাজেই আমি তোমার মামা। মামা যদি অপরাধ করিয়া থাকে, ভাগিনে তাহা লইতে পারে না। বিশেষতঃ দেহ-সম্বন্ধ অপেক্ষা গ্রাম-সম্বন্ধ বড়। তুমি ভাগিনে, আমার বাড়ী আসিয়াছ, এ তোমার বাড়ী। আমি আর কি অভ্যর্থনা করিব?" নিমাই বলিতেছেন, "তোমার সঙ্গে আমার গুটী দুই কথা আছে। প্রথমতঃ তুমি কি অপরাধে আমাদের কীর্তন রোধ করিয়াছিলে? আবার আপনি-আপনি ক্ষান্তই বা হইলে কেন? আমাকে এ সমুদয় খুলিয়া বল।"

কাজী বলিতেছেন, "সকলে তোমাকে 'গৌরহরি' বলিয়া ডাকে, আমিও তাহাই বলিয়া ডাকিব। শুন গৌরহরি, কেন আমি কীর্তনরোধে ক্ষান্ত দিয়াছি; কিন্তু সে গোপনীয় কথা, তুমি একটু অন্তরালে চল সমুদয় বলিব।" নিমাই বলিলেন, "এরা সকলেই আমার নিজ-জন; ইহারা সকলেই এই কীর্তনরোধের তথ্য শ্রবণ করুন।" তখন কাজী বলিতেছেন, "আমার কীর্তন রোধ করিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু আমার লোকজনে আমাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, আমি যদি কীর্তন বন্ধ না করি, তবে বাদশাহ্ আমার উপর ক্রোধ করিবেন। তাহাতেও আমি কীর্তনে বাধা দিতাম না। কিন্তু তারপরে তোমাদের অনেক হিন্দু আসিয়া আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, নিমাইপণ্ডিত নূতন মত চালাইতেছেন। উহা হিন্দুধর্মের বিরোধী। হিন্দুরা মনে মনে জপ করে। হুড়পাড় দুরদাড় করিয়া নাম করিলে বড় অপরাধ হয়। নিমাইয়ের উৎপাতে হিন্দুদিগের জাতি গেল, তাহাকে দমন করা রাজার কর্তব্য, করিলে লোকের বিরক্তি না হইয়া সন্তোষের কারণ হইবে।"

হিন্দুরা কাজীকে কি বলিয়াছিল, তাহা চরিতামৃতে এইরূপ বির্ণত আছে—"গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন। নিমাই বোলাইয়া তাঁরে করহ বর্জন।।"

কাজী বলিতেছেন, "যখন হিন্দুরা এরূপ বলিল, তখন আমি কীর্তন রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রবৃত্ত হইয়াই বুঝিলাম, কার্য ভাল করি নাই। কারণ রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলাম যে, কীর্তন রোধ করিয়াছি বলিয়া এক নররূপী সিংহ আমার উপর তর্জন করিতেছেন। তৎপরে আমি কীর্তনে বাধা দিতে যে সব লোক পাঠাইয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'হরি হরি', 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া নাচিতে লাগিল। প্রথমে ভাবিলাম, তাহারা হিন্দুদিগকে বিদ্রুপ করিতেছে, কিন্তু শেষে দেখিলাম, তাহারা যেন ভূতগ্রস্ত হইয়াছে। তখন তাড়না করিলে বলিল, কীর্তনে বাধা দিতে গিয়া তাহাদের এই দশা হইয়াছে, মুখে হরি কি কৃষ্ণনাম ছাড়িতে পারিতেছে না।"

এইরূপ ঘটনা তখন মুহুর্মুহুঃ হইতেছিল। নিমাইকে কি তাঁহার ভক্তগণকে দর্শন কি স্পর্শন করিলে লোকের জিহ্বায় হরি কি কৃষ্ণনাম লাগিয়া যাইত, চেষ্টা করিয়াও তাহা ছাড়িতে পারিত না।

কাজী বলিলেন, "এই সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া ভাবিলাম যে, কীর্তনে বাধা দেওয়া কর্তব্য নয়। ইহা মনুষ্যের কার্য নয়, ইহাতে ঐশ্বরিক শক্তি আছে, ইহাই ভাবিয়া কীর্তনে আর বাধা দিই নাই।"

কাজী নিমাইয়ের মুখপানে চাহিয়া যখন এই কথা বলিতেছেন, তখন তাঁহার মনে এই ভাবটি ধীরে ধীরে উদয় হইতে লাগিল যে,—"এই নিমাইপণ্ডিত বস্তুটি কি?" এ প্রশ্ন পূর্বেও তাঁহার মনে হইয়াছিল। পরে ভাবিতে ভাবিতে ও নিমাইকে দর্শন করিয়া হঠাৎ ইহার সিদ্ধান্ত মনে হইয়াছিল। আর তাঁহার সর্বাঙ্গ দিয়া আনন্দ-লহরী চলিয়া গেল। কাজী শিহরিয়া উঠিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "সে কি তুমি?" নয়নে-নয়নে মিলিত হওয়ায় কাজী বুঝিলেন যে, প্রভু ইঙ্গিত

করিলেন, "তিনিই সেই তিনি।" তখন আর ধৈর্য ধরিতে না পারিয়া বলিতেছেন, "গৌরহরি! আমার বোধ হয়, হিন্দুগণ যে বড় ঈশ্বরকে নারায়ণ বলেন—তিনিই তুমি।"

তখন দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ কাজীর একটি অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "যখন তুমি মুখে হরি, কৃষ্ণ ও নারায়ণ এই তিনটি নাম গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার পাপ ক্ষয় হইল।"

নিমাইয়ের অঙ্গুলি স্পর্শমাত্র বাস্তবিক কাজীর পাপক্ষয় হইল। তখন তাঁহার দুটি নয়ন দিয়া অজস্র ধারা পড়িতে লাগিল, আর ছিন্ন মূল তরুর ন্যায় প্রভুর চরণে পড়িয়া তিনি বলিলেন, "প্রভু! তোমার উপর যাহাতে আমার ভক্তি হয়, তুমি আমাকে এইরূপ কৃপা কর।"

প্রভু আস্তে-ব্যস্তে কাজীকে উঠাইয়া বলিলেন, "তোমার নিকট আমার একটি ভিক্ষা, তুমি বল আর কীর্তনে বাধা দিবে না।" তাহা শুনিয়া কাজী বলিতেছেন, "বাপরে বাপ! আমি ত দিবই না, আরও আমার বংশে তালাক দেব যে, কেহ কোনকালে যেন কীর্তনে বাধা না দেয়।" এই কথা শুনিবামাত্র নিমাই উঠিলেন, আর নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। কাজীজীও "হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ," বলিয়া নাচিতে নাচিতে প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে শান্ত করিয়া বাড়ী ফিরাইয়া দিলেন। এই কাজী বাদসাহের দৌহিত্র। তিনি গৌরাঙ্গ প্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। হিন্দুগণ তাঁহাকে সমাজে লইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার বংশীয়গণের আচার-ব্যবহার হিন্দুর মত হইল, আর তাঁহারা গৌরহরিকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। কাজীর কবর অদ্যাপি বিরাজিত। সেখানে ভক্ত বৈষ্ণবগণ গড়াগড়ি দিয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

প্রভুর কার্যের একটি নিগূঢ় রহস্য বলিতেছি। তিনি যাঁহাকে কৃপা করিবেন, তাঁহার যে বিষয়ে দর্প আছে, অগ্রে তাহা চূর্ণ করিয়া তারপর তাঁহাকে কৃপা করিতেন। বাহুবলে বলীয়ান কাজীকে বাহুবলে পরাস্ত করিয়া পরে কৃপা করিলেন। দিগ্বিজয়ী বিদ্যাবলে বলীয়ান, তাঁহাকে বিদ্যায় জয় করিয়া তাঁহার সংসারবন্ধন মোচন করিলেন। অদ্বৈতপ্রভু ভক্তিবলে বলীয়ান, ভক্তিরহস্য দেখাইয়া তাঁহাকে দমন ও শ্রীচরণস্থ করিলেন। এইরূপে নবদ্বীপ নিষ্কণ্টক হইল। গৌরভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, গৌর-অবতারের ন্যায় করুন অবতার আর কোন যুগে উদয় হন নাই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মামা কংসকে আছড়াইয়া মারিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার মামা কাজীকে প্রেমদান করিয়া দমন করিলেন। কাজীকে দমন করিয়া সকলে নাচিতে নাচিতে চলিলেন। যথা—"জয় কোলাহল প্রতি নগরে নগরে। ভাসয়ে সকল লোক আনন্দসাগরে।।" নিমাই নাচিতে নাচিতে প্রথমে শঙ্খবণিকের নগরে গমন করিলেন। শঙ্খবণিকগণ নিমাইয়ের আগে পুষ্প ছড়াইতে লাগিলেন। কেন? পাছে নদীয়ার কঠিন মাটিতে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপদে বেদনা লাগে। তাহার পরে তন্তুবায়দিগের নগরে নগরে গেলেন, সেখানেও ঐরূপ। যথা—"নাচে সব নাগরিয়া দিয়ে করতালি। হরিবোল মুকুন্দ গোপাল বনমালী।।" শেষে শ্রীধরের ভাঙ্গা কুটিরে সকলে উপস্থিত হইলেন। সেই কুটিরের দুয়ারে শ্রীধরের জলপাত্র রহিয়াছে। "কত ঠাঁই থালি তার চোরেও না হরে।" নিমাই সেখানে যাইয়াই সেই জলপূর্ণ পাত্র উঠাইয়া—শ্রীধর নিষেধ করিতে না করিতে—সমুদয় জল পান করিলেন। শ্রীধর ইহাতে ভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তখন তাঁহার অঙ্গে হস্ত দিয়া চেতন করিলেন, করিয়া "প্রভু বলে শুদ্ধ মোর আজি কলেবর।"

যে অসংখ্য লোক সেখানে দাঁড়াইয়া, তাঁহারা নিমাইকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া জানিতেছেন। তাঁহাকে এইরূপে জলপান করিতে দেখিয়া তাঁহারা আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইয়া ভাবিতেছেন, "তুমি ভগবান, সবারই ঈশ্বর। সৈন্য সকল স্থানেই মধুর, তবে তোমার দৈন্য কি মধুর!"

পাঠানগণ পণ্ডিতের নগরী শ্রীনবদ্বীপপুরী সৈন্যসামন্ত দ্বারা অধিকার করিয়া আছেন। শ্রীনিমাইচাঁদ এক মুহূর্ত মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক একত্র করিলেন, আর এই অসংখ্য লোককে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া,—যেমন বাজীকর পুতুল নাচায়, সেইরূপে—একবার হরি বলিয়া নৃত্য করাইয়া,

একবার ক্রোধে মুখে মার মার বলিয়া উত্তেজিত করিয়া,—সেই যবন সেনাপতিকে পদতলস্থ করিলেন। এইরূপ শক্তি মনুষ্যের সম্ভবে না। আমাদের ন্যায় সামান্য জীবে, এরূপ অবস্থায় সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন না যে,—তাঁহার কতদূর শক্তি আছে, আর তাঁহার আহ্বানে কত লোক আসিবে ও যাহারা আসিবে তাহারা তাঁহার কতদূর বশীভূত হইবে, কি যাহারা আসিবে তাহাদের কতখানি তেজ আছে। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের ন্যায় জীব নহেন। আবার শ্রীনবদ্বীপ পণ্ডিতের স্থান; তাহার মধ্যে অনেক আচার্য স্ব স্ব মত চালাইতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নবীন-অধ্যাপক, দশ জনের মধ্যে একজন; তিনি যে মত চালাইতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন; কারণ নৃত্য করিয়া ভজনা পূর্বে ছিল না। তাহার পর, রাজপথের উপর, দুই পায়ে নূপুর দিয়া ও বাহু তুলিয়া নৃত্য করিয়া, ভজন করা স্বভাবতঃই লোকের নিকট হাসিবার সামগ্রী;—বিশেষতঃ নবদ্বীপের ন্যায় বিদ্বজ্জন সমাজে! নিমাই নানা কারণে নবদ্বীপের প্রধান লোকদিগের নিকট অপ্রিয় হইয়াছেন। তিনি রাজপথে প্রকাশ্য স্থানে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, ইহাতে কুণ্ঠিত হইলেন না, বরং সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত ভাব দেখাইলেন। সমান্য জীব হইলে, এমন অবস্থায় একখানি মলিন বস্ত্র পরিয়া ভয়ে ভয়ে পাছে পাছে থাকিতেন। কিন্তু, নিমাইচাঁদ ভঙ্গি করিয়া মাথায় চূড়া বাঁধিলেন, মুখ অলকা-তিলকায় সুসজ্জিত করিলেন, আপাদলম্বিত মালা গলায় পরিলেন, এইরূপে বর স্যাজিয়া সর্বাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। এরূপ অবস্থায়, এইরূপ আচরণ শ্রীভগবান্ ব্যতীত জীবে সম্ভবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজ্য ছাড়ি বৃক্ষতলে, শ্রীরূপ কান্দিয়া বলে, আমি যোগ্য নহি পদলাভে।
মুই দীন হীন ছার, শত কোটি স্পৃহা যার, সে কেমনে শ্রীচরণ পাবে।।
শুনরে দুর্বার মন, বৃথা কর আকিঞ্চন, যাহাতে নাহিক অধিকার।
রূপ বলে শুন বলাই, এসো বসে গুন গাই, লাভালাভের ছাড় হে বিচার।

—শ্রীবলরাম দাস

শ্রীচৈতন্যভাগবতে যথা—
"মৎস্য কূর্ম নরসিংহ বরাহ বামন। রঘু সিংহ বৌদ্ধ কল্কী শ্রীনন্দনন্দন।।
এই মত যতেক অবতার সকল। সব রূপ হয় প্রভু করি ভাব ছল।।"

এইরূপ নিমাই শুদ্ধ যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বিবিধ অবতার হন, তাহা নহে। মহাদেব কি ব্রহ্মা, কিম্বা দুর্গা প্রভৃতি শক্তিরূপাও হইয়াছেন। আবার শ্রীকৃষ্ণলীলার গণ সকলের রূপও গ্রহণ করিয়াছেন,—যথা অক্রুর। অর্থাৎ তিনি নিজ দেহে কখন শ্রীকৃষ্ণ, কখন রাধা, কখন-বা অক্রূর প্রকাশ হইতেন, তখন কি তাঁহার অবয়ব ঠিক শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, কি অক্রুরের ন্যায় হইত? ইহার উত্তর দিতেছি। যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশ পাইতেন, তখনই নিমাই প্রায়ই বিষ্ণুখট্টায় বসিতেন। তাঁহার অঙ্গ দিয়া সোণার প্রচণ্ড তেজ বাহির হইত। সেই আলোতে সমস্ত ঘর আলোকিত হইত। নিকটে যে ভক্তগণ থাকিতেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও অঙ্গ দিয়াও অধিক কি অল্প আলো বাহির হইত। এমন কি, গৃহের জড়দ্রব্য হইতেও আলো বাহির হইতে দেখা যাইত।

বিষ্ণুখট্টায় তেজাবৃত যে নিমাই বলিয়া, তাঁহাকে—কেহ নিমাইরূপে দেখিতেছেন, আবার কেহ-বা দেখিতেছেন নিমাইয়ের স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া। এইরূপে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, ঘরে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে নিমাইকে দেখিতে পাইলেন না; দেখিলেন, বিষ্ণুখট্টায় তাঁহার ভজনীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ; আর শ্রীনিমাইও আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিয়া, তাঁহার মস্তকে শ্রীপাদ তুলিয়া দিলেন। আবার মহাপ্রকাশের সময় মুরারি গুপ্ত প্রভুর সম্মুখে

পড়িয়া আছেন; তখন প্রভু বলিতেছেন, 'মুরারি! উঠ, আমাকে দর্শন কর। তুমি হনুমান, আমি তোমার রামচন্দ্র।' মুরারি মস্তক উঠাইয়া দেখিলেন যে, রাম সীতা লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলে আবির্ভূত,—নিমাইকে মোটে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু মুরারি যে বস্তুকে রাম-সীতা প্রভৃতি রূপে দেখিতেছেন, তাঁহাকেই সেই সময় শ্রীবাস তেজাবৃত নিমাই দেখিতেছেন। এক দিবস নিমাই দেবগৃহে প্রবেশ করিয়া নিতাইকে বলিতেছেন, "আমার রূপ দেখ।" কিন্তু নিতাই কিছু দেখিতে পাইলেন না। তখন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, নিমাই তাঁহাদিগকে অন্য স্থানে যাইতে বলিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে নিতাই রূপ দেখিতে পাইয়া আনন্দে ও ভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যখন নিমাইয়ের মহাদেব ভাব হইল, তখন তাঁহার প্রকৃতি সমুদয় মহাদেবের ন্যায় হইয়া গেল। তিনি মুখবাদ্য করিতে লাগিলেন, আপনাকে মহাদেব বলিয়া পরিচয় দিলেন, মহাদেবের ন্যায় কথা বলিতে লাগিলেন। তবে আকৃতি যেরূপ সেইরূপই থাকিল, কি কিঞ্চিৎ অথবা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইল। অর্থাৎ কেহ দেখিতেছেন, দেহ প্রায় নিমাইয়ের বটে, কিন্তু প্রকৃতি একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে,—ঠিক মহাদেবের মত। "প্রায় নিমাইয়ের মত" এই নিমিত্ত বলি, যেহেতু এরূপে আবিষ্ট হইলে নিমাইয়ের অঙ্গের বর্ণ কখন কৃষ্ণ হইত আর বলরাম কি মহাদেব আবেশে বর্ণ কখন শুক্ল হইত। এই পরিবর্তন সকলেই দেখিতে পাইতেন। আবার কখন কেহ কেহ নিমাইকে ঠিক জটাধারী মহাদেবের রূপেই দেখিতেন।

এখন পূর্বকার কথা স্মরণ করুন। যজ্ঞোপবীতের পর নিমাই বসিয়া তাঁহার মাতাকে ডাকিলেন। মাতা আসিয়া দেখেন যে, নিমাইয়ের সমস্ত অঙ্গ তেজোময়। তখন তিনি নানাভাবে ও ভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। নিমাই বলিতেছেন, "আমি এই দেহ ছাড়িয়া চলিলাম, আবার আসিব। যিনি রহিলেন তিনি তোমার পুত্র। তুমি এই দেহ যত্ন করিয়া পালন করিবে।" ইহাই বলিয়া নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকায় ঢলিয়া পড়িলেন। সন্তর্পণে নিমাই চেতনা পাইলেন এবং তখন তাঁহার অঙ্গের সমুদয় তেজ লুকাইল; আর তিনি পূর্বকার রূপ ধরিয়া নিমাই হইলেন। সেই সময় জগন্নাথ বাড়ী ছিলেন না। তিনি আসিয়া ও সমুদয় শুনিয়া নিমাইকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিমাই অবাক হইয়া বলিলেন, "সে কি বাবা! আমি কি বলিয়াছিলাম?" জগন্নাথ বলিলেন, "তুমি নাকি বলিয়াছিলে, "আমি এ দেহ ছাড়িয়া চলিলাম, তোমার পুত্র রহিল, তাহাকে পালন করিও।" ইহাতে নিমাই বলিলেন, "কৈ বাবা, আমি ত কিছু জানি না।"

এই লীলা মুরারি গুপ্ত তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া ইহার বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ জড়চক্ষে দেখিবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ জীব সে রূপ দেখিতে ও সহ্য করিতে পারে না। জীবের নয়নে প্রকাশ পাইবার নিমিত্ত জড়-দেহের প্রয়োজন। সেই কারণে পূর্বে শ্রীভগবান শচীর গর্ভে ও জগন্নাথের ঔরসে আপনার দেহ সৃষ্টি করিলেন। সেই দেহটি শ্রীভগবানের। উহাতে অপর কাহারও প্রকাশ পাইতে কাহারও বাধা নাই। শ্রীভগবানের দেহে অক্রুর প্রকাশ পাইতে পারেন, কিন্তু অক্রুরের দেহে তদপেক্ষা যিনি ছোট, তিনিই প্রকাশ পাইতে পারেন; কিন্তু শ্রীপূর্ণব্রহ্মসনাতন প্রকাশ পাইতে পারেন না। নিমাইয়ের দেহে ও অন্যান্য দেহে এই প্রভেদ।

যে দিবস প্রভুর বলরাম আবেশ হইল, সেই দিবস ও সমুদয় তত্ত্ব অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইল। এই অদ্ভুত বলরাম প্রকাশ মুরারি গুপ্তের বাড়ীতে হয়। তিনি স্বয়ং দেখিয়া ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীভগবান্‌রূপে নিমাইয়ের মহাপ্রকাশ যেরূপ, ইহাও প্রায় সেইরূপ অদ্ভুত।

এক দিবস প্রত্যূষেই প্রভু আবেশ চিত্ত হইয়া, "মধু দাও, মধু দাও" বলিতে লাগিলেন; পরে স্বেচ্ছায় রাজপথে চলিলেন, ভক্তগণও সঙ্গে চলিলেন। প্রভু ক্রমে মুরারি গুপ্তের বাড়ী

যাইয়া উপস্থিত। তখন তাঁহার চেহারা ও রূপ কি প্রকার তাহা মুরারি গুপ্ত বর্ণনা করিতেছেন। যথা, কেশ এলোমেলো, অঙ্গে দুঃসহ তেজ, গমন মদমত্ত হস্তীর ন্যায়, লোচন ঘূর্ণিত, গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ; ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন, আবার চেতন পাইতেছেন, এবং মুহুর্মুহুঃ "মধু দাও, মধু দাও" বলিতেছেন। ইহাতে ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু আপনার এ কিরূপ আবেশ? আপনাতে সমুদয় আবেশ সম্ভাবনা, কিন্তু অদ্যকার এ আবেশ কি, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।"

কিন্তু নিমাই সে কথার উত্তর না দিয়া কেবল মেঘগম্ভীর স্বরে বারম্বার "মধু দাও, মধু দাও" বলিতে লাগিলেন। ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া তখন ঘটপূর্ণ গঙ্গাজল দিলেন। নিমাই তাহাই পান করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথা, মুরারি গুপ্তের কড়চায়—২য় প্রক্রম ১৪ সর্গঃ

বিপ্রৈরুপেতো হরিনামগায়নৈঃ হৃষ্টেহগমদ্বৈদ্যমুরারিবেশ্মনি।
তত্রাবদদ্দেহি সুধাং মধূৎকটাং প্রাচীদিবানাথ ইবাতিলোহিত।। ৪

শ্রীকবিকর্ণপুরে চৈতন্যচরিত কাব্য ৮ম সর্গ ঃ

মদঘূর্ণিতলোলাক্ষঃ ক্ষণদানাথসুন্দরঃ।
শুক্লৈর্মহোভির্গেহস্য শৈত্যং কুর্ব্বন্ননর্ত্ত সঃ।। ২৫

তখন নিমাইয়ের অঙ্গের বর্ণ ও তেজ বলরামের ন্যায় শ্বেত হইয়াছে। নিমাই কখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, আবার চেতনা পাইয়া নৃত্য করিতেছেন। তখন তাঁহার মেসো আচার্যরত্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে নাথ! হে প্রভো! এ তোমার কি ভাব?" নিমাই আবেশিত চিত্তে নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন, "আমি তোমাদের কৃষ্ণ নই, অতএব আমাকে অনায়াসে মধু দিতে পার।" ইহাই বলিয়া, তিনি যে বলরাম ও সেই জন্য অসীম বলশালী, তাহাই দেখাইবার জন্য নিকটস্থ একটী অতি বলবান্ ব্রাহ্মণকে অঙ্গুলি দ্বারা একটু হাস্য করিয়া স্পর্শ করিবামাত্র তিনি অতি দূরে যাইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ তবুও 'তিনি কে?' জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলে, নিমাই বলিতেছেন, "আমি নীলাম্বরপরিহিত, রৌপ্যবর্ণের পর্বত সদৃশ বৃহৎকায় বিশিষ্ট যে বলরাম, তাঁহাকে দর্শন করিলাম আর তিনি আমার অঙ্গে প্রবেশ করিলেন।" যথা—"হলায়ুধ মোর অঙ্গে প্রবেশ করিল।"—চৈতন্যমঙ্গল।

আর একদিন মুরারির বাড়ীতে নিমাইয়ের বরাহ আবেশ হয়। সে দিনও তিনি দেবগৃহে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "এ যে প্রকাণ্ড শূকর আমার দিকে আসিতেছেন। ইনি যে আমার মর্মে ব্যথা দিতেছেন।" ইহাই বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া বরাহের ন্যায় হইলেন।

যাহা হউক, নিমাই এইরূপে আপনাকে বলরাম বলিয়া প্রকারান্তরে পরিচয় দিলে ভক্তগণ তখন বলরামকে স্তব ও তাঁহার গুণগান করিতে লাগিলেন। নিমাই নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে প্রেমের তরঙ্গ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। শেষে তিনি উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্যের তেজ ক্রমে এরূপ বাড়িল যে নদীয়া টলমল করিতে লাগিল, আর তাঁহার হুঙ্কার ও গর্জনে কর্ণ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। যথা—ভাগবতে—"হেন সে হুঙ্কার করেন, হেন সে গর্জন। নবদ্বীপ আদি করি কাঁপে ত্রিভুবন।। হেন সে করেন মহা তাণ্ডব প্রচণ্ড। পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী হয় খণ্ড।। টলমল করে ভূমি ব্রহ্মাণ্ড সহিতে। ভয় পায় ভৃত্য সব সে নৃত্য দেখিতে।।"

একে অতি দুর্দণ্ড নৃত্য, তাহাতে বিরাম নাই, কাজেই ভক্তগণ ভীত হইয়া প্রভুকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিমাই যখন চেতনা পাইতেছেন, তখন মনের বেগ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। যখন বাহ্য জ্ঞান হইতেছে, তখন চেতন-মনুষ্যের ন্যায় দু'একটি কথা বলিতেছেন—কদাচিৎ কখন প্রভুর বাহ্য হয়। "প্রাণ যায় মোর' সবে এই কথা কয়।।' আবার আর এক অদ্ভুত কথা বলিতেছেন,—"প্রভু বলে

বাপ-কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ! মারিলেন দেখি হেন জেঠা বলরাম।।"

এ আবার কি? নিমাই শ্রীভগবান্। তবে তিনি আবার কৃষ্ণকে বাপ, আর বলরামকে জেঠা কেন বলেন? পূর্বে বলিয়াছি, শ্রীভগবান্ জীব-রূপ ধরিতে পারেন, কিন্তু জীব শ্রীভগবান হইতে পারেন না। আমরা শ্রীনিমাইয়ের লীলায় দেখিতেছি যে, এই নিমাই, শ্রীবিগ্রহ দূরে ফেলিয়া বিষ্ণুখট্টায় বসিতেছেন; গঙ্গাজল, তুলসী ও চন্দনে, এবং "গোবিন্দায় নমো" এই শ্লোকে তাহার পদপূজা করিতে দিতেছেন; কুলবালাগণকে আশীর্বাদ করিতেছেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক," বৃদ্ধ মাতার মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া বলিতেছেন, "তোমার আমাতে প্রেম হউক।" আবার দেখিতেছি, বলরাম হইয়া "ভাই কানাই" বলিয়া ডাকিতেছেন, আর গোপী হইয়া কৃষ্ণ প্রাণেশ্বরকে হারাইয়াছেন বলিয়া রোদন করিতেছেন। আবার ইহাও দেখিতেছি, নিমাই দন্তে তৃণ ধরিয়া, গলায় বসন দিয়া প্রত্যেক ভক্তের নিকট, কৃষ্ণচরণে ভক্তি প্রার্থনা কবিতেছেন, আর "বাপ-কৃষ্ণ, আমাকে উদ্ধার কর" বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন।

ইহার তাৎপর্য এখন পরিগ্রহ করুন। নিমাই বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া নির্বোধ জীবগণের নিকট আপনার পরিচয় দিতেছেন। আবার গোপী কি বলরাম ভাবে ব্রজের নিগূঢ়রস আপনি আস্বাদ করিবার ছল করিয়া, ভক্তগণকে আস্বাদ করাইতেছেন। আর যখন "হে কৃষ্ণ হে কৃপাময় আমি ভবকূলে পড়িয়া; হে পিতা! তুমি সন্তানবৎসল, তোমার দুঃখী সন্তানকে উপেক্ষা করিও না" বলিয়া ব্যাকুল হইতেছেন, তখন কিরূপে সাধন-ভজন করিতে হয়, তাহা "আপনি যজিয়া" জীবগণকে শিক্ষা দিতেছেন। এই নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীভগবানের অন্যান্য প্রয়োজন সিদ্ধির সহিত এই দুইটি ছিল,—প্রথম জীবের নিকট আপনার পরিচয় দেওয়া, আর দ্বিতীয়, কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যায় তাহার উপায় দেখাইয়া দেওয়া।

নিমাই এইরূপ বলরাম আবেশে নৃত্য করিতেছেন, আর পৃথিবী টলমল করিতেছে। হুঙ্কার করিতেছেন, আর কর্ণ যেন ফাটিয়া যাইতেছে। নৃত্য করিতে করিতে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় এরূপ জোরের সহিত পড়িতেছেন যে, তাঁহার সমুদয় অস্থি ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা। পাছে তিনি মৃত্তিকায় পড়িয়া যান, এই নিমিত্ত নিতাই প্রভৃতি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহু প্রসারিয়া বিচরণ করিতেছেন। কখনও সফল হইতেছেন, কখনও বা হইতেছেন না। নিমাই মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলে, সকলে "প্রভুর প্রাণ বাহির হইল" বলিয়া হাহাকার করিতেছেন; আর তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া মুখে জল দিতেছেন, বায়ু ব্যজন করিতেছেন, কোথায় বেদনা লাগিয়াছে কি না পরীক্ষা করিতেছেন, আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন; কেহ বা উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন।

কতক্ষণ পরে নিমাই চেতনা পাইলেন। তখন উঠিয়া বসিয়া বলিতেছেন, "আমার প্রাণ গেল, আমি আর সহিতে পারিতেছি না।" ভক্তেরা বলিতেছেন, "প্রভু ক্ষমা দিউন।" কেহ বা বলরামকে স্তব করিয়া বলিতেছেন, "হে প্রভু! এখন প্রত্যাগমন করুন।" এমন সময় নিমাই আবার বিভোর হইয়া নিতাইয়ের গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "আমার ভাই কানাই কোথা?" ইহাই বলিয়া এমন করুন স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, যাহাতে পাষাণ পর্যন্ত বিগলিত হয়। এইরূপ ভাবে কান্দিতে কান্দিতে, হঠাৎ "এই যে আমার কানাই" বলিয়া আনন্দে বলরামের নৃত্য আরম্ভ করিলেন, অমনি ভক্তগণের প্রাণ উড়িয়া গেল। কিন্তু ভক্তগণও ক্রমে সেই তরঙ্গে পড়িয়া নাচিতে লাগিলেন। ক্রমে ভক্তগণের ভয় কমিল বটে, কিন্তু তাঁহারা শীঘ্র ক্লান্ত হইলেন, আর নৃত্য করিতে পারিলেন না। নিমাইয়ের নৃত্য কিন্তু সমভাবে দুইদিন চলিল। "আনন্দে ভরল নাহি দিগ্‌বিদিগে। দুই দিন গেল প্রভুর আনন্দ না ভাঙ্গে!" তখন ভক্তগণ দিশেহারা হইয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। দুই দিবস অনবরত উদ্দণ্ড নৃত্য করিবার পর নিমাই নিপট্ট-বাহ্য পাইলেন। যখন এই মহা-নৃত্য হয় তখন

অনেকে অনেক প্রকার অলৌকিক দর্শন করিলেন। শ্রীরাম আচার্য দেখিলেন যে, সমুদয় আকাশমণ্ডল নানা বেশধারী দীপ্তকায় দেবগণ দ্বারা পরিপূরিত, যথা মুরারি গুপ্তের কড়চায়— "শ্রীরামনামা দ্বিজবর্য্যসত্তমোঽপশ্যত্তদা তত্র সমাগতান্ বহুন। কর্ণৈকপদ্মান কমলায়তেক্ষণান্ শ্রোত্রৈকবিন্যস্তসুকুন্তলার্চ্চিযা। বিদ্যোতমনান্ সিতবস্ত্রমস্তাকান্ শ্রুত্বা ততোঽন্যো ননৃতুঃ প্রহর্ষিতাঃ"১৯।

তথা কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচরিত কাব্য, ৮ম সর্গে—

"শ্রীরামনামা বিপ্রাগ্র্যো দদর্শাকাশমণ্ডলাৎ।
সমাগতান্ মহাকান্তীন্ মহাদীপ্তিন্ মহাজনান্।। ৪২।।
দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গান্ দিব্যাভরণভূষিতান্।
দিব্যস্রগ্বসনান্ দিব্যান্ দিব্যরূপ-গুণাশ্রয়ান্।। ৪৩।।
এককর্ণধৃতাম্ভোজ কর্ণপুর মনোহরান্।
উষ্ণীষপট্টসংশ্লিষ্ট মস্তকান্ হৃষ্টমানসান্।।" ৪৪।।

"ঐ সময়ে শ্রীরাম নামক একজন বিপ্রাগ্রগণ্য আকাশমণ্ডলে সমাগত মহাকান্তি এবং মহাদীপ্তিশালী বহুসংখ্যক মহাপুরুষ অবলোকন করিলেন। সেই সকল মহাপুরুষদিগের অঙ্গ দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত, দিব্যাভরণে ভূষিত, দিব্যমাল্য ও দিব্যবসনযুক্ত এবং স্বয়ং তাঁহারাও দিব্য অর্থাৎ স্বর্গীয় পুরুষ ও সুদিব্য রূপগুণযুক্ত তথা এক কর্ণে পরিহিত কর্ণপুর (কর্ণভূষণ) দ্বারা তাঁহাদের অবয়ব অত্যন্ত মনোজ্ঞ, পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষে মস্তক সংশ্লিষ্ট এবং তাঁহাদের মন অতিশয় হর্ষযুক্ত।"

আবার বনমালী আচার্য্য আকাশমণ্ডলে পর্বতাকার সুবর্ণ নির্মিত লাঙ্গল দর্শন করিলেন। যথা মুরারি গুপ্তের কড়চায়—

"তত্রৈব কশ্চিদ্বনমালিনামা পশ্যত্তালং কাঞ্চননির্মিতং ক্ষিতৌ।
সৌনন্দনং সূর্য্যকরপ্রকাশকং সংহৃষ্টরোমাশ্রুভিরার্দ্রবিগ্রহঃ।।" ২০।।

তবে ভক্ত মাত্রেই একটি আশ্চর্য দর্শন করিয়াছিলেন। নিতাই নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় সকলে বারুণীর গন্ধ পাইলেন। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য ভ্রমর মেঘের ন্যায় আসিয়া একেবারে আকাশ আচ্ছন্ন করিল। যথা চৈতন্যচরিত কাব্য—

"তং তং গন্ধং সমাঘ্রায় মনোৎকটমতিস্ফুটং।
আকস্মিকৈরিব ঘনৈর্ভ্রমরৈঃ পিদধে নভঃ।।" ৪১।।

এই বলরাম-আবেশে প্রভু বহু কার্য সাধন করিলেন। ইহা দ্বারা শ্রীবলরাম, যিনি সখ্যরসের আধার, তাঁহার কানাইয়ের প্রতি প্রেম কিরূপ তাহা আপনি আস্বাদ করিয়া ভক্তগণকে আস্বাদ করাইলেন। কিশোরীর প্রেম যেরূপ দুর্লভ বস্তু, বলরামের প্রেমও সেইরূপ।

অপিচ যাঁহারা শ্রীভগবানের অবতার বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহাদের ন্যায় সুখী জীব ত্রিজগতে নাই। কারণ অবতার বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁহাদের আর একটি বিশ্বাস আছে। সেটি এই যে, শ্রীভগবান্ নিজ-জন, তিনি জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত এত ব্যস্ত যে, স্বয়ং আসিয়া তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া তাঁহাদের নিশ্চিন্ত করেন ও স্বয়ং তাঁহাদের সহিত সঙ্গ করিয়া তাঁহাদের সুখ বৃদ্ধি করেন। এই বলরাম-আবেশে তাঁহাদের সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

পশুর সমান, করিতে অজ্ঞান, যেত অনায়াসে কাল।
পরিণাম জ্ঞান, দিলে ভগবান, ভাবিতে পরাণ গেল।
কি লাগি সৃজিলে, গোপন রাখিলে, ভাবিয়া ভাবিয়া মরি।
বলা'য়ের প্রাণ করে আনচান, দেহ পদ গৌরহরি।।

নগর-কীর্তন করিয়া নিমাই আবার ঘরে কবাট দিলেন। নগর-কীর্তন করিয়া নবদ্বীপে ভক্তিদান প্রভৃতি কার্য এক প্রকার তাঁহার শেষ হইয়া গেল। বাহিরের লোকের সহিত সঙ্গ করিবার শক্তিও তাঁহার এক প্রকার রহিল না, কারণ তাঁহার নয়নে দিবানিশি কেবল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল; অভ্যাসবশতঃ দেহের কার্য,--যথা স্নানাহার ইত্যাদি সমাধা করেন। ভক্তগণ সর্বদা সঙ্গে থাকেন, কখন বা সঙ্গে করিয়া নগর ভ্রমণেও লইয়া যান, কিন্তু (যথা চৈতন্য ভাগবতে)—"কি নগরে কি চত্বরে কি জলে কি বনে। নিরবধি অশ্রুধারা বহে শ্রীনয়নে।। ১।।

আর সে হাস্যকৌতুক রহিল না, আর যে কৃষ্ণকথা রহিল না, এমন কি, সংকীর্তন পর্যন্ত করিবার শক্তি রহিল না। নিমাই ভাবে বিভোর, কে কীর্তন করে? কাজেই ভক্তগণ শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুকে প্রধান করিয়া সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। নিতাই, গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম প্রভৃতি ভক্তগণ সর্বদা প্রভুর বাড়ীতে প্রভুর সঙ্গে থাকেন। নিমাইকে সকলে যখন যেখানে লইয়া যান, তখন তাঁহাকে একেবারে ঘিরিয়া থাকেন। কেন? যথা (চৈতন্য ভাগবতে)--"কেহ মাত্র কোনরূপে বলে যদি হরি।। শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা পাসরি।।"

এইরূপে দুষ্ট কি অবিবেচক লোকে ভক্তগণকে দুঃখ দিত। নিমাই স্নান করিয়া ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছেন, এমন সময় কেহ রঙ্গ দেখিবার নিমিত্ত হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। আর নিমাই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় আর্দ্রবস্ত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পথে পড়িয়া গেলেন। ঘোর মূর্চ্ছা ও লোকের সংঘট্ট দেখিয়া ভক্তগণ নিমাইকে ধরাধরি করিয়া লইয়া চলিলেন। বাড়ীতে যাইয়া আবার স্নান করাইলেন, এবং বহুক্ষণ পরে নিমাই 'হরি হরি' বলিয়া চেতনা পাইলেন। স্নান করিয়া নিমাই বিষ্ণুপূজা করিতে চলিলেন। পূজা করিতে বসিয়া নয়নজলে বস্ত্র আর্দ্র হইয়া গেল। তখন বস্ত্রখানি অশুদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। আবার পূজায় বসিলেন, আবার নয়নজলে বস্ত্র আর্দ্র হইল। এইরূপে চারিবার বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, শেষে বুঝিলেন যে, তাঁহা দ্বারা পূজা আর হইবে না। তখন গদাধরকে অতি বিষণ্ণ চিত্তে বলিলেন, "গদাধর! আমার ভাগ্যে নাই, তুমি পূজা কর।"

আপনার রসে বিভোর, মোটে বাহ্যজ্ঞান নাই, তাতে নিমাই সংসারের কথা কি বলিবেন? শচী নিমাইয়ের এই নূতন অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। শচীর দুঃখ দেখিয়া নিমাই মাঝে মাঝে বিশেষ চেষ্টা করিয়া একটু সচেতন হয়েন, এমন কি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিতও কিছু কাল অতিবাহিত করেন। কিন্তু সে অল্পক্ষণ মাত্র। শ্রীনিমাইয়ের দিবানিশি ভেদজ্ঞান লোপ হইয়া গেল।

জ্বর সচরাচর অষ্ট দিনের পর ছাড়িয়া যায়। যাহার জ্বর ছাড়িতে দুই পক্ষ লাগে, তাহার অষ্ট দিবসে না ছাড়িয়া আরো বৃদ্ধি পায়। যাহার জ্বর তিন সপ্তাহ থাকিবে, দুই সপ্তাহের শেষ দিবসে তাহার জ্বর না ছাড়িয়া আরো বাড়িয়া উঠে। গয়া হইতে শুভাগমন করিয়া নিমাই প্রেম-তরঙ্গে ভাসিতেছিলেন। ক্রমে সেই তরঙ্গ স্থির হইয়া যাইবার কথা। সামান্য জীবের এইরূপে নবানুরাগ আরম্ভ হইয়া, পরে যাহার যেরূপ আধার, সে সেইরূপ প্রাপ্তিতে শান্ত হয়; নিমাইয়েরও সেইরূপ হইতেছিল। তিনি পূর্বকার ভক্তি-ধন এই নয় মাস উপভোগ করিয়া শান্ত হইতেছিলেন, হইতে হইতে আর একটি বিষম তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে আবার ডুবাইয়া ফেলিল। সে তরঙ্গ আসিবার পূর্বলক্ষণ যে সময় উপস্থিত হইল, তাহা উপরে অল্প কিছু বলিলাম। এ তরঙ্গটি কিরূপে তাহা ক্রমে বলিতেছি।

শ্রীনিমাই বাড়ীতে আপনার ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। নিতাই, গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম প্রভৃতি সেবা করিতেছেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে অদ্বৈত এবং অন্যান্য সকলে কীর্তন করিতেছেন। প্রভুর আজ্ঞাক্রমে, তিনি নিজে পারুন না পারুন, নিশিতে কীর্তন বন্ধ হইত না। এক দিন কীর্তনে অদ্বৈত অত্যন্ত অস্থির হইলেন, অতিশয় দুঃখ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তখন আরো উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইহাতে অদ্বৈত শান্ত না হইয়া

আরো অস্থির হইতে লাগিলেন। নিশি প্রভাত হইল, ক্রমে দুই প্রহর বেলা হইল। ভক্তগণ শান্ত হইলেন ও নানারূপে অদ্বৈতকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন।

অদ্বৈত কহিলেন, "তোমরা স্নানে গমন কর, আমি বিশ্রাম করিয়া পরে যাইব।" ভক্তগণ স্নানে গমন করিলেন, অদ্বৈত ঘরের দাওয়ায় একলা বসিয়া তাঁহার মনের যে দুঃখ রূপ অগ্নি তাঁহাকে দহন করিতেছিল, আবার তাহাতে বায়ুব্যজন করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতের কি দুঃখ তাহা বলিতেছি। অদ্বৈত স্বয়ং মহাদেব, তাঁহার দুঃখ শুনিয়া হয়ত কোন ভক্ত একটু হাস্য করিলেও করিতে পারেন। আবার কোন কোন ভক্ত, তাঁহাকে মনে মনে একটু নিন্দা করিতেও পারেন। কিন্তু হে শ্রোতা মহোদয়গণ। আপনারা কৃপা করিয়া অতি শীঘ্র কোন সিদ্ধান্ত করিবেন না। অদ্বৈতের মনে কি দুঃখ, তাহা বলিতেছি। তাঁহার মনে সেই পুরাতন, সেই চিরদিনের দুঃখ হুতাশনের ন্যায় প্রচণ্ড বেগে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ভাবিতেছেন,—এই যে জগন্নাথের পুত্র নিমাইচাঁদ, যাহাকে তিনি ভজনা করিতেছেন,—ইনি কি সত্যই তিনি, তাঁহার ভজনীয় বস্তু,—শ্রীনন্দনন্দন? অদ্বৈত মনে মনে নিমাইকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "প্রভু! আমি জীবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নীচ। তোমার ভক্তমাত্র নিশ্চিন্ত হইয়া তোমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া প্রেম-সরোবরে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। আর আমি কি হতভাগ্য, কেবল আমিই তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না! এত দেখিলাম, এতবার বিশ্বাস করিলাম, কই তবু'ত আমার মন হইতে সন্দেহ-বীজ গেল না? তাই বুঝিলাম, আমি অতি নরাধম, আমি তোমার নিকট নিতান্ত অপরাধী; তাহা হইবারই কথা। আমাকে না তুমি প্রণাম কর, ভক্তি কর, স্তুতি কর? আমাকে তোমার আপন ভাবিলে তুমি কি এরূপ করিতে? নিত্যানন্দ তোমার নিজ-জন, তোমার দাদা; আর আমি তোমার দাস হইতেও পারিলাম না? কাহাকে দোষ দিব? আমি আমার আপনার অভিমানে এ জন্ম নষ্ট করিলাম।" ইহাই ভাবিতে ভাবিতে সন্দেহজ্বরে জর্জরিত হইয়া পিঁড়া হইতে "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া আঙ্গিনায় পড়িয়া গেলেন, আর বাণবিদ্ধ জীবের ন্যায় ঘোর আর্তনাদে সেই ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীনিমাই তাঁহার বাড়ীতে বসিয়া অঝোর নয়নে,—কি মনের ভাবে তিনিই জানেন—ঝুরিতেছেন। নিত্যানন্দ স্নান করিতে গিয়াছেন, সুতরাং তখন তিনি সঙ্গে নাই। যখন শ্রীঅদ্বৈত "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া শ্রীবাসের ঘরের পিঁড়া হইতে আঙ্গিনায় পড়িয়া গেলেন, তখন সেই কাতরধ্বনি কেহ শুনিল না; কিন্তু নিমাই যদিও বহু দূরে, তবু উহা শুনিলেন, শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। আর বৎসহারা গাভীর ন্যায় এদিকে ওদিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার অচেতন ভাব তদ্দণ্ডে অন্তর্হিত হইল, আর দ্রুতগতিতে শ্রীবাসের বাড়ীর পানে ছুটিলেন। যে ভক্তগণ সেখানে ছিলেন, তাঁহারাও সঙ্গে চলিলেন। কিন্তু নিমাই তাঁহাদিগকে কিছু বলিলেনও না, লক্ষ্যও করিলেন না,—বরাবর শ্রীবাসের বাড়ী যাইয়া আঙ্গিনায় শ্রীঅদ্বৈত যে "প্রাণ যায়, প্রাণ যায়" বলিয়া কাতরে গড়াগড়ি দিতেছেন, তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন, এবং তাঁহার গাত্রে হস্ত দিলেন। অদ্বৈত শ্রীকরকমল-স্পর্শে শীতল হইলেন ও নয়ন মেলিলেন। তখন দুই জনের চারিচক্ষে মিলন হইল। কিন্তু দুইজনের চক্ষে পৃথক পৃথক ভাব। অদ্বৈতের চক্ষু পরিচয় দিতেছে যে, তিনি অকুল পাথারে ভাসিতেছেন, আর শ্রীনিমাইয়ের চক্ষু দেখিয়া অদ্বৈত বুঝিলেন যে, নিমাই বলিতেছেন, "ভয় কি? এই যে আমি।" শ্রীনিমাইয়ের তখন ভগবান্ ভাব।

একটু পরে শ্রীনিমাই অদ্বৈত প্রভুকে ঠাকুর ঘরে লইয়া বলিলেন, "এই ত আমি সম্মুখে। তুমি আর চাও কি?" অদ্বৈত এ কথার যে একমাত্র উত্তর সম্ভব তাহাই দিলেন, অর্থাৎ বলিলেন "প্রভু, তা বটে, তুমি যখন সম্মুখে, তখন আর আমার চাহিবার কিছু নাই।" কিন্তু ইহা বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কি ভাবিতে লাগিলেন, তাহা তাঁহার পরের কথায় প্রকাশ পাইল। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, "তা বটে, তুমি যখন সম্মুখে, তখন আর আমার কিছু চাহিবার নাই। কিন্তু তুমি কে?

তুমি কি সেই তুমি, যিনি আমার একমাত্র সন্দেহ—সেই শ্রীনন্দনন্দন? তুমি যে সেই, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কারণ আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে অপর কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সেইরূপ সিদ্ধান্তও শতবার করিয়াছি, কিন্তু তবু ক্রমে উহা নষ্ট হইয়া আবার সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন আমার তোমাকে দর্শন করিয়া সে সন্দেহ একেবারে ঘুচিয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্বেও এরূপ সন্দেহ হইয়াছিল, আর তোমাকে দেখিয়া উহা ঘুচিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় হইয়াছিল। এবার যে সে সন্দেহের মূল উৎপাটিত হইল, তাহার ঠিক কি? হয় ত, তুমি যেই দূরে যাইবে অমনি আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হইবে। অতএব আর লজ্জা, ভয় কি অনুরোধে আপনার কাজ ছাড়িব না। এবার একেবারে জন্মের মত সন্দেহটা উৎপাটিত করিয়া ফেলিব। তোমাকে আমি এরূপ পরীক্ষা করিব যে, তুমি আমার প্রভু না হইলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না।"

এইরূপ যখন অদ্বৈত ভাবিতেছেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনিই স্বীকার করিতেছ তোমার চাহিবার কিছু নাই, তবে ওরূপ কাতর কেন হইতেছ, তোমার কি দুঃখ বল।" তখন অদ্বৈত বলিলেন,—"আমার চাহিবার কিছু আছে, তুমি কিছু বৈভব দেখাও"। গৌরাঙ্গ বলিলেন, "কি বৈভব দেখিবে?"

তখন অদ্বৈত বলিলেন, "তুমি অর্জুনকে যে বিশ্বরূপমূর্তি দেখাইয়াছিলে, তাহাই আমাকে দেখাও।" অদ্বৈতের মনের ভাব এই যে, স্বয়ং সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, অর্থাৎ সেই শ্রীনন্দনন্দন ব্যতীত অন্য কোন দেবতাই শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ-মূর্তি দেখাইতে পারিবেন না। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ যদি বিশ্বরূপ দেখাইতে পারেন, তবে তিনি যে "সেই" তাঁহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

অদ্বৈত যে মাত্র বলিলেন,—"বিশ্বরূপ দেখিব," অমনি তাহার সম্মুখ হইতে জড়-জগৎ অন্তর্হিত হইল। আর সম্মুখে একটি তেজোময় দেহ দেখিতে লাগিলেন। সে দেহের সমুদয় অনন্ত। যখন তাঁহার চক্ষুর দিকে দৃষ্টি করেন, দেখেন তাঁহার চক্ষু অসংখ্য। এইরূপে তাঁহার অগণিত মস্তক, বাহু ও পদ দেখিলেন। আবার যে অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন; তাহারই সীমা পাইলেন না। ইহা দেখিয়া অদ্বৈত মূর্চ্ছিত হইতেছেন, আর শ্রীগৌরাঙ্গ "দেখ দেখ" বলিয়া হুঙ্কার করিতেছেন, এবং অদ্বৈত চেতনা পাইতেছেন।

ওদিকে নিতাই প্রভুকে বাড়ীতে না পাইয়া তল্লাস করিতে করিতে শ্রীবাসের ঠাকুর-ঘরে আসিয়া পাইলেন। ঘরে কবাট বন্ধ, ভিতরে প্রভুর হুঙ্কার শুনিয়া, তিনিও বাহির হইতে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছাক্রমে অদ্বৈত কবাট খুলিয়া দিলেন, ও নিত্যানন্দ ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া, বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া, ভয়ে নয়ন মুদিয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সে রূপ সম্বরণ করিলেন। অমনি অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রকৃতিস্থ হইলেন। বিশ্বরূপ দেখিয়া উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত বলিতেছেন, "মাতাল! তোকে এখানে ডাকিল কে?" নিতাই বলিলেন, "আমাকে ডাকিবে কে? আমি ঠাকুরের দাদা, আমি আসিয়াছি, তুমি এখানে কেন?" অদ্বৈত তখন কাল্পনিক ক্রোধ করিয়া বলিতেছেন, "পশ্চিম-দেশে যার-তার ভাত খেয়ে, এখন বড় শুদ্ধ ব্রাহ্মণ হয়ে, আমাদের জাতি মারিতে আসিয়া আবার ঠাকুরের দাদা হয়েছেন!"

নিত্যানন্দ বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, আমার আবার অন্নে দোষ কি? তুমি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়া ঘর-সংসারী। আমি সন্ন্যাসী, আমাকে শাসন কর, তোমার প্রাণে ভয় নাই?" অদ্বৈত বলিলেন, "দিনে তিনবার ভাত খাও। মাছ খাও, মাংস খাও, তুমি ত ভারি সন্ন্যাসী!" তাহার পরে আবার উভয়ে উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

অদ্বৈতের এইরূপ কথায় কথায় সন্দেহ কেন? কিন্তু পূর্বে এ বিষয় বিচার করিয়াছি। ব্রহ্মা কি ইন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারেন নাই। সদাশিবও কখন কখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। এবারও যে তিনি মাঝে মাঝে শ্রীভগবানের সহিত বিরোধ দেখাইবেন, সে আর বেশি কথা কি?

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি শ্রীঅদ্বৈতের যে প্রেম, তাহার অবধি নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার প্রাণ, বুদ্ধি, মন, আদি ও অন্ত। তিনি যে মাঝে মাঝে অতি-প্রীতিতে এরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত হইবেন, তাহা বিচিত্র কি? কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, অদ্বৈতের এই সন্দেহভাবের আরো নিগূঢ় কারণ আছে। শ্রীঅদ্বৈতের এই যে সন্দেহ-ভাব, ইহা প্রায় জীবমাত্রেরই হইয়া থাকে। নিত্যানন্দের যে গাঢ় বিশ্বাস, উহা সামান্য জীবে ঘটে না। শ্রীভগবানে গাঢ় বিশ্বাস সহজে হয় না,—বিশ্বাস হয়, আবার যায়। গৌরচন্দ্র কোন সময়ে প্রতাপরুদ্রকে চতুর্ভুজ মূর্তি দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বিশ্বাস করিলেন যে প্রভু পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলেন, বৈকুণ্ঠে ভক্তমাত্রেই চতুর্ভুজ হইয়া থাকেন। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ ঐরূপ দেখাইলেন বলিয়া তিনি যে ভগবান, ইহা ঠিক প্রমাণ হইল না। তাহাই ভাবিয়া অবিশ্বাসকে আবার মনে স্থান দিয়াছিলেন।

এই গৌর-অবতারে তিনি স্বয়ং ও তাঁহার সহচরগণ সকলেই, তাঁহাদের চরিত্র দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, অধিকাংশ জীবের যে ভাব হয়, তাহা গ্রহণ করিলেন,—অর্থাৎ অবিশ্বাস। প্রথমত তিনি দেখাইলেন যে সে সময় লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীগৌরহরিকে শ্রীভগবান বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন, সে সহজে নহে। এখনকার সুসভ্য কৃত-বিদ্য লোকে ভাবিতে পারেন যে, যাঁহারা গৌরহরিকে অবতার বলিয়া মানিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিচারশক্তি তত ছিল না। কিন্তু যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা অদ্বৈত বস্তুটি কি তাহা একবার পর্যালোচনা করুন। ভক্তগণ তাঁহাকে স্বয়ং মহাদেব বলিয়া জানিয়াছিলেন, আর অন্যান্য লোক তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন। এই অবতারের পূর্বে তিনি বৈষ্ণবগণের রাজা ছিলেন। অদ্বৈত প্রভু শ্রীহট্টে যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানকার রাজা উদাসীন হইয়া, "কৃষ্ণদাস" নাম লইয়া অদ্বৈতের ঘরে পড়িয়া যখন অবতারের কথা উঠিল, তখন এমন চর্চা হইয়াছিল যে, "কে কৃষ্ণ—শ্রীনিমাই বা শ্রীঅদ্বৈত?" অদ্বৈতের ন্যায় সর্বশাস্ত্রে বিশারদ তখন আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার শক্তি দেখিয়া লোকে তাঁহাকে মুনি-ঋষি বলিত। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, "অবতার এখনও হইয়া থাকে। একজনকে লইয়া পাঁচ জনে কোন কারণে পাগল হইয়া, তাহাকে ভগবান বলে। গৌর-অবতারও সেইরূপ। তবে গৌর-অবতার নয় কিছু বড়, আর এখনকার অবতার কিছু ছোট।" কিন্তু আপনারা একথা মনে রাখিবেন যে, অবতার ব্যাপার শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বে ছিল না। যখন গৌর-অবতার বলিয়া ধ্বনি উঠিল, তখন লোক নূতন কথা শুনিল। সুতরাং তখন অবতারে বিশ্বাস স্থাপন করান একরূপ অসাধ্য ছিল। এখন সেই দেখাদেখি অবতার হইতেছে, কাজেই অবতার হওয়া সোজা।

পূর্বেই দেখাইয়াছি, নদীয়ার তখন কি অবস্থা ছিল। দীধিতি গ্রন্থ ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করে, এরূপ লোক এখন নাই। সে সময়ে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ভক্ত ও তাপস ছিলেন। তাঁহাকে ঈশ্বরের ন্যায় সকলে মান্য করিত। তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বেসর্বা ছিলেন। তিনি কিরূপে ক্রমে শ্রীগৌরহরিকে গ্রহণ করিলেন, তাহা তিনি জীবগণকে দেখাইলেন। তিনি যেরূপ পদে পদে অবতার পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এখন ইহা অপেক্ষা অধিক সুসভ্য, সুপণ্ডিত, সুবোধ হইয়াও তুমি ইহার অধিক আর কি করিতে পার? আহা! মরি-মরি! অদ্বৈতপ্রভুর দুঃখ দেখ। অবিশ্বাসের বিন্দুমাত্র হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, আর তিনি ত্রাহি-ত্রাহি করিয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর চরিত্র ধ্যান করিয়া তুমি বড় উপকার পাইবে। তুমি দেখিবে যে, অবতার পরীক্ষার নিমিত্ত যাহা করা আবশ্যক তিনি জীবের উপকারের নিমিত্ত তাহা সমুদয় করিয়াছেন। যদি শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় শ্রীঅদ্বৈত স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেন, তবে আজ আমাদের কি দশা হইত! হে অবিশ্বাসী জীব! তুমি নিত্যানন্দের ন্যায় গা ঢালিয়া দিতে না পারিয়া, অদ্বৈতের পন্থা অবলম্বন করিতে নিরস্ত হইতে; আর মনকে ইহাই বলিয়া বুঝাইতে যে, "আমি অবিশ্বাসী, আমার দ্বারা ওরূপ গা ঢালিয়া দেওয়া চলিবে না; কাজেই ও পথ অবলম্বন করাও চলিবে না।" কিন্তু জীব, তোমার দর্শনশক্তি অল্প, সুতরাং তুমি সন্দিগ্ধ-চিত্ত; অতএব সন্দিগ্ধ-চিত্ত বলিয়া দুঃখ ঃ

না। তুমি অদ্বৈতের ব্যবহার অনুকরণ কর। জোর করিয়া বিশ্বাস করিও না। সত্য বস্তু বিশ্বাস করিতে জোর কেন করিতে হইবে? তোমরা অদ্বৈতের ন্যায় কথায় কথায় আপত্তি কর, বুঝিয়া সুঝিয়া ভজনীয় বস্তু বাছিয়া লও। ইহা করিতে পদে পদে সন্দেহ আসিবে! কারণ সন্দেহ জীবের স্বভাবসিদ্ধ; কেবল তাহা নয়, ইহা শ্রীভগবানের প্রধান আশীর্বাদ। সন্দেহ দ্বারা হৃদয়ের কর্ষণ হয় ও তাহার পরে বিশ্বাসরূপ বীজ বপন করিলে সতেজ বৃক্ষ হয়। যেই পরিমাণ সন্দেহ দ্বারা হৃদয় কর্ষিত হয়, সেই পরিমাণ বিশ্বাসরূপ অঙ্কুর মূল হৃদয়ে প্রবেশ করে। তবে এক কাজ করিও। বিশ্বাস প্রার্থনীয়, অবিশ্বাস নয়। যদি মনে সন্দেহের বীজ উদয় হয়, তবে "আমি বড় বুদ্ধিমান" ইহা বলিয়া গৌরব না করিয়া, উহার নিমিত্ত ক্ষুব্ধ হইও, ও শ্রীঅদ্বৈতের ন্যায় "ত্রাহি ত্রাহি" করিও। তাহা হইলে শ্রীভগবান্ সেই সন্দেহের অপনয়ন করিয়া স্বহস্তে বিশ্বরূপ বীজ, তোমার হৃদয়ে রোপন করিবেন।

অষ্টম অধ্যায়

একলা বসিয়া বঁধুয়া, বাঁশীর স্বরে করে গান।
বঁধুয়ার বিনোদিয়া তান, তাহে অবলার প্রাণ, আমার হরে নিল জ্ঞান,
শ্যাম আমায় পাগল কল্লে, গেল কুল-শীল-মান।।
ফুটলো পিরীতের ফুল, মধুভরে টলমল, উঠছে আনন্দের হিল্লোল,
রসে অঙ্গ পড়ে খসে, আহ্লাদে প্রাণ আটখান।।"

—শ্রীবলরাম দাস।

পূর্বে বলিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে আর একটি তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে ডুবাইয়া ফেলিল। এ তরঙ্গটি কি বলিতেছি। প্রথমে মনে রাখুন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান-রূপে প্রকট হইয়া, তিনি কি বস্তু তাহার পরিচয় দিতেন, আর ভক্তরূপে প্রকটিত হইয়া সেই ভগবানকে কিরূপে ভজন করিতে হয় তাহাও শিখাইতেন। এইরূপে ভক্তভাবে গয়ায় গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া, ও ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র লইয়া ভক্তিরসে মগ্ন হইলেন, এবং ভক্তগণ লইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন আরম্ভ করিলেন। হরিমন্দির-মার্জন, নাম-সংকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণলীলা আস্বাদন প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা ভজন ও ভক্তি-পরিবর্ধন করিতে করিতে, ক্রমে তাঁহার পার্ষদগণ শ্রীভগবানকে পাইলেন। এইরূপে আপনি ভজিয়া, ভক্তগণকে দেখাইলেন যে, ভক্তিচর্চা কিরূপে করিতে হয়, আর ভক্তিচর্চা করিলে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়। যখন পার্ষদগণ ভক্তিচর্চা করিয়া ভগবৎদর্শনের উপযুক্ত হইলেন, তখন আপনি ভক্তভাব ছাড়িয়া ভগবানরূপে প্রকাশ হইলেন; এবং শ্রীভগবানের স্বরূপ, আকৃতি প্রকৃতি সমুদয় তাঁহাদিগকে দেখাইলেন। সুতরাং ভক্তিসাধন-কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে নূতন তরঙ্গ আসিল, এবং উহা দ্বারা "প্রেম" সাধন-কার্য্য আরম্ভ হইল।

প্রেম ও ভক্তি বিভিন্ন বস্তু। পূর্বে এই গ্রন্থে সাধুগণের পথ অবলম্বন করিয়া প্রেম ও ভক্তির বিভিন্নতা দেখাই নাই। ভক্তিকে প্রেম বলিয়াই উক্তি করিয়াছি। পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রভু শুক্লাম্বরকে প্রেমদান করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে ভক্তিই দিয়াছিলেন। প্রেমের চর্চা প্রকৃত-প্রস্তাবে তখনও আরম্ভ হয় নাই। পিতা ও পুত্র উভয়েই উভয়ের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব। পুত্রের পিতার উপর যে ভাব, তাহা ভক্তি ও প্রেম মিশ্রিত। পিতার শিশু পুত্রের উপর যে ভাব, তাহা শুদ্ধ প্রেম, তাহাতে ভক্তির লেশমাত্র নাই। সেইরূপ কোন ব্যক্তির কাহারও উপর প্রেমের লেশমাত্র নাই, অথচ সম্পূর্ণ ভক্তি আছে। হরিমন্দির-মার্জনা শুদ্ধ ভক্তির কার্য। পূজা-অর্চনা প্রায়ই ভক্তির কার্য, ব্যক্তিবিশেষ উহা বিশুদ্ধ ভক্তির কার্যও হইতে পারে। এ পর্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ যতরূপ সাধন করিলেন, ইহা হয় শুদ্ধ ভক্তির সাধন, কি প্রধানতঃ ভক্তির সাধন। যথা প্রার্থনা, অর্চনা, বন্দনা, নামকীর্তন প্রভৃতি। তখন শ্রীনিমাই ভক্ত ও ভগবান্ ভাবে বিরাজ করিতেছিলেন। এই ভগবান্-ভাবে বিষ্ণুখট্টায়

বসিলেন, আবার তখনই সে ভাব ত্যাগ করিয়া "কৃষ্ণ আমায় কৃপা কর" বলিয়া ধূলায় পড়িলেন। যথা চৈতন্যভাগবতে— "ক্ষণে হয় স্বানুভাব দম্ভ করি বৈসে। 'মুঞি সেই' 'মুঞি সেই' বলি বলি হাসে।। সেইক্ষণে 'কৃষ্ণরে বাপরে' বলি কান্দে। আপনার কেশ আপনার পায়ে বান্ধে।।" "কখনো ঈশ্বর ভাবে প্রভুর প্রকাশ। কখনো রোদন করে বলে মুঞি দাস।।"

এইরূপে যখন তিনি কৃষ্ণদাস হইতেন, তখন নিমাইপণ্ডিত থাকিতেন, তখন নিমাইপণ্ডিত উদ্ধবের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিতেন। যখন নূতন তরঙ্গ আসিল, প্রেমের চর্চা আরম্ভ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণদাসত্ব গেল, নিমাইপণ্ডিতও গেল। তবে শ্রীগৌরাঙ্গ কি হইলেন,—না শ্রীরাধা। পূর্বে নিমাই দুইরূপে প্রকাশ হইতেন,—"ভক্ত ও ভগবান"; বা "কৃষ্ণদাস নিমাইপণ্ডিত" ও "শ্রীভগবান্ নিমাইপণ্ডিত।" সে সাধনে শ্রীভগবান্ ছিলেন রাজা, কি প্রভু, দয়াময় ইত্যাদি। এখন নিমাইপণ্ডিত হইলেন, "রাধা ও কৃষ্ণ", ---নিমাইপণ্ডিতত্ব আর কিছুই রহিল না। এখন নিমাইপণ্ডিত রাধাভাবে প্রকাশ পাইয়া, কৃষ্ণকে "করুণাময়" কি "প্রভু" বলা ছাড়িয়া বলিতে লাগিলেন,—প্রাণেশ্বর। পূর্বে উদ্ধব ও কৃষ্ণরূপে, এখন বাধা-কৃষ্ণরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।

পূর্বে দেখাইয়াছেন, ভক্তিসাধন কিরূপ, ও ভক্তিসাধনে ঐশ্বর্যশালী ভগবানকে পাওয়া যায়। এখন দেখাইতেছেন, প্রেমসাধন কিরূপ, ও এই প্রেমসাধনে যাঁহাকে লাভ হয়, তিনি ঐশ্বর্যশালী শ্রীভগবান্ নহেন মাধুর্যময় বস্তু। ভক্তিসাধনে যে ভগবানকে পাওয়া যায়, তিনি করুণাময়, ন্যায়পরায়ণ, বদান্যবর ও ক্ষমাশীল। প্রেমসাধনের যে সাধ্যবস্তু, তিনি পরম মিষ্ট, সুন্দর, রসিক, কৌতুকপ্রিয়, প্রেমময়, মিষ্টভাষী বন্ধু। ভক্তিসাধন কর, বৈকুণ্ঠে নারায়ণকে পাইবে; প্রেম-সাধন কর, গোলকে শ্রীনন্দনন্দনকে পাইবে। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ এক্ষণে হইলেন---শ্রীরাধাকৃষ্ণ; কখনো শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেন, কখনো শ্রীকৃষ্ণভাবে রাধাকে আলিঙ্গন করেন। কখনো "কৃষ্ণ প্রাণনাথ" বলিয়া রোদন করেন, কখনো "রাধা প্রাণেশ্বরী" বলিয়া রোদন করেন। কখনো সুধোগ্দারী মুরলী বাজাইয়া "রাধা" বলিয়া ডাকেন, কখনো শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়া "এসেছ" বলিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হন। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ সুরধুনীতে স্নান করিতে গিয়া দেখেন যে, পুলিনে ফুলের বন ও তাহার নিকটে গাভী চরিতেছে। দেখিয়া ভাবে বিভোর হইলেন। মনে হইল, তিনি বৃন্দাবনে, আর যে সকল গাভী চরিতেছে, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের; যে ফুলবন রহিয়াছে, উহা শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াস্থান; আর সম্মুখে যে সুরধুনী দেখিতেছেন, উহা কাজেই যমুনা বলিয়া বোধ হইল।

এই ভাবে মগ্ন হইয়া প্রভু ভাবিতেছেন যে, তিনি রাধা—যমুনায় জল লইতে আসিয়াছেন। এই ভাবে আড়চোখে গাভীগণ ও ফুলের বন পানে চাহিতেছেন, যেন সেখানে শ্রীকৃষ্ণ আছেন কিনা দেখিতেছেন; তখন হৃদয়মন্দির রাধাভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে,—কাজেই একটু সশঙ্কিত। সশঙ্কিত কেন?—না, পাছে কৃষ্ণের হাতে ধরা পড়েন; কারণ কৃষ্ণের হাতে পড়িলেই কুলশীল সমুদয় যাইবে। আবার কৃষ্ণ আসিয়া ধরেন,—ইহাও প্রাণে বড় সাধ। একবার আড়নয়নে নিকুঞ্জবন পানে চাহিতেছেন, আবার জটিলা সেখানে আছে কি না এই ভয়ে এদিকে ওদিকে দেখিতেছেন। এমন সময় দেখিলেন, যেন কদম্বতলে শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন বেশ ধরিয়া অপরূপ ভঙ্গিতে বৃক্ষে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া! নয়নে নয়ন মিলিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ স্ত্রী-স্বভাবে নয়ন ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না,—চাহিয়া রহিলেন। আর কৃষ্ণ যেন সেই সুযোগে নয়ন দ্বারা তাঁহাকে কি সঙ্কেত করিলেন। ইহাতে নিমাই ভয়ে ও আনন্দে জড়ীভূত হইয়া, ও বালা-স্বভাববশতঃ অতিশয় লজ্জা পাইয়া মস্তক অবনত করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। কিছুদূর যান ও নানা ছল করিয়া পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। ক্রমে নবানুরাগিণী রাধা হইয়া ঘরের পিঁড়ায় আসিয়া বসিলেন।

এইরূপে নূতন তরঙ্গের সৃষ্টি হইল। আনন্দে পুলকাদি অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাব মুহুর্মুহুঃ অঙ্গে উদয় হইতেছে এবং নয়নে ধারার উপর ধারা পড়িতেছে। আবার গুরুজনের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া মনের

ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কোন ক্রমে পারিতেছেন না। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে ভাল লাগিতেছে না, সর্বদাই অন্যমনস্ক, আপন ভাবেই ভোর,—কাজেই এক বলিতে আর বলিতেছেন। দিবানিশির প্রভেদ-জ্ঞান নাই, মন অতিশয় চঞ্চল। একবার বাহির একবার ঘর করিতেছেন, যেন বাহিরে কি দেখিতে যাইতেছেন, ভক্তগণকে কি বলিতে যাইতেছেন, কিন্তু বার বার চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণনাম শুনিলেই চমকিয়া উঠিতেছেন, কখন বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। সুখের মধ্যে আনন্দে চন্দ্রবদন টলমল করিতেছে।

শ্রীগৌরাঙ্গকে তাঁহার ভক্তগণ "ভাব-নিধি" বলিয়া থাকেন। ভাবনিধির-ভাব-বর্ণনা এখানে আমরা অল্প মাত্র করিব। যদি গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ড লিখিতে পারি, তখন উহার বিস্তার করিবার ইচ্ছা আছে। তবে তাঁহার পার্ষদ-ভক্তেরা নিকটে বসিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা পাঠক কিছু কিছু বুঝিতে পারিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বিরলে থাকিতে ভাল লাগিতেছে। শ্রীনিতাইকে দেখিলে লজ্জায় জড়সড় হইতেছেন; কারণ ভাবিতেছেন,—নিতাই কৃষ্ণের দাদা বলরাম। সঙ্গীর মধ্যে কেবল গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম, মুরারি, আর দু-এক জন। শ্রীনরহরি শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব দেখিয়া, ব্যাপার কি মনে মনে বিচার করিতেছেন। যথা—

"কি লাগি ধূলায় ধূসর সোণার বরণ শ্রীগৌরাঙ্গ-দেহ।
অঙ্গের ভূষণ সকল তেজল, না জানি কাহার লেহ।।
হরি হরি মলিন শ্রীগৌরাঙ্গচান্দে। ধ্রু।
উহু উহু করি, ফুকবি ফুকরি, উরে পাণি হানি কান্দে।।
তিতিয়া গেয়ল, সব কলেবর, ছাড়ে দীঘল নিশ্বাস।
রাইয়ের পিরীতি, যেন হেন রীতি, কহে নরহরি দাস।।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বুকে কর হানিতেছেন, "উহু-উহু" "মলেম-মলেম" বলিতেছেন, দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছেন, আর নয়নজলে অঙ্গ ভিজিয়া যাইতেছে। নরহরি ভাবিতেছেন, কাহার জন্য এবং কেন প্রভু কাঁদিতেছেন? শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণকে লোভ করিয়া যেরূপ দুঃখ পাইয়াছিলেন, ঠিক যেন সেইরূপ। এ যে রাধার প্রেম, নরহরি কিরূপে বুঝিলেন, তাহা বলিতেছি। শ্রীগৌরাঙ্গ দুই একটি কথা বলিতেছেন, তাহাতে তাঁহার মনের ভাব কিছু প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণ বলিয়া ভূমিতে পড়িতেছেন, আবার উঠিয়া উর্ধ্বমুখে চাহিয়া দুই হাত তুলিয়া বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ! আমি স্বচ্ছন্দে ঘরে ছিলাম, তুমি আমাকে বাউরী করিলে!" আবার বলিতেছেন, "কৃষ্ণের দোষ কি? বিধি! এ সব তোর কার্য। এরূপ কেন ঘটালি? বিধি! ধিক তোরে! আমি দুর্বলা কুলের মাঝারে থাকি, আমি কৃষ্ণকে কিরূপে পাব? তিনি দুর্লভ, আমি অবলা নারী, আমাকে কৃষ্ণের লোভ কেন দিলি?" এইরূপে বিধাতার উপর দোষ দিতেছেন। নরহরি সঙ্গীদের কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "প্রভুর কি ভাব, তোমরা কি কিছু বুঝিতে পারিতেছ?"

কনক চম্পক গোরা চাঁদে। ভূমিতে পড়িয়া কেন কাঁদে।।
ক্ষণে উঠি কহে হরি হরি। "কে করিল আমারে বাউরি?"
আজানুলম্বিত বাহু তুলি। বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি।।
কহে "ধিক্ বিধির বিধানে। এমন জোটন করে কেনে।।"
কোন্ ভাবে কহে গোরা রায়। নরহরি সাধিয়া বেড়ায়।।

যিনি শ্রীভগবানকে ভজন করিবার অধিকারী, তিনি যে পরম ভাগ্যবান তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবগণ তখনই পরম-পুরুষার্থ লাভ করেন, যখন শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহাদের প্রেম জন্মে। ইহার ন্যায় সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? যাঁহার প্রেম হইয়াছে, তাঁহার আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা নাই; কারণ শ্রীভগবান্ তাঁহার অতি নিজ-জন, এবং নিজ-জনের কাছে কেহ কিছু চাহে না। ভগবৎ প্রেমের চরম আদর্শ—শ্রীরাধা। রাধার প্রেম কি, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল;

এবং শ্রীধরস্বামী তাহার বিস্তার করেন। জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায় রামানন্দ প্রভৃতি কবিগণ উহা আরও পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত "রাধাপ্রেম" অক্ষরে লেখা একটি কথামাত্র ছিল। রাধার প্রেম কিরূপ পদার্থ, তাহা কার্য্যে কেহ কখন দেখেন নাই, এবং শ্রীভগবানকে যে কেহ সেরূপ প্রেম করিতে পারেন, তাহাও অনেকে বিশ্বাস করিতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় এখন তাঁহার পার্ষদগণ উহা স্বচক্ষে দেখিতেছেন;—শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং রাধা হইয়া, সেই প্রেমের যে কুটিল ও সূক্ষ্ম গতি, তাহা পর-পর দেখাইতেছেন।

রাধার এই প্রেম কিরূপ? ভগবানের উপর রাধার যে প্রেম, তাহা দাম্পত্য কি বাৎসল্য প্রেম অপেক্ষাও অধিক। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি রাধা হইয়া,—সেই প্রেম যে কবির কল্পনা নহে এবং উহার স্বরূপ কি,—তাহা দেখাইতেছেন। এই প্রেমে তিনি দেহ ও সংসার-ধর্ম ভুলিয়া গিয়াছেন, বাহ্য-জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্ক লোপ পাইয়াছে। সুতরাং অন্য কোন চিন্তার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই—তিনি দিবানিশি কেবল কৃষ্ণের কথাই ভাবিতেছেন, কাজেই বাহিরের লোক তাঁহাকে বিহ্বলের মত দেখিতেছে। প্রেমে শ্রীগৌরাঙ্গ একেবারে বাউরী হইয়াছেন। এ প্রেমের বেগ কিরূপ একটি কথায় তাহার আভাস দিতেছি। যিনি প্রিয়জন, প্রীতিতে তাঁহার নামটি পর্যন্ত মিষ্ট লাগে। এই নিমিত্ত স্বামীর নাম স্ত্রীর নিকট এবং স্ত্রীর নাম স্বামীর নিকট বড় মধুর। কাজেই রাধা-ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কৃষ্ণনামটি বড় মিষ্ট। সে মিষ্টতা এত অধিক যে নামটি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। এমন প্রীতি কে কোথায় শুনিয়াছেন যে, প্রিয়জনের নাম শুনিয়া মূর্চ্ছা যায়? সুতরাং শ্রীভগবান্ যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাব স্বীকার করিয়া, জীবকে দেখাইয়া, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা সপ্রমাণ করিতেছেন। প্রভু রাধা-ভাব কেন গ্রহণ করিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য, গ্রন্থে রাধার প্রেমের কথা ত বরাবরই ছিল, কিন্তু উহা পাঠ করিয়া কি লোকের মুখে শুনিয়া, কেহ উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না ও কেহ পারেন নাই। তাই প্রভু আপনি একেবারে রাধা হইয়া সেই সমস্ত ভাব জীবকে দেখাইলেন। শ্রীনরহরি তখন প্রভুর ভাব বেশ বুঝিয়াছেন, বুঝিয়া প্রভুকে কি প্রকার দেখিতেছেন, তাহা তাঁর একটি পদে এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন—

"আরে মোর গৌরকিশোর। ধ্রু। নাহি জানে দিবানিশি, কারণ বিহনে হাসি, মনের ভরমে পঁহু ভোর।। ক্ষণে উচ্চৈস্বরে গায়, ক্ষণে পঁহু কি সুধায়, 'কোথায় আমার প্রাণনাথ?' ক্ষণে শীতে মহাকম্প, ক্ষণে ক্ষণে দেয় লম্ফ, "কোথা পাই যাই কার সাথ।।" ক্ষণে উর্দ্ধবাহু করি, নাচি বুলে ফিরি ফিরি, ক্ষণে ক্ষণে করয়ে প্রলাপ। ক্ষণে আঁখি-যুগ মুদে, হা নাথ' বলিয়া কাঁদে, ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ।। কহে দাস নরহরি, 'আরে মোর গৌরহরি' রাধার পীরিতে হৈল হেন।' ঐছন ভাবিয়া চিতে কলিযুগ উদ্ধারিতে, বঞ্চিত হইনু মাঞি কেন?"

ভক্তগণ নিকটে আসিলে শ্রীগৌর উঠিয়া দূরে বসিতেছেন, কাহারও সঙ্গ ভাল লাগিতেছে না। প্রেমের ধর্মই এইরূপ। ব্যথার ব্যথী ব্যতীত, অর্থাৎ যাহার নিকট প্রিয়জনের কথা মন খুলিয়া বলা যায়, এমন সঙ্গী ব্যতীত অন্য সঙ্গ ভাল লাগে না। শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে সঙ্গীদিগকে ত্যাগ করিয়া একটু দূরে বসিয়া আপনা-আপনি কথা বলিতেছেন। কিন্তু কি বলিতেছেন, নরহরি ও গদাধর অতি নিকটে বসিয়া সমুদয় শুনিতেছেন। যথা—গৌরসুন্দর মোর। ধ্রু। কি লাগি একলে বসিয়া বিরলে, নয়নে বহিছে লোর।। হরি অনুরাগে, আকুল অন্তর, গদ-গদ মৃদু কহে। "সকলি অকাজ, কহে মনসিজ, এত কি পরাণে সহে।। অবলা নারীরে, করে জর জর বুকের মাঝারে পশি"। কহিছে ঐছন, পুরব বচন, অবনত মুখ-শশী।। প্রলাপের পারা, কিবা কহে গোরা, মরম কেহ না জানে। পূরব রচিত, সদা বিভাসিত, দাস নরহরি ভণে।।

শ্রীগৌরাঙ্গ আপনা-আপনি বলিতেছেন, "আমি অবলা, আমার কি এত সহে"? যথা— "শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব কহনে না যায়। বিরলে বসিয়া পঁহু করে হায় হায়।। প্রিয় পারিষদগণে

বুঝায় তাঁহারে। কহে 'মুঞি ঝাঁপ দিব যমুনার নীরে। করিনু দারুণ প্রেম আপনা-আপনি, দুকুলে কলঙ্ক হৈল, না যায় পরাণি।।' এত কহি গোরাচাঁদ ছাড়য়ে নিশ্বাস। মরম বুঝিয়া কেহ নরহরি দাস।।"

এইরূপ বিভোর হইয়া যে প্রভু এক ভাবেই আছেন, তাহা নহে। ক্রমেই ভাব প্রস্ফুটিত হইতেছে। নবানুরাগে কিছুকাল থাকিয়া এখন আর একটি ভাব কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। সেটি এই,— শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, এই সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ, কৃষ্ণ আসিবেন এই আনন্দে, বাসকসজ্জা করিতেছেন। একটু পরেই ভক্তগণ প্রভুর মনের ভাব বুঝিলেন। কাজেই শ্রীগৌরাঙ্গ পুষ্পপল্লব সংগ্রহ করিতেছেন, ভক্তগণও তাহাই দেখিয়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে গৃহের মধ্যে আনন্দের সহিত কুসুমশয্যা প্রস্তুত হইল। কখনও বা গদাধর, কি নরহরি, কি পুরুষোত্তমকে কিছু-কিছু সাহায্য করিতে বলিতেছেন। গদাধর বরাবর প্রভুর বেশবিন্যা, করিতেন। গদাধরকে সখী জ্ঞান হওয়ায় চুপে-চুপে বলিতেছেন, "সখি! আমার শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তুমি আমার বেশবিন্যাস করিয়া দাও।" গদাধর কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় প্রভু আপনা-আপনি বলিতেছেন, "সখি! কাজ নাই, আমার বেশের প্রয়োজন কি? আমি না কৃষ্ণের দাসী!" শেষে গদাধরের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিতেছেন, "সখি! তুমি আমাকে আর কি ভূষণ দিবে, এই দেখ আমি ভূষণে ভূষিত।" প্রভু তারপরেই বলিতেছেন, "এই দেখ আমি কৃষ্ণ চন্দ্রহার পরিয়াছি। আমার হৃদয়ে এই শ্যাম-পরশমণি! সখি, আমার হাতের ভূষণ শ্যামের পাদপদ্ম সেবন, আর নয়নের ভূষণ সেই মধুর রূপ দর্শন।" এইরূপে গদ-গদ হইয়া প্রভু আপনার প্রতি অঙ্গের ভূষণ বর্ণনা করিতেছেন, আর দুই আঁখি দিয়া প্রেমানন্দ-ধারা পড়িতেছে! প্রভুর বাসক-সজ্জা বাসুঘোষ এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন ঃ

"করুণ নয়নে ধারা বহে। অবনত-মাথে গোরা রহে।। ছায়া দেখি চমকিত মনে। ভূমে পড়ি যায় ক্ষণে-ক্ষণে।। কমল পল্লব বিছাইয়া। রহে পঁহু ধেয়ান করিয়া।। বিরলে বসিয়া একেশ্বরে। বাসক-সজ্জার ভাব করে। বাসুদেব ঘোষ তা দেখিয়া। বলে কিছু চরণে ধরিয়া।"

এই পদটীকে "বাসক-সজ্জার গৌরচন্দ্রিকা" বলে। অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণ লীলার ভিন্ন-ভিন্ন রস কীর্তন করিবার আগে, প্রভু সেই সেই রস যেরূপে তাঁহার পার্ষদ-ভক্তগণকে আস্বাদ করাইয়াছিলেন এবং ঐ ভক্তগণ উহা দর্শন কি শ্রবণ করিয়া যে পদ প্রস্তুত করেন, তাহাকে "গৌরচন্দ্রিকা" বলে। বাসক-সজ্জা কীর্তন করিতে হইলে, উপরের পদটি; কিম্বা ঐ ধরনের একটি পদ প্রথম গাইতে হয়। এইরূপে বাসক-সজ্জা করিয়া গদাধর, নরহরি প্রভৃতি দুই একটি সঙ্গী লইয়া প্রভু সারানিশি বসিয়া, শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। একটু শব্দ শুনিলেই "ঐ এলেন" বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। "পড়ে পাতের উপর পাত, ঐ এলেন প্রাণনাথ"—এই ভাবে বিভোর হইয়া নয়ন মুদিয়া নিশি জাগরণ করিতেছেন। হে ভাবুক! হে রসিক ভক্তগণ! তোমরা এই ভাবটি এখন অনুভব কর। শাস্ত্রে এ ভাবকে বলে "উৎকণ্ঠা"। "উৎকণ্ঠা" কি? না, প্রিয়জনের অপেক্ষা করিয়া, তাঁহার আসিতে বিলম্ব হওয়ায় মনে যে সমুদয় ভাবের উদয় হয়, তাহাকে উৎকণ্ঠা বলে। সেইরূপ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে প্রতীক্ষা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন না, ইহাতে শ্রীমতীর মনে যে ভাব হইয়াছিল, তাহাকে উৎকণ্ঠা বলে। কোন আচার্য হয়ত শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উৎকণ্ঠা কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়া দিবেন। কিন্তু যিনি যেরূপেই বুঝান না কেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার পার্ষদগণকে যেরূপে বুঝাইলেন, এরূপ আর কেহ পারেন নাই, পারিবেনও না। তিনি স্বয়ং রাধার ভাব গ্রহণ করিয়া বাসক-সজ্জা করিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন বন্ধু আসিলেন না, তখন উৎকণ্ঠার ভাবে আক্রান্ত হইলেন। ভক্তগণ ইহা দর্শন করিয়া

এই ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন ও পরে লিপিবদ্ধ করিলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষায় নবানুরাগ হইতে বিরহ পর্যন্ত পরপর সমস্ত ভাব ধারণ করিয়া পার্ষদগণকে দেখাইলেন, এবং তাঁহাদের হৃদয়ে এই সমুদয় ব্রহ্মার দুর্লভ ভাবগুলি প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তাহাই বাসুঘোষ বলিতেছেন—"যদি গৌর না হত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা, প্রেম-রস সীমা, জগতে জানাত কে?"

ঐ পদে আবার বলিতেছেন, "এরূপ জানাইতে শকতিই-বা হইত কার?"

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ যে চৌষট্টি-রস আপনি আস্বাদ করিয়া ভক্তগণকে দেখাইলেন, তাহার মধ্যে আমরা পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত একটি অর্থাৎ উৎকণ্ঠা-ভাব লইয়া তাহার মর্ম দেখাইতেছি। সমস্ত রসগুলি বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিতে আমাদের সাধ্য নাই, এবং করিতে গেলে সেও এক বৃহৎ গ্রন্থ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে বাসক-সজ্জা করিয়া নয়ন মুদিয়া বসিলেন। ইহাতে যে চিত্রের উৎপত্তি হইল তাহা পার্ষদগণের হৃদয়ে বসিয়া গেল। তিনি যাহা বলিলেন তাহা তাঁহারা শুনিলেন; আর সেই সব কথা বলিবার সময় তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেসব ভাব হইল, তাহা তাঁহারা দেখিলেন; এবং তিনি কোন্ কথা কি স্বরে বলিলেন, তাহাও তাঁহারা শুনিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধরের গলা ধরিয়া কাতর কণ্ঠে বলিতেছেন, "সখি! কই কৃষ্ণ ত এলেন না? তোমরা দেখছ না, এ দিকে যে আমার প্রাণ যায়!" সঙ্গীরাও সেইভাবে বিভাবিত হইয়া, ব্রহ্মার সেই দুর্লভরসে মগ্ন হইলেন; অর্থাৎ তাঁহারাও ভাবিতে লাগিলেন যে, কৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিতে আসিবেন কথা ছিল, কিন্তু কৈ এখনও আসিলেন না? আবার শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ-জন তাঁহাদের নিজ-জনদিগকেও এই রসের কিছু অংশ দিলেন। এইরূপে এই রসের আভাস ক্রমে ক্রমে সকলেই পাইতে লাগিলেন।

শুধু ইহাই নহে। যাহাতে এই রস চিরদিন সকলে আস্বাদ করিতে পারে তাহারও উপায় করা হইল। অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ কি বলিলেন, বলিতে গিয়া তাঁহার কি ভাব হইল,—এ সমুদয় বর্ণনা করিয়া ভক্তগণ পদ রচনা করিলেন। এই হইল "মহাজনের পদ"। এইরূপে আধুনিক কীর্তনের সৃষ্টি হইল। মহাজনগণ ব্রজলীলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণকে যে ভাব দিয়াছেন, তাহার নিগূঢ়তম অংশ শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে ব্যক্ত করিলেন, আর তাঁহার পার্ষদগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া জগতে প্রচার করিলেন।

কিন্তু শুদ্ধ লেখনী দ্বারা ভাবের জীবন দেওয়া যায় না। ভাবকে জীবন্ত করিতে হইলে, তাহার দেহ সৃষ্টি ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। তখন সেই শক্তি তোমার সঙ্গিনী হইবে, আর তখন তুমি সেই ভাব জীবে পরিণত করিতে পারিবে। ভাবের দেহ কথা দ্বারা গঠিত হয় বটে, তবে সামান্য কথায় ভাল হয় না। ভাবের যদি সুন্দর দেহ করিতে হয়, তবে সুমধুর কবিতা দ্বারা উহা গঠন করা প্রয়োজন। দেহ গঠিত হইলে দেখিতে সুন্দর হইবে বটে, কিন্তু জীবন্ত হইবে না। সঙ্গীত দ্বারা দেহটির যখন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, তখনই ভাব জীবন্ত হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ কুসুমশয্যা রচনা করিয়া মহানন্দে নয়ন মুদিয়া চুপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রতীক্ষা করিতেছেন। আনন্দে নয়ন দিয়া বারি ধারা পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবার কোন দ্রব্যের কথা মনে পড়িতেছে, আর উহা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বলিতেছেন, এক একবার উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন। কখন বা পুরুষোত্তমকে বলিতেছেন, "সখি! শ্রীকৃষ্ণের পাদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত সুবাসিত জল আছে ত?" যদি থাকে তবে যাঁহারা নিকটে আছেন, তাঁহারা বলিলেন, "আছে," আর না থাকিলে তখনই ঝারিতে করিয়া আনিলেন। ক্রমে

সময় যাইতেছে; আর গৌরাঙ্গ ক্রমে একটু অধৈর্যের ভাব দেখাইতেছেন,—একটু ছট্‌ফট্ করিতেছেন, "সখি! একটু এগিয়ে দেখ না তাঁহার বিলম্ব হইতেছে কেন?" পুরুযোত্তম উঠিলেন এবং একটু দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, "স্থির হও, কৃষ্ণ এখনি আসিবেন।" একটু পরে, শ্রীগৌরাঙ্গ "তবে আমি একটু নিদ্রা যাই" বলিয়া শুইলেন। কিন্তু স্থির হইতে পারিলেন না, আবার উঠিয়া বসিলেন। তখন বলিতেছেন, "সখি! নিদ্রা ত আসে না, এখন কি করি!" ক্রমে উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে, আর ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে। কিন্তু তাহাতে শরীর জুড়াইবে কেন? শেষে মৃদুস্বরে "উহু মরি", "উহু মরি" বলিতে লাগিলেন। তাহাতেও শান্ত হইতে পারিলেন না। শেষে থাকিতে না পারিয়া সঙ্গীদিগের পানে চাহিয়া কথা আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন, "সখি! রাত্রি কি আর আছে? আমি বাসক-সজ্জা করিয়া এ কি অকাজ করিলাম! ছি! কি লজ্জা! এখন তিনি আসিলে, আমি আর নিকুঞ্জে আসিতে দিব না।" ইহা বলিয়া,—আর ধৈর্য ধরিতে না পারিয়া, একেবারে কান্দিয়া উঠিলেন। কান্দিতে কান্দিতে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম হইলে, সঙ্গীরা ধরিলেন। তখন পুরুষোত্তমের গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "সখি! কৈ আমার প্রাণনাথ ত আসিলেন না? আর আমি সহিতে পারিতেছি না! সখি রাত্রি যে পোহাইয়া গেল?" সঙ্গীরা নানা ভাবে বুঝাইতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গও বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দুর্বার মন প্রবোধ মানিতেছে না। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "চুপ! চুপ! কি শব্দ হইল যেন! ঐ বুঝি এলেন! সখি দেখ ত? আমি একটু রাগ করিয়া বসিয়া থাকি।" কিন্তু সে শব্দ কিছুই নয়। ইহাতে কাজেই আরো অধীর হইলেন। তখন করযোড়ে অতি করুণ স্বরে, প্রাণবল্লভকে বাছা বাছা মিষ্ট নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "আমার নয়নানন্দ! তুমি কোথা? আমি মান করিব বলিয়া তুমি ক্ষোভ করিয়াছ? আমি কি প্রকৃত তোমার উপর রাগ করিতে পারি! হে আমার মুরলীবদন! আমি চকোরিণী, তোমার মুখচন্দ্র-সুধা পান করিয়া প্রাণ ধারণ করি। আজ তোমার অধীনা পিপাসায় মরিতেছে, তুমি কৃপাবারি বরিষণ করিলে না! তুমি না আমায় বড় ভালবাসিতে? আমাকে না দেখিলে তোমার না পলকে প্রলয় হইত!"

সঙ্গীরাও তখন আত্মবিস্মৃত হইয়া ঐ রসে ডুবিয়া গিয়াছেন। ভক্তগণ এই রস প্রত্যক্ষরূপে আস্বাদন করিয়া যাহাতে উহা চিরকাল সতেজ অবস্থায় থাকে, তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে কৃষ্ণ আইলেন না এই উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া, সঙ্গীদিগের গলা ধরিয়া কি বলিয়াছিলেন, ভক্তগণ তাহা স্মরণ করিলেন, করিয়া সেগুলি লিপিবদ্ধ করিলেন। কিন্তু দেখিলেন, কথাগুলি প্রভুর মুখে যেরূপ শুনাইতেছিল, লিপিবদ্ধ করিয়া সে শক্তি কিছুই রহিল না। তখন ভাবিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ-নিঃসৃত কথাগুলি কবিতায় লিখিলে সেই ভাব কিঞ্চিৎ সজীব করা যাইতে পারে। তখন প্রভুর কথাগুলি দিয়া নানা জনে নানা ছন্দে রচিলেন। শুধু শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ-ক্ষরিত কথা নয়, উৎকণ্ঠার সময় তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে সকল ভাব হইয়াছিল, তাহাও কবিতায় লেখা হইল। এইরূপে এক এক ভাবের বহু পদের সৃষ্টি হইল। এই উৎকণ্ঠার গুটিকয়েক পদ নিম্নে দিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাভাবে যে উৎকণ্ঠা, উহা হইতে এই সকল পদের কথা ও অঙ্গ -প্রত্যঙ্গের বর্ণনা ভক্তগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা-ভাবের উৎকণ্ঠায় অভিভূত হইয়া বলিতেছেন, "সখি! নিশি পোহাইয়া গেল, কৈ আমার প্রাণনাথ ত এলেন না! সখি! আর ত বিরহ-অনলে আমি বাঁচি না। সখি! তোমার আমাকে এত ভালবাস, এখন আমার বাঁচিবার উপায় বলিয়া দিয়া উপকার কর। তোমরা জান যে, আমি প্রাণনাথ বিনা বাঁচি না। তোমরা প্রবোধ দিতেছ, কিন্তু মন আমার প্রবোধ মানিতেছে না।" একটু থামিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আবার বলিতেছেন, "সখি! এই দেখ, আমি অগুরু, চন্দন, ফুলের মালা, থরে থরে সাজাইয়া রাখিয়াছি। আমি বনে বনে অন্বেষণ করিয়া, ফুল আনিয়া একটি একটি করিয়া

তাহার কাঁটা বাছিলাম, পাছে আমার প্রাণেশ্বরের কোমল অঙ্গে ব্যথা লাগে। দেখ, আমার নিষ্ঠুর বন্ধু আমাকে কেন আনিয়া আর এলেন না।" ভক্তগণ এই সমুদয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া নিম্নের পদগুলি বান্ধিলেন—

"নিশি গেল পোহাইয়ে প্রাণনাথ এলো না।
আর ত বিরহানলে এ প্রাণ বাঁচে না।।
তোমরা আমার প্রিয়-সখী উপায় বুদ্ধি বল না।
তোমরা জান, মন প্রাণ, নিষেধ সে মানে না।।
বনে বনে বুলি বুলি, বনফুল আনিলাম তুলি,
বোঁটাগুলি দিলাম ফেলি, (কেন দিলাম?)
কিনা, শ্যাম অঙ্গে বাজিবে বলে।
সখি! অগুরু, চন্দন, মালা থরে থরে রেখেছি।
এই দেখ মালতীর মালা আমি গেঁথেছি।।
এমন নিঠুর কালা, পর দুঃখ জানে না।
আনিয়া নিকুঞ্জ বনে এত দিল যন্ত্রণা।।"

পাঠক মহাশয়, আর একটি পদ শ্রবণ করুন—

"কৈ গো বৃন্দে সই, তোমার বৃন্দাবন চন্দ্র কৈ?
গগনের চন্দ্র অস্ত গেল ঐ।
করিয়া বাসক-সজ্জা, ছি ছি ছি, একি লজ্জা,
আমি পেলাম সই। কৈ গো নয়নের আনন্দ কৈ?
কার লাগি বনে আগমন?"

পড়ে পাতের উপর পাত, "ঐ এল প্রাণনাথ," চমকিয়া উঠে ধনী!
"আমি গাঁথিলাম ফুলের মালা, সব শুখায়ে গেল,
কত রাশি ফুল বাসি হয়ে রয়েছে ঐ।।"

উপরের দুটি গীতই এক অবস্থার। তাহার পরে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠায় আরও ব্যাকুল হইয়াছেন; তখন পাগলিনী হইয়াছেন।

(প্রেমের) হাট কি ভাঙ্গিলি। (ধূয়া) একে কুলকন্যে, শ্যামেরি জন্যে, এলায়িত কেশা, ছিন্নভিন্ন বেশা, ইত্যাদি।

তাহার পরে রজনী প্রভাত হইতেছে, নিরাশা আসিতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে একটু ক্রোধও উদয় হইতেছে। তাই রাধা বলিতেছেন,—"ত্যাজ সখি কানুর আগমন আশ। ধ্রু। রজনী শেষ ভেল কেবল নৈরাশ।। ইত্যাদি।।" মহাজনেরা উপরের এই পদগুলি বান্ধিলেন, কিন্তু উহাতে প্রাণ দিতে পারিলেন না। উৎকণ্ঠার প্রকৃত আস্থা তবু প্রকাশ হইল না। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বলিয়াছিলেন "কৈ? আমার প্রাণনাথ কৈ? সখি! ফুলের সজ্জা আমার অঙ্গে কণ্টকের ন্যায় বিঁধিতেছে।" তাহাতে তাঁহার পার্ষদগণের মনের মধ্যে যে অবর্ণনীয় ভাবের উদয় হয়, তাহা তাঁহাদের কবিতায় দিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ যে করুণস্বরে, কি স্বরের ভঙ্গীতে তাঁহার মনের বেদনাগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিবামাত্র হৃদয় শুধু দ্রব হয় না, উৎকণ্ঠার ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা তাঁহাদের কবিতায় প্রকাশ পাইল না।

কিন্তু করুণাময় শ্রীভগবান্ ভাব দিয়াছেন, ভাবের ভাষা কি দেন নাই? ইহা হইতেই পারে না। পূর্বে বলিয়াছি, সে ভাবের ভাষা হইল সঙ্গীত। ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গের সেই ভাবগুলি কবিতা দ্বারা প্রকাশ করিতে না পারিয়া সঙ্গীতের সাহায্যে উহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পদে সুর বসান হইল। এই সুর বসান তোমার-আমার কার্য নহে। কেবল তাঁহারাই পারেন, যাঁহারা

ভাবে অভিভূত হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে শুনিলেন, "সখি! আর ত আমি সহিতে পারি না।" যে স্বর ভঙ্গীতে শ্রীগৌরাঙ্গ এই কথাগুলি বলিলেন, তাঁহারা সেই ভাবে বিভাবিত হওয়ায় যাহা অন্যের পক্ষে অসাধ্য, তাহা তাঁহাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইল; অর্থাৎ তাঁহারা সুরের দ্বারা সেই ভাবকে প্রকাশ করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে সুরধুনী তীরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বিভোর হইয়া নীরব হইলেন। কথা কহিতেছেন না বটে, কিন্তু মনের ভাবলহরী প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনায় ও কার্যে প্রকাশ পাইতেছে। কখন উর্ধ্বমুখে চাহিতেছেন, আর যেন কি দেখিয়া লজ্জায় মুখ হেঁট করিতেছেন; আবার মধুর হাসিয়া উর্ধ্বমুখে চাহিতেছেন। কখন আপনা-আপনি কথা কহিতেছেন, কখন রোদন করিতেছেন, কখন বা হাসিতেছেন। ভক্তগণ এই সমুদয় দেখিয়া রাধার নবানুরাগে কি ভাব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিলেন। তাহার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ আর বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, পুরুষোত্তমের গলা ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "উহু, আমি কি দেখিলাম! উহু, আমি কি মধুর রূপ হেরিলাম!" কিন্তু তাঁহার মনের ভাব এই কয়েকটি কথায় অতি অল্পমাত্র ব্যক্ত হইল। তবে ব্যক্ত হইল কিসে, না তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গীতে ও গলার স্বরে। এই গলার স্বর শুনিয়া একটি রাগিণী সৃষ্টি হইল। পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কি দেখিলে?" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমি কি দেখিলাম বলিতে পারি না। আমি দিশেহারা হইয়া গিয়াছি।" অনেক পীড়াপীড়ি করাতে বলিতে লাগিলেন, "আমি একটি অতি সুন্দর নবীন পুরুষ-রতন দেখিয়াছি।" ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের-রূপ বর্ণনা করিতে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহা এখন সর্বসাধারণে অবগত আছেন। কিন্তু রূপ বর্ণনা করার সময় শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাব ও গলার স্বর বিকৃত হইয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল যে, যাঁহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন, তিনি যেন তাঁহার সম্মুখে। যেন তাঁহার রূপ তাঁহার নয়নে ধরিতেছে না। যেন তাঁহার রূপসুধা নয়নদ্বারা অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিতেছেন। যেন সেই পুরুষ-রত্নকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদন করিতেছেন। যে কণ্ঠস্বরে এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন, তাহাতে একটী রাগিণী সৃষ্টি হইল। সে রাগিণী "মাথুর" নামে অভিহিত হইল। ভাল কীর্তনীয়ার কাছে মাথুর রাগিণীতে রূপের গীত শুনিবেন, তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া কিরূপ বিমোহিত হইয়াছিলেন তাহা কতক বুঝিতে পারিবেন। প্রাচীন রাগিণীর মধ্যে কাফি, সিন্ধু, খাম্বাজ, বেহাগ, ভৈরবী, আলেয়া, মাপ্পার সুহা, বাগশ্রী, আশাবরী প্রভৃতি কয়েকটি দ্বারা যদিও এই ব্রজের নিগূঢ় ভাব কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ করা যাইতে পারে কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠস্বরে যে সকল রাগরাগিণী সৃষ্টি হয়, তাহাদের শুধু আলাপেই রস প্রস্ফুটিত হয়, কথার পর্যন্ত প্রয়োজন করে না। এইরূপ প্রাচীন রাগরাগিণীর মধ্যেও কতকগুলি শ্রীগৌরাঙ্গ-মুখ-ক্ষরিত রসে মিশ্রিত হইয়া এ দেশে আর এক রূপ আকার ধারণ করিয়াছে।

মহাজনের পদ তাহাকেই বলি যাহার ভাব ও রাগিণী বিশুদ্ধ। আনন্দ-উদ্দীপক রাগিণীতে মাথুরের ভাব হইলে রসভঙ্গ হয়। ভাব যেরূপ, রাগিণী তাহার অনুয়ায়ী হইলেই প্রকৃত মহাজনের পদ হইল। অনেক মহাজন এইরূপে সর্বাঙ্গ-শুদ্ধ-পদ সৃষ্টি করিয়া জীবের গোলক গমনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সকলের কর্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ, শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য! হে জীব! ভূমি-লুণ্ঠিত হইয়া এই পুরুষোত্তম আচার্যকে প্রণাম কর।

এইরূপে মহাজনী পদের সৃষ্টি হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ যে ব্রজের নিগূঢ় রস প্রকাশ ও বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা এ সকল পদে, জীবের ভাগ্যের নিমিত্ত রক্ষিত হইয়াছে। প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের কথাগুলি বিবিধ ছন্দে আবদ্ধ হইল। তাহার পর তাহাতে সুর সংযোগ করিয়া সেইগুলি জীবন্ত করা হইল। তখন জীবমাত্রে এই সকল মহাজনী-পদ আস্বাদন করিতে পারিল। তবে অকৃত্রিম বস্তুটি আস্বাদন করিতে হইলে অগ্রে সাধন ও ভজন করিয়া মন

নির্মল করা প্রয়োজন। মন নির্মল না হইলে এ রস প্রকৃতপক্ষে আস্বাদ করা অসম্ভব ; যেমন নয়ন না থাকিলে চিত্র দর্শনের সুখভোগ করা যায় না। এইরূপে সহস্র মহাজনের পদ সৃষ্টি হইল। ইহার এক একটি পদ গোলকে যাইবার পথ বা একখানি ভবসাগর পারের নৌকাস্বরূপ। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, এই একটি পদ অবলম্বন করিয়া কিরূপে গোলকে যাওয়া যায়? তাহার উত্তর পূর্ণমাত্রায় দিবার স্থান এ নয়। তবে একটি কথা মনে রাখিবেন। যে জড়জগতে আমরা বাস করি, তাহা লৌহ ও কয়লা প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। গোলকের লৌহ ও কয়লা আর কিছুই নয়, এই সমস্ত মধুর ভাব। এই ভাবগুলি ঘনীভূত হইয়া আমাদের সেখানকার বাড়ী, আহারীয় দ্রব্য, শয্যা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। গোলকে যাইবার একটি পথ ভাব;—সঙ্গীত ও কবিতা সম্বল করিয়া সেই পথে যাইতে হয়। হে জীব! সঙ্গীত অভ্যাস কর। এমন আশীর্বাদ শ্রীভগবানের অতি অল্পই আছে। যদি কেহ বলেন যে, সঙ্গীত শিখিবার স্বর কি, এই বোধ তাঁহার নাই, তিনি অন্যায় বলেন। সঙ্গীত অভ্যাস করিতে পারে না, এরূপ দুর্ভাগ্য লোক অতি দুর্লভ। সঙ্কল্প থাকিলে জীবমাত্রই ইহা পারে।

এখন "গৌরচন্দ্রিকার" উদ্দেশ্য অনুভব করুন। মনে ভাবুন, কীর্তনে "উৎকণ্ঠার" পালা গীত হইবে। রীতি এই যে শ্রীগৌরচন্দ্র এই উৎকণ্ঠার রস যেরূপে পার্ষদগণকে দেখাইয়াছিলেন, প্রথমে তাহার ***একটি পদ*** গাইতে হইবে। এই পদটি গীত হইলে, "উৎকণ্ঠার রস" বস্তুটি কি তাহা শ্রোতারা প্রথমে বুঝিবেন। ইহা দ্বারা আবার শ্রীগৌরাঙ্গের উৎকণ্ঠা-ভাব হৃদয়ে কিয়ৎ পরিমাণে অঙ্কিত হইল। আর যেই এই ভাবটি হৃদয়পটে লিখিত হইল, অমনি যাহার যেরূপ অধিকার, তাহার হৃদয়ে সেই রস ততখানি সৃষ্টি হইল। এখন উৎকণ্ঠা রসের একটি "গৌরচন্দ্রিকা" শ্রবণ করুন। যথা ঃ

গৌরাঙ্গ চমকি,বলে "দেখ সখি, শব্দ হইল কেঁনে।"
বন্ধু না দেখিয়া, বলিছে কান্দিয়া, "আর ত সহে না প্রাণে।।
আসিব বলিয়া, না এল কালিয়া আশায় রজনী গেল।।
কেন বা আইনু, পুড়িয়া মরিনু, অবলা পরাণে ম'ল।।"
পড়িল ঢলিয়া, ইহাই বলিয়া, পরাণের নাহিক আশা।
কহিছে বলাই, রাধা ভাব লই, পঁহুর এরূপ দশা।।

উপরের ছবিটি প্রথমে হৃদয়ে ধারণ করুন, তাহার পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণকীর্তন শ্রবণ করুন।

আর গোটা দুই কথা বলিয়া এ অধ্যায় সমাপ্ত করিব। রস আস্বাদনের নিমিত্ত উভয় নায়ক নায়িকার প্রয়োজন। শুধু নায়িকার ভাব লইয়া থাকিলে রস হয় না। সুতরাং এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন নায়িকার ভাব দেখাইতেছেন, সেইরূপে আবার নায়কের ভাবও দেখাইতেছেন। রাধা ও কৃষ্ণ মিলিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ একবার রাধারূপে, আবার কৃষ্ণরূপেও প্রকাশ পাইতেছেন। কৃষ্ণের লোভে রাধা কিরূপ ব্যাকুল, তাহা রাধাভাবে প্রকাশ হইয়া, আবার রাধার লোভে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ ব্যাকুল, তাহা শ্রীকৃষ্ণ-ভাবে প্রকাশ হইয়া জীবগণকে দেখাইলেন। রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নবানুরাগিণী হইলেন, তাহার আভাস পূর্বে দিয়াছি; আবার রাধাকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কি ভাব হইল, তাহা শ্রীকৃষ্ণ-ভাবে ভক্তগণকে দর্শন করাইতেছেন। এখন এই পদ দুইটি শ্রবণ করুন—

[১]

"আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।। রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী।।
রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে। সুরধুনী ধারা বহে কমল নয়নে।।
ক্ষণে-ক্ষণে গোরা-অঙ্গ ভূমে পড়ি যায়। রাধানাম বলি গোরা ক্ষণে মূরছায়।।
পুলকে ভরল তনু গদ্গদ বোল। বাসু কহে গোরা কেন এত উতরোল।"

[২]

"হরি হরি গোরা কেন কান্দে?

নিজ সহচরগণ পুছই কারণ, হেরই গোরা-মুখচাঁদে।।
অরুণিত লোচন, প্রেমভরে টলমল, ঝর-ঝর ঝরে প্রেম-বারি।
যৈছন শিথিল, গাঁথিল মতিম ফল, ঘসয়ে উপরি উপরি।
সোঙরি বৃন্দাবন, নিশ্বাসই পুনঃ পুনঃ, আপনার অঙ্গ নিরখিয়া।
দুই হাত বুকে ধরি, রাই রাই রাই করি, ধরণী পড়ল মূরছিয়া।।
তাঁহি প্রিয় গদাধর, ধরিয়া করিল কোর, কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া!
পুনঃ অট্ট অট্ট হাসে, জগ-জন মন তোষে, বাসুঘোষ মরয়ে ঝুবিয়া।।"

এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় সুরধুনী তীরে গমন করিয়াছেন; যাইয়া দেখেন, পুলিন ফল-বনে শোভিত। নগরে ঘন বসতি থাকায় পুষ্পবন কি বৃক্ষ দেখিতে হইলে পুলিনে যাইতে হইত। পুষ্পবন দেখিয়া অমনি শ্রীগৌরাঙ্গের বৃন্দাবন মনে হইল এবং চারিদিকেই যেন বৃন্দাবন দেখিতে লাগিলেন। কাজেই সুরধুনী যমুনা বলিয়া ভ্রম হইল। ইহাতে রাস-রসে বিহ্বল হইয়া প্রভু দ্রুতবেগে শ্রীবাসের বাড়ী গেলেন এবং ভক্তগণকে সমুদয় বাদ্যযন্ত্র সুমেল করিতে বলিলেন; আর আপনি আনন্দে ডগমগ হইয়া, ভক্তগণকে সেই আনন্দের অংশ দিতে লাগিলেন। কাজেই ভক্তগণ একে সেই আনন্দের স্রোতে ভাসিতেছেন, আবার অনেক দিন পরে তাঁহাকে শ্রীবাস-আঙ্গিনায় পুনরায় পাইয়া ভক্তগণের তখন কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা মনে অনুভব করুন। বাসুঘোষের নিম্নলিখিত পদে এই লীলার একটু আভাস আছে। যথা—

"বৃন্দাবন-লীলা গোরার মনেতে পড়িল। যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল।।
ফুল-বন দেখি বৃন্দাবনের সমান। সহচরগণ গোপী-সম অনুমান।।
খোল-করতাল গোরা সুমেল করিয়া। তার মাঝে নাচে গোরা জয়-জয় দিয়া।।
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস। রাস-রস গোরাচাঁদ করিল প্রকাশ।"

ভাগ্যবান বাসুদেব সেই দিন সেখানে উপস্থিত। রাস-রসের আস্বাদ হইতেছে; এখন তিনি— সেই নাগর কোথায়? নাগর ব্যতীত রাস কিরূপে হইবে? যিনি (শ্রীগৌরাঙ্গ) আছেন তিনি ত তখন নাগর নহেন,—রাধা; কাজেই সকলের মনে কৃষ্ণ-বিরহ উদয় হইতেছে। তখন নাগর আর থাকিতে পারিলেন না, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে কিরূপে হইল, তাহা শ্রীল বাসুঘোষ নীচের পদে ব্যক্ত করিতেছেন। যথা—

"সোঙরি পূরব-লীলা ত্রিভঙ্গ হইলা। মোহন-মুরলী গোরা অধরে লইযা।।
মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিয়া গোরাচান্দ। অঙ্গুলি চালাঞা করে সুললিত গান।।
নগরে লোক যত শুনিয়া মোহিত। সুরধুনী তীরে তরুলতা পুলকিত।।
ভুবন মোহিল গোরা মুরলীর স্বরে। বাসু ঘোষ ধৈরজ কিরূপেতে ধরে?

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন রাধাভাব ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবান্ হইলেন, হইয়া শ্যামসুন্দর-রূপ ধরিয়া, রাসেব রজনীতে যেরূপ মুরলী বাজাইয়াছিলেন, সেইরূপ মুরলী বাজাইতে লাগিলেন। সেই মধুর মুরলী-রব শুনিয়া ভক্তগণ বিমোহিত হইলেন। তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড হইল। যেমন নাগর ব্যতীত রাস হয় না, তেমনি নাগরী ব্যতীতও রাস হয় না। কাজেই শ্রীগৌরাঙ্গ যদি নাগর হইলেন, তখনই গদাধর রাধা ও নরহরি মধুমতী হইলেন।

"নরহরি-ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া। শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাস-বিনোদিয়া।।
গৌর-দেহে-শ্যাম-তনু দেখে ভক্তগণ। গদাধর রাধারূপ হইলা তখন।।
নরহরি মধুমতী হৈলা সেই কালে। দেখিয়া বৈষ্ণবগণ হরি হরি বলে।।

বৃন্দাবন প্রকাশ হৈল সেই স্থানে। গো-গোপী-গোপাল-সনে শচীর নন্দনে।।
অধিষ্ঠান কামদেব শ্রীরঘুনন্দন। অপ্রাকৃত মদন বলিয়া সে গণন।।"

তখন সকলে দেখিলেন যে, সে স্থান ঠিক বৃন্দাবন হইয়াছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ, সখা-সখী, এমন কি শ্যামলী-ধবলী প্রভৃতি গাভীগণ পর্যন্ত উপস্থিত। তখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, আর সখী সব মণ্ডলী হইয়া কর ধরাধবি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এখন এখানে এই গীতটি দিব—

"কালাচাঁদ-চাঁদ চাঁদের বামে চাঁদবদনী দাঁড়ালো। ধ্রু।*
শ্যামের মাথায় মোহনচূড়া, রাইয়ের মাথায় বেণী।
চূড়া করে ঝলমল ঝলমল, বেণী ধরে ফণী।।
গোবিন্দদাস কহে করযোড় করি।
এই পরিবার বৃদ্ধি কর কিশোর-কিশোরী।।"

উপরে ঐ গীতটি দিবার একটি কারণ এই যে, নদীয়ার সুখের দিন আজ হইতে ফুরাইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ নবানুরাগ হইতে রাস পর্যন্ত সমুদয় রাধাকৃষ্ণ-লীলারস ভক্তগণকে আস্বাদন করাইলেন। যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে লেখা ছিল ও যাহা জয়দেব প্রভৃতি ভক্তগণ পূর্বে বিস্তার করিয়া গিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায়, তাঁহার পার্ষদগণ তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রজের সমস্ত রস দেখাইলেন, কেবল একটি বাকি রহিল—সেটি মাথুর, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ। ব্রজের ভাব প্রাপ্তি জীবের পক্ষে অতি দুর্লভ। আমি ব্রজ-গোপী, কি আমি ব্রজের লোক, একথা মুখে বলিলে হয় না, বাক্যের নূপুর পায়ে দিয়া, কি উপমার শাড়ী পরিয়া, গোপী সাজিলে গোপী হওয়া যায় না। অনেকে দেহ-তত্ত্ব, কি ভাগবত-তত্ত্ব, কি রস-শাস্ত্র পড়িয়া কতগুলি কার্য মাত্র শিখেন, শিখিয়া আপনার মনকে এই বলিয়া বঞ্চনা করেন যে, তিনি ব্রজের লোক হইয়াছেন। অনেকে বেশ উপমা দিতে পারেন। কিন্তু উপমা যোজন করিতে পারিলেই মন কেন নির্মল হইবে, কৃষ্ণ-প্রেম কেন হইবে? একটি উপমা শ্রবণ করুন যথা—জীবন কিরূপ? না, পদ্মের জলের ন্যায়। কিন্তু এই উপমার শুধু অর্থ বুঝিয়া কি ফল হইল? যিনি হৃদয়ে বুঝিতে পারেন যে, জীবন অতি চঞ্চল, এই আছে এই নাই, আর ইহা বুঝিয়া জীবন যাপন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃতরূপে এই উপমার ফলভোগী।

তবে ব্রজের ভাব-প্রাপ্তি জীবের পক্ষে দুর্লভ বলিয়া কি জীব ব্রজের ভজন করিবে না? তাহারও উপায় শ্রীমহাপ্রভু করিয়া গিয়াছেন। ব্রজের ভজন করিতে হইলে গোপীদিগের অনুগত হইয়া করিতে হয়। তুমি রাধা হইতে পার না,—তাঁহার দাসী হও; তুমি যশোদা হইতে পার না, তাঁহার গণ হও,—হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসীদিগের যে লীলা তাহা উপভোগ কর। তুমি রাধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন কর এ সাধ্য তোমার নাই। তুমি এমন স্থলে শ্রীরাধার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করাইয়া দর্শন কর। তুমি যশোদা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখে নবনীত দিতে পার না, যশোদার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখে ননী দাও। তাহাতেই ব্রজবাসীরা যে রস-আস্বাদ করেন তাহার অংশ মাত্র পাইবে। আর যে অংশ পাইবে, তোমার পক্ষে উহা প্রচুর হইতেও প্রচুরতর হইবে,—তুমি প্রেমের পাথারে ডুবিয়া যাইবে।

এখানে কোন সরল স্নিগ্ধ ভক্তি-লোলুপ জীব নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এই রাধাকৃষ্ণ-লীলা ব্যাপারটা কি? যদি প্রভুর লীলাকথা আরও লিখিতে পারি, তবে এ বিষয় ক্রমে ক্রমে বিস্তার করিব। কিন্তু আমার জীর্ণ-শীর্ণ দেহ, কখন কি হয় বলিতে পারি না। অথচ

** ব্রজবিহারের একটি প্রধান-অঙ্গ নৃত্য। শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য দর্শন করিয়া নৃত্যের একটি অস্ফুট-শাস্ত্র সৃষ্টি হয়। এখানে সে বিষয়ের কিছু বিস্তার করিতে পারিলাম না বলিয়া মনে বড় ক্ষোভ রহিল।*

বিষয়টি বড় গুরুতর। সুতরাং এ সম্বন্ধে এ স্থানে দিগ্‌দর্শনরূপে কিছু বলিতেছি। একশ্রেণীর ভক্ত আছেন, তাঁহারা বলেন যে, রাধাকৃষ্ণের লীলা সমস্ত রূপক-বর্ণনা। আর এক শ্রেণীর ভাগ্যবান ভক্ত আছেন, তাঁহারা বলেন, এ সমুদয় সত্য। অপর এক শ্রেণীর ভক্ত আছেন, তাঁহারা বলেন যে এ লীলা সত্য কি মিথ্যা, ইহা বিচারের প্রয়োজন নাই। এ ঐতিহাসিক বিচারের সহিত ব্রজের নিগূঢ়রস আস্বাদনের কোন সম্বন্ধ নাই। যদি বল, তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? ইহার উত্তর এখানে এইমাত্র দিব যে, যাঁহারা গাঢ়রূপে ভগবানের ভজন করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে লীলা স্ফূর্তি হয়। তাঁহারা সে লীলার বৃন্দাদেবী, ও তাঁহাদের হৃদয় বৃন্দাবন হয়েন। ব্রজের নিগূঢ়রস হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে মনে একটি অবস্থা-বিশেষের প্রয়োজন। সে অবস্থাবিশেষ লাভ করিতে সাধন ভজন ও সময় আবশ্যক। আমার "কাঁলাচাঁদ-গীতা" নামক গ্রন্থে আমি ব্রজের নিগূঢ়রস বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছি এবং পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত এই গ্রন্থখানি সচিত্র করিয়াছি। সে যাহা হউক, প্রেমের ভজন সম্বন্ধে এখানে গুটি দুই প্রয়োজনীয় কথা বলিব। শ্রীভগবানকে জীবন্তপ্রীতি দ্বারা ভজনা করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি ভজিয়া শিক্ষা দিলেন। শ্রীভগবানকে প্রাণনাথ বলিয়া মুখে সম্বোধন করা অতি সহজ কথা, কিন্তু তাহাতে রসের উদয় হইবে না। যে পরিমাণে একটি চিত্র প্রস্ফুটিত হয়, সেই পরিমাণে উহা চিত্ত মুগ্ধ করে। কোন স্ত্রী স্বামীকে প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন করিতেছে, দেখিলে প্রকৃত প্রস্তাবে একটি জীবন্ত ছবি দেখা হয়। সেই স্ত্রীলোক যদি একটি কুকুরকে কি বিকটাকার দৈত্যকে বল্লভ বলিয়া সম্বোধন করে, তবে তাহাকে উন্মাদিনী বলিয়া তাহার প্রতি ঘৃণার কি দয়ার উদয় হয়। সেইরূপে যদি কোন জীব নিরাকার ভগবানকে প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন করে, তবে সেটি কি হয়? না,—একটি নির্জীব কবিতা বই আর কিছু নয়। অতএব যদি তুমি স্ত্রীলোক হও, এবং শ্রীভগবান্ পুরুষের আকৃতি প্রকৃতি ধরিয়া তোমার সম্মুখে আগমন করেন, আর তুমি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ কর, তবেই তুমি তাঁহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণনাথ বলিতে পার,—তাঁহাকে প্রাণনাথ বলিবার অধিকার তোমার জন্মে। কিন্তু যখন তুমি তাহা পার না, তখন শ্রীশ্যামের বামে কিশোরীকে দাঁড় করাও, করাইয়া তুমি তাহাদের যুগল বিলাসের সহায়তা কর। এই নিমিত্ত ভগবানের মানবলীলা ব্যতীত তাঁহার প্রেমভক্তির ভজন হইতে পারে না। বৌদ্ধ মুসলমান কি খ্রীষ্টান, ইঁহারা কিঞ্চিৎ-মাত্র লীলা পাইয়াছেন বলিয়া ভক্তির ভজন করিতে পারেন, কিন্তু ব্রজের নিগূঢ়-রস আস্বাদন করিবার মত ভগবৎলীলা ইঁহাদের কিছুমাত্র নাই।

এখন শ্রীভগবানকে বিশুদ্ধ অকৈতব-প্রেমের দ্বারা ভজন করিতে কি কি প্রয়োজন, বিবেচনা কর। প্রথম, শ্রীভগবানের ঠিক মানুষ হইতে হইবে! তাঁহার একজন মাতা কি পিতা কি উভয়ই থাকা চাই। তাঁহার ভ্রাতা চাই, স্ত্রী কি প্রণয়িনী চাই। তাঁহার মাতা না হইলে কে তাঁহাকে বাছা বলিয়া ডাকিবে? কাহার এত বড় শক্তি? কে সখা কি ভাই বলিয়া ডাকিবে? কেই বা প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিবে? তুমি ত ইহার কিছুই পার না। শুধু তাহাও নয় তাঁহার যে শুধু একজন মা চাই তাহা নহে, তাঁহার নিজেরও একটি সর্বাঙ্গসুন্দর দুরন্ত শিশু হওয়া চাই। তাহা না হইলে বাৎসল্য রসের সৃষ্টি হইবে না। তাঁহার একজন সখা হইলেই হইল না, সখার সহিত তাঁহার খেলা করা চাই; আর তাঁহার নিজেরও ক্রীয়াশীল ও সরল হওয়া চাই, তাহা না হইলে সখ্যরসের স্ফূর্তি হইবে না। সেইরূপ, শুধু যে তাঁহার একটি প্রণয়িনী চাই তাহা নহে, মধুর-রস পুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার নিজের নবীন সুন্দর পুরুষ হওয়া চাই, আর তাঁহার প্রণয়িনীরও লাবণ্যময়ী হওয়া চাই। ব্রজরস স্ফূর্তি করিতে কি কি প্রয়োজন, তাহা এখন অনায়াসে বুঝা যাইবে! উহাতে সুন্দর-নাগর চাই, নিভৃত নিকুঞ্জ-বন চাই, সঙ্কেত-বাঁশী চাই, জটিলা চাই। আর চাই কি?—না, নবানুরাগ, বাসকসজ্জা, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ, রাস প্রভৃতি। তুমি যদি ব্রজলীলায় বিশ্বাস করিতে না পার, তবে একটি বুদ্ধির কার্য করিও। মহাজনগণ বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন, সেই অনুরোধে যতদূর পার, বিশ্বাস করিয়া লও। তবু যদি তোমার মনে সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তুমি সমুদয় রূপক বলিয়া ভজনা আরম্ভ

কর—তাহাতেও ক্ষতি নাই। দেখিবে, কিছুকাল পরে সে সমুদয় ভাব ঘুচিয়া তোমার হৃদয়ে ব্রজলীলা মূর্তিমন্ত হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের নবীন-নটবর-নাগর জয়যুক্ত হউন। যাহার মধুর মুরলীরবে ব্রজাঙ্গনার নারীবন্ধন খসিয়া পড়ে, তিনি জয়যুক্ত হউন। যিনি ব্রজ-বধুর মুখ-কমল-মধু লুণ্ঠন করেন, তিনি জয়যুক্ত হউন! যিনি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জয়যুক্ত হউন।

নবম অধ্যায়

নিজ জন নিঠুর আনে দয়া প্রচুর,
ভক্তজনে চঞ্চল, আনে গভীর অটল,
নব অনুরাগ সুধা ভৃঙ্গ।
যত অত্যাচার তোমার, অঙ্গের ভূষণ আমার,
সব সুধা বরিষণ প্রেম অঙ্কুরেতে শিশির সিঞ্চন,
বলরাম দাস মাগে সঙ্গ।।

শ্রীগৌরাঙ্গ কখন কখন আপন ইচ্ছায় শ্রীবাসের বাড়ী সংকীর্তনে যাইতেন। এইরূপ কি ভাবে একদিন সেখানে গিয়াছেন। গিয়া দেখেন শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শত শত ভক্ত মহানন্দে কীর্তন করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়াছেন, সে আনন্দে ভক্তগণের ব্যহ্যজ্ঞান নাই। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীর্তন হইতেছে, সুতরাং তাঁহার আনন্দ সর্বাপেক্ষা অধিক। এমন সময় একজন দাসী ব্যস্ত হইয়া আসিয়া শ্রীবাসকে বাড়ীর ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেল।

শ্রীবাসের এক পুত্র, বয়সে বালক; তাহার সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে। অভ্যন্তরে রমণীরা তাহার সেবাশুশ্রযা ও রোগ প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন, আর শ্রীবাস বাহিরে প্রভুর সহিত নৃত্য করিতেছেন। তাহার এই পুত্র যে সাংঘাতিক রোগে মারা যাইতেছে, তাহাতে শ্রীবাসের মনে বিশেষ চিন্তা নাই। তিনি কেন চিন্তা করিবেন? তিনি যাঁহার, তাঁহার পুত্র যাঁহার, যিনি জীবমাত্রের গতি, সেই তিনি আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন। কাজেই শ্রীবাস রোগাক্রান্ত পুত্রকে রমণীদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া সংকীর্তনে নৃত্য করিতেছেন।

ডাকিবামাত্র দাসীর সহিত শ্রীবাস দ্রুতপদে বাটীর মধ্যে গমন করিলেন। তখন কেবলমাত্র চারিদণ্ড রাত্রি হইয়াছে। পুত্রের কাছে যাইয়া দেখেন যে, তাহার অন্তিমকাল উপস্থিত। তখন তাহাকে অতি যত্নপূর্বক তারকব্রহ্ম-নাম শুনাইলেন। পুত্রের জননী প্রভৃতি রমণীরা কান্দিবার উপক্রম করিলে, শ্রীবাস বিনীতভাবে তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। তিনি বলিতেছেন, "যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র মহাপাতকীও নিত্যধামে যায়, সেই শ্রীভগবান্ স্বয়ং আমার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন। সুতরাং আমার পুত্রের যে ভাগ্য, তাহা ব্রহ্মা পর্যন্ত লোভ করিতে পারেন। যদি তোমাদের পুত্রের উপর প্রকৃতই স্নেহ থাকে, তবে তোমরা আনন্দ-উৎসব কর। সে শুভক্ষণে জন্মিয়াছিল, নৃত্যকারী শ্রীভগবানের সম্মুখে সে দেহত্যাগ করিল, এই কথা মনে করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইতেছে। তোমরা স্ত্রীলোক, দুর্বল জাতি, যদি আমার এই কথায় মনকে সান্ত্বনা করিতে না পার, তবে অন্ততঃ কিছুকাল ক্রন্দন স্থগিত কর। এমন কি, বাহিরে যে ভক্তগণ আছেন, তাঁহারা যেন এই ঘটনার বিন্দুমাত্রও জানিতে না পারেন। কারণ, এই কথা প্রকাশ হইলেই দুঃখের তরঙ্গ উঠিবে, আর তাহা হইলে আমার প্রভুর আনন্দ-রস ভঙ্গ হইবে।" অতএব (যথা চৈতন্যভাগবতে)— "কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়। তবে ত গঙ্গায় প্রবেশিনু সর্বথায়।।" শ্রীবাস বলিতেছেন, "যদি ক্রন্দন-কলরব শুনিয়া প্রভুর আনন্দ-রস ভঙ্গ হয়, তবে আমি তদ্দণ্ডে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীবাসের স্ত্রী, ও বাড়ীর অন্যান্য রমণীরা, কতক বুঝিয়া, কতক অনুরোধে,

আর কতক ভয়ে, ক্রন্দনে ক্ষান্ত দিলেন ও অভ্যন্তরের আঙ্গিনায় মৃতপুত্রকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিলেন,—এ সংবাদ কাহাকেও জানিতে দিলেন না। আর, শ্রীবাস প্রফুল্লিত মুখে কীর্তনস্থানে আসিয়া দুই বাহু তুলিয়া "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

কাজেই ভক্তগণ তখন ইহা জানিতে পারিলেন না বটে; কিন্তু ঐ কথা অধিকক্ষণ গোপন থাকিবার নহে,—কাজেই ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কারণ যিনিই এই সংবাদ শুনিতেছেন, তিনিই নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়া চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় শ্রীবাসের মুখপানে চাহিয়া দেখিতেছেন। দেখিতেছেন কি, যে শ্রীবাস সদ্য পুত্রশোকরূপ-বাণে বিদ্ধ, তিনি দুই বাহু তুলিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীবাসের এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সেই ভক্ত তখন শ্রীগৌরাঙ্গের পানে চাহিতেছেন; আর ভাবিতেছেন, "প্রভু, এ তোমারই কাজ, তুমি ভিন্ন এরূপ রঙ্গ করে কাহার সাধ্য? এই শ্রীবাস তোমার একান্ত প্রিয়, ইহার হৃদয়মাঝারে তুমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই তুমি, তাঁহার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছে, সেই তুমি তাঁহার একমাত্র পুত্র হরণ করিলে, ইহাতে তোমার প্রতি তাঁহার চিত্ত একবিন্দুও বিচলিত হইল না, বরং তাঁহার চিত্তে আনন্দ ধবিতেছে না। ধন্য তুমি! ধন্য তোমার ভক্ত!"

প্রকৃতপক্ষে যাঁহাদেব মন নিতান্ত মায়াজালে আবদ্ধ তাঁহারা ভাবিতে পারেন যে, প্রভু এ কার্যটি ভাল করেন নাই, যেহেতু তিনি যখন শ্রীবাসের বাড়ীতে নৃত্য করিতেছেন, তখন তাঁহার সম্মুখে, সেই শ্রীবাসের বাড়ীতে, কোন বিপদ আসিতে দেওয়া কর্তব্য ছিল না। কিন্তু হে মুগ্ধ-জীব! তুমি কি আমি ভগবান্ নহি, তুমি আমি শ্রীবাসও নহি,—কাজেই তুমি আমি তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিমাপকও হইতে পারি না। শ্রীবাসের এই ঘটনা দ্বারা জগতে একটি কথার উৎপত্তি হইল। সে কথা পূর্বে জগতে ছিল না, সেই কথায় লক্ষ লক্ষ লোক চিরদিন শিক্ষা পাইবে। এই অবতারের সমুদয় কাণ্ডই জীব-শিক্ষার নিমিত্ত। এই লীলা দ্বারা শ্রীভগবান্ দেখাইলেন যে,—তোমরা যাহাকে দুঃখ বল, ভক্তের নিকট তাহা সুখ। পুত্রশোক অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর নাই। শ্রীবাস মর্মে মর্মে এই বিষম আঘাত পাইয়া, সেই শেল বুকে করিয়া, ভক্তিবলে কি করিল, তাহা তিনি জীবকে দেখাইলেন।

তবে তোমরা বলিতে পার যে, শ্রীভগবান্ শ্রীবাসকে কেন এত দুঃখ দিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীবাস একটুও দুঃখ পান নাই। যাঁহার মনে ধ্রুব বিশ্বাস যে, শ্রীভগবান তাঁহার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন, পুত্রশোকে তাঁহার কি করিতে পারে? তোমার যদি সে বিশ্বাসটুকু থাকিত, তবে তোমারও ঐ অবস্থায় দুঃখ হইত না। তাহার পর, আর একটি কথা সকলেরই জানা উচিত। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা ইহকালকে স্বপ্ন মনে করেন। কেবল পরকালই তাঁহাদের পক্ষে প্রকৃত। তাঁহাদের নিকট মৃত্যু "চির বিয়োগ" নয়,—মৃত্যু তাঁহাদের নিকট "নূতন-জীবন ও চির-মিলন।"

বলিয়াছি যে, যিনি শ্রীবাসের মৃতপুত্রের বিষয় শুনিতেছেন, তিনিই নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়া, স্তম্ভিত হইয়া, একবার শ্রীবাসের, একবার প্রভুর মুখ পানে চাহিতেছেন। এইরূপে এক এক করিয়া ক্রমে সকলেই নৃত্যে ক্ষান্ত দিলেন; সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্যও ক্ষান্ত হইল। যখন সমস্ত কোলাহল বন্ধ হইয়া গেল, তখন গৌরাঙ্গের বাহ্য হইল। বাহ্য পাইয়া তিনি ভক্তগণের পানে চাহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "কেন আমার অন্তর কান্দিয়া উঠিতেছে?" তখন শ্রীবাসের দিকে ফিরিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত! তোমার বাড়িতে কি কিছু দুর্ঘটনা হইয়াছে? কীর্তনে কেন আমার সুখ হইতেছে না? আমার প্রাণ কেন কান্দিতেছে?" শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু! তুমি আমার বাড়ীতে, সুতরাং দুর্ঘটনা অসম্ভব।" প্রভু এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "তোমরা আমাকে শীঘ্র বল, পণ্ডিতের বাড়ীতে কি কোন বিপদ হইয়াছে?" তখন ভক্তগণ পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। প্রভুকে দুঃখের কথা কেহই বলিতে চাহেন না। কিন্তু শেষে বলিতে হইল। ভক্তগণ তখন কহিলেন, "শ্রীবাসের পুত্র পরলোকগত হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া প্রভু বলিতেছেন, "সে কি! কতক্ষণ?" ইহাতে

পার্ষদগণ বলিলেন, "এই ঘটনা চারি দণ্ড রজনীর সময় হইয়াছে, আর সে প্রায় আড়াই প্রহর হইল।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসের মুখ পানে চাহিলেন। দেখেন, তাঁহার মুখ আনন্দে প্রফুল্ল। প্রভু শ্রীবাসের মুখ পানে চাহিয়া তাঁহার বদনের ভাব দেখিয়া বড় সুখী হইলেন। বলিতেছেন, "শ্রীবাস! তুমি ধন্য! তুমি অদ্য শ্রীকৃষ্ণকে ক্রয় করিলে।" কিন্তু তিনি আর ধৈর্য ধরিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন, "আমি কিরূপে এই সঙ্গ ত্যাগ করিব? এমন ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে মনে করিয়া আমার বিদীর্ণ হইতেছে।" শ্রীগৌরাঙ্গ এই বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। শ্রীবাস তখন প্রভুকে শান্ত করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস যখন বলিলেন, "প্রভু! পুত্রশোক সহিতে পারি, কিন্তু তোমার নয়নজল দেখিতে পারি না; প্রভু শান্ত হও, আমার দুঃখ নাই, দুঃখের সম্ভাবনাও নাই," তখন শ্রীগৌরাঙ্গ নয়ন মুছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ একটু শান্ত হইলে, সকলে সেই মৃত শিশুকে বাহিরে আনিয়া শোয়াইলেন। প্রভু তাহার নিকট যাইয়া ও তাহাকে জীবিত ভাবিয়া দুই একটি প্রশ্ন করিলেন। প্রভুর প্রশ্ন করিবামাত্র সেই মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইল, আর শিশু কথা কহিতে লাগিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলে সেখানে আসিলেন। শ্রীবাসের পরিবারবর্গ ও ভক্তগণ মৃতশিশুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুর ইচ্ছামত মৃতশিশু উত্তর করিতেছে, যথা, "আমার এ জগতের কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে, কাজেই আমি ভাল স্থানে যাইতেছি। প্রভু! কৃপা কর, যেন তোমার চরণে মতি থাকে।' ইহা বলিয়াই তাহার আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

যখন মৃতপুত্র এইরূপ কথা কহিল, তখন মৃতশিশুর জননী প্রভৃতি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে সে শিশু মরে নাই, সম্পূর্ণরূপে জীবিত আছে। শোক জীবের প্রধান দুঃখ। এই শোক সহ্য করিতে না পারিয়া পূর্বে রমণীগণ মৃতস্বামীর সহিত সহমরণে গমন করিতেন। শোকের কারণ আর কিছু নয়। যিনি শোকাকুল, তিনি ভাবেন যে, তাঁহার প্রিয়জন চিরকালের নিমিত্ত ধ্বংস হইয়া নীরব হইল। আর সে কথা কহিবে না, আর তাহার সহিত কোন কালে মিলন হইবে না। যদি তিনি জানিতে পারেন যে, তিনি যাহাকে মৃত ভাবিতেছেন, সে জীবিত আছে, তাহা হইলে শোকজনিত দুঃখের অনেক পরিমাণে হ্রাস হয়। মৃতশিশুর মুখের কথা শুনিয়া তাহার জননী পর্যন্ত শোক ভুলিয়া গেলেন, এবং আনন্দে পরিপূরিত হইলেন। শ্রীবাসের চারি ভাই একেবারে প্রভুর চরণে পড়িলেন, এবং আর একবার প্রভুকে দেহ, গৃহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি সমর্পণ করিলেন। আর একবার বলি কেন, না তাঁহারা পূর্বে এইরূপ বহুবার আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রভু বলিলেন, "শ্রীবাস! যখন সংসারে আসিয়াছ, তখন তোমাকে ইহার নিয়মের অধীন থাকিতেই হইবে। তবে কেহ কেহ সংসারের দণ্ডে ক্লেশ পায়, কিন্তু তুমি তাহার বাহিরে। তবু তুমি আমার নিজ-জন, যথাসাধ্য তোমাকে একটি সান্ত্বনা বাক্য বলি। যেমন তোমার পুত্র পরলোকগত হইয়াছে, তেমনি আমি আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমার পুত্র রহিলাম।" এই কথা শুনিয়া সকলেই শ্রীবাসের ভাগ্যকে প্রশংসা করিয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাহার পরে ভক্তগণ মৃতদেহ লইয়া সৎকার করিতে গেলেন।

সকলেই শোক দুঃখ ভুলিলেন, কিন্তু একটি কথা কেহই ভুলিতে পারিলেন না। সে কথাটি সকলের হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধিয়া রহিল। সকলেই বিষণ্ণচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন যে, প্রভু ও কি কথা বলিলেন? প্রভু যে বলিলেন, এরূপ সঙ্গ কিরূপে ছাড়িবেন, তবে কি তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন? প্রভু ত্যাগ করিয়া গমন করিলে ত একজনও প্রাণে বাঁচিবে না। সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কথাটি এরূপ মর্মভেদী যে, উহা লইয়া পরস্পর আলোচনা করিতেও পারিলেন না। সকলেই মনে মনে রাখিলেন।

দশম অধ্যায়

আজু কেনে গোরাচাঁদের বিরস বয়ান। ধ্রু। কে আইল কে আইল বলি ঝরয়ে নয়ান।।
চৌদিকে ভক্তগণ কান্দি অচেতন। গৌরাঙ্গ এমন কেনে না বুঝি কারণ।।
সে মুখ চাহিতে হিয়া কেমন জানি করে। কত সুরধুনী গোরার আঁখি যুগে ঝরে।।
হরি হরি বলি গোরা ছাড়য়ে নিশ্বাস। শিরে কর হানে বাসু গদগদ ভাষ।।

মাঝে মাঝে এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া ভক্তগণের সঙ্গে দুই একটি কথা বলিতেন, কি কীর্তন করিতেন। কিন্তু অন্য সময় একেবারে ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। একদিন ভক্তগণ শ্রীনিমাইকে বিশেষ উদ্বিগ্ন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে যে আনন্দময় ভাব ছিল তাহা হঠাৎ অন্তর্হিত হইল। পুত্রের সাংঘাতিক রোগ হইলে মুখে যেরূপ চিন্তায় নিদর্শন দেখা যায়, সেইরূপ ঘোর উৎকণ্ঠায় তাঁহার মুখচন্দ্রিমা মলিন করিল। ভক্তগণ বুঝিলেন যে, কোন ঘোর উদ্বেগ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে অতিশয় যন্ত্রণা দিতেছে। কিন্তু সে চিন্তাটি কি কেহ স্থির করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, এরূপ সাহসও কাহারও হইতেছে না। জিজ্ঞাসা করিলেও ফল নাই, যেহেতু প্রভু হয়ত প্রশ্ন শুনিতে কি বুঝিতে পারিবেন না, বা উহার উত্তরও দিবেন না। নিমাই আপনার ঘরের পিঁড়ায় বসিয়া আছেন, ভক্তগণ চতুষ্পার্শে বসিয়া তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন। নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তাঁহার চক্ষে জল নাই, যেন হুতাশে নয়নের জল শুকাইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছেন, কি অস্ফুট স্বরে "হায় হায়" করিতেছেন! শচী পুত্রের এই হৃদয়বেদনা দেখিয়া দুঃখে রোদন করিতেছেন, কিন্তু নিমাইয়ের মনে কি দুঃখ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। সুতরাং কিরূপে সে দুঃখ অপনয়ন করিবেন, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছেন না।

নিমাই মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক চাহিতেছেন, কখনও বা একটু উঠিয়া উঁকি মারিতেছেন, যেন কাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। অল্প একটু শব্দ হইলেই চমকিয়া উঠিতেছেন ও মুখ শুখাইয়া যাইতেছে। কখন বা শব্দ শুনিয়া নিকটস্থ ভক্তগণকে বলিতেছেন, "তোমরা দেখ ত কে এলো।" এই কথা শুনিয়া কেহ বাটীর বাহিরে যাইয়া দেখিয়া আসিলেন, আর বলিলেন, "কৈ? কেহ ত আসে নাই।" তখন আবার নিমাই একটু শান্ত হইলেন। "আবার উঁকি মারিতে লাগিলেন এবং কোন শব্দ হইলে অমনি বলিলেন, "আবার দেখিয়া আইস, কেহ আসিয়াছেন কি না।" নিমাই কেন এইরূপ করিতেছেন, কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না। এমন সময় গোপীনাথ সিংহ আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার পানে অতি কাতরভাবে চাহিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "অক্রূর! তবে তুমি সত্যই আসিয়াছ? সত্যই আমাকে অনাথা করিয়া কৃষ্ণকে লইয়া যাইবে?" এই বলিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের মনের ভাব কি?

শ্রীবৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ লীলারস সমুদয় স্বয়ং আস্বাদন করিয়া ও ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া এখন শ্রীগৌরাঙ্গ এই কৃষ্ণ-লীলার আর একপদ অগ্রবর্তী হইলেন। শ্রীনবদ্বীপে এখন "অক্রূর-সংবাদ" পালা আরম্ভ হইল। শ্রীগৌরাঙ্গের মনে এই ভাব বিন্ধিয়া গেল যে, শ্রীঅক্রূর আসিয়াছেন, আসিয়া তাঁহার কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবেন।

এখন উপরের বাসুঘোষের পদটি অনুভব করুন। অক্রূর আসিয়া কৃষ্ণকে লইয়া যাইবেন। অক্রূর আসিতেছেন, আগতপ্রায় কিন্তু কখন আসিবেন ঠিক নাই, এই ভাবে শ্রীনিমাই বিভোর। কাজেই উদ্বেগে মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, একটু উঠিয়া মুহুর্মুহুঃ উঁকি মারিতেছেন। কোন শব্দ শুনিলেই "কে এলো" বলিয়া ভয়ে ব্যস্ত হইতেছেন। একটু শব্দ হইলেই ভাবিতেছেন, "এই এসেছে!"

এখন মথুরায় লীলা আরম্ভ হইতেছে। কাজেই শ্রীনিমাই অক্রূরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে ভাব ফুটিতে লাগিল। ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ এই রসে এত বিভোর হইলেন যে অক্রূর আসিয়া যেন তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইলেন, আর তিনি অক্রূরকে অনুনয়-নিয় করিয়া বলিতেছেন,

"অক্রুর, আমার কৃষ্ণকে লইয়া যাইও না।" ইহা বলিয়া এরূপ কাতরস্বরে মিনতি করিতে লাগিলেন যে, যাঁহারা চারিপার্শ্বে বসিয়া প্রভুর ভাব লক্ষ্য করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। শ্রীনিমাই আবার বলিতেছেন, "অক্রূর! কৃষ্ণ আমার যতনের ধন, মথুরা স্বার্থপরতার স্থান, সেখানে তাঁহার যত্ন হইবে না। তাঁহার হৃদয় ভালবাসায় গঠিত, তিনি ব্রজ ফেলিয়া যাইতে মর্মাহত হইবেন।" নিমাই এইরূপ বলিতেছেন, আর যেন বুঝিতেছেন যে, তাঁহার কথা না শুনিয়া অক্রুর তবুও কৃষ্ণকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তখন আবার বলিতেছেন, "অক্রূরের দোষ কি, আমার কপালের দোষ। বিধি আমার কপালে কৃষ্ণ-বিরহ লিখিয়াছেন, অক্রূর কেবল সেই নির্বন্ধ পালন করিতেছে মাত্র।" শ্রীগৌরাঙ্গের সেই মুহূর্তের প্রলাপ অবলম্বন করিয়া মহাজনেরা নানা পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার একটি পদ শ্রবণ করুন। শ্রীমতী রাধা বিধিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"তই রে বিধি অক্রূর মূর্তি ধরি। আমার কৃষ্ণ নিলি চুরি করি।।
যদি কৃষ্ণ নিলি চুরি করি। রাখিস্ তারে যতন করি।।
(আমার যতনের ধন রে)"

এইরূপে শ্রীনিমাই অক্রূরকে অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন। ক্রমে সে ভাব আরো প্রস্ফুটিত হইল। সে ভাব এই যে, নির্দয় অক্রুর তাঁহার কৃষ্ণকে ছাড়িল না, লইয়া চলিল। তখন আরও আকুল ভাবে বলিতেছেন, "অক্রূর! আমার প্রাণনাথকে কোথা নিয়া যাইতেছ? তাহাকে নিয়া গেলে আমি বাঁচিব কিরূপে? "অক্রূর তোমাকে মিনতি করিতেছি" বলিতে বলিতে তাঁহার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তখন কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন, "আমাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া, আমার কৃষ্ণকে লইও না।" ইহা বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু ভক্তগণ ঘিরিয়া দাঁড়াইলে আবার বসিলেন। তখন আবেগ ভরে ভক্তগণকে বলিতেছেন, "তোমরা যে চুপ করে রৈলে? তোমরা কেহ যে কোন কথা কহিতেছ না? কৃষ্ণকে যে লইয়া গেল, দেখিতেছ না?" কিন্তু ভক্তগণ এ কথার কি উত্তর দিবেন, তাঁহারা কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। যথা—

হরি হরি কি কহব গৌরচরিত। ধ্রু।
অকুর অকুর বলি, পুনঃ পুনঃ ধাবহি, ভাবছি পূরব পিরীত।।
কাঁহা মঝু প্রাণনাথ লেই যাওই, ডারি শোকরি কূপে?
কো পুন বচন, বোল নাহি ঐছন, সব জন রহিল নিচুপে।।
রোই ভকতগণ, বোলই পুনঃ পুনঃ তুহুঁ সব না কহসি ভাষ।
ঐছন হেরি, ভকতগণ রোয়ত, না বুঝল গোবিন্দদাস।।

তখন "অক্রূর একটু দাঁড়াও, আমি কৃষ্ণকে একবার জনমের মত দেখিয়া লই,"—ইহাই বলিয়া প্রভু অক্রূরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। ভক্তগণও ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিতে উঠিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বেশি পরিশ্রম করিতে হইল না। কারণ "দাঁড়াও" "দাঁড়াও" বলিয়া দু এক পা যাইতে না যাইতে প্রভু একটু কাঁপিলেন, আর দীঘল হইয়া ধূলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভক্তগণ সর্বদা সর্তক থাকেন যে প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় না পড়েন, কিন্তু সকল সময় তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। কারণ সকল সময় প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার বাহ্য গতিও বুঝিতে পারেন না। অনেক সন্তর্পণে নিমাই চেতন পাইলেন, অর্থাৎ তাঁহার মূর্চ্ছা ছাড়িয়া গেল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাহ্যজ্ঞান হইল না। যেহেতু তখনও আপনাকে গোপী ভাবিতেছেন, আর ভাবিতেছেন যে, কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছে। এই দুই ভাবে রোদন করিতেছেন।

এই কৃষ্ণ-বিরহ পূর্বেও ছিল, এখনও রহিয়াছে; তবু উভয় ভাবে অনেক প্রভেদ। ইহার তথ্য পূর্বে কিছু বলিয়াছি। পূর্বে নিমাই "কৃষ্ণ" বিরহে কান্দিতেন, কিন্তু এখন নিমাই আর নিমাই *রহিলেন না। এখন তিনি শ্রীমতী রোদন রাধা, অথবা একজন গোপী।* আর শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন

করিলে যেরূপ গোপীরা কাতর হইয়া করিয়াছিলেন, সেইরূপ রোদন করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্য-ভাগবতে ঃ

"পূর্বে যেন গোপী সব কৃষ্ণের বিরহে। পায়েন মরণ ভয় চন্দ্রের উদয়ে।।
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার। কান্দেন সবার গলা ধরিয়া অপার।।"

পুনঃ যথা চৈতন্যমঙ্গলে ঃ

"এত মতে আনন্দে সানন্দে দিন যায়। আচম্বিতে উঠে খেদ প্রভুর হিয়ায়।।"

যখন একটু চেতনা হইতেছে, আর ভক্তগণকে সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আমি কি প্রলাপ বকিলাম ? আমি কি রাধা ? আমি না নিমাই ?" কিন্তু ইহার উত্তর শুনিবার অবকাশ পাইতেছেন না, আবার তখনই অচেতন হইতেছেন। এই গোপী-ভাব উদয় হইলে, প্রভু আর শ্রীভগবানরূপে সর্বসমক্ষে প্রকাশ হইয়া বিষ্ণুখট্টায় বসেন নাই। তবু মাঝে মাঝে শ্রীভগবানরূপে প্রকাশ হইতেন বটে, কিন্তু সে কিরূপে, পূর্বে বলিয়াছি।

এই যে গোপী-ভাবে কৃষ্ণবিরহ, ইহা অদ্ভুত কাণ্ড। জ্যোৎস্না দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন। কেন ? না, কৃষ্ণ বিনা কিরূপে রজনী যাপন করিবেন ? শ্রীকৃষ্ণকে অক্রূর মথুরায় লইয়া গিয়াছেন, আর কুব্জা তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে, এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ ধূলায় পড়িয়া রোদন করিতেছেন। যথা নিমাইয়ের উক্তি, "কুব্জা কুৎসিত মতি কৃষ্ণ হরে নিল।"

জীবের শিক্ষা এই অবতারের যে এক প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা পদে পদে বুঝা যায়। প্রভুর এইরূপ ভাব-পরিবর্তনে বুঝা যায় যে, জীব সাধারণতঃ ভক্তিভাবে শ্রীভগবানকে ভজন করিয়া ক্রমে মধুর-ভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে প্রভু বলিয়া ভজনা করিতে করিতে, তিনি শেষে পদতলস্থ ভক্তকে হৃদয়ে ধরিয়া,—পতি যেমন আপন নারীকে গাঢ় আলিঙ্গন করেন,—সেইরূপ করিয়া থাকেন।

নিমাই বাড়ীতে বসিয়া আছেন, এমন সময় কেশবভারতী আইলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শচীদেবী বলিযাছিলেন ঃ

"বড় সাধ ছিল মনে নদিয়া-বসতি। কাল হয়ে এল মোর কেশবভারতী।"

নিমাই যে "কে এলো, কে এলো" বলিয়া উঠিতেছেন, সে কি এই কেশবভারতীর নিমিত্ত। কেশবভারতী ব্রাহ্মণ, পরম ভক্ত, অতি শুদ্ধচিত্ত। তাঁহাকে দর্শন মাত্র নিমাইয়ের অন্তরের বেগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। ভারতী ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়া পুলকিতাঙ্গ ও তাঁহার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেছে। একটু দেখিয়া বলিতেছেন, "তুমি শুক না প্রহ্লাদ ?" এইরূপ স্তুতিবাদ শুনিয়া নিমাই আরো কান্দিয়া উঠিলেন ! কেশবভারতী আবার ভাল করিয়া মুখ দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনের ভাব ফিরিয়া গেল। তখন বলিতেছেন, "তুমি শুক কি প্রহ্লাদ নও, তুমি কি, বলিতেছি।" যথা চৈতন্য-ভাগবতে ঃ

"তুমি প্রভু ভগবান জানিনু নিশ্চয়। সর্বজন প্রাণ তুমি নাহিক সংশয়।"
এ বোল শুনিয়া প্রভু ব্যথিত অন্তর। ন্যাসী নমস্কারী বলে বচন মধুর।।
তোর কৃষ্ণ অনুরাগ অতি বড় হয়। সে কারণে যেথা সেথা দেখ কৃষ্ণময়।।
বল বল ন্যাসীবর করুণা করিয়া। কবে কৃষ্ণ অন্বেষিব সন্ন্যাসী হইয়া।।
কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কবে দেশে দেশে যাব। কোথা গেলে কৃষ্ণ প্রাণনাথে মুই পাব।।

পুনঃ যথা চৈতন্যচরিত কাব্য ঃ

প্রশংসাং স্বা শ্রুত্বা দ্বিগুণবিকলোঽসৌ পুনরপি,
প্রকামং চক্রন্দায়মপি পুনরাহাতি চকিত।
ভবান্ দেবোবিষ্ণুর্বিদিতমিমেবং খলু ময়ে
ত্যপাকর্ণ্য শ্রীমান্নসনমিহ কর্ত্তুংস চকমে।।৫৪।।

কেশবভারতী কাঞ্চননগরে অর্থাৎ কাটোয়ায় সুরধুনী তীরে একটি সুন্দর বটবৃক্ষতলে বাস করিতেন। তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি উহার নিকটবর্তী স্থানে বিরাজ করিতেছেন। ভারতীকে দেখিয়া নিমাই বাহ্য পাইলেন ও তাঁহাকে অনেক যত্ন করিয়া ভিক্ষা করাইলেন, ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ভক্তি দেখাইলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভাবের বিশেষ পরিবর্তন হইল না।

একদিন নিমাই পিঁড়ায় বসিয়া ভাবিতেছেন। কি ভাবিতেছেন, তাহা তাঁহার কার্যের দ্বারা কতক ব্যক্ত হইল; শ্রীকৃষ্ণ যে মথুরায় গিয়াছেন, ইহা নিমাই স্থির বুঝিয়া বসিয়া আছেন। কাজেই কৃষ্ণ বিরহে দিবানিশি পুড়িতেছেন। অতি ব্যথার স্থানে অভিমানে ক্রোধের উদয় হয়। নিমাই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র দেখিয়া মনে মনে ক্রোধ করিলেন। ভাবিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ বড় নির্দয় এবং কৃতঘ্ন। গোপীদিগের সহিত তাঁহার ব্যবহার একটুও ভাল নয়। আপনি ত্রিজগৎকে মোহিত করিতে পারেন, তাহাই বলিয়া অনুগতা সরলা গোপীদিগকে মোহিত করিয়া, কুলের বাহির করিয়া, শেষে পরিত্যাগ করা, নিতান্তই নিষ্ঠুরের কার্য। এরূপ নিষ্ঠুরকে ভজন করার ফল কি? সুখই বা কি? অতএব কৃষ্ণকে আর ভজন না করিয়া গোপীদিগকে করা ভাল। কারণ তাহারা কৃষ্ণের পাদপদ্মের নিমিত্ত সমুদয় ত্যাগ করিল। নিমাই অহরহ মুখে কৃষ্ণনাম জপ করিতেন; কিন্তু এই অবধি গোপীদিগকে ভজন করিবেন স্থির করিয়া, মুখে কৃষ্ণনাম জপ ছাড়িয়া দিয়া, একমনে "গোপী" "গোপী" নাম জপিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ প্রভুর ভাব কিছু কিছু বুঝেন। আর তাঁহারা প্রভুর মনের ভাব একটু বুঝিয়া বিস্মিত হইয়া সেই গোপী-নাম জপ শুনিতেছেন। এমন সময় সেখানে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ আসিলেন। ইনি আর নিমাই এক টোলে গঙ্গাদাসের নিকট পাঠ করিয়াছেন, অতএব প্রভুকে তিনি খুব চিনেন। নিজেও তখন খ্যাতাপন্ন হইয়াছেন। ব্যাস যেরূপ ন্যায়ের, আগমবাগীশ সেইরূপ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান আচার্য। শুনিয়াছেন, নিমাই পণ্ডিত অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং সাধুপথ ছাড়িয়া দিয়া, "হরিভজা" হইয়াছেন। এইজন্য তাঁহার সহিত তর্ক করিতে, অথবা শুধু কৌতূহল তৃপ্তির নিমিত্ত, একবার তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। দেখেন নিমাইপণ্ডিত ভক্তগণ পরিবেষ্টিত। সকলে নীরব হইয়া ভক্তিপূর্বক তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন, আর তিনি একমনে "গোপী" নাম জপিতেছেন।

নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া, আগমবাগীশের জিগীষা বৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া গেল। দেখেন যে, নিমাই নিতান্ত ভালমানুষ, মুখে দম্ভের চিহ্নমাত্র নাই, বরং তাহাতে সারল্য ও বিনয়ের জ্যোতি অতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইতেছে। কাজেই এরূপ নিরীহ ও ক্ষমতাশূন্য লোকের সহিত কোন তর্ক কি শাস্ত্রালাপ করিতে তাঁহার, প্রবৃত্তি হইল না। তবে ইহাও ভাবিলেন,—তিনি আগমবাগীশ, আসিলেন আর চলিয়া গেলেন, অথচ কেহ লক্ষ্য করিল না, ইহা হইতেই পারে না। অতএব এই মুগ্ধ ব্রাহ্মণকুমারকে গোটা দুই উপদেশ দিয়া যাইবেন, সিদ্ধান্ত করিলেন। ইহাই ভাবিয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! তোমার কার্যপ্রণালী শাস্ত্রসম্মত নয়।" নিমাই সে কথা শুনুন বা না শুনুন শুনিয়াছেন যে, তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে দিলেন না, অবিচলিত হইয়া "গোপী", "গোপী" নাম জপিতে লাগিলেন। তখন আগমবাগীশ আবার বলিতেছেন, "তোমার এ প্রণালী অশাস্ত্রীয়। কৃষ্ণনাম জপায় পুণ্য আছে, এরূপ শাস্ত্রে দেখিতে পাই। গোপী-নাম জপিবার বিধি কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাই না। অতএব গোপী-নাম জপা ছাড়িয়া দাও, বরং কৃষ্ণ-নাম জপ কর, তাহাতে ফল পাইবে।"

কৃষ্ণনাম কর্ণে প্রবেশ করিলে, প্রভু মুখ তুলিয়া আগমবাগীশের কথা শুনিতে লাগিলেন। কৃষ্ণানন্দ যাহা বলিলেন, নিমাই তাহার ভাব বুঝিলেন। কিন্তু কৃষ্ণানন্দ যে কে, তাহা

চিনিলেন না। তবে তিনি যে একজন অন্য সম্প্রদায়ের লোক, অর্থাৎ নিজ-জন নহেন, ইহা স্বভাবত তাঁহার মনে উদয় হইল। তখন মনে এই ভাব হইল যে, তিনি ত গোপী, আর কৃষ্ণানন্দ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষীয় মথুরার লোক। তাই প্রভু কৃষ্ণানন্দের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "তুমি বৃথা চেষ্টা করিতেছ। কৃষ্ণ-নাম আর লইব না। কৃষ্ণের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিব না। কৃষ্ণ নির্দয় ও কৃতঘ্ন।" তখন আগমবাগীশ জিভ কাটিয়া বলিতেছেন, "ও কথা বলিতে নাই, শুনিতেও নাই, আর কৃষ্ণ-নাম ত্যাগ করিয়া গোপী-নাম জপ করিলে মহা অপরাধ হয়।" প্রভু বলিতেছেন, "তুমি কৃষ্ণের দূত হইয়া আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছ? তুমি আমার কুঞ্জ হইতে বাহির হও।" আগমবাগীশ ইহার ভাব কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন প্রভু বলিতেছেন, "তুমি এখনও গেলে না? দাঁড়াও, আমি তোমাকে বাহির করিতেছি।" ইহাই বলিয়া নিকটে একখানা যষ্টি ছিল, তাহা লইয়া "বাহির হও" বলিয়া ক্রোধের সহিত আগমবাগীশের পানে ধাইলেন। আগমবাগীশ যদি ঐ ভাবে ভাবুক হইতেন, তবে প্রভু তাঁহাকে কৃষ্ণের দূত ভাবিয়া যেরূপ কথা কহিতেছিলেন, তিনিও সেই ভাব স্বীকার করিয়া তাহার উত্তর দিতেন। কিন্তু তিনি সে ভাবের ভাবুক নহেন, কাজেই প্রভুর ভাব কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তবে তিনি এই বুঝিলেন যে, একজন অতিশয় বলবান প্রকাণ্ড দেহধারী যুবক যষ্টি হস্তে করিয়া কি কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মারিতে আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ,তিনি আর কি কবিবেন? "বাপরে, মার্‌লে রে" বলিয়া উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারিলেন। এত ব্যস্ত হইয়া দৌড়াইলেন যে, পশ্চাতে কেহ তাঁহাকে মারিতে আসিতেছে কি না, ইহা দেখিবার অবকাশও পাইলেন না, অনবরত দৌড়িয়া দৌড়িয়া নিজ-জনের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, কেহ আসিতেছে না, আর নিজজনকে কাছে দেখিয়া অনেকটা সাহসও হইল। তখন ভয়ে ও পরিশ্রমে হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাঁহাদের নিকট বলিতে লাগিলেন, "অদ্য একটি ব্রহ্মহত্যা হইতেছিল। কেবল পিতৃপুরুষের পুণ্যবলে প্রাণ পাইয়াছি। বড় ফাঁড়া কাটাইলাম। রাম! রাম! এমন স্থানেও মনুষ্য যায়? যাহা হউক, ইহার একটা বিহিত করিতে হইবে। নিমাইপণ্ডিত কি দেশের রাজা হইয়াছে?"

সকলে কৌতূহলী হইয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায়, আগমবাগীশ বলিতেছেন, "নিমাইপণ্ডিত বড় ভক্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমি তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখি যে, কতকগুলি অকালকুষ্মাণ্ড তাহার মুখ পানে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে, আর নিমাই "গোপী" "গোপী" বলিয়া নাম জপিতেছে। বেচারার অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। গোপী নাম জপা শাস্ত্রে নাই। ভাবিলাম, ইহাকে একটি সদুপদেশ দিয়া যাই। তাই বলিলাম যে, 'তুমি গোপী-নাম না জপিয়া কৃষ্ণ-নাম জপ কর।' এই আমার অপরাধ। ইহাতে কৃষ্ণকে ত অনেক কটুকাটব্য বলিল, সে কথা শুনিলে কর্ণে হস্ত দিতে হয়। তাহার পরে করিল কি,— নিমাইপণ্ডিতকে দেখেছ ত, সেই চারিহস্ত লম্বা, অঙ্গে অসুরের ন্যায় বল,—হাতে লাঠি লইয়া আমাকে মারিতে আসিল। তখন আমি ভাবিলাম যে, এক দৌড় মারিলে প্রাণরক্ষা হইলেও হইতে পারে। তাই দৌড়িয়া প্রাণ পাইলাম। এখন তোমরা বিচার কর, নিমাইপণ্ডিত কি নদের রাজা?"

আগমবাগীশের ভক্তগণের নিমাইপণ্ডিত ও তাঁহার ধর্মের উপর বড় অশ্রদ্ধা। সুতরাং একথা শুনিয়া প্রভুর দোষ-কীর্তনের একটি সুবিধা পাইয়া তাঁহারা বড় সন্তুষ্ট হইলেন। একজন বলিতেছেন, "কল্য নিমাইপণ্ডিতের সহিত্ একত্রে পড়াশুনা করিলাম, অদ্য তিনি কিরূপে গোসাঞি হইলেন?" আর এক জন বলিলেন, "তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া হয় ত অভিমান করেন, কিন্তু আমরাও ত ব্রাহ্মণের তেজ রাখি। তিনি যে ব্রাহ্মণ মারিতে চাহেন, তাঁহার এ

আস্পর্ধা কেন হয়?'' আর একজনের পিতা একটু বড়লোক। তিনি বলিতেছেন, ''নিমাইপণ্ডিত জগন্নাথের বেটা, আমরাও কমলোকের সন্তান নহি।'' আর একজন বলিলেন, ''তিনি মারিতে যে আসেন, তিনি কি রাজা?'' এই কথা শুনিয়া আর এক জন বলিতেছেন, ''ইহার প্রকৃত কর্তব্য আমি বলিতেছি। তিনি যেমন আমাদের মারিতে আইসেন, আমরাও তাঁহাকে মারিব, দেখি কে রাখে?''

কাজেই তখন তাঁহারা শ্রীনিমাইকে মারিবেন এই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এখন নিমাইয়ের কথা শ্রবণ করুন। তিনি যষ্টি হাতে করিয়া যেমন ''বাহির হও'' বলিয়া অগ্রবর্তী হইলেন, অমনি ভক্তগণও তাঁহাকে ধরিতে উঠিলেন। এদিকে প্রভুর ভাব দেখিয়া আগমবাগীশ চীৎকার করিয়া ভয়ে দৌড় মারিলেন, কিন্তু আগমবাগীশের ভাব দেখিয়া শ্রীনিমাইয়ের রসভঙ্গ হইল ও তদ্দণ্ডে তাঁহার নিপট্র-বাহ্য হইল। নিমাই অনেক দিবস পর্যন্ত গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ বিভোর ছিলেন। সে ভাব দেখিয়া শচী প্রভৃতি ও ভক্তগণ কান্দিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন। তাঁহারা নানা চেষ্টা করিয়াও প্রভুকে এই ভাবসাগর হইতে উঠাইতে পারেন নাই। কিন্তু আগমবাগীশ আসিয়া অতি সহজে তাঁহাকে চেতন করাইয়া দিলেন।

প্রভু সম্পূর্ণরূপে বাহ্য পাইয়া হাতের যষ্টি ফেলিয়া দিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া আবার তাঁহার স্থানে আনিয়া বসাইলেন। প্রভু বসিয়া ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, ''আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম?'' ভক্তগণ কিছু বলিলেন না। কিন্তু তবু শ্রীনিমাই সমুদয় জানিতে পারিলেন। তিনি যে যষ্টি হাতে করিয়া আগমবাগীশকে তাড়াইয়াছিলেন, এ সমুদয় তাঁহার স্মরণ হইল। তখন তাঁহার চাঁদমুখ ক্লেশে একেবারে মলিন হইয়া গেল। তিনি আর কোন কথা বলিলেন না, বিষণ্নমনে অবনত মুখে চুপ করিয়া রহিলেন। নিমাইয়ের এই নীবব অবস্থা রহিয়া গেল। কিন্তু তিনি যে কি ভাবিতেছেন ও কি ভাবিয়া ক্লেশ পাইতেছেন, তাহা ভক্তগণ জানিতে পারিলেন না; কেহ জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসী হইলেন না। তবে সকলে দেখিলেন যে, প্রভুর বাহ্যজ্ঞান রহিয়াছে, আর তিনি কোন ভাবে অভিভূত নহেন। এইরূপে নীরবে নিমাই গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিলেন, ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। প্রভু গঙ্গাতীরে বসিলেন, ভক্তগণও একটু দূরে বসিলেন। তখন প্রভু আপন মনে বলিলেন। ''কয নিবারণের নিমিত্ত পিপ্পলিখণ্ড ব্যবহার করিল, কিন্তু কফ নিবারণ না হইয়া আরও বাড়িয়া চলিল।'' এই কথা বলিয়া প্রভু অট্ট অট্ট হাস্য করিয়া উঠিলেন। তখন বুঝা গেল প্রভুর এই হাসি সুখের নয়,—ক্লেশের।

প্রভুর এই কথা শুনিয়া সকলে চিন্তিত হইলেন। এই কথার অর্থ কি? পূর্বে প্রভু বলিয়াছিলেন, ''এমন সঙ্গ কিরূপে ত্যাগ করিবেন।'' এখন বলিতেছেন, ''ঔষধে পীড়া না সারিয়া বাড়িয়া চলিল।''—এই দুইটি কথা মিলাইয়া সকলে বিচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু নানা জনের নানা মত, কেহ কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। তবে যিনি যাহাই ভাবুন, একটি বিষয় সকলেই নিশ্চিত বুঝিলেন। অর্থাৎ প্রভু কি একটা নিঠুরালী করিবেন, মনে মনে তাহারই যুক্তি করিতেছেন। তবে কিরূপে কি করিবেন, তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতেছে না। পুত্রের আসন্নকাল উপস্থিত হইলে, পিতা-মাতা মুখে বলিতে পারেন না যে, পুত্র মরিবে, কি মরিতেছে। সেইরূপ প্রভু যে সন্ন্যাস করিবেন, এ কথা ভক্তগণ মুখেও আনিতে পারিতেছেন না। এই সময়, নবদ্বীপের অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছেন। নূতন যৌবন, অমানুষিক রূপ, সুন্দর বসন, সর্বাঙ্গ চন্দনচর্চিত, গলে মালতীর মালা, অতি সূক্ষ্ম শুভ্র উপবীত শ্রীঅঙ্গ বেড়িয়া শোভা পাইতেছে। দুষ্টলোক ইহা দেখিয়া ঈর্ষা করিতে লাগিল। আবার ভক্তগণ তাঁহাকে গৌরহরি ও পূর্ণব্রহ্মসনাতন বলিতে লাগিলেন, ও ভগবানের ন্যায় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সুখবিলাসের অবধি রহিল না। তাঁহার ভক্তগণ দেহ মন প্রাণ যথাসর্বস্ব তাঁহাকে

সমর্পণ করিয়াছেন। প্রতি দিবস তাঁহার বাড়ীতে বিবিধ উপহার আসিতেছে। যিনি যাহা সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য ভাবেন, তাহার অগ্রভাগ প্রভুকে না দিয়া কেহ ভোগ করেন না। যিনি দর্শন করিতে আসেন, হস্তে ফুলের মালা, চন্দন ও কোন উপাদেয় দ্রব্য লইয়া আসেন। এই সমস্ত দেখিয়া দুষ্টলোকের আর সহ্য হইতেছে না। তাহারা বলিতে লাগিল, "শচীর বেটা আবার ঠাকুর হইল কবে? নিমাইপণ্ডিতের বড় সুখ হয়েছে। ঠাকুর হয়েছেন, ক্ষীর ছানা চলিতেছে, আর দেখ না, কেমন নাগর হইয়া বেড়াইতেছেন? উহার নাগরালি ঘুচাইতে হইবে।" ইহাই বলিয়া ষণ্ডার দল তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রহার করিবে, এই পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহার পর এই আগমবাগীশের কাণ্ড।

অন্তর্যামী শ্রীভগবান সমস্ত জানিলেন, ক্রমে এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! নগরে পরামর্শ হইতেছে যে, আমাকে প্রহার করিবে, এ কথা আপনি শুনিয়াছেন?" এ কথায় শ্রীনিত্যানন্দ আর কি উত্তর দিবেন, অধোবদন হইয়া রহিলেন। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "যাহারা আমাকে প্রহার করিবে পরামর্শ করিতেছে, তাহাদিগকে আমি জানি। আমি সন্ন্যাসী হইব। কৌপীন পরিয়া, হাতে করোয়া লইয়া, সেই সমুদয় লোকের বাড়ী যাইয়া ভিক্ষা মাগিব। আমার গার্হস্থ্য সুখের নাশ ও ভিক্ষুকের অবস্থা দেখিলে আর তাহাদের আমার উপর ক্রোধ থাকিবে না। বরং দয়া হইবে ও তখন স্বচ্ছন্দে তাহারা হরিনাম গ্রহণ করিবে।" এইভাবে কিয়ৎক্ষণ আবিষ্ট থাকিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "শ্রীপাদ নিত্যানন্দ! তুমি সাক্ষী থাকিলে, আর চন্দ্র সূর্য তোমরা সাক্ষী রহিলে। আমার সন্ন্যাসে আমার নিজ-জন বড় দুঃখ পাইবেন। কেহ কেহ ইহাতে আমার উপর ক্রোধ করিবেন, কেহ বা মনের দুঃখে আমাকে ত্যাগ করিবেন, কোন কোন ভক্ত মনোদুঃখে আমাকে নিন্দাও করিবেন। কিন্তু তোমরা সাক্ষী রহিলে, আমি স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসী হইতেছি না। আমি জীবগণের তৃপ্তির নিমিত্ত সুখে বাস করিতেছিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আমি সুখে থাকিলে তাহারা সুখী হইবে। কিন্তু আমার সুখ তাহাদের প্রিয়কর হইতেছে না। অতএব এই অবধি আমি দুঃখী ভিক্ষুক হইব, হইয়া জীবের মনস্তুষ্টি করিব। অতএব তোমরা সাক্ষী থাকিলে, আমি যে ঘরের বাহির হইলাম ইহাতে আমার কোন দোষ নাই।"

এখন এই কথাগুলির তাৎপর্য পরিগ্রহ করুন। নিমাইকে তাঁহার নিজ-জনে প্রাণের অধিক ভালবাসেন। প্রাণের অধিক ভালবাসা যে বলিলাম, ইহা বাহুল্য বর্ণনা নহে,—অনেকেই তাঁহার নিমিত্ত অনায়াসে প্রাণ দিতেও পারেন। তাহার পরে তাঁহার বৃদ্ধা মাতার তিনি ব্যতীত কেহ নাই। তাঁহার নবীনা ঘরণীর কেবল যৌবনাঙ্কুর হইতেছে। নিমাই ও সমুদয় নিজজনকে কি দোষে ছাড়িয়া যাইবেন? এমন সমুদয় অনুগত জনের হৃদয়ে শেল হানিলে তাঁহার নিষ্ঠুর ও কৃতঘ্নের ন্যায় কার্য করা হয়। তাঁহার আত্মীয়স্বজনের কি ইচ্ছা তাহা অনায়াসে অনুভব করা যাইতে পারে। তাঁহাদের ইচ্ছা যে গৌরাঙ্গ গৃহে থাকিয়া পৃথিবীর সমুদয় সুখ ভোগ করুন। প্রভুর অঙ্গে কৌপীন, তাঁহারা কিরূপে সহ্য করিবেন? প্রভু নিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ আর তোমরা আমাকে দোষিতে পারিবে না। আমি তোমাদের তুষ্টির নিমিত্ত সংসারে থাকিয়া আনন্দে দিন যাপন ও নৃত্য-গীত করিতেছিলাম। কিন্তু জীবের তাহা সহ্য হইল না। বরং আমার উপরে তাহাদের ক্রমে ক্রমে ক্রোধ হইতেছে। আমি এখন সমস্ত সাংসারিক সুখ বিসর্জন দিয়া, তোমাদের মনস্তুষ্টির চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া জীবগণের মনস্তুষ্টি করিব। আমি সন্ন্যাসী হইয়া কৌপীন পরিয়া, যাহারা আমাকে মারিতে চাহিয়াছে, তাহাদের দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা মাগিব।" একথা শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি বলিতেছেন, "প্রভু! এমন নিঠুরালী করিও না। মায়ের দশা একবার মনে কর।" প্রভু বলিতেছেন, "সেই জন্য আমি সংসারে থাকিয়া তোমাদের সঙ্গে কীর্তনানন্দ ভোগ করিতেছিলাম। কিন্তু তাহা হইল না। জীব আমার গার্হস্থ্য-সুখ দেখিয়া হরিনাম লইল না। ইহা তোমরা এখন স্বচক্ষে দেখিলে। কাজেই আমার গার্হস্থ্য সুখের ও তোমাদের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত কঠিন জীবগণের উদ্ধার হইল না। এখন শ্রীপাদ! তুমি আমাকে উপদেশ দাও। তোমাদের মনস্তুষ্টির

নিমিত্ত আমি সংসারে থাকিয়া সুখভোগ করিব, না কৌপীন পরিয়া তোমাদিগকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া জীবগণকে উদ্ধার করিব?" শ্রীনিত্যানন্দ উত্তর করিতে পারিলেন না। মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। নিতাইয়ের নয়ন দিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। নিতাই ভাবিতেছেন,—প্রভু শ্রীভগবান্। তিনি তাঁহার ত্রিতাপিত জীবগণকে, স্বয়ং কাষ্ঠা-করঙ্গধারী হইয়া উদ্ধার করিবেন; আমি নিবারণ করিলে তিনি শুনিবেন কেন? আর আমিই বা নিবারণ করিব কি বলে? কিন্তু আমার কথা আমি ভাবি না, প্রভু যেখানেই গমন করেন, আমি সঙ্গে যাইব। প্রভুর পথ হাঁটিয়া উপবাসে, শীতে, রৌদ্রে ক্লেশ হইবে, তাহাও তত ভাবিতেছি না। কিন্তু শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা কি হইবে? ইহাই ভাবিয়া নিতাই ভুবন অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। নিতাই একটু স্থির হইয়া আবার বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি চিরদিন স্বেচ্ছাময়। তোমাকে কে বিধি দিবে বা নিষেধ করিবে? তবে আমার এই নিবেদন—আর পাঁচজন ভক্তের নিকট এই কথা বলুন, আর যাইবার পূর্বে তোমার বিরহে যেন সকলে না মরিয়া যায়, তাহার উপায় করুন।"

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দের কথা শুনিয়া বড় সুখী হইলেন ও মধুর হাসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, "তুমি এত ব্যস্ত হইও না। আমি এখনি যাইতেছি না। আর আমি যাইবার আগে সকলকে বলিযা কহিয়া স্থির না করিয়া যাইব না।"

একাদশ অধ্যায়

যাই মাগো তোমায় তোমার বধূর কাছে রেখে। ধ্রু।
সদা কৃষ্ণনাম নিও, (যাবার বেলা) নিমাই'র এই ভিক্ষে।।
বিষ্ণুপ্রিয়া অবোধিনী, দুঃখিনী সে অনাথিনী,
যতন করে দিও তারে কৃষ্ণনাম শিক্ষে।
রইতে নারি নিমাই গেল, এ কলঙ্ক চিরকাল,
জ্বলন্ত অনল সম বলরামের বক্ষে।।

প্রভু এ কথা নিতাইকে যে ভাবে বলিয়াছিলেন, আর কাহাকেও সে ভাবে বলিলেন না। তাঁহার মনের কথা কতক প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু সে অন্য ভাবে। কিরূপে—বলিতেছি। বাসু ঘোষের অগ্রজ গোবিন্দ ঘোষ ও মুকুন্দ বসিয়া আছেন, এমন সময় গদাধর আসিয়া একটি সংবাদ দিলেন। এই ঘটনাটি গোবিন্দ ঘোষ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"প্রাণের মুকুন্দ হে? আজ শুনিনু আচম্বিত।
কহিতে পরাণ যায়, মুখে নাহি বাহিরায়, শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ।।
ইহা ত জানি মোরা, সকালে মিলিনু গোরা, অবনত মাথে আছে বসি।
নিঝোরে নয়ন ঝুরে, বুক বাহি ধারা পড়ে, মলিন হয়েছে মুখশশী।।
দেখিয়া তখন প্রাণ, সদা করে আনচান, শুধাইতে নাহি অবসর।
ক্ষণেক সম্বিত হৈল, তবে মুঞি নিবেদিল, শুনিয়া দিলেন উত্তর।।
আমি ত বিবশ হঞা, তাঁরে কিছু না কহিয়া, ধাইয়া আইনু তব পাশ।
এই ত কহিনু আমি, যে কহিতে পার তুমি, মোর নাহি জীবনের আশ।।
শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে, গদাধরের বদন হেরিয়া।
শ্রীগৌবিন্দ ঘোষ কয়, ইহা যেন নাহি হয়, তবে মুই যাইব মরিয়া।।"

মুকুন্দের নিকট গদাধরের এই সংবাদ বলিতে যাইবার কারণ আছে। প্রথম, গদাধর ও মুকুন্দ এক-আত্মা ও এক-প্রাণ; আর দ্বিতীয়, প্রভু যে সন্ন্যাস করিবেন, এ সংবাদ মুকুন্দ সর্বাগ্রে সর্বসমক্ষে বলিয়াছিলেন। তিনি ভাবগতিকে পূর্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে প্রভু আর অধিক দিন ঘরে রহিবেন না। যথা চৈতন্যমঙ্গল—

"ইঙ্গিত আকারে তাহা বুঝিল মুকুন্দ। প্রভু রাখিবারে করে প্রকার প্রবন্ধ।।
শুন শুন সর্বজন আমার উত্তর। সন্ন্যাস করিব এই দেব বিশ্বম্ভর।।
যাবৎ আছয়ে দেহ নয়ন ভরিয়া। শ্রীমুখের কথা শুন শ্রবণ পূরিয়া।।
ছাড়িয়া যাইব প্রভু নিজ গৃহবাস। জননী ছাড়িব আর সব নিজ দাস।।"

প্রভু যে সন্ন্যাস করিবেন, গদাধর ইহা কিরূপে বুঝিলেন, বলিতেছি। প্রভু নীরবে আছেন, মনের ভাব কাহাকেও কিছু বলিতেছেন না। তাঁহার ভক্তগণও নীরবে তাঁহার সহিত দিবানিশি বাস করিতেছেন। একদিন সকালে উঠিয়া প্রভু অতি কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া ও করুণ ক্রন্দন শুনিয়া ধৈর্যহারা হইয়া সেই সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রোদন দেখিয়া প্রভু তখন আপনা হইতে বলিতেছিলেন, "কল্য নিশিযোগে এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া বড় কাতর হইয়াছি, রোদন সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।" স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিবার নিমিত্ত সকলে প্রভুর মুখপানে আগ্রহের সহিত চাহিলেন। প্রভু একটু ধৈর্য ধরিয়া বলিতেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, একজন ব্রাহ্মণ আমার কাছে বসিয়া সন্ন্যাসের একটি মন্ত্র বলিল। তাহা আমার হৃদয়ে শেলস্বরূপ বিন্ধিয়াছে। আমি কোনও ক্রমে মন স্থির করিতে পারিতেছি না।" ইহা বলিয়া প্রভু উচ্চৈঃস্বরে পুনরায় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কোন ভক্ত বলিলেন, "ইহাতে দুঃখিত হইবার কারণ কি, বুঝিলাম না। কেহ কোন মন্ত্র বলিয়া থাকে, তাহাতে তুমি কান্দ কেন। মনে করিলেই ত রোদন সংবরণ করিতে পার?" প্রভু বলিলেন, "তাহা আমি পারিতেছি না। সে মন্ত্র আমার হৃদয়ে বিষের স্বরূপ জ্বলিতেছে। সে মন্ত্রের কথা মনে করিতেছি, আর আমার প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে। সে মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে, "তুমি তিনি।" কিন্তু তোমরা বিবেচনা কর যে, (যথা চৈতন্যমঙ্গলে)—"কেমনে ছাড়িব আমি, প্রিয় প্রাণনাথ। তাহারে ছাড়িয়া বা সাধিব কোন কাজ।।"

"যদিও আমি আর শ্রীভগবান্ এক হইলাম, তবে ভক্তি কি প্রেম রহিল না, শ্রীকৃষ্ণ রহিলেন না। তাহা হইলে প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া আমার কি কার্য্য সাধন হইবে?" প্রভুর এই উক্তিতে সম্ভবতঃ কোন ভক্ত, প্রভু যে স্বয়ং ভগবান্ ইহা ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া থাকিবেন, "তুমি তিনি" এ কথা অন্যায় কি হইল? ঠিক কথাইত বলা হইয়াছে? যে ব্রাহ্মণ তোমার কর্ণে এই কথা বলিয়া গিয়াছে, সে তোমার তত্ত্ব অবগত আছে বই আর কিছু নয়।

কোন ভক্ত এরূপ বলিয়া থাকিবেন, এ কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ যে প্রভুর এই দুঃখের কারণ হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেহেতু তখন একটি রহস্যের তরঙ্গ না উঠিলে, মুরারি অত দুঃখের মাঝে কিরূপে প্রভুর সহিত রহস্য করিলেন? এখন শ্রবণ করুন। মুরারিগুপ্ত করপুটে নিবেদন করিতেছেন, "প্রভু! তুমি সেই মন্ত্রকে ষষ্ঠীতৎপুরুষ কর;" যথা (চৈতন্যচরিতকাব্যে)—

ইতি শ্রুত্বা গুপ্ত সপদি স মুরারিঃ সমবদৎ।
প্রভো ত্বং ষষ্ঠীতৎপুরুষ বচনং তত্র কুরুভ্যোঃ।।

অর্থাৎ মুরারি বলিতেছেন যে, "প্রভু! মন্ত্রের অর্থ যদি 'তুমি তিনি' অর্থাৎ 'তুমি আর ভগবান্ এক' এইরূপেই হয়, তবে তুমি সেই মন্ত্রকে 'তুমি তাঁহার' করিয়া লও। তাহা হইলেই হইল।"*

*প্রভুর স্বপ্নের প্রতিপাদ্য বাক্য 'তত্ত্বমসি'। বেদের এই মহাকাব্যের অর্থ সাধারণে 'সেই তুমি হও' এইরূপ বুঝিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। তাই মহাপ্রভু ভঙ্গীদ্বারা মুরারিগুপ্তের মুখে সেই মহাকাব্যের প্রকৃত অর্থ জীবগণকে বুঝাইলেন। "তস্য ত্বম্" ইহা তৎপুরুষ সমাস করিলে তত্ত্বন শব্দ হয়। তস্য অর্থাৎ তাঁহার ত্বং অর্থাৎ তুমি, অসি অর্থাৎ হও।

এই কথা শুনিয়া অতি দুঃখের মাঝেও, শ্রীগৌরাঙ্গ একটু হাস্য করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "ঠিক হইয়াছে। তাহাই করিব। যেমন বিষ, তাহার উপযুক্ত প্রতিকার তুমি বলিলে। কিন্তু কি করিব, আমি স্ববশে নাই। আমার প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে। এ কি শব্দের শক্তিতে হইতেছে? যাহাই বল, আমার সংসারে থাকা হইল না। আমি বুঝিলাম, আমাকে এতদিন পরে গৃহের বাহির হইতে হইল।" এই কথা শুনিয়া গদাধর আর প্রভুর পানে চাইতে পারিলেন না। মাঠের মাঝখানে দেবতার গর্জন শুনিলে লোকে যেরূপ দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হইয়া দৌড় মারে, সেইরূপ গদাধর দৌড়িয়া যাইয়া মুকুন্দকে সমুদায় বৃত্তান্ত জানাইলেন। শেষে বলিলেন যে, তাঁহার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। মুকুন্দ ও গোবিন্দ ঘোষও তাহাই বলিলেন। এই কথা বলিয়া তাঁহারা কান্দিতে লাগিলেন।

নিতাই প্রভুর নিজ মুখে শুনিয়াছেন যে, তিনি সংসার ছাড়িবেন। এখন ভক্তগণও একপ্রকার বুঝিলেন যে, প্রভু আর অধিককাল গৃহে থাকিতেছেন না। ভক্তগণ তখন সমুদয় পার্থিব সুখ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া প্রভুর অনুগত হইয়াছেন। তাঁহারা নয়ন মুদিলে প্রভুর রূপ দেখেন। নয়ন মেলিলেও তাঁহার রূপ দেখিতে পাইবেন বলিয়া তাঁহারা কাছে বসিয়া থাকেন। যখন আপনারা কথা বলেন, তখনও কেবল প্রভুর কথাই বলেন।

একজন আসিতেছেন, একজন যাইতেছেন। পথে দেখা হইলে আগের জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু কেমন আছেন, কি করিতেছেন?"—আর যে কোন কথা, কি কোন বস্তু আছে, তাহা ভক্তগণ তখন ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহারা শুনিলেন যে, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। কাজেই গদাধর বলিলেন যে, তাঁহার আর বাঁচিবার সাধ নাই। কেবল গদাধর কেন,—সকলেই মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, প্রভু যদি প্রকৃতই এরূপ নিঠুরালী করেন, তবে তাঁহারা সকলেই প্রাণত্যাগ কি ঐরূপ একটা কিছু করিবেন। তাঁহাদের বিশেষ ভয়ের কারণ এই যে, প্রভু কি যে করিবেন তাহা তাঁহারা জানেন না। সকলেই ইহাই বলিয়া দিবানিশি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—সকলেরই আহার নিদ্রা সুখেচ্ছা একেবারে গেল।

শচী এ সমুদয় কথা কিছুই জানেন না। কিন্তু তবু দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছেন। মধ্যযোগে নিমাইকে সংকীর্তনে মগ্ন দেখিয়া শচী ভাবিয়াছিলেন যে, পুত্র এতদিন পরে বান্ধা পড়িল, আর বিশ্বরূপের ন্যায় নিঠুরালী করিয়া পলাইতে পারিবে না। কারণ নিমাই সংকীর্তনে পাগল, বাড়ী ছাড়িয়া এরূপ সংকীর্তন আর কোথায় পাইবে? আর নিতাই, অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি সঙ্গীদিগকেই বা কোথায় পাইবে? সুতরাং নিমাই এই সমুদয় সঙ্গীর ও সংকীর্তনের লোভ ছাড়িয়া পলাইবে না। কিন্তু নিমাইয়ের সংকীর্তনের স্পৃহা কমিয়া গেল, নৃত্য-গীত এক প্রকার থামিয়া গেল, সঙ্গীদিগের সহিত কৃষ্ণ-কথা বন্ধ হইল, কেবল থাকিল;—নীরবে রোদন ও বিভোর অবস্থা। শুদ্ধ ইহা নয়। পূর্বে নিমাই আনন্দে ডগমগ থাকিতেন, এখন যেন অতিশয় ব্যথিত, হৃদয়ে যেন শেল বিন্ধিয়া রহিয়াছে, আর তাহাতে চন্দ্রবদন কাতর। শচী আর মনোদুঃখে নিমাইয়ের মুখপানে চাহিতে পারেন না। কিন্তু সেও শচীর প্রকৃত দুঃখ নয়। নিমাই কি আর ঘরে থাকিবে? আর তিনি কিসে তাহাকে ঘরে আটকাইয়া রাখিবেন? নিমাই তাঁহার কি বিষ্ণুপ্রিয়ার বাধ্য নয়, সংকীর্তনে মত্ত নয়, আর তাঁহার ভক্তগণেরও নয়। নিমাই এখন আপনা-আপনি বসিয়া কান্দে, কাহারও সহিত কথা কহে না। এমন সময় শচী দেখিলেন যে, কেশবভারতী আসিয়াছেন, আর নিমাইয়ের সহিত তিনি কথা কহিতেছেন। তখন "নিলে! নিলে! আমার নিমাইকে নিলে!" মনে এই মহা আতঙ্ক হইল। কি করিবেন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া দুঃখিনী শচী তাড়াতাড়ি তাঁহার ভগিনী, চন্দ্রশেখরের পত্নীকে ডাকাইয়া আনিলেন। তাঁহাকে লইয়া নির্জনে বসিলেন এবং অতি বিষণ্ণ মনে বলিতে লাগিলেন। (যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে) —"শচী বলে—ভগ্নি শুন, তোমারে কহি যে পুনঃ, আমার জীবন বিশ্বম্ভর। সন্ন্যাসী দেখিয়ে তারে, বড়ই আদর করে, তা দেখিয়ে মোর লাগে ডর।।"

শচীর ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নিমাই কবে কিরূপে কাহাকে আদর করিল? তাহাতে শচী বলিলেন, "সে দিবস কেশবভারতী নামক একজন সন্ন্যাসী আসিলে, নিমাই তাহার সহিত কথা বলিল আর আদর করিয়া তাহাকে খাওয়াইল। ইহা দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল।" ভগিনী বলিলেন, "ইহাতে দোষ কি হইল? বোধ হয় কেশবভারতী বড় একজন ভক্ত হইবেন, তাই নিমাই তাঁহাকে আদর করিয়াছে।" শচী বলিলেন, "ভগিনী! তুমি কি ভুলে গিয়াছ, সন্ন্যাসী নাম শুনিলে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। বিশ্বরূপ আমাকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছে, তাহা'ত আর ভুলিবার নহে। আমার বাড়ীর পাশ দিয়া যদি সন্ন্যাসী যায়, তবে আমি অমনি ঠাকুর ঘরে গিয়া হত্যা দিই, যেন আমার নিমাইকে না নিয়ে যায়। যদি ঘাটে সন্ন্যাসী দেখি, তবে আমার অমনি বোধ হয় যে, সে নিমাইকে ভুলাইয়া লইতে আসিয়াছে।" তখন দুই ভগিনী পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এ কথা নিমাইকে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য। শচী বলিলেন, "ভগিনী! দেখ দেখি নিমাই বাহিরে আছে কি না? স্নানের বেলা হইল, এখনো বাড়ী আসিল না কেন?" ইহাই বলিতে বলিতে শচীর ভগিনী বলিয়া উঠিলেন, "ঐ যে নিমাই আসিতেছে।" নিমাই আসিলে, শচী দেখিলেন নিমাই সচেতন আছে। নিমাই জননীকে দেখিয়াই ভক্তিতে গদগদ হইয়া করপুটে পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। নিমাই শচীকে যতবার দেখিতেন, ততবারই ঐ ভাবে প্রণাম করিতেন। যথা চন্দ্রোদয়ে—

"মায়ে দেখি গৌরহরি, দুই হস্তাঞ্জলি করি, প্রণমিল চরণ যুগল।"

শচী চিরজীবী হও বলিয়া, আশীর্বাদ করিলেন। তারপর বলিতেছেন, "বাপ। আমার নিকটে তোমার মাসী বসিয়া, দেখিতেছ না? উহাকে প্রণাম কর।" এ কথা শুনিয়া,—

"মায়েব আজ্ঞায় তাঁরে, প্রণমিল বিশ্বম্ভরে, তিঁহ তবে সঙ্কুচিত হৈল।"

যদিও তিনি প্রভুর মাসী, তবু প্রভু প্রণাম করায় জড়সড় হইলেন। শচী সমস্ত মনের কথা খুলিয়া পুত্রের নিকট বলিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার মন কেবল এক সাধে পরিপূর্ণ, অর্থাৎ নিমাই ঘরে বসিয়া সংসার করুক। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস হইতেই এই সাধ অতি প্রবল হইয়াছে। কিন্তু নিমাই একেবারে সংসারের সুখকে তৃণবৎ অগ্রাহ্য করেন। সুতরাং তাঁহার এক ভাব, নিমাইয়ের অন্য ভাব,—কাজেই পুত্রের নিকট সমুদয় মনের কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন। এখন শচী-চিন্তায় ব্যাকুল, অতএব পূর্বেকার সঙ্কুচিত ভাব সঙ্কল্প দ্বারা পরিত্যাগ করিয়া বলিতেছেন, "নিমাই! একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করিব। আমাকে ভাঁড়াইবা না, সঠিক উত্তর দিতে হইবে।" নিমাই বলিলেন, "মা, আজ্ঞা করুন।" শচী বলিলেন, "সন্ন্যাসী দেখিয়া অত আদর কর কেন? কেশব ভারতীকে সে দিবস তোমার অত ভক্তি দেখিয়া আমি বড় ভয় পাইয়াছি।" নিমাই বলিলেন, "মা, ভারতী ঠাকুর পরম ভক্ত, তাহাই আদর করিয়াছি। তাহাতে দোষ কি?" শচী তখন সঙ্কোচ ভাব ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "নিমাই, তুমি আমাকে ভাঁড়াইতেছ। আমার কথার উত্তর দিতেছ না। তুমি কি বিশ্বরূপের মত আমার বুকে শেল মারিয়া ফেলিয়া যাইবে? স্পষ্ট করিয়া উত্তর দাও।" তখন নিমাই বলিতেছেন, "মা, আমায় কি করিতে হইবে আমি বলিতে পারি না, কারণ আমি স্ববশে নাই। তবে আমি যদি কোথাও যাই, তোমাকে বলিয়া যাইব, তোমার অনুমতি লইয়া যাইব, আর আবার আসিয়া তোমাকে দেখা দিব।"

শচী এ সমুদয় কথা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া পুলকিত হইলেন। নিমাই সত্যবাদী; চন্দ্রসূর্য নষ্ট হইবে, তবু নিমাইয়ের কথা লঙ্ঘন হইবে না, তাহা শচী জানেন। এরূপ স্পষ্ট করিয়া কখন তিনি তাঁহার মনের ভাব পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই, আর এরূপ স্পষ্ট উত্তরও পান নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ যে ভাবে উত্তর দিলেন, তাহাতে শচী একেবারে নিঃশঙ্ক হইলেন। তখন মনের মধ্যে একটি প্রাচীন কথা তাঁহাকে ক্লেশ দিবার অবসর পাইয়া দগ্ধ করিতে লাগিল। এ কথাটি এতদিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতদিন এ কথাটি গোপন করিয়া যে তিনি

অন্যায় করিয়াছেন, তাহা বুঝিতেও পারেন নাই। এখন যখন নিঃশঙ্ক হইলেন, মনে মনে বুঝিলেন যে, নিমাই বিশ্বরূপের মত তাঁহাকে ফেলিয়া যাইবে না, তখন তাঁহার যে সে কাজ ভাল হয় নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠিল। শচী বলিতেছেন, "বাপ, আমি তোমাব নিকটে একটি বিষয়ে বড় অপরাধী আছি। আমি এতদিন ভয়ে বলি নাই, অদ্য বলিব। তুমি বাপ, অবশ্য আমাকে ক্ষমা করিবে?" শ্রীনিমাই শিহরিযা বলিতেছেন, "মা! ও কথা বলিতে নাই। জননীর আবার পুত্রের নিকট অপরাধ কি? তবে বিবরণ কি, বল শুনিতেছি।" তখন শচী বলিতেছেন, "তোমার দাদা বিশ্বরূপের কথা।" এই কথা বলিতেই নিমাই অত্যন্ত ব্যাকুল হইযা বলিতেছেন, "সে কি! দাদার কথা? দাদার কথা এ জন্মে শুনিব, ইহা আমি কখন আশাও করি নাই। বল বল, আমি শুনিতে বড় ব্যস্ত হইয়াছি।" শচী বলিতে লাগিলেন, "তোমার দাদা যখন আমাব বুকে আগুন দিয়া আমাকে ফেলিয়া যায়, তাহার কিছুদিন পূর্বে আমার হস্তে একখানি পুঁথি দিয়া বলিয়াছিল, 'মা! নিমাই বড় হইলে তুমি তাহাকে এই পুঁথিখানি দিয়া বলিবে যে, তোমার দাদা তোমায় এই পুঁথিখানি পড়িতে বলিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া আমি পুঁথি লইলাম না। আমি বলিলাম, আমি কেন দিব? তুমি নিজেই ত দিতে পারিবে? তাহাতে বিশ্বরূপ অতি কাতর হইয়া বলিল, 'মা! আমার এ কথা তোমাকে রাখিতেই হইবে। যদি আমি পারি, তবে আমিই নিমাইকে দিব। কিন্তু মরণ বাঁচনের কথা কিছুই বলা যায় না। তাই এই পুঁথিখানি তোমার কাছে রাখিতে চাই। যদি আমি না পারি, তুমি নিমাইকে দিও।' তারপর শচী বলিতেছেন, "তখন আমি জানি না যে, বিশ্বরূপ আমাব বুকে শেল মারিবে। আমি তাহার বিনয় বচনে মুগ্ধ হইয়া পুঁথিখানি লইলাম।" ইহাই বলিয়া শচী মস্তক অবনত করিয়া নীরব হইলেন।

নিমাই জননীকে চুপ করিতে দেখিয়া একটু অধীর হইয়া বলিতেছেন, "মা, চুপ করিলে কেন? বুঝিতেছ না যে, তোমার কাহিনী শুনিতে আমার প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হইযাছে?" তখন শচী ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "বাপ! আমার বলিতে ভয় করে।" ইহাতে শ্রীনিমাই একটু বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন, "মা, তুমি আমাকে ভয় কর, এ তোমার বড় অন্যায়। আমি যাই হই, তোমার পুত্র বই নয়। তুমি শীঘ্র বল, সে পুঁথিখানা কোথায়?" শচী তখন অবনত মস্তকে বলিলেন, "বিশ্বরূপ তাহার পরে সন্ন্যাস করিল। একদিন রন্ধন করিতে করিতে সে পুঁথির কথা মনে পড়িল। সেই পুঁথিখানি আনিলাম, তোমাকে দিব কি না ভাবিতে লাগিলাম। শেষে ভাবিলাম, পড়িয়া শুনিয়া বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইল। এই পুঁথি যদি নিমাই পড়ে, তবে হয়ত তাহার মনেও ঔদাস্য হইবে। তাহাই ভাবিলাম যে, পুস্তকখানি নিমাইকে দিব না।" ইহা বলিয়া শচী আবার চুপ করিলেন। নিমাই ইহাতে আগ্রহ করিয়া বলিতেছেন, "তুমি পুঁথিখানি এখন দাও, আমি উহা দেখিবার নিমিত্ত বড় ব্যগ্র হইয়াছি।" শচী তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি পুঁথি তোমাকে দিব না ভাবিয়া, উহা উনুনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পোড়াইয়া ফেলিয়াছি।" ইহা শুনিয়া নিমাইয়ের চন্দ্রবদন মলিন হইয়া গেল। উহা দেখিয়া শচী বলিতেছেন, "বাপ। তুমি রাগ করিবে জানি, তাই আগে ক্ষমা চাহিয়াছিলাম।" এই কথা শুনিয়া নিমাই লজ্জা পাইলেন, মুখ উঠাইয়া জননীর দিকে চাহিয়া মধুর হাস্য করিলেন। পরে বলিলেন, "আমার দাদার একমাত্র নিদর্শন পুঁথিখানি নষ্ট হওয়ায় স্বভাবত দুঃখ পাইয়াছিলাম। মা, আমাকে ক্ষমা কর। তোমার দোষ কি? তুমি বাৎসল্য-প্রেমে অভিভূত। তুমি ভালই করিয়াছ। তুমি স্বচ্ছন্দ হও, আমিও স্বচ্ছন্দ হইলাম।"

শচীর মনে তদ্দণ্ডে আবার একটু শঙ্কার উদয় হইল। বলিতেছেন, "নিমাই তুমি যে বলিলে,— যদি যাই, তবে বলিয়া অনুমতি লইয়া যাইব, তবে তুমি কি কোথাও যাইবে? "নিমাই বলিলেন", হাঁ মা, আমার ইচ্ছা আছে, কোন পুণ্যভূমি দর্শনে যাইব।" ইহা শুনিয়া শচী বলিলেন, "তুমি বল কি? তুমি তিলমাত্র অদর্শন হইলে আমি মরিয়া যাইব।" তখন নিমাই বলিলেন, "মা। তুমি

বিপরীত বুঝিতেছ। আমি তোমাদের সুখের নিমিত্তই যাইব।" শচী তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বাপ, যাহা কর, আমাকে আর দুঃখ দিও না।" ইহা শুনিয়া নিমাই বলিলেন, "মা, তোমার কি কোন দুঃখ আছে? যথা—

"তোমার মানসে সদা, কৃষ্ণচন্দ্র আছে বাঁধা, তাহাতে সম্পূর্ণ আছ তুমি।
দেশ দিক সুখময়, সদাই তোমার হয়, তোমারে বা কি বলিব আমি?"

শচী বলিলেন, "বাপ, তাহা সত্য, কৃষ্ণ সকলের কর্তা, কিন্তু তুমি আমার সুখ দুঃখ দিবার কর্তা। তুমি বল কৃষ্ণ আমার হৃদয়ে আছেন তাহাই শুনি, কিন্তু আমি ভিতরে কি বাহিরে তোমাকে বই ত কৃষ্ণকে দেখিতে পাই না।" ইহাতে নিমাই বলিলেন, "আমি ত পূর্বেই বলিয়াছি, তোমাকে না বলিয়া ও তোমার অনুমতি না লইয়া, কোথাও যাইব না।" শচী বলিলেন, "তা বটে।"

এখন শ্রীনিমাইয়ের সাহস অনুভব করুন। তিনি পুত্র, শচী জননী। তাঁহার ন্যায় পুত্র, শচীর ন্যায় জননী। তিনি শচী-জননীর নিকট অনুমতি লইয়া কৌপীন পরিবেন! এইরূপ সাহস কি সামান্য জীবের পক্ষে সম্ভবপর?

দ্বাদশ অধ্যায়

গেরুয়া বসন, অঙ্গেতে পরিব, শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে, যেখানে নিঠুর হরি।।
মধুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, খুঁজিব গোপিনী হ'য়ে।
যদি কারু ঘরে, মিলে গুণনিধি, বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে।।
আপন বঁধুয়া বান্ধিয়া আনিব আমি না-ডরাই কারে।
যদি রাখে কেউ, ত্যাজিব এ জিউ, নারি বধ দিব তারে।।
পুন ভাবি মনে, বান্ধিব কেমনে, সে শ্যাম-নাগরের হাতে।
বান্ধিয়া কেমনে, রাখিব পরাণে, তাই ভাবিতেছি চিতে।।
জ্ঞানদাস কহে, মধুর বচনে, শুন বিনোদিনী রাধা।
মথুরা নগরে যেতে মানা করি, দারুণ কুলের বাধা।।

নিমাই দাস্য-ভক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি যে স্বয়ং ভগবান এই পরিচয় দিলেন। তাহার পর গোপীভাবে ব্রজলীলা আস্বাদ করিয়া, তাঁহার ভক্তগণকে উহা আস্বাদন করাইতেছিলেন। কিন্তু জীবের দুর্মতি দেখিয়া তাঁহার স্মরণ হইল যে, ভক্তগণকে ব্রজের নিগূঢ় রস শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত তাঁহার আর একটি কার্য আছে, অর্থাৎ নাস্তিক, মায়াবাদী, অভক্ত প্রভৃতি কঠিন জীবগণকে উদ্ধার করা। অতএব তিনি সন্ন্যাস করিয়া জীবগণের হৃদয় দ্রব করিবেন, করিয়া তাহাতে হরিনামরূপ বীজ রোপণ করিবেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন। এমন সময় কেহ স্বপ্নযোগে সন্ন্যাসের মন্ত্র তাঁহার কর্ণে প্রদান করিলেন।

সন্ন্যাসের পূর্বে স্বপ্নযোগে এই মন্ত্র প্রদান করিবার একটি নিগূঢ় তাৎপর্য ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রভু গোপীভাবে সন্ন্যাস করিয়া কৃষ্ণ অন্বেষণে যাইবেন। যদি সন্ন্যাস করিতে বসিয়া, প্রভু প্রথম সেই মন্ত্র শ্রবণ করিতেন, তবে হয়ত তদ্দণ্ডে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইত। যেহেতু তখন তিনি রাধাভাবে বিভোর। রাধাকে যদি কেহ এ কথা বলে যে কৃষ্ণ আর কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহেন, তুমিই তিনি, তাহা হইলে শ্রীমতী তাহার একমাত্র সুখ ও আশা হইতে বঞ্চিত হইয়া, তদ্দণ্ডে প্রাণে মরিয়া যাইবেন। সেইরূপ যদি শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করিতে বসিয়া, প্রথমে তাঁহার গুরুর নিকট শুনিতেন যে, সন্ন্যাস মন্ত্রের তাৎপর্য্য "তুমিই তিনি," অর্থাৎ শ্রীভগবান্ আর কোন স্বতন্ত্র

বস্তু নহেন, তুমিই ভগবান্ তবে একটা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা হইত। এইজন্য পূর্বেই স্বপ্নযোগে শ্রীপ্রভু সন্ন্যাস মন্ত্রের তাৎপর্য কি, তাহা শ্রবণ করিলেন। সেই মন্ত্র শুনিয়া, প্রভু মর্মাহত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ হাসিয়া, প্রভুর সেই দুঃখ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কতক কৃতকার্যও হইলেন।

প্রভু তখন ভাবিতে লাগিলেন, তিনি কি করিবেন? যদি সন্ন্যাসী হইয়া কাঙ্গালের জীবন অবলম্বন না করেন, তবে জীব উদ্ধার পায় না। অথচ সন্ন্যাসের মন্ত্র ভক্তি-পথের বিরোধী সুতরাং সেই আশ্রমই বা তিনি কিরূপে অবলম্বন করেন? এখন পাঠক, জ্ঞানদাসের উপবিউক্ত পদটি বিচার করুন। প্রভু স্থির করিলেন যে, তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন, কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম অর্থাৎ "তিনিই আমি" এই তত্ত্ব গ্রহণ করিবেন না। তবে করিবেন কি, না—গেরুয়াবসন পরিধান করিবেন, হস্তে করোয়া ও দণ্ড লইবেন, আর সন্ন্যাস আশ্রমের যত দুঃখ স্বীকাব করিয়া লইয়া সংসার ত্যাগ করিবেন। করিয়া সন্ন্যাসের মন্ত্র জপ, কি যোগাভ্যাস না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিবেন।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। প্রভুর মন তাঁহার পার্ষদগণেরও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না, আমরা কিরূপে জানিব? তিনি বসিয়া গল্প করিতেন না, কি ধর্ম উপদেশও দিতেন না; তিনি কি করিবেন, না করিবেন, তাহা লইয়া পার্ষদগণেরও সহিত পরামর্শ করিতেও বসিতেন না। তবে তাঁহার কার্যের, কি আবিষ্ট অবস্থায় দুই একটি কথা দ্বারা তাঁহার মনের ভাব কতক জানা যাইত। প্রকৃত কথা, জীব উদ্ধার করা, কি ধর্ম প্রচার করা যে তাঁহার অতি প্রধান কার্য তাহা বাহিরের লোকে তাঁহার প্রত্যক্ষ কার্য, কি কথা দ্বারা জানিতে পারিত না। শ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাসকে যে হবিনাম প্রচাব করিতে আদেশ করেন, তাহা বাহিরের লোকের জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। যদি নাগরিয়াগণ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম কবিতেন, আর তাহাদের কর্তব্য কর্ম কি জিজ্ঞাসা কবিতেন, তখন তিনি এই মাত্র বলিতেন যে, "তোমরা হরেকৃষ্ণ নাম জপ কর।"

তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইত, শ্রীনিমাইয়ের প্রধান কার্য রসাস্বাদন করা। তিনি ভাব-তরঙ্গে ডুবিয়া থাকিতেন। "আমি জীব উদ্ধার করিতে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব।",—এ কথা তিনি প্রকাশ্যে বলিতেন না, কি প্রায় কাহাকেও জানিতে দিতেন না। ভক্তগণকে বলিতেন যে কৃষ্ণ অন্বেষণে তিনি গৃহত্যাগ করিবেন।

তবে হরিনাম প্রচার করা যে তাঁহার অতি প্রধান কার্য, তাহা লোকে তাঁহার নানা কার্য দেখিয়া প্রকারান্তরে বুঝিতে পারিত। হরিনাম প্রচারের জন্য প্রভু কি করিতেন, বলিতেছি। ভক্তগণ প্রভুর কৃপায়, নূতন নূতন রস আস্বাদন করিয়া পরিবর্ধিত হইতেন, হইয়া এরূপ শক্তিসম্পন্ন হইতেন যে তাঁহারা অনায়াসেই যেখানে সম্ভব, জীবগণের হৃদয় দ্রব করিতে পারিতেন। হরিনাম প্রচারের যে সমুদয় প্রধান বাধা, যাহা অতিক্রম করা ভক্তগণের সাধ্যতীত, (যেমন জগাই মাধাইকে উদ্ধার), ঐ সকল প্রভু নিজে করিতেন। আবার প্রভু দেখিলেন যে, তিনি সংসারে থাকিলে হরিনাম প্রচার হইবে না, তাই হরিনাম প্রচারের পথ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত সংসার ত্যাগ করিলেন। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার প্রয়োজন ছিল না। তিনি নিজে বলিয়াছেন, "কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন।" তাঁহার সন্ন্যাস কার্য্যটি কেবল মলিন জীবগণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত।

সে যাহা হউক, নিমাই আবার বিরহ-রসে ডুবিয়া গেলেন। যাঁহারা তরঙ্গের মধ্য দিয়া বড় নদী পার হইয়াছেন, তাঁহারা এটা কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, নৌকায় এক একটি তরঙ্গ আঘাত করিতেছে, আর উহা টলমল করিতেছে। নৌকা যতই অগ্রবর্তী হইতেছে, ততই তরঙ্গ বাড়িতেছে। ক্রমেই বোধ হইতেছে যে, নৌকা বুঝি ডুবিল। পরে সম্মুখে বৃহৎ একটি তরঙ্গ নৌকার দিকে আসিতেছে দেখা গেল; দেখিয়া প্রাণ শুকাইয়া গেল। তখন মনে হইল, বার বার এইবার বুঝি

নৌকা ডুবিল। ভক্তগণ সেইরূপ বুঝিলেন যে, আর একটি প্রকাণ্ড রস-তরঙ্গ প্রভুকে আঘাত করিতে আসিতেছে। এবার প্রভুকে একেবারে ডুবাইবে, কি কূল ছাড়াইয়া অকূলে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। এইবার বুঝি প্রভুকে তাঁহারা হারাইলেন।

প্রকৃতই এই তরঙ্গে নিমাইকে কুলের অর্থাৎ গৃহের বাহিরে করিল। নিমাই এত দিবস কৃষ্ণ-বিরহরূপ অগ্নি হৃদয়ে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আর তাহা পারিতেছেন না, উহা অতি প্রবলরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। পূর্বে নীরবে রোদন করিতেছিলেন, এখন "প্রাণ যায়" বলিয়া পার্ষদগণের গলা ধরিলেন। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোক মনের দুঃখ মনে রাখেন, কিন্তু দুঃখ ক্রমে প্রবল হইতে থাকিলে, পরিশেষে তাঁহাদের এরূপ অবস্থা হইতে পারে যে, আর তখন মর্মী প্রিয়জনের আশ্রয় না লইয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীবাসের বাড়ীতে বসিয়া ভক্তগণকে নিকটে ডাকিয়া প্রভু বলিলেন, "তোমরা আমার বান্ধব, আমাকে বিদায় দাও। আমি আর তোমাদের কাছে থাকিতে পারিতেছি না।" যথা—"নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি। দেখিবারে যাব যথা বৃন্দাবন ভূমি।।" তারপর "কৃষ্ণ আমার প্রাণনাথ, আমি তোমাকে কবে দেখিব" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। যথা—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি উচ্চ নাদে। সকরুণ স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে।।"

তাহার পরে অঙ্গের জ্বালায় ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বৃশ্চিকে দংশন করিলে লোকে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া থাকে। পুত্রবিয়োগ সংবাদ পাইলেও ঐরূপ গড়াগড়ি দিয়া থাকে। নিমাই কৃষ্ণ-বিরহ যন্ত্রণায় ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। পার্ষদগণ চারিপার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রভু একটু শান্ত হইলে সকলে তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইলেন। গদাধর অমনি প্রভুর পশ্চাদ্দিকে বসিলেন, আর নিমাই তাঁহার অঙ্গে এলাইয়া পড়িলেন, এবং নীরবে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। সোনার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, রোদন করিয়া নয়ন পদ্ম-পুষ্পের ন্যায় লোহিত বর্ণ হইয়াছে। কথা কহিতে পারিতেছেন না। চতুষ্পার্শ্বে ভক্তগণ রোদন করিতেছেন। নিমাই তখন অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত করিয়া ভক্তগণকে আরো নিকটে আসিতে বলিলেন, যেন কি বলিবেন। সকলে আরো নিকটে আসিলেন। নিমাই কথা কহিতে গেলেন, কিন্তু—যথা চৈতন্য-মঙ্গলে—

"কহিতে আরম্ভ মাত্র গদ গদ স্বর। অরুণ কমল আঁখি করে ছল ছল।।
সকরুণ কণ্ঠ আধ আধ আর বাণী কহে।সম্বরিতে নারি ক্ষণে নিঃশব্দে রহে।।"

ক্রমে দৃঢ়-সঙ্কল্পে একটু ধৈর্য ধরিয়া বলিতেছেন, "তোমরা আমার চিরবান্ধব, আমাকে বিদায় দাও। আমি যোগী হইব, হইয়া দেশে দেশে আমার প্রাণনাথকে তল্লাস করিয়া বেড়াইব। আমি তোমাদের লাগি এতদিন আমার হৃদয়ের বেগ সহ্য করিয়াছিলাম, আর পারিতেছি না। তোমাদের যদি আমার উপর স্নেহ থাকে, তবে আমাকে মনোসুখে বিদায় দাও। তোমাদিগকে ফেলিয়া যাইতে আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে, কিন্তু থাকিতে পারিতেছি না।

ভক্তগণ কোন উত্তর করিলেন না, কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। নিমাইও উত্তর শুনিবার অবকাশ পাইলেন না, কথা কহিতে কহিতে ভক্তগণকে ভুলিয়া গেলেন। তখন এক অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হইল। শ্রীনিমাইয়ের দেহে এক সময়ে রাধা-কৃষ্ণ উভয়ে প্রকাশ পাইলেন, পাইয়া উভয় উভয়ের নিমিত্ত প্রাণ উঘাড়িয়া বিরহ-দুঃখ বলিতে লাগিলেন। আবার উভয়ে আর্তনাদ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন পরিকরগণকে ডাকিতে লাগিলেন। একবার রাধা-ভাবে "কোথা আমার প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, কোথা আমার ললিতা, কোথা আমার বিশাখা, কোথা আমার নিভৃত নিকুঞ্জ", বলিয়া রোদন করিতেছেন, আবার শ্রীকৃষ্ণ-ভাবে বিভাবিত হইয়া ভক্তগণের গলা ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "কোথায় আমার মা যশোদা? কোথায় নন্দ পিতা? কোথা আমার দাদা বলরাম? আমার প্রাণের সখা ছিদাম কি বেঁচে আছে? আমার সুবল? আহা!

সুবল আমার চিত্রপটের সহিত কথা কহিত। আর আমার প্রাণেশ্বরী রাধা! আমার কি কঠিন প্রাণ। প্রাণেশ্বরি! তোমাকে ভুলিয়া আমি কিরূপে প্রাণ ধরিয়া আছি? আহা! আমার সকল কথা একেবারে স্মরণ হইল। ইহাতে আমি কিরূপে বাঁচি? তোমরা সকলে একেবারে মনে উদয় হইলে, আমি কার জন্য কাঁদিব? কোথা আমার সুখের বৃন্দাবন? কোথায় বা যমুনা-পুলিন? কোথায় আমার প্রাণতুল্য মুরলী? কোথা আমার নিধুবন? কোথায় আমার ভাণ্ডীর বন? কোথায় বা আমার গোকুল? কোথায় আমার শ্যামলী ধবলী?"*

আবার তদ্দণ্ডে রাধা-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন। যথা, চৈতন্য-মঙ্গলে—

ভাবান্তরে বলে পঁহু কাহা গুণমণি। না শুনি বিদরে হিয়া সে মুরলী ধ্বনি।।
কবে সে মধুর রূপ হেরিব নয়নে। হিয়াতে চাপিব সেই রাতুল চরণে।।
এ ছার সংসারে আমি কেমনে রহিব। নন্দের দুলাল আমি কোথা গেলে পাব।।

এইরূপে বৃন্দাবন স্মরণ করিতে করিতে ক্রমে তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তখন আর থাকিতে পারিলেন না। গলায় উপবীত ছিল, ছিঁড়িয়া ফেলিলেন ও "বৃন্দাবন, বৃন্দাবন" বলিয়া উঠিয়া ছুটিলেন। কিন্তু অধিক দূর যাইতে পারিলেন না। ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া মৃতবৎ ধূলায় পড়িয়া গেলেন। এই উপবীত তাঁহাকে কূলে আটকাইয়া রাখিয়াছে ভাবিয়া, সেই রজ্জু ছিঁড়িয়া, কুলের বাহিরে অনন্ত পথে যাইতে, অচেতন হইয়া, দীঘল হইয়া, পতিত হইলেন।

ভক্তগণ "কি হলো, কি হলো" বলিয়া প্রভুকে ধরিয়া সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। সজোরে কপালে জলের আঘাত, বায়ু, বীজন, আর কর্ণে অতি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। একটু পরে নিমাইয়ের দাঁত ছাড়িয়া গেল, নিশ্বাস ফেলিলেন, চক্ষু মেলিলেন। তখন সকলে যত্ন করিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন, আর গদাধর অমনি প্রভুর পশ্চাদ্দিকে বসিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিলেন। নিমাই বাহ্য পাইয়া বলিতেছেন, "তোমাদের স্নেহ আমার কাল হইল। তোমাদের স্নেহে আমি আমার মনোমত কার্য করিতে পারি না। তোমাদের নিমিত্ত আমি শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে পারি না। কিন্তু কৃষ্ণ কৃপাময়। তোমরা আমাকে রাখিতে পারিবে না। যদি তোমরা স্নেহে আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখ, তবে শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণ লইয়া যাইবেন। তোমরা যদি আমার প্রাণ বাঁচাইতে চাও, তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি একবার দৌড়িয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আসি। তোমরা আমার এ শূন্যদেহ রাখিয়া কি করিবে। ইহাতে ত আমার প্রাণ নাই। আমার প্রাণ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে গিয়াছে। ভাই! আমার এ দেহে কি আর কিছু আছে যে, তোমরা রাখিবে? ইহা কৃষ্ণের বিরহে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। তোমাদের বিনয় করিয়া বলি, আমাকে ছাড়িয়া দাও।" তখন ভক্তগণ বিষম বিপদে পড়িলেন। "তুমি বৃন্দাবনে যাও" এ কথা মুখে বলিতে পারেন না। প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িবেন, এ কথা মনে হইলে, তাঁহারা চতুর্দিকে অন্ধকার দেখেন। আবার প্রভুকে রাখেন বা কি বলিয়া? যদি সামান্য রজ্জু দিয়া বান্ধিয়া রাখেন, তবে তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া পলাইবে। ভক্তগণ কি করিবেন বা বলিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

গদাধর নিমাইয়ের মুখপানে চাহিয়া কথা কহিতে সাহস পান না, কাজেই তাঁহার সহিত কথা কাটাকাটি করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ঘোর বিপদ-কাল উপস্থিত, প্রভু গৃহ ছাড়িয়া যাইতেছেন কাজেই তাঁহার ভয় একেবারে দূর হইয়া গেল। তখন নির্ভীক ভাবে স্পষ্ট করিয়া

* "নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি। দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবন ভূমি।।
ক্ষতি মোর কালিন্দি যমুনা নিধুবন। ক্ষতি মোর বেহুলা ভাণ্ডার গোবর্ধন।
ক্ষতি গেল মোর ললিতা আর রাধা। ক্ষতি গেল আর মোর শ্রীনন্দ যশোদা।।
শ্রীদাম সুদাম মোর রহিল কোথায়। শ্যামলী ধবলী বলি অনুরাগে ধায়।।

বলিতে লাগিলেন, "প্রভূ! তুমি সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে, তাহাতে আমার ক্ষতি কি? যেহেতু আমি উদাসীন। আমি তোমার পাছে পাছে যাইব। কিন্তু তোমার মত কি পরিষ্কার করিয়া বল। তোমার মতে কি গৃহে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন হয় না? এখন আমার মত কি শুন। তুমি যদি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাও, তবে প্রথমে জননী-বধের ভাগী হইবে। আর জননীকে বধ করিয়া যে ধর্মার্জন, তাহা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। গদাধর শুধু জননীর দোহাই দিয়া বলিলেন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কথা আর স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না। কিন্তু তিনি যে এই দুই জনকেই মনে করিয়া বলিতেছেন, তাহা সকলেই বুঝিলেন।

প্রভু কি উত্তর দেন, শুনিবার নিমিত্ত ভক্তগণ অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তখন নিমাই গদাধরের পানে মুখ ফিরাইলেন। মুখের ভাবে বোধ হইল যেন তিনি গদাধরের কথা শুনিয়া মর্মে আঘাত পাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "গধাধর! তুমি তোমার বাক্যবাণে বিষ মাখাইয়া আমার মর্মে আঘাত করিতেছ। আমার অতি সরলা, পুত্রবৎসলা বৃদ্ধা জননীর আমা বই আর কেহ নাই। তিনিই আমার সংসারত্যাগের প্রধান বিরোধী। তাঁহার ভাবনাই আমার হৃদয়ে জ্বলন্ত আগুনের ন্যায় জ্বলিতেছে। তোমরা আমার প্রাণের বান্ধব। কোথায় আমার সেই অগ্নি নিবাইবে, না তাহাই আবার জ্বালিয়া দিতেছে? গদাধর! নিঠুরালী করিও না। আমার জননীর শেষ দশায় যে, তাঁহাকে আমার বিরহ-বেদনা পাইতে হইবে তাহা মনে করিলে, আমি শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া যাই। গদাধর! আর এরূপ বাক্যবাণে আমার অঙ্গ খণ্ড না করিয়া যদি আমাকে ভালবাস, তবে আপন সুখের নিমিত্ত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া, আমার বৃদ্ধা জননীকে পালন করিও, তাঁহার নয়ন জল মুছাইও। আর তাঁহার যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ মতি হয় তাহাই করিও। যাইবার বেলা তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা।"

একটু থামিয়া আবার বলিতেছেন, "মানুষের বিষম জ্বর হইয়া থাকে, শুনিয়াছ ত? আমারও সেই শ্রীকৃষ্ণ বিরহরূপ বিষম জ্বর হইয়াছে। সেই বিষম জ্বরে আমার ইন্দ্রিয়গণ, সংসারের মায়া, সমুদয়ই ভস্ম হইয়া গিয়াছে। আমার প্রাণাধিক বন্ধুগণ! আমার গৃহে থাকিতে কি অসাধ! তোমাদের সঙ্গ, যাহা ব্রহ্মাদির দুর্লভ, জননীর চরণ-সেবা যাহা আমার সর্বপ্রধান কর্তব্য কর্ম,— ইহা কি স্বইচ্ছায় ত্যাগ করিতেছি? আমি স্ব-বশে নাই। আমাকে শ্রীকৃষ্ণ ঘরের বাহির করিতেছেন। আমি গৃহে থাকিবার নিমিত্ত যে মাত্র ইচ্ছা করিতেছি, অমনি যেন আমার প্রাণ বাহির হইতেছে। যদি তোমরা আমার স্বোয়াস্তি কামনা কর, তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি বৃন্দাবনে যাইয়া আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিয়া আসি।" প্রভুর কথা শুনিয়া ভক্তগণ মস্তক অবনত করিলেন, ভুবন অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার কথার উত্তর করিতে পারিলেন না। একটি কথা মনে রাখুন। যদিও নিতাইয়ের নিকট প্রভু হরিনাম প্রচার ও জীব উদ্ধারের কথা বলিয়াছিলেন, এখন সর্বসমক্ষে সে কথা কিছুই বলিলেন না। তাঁহার এখনকার সমুদয় কথার তাৎপর্য্য এই যে, "আমাকে বিদায় দাও, আমি কৃষ্ণের অন্বেষণে যাইব।"

একটু পরে শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু' তাহাই হউক। তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমাকে আমরা রাখিতে পারিব না। তবে আমাকে এই অনুমতি কর, যেন আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারি। না, আমি ভাল বলিলাম না। আমি কেবল আমার কথাই ভাবিতেছি। প্রভু তুমি যাবে যাও, কিন্তু যে তোমার সহিত যাইতে চাহে, তাহাকে সঙ্গে যাইতে অমুমতি দাও।"

নিমাইয়ের তখন সকলকে শান্ত করিবার সময়। কাজেই আপনি শান্ত হইয়া বলিতেছেন. "তোমরা এ ক্ষুদ্র কথা লইয়া কেন এত আড়ম্বর করিতেছ? সওদাগর ধন আহরণের নিমিত্ত দূরদেশে গমন করে। ধনোপার্জন করিয়া গৃহে আসিয়া বন্ধুবান্ধবকে দেয়। আমিও বিদেশে সেইরূপ প্রেম-ধন উপার্জন করিতে যাইতেছি। উপার্জন করিয়া আনিয়া তোমাদিগকেই দিব।"

শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু! ও কথায় কেহ প্রবোধ মানিবে না। তুমি সন্ন্যাসী হইয়া নবদ্বীপ

পরিত্যাগ করিলে, যে প্রাণে বাঁচিবে, তাহাকে তুমি ফিরিয়া আসিয়া প্রেম-ধন দিও। কিন্তু আমি তোমাকে পলকে হারাই। তুমি চলিয়া গেলেই আমি প্রাণে মরিব। সুতরাং তুমি যে ধন লইয়া আসিবে, তাহাতে আমার কি?"

মুরারি ভাবিতেছেন যে, সংসারের কথায় প্রভু ভুলিবেন না। গদাধর সে কথা বলিয়া কিছু করিতে পারেন নাই। আমি পরমার্থ কথা অর্থাৎ যে কথায় প্রভুর লোভ আছে, তাহাই বলিয়া তাঁহার হৃদয় কোমল করিবার চেষ্টা করিব! ইহা ভাবিয়া বলিতেছেন, "প্রভু! আমরা ক্ষুদ্র কীট, পিপীলিকা হইতেও অধম। তুমি কৃপাময়, দয়া করিয়া আমাদিগকে কিঞ্চিৎ ভক্তি দিয়াছ। তুমি যদি এখন আমাদিগকে ফেলিয়া যাও, তবে সংসার-ব্যাঘ্র আমাদিগকে গ্রাস করিবে। প্রভু! আপন হাতে বৃক্ষ রোপণ করিলে, জল সিঞ্চাইয়া পরিবর্দ্ধন করিলে, এখন আপন হাতে সেই বৃক্ষ কাটিতে চাহিতেছ? প্রভু! তোমার কি একটুও মমতা হইতেছে না?"

হরিদাস প্রভুর দুইখানি চরণ ধরিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, পড়িয়া এই মাত্র বলিলেন, "আমার প্রাণ, মন, বুদ্ধি, তোমাকে অর্পণ করিলাম, গ্রহণ কর।" এ পর্যন্ত ভক্তগণ অতি কষ্টে ধৈর্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। মুকুন্দ সেই ধৈর্য ভাঙ্গিয়া দিলেন; যথা চৈতন্য-মঙ্গলে—মুকুন্দ কহয়ে "প্রভু পোড়য়ে শরীর। অন্তর পোড়য়ে প্রাণ না হয় বাহির।"

মুকুন্দ বলিতেছেন, "প্রভু! দেশদেশান্তরে যাইবে, ইহা কি সহ্য করা যায়? আমাদের প্রাণ বাহির হইতেছে না, কিন্তু জ্বলিয়া যাইতেছে। প্রভু! তুমি আমাদের প্রাণ! প্রাণের প্রাণ! তুমি কোথাও যাইবে এ কথা মনে করিতেও পারি না।" এই কথা বলিতে বলিতে মুকুন্দ উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিলেন। অমনি সকলের হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দনের রোল উঠিল। তখন ভক্তগণ অস্থির ও দিশেহারা হইয়া "প্রভু ক্ষমা দাও" বলিয়া সকলেই প্রভুর চরণ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন শ্রীভগবান্ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শ্রীভগবান্ ইচ্ছামাত্র অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতে পারেন, কিন্তু অবুঝ ভক্তকে বুঝাইতে পারেন না। কাজেই শ্রীনিমাই তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন; যথা চৈতন্য-মঙ্গলে—

ভকতের দুঃখ দেখি ভকতবৎসল। অরুণ করুণ আঁখি করে ছল ছল।।
গদ্গদ স্বর, কথা না বাহির হয়। সকরুণ দিঠে প্রভু ভক্ত পানে চায়।।

পরে সকলের প্রতি অতি করুণ ও স্নেহপূর্ণ নয়নে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "তোমরা শান্ত হও। আমার এ দেহ তোমাদের! তোমরা আমাকে যেখানে সেখানে বেচিতে পার। প্রথমতঃ আমি এই পথে বৃন্দাবন যাইতেছি না। আমার বিলম্ব আছে। আবার তোমাদিগকে আমি একেবারে ফেলিয়াও যাইতেছি না। আমাকে তোমরা সর্বদা দেখিতে পাইবে। আমি যেখানে থাকি, তোমরা সেখানে স্বচ্ছন্দে যাইও, আমিও মধ্যে মধ্যে তোমাদিগকে দেখিতে আসিব। তোমরা যখনই সংকীর্তন করিবে, তখনই তাহার মধ্যস্থলে আমি নাচিব।" শ্রীবাসের প্রতি চাহিয়া বলিতেছেন, "তোমার ঠাকুরমন্দিরে আমাকে সর্বদা দেখিতে পাইবে। আর এক কথা বলি—যিনি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবেন—কি আমার জননী, কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া, কি তোমরা ভক্তগণ,—তিনিই আমাকে দেখিতে পাইবেন। আমি তোমাদের নিকট এই কথা অঙ্গীকার করিলাম।" এই কথা শুনিবামাত্র ভক্তগণের একটি কথা মনে পড়িল। সেটি তখন তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেটি এই যে, নিমাই শ্রীভগবান, আর কিছু নহেন। তখন সকলে ভাবিতে লাগিলেন, প্রভুর সহিত অধিক হঠকারিতা ভাল নয়। তিনি যতদূর স্বীকার করিলেন সেই ভাল। শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি ইচ্ছাময় এবং তোমার ইচ্ছা ভাল বই মন্দ হইতে পারে না। আমরা নির্বোধ বলিয়া তোমাকে উপদেশ দিতে যাই, আর তোমার গতি রোধ করিতে চেষ্টা করি। তবে একটি নিবেদন। তুমি আমাদের সকলের প্রাণ, দেখিও যেন তোমার বিরহে কেহ প্রাণে না মরি।"

নিমাই মধুর হাসিয়া জনে জনে বার বার প্রেমালিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এখন চণ্ডীদাসের পদটি স্মরণ করুন, অর্থাৎ--"নামের প্রতাপে যার, ঐছন করিল গো, অঙ্গের পরশে কি না হয়।"

শ্রীনিমাই "অঙ্গের পরশ" দিলেন কাজেই সকলে অনেকটা শান্ত হইলেন। যথা চৈতন্য-মঙ্গলে—

এ বোল শুনিয়া, প্রভু সে হাসিয়া, সবারে করিয়া কোলে।
প্রেম প্রকাশিয়া, সবা সম্বোধিয়া, প্রবোধ উত্তর বলে।।
শুন সর্বজন, আমার বচন, সন্দেহ না কর কেহ।
যথা তথা যাই, তোমা সবা ঠাঁই, আছি হে জানিও এহ।

সন্ধ্যাকালে প্রভু হরিদাসকে সঙ্গে করিয়া মুরারির গৃহে গমন করিলেন, এবং উভয়ে দেবগৃহে উঠিলেন। প্রভু মুরারিকে নিকটে বসাইয়া মধুর বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "মুরারি! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ত্রিজগতে ধন্য। তাঁহার সেবা করিলে কৃষ্ণের কৃপা হয়। আমার অভাবে, তুমি তাঁহাকে আশ্রয় করিও।" মুরারি অঝোর নয়নে কান্দিতে লাগিলেন। মুরারিকে যেরূপে সান্ত্বনা করিলেন, সেইরূপে প্রত্যেকের বাড়ী যাইয়া নিমাই সকলকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কাহারে কি বলিয়া শান্ত করিলেন, তাহা তিনিই জানেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রজ্য ছাড়ি বৃক্ষতলে শ্রীরূপ কাতরে বলে আমা হতে না হ'ল ভজন।
আমি দীন হীন ছার শত কোটি স্পৃহা যার, কি গুণে পাইব সে চরণ।।
শুনরে দুর্বার মন, বৃথা কর আকিঞ্চন, যাহাতে নাহিক অধিকার।
শ্রীরূপ বলে শুন বলাই, এসো বসে গুণ গাই পাও না পাও ছাড় সে বিচার।।

শ্রীনিমাই সন্ন্যাস করিবেন, এ কথা আর গোপন থাকিল না। ভক্তগণের কাছে তাঁহাদের পত্নীরা শুনিলেন। স্ত্রীলোকদিগের নিকট শচী শুনিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পিত্রালয়ে ছিলেন; তিনিও সেখানে এ কথা শুনিলেন। লোকে যে নিঠুরালি করিয়া তাঁহাদিগকে সংবাদ দিল তাহা নয়। নিমাই সন্ন্যাস করিবেন অর্থাৎ সংসার ত্যাগ করিবেন। নিমাইয়ের সংসার, কেবল জননী ও ঘরণী লইয়া। তাঁহার পিতা নাই, ভ্রাতা-ভগিনী নাই, পুত্র-কন্যা নাই। নিমাই সন্ন্যাস করিবেন, তাহার অর্থ এই যে, তিনি জননীকে ও আপনার পত্নীকে ত্যাগ করিবেন। অতএব নিমাইয়ের সন্ন্যাসের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ কেবল ঐ দুইজনের। নিমাই সন্ন্যাস করিলে ঐ দুজনের যেরূপ সর্বনাশ হইবে, এরূপ আর কাহারও নয়! নিমাইয়ের সন্ন্যাস করিবার এই দুইজন যেরূপ প্রতিবন্ধক, এরূপ আর কেহ নহে। অতএব যদি কেহ তাঁহাকে গৃহে রাখিতে পারেন, তবে এ দুই জনে। কাজেই সকলে, আকার ইঙ্গিতে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলিলেন যে, তাঁহাদের প্রিয় বস্তুর গতিক ভাল নহে, এই বেলা তাঁহারা উপায় করুন।

নিমাই প্রতিশ্রুত আছেন যে, জননীর অনুমতি না লইয়া কোথাও যাইবেন না। সুতরাং শচী যখন এ সংবাদ শুনিলেন, তখন উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি পারিলেন না। ষোল বৎসরের পরম সুন্দর, পিতৃ-মাতৃ-বৎসল, স্নিগ্ধ, সাধু ও পণ্ডিত পুত্র তাহাকে ফেলিয়া যাওয়া তাঁহার একটি রোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেটি বায়ু রোগের মত। নদীয়ায় সন্ন্যাসী দেখিলেই তাঁহার প্রাণ উড়িয়া যাইত। সন্ন্যাসী দেখিলেই ভাবিতেন যে, সে আগে বিশ্বরূপকে লইয়া গিয়াছে, এখন নিমাইকে লইতে আসিয়াছে। যদি কোন সন্ন্যাসীর সহিত নিমাইয়ের একটু ঘনিষ্ঠতা দেখিতেন, অমনি ঠাকুর-ঘরে যাইয়া হত্যা দিতেন। আর বলিতেন, "ঠাকুর! তুমি দেখ, আমি তোমাকে যথাসাধ্য সেবা করিতেছি। তুমি স্বামী ও পুত্র

লইলে, আমি তোমার ও আমার নিমাইয়ের মুখপানে চাহিয়া সহিয়া আছি। আমার নিমাইকে লইও না। তুমি এরূপ আশীর্বাদ কর যে, নিমাই আমার এক শত বৎসর বাঁচিয়া সংসারে থাকিয়া ঘরকন্না করুক।" শচী সংকীর্তন ভালবাসেন না, তবে নিমাইয়ের ভয়ে কিছু বলিতে পারেন না। সংকীর্তন আরম্ভ হইলে, পিঁড়ায় বসিয়া, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র উহা বন্ধ করিয়া সকলে বাড়ী চলিয়া যান ও নিমাই ঘরে আসিয়া শুইয়া থাকে, ইহার নানা মত চেষ্টা করেন। কখন অদ্বৈত, কখন নিমাই, কখন নরহরি, কখন বা শ্রীবাসকে ডাকিয়া আনিয়া বলেন, "রাত্রি অধিক হইয়াছে, নিমাইকে শুইতে পাঠাইয়া দাও।"

নিমাই যে জগৎপূজ্য হইয়াছেন, নিমাই যে কৃষ্ণ-কথায় মত্ত থাকেন, নিমাই যে সাধুসঙ্গ করেন, ইহার কিছুই শচীর ভাল লাগে না। পাড়ার মেয়েদের ডাকিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভুবনমোহিনী বেশে সাজাইয়া তাম্বুলের বাটা হাতে দিয়া রজনীতে পুত্রের ঘরে পাঠাইয়া দেন। শচীদেবীর তখন সম্পদের সীমা নেই। আর সংসারের একমাত্র ও সম্পূর্ণ কর্ত্রী তিনিই। নিমাইয়ের শয়ন-ঘর সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছেন। উত্তম-পালঙ্ক শয্যা, বালিশ, মশারি প্রস্তুত করিয়া শয়ন-ঘব সুখের স্থান করিয়াছেন। কিন্তু নিমাই ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। ইহা তাঁহার ভাল লাগিবে কেন? শুধু তাই নয়। নিমাই এক একবার ছিন্নমূল তরুর ন্যায় মৃত্তিকায় পড়িতেছেন, আর শচী কান্দিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "বাছার এইবার হাড় গোড় ভাঙ্গিয়া গেল।"

সাংসারিক সুখে কিছুতেই নিমাইয়ের লোভ জন্মাইতে পারিলেন না দেখিয়া, শচীর ব্যাকুলতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। দিবানিশি মনে ভয় যে, পুত্র চলিয়া যাইবে। রাত্রিতে স্বপ্নে "নিমাই" বলিয়া কান্দিয়া উঠেন, আর দিবানিশির মধ্যে এক মুহূর্তও স্বস্তি পান না। ভরসার মধ্যে নিমাইয়ের বাক্য, অর্থাৎ তিনি না বলিয়া কোথাও যাইবেন না। কিন্তু এ আশ্বাস বাক্যের শক্তি স্বভাবত ক্রমেই হ্রাস হইতেছিল। যদিও তিনি জানিতেন, নিমাই সত্যবাদী, নিমাইয়ের কথা—পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উদয় হইলেও—লঙ্ঘন হইবার নহে, তথাচ তিনি জানিতেন যে, তিনি নিমাইকে কখন কোন কথায় "না" বলিতে পারিবেন না।

শচী অর্ধক্ষিপ্তের ন্যায় হইলেন। যাঁহারা নিজ-জন, তিনি প্রথমে তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নিমাই সন্ন্যাস করিবে একথা মুখে আনিতে পারেন না, ঠারে-ঠোরে জিজ্ঞাসা করেন, যথা—"তুমি শুনেছ নিমাই নাকি কি করবে, সে নাকি আমারে অকূলে ভাসাইয়া পলাইবে?" তাঁহারা বলিলেন যে, তিনি ইহার-উহার কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়া, আপনার পুত্রকেই জিজ্ঞাসা করুন, আর তিনি পুত্রকে ধরিয়া রাখুন। তিনি ইচ্ছা করিলেই মাতৃ-বৎসল আজ্ঞাকারী পুত্রকে অবশ্য রাখিতে পারিবেন।

শচী এই পরমার্শ গ্রহণ করিলেন। পুত্রকে একটু বিরলে পাইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। নিকটে বসিয়া পুত্রের হস্ত ধরিয়া তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পূর্বে বলিয়াছি, শচীর বয়স তখন অন্ততঃ সাতষট্টি বৎসর। ইহার মধ্যে আটটি কন্যার শোক পাইয়াছেন, বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-জনিত বিষম-বিয়োগ সহিয়াছেন, এবং দেবতুল্য পতি হারাইয়াছেন। চিরদিন দুঃখের বোঝা বহিয়া বহিয়া তাঁহার মেরুদণ্ড ভগ্ন হওয়ায় তিনি কুব্জা হইয়া গিয়াছেন। তাহার পরে যে অবধি নিমাই কৃষ্ণবিরহে অভিভূত হইয়াছেন, সেই অবধি চিন্তায় চিন্তায়, আর কান্দিয়া কান্দিয়া, আরো ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন। পুত্রের মুখপানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিলেন না, তাহার পরে বলিলেন, "নিমাই! কি শুন্‌ছি যে?"

পূর্বে নিমাইয়ের সাহসকে প্রশংসা করিয়াছি। বলিয়াছি যে, তাঁহার অসীম সাহস, তিনি স্বচ্ছন্দে এ ভরসা করিলেন যে, তাঁহার ন্যায় পুত্র, শচীর ন্যায় জননীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া সন্ন্যাস করিতে যাইবেন। কিন্তু এ সময় নিমাই জননীর বদন, তাঁহার দীনহীন বেশ, এলোথেলো কেশ, জীর্ণশীর্ণ দেহ, চিরদুঃখিনীর মুখ দেখিয়া মস্তক হেঁট করিলেন। শ্রীভগবানের সাহস সেই মুহূর্তে পলাইয়া গেল।

নিমাই একটু নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা! তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া ভালই করিয়াছ। আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমিই তোমার নিকট এ কথা উত্থাপন করিব। কিন্তু কোন্ মুখে করিব ভাবিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও পারি নাই। মা। তুমি আমাকে যেরূপ পালন করিয়াছ, জগতে এরূপ কোন মাতা কোন সন্তানকে করিতে পারে না। তোমার দুগ্ধে এ দেহ পালিত। আমার শৈশবে তুমি জননীর কার্য করিলে। আমি একটু বড় হইলে প্রতিপালন করিলে ও পড়াইলে, শুনাইলে, তখন পিতার কার্য করিলে। এখন তুমি অতি বৃদ্ধা হইয়াছ, তুমি শোকের উপর শোক পাইয়া জর-জর। আমি তোমার একমাত্র পুত্র। এখন আমার কর্তব্য কার্য তোমাকে পালন করা,—আপনার প্রাণ দিয়া তোমার সেবা করা। না মা?"

শচী পুত্রের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, বা করিলেন না। শচী কোন উত্তর না করিলে, নিমাই বলিতেছেন, "মা! লোকের শুভক্ষণে সন্তান জন্মে, অশুভক্ষণেও জন্মে। মা! আমি অশুভক্ষণে জন্মিয়াছিলাম। লোকের অন্ধ, আতুর, খঞ্জ, অক্ষম, পুত্র জন্মিয়া থাকে। মা আমি তোমার সেইরূপ বৃথা পুত্র, আমার দ্বারা তোমার প্রতিপালন হইল না।"

নিমাইয়ের আয়ত নয়ন দুটি জলে পুরিয়া যাইতেছে, কিন্তু অতি কষ্টে উহা সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। শচীর নয়নে জল নাই, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, এক দৃষ্টে পুত্রের মুখ দেখিতেছেন; যেন পুত্রকে হারাইবেন জানিয়া, জন্মের মত প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইতেছেন। নিমাই বলিতেছেন, "এ জন্মে আমাদ্বারা তোমার ঋণ শোধ হইল না। আর কোটি জন্ম চেষ্টা করিলেও শোধ করিতে পারিব না। তবে, মা তুমি সদাশয়া, তোমার নিজগুণে আমার এই ঋণ শোধ করিয়া লইবে। আমি তোমাকে বলিযাছিলাম, তোমাকে না বলিয়া কিছু করিব না। এখন মা! আমাকে খালাস দাও, আমি সন্ন্যাসী হইয়া কৃষ্ণ অন্বেষণে বৃন্দাবনে যাইব। আমার হিত চেষ্টাই তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমার সুখ ও মঙ্গল হইবে, ইহা ভাবিয়া তুমি আমাকে স্বচ্ছন্দে মনে অনুমতি দাও।"

এ কথা শুনিয়া শচীর মূর্চ্ছিত কি জড়বৎ হইবার কথা। কিন্তু ঘোর বিপদকাল বলিয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, তিনি এক প্রকার স্থির ও সজীব রহিলেন,—নিমাইয়ের কথায় কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তবে অস্ফুটস্বরে, পুত্রের পানে চাহিয়া, একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া একটি প্রশ্ন করিলেন, সে শব্দটি—"বিষ্ণুপ্রিয়া?" নিমাই আবার মস্তক হেট করিলেন। আপনাকে একটু সামলাইয়া বলিতেছেন, "মা! তাহার তত দুঃখ হইবে না। যদি আমি নির্দয় হইয়া, কি অন্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতাম, তবে তাহার দুঃখ হইতে পারিত। যদি আমি নিজ সুখে বিভোর হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতাম, তবে তাহার ক্ষোভের কারণ হইত। কি আমি মোটে এ জগতে না থাকিতাম, তবে তাহার দুঃখ হইত। আমি থাকিব,—তবে একটু দূরে। তাহাতে তাহার দুঃখ কেন হইবে? আমি সাধুপথ অবলম্বন করিতেছি, ইহাতে তাহার ভাল ও আমার ভাল হইবে, তাহাতে সে কেন দুঃখ পাইবে? তাহার নিমিত্ত তুমি ভাবিও না। আমার হইয়া সে তোমার সেবা করিয়া সুখ পাইবে, জীবে তাহার দুঃখে উপকৃত হইবে, তাহাতেও তাহার সুখ হইবে। আর তুমি, তাহাকে, ও সে তোমাকে, আমার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। দুই জনে পরস্পরের ব্যথার ব্যথী,—আমার কথা কহিয়া বড় সুখ পাইবে। তবে মা! আমার এই নিবেদন, তাহাকে কৃষ্ণ-নাম শিক্ষা দিও, এই আমার ভিক্ষা!

বৃথাপুত্র তোমার জন্মেছিল উদরে। ধ্রু।
হলো না হলো না (আমা হতে) প্রতিপালন তোমারে।।
বিষ্ণুপ্রিয়া তোমার জ্বলন্ত আগুনি, গৃহে রহিল সে হয়ে অনাথিনী,
মা যতন করে রেখো তারে। (মা জননি গো)"

শচী বলিতেছেন, "নিমাই! আমার চিরদিনের একটি সাধ ছিল। সে সাধ আমার মনে মনে ছিল। এখন বুঝিলাম আমার সে সাধ পূরিল না। সাধ ত পূরিল না, তবে তোমাকে বলিয়া মন হইতে ফেলিয়া দিই। নিমাই! আমার বড় সাধ ছিল যে, তুমি নদের মাঝে বড় পণ্ডিত হও, তোমার পদমর্য্যাদা ও ধন হউক। আমার পুত্রবধূ হউক, তোমার সন্তান হউক, আর আমি সে সব লইয়া নদীয়ায় বসতি করি। আর আমি তোমাকে এইরূপ রাখিয়া মরিয়া যাই, আর তুমি একশ বৎসর বাঁচিয়া থাক। সে সব সাধে ছাই পড়িল। পুত্রবধূ হয়েছে, ধন ও মর্যাদা হয়েছে, কিন্তু সবই আমার দুঃখের কারণ হইল। নিমাই! তুই পথে হাঁটিবি কিরূপে? তুই যখন হাঁটিস, তখন পা বহিয়া যেন রক্ত পড়ে। তাও যাউক। নিমাই, তুই কি এখন দ্বারে দ্বারে মাগিয়া খাইবি। যথা—"এ হেন কোমল পায় কেমনে হাঁটিবে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন কাহারে মাঙ্গিবে।। ননীর পুতলী তনু রৌদ্রেতে মিলায়। কেমনে সহিবে ইহা এ দুঃখিনী মায়।।" (চৈতন্য-মঙ্গল) বৈরাগী হইয়া দ্বারে দাঁড়াইবি, তোকে মুষ্টিভিক্ষা দিবে, অমনি আর এক বাড়ী যাইবি, নিমাই! তোকে কে রান্ধিয়া দিবে? আর তোর খাবার সময় তোর সম্মুখে বসিয়া, কত ছল করিয়া, তোর অচৈতন্য ভাঙ্গিয়া, তোকে মাথার দিব্য দিয়া, দুটা খাওয়াই। তাহা আর তোকে কে করিবে? নিমাই! এই যে সব আমি বলিতেছি, ইহা এখনই মনে হইল, এমন নয়। এ সব আমি পূর্বে ভাবিয়া রাখিয়াছি। তুমি যে যাইবে, আমার প্রাণ কান্দিয়া কান্দিয়া আমাকে বলিত, আর তোমার যে সমুদয় ক্লেশ হইবে, তাহাও আমার মন আপনা-আপনি বলিত। আমি ভাবিতাম যে, তোমার ন্যায় পুত্র আমার হইয়া আমার ঘরে থাকিবে? নিমাই! তুমি আমাকে ও বউমাকে কৃষ্ণ-সেবা করিতে বলিতেছ। তিনি মাথার উপর। কিন্তু নিমাই! আমরা তোমার ভজন করিয়া থাকি, কৃষ্ণের ভজন করিতে পারি না। ইহাতে কি তিনি আমাদের উপর ক্রোধ করিবেন? যদি করেন, আমরা মেয়েমানুষ, আমরা কিরূপে তাঁহাকে সন্তোষ করিব?" শচী একটু চুপ করিয়া আবার বলিতেছেন, "নিমাই! আমার নিকট অনুমতি চাহিতেছ, ভাল। আমার দুঃখ আমি অনায়াসে সহিব। যদিও তোমাকে তিলমাত্র না দেখিলে মরি, তবু তোমার সুখের নিমিত্ত, আমি না হয় যে কটা দিন বাঁচিব আরো দুঃখ পাইব। কিন্তু পরের মেয়ে আমার নিরপরাধিনী বউমা, তাহাকে কি বলিয়া বুঝাইব?" যেমন অপরাধী বিচারকের অগ্রে ভয়ে করযোড়ে থাকে, শ্রীভগবানও সেইরূপ শচীর অগ্রে করযোড়ে অপরাধীর ন্যায় দীনভাবে বসিয়া। শচীর কথা যত শুনিতেছেন, ততই তিনি মাথা হেঁট করিতেছেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শচী আবার বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি যে কি ধর্ম্ম পালন করিতেছ, তাহা আমি স্ত্রীলোক, বুঝিতে পারি না। তোমার সর্ব্বজীবে দয়া দেখিতে পাই; কেবল জনকয়েক ছাড়া,—আমি, বিষ্ণুপ্রিয়া, আর তোমার প্রিয় ভক্তগণ। তুমি সন্ন্যাস করিলেই এরা সকলেই মরিয়া যাইবে। তা হইলে তোমার কি ধর্ম্ম হইবে? তবে কি, যে তোমার যত নিজ-জন, তুমি তাহার প্রতি তত নিঠুরালী করিবে?—এই কি তোমার বিচার।" যথা, চৈতন্য-মঙ্গলে—"সর্ব্বজীবে দয়া তোর মোরে অকরুণ। না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ।। আগেত মরিব আমি পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া। মরিবে ভকত সব বুক বিদরিয়া।।"

নিমাই তখন করযোড় করিয়া বলিলেন, "মা! ক্ষমা দাও। তোমার কাতরধ্বনি আমার হৃদয় বিদারণ করিতেছে। তুমি যদি এরূপ মর্ম্মাহত হও, মনোসুখে বিদায় না দাও, তবে আমি যাইব না।" তখন শচী রুদ্ধকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "মনোসুখে আমি তোমাকে সন্ন্যাসী করিব তা আমি কিরূপে পারি? তবে তোমার যদি সুখ হয়, তবে আমি সব দুঃখ সহিব।" তারপর আবেগভরে বলিলেন, "নিমাই! তুমি যখন এ কথা বলিলে যে তোমার মঙ্গল হইবে, তখন আমি বাধা দিব না। তুমি আমার নিকট অপরাধী বলিতেছ, ও কথা মাকে বলিলে মা কষ্ট পায়। আমি তোমাকে সরলভাবে অনুমতি দিলাম। তবে মনোসুখে অনুমতি দেওয়া আমার অসাধ্য। যেহেতু আমি মা, ও তোমা বই আমার কেহ নাই।"

এখন পাঠক বিচার করুন যে, শ্রীভগবান জিতিলেন, না শচী জিতিলেন। আমরা বলি, শ্রীভগবান জিতিলেন—ইহার রহস্য বলিতেছি। নিমাই তিনপ্রকারে মায়ের নিকট বিদায় লইতে পারিতেন। প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি শচীর যে স্নেহ, তাহারই শক্তিতে; দ্বিতীয়তঃ তাঁহাকে বুঝাইয়া; আর তৃতীয়তঃ, তাঁহার ঈশ্বরশক্তির দ্বারা জননীকে অভিভূত করিয়া। নিমাই শেষোক্ত দুই পথ ঘৃণা করিয়া অবলম্বন করিলেন না। তাঁহার জননীর গৌরব বাড়াইবার নিমিত্ত, আর শচী তাঁহাকে গর্ভে ধরিবার কিরূপ উপযুক্তা হইয়াছিলেন তাহা জগতে জানাইবার নিমিত্ত, প্রথম পথটি অবলম্বন করিয়া শচীর নিকট বিদায় লইলেন। নিমাই বলিলেন "মা! সন্ন্যাসী হইয়া গমন করিলে আমার মঙ্গল হইবে।" অমনি শচী বলিলেন, "তবে তুমি যাও।"

অনুমতি দিবা মাত্র শচীর হৃদয়ে দুঃখের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল; তাহা যথাসাধ্য দমন করিয়া বলিতেছেন, "একটি কথা আমি বলি, দেখ দেখি তোমার মনে ধরে কি না। এত অল্প বয়স সন্ন্যাসের সময় নয়। কিছু কাল পরে গেলে কি হয় না? বাড়িতে ভক্তগণ আছেন, তাঁহাদের লইয়া এখন সংকীর্তন কর, তাহার পরে যাইও।"

নিমাই শুধু শচীর নিঃস্বার্থতার বলে অগ্রে বিদায় লইয়া পরে পূর্বোক্ত দ্বিতীয় (অর্থাৎ বুঝাইয়া); ও তৃতীয় পথ (অর্থাৎ ঐশ্বর্য) অবলম্বন করিলেন। তিনি বলিলেন, "মা! আমি নদীয়ার এই সম্পত্তি ছাড়িয়া, তোমা হেন জননীকে অকূলে ভাসাইযা যাইব, ইহা কি আমি স্ববশে থাকিলে পারি? আমি স্ববশে নাই। বিয়োগ আর সংযোগ শ্রীভগবান করেন। আমরা তাঁহার ইচ্ছাধীন। আমাদের একমাত্র কর্তব্য তাঁহাকে ভজন করা। সংসারে লিপ্ত হইয়া আমরা তাঁহার চরণ হইতে বঞ্চিত হই। শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া তাঁহার চরণ পাই। যথা, চৈতন্য-মঙ্গলে—"সংসার আরতি করি মরিবার তরে। শ্রীকৃষ্ণ আরতি করি ভব তরিবারে।।"

"ভজন ব্যতীতে আমাদের আর কোন শক্তি নাই। সংযোগ বিয়োগ তিনিই করেন। তিনি গলায় ফাঁসী দিয়া আমাকে লইয়া যাইতেছেন। আমিও পরম সুখে যাইতাম, কেবল তোমার আর অন্যান্য যাঁহারা আমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন তাহাদের নিমিত্ত যাইতে পারিতেছি না। তোমরা আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাখিতে দিবেন না, লইয়া যাইবেন। তাঁহার হাতেই তুমি আমাকে সমর্পণ কর। তুমি ত দিবানিশি আমার মঙ্গল কামনা করিয়া থাক। মা! আমি সত্য বলিতেছি যে, সংসার ত্যাগ করিয়া গমন করিলেই আমার মঙ্গল হইবে। আমার মঙ্গল হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে আমাকে সঁপিয়া দিলে তুমি তাঁহাকে পাইবে, আর তোমার নিমাইকেও পাইবে না। যথা, চৈতন্য-মঙ্গলে "(ওমা) কেন্দ নাকো আর নিমাই বলে, কৃষ্ণ বলে কান্দ। কৃষ্ণ পাবে আর পাবে নিমাইচাঁদ।।"

"তাহা যদি না কর, পরিশেষে তাঁহাকেও হারাইবে, তোমার নিমাইকেও হারাইবে। তাই মা, বলিতেছি, তুমি মনোসুখে বিদায় দাও যে, আমি সুখের সহিত বৃন্দাবনে যাইয়া সুখময় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করি।" এই কথা বলিতেই নিমাই বিহ্বল হইলেন। বলিতেছেন, "মা! তুমি ত আমার মনোবেদনা সমুদয় জানো। মা! কৃষ্ণবিরহে আমার নয়ন শ্রাবণের মেঘের মত হইয়াছে, দিবানিশি আমার হৃদয় পুড়িতেছে, আমার যে আগুন, শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহ নিবাইতে পারিবেন না। বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াইব। কিন্তু তোমার কথা মনে হওয়ায় এই সঙ্কল্পকরি যে, তোমাদের বুকে শেল আঘাত করিয়া যাইব না কিন্তু এ ইচ্ছা হইবা মাত্র—" অমনি নিমাই নীরব হইলেন। শচী দেখেন, নিমাইয়ের চক্ষু স্থির হইয়াছে। তখন ব্যস্ত হইয়া কোলে করিলেন। "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া কর্ণকুহরে অতি কাতর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। অনেকে দৌড়িয়া আসিল, নিমাইয়ের চক্ষে জলের ছাটি মারিতে মারিতে তাঁহার নিঃশ্বাস পড়িল, একটু পরে তিনি নয়ন মেলিলেন। শচী বুঝিলেন যে, পুত্রকে আর রাখিতে পারিবেন না। বলিতেছেন, "নিমাই তুমি কি চেতন আছ।" নিমাই বলিলেন, "হ্যাঁ মা।" তখন

শচী বলিতেছেন, "নিমাই! আমি শুনেছি যাহারা সন্ন্যাসী হয় তাহারা পিতাকে পিতা, মাতাকে মা, বলে না। তুমি সন্ন্যাসী হইলে আমাকে কি আর মা বলিবে না?" প্রভু দেখিলেন, জননী পাগল হইতেছেন, বুঝিবার অবস্থা তাঁহার নাই। ফল কথা, এ পর্যন্ত শচী যে কি শক্তিতে এরূপ স্থির হইয়া কথা বলিতেছিলেন, তাহা বুদ্ধির অগম্য। অতি বৃদ্ধা, শোকাকুলা, তাহাতে স্ত্রীলোক, শ্রীভগবান্ শচীর ঘাড়ে যে বোঝা চাপাইলেন, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না-- পাগলের মত দুই একটা অর্থশূন্য কথা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানের তখনও একটি কার্য বাকী আছে। শচী বিদায় দিয়াছেন বটে, কিন্তু "মনোসুখে" নয়। তাঁহার নিকটে মনোসুখে বিদায় লইতে হইবে। কিন্তু ভগবান্ দেখিলেন, শচী আর দুঃখের বোঝা বহিতে পারিতেছেন না। যাহা চাপাইয়াছেন, তাহাই অধিক হইয়াছে। তখন তাড়াতাড়ি জননীকে জ্ঞান দিলেন। যথা—"(শচীর) সেইক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণ-বুদ্ধি হৈল। আপন তনয় বলি মায়া দূরে গেল।"

শচী তখন দেখিতেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব আছে তাহাদের সকলের প্রাণ শ্রীভগবান্। সেই ভগবানের সহিত সমস্ত জীবের গাঢ় সম্বন্ধ! তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ স্বয়ং আগমন করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন, হইয়া জীবের দ্বাবে দ্বারে হরিনাম বিতরণরূপ অভয় প্রদান করিবেন। শচী ভাবিতেছেন, "এ অতি শুভ কথা। আমি তিনলোকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবতী যে, শ্রীভগবান্ আমার উদরে জন্ম লইয়াছেন। এখন সেই শ্রীভগবান্ জীবের পক্ষে যাহা সর্বাপেক্ষা শুভকর্ম, তাহাই করিতে যাইতেছেন, ইহাতে বাধা দিতে আমার দুর্বুদ্ধি কেন হইল?" তখন শচী ভাবিতেছেন, তাঁহার ত ইহাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়। বরং গাঢ় আনন্দ প্রকাশ করা কর্তব্য। ইহাই ভাবিয়া বলিতেছেন, "বাপ নিমাই! তুমি কে, আমি তাহা জানিয়াছি। আমি তোমাব মা নই, তুমি আমার পুত্র নও। তুমিই সকল জীবের মা ও বাপ। তুমি কৃপা কবিয়া আমার গর্ভে জন্ম লইয়াছ। যতদিন মনোসুখে আমার বাড়ী পবিত্র করিয়াছ, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি এখন মনোসুখে, তোমার প্রতি প্রিয় যে জীব, তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত সন্ন্যাস করিবে। এ বড় শুভ কথা। তুমি কৃপা করিয়া আমার সম্মান বাড়াইবার নিমিত্ত, আমার কাছে অনুমতি চাহিতেছ। আমি মনোসুখে অনুমতি দিলাম, তুমি স্বচ্ছন্দে সন্ন্যাস কব।" শচী যে অতি জ্ঞানের ও উত্তম কথা বলিলেন, তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহা লইয়া পরে একটু বিচার করিব। যখন শচী এই কথা বলিতেছেন, তখন আহ্লাদে ডগমগ হইয়া গলিয়া পড়িতেছেন। যেই মাত্র এই কথা বলা সাঙ্গ হইল, অমনি শচীর জ্ঞান লোপ হইল।

তিনি জ্ঞান হারাইয়া বাৎসল্য-প্রেমে অভিভূত হইলেন। যথা—"জগত দুর্লভ কৃষ্ণ আমার তনয়। কারো বশ নয় মোর শক্তি কিবা হয়।। এত অনুমানি শচী কহিল বচন। স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষ রতন। মোর ভাগ্যে এত দিন ছিলে মোর বশ। এখন আপন সুখে করগে সন্ন্যাস।। পুনর্বার শচীমাতা মায়াছন্ন হৈল। 'হায় কি করিলাম বলি' ভূমিতে পড়িল।।" অভিভূত হইয়া শচী দুইরূপ দুঃখে জরজর হইতে লাগিলেন। প্রথম এই যে, নিমাই সন্ন্যাসী হইল; আর দ্বিতীয়, তিনিই তাঁহাকে বৈরাগী করিলেন। তখন এই দুঃখে আহত হইয়া শচী ইহাই বলিয়া ধূলায় পড়িলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে—"আমি কি বলিতে কি বলিলাম। মা হয়ে নিমা'য়ে বিদায় দিলাম।।"

দুইটি সুখ একেবারে আসিলে যেরূপ কোনটিই ভাল করিয়া ভোগ করা যায় না, দুইটি দুঃখও এক সময়ে আসিলে সেইরূপ উভয়ের একটিও পূর্ণ পরিমাণে দুঃখ দিতে পারে না। তাই শচী প্রাণে মরিলেন না। শচী তখন কেবল "নিমাই, নিমাই" বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

শচী যে কথা মুখ দিয়া একবার বলিয়াছেন, তাহাতে যে আবার 'না' বলিবেন, সেরূপ মেয়ে

তিনি নহেন। তিনি নিমাইয়ের মা ও তাঁহারই মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই যে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, ইহার মধ্যে একবারও এ কথা বলিলেন না যে, "নিমাই! আমি কি বলিতে কি বলিয়াছিলাম। নিমাই! আমি বিদায় দিই নাই, আর যদি দিয়া থাকি সে আমার ঘাড়ে দুষ্ট সরস্বতী আসিয়াছিল। আমি কখনই যেতে দিব না।" তবে ইহাই বলিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, "কি কৈলাম? আমার নিমাইকে পথের ভিখারী করিলাম? বাছার ত কোন দোষ নাই! বাছা ত আমার উপর নির্ভর করিয়াছিল। নিমাই আমার মাতৃবৎসল! আমাকে না জানাইয়া কোন কাজ করে না। নিমাই যোগ্য হইয়াছে, তবু মা বই জানে না।" তাহার পরে নিমাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "নিমাই! তোমার আমাকে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কু-লোকে তোমাকে কু-পরামর্শ দিয়া ঘরের বাহির করিতেছিল। তুমি তাহাদের হাত ছাড়াইতে না পারিয়া আমার উপর নির্ভর করিয়াছিলে। তুমি ভাবিয়াছিলে, আমি আর কিছুতে তোমাকে যেতে দিব না। কেমন নিমাই? এখন দেখ, আমি তোমার কেমন মা! এই নবীন বয়স, ভুবনমোহন রূপ; তোমাকে কৌপীন পরাইয়া ঘরের বাহির করিলাম!" শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি ব্যস্ত হইয়া, জননীকে উঠাইয়া আপনার অঙ্গে হেলান দিয়া বসাইলেন। বলিতেছেন, "মা! সত্য কি পাগল হইলে? ও কি তুমি অনুমতি দিয়াছ? শ্রীকৃষ্ণ তোমার জিহ্বায় বসিয়া অনুমতি দিয়াছেন। কেন কান্দিতেছ? আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিতেছি? এ যে পরমার্থ ত্যাগ, এ ত্যাগ নয়,—চির-মিলন। আমি যে নিমাই, তাহাই আছি; আর তুমি আমার যে মা, তাহাই আছ। আমি যেখানে যাই, তুমি সেখানে থাক,—আমি যাহা তাহাই থাকিব, তুমি যাহা তাহাই থাকিবে। আমি তোমার পুত্র, তুমি আমার মা; এ সম্পর্ক কোন কালে যাইবার নহে। তুমি যেমন আমার কথা দিবানিশি ভাবিবে, আমিও তেমনি তোমার কথা তিলমাত্র ভুলিতে পারিব না। না হয় কিছুকাল দেখাদেখি না-ই হইবে; তাহাতে কি? ভালবাসা নষ্ট হইলেই দুঃখ, তাহা কোন যুগে হইবে না। মনে ভাবো, আমি যেন ধন উপার্জনের নিমিত্ত বিদেশে যাইতেছি! অন্যের পুত্র বৃথা ধন আনিয়া জননীকে দেয়; আমি তোমাকে অক্ষয়, পরম ধন আনিয়া দিব। শান্ত হও, তোমার মলিন মুখ আমি কিরূপে দেখিব? তাহা হইলে আমি কিরূপে যাইব? তুমি বলিলে, আমি সকলের উপর করুণ, কেবল তোমাদের উপর নির্দয়। মা! শ্রীভগবান্ যে তাঁহার নিজ-জন, তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকেন। কারণ তিনি জানেন যে, তাঁহার ভক্ত উহা সহিবে। সন্তানেও জননীর প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, কারণ সে জানে যে, জননী উহা সহিবেন। যেখানে গাঢ় স্নেহ, সেখানে পদে পদে এরূপ নিঠুরালী হইয়া থাকে। মা! আমার অত্যাচার তুমি ব্যতীত অন্যে কেন সহিবে?" ইহা বলিতে বলিতে জননীর গলা ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "মা! আমি স্ববশে থাকিলে কি, তোমা হেন জননীকে এই বৃদ্ধকালে ফেলিয়া যাইতে পারি? আমি যাইব, না থাকিব এইরূপ কত প্রকারে মনকে বুঝাইতেছি। কিন্তু এ কথা উদয় হইবা মাত্র যেন আমার হৃদয় বিদরিয়া যাইতেছে। কিন্তু মা! আমি থাকিতে পারিলাম না, সংসারের সুখ-ভোগ আমার কপালে নাই। তাই বলিয়া তুমি ক্ষোভ করিও না; সংসারের সুখ মিছা, আর প্রকৃত যে সুখ, আমি তাহার নিমিত্ত সংসার ত্যাগ করিতেছি।"

তখন শচী আঁচল দিয়া নিমাইয়ের নয়ন-জল মুছাইতে লাগিলেন, আর বলিতেছেন, "বাপ! যদি তুমি যাইবে, তবে বিশ্বরূপের মত নিঠুরালী করিও না; আমার চাঁদ, আমার এই কথাটি রাখিও। আমাকে মাঝে মাঝে দেখা দিও, আর আমাকে সর্বদা তোমার সংবাদ দিও!" শ্রীনিমাই বলিতেছেন, "মা, সে কি? এ বুদ্ধি তোমাকে কে দিল, যে আমি তোমাকে ফেলিয়া যাইব আর আসিব না আর তোমাকে ভুলিয়া থাকিব? মা! আমি তা পারিব কেন? আমার সন্ন্যাসী হওয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের আর একটি উপলক্ষ্য মাত্র। সন্ন্যাসী হইলাম বলিয়া তোমার চরণে অপরাধ করিব না। যে সন্ন্যাসে তোমার সহিত সম্পর্ক লোপ হয় সে সন্ন্যাসের মুখে ছাই। তুমি যাহা বল তাহাই করিব, যেখানে থাকিতে বল সেখানে থাকিব।" তখন শচী নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, "বাপ! তুমি যখন অন্যের বাড়ী যাও, তখন আমি অস্থির হইয়া দ্বারে বসিয়া

থাকি। সেই তুমি বৃন্দাবন যাইবে। তাহা হইলে বোধ হয় আমার প্রাণ বাহির হইবে। দেখিস্ নিমাই, জননী-বধের ভাগী হইস্ না।* তোকে লোকে বড় নিন্দা করিবে।"

নিমাই তখন ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "মা! তোমাকে একটি গোপনীয় কথা বলি। তুমি, কি তোমার দুঃখিনী বধু, কি ভক্তগণ, যিনি "অনুরাগে"* ভজন করিবেন, তিনিই আমাকে দেখিতে পাইবেন। আর জননী। আরো বলি, যখন আমার বিরহে তুমি বড় ব্যাকুল হইবে, তখনই তুমি আমার দর্শন পাইবে। মা! তুমি ভাবিতেছ আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব। আমার আবার ভয়, পাছে তোমরা আমাকে ভুলিয়া যাও। আমার প্রতি তোমার যে গাঢ় ভালবাসা তাহা যাহাতে কিঞ্চিৎ শিথিল না হয়, তাই তোমার বধূকে তোমার কাছে রাখিয়া গেলাম। উভয়ে উভয়কে আমার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।"

শচী চিরদিন রন্ধনপটু। তাঁহার পুত্রের সর্বপ্রধান সেবা রন্ধন করিয়া খাওয়ান। যাহা পুত্র ভালবাসেন তাহাই সংগ্রহ করেন, মনোসুখে তাহাই উত্তম করিয়া রন্ধন করেন, আর মনোসুখে তাহাই বসিয়া পুত্রকে খাওয়ান। এই তাঁহার সুখের সীমা, ইহার অধিক সুখ তিনি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন না। শচীর এখন সেই কথা মনে পড়িল। বলিতেছেন, "নিমাই। তুমি কি ভালোবাসো, তাহা আমি যেরূপ জানি জগতে আর কেহই সেরূপ জানে না। তোমার আমা ভিন্ন আর কাহারও রন্ধন ভাল লাগে না। নিমাই। আমি এখন সেই কথা ভাবিতেছি; অপরের রন্ধন খাইয়া তোর পেটও ভরিবে না, আর শরীরও কাহিল হইয়া যাইবে।"

শ্রীনিমাই বলিতেছেন, "মা! তুমি এ কথা ভাবিও না যে, আমি তোমার ঘর ছাড়িয়া যাইতেছি। তুমি যেরূপ কর, সেইরূপ প্রত্যহ করিও। আমাব নিমিত্ত আমার প্রিয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া, রন্ধন করিয়া, আমি যেখানে বসিয়া ভোজন করি, সেখানে তুমি এখন যেরূপ বসিয়া আমাকে ভোজন করাও, তোমার যে দিন ইচ্ছা হয়, সেইরূপ করিও। আমি তাই ভোজন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিব। আমি যে ভোজন করিলাম, ইহার প্রত্যয়ের নিমিত্ত তোমাকে আমি মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ দর্শন দিব। সে সুখ তোমার,—এখন আমাকে নয়নেব উপর রাখিয়া যে সুখ পাও, তাহা অপেক্ষাও অনন্ত গুণ অধিক হইবে। আরও বলি, মা। তুমি বলিলে যে, তোমার সাধ যে নবদ্বীপে আমি ঘরকন্না করি। তাই তোমার সুখের নিমিত্ত, আমি কিছুকাল যাওয়া স্থগিত রাখিয়া, নদীয়ায় গৃহস্থালি করিব।"

শ্রীনিমাইয়ের এই সময়কার লীলা ভক্তগণ আলোচনা করিতে পারেন না,—করিতে গেলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি কঠিন বলিয়া করিতেছি। ভক্তগণকে একটু বিশ্রাম দিবার নিমিত্ত, এখন এ কাহিনী ক্ষান্ত দিয়া, গোটা দুই কথা লইয়া.বিচার করিব। শ্রীশচী পুত্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, "নিমাই! এখন গৃহত্যাগ না করিয়া আমার মৃত্যুর পর করিলে ভাল।" এইরূপ কথা কিছুদিন পরে নিমাইকে কেশব ভারতীও বলিয়াছিলেন, আর অদ্যাবধি অনেক লোকে বলিয়া থাকেন। ইঁহারা বিজ্ঞলোক, অত্যন্ত জ্ঞানবান, অন্যের কার্যপ্রণালী বিচার করিতে পটু। তাঁহারা বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বৃদ্ধা জননীকে ত্যাগ করিয়া ভাল করেন নাই। কেহ এ কথাও বলেন যে যদি তিনি গৃহত্যাগ করিবেন, তবে বিবাহ করিলেন কেন? এ সম্বন্ধে অধিক না বলিয়া বলরাম দাসের একটি পদ উদ্ধৃত করিব। যথা—

যত বিজ্ঞ জনে প্রভুরে নিন্দয়ে। বলে 'কেন ছাড়িলেন বৃদ্ধা মায়ে'।।
কেহ কেহ বলে অতি বিজ্ঞ হয়ে। 'কেন শ্রীগৌরাঙ্গ করিলেন বিয়ে?'
বৃদ্ধা জননী নবীনা ঘরণী। ছাড়ি ভাল কাজ করেন নাই তিনি।।

* "অনুরাগ" কথাটিতে চিহ্ন দিলাম। কাবণ শুনিয়াছি যে এখনও যিনি অনুবাগে শ্রীগৌবাঙ্গকে ভজনা কবেন তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান।

গৃহ ছাড়িবেন যদি মনে ছিল। বিয়া নাহি করা তাঁর ছিল ভাল।।
এই সব কথা বলে বিজ্ঞ লোকে। কি উত্তর দিব? শুনি বসি দুঃখে।।
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইল। ভুবনে উঠিল ক্রন্দনের রোল।।
নদে মাঝে তাঁর শত্রুপক্ষ ছিল। কাতরে তাহারা কান্দিতে লাগিল।।
'হেন মহাজন চিনি নাহি মোরা।' অনুতাপে দগ্ধ আগে হ'ল তারা।।
নবীনা ঘরণী আর বৃদ্ধা মাতা। সন্ন্যাসের কালে গোরার না থাকিত।।
তবে বল তাঁর সন্ন্যাসের কালে। কেন কান্দিবেক ভুবনে সকলে?
করুণায় যদি জীব না কান্দিত। তবে কি কেহ বৈষ্ণব হইত?
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইল। তখন অদ্ভুত তরঙ্গ উঠিল।।
যত গৌড়বাসী কান্দিতে লাগিল। সেই কালে কত সন্ন্যাসী হইল।।
কেহ-বা শোকেতে পাগল হইয়া। কত শত দিন বেড়াল ভ্রমিয়া।।
'কি হলো, কি হলো' শুধু এই রব। 'হায় হায় হায়' করে জীব সব।।
ইহাতে জীবের হিয়া দ্রব হলো। তবে ভক্তি-বীজের অঙ্কুর হইল।।
নবীন সন্ন্যাসী সোণার বরণ। সদা ঝুরিতেছে কমল নয়ন।।
অতি দীর্ঘকায় সুবলিত অঙ্গ। কৌপীন পরেছেন আমার গৌবাঙ্গ।।
দৃষ্টিমাত্র জীবের হিয়া দ্রব হয়। 'মনু মনু' বলি পড়ে রাঙ্গা পায়।।
আদরে শ্রীগৌরাঙ্গ ধরে তারে বুকে। বলে, 'প্রিয় শুন হরি বল মুখে'।।
এইরূপে গৌর জীব উদ্ধারিল। শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ায় তাহাতে ত্যজিল।।
শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ-জন তাঁর। তাঁহাদের দুঃখে জীবের উদ্ধার।।
যেবা হয় অতি নিজ-জন তাঁর। দুঃখ দেওয়া তারে স্বভাব তাঁহার।।
বলেন তাহারে, যে নিজ-জন তাঁর। "আমার দৌরাত্ম্য সহিবে কে আর?"
যখন গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইল। শচী বিষ্ণুপ্রিয়ায় স্পষ্টত বলিল।।
"তোমাদের দুঃখে জীবের মঙ্গল। দুঃখ নিবে কি না স্পষ্ট করি বল?
বড়ই মলিন হ'লো সব জীব। তোমাদের আঁখি জলেতে শোধিব।।
কারে দুঃখ দিব, কে আর সহিবে। তোমাদের দুঃখে জীব উদ্ধারিবে।।"
দুহে ইহা শুনে শিরে দুঃখ নিয়ে। অনুমতি দিল গদ গদ হয়ে।।
ক্ষুদ্র লোকে ভাবে বড় দুঃখ পেল। শচী বিষ্ণুপ্রিয়া ভাগ্য বলি নিল।।
যখন গৌরাঙ্গ করিলা সন্ন্যাস। শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার হলে সর্বনাশ।।
আর যত তাঁর প্রিয় ভক্তগণ। সকলের সঙ্গে সদাই মিলন।।
কেবল কান্দিল শচী বিষ্ণুপ্রিয়া। শূন্য নদীয়ার ঘরেতে শুইয়া।।
অতএব শুন ওহে ভক্তগণ। শচী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর নিজ-জন।।
নিজ-জন বলি দিল এ দুঃখ। তুমি ভাব দুঃখ তাদের মহাসুখ।।
শ্রীগৌরাঙ্গ যদি সন্ন্যাসী না হ'ত। বলাই কি তারে চিনিতে পারিত?

সন্ন্যাস-আশ্রম সৃষ্টি করিবার একটি প্রধান উদ্দেশ্য জীবকে সংসারের অনিত্যতার উপদেশ দেওয়া, আর পরকালের প্রতি দৃষ্টি করিতে উত্তেজিত করা। মহাজনে সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন করিয়া দেখাইয়া থাকেন যে, জীবগণ যে সুখকে সুখ বলে, তাহা তাঁহাদের ন্যায় মহাজন পা দিয়া ফেলিয়া দিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীর স্ত্রীর মুখ দেখিতে নাই; সন্ন্যাসীর উদর পূর্তি করিয়া অন্ন সেবা করিতে নাই; সন্ন্যাসীর, ব্যঞ্জন কি অন্নের অন্য উপকরণ ব্যবহার করিতে নাই। তাঁহাদের শীতের নিমিত্ত গাত্রে অন্যের পরিত্যক্ত ছেঁড়া বস্ত্র এবং লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত কৌপীন পরিধান করিবার অধিকার আছে মাত্র।

সন্ন্যাস-আশ্রমের আর এক উদ্দেশ্য,জীবের নিকটে শ্রদ্ধা আহরণ করা। যে ব্যক্তি পরমার্থের নিমিত্ত স্বার্থ ত্যাগ করেন, তাঁহাকে লোকে সহজেই ভক্তি করে ও তাঁহার উপদেশ মান্য করে, শ্রীভগবান্ এইরূপে সন্ন্যাসী হইয়া জীবকে শিক্ষা দিবেন। তিনি তাঁহার সুখ বিসর্জন দিয়া জীবের হৃদয় দ্রব করিবেন। সুতরাং তিনি এরূপ অদ্ভুত ত্যাগ স্বীকার করিলেন যে, সামান্য জীবে তাহা পারে না। তিনি সাতষট্টি বৎসর বয়স্কা শোকাকুলা জননী শচীদেবী ও চতুর্দশবর্ষীয়া ভার্যা বিষ্ণুপ্রিয়া, এই দুই জনকে ফেলিয়া চলিলেন। আর সমস্ত গৌড়দেশ ও পরে সমস্ত ভারতবর্ষ হাহাকার করিয়া উঠিল। যদি তিনি শচীর মৃত্যু অন্তে গমন করিতেন ও আদৌ বিবাহ না করিতেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহার সন্ন্যাসে কান্দিবে কেন?

শ্রীভগবান্ শচীকে জ্ঞান দিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া পরে আবার তাঁহার জ্ঞান হরণ কবিলেন। জ্ঞানী লোকে বলিতে পারেন, প্রভু এ কাজ কি ভাল করিলেন? যদি জ্ঞান দিলেন, তবে আবার লইলেন কেন? জননীকে জ্ঞান দিয়া ফাঁকি দিয়া অনুমতি লইলেন, শেষে তাঁহাকে আবার অকূলে ভাসাইলেন, এ কাজ কি ভাল করিলেন? এ কথার একটু বিচার করিব। এ কথার বিচার করিতে গেলে বৈষ্ণবধর্ম্মের সার কথা উঠিবে। যাঁহারা শ্রীভগবানের অস্তিত্ব মানেন, তাঁহারা, তাঁহার সহিত তিনরূপ সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকেন। একদল বলেন যে, তিনিও যে, আমিও সে; অতএব তাঁহার ভজনা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি যখন কোন এক পৃথক বস্তু নহেন, তখন তিনি কিছু দিতেও পারেন না, লইতেও পারেন না,—লওয়া কি দেওয়া আমার নিজের হাত। আমার সাধ্য থাকে, সাধন করিয়া ধন আহরণ করিব, সাধ্য না থাকে পারিব না,—যাহা আছে তাহাও হারাইব। আর এক শ্রেণী আছেন, যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে শাস্তা ও দাতা বলিয়া ভজনা করেন। যদি পাপ করি শ্রীভগবান্ দণ্ড করিবেন, যদি তাঁহার মনস্তুষ্টি করিতে পারি তবে পুরস্কার পাইব। এই শ্রেণীর জীবের ভজন, সুতরাং দুইরূপ। একরূপ, "হে ভগবান্। পাপ মার্জনা কর," আর একরূপ, "হে ভগবান্! আমাকে ভাল ভাল দ্রব্য দাও।"

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলেন যে শ্রীভগবানের ভজনপ্রণালী আমাদের সংসার দ্বাবা আমরা জানিতে পাই। আমরা জীবগণের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকি। যাহার সহিত আমি যেরূপ সম্বন্ধ পাতাই, সেও আমার সহিত সেইরূপ পাতায়। যথা, আমি যদি একজনের বন্ধু হই, তবে সেও আমার বন্ধু হয়। আমি যদি কাহারও সহিত স্ত্রীরূপ সম্বন্ধ পাতাই তবে আমি তাঁহার স্বামী হই। যদি প্রভু বলিয়া কাহারও সহিত সম্পর্ক করি, তবে তিনি আমার সহিত দাস সম্পর্ক স্থাপিত করেন। এইরূপে জীবগণ সমাজ-আবদ্ধ কি পরিবার-আবদ্ধ হইয়া বাস করে। সেইরূপ, শ্রীভগবানের সহিত তুমি যেরূপ সম্বন্ধ পাতাও, তিনিও তোমার সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ করিবেন। তুমি তাঁহাকে সখা বলিয়া ভজনা করিলে তিনি তোমার সহিত বন্ধুর ন্যায়, তুমি তাঁহাকে পুত্ররূপে ভজনা করিলে তিনি তোমাকে পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবেন। এইরূপে শ্রীভগবানের সহিত চারি প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় যথা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এ সমুদয় সম্বন্ধ পাতাইবার উপায়, ভক্তি আর প্রেম। অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে মুখে "নাথ" কি "বন্ধু" বলিলে লাভ নাই। তাঁহার উপর প্রকৃতই সেইরূপ ভাব হওয়া চাই, তবে তিনিও সেইভাবে তোমার সহিত মিলিত হইবেন। যাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত প্রকৃতই এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহারাই বৃন্দাবনে স্থান পাইবার অধিকারী হয়েন। মন্ত্রতন্ত্রের বলে, কি উপমা-অলঙ্কার পরিয়া, কি বাক্য-ঢক্কা গলায় দিয়া, শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করা যায় না,—এই সম্বন্ধ স্থাপন, তত্ত্বকথার দ্বারা, কি কতকগুলি নিয়ম পালন করিয়া করা যায় না।

এরূপ ভজনে যাগ যোগ, যজ্ঞ, পূজা কি কোন গুপ্ত-করণ কিছু থাকিল না। এরূপ ভজনে কোন স্বার্থ-সাধনের প্রয়োজন থাকিল না। কারণ যাঁহার কাছে চাহিব তিনি নিজ-জন, তাঁহার নিকট চাহিতে হইবে কেন? স্ত্রী কি কখনও স্বামীর কাছে বলেন, "আমাকে পোষণ কর?"

অতএব এ ভজনের প্রধান সাধন-ভক্তি, প্রেম-ভক্তি ও প্রেম। প্রেম-ভক্তি গেল ত সব গেল, প্রেম-ভক্তি থাকিল ত সব থাকিল।

শ্রীভগবান্ শচীর প্রেম হরণ করিলেন। বাৎসল্য-প্রেমে শচীর জ্ঞান আবৃত ছিল। সেই জ্ঞান উদয় হওয়ায় শচী দেখিলেন যে, নিমাই তাঁহার পুত্র নহেন। আর দেখিলেন যে, নিমাই জীবগণের উপকারের নিমিত্ত সন্ন্যাস করিতে যাইতেছেন। তখন এরূপ শুভকর্মে বাধা দিতে নাই, ইহাই বুঝিয়া তিনি যে বস্তুকে পুত্র ভাবিতেন, তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

কিন্তু এই জ্ঞান হওয়াতে শচীর অতিশয় অনিষ্ট হইল। অগ্রে তিনি শ্রীভগবানের একমাত্র জননী ছিলেন, এই জ্ঞান উদয় হওয়ায় তিনি একজন সামান্য জীব মাত্র হইলেন। পূর্বে তাঁহার বিমল সুখের প্রস্রবণ যে অতি প্রিয় বস্তুটি ছিল, জ্ঞান পাইয়া তাহা হারাইলেন। শচী জ্ঞান পাইলেন বটে, কিন্তু পুত্রটি হারাইলেন। কাজেই শ্রীভগবান্ আবার শচীর জ্ঞান হরণ করিয়া মাতৃরূপ যে দুর্লভ পদ তাহাই তাঁহাকে দিলেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রিয় ও সুখের বস্তুটি তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করিলেন।' অবশ্য জ্ঞানের অবস্থায় শচীর কান্দিবার কোন কারণ ছিল না, তবু জ্ঞান যাওয়ায় "হা নিমাই" বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু ভালবাসার সেবা করিতে হইলে এইরূপ কান্দিতে হইবে। কারণ যেখানে ভালবাসা সেইখানেই বিরহ। বিরহ লইতে যদি আপত্তি থাকে তবে ভালবাসা পাইবে না। যদি প্রেমোত্থিত সুখ চাও, তবে বিরহরূপ দুঃখ লইতে হইবে। যাহার বিরহরূপ দুঃখ নাই, তাহার মিলন-সুখও নাই। এই বিরহ ভালবাসাকে পুষ্টি ও নির্মল করে। তাই নিমাই শচীকে বলিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসী হইয়া তিনি মাঝে মাঝে শচীকে দর্শন দিবেন, তাহাতে শচী যত সুখ পাইবেন, নিমাই সর্বদা তাঁহার নয়নের নিকট থাকিলে তাহার শতাংশের এক অংশও সুখ পাইবেন না।

ফল কথা, যদি জ্ঞানী হও, তবে যত প্রকার মানসিক প্রবৃত্তি দ্বারা হৃদয় কোমল হয়—অর্থাৎ প্রেম, ভক্তি, দয়া, স্নেহ, মমতা ইহার কিছুই থাকিবে না। এ সমুদয় না থাকিলে, ইহা হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহা পাইবে না বটে, কিন্তু এ সমুদয় হইতে যে সুখোৎপত্তি হয় তাহাও পাইবে না। অর্থাৎ একটি নীরস শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া থাকিবে। অর্থাৎ জ্ঞানী হও, তবে শ্রীভগবান্ কি কোন প্রিয়জনের নিমিত্ত কান্দিতে হইবে না, কিন্তু তাহাদের হইতে কোন সুখও পাইবে না। প্রেমের চর্চা কর, তবে প্রেম হইতে যে সুখ উৎপত্তি হয়, তাহা ভোগ করিতে পাইবে, ও বিয়োগজনিত দুঃখ কাজেই ভোগ করিতে হইবে। তাই শ্রীভগবান্ শচীর প্রতি করুণা করিয়া তাঁহার সুখ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, আপনি তাঁহার পুত্র থাকিবেন বলিয়া, তাঁহার জ্ঞান হরণ করিলেন, আর "হাঁ নিমাই" বলিয়া কান্দিবার মহা ভাগ্য দিলেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

কিবা হইল দুর্মতি, বিষ্ণুপ্রিয়া গুণবতী, কি ক্ষণে আনিনু তোমা ঘরে।
দিবানিশি কান্দাইনু, সুখ মাত্র নাহি দিনু প্রিয়ে! কৃপা করি ক্ষম মোরে।।
করি ধন আহরণ, আপন জন পোষণ, জগ-মাঝে সবে করে সুখী।
সুখ নাহি দিনু তোরে, জন্মের মত দেশান্তরে চলেছি, একাকী তোমারে রাখি।।
বলরাম দাস গায়, স্বামী পানে বালা চায়, দু'নয়নের তারা নাহি চলে।
শুখাইল মুখ-ইন্দু অঙ্গ ফাঁদে মৃদু মৃদু মুরছিয়া পড়ে পতি কোলে।।

নিমাই জননীর নিকট, তাঁহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া, অনুমতি লইলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শচী মর্মাহত হইয়া বাহ্যজ্ঞান প্রায় হারাইয়া, অভ্যাসবশতঃ সংসারের কার্য করিতে লাগিলেন। শচীর এই দুঃখ-ভাব ঘুচাইয়া, নিমাই কিছুকাল সংসারী হইবেন, তিনি জননীকে সেই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। জননীর নিকট বিদায় লইয়াছেন বটে,

কিন্তু চতুর্দশ-বর্ষীয়া নববালা, সেই সরলা, পতি-প্রাণা, পতি-গৌরবিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট বিদায় লইতে বাকি আছে। বিষ্ণুপ্রিয়া অগ্রহায়ণ মাসে পিত্রালয় গমন করিয়াছেন। সেখানে কাণাঘুষা শুনিলেন, তাঁহার স্বামী নাকি নিজমুখে বলিয়াছেন যে, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ ছাড়িবেন। তাঁহাকে তাঁহার স্বামী—যাঁহার হৃদয় কেবল ভালবাসা দ্বারা গঠিত,—যে ছাড়িয়া যাইবেন, ইহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। কিন্তু ভরসাই বা কি? তাই ব্যস্ত হইয়া পতির গৃহে আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীনিমাই রজনীতে ভোজন করিয়া খট্টায় শয়ন করিলেন, একটু নিদ্রাও গেলেন। এমন সময় বিষ্ণুপ্রিয়া অল্প-স্বল্প বেশবিন্যাস করিয়া হাতে পানেব বাটা, আব একখানি রেকাবিতে চন্দনের বাটী ও ফুলের মালা লইয়া পতির শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, পতি ঘুমাইয়া আছেন, বস্ত্রের দ্বারা সমুদয় অঙ্গ আবৃত, কেবল বদনখানি চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ধৈর্য মাত্র নাই। পিতার গৃহ হইতে অনাহূত দ্রুতগমনে আসিয়াছেন, কেন না—স্বামীর কাছে শুনিবেন যে, লোকে যে জনরব করিতেছে তাহার অর্থ কি? সেইরূপ ব্যস্ত হইয়া দুটো অন্ন মুখে দিয়া শীঘ্র শীঘ্র পতির শয়নগৃহে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার ভাগ্যক্রমে সে দিবস প্রভু সংকীর্তনে গমন করেন নাই। পতির নিকটে যাইয়া কি বলিবেন, এ সমুদয় কথা মনে মনে শতবার রচনা করিয়াছেন। আব পতির নিকট যাইয়া দেখেন, তিনি ঘুমাইতেছেন। পতিকে নিদ্রিত দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া অমনি দাঁড়ালেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ভাবিলেন, তাঁহার বল্লভের ভাগ্যে ত প্রায় নিদ্রা হয় না; একটু ঘুমাইতেছেন, এখন জাগান কর্তব্য নয়। আবার ভাবিতেছেন, ভালই হইয়াছে, এই সুযোগে পদতলে বসিয়া মুখখানি দেখি। তখন পানের বাটা ও হস্তের রেকারি নিঃশব্দে খট্টার নিম্নে রাখিলেন, ও ঐরূপ নিঃশব্দে ভয়ে ভয়ে,—যেন কত অপরাধ করিতেছেন,—স্বামীর পদতলে বসিলেন। বসিয়া মহাসুখে অতি গৌরবের সহিত, পতির মুখচন্দ্র দর্শন করিতে লাগিলেন। পতির শ্রীপদে হস্ত-স্পর্শ করিতে সাহস হইতেছে না। কারণ, শীতকাল, তাঁহার করতল শীতল, উষ্ণ বস্ত্রে পতির চরণ আবৃত; সুতরাং তাঁহার করতল-স্পর্শে নিদ্রাভঙ্গের সম্ভাবনা। ইহা ভাবিয়া সেই উষ্ণ বস্ত্রের মধ্যে, ধীরে ধীরে হস্ত প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। যখন বুঝিলেন যে করতল উষ্ণ হইয়াছে, তখন শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। একটু পরে, চৌরগণ যেরূপ অতি নিঃশব্দে ও ধীরে ধীরে দ্রব্যকে স্থানভ্রষ্ট করে, সেইরূপ শ্রীমতী পতির চরণ দুখানি হস্তদ্বারা উঠাইতে লাগিলেন। মনে মহা-ভয় পাছে পতির নিদ্রাভঙ্গ হয়। কিন্তু বিধি তাঁহার প্রতি সে রাত্রি সুপ্রসন্ন,—নিমাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া পতির দুটি অভয় পদ উঠাইয়া আপনার হৃদয়ে ধরিলেন। এই যে বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের পদ হৃদয়ে ধরিলেন, ইহার তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহার উষ্ণ-হৃদয়ে স্বামীর পদতল চাপিলে শ্রীনিমাইয়ের আরাম হইবে; দ্বিতীয়তঃ ভাবিলেন যে, তাঁহার বুকের মধ্যে কুচিন্তা জ্বলন্ত অনলের ন্যায় পোড়াইতেছে—স্বামীর শীতলপদ-স্পর্শে উহা নির্বাণ হইবে; তৃতীয়তঃ বরাবর ভাবিতেছেন যে, স্বামীর অভয়-পদে একবার শরণ লইবেন, তাহাই এখন লইলেন। শ্রীপদ হৃদয়ে ধরিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া পতির প্রসন্ন-বদন দেখিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, ত্রিভুবনে এমন সুন্দর মূর্তি আর নাই! পদস্পর্শে শরীর আনন্দে পুলকিত হইল, আর তাহাতে যেন পতিমুখ আরো প্রফুল্লিত হইল। হাস্য ও রোদন যেরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সুখ ও দুঃখও সেরূপ। অধিক হর্ষ হইলে রোদনের উৎপত্তি ও অধিক রোদন হাস্যের উৎপত্তি; অধিক দুঃখে সুখের উৎপত্তি ও অধিক সুখে দুঃখের উৎপত্তি। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবিতেছেন, তাঁহার মত ভাগ্যবতী ত্রিজগতে আর কেহ নাই—তাঁহার এ ভাগ্য কি থাকিবে! ইহাই মনে উদয় হওয়ায় নয়ন দুটি জলে পুরিয়া গেল, আর যদিও পতির নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে নীরবে রহিলেন, কিন্তু নয়ন-জল নিবারণ করিতে পারিলেন না। জল নয়নে স্থান ন' পাইয়া ভাসিয়া

চলিল, আর উহার এক বিন্দু পতির শ্রীপাদপদ্মে পড়িল। এই উষ্ণ-নয়নজল পায়ের উপর পড়িবামাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং তিনি নয়ন মেলিলেন। দেখেন, তাঁহার প্রিয়া পদতলে বসিয়া তাঁহার চরণ দুইখানি হৃদয়ে ধরিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন। ইহা দেখিবামাত্র নিদ্রার আবেশ একেবারে গেল,—তিনি অতিশয় ক্লেশ পাইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং প্রিয়াকে উরুর উপর রাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে চিবুক ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার প্রাণপ্রিয়া, তুমি কাঁদ কেন?" যথা চৈতন্য-মঙ্গলে—

দু'নয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর, চরণ বাহিয়া পড়ে ধারা।
চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে, বিষ্ণুপ্রিয়ায় পুছে অভিপারা।।
"মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি, কান্দ কি কারণে জানি, কহ কহ ইহার উত্তর।"
থুইয়া উরুর পরে, চিবুক দক্ষিণ করে, পুছে বাণী মধুর অক্ষরে।।

এই মধুর সম্ভাষণ শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার উত্তর দিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু পারিলেন না; তাঁহার ধৈর্য-বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, আর ধারার বেগ শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাতে আরো ব্যস্ত হইয়া প্রিয়ার অঞ্চল দিয়া তাঁহার নয়ন মুছাইতে লাগিলেন। তাহাতে বিপরীত ফল হইল—হৃদয়ের তরঙ্গ বাড়িয়া উঠিল। শ্রীনিমাই তখন অতি কাতর হইলেন। ভাবিলেন, হৃদয়-বেগের কিছু নিবৃত্তি না হইলে প্রিয়া কথা কহিতে পারিবেন না। কাজেই, ধৈর্য ধরিয়া, আর কোন কথা না বলিয়া, প্রিয়ার নয়ন জল মুছাইতে লাগিলেন ও প্রিয়ার হৃদয়ের দুঃখ তরঙ্গে মুখে যে নানা ভাব খেলিতেছে, তাই একদৃষ্টে সজল-নয়নে দেখিতে লাগিলেন। একটু পরে আবার বলিতেছেন, প্রিয়ে! আমাকে কেন দুঃখ দিতেছ? আমার প্রতি কৃপা করিয়া তোমার কথা বল। এই ত আমার ক্রোড়ে বসিয়া আছ। আর তুমি পতিপ্রাণা, তোমার আবার দুঃখ কি হইতে পারে?" নিমাই দেখিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না, স্বামীর কোলে অল্প অল্প কাঁপিতেছেন, কেবল স্থান গুণে মূর্চ্ছিত হইতেছেন না। নিমাইয়ের দ্বারা নানা প্রকার আশ্বাসিত ও সেবিত হইয়া শেষে পতির মুখপানে চাহিলেন। নিমাই দেখিলেন, দৃষ্টি ক্ষোভে পূর্ণ। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "তুমি নাকি মাকে অকূলে ভাসাইয়া যাইবে?" তিনি প্রথমে "আমাকে" বলিতে গিয়াছিলেন, তাহা না বলিয়া বলিলেন "মাকে।" শ্রীনিমাই যদিও বুঝিলেন, এবং পূর্বেও বুঝিয়াছিলেন যে বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার সন্ন্যাসের জনরব শুনিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন তবুও মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আরও বুঝাইয়া বল, ফেলে যাব সে কি?" বিষ্ণুপ্রিয়ার ইচ্ছা নয় যে সন্ন্যাস শব্দ মুখে আনেন। তাই বলিতেছেন, "তোমার দাদা যাহা করিয়াছিলেন, তুমি নাকি তাহাই করিবে?"

নিমাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমাকে এ কথা কে বলিল? আপনা-আপনি অহেতুক কেন দুঃখ পাইতেছে?" ইহাতে বিষ্ণুপ্রিয়া পতির হস্তখানি মস্তকে রাখিয়া বলিলেন, "আমার মাথা খাও ঠিক কথা বল।" ইহাতে শ্রীনিমাই বলিলেন, "কত দিন পরে তোমার দেখা পাইলাম এখন তোমার চাঁদমুখ দেখিব, না কেবল কান্না-কাটা করিব! যখন যেখানে যাইব তোমার অনুমতি না লইয়া যাইব না। এখন ও সমুদয় ভুলিয়া যাও।" ইহা বলিয়া প্রিয়ার সহিত নানাবিধ হাস্য-কৌতুক করিতে লাগিলেন।

প্রভুর এ সমস্ত গার্হস্থ্যরস পূর্বে ভোগ করিবার অবকাশ ছিল না। তখন সমস্ত নিশা সংকীর্তনে যাইত। কেবল যখন ভাবে বিভোর থাকিতেন, তখনই সংকীর্তনে গমন করিতেন না। কাজেই তাহাতে শ্রীমতীর কি? উভয় সময়েই তিনি বঞ্চিতা। কিন্তু শচীমার মনের বাসনা কি, তাহা তিনি জানিতেন ও সে দিবস মায়ের মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার সাধ যে নিমাই অন্ততঃ কিছুকাল ঘরকন্না করেন। প্রভু তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়া বলেন যে, তাঁহার এই সাধ তিনি

যথাসাধ্য পূর্ণ করিবেন। এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার সমস্ত ভাবকে তখন হৃদয়ে লুকাইয়াছিলেন, এবং চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পতি, চতুর্দশ বর্ষ বয়স্কা বল্লভার সহিত যেরূপ হাস্যকৌতুক করে. প্রভু প্রিয়ার সহিত তাহাই করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া পতির এই নূতন ভাব দেখিয়া একেবারে আহ্লাদে গলিয়া পড়িলেন।

এইরূপে প্রায় সমস্ত রজনী কাটিল। নববালা সমস্ত নিশা ঢোকে ঢোকে আনন্দ পান করিলেন, হৃদয়ে যেন আনন্দ আর ধরিতেছে না। তখন স্বাভাবিক নিয়মে হৃদয়ে আবার দুঃখের তরঙ্গ উঠিল। পূর্বেই বলিয়াছি, বড় সুখ হইলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আসিয়া আপনি উপস্থিত হয়। তখন ভাবিতেছেন—আমি কি ছার যে আমার এ সুখ চিরদিন থাকিবে। ইহা ভাবিয়া পতির মুখপানে চাহিলেন, চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। পতি-পানে চাহিয়া সেই সন্দেহ গেল না, বরং যেন আরও বৃদ্ধি পাইল। ইহার তাৎপর্য পরিগ্রহ করুন। বিষ্ণুপ্রিয়া পতি-মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন যে, যদিও তিনি আমোদ ও কৌতুক করিতেছেন, কিন্তু সে সমুদয় বাহ্য, প্রকৃতপক্ষে তিনি যেন অন্তরে অন্তরে কান্দিতেছেন। তখন তাঁহার মাথা একেবারে ঘুরিয়া গেল। মনের সন্দেহ ঘুচাইবার নিমিত্ত স্বামীর মুখপানে আবার চাহিলেন, চাহিয়া সন্দেহ গেল না, বদ্ধমূল হইল। তখন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি কান্দিতেছ কেন?"

শ্রীগৌরাঙ্গ এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। সরলা স্ত্রীর মুখের ভাব দেখিয়া কান্দিয়া ফেলেন, এইরূপ ভাব হইল। কিন্তু দৃঢ় সঙ্কল্পে ধৈর্য ধরিয়া বলিলেন, "কৈ, এই ত আমি হাসিতেছি।" শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া এ কথায় প্রবোধ মানিলেন না। পতির দুইখানি হস্ত লইয়া আপনার বুকে ধরিলেন, আর বলিলেন, "তোমার ভাব আমার নিকট একটুও ভাল বোধ হইতেছে না। যদিও আমি মেয়েমানুষ, কিন্তু তোমার মুখ দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, যেন তুমি আমাকে ফাঁকি দিতেছ। তবে কি তুমি সত্যি মার ও আমার গলায় ছুরি দেবে? যথা চৈতন্য-মঙ্গলে— প্রভুর কর বুকে নিয়া, পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, "মিছা না বলিহ মোর ডরে। হেন অনুমান করি যত কহ সে চাতুরী। পলাইবে মোর অগোচরে!"

এখন বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে নিমাইয়ের শেল মাবিবার সময় উপস্থিত হইল। কাজেই প্রভু একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! হিত বাক্য শুন। আমার ইচ্ছা তোমার হিত হয়, তোমার ইচ্ছা আমার হিত হয়। উভয়ের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে, কেবল এক শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিলে। তুমি তাই কর, আমিও তাই করি। তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া তুমি নামের স্বার্থকতা কর।" পতি যাহা বলিলেন, তাহা সমুদয় তিনি শুনিতে পাইলেন না, তবুও স্পষ্ট বুঝিলেন যে, তাঁহাদের ছাড়াছাড়ির কথা হইতেছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ শুকাইয়া গেল, তবে তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন না, কারণ তাঁহার সম্মুখে কি বিপদ, তাহা তখন সম্যক্‌রূপে মনে ধারণা করিতে পারেন না। বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে একটি কথা বলি। তুমি যাই কর, বাড়ী ত্যাগ করিও না। আমি বাপের বাড়ী থাকিব, তোমার কাছে আসিব না। তুমি মাকে ত্যাগ করিলে, মা মরিয়া যাইবেন, আর লোকে তোমাকে নিন্দা করিবে।" আরও কি কি বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ঐ এক কথা বার বার বলিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া যে অবধি এই বিপদের কথা শুনিয়াছেন, সেই অবধি উপরের কথাগুলি এবং এইরূপ আরো অনেক কথা চেষ্টা করিয়া মনে মনে যোজন করিয়াছিলেন। কারণ ঐ সকল কথা পতিকে বলিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবেন, কিন্তু সময় কালে অধিকাংশ কথা ভুলিয়া গেলেন। কেবল "আমি তোমার কাছে আসিব না, জননীকে বধ করিও না," এইরূপ দুই একটি কথা বার বার বলিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার বালা-প্রেয়সীর তাঁহাকে বাড়ী রাখিবার চেষ্টা দেখিয়া, দুই ভাবে বিভোর হইলেন। প্রথমতঃ তাঁহার প্রিয়াকে,—তাঁহার অতি ভালবাসার পাত্রীকে দুঃখ দিতেছেন বলিয়া

তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। আবার, তাঁহার বালিকা স্ত্রীর তাঁহার ন্যায় ধীশক্তি-সম্পন্ন স্বামীকে বুঝাইয়া পড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা দেখিয়া, দয়ার উদ্রেক হইতেছে। কাজেই প্রিয়ার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া চাহিতে লাগিলেন। একটু পরে নিমাই বলিতেছেন, "তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি সন্ন্যাসী হইব। কিন্তু প্রিয়ে! তোমার প্রতি কি আমার ভালবাসার অভাব আছে? তোমাকে দুঃখ দিতেছি বটে, আমার নিমিত্ত তুমি বড় দুঃখ পাইবে, কিন্তু আমিও ত তোমার নিমিত্ত দুঃখ পাইব? তোমাকে দুঃখ দিতেছি আর আমি দুঃখ পাইতেছি, ইহা কি ইচ্ছা করিয়া করিতেছি, বিষ্ণুপ্রিয়ে! শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত এ সমুদয় করিতেছি, ইহাতে তোমার ও আমার দুইজনেরই ভাল হইবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া পতির এই কথা শুনিলেন বটে, কিন্তু উহা তাঁহার হৃদয়ে ভাল করিয়া স্পর্শ করিল না। তিনি যেন আপনা-আপনি কথা কহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "আজ কয়েক দিন আমি অনেক অমঙ্গল দেখিতেছি, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম যে, আমার সুখ ফুরাইয়া গিয়াছে। আমি সব জানি, আমি ত সে উছটের কথা এক দিনও ভুলি নাই।" এই কথা বলিয়া পতির মুখপানে চাহিয়া বলিতেছেন, "হাঁগো সত্যবাদী! আমার পায়ে উছট লাগিলে, তুমি না বলেছিলে, এই যে আমি আছি, তোমার ভয় কি?" ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ মস্তক অবনত করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া আবার বলিতেছেন, "তোমার দোষ কি? তুমি ত গুণনিধি। আমার কপালে বিধি পতি থাকিতে বৈধব্য লিখিয়াছেন। কিন্তু এ সব কি? আমি কি স্বপ্নে দেখিতেছি, না তুমি তামাসা করিতেছ? তুমি কি আমাকে ভয় দিতেছ?" তখন শ্রীগৌরাঙ্গ অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রিয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! এ স্বপ্নও নয—তামাসাও নয়,—সত্যই আমি সন্ন্যাসী হইব।"

বিষ্ণুপ্রিয়ার তখন ঠিক চেতনাবস্থা নাই, তাহা থাকিলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু এ যেন স্বপ্ন নহে—সত্য, শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাই বলিতেছেন, "প্রিয়ে! আমি সত্যই তোমাকে ফেলিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইব, এখন মনোসুখে আমাকে অনুমতি দাও।"

এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার যেন চমক ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন, "তুমি বল কি? তুমি যাবে কোথা? তুমি কেন যাবে? ইহা নাকি আবার হয়! আমি মাকে এখনই ডাকিয়া বলিতেছি। আমাকে না হয় পায়ে ঠেলিলে, তাঁহাকে আর এই বৃদ্ধকালে ফেলে যাইতে পারিবে না।" এই কথা বলিয়া শ্রীমতী মায়ের নিকট চলিলেন। মায়ের নিকট যে চলিলেন, ইহার অনেক কারণ আছে, এক কারণ এই যে, স্বামী ত্যাগ করিলেন, কাজেই মায়ের আশ্রয় লইতে চলিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে ধরিয়া ক্রোড়ে বসাইলেন। তারপর বলিতেছেন, "প্রিয়ে! একটু ধৈর্য ধর। আমি যাইব, তাহাতে আমার ক্লেশ; তোমাকে দুঃখ দিতেছি, তাহাতেও ক্লেশ। কিন্তু তুমি পতিপ্রাণা, সমুদয় দুঃখ আমার ঘাড়ে না দিয়া, ইহার কিছু অংশ তুমি লও। আর মার নিকট আমি অনুমতি লইয়াছি, এখন তোমার নিকট অনুমতি লইব।"

বিষ্ণুপ্রিয়া। (আশ্চর্যান্বিত হইয়া) তুমি বল কি! মা অনুমতি দিয়াছেন!

শ্রীগৌরাঙ্গ। হাঁ, তিনি মনোসুখে অনুমতি দিয়াছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা অনুমতি দিয়াছেন! তা দিতেও পারেন! তিনি আর কদিন বাঁচিবেন? বল দেখি আমি এ চিরজীবন কীরূপে কাটাইব? তুমি আমাকে কার হাতে রাখিয়া যাইবে? মা-ত অল্পকাল পরেই চলিয়া যাইবেন, তখন আমাকে কে রক্ষা করিবে?—ইহাই বলিয়া ঘাড় হেঁট করিলেন। আবার বলিতেছেন, "আমি তোমাকে একটি কথা বলি। তুমি মাকে ফেলিয়া যাইও না, উহাতে তোমার অধর্ম হবে। তুমি সন্ন্যাসী হইবে, তার মানে আমাকে ত্যাগ করিবে। তার জন্য তুমি বাড়ী কেন ছাড়িবে? না হয় আমি বাপের বাড়ী থাকব।" ইহাই বলিয়া উত্তরের জন্য

পতির মুখপানে চাহিলেন! তখন বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদিত হয় নাই; তাই আবার বলিতেছেন, "তাহাতে হইবে না! আচ্ছা! আমি বিষ খেয়ে, কি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিব। তুমি ঘর ছাড়িও না, মাকে ত্যাগ করিয়া অধর্ম ও লোকনিন্দা ঘাড়ে করিও না। তুমি সন্ন্যাসের দুঃখ লইও না।" যথা, চৈতন্য-মঙ্গলে—

কি কহিব মুঞি ছার, আমি তোমার সংসার, সন্ন্যাস করিবে মোর তরে।
তোমার নিছনি লয়ে, মরি যাই বিষ খেয়ে, সুখে নিবসহ নিজ ঘরে।।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ অতি কাতর ও করুণ স্বরে বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি সব কথা বুঝিতেছ না। এ জনম আমি ক্রন্দন করিতে আসিয়াছি, ক্রন্দনও করিয়াছি, তবু জীবে হরিনাম লইল না! এখন আমি ও আমার নিজ-নিজ সকলে একত্র হইয়া, রোদন করিয়া, জীবের হৃদয় দ্রব করাইব। আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিলে,—মা রোদন করিবেন, তুমি রোদন করিবে। তখন জীব আমার বৃদ্ধা জননীর অবস্থা, আর আমার প্রাণপ্রিয়া—তোমার অবস্থা দেখিয়া আমাতে কৃপার্ত হইবে, হইয়া হরিনাম লইবে। তাই মার নিকট অনুমতি লইয়াছি ও তোমার নিকট লইব। মাকে ও তোমাকে কান্দাইতে হইবে, তাহা না হইলে জীব উদ্ধার হইবে না।"

এ কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তারপর একটু থামিয়া আবার বলিতেছেন, "আজ আমি লজ্জা ত্যাগ করিয়া তোমাকে মনের কথা বলিব। আমার মত ভাগ্যবতী এ জগতে আর কে আছে? তোমার রূপে ও গুণে পশুপক্ষী মোহিত। আমি ঘাটে যাই, শুনি যে, লোকে আমাকে দেখাইয়া, তোমার রূপ গুণের প্রশংসা করিতেছে। আমি পথে তাহাই শুনি, ঘরেও তাহাই শুনি,—এমন কি, আমি শুনি যেন ত্রিজগৎ কেবল তোমার রূপ ও গুণের কথা বলিতেছে। সেই তুমি—আমার স্বামী, আমার সামগ্রী। দেখ, আমি তোমাকে দেখিতে পাই না। তুমি আমার কাছে আইস না, ভাল করিয়া আমার সঙ্গে কথা কও না। এমন কি, তোমার মুখখানি যে একবার ভাল করিয়া দেখিব, সে অবকাশও তুমি দেও না। কিন্তু তাহাতেও আমি দুঃখ করিতাম না। ভাবিতাম, আমারই ত স্বামী? আবার যখন তুমি কীর্তন করিতে, আমি একা শুয়ে ভাবিতাম যে, আমি আর একটু বড় হইলে, তখন তুমি আমাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে, আর আমি তোমাকে পাইব। যথা চৈতন্য-মঙ্গলে—

আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোন যুবতী, তুমি মোর নিজ প্রাণনাথ।
বড় প্রীতি আশা ছিল, দেহ মন সমর্পিল, এ নব যৌবনে দিবে হাত।।

দেখ, সে সাধও আমি ছাড়িলাম। আমাকে ছাড়িলে তোমার দুঃখ হইতে পারে, কিন্তু আমি ছার, আমাকে ছাড়িয়া তোমার দুঃখ কেন হইবে? তুমি বাড়ী ছাড়িয়া যাইও না। কে তোমাকে রান্ধিয়া দিবে? কে তোমার সেবা করিবে? আবার পথে হাঁটিবে কিরূপে? তোমার পা দুইখানি যেন শিরীষ ফুল। তুমি আমার গলায় ছুরি দিয়া, যদি না বলিয়া যাও আমি কি করিতে পারি? কিন্তু তুমি ঘরের বাহির হও, এ অনুমতি আমি দিতে পারিব না।" যথা—কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে। শিরীষ কুসুম যেন, সুকোমল শ্রীচরণ, ডর লাগে পরশিতে হাতে।।

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "প্রিয়ে, সংসারের সুখ, তোমাদের স্নেহ, সবই ত্যাগ করিতেছি। এ সমুদয় আমি ইচ্ছা করিয়া করিতেছি না। আমার প্রাণ জরজর হইয়াছে। তুমি আমাকে ঘরে রাখিতে চাও কেন? তুমি আপনিই বলিলে, তুমি আপনার সুখ চাও না, আমার সুখের নিমিত্ত আমাকে ঘরে রাখিতে চাহিতেছ। তুমি যেমন বুঝ, তেমনি বলিতেছ। কিন্তু ঘরে থাকিলে আমার সুখ হইবে না, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি বৃন্দাবনে যাই, তবেই আমি বাঁচিব।" বিষ্ণুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, "যদি বৃন্দাবনে গেলে সুখী হও, তবে যাও, আমাকে সঙ্গে লও। দেখ রাম যখন বনে গমন করেন, তখন সীতাকে লইয়া গিয়াছিলেন।"

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি সব ভুলে গেলে? তোমাকে সঙ্গে লইলে আর

আমার সন্ন্যাস হইল না, আর তাহা হইলে জীবের নিকট করুণা পাইব না। আমায় কাঙ্গাল, তোমায় কাঙ্গালিনী হইতে হইবে। তুমি আমার সঙ্গে থাকিলে তাহা হইবে না। প্রিয়ে! আমি তোমার, যেখানে থাকি সেইখানেই তোমার। আমাকে যাইতে দেও, দিয়া হৃদয়ের মধ্যখানে আমাকে রাখিয়া, তোমার বিরহ যন্ত্রণা দূর করিও। তোমার বিরহও আমি ঐ উপায়ে সহ্য করিয়া থাকিব। শুন, তোমাকে সার কথা বলি। নয়নের অন্তরালে গমন করিলে তাহাকে বিচ্ছেদ বলে না। প্রীতি ছিন্ন হইলেই তাহাকে বিয়োগ বলে। আমি চলিলাম, কিন্তু আমি আমার প্রতি তোমার প্রীতিটুকু রাখিয়া যাইতেছি। তা লইয়া গেলে তুমি কিরূপে বাঁচিবে, আমিই বা কিরূপে বাঁচিব? সুতরাং আমি তোমারই থাকিব, কেবল স্থানান্তরে বাস করিব। প্রিয়ে! তুমি আমার, আমি তোমার। আমি জীবের দুঃখে দুঃখ পাইতেছি, তুমি আমাকে বাধা দিও না। আমি তোমার পতি, তুমি পতিপ্রাণা, তুমি আমার সহায়তা কর।'' ইহা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার দুইখানি হাত ধরিলেন। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া মুখখানি উঠাইয়া পতির মুখপানে চাহিলেন, নয়নে নয়নে মিলন হইল, না বলিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া ঢলিয়া পড়িয়া গেলেন। যথা—
"প্রিয় করে ধরি, অনুমতি মাগিতে মূরছে পড়িলা তছু ঠাঁই।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ হাহাকার করিয়া প্রিয়াকে ধরিয়া সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিতে লাগিলেন, "উঠ! তোমার ত জীবন আছে? তোমাকে ত বধ করি নাই? প্রিয়ে! দেখিও, আমাকে নারী বধের ভাগী করিও না। উঠ! আমার প্রতি কৃপা করিয়া উঠ। আমি তোমাকে চিরদিন দুঃখ দিয়া অদ্য তোমার কোমল হৃদয়ে শেল আঘাত করিতেছি। কিন্তু তুমি পতিপ্রাণা, পতির অপরাধ না লইয়া জীবিত হইয়া আমার প্রাণদান কর।" ক্রমে বিষ্ণুপ্রিয়া নয়ন মেলিলেন, ও একটু সজীব হইয়া উঠিয়া বসিলেন; কিন্তু সর্বেন্দ্রিয় শুখাইয়া গিয়াছে, নয়নে তখনও জল আইসে নাই; নয়নে একটু জল আসিলেই প্রাণ রক্ষা হয়। কাজেই বিহ্বলের ন্যায় বকিতে লাগিলেন। প্রভুকে বলিতেছেন, "আমি কি করিব বলিয়া দাও। তুমি গেলে আমি কি হইলাম? আমি ত সধবা থাকিব? তুমি আমার স্বামী, তাহা বলিতে দিবে ত? আমি তোমার স্ত্রী, লোকে ইহা ত বলিবে? না, আমি এখন ত্রিজগতে একাকিনী হইব? আমাকে সবে ভাগ্যবতী বলিত, এখন সকলে অভাগী না বলে, তুমি তাহাই করিয়া যাইও। আর একটি কথা বলি", ইহাই বলিয়া পতির একখানি হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "তুমি সন্ন্যাসী হইয়া গেলে লোকে আমাকে কি বলিবে? পৃথিবীতে যত স্ত্রীলোক আমাকে নিন্দা করিবে। বলিবে যে, ইঁহার ঘরণী অতি নিঠুর, কালসাপিনী; তা না হইলে এ যৌবনকালে ইনি সংসার কেন ছাড়িবেন? সংসারে যদি ইহার সুখ থাকিত, তবে কি ঘর ছাড়িয়া বনবাসী হইতেন? সত্য করিয়া বল, আমি কি ত্যক্ত করিয়া তোমাকে ঘরের বাহির করিলাম?" প্রভুর সন্ন্যাসের পর বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রলাপ বর্ণনা করিয়া বলরাম দাস এই পদটী গ্রথিত করেন, যথা—

আমার বয়সী, যে তোমা দেখিল, কত না নিন্দিল মোরে।
সে ত অভাগিনী, হেন গুণমণি, কেন রবে তার ঘরে?
যদি রূপ গুণ, থাকিত তাহার, পতি কি যৌবনকালে।
কৌপীন পরিয়া, কাঙ্গাল হইয়া, গৃহ ছাড়ি বনে চলে?
নিঠুর রমণী, পাপিনী তাপিনী, পতি দেশান্তরি করে।
নিদয় হইয়া, চলিছ ফেলিয়া, লোকে গালি পাড়ে মোরে।।
আমি কি তোমায়, দিয়াছি বিদায়, সত্য করে বল নাথ।
তোমার লাগিয়া, মরিছি পাড়িয়া, তাহে লোকে পরিবাদ।।
তুমি মোর পতি, হইয়াছ যতি, একা মোর সর্বনাশ।
প্রিয়ার রোদন, তারিবে ভুবন, আর বলরাম দাস।।

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন প্রিয়ার অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন; এবং তাঁহাকে নানারূপে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছু করিতে পারিলেন না। তখন একটি চতুর্দশ-বর্ষিয়া বালিকার নিকট শ্রীভগবান্ পরাজিত হইয়া, ঐশ্বর্যের সহায়তা লইতে বাধ্য হইলেন। শচীর প্রেম হরণ করিয়া লইয়াছিলেন; বিষ্ণুপ্রিয়ারও তাহাই করিলেন; এবং তাঁহাকে জ্ঞান দিয়া বলিতেছেন, "কি মিছে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পাগলের মত বকিতেছ? শ্রীকৃষ্ণ একাই সকলের পতি, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-ভজন জীবের একমাত্র কর্তব্য, তাহাই কর, তবে নিত্য ও বিশুদ্ধ আনন্দ পাইবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া তখন জ্ঞান পাইয়াছেন। সুতরাং প্রভুর তত্ত্ব উপদেশগুলি অতি মিষ্ট লাগিতেছে, ক্রমেই হৃদয়ের জ্বালা অপনয়ন হইতেছে আর শান্তি আসিতেছে। যখন মনে সম্পূর্ণরূপে শান্তি হইল, তখন দেখেন যে, তাঁহার পতি আর নাই, আছেন "শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু!"

বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর এই রূপ দেখিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন। একটু সামলাইয়া ভক্তিতে গদগদ হইয়া গলায় বসন দিয়া প্রণাম করিলেন; করিয়া করযোড়ে বলিলেন, "আমি অবলা বালিকা, আমার প্রতি এ ভাব কেন? ঠাকুর! আমার স্বামী কোথা গেলেন? আমি তাঁহাকে ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচিব না! ঠাকুর! তুমি কি আমার স্বামী? তাহা যদি হও, তবে আমি তোমার চরণে কোটি প্রণাম করি, তুমি আবার আমার স্বামীর মত হও।" যথা চৈতন্য-মঙ্গলে—

দূরে গেল দুঃখ শোক, আনন্দে ভরিল বুক, চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিতে।
তবে দেবী বিষ্ণু প্রিয়া, চতুর্ভূজ দেখিয়া, পতি বুদ্ধি নাহি ছাড়ে তাতে।।

ঐশ্বর্য প্রেমের নিকট পরাজিত হইল, শ্রীভগবানের ভক্তি প্রীতির অগ্রে দুর্বল হইয়া পড়িল। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট আবার পরাজিত হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ কাজেই তাঁহার ঐশ্বর্য সম্বরণ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন দুই বাহুদ্বারা প্রিয়াকে কোলে লইয়া বলিতে লাগিলেন, "সাধ্বী বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি আমার নিমিত্ত শ্রীনারায়ণকে উপেক্ষা করিলে! আমি তোমাকে কি ত্যাগ করিতে পারি? লোকদৃষ্টে ত্যাগ করিব মাত্র, কিন্তু তুমি যখনই আমার বিরহ-বেদনায় কাতর হইবে, তখনই আমি আসিয়া তোমাকে জুড়াইব। আর জানিও, বিরহ ব্যতীত মিলনে সুখ নাই। বিরহ হইলেই, মিলন-সুখ কাহাকে বলে, তাহা তুমি প্রকৃতরূপে আস্বাদ করিতে পারিবে।"

তখন গাঢ় আলিঙ্গনে বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়নে জল আসিল, শ্রীগৌরাঙ্গের কোলে বসিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন, আর প্রভু তাঁহার নয়নজল মুছাইতে লাগিলেন। প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে জ্ঞান দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জ্ঞান তাঁহার প্রেম ধ্বংস করিতে পারে নাই, বরং উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। তবুও জ্ঞান পাইয়া তিনি প্রভুর সমুদয় লীলা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিলেন। তখন কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "তুমি স্বেচ্ছাময়, আমাকে দাসীর পদ দিয়াছিলে, যেন আমার উহা থাকে। তুমি জীবের মঙ্গল করিবে তাহাতে আমি দুঃখ লইব, এ ত ভাগ্যের কথা। তুমি মনোসুখে শুভকার্য কর, কেবল এই করিও, যেন আমার চিত্ত তোমার চরণ হইতে ক্ষণকালও বিচলিত না হয়।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "তাহাই হউক! আমার তোমাকে ভুলিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ উপকৃত জীবগণে, তোমার কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

(শচীদেবীর উক্তি)

আর না হেরিব প্রসর কপালে অলকা তিলক কাচ।
আর না হেরিব সোনার কমলে নয়ন খঞ্জন নাচ।।
আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে সকল ভকত লয়ে।
আর না নাচিবে আপনার ঘরে আর না দেখিব চেয়ে।।
আর কি দু' ভাই নিমাই নিতাই নাচিবেন এক ঠাঁই।
নিমাই বলিয়া ফুকারি সদাই নিমাই কোথাও নাই।

(বিষ্ণু-প্রিয়ার উক্তি)

নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গসুন্দরে না দেখি কেমনে রহিব নদীয়া মাঝ।।
কেবা হেন জন, আনিবে তখন আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ি বধূর রোদন শুনিয়া বংশী গড়াগড়ি যায়।।

গোবিন্দের কড়চা বলিয়া একখানি অতি সুন্দর গ্রন্থ আছে। গ্রন্থকার কায়স্থ, বেশ পয়ার লিখিতে পারেন, বর্ণনাশক্তিও বেশ আছে, সংস্কৃত ভাষায়ও উত্তম অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। গোবিন্দ তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন, তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় পুত্রবধূ সংসারের কর্ত্রী হয়েন। গোবিন্দ গৃহশূন্য হওয়ায় সংসারে থাকিয়া আর সুখ পায়েন না। ইহার উপর পুত্রবধূ তাঁহাকে উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। পুত্রের কাছে নালিশ করেন, পুত্র তাঁহার স্ত্রীকে ধমকান, কিন্তু সে মুখে।

এই গোবিন্দ দায় ঠেকিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন, পথে আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কোন দিকে যাইবেন। শেষে মনে হইল যে, নদীয়ায় নাকি একটা কাণ্ড হইতেছে। ভাবিলেন সেখানেই যাব। ইহাই ভাবিয়া নদীয়ায় আসিলেন, আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাঁ গা, তোমরা বলিতে পারো, নদে যে অবতার হয়েছেন, তাঁহার বাড়ী কোথা?" তাহাতে একজন বলিলেন, "ঐ যে তিনি ঘাটে স্নান করিতেছেন।"*

প্রকৃতই শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া স্নান করিতেছিলেন। গোবিন্দ দেখিলেন, মধ্যস্থানে পরম সুন্দর একজন যুবাপুরুষ স্নান করিতেছেন, আর তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অনেক তেজস্কর সাধুলোক প্রতি কার্যে তাঁহাকে অতীব ভক্তি দেখাইতেছেন। গোবিন্দ তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন যে, সেই যুবাপুরুষটিকে দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিতেছেন, এমন রূপ ত কখন দেখেন নাই। রূপ যেন আঁখিতে ধরিতেছে না। কাজেই মাঝে মাঝে নয়ন মুদিয়া আপনাকে সামলাইতেছেন। রূপে এত মাধুর্য আছে, গোবিন্দ ইহা পূর্বে জানিতেন না। নয়ন দিয়া রূপ যেন ঢোকে ঢোকে পান করিতে লাগিলেন। অতি উত্তম আস্বাদীয় সামগ্রী সম্মুখে থাকিলে যেরূপ জিহ্বায় জল আইসে, রূপ দেখিয়া সেইরূপ গোবিন্দের নয়নে জল আসিল বদন ভাসিয়া যাইতেও লাগিল।

তখন গোবিন্দের মনে হঠাৎ একটি অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বকথার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, "এ বস্তুটি শ্রীভগবান্। কেননা, এরূপ রূপ জীবে সম্ভবে না। তাহার পরে, আমি কে, আর উনি কে? উনি বা কোথা, আমি বা কোথা? এইমাত্র আমি উহাকে দেখিলাম, কিরূপ মানুষ জানি না, কোন গুণ আছে কি না জানি না, আমি মরি কি বাঁচি তাহাতে উহার কোন লাভালাভ নাই,

* মহাত্মা শিশিরকুমার যখন এই খণ্ড লেখেন, তখন গোবিন্দের কড়চা নামক একখানি পুঁথির গোড়ার কয়েকটি পাতার নকল পান। ইহার সুন্দর বর্ণনা তাঁহার মন আকৃষ্ট করে। উহা পাঠ করিয়া তিনি গোবিন্দের কথা লেখেন। কয়েক বৎসর পরে ঐ গ্রন্থ ছাপা হইলে তিনি বুঝিতে পারেন যে ইহা আধুনিক গ্রন্থ। তাই ৬ষ্ঠ খণ্ডের পাদটীকায় ইহা জানান।

আমি যে উঁহাকে এ স্থান হইতে দেখিতেছি তাহাও উনি জানেন না, কিন্তু তবু উনি মন প্রাণ সমুদয় হরণ করিয়া লইলেন। এখন আমি উঁহার অতি অল্প সন্তোষের নিমিত্ত আমার এই প্রাণ শতবার দিতে পারি। অতএব ইনি ভগবান, সর্ব জীবের প্রাণ।"

এই গ্রন্থকারের মনেও শ্রীগৌরাঙ্গ-চর্চা করিতে ঠিক এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। তবে আমি (লেখক) কঠিন-হৃদয় বলিয়া আমার মনে উহা ছাড়া আর একটু অধিক উদয় হইয়াছিল। আমি ভাবিলাম যে, যদি শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবান্ না হইয়া, শুধু পরম ভক্ত বলিয়া পার্ষদগণের মন হরণ করিতেন, তবে তিনি উহা আপনি গ্রহণ না করিয়া শ্রীভগবানের দিকে লইয়া যাইতেন। তাহাও নয়, যদি কেহ বলেন যে মহাজন মাত্রই জীবগণের মন আকর্ষণ করিয়া থাকেন, সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা হইতেও পারেন। তাহা সত্য। কিন্তু মহাজনেরা তাহাদের পার্ষদ কি শিষ্যগণের চিত্তের অল্প কিছু অংশ নিজেরা লইয়া অবশিষ্ট শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত রাখেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের—এমন কি শ্রীঅদ্বৈত (যিনি তখন বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রধান) অবধি সকলেরই—মন গৌর রূপে একেবারে পুরিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সকলে পরমভক্ত হইয়াও, ভগবানে তাঁহাদের যেটুকু ভক্তি ছিল, তৎসমুদয় শ্রীগৌরাঙ্গকে অর্পণ করেন।

শ্রীযীশুখ্রীষ্টের মত পরম-বস্তু দুর্লভ। কত কোটি লোক তাঁহাকে ভজনা করিতেছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার ভক্তগণের নিকট ঈশ্বরের পুত্র বই নয়, এবং তিনি তাঁহার ভক্তগণের ভক্তি অধিকাংশ শ্রীভগবানের নিমিত্ত রাখিয়া, অল্প কিছু আপনি লইয়াছিলেন। সেইরূপ শ্রীমহম্মদও কত কোটি লোকের উপাস্য, কিন্তু তবু তিনি শ্রীভগবানের "দোস্ত" অর্থাৎ সখা ভিন্ন আর কিছু নয়। তিনিও তাঁহার ভক্তগণের ভক্তির অল্প অংশ স্বয়ং লইয়া অধিকাংশ শ্রীভগবানের নিমিত্ত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার ভক্তগণের সমুদয় ভক্তি, সমুদয় চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন। এরূপভাবে অপর কাহাকেও কোন কালে জীব আত্মসমর্পণ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। অর্থাৎ গৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীভগবান্ না হইলে তিনি কখনই পার্ষদগণের সমুদয় চিত্ত হরণ করিয়া তাঁহাদিগকে একেবারে আপনার করিয়া লইতে পারিতেন না, আর তাঁহারাও তাঁহাকে সমুদয় মনপ্রাণ দিতেন না,—দিতে পারিতেনও না। আরও ভাবুন, শ্রীগৌরাঙ্গ যদি শুধু পরম-ভক্ত হইতেন, তবে তাঁহার পার্ষদগণের যে ভগবদ্ভক্তি, উহা আপনি লইতে সাহস পাইবেন কেন? গোপীগণ যমুনার জল আনিতে গিয়া, তাঁহাদের মন প্রাণ সমুদয় যে হারাইয়া আসিয়াছিলেন, এ সমুদয় যে কবির বর্ণনা নয়, তাহার আর একটি উদাহরণ দিতেছি। শ্রীখণ্ডের নরহরিরও এই দশা হইয়াছিল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া একেবারে আপনার যথাসর্বস্ব হারাইয়া, আপনার দশা আপনি বহুতর পদে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুইটি এখানে দিতেছি, যথা—

মরম কহিব সজনি কায়, মরম কহিব কায়। ধ্রু।
উঠিতে বসিতে, দিক নিরখিতে, হেরি এ গৌরাঙ্গ রায়।।
হৃদি সরোবরে, গৌরাঙ্গ পশিল, সকলি গৌরাঙ্গময়।
এ দুটি নয়ানে, কত বা হেরিব, লাখ আঁখি যদি হয়।।
জাগিতে গৌরাঙ্গ, ঘুমাতে গৌরাঙ্গ, সকলি গৌরাঙ্গ দেখি।
ভোজনে গৌরাঙ্গ, গমনে গৌরাঙ্গ, কি হৈল আমার সখি?
গগনে চাহিতে, সেখানে গৌরাঙ্গ, গৌর-হরি যে সদা।
নরহরি কহে, গৌরাঙ্গ চরণ, হিয়ায় রহিল বাঁধা।।

তাহার পরে নরহরি, ব্যথিত-হৃদয় শীতল করিবার নিমিত্ত সঙ্গিনী খুঁজিতে লাগিলেন, যথা—

কে আছে এমন মনের বেদন, কাহারে কহিব সই।
না কহিলে বুক, বিদরিয়া মরি, তেঁই সে তুহারে কই।।
বেলি অবসানে, ননদিনী সনে, জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গচাঁদের, রূপ নিরখিয়া, কলসী ভাঙ্গিয়া আনু।।

সঙ্গে ননদিনী, কাল ভুজঙ্গিনী, কুটিল কুমতি ভেল।
নয়নের বারি, সম্বরিতে নারি, বয়ান শুখায় গেল।।
কাঁপে কলেবর, গায়ে আসে জ্বর, চলিতে না চলে পা।
গৌরাঙ্গচাঁদের, রূপের পাথারে, সাঁতারে না পাই থা।।
গৌর কলেবর, করে ঝলমল, শারদ চাঁদের আলো।
সুরধুনী তীরে, দাঁড়াইয়া আছে, দুকূল করিয়া আলো।
বুক পরিসর, তাহার উপর, চন্দন ফুলের মাল।
নয়ন ভরিয়া, দেখিতে নারিনু, নদনদী হইল কাল।।
দীঘল দীঘল, নয়ন যুগল, বিন্ধিল কুসুম শরে।
রমণী কেমনে, ধৈরজ ধরিবে, মদন কাঁপয়ে ডরে।।
কহে নরহরি, গৌরাঙ্গ-মাধুরী, যাহার হৃদয়ে জাগে।
কুল-শীল তার, সব ভাসি যায়, গৌরাঙ্গ অনুরাগে।।

গোবিন্দ এইরূপে রূপ দেখিয়া গিয়া কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, অবশ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তীরে উঠিয়া ভক্তগণ সহ গৃহে চলিলেন, গোবিন্দ পিছু পিছু যাইতে লাগিলেন। গোবিন্দ ভাবিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। ভক্তগণ প্রভুর বাড়ীর দ্বারে প্রভুকে রাখিয়া, স্ব স্ব গৃহে আর্দ্র-বস্ত্র ত্যাগ করিতে গমন করিলেন। গোবিন্দ আর কোথায় যাইবেন, সেখানেই দাঁড়াইয়া থাকিলেন। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, তখন গোবিন্দের দিকে চাহিলেন, গোবিন্দ কৃতার্থ হইলেন। প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া অঙ্গুলি হেলাইয়া ডাকিলেন, গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে চলিলেন। প্রভু তখন গোবিন্দকে স্নান করিতে ইঙ্গিত করিলেন। গোবিন্দ স্নান করিয়া আসিলেন ও প্রসাদ পাইলেন। এইরূপে গোবিন্দ তাঁহার প্রাণেশ্বরের বাড়ীতে রহিয়া গেলেন।

প্রভুর বাড়ীতে তখন দুইটি সেবক হইলেন, ঈশান ও গোবিন্দ। প্রভুর তত্ত্বাবধায়ক দামোদর পণ্ডিত। এই দামোদর পণ্ডিত মুরারি গুপ্তকে বলেন যে, প্রভুর আদিলীলা তাঁহার ন্যায় আর কেহ জানেন না। এই সমুদয় কাহিনী তাঁহার লিপিবদ্ধ করা উচিত। তাই নীলাচলে প্রভুর গৃহের একপার্শ্বে বসিয়া মুরারি গুপ্ত একটি একটি করিয়া লীলা বলেন, আর দামোদর পণ্ডিত অতি সহজে সংস্কৃত শ্লোকে উহা গ্রন্থিত করেন। তাহাকেই "মুরারি গুপ্তের কড়চা" বলে।

দামোদর পণ্ডিত প্রভুর বাড়ীর সমুদয় দেখাশুনা করেন। পরম পণ্ডিত, পরম ভক্ত, গৌর ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, কিছু মানেনও না। নিজে ও তাঁহার অন্য চারি ভ্রাতা উদাসীন। তিনি প্রভুর বাড়ীতে থাকেন; আর সমুদয় সংসারের তত্ত্বাবধান করেন। তখন নিমাইয়ের সংসার বড় মানুষের মত। প্রভু শচীর নিকট প্রতিশ্রুতি হইয়াছেন যে, তিনি কিছুকাল সংসারী হইবেন। দেড় মাস কাল প্রভু শচীদেবীর অনুরোধে ঘরকন্না করিলেন। তখন প্রভু ব্রজলীলা-রস আস্বাদনে নিরস্ত থাকিলেন এবং তাঁহার বিভোর অবস্থা তখন আর রহিল না। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া পূজা আহ্নিক করেন, পরে ভোজন করিয়া শয়ন করেন। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া পানের বাটা লইয়া স্বামীর পদতলে উপস্থিত হয়েন। অতি অল্প একটু গড়াগড়ি দিয়া প্রভু বহির্বাটিতে আসিয়া উপবেশন করেন। দিবানিশি প্রভুর বাড়িতে লোকের সমাগম। যত লোকে প্রাতে গঙ্গাস্নানে গমন করেন, তাঁহারা বাটীতে ফিরিবার সময় প্রভুকে প্রণাম করিতে আইসেন। এতদ্ভিন্ন কেহ ভব-রোগের, কেহ বা দেহরোগের নিমিত্ত, আর ভক্তগণ দর্শন করিতে আগমন করেন। যিনি যাহা উত্তম দ্রব্য পান, তাহা অবশ্য প্রভুর নিমিত্ত আনয়ন করেন। এই রূপে প্রভুর ভাণ্ডার সর্বদা পরিপূর্ণ থাকে। আবার যেমন পূর্ণ হইতেছে, তেমনি ব্যয়ও হইতেছে। ভিক্ষুক, কাঙ্গাল, সাধু, ভক্ত, অতিথি, ইহাদের প্রভুর বাড়ীতে অবারিত দ্বার। প্রভু যেন দ্বারকা লীলা আরম্ভ করিয়াছেন। শচীদেবীরও রন্ধন করিতে

আলস্য নাই। শচীদেবী যে একা সমুদয় বন্ধন করিয়া উঠিতে পারেন তাহা নয়, শচী রন্ধন করেন, বিষ্ণুপ্রিয়াও করেন, আর ভক্তগণের পরিবারেরা আসিয়াও সাহায্য করেন। এরূপ সাহায্য না করিলে চলে না, যেহেতু প্রভুর বাড়ীতে প্রত্যহ মহোৎসব, আর ভাণ্ডার যেন অক্ষয়।

অতিথি, কাঙ্গাল ও সাধু ব্যতীত এক প্রকাণ্ড দল প্রভুর অন্নের প্রার্থী ছিলেন;—তাঁহারা ভক্তগণ। প্রভুর ভোজন দর্শন করিবেন ও তাঁহার প্রসাদ পাইবেন, ইহা সকলেরই ইচ্ছা। সুতরাং ভোজন করিতে বসিলে সে স্থানে বসিবার নিমিত্ত শচী অল্প একটু স্থান পাইতেন বটে, কিন্তু ভক্তগণের মধ্যে স্থান লইয়া বড় হুড়াহুড়ি হইত। প্রভু ভোজন করিতেছেন,—ভক্তগণ দর্শন করিবেন, এই তাঁহাদের সুখ। কেনই বা সুখ না হইবে? শ্রীভগবানের ভোজন দর্শন করিতে কাহার না সুখ হয়? প্রভু ভোজন কবিতে বসিয়া ভক্তগণকে তাঁহার সঙ্গে ভোজন করিতে আহ্বান করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে বড় ডাকিতে হইত না, আপনিই পাত লইয়া বসিতেন। অন্যান্য ভক্তগণকে ডাকিলে তাঁহারা বলিতেন, "আপনি ভোজন করুন, আমরা দেখি।" প্রভু এই কথা শুনিয়া কখন নিরস্ত হইতেন, কখন বা হইতেন না। তবু এইরূপে প্রভু বসিলে অবশ্য তাঁহার সহিত দশ বিশ জনকে বসিতে হইত। ভোজনকালে প্রভু হাস্য রহস্য করিতেছেন, তাঁহার সহিত রঙ্গ কবিতেছেন। মা ভাবিতেছেন, যেন নিমাই দুগ্ধপোষ্য বালক,— "নিমাই ইহা খা, আর একটু খা, আমার মাথা খাইস," এই তাঁহার আলাপ। প্রভু কখন মার উপর কপট রাগ করিয়া আহারে বিরত হইতেন। আর শচীর তখন সাধ্যসাধনরূপ অপরূপ দৃশ্য হেরিয়া কে না মুগ্ধ হইতেন? প্রভুর ভোজনান্তে উচ্ছিষ্ট লইয়া ভক্তগণ কাড়াকাড়ি করিতেন।

অপরাহ্নে প্রভু হয়ত একটু পাশাখেলা করিলেন, না হয় কৃষ্ণ-কথায় যাপন করিলেন। অল্প বেলা থাকিতে নগর-ভ্রমণে বাহির হইলেন। বাহির হইবার সময় গদাধর তাঁহার কেশসজ্জা করিয়া দিলেন। নিমাই অতি অপূর্ব বস্ত্র পরিধান করিলেন, গলায় ফুলের মালা দিলেন, দিয়া ভক্তগণের সহিত নগর-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। সন্ধ্যার সময় গৃহে আসিয়া সকলে সংকীর্তনে কি কৃষ্ণ-কথায় রত হইলেন। তাহার পরে নিমাই আহার করিয়া উত্তম-শয্যায় শয়ন করিলেন।

এই যে প্রভু সংসারীর ন্যায় দ্বারকা লীলা করিতেছেন, কিন্তু ইহা দর্শন করিয়াও লোকের মন নির্মল ও পবিত্র হইতেছে। প্রভুর বাড়ীতে সংকীর্তন অহরহ হইতেছে; প্রভুর বাড়ীর চারিপার্শ্বে, নদীয়ার প্রতি গলিতে, প্রতি পাড়ায় সংকীর্তন হইতেছে। তবু প্রভু আল্‌গোচ থাকেন। বহুক্ষণ শচীর নিকট থাকেন; নিশি বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত যাপন করেন। এইরূপে প্রায় দেড় মাস শ্রীনিমাই গৃহস্থালী করিলেন। প্রভুর যত নিজ-জন সকলেই, প্রভু যে সন্ন্যাসী হইবেন, ইহা ক্রমেই ভুলিতে লাগিলেন। যথা—

নিরবধি পরানন্দ সংকীর্তন রঙ্গে। হরিষে থাকেন সর্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে।।
পরানন্দে বিহ্বল সকল ভক্তগণ। পাসরি রহিলা সবে প্রভুর গমন।।

অগ্রহায়ণ মাসে এক দিবস সন্ধ্যাকালে, প্রভু ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া পিঁড়ায় বসিয়া কৃষ্ণ-কথা রসে নিমগ্ন আছেন, এমন সময় একটি যুবক ব্রাহ্মণকুমার আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় প্রভুর পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন আলো আছে, সুতরাং সকলে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন। দেখেন যে ব্রাহ্মণকুমারটি পরম সুন্দর, আর যেন ভাবে বিভোর। প্রভু তাঁহার পানে চাহিলেন, চাহিয়াই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তখন দুই বাহু প্রসারিয়া, "লোকনাথ এসেছ?" বলিয়া আঙ্গিনায় যাইয়া, সেই যুবকটিকে বুকে করিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। এই লোকনাথ যশোহর জেলার তালখড়ির পদ্মনাভ চক্রবর্তীর পুত্র। ইঁহার কাহিনী আমার কৃত "শ্রীনরোত্তম-চরিত" গ্রন্থে বিবৃত আছে। সুতরাং এখানে তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিব না। লোকনাথ নদে-অবতারের কথা শুনিয়াই, প্রভুকে না দেখিয়াই, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে চির-পরিচিতের ন্যায় হৃদয়ে ধরিলেন, পঞ্চ দিবস নিকটে রাখিলেন, পরে এই কথা

বলিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন যে. "তুমি যাও, সেই তীর্থস্থানে বাস কর, আমিও সত্বর সন্ন্যাসী হইয়া সেখানে আসিতেছি।"

এইরূপে প্রভু পৌষ মাস কাটাইলেন। শ্রীনবদ্বীপবাসী যাঁহার যেরূপ অধিকার তিনি সেই ভাবে, যথা, - শচী পুত্রভাবে, বিষ্ণুপ্রিয়া পতিভাবে, পুরুষোত্তম সখাভাবে, গদাধর প্রাণনাথভাবে, শ্রীবাস প্রভৃতি প্রভুভাবে,—প্রাণ ভরিয়া প্রভুকে আস্বাদ করিলেন। ইহাতে, প্রভু যে সন্ন্যাস করিবেন তাহা এক প্রকার ভুলিয়া, তাঁহারা যে, "সুখের পাথারে" সন্তরণ দিতেছেন, তাহাও একটু ভুলিলেন। আনন্দের উপভোগে যেরূপ সুখ উহার প্রত্যাশায় ও গত আনন্দের ধ্যানে, তদপেক্ষা অধিক সুখ। আনন্দের মধ্যে থাকিলে ক্রমে উপভোগ শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। মিলন-সুখ শ্রীভগবানের নিজস্ব-ধন। উপভোগে সুখের শক্তি ক্রমে হ্রাস হইয়া যায়, এবং তখন বিরহ প্রয়োজন হয়। যেমন আহারান্তে পুনরায় ক্ষুধার নিমিত্ত কিয়ৎকাল উপবাস প্রয়োজন। এই বিরহে প্রীতি ও মিলনসুখ পরিবর্ধিত হয়। এই নিমিত্ত রাসের রজনীতে শ্রীভগবান্ অন্তর্ধান হইয়াছিলেন। এইরূপে সুখের জোয়ার আসিয়া যখন নবদ্বীপে পরিপূর্ণ হইল, যখন তাঁহার নিজ-জনের আস্বাদ করিবার শক্তি হ্রাস হইবার উপক্রম হইল, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের সময় হইল।

প্রভু পরদিবস গৃহত্যাগ করিবেন। কিন্তু সকলে প্রাত্যহিক মহোৎসব ও সংকীর্তনে মগ্ন আছেন,—প্রভু সন্ন্যাস করিবেন, এ কথা আর কাহারও মনে নাই। প্রভু প্রত্যূষে উঠিলেন। নিমাইয়ের মুখ আনন্দময়, চতুর্দিকে আনন্দ বিতরণ করিতেছেন। সমস্ত দিবস ভক্তগণ ও জননীর সহিত আনন্দে যাপন করিলেন, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়া আহার করিলেন। অপরাহ্নে ভক্তগণ সহ নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। প্রভু জানিতেছেন যে, আর সে নগরে বেড়াইবেন না। তাই মনে-মনে তাঁহার পরিচিত প্রত্যেক বৃক্ষ, লতা, গৃহ, গলি প্রভৃতির নিকট বিদায় লইতেছেন। নগর ঘুরিয়া আসিয়া প্রভু তাঁহার অতিপ্রিয় স্থান সুরধুনীতীরে, উপবেশন করিলেন। এখানে বসিয়া শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি বহুদিন বিদ্যাচর্চা করিয়াছেন; আবার ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণকথাও কহিয়াছেন,—আর কহিবেন না! স্থির গঙ্গাতীরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, শীতকাল—জল অতি পরিষ্কার হইয়াছে, অতি বেগে স্রোত চলিয়াছে, এই জলে বয়স্যগণ ও ভক্তগণ লইয়া কত কোন্দল ও কেলী করিয়াছেন,—আর তাহা করিবেন না। সে স্থান হইতে বিদায় লইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে ফিরিয়া আপনার পিঁড়ায় বসিলেন,—আর সেখানে বসিবেন না!

তখন ভাবিতেছেন, নবদ্বীপবাসিগণের নিকট বিদায় লইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্ঠে বিচরণ করিতেন, তখন গাভীগণ বৃন্দাবনে ছড়াইয়া পড়িলে মুরলীধ্বনি করিতেন, আর তাহারা উচ্চ-পুচ্ছ হইয়া তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসিত। এখন পিঁড়ায় বসিয়া মনে মনে নবদ্বীপবাসিগণকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা কেহ ভক্তি-কথায় মুগ্ধ, কেহ বিষয়-কার্যে বিব্রত ছিলেন। হঠাৎ তাঁহাদের হৃদয়মাঝারে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের শ্রীমুখ স্ফুরিত হইল। তখন প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলে অতিশয় ব্যাকুলিত হইলেন, আর সারি-বান্ধিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিলেন। সকলেরই হস্তে ফুলের মালা ও চন্দন, সকলেই উপাদেয় আহারীয় সামগ্রী হস্তে করিয়া, আনন্দে ডগমগ হইয়া, প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন।

প্রভু পিঁড়ায় বসিয়া। শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভক্তগণ সেখানে গেলেন এবং আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রভুও প্রফুল্ল বদনে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তখন তাঁহারা এক এক করিয়া চন্দন, ফুলের মালা, উপাদেয় আহারীয় দ্রব্য হস্তে লইয়া প্রভুর কাছে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। প্রভু আপনার ফুলের মালা লইয়া একজনের গলায় পরাইয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে আপনার গলে মালা পরাইয়া দিবার অনুমতি দিলেন। ভক্ত প্রভুর গলায় মালা দিলে, প্রভু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার যদি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্র স্নেহ থাকে, তবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কর।" এই রঙ্গ প্রতি জনার সহিত হইতে লাগিল। এমন সময় শ্রীধর আসিয়া উপস্থিত।

দরিদ্র শ্রীধর প্রভুকে আর কি দিবেন, একটি লাউ হস্তে লইয়া আসিয়াছেন। তখন আর প্রভুর সঙ্গে শ্রীধরের কোন্দল নাই, তাঁহাকে অদেয় কিছুই নাই। লাউটি সম্মুখে রাখিয়া শ্রীধর প্রভুকে প্রণাম করিলেন, আর প্রভু সহাস্যে শ্রীধরকে আদর-আহ্বান করিলেন। তারপর প্রভু মনে মনে ভাবিলেন শ্রীধরের প্রদত্ত লাউটি ভোজন করিতে হইবে। তাই জননীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, এই লাউ দিয়া পায়স রান্না কর।" এইরূপে সারি সারি ভক্তগণ আসিয়া প্রভুর বাড়ী পরিপূর্ণ করিতেছেন ও মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি হইতেছে। আর প্রভু মিষ্টভাবে সকলকে আপ্যায়িত করিতেছেন। ক্রমে রজনী দ্বিপ্রহর হইল। তখন ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া সহাস্য বদনে প্রভু আহার করিতে বসিলেন;— আর তিনি নবদ্বীপের বাড়ীতে আহার করিবেন না। শচীর সহিত আলাপ করিতে করিতে প্রভু ভোজন করিতেছেন। শচীর ইচ্ছা নিমাই সমুদয় আহার করেন। নিমাই মাতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহাই করিলেন। আহারান্তে প্রভু আপনার শয়ন-কক্ষে গেলেন, এবং শচীমাতা যাইয়া আপন ঘরে শয়ন করিলেন,—শচী ঠাকুরাণী প্রাতে উঠিয়া পুত্রের মুখ আর দেখিতে পাইবেন না।

শ্রীনিমাইচাঁদ শয়ন-কক্ষে যাইয়া উত্তম শয্যায় বসিয়া প্রিয়ার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, সেদিন আর ঘুমাইয়া পড়িলেন না। বিষ্ণুপ্রিয়া পতির গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, নিমাইচাঁদ "এস এস" বলিয়া মধুর সম্ভাষণ করিলেন। প্রাণেশ্বরকে অতিশয় প্রফুল্ল দেখিয়া প্রিয়াজীর হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। আর তাঁহার মনে একটা সাধ ছিল তাহা প্রবল হইয়া উঠিল। বলিলেন, "তুমি অনুমতি করিলে আজ আমি তোমাকে সাজাইব।" নিমাই বলিলেন, "আমি অনুমতি দিব, কিন্তু আগে বল তুমিও তারপর আমাকে সাজাইতে দিবে?" বিষ্ণুপ্রিয়া স্বীকার করিলেন, তবে ভাবিলেন যে, পুরুষমানুষ আবার সাজানো-গোজানোর কি বুঝে? বিষ্ণুপ্রিয়া পতিকে সাজাইবেন সঙ্কল্প করিয়া, সাজাইবার সজ্জা সঙ্গে আনিয়াছেন। এখন পতিকে সাজাইতে বসিলেন। প্রথমে স্বামীর শ্রীমুখে বিন্দু বিন্দু অলকা-তিলকা দিয়া সাজাইলেন। তার পর, যেখানে-যেখানে শোভা পায় চন্দন দিয়া, গলায় মালতীর মালা দিলেন। শেষে নিজ হস্তে একটি খিলি লইয়া পতিব মুখে দিলেন। সজ্জা শেষ হইলে শ্রীমতী অর্ধ-অবগুণ্ঠনে সলজ্জভাবে অগ্রে দাঁড়াইয়া মহাসুখে পতির চাঁদমুখ দেখিতে লাগিলেন। একটু পরে শ্রীনিমাই বলিলেন, "এসো, এখন আমার পালা,"—ইহা বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাজাইতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিতেছেন যে, পুরুষ মানুষও সাজাইতে জানে। বেশবিন্যাসে বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ একেবারে ত্রৈলোক্য-মোহিনী হইল। যথা, চৈতন্য-মঙ্গলে—

"তবে মহাপ্রভু সে রসিকশিরোমণি। বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে বেশ করয়ে আপনি।।
সুন্দর ললাটে দেয় সিন্দূরের বিন্দু। দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু।।
সিন্দূরের চৌদিকে চন্দন বিন্দু আর। শশিকালে সূর্য যেন ধায় দেখিবার।।"
শেষে,—ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপ নিরখে বদন।"

এখানে আমি বলরাম দাস-কৃত বিষ্ণুপ্রিয়ার বন্দনার কিঞ্চিৎ প্রকাশ করি। যথা—

চাঁদবদনী ধনী, প্রিয়া মৃগ-নয়নী।। ধুয়া

বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী আমার তড়িৎ-প্রতিমা। কোথা পাব কিবা দিব তাহার উপমা।।
কাঞ্চনবরণী ধনী নবদ্বীপময়ী। অধিষ্ঠাত্রী দেবী মোর সুখে গুণ গাই।।
হের দেখসিয়ে আমাদের বিষ্ণুপ্রিয়া। সর্ব অঙ্গে শ্রীলাবণ্য পড়িছে খসিয়া।।
নবীনা প্রিয়াজী, সবে যৌবন উদয়। লজ্জায় মুগুধা ধনী অধোমুখে রয়।।
চঞ্চল চরণে গৃহ কোণেতে লুকায়। শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহ-মাঝে খুঁজিয়া বেড়ায়।।
পদ্ম-গন্ধ বহে মরি সুরস অধর। দিবানিশি মত্ত তাহে গৌরাঙ্গ-ভ্রমর।।
বিষ্ণুপ্রিয়া পূর্ণ-শশী গৌরাঙ্গ চকোর। যার রূপ-সুধা পিয়ে প্রমত্ত শ্রীগৌর।।
গৌর-প্রেমে গরবিনী ধনী বিষ্ণুপ্রিয়া। গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী দেহ পদচ্ছায়া।।
জন্মিলে মরণ আছে নাহি তাহে ভয়। বলরাম দাসে ধনি রেখো রাঙ্গা পায়।।

ভপনের এই ছবিটি কেন দিলাম? শ্রীভক্তগণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার এরূপ রূপ আর দেখিতে পাইবেন না। এই বেলা রূপটি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লউন। আবাব তাঁহার সুখের শেষ-রজনীতেই-বা বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার পতিকে সাজাইবেন, এরূপ ইচ্ছা তাঁহার কেন হইল? বোধ হয় প্রভুর লীলাখেলার এও একটি অঙ্গ। অতঃপর শ্রীগৌরাঙ্গ যেন মুগ্ধ হইয়া প্রিয়ার পানে চাহিতে লাগিলেন। প্রিয়ার প্রতি প্রিয়ের লোভ, ইহা হইতে প্রিয়ার অধিক সুখ আর কি হইতে পারে? বিষ্ণুপ্রিয়া ইহাতে সুখে বিভোর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু লজ্জা পাইয়া গৃহকোণে লুকাইলেন। এইরূপ লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে শেষে ধরা পড়িলেন, কি ধরা দিলেন। এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ নানা রস-বিথারে প্রীতির বন্যা উঠাইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া কৃতার্থ হইলেন। শ্রীনিমাই প্রিয়ার সহিত এরূপ রসকৌতুক ও গাঢ় প্রেমালাপ আর কখনও করেন নাই।

এখন কোন পাঠক প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যাওয়ার নিশিথে প্রভু কেন এরূপ করিলেন? তিনি যাইবার দিন অত প্রীতি দেখাইয়া কেবল বিষ্ণুপ্রিয়ার, তাঁহার বিরহজনিত দুঃখ আরো তীক্ষ্ণতর করিলেন বই ত নয়? কিন্তু এরূপ প্রশ্নের উত্তর আমরা পূর্বেই দিয়াছি। শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দেশ্য এই যে তাঁহার প্রতি বিষ্ণুপ্রিয়ার যে বিরহ, উহা অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতে থাকুক। শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়ার সহিত শেষের রজনীতে অতি প্রীতি করিয়া কি করিলেন, না—সেই বিরহরূপ-দীপে যাইবার বেলা একটু তৈল ঢালিলেন, আর গোটা দুই সলিতা বেশী করিয়া দিলেন।

যখন প্রীতি-ডোরে আবদ্ধ দুটি জীবে ছাড়াছাড়ি হয়, তখন স্বভাবতঃ তাহাদের মধ্যে কি কথা হয় শ্রবণ করুন।

প্রিয় বলিতেছেন, তুমি আমাকে ভুলিবে না ত?

প্রিয়া উত্তরে বলিলেন, "তোমার ছবিটি আমাকে দিয়া যাও, দেখিয়া প্রাণ ধারণ করিব।" শেষে প্রিয় বলিলেন, "আমি তোমার রূপ হৃদয়ে পূরিয়া লইয়া যাইব, ও সেই ছবি দেখিয়া প্রাণ শীতল করিব।"

প্রীতি-ডোরে আবদ্ধ দুটি জীব, বিচ্ছেদের পূর্বদিন এইরূপ ভাবে কথা কহিয়া থাকেন। এ কথা আর কেহ বলেন না যে, "তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও"; যদি বলেন, সে ক্ষোভ করিয়া, মনের সঙ্গে নহে। প্রীতির অঙ্কুর হইলে বিচ্ছেদে উহা পরিবর্ধিত হয়। যে প্রীতি ক্রমেই নষ্ট হইয়া যায়, সে প্রকৃত প্রীতিই নয়। বিরহে প্রকৃত প্রীতি ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়। বিরহে প্রিয়জনের রূপ, গুণ ও প্রত্যেক প্রীতির কার্য এক একটি অগ্নিশিখারূপে হৃদয়ে জ্বলিতে থাকে। সেই শিখাগুলি প্রিয়-বস্তুর দূতস্বরূপ হইয়া সর্বদা তাহার বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। যদিও প্রথম প্রথম এ গুলিতে হৃদয় দগ্ধ করে, কিন্তু পরিণামে এই এক একটি শিখা হৃদয়ের এক একটি কোটর প্রফুল্ল করে। কিম্বা প্রিয়জনের এই অঙ্গের লাবণ্য, গুণ ও প্রত্যেক প্রীতির কার্যকে প্রীতি-অঙ্কুরের এক-একটি বৃক্ষমূলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই সমুদয় দ্বারা প্রীতির-অঙ্কুর পরিবর্ধিত ও সজীব হইয়া হৃদয়ে আবদ্ধ থাকে। প্রিয়জনের প্রত্যেক কার্যকে তাঁহার প্রিয়া লীলাখেলা ভাবিয়া থাকেন। প্রিয়জনের প্রত্যেক লীলাখেলা তাঁহার প্রিয়ার এক একটি সুখের প্রস্রবণ। সুতরাং যে প্রিয়জনের অধিক-লীলা, তাঁহার প্রিয়ার অধিক দুঃখের ও পরিণামে অধিক-সুখের প্রস্রবণ হয়। প্রিয়জন তাঁহার প্রিয়ার হৃদয়ক্ষেত্রে বীজ রোপণ করেন। তাঁহার বিয়োগে, নয়ন জলে সেই সমুদয় লীলাখেলারূপে বীজ অঙ্কুরিত হয়, পরে কুসুমিত হয়, বা সুপক্ক রসাল ফল ধারণ করে।

শ্রীরাধা বৃন্দাকে বলিতেছেন, "সখি! তুমি কি আমার ব্যথা জান না? যে দিবস মাধব মধুপুরে গেলেন, আমি রাজপথে দাঁড়াইলাম। প্রকাশ হইতে পারি না, যেহেতু সেখানে শ্রীনন্দ, যশোদা, জটিলা, কুটিলা সকলে দাঁড়াইয়া। কাজেই একটি কুঞ্জের আড়ালে লুকাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে

দেখিতে লাগিলাম। মাধব যখন গমন করেন, সেই কুঞ্জের প্রতি চাহিলেন ও সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সহিত আমার নয়নে নয়নে মিলন হইল। তখন আমি নয়ন-ভঙ্গিতে বলিলাম—

(ছড়ার সুরে) বন্ধু, আমার কে আছে? রেখে যাও কার কাছে?

তখন আমার প্রসন্ন-বদন, আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে—(গীত)

যেতে যেতে, রথ হতে, কি কথা বলিতেছিল; মুখের কথা মুখে রইল;

আমার মুখপানে চেয়ে, নয়ন-জলে ভেসে গেল।

(কে জানে মা, তার কথা তিনি জানেন)

(অভিপ্রায় বুঝি, যাবার মন তার ছিল না)

(তা নৈলে কেন, যাবার বেলা কেন্দে গেল)

সখি! বন্ধুর সেই কান্দা-বদন, আমার হৃদয়ে দিবানিশি জ্বলিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ যাইবার বেলা তাঁহার এই কান্দা-বদনটী শ্রীরাধার হৃদয়ে, তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত, সঙ্গিনী-স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই সঙ্গিনী বড় দুঃখ দিয়াছিল, কিন্তু আবার অপার সুখও দিয়াছিল, কারণ সে প্রিয়ের ভালবাসার একজন সাক্ষী। এই জন্য জীবের ভজন-সাধন সুলভের নিমিত্ত ও তাহাদের সহিত প্রীতি-বর্ধনের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ নরলীলা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের নর-লীলা কি মধুর! তিনি যতই মনুষ্যের মত লীলা করেন, ততই উহা মধুর হয়। বৈষ্ণবধর্মে, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা আছে। আহা! শ্রীবৈষ্ণবেরা কি ধন্য!

যাঁহারা শোকাকুল, লোকে তাঁহাদের এই পরামর্শ দিয়া থাকেন যে, "তোমরা তোমাদের হারান প্রিয়বস্তুকে বিস্মৃত হও!" কিন্তু বিস্মৃত হওয়া শোকের ঔষধ নয়, স্মরণ করাই ঔষধ। শোকাকুল জনকে আমাদের বিনীতভাবে নিবেদন এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের হারান প্রিয়বস্তুকে ভুলিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহার কথা দিবানিশি চিন্তা করুন, তাঁহার গুণ স্মরণ ও ধ্যান করুন, তাহা হইলে শুধু যে শোকের যন্ত্রণা লাঘব হইবে তাহা নয়, ঐ শোকে হৃদয় নির্মল করিবে ও পরিণামে ঐ শোক হইতে বিমল আনন্দ হইবে।

তবে জীবের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের একটু প্রভেদ আছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, শ্রীগৌরাঙ্গ কুলবধূগণকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন যে, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক।" অতএব তাঁহার পক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট বিদায় লইবার বেলা, যতদূর সম্ভব, তাঁহার প্রতি প্রিয়ার প্রীতিবর্ধন করিয়া যাওয়া অসংলগ্ন কার্য নহে। যেহেতু তাঁহাতে প্রীতির ন্যায় জীবের পক্ষে সৌভাগ্য আর নাই।

প্রদীপ নির্বাণ করিয়া গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা গেলেন। রজনী ছয় দণ্ড আছে, বিষ্ণুপ্রিয়া মহাসুখে নিশ্চিন্ত হইয়া পতির কোলে ঘুমাইতেছেন। শ্রীনিমাই তখন আস্তে আস্তে উঠিলেন। আর ঐরূপে ধীরে ধীরে তাঁহার শিওরের বালিস বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকে, (আপনি যেখানে ছিলেন সেখানে) রাখিলেন। তার পরে আপনার চরণের উপর হইতে প্রিয়ার বাম চরণ উঠাইয়া পার্শ্বের বালিসের উপর রাখিলেন। যথা—

নিদ্রিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীবাম চরণে। পার্শ্বে উপাধানোপরি করিয়া রক্ষণে।।
বক্ষস্থলে নিজ গণ্ড-উপাধান দিয়া। বাহির হইল গোরা দ্বার উদ্ঘাটিয়া।।

তৎপরে প্রিয়ার মুখচুম্বন করিয়া ধীরে-ধীরে তাঁহার কোল হইতে সরিয়া পালঙ্ক হইতে নামিলেন এবং নিঃশব্দে দ্বার খুলিলেন। তারপর রাত্রিবাসের বসন-ভূষণ ত্যাগ করিয়া ও সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া আঙ্গিনায় আসিলেন। শেষে মনে মনে জননীকে প্রণাম করিয়া, সদর দ্বার খুলিয়া বাটির বাহিরে আসিলেন। তখন নিজ ভবনকে, শ্রীনবদ্বীপধামকে ও জননীকে সম্বোধন করিয়া আবার প্রণাম করিলেন এবং দ্রুতপদে গঙ্গাভিমুখে যাইয়া, তাঁহার দাদা বিশ্বরূপকে স্মরণ করিয়া, সেই শীতকালের শেষ-রাত্রিতে, শীতে, গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। তখন আর শরীরে সুখ দুঃখ বোধ নাই।

ক্ষণকাল পরে গঙ্গার অপর পারে উঠিয়া, সেই আর্দ্রবস্ত্রে দ্রুতগমনে কাটোয়া অভিমুখে চলিলেন। যথা—লোচনদাসের পদ---

"শয়ন মন্দিরে, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, উঠিলা রজনী শেষে।
মনে দৃঢ় আশ, করিব সন্ন্যাস, ঘুচাব এ সব বেশে।।
ঐছন ভাবিয়া, মন্দির ত্যজিয়া, আইলা সুরধুনী তীরে।
দুই কর জাড়ি, নমস্কার করি, পরশ করিল নীরে।।
গঙ্গা পরিহরি, নবদ্বীপ ছাড়ি, কাঞ্চননগর পথে।
করিলা গমন, শুনি সব জন, বজর পড়িল মাথে।।
পাষাণ সমান, হৃদয় কঠিন, সেও শুনি গলি যায়।
পশু পাখী ঝুরে, গলয়ে পাথরে, এ দাস লোচন গায়।।"

যে গঙ্গার ঘাটে শ্রীগৌরাঙ্গ পার হইলেন, নবদ্বীপের লোক তাহাকে অভিশাপ দিয়াছিল। সেই হইতে সে ঘাটের নাম হইল "নিরদয়ের ঘাট"। যথা শ্রীবংশীশিক্ষা—

"এ ঘাটের নাম আইজ হইতে। নিরদয় ঘাট জানিহ নিশ্চিতে।।"

বিষ্ণুপ্রিয়া মহাসুখে ঘোর-নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। সেই সুখ অন্তর্হিত হওয়ায়, একটু পরেই চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। তখন দেখেন যে, পার্শ্বে পতি নাই। তিনি একটু সরিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া,—যেহেতু ঘর অন্ধকার,—পালঙ্কে হাত বুলাইতে লাগিলেন। পালঙ্কে হাত বুলাইয়া দেখিলেন যে, সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গ নাই। পতির নিদ্রাভঙ্গ হইবে বলিয়া প্রথমে কোন শব্দ করেন নাই। এখন তিনি পালঙ্কে নাই বুঝিয়া, "তুমি কোথা গেলে" বলিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া উঠিয়া বসিলেন, দেখেন ঘরের কপাট খোলা। পতি ঘরে নাই বুঝিয়া উঠিয়া পিঁড়ায় আসিলেন। সেখানেও তাঁহার কোন উদ্দেশ পাইলেন না। তখন তাঁহার মনে ঘোর উদ্বেগ উপস্থিত হইল। ভাবিতেছেন, "এত প্রত্যূষে তিনি কোথায় গেলেন? এমন সময় একাকী ত তাঁহার কোথাও যাইবার কথা নয়! তিনি না আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না বলিয়াছিলেন?" আবার তখন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার সহিত রাত্রে যত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি যে ভাবে চাহিয়াছিলেন, যে ভাবে কথা কহিয়াছিলেন, তাঁহার প্রত্যেক গতি, প্রত্যেক কার্য একেবারে মনে উদয় হওয়ায়, সন্দেহ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। যথা, লোচনদাসের পদ—

"এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া, পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া, উঠিল কান্দিয়া, শিরে মারে করাঘাত।।
মুঁই অভাগিনী, সকল রজনী, জাগিল প্রভুরে লৈয়া।
প্রেমেতে বান্ধিয়া, মোরে নিদ্রা দিয়া, প্রভু গেল পলাইয়া।।
কাঞ্চন নগর, গেল বিশ্বম্ভর, জীব উদ্ধারিবার তরে।
এ দাস লোচন, দগধয়ে মন, না পাইল শচী দেখিবারে।।"

একবার ভাবিতেছেন, জননীকে সংবাদ দিবেন, ভাবিতেছেন, হঠাৎ তাঁহাকে কেন ভয় দিবেন? কিন্তু আশঙ্কা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া জননীর ঘরে চলিলেন, পিঁড়ায় উঠিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, বসিয়া পড়িলেন। তখন দুয়ারে আঘাত করিতেছেন, আর মৃদুস্বরে ডাকিতেছেন, "মা উঠ! মা উঠ!"

শচী যদিও নিমাইকে লইয়া আনন্দে ভাসিতেছিলেন, কিন্তু সেই আনন্দের মাঝে "নিমাই বাড়ী ছাড়িবেন," এই চিন্তাটি সজীব হইয়া ছিল। কাজেই আনন্দে মগ্ন থাকিলেও, কোন একটা শব্দ শুনিলে, অমনি এই উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয় যে, "ঐ বুঝি নিমাই গেল।" সঙ্গে সঙ্গে বুক দুরদুর করিয়া উঠে, আর জিজ্ঞাসা করেন, "কি ও?" বিষ্ণুপ্রিয়া যেই "মা উঠ!" "মা উঠ!" বলিয়া ডাকিলেন, অমনি বৃদ্ধা শচী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়াই বলিতেছেন, "কে ও, যেন মা বিষ্ণুপ্রিয়া?

সংবাদ কি? নিমাই ত ভাল আছে?" বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "হাঁ মা, আমি। মা, তিনি ঘরে ছিলেন, কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া শচী প্রথমে "সে কি!" বলিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন এবং তাহার পর দুয়ার খুলিলেন। এখন বাসুঘোষের এই পদটী শ্রবণ করুন---

"শচীব মন্দিরে আসি, দুয়ারের পাশে বসি, ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিল, নিশা অন্তে কোথা গেল, মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া।।
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাই দু-নয়নে, শুনিয়া উঠিল শচীমাতা।
আলু থালু বেশে ধায়, বসন না রয় গায়, শুনিয়া বধূর মুখের কথা।।
ত্বরিতে জ্বালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতি-উতি, কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাঞা।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে, কান্দিতে কান্দিতে পথে, ডাকে শচী নিমাই বলিয়া।।
ধুয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি ডাক প্রাণনাথ বলিয়া। ধ্রু
আমি ডাকি নিমাই বলিয়া।।
তা শুনি নদের লোকে, কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে, যারে তারে পুছেন বারতা।
একজন পথে ধায়, দশ জন পুছে তায়, গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা?
সে বলে দেখেছি যেতে, আর কেহ নাহি সাথে, কাঞ্চননগর পথে ধায়।
বাসু কহে আহা মরি, আমার গৌরাঙ্গহরি, পাছে জানি মস্তক মুড়ায়।"

শচী রাজপথে প্রদীপ হাতে করিয়া চলিয়াছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া ছায়ার মত শাশুড়ীর বস্ত্র ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। শচী "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে চলিয়াছেন, কোন উত্তর পাইতেছেন না। গলার শব্দ অধিক দূরে যাইতেছে না ভাবিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "মা আমিও ডাকি, মা তুমিও ডাক।" বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "আমি কি বলে ডাকিব?" বিষ্ণুপ্রিয়া মনে মনে যাহাই বলিয়া ডাকুন, প্রকাশ্যে আর কোন শব্দ করিলেন না। ক্রমে রাত্রি অবসান হইয়া আসিল, দুই একটি লোকের সহিত দেখা হইতে লাগিল। তখন দুইজনে ফিরিলেন, ফিরিয়া দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু শচীর কাঁকলী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, শেষে বসিয়া পড়িলেন। তখন দেখেন, তাঁহাদের বাড়ীর দিকে লোক সব আসিতেছে। শচী বাহির বাটীতে বসিয়া (যেখানে নিমাই, মুরারির নিকট তীর্থযাত্রার ও গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনের কথা বলিয়াছিলেন), বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়া। কিন্তু তাঁহাদের বাড়ীতে অনেক লোক ও তাঁহার ভৃত্য ঈশান আসিতেছে দেখিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভিতরে যাইতে বলিলেন, আর আপনি ঈশানকে লইয়া বাহির দুয়ারে রহিলেন।

যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা সকলেই প্রভুর ভক্ত। তাঁহাদের নিয়ম ছিল যে প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া, বাড়ী প্রত্যাগমন করা। সেই নিয়মানুসারে তাঁহারা প্রত্যুষে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। কিন্তু সে দিবস তাঁহারা পূর্বদিন অপেক্ষা অধিক সকালে ও দ্রুতগতিতে আসিতেছেন। প্রভুর বাড়ী গঙ্গার নিকট। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে যাইতে যাইতে, শচী "নিমাই, নিমাই" বলিয়া যে ডাকিয়াছিলেন, সে স্বর তাঁহাদের কর্ণে গিয়াছিল। তখন ব্যস্ত হইয়া সকলে প্রভুর বাড়ীর দিকে চলিয়া আসিলেন। নিতাই আসিলেন, শ্রীবাস আসিলেন, আর বাসুঘোষও আসিলেন। আসিয়া কি দেখিলেন, তাহা বাসুঘোষ এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন ঃ

"সকল মহান্ত মেলি, সকালে সিনান করি, আইলা গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি, বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি, শচী কান্দে বাহির দুয়ারে।।
শচী কহে শুন মোর নিতাই গুণমণি। ধ্রু
কেবা আসি দিল মন্ত্র, কে শিখাল কোন তন্ত্র, কিবা হৈল কিছু নাহি জানি।।
গৃহ-মাঝে শুয়েছিনু, ভালমন্দ না জানিনু, কিবা করি গেল রে ছাড়িয়া।
কেবা নিঠুরাই কৈল, পাথারে ভাসাঞা গেল, রহিব কাহার মুখ চাহিয়া।।

বাসুদেব ঘোষ ভাষা, শচীর এমন দশা, মরা হেন রহিল পড়িয়া।
শিরে করাঘাত করি, ঈশানে দেখাই ঠারি, গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া।"

দ্রুতগতিতে আসিয়া দেখেন, শচী ঈশানের অঙ্গে অঙ্গ হেলান দিয়া বসিয়া। শচীকে ওরূপ সময়ে বাহির দুয়ারে দেখিয়া সকলে আরো ব্যস্ত হইলেন। শ্রীবাস "ব্যাপার কি?" বলিয়া শচীকে শুধাইলেন। তিনি নিতাইয়ের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "আমি কিছু জানি না। রাত্রে শুয়েছিলাম, চিন্তায় চোখে নিদ্রা নাই, কখন নিমাই কি করে। বউমা আসিয়া আমারে ডাকিলেন, চমকিয়া উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত বাড়ী তল্লাস করিলাম। তখন বাহিরের কপাট খোলা দেখিয়া বুঝিলাম, নিমাই বাহিরে গিয়াছে। বউমাকে, কার কাছে রাখিয়া যাইব বলিয়া, সঙ্গে লইয়া পথে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলাম। নিমাই তোমাদের বাধ্য। এখন নিমাইকে যেখানে পাও, আমাকে আনিয়া দাও।" তাঁহার পরে ঈশানের দিকে চাহিয়া, কপালে করাঘাত করিয়া, সঙ্কেত দ্বারা বলিলেন যে, "নিমাই নিশ্চিত আমায় ফেলে চলে গেছে;"—মুখে বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। বাসুদেব ঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং নীচের চিত্রটি তাঁহার স্বচক্ষে দেখিয়া অঙ্কিত, যথা—

"পড়িয়া ধরণী তলে, শোকে শচীদেবী বলে লাগিল দারুন বিধি বাদে।
অমূল্যরতন ছিল, কোন ছলে কেবা নিল, সোনার পুতুলি গোরাচাঁদে।।
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার। আই কেনে রয়েছেন বাহির দুয়ারে।।
অঙ্গুরী অঙ্গদবালা, গোরাচাঁদের কণ্ঠমালা, খাট পাট সোনার দুলিচা।
সে সব রয়েছে পড়ি, নিমাই গিয়াছে ছাড়ি, মুঞি প্রাণ ধরিয়াছি মিছা।।
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেল, নদীয়া আঁধার হৈল, ছটফট করে মোর হিয়া।
যোগিনী হইয়া যাব, যেথায় গৌবাঙ্গ পাব, কান্দিব তার গলায় ধরিয়া।।
যে মোরে নিমাই দিবে, বিনামূল্যে কিনে লবে, হব মুই তার দাসের দাসী।।
বাসুদেব ঘোষ ভণে, শচী কান্দে অকারণে, জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী।।"

এই কথা শুনিয়া মহান্তগণের শিরে বজ্রাঘাত হইল। কিছুকাল কেহ কথা কহিতে পারিলেন না। কথা ফুটিলে নিতাই মায়ের দিকে চাহিলেন, চাহিয়া কি ভাবিলেন, এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া শচীকে বলিলেন, "মা, ব্যস্ত কি! আমি তোমার পুত্রকে আনিয়া তোমার সহিত মিলন করিয়া দিব, প্রতিজ্ঞা করিতেছি।" তিনি জননীকে সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া, মহান্তগণকে সঙ্গে করিয়া একটু দূরে আসিয়া তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নিতাই বলিলেন, "তোমরা কি বুঝো?" শ্রীবাস বলিলেন, "মনকে বঞ্চনা করিয়া কি লাভ? আমার বিশ্বাস প্রভু নিতান্তই জন্মের মত ঘর ছাড়িয়াছেন।" আবার সকলে নীরব হইলেন। সর্বনাশ হইলে মনের ভাব যেরূপ হয়, সকলের তাহাই হইয়াছে। সকলে ভাবিতেছেন যে এখনি মরিলে বাঁচেন। এক জন বলিলেন, "প্রভু-শূন্য নদীয়ায় বাস করিবার আর প্রয়োজন নাই, আমি বাহির হইলাম, সমস্ত পৃথিবী তল্লাস করিয়া তাঁহাকে যেখানে পাই সেখানে যাইব। বাড়ী আনিতে পারি ভাল, নতুবা তাঁহার সঙ্গে থাকিব।" ইহাতে সকলেই "আমারও ঐ কথা" বলিয়া উঠিলেন। আবার পরামর্শ চলিতে লাগিল। কেহ বলিলেন, "প্রভু নিশ্চিত সন্ন্যাস করিতে গিয়াছেন, অতএব ভারতবর্ষে সন্ন্যাসের যে যে প্রসিদ্ধ স্থান আছে, সম্ভবতঃ তন্মধ্যে কোথাও গিয়াছেন। সেখানে তল্লাস করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। এসো, আমরা সেই সব স্থান ভাগ করিয়া লই। কেহ বৃন্দাবনে, কেহ নীলাচলে, কেহ বারাণসীতে, কেহ পাণ্ডুপুরে চল। এইরূপে স্থান ভাগ করিয়া লইলে তল্লাসের সুবিধা হইবে!" নিতাই বলিলেন, "এই উত্তম যুক্তি। তবে প্রভু কোন সময়ে বলিয়াছিলেন যে, কাটোয়াতে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইবেন। অগ্রে সেখানে দেখা কর্তব্য। সেখানে যদি তাঁহাকে না পাওয়া যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানে তল্লাস করিব। আমি কাটোয়ায় চলিলাম, আমার সঙ্গে

আমার সহায়তার নিমিত্ত জনকয়েক বিজ্ঞ ধীর ভক্ত দাও। কারণ তাঁহাকে শুদ্ধ ধরিতে পারিলেই হইবে না, তাঁহাকে কোন গতিকে ফিরাইয়া আনিতেই হইবে।"

এই কথা শুনিয়া অনেকে বলিয়া উঠিলেন, "আমি যাবো"। শ্রীবাস বলিলেন, "সকলে গেলে চলিবে না। প্রভুর বাড়ী আগলাইতে ও শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। কারণ একটু ফাঁক পাইলেই তাঁহারা গঙ্গায় ঝাঁপ দিবেন। শুধু তাহা নয়, তাঁহাদের কাছে না থাকিলে তাঁহারা হুতাশে প্রাণে মরিবেন। আমি যাইব না, আমি তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত থাকিলাম। পরে যদি কোন দিক হইতে সংবাদ পাওয়া যায়, তখন কি করিতে হইবে তাহার পরামর্শের নিমিত্ত বিজ্ঞালোকের প্রয়োজন। তোমরা জন পাঁচেক শ্রীপাদের সহিত গমন কর। যথা চৈতন্য-মঙ্গলে—

"চন্দ্রশেখর আচার্য, পণ্ডিত দামোদর। বক্রেশ্বর আদি করি চলিল সত্বর।
এই সব লই নিত্যানন্দ চলি যায়। প্রবোধিয়া শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়।।"

তখন এই পাঁচজন যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। চন্দ্রশেখর প্রভুর মেশো, পিতৃস্থানীয়, প্রভুর গৌরবের পাত্র। কাজেই নানা কারণে তাঁহাকে যাইতে হইল।

শচী ঈশানের অঙ্গে হেলান দিয়া এবং মালিনী প্রভৃতি গর্বিতা রমণীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিতা হইয়া বসিয়া আছেন। আর বিষ্ণুপ্রিয়া একটু দূরে অন্তরালে পড়িয়া আছেন। শচীকে কিরূপ দেখাইতেছ, না, পৃথিবী মধ্যে সর্বাপেক্ষা কাঙ্গালিনী। তাঁহার নয়নে বারি কি পলক নাই, ইহার উহার পানে চাহিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও যে চিনিতে পাবিতেছেন, তাহা বোধ হইতেছে না। বিষ্ণুপ্রিয়ার নবযৌবন সময়, কাঁচা সোণার বর্ণ। গত নিশিতে রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে সাজাইয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। মস্তকের সেই ভঙ্গিম বেণী রহিয়াছে, বদনে অলকার চিত্র যেমন তেমনই রহিয়াছে। এখন ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছেন। আর তাঁহার সমবয়স্কা রমণীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। চারি-দণ্ড পূর্বে ত্রিলোকের মধ্যে তিনি ভাগ্যবতী ছিলেন, এখন ত্রিলোকের মধ্যে একাকিনী, অনাথিনী, কাঙ্গালিনী। একটু পূর্বে সমুদয় ছিল, এখন কিছুই নাই—আশা পর্যন্ত গিয়াছে।

নিতাই মহান্তদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া আবার সেখানে আসিলেন। আসিয়া শচীকে (ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে) শুনাইয়া বলিতেছেন,—"ত্রিলোক-জননি। তোমার পুত্র চিরকাল স্বেচ্ছাময়। তিনি বস্তু কি, তাহা ভাবিয়া তোমরা আপনাদের মন শান্ত কর। তিনি যাহাকে বলিয়া গিয়াছেন, সকলের তাহাই করা কর্তব্য। তিনি যে একেবারে গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কি ভাবে কোথা গিয়াছেন আমরা কেহ কিছু জানি না। আপনারা ধৈর্য ধরুন, আমরা তাঁহার তল্লাসে বাহির হইলাম। যদি তিনি প্রকৃতই গৃহত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আমরা সমস্ত পৃথিবী তল্লাস করিয়া তাঁহাকে ধরিব। ধরিয়া আপনার সহিত মিলন করাইব, আমি এই প্রতিশ্রুত হইলাম, আপনারা নিশ্চিন্ত হউন।" এই কথা বলিয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতি পাঁচ জন কাটোয়ার দিকে তীরের ন্যায় ছুটিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

"তোমরা কেউ দেখেছ যেতে ।ধ্রু। সোণার বরণ গৌরহরি জনেক সন্ন্যাসী সাথে। তাঁর ছেঁড়া কাঁথা গায়, প্রেমে ঢুলু ঢুলু যায়, যেন পাগলের প্রায়।
মুখে হরেকৃষ্ণ বলে, দণ্ড করোয়া হাতে।।" (প্রাচীন পদ)

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ সেই শীতে, আর্দ্রবস্ত্রে কাটোয়া অভিমুখে বিদ্যুৎ গতিতে চলিয়াছেন। এত দ্রুত চলিয়াছেন যে, তিনি কোথা যাইতেছেন, তাহা শুধাইবার অবকাশও লোক পাইতেছে না। এইরূপে প্রভু কাটোয়ায় সুরধুনী'তীরে, বটবৃক্ষতলে, কেশব ভারতীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। যথা—

"কণ্টকনগরে গেলা দ্বিজ বিশ্বম্ভর। যেখানে বসিয়া আছে সেই ন্যাসীবর।।
সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রভু নমস্কার করে। সম্ভ্রমে উঠিয়া ন্যাসী নারায়ণ স্মরে।।
কোথা হতে এলে তুমি যাবে কোথাকারে। কি নাম তোমার সত্য কহত আমারে।
প্রভু কহে শুন গুরু ভারতীগোঁসাঞি। কৃপা করি নাম মোর রেখেছে নিমাই।।
বসিয়া আনন্দে কহে মনেতে উল্লাস। তোমার নিকট এলাম দেহ ত সন্ন্যাস।।
লোচন বলে মোর সদা প্রাণে ব্যথা পায়। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিবে এতবড় দায়।।"

ভারতী চমকিয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, যেন বিদ্যুৎ-মণ্ডিত একটি সুবর্ণ-বর্ণের পুরুষ বিদ্যুৎ-গতিতে আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন। সন্ন্যাসী গোঁসাই তখন দিশেহারা হইয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া, "নারায়ণ" "নারায়ণ" স্মরিয়া বলিতেছেন, "কে তুমি বাপু আমাকে প্রণাম কর?" তখন নিমাই করজোড়ে বলিলেন, "আমি আপনার কৃপা-প্রার্থী, আমাকে নিমাই বলিয়া ডাকিয়া থাকে। আমি পূর্বে আপনার চরণ দর্শন করিয়াছি। তখন আপনি আমাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমাকে সন্ন্যাস দিবেন, তাই আমি আসিয়াছি। এখন আমি আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম। আপনি দয়াময়, সন্ন্যাসমন্ত্র দিয়া আমাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করুন।" ভারতীর তখন সমুদয় কথা স্মরণ হইল ও তিনি সমুদয় কথা বুঝিলেন। বলিতেছেন, "বাপু! তুমি উপবেশন কর, বিশ্রাম কর, তাহার পর তোমার সহিত এ সমুদয় কথা হইবে।" ইহা বলিয়া নিমাইকে যত্ন করিয়া বসাইলেন। বাসুঘোষ শ্রীনিমাইয়ের সহিত সন্ন্যাসীর কাটোয়াতে মিলন এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনোহর। সুরধুনী তীরে তরু ছায়া যে সুন্দর।
তার তলে বসি আছে গৌরাঙ্গসুন্দর কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্ত কলেবর।।
নগরের লোক ধায় যুবক-যুবতী। সতী ছাড়ে নিজ পতি যপ ছাড়ে যতী।।
কাঁখে কুম্ভ করি তারা দাঁড়াইয়া রয়। চলিতে না পারে সেও নড়ি হাতে ধায়।।
কেহ বলে হেন নাগর যে দেশেতে ছিল। সে দেশে পুরুষ-নারী কেমনে বাঁচিল?
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া কেহ বলে মা- বাপেরে এসেছে বধিয়া।।
কেহ বলে ধন্যা মাতা ধরেছিল গর্ভে। দৈবকী সমান যেন শুনিয়াছি পূর্বে।।
কেহ বলে কোন্ নারী পেয়েছিল পতি। ত্রৈলোক্যে তাহার সম নাহি ভাগ্যবতী।।
কেহ বলে ফিরে যাও আপন আবাসে। সন্ন্যাসী না হও, না মুড়াও কেশে।।
প্রভু বলে আশীর্বাদ কর মাতাপিতা। সাধ আছে কৃষ্ণ-পদে বেচিব এ মাথা।।
হেনকালে কেশব ভারতী মহামতি। দেখিয়া তাঁহারে প্রভু করিলা প্রণতি।।
কৃষ্ণদাস কয় গোসাঞি দেহ ভক্তি বর। বাসুঘোষ কহে মুণ্ডে পড়িল বজর।।"

নিমাইয়ের মুখপানে চাহিয়া ভারতী নানা ভাবে বিভোর হইলেন। দুঃখে যেন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। মনের মধ্যে ভাবের উপর ভাব, এইরূপে ভাবের তরঙ্গ আসিতে লাগিল। কিন্তু যত রূপ ভাবই আসুক, এই নবীন-পুরুষটিকে সন্ন্যাস দিবেন না, ইহা মনের মধ্যে স্থির-সঙ্কল্প করিলেন।

তবে বাধার মধ্যে এই যে, তিনি নিমাইয়ের নিকট প্রতিশ্রুত আছেন। এখন সেই প্রতিজ্ঞা হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাইবেন, তাহাই ভাবিবার নিমিত্ত, নিমাইকে বসাইয়া, মনে মনে গাঢ় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে নিত্যানন্দ প্রভৃতি পঞ্চজন কাটোয়ার দিকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। কেহ কাহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না। মনে মনে কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কাতর হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছেন, "প্রভু, তুমি দয়াময়, ভক্তবৎসল, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও! আমাদের দর্শন দাও! প্রভু, নির্দয় হইও না! যদি তোমাকে কাটোয়ায় দেখিতে না পাই, তবে আমরা প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না, আমাদের প্রাণ নিরাশে তদ্দণ্ডে বাহির হইয়া যাইবে"। সকলে যতই ভারতীর

স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, ততই বুক দুরদুর করিতেছে, ততই কাতর হইতেছেন, পা আর চলিতেছে না—কাঁকালি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সম্মুখে বটবৃক্ষ দেখিলেন, একটু পরেই দেখিলেন যে, নিমাই দুই জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া, সেই বৃক্ষতল আলো করিয়া বসিয়া আছেন।

তখন সকলে একসঙ্গে "ঐ যে, প্রভু" বলিয়া উঠিলেন। পরক্ষণে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া সকলে প্রভুর দিকে দৌড়িয়া চলিলেন। হরিধ্বনি শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মুখ তুলিলেন। অমনি পরস্পরের নয়নে নয়ন মিলিত হইল। তখন ভক্ত-পঞ্চজনের আনন্দে বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। প্রভু সহাস্য বদনে বলিলেন, "এসো এসো; তোমরা আসিয়াছ, বড় ভালই হইয়াছে।" ভক্তগণ আসিয়া নিমাইয়ের সম্মুখে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ধূলায় পড়িয়া গেলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তোমরা আসিয়া ভালই করিয়াছ!" আবার বলিতেছেন, "আমি সন্ন্যাস করিয়া বৃন্দাবন যাইব।" 'বৃন্দাবন' নাম করিবামাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের নয়ন-জলে বদন ভাসিয়া গেল; তখন আবার তিনি ভারতীর পানে চাহিয়া করযোড়ে বলিতেছেন, "গোসাঞি! তোমার পাদপদ্মে আমার এই দেহ অর্পণ করিলাম, তুমি আমাকে ভবসাগর পার কর, যেন আমি অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাই।" এই কথা বলিতে প্রভুর কণ্ঠরোধ হইল।

ভারতী গোসাঞি নিমাইয়ের প্রতি-অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, "বিধির কি সুন্দর সৃষ্টি! কি অদ্ভুত প্রেম! এ বস্তুটি না আমি সে দিবস শ্রীভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম? যাহা হউক, ইহাকে আমি সন্ন্যাস দিব না। নবনীত কি রৌদ্রে রাখিতে আছে? রাখিলে গলিয়া যাইবে! এই কমনীয় বস্তুটি অপেক্ষাও কোমল ও মধুর। ইহাকে দর্শনমাত্র ইঁহার প্রতি আমার কোটি পুত্রের স্নেহ হইয়াছে।" সতৃষ্ণ নয়নে ভারতী নিমাইয়ের চাঁদমুখখানি দেখিতেছেন, আনন্দে নয়নে জল আসিতেছে, আর উহা তিনি কষ্টে সৃষ্টে নিবারণ করিতেছেন। সেই মুহূর্তে স্মরণ হইল যে,ইঁহার জননী আছেন, আবার নবযৌবনা ঘরণী আছেন। তখন স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া রুক্ষভাবে বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি অন্য স্থানে গমন কর, আমার হতে তোমার সন্ন্যাস হইবে না।"

ভারতীর স্থান সুরধুনী তীরে, ঘাটের নিকট। সেই পথে লোক যাইতেছে, আর বৃক্ষতলে এক অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছে। দেখিতেছে যে, জন কয়েক উদাসীন,—কারণ চন্দ্রশেখর ছাড়া আর সকলেই উদাসীন এবং কাহার বা সম্পূর্ণ সন্ন্যাসীর বেশ,—আর তাঁহাদের মধ্যস্থানে একটি অপরূপ বস্তু বসিয়া। শ্রীনিমাইকে দর্শন করিবামাত্র মনে একটি ভাবের উদয় হইত। সেটি এই যে, "এ বস্তুটি কি? এটি কি আমাদের মনুষ্য-জাতীয়?" তাহার পরে বোধ হইল, যেন মনুষ্য অপেক্ষা কোন বড় জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, কোন দেববংশীয় হইবেন! অন্ততঃ এরূপ মনুষ্য তাঁহারা আর কখন দেখেন নাই। মনুষ্যের এরূপ কাঁচা সোনার বর্ণ, এরূপ নির্দোষ সুললিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এরূপ লাবণ্যময় ভঙ্গি, এরূপ সুচারু-চিক্কণ কেশ, এরূপ কমল নয়ন, এরূপ পরিসর বক্ষ, এরূপ আজানুলম্বিত বাহু, এরূপ ক্ষীণ-কটি, এরূপ হিঙ্গুলমণ্ডিত ওষ্ঠ করতল ও পদতল, এরূপ সুদীর্ঘ কায়া কখন দর্শন করেন নাই। সচরাচর লোকে চন্দ্রের সহিত মুখের তুলনা দিয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্যের মুখ পূর্ণিমার চন্দ্র হইতেও যে মনোহর হয়, ইহা কে কবে বিশ্বাস করিত? মনুষ্যের যে এরূপ তেজ হইতে পারে,—অর্থাৎ কাহাকে দেখিবামাত্র মনের প্রকৃতি একেবারে পরিবর্তিত হয়,—ইহা তাঁহারা পূর্বে কখনও বিশ্বাস করিতেন না। নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া তাঁহাদের চিত্তে নানাবিধ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। প্রথমে বুঝিলেন যে, এ বস্তুটির অন্তরে ময়লামাত্র নাই, এবং ইহার সমুদয় গুণই আছে। ক্রমে ক্রমে মনে আরও নানা ভাবের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। সে কিরূপ ভাব তাহা তাঁহারা পরস্পরের যে কথা কহিতে লাগিলেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। যেমন একজন আর একজনকে বলিতেছেন, "এই ব্রাহ্মণ কুমারটিকে দেখিয়া কেন আমার প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে? কেন আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে?"

এইরূপে ঘাটের পথে লোক দাঁড়াইয়া যাইতেছে। যাঁহারা ঘাটে যাইতেছিলেন, তাঁহারা আর ঘাটে না যাইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। স্নান করিয়া কি জল লইয়া যাঁহারা গৃহে যাইতেছিলেন, তাঁহারা অমনি দাঁড়াইয়া গেলেন। এইরূপে সেখানে ক্রমেই জনতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

যখন ভারতী বলিলেন যে, তিনি নিমাইকে সন্ন্যাস-মন্ত্র দিবেন না, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "গোসাঞি! আপনি আমার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন, আর সেই নিমিত্ত কৃতার্থ হইতে আমি আসিয়াছি।" ভারতী এ কথার উত্তর আগেই মনে যোজনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "সে কথা পালন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সন্ন্যাসের সময় আছে। পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে রাগ নিবৃত্তি হওয়া কঠিন, বলিয়া তাহার পূর্বে কাহাকে সন্ন্যাসধর্ম দেওয়া কর্তব্য নয়।" তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বিনীতভাবে বলিলেন, "গোসাঞি! আমি তোমার আগে কি বলিতে জানি। পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে যদি সন্ন্যাসধর্ম দিতে নাই, তবে যাহাদের অল্প আয়ু তাহাদের উপায় কি? আমি ভব-সাগরে হাবু ডুবু খাইতেছি, তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া দয়াময়ের কার্য্য কর।" তখন ভারতী বলিতেছেন, "তোমার সন্তান-সন্ততি হয় নাই, তোমার জননী বর্তমান, আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিতে পারিব না। যেখানে ইচ্ছা যাইয়া তুমি মন্ত্র গ্রহণ কর।" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "গোসাঞি! আমাকে আর পরীক্ষা করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত এই জনম; আমি বৃন্দাবনে যাইয়া তাঁহার ভজন করিয়া জনম সফল করিব। আমার আর বিলম্ব সহিতেছে না, আমি সংসারডোরে আবদ্ধ আছি, আপনি আমাকে খালাস করিয়া দিউন। আপনি আমার জননী প্রভৃতির কথা বলিতেছেন, আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট অনুমতি লইয়া আসিয়াছি, এখন কেবল আপনার কৃপা সাপেক্ষ রহিয়াছে।"

যাহারা সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহারা এই সকল কথাবার্তা শুনিতেছেন, যাহারা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, তাঁহারা সম্মুখের লোকের নিকট উপরিউক্ত কথাবার্তার প্রত্যেক আখর শুনিতেছেন। যাহারা কুলবধূ, তাঁহারা জ্যেষ্ঠাগণের নিকট শুনিতেছেন। ইহারা সকলে শুনিলেন যে ঐ ভুবনমোহন যুবকটি, তাঁহার অতি বৃদ্ধা জননীর একমাত্র পুত্র। আবার তাঁহার নবযৌবনা পত্নী আছেন। এ সমুদয় ফেলিয়া তিনি সন্ন্যাস করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা আরো শুনিলেন যে, নদীয়ায় যে অবতার হইয়াছেন, তিনিই এই যুবক। এই কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সম্মুখে যে কাণ্ড হইতেছে, তাহাতে তাঁহাদের সমুদয় ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও চিত্ত নিয়োজিত হইয়াছে। তাঁহারা তখন নিজেদের চিরদিনের সমস্ত বাসনা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহার স্থানে একটি নূতন বাসনা তাঁহাদের উদয় হইয়াছে। সেটি এই যে, যেন এই নবীন পুরুষ-রত্ন সন্ন্যাসী না হন। আর ভারতীরও সেই ইচ্ছা দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি বড় কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। যে কথাবার্তা হইতেছে, সকলেই আগ্রহের সহিত কাণ পাতিয়া তাহা শুনিতেছেন। নিজেরা কোন কথা বলিতেছেন না, সকলেই নীরব। যখন যাঁহার একটি আখর শুনিতে ব্যাঘাত হইতেছে, তিনি অমনি চুপে চুপে তাঁহার পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে উহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যখন ভারতী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিলেন যে, যুবকটিকে সন্ন্যাস দিবেন না, তখন উপস্থিত কি পুরুষ কি নারী, সকলেই আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

ভারতী বলিতেছেন, "তোমার মাতা ও পত্নী তোমাকে অনুমতি দিয়াছেন শুনিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তাঁহারা ধন্য! তবে সম্ভবতঃ তাঁহারা জানেন না যে, সন্ন্যাস-আশ্রম পদার্থটি কি? এ আশ্রমে কত দুঃখ, নিশ্চিত তাঁহারা কিছুই জানেন না। নিমাই! তোমাকে আমি হৃদয়ের কথা বলি। তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের ও এ জগতের অতি আদরের ধন। তোমার অঙ্গ স্ত্রীলোক হইতেও কোমল। তুমি কখন দুঃখ কাহাকে বলে জান না। তোমাকে সন্ন্যাস দেওয়া আমার কোন ক্রমে উচিত নয়। প্রথমতঃ ঐরূপ করিলে আমি তোমার জননী ও পত্নী বধের ভাগী হইব। তাহার পরে সন্ন্যাসের দুঃখ তুমি বহুদিন সহ্য করিতে পারিবে না, তুমি আপনিও

প্রাণে মরিবে। এ কাজ করিলে জগতে আমি নিন্দার ভাগী হইব, আর পরকালে দণ্ড পাইব। আমি সন্ন্যাসী আমার হৃদয়ের যত কোমল ভাব সমুদয় আমি শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছি। তুমি আমার কেহ নহ, তবু তোমাকে সন্ন্যাস দিব, একথা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এখন ভাব দেখি, তোমার জননী ও পত্নীর কি দুঃখ হইবে? নিমাই! ঐ চেয়ে দেখ! এই সমুদয় লোক তোমাকে কেহ চিনে না, তুমি সন্ন্যাস করিবে শুনিয়া ইহারা হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছে।" তখন নিমাই সাশ্রুনয়নে তাঁহাদের পানে চাহিলেন, অমনি যাঁহারা পদস্থ ব্যক্তি, তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, "বাপু হে, এমন কাজ কখন করিও না!" একজন বলিলেন, "বাপু! এই সুন্দর দেহে এই যৌবনকালে কৌপীন পরিলে দেশের লোক পাগল হইয়া যাইবে।" স্ত্রীলোকেও নানা কথা বলিতে লাগিলেন। এমন কি, কুলবধূগণ,—অবগুণ্ঠন দ্বারা যাঁহাদের মুখাবৃত, তাঁহারও মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "তোমরা আমার বাবা ও মা, কারণ আমার প্রতি তোমাদের সেইরূপ স্নেহ দেখিতেছি। যদি আমার অঙ্গে রূপ থাকে, যদি আমার যৌবন উদয় হইয়া থাকে, তবে এই বেলা আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিন, যেখানে আমার প্রাণেশ্বর, আমার নয়নানন্দ, আমার একমাত্র গতি ও সুখ শ্রীকৃষ্ণ আছেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ বাহ্য হারাইলেন। তখন "আমি বৃন্দাবনে যাব, আমার প্রাণনাথের সেবা করিব," এই ভাবে আনন্দে আত্মহারা হইয়া, দুই বাহু তুলিয়া কটি দোলাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অমনি মকুন্দ সমুদয় ভুলিয়া গিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। আর পাছে কাটোয়ার কঠিন মাটিতে শ্রীনিমাই পড়িয়া আঘাত পান, এই ভয়ে নিতাই, দুই বাহু প্রসারিয়া নিমাইয়ের পাছে পাছে বেড়াইতে লাগিলেন। কাটোয়ায় তখন নবদ্বীপের উদয় হইল। চন্দ্রশেখর মনে মনে ভাবিতেছেন, "বাপু, খুব নাচ! এখানে আর বাধা দিবার কেহ নাই। তোমার মা আর তোমাকে নাচিতে বাধা দিতে পারিবেন না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য আরম্ভ করিলে, তাঁহার নয়ন দিয়া জল ছুটিতে আরম্ভ করিল। যেমন পিচকারী দিয়া জল চলে, এইরূপ নয়ন হইতে জল ছুটিয়া নিকটবর্তী সকল লোক স্নাত হইতে লাগিলেন। তবে সে আর কিছু নহে; কিন্তু উপস্থিত সকল লোকের হৃদয় একেবারে বিলোড়িত হইল,—সকলে সেই রসে মজিয়া গেলেন। তখন কেহ নৃত্য করিতে, কেহ গীত গাহিতে, কেহ গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কেহ আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আর সহস্র সহস্র লোকে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। মুহূর্ত মধ্যে সকলেই নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা ভুলিয়া গেলেন। ভারতীর তখন আবার সেই পুরাতন ভাব মনে উদয় হইল। ভাবিতেছেন, "এটি মনুষ্য নয়, দেবতাও নয়, এটি স্বয়ং—তিনি। কারণ আমার চিত্ত তাহাই বলিতেছেন। ইহাকে আমি 'না' কিরূপে বলিব? আবার মন্ত্রই বা দিই কি বলিয়া? মন্ত্র দিলে ত আমাকে প্রণাম করিবেন? আর স্বয়ং ভগবান্ আমাকে প্রণাম করিবেন, তবে ত আমার সাধন-ভজনের খুব ফল হইল!" ভারতী তখন আপনার চিত্তকে আর আপন বশে রাখিতে পারিতেছেন না। দেখিতেছেন যে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তে খেলার সামগ্রীর ন্যায় হইয়াছেন। তখন উঠিলেন, এবং শ্রীগৌরাঙ্গের হস্ত ধরিয়া নানা উপায়ে তাঁহাকে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত করাইয়া বসাইলেন।

তখন ভারতী বলিতেছেন,—"নিমাই! আমি এখন বুঝিলাম, তুমি শ্রীকৃষ্ণ,—তুমিই সর্বজীবের প্রাণ।।" কিন্তু এই কথা বলিবামাত্র নিমাই ভারতীর দুইখানি চরণ ধরিয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে কিছু বলিতে না দিয়া, নিজেই বলিতেছেন, "গোসাঞি! একে দুঃখে আমি মৃত আমার জনম বিফলে গিয়াছে; শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে না পারায় আমার মরণ বাঁচন সমান হইয়াছে। আবার তাহার উপর আপনি অনুচিত কথা বলিয়া আমার হৃদয়ে ব্যথা দিতেছেন। গোসাঞি! আমাকে খালাস করিয়া দিন, আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। আমি বৃন্দাবনে যাই।"

ভারতী বলিতেছেন, "তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি শ্রীভগবান, আমাকে বধ করিতে এই অবতার লইয়াছ, বুঝিলাম। আমি ক্ষুদ্র জীব, তোমাকে রোধ করিব আমার কি ক্ষমতা। তবে অন্যের যে গতি, আমারও সেই গতি। তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। তুমি এই মাত্র বলিলে যে, তুমি তোমার জননী ও পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছ। সেখানে তোমার তাঁহাদের নিকট আবার বিদায় লইতে বিচিত্র কি? অতএব তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। তাঁহাদের নিকট সমস্ত পরিষ্কাররূপে বলিয়া কহিয়া, আবার বিদায় লইয়া আইস। যাঁহাকে তুমি জননী বলিয়া জান ও যাঁহাকে তুমি পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তাঁহারা যদি তোমাকে সন্ন্যাসে অনুমতি করেন, তবে আমি কোন্ ছার, আমি কেন তাহাতে বাধা দিব? যদি তুমি তাঁহাদেব নিকট সমুদয় বলিয়া কহিয়া অনুমতি লইয়া আমার নিকটে আসিতে পার, তবে তুমি যখনই বল, তখনই তোমাকে সন্ন্যাস দিব।"

ভারতী ভাবিতেছেন, "নিমাই আর সকলের নিকট অনুমতি লইতে পারিবেন না; আর যদিও পারেন, তবু আমাকে আর ধরিতে পারিবেন না। তাঁহার ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই আমি এমন স্থানে চলিয়া যাইব যে আমাকে আর খুঁজিয়া পাইবেন না।" যথা চৈতন্য-মঙ্গলে—

"এত অনুমানি সন্ন্যাসী করিল উত্তর। সন্ন্যাস করিবে যদি যাহ নিজ ঘর।।
সাক্ষাতে জননী ঠাঁই লইবে বিদায়। তোর পত্নী সুচরিতা যাবে তাঁর ঠাঁই।।
সাক্ষাতে সবার ঠাঁই বিদায় হইয়া। আইসহ মোর ঠাঁই সবা বুঝাইয়া।।
মনে আছে গোরাচাঁদে করিয়া বিদায়। আসন ছাড়িয়া মুই যাব অন্য ঠাঁই।।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন, "যে আজ্ঞে, আমি তাঁহাদের অনুমতি আনিতে চলিলাম!" এই কথা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ অভিমুখে ছুটিলেন। পাঠক! একটু চিন্তা করিলেই বুঝিবেন যে, এ অবস্থায় এরূপ কার্য সামান্য জীবে করিতে পারে না। ভক্তগণ এই অননুভবনীয় কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, প্রভু অনুমতি আনিবার নিমিত্ত প্রকৃতই নবদ্বীপ মুখে ছুটিলেন, তখন সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নিত্যানন্দ ডাকিয়া বলিলেন, "প্রভু, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমরাও আসিতেছি।" এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দাঁড়াইলেন।

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ "যে আজ্ঞা" বলিয়া নবদ্বীপমুখে যাইতে উদ্যত হইলে ভারতীর মনে আর এক ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "ইনি স্বয়ং ভগবান্; ইঁহাকে ত্রিজগতে কেহই রোধ করিতে পারিবে না। এই নিমিত্ত ইনি জননী ও পত্নীর নিকট বিদায় লইতে পারিয়াছেন, আর এই নিমিত্তই তিনি শতবার চেষ্টা করিলেও শতবারই অনায়াসে অনুমতি লইতে পারিবেন। সেখানে আমি আর কেন শ্রীভগবান্‌কে দুঃখ দিতেছি? বিশেষতঃ একবার তাঁহারা অনুমতি দিবার সময় অবশ্য বহু দুঃখ পাইয়াছেন, তাঁহাদের সেই দুঃখ কেন আমি আবার দিব? তাহার পর, শ্রীভগবানের কাছ হইতে আমি কোথা পলাইব?" এই সমুদয় কথা মনে উদয় হওয়ায় ভারতী প্রভুকে ডাকিয়া বলিলেন, "নিমাই! তুমি প্রত্যাবর্তন কর।" এই কথা শুনিয়া প্রভু ফিরিয়া আসিলেন। তখন ভারতী বলিতেছেন, "নিমাই, আমি তোমাকে রোধ করিতে পারিলাম না, আর ত্রিলোকে কেহই পারিবে না, কিন্তু একটি কথা ভাবিয়া দেখ। আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিব। আমি তোমাকে মন্ত্র দিলে তুমি আমাকে গুরু বলিবে, তাহাতে আমি অপরাধী হইব। সুতরাং তাহাতে পতন হইবে। অতএব তোমার গুরু হইলাম সত্য, কিন্তু তুমি আমার ভব সাগরের কাণ্ডারি হও; দেখিও যেন আমার পরকাল নষ্ট না হয়, তোমার গুরুর যদি অধোগতি হয়, তবে ত্রিলোকে তোমার বড় কলঙ্ক হইবে।" ভারতীর তখন এরূপ ভাব যে প্রভুর চরণে পড়েন, কিন্তু তাহা করিলেন না। এই কথা শুনিয়া সমস্ত ভক্তগণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা পূর্বে প্রভুকে সন্ন্যাসে অনুমতি দিয়াছেন, এখন কাজেই কিছু বলিতে

পারিতেছেন না, চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের অন্তর পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। যখন ভারতী প্রভুকে সন্ন্যাস দিতে অসম্মত হইলেন, আর সেই সঙ্কল্পে দাঢ্যতা দেখাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের একটু আশার সঞ্চার হইল। যখন প্রভু আবার নবদ্বীপে জননী ও ঘরণীর অনুমতি লইতে চলিলেন, তখন সে আশা আর একটু বৃদ্ধি পাইল। এখন ভারতী প্রভুকে সন্ন্যাস দিবেন স্বীকার করিলেন, সেই কথা ভক্তগণের হৃদয়ে শেলের স্বরূপ বিন্ধিয়া গেল, তাই দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন।

উপস্থিত লোক সকল যখন শুনিলেন যে, ভারতী সন্ন্যাস দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন তাঁহারা পরম ব্যথিত হইলেন, আর অনেকে সঙ্কল্প করিলেন যে এরূপ গর্হিত কার্য কখনই করিতে দিবেন না। যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, এ কাজটাই অশাস্ত্রীয়, অতএব ভারতীর সহিত শাস্ত্র বিচার করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিবেন। যাঁহাদের হৃদয় কোমল, তাঁহারা ও স্ত্রীলোকেরা ভাবিতেছেন যে, ভারতীর ও নিমাইয়ের পায়ে ধরিয়া এই কার্য বন্ধ করিবেন। যাহারা গোঁয়ার, তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, প্রকৃতই যদি ভারতী এই নবীন ব্রাহ্মণকুমারের কর্ণে মন্ত্র দিতে যান, তবে মন্ত্র দিবার অগ্রেই তাঁহার গলদেশ ধরিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিলেই হইবে।

এদিকে প্রভু ভারতীর অঙ্গীকার শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রফুল্ল হইলেন এবং করজোড়ে তাঁহাকে বলিলেন, "অদ্য আমি তোমার কৃপায় সুস্থ হইলাম।" ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "মুকুন্দ! একটু কৃষ্ণমঙ্গল গান কর, আমি শ্রবণ করি। কল্য আমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইব।" নিত্যানন্দের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি ত সব জান। বল দেখি বৃন্দাবনে গেলে কৃষ্ণ কি আমায় দেখা দিবেন? আমি ত তাঁহাকে পাইব?" নিতাই উত্তর করিতে না পারিয়া, অঝোরে-নয়নের ঝরিতে লাগিল। চন্দ্রশেখর প্রভুর মেসো, বলিতে গেলে এক মাত্র তিনিই তাঁহার পিতৃস্থানীয় অভিভাবক। তাঁহাকে প্রভু অনেক সময় বাপ বলিতেন। শচী তাঁহার স্ত্রীর জ্যোষ্ঠা ভগ্নী ও বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার বধূমাতা। তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছেন যে, নিমাইকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিবেন। তিনি ভাবিতেছেন, "নিমাইয়ের জননী ও তাঁহার বধূমাতার নিকট যাইয়া বলিতে হইবে যে, তাঁহাদের সেই হৃদয়ের ধন কৌপীন পরিয়া পলায়ন করিয়াছে। কি করিয়া আমি এ সংবাদ লইয়া যাইব! তদপেক্ষা মা গঙ্গা আছেন, তাহাতেই প্রবেশ করিব, তাহা হইলে আমার সব দুঃখ দূর হইবে। যে পারে সে এ সংবাদ তাঁহাকে বলুক গিয়া।"

প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া মুকুন্দ কৃষ্ণমঙ্গল গাইতে লাগিলেন, আর শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুকে ধরিতে উঠিলেন, আর উপস্থিত সকলে হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কাটোয়ার লোক যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা এই দলে মিশিয়া ও ভক্তিরসে ডুবিয়া যাইতেছেন। হরিধ্বনি শুনিয়া আরও অনেক লোক দৌড়িয়া আসিতেছে! ক্রমে খোল করতাল আসিতে লাগিল ও দলে দলে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল। খোল, করতাল, হরিনাম ও কীর্তনের ধ্বনিতে কাটোয়া টলমল করিয়া উঠিল। সেই শব্দ শুনিয়া ভিন্ন গ্রামস্থ লোক আসিতে লাগিল। তাঁহারা এরূপ অভিনব ও মধুর রস কখনও পান করেন নাই। আর নিজে শুনিয়াও তৃপ্তি হইতেছে না, তাই নিজ প্রিয়জনকে উহার অংশ দিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল,—তখন দৌড়িয়া নিজ-জনের কাছে গিয়া ডাকিলেন, "ওরে শীঘ্র আয়, দেখে যা।" তাহার ভাব দেখিয়া শুধু যে নিজ-জন পশ্চাতে দৌড়িল এরূপ নয়, গ্রামের অন্য লোকও দৌড়িল। এইরূপে নানা দিক হইতে লোক আসিতে লাগিল। প্রভু যে কি শক্তি প্রকাশ করিলেন তাহা অননুভবনীয়। কাটোয়া নগর বাহিরের লোকে পরিপূর্ণ হইল এবং ভক্তির তরঙ্গে লোক একেবারে উন্মত্ত হইল। প্রভাতে গদাধর ও নরহরি আসিয়া উপস্থিত। যথা— "নবদ্বীপ হতে গদাধর নরহরি। আসিয়া মেলিল তারা বলি হরি হরি।।" তাঁহাদিগকে প্রভুর নিজ-জন ভাবিয়া, লোকে পথ ছাড়িয়া দিল। তাঁহারা আসিয়া আকুল-ভাবে "হা প্রভু" বলিয়া

শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পড়িলেন। প্রভুর তখন একটু বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি তাঁহাদিগকে উঠাইয়া অতি আনন্দের সহিত বলিলেন, "আসিয়াছ? বেশ করিয়াছ।" এই কথা শুনিয়া নরহরি ও গদাধরের হৃদয় আরও বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন প্রভাত হইয়াছে। একটু পরে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর, দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ ও আগন্তুক অসংখ্য লোক সারা নিশি আনন্দে নৃত্য করিয়া যাপন করিয়াছেন। কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, "তাঁহারা নাচেন কেন? ইহা কি নাচিবার সময়? শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইবেন, আর তাঁহারা নাচিতেছেন! তাঁহাদের হৃদয় কি এত কঠিন?" ইহার উত্তর এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ সকলকে নাচাইলেন, তাই সকলে নাচিলেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, শ্রীবাস মৃত পুত্রকে ভিতরের আঙ্গিনায় শোয়াইয়া রাখিয়া বর্হিবাটিতে নৃত্য করিয়াছিলেন। "ভক্তিতে মন নিবিষ্ট হইয়াছে" ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল এই যে, মনোভৃঙ্গ শ্রীভগবানের পাদপদ্মমধু পান করিতেছে। যখন মনোভৃঙ্গ সেই পাদপদ্মমধু পান করে, তখন ভক্ত উন্মত্ত হইয়া দুঃখ ভুলিয়া যান, জগতে যে দুঃখ আছে ইহা মনে ধারণা করিতেও পারেন না, এবং তাঁহার বোধ হয়, যেন ত্রিজগতকে লইয়া সেই ত্রিজগতের নাথ দিবানিশি আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। উপস্থিত যে অসংখ্য লোক আসিতেছেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের পাদপদ্মমধুর আস্বাদ পূর্বে জানিতেন না;—এই প্রথমে আস্বাদ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া সারানিশি নৃত্য করিলেন। এখন প্রভাত হইলে তাঁহাদের স্মরণ হইল যে, সুখের নিশি পোহাইয়া দুঃখের দিন আসিয়াছে।

কাটোয়ায় তখন কি তরঙ্গ উঠিয়াছিল, আমি তাহা কি বর্ণনা করিব? সে ঢেউ অদ্যাপি রহিয়াছে। আমার সেই সোণার-চাঁদের চাঁচব কেশগুলি অদ্যাপি কাটোয়ায় আছে। ভক্তগণ তাহা গঙ্গা-তীরে প্রোথিত করিয়া, তাহার উপর একটি স্তম্ভ করাইযা দিয়াছেন। পাছে তাঁহার সন্তানগণ জীবের প্রতি অত্যাচাব করে বলিয়া, প্রভু দ্বারকাতে তাঁহার সন্তান-সন্ততি সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। এ অবতারে সেই নিমিত্ত তিনি সন্তান উৎপাদন করিলেন না। প্রভু আমার এ জগতে যে আসিয়াছিলেন, তাহার চিহ্নের মধ্যে সেই কেশগুলি আছে।

এই নৃত্যকারী সোণার-পুতুলটি আজ কাঙ্গালের বেশ ধরিয়া বৃক্ষতলবাসী হইবেন, এই কথা সকলের মনে উদয় হইল। তখন সকলেই ভাবিলেন—"সে কি? তা হবে না,—তা করিতে দেওয়া হবে না।" আবার ইহাও মনে হইল, "এই যুবকটিকে সন্ন্যাস করিতে দেওয়া-না-দেওয়া তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই যুবক আর এই সন্ন্যাসী যদি এরূপ যুক্তি করে, তবে এই লক্ষ লোকের অনিচ্ছায় তাহারা কি করিতে পারে?" তখন জন কয়েক বিজ্ঞলোক অগ্রসর হইয়া প্রভুকে বলিলেন, "তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও।" প্রভু অমনি তাঁহাদের দিকে সাশ্রুনয়নে এরূপ কাতর ভাবে চাহিয়া করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহারা কাঁদিয়া আকুল হইলেন ও প্রকৃতই ক্ষমা করিলেন; আর—অপর লোকদিগকে বলিলেন, "না, আমরা পারিলাম না, তোমরা পার ত যাইয়া নিষেধ কর। নিষেধ করিলে তাঁহার যে দুঃখের উদয় হয়, তাহা সহ্য করিতে আমরা পারিলাম না।" তখন আর একদল সাহস বান্ধিয়া গেলেন। প্রভু বলিলেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে যাইতেছি, ইহাতে আমার দুঃখের সম্ভাবনা কি? বাবা! তোমরা কি পাগল হলে? আমি না অভাগ্য ছাড়িয়া ভাগ্য আহরণ করিতে যাইতেছি?" প্রভু এই কথাগুলি এরূপ ভাবে ও এরূপ কণ্ঠস্বরে বলিলেন, যে, যাঁহারা তাঁহার মন ফিরাইতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাবিলেন, 'ইনি ত ভাল কথাই বলিতেছেন? ইনি ত সাধুপথই অবলম্বন করিতেছেন? ইহাকে নিষেধ না করিয়া, বরং এই পথ অবলম্বন করিতে দেওয়াই আমাদের কর্তব্য।" কাজেই তাঁহারাও নিরস্ত হইয়া বলিতেছেন, "কই আমরাও ত পারিলাম না। তোমরা আর যদি কেহ পার তবে চেষ্টা কর।" তখন গর্বিতা স্ত্রীলোকেরা কর্তৃপক্ষীয়গণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "তোমরা সরিয়া যাও, আমরা দুটো কথা বলে দেখি।" তাঁহারা বলিলেন, "ও গো বাছা!

তোমার না মা আছেন? লোকে বলিতেছে, তাই শুনিতেছি যে, তোমার জননী ও ঘরণী আছেন। তুমি যদি এ কাজ কর, তবে আমরাই দুঃখে মরিয়া যাইব। তখন বাপু, তোমার মায়ের ও স্ত্রীর কি দশা হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি?" প্রভু তাঁহাদিগকে বলিলেন, "মা! তোমরাই আমার জননী, আমার প্রতি তোমরা একটু দয়া কর। আমার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত জ্বলন্ত আগুনে দিবানিশি দগ্ধ হইতেছেন। আমার জননীকে আমি ইচ্ছায় কি ফেলিয়া আসিয়াছি? আমি তিষ্ঠাইতে না পারিয়া আমার হৃদয়ের জ্বালা নিবাইতে বৃন্দাবনে যাইতেছি।" ইহা বলিয়া প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং করযোড়ে তাঁহাদিগকে বলিতেছেন, "মা! আমি তোমাদের সন্তপ্ত পুত্র, আমাকে তোমরা আশীর্বাদ কর, যেন আমি ব্রজে কৃষ্ণ পাই।" প্রভু যখন করুণ, স্বরে ও করুণ নয়নে চাহিয়া এই কথা বলিলেন, তাঁহারা তখন বুঝিলেন যে, নিমাইকে নিবৃত্ত করা তাঁহাদের কর্ম নয়। এইরূপে দলে দলে লোক হাসিতে হাসিতে মায়ারজ্জু লইয়া প্রভুকে বন্ধন করিতে যাইতেছেন, আর প্রভু নানা কথা বলিয়া সকলকেই কান্দাইয়া নিরস্ত করিতেছেন।

হঠাৎ এ কথা মনে হইতে পারে, "উপস্থিত অসংখ্য লোকে একটি যুবককে নিষেধ করিতে পারিল না, একথা কিরূপে বিশ্বাস করি?" কিন্তু একটু স্থির হইয়া শুনুন, তাহা হইলে সব বুঝিতে পারিবেন। পূর্বে যখন দুর্বলা যুবতী পতির চিতারোহণ করিতে যাইতেন, তখন কি লোকে তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারিত না। তাঁহার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয় স্বজন, পুরোহিত—সকলেই তাঁহাকে প্রাণপণে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সন্তান থাকিলে তাহাকে সেই সতীর কোলে বসাইয়া দিতেন, আর সে মাতার গলা ধরিয়া কাঁদিত। উপস্থিত সহস্র সহস্র লোকে তাহাকে নিষেধ করিতেন, নানা প্রকার ভয় দেখাইতেন। কিন্তু একটি শিশু অপেক্ষাও যে দুর্বলা, সেই রমণী উপস্থিত সকলকে করায়ত্ত করিতেন ও তাঁহারই আবার তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন,—তাঁহাকে চিতায় বসাইযা অগ্নি প্রদান করিতেন। মনুষ্যের বাহুবল কতটুকু? নিমাইয়ের বল তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক।

তবে শ্রীনিমাই সন্ন্যাস করিবেন বলিয়া, লোকে এত অধীর কেন হইতেছে, সে সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলিতেছি। কোন একটি স্ত্রীলোক মরিতেছে দেখিয়া ভিন্ন লোকে বিগলিত হয় না। কিন্তু সেই স্ত্রীলোক যদি সতী হইতে যায় তবে সেই ভিন্ন লোকেও কাঁদিয়া আকুল হয়,—কেন? যাঁহারা সতীদাহ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, যে স্থানে এই ঘটনা হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বের লোক হাহাকার করিয়া রোদন করিতে থাকে। তখন তাহাদের ঔদাস্যের উদয় হয় ও ভগবানের চরণের দিকে মন ধাবিত হয়। কেহ কেহ বা সতীদাহ দর্শন করিয়া সন্ন্যাসী, কেহ বা কিয়ৎকালের নিমিত্ত পাগলও হইয়া যায়। এমন কি, যে স্থানে এই ঘটনা হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ লোক পবিত্র হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, ধর্মের নিমিত্ত যে ত্যাগ, উহা দর্শনে লোকের মন স্বভাবতঃ দ্রবীভূত হয়। শ্রীভগবান্ যে আছেন, আর শ্রীভগবদ্ভজন যে জীবের সর্বপ্রধান কার্য, ইহা অপেক্ষা তাহাব বড় প্রমাণ আর হইতে পারে না। ঐরূপ, যদি কেহ সংসারের সুখ ত্যাগ করিয়া কৌপীন পরিধান ও হস্তে দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া বৃক্ষতলবাসী হন, তাহা দর্শন করিলেও লোকের মন স্বভাবতঃ দ্রবীভূত হয়। তবে যদি সন্ন্যাস গ্রহণ দেখিয়া কাহারও মন বিগলিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, সে সন্ন্যাসী, হয় ভণ্ড না হয় কাঙ্গাল, অর্থাৎ তাহার এমন ধন জন কি সম্পত্তি নাই যাহা তাহার ত্যাগ করিতে হইবে, তখন তাহার সন্ন্যাসের নিমিত্ত লোকে তত বিগলিত হয় না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করিবেন, ইহা যদি তাঁহার মনে ছিল, তবে তাঁহার জননী পরলোকগত হইবার পর সন্ন্যাস করিলে, এবং আদৌ বিবাহ না করিলে ভাল হইত। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার সন্ন্যাসে এত কারুণ্য রসের উদয় হইত না। এখন শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের কথা স্মরণ করুন। তখন তাঁহার শোকা কুলা জননীর বয়স ৬৭ বৎসর

ও তিনি তাঁহার একমাত্র সন্তান। আর তাঁহার ঘরণীর বয়স ১৪ বৎসর। নিমাইয়ের সম্পত্তির অবধি নাই। বয়স ২৪, রূপের তুলনা নাই, আবার প্রেমে তাঁহার কমল-নয়ন দিয়া অনবরত ধারা পড়িতেছে। এই বস্তু ছিন্ন-কাঁথা গায়ে দিয়া, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, পথের কাঙ্গাল হইতেছেন। ইহা দেখিয়া যদি কাটোয়ার লোকের হৃদয় বিগলিত হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের অপরাধ কি? শুধু তাহা নয়। শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্তি দর্শনে লোকের চিরদিনের সঞ্চিত পাপ ক্ষয়, হৃদয় নির্মল ও তাহাতে প্রেম-ভক্তির উদয় হয়। তাঁহার মুখে হরিধ্বনি শ্যামের মুখের মুরলীর ন্যায় উন্মাদকারী। তাঁহার নৃত্য দর্শনে সমস্ত অঙ্গ বিবশীকৃত হয়। কাটোয়ার লোকে তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন, তাঁহার মুখে হরিধ্বনি শুনিতেছেন, আর সেই সুবর্ণ পুত্তলী তাঁহাদের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। আবার যদি এই সমুদয় ত্যাগ করিয়া কাঙ্গাল হইতেছেন বলিয়া শ্রীনিমাই একটু দুঃখ প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে হয়ত লোকের দুঃখ কিছু লাঘব হইত। কিন্তু তাহা নয়, সন্ন্যাসী হইবেন বলিয়া যেন নিমাইয়ের আনন্দ ধরিতেছে না। তাই গর্বিতা রমণীগণ শ্রীগৌরাঙ্গ কে যাইয়া বলিতেছেন, "বাপু হে! তুমি দুঃখে কাতর না হইয়া আনন্দে নাচিতেছ কেন? উহা তো আর দেখা যায় না। তোমার আনন্দ দেখিয়া আমাদের হৃদয় আরো বিদীর্ণ হইতেছে।

তখন সে স্থল ক্রন্দনময় হইল। যিনি তখনই আসিয়াছেন, তিনি লোকের ভীড়ে অগ্রবর্তী হইতে না পারিয়া, অগ্রের লোককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ব্যাপারটা কি?" সে কথায় কে উত্তর দিবে? উত্তর দিতে কাহারও ক্ষমতা কি ইচ্ছা হইতেছে না। তাঁহার বার বার আকিঞ্চনে হয়তো কেহ বলিবেন,—"ব্যাপার কি, অগ্রবর্তী হইয়া দেখ। শুন নাই যে, উনি সন্ন্যাসী হইতেছেন?" আগন্তুক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি! উনি কে?" ইহাতে অপর ব্যক্তি উত্তর দিলেন,—"উনি কে, জান না? উনি নিমাইপণ্ডিত, বৃদ্ধা-জননী ও যুবতী-স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়া আজ সন্ন্যাসী হইতেছেন।" তখন আগন্তুক ব্যক্তি ভাবিতেছেন—"নিমাইপণ্ডিত ত ইহার আপনার কেহ নহেন, তবে তার জন্য ইনি এরূপ শোকাকুল কেন হইতেছেন? শুধু তাহাও নহে, সকলেই দেখি কান্দিয়া কান্দিয়া পাগল হইতেছে।" তিনি অবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "নিমাইপণ্ডিত সন্ন্যাসী হইতেছেন তাহাতে তোমার কি?" এ কথার উত্তর দিবার কিছু নাই। তাই তিনি একটু ভাবিয়া বলিতেছেন, "তুমি জান না তাই বলিতেছ, তাঁহার মায়ের আর কেহ নাই। তাঁহার মায়ের কি উপায় হইবে?" আগন্তুকতবু বুঝিতে না পারিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, তাঁহার মা কান্দুন, কিন্তু তুমি কান্দ কেন?" অপর ব্যক্তির তখন কথা কাটাকাটি করিতে ভাল লাগিতেছে না, তাই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এখানে দাঁড়ায়ে কোন্দল না করে একটু আগে যেয়ে দেখ, তুমিও আমার মত কান্দবে।"

সপ্তদশ অধ্যায়

"অল্প বয়সে নিমাই রে, ও তোর কে মুড়ালে মাথা"

এই অবস্থা। যদি লোকের শোক একটু শিথিল হয়, তবে নিমাইয়ের কাণ্ড দেখিয়া আবার শতগুণ উথলিয়া উঠিতেছে। নিমাই কখন আনন্দে দুই বাহু তুলিয়া নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করিতেছেন, যেন তাঁহার আনন্দ ধরিতেছে না। কখন বা বৃন্দাবনের দিকে চাহিয়া, "আমি এলাম, আমি এলাম" বলিয়া (যেন কাহারও কথার উত্তরে তিনি বলিতেছেন) সেই দিকে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, আর ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতেছেন। নিমাই অমনি চেতনা লাভ করিয়া ভারতীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আর কত বিলম্ব?" তখন সেখানে ক্রন্দনের রোল উঠিল। কেহ সেখানে বসিয়া কান্দিতেছেন, কেহ বা সেখানে থাকিতে না পারিয়া দূরে যাইয়া কান্দিতেছেন। কেহ উচ্চৈঃস্বরে কেহ বা নীরবে রোদন করিতেছেন। কেহ কেহ এত অধীর হইয়াছেন যে, কান্দিতে পারিতেছেন না,—বুক চাপড়াইতেছেন, কি ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছেন। কেহ "কি

হলো" "কি হলো" বলিয়া অন্যের নিকট সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কেহই তাহা দিতে পারিতেছেন না। কেহ কোন মাননীয় লোকের চরণ ধরিয়া বলিতেছেন, "তুমি যাইয়া মানা কর,—কখনও সন্ন্যাসী হইতে দিও না। তুমি অবশ্য পারিবে।" কোন রমণী প্রায় উন্মাদিনী অবস্থায় লোকের ভীড় ঠেলিয়া, এলোথেলো কেশে ও বেশে নিমাইয়ের সম্মুখে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পড়িয়া বলিতেছেন, "বাপ, তুমি সন্ন্যাসী হইও না।" অন্য রমণী জনা-জনার উপাসনা করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছে, "ওরে, তোরা দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছিস? শীঘ্র উহার জননীকে সংবাদ দে। তিনি লোক পাঠাইয়া বান্ধিয়া বাড়ী লইয়া যাউন।" আবার কেহ বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন, কেহ বা অচেতন হইয়া মাটিতে পড়িয়া আছেন, কেহ একেবারে উন্মাদ হইয়াছেন, কেহ বা প্রলাপ বকিতেছেন। আবার কেহ ভাবিতেছেন, তিনিই শচী, ও "নিমাই কোলে আয়" বলিয়া তাঁহাকে কোলে করিতে যাইতেছেন। কেহ ভাবিতেছেন, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, আর সেই ভাবে তিনি শিরে করাঘাত করিতেছেন। আবার কেহ অধিরূঢ় ভাব প্রাপ্ত হইয়া—তিনিই নিমাই, মনে এই ভাব উদয় হওয়াতে— নিমাইয়ের মত নৃত্য করিতেছেন।

ইহার মধ্যে আবার বহুতর লোক খোল করতাল সহ আসিয়া দলবদ্ধ হইয়া এখানে ওখানে মহা কলরব করিয়া "হরি হরয়ে নমো" গাহিতেছেন, আর হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভক্তগণ ভাবিতেছেন, প্রভুর সন্ন্যাস না হইতেই এই, হইলে না জানি কি হইবে!

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভাতে গম্ভীর স্বরে চন্দ্রশেখর আচার্যকে বলিলেন, "বাপ! এ কার্যের যে নিয়ম আছে তাহা তুমি সমুদয় কর। আমি তোমাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলাম।" এই আজ্ঞা পাইয়া চন্দ্রশেখরের মনে কি ভাবের উদয় হইল তাহা অনুভব করা যাইতে পারে। তিনি প্রভুর পিতৃস্থানীয়। শচীর বিশ্বাস, তাঁহার খ্যাপা ছেলে অনেকটা অন্যের পরামর্শে খ্যাপাম করে। নিমাই তাহাদের আপনার কেহ হইলে তাহারা খ্যাপাইত না। চন্দ্রশেখর নিমাইয়ের নিজজন। তিনি অবশ্য তাঁহার খ্যাপামতে উৎসাহ দিবেন না। ইহা ভাবিয়া শচী চন্দ্রশেখরকে তাঁহার পুত্র ফিরাইয়া আনিতে পাঠাইয়াছেন। সেই চন্দ্রশেখরকে প্রভু বলিতেছেন, "তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া আমার সন্ন্যাসের সহায়তা কর।" চন্দ্রশেখর ভাবিতেছেন, "প্রভুর যেরূপ গতিক, যদি আমি না থাকিয়া শচীদেবী এখানে থাকিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহাকেই সন্ন্যাসের সমস্ত উদ্‌যোগ করিতে বলিতেন। এ আদেশটি আমাকে না করিয়া প্রভু যদি অন্যকে করিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। আমি শচীদেবীকে ও বধূমাতাকে যাইয়া কি বলিব? ইহাই ত বলিতে হইবে যে, আমি আপন হাতে তাঁহাদের দুর্লভ-ধনকে বাড়ী না আনিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছি! প্রভু! তুমি চিরদিন বড় নির্দয়;—আমি এই কার্য করি, আর তুমি আনন্দে নৃত্য কর? যাহা হউক আমি আর নদীয়ায় যাইব না, গঙ্গায় প্রবেশ করিব।"

চন্দ্রশেখর মনে যাহাই ভাবুন, মুখে দ্বিরুক্তি করিতে সাহস হইল না। কেবল, "যে আজ্ঞা" বলিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তবে তাঁহার বড় কিছু করিতে হইল না। সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য যে সমুদয় দ্রব্য প্রয়োজন, লোকে শুনিবামাত্র, তাহা আপনারই আনিতে লাগিল। যখন সতীদাহ হয়, তখন শত শত লোকে কান্দিতে কান্দিতে কাষ্ঠ আহরণ করে। তেমনি কান্দিতে কান্দিতে লোকে দধি, মিষ্টান্ন, বস্ত্র, ফুল, চন্দন প্রভৃতি ভারে ভারে আনিয়া আয়োজনের স্থান পূরিয়া ফেলিল। চন্দ্রশেখর স্নান করিয়া আসিয়া কৃষ্ণপূজা করিতে বসিলেন।

এমন সময় নাপিত আসিল। নাপিত কেন আসিলেন তাহা শ্রীভগবান্‌ জানেন। তাঁহার আসিবার ইচ্ছা মাত্র ছিল না। কাটোয়ার নাপিতদিগের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা পদস্থ, তাই তাঁহাকে ডাকা হইল, আর তিনি আসিলেন। নাপিত আসিবার সময় সকলে পথ ছাড়িয়া দিল, কারণ তিনি সন্ন্যাসের একজন প্রধান সহায়। নাপিত স্বচ্ছন্দ মনে আসিলেন, আর সেইরূপ

নিশ্চিন্তভাবে প্রভুর আগে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি আজ্ঞা, ঠাকুর?" প্রভু কি কহিলেন, তাহা প্রাচীন পদে এইরূপে বর্ণিত আছে---যথা—"খালাস করহে নাপিত বৃন্দাবনে যাই। তোরে কৃপা করিবেন কৃষ্ণ দয়াময়।।"

তখন নাপিত বুঝিতে পারিলেন ব্যাপার কি? তাই তিনি বলিলেন—"ঠাকুর! এই কাটোয়ায় নাপিত ঢের আছে, যাহাকে পাব ডাক, আমা হতে তোমার ও কাজ হবে না।" তখন প্রভু বলিলেন, "হরিদাস! তুমি উপবেশন কর। আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে আমি বৃন্দাবনে যাইব। আমার এই কেশগুলি আমাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। আমি সেই বন্ধনদশায় বড় দুঃখ পাইতেছি, তুমি আমাকে খালাস কর, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিবেন।" নাপিত বলিতেছেন, "ঠাকুর, তুমি ত বল্লে তোমাকে খালাস করিয়া দিতে। আর আমি তার উত্তর করিলাম যে, ঢের নাপিত আছে, তাহাদের কাহাকেও ডেকে নিয়ে এসো, আমা হইতে ইহা হইবে না।"

প্রভু বলিলেন, "নাপিত, তুমি আমাকে খালাস করিয়া দাও, তোমার সৌভাগ্য হইবে, বংশ বাড়িবে ও তুমি সর্ব প্রকারে সুখী হইবে। অন্তিমে তুমি বৈকুণ্ঠে বাস করিতে পারিবে।"

নাপিত বলিলেন, "আমি সৌভাগ্য চাহি না, যাহা আছে তাহাও যাউক। আমার কুষ্ঠ হউক, আমার অঙ্গ গলিয়া খসিয়া তাহাতে পোকা পড়ুক। আর ঠাকুর তুমি বৈকুণ্ঠের লোভ দেখাইতেছ? আমার সঙ্গে আমার নিজ-জন ঘোর নরকে যাউক, তবু ঠাকুর আমা হতে তোমার ওকাজ হবে না।" যথা চৈতন্য-মঙ্গলে—

মোর ভাগ্যনাশ প্রভু যাউক সর্বথায়। কেমনে বা হাত দিব তোমার মাথায়।।
যদি মোর কুষ্ঠ হয় গলি যায় অঙ্গ। বংশ মোর নরকে যা'ক শুনহ গৌবাঙ্গ।।*

শ্রীভগবান, জননী, ঘরণী ও ভক্তগণের নিকট বিদায় হইয়া, ভারতীকে বাধ্য করিয়া শেষে ক্ষুদ্র নাপিতের নিকট পরাস্ত হইয়া বসিয়া থাকিলেন। একটু পরে প্রভু মুখ তুলিয়া বলিলেন, "হরিদাস! আমার কেশ মুণ্ডনে তোমার আপত্তি কি? কি অপরাধে তুমি আমাকে এরূপ দুঃখ দিতেছ?" নাপিতও ঐরূপ মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তুমিও কি ত্রিজগতে আর নাপিত পাইলে না? আমিই বা তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি যে, এত নাপিত থাকিতে তুমি আমাকে এ কাজ করিতে বলিতেছ? ঠাকুর! যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে তুমি সন্ন্যাসী না হইয়া ছাড়িবে না। তুমি এক কাজ কর। ইচ্ছা হয় তুমি সন্ন্যাস কর, কিন্তু মাথা ক্ষৌরী করিও না!" যথা—"যে কর সে কর তুমি না কর মুণ্ডন।"

প্রভু একটু হাসিয়া বলিলেন, "হরিদাস! মুণ্ডন না করিলে হয় না। মুণ্ডন করা সন্ন্যাসের নিয়ম।" নাপিত বলিলেন, "তবে আর তোমার সন্ন্যাস করা হইল না, আমি ত পারিবই না, আর কোন নাপিত যে পারিবে তাহাও বোধ হয় না। আমি বড় কঠিন, তবু পারিতেছি না, অন্যে কেন পারিবে? ঠাকুর, তোমাকে মনের কথা বলি! অনেকের মস্তক মুণ্ডন করিয়াছি, কিন্তু তোমার যেমন সুন্দর কেশ, এমন কেশ আমার বাবার কালেও দেখি নাই। এই সুন্দর কেশে আমি ক্ষুর দিতে পারিব না। কারণ ক্ষৌর করিতে গিয়া হাত কাঁপিবে, তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিব, শেষে আমার সর্বনাশ হইবে।" তখন প্রভু অতি করুণস্বরে মিনতি করিয়া বলিতেছেন,

* এই গ্রন্থের অনেক স্থান চৈতন্য-মঙ্গল হইতে উদ্ধৃতি আছে, তাহা ছাপা পুস্তকে নাই। নাপিতের সহিত প্রভুর যে কথাবার্তা তাহা ছাপার চৈতন্য-মঙ্গলে সমুদয় নাই। কাঁকড়া হোসেনপুর নিবাসী শ্রীপ্রাণবল্লভ চক্রবর্ত্তী একজন প্রধান চৈতন্য-মঙ্গলগীতগায়ক। তাঁহাদের ঘরে প্রথমে লোচনেব পদ সুরে গাঁথা হয়। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে এই চৈতন্য-মঙ্গল গীত গাইয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের ঘবে লোচনের হস্তলিখিত চৈতন্য-মঙ্গল আছে। উহার এক খণ্ড নকল আমাকে দিয়েছেন ও উহা যত্ন করিয়া মুদ্রিত করা হইয়াছে। উহা হইতেই উপরেব কয়েকছত্র লওয়া হইল।

"হরিদাস। বিলম্বে আমার হৃদয় বিদরিয়া গেল। তুমি কৃষ্ণ-ভক্ত, আমি তোমার সেই ঠাকুরের অন্বেষণে যাইতেছি। আমাকে খালাস করিয়া দাও। হরিদাস! আমি তোমাকে মিনতি করিতেছি।" নাপিত এক দৃষ্টে নিমাইয়ের মুখ দেখিতেছেন। একটু দেখিয়া বলিতেছেন, "বুঝেছি! তাই বল. আমি ভাবিতেছিলাম, তোমার নিমিত্ত এমন করিয়া প্রাণ কান্দে কেন? তুমি সেই সকলের নাথ, সকলের কর্তা শ্রীকৃষ্ণ। আমি মূর্খ বলিয়া তুমি আমাকে ফাঁকি দিতেছ। ঠাকুর, আমি অতি হীন, অতি নীচ জাতি। তুমি আমাকে বধ করিতে এবার ধরাধামে আসিয়াছ? ঠাকুর! আর একজনকে ডাক।" প্রভু দেখিলেন বড় বিপদ, তখন কতক মিনতি, কতক আজ্ঞার ভাবে বলিলেন, "হরিদাস! তুমি আমার বন্ধন মোচন করিয়া দাও, সন্ন্যাসের শুভক্ষণ আসিতেছে, আর বিলম্ব করিতে পারি না। আমাকে বন্ধন দশায় রাখিয়া যে দুঃখ দিতেছ, তাহা মনে কর। আমি তোমাকে মিনতি করিতেছি।"

নাপিত অনেকক্ষণ প্রভুর সহিত বাক্-যুদ্ধ করিয়াছেন। এই কথাবার্তা সকলে চুপ করিয়া শুনিলেন। সকলে নিবিষ্ট হইয়া অবুঝ-ভক্তে ও চক্রী-ভগবানের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। নাপিতের প্রথম জয় দেখিয়া সকলে তাহাতে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। শেষে শ্রীভগবান না পারিয়া, প্রভুত্বের সহায় লইয়া, নাপিতকে আজ্ঞা করিলেন। তখন নাপিত নাচার হইয়া পরাজয় স্বীকাব করিলেন। নাপিত প্রভুকে বলিতেছেন, "যদি তোমার আজ্ঞা পালন করি, তবে আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে। আবার তুমি ভগবান, তোমার আজ্ঞা পালন না করিলেও সর্বনাশ। ঠাকুর তুমি আর একটু বিবেচনা কর। আমার যে কাজ তাহাতে পায়ের নখ ফেলিতে হয়। আমার এই হাত তোমার মাথায় দিব, আবার সেই হাত কাহার পায়ে দিব? আর ইহাতে আমার ও তাহার সর্বনাশ করিব। ঠাকুর, আমি তোমার নাপিত, ত্রিজগতের মধ্যে ধন্য, আবার কাহার নাপিতের কার্য করিব?" প্রভু তখন বলিলেন, "হরিদাস! তুমি তোমার ব্যবসা ত্যাগ করিয়া মধুমোদকের ব্যবসা অবলম্বন কর। তুমি আমাকে কৃপা করিয়া খালাস করিয়া দেও, কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিবেন।"*

তখন নাপিত অধোবদন অঝোর নয়নে কান্দিতে লাগিলেন। নাপিত যখন পরাস্ত হইলেন, তখন সকলের আশা ফুরাইল। নাপিত যে প্রভুর মুণ্ডনে আপত্তি করিতেছেন, তাহাতে লোকের কোন আশার সঞ্চার হওয়া অন্যায়; যেহেতু যে বস্তু শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মতি লইয়াছেন, তিনি কি আর নাপিতের মত করিতে পারিবেন না? কিন্তু জীবের ধর্মই এই। যিনি নাস্তিক, কিছুই

* প্রভু কহে নিজগুণে দেহত সন্ন্যাস। "হইও না সন্ন্যাসী নিমাই মুড়াইও না কেশ।।"
কাঞ্চন নগরের লোক সব মানা করে। "সন্ন্যাস না কর বাছা ফিরে যাহ ঘরে।।
পঞ্চাশের ঊর্ধ্ব হলে রাগের নিবৃত্তি। তবে ত সন্ন্যাস দিতে হয়ত উচিত।।"
ওই বোল শুনিয়া প্রভু বলে এই বাণী। "তোমার সাক্ষাতে গুরু কি বলিতে জানি।।
পঞ্চাশ হইতে যদি হয় ত মরণ। তবে আর সাধু সঙ্গ হইবে কখন।।"
এ বোল শুনিয়া কহে ভারতী গোসাঞি "সন্ন্যাস দিব রে তোরে শুন রে নিমাই।।"
এ কথা শুনিয়া প্রভু আনন্দে উল্লাস। নাপিত ডাকাইল তবে মুরাইতে কেশ।।
নাপিত বলয়ে "প্রভু করি নিবেদন। এরূপ মনুষ্য নাই এ তিন ভুবন।।
তব শিরে হাত দিয়া ছোঁব কার পায়। যে বল সে বল প্রভু কাঁপে মোর গায়।।
কার পায়ে হাত দিয়া কামাইব নিতি। অধম নাপিত জাতি মোর এই রীতি।।"
এ বোল শুনিয়া কহে বিশ্বম্ভর রায়। "না করিও নিজ বৃত্তি" ঠাকুর কহয়।।
কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম গোঁয়াইবে সুখে। অনন্ত কালেতে গমন হইবে বিষ্ণুলোকে।।
কাঞ্চন নগরের লোক কাতর হৃদয়। বাসুঘোষ জোড়হাতে ভারতীরে কয়।।

মানেন না তিনিও বিপদকালে শান্তি স্বস্ত্যয়ন, কি নীচ লোকের দ্বারা দৈবক্রিয়া করিয়া থাকেন। যখন নাপিত মুণ্ডন করিতে স্বীকার করিল, তখন সকলে বুঝিলেন সর্বনাশের সময় উপস্থিত। নিমাই সংসারের বাহির হইলেন। নিমাই গেলেন আর রাখিবার উপায় নাই। ভারতী কর্ণে মন্ত্র দিলেই হয়! কেবল সেই এক কার্য বাকী। এখন ভারতী যদি মন্ত্র না দেন, তবেই নিমাইকে ঘরে রাখিলে রাখা যাইতে পারে। অতএব ভারতীকে মন্ত্র দিতে দেওয়া হইবে না। ইহাই সাব্যস্ত করিয়া সকলে ভারতীকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।

বিজ্ঞলোকে বলিতে লাগিলেন, "ভারতী ঠাকুর, তুমি এরূপ বালককে সন্ন্যাস দিয়া অশাস্ত্রীয় কাজ করিও না। পঞ্চাশের পূর্বে কাহাকেও সন্ন্যাস দিতে নাই। তুমি এরূপ অশাস্ত্রীয় কার্য করিয়া কেবল নারীবধের ভাগী হইবে। কারণ ইহার বৃদ্ধা জননী আছেন, নব-যুবতী ঘরণী আছেন, তাঁহার আবার সন্তান সন্ততি হয় নাই।" ভারতী বলিলেন, "শাস্ত্রের তাৎপর্য যে পঞ্চাশের পূর্বে রাগের নিবৃত্তি হয় না বলিয়া সন্ন্যাস দিতে নাই। কিন্তু এ বস্তুটি মনুষ্য নয়, তাহা আপনারা সকলে দেখিতেছেন। তাহার পরে ইনি ইঁহার জননী ও ঘরণীর সম্মতি লইয়া সন্ন্যাস করিতেছেন।" বিজ্ঞগণ ভারতীর এইরূপ উত্তরে একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "গোসাঞি, তুমি দেখিতেছ না যে, অসংখ্য লোক দুঃখে ও শোকে অধীর হইয়াছে? তুমি একটু কৃপা করিলেই লোকের এই দুঃখ অপনীত হয়।"

ভারতী মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার উপর অত্যাচার হইতেছে, যেহেতু তিনি নিরপরাধ। তবে লোকের নিকট তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছে না। ভারতী একটু বিদ্রুপ ভাবে বিজ্ঞজনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, আমার ত দয়া মায়া না থাকিবার কথা। এই বস্তুটি, ইনি বালক, এখন ইঁহার হৃদয় নবনীতের ন্যায় কোমল আছে। ইহার নিমিত্ত তোমরা শোকাকুল আছ। আমাকে উপাসনা না করিয়া কেহ উহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া নিবৃত্ত কর না?" বিজ্ঞজন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর! এ তোমার অন্যায় কথা। ইহার কি এখন জ্ঞান আছে? ইনি প্রেমে উন্মত্ত, হয়ত আমাদের কথা ইঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবে না। তোমার ত সহজ জ্ঞান আছে, তুমি কেন এরূপ গর্হিত কাজ কর?"

তখন বলবান যুবকগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া, বিজ্ঞজনদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "আপনারা একটু সরিয়া যাউন। সন্ন্যাসী বড় কঠিন। এ অনুনয় বিনয়ের কাজ নয়। যেমন রোগ তেমনি ঔষধ আমরা দিতেছি। এই বলিয়া যুবকগণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া, সন্ন্যাসী যে স্ত্রীলোকের ন্যায় অবধ্য ইহা ভুলিয়া, যষ্টি হস্তে করিয়া ভারতীকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং সকলে তর্জন গর্জন আরম্ভ করিল, গালি দিতে লাগিল। শেষে মারিতে উদ্যত হইল। কেহ বা ইহাও বলিতে লাগিল যে, সন্ন্যাসী ঠাকুর বড় একটি শিকার পাইয়াছেন, আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না।" কেহ বলিল "তোকে বধ করিলে পাপ নাই। তুই সন্ন্যাসী নয়, তুই হিংস্র পশু।" কেহ বলিল, "আর বিলম্ব কি? তর্জন গর্জনের কাজ নহে। দেখিতেছ না নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে? চতুর সন্ন্যাসী ভাবিতেছে যে, এ কেবল ভয় দেখান হইতেছে। সকলে উহাকে ধর, ধরিয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া চল, তাহার পরে নৌকায় উঠাইয়া গঙ্গার ওপারে লইয়া ফেলিয়া দিয়া এস।"

ভারতী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে যদি বধ করিতে পার, তবে বন্ধুর কার্য করিবে। এই যে বস্তুটি দেখিতেছ, ইনি স্বয়ং পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন। ইহাকে আমি রোধ করিতে পারিলাম না। ত্রিজগতে কেহ পারিবেও না। তাহা যদি পারিত, তবে এই যে পিতৃস্থানীয় ওঁর মেশো সম্পর্কীয় আচার্য রত্ন বসিয়া আছেন, উনি কি পারিতেন না? তবে আমি বাধ্য হইয়া গোলকের অধিকারীকে কৌপীন পরাইয়া কাঙ্গালের বেশ ধরাইতেছি, এ দুঃখ আমার চিরদিন থাকিবে। এ কলঙ্ক আমার কিছুতেই যাইবে না। ত্রিজগতে ভক্তমাত্রেই আমাকে শাপ দিবে। অতএব তোমরা দয়া করিয়া আমাকে বধ কর, করিয়া আমার যন্ত্রণা দূর কর। ইহা বলিয়া

ভারতী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিরদিনের উপার্জিত জ্ঞান এক বিন্দুও তখন রহিল না। তখন তিনি প্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাপ নিমাই! তোমার মনে কি এই ছিল?" তখন লোকে বুঝিলেন, ভারতী নিরপরাধ।

এদিকে আকুল নাপিতকে শ্রীগৌরাঙ্গ অতিশয় মিনতি করিয়া কাতরস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "হরিদাস! শুভক্ষণ উপস্থিত প্রায়! আমাকে সংসার-বন্ধন হইতে মোচন করিয়া দাও, আমি বৃন্দাবনে যাই।" নাপিত তখন বাহ্য-জ্ঞান পাইলেন, এবং প্রভুর অগ্রে বসিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, আর প্রভু তাঁহাকে সাহস দিতে লাগিলেন।

গৌর-ভক্তগণ চিরদিন জীবগণকে এই বলিয়া দোষিয়া থাকেন যে, তাহারা তাহাদের প্রভুকে ঘরের বাহির করিল। জীব কুকর্মান্বিত না হইলে, কি মুগ্ধ থাকিয়া তাঁহাকে অগ্রাহ্য না করিলে, তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন হইত না। ভক্তগণ দুঃখে বলিয়া থাকেন, "জীব! তোকে ধিক্! তুই সর্বাঙ্গসুন্দর শ্রীভগবান্‌কে কৌপীন পরাইলি?" কিন্তু জীবের পক্ষ হইয়া আমি একটি কথা বলিব। শ্রীভগবান্ যখন সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন জীবমাত্রই—কি ভক্ত কি অভক্ত, কি নিজ-জন কি ভিন্নজন,—সকলেই সন্তপ্ত হৃদয়ে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছিলেন।

যখন নাপিত প্রভুর অগ্রে বসিলেন, তখন বোধ হইল যেন ত্রিভুবন হাহাকার করিয়া উঠিল। উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রই "কি হ'লো কি হ'লো" বলিয়া ঢুপ ঢাপ করিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কেহ বা একেবারে মূর্চ্ছিত হইলেন; কেহ সংজ্ঞা হারাইলেন আর বহুদিন সংজ্ঞা লাভ না করিয়া "নিমাই নিমাই" বলিয়া পথে পথে রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সে পরের কথা। প্রভুর নিজ-জনের তখন অচেতন হইলে চলিবে না জানিয়া, তাঁহারা বুকে পাষাণ বান্ধিয়া বসিয়া থাকিলেন। কিন্তু তাঁহারা বস্ত্রে মুখ ঝাঁপিলেন। যথা "মুণ্ডনের কালে বস্ত্র মুখে দেয় ঝাঁপ।" (চৈতন্য-মঙ্গল)। আমি এখানে লেখনী রাখিলাম এবং মহাজনগণ এই স্থানটি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, নিমাই সন্ন্যাসী হইয়াছেন, আর অনন্ত কোটি লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাকে নতি করিতে করিতে যাইতেছে; শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার যে বাসরঘরে যাইতে পায়ে উছট লাগিয়াছিল; ব্রাহ্মণ যে শাপ দিয়াছিল, "নিমাই পণ্ডিত! তোমার সংসার-সুখ নাশ হউক!" শাস্ত্রে যে ভগবানের সহস্র নামের মধ্যে এই পদ আছে, যথা— "সন্ন্যাসকৃৎ শমো শান্তো নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ,"—এতদিন পরে এ সমুদয় সফল হইতে চলিল। নাপিত অগ্রে বসিলেন। নিকটে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা বস্ত্র দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভুর চরণ স্পর্শ করিবামাত্র নাপিত প্রেমে অধীর হইলেন। তিনি ক্ষৌর করিবেন কি, প্রেমে থর-থর কাঁপিতে লাগিলেন, নয়ন জলে পরিপূর্ণ হওয়ায়, তিনি একেবারে অন্ধ হইলেন। যাঁহারা পশ্চাতে ছিলেন, তাঁহারা শুনিলেন যে প্রভু ক্ষৌর করিতে বসিয়াছেন। তখন সকলে নিরাশ হইয়া, যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি তিনি সেইভাবে মনের বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেইদণ্ডে অনেকে মনে মনে স্থির করিলেন যে, তাঁহারা আর গৃহে যাইবেন না। কেহ বা এরূপ সঙ্কল্পও করিলেন যে, নবীন-সন্ন্যাসীর সঙ্গে বনে যাইবেন। সহজ-জ্ঞান কাহারও ছিল না। যাঁহারা দূরে আছেন তাঁহারাও অধৈর্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "মুণ্ডন কতদূর হইল?" "মুণ্ডন কি শেষ হইল?" "মুণ্ডন কি হইতেছে?" কিন্তু মুণ্ডন হইবে কি? নাপিত ক্ষুর রাখিয়া নৃত্য করিতেছেন। একবার নৃত্য করিতে করিতে অগ্রে আসিয়া ভূমে লুণ্ঠিত হইয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিতেছেন, আবার উঠিয়া প্রভুকে অগ্রে করিয়া নৃত্য করিতে করিতে পশ্চাৎ দিকে যাইতেছেন। আর, প্রভু স্বয়ং মোহিত হইয়া সেই ভঙ্গীর নৃত্য দেখিতেছেন। শেষে প্রভু মনের বেগ সম্বরণ করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "হরিদাস। শুভক্ষণ উপস্থিত প্রায়, তুমি

আমাকে খালাস কর।" এ কথা শুনিয়া নাপিত যেন জাগ্রতোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া ক্ষৌর করিতে বসিলেন। কিন্তু নাপিতের হাত কাঁপিতে লাগিল, হাতের ক্ষুর পড়িয়া গেল, শেষে কাঁপিতে কাঁপিতে ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। প্রভু তখন তাঁহার গাত্রে পদ্ম-হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। নাপিত আবার শান্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু একা নাপিতের দোষ কি? প্রভুও মাঝে মাঝে ক্ষৌর রাখিয়া নৃত্য করিতেছেন! প্রভু বলিতেছেন, "হরিদাস! আমাকে ক্ষমা দাও, আমি একটু নৃত্য করিয়া লই।" বৃদ্ধা জননী ও নবীনা ঘরণী ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস লইবার জন্য ক্ষৌর হইতে বসিয়া, "আমি একটু নৃত্য করিয়া লই" এ কথা বলে এরূপ অধিকার, ত্রিজগতে এক আমাদের প্রভু ছাড়া আর কাহারও নাই। আবার কখন বা প্রভু নাপিতের কর ধরিয়া দুইজনে নৃত্য করিতেছেন। প্রভুর যিনি অতি কৃপাপাত্র তাঁহার কর ধরিয়া তিনি নৃত্য করিতেন। তবে এরূপ ভাগ্য অতি অল্প জীবেরই হইত। নাপিতের উপর প্রভু বড় সদয়, কারণ নাপিত তাঁহাকে খালাস করিতেছেন। এইরূপে ক্ষৌরকার্য আর শেষ হয় না। এখানে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম ঃ

"হেন সে কারুণ্য প্রভু গৌরচন্দ্র করে। শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে।।
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার কারণ। এই তার সাক্ষী দেখ কান্দে সর্বজন।।
প্রেম-রসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র। স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প।।
বোল বোল করি প্রভুর বিশ্বম্ভর। গায়েন মুকুন্দ প্রভু নাচে নিরন্তর।।
বসিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে। প্রেম-রস মহা-কম্প বহে অশ্রুধারে।।
বোল বোল করি প্রভু করয়ে হুঙ্কার। ক্ষৌরকর্ম নাপিত না পারে করিবার।।
কথং কথমপি সর্ব দিন অবশেষে। ক্ষৌরকর্ম নির্বাহ হইল প্রেম-রসে।।"*

কেশ মুণ্ডন শেষ হইল; আর এ সংবাদ লোকের মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল। কেশগুলি দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলে হুড়াহুড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু উহা স্পর্শ করিতে কাহারও সাহস হইল না। তখন প্রভু স্নান করিতে দৌড়িলেন। মুখে মুখ যাঁহারা সে কথা শুনিলেন, তাঁহারাও দৌড়িলেন। সকলে গগনভেদী হরিধ্বনির সহিত গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। কেশব ভারতীর স্থানে তিনি একক বসিয়া রহিলেন। এদিকে নাপিত তাঁহার অস্ত্রগুলি লইয়া বিপদে পড়িলেন। তাঁহার সে গুলির আর প্রয়োজন নাই, তিনি আর ক্ষৌরকার্য করিবেন না। সেগুলি কোথাও রাখিয়া বিশ্বাস হইল না। তখন উহা মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতে করিতে গঙ্গায় চলিলেন। গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া অস্ত্রগুলি টান দিয়া দূর জলে নিক্ষেপ করিলেন। প্রভুর কেশের সমাধি অদ্যাপি কাটোয়ায় বিরাজিত। নাপিতের সমাধি "মধু মদকের" সমাধি বলিয়া প্রসিদ্ধ। শুনিয়াছি, সেখানে গড়াগড়ি দিলে পাপী তাপীর হৃদয় পবিত্র ও শীতল হয়।

*"তখন নাপিত আসি প্রভুর সম্মুখে বসি ক্ষুর দিল সে চাঁচর কেশে
করি অতি উচ্চ-রব কান্দে যত লোক সব নয়নের জলে দেহ ভাসে।।
হরি হরি কিনা হৈল কাঞ্চননগরে। ধ্রু।
যতেক নগরবাসী দিবসে দেখয়ে নিশি প্রবেশিলা শোকের সাগরে।।
মুণ্ডন করিতে কেশ হৈয়া অতি প্রেমাবেশ নাপিত কান্দয়ে উচ্চরায়।
"কি হৈল, কি হৈল" বলে হাতে নাহি ক্ষুর চলে প্রাণ মোর বিদরিয়া যায়।।
মহা উচ্চরোল করি কান্দে কুলবতী নারী সবাই প্রভুর মুখ চায়ে।
ধৈরজ ধরিতে নারে নয়ন-যুগল ঝুরে ধারা বহে নয়ন বাহিরে।।
দেখি কেশ অন্তর্ধান অন্তরে দগ্ধে প্রাণ কান্দিছেন অদ্বৈত রায়।
রসিকানন্দের প্রাণ শোকানলে আনচান এ দুঃখ ত সহা না যায়।।

প্রভু স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে ভারতীর নিকটে আসিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্রবস্ত্রে সকলে হরিধ্বনি করিতে করিতে আসিলেন। প্রভু আসিতেছেন দেখিয়া ভারতী তিন খণ্ড অরুণ-বস্ত্র হস্তে করিয়া দাঁড়াইলেন,—ইহার একখানি কৌপীন, আর দুইখানি বহির্বাস। ভারতীকে বস্ত্র-হস্তে দাঁড়াইতে দেখিয়া নিমাই দুই হস্তে অঞ্জলি করিয়া বস্ত্র মাগিলেন। ভারতী অর্পণ করিলেন। নিমাই তখন সেই তিনখানি বস্ত্র ভক্তিপূর্বক মস্তকে ধরিলেন। নিমাই যখন কৃতার্থ হইয়া অরুণ-বসনে মস্তকে করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন যেন ত্রিভুবন গলিয়া গেল। শুধু ইহাই নহে। আমার রসিকশেখর গৌর সেই বস্ত্র মস্তকে করিয়া করযোড়ে সেই লোকসমুদ্রের নিকটে অনুমতি চাহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "হে আমার সুহৃদ্গণ! বাবা, মা! তোমরা অনুমতি কর, আমি এখন ভবসাগর পার হইব, তোমরা আমাকে আশীর্বাদ কর যেন আমি ব্রজে কৃষ্ণ পাই।"*

এ কথার কে উত্তর দিবে? ইহার যে একমাত্র উত্তর অর্থাৎ রোদন তাই সকলে একস্বরে করিয়া উঠিলেন। ভারতী আসনে বসিয়া, নিমাই মুণ্ডিত মস্তকে কৌপীন ও বহির্বাস পরিধান করিয়া সন্ন্যাসীর বাম দিকে বসিলেন। সতী-দাহের সময় যখন চিতাতে অগ্নি প্রদান করা হয়, তখন লোকে চুপ করে, তাহাদের পূর্বকার আর্তনাদ তখন ক্ষান্ত হইয়া যায়। সেইরূপ সেই অসংখ্য লোক চুপ করিলেন। প্রভু তখন শান্ত হইয়াছেন, দক্ষিণ দিকে মস্তক একটু নত করিয়া ভারতীকে বলিতেছেন, "গোসাঞি, আমাকে স্বপ্নে কোন ব্রাহ্মণ একটি সন্ন্যাসের মন্ত্র বলিয়াছিলেন। আপনি উহা শ্রবণ করুন। দেখুন আমাকে সেই মন্ত্র, কি পৃথক মন্ত্র দিবেন।" ইহাই বলিয়া প্রভু চুপে চুপে ভারতীর কর্ণে তাহা বলিলেন। সন্ন্যাসের মন্ত্র অতি গোপনে রাখা হয়, কেহ জানিতে পারেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে সন্ন্যাসের মন্ত্র শুনিয়া ভারতী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "এই সন্ন্যাসের মহামন্ত্র; তুমি যে ইহা পাইবে, তাহা তোমার পক্ষে বিচিত্র কি?" আর সেই সঙ্গে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

ভারতীর নিকট মন্ত্র লইবার অগ্রে শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে তাঁহাকে মন্ত্র দিয়া শিষ্য ও তাঁহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিলেন! এইরূপে শ্রীভগবান্ প্রকারান্তরে আপনার মর্যাদা রাখিলেন। কেশব ভারতী মন্ত্র পাইয়া প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। তৎপরে তিনি প্রভুর কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র দিলেন। কেশব ভারতী তখন প্রেমে বিহ্বল হইয়াছেন, অতএব তাঁহার মুখে সে মন্ত্রের রস-শোষণ শক্তি যাইয়া রস-সঞ্চার শক্তি হইয়াছে। কিন্তু তখনও সমুদয় কার্য শেষ হয় নাই। শাস্ত্র অনুসারে নিমাইয়ের তখন পুনর্জ্জন্ম হইল, সুতরাং প্রথম আশ্রমের সমুদয় (নাম পর্যন্ত) লুপ্ত হইয়া গেল। এখন তাঁহার নূতন নাম রাখিতে হইবে। কেশব ভারতী ভাবিতে লাগিলেন যে, নিমাইয়ের কি নাম রাখিবেন। ভারতী শিষ্য ভারতী হয়; কিন্তু সন্ন্যাসের যে নয় সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে ভারতী সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা ছোট। আর নিমাই যে তাঁহার কি আর কাহারও শিষ্য, ইহার কোন প্রমাণ রাখিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইল না। ভাবিতে ভাবিতে তিনি নিমায়ের নাম পাইলেন। কেহ

*"মুড়াইয়া চাঁচর চুলে স্নান করি গঙ্গাজলে বলে দেহ অরুণ বসন।
গৌরাঙ্গের বচন শুনিয়া ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন।
অরুণ দুখানি ফালি ভারতী দিলেন আনি আর দিল একটি কৌপীন।।
মস্তকে পরশ করি পরিলেন গৌর-হরি আপনাকে মানে অত দীন।।
তোমরা বান্ধব মোর এই আশীর্বাদ কর নিজ কর দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস নহে যেন উপহাস ব্রজে যেন পাই ব্রজ-নাথে।।
এত বলি গৌরাঙ্গরায় উর্ধ্বমুখ করি ধায় দিক্বিদিক্ নাহি মানে।
ভক্তজনের পাছে লোটায়ে লোটায়ে কান্দে বাসুদেব হা কাঁদ কান্দনে।।

বলেন নাম দৈববাণী দ্বারা উপস্থিত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশ হইল, আবার কেহ বলেন সরস্বতী ভারতীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নামটি বলিয়া দিযাছিলেন। তখন কেশব ভারতী নিমাইয়ের বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "নিমাই! তুমি জীবমাত্রকে শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্য করাইলে, অতএব তোমার নাম হইল—**শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য**।

ইহাতে কি হইল শ্রবণ করুন। শ্রীজগন্নাথ-শচী-নন্দন নিমাই এখন হইলেন ভারতীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। জগতের যত পুরুষ সকলেই এখন তাঁহার পিতা, আর যত রমণী সকলেই তাহার মাতা। নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী শ্রীনবদ্বীপে, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের বাড়ী নাই, কি বাড়ী— অনন্ত পথে। তিনি শচীর ভবনে বাস করিতেন, এখন বৃক্ষতলবাসী হইলেন। যখন নিমাইপণ্ডিত কৃষ্ণ-চৈতন্য হইলেন, তখন তাঁহার পুনর্জন্ম হইল, তিনি তাঁহার জননীকে ত্যাগ করিলেন ঘরণীকে ত্যাগ করিলেন, তাঁহার নবদ্বীপ গমন করিবার আর অধিকার থাকিল না, গৃহ-মধ্যে বাস করিতে আর পারিবেন না। তাঁহার আর কোন সম্পত্তি রহিল না, সম্পত্তি স্পর্শ করিতেও অধিকার রহিল না। তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে বাঁশের একখানি যষ্টি, যাহাকে "দণ্ড" বলে; কমণ্ডলু অর্থাৎ কাষ্ঠের কি নারিকেল মালার জল-পাত্র; একখানি কৌপীন; আর দুই খানি বহির্বাস; এবং শীত নিবারণের নিমিত্ত একখানি ছেঁড়া কাঁথা। নিমাইয়ের কৃষ্ণ-চৈতন্য নাম ধারণ কবাও তাঁহার শয্যায় শয়ন করিবার এবং উপকরণ সহিত অন্ন গ্রহণ করিবার অধিকার গেল। এমন কি, অঙ্গে তৈল মর্দনের অধিকারও রহিল না।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য এখন একলা, ত্রিজগতে তাঁহার আর কেহ নাই। কিরূপ একলা তাহা একটি ঘটনায় বুঝা যাইবে। প্রভুকে হারাইলেন ভাবিয়া গদাধর বিনীত হইয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য রুক্ষভাবে গদাধরকে বলিলেন, "আমি একলা, আমি অদ্বিতীয়, আমার আবার সঙ্গী কে?" ইহা শুনিয়া গদাধর ভয়ে আর কিছু কহিতে পারিলেন না।

প্রভুর নামকরণ হইবামাত্র সকলেই মুখে মুখে উহা শুনিতে পাইলেন। তখন কেহ কৃষ্ণ, কেহ চৈতন্য, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভুর সেই মুহূর্তের ভাব দেখিয়া তখনি সে কলরব থামিয়া গেল।

প্রভুর নাম যেমাত্র রাখা হইল, অমনি তিনি, "আমি বৃন্দাবনে আমার প্রাণনাথের কাছে চলিলাম, আমাকে বিদায় দাও," বলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলেন। কিন্তু লোকের ভিড় বলিয়া দৌড় মারিবার সুবিধা পাইলেন না। এই সুযোগে ভারতী উঠিয়া "কৃষ্ণ চৈতন্য দাঁড়াও, ফিরিয়া আইস, তোমার দণ্ড ও কমণ্ডলু লইয়া যাও," বলিয়া ঐ দুইটি বস্তু হস্তে করিয়া প্রভুকে ডাকিতে লাগিলেন। সেই ধ্বনি প্রভু শুনিলেন, শুনিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিলে, ভারতী তাঁহার হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু দিলেন।* তখন প্রভু ভক্তগণের প্রতি নিদয় ও পাষাণবৎ এবং জীবের প্রতি সদয় হইয়া সেই লোকসাগরের মাঝে দণ্ড ও কমণ্ডলু হস্তে করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রথমে নিজ ভক্তগণ সকলে চরণে পড়িলেন, এবং ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। তখন সেই অনন্ত লোক, সেই সঙ্গে "গোঁসাঞিও! পরিত্রাণ কর," বলিয়া প্রণাম করিলেন।

আজ আমাদের প্রাণের নিমাই "গোঁসাঞিও" হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তের আদরে বিবশীকৃত হইয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের দর্শন-সুখ উৎপাদন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ, সেই নবীন বয়সে, কাঙ্গাল বেশ ও দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া জীবের অগ্রে হরিনাম শিক্ষা করিতে দাঁড়াইলেন। দীর্ঘকায়, সুবলিত অঙ্গ, পরমসুন্দর, সুবর্ণকান্তিবিশিষ্ট নবীনপুরুষ-রতন যখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়া, জীবের অগ্রে কৃপাপ্রার্থী হইয়া ছল-ছল নয়নে দাঁড়াইলেন, তখন সকলেই ভাবিলেন যে, "হে

*ইহার মধ্যে একটি অর্থাৎ (দণ্ড) আমার নিতাই সন্ন্যাস গ্রহণের কিছুদিন পরে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ভগবান্! তুমিই ভক্ত! তুমিই দয়াময়! তুমিই মহাজন! তুমিই ধন্য! পতিব্রতা যে স্বামীর চিতায় পুড়িয়া প্রাণ দেয়, সে তাহার নিষ্ঠা তোমার কাছেই পাইয়াছে। রাজ্য-সুখ ত্যাগ করিয়া যে শক্তিতে সাধুগণ কঠোর সাধনা করেন, সেও তাঁহারা তোমারই নিকট পাইয়াছেন!"

তখন বোধ হইতে লাগিল যে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, দীনভাবে, দীনবেশে, কাতর-স্বরে, করজোড়ে, মনুষ্যরূপ কীটের নিকট, কৃপা ভিক্ষা করিয়া যেন বলিতেছেন, "জীবগণ! আমার সমুদয় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া আমার উপর তোমরা ক্রোধ করিও না। আমি নিরপরাধ, আপাততঃ কিছু দেখিয়া তোমরা আমাকে নিন্দা কর, কিন্তু অপেক্ষা কর, ক্রমে বুঝিবে যে আমার কোন দোষ নাই। তোমরা জানিবে আমি তোমাদের, তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই সব! এই যে দুঃখ দেখ, ইহাও তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত; এই যে জগতে প্রলোভনের নানা বস্তু রহিয়াছে, ইহাও তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত; আমার প্রাণ তোমাদের নিমিত্ত সর্বদা ব্যাকুল, তোমরা আর কত কাল আমাকে ভুলিয়া থাকিবে?"*

শ্রীগৌরাঙ্গের সর্বাঙ্গের সর্বাঙ্গ চন্দনে চর্চিত, সর্বাঙ্গ ফুলের মালা, রক্তবর্ণ নয়ন দিয়া শত সহস্র ধারা পড়িতেছে। বাম হস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে দণ্ড; দণ্ডে বঙ্কিমভাবে একটু আশ্রয় লইয়া উপস্থিত জনগণকে বলিতেছেন, "মা! বাবা! আমাকে অনুমতি কর, আমি ব্রজে যাই। মা! বাবা! আশীর্বাদ কর, যেন ব্রজে আমার প্রাণনাথকে পাই। মা! বাবা! যাইবার বেলা আমার আর একটি ভিক্ষা। তোমরা সকলে আমার শ্রীহরিকে ভজন কর, তিনি বড় কৃপাময়।"

হে কৃপাময় পাঠক! তুমি প্রভুকে কি ভিক্ষা দিবে না?—ঐ বেশে তোমার দ্বারে প্রভুকে কি চিরদিন দাঁড় করাইয়া রাখিবে? তখন উপস্থিত সকলেই এই সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, সংসারে থাকিবেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কাঙ্গালবেশ ধরিয়া লোক-সমাজে দাঁড়াইলেন, তখন কি তরঙ্গ উঠিল তাহার একটু আভাষ মাত্র বর্ণনা করা যাইতে পারে, তাহাই করিতে আমি চেষ্টা করিতেছি। মনে কর চতুর্দশ-বর্ষীয়া বালিকা বিধবা হইয়াছে। বালিকার রূপের অবধি নাই, কিন্তু বাহ্য-সৌন্দর্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই। মস্তকে ভুবনমোহন কেশ, কিন্তু উহা এলাইয়া স্কন্ধে পড়িয়াছে। ধূলায় গড়াগড়ি দেওয়ায় কেশ ধূলাবৃত হইয়াছে। বালিকার পরিধানে অপূর্ব পট্টবস্ত্র, সর্বাঙ্গ মণিমুক্তায় ভূষিত। এই অবস্থায় সেই পতিবিয়োগিনী ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল এবং ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া ভক্তিপূর্বক ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "হে ঠাকুর! এই দীন কাঙ্গালিনীকে তোমার অভয়-চরণে স্থান দাও।" তৎপরে অঙ্গের মণিমুক্তা উন্মোচন করিয়া এবং পট্টবস্ত্র ত্যাগ করিয়া ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিল। সেই পট্টবস্ত্র ও আভরণ ঠাকুরের অগ্রে রাখিয়া প্রফুল্ল বদনে বলিতে লাগিল, "ঠাকুর! এ সমুদয় দ্রব্যে আমার আর প্রয়োজন নাই, তুমি ইহা গ্রহণ কর, আর উহার বিনিময়ে আমাকে তোমার শ্রীচরণের ধূলি কর।"

এরূপ দর্শন যাহার ভাগ্যে ঘটে, সে যদি মদ্যপ কি লম্পটও হয়, তবুও সেও তদ্দণ্ডে সঙ্কল্প করে যে, সে আর তুচ্ছ সুখের নিমিত্ত কুকর্ম করিবে না। যদি কন্যার পিতা, মাতা কি অন্যান্য নিজজনে এই চিত্রদর্শন করেন, তবে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সংসারে ঔদাস্য অসে ও শ্রীভগবানে মন অকৃষ্ট হয়। নবীন-সন্ন্যাসীকে দেখিয়া জীব সকল কান্দিয়া আকুল হইলেন। সকলেই ভাবিলেন যে, আর বাড়ী যাইবেন না। তখন পিতা আপনার পুত্র, স্ত্রী আপনার স্বামী, রুগ্ন আপনার রোগ, কুলবধূ আপানার লজ্জা, বণিক আপনার ধন তুলিলেন!

* আমি প্রাণের অধিক ভালবাসি যারে। আমি জানি সে ত ভালবাসে না আমারে।
লক্ষ লক্ষ জনম গেল, তবু মোরে না খুঁজিল, পরাণ শুকায়ে গেল, মরি আছি রে।।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অমন করে যাস্ না, যাস্ না, ধীরে ধীরে চল, গজগামিনী ।ধ্রু।

তুই, নয়ন মুদে চলে যাবি। প্রেমের দায়ে কি প্রাণ হারাবি।। (রাই উন্মাদিনী)

শ্রীগৌরাঙ্গ জীবগণের নিকট কৃষ্ণ-ভজন ভিক্ষা ও তাঁহাদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়াই পশ্চিমাভিমুখে দৌড় মারিলেন। পূর্বে ঐরূপ একবার দৌড় মারিয়াছিলেন, কিন্তু দণ্ড-কমণ্ডলু গ্রহণ করিতে প্রত্যাবর্তন করেন। এবারেও দৌড় মারিলেন। বার বার দৌড় মারিতেছেন কেন? মনের ভাব যে, এক নিশ্বাসে বৃন্দাবনে যাইবেন, আর বিলম্ব সহিতেছে না।

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ পশ্চিম দিকে দৌড় মারিলেন, তখন গদাধর প্রভুর নিষেধ নিমিত্ত যাইতে পারিলেন না, এবং নরহরি, দামোদর, বক্রেশ্বর প্রভৃতি অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিতাই, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িলেন। আর সেই লোক-সমুদ্র প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িল। হে ভক্ত! এই পদটি কি শ্রবণ করিয়াছেন?—

"উভ হাতে শঙ্কর* বলে। রথ রাখ যমুনার কূলে।।"

এই লক্ষ-লোকে "দাঁড়াও" "দাঁড়াও" বলিয়া প্রভুর পশ্চাতে "উভ হাতে" ডাকিতে ডাকিতে দৌড়িলেন। তাঁহারা বলিতেছেন, "প্রভু দাঁড়াও, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব। আমাদের কোথা ফেলিয়া যাও?"

সকলেরই মনে বোধ হইল যে, তাঁহাদিগকে ফেলিয়া যাওয়া প্রভুর নিতান্ত অস্বাভাবিক কার্য হইতেছে। নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁহাদের তখন চিরদিনের নিমিত্ত বন্ধন হইয়া গিয়াছে। তখন তাঁহারা নিমাইয়ের, নিমাই তাঁহাদের। কাজেই তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া নিমাইয়ের গমন তাঁহাদের নিকট যেন নির্মমতার কার্য বোধ হইতেছে। নিমাইকে রাখিবার চেষ্টা করিয়া রাখিতে পারিলেন না। নিমাই চলিলেন। তখন সকলে বলিতেছেন, "তুমি চলিলে ভাল, আমাদেরও নিয়া চল, আমাদের কার কাছে রাখিয়া যাও?"

যখন সেই লোক-সমুদ্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথমে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু অধিক দূরও যাইতে পারিলেন না। যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করেন, তখন গোপীরা রথের অগ্রে পথে শয়ন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বন্ধু! যদি নিতান্তই যাইবে, তবে তোমার রথ আমাদের হৃদয়ের উপর দিয়া গমন করুক।" তখন শ্রীকৃষ্ণ কাজেই রথ হইতে নামিয়া, তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া, তাঁহার রথের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিলেন যে, তাঁহার বৃন্দাবনের পথ লোকে বদ্ধ করিয়াছে। লোকের ভিড়ে তাঁহার যাইবার পথ নাই, সহস্র সহস্র লোক তাঁহার গমন-পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

তখন তিনি অতি মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া, যাইবার পথ করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "বাবা! মা! তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাময়, তোমাদের কৃপা করুন। তোমরা গৃহে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন কর। আমিও শ্রীকৃষ্ণ ভজনের নিমিত্ত চলিলাম। আমি অল্প বয়সে সন্ন্যাস করিলাম, তোমরা আশীর্বাদ কর, যেন আমি হাস্যাস্পদ না হই, আর যেন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে পাই।"

এই কথা বলিতে বলিতে, নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, ভারতী প্রভৃতি আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। কেশব ভারতী বলিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য! আমি তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছি না, অমি তোমার সঙ্গে যাইব, আমাকে তুমি অনুমতি কর।" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "গোসিঞির যে আজ্ঞা।"

*পদকর্তার নাম "শঙ্কর"।

তখন প্রভু চন্দ্রশেখরকে সম্মুখে দেখিলেন। চন্দ্রশেখর শচীর ভগ্নীপতি, শচীর বাড়ীর নিকট বাস করেন,—প্রভুর একমাত্র নিজ-জন। ভগ্নীপতি চন্দ্রশেখরকে শচী আপনি পাঠাইয়াছেন। কেন? না—আব কাহাকেও তাঁহার বিশ্বাস নাই। সকলে জুটিয়া তাঁহার নিমাইকে পাগল করেছে, পাগল করে ঘরের বাহির করেছে,—এই তাঁহার মনের সন্দেহ। সুতরাং নিমাইকে বাড়ীতে ফিবাইয়া আনিতে আর কাহাকেও পাঠাইতে বিশ্বাস হয় নাই। যদি তাঁহার পতি জগন্নাথ মিশ্র বাঁচিযা থাকিতেন, তবে তাঁহাকেই পাঠাইতেন। তিনি নাই, কাজেই তাঁহার ভগ্নীপতি চন্দ্রশেখরকে পাঠাইয়াছেন। সেই চন্দ্রশেখর কোথায় নিমাইকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন; তাহা ত করিতে পাবেনই নাই, অধিকন্তু নিমাইকে আপনি হাতে সন্ন্যাসী করিয়াছেন। চন্দ্রশেখর আপনাকে শ্রীনন্দের ন্যায় দুর্ভাগ্য ভাবিতেছেন। যশোদা নন্দের হাতে দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় পাঠাইয়া দেন। নন্দ পুত্রকে মথুরায় হারাইযা বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর ভাবিতেছিলেন, "আমার শুধু হাতে নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইতে হইবে। শচী দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'কৈ, আমার নিমাই কৈ?' বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসু হইয়া আমার মুখপানে চাহিবেন,—তখন আমি কি বলিব?" একবার ভাবিতেছেন, গঙ্গায় প্রবেশ করিবেন; আবার ভাবিতেছেন, নিমাইয়ের সঙ্গে যাইবেন।

নিমাই ও চন্দ্রশেখর চারি চক্ষে মিলন হইল। নিমাই এ পর্যন্ত রাধাভাবে আপনাকে হারাইয়া বসিয়া আছেন। প্রাণেশ্বরের নিকট শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন, এই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া দেহ-ধর্ম পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু যে মাত্র চন্দ্রশেখরে ও তাঁহাতে নয়নে নয়নে মিলন হইল, তাহাতে কি হইল?—"অমনি মনে পড়িল নদেভূম।" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জন্মভূমি, তাঁহার আরামের বাড়ী, তাঁহার বাড়ীর সুখের মালঞ্চ, তাঁহার গঙ্গার পুলিন, তাঁহার সমুদয় খেলার স্থান, তাঁহার প্রাণাধিক ভক্তগণ, তাঁহার পুত্র-বৎসলা মাতা, তাঁহার প্রাণ হইতে প্রিয়তমা নবীনা ভার্যা,—এ সমস্ত তাঁহার হৃদয় আকাশে একেবারে উদয় হইল।

মুক্ত-জীবের ন্যায় সুন্দর ও মনোহর বস্তু ত্রিজগতে আর নাই, কিন্তু মুক্তজীব হইতে মুগ্ধ-ভগবান্ আরও মনোহর ও সুন্দর। অর্থাৎ জীব মুক্ত হইয়া সুন্দর হয়েন, আর শ্রীভগবান্ মায়ামুগ্ধ হইয়া সুন্দর হয়েন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-ধারার স্থানে নয়নাশ্রুর সৃষ্টি হইল। নিমাই আপনি বসিলেন, আর দুই হস্তে চন্দ্রশেখরকে ধরিয়া আপনার সম্মুখে বসাইলেন; এবং বাহুদ্বারা তাঁহার গলাটী ধরিয়া গদগদ ভাবে বলিতে লাগিলেন, "বাপ! শিশুকালে যখন আমার পিতৃবিয়োগ হয়, তখন তুমি আমার পিতার কার্য করিয়াছিলে। এখন তুমি আমার বন্ধন মোচনের সহায়তা করিয়া নিঃস্বার্থ সুহৃদের কার্য করিলে। বাপ! তুমি বাড়ী যাও, যাইয়া আমার জননীকে সান্ত্বনা করিও। দেখিও যেন তিনি আমার বিরহে প্রাণে না মরেন। আর যাহারা আমার নিমিত্ত দুঃখ পাইবেন, তাঁহাদের সকলকে আমার মিনতি জানাইয়া বলিও যে, তাঁহাদের নিমাই এজন্মে কেবল তাহার নিজ-জনকে দুঃখ দিতে জন্মিয়াছিল! তাঁহাদিগকে বলিবে, তাঁহাদের নিমাই আর ঘরে যাইবে না। তাঁহাদিগকে আরও বলিবে যে, নিমাই যেদিন গদাধরের পাদপদ্ম দেখিয়াছে, সেইদিনই তাহাতে তাহার প্রাণ মিশিয়া গিয়াছে, আর—যার নিমাই তারই হয়েছে।" যথা—"আর ত ঘরে যাবুই না।ধ্রু।

তোমরা গৃহে যেয়ে ইহাই বলো। এত দিনে, যার রাধা তারি হলো।।
যদি আমার কথা বাড়ী পুছে। বলিও, পাদপদ্ম পেয়ে মিশায়েছে।।"

এই কথা বলিতে বলিতে নিমাইয়ের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি তখন বিহ্বল হইয়া চন্দ্রশেখরকে, এবং তিনি যাহা ও যাহাদের, এ সমুদয় একেবারে ভুলিয়া গেলেন। এমন কি, আপনাকেও ভুলিলেন. তখন, "প্রাণবল্লভ! আমি এই আইলাম" বলিয়া আবার দৌড়িলেন। ইহাতে সেই সমুদয় লোক তাহার পশ্চাতে দৌড়িল, মনে হইল এই লোকসমূহকে যেন তিনি

বান্ধিয়া লইয়া চলিয়াছেন। কাটোয়ার পশ্চিমে তখন বন ছিল। প্রভু সেই বনে প্রবেশ করিলেন, লোকেরাও প্রবেশ করিল। প্রভু ক্রমেই নিবিড় বনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের সংখ্যা ক্রমেই কমিতে লাগিল। কারণ তাহারা প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিতেছিল না।

প্রভু কটির ডোরে কমণ্ডলু বাঁধিয়া, আর হাতে দণ্ড লইয়া দৌড়িয়াছেন। প্রভু যেমন দৌড়িতেছেন, কটিতে তেমনি করঙ্গ দুলিতেছে। তিনি বিদ্যুতের ন্যায় দৌড়িতেছেন, আর লোকসকল পাছে পড়িয়া থাকিতেছে। শেষে তিনি—নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ ব্যতীত অপর সকলের আঁখির বাহির হইলেন। এই কয়েকজনের ভয় যে, প্রভু একবার নয়নের অন্তরালে গেলে আর তাঁহাকে ধরিতে পারিবেন না। তাই তাঁহারা প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত দৌড়িয়া না পারিয়া পশ্চাৎ হইতে ডাকিতেছেন "প্রভু! ধীরে গমন করুন। আমরা আর দৌড়িতে পারিতেছি না। হে আমার প্রাণের ভাই! তোমার অভাগা ভাইকে ফেলিয়া কোথায় যাইতেছ?" আবার জিভ কাটিয়া ভাবিতেছেন, "আমার ভাই! আমার ভাই কে? আমি কাহাকে ভাই বলিতেছি? উনি না শ্রীভগবান্? ভাই বলে আর ডাকিব না, প্রভু বলে ডাকিব। আমার প্রভু দয়াময়, ভবসাগরের কাণ্ডারী, আমাকে ভবসাগর পার করাইতে বলিব।" ইহাই ভাবিয়া ডাকিতেছেন, "হে প্রভু! হে দীননাথ! হে কৃপাসাগর আমি দীন, আমি ভবসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি, আমাকে উদ্ধার না করিয়া কোথা যাইতেছ?" পাঠক এখন বুঝিতেছেন যে, নিতাইয়ের তখন সহজ জ্ঞান এক প্রকার লোপ পাইয়াছে। নিতাই যে এত ডাকিতেছেন, ইহাতে প্রভু "হাঁ" কি "না" কিছুই বলিতেছেন না। এমন কি, তিনি যে সে ডাক শুনিতে পাইতেছেন, তাহাও বোধ হইতেছে না। প্রভু একমনে দৌড়িতেছেন। ভক্তগণের মধ্যে কেবল নিতাই প্রভুর পশ্চাতে, অল্প দূরে; আর সকলে এত দূরে পড়িয়া গিয়াছেন যে, কখন কখন নিমাই ও নিতাই উভয়েই তাঁহাদের নয়নের বাহির হইতেছেন। কিন্তু তবু নানা প্রকারে আবার তাঁহারা প্রভুর দর্শন পাইতেছেন যেহেতু, প্রভু সোজা পথে না যাইয়া, কখন পশ্চিম, কখন বা পূর্বমুখো যাইতেছেন। তখন তাঁহার দিগ্বিদিক জ্ঞান কতক রহিত হইয়াছে।

এদিকে কাটোয়াবাসীগণ প্রভুকে হারাইয়া, যেমন দেবী-বিসর্জন দিয়া লোকে বিষণ্ণচিত্তে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করে, সেইরূপ শোকাকুল হইয়া গৃহে ফিরিলেন। বাড়ীতে আসিতে কাহারও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ক্রমে, ধীরে ধীরে একে একে সকলেই গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সকলেরই মনে কি দেখিলেন তাহাই কেবল জাগিতেছে। সংসারের কিছু ভাল লাগিতেছে না। সকলেরই প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে, কেহ বা নীরবে বসিয়া রোদন করিতেছেন। যাঁহারা প্রভুর সন্ন্যাস দর্শন করিলেন, তাঁহাদিগকে আবার যাঁহারা দর্শন করিলেন, তাঁহাদেরও চিত্ত নির্মল হইল। কাটোয়ার ও কাটোয়ার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান এইরূপে পবিত্র হইল। সে তরঙ্গের লহরী অদ্যাপি সেখানে আছে, অদ্যাপি সেখানে পাষাণসদৃশ জীবও গমন করিলে দ্রবীভূত হয়েন; কেহবা কিছুকালের নিমিত্ত একেবারে উন্মাদ হন। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য পাগল হইয়া, "চৈতন্য" "চৈতন্য" বলিতে বলিতে বাহির হইলেন। তাঁহার এক বুলি হইল "চৈতন্য"! কোন কথা কহিলেই, তিনি কেবল "চৈতন্য" এই কথা বলিতে লাগিলেন। সাত দিবস পরে তাঁহার নয়নে জল আসিল, আর তাঁহার ঘরণী তাঁহাকে দুটো অন্ন খাওয়াইলেন। কিন্তু তাঁহার নাম আপনা আপনি সাধ করিয়া, "চৈতন্যদাস" রাখিলেন।

পুরুষোত্তম আচার্য প্রভুর সর্বাপেক্ষা মর্মী-ভক্ত। প্রধানতঃ তাঁহাকে লইয়া প্রভু নবদ্বীপে ব্রজলীলা আস্বাদন করিয়াছিলেন। তিনি এক অপূর্বভাবে অভিভূত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠুরতায় শ্রীমতী ক্রোধ করিয়া সখীকে বলিয়াছিলেন, "সখি! আর শ্রীকৃষ্ণকে ভজিব না। যাহাতে হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ উদ্দীপ্ত হয়, তাহাও নিকটে রাখিব না। আমি সেই নিমিত্ত কেশ মুণ্ডন করিব, নীল সাটী ত্যাগ করিয়া গেরুয়া বসন পরিব।" সখী বলিলেন "শ্রীমতি! শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া তুমি

কাহাকে ভজিবে?" তাহাতে শ্রীমতী বলিলেন, "মহেশকে ভজিব, গণেশকে ভজিব। তাঁহারা দয়াময়, ভক্তের দুঃখ বুঝেন। যাহা চাহিব তাহাই পাইব। আমি প্রীতির লাগি, সব ত্যাগ করিলাম। আমি সেই এক বিন্দু প্রীতির আশায়, চাতকিনীর ন্যায়, সব জলে ভাসাইয়া দিলাম। আমি মোমের বাতি জ্বালাইয়া কুঞ্জে বসিয়া রহিলাম, আর আমার নিঠুর-বন্ধু আমার উদ্দেশ্য না লইয়া, যাহারা প্রীতির মর্ম জানে না, সেই সমুদয় রমণীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। অতএব প্রীতির ভজন বিড়ম্বনা মাত্র। আমি অদ্যাবধি সিদ্ধিদাতা গণেশের ভজনা করিব।"* কিন্তু, শ্রীমতীর যে অন্যায় ক্রোধ, তাহা সখীরা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। আর সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রীমতী অন্যায় কার্য করিয়াছিলেন। যেহেতু কাহার সাধ্য যে, শ্রীভগবান্‌কে "নিঠুর" বলে? কাহার সাধ্য যে তাঁহাকে বলে, "তোমাকে আমি চাহি না, তুমি দূর হও।" প্রীতির ভজন করিয়াই ত ত্রিভুবনের মধ্যে শ্রীমতী এই অধিকার পাইয়াছিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবেরা ধন্য! অন্যে প্রেমময়, দয়াময় বলিয়া শ্রীভগবানকে স্তুতি করেন। অন্যে তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত বহু দুঃখ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবেরা শ্রীমতীর দ্বারা তাঁহাকে "নিষ্ঠুর" "নিদয়" বলাইলেন, তাঁহাকে শ্রীমতীর পায়ে ধরাইলেন, গোপীর প্রীতির নিমিত্ত তাঁহাকে পাগল করাইলেন। অন্যে শ্রীভগবানের তল্লাস করিয়া বেড়ান, আর বৈষ্ণবেরা শ্রীভগবানের দ্বারা বিষণ্ণচিত্তে শ্রীমতীকে তল্লাস করাইয়া থাকেন। শ্রীভগবানের ক্রোধ হইবে, এই ভয়ে অন্যের মুখ শুকাইয়া যায়, আর বৈষ্ণবগণের যে শ্রীভগবান্, তিনি, শ্রীমতীর ক্রোধ হইবে এই ভয়ে, তাঁহার সম্মুখে করজোড়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকেন। প্রীতি যে সর্বাপেক্ষা শক্তিধর বস্তু, যাহার জন্য শ্রীভগবান্ শ্রীমতীকে "দাসখত" লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ যখন নবদ্বীপে মানদণ্ড আস্বাদন করেন ও করান, তখন তাহা ভক্তগণকে দেখাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দূত ভাবিয়া তিনি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে বাড়ীর বাহির করেন, তাহাও পাঠক মহাশয়ের অবশ্যই স্মরণ আছে। এখন প্রভুর ভক্ত পুরুষোত্তম আচার্য দেখাইতেছেন যে, শ্রীমতীর মান কবির কল্পনা নয়; প্রকৃত পক্ষে অতি-প্রীতিতে শ্রীভগবানের প্রতি ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে।

শ্রীনিমাই যখন মস্তক মুণ্ডন করিলেন, তখন পুরুষোত্তম আচার্য ভাবিলেন যে, এরূপ নির্দয় প্রভুকে ভজন করিতে নাই। যিনি কার্য উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহার ভক্তগণকে এরূপ মর্মে আঘাত করিতে পারেন, তাঁহাকে বুদ্ধিমান লোকের মন প্রাণ সমর্পণ করিতে নাই। ইহাই ভাবিয়া পুরুষোত্তম ক্রোধ করিয়া, যে দেশে নিমাইয়ের কথা নাই, যে নগরের সাধুগণ ভক্তিধর্মকে ঘৃণা করেন, সেই বারাণসী নগরীতে দ্রুতবেগে গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বিরুদ্ধমত, অর্থাৎ "আমিই তিনি", এই ধর্ম অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল "স্বরূপ দামোদর।"

ইঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে পূর্বে একবার ভক্তগণকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। হে জীব! তাঁহার কার্য বিচার কর। শ্রীভগবানের উপর শ্রীমতী প্যারী ক্রোধ করিয়া, তাঁহাকে কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া দেন, একথা কে বিশ্বাস করিতে পারিত? জীব কি কখন ভগবানের উপর ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে?

এই পুরুষোত্তম,—শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব, অর্থাৎ "শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ এক দেহে মিলিত"—এই শাস্ত্র প্রচার করেন। ইঁহাদের শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি যেরূপ অটল বিশ্বাস, সেরূপ প্রভুর কোটি কোটি ভক্তের মধ্যে অপর কাহারও ছিল না। এই স্বরূপ দামোদর,—যিনি প্রভুকে সর্বান্তঃকরণে জানিতেন যে, তিনিই পূর্ণব্রহ্ম ও সনাতন এবং ত্রিভুবনবাসী সকলের উপরের কর্তা,—ক্রোধ করিয়া সেই প্রভুকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।

* ওরে নামে নাই মোর কাজ। (ওকে যেতে বল আমার কুঞ্জ হতে)
আমি জ্বালিয়া মোমের বাতি। জাগিয়া পোহানু রাতি।।

হে জীব! স্বরূপ যাহা করিলেন, এরূপ মনুষ্য কখন যে করিতে পারে, তাহা কেহ বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার কার্য্যটি মনে একবার অনুভব কর, তাহা হইলে, শ্রীভগবানে ও তাঁহার ভক্তে কিরূপ প্রেমেব খেলা তাহা বুঝিতে পারিবে। কলহ ও প্রীতি এই দুটি এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যে স্থলে বিশুদ্ধ প্রেম, সেখানেই কলহ। যেখানে কলহ নাই, সেখানে জানিবে যে প্রীতির সহিত একটু ভক্তি মিশান আছে। এমন হইতে পারে যে, পতি পত্নীতে অতিশয় প্রেম আছে, অথচ কলহ একেবারে নাই। সেখানে একজন অপরকে অতিশয় ভক্তি করেন, অর্থাৎ মনে মনে আপন অপেক্ষা বড় ভাবেন। শ্রীভগবানের উপর জীবের ক্রোধ অসম্ভব। কিন্তু অতি প্রেমে অন্ধ করে, তাই শ্রীভগবানের উপর জীবের ক্রোধ অসম্ভব। কিন্তু অতি প্রেমে অন্ধ করে, তাই শ্রীভগবানের উপর জীবের ক্রোধ সম্ভব হয়। প্রেমে অন্ধ করে, করিয়া ক্রোধের সৃষ্টি হয়। এই প্রেম-কলহে প্রীতির বর্ধন হয়, তাহা সকলে জানেন।

নিত্যানন্দই শ্রীগৌরাঙ্গের পশ্চাৎ যাইতে পারিতেছেন, অন্য কোন ভক্ত পারিতেছেন না। প্রভু মধ্যে মধ্যে বিপরীত পথে যাইতেছেন, আর মূর্চ্ছিত হইয়া নিশ্চল ভাবে পতিত হইতেছেন বলিয়া, তাঁহারা তাঁহার লাগ পাইতেছেন, নতুবা তাহাও পাইতেন না। আমার অভিন্ন-কলেবর বলরাম দাস দুরন্ত মাঠে প্রভুদ্বয়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এই কবিতাটি লিখিয়াছেন ঃ

নবীন যৌবন, গলিত কাঞ্চন, কটি বেড়া রাঙ্গা বাস।
সন্ন্যাস করিয়া, করঙ্গ বান্ধিয়া, ধায় গোরা উর্ধ্বশ্বাস।।
কটির দড়িতে, করঙ্গ ঝুলিছে, হাতে দণ্ড করি ধায়।
কে জানে তার মন, ভাবেতে বিভোর, কোথা যায় গোরারায়।।
লক্ষ লক্ষ লোক, সকলি উন্মত্ত, ধূলায় পড়িয়া কান্দে।
শুদ্ধ নিতাইর, চক্ষে নাহি পাণি, দৃষ্টি বাঁধা গোরাচাঁদে।।
গোরা ধেয়ে গেল, চকিতের মত, নিতাই দেখিল চখে!
গৌরাঙ্গ দৌড়িল, নিতাই ধাইল, সদা চোখে গোরা রেখে।।
নিত্যানন্দ সনে, আর তিন জনে, পাগলের মত ধায়।
নয়ন মুদিয়া, নিতাই দৌড়িছে, দিক্-বিদিক্ জ্ঞান নাই।।
নিতাই কাতর, দৌড়িবারে নারে, কিন্তু বিশ্রামিতে নারে।
মাত্র এক বার আড়াল হইলে, ধরিতে নারিবে তাঁরে।।
নিমাই চলিছে, বিদ্যুতের মত, নিতাই চলিতে নারি।
প্রভু প্রভু বলি, ডাকে উচ্চৈঃস্বরে, দাঁড়া ভাই কৃপা করি।।
আছাড়ে আছাড়ে, হাড় ভাঙ্গি গেল, আমি তোর বড় ভাই।
তুহার সন্ন্যাসে, ভুবন আঁধার, চোখে না দেখিতে পাই।।
তুমি ফেলে গেলে, আমি তো না পারি, আর মোর নাহি কেহ।
কৌপীন পরেছ, ভালই করেছ, আমা সঙ্গে করি লহ।।
বিভোর নিমাই, আপনাতে নাই, কোথা কি উত্তর দিবে।
নাহি কিছু জ্ঞান, উত্তান নয়ন, নিমাই ভুলেছে সবে।।
নিতাই ভাবিছে, ভাই বলি মিছে, ভাই বলি না পাইব।
পতিত পাবন, কাঙ্গালের ধন, বলি এবে সে ডাকিব।।
"কোথা দীন-বন্ধু, অধম নিতাই, বড় দুঃখে ডাকে তোরে।
দীন-বন্ধু নাম, সফল করহ, এ হেন কাঙ্গাল তরে।।"
এ হেন সময়, ভাবেতে গৌরাঙ্গ, মুরছিয়া পড়ে ধরা।
পড়িতে পড়িতে, ধরিল বাহুতে, উত্তান নয়ন গোরা।।

কোলে শোয়াইল, ফেন বহে মুখে। হতাশ নিতাই, জল নাহি চোখে।।
জল বিন্দু নাই, বাঁচাই নিমাই। "এক বিন্দু জল, এনে দে রে ভাই।।"
দুরন্ত সে মাঠ, কোথা লোক জন। নিতাই চাহিছে, শুনে কোন জন।।
ওষ্ঠাগত প্রাণ কথা নাহি সরে। নিতাই'র হিয়া, যায় বিদরিয়ে।।
বলে, "আয় আয়, আয় জীবগণ। তোদের কামনা, হইল পূরণ।।
দীন দয়াময়, গোলক-আশ্রয়। সন্ন্যাস করিয়া, শোয়ালি ধরায়।।
ধিক্ ধিক্ ধিক্, তু মানুষ জাতি। নিদয় নিষ্ঠুর, চির-বন্ধু-ঘাতী।।
তোরা ত আনিলি, নদিয়া হইতে। তোরা সবে দিলি, দণ্ড প্রভু হাতে।।"
উঠিল গৌরাঙ্গ, চাহে ইতি-উতি। আবার ধাইল, বৃন্দাবন প্রতি।।
যদি না গৌরাঙ্গ, সন্ন্যাসী হইত। তবে কি জীব, হরি নাম নিত?

প্রভু মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান লাভ হইল না। তাঁহার সঙ্গী ভক্তগণের উদ্দেশ্য লইলেন না, উঠিয়াই আবার দৌড়িতে লাগিলেন। প্রভুর ক্লান্তি নাই; ভক্তগণ কিন্তু ক্লান্ত হইতেছেন। সন্ধ্যার পূর্বে প্রভু এমনি দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন যে, শ্রীনিত্যানন্দও তাঁহাকে হারাইলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। ভক্তগণ বিষণ্ন মনে দাঁড়াইলেন;—কিন্তু প্রভু নাই!

তাঁহারা সম্মুখের গ্রামে প্রবেশ করিলেন, বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ কোন উদ্দেশ বলিতে পারিল না। ভক্তগণ সে স্থান ছাড়িয়াও যাইতে পারেন না, প্রভু যদি তাহার নিকট কোথাও থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তগণকে আশ্বাস দিতেছেন; বলিতেছেন, "ইহা কি হইতে পারে? প্রভু আমাদিগকে ফেলিয়া যাইবেন, ইহা কিরূপে হইবে?" সারানিশি সকলে বসিয়া. কাহারও আহার নিদ্রা নাই। রাত্রি শেষ হইতেছে, সমস্ত জগৎ নীরব; এমন সময় তাঁহারা কাতরধ্বনি শুনিতে পাইলেন, এবং উহা লক্ষ্য করিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রবর্তী হইলেন। তখন শুনিলেন, কেহ যেন করুণস্বরে রোদন করিতেছেন। তখনি বুঝিলেন যে, আর কেহ নয়, প্রভুই রোদন করিতেছেন। কারণ ওরূপ করুণ-স্বরে রোদন করে, ত্রিজগতে আর কাহার সাধ্য? যেমন স্ত্রীলোক বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দে, সেইরূপ অতি করুণ স্বরে,—যে স্বরে সমস্ত ত্রিভুবন কারুণ্যরসে পরিপ্লুত করে,—প্রভু অনেক দূরে কান্দিতেছেন। ভক্তগণ ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া দৌড়িয়া মাঠের মধ্যে গমন করিলেন; তখন শুনিলেন, একটি অশ্বত্থবৃক্ষতল হইতে ধ্বনি আসিতেছে। তাঁহারা আরও দৌড়িলেন; নিকটে গমন করিয়া দেখেন যে, তাঁহাদের জীবনের জীবন প্রভু, শূন্য গায়ে একখানা কৌপীন মাত্র পরিধান করিয়া, বাম হস্তে গণ্ড রাখিয়া, আত্মহারা হইয়া চীৎকার করিয়া রোদন করিতেছেন। আর রোদন করিতে করিতে বলিতেছেন, "কৃষ্ণ! আমাকে কি দর্শন দিবে না?" আবার বলিতেছেন, "আমি যে আর সহিতে পারিতেছি না! আমি কোথা যাবো? কোথা গেলে তোমাকে পাবো? কৃপাময়! আমাকে কি তুমি আর দেখা দিবে না? তুমি ত আমার মন জানো? আমার মন যে আমার কথা শুনে না! আমার মন যে তোমার প্রতি ধায়! আমি ত কত করিয়াও মনকে নিবারণ করিতে পারিলাম না।"

ভক্তগণ প্রভুর দশা দেখিয়া, রোদন শুনিয়া, ও কি বলিয়া রোদন করিতেছেন তাহা শুনিয়া, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, প্রভু করেন কি? এরূপ করিতে থাকিলে কি করিয়া জীব উদ্ধার হইবে? সমস্ত জগৎ যে বিগলিত হইয়া যাইবে?*

*এই স্থানটিকে "বিশ্রামতলা" বলিয়া বোধ হয়। লোচনের বাসস্থানের অর্থাৎ কো গ্রামের নিকট বিশ্রামতলা বলিয়া যে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে, তাহার তলায় প্রভু বসিয়াছিলেন। এই প্রাচীন বৃক্ষের তলদেশ পবিত্র স্থান বলিয়া ভক্তগণ অদ্যাপিও সেখানে গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। সেখানে গৌর-মন্দিরও স্থাপিত হইয়াছে।

একটু পরে প্রভু আবার উঠিলেন, উঠিয়া আবার পশ্চিম মুখে চলিলেন। ভক্তগণ যে তাঁহার নিকট আছেন, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। কারণ বাহ্য-জগতের সঙ্গে তখন তাঁহার সম্বন্ধ অতি অল্পমাত্র ছিল, এবং যেটুকু ছিল, ক্রমে তাহাও গেল। পূর্বে কখন নয়ন মেলিয়া, কখন বা মুদিয়া, গমন করিতেছিলেন। কিন্তু যখন বাহ্যজ্ঞান একেবারে লোপ পাইল, তখন স্থির-নয়ন হইল, তারা ঊর্ধ্বে উঠিল, আর উহা অল্পমাত্র দেখা যাইতে লাগিল। প্রভু তখন যে বাহিরের আর কিছু দেখিতে পাইতেছেন না, তাহা তাঁহার পদচালনাতে বুঝা যাইতেছিল। চক্ষু মুদিয়া যদি কেহ হাঁটিতে থাকে কি নিদ্রিতাবস্থায় যদি কেহ পদবিক্ষেপ করে, তাহাতে তাহার যেরূপ পদে পদে পদস্খলন হয়, প্রভুরও তাহাই হইতে লাগিল। প্রভুর পরিধানে কৌপীন ও বহির্বাস, অঙ্গে বস্ত্র নাই, তবে কি আছে, না—ধূলা-মাখা। ধূলা কোথা হইতে আসিল? পদস্খলন হওয়ায় প্রভু কখন মৃত্তিকায় পড়িয়া যাইতেছেন, কখন বা একেবারে জ্ঞানহারা হইয়া ধূলায় পড়িতেছেন। পশ্চাতে নিত্যানন্দ প্রভৃতি বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। কখন করিতে পারিতেছেন, কখন বা পারিতেছেন না। প্রভুর স্থির-চক্ষু ঊর্ধ্বে স্থাপিত, কটিতে করঙ্গ ঝুলিতেছে, আর উহা শ্রীঅঙ্গে বার বার আঘাত করিতেছে দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখ পাইতেছেন। প্রভুর মূর্চ্ছিত অবস্থায় উহা খুলিয়া লইতেও সাহস হইতেছে না।*

প্রভু চক্ষে দেখিতেছেন না, কর্ণে শুনিতেছেন না; এই যে তাঁহার শরীরে ব্যথা বোধ নাই, এই যে ক্ষুধা কি তৃষ্ণা বোধ নাই, নিদ্রা কি ক্লান্তি বোধ নাই, কিন্তু তত্রাচ ভিতরটি যে সম্পূর্ণরূপে সজীব রহিয়াছে, তাহা তাঁহার অপরূপ প্রলাপ দ্বারা জানা যাইতেছে।

যাঁহারা যোগী, তাঁহারা নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা ক্রমে ঈশ্বরেতে মন নিযুক্ত করেন। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারাও এই যোগ্যভ্যাস অর্থাৎ মন সংযম করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যোগীগণের উপায় অবলম্বন করেন না। জীবাত্মা দেহকে সজীব করেন, আর পরমাত্মা জীবাত্মাকে সজীব করেন। জীবাত্মার প্রীতি দেহের সঙ্গে, আর পরমাত্মার প্রীতি জীবাত্মার সঙ্গে। এই জীবাত্মাকে লইয়া দেহ ও পরমাত্মা টানাটানি করেন। জীবাত্মা স্ত্রীলোক,—দেহ তাহার উপ-পতি আর পরমাত্মা পতি। জীবাত্মাকে দেহের সহিত অল্পে অল্পে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া পরমাত্মার সহিত মিলন করাকেই "যোগ" বলে। জ্ঞানী-লোকের পরমাত্মা তেজোময় আকাশ, আর ভক্তের পরমাত্মা পরমসুন্দর নবীন-পুরুষ। জ্ঞানী-লোক মারিয়া ধরিয়া ধমকাইয়া ও জোর করিয়া, কুলটারূপ জীবাত্মাকে দেহরূপ উপ-পতি হইতে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া, তাঁহাকে (জীবাত্মাকে) পতির (পরমাত্মার) সহিত মিলাইতে চাহেন।

জীবাত্মারূপ কুলটা, দেহরূপ উপ-পতির সঙ্গসুখে এত মোহিত হইয়া থাকেন যে, সেই দেহরূপ উপ-পতি যে অল্পদিনের বই নয়, ও পরিণামে দুঃখের কারণ হয়, তাহা ভুলিয়া যান। এই নিমিত্ত জ্ঞানীলোকে জীবাত্মাকে শাসন করেন। কিন্তু ভক্তগণ জীবাত্মাকে শাসন না করিয়া তাহাকে পরমাত্মার রূপে গুণে মোহিত করেন, এবং এইরূপে দেহের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া, শ্রীভগবানের সহিত তাহার মিলন করাইয়া দেন। আরো একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। জ্ঞানী জনে, জীবাত্মা কুলটাকে দেহরূপ উপ-পতি হইতে কোন সুখ ভোগ করিতে না দিয়া, পরমাত্মারূপ পতির সহিত তাঁহার "যোগ" ঘটান। কিন্তু ভক্তগণ, পরমাত্মারূপ তাঁহার পতি

* অগ্রে পশ্চাতে কিছু না করে বিচার।
সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তি হীন কলেবর। কোথা যান ইতি উতি নাহি ত ঠাওর।।
পথ বা বিপথ কিছু নাহিক জোয়ান। পথ পানে নাহি চান ঘূর্ণিত নয়ন।।
কখন উন্মত্ত প্রায় উঠেন ঊর্ধ্বস্থানে। কখন বা গর্তে পড়ে তাহা নাহি জানে।।
চলি চলি কখন পড়েন যাই জলে। কখন প্রবেশে বনে চক্ষু নাহি মিলে।।
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক)

যে দেহরূপ উপ-পতি হইতে অধিক সুখকর, ইহা দেখাইয়া পতির সহিত তাঁহার মিলন করান। জ্ঞানী লোকে সেই নিমিত্ত দেহরূপ উপ-পতিকে উপবাস প্রভৃতি বহুপ্রকারে দুঃখ দিয়া, উহাকে জীবাত্মা-কুলটার নিকট সুখকর না করিয়া দুঃখকর করেন। কিন্তু ভক্তগণ জীবাত্মা-কুলটাকে দেখাইয়া দেন যে, পরমাত্মারূপ পতি হইতে যে বিমলানন্দ উৎপত্তি হয়, তাহা দেহ-সম্ভোগের সুখ হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীরা সেই নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গুলি ধ্বংস করেন, যাহাতে জীবাত্মা আর দেহ হইতে কোন সুখ না পায়। আর ভক্তগণ ইন্দ্রিয় সজীব রাখিয়া উহা দ্বারা পরমাত্মাকে আস্বাদ করাইয়া, জীবাত্মার উহাতে লোভ জন্মাইয়া দেন। জ্ঞানী-জন, কুপ্রবৃত্তি না হয়, সেই নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে একেবারে নষ্ট করেন। কিন্তু ভক্তেরা ইন্দ্রিয়গুলি ধ্বংস না করিয়া তাহাদিগকে সৎপথে লইয়া যান, ও উহাদের দ্বারা অতি পবিত্র আনন্দ উপভোগ করেন।

জ্ঞানী লোকে তেজ অর্থাৎ শক্তির উপাসনা করেন, এবং তাহাতে যে শক্তি পান, তাহা দ্বারা তাঁহারা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতে পারেন। কিন্তু ভক্তগণ পরম-সুন্দর নবীন-পুরুষকে ভজনা করিয়া, চিরদিনের একটি—"তুমি আমার, আমি তোমার"—সঙ্গী লাভ করেন। সেই সঙ্গী কিরূপ, না—পঞ্চ-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর, ও তাঁহার রূপে নয়ন শীতল, ও অঙ্গ-গন্ধে নাসিকা উন্মাদ করে। আর তিনি কিরূপ, না—সরল, স্নিগ্ধ সুবোধ রসিক ও নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রস্রবণ। এখন গীতার শ্লোক স্মরণ করুন। যথা, আমাকে যে যে-রূপে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেইরূপে ভজনা করি। অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে যিনি যেরূপে ভজনা করেন, তিনি তাহার নিকট সেইরূপ উদয় হন। যিনি জ্ঞানী তিনি তেজরূপ ভগবান, আর যিনি ভক্ত তিনি নবীন-নাগররূপ ভগবান্ পাইয়া থাকেন। যোগীগণ শক্তিসম্পন্ন হয়েন, কারণ তাঁহারা শক্তি প্রার্থনা করেন। কিন্তু ভক্তগণ শক্তি প্রার্থনা করেন না,—তাঁহারা ঐশ্বর্যকে অতি হেয় মনে করেন। কেন? যেহেতু ঐশ্বর্যে সুখ নাই, বরং দুঃখ ও বিপদ আছে। খর্জুর-বৃক্ষ সকল দেশেই আছে। এখানে খর্জুর-বৃক্ষ হইতে রসের সৃষ্টি হয় অন্য দেশে লোকে রস না লইয়া, উহার ফল লইয়া থাকেন। যাঁহারা যোগী, তাঁহারা দেহরূপ বৃক্ষ হইতে ফল লয়েন, যাঁহাবা ভক্ত তাঁহারা রস লয়েন।

ভৃঙ্গ গুণ গুণ করিয়া অতি চঞ্চল ভাবে এদিকে ওদিক উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু যখন মধুপান করিতে ফুলের উপর উপবেশন করে, তখন নিশ্চল ও নীরব হইয়া থাকে। সেইরূপ ভক্তগণের চিত্ত-ভৃঙ্গ যখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মমধু পান করিতে উপবেশন করেন, তখন তাঁহার বাহ্য-জগতের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। তখনই তাহার যোগ-সিদ্ধ হয়। অতএব ভক্তগণও পরম যোগী, অথচ তাঁহাদের যোগাভ্যাস করিতে বনে গমন,কি নানাবিধ কঠোর সাধনের প্রয়োজন করে না। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি আচরিয়া, তাঁহার জীবগণকে দেখাইয়াছিলেন যে, ভক্তগণ পরম যোগী। শ্রীগৌরাঙ্গ এই যে গমন করিতেছেন, বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্কমাত্র নাই; এমন কি, ভক্তগণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়াও তাঁহার সেই অদ্ভুত নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার প্রাণ রসে টলমল করিতেছে। আশ্চর্য এই যে, তখন তাঁহার রাধাভাব একেবারে গিয়াছে, যাইয়া দাস্যভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহা তাঁহার শ্রীমুখের অধস্ফুটিত গোটাকয়েক বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীভাগবতে লেখা আছে যে, অবন্তিনগরে একজন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ অনুতপ্ত হইয়া পরিশেষে একটি সাধু সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, ভব-সাগর তরিবার একমাত্র উপায় ভজন করা। ইহাই ভাবিয়া তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, শ্রীমুকুন্দ-চরণ ভজন করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্দে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্ত ভিক্ষুকের বচনটি এই :

এতাং সমাবস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব।।

প্রভু যাইতে যাইতে হঠাৎ এই শ্লোকটি আপনি আপনি উচ্চারণ করিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া যাইতেছেন, সুতরাং তাঁহারা শুনিলেন। এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া আবার আপনি-আপনি

কথা কহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "সাধু! সাধু! হে ব্রাহ্মণ! তুমিই সাধু! তোমার সঙ্কল্প অতি উত্তম। আমিও তোমার অনুবর্তী হইব। আমি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীমুকুন্দের সেবা করিব!" পূর্বে বলিয়াছি যে, নিমাই দেহ-ধর্ম সমুদয় ভুলিয়া গিয়াছেন, হৃদয়ের তরঙ্গ তাঁহার দেহ-ধর্মকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এখন দেখিতেছি যে, সেই প্রবল তরঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের অন্যান্য "ভাব" ও সমুদয় "স্মরণ" ধৌত করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি সমুদয় ভুলিয়াছেন,—নবদ্বীপ ভুলিয়াছেন, কি ছিলেন তাহা ভুলিয়াছেন, তাঁহার কে কে আছেন তাহা ভুলিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত যে সহস্র সহস্র লোক বিষাদ-সাগরে ডুবিয়া আছেন তাহার কণা মাত্রও তাঁহার মনে নাই। তিনি যে জগতের সমুদয় সুখ ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলবাসী হইয়াছেন, তাহাও তাঁহার মনে নাই। তাহার পরে তিনি যে রাধাভাবে কৃষ্ণের অন্বেষণে যাইতেছিলেন তাহাও ভুলিয়াছেন। তাঁহার মনে কেবল ঐ একটি ভাব রহিয়াছে, অর্থাৎ তিনি বৃন্দাবনে যাইবেন, যাইয়া মুকুন্দ ভজন করিয়া ভব-সাগর পার হইবেন। মনের ভাব এত প্রবল হইয়াছে যে, উহা হৃদয়ে স্থান না পাইয়া কথা দ্বারা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে।

ইহার পূর্বদিন সমুদয় ত্যাগ করিয়া, নয়ন মুদিয়া মৃত্তিকায় আছাড় খাইতে খাইতে, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণের নিমিত্ত গমন করিয়াছেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

গেল গৌর না গেল বলিয়া। হাম অভাগিনী নারী অকূলে ভাসাইয়া।।ধ্রু।।
হায় রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর। জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর।।
হায দারুণ বিধি কি কাজ সাধিলি। সোণার গৌরাঙ্গ মোর কারে বা দিলি।।
আর কে সহিবে মোর যৌবনের ভার। বিরহ-অনলে পুড়ে হব ছারখার।।
বাসুঘোষ কহে কারে দুঃখ কব। গোরাচাঁদ বিনা প্রাণ আর না রাখিব।।

এ দিকে নবদ্বীপের অবস্থা বাসুঘোষের উপরের পদে কিছু জানা যাইবে। পদটি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি।

শ্রীগৌরাঙ্গ কাটোয়ায় যে যে কাণ্ড করিয়াছেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও নবদ্বীপবাসী শুনেন নাই। কাটোয়ায় যে কাণ্ড হইতেছে তাহা যিনি দর্শন করিলেন, তিনি সেখানে আবদ্ধ হইয়া গেলেন। সেই কারণে হউক, বা বড় দুঃখের কথা বলিয়া কেহ ইহা প্রকাশ করিতে নবদ্বীপে দৌড়িলেন না বলিয়াই হউক, প্রভুর বাড়ীর নিজ-জনে, কি ভক্তগণে, কেহই এ কথার কিছু শুনিলেন না। শ্রীনিত্যানন্দের আগমন প্রত্যাশায় সকলে পথপানে চাহিয়া রহিলেন।

ক্রমে সমস্ত দিন গেল, নিত্যানন্দ কি অপর কেহ নবদ্বীপে ফিরিলেন না। আবার কেহ কেহ রহিতে না পারিয়া তল্লাসে কাটোয়াভিমুখে ছুটিলেন। কেহ বা চলিতে অপারগ হইয়া পড়িয়া রহিলেন অথবা প্রভুর বাড়ি আগলিয়া রহিলেন। ক্রমে রজনী হইল, কোন সংবাদ আসিল না। শচী বিষ্ণুপ্রিয়া মুখে জল বিন্দুও দিলেন না। আর ভক্তমাত্রেই উপবাসী রহিলেন। শচী মৃত্তিকায় পড়িয়া আছেন, আর উঠেন নাই, উঠিবার শক্তিও নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া অবগুণ্ঠনাবৃতা, পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া শুইয়া আছেন। ভক্তগণেরও ঐ দশা, তাঁহারা শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ফেলিয়া কোথাও যাইতে পারিতেছেন না। মাঝে মাঝে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া অভিভূতা হইতেছেন, একটু তন্দ্রা আসিতেছে, আবার চমকিয়া উঠিতেছেন। শচী বলিতেছেন, "ও নিমাই! নিমাই! তুই বাড়ী ফিরে আয়, তোর সংকীর্তনে মানা করব না।" নিমাইয়ের অপরাধ শচী আপনার ঘাড়ে লইতেছেন। কিন্তু নিমাইয়ের সমুদয় অপরাধ, শচী তল্লাস করিয়া নিজের অপরাধ কিছুমাত্র পাইতেছেন না। তবে ঐ এক অপরাধ, যে তিনি সংকীর্তনের বিরোধী ছিলেন। তাই ঐ কথা বারংবার বলিয়া, আপনার নিমাই যে নির্দোষ তাহাই সাব্যস্ত করিতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার বড় গৌরব যে তাঁহার পতি "মদনমোহন"। সে কথা পরে বলিতেছি। তিনি মাঝে মাঝে পার্শ্ব পরিবর্তন করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "যা

ছিল কপালে।" যথা—সবে এক বোল বলে "যা ছিল কপালে!" (চৈতন্য-মঙ্গল)

যখন নবদ্বীপে বড় আনন্দ, যখন নিমাই আপনি রাধা ভাবে প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণকে ব্রজলীলা আস্বাদন করাইতে লাগিলেন, তখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও সেই লীলারসে অভিভূত হইয়া সেই সমুদয় রসাস্বাদন করিতেন। তাহার সাক্ষী শ্রীবৃন্দাবন দাস। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া পতির আগমন প্রতীক্ষায় বেশভূষা ও নানাবিধ সজ্জা, অর্থাৎ বাসর-সজ্জা করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস-আঙ্গিনায় ভক্তগণ লইয়া কীর্তন করিতেছেন। ক্রমে নিশি শেষ হইতেছে; আর বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণনাথ আসিতেছেন না বলিয়া অধীর হইতেছেন। নিশি অবসানে নিমাই আসিলেন। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া রাধাভাবে নিমাইয়ের প্রতি ক্রোধ করিয়া বলিতেছেন। যথা—

অলসে অরুণ আঁখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি, রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে।
(তোমার) বদন-সরসীরুহ, মলিন যে হৈয়াছে, সারানিশি করি জাগরণে।।
(যাও গৌর) তুয়া সনে মোর কিসের পিরীতি।ধ্রু
এমন সোনার দেহ, পরশ করিলে কেহ, না জানি সে কেমন রসবতী।।
নদীয়া-নাগরী সনে, রসিক হয়েছ ওহে, অবহু কি পার ছাড়িবারে।
সুরধুনী তীরে যেয়ে, মার্জনা করগে হিয়ে, তবে সে আসিতে দিব ঘরে।।
গৌরাঙ্গ করুণ-ভাষী, কহে মৃদু মৃদু হাসি, কাহে প্রিয়ে কহ কটু ভাষ।
হরিনামে জাগি নিশি, অমিয়-সাগরে ভাসি, গুণ গায় বৃন্দাবন দাস।।

চৈতন্য-মঙ্গল গীতে শুনিতে পাই যে, এক দিবস শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া শয়ন-ঘরে আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার বল্লভ ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। তাহাতে তিনি হাহাকার করিয়া পার্শ্বে বসিয়া আপন জীবিতেশ্বরকে ইহাই বলিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যথা—'হরি বলে হরি বলে, প্রাণনাথ আমার গো, কেন দাও ধূলায় গড়াগড়ি, একবার উঠ গো নাথ। সোণার অঙ্গে ধূলা লেগেছে।' ইত্যাদি।

এখন যদি শ্রীগৌরাঙ্গ বাড়ী থাকিতেন, কি যদি বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন, আসিয়া দেখিতেন বিষ্ণুপ্রিয়া ধূলায় তাঁহার নাম লইয়া এ-পাশ ও-পাশ করিতেছেন, তবে তিনিও বলিতে পারিতেন—গৌর বলে গৌর বলে, প্রাণপ্রিয়া আমার গো—ইত্যাদি।

শ্রীঅদ্বৈত করজোড়ে অতি কাতর স্বরে বলিতেছেন, "হে বিশ্বম্ভর! হে গুণনিধে! হে দীনবন্ধো! তুমি কি অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিলে? আমি ভুবন অন্ধকার দেখিতেছি।" যথা চন্দ্রোদয় নাটকে—

হে বিশ্বম্ভরদেব! হে গুণনিধে! হে প্রেমবারাংনিধে।
হে দীনোদ্ধারণাবতার ভগবান্ হে ভক্তচিন্তামণে!
অন্ধীকৃত্য দৃশো দিশোহন্ধ-তমসীকৃত্যাখিল প্রাণিনাং
শূন্যীকৃত্য মনাংসি মুঞ্চতি ভবান্ কেনাপরাধেন নঃ।।

সকলেই মনে ভাবেন যে, তাঁহাতে ও প্রভুতে যত প্রীতি এরূপ আর কাহারও সঙ্গে নাই। সকলেই ভাবেন যে, প্রভু যাহা করেন তাহা প্রায় তাঁহারই জন্য। সকলেই ভাবিতেছেন, প্রভু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর প্রভু তাঁহারই অপরাধের নিমিত্ত তাঁহাকে ও অন্যান্যকে ত্যাগ করিয়াছেন। যিনি সকল চিত্ত আকর্ষণ তিনিই—শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি কি এই জন্যই আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলে যে এই অপরাধে ভাল করিয়া দণ্ড দিবে?"

হরিদাস বলিতেছেন, "মনে বিশ্বাস ছিল যে, প্রভুকে আমি তিলে হারাই, আর ক্ষণমাত্র তিনি অদর্শন হইলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে। প্রভুকে বহুক্ষণ দর্শন করি নাই, কই তবু এ হৃদয় ফাটিতেছে না? তাই বুঝিলাম, প্রাণ বড় কঠিন! তাই বুঝিলাম, প্রভুর যে আমার প্রীতি উহা বাহ্য, আর সেই নিমিত্ত আমি প্রভুকে হারাইলাম। আমার কপট-প্রেমে তাঁহাকে কিরূপে বাধা করিব?"

কিন্তু নিমাইচন্দ্রের শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীবাস প্রভৃতি কাহারও কথা মনে নাই। তাঁহাব যে কেহ ছিলেন, কি [illegible]ছেন; তাঁহারা যে শোকে পুড়িতেছেন, আর সেই নিমিত্ত তাঁহারা [illegible] মৃতবৎ পড়িয়া আছেন, তাহাতে নিমাইচন্দ্রের কি? তিনি মহানন্দে মুকুন্দ-ভজন করিতে বৃন্দাবনে চলিয়াছেন, আর সমুদয় ভুলিয়াছেন।

মুরারি বড় গম্ভীব। আপনি ধৈর্য ধরিয়া কাহাকেও বা সান্ত্বনা করিতেছেন। ইহাও বলিতেছেন, "তোমবা এরূপ অদূরদর্শী কেন? তোমরা এরূপ চঞ্চল হইলে প্রভুর জননী ও ঘরণীকে কি বলিয়া বুঝাইবে?" কিন্তু মুরারি অধিকক্ষণ বুঝাইতে পারিলেন না। কারণ তাঁহার যে শান্তভাব ও গাম্ভীর্য সে সমুদয় বাহ্য। তিনি কথা কহিতে কহিতে "হা নাথ।" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু নিমাইয়ের তাহাতে কি? তিনি বৃন্দাবনে মুকুন্দ-ভজন করিতে চলিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার নিমিত্ত নিরাশা-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন তাঁহাদের জন্য কিছু দুঃখে—সে ত' অনেক কথা, তাঁহাদের কথা পর্যন্ত তাঁহার মনে নাই। এখন চৈতন্য-মঙ্গল গীতের একটি কাহিনী বলি।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া অন্তঃপুরে এক পার্শ্বে ধূলায় পড়িয়া আছেন। এমন সময়ে উঠিয়া বসিলেন এবং অতি প্রবল বিরহ-তরঙ্গে অভিভূত হইয়া, করজোড়ে শ্রীগৌরাঙ্গকে ইহাই বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন,—"হে নাথ। হে হরি। কৃপা করিয়া এই বেলা দর্শন দাও। যেহেতু আমার প্রাণ বুঝি যায়। হে মদনমোহন। তুমি একটিবার দাও, আমি জন্মের মত তোমাকে দেখিয়া মরি।"*

শ্রীনিমাই চলিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন, এই বাসনায় সর্বেন্দ্রিয় এরূপ অধিকৃত হইয়াছে যে, তিনি যে ব্রজধামে চলিয়াছেন, ইহা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, অনিদ্রা ইত্যাদি কিছুতেই তাঁহাকে কিছুমাত্র বাধা দিতে পারিতেছে না। কিন্তু যাইতে যাইতে হঠাৎ তিনি দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তখন নিতাই দেখিলেন, প্রভু পড়িয়া যাইতেছেন। তখনই তিনি বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। প্রভুও নিতাইয়ের অঙ্গে এলাইয়া পড়িয়া, অঝোর নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। আর যাইতে পারেন না,—শ্রীপদ আবদ্ধ হইল; আর ধৈর্য ধরিতে পারেন না, —ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। যে মাত্র বিষ্ণুপ্রিয়া "হে মদনমোহন হরি! দর্শন দাও," বলিয়া কাতরধ্বনি করিয়া উঠিলেন, অমনি সেই ধ্বনি, প্রেম-রজ্জু-স্বরূপ হইয়া গৌরাঙ্গের দুটি পদ বন্ধন করিল।*

সূর্য গ্রহগণকে ও গ্রহগণ সূর্যকে, পরস্পরে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আকর্ষণ জীবন্ত হইলে তাহাকে প্রীতি বলে। সেইরূপে শ্রীভগবান্ জীবগণকে, জীবগণ ভগবানকে, ও জীবগণ পরস্পরে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তবে জড় পদার্থের আকর্ষণের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, যেহেতু ইহা নির্জীব শক্তি। জীবগণ যে আকর্ষণ করেন, সে জীবন্ত শক্তি; উহা পরিবর্ধনশীল ও উহা তাঁহাদের করায়ত্তে আছে। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার এইরূপ আকর্ষণে যে প্রভু আবদ্ধ হইবেন, তাহার বিচিত্র কি? বাসুদেব নামা একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এইরূপে প্রভুকে আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনিয়াছিলেন, কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

আপনারা সকলেই জানেন, শ্রীভগবান্ সর্বশক্তিসম্পন্ন ও সকলের উপরের কর্তা। আর ইহাও জানেন যে, তিনি স্বেচ্ছাময়। কিন্তু তিনি আপনার একটী কর্তা করিয়াছেন, সেটি প্রীতি।

* হরি এই বেলা দাও দরশন। ধ্রু।
দাও দরশন, মদনমোহন
ভুবনমোহন গৌরাঙ্গ
বিদায় হই জনমের মত।।—চৈতন্য-মঙ্গল গীত।

* প্রেম-ফাঁসে বান্ধিল গৌরাঙ্গ মত্তসিংহ।
চলিতে না পারে প্রভু গতি হইল ভঙ্গ।।
নিত্যানন্দ অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া রহিল।
অঘোর নয়নে প্রভু কান্দিতে লাগিল।
(চৈতন্যমঙ্গল)

অতএব জীবগণ যেমন তাঁহার অধীন, কর্তব্যে তিনিও জীবগণের অধীন। শ্রীভগবান্ বড় জিদ করিয়া সমুদয় উপেক্ষা করিয়া, "মত্ত সিংহের" ন্যায় যাইতেছিলেন। নিতাই যে পশ্চাৎ হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছেন, তাহা কর্ণেও যাইতেছে না। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রীতির অতিসূক্ষ্ম-রজ্জুতে প্রভু বান্ধা গেলেন, আর নিতাইয়ের অঙ্গে এলাইয়া পড়িলেন। প্রভু সেই রজ্জু ছিঁড়িবার নিমিত্ত লম্ফ-ঝম্ফ করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে রজ্জু ছিঁড়িলেন,—যেহেতু তিনি অসীম শক্তিধর; শেষে নয়নজল মুছিলেন, আবার গতি পাইলেন, আবার পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন!

প্রভু এবার আরো দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া চলিলেন। কিন্তু শচী "নিমাই!" বলিয়া কাঁদিতেছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া "মদনমোহন" বলিয়া ডাকিতেছেন, ভক্তগণ "প্রভু" বলিয়া চীৎকর করিতেছেন। এই সমস্ত আকর্ষণ ও রোদন সূক্ষ্মরজ্জুরূপে সৃষ্টি হইয়া প্রেমফাঁসরূপে পরিণত হইতেছে। এই সমস্ত প্রেমফাঁস প্রভুকে চারিদিকে ঘিরিতেছে। তিনি অসীম শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া এ সমুদয় রজ্জু ছিঁড়িতেছেন। কিন্তু ইহা খণ্ড খণ্ড করিতে সময় লাগিতেছে, পরিশ্রম হইতেছে। ইহাতে শচীর "বাছা" আর বড় অগ্রগামী হইতে পারিতেছেন না,—কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

এইরূপে নিমাই তিন দিবস রাঢ়ে ঘুরিয়াই বেড়াইতেছেন, বৃন্দাবনের দিকে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। একবার সঙ্কল্প করিয়া প্রভু নিজ শক্তিতে দুই ক্রোশ পশ্চিম-উত্তরমুখে গমন করিলেন। এদিকে নবদ্বীপবাসীগণ পশ্চাতে টানিতে লাগিলেন। তাঁহারা টানিয়া টানিয়া আবার তাঁহাকে দুই ক্রোশ পশ্চাতে হটাইলেন। প্রভু প্রথম দিন যেখানে ছিলেন, তিন দিনের দিনও প্রায়ই সেখানে। অথচ এই তিন দিবস রজনী কেবল হাঁটিয়াছেন, আর প্রথম দিবস কেবল দৌড়াইয়াছেন। প্রভু অনবরত চলিয়াছেন, পিপাসা শান্তি নিমিত্ত একবার বিশ্রামও করেন নাই, অথচ তিন দিনের দিন বাড়ীর নিকটেই আছেন!

এইরূপে তিন দিবস-রজনী গেল। প্রভু জলস্পর্শও করেন নাই, ভক্তগণও করেন নাই। প্রভু জলস্পর্শ করেন নাই, ভক্তগণের উহা স্পর্শ করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? কিরূপে তাঁহারা বাঁচিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। প্রভু যখন ঘোর অচেতন দশা প্রাপ্ত হইলেন, তখন ভক্তগণ ভাবিলেন যে, তাঁহাকে কোনগতিকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী লইয়া যাইবেন। প্রভুকে শান্তিপুরে লইতে পারিলেও তাঁহাকে শ্রীনবদ্বীপে লওয়া হইবে না, যেহেতু সন্ন্যাসীর নিজগ্রামে যাওয়া নিয়ম-বিরুদ্ধ। প্রভুকে কিরূপে শান্তিপুরে লইবেন, দিবানিশি তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। শেষে, কতক কৃতকার্যও হইয়াছেন। প্রভু কাটোয়া হইতে পশ্চিমদিকে গমন করিয়া বহুদূর গিয়াছিলেন, এখন সেই প্রভু শান্তিপুরের অপর পারে দুই-চারি ক্রোশ দূরে। ভক্তগণ নানা উপায়ে প্রভুকে শান্তিপুরের এত নিকটে আনিয়াছেন।

নিমাই নয়ন অর্ধ-মুদ্রিত করিয়া চলিয়াছেন, নিতাইয়ের হৃদয়ে ক্রমেই আশালতা বাড়িতেছে,—প্রভুকে ফিরাইতে পারিবেন, এ ভরসা ক্রমেই বলবতী হইতেছে। সেখানে মাঠে রাখালগণ গরু চরাইতেছে। প্রভু অন্ধের ন্যায় গমন করিতেছেন, এমন সময়ে প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভৃতি পঞ্চ বিগ্রহের প্রতি চাহিলেন। তাঁহাদের নয়ন-ভৃঙ্গ কাজেই পরিণামে প্রভুর মুখ-পদ্মে আকৃষ্ট হইল। প্রভুর বদন দেখিয়াই তাঁহাদের হৃদয় বিলোড়িত হইল। ক্রমে তাঁহাদের হৃদয়ে অপরূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তাঁহাদের নিকট বোধ হইল যেন জগতে কেবল শীতল বায়ু বহিতেছে, জগতে কেহ দুঃখী নাই, তাঁহাদেরও দুঃখ নাই। জগতে আছে কেবল আনন্দ, এবং সেই আনন্দের প্রস্রবণ শ্রীহরি, আর সেই শ্রীহরি কপট-সন্ন্যাসী বেশ ধরিয়া তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছেন। তখন রাখালগণের জিহ্বায় শ্রীহরিনাম উদয় হইল, তাহারা আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। শেষে আনন্দে অচেতন হইয়া "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া সকলেই নৃত্য করিতে লাগিল।

প্রভুর এই একটি অচিন্তনীয় শক্তি ছিল। এমন কি তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়াও কখন কখন জীবের "হরি বলে, বাহু তুলে" নাচিতে হইত। রাখালগণ এই আনন্দজনক হরিধ্বনি করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর অচিন্ত্যনীয় শক্তি দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা ভাবিতেছিলেন, এরা না রাখাল? এরা হরি বলে কেন? এরা নাচেই বা কেন? প্রভু ত ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই? ইহারা ত কখন সাধন-ভজন করেন নাই? ভক্তগণ প্রভুকে শ্লাঘা করিয়া ভাবিতেছেন, "সাবাস! বুঝিলাম এ অবতারে তুমি রাখাল পর্যন্ত প্রেমে উন্মত্ত করিবে।" কিন্তু তাহাদের অধিকক্ষণ প্রভুকে প্রশংসারূপ আনন্দভোগ করা হইল না, যেহেতু প্রভু হঠাৎ দাঁড়াইলেন।

প্রভু দাঁড়াইলে, তাঁহারাও দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন, প্রভু দাঁড়াইয়া নয়ন উন্মীলিত করিলেন, করিয়া মস্তক অবনত করিয়া যেন কি শুনিতে লাগিলেন। ভক্তগণ বুঝিলেন, হরিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করায় প্রভু দাঁড়াইয়াছেন। এখন সেই মধুর-ধ্বনি শুনিতেছেন।

এইরূপে প্রভু নয়ন মেলিয়া, কান পাতিয়া, কোন্ দিক হইতে হরিধ্বনি আসিতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া, রাখালগণের দিকে মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন, রাখালগণ আনন্দে হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রভু তখন সেই দিকে চলিলেন। সে সময় নয়ন মেলিয়া যাইতেছেন, আর পদস্খলন হইতেছে না। তবু ভক্তগণ যে নিকটে তাহা জানিতে পারিলেন না।

রাখালগণ প্রভুকে আগমন করিতে দেখিয়া তটস্থ হইয়া, ভক্তিতে গদগদ হইয়া, তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিল। প্রভু কথা কহিলেন,—এই প্রথম। তিনি বলিতেছেন, "বাপগণ! উঠ; উঠিয়া আমাকে হরিনাম শুনাও। বাপ! আমি বহুদিন হরিনাম শুনি নাই। আমার কর্ণ বহুদিন উপবাসী আছে, তাই আমি মরিয়া আছি, তোমরা আমাকে হরিনাম শুনাইয়া প্রাণদান কর।"

আমাদের নবদ্বীপচন্দ্র যে তিন দিবস পূর্বে বৈকুণ্ঠের সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন, আর এখন বৃক্ষতলবাসী হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। তিন দিবস পূর্বে যে, তাঁহার যত প্রিয়স্থান ও প্রিয়জন সমুদয় জনমের মত ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। তাঁহার বৃদ্ধা জননী যে তাঁহার নিমিত্ত বিষাদসাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন, তাঁহার ত্রিজগতের মধ্যে ভাগ্যবতী নবীনা ভার্যা যে এখন ত্রিলোকের মধ্যে কাঙ্গালিনী হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। প্রভু যে তিন দিবস অনাহারে ও অনিদ্রায় আছেন, তাঁহার যে চলিয়া চলিয়া অঙ্গ অসাড় হইয়া গিয়াছে, তাঁহার যে কন্টকে শ্রীঅঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাঁহার পদ্মপুষ্পের ন্যায় কোমল পদে যে চলিয়া ব্রণ হইয়াছে, তাহা তাঁহার বোধ নাই। বহুদিন হরিনাম শুনেন নাই, এই দুঃখে তিনি অন্য সমুদয় দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন রাখালগণের মুখে হরিনাম শুনিয়া সমুদয় দুঃখ ভুলিয়া আনন্দে তাহাদের নিকটে দৌড়িতেছেন।

তিনি ঘোর অচেতন অবস্থায় ছিলেন। এ অচেতন অবস্থা কিছুতেই ভঙ্গ হয় নাই। অনিদ্রায়, অনাহারে, পথের ক্লেশে, রৌদ্রে শীতে কি পিপাসায় তাঁহার চেতন হয় নাই। নিত্যানন্দ তাঁহার পশ্চাতে চীৎকার করিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া শতবার ডাকিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চেতন হয় নাই। কিন্তু হরিনাম কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র অমনি স্থির হইলেন, চেতন পাইলেন ও নয়ন মেলিলেন। জীবগণ ক্ষুধায় মরে, তৃষ্ণায় মরে, অনিদ্রায় মরে, দেহের ক্লেশে মরে, বন্ধু-বিরহে মরে। কিন্তু প্রভু ইহাতে মরেন নাই। প্রভু তিন দিন হরিনাম শুনেন নাই, তাহাতেই মরিয়াছিলেন। জীবগণ অনাহারে থাকিয়া আহার করিয়া, কি অনিদ্রায় থাকিয়া নিদ্রা-আরাম ভোগ করিয়া বলিয়া থাকে যে, তাঁহারা মরিয়াছিল, এখন আহার করিয়া কি নিদ্রা গিয়া প্রাণ পাইল।

প্রভু বলিতেছেন, "আমি মরিয়াছিলাম, হে রাখালগণ! তোমরা আমাকে হরিনাম শুনাইয়া বাঁচাইলে।" প্রভু রাখালগণকে নিকটে আনিয়া তাহাদের মস্তকে শ্রীকর স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন,

"বাপু! তোমরা আমার বড় উপকার করিলে। শ্রীভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। বাপ! তোমরা এ হরিনাম কোথায় শিখিলে? বুঝিলাম, তোমরা ব্রজের রাখাল হইবে।"*

তখন রাখালগণ বাহু তুলিয়া হরি বলিয়া ক্ষণেক নৃত্য করিল। প্রভু যে বৃন্দাবনে গমন করিতেছেন, এ ভাব তাঁহার মনের মধ্যে ছিল। তাই ভাবিতেছেন যে, ব্রজের নিকটবর্তী হইয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই, আর এই রাখালগণ সেই বৃন্দাবনের নিকটবর্তী স্থানে থাকে বলিয়া হরিনাম বলিতে শিখিয়াছে। প্রভু বলিতেছেন, "বাপ! তোমরা আমার বড় উপকার করিলে। আর একটু উপকার কর। বল দেখি, বৃন্দাবন কোন্ পথে যাব?" অতি দুঃখে হাসি পায়। প্রভুর প্রশ্নে একটি হাসি পাওয়ার কথা। বৃন্দাবন পশ্চিম-উত্তরে। প্রভু নয়ন মুদিয়া পূর্ব-দক্ষিণে আসিতেছেন। এখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাপ! বৃন্দাবন কোন্ পথে যাব?" শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি কাছে দাঁড়াইয়া, তাঁহাদের প্রতি কিন্তু প্রভুর লক্ষ্য নাই। যে মাত্র রাখালগণের কাছে বৃন্দাবনের পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, অমনি শ্রীনিত্যানন্দ দেখিলেন, বড় সুযোগ উপস্থিত। তিনি পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগকে হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করিয়া শান্তিপুরের পথ দেখাইতে বলিলেন। রাখালগণ সঙ্কেত করিয়া প্রভুকে শান্তিপুরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিল। প্রভু তখন সেই পথ ধরিলেন। রাখালগণ তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছিল, কিন্তু নিত্যানন্দ তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন।

সেই সময় নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "তুমি দ্রুতগতিতে শান্তিপুরে যাও। সেখানে যদি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু থাকেন, তবে তাঁহাকে বলিবে যে, তিনি যেন একখানি নৌকা লইয়া এই পারে অপেক্ষা করেন। আমি কোনক্রমে প্রভুকে সেই ঘাটে লইয়া যাইব। যদি তিনি শান্তিপুরে না থাকেন, তবে তুমি তাঁহাকে শ্রীনবদ্বীপে পাইবে, তাঁহাকে শীঘ্র নৌকা লইয়া আসিতে বলিবে। বাড়ী যাইয়া সকলকে প্রভুর সন্ন্যাসের কথা বলিবে আর বলিও যে, আমি প্রভুকে শান্তিপুর লইয়া গেলে তাঁহাদিগকে সংবাদ দিব, তখন তাঁহারা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিতে পারিবেন। জননীকে এখন এ কথা বলিও না।" কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের আজ্ঞা, আর সে আজ্ঞা বিবেচনাসঙ্গত, কাজেই চন্দ্রশেখর অতি কষ্টে প্রভুকে ছাড়িয়া দ্রুতগতিতে চলিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা সকলে বুঝিলেন।

বিংশ অধ্যায়

"নবীন সন্ন্যাসী দেখি। রূপে ঝুরে আঁখি সখি।"

শ্রীনিত্যানন্দের কথা কি বলিব? প্রভু নিতাই! তোমাকে কি ধন্যবাদ দিব? আহা! ধন্যবাদ ত অনেককেই দিয়া থাকি, হৃদয়ে কি তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করিব? তাহাও ত সকলে করিয়া থাকে। অতএব হে নিত্যানন্দ! হে বিশ্বরূপের অভিন্ন-কলেবর। হে জীবের বন্ধু! আমি তোমার ধার শুধিতে পারিলাম না, তোমার নিকট চিরঋণী রহিলাম।

প্রভু শান্তিপুরের প্রশস্ত পথে চলিলেন, পশ্চাতে নিত্যানন্দ, তাহার পশ্চাতে একটু দূরে মুকুন্দ ও গোবিন্দ। প্রভু তখন অর্ধবাহ্য অবস্থা। চিত্ত একটি ভাবে বিভোর, সুতরাং বাহ্যজগতের সহিত তাঁহার প্রায় সম্বন্ধ নাই। চক্ষু উন্মীলিত,পথ দেখিতেছেন, বাহিরের অন্যান্য দ্রব্যও দেখিতেছেন, কিন্তু তাহাতেও ধ্যান ভঙ্গ হইতেছে না। মনে ইহাই ভাবিতেছেন যে, অবন্তিনগরের বিপ্রের ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া একমনে গোবিন্দভজন করিবেন। আবার "এতাং সমাস্থায়"

* ও ব্রজের রাখালগণ! এ নাম কোথায় পেলে, কে শিখালে।। ধ্রু।।
আমি বৃন্দাবনে যেতে ছিলাম। নাম শুনে ধেয়ে এলাম।।
এই যে আমি মরে ছিলাম। নাম শুনে প্রাণ পেলাম।।
আমার কর্ণ উপবাসী ছিল। হরিনামে আবার প্রাণ এল।। (প্রাচীন পদ)

শ্লোকটী পড়িলেন। আবার শ্লোকের তাৎপর্য বলিলেন। আবার বলিতেছেন, "সাধু বিপ্র! তোমার সঙ্কল্প জীব মাত্রের অনুকরণ করা উচিত।" ইহাই বলিতেছেন, আর গমন করিতেছেন। এমন সময় বুঝিলেন, যেন তাঁহার পশ্চাতে আব কেহ আসিতেছেন।

প্রভুর স্থির-নয়ন পথ-পানে রহিযাছে, চিত্ত উপরি-উক্ত ভাবে বিভোর রহিয়াছে। যদিও পশ্চাতে কেহ আসিতেছে জানিতে পারিলেন, তবু নয়নতারা স্থান-ভ্রষ্ট করিলেন না। পথের দিকে চাহিয়া কতক মনে মনে, কতক যেন পশ্চাতে লোকের নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া বলিতেছেন, "বৃন্দাবন আর কত দূর?" নিত্যানন্দ দেখিলেন যে, প্রভুর স্বর প্রশ্নাত্মক। তখন ভাবিলেন, এ সুযোগ ছাড়া নয়। তাই অমনি প্রভুব কথাব উত্তর করিযা বলিতেছেন, "বৃন্দাবন আর অধিক দূরে নয়।" প্রভু এই কথা শুনিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। যেমন যাইতেছিলেন সেইরূপ পথ-পানে নয়ন রাখিয়া চলিলেন না। মনের মধ্যে আনন্দ রহিয়াছে যে, বৃন্দাবনে যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন। সে ভাবের একটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন "বৃন্দাবন কতদূর" জিজ্ঞাসা করিলেন। সে প্রশ্নের উত্তর পাইলেন, তবু মনে যে আনন্দ-তরঙ্গ খেলিতেছে উহা ভঙ্গ করিয়া, কোন্ ব্যক্তি যে তাঁহাব প্রশ্নের উত্তর করিল, তাহা কিছুমাত্র জানিবার চেষ্টা করিলেন না; পূর্বের মত মস্তক অবনত করিয়া চলিলেন। নিত্যানন্দ ইহাতে ঠকিলেন। ভাবিয়াছিলেন, তিনি প্রভুর কথায় উত্তব দিলে, আর তাঁহার গলার স্বব শুনিলে, প্রভু তাঁহার দিকে চাহিবেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাব দিকে চাহিলেন না। তখন ভাবিলেন, প্রভুকে শান্তিপুরে লইয়া যাইবার এই সুযোগ, এখন উহার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। প্রভুর ভাবগতিক নিতাই যেরূপ জানেন এরূপ আর কেহ জানেন না। তিনি বুঝিলেন যে, প্রভুব যতদূর চেতনা হইয়াছে এখন তাঁহাকে চিনিলেও চিনিতে পাবেন। অতএব এখন পরিচয় দেওয়াই উচিত। ইহাই বলিয়া দ্রুতপদে অগ্রে গমন করিলেন, এবং পথ আগুলিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "আমি নিত্যানন্দ।"

এইরূপ "আমি নিত্যানন্দ". কত বার, কত প্রকারে, কত চেঁচাইয়া, প্রভুকে জানাইয়াছেন; কিন্তু প্রভুকে চেতন করিতে পারেন নাই। এখন অগ্রে দাঁড়াইয়া নিতাই যখন আপনার পরিচয় দিলেন, তখন প্রভু মুখ উঠাইলেন। মুখ উঠাইয়া কমল-নয়নে নিতাইয়ের পানে চাহিলেন। দুই ভাইয়ের চারি চক্ষে মিলন হইল। মনে ভাবুন, সন্ন্যাসের পরে এই প্রথম দেখা। মনে ভাবুন, নিতাই হারাধন পাইলেন। ইহাতে তাঁহার চতুর্দিক অন্ধকারময় হইয়া আসিল, নয়নে শতধারায় জল, আর কণ্ঠে অতি বেগের সহিত ক্রন্দনের রব আসিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহা হইলে প্রভুর হয়ত নিপট্ট-বাহ্য হইবে, আর নিপট্ট-বাহ্য হইলে তাঁহার যে মনস্কাম, তাহার ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। ইহাই ভাবিয়া নিতাই,—স্বয়ং ঈশ্বর সুতরাং বড় শক্তিধর বলিয়া,—মনকে বশীভূত করিলেন। বদনে চিত্তবিচলিতের কোনরূপ চিহ্নও দেখাইলেন না।

প্রভু মুখ উঠাইয়া শ্রীনিত্যানন্দের পানে চাহিলেন। চাহিবামাত্র চিনিতে পারিলেন না। বুঝিলেন যে, লোকটি পরিচিত বটে। অন্ততঃ ইহাকে পূর্বে দেখিয়াছেন। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন, আর এ ব্যক্তি কে, তাহা ঠিক নিরাকরণ করিতে পারিতেছেন না। সেই নিমিত্ত নিতাইয়ের মুখে, দুই পরিসর নয়ন রাখিয়া, তাঁহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময় নিতাই, প্রভুর ভাব বুঝিয়া আবার বলিলেন, "প্রভু! চিনিতে পারিতেছ না, আমি তোমার নিত্যানন্দ!" প্রভু তখন একটু চিনিতে পারিলেন; বলিতেছেন "তোমাকে যেন চেন চেন করি? যেন শ্রীপাদ?"

তখন নিতাই করজোড়ে বলিলেন, "সেই অধমই বটে। আমি তোমার নিত্যানন্দই বটে।" প্রভু ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন, "তুমি শ্রীপাদ? তুমি বল কি? তাও ত বটে! শ্রীপাদই ত বটে! তুমি এখানে কিরূপে আইলে? আমি বৃন্দাবনে যাইতেছি, তুমি কিরূপে আমাকে ধরিলে? আমি যে কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" পাছে প্রভুব নিপট্ট বাহ্য হয়,

এই ভয়ে বেশী কথা না বলিয়া কেবল বলিলেন "আপনি চলুন, বলিতেছি। লোকমুখে শুনিলাম আপনি বৃন্দাবনে যাইতেছেন, তাই আমিও আপনার পাছে পাছে আসিলাম। দৌড়িতে দৌড়িতে প্রাণ গিয়াছে। এই আপনার লাগ পাইলাম। এখন চলুন, কথা কহিতে কহিতে যাই।"

প্রভু তখন অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন "বড়ই সুন্দর! বড়ই বুদ্ধির কাজ করিয়াছ। চল এখন দুইজনে বৃন্দাবনে যাইয়া নির্জনে এক মনে শ্রীমুকুন্দের ভজন করিব।" প্রভু অধিক কথা বলেন, ইহা নিতাইয়ের ইচ্ছা নয়। তাই বলিতেছেন, "এই উত্তম যুক্তি। আপনি চলুন, কথা কহিতে কহিতে যাইব।" প্রভু চলিলেন। নিতাই অগ্রে, প্রভু পাছে। নিতাই পথ দেখাইয়া যাইতেছেন। নিতাই ভাবিতেছেন, এইরূপে প্রভুকে ভুলাইয়া একেবারে গঙ্গার ধারে লইয়া যাইবেন। দুই চারি পা যাইয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "শ্রীপাদ, শ্রীকৃষ্ণ ত আমায় দর্শন দিবেন?" নিতাই ভাবিলেন, এই আবার কপাল পুড়িল। আবার শ্রীকৃষ্ণের কথা উঠাইলে হয়ত সেই পূর্বকার মত ঘোর বিহ্বলতা আসিয়া পড়িবে, তাই প্রভুর কথায় সহানুভূতি না দেখাইয়া বলিতেছেন, "এখন ওসব থাক, চল অগ্রে বৃন্দাবনে যাই, তাহার পরে সেখানে যাইয়া কিরূপে কৃষ্ণের দর্শন পাই, তাহার যুক্তি করিব।" শ্রীনিতাই প্রভুকে কখন "আপনি," কখন "তুমি" বলিতেন।

প্রভু মস্তক অবনত করিয়া ও পথপানে চাহিয়া চলিতেছেন। একটু যাইয়া আবার বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া আমি কি করিব বলিতেছি। মাধুকরী করিব, করিয়া জীবন যাপন করিব। আবার কি করিব বলিতেছি। জয় রাধে শ্রীরাধে বলিয়া রাধাকুণ্ডের ধূলায় গড়াগড়ি দিব।"*

প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া কি কি করিবেন এই সমুদয় মনের খেয়ালে বলিতে আরম্ভ করা মাত্র গদগদ হইয়াছেন। নিতাই দেখিলেন যে, ভাব বড় ভাল নয়, আবার কপাল পুড়িবার উপক্রম। তখন প্রভুর উত্থিত ভাব-তরঙ্গকে রোধ করিবার আশায় বলিতেছেন, "প্রভু! তোমার এ সমুদয় কথা এখন আমার ভাল লাগিতেছে না। ক্ষুধায় পিপাসায় তুমিও কাতর, আমিও কাতর। আগে বৃন্দাবনে যাই, ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করি, পরে মুকুন্দ-ভজনের যুক্তি করিব।"

নিত্যানন্দ ভাবিলেন যে, তিনি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দুঃখ পাইতেছেন, এ কথা শুনিলে প্রভু একটু দয়ার্দ্র হইবেন। হয়ত তাঁহার নিজেরও ক্ষুধাপিপাসা বোধ হইবে, ও বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ সজীব হইবে। তাহা হইলে অতিরিন্দ্রিয়গণের শক্তি হ্রাস হইবে। প্রকৃতই নিতাইয়ের তাড়া খাইয়া প্রভু একটু চুপ করিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। খানিক গমন করিয়া ধীরে ধীরে, ভয়ে-ভয়ে, আবার নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "শ্রীপাদ! বৃন্দাবন, আর কতদূর আছে?" এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার কি করা কর্তব্য এই সিদ্ধান্ত মধ্যাহ্ন-সূর্যের ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দের সম্মুখে প্রকাশ হইল। নিতাই চিন্তার বোঝা ঘাড়ে করিয়া প্রভুর অগ্রে চলিয়াছেন, সে চিন্তায় একেবারে অভিভূত, সংজ্ঞাশূন্য। ভাবিতেছেন, "প্রভুকে ত শান্তিপুর মুখে লইয়া যাইতেছি, প্রভুও বৃন্দাবন পথভ্রমে শান্তিপুরের পথে চলিয়াছেন, তাঁহার বাহ্যও ক্রমে হইতেছে। যদি একবার প্রভু মস্তক তুলিয়া সূর্যের পানে চাহিয়া দেখেন, তখনই জানিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব-দক্ষিণে গমন করিতেছেন। যদি প্রভু জানিতে পারেন যে, আমি তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্তিপুরাভিমুখে লইয়া যাইতেছি, তবে স্বেচ্ছাময় হয়ত রাগ করিয়া বৃন্দাবনের দিকে এমনি দৌড় মারিবেন যে, আমি আর ধরিতে পারিব না।" এই চিন্তায় নিতাই অভিভূত। এমন সময়

* নিতাই বলয়ে কতদূরে বৃন্দাবন। আমায় দিবেন কি কৃষ্ণ দরশন।। ধ্রু।।
কবে বৃন্দাবনে যাব, মাধুকরী করে খাব, রাধাকুণ্ডে গড়ি দিব।
(জয় রাধে-শ্রীরাধে বলে)

প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃন্দাবন 'আর কতদূর?"

এই যে প্রভু 'আর' শব্দটি ব্যবহার করিলেন, ইহাতে নিতাই বুঝিলেন যে বৃন্দাবনের খুব নিকটে আসিযাছি, প্রভুব এই ভ্রম হইয়াছে। তখন তাঁহার কি কর্তব্য এই সিদ্ধান্ত বিদ্যুৎ-গতির ন্যায় তাহাব হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন যে, প্রভুর এই ভ্রমই তাঁহার সহায় হইবে। নিতাই বলিতেছেন, "আর কতদূর? শ্রীবৃন্দাবন অতি নিকট।" নিমাই আবার চলিলেন। একটু যাইযা আবার ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "শ্রীপাদ! শ্রীবৃন্দাবন খুব নিকটে বলিলে, কিন্তু কত নিকটে তা ত' বলিলে না।"

তখন সুরধুনী তীরস্থিত গ্রামের বৃক্ষাদি দেখা যাইতেছে। এমন কি অতিদূরে একটী বটবৃক্ষও দেখা যাইতেছে। এটি শান্তিপুরের অপর পারে। নিতাই বলিতেছেন, "প্রভু, তুমি একটু হাঁটিয়া চল, বৃন্দাবনে ত' এলাম।" প্রভু আর ভাল-মন্দ না বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া চলিলেন। সেখান হইতে বটবৃক্ষটি পরিষ্কাররূপে দেখা যায়। নিতাই আপনি-আপনি বলিতেছেন, "বৃন্দাবনে ত এলাম। অদ্যই বৃন্দাবনে যাইব।"

এই কথা শুনিবামাত্র প্রভু দাঁড়াইলেন ও নিত্যানন্দের দিকে ফিরিলেন। তাঁহার বদনের ও কথার ভাবে নিতাই বুঝিলেন যে, বৃন্দাবন যে এত নিকটে তাহা প্রভু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেছেন না। প্রভু বলিতেছেন, "বৃন্দাবন অদ্যই যাইব? সেকি? আমি যে তোমার কথা কিছুই বুঝিতেছি না।" নিতাই বলিলেন, "আমার কথা বুঝা কষ্ট কি? আমি তবু তোমারে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। ঐ একটি বড় বৃক্ষ দেখিতেছ?" প্রভু একটু ঠাহরিয়া দেখিয়া বলিতেছেন, "হ্যাঁ। ঐ ত, বোধ হয় বটবৃক্ষ।" নিতাই বলিতেছেন, "তাই বটে! আবার উহার ধারে একটী নদী দেখিতেছ?" প্রকৃত সেখান হইতে সুরধুনীর গর্ভ কিঞ্চিৎ দেখা যাইতেছিল। প্রভু আবার মনোনিবেশ করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "ঐ ত একটী নদী বটে। ঐ বৃক্ষটি ও নদীটি কি?" তখন নিত্যানন্দ একটু হাসিয়া বলিতেছেন, "ওটি শ্রীবৃন্দাবনের বংশীবট, উহার আঙ্গিনায় যাইয়া বিশ্রাম করিব। আর ঐ নদীটি যমুনা।"

এই কথা শুনিয়া প্রভু এত আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে, প্রথমে তিনি একেবারে নিতায়ের কথা বুঝিতে পারিলেন না, ক্রমেই নিতায়ের কথার ভাবার্থ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তখন প্রকৃতই অবাক হইয়া "নিতাই রহস্য করিতেছেন কি না তাহা বুঝিবার নিমিত্ত," তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিতাই অবিচলিত রহিলেন। প্রভুবও কথা ফুটিল। বলিতেছেন,— "আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। ঐ বৃন্দাবন? আমার কোন মতে প্রত্যয় হয় না। আমার ভাগ্যে বৃন্দাবনে কিরূপে আইলাম?"

নিতাই বলিলেন, "প্রভু তুমি এখন চল। বংশীবট আঙ্গিনায় বিশ্রাম করিয়া, যমুনার জলে স্নান করিব। একটু দ্রুত চল, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন বোধ হইতেছে।"

যাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহাদের প্রকৃতি কেবল বিপরীত দ্রব্য দ্বারা গঠিত। তাঁহাদের হৃদয় কুসুম হইতে কোমল, এবং বজ্র হইতেও কঠিন। তাঁহাদের বুদ্ধি বৃহস্পতি হইতে তীক্ষ্ণ, আর সারল্য দশম বৎসরের বালিকা হইতেও অধিক। শ্রীনিমাইচাঁদ শ্রীনিতাইয়ের সামান্য প্রবঞ্চনায় ভুলিলেন। তখন বলিতেছেন, "তুমি আগমন কর, আমি অগ্রে যাইযা যমুনায় অঙ্গ মার্জনা করি।" ইহাই বলিয়া এমনি দ্রুতবেগে চলিলেন যে, প্রভু খানিক অগ্রবর্তী হইলে নিতাই জানিতে পারিলেন। নিতাইও দৌড়াইয়া চলিলেন। নিতাইও দৌড়িতে খুব মজবুত। দুইজনকেই ধরা কঠিন, তবে নিতাইকে ধরা কিছু সহজ, তাহা ভক্তগণ জানেন।

নিতাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে, প্রভুকে লইয়া গঙ্গার ধারে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিবেন। যেহেতু শ্রীঅদ্বৈত আসিয়াছেন কি না ইহা তিনি জানিতেন না। নিতাইয়ের মনের ভাব যে, যদি তিনি পান, তবে দুই জনে প্রভুকে অবশ্য শান্তিপুরে লইয়া যাইতে পারিবেন। বিশেষতঃ

শ্রীনিমাই অদ্বৈতকে বড় মান্য করেন, তাঁহার কথা প্রায় লঙ্ঘন করেন না। কিন্তু নিমাই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ছুটিলেন, নিতাইও অমনি পশ্চাতে ছুটিলেন। প্রভু তীরে পৌঁছিলেন এবং বিশ্রাম না করিয়াই গঙ্গাকে যমুনা ভাবিয়া, ঝম্প প্রদান করিলেন। ঝম্প দিবার সময়ে এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন, যথা চন্দ্রোদয় নাটকে ঃ

চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ পর-প্রেম-পাত্রী দ্রব-ব্রহ্ম-গাত্রী।
অঘানাং নবিত্রী, জগৎক্ষেম ধাত্রী পবিত্রী ক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্র পুত্রী।।

ভাগ্যক্রমে শ্রীঅদ্বৈতের নৌকাও সেই সময়ে সেই ঘাটে লাগিল, নৌকায় তিনি ও আরো কেহ কেহ ছিলেন।

প্রভু স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন, উঠিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। নয়ন মুদিত, দুই হস্ত মস্তকে, নয়নে আনন্দ ধারা বহিতেছে। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিতেছেন না। মস্তক মুণ্ডিত হওয়ায় প্রভুর আকৃতি পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। তবু দেখিতেছেন, যেন একটি সোণার বিগ্রহ সম্মুখে দাঁড়াইয়া। দেখিতেছেন, সুবলিত ও প্রকাণ্ড দেহ, পরিসর বুক ও "মুঠে পাই কটিখানি"। আর দেখিলেন, শরীর দিয়া অমানুষিক তেজ বাহির হইতেছে। তখন বুঝিলেন, প্রভুই বটে।

কিন্তু তাঁহার দশা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। যাঁহার শ্রীপদে বেদনা লাগিবে বলিয়া নদীয়ার পথে লোকে ফুল ছড়াইতেন, যাঁহাকে হৃদয়ে কি নয়নের উপর রাখিয়াও মনের বেগ মিটিত না, আজ তাঁহার একি দশা! তিনি আজ প্রায় উলঙ্গ, স্নান করিয়াছেন তাহাতে আরো উলঙ্গ দেখা যাইতেছে, সে জ্ঞান নাই। শীতকালে স্নান করিয়াছেন, গাত্র দিয়া জল পড়িতেছে, কিন্তু গাত্রমার্জনী নাই; আর্দ্র কৌপীন পরিয়া আছেন, উহা ত্যাগ করেন এরূপ দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। শ্রীনবদ্বীপে প্রভু যদি কোনখানে দাঁড়াইতেন, তবে শত শত লোকে তাঁহার শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া করজোড়ে আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিত। এখন তিনি একাকী, তাঁহাকে দুটী কথা বলে এমন লোক নাই। শ্রীঅদ্বৈত ভাবিতেছেন, "হে বসুন্ধরে! তুমি দ্বিধা হও, আমি উহাতে প্রবেশ করি।" শ্রীঅদ্বৈত অতি কষ্টে প্রভুর নিকট গমন করিলেন, কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রভুর যে তখন গঙ্গাকে যমুনা বলিয়া ভ্রম হইয়াছে, ইহা জানিলে হয়ত ধৈর্য ধরিয়া থাকিতেন, কান্দিয়া তাঁহার ভ্রমের অবস্থা হঠাৎ ভঙ্গ করিতেন না।

প্রভু যমুনায় স্নান করিয়াছেন—এই আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈতের অতি কাতর ক্রন্দন রবে তাঁহার রস-ভঙ্গ ও কাজেই ধ্যান-ভঙ্গ হইল। তখন তিনি নয়ন মেলিলেন। দেখেন, সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈত।

শ্রীঅদ্বৈতকে দেখিয়া প্রভু বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দও সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার দিকে চাহিয়া প্রভু চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "শ্রীপাদ! ইনি অদ্বৈত আচার্য না?" নিতাইয়ের এখন অনেক সাহস হইয়াছে। ওপারে শান্তিপুর ঘাটে নৌকা, আর অদ্বৈত উপস্থিত। প্রভু আর যাইবেন কোথা? তখন আর প্রতারণা করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না, সুতরাং স্পষ্টভাবে বলিলেন, "প্রভু। তিনিই বটে।"

শ্রীঅদ্বৈতকে পাইয়া, নিমাই অতি আনন্দিত হইলেন। তখন আর্দ্রগাত্রে তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, "তুমিও আসিয়াছ? বেশ করিয়াছ। এখন আমরা সুখে মুকুন্দ-ভজন করিব।"

একটু পরেই মনে সন্দেহের উদয় হওয়ায় বলিতেছেন, "আমি বৃন্দাবনে তুমি কিরূপে জানিলে?" শ্রীঅদ্বৈত তখন বুঝিলেন যে, প্রভু বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তাঁহার এই ভ্রম হইয়াছে। ইহাতে হৃদয় আবার দ্রব হইল, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। উত্তর করিতে গিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

প্রভু উত্তর না পাইয়া এবং শ্রীঅদ্বৈতকে রোদন করিতে দেখিয়া, প্রকৃত ব্যাপার কি বুঝিবার নিমিত্ত, একবার নিতাইয়ের আর একবার অদ্বৈতের মুখপানে চাহিতে লাগিলেন। নিতাইকে বলিতেছেন, "শ্রীপাদ। আমি ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না? আমি বৃন্দাবনে আসিলাম, আসিতে পথে দেখি তুমি অগ্রে দাঁড়াইয়া। আবার খানিক আসিয়া দেখি যে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য উপস্থিত। ইহা কিরূপে সম্ভবে? সত্য কি আমি বৃন্দাবনে না কোথায়? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না জাগ্রত আছি?" নিতাই কি উত্তর করিবেন ভাবিতেছেন। কিন্তু তাঁহার আর উত্তর করিতে হইল না। প্রভুর একেবারে নিপট্ট-বাহ্য হইল তখন ব্যাপার কি সমুদয় একেবারে পরিষ্কাররূপে বুঝিলেন। বুঝিলেন ওপারে শান্তিপুর। বুঝিলেন নিতাই তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া বৃন্দাবনের নাম করিয়া শান্তিপুরের ওপারে লইয়া আসিয়াছেন।

প্রভু মনে বড় ব্যথা পাইলেন। বৃন্দাবনে যাইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন এই আনন্দে বাহ্যেন্দ্রিয় সমুদয় এক প্রকার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সেই বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, সেই যমুনায় স্নান করিলেন, এত পথ হাঁটিলেন ও দেহের ক্লেশ এত লইলেন; এখন শুনিলেন যে, তিনি বৃন্দাবনে যাইতে পারেন নাই, বরং যে স্থান হইতে বৃন্দাবনমুখো গমন করিয়াছিলেন, প্রায় সেইখানেই আছেন। তখন হৃদয়ে অতিশয় ব্যথা পাইয়া অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিলেন।

কিন্তু ভগবানের ক্রোধ তাঁহার প্রীতির ন্যায় কেবল মধুর। শ্রীনিমাই ক্রোধে ও দুঃখে নিতাইকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি আমাকে প্রতারণা করিলে? এ ত বংশীবট নয়, এ ত যমুনা নয়,—এ যে গঙ্গা! তুমি আমাকে ভুলাইয়া নিয়া আসিলে? শ্রীপাদ! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া ভাই বলিয়া থাক, এই কি ভাইয়ের উপযুক্ত কাজ হইয়াছে? আমার সঙ্গীরা একে একে বৃন্দাবনে গেলেন, কেবল আমারই যাওয়া হইল না। শ্রীপাদ! আমি যার লাগি সন্ন্যাসী হলেম, তারে ত আর পেলেম না!"*

প্রভু ক্ষোভ বাক্যে নিতানন্দ ধরা পড়িয়াছেন জানিয়া, একটু লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত সমুদয় অবস্থা বুঝিলেন। বুঝিলেন যে সুরধুনীকে যমুনা বলিয়া ভুলাইয়া নিতাই প্রভুকে আনিয়াছেন। নিতাই যখন মস্তক অবনত করিলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "গঙ্গার পশ্চিম ধারে যমুনা বহিয়া থাকেন—ইহা শাস্ত্রের কথা। প্রভু করুণা কর, তোমার ভক্তগণ প্রতি একবার নয়ন মেল। এই শুষ্ক কৌপীন পরিধান কর।" অদ্বৈত অতিশয় বিবেচনার সহিত সমভিব্যাহারে কৌপীন ও বহির্বাস আনিয়াছিলেন।

"আমার যাওয়া হইল না" ইহা বলিতে বলিতে প্রভু আর্দ্রকৌপীন ত্যাগ করিয়া শুষ্ক কৌপীন পরিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "বহুদিন উপবাসী আছেন, দাসের গৃহে পদার্পণ করুন, করিয়া এক মুষ্টি অন্ন গ্রহণ করুন, নৌকা প্রস্তুত।" প্রভু এ কথার উত্তর করিলেন না। নিতাইয়ের দিকে রুক্ষভাবে চাহিয়া বলিলেন, "এই নিমিত্ত বুঝি তুমি আমাকে ভুলাইয়া আনিয়াছ?" শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমাকে ভুলায়েন নাই, অদ্য তিনি ত্রিভুবনে দেখাইলেন যে, তুমি কিরূপ ভক্তবৎসল।" প্রভু বলিলেন, "তাহা নয়। শ্রীপাদ দেখাইলেন যে, আমি পুত্তলি, আর আমাকে সূত্রে বাঁধিয়া তিনি নাচাইয়া থাকেন।"

* নিতাই এত নয় বংশীবট আঙ্গিনা। ধ্রু।
তুমি জাহ্নবী দেখায়ে বল ঐ দেখা যায় যমুনা।
তুমি ভাই হয়ে এই করিলে, ব্রজে যেতে দিলে না।
আমার খেলার সাথী সব গিয়াছে, আমার যাওয়া হল না।
আমি যার লাগি সন্ন্যাসী হলেম, তারে বুঝি পেলাম না। (প্রাচীন পদ)

নিতাই অপরাধীর ন্যায় মস্তক অবনত করিলেন। কিন্তু সে কিছুক্ষণের নিমিত্ত। শেষে বলিতেছেন, "প্রভু! তোমার যে সমুদয় নিজ-জন, ইহাদের প্রতি কি একটু করুণা করিবে না? জীবে তোমার করুণা পাইল, কিন্তু ইহারাও ত জীব?" শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "প্রভু! আমাদের প্রতি সদয় হও। কেহ যে প্রাণে মরে নাই সে কেবল তোমার ইচ্ছায়। এখন নৌকায় উঠ। দুটো অন্ন মুখে দাও, দিয়া প্রাণধারণ কর।" ইহা বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত নিমাইয়ের হস্ত ধরিলেন।

নিমাই অদ্বৈতের কথা ফেলিতেন না। তখনও তিনি কোন কথা বলিলেন না, আস্তে আস্তে নৌকায় উঠিলেন। তখন মুকুন্দ ও গোবিন্দ আসিয়াছেন, প্রভুবা উঠিলে তাঁহারাও উঠিলেন। নৌকা যখন ভাসিল তখন নিতাইয়ের নয়নে জল, আর দেহে ক্ষুধা-পিপাসার উদয় হইল। নিত্যানন্দেব পূর্বাশ্রমের নাম কুবের পণ্ডিত। তাঁহার আনন্দ নিত্য বলিয়া নিত্যানন্দ নাম প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার কার্য নৃত্য করা ও অন্যকে নৃত্য করান। তাঁহার কার্য আপনি আনন্দ ভোগ করা ও অন্যকে আনন্দ দেওয়া। তাঁহার এ ভোগ কেন? এখন প্রভুকে নৌকায় উঠাইয়া গঙ্গার মাঝখানে আসিয়া, তিনি আর অদ্বৈত, নিমাইয়ের দুই পার্শ্বে প্রহরী স্বরূপ বসিয়া, সুতরাং আবার তিনি স্বাভাবিক অবস্থা পাইলেন, অর্থাৎ নিত্যানন্দ হইলেন। তখন একটু কোন্দল করিবার ইচ্ছায় শ্রীঅদ্বৈতকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ওগো ঠাকুর! বাড়ীতে ত নিয়ে যাচ্ছ, দুটো পেটভরে খেতে দিতে পারিবে ত?" অন্য সময় হইলে শ্রীঅদ্বৈত ইহার উপযুক্ত উত্তর দিতেন, কিন্তু তখন তাঁহার প্রভুর সন্ন্যাস-জনিত দুঃখ জাগরিত হইয়াছে, কাজেই তিনি এইমাত্র বলিলেন, "তাই হবে।" কিন্তু নিতাইয়ের ওরূপ কথা ভাল লাগিতেছে না, তাই বলিতেছেন, "ওরূপ নয়, স্পষ্ট করিয়া বল। প্রভু লইলেন দণ্ড, কিন্তু দণ্ড পাইলাম আমি। অদ্য চারি দিবস জল-বিন্দু মুখে দেই নাই। আমিও দেই নাই, প্রভুও দেন নাই। কিন্তু উঁহার কি? উনি ঢোকে ঢোকে প্রেমানন্দ পান করিতেছেন, আমাদের হুতাশে কোথাকার প্রেম কোথা পলাইয়াছে। একে হুতাশ তাহার পরে দৌড়িয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। অনাহারে কতদিন দৌড়ান যায়? তাই বলিতেছি, বাড়ী নিয়া যাইতেছ ভাল, যত চাইব, তত অন্ন কিন্তু দিতে হইবে।"

কিন্তু অদ্বৈতের কোন্দলে রুচি হইতেছে না। তিনি নিত্যানন্দের কথা শুনিয়া সকৃতজ্ঞ-চক্ষে তাঁহার প্রতি চাহিলেন। গদগদ হইয়া বলিতেছেন, "তুমি যে কাজ করিয়াছ তাহাতে আমি কেন, যাবৎ চন্দ্র সূর্য থাকিবে সকলেই পরিতৃপ্ত করিয়া তোমাকে অন্ন দিবে। বাপ রে বাপ! এ কয়েক দিবস মানুষ ত দূরের কথা, পশু পক্ষী পর্যন্ত আহারাদি করে নাই।" নৌকা শান্তিপুরের ঘাটে লাগিলে দেখা গেল, ইহার মধ্যেই তীরে বহু লোক জড় হইয়াছে। নৌকা দেখিবামাত্র সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। নিতাই বলিতেছেন, নৌকা হইতে শীঘ্র নামিয়া চল, শ্রীভগবানের আকর্ষণে, দেখিতে দেখিতে এত লোক হইবে যে তখন যাইতে পারিব না।" প্রভুসকল গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পদ-ধৌতের জল আসিল। শ্রীঅদ্বৈত আপনি প্রভুর পদধৌত করিতে ইচ্ছা করিলেন, তাহাতে শ্রীনিমাই একটু বিরক্তি প্রকাশ করায় তাহা হইতে ক্ষান্ত দিলেন। পদধৌত করিয়া সকলে উত্তম আসনে বসিলেন। নিতাই বলিতেছেন, "আচার্য! তুমি এক কাজ কর। দ্বারে কতকগুলি বলবান্ দ্বারী নিযুক্ত করিয়া দাও। এখনি এত লোক আসিবে যে তোমার বাড়ী চূর্ণ হইয়া যাইবে।" শ্রীঅদ্বৈত তাহাই করিলেন। নিতাই আরো বলিলেন, "কৃষ্ণের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে যেন বিলম্ব না হয়।" একটু তাড়াতাড়ি করিবার কথা বটে, চারি দিবস মুখে জল পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই।

শ্রীঅদ্বৈতের সম্পত্তির অবধি নাই, নানাবিধ দ্রব্যে ভাণ্ডার পূর্ণ। অতি অল্প সময়ে মহা আয়োজন হইল। ঠাকুর-ঘরে তিন পাত্রে ভোগ দেওয়া হইল। ভোগের কিরূপ আয়োজন হইল, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বিবরিত আছে। ঠাকুরের আরত্রিক আরম্ভ হইল, গৌর নিতাই

ও ভক্তগণ উহা দর্শন করিলেন। তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন ও শয়ন করাইয়া নিতাই ও গৌরকে লইয়া অদ্বৈত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখেন যে, শুভ্র বস্ত্রাবৃত দুইখানি পীড়ি, আর তাহার সম্মুকে কদলী পত্রে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন রহিয়াছে। প্রভু অন্নকে নমস্কার করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "হরিদাস কোথা? হরিদাস ও মুকুন্দ?" শ্রীভগবানের নিকট জাতিবিচার নাই।

মুকুন্দ যদিও বৈদ্য, কিন্তু হরিদাস প্রকৃত প্রস্তাবে যবন। প্রভু হরিদাস বলিয়া ডাকিলে, হরিদাসের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি করজোড়ে বলিলেন, "প্রভু, ক্ষমা দিউন, আমি পিঁড়ায় থাকিয়া ভোজন দর্শন করিব।" মুকুন্দও ঐ কথা বলিলেন। দুইজনেরই তাঁহাদের সহিত ভোজন করিতে নিতান্ত আপত্তি দেখিয়া প্রভু ক্ষান্ত দিলেন। দিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেছেন, "একখানি পাতা দাও, আর অল্প দুটি অন্ন দাও।" শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "আবার পাতা দিব কি? পীড়ির উপর উপবেশন কর।" প্রভু বলিতেছেন, "সে কি? শ্রীকৃষ্ণের আসনে কিরূপে বসিব?" শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "ও একই কথা, তুমি উপবেশন কর।" ইহা বলিয়া প্রভুর হাত ধরিয়া পীড়ির উপরে বসাইলেন।

শ্রীনিমাই অন্নের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এত অন্ন কি হইবে, সমুদয় উঠাইয়া লও, অল্প কিছু রাখ।" অদ্বৈত বলিলেন, "উঠাইয়া আর লইব না। পাতে থাকে থাকিবে, তুমি আহার কর।" নিমাই তখন বলিতেছেন, "এত অন্ন খাইতে পারিব না; আর সন্ন্যাসীর উচ্ছিষ্ট রাখিতে নাই।" অদ্বৈত তখন বলিলেন, "তুমি প্রভু, তোমাকে মিনতি করি, ভোজন কর।"

অদ্বৈতের কথা প্রভু অমান্য করিতে পারিলেন না, কাজেই বসিতে হইল। তখন বলিলেন, "এ সমুদয় উপকরণ লইয়া যাও। সন্ন্যাসীর উপকরণ ব্যবহার করিতে নাই।" ইহাতে অদ্বৈত বলিলেন, "প্রভু ক্ষমা দাও। সমুদয় ভোজন করিতে হইবে, না করিলে আমি আত্মহত্যা হইব।"

তখন নিমাই বলিতেছেন, "আচার্য! আমার কর্তব্য দুটী মাত্র অন্ন গ্রহণ করিয়া জীবন যাপন করা। গুরুতর আহার করিলে ইন্দ্রিয় কিরূপে দমনে রাখিব?" নিমাই এই কথা মনে মনে যে ভাবেই বলুন, বাহিরে দেখাইলেন যেন সরলভাবে বলিতেছেন। তখন অদ্বৈত হাসিয়া বলিলেন, "নীলাচলে প্রত্যহ পর্বত-প্রমাণ অন্ন আহার কিরূপে কর? ঠাকুর, সন্ন্যাসী হয়েছ, ভাল, আমরা ত জানি তুমি কেমন? এ সমুদয় রঙ্গ বাহিরের লোকের সহিত করিও, আমাদের সঙ্গে কেন? প্রভু, ক্ষমা দাও, অদ্য চারি দিবস মুখে জল মাত্র দেও নাই, আমি যাহা রন্ধন করিয়াছি সমুদয় ভোজন করিতে হইবে। তাহা না কর, তোমার সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ করিব।" ইহা বলিয়া প্রভুর দক্ষিণ হস্তখানি আপনি ধরিয়া জল দ্বারা ধৌত করিলেন। তাহার পর নিতাইয়েরও ঐরূপ করিলেন।

শ্রীনিমাই বড় স্বাধীন প্রকৃতির লোক, কাহারও হাতের পুতুল হইতে বড় নারাজ। একটু পূর্বে নিতাই তাঁহাকে হাতের পুতুল করিয়াছেন বলিয়া ধমকাইয়াছিলেন। কিন্তু তবু নিমাই স্নেহের বশ, ভক্তের দুঃখ দেখিতে পারেন না। সন্ন্যাস-আশ্রমের প্রতি নিমাইয়ের কিঞ্চিৎ মাত্র শ্রদ্ধা নাই, এবং সন্ন্যাসধর্মকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। যখন শ্রীঅদ্বৈত জিদ করিয়া,—যেন হাতে ছুরি ধরিয়া সম্মুখে বসিয়া—বলিতে লাগিলেন, "তুমি যদি ভোজন না কর আমি তোমার সাক্ষাতে মরিব," তখন প্রভু অল্পে অল্পে ভোজন করিতে লাগিলেন, আর কথা কহিলেন না।

নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রভু একটি আস্বাদ করিয়া আর একটিতে হাত দিতে যাইতেছেন, অমনি অদ্বৈত বলিতেছেন, "ওটা বুঝি ভাল হয় নাই, যদি ভাল হইয়া থাকে, আমার মাথার দিব্য আর একটু খাও।" প্রভু করেন কি, দস্যুহস্তে পতিত, কাজেই আর একটু খাইলেন। এইরূপে অগ্রে বসিয়া শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিমাইকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। সীতাদেবী দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া এই কার্যের সহায়তা করিতেছেন। গুরুতর ভোজন হইতেছে আর

বলিতেছেন, "আর কত খা'ব?" অমনি অদ্বৈত বলিতেছেন, "আমার মাথা খাও, এই ব্যঞ্জন আর একটু আহার কর।"

কিন্তু শ্রীনিতাইকে ভোজন করাইতে কোন দুঃখ পাইতে হইতেছে না। ভাইকে হারায়েছিলেন, ভাইকে পেয়েছেন, ভাইয়ের সঙ্গে আহার করিতেছেন, কাজেই নিতাই সন্ন্যাসের কথা সব ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি এক মনে ভোজন করিতেছেন। যখন আর ভোজন করিতে পারেন না, উদর আর কিছু গ্রহণ করিতে নিতান্তই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল,। তখন অদ্বৈতের সঙ্গে কোন্দল করিবার শক্তি ও সেই সঙ্গে ইচ্ছা হইল। বলিতেছেন, "আমি তখন জানি পেট ভরিবে না। চারি দিনের উপবাস, এই ক'টা অন্নে কি আমার পেট ভরে? আমার অদৃষ্টে অদ্য উপবাস আছে তাহা মনে মনে জানিতাম, তাই গঙ্গার গর্ভে আচার্যকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লই যে, আমাকে পেট ভরিয়া দুটা ভাত দিতে হইবে; তা পেট ভরিল না,—পেট ভরিল না" ইহা বলিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

আচার্য উত্তরে বলিতেছেন, "আমি জানি যে, তোমার সন্ন্যাস সমুদয় মিথ্যা কেবল ব্রাহ্মণ বধ করা তোমার উদ্দেশ্য! তুমি এখন পর্বত-প্রমাণ অন্ন খাইতে পার। সব যদি তুমি খাও তবে আমরা খাব কি? শুদ্ধ তাও নয়, আমরা অত অন্ন পাইবই বা কোথায়? তুমি সন্ন্যাসী, তীর্থ করিয়া বেড়াও, ফল মূল ভোজন করিয়া জীবন যাপন কর, অদ্য দুটা অন্ন পাইলে, কৃতার্থ হও। এখন উঠ, আর লোভ করিও না, সন্ন্যাসীর লোভ করিতে নাই।"

তখন শ্রীনিতাই, "এই নে, তোর ভাত নে" ইহাই বলিয়া যেন ক্রোধ করিয়া, হস্তে এক দলা ভাত লইয়া শ্রীঅদ্বৈতের গায়ে দিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের অঙ্গে অন্ন পড়িলে তিনি ইহাই বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, "আজ অবধূতের ঝুটা আমার অঙ্গে লাগিল, অদ্য আমি পবিত্র হইলাম!" ইহাতে নিতাই বলিতেছেন, 'ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ, ইহাকে তুমি ঝুটা বলিলে, তুমি অতিশয় অপরাধ করিলে। আমার মত এক শত সন্ন্যাসীকে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করাইলে, তবে এই অপরাধের দণ্ড হয়।"

শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "আবার সন্ন্যাসী! আবার সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ? উহা আমা দ্বারা আর হবে না। সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ করিয়া এই ফল,—সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিয়া আমার কুল, ধর্ম, পদ, বিধি সমুদয় গেল।"

তখন দুই প্রভু আচমন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিমাইকে যত্ন করিয়া উত্তম শয্যায় বসাইলেন, গলায় ফুলের মালা দিলেন, শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপিলেন, যত্ন করিয়া শোয়াইলেন, আর আপনি পদতলে বসিয়া পদসেবা করিতে গেলেন। ইহাতে নিমাই একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে ঢের নাচাইয়াছ, আর কাজ নাই। এখন যাও মুকুন্দ, গোবিন্দ, হরিদাস প্রভৃতিকে, আর নিজের মুখে দুটা অন্ন দাও গিয়া।"

শ্রীঅদ্বৈত তাহাই করিলেন; প্রভু একটু শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীঅদ্বৈতের গণ খোল করতাল লইয়া উপস্থিত হইলেন ও বাদ্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া কীর্তন শুনিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী, প্রভু তাঁহার অতিথি, তাঁহাকে ভোজন করাইলেন, এখন কীর্তন শুনাইতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত বিদ্যাপতির এই পদ গাওয়াইতে লাগিলেন, যথা— "কি কহিব রে সখি আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।। আর হাম প্রিয়া দূর দেশে না পাঠাঙ। আঁচল ভরিয়া যদি ধন পাঙ।।"

প্রকৃতই অদ্বৈতের আনন্দের ওর নাই। মাধবকে হারাইয়াছিলেন, এখন পাইয়াছেন। "মাধব" যে সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাহা তখন ভুলিয়া গিয়াছেন। মনের আনন্দে বলিতেছেন, 'আঁচল ভরিয়া যদি টাকা পাই তবুও প্রিয়কে আর দূরদেশে যাইতে দিব না।' শ্রীঅদ্বৈতের গণ গাইতেছেন, আর তিনি স্বয়ং নৃত্য করিতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিতেছেন,

আর প্রভু অমনি উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। প্রভুর সন্ন্যাস করায় ভক্তগণের এই একটা লাভ হইয়াছে। অগ্রে গর্বিত লোকে কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনিও ফিরিয়া প্রণাম করিতেন, কাজেই ভয়ে তাঁহারা কেহ প্রভুকে প্রণাম করিতেন না। সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্যকে প্রণাম করিতে নাই, কাজেই .অদ্বৈত প্রাণ ভরিয়া প্রভুকে প্রণাম করিতেছেন, আর প্রভু উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, ফিরিয়া আর প্রণাম করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু প্রভুর কিছু ভাল লাগিতেছে না। তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ-বিরহ ভাব সেই রূপেই জ্বলন্ত রহিয়াছে। তবে এখন দাস্যভাব যাইয়া গোপী-বিরহভাব উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ এখন সাধু-বিপ্রের ন্যায় বৃন্দাবন যাইয়া মুকুন্দ ভজন করিবেন, সে ভাব আর নাই, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে গোপীগণ যে বিরহ-দুঃখ পাইয়াছিলেন, তাহাই এখন তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। অতএব অদ্বৈত যে মনের আনন্দে গাইতেছেন, "মাধবকে পাইয়াছি আর যাইতে দিব না," কি কখন প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিতেছেন, "প্রেমডোর দিয়া এই দুইখানি চরণ বাঁধিয়া রাখিব, আর ছাড়িয়া দিব না," ইহা প্রভুর ভাল লাগিতেছে না। শ্রীমুকুন্দও পিঁড়ায় প্রভুর নিকট বসিয়া, কিন্তু তিনি কীর্তন শুনিতেছেন না, এক চিত্তে প্রভুর কাতর বদন দেখিতেছেন। মুকুন্দ শ্রীনিমাইয়ের বদন দেখিয়া বুঝিলেন, শ্রীঅদ্বৈত যে রসে গাইতেছেন, তাহা প্রভুর ভাল লাগিতেছে না, আর তাঁহার মনে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহরূপ-রসে পীড়া দিতেছে। তখন তিনি সুস্বরে এই গীতটি ধরিলেন—"আহা প্রাণপ্রিয়া সখি কি না হৈল মোরে। কানু-প্রেম-বিষে মোর তনু মন জরে।। রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাই। কাঁহা গেলে কানু পাই তাঁহা উড়ে যাই।।"

এই গীত শুনিবামাত্র প্রভুর ধৈর্য-বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি নয়ন বহিয়া শত শত ধারা পড়িতে লাগিল। ক্রমে ভাবের তরঙ্গ এত প্রবল হইল যে, তিনি একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন সকলে হাহাকার করিয়া কীর্তন রাখিয়া প্রভুকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। একটু পরে প্রভু হরি হরি বলিয়া উঠিলেন, উঠিয়া মহানন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন আবার সকলে মৃদঙ্গ করতাল বাজাইতে লাগিলেন, আর মুখে তালে তালে "হরিবোল, হরিবোল" বলিতে লাগিলেন। প্রভু যেমন নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ অমনি (পাছে প্রভু মৃত্তিকায় পড়িয়া যান,এই ভয়ে) বাহু প্রসারিয়া তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। প্রভু বহুদিন উপবাসে ও অনিদ্রায় আছেন, সকলেরই ইচ্ছা যে, তিনি নৃত্য না করেন, সেই নিমিত্ত পরামর্শ করিয়া সকলে বাদ্য রাখিলেন, আর চুপ করিলেন। যখন সমস্ত শব্দ রহিত হইল, তখন প্রভু বাহ্য পাইলেন। আর নিতাই ও অদ্বৈত তাঁহাকে ধরিয়া বাধ্য করিয়া অতি উত্তম শয্যায় শয়ন করাইলেন। শ্রীনিতাই কাছে শুইলেন, শ্রীঅদ্বৈত নিজস্থানে শয়ন করিতে গমন করিলেন।

দুই ভাই শয়ন করিলে নিতাই বলিতেছেন, "প্রভু! একটা কথা বলিব।" প্রভু বলিলেন, "বল।" বলিতে গিয়া নিতাইয়ের হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, কিন্তু কষ্টে-সৃষ্টে উহা নিবারণ করিয়া বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি কি সমুদয় ভুলিয়া গিয়াছ? তোমার জন্য যে, তোমার নিজ-জন প্রাণে-মরিতেছে, তাহাদের কথা কি তোমার মনে আছে?"

নিমাই নীরব রহিলেন। নিতাই বলিতেছেন, "মা বাঁচিয়া আছেন না আছেন জানি না। শ্রীবাস মুরারি প্রভৃতি তোমার ভক্তগণের কি দশা হয়েছে তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। আমরা অদ্য মুখে অন্ন জল দিয়াছি, তাঁহাদের সম্ভবতঃ অদ্যাবধি তাহাও হয় নাই। তুমি যদি অনুমতি কর, আমি কল্য নবদ্বীপে গমন করি, করিয়া সকলকে এখানে লইয়া আসি।"

শ্রীনিমাইয়ের তখন নবদ্বীপ মনে পড়িতে লাগিল। একটু চিন্তা করিয়া বলিতেছেন, "আমি যে সন্ন্যাস করিয়াছি, এ সংবাদ কি নবদ্বীপবাসীরা শুনিয়াছেন?" নিতাই বলিলেন, "আমি আচার্যরত্নকে সে সংবাদ লইয়া পাঠাইয়াছি।" আচার্যরত্নের নাম শুনিয়া প্রভু আশ্চর্য হইলেন।

বলিতেছেন, "তাঁহাকে কোথা পাইলে?" নিতাই তখন সংক্ষেপে সমুদয় কথা বলিলেন। তারপর বলিতেছেন, "সম্ভবতঃ আচার্য্যারত্ন নদীয়ায় তোমার সন্ন্যাসের কথা বলিয়াছেন। এখানে তুমি যে আসিয়াছ, তাহার ঠিক সংবাদ তাঁহারা কেহ পান নাই। অতএব আমাকে আজ্ঞা কর, আমি নদে যাই, যাইয়া সকলকে এখানে আনি।" প্রভু বলিলেন, "তা বটে। আমি যদি তাহাদিগকে দেখা না দিয়ে যাই তবে তাঁহারা প্রাণে মরিবেন। তুমি যাও, তাঁহাদের সকলকে লইয়া আইস।" প্রভুর এই অনুমতি পাইয়া নিতাইয়ের মনস্কামনা সিদ্ধি হইল, তিনি অতিশয় সুখী হইলেন। তাহার পরে আর একটু ভাবিতে লাগিলেন, ভাবিয়া বলিতেছেন, "প্রভু! এ সংবাদ শুনিলে সকলেই আসিতে চাহিবেন, একেবারে নবদ্বীপ ভাঙ্গিবে। আমার কাজেই সকলকে আনিতে হইবে, যিনি আসিতে চান তাঁহাকেই ত আনিব?" নিমাই বলিলেন, "তাহার সন্দেহ কি? যিনি আসিতে চান তাঁহাকেই আনিবে। আমি সকলের নিকট মহানন্দে বিদায় লইয়া যাইব।"

এ কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ "যে আজ্ঞা" বলিলেন। নিতাই "যে আজ্ঞা" বলিলেন, ইহাতে একটু আনন্দ প্রকাশ পাইল। নিতাই বরাবর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা ভাবিতেছিলেন, তাই তাঁহাকে আনিবার নিমিত্ত প্রভুর নিকট প্রকারান্তরে অনুমতি চাহিতেছিলেন, তাই দুই-বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকলকেই ত আনিব?" প্রভুও বলিলেন, "হাঁ, সকলকেই আনো।" ইহাতে নিতাই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকেও আনিতে পারিবেন, এরূপ অনুমতি পাইলেন, বুঝিয়া, বড়ই আনন্দিত হইলেন। আর সেই আনন্দ, "যে আজ্ঞা" কথায় প্রকাশ পাইল। প্রভু নিতাইয়ের আনন্দ দেখিয়া একটু সন্দিগ্ধ হইলেন। আর তখন তাঁহার মনে পড়িল যে, তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, শাস্ত্রমতে আর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিতে পারিবেন না। তখন ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! সকলকেই আনিবে, যে আসিতে চায় তাহাকেই আনিবে,—কেবল একজন ছাড়া।" নিতাই তখন কপালে ঘা দিলেন, তাঁহার মানা করিবার সাধ্য হইল না।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীপ্রভু গঙ্গাস্নান করিতে পারিলেন। নিতাই ঠিক অনুভব করিয়াছিলেন, নিমাইচাঁদ সন্ন্যাস করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী আসিয়াছেন, এ সংবাদ দাবানলের ন্যায় চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল, তখনি দলে দলে লোক আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। শত শত লোক 'প্রভু' 'প্রভু' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। অদ্বৈতের বাড়ী প্রবেশ করিতে না পারিয়া দ্বারীগণের নিকট "পথ ছেড়ে দে ওরে দ্বারী" বলিয়া মিনতি করিতে লাগিল। দ্বারীগণ তখন তাহাদের ইহাই বলিয়া নিরস্ত করিল যে, "প্রভু অদ্য চারি দিবস জলমাত্র মুখে দেন নাই তাঁহাকে সেবা করিতে দাও, একটু নিদ্রা যাইতে দাও, কল্য আসিও, প্রভুকে দেখাইব।" কাজেই পূর্ব দিন প্রভুকে কেহ দর্শন করিতে পারেন নাই। প্রাতঃকাল হইতেই ভিড় আরম্ভ হইয়াছে। প্রভু অতি প্রত্যূষে স্নান করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, আর ক্রমে লোকের ভিড় বাড়িতে লাগিল। লোকে "প্রভু দর্শন দাও" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। দ্বারীগণ আর দ্বার নিবারণ করিতে পারে না। তখন শ্রীঅদ্বৈত এক উপায় করিলেন, প্রভুকে লইয়া ছাদের উপর উঠিলেন। প্রভু ছাদের উপর দাঁড়াইলেন, তখন সকলে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ প্রভুকে পূর্বে দেখিয়াছিলেন, কেহ দেখেন নাই। সকলেই নাম শুনিয়াছেন, সকলেরই মনে বিশ্বাস যে, তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, কি ঐরূপ একজন। দর্শকগণ প্রভুকে দর্শন করিয়া কেহ ক্ষুণ্ণ হইলেন না। সকলেরই প্রভুকে দর্শন একটি মহাভাগ্য বলিয়া বোধ হইল। সকলেই বড় আশা করিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, এমত স্থানে নিরাশ হওয়ারই কথা, যেহেতু যেখানে অধিক আশা সেখানেই নিরাশা। কিন্তু তাহা না হইয়া, সকলে আশার অতিরিক্ত ফল পাইলেন। প্রভুকে দর্শন করিয়া সকলে "ইনিই সেই বটে, সর্বজীবের গতি ও কাণ্ডারী" এইরূপ বুঝিলেন। ভব-সাগর পার হইবেন বলিয়া প্রথমে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, প্রভুকে দর্শন করিয়া স্বার্থের কথা ভুলিয়া গিয়া আনন্দে সহস্র সহস্র

লোকে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সহস্র সহস্র লোক ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন, আর যাহার যেরূপ স্ফুরিত হইতেছিল, তিনি সেইরূপ ভাবে স্তুতি কি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের এক অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, যখন বহুতর লোকে তাঁহার শ্রীবদন নিরীক্ষণ করিতেন, তখন প্রত্যেক দর্শকের বোধ হইত যে, প্রভু তাহারই পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক দর্শকের বোধ হইতে লাগিল যে, নিমাই যেন তাহার কথা শুনিবার নিমিত্ত তাহার পানে চাহিয়া আছেন। সেই সঙ্গে আবার সকলেরই আর এক ভাব হইল। তাহারা যে লোক মাঝে দাঁড়াইয়া, ইহা সকলে ভুলিয়া গেলেন, এবং প্রত্যেকের মনে এই ভাব হইল যে তিনি আর প্রভু দাঁড়াইয়া উভয় উভয়ের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন; আর তাহার কথা শুনিবার নিমিত্ত প্রভু কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কাজেই যাহার যেরূপ মনের ভাব তিনি সেইরূপ মন উঘাড়িয়া বলিতে লাগিলেন। কেহ বলিতেছেন, "আমি পাপী, আমাকে উদ্ধার কর।" কেহ বলিতেছেন, "আমার নিমিত্ত আমি কিছু চাহি না, যেহেতু আমি তোমার দর্শনে নির্মল হইয়াছি। আমার পুত্রটিকে ভাল কর।" কেহ বলিতেছেন, "প্রভু, আমি ভবকূপে পড়িয়া, আমাকে উঠাও।" কেহ বলিতেছেন, "আমি অস্পৃশ্য; আমাকে স্পর্শ করিলে পাপ হয়, আমার উপায় কি হবে?" *শ্রীগৌর অবতারে এই সময়ে, জীবের হৃদয় হইতে যে সমুদয় প্রার্থনা উদিত হইয়াছিল, এরূপ কোন কালে কি কোন দেশে হয় নাই।

প্রভু ছাদের উপর বসিলেন। চতুষ্পার্শ্ব হইতে বহুতর লোক তাঁহাকে সতৃষ্ণ নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই দর্শন-সুখ ছাড়িয়া গৃহে গমন করেন এরূপ কাহারও ইচ্ছা হইতেছে না। প্রভু বসিয়া, আর ভক্তগণ চতুষ্পার্শে বসিয়া। শ্রীঅদ্বৈত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভাল প্রভু, আমার একটি কথার উত্তর দিতে হইবে। সন্ন্যাসীগণ "সোহংবাদী," অর্থাৎ ভগবানের সহিত তাঁহারা আপনাদিগকে অভেদ মনে করেন। তাঁহারা ভগবানের অদ্বৈতভাবে ভজনা করেন, তুমি জীবকে ভক্তি পথ অর্থাৎ দ্বৈতভাব শিক্ষা দাও, তুমি তাঁহাদের পথ কেন অবলম্বন করিলে না?" শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন, "আমিও শ্রীঅদ্বৈতকে ভজনা করি। সন্ন্যাসীদিগের যে অদ্বৈত তিনি শক্তিরূপ ও নিরাকার। এখন সেই অদ্বৈত রূপ ধারণ করিয়া শান্তিপুরে জন্ম লইয়াছেন।" ইহাতে অদ্বৈত বলিলেন, "তুমি সরস্বতী-পতি, তোমার সহিত কথায় পারিব কেন?"

একবিংশ অধ্যায়

'চলে নন্দ-রাজ-রমণী, বলে কোথায় নীলমণি, একবার দেখা দে আমায়।।" ধ্রু

চন্দ্রশেখরকে নিত্যানন্দ পথ হইতে বিদায় করিলে তিনি দ্রুতপদে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে সমুদয় কথা বলিলেন। শ্রীঅদ্বৈত অমনি কয়েক ব্যক্তি সঙ্গে করিয়া নৌকাসহ শান্তিপুরের অপর পারে গমন করিলেন। চন্দ্রশেখর শ্রীঅদ্বৈতকে পাঠাইয়া দিয়া, নবদ্বীপে আপন গৃহে গমন-করিলেন।

* অনেকে এই প্রাচীন গীতটি শুনিয়া থাকেন। প্রভুর দর্শনে লোকের মনে কি ভাব হইল তাহা এই গীত দ্বারা কতক প্রকাশিত হইবে। সুতরাং গীতটি এখানে দিলাম—

"প্রভু দয়াল আমি সাধু মুখে শুনেছি। অকুল পাথারে পড়ে ডাক্‌তেছি।। ধ্রু
তুমি দিয়া চরণ তরি, উঠাও কেশে ধরি, আমি ভবার্ণবেতে ডুবে রয়েছি।।
অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি।।
তুমি করিয়া অধম তারণ, নাম ধর পতিত পাবন, আমি অধম জন হতে শুনেছি।।
করিতে পতিত উদ্ধার প্রকাশ হয়েছ এবার, মোর সমান পতিত প্রভু কোথা পাবে আর।
প্রভু, যে তোমার শরণ লয়, তার দশা কি এমনি হয়,
আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি।।"

আপন বাড়ী আইলেন বটে, কিন্তু যে কারণেই হউক প্রভুর বাড়ী যাইতে পারিলেন না; হয় ভাবিলেন ঠিক সংবাদ কিছু তাঁহার নিকট নাই, যেহেতু তিনি গৌরাঙ্গকে মাঠের মাঝখানে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাই শচীর কাছে আর গমন করিলেন না। না হয় ভাবিলেন, নিমাইকে বাড়ী আনিতে গিয়া বিদায় করিয়া দিয়া আসিয়াছেন, তিনি আর শচীদেবীকে কি বলিয়া মুখ দেখাইবেন? শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট কাজেই তিনি কিছু বলিতে গেলেন না। কিন্তু ভক্তগণ অনেকে তাঁহার মুখে সন্ন্যাসের বৃত্তান্ত শুনিলেন।

আচার্যরত্ন নবদ্বীপে আসিবামাত্র এ সংবাদ অনেকে জানিতে পারিলেন। কাজেই প্রভুর সংবাদ শুনিতে অমনি তাঁহারা তাঁহার নিকট দৌড়িলেন। আচার্যরত্ন প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে পারিলেন না। কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার কারণ—কি বলিবেন? সকলে "কোথা প্রভুকে রাখিয়া আসিলে বল বল বল" বলিয়া দাপাদাপি করিতে থাকিল—যথা (চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক)—

"আচার্য রতন কান্দি কহেন সবারে। কি জিজ্ঞাস আর বজ্রপাত হল শিরে।। সমাপ্ত হইল সংকীর্তন নৃত্য খেলা। সেই সব প্রেমের বিলাস বাক্য ধারা।। দৃষ্টি ছাড়ি মো সবার হৃদয়ে রহিল। দৃষ্টি-সুখ নবদ্বীপবাসীর ফুরাইল।। প্রভুর সেই প্রীতি সেই সকল করুণা। স্মৃতি মাত্র করিতে তা রহিল ঘোষণা।। হাহা প্রভু গৌরচন্দ্র তোমার সন্ন্যাস! আমা সকলের করিলেক সর্বনাশ।। প্রভুর সন্ন্যাস শুনি আচার্যের মুখে। সব ভক্তগণ শূন্য দেখে তিন লোকে।। মূর্চ্ছিত হইয়া কেহ ভূমেতে পড়িল।" প্রভুর বাড়ীর কেহ কিছু শুনিল না।

এদিকে শ্রীনিত্যানন্দ অতি প্রত্যূষে শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ চলিলেন। শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপ চার পাঁচ ক্রোশ ব্যবধান। অর্ধ পথ খুব হাঁটিয়া আইলেন। নবদ্বীপ দেখা যাইতেছে, শ্রীনবদ্বীপে দেবীকে যাইয়া কি বলিবেন? শচীদেবী কি বাঁচিয়া আছেন? বিষ্ণুপ্রিয়ার কি অবস্থা? এই সমস্ত চিন্তা একেবারে তাঁহার মনে উদয় হইল। কাজেই নিত্যানন্দের আনন্দ ফুরাইল ও তখন ক্লেশে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ উঠিলেন, আবার চলিলেন, আবার ধূলায় পড়িলেন। আবার ভাবিতেছেন, তাঁহার এখন শোকের সময় নয়। প্রভু শান্তিপুরে আছেন, এই শুভসংবাদ যত শীঘ্র পারেন দিতে হইবে। কাজেই আবার দৌড়িতে লাগিলেন। নদীয়ায় প্রবেশ করিয়া নিত্যানন্দের বোধ হইল যেন সুখের নদীয়া ছারে-খারে গিয়াছে। যেন প্রত্যেক বাড়ী, গলি, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী রোদন করিতেছে। প্রকৃত কথা, বাহিরের জগৎ জীবের ইচ্ছামত কান্দিয়া কি হাসিয়া থাকে। নিত্যানন্দ হৃদয়ে রোদন করিতেছেন, তাঁহার বোধ হইল ত্রিজগৎ ক্রন্দন করিতেছে। নিত্যানন্দ প্রভুর বাড়ী গেলেন, তখনও প্রত্যূয। বাড়ী নীরব। নিতাই ভাবিতেছেন, এঁরা কি বেঁচে আছেন? প্রভুর আঙ্গিনায় গমন করিলেন, সেটি গৌরপ্রিয়গণের নৃত্য করিবার স্থান। পতিসোহাগিনী রমণী অকস্মাৎ বিধবা হইলে যেরূপ দেখায়, সেই আঙ্গিনা তখন সেইরূপ বোধ হইতেছে। নিত্যানন্দ আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া, 'মা' 'মা' বলিয়া ভগ্নস্বরে ডাকিলেন। শচী ঘরে ছিলেন, নিতাইয়ের গলার সাড়া পাইয়া বলিতেছেন, "কে ও নিতাই, আমার নিমাইকে এনেছ?" ইহা বলিয়া বাহিরে আইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও উঠিয়া দ্বারে দাঁড়াইলেন, আর প্রভুর বাড়ী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা নিতাইকে ঘিরিয়া ফেলিলেন! নিতাই আসিয়াছেন, এ সংবাদ বাড়ী বাড়ী গেল, দেখিতে দেখিতে প্রভুর বাড়ী লোকারণ্য হইল। যখন নিতাই ও শচীর মিলন হইল, তখন মুরারি গুপ্ত সেখানে দাঁড়াইয়া। তিনি সেই মিলন কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন—

"প্রেমাবেশে প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে। নিত্যানন্দ আইলেন নদীয়া নগরে।। ভাবিয়া শচীর দুঃখ নিত্যানন্দরায়। পথ মাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায়।। ক্ষণেক সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে। শুনি শচী ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে।। দাঁড়াইয়া মায়ের আগে ছাড়িয়ে নিশ্বাস। প্রাণ বিদরয়ে

ভায়ের কহিতে সন্ন্যাস।। কাতরে পড়িয়া শচী দেখিয়া নিতাই। কাঁদি বলে কোথা আছে আমার নিমাই।। না কান্দিহ শচীমাতা শুন মোর বাণী। সন্ন্যাস করিলা প্রভু গৌর গুণমণি।। সন্ন্যাস করিয়া প্রভু আইলা শান্তিপুরে। আমারে পাঠা'য়া দিল তোমা লইবারে।। শুনিযা নিতাই মুখে সন্ন্যাসের কথা। অচৈতন্য হয়ে ভূমে পড়ে শচীমাতা।। উঠাইলা নিত্যানন্দ, চল শান্তিপুরে। তোমার নিমাই আছে অদ্বৈতের ঘরে।। শচী কান্দে নিতাই কান্দে কান্দে নদীয়া-নিবাসী। সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী। কহয়ে মুরাবি গোরাচাঁদ না দেখিলে। নিশ্চয় মবিব প্রবেশিয়া গঙ্গাজলে।।"

মালিনী প্রভৃতি প্রবীণা রমণীগণ প্রভুর বাড়ীতে শচীকে ঘিরিয়া ছিলেন। আবাব অল্পবয়স্কা কয়েকজন রমণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবার নিমিত্ত ছিলেন। শচী যখন বাহিরে আসিলেন, পাছে পাছে মালিনীও আসিলেন। শচী নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনেক সন্তর্পণে শচী চেতন পাইলেন। মালিনীকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া বলিতেছেন, "মালিনি! নিমাই নাকি অদ্বৈতের ঘরে আমাকে নিতে পাঠাইয়াছে চল যাই", বলিয়া চুপ করিলেন। আবার বলিতেছেন, "নিমাই এখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়াছে,---না, আর তাহাকে দেখিব না, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিব।" আবার চুপ করিলেন। একটু পরে উঠিয়া, "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া ছুটিলেন।* তখন সকলে তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন। শ্রীবাস বলিলেন, 'মা! একটু অপেক্ষা কর, দোলা আসিতেছে, তাহাতে উঠিয়া যাইবে। আমরাও যাইব। আর সকলে মিলিয়া তোমার নিমাইকে ধরিয়া নদীয়ায় আনিব।" প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যিনি শুনিলেন তিনিই চলিলেন। স্ত্রীলোকেরাও চলিলেন। সকলেই প্রভুর বাড়ীতে আসিযা জুটিতেছেন। শুধু ভক্তগণ নহে, যাঁহারা পূর্বে শত্রু ছিলেন, তাঁহারা পর্যন্ত চলিলেন।

পূর্বে বলিয়াছি শ্রীনবদ্বীপে তিন শ্রেণীর লোক ছিলেন। এক শ্রেণী প্রভুর ভক্ত, এক শ্রেণী পরম শত্রু আর এক শ্রেণী—ইহাও নয় উহাও নয়। প্রভু সন্ন্যাস লওয়ায় এই তিন শ্রেণী আর থাকিল না, সকলেই প্রভুর জন্য রোদন করিতে লাগিলেন। আদবে শ্রীনিমাইয়ের প্রতি কাহারও ক্রোধ হওয়া আশ্চর্য। যখন তিনি বালক ছিলেন, তখন বাহিরের লোকে তাঁহার দুর্বৃত্তপনায় আমোদিত হওয়া ব্যতীত বিরক্ত হইবার কারণ পাইতেন না। যখন বিদ্যাভ্যাস করিতেন, তখন তিনি কাহাকেও মর্মে আহত করিতেন না। যাহা কিছু কোন্দল করিতেন, সে কেবল নিজ-জনের সহিত। যখন সংসারী ছিলেন, তখন পরম পণ্ডিত, স্নেহশীল, উদার, বদান্যবর, নির্মল-চরিত্র, মধুরভাষী, কৌতুক-প্রিয়। যখন ভক্ত হইলেন, তখন তাঁহার দর্শনে লোকের হৃদয় দ্রব হইত। তবে তাঁহার শত্রু হয় কেন? কিন্তু জগতের নিয়মই এই যে, সব স্থানে সব অবস্থায় বিপরীত দেখিবে, বিপরীত ব্যতীত সংসারের কার্যই চলে না। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা যেরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সেইরূপ ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আছে। যিনি লোকের প্রিয় হয়েন, তিনি শুধু সেই কারণে অন্যের অপ্রিয় হয়েন। এই সমুদয় দেখিয়া খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানগণ সয়তানের এবং হিন্দুরা দেবতা ও অসুরগণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এমন কি, শ্রীভগবানের শত্রু আছেন, ইহা সকল ধর্মই বলিয়া থাকেন।

এই নবদ্বীপে শ্রীনিমাই শত্রুদলকে বশীভূত করিবেন, তাঁহার সন্ন্যাসী হইবার সেই এক কারণ। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া বশীভূত করেন, আর এ অবতারে শ্রীভগবান্ কঠিন

* হেদে গো মালিনী সই চল দেখি যাই। নিমাই অদ্বৈতের ঘরে কহিল নিতাই।।
সে চাঁচর কেশ হীন কেমন দেখিব। না যাব অদ্বৈতের ঘরে গঙ্গায় পশিব।।
এত বলি শচীমাতা কাতর হইয়া। শান্তিপুর মুখো ধায় নিমাই বলিয়া।।
ধাইল সকল লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে। বাসুদেব সঙ্গে যায় কান্দিতে কান্দিতে।।

জীবগণকে কারুণ্যরসে দ্রব্য করাইয়া নির্মল এবং বশীভূত করিলেন।

যখন সকলে শুনিলেন যে, নিমাইপণ্ডিত সন্ন্যাস-ধর্ম আশ্রয় করিয়া, গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহার পূর্বকার পদ মর্যাদা, ধন, গার্হস্থ্য সুখ, রূপ, বয়স, আর এখনকার দীনাবস্থা অবলোকন করিয়া, সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিলেন। নিমাইয়ের পরম শত্রু যিনি তিনিও বলিতে লাগিলেন, "নিমাই পণ্ডিত সত্যই মহাপুরুষ। আমরা ভাবিতাম, বুদ্ধিবলে তিনি তাঁহার পার্ষদগণকে স্তম্ভিত করিয়া তাহাদিগের সর্বনাশ করিতেছেন—তাহা নয়, তাহা নয়। এমন মহাজনকে আমরা চিনিতে না পারিয়া নিন্দা করিয়া অতি গর্হিত কার্য করিয়াছি। এখন যদি তাঁহাকে পাই, তবে তাঁহার চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।" তাঁহারা যখন শুনিলেন যে নিমাই পণ্ডিত শান্তিপুরে অদ্বৈতের ঘরে আছেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিতে ছুটিলেন।

আর এক দল, নিমাই পণ্ডিতের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জননীর ও ঘরণীর অবস্থা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহারা কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রভুর বাড়ী, শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা করিতে দৌড়িলেন। ভক্তগণের তখন কান্দিবার অবস্থা হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের দশা দেখিয়াও অনেকে কান্দিতে লাগিলেন। সেই যে "কী হোল" "কি হোল" বলিয়া ক্রন্দন রোল উঠিল, তখন ইহা দাবানলের ন্যায় সমস্ত গৌড়দেশে বিস্তার হইয়া পড়িল।

ভক্ত ও অভক্তগণ একত্র শান্তিপুর যাইবার নিমিত্ত প্রভুর বাড়ীতে সমবেত হইয়াছেন। দোলা আনিয়া আঙ্গিনায় রাখা হইয়াছে। শচীকে মালিনী প্রভৃতি ধরিয়া দোলার নিকট লইয়া গেলেন, শচী দোলা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ভিতরে যাইবেন উদ্যোগ করিতেছেন,—এমন সময়ে সকলে স্ত্রীলোকের ভূষণধ্বনি শুনিলেন। ধ্বনি শুনিয়া সকলে মুখ তুলিয়া দেখেন, আপাদমস্তক অবগুণ্ঠনে আবৃত, কোনো অল্পবয়স্কা বালা, তাঁহার সমবয়স্কা অন্য আর এক জনের আশ্রয় লইয়া আসিতেছেন। সকলে ভাবিতেছেন, ইনি কে? কিন্তু তাঁহাদের অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না। যেহেতু সেই অবগুণ্ঠনাবৃতা নব-বালা, প্রতি পদবিক্ষেপে মনোহর ভূষণধ্বনি করিতে করিতে আগমন করিয়া শচীদেবীর অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইলেন। শচী বধূর দিকে ফিরিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিলেন। তখন সকলে বুঝিলেন,—ইনি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া। ইহাতে কারুণ্যরসে জগৎ প্লাবিত হইল। এও কি প্রভুর লীলখেলা? এই যে সহস্র ভক্তগণের মধ্যে প্রভুর ঘরণী ও জননী দাঁড়াইলেন, তাহার কারণ কি এই?—যে জীবগণ এই দৃশ্য ধ্যান করিবে, করিয়া তাঁহাদের হৃদয় কর্ষিত ও পরে কারুণ্যরসে সিঞ্চিত করিবে? শচী পর্যন্ত স্তম্ভিত হইলেন, আপনার দুঃখ ভুলিয়া গেলেন, অন্যের কি কথা।

তখন শ্রীনিত্যানন্দ বড় বিপন্ন হইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইতে প্রভুর আজ্ঞা নাই, আর তখন তিনি বুঝিলেন যে, প্রভু উত্তম আজ্ঞাই করিয়াছিলেন। শ্রীমতী সেখানে যাইয়া কি করিবেন? প্রভু তাঁহার মুখ দেখিবেন না, তাই সন্ন্যাস লইয়াছেন। প্রভু যদি শুনিতে পান যে, বিষ্ণুপ্রিয়া আসিতেছেন, তবে একেবারে দৌড় মারিবেন। আর বিষ্ণুপ্রিয়া গমন করিলে যদি দৌড় মারেন, তবে শ্রীমতীর অবস্থা কি হইবে? আর অন্যান্য লোকেও হয়ত বলিবে, প্রভুর সন্ন্যাস একটি ভণ্ডামি মাত্র। এই সমুদয় চিন্তা নিত্যানন্দের হৃদয়ে বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন নিতাই অনন্যোপায় হইয়া সর্বজনকে শুনাইয়া অতি কাতরস্বরে অথচ দৃঢ়রূপে বলিলেন,—"শ্রীমতীকে লইয়া যাইতে প্রভুর আজ্ঞা নাই।"

যখন বিষ্ণুপ্রিয়া আসিয়া শাশুড়ীর অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইলেন, তখন প্রথমে সকলে স্তম্ভিত হইলেন। তাহার পর, তাঁহারা সেই মর্মভেদী আঘাত সামলাইয়া রোদন করিবার উপক্রম করিতেছিলেন। কিন্তু নিতাইয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া আবার সকলে স্তম্ভিত হইলেন। লোকের এই স্তম্ভিত ভাব শচী ভঙ্গ করিলেন। তিনি তখনই বলিলেন,—"তবে আমিও যাইব না।"

এই কথা শুনিয়া লোকে স্তম্ভিতেব উপর স্তম্ভিত হইলেন। কে যে কি বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহারা ভুবন অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া লোকের স্তম্ভিতভাব ভঙ্গ করিলেন। যখন শচী বলিলেন,—তবে তিনিও যাইবেন না, তখন শ্রীমতী একটু ভাবিয়া, আর কোন কথা না বলিয়া—যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে সেই আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত অবস্থায়, সেই সখীর অঙ্গে নির্ভর করিয়া, ভূষণ-ধ্বনি করিতে করিতে গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহামায়াতনয়া* চকিতের ন্যায় জীবকে দর্শন দিয়া সকলকে মহামায়ায় অভিভূত করিয়া তিলার্ধ মধ্যে গৃহাভ্যন্তরে অদর্শন হইলেন। তিনি কি কাঁদাইতে আসিয়াছিলেন? তিনি না তাঁহার পতির মুখে শুনিয়াছিলেন যে, জীবকে ক্রন্দন করাইবার নিমিত্ত তাঁহার পতির অবতার? তাঁহাব পতি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ও তাঁহার নিজ-জনের নয়নজল দিযা কলুষিত জীবকে ধৌত করিবেন। তাই কি তিনি পতির প্রিয় কার্য সাধন করিবার নিমিত্ত বাহিরের জীবকে এই অবস্থায় দর্শন দিলেন? শ্রীঅঙ্গ হইতে ভূষণ-ধ্বনির কথা আমি দুইবার উল্লেখ করিলাম। তাহার কারণ, এই ভূষণ-ধ্বনি উপস্থিত সকলেরই কর্ণে বজ্রের ন্যায় বেদনা দিতেছিল। শ্রীমতীর ধীরে ধীরে গমন, সকলে নীরব হইয়া দেখিতে লাগিলেন; কেহ কোন কথা বলিতে, এমন কি, কান্দিতেও পারিলেন না। তখন শচী বসিয়া পড়িলেন।

একটু পরে তিনি বলিলেন, "আমাকে বৌমার নিকট লইয়া চল।" তাঁহাকে সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। তখন শচী বলিলেন, নিমাইকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার যাইবার উদ্যোগ করা অন্যায় হইয়াছে, তিনি যাইবেন না। ইহা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জিত হইলেন; ভাবিলেন, তিনি জননীকে অহেতুক দুঃখ দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, যখন শ্রীনিতাই বলিলেন যে, প্রভুর শ্রীমতীকে লইবার অনুমতি নাই, তখন প্রথমে শ্রীপিয়াজী এই সংবাদ বজ্রাঘাতের ন্যায় বোধ করিলেন। কিন্তু তখনি হৃদয়াকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল, ও উহাতে আনন্দচন্দ্রের উদায় হইল। প্রথমে শুনিয়া ভাবিলেন যে, কি অন্যায়! কি অন্যায়! কেবল আমিই না? ত্রিলোকের সকলে দেখিতে পাবে, কেবল আমিই না? যদি প্রভুর ঘরণী না হইতাম, তবে আমিও যাইতে পারিতাম! আমার কেবলমাত্র অপরাধ যে, আমি তাঁহার ঘরণী! যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে—"আমা লাগি প্রভু মোর করিলা সন্ন্যাস। ফিরিয়া যদ্যপি আইলা অদ্বৈতের বাস।। স্ত্রী-পুরুষ বাল-বৃদ্ধ যুবতী-যুবক। দেখিতে আনন্দে ধাঞা চলে সব লোক।। কোন্ অপরাধ কৈনু মুঞি অভাগিনী। দেখিতেও অধিকার না ধরে পাপিনী।। প্রভুর রমণী যদি না করিত বিধি। তথাপি পাইতু দেখা প্রভু গুণনিধি।।"

তখনি তাঁহার মনের মধ্যে যেন কেহ বলিতে লাগিল, "ভাল শ্রীমতী! তুমি নিমাইয়ের আধা হইয়া তাঁহার দর্শনে বঞ্চিত হইবে, না—তাহার আধা না হইয়া দর্শন পাইবে? তুমি কি চাও?" অমনি মনে মনে উত্তর করিতেছেন, "সে কি! আমি শ্রীগৌরাঙ্গের আধা, শ্রীগৌর আমার আধা, এ অমূল্য সম্পর্ক আমি কোন লাভের নিমিত্ত ছাড়িব? হয় দেখা না হবে, তবু ত আমার! আমার বস্তু সকলে দেখিয়া নয়ন তৃপ্তি করুক। ইহাতে আমার ঈর্ষা কেন হইবে? ত্রিজগত আমার হৃদয়ের রত্নহার দেখিবার নিমিত্ত দৌড়িতেছে, ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? সকলে দেখুক, দেখিয়া আমার ভাগ্যকে প্রশংসা করুক। আমি নাই দেখিলাম, সামগ্রী আমারি ত!" ক্রমে শ্রীমতীর হৃদয় গৌরবে ভরিয়া যাইতেছে, আর সেই সঙ্গে আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে। ভাবিতেছেন, "ত্রিজগৎ একদিকে, আর আমি একদিকে। আমার প্রভু আমাকে ত্রিজগতের সহিত পৃথক্ করিলেন। ইহাতেই এই প্রমাণ হইল যে,—হয় আমি প্রভুর একমাত্র অরি; আর না হয় সর্বাপেক্ষা বল্লভা!" কিন্তু

*শ্রীমতীর জননীর নাম মহামায়া।

তিনি তো আমার শত্রু নহেন, তাহা হইলে আমাকে যেমন ত্যাগ করিলেন, তেমনি অন্য একজন রমণীকে কৃপা করিতেন। তাহা ত করিলেন না? সন্ন্যাসে বড়ো দুঃখ, লোকে তাঁহার দুঃখ দেখিয়া কান্দিবে। সন্ন্যাসের অর্থ আমাকে ত্যাগ করা, অতএব আমাকে ত্যাগ করাই তবে তাঁহার সর্বপ্রধান দুঃখ, যে দুঃখে লোকে কান্দিবে।* আমাকে ত্যাগ করা যদি তাঁহার সর্বাপেক্ষা দুঃখ হইল, তবে আমার সহিত মিলন তাঁহার সর্বাপেক্ষা সুখ, আর আমি তাঁহার সর্বাপেক্ষা নিজ-জন।"

যখন শ্রীমতীর হৃদয়ে এই সকল ভাবতরঙ্গ উঠিয়া, তাঁহাকে দুঃখ-সাগর হইতে সুখের রাজ্যে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, সেই সময় শচী আসিয়া বলিলেন যে, তিনিও নিমাইকে দেখিতে যাইবেন না। বিষ্ণুপ্রিয়া তখন অনায়াসে শচীকে প্রবোধ দিয়া শান্ত করিলেন, আর শান্তিপুরে যাইবার সম্মতি করাইলেন।

শ্রীভগবান্ ব্যতীত আর সকলেই একটু না একটু স্বার্থপর। প্রথমে সকলেই আপনাদের মনের ভাবতরঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়াকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন,—শচী পর্যন্ত। যখন বিষ্ণুপ্রিয়াকে সকলে দর্শন করিলেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। যখন শ্রীমতী শ্রীনিমাইয়ের মুখে কঠিন আজ্ঞা শুনিয়া আবার অভ্যন্তরে লুকাইলেন, তখন একা শচী নয়, ভক্তমাত্রেই সঙ্কল্প করিলেন যে, প্রভুকে কেহই দেখিতে যাইবেন না। যথা, চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে—"বিষ্ণুপ্রিয়া দশা দেখি যত ভক্তগণ। দ্বিগুণ হইল দুঃখ না করে গমন।।"

শচী যখন বুঝিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার কোনো দুঃখ নাই, তিনি আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন, তখনই তিনি শান্তিপুরে যাইতে সম্মত হইলেন, আর তাঁহার সঙ্গে ভক্তগণও চলিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া জনকয়েক সঙ্গিনী লইয়া গৃহে রহিলেন। শচীকে দোলায় চড়াইয়া অগ্রে করিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে সকলে শান্তিপুরাভিমুখে চলিলেন। কাহারা ও কতজনে এইরূপে চলিলেন, তাহা চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপে বর্ণিত আছে। যথা—

"লক্ষ লক্ষ লোক ধায় ঊর্ধ্বমুখ করি। অন্ন জল ঘর দ্বার সব পরিহরি।।
ঘর হতে বাহির যে না হয় কুলনারী। তারাও ধাইয়া যায় সব পরিহরি।।
বৃদ্ধ সব নড়ি হাতে মন্দ মন্দ যায়। শিশু সব আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ধায়।।
যে সব পণ্ডিত পূর্বে উপহাস কৈল। তারাও উৎকণ্ঠাতে ধাইয়া চলিল।।"

অর্থাৎ প্রভু আবার বিদায় হইবেন, তাহাতেই নবদ্বীপবাসীকে আকর্ষণ করিলেন। যখন সকলে নদীয়া শূন্য করিয়া শান্তিপুর অভিমুখে চলিলেন, তখন শ্রীমতী এলাইয়া পড়িলেন। আর,—আপনার মন্দিরে—

"কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া, লোটায়ে-লোটায়ে ক্ষিতিতলে।
ওহে নাথ কি করিলে, পাথারে ভাসায় গেলে, কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে।।
এ ঘর জননী ছাড়ি, মুই অনাথিনী করি, কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।
বেদে শুনি রঘুনাথ, লইয়া জানকী সাথ, তবে সে করিলা বনবাস।।
পূরবে নন্দের বালা, যবে মধুপুরে গেলা, এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজ তত্ত্ব জানাইয়া, রাখিলেন তা-সবার প্রাণে।।
চাঁদ-মুখ না দেখিব, আর পদ না সেবিব, না করিব সে সুখ-বিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার শরণ নিব, বাসুর জীবনে নাই আশ।।"

---

*কার উপরে কর অভিমান, অবুঝ প্রাণ। ধ্রু
তোমার অঙ্গে নূতন শাড়ী, তাঁর কৌপীন পরিধান।।
শীত গ্রীষ্মে রৌদ্রে সে যে, তুমি থাক গৃহ-মাঝে,
নিশি দিশি প্রভুর আমার বৃক্ষতলে অবস্থান।—শ্রীবলরাম দাস

এদিকে শান্তিপুরের যাত্রীরা শচীর দোলা আগে করিয়া মহা কলরবের সহিত হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিয়াছে। বাসুঘোষ তাঁহার নিজের পদে,—যাহা পাঠক মহাশয় একটু পূর্বে পড়িয়াছেন, বলিতেছেন যে, তিনি সেই সঙ্গে "কান্দিতে কান্দিতে" চলিয়াছেন। শান্তিপুর যাইয়া দেখেন লোকের ভিড়ে পদবিক্ষেপ দুষ্কর। কিন্তু লোকে যখন শুনিল যে নদেবাসীগণ আসিতেছেন, অমনি সকলে হরিধ্বনি করিয়া পথ ছাড়িয়া দিলেন। তখন উভয় দলে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভু প্রভৃতি সকলেই তখন শ্রীঅদ্বৈতের গৃহের ছাদে বসিয়া। হঠাৎ কলরব বৃদ্ধি দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "ঐ নদেবাসীগণ আসিলেন।" অমনি প্রভুও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখেন সর্বাগ্রে দোলা, তাহাব মধ্যে শচী মুখ বাড়াইয়া পুত্রকে দেখিবার জন্য ইতি-উতি চাহিতেছেন। প্রভু আর থাকিতে না পারিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে চলিলেন। এদিকে চারি পাঁচ জন বলবান্ দ্বারী, যাহাবা দ্বার রক্ষা করিতেছিল, তাহারা দেখিল প্রভুর জননী ও নদেবাসীগণ দ্বারের আগে আসিলেন, অমনি সম্ভ্রমে তাহারা দ্বার ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করাইল। দোলা আঙ্গিনায় নামিল। সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসী ব্যতীত আর কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই। নিমাই তাহা মানিলেন না, দোলা নামিলেই অমনি তিনি ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া জননীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তাহাব পরে হস্ত ধরিয়া জননীকে দোলা হইতে নামাইলেন। শচী নিমাইয়ের অঙ্গে ভর দিয়া বাহিরে আসিলেন, কিন্তু দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন নিমাই জননীকে আবার প্রণাম করিয়া তাঁহাকে স্তব ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "মা। ত্রিজগতের যত সুন্দর বস্তু সব তুমি। তুমি দয়া, তুমি ভক্তিরূপিণী, তুমি জীবকে কৃষ্ণ-ভক্তি দিতে পার, তুমি ভুবন পবিত্র করিয়া থাক, এমন কি তোমার নাম যে গ্রহণ কবে সে পবিত্র হয়।" ইহাই বলিয়া করজোড়ে জননীকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আর সম্মুখে আসিয়া এক একবার প্রণাম করিতেছেন। কিন্তু শচীর ইহা ভাল লাগিতেছে না। কারণ প্রদক্ষিণ করিতে নিমাই যখন পশ্চাতে যাইতেছেন, তখন পুত্রের মুখ দেখিতে পাইতেছেন না; তাহার পরে, মহাতেজস্কর পুত্রের প্রণামে একটু সঙ্কুচিতও হইতেছেন।

ক্রমে নিমাই মায়ের অগ্রে বসিলেন। তখন শচী বলিতেছেন, "নিমাই! আমাকে তুমি প্রণাম করিতেছ, ইহাতে যদি আমার অপরাধ হইত, তবে বাপ, অবশ্য তুমি করিতে না!" ফল কথা, তখন শচী ভাবিতেছেন যে, তাঁহার পুত্র স্বয়ং ভগবান্। আবার বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি যাই হও, তবু আমার এ বিশ্বাস কোনো ক্রমে যায় না যে, তুমি আমার দুধের ছাওয়াল।" ইহা বলিা তাঁহার গলা ধরিয়া বদন চুম্বন করিলেন। ইহাতে জ্ঞান লোপ পাইয়া বাৎসল্যরসে শচী অভিভূত হইলেন। শচী পুত্রের সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর উপস্থিত লোকে নীরব হইযা মাতা-পুত্রের কাণ্ড দেখিতেছেন। শেষে শচী কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বাসুঘোষ পশ্চাতে দাঁড়াইয়া। স্নেহে ও কোপে পুত্রকে কি বলিতেছেন তাহা বাসুঘোষের বর্ণনায় শ্রবণ করুন—

"নিতাই করিয়া আগে, চলিলেন অনুরাগে, আইল সবাই শান্তিপুরে।
মুড়ায়েছে মাথার কেশ, ধরেছে সন্ন্যাসী বেশ, দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে।।
করজোড়ি অনুরাগে, দাঁড়াল মায়ের আগে, পড়িলেন দণ্ডবৎ হয়ে।
দুই হাতে তুলি বুকে, চুম্ব দিল চাঁদমুখে, কান্দে শচী গলাটি ধরিয়ে।।
ইহার লাগিয়া যত, পড়া'লাম ভাগবত, এ দুঃখ কহিব আমি কায়?
অনাথিনী করে মোরে, যাবে বাছা দেশান্তরে বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়?
এ ডোর কৌপীন পরি, কি লাগিয়া দণ্ডধারী, ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীবন্ত থাকিতে মায়, উহা নাকি দেখা যায়, কা'র বোলে হইলা বৈরাগী?

গৌরাঙ্গের বৈরাগে, ধরণী বিদায় মাগে, আর তাহে শচীর করুণা।
কহে বাসুদেব ঘোষে, গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে, ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা।।"

অদ্য আমার ভাগ্য ফুরাইল। আমার প্রতি যে আদেশ তাহা পালন করিলাম। প্রভুর বয়স তখন চতুর্বিংশতি, প্রভু আরও চতুর্বিংশতি বৎসর প্রকট ছিলেন। যাঁহার ভাগ্যে থাকে তিনি প্রভুর এই সন্ন্যাসলীলা লিখিবেন। এ লীলা অতি গুহ্য। স্বরূপ ও রামরায়কে লইয়া প্রভু গম্ভীরায়, অর্থাৎ তাঁহার কুটিরের গুপ্তস্থানে, দ্বাদশ বৎসর যে অতি গুহ্য লীলা করিয়াছিলেন, তাহা জীবের নিকট গোপন রহিয়াছে। আমার মনের সাধ ছিল যে, আমি সেই লীলার যে কিঞ্চিৎ জানি, জীবগণের নিকট প্রকাশ করিব। সে সাধ আপাততঃ পুরিল না। যেহেতু আমার আর শক্তি নাই। প্রভু যাহাকে শক্তি দেন তিনিই লিখিবেন।

পরিশিষ্ট

পাঁচ বৎসর হইল শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ ছাড়িয়া গিয়াছেন। জননীকে বলিয়া গিয়াছেন "মা! আমি আবার আসিব।" শচী প্রত্যহ ভাবেন নিমাই কল্য আসিবেন। সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে নিমাইয়ের সহিত কথা বলেন। পুত্রের নিমিত্ত প্রত্যহ রন্ধন করেন, আর বসিয়া কান্দেন! আর বলেন, "নিমাই! আমার ঘরে দ্রব্যের অভাব নাই। কত প্রকার রান্ধিলাম। নিমাই! বাপ আমার ! ইহা কাহারে খাওয়াইব?"

অমনি শচী দেখেন যে নিমাই আসিয়া সমুদয় খাইতেছেন। শচী তখন সমুদয় ভুলিয়া যান। ভাবেন, নিমাই বাড়িতে আছেন। আবার একটু পরে চৈতন্য হয়। তখন সমুদয় স্বপ্ন ভাবিয়া রোদন করেন।

কখন শচী অধিক রজনীতে স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া একেবারে শ্রীবাসের বাড়ি উপস্থিত। সেখানে গিয়া, 'মালিনী সই, মালিনী সই" বলিয়া ডাকিলেন। শচীদেবীর গলার সাড়া পাইয়া মালিনী তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিলেন। শচী মালিনীকে দেখিয়া বলিতেন, "নিমাই তোমাদের বাড়ী আসিয়াছে? আমি রান্ধিয়া বসিয়া রহিয়াছি, ভাত জুড়াইয়া গেল।" তখন মালিনী হাহাকার করিয়া শচীকে ধরিলেন, শচীর চেতনা হইল। বাসুঘোষ একদিনকার শচীর কথা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"আজিকার স্বপন কথা, শুন লো মালিনী সই, নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া, গৃহ পানে নেহারিয়া, মা বলিয়া ডাকিল আমারে।।
ঘরেতে শুইয়াছিনু, অচেতন বাহির হনু, নিমাইর গলার সাড়া পাঞা।
আমার চরণ ধূলি, নিল নিমাই শিরে তুলি, পুনঃ কান্দে গলাটি ধরিয়া।।
তোমার প্রেমের বশে, ফিরি আমি দেশে দেশে, রহিতে নারিনু নীলাচলে।
তোমায় দেখিবার তরে, আইনু নদীয়াপুরে, কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে।।
এস মোর বাছা বলি, হিয়ার মাঝারে তুলি, হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুনঃ না দেখিয়া তারে, পরাণ কেমন করে, কান্দিয়া রজনী পোহাইল।।
সেই হৈতে প্রাণ কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে, কি করিব কহ গো উপায়।
বাসুদেব ঘোষে কয়, গৌরাঙ্গ তোমারি হয়, নহিলে কি দেখা পাও তায়?"

শচীর একটু নিদ্রা আইলেই স্বপ্নে পুত্রকে দেখেন। প্রায় নিদ্রা হয় না, শুইয়া নিমাইকে ভাবেন। আর এক দিবসের কাহিনী শুনুন ঃ

"বিরহ বিকল মায়, সোয়াথ নাহিক পায়, নিশি অবসারে নাহি ঘুমে।
ঘরেতে রহিতে নারি, আসি শ্রীবাসের বাড়ী, আঁচল পাতিয়া শু'ল ভূমে।
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি রাত্রদিনে, মালিনী বাহির হয়ে ঘরে।

সচকিতে আসি কাছে, দেখে শচী পড়ে আছে, অমনি কান্দিয়া হাত ধরে।।
উথলিল হিয়ার দুখ; মালিনীর ফাটে বুক, ফুকারি কান্দয়ে উভরায়।
দুঁহু দোঁহা ধরি গলে, পড়িয়া ধরণী তলে, তখনি শুনিয়া সবে ধায়।।
দেখিয়া দোঁহার দুখ, সবার বিদরে বুক, কত মত প্রবোধ করিয়া।
স্থির করি বসাইলে, ভাসে নয়নের জলে, প্রেমদাস যাউক মরিয়া।।"

নিমাই গৃহ ছাড়িবার পর পাঁচ বৎসব গত হইয়াছে। শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাছা, নিমাই কি ঘরে শুইয়া আছে?" এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথা ঘুরিয়া আইল, ও জলে নয়ন ভরিয়া গেল। শচী বলিতেছেন, "মা, তুই কান্দিস কেন?" তখন বিষ্ণুপ্রিয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া ধূলায় পড়িয়া গেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা দেখিয়া শচীর অর্দ্ধ-চেতন হইল। তখন বলিতেছেন, "ঠিক আমার ভুল হয়েছে। নিমাই ত আমার বাড়ী নাই!" এখন বিষ্ণুপ্রিয়ার কি দশা হইয়াছে, তাহা প্রেমদাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

"যেদিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া। তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া।।
দিবানিশি পিয়ে গৌর-নামসুধা খানি। কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণি।।
বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে। দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে।।
হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী। গৌরাঙ্গ বিরহে কান্দে দিবস-রজনী।।
সঙ্গিনী প্রবোধ করে কহি কত কথা। প্রেমদাস-হৃদয়ে রহিয়া গেল ব্যথা।।"

পাঁচ বৎসর গত হইয়াছে, শচী গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন। শচীর বয়ঃক্রম ৭২ বৎসর, ভাল চলিতে পারেন না। ঈশান তাঁহার হাত ধরিয়াছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুড়ীর অঞ্চল ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার নিয়ম ছিল যে, শাশুড়ীর সঙ্গ ভিন্ন কখন গঙ্গাস্নানে যাইতেন না। গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় মস্তক অবনত করে, শাশুড়ীর অঞ্চল ধরে, তাঁহার চরণ দুটি দেখিতে দেখিতে যাইতেন। সেদিনও এইরূপে অঞ্চল ধরিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া চলিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার কর্ণে কলরব প্রবেশ করিল। শচীও কলরব শুনিতে পাইলেন। কলরব লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন যে, বহুতর লোক একত্র হইয়া হরিধ্বনি করিতেছে।

ওপারে কুলিয়ানগরে কলরব হইতেছে। কলরবের কারণ বলিতেছি। পাঁচ বৎসর পরে শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপের ওপারে কুলিয়াতে আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য জননীকে দর্শন করিবেন। কুলিয়াতে শ্রীগৌরাঙ্গ উপস্থিত হইলে বহু লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। এ পযন্ত তিনি গৃহ-মধ্যে ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। এখন স্নানের জন্য বাহির হইলে, অসংখ্য লোকে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, আনন্দে, হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

ওপারে শ্রীগৌরাঙ্গ ঘাটে স্নান করিতে আসিয়াছেন, এ পারে শচীদেবীর অঞ্চল ধরিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াও স্নান করিতে যাইতেছেন। হরিধ্বনি শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মাথা তুলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এরূপ সুদীর্ঘ কায় যে, লোকের মাঝে থাকিলেও তাঁহাকে দেখা যাইত। বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যাপারখানা কি তখনি বুঝিলেন, বুঝিয়া শাশুড়ীকে বলিতেছেন—

ওমা আমায় ধর ধর। ধূয়া।
কেন বা আনিলে সুরধুনী তীরে, ওপারে কুলিয়া দেখ নয়ন ভরে,
লক্ষ লক্ষ লোক হরি হরি বলে, কেন মা জননী বল আমারে।।
লক্ষ লক্ষ লোক হরি বলে নাচে, বুঝি তোর পুত্র ওখানে বিরাজে।
উহু মরি মরি দেখিবারে নারি, এ দুঃখ আমার কহিব কারে।।
পাপী তাপী হলো শ্রীচরণ ভোগী, জগতে বিষ্ণুপ্রিয়া সে বিয়োগী,
দাসীর দণ্ড দিবার লাগি এই অবতার।।

চল চল চল মাগো আমায় নিয়ে চল, লুকাইয়া চল ঝাঁপিয়া অঞ্চল,
ঐ যে দেখা যায় দীঘল শ্রীঅঙ্গ, ঐ ত আমার প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ,
সোনার অঙ্গেতে কৌপীন পরেছে চিরদিন দুঃখ অবধি পেয়েছে,
তোমার মায়ায় আবার আসিছে, বাড়ী ডাকি আন।
বলরাম দাসেব বিদরয়ে বুক, জীবের লাগিয়া প্রভুর এই দুখ,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ জীব তোরে ধিক্, হেন দুঃখ দেহ চিরবন্ধু জনে।।

ইহার পরে সন্ন্যাস আশ্রমের নিয়মানুসারে শ্রীনিমাই জন্মভূমি দেখিতে এক দিনের নিমিত্ত শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন। তাহাতে—

"আওল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে। আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে।।
চিরদিনে গোরাচাঁদের বদন দেখিয়া। ভুখিল চকোর আঁখি রহয়ে মাতিয়া।
আনন্দে ভকতগণ হেরিয়া বিভোর। জননী ধাইয়া গোরাচাঁদে করে কোর।।
মরণ শরীরে যেন পাইল পরাণ। শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়াপুরে বাসুঘোষ গান।।"

তাহার পর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া পতিমুখ দর্শন করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, যথা—

"এত দিনে সদয় হইল মোরে বিধি। আনি মিলাওল গোরা গুণনিধি।।
এত দিনে মিটল দারুণ দুখ। নয়ন সফল ভেল দেখি চাঁদমুখ।।
চির উপবাসী ছিল লোচন মোর। চাঁদ পাওল যেন তৃষিত চকোর।।
বাসুদেব ঘোষে গায় গোরা-পরবন্ধ। লোচন পাওল যেন জনম-অন্ধ"।।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত।। তৃতীয় খণ্ড

পাঠকগণের প্রতি নিবেদন

রসলোলুপ পাঠক প্রভুর নবদ্বীপ-লীলায় যে রস আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহার নবদ্বীপের বাহিরের লীলায় সে রস প্রত্যাশা করিতে পারেন না। প্রভুর মাধুর্যলীলাই মধুর; আর মাধুর্য-লীলা শ্রীজগন্নাথ, শচী, বিশ্বরূপ, বিষ্ণুপ্রিয়া, নদেবাসী ভক্ত ও সখাগণ লইয়া। প্রভু যখন গৃহত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার নিজ-জন প্রায় সকলেই শ্রীনবদ্বীপে রহিলেন। প্রভুর নীলাচল-লীলাতেও কারুণ্যরস প্রচুর আছে সত্য, তবু, "নিমাই সন্ন্যাস" একবার বই দুইবার হয় না। বলিতে কি, যিনি নিমাইচাঁদ, শচীর দুলাল, বিষ্ণুপ্রিয়ার বল্লভ, গদাধরের প্রাণ, শ্রীবাস ও মুরারির প্রভু,—তিনি কাটোয়া হইতে গুপ্ত হইলেন, কি গুপ্তভাবে শ্রীনবদ্বীপে রহিলেন। যিনি নীলাচলে গমন করিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভাবতী, ত্রিজগতের গুরু, জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ। নবদ্বীপে যিনি গুপ্তভাবে রহিলেন তিনি পূর্ণ; নীলাচলে যিনি গমন করিলেন, তিনি নারায়ণ,—শ্রীভগবানের সৎ ও চিৎ শক্তি। এখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর লীলা বলিতেছি, সুতরাং স্বভাবতঃ ইহাতে অধিক পরিমাণে শিক্ষার কথা থাকিবে। অতএব এ খণ্ডে শুদ্ধ রসচর্চা চলিবে না।

শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যখন শ্যামসুন্দর মথুরায় গমন করিলেন, তখন সেই মুরলীধর দণ্ডধর হইলেন, অর্থাৎ মধুর বনমালী, ঐশ্বর্যসম্পন্ন পাত্র-মিত্র-সভাসদ্-বেষ্টিত মহারাজ হইলেন। সেইরূপ মাধুর্যময়, কৌতুকপ্রিয়, স্নেহশীল, চঞ্চল এবং সুকেশ ও সুবাস-মালতীমাল সম্বলিত নিমাইচাঁদ, এখন অতি জ্ঞানী, গম্ভীর, ধীর, দয়ালু, দণ্ড কৌপীন ও ছিন্নকন্থাধারী গুরুরূপে প্রকাশ পাইলেন।

এস্থলে নির্লজ্জ হইয়া নিজের একটি কথা বলিতে হইতেছে। তজ্জন্য আপনারা আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন। এই খণ্ড লিখিতে আরম্ভ করিবার সময় আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। বহুদিন এরূপ হইয়াছে যে, রাত্রে নিজ-জনের নিকট বিদায় লইয়া শয়ন করিয়াছি। কারণ কোনো কোনো দিন এত দুর্বল বোধ হইত যে, হয়ত রজনীর মধ্যে আমার আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে।

এক নিশিতে আমি অতি দুর্বল অবস্থায় শয়ন করিয়া আছি। সমস্ত জগৎ নীরব, আমি স্বয়ং কি অবস্থায় আছি ঠিক বলিতে পারি না। কখন বোধ হইতেছে, আমি এ জগতে আছি, কখন বোধ হইতেছে অন্য জগতে গিয়াছি। এমন কি, আমি মনের মধ্যে বিচার করিতেছি যে, আমি কোথায়? এমন সময় যেন কেহ আমাকে বলিলেন, "হিন্দুধর্মে প্রচার নাই, এ কথা ঠিক নহে।"*

এই কথা কে বলিলেন, আমার তাহা অনুসন্ধান করা উচিত ছিল; কিন্তু তাহা না করিয়া মনে মনে তাঁহার কথার উত্তর দিলাম,—"কেন?" তিনি বলিলেন, "বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের এক শাখা উহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচারিত হইয়াছে। আর শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম এইরূপে মুসলমানদিগের মধ্যেও প্রচারিত হইয়াছিল। এমন কি, সেদিন অনার্যজাতীয় মণিপুরবাসীগণ, দেশসমেত, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর আশ্রয় লইলেন।"

* ইহার কিছুদিন পূর্বে অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয়—"হিন্দুধর্মে প্রচার নাই, হিন্দুর পুত্র হিন্দু হয়, ভিন্ন-জাতীয়গণকে হিন্দুধর্মে গ্রহণ করেন না।"

তখন আমি বলিলাম, "ঠাকুর, তা তো হলো, কিন্তু আপনার অভিপ্রায় কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "যদি জীবের মঙ্গল কামনা কর, তবে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম—যাহা জীবের অধিকারের চরম সীমা (যাহা অতি সরল ও সর্বজন-হৃদয়গ্রাহী) জগতে প্রচার কর। জীবমাত্রই দুঃখে অভিভূত ;—রাজনৈতিক, সামাজিক, কি অন্যরূপ উন্নতিতে জীবের দুঃখ যাইবে না। যেহেতু এ জগতে জীব অতি অল্পকাল বাস করে। এই অল্পকাল, তাহার দুঃখে ও সুখে যায়। মধ্যে মধ্যে তাহাকে বহু দুঃখও ভোগ করিতে হয়। এ দুঃখ আত্মোৎসর্গ ভিন্ন অপনয়ন করা যাইতে পারে না। যাহাতে চির-নিবাসের স্থান অর্থাৎ পরকাল সুখের হয়, তাহাই করা জীবের সর্বপ্রধান কার্য। অতএব সহৃদয-গ্রাহী যে শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম, তাহাই জগতে প্রচার করো।" আমি বলিলাম, "কিরূপে এ দুরূহ কার্য করিব? ধর্মপ্রচার ত ইচ্ছা করিলেই করা যায় না?" তিনি বলিলেন, "তাহা ঠিক, তবে তোমার কাজ তুমি করো। অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু ও তাঁহার ধর্ম কি, ইহা যাহাতে সকলে বেশ বুঝিতে পারে, তুমি সেইরূপ করিয়া লেখ।" আমি তখন অতি কাতর হইলাম কারণ এরূপ কার্যে আমি আপনাকে কিছুমাত্র শক্তিমান বলিয়া বোধ করিলাম না। তখন কাতর হইয়া, আপনার দুর্দশার কথা একে একে বলিলাম। বলিলাম, একে তো আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তাহাতে বিষয়-জ্বালায় জর্জরিত! আমি গ্রন্থ লিখিয়া ভুবন উদ্ধার করিব, এরূপ ভরসা আমার কেন হইবে? যে মহাজনগণ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নামে ভুবন পবিত্র হয়। আমি কেবল তাঁহাদের পশ্চাদ্বর্তী হইয়া, সমগ্র গৌরলীলা একত্র করিতেছি এইমাত্র।" তখন তিনি বলিলেন, "তুমি কর, আমি করি, এ কথা ঠিক নহে। তিনিই সব করেন। আর তুমি কি শুন নাই যে, তাঁহার ইচ্ছায় অন্ধ দিব্যচক্ষু পায়, খঞ্জ নর্তনশীল হয়? শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল, প্রভৃতি গ্রন্থ বড়ো বড়ো মহাজনের লেখা সন্দেহ নাই; তবে সে সমুদয় গ্রন্থ প্রধানতঃ বৈষ্ণবগণের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা হিন্দু নহেন, তাঁহারা ওরূপ গ্রন্থ দ্বারা অতি অল্প উপকার পাইবেন, যেহেতু তাঁহারা উহার তত্ত্বকথা আদৌ বুঝিতে পারিবেন না। তুমি তোমার গ্রন্থ এইরূপ করিয়া লেখ যে, কি হিন্দু কি অহিন্দু সকলেই, শ্রীগৌরাঙ্গ কি ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারে। তুমি বৈষ্ণবগণের নিগূঢ় তত্ত্বগুলির এরূপ বেশ দাও যে, ভিন্ন জাতীয়গণ উহার মধ্যে কতগুলিকে পরিচিত বলিয়া চিনিতে কি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে ও যে-গুলি অপরিচিত, সে-গুলিকে সুহৃদ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।" আমি বলিলাম—"এ জগতের যা কিছু সংবাদ রাখি তাহাতে দেখিতে পাই যে, জীবমাত্রই কেবল কুকুরের ন্যায় কলহ করিতেছে। কে কাহাকে দংশন করিবে তাহা লইয়াই প্রায় জীবমাত্র ব্যস্ত। এরূপ হৃদয়ে শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম কিরূপে অঙ্কুরিত হইবে? শ্রীপ্রভু যে ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন উহা অতি সূক্ষ্ম, মনুষ্যবুদ্ধির চরম সীমা। উহা মদ্যমাংসলোলুপ, বিষয়মদে অন্ধ, যুদ্ধপ্রিয় জীবগণ কিরূপে বুঝিবে? শ্রীরাধার "কিলকিঞ্চিত" ভাব, যদি অধ্যাপক মোক্ষমোলারের নিকট বিবরিয়া বলা যায়, হয়ত তিনিও তাহা বুঝিতে পারিবেন না। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম সর্বজীবের হৃদয়গ্রাহী, কি সরল, ইহা কিরূপে বুঝিবে? তখন তিনি বলিলেন,—"তোমার যতদূর সাধ্য তুমি বৈষ্ণবধর্ম সম্পূর্ণ করিয়া অঙ্কিত কর। উহার অতি সূক্ষ্ম হইতে স্থূল অঙ্গ পর্যন্ত, সমুদয় এই চিত্রে যথাস্থানে সন্নিবেশিত কর। তুমি একটি কথা মনে রাখিও। সে কথা কেবল বৈষ্ণবগণেই বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ অধিকারী ভেদে সাধন। যাহার যেরূপ অধিকার সে সেইরূপ সাধন করিবে। এমন কি, তাঁহারা এ কথাও বলেন যে, সমুদয় শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় রসাস্বাদনের পাত্র কেবল সাড়ে তিন জন মাত্র ছিলেন। তাহার পরে এই পদটী স্মরণ কর, যথা—"বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম-সংকীর্তন। অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস-আস্বাদন।।" তুমি যতদূর পার সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মটি আঁকিও। কেহ উহার

স্থূল, কেহ সূক্ষ্ম অঙ্গ লইবে;—কেহ চরণ, কেহ মস্তক, কেহ অন্য অঙ্গ, কেহবা সর্বাঙ্গ, অর্থাৎ যাহার যেরূপ অধিকার সে সেইরূপ গ্রহণ করিবে।"

তখন হঠাৎ একটি কথা আমার মনে উদয় হইল। আমি বলিলাম, "গ্রন্থ-প্রকাশ ব্যতীত আর কি উপায়ে এ ধর্ম প্রচার করিব জানি না। আর কোনো উপায় আছে কি না, তাহাও মনে উদয় হয় না। অথচ গ্রন্থ-প্রচার করিয়া যে কোনো ধর্ম-প্রচার হয়, ইহাও মনে হয় না।" তখন তিনি বলিলেন, "তুমি ইহা জানিয়াছ যে, তোমার গ্রন্থ পড়িয়া সমাজের শীর্ষস্থানীয় অনেক লোক শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন।"

আমি বলিলাম—"তাঁহারা হিন্দু, তাঁহাদের হৃদয়-কলিকা অর্ধস্ফুটিত, তাঁহারা পূর্বেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন, আমার গ্রন্থ তাঁহাদের উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে কিরূপে আমি প্রমাণ করিব যে, শ্রীনবদ্বীপ বলিয়া একটি নগরে শ্রীগৌরাঙ্গ-নাম ধারণ করিয়া শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া এই গ্রন্থের লিখিত সমুদয় লীলা করিয়াছিলেন? ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি কিছু দিতে পারিব না। প্রমাণের মধ্যে কেবল গ্রন্থ, তাহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয়।"

তখন তিনি বলিলেন,—যাঁহারা এদেশে খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের প্রমাণও একখানি গ্রন্থ। যাঁহারা জাপানে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিরূপে প্রমাণ করেন যে, উত্তর-বঙ্গদেশে বুদ্ধ-নামে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? তাঁহাদের প্রমাণও একখানি গ্রন্থ। লোক কেন যে নূতন-ধর্ম অবলম্বন করে, সে নিগূঢ় তত্ত্বের বিচার করার এখানে প্রয়োজন নাই। তবে ইহা মনে রাখিও যে, জাপানে বুদ্ধের কথা ও তাঁহার শিক্ষাব ও লীলার কথা শুনিয়া কোনো কোনো লোকে তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল। সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার কথা শুনিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিবে। এইরূপে প্রথমে উচ্চশ্রেণীর লোকে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রদত্ত সুধা পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া, উহা নিম্নশ্রেণীতে বিতরণ করিবে। একটি সূক্ষ্মকথা বলি। ধর্ম "বিচারের" বস্তু নয়, "আস্বাদের" বস্তু। সদ্যোজাত শিশুর মুখে তিক্ত দিলে সে ক্রন্দন করিবে, মধু দিলে সে আনন্দ প্রকাশ করিবে। কথা যদি প্রকৃত ভাল হয়, তবে শুনিবামাত্র উহা চিত্তকে আপনাপনি অধিকার করিয়া লইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম সকল শাস্ত্রের বিবাদের মীমাংসক, সর্বচিত্ত আকর্ষক, সর্বাঙ্গসুন্দর ও সুলভ; এমন জীব অতি দুর্লভ, যে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা আস্বাদন করিয়া মুগ্ধ না হইবে। এতদিন যে এই সুধা জীবমাত্রে গ্রহণ করে নাই, তাহার কারণ, যাঁহাদের কর্তব্য তাঁহারা উহা জীবগণকে বিতরণ করেন নাই। যিনি যে ধর্ম আস্বাদন করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সে ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা ও ধর্ম যদি আস্বাদে মিষ্ট লাগে, তবে জীবে উহা আপনাপনি গ্রহণ করিবে। তাহারা আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিবে না।"

এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে আমার নিপট্ট-বাহ্য হইল। উপরে যে "কথা"গুলি বলিলাম, তাহা আমি পরে যোজনা করিয়াছি, কিন্তু উহার "ভাব"গুলি বিদ্যুৎগতিতে তখনিই আমার মনে উদয় হইয়াছিল। উপরের কথাগুলি কেহ আমাকে বলিলেন, অথবা তা সব আমার নিজের মনের ভাব, তাহা এ পর্যন্ত আমি বিচার করি নাই, আর বিচার করিবার প্রয়োজনও নাই।

শ্রীভগবান সর্বজীবের প্রাণ ও আশ্রয়। জীবগণ তাঁহার আশ্রয় লইলেই তাহাদের সর্বার্থসিদ্ধি হইবে। জীবগণের একই স্থান হইতে উৎপত্তি, আর একই স্থানে তাহাদের যাইতে হইবে। তাহারা পরস্পর অকাট্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, আর সকলে সেইরূপ আবদ্ধ থাকিয়া সেই যে প্রাণের-যে-প্রাণ, তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে। কবে জীবের চৈতন্য হইবে যে,

ঈর্ষা, ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি রিপু হইতে যে সুখ,—স্নেহ, মমতা, দয়া ও প্রীতি উৎকর্ষে তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণ অধিক সুখ? কবে তাহাদের এ জ্ঞান হইবে যে, অন্যের অনিষ্ট করিলে নিজের যত অনিষ্ট হয়, তত অন্যের হয় না। হে দুর্বল-জীব! যদি আশ্রয় চাও, তবে অন্যকে আশ্রয় দাও। যদি অন্যের প্রিয় হইতে চাও, তবে অন্যকে ভালোবাসিতে শিক্ষা কর। শ্রীভগবান্ সর্বগুণের আকর, যতদূর পার তাঁহার মতো হও, তাতেই ব্রজে যাইতে পারিবে।

উৎসর্গপত্র

শ্রীমান অমিয়কান্তির প্রতি—

তুমি ওপারে গিয়াছ, আমি এপারে আছি। এরূপ পিতা-পুত্রে ছাড়াছাড়ি, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে বড়োই কষ্টকর। কিন্তু তোমার কি আমার, ইহাতে দুঃখ করিবার কারণ নেই; যেহেতু তুমি এখন সেই সকলের পিতার শ্রীহস্তদ্বারা প্রতিপালিত হইতেছ। পুত্রের নিকট পিতা অনেক আশা করিয়া থাকে। তুমি অতি শিশুবেলা ভবসাগর পার হইয়াছ, তাই পিতৃঋণ কিছু শোধ করিতে পার নাই বলিয়া ক্ষোভ করিও না। এই সংসারে নানা কুপ্রবৃত্তি দ্বারা বিচলিত হওয়ায় আমার অন্তর অঙ্গার হইতেও মলিন হইয়াছিল। তোমার বিয়োগ-জনিত নয়নজল দ্বারা আমার অন্তর কিয়ৎ পরিমাণে ধৌত হয়, তাহা না হইলে আমার যে কি দশা হইত, তাহা মনে করিলে আমার হৃৎকম্প হয়। তার পরে আমার সর্বস্বধন নিমাইচাঁদ;—তাঁহাকে কত চেষ্টা করিয়া একটু ভালোবাসিতে পারিলাম না। তাই তাঁহার প্রতি একটু প্রীতি বাড়াইবার আশায় আমি তোমার নাম তাঁহার নামের সহিত মিলাইয়া দিয়াছি। প্রকাশ্যে তাঁহাকে আমি শুধু "নিমাই" বলিয়া ডাকি; কিন্তু মনে মনে যখন ডাকি, তখন তাঁহাকে "অমিয়নিমাই" বলিয়া সম্বোধন করি। দেখি যদি তোমার সাহায্যে তাঁহাকে পাই।

শ্রীমঙ্গলাচরণ (আদি ও অন্ত)

জগতের নাথ কেহ নাহি সাথ একা দুঃখ পান চিতে।
রসের হৃদয় সঙ্গী কেহ নাই সেই রস আস্বাদিতে।।
নাহি হেন জন মনের বেদন বলি জুড়াবেন বুক।
প্রাণ উঘাড়িয়া পিরীতি করিয়া ভুঞ্জিবেন প্রেম-সুখ।।
মনের মতন সঙ্গীর সৃজন করিতে বাসনা হ'লো।
আপন হৃদয় হইতে উদয় হ'লো জীব জল স্থল।।
সুখের কানন করিলা সৃজন মরি কিবা কারিগরি।
তাঁহার অন্তর কিরূপ সুন্দর পরিষ্কার সাক্ষী তারি।।
জীব সৃষ্টি হ'লো ভ্রমিতে লাগিল ক্রমে বিকশিত হ'য়ে।
জীব পরিণাম মানব জনম লভে লক্ষ জন্ম পেয়ে।।
নামেতে মানুষ স্বভাবে রাক্ষস দুর্গন্ধ সকল অঙ্গ।
যান মিলিবারে মিলিতে না পেরে শ্রীভগবান্ দেন ভঙ্গ।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ফুটিল ব্রজেতে গোপ-গোপী-সখাগণ।
জগতের নাথ স্বীয় মনোমতো পাইলেন নিজ জন।।
ডাকেন তখন এসো প্রিয়াগণ* মুরলীতে করি গান।

* স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ত্রিজগতে পুরুষ কেবল একমাত্র তিনি, কানাইয়ালাল, অপর সকলে প্রকৃতি।

মুরলী বাজিল	কেহ না শুনিল	বিনা গোপ-গোপীগণ।।
আকুল হইয়া	চলিলা ধাইয়া	যথা সে রসিকবর।
তাদের চাহিয়া	বলেন হাসিয়া	"যাহা চাহ দিব বর।।"
গোপী বলিতেছেন—		
"নিঠুর বচন	বল কি কারণ	চাহিবার কিছু নাই।
কান্দিছে পরাণ	শুনি বাঁশী গান	তাই আনু তোমা ঠাঞি।।
মধু হতে মধু	তুমি প্রাণবঁধু	চরণের দাসী কর।
কিছু না চাহিব	চরণ সেবিব	দাও নাথ এই বর।।"
গোপীগণ ভাব	শুনি স্বপ্রকাশ	পদ্ম-আঁখি ছল-ছল।
"পিরীতি করিবে	কিছু না চাহিবে	এ কথা আবার বল।।
'দাও' 'দাও' কথা	শুনে থাকি সদা	দিতে নারি, গালি খাই।
মন-কথা কই	হৃদয় জুড়াই	হেন মোর সঙ্গী নাই।।
একাকী বেড়াই	হেন নাহি পাই	আমারে পিরীতি করে।
হৃদয়ে যা ছিল	সুরস কোমল	সব গেল ছারে-খারে।।
নূতন জীবন	পাইনু এখন	শুনি তোমাদের বাণী।
সুখ-বৃন্দাবন	রব চিরদিন	করি প্রেম বিকি-কিনি।।"
ব্রহ্মত্ব ইন্দ্রত্ব	সকল মহত্ত্ব	সব ফেলি দিয়া দূরে।।
বলরাম দাসে	কান্দিছে নিরাশে	কিরূপে যাব ব্রজপুরে।

প্রথম অধ্যায়

বন্ধুর লাগিয়া,	কতই রান্ধিনু,	লুকায়ে যাইব লয়ে।
রজনী আসিছে,	কিছু নাহি আছে,	বার জনে গেল খেয়ে।।
এবে শুধু হাতে,	বন্ধুর আগেতে,	কেমনে যাইব আমি।
রান্ধিতে সময়,	আর সখি নাই,	উপায় বলহ তুমি।।
(আমার) ভাণ্ডারেতে পোরা,	কতই সামগ্রী,	রান্ধিবার শক্তি নাই।
করুণা করিয়া,	কে দিবে রান্ধিয়া,	বন্ধুরে খাওয়াব যাই।।
সংকেত কুঞ্জেতে,	বন্ধুর আগেতে,	বসিয়া খাওয়াতাম নিতি।
(আজ) কেমনে যাইব,	কিবা তাঁরে দিব,	অভাগ্য বলাই অতি।।

শচীর কোলে নিমাইকে রাখিয়া দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত করিয়াছি। আমরা আরও কিছুক্ষণ তাঁহাকে মায়ের কোলে রাখিব, রাখিয়া একটি নিগূঢ় রস অর্থাৎ পরকীয়া রসের কথা কিঞ্চিৎ বলিব। বেশীক্ষণ রাখিতে পারিব না। ভাগ্যবান পাঠক, এইবেলা মনের সাধে ও প্রাণ ভরিয়া "শচীর কোলে নিমাই" দৃশ্যটি দর্শন করুন; কারণ, এই দৃশ্য বহুদিন আর দেখিতে পাইবেন না।

শ্রীগৌড়ীয় বাদশাহের তখনকার মন্ত্রীদ্বয়,—সাকার মল্লিক (রূপ) ও দবীর খাস (সনাতন)। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও সহোদর। যখন তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারের কথা শুনিলেন, তখন আপনারা আসিতে না পারিয়া, প্রভুর নিকট দৈন্য করিয়া বারে বারে এইভাবে পত্র লিখিতে লাগিলেন,—"প্রভু! আমাদের দুর্দশার সীমা নাই, কৃপা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন।" এই দুই ভ্রাতার ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে তখনকার গৌড়ের বাদশাহ ছিলেন। যিনি নামে বাদশাহ, তিনি আমোদ-আহ্লাদে, কি যুদ্ধ-বিগ্রহে, বিব্রত থাকিতেন।

তাঁহাদের এইরূপ বিষয়-সুখের প্রতি ঔদাস্য দেখিয়া প্রভু তাঁহাদের উপর কৃপার্ত হইলেন,

এবং যদিও তাঁহাদের পত্রের উত্তর দিলেন না, তবু তাঁহাদের কথা মনে করিয়া একটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীমুখের শ্লোকটি এই—"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু। তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্।"

শ্লোকের অর্থ এই—কুলটা-রমণী গৃহকার্যে ব্যগ্র থাকিলেও অন্তরে উপপতির নবসঙ্গরূপ রসায়ন আস্বাদন করে। এই দুই ভ্রাতাও ঠিক তাহাই করিতেছেন; অর্থাৎ তাঁহারা কুলটার মতো বিষয়কার্যে সর্বদা ব্যগ্র থাকিয়াও অন্তরে শ্রীকৃষ্ণরূপ উপপতির সঙ্গই আস্বাদন করিতেছেন।

এখন দেখুন, প্রভু এই দুই ভ্রাতাকে কুলটার সহিত তুলনা করিলেন কেন? "পরকীয়া" কথাই-বা কেন ভজন-সাধনের মধ্যে আসে? পরকীয়া রস শুনিলে পবিত্র-লোকের মনে ঘৃণায় উদয় হয়। অতএব এ সব কথা এ সমুদয় পবিত্রতার মধ্যে কেন? শচী ও নিমাইয়ের এখনকার অবস্থা বুঝাইবার নিমিত্ত এ কথার অল্প একটু বিচার করিতে হইতেছে। প্রিয়বস্তু সুলভ হইলে তাহার মিষ্টতা কমিয়া যায়। পাখি বড়ো সুন্দর, তাহার বিশেষ কারণ পাখি ধরা যায় না। পাখি যদি ইচ্ছা করিলেই ধরা যাইত, তবে উহার সৌন্দর্য অনেক কমিয়া যাইত। চণ্ডীদাস একটি পদে বলেন, গুপ্ত-প্রীতিতে অনেক মাধুর্য। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, উপপতি কি উপপত্নী, পতি কি পত্নী অপেক্ষা দুর্লভ। অতএব যদি পতি উপপতির ন্যায় দুর্লভ হয়েন, তবে পতিও উপপতির ন্যায় মিষ্ট হয়েন। পতির সঙ্গসুখ ইচ্ছা করিলেই করা যায়, কিন্তু উপপতির সঙ্গসুখ করিতে নানারূপ বিপদ ও পরিণামে নৈরাশ্যের সম্ভাবনা আছে। এই নিমিত্ত দুর্লভ বলিয়া পতি অপেক্ষা উপপতি মিষ্ট।

শ্রীভগবানের মধুর-ভজন করিতে হইলে দুই প্রকারে করা যায়,—পতি-ভাবে ও উপপতি-ভাবে। এ কথার আভাস পূর্বে দিয়াছি। ভগবান্ যাঁহার পতি, কাজেই তিনি একটু বঞ্চিত। আর ভগবান্ যাঁহার উপপতি, তিনি সম্পূর্ণ সুখী। ভগবান্ আস্বাদের সামগ্রী। তিনি যদি পতির ন্যায় সুলভ হইলেন তবে তাঁহার মিষ্টতা কমিয়া গেল। যদি উপপতির ন্যায় দুর্লভ হইলেন, তবেই তাঁহার মিষ্টতা পূর্ণমাত্রায় রহিয়া গেল। লক্ষ্মীর পতি ভগবান্, দুজনে একত্রে বাস করেন; কিন্তু লক্ষ্মী ব্রজগোপীদিগের ভাগ্যের নিমিত্ত তপস্যা করিয়া থাকেন, শাস্ত্রে যে এ কথা লেখা আছে, এখন তাহার তাৎপর্য পরিগ্রহ করুন।

শ্রীভগবান্‌কে উপপতি বলিয়া ভজনা করিবার আরও কারণ আছে; শ্রীভগবানের মধুর ভজনের সহিত উপপতি-ভজনের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। উপপতিভজনে আনন্দে উন্মাদ করে,—ভদ্রাভদ্র, বিপদাপদ জ্ঞান থাকে না। ভগবানের মধুর ভজনেও তাহাই করে। ভজনা দ্বারা উপপতি প্রাপ্তির অনেক বাধা ও নিশ্চিততা নাই। শ্রীভগবান্-ভজন সম্বন্ধেও তাহাই। সেই জন্য পতিরূপে শ্রীভগবানকে বর্ণনা করিলে সে বর্ণনা স্বাভাবিক হইত না,—উপপতিরূপে বর্ণনায় স্বাভাবিক হইয়াছে। বিশেষতঃ পতির সহিত যে সম্বন্ধ তাহাতে স্বার্থগন্ধ আছে—যেহেতু পতি প্রতিপালক, রক্ষাকর্তা ইত্যাদি। আর উপপতির সহিত যে সম্বন্ধ উহা বিশুদ্ধ প্রীতির দ্বারা গ্রন্থিত।

আমি বৈঠকখানায় বসিয়া আছি। আন্দাজ ত্রিশ বৎসরের একটি স্ত্রীলোক সেখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শিশির বাবু?" আমি বলিলাম, "হাঁ"। তখন সে বলিল, "নারায়ণ কোথা বলিতে পার?" নারায়ণ আমাদের গ্রামবাসী একটি ব্রাহ্মণযুবক! সে এই স্ত্রীলোকটির ধর্মনষ্ট করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এই স্ত্রীলোকটি শুনিয়াছিল নারায়ণ আমাদের এক গ্রামস্থ। তাই সে একাকিনী কোনো এক পল্লীগ্রাম হইতে তল্লাস করিতে করিতে কলিকাতায় আসিয়াছে, এবং কলিকাতায় তল্লাস করিয়া আমার বাড়ী পাইয়া নির্ভয়ে আমার কাছে আসিয়াছে। আমাকে চিনে না, তবুও আমাকে লজ্জা কি ভয় করিল না,—আসিয়াই বলিল, "নারায়ণ

কোথা বলিতে পার?" স্ত্রীলোকটির বেশ পাগলিনীর মতো। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত যিনি পাগলিনী, তাঁহারও ঠিক এইরূপ দশাই হয়। তাঁহার লজ্জা ভয় থাকে না, তিনি কৃষ্ণকে এইরূপে তল্লাস করিয়া বেড়ান,—দুর্গম স্থানেও যান। তাই সাধুগণ মধুর-ভজন পরিষ্কার বুঝাইবার নিমিত্ত "পরকীয়া" উদাহরণ দিয়া থাকেন; এবং তাহাই রূপ সনাতন সম্বন্ধে প্রভুও এইরূপ দেখাইয়াছিলেন।

ভক্তি কি প্রেম-ভক্তিতে বিহ্বল হইয়াছেন, এরূপ ভাগ্যবান্ জীব আমরা দুই-একজন দেখিয়াছি। মদ্যপান করিলে দেহে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, ভগবৎ-প্রেম উদয় হইলে ঠিক তাহাই হয়। এমন কি, মদ্যপায়ীর মুখে যেরূপ লালা পড়ে, প্রেমোন্মত্ত ভক্তের মুখেও সেইরূপ কখন কখন লালা পর্যন্ত পড়িতে থাকে। তবে সামান্য মাতাল দেখিলে ঘৃণা হয়, আর কৃষ্ণ-প্রেমে মাতোয়ারা দেখিলে হৃদয় দ্রবীভূত ও নির্মল হয়। সাধুগণ জীবগণকে বুঝাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণ-প্রেমকে মদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাই বলিয়া কি কৃষ্ণ-প্রেম দোষের হইল? সেই রূপ শ্রীভগবানের মধুর-ভজন কিরূপ, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত সাধুগণ পরকীয়া-রসের সাহায্য লইয়া থাকেন। তাই বলিয়া কি সাধুগণের দোষ হইল?

এখন পরকীয়া-রসের সার লক্ষণ বলি। প্রিয়জন যখন দুর্লভ হয়েন, কি প্রিয়জনকে প্রাপ্তির নিশ্চয়তা যায়, তখনই পরকীয়া-রসের উদয় হয়। প্রিয়জন যদি দুর্লভ হয়েন, তবে তিনি পরম-প্রিয় হয়েন। যদি স্বামী পরের অধীন হয়েন,—তাঁহাকে প্রাপ্তি অন্যের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, তবে তিনিও উপপতির ন্যায় সুখের সামগ্রী হয়েন। যদি প্রিয়জন অন্যের অনুগত কি অপরের বস্তু হয়েন, তবে পরকীয়া-রসের উদয় হয়।

শ্রীনিমাই সন্ন্যাসী হইয়াছেন, স্ত্রী ও জননী ত্যাগ করিয়াছেন, তখন স্ত্রীলোক-মাত্রকেই তাঁহার জননী-জ্ঞান করিতে হইবে; এমন কি, তাঁহাদের মুখ পর্যন্তও দেখিতে পাইবেন না। যদি দৈবাৎ স্ত্রীলোক সম্মুখে পড়ে, তবে হয় মুখ ফিরাইতে, নয়ন মুদিতে, কি অন্য পথে যাইতে হইবে। এমন কি, তাঁহার স্ত্রীলোকের চিত্র পর্যন্ত দেখিতে এবং স্ত্রীলোকেব নাম পর্যন্ত শুনিতে নিষেধ। তাহাও নয়, "স্ত্রী" শব্দও ব্যবহার করিতে বিধি নাই। তবে যদি কোনো কারণে স্ত্রীলোকের কথা বলিতে হয়, তবে স্ত্রী স্থানে "প্রকৃতি" বলিতে হইবে। যেমন শিবানন্দ সেনের "স্ত্রী" না বলিয়া, শিবানন্দের "প্রকৃতি" বলিতে হইবে। পথে কয়েকজন "স্ত্রীলোক" দাঁড়াইয়া না বলিয়া, কয়েজন "প্রকৃতি" দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক এইরূপ ভয়ঙ্কর সামগ্রী।

নিমাইয়েরও জননীর সঙ্গে এইরূপে সম্পর্ক একেবারে গিয়াছে। শচী আর এখন তাঁহার জননী নহেন, তবে কি না, তাঁহার "পূর্বাশ্রমের" মা। তিনি আর এখন শচীর তনয় নহেন, তিনি এখন কেশব ভারতীর পুত্র। শচী আর তাঁহাকে বাটী লইতে পারিবেন না। এমন কি, শ্রীনিমাই এখন শচীকে প্রণাম পর্যন্ত করিতে পারিবেন না; নিয়ম মতো শচী এখন নিমাইকে প্রণাম করিবেন। কাজেই শ্রীনিমাই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করাতে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার সামাজিক সম্পর্ক একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি নিমাইয়ের প্রতি শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার ভালোবাসা গিয়াছে? না,—তাহার তো, একবিন্দুও যায় নাই, বরং উহা অনন্ত-গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেহেতু, নিমাইরূপ যে অতি-প্রিয়বস্তু, তিনি এখন আর তাঁহার নিজ-জন নহেন,—অপরের বস্তু হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গমন করিয়া দেবকীর ক্রোড়ে বসিলেন, তখন যশোদার কৃষ্ণ-প্রেম কোটিগুণ বৃদ্ধি পাইল। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ দুর্লভ হইলে, শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণে পিপাসা আরও কোটিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

শচীর প্রিয়বস্তু নিমাই। নিমাই তাঁহার পুত্র ছিলেন, এখন তাঁহার উপপুত্র হইলেন। সেইরূপ বিষ্ণুপ্রিয়ার পতি নিমাই, এখন তাঁহার উপপতি হইলেন। ইহাতে শচী বাৎসল্য, ও

বিষ্ণুপ্রিয়া মধুর প্রেম-সাগরে ডুবিয়া গেলেন, থই পাইলেন না।

এখানে আর একটি গুহ্য-কথা বলিব। এইরূপে বিয়োগে প্রিয়বস্তু আরও প্রিয় হয়েন। আর এইরূপে মৃত্যুরূপ বিয়োগে প্রিয়বস্তুর সহিত প্রীতি আরও বর্ধিত হয়। অতএব মৃত্যুর তাৎপর্য ছাড়াছাড়ি নয়,—প্রীতির পরিবর্ধন। প্রিয়বস্তুর সহিত মৃত্যুরূপ বিচ্ছেদ হইলে, তাঁহার আর দোষ দেখা যায় না, তাঁহার গুণগুলিই কেবল হৃদয় মাঝারে মহামণির ন্যায় জ্বলিতে থাকে। আর যদিও ভাবের তরঙ্গে জীব হাবুডুবু খাইতে খাইতে পরলোকগত প্রিয়জনের কথা বাহ্য দৃষ্টিতে ভুলিয়া যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রিয়জনের প্রতি প্রীতি অন্তরে-অন্তরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরলোকগত প্রিয়জনের কথা হৃদয়ে একটু ধ্যান করিলেই ইহা জানা যায়। দুইটি জীবে অন্তরে-অন্তরে অত্যন্ত প্রণয়। কিন্তু দুইজনে খটমটি হইতেছে;—কোথা কি বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে, দুইজনে মিলিতেছে না। হঠাৎ দুইজনে বিচ্ছেদ হইল, তখন "দুহে দুহার" দোষ ভুলিয়া গেলেন, কেবল গুণই দেখিতে লাগিলেন। দুইজনে পূর্বে কলহ করিয়াছেন বলিয়া এখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পরে দুইজনে মিলন হইল, তখন বাহু প্রসারিয়া উভয়ে উভয়ের গলা ধরিলেন। মহাভারতে দেখিতে পাই, মৃত্যুর পরে যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনে যেই দেখা হইল, অমনি উভয় উভয়ের দোষ ভুলিয়া গিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। সে যাহা হউক, এ সমুদয় রহস্য ক্রমেই বিস্তারিত হইবে।

শচীর কোলে নিমাই। প্রথমে যখন শচী সন্ন্যাসবেশধারী নিমাইকে দেখিলেন, তখন পুত্রকে চিনিতে কষ্ট হইল, যেহেতু অরুণবসনধারী ও মুণ্ডিত-মস্তক নিমাইয়ের বেশ তখন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহা নহে; তখন নিমাইয়ের আকৃতি অতিশয় ভক্তি-উদ্দীপক হইয়াছে। নন্দন আচার্যের বাড়ী প্রভুকে নিতাই যখন প্রথম দর্শন করেন, তখন তাঁহার পরিধানে পট্টবস্ত্র, গলে ফুলের মালা, নটবর নবীন-নাগর বেশ;—ভক্তিউদ্দীপক কোনো উপকরণ নিমাইয়ের অঙ্গে ছিল না। তবু নিতাই প্রেমে অধীর হইয়া প্রভুকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। আবার শ্রীকৃষ্ণের রাজবেশ দেখিয়া ব্রজবালা রাধা অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া মস্তক অবনত করিয়া বসিয়াছিলেন। শচীর সহিত নিমাইয়ের শুদ্ধ অমিশ্রপ্রেম সম্বন্ধ,—ভক্তি সম্বন্ধ নহে। কিন্তু নিমাইয়ের সন্ন্যাসী-বেশ দেখিয়া শচীর ভক্তির উদয় হইল, সুতরাং পুত্রের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহার বিভ্রাট ঘটিল। কাজেই শচী নিমাইকে দেখিবামাত্র প্রথমে চিনিতে পারিলেন না, আর চিনিয়াও তাঁহার উপর পুত্রভাব অর্পণ করিতে পারিলেন না;—ভক্তিতে গদগদ হইয়া শচী পুত্রের রূপ দেখিতে লাগিলেন, ইচ্ছা যে প্রণাম করেন। কিন্তু পূর্বসংস্কারবশতঃ তাহা পারিতেছেন না। তাই নিমাই যখন তাঁহাকে বারম্বার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, তখন শচী ভয় পাইয়া বলিলেন, "বাপ্! তুমি আমাকে প্রণাম করিতেছ, ইহাতে আমার ভয় করিতেছে। তবে ভরসা এই যে, যদি তোমার প্রণামে আমার অপরাধ হইত, তবে তুমি আমাকে কখনই প্রণাম করিতে না।"

এইরূপ ভক্তি-চক্ষে শচী নিমাইকে দর্শন না করিলে একটি বিষম অনর্থ হইত। পূর্বে বলিয়াছি, জীবের সন্দেহরূপ নীলকাঁচে শ্রীভগবানরূপ সূর্যকে দর্শন করিতে সক্ষম করে। সেইরূপ ভক্তিরূপ বাঁধে প্রেমের বন্যাকে নিবারণ করে। শচী তাঁহার জীবনের জীবন পুত্রকে হারাইয়া, সেই পুত্রকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। নিমাইয়ের প্রতি তাঁহার যে স্বাভাবিক ভাব তাহা থাকিলে, পুত্রকে দর্শন করিবামাত্র, সেই শত সহস্র লোকের মধ্যে, "হা নিমাই" বলিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন;—এমন কি, তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইবারও সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু নিমাইকে দর্শন করিবামাত্র শচীর ভক্তির উদয় হইল, অমনি প্রেমের হিল্লোলে একটি বাঁধ পড়িল, আর শচী ভাসিয়া গেলেন না,—সচেতন রহিলেন; ও সচেতন থাকিয়া পুত্রের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন।

শচী ভাবিতেছেন, "আমার পুত্রটি স্বয়ং ভগবান্ কিন্তু আমি কি নির্বোধ, তবু নিমাইকে আমার পুত্র বোধ গেল না!" ইহাতে আপনাকে একটু অপরাধী ভাবিতেছেন, আর আপনার কল্পিত অপরাধ যতদূর সম্ভব অপনয়ন করিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "নিমাই! তুমি যাই হও, তবু আমার এ বিশ্বাস যায় না, যে তুমি আমার দুধের ছাওয়াল।" কিন্তু শচীর এই জ্ঞানরূপ দুর্দশা অধিকক্ষণ রহিল না, দুই একটি কথা বলিতে না বলিতে উহা শেষ হইয়া গেল, আর হৃদয় বাৎসল্য রসে পূরিয়া উঠিল। তখন তিনি বাহু প্রসারিলেন, অমনি নিমাই অগ্রবর্ত্তী হইয়া গলা বাড়াইয়া দিলেন, আর জননী পুত্রের বদনে ঘন ঘন চুম্বন দিতে লাগিলেন। মাতা-পুত্রে কথা আরম্ভ দেখিয়া সকলের ইচ্ছা হইল দূরে যাইবেন; একটু দূরেও গেলেন, তবু বেশি দূরে যাইতে পারিলেন না। কারণ শচী ও নিমাই বসিয়া কথা কহিতেছেন, ইহা ফেলিয়া কিরূপে যাইবেন?—তাঁহারা চুপ করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা শুনিতে লাগিলেন।

শচী প্রথমে ভক্তি, পরে বাৎসল্য, পরে অভিমান রসে বিভাসিত হইয়া কথা কহিতেছেন। বাসুঘোষও সেখানে দাঁড়াইয়া, সুতরাং তাঁহার একটি পদে আমরা জানিতে পারিতেছি, শচী কি কি বলিলেন। শচী বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি পিতৃহীন বালক, আমি সেই নিমিত্ত আরো যত্ন করিয়া তোমাকে লেখা-পড়া শিখাইলাম ও ভাগবত পড়াইলাম। সেই ঋণের শোধ কি তুমি এইরূপে দিলে? তোমাকে আমি বড়ো-মানুষের ঘরে পরমসুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ দিলাম; তুমি এখন তাহাকে আমার গলায় বাঁধিয়া দিয়া ফেলিয়া চলিলে। ইহাতে কি তোমার বড় ধর্ম্ম হইবে?* আমি তোমার বৃদ্ধ-মাতা, আমার প্রতি তোমার দয়া হইল না। তা'তেও আমি তোমাকে দোষ দিই না। আমি তোমার মা, আমার প্রতি তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার; কিন্তু সে পরের মেয়ে, তা'র অপরাধ কি? বৌমাকে কি বলিয়া বুঝাইব, বলো দেখি?"

ইহা শুনিয়া নিমাই মস্তক অবনত করিলেন। মায়ের দুঃখে ক্রমে তাঁহার মুখ মলিন হইতেছে। নিমাই মানুষের মতো কথা কহিতেন ও ব্যবহার করিতেন। ইহাতে যাঁহারা তাঁহাকে শ্রীভগবান্ ভাবিতেন, তাঁহারাও সময়ে সময়ে তাঁহার ভগবত্তা ভুলিয়া যাইতেন। আর ভিন্ন-লোকে সেই কথা বলিয়া তাঁহার ভগবত্তায় দোষ ধরেন। তাঁহারা বলেন, "প্রভু যদি শ্রীভগবান্ হইবেন, তবে মনুষ্যের অনিশ্চিততা, দুর্বলতা, অজ্ঞতা, দেখাইবেন কেন? কিন্তু এ কথা একবার স্মরণ করা উচিত যে, যদি শ্রীভগবান্ মনুষ্য-সমাজে উদয় হয়েন, তবে তাঁহার ঠিক মনুষ্য হইয়া না আসিলে, অর্থাৎ মনুষ্যের যে যে স্বভাব তাহা না লইয়া আসিলে, তাঁহার মনুষ্যের সহিত সঙ্গ কিরূপে সম্ভবে? মনুষ্য, ষড়ৈশ্বর্য-ভগবানের সঙ্গ সহ্য করিতে পারে না। আর তাহা হইলে তাঁহার লীলাও মাধুর্যময় না হইয়া ঐশ্বর্যময় ও নীরস হয়। শ্রীরাধা কোপ করিয়াছেন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ মলিন হইয়া গেল। রাধাকৃষ্ণ-লীলায় এ সব কথা না থাকিলে উহা মিষ্ট হইত না। আর রাধার কোপে শ্রীকৃষ্ণের মুখ মলিন না হইলে, রাধাও

*হেদেরে নদীয়ার চাঁদ বাছারে নিমাই। অভাগিনী তোর মায়ের আর কেহ নাই।।
এত বলি ধরি শচী গৌরাঙ্গের গলে। স্নেহভাবে চুম্ব খায় বদন-কমলে।।
মুই বৃদ্ধ-মাতা তোর, মোরে ফেলাইয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ দিলে গলায়-গাঁথিয়া।।
তোর লাগি কান্দে সব নদীয়ার লোক। ঘরে রে চলয়ে বাছা দূরে যাউক শোক।।
শ্রীনিবাস হরিদাস যত ভক্তগণ। তা সবারে লয়ে বাছা করহ কীর্তন।।
মুরারি মুকুন্দ বাসু আর হরিদাস। এ সব ছাড়িয়া কেন করিলে সন্ন্যাস।।
যে করিলা সে করিলা চলরে ফিরিয়া। পুনঃ যজ্ঞসূত্র দিব ব্রাহ্মণ আনিয়া।।
বাসুদেব ঘোষ কহে শুন মোর বাণী। পুনরায় নদে.চল গৌর-গুণমণি।।

কোপ করিতে পারিতেন না। পাঠকগণের অবশ্য স্মরণ আছে যে, সাত প্রহর শ্রীনিমাই ভগবান-আবেশে ছিলেন, তাহাই ভক্তগণ সহ্য করিতে পারেন নাই।

আরব্য উপন্যাসের পাতসা গুপ্তবেশে প্রজা-সমাজে বেড়াইতেন। তিনি প্রজাগণের সহিত রঙ্গ করিতেন, প্রজাগণও তাঁহার সহিত রঙ্গ করিত। তাহার কারণ প্রজাগণ তাহাকে তাহাদের মতো একজন ভাবিত,—পাতসা বলিয়া জানিলে এ রস আর একটুও হইত না। অতএব শচী ও নিমাইয়ে যখন কথা হইতেছে, তখন প্রভু যে শচীর পুত্র, ইহা ব্যতীত আর কোনো ভাব কাহারও মনে রহিল না,—থাকিলে কোনো রসই হইত না। পুত্রের মলিন মুখ দেখিয়া শচীর কোপ অন্তর্হিত হইল। তখন তাঁহার আর এক কথা মনে পড়িল। তিনি ভাবিতেছেন, নিমাই তো এখন আর তাঁহার নহে। যে ডোরে তাঁহার পুত্র তাঁহার নিকট বান্ধা ছিলেন, তাহা নিমাই ছিঁড়িয়াছেন। এখন নিমাইয়ের এক গতি, তাঁহার অন্য গতি। কাজেই নিমাই তাঁহার বাড়ী যাইবে না, তাঁহার ঘরে শুইবে না, তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবে না; অথচ নিমাই তাঁহার পুত্র, তাঁহার জীবনের জীবন। কাজেই তখন জোর জুলুম ছাড়িয়া দিয়া, নিমাইয়ের প্রতি তাঁহার কোনো দাবি দাওয়া নাই, এই ভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "নিমাই! আমি তোমার বৃদ্ধ-মাতা, আমাকে ফেলিয়া যাইও না। তুমি কেন আমাকে ফেলিয়া যাইবে? বাড়ী বসিয়া নিতাই, গদাধর, মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীবাস, নরহরি, বাসুঘোষ—ইহাদের সহিত সংকীর্তন করিও। আমি আর মানা করিব না। তবে তুমি সন্ন্যাস লইয়াছ, ভাল ব্রাহ্মণ আনিয়া আমি তোমার পৈতা দিব। তুমি বৈরাগী হইয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া খাবে, ওমা, তাহা আমি কেমন করিয়া দেখিব। এই সুন্দর শরীরে কাঙ্গালের ডোর-কৌপীন পরিয়াছ, ইহা দেখিয়া পশুপক্ষী পর্যন্ত কান্দিতেছে;—আমি তোর মা, বাঁচিয়া আছি। অন্যে সহিতে পারে না, আমি মা কিরূপে সহিব? নিমাই, তুমি সুবোধ; বলো দেখি মা হইয়া কি কেহ ইহা দেখিতে পারে? আবার বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা ভেবে দেখো দেখি? তাহার এই কচি বয়স। তাহাকে আমি কি বলিয়া বুঝাইব? নদীয়া আঁধার হয়েছে। বৌমা অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে। আমি তোমাকে নিতে আসিয়াছি। বাপ! বাড়ীর ধন বাড়ী চলো।" এই বলিয়া নিমাইয়ের গলা ধরিয়া আবার ঘন ঘন চুম্বন দিলেন ও কাঁদিতে লাগিলেন।

ভক্তগণের স্বাভাবিক টান শচীর দিকে। তাঁহারা ভাবিতেছেন, শচী ঠিক বলিতেছেন, প্রভুরই সমুদয় অন্যায়। ভক্তগণের অবস্থা ও মনের ভাব সেই স্থানে উপস্থিত বাসুঘোষের একটি পদে বেশ বুঝা যাইবে। ভক্তগণ ভাবিতেছেন, "প্রভুর একি রীতি? যিনি শ্রীভগবান প্রেমদান করিতে আসিয়াছেন, তিনি কৌপীন ও দণ্ড লইয়া, কেশ মুড়াইয়া, কেন আমাদের বুকে শেল হানিতেছেন? একবার তাঁহার নিজ জনের অবস্থা দেখিলেন না! বৃদ্ধা-জননী যুবতী-ভার্যা ছাড়িলেন! ভক্তগণ প্রাণে মরিতেছে, কান্দিয়া কান্দিয়া তাহাদের জীবন সংশয় হইয়াছে।* তাহা দেখিলেন না! অতএব গঙ্গায় ডুবিয়া মরণই আমাদের এ দুঃখের একমাত্র ঔষধ।"

* কি লাগিয়া দণ্ডধরে, অরুণ বসন পরে, কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখচাঁদে, রাধা রাধা বলি কাঁদে, কি লাগিয়া ছাড়ে গৌড়দেশ।।
শ্রীবাসের উচ্চ রায়, পাষাণ গলিয়া যায়, গদাধর না জীবে পরাণে।
বহিছে তপত ধারা, যেন মন্দাকিনী পারা, মুকুন্দের ও দুটি নয়ানে।।
কান্দে শান্তিপুর-নাথ, শিরে দিয়ে দুটি হাত, কি হৈল কি হৈল বলি কান্দে।
অদ্বৈতঘরণী কান্দে, কেশ পাশ নাহি বান্দে, মরা যেন পড়িল ভূমিতে।।
এ তোমার জননী ছাড়ি, যুবতী রমণী এড়ি, এবে তোমার সন্ন্যাসে গমন।
গঙ্গায় শরণ নিব, এ তনু গয়ায় দিব, বাসুঘোষের অনলে জীবন।।

মায়ের বচনে নিমাইয়ের দুঃখ-তরঙ্গে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। কষ্টে-শ্রষ্টে নয়ন-জল নিবারণ করিয়া বলিতেছেন, "মা, জানিয়া বা না-জানিয়া যদি সন্ন্যাস করিয়া থাকি, কিন্তু তোমার প্রতি আমি কখনও উদাস হইব না। দেখো মা, তোমাকে দুঃখ দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছিলাম, তাহাতে বিঘ্ন ঘটিল,—যাইতে পারিলাম না। তুমি এখন বিশ্রাম করো। আমার যাহাতে ভাল হয়, তাহা তুমি বিচার কবিয়া দিও, আমি আর স্ব ইচ্ছায় কিছু করিব না। এ দেহ তোমার, আমার ইহার প্রতি কোনো অধিকার নাই। তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। যদি আবার বাড়ী যাইতে বল, তাহাই যাইব। সর্ব-সমক্ষে আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম।"

শ্রীঅদ্বৈতের ঘরণী সীতাদেবী একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি আসিয়া শচীর দুইখানি হাত ধরিয়া তাঁহাকে অভ্যন্তরে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, শচীও সম্মত হইলেন। কারণ তাঁহার মনে তখন একটি সাধের উদয় হইয়াছিল। তিনি বাড়ীর ভিতর যাইয়া সীতাদেবীকে বলিলেন, "আমি রাঁধিব, রাঁধিয়া নিমাইকে খাওয়াইব।" এই কথা শুনিয়া সকলের চোখে জল আসিল। শচী তখনি স্নান করিয়া রন্ধন করিতে বসিলেন। কি কি ব্যঞ্জন নিমাইয়ের প্রিয় তিনি তাহা বেশ জানেন। অন্যের বাড়ী বলিয়া, রন্ধনের দ্রব্যের ফরমাইস করিতে শচীর একটু কুণ্ঠিত হইবার কথা, কিন্তু তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কারণে নিমাইয়ের লোভ যা কিছু শাক, থোড়, মোচা প্রভৃতির উপর,—মূল্যবান ক্ষীর সর ছানার উপর নহে।

শচী অন্তঃপুরে গমন করিলে, নিমাই বদন তুলিয়া ভক্তগণ পানে চাহিলেন। ভক্তগণের দশা দেখিয়া প্রভু আবার কাতর হইলেন। সকলের এলোথেলো বেশ, রোদন করিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ, অনাহারে দেহ শীর্ণ। তখন যদিও একটু প্রফুল্ল হইয়াছেন, কিন্তু তবু তাঁহারা যে একটু পূর্বে দুঃখসাগরে ডুবিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের অবস্থায় বেশ বুঝা যাইতেছে। তখন প্রভু জনা-জনাকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, আর যেন সেই শীতল স্পর্শে ভক্তগণের দুঃখ হরণ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, ভক্তগণ আর দুঃখ ভাবিতে বড়ো সময় পাইলেন না। প্রভু তখনি তাঁহাদের লইয়া স্নানে চলিলেন। এ দিকে শ্রীঅদ্বৈত সকলের বাসার সংস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত বিষয়-সম্পত্তিতে একজন বড়োমানুষ,—তখনকার বৈষ্ণবগণের সর্বপ্রধান। তাঁহার ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়। অনায়াসে সকলের আতিথ্যের ভার লইলেন। যাঁহারা নবদ্বীপ কি দূরবর্তী কোনো গ্রাম হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের থাকিবার বাসা এবং সমুদয় আহারের সামগ্রী দিলেন। শ্রীঅদ্বৈত বাহিরে এই আমোদ করিতেছেন, ওদিকে শচী এক মনে, যেন পরম যোগিনীর ন্যায়, রন্ধন করিতেছেন। এ দিকে নদেবাসীগণ সুরধুনীতে জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। প্রভুকে মধ্যস্থলে করিয়া জল-যুদ্ধ, সন্তরণ, "কয়া" "কয়া" খেলারূপ আনন্দে সকলে প্রভুর সন্ন্যাস তখন একরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে প্রভুর সন্ন্যাসের পর ত্রিভুবন শীতল হইল, কেবল একজন ছাড়া,—তিনি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীমতী প্রভুর বাড়ীতে সখী পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন। তখন তিনি সে বাড়ীর কর্ত্রী, উত্তরাধিকারিণী। প্রভুর এই বাড়ীতে তিনি চিরজীবন যাপন করিয়াছিলেন, আর প্রভু বিংশতি দিবসের পথ দূরে অর্থাৎ নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে প্রভুকে পরে লইয়া যাইব। সর্বাগ্রে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁহার শূন্য-ভবনে স্থাপিত করিব। বিষ্ণুপ্রিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তির আদরের কন্যা। তিনি সুরধুনীর তীরে শচীর অগ্রে দাঁড়াইয়া মুখ অবনত করিয়া মনে মনে বলিতেন, "মা! আমাকে ঘরে নিয়ে চল।" তাহার পরে প্রকৃতই তিনি শ্রীনিমাইয়ের অঙ্গে অঙ্গ দিয়া দাঁড়াইলেন; তখন তাঁহার রূপ কি প্রকার, না,—"ঝলমল করে যেন তড়িৎপ্রতিমা।" তিনি রাজরাজেশ্বরী, পতিসোহাগিনী, ত্রিভুবনের আদরিণী।

অগ্রহায়ণ মাসে তিনি পিত্রালয়ে গমন করিলেন। সেখানে হঠাৎ নানাবিধ অমঙ্গল-লক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। যথা—

বিষ্ণুপ্রিয়া সখী সনে কহে ধীরে ধীরে। আজ কেন প্রাণ মোর অকারণে ঝুরে।।
কাঁপিছে দক্ষিণ আঁখি, যেন স্ফুরে অঙ্গ। না জানিয়ে বিধি কিবা করে সুখ-ভঙ্গ।।
আরে সখি পাছে মোরে গৌরাঙ্গ ছাড়িবে। মাধব* এমন হলে অনলে পশিবে।।"

শ্রীমতী আবার বলিতেছেন, "সখি! সুখের নবদ্বীপের এরূপ দশা কেন? চতুর্দিকে সকলে কেবল রোদন করিতেছে।" যথা—

"আজ কেন নদীয়া উদাস লাগে মোরে। অঙ্গে নাহি পাই সুখ, দুটি আঁখি ঝুরে।।
সুরধুনী পুলিনে মলিন তরুলতা। ভ্রমর না খায় মধু, শুকাইল পাতা।।
স্থগিত হইল কেন জাহ্নবীর ধারা। কোকিলের রব নাহি, হৈল মূক পারা।।
এই বড় ভয় লাগে বাসুর হিয়া মাঝে। নবদ্বীপ ছাড়ে পাছে গোরা নটরাজে।"

তখন সখিগণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা আর গোপন রাখিলেন না; বলিলেন, "নগরে এরূপ কথা হইতেছে যে, সোনার ঠাকুর নাকি নবদ্বীপ ছাড়িবেন।" এই কথা শুনিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া আর পিত্রালয়ে রহিলেন না, তদ্দণ্ডে আপন গৃহে আসিলেন। সেই সময় কিছুকাল শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার সহিত গার্হস্থ্য-রস আস্বাদন করিয়াছিলেন; আর সন্ন্যাসের রজনীতে সেই রসের বন্যা উঠাইলেন।**

তাহার পরে পতিকে হৃদয়ে ধরিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় কিরূপে পতিকে হারাইলেন, আর কোল শূন্য দেখিয়া "পালঙ্কে বুলায় হাত" ইত্যাদি লীলা পাঠকের স্মরণ আছে। এখন পতি হারাইয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া শূন্য নবদ্বীপের মাঝে, তাঁহার শূন্য-গৃহে বসিয়া আছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কখন শোকে, কখন ভক্তিতে, কখন ক্রোধে, কখন আনন্দে অভিভূত হইতেছেন। কখন আপনাকে অতি প্রাচীনা বোধ করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, তাঁহার শ্বাশুড়ীকে পালন করিতে হইবে। আবার কখন প্রলাপ বকিতেছেন ও কখন-বা নিরাশ হইয়া সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় মন উঘাড়িয়া রোদন করিতেছেন। যথা—

"হেদেরে পরাণ নিলাজিয়া। এখনও না গেলি তনু ত্যজিয়া।।
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর। আরকি গৌরব আছে তোর।।
মিছা প্রীতি আশ-আশে রবে। আর কি গৌরাঙ্গচাঁদে পাবে।।
সন্ন্যাসী হইয়া পঁহু গেল। এ জনমের সুখ ফুরাইল।।
কান্দি বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বাণী। বাসু কহে না রহে পরাণি।।"

শ্রীমতী ভাবিতেছেন, "আমার প্রভু বড় নিষ্ঠুর"; আবার ভাবিতেছেন, "সে কি! আমার দুঃখ, তাঁর দুঃখ না? আমি তো ঘরে আছি, তিনি যে বৃক্ষতলে?" তখন সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভাই! সন্ন্যাসীর কি কি নিয়ম তোরা কিছু জানিস্? আচ্ছা, সন্ন্যাসীর যে স্ত্রী,

* মাধব বাসুঘোষের ভ্রাতা।

** সেই রজনীর দম্পতি-রসলীলা বর্ণিত এই পদটি প্রস্তুত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়ার চিবুকে ধরিয়া বলিতেছেন। যথা—

"সলাজনয়না বালা মুখ নাহি তোলে। পড়িল পড়িল ভ্রমর পদ্ম-মধু লোভে।।
হিঙ্গুলে রঞ্জিত ঠোঁট কাঁপে মৃদু মৃদু। প্রেম সরোবরে আঁখি ঝুরে বিন্দু বিন্দু।।
নয়নের তারা আধো পদ্মদলে ঢাকা। জনমের মত হিয়ার মাঝে রইল আঁকা।।
নানা ভাব খেলে মুখে চঞ্চল চপল। কঠিন পুরুষ আমি করিল পাগল।।
বিষ্ণুপ্রিয়ার আজ্ঞা পেয়ে বলাই মালা গাঁথে। অঞ্জলি করিয়া দিল প্রাণেশ্বরীর হাতে।।"

তাহার নিয়ম তোরা বলিতে পারিস্? আমি তাহার সমুদয় পালন করিব। প্রভু ভাবিতেছেন, তিনি মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া আমাকে জব্দ করিবেন? আমিও শয্যায় শুইব না। তিনি প্রাণধারণের নিমিত্ত দুটি অন্ন মুখে দিবেন, আমিও তাই করিব।"*

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার এই অবস্থা ধ্যানের বস্তু। ইহাতে মন নির্মল হয়, শ্রীগৌরাঙ্গে প্রীতি হয়, আর শ্রীভগবৎবিরহরূপ যে জীবের পঞ্চমপুরুষার্থ তাহা পবিমাণে লাভ হয়। তাই আমি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা বর্ণনা করিয়া, প্রিয়াজী কর্তৃক তাঁহার পতির নিকট শান্তিপুরে-প্রেরিত দুইখানি লিপি রচনা করিয়াছিলাম। শুনি, কিন্তু শাস্ত্রে প্রমাণ নাই যে, যখন নদেবাসীরা শান্তিপুরে শ্রীনিমাইকে আনিতে গমন করেন, তখন প্রিয়াজী একটি স্ত্রীলোক দ্বারা প্রভুকে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন; সেই জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া এই পত্রিকা লেখা হয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীনিমাইয়ের প্রতি—

"যে অবধি গেছ তুমি এ ঘর ছাড়িয়া। সে হ'তে আছেন মাতা উপোস করিয়া।
সদা তাঁর সঙ্গেতে মালিনী ঠাকুরাণী। নৈলে প্রাণে এতদিনে মরিতেন তিনি।।
খাওয়াইতে করি যত সাধ্যসাধন। মোরে কোলে করি করেন দ্বিগুণ রোদন।।
মোর হাতে মা রাখিয়া চলে গেলে তুমি। অকূল পাথারে দেখ পড়িলাম আমি।।
পিতা চেয়েছিলেন মোরে বাড়ি লইবারে। তা কি আমি যেতে পারি মাকে একা ছেড়ে?
সন্ন্যাসী-ঘরণীর নিয়ম কিছুই না জানি। কি খাইব কি পরিব লিখিবে আপনি।।
হাতের কঙ্কণ ফেলিবারে হলো ভয়। পাছে বা তোমার কিছু অমঙ্গল হয়।।
তোমার পাটের জোড় গলার চাদর। তোমার গলার হার চরণ-নূপুর।।
কি করিব এ সকল সামগ্রী লইয়া। রাখিব কি গঙ্গা মাঝে দিব ভাসাইয়া।।
এ সব বারতা আমি কাহারে সুধাই। মাকে সুধাইলে মরি যাবেন নিশ্চয়।।
মার কাছে থাক যদি বড় ভাল হয়। আমি কাছে না যাইব না করিহ ভয়।।
তা'হলে সে শান্ত হবেন দুঃখিনী জননী। তাঁরে বলে দিও নিয়ম কি পালিব আমি।।
আপনি যে সব তুমি নিয়ম পালিবে। তা'হতে কঠোর নিয়ম এ দাসীরে দিবে।।
বাঁচিব ত্যজিয়া আমি ভূষণ ভোজন। সুখেতে করিব আমি মাটিতে শয়ন।।
লোকে বলে তুমি নাকি আমার লাগিয়া। গার্হস্থ্য ছাড়িয়া গেলে সন্ন্যাসী হইয়া।।
কেন আমি তোমার কি করিলাম ক্ষতি। কোন দিন সংকীর্তনে করেছি আপত্তি?
আছাড়ে তোমার সর্ব অঙ্গে লাগে ব্যথা। বলো দেখি কোন দিন কহিয়াছি কথা?
খাট হ'তে ভূমে গড়াগড়ি দিতে তুমি। বলো কোন দিন রাগ করিয়াছি আমি?
পাষাণ গলিত তোমার করুণ রোদনে। মোর দুঃখ রাখিতাম আপনার মনে।।
আমারে দেখিলে যদি ধর্ম নষ্ট হয়। আমি নয় রহিতাম বাপের আলয়।।
বিষ্ণুপ্রিয়া পত্র লেখে কান্দিয়া কান্দিয়া। বলরাম দেখে পাছে থাকি দাঁড়াইয়া।।"

শ্রীমতী কখনও ভাবিতেছেন, তিনিও একজন। পূর্বে তিনি যে পৃথক কেহ তাহা বোধ ছিল না। এখন ভাবিতেছেন, তাঁহার শাশুড়ীকে সেবা করিতে হইবে। শশুড়ী যাহাতে উতলা না হয়েন এইরূপ ধৈর্য ধরিয়া তাঁহার চলিতে হইবে। কখন বলিতেছেন, "সখি! আমার হাতে তিনি জননীকে রাখিয়া গিয়াছেন; আর তাঁহার আপনার স্থানে আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন। আমার সেই ভার কুলাইতে হইবে!" আবার বলিতেছেন, "সখি! আমার সমবয়সিরা বড়ো খুসী হইয়াছে, না? তাহারা ভাবিতেছে,—'খুব হয়েছে, বড়ো আদরিণী হইয়াছিলেন, মাটিতে পা দিতেন না।' কিন্তু এ কথা কি অন্যায় না? আমার কি গরব হইয়াছিল? গরব তা নয়, আমার একটু তাচ্ছিল্য হইয়াছিল। আমি পতিসেবা করি নাই।

* যে দিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া। তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া।।- --প্রেমদাস

তিনি কিরূপ গুণের নিধি তাহা তখন বুঝি নাই, প্রভুকে অনাদর করিয়াছিলাম; তিনি আদরের ধন, তাই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।" আবার ভাবিতেছেন, জগতের সমস্ত লোক তাঁহার নিন্দা করিতেছে। ইহাতে তাঁহার উপর বড় অত্যাচার করা হইতেছে। সে অত্যাচারের নিমিত্ত অভিযোগ তিনি আর কাহার নিকট করিবেন? তাই পতির কাছে করিতেছেন। যথা—

"আমার বয়সী যে তোমা দেখিল কত না নিন্দিল মোরে।
সে তো অভাগিনী হেন গুণমণি কেন রবে তার ঘরে?
যদি রূপ গুণ থাকিত তাহার পতি কি যৌবনকালে।
কৌপীন পরিয়া কাঙ্গাল হইয়া গৃহ ছাড়ি বনে চলে?
নিঠুর রমণী পাপিনী তাপিনী পতি দেশান্তরি করে।
নিদয় হইয়া চলিছ ফেলিয়া লোকে গালি পাড়ে মোরে।।
আমি কি তোমায় দিয়াছি বিদায় সত্য করে বল নাথ।
তোমার লাগিয়া মরিছি পুড়িয়া তাহে লোক-পরিবাদ
তুমি মোর পতি হইয়াছ মতি একা মোর সর্বনাশ।"
প্রিয়ার রোদন তারিবে ভুবন আর বলরাম দাস।।

কখন কখন "প্রভু" "প্রভু" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। তখন সখিগণ বায়ুবীজন করিতেছেন, কপোলে সজোরে জলের ছিটা মারিতেছেন, দাঁত ছাড়াইতেছেন, প্রাণ আছে না আছে পরীক্ষার লাগি নাশায় তুলা ধরিতেছেন। শুশ্রূষায় চেতন পাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া সখীর গলা ধরিয়া রোদন করিতেছেন। আবার মাঝে মাঝে ঝলকে ঝলকে আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে।

যে কথা বলিবার নিমিত্ত উপরে এত ভূমিকা করিলাম, পাছে শ্রীমতীর দুঃখে কেহ অধীর হয়েন, তাঁহার সান্ত্বনার নিমিত্ত আমার সেই কথা বলিতে হইতেছে। সে কথাটি এই যে গৌরপ্রণয়িনীর গৌর বিরহে যেমন দুঃখ, তেমনি আবার তিনি আনন্দ-ভোগও করিতেছিলেন। শ্রীভগবৎবিরহের মত দুঃখ আর নাই। শেষলীলায় প্রভু এই কৃষ্ণ-বিরহ-সাগরে ডুবিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার ন্যায় আনন্দ আর নাই। প্রকৃত কথা, কৃষ্ণ বিরহে যে দুঃখ সে বাহিরের। কারণ কৃষ্ণ বিরহ উপস্থিত হইলে অন্তর আনন্দে পুরিয়া যায়। এখন বিষ্ণুপ্রিয়ার আনন্দের কারণ বিবরিয়া বলিতেছি। মদ্যমাংসে আরাম আছে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতেও অবশ্য মিষ্টতা আছে। অন্যকে দুঃখ দিয়া আপনার সুখ সংগ্রহ করিতেও জীবকে দেখা যায়। কিন্তু হে জীব! জীবকে দুঃখ দিয়া যে সুখ, তাহা অপেক্ষা জীবের সুখের নিমিত্ত আপনি দুঃখ লইয়া যে সুখ, সে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। নির্বোধ জীব সচরাচর তাহার বিপরীত করিয়া থাকে; কিন্তু সে তাহারা জানে না বলিয়া। মনুষ্যের দেবত্ব ও পশুত্ব এই দুই ভাব আছে। সে ভাবগুলি পশুর আছে মনুষ্যেরও আছে, সেই মনুষ্যের পশুভাব। আর যাহা পশুর নাই মনুষ্যের আছে, তাহা তাহার দেবভাব। একটি কাকের ছানা তাহার নীড় হইতে পড়িয়া গেলে, অন্যান্য কাকেরা তাহাকে ঘেরিয়া ঠোক্‌রাইতে থাকে ও এইরূপে তাহাকে বধ করে। কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব এরূপ নয়। তাহারা যদি কোন অনাথশিশু দর্শন করে, তবে তাহাকে পোষণ করে। কাক পশুভাবে কাক শিশুর প্রতি নিঠুরতা করে, আর মনুষ্য দেবভাবে মনুষ্য-শিশুকে পোষণ করে। মনুষ্যের এই দেবভাবকে উদ্দীপনা করা ও পশুভাবগুলিকে উহার অধীন করাকে "সাধন" কি "যোগ" বলে, "উদ্ধার হওয়া" কি "মুক্তি" বলে। যখন কোনো দুর্বল জীব কোন সাধুর চরণে পতিত হইয়া বলে, "প্রভু, আমাকে উদ্ধার করো" তাহার অর্থ এই যে, "প্রভু আমার দেবভাবগুলি উত্তেজিত করিয়া পশুভাবগুলিকে উহার অধীন করিয়া দাও।"

কিন্তু এই পশুভাবগুলিরও প্রয়োজন, ইহা ব্যতীত দেবভাবগুলি পরিবর্ধিত হয় না। স্থানভ্রষ্ট না হইলে এই পশুভাবগুলি বড় উপকারী সামগ্রী। যথা, স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়ে দেবভাব ও পশুভাব আছে। আর এই পশুভাবে সেই দেবভাবের পরিবর্ধন ও সহায়তা করে।

দেবভাবের মধ্যে প্রধান কয়েকটি এই,—প্রেম, ভক্তি, স্নেহ ও দয়া। এই কয়েকটি ভাবে স্বার্থরূপ মলিনতা নাই। ইহাতে স্বার্থরূপ মলিনতা স্পর্শ করিলেই উহা মলিন হইয়া যায়। প্রেম কি, না—অন্যের প্রতি আকর্ষণ। ভক্তি,—অন্যের গুণে মোহিত হওয়া। দয়া,—অন্যের দুঃখে দুঃখিত হওয়া। এই কয়েকটি ভাবের উৎকর্ষে আনন্দ উপস্থিত হয় এবং যে আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহার সহিত ইন্দ্রিয়সুখের তুলনাই হয় না। প্রীতির বস্তু সৃষ্টি হইবামাত্র স্বভাবতঃ আনন্দ হয়। যেমন বিবাহবাত্রে বরকন্যার আনন্দ। অন্যের গুণ দেখিলে আনন্দ, যেমন বাজীকরের উত্তম বাজী দেখিলে আনন্দে নয়নে জল আইসে। অন্যের দুঃখে দুঃখবোধে যে আনন্দ হয়, তাহাও সকলে জানেন। এইরূপে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ ও দয়া হইতে আনন্দ উপস্থিত হয়।

পতি ও পত্নী উভয়ই উভয়ের আনন্দের সামগ্রী। যত দিবস এই আনন্দের সহিত পশুভাব মিশ্রিত থাকে, তত দিবস এই আনন্দ নির্মলতা প্রাপ্ত হয় না। যে দম্পতিপ্রেমে পশুভাবের গন্ধ আছে, সেই দম্পতিপ্রেম হইতে অখণ্ড আনন্দের উৎপত্তি হয় না। সেই দম্পতিপ্রেমে তখনই অখণ্ড আনন্দ উৎপত্তি করে, যখন উহা হইতে পশুভাব একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কাজেই পতিপ্রাণা-বিধবারও একপ্রকার আনন্দ আছে, যাহা সধবা-স্ত্রীর নাই। যেহেতু বিধবা স্ত্রীর পতির সহিত স্বার্থসম্বন্ধ রহিত হইয়া গিয়াছে। কুপ্রবৃত্তির পরিবর্ধন করিয়া জীবের একটা ভ্রম উপস্থিত হয়। তাহারা ভাবে, সুখ কেবল অসুর-ভাবেই আছে। ক্ষমতা পাইব, অন্যের উপর কর্তৃত্ব করিব, ইন্দ্রিয়সুখ প্রাণ ভরিয়া আস্বাদ করিব, তবেই সুখী হইব। কিন্তু এ সমুদয় যে পাশববৃত্তি, তাহা যিনি পবিত্র হইয়াছেন তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

এখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার ও শ্রীমান্ গৌরচন্দ্রের কি ভাব তাহা অনুভব করুন। উনিও আছেন ইনিও আছেন; তাঁহাদের প্রীতি আছে, সব আছে, কেবল পশুভাব নাই। সেখানে পরস্পরের বিরহে যে দুঃখ সে আর কতটুকু? শুধু প্রীতির বস্তু হইতেই একটি সুখ হয়, প্রাপ্তির প্রয়োজন করে না। যথা,—যখন বিবাহ হইতেছে, কি বিবাহের কথা হইতেছে, তখনি বরকন্যা সুখসাগরে ভাসিতে থাকেন। ইনি ভাবেন, আমি আমার ধন পাইলাম কি পাইতেছি; উনিও আবার তাহাই ভাবেন। এই ভাব উদয় হইলেই আনন্দ। পুত্র হইয়াছে শুনিলে আনন্দ হয়, যদিও সে পুত্র তখন তাহার চক্ষুগোচর হয় নাই।

আবার প্রিয়বস্তু যত প্রিয়ত্ব পায়েন, তিনি তত সুখের বস্তু হয়েন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট পতি প্রিয় আছেন; পূর্বে তিনি যেরূপ প্রিয় ছিলেন, এখন তাহাই আছেন, বরং তাঁহার প্রিয়ত্ব কোটি গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীনিমাইপণ্ডিত শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার পতি বলিয়া অতি প্রিয়। এখন উপপতির দুর্লভত্ব প্রাপ্ত হইয়া, তিনি আরো প্রিয় হইয়াছেন, অধিকন্তু, তাহার পরে, তাঁহার নাগর প্রতিকূল নাগরের মাধুর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। কারণ আপনারা জানিবেন, প্রিয়বস্তু যদি দুর্লভ হয়, তবে তিনি প্রিয়তর হয়েন; আবার যদি প্রতিকূল হন তবে প্রিয়তম হয়েন। তাঁহার পতি এখন তাঁহার ছায়া পর্যন্ত দর্শন করিবেন না; তাঁহার ছায়া দেখিলে পালাইবেন কি মুখ ফিরাইবেন। নাগর প্রতিকূল হইলে কখন কখন প্রীতি ভাঙ্গিয়া যায় বটে, কিন্তু তখন সে প্রীতি বদ্ধমূল হয় নাই। প্রকৃত প্রীতি হইলে, নাগর যদি প্রতিকূল হন, তবে উহা আরো বদ্ধমূল হয়; ইহা প্রীতির ধর্ম।

বিষ্ণুপ্রিয়ার তাঁহার স্বামীর সহিত পশুভাব গিয়াছে, এইমাত্র। তাঁহার পতি তাঁহার সুখের

যে প্রস্রবণ তাহা এখনও আছেন, বরং সেই প্রস্রবণ আরও বেগবান্ হইয়াছে। তাঁহার স্বামীর অদ্ভুত কার্য দেখিয়া তিনি আবার স্বামীর প্রতি ভক্তিতে গদগদ হইতেছেন। ভাবিতেছেন, "কি মানুষ! কি অদ্ভুত দয়া! জীবকে হরিনাম লওয়াইবেন বলিয়া আমাকে পর্যন্ত ফেলিয়া গেলেন? ইহা কি কেহ কখন শুনেছে, না দেখছে?" মাঝে মাঝে পতির সন্ন্যাসের রূপ তাঁহার হৃদয়ে আপনা-আপনি উদয় হইতেছে, আর "মলেম মলেম" বলিয়া বুকে হাত দিয়া মৃত্তিকায় পড়িতেছেন। তখন আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন, আর বলিতেছেন, "আমার রাগ করা অন্যায় হইতেছে। আমাকে ফেলিয়া ত তিনি সুখী হন নাই।" যথা—

"কার উপরে কর অভিমান রে পাগল প্রাণ। ধ্রু।
তোমার অঙ্গে সাটী পরা, তাঁর কৌপীন পরিধান।।
শীত গ্রীষ্ম রৌদ্রে সে যে, তুমি থাকো গৃহ মাঝে,
নিশি দিশি প্রভুর আমার বৃক্ষতলে অবস্থান।।"

আবার তখনি ভাবিতেছেন যে তিনিও একজন। এই শুভকার্য সাধনের তিনিও একটি উপকরণ। কেবল যে একটি উপকরণ তাহা নয়—তাঁহার স্বামীর সর্বপ্রধান সহায় তিনি কান্দিবেন, আর জীবও মুক্ত হইবে। এই সমুদয় ভাবে শ্রীমতীর হৃদয় যখন পুরিয়া যাইতেছে, তখন তিনি জগৎ সুখময় দেখিতেছেন, আপনাকে ধন্যা মনে করিতেছেন। আবার দুঃখে যখন নয়নজল ফেলিতেছেন, তখন আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন। উহা দ্বারা মনের দেবভাবগুলি আরো পরিবর্ধিত হইতেছে।

এদিকে শান্তিপুরে প্রভুর কার্য শ্রবণ করুন। প্রভু যেরূপ নদীয়ার বাস করিতেন, শান্তিপুরেও সেইরূপ করিতে লাগিলেন; তবে গূঢ়তম সমুদয় ভাব সম্বরণ করিলেন, রাধা কি কৃষ্ণ ভাবে আর শান্তিপুরে বিরাজ করিলেন না। ভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীভগবান মাধুর্যভাবে বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ, এবং বিশেষ কারণে কোনো কোনো স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়েন নাই।*

শান্তিপুরে প্রভু সন্ন্যাসের সমুদয় নিয়ম ত্যাগ করিলেন। সন্ন্যাসের যে দুঃখ তাহা গৃহস্থ ভক্তগণকে কি জননীকে দেখাইতে ইচ্ছা করিলেন না। পরিধান কেবল কৌপীন ও বহির্বাস—সন্ন্যাসের এই মাত্র চিহ্ন; আর শ্রীমতী নিকট নাই। নদীয়া বিহারের সহিত এইমাত্র বিভিন্নতা। প্রভু সারাদিন কৃষ্ণকথায় যাপন করিয়া সন্ধ্যা হইতে অধিক নিশা পর্যন্ত কীর্তনে মগ্ন থাকেন। শচী রন্ধন করেন, প্রভু ভোজন করেন। শচী কত যে রন্ধন করেন, তাহার সংখ্যাও করা যায় না। প্রভুও বিশ্বম্ভর হইয়া, জননীকে সম্মুখে বসাইয়া ও তাঁহাকে তৃপ্ত করিয়া ভোজন

* নানান্ প্রকারে প্রভু মাযেরে সান্ত্বায়। অদ্বৈতঘরণী সীতা শচীরে বুঝায়।।
শচীর সহিত যত নদীয়ার লোক। সুদৃষ্টি মেলিয়া প্রভু জুড়াইল শোক।।
শান্তিপুর ভরিয়া উঠিল হরিধ্বনি। অদ্বৈতের আঙ্গিনায় নাচে গৌরমণি।।
প্রেমে টলমল করে স্থির নহে চিত। নিতারে ধরিয়া কান্দে নিমাইপণ্ডিত।
অদ্বৈত পশারি বাহু ফিরে পাছে পাছে। আছাড় খাইয়া গোরা ভূমে পড়ে পাছে।।
চৌদিকে ভকতগণ বলে হরি হরি। শান্তিপুর হৈল যেন নবদ্বীপপুরী।।
প্রভু অঙ্গে কোটিচন্দ্র জিনিয়া আভাস। এ ডোর কৌপীন তাহে প্রেমের প্রকাশ।।
হেন রূপ প্রেমাবেশ দেখি শচীমায়। বাহিরে দুঃখিত কিন্তু আনন্দ হৃদয়।।
বুঝিয়া শচীর মন অবধৌত রায়। সংকীর্তন সমাপিয়া প্রভুরে বসায়।।
এইরূপে দশদিন অদ্বৈতের ঘরে। ভোজন বিলাসে প্রভু আনন্দ অন্তরে।।
বাসুদেব ঘোষ কহে চরণে ধরিয়া। অদ্বৈতের এই আশা না দিব ছাড়িয়া।।

করেন। ভোজনান্তে শ্রীনিতাই একবার ভাত ছড়াছড়ি করেন। প্রভুর ভোজন হইলে সেই পাত্র লইয়া কাড়াকাড়ি ও মারামারি হয়, সে আর এক রঙ্গ। শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ীতে প্রত্যহ মহোৎসব—প্রত্যহ সহস্র লোকের আয়োজন। সমস্ত দিবস শত শত সম্প্রদায় "হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ" প্রভৃতি গীত গাইতেছেন, আর সমুদয় শান্তিপুর ভক্তির তরঙ্গে "ডুবু ডুবু" হইতেছে। নদীয়াবাসীরা আগমন করিলে, প্রথম দিবসেই বিকালে, প্রভু অতি নিজ-জন ও অতি বিজ্ঞ ভক্তগণকে নিকটে বসাইয়া মধুর-স্বরে বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের ও জননীকে দুঃখ দিয়া ও তোমাদের অনুমতি না লইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছিলাম, কাজেই যাইতে পারিলাম না। ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, আমার বিরহে তোমরা বড়ো দুঃখ পাইয়াছ। জননীর দশা তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ, আবার আমার দশা দেখিতেছ,—লক্ষ লোকের মাঝে মাথা মুড়াইয়া পৈতা ফেলিয়া কৌপিন পরিয়াছি। যদি আবার পট্টবস্ত্র পরিয়া সমাজে প্রবেশ করি, তবে আমার ধর্ম নষ্ট হইবে, লোকেও উপহাস করিবে। আবার তোমাদের ফেলিয়া গেলে তোমরা দুঃখ পাইবে, জননীও প্রাণে মরিবেন। প্রথম যখন জননীকে দর্শন করিলাম, তখন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আপনাকে আর আপন সন্ন্যাসধর্মকে ধিক্কার দিলাম। ভাবিলাম, কৃষ্ণপ্রেমই পরম-পুরুষার্থ; তাঁহার নিমিত্ত যখন সন্ন্যাস প্রয়োজন নহে, তখন আমি এ ভীষণ আশ্রম কেন গ্রহণ করিলাম? জননীকে দর্শন মাত্র এই অনুতাপে দগ্ধ হইয়া, অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া আমি জননীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোথায়ও যাইব না। আর তিনি যেখানে যাইতে বলেন, সেইখানেই যাইব। এমন কি, আমি এরূপ দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, জননী যদি আমাকে এখন নদীয়ায় যাইতে বলেন, তাহাও আমি যাইব, কোনো বাধা মানিব না। আমি স্বয়ং যাইয়া, আমার প্রতি জননীর কি আদর্শ হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করিতাম। কিন্তু আমি যাইব না, তাহা হইলে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। আমি এই পোড়া আশ্রয় অবলম্বন করায় তিনি আমাকে এখন ভক্তি করিতে শিখিয়াছেন। আমার কাছে মনের কথা সবলভাবে বলিতে সাহস পাইবেন না। অতএব আপনারা তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে আমার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিউন। তাঁহাকে বলিবেন যে, পূর্বেও আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এখনও করিতেছি যে, আমি তাঁহার আজ্ঞাধীন। তিনি আমাকে যাহা করিতে বলিবেন, আমি তাহাই করিব; এমন কি যদি সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করিতে বলেন, তাহাও করিব।"

এই অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া ভক্তগণ স্তম্ভিত হইলেন। প্রভু কি বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে তাঁহাদের অনেক সময় লাগিল। প্রভু যখন জননীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেন, তখন তাঁহারা সেখানে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তখন ভাবিয়াছিলেন যে, প্রভু কেবল জননীকে প্রবোধ দিতেছেন, মনোগত কিছু বলিতেছেন না। এখন এরূপ স্পষ্টাক্ষরে আপনাকে জননীর আজ্ঞাস্রোতে ফেলিয়া দিতেছেন দেখিয়া ভক্তগণের বিস্ময় হইল। ভাবিতেছেন, প্রভুর একি লীলা? প্রভু তো স্বেচ্ছাময়; ত্রিভুবন একদিকে, আর তিনি একদিকে। অদ্য ষষ্ঠ দিবস মাত্র সন্ন্যাস করিয়াছেন। আজ বলিতেছেন, "মা যদি বলেন, তবে গৃহে ফিরিয়া যাইব," এ কথার অর্থ কি? মা আর কি বলিবেন? মা বলিবেন, "বাড়ী চল, লোকে হাসে হাসিবে, ভক্তগণ ত হাসিবে না? আর হাসিবেই বা কেন?" মা ইহা ছাড়া আর কি বলিবেন? আমরা পুরুষ কঠিন, কিছু জ্ঞানও আছে। আমরাই বা কে, প্রভুই বা কে? আমরা কি বলিব? আমরা সকলেই বলিব, প্রভু বাড়ী চল। সেখানে শচী স্ত্রীলোক, বৃদ্ধা, এক পুত্রের মাতা, নিমাইয়ের জননী, তিনি আর কি বলিবেন? তবে কি সত্যই প্রভু আবার নদীয়ায় যাইবেন? সত্যই আবার নবদ্বীপচন্দ্র নবদ্বীপ আলো করিবে? আবার কি আমরা নদীয়ার সুখের পাথারে সাঁতার দিব, আর রাসলীলায় নৃত্য করিব। এই আনন্দে ডগমগ হইয়া ভক্তগণ শচীকে যাইয়া

ঘিরিয়া ফেলিলেন।

নিতাই আগেই বলিতেছেন, "মা! বড়ো শুভ সংবাদ, এখন তুমি বলিলেই হয়। "প্রভু বলিতেছেন, তুমি বলিলেই, তিনি গৃহে গমন করেন। শ্রীঅদ্বৈত তখন নিত্যানন্দকে শান্ত করিয়া শচীকে বলিতেছেন, "ঠাকুরাণি! প্রভু তোমার দুঃখ দেখিয়া বড় সন্তপ্ত হয়েন, হইয়া তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে, তুমি যাহা বলিবে তিনি তাহাই করিবেন। সে প্রতিজ্ঞা এখন তিনি পালন করিবেন। এমন কি, এখন যদি তুমি বল, তবে শ্রীনবদ্বীপে যাইয়া পুনরায় সংসার করিতেও তিনি প্রস্তুত আছেন। সেই নিমিত্ত তাঁহার প্রতি আপনার কি আদেশ, তাহাই শুনিবার নিমিত্ত আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি আপনি আসিতেছেন, তবে তাঁহার সম্মুখে আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া কথা বলিতে পারিবেন না, এই ভাবিয়া আমাদিগবে পাঠাইয়াছেন।"

যখন শ্রীঅদ্বৈত এই কথা বলিতেছেন, তখন ভক্তগণ অতি আগ্রহ সহকারে শচীর—শ্রীঅদ্বৈতের নয়—মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন। শচী সমুদয় কথা শুনিলেন ও বুঝিলেন। বুঝিয়া কিছুমাত্র চাঞ্চল্য দেখাইলেন না, তবে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া মস্তক অবনত করিলেন। শচীর এই ভাব দেখিয়া সকলে অবাক হইলেন। তাহাদের বিলম্ব সহিতেছে না; তাঁহারা বলিলেন, "মা! ভাবিতেছ কি? বলে ফেল যে নদে চল—আর কি?"

শচী ভক্তগণের কথায় উত্তর করিলেন না তবে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, আর প্রতি অক্ষর ভক্তগণ শুনিতে লাগিলেন। শচী বলিতেছেন, "আমার সাধ কি তাহা আমার কাছে তাঁহার জানিতে পাঠান নিষ্প্রয়োজন। তিনি পথে পথে বেড়াইবেন, বৃক্ষতলে শুইবেন ইহা আমার সাধ হইতেই পারে না। তাঁহাকে যদি বাড়ী লইয়া যাই, তবে আমার, বিষ্ণুপ্রিয়ার ও তোমাদের দুঃখ মোচন হইবে; কিন্তু তাঁহার ধর্মনষ্ট হইবে, লোকে তাঁহাকে উপহাস করিবে। আমি মা হইয়া এরূপ কার্য কিরূপ করিব? আমি মরিব সেও ভাল, তবু যাহাতে নিমাইয়ের ধর্মনষ্ট হয়, এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিব না।"

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, যখন নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়াছিলেন, তখন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র শ্রীভগবানের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "হে সর্বজীবের নাথ! আমার শিশুসন্তান সন্ন্যাস করিয়াছে, যেন তাহার ধর্ম নষ্ট না হয়", অর্থাৎ সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া যেন সে বাটী ফিরিয়া না আইসে। আবার এখন শচী নিমাইকে করতলে পাইয়া ভাবিতেছেন, নিমাইকে বাড়ী নিয়া গেলে তাঁহার ধর্ম নষ্ট হইবে। তাহার পরে শচীদেবী বলিতেছেন, "যখন তিনি সন্ন্যাস করিয়াছেন, তখন আর উপায় নাই। তিনি কৃপা করিয়া আমার নিকট অনুমতি চাহিতে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তিনি জানেন যে, আমা হইতে তাঁহার ধর্ম নষ্ট হইবে না, এবং তাহা জানিয়াই আমার উপর নির্ভর করিয়াছেন। আমিও আমার যাহা উচিত তাহাই করিব। আমি ভাবিতেছি যে, তিনি নীলাচলে বাস করুন। তোমরা সেখানে যাইবে, তাহাতে তাঁহার সংবাদ পাইব। আর তিনি যদি গঙ্গাস্নান করিতে আইসেন, তবে তাঁহার দর্শন পাইব।" এই কথা বলিতেছেন, আর শচীর মুখ ক্রমেই দেবীভাব ধারণ করিতেছে, এবং চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল বোধ হইতেছে।

ভক্তগণ এই কথা শুনিয়া চকিত, ও কেহবা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা শচী ও প্রভুকে অগ্রে করিয়া কীর্তন করিতে করিতে নবদ্বীপে যাইবেন, এই আনন্দে মত্ত হইয়া রহিয়াছেন; এখন শচীর মুখে এই কথা শুনিয়া, তাঁহাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ভক্তগণের অবস্থা একবার ভাবুন। তাঁহারা শ্রীনিমাইকে শ্রীভগবান্ বলিয়া জানিয়াছেন ও তাঁহাকে প্রকৃতই মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রীতির ভজন করিয়া একেবারে বালস্বভাব পাইয়াছেন। তাঁহারা জগতের মধ্যে কেবল এক ঠাকুরাণীকে ভজনা করেন। তিনি

কে, না—ভালবাসা। যদি তাঁহারা দেখেন যে, পক্ষী তাহার শাবককে আহার দিতেছে, তবে তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রেমের উদয় হয়, ও নয়নে জল আইসে। যদি দেখেন, কপোত-কপোতী মুখে মুখ দিয়া পরস্পরে প্রণয়সুখ অনুভব করিতেছে, তবে তাঁহাদের আনন্দাশ্রু পতিত হয়। তাঁহাদের নিকট নিয়ম-বিধি ভাল লাগিবে কেন? তাঁহাদের ইচ্ছা যে, প্রভু সুন্দর-নাগর হইয়া বসিয়া থাকুন আর তাঁহারা কেবল মালা গাঁথিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিউন। এই তাঁহাদের ভজন সাধন ও চরম আশা।

ভক্তগণ শচীর বাক্য শুনিয়া হাহাকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ঠাকুরাণি! কর কি? তুমি বিদায় করিলে তিনি থাকিবেন কেন? তোমার বাক্য তাঁহার নিকট চিরদিন বেদবাক্যের ন্যায়। তবে তো তোমার কথায় আমরা প্রভুকে হারাইলাম। যথা চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে*—

ফল কথা, ভক্তগণ প্রভুর সহিত সেখানে একটু বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন। তাঁহাদের শচীদেবীকে কোনো পরামর্শ দেওয়ার অধিকার ছিল না। পাছে স্বয়ং গমন করিলে শচীর মন কোনো প্রকারে বিচলিত হয়, এই নিমিত্ত তিনি ভক্তগণকে পাঠাইলেন, আপনি গমন করিলেন না। ভক্তগণের উপর এইমাত্র ভার ছিল যে, তাঁহারা শচীর নিকট সমুদয় অবস্থা সরলভাবে বলিবেন, বলিয়া তাঁহার সরল অভিপ্রায় কি তাহা জানিয়া আসিবেন। তাঁহারা একটু অধিক করিলেন, অর্থাৎ শচীর পরামর্শ যাহাতে তাঁহাদের মনোমত হয় তাহারি চেষ্টা করিলেন।

শচী সেই দুঃখের মাঝে একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমার নিমাই যখন ত্রিলোক সাক্ষী করিয়া সংসার ত্যাগ করিল, তখন আমি সেখানে থাকিলে তাহাকে নিবাবণ করিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এখন, আমি বলিব যে, "নিমাই! তুমি আমার সুখের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ ও ধর্ম-নষ্ট কর, ইহা আমার দ্বারা হইবে না। নবদ্বীপের নিকট কোনো স্থানেও তিনি থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে আমি, বৌমা ও তোমরা, তাঁহাকে বিরক্ত করিব, আর কু-লোকে নানা কথা বলিবে; আমি নিমাইকে লইয়া পরচর্চা করিতে দিব না।" তখন সকলে বুঝিলেন শচীর সংকল্প অতি দৃঢ়। ইহাতে অনেকে মর্মাহত হইলেন, কিন্তু সকলেই তাঁহার কার্য স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। পাঠক শচীর স্থানে আপনাকে রাখিয়া তাঁহার এই কার্যের বিচার করিবেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, এরূপ জননী না হইলে, তাঁহার গর্ভে কেন শ্রীভগবান্ জন্মগ্রহণ করিবেন? শচী নিমাইকে নীলাচলে থাকিতে অনুমতি দিয়া, স্থির থাকিতে পারিলেন না,—"হা নিমাই" বলিয়া ধূলায় পড়িয়া গেলেন। একবার রঙ্গ দেখুন। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছেন। শ্রীপ্রভু সেইরূপ রাধাভাবে বিভোর হইয়া যোগিনীবেশে তাঁহাকে মথুরায় তল্লাস করিতে গৃহের বাহির হইলেন। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবামাত্র তাঁহার রাধাভাব গেল। তখন দীনের দীন ভক্তরূপে মুকুন্দ-ভজনের জন্য বৃন্দাবনে চলিলেন। আবার বৃন্দাবন গেল, মথুরা গেল, এখন নীলাচলে চলিলেন। কিন্তু প্রভুর তখন বৃন্দাবনে যাইবার সুবিধা হয় নাই। কারণ মুসলমানের অত্যাচারে সেখানকার ভদ্রলোকগণ অন্যত্র গিয়াছন। কেবল দরিদ্র ও মূর্খ লোক সেখানে আছে। তাই ওই স্থান তাঁহার বাসোপযোগী করিবার নিমিত্ত, লোকনাথ ও ভূগর্ভকে সেখানে পাঠাইয়াছেন।

ভক্তগণ প্রভুকে শচীর আজ্ঞা জানাইলেন। প্রভু অমনি ভক্তিতে গদগদ হইয়া, "যে আজ্ঞা" বলিয়া উঠিলেন; শেষে বলিতেছেন, "জননীর আজ্ঞাই শিরোধার্য। আমারও নীলচল-চন্দ্রকে দর্শন করিবার বড়ো ইচ্ছা ছিল, সে বাসনা পূর্ণ হইল।" প্রকৃতই তখন নীলাচল

* শচীর বচন শুনি সর্ব ভক্তগণ। বিবশ হইয়া রহে করিয়া রোদন।।
হেন বাক্য কেন মাতা কহিলে আপনে। শ্রুতিবাক্য সম ইহা খণ্ডে কোন জনে।।
নীলাচলে যাইতে আপনে আজ্ঞা দিলে। দুর্লঙ্ঘ তোমার বাক্য কেন বা কহিলে।।

ব্যতীত প্রভুর থাকিবার উপযুক্ত স্থান আর ছিল না। ভারতবর্ষে তখন প্রধান তীর্থস্থান ছিল,—পাণ্ডুপুর, বারাণসী ও নীলাচল। বৃন্দাবন তখন অরণ্যময়। পাণ্ডুপুর অতি দক্ষিণে, বাংলা হইতে বহু দূরে। কাশী যাওয়ার পথও অরাজকতায় একরূপ বন্ধ ছিল। লোকনাথ ও ভূগর্ভ পূর্ণিয়া দিয়া বৃন্দাবনে যান। প্রভু বারাণসীতে থাকিলে বাংলার গৃহস্থ-ভক্তগণের সেখানে যাওয়া প্রায়ই ঘটিত না। একমাত্র নীলাচল তখন সমৃদ্ধশালী, বাংলার নিকট, অথচ হিন্দুদেশ। কটকের রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্য তখন বাংলার মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা পর্যন্ত ছিল। উহা অতিক্রম করিয়া মুসলমানদের যাইবার অধিকার ছিল না। এই নীলাচলে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে যাত্রীগণ যাইতেন। কাজেই ইহাই প্রভুর বাসোপযোগী স্থান। যাত্রীগণ জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইয়া পাইতেন ও উদ্ধার হইতেন। সুতরাং সাব্যস্ত হইল, প্রভু নীলাচলে থাকিবেন। প্রভু যাইবেন ভাবিয়া ভক্তগণ অতিশয় কাতর হইলেন, তবে মনস্থির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শচীদেবীর মনের কি ভাব তাহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা আমরা করিব না! সন্ধ্যার পরেই কীর্তন আরম্ভ হইল, অমনি মৃদঙ্গ ও করতাল বাজিয়া উঠিল। ভক্তগণ বিমর্ষ, কিন্তু প্রফুল্ল-বদনে নৃত্যস্থলে প্রবেশ করিলেন। প্রভুর এই কীর্তন অন্যরূপ। দুই বাহু তুলিয়া, মধুর ভঙ্গি করিয়া "হরিবোল" বলিয়া মৃদঙ্গ ও করতালের তালে-তালে, পায়ে নূপুর দিয়া নৃত্য। গীত গাইয়া আলাপ করিয়া, রঙ্গের মৃদঙ্গ বাজাইয়া, আসর জমকাইবার অবকাশ প্রভুর হইত না। তবে প্রভু যখন বসিয়া কি অন্তরালে থাকিতেন, তখন মুকুন্দ, বাসু, শ্রীবাস, রামানন্দ প্রভৃতি গান গাইতেন। যেমন সূর্যোদয়ে অন্ধকার যায়, সেইরূপ প্রভু আসিবামাত্র তাঁহাকে হারাইবেন বলিয়া ভক্তদিগের যে উদ্বেগ তাহা থাকিত না। ক্রমে সকলে নৃত্যে যোগদান করিতেন। প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইয়া, তাঁহার মুখপদ্মে আঁখি রাখিয়া, বক্র হইয়া, থুতনিতে হস্ত দিয়া, ভ্রুকুটি করিয়া নৃত্য অদ্বৈতের ভঙ্গী। আর জোরে-জোরে লম্ফ দেওয়া নিত্যানন্দের নৃত্য। তবে নিত্যানন্দ নৃত্যে প্রায় যোগদান করিতে পারিতেন না। প্রভু পাছে পড়িয়া যান বলিয়া, দুই বাহু প্রসারিয়া তিনি প্রভুর পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিতেন। তাঁহার সহকারী ছিলেন—গদাধর ও নরহরি।

শচী পিঁড়ায় বসিয়া; কাছে সীতাদেবী প্রভৃতি। শচী যে কীর্তন দেখিতেছেন কি শুনিতেছেন তাহা নয়। নিমাই ঘুমান নাই, তিনি কিরূপে শুইবেন? আর মনের ভাব যে, তিনি কাছে থাকিলে নিমাইয়ের ভালরূপ রক্ষণাবেক্ষণ হইবে। তাই নিমাই নাচিতে নাচিতে পড়িবার মতো হইলেই শচী উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "নিতাই ধর ধর,নিমাই পড়িয়া গেল।" নিতাই অবশ্য প্রাণপণে নিমাইকে রক্ষা করিতেছেন; তবু মায়ের প্রাণ, তাই শচী সর্বদা নিতাইকে সাবধান করিতেছেন। শচী সেখানে বসিয়া আপনাকে একাকিনী ভাবিতেছেন, কারণ কাছে বিষ্ণুপ্রিয়া নাই। মাঝে মাঝে সেই কথা মনে হওয়ায় শিহরিয়া উঠিতেছেন, আবার নিমাইকে পড়ো-পড়ো দেখিয়া উহা ভুলিয়া যাইতেছেন। শচী যে ঠিক একা আছেন, তাহা নয়। কারণ মুরারি পিঁড়ার নীচে, তাহার কাছে দাঁড়াইয়া। মুরারিও শচীর প্রায় পুত্রের ন্যায় নিজ-জন। মুরারি নৃত্যে যাইতেছিলেন, এমন সময় শচীর প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তাঁহার কীর্তনানন্দের উদ্দাম অন্তর্হিত হইল। অমনি শচীর কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহার অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ একবার সামলাইতে না পারায় প্রভুর সুদীর্ঘ দেহ ছিন্নমূল তরুর ন্যায় মৃত্তিকায় পড়িয়া গেল। প্রভু যেরূপ ভাবে পড়িলেন, তাহাতে বোধ হইল যেন তাঁহার সমুদয় অস্থি চূর্ণ হইল। ভক্তগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন, আর শচী "নিতাই ধর ধর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন, নিতাই ঠেকাইতে পারিলেন না তখন পুত্রের পতন দেখিবেন না বলিয়া নয়ন মুদিলেন, আর পতনশব্দ শুনিবেন না বলিয়া কানে অঙ্গুলি দিলেন। এইরূপে চোখ ও কান বুজিয়া গোবিন্দনাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু

বেশীক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিতে পারিলেন না। নিমাই চৈতন্য পাইলেন কি না দেখিবার নিমিত্ত নয়ন অর্ধ-উন্মীলিত করিলেন। যদি দেখিলেন, নিমাই চেতন পান নাই, তবে আবার নয়ন মুদিয়া গোবিন্দের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিমাই চেতন পাইলে, শচী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "বাঁচলাম ঠাকুর!" কিন্তু নিমাই আবার পড়িলেন! তখন শচী একবার উঠিতেছেন, একবার বসিতেছেন। শেষে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে তোরা কীর্তনে ক্ষান্ত দে। রাত্রি অধিক হয়েছে। কিন্তু সেই আনন্দসূচক হরিবোল-ধ্বনি মধ্যে কে তাঁহার কথা শুনে? একটু পরে আবার বলিতেছেন, "তোরা নিমাইকে ছেড়ে দে; আহা! বাছার আমার আছাড়ে আছাড়ে হাড়-গোড় ভেঙ্গে গেল।" আবার একটু পরে বলিতেছেন, "লোকের রীতি দেখেছ? বাছা আমার সন্ন্যাস করেছে বলে কি শরীরে ব্যথা লাগে না?" তবু কেহ শুনিতে পাইল না। তখন নিতাই, নরহরি, শ্রীবাস প্রভৃতির নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কেহই শুনিতে পাইলেন না। শেষে যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছেন, তাহাকেই ডাকিয়া বলিতেছেন, "ওগো! একবার অদ্বৈত আচার্যকে ডাকিয়া দাও ত?" শচীর এই সব ভাব-তরঙ্গ মুরারি দেখিতেছেন, আর মনে মনে বিচার করিতেছেন। কখন বা প্রভুর উপর তাঁহার রাগ হইতেছে, আর বলিতেছেন, "প্রভু, একবার মায়ের দশা দেখে যাও।" মুরারি, শচীর দশা দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে সেই অবস্থাটি বর্ণনা করিয়া, এই পদটি বান্ধিলেন—

"ধর ধর ধর রে নিতাই, আমার গৌরে ধর। ধ্রু।

আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়া বারেক করুণা কর।।

আচার্য গোসাঞিও, দেখিহ নিতাই, আমার আঁখির তারা।
না জানি কি ক্ষণে, নাচিতে কীর্তনে, পরাণে হইবে হারা।।
শুনহে শ্রীবাস, করেছে সন্ন্যাস, ভূমিতলে গড়ি যায়।
সোনার বরণ, ননীর পুতুল, ব্যথা না লাগয়ে গায়।।
শুন ভক্তগণ, রাখহ কীর্তন, অধিক হইল নিশা।
কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি, দেখ হে মায়ের দশা।।"

আচ্ছা ঠাকুরাণি! আজ নিমাই তোমার কাছে আছেন, ইহার উহার খোসামোদ করে তাঁহাকে প্রাণে বাঁচাইতেছ। দুই-চারি দিন পরে তিনি কোথা থাকিবেন? তখন তিনি পড়িয়া গেলে কে ধরিবে? কিন্তু শচীর তাহা মনে উদয়ই হয় নাই। এই যে জীবে গাঢ় আকর্ষণ, ইহার ন্যায় মনুষ্যের শ্রেয়ঃ আর নাই। অতএব এই আকর্ষণ জীবের সেব্য বস্তু। যিনি ইহাকে অবহেলা করেন, তিনি ঈশ্বরদত্ত যে প্রকৃতি তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনাকে একটি দৈত্য সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন! এই যে জীবে জীবে আকর্ষণ, ইহা লক্ষ করিয়া লোকে বলে "সম্বন্ধ জীবনাবধি।" তাহা হইলে জীবনের পরেও প্রিয়বস্তুর জন্য প্রাণ কান্দে কেন? শ্রীভগবানের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে সম্বন্ধ জীবনাবধি হইলে জীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়বস্তুর স্মৃতিও চলিয়া যাইত। প্রিয়বস্তুর সহিত এরূপ চির-সম্বন্ধ যে, আপনার "আমিত্ব" না ভুলিলে তাহাকে বিস্মৃত হওয়া যায় না।

তুমি কে? ইহা ঠাহরিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, তুমি কর্দমপিণ্ডের মতো হইয়া জন্মাইয়াছিলে। পরে এ জগতে আসিয়া তোমার মা কে, বাবা কে, ভ্রাতা কে, সন্তান কে, প্রিয়জন কে, তাহা শিক্ষা দিয়া তোমাকে অন্যান্য জীব হইতে পৃথক করিয়াছে। তুমি আপনাকে ধ্বংস না করিলে এ সমুদয় শিক্ষার ফল ভুলিতে পারিবে না। তোমার অবশ্য এক জন প্রিয়বস্তু আছে, আর অবশ্য তুমি বিয়োগ দুঃখ ভোগ করিয়াছ। কিন্তু দেখিবে যে, যদিও তোমার প্রিয়বস্তু আর এ জগতে নাই, তবুও সে ছবির মতো তোমার হৃদয়-মন্দিরের প্রাচীরে ঝুলিতেছে। যদি তাহাকে ভুলিতে পারিতে, তবে তাহার সহিত পুনর্মিলন না হইতেও

পারিত। কিন্তু যখন সেই অতিশয় স্নেহশীল শ্রীভগবান্ তোমার প্রিয়জনকে ভুলিতে দিতেছেন না, তখন বুঝিতে হইবে যে, সে বস্তু তিনি তোমার নিমিত্ত রাখিয়াছেন। তুমি যখন চিরদিনেও এ সমুদয় সম্বন্ধে ভুলিতে পার না, তখন কি তুমি ভাবিতে পার যে, শ্রীভগবান্ চিরদিনের নিমিত্ত তোমাকে এই বিয়োগ-জনিত দুঃখ দিবেন? তুমি কি এরূপ নিষ্ঠুর হইতে পার? যদি তোমার শক্তি থাকিত, তবে কি শোকাকুল জননীর কোল হইতে তাহার পুত্রকে চিরদিন পৃথক রাখিতে পারিতে? তুমি যে কার্য নিষ্ঠুর ভাব, তিনি তাহা করিতে পারিবেন কেন? নিমাই দুই দিন পরে কোথা যাইবেন ঠিক নাই। শচী তাহা ভুলিয়া পুত্র ধূলায় না পড়েন, ইহার নিমিত্ত ব্যস্ত হইতেছেন। মৃতপুত্র গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার মস্তকে ছত্র ধরা হইয়াছে,—পাছে তাহার মুখে রৌদ্র লাগে! এই যে জীবে জীবে সম্বন্ধ, ইহাই জীবের উপাস্য দেবতা, ইহারই অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীমতী রাধা, আর ইঁহার সেবা দ্বারাই শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে, অর্থাৎ মাধুর্যময় শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়।

প্রভাতে ভক্তগণ সাব্যস্ত করিলেন যে, তাঁহারা প্রভুকে এক এক দিন "ভিক্ষা" দিবেন। প্রভু এখন সন্ন্যাসী। প্রভুকে আর কেহ "ভোজন" করাইবেন, কি "নিমন্ত্রণ" করিবেন, একথা বলিবার যো নাই। প্রভুকে এখন "ভিক্ষা" দেওয়া যায়, আর প্রভুও "ভিক্ষা" ব্যতীত আর কিছু গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি, প্রভু শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী, সন্ন্যাসের নিয়ম পালন করিতেছেন না। অর্থাৎ জননীকে সন্ন্যাসের যে দুঃখ তাহা কিছু দেখিতে দিবেন না, এই তাঁহার সংকল্প। ভক্তগণ প্রভুকে ভিক্ষা দিবেন একথা যখন প্রকাশ হইল, তখন শচী শুনিয়া বড়ো কাতর হইলেন। তিনি শ্রীবাস প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা নিমাইকে নিমন্ত্রণ করিবে আমি ইহাতে বাধা দিতে পারি না। কিন্তু আমার ইচ্ছা, নিমাই আর যে কয়েক দিন এখানে থাকেন, আমি আমার সাধ পুরিয়া তাঁহাকে খাওয়াই। তোমরা আবার তাঁহার দর্শন পাইতে পারিবে, আমার কিন্তু এই শেষ দেখা। তোমাদের অনুমতি পাইলে আমি জনমের মত নিমাইয়ের একবার সেবা করিয়া লই।"

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ তখনি সম্মত হইলেন। নিশিযোগে কীর্তন, দিবাভাগে সুরধুনীতে স্নান, শচীর হস্তে অন্ন ভোজন, সারাদিন কৃষ্ণ-কথা, এইরূপে পাঁচ দিন কাটিল। প্রভু কবে কী করিবেন, তাহা কেহ কিছু জানেন না। ষষ্ঠ দিন প্রভাতে প্রভু প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমি নীলাচলে চলিলাম।" সকলে বলিয়া উঠিলেন,—"সেকি!" প্রভু নীলাচলে চলিলেন, এ কথা মুখে মুখে দাবানলের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িল। এই কথা শুনিয়া যে যেখানে ছিলেন দৌড়িয়া আসিয়া প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। শচী এলোথেলো বেশে, যত দূর পারেন দৌড়িয়া আসিয়া সেখানে বসিয়া পড়িলেন।

নিমাইচন্দ্রের ভাব, যেন তখন সমুদয় ভুলিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহাকে ঘিরিয়া না ফেলিলে, অমনি অমনিই চলিয়া যাইতেন। কিন্তু শচী এবং ভক্তগণ যখন তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন, তখন প্রভুর সে ভাব গেল। তিনি যাইবেন বলিয়া সকলকে প্রবোধবাক্য বলিতে আরম্ভ করিলে, প্রথমেই শ্রীহরিদাস চরণতলে পড়িয়া অতি কাতরস্বরে বলিলেন, "প্রভু! আমাকে কার কাছে রেখে যাও? আমি তো নীলাচলে যাইতে পারিব না। হরিদাসের ন্যায় গম্ভীর ও বিজ্ঞ ভক্তের দশা দেখিয়া সকলে তাঁহার প্রতি চাহিলেন। হরিদাস স্বভাবতঃ দীনের দীন, তাহার উপর তিনি দৈন্য করিতে থাকিলে দয়াময় প্রভু বড়ো ক্লেশ পাইতেন। প্রভু কঠিন হইয়া বিদায় লইতেছিলেন, কিন্তু হরিদাসের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার চোখে জল আসিল; তিনি বলিলেন, "হরিদাস! তোমার কাতরোক্তিতে আমার বুক বিদীর্ণ হয়।" তখন হিন্দু মুসলমান ঘোর বিবাদ চলিতেছে। উড়িষ্যা হিন্দুরাজ্য, সেখানে মুসলমান গেলে বধ্য হইত। ফকির হইলেও রাজদূত সন্দেহে নিস্তার পাইত না। হরিদাস এখন পরম ভাগবত

হইলেও পূর্বে মুসলমান ছিলেন। কাজেই তাঁহার নীলাচলে যাইবার অধিকার ছিল না। প্রভু বলিলেন, "হরিদাস! আমি শ্রীজগন্নাথদেবকে নিবেদন করিয়া তোমাকে সেখানে লইয়া যাইব।"

ভক্তগণ দেখেন যে, প্রভু চলিলেন, তখন তাঁহাকে রাখে কাহার সাধ্য? তবু তাঁহারা বিবাদের কথা উঠাইয়া বলিলেন, "উড়িষ্যায় যাইবার পথ একেবারে বন্ধ। পথ পরিষ্কার হইলে যাইবেন।" প্রভু উপহাস করিয়া বলিলেন, "নীলাচলচন্দ্রকে দর্শন করিতে যাইতেছি, আমাকে কে রোধ করিবে।" তখন শ্রীঅদ্বৈত করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু! আর কয়টা দিন থাকিয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" শ্রীঅদ্বৈতের কথা প্রভু পারতপক্ষে উপেক্ষা করিতেন না। প্রভু বলিলেন, "তাই হবে।" অমনি সকলে আনন্দে বিহ্বল হইলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া এক ব্রাহ্মণ-তনয় প্রভুকে দেখিতেছিলেন। কিন্তু প্রভুর গাত্র কন্থাদ্বারা আবৃত থাকায় ব্রাহ্মণ-তনয় প্রভুর সর্বাঙ্গ দেখিতে পাইতেছেন না। মুখখানি দেখিতেছেন চন্দ্রের ন্যায়। ভাবিতেছেন, মুখ এত মিষ্ট, অঙ্গ না জানি কেমন! প্রভুর শ্রীঅঙ্গ দেখিবার ব্যাকুলতা ক্রমে তাঁহার এত বাড়িল যে, শেষে জ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহার কাঁথাখানি হঠাৎ বলপূর্বক কাড়িয়া লইলেন। মুরারি বলিতেছেন,—কান্থাখানি অপসৃত হইলে বোধ হইল যেন মেঘাবৃত চন্দ্র প্রকাশিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তখন প্রভুর শ্রীঅঙ্গের রূপ দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি সুন্দর! কি সুন্দর!" ব্রাহ্মণের কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ প্রথমে চমকিত হইলেন, কিন্তু পরে তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া ও তাঁহার দশা দেখিয়া সকলে আনন্দে নিমগ্ন হইলেন,—প্রভু একটু লজ্জা পাইলেন।

শ্রীভগবান্ জীবকে রূপ আস্বাদন করিবার যে শক্তি দিয়াছেন তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব তিনিই জানেন। এই 'রূপ' দুই ভাগে বিভাগ করিয়া পুরুষের নিকট স্ত্রীলোক, ও স্ত্রীলোকের নিকট পুরুষ মনোহর করিয়াছেন। শ্রীভগবানের অচিন্তনীয় শক্তির কথা একবার মনে করুন। সুন্দরী স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়া পুরুষ মোহিত হইবে। কিন্তু তাহাকে কোনো স্ত্রীলোকের সম্মুখে ধরিলে তাহার যে রূপ আছে, সে তাহা বুঝিতেই পারিবে না। সেইরূপ কোনো পুরুষের রূপ দেখিয়া স্ত্রীলোকের নয়নে জল আসিবে, কিন্তু অন্য পুরুষ তাঁহার রূপের মাধুর্য বুঝিতেই পারিবে না।

জীবের এই প্রকার প্রকৃতি জানিয়া তিনি স্বয়ং মনোহর 'রূপ' ধরিয়া থাকেন। শ্রীমতী বলিতেছেন, বন্ধু—

"এনা ছাঁদে কেনা বান্ধে চূড়। চূড়ায় মজালে জাতি কুল।।ধ্রু।।
কার না আছে ও দুটি নয়ন। তোমার অরুণ করুণ আঁখি আন।।

শ্রীমতী বলিতেছেন, "বন্ধু, তুমি যে ছাঁদে চূড়া বাঁধিয়াছ ওরূপ ছাঁদে অনেকেই বাঁধে, তবে তোমার চূড়া অন্য রূপ হয় কেন? আবার তোমার যেমন দুটি চোখ, ওইরূপ তো অনেকেরই আছে, তবে তোমার চোখে এরূপ প্রাণ কাড়িয়া লয় কেন?" ইহার উত্তর এই—তিনি রূপের সূক্ষ্মতত্ত্ব জানেন। শ্রীভগবানের রসজ্ঞান আছে, তাই তাঁহার নাম রসিকশেখর। তুমি ভাবিতে পার যে, যদি শ্রীভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ কি শ্রীগৌর রূপ ধরিয়া তোমার সম্মুখে আসেন, হয়ত তুমি সুখ পাইবে না। কিন্তু সে ভয় তোমার নাই। যদি তিনি আসেন, তবে সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াই আসিবেন, আর তখন তুমি এই প্রার্থনা করিবে, "হে নাথ! হে সুন্দর! হে নয়নানন্দ! হে বঁধু! আমাকে এক লক্ষ চক্ষু দাও। তোমার রূপ আমার এ দুটি আঁখিতে ধরিতেছে না।" বিজয় আখরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের একখানি হস্ত দেখিয়া সাত দিবস উন্মাদ ছিলেন। শ্রীবাসের মুসলমান দর্জিও শ্রীগৌরাঙ্গের গুহ্যরূপ চকিতের মত দেখিয়া, "দেখেছি", "দেখেছি", বলিয়া পাগল হন। এইরূপ রসাস্বাদনই জীবের চরম গতি। জীব পিতা মাতা

স্ত্রী পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগ্নী আত্মীয়স্বজন স্বদেশবাসী লইয়া যে রস শিক্ষা করে, তৎদ্বারা সাধনাকে শ্রীভগবানের মধুর ভজন বলে।

শ্রীনিমাই অদ্বৈতের অনুরোধে আর কয়েক দিন থাকিলেন। এইরূপ শ্রীঅদ্বৈত দশ দিবস মহোৎসব করিলেন।* তখন—

"সন্ন্যাস করিলা প্রভু কারও নাহি মনে। আনন্দে গৌয়ায় দিবা রাত্রি সংকীর্তনে।।"

পর দিবস প্রভাতে শ্রীনিমাই বলিলেন, তিনি তখনই যাইবেন। ইহা শুনিয়া সকলে আসিয়া প্রভুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন, শচীও আসিলেন। প্রভু মাঝখানে বসিয়া, শচী অগ্রে, ভক্তগণ চারিপার্শ্বে। প্রভু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তোমরা আমার বান্ধব, আমাকে অহৈতুকী প্রীতি করিয়া থাক। সে ঋণ শোধ করিব এমন আমার কিছুই নাই। তোমরা গৃহে যাইয়া দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করো। আমি নীলাচলে চলিলাম; দেখি, যদি নীলাচলচন্দ্র আমাকে দয়া করেন।" নীলাচলচন্দ্রের স্মরণ মাত্র, প্রভুর নয়ন জলে ভরিয়া আসিল, কিন্তু অতি কষ্টে ধৈর্য ধরিয়া প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ও "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া চলিলেন। শচী উঠিয়া পুত্রের গলা ধরিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। প্রভু যাইবার পূর্বে কী করিলেন, তাহা বাসু ঘোষের বর্ণনায় দেখুন—

শ্রীপ্রভু করুণ স্বরে, ভকত প্রবোধ করে, কহে কথা কান্দিতে কান্দিতে।
দুটি হাত যোড় করি, নিবেদয়ে গৌরহরি, সবে দয়া না ছাড়িহ চিতে।।
ছাড়ি নবদ্বীপ বাস, পরিনু অরুণ বাস, শচী বিষ্ণুপ্রিয়ারে ছাড়িয়া।
মনে মোর এই আশ, করি নীলাচল বাস, তোমা সবা অনুমতি লয়ে।।
নীলাচল নদীয়াতে, লোক করে যাতায়াতে, তাহাতে পাইবে তত্ত্ব মোর।
এত বলি গৌরহরি, নমো নারায়ণ করি, অদ্বৈত ধরিয়া দিছে কোর।।
শচীরে প্রবোধ দিয়ে, তার পদধূলি লয়ে, নিরপেক্ষ যাত্রা প্রভু কৈল।
এরূপ করুণ বোলে, গোরা যায় নীলাচলে, শান্তিপুর ক্রন্দনে ভরিল।। তখন,—
"চেতন হরিল শচী কান্দিতে না পায়। ধরিবারে চাহে নিজ পুত্রের গলায়।।"চৈঃ মঃ

এদিকে হরিদাস প্রভুর চরণে পড়িয়া করুণস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। ইহাতে সকলের হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল ও সকলে কান্দিয়া উঠিলেন। প্রভু বলিলেন, "হরিদাস! তুমি যেরূপ করিয়া আমার চরণ ধরিলে, তুমি কৃপা কর যে, আমিও এইরূপ কাতরে শ্রীনীলাচলচন্দ্রের চরণ ধরিতে পারি।" নীলাচলচন্দ্রের নাম করিতে আবার প্রভুর নয়ন জলে পুরিয়া আসিল। ভক্তগণ বুঝিলেন, প্রভুকে আর রাখিতে পারিবেন না। তবু আর একবার প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন ভাবিয়া, শ্রীবাস-মুখপাত্র হইয়া প্রভুকে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! আমরা ছার, তুমি স্বতন্ত্র-পুরুষ; আমরা মলিন, তুমি পবিত্র; আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, তুমি জ্ঞানময়; আমরা মায়ায় অভিভূত, তুমি তাহার অতীত;—আমরা তোমার গতিরোধ কিরূপে করিব? চেষ্টা করাও আমাদের পক্ষে অপরাধ। কিন্তু আমরা মুগ্ধজীব, তুমি যেরূপ প্রকৃতি দিয়াছ, তাহার অধীন হইয়া কিছু বলিব, প্রভু ক্ষমা করিবে। তুমি অসাধনে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তোমার বিনোদলীলা দেখাইলে, আবার এখন ভুবন অন্ধকার করিয়া তোমার এই অসহনীয় লীলা দেখাইতে চলিলে। আমরা কি অপরাধে এ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হই? তুমি যাইতেছে তাহা নহে, আমাদের প্রাণ মন বুদ্ধি, এমন কি, পঞ্চেন্দ্রিয় পর্যন্ত লইয়া যাইতেছে। আমরা থাকিব কিরূপে? প্রভু! তুমি বলিতে পার যে, আমরা যাহা অসাধনে পাইয়াছি সেই বিস্তর। আমরা ছার, কিন্তু তুমি যাঁহার উদরে জন্ম লইয়াছ, আর যাঁহাকে পদসেবার অধিকারী

* "শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্র-মুখ। ভোজন করয়ে পূর্ণ হৈল নিজ সুখ।।"চৈ চঃ

করিয়াছ, সেই শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর অবস্থা মনে কর? মা-জননীর দশা চেয়ে দেখো। বিষ্ণুপ্রিয়া নদীয়ায়, তাঁহার ক্রন্দনে পাষাণ পর্যন্ত ঝুরিতেছে।[১] প্রভু! জীবকে করুণা করিতে যাইতেছ, তবে নিজ-জনকে কেন দুঃখ দিতেছ? ন'দের চাঁদ এখন নীলাচলে উদয় হইতে চলিলেন, ইহা কি প্রাণে সহে? প্রভু, বিনোদলীলা করিযা বৃন্দাবনের সম্পত্তি দেখাইলে, কীর্তন-সমুদ্র মন্থন করিয়া সুধা উঠাইলে, এখন কেন বিষ উঠাতেই যাইতেছ? ন'দের ধন ন'দে চল, সংকীর্তন কর, তোমার জীবগণের আর কি সম্পত্তির প্রয়োজন? নাগরবেশ ধরিয়া আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া, এখন কাঙ্গাল হইয়া সম্মুখে উদয় হইলে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সেবিত চরণ দুখানিতে হাঁটিয়া হাঁটিয়া ব্রণ হইবে।[২] বৃক্ষতলে শয়ন করিবে, ভিক্ষা না পাইয়া উপবাস করিবে,—ইহা অপেক্ষা আমাদের কোটি বার মরণ ভাল। প্রভু! আমাদের বুকে নিজ হাতে শেল মারিও না।" শ্রীবাস এইরূপে বলিলেন, আর কেহ প্রভুর পায় ধরিলেন, কেহ মাটিতে পড়িলেন, কেহ বা করযোড়ে প্রভুর মুখ-পানে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। শ্রীবাস আবার বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! শচীমায়ের নিকট কি বলে বিদায় লইবে? বিষ্ণুপ্রিয়া এ কথা শুনিবামাত্র যে মারা যাইবেন। আমরা আর কি তোমার চন্দ্রবদন, তোমার মধুর নৃত্য দেখিতে পাইব না? আর কি নাচিতে নাচিতে আমাদিগকে কোলে করিবে না? আর কে আমাদের মধুর দর্শন দিয়া প্রেমানন্দে ভাসাইবে? হা কষ্ট! হা কষ্ট! এইরূপে দুঃখ দিবে বলিয়াই কি আমাদের পাষাণ হৃদয় কোমল করিয়াছিলে?

তিনটী বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্টক। প্রিয়া, জননী ও ভক্তগণ। একটীর হাত এড়াইয়াছেন, কারণ বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীনবদ্বীপে। ভক্তগণ ও জননী প্রভুকে ফিরাইয়া আনিবেন, এই ভরসায় আশা-পথ চাহিয়া তিনি নদীয়ায় রহিয়াছেন। তবুও দুইটি কণ্টক, জননী ও ভক্তগণ সম্মুখে জননী, পুত্রকে নীলাচলে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। কাজেই তিনি দার্ঢ্য অবলম্বন করিয়া, চুপ করিয়া ও নিমেষহারা হইয়া পুত্রের মুখ পানে চাহিয়া আছেন, বড় বাধা দিতেছেন না। এখন ভক্তগণকে নিরস্ত করিতে পারিলেই তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধি হয়। প্রভু জননীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন বটে, কিন্তু অন্তর কারুণ্যরসে পূর্ণ, নয়নদ্বয় তাহার সাক্ষ্য দিতে চাহিতেছে, আর প্রভু তাহা নিবারণ করিতেছেন। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমার মনের কথা শুন। আমি নীলাচলে বরাবর বাস করিব। আমি আসিব, তোমরা যাইবে, সুতরাং সর্বদা দেখা সাক্ষাৎ হইবে।" এই কথা শুনিয়া কোন ভক্ত বলিলেন, "প্রভু! তোমাকে আমাদের আর বিশ্বাস নাই। তুমি সত্য করে বল যে, নীলাচলে তোমার বরাবর বাস হইবে।" প্রভু বলিলেন, "আমি সত্য করিলাম, নীলাচলে বরাবর বাস করিব।"* এই কথা শুনিয়া সকলে একটু আশ্বস্ত হইলেন; ভাবিলেন, প্রভু যদি নীলাচলে বাস করেন, তবে সে সবে ২০ দিনের পথ, সেখানে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেই হইবে। তখন শচী ধীরে ধীরে বলিলেন, "নিমাই! তোমার মুখখানি কি আমি আর দেখিতে পাইব না?" ইহা শুনিয়া প্রভুর

১। হের দেখ তোর মাতা শচী অনাথিনী। কান্দনাতে ধায় উহার দিবস রজনী।।
বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে। পশু পক্ষী লতা পাতা এ পাষাণ ঝুরে।।" চৈঃ মঃ

২। "একেশ্বর কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন মাগিবে কাহাকে?
শচীর দুলাল তুমি দুর্লভ চরিত। দুখানি চরণ বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত।।
ভক্তগণ অমিয় নয়ন দিঠি পাতে। এ দেহ প্রেমীর তন্ বাড়ে হাতে হাতে।। চৈঃ মঃ

*"সত্য সত্য করি প্রভু বলে বার বার। নীলাচলে বাস সত্য হইবে আমার ।।"চৈঃ মঃ

নয়ন আর বাধা মানিতে চাহে না, কিন্তু নিজে শক্তিধর বলিয়া নয়নকে বাধ্য করিলেন। শেষে বলিলেন, "মা! পূর্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আমি অসিয়া তোমার চরণ দর্শন করিব।" এখানে একটী কাহিনী বলিতেছি। প্রভুর পিতার নাম জগন্নাথ, পিতামহের নাম উপেন্দ্র। বাড়ী শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে। প্রভুর খুল্লতাত-তনয় প্রদ্যুম্ন মিশ্র "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য উদয়াবলী" গ্রন্থ প্রণেতা। সেখানি ছাপা হইয়াছে। উহাতে লেখা আছে, নিমাই যখন মাতৃগর্ভে, তখন জগন্নাথ সস্ত্রীক ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে যান। সেই সময় প্রভুর মাতামহী শোভাদেবী স্বপ্নে দেখিতে পান তাঁহার পুত্রবধূ শচীর গর্ভে স্বয়ং শ্রীভগবান্ প্রবেশ করিয়া বলিতেছেন, "তোমার বধূকে সত্বর শ্রীনবদ্বীপে পাঠাইয়া দাও। আমি শ্রীনবদ্বীপ ভিন্ন আর কোথাও ভূমিষ্ঠ হইব না।" প্রাতে শোভাদেবী শচীকে স্বপ্নের কথা জানাইয়া শেষে বলিলেন, "মা! তুমি অঙ্গীকার কর তোমার পুত্রকে একবার আমাকে দেখাইবে।" শচী স্বীকার হইলেন। শান্তিপুর হইতে পুত্রের চলিয়া যাইবার সময় সেই কথা মনে হওয়ায়, তাঁহাকে ইহা বলিলেন। নিমাইও মাতার প্রতিজ্ঞা-পালনার্থে এক দেহ শান্তিপুরে রাখিয়া অন্য দেহ ধরিয়া অন্তরীক্ষে শ্রীহট্টে গমন করেন ও পিতামহীকে দর্শন দেন। এই কাহিনী ঐ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

জননীকে এই কথা বলিয়া প্রভু আবার "হরিবোল" বলিলেন। "হরিবোল" শব্দটি চিরকাল বড় মধুর, সে সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় আরও মধুর হইয়াছিল। আবার এই চারিটি অক্ষর শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে কি মধুর লাগিত, আহা বর্ণনাতীত। কিন্তু এই সময় শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে "হরিবোল" শব্দটী বজ্রের ন্যায় শ্রুতি-দুঃখকর বোধ হইল।

রসলোলুপ পাঠক! একবার "অক্রূর-সংবাদ" গীত শ্রবণ করিবেন। সেই সময় শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ, শচীকে যশোদা ভক্তগণকে গোপী আর শ্রীমতী রাধা যে কুঞ্জের আড়ালে দাঁড়াইয়া গমন দর্শন করিতেছিলেন, তাহা শ্রীনবদ্বীপে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভাবিলে শ্রীগৌরাঙ্গের শান্তিপুর-ত্যাগ-লীলা কিছু অনুভব করিতে পারিবেন। যথা—এ বোল বলিয়া প্রভু বলে হরিবোল। সত্বর চলিলা, উঠে ক্রন্দনের রোল।। মাতাকে প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন। এথা আচার্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন।। চৈঃ মঃ

কবি কর্ণপুর, প্রভুর বিদায় এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

মায়ের চরণে প্রভু কৈল নমস্কার। শচীর নয়নে বহে অবিচ্ছিন্ন ধার।।
প্রভু বলে "মাতা দুঃখ না ভাবহ মনে। সর্ব সিদ্ধি হইবেক কৃষ্ণ আরাধনে।।
যদি আমা প্রতি শ্রদ্ধা আছে সবাকার। কৃষ্ণ ভজ তবে সঙ্গ পাইবে আমার।।"

প্রভু যদি চলিলেন, তখন শান্তিপুর তাঁহার পশ্চাৎ চলিল, কেবল শচী ছাড়া। শচী পুত্রকে যাইতে অনুমতি দিয়াছেন, তিনি আর কি বলিয়া চলিবেন। তিনি পুত্র পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

ধাইয়া চলিলা পাছে সব ভক্তগণ। কেহ নাহি পারে সম্বরিবারে ক্রন্দন।।
কান্দিতে কান্দিতে সব প্রিয় ভক্তগণ। উঠেন পড়েন পৃথিবীতে অনুক্ষণ।।

যখন সমস্ত শান্তিপুর প্রভুর পশ্চাৎ চলিলেন, তখন প্রভু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হে আমার বন্ধুগণ! তোমরা গৃহে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন কর। তোমরা ভাবিতেছ, আমার বিহনে দুঃখ পাইবে। তাহা, কেবল তোমরা কেন, আমার জননীও পাইবেন না। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে ডুবিলে জীবের দুঃখ থাকে না। তোমাদের সেই বহুমূল্য সম্পত্তি রহিল। তবে আমার নিমিত্ত বিরহকষ্ট,—তাহার ঔষধ আমি বলিতেছি। যিনি অনুরাগে শ্রীকৃষ্ণভজন করিবেন, তিনি আপনার ক্রোড়ে আমায় দেখিতে পাইবেন। (যথা চৈতন্য-মঙ্গলে)—

"কাহারো হৃদয়ে নাহি রবে দুঃখ শোক। সংকীর্তন-সমুদ্রে ডুবিবে সর্বলোক।।

কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচী। যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি।।"

ইহা বলিয়া প্রভু সজল-নয়নে করজোড়ে ভক্তগণকে তাঁহার পশ্চাৎ যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলে। সেই কারুণ্যপূর্ণ নয়ন দেখিয়া ভক্তগণ আর অগ্রবর্তী হইতে পারিলেন না। এই সংসার-আরণ্য। রোগ শোক নৈরাশ্য দারিদ্র্য প্রভৃতি ব্যাঘ্র, সর্প, ভল্লুক সর্বদা বিচরণ করিতেছে। জীব ভবসাগর পার হইবে বলিয়া করুণাময় প্রভু ঘরে ঘরে হরিনাম বিলাইলেন, এবং যাহাতে সংসারে দুঃখ না পায় তজ্জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় শ্রীপ্রভু আজ্ঞা করিয়া গেলেন যে, দুঃখের একমাত্র ঔষধ ভগবদ্‌গুণ-কীর্তন; সেই কীর্তন করিয়া যে সুধাসমুদ্র উঠিবে, তাহাতে অবগাহন করিলে দুঃখ দূর হইবে।" অতএব হে পুত্রশোকিন! যদি পুত্র-বিয়োগরূপ বাণে বিদ্ধ হইয়া থাক, তবে একদল কীর্তনীয়া আনিয়া শ্রীভগবানের জয় দিয়া এইরূপ একটী গান শ্রবণ করিবে; যথা—

কি দিব কি দিব বঁধূ মনে করি আমি। যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি।।
তুমি ত আমার বঁধূ সকলি তোমার। তোমার ধন তোমায় দিব কি দায় আমার।।
সকলি তোমার দেওয়া আমার কিবা আছে। বাছিয়া লওহে বন্ধু যাহা তোমার ইচ্ছে।।
নরোত্তম দাসে কহে শুন গুণমণি। তোমার অনেক আছে, আমার কেবল তুমি।

কোনও অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও সূক্ষ্মদর্শী পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, "শ্রীভগবদ্‌গুণ-কীর্তনে, সংসারে রোগশোকাদি-রূপ দুঃখ কিরূপে নাশ হইবে? জড়-পদার্থের সহিত অজড়-পদার্থের কি সম্বন্ধ আছে?" এ প্রভুর কথা, ইহার উত্তর তাঁহারই দেওয়া উচিত, আমি কিরূপে দিব? তবে যাহা দেখিয়াছি তাহা বলিতে পারি। শ্রীভগবদ্‌গুণ-কীর্তনে চিত্ত-দর্পণ নির্মল হয়, ও অনেক দুঃখ যে কেবল ভ্রম মাত্র, তাহা দেখা যায়; এবং অনেক আনন্দ, যাহা লুক্কায়িত আছে, ক্রমে নয়নগোচর হয়; আর তিনি যে জাগরিত থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিতেছেন, কীর্তনে এ জ্ঞানটি যে পরিমাণে প্রস্ফুটিত হয়, সেই পরিমাণে দুঃখের শক্তি হ্রাস হয়। তুমি যদি পুত্রশোকে পাইয়া, ভক্তি করিয়া নরোত্তমের উল্লিখিত পদটি গাইতে পার, তবে শ্রীভগবান্ অতিশয় লজ্জা পাইয়া শ্রীহস্তে তোমার নয়নজল মুছাইবেন, আর আপনি তোমার পুত্র হইতে স্বীকার করিবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কাতর হইয়া ভক্তগণকে তাঁহার পশ্চাৎ যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন, তখন ভক্তগণ আর যাইতে পারিলেন না, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া গেলেন। প্রভু আবার "হরিবোল" বলিয়া দ্রুত-গমনে চলিলেন। এবার তাঁহার সঙ্গীগণ ছাড়া আর কেহ গেলেন না। কেবল শ্রীঅদ্বৈত চলিলেন। তিনি কিরূপে চলিতেছেন, তাহা শ্রবণ করুন। প্রভু দ্রুতগমনে চলিতেছেন। আচার্য পশ্চাতে তাঁহার সহিত কষ্টে-শ্রষ্টে কাঁকালি অবলম্বন করিয়া যাইতেছেন; বদন বিরস, তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম পড়িতেছে, নয়নে জল-মাত্র নাই।* প্রভু দেখিলেন যে, আচার্য ব্যতীত আর কেহই তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছেন না। প্রথমে আচার্যকে লক্ষ্য করিলেন না, কিন্তু যখন দেখিলেন তিনি পশ্চাৎ ছাড়িলেন না, আর অতি কষ্টে আসিতেছেন, তখন প্রভু ফিরিয়া বলিলেন, "আমি কেবল আপনার ভরসায় সন্ন্যাসরূপ দুরূহ কার্যে সাহসী হইয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, আমি গৃহ ত্যাগ করিলে সকলে ব্যাকুলিত হইবেন, আর আপনি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিবেন। কিন্তু আপনি যদি অধীর হয়েন, তবে আর আমার যাওয়া হয় না। আমরা সকলে আপনার আশ্রিত। মাতৃ আজ্ঞায় আমি নীলাচলে বাস করিতে চলিলাম। আপনি আমার মাতাকে প্রতিপালন ও সান্ত্বনা করিবেন, আর ভক্তগণকে নিরুপদ্রবে রাখিবেন। কিন্তু আপনি যদি এরূপ অধীর হন, তবে ত কেহ প্রাণে

* উত্তরিলা আচার্য কাঁকালি অবলম্বনে। বয়ান বিবস ঘর্ম বিন্দু বহে তাহে।। চৈঃ মঃ

বাঁচিবে না।" শ্রীগৌরাঙ্গ চুপ করিলে শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "প্রভু! আগে আমার কথা শুন, পরে তিরস্কার করিও। তুমি আমাদের সকলের প্রাণ। তুমি এই নবীন বয়সে সমুদয় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতেছে, ইহাতে স্থাবর জঙ্গম পর্যন্ত রোদন করিতেছে, তোমার ভক্তগণের কা কথা। ঐ দেখ, সকলে ঘোর বিয়োগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। ইহাতে কেবল এক জনের হৃদয় স্পর্শ করে নাই। সে এই পাষণ্ড—আমি। তুমি যাইতেছ, ইহাতে যে আমার অন্তর পুড়িতেছে না, তাহা বলিতে পারি না; হৃদয় দগ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু দেখ আমার নয়নে এক ফোঁটাও জল নাই। ইহাতে বুঝিলাম যে, ত্রিজগতে আমা অপেক্ষা কঠিন-হৃদয় আর নাই। কেবল এই কথাটি বলিতে তোমার পশ্চাতে আসিতেছি।"[১]

প্রভু এই কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,[২] "আচার্য! তোমার কোন দোষ নাই, সমুদয় অপরাধ আমারই। আমি দেখিলাম যে, আমার যাইবার সময় সকলে অধীর হইবেন, তাই তাঁহাদের সান্ত্বনা ও রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য একজন অসীম তেজস্বী ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন। সে তুমি ছাড়া আর কে? আমার গৃহত্যাগে অন্যে অধীর হইবেন সত্য, কিন্তু তোমা অপেক্ষা অধিক অধীর আর কেহ হইবেন না। এই জন্য আমার কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত, তোমার আমাতে যে প্রেম, তাহা এই বহির্বাসে বান্ধিয়া লইয়া যাইতেছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, সকলে শান্ত হইলে উহা খুলিয়া দিব। সেই জন্য তোমার নয়ন-জল আসিতে পারে নাই। তুমি দুরাচারও নও, আমার প্রতি কঠিনও নও। তোমার অপেক্ষা ত্রিজগতে আমাকে আর কে অধিক ভালবাসে? তবে, তোমার বড়ো দুঃখ হইয়াছে, কান্দিতে পারিতেছ না; ভাল, তাই হউক, যত পার কান্দ, কিন্তু সকলকে সমাধান করিও।" ইহা বলিয়া প্রভু বহির্বাসের গ্রন্থি দেখাইয়া বলিলেন, "ইহাতে তোমার প্রেম আবদ্ধ আছে, এখনই খুলিয়া দিতেছি।" এই কথা বলিতে বলিতে প্রভু গ্রন্থিটি খুলিয়া দিলেন।* যে মাত্র প্রভু বহির্বাসের গ্রন্থি খুলিলেন, অমনি শ্রীঅদ্বৈত "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া চীৎকার করিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, আর অনবরত ধারা পড়িয়া পৃথিবী ভিজিয়া গেল। শ্রীঅদ্বৈতকে অতি আদরে কোলে করিয়া প্রভু বলিলেন, "মনস্কামনা সিদ্ধ হইল ত? এখন অশ্রু সম্বরণ করো। তুমি যদি প্রেমায় বিহ্বল হও, তবে আমি চলিতে পারিব না। এখন ধৈর্য ধরো, আর সকলকে সান্ত্বনা করো! তুমি ত জান, এ সব কার্য্য কি জন্য হইতেছে।"

বসনের গ্রন্থিতে প্রেম-বন্ধন কি শোষণ করে কিরূপে? কিন্তু আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় দেখিতেছি "প্রেম দান করা", "প্রেম শোষণ করা", "প্রেম কলসে কলসে বিলান" হইতেছে। এ সমস্তই কি রূপক বর্ণনা, না ইহার বিশেষ কোনো অর্থ আছে? প্রথমত দূরে দাঁড়াইয়া একজন যে অপরকে শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন, তাহা অনেকেই জানেন। এক ব্যক্তি বক্তৃতা দ্বারা বহু লোককে মুগ্ধ করিলেন; কিন্তু সে কথাগুলি মুদ্রিত হইলে, তাহাতে আর সে শক্তি দেখা যায় না। কারণ বক্তৃতাকালে বক্তা তাহার এক একটি বাক্য অলক্ষিত শক্তি দ্বারা জীবন্ত করিয়া থাকেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলায় আছে "হানিল নয়ন-বাণ, গেল অবলার প্রাণ।" দূর হইতে নয়ন-বাণ হানিলে অবলা প্রাণে মরে কেন? কারণ অলক্ষিতভাবে নয়ন

১। তোর নিজ জন তোমার বিচ্ছেদ। কান্দয়ে কাতর হয়ে চরণারবিন্দে।।
আমার পাপিষ্ঠ প্রাণ নাহি দ্রবে কেনে। এ কাঠ কঠিন অশ্রু নাহিক নয়ানে।।

২। আমার অধিক আর দুরাচার নাই। তোমার বিচ্ছেদে মোর হিয়ার প্রেম নাই।।
এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসি কৈল কোলে।—চৈতন্য-মঙ্গল।

* "ইহা বলি এলাইল বসনের গ্রন্থি। প্রেমার বিহ্বল সে আচার্য মনে চিন্তি।।"

হইতে একটি শক্তি আসিয়া অবলাকে বিদ্ধ করে। প্রেম দান করিবার শক্তি যে মনুষ্যের আছে, তাহার সাক্ষী এখনও দেখা যায়। কোনো সাধুর নিকট গেলে তিনি তোমাকে দ্রব করিবেন। তোমার দ্রব হইবার ইচ্ছা নাই, কি দ্রবিবে না চেষ্টা করিতেছ, তুমি যে সাধুর সঙ্গ করিতেছ হয়ত তাহাও তুমি জান না, হয়ত সে সাধুতে তোমার ভক্তি নাই, তবু তাঁহার কথায়, স্বরের ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গিতে তুমি দ্রবীভূত হইতেছ। এইরূপে যে বিষয়ের সাধনা কর, সেই বিষয়ে শক্তি পাওয়া যায়। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ন্যায় বীর কেবল কথা কি দৃষ্টি দ্বারা, বহু লোককে মৃত্যুমুখে পাঠাইতে পারেন। প্রেম-ভক্তির সাধনা করিয়াও কোনো কোনো সাধুকে এখনও শক্তি চালনা করিতে দেখা যায়, আর তখন তাঁহারা "ব্রজের ভাণ্ডার" লুটিয়া আনিয়াছিলেন। সুতরাং তখন যে কলসে-কলসে প্রেম বিলাইবেন তাহার বিচিত্র কি? পাঠক মহাশয়! তুমি যদি নাস্তিক বা সন্দিগ্ধচিত্ত হও তবে এই শক্তিটির কথা বিচার করিয়া দেখিলে হয়ত উপকার পাইবে। এরূপ একটি শক্তি যে অলক্ষিতভাবে জীবকে বিচলিত করে, তাহা বেশ বুঝিতে পাইবে। ইউরোপেও এ শক্তি এখন স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা পর্যালোচনা করিলে পরিষ্কাররূপে বুঝিবে যে, এমন কোনো মহাশক্তিধর বস্তু আছে, তাহা হইলে পরকালে এবং স্বভাবতঃ শ্রীভগবানেও বিশ্বাস হইবে। আর তখন ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, শ্রীভগবান বড়ো উপকারী বন্ধু। তিনি যে শুধু জন্মিবার আগে মাতৃস্তনে দুগ্ধ দেন তাহা নয়, মরিয়া গেলে আমাদের জন্য একটী বৃন্দাবন করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীভগবান বড়ো উপকারী বন্ধু, ইহা বুঝিলে প্রেম-ভক্তি আপনি আসিবে, এবং তখন শ্রীগৌরাঙ্গের ফাঁদে পড়িয়া যাইবে। এ জন্য দুঃখ করিও না। আমি কায়মনোবাক্যে ইচ্ছা করি যে, তুমি এইরূপ ফাঁদে পড়।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈতকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া, দ্রুতগতিতে চলিলেন। সঙ্গে চলিলেন নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর ও গোবিন্দ। ইহারা সকলেই উদাসীন। সকলেরই পরিধান বহির্বাস ও কৌপীন, হাতে করোয়া। জগদানন্দ প্রভুর দণ্ড, আর দামোদর তাঁহার করোয়া লইয়াছেন। নবদ্বীপের ভক্তগণের অগ্রবর্তী হইতে প্রভুর আজ্ঞা নাই, কাজেই তাঁহারা এগুতে পারিতেছেন না, অথচ শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদের যথাসর্বস্ব লইয়া যাইতেছেন। দেখিতে দেখিতে প্রভু নয়নের অন্তরালে গেলেন। তখন "তবে নিমাই গেল" বলিয়া শচীদেবী মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় পড়িলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

"কে যায় রে নবীন সন্ন্যাসী। কোন বিধি নিরমিল দিয়া সুধারাশি।।
হেন রূপ হেন বেশ বড়ো ভালবাসি। অন্তরে পরাণ কান্দে দেখি মুখশশী।।
সঙ্গের ভকতগণ সমান বয়সী। হরি হরি বলি কান্দে পরম উদাসী।।
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মুখে হাসি। করঙ্গ কৌপীন দণ্ড ভাবে পড়ে খসি।।
নন্দরাম দাসে কয় মনে অভিলাষী। কান্দায়ে কান্দালো গোরা ত্রিভুবনবাসী।।"

নানা কথা উত্থাপন করিয়া এতদিন প্রভুকে শান্তিপুরে রাখিয়াছিলাম, আর রাখিতে পারিলাম না;—প্রভু নদে ও শান্তিপুর শূন্য করিয়া চলিলেন। এদিকে ভক্তগণ জগজ্জননী শচীকে দোলায় উঠাইয়া নবদ্বীপে ফিরিলেন। শচী কোথা যাইতেছেন সে জ্ঞান বড়ো নাই। ওদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া আশা করিয়া আছেন যে, মা তাঁহার প্রভুকে আনিবেন; কিন্তু হঠাৎ দূরে ক্রন্দনের রোল শুনিয়া বুঝিলেন, নদেবাসী প্রভুকে হারাইয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের অবস্থা, যদি পারি পরে বলিব।

প্রভু ন'দেবাসীর দৃষ্টির বাহির হইলে দাঁড়াইলেন। প্রভুর তখন সম্পূর্ণ সহজ জ্ঞান। ঈষৎ হাস্য করিয়া শ্রীনিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীপাদ্! আপনারা পথের সম্বল কে কি

আনিয়াছেন, আর কেইবা কি দিলেন বলুন।" শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "কপর্দকও আনি নাই, সম্বলের মধ্যে দণ্ড, করোয়া, কৌপীন, বহির্বাস ও ছেঁড়া কাঁথা।" তারপর বলিলেন, "তোমার আজ্ঞা ব্যতীত সম্বল আনিতে সাহস হইবে কেন?" প্রভু অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "সাধু! সাধু! শ্রীকৃষ্ণ ত্রিজগৎ পালন করেন, আমাদেরও করিবেন। আমরা আহারের জন্য কেন ভাবিব? এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীনীলাচলচন্দ্রে তাঁহার চিত্ত আবিষ্ট হইল; ক্রমে বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ লোপ পাইতে ও পথাপথ জ্ঞান শূন্য হইতে লাগিল। তখন কখন দ্রুত কখন বা ধীর গমন, কখন হাস্য কখন ক্রন্দন, কখন উর্ধ্বদৃষ্টি কখন ঘোর-মূর্চ্ছা। মাঝে মাঝে বলিতেছেন, "নীলাচলচন্দ্র। আমাকে দেখা দাও।" কখন বা "হা নীলাচলচন্দ্র" বলিয়া অচেতন হইয়া পড়িতেছেন; কখন বা ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "জগন্নাথ আর কত দূরে?"

প্রভু এই ভাবে চলিয়াছেন। চারিপার্শ্বে ভিন্ন লোক, কেহই তাঁহাকে চিনে না। কেহ নদীয়া-অবতারের কথা শুনিয়াছে, কেহ-বা শুনে নাই। কিন্তু তিনি জগৎ আলো করিয়া চলিয়াছেন। প্রভুর সুন্দর মূর্তি, কচি বয়স, অরুণ আয়ত-লোচন, অবিশ্রান্ত প্রেমধারা, শ্রীমুখে হরেকৃষ্ণ ধ্বনি, প্রেমে টলমল মরালগতি, যে দেখিতেছে সেই ভাবিতেছে, এ বস্তুটি গোলক হইতে জীবের ভাগ্যে এখানে উদয় হইয়াছেন। আবার যখন দেখিতেছে, তাঁহার সোনার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, পরিধান কৌপীন ও অঙ্গে ছেঁড়া কাঁথা, তখন উন্মাদ হইয়া "প্রাণ যায়" বলিয়া চীৎকার করিয়া রোদন করিতেছে। উপরে শ্রীনন্দরাম দাসের যে পদটি দিয়াছি, উহাতে প্রভুর সেই সময়ের অপরূপ শোভার কতক আভাষ পাইবেন। প্রভুর সঙ্গীদের মধ্যে গোবিন্দ ব্যতীত আর সকলেই সমান বয়সী। সকলের বড়ো নিতাই, তাঁহার বয়স উর্ধ্বসংখ্যা ৩০-৩২। সকলেই উদাসীন ও ঘোর বৈরাগী, তেজস্কর, প্রেমভক্তিতে জর্জর ও মনোহর। প্রভু এই সব "সাঙ্গোপাঙ্গ" সহ জীব উদ্ধার করিতে চলিয়াছেন।

"ঢলিয়া ঢলিয়া চলে হরি বলে গোরারায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করে, মাঝখানে গৌরাঙ্গরায়।।"

শান্তিপুরে প্রভু ভক্তগণ ও জননীকে দুঃখ দিবেন না বলিয়া সন্ন্যাসের সব নিয়ম ছাড়িয়াছিলেন; পথে আসিয়া আবার সমুদয় ধরিলেন এবং ঘোর কঠোরতা আরম্ভ করিলেন। প্রভুর মৃত্তিকায় শয়ন, উপাধান বাম হস্ত, বৃক্ষতলে বাস, নাসিকা দ্বারা ভোজন, কারণ জিহ্বায় অন্ন স্পর্শ করিলে কোনো একটি ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব হইবে। ইহাতে ভক্তগণ মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু কি করিবেন? তাঁহারা সেখানে আছেন না আছেন প্রভু সে জ্ঞান পর্যন্ত হারাইয়াছেন, তাঁহাদের কথা কি শুনিবেন? প্রভু মুহুর্মুহুঃ বলিতেছেন "হে নীলাচলচন্দ্র!" দর্শন দাও। শ্রীজগন্নাথ! চরণে স্থান দাও।" দাস্যভাবে মগ্ন হইয়া প্রভু নদে, নদেবাসী, মা, প্রিয়া ও সঙ্গীগণ সমুদয় ভুলিয়াছেন।

নবীন বৈরাগীগণ প্রভুকে মধ্যস্থানে লইয়া আঠিসারা গ্রামে আসিলেন। সেখানে শ্রীঅনন্ত পণ্ডিত, প্রভুকে দর্শনমাত্র আত্ম-সমর্পণ করিলেন, প্রেম-ভক্তি পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। তৎপরে সারানিশি কীর্তনানন্দ ভোগ করিতে করিতে তীরে তীরে শ্রীগঙ্গার দক্ষিণ-সীমা ছত্রভোগে আসিলেন। গঙ্গা এখানে শতমুখী হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছেন। এই স্থানটি এখন ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায়, মথুরাপুর থানায়, খাড়িগ্রামে অবস্থিত এবং জয়নগর-মজিলপুর হইতে আন্দাজ তিন ক্রোশ দূরে। তখন গঙ্গা ঐ পথে ছিলেন; এবং এই ছত্রভোগ একটি লক্ষ্মীসম্পন্ন নগর ছিল। ইহা পীঠস্থান বলিয়া তান্ত্রিকগণের মান্য-স্থান। এখানে শ্রীবিষ্ণুমূর্তি ছিলেন, এখন তিনি দুই হস্ত হইয়া জয়নগরে আছেন। এখানে অম্বুলিঙ্গ ঘাটে, জলমগ্ন শিব আছেন। সুতরাং এই ছত্রভোগ বৈষ্ণব ও শাক্তগণের তীর্থস্থান। প্রভু গঙ্গার কূলে-কূলে

অনেক পবিত্র স্থান দর্শন করিতে করিতে আসিতেছেন। প্রভুর কৌপীন পরিয়া এই প্রথম একটি তীর্থ দর্শন হইল। এই তীর্থ দেখিয়া প্রভু আহ্লাদে বিহ্বল হইলেন এবং হুহুঙ্কার করিয়া সেই অম্বুলিঙ্গ ঘাটে ঝম্প দিলেন। তাঁহার সহিত ভক্তগণও ঝম্প দিলেন। প্রভু মহানন্দে সেই ঘাটে জলক্রীড়া করিয়া তীরে উঠিলে, গোবিন্দ তাঁহাকে শুষ্ক বহির্বাস দিলেন। ইহা পরিধান করিয়া তাঁহার নয়ন দিয়া শতমুখে আনন্দধারা পড়িয়া কৌপীন ও বহির্বাস ভিজিয়া গেল। গোবিন্দ তখন অন্য কৌপীন ও বহির্বাস দিলেন, কিন্তু তাহারও সেই দশা হইল। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, শ্রীগঙ্গাদেবী যেখানে শতমুখী হইয়াছেন, প্রভুর নয়ন দিয়াও সেখানে শতমুখী ধারা চলিল। যথা—"পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার। প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর।।"

সহস্র লোক প্রভুর শ্রীঅঙ্গের নানাবিধ ভাব অদ্ভুত প্রেমধারা দেখিয়া গগনভেদী হরিধ্বনি করিতেছে। ইহা শুনিয়া গৌড়ের দক্ষিণভাগের অধিকারী রাজা রামচন্দ্র খান সেখানে আইলেন। এই ছত্রভোগ গৌড়রাজ্যের শেষ-সীমা। ইহার ওপার উড়িষ্যা-রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে। তিনি ক্ষত্রিয় মহাযোদ্ধা; মুসলমানগণ তাঁহার সহিত পারিয়া উঠিত না। তখন দুই রাজ্যে মহা বিবাদ চলিতেছে। সুতরাং ছত্রভোগ পার হইয়া কোন গৌড়িয়ার উড়িষ্যা যাইবার অধিকার ছিল না। রামচন্দ্র খান হোসেন সাহার অধীন অধিকারী, এবং তাঁহার নামে গৌড়ের দক্ষিণদেশ শাসন করেন। তিনি কলরব শুনিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিতে দোলায় চড়িয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু প্রভুকে দর্শন করিবামাত্র ভয়ে ভয়ে দোলা হইতে নামিয়া প্রভুর পদতলে পড়িলেন। অবশ্য ইহাতে প্রভুর তাঁহাকে আদর করা উচিৎ ছিল। কিন্তু যথা চৈঃ ভাগবতে "প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দ-জলে। হাহা জগন্নাথ প্রভু বলে ঘন ঘন। পৃথিবীতে পড়ি ক্ষণে করয়ে ক্রন্দন।।"

প্রভুর তেজ দেখিয়া রামচন্দ্র খানের প্রথমে ভয় হয়, আর ভয়ে হৃদয়ের দম্ভ অন্তর্হিত হয়। এখন প্রভুর চরণস্পর্শে কারুণ্যরসের উদয় হইল। প্রভুর নয়নে জল আর আর্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

দেখিয়া প্রভুর আর্তি রামচন্দ্র খান। অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সজ্জনের প্রাণ।।
কোনো মতে এ আর্তির হয় সম্বরণ। কান্দে আর এই মত চিন্তে মনে মন।।

রামচন্দ্র খান ভাবিতেছেন, নবীন গোঁসাইর এ আর্তি কিরূপে নিবারণ করিবেন। তখন নিত্যানন্দ বলিতেছেন, "প্রভু! কৃপা করিয়া আপনার পদতলস্থ এই ভদ্রলোকটির প্রতি একবার শুভ-দৃষ্টিপাত করুন।" প্রভু এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিত বাহ্য পাইলেন। তখন রাজাকে দেখিয়া বলিতেছেন, "বাপু! কে তুমি?" রামচন্দ্র বলিলেন, "আমি ছার, আপনার দাসের দাস হইব এই বাসনা করি।" তখন উপস্থিত সকলে বলিলেন, "প্রভু! ইনি এদেশের অধিকারী।" প্রভু বলিলেন, "তুমি অধিকারী? বড়ো ভাল। আমি সকালে "নীলাচলচন্দ্র" দর্শন করিতে যাইব। তুমি তাহার সহায়তা করিতে পারিবে?" "নীলাচলচন্দ্র" বলিতে প্রভু আনন্দে ঢলিয়া পড়িলেন।

রামচন্দ্র খান ভাবিতেছিলেন, তিনি কিরূপে প্রভুর আর্তি নিবারণ করিবেন, এখন সুযোগ পাইলেন। আবার ভক্তগণ ভাবিতেছিলেন, রামচন্দ্র খানের সেই সময় ছত্রভোগে আসা প্রভুর একটা লীলাখেলা। প্রভুর লীলাখেলা কেন, তাহা শ্রবণ করুন। প্রভু সুস্থির হইলে রামচন্দ্র বলিতেছেন, "প্রভু! দুই রাজার বিষম বিবাদ চলিয়াছে, উভয়েই আপনাপন সীমানায় ত্রিশূল পুতিয়াছেন।* এই সীমানা যদি কেহ অতিক্রম করে, তবে তাকে গোয়েন্দা বলিয়া

* "রাজার ত্রিশূল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে?"—শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

প্রাণে মারিতেছে। আমি এ দেশের অধিকারী, আমার এখন এ পথে কাহাকেও যাইতে দিবার অনুমতি নাই। দিলে অগ্রে আমার প্রাণ যাইবে। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা শিরোধার্য। আমার যে কোনো বিপদ ঘটে ঘটুক, প্রভুকে কল্য উড়িয্যা রাজ্যে পাঠাইবার চেষ্টা করিতেই হইবে।

এখন মনে ভাবুন, রামচন্দ্রের আগমনকে ভক্তগণ কেন প্রভুর লীলা খেলা ভাবিতেছিলেন। রামচন্দ্র খানের সেই সময় সেই স্থানে আগমন না হইলে প্রভুর লৌকিক-লীলায় উড়িষ্যায় যাওয়া হইত না; হয়ত নৌকা পাইতেন না, কি আর কোনো উপায়ে উড়িষ্যা রাজ্যে প্রবেশ করা সম্ভবপর হইত না। শুধু যে রামচন্দ্র খানের সেখানে তখন আগমন হইল তাহা নহে, তাঁহার মনের ভাবও এইরূপ হইল। রামচন্দ্র খানের এই কথা শুনিয়া প্রভু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, এবং তাঁহাকে কিঞ্চিত পুরস্কারও দিলেন। যথা চৈতন্য-ভাগবতে— "হাঁসি তাঁরে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত।" যদি বলো, প্রভু একবার প্রসন্ন মুখে চাহিলেন, তাহাতে খাঁর কি হইল? তিনি প্রভুর নিমিত্ত যে কোনো সর্বনাশ গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন। আর, প্রভু কেবল একটু চাহিলেন বৈ ত নয়? এ তাঁহার কিরূপ উপকার-শোধ? ইহার উত্তর চৈতন্য-ভাগবত দিতেছেন, "দৃষ্টিপাতে তায় সর্ব বন্ধ ক্ষয় করি। ব্রাহ্মণ-আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি।।" রামচন্দ্র খান প্রভুর নিমিত্ত সর্বনাশ স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র, তাঁহার কিছু বিপদ ভোগ করিতে হয় নাই। আর প্রভু তাহার বিনিময়ে তাঁহাকে শ্রীভগবানের চরণপদ্ম-মধু পান করিবার অধিকার দিলেন। সুতরাং প্রভু যে রামচন্দ্রের নিকট ঋণী রহিলেন এ কথা কিরূপে বলিব?

রামচন্দ্র ঘোর তান্ত্রিক শাক্ত ছিলেন, এখন পরম গৌরভক্ত হইলেন। তখন রামচন্দ্র গোষ্ঠী সমেত প্রভুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন। একজন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তাঁহাদিগকে বাসা দিলেন। তথায় অনেক লোক উপস্থিত হইল। ক্রমে প্রভু নৃত্য করিতে উঠিলেন, এবং সেই ভুবনমোহন নৃত্য দেখিয়া অনেকের ভব-বন্ধন ছিন্ন হইল। সারানিশি কীর্তনানন্দ চলিতে লাগিল। প্রহর খানেক রাত্রি থাকিতে রামচন্দ্র খান আসিলেন। প্রভুকে প্রভাতে উড়িষ্যা রাজ্যে পাঠাইবার জন্য বিশেষ চিন্তিত থাকায় তিনি কীর্তনে আনন্দভোগ করিতে পারেন নাই। কারণ নাবিকগণের সহজে প্রাণ দিবার জন্য উড়িষ্যায় যাইতে সম্মত হইবার কথা নয়। যাহা হউক, প্রভুর ইচ্ছায় নৌকা পাইয়া রামচন্দ্র তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু! নৌকা প্রস্তুত, উঠিতে আজ্ঞা হউক।" প্রভু সঙ্গীগণসহ নৌকায় উঠিয়া উড়িষ্যায় চলিলেন। প্রভু নৌকায় উঠিয়াই আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নাবিকগণের ইচ্ছা চুপে চুপে যাইয়া প্রভুকে উড়িষ্যায় নামাইয়া দেশে পলায়ন করে। কিন্তু প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলে নৌকা টলিতে লাগিল। আবার মুকুন্দও আনন্দে "হরি হরয়ে নমঃ" কীর্তন আরম্ভ করিলেন। নাবিকগণ ভাবিল, পাগলা ঠাকুরের হাতে বুঝি প্রাণ যায়। তখন তাহারা বলিতে লাগিল, "গোসাঞি!" নৌকা ডুবিয়া গেলে কোথা যাইবেন? এদেশে জলে কুমীর, ডেঙ্গায় বাঘ। আবার জল-ডাকাইতগণ সর্বদা ফিরিতেছে, শব্দ শুনিলেই আসিয়া ধরিবে। এখন আপনারা নিদ্রা যাউন।" কিন্তু শ্রীপ্রভুর আহার নিদ্রা নাই। তিনি শান্তিপুর হইতে এই পর্যন্ত কিরূপ মনের ভাবে আসিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্য-ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"বিশেষ চলিল যে অবধি জগন্নাথে। নাকে'সে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে।।
কারে বলি রাত্র দিন পথের সঞ্চার। কিবা জল কিবা স্থল কিবা পারাপার।।
কিছু নাহি জানে প্রভু ডুবি প্রেমরসে।।"

প্রভুকে স্বয়ং তিনি বলিয়া জানিলেও জীবধর্মবশতঃ ভক্তগণ সে কথা মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাইতেন। কাজেই নাবিকগণের কথায় কেহ কেহ ভয় পাইলেন। ইহাতে মুকুন্দ চুপ

করিলেন, আর প্রভুকে স্থির হইয়া বসিবার জন্য বলিতে লাগিলেন। তখন প্রভু বলিলেন, "তোমরা ভয় পাইয়াছ? ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণের চক্র মাথার উপর ঘুরিয়া ভক্তগণকে রক্ষা করিতেছে।" ইহা শুনিয়া ভক্তগণের আবার মনে হইল প্রভু বস্তু কি! তখন প্রভুকে না থামাইয়া, আপনারা কীর্তনে পুনঃ যোগ দিলেন। এইরূপে নৌকা টলিতে টলিতে কীর্তনের সহিত উৎকলদেশে পৌঁছিল। প্রভু প্রয়াগ-ঘাটে উঠিয়া ভাব সম্বরণ করিলেন এবং জগন্নাথদেবকে লক্ষ্য করিয়া উৎকলদেশকে প্রণাম করিলেন। তখন গৌড়দেশরূপ কণ্টক উত্তীর্ণ হইয়া ও শচী প্রভৃতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। যে পঞ্চজন তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, এখন তাঁহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইলেই বাঁচেন।

প্রয়াগ-ঘাটে যুধিষ্ঠির-স্থাপিত মহেশ আছেন। সেখানে প্রভুগণসহ স্নান করিলেন। প্রভু তখন সহজ ভাবেই বলিলেন, "আমি যাই, অন্ন মাঙ্গিযা আনি।" এখন, ভিক্ষা-মাঙ্গা গোবিন্দ, কি জগদানন্দ, কি আর যাহারাই হউক, প্রভুর কাজ কখনই নহে। প্রভুর হাতে কেবল জপের মালা। তাঁহার দণ্ড জগদানন্দের এবং বহির্বাস, কৌপীন ও করোয়া গোবিন্দের হাতে। তিনি প্রেমানন্দে বিভোর; কোনক্রমে তাঁহার উদরে দুটো অন্ন প্রবেশ করাইয়া ভক্তগণ তাঁহাকে বাঁচাইয়া আনিয়াছেন। এখন প্রভু জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাই ছয় জনের জন্য ভিক্ষা করিতে চলিলেন। নিষেধ করে কাহার সাধ্য, আর নিষেধ করিলেই বা শুনিবে কে? এই যে পঞ্চভক্ত প্রভুকে রক্ষা করিয়া লইয়া যাইতেছেন, ইহাতে তাঁহারাই আপনাদিগকে কৃতার্থ ভাবিতেছেন। তাঁহারা প্রভুর নিকট কিছু মাত্র বাধ্য নহেন। বরং প্রভু চেতন লাভ করিলেই ভক্তগণ তাঁহাকে যত্ন করিতেছেন। সেই প্রভু ভিক্ষা করিতে চলিলেন, ইহা তোমার আমার সহে না, তাঁহারা কিরূপে সহিবেন। কিন্তু নিষেধ করিতেও তাঁহারা সাহস করেন না। প্রভু এইরূপে তাঁহাদের চিত্ত-বিত্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছেন।

প্রভু বহির্বাস দ্বারা ঝুলির মত করিয়া, ভক্তগণকে মন্দিরে রাখিয়া আপনি ভিক্ষায় বাহির হইলেন। প্রভুর এ হরিনাম ভিক্ষা নয়, চাউল ভিক্ষা। প্রভু উপস্থিত হইবামাত্র গ্রাম টলমল করিয়া উঠিল। "ওরে নবীন সন্ন্যাসী দেখে যা" বলিয়া সকলে দৌড়িল। প্রভু কোনো গৃহস্থের দ্বার "হরে কৃষ্ণ" বলিয়া, অবনত মস্তকে আঁচল বিস্তার করিয়া দাঁড়াইলেন; মুখে কিছু বলিলেন না। মস্তক অবনত করিবার কারণ গৃহস্থের বাড়ী স্ত্রীলোক দর্শন সম্ভব। যাহার বাড়ী প্রভু গেলেন সে ভাবিল তাহার যথাসর্বস্ব প্রভুকে দিবে। কিন্তু আর সকলেও ছুটিল। যাহার যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য, তাহা দিবার জন্য সকলে ব্যস্ত হইল। দুই এক বাড়ীতেই আঁচল পুরিয়া গেল। শেষে, লইতে পারিবেন না বলিয়া অনেক দ্রব্য ফিরাইয়া দিলেন। ইহাতে লোকে মহাক্লেশ পাইল, প্রভুও তাহাদের দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। যাহা হউক, ইহাতে প্রভুর একটি শিক্ষা হইল। তিনি বরাবর ভিক্ষা করিবার যে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। প্রভু প্রফুল্ল বদনে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ভিক্ষার দ্রব্য দেখিয়া সকলে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বুঝিলাম, প্রভু আমাদিগকে পোষিতে পারিবেন।" তখন জগদানন্দ রন্ধন করিলেন, এবং আহারান্তে সকলে কীর্তন আরম্ভ করিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ সর্বত্রই দেবালয় ও অতিথিসেবা ছিল। ভারতবর্ষের সে ভাব আর নাই। এখন ইউরোপীয়েরা যেরূপ সৈন্য পোষে, তখন ভারতবর্ষীয়রা সেইরূপ সাধু পোষিতেন। এদেশে এত উদাসীন ছিলেন যে, "গৃহস্থ" কথাটির সৃষ্টি হইল। বিশেষতঃ তখন এখানে সর্বত্র দেবস্থলী, অতিথিশালা, পুষ্করিণী ও কূপ দ্বারা পরিপূরিত ছিল।

উড়িষ্যা গমনের পথে পাটনির বড় উৎপাত ছিল। তাহারা যাত্রীদের উপর বড়ো অত্যাচার করিত। প্রভু গঙ্গাসাগর, সুন্দরবন প্রভৃতি উত্তীর্ণ হইয়া উড়িষ্যায় গেলেন বটে,

কিন্তু পাটনীর হাতে ধরা পড়িলেন। ঐ ঘাটপালগণের সঙ্গে প্রভুর অনেক কাণ্ডের কথা উল্লেখ আছে, কতকগুলিতে বেশ আমোদও আছে। কথা কি, পাটনী ঘাটের রাজা। পার করেন যাত্রীদের। তাহারা বিদেশী, সুতরাং সহায় ও শক্তি-শূন্য। পাটনী লোকজন লইয়া ঘাটে থাকে, অনায়াসে যাত্রীগণকে প্রহার, বন্ধন, লুন্ঠন প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা অত্যাচার করিতে পারে। নিজেরা ছোটোলোক, অথচ অপার-ক্ষমতা-সম্পন্ন। পাঠক! এখন পাটনীর অত্যাচারের কারণ বুঝিয়া লউন। প্রভু উড়িষ্যার অন্যকে কি ভবসাগর পার করিবেন, প্রথম যাইয়াই "দানীর" সহিত তাঁহার দ্বন্দ্ব বাধিল। তাঁহারা ছয় জন পার হইবেন, তাহার দান চাই। কিন্তু কাহারও নিকট কপর্দক-মাত্র নাই। খেওয়ারিই বা বিনা কড়িতে কেন পার করিবে? সঙ্গে কিছু দ্রব্যাদি থাকিলে কাড়িয়া লইত, কিন্তু তাহাও বিশেষ ছিল না। প্রভু সমেত ছয় জন ঘাটে যাইয়া দাঁড়াইলে, দানী দান চাহিল। তাঁহারা বলিলেন, কপর্দক মাত্র নাই। পার কর, তোমার পুণ্য হবে।" কিন্তু সে লোভে দানী ভুলে না। আগে তাঁহাকে দুঃখ দেয়; দুঃখ পাইয়া যদি কিছু থাকে, তখন সাধু তাহা দানীকে দেন। যদি কিছু না থাকে, সাধুর দুঃখ দেখিয়া অন্যান্য যাত্রীগণও পারের মূল্য দেয়। এইরূপে খেওয়ারির প্রায়ই বিনামূল্যে পার করিতে হয় না। দানীকে কাহারও ফাঁকি দিবার যো ছিল না। আগে দান পরে পার, এই তাহাদের নিয়ম। প্রভুর গণেরা যখন বলিলেন, "কপর্দক মাত্র নাই" তখন দানী বলিল, "তবে ওদিকে যাও, এদিকে আসিও না"। একটি পরিখা আছে, তাহার এপারে থাকিয়া মূল্যের বন্দোবস্ত করিতে হয়। যাহারা মূল্য দেন তাহারা পরিখার ও-পারে যাইতে পারে। তাহারা সেখানে বসিয়া থাকে, এবং এক নৌকা মানুষ হইলে তখন সকলকে পার করে। দানী প্রভু ও তাঁহার গণকে বলিল, "ও-দিকে যাও, এ-দিকে আসিও না," ইহা বলিয়াই প্রভুর পানে চাহিল। তখন তাঁহার তেজ দেখিয়া ভয় পাইল। ভাবিতেছে, এঁর কাছে ত দান লইব না, ইহার সঙ্গে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কাছেও লইব না। ইহা ভাবিয়া বলিতেছে, "ঠাকুর! তুমি আইস, তোমার দান লাগিবে না। আর তোমার সঙ্গী কয়েক জনকেও লইয়া আইস।" প্রভু বলিতে পারিতেন যে, তাঁহার সহিত আর ৫ জন আছেন, তাহা হইলে সকলে পার হইতে পরিতেন। কিন্তু রসিকশেখর প্রভু বলিলেন, "দানি, ত্রিজগতে আমার কেহ নাই, আমিও কাহার নহি।" এই কথা বলিলে, দানী প্রভুকে পরিখার মধ্যে আসিতে দিল, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীদিগকে দিল না। প্রভু পরিখার মধ্যে আসিয়া ঘাটের ধারে বসিলেন, এবং দুই জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া 'জগন্নাথ আমাকে দর্শন দাও' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

প্রভুর কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ হাসিয়া উঠিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা-সাগরে ডুবিলেন। প্রভু মুখে একটি কথা বলিলেই দানী তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিত, কিন্তু তাহা কেন বলিলেন না? তবে কি প্রভু সত্যই তাঁহাদিগকে ফেলিয়া যাইবেন? এখন ওপারে গেলেই প্রভু হাত-ছাড়া হইবেন, আর তখন কোথায় যাইবেন তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু প্রভু ফেলিয়া যাইবেন কেন? তখন ভাবিতেছেন, তাঁহারা প্রভুকে ইচ্ছামতো কিছু করিতে দেন না। কি জানি, সত্যই যদি তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে যে, ভক্তগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন! এই সব ভাবিয়া, যদিও প্রভু অতি অল্প দূরে বসিয়া আছেন, তত্রাচ তাঁহারা ভুবন আঁধার দেখিতে লাগিলেন। দানী তাঁহাদিগকে বলিল, "তোমরা ত গোসাঞির লোক নও, কড়ি দিলে তোমাদের পার করিয়া দিব।" এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে পরিখার বাহিরে রাখিয়া প্রভুকে পার করিতে চলিল। যাইয়া দেখে, প্রভু "জগন্নাথ, দেখা দাও" বলিয়া, স্ত্রীলোকের ন্যায় বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছেন। সে স্বর শুনিয়া নিঠুর দানীরও হৃদয় দ্রব হইল। তখন দানী, ইনি কে ও ব্যাপার কি, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল "গোসাঞি! ইনি কে? এত কান্দেন কেন? মানুষের

এত নয়ন-জল ত কখন দেখি নাই? ক্রন্দনও ত কখন শুনি নাই? তোমরা কি সত্যই ঐ ঠাকুরের লোক?" তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "শুন নাই কি, উনি নবদ্বীপের অবতার, স্বয়ং ভগবান, এখন সন্ন্যাসী হইয়া জীব উদ্ধার জন্য নীলাচলে চলিয়াছেন। আমরা উঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছি,"—বলিয়াই সকলে কাঁদিয়া উঠিলেন। দানীও সেই সঙ্গে কাঁদিতে লাগিল, এবং ভক্তগণকে যত্ন করিয়া পরিখার মধ্যে লইয়া গেল। দানী তখন প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিল, "কোটী জন্মের পুণ্যফলে আজ তোমার চরণ দর্শন করিলাম।" তখনই দানীর সমুদয় বন্ধন মোচন হইল, আর সকলে হরি হরি বলিয়া প্রভুসহ নৌকায় উঠিয়া পার হইলেন।

উড়িষ্যার পথে দুই ভয়,—ডাকাতির ও ঘাটপালের। দুই রাজায় যুদ্ধ হইতেছে বলিয়া দুই সীমানার মধ্যস্থলে কোন রাজারই শাসন নাই, লোকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। তাহার পর সমস্ত পথ জঙ্গলময়, ডাকাতি করিলেও ধরে কে? কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার গণ সমুদয় দায় হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। উপরে এক দানীর কাহিনী বলিলাম; আবার কবি কর্ণপুর এই উপলক্ষে কি বলিতেছেন শুনুন—

আর শুন এক অদ্ভুত কহি চমৎকার। গ্রামে গ্রামে বড়ই কপট ঘট্টপাল।।
মহারণ্য পর্বতে যতেক বাটপাড়। পথিক লোকের তারা বড় শঙ্কাকর।।
সে সকল দস্যু দেখি গৌরাঙ্গ ঈশ্বর। কান্দিয়া ঢলিয়া পড়ে পৃথিবী উপর।।
"কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলে, নেত্রে বহে প্রেমধার। গড়াগড়ি যায়, দেহে প্রেমের সঞ্চার।।

এই প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ্যে সকল সময়ে শক্তি-সঞ্চার করিতেন না। শ্রীনবদ্বীপে, সকল কার্য্যই প্রায় গোপনে সাধন করিতেন, ইচ্ছাপূর্বক আপনাকে ধরা দিতেন না। কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া গৌড়দেশ ত্যাগ করিয়া যখন নীলাচলে চলিলেন, তখন অসীম শক্তির সহায়তা লইতে বাধ্য হন। পথিমধ্যে একজনকে উদ্ধার করিতে হইবে। দৃষ্টিমাত্র কার্য শেষ করা চাই। তাহা না হইলে সেখানে থাকিতে হয়, কিন্তু থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই সম্বন্ধে একটী কাহিনী বলিব। প্রভু বিভোর হইয়া চলিয়াছেন, সঙ্গে ভক্তগণ। সেই পথে একজন রজক কাপড় কাচিতেছিল। সেখানে আসিয়া প্রভু হঠাৎ যেন চৈতন্য পাইয়া রজকের দিকে যাইতে লাগিলেন। ভক্তগণও সেই সঙ্গে চলিলেন। তাঁহাদের আগমন রজক আড়চোখে দেখিয়া আপন মনে কাপড় কাচিতে লাগিল। এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ রজকের নিকট যাইয়া বলিতেছেন, "ওহে রজক! একবার হরি বল।" সাধুগণ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন ভাবিয়া, রজক বলিল, "ঠাকুর! আমি অতি গরীব, কিছু ভিক্ষা দিতে পারিব না। "প্রভু বলিলেন, "রজক! তোমার কিছু ভিক্ষা দিতে হইবে না, তুমি কেবল হরি বল।" রজক তখন ভাবিতেছেন, "ঠাকুরদের মনে কোন অভিসন্ধি আছে, নচেৎ আমাকে হরি বলিতে বলিবেন কেন, অতএব হরি না বলাই ভাল।" এই ভাবিয়া মুখ না তুলিয়া কাপড় কাচিতে কাচিতে রজক বলিল, "ঠাকুর আমার কাচ্চাবাচ্চা আছে। আমি পরিশ্রম করে তাহাদের অন্ন-সংস্থান করি। আমি এখন হরিবোলা হলে, তাহারা উপোষ করে মরবে।" প্রভু বলিলেন, "রজক! তোমার কিছু দিতে হবে না, শুধু একবার হরি বল।" রজক ভাবিতেছে, "এ দায় ত মন্দ নয়! কি জানি, কি হইতে কি হইবে, কাজেই হরিনাম না লওয়াই ভাল।" ইহাই সাব্যস্ত করিয়া রজক বলিল, "ঠাকুর! তোমাদের কাজ-কর্ম নাই, আমরা পরিশ্রম করে পরিবার পালন করি। আমি কাপড় কাচব, না হরিনাম লব?" প্রভু বলিতেছেন, "রজক! যদি তুমি দুই কাজ একসঙ্গে না করতে পার, তবে আমি কাপড় কাচিতেছি, তুমি হরি বল।" এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ ও রজক ত অবাক। তখন রজক ভাবিতেছেন, গোঁসাইয়ের হাত ছাড়ান মহা দায় হয়ে পড়ল, তা এখন করি কি? যাহা থাকে

কপালে তাহাই হবে, ইহাই ভাবিয়া বলিতেছে, "ঠাকুর! তোমার কাপড় কাচতে হবে না, তুমি শীঘ্র বল আমায় কি বলতে হবে, আমি তাই বলছি।" এ পর্যন্ত রজক মুখ উঠায় নাই। কাপড় কাচা রাখিয়া এখন সে মুখ উঠাইয়া প্রভুর পানে চাহিয়া উপরের কথাগুলি বলিল। সে দেখিল, সন্ন্যাসী সকরুণ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া আছেন, আর তাহার নয়ন দিয়া ধারা পড়িতেছে। ইহাতে রজক একটু মুগ্ধ হইয়া বলিতেছে, "ঠাকুর! কি বলব, বল।" প্রভু বলিলেন, "রজক! বল 'হরিবোল'।" রজক তাহাই বলিল। তখন প্রভু বলিলেন, "রজক! আবার বল 'হরিবোল'। রজক আবার বলিল,—'হরিবোল'। রজক এই দুইবার প্রভুর অনুরোধক্রমে হরিবোল বলিয়া একেবারে আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইল, এবং বিহ্বল হইয়া গেল। তখন নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও, যেন গ্রহগ্রস্ত হইয়া, আপনিই ক্রমাগত 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে লাগিল। এইরূপে হরিবোল বলিতেছে, আর ক্রমে বিহ্বল হইতেছে। বলিতে বলিতে শেষে একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইল, তাহার নয়ন দিয়া অজস্র ধারা বহিতে লাগিল, আর একটু পরেই রজক দুই বাহু তুলিয়া, "হরিবোল, হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ভক্তগণ ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন। কিন্তু প্রভুর কার্য সমাধা হইয়াছে, তিনি দ্রুতবেগে চলিলেন, ভক্তগণও সঙ্গে চলিলেন। অল্প দূরে যাইয়া প্রভু বসিলেন, আর ভক্তগণ রজকের কাণ্ড দেখিতে লাগিলেন। রজক ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেছে, প্রভু যে চলিয়া গিয়াছেন, তাহার সে জ্ঞান নাই। তখন সেই ভাগ্যবান্ আপনার হৃদয়ে গৌর-রূপ দেখিতেছেন! ভক্তগণের বোধ হইল, রজক যেন একটি যন্ত্র। প্রভু কল টিপিয়া আড়ালে আসিলেন, আর সেই কল "হরিবোল" বলিতে ও নাচিতে লগিল। একটু পরে রজকের স্ত্রী স্বামীর আহারের দ্রব্য লইয়া আসিল, কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কিছু বুঝিতে না পারিয়া, শেষে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার ইচ্ছায় বলিল, ও আবার কি? তুমি নাচতে শিখলে কবে?" কিন্তু রজক উত্তর দিল না, পূর্বকার মত দুই হাত তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়া "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল! রজকিনী বুঝিল যে স্বামীর বাহ্যজ্ঞান নাই, আর তাহার কি একটা হইয়াছে। তখন ভয় পাইয়া চীৎকার করিতে করিতে গ্রামের ভিতর দৌড়িল ও লোক ডাকিতে লাগিল। তাহার চীৎকারে গ্রামের লোক ভাঙ্গিল। তাহারা আসিলে, রজকিনী অতি ভীতভাবে বলিল যে তাহার স্বামীকে ভূতে পাইয়াছে। দিনের বেলায় ভূতের ভয় নাই ভাবিয়া সকলে রজকের কাছে যাইয়া দেখে যে, সে বিভোর হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছে, আর তাহার মুখ দিয়া লালা পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া প্রথমে ভয়ে কেহ তাহার নিকট যাইতে সাহসী হইল না। পরে সাহস করিয়া একজন ভাগ্যবান লোক তাহাকে ধরিল। ইহাতে রজকের অর্ধ-বাহ্য জ্ঞান হইল। রজক আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গন পাইয়া সেই ব্যক্তিও "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিয়া উঠিল! তখন ইহারা দুইজনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই মহাবায়ু জনে জনে ধরিল, এমন কি রজকিনীও সেই মদে উন্মত্ত হইলেন। এই যে দৃষ্টি মাত্র শক্তিসঞ্চার, ইহার বিস্তারিত বর্ণনা পরে করিব। সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রভু দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণে বাহির হন। ক্রমে দুই বৎসর কাল সমগ্র ভারতবর্ষে এই ভাবে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। তিনি যাহাকে আলিঙ্গন করিতেন, কেবল সে যে শক্তি পাইত তাহা নয়, তাহার শক্তি-সঞ্চারের শক্তিও প্রায় পূর্ণমাত্রায় লাভ হইত। যেমন উষ্ণজলের মধ্যে আবার শীতলজলপূর্ণ পাত্র রাখিলে সে জলও উষ্ণ হয়, এবং শেষোক্ত উষ্ণজলের মধ্যে আবার শীতলজলপূর্ণ পাত্র রাখিলে সে জলও উষ্ণ হয়, তবে ক্রমে এই উষ্ণতা কমিয়া আসে, সেইরূপ প্রভুর যে শক্তি তাহা সঞ্চারিত-ব্যক্তির পূর্ণমাত্রায় লাভ হইল না। আবার সঞ্চারিত-ব্যাক্তি যাহাকে সঞ্চার করিলেন তাহারও ঐরূপ সঞ্চারকের পূর্ণ-শক্তি প্রাপ্তি হইল

না। এই গেল সাধারণ নিয়ম। কিছু এরূপও কখন কখন হইত যে, সঞ্চারক অপেক্ষা সঞ্চারিত-ব্যক্তি অধিক শক্তিসম্পন্ন হইতেন। সে হইত যখন সঞ্চারক অপেক্ষা সঞ্চারিত ব্যক্তি অধিক অধিকারী কি বড়ো সাধক হইতেন। অধিকার সকলের সমান হয় না, আবার উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টাও সকলে সমান করে না। শাস্ত্রে আছে যে, গৌর-অবতারে পাত্র মোটে সাড়ে তিন জন, যথা—স্বরূপ, রামরায়, শিখি মাহিতী ও মাধবী দাসী। স্বরূপ—ইনি নবদ্বীপের পুরুষোত্তম আচার্য, যাঁহাকে পূর্বে একবার আমরা পাঠকবর্গকে গললগ্নীবাসে প্রণাম করিতে বলিয়ছি। অপর আড়াই জন পাত্রের কথা পাঠক ক্রমে জানিতে পারিবেন। পাত্র মানে এই যে, ইঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ-দত্ত সুধা যতখানি গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, এত আর কোনো ভক্ত পারেন নাই। অতএব যাহার হৃদয়ে এই ভক্তি কি প্রেম-সুধারস যতখানি ধরে তিনি সেইরূপ অধিকারী হন। অধিকার সকলের সমান নয়;—কেন নয়, তাহা বলিতে পারি না, তাহা লইয়া বিচার করিতে পারি মাত্র, তাহাও এ স্থলে করিব না। এই যে অধিকার, ইহার পরিবর্ধন করার চেষ্টাকেই সাধন করা বলে। যেমন কর্কশ-কণ্ঠ কোনো ব্যক্তি সাধনার দ্বারা সুকণ্ঠ হইয়া ভাল গায়ক হইতে পারেন, সেইরূপ অল্প অধিকারী হইয়াও সাধনার দ্বারা একজন ক্রমে অধিক অধিকার অর্জন করিতে পারেন। পথে চলিবার সময় শ্রীগৌরাঙ্গ কাহাকে কৃপা করিতেছেন, কাহাকে করিতেছেন না;—ইহার কি কারণ তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে যে তিনি বাছিয়া বাছিয়া লোক উদ্ধার করিতে করিতে গমন করিতেন, তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। পথে কত লোক, কত সাধু দেখিলেন, কিন্তু কৃপা করিলেন রজককে। রজকের দ্বারা কেবল যে তাহার গ্রামবাসীদিগকে কৃপা করিলেন তাহা নয়, সে অঞ্চল ভক্তিতরঙ্গে ডুবিয়া গেল।

দানীর সঙ্গে প্রভুর আরও দুইবার গোল হইবার কথা শুনা যায়। একবার কোনো দানী মুকুন্দকে বন্ধন করে। তাহার নিকট কপর্দক না পাইয়া তাঁহার ছেঁড়া কম্বল কাড়িয়া লয়। কিন্তু ইহা কোনো কার্যে আসিল না দেখিয়া, দানী সক্রোধে কম্বলখানি ছয় খণ্ড করিয়া ছয় জনের দানস্বরূপ গ্রহণ করিল। কিছুক্ষণ পরে সেই খেওয়ারীর কর্তা আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিল ও সমুদয় শুনিল। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

"এ বোল শুনিয়া সেই সঙ্কোচ অন্তর। নূতন কম্বল দিল দানীর ঈশ্বর।।"

ইহার পূর্বে প্রভু আর এক স্থানে পার হইয়া উত্তেজিত অবস্থায় দ্রুতগমনে যাইতে যাইতে হঠাৎ দাঁড়াইলেন এবং শেষে ফিরিলেন। প্রভুর হঠাৎ ফিরিবার কারণ ভক্তেরা কিছু বুঝিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না, তাঁহার পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। শেষে দেখিলেন যে, বহু যাত্রীকে দানী নানারূপ যন্ত্রণা দিতেছে। প্রভু আসিবামাত্র কি হইল শ্রবণ করুন। যথা চৈতন্য-মঙ্গলে—

"প্রভুকে দেখিয়া যাত্রী কান্দে উভরায়। ত্রাস পাএগ শিশু যেন মায়ের কোলে যায়।
প্রভুর চরণে পড়ি কান্দে সর্বজন। দেখিয়া পাপিষ্ঠ দানী ভাবে মনে মন।।
এরূপ মানুষ নাই জগত ভিতরে। এই নীলাচলচাঁদ জানিল অন্তরে।।
এতেক চিন্তিয়া মনে সেই মহাদানী। প্রভুর চরণে পড়ি বহে কাকু বাণী।।

যাত্রীগুলি উদ্ধার করিয়া প্রভু আবার নীলাচলে চলিলেন। উড়িষ্যায় প্রবেশ করিয়াই প্রভু দেখিলেন যে, রাজপথে গমন তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক হইতেছে না। তিনি আপন মনে যাইবেন। ভক্তগণ যে তাহার পাছে পাছে আসিতেছেন, ইহাও তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। এই জন্য তাঁহাদের উপর তিনি মহা বিরক্ত। আবার রাজপথে উঠিয়া দেখেন যে, প্রতাপরুদ্রের সহিত গৌড়ের বাদশাহের যুদ্ধ চলিতেছে। রাজপথ সৈন্য ও হাতী-ঘোড়ার কোলাহলে চলিবার যো নাই। প্রভু বিরক্ত হইয়া বনপথে চলিতে লাগিলেন। তবে তীর্থস্থান

দর্শনের জন্য মাঝে মাঝে রাজপথে আসিতে হইতেছে। তবু প্রভুর কণ্টক হইতেছেন—নিজ-গণ। যদিও প্রভু নাসিকায় ভোজন করিবেন সংকল্প করিয়াছেন, তবু নানা প্রকারে ভক্তগণ তাঁহাকে মাঝে মাঝে ভোজন করান এবং নানা প্রকারে তাঁহার সেবা করেন। প্রভুর ইহা ভাল লাগে না। তিনি ভক্তগণ সহ সুবর্ণরেখা নদীর পরিষ্কার জলে স্নান করিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ ভক্তগণকে বলিলেন, "হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমি আগে যাই, আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না;" প্রভুর এই চরিত্র দেখিয়া ভক্তেরা একটু হাস্য করিলেন, কিন্তু বড়ো চিন্তিতও হইলেন। তাহার অভিসন্ধি কি, তাহা কে জিজ্ঞাসা করে, আর কেই বা তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন বা পালন করে, অর্থাৎ তাঁহাকে একা যাইতে ছাড়িয়া দিতে পারে? কাজেই ভক্তগণ উত্তর দিতে পারিলেন না। তবে মুকুন্দ বলিলেন, "প্রভু আপনি গমন করুন, আমরা পাছে রহিলাম।" এই কথা শুনিয়া মহাহর্ষিত হইয়া প্রভু হুঙ্কার করিয়া, শ্রীজগন্নাথের উদ্দেশে দৌড়িলেন; প্রভু একটু দূরে গেলে, ভক্তগণও তাঁহার পশ্চাৎ দৌড়িলেন। তাঁহাদের মনের ভাব, তাঁহারা অলক্ষিতরূপে তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে করিতে যাইবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের এই "নিঠুরতা" লইয়া একটু বিচার করিব। প্রভু নিজ-জন-নিঠুর। অর্থাৎ তিনি নিজ-জনের সহিত যত নিঠুরতা করেন, তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা তত বৃদ্ধি পায়। প্রীতি যদি কখন আস্বাদ করিয়া থাক, তবে জানিবে যে, যেখানে প্রীতির সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে এইরূপ কোন্দলরূপ ঝড়ে ইহার মূল আরো শক্ত হয়। মনে করো, স্বামী যদি উদাসীন হইয়া যান, আর স্ত্রীকে পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে প্রহার করেন, কি তাঁহাকে লুকাইয়া পলায়ন করেন, তবে কি সেই স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ক্রোধ হয়? না, প্রেম আরো বৃদ্ধি পায়? ইহাও সেইরূপ।

প্রভু এক দৌড়ে জলেশ্বর আসিলেন। ইহা শিবের স্থান। এখানে বহুতর মন্দির বিরাজমান। জলেশ্বর-শিব সেখানকার প্রধান ঠাকুর। প্রভু সন্ধ্যার সময় সেখানে আসিলেন। তখন সবে আরত্রিক আরম্ভ হইয়াছে। শিবের পূজার মহা আয়োজন হইতেছে, এবং বহুতর বাদ্য বাজিতেছে। পূজার সজ্জা দেখিয়া প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইলেন, এবং সেখানে যাইয়াই সেই ঢাকের বাদ্যের সহিত নাচিতে লাগিলেন। প্রভুর ভাব দেখিয়া সকলে ভক্তি-তরঙ্গে ডুবিয়া গেলেন; তখন বোধ হইল শিব যেন স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। যথা চৈতন্য-ভাগবতে—

"করিতে আছেন নৃত্য জগৎ-জীবন। পর্বত বিদরে হেন হুঙ্কার গর্জন।।
দেখি শিবদাস সবে হইল বিস্মিত। সবেই বলেন শিব হইল বিদিত।।
আনন্দে অধিক সবে করে গীত বাদ্য। প্রভু নাচিতেছেন, তিলার্ধেক নাই বাহ্য।।

ভক্তগণ প্রভুর সঙ্গে দৌড়িয়াছেন, কিন্তু পারিবেন কেন? তাহাতে আবার অনাহার। তবুও প্রভু বেশী অগ্রে আসিতে পারেন নাই। কারণ ভক্তগণ প্রাণপণে দৌড়িয়াছেন। প্রভু যখন আনন্দে পাগল হইয়া সকলকে পাগল করিয়াছেন,—যখন শিব আসিয়াছেন ভাবিয়া সকলে আত্মহারা হইয়াছেন, ঠিক সেই সময় ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে কোলাহল শুনিয়া তাঁহারা বুঝিলেন, কি একটা কাণ্ড হইতেছে। কাজেই প্রভুর সহিত যে চুক্তি ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং মুকুন্দ প্রভুর প্রিয়-কীর্তন আরম্ভ করিলেন। এ পর্যন্ত প্রভুর নৃত্যে ও শিবের বাদ্যে মিল হইতেছিল না। কিন্তু মুকুন্দ আসিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলে, প্রভুর আনন্দ সর্বাঙ্গসুন্দর ও নৃত্য আরও মধুর হইল। ভক্তগণ গাইতে লাগিলেন, আর প্রভু আনন্দে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। শেষে প্রভুকে ভক্তগণ শান্ত করিলে, তিনি পরম সুখে তাঁহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন এবং সকল কলহ মিটিয়া গেল। ক্রমে তাঁহারা বাঁসদহা পথে, তমলুক অতিক্রম করিয়া, রেমুনাতে আসিলেন। রেমুনা রাজপথের ধারে, গোপীনাথের স্থান। ঠাকুর গোপীনাথ দ্বিভুজ মুরলীধর।

প্রভু এই প্রথম দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্তি দেখিলেন, ও ভক্তগণকে দেখাইলেন। এ কথার তাৎপর্য বলিতেছি। প্রভু প্রকাশ হইয়াই দ্বিভুজ-মুরলীধর-ধ্যান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তখন সকলে শ্রীকৃষ্ণকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে ধ্যান করিতেন। এখন প্রভু শ্রীভগবানের মাধুয্যভাব শিক্ষা দিবার জন্য অবতীর্ণ। মাধুয্য-ভজন অর্থ শ্রীভগবানকে নিজ-জন অর্থাৎ পতি পুত্র সখা রূপে ভজনা করা। কিন্তু শ্রীভগবান যদি চারিহস্তসম্পন্ন শঙ্খ-চক্র প্রভৃতি-ধারী রহিলেন, তবে তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত নিজ-জন বলিতে পারিবে কেন? সুতরাং মাধুয্য-ভাবে ভজন করিবার অগ্রে শ্রীভগবানের দুখানি হাত ফেলিয়া দিতে হইবে। আর যে দুখানি থাকিবে তাহাতে এমন বস্তু দিতে হইবে যাহা মনোহর ও মনুষ্যের ব্যবহার-উপযোগী। অর্থাৎ প্রভু বৃন্দাবনের শ্রীনন্দনন্দনের ভজনা উপদেশ দিতে লাগিলেন। শ্রীনন্দের নন্দন চতুর্ভুজ নহেন; তাহা হইলে নন্দ তাহাকে দিয়া কিরূপে মাথায় বোঝা বহাইবেন, কি যশোদা তাঁহাকে বন্ধন করিবেন? শ্রীনন্দের নন্দন দ্বিভুজ মুরলীধর, আর প্রভু মাধুর্য-ভজনের নিমিত্ত এইরূপ ঠাকুরের ধ্যান শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

প্রভু এই ন্যায়সঙ্গত কথা বলিবামাত্র ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যাহারা বাহিরের লোক, তাহারা তর্ক উঠাইত যে, যদি দ্বিভুজমুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানের বস্তু হইলেন, তবে এরূপ প্রাচীন মূর্তি নাই কেন? ভক্তগণ এ কথার উত্তর দিতে পারিতেন না। কিন্তু রেমুনার গোপীনাথ বহুদিনের প্রাচীন মূর্তি, আর তিনি দ্বিভুজ-মুরলীধর। তাই প্রভু ভক্তগণ সহ বনপথ ছাড়িয়া, রাজপথে রেমুনার গোপীনাথকে দর্শন করিতে আসিলেন। এই ঠাকুর উদ্ধব কর্তৃক বারাণসী নগরে স্থাপিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে রেমুনাতে আনা হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই কথা স্মরণ করিয়া "উদ্ধব" বলিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে ঠাকুরের অগ্রে আসিয়াই প্রথমে "উদ্ধবের ঠাকুর" বলিয়া অঞ্জলি-বদ্ধ করিয়া মস্তক স্পর্শ করিলেন, এবং পরে শ্রীগোপীনাথকে প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্য-মঙ্গলে—

"উদ্ধব উদ্ধব বলি ডাকে আর্তনাদে। প্রেমায় বিহ্বলে প্রভু ভূমে পড়ি কান্দে।।
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার। পুলকে ভরল অঙ্গ কম্প বারে বার।।"

গোপীনাথের দাসগণ প্রভুর রূপ গুণ ও প্রেম-তরঙ্গ দেখিয়া বিহ্বল হইলেন। তখন কে গোপীনাথ, ইহা তাঁহাদের ভ্রম হইতে লাগিল। প্রভু নৃত্য করিতে করিতে গোপীনাথকে প্রণাম করিলেন। অমনি শ্রীগোপীনাথের মস্তকস্থিত পুষ্পরচিত চূড়া খসিয়া প্রভুর মস্তকে পড়িল। প্রভু উহা মস্তকে ধারণ করিয়া আরও স্ফূর্তির সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। আবার ভাবের তরঙ্গে কিয়ৎকালের নিমিত্ত নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়া, ঠাকুরের অগ্রে দাঁড়াইয়া, করজোড়ে এই শ্লোক পড়িয়া গোপীনাথের স্তব করিলেন, যথা—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৬ষ্ঠ অঙ্ক—

"ন্যঞ্চৎ ক ফোণিনমদংসমুদঞ্চদগ্রং তির্য্যক্ প্রকোষ্ঠকিয়দাবৃত পীনবক্ষাঃ।
আরজ্যমানবলয়ো মুরলীমুখস্য শোভাং বিভাবয়তি কামপি বামবাহুঃ।।
আকুঞ্চনাকুলকফোণিতলাদিবাধো, লব্ধ স্রুতা মধুরিমামৃত ধারয়ৈব।
আপ্লাবয়ন্ ক্ষিতিতলং মুরলীমুখস্য লক্ষ্মীং বিলক্ষয়াত দক্ষিণবাহুরেব।।"

ক্রমে লোক সমবেত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রভুর নৃত্যের বিরাম নাই। চৈতন্য-মঙ্গলে—

"চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বোলে। আকাশ পরশে যেন প্রেমার হিল্লোলে।।"

এইরূপে সমস্ত দিন নৃত্য চলিল। সন্ধ্যা হইলে ভক্তগণ অনেক যত্ন করিয়া প্রভুকে বসাইলেন এবং সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া মনসুখে কৃষ্ণকথা কহিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "এই যে ঠাকুর, ইনি একবার ভক্তের নিমিত্ত ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন, তাই ইহার নাম "ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ"। ভক্তগণের অনুরোধে প্রভু এই কাহিনী বলিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুরী শ্রীপ্রভুর গুরু, আর ঈশ্বরপুরীর গুরু মাধবেন্দ্রপুরী। ইঁহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

এই মাধবেন্দ্রর নিকট শ্রীঅদ্বৈত মন্ত্র গ্রহণ করেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও বিল্বমঙ্গল যে সকল রসের পদ লেখেন, প্রভু তাহা জীবন্ত করিলেন। সেইরূপ মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমভক্তি-ধর্মের বীজ রোপণ করিয়া যান, প্রভু তাহাই অঙ্কুরিত ও পরিশেষে ফলবান করিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী ভারতবিখ্যাত। তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক, প্রভুর পূর্বে কেহ কখন দেখেন নাই, শুনেনও নাই। মাধবেন্দ্রপুরীর মেঘ দেখিলে কৃষ্ণস্ফূর্তি হইত, ও তিনি অচেতন হইতেন। তখনকার কালে সে অতি বড়ো কথা। অবশ্য প্রভু অবতীর্ণ হইয়া যে বন্যা উঠাইলেন, তাহার নিকট মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমের তুলনা হয় না। কিন্তু তাহাই বলিয়া প্রভু তাহা বলিতেন না। ''মাধবেন্দ্র'' নাম করিতে প্রভু বিহ্বল হইতেন। এই মাধবেন্দ্রপুরী রেমুনার গোপীনাথের এখানে আসিয়াছিলেন। গোপীনাথের এখানে বারখানি ক্ষীর ভোগ দেওয়া হয়। এই বারখানি ক্ষীর ভুবন-বিখ্যাত। মাধবেন্দ্রের ইচ্ছা হইল, এই ক্ষীর আস্বাদ করিয়া দেখিবেন, কেন ইহা ভুবন-বিখ্যাত; এবং ইহার তথ্য জানিতে পারিলে তিনিও তাঁহার ঠাকুরকে ঐরূপ ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া ভোগ দিবেন। মাধবেন্দ্রের মনে এই ইচ্ছা হইলে, তিনি লজ্জিত হইলেন, এবং মন্দিরের দূরে যাইয়া কৃষ্ণ-কীর্তনে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে পূজারী ভোগ দিয়া শয়ন করিবার পর, গোপীনাথ তাহাকে স্বপ্নে বলিলেন,—''একখানি ক্ষীর আমার অঞ্চলের মধ্যে লুকানো আছে। তুমি উহা লইয়া বাজারে মাধবেন্দ্রপুরী নামক যে একজন সন্ন্যাসী কীর্তন করিতেছেন তাঁহাকে দাও। পূজারী মাধবেন্দ্রকে তল্লাস করিয়া তাঁহার অগ্রে ক্ষীর রাখিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, ''গোসাঞি! এই ক্ষীর ধর, ঠাকুর তোমার নিমিত্ত ইহা চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন''। সেই অবধি গোপীনাথের নাম হইল, ''ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ।'' তৎপরে প্রভু মাধবেন্দ্রের গুণ এবং তাঁহার মানবলীলা সম্বরণ ঘটনা, ঈশ্বরপুরীর নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। মাধবেন্দ্র বৃক্ষতলবাসী। তাঁহার অন্তিম কাল উপস্থিত হইলে ঈশ্বরপুরী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আম্লান বদনে গুরুর সেবা ও তাঁহার মলমূত্র পরিষ্কার করিলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি ঈশ্বরপুরীকে তাঁহার সমুদয় কৃষ্ণপ্রেম অর্পণ করিলেন। তাই ঈশ্বরপুরীও শক্তিধর হইলেন, এবং শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহারই নিকট মন্ত্র লইলেন। প্রভু বলিতেছেন,—ঈশ্বরপুরী সেবা করিতেছেন, আর মাধবেন্দ্র ''কৃষ্ণ'' ''কৃষ্ণ'' বলিয়া হৃদয় উঘারিয়া বিলাপ করিতেছেন। ক্রমেই তাঁহার কৃষ্ণ-বিরহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে সেই বিরহ-বেগ একটি শ্লোকরূপে শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইল। সেই শ্লোকটি এই,—

''অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।''*

রাধাভাবে পুরী গোসাঞি বলিতেছেন, ''হে নাথ! দীনজনের দুঃখে দয়ার উদয় হইয়া তোমার কোমল-হৃদয় দ্রবীভূত হয়। হে নাথ। হে প্রিয়! আমার হৃদয় তোমার অদর্শনে কাতর হইয়া তোমাকে ইতি-উতি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। হে মথুরানাথ! আমি কবে তোমায় দেখিব?'' শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন,—এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে পুরী গোসাঞির চক্ষু স্থির হইল! তখন ঈশ্বরপুরী দেখেন যে, পুরী গোসাঞিকে শ্রীকৃষ্ণ লইয়া গিয়াছেন! আর ওই শ্লোকটি পড়িতে পড়িতে প্রভু অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ দেখেন, প্রভুর সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয় নির্জীব হইয়া গিয়াছে। তখন সকলে নানাবিধ সেবা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে প্রভু নিঃশ্বাস ফেলিলেন, পরে—

''প্রেমোন্মাদ হৈল, উঠি ইতি-উতি ধায়। হুঙ্কার করয়ে, হাসে-নাচে কান্দে গায়।।

* এই 'অয়ি দীন' শ্লোকে, শ্রীঠাকুর মহাশয় সুর বসাইয়া এবং আর কয়েকটি চরণ ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া একটি অপরূপ পদের সৃষ্টি করেন।

অয়ি দীন অয়ি দীন বোলে বারে বার। কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী, নেত্রে অশ্রুধার।।
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ বৈবর্ণ্য। নির্বেদ, বিষাদ, জাড্য, গর্ব, হর্ষ দৈন্য।।
এই শ্লোকে উঘাড়িল প্রেমের কবাট। গোপীনাথ-সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট।।
শেষে লোকের সংকট দেখি প্রভুর বাহ্য হইল।"—চৈঃ চরিতামৃত।।

পবিত্র হইব বলিয়া মাধবেন্দ্রপুরীর কথা একটু আলোচনা করিব। তাঁহার নিজের বলিতে কেহই ছিল না, এক কপর্দক সম্পত্তিও ছিল না। রোগাক্রান্ত অবস্থায় বৃক্ষতলে শুইয়া আছেন; ঈশ্বরপুরী তাঁহার সেবা করিতেছেন। তাঁহার এই অবস্থা মনে করিলে কাহার না হৃৎকম্প হইবে? কিন্তু ইহা তাঁহার নিজের বোধ নাই। কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে। বলিতেছেন, "কৃষ্ণ, তুমি বড়ো দয়াময়, দীনজনের দুঃখ দর্শনে তোমার কোমল হৃদয় দ্রব হয়!" তিনি যে এই অবস্থায় কৃষ্ণকে দয়াময় বলিয়া আদর করিতেছেন, ইহা কি বিদ্রূপ করিয়া? না,—তাহা কখনও নয়। তবে তিনি রোগে অভিভূত হইয়া, নিঃসহায়, বৃক্ষতলে পড়িয়া যে যন্ত্রণা পাইতেছিলেন, তাহার মধ্যেও এমন কিছু ছিল যেজন্য তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইতেছিল। মাধবেন্দ্রপুরী বুদ্ধিতে বিদ্যায় সাধনে অদ্বিতীয়; নতুবা শ্রীঅদ্বৈত আচার্য সমস্ত জগৎ খুঁজিয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবেন কেন? এই মাধবেন্দ্রপুরীর, আমাদের ন্যায় সামান্য জীবের বিবেচনায়, খুব সমৃদ্ধিশালী হওয়া উচিত ছিল। বহুতর লোক তাঁহার অনুগত থাকিবে, রাজা মহারাজগণ তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইবেন ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের বিচারে তিনি ইহার কিছুই পাইলেন না; তবে পাইলেন কি, না--রোগ, বৃক্ষতল, কাঠের একটি জলপাত্র ও একটি কৃপালু শিষ্যের সেবা! তবু তিনি আনন্দে গদ্‌গদ্ হইয়া, তাঁহার সমুদয় যন্ত্রণা ভুলিয়া মৃত্যুকালে বলিতেছেন,—"হে দীনদয়ার্দ্রনাথ।" ইহার তাৎপর্য কি? শুধু তাহাও নয়। তিনি যে মৃত্যুকালে অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণকে দীনদয়ার্দ্রনাথ বলিয়া আদর করিতেছিলেন, তুমি সিংহাসনে বসিয়া, শত সহস্র লোক দ্বারা সেবিত হইয়া, মহা সুখের সময়ও তাহা বলিতে পার না! কেন? ইহার একমাত্র এই উত্তর সম্ভব যে, তোমার সিংহাসন ও দাস-দাসী দ্বারা যে সুখ তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অন্যজাতীয় সুখ মাধবেন্দ্রের ছিল। নতুবা তিনি মৃত্যুকালে রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া এ কথা বলিতে পারিতেন না। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শ্রীভগবান জীবন্ত সামগ্রী, ও তাঁহার ভক্তগণও এই "ভবের বাজারে" সার্থক "বিকি-কিনি" অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকেন।

আবার দেখুন, মাধবেন্দ্র "হে দীনদয়ার্দ্রনাথ! আমি তোমাকে না দেখিয়া দুঃখ পাইতেছি" বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। সামান্য জীবে মৃত্যুকালে যাহা বলে, যথা "আমার গা জ্বলিতেছে," কি "উদরে যন্ত্রণা হইতেছে," কি "অঙ্গ অবশ হইতেছে, আমার প্রাণ গেল," এরূপ ভাবের কোনো কথা তিনি একবারও বলিলেন না। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন?

কোনো কোনো পণ্ডিত লোকে বলেন, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া আপনি হয়, অর্থাৎ নিসর্গই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান্ বলিয়া আর কোনো পৃথক্ বস্তু নাই। জ্ঞানী লোকের এই কথায় আমার তত দুঃখ নাই, যেহেতু তাঁহারা ইহাও বলেন যে, স্বভাবের সৃষ্টিতে জটিলতা নাই; যথা, স্বভাব যেমন অভাব দিয়াছেন, তেমনি অভাব দূর করিবার বস্তু দিয়াছেন; যেমন পিপাসা দিয়াছেন, তেমনি জল দিয়াছেন; যেমন ক্ষুধা দিয়াছেন, তেমনি অন্ন দিয়াছেন; শিশুর জন্মিবার অগ্রে মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। স্বভাবই যদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, আর সে সৃষ্টির যদি ভুল না থাকে, তবে "আমি কখন মরিব না," কি "কৃষ্ণ দরশন দাও নতুবা প্রাণে মরিব,"—এ সমুদয় ভাব তিনি কেন দিলেন? আমি মরিব, অর্থাৎ একেবারে

বিলুপ্ত হইয়া যাইব, জীবে ইহা ভাবিতেও পারে না। স্বভাবের সৃষ্টিতে যদি জটিলতা না থাকে, তবে ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণীকৃত হইবে যে, জীব বিলুপ্ত হইবে না। যদি শ্রীভগবান্‌রূপ বস্তু না থাকিতেন, তবে স্বভাব জীবকে ঈশ্বরের ভাব মনে আসিতে দিতেন না। যদি শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার সম্ভাবনা না থাকিত, তবে স্বভাব কৃষ্ণের প্রতি লোভ দিতেন না। স্বভাব লোভ দিবেন, লোভের বস্তু দিবেন না,—ইহা অসম্ভব।

এই যে মাধবেন্দ্রপুরী "কৃষ্ণ! দেখা দাও, প্রাণ যায়," বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন, স্বভাবের দৃষ্টিতে যদি ভুল না থাকে, তবে কৃষ্ণ তখন কি করিবেন, তাহা সংসাররূপ গ্রন্থে স্বভাব লিখিয়া রাখিয়াছেন। যখন গো-বৎস হাম্বা রবে ডাকিতে থাকে, তখন তাহার দূরবর্তী জননী সেই ডাক শুনিবামাত্র হাম্বা বলিয়া উত্তর দিয়া দৌড়িয়া আইসে। যেমন মাধবেন্দ্র "কৃষ্ণ দর্শন দাও, প্রাণ যায়" বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, আর কৃষ্ণ "এই যে আমি" বলিয়া দর্শন দিলেন; স্বভাব পরোক্ষে ইহা প্রমাণ করিতেছেন। ইহা যদি না হয় তবে সমুদয় মিথ্যা, যে স্বভাব লইয়া নাস্তিকেরা গৌরব করেন, সে স্বভাবও মিথ্যা। যাহা হউক, প্রভু শান্ত হইলে গোপীনাথের সেবকগণ প্রসাদী বারখানা ক্ষীর আনিয়া প্রভুর সম্মুখে ধরিলেন। প্রভু কিছু লইলেন, এবং ভক্তগণ সহ সেবা করিলেন। তথা হইতে সকলে জাজপুরে আসিলেন। জাজপুর তখন বড় সমৃদ্ধিশালী স্থান। এখানকার প্রধান ঠাকুর আদিবরাহ। ইহা বিরজাদেবীরও স্থান বটে। শুধু তাহাও নয়। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

জাজপুরে আছয়ে যতেক দেবস্থান। লক্ষ লক্ষ বৎসরেও নৈতে নারি নাম।।
দেবালয় নাহি হেন নাহি সেই স্থানে। কেবল দেবের বাস জাজপুর গ্রামে।।

প্রকৃত কথা, ভারতবর্ষের প্রধান সম্পত্তি দেবালয়। জাজপুরের যে অবস্থা, এক-কালে সমস্ত ভারতবর্ষের সেই অবস্থা ছিল। মুসলমানগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া এই সমুদয় দেবালয় ভঙ্গ করিতে লাগিল, তাহাতে ভারতবর্ষ এক প্রকার দেবালয়শূন্য হইল। কিন্তু উড়িষ্যায় মুসলমান প্রবেশ করিতে না পারায় ভারতবর্ষের পূর্বকার অবস্থার সাক্ষী স্বরূপ উৎকলদেশ ছিল। জাজপুরে কাজেই বহুতর ব্রাহ্মণ দেবালয় লইয়া জীবন-যাপন করিতেন। জাজপুরের আর এক সম্পত্তি বৈতরণী নদী। ইহার দশাশ্বমেধঘাটে প্রভু গণসহ স্নান করিয়া বরাহ দর্শন করিতে গেলেন। সেখানে বহুক্ষণ নৃত্য করিয়া প্রভু অন্যান্য দেবালয় দেখিতে চলিলেন। প্রভু বিরজাদেবীকে দর্শন করিয়া গোপীভাবে অভিভূত হইলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা করিলেন। সকলেই দেবদর্শনে তন্ময় হইয়া আছেন, এই অবকাশে শ্রীগৌরচন্দ্র লুকাইলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া একটি সঙ্কেতস্থান করিয়া, সকলে নগরের সমস্ত দেব-স্থানে প্রভুকে তল্লাশ করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নে সঙ্কেত স্থানে সকলেই আসিলেন। কিন্তু প্রভুকে পাওয়া গেল না। তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "এস আমরা ভিক্ষা করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করি। প্রভু আমাদিগকে ফেলিয়া যাইবেন কেন? আর যদি তিনি প্রকৃতই লুকাইয়া থাকেন, তবে আমাদের কি সাধ্য যে তাঁহাকে তল্লাশ করিয়া ধরিব? মুখে যাই বলুন, তিনি ভক্তবৎসল, আমাদিগকে অনাথ করিয়া কোথাও যাইতে পারিবেন না।" এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া সকলে আহারাদি করিলেন, এবং সেই স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পর দিবস প্রাতে প্রকৃতই প্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হারাধন পাইয়া সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রভুর লুকাইবার আর কোনো কারণ ছিল না। তবে লোকসঙ্গে দেবদর্শনে সুখ পাইবেন না বলিয়া ভক্তগণকে ফেলিয়া একাকী সমস্ত দেবদেবী দর্শন করিতেছিলেন।

ক্রমে তাঁহারা কটকে আসিলেন। কটক উড়িষ্যার রাজধানী প্রতাপরুদ্রের বাসস্থান। সেখানে তখন দিবানিশি সৈন্য-কোলাহল হইতেছে। প্রভু লোকসঙ্গ ভয়ে বনপথেই গমন

করিতেছেন, কেবল যেখানে দেবস্থান সেখানেই রাজপথে আসিতেছেন। প্রভু সাক্ষীগোপাল দর্শন করিতে কটক আসিলেন। রাজা তখন রাজকার্যে ব্যস্ত থাকায় ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। এইরূপে প্রতাপরুদ্রের ভবিষ্যৎ "সংত্রাতা" তাঁহার ভবনের নিকট দিয়া তাঁহার অজ্ঞতসারে চলিয়া গেলেন। কটকের নিম্নে মহানদী। প্রভু গণসহ সেখানে স্নান করিয়া গোপাল দর্শনে গমন করিলেন। সাক্ষীগোপাল ঠাকুরটি শ্রীগৌরাঙ্গেরই মত। উভয়েরই প্রকাণ্ড শরীর, কমল নয়ন ও একরূপ ভঙ্গী। ভক্তগণের বোধ হইতে লাগিল যেন দুই জনেই এক বস্তু, কি এক প্রকার। বিশেষতঃ যখন শ্রীগৌরাঙ্গ ও গোপাল উভয়ে উভয়ের পানে চাহিয়া থাকিলেন, তখন ভক্তগণের মনে হইল দুই জনেই এক, তবে পৃথক হইয়া কথা কহিতেছেন। প্রকৃত কথা, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কৃষ্ণমূর্তি দর্শন করিতেন, তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইত যে, তিনি যেন কোন জীবন্ত বস্তু দেখিতেছেন, ও তাঁহার সহিত মধুর ,আলাপ করিতেছেন। ভক্তগণ দেখিতেছেন, যেন গোপাল ও গৌরাঙ্গ দুই জনে কথা কহিতেছেন। শ্রীচরিতামৃতে এ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা,—

গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি। ভক্তগণ দেখে যেন দুই এক মূর্তি।।
দুঁহে এক বর্ণ, দুঁহে প্রকাণ্ড শরীর। দুঁহে রক্তাম্বর, দুঁহে স্বভাব গম্ভীর।।
মহা তেজোময় দুঁহে কমল নয়ন। দুঁহার ভাবাবেশে দুঁহে শ্রীচন্দ্রবদন।।
দুঁহে দেখি নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙ্গে। ঠারা-ঠারি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে।।

এই সম্বন্ধে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা—

গোপাল-অধর হইতে বেনু ভূমিতে রাখিল।
গৌরচন্দ্র সঙ্গে যেন কথা আরম্ভিল।।"

কটকের মত জনাকীর্ণ স্থানে প্রেমতরঙ্গ উঠাইলে বিষম-ব্যাপার হইবার সম্ভাবনা বলিয়া চুপে চুপে গোপালেব সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রভু গণসহ ক্রমে ভুবনেশ্বর আসিলেন। ভুবনেশ্বরের ন্যায় সুন্দর-মূর্তি জগতে আর নাই। গ্রীস ও রোম দেশের অনেক মূর্তি মনোহর বটে, কিন্তু ভুবনেশ্বরের দেবমূর্তির যে ভঙ্গী তাহা ইউরোপে কিরূপে অনুভূত হইবে? মূর্তি প্রস্তুত করিতে কারিগরি ব্যতীত প্রেমভক্তির চর্চাও চাই। যেরূপ গায়ক প্রেমভক্তির চর্চা করিলে তাঁহার গীতে ভুবন মোহিত করিতে পারেন, সেইরূপ চিত্রকর ভক্তিচর্চা করিলে তাঁহার কারিগরিতে ভুবন মুগ্ধ করিতে পারেন। বিশাখা চিত্র করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন।

ভুবনেশ্বরের শিবের স্থান, কাশীর ন্যায় বিখ্যাত, সেই জন্য উহাকে গুপ্তকাশী বলে। প্রভু শিবের বৈভব দেখিয়া বড়ো সন্তুষ্ট হইলেন, এবং শিবের অগ্রে নৃত্য করিলেন। যথা চৈতন্য-ভাগবতে—

"যে চরণ-রসে শিব বসন না জানে। হেন প্রভু নৃত্য করে সবে বিদ্যমানে।।"

শিবের প্রেমে প্রভু উন্মত্ত হইলেন, যথা—

"মহেশ দেখিয়া প্রভুর আবেশ শরীর। টলমল করে তনু নাহি রহে স্থির।।
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার। পুলকে ভরল অঙ্গ পড়ে বার বার।।

পরদিন প্রাতে বিন্দুসরোবরে আবার স্নান করিয়া সকলে কমলপুরে আসিলেন; এবং ভাগী নদীতে স্নান করিয়া কপোতেশ্বর-শিব দর্শন করিতে চলিলেন; নিত্যানন্দ গেলেন না, ঘাটে বসিয়া রহিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের গৌর ব্যতীত অন্য কোনো ঠাকুর দেখিতে সেরূপ স্পৃহা ছিল না। যাহা হউক, সকলে কপোতেশ্বর-শিব দেখিতে চলিলেন, তখন জগদানন্দ ভাবিলেন যে, ওই সুযোগে ভিক্ষা করিয়া আনিবেন। তিনি ঠাকুরের দণ্ড বহিতেন, ভিক্ষা করিবেন বলিয়া, দণ্ড-খানি শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে দিয়া গেলেন, এবং নিতাই দণ্ড লইয়া ভাগী নদীর তীরে বসিলেন। গৌর কাছে নাই, কাজেই নিতাই শ্রীগৌরাঙ্গের দণ্ডের সহিত কথা

কহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "দণ্ড! তোমার মতো আমারও একখানি দণ্ড ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি; এখন তোমাকে ভাঙ্গিতে পারিলে আমার মনের দুঃখ যায়। ভাল, দণ্ড। আমি ঠাকুরকে হৃদয়ে বহন করি, সে ঠাকুর তোমাকে বহন করেন, তোমার এত বড়ো স্পর্ধা কেন? এখনই তোমার ঘাড় ভাঙ্গিব, দেখি তোমাকে কে রাখে। ঠাকুর বংশী হাতে করিয়া ত্রিজগত মোহিত করিতেন। সেই বংশী তুমি দণ্ড হইয়া তাঁহাকে বৃক্ষতলবাসী কাঙ্গাল করিয়াছ। আজ, দণ্ড! তোমায় আমি দণ্ড দিব।" ফল কথা, শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে তাঁহার ভক্তগণ ও নিজ-জন বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট প্রভুর সন্ন্যাসের সমস্ত উপকরণ বিষের ন্যায় বোধ হইত; কিন্তু কিছু করিতে, বা কিছু বলিতে সাহস পাইতেন না। এখন শ্রীনিত্যানন্দ দণ্ডটীকে পাইয়াছেন, তাহাকে ছাড়িবেন কেন? প্রকৃতই তাহাকে ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করিলেন, করিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন।

জ্ঞানী-লোকে বলে যে, দণ্ডটী বিধির প্রতিরূপ। শ্রীভগবান বিধির ভৃত্য নহেন, তিনি তাহার বাহিরে; তাহাই শ্রীনিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কেহ কেহ বলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম-ধর্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। বিধি-ধর্ম ও প্রেম-ধর্ম পরস্পর বিরোধী। নিতাই প্রেম-ধর্মের পক্ষপাতী ও ফলোপভোগী। তিনি প্রভুর এই দণ্ডরূপ ভণ্ডামী রাখিতে দিবেন কেন? তাই দণ্ড-গাছটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। দণ্ড ভাঙ্গিয়া নিতাই বসিয়া রহিলেন, মনে মনে সাহস বান্ধিতে লাগিলেন যে, প্রভু যদি দণ্ড-ভাঙ্গা লইয়া ক্রোধ করেন, তবে প্রভুর সহিত ঝগড়া করিবেন। সেই হইতে ভাগী নদীর নাম হইল দণ্ডভাঙ্গা নদী!

তৃতীয় অধ্যায়

"শ্যাম-নাগর ডাকে মোরে অঙ্গুলি হেলায়ে।
চাহিছে আমার পানে হাসিয়ে হাসিয়ে।।—চৈতন্য-মঙ্গল গীত।

প্রভু কপোতেশ্বর দেখিয়া আবার চলিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহার যে দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন, ইহার তথ্য লইলেন না; তিনি যে ইহার কিছু অবগত আছেন তাহাও ভক্তগণ জানিতে পারিলেন না। কমলপুর ছাড়িয়াই প্রভু মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই যেন চেতনা পাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি?" ভক্তগণ বলিলেন, "শ্রীমন্দিরের চূড়া"। ইহা শুনিয়া নানাভাবে প্রভুর শরীর তরঙ্গায়মান হইল, এবং এই সকল ভাব অঙ্গে লুকাইবার স্থান না পাইয়া প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল; যথা—

"অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার। বিশাল গর্জনে কম্প সর্ব দেহ ভার।।
প্রাসাদের দিকে প্রভু চাহিতে চাহিতে। চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে।।"

সে শ্লোকটী এই—প্রাসাদাগ্রেনিবসতিপুরঃস্মেরবক্তারবিন্দো,
মমালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ।

প্রভু যখন প্রাসাদগ্র দর্শন করিলেন, তখন স্তম্ভিত হইলেন। প্রভুর মন তখন দাস্যভাবে নীলাচলচন্দ্রে নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্থান বৃন্দাবন। তখন তাঁহার স্থান নীলাচল হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নীলাচলচন্দ্রের মন্দিরে অবস্থিতি করেন। শ্রীমন্দিরের চূড়া—বহুদিন পরে, বহু কষ্টের পরে, বহু সাধনার পরে—প্রভু দর্শন করিলেন। এ চূড়াটি কি, না মন্দিরের সাক্ষী। মন্দির কি, না শ্রীকৃষ্ণ উহার মধ্যে আছেন। প্রভু চিত্তপুত্তলিকার ন্যায় চূড়ার অগ্রভাগ দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখেন যে, বালক বনমালী প্রাসাদাগ্রে দাঁড়াইয়া, হাসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। যেন বলিতেছেন, "এই দেখো, তুমিও যেমন আমাতে মিলিতে ব্যস্ত, আমিও তেমনি তোমাকে অভ্যর্থনার্থে দাঁড়াইয়া আছি।"

শ্রীমন্দিরের চূড়ার উপর বালগোপাল ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া। তাঁহার গলে বনমালা,

মাথায় ময়ূরপুচ্ছ-চূড়া, সর্বাঙ্গ কুসুমমালায় সজ্জিত, বাম-হস্তে মুরলী। শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, আর বনমালী হাসিয়া হাসিয়া, দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা প্রভুকে ডাকিতেছেন। হে ভক্ত! এই চিত্রটি হৃদয়ঙ্গম কর। শ্রীনিমাই যে শ্রীভগবান বলিয়া বালগোপাল দর্শন করিলেন, তাহা নয়। তিনি ভক্তরূপ ধরিয়া ভক্তের কর্তব্যাকর্তব্য, লাভালাভ এবং সুখাসুখ কি, তাহা জীবগণকে দেখাইতেছেন। শ্রীনিমাই যেটুকু ভক্তির বলে গোপাল দর্শন করিলেন, তোমার যদি সেইটুকু ভক্তি হয়, তবে তোমাকেও বালগোপাল হাসিয়া হাসিয়া ঐরূপে ডাকিবেন; প্রভু "প্রাসাদাগ্রে" শ্লোকটি বালগোপাল দর্শনমাত্র রচনা করিয়া অর্ধেক বলিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সুতরাং উহার অপরার্ধ জীবে আর জানিতে পারিল না। কিন্তু প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। আনন্দ এত হইল যে, হৃদয়ে না ধরিয়া উথলিয়া উঠিল। আনন্দ উথলিয়া উঠিতে থাকিলে যতক্ষণ পথ পায় ততক্ষণ এক প্রকার চেতন অবস্থা থাকে। কিন্তু আনন্দ-তরঙ্গের গতিরোধ হইলেই মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। প্রভুর আনন্দ-তরঙ্গ এত হইয়াছে যে, উহার গতি বন্ধ হওয়াতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু মূর্চ্ছা প্রভুকে অধিকক্ষণ ভূমিশায়ী রাখিতে পারিল না। তিনি অল্প-চেতনা পাইয়াই আবার শ্রীমন্দিরের দিকে গমনের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু চেষ্টা মাত্র,—যাইতেছেন, আবার ধূলায় পড়িতেছেন। প্রভু যখন অল্প-চেতন পাইয়া উঠিতেছেন, তখন প্রাসাদাগ্রে চাহিয়াই দেখিতেছেন যে, তিনি দাঁড়াইয়া আছেন; আর চেঁচাইয়া বলিতেছেন, "দেখো! দেখো! কৃষ্ণবর্ণ-শিশু! আহা মরি, কি সুন্দর নীলমণিকান্তি! কি সুন্দর বদন। কি সুন্দর হাস্য! ওই দেখো আমার পানে চাহিয়া মধুর হাসিতেছেন!" কখন বা নিতাইয়ের হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "ঐ দেখ!" নিতাই করেন কি, না দেখিয়াও বলিতেছেন, "হাঁ দেখিতেছি।" আবার কখন প্রভু "দাঁড়াও! দাঁড়াও! আমি এখনই আসিতেছি," বলিয়া দৌড়িতেছেন, কিন্তু আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন! এই স্থানে চৈতন্য-মঙ্গলের অপরূপ বর্ণনা কিছু উদ্ধৃত করিতেছি!*

এইরূপ লীলা করিতে করিতে প্রভু মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন। যে স্নিগ্ধ স্নেহময় মনোহর মুখ সহজ অবস্থায় দেখিলে লোকের জগৎ সুখময় বোধ হয়, এখন সেই বদন নানাভাবে, নানারূপ সৌন্দর্যে পরিশোভিত হইয়াছে! যেমন দ্বাদশবর্ষীরা বালার মনে আবেগ হইলে ঠোঁট অল্প অল্প কাঁপিতে থাকে, প্রভুর সুচিক্কণ হিঙ্গুলরঞ্জিত ঠোঁট সেইরূপ অল্প অল্প কাঁপিতেছে, পদ্মচক্ষু দুটি লোহিত বর্ণ হওয়ায় বোধ হইতেছে যে, সে দুটী কারুণ্য-রসের সরোবর। প্রভুর গলিত-সুবর্ণ অঙ্গ যখন ধূলায় ধূসরিত হইতেছে, তখন অপরূপ শোভা

* স্নান সমাধিয়া প্রভু চলি যান পথে। জগন্নাথ মন্দির দেখিলা আচম্বিতে।।
অভিন্ন অঞ্জন এক বালকের ঠাম। দেউল উপরে প্রভু দেখে বিদ্যমান।।
ভূমিতে পড়িল প্রভু নাহিক সম্বিত। নিঃশব্দে রহিল যেন ছাড়িল জীবিত।।
তা দেখিয়া সব জন চিন্তিত অন্তর। "প্রভু" "প্রভু" বলি ডাকে না দেয় উত্তর।।
হেনই সময়ে প্রভু উঠিলা সত্বর। পুলকিত সব অঙ্গ প্রেমায় বিহুল।।
দেখিয়া সকল লোক জীয়ল পুনর্বার। মরণে শরীরে যেন জীউর সঞ্চার।।
তা সভারে মহাপ্রভু পুছয়ে বচনে। দেউল উপরে কিছু দেখহ নয়নে।।
নীলমণি বরণ কিরণ উজিয়াল। ত্রৈলোক্যমোহন এক সুন্দর ছাওয়াল।।
কিছু না দেখিয়া তারা কহয়ে দেখিল। পুনঃ মোহ পায় পাছে, আশঙ্কা হইল।।
পথে যত দেখে সুকৃতি নরগণ। তারা বলে এই ত সাক্ষাৎ নারায়ণ।।
চতুর্দিকে বেড়িয়া আইসে ভক্তগণ। আনন্দধারায় পূর্ণ সবার নয়ন।।
সবে চারি দণ্ডের পথ প্রেমের আবেশে। প্রহর তিনেতে আসি হইল প্রবেশ।।

হইতেছে। আবার একটু পরেই নয়ন-জলে সমস্ত অঙ্গ ধৌত হওয়ায় অতি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ প্রকাশ পাইতেছে। প্রভুর সুবলিত অঙ্গে অস্থি আছে বলিয়া বোধ হইত না। প্রভুর বয়স প্রকৃত যত তাহা অপেক্ষাও তাঁহাকে অল্পবয়স্ক বোধ হইত। বয়স বৃদ্ধির সহিত তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ-বৃদ্ধি পায় নাই। কাজেই সকলে ভাবিতেছে, ইনি যে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেছেন, ইনিই ত কিশোর-নারায়ণ! প্রভু চলিয়াছেন কিরূপে, যথা চৈতন্য-চরিতামৃতে

"হাসে কান্দে নাচে গায় হুঙ্কার গর্জন। তিন ক্রোশ পথ হৈল সহস্র যোজন।।

কমলপুর হইতে শ্রীক্ষেত্র তিন ক্রোশ, এইটুকু পথ আসিতে দুই প্রহর বেলা হইল। যেমন প্রতাপরুদ্র কটকের রাজা, তেমনি শ্রীজগন্নাথ পুরীর রাজা। ইচ্ছা করিলেই তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না! যথা চন্দ্রোদয় নাটকে—

নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ দরশন। পরিচায়ক বিনা নাহি পায় অন্য জন।।
তার মধ্যে পরদেশী যেই লোক সব। তা সবার দরশন অত্যন্ত দুর্লভ।।
রাজার মনুষ্যে যদি করয়ে সহায়। তবে সে সুলভ হয় জগন্নাথ রায়।।

ভক্তগণ ভাবিতেছেন যে, তাঁহাদের দর্শন কিরূপে হইবে। তাঁহারা পরদেশী, কাহারও সহিত পরিচয় নাই। তবে শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম নীলাচলে আছেন। তিনি সহায়তা করিলে অবশ্য ঠাকুর দর্শন হইতে পারে। কারণ এক প্রকার তিনিই পুরীর রাজা। উড়িষ্যাবাসীরা তাঁহাকে রাজার নীচে সম্মান করেন। তবে তিনি বড়োলোক, রাজমন্ত্রী হইতেও অধিকতর পূজ্য। রাজা তাঁহার আজ্ঞাবহ, তিনি কেন তাঁহাদের ন্যায় উদাসীনদিগকে সহায়তা করিবেন? এই সময় মুকুন্দ বলিলেন যে, গোপীনাথ আচার্য প্রভুর ভক্ত, তিনি নীলাচলে আছেন কাজেই তিনি সহায়তা করিবেন। আর ইনি সার্বভৌমের ভগিনীপতি বলিয়া সহায়তা করিতে সক্ষম হইবেন। অতএব এই গোপীনাথের ভরসাকে প্রধান করিয়া ভক্তগণ নীলাচলে চলিলেন। অবশ্য প্রভু এ পরামর্শের কিছুই জানেন না। আঠারনালায় আসিয়া প্রভু সমুদয় ভাব সম্বরণ করিয়া নিত্যানন্দকে বলিতেছেন, "আমার দণ্ড কোথায়?" নিত্যানন্দ বরাবর ভাবিতেছেন যে, দণ্ডভাঙার দণ্ড হইতে তিনি এড়াইয়াছেন। এখন প্রভুকে দণ্ডের অনুসন্ধান করিতে দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। তবে প্রভু এখন নীলাচলে আসিয়াছেন, আর কি করিবেন? তাহার পরে, সন্ন্যাস-গ্রহণাবধি প্রভু ভক্তদিগের সুখ-দুঃখের কথা না ভাবিয়া আপনার ইচ্ছামত কার্য করিয়াছেন। কাজেই শ্রীনিতাইয়ের মনে রাগও আছে। এই দণ্ড-ভঙ্গ লইয়া প্রভুর সহিত কোন্দল করিবেন, সে সঙ্কল্পও তাঁহার ছিল। কিন্তু প্রভুর সম্মুখে আসিয়া সে সাহস আর থাকিল না। কাজেই নিতাই উত্তর করিতে না পারিয়া মস্তক অবনত করিলেন। তখন প্রভু যেন কৌতূহলী হইয়া অন্যান্য ভক্তজনের দিকে চাহিলেন। জগদানন্দ প্রভুর দণ্ড বহিতেন। তিনি উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী। কাজেই তিনি প্রভুকে বলিলেন, "আমাদের দিকে চাহেন কেন? শ্রীপাদকে জিজ্ঞাসা করুন।" ইহাতে প্রভু জগদানন্দকে দণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। জগদানন্দ বলিলেন, "তাহা তিন খণ্ড হইয়া গিয়াছে। তখন প্রভু একটু হাসিয়া শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, "দণ্ড ভাঙ্গিলে কেন? পথে কি কাহারও সহিত দাঙ্গা করেছিলে? শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "তুমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে, তখন আমার হাতে দণ্ড ছিল। তোমাকে ধরিতে যাইয়া দুই জনের ভারে উহা ভাঙ্গিয়া গেল।" ইহা শুনিয়া জগদানন্দ বলিলেন, "শ্রীপাদ! প্রভুকে বঞ্চনা করিয়া লাভ কি, আর অব্যাহতিই বা কোথা? আমার নিকট দণ্ড ছিল, আমার এখন স্পষ্ট করিয়া বলাই ভাল। প্রভু, শ্রীপাদ কি ভাবিয়া আপনার দণ্ড ভাঙ্গিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন।" তখন প্রভু যেন কোপ করিয়া শ্রীনিতাইয়ের পানে চাহিলেন। নিতাইয়ের এখন, হয় প্রভুর চরণে পড়া, কি কোন্দল করা,—ইহার একটি বাছিয়া লইতে হইবে। কিন্তু একটু কোন্দল করিবার সাধও আছে। তাই বলিলেন, "তা আমি

ইচ্ছা করেই ভেঙ্গেছি। একখানা বাঁশ বৈত নয়? ইহার যে দণ্ড হয়, কর।"

প্রভুর সহিত মুখোমুখি করিয়া নিতাই ভয় পাইলেন, ভক্তগণও চিন্তিত হইলেন। প্রভুও একটু ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসীর দণ্ডে সমস্ত দেবতার বাস, সেই দণ্ডকে বল কিনা একখানা বাঁশ?" প্রকৃত পক্ষে নিতাইয়ের নিকট দণ্ডটা একখানা বাঁশ বই আর কিছু নয়। প্রেমভক্তি ভজনে সন্ন্যাসের বা অন্য নিয়মের প্রয়োজন কি? ব্রজের গোপীগণের মধ্যে কে কবে দণ্ড ধরিয়াছিলেন? কিন্তু নিতাই আর বাড়াবাড়ি না করিয়া একটি বড়ো মধুর উত্তর দিলেন, বলিলেন, "ভাল, তোমার বাঁশে সমুদয় দেবগণ বাস করেন। তুমি বুঝি এখন তাঁহাদিগকে ঘাড়ে করিয়া বেড়াইবে? আমরা তাহা কিরূপে সহিতে পারি?" এ কথায় প্রভুর ক্রোধ গেল না। কিন্তু ভক্তগণের যেরূপ ভয় হইয়াছিল তেমন কিছু ক্রোধ প্রভু করিলেন না। তবে, প্রভু বড়োই ক্রোধ করিবেন তাহা ভাবিবার কারণ ছিল। প্রভু কাহাকেও নিয়ম ভঙ্গ করিতে দিতেন না, করিলে ভারি শাসন করিতেন। আর নিজেও নিয়ম ভঙ্গ করিবেন না, তাহা নিশ্চিত। দণ্ড ধারণ সন্ন্যাসের নিয়ম। গুরু দণ্ড দিয়াছেন, ইহা ভঙ্গ হইলে আবার তাঁহার কাছে যাইয়া আর একখানি দণ্ড লইতে হইবে। কিন্তু তিনিই বা কোথা, আর তাঁহার গুরু, কেশব ভারতীই বা কোথা। যদি প্রভু সন্ন্যাসের নিয়ম রক্ষার নিমিত্ত বলিতেন যে, দণ্ড ভাঙ্গার সঙ্গে ধর্ম নষ্ট হইয়াছে, অতএব আমি হুতাশনে প্রাণত্যাগ করিব, তাহা বলিতেও পারিতেন। সুতরাং দণ্ড ভঙ্গ করা শ্রীনিতাইয়ের পক্ষে কম সাহসিকের কার্য হয় নাই। নিত্যানন্দই ইহা পারিয়াছিলেন, আর কাহারও সাহসে কুলাইত না, সাধ্যও হইত না। তবে, দণ্ডের উপর প্রভুর নিজের যে শ্রদ্ধা ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। এ দণ্ড-গ্রহণ প্রকারান্তরে তাঁহার আপনার ধর্মের বিরোধী। কাজেই দণ্ড ভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার বিশেষ ক্লেশ হইতে পারে না। ক্রোধও যেটুকু করিলেন, সেও কেবল ভক্তগণকে শাসন করিবার নিমিত্ত। প্রভু বলিতেছেন, "তোমরা আমার সঙ্গে আসিয়া খুব উপকার করিলে। সবে একখানি দণ্ড আমার সম্বল ছিল, তাহাও অদ্য শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভঙ্গ হইল। এখন আমার সহিত আর তোমরা যাইতে পারিবে না। হয় তোমরা অগ্রে যাইয়া জগন্নাথ দর্শন করো, নতুবা আমি অগ্রে যাই।" ইহাতে মুকুন্দ বলিলেন, "তুমি অগ্রে যাও। "সেই ভাল," বলিয়া প্রভু ছুটিলেন। প্রকৃত কথা, প্রভুর ইচ্ছা তিনি একা যাইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিবেন, একা জগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কেন এরূপ ইচ্ছা করিলেন তাহা পরের ঘটনা শুনিলে বুঝিতে পারিবেন। তাই দণ্ড-ভাঙ্গার ছল করিয়া ক্রোধ করিলেন; আর ক্রোধ উপলক্ষ্য করিয়া, ভক্তগণকে পশ্চাৎ রাখিয়া একা শ্রীমন্দির অভিমুখে তীরের ন্যায় ছুটিলেন।

এখন উপরের কথা একটু স্মরণ করুন। ভক্তগণ সমস্ত পথ ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছেন যে, প্রভুকে লইয়া তাঁহারা কিরূপে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ ও ঠাকুর-দর্শন করিবেন। এখন সেই ঠাকুরদর্শন করিতে প্রভু একা চলিলেন—একেবারে অচেতন হইয়া। জগন্নাথের দ্বার, সেবকগণ রক্ষা করিতেছে। তাহাদের অতিক্রম করিয়া কাহারও ভিতর যাইবার যো নাই। প্রভু না জানি আজি কি লীলা করেন! তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে গেলেও হয়ত কিছু সহায়তা করিতে পারিতেন, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা, কেহ সঙ্গে যাইতে পারিবে না। তাহার পর, প্রভু বিদ্যুৎগতিতে গমন করিলেন। চেষ্টা করিলেও তাঁহার সঙ্গে কেহই যাইতে পারিবে না, তাহা তাঁহারা জানেন। এই চিন্তায় মগ্ন হইয়া ভক্তগণ, প্রভু নয়নের অদর্শন হইলেই, দ্রুতপদে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন এবং ক্রমে মন্দিরের সিংহদ্বারে আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহারা যে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে আসিয়াছেন, তাহা মনে নাই—মন্দির দর্শন করিয়া প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গিয়াছেন। সিংহদ্বারে আসিয়া, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি একজন নবীন-সন্ন্যাসীকে এদিকে আসিতে দেখিয়াছ? তাঁহার গায়ে ছেঁড়া কাঁথা, প্রকাণ্ড শরীর, বর্ণ

কাঁচাসোনার ন্যায়, আর প্রেমে তাঁহাকে পাগলের মতো করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "দেখেছি, সে বড় অদ্ভুত কথা।" এদিকে তিনি আঠারনালায় ভক্তদের নিকট বিদায় লইবামাত্র—

"মত্ত সিংহগতি জিনি চলিলা সত্বর।
প্রবিষ্ট হইলা আসি পুরীর ভিতর।।"—চৈঃ ভাঃ।

যাঁহারা দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন তাঁহারা নিবারণ করিতে পারিলেন না, করিবার অবকাশও পাইলেন না। প্রভু মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার পর তাঁহারা জানিতে পাইলেন, ও "মার" "মার" করিয়া তাঁহার পশ্চাতে দৌড়িলেন। মনে ভাবুন, যেন মহারাজ প্রতাপরুদ্র রাজ সিংহাসনে বসিয়া আছেন, আর বহুতর দ্বারী দ্বার রক্ষা করিতেছে। রাজার নিকটে গমন করা মক্ষীকারও সাধ্য নাই। এই অবস্থায় যদি কেহ দৌড়িয়া, বিনা অনুমতিতে রাজার নিকট যাইতে থাকে, তবে রাজসভাস্থ সকলের ও দ্বারীগণের মনে কি ভাবের উদয় হয়? "কে" "কে" "মার্" "ধর্" শব্দ চতুর্দিক হইতে উঠে; আর তাহাকে ধরিতে সকলে ধাবমান হয়। শ্রীমন্দিরেও তাহাই হইল। প্রভু একেবারে শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত!

দেখি মাত্র প্রভু করি পরম হুঙ্কারে। ইচ্ছা হৈল জগন্নাথে কোলে করিবারে।।

প্রভু দেখিলেন জগন্নাথ সিংহাসনে বসিয়া। তখনই ইচ্ছা হইল, হয় তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিবেন, কি তাঁহাকে আপন হৃদয়ে পুরিবেন। এইরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত প্রভু জগন্নাথকে ধরিতে গিয়া লম্ফ দিলেন, জগন্নাথকে স্পর্শও করিলেন, অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। জগন্নাথের যে সমস্ত সেবক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং যাঁহারা প্রভুর পাছে পাছে দৌড়িয়া আসিলেন, তাঁহারা সকলেই ইহা দেখিলেন, কিন্তু কেহই বাধা দিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মতে প্রভু আপন জোরে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, সেই তাঁহার এক অপরাধ। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও তাঁহার কোটিগুণ অধিক অপরাধ হইল, শ্রীজগন্নাথকে স্পর্শ করা। যদি কেহ এইরূপ বিনা অনুমতিতে, এবং রক্ষকগণকে অতিক্রম করিয়া, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মস্তকে যষ্টির আঘাত করে, তবে সেই সাহসিক ব্যক্তির,—রক্ষক ও সভাসদগণের মতে—যেরূপ অপরাধ হয়, জগন্নাথের সেবকগণের মতে, প্রভুর তাহা অপেক্ষাও অধিক অপরাধ হইল। এরূপ ভাবিবার আরও একটা বিশেষ কারণ ছিল। শ্রীজগন্নাথ জীবন্ত-ঠাকুর। তাঁহার সেবকগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহাকে স্পর্শ করিবার অধিকার তাঁহার সেবকগণ ব্যতীত আর কাহারও নাই, এবং যদি অপর কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করে, তবে তদ্দণ্ডে তাহার অঙ্গ শত-শত খণ্ড হইয়া যায়। কিন্তু প্রভু, জগন্নাথকে স্পর্শ করিলেন, অথচ তাঁহার অঙ্গ খণ্ড-খণ্ড হইল না, ইহাতে স্বভাবতঃ সেবকগণের ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। জগন্নাথ যখন দণ্ড করিলেন না, তখন সেবকগণ আপনারাই দণ্ড করিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রথমে মার্" "মার্" বলিয়া সকলে প্রভুকে মারিতে উদ্যত হইল। আবার যখন তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তখন কাজেই শত শত লোক সুবিধা পাইয়া প্রভুকে মারিবার উপক্রম করিল।

ঠিক সেই সময় একজন দীর্ঘকায় পঞ্চদশাধিক বর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত। তাঁহার মনে কিন্তু কোনরূপ ক্রোধের উদয় হয় নাই, বরং বিপরীত ভাব হইয়াছে। তিনি দেখিলেন যে, বিদ্যুল্লতা-জড়িত কোনো মহাপুরুষ আসিয়া জগন্নাথের সম্মুখে প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইহা দেখিবা মাত্র তাঁহার সমস্ত অঙ্গ তরঙ্গায়মান হইল, আর যখন শত-শত সেবকগণ প্রভুকে মারিতে উদ্যত হইল, তখন প্রভুকে প্রাণ দিয়াও রক্ষা করিবেন, এই সংকল্প করিয়া তিনি অতি ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা করো কি? দেখিতেছ না, মহাপুরুষ?" যিনি এ কথা বলিলেন, তাঁহার আজ্ঞা সকলেরই পালনীয়। তিনি সে স্থানে

আজ্ঞা করিতে পারেন, এবং তিনি আজ্ঞা করিলে উহা লঙ্ঘন করে এরূপ সাহস সেখানে কাহারও ছিল না। কিন্তু তবু জগন্নাথের সেবকগণ নিরস্ত হইল না। যেহেতু তাহারা তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়াছে। তাহাবা কাহারও কখন এরূপ স্পর্দ্ধা দেখে নাই। ইহাতে আপনাদিগকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিতেছিল। কাজেই সেই ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া, আপন শরীর দিয়া প্রভুকে আবরণ করিলেন; তখন সেবকগণ বাধ্য হইয়া নিরস্ত হইল। যখন সেই ব্রাহ্মণ প্রভুকে আবরণ করিয়া রাখিলেন, মূর্চ্ছিত সন্ন্যাসীকে মারিতে গেলে পাছে তাঁহার গাত্রে লাগে এই ভয়ে সেবকগণ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। যিনি প্রভুকে এইরূপে আবরণ করিয়া রাখিলেন, তিনি ভুবনবিখ্যাত শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম। নদীয়ার বিখ্যাত-পণ্ডিত মহেশ্বর বিশারদের দুই পুত্র,—বাচস্পতি ও সার্বভৌম। সার্বভৌম মিথিলা হইতে ন্যায় গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়া শ্রীনবদ্বীপে প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রথম ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন। তিনি, শ্রীনবদ্বীপে ন্যায়ের "আদি-চিন্তামণি" গ্রন্থরচয়িতা রঘুনাথ শিরোমণির গুরু। তাঁহার যশঃ শুনিয়া, প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে যত্ন করিয়া পুরীতে আনিয়া স্থাপন করিয়াছেন। তিনি সমুদয় ভারতবর্ষে বিখ্যাত; বলা বাহুল্য, তিনি প্রতাপরুদ্রের গুরুস্থানীয়। ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় উড়িষ্যায় যে কিছু হয়, তিনি তাহার নেতা, মীমাংসক ও মন্ত্রী। কাজেই তিনি এক প্রকার জগন্নাথ-মন্দিরের কর্তা। বাসুদেব মিথিলার ন্যায় অভ্যাস করিয়া, বারাণসী-নগরীতে বেদ পড়িতে গমন করেন। সেখান হইতে বেদ সমাপ্ত করিয়া শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন। এখন পুরীতে টোল করিয়াছেন। এখানে কেবল ন্যায় নহে, যে যাহা ইচ্ছা করে তাহাকে তাহাই পড়ান,—কারণ তিনি সর্বশাস্ত্রবেত্তা। বিশেষতঃ তিনি দণ্ডীদিগকে বেদ পড়াইয়া থাকেন। সুতরাং বেদ পড়িতে কাশীতে না যাইয়া অনেকে তাঁহার নিকট পুরীতে আসিয়া বেদ অধ্যয়ন করেন।

এরূপ অসময়ে, আড়াই প্রহর বেলার সময়, তাঁহার মন্দিরে থাকিবার কথা নহে, কিন্তু সে দিবস ছিলেন। কেন ছিলেন ভক্তগণ তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি ছিলেন বলিয়াই জগন্নাথ-সেবকগণকে নিবারণ করিতে পারিলেন,—তিনি ও কটকবাসী স্বয়ং মহারাজ ব্যতীত আর কেহই ইহা পারিতেন না। সার্বভৌম যে মহাপুরুষের ভয় দেখাইয়াছিলেন, সে ভয়ে সেবকগণ অভিভূত হইতেন না, যেহেতু তাঁহারা জগন্নাথের সেবক। তাঁহাদের উপর আবার মহাপুরুষ কে? শ্রীভগবানের আত্মীয়ই বা কে? তবে তাঁহারা যে নিরস্ত হইলেন, সে কেবল সার্বভৌমের অনুরোধে;—তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না বলিয়া। তবু তাঁহাদের ক্রোধের শান্তি হইল না, মনে মনে রহিয়া গেল। শ্রীজগন্নাথের ভোগ মুহুর্মুহুঃ দেওয়া হয়। যখন ভোগ দেওয়া হয়, তখন ভোগের সামগ্রী ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া, সেবাইতগণ কপাট বন্ধ করিয়া বাহিরে আইসেন। সে সময় সেখানে কেহ থাকিতে পায় না। ভোগের সময় উপস্থিত হইল, অথচ ঠাকুরের সম্মুখে প্রভু অচেতন হইয়া পড়িয়া। জগন্নাথের সেবকগণ সেই কথা অবলম্বন করিয়া বিরক্ত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সার্বভৌম তখন কিছু বিপদে পড়িলেন। এই মহাপুরুষটিকে অচেতন অবস্থায় ধরিয়া বাহিরে ফেলিয়া বাড়ী যাইতে পারিলেন না। তখন চিন্তা করিয়া অচেতন সন্ন্যাসীকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইতে সাব্যস্ত করিলেন, এবং সেবকগণের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার শিষ্য, তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসীকে বহন করিয়া তাঁহার বাড়ী পঁহুছিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তখন তাঁহাদের ক্রোধ একটু শান্তি হইয়াছে, সন্ন্যাসীর রূপ দেখিয়াও কেহ কেহ মুগ্ধ হইয়াছেন। কাজেই সন্ন্যাসীকে সার্বভৌমের বাড়ী লইয়া যাইতে অনেকেই প্রস্তুত হইলেন। তখন কেহ হস্ত, কেহ পদ, কেহ জানু, কেহ মস্তক, কেহ কটি, কেহ বক্ষ ধরিয়া সেই প্রকাণ্ড শ্রীঅঙ্গ বহন করিয়া সার্বভৌমের গৃহাভিমুখেই চলিলেন। প্রভুর ভাব দেখিয়াই হউক, কি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াই হউক, প্রভুকে লইয়া যাইবার সময় সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে জগন্নাথসেবকের স্কন্ধে,

হরিধ্বনির সহিত, আমাদের প্রভু শ্রীসার্বভৌমের গৃহে শুভাগমন করিলেন। তখন প্রভুকে অভ্যন্তরে লইয়া পবিত্রস্থানে, পবিত্র আসনে শয়ন করাইলেন ও বাহকগণকে বিদায় দিয়া, নিজে প্রভুর শিয়রে বসিয়া, তাঁহার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে দেখিলেন, তাঁহার আয়ত-নয়ন অর্ধ-মুদিত, তারা স্থির, আর হৃদয়ে স্পন্দন নাই। ইহাতে ভয় পাইয়া নাসিকায় তুলা ধরিলেন, এবং মনোযোগপূর্বক দেখিয়া বুঝিলেন, তুলা ঈষৎ চলিতেছে। তখন অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, এবং অঙ্গ পুলকাবৃত দেখিয়া বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী মহাভাবে বিভাবিত হইয়া আছেন।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য শাস্ত্রজ্ঞ। শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে সমুদয় অবগত আছেন। তাহার মধ্যে কতক মনোগত ও কতক অভ্যাসবশতঃ বিশ্বাস করেন, আর কতক আদপে বিশ্বাস করেন না। "কৃষ্ণপ্রেম" শব্দ শুনিয়াছেন, ইহাতে কি কি ভাব হয় তাহাও পড়িয়াছেন; কিন্তু ভাবিতেন যে, কলিকালে উহা ঘটে না। "কৃষ্ণপ্রেম" বলিয়া প্রকৃত কোনো বস্তু যদি থাকে, তবে শ্রীকৃষ্ণের গণেরই থাকিতে পারে, অপরের এরূপ প্রেম সম্ভবে না। কিন্তু এখন দেখিতেছেন, কৃষ্ণপ্রেম শাস্ত্রের কল্পনা নয়, প্রকৃত বস্তু। ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইলেন, এবং সন্ন্যাসীটিকে পাইয়াছেন বলিয়া আপনাকে ভাগ্যবান ভাবিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ বড়ো অপরিষ্কার বলিয়া তাহাদের দেখিলে গৃহস্থের কখন কখন ঘৃণা হয়। কিন্তু প্রভুর লীলা-লেখকেরা বলিয়াছেন যে, প্রভুর অঙ্গের সৌরভে সর্বদা নাসিকা মত্ত হইত। তাহার পর সার্বভৌম দেখিতেছেন যে সন্ন্যাসীটির সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সুবলিত, এবং বর্ণ অলৌকিক। বদন দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, এ দেহ কখন পাপ কি কু-ইচ্ছা স্পর্শ করে নাই, আর ইহার হৃদয় করুণা স্নেহ ও মমতায় পূর্ণ, অন্তর সরল ও বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ। সার্বভৌম যত দেখিতেছেন, ততই সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন; তবে বহুক্ষণেও তাঁহার চৈতন্য হইতেছে না দেখিয়া চিন্তিত রহিয়াছেন।

ওদিকে ভক্তেরা সিংহদ্বারে আসিয়া মহা কলরব শুনিলেন। একটু পরেই বুঝিলেন যে, অতি রূপবান নবীনবয়স্ক এক সন্ন্যাসী দ্রুতবেগে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে ধরিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ায়, সার্বভৌম তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তখন সার্বভৌমের বাড়ী যাইবেন স্থির করিয়া ভাবিতেছেন, কিরূপে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন। এমন সময় গোপীনাথ আচার্য আসিয়া উপস্থিত। ইনি সার্বভৌমের ভগিনীপতি, পরম-পণ্ডিত এবং শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত। শ্যালকের নিকট আসিয়াছেন। তাঁহাকে পাইয়া সকলেই মহা হর্ষযুক্ত হইয়া ভাবিলেন, এ প্রভুর কার্য না হইলে, যে সময় যাঁহাকে প্রয়োজন, ঠিক সেই সময় তাঁহাকে পাওয়া যাইবে কেন? পরস্পরে বন্দন-আলিঙ্গনাদির পরে গোপীনাথ শুনিলেন যে, শ্রীনিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে আসিয়াছেন, আর এখন তিনি সার্বভৌমের বাড়ীতে। এই সংবাদ শুনিয়া গোপীনাথের সুখ দুঃখ উভয় হইল। দুঃখ হইল, নবদ্বীপনাগর এখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়াছেন বলিয়া, আর সুখ হইল প্রভুকে দেখিতে পাইবেন বলিয়া। গোপীনাথ তৎক্ষণাৎ ভক্তগণ সহ সার্বভৌমের গৃহাভিমুখে দৌড়িলেন। ভক্তগণ এখানে মহা অপরাধ করিলেন,—মন্দিরের নিকট আসিয়াও শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিলেন না। গোপীনাথের সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই দর্শন করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহাদের চিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গে নিবিষ্ট, জগন্নাথের কথা একেবারে মনেই ছিল না। তবে যাইবার বেলা শ্রীমন্দিরকে প্রণাম করিয়া চলিলেন।

সার্বভৌমের বাড়ী যাইয়া, ভক্তদিগকে বহির্দ্বারে রাখিয়া, গোপীনাথ ভিতরে গেলেন। যাইয়া দেখেন যে, নবদ্বীপচন্দ্র কাঙ্গাল বেশে ধূলায় ধূসরিত হইয়া অচেতন অবস্থায় শুইয়া আছেন। প্রভুর মুখ দেখিয়া গোপীনাথের কিছু সুখ হইল বটে, তবে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া

হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু সার্বভৌম যদিও শ্যালক, তবু বহিরঙ্গ লোক বলিয়া সন্ন্যাসীর উপর নিজের কি ভাব তাহা প্রকাশ করিলেন না। তবে জানাইলেন যে, সন্ন্যাসীর গণ পঞ্চজন আসিয়াছেন। সার্বভৌম শুনিয়াই তাঁহাদিগকে ভিতরে আনিতে বলিলেন। কারণ তিনি সন্ন্যাসীটিকে লইয়া বড় বিব্রত হইয়াছিলেন। গোপীনাথও তৎক্ষণাৎ যাইয়া ভক্তগণকে ভিতরে লইয়া আসিলেন। প্রভুকে দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন ও তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। সার্বভৌম তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহারাও, প্রভুকে যত্ন করিয়াছেন বলিয়া সার্বভৌমকে বহু ধন্যবাদ দিলেন। তখন সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, এইরূপ ঘোরমূর্চ্ছা হইলে প্রভু অচেতন অবস্থায় অনেকক্ষণ থাকেন। সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিলেন যে, তাঁহাদের ভাগ্যে ঠাকুর দর্শন ঘটে নাই, তখন তিনি আপন পুত্র চন্দনেশ্বরকে, তাঁহাদিগকে লইয়া ঠাকুরদর্শন করিতে পাঠাইলেন। ভক্তগণ গোপীনাথের তত্ত্বাবধানে প্রভুকে রাখিয়া, নীলাচলচন্দ্র দর্শন করিতে চলিলেন। তাঁহারা শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলে সেবকগণ শুনিলেন যে, পূর্বে যে সন্ন্যাসী শ্রীজগন্নাথকে ধরিতে গিয়াছিলেন, ইঁহারা তাঁহারি গণ। তখন তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আপনারা স্থির হইয়া দর্শন করিবেন, পূর্বকার গোসাঞির মত অধীর হইয়া জগন্নাথকে ধরিতে যাইবেন না।" ফল কথা, পূর্বকার গোসাঞির সাহসিক কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার ও তাঁহার গণের উপর সেবকগণের একটু ভয় ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তাঁহারা সেইজন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতিকে মালা চন্দনাদি প্রসাদ আনিয়া দিলেন। তাঁহারা জগন্নাথ-দর্শন-সুখ অল্পক্ষণ ভোগ করিয়া প্রভুর কাছে যাইয়া দেখিলেন যে, তখনও তাঁহার চৈতন্য হয় নাই। যথা—"বাহুপরে শির রাখি প্রভু অচেতন। ধুলায় ধূসরিত অঙ্গ মুদিত নয়ন।।"

তখন প্রভুকে চেতন করিবার জন্য ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্তন আরম্ভ করিলেন। মধুর হরিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র প্রভু হুঙ্কার করিয়া "হরি" "হরি" বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন সার্বভৌম "নমো নারায়ণায়" বলিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন। প্রভুও "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তখন সার্বভৌম করজোড়ে বলিলেন, "স্বামিন্, সমুদ্র স্নান করিয়া আসুন, এবং এ অধমের গৃহে ভিক্ষা করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করুন।" প্রভু সম্মত হইয়া সেই তৃতীয়-প্রহর বেলায় গণসহ সমুদ্রস্নানে গেলেন।

এদিকে সার্বভৌম মনের সাধে প্রসাদ সংগ্রহ করিলেন, এবং প্রভু গণসহ স্নান করিয়া আসিলে সার্বভৌম সুবর্ণ থালায় প্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। প্রভু ভক্তগণসহ স্নান করিতে যাইবার সময়, তিনি কিরূপে অচেতন অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করেন, শ্রীজগন্নাথকে ধরিতে যাইয়া ভূমিতে পড়িয়া যান, সেবকগণ তাঁহাকে আক্রমণ করেন ও সার্বভৌম তাঁহাকে রক্ষা করেন এবং শেষে কিরূপে তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া যান,—এ সমুদয় ভক্তগণের মুখে শুনিয়া প্রভু সার্বভৌমের উপর বড়ো সন্তুষ্ট হইলেন। প্রভু স্নান করিয়া আসিয়া "তৃণাদপি" নীচ হইয়া সার্বভৌমকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতে দেখিয়া তিনি মোহিত হইলেন। নবীন সন্ন্যাসীকে ভাল করিয়া ভুঞ্জাইবার জন্য তিনি অতি উপাদেয় প্রসাদ আনিয়াছেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর ধর্ম অবলম্বন করিয়া যদি তিনি সুরস প্রসাদ ভোগ না করেন, এই ভয়ে সার্বভৌম আপনি পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সার্বভৌম যাহা ভাবিয়াছিলেন, প্রভু তাহাই করিলেন। তিনি মস্তক অবনত করিয়া কড়জোড়ে সার্বভৌমকে বলিলেন, "এই সমুদয় পীঠাপানা, ছানাবড়া প্রভৃতি শ্রীপাদ প্রভৃতিকে দিতে আজ্ঞা হয়। আমাকে কিঞ্চিৎ লফরা ব্যঞ্জন দিলেই যথেষ্ট হইবে।" প্রভু গরুড়-পক্ষীর ন্যায় সার্বভৌমের অগ্রে বসিয়া আছেন। সার্বভৌম তাঁহাকে প্রসাদ ভুঞ্জাইবার নিমিত্ত বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "শ্রীজগন্নাথ কিরূপ আস্বাদন করিয়াছেন, স্বামিন্! একবার আপনি আস্বাদন করিয়া দেখুন।" শ্রীসার্বভৌম

এইরূপ করজোড়ে প্রভুকে অনুরোধ করিতে থাকিলে, তিনি আর না বলিতে পারিলেন না, ক্রমে সমুদয় প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তখন সার্বভৌম তাঁহার বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিয়া গোপীনাথ সহ ভোজন করিতে অভ্যন্তরে গেলেন।

এ পর্য্যন্ত সার্বভৌম জানেন না যে, ইহারা কাহারা। যতক্ষণ প্রভু অচেতন ছিলেন, ততক্ষণ কাজেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই। সমুদ্রস্নান হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদিগকে যত্নপূর্বক ভিক্ষা করাইলেন। সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাই অন্যায়, তারপর প্রভু তাঁহার বাড়ী আসিয়াছেন। কাজেই তিনি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। আর না করিবার অন্য কারণও ছিল। গোপীনাথ যে শ্রীগৌরাঙ্গের গণ, ইহা সার্বভৌমকে বলেন নাই। কারণ সার্বভৌম কর্তব্যে নাস্তিক, তাঁহার নিকট নদীয়ার অবতারের কথা বলাও যা, বেণা-বনে মুক্তা ছড়ানও তা। কাজেই গোপীনাথ প্রভুর সাক্ষাতে এরূপ ভাব করিতেছেন, যেন তাঁহাদের সহিত তাঁহার কোন পরিচয় নাই। কিন্তু ইহা গোপন থাকিল না। সার্বভৌম বেশ বুঝিলেন যে, নবীন সন্ন্যাসী গোপীনাথের কেবল পরিচিত নহেন, অতি প্রিয় ও আত্মীয়ও বটেন। তবে তিনি প্রভুর মুখে "কৃষ্ণে মতিরস্তু" শুনিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসী কৃষ্ণভক্ত। ভিতরে যাইয়াই সার্বভৌম ইহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় গোপীনাথ বলিলেন যে, নবীন-সন্ন্যাসী নিমাই পণ্ডিত নামে শ্রীনবদ্বীপে বিখ্যাত। ইনি নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র ও জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের পুত্র; আর সঙ্গীরা নবীন-সন্ন্যাসীর গণ।" ইহা শুনিয়া সার্বভৌম বড়োই আনন্দিত হইলেন। উড়িষ্যার রাজা ও বাংলার পাদসাহে যুদ্ধের নিমিত্ত লোক গতায়াত বন্ধ। কাজেই তিনি নির্বাসিতের ন্যায় দূরদেশে বাস করেন। এমত অবস্থায় গৌড়ীয় মাত্রই সার্বভৌমের আদরের বস্তু। এখন দেখিলেন যে, সন্ন্যাসী ও তাঁহার গণ শুধু গৌড়ীয় নহেন নদীয়াবাসী ও তাঁহার পরিচিত, এবং এক প্রকার আত্মীয়ও বটেন। সার্বভৌম বলিতেছেন, "বটে! তবে ইনি যে আমার নিজ-জন। আমার পিতা বিশারদ ও ইঁহার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী সমাধ্যায়ী, আর ইঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর আমার সমাধ্যায়ী। আমি বড়ো সুখী হইলাম।" ইহাই বলিয়া সার্বভৌম আবার প্রভুর সম্মুখে আসিয়া, "নমো নারায়ণায়" বলিয়া প্রণাম করিলেন, প্রভুও "কৃষ্ণ মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। সার্বভৌম বলিতেছেন, "আমি আপনার মহিমা শ্রবণ করিলাম। আপনি আমার অতি নিজ-জন। আপনার পিতা ও মাতামহের সহিত আমাদের বরাবর ঘনিষ্ঠতা আছে, সহজেই আপনি আমার পূজ্য। আবার এখন সন্ন্যাস লইয়াছেন, অতএব আমাকে আপনার নিজ-জন দাস বলিয়া জানিবেন।" এই কথা শুনিয়া প্রভু শিহরিয়া উঠিলেন ও কর্ণে হস্ত দিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, "আপনি বলেন কি? আপনি জগদ্গুরু, সকলের শীর্ষস্থানীয়। আমি সন্ন্যাসী বটে, আপনি সেই সন্ন্যাসীদের শিক্ষাগুরু। আপনি পরম দয়ালু, এই জগৎকে নিজে দয়াগুণে শিক্ষা দিতেছেন। এই সমুদয় জানিয়া আমি আপনার আশ্রয় লইয়াছি। আমি বালক, অজ্ঞ, ভাল মন্দ জানি না; বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক, সন্ন্যাস-ধর্ম আশ্রয় করিয়াছি। আপনি আমাকে আপনার শিশু ভাবিয়া, যাহাতে আমার ভাল হয় তাহা করিবেন। অদ্যকার বিপত্তির কথা মনে করিলে আমার হৃৎকম্প হয়। আপনি উপস্থিত না থাকিলে আজ আমার যে কি দুর্গতি হইত তাহা বলিতে পারি না। আমার মনে বড়ো সন্দেহ ছিল, বুঝি আমি আপনার দর্শন পাইব না; শ্রীকৃষ্ণ কৃপাময়, তাহা আমাকে মিলাইয়া দিয়াছেন।" সার্বভৌম প্রভুর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "তুমি আর মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিও না। তোমার যেরূপ ভাব তাহাতে সিংহদ্বারে যে গরুড় আছেন, তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া দর্শন করা কর্তব্য। শুন গোপীনাথ, তুমি প্রত্যহ স্বামীকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর দর্শন করা কর্তব্য। শুন গোপীনাথ, তুমি প্রত্যহ স্বামীকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর দর্শন করাইও। গোসাঞির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমার

উপর দিলাম।''

প্রভু অতি দীনভাবে সার্বভৌমকে আত্মসমর্পণ করায় তিনি পরমানন্দিত হইলেন। আর সেই সঙ্গে ধন্ধার বিষম আবর্তে পড়িয়া গেলেন। সার্বভৌম প্রথম যখন শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার তেজ, আকার, প্রকৃতি ও ভাব দেখিয়া মনে করেন, এ বস্তুটি হয় স্বয়ং জগন্নাথ, না হয় কোনো দেবতা, মনুষ্যরূপে বিচরণ করিতেছেন। কারণ ইহার আকৃতি প্রকৃতি ঠিক মনুষ্যের মতো নয়। তারপর এই মহাভাব, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ গাঢ় প্রেম ইহা ত জীবে সম্ভবে না। ইহাতে সার্বভৌমের মনে হইল এ বস্তুটি অতি দুর্লভ, পরম ভাগ্যে মিলিয়াছে। আর সেই জন্য তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে আনয়ন করিয়াছেন। কিন্তু যখন দেখিলেন তাঁহার সঙ্গীরা মনুষ্য, মনুষ্যের মত আকার প্রকার এবং সেইরূপ কথাবার্তা, তখন ভাবিলেন, ইনি একজন উচ্চশ্রেণীর সন্ন্যাসী,—দেবতা নহেন। শ্রীগৌরাঙ্গ চেতনা পাইলে তাঁহার শরীরের তেজ লুকাইল, আর তখন তিনিও মনুষ্যের মতো হইলেন। তাহার পরে তিনি স্নান করিয়া গরুড়পক্ষীর ন্যায় সার্বভৌমের সম্মুখে বসিয়া মনুষ্যের ন্যায় ভোজন করিলেন, ও অতি দীনভাবে কথা কহিতে লাগিলেন, তখন সার্বভৌমের চমক অনেকটা ভাঙ্গিল। আবার গোপীনাথের নিকট প্রভুর যে পরিচয় শুনিয়াছিলেন তাহাতে বুঝিলেন ইনি দেবতা বা কোন বিশেষ বস্তু নয়,—নদীয়ার একজন সামান্য পণ্ডিত, জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার পুত্র। কাজেই প্রভুর উপর অতি বৃহৎ বস্তু বলিয়া প্রথমে যে ভক্তিটুকু জন্মিয়াছিল, তাহা প্রায় গেল। সুতরাং প্রভুর নিকট আসিয়া যখন তাঁহাকে আবার প্রণাম করিলেন, তখন ভাবিলেন, সন্ন্যাস-আশ্রমে আশ্রয় করিলে দম্ভের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ তখন গুরুজনও তাঁহাকে প্রণাম করেন, আর তিনিও গুরুজনকে আশীর্বাদ করিতে অধিকার পান। কিন্তু সার্বভৌমের মনে প্রথমে যে কিছু কুভাবে উদয় হইতেছিল, প্রভুর বিনয় ও মধুর বাক্য শুনিয়া তাহা একেবারে গেল। তখন তাঁহার প্রতি ভক্তি হইল না বটে, তবে ঈর্ষা-ভাবের যে অঙ্কুর হইতেছিল, তাহার স্থানে বাৎসল্যরূপ ভালবাসার উদয় হইল। তখন তিনি প্রভুকে বলিলেন, "তুমি আর একাকী মন্দিরের মধ্যে যাইয়া দর্শন করিও না। হয় গোপীনাথের কি আমার সহিত, কি আমি যে লোক দিব তাহার সহিত যাইয়া জগন্নাথ দর্শন করিও।'' সার্বভৌম তাহার পর গোপীনাথকে বলিলেন, "আমার মাসীর বাড়ী অতি নির্জন স্থান, সেখানে ইঁহাদের বাসা দাও। আর জলপাত্র প্রভৃতি যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দাও।'' প্রভু ও প্রভুর গণ সার্বভৌমের মাসীর বাড়ী যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তখন হয় সার্বভৌম প্রসাদ পাঠাইয়া দেন, নচেৎ গোবিন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি ভিক্ষা করেন।

এ গ্রন্থের প্রথমে লেখা আছে যে, গৌরাঙ্গলীলা বিচার করিলে, স্বভাবতঃ এইটিই বোধ হইবে যে, এ কাণ্ড হঠাৎ বা আপনা-আপনি হয় নাই; হয় শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীভগবান; আর যদি ততদূর বিশ্বাস করিতে না পারেন, তবে বুঝিবেন যে, তিনি শ্রীভগবান কর্তৃক প্রত্যক্ষরূপে চালিত, নিয়োজিত ও রক্ষিত। যাঁহারা সন্দিগ্ধচিত্ত, তাঁহাদের পক্ষে ইহার একটা মানিলেই যথেষ্ট। দেখুন, যখন গৌরাঙ্গ নীলাচল যাইতেছেন, তখন যেখানে হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধের স্থান, ঠিক সেখানে, সেই সময়ে রাজা রামচন্দ্র খাঁ আসিয়া উপস্থিত। আবার নীলাচলের নিকটে আসিয়া, দণ্ড-ভাঙ্গার ছল করিয়া, প্রভু অগ্রে একাকী জগন্নাথ দর্শন করিতে চলিলেন। এখন প্রভুর নীলাচল প্রবেশের অদ্ভুত আয়োজন দেখুন। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, কেহ রোধ করিতে পারিল না। সকলে একত্রে গমন করিলে ইহা হইত না। আবার প্রভু যেখানে মূর্চ্ছিত হইলেন, সেখানে সার্বভৌম দাঁড়াইয়া। তিনি না থাকিলে, জগন্নাথের দাম্ভিক সেবকগণ, প্রভুর অঙ্গে প্রহার করিত। তাহার পর সার্বভৌমই বা এত বিচলিত কেন হইলেন? তিনি তো কিছুই মানেন না। যদি কিছু মানেন তবে সে আপনাকে। একটি সন্ন্যাসীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আপনার অঙ্গ দ্বারা আবরণ কেন করেন? কত সহস্র সন্ন্যাসী ত তাঁহার শিষ্য? আবার প্রভুর লীলাকার্যের নিমিত্ত সার্বভৌমের সহিত পরিচয়েরও

প্রয়োজন। সার্বভৌম কর্তব্যে শ্রীক্ষেত্রের রাজা, তিনি ব্যতীত সেখানে কিছুই হয় না। তাই তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া, তাই তিনি, যদিও জগৎপূজ্য, তথাপি আপনার দেহ দিয়া প্রভুকে রক্ষা করিলেন, আর তাই তিনি প্রভুকে আপনি বহিয়া ও জগন্নাথের সেবকগণ দ্বারা বহাইয়া হরিনামের সহিত আপনার বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। এ সমুদয় আপনা-আপনি ও হঠাৎ হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

প্রভু বাসায় আগমন করিলে, গোপীনাথ পরদিবস অতি প্রত্যূষে আসিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীজগন্নাথের শয্যোত্থান দর্শন করাইলেন, এবং তার পরে সকলে সার্বভৌমের সভায় আগমন করিলেন। সার্বভৌম প্রণাম করিলে, প্রভু "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। প্রভুর কথা শুনিয়াই সার্বভৌমের শিষ্যগণের বড়ো আমোদ বোধ হইল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে, সন্ন্যাসী হইয়া বলে কিনা "কৃষ্ণে মতি হউক!" এটা কি পাগল, না মূর্খ? ইহাই বলিয়া তাহারা হাসিয়া উঠিল। সার্বভৌম ইহাতে লজ্জা পাইয়া প্রভুকে অন্য নির্জন স্থানে লইয়া বসিলেন। প্রভুর কথাতে পড়ুয়াগণ যে হাস্য করিল, তিনি ইহা বুঝিয়াছেন কি না, তাহা কেহ জানিতেও পারিল না। নির্জন স্থানে বসিয়া প্রভু সার্বভৌমকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আমি শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে আসিয়াছি। আপনি জগতের উপদেষ্টা, আমি আপনার আশ্রয় লইলাম, যাহাতে আমার ভাল হয় তাহা করিবেন। আমাকে আপনি উপদেশ করুন; দেখিবেন, যেন আমি ভবকূপে না পড়ি!" সার্বভৌম বলিলেন, "তোমাকে আমি কি উপদেশ করিব? তোমার উপদেশের কিছু অভাব আছে বলিয়া 'ত বোধ হয় না। যে ভক্তি তোমার হয়েছে ইহা মনুষ্যের পক্ষে দুর্লভ। তবে সরলভাবে তোমাকে একটা কথা বলি; সন্ন্যাস করিয়া তুমি ভাল কর নাই। তোমার বয়স অতি অল্প, এ বয়সে সন্ন্যাস শাস্ত্রসিদ্ধ নয়। প্রথমে সংসার-সুখ সমুদয় আস্বাদন করিয়া, যখন ইন্দ্রিয়ের তেজ শিথিল হয়, তখনি সন্ন্যাস কর্তব্য। আবার দেখ,—সন্ন্যাস করিয়াছ ইহাতে গুরুজনে তোমাকে প্রণাম করিতেছেন। তুমি অতি সুবোধ, দেখ দেখি, এ অবস্থায় অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে কি না?"

প্রভু বলিলেন, "আপনি আমার পরম-সুহৃৎ, আমার যাহাতে ভাল হয় তাহাই বলিতেছেন। তবে, যখন সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করি, তখন কৃষ্ণের জন্য আমার মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল, সুতরাং এ কার্যের জন্য আমি সম্পূর্ণ অপরাধী নহি।" এই কথা শুনিয়া সার্বভৌম লজ্জা পাইয়া বলিতেছেন, "তাহা হউক, তুমি অতি ভাগ্যবান। তোমার যে প্রেম দেখিলাম, ইহাতে তোমার উপর আমার বড়ো শ্রদ্ধা হইয়াছে। তোমার ভালই হইবে।" সার্বভৌম, 'আমি তোমার ভাল করিব' না বলিয়া, 'তোমার ভালই হইবে' বলিলেন। কিছুকাল আলাপের পর প্রভু ভক্তগণসহ উঠিয়া গেলেন, কেবল গোপীনাথ ও মুকুন্দ রহিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বড়ো প্রীতি। তারপর তাঁহারা সার্বভৌমের সঙ্গে সভায় ফিরিয়া আসিলেন।

আপনারা জানিবেন যে জগতে যত বিরোধের সৃষ্টি হয়, তাহার অধিকাংশই অনুগত জনের দোষে। দুটি নায়কের এক স্থানে নির্বিবাদে বাস করা সম্ভব, কিন্তু তাঁহাদের গোঁড়াগণ তাহা পারিবে না! সার্বভৌমের পড়ুয়াগণ তাঁহাকে প্রায় শ্রীভগবান্ বলিয়া মান্য করে। তাহারা বিদ্যাকে পূজা করিয়া থাকে, আর সার্বভৌম বিদ্বান্ লোকের পরমপূজ্য। আবার প্রভুর যত গণ, তাঁহারা প্রভুকে শ্রীভগবান্ বলিয়া সম্মান ও পূজা করেন। কিন্তু সার্বভৌমের পড়ুয়াগণ প্রভুকে খ্যাপা কি মূর্খ সন্ন্যাসী ভাবে। প্রভুগণ আবার সার্বভৌমকে পাণ্ডিত্যাভিমানী পাষণ্ড ভাবেন। সার্বভৌমকে দেখিলে তাঁহার শিষ্যগণ জড়সড় হন, কিন্তু প্রভুর গণ সেরূপ কিছু হয়েন না। আবার প্রভুকে দেখিলে তাঁহার গণ সংজ্ঞাশূন্য হয়েন, কিন্তু সার্বভৌমের প্রতি তাঁহারা দৃকপাতও করেন না। অতএব যুদ্ধ আরম্ভ হয় আর কি। এতক্ষণ যে হয় নাই সে কেবল প্রভু নিতান্ত নিরীহ, সার্বভৌম বড় পদস্থ ও গম্ভীর বলিয়া।

প্রভু উঠিয়া গেলে সার্বভৌম মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামী কোন সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস

গ্রহণ করিয়াছেন?" মুকুন্দ বলিলেন, "ভারতী সম্প্রদায়ে। ইঁহার গুরুর নাম কেশব ভারতী, আর ইঁহার নিজের নাম কৃষ্ণ-চৈতন্য।" সার্বভৌম বলিতেছেন, "নামটি বেশ হয়েছে। আহা সন্ন্যাসীব প্রকৃতি কি মধুর! একেবারে বিনয়ের খনি। বলিতে কি ইঁহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় তরল হয়েছে। কি জন্য জানি না, উহার প্রতি আমার বড়ো আকর্ষণ হইতেছে। তাহাতেই বলিতেছি যে, ভারতী সম্প্রদায়টা ভাল নয়। গিরি, পুরী, তীর্থ, সরস্বতী,—এ সমুদয় সম্প্রদায় থাকিতে কেন নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইলেন?" তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য! স্বামীর বাহ্যাপেক্ষা নাই। সংসার ত্যাগ করা উদ্দেশ্য, তাহা যেন তেন প্রকারে করিয়াছেন।"

সার্বভৌম! বাহ্যাপেক্ষা তুমি কাহাকে বল?

গোপীনাথ। এ সম্প্রদায় ভাল, ও সম্প্রদায় মন্দ, এ সমস্ত আসার বিষয়ে স্বামীর মন নাই; কোনো প্রকারে সংসার ত্যাগ করা উদ্দেশ্য, তাই সন্ন্যাস গ্রহণের সময় সম্প্রদায়ের ভাল-মন্দ বিচাব করিবার অবকাশ পান নাই।

সার্বভৌম। তুমি ভাল বলিলে না। যখন সম্প্রদায় আশ্রয় করিতে হইবে, তখন বাছিয়া ভাল লওয়াই ত কর্তব্য।

গোপীনাথ। এ সমুদয় মনের ভাব দম্ভ হইতে উৎপন্ন হয়। লোকে গৌরব করিবে, এ বাসনাকে পোষণ না করাই ভাল।

সার্বভৌম। লোকে গৌরব করিবে, এ বাসনার দোষ কি? তাহা হইলে আমরা বাঁচিয়া আছি কেন? গৌরব করিবে বলিয়াই ত লোকে এ সকল কার্য করিয়া থাকে? যাক্, ও সমুদয় বালকের কথা ছাড়িয়া দাও। স্বামীকে হঠাৎ কোনো অনুরোধ করা আমার পক্ষে ভাল দেখায় না। তিনি তোমাদের আত্মীয়, তোমরা তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া বাধ্য কর। আমি একটি ভাল দেখিয়া ভিক্ষুক আনাইয়া পুনরায় তাহার সংস্কার করাইব।

এই সমস্ত কথা গোপীনাথের ও মুকুন্দের হৃদয়ে শেলের মত বাজিতেছে। প্রথমত সার্বভৌমের শিষ্যগণ প্রভুকে উপেক্ষা করিয়া হাসিল; ইহাতে তোমার আমার মর্মান্তিক হয়, তাঁহাদের কি হইল ভাবিয়া দেখ। তাঁহারা ভাবিলেন, যেমন গুরু, শিষ্যগুলিও সেইরূপ হয়েছে। তাহার পর, সার্বভৌমের প্রত্যেক কথায় প্রভুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পাইতেছে। প্রভুকে তাঁহারা শ্রীভগবান্ বলিয়া জানেন; তাঁহার প্রতি কোনোরূপ কটাক্ষ ভক্তেরা কিরূপে সহ্য করিবেন? যদিও প্রভুর প্রতি সার্বভৌমের স্নেহ অকৃত্রিম, কিন্তু সে তাঁহার নিজের গুণে নয়, প্রভুর প্রকৃতির গুণে। সার্বভৌম প্রভুর প্রতি বিরক্ত হইবার মোটে অবকাশ পাইতেছেন না। একটু ঈর্ষার অঙ্কুর হইতেছে, আর প্রভুর সরল বদন দেখিয়া, ও চিত্তমোহন বাক্য শুনিয়া, শুধু যে তাঁহার সেই ঈর্ষা অন্তর্হিত হইতেছে তাহা নয়, এরূপ কু-প্রবৃত্তিকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন বলিয়া মনে ধিক্কার উপস্থিত হইতেছে। তবে গোপীনাথের দম্ভের সহিত কথা, সার্বভৌমের অবশ্য ভাল লাগিতেছে না। জগতে এরূপ কথা কাহারও নিকট শ্রবণ করা তাঁহার অভ্যাস নাই। তবে যে অনেক সহিয়া রহিয়াছেন, সে কেবল প্রভুর গুণে। তাহা না হইলে গোপীনাথ আরও রূঢ়বাক্য শুনিতেন। তবুও গোপীনাথের কথায় সার্বভৌমের ক্রোধ হইতেছে, ও তাঁহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা তিনি করিতেছেন। গোপীনাথকে আঘাত করিবার অন্য সহজ উপায় নাই। তবে প্রভুকে আঘাত করিয়া অনায়াসে তাঁহাকে ব্যথা দিতে পারেন। তাই সার্বভৌম বলিতেছেন, "আহা! কি সুন্দর এই সন্ন্যাসীটি। কিন্তু ইঁহার কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস লইয়াছেন, ইহাতে ইন্দ্রিয় বারণ কিরূপে হইবে? আমি ইঁহাকে অদ্বৈত মার্গে প্রবেশ করাইয়া যাহাতে ইঁহার ধর্ম থাকে, তাহাই করিব।"

গোপীনাথ আর সহ্য করিতে না পারিয়া বাহ্য হারাইলেন। তিনি প্রভুর আগমন অবধি প্রাণপণে তাঁহার সম্বন্ধে কোনো কথা উঠান নাই, উঠাইতে দেনও নাই। সেই তিনি, সার্বভৌমের সাক্ষাতে, আর সার্বভৌমের সভায় শিষ্যগণ মাঝে, একেবারে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। তিনি

রুক্ষভাবে বলিতেছেন, "ওখানে পাণ্ডিত্য চলিবে না। তুমি যাঁহার ভাল করিবে বলিয়া বারম্বার ঔদার্য দেখাইতেছ, তিনি তোমার সহায়তার অপেক্ষা রাখেন না। তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান্।"

যেমন কোনো নির্জন সরোবরে বন্দুকের শব্দ করিলে বিবিধ পক্ষী বিবিধ স্বর করিয়া উড়িতে থাকে, সেইরূপ গোপীনাথের বাক্যে সার্বভৌমের সভায় নানাবিধ শব্দের উৎপত্তি হইল। সার্বভৌমের অত্যন্ত ক্রোধ হইল, কিন্তু গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া ও অন্যান্য কারণে হঠাৎ কিছু বলিলেন না। আবার একটু ঠাহরিয়া বলেন, তাহার অবকাশও পাইলেন না। কারণ তাঁহার শিষ্যগণ চারিদিক হইতে "কি প্রমাণ?" বলিয়া শত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। গোপীনাথ তখনি বুঝিলেন কাজ ভাল করেন নাই, কিন্তু তখন আর উপায় নাই। আপনি বিচলিত হইয়া যে ঝড় উঠাইয়াছেন, তাহা নিবারণ করিবার উপায় হঠাৎ স্থির করিতে পারিলেন না। তবে শিষ্যগণের সহিত মারামারি করিবেন না, ইহা তখনই স্থির করিলেন। শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও করিলেন না। সার্বভৌমের পানে চাহিয়াই উত্তর করিলেন।

সার্বভৌমও দেখিলেন যে, কাজ ভাল হয় নাই। নবীন-সন্ন্যাসীটি তাঁহার প্রিয়বস্তু, বাড়ীতে অতিথি ও নির্দোষী। তাঁহাকে লইয়া যে তাঁহার শিষ্যগণ চর্চা করিবে, ইহা তাঁহার অভিমত হইতে পারে না। আর তিনি সেখানে থাকিতে শিষ্যগণ বিচার করিবে, তাহাও হইতে পারে না। তাহার পরে গোপীনাথ তাঁহার ভগিনীপতি; তাঁহার ভগিনীপতির সহিত যে তাঁহার শিষ্যগণ সমান হইয়া বিচার করিবে, ইহাও তাঁহার ইচ্ছা নয়। সুতরাং তিনি, শিষ্যগণকে লক্ষ্য না করিয়া, গোপীনাথের দিকে চাহিয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন। গোপীনাথের উচিত ছিল যে, তখনি সার্বভৌমের নিকট ক্ষমা চাহিয়া চুপ করা। তিনি তাহাই করিতেন; কিন্তু তিনি তখন একটু বিচলিত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ওই অবস্থায় কি করা কর্তব্য তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। তিনি সার্বভৌমকে বলিলেন, 'ইহা লইয়া তোমার সহিত বিচার করিতে আমার ইচ্ছা নাই। তবে ভট্টাচার্য, তুমি উহার মহিমা জান না তাই বলিলাম। তুমিও সত্বর জানিবে যে, ও বস্তুটি কি।" কিন্তু শিষ্যগণ চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নয়। সার্বভৌমকে উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়া, "কি প্রমাণ?" "কি প্রমাণ?" বলিয়া তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল। গোপীনাথ তখনও চুপ করিতে পারিতেন, কিন্তু চিত্ত কিঞ্চিৎ বিচলিত হওয়ায় তাহা পারিলেন না। সার্বভৌমের দিকে চাহিয়া শিষ্যগণের কথার উত্তরে বলিলেন, "প্রমাণ এই যে, তাঁহাতে শ্রীভগবানের সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়।" শিষ্যগণ আবার সার্বভৌমকে উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়া বলিয়া উঠিল, "এই সন্ন্যাসী শ্রীভগবান্, কি অনুমানে সাধিবে?" গোপীনাথ আবার সেইরূপে সার্বভৌমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর-তত্ত্ব অনুমানে জ্ঞান হয় না। ইহা জানিবার এক মাত্র উপায় ঈশ্বর-কৃপা।" তাহার পর শিষ্যগণকে আর কোনো কথা কহিতে না দিয়া সার্বভৌমকে বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য! পৃথিবীতে তোমার মতো পণ্ডিত নাই, তুমি জগতের গুরু। শাস্ত্রে তোমার দ্বিতীয় নাই। কিন্তু তুমি যে বলে বলীয়ান, ঈশ্বর-জ্ঞান সে বলের অধীন নয়। যেহেতু তোমাতে ঈশ্বর-কৃপা নাই।"

সার্বভৌম নৈয়ায়িক। গোপীনাথের তর্ক করিতে ভুল হইল, তিনি কিরূপে চুপ করিয়া থাকিবেন? অমনি বলিতেছেন, "তোমাতে যে ঈশ্বর-কৃপা আছে তাহার প্রমাণ?" গোপীনাথ তখন ঠকিলেন, এবং কতক কান্দ-কান্দ হইয়া, কতক কোপের সহিত বলিলেন, "তুমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছ তাহাতেও প্রভুকে চিনিতে পারিলে না, কাজেই বলি যে তোমাতে ঈশ্বর-কৃপায় লেশ মাত্র নাই।"

সার্বভৌম গোপীনাথের ভাব দেখিয়া একটু ভয় পাইলেন। কুলীন ভগিনীপতি, উড়িষ্যা পর্যন্ত তাঁহার বাড়ী আসিয়াছেন। যদি কোপ করিয়া চলিয়া যান, তাই গোপীনাথকে একটু শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, "ভাই, ক্রোধ করিও না। আমি শাস্ত্রদৃষ্টে বলি। শাস্ত্রে কলিযুগে অবতারের উল্লেখ নাই। তাই শ্রীভগবানের নাম ত্রিযুগ হইয়াছে। তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক, সন্ন্যাসীটি পরম ভাগবত, কিন্তু তিনি যে ভগবান্ এ কথা শাস্ত্রে পাই না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার হইয়াছেন, শ্রীনবদ্বীপে এ কথা প্রথমে উঠিলেই বিপক্ষ পণ্ডিতগণ শাস্ত্র দেখিতে চাহিলেন। সার্বভৌম গোপীনাথকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাহাই বলিতে লাগিলেন। কাজেই গৌরভক্তগণ দেখিলেন যে, সাধারণ লোকের নিকট গৌর-অবতার প্রমাণ করিবার নিমিত্ত শাস্ত্র-প্রমাণ প্রয়োজন। তাই গৌরভক্ত পণ্ডিতগণ. অন্বেষণ করিয়া নানা প্রমাণ বাহির করিলেন। যখন শ্রীনিমাই সন্ন্যাসী হইলেন, তখন আবার বিপক্ষ পণ্ডিতগণ বলিতে লাগিলেন, শ্রীভগবান্ সন্ন্যাসী হইবেন তাহা কোন্ শাস্ত্রে আছে? সেই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ মহাভারত হইতে বাহির করিতেও ভক্তগণ বাধ্য হইলেন। তখন পণ্ডিতগণ ন্যায় ও শাস্ত্র লইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন। যে কোনো কথা উপস্থিত হইলেই তাঁহারা শাস্ত্রের প্রমাণ চাহিতেন। সুবিধার মধ্যে শাস্ত্রের অবধি ছিল না, কাজেই প্রমাণেরও অবধি ছিল না। অতএব শাস্ত্রের এত বড়ো শাসন সত্ত্বেও লোকের সংসারযাত্রা নির্বাহ হইতে বড়ো বাধা হইত না। ন্যায়ের চর্চাতে আবার সেইরূপ লোকের "কি প্রমাণ?" ব্যাধি উপস্থিত হইল। প্রভাতে এক পড়ুয়া আর এক পড়ুয়াতে বলিতেছেন, "উঠ, প্রভাত হইয়াছে।" নিদ্রিত পড়ুয়া চক্ষু মেলিয়া, হাই তুলিতে তুলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভাত হইয়াছে তাহার প্রমাণ?" জাগরিত পড়ুয়া বলিলেন, "যেহেতু আলো হইয়াছে।" নিদ্রিত পড়ুয়া বলিলেন, "আলো হইলেই প্রভাত হয় না, গৃহ-দাহ হইলেও রজনীযোগে আলো হয়।" এইরূপে দুই প্রহর বেলা পর্যন্ত বিচার হইল। শেষে ক্লান্ত হইয়া উভয়ে ক্ষান্ত দিলেন।

এখন বিচার করুন যে, গৌরাঙ্গ কিরূপ সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যখন কথা উঠিল যে, নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন, তাহার পূর্বে অবতার বলিয়া কথা আদৌ জগতে ছিল না। এখন অবতারে বিশ্বাস পূর্বাপেক্ষা সহজ হইয়াছে, কিন্তু তখন শ্রীভগবান্ মনুষ্যসমাজে আসিয়াছেন, এরূপ কথা শুনিলে স্বভাবতঃ সর্বদেশে, সকল স্থানে হাসি পাইবার কথা ছিল। কিন্তু গৌর-অবতারের কথা যখন ও যে স্থানে উঠিল, সে সময়ের ও সে স্থানের অবস্থা মনে করুন। সে সময়ে সে স্থানে প্রমাণ ব্যতীত প্রভাত হইয়াছে ইহাও ভদ্রলোকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং বিবেচনা করুন যে, এইরূপ সময়ে ও সমাজে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবের নিকট শ্রীভগবান্ বলিয়া সম্মান লইতে, কত শক্তি ও আয়োজনের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই যে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া পূজা করিতেন, ইহা মুখে নয়, একেবারে হৃদয়ের সহিত। তাহা না হইলে, যে সমুদয় মহান্তগণ পরকালের নিমিত্ত সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলবাসী হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দু হইয়া তাঁহার শ্রীপদে তুলসী, চন্দন ও গঙ্গাজল দিয়া পূজা করিতে পারিতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি কি কিঞ্চিৎমাত্র অবিশ্বাস থাকিলে শ্রীঅদ্বৈতের ন্যায় গোঁড়া হিন্দুর পক্ষে গঙ্গাজল-তুলসী দিয়া তাঁহার শ্রীচরণ পূজা করা অসম্ভব হইত।

সেই সময়ের ও সেই সমাজের কথা এই গ্রন্থের প্রারম্ভে কিছু আলোচনা করিয়াছি এবং বাসুদেব সার্বভৌম বস্তু কি তাহাও কিঞ্চিৎ বলিয়াছি। যেখানে বিচার ও প্রমাণ ব্যতীত, প্রভাত হইয়াছে কি না, লোকে ইহা গ্রহণ করিত না, সেই সমাজের শীর্ষস্থানীয় বাসুদেব সার্বভৌম। তিনি এই সমাজের দুগ্ধফেন, কি প্রকাশ, কি শক্তি। তাঁহার সহিত শ্রীপ্রভুর রঙ্গ অতএব অতিশয় রহস্যজনক। বিশেষতঃ পাঠকমহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহারা সতেজ বুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা আপনাদের ও সার্বভৌমের মনের ভাবের অনেক ঐক্য দেখিতে পাইবেন, সেই জন্য আমি ঐ সম্বন্ধে একটু বিস্তার করিয়া লিখিলাম।

শ্রীগোপীনাথ আবার চঞ্চল হইলেন, হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি পণ্ডিত-শিরোমণি হইয়া কিরূপে বলিতেছ যে কলিযুগে অবতারের কথা শাস্ত্রে নাই। তবে এ সমুদয় শ্লোকের অর্থ কি?" ইহাই বলিয়া শ্রীগোপীনাথ, প্রভুর অবতার সম্বন্ধে যে যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ তখন সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা একে একে বলিতে লাগিলেন। এ সমুদয় শাস্ত্রীয় প্রমাণরূপ নীরস বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করিব না। প্রথমতঃ আমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই; দ্বিতীয়তঃ গোপীনাথ যাহা সার্বভৌমকে বলিয়াছেন তাহা ঠিক কথা, অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রমাণে শ্রীগৌরচন্দ্রকে যিনি বিশ্বাস করেন, তাঁহার বিশ্বাস না করাই

ভাল। গোপীনাথ শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিতে থাকিলে, সার্বভৌম তাঁহার প্রতিপক্ষ করিতে পারিতেন; করিলেও হয়ত তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের সহিত গোপীনাথ পারিয়া উঠিতেন না। কিন্তু সার্বভৌম অনেক কারণে সহিয়া গেলেন, আর তর্ক উঠাইলেন না। বলিলেন, "ও সমুদয় এখন থাকুক। তুমি এখন তোমার শ্রীভগবান্‌কে তাঁহার গণসহ আমার হইয়া নিমন্ত্রণ করো গিয়া। তবে আমাকে শিক্ষা দেওয়া, তাহা পরে দিলেই পারিবে।"

এইরূপ কথা বলিয়া সার্বভৌম সমুদয় মনের বেগ ব্যক্ত করিলেন। প্রথমতঃ তোমার শ্রীভগবান্‌কে গণসহ নিমন্ত্রণ কর, ইহা হাসিবার কথা। শ্রীভগবানের আবার "গণ" কে? আর তাঁহাকে মনুষ্যে নিমন্ত্রণ করিবে তাহাই বা কি? আবার সার্বভৌম গোপীনাথকে উপরের কথাগুলিতে ইহাও বলিলেন যে, শ্রীভগবান্‌কে নিমন্ত্রণ করা, ইহাও যেরূপ হাস্যকর, তুমি গোপীনাথ আর আমি সার্বভৌম, তোমার আমাকে শিক্ষা দিতে আসা, সেও সেইরূপ হাস্যকর। এই কথা শুনিয়া গোপীনাথ ও মুকুন্দ সার্বভৌমের সভা ত্যাগ করিয়া প্রভুর ওখানে চলিলেন। এখন সার্বভৌমের অবস্থা শ্রবণ করুন। তিনি দিগ্বিজয়, জয় করা তাঁহার ব্যবসায়, পরমার্থ ও আনন্দ। এইরূপে অন্যকে জয় করিয়া তাঁহার কয়েকটি প্রবৃত্তি বড়ো প্রবল হইয়াছিল। তাহার মধ্যে অন্যের উপর আধিপত্য করা একটি প্রধান। তিনি যেখানেই থাকুন, কর্তা হইয়া থাকিবেন। এরূপ না হইলে তাঁহার সে স্থানে থাকিবার সম্ভাবনা হইত না। এ অবস্থার বিপরীতও কখন হয় নাই, কার তাঁহার সমকক্ষ লোক তখন ভারতবর্ষে ছিলেন না। কাজেই তাঁহার কোথাও থাকিতে অসুবিধা হয় নাই। এখন তাঁহার নিজ স্থানে, এমন কি তাঁহার নিজ ভবনে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া উপস্থিত। প্রতিদ্বন্দ্বী শুধু নয়, তাঁহার বড়ো, স্বয়ং ভগবানের ন্যায় পূজিত। সার্বভৌমের এ অবস্থা ভালো লাগিতেছে না। আবার নবীন সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার ঈর্ষা-ভাব যে অতি গর্হনীয় কার্য্য তাহাও বুঝিতেছেন। কাজেই তখনি আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন এবং এই ঈর্ষা-ভাব আপনার মনের নিকট আপনি গোপন করিতেছেন; আর ভাবিতেছেন, "জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রের উপর আমার ঈর্ষা, তাহা হইতেই পারে না। তাহার উপর মাঝে মাঝে একটু ক্রোধ হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে আমারও দোষ নাই, তাহারও দোষ নাই,—সে দোষ তাহার গোঁড়াগণের। তাহারা বলে কি না,—তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান্! এ কথা শুনিলে সহজেই একটা বিরক্তিভাব হয়; কিন্তু এ সামান্য কথা লইয়া আমার মতো লোকের চিত্তচাঞ্চল্য ভালো দেখায় না! অবশ্য আমার চিত্তের চাঞ্চল্য হয় নাই, সন্ন্যাসীর উপর কোনো প্রকার ঈর্ষাও নাই। তবে সন্ন্যাসীটি অপরূপ বস্তু, আমার আশ্রয় লইয়াছে, আমিও বলিয়াছি যে, তাহার যাহাতে ভাল হয়, তাহা করিব। এখন পাঁচজন মূর্খেতে যদি তাহাকে "ভগবান্" বলিয়া পূজা করিতে থাকে, তবে তাহার চিত্ত আর কতদিন স্থির থাকিবে?—এ অপরূপ বস্তুটি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। আবার গোপীনাথ প্রভৃতি যে, সন্ন্যাসীকে ভগবান্ বলে, তাহাতে তাহাদেরই বা লাভ কি? শাস্ত্রে দেখি যে, জীবকে শ্রীভগবান্-বুদ্ধি করিলে সর্বনাশ হয়। অতএব গোপীনাথ প্রভৃতি তাহাদের নিজের সর্বনাশ করিতেছে, এরূপ করিতে দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং আমি তাহাও করিতে দিব না। গোঁড়াগণ যে সন্ন্যাসীকে শ্রীভগবান্ বলিয়া উন্মত্ত হইয়াছে, এই অবস্থা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। তাহা হইলে সন্ন্যাসীরও ভাল, তাহার অনুগতগণেরও ভাল, আর আমারও কর্তব্য করা হয়,—যেহেতু ইহারা সকলেই আমার আশ্রিত। অতএব এ সন্ন্যাসীটি ভগবান্ এ কথাটি আমি একেবারে বন্ধ করিয়া দিব। এই সমুদয় ভাবিয়া সার্বভৌম আপনার মনকে বুঝাইলেন যে, তাঁহার সন্ন্যাসীর উপর ঈর্ষা নাই, আর তিনি যে সন্ন্যাসীর ভগবত্তা উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এ কেবল সাধু অভিপ্রায়ে, কোনো মন্দ অভিপ্রায়ে নহে। কিন্তু সরল কথায় বলিতে, তিনি যে সন্ন্যাসীকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার মূল কারণ এই যে, তিনি সন্ন্যাসীর আধিপত্য সহিতে পারিতেছেন না। সার্বভৌম সেই জন্য সন্ন্যাসীর ভগবত্তা কিরূপে উড়াইয়া দিবেন তাহার উপায় মনে মনে স্থির করিলেন। সে উপায় কি, পরে বলিতেছি।

এ দিকে মুকুন্দ ও গোপীনাথ প্রভুর ওখানে আসিলেন। পরে গোপীনাথ সার্বভৌম-প্রেরিত অতি অপূর্ব মহাপ্রসাদ প্রভুকে-ও ভক্তগণকে ভুঞ্জাইলেন। প্রসাদ গ্রহণের পরে প্রভু ও ভক্তগণ বসিলেন। তখন গোপীনাথ করজোড়ে প্রভুকে বলিতেছেন, "প্রভু! ভট্টাচার্য আর এক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যদিও আপনার নামটী ভাল, কিন্তু আপনার সম্প্রদায় ভাল নয়। অতএব তিনি ভাল একজন ভিক্ষুক আনাইয়া আপনার পুনঃসংস্কার করাইবেন। তাঁহার বড় ভয় হইয়াছিল যে, আপনার অল্প বয়স, কিরূপে ইন্দ্রিয় দমন হইবে ও ধর্ম থাকিবে। তাহার উপায়ও তিনি ঠাহরিয়াছেন। তিনি আপনাকে অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইবেন ও স্বয়ং ক্লেশ করিয়া নিয়ত আপনাকে বেদ শ্রবণ করাইবেন।"

গোপীনাথ এ সমস্ত কথা এরূপ ভাবে বলিলেন, যাহা ভাবের চিহ্ন শুনিয়া প্রভুর রাগ হয়। কিন্তু তাহার কিছুই হইল না,—প্রভুর মুখে বিরক্তি কি কোনো মন্দ পর্য্যন্ত দেখা গেল না। বরং এ কথা শুনিয়া প্রভু যেন বড় সুখী হইলেন। বলিতেছেন, "বটে বটে, তাঁহার উপযুক্ত কথাই হয়েছে। তাঁহার আমাব উপর বাৎসল্য-ভাব ও বিস্তর অনুগ্রহ; তিনি আমার মঙ্গল সর্বদা কামনা করিতেছেন। আমি এ কথা শুনিয়া বড়ই কৃতার্থ হইলাম।"

কিন্তু ভক্তগণের কাহারও এ কথা ভাল লাগিল না। সকলেই ভাবিয়াছিলেন, প্রভু ভট্টাচার্যের দম্ভের কথা শুনিয়া অন্ততঃ মনে মনে ক্রোধ করিবেন; কিন্তু তাঁহার মুখে কি কথায়, ক্রোধের লেশমাত্র উপলক্ষিত হইল না। বরং তিনি যেন সার্বভৌমের উপয় বড়ো খুশী। কাজেই ভক্তগণের তখন প্রভুকে বুঝাইয়া, যাহাতে সার্বভৌমের উপর তাঁহার রাগ হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে। সেই অভিপ্রায়ে মুকুন্দ বলিতেছেন, "তুমি ভট্টাচার্যের এ সমুদয় অভিপ্রায় বিষম অনুগ্রহ ভাবিতে পার, কিন্তু তাহার কথা সমুদয় তোমার ভক্তগণের গাত্রে অগ্নিকণার ন্যায় লাগিয়াছে। বিশেষতঃ গোপীনাথ বড়ো দুঃখ পাইয়াছেন, যেহেতু ভট্টাচার্য তাঁহার কুটুম্ব। এমন কি, গোপীনাথ দুঃখে অদ্য উপবাসী আছেন।" এ কথা শুনিয়া প্রভু আশ্চর্যান্বিত হইয়া গোপীনাথের দিকে চাহিলেন; চাহিয়া বলিতেছেন, "গোপীনাথ, সে কি? ভট্টাচার্য মহাশয়, স্নেহ ও বাৎসল্যে, আমার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা তিনি যেরূপ বুঝেন, সেইরূপ বলিয়াছেন; তাহাতে তুমি দুঃখ পাও কেন?" গোপীনাথ তখন ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন; বলিতেছেন, "সার্বভৌম আমার কুটুম্ব। তিনি তোমাকে কথায় কথায় অবজ্ঞা করিয়া কথা বলেন, আমি ইহা কিরূপে সহ্য করিব?" যথা শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে—"গোপীনাথ কহে পুন সজল নয়ন। ভট্টাচার্য বাক্য হৈল শেলের সমান।। মোর বুকে লাগিয়াছে বিকল পরাণ। সেই শেল তুমি প্রভু উদ্ধারো আপন।। তবে সে করিব আমি জীবন ধারণ।।"

গোপীনাথের প্রার্থনা অতি অল্প,—নয় কি? জগতের যে সর্বপ্রধান নৈয়ায়িক, প্রভু তাঁহাকে উদ্ধার করুন, তাহা হইলে তিনি অন্ন জল খাইবেন, প্রাণ রাখিবেন, নতুবা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন। শ্রীভগবানের সংসারই এইরূপ অবুঝ-ভক্ত লইয়া, তাহাদের কথা না শুনিলে তাঁহার সংসার থাকে না। কাজেই তিনি আর করেন কি? দামোদরকে বলিতেছেন "তুমি গোপীনাথকে লইয়া গিয়া প্রসাদ গ্রহণ করাও।" তাহার পরে গোপীনাথের প্রতি চাহিয়া একটু হাসিলেন, শেষে বলিলেন, "তুমি ভক্ত, আর শ্রীজগন্নাথ বাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি অবশ্য তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। যাও এখন প্রসাদ গ্রহণ করো গিয়া।" প্রভুর এই কথা শুনিবামাত্র ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা জানেন প্রভুর শক্তির সীমা নাই, ও তাঁহার বাক্য অখণ্ডনীয়। তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, সার্বভৌমের সৌভাগ্যচন্দ্র উদয় হইতে আর বিলম্ব নাই। গোপীনাথ অমনি আহ্লাদে গদগদ প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে চাহিলেন।

এখন শ্রীনবীন-সন্ন্যাসী ও সার্বভৌম, এই দুই জনের দুই কথা মনে করুন উভয়েই শক্তিধর পুরুষ, উভয়ে উভয়কে পদতলে আনিবেন সঙ্কল্প করিলেন। যুদ্ধটিতে বিশেষ রস আছে। যখন দুই

বীরপুরুষে যুদ্ধ হয়, তখন সাধারণ লোকে জ্ঞানহারা হইয়া তাহা দাঁড়াইয়া দেখে।

পাঠক মহাশয়, তোমার নিকট আমার একটি প্রশ্ন আছে; বল দেখি—গুরু হওয়া ভাল, না শিষ্য হওয়া ভাল? যদি বলো শিষ্য হওয়া ভাল, কিন্তু দেখিবে জগতে সকলেই গুরু হইতে চাহিবে,—শিষ্য হইতে কেহই চাহে না। এখন গুরু ও শিষ্য উভয়ের কার্য দেখো। গুরু দান করেন, আর শিষ্য গ্রহণ করেন। গুরুর কিছুই প্রাপ্তি হয় না, শিষ্যেরই সমুদয় লাভ। এমন স্থলেও দেখিবে, সকলেই গুরু হইবার বাসনা করিতেছে। মনে করো, দুই জনে দেখা হইল। একজন বলিলেন, তুমি আমার নিকট শিক্ষা করো। অন্য জনও বলিলেন, তাহা কেন, তুমি আমার নিকট শিক্ষা করো। এমত স্থলে, যে সুবোধ সে শিখাইতে না গিয়া নিজে শিখিতে স্বীকার করে। কারণ, তাহার যাহা আছে তাহা ত আছেই, আরও যদি কিছু নূতন শিখিতে পায়, তাহা ছাড়িবে কেন? কিন্তু এই যে, "আমি গুরু হইব, অন্যকে শিক্ষা দিব, অন্যের নিকট শিখিব না,"—এই কুপ্রবৃত্তিতে জগতের জীব নষ্ট হইল। যদি কিছু গ্রহণ করিতে চাও, তবে দীন হইয়া আঁচল পাত। যে মাত্র আঁচল পাতিতে শিখিবে, সেই তোমার প্রতি শ্রীভগবানের করুণা হইবে। বিবেচনা করিতে গেলে তুমি অতি দীন, তোমার ক্ষমতা মাত্র নাই। এক মুহূর্ত পরে তোমার কি দশা হইবে, তাহা তুমি বলিতে পার না। ত্রিতলে থাকিয়া, সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়াও যখন তোমার নিশ্চিন্ততা নাই, তখন তোমার অভিমান কেন আসে? শ্রীভগবান তাই জীবকে আঁচল পাতিবার অধিকার দিয়াছেন; আঁচল পাতিলেই, সরল মনে যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। এই আঁচল পাতার প্রধান প্রতিবন্ধক দম্ভ ও অভিমান। "আমি উহার নিকট কেন খর্ব হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিব?"—এই প্রকার প্রায় জীবমাত্রেরই মনের ভাব। জীবগণ অন্যকে আপন পদতলে আনিবে, অন্যের উপর কর্তৃত্ব করিবে, এই সাধ মিটাইবার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিতেছে। "আমি গুরু হইব, ও ব্যক্তি আমার পদতলে পতিত হইবে,"—এই সামান্য সুখের জন্য জীব অনায়াসে পরম লাভ ত্যাগ করিতেছে।

সার্বভৌম যখন নবীন-সন্ন্যাসীর মহাভাব প্রথম দেখিলেন, তখন এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, স্কন্ধে করিয়া তাঁহাকে নিজ-গৃহে আনয়ন করিলেন। তারপর ভাবিলেন, ত্রিজগতের মধ্যে এই ব্যক্তিই ভাগ্যবান। তখন আপনার বিদ্যাবুদ্ধি অতি নিস্ফল ধন বলিয়া বোধ হইল। তাহার যে বিদ্যাবুদ্ধি আছে তাহা আর যাইবে না; কিন্তু নবীন-সন্ন্যাসীর কৃষ্ণ-প্রেম-রূপ যে ভাব, তাহা তাঁহার নাই, এবং উহা যে পরম-ধন তাহাতেও সন্দেহ নাই। সেরূপ বোধ না হইলে তিনি তাঁহাকে অতি যত্ন করিয়া বাড়ী আনিতেন না। এরূপ অবস্থায় সার্বভৌমের কর্তব্য ছিল যে, কৃষ্ণ-প্রেম-রূপ মহাভাব, যাহা তাঁহার নাই, তাহাই যদি পারেন আদায় করুন। কিন্তু তাঁহার প্রবৃত্তি সে দিকে গেল না। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লইবেন না, তিনি তাঁহার নাস্তিকতারূপ ছাই-ভস্ম প্রভুকে দিবেন। কেন? কারণ দিলে তিনি গুরু হইবেন, আর আধিপত্যের সুখভোগী হইবেন। এই অতি তুচ্ছ কু-প্রবৃত্তির তৃপ্তির নিমিত্ত তিনি পরম-ধন অবহেলায় ছাড়িলেন। তাই বলি, গুরু হইবার এই লোভে জীব ছারেখারে যাইতেছে।

এই যে পুরুষ-ভাব, ইহা শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মের পক্ষে একেবারে বিষ। তাঁহার দাসেরা বলেন যে, ত্রিজগতে 'পুরুষ' কেবল একজন, তিনি—কানাইলাল; আর সকলেই 'প্রকৃতি'। সুতরাং আর সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহারা পুরুষ হইতে চাহেন, তাঁহারা নির্বোধ ও আত্মঘাতী। অতএব প্রকৃতির যে ধর্ম, অর্থাৎ গ্রহণ করা, তাহাই কর,—ইহা শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মের সার-কথা। তুমি প্রকৃতি হও, আর তুমি যে পুরুষ এ অভিমান ছাড়িয়া দাও। পুরুষ এ অভিমান করিলে তুমি শ্রীবৃন্দাবন যাইতে পারিবে না।

সার্বভৌম ঐশ্বর্য কামনা করেন। ঐশ্বর্য ব্যতীত অন্য কোনো মূল্যবান সম্পত্তি যে ত্রিজগতে আছে, তাহা তিনি জানেনই না। তিনি আপনি বড়ো হইয়া অন্যের মস্তকে পদ দিবেন, এই তাঁর পরম-আশা। কাজেই তিনি প্রভুকে শিক্ষা দিতে চলিলেন। কিন্তু পাঠক মহাশয়, আপনি যদি বৃদ্ধি

পাইতে চাহেন, তবে প্রকৃতি হউন। আমি এ সম্বন্ধে প্রভুর আজ্ঞা বলিতেছি। তাঁহার শ্রীমুখের শ্লোক শ্রবণ করুন—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন, কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।" অর্থাৎ প্রভু বলিতেছেন,—সেই ব্যক্তিই কেবল হরিকীর্তনে অধিকার পায় যে ব্যক্তি তৃণের ন্যায় দীন-ভাবে অন্যকে মান দেয়।" অতএব পাঠক, জীব মাত্রকেই গুরু ভাবিয়া শ্রদ্ধা করিও। কারণ এমন জীব নাই, যার কাছে তুমি কিছু-না-কিছু শিখিতে পার! আপনি নীচ হইয়া অন্যকে মান দিলে তোমার অনেক লাভ হইবে। প্রথমতঃ তোমার মন কোমল হইবে। দ্বিতীয়তঃ তুমি হৃদয়ে সুখ পাইবে। ও অন্যের হৃদয়ে সুখ দিবে। তৃতীয়তঃ তুমি ক্রমে শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইবে। আর চতুর্থত তুমি কি শুন নাই যে, তিনি "দীনদয়ার্দ্র-নাথ", অর্থাৎ দীনজন-দর্শনে শ্রীভগবানের পদ্ম-চক্ষু করুণার জলে ডুবিয়া যায়?

তবে কি অন্যকে শিক্ষা দিবে না? তুমি দীনভাব অবলম্বনে যেরূপ শিক্ষা দিতে পারিবে, গুরুভাবে তাহা পারিবে না। প্রতিষ্ঠা-লোভ ত্যাগ করিয়া শিক্ষা দিলে তাহার ফল সদ্য উদয় হইবে। এখন, বিনয়ের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ, ও দম্ভের পর্বত সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সংঘর্ষণে কি ফলোৎপত্তি হইল শ্রবণ করুন।

সার্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা উড়াইয়া দিবেন, তাঁহার এই সঙ্কল্প। তাঁহার এই কার্যের সহায় এই কয়েকটি উপকরণ, যথা—অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অগাধ শাস্ত্র-বিদ্যা, শীর্ষস্থানীয় পদ-মার্যাদা ও তীব্র শাসনবাক্য। সার্বভৌমের সহিত প্রভুর দেখা হইল, দুই জনে নিভৃতে বসিলেন। ভট্টাচার্য প্রথমতঃ আপনার নিস্বার্থতা প্রমাণ করিলেন। বলিলেন, "স্বামিন! তুমি আমার এক গ্রামস্থ, বন্ধুতনয়, ও পরম গুণে ভূষিত। তোমাতে সহজে আমার চিত্ত ধাবিত হয়। এই নিমিত্ত তোমাকে গুটিকয়েক কথা বলিতে বরাবর ইচ্ছা করিতেছি। আমার উদ্দেশ্য বিচার করিয়া তুমি আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবে।"

এ স্থলে একটি কথা বলিয় রাখি। সার্বভৌম যতই দাম্ভিক ও পদস্ত হউন, প্রভুর নিকট আসিলেই একটু নম্র হইতে বাধ্য হন। কেন, তাহা বুঝিতে পারেন না; তবে ইহা বুঝিতে পারেন যে, পরোক্ষ তাঁহার যতখানি সাহস, প্রভুর নিকট আসিলে ততখানি থাকে না।

সার্বভৌম এক ঠাকুরকে উপাসনা করেন,—সে বিদ্যাবুদ্ধি। প্রভুর কতদূর বিদ্যা ও কতটুকু বুদ্ধি তাহা জানেন না। তবু তাঁহার এ বিশ্বাস অটল-রূপে রহিয়াছে যে, বালক-সন্ন্যাসী কোনো ক্রমে তাহার সমকক্ষ হইবেন না। কিন্তু তবু সেই বালক-সন্ন্যাসীর নিকট আসিলেই একটু স্তম্ভিত হয়েন, আর চেষ্টা করিয়াও আপনার সেই সহজ স্বচ্ছন্দতা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করিতে পারেন না। সার্বভৌম সে দিবস সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছেন, আর প্রভুর নিকট নত হইবেন না। সেই নিমিত্ত রুক্ষ কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "তুমি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবে। কিন্তু তোমার সমুদয় কার্য যে শাস্ত্র ও ন্যায়সঙ্গত তাহা আমি বলিতে পারি না। তুমি অল্প-বয়সে সন্ন্যাস লইয়া ভালো কর নাই; তবে তোমার যে ভক্তি উদয় হইয়াছে উহা দুর্লভ। কিন্তু যদি ভাবুকের ধর্মই অবলম্বন করিবে, তবে কেন সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিলে? সন্ন্যাসীর পক্ষে নর্তন-গায়ন অতি দূষ্য-কার্য, কিন্তু উহাই হইল তোমার ভজন-সাধন। তোমার বয়স অল্প, ইন্দ্রিয় বশে রাখিতে হইবে, জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত, নর্তন ও গায়নে কিরূপে ইহাতে শক্ত হইবে?"

শ্রীনিমাই তখন করজোড়ে বলিলেন, "আমি অজ্ঞ বালক, ভাল-মন্দ বুঝি না, সেই জন্য আপনার আশ্রয় লইয়াছি। আমি আমার এই দেহ আপনাকে সমর্পণ করিলাম। আমার যাহাতে মঙ্গল হয় আপনি তাহাই করুন।" সার্বভৌম এই কথায় পরম পুলকিত হইলেন। প্রভু যদি বলিতেন, "ভট্টাচার্য, তুমি অন্ধ, দাম্ভিক ও বৃথা-রস লইয়া আছ। আমার নিকট অমূল্য-ধন আছে, উহা বিনা-বিনিময়ে তোমাকে দিতে আসিয়াছি"; তবে ভট্টাচার্য মহা-ক্রুদ্ধ হইতেন। এই জীবের ধর্ম। শ্রীপ্রভু যে তাহা না বলিয়া, বলিলেন—"তুমি বড়ো, আমি ছোটো", তাই এই সার্বভৌম ভট্টাচার্য,—যিনি জগতের

মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান,—একেবারে আহ্লাদে গলিয়া গেলেন। হে প্রতিষ্ঠালোভ, তোমাকে ধন্য। সার্বভৌম বলিলেন, "তুমি অতি সুপাত্র, তাই তোমার গুণে তোমার প্রতি আমার চিত্ত এইরূপে ধাবিত হইতেছে। তুমি যে সন্ন্যাসীর ধর্ম লইয়াছে, ইহা ভাবুকের ধর্ম অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। অতএব আমি তোমাকে জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করাইব। সন্ন্যাসীর প্রধান ধর্ম বেদ-শ্রবণ। তুমি উহা শ্রবণ কর, ক্রমে তোমার জ্ঞান স্ফুরিত হইবে, ও ইন্দ্রিয়-দমনশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। আমি প্রত্যহ অপরাহ্ণে বেদ পাঠ করিয়া তোমাকে শুনাইব।" প্রভু বলিলেন, "যে আজ্ঞা; আমি প্রত্যহ অপরাহ্ণে আসিয়া আপনার নিকট বেদ শ্রবণ করিব।" পর দিবস শ্রীমন্দিরে প্রভু ও সার্বভৌম মিলিত হইলেন। সেখান হইতে দুইজনে সার্বভৌমের বাড়ী আসিলেন। দুই জনে নিভৃত স্থানে বিভিন্ন আসনে বসিলেন, এবং সার্বভৌম বেদ পাঠ করিতে ও প্রভু শুনিতে লাগিলেন। সার্বভৌমের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল;—তিনি তাঁহার যে স্থান তাহা পাইলেন, পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু সেই আসন ত্যাগ না করিলে তাঁহার মঙ্গল নাই। তাঁহার প্রকৃতি-ভাব অর্থাৎ গ্রহণ করিবার শক্তি লাভ করিতে হইবে। তবে প্রেম কি ভক্তির বীজ পাইবেন। সার্বভৌম বেদপাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। প্রভুও মনোনিবেশপূর্বক একাগ্রচিত্তে নির্বাক হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন,—হাঁ-কি-না কিছুই বলিলেন না। কেবল তাহাও নয়, বেদ শ্রবণে তাহার মনে কিরূপ ভাব খেলিতেছে, তাহার চিহ্ন-মাত্রও বদনে প্রকাশ পাইতে দিলেন না।

কিন্তু তাঁহার মনে মনে কি খেলিতেছে? প্রভুর তখন ভক্তভাব। কৃষ্ণনাম শুনিলে তিনি প্রেমে মূর্চ্ছিত হয়েন; এই তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা। কৃষ্ণ কথা ব্যতীত তাঁহার মুখে অন্য কথা আইসে না, কর্ণে তিনি অন্য কথা শ্রবণ করেন না, হৃদয়ে তাঁহার অন্য কথার স্থান নাই। কিন্তু সার্বভৌম তাঁহাকে বেদ ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছেন; বলিতেছেন যে, "এ সমুদয় মায়া, জগৎ মায়া, ভগবান্ আর কোনো পৃথক্ বস্তু নয়, তুমিই ভগবান্।" ইহাতে শ্রীভগবান গেলেন, শ্রীকৃষ্ণ গেলেন, বৃন্দাবন গেলেন, গোপীগণ গেলেন, ভগবদ্ভক্তি গেলেন;—এমন কি পরকাল পর্যন্ত গেলেন। রহিলেন কি? না—নাস্তিকতা। কাজেই ইহার প্রত্যেক অক্ষর শ্রীপ্রভুর হৃদয়ে বিষাক্ত-শরের ন্যায় বিন্ধিতেছে। ইহাতে প্রভু এত বিকল হইতেছেন যে, তাঁহার প্রাণ বাহির হয় আর কি। কিন্তু তিনি শক্তিধর; সমুদয় সহিয়া, নীরব হইয়া, বসিয়া রহিয়াছেন। সার্বভৌমের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, বেদ শুনিবেন, তাহাই শুনিতেছেন। সন্ধ্যা হইল, পুস্তকে ডোর দেওয়া হইল। প্রভু বাসায় আসিয়া, তাপিত-হৃদয়ে শীতল করিবার জন্য শ্রীমন্দির আরত্রিক দর্শন করিতে গমন করিলেন।

সার্বভৌম ব্যাখ্যা করিলেন, তাহার যতদূর সাধ্য। বাসনা, নবীন-সন্ন্যাসীটিকে, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে চমকিত করিবেন। এক একবার পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির চমক উঠাইতেছেন, আর ভাবিতেছেন, নবীন-সন্ন্যাসী স্তম্ভিত হইবেন। কিন্তু তাহা না হওয়াতে সার্বভৌম একটু মনস্তাপ পাইতেছেন। আবার প্রভুর মুখের ভাব ঠাহরিয়া দেখিতেছেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। তখন ভাবিলেন, নবীন-সন্ন্যাসীর ধান্দা লাগিয়াছে; দুই এক দিবস ধান্দা ভাঙ্গিতে যাইবে, তখন কথা বলিলেন। দ্বিতীয় দিবসও ঠিক সেইভাবে গেল। সার্বভৌমও দুঃখিত হইয়া পাঠ বন্ধ করিলেন। এইরূপে সাত দিবস গত হইল। সার্বভৌম তখন ধৈর্য হারাইয়াছেন। ভাবিতেছেন, এ ত ভোগ মন্দ নয়? এত পরিশ্রম করিয়া আমি কোন কালে কাহারও নিকট বেদ ব্যাখ্যা করি নাই! কিন্তু ফল কি হইতেছে? সন্ন্যাসীটি একবার আমার নিকট উপকার স্বীকারও করিল না? ভাল, তাই না করুক, একবার ভাল কি মন্দ কিছুই বলিল না? ইহার মানে কি? এটি কি পাগল, না নির্বোধ, না মূর্খ? সত্যই কি এ মূর্খ! আমি যাহা বলিতেছি তাহা বুঝিতেছে না? কিম্বা ইহার কাছে আমার ব্যাখ্যা ভাল লাগিতেছে না? তাহাই বা বলি কিরূপে? যেরূপ বিনয়ী, লাজুক ও নম্র, ইহার দম্ভ ও অভিমানের লেশমাত্র আছে বলিয়া ত বোধ হয় না। যাহা হউক, কল্য ইহার তথ্য জানিতে

হইবে। ইহার তথ্য না জানিয়া আর ব্যাখ্যা করিব না। এদিকে প্রভুও সার্বভৌমের বিষাক্ত বাণ-স্বরূপ ব্যাখ্যায় জরজর হইয়াছেন। তিনি শক্তিধর বলিয়াই সহিয়া আছেন, ত্রিজগতে আর কেহ পারিতেন না।

অষ্টম দিবসে সার্বভৌম পুস্তক খুলিয়া বলিতেছেন, "স্বামিন্! এই সপ্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া বেদ পাঠ করিলাম, কিন্তু তুমি হাঁ-কি-না কিছুই বল না কেন?"

প্রভু! আপনার আজ্ঞা বেদ শ্রবণ করা, তাই করিতেছি।

সার্বভৌম। সে উত্তম, কিন্তু আমি ত শুধু পাঠ করিতেছি না, ব্যাখ্যাও করিতেছি। ব্যাখ্যা তোমার নিমিত্তই করিতেছি। কিন্তু তুমি চুপ করিয়া শুনিতেছ, ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটী কথাও বলিতেছ না।

প্রভু। আমি অজ্ঞ, অধ্যয়ন নাই। আপনি ভুবন-বিজয়ী পণ্ডিত, আপনার ব্যাখ্যা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

সার্বভৌম। বুঝিতেছ না? তবে আমি ব্যাখ্যা করিতেছি; তুমি বুঝিতে পারিবে, এই জন্যেই ত? আমি ব্যাখ্যা করি, তুমি চুপ করিয়া বসিয়া থাক; বুঝ-না-বুঝ আমি কিরূপে জানিব? যে না বুঝে, সে জিজ্ঞাসা করে। তোমার এ কি ভাব? বুঝ না বলিতেছ, তবে জিজ্ঞাসা কর না কেন?

প্রভু। বেদের সূত্রগুলি পরিষ্কার, তাহা বেশ বুঝিতেছি। কিন্তু আপনি যে ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

এই কথা শুনিয়া, প্রভু কি বলিতেছেন, সার্বভৌম হঠাৎ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কারণ প্রভু যাহা বলিলেন, সেরূপ কথা তাহার শুনা অভ্যাস নাই। আর ২৪ বৎসর বয়স্ক একটী নিরীহ বালক-সন্ন্যাসীর নিকট যে এরূপ কথা শুনিবেন, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বালক-সন্ন্যাসীর কথার তাৎপর্য এই যে, পণ্ডিত-প্রবর সার্বভৌম ভুল ব্যাখ্যা করিতেছেন! সার্বভৌম উগ্রভাবে বলিলেন, "কি বলিলে? বেদের সূত্র বেশ বুঝিতে পার কিন্তু আমার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছ না? অর্থাৎ আমার ব্যাখ্যায় ভুল যাইতেছে, আর তোমার মনোমত হইতেছে না?" প্রভু বলিলেন, "শাস্ত্রে দেখিতে পাই, কোনো উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত, শ্রীভগবানের আজ্ঞাক্রমে, শঙ্করাচার্য বেদের প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন করিয়া মনঃকল্পিত অর্থ করেন। শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যা যে মনঃকল্পিত, তাহা বেদের সূত্র তাঁহার ব্যাখ্যা পাঠ মাত্র জানা যায়। সূত্রের একরূপ অর্থ, শঙ্করাচার্য কল্পনা-বলে অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। আপনার ব্যাখ্যা সেই শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যার অনুযায়ী। সে ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার অন্তর অত্যন্ত বিকল হইতেছে। কিন্তু আপনি বেদ শ্রবণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাই আপনার আজ্ঞানুসারে শ্রবণ করিতেছি।"

সার্বভৌম বুঝিলেন. প্রভু তাহার অর্থের ভুল ধরিতেছেন, তাঁহার অর্থ কল্পিত বলিতেছেন। তিনি পুরীতে টোল স্থাপন করিয়া বেদ পড়াইয়া থাকেন। কাশীতে যেরূপ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর বেদের টোল, শ্রীক্ষেত্রে তেমনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বেদের টোল। বহুতর পড়ুয়া এখন কাশীতে না যাইয়া, শ্রীক্ষেত্রে বেদ পড়িতেছেন। এমন কি, বহুতর দণ্ডী সার্বভোমের টোলে বেদ পড়িয়া থাকেন। সেই সার্বভৌম ভট্টাচার্য বেদের ব্যাখ্যা করিতেছেন। শুনিতেছেন কে, না নদে নিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, বয়স ২৪ বৎসর, কখন বেদ পাঠ করেন নাই। আর ব্যাখ্যা করিতেছেন কে, না সার্বভৌম ভট্টাচার্য, যিনি স্বয়ং সেই বেদের আকরস্থান কাশীতে যাইয়া সেখানকার সমুদয় বিদ্যা-বুদ্ধি শুষিয়া লইয়া আসিয়াছেন। সেই বালক-সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার বাৎসল্যভাব। তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, শত সহস্র কার্যের মধ্যে, তিনি বেদ ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছেন। সেই বালক এখন বলে কি না,—তোমার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই, আমি বেদ বেশ বুঝি। তোমার ব্যাখ্যা আমূল কেবল ভুল!" কাজেই সার্বভৌম ধৈর্য হারাইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন বলিতেছেন, "হুঁ! আবার পাণ্ডিত্যাভিমানও আছে! বাহিরে দীনতা, অন্তরে দেখি

অভিমানপূর্ণ! তুমি আমাকে শিখাইবে নাকি? তাহাই হউক, এখন বৃদ্ধকালে তোমার নিকটেই বেদ শিখিব। তুমি ব্যাখ্যা কর, আমি শ্রবণ করি। দেখি, তুমি কাহার কাছে কিরূপ ব্যাখ্যা শিখিয়াছ।"*

সার্বভৌম যে নিতান্ত বালকের ন্যায় চঞ্চল হইয়া কথা বলিতেছেন, প্রভু তাহা লক্ষ্য করিলেন না। তিনি শঙ্করাচার্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শঙ্করাচার্য্যের ইচ্ছা মায়াবাদ স্থাপন। সেটি যেন তেন প্রকারেণ করিতে হইবে। কিন্তু বেদ তাহার বিরোধী। বেদ বিরোধী হইলে কেহ তাঁহার মত লইবে না। সেই নিমিত্ত, তিনি বেদের সূত্রের পরিষ্কার অর্থ ত্যাগ করিয়া, মনঃকল্পিত অর্থ করিয়াছেন। কাজেই সূত্র বুঝিতে যত সহজ, তাহার ভাষ্য বুঝা তাহা অপেক্ষা কঠিন। বেদ বলেন যে, "শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ও তাঁহার উপর প্রীতি জীবের পঞ্চম-পুরুষার্থ।" প্রভু এই কথা বলিয়াই বেদের সূত্র আওড়াইলেন, ও তাহার সরল অর্থ করিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য প্রথমে ভাবিলেন, তাড়া দিয়া প্রভুকে নিরস্ত করিবেন। সেইরূপ উদ্যোগও করিলেন। কিন্তু আপনি বুদ্ধিমান লোক, প্রথমেই প্রভুর মুখে নূতন কথা শুনিলেন, শুনিয়া একটু আকৃষ্ট হইলেন। তখন প্রভুকে তাড়া না দিয়া তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিতে অবসর দিলেন। ইহাতে আরও ধান্দায় পড়িলেন; যেহেতু প্রভুকে আরও নূতন কথা বলিতে অবকাশ দিলেন, ইহাতে আরও আকৃষ্ট হইলেন, হইয়া শুনিতে লাগিলেন, প্রভুর কথা শুনিবামাত্র বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী নির্বোধ নহেন। আর একটু পরে বুঝিলেন, সন্ন্যাসী পণ্ডিতও বটেন। আর একটু পরে বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী কেবল পণ্ডিত ও সুবোধ নহেন, একজন উচ্চ-শ্রেণীর পণ্ডিত। প্রভুর উপর সার্বভৌমের শ্রদ্ধা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সার্বভৌম যখন বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী তাঁহার অবজ্ঞার পাত্র ত নহেন বরং তাঁহার সমকক্ষ ইহাতে কিছু ব্যস্ত ও ভীত হইলেন। তখন ভাবিতেছেন, তাঁহার গুরুর আসনখানি বজায় রাখিবার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে, সুতরাং আর চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়। তখন ভট্টাচার্য উত্তর আরম্ভ করিলেন।

ভট্টাচার্য পুনঃ পুনঃ কহয়ে প্রভুরে। বেদান্ত শুনহ, নাচ কাচ ত্যজ দূরে।।
প্রভু কহে যে আজ্ঞা যাহাতে মোর হিত— হয় তাহা কৃপা করি কব যে উচিত।।
মূর্খ মুঞি মোর নাহি দিশ পাশ জ্ঞান। দয়া করি কর যাহে মোর পরিত্রাণ।।
ভট্টাচার্য কহে ভাল তাহাই হইবে। ঈশ্বর তোমার অর্থে ভালই কবিবে।।
এত কহি ভট্টাচার্য বেদ্যন্ত ব্যাখ্যান। সাত দিন করেন প্রভু বসিয়া শ্রবণ।।
নির্বিশেষ ব্রহ্ম আর তত্ত্বমসি জ্ঞান। মায়াময় বাদ যাহা পাষণ্ডী বিধান।।
এই সব মত ব্যাখ্যা করে ভট্টাচার্য; কিছু নাহি কহে প্রভু করি রহে ধৈর্য।।
ভট্টাচার্য কহে তুমি মৌনে কেন রহ। বুঝ কি না বুঝ তাহা কিছুই না কহ।।
প্রভু কহে কি কহিব যে কহিছ অর্থ। সকলি যে বিপর্যয় ব্যাখ্যান অনর্থ।।
সচ্চিৎ আনন্দময় রূপ ভগবান। অনন্ত স্বরূপ শক্তি-যোগমায়া হন।।
জীব মায়াদাস সেব্য সেবক সম্বন্ধ। ইহার অন্যথা কহ এ বড়ই ধন্ধ।।
মুখ্য অর্থ ছাড়ি কর গৌণার্থ ব্যাখ্যান। লক্ষণ করিয়া সহ কহ অবিধান।।
ঈশ্বর নিঃশক্তি আর বিগ্রহ অনর্থ। অশ্রোতব্য এই বাক্য বড়ই অনর্থ।।
শুনি দগ্ধ হয় কর্ণ না সহে পরাণে। ভট্টাচার্য ইহা শুনি ক্রোধ হৈল মনে।।
কহয়ে তুমি যে বড় আমারে শিখাও? কি শিখেছ তুমি তবে শুনি দেখি কও।।
প্রভু কহে তবে যদি আজ্ঞা কর তুমি। কিছু ব্যাখ্যা করি তবে যাহা জানি আমি।।
তবে প্রভু সেই সূত্র ব্যাখ্যা আরম্ভিল। ষাটি প্রকার তার সদর্থ করিল।।
শুনি ভট্টাচার্য তবে চমকিয়া কহে। ইহা ত সামান্য মনুষের সাধ্য নহে।।
ভট্টাচার্যের যেই পাণ্ডিত্য অভিমান। গেল যদি প্রভু তবে হৈল কৃপাবান।।

যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে---

"ভট্টাচার্য পূর্বপক্ষ আবার করিল। বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল।।"

অর্থাৎ তর্কে জয়ী হইবার নিমিত্ত নৈয়ায়িকদিগের যত ন্যায্য ও অন্যায্য উপায় আছে, ভট্টাচার্য সমুদয় অবলম্বন করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য ১২শ সর্গঃ—

ইত্থং প্রমাণৈরখিলৈশ্চ শক্ত্যা তাৎপর্য্যতো লক্ষণয়াচ গৌণ্যা।

মুখ্যা জহৎস্বার্থ তদন্যমিশ্রস্বরূপয়া স্বমতমাবভাষে।।২৫

অর্থাৎ "এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের অখিল প্রমাণ দ্বারা তথা তাৎপর্য, লক্ষণা, গৌণী, মুখ্যা, জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, এবং জহদজহৎস্বার্থা নামক শব্দের শক্তি দ্বারা স্বীয় মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।"

অসৌ বিতণ্ডাচ্ছলনিগ্রহাদ্যৈর্নিরস্ত ধীরপ্যথ পূর্বপক্ষং।

চকার বিপ্রঃ প্রভুনা সচাস্ত স্বসিদ্ধ সিদ্ধান্তবতা নিরস্তঃ।।

অর্থাৎ "অনন্তর বিপ্রবর সার্বভৌম বিতণ্ডা, ছল ও নিগ্রহাদি দ্বারা নিরস্ত বুদ্ধি হইয়া পুনর্বার পূর্বপক্ষ করিলেন, এবং স্বভাব-সিদ্ধ সিদ্ধান্তবিদ্ মহাপ্রভু শীঘ্র পূর্বপক্ষকে নিরস্ত করিলেন।" তখন ভট্টাচার্যের প্রাণপণ হইয়াছে, তিনি যান যান, তাঁহার সর্বনাশ উপস্থিত। তাঁহার চিরজীবনের সাধনের ধন সেই গুরুর আসন, তাঁহার অর্থের চরমসীমা সেই ভুবন-বিখ্যাত প্রতিষ্ঠা—যায় যায় হইয়াছে। কিন্তু করেন কি? আবার অন্যায় ছল উঠাইয়া পদে পদে আপনি অপদস্থ হইতে লাগিলেন।

যখন দুই বীরে মল্লযুদ্ধ হয়, তখন প্রথম ধীরে ধীরেই আরম্ভ হয়। ক্রমে প্রাণপণ হয়। একজন ক্রমে দুর্বল হইতে থাকেন, তাহার পরে তাহার সমুদয় শক্তি লোপ হইয়া পড়ে। তখন সে নিরাশ হইয়া পৃষ্ঠাসন অবলম্বন করে, আর তাহার জয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী তাহার বক্ষস্থলের উপর বসিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরে। পরাজিত মল্ল তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর পানে কাতরভাবে চাহিতে থাকে।

পণ্ডিতপ্রবর সার্বভৌম ক্রমে দুর্বল হইতেছেন; বুঝিতেছেন, দুর্বল হইতেছেন, কিন্তু উপায় নাই; প্রাণপণ করিয়াও পারিতেছেন না। অগ্রে যে বিরোধ করিতেছিলেন, তাহা ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। আর শক্তি নাই। তখন নিরাশ হইয়া, অতি কাতর বদনে চুপ করিয়া বসিয়া, প্রভুর দিকে চাহিয়া, তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন। তখন সার্বভৌম হইয়াছেন যেন একটি পঞ্চমবর্ষের শিশু, আর প্রভু তাঁহার পরম উপদেষ্টা; অতিশয় বাৎসল্যের সহিত তাঁহাকে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য কি তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন। প্রভু বলিলেন, "ভট্টাচার্য, শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি জীবের পরম সাধন; যাঁহারা মুনি, সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, তাঁহারাও ভগবদ্ভক্তি কামনা করিয়া থাকেন।" ইহা বলিয়া প্রভু অন্যান্য অনেক শ্লোকের মধ্যে, শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটী পাঠ করিলেন, যথা—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্য-হৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণে।।"

সার্বভৌম তখন বিনয়ের সহিত বলিলেন, "স্বামিন্! এই শ্লোকটির অর্থ আপনার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি।" প্রভু বলিলেন, "যে আজ্ঞা তাহাই করিব। তবে অগ্রে আপনি অর্থ করুন। পরে আমি ইহার অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছি করিব।"

সার্বভৌম ইহাতে পরম আশ্বাসিত হইলেন,—তিনি মরিয়াছিলেন, নবজীবন লাভের একটি উপায় পাইলেন। অর্থাৎ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাঁহার পাণ্ডিত্য দর্শাইবার অবকাশ পাইলেন। এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিচ্যুতপদ, যতদূর সম্ভব পুনঃ অধিকার করিবেন, এই আশা করিয়া অতি আগ্রহের সহিত ইহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। নানা তর্কের ছল উঠাইলেন, নানা কথার নানা অর্থ করিলেন, এইরূপে শ্লোকের নয়টি অর্থ

করিলেন। শেষে ভাবিলেন, তিনি যাহা করিলেন ইহা জগতে অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু প্রভু সেরূপ কোনো ভাব দেখাইলেন না,—তিনি সার্বভৌমের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সার্বভৌম ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়া প্রশংসার আশয়ে মহাপ্রভুর মুখপানে চাহিলেন। প্রভুও সার্বভৌমের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া শেষে বলিলেন, "পৃথিবীতে তোমার সমান পণ্ডিত বিরল। তুমি ইচ্ছা করিলে এক শ্লোকের নানাবিধ অর্থ করিতে পার। তবে তুমি পাণ্ডিত্যের শক্তিতে অর্থ করিয়াছ। কিন্তু এই শ্লোকের আরও তাৎপর্য থাকিতে পারে।"

ভট্টাচার্য ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ন্যায্য ও অন্যায্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া শ্লোকটির নয়টি অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় যখন শ্লোক-ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলিবার আর কিছু রহিল না তখনই ক্ষান্ত দিয়াছেন। এখন প্রভুর মুখে শুনিলেন যে, শ্লোকের আরও অর্থ আছে। ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিতেছেন, "সে কি? আপনি বলিতেছেন ইহার আরও অর্থ আছে! আর কি অর্থ আছে বলুন দেখি?"

প্রভু এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। সার্বভৌম যে সকল অর্থ করিয়াছেন, তাহার একটিও স্পর্শ করিলেন না,—সে পথেই গেলেন না। তিনি যে পথ লইলেন তাহা সম্পূর্ণ নূতন এবং যতগুলি অর্থ করিলেন তাহাও সমুদয় নূতন। এইরূপে প্রভু ইহার অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন!

কিরূপে প্রভু এই এক শ্লোকের বিবিধ অর্থ করিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বিবরিত আছে। প্রভুর ব্যাখ্যার পদ্ধতি দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। প্রথমে প্রভু শ্লোকের 'আত্মা' শব্দ লইয়া ইহার যত প্রকার অর্থ আছে বলিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত— "আত্মা শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি, স্বভাব, এই সাত অর্থ প্রাপ্তি।।"

তথাহি বিশ্ব-প্রকাশে—'আত্মা, দেহ, মনো, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি বুদ্ধিষু প্রযত্নে চ।'

প্রভু এইরূপে এই শ্লোকে যতগুলি শব্দ আছে, এবং অভিধান অনুসারে প্রত্যেক শব্দের যত রকম অর্থ আছে, সব বলিলেন। তারপর এই সকল শব্দের নানাবিধ অর্থ যোগ করিয়া শ্লোকের নানাবিধ অর্থ করিতে লাগিলেন। শেষে দেখাইলেন যে, এই সমুদয় অর্থের তাৎপর্য একই,—অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিই সর্বজীবের পরম পুরুষার্থ।

সার্বভৌমের নিকট ভক্তির প্রাধান্য দেখাইবার নিমিত্ত, প্রভু অন্যান্য বহুতর শ্লোকের সঙ্গে "আত্মারাম" শ্লোকটিও আওড়াইয়াছিলেন। ইহার অর্থ যে তাঁহার করিতে হইবে, তাহা তিনি জানিতেন না। আর শ্লোকের ব্যাখ্যা করাও প্রভুর কার্য নহে, ইহা পণ্ডিতগণের কার্য। সার্বভৌমের নিকট শ্লোক পাঠ করিতে গিয়া, যে তাহার মধ্যে বাছিয়া প্রভুর নিকট সার্বভৌম এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে চাহিবেন, তাহাও অননুভবনীয়। ঘটনাটি এইরূপে হইল। প্রভু কথায় কথায় অন্যান্য শ্লোকের মধ্যে "আত্মারাম" শ্লোকটি আওড়াইয়াছিলেন। সার্বভৌম (কেন তিনিই জানেন) উহার ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলেন। প্রভু বলিলেন, "আগে তুমি ব্যাখ্যা কর, পরে আমি করিব।" এই অনুমতি পাইয়া সার্বভৌম (অর্থাৎ সেই ভুবনবিজয়ী পণ্ডিত) তাঁহার যতদূর সাধ্য সেই শ্লোকটি নিঙ্গড়াইয়া অর্থ বাহির করিলেন। শেষে প্রভুকে উহার অর্থ করিতে দিলেন। প্রভুও অমনি ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। সার্বভৌম যত প্রকার অর্থ করিলেন, প্রভু তাহার একটিও না লইয়া নূতন নূতন অর্থ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই দেখাইলেন যে, সমগ্র অভিধানখানি তাঁহার কণ্ঠস্থ। তাহার পর, এই সমস্ত শব্দ সংযোগ করিয়া প্রভু প্রথমে একটি সম্পূর্ণ নূতন অর্থ করিলেন। ইহা শুনিয়া সার্বভৌম ভাবিতেছেন,— অদ্ভুত! অদ্ভুত!! তাহার পর শ্লোকের শব্দের অর্থ দিয়া যখন প্রভু আর একটি অর্থ করিলেন,

তখন সার্বভৌম আরও আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছেন,--হরি! হরি! কি অদ্ভুত! কি পাণ্ডিত্য!! কি অমানুষিক শক্তি!!!

প্রভু এই প্রকারে ঐ শ্লোকের আরও একটি অর্থ করিলেন। এই নূতন অর্থের মধ্যে সার্বভৌম আরও কারিগরি দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি দেখিতেছেন যে, যদিও প্রভু শ্লোকের নূতন নূতন অর্থ করিতেছেন, কিন্তু সমুদয় অর্থ দ্বারাই তাঁহার মত, অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তিই যে জীবের পুরুষার্থ, তাহাই প্রমাণ করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া সার্বভৌমের বুদ্ধি-শুদ্ধি ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল। আবার তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের একটি অর্থও লইলেন না, তাহাও বুঝিলেন। প্রথমে প্রভু যখন শব্দের অর্থ করিতে লাগিলেন, তখন সার্বভৌম ভাবিলেন, শব্দ উহার খেলার সামগ্রী। ইনি যে সরস্বতীর বরপুত্র! বুঝিলেন যে, নবীন সন্ন্যাসী মনুষ্য নহেন। শ্লোকের অর্থ করিতে প্রভু যে অদ্ভুত শক্তি দেখাইতে লাগিলেন, ইহা যে কত বিস্ময়কর তাহা পাঠক কিছু কিছু বুঝিতে পারেন; কিন্তু সার্বভৌম উহা যেরূপ বুঝিলেন, সেরূপ আর কেহই বুঝিতে পারিবেন না; কারণ তিনি নিজে কারিগর লোক। পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য পণ্ডিতে যেরূপ বুঝিতে পারেন, অন্যে তাহা পারেন না। আবার যাঁহার যত বড় পাণ্ডিত্য, তিনি অন্যের পাণ্ডিত্য-শক্তি তত বেশী অনুভব করিতে পারেন। কাজেই নবীন সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্য সার্বভৌম যেরূপ অনুভব করিলেন, তাঁহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট পণ্ডিতে তাহা পারিতেন না। প্রভু শ্লোকের অর্থ পূর্বে ভাবিয়া চিন্তিয়া রাখেন নাই, উপস্থিত মতই করিলেন।

প্রভুর নিকট শ্লোকের অর্থ শুনিতে শুনিতে সার্বভৌমের মনের ভাব ক্রমেই পরিবর্তিত হইতে লাগিল। প্রথমে প্রভুর মুখে বেদের অর্থ শুনিয়া সার্বভৌম বুঝিলেন যে, জগতের মাঝে তিনিই অদ্বিতীয় পণ্ডিত নন, তাঁহার উপরে আরো পণ্ডিত আছেন। কিন্তু প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে তিনি একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তিনি প্রথমেই বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসীর শক্তি কেবল যে অসাধারণ তাহা নহে, এরূপ শক্তি মনুষ্যের হইতেই পারে না। তখন ভাবিতেছেন, তবে ইনি কি স্বয়ং বৃহস্পতি, মনুষ্যরূপ ধরিয়া আমার গর্ব খর্ব করিতে আসিয়াছেন? যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য—১২শ সর্গে ঃ

অথৈষ বিস্মেরমনা দ্বিজাগ্র্যো হৃদাহৃদি ব্যাকুলিতো জগাদ।
ক এষ মৎপ্রাতিভখণ্ডনার্থমিহাবতীর্ণঃ কিমুগীষ্পতিঃ স্যাৎ।।২৮

"তদনন্তর দ্বিজাগ্রণী সার্বভৌম ব্যাকুলিত ও বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, ইনি কি বৃহস্পতি, যিনি আমার প্রতিভা হরণ করিতে আসিয়াছেন? আবার ভাবিতেছেন, বৃহস্পতি হইলেও আমি একটু যুদ্ধ করিতে পারিতাম,—ইনি তাঁহা অপেক্ষাও বড়।"

তখন তাঁহার গোপীনাথের কথা মনে পড়িল। ভাবিলেন, গোপীনাথ বলেছিল যে, এ সন্ন্যাসী স্বয়ং—তিনি। সেইরূপ আকৃতি প্রকৃতি বটে,—যেমন সুন্দর মুখশ্রী, তেমনি মধুর প্রকৃতি, আবার সর্বাঙ্গ লাবণ্যে মণ্ডিত। এত রূপ গুণ কি অপরের সম্ভবে? এই কথা মনে হওয়াতে সার্বভৌমের শরীর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমস্ত অবিদ্যা অন্তর্হিত হইল! তাহাতে কি হইল? না,—তাঁহার চিত্তদর্পণ নির্মল ও সমুদয় দেখিবার ও বুঝিবার শক্তি হইল। তখন বুঝিলেন, তিনি অভিমান ও ঈর্ষা দ্বারা চালিত হইয়া সম্মুখের বৃহদ্বস্তুটীকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, আর তাঁহার প্রতি নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছেন। তখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া গলায় বসন দিয়া "আমি অপরাধী" বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া প্রভুর চরণে পড়িতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না; কারণ দেখেন যে, সম্মুখে নবীন সন্ন্যাসী আর নাই। সে স্থানে বিদ্যুল্লতা-মণ্ডিত সুবর্ণবর্ণের অঙ্গ লইয়া একজন অতি সুন্দর-পুরুষ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার

ষড়ভুজ। উর্ধের দুই বাহু দুর্বাদলের ন্যায় বর্ণ, উহাতে ধনুর্বাণ; মধ্যে দুই বাহু নীলাকান্তমণির ন্যায়, উহাতে মুরলী; আর নিম্নের দুই বাহু সুবর্ণ-বর্ণের, উহাতে দণ্ড ও কমণ্ডলু। এই সুন্দর-মূর্তির শ্রীবদন মুরলীরন্ধ্রে চুম্বিত। ইহার মুখে মধুর হাস্য, মস্তকে চূড়া, আর অঙ্গের জ্যোতি সুশীতল স্নিগ্ধকারী ও আনন্দপ্রদ। ইহা দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে— "অপূর্ব ষড়ভূজ মূর্তি কোটি সূর্যময়। দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্বভৌম মহাশয়।।"

সার্বভৌমের চিত্তদর্পণ বিদ্যামদে মলিন হইয়াছিল। চাঁদকাজীকে রাহুবলে অন্ধ করে। তাঁহার বাহুবল অন্তর্হিত হইলে, তাহার চক্ষু পরিষ্কার হইল। যে বলে চাঁদকাজীর উদ্ধার হইয়াছিল, সে বলে সার্বভৌমের কিছুই হইত না। যে শক্তিতে সার্বভৌম উদ্ধার হইলেন, উহা চাঁদকাজীকে স্পর্শও করিত না। সার্বভৌমকে কৃপা করিতে তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমান হরণ করিবার প্রয়োজন হয়, প্রভু তাহাই করিলেন। অমনি তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমান গেল, তিনি দিব্যচক্ষু পাইলেন। সার্বভৌম ষড়ভূজমূর্তি যেরূপ দর্শন করেন, তাহা তিনি জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে ও আপনার বাসগৃহে অঙ্কিত করিয়া রাখেন। উহা অদ্যাপিও বিদ্যমান। সার্বভৌম মূর্চ্ছিত হইলে প্রভুর "শ্রীহস্ত পরশে বিপ্র পাইল চেতন।" অমনি সার্বভৌম চক্ষু মেলিলেন, ও প্রভুর পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিলেন। প্রভু বলিলেন, "তুমি আমার ভক্ত, তাই তোমাকে দর্শন দিলাম।" "সংকীর্তন আরম্ভে আমার অবতার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মুই বহি নাহি আর।।"

সার্বভৌম ক্রমে অল্প চেতন পাইয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায় ইতি-উতি চাহিতে লাগিলেন; কিন্তু সে মূর্তি আর দেখিতে পাইলেন না। তবে দেখিলেন, সে স্থানে সেই নবীন সন্ন্যাসী বসিয়া। সার্বভৌম সম্পূর্ণরূপে চেতন পাইবার পূর্বেই প্রভু উঠিয়া বাসায় গেলেন। ক্রমে সার্বভৌমের নিপট্ট-বাহ্য হইল। তিনি তখন কি দেখিয়াছেন, কি শুনিয়াছেন ও দেখিবার পূর্বে কি কি ঘটনা হয়, ক্রমে সমুদয় স্মরণ করিতে লাগিলেন। কখন ভাবিতেছেন, সমুদয় ইন্দ্রজাল; আবার ভাবিতেছেন,—কিন্তু বেদের যে নূতন অর্থ শুনিলাম তাহা ত ইন্দ্রজাল নয়। আর আত্মারাম শ্লোকের যে ব্যাখ্যা শুনিলাম তাহা ত সমুদয় মনে আছে। অবশ্য যে মূর্তি দেখিয়াছি তাহা স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু মূর্তি দেখিবার পূর্বে আমি না সন্ন্যাসীকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া তাঁহার চরণে পড়িতে গিয়াছিলাম? সন্ন্যাসী যে মনুষ্য নহেন, তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্যে প্রকাশ। যাঁহার এরূপ অমানুষিক শক্তি, তাঁহার পক্ষে ষড়ভূজ হওয়ার বিচিত্রতা কি? তবে এ ষড়ভূজের অর্থ কি? ইহার এক অর্থ এই হইতে পারে যে অগ্রে রাম, পরে শ্রীকৃষ্ণ, শেষে শ্রীগৌরাঙ্গ; অর্থাৎ আমি সেই রাম, আমিই সেই কৃষ্ণ, আর আমিই সেই গৌরাঙ্গ। প্রভু ষড়ভুজের দ্বারা আমাকে সেই পরিচয় দিলেন। স্বপ্নে এত জ্ঞানগর্ভ অর্থ কিরূপে থাকিবে? প্রভু মুখে কিছু বলিলেন না বটে, তবে প্রকারান্তরে আমাকে সমুদয় পরিচয় দিয়া গেলেন। সার্বভৌম আবার ভাবিতেছেন, "যাহা দেখিয়াছি তাহা ঠিক। তবে কে, কিরূপে, উহা আমাকে দেখাইলেন?" তখন মনে হইল, সন্ন্যাসীর যে এই কার্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সন্ন্যাসীটি কি শ্রীভগবান্?

অমনি সার্বভৌমের মন বলিয়া উঠিতেছে,—"না, না সন্ন্যাসী ভগবান্ কিরূপে হইবেন?" সার্বভৌমের এরূপ মনের ভাবের কারণ এই যে, জীবের দুইটি মন্ত্রী আছে—সন্দেহ ও বিশ্বাস। দুটিই উপকারী; তাহার মধ্যে সন্দেহ, বিশ্বাস অপেক্ষাও বলবান। সন্দেহ ও বিশ্বাস হুড়াহুড়ি বাধিলেই সন্দেহের জয় হয়। সার্বভৌম ভাবিতেছেন, ইনি শ্রীভগবান্ কখনও নয়; শ্রীভগবান্ কলিকালে নর-সমাজে আসিয়াছেন, তাহা কি হইতে পারে? এ যে হাসিবার কথা। তবে সন্ন্যাসীটি সম্ভবতঃ ইন্দ্রজাল জানেন, তাহার দ্বারা আমার ভ্রম জন্মাইয়াছিলেন। তিনি ভগবান্ কখনও হইতে পারেন না।"

আবার বিশ্বাস আসিতেছে। তখন ভাবিতেছেন, "তবে সন্ন্যাসী আপনিই স্বীকার করিলেন

যে, তিনি শ্রীভগবান্। ইহা ঘোর নাস্তিক ও পাষণ্ড ব্যতীত আর কেহ কি বলিতে পারে? কিন্তু সন্ন্যাসী নাস্তিকও নয়, মূর্খও নয়, ভণ্ডও নয়। ইঁহার প্রেম শ্রীরাধার প্রেমের ন্যায়, যাহা মনুষ্যের অসম্ভব। ইঁহার বুদ্ধি বিদ্যা সরস্বতীকান্তের ন্যায় বৈরাগ্য অকথ্য, আর স্পৃহা মাত্র নাই। ইঁহার দীনতা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইঁহার বদনের সারল্য দেখিলে, অতি কঠিন পুরুষেরও নয়নে জল আইসে। ইনি আপনাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া পরিচয় দিবেন কেন? ইঁহার স্বার্থ কি? ইঁহার ত কোনো স্পৃহা নাই? ইঁনি কখনই ভণ্ড-ভক্ত হইতে পারেন না; কারণ ইঁহার বায়ুতে জীবের হৃদয় ভক্তিতে গদগদ হয়। যিনি প্রকৃত ভক্ত, তিনি কি কখন শ্রীভগবান্কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপনাকে সেখানে বসাইতে পারেন? ইনি যে শ্রীভগবান্ তাহার সন্দেহ নাই। শ্রীভগবান্ না হইলে, আপনাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া পরিচয় দিতেন না।" ইহা ভাবিয়া সার্বভৌম আবার আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন।

সার্বভৌমের এইরূপে সমস্ত নিশি কাটিয়া গেল। এই এক নিশির মধ্যে তাঁহার হৃদয় কর্ষিত হইল। তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্র কণ্টকবৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল; প্রভু তখন তাহার মধ্যে ভক্তি-বীজ রোপণ করিলে উহা অঙ্কুরিত হইত না। এই নিমিত্ত ভক্তি-বীজ রোপণ করিবার পূর্বে হৃদয়স্থ কণ্টকী-লতাগুলি উৎপাটিত ও হৃদয় কর্ষণ করিতে হইল। ষড়ভুজ দর্শন করিয়া এবং প্রভুর সহবাসে সার্বভৌম ভক্তি পাইলেন না। তবে ভক্তি পাইবার যোগ্যপাত্র হইলেন। এই এক নিশির মধ্যে, তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত ও সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত এবং নয়ন-জলে আর্দ্র হইল। তখন কেবল বীজ রোপিত হইতে বাকি রহিল। কিঞ্চিৎ রজনী থাকিতে তিনি নিদ্রা গেলেন।

এদিকে প্রভু বাসায় আসিয়া রজনী যাপন করিয়া, অতি প্রত্যূষে শয্যোত্থান দর্শন করিতে চলিলেন। প্রভু দর্শন করিতেছেন, ভক্তগণ নিকটে দাঁড়াইয়া। শ্রীজগন্নাথদেবের গাত্রোত্থান, মুখধাবন, স্নান, বস্ত্রপরিধান, বাল্যভোগ ও পরে হরিবল্লভ-ভোগ হইল। তখন আন্ধার আছে। তাহার পরে প্রাতে ধূপ-পূজা হইল। এমন সময় শ্রীজগন্নাথের দুইদিক হইতে দুইজন সেবক হঠাৎ বাহির হইয়া প্রভুর নিকটে আসিলেন। একজনের হস্তে মালা, আর একজনের অঞ্জলিতে ধূপ-পূজার প্রসাদান্ন। তাঁহারা প্রভুর নিকটে আসিলে,—যথা শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে—

"মহাপ্রভু অধো মাথা করিলা আপনে। এক জন মালা গলে দিলেন তখনে।।
বহির্বাস অঞ্চল প্রসারি ভগবান। প্রসাদান্ন আর জল করিলা স্বাদন।।"

গৌরাঙ্গের গলায় মালা পরান হইলে, তিনি বহির্বাসের অঞ্চলে প্রসাদান্ন লইলেন। ভক্তগণ অবাক হইয়া দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন এত ভোরে উঁহারা কাহারা আসিলেন? আর কেন আসিলেন? আপনা আপনি আসিবার ত কোন কথা নয়, কেহ অবশ্য তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কে পাঠাইলেন? প্রভুর কি গোপনে গোপনে সেবকগণের সহিত কোনো বন্দোবস্ত হইয়াছিল? তাই বা কখন হইল? আমরা ত সর্বদা প্রভুর সঙ্গে।" শেষে ভাবিলেন, এ কাণ্ড স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ করিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। বোধহয় তাঁহার,—অর্থাৎ জগন্নাথ ও প্রভু,—দুই জনে কি যুক্তি করিয়াছিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া ভক্তগণ এই কাণ্ড দেখিতেছেন। তাঁহাদের আশ্চর্য ভাব ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাইল। তাঁহাদের বোধ হইল, যেন প্রভু সমুদয় জানিতেন; অর্থাৎ দুইজনে আসিয়া যে তাঁহাকে প্রসাদ দিবেন, ইহা যেন প্রভু প্রত্যাশা করিতেছিলেন। প্রভু প্রসাদ পাইলেন, কিন্তু, বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন না, অমনি তীরের মত ছুটিলেন। প্রভু যদি দৌড়িলেন, ভক্তগণও তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন। প্রভু হঠাৎ বিদ্যুৎ-গতিতে গমন করিলেন, সুতরাং ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারিলেন না; তবে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, প্রভু দৌড়িয়া যাইতেছেন; এবং নিজ-বাসার পথ ছাড়িয়া সার্বভৌমের বাড়ী যে পথে সেই দিকে ছুটিলেন। ইহাতে অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহারাও সেই পথে চলিলেন। প্রভু দৌড়িয়া, একেবারে সার্বভৌমের গৃহের দ্বিতীয় কক্ষের ভিতরে, দ্বার অতিক্রম

করিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহে সার্বভৌম নিদ্রা যাইতেছেন, দাওয়ায় একজন ব্রাহ্মণকুমার শয়ন করিয়া। প্রভু যাইয়া "সার্বভৌম ভট্টাচার্য" বলিয়া ডাকিলেন। ইঁহাতে প্রথমেই সেই ব্রাহ্মণবালক উঠিল, উঠিয়া প্রভুকে দেখিয়া তটস্থ হইয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে ডাকিতে লাগিল। বলিতেছে, "ভট্টাচার্য মহাশয়! শীঘ্র উঠুন, সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়াছেন।" সার্বভৌম হইাতে উঠিলেন, উঠিয়া হাই তুলিতে তুলিতে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিতে লাগিলেন। সার্বভৌম প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিবার অগ্রে কৃষ্ণনাম করিতেন না। এই প্রথম বলিলেন। তারপর যখন বুঝিলেন যে প্রভু আসিয়াছেন, তখন ব্যস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং আসিয়াই প্রভুর চরণে পড়িলেন, আর প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

এখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাশয় কিরূপে ধর্ম মানেন, তাহা একটু বর্ণনা করিবার প্রয়োজন হইতেছে। এখানকার ব্রাহ্মপণ্ডিতেরা যেরূপ, তিনিও সেইরূপ। তবে এখনকার ব্রাহ্মণপণ্ডিত অপেক্ষা অধিক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অধিক তেজস্কর ও অধিক সূক্ষ্মদর্শী। ভিন্ন জাতির জল হিন্দুদের আচরণীয় নহে। কিন্তু সার্বভৌমের অঙ্গে যদি ঐরূপ জলের ছিটা লাগিত তবে তিনি উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। সমাজের ঘোর শাসন ছিল, তাহা ভট্টাচার্যেরাই পালন করিতেন; কাজেই তাঁহাদের সেই শাসনের অধীন থাকিতে হইত। আপনারা না মানিলে অন্যে মানে না, সুতরাং সেই শাসন অন্য অপেক্ষা আপনারা অধিক মানিতেন। আচার বিচার ও শুচি লইয়া দেশ সমেত লোক বিব্রত। এ ব্যক্তি অস্পৃশ্য, এ দ্রব্যটা অশুচি—ইহার বিচারই ক্রমে জীবের প্রধান ধর্ম হইল। জাতি বিচার ইহার প্রধান কারণ। আর এক বিচার দেহধর্ম লইয়া। অস্নাত ভোজন করিতে নাই, দন্তধাবন না করিলে পূর্বপুরুষ নরকে যায়, রাত্রিকালের বসন ত্যাগ করিতে হয়, ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য উচ্ছিষ্ট। অমুক চণ্ডাল, তাহার ছায়া স্পর্শ করিতে নাই। অমুকের বাড়ী মুসলমান ভৃত্য, তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে হইবে। পূর্বে বলিয়াছি যে, গৌড়ের রাজা সুবুদ্ধি রায়ের মুখে জোর করিয়া মুসলমানের জল দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া, নবদ্বীপের পণ্ডিতমহাশয়গণ ব্যবস্থা দিলেন যে, তাঁহার তপ্ত ঘৃত পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে! এই সব কঠোর শাসনের শাস্ত্রবেত্তা শ্রীনবদ্বীপের ভট্টাচার্যগণ; আর এই ভট্টাচার্যগণের প্রধান সার্বভৌম।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম ইহার ঠিক বিপরীত। জাতি-বিচার আবার কি, সকলেই ত শ্রীভগবানের? যে ভক্ত সেই সর্বশ্রেষ্ঠ। এমন কি, অভক্ত-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত-চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। হরিদাস যবন, তাঁহার পাদোদক ভক্তগণ পান করিতে লাগিলেন, আর তিনি হইলেন কুলীনগ্রামের বর্ধিষ্ণু বসুগণের গুরু। যে অন্ন শ্রীভগবানকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহা আবার উচ্ছিষ্ট কি? তাহা অতি পবিত্র, অঙ্গে মাখিতে হয়। অতএব ভট্টাচার্যগণের নিয়মাবলী এবং শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম এক সঙ্গে যাজন করা যায় না। এই নিমিত্ত ভট্টাচার্যগণ, শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মের প্রতিবাদী হইলেন। যদিও প্রভু সমাজের বিরোধী কোনো উপদেশ দিতেন না, তবু তাঁহার ধর্ম যে সামাজিক নিয়মের বিরোধী, তাহা পণ্ডিতগণ বেশ বুঝিলেন, আর সেই নিমিত্ত উহা ধ্বংস করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই সার্বভৌম শাস্ত্রবেত্তা ভট্টাচার্যগণের প্রধান। তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত ভক্তি-পথে আনা হইল। সার্বভৌম ভক্তি পাইলেন, ষড়ভুজ দর্শন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-নাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তবুও তিনি উপরিউক্ত সামাজিক বন্ধনে আষ্টে-পৃষ্টে আবদ্ধ রহিলেন। সেই সমুদয় বন্ধন হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে তাঁহার কিছুই হইবে না। প্রভু এখন সেই বন্ধন ছেদন করিতে লাগিলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে, প্রভু অতি যত্ন করিয়া, অঞ্চলের প্রসাদান্ন বাহির করিলেন এবং ভট্টাচার্যের হস্তে দিয়া, মধুর হাসিয়া বলিলেন, "গ্রহণ কর, ইহা শ্রীমুখের প্রসাদ।" তখন সার্বভৌম স্নান করেন নাই, বাসী-বসন

ত্যাগ করেন নাই, শৌচে যান নাই, দন্তধাবনও করেন নাই; তিনি কিরূপে প্রসাদ গ্রহণ করিবেন? প্রসাদ কি, না ভাত! ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ, শতবার মৃত্যু স্বীকার করিবেন, তবুও মুখ না ধুইয়া অন্ন গ্রহণ করিবেন না। সেই ভাত লইয়া, অতি প্রত্যুষে, স্নান না করিয়া, মুখ না ধুইয়া প্রভু উহা সার্বভৌমকে গ্রহণ করিতে অর্থাৎ খাইতে বলিতেছেন। প্রভু যে বলিলেন, "শ্রীমুখের প্রসাদ গ্রহণ কর", তাহার অর্থ (ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণের নিকট) এই যে, "মুখ না ধুইয়াই তুমি এই কয়টি শুখ্না ভাত খাও।" কিন্তু সার্বভৌম তখন আর পূর্বকার ভট্টাচার্য-ব্রাহ্মণ নাই; তাঁহার হৃদয় কোমল হইয়াছে, শ্রীবৃন্দাবনের বায়ু তাঁহার অঙ্গে লাগিয়াছে। (যথা শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক)—"প্রভু খাও খাও ভট্টাচার্যে বলে হাসি।" ভট্টাচার্য আর দ্বিধা করিলেন না; অঞ্জলি পাতিয়া প্রসাদান্ন গ্রহণ করিলেন, করিয়া অভ্যাসবশতঃ তবু দুইটা শ্লোক পড়িলেন, যথা—

(১) শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা।।
(২) ন দেশ নিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ।।

সার্বভৌম প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ কুলধর্ম ছাড়িলেন।

কিন্তু সেই প্রসাদান্ন ভোজন মাত্র সার্বভৌমের এক অপরূপ ভাব হইল। যথা (শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে) "চক্ষুজলে বস্ত্র সিক্ত কণ্টকিত গাত্র।" তাহার পরে সার্বভৌম আপনাকে আর সামলাইতে পারিলেন না, মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন তাঁহার কি দশা হইল শ্রবণ করুন। "নিরন্তর কণ্ঠ শব্দ হয় ঘরঘর। অপস্মার রোগে যৈছে ব্যগ্র কলেবর।। মহীতলে গড়াগড়ি যায় বার বার।"

এই মহাপ্রসাদে কি শক্তি নিহিত ছিল তাহা প্রভুই জানেন। সার্বভৌম এই কয়েকটি শুষ্ক প্রসাদান্ন যেই মুখে দিলেন, অমনি অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। প্রভুর হাতে এই প্রসাদ গ্রহণরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা সার্বভৌম নির্মল হইলেন। যথা চৈতন্য-চরিতামৃতে—"চৈতন্য প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল।"

সার্বভৌম অচেতন হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, আর প্রভু তাঁহার গাত্রে পদ্মহস্ত বুলাইতে লাগিলেন; হস্ত বুলাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইলেন, যেহেতু তখন তাঁহার উঠিবার শক্তিমাত্র ছিল না। উঠাইয়া প্রভু অতি আদরে, অতি প্রেমে—আহা! ভগবানের প্রেমের কি বর্ণনা করিব, যে প্রেমের কণা পাইয়া সতী নারী স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরেন, সেই ভগবানের প্রেমে সার্বভৌমকে বুকে করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন! আলিঙ্গন দিতে দিতে প্রভু বলিতে লাগিলেন;—যথা চৈতন্য-চরিতামৃতে—

"আজি মুই অনায়াসে জিনিল ত্রিভুবন। আজি মুই করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ।।
আজি মোর পূর্ণ হৈল অভিলাষ। সার্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস।।
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়। কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হৈলা সদয়।।
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন। আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন।।
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি যোগ্য হৈল তোমার মন।বেদ-ধর্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ।।"

সেই আলিঙ্গনের সহিত সার্বভৌম পঞ্চম-পুরুষার্থ পাইলেন। তাঁহার যে শুদ্ধ বন্ধন ছেদন হইল তাহা নহে, আরো কিছু হইল। যেরূপ বিদ্যুৎমালা মেঘের সহিত খেলা করে, সেইরূপ আনন্দ-লহরী তাঁহার অঙ্গের সহিত খেলা করিতে লাগিল। সেই লহরী, শরীরের সমস্ত ধমনী বাহিয়া সর্বাঙ্গ আবৃত করিল, অঙ্গের প্রত্যেক ছিদ্র দিয়া চোয়াইয়া পড়িতে লাগিল, আর তাঁহাতেই প্রত্যেক লোমকূপে পুলকের সৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন হৃদয়-কপাট

খুলিয়া ঝলকে ঝলকে আনন্দের তরঙ্গ আসিতে লাগিল। শেষে হৃদয়ে স্থান না পাইয়া মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। কিন্তু প্রভু তখন সার্বভৌমের আনন্দ-তরঙ্গের নালী কাটিয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন এবং দুই জনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সার্বভৌমের এই প্রথম নৃত্য এবং ইহা বন্ধন ছেদনের অব্যর্থ প্রমাণ। চির-আবদ্ধ পশুগণ কোনো ক্রমে বন্ধন ছেদন করিতে পারিলে একবার ছুটাছুটি করে। সমাজের বন্ধনে লোক স্থির-শান্ত ভব্য-সভ্য হইয়া বেড়ায়। মদ্যপানে সেই বন্ধন ছিন্ন হইলে তখন সে নির্লজ্জের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকে। যখন মদ্যপান করিয়া কেহ নৃত্য করে,—সে যে উন্মত্ত হইয়াছে, নৃত্যই তাহার প্রমাণ। সার্বভৌম নৃত্য করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, তিনি তাঁহার পূর্বকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

একজন যুবক এক দস্যুপতির নিকট আসিয়া তাঁহার দলভুক্ত হইতে চাহিল। দস্যুপতি দেখিল, যুবক বলবান বটে। পরে তাহার মুখ দেখিয়া বলিল, "বাপু! তুমি পারিবে না, দস্যু হইবার যে সমস্ত গুণ প্রয়োজন তাহা তোমার নাই।" যুবক দুঃখিত হইয়া বলিল, সে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছে। দস্যুপতি তখন হাসিয়া একখানি তরবারি যুবকের হস্তে দিয়া বলিল, "ঐ যে ষাঁড়টি চরিতেছে, উহার মাথাটি লইয়া আইস।" যুবক বলিল, "অনর্থক কেন একটী জীব হত্যা করিব!" তখন দস্যুপতি তাহার ভৃত্যকে ঐ পশুর মস্তকটি আনিতে বলিল। সে দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করিল। যদি যুবকটি আজ্ঞামাত্র পশুটির মস্তক ছেদন করিতে পারিত; তবে দস্যুপতি বুঝিতে পারিত যে, সে তাহারই গণ বটে। পূর্বে বলিয়াছি, মদ্যপান করিয়া যে নৃত্য করে, তাহাকে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, "হাঁ, এ মাতাল বটে।" সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রেম ও ভক্তির শক্তিতে নৃত্য করিতে পারে, তাহাকে বলা যাইতে পারে যে, সে ভক্ত কি প্রেমিক বটে। জগাই মাধাই উদ্ধার হইলে, জগাই প্রথমে নাচিতে লাগিলেন। তাহার পরে মাধাইও নাচিলেন। মাধাই অপেক্ষা জগাই ভাল, বিশেষতঃ তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে বাঁচাইয়াছিলেন। সুতরাং জগাই নাচিতে থাকিলে ভক্তগণ আশ্চর্যান্বিত হইলেন না। কিন্তু যখন মাধাই নাচিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—"প্রভুর একি ঠাকুরাল! জগাই নাচিলেও নাচিতে পারে, এ যে মাধাই নাচে!" মাধাই যখন প্রেম-ভক্তিতে নাচিতে পারিলেন, তখন বুঝা গেল যে, তাঁহার সর্ব বন্ধন ছেদন হইয়াছে।

দেবাদিদেব-মহাদেব-অবতার শ্রীঅদ্বৈত সকল ভক্তের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার দাস্যভক্তি। তিনি গঙ্গাজল তুলসী দিয়া শ্রীভগবানকে পূজা করিতেন। তিনি ধ্যানপরায়ণ, যাজক ও মন্ত্রবিৎ। তিনি পূজা অর্চনাদি সমুদয় ভক্তির অঙ্গ পালন করিতেন। নৃত্য-গীত তাঁহার ভজন নয়। যখন তিনি প্রভুর প্রকাশ দেখিলেন, তখন নানা উপহারে ও শাস্ত্র-বিধানে শ্রীভগবানের চরণ পূজা করিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার জাড্য রহিয়াছে। পূজা সমাপ্ত হইলে প্রভু বলিলেন; "নাড়া, একবার নৃত্য কর।" অমনি সেই পরম-গম্ভীর পৃথিবী-পূজিত বৃদ্ধব্রাহ্মণ ভঙ্গি করিয়া নাচিতে লাগিলেন। সে ভক্তি দেখিয়া প্রভু পর্যন্ত হাসিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত যখন নৃত্য করিলেন, তখন তাঁহার সর্বার্থ সিদ্ধি হইল। সার্বভৌম যখন নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সর্ব বন্ধন ছেদন হওয়াতে, নাচিবার আর বাধা রহিল না। নাচিতে বাধা না থাকিলেই কি লোকে নাচিতে পারে? ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া কি কেহ আপনা-আপনি নাচিতে পারে? তাহার সে ইচ্ছা হইবে কেন? নাচিবার কারণ চাই,—কিছু উত্তেজক মাদকদ্রব্য চাই। ভট্টাচার্যের পক্ষে সেই মাদক-দ্রব্য হইতেছে—প্রেম ও ভক্তি। ভট্টাচার্য কেবল মুক্ত হইয়াছেন তাহা নয়, সেই সঙ্গে নৃত্য করিবার শক্তি,—যে শক্তি কেবল বিশুদ্ধ প্রেম-ভক্তিতেই আছে—তাহাও পাইয়াছেন; তাই তিনি প্রভুর হস্ত ধরিয়া

নৃত্য করিতেছেন। এখন ব্রজের দুই সখীর একটি কাহিনী শ্রবণ করুন—

প্রথম সখী। ভদ্রে একি? তুমি যে নৃত্য করিতেছ?

দ্বিতীয় সখী। কেন? একটু নাচিব না? তোরা নাচিস, আমি কেন নাচিব না?

প্রথম সখী। আমরা নাচি,—আমরা কুলটা, কুল হারাইয়াছি, লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়াছি। আমাদের ও তোমার অনেক প্রভেদ। তুমি কুলবালা, ধীর, গম্ভীর; আমাদের লজ্জাবিহীন আচার ব্যবহার দেখিয়া তুমি ঘৃণায় মূর্চ্ছিত হইতে, আমাদিগকে নিন্দা করিতে; এমন কি, আমাদের ছায়া পর্যন্ত স্পর্শ করিতে না। তোমার এ দশা কেন?

দ্বিতীয় সখী। সই। আমিও শ্যামের হাতে কুল হারাইয়াছি।

প্রথম সখী। সে কি! তুই এত বড়ো গম্ভীর, তোর এ দশা হ'ল কেন, বল্ দেখি?

দ্বিতীয় সখী। শুন্‌বি?

"শুন সই মনের মরম। ধ্রু।
এত দিন জাতি কুল, রাখিয়াছিলাম গো,
হাতে হাতে মজাইলাম কুলের ধরম।।
কানু সেই কালিন্দি তীরে, মুই গেনু যমুনা নীরে,
গা খানি মাজিতেছিলাম একা।
যুবতীর চিতচোরা, জলের ভিতর গো,
যৌবন-রতনে দিল দাগা।।
হৃদয় মাঝারে শ্যাম, লুকাইয়া রাখি গো,
উপরেতে ঝাপি দিলাম বাস।
হেনকালে গুরুজনা, চিনিতে পারিল গো,
অনুমানে কহে কানুদাস।।*

সার্বভৌমও শ্যামকে হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারিলেন না,—নাচিয়া উঠিলেন; তখনি "অনুমানে" বুঝা গেল যে, তাঁহার হৃদয়ে শ্যামকে আঁচল দিয়া ঝাঁপিয়া রাখিয়াছেন! ভক্তগণ তখন সেখানে উপস্থিত। সেই দীর্ঘকায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সেই গর্বিত দণ্ডীদিগের গুরু, সেই জ্ঞানের প্রস্রবণ, সেই নদীয়া-বিজয়ী পণ্ডিতের নৃত্য,—ইহাও যেরূপ অদ্ভুত, পশ্চিমে সূর্য উদয়ও সেইরূপ অদ্ভুত। ভক্তগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। আমি পূর্বে বলিয়াছি, প্রেমের নৃত্য ক্রমে প্রস্ফুটিত ও মধুর হয়। প্রথম দিনকার নৃত্যে মাধুর্যের সঙ্গে একটু হাস্য-উদ্দীপক ভাবও থাকে। যে ব্যক্তি কখন নৃত্য করে নাই, কি যাহার করিবার সম্ভাবনাও নাই, সে যদি নৃত্য আরম্ভ করে, তবে তাহার নৃত্য প্রথম প্রথম কতকটা হস্তীর কি গণ্ডারের নৃত্যের ন্যায় হয়। সার্বভৌম সেইরূপ কত অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেছেন। ইহাতে ভট্টাচার্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ।"—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

গোপীনাথ বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য, কর কি? তোমার পড়ুয়াগণ কি বলিবে? ত্রিভুবন কি বলিবে? বলিবে যে, সার্বভৌম ভট্টাচার্য পাগল হয়েছে। ছি! সম্বরণ কর। তোমার নৃত্য করিতে লজ্জা করিতেছে না?" তখন সার্বভৌম এই অপরূপ শ্লোকটি রচনা করিয়া বলিলেন। যথা—

"পরিবদতু জনো যথা তথায়ং, ননু মুখরোহয়ং ন বিচারয়ামঃ
হরিরসমদিরা মদাতিমত্তা, ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ।।

অর্থাৎ—"অয়ে! মুখর লোক যেখানে সেখানে নিন্দা করে করুক, কিন্তু আমরা বিচার

এ ছড়াটি অতি অপূর্ব সুরে শ্রীবদন অধিকারী গাইতেন।

করিব না, হরিরস-মদিরায় অতিশয় মত্ত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠন করিব, নৃত্য করিব ও পতিত হইব।"

তাহার পরে সার্বভৌমকে শান্ত করিয়া প্রভু ভক্তগণ সহ বাসায় আসিলেন। একটু পরে সার্বভৌমও একজন ভৃত্য সঙ্গে করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে—

"প্রভু দরশনে তবে চলে শীঘ্রগতি। পাছে এক ভৃত্য তার চলিল সংহতি।।
জগন্নাথ না দেখিয়া সিংহদ্বার ছাড়ি। প্রভুর বাসার কাছে যান ত্বরা করি।।
তাঁর ভৃত্য উচ্চৈঃস্বরে ডাকি তাঁরে কয়। জগন্নাথ মন্দিরের পথ এই নয়।।"

সার্বভৌমকে ডাকিয়া ভৃত্যের এরূপ বলিবার তাৎপর্য পরিগ্রহ করুন। সার্বভৌমের ভৃত্যগণ তখন বুঝিয়াছে যে, তিনি আর এখন ঠিক প্রকৃতিস্থ নাই। তিনি যে একটু পূর্বে ঘরের পিড়ায় অচেতন হইয়া গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, তাহা তাহারা জানিয়াছে, কেহ কেহ বা দেখিয়াছে। সে সম্বন্ধে তাহাদের মনে নানারূপ তর্ক-বিতর্কও হইয়াছে; নবীন-সন্ন্যাসী তাঁহাকে পাগল করিয়াছেন, এ কথাও উঠিয়াছে। সার্বভৌম ঢুলিতে ঢুলিতে চলিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ ওই রূপ সময়ে শ্রীঠাকুর দর্শন করিতে গমন করেন। সে দিবস তাহা না করিয়া মন্দিরের পথ ছাড়িয়া, অন্যপথে চলিলেন। কাজেই ভৃত্য ভাবিল ভট্টাচার্য্যের এখনও সম্পূর্ণ চৈতন্য হয় নাই। তাই বলিল, "ঠাকুর, ও পথে নয়! ও পথে নয়!

তাহার পরে শ্রবণ করুন। সার্বভৌম আসিতেছেন,—যথা—(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে)

"আর ভট্টাচার্য মনে মনে কথা হয়। গোপীনাথ যে কহিল সেই সত্য হয়।।
সত্য গৌর ভগবান্ সাক্ষাৎ ঈশ্বর। সে নহিলে কেবা হয় এত শক্তিধর।।
এই মনে ভাবি শীঘ্র দেখিতে চলিল। আপন মাসীর পুরদ্বারে উত্তরিল।।
গোপীনাথ আচার্য ভট্টাচার্য্যেরে দেখিয়া। অগ্রসরি তথা হইতে আইল উঠিয়া।।
গোপীনাথ দেখি সার্বভৌম সুখী মর্মে। জিজ্ঞাসিলা মহাপ্রভু আছেন কিবা কর্মে।।
গোপীনাথ বলেন প্রভু আছেন বসিয়া। এসো এসো প্রভুর চরণ দেখি গিয়া।।"

সার্বভৌম অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। এ প্রণাম অন্য প্রকার, পূর্বকার "রোগী যেন নিম খায় নয়ন মুদিয়া," মতো নয়। প্রণাম করিয়া উঠিয়া, দুই কর জুড়িয়া তিনি অগ্রে দাঁড়াইলেন। সার্বভৌমের প্রেমধারা পড়িতে লাগিল এবং তিনি গদগদ হইয়া এই দুইটি শ্লোক উপস্থিত মত রচনা করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। যথা, চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে—

নানালীলারসবশতয়া কুর্বতো লোকলীলাং
সাক্ষাৎ করোঽপিচ ভগবতো নৈব তত্তত্ত্ববোধঃ।
জ্ঞাতুং শক্নোত্যহ ন পুমান দর্শনাৎ স্পর্শরত্নং
যাবৎ স্পর্শাজ্জনয়তি তরাং লোহমাত্রং ন হেম।।

অপিচ, স্বজনহৃদয় সদ্মা নাথপদ্মাধিনাথো ভূব চরসি যতীন্দ্রচ্ছদ্মনা পদ্মনাভঃ।
কথমিহ পশুকল্পাস্ত্বা মনল্পানুভাবং প্রকটমনুভবাম্মোহন্ত বামোবিধি র্নঃ।।

তারপর সার্বভৌম করজোড়ে বলিলেন, "প্রভু! গোপীনাথ আমাকে তোমার পরিচয় বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমার তর্কনিষ্ঠ মনে তখন তাহা বিশ্বাস হইল না। তাই আমি তোমাকে উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু প্রভু আমার অপরাধ কি? তুমি নানা লীলা করো। এখন মনুষ্যরূপ ধরিয়া কপট-সন্ন্যাসী হইয়া আমার অগ্রে আসিয়াছ। আমি তোমাকে কিরূপে চিনিব? তোমার যদি ইচ্ছা হয় যে তুমি গোপন থাকিবে, তবে আমি কিরূপে তোমার সে রহস্য ভেদ করিব? আমি তর্কনিষ্ঠ, তোমাকে চিনিতে প্রমাণ চাহিলাম, তাহা পাইলাম না,

কাজেই তোমাকে চিনিতে পারিলাম না। কিন্তু তুমি কৃপালু। আমার দুর্দশা দেখিয়া আমার নিকট প্রকাশ হইতে ইচ্ছা করিলে। আমার তর্কনিষ্ঠ মন, প্রমাণের প্রয়োজন, তাই প্রমাণ দিলে। স্পর্শমণিকে কেহ চিনিতে পারে না, চেনাইতে হইলে উহা দ্বারা লৌহকে স্পর্শ করিতে হয়। প্রভু! আমি তর্ক করিয়া যে লৌহপিণ্ড হইয়াছিলেন, আমাকে স্পর্শন দ্বারা দ্রব করিলে, তখনই আমি চিনিতে পারিলাম যে তুমি স্পর্শমণি।"

সার্বভৌমের আর দম্ভ নাই। তিনি তখন বিনযী, দীনহীন, কাঙ্গাল। তখন তাঁহার সর্ব-বচন ও সর্ব-অঙ্গ মধুময় হইয়াছে। তাঁহার বাক্য শুনিয়া ও ভঙ্গি দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দে দ্রবীভূত হইলেন। কিন্তু প্রভু কি করিলেন? তিনি সার্বভৌমকে ষড়ভূজমূর্তি দর্শন করাইয়াছেন, সার্বভৌমকে প্রসাদান্ন ভোজন দ্বারা উদ্ধার করিয়াছেন,—ইহা তাঁহার কিছু মনে নাই। অন্ততঃ সে সমুদয় যে তাঁহার মনে আছে, কি কস্মিন্‌কালে তিনি অবগত ছিলেন, তাঁহার কথায় ও ভঙ্গিতে তাহা কিছুমাত্র বোধ হইল না। সার্বভৌম তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া স্তব করিতেছেন শুনিয়া তিনি প্রথমে যেন বুঝিতে পারিলেন না। পরে বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন, শেষে আর শুনিতে পারিলেন না, তাই (যথা শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে)—

দুই হস্তে ভগবান, আচ্ছাদিল দুই কান, সার্বভৌমে কহেন বচন।
শুন ভট্টাচার্য তুমি, তোমার বালক আমি, মোরে কোথা করিবে বাৎসল্য।
তুমি মহা বিজ্ঞ হও, কেমনে যে কথা কও, লোক উপহাসের প্রাবল্য।।"

সার্বভৌমকে প্রভু বলিতেছেন, "আমি তোমার বালক, তুমি আমাকে কেন লজ্জা দিতেছ?" গোপীনাথ তখন আর থাকিতে পারিলেন না; বলিলেন, "ভট্টাচার্য! কেমন বলেছিলাম, এখন ঠিক হ'লো।" ভট্টাচার্য গোপীনাথের পানে চাহিলেন। আর দ্বন্দ্বের ইচ্ছা নাই, বিদ্রুপের শক্তি নাই। সার্বভৌম কৃতজ্ঞ-চক্ষে গোপীনাথকে দর্শন করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "গোপীনাথ! আমার এই সম্পত্তি কেবল তোমা হতে। আমি প্রভুর কৃপা পাইবার কিছু করি নাই; কোনো মতে উপযুক্তও নহি। তবে তুমি প্রভুর ভক্ত, আর আমার দুরবস্থায় তোমার বড় দুঃখ হইতেছিল। প্রভু তোমার দুঃখ দেখিতে পারিলেন না, তাই তোমার নিমিত্ত আমাকে উদ্ধার করিলেন।"

এই কথা শুনিয়া প্রভু আর থাকিতে পারিলেন না,—সার্বভৌমকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তখন মহাপ্রীতিতে দুইজনে বসিয়া ভক্ততত্ত্বকথা কহিতে লাগিলেন। সার্বভৌম তখন বেদ ও নানা শাস্ত্র হইতে, শ্রীভগবানের ভক্তিই যে জীবের পুরুষার্থ, তাহা প্রমাণ করিলেন। প্রভু মহাসুখে শুনিতে লাগিলেন। সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আমি এখন কি করিব? আমাকে উপদেশ করুন।" প্রভু বলিলেন, "কেন? শাস্ত্র ত উপদেশ করিয়াছেন,—হরিনাম ব্যতীত কলিকালে আর গতি নাই।" ইহা বলিয়া প্রভু "হরের্ণামৈব কেবলং" শ্লোক পাঠ করিলেন। ইহা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য ঐ শ্লোকের অর্থ শুনিতে চাহিলেন। প্রভু আবিষ্ট হইয়া অর্থ করিলেন। এই এক সামান্য শ্লোকের দ্বারা প্রভু জীবের কি ধর্ম তাহা বিস্তার করিয়া প্রমাণ করিলেন। সার্বভৌম শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। এ শ্লোকের মধ্যে যে এত নিগূঢ় অর্থ আছে, তাহা তিনি কস্মিনকালেও জানিতেন না। প্রভু এই শ্লোকের অর্থ দুই তিন স্থানে করিয়াছেন। কিরূপ অর্থ করেন, তাহার আভাসমাত্র পাওয়া যায়, তাহা আমি প্রথম খণ্ডে দিয়াছি।

সার্বভৌম গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন, যাইবার সময় জগদানন্দ ও দামোদবকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। তাহার পরে (যথা চরিতামৃতে)—

উত্তম উত্তম প্রসাদ তাহাই আনিল। নিজ বিপ্র হাতে দুই জনা সঙ্গে দিল।।
নিজ দুই শ্লোক লেখি এক তালপাতে। প্রভুকে দিও বলি দিল জগদানন্দ হাতে।।

এই দুই শ্লোক ও প্রসাদ লইয়া চারিজনে প্রভুর নিকট আসিলেন। মুকুন্দ, জগদানন্দের হাতে তালপাতা দেখিয়া, উহা লইয়া শ্লোক পাঠ করিলেন। তিনি বুদ্ধির কার্য করিয়া ওই দুই শ্লোক ঘরের প্রাচীরে লিখিয়া রাখিলেন। জগদানন্দের সেই পত্র প্রভুর হাতে দিলেন। প্রভু পড়িয়া অমনি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কিন্তু মুকুন্দ পূর্বে উহা প্রাচীরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া শ্লোক নষ্ট হইল না।

"এই দুই শ্লোক ভক্ত কণ্ঠমণি হার। সার্বভৌমের কীর্তি ঘোষে ঢক্কা বাদ্যকার।।"

সে দুইটি শ্লোক এই ঃ—

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগঃ, শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী, কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে।। ১।।
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।। ২।।

সার্বভৌম প্রথমে এই দুই শ্লোকে পরিচয় দিলেন যে, প্রভু তাঁহার হৃদয়ে কিরূপে উদয় হইয়াছেন। এই দুই শ্লোকের মর্ম এই যে, "সেই পুরাণ-পুরুষ, অর্থাৎ শ্রীভগবান, দেখিলেন যে তাঁহাতে যে ভক্তি ইহা ক্রমে নষ্ট হইতেছে, অতএব জীবের প্রতি কৃপা করিয়া সেই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধরিয়া যিনি জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্ম আমার চিত্ত-ভঙ্গ গাঢরূপে প্রাপ্ত হউক।" সার্বভৌম সম্বন্ধে আর গোটা দুই কথা বলিতে বাকি আছে। সার্বভৌমের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন, যথা—

"সার্বভৌম হইল প্রভুর ভক্ত একজন। মহাপ্রভুর সেবা বিনা নাহি অন্য মন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম। এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম।।"

কিন্তু সার্বভৌমের মনের ভাব কি হইল তাহার অন্য সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। তিনি স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে স্তুতি করিয়া যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। সার্বভৌম শ্লোকচ্ছন্দে প্রভুর রূপ ধ্যান প্রভৃতি ইহাতে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং বিলসিত-নিরবধি-ভাববিদেহং।
ত্রিভুবন-পাবনং কৃপয়াঃ লেশং ত্বং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং।। ১
গদ্‌গদ-অন্তর-ভাববিকারং দুর্জন-তর্জন-নাদ-বিলাসং।
ভবভয় ভঞ্জন-কারণ-করুণং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং।। ২
অরুণাম্বরধর-চারুকপোলং ইন্দু-বিনিন্দিত-নখচয়-রুচিরং।
জল্পিত-নিজগুণনাম-বিনোদং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং।। ৩
বিগলিত-নয়ন-কমল-জলধারং ভূষণ-নবরস-ভাববিকারং।
গতি-অতি মন্থর-নৃত্যবিলাসং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং।। ৪
চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি রুচিরং মঞ্জীর-রঞ্জিত-পদযুগ-মধুরং।
চন্দ্র-বিনিন্দিত-শীতল বদনং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং।। ৫
ধৃত-কটি-ডোর-কমণ্ডলু-দণ্ডং দিব্য-কলেবর-মণ্ডিত-মণ্ডং।
দুর্জন-কল্মষ-খণ্ডন-দণ্ডং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং।। ৬
ভূষণ-ভূরজ-অলকা-বলিতং কম্পিত-বিম্বাধরবর-রুচিরং।
মলয়জ-বিরচিত-উজ্জ্বল-তিলকং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং।। ৭
নিন্দিত-অরুণ-কমলদল-লোচনং আজানুলম্বিত-শ্রীভুজ-যুগলং।
কলেবর-কৈশোর-নর্তক-বেশং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং।। ৮

* * *

নব গৌরবরং নব পুষ্পশরং নব ভাবধরং নবোল্লাস্যপরং।
নব হাস্যকরং নব হেমবরং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং।। ৯
নব প্রেমযুতং নবনীতশুচং নব বেশকৃতং নব প্রেমরসং।
নবধা বিলাসং সদা প্রেমময়ং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং।। ১০
হরিভক্তি পরং হরিনাম ধরং করজপ্য করং হরিনাম পরং।
নয়নে সততং প্রেম সম্বিশতং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং।। ১১
নিজভক্তি করং প্রিয় চারুতরং নট নর্তন নাগরী রাজকুলং।
কুলকামিনী মানসোল্লাস্যকরং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং।। ১২
করতাল বলং নীলকণ্ঠ করং মৃদঙ্গ রবাব সুবীণা মধুরং।
নিজভক্তি-গুণাবৃত-নাট্যকরং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং।। ১৩
যুগধর্ম যুতং পুন নন্দসুতং ধরণী সুচিত্রং ভবভাবোচিতং।
তনুধ্যান চিত্রং নিজ-বাস যুতং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং।। ১৪
অরুণ নয়নং চরণ বসনং বদনে স্খলিত স্বনাম মধুরং।
কুরুতে সুরসং জগতো জীবনং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং।। ১৫

এই শ্লোকগুলি সার্বভৌমের। তিনি চর্মচক্ষে ও দিব্যচক্ষে প্রভুকে কিরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা এই শ্লোকগুলি দ্বারা বুঝা যাইবে। শ্রীনিমাইয়ের কি রূপ, কি গুণ, কি প্রকৃতি ছিল, ভারতবর্ষের তখনকার সর্বপ্রধান পণ্ডিত এই শ্লোকগুলি দ্বারা তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। ভক্তগণ এই শ্লোকগুলি দ্বারা প্রভুর রূপ গুণ ও ধ্যান হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লউন।

সার্বভৌম উদ্ধার হইলেন বটে, কিন্তু বাকি রহিলেন,—রূপ, সনাতন, রামানন্দ রায়, বৌদ্ধাচার্য ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী। ইহার তাৎপর্য বলিতেছি। প্রভুর কার্য করিতে বড়ো বড়ো যে সকল বাধা ছিল, সে সমুদয় আপনি ক্রমে ক্রমে দূরীভূত করিতেছেন। যে কার্য ভক্তের দ্বারা সম্ভব, তাহা ভক্তের দ্বারা করাইতেছেন; যাহা ভক্তের দ্বারা সম্ভব নয়, তাহা আপনি করিতেছেন। প্রভুর প্রথম বাধা নবদ্বীপের কোটাল জগাই মাধাই। প্রভু তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। দ্বিতীয় বাধা চাঁদকাজী, প্রভু তাহাকে কৃপা করিলেন। তৃতীয় বাধা অধ্যাপক পণ্ডিত ও নৈয়ায়িকগণ। ইহাদের আদিস্থান শ্রীনবদ্বীপ, আর এ সম্প্রদায়ের সর্ববাদীসম্মত রাজা শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম। প্রভু তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। এখন বাকী রহিলেন কয়েকজন; তাঁহাদের ও অন্য সকলের কথা ক্রমে বলিব, প্রকাশানন্দের কথা এখন একটু বলি।

এটি শ্রীশ্রীশচীতনয়াষ্টকং।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষড়ভুজ মূর্তিদর্শনকালে শ্রীপাদ সার্বভৌম যাহা চর্মচক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহা "শ্রীপাদ সার্বভৌম শতকম্" গ্রন্থে লিখিত আছে। এটি তাহা নয়। এটি পরবর্তীকালে শ্রীপাদ সার্বভৌম যে কয়টি অষ্টক লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটি। এই অষ্টকটির নীচে সেই কারণেই লিখিত আছে—

"ইতি শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য-বিরচিতং
শ্রীশ্রীশচীতনয়াষ্টকং সম্পূর্ণং"

সুতরাং এখানে যে দুইটি অষ্টক দেওয়া হইয়াছে, কোনটিই শ্রীপাদ সার্বভৌম বিরচিত "শতকম্" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইহা তিনি বিক্ষিপ্তভাবে অন্যত্র অন্যসময়ে লিখিয়াছিলেন। পরবর্তী অষ্টকটির শেষ লাইন বর্তমান গ্রন্থের অপ্রয়োজনে গ্রন্থকার উল্লেখ করেন নাই।

নবদ্বীপ যেরূপ ন্যায়, তন্ত্র, স্মৃতি ও পুরাণের স্থান, কাশী সেইরূপ বেদের স্থান। বেদ পড়িতে কাশীতে যাইতে হয়, সেখানকার উপাস্য দেবতা শঙ্করাচার্য। সেখানে তাঁহার তখনকার সর্বপ্রধান পাণ্ডা প্রকাশানন্দ সরস্বতী। এই প্রকাশানন্দ দশ সহস্র শিষ্য লইয়া কাশীতে বিরাজ করেন। ইনি সার্বভৌমের ন্যায় ভারতবিখ্যাত। সার্বভৌম যেরূপ নবদ্বীপের পাণ্ডিত্যের ও আচার্যের মত প্রভু ও শ্রীগৌরাঙ্গের মত ঠিক বিপরীত। শঙ্করাচার্য বলেন, "আমি তিনি, তিনি আমি।" প্রভু বলেন, "আমি তাঁহার, তিনি আমার।" শঙ্করাচার্যের মত যদি ঠিক হয়, তবে প্রভুর মত বাতুলামি। আর প্রভুর মত যদি সত্য হয়, তবে শঙ্করের মত কর্তব্যে নাস্তিকতা। শঙ্করের মতে অনেকে আকৃষ্ট হন, তাহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ বড়ো হইতে সকলেরই সাধ, আর সাধারণের বিশ্বাস জ্ঞান বড়োলোকের দ্রব্য। জ্ঞানীলোকে ভক্তের ভাবকালী দেখিয়া হাসিবেন, আর ভক্তের ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। কারণ জ্ঞানীর এমন কিছু নাই যাহা ভক্তগণের বিদ্রূপের সামগ্রী হইতে পারে। জ্ঞানীলোক বলিবেন, "স্ত্রীলোকের ন্যায় তুমি রোদন কর কেন? নৃত্য করিতে তোমার লজ্জা করে না? এই মাটিতে মৃদঙ্গ হয় বলিয়া ঢলিয়া পড়, এই কি মনুষ্যত্ব?" জ্ঞানীলোকের এই সমুদয় বিদ্রুপ-বাণের তীক্ষ্ণ আঘাত হইতে রক্ষা পাইবার কোনো কবচ ভক্তের নাই। এই সমুদয় কথা শুনিয়া ভক্তের পরাজিত হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। কাজেই সাধারণের ধারণা যে শঙ্করের ধর্ম বড়ো লোকের ধর্ম, আর ভক্তের ধর্ম দুর্বলের ধর্ম। কাজেই লোকে স্বভাবতঃ শঙ্করের ধর্মের আশ্রয় লইতে চায়।

দ্বিতীয়তঃ শঙ্করের ধর্মযাজন অপেক্ষাকৃত সহজ। শঙ্করের ধর্ম পালন করিতে আরাম আছে। "আমি তিনি, তিনি আমি" এই বলিয়া বসিয়া থাকিলে, তাহার আর কোনো ভজনের কাজ রহিল না, কেবল খাও আর আমোদ করো। পিতা যত্ন করিয়া পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করান। বিদ্যাভ্যাস করিলে তাঁহার পুত্রের মানসিকবৃত্তি পরিবর্ধিত হইবে ও পরকালে ভাল হইবে। কিন্তু দুর্বৃত্ত পুত্রের নিকট এ শাসন ভাল লাগে না। বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রথমে কিছু কষ্ট। এ ভুবনে পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই লাভ হয় না। কিন্তু পুত্রের এ কষ্ট সহ্য হয় না। পিতা মরিয়া গেলেন, তখন পুত্র ভাবিল, "বাঁচিলাম, আর পড়িতে হইবে না।" এইরূপে, ভজন নাই এরূপ ধর্মযাজন প্রথম সুলভ, তাই অনেকে উহাতে আকৃষ্ট হন। তাঁহারা জানেন না যে, ভজনের ন্যায় সুখ ত্রিভুবনে আর নাই। তাহা জানা থাকিলে, ভজনকে একটি দণ্ড বলিয়া ভাবিতেন না।

ভক্তের ধারণা যে, শ্রীভগবদ্ভক্তি সর্বপ্রধান কর্ম। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বলবৎ কাজ শ্রীভগবানের ভজন। মোটামুটি, ভক্ত হওয়া অপেক্ষা কর্তব্যে নাস্তিক হওয়ায় আপাততঃ অনেক সুবিধা আছে। কিন্তু ভক্তি-ধর্মের একটি শক্তি আছে, উহা অনির্বচনীয় ও অনিবার্য। একটি গল্প এখানে বলিব। বৈদ্যনাথ-দেওঘরে একজন তেজস্কর সন্ন্যাসী গিয়াছিলেন আমাকে দর্শন দিতে। তিনি বাঙ্গালী, ইংরেজী জানেন, সবল, বয়স ৫৫ বৎসর। দেখিলাম, লোকটি সাধু বটে। আমি প্রণাম করিয়া বসাইলাম। কিন্তু মনে মনে বড়ো বিরক্ত হইলাম, কারণ আমি তখন বিরলে বসিয়া কিঞ্চিৎ ভজন করিতে যাইতেছিলাম। শেষে ভাবিলাম, অগত্যা এই সন্ন্যাসীকে লইয়াই আজ ভজন করিতে হইবে; দেখি, যাহা থাকে কপালে। আমি বলিলাম, "ঠাকুর! তুমি কি কর, তোমার এ ব্রতের উদ্দেশ্য কি?" সন্ন্যাসী নানারূপ কথা বলিলেন। দেখিলাম, তিনি এক-প্রকার উদ্দেশ্যশূন্য। বলিতে কি, প্রায় জীবমাত্রেই এইরূপ উদ্দেশ্যশূন্য। যে কোন সাধু হউন, যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করো, তুমি যে এই কষ্ট করিতেছ, ইহার উদ্দেশ্য কি? তবে অনেক সময়ে দেখিবে যে, তিনি নিজের যে কি উদ্দেশ্য তাহা ভাল করিয়া জানেন না।

ঠাকুরের মনের ভাব এই যে, তিনি একটি ভালো কাজ করিতেছেন; তবে সে ভালো কাজ যে কি, তাহা বিচার করিয়া দেখেন নাই। আমি বলিলাম, "ঠাকুর! তুমি যে সমুদয় বড়ো বড়ো কথা বলিতেছ, উহার অধিকারী আমি নই। তুমি কৃপা করিয়া অধমের বাড়ী পদধূলি দিয়াছ, আমি তোমাকে দুই একটি গীত শুনাইব।" ইহা বলিয়া আমি সুরে সুর মিলাইয়া মহাজনের একটি বিখ্যাত পদ গাইতে লাগিলাম। সে পদটির প্রথম চরণ এই—

"দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, চাঁদমুখ না দেখিলে,
মরমে মরিয়া আমি থাকি, (সজনী গো!)।"

এই পদটি কেন গাইলাম তাহা বলিতেছি। আমি শ্রীভগবানের ভজন করিতে যাইতেছিলাম; কিন্তু যাইতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইলাম। মনের মধ্যে এই ভাব ছিল বলিয়া ঐ পদটি মুখে আসিল। প্রথম চরণ গাইতে আরম্ভ করিয়া দেখি, ঠাকুরের বদন ভক্তিতে লাবণ্যময় হইল, চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। তাহার পরে দ্বিতীয় চরণ গাইলাম, যথা—

"দুই ভুজ-লতা দিয়া, হৃদিমাঝে আকর্ষিয়া,
নয়নে নয়নে তাবে রাখি, (সজনী গো!)"

তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর অত্যন্ত অধীর হইলেন। তাঁহার সুন্দর বদন বাহিয়া পরিসর ধারা পড়িতে লাগিল। কাঁদিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ ও বদন কমনীয় হইল। একটু পরে শান্ত হইয়া বলিতেছেন, "এই ঠিক, আমি ইহাই চাই। আমি এ সম্পত্তি কিরূপে পাইব, তাহারই নিমিত্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।" যাহা স্বাভাবিক মিষ্ট, তাহা প্রমাণ কবিতে কষ্ট নাই। সদ্যোজাত শিশুব মুখে এক বিন্দু তিক্ত দিলে সে কান্দিযা উঠিবে, আর এক বিন্দু মধু দিলে চাটিতে থাকিবে। তাহাকে আর একথা বুঝাইতে হয় না যে, এই বস্তু তিক্ত, এ বস্তু মিষ্ট। আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কখনই বুঝাইতে পারিতাম না যে, যে ভক্তি-ধর্ম বলিয়া একটি সামগ্রী আছে যাহা অতি মধুর, অতি সরল ও অতি তেজস্কর। তাহা করিতে গেলেই যুদ্ধ বাধিত। তবে আমি করিলাম কি, না, তাঁহার বদনে ভক্তিধর্মরূপ মধু এক বিন্দু দিলাম। তিনি চাখিলেন, আর বেশ! বেশ! বলিয়া আনন্দে অধীর হইলেন।

শ্রীভগবানের সৃষ্টি সর্বাঙ্গসুন্দর। আম্র দেখিতে সুন্দর, ইহার গন্ধ সুন্দর, আস্বাদও সুন্দর। সেইরূপ ভক্তিধর্ম যাজন যে জীবের স্বাভাবিক ধর্ম, তাহার কয়েকটি সহজ লক্ষণ বলিতেছি। শ্রীভগবান অর্থাৎ একজন যে কর্তা আছেন, ইহা মনুয্যমাত্রেরই মনের অটল ভাব। যাঁহারা মুখে বলেন শ্রীভগবান্ নাই, তাঁহারা অন্তরে বলিতে পারেন না। কারণ যেমন মস্তক না থাকিলে জীবন থাকে না, সেইরূপ ভগবান্ আছেন, এরূপ বিশ্বাস না থাকিলে, মনুষ্যের পৃথক অস্তিত্বই থাকে না। সার কথা, যখন শ্রীভগবান্ আছেন, এই ভাব মনুষ্যমাত্রকে স্বভাব দিয়াছেন, তখন অবশ্য শ্রীভগবান আছেন। দ্বিতীয়ত, জীব দিবানিশি নিরাশ্রয়ে ভাসিতেছে। সেই নিমিত্ত জীবের স্বভাব এই যে, বিপদে পড়িলে চুপ করিয়া থাকে না। প্রথমে নিজে নিবারণ করিতে চেষ্টা করে। যখন না পরে, তখন হতাশ হইয়া কান্দিয়া বলে, "হে শ্রীভগবান রক্ষা কর।" যদি শ্রীভগবান রক্ষা-কর্তা না হইতেন, তবে স্বভাব মনুষ্যকে "ত্রাহি মাং রক্ষ মাং" ভাব দিতেন না। ইহাতে কি বুঝিলাম, না—"হে শ্রীভগবান্! তুমি আমার আশ্রয়। আমি দুর্বল জীব, বিপন্ন, আমাকে রক্ষা করো।" এই ভাব স্বাভাবিক, আর ইহাকে ভক্তিধর্ম বলে। লোক যাহাকে শঙ্করাচার্যের মত বলে, তাহা ইহার বিপরীত। অতএব ভক্তি বলিয়া একটি মানসিক বৃত্তি আছে, সেই বৃত্তি আলোচনা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম, কাজেই উহা আলোচনায় সুখ আছে। লোকে তাই ভক্তির সামগ্রী খুঁজিয়া বেড়ায়, এবং পাইলে কৃতার্থ হয়। এইরূপে কেহ স্বামীকে, কেহ গুরুকে, কেহ রাজাকে, আপনার ভক্তিটুকু দিয়া সুখ ভোগ করেন।

ত্রিপুরার মহারাজা সিংহাসন উপবিষ্ট। সরস্বতীর বরপুত্র যদুভট্ট তাঁহার সম্মুখে বসিয়া

তাম্বুরা লইয়া সুস্বরে তান লয় মিলাইয়া তিলোককামোদ রাগিণীতে নিজ-কৃত এই গীতটি গাইয়া মহারাজের স্তুতি করিতেছেন। যথা—জয়তি ত্রিপুরেশ্বর দয়াল বীরচন্দ্র, গুণী-জন প্রতিপালক, তোমা সমান। দাতা কই নহি রাজা।

এই গীত শুনিয়া মহারাজের হৃদয় দ্রব হইল; গাইতে গাইতে যদু ভট্টের হৃদয় আরো দ্রব হইল। তখন উভয়ে রসে পরিপ্লুত হইলেন। মহারাজ ভক্তিরূপ সুধা গ্রহণ ও ভট্ট উহা প্রদান করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। উপরে ভক্তির ছবি দিলাম; এখন সিংহাসনে সামান্য রাজার স্থানে যদি রাজার রাজাকে, আর যদুভট্টের স্থানে একজন ভক্তকে বসাও, তাহা হইলে বিশুদ্ধ ভক্তির একটি নিদর্শন পাইবে এবং ভক্তি-ভজন কিরূপ মধুর তাহাও বুঝিবে; তবে ভক্তি-ভজন অপেক্ষা প্রেম-সাধন আরো মধুর লাগিবে।

তবে ভক্তি-আলোচনার সুখে একটি বাধা আছে। ভক্তির পাত্র মাত্রেই প্রায় মলিন ও স্বার্থপর। এইজন্য পতিব্রতা স্ত্রী পতির এবং শিষ্য গুরুর মলিনতা ও স্বার্থপরতা দেখিয়া ক্লেশ পান। সুতরাং ভক্তি হইতে তখনই অখণ্ড সুখোৎপত্তি হয়, যখন উহা শ্রীভগবানে অর্পিত হয়। যেহেতু তিনি দোষশূন্য ও গুণময়। অতএব হে মূর্খ-জীব! শ্রীভগবান্ না থাকিলে স্বভাব কি কখন ভগবদ্ভক্তি দিতেন? স্বভাব জীবকে ভগবদ্ভক্তি দিয়াছেন বলিয়াই প্রমাণ হইতেছে যে, শ্রীভগবান্ আছেন। জীবের আনন্দের একটি প্রস্রবণ প্রেম, আর একটি ভক্তি। শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া "ত্রাহি মাং রক্ষ মাং," কি "তুমি কৃপাময় ও পবিত্র," কি "তুমি নয়নানন্দ" ইত্যাদি বলিয়া পূজা করিয়া আনন্দভোগ করিবার নিমিত্ত জীবকে ভক্তি ও প্রেম দিয়াছেন।

তাহার পর, ভক্তি-চর্চা যে মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম তাহার আরো কারণ বলিতেছি। গোপীগণ কি আয়োজনে শ্রীভগবানকে ভজনা করেন, দ্বিতীয় খণ্ডের মঙ্গলাচরণে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ভক্তি-ধর্ম যাজন করিবার উপকরণগুলি একবার স্মরণ করুন। যথা পূর্ণিমানিশি, বৃন্দাবন, কুসুম-কানন, লাবণ্য, সৌন্দর্য, কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি। ইহা যাজন করিলে দেহের বাহ্য-সৌন্দর্য ও প্রতি অঙ্গ লাবণ্যময় হয়। যিনি যাজন করেন, তাঁহার নয়ন মনোহর, গলার স্বর মধুর ও হৃদয় কোমল হয়। সুতরাং তাহাতে তাঁহার জ্ঞানরূপ বীজ সহজে ফলবতী হয়, তাঁহার প্রকৃতি মধুর হয়, আর তাঁহার দশদিক সুখময় বোধ হয়।

উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে ভক্তি-ধর্মের প্রধান বিরোধী শঙ্করাচার্য। অন্ততঃ শঙ্করাচার্যের ভাষ্য জ্ঞানী সন্ন্যাসীগণ যেরূপ ব্যাখ্যা করেন, উহা ভক্তিধর্ম-বিরোধী। তাঁহার তখনকার প্রধান পাণ্ডা প্রকাশানন্দ স্বরস্বতী, আর প্রভুর তখন প্রকাশানন্দকে উদ্ধার কার্য বাকী রহিল। ইহার প্রায় ছয় বৎসর পরে এই কার্য সমাধা হয়।*

চতুর্থ অধ্যায়

"তোরা আয়রে পুরবাসীগণ, আনন্দেতে করি সংকীর্তন।
তোদের ভবের মেলা ধূলাখেলা, হারাসনে জীবন রতন।
তোদের গোলোকধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিত-পাবন।"

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে প্রভু সন্ন্যাস লইয়া ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আসিলেন এবং ভক্তগণ লইয়া সার্বভৌমের মাসীর বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ, জগদানন্দ ও দামোদর ভিক্ষা করেন, আর প্রায়ই সার্বভৌম ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করেন। প্রভু অতি গোপনে বাস করিতেছেন। ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সর্বদা থাকেন, কেহ নিকটে আসিতে পারে না।

* যাঁহারা প্রকাশানন্দের উদ্ধার বিবরণ জানিতে উৎসুক তাঁহারা কৃপা করিয়া আমার কৃত "প্রবোধানন্দ ও গোপালভট্ট" গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

প্রভুর মহিমা কাজেই নীলাচলবাসীরা ভালো করিয়া জানিতে পারিলেন না। তবে অবশ্য কিছু কিছু জানিলেন। সার্বভৌম ক্রমে ক্রমে শশিকলার ন্যায় প্রেম ও ভক্তিতে বৃদ্ধি পাইতেছেন। কথায় আছে গুপ্তপ্রেম গুপ্ত থাকে না। সার্বভৌম আপনার দশা গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। পূর্বে তাঁহার এক ভাব, এখন আর এক ভাব। পূর্বে দাম্ভিক, এখন অতি বিনয়ী। পূর্বে নীরস গভীর কঠিন; এখড় সর্বদা তরল চঞ্চল প্রফুল্ল মধুর ও পরোপকারী, এবং কথায় কথায় নয়নে জল আসিয়া, তাঁহার গুপ্তপ্রেম প্রকাশ করে। পড়ুয়াগণ ইহা জানিল; আর ইহাও জানিল যে, এ সব নবীন সন্ন্যাসীর কার্য। সুতরাং এ কথা নীলাচলময় ব্যক্ত হইল যে, সার্বভৌম ভট্টাচার্য এখন বড়ো ভক্ত হইয়াছেন। আর তাঁহার পরিবর্তনের কারণ, একজন অতি সুন্দর নবীনবয়স্ক সন্ন্যাসী। কিন্তু তবু নীলাচলবাসী কেহ প্রভুকে দেখিতে আসিলেন না। তাঁহার নানা করাণ ছিল। প্রধান কারণ এই যে, পুরী তখন সাধু ও সন্ন্যাসীতে পরিপূর্ণ, কে কাহার তল্লাস লয়।

প্রভু নীলাচলে দোল দেখিলেন, সার্বভৌমকে উদ্ধার করিলেন; পরে এক দিবস ভক্তগণকে লইয়া যুক্তি করিতে বসিলেন। প্রভু শ্রীনিতাইয়ের হস্ত ধরিয়া ও অন্যান্য ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার চিরদিনের বান্ধব; তোমাদের ঋণ শোধ দিব, এমন আমার কিছুই নাই। তোমরা কৃপা করিয়া আমাকে নীলাচলচন্দ্র দেখাইলে, এখন সেইরূপ কৃপা করিয়া আমাকে দক্ষিণ-দেশে যাইতে অনুমতি করো।" শ্রীনিত্যানন্দ দক্ষিণ দেশে যাইবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। আরও বলিলেন, "তুমি নীলাচলে বাস করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এখন আবার নীলাচল পরিত্যাগ করিবে কেন?" প্রভু বলিলেন, "আমার দাদা প্রায় বিংশতি বৎসর হইল অনুদ্দেশ হইয়া দক্ষিণদেশে গমন করেন। আমি এতদিন তোমাদের ও জননীর গাঢ় অনুরাগে তাঁহার তল্লাস লইতে পারি নাই। এখন আমি তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া গৃহের বাহির হইয়াছি। কাজেই আমার এখন প্রথম কর্তব্য তাঁহার তল্লাশ করা।"

এখানে একটি নিগূঢ় রহস্য বলিব। বিশ্বরূপ পুনা নগরের নিকট পাণ্ডুপুরে অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে অদর্শন হন। শিবানন্দ সেন উহা জানিতে পান। তাঁহার পুত্র কবিকর্ণপুর পিতার মুখে সেই ঘটনা শুনিয়া তাঁহার কৃত গৌর-গণোদ্দেশদীপিকায় উহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যথা—

যদা শ্রীবিশ্বরূপহয়ং তিরভতঃ সনাতনঃ।
নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদা স্থিতঃ।।
ততোহবধূতো ভগবান্ বলাত্মা ভবন সদা বৈষ্ণববর্গ মধ্যে।
জর্জাল তিগ্মাংশু সহস্রতেজা ইতি ব্রুবন্ মে জনকো ননর্ত।।

তথা ভক্তমাল গ্রন্থে—

শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপ মতি। দার পরিগ্রহ নাহি কৈল হৈলা যতি।।
শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরীতে নিজ শক্তি। অপি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি।।
নিত্যানন্দ প্রভুতে এক শক্তি সঞ্চারিলা। ভক্তগণ মধ্যে তেজপুঞ্জ রূপ হৈলা।।
সহস্র সূর্যের তেজঃ ধারণ করিলা। শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিলা।।

অতএব বিশ্বরূপ দেহ ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার ছোটো ভাই নিমাইকে ত্যাগ করেন নাই। বিশ্বরূপ প্রথমে ঈশ্বরপুরীর দেহে প্রবেশ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে মন্ত্রদান করেন। দাদা ব্যতীত অপরের নিকট শ্রীভগবান মন্ত্র কেন লইবেন? তাহা হইলে যে তাঁহার মর্যাদার ব্যাঘাত হয়। আবার ঈশ্বরপুরী যখন দেহত্যাগ করেন, তখন বিশ্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দের শরীরে প্রবেশ করেন, করিয়া বৃন্দাবন হইতে একদৌড়ে শ্রীনবদ্বীপে চলিয়া আসেন। সেই

নিত্যানন্দের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, ''আমি বিশ্বরূপের উদ্দেশ্যে দক্ষিণদেশে গমন করিব!''

এখন 'শ্রীনিত্যানন্দের শরীরে বিশ্বরূপ', এ কথার অর্থ কি? আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় এই অতি আশ্চর্য সুখপ্রদ কথাটির বহুতর প্রত্যক্ষ-প্রমাণ পাইতেছি। হে পাঠক! পুলকিতাঙ্গ হইয়া শ্রবণ করুন। মহাভারতে দেখিবেন, যুধিষ্ঠির বনবাসী বিদুরের পশ্চাৎ গমন করিতে থাকিলে, তিনি যুধিষ্ঠিরের পানে ফিরিয়া চাহিলেন, চাহিয়া আপন দেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে আমাদের শাস্ত্রে 'পরকায়া প্রবেশ' শক্তির কথা বহুস্থানে উক্ত আছে। সে কথার অর্থ এই। এই দেহটি একটি গৃহ মাত্র, আর অভ্যন্তরে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা বাস করেন। পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা প্রাণ পান, আর দেহ দ্বারা তিনি (জীবাত্মা) জড়জগতের সহিত পরিচয় করেন। জীবাত্মা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শ্রবণ-দর্শনাদি করিয়া জড়জগত হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া একটি স্বতন্ত্র জীব সৃষ্ট হয়েন। এই পৃথকীকৃত জীবটি, তাঁহার দেহরূপ-গৃহ ভঙ্গ হইলে, অন্য স্থানে গমন করেন। সে স্থান তাঁহার দেহেন্দ্রিয়ের গোচর নহে, কিন্তু জীবাত্মার গোচর; এই গেল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, কোনো পৃথকীকৃত জীবাত্মার এ জগতে কোনো কর্ম করিতে বাকি আছে, কি ইচ্ছা আছে। তখন তিনি কি করিবেন? তাঁহার দেহ নাই, সুতরাং জগতের সহিত কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন না। কাজেই তখন তাঁহার অন্যের দেহের সাহায্য লইতে হয়। ইহাকে বলে ''ভূতে পাওয়া'', কি সাধু ভাষায় ''আবেশ''। এইরূপে সুরাসক্ত ব্যক্তি পরকালে মদ্য না পাইয়া, অথচ মদ্যের লোভে অভিভূত হইয়া, তাহার পিপাসা কথঞ্চিৎ পরিমাণে শান্তি করিবার নিমিত্ত, মদ্যপায়ীর দেহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। আর এইরূপে দেহশূন্য-জীব তাহার শোককুল নিজ-জনকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করে। ''চেষ্টা করে'' একথা উপরে বারম্বার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, চেষ্টা করে, কিন্তু সহজে কি সর্বদা পারে না। দেহশূন্য জীব মনে করিলেই যদি কাহারো দেহে প্রবেশ করিতে পারিত, তবে আর লোকের সংসারযাত্রা সর্বদা নির্বাহ হইত না। দেহশূন্য জীব জীবিত ব্যক্তির শরীর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সর্বদা পারে না, কখন কখন পারে। কি অবস্থায় পারে, কি অবস্থায় পারে না, তাহা লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। তবে একটি উদাহরণ দিতেছি। তুমি তোমার ঘরে বাস করিতেছ। সেখানে যদি কেহ প্রবেশ করিতে চাহে, তবে তোমার সম্মতি লইয়া, কি জোর করিয়া, কি তোমার নিদ্রিত অবস্থায় তোমাকে লুকাইয়া, তাহার যাইতে হইবে। সেইরূপ কোনো দেহশূন্য জীব তোমার দেহে প্রবেশ করিয়া এবং তোমাকে কোণ-ঠাসা করিয়া আপনি তোমার দেহটি লইয়া আমোদ করিবে,—এরূপ বন্দোবস্তে তুমি কখন সম্মত হইতে পার না। কাজেই যদি কোনো দেহশূন্য জীব তোমার দেহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে, তবে তুমি জানিতে পার না, কিন্তু ভিতরে তাহার বিরোধী হইয়া থাক, সে জন্য তোমার দেহ কেহ সহজে অধিকার করিতে পারে না। কিন্তু কখন হয়তো তুমি সচেতন থাক না; তখন যে কেহ অনায়াসে চুপে-চুপে তোমার দেহে প্রবেশ করিতে পারে। তাই নিদ্রিত অবস্থায় কখন কখন দেহশূন্য জীবের সহিত পরিচয় হয়। কখন বা তুমি ইচ্ছা করিয়া আপনার দেহে দেহশূন্য জীবকে আসিতে আহ্বান কর। যেমন প্রেত-সাধন কি স্প্রিরিচুয়াল সার্কেল করা। কখন বা তুমি অন্যমনস্ক, কি অসাবধানে আছ, আর সেই ফাঁকে দেহশূন্য জীব তোমার শরীরে প্রবেশ করে। স্ত্রীলোকের যে ভূতাবেশ হয়, তাহা প্রায় এইরূপে। স্ত্রীলোকের বিরোধ-শক্তি অল্প। সেইজন্য কোনো দেহশূন্য জীব হঠাৎ তাহার দেহে প্রবেশ করিয়া আর ছাড়িল না। সেই দেহশূন্য জীবের প্রেতভূমি ভালো লাগে না বলিয়া, সেখানে থাকিতে তাহার নিতান্ত অনিচ্ছা। এখন এ জগতে একটি দেহ পাইয়া সে আবার বাঁচিয়া

উঠিল। উহা সে কেন ছাড়িবে। কাজেই নানা উপায়ে তাহাকে সেই দেহ হইতে তাড়াইতে হয়। ইহাকে বলে "ভূত-ছাড়ান"।

আবার কোনো কোনো দেহশূন্য জীব শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদের অপেক্ষা দুর্বল জীবের দেহে প্রবেশ করিতে পারেন। তবে তাঁহাবা মহৎ লোক, বিশেষ কারণ ব্যতীত স্বার্থের নিমিত্ত অন্য দেহে বল পূর্বক প্রবেশরূপ কুকর্ম কেন করিবেন?

দেহ ভঙ্গ হইলে জীব দেহশূন্য হইয়া অন্যস্থানে গমন কর। আবার যোগ বলে কেহ আপন দেহ হইতে আত্মা বাহির করিতে, ও আবার উহা দেহে প্রবেশ করাইতে পারেন। আত্মা দেহ হইতে বাহির হইলে, দেহ মরিয়া পড়িয়া থাকে; আবার দেহে প্রবেশ করিলে বাঁচিয়া উঠে। এইরূপে কেহ আপন দেহ হইতে আত্মা বাহির করিয়া, অন্য দেহেও প্রবেশ করাইতে পারেন। ইহাকেই বলে 'পরকায়া-প্রবেশ'। পরকায়া-প্রবেশ দুইরূপ। (১) দেহ-বিশিষ্ট মনুষ্য যোগবলে পরকায়া প্রবেশ করিতে পারেন, আর (২) মৃত ব্যক্তির আত্মাও পরকায়া প্রবেশ করিতে পারেন। দেহ-স্বামীর সহিত, দেহশূন্য আত্মা-অতিথির চারি প্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে। প্রথম, কোনো দেহশূন্য-জীব অন্যের শরীরে প্রবেশ করিয়া এক কোণে পড়িয়া থাকিলেন, দেহ-স্বামীর সহিত কোনো সম্বন্ধ রাখিলেন না, এবং তিনি যে সেখানে আছেন তাহাও জানিতে দিলেন না; যেমন বিদুর তাঁহার দেহ জীর্ণ হওয়ায় আর উহাতে বাস করিতে পারিতেছিলেন না, অথচ পৃথিবীতে আর কিছুকাল কোনো কার্য্যের জন্য তাঁহার থাকিতে ইচ্ছা হইল। তাই নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করিয়া এক কোণে গোপনে বাস করিতে লাগিলেন; অথচ যুধিষ্ঠির তাহা জানিতে পারিলেন না। এইরূপে কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত দেহশূন্য-জীব চুপে-চুপে অন্যের দেহে প্রবেশ করিয়া সেখানে গোপনে বাস করে,—এত গোপনে যে দেহ-স্বামী পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন না। শিশুগণ, যাহাদের দৈবাৎ দেহ-ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, অথচ জগতে তাহাদের যে শিক্ষার প্রয়োজন তাহা হয় নাই, তাহারা এইরূপে, তাহাদের ভ্রাতা, কি ভগ্নী, কি পিতা, কি মাতার দেহে চুপে চুপে বাস করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়।

দেহশূন্য-জীব, দেহী-জীবের সহিত আরও কয়েক প্রকার সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকে। (১) দেহশূন্য-জীব দেহ-স্বামীর দেহে প্রবেশ করিয়া উহা অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে;—কতক পারিতেছে, কতক পারিতেছে না। (২) দেহশূন্য-জীব কাহারও দেহে প্রবেশ করিয়া কখন সম্পূর্ণ অধিকার করিতেছে, কখন একেবারে ছাড়িয়া দিতেছে। (৩) দেহশূন্য-জীব অন্যের দেহ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে, আর ছাড়িয়া দিতেছে না; আর যাহার দেহ, তাহাকে কোণ-ঠেলা করিয়া আপনি দেহটিকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। এখন এই কয়েক প্রকার পরকায়া-প্রবেশের কথা বিররিয়া বলিতেছি।

(১) আত্মা অন্যের দেহে প্রবেশ করিয়া চুপে-চুপে বাস করিতে লাগিল, দেহ-স্বামী তাহা জানিতে পারিল না। (২) আত্মা অন্যের দেহে প্রবেশ করিল, কিন্তু দেহটি সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিল না। (৩) আত্মা অন্যের দেহে প্রবেশ করিল ও দেহটি সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিল। এইরূপে ইচ্ছামতো দেহটি অধিকার করে, ইচ্ছামতো ছাড়িয়া দেয়। সমস্ত গৌরলীলাটী এইরূপ আবেশের ভিত্তিভূমিতে স্থাপিত। (৪) আত্মা অন্য দেহে প্রবেশ করিল, করিয়া দেহ-স্বামীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনি দেহটি অধিকার করিয়া বসিল, আর তাড়াইয়া না দিলে ওই স্থান ছাড়িল না। ইহাকে 'ভূতে পাওয়া' বলে।

কোন পাঠক বলিতে পারেন যে, উপরে যাহা লেখা হইল, তিনি তাহার এক আখরও বিশ্বাস করেন না। আমরাও বলিতেছি যে, তর্ক করিয়া তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা আমরা করিব না। যেহেতু এ সমস্ত নিগূঢ় বিষয় বুঝাইতে তর্কের শক্তিতে কুলায় না। তবে একটি

কথা বলিয়া রাখি। তুমি পশু-জীবন না দেব-জীবন যাপন করিবে? অর্থাৎ পশুর মতো খাইলাম, নিদ্রা গেলাম ও মরিয়া গেলাম,—ইহাই করিবে; না পশুত্ব অপেক্ষা অন্য কোনো সম্পত্তি আছে কিনা তাহার অনুসন্ধান করিবে? যদি তোমার পশু-জীবন ব্যতীত অন্যরূপে জীবনে স্পৃহা থাকে, তবে অগ্রে তোমার মলিন চিত্ত-দর্পণকে নির্মল করিবার চেষ্টা করো, সাধন-ভজন করো ও সাধুসঙ্গ করো। তাহা হইলে ক্রমে তোমার চিত্ত পরিষ্কৃত হইবে। তখন অনেক বিষয় দেখিতে পাইবে, যাহা তুমি এখন দেখিতে পাইতেছ না। দুর্ভগ্যক্রমে তুমি দেখিতে পাও না, তাই বলিয়া যাহারা বলে দেখিতে পাই, তাহাদের কথা দম্ভের সহিত উড়াইয়া না দিয়া, স্বভাবের প্রকৃতি ধরিয়া, শ্রীভগবানের অপরূপ মনুষ্য সৃষ্টি অনুশীলন ও অনুসন্ধান করো। তাহা হইলে সেই কারিগর-শিরোমণির অনেক কারিগরি দেখিতে পাইবে। তখন আর এ সমস্ত নিগূঢ় বিষয় সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিবে না। তবে তোমার যাহাতে এই কথা গুলিতে বিশ্বাস হয়, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত দুই একটি কথা বলিব। যে কথা সর্বস্থানে ও সর্বকালে প্রচলিত আছে, তাহা যে অমূলক হইতে পারে না, ইহা বিজ্ঞলোকের স্বীকার করা কর্তব্য। এই উপরে যে আবেশের কথা বলিলাম, ইহা সর্বশাস্ত্রে, সর্বদেশে সর্বসময়ে,—কি অসভ্য বর্বর, কি সুসভ্য জাতির মধ্যে,—দেখিতে পাইবে। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম প্রচলিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের ভিত্তিভূমি এই আবেশ। বাইবেলে এই আবেশের কথা লেখা আছে; মহম্মদ স্বয়ং আবিষ্ট হইতেন; বুদ্ধদেবের ও হিন্দুদের ত কথাই নাই।

যখন ইউরোপের মেস্মেরিজমের কথা প্রথম শুনিলাম, তখন আমরা উহা অবিশ্বাস করিয়াছিলাম; ভাবিতাম, গাত্রে হস্ত বুলাইয়া রোগ আরাম করা অসম্ভব। কিন্তু আমরা যখন মেস্মেরিজমের প্রক্রিয়া দেখিলাম তখন জানিলাম, উহা ঠিক আমাদের মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ানোর মত। অগ্রে মেস্মেরিজম মানিতাম না, মন্ত্রদ্বারা ঝাড়ানও মানিতাম না। পরে এই দুইরূপ প্রক্রিয়াই মানিতে বাধ্য হইলাম। দেখিলাম, মেস্মেরিজমে গাত্রে হস্ত বুলায়, ফুৎকার দেয়, আর রোগীকে বলে, "বল, নাই"। পূর্বে ঝাড়ানতেও ঠিক এইরূপ দেখিয়াছিলাম। তখন বুঝিলাম যে, ইহাতে প্রকৃতপক্ষে শক্তি না থাকিলে, এরূপ অদ্ভুত রোগ আরোগ্যের পদ্ধতি দুই স্থানে দুই সময় অবলম্বিত হইত না।

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় এই আবেশের কথা আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়। পূর্বে এই পরকায়া-প্রবেশের কথা শাস্ত্রে দেখিতাম, শুধু আমাদের শাস্ত্রে নয়,—বৌদ্ধ-শাস্ত্রে, খ্রীষ্টিয়ান-শাস্ত্রে ও মুসলমান-শাস্ত্রেও বটে। পরে, ঠিক এই কথা, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশেও উঠিল। তাহার পরে, আমরা যখন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা পাঠ করিলাম, এবং দেখিলাম, উহাতেও কেবল ঐ কথা,—তখন বিস্মিত হইলাম, ও ভাবিলাম, এই আবেশ সত্য না হইলে উহা সর্বদেশের মহাপুরুষগণ মানিতেন না। তবে আমেরিকার কাণ্ড প্রায় ভূতপ্রেত লইয়া, আর শ্রীগৌরাঙ্গ -লীলার কাণ্ড দেহদেবী, এমন কি, স্বয়ং শ্রীভগবান লইয়া।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, পরকাল সম্বন্ধে যে বিশ্বাস উহাই সাধন-ভজনের ভিত্তিভূমি। পরকালে বিশ্বাস না থাকিলে লোকে নাস্তিক বা কুকর্মান্বিত হয়, ও দুঃখে অভিভূত হয়। পরকালে বিশ্বাস হইলে, শ্রীভগবানে বিশ্বাস হয়, আর জীব জগতের দুঃখে কাতর হয় না। পুত্রশোকে বড়ো দুঃখ; কিন্তু যদি পুত্রের সহিত আবার মিলন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে শোকে বেশী কাতর করিতে পারে না। এইরূপে মনুষ্যের যে কোনো দুঃখ হউক, যদি পরকালে বিশ্বাস থাকে, তবে সে দুঃখ সহ্য করা সহজ হয়। পরকালে যাহার বিশ্বাস আছে, তাহার নিকট মৃত্যু অতি প্রিয়-সুহৃদ, আর দুঃখ তৃণের ন্যায় তাচ্ছিলেরে সামগ্রী। কাজেই পরকালে বিশ্বাসই মনুষ্যের সুখের ভিত্তিভূমি। তাই আমি এ কথা একটু বিস্তার করিয়া বিচার করিতেছি।

আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় দেখিলাম যে, এই পরকায়া-প্রবেশের কথা সর্বশাস্ত্রে যেরূপ আছে এবং আমেরিকায় যে সমুদয় কাণ্ড হইতেছে, উহাতেও তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। গৌরাঙ্গ-লীলার প্রমাণগুলি দেখিলে সে গুলি যে সত্য, তাহা আপনা-আপনি মনে বিশ্বাস হয়। এমন কি, আমেরিকার কাণ্ডগুলি যদিও এ কালের কথা আর শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার কথা চারি শত বর্ষেরও পূর্বের কথা, তবু আমেরিকার প্রমাণ অপেক্ষা-শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-ঘটিত প্রমাণগুলিই বলবৎ বলিয়া মনে হয়। কেন, তাহার কারণ বলা বাহুল্য। প্রথমতঃ ঘটনাগুলি শুনিলেই বুঝা যায় যে, উহা কল্পনার কথা নয়, এবং আপনা-আপনি মনে বিশ্বাস হয়। কোনো ঘটনা সত্য কি অসত্য, তাহাব ইহা অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ আর নাই যে, শুনিলেই মনে বসিয়া যায়। আমেরিকায় এই আবেশ লইয়া কেবল ছাইপাঁশের আলোচনা হয়, কিন্তু গৌরলীলায় ইহা দ্বারা মনুষ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহারা সাধুপুরুষ। তাঁহাদের নাম-স্মরণে ভুবন পবিত্র হয়। আর তৃতীয়তঃ, যাঁহারা ঐ লীলা লিখিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীপ্রভুকে স্বয়ং তিনি, অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন বলিয়া জানিতেন। কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা লিখিতে কখন সাহস করিতেন না। এবং তাঁহার লীলা লিখিতে, কোনো আনুমানিক কথা লেখা যে মহাপাপ, তাহা তাঁহারা বেশ জানিতেন। শিবানন্দ সেনের পুত্র শ্রীকবিকর্ণপুর তাঁহার নিজের কাহিনী এইরূপ বলিয়াছেন। তাঁহার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বদনে করিয়াছিলেন, তাহাতে তদ্দণ্ডে তাঁহার সংস্কৃত-ভাষা-জ্ঞান ও কবিত্ব স্ফূর্তি হয়। যদিও তখন তিনি কিছুমাত্র সংস্কৃত জানিতেন না। তবু অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ মাত্র একটি শ্লোক রচনা করিয়া প্রভুকে শুনিয়াছিলেন। কবিকর্ণপুর তাঁহার গৌরাঙ্গ-লীলা-ঘটিত "চৈতন্য-চন্দ্রোদয়" নামক অপরূপ নাটক সমাপ্ত করিয়া বলিতেছেন, যথা—

যস্যোচ্ছিষ্ট প্রসাদাদয়জনি মম প্রৌঢ়িমা কাব্যরূপী
বাগ্দেব্যা যঃ কৃতার্থী কৃত ইহ সময়োৎকীর্ত্য তস্যাবতারম্।
যৎ কর্তব্যং মমৈতৎকৃতমিহ সুধিয়ো যেঽনুরজ্যন্তি তস্মী,
শৃণ্বন্ত্বন্যান্নমামশ্চরিতমিদমমী কল্পিতং নো বিদন্তু।।

প্রেমদাস কর্তৃক এই শ্লোকের অনুবাদ—

যদুচ্ছিষ্ট প্রসাদেতে, প্রৌঢ়িমা হইল চিতে, ইচ্ছা হইল কাব্য রচিবারে।
বাগ্দেবী বসিয়া মুখে, গৌরলীলা বর্ণে সুখে, দ্বার মাত্র করিয়া আমারে।।
আমার কর্তব্য যেই, তা আমি করিল এই, সুবুদ্ধি হয়েন সেই জন।
ইথে অনুরাগ তার, গৌরলীলামৃত সার, নিরবধি করুন শ্রবণ।।
গৌরলীলা যে দেখিনু, তার কিছু বিচারিনু, সত্য এই না কহি কল্পন।
ইথে রতি নাহি যার, দূরে তারে নমস্কার, তার মুখ না দেখি কখন।

শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের আর একটি শ্লোক ঃ—

শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাবর্ণিতং
জগ্রন্থে কিয়তী তদীয়কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া।
এতাং তৎ প্রিয়মণ্ডলে শিব শিব স্মৃত্যেকশেষং গতে,
কো জানাতু শৃণোতু কস্তদনয়া কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাম।।

প্রেমদাস কর্তৃক ইহার অনুবাদ—

শ্রীচৈতন্য-কথামৃত, দেখিনু শুনিনু যত, কোটি গ্রন্থে না যায় বর্ণন।
অজ্ঞান বালক হঞা, আমি তাঁর কৃপা পাঞা, কিছু মাত্র করিল লিখন।।
গৌরপ্রিয় মণ্ডল, তা দেখিল যে সকল, স্মৃতি পথে গেল তারা সব।

পুস্তকে লিখিল যাহা, সত্য হয় নয তাহা, অন্য কেবা জানিব শুনিব।।
অতএব কৃষ্ণ তুমি, সর্বজ্ঞেয় শিরোমণি, অন্তর্বাহ্য তোমাতে গোচর।
যদি সত্য লিখি আমি, তবে তুষ্ট হওএা তুমি, প্রীতি হবে আমার উপর।।

হিন্দুগণ কখন শপথ করিতে ইচ্ছুক নহেন, ইংরাজ অধিবাসীগণ তাহা বেশ জানেন। কেন চাহেন না, পাছে ভুলক্রমে মুখ দিয়া একটী মিথ্যা কথা বাহির হয়। কবিকর্ণপূর পরমভাগবত, হিন্দু হইয়া ও কৃষ্ণের নাম লইয়া, এইরূপ কঠোর শপথ করিয়া তাঁহার গ্রন্থ সমাপন করিতেছেন যে, "যদি তিনি সত্য বলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইবেন।" অর্থাৎ যদি মিথ্যা লিখেন, তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন। শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনিমাই যে কৃষ্ণলীলা, অর্থাৎ দানলীলার যাত্রা করিলেন, সেই লীলা বর্ণনা করিবার সময় কর্ণপুর বলিতেছেন যে, রঙ্গ ভূমিতে উপস্থিত হইলে প্রত্যেকের শরীরে ব্রজের পরিকর একে একে প্রবেশ করিলেন। যথা, শ্রীঅদ্বৈতের দেহে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনিমাইয়ের দেহে শ্রীমতী রাধিকা, শ্রীগদাধরের দেহে ললিতা ও শ্রীনিতাইয়ের দেহে বড়াই বুড়ী। অদ্বৈতের বয়স তখন পঞ্চাশ-বর্ষ, কিন্তু তাঁহাকে পঞ্চদশ-বর্ষীয় নবীন যুবক বলিয়া বোধ হইতেছে; এমন কি, দেখিতে ঠিক কৃষ্ণের মত। কবি কর্ণপুর বলিতেছেন যে শুদ্ধ বেশে যে অদ্বৈতকে ওরূপ দেখা যাইতেছিল তাহা নয়, কারণ কেবল বেশে ওরূপ আমূল, আন্তরিক ও বাহ্যিক পরিবর্তন হইতে পারে না। তবে অদ্বৈতের ঠিক কৃষ্ণরূপে প্রকাশ পাইবার কারণ এই যে, তাঁহার শরীরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছিলেন। যথা—"এহো ত অদ্বৈত নহে বুঝিনু নিশ্চয়। বেশ রচনার শিল্পে এমন কি হয়? কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ আসি কৈল আবির্ভাব।" (প্রেমদাসের নাটকের অনুবাদ।)

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, এই কৃষ্ণযাত্রা বর্ণিত আছে। পাঠক মহাশয়, এই দানলীলা পাঠ করিয়া দেখিবেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে যখন আকর্ষণ করিলেন, তাহার পরে কি লীলা হইল, তাহা নরলোককে দেখিতে দিবেন না বলিয়া, ব্রজের সমুদয় পরিকর অন্তর্ধান করিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধা, শ্রীললিতা, শ্রীবড়াই-বুড়ী, গেলেন; রহিলেন,—শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিমাই, শ্রীগদাধর ও শ্রীনিতাই।

এখানে চন্দ্রোদয় নাটক হইতে কিছু অনুবাদ করিয়া দেখাইতেছি। মৈত্রী ও প্রেমভক্তিতে কথা হইতেছে। মৈত্রী প্রভুর দান-লীলার কথা শুনিতেছেন, আর প্রেমভক্তি বর্ণনা করিতেছেন। অদ্বৈতের দেহে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনিমাইয়ের দেহে শ্রীমতী রাধা, শ্রীনিতাইয়ের দেহে বড়াই-বুড়ী প্রবেশ করিয়া দান-লীলা করিতেছেন।

প্রেমভক্তি বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধার বসন ধরিলে, বড়াই-বুড়ী কোপাবিষ্ট হইয়া রাধাকে লইয়া অন্তর্ধান হইলেন। তখন নিত্যানন্দ নিজরূপ ধরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।"

মৈত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি? বড়াই-বুড়ী গেলেন কোথা, আর শ্রীনিত্যানন্দই বা কিরূপে আসিলেন?"

প্রেমভক্তি বলিলেন,—"বড়াই-বুড়ী নিত্যানন্দের দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, লীলার শেষাংশ কাহাকেও দেখাইবেন না বলিয়া, তিনি অন্তর্ধান হইলেন, কাজেই নিত্যানন্দ রহিলেন। সে কিরূপ বলিতেছি। যেমন জলে উত্তাপ করিলে উহা তপ্ত হয়, আবার তাপ চলিয়া গেলে উহা পূর্বকার মত শীতল হয়; সেইরূপ যখন বড়াই নিত্যানন্দের দেহে প্রবেশ করেন, তখন একরূপ হইয়াছিলেন, বড়াই চলিয়া গেলে, তিনি আবার নিত্যানন্দ হইলেন।

এই ঘটনাটি দ্বারা পরকায়া-প্রবেশরূপ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা এবং প্রকারান্তরে পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছেন। এখন শ্রীগৌরাঙ্গলীলা হইতে ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত দুই চারিটি ঘটনা বলিতেছি। পূর্বে বলিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গের দেহ শ্রীভগবানের, অতএব উহাতে ব্রহ্মাণ্ড-

প্রকাশ হইতে পারে। আর সেই দেহে অক্রুর, ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি প্রকাশ হইতেন। যে দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ মুরারির দেবগৃহে নর-বরাহ আকার ধারণ করেন, সেদিন দেবগৃহে প্রবেশ করিয়াই আপনা-আপনি বলিতেছেন, "একি! ইনি যে প্রকাণ্ড শূকবাকৃতি! ইনি যে আমার মর্ম স্পর্শ করিতে আসিতেছেন" ইহা বলিতে বলিতে— যেন বরাহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত—পশ্চাৎ হটিতে হটিতে অচেতন হইলেন, এবং নর-বরাহাকৃতি হইয়া বিশাল গর্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বলবাম-রূপে প্রকাশ হন, সে কাহিনী এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পড়িয়া দেখিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অমানুষিক বল ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন, কিন্তু ভক্তগণ বুঝিতে পারিতেছেন, প্রভু তখন কাহার প্রকাশ-রূপে বিরাজ করিতেছেন। প্রভু যখন একটু চেতন পাইতেছেন তখনি বলিতেছেন, "আমার প্রাণ যায়।" প্রভুর এই চেতন অবস্থায় চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপ, তোমার এ কি ভাব, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।" প্রভু প্রকারান্তরে এইরূপে তাঁহার তখনকার পরিচয় দিলেন, যথা (চৈতন্য-ভাগবতে)--"হলায়ুধ (বলরাম) মোর অঙ্গে প্রবেশ করিল।"

হয়ত কাহারও কাহারও হিন্দু-দেবদেবীর উপর বিশ্বাস নাই। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, বলরাম, কি মহাদেব, কি ব্রহ্মা প্রভৃতি যত দেবগণের নাম উল্লেখ আছে, উহা কেবল রূপক বর্ণনা। ইহারা প্রকৃত কেহ ছিলেন না, অতএব ইঁহাদের অস্তিত্বে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। এরূপ বলিলেও আমরা যাহা বলিতেছি, তাহাতে কোনো দোষ পড়িতেছে না। যদি ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি শ্রীভগবানের রূপক-বর্ণনাই হন, তবে শ্রীভগবান্ সেই রূপক-রূপেই অন্যের দেহে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। শ্রীহরিদাসের দেহে শ্রীব্রহ্মার প্রকাশ হইত। যদি পাঠক ব্রহ্মার পৃথক অস্তিত্ব না মানেন, এবং বলেন যে, ব্রহ্মা শ্রীভগবানের আংশিক প্রকাশ, আমরা তাহাই স্বীকার করিয়া লইলাম। শ্রীহরিদাসের যেরূপ দেহ, উহা শ্রীভগবানের এই ব্রহ্মারূপ আংশিক প্রকাশের উপযোগী, তাই হরিদাসের দেহে তিনি ব্রহ্মারূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। অতএব ব্রহ্মাকে রূপক-সৃষ্টি বলিলেও 'পরকায়া প্রবেশ' সম্বন্ধে কোনো দোষ হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গঅবতারের উদ্দেশ্য, এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে জীবের যে প্রেম ভক্তি-ধর্মের উপদেশ আছে, উহা কি, তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া।

কেহ কেহ হয়ত শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণলীলা আছে, উহা রূপক-বর্ণনা মনে করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত তাঁহার কৃত শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতায়, এই রূপক-বর্ণনা কি, তাহা বিবরিয়া বলিয়াছেন। এই লীলা যাঁহারা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহারা উত্তমাধিকারী; আর যাঁহারা রূপক-বর্ণনা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অধম-অধিকারী। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা বলিতে পারেন যে, "বড়াই-বুড়ী, কি বৃন্দাদেবী, কি ললিতা,— ইঁহারা প্রকৃত কোনো বস্তু নহেন, রূপক-বর্ণনা মাত্র। তবে ইঁহারা কোথা হইতে আসিলেন, আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-যাত্রার দিবসে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর প্রভৃতির দেহে প্রবেশ করিলেন?" দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁহাদের বিশ্বাস কিছু মৃদু, তাঁহারা ইহা মনে করিতে পারেন যে. শ্রীভগবান সেই রূপক অবলম্বন করিয়া নবদ্বীপবাসী ও জগতের জীবগণকে ব্রজের নিগূঢ়-রস কি, তাহা বুঝাইয়াছিলেন। মনে ভাব, প্রবোধ চন্দ্রোদয় নামক একখানি নাটক আছে। তাহাতে যে সমুদয় ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে,—যথা বিবেক, অধর্ম, বিদ্যা ও উপনিষদ,—উহা মনঃকল্পিত, তাহা সকলে জানেন এই নাটকখানির উদ্দেশ্য জীবকে জ্ঞানোপদেশ দেওয়া। মনে ভাব, তোমরা কয়েকজন, কেহ দয়া, কেহ ধর্ম সাজিয়া, সেই নাটক অভিনয় করিয়া সভ্যগণকে দেখাইলে; পরে আপনাপন স্বাভাবিক আকার ধারণ করিলে। যে সকল ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ-লীলা রূপক মনে করেন, তাঁহারা ভাবিতে পারেন যে, শ্রীভগবান্ ব্রজের নিগূঢ়-রস বুঝাইবার নিমিত্ত, তাঁহার ভক্তের মধ্যে যাঁহার দেহ যেরূপ উপযোগী, তাঁহার দেহে সেইরূপে

প্রকাশ পাইলেন। কি ইহাও হইতে পারে যে, কোন গোলকবাসী শ্রীভগবানের ভক্তের প্রকৃতি শ্রীললিতার ন্যায়, আবার গদাধরের প্রকৃতি ললিতার ন্যায়। পূর্বোক্ত জন তাই ব্রজের নিগূঢ়রস বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীগদাধরের দেহে ললিতারূপে প্রবেশ করিলেন।

এখানে আবার বলি, যে সকল ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহারা যেরূপ রসাস্বাদন করিতে পারিবেন, যাঁহারা জ্ঞানী, অতদূর বিশ্বাস করিতে পারেন না, অর্থাৎ সে লীলাকে রূপকবর্ণনা ভাবেন, তাঁহারা তাহার এক কণাও আনন্দরস ভোগ করিতে পারিবেন না। জ্ঞানী-পাঠক মহাশয়! তুমি করজোড়ে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিও যে, তুমি জ্ঞানরূপ কণ্টাকাকীর্ণ স্থান হইতে অব্যাহতি পাইয়া, বিশ্বাস-রূপ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে পার। ইহা যিনি পারেন, আমি তাঁহার চরণধূলি দ্বারা মস্তক ভূষিত করি। যিনি শ্রীকৃষ্ণলীলা রূপক বলিয়া বিশ্বাস করেন, উহার অধিক পারেন না, তিনি যদি মনোনিবেশপূর্বক ভজন-সাধন করেন, তাহা হইলে ব্রজের পরিকরগণ তাহার সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উদয় হইবেন। ইহা আমার প্রত্যক্ষ দেখা আছে।

শ্রীবিশ্বরূপ সন্ন্যাস লইয়া গমন করায়, তাঁহার পিতা-মাতা,—জগন্নাথ ও শচী,—অতিশয় শোকাকুল আছেন। কেবল শিশু নিমাইকে কোলে করিয়া মন কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিতেছেন। এই সময় একদিন নিমাই (তখন তাঁহার বয়ক্রম ছয় হইতে আটের মধ্যে হইবে) নৈবেদ্যের তাম্বুল খাইয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। যথা (চরিতামৃতে)—

"একদিন নৈবেদ্যের তাম্বুল খাইয়া। ভূমেতে পড়িলা প্রভু অচেতন হইয়া।।
আস্তে ব্যস্তে শচী-মাতা মুখে দিলা পাণি। সুস্থ হঞা কহে প্রভু অপূর্ব কাহিনী।।
এথা হইতে বিশ্বরূপ লয়ে গেল মোরে। 'সন্ন্যাস করহ তুমি' কহিলা আমারে।।
আমি বৈল আমার অনাথ পিতা মাতা। আমিহ বালক সন্ন্যাসের কিবা কথা।।
গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃ মাতৃ সেবন। ইহাতে সন্তুষ্ট হয়েন লক্ষ্মী-নারায়ণ।।
তবে বিশ্বরূপ এথা পাঠাইলা মোরে। মাতা পিতাকে কহিলা কোটি মনস্কারে।।

বিশ্বরূপ ১৬ বর্ষ বয়সে সন্ন্যাস লইয়া ১৮ বর্ষ বয়সে পাণ্ডুপুরে অদর্শন হন। যখন উপরি-উক্ত ঘটনা হয়, তখন হয় তিনি এ জড়জগতে ছিলেন, কি তাঁহার দেহ ভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন, উপরের লিখিত ঘটনায় ইহাই দেখা যাইতেছে যে, তিনি ছিলেন ও তিনি নিজ দেহের সাহায্য না লইয়া কনিষ্ঠের নিকট আসেন ও তাঁহার সহিত মিলিত হন, আর তখন তিনি অখণ্ডরূপে বিশ্বরূপেই ছিলেন, অর্থাৎ সেই জ্ঞান, আর পিতা মাতা ও ভ্রাতার প্রতি তাঁহার সেইরূপ ভালবাসা ও স্নেহ সম্পূর্ণরূপে ছিল। অতএব দেহ ও আত্মা পৃথক; এবং দেহের সহায়তা ব্যতীতও আত্মা অখণ্ডরূপে জীবিত থাকিতে পারে। অর্থাৎ দেহ গেলেও, পূর্বে তাহার যাহা যাহা ছিল, সমুদয় থাকে। ইহাতে অপরিস্ফুট আত্মার কখন কখন একটু ক্লেশ হয়। এরূপ জীবের জড়-জগতের প্রতি সম্পূর্ণরূপে মমতা যায় না, অথচ দেহ ভঙ্গ হওয়ায় উহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাখিতে পারে না। তাই সাধুগণ ভজন-সাধনের দ্বারা বিষয়-লোভ হইতে মুক্ত হয়েন। যাহাদের জড়-জগতের প্রতি লোভ অতি প্রবল, তাহারা উহার শান্তির নিমিত্ত আবার এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে।

এখন উপরি-উক্ত ঘটনাটি যদি সত্য হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশ্বরূপ দেহ ব্যতীতও অখণ্ডরূপে ছিলেন। তবে কথা হইতেছে; ঘটনাটি সত্য কি না। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে, এটি কল্পনা করিবার কথা নয়। কারণ লোকে যে যে কারণে কল্পনা করে, তাহাব কিছুই ইহাতে পাওয়া যায় না। ঘটনা শুনিলেই, ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। সত্য না হইলে ঐরূপ ঘটনা কল্পনা করিয়া লিখিত হইত না। ইহা অপেক্ষা আরো অদ্ভুত কথা বলিতেছি। মুরারি গুপ্তের কড়চায় দেখিতে পাই যে, প্রভুর

বয়স যখন ২৮ বৎসর, সেই সময় ঐ গ্রন্থ লিখিত হয়। মুরারি, প্রভুর বড়,—এমন কি, ছোট বেলায় তাঁহাকে কোলে করিয়াছেন। মুরারি, প্রভুর পিতার বন্ধু ও এক দেশস্থ, এবং নবদ্বীপের এক স্থানে বাস করিতেন। কাজেই তিনি প্রভুর সমুদয় আদিলীলা প্রত্যক্ষরূপে অবগত ছিলেন। তিনি তাঁহার কড়চায় বলিতেছেন যে, নবম বর্ষ বয়সে শ্রীনিমাইয়ের উপবীত হইল। তিনি নিয়মানুসারে গোপনীয় স্থানে বসিয়া ছিলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহা তিনি তাঁহার কড়চায় প্রথম প্রক্রম, ৭ম সর্গ, ১৮ হইতে ২৪ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা প্রভু রাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয়ের অনুবাদসহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

ততঃ কদাচিন্নিবসন্ স্বমন্দিরে সমুদ্যদাদিত্যকরাতিলোহিতঃ।
স্বতেজসাপূরিতদেহ আবভৌ উবাচ মাতর্বচনং কুরুষ্ব মে।।১৮।।

তাহার পরে নিজ মন্দিরে বাস করিতে করিতে কোন দিন শ্রীমহাপ্রভু সমুদিত সূর্যকর অপেক্ষা অধিক লোহিত বর্ণ হইলেন ও নিজ তেজঃ দ্বারা পরিপূরিত দেহ হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। সেই সময় জননীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে মাতঃ! আমার একটি কথা প্রতিপালন কর।"

তথা জ্বলন্তং স্বসুতং স্বতেজসা বিলোক্য ভীতা তমুবাচ বিস্মিত।
যদুচ্যতে তাত করোমি তত্ত্বায় বদস্ব যত্তে মনসি স্থিতং স্বরম্।।১৯।।

সেই সময় স্বীয় ঐশ্বরিক তেজোযুক্ত নিজ পুত্রকে বিলোকন করিয়া শ্রীশচীদেবী ভীতা ও বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, হে তাত! তুমি যাহা বলিবে, আমিই তাহাই করিব। তোমার মনের কথা বল।"

তদিত্থমার্কণ্যবচোঽমৃতং পুনস্তাং প্রাহ মাতর্ণ হরেস্তিথৌ ত্বয়া।
ভোক্তব্যমাকর্ণ্য বচঃ সুতস্য সা তথেতি কৃত্বা জগৃহে প্রহৃষ্টবৎ।।২০।।

শ্রীমহাপ্রভু জননীর এই প্রকার বচনামৃত শ্রবণ করিয়া পুনরপি কহিলেন, "হে মাতঃ! তুমি আর শ্রীহরিবাসরে ভোজন করিও না।" শ্রীশচীদেবী প্রহৃষ্টবৎ "তাহাই করিব" বলিয়া এই বাক্য গ্রহণ করিলেন।

নিবেদিতং পূগফলাদিকং যৎ দ্বিজেন ভুক্ত্বা পুনরব্রবীত্তাম্।
ব্রজামি দেহং পরিপালয়স্ব সুতস্য নিশ্চেষ্টগতং ক্ষণার্দ্ধম্।।২১।।

তাহার পরে এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিবেদিত পুগ (গুবাক) ফলাদি আহার করিয়া, পুনরায় মাতাকে কহিলেন, "হে মাতঃ! আমি চলিলাম, তোমার পুত্রের নিশ্চেষ্টগত দেহ প্রতিপালন কর।"

ইত্যুক্ত্বা সহসোত্থায় দণ্ডবচ্চাপতদ্ভুবি।
বিশ্বম্ভরং গতং দৃষ্ট্বা মাতা দুঃখসমন্বিতা।।২২।।

এই কথা বলিয়া সহসা উঠিয়া দণ্ডবৎ করিয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন। জননী পুত্রের সংজ্ঞা রহিত দেখিয়া দুঃখে সমন্বিত হইলেন।

স্নাপয়ামাসি গাঙ্গৈয়েস্তোয়ৈরমৃতকল্পকৈঃ।
ততঃ প্রবুদ্ধঃ সুস্থোঽসৌ ভূত্বা স ন্যবসৎ সুখী।।২৩।।

তৎপরে অমৃততুল্য গঙ্গাজলে স্নান করাইলেন। তাহাতে প্রভু চৈতন্য লাভ করিয়া সুস্থ ও স্বাভাবিক তেজঃযুক্ত হইয়া অবস্থান করিয়াছিল

তেজসা সহজেনৈব তৎ শ্রুত্বা বিস্মিতোঽভবৎ।
জগন্নাথোঽব্রবীচ্চৈনাং দৈবীং মায়াং ন বিদ্মহে।।২৪।।

তাহা শুনিয়া জগন্নাথ মিশ্র বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীশচীদেবীকে বলিলেন, "দৈবমায়া বুঝিতে পারিলাম না।"

স্ত্রীলোকের ভূতে পাওয়ার কথা যে শুনা যায়,—কেহ কেহ এরূপ ঘটনা দর্শন করিয়াও থাকিবেন,—উপরের কথাটি ঠিক সেইরূপ। ভূতগ্রস্ত স্ত্রীলোক হঠাৎ জ্ঞানশূন্য হইয়া অন্যের ন্যায় কথা বলিতে থাকে, এবং জিজ্ঞাসা করিলে বলে 'আমি' অমুক। তাহার পর ভূত ছাড়ান হয়, কি ভূত আপনি ছাড়িয়া যায়। ভূত ছাড়িয়া গেলে স্ত্রীলোকটি অচেতন হইয়া পড়ে। তখন তাহার মুখে ও কপালে শীতল জলের ঝাপ্টা দেওয়া হয় ও তাহাকে ডাকা হয়। সে ক্রমে সহজ অবস্থা পায়। শ্রীমুরারির কাহিনী অনুসারে নিমাইয়ের ঠিক তাহাই হইয়াছিল। ভগবান্ প্রকট হইবার পরও শ্রীগৌরাঙ্গকে অদ্বৈত এইরূপে ভূতগ্রস্ত ভাবিতেন, যথা চৈতন্যদয়েঃ "অদ্বৈত বলেন ভূত আবেশ যে করে। তাতে আর কৃষ্ণাবেশ সম ভাব ধরে।।"

মনুষ্য যদি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করে, তবে উহা অনেক সময় পরস্পরে বিরোধী হয়। রাজা প্রজা-শাসনের নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম করিলেন, কিন্তু কর্মচারীগণ শাসন করিতে গিয়া দেখেন যে, নিয়মগুলি মাঝে মাঝে পরস্পরে বিরোধী হয়। কিন্তু ভগবানের নিয়ম সেরূপ হয় না, সমুদয় নিয়মে পরস্পরে সামঞ্জস্য আছে। এমন কি এই নিয়মগুলি একটি মনোযোগ করিয়া দেখিলেই জানা যায় যে, সৃষ্টিকর্তা একজন বই দুইজন নয়, আর তিনি জ্ঞানময়। তাঁহার নিয়মের এরূপ সামঞ্জস্য যে, একটি প্রক্রিয়া দেখিলে অন্য প্রক্রিয়া অনুভব করা যায়। একটা গ্রহের গতি দেখিলেই বুঝা যায় যে, অন্য গ্রহের গতি কিরূপ। একটি জীবের সন্তানোৎপত্তি পদ্ধতি দেখিলে জানা যায়, অন্য জীবের সন্তানোৎপত্তি নিয়ম কিরূপ। ফল কথা, শ্রীভগবানের নিয়ম অকাট্য, তাহাতে জটিলতা মাত্র নাই। আর নিয়মাবলীতে পরস্পরে অসামঞ্জস্য হইতে পারে না।

এখন মনে ভাবুন, ভূতে পাওয়া প্রক্রিয়াটি সত্য, অর্থাৎ প্রকৃতই পরকালের কোনো মলিন জীব, এ জগতের কোনো জীবের দেহে প্রবেশ করিয়া, এ জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে। ইহা যদি ঠিক হয়, তবে শ্রীভগবানের নিয়মানুসারে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত পবিত্র, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত পবিত্র দেহে অবশ্য প্রবেশ করিতে পারিবেন। এমন কি, অতি পবিত্র দেহ পাইলে, অতি পবিত্র আত্মা, এমন কি শ্রীভগবানের পার্যদ পর্যন্ত, সেই দেহে আশ্রয় করিয়া জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন। অতএব শ্রীল নারদ কি শ্রীবেদব্যাস প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত এইরূপ জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন। এইরূপে শ্রীভগবান্ উপযুক্ত দেহ পাইলে, জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে শক্তি ধরেন। শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে "করিতে শক্তি ধরেন", এরূপ কথা বলা এক প্রকার অন্যায়, এক প্রকার অন্যায়ও নয়। যেহেতু যদিও তিনি সমুদয় পারেন, তবু তিনি চঞ্চল রাজার ন্যায় আপনার নিয়ম আপনি ভঙ্গ করেন না। তিনি ইচ্ছা করিলে, অসংখ্য উপায়ে জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন বটে, কিন্তু তবু তাহা না করিয়া চিন্ময়দেহধারী আত্মাগণ সম্বন্ধে যে যে উপায় সৃষ্টি করিয়াছেন, নিজেও চিন্ময় বলিয়া, সেই সেই উপায় অবলম্বনে জড়জগতের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। উহার বিপরীত কার্য করিয়া নিজের নিয়ম নিজে কখন ভঙ্গ করেন না।

পাঠক, এখন অবতার প্রকরণ বুঝিয়া লউন। যাঁহারা সন্দিগ্ধচিত্ত, তাঁহারা এখন দেখুন যে, অবতার ঘটনা অসম্ভব ত নয়, বরং অতি স্বভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ এই জড়জগতের সহিত আংশিক রূপে যে সে দেহর দ্বারা প্রকাশ পাইতে পারেন। কিন্তু পূর্ণ হইয়া প্রকাশ হইতে হইলে শ্রীমতী রাধার দেহের প্রয়োজন। ত্রিজগতে রাধারাণী ব্যতীত এরূপ আর কেহ নাই, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ের উপর আপাদমস্তক স্থান দিতে পারেন।

যদি বল, রাধা কে? রাধা শ্রীভগবানের প্রকৃতি। এই জগৎ শ্রীভগবানের প্রকাশ।

ইহাতে,—কি জড়পদার্থ, কি জীবগণ,—সমুদয়, পুরুষ ও প্রকৃতি দ্বারা জড়ীভূত। অতএব শ্রীভগবানেরও পুরুষ ও প্রকৃতি ভাব আছে। তাঁহার প্রকাশ যে জগৎ, তাহা যদি পুরুষ ও প্রকৃতি দ্বারা জড়ীভূত হইল, তবে তিনিও তাহাই। সে যাহা হউক, যদি পারি তবে রাধার তত্ত্ব উপযুক্ত স্থানে ব্যক্ত করিব।

অতএব যীশু শ্রীভগবানের একজন পরকালের উচ্চ বস্তু। তিনি আপনাকে শ্রীভগবানের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাই তিনি ভগবান্‌কে দাস্যভক্তি দ্বারা ভজন করেন। অর্থাৎ তিনি এই জগতের উপযোগী একটি দেহ অধিকার করিয়া জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত খৃষ্টীয়ধর্ম প্রচার করেন। ঐরূপ মহম্মদও একজন পূর্বকালের উচ্চ বস্তু। তিনি আপনাকে শ্রীভগবানের সখা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি শ্রীভগবানকে সখ্য-ভক্তি দ্বারা ভজন করেন। অর্থাৎ জীবের নিকট সেইরূপ ভজনা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, তিনি একটি উপযোগী দেহ আশ্রয় করেন। এখানে শ্রীগীতার এই শ্লোকটি স্মরণ করুন—"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।"

সেইরূপ নবদ্বীপে শ্রীভগবান্ উপযোগী দেহ আশ্রয় করিয়া জীবের নিকট ব্রজের নিগূঢ়-রস,—যাহা পূর্বে "অনর্পিত" ছিল, প্রকাশ করিলেন।

যীশু, কি মহম্মদ, কি গৌরাঙ্গ, কেহই মিথ্যা কহিবার লোক নহেন। ইঁহারা স্পষ্ট করিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন। যীশু আপনাকে শ্রীভগবানের পুত্র বলিয়া, এবং মহম্মদ তাঁহাকে আপন সখা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আর শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবানের সিংহাসনে বসিয়া, আপনাকে শ্রীপূর্ণব্রহ্ম-সনাতন বলিয়া পরিচয় দিয়, তাঁহার পূজা লইয়াছেন। রহস্য এই যে, যীশু এক দেশে এবং শ্রীগৌরাঙ্গ অন্য দেশে শিক্ষা দিলেন। উভয়ে যে বিষয়ে শিক্ষা দিলেন, তাহা অতি সূক্ষ্ম ও পরস্পরে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য; এমন কি, খ্রীষ্টীয়ধর্মকে শ্রীবৈষ্ণবধর্মের এক শাখা বলিলেও হয়। তবে খ্রীষ্টীয়ধর্ম অতি মোটা, আর বৈষ্ণবধর্ম অতি সূক্ষ্ম। এই যে যীশুর ও শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষায় সামঞ্জস্য, ইহাই এক অকাট্য প্রমাণ যে, উভয়েই সত্য বস্তু।

উপরে উপবীতকালে শ্রীগৌরাঙ্গের যে কাহিনী বলিলাম, সে সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কাহিনিটি যে সত্য, তাহার অকাট্য প্রমাণ কি? তাহার অকাট্য প্রমাণ নাই, এবং এই সমুদয় বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ হইতেও পারে না। আমি পূর্বে বলিয়াছি, যিনি অকাট্য প্রমাণ চাহেন, তিনি সাধন-ভজন করুন, আপনা-আপন অকাট্য প্রমাণ পাইবেন। তবু গোটা কয়েক কথা বলিব। মুরারি গুপ্তের বাড়ী প্রভুর বাড়ীর নিকট। এক দেশস্থ বলিয়া তাঁহার সহিত শচী ও জগন্নাথের অতিশয় আত্মীয়তা ছিল। মুরারি নিমাইকে ছোটবেলায় কোলে করিয়া বেড়াইয়াছেন। মুরারি বৈদ্য, চিকিৎসা করিয়া সংসার চালাইতেন। প্রভু বরাহরূপে তাঁহার নিকট প্রকাশ হইলে, মুরারি তাঁহাকে শ্রীভগবান্-জ্ঞানে তাঁহার চরণ আশ্রয় করিলেন। প্রভু পাছে তাঁহাকে ফেলিয়া গোলকে চলিয়া যান, এই ভয়ে প্রভুর অগ্রে মরিবেন বলিয়া তিনি আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন। এ কাহিনী পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে।

প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় নীলাচলে ফিরিলে, নদেবাসীরা তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। সেই সঙ্গে মুরারিও গিয়াছিলেন। নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে দামোদর পণ্ডিত গিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ জানেন। মুরারি নীলাচলে গেলে দামোদর পণ্ডিত তাঁহাকে বলিলেন, "হে বৈদ্যরাজ! হরিকথা কি জীবে জানিতে পাইবে না? শ্রীগৌরহরির আদিলীলা কেবল তুমিই উত্তমরূপে অবগত আছ। জীবের উপকারের নিমিত্ত এই সময়ে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখ।" মুরারি ইহা স্বীকার করিলেন। কথা হইল যে, মুরারি প্রভুর লীলা-কাহিনী বলিবেন, আর দামোদর উহা সংক্ষেপে শ্লোকবদ্ধ করিবেন। তাঁহারা তাঁহাই

করিলেন। ইহাই হইল "মুরারির কড়চা"। প্রভুর বয়স তখন ২৮ বৎসর। তিনি গৃহের এক কোণে প্রেমানন্দে বিহ্বল, আর এক কোণে কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া মুরারি তাঁহার লীলাকথা লিখিলেন। সুতরাং এই গ্রন্থে জ্ঞানতঃ কোন অলীক কথা থাকিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। আবার, যে কোনো ধর্মের যত প্রমাণই থাকুক, শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার সম্বন্ধে মুরারির কড়চা যেরূপ প্রমাণ, এরূপ প্রমাণ বুদ্ধ, মহম্মদ, খ্রীষ্ট, কি আর কোনো ধর্ম সম্বন্ধে নাই।

অপর মুরারি যাহা বলিলেন, ইহা নূতন কথা নহে,—জগতের সর্বস্থানে সকল সময়, এই আবেশের কথা লেখা আছে। মুরারি মিথ্যা কথা কহিবার লোক নহেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া জানেন, সুতরাং প্রভুর সম্বন্ধে তাঁহার কোনো মিথ্যা কথা বলিবার সম্ভাবনা নাই। আর মুরারির ওরূপ কাহিনি কল্পনা করারও কোনো স্বার্থ নাই, বরং স্বার্থের হানি আছে। সে কিরূপ বলিতেছি। প্রথম দেখুন, এই অদ্ভুত কাহিনির মধ্যে প্রভু তখনি "সুপারি খাইলেন," এরূপ অসংলগ্ন কথা কেন? এ ঘটনা কিরূপে হইয়াছিল বলিতেছি। শ্রীজগন্নাথ বাড়ীতে নাই, নিমাই উপবীত লইয়া গুপ্তভাবে আছেন; এমন সময়ে তিনি জননীকে ডাকিলেন। জননী আসিয়া দেখেন যে, পুত্রের শরীর দিয়া লোহিত সূর্যের আলো বাহির হইতেছে, আর উহাতে সে স্থান আলোকিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া শচী ভয় পাইলেন। নিমাই তখন শচীকে একটি আদেশ করিলেন। অমনি তিনি ভয়ে তদ্দণ্ডে তাহা স্বীকার করিলেন। পরে নিমাই সেই আবেশ অবস্থায় বলিলেন, "আমি চলিলাম। আমি চলিয়া গেলে তোমার পুত্র অচেতন হইবেন, তুমি তাঁহাকে শুশ্রূষা করিও।" ইহাই বলিয়া নিমাই যেন প্রণাম করিতে গেলেন, এবং শচীও তাহাই ভাবিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন শ্রীভগবান্ লুকাইলেন; আর ভূতাবেশ ছাড়িলে যেমন জীব ঢলিয়া পড়ে, নিমাইয়ের দেহ সেইরূপ ঢলিয়া পড়িল। জগন্নাথ তখন বাড়িতে ছিলেন না, কাজেই শচী মহাব্যস্ত হইলেন; এবং মুরারিকে ডাকাইলেন। তিনি চিকিৎসক এবং তাঁহাদের আত্মীয় ও প্রতিবাসী। মুরারি আসিবার পূর্বেই শচী পুত্রকে স্নান করাইয়া ও মুখে জলের ছিটা দিয়া চেতন করিলেন। মুরারি আসিয়া নিমাইয়ের কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে শচী বলিলেন, একটী শুপারি খাইয়া অচেতন হন। মুরারি বলিলেন, 'কিরূপে হইল বল দেখি?' তখন শচী আনুপূর্বিক সমস্ত বলিলেন। মুরারিও দামোদরকে তাহাই বলিলেন, এবং দামোদরও সংক্ষেপে তাহা সূত্রে বদ্ধ করিলেন। তাহার পরে জগন্নাথ মিশ্র গৃহে আসিলেন, এবং সমুদয় শুনিয়া বলিলেন, "এ দেবতাগণের কাণ্ড আমি বুঝিতে পারিলাম না।" নিমাই তাঁহার ভগবান-ভাব তাঁহার পিতাকে কখন দেখিতে দেন নাই।

"এ ঘটনা কল্পনা হইলে কিম্বা মুরারির মনে কিছুমাত্র কল্পনার সন্দেহ থাকিলে, তিনি উহা বলিতেন না। কারণ ইহাতে প্রকারান্তরে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তায় দোষ পড়িতেছে। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া মানিতেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান একজন মুরারি। তিনি যে কাহিনি বলিলেন, তাহাতে ভিন্ন-লোকে, এমন কি, নিজ-জনেও সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ একজন সামান্য মনুষ্য, তবে শ্রীভগবান্ তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতেন বটে। এইরূপ সিদ্ধান্ত যে অতি স্বাভাবিক, তাহা মুরারির গ্রন্থের পরের শ্লোকেই প্রকাশ। মুরারি যেরূপ গৌরাঙ্গভক্ত, গৌরাঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনো দেবদেবী মানিতেন না, দামোদরও তাহাই। মুরারি উপরি-উক্ত কাহিনী বলিলে, দামোদর চমকিয়া উঠিলেন, একটু কষ্টও পাইলেন। উপরে ১ম প্রক্রম ৭ম সর্গের ২৪ শ্লোক পর্য্যন্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। এখন ২৫ শ্লোক হইতে শ্রবণ করুন ঃ—

ইতি শ্রুত্বা কথাং দিব্যাং প্রাহ দামোদরোদ্বিজঃ।
কিমিদং কথিতং ভদ্র স্বয়ং কৃষ্ণো জগদ্‌গুরুঃ।। ২৫।।

জাতঃ কথং ব্রজামীতি পালয়স্ব সুতং শুভে।
ইতি মাত্রে কথং প্রাহ হ্যেতন্মে সংশয়ো মহান্।। ২৬।।
কিং মায়া জগদীশস্য তদ্বক্তুং ত্বমিহার্হসি।
হরেশ্চরিত্রমেবাত্র হিতায় জগতাং ভবেৎ।। ২৭।।

এই দিব্য কথা শুনিয়া সন্দিহান হইয়া শ্রীদামোদর দ্বিজ শ্রীমুরারি গুপ্তকে কহিলেন, "হে ভদ্র! তুমি এ কি কহিলে? ইহাতে আমার মহা সন্দেহ হইল। জগৎ পিতা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তিনি কিরূপে মাতাকে কহিলেন, "হে শুভে! আমি চলিলাম, তুমি তোমার পুত্রের দেহ পালন কর। হে ভদ্র মুরারি গুপ্ত। ইহা কি জগদীশ্বরের মায়া?" অর্থাৎ দামোদর বলিতেছেন, "মুরারি! তুমি বল কি, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংই শ্রীভগবান, তবে তিনি কিরূপে বলিলেন, তোমাব পুত্রের দেহ সন্তর্পণ কর, আমি চলিলাম?" যথা কড়চার ১ম প্রক্রম ৮ম সর্গ ঃ—

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য চিন্তয়িত্বা বিচার্য্য চ।
নত্বা হরিং পুনঃ প্রাহ শৃণুম্ব সুসমাহিতঃ।। ১।।

শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীদামোদর পণ্ডিতের এই বচন শ্রবণ করতঃ চিন্তা ও বিচার করিয়া শ্রীহরিকে প্রণতিপূর্বক পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, "হে দামোদর পণ্ডিত। সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। ১।

জনস্য ভগবদ্ধ্যানাৎ কীর্তনাৎ শ্রবণাদপি।
হরেঃ প্রবেশো হৃদয়ে জায়তে সুমহাত্মনঃ।। ২।।

শ্রীভগবদ্ধ্যান, কীর্তন ও শ্রবণ হেতু সুমহাত্মা জনের হৃদয়ে শ্রীহরি প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। ২।

তস্যানুকারং চক্রে স তত্তেজস্তৎপবাক্রমম্।
দধাতি পুরুষো নিত্যামাত্মদেহাদিবিস্মৃতঃ।। ৩।।

শ্রীভগবান্ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে মনুষ্য ভগবানের অনুকরণ করে এবং ভগবৎ তেজ ও ভগবৎ পরাক্রম ধারণ করে এবং আত্মদেহাদি বিস্মৃত হয়। ৩।

ভবেদেবং ততঃ কালে পুনর্বাহ্যো ভবেত্ততঃ।।
করোতি সদজং কর্ম প্রহ্লাদস্য যথা পুরা।। ৪।।
তাদাত্ম্যোহভূত্তোয়নিধৌ পুনর্দ্দেহস্মৃতিস্তটে।

তাহার পরে, পুনরায় বাহ্য হইয়া থাকে ও বাহ্য হইলে সহজ কর্ম করিয়া থাকে। যেমন পূর্বে প্রহ্লাদের সমুদ্র মধ্যে তদাত্ম্য ও তটে বাহ্য হইয়াছিল। অর্থাৎ সমুদ্র মধ্যে প্রহ্লাদ যখন নিক্ষিপ্ত হন তখন শ্রীভগবন্ময় হইয়াছিলেন, আর তটে উঠিয়া আপনার সহজ অবস্থা পাইয়াছিলেন।

'ঈশ্বরস্তস্য সৎশিক্ষাং দর্শয়ং স্তচ্চকার হ।
লোকস্য কৃষ্ণভক্তস্য ভবেদেতৎস্বরূপতা।। ৬।।
যথাত্র ন বিমুহ্যন্তি জনা ইত্যভাশিক্ষয়ন্।

ঈশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ ইহা শিখাইবার জন্য এই লীলা করিয়াছিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণভক্ত-জনের শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতা হয়, ইহাতে লোক সকল যাহাতে ভ্রান্ত না হয়, তাহাও শিখাইবার জন্য এই লীলা করিয়াছিলেন।

ভক্তদেহ ভগবতো হ্যাত্মা চৈব ন সংশয়।। ৭।।
ভক্তদেহই ভগবানের আত্মা, ইহাতে সংশয় নাই।
কৃষ্ণঃ কেশিবধং কৃত্বা নারদায়াত্মনো যশঃ।
তেজশ্চ দর্শয়ামাস ততো মুনিবরো ভুবি।। ৮।।

পপাত দণ্ডবত্তস্মিন স্থানে শতগুণাধিকম্।
ফলমাপ্নোতি গত্বা তু বৈষ্ণবো মথুরাং পুরীং।। ৯।।

শ্রীকৃষ্ণ কেশিবধ করিয়া শ্রীনারদকে আপনার রূপ ও তেজ দর্শন করাইয়াছিলেন। তাহার পরে মুনিবর শ্রীনারদ ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়াছিলেন। মনুষ্য মথুরাপুরী গমন করিয়া সেই স্থানে (কেশি-তীর্থ) শত গুণ ফল হয়।

এবং রামো জগদ্যোনিশ্বরূপমদর্শয়ৎ।
শিবায় পুনরেবাসৌ মানুষীমকরোৎ ক্রিয়ান্।। ১০।।

এই প্রকার ভগবান্ রামচন্দ্র শ্রীশিবকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া, পুনরায় মানুষী ক্রিয়া করিয়াছিলেন।

মুরারি গুপ্ত উপরে কি বলিলেন, পাঠক অনুভব করিয়া দেখুন। তিনি বলিলেন যে, ভক্তজনে কীর্তনাদির দ্বারা হৃদয় এরূপ নির্মল করিতে পারেন যে, স্বয়ং ভগবান্ উহাতে কখন কখন প্রবেশ করিয়া থাকেন। তিনি ভক্ত-হৃদয়ে কিয়ৎকালের নিমিত্ত অবস্থিতি করেন। তখন সেই ভক্ত আত্মবিস্মৃত হন, হইয়া ভগবানের ন্যায় কথা বলেন; এমন কি, সেইরূপ ক্ষমতাও প্রাপ্ত হন। তাহার পরে শ্রীভগবান্ তাঁহার হৃদয় হইতে চলিয়া গেলে, সেই ভক্ত আবার নিজের প্রকৃতি প্রাপ্ত হন। এই মুরারির কথা। তাহার পরে মুরারি বলিতেছেন, "শ্রীভগবান্ জীব-শিক্ষার নিমিত্ত শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তিনি কখন ভক্ত-ভাব, কখন ভগবান-ভাব অবলম্বন করিতেন। ভক্ত হইয়া ভক্তি হইয়া ভক্তি কি বস্তু তাহা জীবগণকে শিখাইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এই লীলা দ্বারা দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান্ মনুষ্য-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া থাকেন, আর যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন তিনি ভগবান্-ভাব প্রাপ্ত হন, তাই দেখিয়া যেন কেহ তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া পূজা না করে।"

মুরারি উপরি উক্ত ঘটনার যে ব্যাখ্যা করিলেন তাহা শুনিয়া কোনো সন্দিগ্ধচিত্ত পাঠক হাস্য করিয়া বলিতে পারেন, "বৈদ্যরাজ! তাই যদি হইল, তবে তোমার শ্রীগৌরাঙ্গকে কেন ভক্ত বল না? তিনি ভক্ত-শিরোমণি ছিলেন, তাই শ্রীভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশ হইয়া তাঁহাকে ক্ষণিক মাত্র ভগবত্ত্ব অর্পণ করিতেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের ন্যায় একজন মনুষ্য বই আর কিছু নয়।" যদি স্বীকার করা যায় যে, শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে প্রবেশ করিয়া ভক্তিধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রভুর ভগবত্ত্বায় দোষ পড়িল বটে, কিন্তু তিনি যে ধর্ম প্রচার করিলেন, তাহা প্রমাণিত হইল, অর্থাৎ শ্রীভগবান্ মঙ্গলময়, তাঁহার শ্রীশ্রীচরণ সেবনই জীবনে সর্বপ্রধান কর্ম।

কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে যে, মুরারি যে সিদ্ধান্ত করিলেন, উহা ভক্তগণের নিমিত্ত, বহিরঙ্গ লোকের জন্য নয়। বহিরঙ্গ লোকে ওই প্রশ্ন করিলে মুরারি এই উত্তর দিতেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যে শ্রীভগবান্, তিনি তাহার শত সহস্র প্রমাণ পাইয়াছেন। তিনি তাঁহার বরাহ প্রভৃতি রূপ দর্শন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মহাপ্রকাশ এবং তাঁহার অন্যান্য প্রকাশ শত-শত বার দর্শন করিয়াছেন। আর তাঁহার নিজমুখেও বহুবার শুনিয়াছেন যে, তিনিই পূর্ণব্রহ্ম, তিনিই সকলের আদি। তিনি যে শচীনন্দন হইতে পৃথক বস্তু তাহা কখনও বলেন নাই। এবং শচীর উদরে তাঁহার যে দেহের উৎপত্তি সেই তাঁহার নিজ দেহ,—তাহা বারম্বার বলিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত যখন শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করিতে চাহেন, তখন শ্রীপ্রভু তাঁহাকে বলেন, "এই গৌর-রূপই আমার প্রকৃত রূপ, আর এই রূপ অদ্বৈতেরও প্রিয়।" জগদানন্দকে তিনি নিজহস্তে আপনার গৌর-গোবিন্দ বিগ্রহের পূজা করিতে দিয়াছিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমেই গৌর-মূর্তি স্থাপন করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মুরারি কেবল ভক্তের নিমিত্ত লিখিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন নাই। হৃদয় নির্মল হইলে, শ্রীভগবান স্বয়ং প্রবেশ করিয়া প্রকাশ হয়েন, হইয়া ভক্ত ঠিক ভগবানের ন্যায় হয়েন, এ কথা মুরারি বলিতে পারেন না। এরূপ যে কোথায় হইয়াছে তাহাও প্রমাণ নাই। প্রহ্লাদের ক্ষণিক অধিরূঢ়ভাব, অর্থাৎ তিনিই ভগবান্ এ ভাব, আর শ্রীগৌরাঙ্গের বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া শ্রীপদ বাড়াইয়া গঙ্গাজল, চন্দন ও তুলসীর দ্বারা শ্রীভগবানের পূজা গ্রহণ,—এই দুই ভাবে বহু পৃথক। অবশ্য ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত হইলে ভক্তগণ শ্রীভগবানের লীলার অনুকরণ করিয়া থাকেন। কেহ গোপাল-আবেশে ত্রিভঙ্গ দাঁড়াইয়া যেন মুরলী বাদন করিতেছেন, কেহ-বা বাল-গোপাল আবেশে জানু-গতিতে চলিতেছেন,—প্রেমে ভক্তগণ এরূপ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-দাসের ন্যায় ভক্ত ত্রিভুবনে আর হয় নাই। তাঁহারা অনেকে প্রহ্লাদ অপেক্ষাও বড়ো। কৈ তাঁহারা কবে শ্রীভগবান কর্তৃক আবেশিত হইয়া শ্রীভগবানের ন্যায় কথা কহিয়াছেন, কি ঐশ্বর্য দেখাইয়াছেন, কি পা বাড়াইয়া দিয়া শ্রীভগবানের পূজা লইয়াছেন? কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার আমূল তাহাই। শ্রীভগবানের সিংহাসনে বসিয়া শ্রীনিমাই প্রফুল্ল বদনে ভক্তগণ সঙ্গে বিহার করিতেছেন। তাঁহার অঙ্গের আলোতে গৃহ বৈদ্যুতিক আলো অপেক্ষাও কোটি গুণ আলোকিত এবং অঙ্গ-গন্ধে দিক্ আমোদিত হইয়াছে। শ্রীনিমাই কথা কহিতেছেন, আর যেন সুধা উগরাইতেছেন; আর বলিতেছেন, "আমিই আদি, আমিই অন্ত, আমিই তোমাদের, তোমরা আমার।" আর কি বলিতেছেন?—না, "আমি জীবের দুঃখে কাতর হইয়া, ভক্তগণের আকর্ষণে জীবকে আশ্বাস দিতে ও ভক্তি-ধর্ম শিখাইতে আসিয়াছি।" কৈ,—কবে কে এরূপ বলিয়াছেন বা করিয়াছেন? কোনও শাস্ত্রে বা কোনও দেশে এরূপ নাই। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, নানক প্রভৃতি বহু অবতার জগতে প্রকাশ হইয়াছেন। কিন্তু কবে কোন্ অবতার সিংহাসনে বসিয়া, শ্রীভগবানের তেজ প্রকাশ করিয়া, শ্রীভগবান্ বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া, "বর মাগো" বলিয়া জীবগণকে আশ্বাসিত করিয়াছেন? এরূপ ঘটনা কেহ কখন শুনেন নাই, অনুভবও করেন নাই।

শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ চিন্ময়,—উহা জড়-পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট নয়। শ্রীভগবানকে চর্মচক্ষে দর্শন করা যায় না; দর্শন করিতে হইলে তাঁহাকে চর্মচক্ষু-গোচর দেহ ধারণ করিতে হয়। মনুষ্যের ধ্যান স্ফূর্তির নিমিত্ত এরূপ দেহ প্রয়োজন, তাই শ্রীভগবান্ চর্মচক্ষু-গোচর দেহ ও রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। আকাশ-ধ্যান যে ভক্তের নিকট নিষ্ফল তাহা ভক্তমাত্রেই জানেন; আর যিনি ইহা বিশ্বাস না করেন, তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে, ভক্তের ধ্যান জীবন্ত সামগ্রী।

শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহ শ্রীভগবানের দেহ,—শুধু আধার নয়। মুরারিকে শ্রীগৌরাঙ্গ আলিঙ্গন করিলে তিনি ১০ম স্কন্ধের ৮১ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোক পড়িয়া শ্রীভগবানকে স্তুতি করিলেন। সে শ্লোকের অর্থ এই যে, "কোথা আমি দীন, আর কোথা তুমি শ্রীভগবান; তুমি আমাকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলে!" মুরারির এই বাক্য শুনিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র কি বলিলেন, শ্রবণ করুন। যথা, চৈতন্য-চরিত ৭ম সর্গ,—

> শ্রুত্বা স ইত্থমুদিতং ভগবাংস্তদৈব স্বৈশ্বর্য্যমুত্তমমুপেত্য ররাজ নাথঃ।
> রম্যাসনোপরি পরিষ্ঠিত উদ্ভটেন তেজশ্চয়েন দিননাথসহস্রতুল্যঃ।। ১০১।।

ভগবান্ গৌরচন্দ্র এই কথা শুনিয়া তৎকালীন ঐশ্বর্য্য লাভ করতঃ, অত্যুদ্ভট তেজের দ্বারা সহস্র সূর্যের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া, শোভন আসনোপরি অধিষ্ঠানান্তর পরম শোভা পাইতে লাগিলেন।। ১০১।।

> ইদং শরীরং পরমং মনোজ্ঞং সচ্চিদ্‌ঘনানন্দময়ং মমৈব।
> জা নীত যুয়ং নহি কিঞ্চিদন্যদ্বিনাস্তি ভূমৌ স ইতীদমুচে।। ১০২।

এবং কহিলেন, আমার এই শরীর পরম মনোজ্ঞ, নিত্য, চিদ্‌ঘন ও আনন্দময়, তোমরা নিশ্চয় জানিও আমার শরীর ব্যতিরেকে এই ভূমণ্ডলে আর কিছুই নাই।। ১০২।।

তাহার পরে যদি শচীনন্দন শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক বস্তু হইতেন, আর তাঁহার দেহটি শ্রীভগবানের না হইয়া একজন মনুষ্যের হইত, তবে শ্রীভগবান্ সেই দেহে প্রকাশ পাইয়া কুলবতীগণের মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া বলিতেন না যে, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক," অর্থাৎ "আমাকে তোমার স্বামী বলিয়া গ্রহণ করো।" আবার তাহা হইলে শ্রীভগবান্ সেই দেহে প্রকাশ পাইয়া, সেই দেহের পদ, তাঁহার দেহধারী বৃদ্ধা জননীর মস্তকে দিতেন না। শ্রীভগবান্ কর্তৃক এরূপ মূঢ়তার কার্য্য সম্ভব হয় না। শ্রীঅদ্বৈত দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন, জগন্নাথ-সুত যদি "তিনি" হয়েন, তবেই আমার মস্তকে চরণ দিতে সক্ষম হইবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাই করিলেন, আর তখনি শ্রীঅদ্বৈত স্বীকার করিলেন যে, প্রভু স্বয়ং আসিয়াছেন। আবার শ্রীশচীর মস্তকে পা দিয়া, শ্রীভগবান্ ইহাই প্রমাণ করিলেন যে, তিনি আর শচীনন্দন পৃথক বস্তু নন, আর শচীনন্দনের যে দেহ, উহা তাঁহার নিজের দেহ। আর যদিও বাহ্য সম্পর্কে শচী তাঁহার জননী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শচীর পিতা। আরো দেখাইলেন যে, যদিও শচী অতি বৃদ্ধা, কিন্তু তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন।

পঞ্চম অধ্যায়

গৌরাঙ্গ কল্পতরু, অদ্বৈতাদি শাখা চারু, কীর্তনে কুসুম পরকাশ।
ভকত ভ্রমরগণ, মধু-লোভে অনুক্ষণ, আনন্দেতে ফিরে চারুপাশ।।
হরিনাম পত্র শোভে, স্নিগ্ধ-সুমধুর ভাবে, কিবা সুশীতলতার ছায়া।
কলি-দগ্ধ জীব যত, পাপ-তাপে সন্তাপিত, তার তলে আসিয়া জুড়ায়।।
অকৈতব প্রেমফল, রসভরে টলমল, খাইতে বড়ই মিঠে লাগে।
গল-লগ্নকৃত বাস, হইয়ে উদ্ধব দাস, কাতরেতে সেই ফল মাগে।।

শ্রীবিশ্বরূপ নিত্যানন্দের দেহে সর্বদা বিরাজ করিতেন; এমন কি, শচীর কখন কখন ভ্রম হইত—যেন নিত্যানন্দ তাঁহার সেই হারান পুত্র বিশ্বরূপ। সেই নিত্যানন্দের নিকট প্রভু বলিতেছেন যে, তিনি অনুমতি পাইলে তাঁহার দাদা বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে যাইবেন।

এখন বিশ্বরূপ যে জগতে নাই, তাহা কি শ্রীগৌরাঙ্গ জানিতেন না? তাঁহাকে যাই ভাব, এ কথা তাঁহার না জানিবার কোনো কারণ ছিল না, কারণ শচী ব্যতীত পৃথিবী সমেত সকলেই এ কথা জানিতেন যে, বিশ্বরূপ অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পাণ্ডুপুরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অতএব প্রভুও ইহা জানিতেন। তবে তিনি কিরূপে বলিলেন যে, বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে গমন করিবেন? শ্রীচরিতামৃত এ কথার এই উত্তর দিতেছেন, যথা—"বিশ্বরূপ অদর্শন জানেন সকল। দাক্ষিণাত্য উদ্ধারিতে পাতেন এই ছল।।"

অর্থাৎ জীব-উদ্ধার ও ভক্তিধর্ম-প্রচার, প্রভুর একটি প্রধান কার্য্য। কিন্তু তাহা তিনি সহজ অবস্থায় মুখে বলিতেন না; এমনকি, বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন। কারণ সে অবস্থায় তিনি দীন হইতে দীন। দক্ষিণ-দেশে ভক্তি-ধর্ম প্রচার করা তাঁহার কর্তব্য, ইহা সাব্যস্ত করিয়াছেন। সুতরাং দক্ষিণদেশে গমন করিবেন, ইহা তাঁহার স্থির সঙ্কল্প, তাই অনুমতি চাহিতেছেন। এ কথা বলিতে পারিতেন যে, শ্রীপাদ আমাকে অনুমতি কর, আমি দক্ষিণদেশে ধর্ম-প্রচার করিতে যাইব। কিন্তু প্রভু দৈন্যের অবতার। সহজ অবস্থায় যিনি ভক্তগণের প্রত্যেকের হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া দিবানিশি বলিতেছেন, "তোমরা ভক্ত, আমাকে কৃপা করিয়া বল, আমার কিরূপে শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়।" তিনি কি মুখাগ্রে এই দম্ভের কথা আনিতে পারেন যে, "আমি দেশ উদ্ধার করিতে যাইব।" অথচ দক্ষিণদেশ উদ্ধার করিতে যাইতেই

হইবে। কিন্তু কি বলিয়া যাইবেন; তাহাই বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে গমন করিবেন, এই "ছল পাতিলেন।" প্রকৃত পক্ষে, তাঁহার দক্ষিণ-ভ্রমণের মধ্যে বিশ্বরূপেব অনুসন্ধান বড়ো একটা দেখা যায় না, কেবল ভক্তি-ধর্ম প্রচারই দেখা যায়।

শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "উত্তম কথা, আমরাও যাইব।" কিন্তু প্রভু বলিলেন, "তাহা হইবে না, আমি একাকী যাইব।" তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "কেন, আমাদেব অপরাধ?" প্রভু বলিলেন, "তোমাদের গাঢ় অনুরাগ আমাব প্রধান কণ্টক; আমি ইচ্ছামত কার্য করিতে পারি না। আমার মনোমত কার্য করিতে গেলে, তোমাদের মনে দুঃখ দিতে হয়, তাহা আমি পারি না। ইহা বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দের মুখপানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি সন্ন্যাস লইয়া বৃন্দাবন যাইব সঙ্কল্প কবিলাম, তুমি ভুলাইয়া আমাকে শান্তিপুরে আনিলে। দেখ, তুমি মধ্যবর্তী না হইলে, আজ আমি কোথা থাকিতাম? আবার সন্ন্যাসীর প্রধান সহায় দণ্ড; তুমি ইচ্ছা করিলে, আর আমার দণ্ডখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। এখন আমি অঙ্গহীন সন্ন্যাসী হইলাম। তোমরা ভালবাসিয়া এই সব কর, কিন্তু আমার কার্য নষ্ট হয়।"

শ্রীনিত্যানন্দ ভালোমানুষ, ছোট ভাইয়ের দাস। তিনি উত্তর করতে না পারিয়া ঘাড় হেঁট করিলেন। তখন দামোদর বলিলেন, "আমার অপরাধ কি?" প্রভু বলিলেন, "তুমি ব্রহ্মচারী, আমি সন্ন্যাসী। পথে আমি তোমা অপেক্ষা বড়ো, কিন্তু সন্ন্যাসের সকল নিয়ম আমি জানি না, স্মরণ রাখিতেও পারি না; আবার অনেক সময় শ্রীকৃষ্ণের বিরহে, সে সমুদয় নিয়ম পালন করিতেও পারি না। কিন্তু তুমি সমুদয় বিধি অবগত আছ ও পালন করিয়া থাক, সর্বদা আমাকে সাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ। এই বিধি সমুদয় পালন করিতে গিয়া,— আমি শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত যে একটু রোদন করিব, তাহাও পারি না।"

তখন জগদানন্দ বলিলেন, প্রভু, সকলের গুণানুবাদ কীর্তন কবিলেন, কিন্তু আমার কি অপরাধ শুনিয়া রাখি।" প্রভু বলিলেন, "তুমিই ত নাটের গুরু। আমি সন্ন্যাসধর্ম আশ্রয় করিয়াছি; তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। তোমার দিবানিশি একমাত্র চেষ্টা কিসে আমার ধর্ম-নষ্ট হয়। তোমার ইচ্ছা আমি উদর পুরিয়া পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়া ভোজন করি, অতি উত্তম শয্যায় শয়ন করি, উত্তম তৈল মাখিয়া স্নান করি, এবং সমুদয় বিষয়-সুখ ভোগ করি। কিন্তু আমি ত তাহা করিতে পারি না। আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি, এ সমুদয় সুখ ভোগ করিলে আমার ধর্ম নষ্ট হইবে। কিন্তু তুমি তাহা বুঝিবে না, শুনিবেও না; আমার সম্মুখে বিষয়-সুখ রাখিয়া, যাহাতে উহা আমি ভোগ করি, তাহার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্রতা দেখাইবে। কিন্তু আমি তোমার অনুরোধ রাখিতে পারি না বলিয়া তুমি রাগ করিয়া আমার সহিত কথা বন্ধ কর। তখন তোমাকে কথা কহাইবার নিমিত্ত আমার বহু সাধ্যসাধনা করিতে হয়।" তাহার পরে প্রভু বলিলেন, "সকলের কথা যখন বলিলাম, তখন মুকুন্দের কথাও বলি। মুকুন্দ এই প্রথম সংসারের বাহির হইয়াছেন, কাজেই তাঁহার হৃদয় এখনও অত্যন্ত কোমল আছে। তিনি কাহারও দুঃখ সহিতে পারেন না, আমার দুঃখ কিরূপে সহিবেন? আমি শীতে তিন বার স্নান করিতাম, দেখিয়া মুকুন্দ বড় কষ্ট পাইতেন। আমি মৃত্তিকায় শয়ন করি, মুকুন্দ ইহা সহিতে পারেন না। সন্ন্যাসধর্ম পালনের জন্য আমার অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হয়। এ সকল কথা সাহস করিয়া তিনি আমাকে বলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারি। আমি যে নিয়ম পালন করি, উহাতে আমার কিছু দুঃখ হয় না, কিন্তু আমি দুঃখ পাইতেছি ইহা অনুমান করিয়া মুকুন্দের যে দুঃখ তাই দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; এমন কি, আমি মুকুন্দের মুখপানে চাহিতে পারি না।

প্রভু এই বলিয়া যাঁহার যে গুণ তাহা সমুদয় দোষ বলিয়া কীর্তন করিলেন। প্রভুর সন্ন্যাসাদি কার্য্যে শ্রীনিত্যানন্দের কিছুমাত্র আস্থা নাই। তাই তিনি প্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলেন,

আর প্রভুকে শান্তিপুরে লইয়া যান। তাঁহার মতে প্রভুর এ সমুদয় কাজ ফেলিয়া দিয়া নদীয়ায় জননীর নিকট যাওয়াই উচিত। জগদানন্দের ও দামোদরের ঠিক বিপরীত ভাব। দামোদরের সর্বদা ভয় পাছে প্রভুর ধর্মপালন নিয়ম মতো না হয়; আর জগদানন্দের ভয় পাছে প্রভুর পেট না ভরে, কি নিদ্রা ভাল না হয়। মুকুন্দের ভজন সাধন,—প্রভুকে কীর্তন শুনান, প্রভুর রূপ-দর্শন ও প্রভুর চরণ-সেবন। তিনি প্রভুর সোনার অঙ্গে কৌপীন, কি মৃত্তিকায় শয়ন, কিরূপে দেখিবেন?

ভক্তগণ তখন মস্তক অবনত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। এতদিন নদেবাসীরা নদের যথাসর্বস্ব ভক্তদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া এবং ভক্তগণও তাঁহাদের প্রাণ-মন-বুদ্ধি সমুদয় শ্রীগৌরাঙ্গকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন যে তিনি দক্ষিণদেশে যাইবেন, কাহাকেও সঙ্গে লইবেন না! যিনি এই কথা বলিতেছেন, তিনি অগ্রে সাব্যস্ত করেন, পরে প্রস্তাব করেন। তারপর ত্রিভুবনও বিরোধী হইলে তাহা শুনেন না। কাজেই ভক্তগণ বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া ভুবন অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, "শতবার দেহ ত্যাগ করা যায়, তবু তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করা যায় না। তোমরা আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া নীলাচলচন্দ্র দর্শন করাইলে। এ দেহ সম্পূর্ণরূপে তোমাদের, তোমরা আমাকে যেখানে সেখানে বিক্রয় করিতে পার। আমি একবার দক্ষিণদেশে যাইব; একাকী সেতুবন্ধন পর্যন্ত দ্রুতগতিতে যাইয়া ফিরিয়া আসিব। তোমরা এখানেই থাক, আমি যেই যাইব সেই আসিব।" তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিতেছেন "প্রভু নিতান্তই যদি যাইবে, আমরা আর কি বলিব? তবে তুমি একাকী যাইবে, ইহা আমরা কি করিয়া সহিব? প্রথমতঃ নাম-জপ করিতে তোমার হস্ত আবদ্ধ থাকিবে। তোমার কৌপীন, বহির্বাস ও জলপাত্র কে বহন করিবে? যদি স্বয়ং বহন কর তবে নাম জপিবে কিরূপে? তারপর, পথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিলে, কে তোমাকে সন্তর্পণ করিবে? কে ভিক্ষা করিবে, ও প্রসাদ ভুঞ্জাইয়া তোমার প্রাণ রক্ষা করিবে? তুমি স্বেচ্ছাময় যাহা আজ্ঞা করিবে, তাহা আমাদের করিতেই হইবে। তবে এরূপ ভাবে তোমাকে বিদায় দিতে আমরা প্রাণ থাকিতে কিরূপে পারি?"

প্রভুর মন একটু নরম হইল, তাহা ভক্তগণ বুঝিলেন। তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "এখন সার্বভৌম ও গোপীনাথের নিকটে চলুন, এবং এ কথা শুনিয়া তাঁহারা কি বলেন শ্রবণ করুন।" শ্রীনিত্যানন্দ ভাবিলেন যে, প্রভু সার্বভৌমকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করেন। যদি প্রভুর মন ফিরাইতে হয়, তবে উহা সার্বভৌম দ্বারা করাইতে হইবে। প্রভু বলিলেন, "ভাল কথা, তবে চল সার্বভৌমের নিকট যাই।" ইহা বলিয়া তাঁহার নিকট সকলে গমন করিলেন। সার্বভৌম সর্ব সুমঙ্গল উপস্থিত দেখিয়া, মহাহর্ষে উঠিয়া পাদ্য-অর্ঘ দিয়া প্রভুকে ও শ্রীনিতাইকে পূজা করিলেন। সার্বভৌম জানেন না যে, প্রভু তাঁহার গলায় ছুরি দিতে আসিয়াছেন। দুই একবার কৃষ্ণ-কথার পরে, প্রভু তাঁহার দক্ষিণদেশে ভ্রমণ-ইচ্ছা জানাইলেন। ইহা শুনিয়া সার্বভৌম মর্মাহত হইলেন। শ্রীভগবদ্দত্ত মনুষ্য-হৃদয়ের যে মধুর ভাবগুলি তাহা তিনি কখন ইচ্ছা করিয়া উৎকর্ষ করেন নাই, বরং চেষ্টা করিয়া দলন করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার হৃদয়-বৃন্দাবন পোড়াইয়া ছাই করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন। সেই ভস্মাবৃত স্থান প্রথমতঃ আর্দ্র করিয়া, পরে কর্ষণ করিয়া শ্রীপ্রভু যত্ন করিয়া সেখানে প্রেমের বীজ রোপণ করিলেন। এই বীজ এখন অঙ্কুরিত হইয়াছে। প্রভু তাই এখন ভাঙ্গিতে চাহিলেন, তিনি তাহা সহিবেন কিরূপে? প্রভু যাইবেন শুনিয়া, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সার্বভৌম বলিতেছেন, "প্রভু! তোমার বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে জানিতাম না। তুমি স্বেচ্ছাময়; যখন যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, কাহার সাধ্য তাহা হইতে তোমাকে বিরত

করে। তবে তুমি গমন করিলে, তোমার বিরহে আমাদের জীবন থাকিবে না তাহা বুঝিতেছি।
সার্বভৌম বলিতেছেন—(যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য ১২ সর্গঃ)

কথং মমাভূন্নহি পুত্রশোকঃ কথং মমাভূন্নহি দেহপাতঃ।
বিলোক্য যুষ্মৎপদপদ্মযুগ্মং সোঢুং ন শক্তোহস্মি ভবদ্বিয়োগং।। ৯৭।।
বত ক্ব গন্তাসি পথা নু কেন কথং পথঃ ক্লেশসহোহথ ভাবী।

প্রভো! আমার পুত্রশোক কেন না হইল, আমার দেহপাত কেন না হইল আপনার পাদপদ্ম-যুগল দর্শন না করিয়া আপনার বিয়োগ কিরূপে সহ্য করিব? প্রভো! আপনি কোন্ পথে যাইবেন? এবং কিরূপেই বা পথের ক্লেশ সহ্য করিবেন? হা কষ্ট!

"শুনি সার্বভৌম হৈল অত্যন্ত কাতর। চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ অন্তর।। ৪৬।।
বহুজন্মের পুণ্যফলে পাই তোমার সঙ্গ। হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ।।
শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়। তাহা সহি তোমার বিচ্ছেদ সহনে না যায়।।'
আবার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ঃ ৭ম পরিচ্ছেদ—

এই প্রবলপ্রতাপান্বিত শ্রীবৃহস্পতি-অবতার সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকট এখন শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার একমাত্র পুত্র চন্দনেশ্বর অপেক্ষাও বহুগুণে প্রিয়-হইয়াছেন। যখন শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা বর্ণন করিতে করিতে বলিলেন,—শ্রীনন্দনন্দন গোপগোপীগণের নিকট এত প্রিয় হইলেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে আপন পুত্র হইতেও অধিক প্রীতি করিতে লাগিলেন, তখন শ্রোতাবর্গ আশ্চর্যন্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিরূপে হইতে পারে? এ যে একেবারে অস্বাভাবিক। তাহাতে শুকদেব বলিলেন, এরূপ হওয়া অস্বাভাবিক নয়, বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; যেহেতু যিনি যত নিকট-সম্পর্কীয় হউন, শ্রীভগবানের মতো নিকট-সম্পর্কীয় কেহই নহেন, কারণ তিনি জীবের প্রাণের প্রাণ। সুতরাং সার্বভৌম যে বলিলেন, পুত্র মরিয়া যায় ইহাও সহ্য করা যায়, তবু প্রভুর বিরহ সহ্য করা যায় না, তাহার বিচিত্র কি? শ্রীগৌরাঙ্গ সার্বভৌমের দুঃখ দেখিয়া কাতর হইয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, তুমি এত কাতর হইতেছ কেন? আমি সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যাইব, যে যাইব সেই আসিব, আর শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সত্বরই ফিরিয়া আসিব।"

এই যে শ্রীপ্রভু বলিলেন, তিনি সত্বর ফিরিয়া আসিবেন, ইহাতে সকলে নিতান্ত আশ্বস্ত হইলেন। কারণ তাঁহারা জানেন প্রভুর বাক্য অব্যর্থ। সার্বভৌম সাহস করিয়া আর তখন প্রভুকে তাঁহার ইচ্ছা হইতে নিবৃত করিবার যত্ন করিলেন না। ভাবিলেন, পরে সুবিধামত উহা করিবেন। তবে বলিলেন, "প্রভু! তুমি স্বেচ্ছাময়, তোমাকে আমরা রোধ করিতে পারিব না। তবে যদি যাইবে, আর কিছু দিন থাক, প্রাণ ভরিয়া শ্রীচরণ দর্শন করি।" প্রভু এ কথা শুনিয়া তখনি স্বীকার করিলেন। সার্বভৌম তখন প্রভুকে প্রত্যহ নিমন্ত্রণ করিয়া মনের সাধে ভিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রী (যাঁহাকে ষাঠীর মাতা বলিতেন, যেহেতু তাঁহার কন্যার নাম ষাঠী) রন্ধন করেন, আর সার্বভৌম স্বয়ং পরিবেশন করেন। সার্বভৌম ও ভক্তগণ প্রভুকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। প্রভু যাইবেন সাব্যস্ত হইল, তবে একজন ভৃত্য সঙ্গে লইবেন, সকলের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিলেন; আর সার্বভৌমের অনুরোধে প্রভু পঞ্চ দিবস রহিলেন।

ষষ্ঠ দিবস প্রভাতে প্রভু বলিলেন, "তবে আমি চলিলাম।" এই কথা শুনিয়া সকলের মুখ মলিন হইয়া গেল। মনোদুঃখে ও নীরবে সকলে প্রভুর সহিত শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গমন করিলেন। প্রভু করজোড়ে, সর্বসমক্ষে, শ্রীজগন্নাথের নিকট দক্ষিণ ভ্রমণের আজ্ঞা মাগিলেন। পূজারি তখনই আজ্ঞা-মালা ও চন্দন আনিয়া দিলেন। প্রভুও মহা-আনন্দিত হইয়া মালা গ্রহণ করিলেন। তখন সকলে একত্র হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন; তৎপরে সমুদ্র-পথ ধরিলেন।

সঙ্গে ভক্তগণ চলিলেন এবং গোপীনাথ ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রসাদান্ন, আর প্রভুর ভৃত্য দ্বারা চারিখানি কৌপীন ও বহির্বাস সেই সঙ্গে লইলেন।

একটু গমন করিয়া প্রভু দাঁড়াইলেন; দাঁড়াইয়া সার্বভৌমকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। সার্বভৌম বলিলেন, "প্রভু আমার একটি নিবেদন আছে। গোদাবরী তীরে, বিদ্যানগরের অধিকারী শ্রীরামানন্দ রায় আছেন। সে দেশ গজপতি প্রতাপরুদ্রের অধিকারভুক্ত। সেই রামানন্দ রায় জাতিতে কায়স্থ ও বিষয়ীর কার্য করেন। আমরা ইচ্ছা যে, আপনি তাঁহাকে তাই বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। তাঁহাকে অবশ্য দর্শন দিবেন। তাঁহার ন্যায় ভক্ত ও রসজ্ঞ পৃথিবীতে আর নাই। তাঁহার কথা কিছু না বুঝিতে পারিয়া, বৃথা বিদ্যা মদে আমি চিরদিন তাঁহাকে উপহাস করিয়া আসিয়াছি। এখন আপনার কৃপাবলে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিয়াছি। অতএব তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন না।" প্রভু বলিলেন, "তাহাই হইবে।"

প্রভু সার্বভৌমকে আর সঙ্গে যাইতে দিলেন না। বলিলেন, তুমি গৃহে যাও, যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিও; আমি তোমার আশীর্বাদে ফিরিয়া আসিব।" ইহাই বলিয়া সার্বভৌমকে হৃদয়ে ধরিয়া অতি প্রেমে গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন; তারপর প্রভু চলিলেন। ভট্টাচার্য একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, ক্রমে কাঁপিতে লাগিলেন, শেষে "প্রভু!" বলিয়া মৃত্তিকায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আর ফিরিয়া চাহিলেন না, চলিতে লাগিলেন—তবে একটু আস্তে আস্তে। প্রভু কি বলিয়া ফিরিয়া চাহিবেন? কি দেখিবেন? আর, দেখিয়া সহিবেনই বা কিরূপে? কিন্তু ভক্তগণ অমনি সার্বভৌমকে ঘিরিয়া বসিয়া তাঁহাকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সার্বভৌম চেতন পাইলেন। তখন ভক্তগণ তাঁহাকে বুঝাইয়া লোক দ্বারা বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। সার্বভৌম বাণাহত মৃগের ন্যায় ধীরে ধীরে গৃহে যাইতে লাগিলেন। এদিকে ভক্তগণ প্রভুসহ মিলিত হইয়া সমুদ্রের ধারে ধারে আলালনাথে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রভু আলালনাথকে প্রণাম করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর সৌন্দর্য, হাবভাব, নৃত্য, বসন ও বয়স দেখিয়া চারিদিক হইতে লোকের সমাগম হইতে লাগিল এবং তাহারাও উন্মত্ত হইয়া গৃহ ভুলিয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এই মহা কলরবের মধ্যে প্রভুর ভিক্ষা সমাধান হওয়া দুর্ঘট হইল। তখন ভক্তগণ নিরুপায় হইয়া মন্দিরের কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন; এবং গোপীনাথ যে প্রসাদান্ন আনিয়াছিলেন তাহা প্রথমে নিতাই ও গৌরকে ভুঞ্জাইলেন, এবং অবশিষ্ট প্রসাদ আপনারা বাঁটিয়া খাইলেন। এদিকে লোকের ভিড় ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং সকলেই "প্রভু, একবার দর্শন দাও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। লোকের ভিড় এত হইল যে, ভক্তেরা দ্বার খুলিতে সাহস পাইলেন না। কিন্তু প্রভু লোকের আর্তি দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি দ্বার খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। ইহাতে সহস্র সহস্র লোক প্রভুকে দর্শন করিল, আর "জয় কৃষ্ণচৈতন্য", "জয় সচল জগন্নাথ" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

এ রহস্য যেন স্মরণ থাকে যে, প্রভু একজন সন্ন্যাসী মাত্র, অথচ দর্শনমাত্র লোকে তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া লইল। সারানিশি এইরূপ নৃত্যে ও হরিনামের কোলাহলে কাটিল। এই ব্যাপার দেখিয়া নিত্যানন্দ অন্যান্য ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমরা এখন প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য বুঝিলে ত? এইরূপ গ্রামে গ্রামে হইবে।"

প্রভাত হইল, সকলে প্রাতঃস্নান করিলেন। তখন প্রভু সঙ্গীদিগের নিকট বিদায় মাগিলেন। কেহ কোনো কথা বলিতে পারিলেন না। প্রভু সকলকে ধরিয়া ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন, আর একে একে সকলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পড়িয়াই

থাকিলেন; তাঁহারা যেরূপ সার্বভৌমকে ধরিয়া উঠাইয়াছিলেন, সেরূপ করিয়া তাঁহাদের আর কে উঠাইবে? তখন প্রভু কি করিলেন? যথা চরিতামৃতে—(মধ্যঃ ৭মঃ ৯৩) "বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হঞা।" আর তাঁহার পশ্চাতে ভৃত্য জলপাত্র ও বহির্বাস বহন করিয়া চলিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

"আমায় ধর নিতাই।। ধ্রু।।
আমার মন যেন আজ করেরে কেমন।
জীবকে হরিনাম বিলাতে, লাগল রে ঢেউ প্রেম-নদীতে,
সেই তরঙ্গে আমি এখন ভাসিয়া যাই।।
যে দুঃখ আমার অন্তরে, ব্যথিত কেবা কব কারে,
জীবের দুঃখে আমার হিয়া বিদরিয়া যায়।।"—শ্রীগৌরাঙ্গের উক্তি।।

শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যাকুল হৃদয়ে ভৃত্যের সহিত চলিলেন। ভক্তগণ পড়িয়া রহিলেন। এইরূপে সারা দিবস ও রজনী কাটিল। পর দিবস প্রভাতে তাঁহারা উঠিয়া রোদন করিতে করিতে ধীরে ধীরে নীলাচল অভিমুখে চলিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার প্রিয় জীবগণকে উদ্ধার করিতে চলিয়াছেন। ভক্তগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া, প্রভু একটু অগ্রবর্তী হইয়া দুই বাহু তুলিয়া, অতি মধুর নৃত্য ও অতি গম্ভীর স্বরে কীর্তন আরম্ভ করিলেন। যথা, প্রভুর শ্রীমুখের কীর্তন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম।।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।।

সেই সুমধুর কীর্তন শুনিয়া যেন ত্রিভুবন সুশীতল ও আশ্বাসিত হইতে লাগিল। প্রভুর বয়স তখন সবে পঞ্চবিংশতি, সর্বাঙ্গ মনোহর ও দেহ অতি দীর্ঘ। তাঁহার পরিধান কৌপীন ও বহির্বাস। দুই বাহু ঊর্ধ্বদিকে, তাহাতে জপের মালা; সেই মালা ভক্তিপূর্বক মস্তকোপরি ধরিয়াছেন, আর সুমধুর স্বরে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্" বলিয়া গাইতেছেন, ও পদ্ম-চক্ষু দিয়া অবিরত ধারা পড়িতেছে। প্রভু যাইতেছেন কেন, না পতিত জীবকে উদ্ধার করিতে। আমার বোধহয়, দেবগণ তখন অন্তরীক্ষে থাকিয়া প্রভুর অপরূপ শোভা দর্শন ও তাঁহার মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করিতেছিলেন।

প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নাই, কাহার সহিত কথাও নাই। ভৃত্যও নীরবে তাঁহার পশ্চাৎ যাইতেছেন। প্রভুর গতি-ভঙ্গ নাই, এক মনে চলিয়াছেন। হঠাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, পরে বসিলেন। কেন বসিলেন, তাহা একটু পরে বুঝা গেল। যেমন পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবামাত্র মধুকর আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ প্রভু বসিলে, দুই এক করিয়া ক্রমে বহু লোক আসিল এবং প্রভুকে দর্শন করিয়া "হরি" "হরি" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। একটু পরে প্রভু উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রেমের তরঙ্গ উঠিল। প্রভু তখন দুই-একজনকে আলিঙ্গন করিয়া আবার চলিলেন। কখন বা পথের লোক প্রভুর পশ্চাৎ চলিতেছে। প্রভু বলিলেন, "বল হরিবোল।" আর তাহারও "হরি হরি" বলিতে বলিতে চলিল। এইরূপে কতক দূর যাইতে যাইতে তাহাদের মধ্যে কাহারও মন নির্মল, হৃদয়ক্ষেত্র আর্দ্র ও কর্ষিত হইল, এবং সে প্রেমরূপ বীজ অঙ্কুরিত করিতে শক্তি পাইল। অমনি প্রভু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, ও

তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সে অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, আর প্রভু চলিয়া গেলেন। এই যে প্রভুকে লোকে একবার দর্শন করিল, কি দুই একজন তাঁহার আলিঙ্গন পাইল, তাহাতেই সে দেশ কিরূপে উদ্ধার হইল তাহা বলিতেছি। প্রভু দক্ষিণ-দেশে যে শক্তিতে ভক্তি-ধর্ম প্রচার করেন তাহা অননুভবনীয়। সেইরূপ শক্তির কথা কোথাও শুনা যায় না।*

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সমুদয় লোক শুধু যে "হরি" "কৃষ্ণ" বলিতে শিখিল ও বলিতে লাগিল, কিন্তু উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, তাহা নহে;—প্রভুর ধর্মের যে নিগূঢ়-তত্ত্ব, তাহা যাহার যতদূর অধিকার, তাহার মনে সেই মুহূর্তেই ততটা স্ফূর্তি হইল;—স্ফূর্তি হইল বলা ঠিক হইল না, "সেই সমুদয় তত্ত্বের বীজ রোপিত হইল।"

প্রভুর পার্ষদ ও লীলা-লেখক মহাজনগণের এই শক্তি-সঞ্চার-প্রক্রিয়া বর্ণনায় একটি বড়ো রহস্য অবগত হওয়া যায়। সেটী এই যে, প্রভু যেন প্রক্রিয়াটি বেশ বুঝিতেন ও জানিতেন। যেমন 'কর্দম' কুম্ভকারের নিকট, সেইরূপ 'কোনো জীব' (যাঁহাকে প্রভু কৃপা করিবেন) তাঁহার নিকট। প্রভু কাহাকে স্পর্শ করিলেন, কাহাকে বা করিলেন না,—কেবল বলিলেন, "হরি বল"। ফল কিন্তু একই হইল, উভয়েই 'হরি' বলিয়া উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। কেন একজনকে শ্রীমুখের বাক্য দ্বারা, এবং অপরকে স্পর্শ করিয়া শক্তি-সঞ্চার করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। যদি বল, প্রভু বিচার করিয়া কোনো বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতেন না, যখন যে পদ্ধতিই অবলম্বন করুন না কেন, ফল একই হইত। কিন্তু প্রভুর লীলা চিন্তা করিয়া আমাদের তাহা বোধ হয় না। ইহার যে একটি শাস্ত্র আছে তাহার সন্দেহ নাই; সাধুগণ উহার নিয়ম কিছু কিছু জানেন, কিন্তু প্রভু ছিলেন ইহার অধ্যাপক।

এইরূপে প্রভু প্রথমে একজনকে শক্তি-সঞ্চার করিলেন, কিন্তু তখন তাহাতে কোন তত্ত্ব স্ফুরিত হইল না। কেবল যন্ত্রের ন্যায় বিবশ হইয়া সে মুখে হরি বলিতে ও নৃত্য করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার দেহে নানাবিধ ভাব প্রকাশ পাইল,—নয়ন দিয়া জল ও মুখ হইতে লালা পড়িতে ও তাহার ঘর্ম হইতে লাগিল। এ পরিশ্রমের ঘর্ম নয়,—এ ঘর্ম অন্যরূপ। তারপর মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা হইয়া তাহার হৃদয় নূতন আকার ধারণ করিল। প্রায় জীবমাত্রেরই হৃদয়—সুবর্ণখনির এক খণ্ড মৃত্তিকার ন্যায়। মৃত্তিকা হইতে সুবর্ণ উদ্ধার করিতে হইলে নানাবিধ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। প্রভু যাহাকে শক্তিসঞ্চার করিলেন, তাঁহার হৃদয়ে সেই সমুদয় প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল। ক্রমে হৃদয় দ্রব হইল, আর তাহার মধ্যস্থিত সাধুভাব মলিন আবরণ হইতে পৃথক হইতে লাগিল। যেমন সুবর্ণ দ্রবীভূত হইলে, উহা ছাঁচে ঢালা হয়; সেইরূপ যখন হৃদয় দ্রবীভূত হইল, তখন প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন দিলেন। সে ব্যক্তি পূর্বে একজন সামান্য জীব ছিল, এখন প্রভুর আলিঙ্গন-রূপ ছাঁচে পড়িয়া ব্রজের একজন হইল। এখন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে উপরে যে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই চরণটি বিচার করুন, যথা—"কতক্ষণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গয়ে।" এখানে "কতক্ষণ রহি" এই কয়েকটি কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার অর্থ এই যে, যে পর্যন্ত হৃদয় সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত না হয়, ততক্ষণ প্রভু অপেক্ষা করেন। স্বর্ণকার স্বর্ণ উত্তাপে দিয়া "কতক্ষণ" বসিয়া থাকে; কেননা সুবর্ণ দ্রবীভূত হইতে সময় লাগে। ইহাও সেইরূপ।

একটু পূর্বে বলিলাম যে, প্রভুর আলিঙ্গন পাইয়া কৃপা-পাত্র শুধু যে ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইল তাহা নহে, বৈষ্ণবধর্মের সমুদয় নিগূঢ়-তত্ত্ব তাহার হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে স্ফুরিত হইল;

* শ্রীচরিতামৃত এই অচিন্ত্যনীয় শক্তির এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন, যথা—

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি। লোক দেখি পথে কহে—বল হরি হরি।। ৯৭
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ। প্রভুর পাছে পাছে যায়—দর্শনে সতৃষ্ণ।।

অর্থাৎ প্রভু আলিঙ্গন দিয়া তাহার হৃদয়ে এই নিগূঢ় তত্ত্বের বীজ রোপণ করিলেন। প্রভু চলিয়া গেলে, সেই বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হইতে লাগিল। তবে সকলের হৃদয়ে সমান স্ফুরিত হয় না, যেহেতু ক্ষেত্র অর্থাৎ অধিকার সকলের সমান নহে। মনে ভাবুন, কোনো নিবিড় জঙ্গলে, (যেখানে আম্র-বৃক্ষ নাই) এক ব্যক্তি একটু স্থান পবিষ্কার, কর্ষণ ও জল সেচন করিয়া সেখানে একটী আম্র-বীজ রোপণ করিল ও ঘিরিয়া দিয়া চলিয়া গেল। ত্রিশ বৎসর পরে সেই ব্যক্তি আবার সেখানে আসিয়া দেখিল যে, সেখানে অনেকগুলি বৃক্ষ হইয়াছে, সেগুলি ঠিক আম্রবৃক্ষের মতো, আর তাহাতে যে ফল হইতেছে তাহাও ঠিক আম্রের মত,—সেই আস্বাদ, সেই গন্ধ ও সেই আকার। এই শক্তিসঞ্চার প্রক্রিয়া, বিশেষ বিশেষ ঘটনা লইয়া পরে আরো বিচার করিতে হইবে। তখন বুঝা যাইবে যে, শ্রীভগবান মনুষ্য সৃষ্টি করিতে কত কারিগরিই করিয়াছেন ও তাহাদিগকে কত প্রকার শক্তিই দিয়াছেন।

প্রভু কখন ধীরে, কখন বিদ্যুদ্‌বেগে চলিয়াছেন। যখন দ্রুত যাইতেছেন, তখন ভৃত্য সমভাবে যাইতে পারিতেছেন না, তবু কোন গতিকে প্রভুকে নয়নের অন্তরাল হইতে দিতেছেন না। যখন প্রভু কোন নগরে কি গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন, তখন ভারে ভারে উপহার আসিতেছে, ভৃত্য প্রয়োজন মত লইতেছেন, অবশিষ্ট ফিরাইয়া দিতেছেন। যখন জনপদ দিয়া যাইতেছেন, তখন আহারীয় দ্রব্য কোন না কোন প্রকারে মিলিতেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে নিবিড় অরণ্য,—১০।১৫ দিনের মধ্যে কিছুই পাওয়া যাইবে না। ভৃত্য এই সংবাদ জানিয়া কিছু আহারীয় সংগ্রহ করিলেন, কিছুদিন পরে আহারীয় দ্রব্য ফুরাইয়া গেল, কাজেই ভৃত্য প্রভুকে ভিক্ষা দিতে পারিলেন না। সারাদিন উপবাসে গেল, রজনী আসিল। নিবিড় জঙ্গল, আর অগ্রসর হইবার যো নাই। প্রভু সেই অন্ধকারে বৃক্ষতলে বসিলেন। ভৃত্যও প্রভুর পদতলে বসিলেন। প্রভু তখন বৃক্ষ হেলান দিয়া বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরহে—কখন নীরবে, কখন উচ্চৈঃস্বরে—রোদন করিতে লাগিলেন।

ভৃত্য নিজে উপবাসী তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু প্রভু উপবাসী থাকায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। একে এই দুঃখ, তারপর প্রভুর করুণস্বরে রোদন। ভৃত্য প্রভুর পদতলে, দুই জানুর মধ্যে মাথা রাখিয়া বসিয়া রহিলেন। প্রভুর নিদ্রা বা ক্ষুধা-বোধ, কি অন্য কোনও দুঃখ নাই, একমাত্র দুঃখ—শ্রীকৃষ্ণ বিরহ! এমন সময় হিংস্র পশুগণ গর্জন করিয়া উঠিল। প্রভু উহা শুনিলেন কিনা ভৃত্য জানিতেও পারিলেন না, তবে ভৃত্য ভয় পাইয়া প্রভুর পদতলের আরো নিকটে আসিলেন। এমন সময় এক ব্যাঘ্র সম্মুখে আসিল। ভৃত্য বড় ভয়ো পাইলেন। ব্যাঘ্র তাহাদিগকে খানিক দেখিয়া চলিয়া গেল। এইরূপে হিংস্র জন্তুর সহিত মুহুর্মুহুঃ দেখা হইতে লাগিল, কিন্তু প্রভুকে দর্শন মাত্র তাহারা পশুভাব হারাইয়া অতি নম্র হইয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল, কখন বা সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর পর্য্যন্ত চলিল।

কতক্ষণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া। বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া।।
সেই জন নিজ গ্রামে করিয়া গমন। কৃষ্ণ বলি হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ।।
যারে দেখে তারে বলে,—কহ কৃষ্ণ নাম। এই মত বৈষ্ণব করিল সব গ্রাম।।
গ্রামান্তর হৈতে দেখিতে আইসে যত জন। তাঁর দর্শন-কৃপায় হয় তাঁহারি মতন।।
সেই যাই নিজ গ্রামে বৈষ্ণব করয়। অন্য গ্রামী আসি তারে দেখি বৈষ্ণব হয়।।
সেই যাই অন্য গ্রামে করে উপদেশ। এই মত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ।।
এই মত পথে যাইতে শত শত জন। বৈষ্ণব করেন সবে করি আলিঙ্গন।।
যে গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে। সেই গ্রামে লোক তথা আইসে দেখিবারে।।
প্রভুর কৃপায় হয় তারা মহাভাগবত। সে সব আচার্য্য হঞা তারিলা জগৎ।।
এই মত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে। সর্বলোক বৈষ্ণব হৈলা প্রভুর সম্বন্ধে।।

শচীর দুলাল নিমাই এখন উপবাসী রহিতে লাগিলেন। তিনি ভক্তভাব অবলম্বন করিয়া দুঃখ ও সুখ আস্বাদ করিতে লাগিলেন। ভক্তের সময় সময় উপবাসী থাকিতে হয়, তাঁহারও থাকিতে হইল। তাঁহার নিজের বেলা উপাদেয় সেবা, আর ভক্তের বেলা উপবাস,—এরূপ বিচার তিনি কখনও করিতে পারেন না। জীব উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভু কাঙ্গাল বেশ ধরিলেন, বৃক্ষতলবাসী হইলেন, সুতরাং উপবাস করিবেন তাহার আর বিচিত্র কি ? কিন্তু সেই শচীর স্তনদুগ্ধে প্রতিপালিত এবং নবদ্বীপবাসীর আদরে বর্দ্ধিত, ভুবনমোহন "বরতনু" ক্রমে দুর্বল হইতে লাগিল। প্রভুর সুন্দর, সুবলিত, প্রকাণ্ড ও রোগশূন্য দেহ হঠাৎ দুর্বল হইবার কথা নয়। যতদিবস তাঁহার শরীরের দৌর্বল্য স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় নাই, ততদিন তাঁহার কাঙ্গাল বেশ অন্যের নিকট তত ক্লেশকর বোধ হয় নাই। কিন্তু প্রভু স্বইচ্ছায় স্বভাবের নিয়মের অধীনে আসিয়াছেন। সেই ভীষণ রৌদ্রের সময়, সেই উষ্ণ-প্রধান দেশে, অনবরত পথ হাঁটিয়া চলিয়াছেন। কৃষ্ণ-বিরহ-রূপ "মহাজ্বর" তাঁহার হৃদয় ক্ষয় করিতেছে, আর উদরাগ্নি ও উপবাস তাঁহার সর্বতনু ক্ষয় করিতেছে,—সেখানে যে তিনি ক্রমে দুর্বল হইবেন, তাহার বিচিত্র কি?

প্রভুর সর্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত; তবে নয়ন-জলের স্রোত শরীরের যে অংশ বহিয়া পড়িতেছে, সে স্থান ধৌত হওয়াতে, দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য জ্বলজ্বল করিতেছে। প্রভুর পরিধান কৌপিন ও বহির্বাস, তাহা আবার অতি মলিন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত কটিদেশে কেবল অতি ক্ষুদ্র একখণ্ড বস্ত্র এই মাত্র। প্রভুর মুখে শ্মশ্রুর আবির্ভাব হইয়াছে। কাটোয়ায় কেশ মুণ্ডন করেন, আবার কেশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। কটিদেশে একগাছি দড়ি দ্বারা বেষ্টিত, উহাতে কৌপীন আবদ্ধ। দুই হস্ত উচ্চ করিয়া প্রভু মালা জপিতেছেন, আর উচ্চৈঃস্বরে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া ডাকিতেছেন।

প্রভুর সেই বিশাল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্রমে অস্থি দর্শন দিল। প্রভুকে দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন ভক্তিদেবী পুরুষ বেশ ধরিয়া বেড়াইতেছেন। আর ইহাও বোধ হইতে লাগিল যে, ইহা দেখা অপেক্ষা মৃত্যু শত গুণে ভাল।

প্রভুর গার্হস্থ্য সুখ দেখিয়া নবদ্বীপের ষণ্ডাগণ তাঁহাকে প্রহার করিতে চাহিয়াছিল। এখন যদি তাহারা তাঁহাকে দেখিত, তবে কান্দিয়া আকুল হইত; আর বলিত, "হে সুন্দর! আমরা ভাল হইব, শ্রীহরিকে ভজনা করিব, আর তাঁহাকে ভুলিব না, তুমি যাহা বল তাহাই করিব। তুমি এ বেশ, এ ভাব ত্যাগ করো, আমরা আর সহিতে পারিতেছি না। এইরূপে প্রভুর অননুভবনীয় ক্লেশ জীব-উদ্ধারের কারণ হইল।

প্রভুকে দর্শন করিয়া বালকগণ তাঁহার পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। এক রাখাল অন্যকে ডাকিয়া বলিতেছে, "ওরে পাগল দেখে যা। এ হরিনামের পাগল, হরিনাম বলিলেই খেপিয়া উঠে।" এ কথা শুনিয়া রাখালগণ জুটিয়া গেল। তখন সেই রাখাল বলিতেছে, "দেখ, এমনি বেশ যাইতেছে, কিন্তু হরিনাম শুনিলেই খেপিয়া উঠিবে। আয় আমরা পাগল খেপাই।" ইহাই বলিয়া সকলে হরিবোল বলিয়া চীৎকার করিতে ও করতালি দিতে লাগিল। প্রভু দ্রুত যাইতেছিলেন, হরিবোল শুনিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর মুখ ফিরাইলেন। সেই রাখাল তখন বলিতেছে, "দেখ্‌লি ত? ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, আরো হরি বল। এই খ্যাপে আর কি?" রাখালগণ আরো উৎসাহের সহিত হরি বলিতে লাগিল। তখন প্রভু বসিয়া পড়িলেন; বসিয়া গাত্রে ধূলা মাখিলেন। রাখালগণ যতই হরি বলে, প্রভু তাহাদের দিকে চাহিয়া আহ্লাদে হাসিয়া গাত্রে ততই ধূলা মাখেন। সেই রাখাল বলিতেছে, "ঐ দেখ খেপিয়াছে।" কিন্তু রহস্য এই যে, প্রভু খেপুন আর নাই খেপুন, রাখালগণ প্রকৃতই খেপিল, তাহাদের মুখে চিরদিনের জন্য হরিনাম লাগিয়া গেল।

প্রভু চলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মহিমা অগ্রে অগ্রে যাইতেছে। সে মহিমা এই যে,—শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া জীবগণকে হরিনাম বিলাইতে আসিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়; প্রভু যে শ্রীভগবান্, তাহা সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। কিছুদিন পরে প্রভু কূর্মস্থানে উপস্থিত হইয়া বহু নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন। যথা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—
"কর্ম দেখি কৈল তারে স্তবন প্রণামে।।১১৩

প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্য গীত কৈল। দেখি সর্বলোক চিত্তে চমৎকার হৈল।।
আশ্চর্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবার। প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈলা চমৎকার।।
দর্শনে বৈষ্ণব হৈল বোলে কৃষ্ণ হরি। প্রেমাবেশে নাচে সবে ঊর্ধ্ববাহু করি।।
কৃষ্ণনাম লোক-মুখে শুনি অবিরাম। সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম।।
এই মত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈলো। কৃষ্ণনামামৃত বন্যায় দেশ ভাসাইলা।
কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা। কূর্মের সেবক বহু সম্মান করিলা।।

পর দিবস প্রাতে প্রভু সে স্থান ত্যাগ করিলেন। লোক সকল তাঁহার পশ্চাৎ চলিল, কিন্তু প্রভু তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া গৃহে পাঠাইলেন ও বলিলেন, "ঘরে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করো।" প্রভু এক ক্রোশ পথ গমন করিলে, সেই কূর্ম-স্থানে বাসুদেব নামক একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পরম ভক্ত, কিন্তু কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত। তাহাতে তাঁহার দুঃখ নাই, কারণ শ্রীভগবানে তাঁহার গাঢ়-ভক্তি। বাসুদেবের সর্বাঙ্গ ক্ষত হইয়া তাহাতে কীড়া হইয়াছে। সকলে ভাবে, ঐ কীড়া তাঁহাকে বড়ো দুঃখ দিতেছে। কিন্তু বাসুদেব ভাবেন যে, তাঁহার দেহ একেবারে জগতের ত্যাজ্য-সামগ্রী নহে, যেহেতু উহা সেই ক্রীড়া গুলিকে আহার দিতেছে, কাজেই যদি অঙ্গের ক্ষতস্থান হইতে কোনো কীড়া মৃত্তিকায় পড়িয়া যায়, তবে সে দুঃখ পাইবে বলিয়া উহা আবার সেই স্থানে যত্নপূর্বক রাখিয়া দেন। যেমন মাতা পুত্রগণকে স্তন পান করাইয়া থাকেন, বাসুদেব সেইরূপ কীড়াগণকে আপন অঙ্গ দিয়া পালন করেন। তাহাব আর এক বিশেষ কারণ এই যে, কীড়াগুলি ব্যতীত তাঁহার নিজ-জন আর কেহ ছিল না। তাঁহার অঙ্গের দুর্গন্ধে কেহ তাঁহার নিকটে আসিতে পারিত না। সুতরাং ঐ কীটগুলি তাঁহার একমাত্র সঙ্গী তাই তাহাদিগকে নিজ-জন ভাবিয়া যত্ন করিয়া পালন করিতেন। বাসুদেব রজনীতে শুনিলেন যে, শ্রীভগবান্ সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া নগবে নগরে হরিনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। এই কথা শুনিয়া তিনি তখন সন্ন্যাসীরূপী শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে চলিলেন। কিন্তু চলৎশক্তি নাই, তাই আস্তে আস্তে, কখন বসিয়া, কখন উঠিয়া, কখন জানু গতিতে, অর্থাৎ যেরূপে পারেন, কুর্মস্থানে যাইতে লাগিলেন। শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, সুতরাং অঙ্গে একটু বলও হইয়াছে, আর সেই বলে প্রকৃতই কূর্ম-স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন। যাইয়াই শুনিলেন যে, প্রভু একটু পূর্বেই চলিয়া গিয়াছেন। বাসুদেব বড়ো আশা করিয়া গিয়াছিলেন, সে আশা ভঙ্গ হওয়ায় সামলাইতে পারিলেন না,—"হা,—ভগবান্! তোমাকে দেখিতে পাইলাম না।" বলিয়া মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

যখন প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেন, তখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া, "হা হরি! শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন দাও" বলিয়া রোদন করিতে থাকিলে প্রভুর "গতি-ভঙ্গ" হয়, এখনও তাহাই হইল। "হা ভগবান্! আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম না" বলিয়া যেইমাত্র বাসুদেব মূৰ্চ্ছিত হইলেন, তৎক্ষণাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের "গতি-ভঙ্গ" হইল, প্রভু আর চলিতে পারিলেন না,—দাঁড়াইলেন, আর যেন কান পাতিয়া কি শুনিতে লাগিলেন। তখনই "এই যে আইলাম" অর্দ্ধস্ফুট-বাক্যে ইহাই বলিয়া কূর্মস্থানের দিকে ফিরিয়া দৌড়িলেন। প্রভু তখন বাসুদেব হইতে এক ক্রোশ দূরে। এই এক ক্রোশ মুহূর্তের মধ্যে অতিক্রম করিলেন, ভৃত্য তাঁহার পশ্চাৎ আসিতে পারিলেন না। তাঁহার পরে—

"কুষ্ঠী বিপ্র পাশ গেলা প্রভু গৌরচন্দ্র। চিরকালে পাইল যেন অতিশয় বন্ধু।।
দীর্ঘ দুই ভুজ প্রকাশিয়া দামোদর। গাঢ়তর আলিঙ্গন কৈল ব্রাহ্মণেরে।।
রক্ত রসা কৃমি দেখি ঘৃণা না করিল।।"

প্রভু বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়া বাসুদেবকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাহাতে কি হইল? যথা, চৈতন্যচরিতের ১২শ সর্গে—

অগত্যা দোর্ভ্যাং পরিরভ্য বিপ্রং কুষ্ঠৈঃ সমং মোহমপাচকার।
সচেতনাং চারুতরাং তনুঞ্চ প্রাপ্যানমত্তং ধৃতহর্ষশোকঃ।।১১১।।

গৌরাঙ্গদেব আসিয়াই বিপ্রকে দুই বাহু দ্বারা অলিঙ্গন করিয়া কুষ্ঠরোগের সহিত তাঁহার মোহকে বিনষ্ট করিলেন! শ্রীপ্রভুর অলিঙ্গন পাইয়া বাসুদেব চেতন প্রাপ্ত হইলেন ও দেখেন যে, তাঁহার অঙ্গ সুবর্ণের ন্যায় হইয়াছে, কুষ্ঠরোগের চিহ্নমাত্র নাই! তখন তিনি প্রভুকে প্রণাম করিয়া আবেগভরে কহিলেন, "হে দয়াময়! এ কি করিলে? জগতের জীবমাত্রই ঘৃণা করিয়া আমার নিকট আইসে না। আর তুমি,—সেই লক্ষ্মীর আবাস স্থান,—আমাকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলে! এ কেবল তুমিই পার, জীবের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়; কারণ উত্তম ও অধম সকলেই তোমার সমান প্রিয়।" আবার বলিতেছেন, "প্রভু! আমার সুখ হইতেছে না। অস্পৃশ্য ছিলাম বলিয়া আমার মনে অভিমান আসিতে পারিত না, তাই তোমাকে পাইলাম। এই দেহ তুমি কৃপা করিয়া সুন্দর করিলে। এখন আমার ভয় হইতেছে, আর সে দীনতা থাকিবে না। অভিমান সৃষ্টি হইলে, পাছে আমি তোমাকে হারাই।" যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"মোরে দেখি গন্ধে পলায় পামর। হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।।
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া। এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া।।"

এই কথা শুনিয়া প্রভুর হৃদয় দ্রব হইল, নয়ন ও চন্দ্রবদন জলে ভাসিয়া গেল। প্রভু ভাবিতে লাগিলেন যে, বাসুদেব তাঁহাকে পরাজয় করিল। তখন প্রভু বলিলেন, "তোমার ন্যায় ভক্তের যদি অহঙ্কার হয়, তাহা হইলে জীবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিবে কেন? আমি বলিতেছি, তোমার অভিমান হইবে না; তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর, আর জীবগণকে ভক্তিধর্ম শিক্ষা দিয়া উদ্ধার কর।"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে এই সম্বন্ধে নিম্নের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম; যথা, বাসুদেব বলিতেছেন—

"কোথা আমি দরিদ্র পরম পাপী জন। কোথা কৃষ্ণ ভগবান্ লক্ষ্মী-নিকেতন।।
নিন্দিত ব্রাহ্মণ মোরে ঘৃণা না করিলা। বাহু পসারিয়া মোরে আলিঙ্গন কৈলা।।
এই শ্লোক বিপ্রবর যখন পড়িল। সেইক্ষণে আর এক অদ্ভুত দেখিল।।"
রক্ত রসা কৃমি কুষ্ঠ সব কোথা গেল। প্রকৃত সুন্দর দেহ অতি দীপ্ত হৈল।।
দেখি ইহা বাসুদেব কহিল প্রভুরে। "এমন সুন্দর কেন করিলে আমারে।।
তুমি ত ঈশ্বর পার সকল করিতে। কিন্তু আমি ব্যাধি হঞা ছিনু সুস্থ চিতে।।
নিরুদ্বেগে সুখে ছিনু স্থির ছিল মনা। নিরন্তর স্মৃতি ছিল গোবিন্দ-চরণ।।
সম্প্রতি সুন্দর কৈলে ভজিতে না পাব। বিষয়ে আসক্ত মন নানা দিকে যাব।।
কৃষ্ণ-সুখ ছাড়াইয়া ইন্দ্রিয়-সুখ দিলে। ব্যাধি ঘুচাইয়া কেন এমন করিলে?
তখন প্রভু গদগদ চিত্তে উত্তর করিলেন ঃ—
তা শুনিয়া সদ্রব হৈল প্রভুর মন। কহিতে লাগিলা—"তুমি শুনহ ব্রাহ্মণ।
পুনর্বার তোমার গোবিন্দ-স্মৃতি বিনা। না হবে ব্যাপার বাহ্যে মনে দুর্বাসনা।।
অতএব মনে কিছু উদ্বেগ না কর। ভক্তি সুখ আস্বাদন কর নিরন্তর।।

প্রভুর কথা শুনিয়া বাসুদেব উত্তর করিবার অবসর পাইলেন না; কারণ কথাগুলি বলিয়াই প্রভু অন্তর্ধান করিলেন। বাসুদেবের তাহাতে বিশেষ দুঃখ হইল না। কারণ প্রভু যেমন তাঁহার জড়চক্ষু হইতে অন্তর হইলেন, অমনি অভ্যন্তরের চির-নয়নে উদয় হইয়া তাঁহাকে আনন্দ দিতে লাগিলেন।

এখানে কথা উঠিতে পারে যে, প্রভু যখন বাসুদেবকে দেহরোগ ও ভবরোগ হইতে উদ্ধার করিলেন, তখন তাঁহাকে ফেলিয়া না গিয়া, একটু অপেক্ষা করিলেই পারিতেন; কারণ তাহা হইলে তাঁহার দুই ক্রোশ পথ চলিবার শ্রম লইতে হইত না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবানে ও জীবমাত্রে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ, পরস্পর পরস্পরকে অনবরত আকর্ষণ করিতেছেন। যখন সেই আকর্ষণ পূর্ণমাত্রায় হয়, তখনি জীব ও ভগবানে মিলন হয়। বাসুদেবের একটু বাকী ছিল, কূর্মস্থানে আসিয়া প্রভুকে না পাইয়া সেইটুকু পূরণ হইল, আর অমনি শ্রীভগবানের দর্শন পাইলেন। মহারাসের রজনীতে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া বহু রোদন করিতে করিতে যখন তাঁহাদের বিরহ অসহনীয় হইল, তখনি শ্রীভগবানের দর্শন পাইলেন।

প্রভুর কি নাম, কোথায় তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইত্যাদি কূর্মস্থানের লোকেরা জানিতে পারিয়াছিলেন কি না তাহা ঠিক জানি না। তবে, দক্ষিণ দেশে অনেক স্থানে তাঁহার পরিচয় কেহ যে পান নাই, তাহা জানি। কূর্মস্থানের লোকেরা, যাহা হউক, প্রভুকে একটি নাম দিয়াছিল, সে নামটি "বাসুদেবামৃত পদ।"

তাহার পরে প্রভু জিয়ড-নৃসিংহের স্থানে আসিলেন। এই ঠাকুর প্রহ্লাদ কর্তৃক স্থাপিত, সেই কথা মনে করিয়া প্রভু অকথ্য-প্রেম প্রকাশ করিলেন। প্রভু সেখানে এক রাত্রি থাকিয়া প্রভাতে আবার চলিলেন। ক্রমে গোদাবরী-তীরে আসিলেন। এই স্থান জঙ্গলে পূর্ণ। সেই বন দেখিয়া প্রভুর বৃন্দাবনের কথা মনে পড়িল, ক্রমে গোদাবরীকে যমুনা ভ্রম হইতে লাগিল, প্রভু আনন্দে ডগমগ হইয়া চলিলেন। কবি-কর্ণপুর তাঁহার চৈতন্য-চরিতের ১২শ সর্গে গোদাবরী দর্শনে প্রভুর মনোভাব সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"গোদাবরীতুঙ্গতরঙ্গশীতৈর্মরুদ্ভিরাশ্লিষ্টলতাসমূহৈঃ।
ইতস্ততো ভূরি সমেতমন্তর্বনং বিলোক্যৈষ ননন্দ নাথ।।১২২।।
কদম্ববীর্থীষু নদন্মৃদঙ্গৈঃ সমুল্লসত্তাণ্ডবসৎকলাপৈঃ।
বিশ্রদ্ধমুগ্ধৈর্মৃগযুগৈঃ কৃপালুর্ননন্দ ভূয়োহরিণৈঃ সকান্তৈঃ ।।১২৩।।
নিষ্কূজশান্তাঃ ক্ব চ চণ্ডশব্দপ্রতিধ্বনিগ্রস্তদিশঃ ক্বচাপি।
ক্ব চ প্রসুপ্তোরুকরালসত্ত্বশ্বাসাগ্নিতীপ্তা বনভূমিভ্যাগাঃ।।১২৪।।
গোদাবরীবেগমহানিনাদা ভীমা গিরিপ্রস্রবণা রবেণ।
শ্রীগৌরচন্দ্রস্য বিতেনুরুচ্চৈঃ সুকোমলং চিত্তমনাপ্তধৈর্য্যং।।১২৫।।
ক্ষণাৎ স্খলৎপাদবিকম্প্রপক্ষৈশ্চঞ্চূপতদ্বীজচয়ৈঃ প্রপূর্ণৈঃ।
শুকৈর্দলদ্দাড়িম্বচুম্ববদ্ভির্গোদাবরীতীরবনে স রেমে।।১২৬।।
তাম্বূলবল্লীদলবৃন্দমূচৈর্ভিন্দদ্ভিরুগ্রৈঃ ক্রকচৈরসদ্ভিঃ।
অজস্রদীর্ঘেণ বিমুগ্ধঝিল্লীঝঙ্কাররাবেণ নিকামরম্যে।।১২৭।।
জ্যোতির্গণাচুম্বিভিরম্বুদাভৈস্তমালমালার্জ্জনকোবিদারৈঃ।
নানাবিধৈঃ পত্ররথৈরসদ্ভিশ্চমূরবৃন্দৈশ্চমরৈশ্চ জুষ্টৈঃ।।১২৮।।
অর্কপ্রভাপর্কবিহীনসান্দ্রস্নিগ্ধাতিসচ্ছীতলচারুভূমৌ।
অকৃত্রিমালেপনিপীতমূলে বাপীতড়াগাদিনিরন্তরালে।।১২৯।।

অর্থাৎ, "তৎপরে গোদাবরীর উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালায় সুশীতল বায়ু কর্তৃক আলিঙ্গিত লতাসমূহ দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চারিত কাননের মধ্যভাগ সন্দর্শন করিয়া গৌরচন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন।।১২২।।"

"তৎপরে কদম্ববীথীতে শব্দিত মৃদঙ্গ এবং তৎশ্রবণে মেঘ আশঙ্কায় সমুল্লাসযুক্ত, ময়ূরনৃত্য ও উত্তোলিত পুচ্ছ, তথা বিশ্বস্তভাবে উর্দ্ধনয়ন হরিণীগণের সহিত হরিণগণ অবলোকন করিয়া গৌরচন্দ্র পুনর্বার অতিশয় আনন্দিত হইলেন।।১২৩।।"

"যে অরণ্যের ভূভাগ সকল কোন স্থানে পশুপক্ষ্যাদির শব্দ শূন্য হওয়ায় শান্ত, কোন স্থানে প্রচণ্ড শব্দের প্রতিধ্বনিতে দিক সকল গ্রস্থপ্রায় এবং কোথাও বা প্রসুপ্ত অতি ভয়ানক জন্তুসকলের নিশ্বাসরূপ অগ্নি দ্বারা বনভূভাগ সুদীপ্ত, তথা গোদাবরীর জলবেগের মহানিনাদ ও ভয়ানক গিরিপ্রস্রবন শ্রীগৌরচন্দ্রের সুকোমল চিত্তকে ধৈর্যশূন্য করিতে লাগিল।।১২৪-১২৫।।"

"যাহার উপরে ক্ষণে ক্ষণে পাদস্খলন হয়, অর্থাৎ পা পিছলিয়া যায়, তাদৃশ মনোহর পক্ষিগণের পক্ষ ও চঞ্চূ-পতিত বীজসমূহ দ্বারা, তথা বিদারিত দাড়িমফলে চুম্বনকারী ও তাম্বূল লতার উৎকৃষ্ট দল সকলকে সশব্দে খণ্ড খণ্ড করিতেছে, সুতরাং শব্দায়মান তীক্ষ্ণকরপত্র অর্থাৎ করাত-সদৃশ চঞ্চূশালী শুকপক্ষিগণে পরিব্যাপ্ত এবং বিমুগ্ধ ঝিল্লী (ঝিঁঝিঁপোকা) সমূহের নিয়ত সুদীর্ঘ ঝঙ্কার রবে যাহা অতিশয় রমণীয়, তথা নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণস্পর্শী অর্থাৎ সমধিক সমুন্নত অম্বুদসদৃশ তমালশ্রেণী, অর্জুনবৃক্ষ, কোবিদার (রক্তকাঞ্চন), তথা নানাবিধ শব্দায়মান পক্ষিগণ, চমুর (মৃগ) ও চমর-নামক পশুগণে যাহা সেবিত এবং প্রভাকরের প্রভাবিহীন, সুতরাং নিবিড় ও সুস্নিগ্ধ যাহারা সুচারু ভূভাগ সুশীতল তথা নৈসর্গিক লেপন-ক্রিয়ায় যাহার মূলদেশ পরিষ্কৃত ও দীঘিকা তড়াগাদি দ্বারা যাহা নিয়ত ঘন সন্নিবেষ্টি অর্থাৎ আচ্ছন্ন, তাদৃশ গোদাবরী নদীর তীরস্থ বনমধ্যে গৌরচন্দ্রের মন অতীব পরিতৃপ্তি লাভ করিল।।১২৬-১২৯।।

প্রভু গোদাবরী পার হইয়া ওপারের ঘাটে স্নান করিলেন। তৎপরে ঘাটের একটু দূরে বসিয়া মালাজপ করিতে করিতে রামানন্দ রায়কে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই রামানন্দ রায়ের কথা সার্বভৌম বলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে "প্রভু, বিষয়ী বলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা না করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন।" তাই প্রভু সেখানে গিয়াছেন, এবং ঘাটে বসিয়া রামানন্দ রায়কে অপেক্ষা করিতেছেন। রামানন্দ রায় কায়স্থ, উৎকল নিবাসী, বিদ্যানগরের অধিপতি। বিদ্যানগর প্রত্যাপরুদ্র গজপতির সাম্রাজ্যের অধীন; রামানন্দ উহার অধিকারী, অর্থাৎ প্রতাপরুদ্রের নামে সেই দেশ শাসন করেন। সুতরাং তাঁহার সমুদয় বিষয়কার্য করিতে হয়, কিন্তু তবু তিনি বিষয় হইতে নির্লিপ্ত। যাঁহারা বিষয়কে তুচ্ছ করিয়া শ্রীভগবান-ভজনের নিমিত্ত বনে গমন করেন, তাঁহারা অবশ্য মহাপুরুষ এ মহা-শক্তিধর। কিন্তু যাঁহারা বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া বিষয়ের সহিত খেলা করেন ও উহা হইতে অন্তরে থাকিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহারা আরো শক্তিধর। রামানন্দ রায় সেই প্রকৃতির লোক। তিনি ভৃত্য দ্বারা পরিবেষ্টিত, উত্তম শয্যায় শয়ন করেন, আর যথাযোগ্য সমুদয় বিষয় তোগ করেন, তবুও হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে দিবানিশি টলমল করিতেছে। রামানন্দ রায় ইহার পূর্বে "জগন্নাথবল্লভ নাটক" লিখিয়াছিলেন এবং গজপতি মহারাজকে উৎসর্গ করেন। এই নাটকের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা শ্রীমতী রাধা। নাটকখানি মধু হইতে মধু, পাঠকগণ কৃপা করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। ইহা এখন অনুবাদ সহিত ছাপা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত রামানন্দ একাকী ছিলেন। তিনি যে রস-ভোগ করিতেন, তাহা ভোগ করিবার আর সঙ্গী ছিল না। কাজেই সার্বভৌম তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বিদ্রুপ করিতেন।

প্রভু ঘাটের একটু দূরে বসিয়া রামানন্দ রায়কে আকর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। তাঁহার হঠাৎ গোদাবরীতে স্নান করিবার ইচ্ছা হইল, তাই আসিলেন। তিনি স্নান করিতে যাইবেন, কাজেই সে এক বৃহৎ ব্যাপার হইল,—সঙ্গে বহুতর বৈদিক-ব্রাহ্মণ, বহুতর ভৃত্য, সৈন্য, হস্তি, ঘোড়া চলিল; আর নানাবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল। এই সাজ-সজ্জায় রামানন্দ, প্রভু যে ঘাটের একটু দূরে নদীতীরে বসিয়া আছেন, সেই স্থানে স্নান করিতে আসিলেন, এবং যে প্রভু বিষয়কে তৃণ হইতেও লঘু ভাবেন, রামানন্দ এই সজ্জায় তাঁহারই সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই স্থান একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। সে স্থান নানা সজ্জায় সুসজ্জীভূত এবং অদ্যাপিও লোকে উহা দর্শন করিতে যাইয়া থাকে।

রামানন্দ স্নান করিলেন, তর্পণ করিলেন, পূজা করিলেন। এই সব করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন যে, নদীর তীরে একটু দূরে এক জন সন্ন্যাসী বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। সন্ন্যাসী তিনি অনেক দেখিয়াছেন সচরাচর তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাও বড় ছিল না; কিন্তু ইঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। রামরায় দেখিতেছেন, সন্ন্যাসী যেন বন আলো করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার গাত্র দিয়া অমানুষিক তেজ বাহির হইতেছে। কিন্তু সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তিনি যে শুধু বিস্মিত হইলেন তাহা নহে, অত্যন্ত আকৃষ্টও হইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল সন্ন্যাসী যেন তাঁহার মন-প্রাণ ধরিয়া টানিতেছেন। কাজেই রাজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, দ্রুত-গমনে সন্ন্যাসীর দিকে যাইতে লাগিলেন। রামানন্দ তাঁহার দিকে আসিতেছেন দেখিয়া প্রভুর ইচ্ছা হইতে লাগিল যে দ্রুত-গতিতে যাইয়া তাঁহাকে হৃদয়-মাঝে চাপিয়া ধরেন। যে প্রভু বিষয়ী হইতে বহু দূরে থাকেন, যে প্রভু গভীর অটল, তিনি আজ একটি অপরিচিত বিষয়-সংসৃষ্ট শূদ্রকে হৃদয়ে ধরিবার নিমিত্ত ধৈর্য্য হারাইলেন। যে প্রভু কোনো এক জন ভক্তকে এক খণ্ড হরিতকী সঞ্চয় করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, তোমার অদ্যাপি সঞ্চয়-বাসনা যায় নাই, অতএব তুমি আমার সহিত থাকিতে পারিবে না," সেই প্রভু আজ একজন ভোগী রাজাকে বাজনা বাজাইয়া স্নান করিতে যাইতে দেখিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিবেন বলিয়া চঞ্চল হইয়াছিলেন, কিন্তু তবু ধৈর্য ধরিয়া বসিয়া থাকিলেন। রামানন্দ প্রভুর নিকট যাইয়া শির লোটাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রভু অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "উঠ, কৃষ্ণ বল।" তারপর বলিলেন, "তুমি না রামানন্দ?" রামানন্দ তখন করজোড়ে বলিলেন, "আজ্ঞে আমিই সেই পাপাত্মা শূদ্রাধম বটে।" প্রভু আর কিছু না বলিয়া, যেন চিরদিনের হারান বন্ধু পাইলেন, এইভাবে বিভাবিত হইয়া আনন্দে হুঙ্কার করিলেন, এবং সুদীর্ঘ ভুজদ্বয় দ্বারা তাঁহাকে হৃদয় মাঝে চাপিয়া ধরিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মে প্রণামাদি অভ্যর্থনা প্রশস্ত নহে। গৌরদাস জীবকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। প্রণাম জীবকে পৃথকীকৃত ও ছোটো-বড়ো করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবে-জীবে গাঢ় সম্বন্ধ, তাহাদের মধ্যে ছোটো-বড়ো নাই। সকলেরই উৎপত্তি-স্থান ও গতি এক। যাঁহারা এই ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন, তাঁহাদের জীবনমাত্রের প্রতি গাঢ় আকর্ষণ হয়, তখন আর প্রণামরূপ অভ্যর্থনায় তৃপ্তি হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গ-ধর্মের এখন হীন-দশা বলিয়া, প্রণামের এবং সেই সঙ্গে কপট-দৈন্যের ঘটা অধিক হইয়াছে।

প্রভু যেন চিরসুহৃদ পাইয়া রামরায়কে হৃদয়ে ধরিলেন ও আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামানন্দও যেন চির-আশ্রয়-স্থান পাইয়া আর ইহাতে এত সুখের উদয় হইল যে, ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া,—তিনিও মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন, সতী-স্ত্রী ও মৃত-পতি যেরূপ ভাবে চিতায় শয়ন করিয়া থাকেন, সেই রূপ প্রভু ও রামরায় পরস্পরে বাহু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অচেতন অবস্থায় মৃত্তিকায় পড়িয়া রহিলেন।

রামানন্দ যখন সন্ন্যাসীর দিকে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গীদিগের দৃষ্টি সেই দিকে

পড়িল। সকলে প্রভুকে দেখিলেন, এবং তাঁহার ও তাহাদের রাজার কাণ্ড দেখিলেন, ইহা দেখিয়া সকলে ভক্তিতে গদগদ হইয়া, আপনাপন রুচি অনুসারে মনোভাব ব্যক্ত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সহস্র সহস্র লোক মুহূর্ত মধ্যে দ্রবীভূত হইয়া গেলেন।

প্রভু ও রামানন্দ কিছুকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিলেন; এবং তাঁহাদের উভয়ের অঙ্গ পুলকে আপ্লুত হইয়া প্রেমানন্দ ধারায় বদন ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিছুকাল পরে উভয়ে উঠিলেন ও সুস্থ হইয়া বসিলেন। একটু চাওয়া চাহির পর, প্রভু মধুর হাসিয়া বলিলেন, "আমি যখন নীলাচল হইতে দক্ষিণে আসি, তখন তথাকার বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য আমাকে বলেন যে, গোদাবরী তীরে ভাগবতোত্তম রামানন্দ রায়কে দর্শন করিও। সেই নিমিত্ত আমার এখানে আগমন। আমি বড় ভাগ্যবান, তাহাই অনায়াসে তোমার দর্শন পাইলাম।" ইহাতে (যথা চরিতামৃত মধ্যঃ ৮ম পঃ)

রায় কহে, সার্বভৌম করে ভৃত্য জ্ঞান। পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান।। ৩২।।
তাঁহার কৃপায় পানু তব চরণ দর্শন। আজি সফল হৈল মোর মনুষ্যজনম।। ৩৩।।
সার্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিন। অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন।।
কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ। কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম।। ৩৫।।
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদ-ভয়। মার দর্শন তোমা বেদে নিষেধয়।। ৩৬।।
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম।।
আমা নিস্তারিতে তোমার ইঁহা আগমন। পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন।। ৩৮।।
মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্য নাই তবু যান তার ঘর।। ৩৯।।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোক—

মহদ্বিচলনঃ নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ।। ৩২।।

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন। তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন।। ৪০
"কৃষ্ণ" "হরি" নাম শুনি সবার বদনে। সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে।। ৪১
আকৃত্যে প্রকৃত্যে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ। জীবে না সম্ভবে এই অপ্রকৃত গুণ।। ৪২

প্রভু বলিলেন, "আমাকে ওরূপ কথা কেন বলিতেছ? তুমি পরম ভক্ত, তোমার সঙ্গীদিগের মুখে হরি কি কৃষ্ণ নাম,—ইহা আর বিচিত্র কি? তোমার দর্শনে ইহাদের মন দ্রবীভূত হইয়াছে, তাহার সাক্ষী দেখ। আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তি কি পদার্থ তাহা জানি না। কিন্তু তোমার স্পর্শে আমারও কিঞ্চিৎ ভক্তির উদয় হইয়াছে। আমি এখন বুঝিলাম, আমার কঠিন মন দ্রব করিবার নিমিত্তই সার্বভৌম তোমার নিকট আমাকে পাঠাইছেন।"

উভয়ে উভয়ের দর্শনে আনন্দে ভাসিয়া, উভয় উভয়ের স্তুতি করিতেছেন, এই সময় একজন ব্রাহ্মণ করজোড়ে প্রভুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন, প্রভুও স্বীকার করিলেন। তাহার পরে রামানন্দ রায়ের প্রতি মধুর হাসিয়া প্রভু বলিতেছেন, "তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত স্পৃহা হইয়াছে। সেইজন্য তোমার আবার দর্শন কামনা করি।" এরূপ কথা, যাহা প্রভু সেই বিষয়-জড়ীভূত শূদ্রকে বলিলেন, তাহা তিনি কস্মিন্‌কালে কাহাকেও বলেন নাই। রামানন্দ বলিলেন, "স্বামিন্। যখন কৃপা করিয়া এই পামরকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, তখন দিন কয়েক এখানে থাকিয়া আমার কঠিন ও মলিন হৃদয় বিশেষ করিয়া মার্জিত না করিলে, উহা শোধিত হইবে না।" রামানন্দ নিজ ভবনে গমন করিলেন। পরস্পরের দর্শন লালসা ক্রমেই বাড়িতে পরস্পরে প্রেমডোরে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছেন যে, এই ক্ষণিক বিদায়ের নিমিত্ত উভয়েই বড় কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রভু ব্রাহ্মণের গৃহে ও রামানন্দ নিজ ভবনে গমন করিলেন। পরস্পরে দর্শন লালসা ক্রমেই

বাড়িতে লাগিল। সূর্য অস্ত গেলে, রামানন্দ সামান্য বেশে একটি মাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, গোপনে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন; এবং রামরায় প্রভুকে প্রণাম ও প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে বসিলেন।

প্রভু বলিলেন, "বল রামরায়, জীবগণ কিরূপ সাধন-ভজন করিলে উদ্ধার হইবে?"

এখন রামরায় প্রভুকে জানেন না;—প্রভু কে, তাঁহার কি মত, তাহাও জানেন না। প্রভুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে স্তুতিবাক্য। সন্ন্যাসী মাত্রই "নারায়ণ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। রামরায় কেবল এই মাত্র জানিয়াছেন যে, প্রভু একটি ধীশক্তিসম্পন্ন অতি বৃহৎ বস্তু ও কৃষ্ণভক্ত; এবং তাঁহার চিত্ত একেবারে হরণ করিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিয়াছেন। প্রভুর এই প্রশ্নের হঠাৎ কি উত্তর করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। আবার প্রভুর আজ্ঞা পালন না করিয়া, যে কথা কাটাকাটি করিবেন ও বলিবেন, "আগে আপনি বলুন," ইহা পারিলেন না,—বলিতে সাধ্যও হইল না। কাজেই, আপনার মত গোপন করিয়া সর্বসাধারণোপোযোগী যে মত, প্রথমে তাহাই বলিলেন; অর্থাৎ বলিলেন, "স্বামিন্! আমি সাধন-ভজনের কথা কিছু জানি না। তবে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই, ঐ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর আছে,—"যাহার যে স্বধর্ম, তিনি তাহা পালন করিলে, পরিণামে তাহার শ্রীভগবানে ভক্তি হয়।"

বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকে দেখা যায় যে, হিন্দুধর্মের ন্যায় উদার ধর্ম জগতে আর নাই। খ্রীষ্টীয়ানগণ বলেন, তাঁহারা ব্যতীত আর সকলে নরকে যাইবে। মুসলমানেরাও তাহাই বলেন। কিন্তু হিন্দুরা বলেন যে, শুধু স্বধর্ম-পালন দ্বারা ক্রমে সকলে উদ্ধার হইবেন। কারণ স্বধর্ম পালন করিতে করিতে ক্রমে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়; আর তখন জীব উদ্ধার হইয়া যায়। তবে কি, ধর্মের ভাল মন্দ নাই? অবশ্য আছে। জীবের পরিবর্ধনই গতি। যে ধর্মে তোমার এখন ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতেছে, তুমি একটু পরিবর্ধিত হইলে উহা অপেক্ষা সারবান আহার তোমার প্রয়োজন হইবে। রামরায় ও প্রভুতে যে অদ্ভুত কথোপকথন হয়, ইহা দ্বারা, জীব কিরূপে ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিয়াছে, তাহাই বিকশিত হইতেছে। এরূপ কথোপকথন জগতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। রামরায় যে উত্তর করিলেন, তাহাতে এই কয়েকটি কথা তিনি মানিয়া লইলেন,—যথা শ্রীভগবান আছেন ও ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তবে তিনি যে উত্তর করিলেন, ইহাতে তাঁহার প্রকৃত মত কি, তাহা কিছুই বুঝা গেল না।

প্রভু এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "রামরায়, এত তুমি মোটা কথা বলিলে। ইহা অপেক্ষা নিগূঢ় যদি কিছু থাকে তবে বল।" রামরায় তখন গীতার একটি শ্লোক পড়িয়া বলিলেন যে, "গীতায় দেখিতে পাই শ্রীভগবান বলিতেছেন, জীব যে কোনো কর্ম করে, উহা আমাকে সমর্পণ করিয়া করিলেই তাহার সাধনা সিদ্ধ হয়।" প্রভু বলিলেন, "এ সমুদয় কথা বাহ্য। ইহা অপেক্ষা নিগূঢ় যাহা জান তাহাই বল।"

হঠাৎ লোকের মনে বিশ্বাস হইতে পারে যে, রামরায় গীতার যে কথা বলিলেন, উহা অতি বড় কথা। এমন কি, খ্রীষ্টীয়ান-ধর্মে এ কথাটি সর্বাপেক্ষা বড় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কারণ তাহাদের প্রার্থনার মধ্যে—"প্রভু তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক"—এই নিবেদন প্রধান। কিন্তু প্রভু এ কথা মানিলেন না; যেহেতু জীবে ও ভগবানে যে কোনো ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহা ইহাতে বুঝা যায় না। রামরায় তাহা বুঝিয়া বলিলেন, "এ কথা যদি বাহ্য হয়, তবে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া যিনি শ্রীভগবানের শরণ লন, তিনিই প্রকৃত সাধক।" এ কথার প্রমাণও রামরায় দিলেন। কিন্তু প্রভু এ কথাও উড়াইয়া দিলেন। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তির শ্রীভগবানে এত অনুরাগ যে, তাঁহাকে পাইবার লোভে আপনার কুলধর্মও ত্যাগ

করেন, তিনি অবশ্য শ্রীভগবানের প্রিয়। কিন্তু রামরায়ের কথায় ঠিক তাহা বুঝাইল না। মনে ভাবুন, সাহেবের বিবি বিবাহ করিবে বলিয়া যদি কোন হিন্দু খ্রীষ্টীয়ান হয়, তবে কি সে বড় সাধক হইল?

রামরায় তখন একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ভক্তি ও জ্ঞান এই উভয় যোগে যিনি শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, তিনিই প্রকৃত সাধক। প্রভু এ কথাও মানিলেন না। বলিতে কি, ভক্তি ও জ্ঞান এক প্রকার বিরোধী। মনে ভাবুন, যদি কোন স্ত্রী ভাবেন যে, এইজন্য স্বামী স্ত্রীলোকের পরম-গুরু, সুতরাং তাঁহাকে ভক্তি না করিলে মহাপাপ হয়, কি সংসার বিশৃঙ্খল হয়, কি দুঃখের উৎপত্তি হয়; তবে তাহার সে ভক্তি এক প্রকার স্বার্থপরতা। জ্ঞান-মিশ্র ভক্তি বলিতে মোটামুটি এই বুঝায় যে, শ্রীভগবান্ জীবন-মরণের কর্তা, সুতরাং তাঁহাকে ভক্তি না করিলে ক্ষতি, করিলে লাভ। এরূপ হিসাব করিয়া যিনি শ্রীভগবানকে ভক্তি করেন, তিনি শ্রীভগবানকে ভক্তি করেন না, আপনার স্বার্থের পোষণ করেন।

রামরায় তখন একটু চিন্তা করিয়া পরে বলিলেন, "শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই যে, জ্ঞানশূন্য ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়।" ইহা বলিয়া শ্রীভাগবত হইতে একটি শ্লোক পড়িলেন। যখন রামরায় এইরূপ বিশুদ্ধ ভক্তির কথা উঠাইলেন, তখন প্রভু একটু সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এ ভাল কথা, কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও কিছু ভাল কথা যদি থাকে তবে বল।"

জ্ঞানশূন্য ভক্তি কাহাকে বলি, না উদ্দেশ্যশূন্য ভক্তি। সম্রাটকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলাম, আর বলিলাম, "রাজন! আমি তোমার দাসানুদাস।" কিন্তু মনে রহিল যে, রাজা আমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন, হইয়া আমার ভাল করিবেন। ইহাকে রাজভক্তি বলে না, ইহাকে বলে তোষামোদ। অতএব জ্ঞানশূন্য যে ভক্তি, ইহা দ্বারাই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম পাওয়া যায়। প্রভু ইহা স্বীকার করিলেন, কিন্তু তিনি আরো গুহ্য-কথা শুনিতে চাহিলেন। তখন রামরায় প্রেমের কথা উঠাইলেন।

এতক্ষণ রামরায় গীতার রাজ্যে ছিলেন, এখন শ্রীমদ্ভাগবতের অধিকারে আসিলেন। ধর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই দুই রাজ্যে বিভক্ত,—শ্রীগীতার রাজ্য ও শ্রীভাগবতের রাজ্য জ্ঞান-মিশ্র ভক্তি গীতার শেষ সীমা। জ্ঞান-শূন্য ভক্তি শ্রীভাগবত রাজ্যের আরম্ভ। যে পর্যন্ত রামরায় গীতার রাজ্যে ছিলেন, সে পর্যন্ত প্রভু "ইহা বাহ্য" বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। যে মাত্র রামরায় জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা বলিলেন, অর্থাৎ শ্রীভাগবত রাজ্যের সীমায় আসিলেন, সেই প্রভু বলিলেন, "ইহা ভাল বটে, কিন্তু ইহার পরে আরও বল।"

ঐশ্বর্য ও মাধুর্য শ্রীভগবানের এই দুই ভাব। তিনি সর্ব-শক্তিমান,—এই গেল তাঁহার ঐশ্বর্যভাব; আর তিনি তাঁহার রূপ ও গুণে আকর্ষণ করেন,—এই গেল তাঁহার মাধুর্যভাব। গীতায় শ্রীভগবানকে ঐশ্বর্য্যভাবে ভজনার কথা লেখা, আর শ্রীভাগবতে মাধুর্য্যভাবের ভজনা বিরচিত। গীতার রাজ্যের অন্তর্গত বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়, মুসলমান প্রাচীন-হিন্দুধর্ম। এই কয়েক ধর্মের সার-কথা গীতায় উদ্ধৃত আছে। এই সমস্ত ধর্মে যে যে কথা ছড়ান আছে, উহা গীতায় একত্রিত করা হইয়াছে ও পর পর সাজান হইয়াছে। মিঠাইকার তাহার দোকানে যেরূপ নানা রসের খাদ্যদ্রব্য সুন্দর আকার দিয়া সাজাইয়া রাখে, গীতায় সেইরূপ জগতের যত ধর্ম ও সে সমুদয় যত রস আছে, তাহা সুন্দর আকার দিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। তাই গীতা জগতে আদরিত।

শ্রীভাগবত জ্ঞানশূন্য-ভক্তি হইতে আরম্ভ। শ্রীভগবান যে নিজ-জন, জ্ঞান থাকিলে, ইহা হৃদয়ে সম্যক প্রকারে বুঝা যাইতে পারে, কিন্তু বোধ অর্থাৎ আস্বাদ করা যায় না। শ্রীভাগবত-গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে শ্রীভগবান্ নিজ-জন, আর নিজ-জন রূপে তাঁহার যে ভজনা তাহা

দ্বারাই "তাঁহাকে" পাওয়া যায়। নিজ-জন কাহাকে বলে? না,—পিতা কি প্রভু, সখা কি ভাই, সন্তান কি পতি ইহারই নিজ-জন। আর প্রভু কে? না,—যিনি ক্রীতদাসের মরণ-বাচনের কর্তা। ক্রীত-দাসের নিজ-জন প্রভু ব্যতীত আর কেহ নাই,—যেমন পুত্রের নিজ-জন পিতা বই আর নাই। আর নিজ-জন কে? না,—বন্ধু বা ভাই-ভগ্নী। আর কে? না,—পতি বা পত্নী। এই সমুদয় নিজ-জন লইয়া সংসার।

সেকালে এ দেশে দাস রাখিবার পদ্ধতি ছিল। এখনও কোনো কোনো দেশে আছে। এই দাস শব্দ হইতে দাস্য-ভক্তি কথাটি লওয়া হইয়াছে। তুমি একজন সংসারী। এখন দেখ, তোমার সংসার পাতাইতে কি কি লাগে। তুমি, তোমার সন্তান, তোমার জনক-জননী, তোমার অতি আত্মীয় ও তোমার ঘরণী। এই যে কয়েকটি বস্তু লইয়া সংসার, ইহাদের পরস্পরে যে আকর্ষণ তাহাকে—'প্রেম', কি 'রস', কি 'ভাব' বলে। সন্তানের পিতার প্রতি যে ভাব, তাহাকে দাস্য-প্রেম বলে। যদি বল ক্রীতদাসের আবার প্রভুর উপর প্রেম কি? কিন্তু ক্রীতদাসের জগতে আর কেহ নাই; প্রভুর সহিত থাকিয়া-থাকিয়া, প্রভুর নিজের ও তাহার গণের প্রতি সে আকর্ষিত হয়। এমন কি, শুনা যায় যে, ক্রীতদাস প্রভুর নিমিত্ত প্রাণ পর্যন্তও দিয়াছে। পুত্রের পিতার উপর যে প্রেম, ইহাকে শাস্ত্রকারেরা দাস্য-প্রেম বলেন। ফল কথা, শ্রীভগবানকে পিতা-বলিয়া বোধ, ও প্রভু-বলিয়া বোধ,—এই দুই ভাবে বড় বিভিন্নতা নাই। দাসের প্রভুর প্রতি খানিক স্নেহ, খানিক ভক্তি ও খানিক ভয় আছে। সন্তানেরও পিতার প্রতি তাহাই আছে।

তাহার পর, জীবমাত্রের অন্ততঃ একজন অতি আত্মীয় আছেন। তিনি যদিও সকল অবস্থায় এক সংসার-ভুক্ত থাকেন না, কিন্তু সংসার পূর্ণমাত্রায় পাতাইতে একটি সখার প্রয়োজন। এইরূপ আত্মীয়ের উপর এক প্রকার স্নেহ আছে, তাহাকে বলে সখ্য-ভাব। তাঁহার নিকট কোনো বিষয়ে অবিশ্বাস নাই, তিনি সুখদুঃখের সাথী, তাঁহাকে মনের বেদনা বলিতে কোনো বাধা নাই। তিনি আব তুমি এক শ্রেণীর লোক,—তুমিও বড় না, তিনিও বড় না। তিনি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা তোমার ন্যায় অতি পরিমিত। এইরূপ যে ভাব, সে গেল সখ্য-প্রেম। বাৎসল্য ও মধুর প্রেমের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

আমরা এইরূপে সংসার পাতাইয়া বাস করি। আমরা এই সংসার পাতাইয়া বাস করিব বলিয়া, শ্রীভগবান তাহার উপযোগী সমুদয়, অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র পিতামাতা আত্মীয়স্বজন দিয়াছেন; অতএব এই সংসার-পাতানই আমাদের স্বাভাবিক গতি। এই সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আমরা শ্রীভগবানরূপ কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইতেছি, কি উহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। এই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইতে আকর্ষণের প্রয়োজন। এই আকর্ষণ যদি না থাকে, তবে চিরদিন ঘুরিয়া বেড়াইবে। যদি আকর্ষণের সহায়তা লইতে পার, তবে কেন্দ্র দিকে যাইতে পারিবে। এই আকর্ষণ হইতেছে—প্রেম। এই প্রেমে পরিবার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, আর এই প্রেমে সর্ব-পরিবার শ্রীভগবানে আবদ্ধ। উপরে বলিয়াছি, এই প্রেম চারি প্রকার—দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর; আর, সংসার পাতাইয়া বাস করা জীবের স্বভাব। অতএব এই সংসার যে প্রণালীতে আবদ্ধ হইয়াছে, শ্রীভগবানকে এই সংসারভুক্ত করিতে হইলে সেই প্রণালী ব্যতীত আর গতি নাই। আর যে গতি নাই, তাহার অপর কোনো প্রমাণ প্রয়োজন করে না,—ইহা স্বীকার করিলেই হইবে যে, সংসার পাতাইয়া বাস করা আমাদের স্বভাব। অতএব এই সংসারের যে চারিটি বস্তু—পুত্র, সখা, পতি ও পিতা, ইহার মধ্যে শ্রীভগবানকে একজন কর। হয় তাঁহাকে পিতারূপে, না হয় সখারূপে, না হয় পুত্ররূপে, না হয় পতিরূপে ভজনা কর। তাহা না করিলে তাঁহাকে সংসারে স্থান দিতে পারিবে না,—তিনি বাহিরের লোক হইবেন।

এই গেল শ্রীমদ্ভাগবতের সার সংগ্রহ। এখন মনে ভাব, তুমি যেন শ্রীভগবান্‌কে পিতারূপে ভজনা করিবে। তাহা হইলে সে ভজনা-প্রণালী কিরূপে তাহা শিখিতে তোমার আর কোথাও যাইতে হইবে না। যেরূপ সুবোধ শিশু-পুত্র সর্বগুণনিধি পিতাকে ভজনা করে, সেইরূপ করিলেই হইবে। শিশু-পুত্র বলি কেন?—না, তাঁহার নিকট সকলেই শিশু। এখন বিচার কর, এরূপ পিতাকে পুত্র কিরূপে ভজনা করে।

এই প্রভুকে,—সখা, কি সন্তান, কি পতি ভাবে, দুইরূপে ভজনা করা যাইতে পারে,—হয় সাক্ষাৎ ভাবে, অথবা গোপীর অনুগত হইয়া। সাক্ষাৎ ভাবে কিরূপে ভজনা করিতে হয়, তাহাই এখন বলিতেছি। প্রথমে ধ্যানে তোমার পিতাকে ভজনা করিতে থাক। যদি বল তিনি জীবিত আছেন, তবে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা কর। যদি তোমার কোনো গুরু থাকেন, তবে তাঁহাকেও ঐরূপ সেবা করিলে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে প্রভুকে কিরূপে ভজনা করিতে হয়, তাহা জানিতে পারিবে। তখন সেই পিতার স্থানে শ্রীভগবান্‌কে বসাইবে। এই যে তোমার মধুর প্রভৃতি চারি প্রকার ভাব আছে, ইহা স্বাভাবিক;—এত স্বাভাবিক যে, সে ভাবের বস্তু না পাইলে তুমি অস্থির হইবে। যাহার পুত্র নাই, সে পুত্র পুত্র করিয়া প্রাণ ছাড়িবে; যাহার স্ত্রী নাই, সে আপনাকে অপূর্ণ ও তাহার সংসার শূন্য ভাবিবে। অতএব এই চারি-ভাব স্বাভাবিক, আর এই চারি-ভাবের বস্তুর নিমিত্ত লালসাও স্বাভাবিক। এই আকাঙ্ক্ষা জীবের দ্বারা কতক পরিপূরিত হয়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হয় না। যেহেতু এই ভাবের বস্তুগুলি অপূর্ণ ও মলিন। পতিপ্রাণা সতী আপনার পতির নিমিত্ত প্রাণ দিবেন; কিন্তু তবু দেখিবে যে, তাঁহার পতি নির্মল কি পূর্ণ নহেন। অতএব তাঁহার মধুর-ভাবের সম্পূর্ণরূপে তৃপ্তি-সাধন হইতেছে না। এই ভাবের পিপাসা তখনই শান্তি হইবে, যখন ইহার বস্তু নির্মল ও পূর্ণ হইবে। এমন বস্তু শ্রীভগবান্ বই আর নাই। অতএব এই ভাবগুলির দ্বারা যখন শ্রীভগবান্‌কে ভজন করা হয়, তখনি জীবের প্রকৃত প্রয়োজন সাধন হয়,—তখনি জীব প্রেমানন্দ-তরঙ্গে পড়িয়া ভাসিতে থাকে। এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতেছি, অর্থাৎ শ্রীপ্রভুতে ও রামরায়ে যে বিচার তাহা এখন বর্ণনা করিব।

প্রভু স্বীকার করিলেন যে, জ্ঞানশূন্য ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের ভজনা হয়। তারপর তিনি বলিলেন, "রামরায়! আরো গূঢ় কথা বল।" তখন রামরায় বলিলেন, "সার্বোত্তম সাধনা, শ্রীভগবানকে প্রেম ও ভক্তি দ্বারা ভজন কর।" এ কথা শুনিয়া প্রভু বড় সন্তুষ্ট হইলেন; তবে বলিলেন, "এ অতি উত্তম কথা। কিন্তু যদি আরো কিছু নিগূঢ় থাকে, তবে কৃপা করিয়া তাহা বল।" তখন রামরায় দেখিলেন যে, তিনি ক্রমে ক্রমে প্রেমের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—এই তাঁহার নিজ দেশ। তখন তিনি ভক্তির কথা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "দাস্য-প্রেমের দ্বারা শ্রীভগাবানকে সেবা করাই সর্বোত্তম ভজন।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "সাধু রামরায়! তুমি আমাকে কৃতার্থ করিলে"; কিন্তু তারপরেই বলিতেছেন, 'ইহা অপেক্ষা আরও কি কিছু উত্তম আছে?"

তখন রামরায় বলিলেন, "আছে, সে সখ্য-প্রেম। শ্রীভগবানকে প্রভু বলিয়া ভজন করায় যে আনন্দ, তাহা অপেক্ষা সুহৃদ্ বলিয়া ভজন করায় অধিক আনন্দ।" প্রভু বলিলেন, "আমি কৃতার্থ হইলাম। কিন্তু আরও যদি কিছু নিগূঢ় থাকে, তাহা বল; আমাকে বঞ্চিত করিও না।"

রামরায় তখন এক প্রকার গ্রহগ্রস্ত হইয়াছেন, তখন যেন তিনি আর স্ববশে নাই; তিনি যেন প্রভুর জিহ্বা-যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছেন। প্রভু যেন সাধন-তত্ত্ব তাঁহার মুখ দিয়া প্রকাশ করিতেছেন। রামরায় প্রভুর কথার উত্তরে বলিলেন যে, "সখ্য-প্রেম অপেক্ষা বাৎসলা-প্রেম আরো গাঢ়। অতএব শ্রীভগবানকে আপনার পুত্র ভাবিয়া যদি ভজন করা হয়, তবে উহা সাধনার এক প্রকার শেষ-সীমা হয়।"

ইহাতে প্রভু বলিলেন, "রামরায়, তুমি আমাকে একেবারে বিনামূল্যে ক্রয় করিলে, তবে আরও যদি গুহ্য কিছু থাকে তবে বল।" তখন রামরায় বলিলেন, "আছে; শ্রীভগবান্‌কে কান্তভাবে ভজনা করা।" এখানে আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর।রায় কহে—দাস্য-প্রেম সর্বসাধ্যসার।।
প্রভু কহে—এহো হয়, কিছু আগে আর। রায় কহে—সখ্য-প্রেম সর্বসাধ্যসার।।
প্রভু কহে—এহোত্তম, আগে কহ আর। রায় কহে—বাৎসল্য-প্রেম সর্বসাধ্যসার।।
প্রভু কহে—এহোত্তম, কহ আগে আর। রায় কহে—কান্ত ভাব প্রেমসাধ্যসার।।"

রামরায় এইরূপে ক্রমে ক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত-রাজ্যের শেষ-সীমায় আসিয়া ভাবিলেন, এখানে বিশ্রাম করিবেন। এই উদ্দেশ্যে কান্তভাব কি, তাহাই বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন, "স্বামিন্। সাধনার উদ্দেশ্য শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্তি। তবে প্রাপ্তি অনেক প্রকার আছে—আংশিক ও পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু সাধক ইহাদের প্রভেদ বড় বুঝিতে পারেন না। যদি সমুদয় ব্যঞ্জন উত্তম হয়, তবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যেটি অগ্রে বদনে দেন, সেইটী সর্বাপেক্ষা উত্তম ভাবিয়া থাকেন। শ্রীভগবানে এত মধু আছে যে, জীব যখন যে অংশ পায়, তাহাতেই মুগ্ধ হয়। এমন কি, শ্রীভগবান্‌কে যিনি যেভাবে ভজনা করেন, তাঁহার কাছে সেই ভাবই সর্বোত্তম বলিয়া বোধ হয়। রামরায়ের কথার তাৎপর্য এখন পরিগ্রহ করুন।

যাঁহারা দাস্যভাবে শ্রীভগবানকে ভজনা করেন, তাঁহারা বলেন, দাস্যভাব সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের মধ্যে এমন সব ভক্তও আছেন যাঁহারা বলেন যে, দাস্যভাবই সর্বোত্তম, এবং কান্ত প্রভৃতি অন্যান্য ভাবে ভজনা করা জীবের অধিকার নাই।

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ হইলেন, তখন পশ্চিমদেশে বল্লভাচার্যও ঐরূপ ভাবে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার মত এই যে, বাৎসল্য প্রেমই সর্বোত্তম। এই মত প্রচার করিতে করিতে, ক্রমে তিনি নীলাচলে প্রভুর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। শ্রীধরস্বামী যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, উপরে রামরায় যাহা বলিলেন, ভাগবতও তাহাই বলিয়াছেন;—অর্থাৎ কান্তভাবই সর্বোত্তম। কিন্তু বল্লব ভট্ট, শ্রীধরস্বামীর টীকা উড়াইয়া দিয়া, আপনি শ্রীবগবতের টীকা করিলেন এবং বাৎসল্য-প্রেমই যে সর্বোত্তম, তাহাই প্রমাণ করিবার নিমিত্ত তিনি বৃহৎ গ্রন্থও লিখিলেন, এবং পশ্চিম-দক্ষিণ দেশে তাঁহার শিষ্যের সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইল। ইহার শিষ্যগণ অদ্যাপিও সেই সমস্ত দেশে বড় প্রবল। ইহার উপাচার্যগণকে "গোকুলে গোঁসাই" বলে। ইহাদের শিষ্যগণ প্রায়ই বণিক, কাজেই আচার্যগণের অনেকের ঐশ্বর্যের সীমা নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের গণ "করঙ্ককাস্থাধারী", কিন্তু গোকুলে-গোস্বামীর মধ্যে অনেকেই রাজরাজেশ্বর। শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ী আচার্য্যগণের মধ্যেও ঐশ্বর্য-লোভে মুগ্ধ হইয়া, রাজরাজেশ্বরের ন্যায় বাস-প্রথা ক্রমে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর পার্ষদগণ কাঙ্গাল হইতেও কাঙ্গালরূপে অবস্থিতি করিয়া জীব উদ্ধার করিতেন। তাঁহাদের দীন-বেশ দেখিলে জীবের হৃদয় দ্রব হইত। এখানকার আচার্য্যদের মধ্যে কাহারও ঐশ্বর্য দেখিয়া জীবের হৃদয় দ্রব হয় না, বরং শ্রীবৈষ্ণবধর্মের প্রতি ঘৃণার উদয় হয়।

শ্রীবল্লভাচার্য নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া, শেষে আপনি তাঁহার শরণাগত হইলেন। এমনকি, শেষে তিনি শ্রীগদাধর গোস্বামীর নিকট যুগল-মন্ত্র লইয়া কান্তভাবে শ্রীভগবানকে ভজনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা দেশে রহিলেন, তাঁহারা বল্লভাচার্যের পূর্বকার মত পালন করিতে লাগিলেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে "বল্লভাচারী" বলে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বালগোপাল অর্থাৎ সন্তান-ভাবে উপাসনা করেন।

রামরায় প্রভুকে বলিতেছেন, "যাহার যে ভাব, তাহার কাছে সেই উত্তম সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া সব যে সমান তাহা নয়,—ভাল মন্দ অবশ্য আছে। দাস্যভাব যে অতি উত্তম তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু দাস্য অপেক্ষা সখ্য আরও ভাল, যেহেতু সখ্যভাবে দাস্য ও সখ্য উভয়ই আছে। সেইরূপ মধুর-ভাব সর্বাপেক্ষা উত্তম। যেহেতু এক মধুর-ভাবে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত,—এই চারি ভাবই জড়িত আছে। অতএব যিনি মধুর-ভাবে ভজনা করেন, তিনি কর্তব্যে—চারি ভাবেই ভজনা করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনিই সর্বোত্তম অধিকারী।"

রামরায় বলিলেন যে, "মধুর-ভাবে দাস্য, বাৎসল্য ও কান্ত এই চারি ভাব আছে," ইহার তাৎপর্য পরিগ্রহ করুন। কান্ত মানে স্ত্রীলোকের স্বামী। স্ত্রী কখন স্বামীর দাসী হয়েন, কখন সখী হয়েন, কখন মাতা হয়েন, কখন বা বক্ষবিলাসিনি হয়েন। রামরায় বলিলেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্তি কেবল এই কান্তভাবেই হয়। এইরূপে রামরায়, শ্রীভাগবত-রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইয়া বিশ্রাম করিবেন ভাবিলেন। কিন্তু প্রভু বলিলেন, "রামরায়, তুমি যে বলিলে, 'সাধনার এই শেষ-সীমা' ইহা ঠিক, তবে আরও কিছু বাকি থাকে ত বল।" এই কথা শুনিয়া রামরায় অবাক হইলেন। যথা ঃ—রায় কহে—"ইহার আগে পুছে কোন জনে। এত দিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে।।"

রামরায় ভাবিতে লাগিলেন, ইহার পরে আবার কি? ইহা ভাবিবার কারণও রামরায়ের আছে। পাঠক মহাশয় যদি ও পর্যন্ত মনোযোগ দিয়া পড়িয়া থাকেন, তবে তিনিও ভাবিতে পারেন যে, ইহার পরে আবার কি হইতে পারে? ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ রামরায়ের মনে স্ফূর্তি হইল; তিনি বলিলেন, "ইহার অগ্রে—রাধার প্রেম।"

ইহা শুনিয়াই ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "রাধার প্রেম যদি কান্তভাব অপেক্ষাও গাঢ় হয়, তবে তাহার কারণ কি বল। তোমার মুখে কৃষ্ণকথা যেন অমৃতের ধার। ইহা শুনিয়া অঙ্গ শীতল হইতেছে। বল বল রামরায়! রাধার প্রেম এত শ্রেষ্ঠ কেন?"

রামরায় তখন বলিতেছেন, "ত্রিজগতে রাধার প্রেমের তুলনা নাই। শত কোটি গোপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত বসবাস করিলেন, কিন্তু রাধা ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা তাঁহার প্রেম-পিপাসা শান্তি হইল না।" তখন প্রভু বলিলেন, "ইহাই সাধনের সীমা সন্দেহ নাই। তবে আরও কিছু নিগূঢ় যদি থাকে, তাহা বলিয়া আমার কর্ণ শীতল কর।"

প্রভু কহে—এহো হয় আগে কহ আর। রায় কয়ে—ইহা বহি বুদ্ধি গতি নাহি আর।।

রামরায় যে এরূপ বলিলেন, ইহাতে তাঁহার দোষ কি? সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম সৃষ্টির নানা দ্রব্য আছে। কিন্তু জীবের দৃষ্টি সীমা-বিশিষ্ট, সেই সীমা জীব অতিক্রম করিতে পারে না। তাই রামরায় কিছুক্ষণ ভাবিয়া শেষে বলিতেছেন, "স্বামিন্! আর শক্তি নাই। যাহা দিয়াছিলে সব নিঃশেষ হইয়াছে। যদি আর কিছু শক্তি দাও, তাহা হইলে তোমার কথার উত্তর দিতে পারি। তবে আমার নিজ-কৃত একটী গীত আছে। সেটি গাইতেছি। উহাতে আপনাকে সুখ দিবে কি না জানি না।" ইহা বলিয়া রামরায় এই গীতটি গাইতে লাগিলেন। যথা ঃ—

পহিলেহি রাগ নয়ন ভঙ্গে ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।।
না সো রমণ না হাম রমণী। দুহু-মন মনোভব পেষল জানি।।
এ সখি, সো সব প্রেম-কাহিনী। কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি।।
না খোঁজলু দোতী না খোঁজলুঁ আন। দুহুঁকো মিলনে মধ্যত পাঁচ-বাণ।।
অব সোই বিরাগে তুহুঁ ভেলি দোতী। সুপুরুষ-প্রেমক ঐছন রীতি।।
বর্ধন রুদ্র-নরাধিপ-মান্। রামানন্দ রায় করি ভাণ।।

শ্রীনবদ্বীপের পুরুষোত্তম আচার্যের পবে আর একটি "পাত্রের" সহিত প্রভু এই মিলিত হইলেন। রামানন্দ রায় অনুরাগা ভক্ত, কাব্য ও সঙ্গীত তাঁহার ভজনের উপকরণ, পৃথিবীর মধ্যে তিনি রসিক-শিরোমণি। রামানন্দ রায় গাহিতে আরম্ভ করিলে, প্রভু প্রেমে চঞ্চল হইতে লাগিলেন। ক্রমে এরূপ অধীর হইলেন যে, আর শ্রবণ করিতে না পারিয়া—"চুপ্" "চুপ্" এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য নিজ হস্ত দ্বারা রামনন্দের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। মনের ভাব এই,—"চুপ্! এ অতি পবিত্র বস্তু; বহিরঙ্গ লোকে শুনিবে,—চুপ্!"

পূর্বে বলিয়াছি যে, জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তি গীতার শেষ সীমা। গীতার আরম্ভ মায়াবাদ হইতে। শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভ—জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তির অপর পার—জ্ঞান-শূন্য ভক্তি হইতে; সেখান হইতে আরম্ভ হইয়া প্রেমের কাণ্ড রাধাভাবে সমাপ্ত। এখন রামরায় যাহা বলিলেন, ইহা কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণই সম্ভোগ করিতে পারেন। যথা, শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত হইতে প্রবোধানন্দ সরস্বতীর বাক্য—

> ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে
> কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ।
> যন্ন ক্বাপি কৃপাময়েন চ নিজেঽপ্যুদ্ঘাটিত শৌরিণা
> তস্মিন্নুজ্জ্বলভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ।। ১৮।।

অর্থাৎ—"যে মধুর ভক্তি-পথে ব্যাস প্রভৃতি মুনীন্দ্রগণও ভ্রান্ত হইয়াছেন, যাহাতে পূর্বে পৃথিবীতলে কাহার বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই, যাহা শুকদেবও অবগত ছিলেন না, এবং যাহা কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্তের নিকটেও প্রকাশ করেন নাই, তাহাতে এক্ষণে শ্রীগৌরভক্তগণ সুখে ক্রীড়া করিতেছেন!"।। ১৮।।

রামরায়ের উপরি-উক্ত গীতে প্রেমের চরমসীমা বিরচিত হইতেছে। অতএব প্রেমের রাজ্যটি একবার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। পূর্বে বলিয়াছি যে, জড়জগতে পরস্পরের মিলন করিবার শক্তিকে বলে আকর্ষণ, আর জীব-মণ্ডলীতে এই শক্তিকে বলে প্রেম। সূর্যকে মধ্যস্থলে রাখিয়া, তাহার চতুষ্পার্শ্বে গ্রহগণ উপগ্রহ সঙ্গে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এ সমুদয় আকর্যণ-শক্তি দ্বারা হয়। আকর্ষণে উপগ্রহও সংযোগ সিদ্ধ হয়, আর আকর্ষণে ইহারা সূর্যের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়। সেইরূপ জীবগণ এই প্রীতি-বন্ধন দ্বারা সংসারবদ্ধ হইয়া শ্রীভগবানের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়। জড়-জগত ও জীব-জগত নানা নিয়মের অধীন; কিন্তু ইহাদের যত প্রভু আছে, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান প্রভু—আকর্ষণ কি প্রেম। ইহা অতিক্রম করিতে তাহারা পারে না; তাহারা এই শক্তির সম্পূর্ণ অধীন। এই প্রেমের শক্তি এখন বিবেচনা কর। স্বামী দেহ ত্যাগ করিলে তাহার স্ত্রী ওই দেহের সহিত স্ব ইচ্ছায়, এমন কি জিদ করিয়া, অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতেছেন। কোন ইষ্ট সাধনের নিমিত্ত কি কেহ অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারে? মনুষ্যের উপর, কেবল প্রীতিরই এইরূপ আধিপত্য আছে। রেলের গাড়ি হইতে সন্তান পড়িয়া গেলে, তাহার পিতা তদ্দণ্ডে সেই সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি হইতে লম্ফ দিতে পারেন। প্রেমের শক্তির আরও উদাহরণ দিতেছি। তুমি যদি ইচ্ছা কর যে, তুমি জগতের এক প্রান্তে বাস করিবে, তবে তুমি একটিও সঙ্গী পাইবে না; যদি কেহ যায়, তবে বিশেষ স্বার্থসাধনের নিমিত্ত যাইবে। কিন্তু যদি তুমি যাইবার সময় তোমার স্ত্রীকে ফেলিয়া যাও, তবে তিনি রোদন করিবেন, সমুদয় ভুবন অন্ধকার দেখিবেন ও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তোমাকে সাধ্যসাধনা করিবেন। যে শক্তি স্ত্রী ও স্বামীকে এইরূপ বন্ধন করিয়াছে, তাহার তেজ এখন অনুভব করুন!

শাস্ত্রে বলে, কোনো বংশে একজন সাধু হইলে তাঁহার বহু পুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়;

প্রকৃতপক্ষে যদি স্বামী সাধু হন, তবে সেই সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীও উদ্ধার হইতে পারেন। বেলুন-যন্ত্র পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া উর্ধ্বে উঠে; আবার উহার শক্তি একটু অধিক হইলে, সেই বেলুন অন্য দ্রব্য লইয়াও উঠিতে পারে। দুটি জীব প্রীতিতে আবদ্ধ,—একজন পবিত্র, আর এক জন অপবিত্র। যে পবিত্র, সে তাহার অপবিত্র সঙ্গীকে উর্ধ্বদিকে ও যে অপবিত্র, সে তাহার পবিত্র সঙ্গীকে অধোদিকে আকর্ষণ করে। এই টানাটানিতে,—কখন পবিত্র, কখন-বা অপবিত্র জীবের জয় হয়। বিল্বমঙ্গলঠাকুর চিন্তামণি বেশ্যাতে অনুরক্ত ছিলেন, তাহাতে চিন্তামণি উদ্ধার হইয়া গেল। আবার মুনি ঋষি মহাতপ করিয়াও কুসঙ্গের শক্তিতে অধঃপাতে গিয়াছেন।

যেমন ধূমকেতু সূর্য্যের দিকে গমন করে, সেইরূপ ভক্তগণ শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হন। যেরূপ ধূমকেতু তাহার পুচ্ছ লইয়া সূর্যের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ সাধুগণ তাঁহাদের নিজ-জন লইয়া শ্রীভগবানের দিকে গমন করেন। সর্বজীবে সমান দয়া, কি সমান স্নেহ, জীবে সম্ভবে না,—ইহা কেবল স্বয়ং শ্রীভগবানই পারেন। সেই নিমিত্ত প্রেম পরিবর্ধনের জন্য শ্রীভগবান্ মনুষ্যকে সংসারবদ্ধ হইয়া বাস করিবার বলবৎ বাসনা দিয়াছেন; তাই, জীব সংসার পাতাইয়া বাস করে। এই সংসার তাহার উদ্ধার কি পতনের কারণ হয়। যদি সে ব্যক্তি স্বয়ং, কি তাহার যে প্রিয় সে সাধু হয়, তবে সে ব্যক্তিও উদ্ধার হইয়া যায়। আর যদি তাহার বিপরীত হয়, তবে সে সংসারে আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। এই নিমিত্ত প্রেম প্রভৃতি হৃদয়ের কমনীয় ভাবগুলি পরিবর্ধনের নিমিত্ত সংসারে বাস করা জীবমাত্রেরই কর্তব্য। যখন কোনো জীব দেখেন যে, সংসার তাহাকে অধোদিকে লইয়া যাইতেছে, তিনি উহা ছাড়াইয়া উর্ধ্বে যাইতে পারিতেছেন না, তবে শেষকালে তাঁহার সংসার হইতে দূরে বাস করাই কর্তব্য। আর এই নিমিত্ত, আমাদের দেশের ভাল লোকেরা প্রৌঢ় বয়সে, হয় বনে, না হয় তীর্থস্থানে জীবন যাপন করিতেন। ইহাতে তাঁহারা স্বয়ং উদ্ধার হইতেন ও তাঁহাদের নিজ-জনকেও উদ্ধার করিতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইলেন ও শ্রীনিত্যানন্দ আকুমার ব্রহ্মচারী রহিলেন, দেখিয়া অনেক ভক্ত সংসারে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। তখন মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন যে, তাঁহার সংসারে প্রবেশ করিয়া জীবগণকে পথ দেখাইতে হইবে। তিনি স্বয়ং এইরূপ সংসারে প্রবেশ না করিলে, ভক্তগণ উহা করিবেন না। অতএব সংসার ত্যাগ করা ধর্ম নয়, সংসারে বাস করাই ধর্ম। তবে সংসারে বাস, যতদূর সম্ভব, নির্লিপ্ত হইয়া করিতে হইবে। কাহাকেও অতিরিক্ত ভালবাসিও না, আর যদি তাহা কর, তবে ভজনসাধন দ্বারা আপনাকে এরূপ শক্তিসম্পন্ন করিবে যে, তাহার প্রেমে তোমার অধোগতি না হয়।

জড়জগতের আকর্ষণ সমভাবে থাকে, কিন্তু প্রেম পরিবর্ধনশীল। সংসারে বাস করিয়াও পরিবর্ধন হয়, আর ভজন-সাধন দ্বারা ভগবৎ-প্রেম পরিবর্দ্ধন করিতে হয়। প্রেম দুই রূপ,—অহেতুক ও হেতুক, বা পরকীয় ও স্বকীয়। যে প্রেমের হেতু আছে সে স্বকীয়, আর যাহার হেতু নাই সে পরকীয়। এখন বিবেচনা করুন, ঠিক বলিতে স্বকীয়-প্রেম প্রেমই নয়। "সোনার পাথরের বাটি" যেরূপ অসংলগ্ন, "স্বকীয় প্রেমও" সেইরূপ দুটি অসংলগ্ন বস্তু। কিন্তু স্ত্রী-স্বামীতে যে প্রেম, উহা "স্বকীয়"। এ প্রেমের হেতু এই যে, স্ত্রীর প্রেমের বস্তু স্বামী;—যে কেহ তাঁহার স্বামী হউন, তাঁহাকেই তিনি ঐরূপ ভালবাসিতেন। অতএব স্ত্রী যে স্বামীকে ভালবাসেন উহা প্রকৃত প্রেম নয়, উহার মূল "স্বার্থপরতা"। সেইরূপ জননী যে সন্তানকে ভালবাসেন, তাঁহাও প্রকৃত প্রেম নয়। কারণ তাঁহার সন্তানমাত্রই তাঁহার ভালবাসার পাত্র। অতএব "বিশুদ্ধ-প্রেম" বা "অকৈতব-প্রেম", অর্থাৎ যাহাতে স্বার্থগন্ধ নাই, তাহা পরকীয় ব্যতীত অন্য কোনোরূপ হইতে পারে না। এই পরকীয়, অর্থাৎ অহেতুক বা নিঃস্বার্থ বিমল-

প্রেম হইতে অখণ্ড-আনন্দময় যে ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাঁহাকে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বকীয়-প্রেম, অর্থাৎ কান্ত-ভাবে, স্বার্থ গন্ধ আছে বলিয়া ইহাতে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না।

আকর্ষণ জড়জগতের প্রাণ। আকর্ষণ যেরূপ নানা প্রকার আছে, প্রীতিও সেইরূপ,—দাস্য-সখ্যাদি নানা প্রকার আছে। আকর্ষণ যেরূপ জড়-জগৎকে পৃথকীকৃত করিয়া প্রত্যেককে যথাস্থানে নিয়োজিত ও পৃথক-পৃথক প্রকৃতি-সম্পন্ন করে, প্রীতিও জীবগণ সম্বন্ধে সেইরূপ করিয়া থাকে। জীবগণ এই আকর্ষণ-তত্ত্ব বিচার করিয়া, উহার উপর যেরূপ আধিপত্য স্থাপন এবং জড়-জগতকে আপন করায়ত্বে আনয়ন করে, সেইরূপ প্রীতির সূক্ষ্মতত্ত্ব বিচার করিয়াও উহার উৎকর্ষ সাধন ও উহার উপর আধিপত্য স্থাপন করে। গন্ধক ও পারদে পরস্পরে আকর্ষণ আছে, জীবগণ অনুসন্ধান দ্বারা ইহা জানিয়া, পারদ ও গন্ধক একত্র করিয়া যেরূপ কজ্জলি প্রস্তুত করে; সেইরূপ প্রীতির সূক্ষ্মতত্ত্ব বিচার করিয়া এবং ক্রমে উহার উৎকর্ষ করিয়া, উহার দ্বারা শ্রীভগবানের উপর পর্যন্ত আধিপত্য স্থাপন করে। তাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,—"এ তিন ভবনে সারই পিরীতি।" এই প্রীতির সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীরামরায়ের উল্লিখিত পদটিতে সেই প্রীতি-তত্ত্বের শেষ-সীমা প্রকাশ পাইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের রাসলীলা বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন, "মধুর মুরলী" রব শুনিয়া গোপীগণ আসিলেন, এবং প্রত্যেকে একজন করিয়া কৃষ্ণ পাইয়া তাঁহার সহিত নৃত্য-গীতাদি ও বিহার করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমতী রাধার আভাসমাত্র আছে। উহা পূর্ণ-মাত্রায় প্রকাশ করিলে, দুই-একজন মাত্র উহা বুঝিতে পারিত।

এই রাধাতত্ত্ব জীবকে বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া উহা নানারূপে বুঝাইলেন। আপনি রাধাভাব ধারণ করিয়া রাধার প্রেম কি তাহা দেখাইলেন; আর শ্রীরামানন্দের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, পরকীয়-রসের প্রকাশস্বরূপ যে শ্রীমতী, তাঁহার তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন।

এখন রামরায়ের গীতের অর্থ করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীমতী বলিতেছেন, "সখি! শ্যামের সহিত আমার কিরূপে প্রীতি হইল তাহ বলিতেছি। প্রথমে, তাঁহার সহিত নয়নে নয়নে মিলন হইল,—আমি তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি আমাকে দেখিলেন। তদ্দণ্ডে প্রীতির সৃষ্টি হইল, এবং ক্রমে উহা বাড়িয়া চলিল, তাহার শেষ পাইলাম না।"

এখন শ্রীমতীর কথা লইয়া একটু বিচার করিব। শ্রীকৃষ্ণ কে, তাহা শ্রীমতী জানেন না। তাঁহাতে কোনো গুণ আছে কি না,—তিনি স্নেহশীল কি নিষ্ঠুর, দেব কি দৈত্য, তাহাও জানেন না। তবে দেখা-মাত্র প্রীতি হইল কেন? এরূপ কি কখন হয়? ইহার উত্তর এই যে,—এরূপ হয়। কোন সুন্দরী রমণীতে ও সুন্দর যুবকে এইরূপ দেখা-দেখি হইবামাত্র পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সৃষ্টি হয়। এরূপ হইবার কারণ,—একজন পুরুষ, আর একজন রমণী বলিয়া। কিন্তু রাধার মনে যে ভাবের গন্ধও ছিল না। শ্রীরাধা বলিতেছেন—"না সো রমণ, না হাম রমণী"—অর্থাৎ, "সখি! এই যে প্রীতি হইল, ইহা আমি রমণী ও তিনি রমণ বলিয়া নহে। কারণ তিনি যে পুরুষ, আর আমি যে নারী, তাহা আমি তখন কিছুই জানিতাম না ও বুঝিতাম না।" সুতরাং সামান্য সুন্দরী ও সুন্দরে যে প্রীতি, তাঁহার সহিত রাধার প্রীতি অনেক বিভিন্ন। পুরুষ যে স্ত্রীলোকের ও স্ত্রীলোক যে পুরুষের সুখের সামগ্রী, শ্রীমতী তখন তাহা কিছুই জানিতেন না। সুতরাং এই যে প্রীতি হইল, ইহার কোনো হেতু পাওয়া যায় না, তাই ইহাকে বলে "অহেতুক প্রেম।"

শ্রীমতী বলিতেছেন, "সখি! দুই জনের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার করিবার জন্য মধ্যস্থ একজন দূতী থাকে। সে পরস্পরে পরিচয় করিয়া দেয়, আর পরস্পরে প্রীতিবর্ধনের সহায়তা

করে।" অর্থাৎ "অমুক তোমাকে দর্শনাবধি তোমার বিরহে মৃতবৎ আছেন,—এইরূপ বলিয়া পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবর্ধন করিয়া দেয়। কিন্তু শ্রীমতী বলিতেছেন, "আমরা পরস্পরে দর্শনাবধি অধীর হইলাম, এবং আমাদের প্রীতি আপনাপনি বাড়িতে লাগিল—দূতীর প্রয়োজন হইল না। আমাদের দৌত্য করিল কেবল 'পাঁচ বাণ।' এই 'পাঁচ বাণ' অর্থ—পরস্পরের লোভ। এ "পাঁচ বাণ" কাম নয়, যেহেতু শ্রীমতী জানেন না যে, তিনি স্ত্রী ও শ্যাম পুরুষ। এইরূপ প্রীতি মনুষ্যে সম্ভবে না, যেহেতু আমরা অপূর্ণ অর্থাৎ পরিবর্ধনশীল। এরূপ প্রীতি কেবল সম্ভব শ্রীমতী রাধার। তিনি কে? না,—শ্রীভগবান্ পুরুষ ও প্রকৃতি সম্মিলিত আর রাধা তাঁহার প্রকৃতি-অংশ। অতএব শ্রীভগবানকে দুই ভাগ, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি করিয়া, সাধক তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা-রূপে সম্মুখে রাখিলেন; রাখিয়া এই অকৈতব প্রীতির খেলা খেলাইতে লাগিলেন।

"কান্তভাবে" গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে সতিত প্রত্যক্ষ-বিহার করেন, কিন্তু "পরকীয়ভাবে" তাঁহারা পরোক্ষ-বিহার করেন,—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রীতির যে খেলা, তাই যোজকতা করিবার একজন হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহারা আপনারা বিহার করেন না,—রাধাকৃষ্ণের বিহার করাইয়া আনন্দ ভোগ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার যে প্রীতি, উহা জীবে সম্ভবে না। সে এত গাঢ়, এত পবিত্র, এত সূক্ষ্ম, এত মধুর, যে জীবে উহা প্রত্যক্ষ ভোগ করিবার শক্তি ধরে না। অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা-রস আস্বাদ করিয়া জীব ক্রমে প্রীতিরূপ পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রাপ্ত হয়, এবং ইহা পাইয়া ব্রহ্মত্ব ও ইন্দ্রত্ব পর্যন্ত তুচ্ছ করে।

হে তত্ত্বকথা! তুমি সূর্যের ন্যায় অতি বৃহৎ ও তেজস্কর বস্তু, তোমাকে আমি লাগ পাই না। আমি ক্ষুদ্র, তোমার তেজ সহিতে পারি না। তুমি এখন আমাকে বিদায় দাও, আমি প্রভুর লীলারূপ সুধা-সাগরে প্রবেশ করিয়া আমার তাপিত অঙ্গ শীতল করি।*

আমি ক্ষুদ্র-বুদ্ধি, তত্ত্বকথা সমুদয় বুঝি না। যাহা একটু বুঝি, তাহাও সমুদয় এখানে বলিতে পারিলাম না, যেহেতু সকল কথা ভাষায় কুলায় না। যাঁহারা এ বিষয়ে রসিক তাঁহারা শ্রীগোস্বামীগণের গ্রন্থ পড়িবেন।

সেদিনকার কথা, তখন আমি দিগম্বর শিশু ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। বৃদ্ধ যে হইয়াছি, তাহা সকল সময় বুঝিতে পারি না। লোকে বলে তাই শুনি, কি দর্পণে মুখ দেখিয়া বুঝি, কি আপনার শারীরিক দৌর্বল্য দেখিয়া কতক জানিতে পাই। শিশুকাল হইতে মনে যে সকল সাধের সৃষ্টি হইয়াছে, সে সাধগুলি সব আছে, একটিও যায় নাই। এখনও ইচ্ছা করে বালকের ন্যায় খেলা করি। তবে দেহে শক্তি নাই বলিয়া পারি না, কি লোকে হাসিবে তাই করি না। লোকে যাহাই বলুক, তবে দেখিতেছি যে, আমি ক্রমেই যেন শিশু হইতেছি, ক্রমেই যেন আমার সাধ ও চাঞ্চল্য বাড়িয়া যাইতেছে। শুনিতে পাই যে, বার্দ্ধক্যের সঙ্গে অন্তরেন্দ্রিয় সকল জড়বৎ হয়; কিন্তু আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। তবে বিলাস-রূপ যে সুখ, তাহা ভোগ করিবার শক্তি এখন নাই।

একদিন প্রাচীরের গায়ে এই কয়েকটি কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, যথা—"হে ঐশ্বর্য! হে ইন্দ্রিয়সুখ! আমি তোমাদের পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, সুখ তোমাদের নিকট নাই। ধন জন যাহা যাহা বিষয়-জগতে প্রয়োজন, সমস্তই পাইয়াছি। দরিদ্র ছিলাম, ধনশালী হইয়াছি; নগণ্য ছিলাম, প্রতিষ্ঠা পাইয়াছি; প্রণয়ের বস্তু পাইয়াছি, ও সাধ্যমত ভালবাসিয়াছি, আবার সেইরূপ ভালবাসাও পাইয়াছি;—তবু সাধ মিটে নাই। যথেষ্ট অর্থ করায়ত্ত করিয়া

* এই অধ্যায়ের শেষ কয়েক পৃষ্ঠা আমি আমার নিজ-জনের নিমিত্ত লিখিলাম। বহিরঙ্গ লোক ইচ্ছা করিলে এই কয়েক পাতা না পড়িয়া উল্টাইয়া যাইবেন।

সন্তানকে ক্রোড়ে ও প্রণয়িনীকে হৃদয়ে করিয়া, ভ্রাতার গলা ধরিয়া, আনন্দভোগ কি শান্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সাধ মিটে নাই, ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এ সাধটা কি? আর এই যে দিবানিশি প্রাণ কান্দিতেছে,—এ কেন, কাহার জন্য?

এখন বুঝিতেছি, যদি জগতের,—এমন কি ইন্দ্রলোকের বা ব্রহ্মালোকের কর্তৃত্ব পাই, তবু আমার সাধ মিটিবে না, তৃপ্তি হইবে না,—তবু প্রাণ হা হুতাশ করিবে। কোথা যাব? কার কাছে যাব? কি করিব? কিসে প্রাণ জুড়াবে? এই হা হুতাশ কিছুতেই যাইতেছে না, বরং ক্রমেই বাড়িতেছে। আবার এই তাপ কেন, তাহাও বুঝিতে পারি না। কত দিন চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি না, কেন আমার এইরূপ দশা।

এই মাত্র বলিলাম, প্রণয়িনীকে হৃদয়ে করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। শুধু তাই নয়; প্রণয়িনীকে হৃদয়ে করিয়াই আগুন যেন শতগুণ জ্বলিয়া উঠিল;—কেন? কাহার জন্য? প্রণয়িনী অপেক্ষাও অধিক প্রণয়িনী আর কে? অতি-বড় অনেকগুলি শোক পাইয়াছি। এক একটি শোকে হৃদয়ে এক একটী গহ্বর খনন করিয়া রাখিয়াছে। আমার দাদা ও মেজদাদা এবং অন্যান্য পরলোকগত নিজ-জনের জন্য প্রাণ কান্দে; ইচ্ছা করে তাঁহাদের সহিত সঙ্গ করি। এমনও বোধহয় যে, তাঁহাদের যদি পাই, তবে এই দুঃখ যাইবে, আমি শীতল হইব। কিন্তু ক্রমে বুঝিয়াছি, সে আমার ভ্রম। তাঁহাদের এখন পাইলে আহ্লাদে মূর্চ্ছিত হইব সন্দেহ নাই, কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য; ক্রমে উহা ক্ষয় হইবে, আবার প্রাণ কান্দিয়া উঠিবে, আবার হা হুতাশ আরম্ভ হইবে।

মহাজনগণ রাসমণ্ডল এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"রাস-হাট পরে ছত্র শশধর ধরে রে! পবন চামর হয়ে মন্দ মন্দ বহে রে।।
চৌদিকে ফিরত দীপ—তারকার মালা। বটন হিল্লোলে দোলে নব ব্রজবালা।।
কোকিল কোটাল হয়ে কামেরে জাগায়। ভ্রমর ঝঙ্কার দিয়ে শ্যাম-গুণ গায়।।
ভ্রময়-হাটের বাদ্য, পসার যৌবন। গ্রাহক রসিকবর—মদনমোহন।।"

এখন ফাল্গুন মাস। মন্দ-মন্দ, বলপ্রদ, স্নিগ্ধকারী, সুগন্ধ বায়ু বহিতেছে। এ বায়ু আমার অঙ্গে বরাবর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় লাগে। শিমুলফুল ফুটিয়াছে, দেখিয়া বোধ হয় যেন প্রভাতে ভানু উদয় হইতেছে। উহা দেখিলে হৃদয়ে আনন্দ ডগমগ করিয়া উঠে। কিন্তু সে ক্ষণিক, পরক্ষণেই প্রাণ আবার অস্থির হইয়া পড়ে। তখন ভাবি যে, এ সুখ কাহার সহিত ভোগ করিব, আমার এ সুখের সাথী কে?

ফাল্গুন মাস আমার নিকট চিরদিন বিষমকাল। এই ফাল্গুন মাসে আমার পক্ষে সমুদয় যন্ত্রণাদায়ক। ফাল্গুন মাস আসিতেছে মনে করিলে আনন্দ হয়, কিন্তু আসিলে আনন্দ পাই না; আবার গত হইলে উহার কথা মনে করিয়া আনন্দ পাই। তাই বুঝিলাম, সম্ভোগে সুখ নাই; যদি কিছু থাকে, তবে সে পূর্বের সম্ভোগ স্মরণ করিয়া এবং ভবিষ্যৎ সম্ভোগের আশায়।

ফাল্গুন মাসে শিমূলফুল ফুটে। উহা দেখিলে মনে হয়, প্রভাতের ভানু যেন বৃক্ষের আড়াল দিয়ে উঠিতেছে। তখন আবার আম্র ও সজনা বৃক্ষ মুকুলিত হয়। কেন, কি জানি, পুষ্পে সুশোভিত সজনার গাছ দেখিলে আমার বোধ হয়, যেন একজন অতি প্রাচীন সাধু দাঁড়াইয়া আছেন। আবার মুকুলিত আম্র-বৃক্ষ দেখিলেই মনে হয়, যেন স্বয়ং ভগবতী জগৎকে আশীর্বাদ করিতেছেন। মাঠের দিকে সৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে দ্রোণপুষ্প ও জল-কল্মীফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। কল্মীফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, অথচ লতা প্রায় শুখাইয়া গিয়াছে। এ সমুদয় দেখি, আর প্রাণ আনচান করে, মনে হয় আমি প্রাণধনকে হারাইয়াছি। আবার জল-কল্মী অপেক্ষা স্থল-কল্মী আরো হৃদয়ভেদী। উহা আমি দেখিতে পারি না। শ্রীবৈষ্ণবগণ, কীর্তনে

শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও ভঙ্গি বর্ণনা করিতে গিয়া এই বলিয়া আখর দেন;—"ইহাতে কি অবলা বাঁচে?" প্রকৃতই স্থল-কল্‌মী দেখিলে জীব বাঁচে না। একটি যাত্রার গীত এই বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে,—

"বসন্ত-কাল সুখের কাল, সুখের কপাল নয়।
মনসুখে সারী শুকে, সুখেরী মিলন হয়।।"

এই গীতটি মনে করিলে আমার হৃদয় দ্রব হয়। বসন্তকাল সুখের কাল বটে, কিন্তু একাকিনী বিরহিণী ও বিয়োগিনীদের পক্ষে ইহা বিষমকাল। দেখ, ভাটীর ফুল ফুটিয়া দিক্ আলোকিত ও আমোদিত করিয়াছে, আর মধুমক্ষিকারা মধুপানে মত্ত হইয়া পুষ্পের সহিত বিহার করিতেছে। আবার "ফটিক-জল" পক্ষী দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু তা'র স্বরে অবলার প্রাণ বাঁচে না। সেই সঙ্গে হরিদ্রা-পাখী ও কোকিল ডাকিতেছে। উহারা বসন্তরাজার সেনা, সকলে একই সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের সহায় হইল আম্রমুকুল এবং নেবু ও ভাটী প্রভৃতি বন-ফুলের গন্ধ। ইহারা সকলেই "কাম জাগাইবার কোটাল।" ইহারা বিরহিণীর হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়া দেয়, তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারে। একটি শ্লোক আছে তাহার অর্থ এই যে, কোকিলের ডাক শুনিয়া বিরহিণী "জৈমিনী ভারতী" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। মেঘগর্জন করিলে বজ্র-ভয় নিবারণের জন্য লোকে "জৈমিনী ভারতী" নাম লইয়া থাকে। বিরহিণীর কর্ণে কোকিলের ডাক বজ্রাঘাতের ন্যায় লাগে, তাই ঐ নাম ধরিয়া ডাকেন। পূর্বে আমি এই শ্লোকটি একটি কবিতা মাত্র ভাবিতাম, কিন্তু এখন আর সেরূপ বোধ হয় না। কোকিলের ডাক শুনিলে আমি "জৈমিনী ভারতী" বলিয়া উঠি না বটে, কিন্তু ঐ স্বর বাণের ন্যায় হৃদয়ে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে, আমার শরীর শিহরিয়া উঠে, আর আমি অতিশয় কাতর হইয়া পড়ি।

চণ্ডীদাসের নিম্নলিখিত পদটির ন্যায় গীত আমি আর কখনও শুনি নাই। এটি গোলক-চ্যুত সতেজ সুধা-চক্র। ইহা গান করিয়া আমি কত দিন নয়ন-জল ফেলিয়াছি। গীতটি এখন শ্রবণ করুন—

নিকুঞ্জ মন্দিরে, ফুলের বাগান, কি সুখ লাগিয়া রুনু।
মধু খাই খাই, ভোমরা মাতিল, বিরহ জ্বালাতে মনু।।
জাতি রুইনু, জুতি রুইনু, রুইনু গন্ধ-মালতী।
ফুলের সুভাসে, নিদ্রা নাহি আসে, কঠিন পুরুষ জাতি।।
কুসুম তুলিয়া, বোঁটা ফেলি দিয়া, শেজ বিছাইনু কেনে।
যদি শুই তায়, কাঁটা বিন্ধে গায়, কালিয়া নাগর বিনে।।
রতন মন্দিরে, সখীর সহিত, তা সঙ্গে করিনু প্রেম।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি, যেন দরিদ্রের হেম।।"

চণ্ডীদাস বলিতেছেন, কৃষ্ণবিরহিণীর অবস্থা। কিন্তু আমি ত কৃষ্ণকে চিনি না, তাঁহাকে প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে দেখি নাই তাঁহার সহিত পরিচয় নাই, তাঁহাকে খুঁজি নাই, তবে তাঁহার জন্য কেন বিরহিণী হইব? তাঁহার জন্য কেন প্রাণ কান্দিবে?—তবে তিনি কেন আমার সেই হারাধন,—সেই হা হুতাশের কারণ হইবেন? বিশেষতঃ আমার যে অবস্থা, প্রায় জীবমাত্রেরই এইরূপ,—কাহার অধিক, কাহার-বা অল্প। কেহ সংসারের কার্যে বিব্রত থাকায় এই মহাআগুনের তত্ত্ব লইতে পারেন না, কেহ-বা নানা উপায়ে এই অগ্নিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছেন, এই মাত্র। কিন্তু অবস্থা সকলেরই এক, সকলেই ধনহারা হইয়া আমারি মতো হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন। তাই বুঝিলাম, এই সংসারে কোকিল প্রভৃতি "কোটাল হইয়া কামকে জাগাইতে" থাকে, আর এ সংসারে এমন কিছু নাই যাহাতে উহা নির্বাণ

করিতে পারে। শিশুকাল হইতে শত সহস্র বাসনা সৃষ্টি হইতেছে, ক্রমে উহা পরিবর্তিত ও মার্জিত হইয়া মনাগুণ বাড়িতেছে, আর উহা শত-সহস্র পৃথক-পৃথক শিখাকারে হৃদয়ে জ্বলিতেছে; যত শুভ ও সুন্দর দর্শনে এই মনাগুণকে উদ্রেক করে। এই কাম আর কোথাও নির্বাপিত হইবে না। এই ব্যাধির এক মাত্র ঔষধ সেই চরমগতি,—শ্রীভগবানের পাদপদ্ম। শ্রীকৃষ্ণ পরিণামে জীবকে শীতল করিবেন, তাই তাহাদের হৃদয়ে শত সহস্র শিখা সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

এইরূপে রাজা রামানন্দ রায় সন্ধ্যার সময় আসিয়া প্রভুর সহিত সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণ-কথায় যাপন করেন, এবং প্রত্যূষে বাড়ী ফিরিয়া যান। রামানন্দ ক্রমেই প্রেমে উন্মত্ত হইতেছেন, আর প্রভু সম্বন্ধে তাঁহার মনে ক্রমেই ধান্দা লাগিতেছে। রামরায় একদিন বলিলেন, "স্বামিন্! আমার বলিতে ভয় করে, আপনি দিন দশেক এখানে থাকুন। যখন আমাকে কৃপা করিতে এখানে আসিয়াছেন, তখন কিছু দিন না থাকিলে আমার দুষ্ট মন শোধিত হইবে না।" প্রভু বলিলেন, "তুমি বল কি? দশ দিন কেন, আমি যতদিন বাঁচিব, তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিব না। তোমরা মহিমা শুনিয়া আমি তোমার নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে আসিয়াছিলাম। তাহা যেমন শুনিয়াছিলাম, তেমনিই দেখিলাম। কৃষ্ণ-কথা শুনাইয়া তুমি আমার মন শুদ্ধ করিল। এখন নীলাচলে চল, সেখানে তোমায় আমায় কৃষ্ণ-কথায় সুখে কাটাইব।" আবার সন্ধ্যার সময় রামরায় আসিলেন। এইরূপে ক্রমেই প্রেমের হিল্লোল বড়িতেছে, ক্রমেই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম তত্ত্বের বিচার হইতেছে, ক্রমেই রামরায় আর একরূপ হইয়া যাইতেছেন,—ক্রমেই তিনি বিহ্বল হইতেছেন। নিশাভাগে প্রভুর সহিত কৃষ্ণ-কথায় যাপন করেন, আর দিবাভাগে চিরদিনের নিয়মানুসারে পূজা করেন। পূজা আর কিছু নয়,—ধ্যান করেন, আর ধ্যানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের তাঁহার প্রতি কৃপাও সেইরূপ। রামরায় ধ্যান করিতে বসিলেন, অমনি শ্রীবৃন্দাবন আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন;—শুধু বৃন্দাবন নয়, বৃন্দাবনের পরিকর সহিত স্বয়ং শ্রীরাধাকৃষ্ণ আসিলেন। রামরায় এইরূপ একদিন ধ্যান করিতেছেন, নয়ন হইতে আনন্দের ধারা পড়িতেছে, এমন সময় শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ইহাতে রামরায় বড় ব্যাকুলিত হইলেন। যাহারা ধ্যান-সুখের মাঝে এইরূপ বঞ্চিত হয়েন, তাহাদের দুঃখের অবধি থাকে না। রামরায় ব্যাকুলিত হইয়া হৃদয়-বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে তল্লাস করিতে লাগিলেন;—করিতে করিতে আবার রাধাকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহার পরে অতি আশ্চর্য একটি কাণ্ড দেখিলেন। দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে রাধার অঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে কৃষ্ণ একেবারে লুকাইলেন। রহিলেন কে, না—একজন অতি গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী! দেখিলেন যে, সন্ন্যাসিটী আর কেহ নন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাধার অঙ্গ দ্বারা আবৃত! তাহার পরে দেখিলেন যে, যে সন্ন্যাসী আসিয়াছেন ও যাঁহার সহিত তিনি এখন প্রত্যেক নিশি যাপন করিতেছেন, ইনি সেই সন্ন্যাসী।

রামরায়ের এ সমুদয় কিছু ভাল লাগিতেছে না। তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণ খুঁজিতেছিলেন, তাই খুঁজিতে লাগিলেন। আর সন্ন্যাসীকে উহার হৃদয় হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর রূপ ক্রমেই ফুটিতে লাগিল, ক্রমেই তিনি তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসিতে লাগিলেন। তখন রামরায় অতি ব্যাকুলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, যথা, চৈতন্য-মঙ্গল গীতে—

"আজ এ কি হলো আমার হৃদয় মাঝার। জাগে গোরা-রূপ খানি অতি মনোহর।।
ধ্যান করি চিরদিন কালিয়া বরণ। কাল বহি নাহি জানি, না দেখে নয়ন।।
গোপ-বেশ বেণুকর নবীন-কিশোর। কোথা লুকাইল আজ শ্যাম নটবর।।"

কিন্তু গৌররূপ গেলেন না, তাঁহার প্রতি সজল নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

"ধ্যান করে কৃষ্ণ, রাজা দেখে গৌরচন্দ্র। পুনরপি ধ্যান করে, জপে মহামন্ত্র।।
পুনরপি গৌররূপ দেখয়ে নয়নে। কি হৈল কি হৈল বলি গণে মনে মনে।।
পুনরপি ধ্যান করে সুস্থির হিয়ায়। পুনরপি গৌরচন্দ্র হিয়ার মাঝায়।।"

রামরায় তখন বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণ রাধা-অঙ্গ গ্রহণ করিয়া, সন্ন্যাসী হইয়া, জীবকে হরিনাম বিতরণ করিতে ও তাঁহাকে দর্শন দিতে আসিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, যথা, (চৈতন্য-চরিতামৃতে)—"অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়। বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হিয়ায়।।"

তখন তিনি বুঝিলেন, নবীন-সন্ন্যাসী মুখে কিছু না বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। রামরায় তখন আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং সন্ধ্যা হইলে দ্রুতগমনে যাইয়া প্রভুকে বলিতেছেন, যথা,—

কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব সার। রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার।।
এই তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন। ব্রহ্মাকে বেদ যেন পড়াইয়া নারায়ণ।।
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়। বাহিরে না কেহ বস্তু প্রকাশে হৃদয়।।

রামরায় বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি আমার মুখ দিয়া যত তত্ত্ব প্রকাশ করিলে, ইহার কিছুই আমি জানিতাম না। ইহাতে বুঝিলাম যে,—তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া এ সমুদয় নিগূঢ় কথা প্রকাশ করিলে। ইহাতে আমার বোধ হয় তুমি সেই অন্তর্যামী ঈশ্বর। এ সম্বন্ধে আরও গুহ্য কথা বলিতেছি। আমি প্রথমে যখন দেখি তখন তোমাকে একজন সন্ন্যাসী মাত্র ভারিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বোধ হইতেছে, তুমি আমার শ্যামসুন্দর। আবার ভাবি তবে তোমার বর্ণ কাঁচা সোনার মত কেন? তখন মনে হয়, তুমি শ্রীমতী রাধা। কিন্তু শেষে স্থির করিয়াছি,—তুমি শ্যামসুন্দর, শ্রীমতী রাধার অঙ্গ দ্বারা আপনার রূপ ঢাকিয়া জগতে বিচরণ করিতেছ।"

প্রভু বলিলেন, "তুমি যে এরূপ বলিবে তাহাতে বিচিত্র কি? শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের ধর্মই এই। যাঁহাদের এই কৃষ্ণ-প্রেমে আছে, তাঁহারা চতুর্দিকে কৃষ্ণময় দেখেন। তুমি যে আমাকে রাধাকৃষ্ণ ভাবিবে এ বিচিত্র কি? স্থাবর জঙ্গমও তোমার নিকট রাধাকৃষ্ণ বলিয়া ভ্রম হইবে।"

রামরায় তখন গদ্‌গদভাবে বলিতেছেন, "প্রভু! এই জঙ্গলময় দেশে, বিষয়কার্য লইয়া বিব্রত ছিলাম। কৃপা করিবার জন্য তুমি তল্লাস করিয়া আমাকে বাহির করিলে; এখন আমাকে বঞ্চনা করিতেছ! প্রভু, এ কি তোমার উচিত?" শ্রীভক্তগণ শ্রীভগবানকে এরূপ ধমকাইয়া কথা বলেন, আর শ্রীভগবানের নিকট অন্যের স্তুতি ও চাটুবাক্য অপেক্ষা ভক্তের তিরস্কার অনন্ত গুণ মধুর লাগে। এই ধমক খাইয়া, (যথা চরিতামৃতে)

"তবে প্রভু হাসি তারে দেখাল স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ।।
দেখি রামানন্দ হৈল আনন্দে মূর্চ্ছিত।।"

প্রভু গাত্রে হস্ত বুলাইয়া তাঁহাকে চেতন করাইলেন। বিদ্যানগরে প্রভুর কার্য শেষ হইল। তখন তিনি বিদায় মাগিলেন এবং রামরায়কে বিষয় ত্যাগ করিয়া নীলাচলে যাইতে বলিলেন। কিন্তু ওরূপ আজ্ঞার আর প্রয়োজন হইল না। রামরায় তখন প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন, বিষয়-কার্য করিবার আর তাঁহার ক্ষমতা রহিল না। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "যাবৎ আমি দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া না আসি, তাবৎ তুমি এখানে থাকিও।" রামরায়, প্রভু প্রত্যাগমন করিবেন সেই আশায় বিদ্যানগরে প্রভুর পথ চাহিয়া রহিলেন। প্রভু দক্ষিণ-দেশে চলিয়া গেলে রামরায় মূর্চ্ছিত হইলেন; আর বিদ্যানগরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। প্রভু সেই নগরে দশ দিবস বাস করায় সমস্ত নগরবাসী প্রেম ও ভক্তির তরঙ্গে ডুবিয়া গিয়াছিল, আর শ্রীমহাপ্রভুকে একেবারে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিল। তাহারাও রাজার সহিত শোকে অভিভূত হইল। এইরূপে প্রভু একেবারে গৌড়ীয় ভক্তগণের নয়নের অদর্শন হইলেন।

ও দিকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের কথা পাঠক স্মরণ করুন। প্রভু আলালনাথে ভক্তদিগকে ফেলিয়া গমন করিলে, তাঁহারা অচেতন হইয়া সারাদিন-রাত্রি পড়িয়া রহিলেন। পরদিবস প্রভাতে প্রভুর আজ্ঞাক্রমে ধীরে-ধীরে শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করিলেন। যে প্রভুর নিমিত্ত তাঁহারা সমুদয় ত্যাগ করিয়াছেন, সেই প্রভু তাঁহাদিগকে এখন ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা শ্রীক্ষেত্রে মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। আর তাঁহাদের গরব নাই, তেজ নাই, এমন কি চেতন যে আছে তাহাও সব সময় বোধ হয় না। তাঁহারা জীবনধারণের নিমিত্ত আহার করেন, কয়েক জন বসিয়া একচিত্ত হইয়া প্রভুর কথা বলেন, গলাগলি হইয়া রোদন করেন, রাত্রে প্রভুকে স্বপন দেখেন। এইরূপে দক্ষিণ-মুখে চাহিয়া সকলে নিশি-দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

সার্বভৌম রোদন করিয়া তখন অন্যরূপ ধারণ করিয়াছেন। যখন বড় দুঃখ বোধ হয়, তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে প্রভুর কথা আলোচনা করিয়া মনকে সান্ত্বনা করেন। সৌভাগ্য অন্তর্ধান না হইলে তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে না। প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিলেই, তাঁহার মহিমা সূর্যের ন্যায় ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে এই সমুদয় কথার সৃষ্টি হইতে লাগিল;—যথা, শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসীরূপে বিচরণ করিতে নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন; তিনি সার্বভৌমকে কৃপা করিয়া এখন আবার অদর্শন হইয়াছেন। তখন নীলাচলবাসী ভক্ত ও অভক্ত সকলেই সার্বভৌমকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের আবেদন এই যে, প্রভুকে তাঁহারা দেখিবেন। সার্বভৌম তাঁহাদিগকে ইহাই বলিয়া সান্ত্বনা করিয়া বিদায় করিলেন যে, প্রভু দক্ষিণদেশে গমন করিয়াছেন, সত্বর আসিবেন; আসিলেই তাঁহাদের সহিত মিলাইয়া দিবেন। ক্রমে এই কথা মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কর্ণে গেল। তখন তিনি সার্বভৌমকে আহ্বান করিয়া, কটক হইতে পুরীতে দূত পাঠাইলেন। সার্বভৌম রাজার আজ্ঞা শুনিয়া একটু বিস্ময়াবিষ্ট ও চিন্তিত হইলেন; ভাবিতে লাগিলেন যে, অসময়ে রাজা তাঁহাকে কেন ডাকিলেন? মহারাজ প্রতাপরুদ্র দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত। তখন হিন্দুদিগের মধ্যে তিনিই কেবল মুসলমানগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন ও যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছেন। স্বয়ং রাজপুত; আবার রাজপুতদিগের শ্রী, পদ ও মর্যাদা তখন তিনিই কেবল রক্ষা করিতেছেন। মুসলমানগণ তাঁহাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছেন; কাজেই আত্মরক্ষার নিমিত্ত তিনি দিবানিশি সৈন্য লইয়া যুদ্ধ কার্যে ব্যস্ত। তিনি ডাকিতেছেন, কাজেই সার্বভৌমের ভয়ও হইল।

সার্বভৌম উৎকণ্ঠিত চিত্তে দ্রুতগতিতে কটক গমন করিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া সহাস্যে সম্ভাষণ ও প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন। সার্বভৌম আশ্বস্ত হইয়া বসিলেন। তখন রাজা বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য! আমি শুনিলাম, এক মহাশয় নাকি নীলাচলে আগমন করিয়াছেন, আর তিনি নাকি বড় প্রতাপান্বিত; এমন কি, অনেকে তাঁহাকে স্বয়ং জগন্নাথ বলিয়া বিশ্বাস করে। তিনি নাকি তোমাকে বড় কৃপা করিয়াছেন। তাই তোমাকে ডাকাইলাম। তুমি তাঁহার সমুদয় কথা বল, আমি শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি।" সার্বভৌম বলিলেন, "মহারাজ যাহা শুনিয়াছেন, সে সমুদয় ঠিক। তিনি অতি মহাশয়, তাই আমাকে কাঙ্গাল দেখিয়া আমার দুষ্টমন শোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "বটে! তবে তুমি একবার তাঁহাকে আমাকে দেখাও।" সার্বভৌম দেখিলেন, রাজার যেরূপ ভাব তাহাতে যেন তিনি আজ্ঞা দিয়া প্রভুকে কটকে লইয়া আসিবেন। তাই তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন, "মহারাজ, আপনি যাহা শুনিয়াছেন সমুদয় সত্য। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী, নির্জ্জনে ভজন করেন; রাজদর্শনে সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। তিনি প্রাণ গেলেও যে তাঁহার ধর্ম নষ্ট করিবেন তাহা বোধ হয় না।" ইহাতে

রাজা বলিলেন, "সে কি! তোমরা সকলে উদ্ধার হইয়া যাইবে, কেবল আমি রাজা বলিয়া উদ্ধার হইতে পারিব না?"

সার্বভৌম; তিনি কৃপাময়, মহারাজকে দর্শন দিলেও দিতে পারেন; আমি সে চেষ্টাও করিতাম, কিন্তু সম্প্রতি তিনি দক্ষিণদেশে তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন।

রাজা। শ্রীক্ষেত্র অপেক্ষা বড় তীর্থ আবার কোথায়? ক্ষেত্রে আসিয়া আবার তাঁহার তীর্থদর্শন করিবার প্রয়োজন কি ছিল?

সার্বভৌম। তাঁহার নিজের কিছু প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু জীবের কুকর্মের নিমিত্ত তীর্থস্থান কলুষিত ও নিস্তেজ হয়। তাই মহাজনগণ সেখানে যাইয়া উহা পবিত্র করিয়া থাকেন।

রাজা। তুমি তাঁহাকে যাইতে দিলে কেন? বুঝাইয়া পড়াইয়া রাখিলে না কেন? তাহা হইলে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম।

সার্বভৌম। তার ত্রুটি করি নাই। তবে তিনি স্বতন্ত্র, তাঁহাকে বাধ্য করিতে পারিলাম না।

রাজা। তুমি কেন খুব জিদ করিয়া ধরিলে না?

সার্বভৌম। আমি কোনও অংশে ত্রুটি করি নাই। তাঁহার পা ধরিয়া রোদন করিয়াছি, তাঁহার সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ করিতে চাহিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে রাখিতে পারিলাম না। যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, ত্রিলোকের মধ্যে কাহারও তিনি বাধ্য নহেন।

রাজা। (বিস্ময়ের সহিত) স্বতন্ত্র ঈশ্বর! সামান্য লোকের মুখে এ কথা শুনিয়াছি, তুমিও কি তাঁহাকে শ্রীভগবান বল না কি?

সার্বভৌম। আমি মন্দমতি, তর্কনিষ্ঠ, তাঁহাকে পূর্বে চিনিতে পারি নাই। এখন তিনি, আমার দুর্দশা দেখিয়া, আমার প্রতি কৃপার্ত হইয়া, আমাকে তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন।

রাজা। তিনি শ্রীভগবান আর আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিলাম না? তুমি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ। তুমি দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিতেছ, সেখানে আর আমার সন্দেহ হয় না। তবে আমি শ্রীভগবানকে পাইয়া দেখিতে পাইলাম না?

সার্বভৌম। তিনি আবার আসিবেন, এমন কি, শ্রীক্ষেত্রে বাসও করিবেন। অতএব মহারাজ ব্যগ্র হইবেন না। যখন আপনার স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তখন অবশ্য আপনাকে দর্শন দিবেন।

কথা এই যে, শ্রীভগবান আসিয়া তাঁহাকে দেখা না দিয়া গিয়াছেন, ইহাতে জীবমাত্রেরই ক্ষোভ হইতে পারে, প্রতাপরুদ্রের ত' হইবারই কথা। যেহেতু তিনি রাজা, সকল বিষয়ে অগ্রভাগ তাঁহার। তাঁহার মনোদুঃখ দেখিয়া সার্বভৌম রাজাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি আসিবেন, আর শ্রীক্ষেত্রে থাকিবেন। রাজাকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত আর একটি কথা উঠাইলেন। বলিতেছেন, "মহারাজ! শ্রীভগবান ত সত্বরই প্রত্যাগমন করিবেন, কবে আসিবেন নিশ্চয়তা নাই। তাঁহার থাকিবার একটি বাসস্থান চাই। এমন বাসা চাই যে, সেখানে অনেক স্থান থাকে, এবং উহা নির্জন ও মন্দিরের অতি নিকট হয়।"

রাজা ইহাতে প্রভুর একটু উপকার করিবার সুবিধা পাইয়া, সহর্ষে বলিতেছেন, "তাহার ভাবনা কি? ভাল বাসাই দেওয়া যাইবে। আমার বোধ হয় কাশীমিশ্রের বাটী দিলে হইতে পারে।" সার্বভৌম এই বাসার কথা শুনিয়া মনের সহিত অনুমোদন করিলেন। অতএব প্রভু প্রত্যাগমন করিলে কাশীমিশ্রের বাড়ী থাকিবেন সাব্যস্ত হইল। কাশীমিশ্র রাজার গুরু।

তারপর রাজা সার্বভৌমের নিকট প্রভুর গুণ-চরিত্র শুনিতে লাগিলেন। রাজা, শ্রীমতী রাধার ন্যায়, সার্বভৌম-রূপ যে ভাট, তাঁহার মুখে প্রভুর কথা শুনিয়া তাঁহাকে না দেখিয়াই, চিত্ত ও মনের অধিকাংশ তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন।

এ দিকে প্রভু "কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং" বলিয়া দক্ষিণদেশের জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের সহ বৌদ্ধচার্য, জৈনাচার্য, শঙ্করাচার্য, শৈব্যাচার্য প্রভৃতি যত প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের আচার্যগণের মিলন হইল। মুসলমানদিগের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষের কি অবস্থা ছিল, তাহা দাক্ষিণাত্য দর্শনে জানা যাইত। মুসলমানগণ সে দেশে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সুতরাং দক্ষিণদেশে মারামারি কাটাকাটি নাই; সেখানে কেবল ধর্মচর্চা, আর ইহা ভদ্রলোকের কেবল এক মাত্র কার্য্য। প্রভুর এইরূপ ভ্রমণ করিতে প্রায় দুই বৎসর গেল। দ্বারকা যাইবার পথে, কুলিনগ্রাম নিবাসী রামানন্দ বসুর সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। তিনি প্রভুকে পূর্বে দর্শন করেন নাই, নাম শুনিয়াছিলেন মাত্র। এখন তীর্থভ্রমণের ফলস্বরূপ প্রভুকে পাইবামাত্র, তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া, তাঁহার সহিত বহিয়া গেলেন ও নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বসু রামানন্দের একটী গীতের ভণিতা শ্রবণ করুন—

"বসু রামানন্দের বাণী, দিবা নিশি নাহি জানি,
গৌর আমায় পাগল কৈলে।"

প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণকাহিনী পরে লেখা হইবে। শুদ্ধ সেই লীলাই এক বৃহৎ গ্রন্থের ব্যাপার।

প্রভু যেখানে গমন করেন, সেখানে আপনিই এই কথা প্রচার হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া লোকে ভক্তির শক্তিতে উন্মাদগ্রস্ত হয়; আর প্রভু সেখানে দুই একটি আচার্য সৃষ্টি করিয়া অন্য স্থানে গমন করেন। এই আচার্য-সৃষ্টির মধ্যে একটি রহস্য আছে। তিনি দক্ষিণ-দেশে, যখন যেখানে যাইতেছেন, সেখানেই কোন বিশেষ ধর্মের সর্বপ্রধান আচার্যকে ধরিতেছেন ও তাঁহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাকেই শ্রীবৈষ্ণবধর্ম প্রচার কবিবার জন্য নিযুক্ত করিতেছেন। আর এক অদ্ভুত কথা স্মরণ করুন। প্রভু যেখানে যাইতেছেন, সেই স্থানে এক একটি চিরস্মরণীয় কীর্তি স্থাপিত হইতেছে। সৌরাস্ট্রে প্রভু যে বটবৃক্ষ তলে বসিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপিও লোকেরা দেখাইয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় আমি একটি প্রস্তাব লিখি, তাহা হইতে এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম;—শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত রামযাদব বাগচি মহাশয় দক্ষিণদেশে ইলোরার গহ্বর দেখিতে গমন করেন। এই গহ্বরের মধ্যে প্রাচীন নানাবিধ ভগ্নপ্রায় মন্দির আছে। এই স্থান অতি দুর্গম, বোম্বাই হইতে কয়েক দিবস দূরে। রামযাদব বাবু কষ্টেসৃষ্টে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সেখানে একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে, আর সন্ধ্যার সময় সেই মন্দিরে আরতি আরম্ভ হইল। এখানে আর এক কাণ্ড দেখিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি দেখিতেছেন যে সেই বিগ্রহের সম্মুখে আমাদের দেশীয় খোল-করতাল লইয়া কয়েকজন ওই দেশীয় বৈষ্ণব আমাদের সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। আমাদের সমকীর্তন বলার তাৎপর্য এই যে, যদিও সে সংকীর্তনের ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু তবু উহার আকৃতি ঠিক আমাদের সংকীর্তনের মত। রামযাদব বাবু আশ্চার্যান্বিত হইয়া শুনিতেছেন, এমন সময় সেই সংকীর্তনের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিলেন। ইহাতে তাঁহার শরীর বিস্ময়ে কাঁপিয়া উঠিল। এই নিবিড় জঙ্গলে, এই বহুদূরে, আমাদের সংকীর্তন, আর আমাদের নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ-কুমারটির নাম কিরূপে আসিল?—ইহা ভাবিতে ভাবিতে রামযাদব বাবু বিভোর হইলেন।

"কীর্তনান্তে বৈষ্ণবগণের নিকট ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন রামযাদব বাবুর এই সংকল্প হইল যে, ইহার তথ্য না জানিয়া তিনি যাইবেন না। এই উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে রহিয়া গেলেন, ও দুই দিবসের অনুসন্ধানের পরে একটি প্রাচীন বৈষ্ণবের দর্শন পাইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"তোমাদের বাড়ী যে বঙ্গদেশে, সেই বঙ্গদেশ হইতে এই খোল করতাল ও এই কীর্তন আসিয়াছে।" কিরূপে আসিল ইহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"তোমাদের দেশের যিনি চৈতন্যদেব, তিনি ঐ মন্দিরের সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন।"

পথে যাইতে যাইতে সেই ইলোরার মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিয়াছিলেন। সে প্রায় চারিশত বৎসরের কথা। আর সে কথা ও সে তরঙ্গ অদ্যাপি সেখানে আছে! একবার এই বিষয়টি অনুভব করুন, তবে বুঝিবেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ বস্তু। "এখানে তোমাদের চৈতন্য নৃত্য করিয়াছিলেন," বৈষ্ণব ইহাই বলিলেন। কেবল নৃত্য করিয়াছিলেন তাহাতেই সেখানে বৈষ্ণবধর্মের বীজ বপন করা হইল!

প্রভুর মস্তকে জটা, মুখে শ্মশ্রু, পরিধানে জীর্ণ কৌপিন। সেই অতি দীর্ঘ দেহ এখন ক্ষীণ হইয়াছে, সর্বাঙ্গ ধূলায় ধূসারিত, নয়ন প্রেমে ঢলঢল ও ঈষৎ লোহিৎ বর্ণ। প্রভুকে দর্শনমাত্র লোকের হৃদয় দ্রব হয়। প্রভু এই যে প্রায় দুই বৎসর দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিলেন, ইহার মধ্যে মাত্র এক দিবস শ্রীনবদ্বীপ স্মরণ করিয়াছিলেন। পুনা নগরের নিকট প্রভু বৃক্ষে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন, যেন জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীন ও কাঙ্গাল। তাঁহার ভৃত্য একটু দূরে বসিয়া। হঠাৎ প্রভুর শ্রীনবদ্বীপ মনে পড়িল। তখন রোদন করিতে লাগিলেন, আর অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কোথা আমার প্রাণ-প্রতিম মুরারি! কোথা নরহরি! তোমাদের না দেখিয়া বাঁচি না! কবে তোমাদিগকে আবার দেখিব!"

এ দিকে স্বপ্নবিলাসের কাহিনী মনে করুন্। শ্রীকৃষ্ণ গোপীর প্রেমঋণ শোধিতে পারিলেন না; বলিলেন,—"তোমরা অহেতুক এত প্রীতি করিয়া আমাকে চিরঋণের দায়ে আবদ্ধ করিয়াছ। আমি তোমাদিগকে কিছু দিলে তোমরা লইবে না, লইলেও আমার এমন কিছু নাই যাহাতে তোমাদের ঋণ শোধ হইতে পারে।" তাহাতে শ্রীমতী বলিলেন,—"সে ঋণ শোধ করা অধিক কথা নয়; তুমি তাহা অনায়াসে শোধিত পার। তুমি জীবকে যদি হরিনাম দাও, তবে আমি তোমাকে ঋণ হইতে খালাস দিব।"

শ্রীমতী যদিও কতক রহস্য-ভাবে এ কথা বলিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অমনি বলিলেন,—"তথাস্তু"; তাই শ্রীকৃষ্ণ একখানি "দাস-খত" লিখিয়া দেন। তাহাতে লেখা থাকে যে, তিনি কলিযুগে সন্ন্যাসী হইয়া দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ করিবেন। শ্রীভগবান এই কার্য করিয়া শ্রীমতীর ঋণ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, তাই গৌর-অবতার হইলেন। এই গেল স্বপ্নবিলাসের কথা। বাংলা দেশে কৃষ্ণকীর্তন ও কৃষ্ণযাত্রা হইয়া থাকে, তাহাতে সেই 'দাস-খত' খানি গীত হইয়া থাকে। সে দাস-খত এইরূপে লিখিত—

"ইয়াদি কৃত্য, গুণ সমুদ্র, সৎ সাধু শ্রীরাধা।
সচ্চরিত্র চরিতেষু, পুরাহ মনের সাধা।।
তস্য খাতক, হরি নায়ক, বসতি ব্রজপুরি।
অস্য কর্জ্জং পত্রমিদং, লিখিত সুকুমারী।।
তারিখস্য দ্বাপরস্য, পরিশোধ কলিযুগে।
এই কথায়ে, খথ লিখিনু, ইসাদি মঞ্জুরি ভাগে।।"

এখন উপরি-উক্ত কাহিনী অবলম্বন করিয়া মহাজনগণ যে পদ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন—

কেন্দে আকুল হলো গৌরহরি। বলে কোথা রাই-কিশোরী ।। ধ্রু।।
প্রেম-নয়নে দীনের পানে, চাও বারেক কৃপা করি।।
ছেঁড়া কাঁথা, করোয়া হাতে কেন্দে বেড়াই পথে পথে,
তোমারি নাম নিতে নিতে এসেছি আশা করি।। (খালাস হব বলে)

প্রভু এই ত্রিজগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীন হইয়া দক্ষিণে ভ্রমণ করিতেছেন। এদিকে এ কথা শ্রীনবদ্বীপে প্রকাশ হইল যে, নিমাই নীলাচল ত্যাগ করিয়া, একটি ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, দক্ষিণদেশে চলিয়া গিয়াছেন। তখন সমস্ত গৌড়দেশবাসী ঘোর বিয়োগে অভিভূত হইলেন। শ্রীনিমাই নীলাচল

বাস করিবেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন,—যত দিবস এরূপ সাব্যস্ত ছিল, তত দিবস লোকে এক প্রকার মনকে বুঝাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এখন এ কি কথা? নিমাই কোথায় গেলেন? তিনি একা গেলেন, তাঁহাকে রক্ষা কে করিবে! নিমাই কি আর ফিরিয়া আসিবেন!

যে নিমাই সর্বদা প্রেমে বিভোর, আহার না করাইয়া দিলে যিনি আহার করেন না। যাঁহাকে সাধ্যসাধনা না করিলে কৃষ্ণ-ভজন রাখিয়া শয়ন করেন না, তিনি এখন দূর ও জঙ্গলময় দেশে একাকী হাঁটিতেছেন। কে ভিক্ষা দিতেছে, কে রন্ধন করিতেছে, কোথা রাত্রি বাস করিতেছেন, এই ভীষণ রৌদ্র কিরূপে সহিতেছেন! যে নিমাইকে নয়নের উপর রাখিয়াও, ভয় হয় যে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে পদে পদে ব্যথা লাগিবে, তাহার এখন এই দশা! কাজেই নবদ্বীপে হাহাকার পড়িয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ জীবের পুরুষার্থের সীমা। এই কৃষ্ণ-বিরহ, প্রভু আপনি রাধা-ভাব ধারণ করিয়া জীবকে দেখাইলেন। আর এই কৃষ্ণ-বিরহ কিরূপ, তাহা তিনি নবদ্বীপে নিজ পরিকরগণ দ্বারা জীবকে দেখাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে ব্রজবাসীদের দশা যেরূপ হইয়াছিল, শ্রীনবদ্বীপবাসীদের দশা প্রকৃত তাহাই হইল। গৌরপরিকরগণ গোপগোপীর যে দশা তাহাই পাইলেন। কেহ দাস্য, কেহ সখ্য, কেহ বাৎসল্য, কেহ-বা মধুর-ভাবে অভিভূত হইয়া গৌরবিরহসাগরে ডুবিলেন।

শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ঘোর-বিয়োগে চেতনহারা হইলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার যদিও একটু চেতন থাকিল, শচী একেবারে পাগল হইলেন। তাঁহার মনে এই ভাব বসিয়া গেল যে, তিনি শ্রীমতী যশোদা, আর নিমাই তাঁহার কৃষ্ণ, এখন মথুরায় গিয়াছেন;—শচী সেই ভাবে বিভোর। যখন একটু চেতন হয়, তখন শ্রীনবদ্বীপে অভ্যাগত সাধুগণকে অন্বেষণ করেন;—কাহার নিকট লোক পাঠাইয়া দেন, কাহাকেও বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন। এই সমুদয় লোকের নিকট তাঁহার এক মাত্র প্রশ্ন, "নিমাই কি নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছে? নিমাইকে দেখিতে বড় সুন্দর, তাহার কচি বয়স, পরিধান কৌপীন, মুখে সর্বদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল, আর প্রেমে পাগলের মতো ঢুলে ঢুলে চলে।" যথা, একটি প্রাচীন পদ হইতে উদ্ধৃত—

"নীলাচলপুরে, গতায়াত করে, সন্ন্যাসী বৈরাগী যারা।
তাহা সবাকারে, কান্দিয়া শুধায়, শচী পাগলিনী-পারা।।
তোমরা কি এক সন্ন্যাসী দেখেছ? শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম, তাঁরে কি ভেটেছ?
বয়স নবীন, গলিত কাঞ্চন— জিনি, তনুখানি গোরা।
হরেকৃষ্ণ নাম, বোলয়ে সঘন, নয়নে গলয়ে ধারা।।"

তাহারা বলে, "না, দেখি নাই।"

শচী যখন অচেতন থাকেন, তখন নানা রঙ্গ করেন। কখন শ্রীবাসের বাড়ীতে নিমাইকে তল্লাস করিতে যান। কখন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা মথুরার সংবাদ বলিতে পার? কখন নিমাইয়ের নিমিত্ত রন্ধন করেন। কখন নিমাইকে বসিয়া খাওয়ান। লোকে দেখে যে, তিনি নিমাইকে খাওয়াইতেছেন, তাহার সহিত কথা কহিতেছেন, কিন্তু নিমাইকে কেহ দেখিতে পাইতেছেন না। কখন শচী রজ্জু লইয়া যশোদাভাবে রাগ করিয়া নিমাইকে বান্ধিতে যান, তখন সকলে যশোদার শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধনরূপ-লীলা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। আবার রাত্রিতে কখন শচী স্বপ্ন দেখিয়া "নিমাই নিমাই' বলিয়া কান্দিয়া উঠেন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘোর-বিয়োগ লোচনানন্দ ঠাকুর বর্ণনা করিয়াছেন, লোচন সেই বর্ণনা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে পড়িতে দিয়াছিলেন। এমন কি, কিংবদন্তী আছে যে, শ্রীমতী উহার দুই এক স্থান পরিবর্তনও করেন। লোচনদাসের সেই শ্রীমতীর বার-মাসের দুঃখ-বর্ণনা অর্থাৎ বারমাসিয়া শ্রবণ করুন, করিলে মন নির্মল হইবে। যথা—

১। ফাল্গুনে গৌরাঙ্গচাঁদে পূর্ণিমা-দিবসে। উদ্বর্তন-তৈলে স্নান করাব হরিষে।।
পিষ্টক পায়স আর ধূপ-দীপ গন্ধে। সংকীর্তন করাইব মনের আনন্দে।।
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ! তোমার জন্মতিথি পূজা।
আনন্দিত নবদ্বীপে বাল বৃদ্ধ যুবা।।

২। চৈত্রে চাতক পক্ষী পিউ পিউ ডাকে।
তাহা শুনি প্রাণ-কান্দে কি কহিব কাকে।।
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুহু।
তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা পাই মুহুর্মুহুঃ।।
পুষ্প-মধু খাই মত্ত ভ্রমরীরা বুলে।
তুমি দূরদেশে আমি গোঙাব কার কোলে।।
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ! আমি কি বলিতে জানি।
বিঁধাইল শরে যেন ব্যাকুল-হরিণী।।

৩। বৈশাখে চম্পকলতা নৌতুন গামছা। দিব্য-ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোঁচা।।
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কান্ধে।
সে রূপ না দেখি মুই জীব কোন ছাঁদে।।
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ! বিষম বৈশাখের রৌদ্র।
তোমা না দেখিয়া মোর বিরহ-সমুদ্র।।

৪। জ্যৈষ্ঠে প্রচণ্ড তাপ তপত সিকতা। কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পদাম্বুজ রাতা।।
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কান্দে নিশি দিন। ছটফট করে যেন জল বিনু মীন।।
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ! তোমার নিদারুণ হিয়া।
অনলে প্রবেশ করি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া।।

৫। আষাঢ়ে নৌতুন মেঘ দাদুরীর নাদে।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে।।
শুনিয়া মেঘের নাদ, ময়ূরীর নাট। কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট।।
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ! মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও।
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তি চাও।।

৬। শ্রাবণে গলিত-ধারা ঘন বিদ্যুল্লতা। কেমনে বঞ্চিব প্রভু, কারে কব কথা।।
লক্ষ্মীর বিলাস-ঘরে পালঙ্কে শয়ন। সে সব চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন।।
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ! তুমি বড় দয়াবান।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান।।

৭। ভাদ্রে ভাস্বত-তাপ সহনে না যায়। কাদম্বিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায়।।
যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে। হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্রাঘাত শিরে।।
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ! ভাদ্রের বিষম খরা।
প্রাণনাথ নাহি যার জীবন্তে সে মরা।।

৮। আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা দুর্গা-মহোৎসবে।
কান্ত বিনা যে দুঃখ তা কার প্রাণে সবে।।
শরৎ সময়ে যার নাথ নাহি ঘরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে।।
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ! মোরে কর উপদেশ।
জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ।।

৯। কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা।
কেমনে কৌপীন-বস্ত্রে আচ্ছাদিবা গা।।
কত ভাগ্য করি তোমার হৈযাছিলাম দাসী।
এবে অভাগিনী মুই হেন পাপ রাশি।।
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ! তুমি অন্তর-যামিনী।
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি।।
১০।অগ্রাণে নৌতুন ধান্য জগতে বিলাসে।
সর্ব সুখ ঘরে, প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে।।
পাটনেত ভোটে, প্রভু, শয়ন কম্বলে।
সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে।।
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ! তোমার সর্বজীবে দয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গা-চরণের ছায়া।।
১১।পৌষে প্রবল শীত জ্বলন্ত পাবকে।
কান্ত-আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক না থাকে।।
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূরদেশে।
বিরহ-অনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে।।
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে! পরবাস নাহি শোহে।
সংকীর্তন অধিক সন্ন্যাস-ধর্ম নহে।।
১২।মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নাবিব।
এই ত দারুণ শেল রহিল সম্প্রতি।
পৃথিবীতে না রহল তোমার সন্ততি।।
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ! মোরে লহ নিজ পাশ।
বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচনদাস।।

শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা এখানে আর অধিক বলিব না। তাঁহাদের বিরহ বর্ণনের স্থান আছে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রভু দুই বৎসর দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। এই দুই বৎসরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে এখানে বর্ণিত হইল।

প্রভু বিদ্যানগর হইতে ত্রিমল্ল নগরে উপনীত হইলেন। এখানে বহু বৌদ্ধ বাস করেন। বৌদ্ধগণের শিরোমণি মহাপণ্ডিত রামগিরির সহিত প্রভুর তর্ক হয় এবং রামগিরি পরাজিত হইয়া প্রভুর চরণ আশ্রয় করেন। তৎপরে ঢুণ্ডিরাম নামক মহা-পাণ্ডিত্যাভিমানীর সহিত প্রভুর বিচার হইল, এবং ঢুণ্ডিরাম প্রভুর কৃপা পাইয়া "হরিদাস" নামে খ্যাত হইলেন। প্রভু ক্রমে "অক্ষয়বট" নামক স্থানে আসিয়া তথাকার "বটেশ্বর" শিবকে দর্শন করিলেন। সেখানে তীর্থরাম নামক জনৈক ধনী বণিক, সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই নামক দুটি বেশ্যাসহ উপস্থিত হইয়া প্রভুকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রভুর প্রেমের বেগ দেখিয়া ইহারা তিন জনই তাঁহার চরণে পতিত হইয়া তাহাদের পাপরাশি দূরীভূত করিল। তীর্থরামের স্ত্রী কমলাকুমারীও প্রভুর কৃপা পাইলেন। বটেশ্বরে সাত দিন থাকিয়া দশক্রোশব্যাপী এক বিশাল জঙ্গলে প্রভু প্রবেশ করিলেন। তৎপরে মুন্নানগরে আসিয়া প্রভু অদ্ভুত নৃত্য করিলেন, এবং উহা দর্শন করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক পবিত্র হইল। মুন্নানগর হইতে প্রভু বেঙ্কটনগরে পৌঁছিয়া ঘরে ঘরে

হরিনাম বিতরণ করিলেন। তৎপরে প্রভু পন্থভীল নামক দস্যুকে উদ্ধার করিতে চলিলেন। বগুলা নামক বনে পন্থভীলের বাস। পন্থভীল প্রভুর দুই চারিটি কথা শুনিয়া অমনি দল সমেত অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া কৌপীন ধারণ করিল ও হরিনামে মত্ত হইল। এখান হইতে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে প্রভু উন্মত্তের ন্যায় তিন দিবস অনাহারে গমন করিয়া চতুর্থ দিবসে দুগ্ধ ও আটা সেবা করিলেন।

তদন্তর গিরীশ্বর-লিঙ্গ দর্শন করিয়া প্রভু নিজ হস্তে তথাকার শিবকে অঞ্জলি করিয়া বিল্বপত্র প্রদান করিলেন। এখানে এক মৌনী সন্ন্যাসীর সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। এই সন্ন্যাসী নিরন্তর ধ্যানে মগ্ন, কাহারও সহিত কথা কহেন না, কিন্তু প্রভু তাঁহার মৌন ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে প্রেমদান করিলেন। এখান হইতে ত্রিপদী নগরে উপস্থিত হইয়া প্রভু শ্রীরাম-মূর্তি দর্শন করিলেন। সেখানে মথুরা নামক এক তার্কিক রামাইত পণ্ডিত প্রভুর সহিত তর্ক করিতে আসিলেন, এবং প্রভুর ভাব দেখিয়া তখনই তাঁহার শরণাগত হইলেন! তৎপরে পানা-নরসিংহ দর্শন করিয়া প্রভু বিষ্ণুকাঞ্চী-ধামে লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করিলেন। সেখান হইতে চার ক্রোশ দূরে ত্রিকোণেশ্বর শিব আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভদ্রা নদীস্থ পক্ষগিরি তীর্থে আসিলেন। তৎপরে কাল-তীর্থে বরাহদেবের মূর্তি দর্শন করিয়া পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে সন্ধি-তীর্থে আসিলেন। সেখানে অদ্বৈতবাদী সদানন্দপুরীকে ভক্তি প্রদান করিয়া চাঁইপন্দী তীর্থে যাত্রা করিলেন।

চাঁইপন্দী হইতে নাগর নগর ও সেখান হইতে তাঞ্জোরের কৃষ্ণভক্ত ধনেশ্বর ব্রাহ্মণের বাটী উপস্থিত হইলেন। তৎপরে চণ্ডালু নামক গিরি,—যেখানে বহু সন্ন্যাসীর বাস—সেখানে গমন করিলেন। তথাকার ভট্ট নামক ব্রাহ্মণ ও সুরেশ্বর নামক সন্ন্যাসীবরকে কৃপা করিয়া, প্রভু পদ্ম-কোট তীর্থে অষ্টভুজা ভগবতীকে দর্শন করিলেন। এই স্থানে প্রভু যখন অষ্টভুজা দেবীকে বেড়িয়া বালক-বালিকাদিগের সহিত হরি-কীর্তন করেন, তখন হঠাৎ পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল। এখানে প্রভু এক অন্ধ-ব্রাহ্মণকে চক্ষুদান করেন। কিন্তু এই অন্ধ-ব্রাহ্মণ প্রভুর রূপ দর্শন করিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিল, এবং প্রভু মহা-সমারোহে তাহার সমাধি দিলেন। পদ্মকোট হইতে ত্রিপাত্র নগরে চণ্ডেশ্বর শিব ও তথাকার প্রধান দার্শনিক বৃদ্ধ ও অন্ধ ভগদেবকে কৃপা করেন। ত্রিপাত্র নগরে প্রভু সাত দিন ছিলেন।

প্রভু আবার গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। এক পক্ষ পরে এই বন পার হইয়া রঙ্গাধামে নরসিংহ দেবের মূর্তি দর্শন করিলেন। এখান হইতে রাসভ পর্বতে গমন করিয়া পরমানন্দপুরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপরে রামনাথ নগরে আসিয়া রামের চরণ ও তদন্তর রামেশ্বর শিব দর্শন করিলেন। তিন দিন পরে সাধ্বীবন নামক স্থানে মৌনব্রতধারী মহাতাপসকে দেখিতে গিয়া তাঁকে কৃপা করিলেন। মাঘি পূর্ণিমার দিন প্রভু তাম্রপর্ণী নদীতে স্নান করিয়া সমুদ্র পথ ধরিয়া কন্যাকুমারী চলিলেন।

কন্যাকুমারীতে সমুদ্রস্নান করিয়া প্রভু ফিরেলেন। সাঁতন দিয়া ত্রিবাঙ্কুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনকার ত্রিবাঙ্কুরের রাজার নাম রুদ্রপতি। তিনি অতিশয় প্রজাবৎসল, ভক্ত ও পুণ্যবান। প্রভু এক বৃক্ষতলে হেলান দিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে হরিনাম জপ করিতেছিলেন, আর শত শত নগরবাসী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিল। ক্রমে রাজা রুদ্রপতি প্রভুর মহিমা শুনিয়া তাঁহাকে রাজধানী আনিবার নিমিত্ত এই দূত পাঠাইলেন। প্রভু অবশ্য অস্বীকার করিলেন। শেষ রাজা স্বয়ং আসিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইয়া তাঁহার কৃপা অর্জন করিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের নিকট রামগিরি নামক পর্বতে অনেকগুলি শঙ্করের শিষ্য বাস করেন। প্রভু তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া মৎস্যতীর্থ, নাগ-পঞ্চপদী, চিতোল প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া তুঙ্গভদ্রা নদীতে আসিয়া স্নান করিলেন। সেখান হইতে চণ্ডপুর নগরে ঈশ্বর ভারতী নামক কোনো জ্ঞানী সন্ন্যাসীকে প্রেমদান

করিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস রাখিলেন। তারপর চণ্ডপুর ত্যাগ করিয়া দুই দিবস ভয়ঙ্কর দুর্গম পথ দিয়া চলিলেন। অনেক ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর সহিত প্রভুর দেখা হইল। তাহারা প্রভুকে দেখিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। এই দুর্গম পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রভু পর্বতবেষ্টিত একটি অতি দরিদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া কোন ভক্ত ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে দর্শন দিলেন।

ক্রমে প্রভু নীলগিরি পর্বতের নিকটস্থ কাণ্ডারি নামক স্থানে আসিয়া অনেক সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তদনন্তর অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া, প্রভু গুর্জরী নগরে অগস্ত্যকুণ্ডে স্নান করিলেন। গুর্জরী নগরে প্রভুর প্রেমের হিল্লোল তুলিয়া সহস্র সহস্র লোককে ভক্তি প্রদান করিলেন। গুর্জরী নগর হইতে বিজাপুর পর্বত দিয়া সহ্য-কুলাচল ও মহেন্দ্র-মলয় দর্শন করিয়া পুনা নগরে উপস্থিত হইলেন। পুনা নগর তখন কতকটা নদীয়ার মত চতুষ্পাঠীতে ও পণ্ডিতদলে পরিপূর্ণ। প্রভু তচ্ছর নামক জলাশয়ের ধারে বসিয়া, কৃষ্ণ-বিরহে বিভোর। সহস্র লোক দ্বারা অমনি তিনি বেষ্টিত হইলেন। একজন বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ওই জলাশয়ের মধ্যে। অমনি প্রভু সরোবরের মধ্যে ঝম্প দিয়া জলমগ্ন হইলেন। উপস্থিত লোক সকল হাহাকার করিয়া তাঁহাকে কোনক্রমে উঠাইলেন।

পুনা হইতে প্রভু ভোলেশ্বর দর্শন করিতে চলিলেন। ভোলেশ্বর, পটস্ গ্রামের সন্নিকটস্থ গোরঘাট নামক গ্রামে। সেখান হইতে দেবলেশ্বর ও তথা হইতে খাণ্ডবায় খাণ্ডবাদেবকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। যে নারীর বিবাহ না হয়, তাহার পিতামাতা তাহাকে খাণ্ডবা দেবকে সেবা করিবার নিমিত্ত অর্পণ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ লোকে "কুমারী" বলিয়া ডাকে। এই কুমারী অর্থাৎ দেবদাসীগণের মধ্যে অনেকেই ভ্রষ্টাচারিণী। ইহাদের প্রতি কৃপার্ত হইয়া প্রভু ইহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। তৎপরে চোরানন্দী বনে প্রবেশ করিয়া নারোজী নামক প্রসিদ্ধ ডাকাইতকে উদ্ধার ও সঙ্গে করিয়া শূলা-নদী তীরস্থ খণ্ডলা তীর্থে গমন করিলেন। সেখান হইতে নাসিক নগরে ও নাসিক নগর হইতে পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করিয়া দমন নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে উত্তর দিক ধরিয়া পনের দিন পরে সুরাট-নগরে আসিলেন। এখানে তিন দিন বাস করিয়া তথাকার অষ্টভুজা ভগবতীর নিকট পশু বলিদান প্রথা নিবারণ করিয়া তাপ্তি নদীতে আসিয়া স্নান করিলেন। তারপর নর্মদায় স্নান করিয়া বরোচ নগরে যজ্ঞকুণ্ড দর্শন করিয়া বরোদায় আসিলেন। এখানে নারোজী—যিনি প্রভুর কৃপা পাইয়া তাঁহার সঙ্গে আসিতেছিলেন,—দেহত্যাগ করিলেন; মৃত্যুর সময় প্রভু তাঁহার কর্ণে কৃষ্ণনাম প্রদান করিলেন। বরোদার রাজা প্রভুকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। মহানদী পার হইয়া প্রভু আহাম্মেদাবাদে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে শুভ্রামতী নদীর তীরে পৌঁছিয়া প্রভু কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ রামানন্দ বসু ও গোবিন্দচরণের দেখা পাইলেন এবং ইঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া দ্বারকায় চলিলেন। শুভ্রামতী নদী পার হইয়া যোগা নামক স্থানে আশ্চর্য্যরূপে 'বারমুখী' বেশ্যাকে উদ্ধার করিয়া, সোমনাথ অভিমুখে ছুটিলেন, এবং যাফেরাবাদ দিয়া ছয় দিন পরে সেখানে পৌঁছিলেন; এবং যবনেরা ইহার দুর্দশার এক শেষ করিয়াছে দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন। শেষে সোমনাথকে পুনঃপুন এই প্রার্থনা করিলে লাগিলেন যে, তিনি তাঁহার ঐশ্বর্যসহ পুনরায় তাঁহার ভক্তগণের চক্ষে উদয় হউন। "এস প্রভু সোমনাথ অন্তরে আমার। হৃদয়ের মধ্যে হেরি মুরতি তোমার।।" প্রভু এই বাক্য দ্বারা সোমনাথকে স্তুতি করিয়াছিলেন।

সোমনাথ হইতে জুনাগড় দিয়া গৃর্ণার পাহাড়ে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিলেন এবং গয়ায় চরণ-চিহ্ন দর্শন করিয়া প্রভুর হৃদয়ে যেরূপ ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছিল, সেইরূপ ভাব-তরঙ্গে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। এই স্থানে ভর্গদেব নামক এক প্রতাপশালী সন্ন্যাসীকে পীড়া হইতে মুক্তি করিয়া, তাঁহাকে প্রেমদান করিলেন এবং সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তৎপরে ঝারিখণ্ড অর্থাৎ নিবিড় জঙ্গল পথে চলিতে লাগিলেন। সঙ্গে

ষোল জন ভক্ত। এই ঝারিখণ্ডের মধ্য দিয়া প্রভু চলিয়াছেন, আর করতালি দিয়া সুস্বরে "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" গীত গাইতেছেন। সঙ্গীগণ আনন্দে বিভোর হইয়া বনের শোভা দর্শন ও অতি সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিতে করিতে সঙ্গে চলিয়াছেন। সাতদিন পরে এই নিবিড় বন উত্তীর্ণ হইয়া অমরাপুরী গোপীতলা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইহাকেই "প্রভাস-তীর্থ" বলে। এই তীর্থ দর্শন করিয়া প্রভু একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন,—কখন কান্দিতেছেন, কখন হাসিতেছেন, যেন চির-পরিচিত স্থানে আসিয়া পূর্ব্বকার সমস্ত চিহ্ন দর্শন করিতেছেন। এখানে

অমরাপুরীর লোক একত্র জুটিয়া। আনন্দ পাইল সবে প্রভুরে দেখিয়া।।
পাগলের ন্যায় যেন ইতি-উতি চায়। আবেশে উন্মত্ত হয়ে চারিদিকে ধায়।।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে কভু যেন জ্ঞানহারা। মিশিয়া গিয়াছে ঊর্দ্ধে নয়নের তারা।।

১লা আশ্বিন প্রভাসতীর্থ ছাড়িয়া প্রভু দ্বারকায় চলিলেন। সাগরের তীরে তীরে চলিয়া, এবং চারিদিন পরে দড়ার উপর দিয়া সাগরের খাড়ি পার হইয়া দ্বারকায় উপনীত হইলেন। প্রভাসের ন্যায়, দ্বারকায় আসিয়াও প্রভু এই তীর্থস্থান প্রেমের বন্যায় ডুবাইলেন। এক পক্ষকাল দ্বারকায় থাকিয়া, নানাবিধ রসরঙ্গ করিয়া, নীলাচল অভিমুখে ফিরিলেন। সঙ্গীগণকে বলিলেন যে, বিদ্যানগর হইতে রায় রামানন্দকে সঙ্গে করিয়া তিনি জগন্নাথ যাইবেন।

আশ্বিন মাসের শেষে প্রভু পুনরায় বরদা নগরে আসিলেন। ইহার ষোল দিন পরে নর্ম্মদা নদীতে আসিয়া স্নান করিলেন। এখানে ভর্গদেবের সহিত প্রভুর ছাড়াছাড়ি হইল। বিদায়কালে প্রভুর চরণধুলি লইয়া ভর্গদেব উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শেষে তিনি দক্ষিণদিকে ও প্রভু নীলাচলের দিকে চলিলেন।

নর্ম্মদার ধারে ধারে প্রভু চলিয়াছেন। সঙ্গে রামানন্দ বসু ও গোবিন্দচরণ। দোহদ-নগর ত্যাগ করিয়া কুক্ষি-নগরে অনেকগুলি বৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এখানে দুটি ভক্তকে বিশেষরূপে কৃপা করিয়া ক্রমে বিন্ধ্যাচলে উঠিয়া মন্দুরা নগরে উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে তিন দিনে দেবঘর আসিয়া আদিনারায়ণ নামক এক কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করেন। দেবঘর হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে শিবানী-নগর। দুই দিনে সেখানে পৌঁছিয়া তাহার পূর্ব্বভাগস্থ মহলপর্ব্বত দিয়া চণ্ডীনগরে আসিয়া চণ্ডীদেবী দর্শন করিলেন।

অবশেষে রায়পুর দিয়া বিদ্যানগরে আসিয়া রামানন্দ রায়ের সহিত মিলিত হইলেন। রামানন্দ যাইয়া চরণে পড়িলে, প্রভু তাঁহাকে স্বপ্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া নগরে মহা কলরব হইল; লোকে নানারূপ উৎসব করিতে লাগিল। প্রভু তখন বলিলেন, "রাম রায়, এখন নীলাচলে চল।" রাম রায় বলিলেন, "প্রভু, তোমার আজ্ঞা পাইয়া আমি রাজাকে লিখিয়াছিলাম যে, আমা হইতে আর বিষয়-কর্ম্ম হইবে না। শেষে অনেক চেষ্টা করিয়া রাজার নিকট বিদায় লইয়াছি। এখানে কেবল তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম; আমার মহাসমারোহের সহিত যাইতে হইবে। আমার সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, সৈন্য যাইবে, অতএব আপনি অগ্রে গমন করুন। আমি দিন দশেকের মধ্যে সমুদয় গোছাইয়া আপনার পশ্চাৎ আসিতেছি।"

তখন প্রভু নীলাচল অভিমুখে চলিলেন। মহানদীর তীরস্থ রত্নপুরে আসিলেন, এবং তথা হইতে পূর্ব্বদিক দিয়া স্বর্ণগড়ে উপনীত হইলেন। রত্নপুরের রাজা শান্তিশ্বর পরম-ধার্ম্মিক। তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রভুকে ভূমি লোটাইয়া প্রণাম করিলেন, এবং প্রভু তাঁহার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে সম্বলপুর দিয়া ভ্রমরানগর, প্রতাপনগর, দাসপালনগর উদ্ধার করিয়া রসালকুণ্ডেতে আসিলেন। এখানে কোন মাড়ুয়া ব্রাহ্মণের পুত্রকে স্পর্শ করিয়া প্রভু পরমভক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া সে প্রভুকে মারিতে উদ্যত হয়। পুত্রের আকিঞ্চনে প্রভু

পবে সেই মাড়ুয়া ব্রাহ্মণকে কৃপা করেন। শেষে ঋষিকুলা নামক স্থান পবিত্র করিয়া প্রভু আলালনাথের কাছে উপস্থিত হইলেন।

নীলাচলের এক দিবসেব পথ থাকিতে প্রভু ভৃত্যদ্বাবা অগ্রে আপন আগমন-বার্তা পাঠাইলেন। প্রভুর ভক্তগণ বসিয়া আছেন, সকলেরই গৌরগতপ্রাণ, কিন্তু গৌর নাই। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "প্রভু আসিতেছেন, আসুন।" ভৃত্য তাঁহাদিগকে এই সংবাদ দিয়া সার্বভৌমকে সংবাদ দিতে চলিলেন। অমনি সকলে আনন্দে ডগমগ হইলেন ও নাচিতে নাচিতে চলিলেন; কিন্তু এক সময়ে নৃত্য করা আর গমন করা সহজ কথা নয়,—তাঁহারা নৃত্য করিবেন, না গমন করিবেন?-- যথা চবিতামৃতে—

প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়। উঠিয়া চলিলা, প্রেমে থেহ নাহি পায়।।
জগদানন্দ, দমোদরপণ্ডিত, মুকুন্দ। নাচিয়া চলিলা, দেহে না ধরে আনন্দ।।"

প্রভুকে আনিতে অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্তগণও চলিলেন। যখন তিনি শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিলেন, তখন পঞ্চজন ভক্ত ব্যতীত আর কাহাকেও সঙ্গে আসিতে দিলেন না। কিন্তু প্রভু দেশ ছাড়িলে, কোনও কোনও ভক্ত গৌরশূন্য দেশে আর থাকিতে পাবিলেন না। শ্রীগদাধর, শ্রীনরহরি, শ্রীমুরারি, শ্রীভগবান (ইনি খঞ্জ), শ্রীরাম ভট্ট প্রভৃতি নীলাচলে দৌড়িলেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই নবীন-ব্রহ্মচারী। নীলাচলে আসিয়া শুনিলেন যে, প্রভু দক্ষিণে গমন করিয়াছেন। তখন আসা ভঙ্গ হইয়া তাঁহারা মৃতবৎ অবস্থায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির সহিত প্রভুর প্রতীক্ষায় রহিয়া গেলেন।

সার্বভৌম শুনিলেন প্রভু আসিতেছেন, আরও শুনিলেন ভক্তগণ তাঁহাকে আনিতে ছুটিয়াছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, শ্রীভগবান্ নীলাচলে আসিতেছেন, তাঁহাকে একটু আদর করিয়া আনা উচিত। আর এখন ভয় কি? রাজা এখন এক প্রকার নবীন সন্ন্যাসীর নিজ-জন হইয়াছেন। তখন সার্বভৌম নিশান, পতাকা, খোল, করতাল জোগাড় করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পুরীময় রাষ্ট্র হইল 'সার্বভৌমের সন্ন্যাসী' আসিতেছেন। সকলে শুনিয়াছেন স্বয়ং মহারাজা সেই সন্ন্যাসীর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিবার নিমিত্ত পাগল হইয়াছেন। সুতরাং প্রভুকে আনিবার নিমিত্ত খোল করতাল ডঙ্কা ইত্যাদির সহিত বহুতর লোক চলিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্বে প্রভুকে কখন দেখেন নাই। বহুদিন পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি সঙ্গীগণ পাইয়া প্রভুর বদন অতিশয় প্রফুল্ল হইল। তৎপরে সার্বভৌম যাইয়া সমুদ্রধারে প্রভুকে পাইলেন। প্রভুকে দেখিয়া তিনি সঙ্গীগণসহ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। নিকটবর্তী হইয়া রোদন করিতে করিতে সার্বভৌম প্রভুর চরণে পড়িলেন, আর প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। যথা—চরিতামৃতে—

"সার্বভৌম ভট্টাচার্য আনন্দে চলিলা। সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা।।
সার্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে। প্রভু তাঁরে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গনে।।
প্রেমাবেশে সার্বভৌম করিলা রোদনে। সবা সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর দরশনে।।

প্রভুকে দেখিয়াই শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ প্রণাম করিলেন। তাঁহারা জগন্নাথের সেবক শুনিয়া, প্রভু জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন, শ্রীজগন্নাথের সেবক সকলেরই প্রণামের পাত্র। ইঁহারা তাঁহাকে প্রণাম করেন ইহাতে তাঁহার ভয় হয়। প্রভু তখন সকলকে লইয়া শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ দর্শনের নিমিত্ত গেলেন। কিন্তু শ্রীজগন্নাথ তখন স্নান করিতেছেন, কাজেই তখন তাঁহার দর্শন নাই। ইহাতে সেবকগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সার্বভৌমকে তাঁহাদের দুঃখের কথা জানাইলেন। একদিনকাল প্রভু বিনা অনুমতিতে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া পাণ্ডাগণের বিষম ক্রোধের ভাজন হইয়াছিলেন। এখন সেই পাণ্ডাগণ, যদিও তাহারা প্রভুর মহিমা প্রত্যক্ষ কিছু দেখেন নাই, তবু তাঁহাকে জগন্নাথের স্নানের নিমিত্ত তদ্দণ্ডে দর্শন করাইতে পারিবেন না

বলিয়া ব্যস্ত হইলেন। প্রভু এই কথা শুনিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত দর্শন সুখে বঞ্চিত হইলেন বলিয়া মনে বড় ব্যথা পাইলেন; কিন্তু ধৈর্য ধরিয়া বলিলেন যে, স্নান না হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিবেন।

গোপীনাথ এই সময় সার্বভৌমকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, দর্শনের পরে প্রভুকে কোথায় লইয়া যাওয়া যাইবে। সার্বভৌম বলিলেন, "অদ্য আমার ওখানে, আর কল্য হইতে তাঁহার বাসায়—কাশী মিশ্রের আলয়ে।" তাহার পর প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু, মহারাজা আপনার বাসা স্বয়ং ঠিক করিয়া দিয়াছেন। সে কাশীমিশ্রের বাড়ী। সেখানে স্থান বিস্তর আছে। আবার উহা শ্রীমন্দির ও সমুদ্রের নিকট, পরম নির্জন ও কুসুম-কাননে সুশোভিত।"

সার্বভৌম এইরূপে রাজার নিমিত্ত প্রভুর নিকট প্রথম দর্শন হইতেই দৌত্যকার্য আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীমন্দিরের কপাট উৎঘাটিত হইলে প্রভু দর্শন-সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। সে সুখ কিরূপ তাহা এখানে বর্ণনা করিতে পারিলাম না। বহু জনতা দেখিয়া প্রভু হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিলেন। পাণ্ডাগণ প্রসাদী-মালা ও চন্দন আনিয়া প্রভুকে দিলেন। তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা যে প্রভুর সহিত পরিচিত হন, আর সেই আবেদন সার্বভৌমকে জানাইলেন। সার্বভৌম বলিলেন, "কল্য প্রাতে আমি প্রভুকে কাশীমিশ্রের আলয়ে লইয়া যাইব। তোমরা সকলে সেখানে উপস্থিত থাকিও; প্রভুর সহিত একে একে তোমাদের সকলের মিলন করাইয়া দিব।" তৎপরে সার্বভৌম প্রভুকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন। প্রভুর অভ্যর্থনার নিমিত্ত তিনি পূর্বেই আপনার বাড়ী ধুইয়া পরিষ্কার ও সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রভু তাহার বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র সার্বভৌমের ঘরণী ও কন্যা যাটী হুলুধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার বাটীতে অন্যান্য মঙ্গলসূচক আনন্দধ্বনি ও কলরব হইতে লাগিল। তৎপরে প্রভু ভক্তগণ লইয়া সমুদ্রস্নানে গমন করিলেন। এ দিকে সার্বভৌম চর্বচোষ্য প্রভৃতি অতিচ উপাদেয় সামগ্রী সংগ্রহ করিলেন। প্রভু ফিরিয়া আসিয়া হাস্যকৌতুকে ভক্তগণের সহিত নানারূপ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সার্বভৌম আপনি পরিবেশন করিলেন, ও সাধ মিটাইয়া প্রভুকে ভোজন করাইলেন; এবং ভোজন সমাপ্ত হইলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ চন্দনে সিক্ত করিয়া গলায় ফুলের মালা দিয়া উত্তম শয্যায় শয়ন করাইলেন। এইরূপে প্রভু দুই বৎসর পরে উত্তম বস্তু সেবন এবং উত্তম শয্যায় শয়ন করিলেন। পূর্বে বলিয়াছি যে, নিজ-জনের মনে ব্যথা লাগিবে বলিয়া, প্রভু সন্ন্যাসের নিয়মগুলি তাঁহারা নিকট থাকিলে পালন করিতেন না।

সার্বভৌম ভাবিলেন যে, প্রভু দুই বৎসর হাঁটিয়া বেড়াইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার শ্রীপদে ব্রণ হইয়া থাকিবে। আজ তিনি স্বহস্তে তাঁহার পদ-সেবা করিয়া আপনার মনের ও প্রভুর শ্রীচরণের দুঃখ দূর করিবেন; এবং এইজন্য, প্রভু শয়ন করিলে, তাঁহার পদতলে বসিলেন। প্রভু ভট্টাচার্যের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া অতি-কাতর বদনে তাঁহাকে উহা করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। সে নিষেধ ভট্টাচার্য শুনিলেন কিনা জানি না। তবে প্রভুর পদতলে বসিয়া সার্বভৌম দেখিলেন যে, পদতলে দুটীতে ব্রণের চিহ্ন মাত্র নাই, বরং উহা পদ্মফুলের শোভা পাইতেছে।

পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রভু মলিন-কৌপীন ধারণ করিলে, কি ধূলায় ধূসরিত হইলেও, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ দিয়া অনুক্ষণ পদ্মগন্ধ নির্গত হইত। এমন কি, সেই গন্ধের লোভে, কেবল মনুষ্য নহে, পশু-পক্ষী-কীট পর্যন্ত আকৃষ্ট হইত। প্রভু জীবের দুঃখনাশের নিমিত্ত পথে বিস্তর হাটিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তগণের সাধনবলে তাঁহার পদতল চিরদিনই সমান মনোহর ছিল; সে এত মনোহর যে পদতল দেখিলেই বুঝা যাইত যে, ইহা সামান্য মনুষ্যের পদতলে নহে। সার্বভৌম শ্রীপদ দর্শন করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন, তাঁহার মনের দুঃখ ও ভ্রম দূর হইল;

ভাবিলেন, পৃথিবী যাঁহার বিচরণে ধন্যা, তিনি তাঁহার শ্রীপদে আঘাত কেন করিবেন? প্রভুর আজ্ঞাক্রমে সার্বভৌম প্রসাদ পাইতে গেলে, প্রভু একটু ঘুমাইলেন। তৎপরে সারা-নিশি প্রভু নির্জনে ভক্তগণ লইয়া তীর্থযাত্রার কথা বলিতে লাগিলেন; বলিতেছেন, "দক্ষিণদেশে নানারূপ বিগ্রহ এবং মায়াবাদী, বৌদ্ধ, নাস্তিক, শৈব প্রভৃতি বহুবিধ সাধু দেখিলাম। বৈষ্ণব বড় দেখিলাম না। যাহাও দেখিলাম তাহার মধ্যে তোমাদের মত একজনকেও দেখিলাম না। তবে এক মাত্র রামানন্দ রায় আমাকে সুখ দিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় রসিক-ভক্ত আর দেখি নাই। সার্বভৌম অমনি বলিলেন, "সেইজন্য ত তোমাকে তাহার সহিত মিলিতে বলিয়াছিলাম। অগ্রে যখন তিনি আমাকে কৃষ্ণকথা রসতত্ত্ব শুনাইতেন, তখন না বুঝিয়া তাঁহাকে বিদ্রুপ করিতাম। কিন্তু তুমি যখন আমার বৃথা-জ্ঞানরূপ-অজ্ঞানতা দূর করিলে, তখনি তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিলাম।" প্রভু বলিলেন, "সাধকেরা শ্রীভগবানকে প্রাপ্তির নিমিত্ত নানা পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি দেখিলাম, রামানন্দের মতই সর্বোত্তম। তাই আমি তাঁহার মত অবলম্বন করিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া সার্বভৌম হাসিয়া উঠিলেন; আর বলিলেন, 'রামানন্দ আর মত-কর্তা হইতে পারেন না। তুমি তাঁহার কাছে শিক্ষা করিয়াছ, এ কথা সকলকেই বলিয়া থাক। ইহাতে বুঝিলাম যে, রামানন্দ রায়ের দ্বারা জগতে তুমি রসতত্ত্ব প্রচার করিবে।"

প্রভু বলিতেছেন, "দক্ষিণদেশে আরও দুটি উপাদেয় বস্তু পাইয়াছি। সে দুইখানি গ্রন্থ—ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত। রামানন্দের কাছে যে মত শুনিলাম, এই দুই গ্রন্থে তাহাই দেখিলাম। রামানন্দ এই দুই গ্রন্থ লিখাইয়া লইয়াছেন। আমিও লিখাইয়া লইব বলিয়া আনিয়াছি।" এইরূপে ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থকার বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বিষয় এখন সকলে অবগত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ন্যায় উপাদেয় গ্রন্থ জগতে দুর্লভ। প্রভুর অবতারের পূর্বে যে কয়েকখানি গ্রন্থ সর্বপ্রধান, সেই কয়েকখানি মহাগ্রন্থের নাম করিতেছি; যথা—জয়দেব, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শ্রীভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শকুন্তলা, আর রামানন্দ রায়ের শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক। শকুন্তলার নাম ইহার মধ্যে করিলেন, তাহার কারণ যাঁহারা রসিক ভক্ত, তাঁহারা এই মহা-নাটকে কেবল কৃষ্ণলীলা আস্বাদ করিয়া থাকেন।

পর দিবস প্রাতে সার্বভৌম প্রভুকে লইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করাইয়া কাশীমিশ্রের আবাসে লইয়া গেলেন। সেখানে কাশীমিশ্র গললগ্নবাস হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। সে বাড়ীটি সর্বপ্রকারে মনোমত। এই বাড়ীর কয়েকখানি ঘর, মিশ্র মহাশয় সংস্কার ও ধৌত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। প্রভু আগমন করিবামাত্র কাশীমিশ্র চরণে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু, আমার এই গৃহ গ্রহণ করুন, আর সেই সঙ্গে আমাকেও গ্রহণ করিতে হইবে।"

কাশীমিশ্র মহারাজের গুরু। যখন মহারাজা পুরীতে আগমন করেন, তখন কাশীমিশ্রকে ভোজন করাইয়া তাঁহার পদসেবা করিয়া ও তাঁহাকে নিদ্রিত করাইয়া, আপনি ভোজন ও আরাম করেন।

কাশীমিশ্র প্রভুর চরণে পড়িলেন। তখন সার্বভৌম তাঁহার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "তোমার থাকিবার নিমিত্ত মহারাজা এই বাসা সাব্যস্ত করিয়াছেন। তোমার যোগ্য বাসা সন্দেহ নাই। এখন ইহা আপনি গ্রহণ করেন, ইহা কাশীমিশ্রের ও আমাদের সকলের নিতান্ত বাসনা।"

প্রভু কাশীমিশ্রকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন; করিয়া বলিলেন, "এ দেহ তোমাদের, তোমরা যাহা বল সেই আমার কর্তব্য।"

প্রভুর আলিঙ্গন পাইবামাত্র কাশীমিশ্র বিহ্বল হইলেন। তিনি দেখিলেন, প্রভু

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। কাজেই কাশীমিশ্র চিরদিনের নিমিত্ত প্রভুর হইলেন। যথা চৈতন্য-চরিতামৃতে—

"কাশীমিশ্র আসি পড়ে প্রভুর চরণে। গৃহ সহিত আত্মভারে কৈল নিবেদনে।।
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্তি তারে দেখাইলা। আত্মসাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈলা।।"

প্রভু আপনার বাসা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কাশীমিশ্র বর্হিবাটীর পীড়ায় দিব্যাসনে যত্নপূর্বক তাঁহাকে বসাইলেন। প্রভুর দক্ষিণ-পার্শ্বে সার্বভৌম বসিলেন। তখন শ্রীনীলাচলবাসী ভক্তগণ এবং জগন্নাথের সেবকগণ প্রভুর সহিত মিলিত হইতে আসিলেন। তাঁহারা জনে জনে প্রভুকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রভু হাহাকার করিয়া উঠিলেন। শাস্ত্রের নিয়মানুসারে সন্ন্যাসী সকলেরই প্রণম্য; সন্ন্যাসীর কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই, কাজেই প্রভু উঠিয়া প্রত্যেককে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। যিনি যখন প্রণাম করিতেছেন, সার্বভৌম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার পরিচয় করিয়া দিতেছেন; বলিতেছেন, "ইনি পরীক্ষা মহাপাত্র, এই শ্রীমন্দিরের কর্তা। ইনি জনার্দন মহাপাত্র, শ্রীজগন্নাথের অন্তরঙ্গ সেবা করেন। ইনি কৃষ্ণদাস, সুবর্ণ-বেত্র ধরিয়া শ্রীজগন্নাথের প্রহরীর কার্য করেন। ইনি শিখি-মাইতি, কায়স্থ ও লিখনাধিকারী, আর ইঁহার দুই ভ্রাতা মুরারি ও মাধবী। ইনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র, পরম বৈষ্ণব। ইনি প্রহরিরাজ মহাপাত্র, ভাগবতোত্তম।" সার্বভৌম এইরূপে শ্রীজগন্নাথের প্রধান প্রধান সেবকগণকে প্রভুর সহিত মিলন করিয়া দিতেছেন। এমন সময় মহারাজার ব্রাহ্মণমন্ত্রী চন্দ্রনেশ্বর, মুরারি ও হংসেশ্বর আসিলেন। যদিও ইঁহারা রাজপাত্র, তথাপি মহাভক্ত। ইঁহারা আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলে, সার্বভৌম ইঁহাদিগের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

এমন সময় চারিপুত্রের সহিত ভবানন্দ রায় আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। সার্বভৌম বলিলেন, "ইনি ভবানন্দ রায়; রামানন্দ রায় ইঁহার প্রথম পুত্র, আর এই চারিজন রামানন্দের ভ্রাতা।" এই কথা শুনিয়া প্রভু মহা আনন্দিত হইয়া বৃদ্ধ ভবানন্দ রায়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন; বলিতেছেন, "তুমি রামানন্দের পিতা? তোমার মত ভাগ্যবান ত্রিজগতে আর নাই। রামানন্দ যাঁহার পুত্র তাঁহার আর অভাব কি?" ভবানন্দ রায় তখন করজোড়ে বলিলেন, "আমি শূদ্র, বিষয়ী, অধম। আমাকে যে তুমি স্পর্শ কর, ইহা কেবল তুমি শ্রীভগবান বলিয়া। তোমার কাছে ছোটো বড়ো সবই সমান।" যথা চরিতামৃতে—

"নিজগৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চপুত্র সনে। আত্ম সঁপিলাম আমি তোমার চরণে।।
এই বাণীনাথ রবে তোমার চরণে। যবে যেই আজ্ঞা তাহা করিবে সেবনে।।"

এইরূপে ভবানন্দ রায় আপন পুত্র বাণীনাথ পট্টনায়ককে প্রভুর কাছে রাখিলেন। তাঁহার কার্য হইল, ইঙ্গিত বুঝিয়া প্রভুর সেবা কবা।

প্রভু প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এই সংবাদ নবদ্বীপে পাঠাইবার জন্য ভক্তগণ বড়ো ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু প্রভুর বিনা অনুমতিতে তাঁহারা কিছু করিতে পারেন না। শ্রীনিত্যানন্দ তাহাই প্রভুকে জানাইলেন যে, শচী-মা ও ভক্তগণ বড়ো ব্যস্ত আছেন। প্রভুর প্রত্যাবর্তন সংবাদ পাইলে নবদ্বীপবাসীরা সজীব হইবেন। অতএব, "প্রভু আজ্ঞা করুন, নবদ্বীপে তোমার আগমন-সংবাদ পাঠাই।" প্রভু, "পাঠাও" এ কথা বলিলেন না; তবে বলিলেন, "তোমাদের যাহা অভিরুচি তাহাই কর।" প্রভু দুই বৎসর পূর্বে নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে গমন করেন, এবং একাদশ মাস পরে শ্রীনীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন;—এই সংবাদ শ্রীনবদ্বীপের লোকে চৈত্র মাসে পাইল।

পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রভু ইচ্ছা করিয়া অলৌকিক কোনো কার্য করিতেন না। কিন্তু তবু এইরূপ অলৌকিক কার্যসকল অনবরত যেন আপনি-আপনি তাঁহার সহিত বিচরণ করিত। প্রভু যে-মাত্র নীলাচল আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি সেই মুহূর্তে ভারতবর্ষের নানাস্থান

হইতে তাঁহার এই লীলার সহকারীগণ বিনা-সংবাদে নীলাচল অভিমুখে ছুটিলেন। প্রভু শীতের শেষ মাসে নীলাচলে আসিলেন, আর দুই চারি সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার চিরসঙ্গীগণ, আপনা আপনি তাঁহার চরণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

পূর্বে কয়েক স্থানে বলিয়াছি যে, এই গৌর-অবতারে "পাত্র" মোটে সাড়ে-তিনজন। অর্থাৎ--স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, শিখি মাহাতি ও মাধবী দাসী। শিখি মাহাতি ও মাধবীব কথা এই মাত্র বলিলাম। রামানন্দের কথা শুনিয়াছেন। স্বরূপ দামোদরের কথাও বারম্বার বলিয়াছি। এই স্বরূপ দামোদর এখন নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি শ্রীনবদ্বীপে বাস করিতেন, প্রভু প্রকাশ পাইলেই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন; কিন্তু সে গোপনে। তিনি যে প্রভুর একজন,—কি বিশেষ একজন ভক্ত তাহা আর কেহ জানিতে পারিলেন না; সে কেবল তিনি আর প্রভু জানিতেন। শ্রীপ্রভুর লীলাঘটিত যতগুলি গ্রন্থ আছে, তাহাতে ছোট-বড় শত শত ভক্তের নাম উল্লেখ করা আছে, কিন্তু পুরুষোত্তম আচার্য্যের নাম কোথাও পাওয়া যায় না। শ্রীমহাপ্রভুর অবতারের পরে মহাজনের লক্ষ লক্ষ পদ সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার মধ্যে কেবল একটিতে পুরুষোত্তমের নাম পাইয়াছি। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থকার শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য অর্থাৎ স্বরূপ-দামোদর সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

পুরুষোত্তম আচার্য তাঁর নাম পূর্বাশ্রমে। নবদ্বীপে ছিলা তেঁহ প্রভুর চরণে।।
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া। সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারানসী গিয়া।।
গুরু ঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইলা নীলাচলে। রাত্রি দিনে কৃষ্ণ-প্রেম আনন্দ বিহ্বলে।।
পাণ্ডিত্যের অবধি বাক্য নাহি কার সনে। নির্জনে রহয়ে, লোক সব নাহি জানে।।
কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা দেহ-প্রেমরূপ। সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ।।
গন্থ শ্লোক গীত কেহ প্রভু পাশে আনে। স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু তাহা শুনে।।
ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, আর রসাভাস। শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস।।
অতএব স্বরূপ গোসাঞি করেন পরীক্ষণ। শুদ্ধ হয় যদি প্রভুর করান শ্রবণ।।
সঙ্গীতে গন্ধর্বসম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি। দামোদর সম আর নাহি মহামতি।।

পুরুযোত্তম আচার্য শ্রীনবদ্বীপে গোপনে বাস করেন, অন্তরঙ্গ সেবা করেন, রস লইয়া থাকেন, হৈ-চৈ হইতে দূরে পলায়ন করেন; সুতরাং তাঁহার মাহাত্ম্য প্রভু ব্যতীত আর প্রায় কেহই জানিতেন না। পুরুষোত্তম প্রভুর "দ্বিতীয় স্বরূপ।" প্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তখন প্রভুর উপর রাগ করিয়া, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যেখানে প্রভুর নাম-গন্ধও নাই,—যেখানে সাধুগণ ভক্তিধর্মের বিরোধী, সেই বারাণসীতে যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল স্বরূপ দামোদর'। এই স্বরূপ প্রভুকে কেবল যে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন তাহা নহে,—প্রভুর তত্ত্ব তিনিই প্রথম তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রেমের শক্তি দেখুন,--অকৈতব-প্রেমের সূক্ষ্মগতি অনুভব করুন। পুরুষোত্তম প্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন; অথচ তাঁহার উপর রাগ করিয়া, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের উপর রাধার প্রেমজনিত মান যে অসম্ভব নয়, তাহা স্বরূপ কার্য দ্বারা দেখাইলেন।

স্বরূপ শেষ-জীবন নীলাচলে প্রভুর সহিত বাস করিয়াছিলেন; শয়নে-স্বপনে, নিদ্রা-জাগরণে, সুখে-দুঃখে প্রভুর সহিত থাকিতেন। তিনি দাসরূপে প্রভুর সেবা করিতেন, সখারূপে তাঁহার সুখ-দুঃখের ভাগী হইতেন, আর মাতারূপে—তাঁহাকে লালন-পালন করিতেন, যত্ন করিয়া আহার করাইতেন, শয্যায় শয়ন করাইতেন ও নানারূপে রক্ষা করিতেন। প্রত্যেক মুহূর্তে প্রভুর সেবার জন্য স্বরূপের প্রয়োজন হইত, আর প্রত্যেক মুহূর্তে তাঁহাকে পাওয়া যাইত। প্রভু শয়ন করিতেছেন না; রাত্রি অধিক হইয়াছে, প্রভু নাম-জপ করিতেছেন,—

কৃষ্ণনাম-গ্রহণরূপ সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া নিদ্রা যাইবেন না। কিন্তু শরীর অতি দুর্বল, একটু নিদ্রা না গেলে শরীর থাকিবে কেন? ইহাই ভাবিয়া স্বরূপ নানারূপ সাধ্যসাধনা করিতেছেন;—বলিতেছেন, "প্রভু চলুন, রাত্রি অধিক হইয়াছে।" শ্রীনবদ্বীপে শচীও তাঁহার নিমাইকে ঐ ভাবে সেবা করিতেন। প্রভু যাইবেন না, স্বরূপও ছাড়িবেন না। তখন প্রভু স্বরূপকে খোশামোদ করিতে লাগিলেন;—কখন বলিতেছেন, "স্বরূপ! একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই যাইতেছি।" আবার—"স্বরূপ! রাত্রি ত অধিক হয় নাই আমাকে আর একটু কৃষ্ণনাম জপ করিতে দাও, তোমাকে মিনতি করি।" একটু পরে—"স্বরূপ! আমার নিদ্রা আসিতেছে না, শয়ন করিয়া কি করিব?" কি, কখন একেবারে ভাবে বিহ্বল হইয়া বলিতেছেন, "স্বরূপ! আমি শয়ন করিব কিরূপে? কৃষ্ণ এখনই আসিবেন, তাই তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" কিন্তু শেষে প্রভু স্বরূপের হাত এড়াইতে পারিলেন না। কোন প্রকারে স্বরূপ তাঁহাকে শয্যায় লইয়া শয়ন করাইলেন এবং প্রদীপ নির্বাণ ও দ্বার বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিলেন, এবং প্রভু কি করেন জানিবার নিমিত্ত কান পাতিয়া রহিলেন। এদিকে—তিনি চলিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া, প্রভু আবার চুপে চুপে নাম-জপ আরম্ভ করিলে, স্বরূপ আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। আর ধরা পড়িয়াছেন দেখিয়া অমনি ভয়ে প্রভুর মুখ শুখাইয়া গেল। তখন স্বরূপ বলিতেছেন, "প্রভু, ভক্তগণকে দুঃখ দিতে তোমার কি একটুও মায়া হয় না? ভাল, তোমার যেন নিদ্রা নাই, কি কৃষ্ণনামগ্রহণরূপ সুখ ত্যাগ করিয়া নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা নাই; কিন্তু আমরা সামান্য জীব, আমাদের দেহধর্ম আছে, আমরা একটু নিদ্রা না গেলে বাঁচিব কিরূপে?" প্রভু তখন অতিশয় লজ্জা পাইয়া বলিতেছেন, "স্বরূপ! ক্ষমা দাও, আমি এখনি নিদ্রা যাইতেছি।" প্রভু ও স্বরূপে নিতিনিতি এইরূপ কাণ্ড হয়! প্রভু, কৃষ্ণবিরহে কি মিলনে, যে ভাবে যখন বিভাবিত হয়েন, তাহা স্বরূপের গলা ধরিয়া কান্দিয়া বলেন। প্রভু কৃষ্ণবিরহে রাই-উন্মাদিনী-ভাবে বিভাবিত হইলেন; অমনি স্বরূপ তাঁহার নিকট ললিতা-রূপে প্রকাশ পাইলেন। প্রভু স্বরূপকে ললিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। প্রভু-স্বরূপের গলা ধরিয়া মন উঘাড়িয়া মনের বেদনা বলিতেছেন, আর স্বরূপও তখন সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া সেই রস আস্বাদন করিতেছেন।

প্রভু যখন রাধারূপে কৃষ্ণদর্শনে বৃন্দাবনে যাইতেছেন, স্বরূপ তখন ললিতা-রূপে তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন। প্রভু যখন কৃষ্ণবিরহে মূর্চ্ছিত হইতেছেন, স্বরূপ তখন প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইয়া তাঁহাকে চেতনা করাইতেছেন। প্রভুর চিত্ত ও স্বরূপের চিত্ত এক হইয়া গিয়াছে। প্রভু যখন যে ভাবে বিভাবিত হইলেন, স্বরূপও অমনি আপনা-আপনি সেইভাবে বিভাবিত হইলেন। প্রভুর বিরহ-ভাব উপস্থিত হইলে, স্বরূপ অমনি আপনা-আপনি বিরহের পদ গাইয়া প্রভুকে শান্ত করিতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত তিনি প্রভুর "দ্বিতীয় স্বরূপ" নামে অভিহিত হন।

প্রভু ও স্বরূপ দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া, এক-চিত্ত হইয়া, প্রেমের যে নিবিড়-মালঞ্চ, তাহাতে দিব্যচক্ষে দ্বাদশবর্ষ বিচরণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাট্যকার স্বরূপকে এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন—

"অহো বস ফলবান কৃষ্ণ ভগবান। তার রসাচার্য্য ভাব হইতে মূর্তিমান।।
সন্ন্যাসীর বেশ বহু প্রকাশ করিয়া। অবতীর্ণ হৈল লোক কৃপাযুক্ত হৈয়া।।
সর্বলোক দামোদর স্বরূপ বলেন। প্রেমে হইতে অপৃথক তাঁহারে মানেন।।"

প্রভু গদগদ হইয়া কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছেন, স্বরূপ শ্রবণ করিতেছেন। প্রভু, কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার কত ভালবাসা তাহা বর্ণনা করিতেছেন, স্বরূপ শ্রবণ করিতেছেন। সেই গোলোকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি, সেই দুর্লভ সুধা,—যাহা চিরদিন জীবের নিকট গুপ্ত ছিল,—তাহা ভোগ করিবার প্রধান অধিকারী স্বরূপ।

প্রভু দ্বাদশবর্ষ গোপনে এই সমুদয় ব্রজের রস নিঙ্গড়াইয়া সুধা বাহির করিলেন। স্বরূপ শুনিলেন, আর সেখানেই উহা শেষ হইয়া যাইত, তাহা হইলে, প্রভুর অবতার বৃথা হইত। কিন্তু স্বরূপ সেই সুধা পাত্রে ধরিলেন, আর জীবের জন্য উহা চিরদিনের নিমিত্ত সঞ্চিত করিয়া রাগিলেন।

এই সুধা কি,—না ব্রজের নিগূঢ়-রস। এই রস বাহির করিতে আমাদের প্রভুর ন্যায় বস্তুর দ্বাদশবর্ষ লাগিয়াছিল। এই রসের চর্চা জনতার মধ্যে হইত না। তাই প্রভু আপনার কুটীরে রজনীতে স্বরূপের গলা ধরিয়া উদগীরণ করিতেন। স্বরূপ এই সমুদয় ভাব তাঁহার কড়চায় লিখিয়া রাখিলেন, আর সঙ্গীত দ্বারা উহার জীবন্ত আকার দিলেন। স্বরূপ সঙ্গীতে গন্ধর্বসম। এখন যে উন্মাদকারী কীর্তনের সুর শুনা যায়,—প্রভুর কৃপা পাইয়া স্বরূপ তাহা সৃষ্টি করেন। শুধু সুর নয়, তালও বটে। এইরূপে দশ সহস্র মহাজনী পদের সৃষ্টি হইল। আর স্বরূপ যদি প্রভুর সহিত শেষ দ্বাদশবর্ষ বাস না করিতেন, তবে প্রভু যে এত দিন কি করিয়াছিলেন, কেহ তাহা জানিতেও পারিত না।

স্বরূপ রাগ করিয়া কাশীতে যাইয়া চৈতন্যানন্দ গুরুর নিকট সন্ন্যাস লইলেন। গুরু বেদ পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বরূপের গৌরগত প্রাণ; তিনি গোপনে গৌররূপ ধ্যান করেন, আর রোদন করেন। যখন শুনিলেন, প্রভু নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গিয়াছেন, আর তৎক্ষণাৎ কাশী হইতে নীলাচলে ছুটিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া শুনিলেন যে, প্রভু কয়েক দিন মাত্র দক্ষিণ হইতে ফিরিয়াছেন। প্রভু কাশীমিশ্রের আলয়ে ভক্তগণ সহ বসিয়া নামজপ করিতেছেন, এমন সময় স্বরূপ আসিয়া প্রভুর দ্বারে দাঁড়াইলেন। গোপীনাথ তাঁহাকে দেখিয়াই প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "শ্রীনবদ্বীপের পুরুষোত্তম আচার্য অবধূত বেশে দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন।" এই সংবাদ শুনিয়াই প্রভুর চন্দ্রবদন প্রফুল্ল হইল। তিনি তখনই দ্রুতপদে তাঁহার নিকট গেলেন, এবং উভয়ের নয়নে নয়ন মিলিত হইল। প্রভুকে দেখিয়াই স্বরূপের বুক দুর্‌দুর্‌ করিতে লাগিল। তিনি কষ্টেশ্রেষ্টে চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন,—

"হেলোদ্ধুলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া,
শ্যামচ্ছাস্ত্রবিবাদয় রসদয়া চিত্রার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া,
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভুয়াদমন্দোদয়া।।", অস্যার্থ—

"শ্রীচৈতন্য দয়ানিধি, তব দয়া সাধ্যাবধি, মোরে হও আনন্দ উদয়া।
মাধুর্য মর্যাদা যেই, তাহাতে লক্ষিতা সেই, সে মাধুর্য মর্যাদা বিশদা।
খেদকে কাঁপায় হেলে, রস দেই সর্বকালে, আমোদ উন্মীলে তাহে সদা।
যাহা হৈতে চিত্তোন্মাদ, সাম্য শাস্ত্রে করে বাদ, মাধুর্য মর্যাদা মত্তা অতি।
নিরন্তর অতিশয়, ভক্তির বিনোদ হয়, শ্রীকৃষ্ণচরণে দেই রতি।
হেন দয়া মোরে কর," এত বলি দামোদর, প্রভুর নিকটে চলি যায়।"

স্বরূপ প্রভুর চরণে পড়িতে গেলেন, অমনি প্রভু তাঁহাকে দুই বাহু দ্বারা হৃদয়ে ধরিলেন এবং উভয় উভয়কে ভুজলতায় বন্ধন করিয়া অচেতন হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন; ভক্তগণ স্থির নয়নে দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে উভয়ের চেতন হইল, উভয়ে উঠিয়া বসিলেন, এবং কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "তুমি যে আসিবে তাহা আমি কল্য স্বপ্নে দেখিয়াছি। আসিয়া বড় ভাল করিয়াছ। তোমা বিনা আমি অন্ধ ছিলাম, এখন আমি দুই চক্ষু পাইলাম।

স্বরূপ বলিতেছেন, "প্রভু, আমি আপনি আসি নাই, তোমার কৃপা-পাশে আমাকে

বান্ধিয়া আনিয়াছ। আমি অতিশয় অধম, তাই তোমাকে ছাড়িয়া দূরদেশে গিয়াছিলাম। তোমার চরণে যদি লেশমাত্র প্রেম থাকিত, তবে আমি কি আর যাইতে পারিতাম? স্বরূপ তারপর শ্রীনিত্যানন্দ ও পরমানন্দপুরীকে প্রণাম ও অন্যান্য ভক্তগণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। প্রভু স্বরূপকে একখানি ঘর ও তাহার সেবার নিমিত্ত একজন কিঙ্কর দিলেন।

এই যে পরমানন্দপুরীর কথা বলিলাম, ইঁহাদের মাহাত্ম্যের কথা কিছু বলিব। ইহাতে প্রভুর দাদা বিশ্বরূপের শক্তি ছিল। ইনি ত্রিহুত নিবাসী, মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য, অতএব ঈশ্বরপুরীর পরমার্থ ভাই, আর তাঁহার কৃষ্ণ-প্রেমের অংশী। দেখিতে পরম সুন্দর, প্রকৃতি অতি মধুর, আর ভারত-বিখ্যাত সুখ্যাতি। প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিয়াছেন। যদিও তখন দেশ হিন্দু-মুসলমানের বিরোধে ছারেখারে যাইতেছিল এবং সেইজন্য সমস্ত রাজপথ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তবুও শ্রীগৌরাঙ্গের কথা তখন সমস্ত ভারতে প্রচার হইয়াছে। প্রভুর কথা শুনিবা-মাত্র পরমানন্দপুরী তাঁহাতে আকৃষ্ট হইলেন। শুনিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের যে কৃষ্ণ-প্রেম তাহার এক-কণাও তাঁহার গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর ছিল না। তাঁহার যেরূপ প্রেম, তাহা জীবে সম্ভবে না। আরও শুনিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং—তিনি, এবং পরমানন্দ ইহা কতক বিশ্বাসও করিলেন। আবার তাঁহার সমুদয় কাণ্ড শুনিয়া তাঁহার প্রতি এত আকৃষ্ট হইলেন যে, স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। প্রথমে শুনিলেন, তিনি দক্ষিণদেশে গিয়াছেন, তাই তীর্থভ্রমণ ছল করিয়া দক্ষিণদেশে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া শুনিলেন, প্রভু উত্তরাভিমুখে গিয়াছেন। কাজেই উত্তরে আসিতে লাগিলেন। শেষে সাব্যস্ত করিলেন, যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যেখানেই থাকুক, শ্রীনবদ্বীপে গেলে তাঁহার ঠিকানা জানিতে পারিবেন; ইহাই ভাবিয়া একেবারে নবদ্বীপে শ্রীশচীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শচীর তখন যত কুটুম্বিতা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে। তাঁহাদিগকে তিনি আদর করেন। সন্ন্যাসীকে আর তাঁহার ভয় নাই, তাঁহাদের যাহা করিবার তাহা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের নিকট কোন সংবাদ পান না। তাই নিমাইকে তল্লাস করিতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন, আর বলেন, "যদি তাঁহার সহিত দেখা হয়, তবে আমাদের দুর্দশার কথা জানাইবে, আর একবার আমাকে দেখা দিয়া যাইতে বলিবে।"

পরমানন্দপুরীকে দেখিয়া শচীর বোধ হইল যেন বিশ্বরূপ আসিয়াছেন। ফল কথা, শচী তখনও জানেন না যে, বিশ্বরূপ অদর্শন হইয়াছেন। পুরী ভাবিলেন, শচীর নিকট শ্রীগৌরাঙ্গের সংবাদ পাইবেন; আর শচী ভাবিলেন, পুরীর নিকট নিমাইয়ের সংবাদ পাইবেন। কিন্তু উভয়েরই আশা ভঙ্গ হইল। তবে পূর্বে বলিয়াছি, প্রভুর লীলার মধ্যে পদে-পদে অলৌকিক ঘটনা উপস্থিত হইত। পরমানন্দপুরী শচীর বাটী আসিলেন। শচী ও তিনি প্রভুর সংবাদ না পাইয়া দুঃখিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রেরিত লোক নীলাচল হইতে সংবাদ আনিলেন যে, প্রভু নীলাচলে আসিয়াছেন। ঐ সংবাদ শুনিয়া নবদ্বীপে আনন্দ-কলরব উঠিল, এবং ভক্তগণ নীলাচলে প্রভুকে দেখিতে যাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরমানন্দপুরীর দেরী সহিল না। তিনি কমলাকান্ত নামক প্রভুর জনৈক ব্রাহ্মণ-ভক্তকে সঙ্গে করিয়া, শচীর নিকট বিদায় লইয়া নীলাচল মুখে দৌড়িলেন।

শ্রীক্ষেত্রে ভক্তগণ জগন্নাথ দর্শনের নিমিত্ত গমন করেন। কিন্তু ভক্তোত্তম পরমানন্দ, শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে চলিলেন। শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রভুকে তল্লাস করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথের মন্দির তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীজগন্নাথকে মনে পড়িল। তখন পুরী অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ভক্তগণের ঠাকুর জীবন্ত সামগ্রী। তাই পুরী ভাবিতেছেন, "শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া অগ্রে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন না করিয়া এ কি কুকার্য্য করিলাম?" শ্রীজগন্নাথকে অবমাননা করিলেন বলিয়া ভয় হইল। তখন করজোড়ে

শ্রীমন্দিরের দিকে ফিরিয়া বলিতেছেন, যথা চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে—

"অগ্রে না দেখিয়া প্রভু তোমার চরণ। গৌরচন্দ্র দেখিবার করি অন্বেষণ।।
ইথে মোর যদ্যপি হইল অপরাধ। তাহা ক্ষমি জগন্নাথ করিবে প্রসাদ।।
তুমি সে সর্বজ্ঞ, জান সবার অন্তর। মোর উৎকণ্ঠার কথা তোমার গোচর।।
উৎকণ্ঠাতে লয়ে যায় কি করিব আমি। ইহা জানি অপরাধ ক্ষম মোর তুমি।।"

শ্রীমন্দিরের পানে চাহিয়া শ্রীজগন্নাথকে নিবেদন করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, সম্মুখে লোকের জনতা হইয়াছে, আর মধ্যস্থানে একটি সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। সন্ন্যাসী অতিশয় দীর্ঘাঙ্গ বলিয়া সবার উপরে তাঁহার মস্তক দেখা যাইতেছে। আর একটু কাছে যাইয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসীর বয়স অল্প, তাঁহার বর্ণ বিমল-হেমের ন্যায় উজ্জ্বল এবং রূপ অতুলনীয়। আরও দেখিলেন, সকলের দৃষ্টি এই সন্ন্যাসীর উপর রহিয়াছে। শুনিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ অমানুষিক, তাই যুবক-সন্ন্যাসীটিকে দেখিয়া মনে হইতেছে, ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গ,—তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরী গোসাঞি, প্রভুকে কিরূপ দেখিতেছেন তাহা চন্দ্রোদয় নাটক এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন ঃ "দেখিলাম মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে। জগন্নাথ দেখি বসিয়াছেন অতি রঙ্গে।। জগন্নাথের রূপ গুণ কহিতে কহিতে। দুই নেত্রে অশ্রুধারা বহে শতে শতে।। হেম-মণি শিলা বিলাসিত বক্ষঃস্থল। তাহা বাঞা পড়িছে আনন্দ অশ্রু জল।। আপাদ মস্তক সব পুলকে বেষ্টিত।"

শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিবামাত্র পুরী গোসাঞির মনে যে কিছু সন্দেহ ছিল তাহা গেল; তখন বুঝিলেন যে, এরূপ চিত্তাকর্ষণ, এরূপ রূপ ও লাবণ্য ধারণ, শ্রীভগবান ব্যতীত কোন মনুষ্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে। শ্রীগৌরাঙ্গের অতুলনীয় রূপ দেখিয়া পুরী গোসাঞির আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। যাঁহারা শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র, তাঁহারা দর্শন-সুখ অপেক্ষা আর অধিক কোন সুখ আছে, তাহা জানেন না।

পুরী গোসাঞি যাইয়া অগ্রে দাঁড়াইলেন। মহাপুরুষ দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। তাঁহাকে দেখিয়া সকলের মনে হইল যে, একটি মহাপুরুষ আসিয়াছেন। দেখিলেন, প্রেমানন্দে সন্ন্যাসীর বদন প্রফুল্ল হইয়াছে। প্রভুর সেবক কমলাকান্ত অমনি পরিচয় দিলেন যে, ইনি পরমানন্দপুরী। পরমানন্দপুরীর নাম ভারত-বিখ্যাত, শুনিবামাত্র সকলে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। প্রভুও গাত্রোত্থান করিয়া পুরী গোসাঞিকে প্রণাম করিলেন। উহাতে তিনি ভয় পাইলেন, কিন্তু আপত্তি করিতে সাহস হইল না। প্রভু প্রণাম করিলে, পুরী তাঁহাকে উঠাইয়া প্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু বলিলেন, "গোসাঞি, শ্রীজগন্নাথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এখানে থাকুন।" পুরী বলিলেন, "আমার ইচ্ছা তোমার নিকট থাকি। তোমার তল্লাসে শ্রীনবদ্বীপে গিয়াছিলাম, সেখানে শচী-জননী আমাকে ভিক্ষা দিলেন। সেখানে শুনিলাম, তুমি নীলাচলে আসিয়াছ। ইহা শুনিয়া জননী-শচী ও অন্যান্য সকলে আনন্দে পরিপ্লুত হইয়াছেন। ভক্তগণ সম্মুখে রথযাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিতেছেন। আমার তত বিলম্ব সহিল না, তাই অগ্রে আসিলাম। এখন তোমার রূপ দর্শন করিয়া নয়ন শীতল হইল।" যথা—
"দেখিয়া তোমার রূপ নেত্র জুড়াইল। তীর্থযাত্রাদি মোর সফল হইল।।"

প্রভু তাঁহাকে নিজ বাসায় একখানি ঘর ও সেবার নিমিত্ত একজন কিঙ্কর দিলেন; তাহার অনতিবিলম্বে স্বরূপ আসিলেন। যখন পুরী ও স্বরূপ আসিলেন, তখন সার্বভৌম এই শ্লোক পড়িলেন যে, যেখানে যত নদী আছে সকল আসিয়া সাগরে মিলিত হয়। পুরীকে সে দিবস জগদানন্দ ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন।

তাহার পর গোবিন্দ আসিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বসিয়া নাম-জপ করিতেছেন, এমন সময় গোবিন্দ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে দাঁড়াইলেন। সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কে তুমি?" তাহাতে গোবিন্দ বলিতেছেন, "আমি শূদ্রাধম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবক। তিনি যখন দেহত্যাগ করেন, তখন আমাকে আর তাঁহার অন্য সেবক কাশীশ্বরকে বলিলেন, "তোমরা যাও, যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে সেবা করিবে। আর আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে বলিবে যে, "তিনি যখন গৃহাশ্রমে ছিলেন, তখন আমি তাঁহার মধুর নটেন্দ্ররূপ দর্শন ও হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছি। এখন তাঁহাকে দর্শন করিলে আর সেরূপ দেখিতে পাইব না, বরং আমার প্রাপ্ত ধন হারাইব। তাই তাঁহাকে দেখিতে যাই নাই। শ্রীপাদপুরী গোসাঞিব আজ্ঞাক্রমে আমি শ্রীচরণে উপস্থিত হইলাম। এখন প্রভু কৃপা করিয়া আমাকে স্থান দিতে আজ্ঞা হয়। কাশীশ্বর তীর্থ করিতে গিয়াছেন, সত্বর আসিবেন।"

ঈশ্বরপুরীর সন্দেশ শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন, "আমার প্রতি তাঁহার যে বাৎসল্যপ্রেম তাহার অবধি নাই।" কিন্তু পাঠক মহাশয়! ঈশ্বরপুরী কি বস্তু তাহা একবার অনুভব করুন। যে নিমাই শ্রীভগবান বলিয়া জগতে পূজিত, তাঁহার গুরু তিনি। পাছে তাঁহার হৃদয় হইতে প্রভুর গৌরনটেন্দ্র-রূপ কিছু মলিন হয়, এই ভয়ে তাঁহার যে শিষ্য, যিনি জগতে শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত, তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন না। সার্বভৌম গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিত্র কায়স্থ, তুমি ঈশ্বরপুরী গোসাঞিব কি কার্য করিতে?" গোবিন্দ বলিলেন, "সমুদয় কার্যই করিতাম, এমন কি, রন্ধন পর্যন্ত।" ইহাতে সার্বভৌম পূর্ব অভ্যাসবশতঃ একটু আশ্চর্য হইয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "পুরী গোসাঞি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ। তিনি কিরূপে শূদ্র-সেবক রাখিলেন?"

এ কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন। জাতিবিচার হিন্দু ধর্মের মজ্জাগত। সন্ন্যাসীদেরও শাস্ত্রমতে শূদ্র-সেবক রাখিতে নাই।

প্রভু বলিলেন, যাঁহারা মহাজন তাঁহারা লোকের মাহাত্ম্য দেখিয়া বিচার করেন, জাতি দেখিয়া বিচার করেন না। সার্বভৌম তখন বলিলেন, "তা বটে! বৈষ্ণবের কাছে এ সমুদয় ক্ষুদ্র বিধি আবার কি?" সার্বভৌম বলে প্রভু এই সুনিশ্চয়। কৃষ্ণ বৈষ্ণবের চেষ্টা লৌকিক না হয়।

প্রভু গোবিন্দের কথায় কোন উত্তব না দিয়া সার্বভৌমকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য, তুমি ইহার বিচার কর। যিনি গুরুকে সেবা করিয়াছেন তিনি পূজ্য, আমি তাঁহার সেবা কিরূপে লইব? আবার এদিকে গুরুর আজ্ঞা। এখন আমি কি করি?"

সার্বভৌম বলিলেন, "গুরুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা সর্বাপেক্ষা বলবৎ। অতএব গোবিন্দকে গ্রহণ করা উচিত।"

তখন প্রভু উঠিয়া গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। গোবিন্দ অমনি প্রভুর শ্রীচরণতলে পতিত হইলেন। এই হইতে গোবিন্দ প্রভুর সেবক হইলেন। এই গোবিন্দের কথা কি বলিব। যেমন প্রভু তেমনি সেবক। নিজে উদাসীন, পরম ভক্ত, অন্যকে সেবা করা গোবিন্দের ধর্ম। গোবিন্দ প্রভুকে কিরূপে সেবা করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে বলিব। ত্রিভুবনে গোবিন্দ হইতে অধিক ভাগ্যবান আর নাই।

অগ্রে কাশীশ্বর, দক্ষিণে পুরী গোসাঞি, বামে ভারতী গোসাঞি, পশ্চাতে স্বরূপ ও গোবিন্দ, আর মধ্যস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ। এইরূপে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে গমন করিতেন। সকলের কথা বলিলাম, এখন ভারতী ঠাকুরের আগমনবার্তা বলিব।

কেশব ভারতী প্রভুকে সন্ন্যাসমন্ত্র দেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী তাঁহার পরমার্থ-ভাই। গোবিন্দের আগমনের পরেই তিনি নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার যেমন গৌরবর্ণ রূপ, তেমনি প্রকাণ্ড দেহ, আবার সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি পরম সাধু ও পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু তিনি ভক্ত নহেন—শান্ত, অর্থাৎ নিরাকার ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া থাকেন।

প্রভুকে কখন দর্শন করেন নাই। তাঁহার মহিমা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মুকুন্দ প্রভুর দ্বার রক্ষা করিতেছেন, এমন সময় সেখানে আসিয়া ভারতী আপনার পরিচয় দিয়া প্রভুকে দর্শন করিবেন, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তখন মুকুন্দ শীঘ্র প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "ব্রহ্মানন্দ ভারতী ঠাকুর আসিয়াছেন, তোমাকে দর্শন করিতে চাহেন।" প্রভু একটু মধুর-হাস্য করিয়া বলিলেন, "তিনি গুরু, আমিই তাঁহাকে দেখিতে যাইব; বিশেষতঃ তিনি শান্ত। তিনি "শান্ত", এই কথা বলিয়া প্রভু ইহাই ব্যক্ত করিলেন যে, তিনি অন্যজাতীয়,—প্রভুর গণ নহেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ ভারতী ঠাকুরকে আনিতে চলিলেন। প্রভু ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছেন দেখিয়া ভারতীর নয়ন-ভৃঙ্গ প্রভুর শ্রীবদন-পদ্ম প্রতি আকৃষ্ট হইল। যথা—

"চতুর্দিকে ভক্তগণ মাঝে বিশ্বম্ভর। তারকা বেষ্টিত যেন পূর্ণ-শশধর।।
দূর হৈতে ব্রহ্মানন্দ প্রভুকে দেখিয়া। কহিতে লাগিলা অতি বিস্ময় পাইয়া।।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ইহোঁ জানিল নিশ্চয়। যে অপূর্ব শুনিয়াছি সেইরূপ হয়।।
কনক-পরিঘ সম দীর্ঘ বাহুদ্বয়। স্ফুটতর কনক কেতকী-কান্তি হয়।।
নব দমনক মাল্য লাল্যমণি দ্যুতি। উদয় করিল গৌরচন্দ্র চারু গতি।।
এই মত ব্রহ্মানন্দ দেখে নেত্র ভরি। তাহার নিকট আইলা গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।।"

প্রভু নাম শুনিয়া প্রথমেই বলিয়াছেন, "ইনি শান্ত, ইহার নিকট আমি যাইব।" তাহার পরে দেখেন ভারতীঠাকুর চর্মাম্বর পরিধান করিয়াছেন। দেখিবামাত্র প্রভু চটিয়া গেলেন। তখন মুকুন্দের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "কৈ ভারতী-গোসাঞি কোথায়?" মুকুন্দ বলিলেন, "ঐ তোমার অগ্রে দাঁড়াইয়া।" প্রভু বলিলেন, "মুকুন্দ, তুমি অজ্ঞান। তুমি কাহাকে ভারতী বলিতেছ, উনি ভারতী-গোসাঞি হইলে চর্মাম্বর পরিবেন কেন?" যথা—

"যদি হইতেন তিহঁ ভারতী-গোসাঞি। বাহ্য বেশ চর্মাম্বর পরিতেন নাই।।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ আশ্রয় যে সভাকার। চর্মাম্বর বাহ্য প্রতারণা নাহি তার।।"

এই কথা শুনিয়া ভালমানুষ ভারতীর মুখ শুখাইয়া গেল। তাঁহার প্রভুর সহিত পাল্লাপাল্লি দিবার ইচ্ছা নাই। প্রভুকে আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছেন। পূর্বেই প্রভুকে শ্রীভগবান্ বলিয়া অনেকটা বিশ্বাসও হইয়াছিল; এখন দর্শন-মাত্রে সে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। অতএব প্রভু যখন মধুর ভর্ৎসনা করিলেন, তখন ভারতী কথায় কিছু বলিলেন না, তবে মুখের ভাবে বলিলেন, "ক্ষমা কর, আমি এখনি চর্মাম্বর ত্যাগ করিতেছি।" প্রভু তখন পণ্ডিত দামোদরের দিকে চাহিলেন। দামোদর ইঙ্গিত বুঝিয়া একখানি নূতন বহির্বাস আনিলেন। ভারতীয় উহা গ্রহণ করিয়া পরিধান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "ঠিক্! আমি এখন বুঝিলাম, আমি যে চর্মাম্বর পরিতাম, ইহা কেবল দম্ভের নিমিত্ত। চর্মাম্বর পরিয়া ভবসাগর পার হওয়া যায় না।"

যে মাত্র ভারতী গোসাঞি বহির্বাস পরিধান করিলেন, অমনি প্রভু আসিয়া তাঁহাকে অতি বিনীত ভাবে প্রণাম করিলেন।

কাপড়ের বহির্বাস পরিবর্তে চর্মের বহির্বাস, প্রভুর বাহ্য-প্রতারণা বলিয়া সহ্য হয় নাই, কিন্তু এখন বাহ্য-প্রতারণা ব্যতীত, তাঁহার ধর্মের মধ্যে, আর কিই কি আছে? মাঝে মাঝে দুই একটি বিমল বস্তু দর্শন হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাহ্য-প্রতারণা।

যখন প্রভু ব্রহ্মানন্দকে প্রণাম করিলেন, তখন ভারতী অতিশয় ভয় পাইলেন। কারণ প্রভুকে দর্শন-মাত্রে তাঁহার চিরকালের বিশ্বাস নষ্ট হইয়া পুর্নজন্ম হইয়া গিয়াছে। প্রভু যে স্বয়ং শ্রীভগবান্ এই বিশ্বাস তাঁহার তখন হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ ভয় পাইয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "স্বামিন্! তোমার জীব-শিক্ষা দিবার লাগি অবতার। আমাকে এই নিমিত্ত প্রণাম করিলে।

তুমি তোমার জীবকে দৈন্য ও গুরু-সম্পর্কীয় জনকে ভক্তি-শিক্ষা দিতেছ, কিন্তু তবু আমার এই মিনতি, আমাকে আর প্রণাম করিবেন না, উহাতে আমার মনে বড় ভয় হয়।" তারপর প্রভুর ভক্তগণের সহিত ব্রহ্মানন্দের পরিচয় হইল, আর স্বরূপ প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

তৎপরে ব্রহ্মানন্দ প্রভুকে বলিতেছেন, "শ্রীজগন্নাথ দেবের মহিমা বর্ণিবার শক্তি আমার নাই; কিন্তু এখন সেই মহিমা আরো উজ্জ্বল হইয়াছে। যেহেতু সম্প্রতি শ্রীক্ষেত্রে উভয় স্থির ও জঙ্গম-ব্রহ্ম উপস্থিত। স্থির-ব্রহ্ম নীলবর্ণ ও জঙ্গম-ব্রহ্ম গৌরবর্ণ ধরিয়া উদয় হইয়াছেন।"

প্রভু এই কথা শুনিয়া সামান্য অপ্রস্তুত হইলেন, হইয়া হাসিয়া বলিলেন, "স্বামী, যাহা বলিলে তাহা ঠিক! এই নীলাচলে নীলবর্ণ ধরিয়া স্থির-জগন্নাথ ছিলেন; এখন তুমি, জঙ্গম-জগন্নাথ, গৌরবর্ণ ধরিয়া উদয় হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দস্বামীর অঙ্গের বর্ণ অতি-গৌর পূর্বে বলিয়াছি।

ব্রহ্মানন্দ তখন প্রভুকে ছাড়িয়া দিয়া সার্বভৌমকে বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য, তুমি নৈয়ায়িকের শিরোমণি, তুমি বিচার কর। যিনি ব্যাপ্য তিনি জীব, যিনি ব্যাপক তিনি শ্রীভগবান্,—এই শাস্ত্রের বচন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বামী আমার চর্মাম্বর ঘুচাইলেন, ইহাতে আমি হইলাম ব্যাপ্য অর্থাৎ জীব, আর স্বামী হইলেন ব্যাপক অর্থাৎ শ্রীভগবান্।"

ভট্টাচার্য বলিলেন, "স্বামীন্! আপনারই জয় হইল, আপনার কথাই শাস্ত্রসম্মত!"

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "শাস্ত্রের কথাও বটে, আর শ্রীভগবানের যে প্রকৃতি তাহার কথাও বটে। শ্রীভগবানের প্রকৃতিই এই যে, চিরদিন ভক্তের নিকট তিনি হারি মানিয়া থাকেন।" তাহার পরে আবার প্রভুকে বলিতেছেন, "স্বামিন্! আর এক অদ্ভুত কথা শ্রবণ করুন। চিরদিন আমি নিরাকার ধ্যান করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু তোমাকে দর্শনমাত্র আমার সে ভাব দূরে গিয়াছে। এখন আমার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ উদয় হইয়া আনন্দ দিতেছেন, আমার মন শ্রীকৃষ্ণতে আকৃষ্ট হইতেছে, আমার জিহ্বা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে লোলুপ হইয়াছে। অধিক কি, তোমাকে আমার সেই কৃষ্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে।" যখন ব্রহ্মানন্দ এই কথাগুলি বলিলেন, তখন তিনি ভাবে এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে, প্রভু আর উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না; তখন প্রভু তাঁহার চিরদিনের পন্থা অবলম্বন করিলেন,—সে কি তাহা বলিতেছি। চরিতামৃতে এই যে কথাটা আছে—"অন্তর্যামি ঈশ্বরের এই রীতি হয়। বাহিরে না কহি বস্তু প্রকাশে হৃদয়।"

ইহা স্মরণ করুন। প্রভুর এই এক প্রভাব ছিল। তিনি আপনাকে শ্রীভগবান্, কি অবতার, কি শ্রীভগবানের কেহ, এরূপ কোন কথা মুখাগ্রে আনিতেন না; কিন্তু তাঁহাকে দর্শন মাত্র লোকের তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস হইত। অর্থাৎ মুখে তিনি কাহার নিকট আপনার পরিচয় দিতেন না, তবে তাহার অন্তরে উদয় হইয়া, তিনি বস্তু কি, তাহা প্রকাশ করিতেন। এরূপ ঘটনা যখনই হইত, তখনই সেই ভাগ্যবানের নিকট প্রভু এইরূপে অন্তরে অন্তরে নিজের পরিচয় দিতেন। সেই ব্যক্তি স্বভাবতঃ "তুমি নিশ্চিত সেই তিনি, জীবের প্রাণ, যেহেতু তোমাকে আমার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে।" এইরূপ বলিলে, প্রভুর একটি উত্তর ছিল; তিনি তাহাই বলিয়া সেই ভাগ্যবানের নিকট আপনাকে গোপন করিবার চেষ্টা করিতেন। ব্রহ্মানন্দকে এখন সেই উত্তরটি দিলেন; অর্থাৎ বলিলেন, "স্বামিন্! তোমার কৃষ্ণের প্রতি গাঢ় অনুরাগ। যাহার এরূপ ভাব, সে চারিদিকে কৃষ্ণময় দেখে; এমন কি তাহার স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতিকে কৃষ্ণ বলিয়া বোধ হয়,—আমাকে যে হইবে তাহার বিচিত্র কি?"

সার্বভৌম বলিলেন, "সে ঠিক কথা। কৃষ্ণ প্রেম গাঢ় হইলে এরূপ হয়! আবার যাহার

কৃষ্ণ-প্রেম নাই, তাহাকে যদি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দর্শন দেন, কিম্বা যদি তিনি ছদ্মবেশেও উদয় হয়েন, তাহা হইলেও ঐরূপ হয়।

প্রভু অমনি কর্ণে হস্ত দিয়া বলিতেছেন, "শ্রীবিষ্ণু! সার্বভৌম, তুমি কি ভুলে গেলে যে, অতি-স্তুতি আর নিন্দা উভয়ই সমান?"

ব্রহ্মানন্দ আবার প্রভুকে ছাড়িয়া দিয়া কতক যেন আপন মনে আর কতক সার্বভৌমকে লক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"যিনি শ্রীভগবান্ তিনি পরম-সুন্দর। তাঁহার দর্শনে, জীবকে আনন্দে বিহ্বল করে। সে আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া যে নিরাকার ধ্যান করে, তাহার কেবল দুর্বাসনা। আবার ইহাও বলা যাইতে পারে, যাঁহার দর্শনে আনন্দে বিহ্বল করে, সেই বস্তু শ্রীভগবান্। এই যে বস্তুটি সন্ন্যাসী-রূপে ধরিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ইঁহার দর্শনে শুধু যে আমার মন নির্মল ও রুচি পরিবর্তন হইয়াছে তাহা নয়,—আনন্দে আমাকে একেবারে উন্মাদ করিয়াছে। ইহাতে আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, এই যে বস্তুটি, ইনি সেই তিনি, যিনি তাঁহার রূপে ও গুণে সর্বজীবকে আকর্ষণ করেন। ভট্টাচার্য্য, তুমি কি বল?" এই কথা আরম্ভ হইলেই প্রভু অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন, আর সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া তত্ত্ব-বিচার করিতে লাগিলেন। যথা—চৈতন্য গোসাঞি হন স্বয়ং ভগবান্। সার্বভৌম হন বৃহস্পতি বিদ্যমান।। ব্রহ্মানন্দ ভারতী পরম বিজ্ঞতম। দামোদর (স্বরূপ) পণ্ডিতাদি শাস্ত্রজ্ঞ উত্তম।। সবে মেলি কৈল পরম-ব্রহ্মের বিচার।।

সার্বভৌম বলিলেন, "স্বামিন্! আপনার সিদ্ধান্ত অতি চমৎকার।"

ব্রহ্মানন্দ বলিতেছেন, "দেখ ভট্টাচার্য, শাস্ত্রে ও মহাভারতে আমরা এই কথার অপরূপ প্রমাণ পাইতেছি। শ্রীভগবানের সহস্র নামের মধ্যে এই একটি নাম আছে, যথা—"সুবর্ণোবর্ণো হেমাঙ্গোবরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।"

"এই যে শ্রীভগবান্ সুবর্ণবর্ণ ধরিয়া সন্ন্যাসী হইবেন শাস্ত্রে উক্তি আছে, ইহা এতদিন সফল হয় নাই, এখন হইল। শ্রীভগবান্ স্বয়ং আনন্দ, সুতরাং তিনি জীবকে আনন্দ দিয়া থাকেন। নিরাকার ধ্যানে আনন্দ কি? তিনি যাহার প্রতি কৃপাবান হয়েন, তাহার নিকট ভুবনমোহন-রূপে ধারণ করিয়া তাহাকে আনন্দ প্রদান করেন। যে ব্যক্তি ভাগ্যবান, সে সেই আনন্দপ্রদ-রূপ ধ্যান না করিয়া নিরাকার ধ্যান কেন করিবে?

এমন সময় পণ্ডিত দামোদর আসিয়া গলায় বসন দিয়া ব্রহ্মানন্দকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন, আর তাঁহাকে আপনার কুটিরে লইয়া গেলেন। ভারতীকে প্রভু বাসা করিয়া দিলেন, আর একটি ভৃত্যও দিলেন।

সার্বভৌম প্রভুর সহিত অহোরহ রহিয়াছেন, আবার তাঁহার মনে অহোরহ একটি বাসনা রহিয়াছে। প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা করেন, আর তাঁহার অন্নদাতা। রাজা মহাপ্রভুকে দর্শনের নিমিত্ত পাগল হইয়াছেন, তাহা চক্ষে দেখিয়াছেন। রাজার প্রধান ভরসা তিনি। সার্বভৌম এই কথা প্রভুর নিকট উত্থাপন করিবেন বলিয়া অনবরত চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু সাহস হইতেছে না। বলিতে যান, আবার পারেন না। রাজার সহিত যদি তাঁহার নিঃস্বার্থ সম্বন্ধ থাকিত, তবে এরূপ কুণ্ঠিত হইতেন না। ওদিকে বিলম্বও আর করিতে পারেন না, যেহেতু রাজার নিকট হইতে পত্র আসিল। রাজা এই পত্রে জানিতে চাহিলেন যে, তাঁহার কথা প্রভুর নিকট বলা হইয়াছিল কি না, আর প্রভুর কিরূপ অনুমতি হইয়াছে। তখন ভট্টাচার্য সাহস করিয়া করজোড়ে প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু, একটি নিবেদন।" প্রভু মুখ তুলিয়া কথা শুনিবার সম্মতি প্রকাশ করিলেন; তখন সার্বভৌম বলিলেন, "প্রভু, অভয় দেন ত, বলি।" প্রভু বুঝিলেন যে সার্বভৌমের অভিপ্রায় ঠিক সৎ নহে। তাই—প্রভু কহে,—"কহ তুমি, নাই কিছু ভয়। যোগ্য হইলে করিব, অযোগ্য হইলে নয়।।

সার্বভৌম বলিতেছেন, "মহারাজা প্রতাপরুদ্র তোমার সহিত মিলিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। আমাকে লইয়া যাইয়া তোমাকে এই কথা বলিবার নিমিত্ত বিস্তর সাধ্যসাধনা করিয়াছেন। আবার সম্প্রতি অতি কাতর হইয়া পত্র লিখিয়াছেন। একবার তাঁহাকে দর্শন দাও, এই আমাদের ইচ্ছা।" প্রভু এই কথা শুনিয়া শিহরিয়া কর্ণে হস্ত দিলেন। বলিতেছেন,—"ভট্টাচার্য, তুমি বিজ্ঞতম, তুমি ওরূপ কথা কিরূপে বল? যে নিষ্ঠাবান, শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবে, তাহার পক্ষে বিষয়ী-ব্যক্তি ও নারী দর্শন অপেক্ষা বিষ খাইয়া মরা ভাল। তুমি আমাকে রাজদর্শন-রূপ অবৈধ কার্য্যে রত করিও না, যেহেতু আমি ভিক্ষুকের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি।"

সার্বভৌম বলিলেন, "প্রভু, তুমি যে শাস্ত্রের কথা বলিলে তাহা আমি জানি। রাজা সামান্য বিষয়ী হইলে আমি কখন এ কথা বলিতাম না। রাজা শ্রীজগন্নাথের সেবক, পরম ভক্ত, তাই তুমি তাঁহাকে দর্শন দিলে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য হইবে না।"

প্রভু বলিলেন, "তাহা হইলেও বিষয়ী ব্যক্তি ও নারী ভিক্ষুকের পক্ষে বিষ। এমন কি, বিষয়ী ব্যক্তির কি স্ত্রী মূর্তি পর্যন্ত ভিক্ষুকের দর্শন করিতে নাই, কি জানি যদি মন বিচলিত হয়। ঐশ্বর্যশালী রাজার সহিত আমাকে মিলিত বল?"

সার্বভৌম তবু নিরস্ত হইলেন না, যেন প্রত্যুত্তরে কি বলিবেন তাহারই উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। তখন প্রভু একটু কঠিন হইয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য, তুমি আর্য, তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না। তুমি যদি এরূপ অন্যায় আজ্ঞা কর, তবে নীলচল হইতে আমার পলাইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য করজোড়ে ক্ষমা মাগিলেন, আর বলিলেন,—এমন কার্য্য তিনি আর করিবেন না।

সার্বভৌম তখন রাজাকে লিখিলেন যে, প্রভুর অনুমতি হইল না। তবে তিনি ভক্তবৎসল, অনুমতি অবশ্য হইবে। কিন্তু রাজার বিলম্ব সহিতেছে না। তিনি আবার সার্বভৌমকে লিখিলেন যে, প্রভু যদি অস্বীকার করেন, তবে তাঁহার ভক্তগণ দ্বারা তাঁহার মন দ্রব করাইবে। তিনি আরো লিখিলেন যে, প্রভুকে দর্শন নিমিত্ত তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহার রাজ্য পর্য্যন্ত ভাল লাগিতেছে না। এমন কি, প্রভু যদি তাঁহাকে দেখা না দেন, তবে তিনি কর্ণে কুণ্ডল পরিয়া যোগী হইয়া বাহির হইবেন। এই পত্র পড়িয়া সার্বভৌম বড় চিন্তিত হইলেন। কিন্তু প্রভুর নিকট আবার গমন করিতে সাহস হইল না; তখনই ভক্তগণ লইয়া ষড়যন্ত্র করিতে বসিলেন। তাঁহাদিগকে সমুদয় কহিলেন, ও রাজার পত্র দেখাইলেন। শেষে শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন যে, তিনি যদি প্রভুর মন কোমল করিতে পারেন, তবেই হইবে। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের সাহস হইল না। তখন ভট্টাচার্য বলিলেন, "চল সকলে যাই। তাঁহাকে রাজার সহিত মিলিতে বলিব না, তবে রাজার চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়া প্রভুর মন নরম করিব। সকলে দল বান্ধিয়া প্রভুকে যাইয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন; সার্বভৌম সকলের পাছে, নিতাই সকলের আগে। তাঁহাদের মুখ দেখিয়া প্রভু বুঝিলেন যে, তাঁহাদের কোন কথা আছে, তাই শুনিবার নিমিত্ত মুখ উঠাইলেন। নিতাই বলিতে গেলেন, কিন্তু একে একটু তোতলা, তাহাতে আবার কথাটা তত ভাল নয়, তাই বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া প্রভু বলিলেন, "তোমরা যেন কি বলিবে? বল, আমি শুনিতেছি।" ইহাতে নিতাই সাহস বান্ধিয়া বলিলেন, "তোমাকে না বলিলে মরি, বলিতেও সাহস হয় না। আর কিছু নহে, রাজা তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বড় ব্যাকুল হইয়াছেন। রাজা যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমাদের তাঁহার প্রতি বড় শ্রদ্ধা হইয়াছে। রাজা লিখিয়াছেন যে, যদি তোমার দর্শন না পান তবে কর্ণে কড়ি দিয়া উদাসীন হইবেন, তাঁহার রাজ্যসুখ আর ভাল লাগিতেছে না। তাঁহার মনের এক মাত্র সাধ যে তোমার শ্রীচরণ ও শ্রীবদন নয়ন ভরিয়া একবার দেখিবেন।"

প্রভু এই কথা শুনিয়া, কতক রুক্ষ কতক ব্যঙ্গ ভাবে বলিলেন, "তোমাদের ইচ্ছা যে আমাকে লইয়া এখন কটকে চল। তাহা হইলে তোমাদের বড় ভাল হইবে,—না? তোমরা যদি পরমার্থ না মান লোকে কি বলিবে, তাই একবার ভাব, দেখ? অপরের কথা দূরে থাকুক, দামোদর পর্য্যন্ত আমাকে নিন্দা করিবেন। ভাল, দামোদর আমাকে আজ্ঞা করিলে আমার রাজার সহিত মিলিতে আপত্তি নাই।"

দামোদর বলিলেন, "আমি ক্ষুদ্র জীব আর তুমি শ্রীভগবান, তোমাকে আমি বিধি দিব ইহা হইতেই পারে না। তবে রাজার যদি তোমার প্রতি প্রকৃত ভক্তি ও প্রেম থাকে, তবে তিনি অবশ্য তোমার চরণ পাইবেন, ইহা আমি বলিতে পারি।" শ্রীনিত্যানন্দ তাড়া খাইয়া ভয় পাইয়াছেন। বলিতেছেন "সর্বনাশ। রাজদর্শন কর তোমাকে এ কথা কে বলিবে? তবে রাজা যখন তোমার নিমিত্ত প্রাণ ছাড়িতে প্রস্তুত, তখন তোমার কৃপা-চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে তোমার একখানা বহির্বাস পাঠাইতে অনুমতি দাও, তাহা পাইলে রাজা এখন সুস্থির হইবেন।" প্রভু বলিলেন, "যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তবে তাহা কর, আমার আপত্তি নাই।" তাহা করা হইল, রাজাও বস্ত্র পাইয়া কৃতার্থ হইলেন, কিন্তু নিরস্ত হইলেন না; তাহার কারণ বলিতেছি।

প্রভু যে রাজার সম্বন্ধে এই বাহ্য নিষ্ঠুরতা দেখাইলেন, তাহার আর কোন কারণ নাই, কেবল এই যে, ভূপতির তখন প্রভু-দর্শনে অধিকার হয় নাই। রাজা সকলের কর্তা, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। তাঁহার বাসনা রোধ করে কাহার সাধ্য। যখন ইচ্ছা হইয়াছে প্রভুকে দেখিবেন, তখন দেখিবেন। এই যে ইচ্ছা, ইহা কেবল প্রেম ও ভক্তি জনিত নহে। তাহা হইলে, প্রভু-দর্শন সুলভ হইত। কিন্তু এই ইচ্ছার হেতু প্রেম ও ভক্তি ব্যতীত আরও কিছু ছিল, তাহা এই যে,—তিনি রাজা। তিনি রাজা, প্রভুর সহিত মিলিতে চাহিয়াছেন, তাহা পারিবেন না, তাহা কিরূপে হইবে? তিনি না দেশের রাজা? তাই, প্রভু নিষ্ঠুর হইয়া বলিলেন যে, এ কথা পুনরায় উত্থাপিত হইলে তিনি নীলাচল ত্যাগ করিবেন। রাজা শুধু বহির্বাস পাইয়া ঠাণ্ডা হইতেন না, তবে সার্বভৌমের পত্রে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। সার্বভৌম লিখিলেন যে, প্রভু অবশ্য তাঁহাকে দর্শন দিবেন, তিনি যেন ব্যস্ত না হন।

প্রতাপরুদ্র স্নানযাত্রার দুই তিন দিন থাকিতে প্রতি বৎসর পুরীতে আসেন, সেই নিয়মানুসারে নীলাচলে আসিলেন। রাজার সঙ্গে রামরায়ও আসিলেন। রামানন্দ, প্রভুকে বিদ্যানগর হইতে বিদায় দিয়া, সৈন্যসামন্ত সহ রাজার কাছে গমন করেন, এবং তাঁহাকে বিষয়কার্য্য বুঝাইয়া দিয়া চিরদিনের তরে অবসর লয়েন, এখন রাজার সহিত নীলাচলে আসিলেন। রাজা পুরীতে আসিয়াই, "কে আছ, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া আন," বলিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। দূত দৌড়িয়া আসিয়া সার্বভৌমকে রাজার আজ্ঞা জানাইল।

রাজা আসিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে চলিলেন, আর রামরায় জগন্নাথ দেখিতে না যাইয়া প্রভুকে দেখিতে দৌড়িলেন।

রাজা শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিয়া, চন্দ্রাতপের ছায়াতে পাত্র মিত্র লইয়া বসিয়া, সার্বভৌমকে প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন। রাজার হৃদয় তখন আনন্দে পরিপ্লুত; ইহা শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া নয়, প্রভুকে দর্শন করিবেন সেই আশায়। সার্বভৌম তাঁহাকে পূর্বে আশা দিয়া লিখেন, তাহাতে রাজা বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি নীলাচলে আইলেই প্রভুর দর্শন পাইবেন। তাহার পরে রামানন্দ কটকে যাইয়া কার্য্য হইতে অবসর মাগিলে, রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, বিষয়কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি প্রভুর চরণে থাকিবেন। এইরূপে রাজার নিকট আবার প্রভুর কথা উত্থাপিত হইল। তখন রামানন্দ সহস্র মুখে প্রভুর গুণানুবাদ করিলেন। পূর্বে শ্রীপ্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে রাজার যে কিছু সন্দেহ

ছিল, রামরায়ের সহিত কথাবার্তায় তাহা দূর হইল। রাজা তখন কাতর ভাবে রামানন্দের শরণাগত হইয়া বলিলেন, "তুমি প্রভুর প্রিয়পাত্র, আমায় একবার প্রভুকে দেখাও।" রামরায়ও ইহা স্বীকার করিয়া বলিলেন, "প্রভু প্রেমভক্তির বশ, তোমার সময় হইলে তোমাকে অবশ্য দর্শন দিবেন। তাঁহার রীতিই এই।"

রাজা প্রতি বৎসর স্নানযাত্রার কিছু পূর্বে নীলাচলে যেরূপ আসিয়া থাকেন, এবারও সেইরূপ আসিয়াছেন। কিন্তু এবার জগন্নাথ দর্শন করিতে তত নয়, যত প্রভুকে দর্শন করিতে। দূতী প্রেরণ করিয়া, প্রিয়তমের নিমিত্ত বাসকসজ্জা করিয়া, প্রিয়তমের আগমন সংবাদ প্রতীক্ষায় ও উল্লাসে প্রিয়া যেরূপ বসিয়া থাকেন, রাজা সেইরূপ সার্বভৌমকে প্রত্যাশা করিতেছেন।

সার্বভৌম আসিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিলেন; রাজা প্রণাম করিয়া ভট্টাচার্যকে বসাইলেন, এবং বলিলেন, "ভট্টাচার্য, প্রভুর নিকট লইয়া চল।" অমনি ভট্টাচার্য্যের মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি কষ্টে-সৃষ্টে বলিলেন যে, প্রভুর এখনও অনুমতি হয় নাই। তাহার পরে রাজাকে ২। ১টা আশ্বাস বাক্য বলিতে গেলেন, কিন্তু রাজা সে অবসর দিলেন না; প্রভুর অনুমতি হয় নাই শুনিবামাত্র ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। যথা চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে—

"শ্রীচৈতন্য দরশন, না দিবেন অভাগার প্রতি।
হা হা ধিক রাজত্ব, ইহা হইতে সুনীচত্ব,
পৃথিবীতে আর আছে কতি।
দর্শন না করি যারে, হেন নীচ অধমেরে,
মহাপ্রভু করে দরশন।"

রাজা বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য, ধিক আমার রাজত্ব, আমি কি এত নীচ! আমি যাহাকে ঘৃণা করিয়া দেখি না, তাহাকে প্রভু দেখা দেন, তবু আমাকে দেখা দিবেন না! ভাল ভট্টাচার্য, আমি নয় নীচ হইলাম, তিনি ত শ্রীভগবান্? তিনি পতিত উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তবে আমাকে উপেক্ষা কি বলিয়া করিবেন? তবে কি তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন যে, একা প্রতাপরুদ্র ব্যতীত জগতের তাবল্লোককে উদ্ধার করিবেন? ভট্টাচার্য, আমারও প্রতিজ্ঞা শুন। তিনি শ্রীভগবান্, আমাকে দর্শন দিবেন না সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাঁহার দর্শন না পাইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "এরূপ যাহার দৃঢ়সঙ্ককল্প তাহার অভাব কি? অবশ্য প্রভু তোমাকে দর্শন দিবেন; সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তবে আরও দুই এক দিন অপেক্ষা কর।" যথা চরিতামৃতে— "তেঁহ প্রেমাধীন, তোমার প্রেম গাঢ়তর। অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপরি।।"

এদিকে রাজা শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে চলিলেন দেখিয়া রামানন্দ, তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া, প্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন। রামানন্দ আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন, আর উভয়ে গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

রামানন্দের সহিত প্রভুর এত গাঢ় আত্মীয়তা দেখিয়া তাঁহার নিজ ভক্তগণ আশ্চার্যান্বিত হইলেন। তাহার পরে দুইজনে বসিয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। রাজা রামানন্দকে দূতী নিযুক্ত করিয়াছেন, আবার রাজা রামানন্দের চিরদিনের অন্নদাতা। রাজাকে যে প্রভুর সহিত মিলাইবেন, ইহা তাঁহার কাজেই আন্তরিক ইচ্ছা। রামানন্দ বলিতেছেন, "প্রভু, তুমি যখন নীলাচলে আসিলে, আমি তাহার কিছুদিন পরে রাজার নিকট গমন করিলাম; এবং বিষয় হইতে আমাকে অব্যাহতি দিতে রাজার অনুমতি চাহিলাম। রাজা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা

করিলে আমি বলিলাম, আমি যতদিন বাঁচিব. প্রভুর চরণ পূজা করিব, এই সঙ্কল্প করিয়াছি। এই কথা বলিবামাত্র রাজা মহা-প্রেমে চঞ্চল হইলেন, এবং উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং পরে বলিলেন, "তুমি ধন্য, প্রভুর কৃপা পাইয়াছ। আমি ছার, তাহা পাইবার যোগ্য নহি। তুমি সচ্ছন্দে যাও এবং তাঁহার চরণ ভজন করিয়া জন্ম সার্থক কর। আরও বলিতেছি, তুমি বিষয় কার্য করিও না, কিন্তু তোমার যে বেতন ইহার দ্বিগুণ পাইবা। তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কৃপাময়; যদিও এ জন্মে আমাকে কৃপা না করেন, তবে অবশ্য অন্য কোন জন্মে করিবেন।"

এই সমুদয় বলিয়া শেষে রামরায় বলিতেছেন, "প্রভু, রাজার তোমার প্রতি যে প্রেম দেখিলাম তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। সে প্রেমের লেশও আমাতে নাই।" এই কথা শুনিয়া প্রভু বলিতেছেন, "তুমি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তোমায় যিনি ভক্তি করেন, তিনি ভাগ্যবান। রাজার এ গুণে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপার পাত্র হইবেন।" প্রভু রাজাকে যে কৃপা করিবেন, এই প্রথমে তাহার আভাস দিলেন। তাহার পরে প্রভু বলিতেছেন, "রামানন্দ, শ্রীমুখ দর্শন করিয়াছ?" রামরায় বলিলেন, "না, এই এখন যাইব।" ইহাতে প্রভু বলিলেন, "এ কি অকার্য করিলে! জগন্নাথ ঈশ্বর, তাঁহাকে দর্শন না করিয়া কেন এখানে আসিলে?" রামরায় বলিলেন. "চরণ রথ, হৃদয়-সারথী। সারথী যে দিকে লইয়া যায়, চরণ সেই দিকে গমন করে। হৃদয়-সারথী এই দিকেই আনিলেন।" প্রভু বলিলেন, "তবে যাও, এখন জগন্নাথ দর্শন ও পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত দেখাশুনা কর গিয়া।" রামরায়, প্রভু ও ভক্তগণকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলেন, এবং জগন্নাথ দর্শন করিয়া রাজার নিকট গমন করিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামানন্দ, প্রভুর নিকট নিবেদন করেছিলে?" রামরায় বলিলেন, "ধৈর্য ধরুন। প্রায় হয়েছে, একটু বিলম্ব আছে, আর কিছুকাল অপেক্ষা করুন।" রামানন্দ আপন উদ্যানে মহা-বিষয়ীর ন্যায় বাস করেন, প্রভুর ওখানে প্রায় দিবানিশি যাপন করেন, আবার রাজাকেও একবার দর্শন করিতে গমন করেন। বাজার নিকট গমন করিলেই রাজা জিজ্ঞাসা করেন, "কত দূর? প্রভুর কি পূর্বাপেক্ষা মন একটু শিথিল হয়েছে?"

রামানন্দ শেষে প্রভুকে ধরিলেন। তাঁহাকে বলিতেছেন, "প্রভু! রাজার সহিত দেখা করা আমার দুর্ঘট হয়েছে। দেখা হইলেই কেবল এক কথা, 'প্রভুর সহিত মিলাইয়া দাও। তুমি মনে করিলেই পারিবে।' রাজা ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়াছেন, তাঁহার যেরূপ ভাব তাহাতে তাঁহাকে দেখা না দিলে তিনি প্রাণে বাঁচিবেন বলিয়া বোধ হয় না।" ইহা শুনিয়া প্রভু একটু কাতর হইলেন। বলিতেছেন, "রামানন্দ, তোমরা আমাকে রাজার কথা বলিয়া কেন দুঃখ দাও? আমার তাঁহাকে দর্শন দিতে ত কোন আপত্তি নাই। তবে নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ কিরূপে করি?"

রামানন্দ বলিলেন, "তোমার আবার কি বিধি পালন করা কর্তব্য; তাহা সত্য, কিন্তু প্রতাপরুদ্র নামে রাজা, কর্তব্যে ভক্ত!"

প্রভু বলিলেন, "তাহা আমি জানি। কিন্তু আমার যে অবস্থা, তাহাতে সমুদয় বিচার করিতে হইলে আমার অতি সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। আমার একটু ছিদ্র পাইলে জীবে আর হরিনাম লইবে না।"

রামানন্দ। প্রভু, কত লক্ষ অধম পতিত অস্পৃশ্য পামরকে অধম হইতে উত্তম করিলে,—এমন কি ব্রজরস দান করিলে; রাজা তোমার ভক্ত, তাঁহাকে বঞ্চিত করিবা, ইহাও ত সঙ্গত হয় না।

প্রভু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন. "রামানন্দ, তুমি এক কার্য কর। তুমি রাজার পুত্রকে লইয়া আইস।" শাস্ত্রে "আত্মা বৈ জায়তে পুত্র" বলে। রাজার পুত্রের সহিত মিলিব, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হউন।"

রামানন্দ ইহাতে সম্পূর্ণরূপে না হউক, কতক আনন্দিত হইলেন সন্দেহ নাই। আর সেই আনন্দ মনে, রাজার নিকট গমন করিয়া সমুদয় কথা বলিলেন। শেষে বলিলেন, "প্রভুর তোমার উপর সম্পূর্ণ কৃপা, আর সেই কৃপার আরম্ভ এই।" ইহাতে রাজাও আনন্দিত হইলেন। তখন রসিকভক্তচূড়ামণি জগন্নাথবল্লভ নাটক-লেখক রামানন্দ রাজপুত্রকে সাজাইতে লাগিলেন। রাজকুমারের কেবল যৌবনারম্ভ, শ্যাম বর্ণ, কাজেই তাঁহাকে কৃষ্ণের ন্যায় বেশভূষা করাইলেন। অর্থাৎ পীতাম্বর পরাইলেন, আর তাহার উপযোগী মনোমত আভরণ দ্বারা সাজাইলেন। রাজকুমার কিরূপে চলিলেন, না যেরূপ যুবতী পতির সহিত প্রথম ঘরে মিলিতে যান; সেইরূপ মন্থর-গতিতে, প্রতি পদ-বিক্ষেপে মঞ্জরী-ধ্বনি করিতে করিতে রাজপুত্র প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন।

রামানন্দের ইচ্ছা, রাজপুত্রের হাবভাব লাবণ্যে প্রভুকে ভুলাইবেন; আর সেইরূপ করিয়া তাঁহাকে সাজাইয়াছেন এবং সেইরূপ অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রকৃতই প্রভু রাজপুত্রকে দেখিয়া ভুলিলেন, রাজকুমারকে দর্শনমাত্র তাঁহার রাধা-ভাবে শ্যামসুন্দরের স্মৃতি হইল। প্রভু, তখন উঠিয়া বিবশীকৃত হইয়া রাজকুমারকে বলিলেন, "তুমি বড় ভাগ্যবান্, তোমার দর্শনে আমার ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্মৃতি হইল।" প্রভু ইহা বলিতে বলিতে কুমারকে আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু রাজকুমার কি করিলেন? "প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ। স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ পুলক বিশেষ।। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে, নাচে, করয়ে রোদন।"—চরিতামৃত।

প্রভু যত্ন করিয়া তাহাকে শান্ত করাইলেন ও নৃত্য হইতে ক্ষান্ত করিলেন। প্রভু বলিলেন, "তুমি ভাগবতোত্তম। তুমি এখানে প্রত্যহ আসিবা।" রাজকুমার প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া পিতার নিকট চলিলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে রাজকুমার আনন্দে টলমল করিতেছেন, অঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইয়াছে, নয়ন দিয়া ধারা পড়িতেছে, অধিক কি—তাঁহার পুনর্জন্ম হইয়াছে। তাঁহার রূপ এত মনোহর হইয়াছে যে, তাঁহাকে চেনা যাইতেছে না। রাজপুত্রের দশা দেখিয়া রাজা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজা পুত্রকে আলিঙ্গন দিয়া সেই আনন্দের অংশ পাইলেন। যে ব্যক্তি শ্রীঅঙ্গের পরশ পাইয়াছে, তাহার অঙ্গ-পরশের আস্বাদ করিয়া, রাজার শ্রীপ্রভুর প্রতি লোভ নিবৃত্তি হইল না, বরং আরও বর্ধিত হইল।

অষ্টম অধ্যায়

একবার এস হৃদি মন্দিরে, কাঙ্গাল ডাকে অতি কাতরে।
একবার এস হে, এস হে, এস হে, গৌর এস হে।
তুমি আসিবে আশায় হৃদি-পদ্মাসন পাতিয়া রাখিয়াছি।।
একবার এস নাথ সেই আসনে বস।
আমি হেরিব বদন, পূজিব চরণ, আমি ধোয়াব চরণ নয়নের জলে,
আর মাগিব এক ভিক্ষা।
আমি চাহি না ধন, চাহি না জন, চাহি না পদ, চাহি না সম্পদ,
শুভ দৃষ্টিপাত জীবগণ প্রতি কর। বলরাম দাসের চিরদুঃখ হর।।

নীলাচল হইতে নবদ্বীপে সংবাদ আসিল যে, নবদ্বীপের চাঁদ দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া, সচ্ছন্দে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়া, সেখানে বাস করিতেছেন। এই সংবাদ শচীর মন্দিরে পৌঁছিল; শচী শুনিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়াও শুনিলেন। দূত প্রভুদত্ত মহাপ্রসাদ শচীর অগ্রে রাখিলেন। ঘোর-বিয়োগানলে উত্তপ্ত শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া অমিয়-সাগরে ডুবিলেন। এই দুই বৎসর স্বপ্নের ন্যায় দুঃখ-সাগরে ভাসিয়া বেড়াইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহাদের দুঃখ-সাগর শুখাইয়া, সুখের সাগর বহিল। "অবশ্য নিমাই আমার বাড়ী আসে নাই, তবুও বেঁচে আছে?

তবুত ভাল আছে?"—এই শচীর আনন্দ। আর "আমার শ্রীগৌরাঙ্গ সমুদ্রকূলে নৃত্য করিয়া এখন নীলাচলবাসীকে সুখ দিতেছেন, কত শত লোক উদ্ধার পাইতেছে;"—এই বিষ্ণুপ্রিয়ার আনন্দ। যথা—

"প্রাণনাথ মোর সিন্ধুকূলে প্রেমে নাচিছে। ধ্রু।
হরি বলে কত লোকে সুখে ভাসিছে।।"

যখন দুঃখ থাকে, তখন বোধহয় ইহার আর প্রতিকার নাই। আবার অনেক সময় সেই দুঃখই সুখের আকর হয়। এই যে ভুবনমোহন দুর্লভ ধন, এই যে প্রাণ হইতে প্রিয়তম বস্তু, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া, সন্ন্যাসী হইয়া, বৃক্ষতলবাসী হয়েছে,—এ কথা শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রভুর প্রত্যাগমন সংবাদ শুনিবামাত্র ভুলিয়া গেলেন। এই গেল রসিকশেখরের এক অত্যাশ্চর্য রঙ্গ। তবে আবার দুঃখ কি গা? তাঁহার ইচ্ছায় অগ্নির গহ্বরও সুখসাগরে পরিণত হইতে পারে। প্রভুর প্রত্যাগমন সংবাদ এক মুহূর্তে শ্রীনবদ্বীপময় ছড়াইয়া পড়িল, আর তখনি প্রভুর বাড়ী লোকারণ্য হইল। "জয় নবদ্বীপচন্দ্রের জয়!"—এই ধ্বনি মুর্হুমুর্হুঃ হইতে লাগিল। সকলে বলিয়া উঠিলেন, "চল যাই প্রভুকে দর্শন করি গিয়া।" যেন প্রভু ও-পাড়ায় আছেন। কিন্তু প্রভু বিংশতি দিনের পথ দুরে; শুধু তাহা নহে, পথও অতি দুর্গম।

কিন্তু কে লইয়া যাইবে? প্রভু না যাইবার সময় বলিয়াছিলেন যে, আমার অভাবে তোমরা শ্রীঅদ্বৈত আচার্যকে ভজনা করিও? চল সকলে সেখানে যাই। তিনিই আমাদিগকে লইয়া যাইবেন। এই কথা সাব্যস্ত করিয়া প্রভুর ভক্তগণ, নীলাচলের দূত সঙ্গে করিয়া অদ্বৈতের বাড়ী শান্তিপুরে চলিলেন।

সেখানে দিন কয়েক মহোৎসব হইল; শ্রীঅদ্বৈত অন্নদানে কখন কাতর নহেন। ইহার পরে সকলে জুটিয়া, তাঁহাকে অগ্রে করিয়া শচীর মন্দিরে আসিলেন। সেখানে আবার মহোৎসব আরম্ভ হইল। সকলে পথের সম্বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শচীর আজ্ঞা লইয়া এবং তাঁহার দত্ত সামগ্রী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বহস্তে প্রস্তুত উপহার লইয়া, সকলে "জয় জগন্নাথ," "জয় নবদ্বীপচাঁদ" বলিয়া চলিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে দূরদেশে গমন করা সুখের কার্য নয়, কিন্তু ভক্তগণ উহা মনে করিলেন না। সকলে প্রভুর নিমিত্ত অতি উপাদেয় খাদ্য সঙ্গে লইলেন, আবার অনেকে মহাপ্রভুর প্রাণের সম্পত্তি—মৃদঙ্গ, করতাল, মন্দিরা—বহন করিয়া লইয়া চলিলেন।

ভক্তগণ আসিতেছে, এই সংবাদ প্রচার হওয়ায় রাজা প্রতাপরুদ্র ভক্ত আগমন দর্শন করিতে, গোপীনাথকে সঙ্গে করিয়া অট্টালিকায় উঠিলেন। ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছিয়া পায়ে নূপুর পরিলেন, এবং খোল ও করতাল বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে চলিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল গীতধ্বনি উঠিল। দুই শত ভক্ত বহুতর মৃদঙ্গ ও করতালের সহিত কীর্তন করিতে করিতে প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন।

যাঁহারা শ্রীভগবানকে ভীষণ ভাবিয়া ভজন করেন, তাঁহারা ভয়ে ভীত হইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, "তুমি দয়াময়", "তুমি দয়াময়" এই চাটুবাক্য বলিতে বলিতে গমন করেন। আর যাঁহারা মহাপ্রভুর গণ, তাঁহারা ভগবানকে প্রিয় হইতে প্রিয়তম ভাবিয়া, তাঁকে দর্শন করিতে, নূপুর পায় দিয়া নৃত্য করিতে করিতে গমন করেন।

কৃষ্ণমঙ্গল-গীত শুনিয়া রাজা বিহ্বল হইলেন। বলিতেছেন, একি সুধাবর্ষণ! কথা একটিও ত বুঝিতেছি না, কেবল সুর শুনিয়া অন্তরে ভক্তির উদ্রেক, অঙ্গ পুলকিত ও হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে। কি আশ্চর্য!

গোপীনাথ বলিলেন, "মহারাজ! আমাদের বদান্যবর মহাপ্রভু জীবকে এই সংকীর্তন-রূপ সম্পত্তি দান করিয়াছেন।"

ভক্তগণ শ্রীমন্দিরের সম্মুখে আসিলেন, কিন্তু মন্দিরে গেলেন না; মন্দির দক্ষিণে রাখিয়া কাশীমিশ্রের আলয় অভিমুখে গমন করিলেন। এই স্থানে তাঁহাদের সর্বস্ব-ধন রহিয়াছেন। তাঁহারা সেই আলয়ের নিকটবর্তী হইলে, প্রভু তাঁহার নীলাচলস্থ সঙ্গীগণ লইয়া বাহির হইলেন।

তখন প্রভুর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর। প্রভুর বদন আনন্দে প্রফুল্ল, পদ্ম-সদৃশ নয়ন হইতে ধারা বহিতেছে।

তখন নয়নে-নয়নে মিলন হইল। সকলের নয়ন প্রভুর শ্রীমুখে, আর প্রভুর নয়ন সকলেব মুখে! প্রত্যেকের মনে হইতেছে যে, প্রভু তাঁহাকেই দেখিতেছেন, আর নয়ন-ভঙ্গি দ্বারা প্রাণের সহিত তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ভূমিকা

আমাকে অনেক সময় একটি ভাবে অভিভূত করে; সেটি এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের ন্যায় বৃহৎ ঘটনা জগতে আর হয় নাই। দেখুন, শ্রীভগবানই সব, তাঁহার ন্যায় বৃহৎ বস্তু আর কিছুই নাই। সেই বৃহৎ বস্তুটি, কি কেবলমাত্র সেই বস্তুটি, গুপ্তভাবে রহিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে যে জ্ঞান ইহার ন্যায় বহুমূল্য সম্পত্তি জীবের আর হইতে পারে না। কত বৃহৎ সাম্রাজ্যের পতন হইতেছে, কত প্রকাণ্ড সমর হইতেছে, কত নৈসর্গিক বিপ্লব ঘটিতেছে, এমন কি, ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত লয় হইতেছে। এ সমুদয় বৃহৎ ঘটনা সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সমুদয় ঘটনার সহিত আমাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। যদি শ্রীভগবান আমাদের গতি হইলেন, অর্থাৎ যদি মৃত্যুর পরেও জীবন থাকে, তবে এই সৌরজগৎ নাশ হইলেই বা আমাদের ক্ষতি কি? আর এ জগতে সাম্রাজ্য পাইলেন বা লাভ কি? কারণ এই জড়-জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্ষণিক বই নয়। কাজেই শ্রীভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের একমাত্র সম্পত্তি। এই সংসারের অনিত্যতা যাঁহাদের সম্যক প্রকারে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাঁহারা সংসারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া কোথা যাব, কি করিব দিবানিশি ইহাই ভাবিয়া অস্থির হইতেছেন। এইরূপে চেতন-জীব মাত্রেই যে কোন অস্থির না হয়েন, ইহাই আশ্চর্যের কথা। কারণ সংসারে যে অনিত্য, ইহা জীবমাত্রেই সর্বদা অনুভব করিতেছেন। তাই হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা মায়া বলিয়া একটি কথার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই মায়ারূপ শক্তি-কর্তৃক অভিভূত হইয়া জীব নিশ্চিন্ত হইয়া জগতে বিচরণ করিতেছে। এই 'মায়া' না থাকিলে জীব ক্ষণমাত্রও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না। দেখুন প্রীতির বিচ্ছেদ হইবে জানিয়াও লোক স্বচ্ছন্দে উহা কর্তৃক আবদ্ধ হইতেছে; নিজে অতি ক্ষুদ্র ও নিরাশ্রয় জানিয়াও অন্যের উপর আধিপত্য করিতেছে; মরিবে নিশ্চিত জানিয়াও অমরের ন্যায় কার্য্য করিতেছে।

এরূপ অনেক বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও পণ্ডিত লোক আছেন, যাঁহারা সব বুঝেন, কেবল নিজের প্রকৃত স্বার্থের বেলা অন্ধ হন। প্রকৃত কথা, পরম-পণ্ডিত, যিনি অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন; অতি বিদ্বান, যিনি সমুদয় শাস্ত্র মন্থন করিতেছেন; অতি চতুর, যিনি বুদ্ধিবলে জগৎ করতলে আনিতেছেন,—অথচ আপনি যে মরিবেন তাহা একেবারে ভুলিয়া, সেই মহাপ্রস্থানের কোন সম্বল করিতেছেন না। কাজেই তিনি পণ্ডিত কি বিদ্বান নয়, বুদ্ধিমানও নয়,—তিনি প্রকৃতপক্ষে অন্ধ ও অভাগ্য।

জীবমাত্রেই প্রায় এইরূপ। পথে ঘাটে, বাজারে, সভা সমিতিতে, যেখানে যাও দেখিবে জীব কেবল বাজে-কথা ও বাজে-কাজ লইয়া ব্যস্ত। শ্রীগৌরাঙ্গের একটি উপদেশ এই—"গ্রাম্য-কথা কহিও না গ্রাম্য-কথা শুনিও না।" কিন্তু সকলেই কেবল গ্রাম্য-কথা লইয়া বিভোর, আপনার আধিক্য, পরের কুৎসা, এই সব লোকের সময় কাটাইবার উপায়। কিসে স্বার্থ-সাধন হইবে, কিসে শত্রু-দমন করিবে, ইহা লইয়া জীব-মাত্রেই ব্যস্ত।

যাঁহারা মায়ারূপ কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া একটু অগ্রে দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারা আর সব কাজ ফেলিয়া,—আমি কে, আমি কাহার, আমার গতি কি হইবে, ইত্যাদি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরিশেষে জগতে ধর্মশাস্ত্র প্রচার করেন। যাঁহাদের কিছু প্রাপ্তি হয় তাঁহারা সরস শাস্ত্র, আর যাঁহাদের তাহা না হয় তাঁহারা নীরস-শাস্ত্র প্রচার করেন। সংসার অনিত্য, এ জ্ঞান ভারতবর্ষে যেরূপ প্রবল, এরূপ আর কোথাও নহে;

সুতরাং এখানে এই ধর্মশাস্ত্র বহুল পরিমাণে কর্ষিত হইয়াছে। এই ধর্মশাস্ত্রবেত্তাগণকে আমরা মুনি বলি। ইঁহারা সাধন-বলে ধর্মশাস্ত্র আবিষ্কার ও বিকশিত করেন। জীবের প্রকৃতি ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং শাস্ত্র মধ্যে নাস্তিকতা ও আস্তিকতা আছে, ভক্তির কথা ও ভক্তির বিরোধী কথাও আছে। লোকে আপনার প্রকৃতি, কি শিক্ষা, কি অধিকার অনুসারে ইহা হইতে আপনার ধর্ম বাছিয়া লয়। এইরূপে আমাদের দেশে নাস্তিকতা হইতে বৈষ্ণবধর্ম পর্য্যন্ত নানা প্রকার ধর্ম প্রচলিত হইয়াছে।

জীব আর এক উপায়ে ধর্মকথা শিখিয়া থাকে,—সে অবতার দ্বারা। কোন ব্যক্তি বনে না যাইয়া, তপস্যা না করিয়া, এমন কোন শক্তি কর্তৃক চালিত হইয়া, জীবকে ধর্ম-উপদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার বহুতর শিষ্য হইল; শেষে তিনি অবতার বলিয়া পরিগণিত হইলেন। অবতার অর্থ শ্রীভগবানের দূত, কি সমাচার-বাহক, কি নিজ-জন, কি তিনি স্বয়ং। যেমন উদ্ধব মথুরা হইতে শ্রীমতীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন, তেমনি অবতারগণ শ্রীভগবানের সংবাদ ও তাঁহার প্রকৃতি এবং জীবগণের কর্তব্য কি, তাহা তাহাদিগকে অবগত করিয়া থাকেন। গীতা-গ্রন্থখানি এখন সর্বত্র-গ্রাহ্য। স্বদেশ কি বিদেশ সর্বত্রই হিন্দু কি অহিন্দু সকলেই শ্রীগীতার কথাগুলিকে পরম শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। গীতা বলিতেছেন, যেখানে ধর্মের গ্লানি হয়, সেখানে জীবকে ধর্ম-শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীভগবানের অবতার হইয়া থাকে। এ কালের তিনটি অবতারের কথা বলিব;—যীশু মহম্মদ ও গৌরাঙ্গ। যীশুর মতাবলম্বীরা বলেন, তাঁহাদের প্রভু ঈশ্বরের পুত্র; মুসলমানগণ বলেন, তাঁহাদের প্রভু ঈশ্বরের বন্ধু কি দূত; আর গৌরাঙ্গের ভক্তগণ বলেন, তাঁহাদের প্রভু স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন।

অবতারের নাম শুনিয়া কেহ কেহ অবজ্ঞা করেন। কিন্তু এই জগতে সকলেই অবতারের অনুগত। রুশিয়ার সম্রাট ও গ্ল্যাডষ্টোন অবতার মানিতেন, জাপানের সম্রাট ও তুর্কী সুলতানও মানেন, আর যাঁহারা গীতা-গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, সেই হিন্দুরা অবশ্যই ইহা মানেন। অতএব জগতের সকল জাতি যখন অবতার মানেন, তখন অবতারকে অবজ্ঞা করিবার অধিকার কাহারও নাই; যে বিষয় সর্বদেশে সর্বসময়ে একরূপ বিশ্বাস, তাহা অবশ্য সত্য, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। এই সমস্ত অবতার একই স্থানের (পরকালের) সংবাদ একই স্থানে (এই জগতে) প্রচার করেন। সুতরাং যদি অবতার প্রকরণ সত্য হয়, তবে অবতারগণ যে সমুদয় সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন, তাহা একরূপেই হওয়া উচিত। মনে ভাবুন, যীশু ভগবানের নিকট হইতে সংবাদ আনিয়াছেন, মহম্মদও আনিয়াছেন। যদি তাঁহাদের বাক্যের অনৈক্য হয়, তবে হয় উভয়েই কৃত্রিম, না হয় অন্ততঃ একজন কৃত্রিম, ইহা প্রমাণিত হইবে। কিন্তু অবতারগণের কথায় অমিল নাই। শ্রীভগবান্ আছেন, পরকাল আছে ও ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায়,—ইহা অবতার মাত্রেরই শিক্ষা।

ভগবান মানে ঈশ্বর নহেন,—ভক্তের উপাস্য ধন, অর্থাৎ পরিমিত কি সাকার পুরুষ। অবশ্য খৃষ্টিয়ান কি মুসলমানগণ শ্রীভগবানকে অপরিমিত নিরাকার বলিয়া বর্ণনা করেন; কিন্তু সে মুখে, হৃদয়ে নয়। কারণ যখন তাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে সিংহাসনে বসাইয়া পাত্রমিত্র সহ তাঁহার সদালাপ বর্ণনা করেন, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা ভগবানকে পরিমিত বলিয়া স্বীকার করেন। অবতার-প্রকরণ যে সত্য ইহার অতি আশ্চর্য প্রমাণ এই যে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবতারের উদয় দেখা যায়, তবুও তাঁহাদের শিক্ষা এক জাতীয়। আর এই শিক্ষার অনেক অননুভবনীয় নূতন সামগ্রী পূর্বে জগতে ছিল না। মুনিগণ ও অবতার কর্তৃক ধর্ম প্রচারিত হইয়া থাকে। মুনি কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম ভারতবর্ষ ভিন্ন জগতে আর কোথাও নাই। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যে সমুদয় ধর্ম প্রচলিত, ইহা অবতার কর্তৃক। কিন্তু ভারতে মুনি কর্তৃক প্রচারিত বহুতর ধর্ম শাস্ত্ররূপে প্রচলিত আছে। যথা—বৈদান্তিক,

তান্ত্রিক প্রভৃতি। তবে একটু ভাবিলে দেখা যাইবে যে, এ সমুদয়ের সহিত অবতার-প্রচারিত ধর্মের বিশেষ ঐক্য নাই। কারণ অবতার-প্রচারিত ধর্মের ভিত্তিভূমি 'ভগবান্ ও ভক্তি', আর অন্যান্য ধর্মের ভিত্তিভূমি 'শক্তি ও প্রক্রিয়া।' এই অবতারগণের মধ্যে আমরা শ্রীগৌরাঙ্গকে সর্বপ্রধান বলি; কারণ—

১। তিনি যখন নবদ্বীপে উদয় হয়েন, তখন পাণ্ডিত্যে সে নগরের যেরূপ উন্নত অবস্থা, এরূপ অন্য কোন স্থানে কোন কালে হয় নাই সেখানে তখন সকলেই কেবল বিদ্যা,—শুধু বিদ্যা নয়,—অতি সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-চর্চা লইয়া উন্মত্ত। তখন সে সমুদয় অতি দুর্বোধ্য ও অতি সূক্ষ্ম চর্চা সাধারণের খেলার সমাগ্রী ছিল,—বালকগণ পর্যন্ত যাহা লইয়া তর্ক ও বিচার করিত, এখন মহাপণ্ডিতগণও উহা বুঝিতে পারেন না। সেই সময় সেই সমাজের মধ্যস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত হন। অন্যান্য অবতারগণ অপেক্ষাকৃত অসভ্য লোক কর্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন।

২। তখনকার প্রধান ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিয়াছেন। যথা শ্রীহরিদাস,—ইনি বেত্রাঘাতে যখন মরিতেছেন, তখনও আপনার বেদনা ভুলিয়া শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার হত্যাকারীগণের মোচন-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীবাসুদেব দত্ত,—ইনি জগতের সমস্ত জীবের পাপ নিজ স্কন্ধে লইয়া, তাহাদিগকে নিষ্পাপ করিবার জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম—ইনি তখনকার সর্বপ্রধান নৈয়ায়িক। শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী,—ইনি তখন ভারতবর্ষের শঙ্করাচার্য্যের প্রতিনিধি। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য,—ইনি গৌড়ের, এবং শ্রীবল্লভাচার্য,—ইনি পশ্চিমের বৈষ্ণবদের সর্বপ্রধান। এই সমস্ত লোকের শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুকে শ্রীভগাবান্ বলিয়া এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহারা হিন্দু হইয়া গঙ্গাজল ও তুলসী লইয়া তাঁহার চরণ পূজা করিতেন।

৩। তিনি শক্তি, তর্ক, কি বক্তৃতা, দ্বারা ধর্ম প্রচার করেন নাই। জীব তাঁহাকে দর্শন করিয়া, কি তাঁহার দুই একটি কথা শুনিয়া, কি তাঁহা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিত। প্রকাশানন্দ দশ সহস্র শিষ্য লইয়া বিরাজ করিতেন ও ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান সন্ন্যাসী বলিয়া পূজিত হইতেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় প্রেমধন পাইয়া বলেন—

ধর্মাস্পৃষ্টঃ সতত-পরমাবিষ্ট এবাত্যধর্মে
দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং সৃষ্টিষু ক্বাপি নো সন্।
যদ্দত্ত শ্রীহরিরসসুধাস্বাদুমত্তঃ প্রনৃত্য-
ত্যুচ্চৈর্গায়তার্থ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশম্।। ১।।

অর্থাৎ "যে জনকে কখন ধর্ম স্পর্শ করে নাই, যে সর্বদা উৎকৃষ্ট পাপাসক্ত, এবং যে কোন সাধুজন-দৃষ্টপথের সজনরচিত স্থানে গমন করে নাই, সে ব্যক্তিও যদ্দত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরসসুধাস্বাদনে প্রমুগ্ধ হইয়া নৃত্য গীত ও ভূমিতে বিলুণ্ঠন করে, সেই অনির্বচনীয় ঈশ্বরকে (গৌরাঙ্গকে) আমি স্তুতি করি"।। ২।।

তাঁহার আর একটি শ্লোক শ্রবণ করুন—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতে বা, দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা।
প্রেমঃ সারং দাতুমীশো য একঃ শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম্।। ৪।।

অর্থাৎ "যিনি একমাত্র দৃষ্ট ও আলিঙ্গিত বা কীর্তিত হইলেই অথবা দূরস্থ ব্যক্তি কর্তৃক নমস্কৃত বা বহু মানিত হইলেই, প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব প্রদান করেন, সেই একমাত্র দয়ালু শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার করি"।। ৪।।

৪। তিনি প্রকট থাকিতে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে খুঁজিয়া পূজা করিতেন। অপর কোন অবতার জীবকে এরূপ মুগ্ধ করিতে পারেন নাই।

৫। অবতারগণ আপনাপন পরিচয় দিয়াছেন। যীশু বলেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র। মহম্মদ বলেন, তিনি ঈশ্বরের সখা। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং চিন্ময় দেহ ধারণ করিয়া, চিন্ময়-রত্ন-সিংহাসনে শত শত ভক্তের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া, বারম্বার বলিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং ভগবান্, আদি ও অন্ত, তিনি জীবের দুঃখ দেখিয়া তাহাদিগকে ধর্মশিক্ষা দিতে ও অভয় প্রদান করিতে মনুষ্য-সমাজে আগমন করিয়াছেন। এরূপ অদ্ভুত অননুভবনীয় ঘটনা অপর কোন অবতার সম্বন্ধে শুনা যায় না।

৬। অবতারদিগের কাহিনী জনশ্রুতি হইতে সঙ্কলিত। উহার প্রত্যক্ষ কি বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে তাঁহার ভক্তগণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া উহা বিস্তাররূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ, প্রভুর অবতারের চিহ্ন নবদ্বীপের চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে; নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের বংশধরগণও অদ্যাপি বিদ্যামান আছেন। এদেশে নানাস্থানে প্রভুর বিগ্রহ পূজিত হইতেছেন। প্রভু যেখানে গমন, অবস্থান কি উপবেশন করিয়াছেন, তাহা তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে সার্বভৌমের অঙ্কিত প্রভুর ষড়ভূজ মূর্তি রহিয়াছে।

৭। প্রভুর লীলা ও চরিত্র বড় মধুর। সাধুসঙ্গ জীবের উপকারী ধন। ইহা অপেক্ষা ভগবৎসঙ্গ আরও উপকারী। কিন্তু ভাগবৎসঙ্গ সর্বদা সম্ভবে না, তাই জীব লীলাদ্বারা শ্রীভগবানের সঙ্গ করিয়া থাকেন। যীশু ঈশ্বরের পুত্র, তাঁহার লীলাখেলা অতি অল্প। ঈশ্বরের সখা মহম্মদেরও ঐরূপ। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং 'তিনি' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন; জন্মাবধি শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার অসংখ্য লীলা রহিয়াছে, ইহা চুমুকে চুমুকে সমান মিষ্ট। ইহা পাঠ করিয়া মুগ্ধ না হন এমন জীব কোথা?

৮। অন্যান্য ধর্মের যেখানে শেষ, শ্রীগৌরাঙ্গ-ধর্ম তথা হইতে আরম্ভ। শ্রীনন্দনন্দন বলিয়া শ্রীভগবান্ অন্য কোন ধর্মে পূজিত হয়েন না। আমরা যীশুকে অবতার বলি ও তাঁহার উপদেশ মান্য করি। কিন্তু খৃষ্টিয়ানগণ ব্রজের নিগূঢ় রস জানেন না ও মাধুর্য্যময় নন্দসুতকে উপাসনা করেন না, ঐশ্বর্য-সম্বলিত ঈশ্বর তাঁহাদের উপাস্য। আমরা খৃষ্টিয়ান-মন্দিরে যাইয়া মনের সাধে ভজনা করিতে পারি, কিন্তু খৃষ্টিয়ানগণ আমাদের রস-কীর্তনে যোগ দিতে পারেন না। অন্যান্য ধর্মে যাহা আছে উহা সবই বৈষ্ণবধর্মে আছে, কিন্তু বৈষ্ণবধর্মে যাহা আছে, তাঁহার সমস্ত অন্য কোন ধর্মে নাই।

আর এক কথা। যেখানে যে রোগ, তাহার ঔষধ সেখানেই থাকা কর্তব্য। কারণ শ্রীভগবানের কার্যে জটিলতা নাই। আমরা ভারতবাসী, আমাদের যদি অবতার মানিতে হয়, তবে অন্য কোন দেশে যাইবার প্রয়োজন নাই, অবতার আমরা এখানেই পাইব। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা হিন্দুরা আধ্যাত্মিক উন্নতি অধিক করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে যে অবতার হইয়াছেন, তাহা সর্বাপেক্ষা বড় হওয়া উচিত।

গৌরাঙ্গ-অবতারের ন্যায় বৃহৎ ঘটনা জগতে আর নাই বলিয়া এই প্রস্তাব আরম্ভ করিয়াছি। যদি আমরা শ্রীভগবানের শ্রীচরণ পাই, তবে কিসে বা কে আমাদের কি করিতে পারে? যদি না পাই, তবে সাম্রাজ্য বা ঐশ্বর্যে কি লাভ? অতএব যিনি গৌর অবতার সত্য ভাবেন, তাঁহার ইহার ন্যায় বৃহৎ ঘটনা আর অনুভূত হইবে না। এই গৌর-অবতার বর্ণনারূপ বৃহৎ ভার আমার উপর পড়িল। আমি ইচ্ছা করিয়া এ ভার লই নাই। যাঁহারা এ বিষয়ে সক্ষম, তাঁহারা যখন ইহা গ্রহণ করিলেন না, তখন ভাবিলাম, এরূপ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার কি জগতে চিরদিন সুপ্ত থাকিবে? অতএব প্রভুর কৃপায় যাহা পারি লিখিব, তাই লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ প্রভৃতি জীবগণকে শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে পশ্বাচার হইতে দেবাচারে

লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে ভক্তিযোগ নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, জগতে কেবল কাটাকাটি মারামারি; এবং অধিপত্যের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া জীব আপনার পরকাল ভুলিয়া গিয়াছে। ইউরোপে এইরূপে শ্রীভগবান্ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। তাহাদের দেখাদেখি এ দেশেও প্রায় সেইরূপ ঘটিয়াছে। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা আস্বাদন ও নিয়ত চিন্তা কর, তাহা হইলে পবিত্র ও শান্ত হইবে। দুঃখী তাপী এই মধুরলীলারূপ সুধাসমুদ্রে অবগাহন করুন, অবশ্য জুড়াইবেন।

এই চতুর্থ খণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স সাতাইশ হইতে ত্রিশ পর্য্যন্ত চারি বৎসরে অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলচল হইয়া দক্ষিণদেশে গমন এবং তথা হইতে দুই বৎসর পরে ফিরিয়া নবদ্বীপে দর্শন পর্য্যন্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমঙ্গলাচরণ

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লোমকূপে যাঁর।
পবমাণু মাঝে বিরাজ যাঁহার।।
নিরাশ্রয়ে ভাসে যত জীবগণ।
জীব-দুঃখে যাঁর দ্রবীভূত মন।।
মনুষ্যে অভয় দান করিবারে।
উদিলেন ভবে মানুষ-আকারে।।
রূপ আর গুণে ভুবন মোহিয়া।
লুকালেন যিনি জীবে আশ্বাসিয়া।।
এ হেন ঠাকুর সুন্দর সুজন।
বলরাম দাস করয়ে ভজন।।

প্রথম অধ্যায়

"মুখ খানি পূর্ণিমার শশী কিবা মন্ত্র জপে।
বিম্ব-বিড়ম্বিত ঠোঁট কেন সদা কাঁপে।"

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর দুই বৎসর দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার শুভ আগমন-বার্তা লোক দ্বারা নবদ্বীপে পাঠান হইল। ইহা বলিয়া তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত করিয়াছি; এবং এই সময়, প্রভুর সঙ্গে ভক্তগণের মিলন-কাহিনীর কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছি। এই খণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহে নবদ্বীপ-ভক্তগণের অবস্থা ও নীলাচলে তাহাদের আগমন-উদ্যোগ ইত্যাদি বিষয় বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উপরে যে দুই চরণ কবিতা দিয়াছি, উহা গদাধরের শিষ্য নয়নানন্দ কৃত শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ-বর্ণনার পদ হইতে উদ্ধৃত। শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম "গদাধরের প্রাণনাথ"। সেই গদাধরের পশ্চাতে তাঁহার অষ্টাদশবর্ষীয় শিষ্য নয়নানন্দ দাঁড়াইয়া, নানা ছলে প্রভুর মুখ দর্শন করিতেছেন, দেখিতেছেন, মুখখানি এমন সুন্দর যে উহার তুলনা একমাত্র চন্দ্র হইতে পারে। শুধু চন্দ্র নয়, পূর্ণিমার চন্দ্র। নয়নানন্দ দেখিতেছেন যে প্রভুর ঠোঁট দুটি যেন হিঙ্গুলে রঞ্জিত, আর অল্প অল্প কাঁপিতেছে। তিনি ভাবিতেছেন, প্রভুর ঠোঁট কাঁপিতেছে কেন? উনি কি কোনো মন্ত্র জপ করিতেছেন? না, কারাও নিমিত্ত উতলা হইয়াছেন? প্রভুর মুখ দেখিয়া, তাঁহার মনে যে প্রবল বেগ রহিয়াছে, তাহা নয়নানন্দ বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। ফলকথা, প্রভুর অন্তর দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার ন্যায় নির্মল ও স্বচ্ছ, এবং তিনি সেইরূপ সরল, নম্র ও লাজুক। তাঁহার অন্তরে যে তরঙ্গ খেলিতেছে, তাহা তিনি লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু ফল বিপরীত হইতেছে,—তরঙ্গের বেগ বাড়িয়া যাইতেছে। এত বাড়িতেছে যে, তাঁহার মুখে ও অঙ্গভঙ্গিতে উহা প্রকাশ পাইতেছে। প্রভুর ঠোঁট কম্পন দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার হৃদয়ে প্রবল তরঙ্গ খেলিতেছে, আর উহা তিনি কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। উদ্ধৃত চরণদ্বয় দ্বারা বুঝা যাইবে নবদ্বীপবাসীরা প্রভুর প্রতি কিরূপ আকৃষ্ট ছিলেন। বাসুঘোষ তাঁহার এক পদে বলিতেছেন, "গোরা গোরা, পরাণের পরাণি"। প্রকৃতই তিনি নবদ্বীপবাসীর "পরাণের পরাণি" ছিলেন। যখন শুকদেব বলিলেন যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পুত্র অপেক্ষাও অধিক প্রীতি করিতেন, রাজা পরীক্ষিত তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাহাতে শুকদেব বুঝাইয়া বলিলেন যে, শ্রীভগবান তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ, তাঁহাতে ও জীবে যেরূপ সম্বন্ধ, জীবে জীবে সেরূপ সম্বন্ধ হইতেই পারে না। কাজেই ব্রজবাসীদিগের নিজ সন্তান অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের উপর অধিক প্রীতি ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধেও নদেবাসীর ঠিক ওইরূপ ভাব ছিল। তিনি তাঁহার ভক্তগণের হৃদয় যেরূপ অধিকার করিয়াছিলেন, সেরূপ কেহ কখনো করিতে পারেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে, তাঁহার ভক্তগণ শতবার প্রাণ দিতে পারিতেন। শঙ্করাচার্যের প্রতিনিধি-স্বরূপ তখনকার সর্বপ্রধান সন্ন্যাসী প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁহার 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' গ্রন্থে বলিতেছেন --

"পতন্তি যদি সিদ্ধয়ঃ করতলে স্বয়ং দুর্লভাঃ
স্বয়ঞ্চ যদি দেবকীভবিতুমাগতাঃ স্যুঃ সুরাঃ।
কিমন্যদিদমেব বা যদি চতুর্ভুজং স্যাদ্বপু
স্তথাপি মন নো মনাক্ চলতি গৌরচন্দ্রান্মনঃ।। ৬৪।।

"যদি দুর্লভ সিদ্ধিসকল (অনিমা, লঘিমা অর্থাৎ নানাবিধ অলৌকিক ক্ষমতা) আপনা আপনি আমার করতলগত হয়, অর্থাৎ হঠাৎ যদি আমি আমার বিনা চেষ্টায় সিদ্ধপুরুষ হইয়া পড়ি; যদি সুরনারীরা আপনারা আসিয়া আমার কিঙ্করী হন; অধিক আর কি বলিব, আমার এই বপু যদি চতুর্ভুজ হয়, অর্থাৎ আমি সংশরীরে যদি বৈকুণ্ঠে যাইতে পারি,— তথাপি আমার মন শ্রীগৌরচন্দ্র হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইবে না।"

যাঁহাকে "দণ্ডে দণ্ডে, তিলে তিলে" না দেখিলে ভক্তগণ বাঁচিতেন না, সেই "প্রাণের প্রাণ" নবদ্বীপ হইতে একেবারে অদর্শন হইয়াছেন; শুধু তাহা নহে, তিনি নীলাচলে বাস করিবেন এই ভরসায় ভক্তগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। প্রভুর যদি এরূপ প্রতিশ্রুত না হইতেন, তবে বহুতর ভক্ত তাঁহার সঙ্গে যাইতেন। তাহার পর নবদ্বীপবাসীরা শুনিলেন, প্রভু নীলাচল ছাড়িয়া গিয়াছেন; শুধু তাহা নহে, কোথা গিয়াছেন ঠিক নাই, এবং তাঁহার সঙ্গে ও কোন ভক্তকে লয়েন নাই। অর্থাৎ যে প্রভুকে নবদ্বীপে শতলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তিনি একটি মাত্র লোক সঙ্গে লইয়া কৌপীন-করঙ্গ সম্বল করিয়া, কোন দেশে চলিয়া গিয়াছেন, তাহার ঠিক নাই। তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলে, কে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে? তিনি প্রেম-বিহ্বলতায় উপবাস করিলে, কে তাঁহাকে যত্নপূর্বক খাওয়াইতেছে? ঝড়বৃষ্টিতে তিনি কিরূপে আপনাকে রক্ষা করিতেছেন? এই সকল ভাবিয়া প্রভুর ভক্তেরা শ্রীনবদ্বীপে একপ্রকার উন্মাদ অবস্থায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। তবুও শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে তাঁহারা প্রেমভক্তিতে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ঘোর-বিয়োগ যেরূপ কষ্টকর, সেইরূপ উহার মত উপকারী সামগ্রীও জগতে আর নাই। যেমন সুবর্ণ উত্তাপে পরিষ্কৃত হয়, সেইরূপ জীবাত্মা ঘোর বিয়োগানলে ক্রমে নির্মল হয়।

আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা আনন্দময়। উহা মলিন হইলে, সেই আনন্দলহরী চলাচলের পথ রুদ্ধ হয়, তাহাতে উহা দ্বারা আনন্দ খেলিতে পারে না। বিয়োগানল, যোগ-প্রক্রিয়া কি অন্য উপায় দ্বারা আত্মার মলিনতা দূরীকৃত হইলে, অন্তরে আপনা আপনি আনন্দের উদয়

হয়। সুতরাং ঘোর বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক আনন্দ আপনি আসিয়া থাকে। এই গেল শ্রীভগবানের আশ্চর্য রঙ্গ। তাই লোকে বলে, "যতটুকু কাঁদিবে, ততটুকু হাসিবে"। অতএব যাঁহারা কথঞ্চিৎ নির্মলতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে দুঃখ বলিয়া সামগ্রী জগতে কিছুই নাই। এই যে শ্রীনবদ্বীপবাসীরা ঘোর বিয়োগানলে দগ্ধ হইতেছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহারা আনন্দের তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছেন।

তবুও কেহ কেহ গৌরশূন্য নদীয়ার আর বাস করিতে পারিলেন না। প্রভু যখন নীলচলে গমন করেন, তখন অবশ্য গদাধর সঙ্গে যাইতে চাহেন। গদাধর গৌর-মুখ না দেখিলে একদণ্ড বাঁচেন না। কিন্তু তিনি অতি নবীন, কোনো সাংসারিক দুঃখ ভোগ করেন নাই। প্রভু তাই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান নাই। প্রভু নীলাচলে গমন করিলে, গদাধর বিরহ-জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রভুকে দর্শন করিতে সেই মুখো ছুটিলেন। শ্রীনরহরির দশাও ঠিক সেইরূপ। তিনিও শ্রীগৌরাঙ্গ-মুখ না দেখিলে এক তিল বাঁচেন না। এই কারণে উভয়ে পরম সম্প্রীতি। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম ও অন্যান্য প্রেমে এই বিশেষ বিভিন্নতা। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে ঈর্ষা-ভাব নাই; তাই নরহরি ও গদাধর একত্রে ছুটিলেন। অনেক গৃহী-ভক্ত প্রভুর সহিত শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাইতেন। কিন্তু প্রভু তাহাদিগকে সঙ্গে যাইতে দেন নাই। এ সম্বন্ধে জীবের ধর্ম কি, তাহা আমাদের প্রভু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। যিনি গৃহী তাঁহার সংসারধর্ম ত্যাগ করিয়া বাতুলতা করিয়া বেড়াইলে চলিবে না। তাঁহাকে অবশ্য স্ত্রী পুত্র, প্রভৃতি পালন করিতে হইবে। যিনি সংসারে আদৌ মন নিবিষ্ট করিতে না পারেন, তিনি সন্ন্যাসী হউন, কোন আপত্তি নাই। আবার যিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন তাঁহাকে সন্ন্যাসীর ধর্ম কঠোররূপে পালন করিতেই হইবে। কিন্তু জীবের সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ-প্রেমই জীবের সর্বপ্রধান পুরুযার্থ। এইরূপে শ্রীনরহরি, শ্রীগদাধর, শ্রীভগবান প্রভৃতি জনকয়েক নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন। শ্রীভগবান আচার্যকে পাঠক চিনেন না। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে, যথা—

"ন্যায় আচার্য একজন ভগবান নামে। যাবজ্জীবন আসি রহিলেন পুরুষোত্তমে।
প্রভু সঙ্গে সখ্য ভাব না দেখিলে মরে। গৃহ বন্ধু সব ছাড়ি রহে নীলাচলে।"

সেখানে যাইয়া তাঁহারা শুনিলেন যে প্রভু দক্ষিণদেশে গিয়াছেন। আর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতিকে আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার প্রত্যাগমন পর্যন্ত তাঁহারা যেন সেখানে প্রতীক্ষা করেন। কাজেই তাঁহারা নিত্যানন্দ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া নীলচলে প্রভুর প্রতীক্ষায় বাস করিতে লাগিলেন। ইহারা অবশ্য কতকটা শান্ত হইলেন, কিন্তু যাঁহারা নদীয়ায় রহিলেন, তাঁহারা নিরাশ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। "আর কি তিনি ফিরিয়া আসিবেন? আর কি তাঁহার নদীয়া মনে আছে।"—এইরূপ দুর্ভাবনায় মৃতবৎ হইয়া থাকিলেন কিন্তু দুর্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল আশাও ছিল যে, প্রভুকে আবার দেখিবেন; তাই জীবিত রহিলেন। এখন বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তিতে এই পদের রস আস্বাদন করুন। যথা—"কোন্ দেশে প্রভু গেল মোর।" ধ্রু। আর ভক্তগণের কিরূপ অবস্থা হইল, তাহা বাসুঘোষ বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির বলিবার আর কিছু তিনি রাখিয়া যান নাই। যথা পদ—

"গোরা গুণেপ্রাণ কান্দে, কি বুদ্ধি করিব। সে হেন গুণের নিধি কোথা গেলে পাব। কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া। পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে-কাঁন্দিয়া।"

বাসুঘোষ বলিতেছেন, "একে তিনি অদর্শন হইয়া ভক্তগণকে 'ধনে প্রাণে' মারিয়া গিয়াছেন। আমার তিনি ভিন্ন আমাদের ন্যায় পতিতগণকে কে আর দয়া করিবে? কে আর চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিবে?" এইরূপ যখন নদীয়াবাসীর অবস্থা, তখনই সংবাদ আসিল প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, স্বচ্ছন্দে আছেন ও ভক্তগণের দ্বারা রক্ষিত হইতেছেন।

তখন সকলে তাঁদের সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন এবং সকলে এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন,—তাঁহারা প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে যাইবেন। রথযাত্রাও নিকটে। যদিও নবদ্বীপ হইতে নীলাচল বহুদূরের পথ, কিন্তু তাহা তাঁহারা ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। প্রভু যখন নীলাচলে গমন করেন, তখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধের জন্য পথ বন্ধ ছিল এখন তাহাও নাই। যখন সকলেই নীলাচলে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন প্রধান উদ্যোগীগণ ভাবিলেন যে, এ সম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের পরামর্শ লওয়া কর্তব্য। মহাপ্রভু যখন গৃহত্যাগ করেন, তখন ভক্তগণকে তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। কাজেই সকলে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের নিকটে চলিলেন। ভক্তগণ তখন এরূপ ব্যস্ত হইয়াছেন যে, তাঁহাদের মনের ভাব ঐ পথেই অমনি নীলাচলে গমন করেন।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, প্রভুর শুভ প্রত্যাগমন সংবাদ শুনিয়া, আনন্দে হুহুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তখনই নৃত্য আরম্ভ হইল। তাঁহার বিষয় সম্পত্তির সীমা ছিল না। তিনি ভক্তগণকে লইয়া মহোৎসব আরম্ভ করিলেন। তিন দিবস পরে সকলে পরামর্শ করিতে বসিলেন। শেষে সাব্যস্ত হইল, তাঁহারা শ্রীশচীমাতার পদধূলি লইয়া নীলাচলে যাইবেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ভক্তগণকে লইয়া প্রভুর আলয়ে আসিলেন, এবং সেখানেও আবার মহোৎসব আরম্ভ হইল। যদিও শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পত্তিহীন, তবুও তাঁহাদের কোন অভাব ছিল না। প্রভু যাইবার সময় শচীমাতাকে বলিয়া গিয়াছিলেন,—"তোমার সাংসারিক ও পারমার্থিক সমুদায় ভার আমার উপর রহিল।" প্রভু গৃহত্যাগ করিলে, তাঁহার অসংখ্য ভক্ত তাঁহার আলয়ে ভারে-ভারে দ্রব্যাদি পাঠাইতে লাগিলেন। তাহাতে শুধু যে শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার অভাব দূর হইল তাহা নহে, তাঁহার বাড়ীতে প্রত্যহ যে বহুতর লোক প্রভুর-স্থান দর্শন করিতে আসিতেন তাঁহারাও প্রসাদ পাইতেন। প্রভুর বাড়ীতে মহোৎসব আরম্ভ হইলে নবদ্বীপের নিকটস্থ ভক্তগণ নীলাচল যাইবেন বলিয়া প্রভুর বাড়ীতে জুটিতে লাগিলেন। কাঁচরাপাড়া হইতে শিবানন্দ সেন, কুলীনগ্রাম হইতে গুণরাজ ও সত্যরাজ প্রভৃতি, আর শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীনরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ, সুলোচনা প্রভৃতি আসিলেন। এইরূপে কেবল যে প্রভুর পুরাতন ভক্তগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিলেন তাহা নহে, যাঁহারা পূর্বে তাঁহাকে দর্শন করেন নাই, অথচ তাঁহার ভক্ত হইয়াছেন তাঁহারাও অনেক চলিলেন। যথা, বাসুদেব দত্ত (মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) ও শঙ্কর (দামোদর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)। দামোদর পণ্ডিতেরা পঞ্চভ্রাতা,—সকলেই উদাসীন, পরম পণ্ডিত ও শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত। যাঁহারা উদাসীন তাঁহারা প্রভুর নিকট চিরকাল বাস করিবেন বলিয়া চলিলেন। আর যাঁহারা গৃহী তাঁহারা চারি মাসের জন্য বাড়ীর সংস্থান রাখিয়া, আর পঞ্চবিংশতি দিনের পথে যাওয়া-আসার ও নীলাচলবাসের চারি মাসের সম্বল সংগ্রহ করিয়া শুভযাত্রা করিলেন। হরিদাস মুসলমান। নীলাচলে মুসলমানদিগের যাইবার অধিকার ছিল না এবং সেইজন্য প্রভুর সহিত তিনি নীলাচলে যাইতে পারেন নাই। এখন শুনিলেন যে, মহারাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর ভক্ত হইয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রভুর সহিত বাস করিবেন সংকল্প করিয়া ভক্তগণের সঙ্গে চলিলেন।

তখন শ্রীপ্রভুর নিমিত্ত কে কি লইবেন তাহা স্থির করিতে লাগিলেন। প্রভুর জন্য এমন প্রিয়দ্রব্য লওয়া চাই, যাহা এক মাসেও নষ্ট না হয়। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াও মহানন্দে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিলেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্যাদি শ্রীবাসের হস্তে ন্যস্ত হইল। শচী তাঁহার নিমাইকে বলিবার যে কথা,—সে এক কথা বই নয়,—তাহা শ্রীবাসকে বলিয়া দিলেন। সে কথা এই—"একবার যেন তিনি দেখা দিয়া যান"। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারও ঐ এক কথা, সুতরাং প্রভুকে তাঁহার পৃথক সন্দেশ পাঠাইবার যেমন সুবিধা ছিল না, সেইরূপ প্রয়োজনও হইল না।

নীলাচলে রথ উপলক্ষে পূর্বে গৌড়দেশ হইতে অধিক লোক যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। যেহেতু পথ অতি দুর্গম, এবং হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ হওয়ায় উহা কখন কখন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। বিশেষতঃ নীলাচলের রথযাত্রা প্রভু কর্তৃক অধিক খ্যাতিপন্ন হয়। তাহার পূর্বে উহার এত গৌরব ছিল না, বেশি লোকও যাইত না—এই প্রথমে গৌরদেশ হইতে প্রায় দুইশত প্রভুর ভক্ত নীলাচলে রথ অধিকার করিতে চলিলেন। তাঁহাদের সুবিধা এই ছিল যে, উপবাসে তাঁহারা ক্লিষ্ট হইতেন না, এক মুষ্টি চিপিটক কি চণক পাইলেই দিন কাটাইতে পারিতেন। বিশেষতঃ সমস্ত পথে দেবস্থলী। কোন কোন দেবস্থানে সকলেই অন্ন পাইতেন। বাড়ী হইতে চিপিটক, জলপাত্র, কম্বল, কিছু স্বর্ণ ও এক বোঝা কড়ি মুটিয়ার ঘাড়ে দিয়া তখনকার যাত্রীরা গমন করিতেন। গৌর-ভক্তগণের আর একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী—খোল করতাল, মাদল ও মন্দিরা—অবশ্য সঙ্গে চলিল। প্রভুর ইচ্ছায় বিনা-বিপদে ভক্তগণ পুরীধামে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে আমাদের প্রভুর কাণ্ড শুনুন। স্নান যাত্রার তিন দিন থাকিতে মহারাজা প্রতাপরুদ্র পুরীধামে আসিলেন। এই সমস্ত উৎসব বড় জাঁকের সহিত বরাবর হইয়া থাকে, এবার প্রভুর সন্তোষের নিমিত্ত আয়োজন আরো অধিক হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথদেব অতি গ্রীষ্মের সময় স্নান করিলেন ও নূতন বস্ত্র পরিলেন। স্নান যাত্রার পর ১৫ দিন তিনি জীবকে দর্শন দেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার নিত্য নিয়মানুসারে ঠাকুর দর্শন করিতে যাইয়া দেখেন,—শ্রীমন্দিরের কপাট বন্ধ। তিনি অমনি বসিয়া পড়িলেন এবং অতি দুঃখে কান্দিতে লাগিলেন। তিনি কেন কান্দিতেছেন, ভক্তগণ তাহা প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। শুধু প্রভুর রোদন দেখিয়া, সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন যে, শ্রীমুখ না দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। শেষে প্রভুর নীলাচলে বাস অসহনীয় হইল। তিনি জগন্নাথশূন্য পুরীতে থাকিতে না পারিয়া, মন্দির দ্বার হইতে অমনি আলালনাথের দিকে ছুটিলেন।

শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন, এ সংবাদ পুরীগোঁসাই তাঁহাকে অগ্রে দিয়াছেন। প্রভু তাঁহাদের প্রাণ, তাঁহারাও প্রভুর প্রাণ; দুই বৎসর পরে তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন, তিনিও তাঁহাদিগকে দেখিবেন। তাঁহার তনুখানি প্রেমে গড়া। তিনি যে এখন তাঁহাদিগকে ফেলিয়া আলালনাথে প্রস্থান করেন, এ তাঁহার কি ভঙ্গী? যান কেন, তাহা বিচার করিলে, আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের হাসি পাইবার কথা। শ্রীজগন্নাথের মুখ দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া দুঃখ হইয়াছে,—ভাল। কিন্তু জগন্নাথ তো ভিতরেই আছেন, না হয় ১৫ দিন শ্রীমুখ নাই দেখা হইল? শাস্ত্রে বলে, স্ত্রী-পুরুষে যে মধুর প্রণয়, ইহার ন্যায় গাঢ় সম্বন্ধ আর নাই। পতি যদি বহির্বাটীতে থাকেন তবে অন্তঃপুরে থাকিয়া, দুই চারি দিন তাঁহাকে না দেখিয়া, কবে কোন্ সতীনারী কোথায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? অতএব প্রভুর যে কৃষ্ণপ্রেম, ইহা স্ত্রী-পুরুষের প্রেম হইতেও গাঢ়। অর্থাৎ ইহা রাধার প্রেম, ইহা এ জগতে সম্ভবে না,—ইহা কেবল স্বয়ং রাধা কৃষ্ণ দেখাইতে পারেন।

প্রভুর অদ্ভুত দর্শনভঙ্গী এখানে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি। ইহাতে কতক বুঝা যাইবে যে শ্রীগৌরাঙ্গ কেন পঞ্চদশ দিবস শ্রীজগন্নাথ দর্শন সুখ হইতে বঞ্চিতরূপ দুঃখে জর্জরীভূত হইয়া, সে স্থান ত্যাগ করিয়া দূরদেশে পলায়ন করেন। প্রভুর এই অদ্ভুত দর্শনভঙ্গীর দ্বারা জানা যাইবে যে, তিনি কিরূপ প্রকাণ্ড বস্তু, এবং কেন তিনি শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত। যদি শুধু অলৌকিক কার্যের দ্বারা—যেমন আম্র-বীজ হইতে সদ্য সদ্য আম্র সৃষ্টি করিয়া—প্রভু জীবের মন মুগ্ধ করিতেন, তবে নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা কি ভাল লোকেরা, তাঁহাকে ঐন্দ্রজালিক বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু প্রভুর শক্তি অন্যরূপ, তিনি তাঁহার গুণে

লোককে মোহিত করিতেন। লোকে বুঝিত শ্রীগৌরঙ্গের যে গুণ, তাহা জীবে সম্ভবে না। অতএব প্রভু অলৌকিক দেখাইয়া লোককে স্তম্ভিত করিতেন না,—গুণ দেখাইয়া লোকের মন-প্রাণ হরণ করিতেন।

প্রভু প্রত্যুষে অতি ব্যগ্র হইয়া শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে গেলেন; ভিতরে যাইবেন না, বাহির হইতে গরুড়স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, উহাতে হস্ত অবলম্বন করিয়া, দর্শন করিতেছেন। দর্শন মাত্র প্রভুর বদন আনন্দে প্রফুল্ল হইল। মনে ভাবুন, সাধারণ লোকে শ্রীজগন্নাথের মুখে সুখকর কিছু দেখিতে পাইবেন না, বরং হাস্য-উদ্দীপক অনেক দেখিতে পাইবেন। সাধারণ লোকে যদি কোন ঠাকুরের মূর্তিতে কিছু খুঁত দেখে, তবে মনে কষ্ট পায়। কিন্তু প্রভু,—শ্রীজগন্নাথের সাধারণের নিকট সেই হাস্য-উদ্দীপক মুখ দর্শন মাত্র,—আনন্দে বিহুল হইলেন। প্রভু নিমিষহারা হইয়া শ্রীবদন দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে নয়নতারা ফুটিয়া জল আসিল, ও ধারার সৃষ্টি হইল। সে ধারার বিরাম নাই। এ ধারা অঙ্গ বহিয়া বক্ষ পর্যন্ত আসিল, সেখান হইতে প্রস্তরে পড়িল। এইরূপে প্রস্তরের উপর নয়নজল জমিতে লাগিল, ক্রমে স্রোতের সৃষ্টি হইল এবং সেই স্রোত যাইয়া সন্নিকটস্থ গর্ত পূর্ণ করিতে লাগিল। প্রভুর চতুর্দিকে বহু লোক আছেন কিন্তু প্রভুর নয়ন-ভৃঙ্গ নিমিষহারা হইয়া জগন্নাথের মুখ-পদ্মের উপরই অর্পিত আছে। মাঝে মাঝে ভোগ লাগিতেছে, আর কবাট বন্ধ হইতেছে। তখন প্রভু দর্শন-সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া, বিষণ্ন মনে সেখানে বসিয়া পড়িতেছেন; এবং নখ দ্বারা মৃত্তিকায় ত্রিভঙ্গাকৃতি আঁকিয়া তাহাই দর্শন করিতেছেন। কিন্তু নয়ন-জলে সেই নখাঙ্কিত মূর্তি ধুইয়া যাইতেছে, প্রভু আবার আঁকিতেছেন। এমন সময় কবাট খোলা হইল। অমনি প্রভু উঠিয়া আবার আনন্দে দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে দুই-প্রহর গেল। প্রভু এই দুই-প্রহর কি দেখিলেন,—না, জগন্নাথের মুখখানি, সে কিরূপ, তাহা আপনারা জানেন। কিন্তু তখন প্রভুর বদন পানে চাহিলে দেখিবেন, আনন্দে উহা টলমল করিতেছে, যেন কেহ বিদ্যুৎ বাটিয়া তাহার বদনে মাখাইয়াছেন। প্রভুর নয়নে পলক নাই, ধারার বিরাম নাই, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। মাঝে মাঝে শ্রীঅঙ্গ পুলকে আবৃত হইতেছে, আর অন্যান্য নানাবিধ ভাব দ্বারা সুশোভিত হইতেছে। প্রভু এইরূপে প্রত্যহ জগন্নাথের আপাতদৃষ্টি-কুৎসিত মুখ দেখিতে যান, আর প্রত্যহ দুই-প্রহর পর্যন্ত দাঁড়াইয়া উহা দর্শন করেন। হে কৃপাময় পাঠক! আপনি কি ইহা পারেন? কিন্তু প্রভু আমার অষ্টাদশ বৎসর প্রায় প্রত্যহ এইরূপ করিয়াছিলেন! তবু তাঁহার দর্শন-লালসা মিটে নাই। প্রভুর দর্শন-সুখ কত তাহা পরিমাণ করিবার যন্ত্র আমাদের নাই। তবে শ্রীমুখের দুই একটি কথা উহা কতক বুঝা যাইবে। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, প্রভুকে বাড়ী আনিতে হইবে; কিন্তু প্রভু নিমিষহারা হইয়া দর্শন করিতেছেন, তিনি আসিবেন কেন? স্বরূপ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; বলিতেছেন, "প্রভু বাড়ী চল", "প্রভু বেলা গেল", "প্রভু আমাদের ক্ষুধা হইতেছে'। কিন্তু যেমন গো-বৎস মাতৃস্তন মুখে করিয়া দুগ্ধ পান করিবার সময় উহা কিছুতেই ছাড়িতে চায় না, প্রভুও সেইরূপ দর্শন-সুখ ফেলিয়া আসিবেন না। বেশি পীড়াপীড়ি করিলে, বলিলেন, "স্বরূপ! আর একটু দর্শন করি", "স্বরূপ! আজ ভাল করিয়া দর্শন করিতে পারি নাই," "স্বরূপ! আমি ত এই মাত্র আসিলাম, আমাকে আর একটু দেখিতে দাও," "স্বরূপ! আমি যাইব না, আমি স্নানাহার কিছুই করিতে চাই না, তুমি চলিয়া যাও," "স্বরূপ! তোমাকে মিনতি করি," "স্বরূপ! আমার প্রাণ বাহির হইবে, আমাকে আর একটু দেখিতে দাও।" প্রভু এইরূপ নানা ছল করিতে লাগিলেন। দুই-প্রহর দেখিতেছেন, প্রত্যহ দেখিতেছেন, তবুও প্রভুকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিলে সর্বনাশ! প্রভু যখন দেখিলেন যে, স্বরূপ আর ছাড়েন না, তখন স্বরূপের দুটি হাত ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বিনয় করিতে লাগিলেন।

প্রভু দর্শন করিতেছেন, স্বরূপ কাছে দাঁড়াইয়া, প্রভু মৃদুস্বরে কি বলিতেছেন। স্বরূপ বুঝিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেছেন। ব্যাপার এই যে, তখন প্রভু দেখিতেছেন কাহাকে? না,—শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ নয়,—স্বয়ং তাঁহাকে; আপনাকে ভাবিতেছেন রাধা, আর সেই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত আলাপ করিতেছেন। প্রভু মৃদুস্বরে শ্রীজগন্নাথের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "বন্ধু! আমি তোমাকে ফেলিয়া অদ্য গৃহে যাইব না। বন্ধু, আমার বয় কি? তোমাকে ফেলিয়া কোথায় যাইব?" যিনি এইরূপ কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, তিনি স্বরূপের কথায় বসায় যাইবেন কেন? প্রভু ত্রিভুবনের সমস্ত সৌন্দর্যের আকর সেই শ্রীকৃষ্ণের বদন দর্শন করিতেছিলেন। তিনি পঞ্চদশ দিবস সে সুখে বঞ্চিত হইয়া কেন অধীর না হইবেন?

প্রভুর দর্শন-সুখ কত, তাহার পরিমাণ, ভক্তগণকে ফেলিয়া আলালনাথের প্রস্থানরূপ অদ্ভুত ঘটনার দ্বারা জানা যাইবে। নীলাচলের ভক্তগণ প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আলালনাথে চলিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র এই সংবাদ শুনিয়া অতিশয় শঙ্কিত ও ব্যথিত হইলেন। সার্বভৌম স্বয়ং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রভুকে আনিতে আলালনাথে চলিলেন। অনেক যত্নে প্রভুকে সচেতন করা হইল। কিন্তু তবু পুরীতে দর্শন-সুখ নাই বলিয়া, প্রভু সেখানে আসিতে চাহিলেন না। তখন সার্বভৌম নবদ্বীপবাসীদিগের কথা উঠাইলেন; বলিলেন, "অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি ভক্তগণ আসিতেছেন। তাঁহারা আসিয়া যদি দেখেন যে তুমি সেখানে নাই, তবে তদ্দণ্ডে তাঁহারা প্রাণে মরিবেন।" পরিশেষে প্রভু সম্পূর্ণরূপে চেতন পাইয়া পুরীতে আসিলেন, এবং ভক্তগণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

"কত দিনে হেরব গোরাচান্দের মুখ। কবে মোর মনের মিটিবে সব দুঃখ।
কত দিনে গোরা-পঁহু করবহি কোর। কতদিনে সদয় হইবে বিধি মোর।।
কত দিনে শ্রবণের হইবে শুভদিন। চাঁদমুখের বচন শুনিব নিশিদিন।।
বাসু ঘোষ কহে গোরা-গুণ সোঙারিয়া ঝরয়ে নদীয়ার লোক গোরা না দেখিয়া।।

ভবানন্দের পুত্র ও রামানন্দের কনিষ্ঠভ্রাতা বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রভুর সেবায় নিযুক্ত আছেন। ভবানন্দ যখন প্রথম প্রভুকে দর্শন করেন, তখন আপনাকে, আপনার পঞ্চ পুত্রকে ও আপনার সমুদয় বিষয়-বৃত্তি প্রভুর চরণে সমর্পণ করেন, আর বলেন যে, "বাণীনাথ, তোমার নিকট থাকিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিবে।" কিন্তু প্রভুর আবার কি আজ্ঞা? বা অর্থবৃত্তির কি প্রয়োজন? সুতরাং রামানন্দের অতুল ঐশ্বর্য কিম্বা বাণীনাথের সেবা, প্রভুর বিশেষ কোন উপকারে আসিতেছিল না। প্রভুর ভক্তগণ প্রভুর নিকট আসিতেছেন। এই দুইশত ভক্ত একপ্রকার প্রভুর অতিথি। তাঁহাদিগকে থাকিবার বাসা দিতে হইবে, এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাইতে হইবে। বাণীনাথ এই সকল উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রভু কিছু আজ্ঞা করেন না। কিন্তু স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রভুর মন জানেন, সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায় বাণীনাথ তাঁহাদের নিকট জানিতে পারেন। ভক্তগণের জন্য বাণীনাথ চন্দন ও ফুলের মালা প্রভৃতি এবং বাসার সন্ধান করিতে লাগিলেন।

প্রভুর ভক্তগণ আসিতেছেন, একথা সর্বত্র প্রচার হইয়াছে। সকলে প্রভুর ভক্তের মিলন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ আগতপ্রায় শুনিয়া পুরীবাসীরা অনেকে ধাইলেন। এদিকে সার্বভৌম দ্রুতগতিতে রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, "ভক্তগণ আগতপ্রায়, অতএব যাহাতে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে ঠাকুর-দর্শন করিতে পারেন ও বাসা পান, তাহার সুবিধা করিয়া দিতে হইবে।" রাজা এই কথা শুনিয়া, সহর্ষে কাশীমিশ্র ও পরীক্ষা মহাপাত্রকে ডাকাইয়া

সেইরূপ আদেশ দিলেন। তাঁহারও সেই আদেশ পালন করিতে চাহিলেন। এদিকে মহারাজা সার্বভৌমের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, প্রভুর সহিত ভক্তগণের মিলন স্বচ্ছন্দে দেখিবার জন্য একটি অট্টালিকা বাছিয়া লইলেন? তখন রাজা বলিলেন, "ভট্টাচার্য, প্রভুর সকল ভক্তকে আমায় চিনাইয়া দিতে হইবে।" ভট্টাচার্য গোপীনাথকে ডাকিয়া সে বন্দোবস্ত করিলেন।

এদিকে ভক্তগণ ক্ষুৎপিপাসা অনিদ্রা রৌদ্রতাপ প্রভৃতি ক্লেশ তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া, প্রভুকে দর্শন করিবার আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। যতই তাঁহারা প্রভুর নিকটবর্তী হইতেছেন, ততই আনন্দে প্রচুর শক্তি পাইতেছেন। ক্রমশঃ নগরের প্রান্তভাগে, নরেন্দ্রসরোবরের তীরে আসিয়া তাঁহারা ধৈর্যহারা হইলেন, এবং "প্রভু, প্রভু" বলিয়া আনন্দে গর্জন করিতে লাগিলেন, সেই সঙ্গে খোল ও মাদল যেন আপনি বাজিয়া উঠিল। ভক্তগণও আবিষ্ট চিত্তে পায়ে নূপুর পরিলেন, আর এই দুই শত ভক্ত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত গাহিতে লাগিলেন।

ভক্তগণকে বলি, "এটি বিদেশ, এখানে তোমরা কখনও এস নাই, এবং কাহারও সহিত তোমাদের পরিচয় নাই, রাজা দোর্দণ্ড-প্রতাপান্বিত, তোমাদের ভজন-পদ্ধতি নূতন। বাহিরের লোকের নিকট তোমাদের ভজন কিরূপ, না—মাতাল বা পাগলের মত নৃত্য-গীত করা। যেমন সুরাভিভূত ব্যক্তির কাণ্ড দেখিলে ভদ্রলোক হাস্য করে, তোমাদের কাণ্ড দেখিলেও সেইরূপ বহিরঙ্গ লোক হাস্য করিতে পারে। ভদ্রলোকে, শ্রীভগবানের ভজন ও সাধন বলিতে বুঝনে যে, চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করা, কি মন্ত্র পড়া, কি ফুল দিয়া তাঁহাকে পূজা করা। কিন্তু পায়ে নূপুর পরিয়া, হাত তুলিয়া নৃত্য করিয়া ও চীৎকার করিয়া গীত গাইয়া ভজন করিতে থাকিলে, ভব্যলোক কিরূপে সহিবে? তোমরা সেই জন্য অপরিচিত স্থানে, পায়ে নূপুর পরিয়া, নাচিতে নাচিতে ও গাইতে গাইতে যে গমন কর, তোমাদের সাহস কি? কিন্তু আমার প্রভুর ভক্তগণের আবার ভয় কি? তাঁহারা প্রেমানন্দে বিহ্বল ও চঞ্চল হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের বাহ্যাপেক্ষা নাই। যাহারা সামান্য মদ্যপান করিয়া উন্মত্ত হয়, তাহাদের লজ্জা থাকে না। যাঁহারা প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের লজ্জা কেন থাকিবে? তাঁহাদের গীত বাদ্য হুঙ্কার বিশাল গর্জন ও হরিধ্বনি শুনিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিতেছে। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীতের এই এক অদ্ভুত মহিমা। কীর্তনের যখন তরঙ্গ উঠে, তখন বোধ হয় যেন উহার ঢেউ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া শ্রীগোলকের সিংহাসনে লাগিতেছে। প্রকৃত পক্ষে তখন নীলাচল টলমল করিয়া উঠিল। প্রথমে, প্রভুর নীলাচলের ভক্তগণ নদীয়ার ভক্তদিগের আগমন দেখিতে গিয়াছিলেন, শেষে বাল বৃদ্ধ যুবা-কি ভক্ত কি অভক্ত— সকলেই এই কীর্তন দেখিতে ছুটিলেন। নীলাচলে একেবারে হুলস্থূলু পড়িয়া গেল। এই মহারোল রাজার কর্ণে পৌছিল। তিনি সার্বভৌম ও গোপীনাথকে লইয়া তাড়াতাড়ি পূর্বনির্ণীত ছাদের উপর উঠিলেন। তখন নীলাচলবাসী দেখিলেন যে, প্রায় দুইশত লোক নৃত্য গীত ও বাদ্যে উন্মত্ত হইয়া আসিতেছেন। ইহারা সকলেই ভদ্রলোক। বৃদ্ধ ও যুবা একত্র হইয়া পাগলের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন ও গীত গাইতেছেন। ইহা দেখিলে হাসি পাইবার কথা। বিশেষতঃ এরূপ কাণ্ড দেখিলে, ইতর লোকে হাস্য করে, ঢিল মারে, নানা উৎপাত করে। কিন্তু এখনে সেরূপ কিছু হইল না; ভক্তগণ পরম-ধন হারাইয়াছিলেন, আবার তাঁহাকে পাইবার জন্য আসিতেছেন, কাজেই তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা নাই। তাঁহাদের আনন্দের যে তরঙ্গ উঠিল, তাহাতে তাঁহারা ভাসিয়া চলিলেন। বাষ্পীয় যান হওয়াতে তীর্থ দর্শন-সুখ এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। যাঁহারা কায়িক-শ্রম করিয়া, অনাহারে নানা বিপদ আপদ লইয়া তীর্থ-দর্শন করিতে যান, তাঁহারা—যতই শ্রীমুখ-সন্নিকটে হয়েন, ততই চঞ্চল হন ও আনন্দ প্রকাশ ও রঙ্গ করেন। ভক্তগণ পঞ্চবিংশতি দিবস পথ হাটিয়া, প্রভুর নিকটবর্তী হইয়া আহ্লাদে পাগলের ন্যায় হইয়াছেন। ইহাদের আগমন দর্শন করিয়া রাজা ও সার্বভৌম

বিস্মিত হইলেন। সার্বভৌম তাঁহার মনের ভাব শ্লোকরূপে ব্যক্ত করিলেন। সেই শ্লোকটি পড়িলে পাঠক ব্যাপার কতক বুঝিতে পারিবেন। যথা—

"আনন্দহুঙ্কারগম্ভীরঘোষো হর্ষানিলোচ্ছ্বাসিতাশ্রুবোম্মিঃ।
লাবণ্যবাহী হরিভক্তিসিন্ধুশ্চলঃ স্থিরং সিন্ধুমধঃ করোতি।।"

ভক্তগণ আসিতেছেন; মহারাজা, সার্বভৌম ও গোপীনাথকে সঙ্গে লইয়া, প্রাসাদের উপর দাঁড়াইয়া, ইহা দর্শন করিতেছেন। রাজা অগ্রে নৃত্য দেখিলেন, পরে সঙ্গীতের স্বর শুনিয়া একেবারে তমোহতি হইলেন। রাজা বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-গীত বিস্তর শুনিয়াছি। কিন্তু একি অদ্ভুত কাণ্ড! কথা একটিও বুঝিতেছি না, কেবল সুর শুনিয়া মন প্রাণ এলাইয়া যাইতেছে।" ভট্টাচার্য বলিলেন, 'সুর শুনিয়াই এই; ইহার সহিত অর্থ বুঝিলে না জানি কি হয়। রাজা বলিলেন, 'শুধু সুরেই আমার প্রাণ অস্থির হইল। ভট্টাচার্য! ইহা কোথা হইতে আসিল?' গোপীনাথ উত্তর করিলেন, "মহারাজ! ইহা শ্রীভগবান, আমাদের প্রভুর সৃষ্টি। পৃথিবীতে এরূপ কীর্তন ছিল না, তিনি ব্রজের নিগূঢ়-রস প্রকাশ করিবার নিমিত্ত এই কীর্তন-পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছেন।" রাজা বলিলেন, "এরূপ কীর্তন, নৃত্য ও প্রেমভাব আর কখনও দেখি নাই। আর হরিধ্বনিতে যে এত মাধুর্য আছে ইহাও পূর্বে জানিতাম না। ভট্টাচার্য! এই যে বৈষ্ণবগণ আসিতেছেন, ইঁহাদের তেজ যেন কোটি সূর্যের ন্যায়। বৈষ্ণবের এত তেজ হইতে পারে, ইহা কখনও জানিতাম না। ইঁহারা সকলেই কি প্রভুর গণ? সার্বভৌম বলিলেন, "হ্যাঁ। ইঁহারা আর কিছুই জানেন না; ইহাদের ধ্যান জ্ঞান প্রাণ, প্রাণের প্রাণ, আমাদের প্রভু।" রাজা তখন ভাবিতেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের গণ হইবার ভাগ্য তাঁহার কি কখন হইবে?

শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা বিবেচনা করুন। এই ভক্তগণ, যিনি যেখানে বাস করিয়াছেন, সেই স্থান অদ্যাপিও তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। খড়দহ, শান্তিপুর, শ্রীখণ্ড, ইত্যাদি অনেক স্থানেই সম্পন্নশালী শ্রীবিগ্রহ দেখিবেন। আবার অনুসন্ধানে ইহাও জানিবেন যে, এই সকল স্থানে সেই সকল ভক্তের শক্তির পরিচয় এখনও রহিয়াছে। ইহাদের কাহিনী পর্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, ইঁহারা সকলেই পতিতপাবন ও শক্তিসঞ্চারক্ষম ছিলেন। সেরূপ শক্তিশালী লোক এখন আর একটিও জন্মে না। ইঁহারা সকলেই আমাদের প্রভুর সৃষ্ট, ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ কি প্রভূত বস্তু তাহা অনুভূত হইবে।

সার্বভৌম বলিলেন, "কলিযুগে শ্রীনাম-সংকীর্তনই কেবল ধর্ম, ইহা শাস্ত্রের বচন"। আমরা শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ পাইতেছি যে, এই নাম-সংকীর্তন প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবেন। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ৪ অধ্যায় ২৯ শ্লোকে—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাইকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।"

রাজা বলিলেন, "প্রভু যে স্বয়ং ভগবান, তাহা আমি মনে প্রাণে জানিয়াছি। শাস্ত্রেও প্রভুর ভগবত্তার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু আমি বুঝিতে পারি না যে, বহুতর পণ্ডিত প্রভুকে কেন বিদ্বেষ করেন?" সার্বভৌম বলিলেন, "শ্রীভগবান না জানাইলে তাঁহাকে কেহই জানিতে পারেন না। যদি ভগবানের কৃপা না হয়, তবে যিনি যত বড় পণ্ডিত হউন না কেন, তাঁহাকে কখনই জানিতে পারিবেন না। এমন কি, ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারেন নাই। যথা—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্দে ১৫ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে কৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মা বাক্য ঃ—

"তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোইপি চিরং বিচিন্তন্।।"

অর্থাৎ "আমি প্রভুকে প্রথমে জানিতে পারি নাই বলিয়া তাঁহাকে অবহেলা করি। শেষে যখন কৃপা করিলেন, তখন তাঁহাকে জানিতে পারিলাম।"

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় শ্রীস্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দ প্রভুর আলয় হইতে সেখানে আসিলেন। তাঁহারা প্রভুর আজ্ঞাক্রমে ভক্তগণকে আদর করিয়া আনিতে যাইতেছেন, ওদিকে শ্রীঅদ্বৈত ভক্তগণসহ কীর্তন ও নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছেন, আর রাজা পার্ষদগণসহ ছাদের উপর হইতে দর্শন করিতেছেন। স্বরূপকে দেখিয়া সকলে চুপ করিলেন। রাজা অমনি ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে? ভট্টাচার্য বলিলেন, "ইনি স্বরূপ-দামোদর; প্রভুর অতি মর্মী ভক্ত।" ক্রমে স্বরূপ ও ভক্তগণে দেখাদেখি হইল ও সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তখন স্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতের গলায় মালা পরাইলেন আর শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আদর পাইয়া বিবশীকৃত হইলেন। এমন সময় গোবিন্দ শ্রীঅদ্বৈতকে আর এক গাছি মালা পরাইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত গোবিন্দকে চিনেন না, স্বরূপ তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। কিন্তু তখন কাহারও আর কথা কহিবার অবকাশ নাই, সকলেই প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত। স্বরূপ তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন।

রাজা ভাবিয়াছিলেন, ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথ-মন্দির প্রণাম ও দর্শন করিতে যাইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা পঁচিশ দিনে পথ হাঁটিয়া শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীমন্দিরকে প্রণাম এবং শ্রীমূর্তি লক্ষ না করিয়া, অন্যপথে চলিলেন দেখিয়া রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য! এ কিরূপ কার্য হইল? শ্রীজগন্নাথ যদিও এখন গুপ্তভাবে আছেন, তবুও তাঁহার মন্দির কি চক্রকে প্রণাম না করিয়া, ভক্তগণ যে প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন, ইহাতে ত অপরাধ হইতে পারে?"

ভট্টাচার্য বলিলেন, "প্রেমের তরঙ্গ বিধির বাঁধে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। এখন প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ভক্তগণের প্রাণ নিতান্ত উচাটন হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় শ্রীজগন্নাথ-মন্দির দর্শনে তাঁহারা সুখ পাইবেন কেন? আর এরূপ অবস্থায় দর্শনে অপরাধও হইতে পারে। তাই আগে প্রভুকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সকলে মহানন্দে শ্রীমন্দির দর্শন করিবেন।"

এমন সময় রাজা দেখিলেন যে, রামানন্দের ভ্রাতা বাণীনাথ, বহুতর ভৃত্যের দ্বারা মহাপ্রসাদ বহাইয়া, দ্রুতগতিতে প্রভুর আলয়ের দিকে যাইতেছেন। রাজা ইহা দেখিয়া ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত মহাপ্রসাদ কোথা যাইতেছে?" তিনি বলিলেন, "ইহা যে ক্ষুধিত ও পথশ্রান্ত প্রভুর ভক্তগণের নিমিত্ত, তাহার সন্দেহ নাই। বাণীনাথ ভবানন্দের ও রামানন্দের আজ্ঞাক্রমে, প্রভুর সেবায় নিযুক্ত আছেন। প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া নিশ্চিত তিনি এই সকল মহাপ্রসাদ লইয়া যাইতেছেন"। রাজা ইহাতে নিতান্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "সত্যই কি মহাপ্রসাদ ভক্তগণের নিমিত্ত যাইতেছে? লোক তীর্থস্থানে আগমন করিয়া ক্ষৌর করে ও উপবাস করে। আর ইহারা তীর্থে আগমন মাত্রেই মহাপ্রসাদ-সেবা করিতে বসিবেন!" ভট্টাচার্য ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রেমের ধর্মে বিধি নাই। অবশ্য শাস্ত্রের আজ্ঞা উপবাস। কিন্তু ভক্তগণ শাস্ত্রে যে পরোক্ষ আজ্ঞা আছে তাহা পালন করিবার জন্য, শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ কেন লঙ্ঘন করিবেন? বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ স্বয়ং প্রসাদ ভুঞ্জাইবেন তিনি সম্মুখে বসিবেন, হয়ত তিনি স্বহস্তে পরিবেশন করিবেন। এতটি শুভ পরিত্যাগ করিয়া কোন্ ছার শাস্ত্রের বিধি পালন করিবে? তাহার পর যেখানে মহাপ্রসাদ সেখানে উপবাস হইতেই পারে না। প্রভু যখন আমাকে কৃপা করেন, তাহার পূর্বে আমার মনের জড়তা ভঙ্গ করেন। অতি প্রত্যুষে আমি নিদ্রা যাইতেছি, এমন সময় প্রভু আসিয়া আমার হস্তে মহাপ্রসাদ দিয়া আহার করিতে আজ্ঞা করিলেন। তখনই আমি বুঝিলাম

যে, প্রেম-ভক্তির উচ্ছ্বাস বিধির বাধ্য নহে।" রাজা যাহা দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন, সমুদয় তাঁহার নিকট নূতন বোধ হইতেছে। এই সমুদয় শাস্ত্রকথা, একটু ভাবিয়া পরে তিনি বলিলেন, "ভট্টাচার্য! এই যে মহাপ্রভুর তেজস্বী ভক্তগণ যাইতেছেন, আমাকে ইহাদের পরিচয় করিয়া দাও।" তখন সার্বভৌম গোপীনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভাই! আমি ইহাদের অনেককেই চিনি না। তুমি মহারাজকে আমারে প্রভুর ভক্তগণকে চিনাইয়া দাও— আমাকেও বটে।" রাজা তখন গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাহাকে মালা দেওয়া হইল, সেই বড় তেজস্বী মহাজনটি কে? গোপীনাথ বলিলেন. "ইনি বৈষ্ণবগণের রাজা; উহার খ্যাতি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য। ইনি মহাপ্রভুর এক স্কন্ধ। আর এক স্কন্ধ শ্রীনিত্যানন্দ। তিনি এখানে পূর্ব হইতেই আছেন।" তারপর গোপীনাথ বলিতেছেন, "শ্রীঅদ্বৈতচার্যের পশ্চাৎ যিনি যাইতেছেন, তিনি শ্রীবাস। তাঁহার পার্শ্বে আচার্যরত্ন।" গোপীনাথ এইরূপে বক্রেশ্বর, পুরন্দর আচার্য, গঙ্গাদাস, শঙ্কর, নারায়ণ, হরিদাস, বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ, গোবিন্দমাধব এবং বাসু তিনভাই, শুক্লাম্বর, শ্রীধর, বিজয়, কুলিন গ্রামের সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বসু শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ, চিরঞ্জীব, সুলোচন প্রভৃতি ভক্তগণের পরিচয় ক্রমে দিলেন। রাজা যদিও প্রভুকে দর্শন করেন নাই তবু তাঁহার প্রত্যেক লোমকূপে প্রভু প্রবেশ করিয়াছেন। তখন তাঁহার প্রভুর কথা ব্যতীত আর কিছুই ভাল লাগে না। প্রভুর গণ তাঁহার নিজ গণ। সুতরাং তাঁহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত কাহিনী তাঁহার কাছে বড় মিষ্টি লাগিতেছিল।

ভক্তগণ রাজার দৃষ্টিপথের বর্হিভূত হইলে, তিনি অট্টালিকা হইতে নামিয়া কাশীমিশ্র ও পরীক্ষা মহাপাত্রকে গুটিকয়েক আজ্ঞা করিলেন। ইঁহারা শ্রীমন্দিরের কর্তা, একপ্রকার পুরীনগরের কর্তাও বটে। রাজা বলিলেন, "গৌড় দেশ হইতে প্রভুর ভক্তগণ আসিয়াছেন। তাঁহাদের বাসা করিয়া দিতে হইবে। আর দেখিও যেন তাঁহার দর্শনের কোন ক্লেশ না হয়।" রাজা ভাবিলেন, প্রভু সন্ন্যাসী, তাঁহার নিজের কিছু প্রয়োজন নাই; কিন্তু এখন তাঁহার দুইশত নিজ-জন আসিয়াছেন। সুতরাং তিনি এখন এক প্রকার ভারী-সংসারী। ইহাই ভাবিয়া রাজা বলিলেন, "তোমরা যাইয়া সর্বদা প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবে। তিনি শ্রীমুখে কিছু বলিবেন না, কিন্তু তাঁহার মন বুঝিয়া সমুদায় কার্য করিবে।" তাঁহারা এই আজ্ঞা পাইয়া প্রভুর নিকটে চলিলেন। তখন রাজা তাঁহাদের লক্ষ করিয়া বলিলেন, "তোমরা গিয়া প্রভু ও ভক্তে মিলন দেখ। আমার ভাগ্যে নাই, আমি যাইতে পারিব না"। তখন সার্বভৌম ও আচার্য ভক্তগণের পশ্চাৎ প্রভুর বাসায় চলিলেন।

এদিকে, ভক্তগণ যখন স্বরূপ ও গোবিন্দের পশ্চাৎ শ্রীমন্দির দক্ষিণে রাখিয়া প্রভুর বাসাপথে চলিলেন, প্রভুও তখন ভক্তগণসহ অগ্রবর্তী হইয়া নদীয়াবাসী প্রিয়ভক্তগণকে আদর অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। প্রভুর ও ভক্তগণের নয়নে নয়নে মিলন হইল। তখন ভক্তগণ ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। প্রভু সন্ন্যাসী, তাঁহার কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই; কিন্তু তিনিও তখন তাহা ভুলিয়া গিয়া সাষ্টাঙ্গে ভক্তগণকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে শ্রীঅদ্বৈত নিকটে আসিয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভুও তাঁহাকে উঠাইয়া গাঢ়-আলিঙ্গন করিলেন। তখন প্রভুর বদন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে, পদ্মলোচনে জল আসিতেছে, কিন্তু তিনি সময় বুঝিয়া অতিকষ্টে উহা নিবারণ করিলেন। প্রভু দেখিলেন, শ্রীঅদ্বৈতের পশ্চাতে তাঁহার খেলার সাথী ও গুরুজন, সতৃষ্ণ সজল ও সপ্রেম নয়নে পলক-হারা হইয়া দৃষ্টি করিতেছেন। প্রভু তখন ব্যগ্র হইয়া শ্রীবাসকে ধরিয়া গাঢ়-আলিঙ্গন করিলেন। ভক্তগণ আর প্রণাম করিবার অবকাশ পাইলেন না। কারণ প্রভু তখন প্রত্যেক ভক্তকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। যাহাকেই আলিঙ্গন করিতেছেন, তাঁহার পথ শ্রান্তি ও মনের দুঃখ দূর এবং অঙ্গ সুশীতল হইতেছে। তাহার পর, প্রভু অতি

সমাদরে ভক্তগণকে তাঁহার আলয়ে লইয়া চলিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া সকলকে বসাইয়া আপনিও বসিলেন। তখন সকলের হৃদয়াবেগ এরূপ প্রবল হইয়াছে যে, অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল পলক-হারা হইয়া প্রভুর সেই স্নিগ্ধ চন্দ্রবদনখানি দেখিতে লাগিলেন। মহাজনগণ এখানে একটি আশ্চর্য কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, কাশীমিত্রের আলয়ের স্থান অতি অল্প সেখানে এত ভক্তের স্থান কখনও হইত না। তবে প্রভু অলৌকিক শক্তির দ্বারা সেই আলয়ে সমস্ত ভক্তের স্থান দিয়াছিলেন। ভক্তগণ বসিলে, প্রভু স্বহস্তে প্রত্যেকের গলায় মালা ও অঙ্গে চন্দন দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। না করিবেন কেন? ভক্তগণ যে তখন শ্রীভগবানের অতিথি। তিনি তখন অতি দীনভাবে আতিথ্য-ধর্ম পালন করিতেছেন। তৎপরে প্রভু বিনয়নম্রভাবে কৃতজ্ঞতায় গদ্গদ হইয়া শ্রীঅদ্বৈত পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "আজ আমি তোমাদের দর্শনে পূর্ণ হইলাম।" শ্রীঅদ্বৈতও সেইভাবে বিভোর হইয়া উত্তর করিলেন, "শ্রীভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ অতএব তিনি চিরদিনই পূর্ণ। তত্রাচ ভক্তসঙ্গে যে তাঁহার উল্লাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার আর সন্দেহ নাই।"

তৎপরে প্রভু বাসুদেবের প্রতি চাহিলেন। ইনি মুকুন্দের দাদা, এই প্রথম প্রভুর কাছে আসিয়াছেন। অন্তর্যামী প্রভু বাসুদেব যে কি বস্তু তাহা জানেন। এই যে ভক্তগণ বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে অনেকে প্রভুর নীলাচলে আগমনের পর তাঁহার ভক্ত হইয়াছেন। এমন কি প্রভুর সহিত অনেকের আলাপ পরিচয়ও নাই। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিতে প্রভুর কোন বাধা হইতেছে না। তিনি এই সব নূতন ভক্তগণের নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন ও যে যেরূপ প্রকৃতির লোক তাঁহার সহিত সেইভাবে আলাপ করিতেছেন। যথা চন্দ্রোদয়নাটকে—

"যারে যাঁরে পূর্বে নাহি দেখে গৌরহরি। আপনে সম্ভাসে প্রভু তাঁর নাম ধরি।।
এই মত প্রিয় উক্তে শ্রীচন্দ্রবদনে। নাম ধরি জিজ্ঞাসেন যাঁরে নাহি চিনে।।"

মুকুন্দের দাদা বাসুদেবকে প্রভু পূর্বে দেখেন নাই কিন্তু তাঁহার সহিত চিরপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত দিয়া বলিতেছেন, "বাসুদেব! মুকুন্দ যদিও শিশুকাল হইতে আমার নিকটে আছেন, কিন্তু তবুও তুমি মুকুন্দ অপেক্ষা আমার নয়নে অধিক সুখকর হইতেছ। তখন সর্ব-জীবে-দয়াল বাসুদেব অতি দীনভাবে সকৃতজ্ঞ চিত্তে গদ্গদ হইয়া প্রভুকে বলিলেন, "তোমার চরণ-প্রাপ্তিকে বলে পুনর্জন্ম। মুকুন্দ শ্রীপাদপদ্ম পূর্বেই পাইয়াছেন, আমি অদ্য পাইলাম! অতএব মুকুন্দ আমার জ্যেষ্ঠ আমি তাঁহার কনিষ্ঠ। বিশেষতঃ মুকুন্দ তোমার কৃপাপাত্র, সুতরাং সেই কারণে তিনি আমার ও সকলের পূজ্য।" তৎপরে প্রভু বাসুদেবকে বলিলেন, "দক্ষিণ হইতে আমি দুইখানি অপূর্ব গ্রন্থ, "কৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা" আনিয়াছি; উহা লেখাইয়া লইও।" এই দুই খানি পুস্তক এখন গৌড়মণ্ডলে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থখানি লীলা-শুক অর্থাৎ বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সৃষ্টি। এই গ্রন্থখানি প্রেমোন্মাদ অবস্থায় লেখা। যিনি গৌর লীলার মধু পান করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ ইহা বুঝিতে পারিবেন না। এই গ্রন্থখানি জগতে গুপ্ত ছিল, শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার শক্তিতে উহা জীবন-প্রাপ্ত হইল। প্রভু তাহার পরে শ্রীবাসের দিকে চাহিয়া, করুণস্বরে বলিলেন, "পণ্ডিত! আমি তোমাদের চারি ভাইয়ের নিকট চিরদিনের জন্য বিক্রীত আছি।" এই যে প্রভু শ্রীবাসকে গৌরব করিয়া বলিলেন, ইহার একটি আঁখরও অলীক বা অত্যুক্তি নহে। প্রভু যত লীলা নিজ বাটিতে করেন, তদপেক্ষা অনেক বেশি শ্রীবাসের বাড়ী করিয়াছিলেন। শ্রীবাস প্রভুর এই উক্তিতে বিশেষ ব্যথিত হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু! এরূপ আজ্ঞা কখনও করিবেন না। আমরা চারি ভাই আপনার চরণে বিক্রীত, শ্রীবাসের এ কথাও ঠিক, কারণ

এ জগতে কে না শুনিয়াছে, "শ্রীবাসের আঙ্গিনায় নাচে গোরা রায়।" প্রভু ইহার পরে শিবানন্দের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমি বেশ জানি, আমার উপর তোমার চিরদিন বড় টান।" প্রভু এ কথাও শিবানন্দকে বলিতে পারেন। শিবানন্দের জ্যোষ্ঠপুত্র শ্যামসুন্দর বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে সেন মহাশয় পুত্রকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি বহু তপস্যা করিয়া কালকে গৌর করিয়াছিলাম, তুই আবার সেই গৌরকে কাল করিলি?" প্রভুর ভক্তগণ যখন নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আগমন করিতেন, তখন শিবানন্দ কেবল যে সকলের পাথেয় দিতেন তাহা নহে, যাহাতে তাঁহাদের কোন কষ্ট না হয়, তাহার সমস্ত ব্যবস্থাও করিতেন। এ কথা বলিলেই হইত যে, "আমি প্রভুকে দর্শন করিতে যাইব"; অমনি শিবানন্দ তাঁহার পথের ভার গ্রহণ করিতেন। অতএব প্রভু যে বলিলেন, "শিবানন্দ, আমার প্রতি তোমার বড় টান" তাহা ঠিক। প্রভু এই কথা বলিলে শিবানন্দ প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া, গলায় বসন দিয়া এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে চরণে পড়িলেন। যথা—

"নিমজ্জতোঽনন্ত ভাবার্ণবানন্তশ্চিরায় মে কুলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীমনুত্তমং পাত্রমিদং দায়ায়াঃ।।"

শঙ্কর, দামোদর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভাই। ইহারা সর্বসমেত পঞ্চভ্রাতা, সকলেই উদাসীন, সকলেই প্রভুর অতি মর্মী-ভক্ত। দামোদর বরাবরই প্রভুর সগে আছেন, সর্বকনিষ্ঠ শঙ্কর এখন আসিলেন। শঙ্করকে লক্ষ করিয়া প্রভু স্বরূপের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "দামোদরের প্রতি আমার যেরূপ স্নেহ আছে, তেমনি তাহাকে ভক্তি করিয়া থাকি। কিন্তু শঙ্করের উপর আমার"—ইহা বলিয়া যেন কি বলিবেন, তাই দামোদরের পানে চাহিয়া, তাঁহার ভয়ে বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তখন দামোদর বলিলেন, "প্রভু চুপ করিলেন কেন? আপনার শ্রীমুখে আমার কনিষ্ঠ শঙ্করের গুণানুবাদ আমার ত কখন ক্লেশের কারণ হইতে পারে না, বরং বড় সুখের বিষয়ই হইবে।" তখন প্রভু বলিতেছেন, "আর কিছু নয়, শঙ্করের উপর আমার যে বিশুদ্ধ প্রীতি, তাহাতে ভক্তির গন্ধও নাই। তাই বলি, শঙ্করকে আমার এখানে থাকিতে দাও।" দামোদর বলিলেন, "আমরা সকল ভ্রাতাই আপনার নিকট চির-বিক্রীত। তবে শঙ্কর অদ্য আমার বড় ভাই হইলেন।" প্রভু তখন স্বরূপকে আবার বলিলেন, "শঙ্করকে আমি তোমার হস্তে দিলাম।" আবার গোবিন্দকে বলিলেন, "গোবিন্দ, শঙ্করকে যত্ন করিয়া পালন করিও, যেন কোন দুঃখ না পায়।"

তৎপরে প্রভু ইতিউতি চাহিতে লাগিলেন, যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন। পরে বলিলেন, "মুরারি! মুরারি কোথায়?" এখন মুরারির কাহিনী শুনুন। মুরারি ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীমন্দিরের নিকটে আসিয়া বিবশীকৃত হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন, আর উঠিতে পারেন নাই। সেইখানে পড়িয়া ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভক্তগণ! আমি পামর ও দুঃখী, আমার আর যাইতে সাহস হইতেছে না। এতদূর যে আসিয়াছি ইহা কেবল আপনাদের কৃপায়।" প্রভু যখন মুরারিকে খুঁজিতে লাগিলেন, তখন কয়েকজন ভক্ত তাঁহাকে আনিতে গেলেন। তাঁহারা মুরারির অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "শীঘ্র উঠ, প্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন।" তখন মুরারি কষ্টেসৃষ্টে উঠিয়া দুই গুচ্ছ তৃণ মুখে করিয়া, আর দুই গুচ্ছ তৃণ দুই হাতে লইয়া, দীনাতিদীন হইয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রভু মুরারিকে দেখিবামাত্র সহর্ষে উঠিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনের নিমিত্ত অগ্রবর্তী হইলে, মুরারি করজোড়ে অতি কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "প্রভ! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে স্পর্শ করিও না; আমি অতি মলিন, আপনার স্পর্শযোগ্য নহি।" প্রভু অবশ্য সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলপূর্বক মুরারিকে আলিঙ্গন করিয়া নিজের কাছে বসাইলেন, এবং তাঁহার অঙ্গ মার্জন করিতে করিতে বলিতে

লাগিলেন, "মুরারি! দৈন্য সম্বরণ কর, তোমার দৈন্য আমি সহিতে পারি না।"* যথা চৈতন্যচরিত কাব্যে—

"প্রভুশ্চ তৎ কাকুবাদং রোদনং চ মহত্তরং।
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা ক্ষণমপি ন সেহে বিকলোঽভবৎ।।"

পানিহটিতে অদ্যাপি যে রাঘবের স্থানে মহোৎসব হইয়া থাকে, সেই রাঘবের প্রতি চাহিয়া প্রভু বলিলেন, "তুমি কৃষ্ণের কৃপাপাত্র, তুমি অতি ভাগ্যবান্।" রাঘব এই কথা শুনিয়া বিহ্বল হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, কোন কেথা কহিতে পারিলেন না। তাহার পর প্রভু বলিতেছেন, "হরিদাস! হরিদাস কোথায়?" তখন আবার জনকয়েক হরিদাসকে আনিতে ছুটিলেন। যাইয়া দেখেন, হরিদাস মুরারির ন্যায় প্রভুকে প্রণাম করিতে গিয়া বিবশীকৃত হইয়া পড়িয়া আছেন, আর উঠিতে পারেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, রাসের রজনীতে শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া গোপীগণ অতি কাতর হইয়া তাঁহাকে খুঁজিতেছিলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, কোন কোন বৃক্ষের শাখা স্বভাবতঃ মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। গোপীগণ তখন ভগবৎবিরহে বিভোর। তাঁহারা যাহা দেখিতেছেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের কার্য ভাবিতেছেন। এই বৃক্ষের শাখাগুলি দর্শন করিয়া ভাবিতেছেন যে, "ইহারা নিতান্তই প্রণাম করিতেছিল। প্রণাম আর কাহাকে করিবে, অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকে।" আবার তর্ক করিতেছেন, "যদি তাই হয়, তবে মস্তক উঠাইতেছে না কেন? শ্রীকৃষ্ণ ত এখন চলিয়া গিয়াছেন!" তাহাতে গোপীগণ আপনা-আপনিই সিদ্ধান্ত করিতেছেন, "এই বৃক্ষ শাখাগুলি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিল, আশীর্বাদ পায় নাই, তাই মস্তক উঠায় নাই, এবং আশীর্বাদের আশায় ঐরূপ পড়িয়া আছে।" গোপীগণ উন্মাদ অবস্থায় যাহা বলিয়াছিলেন, মুরারি ও হরিদাস তাহাই সফল করিলেন। মুরারি প্রভুর বাড়ীর নিকট পড়িয়াছিলেন; কিন্তু হরিদাস দূর হইতে প্রভুকে দর্শন করিয়া অমনি রাজপথে পড়িয়া রহিলেন। শ্রীপ্রভুর ভক্তদিগের মধ্যে এক এক জন এক এক ভাবের আদর্শ ছিলেন। হরিদাস ছিলেন দৈন্যের আদর্শ। তখন হরিদাসকে লইতে কয়েকজন ভক্ত আসিলেন; কিন্তু তিনি যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন; "প্রভু তাঁহার নিজ কার্যে ঔদাস্য দেখান তাহা তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার ন্যায় অতি নীচ জাতির শ্রীমন্দিরের নিকটে যাওয়া কর্তব্য নয়।" তাই—যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"হরিদাস কহে মুঞি নীচ জাতি ছার। মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার।।
নিভৃত টোটার মধ্যে কিছু স্থান পাঙ। তাহা পড়ি রহি একা একাল গোঙাঞ।।"

প্রভু এই সংবাদ শুনিয়া বড় আনন্দিত হইলেন, দৈন্য দেখিলে প্রভু চিরকালই আনন্দিত হইয়া থাকেন; তাই নিজ মুখে শ্লোকে বলিয়াছেন যে—যে তৃণ হইতেও নীচ হইতে পারে সে-ই কৃষ্ণ-কীর্তনের উপযুক্ত।

এমন সময় কাশী মিশ্র ও তুলসী পড়িছা আসিলেন এবং প্রভুকে প্রণাম করিয়া বৈষ্ণবগণের সৌন্দর্য ও প্রভুর সহিত তাঁহাদের মিলন দর্শন করিতে লাগিলেন; তাহার পর করজোড়ে প্রভুকে বলিলেন, "মহারাজের আজ্ঞাক্রমে বৈষ্ণবদিগের বাসস্থান ঠিক করিয়াছি। এখন আদেশ পাইলে তাঁহাদিগকে লইয়া বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিই।" এ বাসস্থান নির্ণয় প্রভুর ইঙ্গিত ক্রমে বাণীনাথ পূর্বে করিতেছিলেন। কিন্তু মহারাজা স্বয়ং এর ভার লওয়াতে, তাঁহার এই কার্য আর করিতে হয় নাই। প্রভু বলিলেন, "গোপীনাথ, তুমি সকলকে তাহাদের

* 'গোবিন্দের কড়চা' নামক গ্রন্থ অনুসারে পূর্বে লিখিয়াছিলাম যে, মুরারি প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে বোধহয় তিনি যান নাই।

বাসায় লইয়া যাও।" তাহার পরে ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমারা যাইয়া সমুদ্রে স্নান করিয়া ও মন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া এখানে আসিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবা।"

ভক্তগণ গমন করিলে, প্রভু কাশীমিশ্রকে বলিলেন, "আমার বাসার নিকটস্থ পুষ্পোদ্যানে, একখানি ঘর আছে, ওখানি আমাকে ভিক্ষা দাও।" কাশীমিশ্র বলিলেন, "ঘর কি ছার বস্তু, আমার আপনার, যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করুন!" প্রভু তখন নিশ্চিন্ত হইয়া হরিদাসকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করিলেন। বাসা হইতে বহুদূর গমন করিয়া তাঁহাকে পাইলেন। দেখিলেন, হরিদাস রাজপথে বসিয়া নামকীর্তন করিতেছেন। প্রভুকে দেখিয়া হরিদাস উঠিয়া চরণে দণ্ডবৎ করিলেন। পরে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবেন বুঝিতে পারিয়া করজোড়ে পশ্চাৎ হাঁটিতে লাগিলেন। হরিদাস বলিতেছেন, "প্রভু! আমাকে ছুঁইবেন না, আমি অস্পশ্য পামর, আপনার যোগ্য নহি।" প্রভু তখন গদ্‌গদভাবে বলিতেছেন, "আমি পবিত্র হইবার জন্য তোমাকে স্পর্শ করিতে বাঞ্ছা করি।" যথা চরিতামৃতে—

"প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে। তোমার পবিত্রধর্ম নাহিক আমাতে।।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব-তীর্থে স্নান। ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান।।
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন। দ্বিজ জ্ঞানী হইতে তুমি পবম-পাবন।।"

হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষাধিক নাম জপ করিতেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া প্রভু শ্রীভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ৩৩শ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক পড়িলেন, যথা—

"অহোবত শ্বপচোহতো গরীয়ান যজ্জিহ্বাগ্রে বর্তনে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সম্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।"*

প্রভু তখন হরিদাসকে হৃদয়ে ধরিয়া, ভক্তগণসহ আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে হরিদাসের জন্য যে বাসা স্থির করা হইয়াছে তাঁহাকে সেখানে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এই তোমার ঘর, এখানে বাস করিবে ও নাম কীর্তন করিবে। আমি প্রত্যহ আসিয়া তোমার সহিত মিলিব, আর তোমার নিমিত্ত প্রত্যহ মহাপ্রসাদ আসিবে। মন্দিরের চক্র দেখিয়া প্রণাম করিও।" হরিদাসের মন্দিরে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ প্রভুও পোযকতা করিলেন। প্রকৃত কথা, হরিদাস মুসলমান, মন্দিরের অন্য ভক্তের ন্যায় তাহার যাওয়া বহিরঙ্গ লোকের বিরক্তি হইতে পারে। প্রভু বলপূর্বক কোন মত চালাইতেন না। হরিদাস বাসায় আসিলে, নিত্যানন্দ মুকুন্দ প্রভৃতি—যাঁহারা নীলাচলে ছিলেন—আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

প্রভুর বাসায় বহু প্রকারের বহু প্রসাদ উপস্থিত হইয়াছে। ভক্তগণ সকলে আপন আপন বাসা পাইয়া যাঁহার যে সম্পত্তি তাহা সেইখানে রাখিয়া, সমুদ্রস্নানে গমন করিলেন। পরে চূড়া দর্শন ও প্রণাম করিয়া প্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। প্রভু বিহ্বল হইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার নদীয়ার সমুদয় খেলার সাথী উপস্থিত, তাঁহার বাড়ীতে সকলের নিমন্ত্রণ। আপনি পাতা পাতিতেছেন, আপন সকলকে ধরিয়া ধরিয়া বসাইতেছেন। সকলে উপবেশন করিলে, কাহারও হস্তে জল দিতে উদ্যোগী হইলেন। শেষে আপনি পরিবেশন করিতে চাহিলেন। প্রভু চিরকালই বড় মহাশয় লোক, বিশেষতঃ অতিথিসৎকার করিতে খুব মজবুত। সে সময় তাঁহার ভবিষ্যৎ জ্ঞান থাকে না, কল্য কি খাইবেন তাহাও মনে থাকে না। তাই প্রত্যেক পাতে ২।৩ জনের অন্ন দিতে লাগিলেন। প্রভু এই পরিবেশনে আমোদ করিতেছেন, কিন্তু ভক্তগণ হাত উঠাইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রভু উহা লক্ষ্য না করিয়া আপনার আনন্দে পাতে পাতে

* যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্তমান সে শ্বপচ (চণ্ডাল) হইলেও কেবল সেই জন্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন, তাঁহারাই তপস্যা করেন, যোগ করেন, তীর্থস্নান করেন। তাঁহারাই আর্য (সদাচারী) এবং বেদ অধ্যয়ন করেন।

নানাবিধ সামগ্রী দিতেছেন। এমন সময় স্বরূপ বলিলেন, "প্রভু, দেখিতেছেন না, আপনি না বসিলে, কেহ প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না। আপনি বসুন, আমরা পরিবেশন করিতেছি। আপনার সঙ্গী সমস্ত সন্ন্যাসীকে গোপীনাথ আচার্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনিও প্রসাদান্ন আনিয়াছেন। তাঁহারা আপনার ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অপেক্ষা করিতেছেন। তখন মহাপ্রভু হরিদাসের জন্য গোবিন্দের দ্বারা মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া, আপনি শ্রীনিত্যানন্দকে দক্ষিণে করিয়া ভোজনে বসিলেন।" স্বরূপ, জগদানন্দ ও দামোদর পরিবেশন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রসাদ কখনও অপবিত্র হইতে পারে না, প্রভু অগ্রে সার্বভৌমকে এই শিক্ষা দেন। যিনি এই মহাপ্রসাদ আনিয়াছেন, ইনি কায়স্থ, রামানন্দের ভাই বাণীনাথ। আবার আনাইয়াছেন সেবকগণের দ্বারা। এখন যে নীলাচলের বাহির হইলে কেহ কেহ মহাপ্রসাদকে উচ্ছিষ্ট বলিয়া অপবিত্র ভাবেন, সে কথা প্রভুর সম্মত নয়। যাহা শ্রীভগবানের অধরামৃত স্পর্শ করিয়াছে উহা পরম পবিত্র বস্তু।

মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া কিরূপ ভোজন করিতেন, তাহার কতক নির্দর্শন, এখন বৈষ্ণবগণ যে মহোৎসব করেন তাহাতে জানা যায়। এই 'ভোজনে ভজন' পরে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল। ফল কথা, যিনি প্রকৃত মহাপ্রভুর গণ, তিনি সকল কার্য ভক্তিরসে ডুবাইয়া লয়েন। প্রভু ভক্তগণকে নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে আপনি সকলের অঙ্গে চন্দন দিলেন, সকলের গলায় ফুলের মালা পরাইলেন। তখন ভক্তগণ তাঁহাদের নির্দিষ্ট বাসায় গমন করিয়া বিশ্রাম করিলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে ভক্তগণ খোল করতাল মাদল মৃদঙ্গ লইয়া প্রভুর বাসায় আসিলেন। রামানন্দ রায় বৈষ্ণবগণের অপরিচিত বলিয়া পূর্বে আসেন নাই, এখন প্রভুর নদেবাসী নিজজনদিগের দর্শন করিতে আগমন করিলেন। রামানন্দ কায়স্থ, ধনী লোক, পরম বিষয়ীর ন্যায় আকর। তাঁহার সহিত প্রভুর গাঢ় আত্মীয়তা দেখিয়া সকলে অবাক হইলেন। প্রভু তখন ভক্তগণ লইয়া মন্দিরে গেলেন এবং ধূপ আরতি দর্শন করিলেন। ভক্তগণ অবশ্য খোল করতাল প্রভৃতি লইয়া গিয়াছেন। প্রভু তখন ভক্তগণ লইয়া চারিটি সম্প্রদায় করিলেন এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুইখানি খোল, চারি জোড়া করতাল ও একজন মূল-গায়ক দিলেন। প্রথম সম্প্রদায়ের কর্তা হইলেন নিত্যানন্দ, দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের অদ্বৈত, তৃতীয় সম্প্রদায়ের শ্রীবাস, আর চতুর্থ সম্প্রদায়ের বক্রেশ্বর। এমন সময় তুলসী পড়িছা আসিয়া সকলকে শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞা-স্বরূপ চন্দন ও মালা দিলেন। তখন প্রভু চারি সম্প্রদায়ের মন্দিরের চারিদিকে ভাগ করিয়া ছিলেন এবং কীর্তন আরম্ভ হইল। প্রভু খঞ্জনকৃতি ধরিয়া চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কখন এ সম্প্রদায়ে, কখন ও সম্প্রদায়ে, কখন বা আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া—রাসের রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যেমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ একেবারে চারি সম্প্রদায়ে নাচিতে লাগিলেন। প্রকৃত কথা তিনি কি করিলেন তাহা তিনি জানেন। তবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরা দেখিতে লাগিলেন যে, প্রভু তাঁহাদের সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতেছেন। প্রভু তাঁহাদের সম্প্রদায়ে আছেন তাঁহাদের কীর্তনে নৃত্য করিতেছেন, এই আনন্দে ভক্তগণ উন্মত্ত হইয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর প্রভুর বিরহ সহ্য করিয়া অদ্য আবার তাঁদের সহিত নৃত্য করিতেছেন—এই আনন্দ আর তাঁহাদের ধরিতেছে না। প্রভু আর এক উপায়ে ভক্তগণকে কীর্তনশক্তি দান করিতেছেন। প্রভু যাহাকে নিকটে পাইতেছেন তাহাকেই গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন। এই আলিঙ্গন দ্বারা প্রকারান্তরে জানাইতেছেন যে, "তুমি বেশ কীর্তন করিতেছ, তোমাকে বলিহারী যাই, তুমি আমাকে কিনিয়া লইলে।" প্রভুর আলিঙ্গনে ভক্ত ইহাই বুঝিয়া আরও বিহ্বল হইতেছেন। শ্রীনাম-মঙ্গল কীর্তনে নীলাচল টলমল করিয়া উঠিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সেই মুহূর্তে নীলাচল অধিকার করিয়া লইলেন।

শ্রীকীর্তন-মঙ্গলধ্বনি শ্রবণ করিয়া, পুরুষোত্তমের লোকেরা উহা দর্শন ও শ্রবণ করিতে ধাইলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী নহেন,—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তখন সেখানকার প্রায় সকলেরই এই অটল বিশ্বাস। কাজেই তিনি তাঁহার পার্ষদগণ লইয়া নৃত্য করিতেছেন, ইহা দেখিতে কাহার না সাধ হয়? প্রভুকে কেহ কদাচিৎ দর্শন পান। যদি কেহ কখন পান, তবে দেখেন, তিনি ভাবে বিভোর ও ভক্তগণ পরিবেষ্টিত। সেই প্রভু অদ্য নৃত্য করিতেছেন, ইহা দেখিতে কাহার না লালসা হয়? তাই পুরুষ ও নারীগণ বালকগণসহ চলিলেন। এমন কি স্বয়ং মহারাজ প্রতাপরুদ্র জ্ঞানহারা হইয়া সামান্য লোকেব ন্যায় কীর্তন দর্শন ও শ্রবণ করিতে অট্টালিকায় আরোহণ করিলেন। রাজা চলিলেন, কাজেই পাত্র মিত্র ভৃত্য প্রভৃতি সঙ্গে চলিলেন। মন্দিরের সেবকগণ তখন মন্দির হইতে দীপ আনিয়া কীর্তনস্থান আলোকময় করিয়া প্রভুর নৃত্য দর্শন সুলভ করিয়া দিলেন।

সকলে দেখেন যে, প্রভু তিলার্ধের মধ্যে প্রেম-তরঙ্গে যেন সমস্ত সংসার ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছেন; আর প্রভু সোনার পুত্তলির ন্যায় প্রেমে বিবশীকৃত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। সেই চতুর্হস্ত পরিমিত সুবলিত দেহ, গলিতবিমল হেমোজ্বল-তেজ দ্বারা মণ্ডিত হইয়া, নানাভাবে তরঙ্গায়মান হইতেছে। প্রভুর নৃত্য অনেক ভক্তই বর্ণনা করিয়াছেন। এই নৃত্য দর্শনে সকলেই চঞ্চল হইতেন, আবার বহুতর লোক সংসার জলাঞ্জলি দিয়াছেন। এই নৃত্য দেখিয়া সন্ন্যাসীগণের রাজা, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, কুলশীল হারাইয়া প্রভুর চরণতলে আসিয়াছেন। পুরীবাসীরা ও স্বয়ং রাজা সেই নৃত্য দর্শন করিতেছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন যে, প্রভুর নয়ন দিয়া পিচকারীর ন্যায় জল নির্গত হইয়া চতুর্দিকের লোকসমূহকে স্নান করাইতেছে। প্রভু মন্দির ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, কাজেই সকলে তাঁহার নৃত্য দেখিতে পাইলেন।

শ্রীনিত্যানন্দের কীর্তনে মন নাই। প্রভু পাছে মূর্ছিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া যান, এই ভয়ে তিনি বাহু পসারিয়া, তাঁহার পাছে পাছে বেড়াইতেছেন। নিমাই যখন সন্ন্যাসী হইয়া নীলাচলে গমন করেন, তখন শচীমাতা নিতাইয়ের হাত দুইখানি ধরিয়া বলিয়াছিলেন যে, "বাছা আমার সন্ন্যাসী হইয়া চলিল। সে বালক তার আর অভিভাবক কেহ নাই। তুমি ছোট ভাই ভাবিয়া তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিও। বিশেষতঃ নিমাই যখন মূর্ছিত হইয়া ধূলায় পড়ে, তখন তাহাকে ধরিও যেন মাটিতে না পড়ে।" নিতাই যতদূর সাধ্য তাহা পালন করিয়াছেন। প্রভুকে পড়-পড় দেখিলেই নিতাই দুই বাহু পসারিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেন। কখন প্রভুকে পড়-পড় দেখিয়া আনন্দে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া "সামাল সামাল" বলিতেছেন। কখন বা "সামাল" বলিতে বলিতে আপনি পড়িয়া যাইতেছেন। যথা, পদ—

"নিতাই আপনি পড়িয়া বলে সামালিও ভাই।"

মহারাজ প্রতাপরুদ্র প্রভুর সহিত মিলিবার জন্য ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার নৃত্য ও কীর্তন দেখিয়া ও শুনিয়া আরও সংজ্ঞাহারা হইলেন। যথা—

"সংকীর্তন দেখি রাজার হৈল চমৎকার। প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার।।"

তখন নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীশ্রীবাস ও শ্রীবক্রেশ্বর—এই চারিজনকে প্রভু চারি সম্প্রদায়ে নাচিতে আজ্ঞা দিলেন। এইরূপ কিছুকাল নৃত্যের পর সকলে ক্লান্ত হইলে, কীর্তন বন্ধ হইল। তখন পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া ভক্তগণসহ প্রভু বাসায় ফিরিলেন। যাইয়া দেখেন যে, মহারাজের আজ্ঞাক্রমে তুলসী পড়িছা ভারে-ভারে প্রসাদ রাখিয়া গিয়াছেন। তখন সকলে ভোজনে বসিলেন; ভোজনানন্দের পর সকলে নিজ নিজ বাসায় বিশ্রাম করিতে গমন করিলেন।

প্রত্যহই যে প্রভুর আলয়ে ভোজন হইতেছে তাহা নহে; মধ্যে মধ্যে ভক্তগণও প্রভুকে

নিমন্ত্রণ করিতেছেন। প্রভু যাহা ভালবাসেন তাহাই তাঁহারা গৌড় হইতে আনিয়াছেন। প্রভু ভক্তগণসহ এইরূপে প্রতিদিন মহোৎসব করিতে লাগিলেন। ক্রমে রথযাত্রার দিন সন্নিকট হইল। তখন প্রভু, তুলসী পড়িছা, কাশী মিশ্র ও সার্বভৌমকে ডাকিয়া বলিলেন, রথযাত্রার পূর্বে শ্রীমন্দির পরিষ্কৃত ও মার্জিত করিতে হইবে। তাহারা এই সেবাটি তাঁহাকে দিউন। ইহাতে সকলে হাহাকার করিয়া বলিলেন যে, এরূপ নীচ সেবা প্রভুর পক্ষে শোভা পায় না। তবে যদি নিতান্তই তাঁহার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তা'হলে তাঁহারা কাজেই সে আজ্ঞা পালন করিবেন। ইহাই বলিয়া বহুতর ঘট ও সম্মার্জনী মন্দিরে রাখিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

পরদিবস প্রভাতে প্রভু মহানন্দে মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি করিতে করিতে তিন চারি শত ভক্তসহ মন্দিরে চলিলেন। প্রভু পূর্বে শ্রীনবদ্বীপে হরি মন্দির মার্জনরূপ লীলা একবার করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে ভক্তিতে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত প্রভু প্রত্যেক ভক্তকে স্বীয় শ্রীহস্তে চন্দন মাখাইলেন ও মালা পারইলেন, আর ভক্তগণ শ্রীকরস্পর্শে চন্দন প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে—

"আপনার হস্তে প্রভু চন্দন লইয়া। ভক্ত সবে পরাইলা অতি প্রীত হইয়া।।
ঈশ্বর প্রসাদ মাল্য দিলেন গলায়। আনন্দে বিহুল সবে চৈতন্য কৃপায়।।
করতে শোধনী ভক্তগণ চারিদিকে। মত্ত গজ গতি প্রভু চলিলেন আগে।।"

ভক্তগণ দেখিলেন, তুলসী পড়িছা একশত সম্মার্জনী ও বহুতর ঘট রাখিয়াছেন। তখন কটি-বন্ধন করিয়া সকলে কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশ্য প্রভু সকলের আগে। এখানে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, প্রভু ব্রজের অতি নিগূঢ়-রস জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি মন্দির-মার্জন সেবার ন্যায় অতি স্থূল সাধন-প্রণালী কেন ভক্তগণকে শিক্ষা দিতে গেলেন? ফল কথা, যাহাতে ভক্তির উদ্রেক করে, সেই কার্যেই প্রভুর সম্মত। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের এই সেবা ছিল যে, যখন শ্রীজগন্নাথের রথ মন্দির ত্যাগ করিয়া সুন্দরাচল গমন করিতেন তখন তিনি সুবর্ণ মার্জনী লইয়া অগ্রে পথ পরিষ্কার করিয়া ও চন্দন জলের ছিটা দিয়া উহা পবিত্র করিতেন। এই সেবা দেখিয়া প্রতাপরুদ্রের উপর প্রভুর কৃপা হইল। মনে ভাবুন, শ্রীমন্দির শ্রীভগবানের বাসস্থান, তাহার মার্জন করিতেছি, যাঁহারা মনে এইভাবে জাজ্জ্বল্যমানরূপে খেলিতে থাকে তাঁহার আনন্দের সীমা কি? ভক্তিকার্যে ছোট-বড় নাই—মোটা-সূক্ষ্ম নাই।

ফল কথা, যখন ভক্তগণ মন্দিরে পরিষ্কার আরম্ভ করিলেন, তখন সকলে ভক্তিতে বিগলিত হইলেন। সকলে মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনির সহিত দিক্ নিনাদিত করিতে লাগিলেন। সর্বাপেক্ষা প্রভুর উৎসাহ অধিক এবং তিনি অধিক কার্য করিতেছেন। যিনি ভাল করিয়া কার্য করিতেছেন, প্রভু তাঁহাকে সাধুবাদ করিতেছেন; আর সাধুবাদ পাইবার নিমিত্ত সকলেই প্রাণের সহিত পরিশ্রম করিতেছেন, কিন্তু তবু কেহ প্রভুর সহিত পারিয়া উঠিতেছেন না। মাঝে মাঝে কীর্তন ও মাঝে মাঝে একটু নৃত্যও হইতেছে। মনে করুন, ইহার মধ্যে কোন ভক্তের একটু বেগ বাড়িয়া উঠিল, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া একটু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অমনি ভক্তগণ সমুদয় কার্য ফেলিয়া কীর্তন্ সুরু করিলেন। কাজেই মন্দির-মার্জন কার্য তত শীঘ্র শীঘ্র হইতেছে না। সম্মার্জনীর দ্বারা উপর ও তলদেশ পরিষ্কার করিয়া শেষে হস্ত দ্বারা আবর্জনা কুড়াইতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, 'যিনি যত কুড়াইলেন সব একস্থানে জড় করুন। পরে বিচার করিয়া যাঁহার অধিক হইবে তিনি পুরস্কার ও যাঁহার কম হইবে তিনি দণ্ড পাইবেন'।

শ্রীঅদ্বৈত উপবাসে বয়সে, পথশ্রমে ও নানাবিধ কারণে দুর্বল,—অধিক কুড়াইতে পারেন নাই। বিচারে প্রভুর কঙ্করের কাঁড়ি সর্বাপেক্ষা অধিক ও শ্রীঅদ্বৈতের সর্বাপেক্ষা কম হইল।

তখন প্রভু হাসিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেছেন যে, পূর্বে যে কথা স্থির হয়, তাহাতে তুমি দণ্ডার্হ! শ্রীঅদ্বৈতের উত্তর নাই। তখন স্বরূপ তাঁহার পক্ষ হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু, তুমি গোয়ালা পেট ভরিয়া দুধ ও ননী খাও, তোমার সহিত তাপস-ব্রাহ্মণ শ্রীঅদ্বৈত পারিবেন কেন?" স্বরূপ যেরূপ প্রভুকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সাব্যস্ত করিয়া কথা কহিলেন, প্রভুও সেইরূপ শ্রীঅদ্বৈতকে মহাদেব স্থির করিয়া বলিলেন, "স্বরূপ, তাহা নয়, তাহা নয়! যিনি ব্রহ্মাণ্ড সংহার করেন শ্রীভগবান্ তাঁহার জয় কখনও দেন না। স্বরূপ, ধর্মের বল বড় জানিবা।" স্বরূপ বলিলেন "গোয়ালা বুঝি বড় সাধু পুরুষ? পুতনা দিলে স্তন্যদুগ্ধ, আর সেই হতভাগিনী সেই অপরাধে মারা গেল। প্রভু বলিলেন, "স্বরূপ, কথা কাটাকাটি করার কি ফল। শ্রীজগন্নাথদেব এইখানে স্বয়ং সাক্ষী। যদি শ্রীঅদ্বৈত সংহারী ও আমি নিরপরাধী না হইব, তবে শ্রীজগন্নাথ তাঁহাকে পরাজয় ও আমাকে জয় দিবেন কেন? আমার কঙ্করের কাঁড়ি বড় হইয়াছে, ইহাতেই বুঝিতেছি যে শ্রীজগন্নাথ আমার পক্ষে সাক্ষী দিতেছেন।" শ্রীঅদ্বৈতের তখন কথা ফুটিল, তিনি বলিলেন, "যে ব্যক্তি সুজন হয়, সে আপনাকে আপনি সাক্ষী মানে না। তোমার সাক্ষী জগন্নাথ, আর তুমি শ্রীজগন্নাথের সাক্ষী। ইহাতেই প্রমাণ, তোমরা কিরূপ সুজন।" সুতরাং নৃত্য, গীত ও কায়িক পরিশ্রমের সহিত হাস্যকৌতুকও হইতেছে। মন্দির পরিষ্কৃত হইলে জল আনিবার আজ্ঞা হইল। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামতে—

"শত শত লোক জল ভরে সরোবরে। ঘাটে স্থল নাহিত কেহ কূপে জল ভরে।।
পূর্ণ কুম্ভ লইয়া আসে শত ভক্তগণ। শূন্য ঘট লৈয়া যায় আর শত জন।।
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল। শত শত ঘট তাহা লোকে আনি দিল।।
জল ভরে ঘট ধোয়ে করে হর্ষধ্বনি। কৃষ্ণ হরিধ্বনি বিনু আর নাহি শুনি।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘট সমর্পণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন।।
যেই সেই কহে সেই কহে কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ নাম হৈল তাহা সঙ্কেত সর্বকাম।।
প্রেমাবেশে কহে প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম। একলা করেন প্রেমে শত জনের কাম।।"

এইরূপ সমস্ত মন্দির ধৌত করা হইল; যথা চন্দ্রোদয় নাটকে—

"এবং গৃহ মার্জি কৈল প্রসন্ন শীতল। আপন চরিত্র যেন আপন অন্তরে।।"

অর্থাৎ প্রভুর অন্তর যেরূপ পবিত্র ও শীতল, মন্দিরও সেইরূপ পরিষ্কার ও ধৌত করিয়া শীতল ও পবিত্র করিলেন।

ভক্তগণ মন্দিরে জল ঢালিতেছেন, সেই উপলক্ষ্য করিয়া কেহ বা প্রভুর শ্রীপদ ধোয়াইতেছেন, আবার সেই জল পান করিতেছেন। প্রভু আমার সরল চিত্ত, ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পাইতেছেন না। এমন সময় এক সরলবুদ্ধি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ একঘট জল প্রভুর পায়ে ঢালিয়া দিয়া সেই জল অঞ্জলি করিয়া পান করিতে লাগিলেন। প্রভু ব্রাহ্মণের কার্য দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন; বলিলেন, "স্বরূপ, আমার দুর্গতি দেখ। এই জগন্নাথের মন্দির, ইহার মধ্যস্থানে এই ব্রাহ্মণ আমার পদ ধৌত করিল, তাহার পরে সেই অপবিত্র জল লইয়া আপনি পান করিল। এখন বল আমার কি গতি হইবে? ঐ ব্রাহ্মণ নির্বোধ, ভালমন্দ বুঝে না কিন্তু শ্রীজগন্নাথের নিকট আমার অপরাধ কিসে মোচন হইবে?" শ্রীজগন্নাথে ও শ্রীপ্রভুতে প্রভেদ নাই, ইহা ভক্তগণ মনে ঠিক জানেন। সুতরাং সেই ব্রাহ্মণের উপর তাঁহাদের রাগ হইল না, বরং বড়ই ভক্তি হইল। তবু প্রভু ক্রোধ করিয়াছেন, অর্থাৎ ধর্মশিক্ষা দিতেছেন, কাজেই প্রভুর কথায় তাঁহাদের সহানুভূতি করিতে হইল। তাই স্বরূপ সেই ব্রাহ্মণের ঘাড় ধরিয়া ধাক্কা দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ দণ্ড পাইয়া মহা খুশি। ভক্তগণ তাঁহাকে তাঁহার কার্যের নিমিত্ত সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণকে বাহির করিয়া দিলে, ভক্তগণের পরামর্শনুসারে সেই ব্রাহ্মণ আবার ভিতরে আসিল, এবং প্রভুর চরণে পড়িয়া

বলিল, "প্রভু আমি মূর্খ, আমি ভাল মন্দ কি বুঝি? আমাকে ক্ষমা করুন।" প্রভু হাসিলেন, আর কিছু বলিলেন না। মন্দির ধৌত হইলে ভক্তগণ আপন আপন বসন দ্বারা জল মুছিয়া লইলেন। তখন সকলে একটু পরিশ্রান্ত হইয়াছেন; অল্প বিশ্রাম করিয়া প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যথা চন্দ্রোদয় নাটকে—

গুণ্ডিচা মার্জন করি, আনন্দেতে গৌরহরি, স্বরূপাদি ভক্তগণ লৈয়া।
আরম্ভিল সংকীর্তন, আনন্দিত ত্রিভুবন, ধ্বনি উঠে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া।।
স্বরূপের উচ্চ গীতে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে, ইত্যাদি।।

তাহার পর প্রভু উদ্দণ্ড-নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যথা—

"মহা উচ্চ সংকীর্তনে আকাশ ভরিল। প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল।।"

প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্য দেখিলে ভক্তগণ ভয় পাইতেন, উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভুর আছাড় দেখিলে ভক্তগণের হৃদয় শুকাইয়া যাইত। স্বরূপ বেগতিক দেখিয়া কীর্তনে ক্ষান্ত হইলেন। কাজেই প্রভুও ক্রমে নৃত্যে ক্ষান্ত দিলেন। সকলে একটু শান্ত হইলে, ভক্তগণসহ প্রভু সরোবরে ঝম্প দিলেন এবং কৃষ্ণের বাল্যলীলা ভাবে বিভাবিত হইয়া মহানন্দে সকলে জলকেলি আরম্ভ করিলেন। তখন কাহারও বাহ্যজ্ঞান; কি বৃদ্ধ কিবা যুবা, সকলেই নিতান্ত বালকের ন্যায় খেলা আরম্ভ করিলেন। যিনি অতি বিজ্ঞ, তিনিও শিশুর ন্যায় ডুব দিয়া যাহাকে সম্মুখে পান তাহার পা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দে জলযুদ্ধ বাধাইয়া রঙ্গ দেখিতেছেন। আবার ভক্তগণও প্রভু ও গদাধরে জল-যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়া তাহার শোধ লইতেছেন। ছেলেবেলায় "কয়া কয়া" খেলায় প্রভু বড় আমোদ পাইতেন; পরেও সেই রহস্য আস্বাদন করিতেন। কৃষ্ণপ্রেমে জীবকে শিশুর ন্যায় চঞ্চল করে। হে কৃপাময় পাঠক। বনে গমন করিয়া ও উপবাস করিয়া যোগদ্বাবা অষ্টসিদ্ধি লাভ, আর এই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন খেলা,—এই দুই তুলনা কর!

জলক্রীড়া শেষ করিয়া নৃসিংহদেবকে প্রণাম করিলেন, শেষে সকলে উপবনে প্রবেশ করিলেন। সেইখানে মহারাজের আজ্ঞাক্রমে, কাশী মিশ্র ও তুলসী পড়িছা, পাঁচশত লোকের উপযোগী অতি উপাদেয় প্রসাদ আনিয়া রাখিয়াছেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ভক্তগণের যেমন ক্ষুধা, প্রসাদও তাঁহার উপযোগী। এই তিন চারি শত ভক্তসহ প্রভু ভোজন করিতে বসিলেন। মধ্যস্থানে প্রভু, তাঁহার দক্ষিণে সার্বভৌম, তাঁহার পার্শ্বে পুরী ও ভারতী, তাঁহার পরে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ। ইহাদের ঝগড়া করিতে সুবিধা হইবে বলিয়া ভক্তগণ যোগাড় করিয়া তাঁহাদিগকে পাশাপাশি বসাইয়া দিলেন। আজ সার্বভৌমের সমন্বয় হইবে। তিনি বড় শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, বিধির দাস। অদ্য "ছত্রিশ বর্ণ" একত্র হইয়া মহাপ্রসাদ অর্থাৎ সেই শূদ্রপৃষ্ঠ অন্ন, শূদ্রের হস্তে, ছত্রিশ বর্ণের সহিত ভোজন করিবেন, তাই সার্বভৌমকে প্রভু আপনি ধরিয়া নিজের কাছে বসাইয়াছেন।

তখন প্রভু "হরিদাস" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। হরিদাস মুসলমান; তিনি যদি সেই মহাকুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক পংক্তিতে বসেন, তবে হিন্দুর হিন্দুত্বের শ্রাদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ভক্তগণের তখন মনের এই ভাব যে, কৃষ্ণ জগতের পিতা, আর সকলেই তাঁহার সন্তান; সুতরাং হরিদাস তখন ভোজনে বসিলে, সে যে কোন অন্যায় কার্য হইবে, ইহা কেহ ভাবিতেও পারিতেন না। কিন্তু হরিদাস দীন হইতে দীন। তিনি করজোড়ে বলিলেন, "প্রভু, আমাকে বধ করিবেন না। আমি এ সমাজে বসিবার উপযুক্ত নহি, আমাকে নিজ গুণে ক্ষমা করুন।" প্রভু আর পীড়াপীড়ি করিলেন না। পরিবেশক সাতজন নিযুক্ত হইলেন, যথা— স্বরূপ, জগদানন্দ, দামোদর, কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ ও শঙ্কর। ইহাদের মধ্যে বাণীনাথ কায়স্থ।

যখন ভক্তরা উপবনে বসিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের পুলিন-ভোজনে সকলে মনে একেবারে স্ফূর্তি হইল। প্রভু এই ভাবে এত বিভোর হইলেন যে, তাঁহার নয়ন জলে ভোজন-কার্য বন্ধ হইয়া গেল। প্রভু দেখিলেন যে, তিনি ভোজন না করিলে কেহই করেন না, তাই কষ্টে-সৃষ্টে ধৈর্য ধরিলেন। পূর্বে নাচিয়া গাহিয়া ভজনের কথা বলিয়াছি। যদি নাচিয়া গাহিয়া ভজন হয়, তবে, জলক্রীড়ায় কি বড়-ভোজনে ভজন কেন না হইবে? গীতা বলেন, সকল কর্ম কৃষ্ণে সমর্পণ করিবে। এই মহাকাব্য আর একটি কথার উত্তর। সেইটি বৌদ্ধগণের নিকট হিন্দুগণ শিখিয়াছিলেন। কথাটি এই যে জীবের কর্মের বোঝা বহিবে কে? কর্ম করিলে তাহার ফল জীবের গ্রহণ করিতেই হইবে। কাজেই তাহার নরক, স্বর্গ ও পুনর্জন্ম ভোগ করিতেই হইবে। এই কথার উত্তর এই যে, সকল কর্ম কৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া করিলে, তিনিই সেই সকল বোঝা বহিবেন। প্রভু এই অবতারে আপনি আচরিয়া তাঁহার জীবকে ধর্ম-শিক্ষা দিতেছেন। তিনি দেখাইতেছেন যে, শ্রীভগবান জীবের সুহৃদ, কাজেই তাঁহার ভজনে কেবল আনন্দ ব্যতীত কোন দুঃখ হইতেই পারে না, এমন কি, যে কার্যে প্রকৃত দুঃখ আছে, সে তাঁহার ভজনই নয়। তবে কোন কোন ভজনে আপাততঃ দুঃখ বোধ হইতে পারে; কিন্তু সেই দুঃখ প্রথমে—প্রকৃত-ভজনের চরম কেবল আনন্দ। মনে ভাবুন, শুদ্ধ নাম-জপ আপাততঃ দুঃখকর বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু যিনি এরূপ ভাবেন, তিনি আপনি নাম জপিয়া দেখিবেন যে, আমাদের সেই সুহৃদের নাম "জপিতে জপিতে উঠে অমৃতের খনি।"

অতএব, হরি-মন্দির মার্জন যদিও নীচ-কার্য, কিন্তু উহাও ভজন; আবার জলক্রীড়া ও বন-ভোজন—উহাও ভজন। তবে কি না, কৃষ্ণে অর্পণ করিয়া করিলে সমুদয় কার্যেই ভজন হয়; কাজেই ইহার ফল-স্বরূপ বোঝা বহিতে হয় না। যাঁহারা ভজনে বসিয়াছেন, তাঁহারা আনন্দে বিহ্বল হইয়াছেন; যাঁহারা স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা বলেন যে, ভোজনের সময় সুখকর আলাপনে ক্ষুধার উদ্রেক হয় ও পরিপাকের সহায়তা করে। তাই যখন পাঁচজনে বসিয়া ভোজন করেন, তখন কেহ পরের কুৎসা করেন, কেহ বা বাজে গল্প করেন, কারণ দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া ভোজনে যে সুখ তাহা তাঁহারা জানেন না।

সকলে ভোজনে বসিলে হরিধ্বনি হইয়া উঠিল। প্রথম গ্রাস বদনে দিবার সময় ভাবিতেছেন যে, শ্রীভগবানের অধরামৃত দ্বারা ইহা পবিত্রীকৃত হইয়াছে। আর প্রকৃতই গ্রাস ভক্তগণের জিহ্বায় অনির্বচনীয় উপাদেয় আস্বাদ দিতেছে। আবার কৃষ্ণের সুখকে ভক্তেরা আপনার সুখ বলিয়া মনে করেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণও ইহা আস্বাদ করিয়া সুখানুভব করিয়াছেন ভাবিয়া তাহারা আরও আনন্দ পাইতেছেন। এইরূপ মনের ভাবে কোন ভক্ত সময়োপযোগী একটি শ্লোক পাঠ করিলেন, আর সেই সঙ্গে সকলে সেই শ্লোকটি আস্বাদন করিলেন। সেই শ্লোকটিতে অন্য একটি ভাবের উদয় হওয়াতে আর একজন ভক্ত আর একটি শ্লোক পড়িলেন। উহা শুনিয়া ভক্তগণ পুলকিত হইয়া গগন ভেদিয়া হরি হরি বলিয়া উঠিলেন।

এই গেল মহোৎসবের মহাপ্রসাদ ভোজনের সুখ। এই গেল 'ভোজনে ভজন'। ইহার মধ্যে কেহ বা হাস্য-কৌতুক করিতেছেন, আর সকলে আনন্দে টলমল করিতেছেন বলিয়া, উহা শ্রবণ করিয়া হাসিয়া গলিয়া পড়িতেছেন। শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "এতদিনে আমার জাতিটি গেল।" সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন হইল কি?" অদ্বৈত বলিতেছেন, "প্রভুর কি? উনি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর অন্নে দোষ নাই। কিন্তু আমি গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ, আমি অবধূতের (নিত্যানন্দকে দেখিয়া) সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া সমাজ ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধকার্য করিলাম। আমার যে কি উপায় হইবে বলিতে পারি না।" নিত্যানন্দ উত্তরে বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণ, আমি কি ব্রাহ্মণ নই? তোমার পরম ভাগ্য যে আমার ন্যায় ব্রাহ্মণ তোমাকে লইয়া ভোজন করিতেছে।" অদ্বৈত বলিলেন, "তুমি ত আপনাকে ব্রাহ্মণ বল, তাহা শুনিয়া থাকি, কিন্তু

তোমার উৎপত্তির ঠিকানা---আমরা তো কেহই জানি না। তা না হয় তুমি ব্রাহ্মণ হইলে, কিন্তু কুড়ি বৎসর পশ্চিমে ছিলে, বল দেখি তুমি কোথাকার অন্ন না খাইয়াছ?" নিত্যানন্দ বলিলেন, "ঠাকুর, তুমি অতি মহাজন ব্যক্তি, দ্বৈত মান না, নাম লইয়াছ অদ্বৈত। অর্থাৎ মনে ভাব শ্রীভগবান আর তুমি এক। আমরা শ্রীভগবানের দাস, তুমি কর্তব্যে নাস্তিক, আমাদের এখানে তুমি কেন? শান্তিপুর কি নবদ্বীপ হইলে এই কোন্দল ক্রমে বাড়িয়া চলিত। কিন্তু নীলাচলে পুরীবাসী বহুতর ভিন্ন লোক থাকেন, সেখানে কাজেই অল্পে অল্পে কোন্দলে থামিয়া গেল।

পরিবেশকগণ প্রভুকে উত্তম প্রসাদ দিতে আসিলেই প্রভু অমনি বলেন, "উহা ভক্তগণকে দাও, আমাকে সামান্য ব্যঞ্জন ব্যতীত আর কিছুই দিও না।" কাজেই ভয়ে কেহ প্রভুকে ভাল দ্রব্য দিতে পারেন না। কিন্তু জগদানন্দের প্রেমের নিকট প্রভু পরাস্ত। জগদানন্দ উত্তম দ্রব্য হস্তে লইয়া পংক্তির মধ্যপথ দিয়া দ্রুতগতিতে যাইতেছেন। হঠাৎ—যেন না জানিয়া, কি অন্য মনস্ক হইয়া,—প্রভুর পাতে দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু প্রভু উহা গ্রহণ করিলেন না, পাতের এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিলেন। এমন সময় দেখেন জগদানন্দ আবার আসিতেছেন, আসিয়া প্রভুর একটু দূরে দাঁড়াইয়া আড়-চোখে দেখিতেছেন যে, তাঁহার দত্ত দ্রব্য প্রভু গ্রহণ করিয়াছেন কি না। ইহা দেখিয়া প্রভুর মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল। প্রভু বেশ জানেন যে, যদি তিনি উহা গ্রহণ না করেন, তবে জগদানন্দ মুখে কিছু বলিবেন না বটে, তবে ঘরে কপাট দিয়া উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিবেন; তাই জগদানন্দের সেই উত্তম প্রসাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এইখানেই জগদানন্দের হাত হইতে যে প্রভু অব্যাহতি পাইলেন, তাহা নহে। এই যে পাঁচশত লোকের প্রসাদ আসিয়াছে, জগদানন্দ ইহার মধ্য হইতে সর্বাপেক্ষা উত্তম সামগ্রী প্রভুর নিমিত্ত অগ্রে বাছিয়া রাখিয়াছেন। প্রভু তাঁহার দত্ত একটি উত্তম দ্রব্য গ্রহণ করিলেন দেখিয়া জগদানন্দ আর একটি উত্তম দ্রব্য আনিতে দৌড়াইলেন, আর উহা আনিয়া ঐরূপে না বলিয়া কি কহিয়া, হঠাৎ প্রভুর পাতে দিলেন।

জগদানন্দের এই ভাব দেখিয়া, সার্বভৌম ও আর যাঁহারা প্রভুর নিকটে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা হাসিতেছেন। কিন্তু জগদানন্দের তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। এদিকে প্রভুর আর এক শত্রু জুটিয়া গেলেন। তিনি স্বরূপ দামোদর, প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর ও অতি মর্মী ভক্ত এবং তাঁহার শেষকালের প্রতি মুহূর্তের সুখ ও দুঃখের সাথী। তিনিও প্রভুর জন্য বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল সামগ্রী রাখিয়াছেন। তিনি জগদানন্দের পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া, হাতে উত্তম সামগ্রী লইয়া প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "প্রভু, অভয় দেন তো বলি। শ্রীজগন্নাথ এই অমৃত-কেলি সেবা করিয়াছেন। আপনি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন, তিনি কিরূপ আস্বাদ করিয়াছেন?" প্রভু স্বরূপের মুখ পানে চাহিলেন; দেখিলেন, উহা গ্রহণ না করিলে তিনি মনে বড় বেদনা পাইবেন; তাই হাসিয়া বলিলেন, "দাও, তবে আর না।" কিন্তু স্বরূপ আবার একটি দ্রব্য আনিয়া উপস্থিত। জগদানন্দ ও স্বরূপের এইরূপে প্রভুকে খাওয়াইবার যত্ন দেখিয়া সার্বভৌম প্রভৃতি অতিশয় মুগ্ধ হইতেছেন।

সার্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আসিয়া প্রভু ও ভট্টাচার্যের অগ্রে দাঁড়াইয়া সার্বভৌমকে বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য, ব্যাপার কি? তুমি এখানে কেন? তুমি বেদাচার-ধর্ম ত্যাগ করিয়া এ কি অকাজ করিতেছ?" আবার বলিতেছেন, "কি ছিলে কি হয়েছ, একবার বিচার কর; এ আনন্দের কি উপমা আছে?" সার্বভৌম গদ্‌গদ হইয়া গোপীনাথকে বলিতেছেন, (যথা চরিতামৃতে)—

"সার্বভৌম বলে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি। তোমার প্রসাদে আমার সম্পদ সিদ্ধি।।
মহাপ্রভু বিনে কেহ নাহি দয়াময়। কাকের গরুড় করে ঐছে কোন হয়।।

তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি। সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ-হরি।।
কাঁহা বহির্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গে। কাঁহা এই সখ্য-সুধা সমুদ্রতরঙ্গ।।"

এই কথা শুনিয়া প্রভু অতি গম্ভীর হইয়া সরলভাবে বলিলেন, "ভট্টাচার্য, তাহা নয়, পূর্বে তোমার সাধনা ছিল; সেই বলে তোমার বদনে কৃষ্ণনাম স্ফূর্তি হইয়াছে। আমারও তোমার পবিত্র সঙ্গে নাম রতি হইয়াছে।" প্রভুর এই উত্তর শুনিয়া সার্বভৌম হাসিতে লাগিলেন। তখন প্রভু পরিবেশকদিগের দ্বারা ভাল ভাল প্রসাদ আনাইয়া অতি স্নেহের সহিত সার্বভৌমকে খাওয়াইতে লাগিলেন। কোন্ ভক্ত কি ভালবাসেন, অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানেন। যথা চরিতামৃতে—

"তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লঞা। প্রসাদ দেন যেন কৃপা-অমৃত সিঞ্চিয়া।।"

মহাপ্রভু বলিতেছেন, 'খাও'। খাইতে বলিতেছেন কি না—মহাপ্রসাদ; দ্রব্য কি না—অতি উপাদেয় বস্তু, সুতরাং—"আকণ্ঠ পুরিয়া বৈষ্ণব করিল ভোজন।"

তাহার পর স্বর্গমর্তভেদী হরিধ্বনি করিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। তখন প্রভু ভক্তগণকে চন্দন ও মালা বন্টন করিয়া দিলেন। তাহার পর ভক্তগণ নিজ নিজ বাসায় আরাম করিতে চলিলেন। সকলের ভোজন শেষ হইলে সাতজন পরিবেশক ভোজন করিলেন। গোবিন্দ হরিদাসকে প্রসাদ দিয়া আপনি ভোজন করিলেন।

পর দিবস শ্রীজগন্নাথের নেত্রোৎসব। পঞ্চদশ দিবস অদর্শনের পর সেই দিবস তিনি জগজ্জনের নেত্র-গোচর হইবেন। শাস্ত্রের কথা এই যে, শ্রীজগন্নাথদেব স্নান করিয়া পঞ্চদশ দিবস নিভৃতে মহালক্ষ্মীর সহিত যাপন করেন। তাহার পরে তাঁহার অনুমতি লইয়া নীলাচল ত্যাগ করিয়া রথে চড়িয়া সুন্দরাচল গমন করেন। সেইখানে উপবনে সপ্তদিবস শ্রীরাধার সহিত বিহার করিয়া, আবার নীলাচলে প্রত্যাগমন করেন।

নেত্রোৎসব দিনে শ্রীজগন্নাথ নয়ন-গোচর হইলে প্রভু ভক্তগণ লইয়া মহাআনন্দে দর্শনে গমন করিলেন। প্রভু কিরূপ করিয়া দর্শন করেন, তাহার বর্ণনা যৎকিঞ্চিৎ স্থানান্তরে করিয়াছি। প্রভু যখন দর্শনে গমন করিলেন, তখন পুরী ও ভারতী গোসাঞী অগ্রে, স্বরূপ ও নিত্যানন্দ দুই পার্শ্বে, এবং পশ্চাতে ভক্তগণ ও গোবিন্দ; আর কাশীশ্বর মহাশক্তিধর বলিয়া, ভিড়ের মধ্যে দিয়া মহাপ্রভুর পথ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। একপক্ষ পরে শ্রীজগন্নাথদেবকে পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আনন্দে কিরূপ বিহ্বল হইলেন, তৎসম্বন্ধে প্রভু দর্শন করিতে করিতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ঠাকুর নরহরি—যিনি তখন প্রভুর নিকটে ছিলেন—একটি গীতে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই গীতটি দ্বারা প্রভুর মনের ভাব কতক প্রকাশ পাইবে, যথা—

"হেরি গোরা নীলাচল-নাথ। নিজ পারিষদগণ সাথ।।
বিভোর হইয়া গোপী-ভাবে। কহে কিছু করিয়া আক্ষেপ।।
'আমি তোমায় না দেখিলে মরি। পালটি না চাহ তুমি ফিরি?
ছলছল অরুণ নয়ন। বিরস আজ সরস বদন।।
বিভাবিত গোরা-ভাব হেরি। কহে কিছু দাশ নরহরি।।"

প্রভু, শ্রীজগন্নাথকে দেখিতেছেন যেন শ্যামসুন্দর। প্রভু যে বিগ্রহ দেখিতেছেন, তাঁহার সে জ্ঞান নাই। তাঁহার বোধ হইতেছে স্বয়ং শ্যামসুন্দর তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নিষ্ঠুরতা দেখিয়া প্রভুর রাগ হইয়াছে। কিন্তু প্রভু চন্দ্রাবলীর ন্যায় প্রগল্ভ স্বভাব নহে, রাধার ন্যায় ধীর স্বভাব। এই পঞ্চদশ দিবস শ্রীজগন্নাথ অদর্শন ছিলেন, সেই নিমিত্ত প্রভু তাঁহার উপর বড় রাগ করিয়াছেন; কিন্তু তবু তাঁহার মুখে কটু-বাক্য আসিতেছে না। তাই বলিতেছেন যে, "হে বন্ধু! এই কি তোমার ধর্ম? আমি তোমাকে না দেখিলে মরি,

অথচ তুমি আমাকে পালটি চাহ না।" এই যে প্রভু শ্রীজগন্নাথের মুখের দিকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, এই চিত্রটি, হে পাঠক, হৃদয়ে অঙ্কিত কর। প্রভু তখন রাধা ভাবে বিভোর। তিনি যে ভাবগুলি ব্যক্ত করিতেছেন, কেবল তাহাই নয়, তাঁহার কথাগুলি ও গলার স্বর পর্যন্ত স্ত্রীলোকের ন্যায়। কেহ হয়ত বলিতে পারেন, কোন্ যুগে কোন্ অবতারে কেহ কখনও শ্রীভগবানকে এইরূপ বলিয়াছেন, হে বন্ধু! তুমি আমার দিকে ফিরে চাও না, কিন্তু আমি তোমা লাগি মরি! এইরূপ যিনি বলিতে পারেন তিনি হয় শ্রীভগবান, না হয় শ্রীভগবান যে পুরুষ ও প্রকৃতি মিলিত, তাহার প্রকৃতি অংশ। মনে ভাবুন, একজন তাপস সহস্র বৎসর বনে তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার শরীর ক্লিষ্ট হইয়াছে, তাহার মস্তকে পিপীলিকার বাসা হইয়াছে। তাঁহার ভাল হইবে বলিয়া তিনি কষ্ট করিতেছেন। তিনি হয় উদ্ধার হইবেন, না হয় মহাশক্তি-সম্পন্ন হইবেন। আর একজন জপ-তপ উপবাস কিছু জানেন না, সংসারে বাস করেন, কিন্তু তিনি শ্রীভগবৎপ্রেমে পাগল হইয়াছেন, তাঁহাকে না দেখিলে প্রাণে মরেন। তিনি মান-ভরে অভিভূত হইয়া শ্রীভগবানকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন, "হে নিষ্ঠুর! তোমার শরীরে দয়া-মায়া নাই। আমি তোমা বিনে তিলার্ধ বাঁচি না অথচ তুমি আমার দিকে ফিরেও চাও না।" ইহার প্রথম জন মুনি, আর অপর জন গোপী। শ্রীভগবান কাহার কথা অগ্রে শুনিবেন? কাহার বশ হইবেন? গোপীর না মুনির? যদি শ্রীভগবানের কিঞ্চিন্মাত্র দয়া-মায়া থাকে তবে অবশ্য তিনি সেই ব্যক্তির বশীভূত হইবেন যিনি কিছু চাহেন না কেবল তাঁহার নিমিত্ত পাগল। শেষোক্ত বস্তুটি জীব হইলেও শ্রীভগবান তাঁহার নিকট বাধ্য। অতএব যদি তুমি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে ভগবান বলিয়া মানিতে না পার, তবে তাঁহাকে ভজনা করিতে তুমি আপত্তি করিতে পার না। যাঁহার শ্রীভগবানের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ যে, তিনি তাঁহাকে নিষ্ঠুর নির্মোহ বলিয়া গালি দিবার অধিকার ধরেন, তিনি অবশ্য তোমাকে উদ্ধার করিতে শক্তি ধরেন। এইরূপে প্রভু—

"মধ্যাহ্ন পর্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দর্শন। স্বেদ কম্প ঘর্ম অঙ্গে বহে অনুক্ষণ।।" তখন ভক্তগণ প্রভুকে সান্ত্বনা করিয়া বাসায় আনিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

"নীলাচলে জগন্নাথ রায়। গুণ্ডিচা মন্দিরে চলি যায়।।
অপরূপ রথের সাজনি। তাহে চড়ি যায় যদুমণি।।
দেখিয়া আমার গৌরহরি। নিজগণ লৈয়া এক করি।।
মাল্য-চন্দন সবে দিয়া। জগন্নাথ নিকটে যাইয়া।।
রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়। কীর্তন করয়ে গৌররায়।।
আজানুলম্বিত বাহু তুলি। ঘন উঠে হরি হরি বলি।।
গগন ভেদিল সেই ধ্বনি। অন্য আর কিছুই না শুনি।।
নিতাই অদ্বৈত হরিদাস। নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস।।
মুকুন্দ স্বরূপ রামরায়। মন বুঝি উচ্চৈঃস্বরে গায়।।
গোবিন্দ মাধব বাসুঘোষ। যার গানে অধিক সন্তোষ।।
বসু রামানন্দ নরহরি। গদাধর পণ্ডিতাদি করি।।
দ্বিজ হরিদাস বিষ্ণুদাস। ইহা সভার গানেতে উল্লাস।।
এই মত কীর্তন নর্তনে। কতদূর করিল গমনে।।
এই সভার পদরেণু আশ। করি কহে বৈষ্ণবের দাস।।"

পর দিবস রথযাত্রা। প্রভু সেই আনন্দে একেবারেই রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। রজনী থাকিতে আপনি উঠিলেন ও ভক্তগণকে উঠাইলেন। তাহার পর সকলে শীঘ্র শীঘ্র স্নানাদি ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া পাণ্ডুবিজয় দর্শন করিতে বাহির হইলেন। সকলে দেখেন রথে মহাসজ্জা হইয়াছে। অন্যান্য বারে রথে যে সজ্জা হইত, এবারে প্রভুর সন্তোষের নিমিত্ত, রাজার আজ্ঞায়, আরও অধিক সজ্জা দেওয়া হইয়াছে। বোধ হইতেছে, রথ যেন সুবর্ণ-মণ্ডিত। নানা বর্ণের বস্ত্র দ্বারা উহা সুশোভিত। নানা বর্ণের কত পতাকা উড়িতেছে, কত ঘণ্টা বাজিতেছে, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে মহাকলরবের সহিত বাদ্যধ্বনি হইতেছে। শ্রীজগন্নাথকে রথে আরোহণ করাইবার নিমিত্ত মহাবলিষ্ঠ সেবকগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। কেহ শ্রীপদ, কেহ কটি এইরূপে শ্রীবিগ্রহকে ধরিয়া, বাদ্যের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, শ্রীবিগ্রহ উঠাইতেছেন। মহাপ্রভু "মণিমা" "মণিমা" বলিয়া উচ্চধ্বনি করিতেছেন। এই আনন্দ কলরবের মধ্যে শ্রীজগন্নাথকে রথের উপর বসান হইল। রথের পথ সূক্ষ্ম ও শ্বেত বালুকা মণ্ডিত। পথের উত্তরে প্রায় উভয় পার্শ্বে ফুলের বাগান। রথ মধ্যস্থান দিয়া চলিল, দর্শকগণ রথের দুই পার্শ্বে সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন।

কোন মহান্ ব্যক্তি অশ্ব-শকটে গমনাগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ, কখন কখন সে অশ্বকে অব্যাহতি দিয়া আপনারাই উহা টানিয়া লইয়া যান। এই মহান্ ব্যক্তির অশ্ব ছিল, তাঁহার শকট চালাইবার নিমিত্ত কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তবু তিনি তাঁহার অনুগত ভক্তগণের তৃপ্তির নিমিত্ত, অশ্ব খুলিয়া দিতে আপত্তি করিলেন না। তাহারা যদিও কায়িক পরিশ্রম করিয়া তাঁহার শকট টানিতে লাগিল, তবুও উল্লিখিত কারণানুসারে তিনি তাহাদিগকে বাধা দিলেন না। সেইরূপ শ্রীজগন্নাথ নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে যাইতে পারিতেন। কিন্তু ভক্তগণের ইচ্ছা তাঁহাকে রথে উঠাইয়া টানিয়া লইয়া যাইবেন। এমত অবস্থায় শ্রীজগন্নাথের ন্যায় মহান্ বস্তু কি আপত্তি করিতে পারেন? শ্রীভগবানের নিজস্ব কি কি খেলা আছে তাহা জানি না। কিন্তু যদি মনুষ্যের সহিত তাঁহার খেলা করিতে হয়, তবে তাঁহার মনুষ্যের ন্যায় হইতে হইবে, নতুবা খেলা হইবে না। তিনি যদি কেবল তেজ হইয়া ওতপ্রোতভাবে জগৎ ব্যাপিয়া থাকেন, তবে আর মনুষ্য তাঁহার সহিত খেলা খেলিতে পারে না। তাই মনুষ্য যে শ্রীভগবানকে রথের উপর বসাইয়া টানিয়া লইয়া যায়, ইহাতে যেমন ভক্ত মুগ্ধ হয়েন, সেইরূপ শ্রীভগবানও তাঁহার প্রতি তাঁহার জীবের প্রীতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন। রথ চলিবার পূর্বে সেই ধীশক্তিসম্পন্ন রাজাধিরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র হস্তে সুবর্ণের মার্জনী লইয়া পথ পরিষ্কার করিতে আর উহাতে চন্দন-জলের ছিটা দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু রাজার এইরূপ তুচ্ছ-সেবা দেখিয়া তাঁহার প্রতি মনে মনে কৃপার্দ্র হইলেন। প্রভুর বলে বলিয়ান গৌড়ীয়গণ, উৎকলবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া রথের রজ্জু ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। বাদ্যের শব্দে কর্ণ বধির হইতেছে, আর আনন্দে উন্মত্ত হইয়া রথের সঙ্গে সকলে চলিতেছেন। তখন মহাপ্রভু নিজগণকে একত্র করিয়া সকলকে মাল্য ও চন্দন দানে শক্তিসম্পন্ন করিলেন; তাহার পর তাহাদিগকে লইয়া প্রথমে চারিটি কীর্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম সম্প্রদায়ের প্রধান অবশ্য স্বরূপ দামোদর, আর দামোদর পণ্ডিত, রাঘব, গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দানন্দ ও নারায়ণ—এই পঞ্চজন তাঁহার দোহার। ইহারা ছয় জন গীত গাইবেন আর দুইজন মৃদঙ্গ বাজাইবেন। এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। এইরূপে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সর্বসমেত নয়জন করিয়া রহিলেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান শ্রীবাস; তাঁহার দোহার ছোট হরিদাস, গঙ্গাদাস, শুভানন্দ, শ্রীমান পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিত। ইহতেও দুইটি মৃদঙ্গ। এই সম্প্রদায়ে নৃত্যকারী স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ। তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান মুকুন্দ,

এবং দোহার মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ বাসুদেব দত্ত, মুরারি, শ্রীকান্ত, বল্লভ সেন ও গোপীনাথ। এই সম্প্রদায়ে গোপীনাথ ব্যতীত সকলেই বৈদ্য। ইহার নৃত্যকারী বড় হরিদাস। চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রধান বাসুঘোষের দাদা গোবিন্দ ঘোষ। আর দোহার বাসু ও মাধব দুই ভাই, অন্য হরিদাস, বিষ্ণুদাস ও অন্য রাঘব। ইহার নৃত্যকারী বক্রেশ্বর। ইহা ব্যতীত আরও তিন সম্প্রদায় পূর্ব হইতে প্রস্তুত ছিলেন—যথা কুলীনগ্রামের, শ্রীখণ্ডের ও শান্তিপুরের। কুলীনগ্রামের প্রধান রামানন্দ বসু, শান্তিপুরের প্রধান অদ্বৈতপ্রভুর জ্যেষ্ঠ-তনয় অচ্যুতানন্দ, আর শ্রীখণ্ডের প্রধান নরহরি সরকার ঠাকুর। এই সাত সম্প্রদায়ের চারি সম্প্রদায় রথের অগ্রে, দুই সম্প্রদায় দুই পার্শ্বে আর এক সম্প্রদায় পশ্চাতে চলিলেন। এইরূপে চৌদ্দ-মাদল বাজিয়া উঠিল, বেয়াল্লিশ জন গীত গাইতে লাগিলেন ও সাত জন সাত ঠাঁই নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

কীর্তন আরম্ভমাত্রই সকলে আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বাদ্য থামিয়া গেল। রথাগ্রে কীর্তন পদ্ধতির সৃষ্টি এই প্রথমে আমার প্রভু করিলেন। তিনিই এই সাত সম্প্রদায়ের কর্তা। তাঁহাকে এই সকল সম্প্রদায়ে থাকিয়া জীবন দিতে হইবে। কারণ প্রভুকে না দেখিলে কেহই নাচিতে কি গাহিতে পারেন না। অথচ সর্বাগ্রে ও সর্বশেষের সম্প্রদায় মধ্যে বহু ব্যবধান। এই সাত স্থানে প্রভু একেবারে কিরূপে থাকেন? অথচ তাঁহার না থাকিলেও নয়। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

"সাত ঠাঁই বুলে প্রভু হরি হরি বলি। জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি।"

ফল কথা, এই সাত সম্প্রদায়েরই ভক্তগণ দেখিতেছেন যে, প্রভু তাঁহাদের মধ্যে আছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় ভাবিতেছেন যে, তাঁহাদের প্রতি প্রভুর বড় টান, তাই অন্য সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের সম্প্রদায়ে প্রভু আছেন। প্রভু কি সত্য সত্যই একেবারে সাত ঠাঁই বিরাজ করিতেছিলেন? যথা চরিতামৃতে—

"আর এক শক্তি প্রভু করিলা প্রকাশ। এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস।।
সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়। অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমার মায়ায়।।"

এই যে রথখানি চলিতেছে, ইহা রাজা প্রতাপরুদ্রের। তিনি সেইখানকার সকলের কর্তা, কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কাহারও তাঁহার প্রতি লক্ষ্য নাই; সকলেরই দৃষ্টি প্রভুর দিকে। ইহাতে রাজার ঈর্ষা নাই। তিনি নিজে আত্মহারা হইয়া প্রভুকে দর্শন করিতেছেন। এই প্রথম তিনি স্পষ্টরূপে প্রভুকে দর্শন করিলেন। ইহার পূর্বে যখন তিনি প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন, সে হয় দূর হইতে, কিম্বা কতক অন্ধকারের মধ্যে। প্রভুকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার ভক্তি দেখিয়া রাজা প্রেমে অচেতনবৎ হইলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে তাঁহার নীচসেবা দেখিয়া প্রভু তাঁহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়াছেন। এখন প্রভু রাজাকে তাঁহার পুরস্কার দিতেছেন। রাজা দেখিতেছেন যে, শ্রীজগন্নাথ রথ স্থগিত করিয়া প্রভুর কীর্তন শুনিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার জ্ঞান হইল যে, রথের উপরে যিনি বসিয়া আছেন, তিনি আর প্রভু এক বস্তু। কারণ তিনি দেখিলেন রথে জগন্নাথের স্থানে প্রভু বসিয়া আছেন।

"প্রতাপরুদ্র হইল পরম বিস্ময়। দেখিতে বিবশ রাজা হৈল প্রেমময়।।
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রসন্ন প্রভুর মন। সে প্রসাদে পাইল এই রহস্য দর্শন।।"

রাজা ক্রমেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেছেন, ক্রমেই প্রভু কর্তৃক আকৃষ্ট হইতেছেন। প্রভু এইরূপে খঞ্জন পক্ষীর ন্যায়, সম্প্রদায়-সম্প্রদায় বিচরণ করিতেছেন, কিম্বা তাঁহার অনুভবনীয় শক্তির দ্বারা সকল সম্প্রদায়ে এক সময় বিরাজ করিতেছেন। কখন বা প্রভু আপনি কোন দলে মিশিয়া গীত গাইতেছেন। কখন ভাবে মুগ্ধ হইতেছেন, কিন্তু সময় বুঝিয়া আপনাকে এ পর্যন্ত দিব্য সচেতন রাখিয়াছেন ও ভাব সম্বরণ করিতেছেন। এইরূপে খানিক নৃত্যের পরে প্রভু স্বয়ং নৃত্য করিবেন ইচ্ছা করিলেন। তখন সাত সম্প্রদায় একত্র করিয়া তাহার

মধ্য হইতে—শ্রীবাস, মুকুন্দ, হরিদাস, মাধব, গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ দত্ত, রামাই, রাঘব ও গোবিন্দানন্দ—এই নয়জন প্রধান প্রধান গায়ক বাছিয়া লইলেন। ইহাদের কর্তা হইলেন স্বরূপ। ইহাদিগের গীত আরম্ভ হইলে প্রভু নৃত্যের উদ্যোগ করিলেন। তিনি কিরূপে নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তাহা মুরারি গুপ্ত স্বচক্ষে দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভু প্রথমে শ্রীজগন্নাথকে দণ্ডবৎ করিলেন; তৎপরে তাঁহার দিকে চাহিয়া জোড়-হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃত--

"নমো ব্রহ্মাণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।"

প্রভু ভঙ্গ-স্বরে এক একটি শ্লোক পাঠ করিতেছেন, আর আপনাকে সম্বরণ করিবার নিমিত্ত ক্ষণেক চুপ করিতেছেন। উপরের শ্লোকটি পাড়িয়া তৎপরে প্রভু একে একে উচ্চৈঃস্বরে এই শ্লোকগুলি পাঠ করিলেন, যথা—

জয়তি জয়তি দেবো দেবকী নন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গ
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ।। ২।।
জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত শ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্।। ৩।।
নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রদ্যোন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
গোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়োর্দাস দাসানুদাসঃ।। চৈতন্যচরিতকাব্য।।

প্রভু যখন তাঁহার পদ্মনেত্র শ্রীজগন্নাথের মুখপদ্মে অর্পণ করিলেন, তখন বোধ হইল প্রভুর সমুদয় প্রাণ তাঁহার নয়নে আসিয়াছে। প্রভু শ্রীজগন্নাথের মুখপানে নিমিষহারা হইয়া চাহিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিবামাত্র, তাঁহার আয়তনেত্র দিয়া জলের ধারা পড়িতে লাগিল। প্রভু গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনের সময় যে লীলা করেন, এখন তাহাই করিতে লাগিলেন। দর্শকগণ দেখিতেছেন, নয়নবারি বদন বহিয়া হৃদয়ে আসিতেছে। সেই ধারা আসিয়া ত্রিধারা হইয়া মৃত্তিকায় পড়িতেছে। প্রভুর এই অমানুষিক নয়ন-ধারা কবিকর্ণপুর তাঁহার কাব্যে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

উন্মীল্য প্রথমং পরিপ্লবয়তা পক্ষ্মাণি ভূয়ঃ ক্ষণাৎ
শ্রীমগ্দণ্ডতটীষু দীর্ঘময়তা ধারাভিরুচ্চৈস্ততঃ।
প্রাপ্যোরঃ পদবীং ত্রিধা প্রসরতা ভূমৌ ত্রুটন্মৌক্তিক
শ্রেণীবৎ ক্রিয়তাং সদৈব জগতাং হর্ষঃ প্রভোরশ্রুণা।। ২২

অর্থাৎ—"যে জল প্রথমে উৎপন্ন হইয়াই নেত্র-পদ্ম অভিষিক্ত করিতেছে, এবং ক্ষণকাল মধ্যেই পুনর্বার সুশোভিত গণ্ডস্থলে সুদীর্ঘধারে বহমান হইতেছে, তৎপরে যে সুবিশাল বক্ষঃস্থল পাইয়া তথা হইতে তিন ধারায় ভূতলে পতিত হইতেছে, প্রভুর সেই নেত্রপতিত জল ছিন্নসূত্র-মুক্তাহারের ন্যায় সর্বদা জগন্মণ্ডলে হর্ষবিধান করুক।"

গ্রন্থকার এখানে কর্ণপুরকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, "তথাস্তু!" এই যে ধারা, ইহা সমুদয় নয়ন জুড়িয়া আসিতেছে। প্রভু স্তব পাঠ সমাপ্ত করিয়া হুঙ্কার করিলেন, তৎপরে

নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর পাক দিয়া নৃত্য করিবার কালে, পূর্বে যে নয়ন-জল মৃত্তিকায় পড়িতেছিল, উহা এখন চতুর্দিকের লোককে স্নান করাইতে লাগিল। প্রভু কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছেন। প্রভুর নৃত্যে যেন ভূমিকম্প হইতে লাগিল।

"নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল। সসাগর-শৈল মহী করে টলমল।।"

প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্য দেখিয়া ভক্তগণের প্রাণ শুকাইয়া গেল। কারণ উদ্দণ্ড-নৃত্যের সময় প্রভু আছাড় খাইলে বোধ হইত যে, তাঁহার সমুদয় অস্থি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাজেই শ্রীনিতাই, শ্রীঅদ্বৈত, স্বরূপ তাঁহার পশ্চাতে বাহু পসারিয়া, তাঁহার সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও তাঁহারা তিনজনে প্রভুকে সামলাইতে পারিতেছেন না। প্রভু তবু মধ্যে মধ্যে আলগোছে এমন আছাড় খাইতেছেন যে, ভক্তগণ ত্রাসে হাহাকার করিয়া নয়ন মুদিতেছেন। প্রভু আছাড় খাইলেই অমনি ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতেছেন এবং দেখিতেছেন, প্রভু জীবিত আছেন কি না, এবং সমুদায় অস্থি ভঙ্গ হইয়াছে কি না। কখন ধরিতে না ধরিতে প্রভু উঠিয়া আবার নাচিতে লাগিলেন। কখন বা ঘোর অচেতনে উঠিলেন না, তখন সকলে তাঁহাকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। যদি দেখিলেন, নিশ্বাস বহিতেছে তবে কতক নিশ্চিন্ত হইয়া বায়ুজীবন প্রভৃতি দ্বারা সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যদি দেখেন নিশ্বাস বন্ধ, বুক দুরদুর করিতেছে না, তখন আতঙ্কে সকলে মহাব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহাদের সর্বদা ভয়, কখন তাঁহাদের প্রাণাধিক প্রিয়তম ফাঁকি দিয়া চলিয়া যান। প্রভুর সে অবস্থা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হয়। প্রভু পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন করিয়া সেই তপ্ত-বালুকার উপর পড়িয়া আছেন, জীবনের চিহ্নমাত্র নাই, মুখ বাহিয়া ফেন পড়িতেছে। তবে প্রভুর মুখশ্রী ও শ্রীঅঙ্গের তেজ তখন যেন আরও বৃদ্ধি পাইত। ভক্তগণ চারিপার্শ্বে বসিয়া সন্তর্পণ করিতেছেন। স্বরূপ নিজের জানুর উপর প্রভুর মস্তক উঠাইয়া রাখিলেন। নিত্যানন্দ বায়ু-জীবন, অদ্বৈত গগনভেদী হুঙ্কার ও হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে এবং কেহ বা সজোরে মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন। উপস্থিত অপর সকলেই চুপ করিয়া লোকেরা আছেন। পশ্চাতের সম্মুখের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, প্রভু চেতন পাইয়াছেন কি না। এই দুর্ভাবনার মধ্যে প্রভু হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন ও আবার নৃত্য করিতে লাগিলেন। আর অমনি লক্ষ লক্ষ লোক আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর। যখন তিনি কাণ্ডারি হইয়া গোপীদের পার করিতেছিলেন, তখন মাঝ-যমুনায় আসিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিলেন এবং এইরূপে গোপীদের ভয় দিয়া আমোদ দেখিতে লাগিলেন। ভয় পাইলেই লোকে আশ্রয়দাতার নিকটে যাইয়া থাকে। গোপীরাও ভয় পাইয়া ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে লাগিলেন। এইরূপে কি প্রভু আছাড় খাইয়া পড়িয়া, দুইদণ্ড পর্যন্ত অচেতন, এমন কি মৃত অবস্থায় থাকিয়া ভক্তগণকে ভয় দিয়া আমোদ চেখিতেন? একটি ঘটনা স্মরণ হওয়ায় একথা বলিতেছি। প্রভু নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় রথ আসিতেছে। সেই সময় প্রভু ঐ রথের সম্মুখে হঠাৎ ঘোর মূর্ছায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমন কি, রথ প্রভুর শ্রীঅঙ্গের উপর আসিবার উপক্রম হইল। অমনি একজন ভক্ত ভয় পাইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া রথের সম্মুখ হইতে একপার্শ্বে আনিলেন। প্রভু যেরূপ অচেতন, ছিলেন, সেইরূপ রহিলেন। যথা চৈতন্যচরিত কাব্যে—

"তৈরেতেঃ করপল্লবৈ নিজ নিজ ক্রোড়েষু কৃত্বা কিয়-
দ্দূরে স্বৈরমুপাসিতো বিজয়েতে শ্রীগৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ।"

ইহা দেখিয়া ভক্তগণ ও রাজা ভয় পাইলেন। বিশেষতঃ উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু যে কখন কোথা যাইতেছেন তাহার ঠিকানা নাই। আবার লক্ষ লক্ষ লোকে প্রভুর নৃত্য দর্শন করিবার নিমিত্ত সম্মুখে ঝুঁকিতেছেন। এমন কি, ভক্তগণকে ঠেলিয়া প্রভুর গায়ে পর্যন্ত পড়িতেছে।

তখন সকলে যুক্তি করিয়া মণ্ডলী বাঁধিয়া প্রভুকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথম মণ্ডলে নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীস্বরূপ; প্রভু মধ্যস্থানে! দ্বিতীয় মণ্ডলে আছেন প্রভুর ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা প্রভূত বলশালী ও নিতান্ত নিজজন, যথা কাশীশ্বর, গোবিন্দ, শ্রীবাস ইত্যাদি। আবার তৃতীয় মণ্ডলে স্বয়ং মহারাজা। তিনি তাঁহাব পাত্র মিত্র ও যোদ্ধাগণ লইয়া বাহিরে এক মণ্ডলী করিয়া প্রভুকে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু রাজার সম্মুখে শ্রীবাস দাঁড়াইয়া আছেন বলিয়া তিনি ভাল করিয়া প্রভুকে দেখিতে পাইতেছেন না। প্রভুর কি কাণ্ড, তখন রাজা প্রজা সব মিশিয়া গিয়াছে; আর রাজা যে সেখানে দাঁড়াইয়া, তাহা অল্প লোকেই লক্ষ্য করিতেছে। রাজার দক্ষিণে তাঁহার প্রধান অমাত্য হরিচন্দন দাঁড়াইয়া। তাঁহার স্কন্দে হস্ত রাখিয়া রাজা প্রভুকে ভাল কবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু শ্রীবাস, একটু স্থূলকায় বলিয়া তাহা পাইতেছেন না; কাজেই একবার বামে, একবার দক্ষিণে, মস্তক হেলাইতেছেন। রাজার এই দশা দেখিয়া হরিচন্দনের রহস্য হইতেছে। শেষে তিনি শ্রীবাসকে একপার্শ্বে সরাইয়া দিবার জন্য ঠেলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস তখন ভাবে বিভোর। রাজা ও রাজমন্ত্রী যে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, আর মন্ত্রী যে, রাজার প্রভু দৃশ্য সুলভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ঠেলিতেছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। বারম্বার ঠেলিতে থাকায়, শ্রীবাস বিরক্ত হইয়া, কে ঠেলিতেছে তাহা না দেখিয়া, হরিচন্দনের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন। হরিচন্দন রাজনীতি লইয়া থাকেন। তিনি রাজা ব্যতীত আর কাহাকেও চিনেন না ও রাজনীতি ব্যতীত আর কিছুই বুঝেন না। সম্মুখে এক দরিদ্র বিদেশী ব্রাহ্মণের চপেটাঘাত দ্বারা অপমানিত হইয়া, ক্রোধভরে শ্রীবাসকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু রাজা তখন পূর্বরাগ-রসে বিভাবিত। তাঁহার নিকট শ্রীগৌবাঙ্গপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ কি কোন বস্তু, মধু বলিয়া বোধ হইতেছে। কাজেই হরিচন্দনের ক্রোধ দেখিয়া, রাজা ব্যস্ত হইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "তুমি কর কি? দেখিতেছ না উনি প্রভুর ভক্তগণ! উহার শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়াছ, তুমি অতি ভাগ্যবান। আমি পাইলে আপনাকে অতিশয় ভাগ্যবান ভাবিতাম।" হরিচন্দন কাজেই নিরস্ত হইলেন। যাঁহারা রাজার চরিত্র দেখিলেন ও বুঝিলেন, তাঁহাকে তাঁহারা সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। অবশ্য শ্রীবাস একটু লজ্জা পাইলেন।

সকলে শুনিয়াছেন যে শ্রীশচীর উদরে শ্রীনবদ্বীপনগরে শ্রীনন্দের নন্দন জন্মগ্রহণ করেন, এখন তিনি সন্ন্যাসীরূপে নীলাচলে বাস করিতেছেন। অতি ভাগ্যবান্ ব্যক্তি দূর হইতে তাঁহার দর্শন পাইয়া থাকেন। অদ্য তিনি সর্ব-নয়ন-গোচর হই' ছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-তরঙ্গের নৃত্য যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই অনুভব করিতে পারিবেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য ভুবন কেন মোহিত করিত। সেই নবীন গৌর-তনু অদ্য দিবা ভাগে, সর্ব সমক্ষে নৃত্য করিতেছেন। এই নৃত্যই অতি কঠিন জীবের পক্ষে যথেষ্ট; কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিগণ ইহার সঙ্গে আরো নানা অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতেছেন! যথা চরিতামৃত—

"উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর বিকার। অষ্টসাত্ত্বিক ভাব উদয় সমকাল।।
মাংস-ব্রণ সম রোমবৃন্দ পুলকিত। শিমূলের বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত।।
এক এক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়। লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়।।
সর্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদগম। 'জজ জজ' 'জজ গগ গগ' গদ্‌গদ বচন।।
জলযন্ত্র-ধারা যৈছে বহে অশ্রুজল। আশে পাশে লোক যত ভিজিল সকল।।
দেহ-কান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ। কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা-পুষ্পসম।।

এই সমস্ত অদ্ভুত দর্শনে যাঁহারা দ্রবীভূত না হয়েন, অলৌকিক দর্শনেই যেন তাঁহারাও মুগ্ধ হইতেছেন। মাঝে মাঝে প্রভু, রায়ুভরে কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত দুই শ্রীকর জুড়িয়া শ্রীজগন্নাথকে প্রণাম করিতে যাইতেছেন। কিন্তু বড় কাঁপিতেছেন বলিয়া, স্থির হইয়া প্রণাম

করিতে পারিতেছেন না। যুগ্ম বৃদ্ধাঙ্গুলি বারম্বার কপালে লাগিতেছে। আবার প্রভু কখন কখন মহামল্লের ন্যায় দৃঢ়রূপে বামপদ অগ্রে স্থাপিত করিয়া শ্রীজগন্নাথ পানে চাহিয়া তাল ঠুকিতেছেন। ইহাতে তুমুল শব্দ হইতেছে ও প্রভুর বাম বাহু রক্তবর্ণ হইতেছে। তখন তাঁহার ভক্ত-ভাব। তিনি শ্রীজগন্নাথের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "আর আমার ভয় কি, আমি তোমার বলে বলীয়ান"। আর ত্রিতাপকে, অর্থাৎ ভয়ের যত কিছু, তাল ঠুকিয়া আরোপ টঙ্কারে তুচ্ছ করিতেছেন। মনে ভাবুন, অতি বলশালী কোন লোক জানু পাতিয়া একটি প্রকাণ্ড শৃঙ্গী মেষকে তাল ঠুকিয়া আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, "আয় দেখি, তোর কত শক্তি।" প্রভুও সেই ভাবে ভাবিত হইয়া তাল ঠুকিতেছেন। কখন মুখে 'জয় জগন্নাথ' বলিতে যাইতেছেন। কিন্তু একে জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ সমুদয় অবাধ্য হইয়ছে, আরও মহাকম্পে দন্তে দন্তে আঘাত লাগিতেছে; কাজেই জয় বলিতে জজ বলিতেছেন, জগন্নাথ বলিতে বলিতে জগ গগ করিতেছেন, আর ভাবোল্লাসে ভক্তির দ্বারা অভিভূত হইতেছেন। যখন মৃত্তিকায় পড়িয়া প্রভুর শ্বাস রহিত হইতেছে, তখন সকলে ক্রন্দন করিতেছেন। আবার যখন প্রভু নৃত্য করিতেছেন, তখন সেই অসংখ্য লোকের হৃদয় নাচিতেছে; এবং তখন সেই লক্ষ লক্ষ লোক প্রেমতরঙ্গে পড়িয়া কি একটা হইয়া যাইতেছেন। আর, কি রাজা, কি প্রজা, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, সকলেই আত্মহারা হইয়া যাহার যেরূপ প্রকৃতি তিনি সেইরূপ বিভাবিত হইতেছেন। ফলকথা, প্রভু তখন এই লক্ষ চিত্তকে বশীভূত করিয়া সম্পূর্ণ রূপে করায়ত্তে আনিয়াছেন।

প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য ভক্তের নিমিত্ত, আর মধুর নৃত্য প্রেমিকের নিমিত্ত। প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে ভক্তি উদ্রেক করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা ব্রজের নিগূঢ়-রসের অধিকারী, তাঁহারা সে নৃত্য দেখিয়া দুঃখ ও ভয় পাইতেছেন। প্রভু মুহুর্মুহুঃ পড়িতেছেন; আর শ্রীনিতাই, শ্রীঅদ্বৈত ও স্বরূপ,—ইহাদের মধ্যে যিনি দেখিতেছেন তিনি ধরিতেছেন ও ভক্তগণ সন্তর্পণ করিতেছেন। প্রভু নৃত্য করিতে করিতে রাজার নিকট আসিলেন, আসিয়া এরূপে পড়িয়া গেলেন। তখন রাজা স্বভাবতঃ হাহাকার করিয়া তাঁহাকে ধরিলেন, ধরিয়া উঠাইতে গেলেন। তখন, প্রভুকে স্পর্শ করিবার সাহস স্বরূপ ও নিতাই ব্যতীত আর কাহারও হইত না। শ্রীঅদ্বৈত পর্যন্তও প্রভুকে স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। রাজা যে প্রভুকে ধরিতে গেলেন, এ যে তিনি রাজা সেই স্পর্ধার বলে তাহা নয়, ইহা কেবল অভ্যাসবশতঃ। তাঁহার পদের নিমিত্ত চিরদিন তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতি; কোন কার্য করিতে কাহারও অনুমতি লওয়ার শিক্ষা তিনি কখনও পান নাই। যে প্রভুকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন, সেই প্রভু তাঁহার সম্মুখে অতি নির্ঘাৎ আছাড় খাইলেন, কাজেই তিনি যাইয়া প্রভুকে ধরিলেন। কিন্তু প্রভুর কার্য একবারে উদ্দেশ্য শূন্য ছিল না। সামান্য জীবের ন্যায় তাঁহার কার্যের ভুল হইত না। তিনি মূর্ছিত অবস্থায়ও কোন অকাজ করিতেন না। প্রভু ঘোর মূর্ছায় অভিভূত হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন; তাঁহার হঠাৎ চেতন পাইবার কথা নয়। কিন্তু রাজা যেই প্রভুকে স্পর্শ করিলেন, অমনি তিনি চেতন পাইলেন, পাইয়া বলিলেন, "ছিঃ। একি হইল? আমার বিষয়ীর স্পর্শ হইল?" ইহাই বলিয়া, রাজার হস্ত হইতে যেন অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত, অন্যত্র গমন করিয়া আবার নৃত্য করিতে লাগিলেন। রাজা এইরূপে লক্ষ লক্ষ লোকের ও তাঁহার পাত্র মিত্র ও সৈন্য সামন্তের মাঝে তাঁহার নিজ স্থানে, নিরপরাধে, প্রভু কর্তৃক অপমানিত হইলেন। রাজার যদি কিঞ্চিন্মাত্রও অভিমান থাকিত, তবে তিনি ক্রোধ করিয়া প্রভুকে সেইস্থানেই উপেক্ষা করিতেন। প্রভুর প্রতি তাঁহার যে ভক্তি, তাহার মধ্যে যদি মলিনতা থাকিত, তবে তিনি এত অপমান সহ্য করিতে পারিতেন না। শুনিতে পাই, যাহাকে শ্রীভগবান্ কৃপা করিবেন তাহাকে এইরূপেই পরীক্ষা করিয়া থাকেন। একদিন

শ্রীমতী রাধিকাও এইরূপে উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। রাজা তখন শ্রীভগবানের কৃপা পাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন। তাই প্রভু কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়াও আপনাকে অপমানিত বোধ করিলেন না। প্রভু যে স্বয়ং শ্রীভগবান্, এ বিশ্বাস তখন তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে। একটু পূর্বে তিনি স্বচক্ষে তাঁহার প্রমাণও পাইয়াছেন। প্রভুর রূপে-গুণে মোহিত হইয়া, নিজের যতখানি প্রাণ, সমুদায় তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন। কাজেই প্রভু কর্তৃক অপমানিত হইয়াও ক্রুদ্ধ না হইয়া, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা লইয়া শ্রীমতী যেরূপে উপেক্ষিত হইয়া সখীদিগের শরণাগত হইয়াছিলেন, সেইরূপে তিনি কাশী মিশ্র, সার্বভৌম ও রামনন্দের নিকট রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, "হে সুহৃদগণ! আমার ভাগ্যে কি প্রভুর কৃপালাভ হইবে না? তবে আর আমার বাঁচিয়া কি ফল?" তখন সকলে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। সার্বভৌম বলিলেন, "তোমার প্রতি প্রভুর সম্পূর্ণ কৃপা। তাহা না হইলে, তিনি যে স্বয়ং জগন্নাথ, ইহা একটু পূর্বে এই লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে, অন্যকে গোপন করিয়া তোমাকে জানাইতেন না। পূর্ণ কৃপা ব্যতীত ইহা হয় না। তিনি ধর্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন তিনি বিধি উপেক্ষা করিলে জীব উহা মানিবে না। সন্ন্যাসীর রাজস্পর্শ ত দূরের কথা, দর্শন পর্যন্তও নিষেধ। এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে তুমি তাহাকে স্পর্শ করিলে, তিনি সেখানে তোমাকে উপেক্ষা করিতে বাধ্য। কিন্তু তুমি তাই বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িও না। তুমি উপেক্ষিত হইয়াছ বলিয়া প্রভুর কথা উপেক্ষা না করিয়া, আবার তাঁহার চরণে শরণ লও, লইয়া জগজ্জনকে দেখাও যে, যদিও তুমি রাজা, কিন্তু তবু তুমি ভক্ত, প্রভুর কৃপা পাইবার নিতান্ত উপযুক্ত। এইরূপে তুমি, তোমাকে প্রভুর কৃপা করিতে যে বাধা আছে, তাহা অন্তর্হিত কর। তবে প্রভু তোমার নিকট ঋণী হইবেন। রাজা সখাগণের এই অপরূপ সান্ত্বনাবাক্যে, এবং একটু পূর্বে প্রভু অন্তরীক্ষে যে তাঁহার গোচরে হইয়াছেন, ইহা মনে করিয়া কথঞ্চিৎ স্থির হইলেন, এবং আবার প্রভুর নৃত্যে মন-সংযোগ করিলেন। প্রভু রাজার হাত ছাড়াইয়া আবার নৃত্য আরম্ভ করিলেন, কিন্তু এবার আর উদ্দণ্ড নৃত্য নয়, ব্রজগোপী নৃত্য। ফল কথা, প্রভুর মনের ভাব তখন অন্যরূপ হইয়াছে। পূর্বে তিনি ভক্ত ভাবে নৃত্য করিতেছিলেন, এখন গোপীভাবে আভিভূত হইয়া কি কি করিলেন তাহা বলিতেছি। প্রথমে এই ভাব পরিবর্তনের তাৎপর্য বলিব। প্রভুর তখন মনের ভাব এই যে, তিনি শ্রীমতী রাধা, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের ওখানে তাঁহার সহিত মিলিতে আসিয়াছেন। প্রথমে দেখেন যে, তাঁহার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ পরম ঐশ্বর্যশালী; তিনি হাতী, ঘোড়া ও সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছেন। আরও দেখেন, তাঁহার বন্ধু রাজবেশ ধরিয়া হাতে দণ্ড লইয়াছেন। বন্ধুর ভিন্ন-বেশ ও ভিন্ন-সঙ্গ দেখিয়া ব্যথিত হইলেন এবং ভাবিলেন শ্রীকৃষ্ণকে বলিবেন, "তুমি এ বহিরঙ্গ লোকসমূহের মাঝে কেন? শ্রীবৃন্দাবনে চল, সেখানে আমরা দুইজনে থাকিব!"

কিন্তু এ সংবাদ শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে অবগত করান? তিনি যে অতি দূরে রথের উপরে আছেন। নিরুপায় হইয়া সেখানে বসিলেন, এবং নখদ্বারা মৃত্তিকায় ত্রিভঙ্গ আকৃতি লিখিলেন। সেই হইল তাঁহার কৃষ্ণ। সেই মূর্তির নীচে নখ-দ্বারা মনের ভাব লিখিতে গেলেন। কিন্তু লিখিবার পূর্বেই নয়ন জলে সেই ত্রিভঙ্গাকৃতি ধুইয়া গেল। এইরূপে পুনঃপুনঃ চিত্র আঁকিতেছেন ও লিখিতেছেন। ইহাতে প্রভুর নখে আঘাত লাগিতেছে দেখিয়া স্বরূপ ব্যথিত হইতেছেন। তাই প্রভু যখনই লিখিতে যাইতেছেন, তখনই স্বরূপ ব্যগ্র হইয়া নিজ হস্ত পাতিয়া দিতেছেন যেন প্রভু মৃত্তিকায় নখ দ্বারা আঁচড় দিতে না পারেন। প্রভু বেগতিক দেখিয়া অন্য স্থানে চিত্র লিখিতে যাইতেছেন, স্বরূপও হাত সরাইয়া প্রভুর নখের নীচে রাখিতেছেন। কিন্তু স্বরূপের অধিকক্ষণ পরিশ্রম করিতে হইল না, যেহেতু ইতিমধ্যে প্রভুর মনে এইভাব হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ রথে চড়িয়া বৃন্দাবনে যাইতেছেন, আর তিনি (রাধা)

সখীগণের সহিত তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন। প্রভু এই ভাবে বিভোর হইয়া আহ্লাদে একেবারে গলিয়া পড়িলেন, কাজেই তাঁহার নৃত্য আপনা আপনি মধুর হইল। স্বরূপও অমনি বুঝিলেন যে, প্রভুর মনের ভাব পরিবর্তিত হইয়াছে, যথা চরিতামৃতে—

"স্বরূপ গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন। প্রভুতে আবিষ্ট যার কায় বাক্য মন।।
স্বরূপের ইন্দ্রিয় প্রভু নিজ ইন্দ্রিয়গণ। আবিষ্ট করিয়া করে গান আস্বাদন।।"

স্বরূপ অমনি এই পদ ধরিলেন; যথা—

"সেইত পরাণ নাথ পাইনু। যার লাগি মদন-দহনে দহি গেনু।।

প্রভুর এই মধুর নৃত্য দেখিলে জীবমাত্রের নয়নে আনন্দ জল আইসে।।" প্রভু তখন রাধা ভাবে সজল ও সলাজ নয়নে জগন্নাথ পানে চাহিতে লাগিলেন, তাহার পরে মনে হইল, তিনি যেন জগন্নাথের সহিত কথা কহিতেছেন। লোকে প্রভুর কথা শুনিতে পাইতেছে না, কিন্তু তিনি যে কি করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। এদিকে প্রভু যে লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে আছেন, ইহা তিনি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি রথে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না। আবার এই লক্ষ লক্ষ লোকেও স্তম্ভিত হইয়া প্রভুর কাণ্ড দর্শন করিতেছেন। প্রভুর মন জগন্নাথে নিবিষ্ট, এই লোকসমূহের মন প্রভুতে নিবিষ্ট। প্রভুর প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী সকলে আবিষ্ট হইয়া দর্শন করিতেছেন। এমন সময় তাঁহাদের মনে হইল যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রভুর নয়নে নয়নে মিলিত হইল, আর প্রভু অমনি লজ্জা পাইয়া মুখ হেঁট করিলেন। আবার যেন অনিবার্য আকর্ষণে তিনি শ্রীকৃষ্ণের দিকে চলিতে লাগিলেন। কখন যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছেন, এই ভাবিয়া অমনি লজ্জা পাইয়া, তিনি ক্রোধভরে অল্প হাসিতে ও করতালি দিতে দিতে, পশ্চাতে নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছেন। কখন হাত নাড়িয়া, মুখ নাড়িয়া রথের শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, 'বন্ধু! তুমি কোথায় আসিয়াছিলে? এখানে লোকের কলরব, আমরা গোপী, আমাদের ওসব দেখিয়া ভয় করে। বন্ধু! বৃন্দাবনে চল, সেখানে পক্ষী গান করিতেছে, বৃক্ষ সুশীতল ছায়া দিতেছে, যমুনা পিপাসা শান্তি করিতেছে। হে আমার প্রাণের প্রাণ! আমি তোমা ছাড়া তিলার্ধ বাঁচি না। চল, সেখানে তোমার নিজ জনের কাছে চল, সকলে সুখে ক্রীড়া করিব।'

প্রভু তখন আপনাকে রাধা বলিয়া ভাবিতেছেন; কাজেই স্বরূপকে ললিতা আর নিকটে যে সকল মর্মী-ভক্ত আছেন তাঁহাদিগকে আপনার সখী বলিয়া বোধ হইতেছে। তখন মনে হইতেছে যে, সখীগণ সহ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দূরে রথের উপরে আছেন। কিন্তু এত দূরে যে, তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিবার সম্ভাবনা নাই। ইচ্ছা হইতেছে যে, প্রিয়তমের গলায় মালতীর মালা দিবেন, কিন্তু তিনি দূরে; আর মালতীর মালাই-বা কোথায় পাইবেন? তখন হাতে যে জপের মালা ছিল, তাহাই মালতীর মালারূপে পরিণত করা হইল; আর শ্রীকৃষ্ণও সম্মুখে,—তাই একটু চিন্তা করিয়া, হস্ত উর্ধে উঠাইয়া আপনার অঙ্গুলীতে মালা ঘুরাইতে লাগিলেন, এবং ক্রমে উহা শ্রীজগন্নাথের দিকে নিক্ষেপ করিলেন; তখন সেই মালা শ্রীজগন্নাথের গলা বেষ্টন করিয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া লক্ষ লক্ষ লোক চীৎকার করিয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রথে, জগন্নাথের পার্শ্বে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সেই মালা আবার প্রভুর হাতে পৌঁছিয়া দিলেন। প্রভুর তখন মর্মীভক্তগণকে সখী-বোধে পুরস্কার-মালা দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কাজেই অঙ্গুলী দ্বারা ঘুরাইতে ঘুরাইতে, কোন ভক্ত-পানে মালা নিক্ষেপ করিতেছেন, আর সেই ভক্তের গলায় সেই মালা বেষ্টন করিতেছেন। বোধ হয় সেই দেখাদেখি এখন দর্শকগণ রুমালে প্রণামী বাঁধিয়া রথের উপর নিক্ষেপ করেন, আর সেবাইতগণ প্রণামী লইয়া সেই রুমালে প্রসাদী-মালা দিয়া উহা প্রত্যার্পণ করেন।

প্রভুর নৃত্য বর্ণনা করা অসাধ্য, কারণ নিমিষে নিমিষে তাঁহার নৃত্য নূতন আকার ধারণ করিত। প্রভুর আনন্দ হইয়াছে, ভাবিতেছেন সখীদেরও সেইরূপ আনন্দ হইয়াছে। তাই সখীদের সহিত আনন্দক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনি মধুর নৃত্য করিতেছেন; এমন সময় সম্মুখে দেখেন বক্রেশ্বর। অমনি তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু শুধু আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্ত হইল না, তাই গলা ধরিয়া তাঁহার মুখ-চুম্বন করিলেন। আবার পার্শ্বে স্বরূপ দামোদরকে দেখিয়া তাঁহাকে অলিঙ্গন করিতে গেলেন; স্বরূপ অমনি চরণে পড়িলেন। আর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বরূপকে উঠাইয়া হৃদয়ে ধরিলেন ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মুখ-চুম্বন করিবেন। তখন বোধ হইল যেন স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে প্রবেশ করিলেন। কারণ প্রভু যেমাত্র স্বরূপকে আলিঙ্গন করিলেন, অমনি তিনি যেন লোকের অদর্শন হইলেন। যথা চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে—(১৬শ স্বর্গঃ)

দধার কটিসূত্রকং প্রভুরিতীহ দামোদরঃ
স্বরূপ ইব তস্য কিং যতিবরোঽয়মুদঘুষ্যতে।
য এষ নটনোৎসবে হৃদয়কায় বাগ্‌বৃত্তিভিঃ
শচীসূত কলানিধৌ প্রবিশতীব সান্দ্রোৎসুকঃ।। ৩১।।

অর্থাৎ—এই দেখিলেন দুই জনে এক হইয়া গেলেন, আবার একটু পরে পৃথকীকৃত হইলেন। কখন দুই জনে হস্ত উত্তোলন ও কর ধরাধরি করিয়া ও মুখোমুখি হইয়া নানাভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই নৃত্য দেখিয়া কি মহাজনের এই পদ সৃষ্টি হইল? যথা—

"হেরাহেরি ফেরাফেরি ধরাধরি বাহু। পূর্ণিমার চাঁদে যেন গরাসিল রাহু।।" আবার স্বরূপ, সিংহের কটি হইতেও ক্ষীণ যে প্রভুর কটি, তাহা এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়া আর বক্র হইয়া অন্য হাতে প্রভুর জানু ধরিয়া এবং প্রভু স্বরূপের কটি ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। যথা—

উন্মীলন্মকরন্দ সুন্দরপদদ্বন্দারবিন্দোল্লস-
দ্বিন্যাসঃ ক্ষিতিষু প্রকামমমুনা দামোদরেণ প্রভুঃ।
আমুষ্কেঃ করকুটমৌলৈরিত ইতোঽর্ধাদধোধো গুরু-
স্নেহার্দ্রেণ দৃঢ়োপগূহিতপদো নৃত্যন্নসৌ দৃশ্যতাম্।। ৩২।।

আবার কখন বা প্রভু, দক্ষিণ দিকে স্বরূপের ও বাম দিকে বক্রেশ্বরের হাত ধরিয়া দ্রুতপদে নৃত্য করিয়া, হাসিতে হাসিতে একবার জগন্নাথের দিকে চাহিয়া অগ্রবর্তী হইতেছেন, আবার পশ্চাতে হটিয়া আসিতেছেন। আবার প্রভু কখন বক্রেশ্বর ও স্বরূপকে ত্যাগ করিয়া, যাঁহাকে সম্মুখে পাইতেছেন, কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া মুখচুম্বন করিতেছেন; আর ভাবিতেছেন যে, তাঁহারা ক্রমে বৃন্দাবনের দিকে যাইতেছেন। এই ভাবে প্রভু যতই অগ্রসর হইতেছেন ততই বৃন্দাবনের নিকটবর্তী হইতেছেন ভাবিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন। যথা, চরিতামৃতে—

"প্রভু হৃদয়ানন্দ-সিন্ধু উথলিল। উন্মাদ ঝঞ্ঝার বায়ু তৎক্ষণে উঠিল।।"

কাজেই সঙ্গে সঙ্গে এই লোকসমূহ আনন্দে পাগল হইল। এখন রাধা ও কৃষ্ণে যে প্রেম-ভাব, ইহা লোকে হৃদয়ে কতক অনুভব করিতে পারে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ ও শ্রীমতী নারী। কিন্তু এই যে প্রভু প্রেমে জর্জরীভূত হইয়া স্বরূপ কি বক্রেশ্বরকে চুম্বন করিতেছেন, ইহা যে কোন্ জাতীয় প্রেম, তাহা বহিরঙ্গ লোকে কিরূপে অনুভব করিবে? কিন্তু ইহা দেখিয়া লোকেরা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বোধ করিতেছে না, বরং একেবারে মুগ্ধ হইতেছে। তাই শাস্ত্রকার বলেন, গোপীপ্রেমে কামগন্ধ নাই। অর্থাৎ হৃদ্‌রোগ কি কামরোগ থাকিতে কৃষ্ণ-প্রেম উদয় হয় না। অথবা কৃষ্ণ-প্রেম উদয় হইলে হৃদ্‌রোগ কি কামরোগ বশীভূত হয়,

স্ত্রী ও পুরুষ ভেদজ্ঞান লোপ হয়, অথচ স্ত্রী ও পুরুষ যে মধুর প্রেম উহা পরিবর্ধিত হয়। একমাত্র শ্রীভগবান্ পুরুষ আর সমুদায় প্রকৃতি,—পরিণামে জীবমাত্রেই গোপগোপীরূপে শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের বক্রেশ্বরকে চুম্বন দ্বারা, শ্রীভগবানের জীবের সহিত ও জীবের শ্রীভগবানের সহিত কত গাঢ় সম্বন্ধ, তাহা কতক অনুভব করা যাইতে পারে। যাঁহারা পরকীয় প্রেমের কথা শুনিলে ক্লেশ পান, তাঁহারা দেখিবেন যে, এই প্রেমে স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান নাই।

"জগন্নাথ-সেবক যত রাজপাত্রগণ। যাত্রিক লোক নীলাচলবাসী যত জন।।
প্রভু নৃত্য প্রেম দেখি চমৎকার। কৃষ্ণ-প্রেম উথলিল হৃদয় সভার।।
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল। প্রভু নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল।।"

প্রভুর তবু ঘন ঘন মূর্ছা হইতেছে, কিন্তু মধুর নৃত্যে যে পতন তাহাতে তত ভয় হয় না। তব্যু প্রভু যে মূর্ছা যাইতেছেন, তাহার কারণ এই যে তাঁহার যে আনন্দের ঢেউ উঠিতেছে, তাহা হৃদয়ে স্থান না পাইয়া মূর্ছা হইতেছে। প্রভু আবার রাজার সম্মুখে মূর্ছিত হইলেন। রাজা পূর্বে তাড়া খাইয়াছেন কিন্তু তাহাতে এবার নিরস্ত হইলেন না; তবে সেবার যেমন প্রভুকে ধরিয়া উঠাইতে গিয়াছিলেন, এবার তাহা না করিয়া তাহার পদতলে বসিয়া শ্রীপদ দুইখানি আপনার ক্রোড়ে রাখিয়া অতি যতনে উহা সেবা করিতে লাগিলেন। যথা—

আনন্দোৎসাহ মূর্চ্ছাগত ইব ভবতি স্পন্দনিশ্বাসমন্দে
রোহদ্রোমাঞ্চপূরৈ বিকলিত-বপুষানন্দমন্দীকৃতেন।
স্যন্দন্নেত্তারবিন্দদ্বয় সলিলজুষা রুদ্রদেবেন ভুয়ঃ
সানন্দং সেবিতাঙ্ঘ্রিদ্বয় সরসিরুহো রাজতে গৌরচন্দ্র।। ২৮

(চরিতামৃত)

অর্থাৎ—"শরীর-স্পন্দন ও নিঃশ্বাস-বায়ু মন্দীভূত হওয়ায় নেত্র-পদ্ম বিগলিত জল-ধারা-যুক্ত, তথা আনন্দে জড়ীকৃত ও রোমাঞ্চ সমূহে বিকলিত অঙ্গ দ্বারা যাঁহাকে বোধ হইতেছে, যেন আনন্দ উৎসাহ ও ততক্ষণেই মূর্ছাগত হইতেছেন এবং প্রতাপরুদ্র কর্তৃক সানন্দে তদবস্থায় যাঁহার পাদপদ্ম যুগল সেবিত হইতেছে, সেই প্রভু গৌরচন্দ্র অতিশয় শোভা পাইতেছেন।"

প্রভু বলিতেছেন, তিনি রাজসম্ভাষণ করিবেন না, রাজারও সংকল্প, তিনি প্রভুর কৃপাপাত্র হইবেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ ভক্তের নিকট পরাস্ত হইলেন। এবার প্রভু বিষয়ীর স্পর্শে হঠাৎ চেতনা লাভ করিলেন না, রাজার সন্তর্পণে ধীরে ধীরে সচেতন হইলেন। কিন্তু মহারাজের সেবা যে তাঁহার অবগতি হইয়াছে, এরূপ কিছু জানিতেও দিলেন না। প্রভু চেতনা পাইয়াই আবার মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু এই রাধা ভাবে, প্রেমের হিল্লোলের মাঝে, সহসা ভক্তি কর্তৃক পরিপ্লুত হইলেন। ভজনকালে প্রেম ও ভক্তি, হৃদয়ে এইরূপ খেলা করে,—প্রেম-ভজন করিতে করিতে কখন হঠাৎ ভক্তির উদয় হয়, আবার ভক্তির সেবা করিতে করিতে প্রেমের উদয় হয়। ভক্তির উদয় হইলে প্রভু শ্লোক-আকারে বলিতেছেন, "হে অরবিন্দ-লোচন। তোমার পাদপদ্ম-মাধুরী অতিশয় রমণীয়, অতিশয় সুগন্ধ, অতিশয় দুর্লভ।" ইহা বলিয়া সেই সুশীতল শ্রীপদকমল ধরিতে গেলেন। আবার তখনই অধিরূঢ় ভাব উপস্থিত হওয়ায়, আপনাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ হইল। তাই রাধা-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপদ ধরিলেন। অর্থাৎ আপনার শ্রীপদ হৃদয়ের উপর রাখিয়া অতি গাঢ়-প্রেমে ও ভক্তিতে চুম্বন করিতে লাগিলেন।

প্রভুর দেহে এক সময়েই রাধা-কৃষ্ণ ভাব ও উদ্ধব-কৃষ্ণ-ভাব মুহুর্মুহুঃ প্রকাশ পাইত। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে পাঠক দেখিবেন যে, প্রভু যখন নবদ্বীপ হইতে ভক্তগণের নিকট বিদায়

লয়েন, তখন একই সময় একবার রাধা হইয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত রোদন করিয়াছিলেন। এইরূপে উদ্ধব ও কৃষ্ণ.—এই দুই ভাবে প্রভু একেবারে বিভাবিত হইয়া, আপনার চুল দ্বারা আপনার শ্রীপদ বন্ধন করিতেন। প্রভুর চুল হইল উদ্ধবের, আর পদ হইল শ্রীকৃষ্ণের। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তাঁহার সেবা হইল আপন কেশ-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদবেষ্টন। ভক্ত ভক্তিতে প্রভুর এইরূপ সেবা করিয়া থাকেন।

ক্রমে রথ বলগণ্ডিতে আসিল। ইহার দক্ষিণে উপবন ও বামে বিপ্রশাসন-নারিকেল-বন। সে স্থানে আসিয়াও প্রভুর নৃত্য ভঙ্গ হয় নাই। কিন্তু সেখানে নিয়ম আছে যে, রাজা-রানী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই আপনাপন সাধ্যমত উত্তম আহার্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে ভোজন করান। সেই কারণে সেখানে এত গোল হইল যে, ভক্তগণ প্রভুকে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত করাইয়া উপবনে লইয়া গেলেন। সেখানে যে উত্তম গৃহ আছে উহার পিণ্ডায় লইয়া ভক্তগণ প্রভুকে বসাইলেন। প্রভু প্রেমে অচৈতন্য অবস্থায় পিণ্ডায় পা মেলাইয়া ঘর হেলান দিয়া বসিলেন। পরিশ্রমে প্রভুর তখন ঘর্মাক্ত কলেবর, তাই সেখানে তিনি শীতলবায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও যে যেখানে পারিলেন, বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। মহারাজ সখাগণ সহ প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছেন। প্রভু পিণ্ডায় উপবেশন করিলে রাজার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তখন সার্বভৌম ও রামানন্দের পরামর্শ ক্রমে রাজা পরিষ্কার ধুতি ও ফতুয়া পরিয়া ও বৈষ্ণব বেশের উপকরণ ধারণ করিয়া একলা উপবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা প্রকাণ্ড দেহধারী ও বলশালী, কিন্তু তখন প্রতিপদে তাঁহার পাদস্খলন হইতেছে। চকিতে হরিণীর ন্যায় রাজা এদিক ওদিকে চাহিতেছেন; কিন্তু সে অভ্যাসে নহে উল্লাসে ও ভয়ে। তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান অল্পমাত্র আছে!

"চতুর্দিকে চাহে রাজা সভয় নয়নে। প্রভুর নিকটে গেল মাথর গমনে।।"

যাইয়া দেখেন সেখানে প্রভুর প্রিয় ভক্তগণ বসিয়া আছেন; তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাজার চেতনা হইল, তখন তিনি করজোড়ে সকলের নিকট সঙ্কেত দ্বারা, প্রভুকে মিলিতে অনুমতি চাহিলেন। রাজার এই দীনভাব আকিঞ্চন ও দৃঢ়তা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন, অনেকেরই হৃদয় দ্রব হইল। আবার কাহার বা একটুকু শঙ্কাও হইল; ভাবিলেন যে, রাজার ভাগ্যে না আজ কি হয়। এইরূপে রাজা ধীরে ধীরে প্রভুর নিকটস্থ হইলেন। প্রভু কি ভাবে বসিয়া আছেন, তাহা চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা—

"নৃত্যাবেশ প্রভু চিতে না পারেন সম্বরিতে, মুদ্রিত করিয়া দুনয়ন।
শ্রীচরণ প্রসারিয়া বসিলা আনন্দ পাঞা পাদপদ্ম চালেন সঘন।।
নিরন্তর নেত্র-জল ধৌত করে বক্ষঃস্থল, প্রেমানন্দ যেমন সাক্ষাৎ।"

আর তখন প্রভু চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের "আঘাতং আনন্দদুঘং পদাম্বুজ" ইত্যাদি শ্লোকের কতকাংশ উচ্চারণ করিতেছেন, আর মুদ্রিত-নয়ন জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

গোপীনাথ নিকটে বসিয়া, প্রভুর এই শ্লোক শুনিয়া ভাবিতেছেন, প্রভু একটু পূর্বে হঠাৎ ভক্তিতে অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ-মাধুরী দর্শন চুম্বন করিয়াছেন। এই দর্শন ও স্পর্শ করিয়া পরমহংসগণ যে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন, তাহা অপেক্ষা তোমার চরণ মাধুরী অনন্ত-গুণে শ্রেষ্ঠ। এ কথার তাৎপর্য বলিতেছি। পরমহংসগণ যোগাভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। ইহার তেজ উপধাবন করেন। প্রভু. শ্রীকৃষ্ণের চরণ-মাধুরী আস্বাদ করিয়া বলিতেছেন, 'হে কৃষ্ণ! তোমার চরণ হইতে যে আনন্দ, উহা ব্রহ্মানন্দ হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ'। ইহাতে প্রভু প্রকারান্তরে সাকার-ভজনকে নিরাকার ভজন হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন।

রাজা, প্রভুর নিকটে আসিয়া তাঁহার ভাব দেখিয়া ও শ্লোক শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া,

কিয়ৎক্ষণ শ্রীচরণ দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎপরে ভাবিতেছেন, প্রভুর শ্রীপদ স্পর্শ করিয়া কি তাঁহার অকৃপার ভাজন হইবেন? আবার ভাবিতেছেন, প্রভু যদি প্রাণে মারেন, তবে তাঁহার শ্রীচরণ ধরিয়াই মরিবেন। রাজার মনে ভয়, পাছে প্রভু ভাবেন যে, তিনি রাজা বলিয়া প্রভু বিনা অনুমতিতে তাহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন। তখন শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি রাজার মনে পড়িল।

যথা—

"সর্বে ভাগবত শ্রীমৎ পাদস্পর্শ হৃতাশুভং
ভেজেস্পর্শবপুহিত্বারূপং বিদ্যাধরার্চিতং।।"

ভাবিলেন, "যদি অপরাধ করি, তবে শ্রীভগবানের পাদস্পর্শে সমুদায় অশুভ ক্ষয় হইয়া যাইবে, অতএব শ্রীভগবানের শ্রীপাদস্পর্শে কখন কোন বিপদ নাই।" ইহা ভাবিয়া সঙ্কল্প করিয়া পদতলে বসিয়া হস্তদ্বারা শ্রীচরণ সেবন করিতে লাগিলেন। প্রভু যেরূপ পদ চালাইতে ছিলেন, সেইরূপই করিতে লাগিলেন, কিছু বলিলেন না।

রামানন্দ রায় রাজাকে শিখাইয়া দিয়াছেন, 'প্রভুর পদ সেবা করিবে, আর সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শুনাইবে" রাজা কোথায় পাঠ করিবেন, কিরূপে পাঠ করিবেন, এই সমস্ত রামরায়ের নিকট শিখিয়া আসিয়াছেন! রাজা পদসেবা করিতে করিতে ধীরে ধীরে রাসের গোপী-গীতার প্রথম শ্লোক পাঠ করিলেন। যথা—

"জয়তি তেঽধিকং জান্মানা ব্রজঃশ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়তি দৃশ্যাতাং দিক্ষু তারকা স্থয়ি ধৃতাসবস্তাং বিচিন্বিতে।।"

গোপীগণ কহিলেন, "হে দয়িত! তোমার জন্ম দ্বারা আমাদের ব্রজমণ্ডল সমধিক উৎকর্ষশালী হইয়াছে। অপর, তুমি এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এই কারণে কমলাও এই ব্রজমণ্ডলকে অলঙ্কৃত করিয়া ও স্থানে নিত্য বিরাজমানা। হে প্রিয়! এই প্রকারে তোমার কারণে যে ব্রজমণ্ডলে সকল ব্যক্তি আমোদান্বিত, সে স্থানে তোমার দাসী, এই সকল গোপী (যাহারা তোমার নিমিত্তই কথঞ্চিৎ প্রাণধারণ করিয়াছে), তোমার অন্বেষণ করিয়া কাতর হইতেছে, কৃপা করিয়া দর্শন দাও।" প্রভুর মনের ভাব বাহিরে ব্যক্ত হইত, কারণ তাঁহার হৃদয় কাচের ন্যায় স্বচ্ছ ও সরল ছিল। এই শ্লোক শুনিবামাত্র প্রভুর প্রফুল্ল বদন আরও প্রফুল্লিত হইল। রাজা ইহা দেখিয়া পরম আশ্বাসিত হইয়া ঐরূপ পদ-সেবা করিতে করিতে তাহার পরের শ্লোক পড়িলেন। যথা—

"শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ সরসিজোদর শ্রীমুষা দৃষা।
সুরতনাথ তেজশুল্ক দাসিকা বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ।।"

"হে সম্ভোগপতে! হে অভীষ্টপ্রদ! আমরা তোমার বিনামূল্যের দাসী। তুমি যে শরৎকালে সুজাত অথচ বিকসিত কমলগর্ভের শোভাহারী নেত্রদ্বারা আমাদিগকে বধ করিতেছ, ইহা কি বধ বলিয়া গণ্য হয় না? অস্ত্র-দ্বারা বধই কি বধ? উহা অবশ্যই বধ শব্দবাচ্য। অতএব তোমার দৃষ্টি-দ্বারা অপহৃত আমাদের প্রাণ প্রত্যর্পণ নিমিত্ত দর্শন দাও।"

প্রভুর আনন্দতরঙ্গ আরও বাড়িয়া উঠিল। তখন যদিও নয়ন মিলিলেন না, কিন্তু মুখে নিতান্ত হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বল, বল, তাহার পর গোপীগণ কি বলিলেন, বল।" প্রভু এই প্রথম রাজার সহিত কথা বলিলেন। রাজার আনন্দে কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতেছে। কষ্টে-সৃষ্টে রাজা পড়িলেন—

"বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিমূর্য তে চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কমিদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্।।"

"হে দেব! আমরা তোমার ভক্ত, আমাদের প্রার্থনা পরিপূর্ণ কর। হে বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ!

তোমার চরণকমল প্রাণীদিগের অভয় দান করে, আমরা সংসার ভয়ে ভীতা হইয়া তোমার ঐ চরণে শরণাপন্ন হইয়াছি। তোমার যে করকমল লক্ষ্মীর কর গ্রহণ করিয়াছ এবং যাহা বরপ্রদ, অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাদের মস্তকে নিহিত কর।" প্রভু এই শ্লোক শুনিয়াই আনন্দে যেন জড়বৎ হইলেন। পুলকাবৃত শ্রীঅঙ্গে মুহুর্মুহুঃ আরও পুলকের সৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রভু কষ্টেসৃষ্টে ভঙ্গস্বরে বলিলেন, "তাহার পর, তাহার পর?" রাজা আবার বলিলেন—

ব্রজজনার্তিনহন্ বীর যোষিতাং নিজজন-স্ময় ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করী স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয়।।"

"সখে! তুমি ব্রজ-জনের আর্তিহরী, হে বীর! তোমার মন্দহাস্য নিজজনের গর্বহারী, আমরা কিঙ্করী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দাও। হে সখে! আমরা অবলা প্রথমে আমাদিগকে বদনকমল দর্শন করাও।"

প্রভুর ইচ্ছা হইতেছে যে, যিনি শ্লোক পাঠ করিতেছেন, উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন; কিন্তু শ্রীঅঙ্গ এলাইয়া পড়িতেছে, উঠিতে পারিতেছেন না। রাজা প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা না করিয়া আবার পড়িলেন—

"মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া বধূ-মনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরমা বীর মুহ্যতীরধর-সীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ।।"

"হে পদ্ম-লোচন! তোমার মধুর বাণী সুন্দর পদাবলী-সমলঙ্কৃতা এবং বুধজনের মনোজ্ঞা, এই বাণীর দ্বারা আমাদের মোহ জন্মিতেছে। হে বীর! আমরা তোমার কিঙ্করী, মুগ্ধ হইয়া মারা পড়ি, অতএব অধরামৃত প্রদান করিয়া জীবিত কর।"

প্রভু আবার উঠিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না। রাজা তখন বুঝিলেন শুনিবার জন্য প্রভু কান পাতিতেছেন, অমনি পড়িলেন, যথা—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃহন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।।"

"হে প্রিয়! তোমার বিরহে আমাদের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল, পুণ্যবানেরা তদীয় কথামৃত পান করাইয়া তাহা নিবারণ করিয়াছেন। ফলতঃ তোমার কথামৃত প্রতপ্ত-জনের জীবনস্বরূপ, ব্রহ্মযজ্ঞ-জনও তাহার স্তব করেন, তাহাতে কাম্য-কর্ম নিরস্ত হয়; অপর তোমার নামামৃত শ্রবণ মঙ্গলপ্রদ এবং শান্তিদায়ক। পৃথ্বীতলে যে সকল ব্যক্তি বিস্তারিতরূপে তাহা পান করেন, নিশ্চয় তাঁহারা পূর্বজন্মে বহু দান করিয়াছেন। হে প্রভু! যাঁহারা তোমার কথামৃত নিরূপণ করেন, তাঁহারা যখন ধন্য হইলেন, তখন দর্শনকারীদের কথা কি? অতএব প্রার্থনা করি আমাদিগকে দর্শন দাও।"

প্রভু আর থাকিতে পারিলেন না। হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন এবং "ভূরিদা, ভূরিদা" অর্থাৎ "তুমি আমাকে অনেক দান করিলে" বলিয়া রাজাকে বাহু পসারিয়া ধরিয়া বলিতেছেন, "কে তুমি হে পরম সুহৃৎ অকস্মাৎ কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইয়া আমার তৃষিত-হৃদয় শীতল করিলে? তুমি আমাকে বহু দান করিলে কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, আমার দিবার কিছু নাই; এস, তোমাকে আলিঙ্গন দান করি" ইহাই বলিয়া রাজাকে হৃদয়ে করিয়া, "তব কথামৃত" শ্লোক পড়িতে পড়িতে উভয়ে উভয়ের বাহুদ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া কিছুকাল অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এই সুযোগে প্রভু হইতে শক্তি নির্গত হইয়া রাজার প্রত্যেক ধমনী দিয়া তাঁহার সমস্ত অঙ্গ ব্যাপিল ও এইরূপে তাঁহার মলিন ধমনীগুলি পরিষ্কৃত হইয়া উহা দিয়া বিদ্যুল্লতার ন্যায় আনন্দ-লহরী খেলিতে লাগিল; আর ইহার ফলস্বরূপ, তাঁহার সর্বাঙ্গে পুলক প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। রাজা যতখানি শক্তি ধরিতে পারেন, যখন ততখানি পাইলেন,

তখন প্রভু চেতন লাভ করিলেন, এবং রাজাকে ফেলিয়া রথ-দর্শনে দৌড়িলেন, রাজা যেমন তেমনি পড়িয়া রহিলেন। যথা—

(প্রভু) "আনন্দ আবেশে আছে বাহ্য নাহি জানে।
কারে আলিঙ্গিয়া ছিলা তাহা নাহি মনে।।
প্রভু সঙ্গে ধাইল সকল ভক্তগণ।
রাজা একা ভূমে পড়ি প্রেমে অচেতন।।"৯

রাজা অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন, এমন সময়, যথা চন্দ্রোদয় নাটকে—"গোপীনাথ আচার্য গেল গজপতি স্থানে। রাজারে উঠায়ে কহে মধুর বচনে।।"

গোপীনাথ রাজাকে উঠাইয়া সান্ত্বনা করিতেছেন, ওদিকে প্রভু ও ভক্তগণ উপবনে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা দূর হইতে প্রভুকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়া ভক্তগণের পদতলে আলিয়া পড়িলেন; কিরূপে—না, যেরূপে নববিবাহিতা বালিকা স্বামীর বন্ধুগণের চরণে পড়িয়া পড়িয়া প্রণাম করেন। রাজার অঙ্গ পুলকে আবৃত হইয়াছে, প্রতি অঙ্গ প্রেমে তরঙ্গায়মান হইতেছে, আর নয়ন দিয়া অবিরত ধারা পড়িতেছে। সকলে রাজার ভাগ্যকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজাও বিনীতভাবে ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে আসিলেন, এবং যত্ন করিয়া প্রভুকে প্রসাদ পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। একটু পরেই রাজার প্রদত্ত উপহার-দ্রব্য সার্বভৌম, রামানন্দ ও বাণীনাথ প্রভুর সমীপে লইয়া আসিলেন। পাঠক! প্রভুর ভোগের নিমিত্ত কি কি প্রসাদ আসিল, তাহা জানিলে নিশ্চয় আনন্দিত হইবেন, ভাবিয়া শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থকার বিবরিয়া বলিতেছেন, যথা—

"ছানা পানা পৈড়আম্রনারিকেল কাঁঠাল। নানাবিধ কদলক আর বীজ তাল।।
নারঙ্গ ছোলাঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর। বাদাম ছোহারা দ্রাক্ষা পিণ্ডখর্জুর।।
মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার। অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার।।
অমৃতমণ্ডা দোনার বড়ি আর কর্পূরকুলি। সরামৃত সরভাজা আর সরপুলি।।
হরিবল্লভ সেবতি কর্পূর মালতী। ডালিমা মরিচা লাড়ু নবাত অমৃতি।।
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার। রিয়ড়ি কদমা তিলা খাজার প্রকার।।
নারঙ্গ-ছোলাঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার। ফল-ফুল-পত্রমুক্ত খণ্ডের বিকার।।
দধি দুগ্ধ দধি তক্র রসালা শিখরিণী। সলবণ মুদগাঙ্কুর আদা খানি-খানি।।
লেবু কোলি আদি নানাপ্রকার আচার। লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার।।"

এই তালিকা পাঠ করিয়া জানিলাম যে, এখানকার ন্যায় পূর্বেও শর্করার নানাবিধ উপকরণ প্রস্তুত হইত। রাজার উপহার-দ্রব্য অর্ধ-উপবন ভরিয়া গেল। উপহার দর্শনে প্রভুও সন্তুষ্ট হইলেন। কেন না—যথা (চরিতামৃত)—

"এই মত জগন্নাথ করেন ভোজন।এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন।।"

প্রসাদের সঙ্গে পাঁচ-সাত বোঝা বৃহৎ কেয়াপত্রের দোনাও আসিল। ভক্তগণের বড় পরিশ্রম ও ক্ষুধা হইয়াছে জানিয়া প্রভু সমুদায় ভাব সম্বরণ করিয়া এক এক ভক্তের সম্মুখে আপনি দশ-দশ দোনা রাখিলেন। তার পরে আপনিই পরিবেশন করিতে লাগিলেন। মনে ভাবুন, আমরা শ্রীভগবানের স্থানে গিয়াছি, আর তিনি স্বয়ং আমাদিগের আতিথ্য-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মনে ভাবুন, শ্রীভগবান আপনি পাতা পাতিতেছেন, আর আমরা দাঁড়াইয়া তাঁহার কার্যকলাপ অবাক হইয়া দেখিতেছি। মনে ভাবুন, শ্রীভগবান শেষে আমাদিগকে বলিলেন, "আপনারা বসুন।" শ্রীভগবান্ বিনয়ের খনি। তিনি ভক্তগণকে এইরূপ সম্মান করিয়া সম্বোধন করিতেছেন, তাহার বিশেষ কারণ এই যে, তিনি সে দিবস গৃহকর্তা,—অতিথি সেবা করিতেছেন। ভক্তগণ বসিতেছেন না দেখিয়া শ্রীভগবান্ শ্রীহস্তে ভক্তগণকে

ধরিয়া বসাইতে গেলেন। তাহা দেখিয়া ভক্তগণ তাড়াতাড়ি বসিলেন। তখন শ্রীভগবান্ নিজ হস্তে পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। শ্রীভগবানের ভাণ্ডার অক্ষয়, আবার চরিত্র উদার,—আতিথ্যের নিমিত্ত সর্বস্ব নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত। শ্রীহস্তে এক-এক জনের পাতে দশ-দশ জনের আহারীয় দ্রব্য দিতেছেন। ইহার সুগন্ধে নাসিকা মাতিতেছে। মনে ভাবুন যেন, স্বয়ং শ্রীমতী রাধা উহা রন্ধন করিতেছেন। কিন্তু শ্রীভগবান বসেন নাই, কাজেই ভক্তগণ কিরূপে ভোজন করিবেন? শ্রীভগবান পরিবেশনে ব্যস্ত। হঠাৎ তিনি দেখিলেন, ভক্তগণ হাত তুলিয়া বসিয়া আছেন। যদিও শ্রীভগবান্ অন্তর্যামী, কিন্তু তখন তিনি মনুষ্যের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। সুতরাং অন্তর্যামী ও সর্বব্যাপী হইয়া বেড়াইলে, মনুষ্য তাঁহার সহিত কিরূপে গোষ্ঠী করিবে? কাজেই তখন তাঁহাকে অতি নিরীহ ও সরল প্রকৃতিস্থ হইতে হইয়াছে। তাই ভক্তগণ কেন ভোজন করিতেছেন না, ইহার কারণ যেন বুঝিতে না পারিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আপনারা বসুন, সেবা করুন, বিলম্ব করিতেছেন কেন?" তখন একজন মর্মীভক্ত বলিলেন, "ঠাকুর! বুঝিতেছ না, তুমি না বসিলে, ইঁহারা কিরূপে ভোজন করিবেন?" তখন লজ্জা পাইয়া ঠাকুর আপনি বসিলেন।

গোপীগণ শ্রীগোলকে যেরূপ নবীন-নাগরের সহিত খেলা করিয়া থাকেন, ভক্তগণ তখন শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সেইরূপ খেলা করিতেছেন। প্রভু ভোজনে বসিলে স্বরূপ দামোদর, গোপীনাথ প্রভৃতি পরিবেশন করিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"তবে মহাপ্রভু বৈসেন নিজগণ লঞা। ভোজন করাইলা সবার আকণ্ঠ পুরিয়া।।"

ভক্তগণের সেবা হইয়া গেলে, দেখা গেল ন্যূনাধিক সহস্র লোকের আহারীয় উদ্ধৃত হইয়াছে। তখন প্রভুর আহ্বানে সহস্রেক কাঙ্গালী আসিল এবং তিনি গোবিন্দ প্রভৃতির দ্বারা তাহাদিগকে খাওয়াইলেন।

প্রভু বলেন, "হরিবোল",—আর সহস্র কাঙ্গালী হরিধ্বনি করে।

"হরি হরি বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়" (চরিতামৃত)

কাঙ্গালী-ভোজন করাইয়া ও তাহাদিগকে দক্ষিণাস্বরূপ ভক্তি ধন দিয়া, প্রভু নিজগণ সহ আরাম করিতে লাগিলেন।

নারিকেল-শাসন-বনের ভোগকার্য সমাধা হইলে গৌড়ীয়গণ আবার রথের দড়ি ধরিয়া টানিতে গেলেন, কিন্তু রথ আর চলেন না। তখন তাঁহারা প্রাণপণ করিতে লাগিলেন, তবুও চলেন না। এদিকে প্রভুর কৃপা পাইয়া রাজা আনন্দে মধ্যাহ্নক্রিয়াদি সমাপন করিতে গৃহে গিয়াছেন। অপরাহ্নে সংবাদ পাইলেন যে, রথ চলিতেছেন না। মনে করুন, রথ না চলা বড় দোষের কথা। ইহাতে এক-প্রকার বুঝা যায় যে, যাঁহার রথ, তাঁহার কিছু অপরাধ হইয়াছে? রাজা এই দুঃসংবাদ শুনিবামাত্র পাত্রমিত্রসহ নারিকেল-শাসন-বনে দৌড়িয়া আসিলেন। প্রথমে রাজা বড় বড় মল্লগণকে রথ টানিতে নিযুক্ত করিলেন। আপনি মহামল্ল,আপনিও ধরিলেন। কিন্তু মহাচেষ্টায়ও রথ চলিলেন না! তখন রাজা আরও ব্যস্ত হইলেন। মল্লগণ অপারগ হইলে, রাজা বড় বড় হাতী আনাইয়া রথে জুড়িয়া দিয়া রথ নাড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রথ চলিলেন না। রাজা ক্রমেই ব্যাকুল হইতেছেন। শেষে মাহুতগণ হস্তীকে প্রহার করিতে লাগিল, হস্তী চীৎকার করিতে লাগিল, তবু রথ চলেন না। পরিষ্কার পথে রথ রহিয়াছেন আর ঐ পথে এই পর্যন্ত রথ অনায়াসে আসিয়াছেন, এখন কেন চলেন না? রাজা নিশ্চিন্ত বুঝিতেছেন যে, তাঁহার উপর শ্রীজগন্নাথ কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন! এই কথা শুধু রাজা নয়, উপস্থিত সকলেই ভাবিতেছেন।

এই যে রথ চলিতেছেন না, রাজা যে ব্যাকুল হইয়া উহা চালাইবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, ইহা প্রভু ভক্তগণ-সহ নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। রাজা যখন

দেখিলেন যে, রথ চালান তাহার পক্ষে অসাধ্য, তখন নিরাশ হইয়া অতি কাতরে প্রভুর পানে চাহিতে লাগিলেন। প্রভু অমনি, 'ভয় কি, এই যে আমি', নয়নভঙ্গী দ্বারা এই ভাব ব্যক্ত করিয়া অগ্রবর্তী হইলেন। প্রভু যদি চলিলেন, ভক্তগণও সঙ্গে চলিলেন। প্রভু হস্তীগুলিকে রথ হইতে ছাড়াইয়া রথের রজ্জু নিজজনের হস্তে দিলেন; আর আপনি রথের পশ্চাতে যাইয়া মস্তকস্পর্শ করিয়া উহা ঠেলিতে লাগিলেন। রথ অমনি গড়গড় করিয়া চলিলেন। যাঁহারা রথের দড়ি ধরিয়া টানিতেছিলেন, তাঁহারা বুঝিলেন যে, তাঁহাদের শক্তিতে রথ চলিতেছেন না, উহা যেন নিজ-শক্তিতে চলিতেছেন। তখন সকলে আনন্দে চীৎকার করিয়া প্রভুর জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। যথা চরিতামৃতে—

"জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই মত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য।
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র সঙ্গে; প্রভুর মহিমা দেখি প্রেম ফুলে অঙ্গে।।"

প্রথমে বড়জানা (রাজকুমার) প্রভুর কৃপাপাত্র হইয়াছেন; এখন রাজা নিজে হইলেন। তাঁহার তখন গৌর ধ্যান ও গৌর জপ সাধন-ভজন হইল। এমন কি, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে যে চৌষট্টি মহান্ত আছেন, প্রতাপরুদ্রও তার মধ্যে একজন হইলেন। প্রতাপরুদ্রের নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। এই গ্রন্থ না হইলে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে গৌরলীলা অসম্পূর্ণ থাকিত; শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতির মুখে শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচরিতামৃতে প্রভুর অন্ত্যলীলা লিখেন। চন্দ্রোদয় নাটক না হইল রঘুনাথ দাস-গোস্বামীর নীলাচল গমনের পূর্বকার লীলা অনেক গুপ্ত থাকিত। এই চন্দ্রোদয় নাটক প্রতাপরুদ্র স্বয়ং লেখাইয়াছিলেন। প্রভু গোলকধামে গমন করিলে প্রতাপরুদ্র শোকে অভিভূত হইলেন। চন্দ্রোদয় নাটক প্রণেতা শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর বলিতেছেন, যে, প্রতাপরুদ্র শোকে অতি কাতর, তবু না আসিলে নয়, তাই রথের পথে সুবর্ণ-মার্জন দ্বারা মার্জন করিতে ও চন্দন ছিটাইতে আসিয়াছেন। যথা (চন্দোদয় নাটকে)—

"শ্রীচৈতন্য ভগবান কৈলা অন্তর্ধান। বিরহ-বেদনায় রাজা আকুল পরাণ।।
সেবা-অধিকার আছে না আইলে নয়। তে কারণে যাত্রাকালে করিল বিজয়।।
সুবর্ণ-মার্জনী লৈয়া পথ মাজি যায়। প্রভু লাগি কান্দে, পথ দেখিতে না পায়।।
এমতি প্রতাপরুদ্র ধৈর্য যত ধরে। বিরহে ভাঙ্গয়ে ধৈর্য রাখিতে না পারে।।"

রাজা ওই সেবা করিয়া প্রভুর কৃপামাত্র হইয়াছেন। রাজা প্রত্যহ যখন রথ-যাত্রার পূর্বে ঐ সেবা করিতেন, তখন আহ্লাদ-সাগরে ভাসিতেছেন। কারণ তিনি সেবা করিতেন, আর প্রভু দাঁড়াইয়া দেখিতেন। তিনি রাজা, তাঁহার নীচসেবা দেখিয়া প্রভু বড় খুশী হইতেন। রাজার এই বড় আনন্দ, প্রধান, সুখ। কিন্তু দেখিয়া প্রভু বড় খুশী হইতেন। রাজার এই বড় আনন্দ, প্রধান সুখ। কিন্তু আজ প্রভু কোথায়? কে তাঁহার সেবা দর্শন করিবে, কাহার দর্শনে সুখী হইয়া তিনি সেই সেবা করিবেন? রাজা সেবা করিতে গিয়াছেন, না গেলে নয়। দেখেন যেখানে দাঁড়াইয়া প্রভু তাঁহার সেবা দর্শন করিতেন, সে স্থান শূন্য। তখন রাজা একেবারে ধৈর্যহারা হইলেন। পথ-মার্জন করিতে যান, চোখের জলে দেখিতে পারেন না। তখন সেই বীরপুরুষ, পতিহীনা, নব-বিয়োগিনী যুবতী-রমণীর ন্যায়, প্রভু যেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, সেই দিকে চাহিয়া, মার্জনী হৃদয়ে করিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন পাত্রমিত্রগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। রাজা, রামানন্দ প্রভৃতি মর্মী-বন্ধুগণ লইয়া, বিরলে রোদন করিতে লাগিলেন। কবিকর্ণপুর বলিতেছেন যে,

"নির্বিঘ্ন হইয়া রাজা বসিলে বিরলে। আমারে ডাকিয়া আনিলে হেনকালে।।"

তারপর রাজা কান্দিতে কান্দিতে আমারে বলিলেন—"হে প্রভুর কৃপাপাত্র কবি! দেখ, সেই জগন্নাথ আছেন, সেই মহোৎসব হইতেছে, সেই বাদ্য বাজিতেছে, আনন্দের সমুদায়

সামগ্রীই রহিয়াছে. কিন্তু—"

"মহাপ্রভু বিনা মোর সব লাগে শূন্য। হায় কি উপায় করি মুই হত পুণ্য।।"

শেষে বলিলেন—"হে কবিবর! আমি প্রভুর বিরহ-বেদনা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি প্রভুব লীলা নাটকাকারে লিখিয়া আমাকে দেখাও, তাহাই দেখিয়া আমি জীবন ধারণ করিব।" এইরূপে রাজার অনুরোধে কবি-কর্ণপুর "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাম দিয়া মহাপ্রভুর লীলাগুলি নাটকাকারে লিখিতে বসিলেন।

রাজা শ্রীপ্রভুর একটি নাম রাখিয়াছিলেন—"প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা।" অতএব— জয় প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতার জয়! জয় প্রতাপরুদ্রের জয়! প্রভুর শক্তিতে মুহূর্ত মধ্যে রথ গুণ্ডিচায় যাইয়া পৌছিল। শ্রীজগন্নাথ সিংহাসনে বসিলেন। আর প্রভু অমনি ভক্তগণ সহ সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সকলে আরতি দেখিলেন। শেষে সকলে শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-উপবনে আসিয়া রাত্রিবাস করিলেন। এই মনোরম উপবনে রামানন্দ রায় শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ নাটক রচিয়া রাজাকে দেখাইয়া ও শুনাইয়াছিলেন। যে কয়েক দিন রথ সুন্দরাচলে রহিলেন, সেই কয়েক দিন প্রভু ওইখানে থাকিলেন। প্রভুর তৈজসপত্র সবে এক জোড়া খড়ম, একখানা কন্থা, একটি জলপাত্র ও দুই-চারিখানা কৌপীন। সুতরাং প্রভুর রাত্রিবাস যেখানে-সেখানে করিলেই হইত। প্রভু মধ্যাহ্নের নির্মিত উপবনে আগমন করেন, অপর সময় সুন্দরাচলে শ্রীজগন্নাথ-দেবের সম্মুখে, কি অন্যান্য উপবনে, ভক্তগণ লইযা কীর্তন করেন। অধিক রাত্র হইলে রাত্রিবাসের জন্য উপবনে শয়ন করিতে আসেন; তখন প্রভুর দেহে কখন রাধাকৃষ্ণ-ভাব একেবারে উদয় হয়, আবার কখন শ্রীকৃষ্ণ ও কখন শ্রীরাধা-ভাব প্রকাশ করেন। কখন সহজ জ্ঞান হয়, কিন্তু আবেশ একেবারে যায় না। এই সুন্দরাচলে প্রভু সচেতন আছেন, ভক্তগণের সঙ্গে হাস্যকৌতুক, তত্ত্ব-আলাপ, এমন কি ভক্তগণের গার্হস্থ্য-কথা অল্প স্বল্প চর্চা করিতেছেন, তবুও তাঁহার মনে অটল বিশ্বাস যে,—শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীমতী রাধা ও তাঁহার সখীগণ লইয়া বিহার করিতেছেন—এই ভাবে প্রভু আনন্দে বিভোর। তখন তাঁহার কৃষ্ণ-বিরহ, কি কৃষ্ণ লাগি ক্রন্দন নাই।

শ্রীনবদ্বীপ হইতে দুইশত ভক্ত আসিয়াছেন, নীলাচলেও শ্রীগৌরাঙ্গের বহু ভক্ত হইয়াছেন। ইহাদের ইচ্ছা এই সকল ভক্ত এবং প্রভুর সঙ্গে যে কয়টি সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহাদের সহ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন। সুতরাং প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে, প্রায় চারি শত লোকের আয়োজন করিতে হয়। রথের যে নয় দিবস জগন্নাথ সুন্দরাচলে রহিবেন, তাহা গৌড়বাসী নয় জন মুখ্যভক্ত বাটিয়া লইলেন। ইঁহারা রোজ এক এক জন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার অধিকার পাইলেন। আর গৌড়বাসী ভক্তগণ যে চারিমাস নীলাচলে থাকিবেন, এই চারিমাস ১২০ জনে ভাগ করিয়া লইলেন। তাহাতেও যদি না কুলায়, তখন প্রত্যহ ২।৩ জনও নিমন্ত্রণ করিতে অধিকার পাইলেন। এইরূপে প্রত্যহ মহোৎসব হইতে লাগিল। তখনও প্রভু ভক্তগণ সহ আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সকলে জগন্নাথের সম্মুখে চলিলেন। সেখানে মধুর-মধুর নৃত্য-গীত হইতে লাগিল। মধুর বলি কেন, না, তখন সকলের ধারণা—শ্রীশ্যামসুন্দর এখন বৃন্দাবনে। গীতও সেই ভাবের। সেই আহ্লাদে চারিশত ভক্ত একেবারে ঝম্প দিলেন। প্রভুর তখনও ধারণা যে যমুনায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত জল-ক্রীড়া করিতেছেন। ভক্তগণের অনেকেরও সেই ভাব। ইঁহাদের মধ্যে 'পতিত-পাবন' অদ্বৈতাচার্য আছেন, 'অতি-বিজ্ঞ' সার্বভৌম আছেন, 'অতি-দীন' হরিদাস আছেন, 'অতি-জ্ঞানী' পরমানন্দপুরী আছেন, 'অতি-ভালমানুষ' গদাধর আছে, 'অতি-রুক্ষ' দামোদর পণ্ডিত আছেন; কিন্তু সকলেই মহা-চাঞ্চল্য আরম্ভ করিলেন। তখন অদ্বৈতাচার্য জীবনের দুঃখ ভুলিয়া গেলেন, পরমানন্দপুরী তাঁহার ধ্যান ছাড়িলেন, দামোদর তাঁহার শাসন শিথিল করিলেন। এক কথায়

সকলে ব্রজবালকের ন্যায় জল-খেলা করিতে লাগিলেন। যদি একটি পাগল জলে সন্তরণ কি ক্রীড়া করে, তবে চারিশত লোকে উহা দেখিতে দৌড়ায়। যদি চারিশত পাগল এইরূপ জলে গণ্ডগোল করে, সে যে কি ব্যাপার অনুভব করুন। একটি ভব্য-লোকও জলে ঐরূপ পাগলামি করিলে, বহুতর লোক রহস্য দেখিতে যায়। কিন্তু এই চারিশত ভব্যলোকে, প্রভু স্বয়ং, ভুবনবিখ্যাত নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক সার্বভৌম, বিদ্যানগরের অধিকারী রামানন্দ রায় প্রভৃতি জল-ক্রীড়া করিতেছেন, কাজেই লক্ষ লক্ষ লোক দেখিতেছেন।

পূর্বে ভোজনে ভজনের কথা বলিয়াছি, জল-ক্রীড়ায় ভজনের বিষয়ে অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই। প্রভুর এই চারিশত ভক্ত, ইহারা প্রায় সকলেই গৃহী, অনেকেই ধনসম্পদ ও খ্যাতাপন্ন লোক। নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ আষাঢ় হইতে আশ্বিন, কি ইহারও অধিক কাল দেশ, ঘর-বাড়ী ও স্ত্রী-পুত্র ফেলিয়া দিবানিশি কেবল প্রেমানন্দে ভাসিতেছেন। কোথায় কে শুনিয়াছেন যে, চারিশত লোকে চারিমাস অহোরহ কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ মত্ত রহিয়াছেন। এ ভজনে যাগ-যজ্ঞ কি মন্ত্র-তন্ত্র নাই; তবে ভজন কি লইয়া,—না, স্নান আহার নৃত্যগীত ও উদ্যান ভ্রমণ লইয়া। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মে কোন প্রবৃত্তি-ধ্বংসের প্রয়োজন নাই; তবে এই সমুদয় কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে। সকল প্রবৃত্তিরই প্রয়োজন আছে, নতুবা শ্রীভগবান্ উহা দিতেন না। আর সমুদয় প্রবৃত্তির সদ্ব্যবহার-শিক্ষাই শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্মের সার উদ্দেশ্য।

সকলে তখন শ্রীকৃষ্ণের রাখালগণের সহিত জলক্রীড়ার স্ফূর্তি হইয়াছে। তাঁহাদের তখন লজ্জা নাই, গুরুজন বলিয়া সমীহ নাই। জলে নানাপ্রকার রহস্য করিতে করিতে জল-যুদ্ধ বাধিয়া গেল। যুদ্ধ হইল নিতাই ও অদ্বৈতে; হারিয়া নিতাইকে গালি দিতে লাগিলেন। গদাধরের গুরু প্রেমনিধি ও স্বরূপে যুদ্ধ বাধিয়া সমান সমান হইল। মুকুন্দ ও মুরারিতে বাধিল—উভয়েই বৈদ্য। বৃদ্ধ শ্রীবাসের সহিত নবীন গদাধরের বাধিল—শেষে রামানন্দ ও সার্বভৌম ঘোরতর বাধিয়া গেল। উভয়েই উড়িষ্যার রাজার উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ইহাদের চাঞ্চল্য দেখিয়া সকলে অবাক হইল। প্রভু দর্শকগণের মনের ভাব বুঝিয়া গোপীনাথকে বলিলেন, "ভট্টাচার্য ও রামরায়কে একটু শান্ত হইতে বল। উভয়ে পরমপণ্ডিত ও গম্ভীর, লোকে কি বলিবে?" গোপীনাথ বলিলেন, "ঠাকুর! ভুবনবিখ্যাত সার্বভৌম-ঠাকুরের বালচাপল্য, ইহা তোমার কৃপার সাক্ষী। ইনি কি ছিলেন, আর কি হইয়াছেন।" এখন স্বয়ং প্রভুর কাণ্ড শুনুন। শ্রীঅদ্বৈতকে জলের উপর পৃষ্ঠাবলম্বনে শয়ন করাইয়া আপনি তাঁহার হৃদয়ের উপর পৃষ্ঠাবলম্বনে শয়ন করিয়া জলে ভাসিতে লাগিলেন। তখন মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি এবং হাত ধরাধরি করিয়া "কৃষ্ণ", "কৃষ্ণ" বলিয়া নৃত্যও হইতেছে।

স্নানের পরে সকলে উদ্যানে আসিয়া ভোজনে বসিলেন। প্রত্যহ একই উদ্যানে মহোৎসব হয় না। সেখানে, মহারাজের কৃপায় বহুতর উপবন পূর্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল। চারিশত ভক্ত ভোজনে বসিলেন। ভোজনান্তে মহোৎসব-কর্তা সকলকে মালা-চন্দনে ভূষিত করিলেন। একটু বিশ্রাম করিয়া সকলে বন-বিহারে চলিলেন। এই উপবন কিরূপ? না, ইহাতে—

"নবজাতি কুন্দ-করবীর যূথিকা নবমালিকা-ললিতমাধবীচয়ৈঃ।

বকুলৈ রসালশিশুভিশ্চ চম্পকৈঃ পরিতঃ সমাবৃতমমন্দবিভ্রমং"। ৪ চৈ-চ কাব্য অর্থাৎ অভিনব-জাতি কুন্দ, করবীর-যূথিকা, নবমল্লিকা, মনোহর মাধবী-সমূহ, বকুল চম্পক, রসাল আম্র-শিশু-বৃক্ষে সমাবৃত উপবনে ভক্তগণ সহ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবেশ করিলেন। যথা চরিতামৃতে—

"বৃক্ষ বল্লি প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে। ভৃঙ্গ পিক গায়, বহি শীতল-পবনে।।"

উপবনে প্রবেশ করিয়া প্রভুর মনে স্ফূর্তি হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, আর

সেখানে প্রভুও গিয়াছেন। তখন প্রত্যেক বৃক্ষ ও লতার প্রতি প্রভুর গাঢ় মমতা উপস্থিত হইল। যথা চৈতন্যচরিত কাব্য ১৮ সর্গ--

"বিলসৎ-কলকণ্ঠ-কাকলীং কলয়ন্ কোমল-চিত্তবৃত্তিকঃ।
মধুরং মধুরোৎকরধ্বনিং শ্রবণেনৈব বিরাজতে"।। ৪

প্রভুর মনের ভাব যে, তাহারা সকলেই বৃন্দাবনবাসী, কাজেই তাঁহার 'নিজ-জন', কোকিল কুহুরব ও ভৃঙ্গ গুণ গুণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা করিতেছে।

"প্রতিকূলরুহমূলমুল্লসন্ প্রতিবল্লি প্রতিকুঞ্জমঞ্জনা।
প্রতিসৈকতরঞ্জিতস্থলং বিলসন্ ভ্রাজতি তত্র তত্র সঃ।।"

প্রতি কুঞ্জ, প্রতি লতা, প্রতি বৃক্ষ—যেন তাঁহার পরিচিত, ইহা ভাবিয়া এবং তাহাদিগকে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে। তাঁহার পার্শ্বে মুকুন্দের ভ্রাতা বাসুদেব দত্ত ও অন্যান্য ভক্তগণ দাঁড়াইয়া। তাঁহারাও সেই রসে মজিয়া গিয়াছেন। তখন বাসুদেব সেই আনন্দের তরঙ্গে মুগ্ধ হইয়া গীত আরম্ভ করিলেন। মধুর গীত কাহাকে বলি, না যাহার সমুদয় অঙ্গ, মিলন, সৌন্দর্য প্রভৃতি শুভদ্বারা গঠিত। যথা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবাইত বংশীবদনের গীত—"মধুর-মধুর বংশী বাজে বনে। ধ্রু। পরমামৃত সিঞ্চিত ভেল ত্রিভুবন, গোকুলনাথ বেণু গানে" ইত্যাদি।

এই গীত শ্রবণে প্রভুর অঙ্গ এলাইয়া পড়িল এবং আনন্দে মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যথা—(চৈতন্যচরিত ১৭ সর্গ)

"অষ্টভাববলিতং সতু যুগপথৎ শ্রীমদঙ্গতলতঃ পরিকালয়ন্।।
আননর্ত্তরভসাদবশ-তনুর্গায়তোঽস্য মধুরং বহু রচয়ন্"।। ৩৬

এক এক বৃক্ষতলে প্রভু একা নৃত্য করিতেছেন ও বাসুদেব একা গীত গাইতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে প্রভু দেখেন যে, সম্মুখে আর একটি বৃক্ষ,—সেও তাঁহার সখী ও তাঁহার কৃষ্ণের প্রিয় বস্তু। তখন প্রভু ভাবিতেছেন যে, যেন সেই বৃক্ষটি মধুর হাসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। অমনি এ বৃক্ষতল ত্যাগ করিয়া সেই বৃক্ষের তলে যাইয়া প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং বাসুদেবও নূতন পদ ধরিলেন। আর ভক্তগণ স্তব্ধ হইয়া এই লীলা দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক বৃক্ষ-পত্রের, বৃক্ষ-কুসুমে ও পাতায়, অবশ্য মাধুর্য আছে। কিন্তু সে মাধুর্য সমভাবে আস্বাদ করিবার শক্তি সকলের নাই,—ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। প্রেমভক্তিজনে সেই মাধুর্যের আস্বাদ-শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি পায়। যখন হৃদয় ভক্তি কি প্রেমে আর্দ্র হয়, তখন এই আস্বাদ-শক্তি অতিশয় প্রবল হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন। তিনি কি দেখিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু ভক্তগণ দেখিতেছেন যে, ঠাকুরের নৃত্যে সমস্ত বন প্রফুল্ল হইয়াছে, বৃক্ষ ও লতা কুসুমিত হইয়াছে, প্রত্যেক কুঞ্জ কুসুমাবৃত হইয়াছে ও তাহাতে ভৃঙ্গগণ বসিয়া উন্মত্ত মধুপান করিতেছে।

গৌর অবতারে নৃত্যকারী দুইজন, আর সুন্দর পুরুষ চারিজন। সুন্দর পুরুষের মধ্যে সৌন্দর্য সর্বাপেক্ষা প্রধান শ্রীগৌরাঙ্গ, তাঁহার নীচে শ্রীগদাধর, তাঁহার নীচে শ্রীবক্রেশ্বর ও শ্রীরঘুনন্দন। আর নৃত্যকারীর মধ্যে প্রধান দুই জন,—প্রথম শ্রীগৌরাঙ্গ, দ্বিতীয় শ্রীবক্রেশ্বর। অতএব নৃত্য ও সৌন্দর্যে বক্রেশ্বর অদ্বিতীয়,—প্রভুর ভক্তগণের মধ্যে সর্বপ্রধান। এই বক্রেশ্বরের নৃত্য দেখিলে অতিবড় পাষণ্ড, অতিশয় পাপী ও অতিবড় নাস্তিক, শ্রীভগবদ্ভক্তি কর্তৃক পরিপ্লুত হইতেন। বক্রেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গের মর্মী-ভক্তের মধ্যে একজন প্রধান। ইহা হইতে "নিমানন্দ-সম্প্রদায়" প্রচলিত হয়। ইহারা "নিমাইপণ্ডিত ও বিষ্ণুপ্রিয়া" ভজন করেন। ইহারা মাধুর্য-উপাসক, তাই প্রভুর লীলার মধ্যে মাধুর্য ভাবটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বক্রেশ্বরকে পার্শ্বে দেখিয়া তাহাকে নৃত্য করিতে বলিলেন এবং স্বয়ং গীত

ধরিলেন। ঠাকুর গাইতে আরম্ভ করিলে, স্বরূপাদি তাঁহার দোসর হইয়া সঙ্গে গাইতে লাগিলেন। যথা চরিতামৃতে—

"প্রভুর সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্তনীয়া গায়।দিক্‌বিদিক্ নাই প্রেমের বন্যায়।।"

বক্রেশ্বর নয়ন-রসায়ন মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। এই নৃত্য দেখিয়া শ্রীপ্রভু এত মুগ্ধ হইলেন যে, অতি-প্রেমে তাঁহাকে গাঢ়-আলিঙ্গন ও তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন। যথা চৈতন্য-চরিত কাব্যে (১৭ সর্গ)

"ক্ষণমপি পরিরভ্য বক্রেশ্বরং সরভসমনুচুম্বতি শ্রীযুতঃ।
ক্ষণমপি লঘুবিন্যাসন্ রাজতে সুমধুরুচির পাদপদ্মদ্বয়ম"।। ২৭

"শ্রীযুত গৌরচন্দ্র সহর্ষে কখনও বক্রেশ্বরকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতেছেন, কখনও বা সুমধুর পাদপদ্মদ্বয় ভূতলে শীঘ্র-শীঘ্র বিন্যাস করতঃ শোভা পাইতেছেন"।

"ক্ষণমপি পরিতো মুহুর্বিভ্রমং সহ পরিরভতেঽথ তং ভূয়শঃ।
লঘু ইঘু মধুরং কলং গায়তি স্মিথরচির রুচাক্ষণং দীপয়ন্"।। ২৮।।

গৌরচন্দ্র কখনও মুহুর্মুহুঃ বিবিধ বিলাস বিস্তার করতঃ পুনঃপুনঃ সেই বক্রেশ্বরকে আলিঙ্গন করিতেছেন, এবং সুমধুর হাস্যরুচিতে দিঙমণ্ডল উদ্দীপ্ত করিয়া সুমধুর অস্ফুট স্বরে মৃদু মৃদু গাইতেছেন।

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এই ভক্তগণকে প্রেমে চুম্বন দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে, জীবের প্রতি শ্রীভগবানের কত ভালবাসা। আর যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে কেবল ভক্তচূড়ামণি ভাবেন, তাঁহারাও বুঝিবেন যে, শ্রীভগবানের হৃদয়ে কত প্রেম আছে। যেহেতু ভক্তগণ শ্রীভগবানের বিন্দুমাত্র প্রেম পাইয়া থাকেন।

হোরা-পঞ্চমীতে নীলাচলে লক্ষ্মীবিজয় উৎসব হয়। তাহা দেখিতে প্রভু গমন করিলেন এবং দর্শনান্তে সুন্দরাচলে আসিলেন। নবম দিবসে শ্রীজগন্নাথ নীলাচলে চলিলেন; প্রভুও ভক্তগণ সহ রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন এবং রাজাও পাত্রমিত্রসহ সঙ্গে চলিলেন। রথ চলিতে চলিতে পট্টডোরী ছিঁড়িয়া গেল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ এক খণ্ড ছিন্ন ডোরী লইয়া কুলীনগ্রামবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা এই ডোরী গ্রহণ কর। প্রতিবর্ষে তোমাদিগকে জগন্নাথের এই পট্টডোরী আনিতে হইবে। এখন হইতে তোমরা ইহার যজমান হইলে। এই খণ্ড ডোরী দেখিয়া দৃঢ়রূপে উহা প্রস্তুত করিবা।" কুলীনগ্রামের প্রধান সত্যরাজখান বসু ও রামানন্দ বসু। তাঁহারা কুলীন কায়স্থ, মহা সম্ভ্রান্ত লোক। প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণকালে শ্রীরামানন্দকে দ্বারকার নিকট পাইয়াছিলেন। ইনি পদকর্তা। কুলীনগ্রামবাসীরা এইরূপে প্রভু কর্তৃক সম্মানিত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। সেই অবধি কুলীনগ্রামের বসু মহাশয়গণ জগন্নাথের পট্টডোরী যোগাইতেছেন।

প্রত্যহ মহোৎসব হইতে লাগিল। আর "একেক দিন একেক ভক্তগৃহে মহোৎসব। প্রভু সঙ্গে তথা ভোজন করে ভক্ত সব।।"

ভক্তগণ কখন প্রসাদ ক্রয় করেন, কখন বা আপনারা জুটিয়া ঘরে রন্ধন করেন। শ্রীঅদ্বৈত একদিবস তুলসী-পুষ্প-চন্দন-পাদ্য-অর্ঘ লইয়া আসিয়া প্রভুকে পূজা করিতে লাগিলেন। শ্রীপদে তুলসী দিতে গেলেন, কিন্তু ঠাকুর উহা দিতে দিলেন না। তখন প্রভুকে পাদ্য-অর্ঘ দিয়া তাঁহার অঙ্গে চন্দন লেপিয়া, তাঁহার মস্তকে তুলসী দিয়া, তাঁহার গলায় ফুলের মালা দিয়া, জোড় হস্তে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সম্বোধন করিয়া প্রাণের সহিত স্তব করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৌতুকী-প্রভু যেন এ সমুদয়ই হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। অল্প কিছু পূজার দ্রব্য অবশিষ্ট থাকিতে প্রভু বলিলেন, "এই পর্যন্ত থাকুক, এখন আমি তোমাকে পূজা করিব।" ইহাই বলিয়া, যেমন মহাদেবের পূজা হইয়া থাকে, সেইরূপ গালবাদ্য করিতে

করিতে, শ্রীঅদ্বৈতের দিকে হাসিয়া হাসিয়া সংস্কৃতে এই মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। যথা—"হে রাধে! হে কৃষ্ণ! হে রাম! হে বিষ্ণু! হে সীতে! হে রাম! হে শিব! তুমি যে হও সে হও, তোমাকে নমস্কার!"

শ্রীঅদ্বৈত নয়ন-জলে "শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া, আর প্রভু হাসিতে হাসিতে "শিবায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিলেন। কিন্তু ভক্তগণ বুঝিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশিবকে ও শ্রীশিব শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন।

তৎপরে শুভ জন্মাষ্টমী আসিলে প্রভু ভক্তগণসহ উৎসব করিলেন। এই মহোৎসবে প্রতাপরুদ্র সমস্ত ভক্তগণকে নূতন বস্ত্র দিলেন; আর প্রভুর মস্তকে জগন্নাথের প্রসাদী একখানি বহুমূল্য বস্ত্র বাঁধিয়া দিলেন। প্রভু তখন ভাবে বিভোর, কাজেই কিছুই জানিতে পারিলেন না; তারপর প্রভু ভক্তগণ লইয়া রামলীলা আস্বাদন করিলেন। শেষে দীপাবলী ও রাসলীলা হইল। এইরূপে চারিমাস ফুরাইল। তখন প্রভু ভক্তগণকে লইয়া বসিলেন এবং তাঁহারা যাইতেছেন ভাবিয়া বড় ব্যাকুল হইলেন। প্রভুর তনুখানি প্রেম দিয়া গড়া। তাহার বয়ঃক্রম সবে ২৭। ২৮ বৎসর। বাল্যকালে খেলার সঙ্গী, গুরুজন, নিজজন ও শিষ্য লইয়া এই চারিমাস পরমানন্দে কাটাইয়াছেন। প্রভু সংসার ত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাদিগের সঙ্গসুখে তিনি এতদিন নদীয়া ও সংসার-বাসসুখ অনুভব করিয়াছেন। এখন আবার সেই সন্ন্যাসী হইতেছেন! তবু সময় বুঝিয়া প্রভু ধৈর্য ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে আমার বন্ধুগণ! তোমরা গৃহী, গৃহে গমন কর। তবে কৃপা করিয়া প্রতি বৎসর রথের সময় শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে আসিও। আমি সেই উপলক্ষে তোমাদিগকে দেখিতে পাইব।" এই কথা শুনিয়া সকলে নীরবে নয়ন জল ফেলিতে লাগিলেন। প্রভুকে ফেলিয়া গৃহে গমন করেন ইহা কাহারও ইচ্ছা নয়, তখন তাহারা স্ত্রী পুত্র গৃহ সব ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যিনি গৃহী, তাহাকে প্রভু সংসার ত্যাগ করিতে দেন না; প্রভুর আজ্ঞায় অবশ্য তাহাদের গৃহে যাইতেই হইবে। প্রভু একটু নীরব থাকিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে বলিতেছেন, "আচার্য! তুমি কৃপা করিয়া মূর্খ, স্ত্রীলোক, চণ্ডাল প্রভৃতিকে কৃষ্ণনাম দিবা।" শ্রীঅদ্বৈত কৃতার্থ হইয়া সজল-নয়নে প্রভুর দিকে চাহিতে লাগিলেন। তৎপরে শ্রীগৌরাঙ্গ রাঘবকে বলিলেন, " তোমার নিষ্ঠা-প্রেমে আমি তোমার নিকট বিক্রীত। ভক্তগণ! রাঘবের কিরূপ সেবা শ্রবণ কর। অন্যান্য দ্রব্যের কথা থাকুক, তিনি কিরূপ নারিকেল-ভোগ দেন, তাহা মনে করিলে আনন্দ হয়। তাঁহার বাড়ীতে শত-শত নারিকেল গাছ আছে, সেখানে নারিকেলের মূল্য পাঁচগণ্ডা। কিন্তু যদি শুনেন যে, দশ ক্রোশ দূরে মিষ্টি নারিকেল আছে, তবে চারি পণ দিয়াও তাহা ক্রয় করিয়া আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভোগ দেন।"

মনুষ্য দুই প্রকারে নত হয়। নিন্দায় ও সুখ্যাতিতে। নিন্দায় জীব নত হয় কষ্ট পাইয়া; আর সুখ্যাতিতে নত হয় সুখ পাইয়া। প্রভু যতই রাঘবের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, ততই তিনি আপনাকে প্রভুর সুখ্যাতির অনুপযুক্ত ভাবিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রভু উঠিয়া রাঘবকে বিদায় আলিঙ্গন দিলেন এবং রাঘব চরণে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু শ্রীখণ্ডের প্রতিনিধিগণ পানে চাহিলেন। তাঁহাদের প্রধান মুকুন্দ। তিনি নরহরির দাদা ও রঘুনন্দনের পিতা! নরহরি আকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিলেই বিহ্বল হইতেন। তিনিও শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয়তম। রঘুনন্দন অতি রূপবান পুরুষ, মদনের অবতার। তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে শ্রীকৃষ্ণকে লাড়ু খাওয়াইয়া ছিলেন। সেই ঠাকুর অদ্যাপিও অর্ধভুক্ত লাড়ু হাতে করিয়া শ্রীখণ্ডে বিরাজ করিতেছেন। প্রভু বলিলেন, "মুকুন্দ! তুমি ঠিক বল দেখি, তুমি রঘুনন্দনের পিতা, না রঘুনন্দন তোমার পিতা?" মুকুন্দ বলিলেন, "রঘু আমার পিতা, আমি তাহার পুত্র।" প্রভু বলিলেন, "এ কথা ঠিক। যাহার কাছে ভক্তি শিক্ষা করা যায় সেই

পিতা। শৈশব হইতেই রঘুনন্দন ভক্তের আদর্শ-স্বরূপ হইয়াছেন।" ভক্তগণ, এখন মুকুন্দের কথা শুন। ইনি গৌড়ের মুসলমান-রাজার বৈদ্য। ইনি রাজসেবা করেন বটে, কিন্তু ইহার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম গুপ্তভাবে থাকে, কেহ জানিতে পারে না। একদিন রাজা উচ্চ টুঙ্গির উপর বসিয়া শ্রীমুকুন্দের কাছে নিজ পীড়ার কথা বলিতেছেন, এমন সময় একজন ভৃত্য ময়ূরপুচ্ছের পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস দিতে আসিল। ময়ূরপুচ্ছ দেখিবামাত্র মুকুন্দের শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্তি হইল, আর অমনিই তিনি মূর্ছিত হইয়া উচ্চ টুঙ্গি হইতে নিম্নে পড়িয়া গেলেন। রাজা ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিলেন এবং প্রাণ আছে দেখিয়া সুখী হইলেন। মুকুন্দ চেতনা পাইলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ত ব্যথা পাও নাই?" মুকুন্দ বলিলেন, "বড় একটা নয়।" তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অচেতন হইলে কেন? মুকুন্দ বলিলেন যে, তাঁহার মৃগী-রোগ আছে। কিন্তু রাজার তাহা বিশ্বাস হইল না, কারণ প্রেম ও মৃগী-রোগে অচেতনের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা সকলেই বুঝিতে পারে, রাজাও বুঝিলেন।

প্রভু তারপর রঘুনন্দনের কথা বলিতে লাগিলেন; বলিলেন, "শ্রীখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের সন্নিকটে পুষ্করিণী। তাহার তীরে কদম্ববৃক্ষে কৃষ্ণের কৃপায় রঘুনন্দন প্রত্যহ একটি করিয়া কদম্বফুল পান ও তাহা দিয়া কৃষ্ণের পূজা করেন। রঘুনন্দন শ্রীকৃষ্ণপূজা করিতে থাকুন, নরহরি ভক্তগণের সঙ্গে যেমন আছেন তেমনি থাকুন, আর তুমি মুকুন্দ, শ্রীকৃষ্ণ ভজন ও পরিবার প্রতিপালন কর।" শ্রীখণ্ডের গোস্বামীগণ জাতিতে বৈদ্য, তবু তাঁহাদের পদ অতি বড়। নরহরির গৌর-প্রেমই খণ্ডবাসীগণের সকল সম্পত্তির কারণ। নরহরি হইতেই আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বরাগের পদ পাইয়াছি। নরহরির ভজনীয় বস্তু গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া। তিনি নিজগৃহে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীমূর্তি স্থাপন করেন। নরহরি হইতে ত্রিলোচনদাসকে ও লোচনের চৈতন্যমঙ্গল পাইয়াছি। তাঁহা হইতেই শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভু ও নরোত্তম ঠাকুরমহাশয়। নরহরির বড় দুঃখ যে সাধারণ লোকে প্রভুকে চিনিল না। তাঁহার মনের সাধ প্রভুর লীলা বাংলায় লেখা হয় এবং উহা পড়িয়া সকলেই উদ্ধার হয়। তাঁহার এই অকিঞ্চনে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গলের সৃষ্টি। কিন্তু এই দুইখানি গ্রন্থে নরহরির সাধ মিটে নাই। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী রাখিয়া গিয়াছেন—"প্রভুর লীলা লিখিবে যে, বহু পরে জন্মিবে সে।" এই কথা অনুসারে প্রভুর লীলা পরে লেখা হইবে। আমরা কেবল সেই লীলারূপ অট্টালিকার ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া যাইতেছি। শ্রীনরহরি জয়যুক্ত হউক, তাঁহা হইতেই সকলে শ্রীগৌরাঙ্গকে জানিয়াছে।

প্রভু এইরূপে এক-এক ভক্তের গুণ বর্ণনা করিতেছেন, আর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইতেছেন। যাঁহার গুণ বর্ণনা করিতেছেন, তিনি ভাবিতেছেন যে, প্রভু অদোষদর্শী, তাই তাঁহার সুখ্যাতি করিতেছেন, আদপে তিনি অতি মন্দ। প্রভু যখন তাঁহাকে এত ভাল বলিয়া বিশ্বাস করেন, তখন তাহার ভাল হইতেই হইবে। এইরূপ মনোভাবের মধ্যে প্রভুর করুণস্বর শুনিয়া ও তাঁহার আলিঙ্গন পাইয়া ভক্তগণ তখনি মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। মহেশ্বর বিশারদের দুই পুত্র,—সার্বভৌম ও বাচস্পতি। সার্বভৌম প্রভুকে আশ্রয় করিয়াছেন, নদীয়ায় থাকিয়া তাহা শুনিয়া বাচস্পতিও প্রভুর চরণে শরণ লইয়াছেন, এবং তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। প্রভু সেই বাচস্পতির নিকট বিদায় লইলেন।

তৎপরে প্রভু কুলীনগ্রামবাসীদিগের নিকট বিদায় চাহিলেন। শেষে বলিলেন, "তোমরা প্রতি বৎসর পট্টডোরী লইয়া আসিবে। হে কুলীনগ্রামবাসীগণ। তোমাদের গ্রামের কুক্কুর পর্যন্ত আমার প্রিয়। গুণরাজ খান শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, উহার আরম্ভে আছে, "নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।' আমি সেই কথায় তোমাদের বংশের হস্তে বিকাইয়া আছি।" এই কথা শুনিয়া রামানন্দ ও গুণরাজের ভ্রাতা সত্যরাজ খান কৃতজ্ঞতা-রসে মুগ্ধ ও গললগ্নী-কৃতবাস হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। সেই সময় তাঁহারা

প্রভুকে প্রশ্ন করিলেন, "বৈষ্ণব কাহাকে বলে?" প্রভু বলিলেন, "যে কৃষ্ণনাম করে সেই বৈষ্ণব। সে যদি দীক্ষা না পায়, কি পুরশ্চরণ না করে, তবুও সে বৈষ্ণব।" অনেকে বলেন, গুণরাজ খানের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বাংলার প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

তারপর শিবানন্দ সেনের দিকে চাহিয়া প্রভু বলিতেছেন, 'তুমি আমার নিজজন। এই সব ভক্তকে তুমি প্রতিবর্ষে পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আনিয়া থাক। তোমাকে আর একটি ভার দিব।' ইহা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মুকুন্দের দাদা বাসুদেব দত্তের পানে চাহিয়া বলিলেন, "বাসুদেব গৃহী, ইহার সঞ্চয় প্রয়োজন। কিন্তু উঁনি উদার চরিত, যে দিবস যাহা পান তাহাই ব্যয় করেন। তুমি ইহার সংসারের ভার লইয়া যাহাতে ইহার কিছু সঞ্চয় হয় তাহা করিবা!" এই কথায় পাঠক অবশ্যই বুঝিতেছেন যে, ইহাদের উভয়ের বাড়ী কাঞ্চনপল্লী বা কাচনাপাড়ায়। তাবপর প্রভু বলিলেন, "বাসুদেব দত্তের কথা কি বলিব। তিনি একটি বস্তু!—নিরীহ, লাজুক, দয়ালু ও ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম হইলে যতগুলি গুণ উপস্থিত হয়, সমুদয় তাঁহাতে হইয়াছে।" প্রভু তাঁহার গুণ বর্ণনা আরম্ভ করিলে বাসুদেব বিশেষ লজ্জা পাইলেন; ক্রমে তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন যে, শ্রীভগবান তাঁহার স্তুতি করিতেছেন, অথচ তিনি অতি মলিন! ইহাতে তাঁহার নিতান্ত অপরাধ হইতেছে। ইহা অপেক্ষা অধিক দণ্ড আর নাই। শ্রীভগবান তাঁহাকে সাধুবাদ দিতেছেন, সে ঋণ শোধের একমাত্র উপায় সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি প্রভুর দুটি চরণ ধরিয়া বলিলেন, "প্রভু দয়াময়! তুমি সর্বশক্তিসম্পন্ন, সবই পার। তোমার জীবগণের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছ। এ জন্য তোমার পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। তুমি জীবের সমুদায় পাপ আমাকে দাও, আমি উহা লইয়া নরক ভোগ করি, আর তোমার সমুদায় জীব, উদ্ধার হইয়া সুখী হউক। জীবের দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রভু আমার দুঃখ মোচন কর। তুমি আমাকে যে এত কৃপা করিতেছ, সে ঋণ পরিশোধেরও আমার অন্য উপায় নাই।"

এরূপ প্রার্থনা ত্রিজগতে কেহ কখনও করিতে পারেন নাই। যদি এরূপ প্রাথনা কেহ করেন, সে মুখে। কিন্তু বাসুদেব ভক্তশিরোমণি, তিনি যাঁহাকে স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন, তাঁহার চরণ ধরিয়া নিবেদন করিতেছেন, ইহা ভণ্ডামি হইতেই পারে না। ভণ্ডামি করিলে, উপস্থিত সকলেই বিরক্ত হইতেন। কিন্তু বাসুদেবের প্রার্থনা শুনিয়া স্বর্গমর্ত যেন স্তম্ভিত হইল। ভক্তগণ অবাক হইয়া, কি করিবেন কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাসু, প্রভুর চরণ ধরিয়া সাশ্রু-নয়নে তাঁহার মুখ-পানে চাহিয়া তাঁহার বর প্রাপ্তির নিমিত্ত ভঙ্গী-দ্বারা অনুনয় করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া একটু চুপ করিলেন। তারপর, বাসুদেবের মনের ভাব বুঝিয়া আপনার হৃদয়-তরঙ্গ গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পারিলেন না। যেহেতু অশ্রু কম্প প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবগুলি, একেবারে তাঁহার শরীরে উপস্থিত হইল। ভক্তগণ তখন সেই সঙ্গে বিস্ময়ে আনন্দে ও করুণা রসে পরিপ্লুত হইয়া, কেহ রোদন, কেহ হাস্য, কেহ বা নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভু একটু ধৈর্য ধরিয়া ভগ্ন স্বরে বলিতেছেন, "বাসুদেব! তুমি যে প্রার্থনা করিলে ইহা তোমার পক্ষে বেশী কিছু নহে, কারণ তুমি স্বয়ং প্রহ্লাদ,—কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা-পাত্র।" ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। একটু চুপ করিয়া মনের বেগ দমন করিয়া আবার বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, তিনি ভক্তের প্রার্থনার অন্যথা করেন না; তাঁহার পক্ষে সমুদায় জীব উদ্ধার করাও কঠিন নহে। অবশ্য তিনি তাঁহার ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তবে তুমি যে উপায়ে বলিতেছ, সেরূপে নহে। কারণ তোমার মত ভক্তকে তিনি দুঃখ দিতে পারেন না।"

জীবগণ সাধন-বলে কতদূর উন্নত হইতে পারেন, তাহার সীমা স্থির করা যায় না। যখন

দেখিলাম যে, যীশু তাঁহার হত্যাকারীগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, "হে ভগবান্! এই মূর্খগণকে ক্ষমা কর।" তখন ভাবিলাম ইহা অপেক্ষা ঔদার্য আর হইতে পারে না। পরে যখন দেখিলাম হরিদাস বলিতেছেন, "হে ভগবান্! এই যে ইহারা আমাকে নিষ্ঠুর-রূপে প্রহার করিতেছে, ইহাতে আমার দুঃখ নাই। তবু ইহাদের গতি কি হইবে, ভাবিয়া আমি দুঃখ পাইতেছি। হে প্রভু! তুমি ইহাদিগকে কৃপা করিয়া উদ্ধার কর।" তখন দেখিলাম যে, এটি আরও বড় কথা। এখন দেখিতেছি যে, বাসুদেব সরল মনে সমুদায় জীবের পাপ আপন-স্কন্দে বহন করিবার প্রার্থনা করিতেছেন! এরূপ কথা কখন শুনি নাই; আর যে শুনিব, তারা মনে কখন উদয়ও হয় নাই। ইহা অপেক্ষা বড় কথাও অননুভবনীয়। শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু, তাহা তাঁহার ভক্তগণের মাহাত্ম্য হইতে কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হইতে পারে। কথায় বলে, ফল দেখিয়া বৃক্ষের বিচার হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু, আর তাঁহার প্রচারিত ধর্ম কিরূপ শক্তিসম্পন্ন, তাহা তাঁহার ভক্তগণকে দেখিয়া বিচার করুন।

তারপরে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে সম্বোধন করিবেন ভাবিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিলেন। অমনি শ্রীপ্রভুর একেবারে শ্রীনবদ্বীপ স্ফূর্তি হইল। শ্রীবাস তাঁহার পিতার বন্ধু, তাঁহার প্রতিবাসী ও তাঁহার মাতৃসখী মালিনীর পতি। শ্রীবাসের বাড়ী তাঁহার নবদ্বীপ-লীলার বৃন্দাবন। তখন তিনি যে নিমাইপণ্ডিত, নবদ্বীপে তাঁহার বাড়ী-ঘর আছে, তাঁহার বৃদ্ধা জননী জীবিতা, যুবতী ঘরণী বর্তমান, আর এ সমুদয় বিসর্জন দিয়া তিনি এখন বৃক্ষতলবাসী হইয়াছেন, এ সকল কথা একেবারে তাঁহার হৃদয়মাঝে উদিত হইল। তাঁহার শৈশব-ক্রীড়া, তাঁহার বিদ্যাবিলাস, তাঁহার গৃহ ও ফুলের বাগান, তাঁহার মাতার সেবা, তাঁহার প্রিয়ার বিয়োগ-দশা—পর-পর মনে উদিত হইয়া শ্রীনিমাইয়ের হৃদয় ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিল। তখন তিনি অশ্রু-নয়নে ও রুদ্ধকণ্ঠে শ্রীবাসের গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত! বল, বল, আমার স্নেহময়ী মাতা ত বেঁচে আছেন?" প্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা ব্যতীত আর কিছু কেহ শুনিতেন না, কেহ কিছু বলিতেও সাহসী হইতেন না, আর প্রভুর হৃদয়মাঝে কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত আর কোন বস্তুর স্থানও ছিল না। যদি কখনও জননীর নাম করিতেন, সে ভক্তিভাবে,—স্নেহভাবে নয়। কাজেই প্রভুর যে মাতার উপর প্রগাঢ় ভালবাসা আছে, তাহা কেহ জানিতেও পারিতেন না,—তিনি সর্বদাই মায়ার অতীত থাকিতেন। এরূপ অবস্থায় তিনি ক্ষুদ্রজীবের নিকট ভক্তি কি দয়া পাইয়া থাকেন, কিন্তু স্নেহ মমতা কি ভালবাসা পান না। তাই জীবের সহিত প্রীতি স্থাপন নিমিত্ত শ্রীভগবানের মায়া লইতে হয়। তাই শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ যদি চিরদিন মায়াতীত হইয়া থাকিতেন, তবে তিনি জীবের চিত্ত এরূপ হরণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার মুখে ঘর-সংসারের কথা অতি বিরল বলিয়া, মধু হইতে মধু লাগিত। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন "আমার মাতা কি বেঁচে আছেন?"—এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন অতি মধুর মায়ারসে মুগ্ধ হইয়া সকলে কান্দিয়া উঠিলেন। শ্রীনিমাই বলিতেছেন, "আমি কি বাতুলতা করিয়াছি! এমন কি কেহ করে? আমার সন্ন্যাসী হইবার কি প্রয়োজন ছিল? কৃষ্ণ-প্রেম জীবনে পরম-পুরুষার্থ, তজ্জন্য ত সন্ন্যাসী হইবার প্রয়োজন নাই। এখন বুঝিতেছি, যখন সন্ন্যাস লইয়াছিলাম, তখন আমার মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল।"

শ্রীপ্রভুকে ক্ষুদ্র গ্রন্থকার একটি কথা স্মরণ করিয়া দিতেছেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন বলিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার; কিন্তু প্রভু নীলাচলে, আর তাঁহারা নবদ্বীপে, সর্বদা তাঁহার সংবাদ পাইতেছেন না। তবে তাঁহাদের দুঃখ এত অধিক কি? তাঁহারা দেখিতেছেন, তাঁহাদের নিজ-জন শ্রীগৌরাঙ্গ ত্রিজগতে পূজিত হইতেছেন, ইহাতেও তাঁহাদের দুঃখের লাঘব হইতেছে। আর প্রভু যদি সন্ন্যাসী না হইতেন, তবে কি জীবে তাঁহার ধর্ম লইতে পারিত?

নিমাই বলিতেছেন, "আমার কর্তব্য বৃদ্ধা জননীর সেবা করা। তাহা না করিয়া আমি এ কি করিতেছি! আমি কাহার হাতে তাঁহাকে রাখিয়া আসিলাম? এ ঘোর সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া আমি আমার অতি সরলা, অতি বৃদ্ধা, অতি স্নেহময়ী জননীর পাদপদ্ম সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি! হে ভক্তগণ! আমার জননীর ঋণ কি আমি শোধ দিতে পারি? আমার প্রতি তাঁহার স্নেহের কি অবধি আছে? কোন দিন গৃহে শালগ্রামের ভোগের আয়োজন একটু অধিক হইলে, অমনি জননী ক্রন্দন করিতে করিতে আমাকে ডাকিয়া বলেন, 'নিমাই! তুমি ঘরে নাই, এ সব আমি কাহাকে দিই? তুমি মোচার ঘণ্ট বড় ভালবাস; এ মোচার ঘণ্ট আমার কে খাইবে?' মা নবদ্বীপে শোকে এইরূপে রোদন করেন, আর আমি নীলাচলে স্থির হইয়া ভজন করিতে পারি না। ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর শ্রীভগবানের ভাব হইল। তখন বলিতেছেন, "আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য মুহুর্মুহুঃ শ্রীনবদ্বীপে গমন করি, কিন্তু তবু তাহা পারি না। তাঁহার হৃদয়ের তরঙ্গ বর্ণনা করা অসাধ্য! যখন আমাকে দর্শন করেন, তখন আনন্দসাগরে ভাসেন; আবার আমার অদর্শনে আমার দর্শন স্বপ্ন বলিয়া ভাবেন। কখন বা আমি যাইয়া তাঁহার সম্মুখে প্রকৃতই বসিয়া ভোজন করি, তখন সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া আমাকে ভোজন করান। তাহার পর আবার ভ্রান্তি উপস্থিত হইলে ভাবেন যে, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এই বিজয়াদশমী-দিবসে আমি জননীর নিকটে বসিয়া ভোজন করিয়া আসিয়াছি।। পণ্ডিত! এ সমুদয় কথা জননীকে স্মরণ করাইয়া দিও; আর আমার হইয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা মাগিয়া লইও। বলিও, আমি তাঁহার অবোধ-শিশু, যদি না বুঝিয়া তাঁহাকে ত্যাগরূপ মহা-অপরাধ করিয়া থাকি, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন; আমি তাঁহারই আজ্ঞায় নীলাচলে বাস করিতেছি।" ইহা বলিতে বলিতে প্রভু ক্ষণকালের নিমিত্ত আবার নিমাই ভাবে বিহ্বল হইয়া 'মা' 'মা' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও অধীর হইয়া সেই সঙ্গে কাঁদিতে লাগিল।

পূর্বে বলিয়াছি যে জন্মষ্টমী দিবসে প্রভুর যখন মহা-আবেশ, তখন প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে একখানি বহুমূল্য প্রসাদী বস্ত্র দিয়াছিলেন। প্রভু চেতনা পাইয়া বস্ত্রখানি দেখিলেন; এবং উহা লইয়া কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন তখন পরমানন্দপুরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। জীবের ভক্তিপথ-শিক্ষাদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। পুরী গোঁসাই বলিলেন—"জগন্নাথের প্রসাদী-বস্ত্র ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, উহা বরং জননী শ্রীশচীদেবীকে পাঠাইয়া দাও!" প্রভু শ্রীবাসের গলা ধরিয়া বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে করিতে কষ্টে-সৃষ্টে ধৈর্য ধরিলেন। পরে সেই বহুমূল্য প্রসাদী-বস্ত্রের কথা স্মরণ করিয়া তাহা আনাইলেন, এবং বহুবিধ প্রসাদের সহিত উহা শ্রীবাসের হস্তে দিয়া কহিলেন, "পণ্ডিত! এই সমুদায় তাঁহার পুত্র নিমাই পাঠাইয়াছে বলিয়া জননীকে অর্পণ করিবে!" প্রভু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাম পর্যন্ত করিলেন না,—সন্ন্যাসীদের ঘরণীর নাম মুখে আনিতেও নাই। তবে তিনি প্রিয়াজীকে যে ভুলেন নাই, তাহার নিদর্শন তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। প্রভু আমার এখন কাঙ্গাল জননীর নিকট আপনার স্ত্রীর নিমিত্ত বহুমূল্য শাড়ী পাঠাইতেছেন, ইহা মনে হইলে কার না হৃদয় দ্রব হইবে?

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে অনুরাগে ভজনা করেন, তাঁহারা অবশ্য তাঁহার বক্ষবিলাসিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকেও ভজনা করেন। তাঁহারা প্রভুর নবদ্বীপের এই বস্ত্র-প্রেরণ-কার্যে ইহাই অনুভব করেন যে, শচীদেবীর সুবর্ণসূত্রগ্রথিত বস্ত্রে কোন প্রয়োজন ছিল না, ইহাই তাঁহার প্রিয়ার নিমিত্তই পাঠাইয়া দিলেন। এ কথা বলি কেন,—না, তাঁহার ভুবনমোহন স্বামী তাঁহাকে বিস্মৃত হয়েন নাই, এবং আগ্রহ করিয়া সুবর্ণসূত্রগ্রথিত শাড়ী পাঠাইয়াছেন, ইহা ভাবিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া সুখী হইবেন। আবার ভক্তগণ এই কার্যের দ্বারা ইহাও ভাবিয়া

থাকেন যে, প্রভুর ইচ্ছা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে এই শাড়ী পরাইয়া তাহার বামে বসাইয়া ভজন করিতে হইবে। ভক্তগণকে বিদায়কালে প্রভু চেষ্টা করিয়া ধৈর্য ধরিলেন, তবে যে তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি-বিরহ দুঃখ খেলিতেছে, তাহা তাঁহার মলিন বদন দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল। ভক্তগণ চারিমাস নীলাচলে থাকিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

"চৈতন্য আদেশ পেয়ে, নিতাই বিদায় হয়ে, আইলেন শ্রীগৌর মণ্ডলে।
সঙ্গে ভাই অভিরাম, গৌরীদাস গুণধাম, কীর্তন বিহার কুতূহলে।।
রামাই সুন্দরানন্দ, বাসু আদি ভক্তবৃন্দ, সতত কীর্তন রসে ভোলা।
পাণিহাটী গ্রামে আসি, গঙ্গাতীরে পরকাশি, রাঘব পণ্ডিত সনে মেলা।।
সকল ভৈকত লৈয়া, গৌরপ্রেমে মত্ত হৈয়া, বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায়।
পতিত দুর্গত দেখি, হইয়া করুণ আঁখি, প্রেমরত্ন জগতে বিলায়।।
হরিনাম-চিন্তামণি, দিয়া জীবে কৈল ধনী, পাপ-তাপ দুঃখ দূরে গেল।
পড়িয়া বিষম ফাঁদে, না ভজি নিতাই চাঁদে, প্রেমদাস বঞ্চিত হইল।।"

প্রভু যে একেবারে একা রহিলেন তা নয়। প্রভুর সঙ্গে গৌড়বাসীগণের মধ্যে সার্বভৌম, গোপীনাথ, স্বরূপ, নিত্যানন্দ, গদাধর, হরিদাস, জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, অন্য হরিদাস, রামদাস, গদাধরদাস, বাসুঘোষ (পদকর্তা) রহিলেন। শ্রীগদাধর ক্ষেত্রে সন্ন্যাস লইয়া যমেশ্বর-টোটায় গোপীনাথের সেবা আরম্ভ করিলেন। সে ঠাকুর অদ্যাপি বিরাজিত। শ্রীনিত্যানন্দ সমস্ত নীলাচলে খেলা ও ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন শ্রীমন্দির যাইয়া বলরামকে ধরেন, কখনও ঠাকুরের মালা কাড়িয়া লইয়া নিজে গলায় পরেন, সেবাইতগণ সচল জগন্নাথের অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের দাদাকে ভয়ে কিছু বলিতে পারেন না। প্রভু বা কোথায় আর নিতাই বা কোথায়? কখন নিতাইচাঁদ একেবারে নিরুদ্দেশ। শ্রীনিতাইয়ের কোন নিয়ম পালন নাই, যেখানে-সেখানে প্রসাদ-ভোজন কীর্তন ও নৃত্য করিয়া ভ্রমণ করেন।

প্রভুর ভক্ত ভাবে হৃদয়ে দুটি ব্যথা,—কৃষ্ণ-বিরহ ও জীবের দুঃখ। শ্রীভগবান্ এরূপ সর্বাঙ্গ-সুন্দর প্রভু, তবু অকৃতজ্ঞ ও কঠিন জীব তাঁহাকে ভুলিয়া নানা কারণে অনর্থক দুঃখ পাইতেছে, প্রভুর মনে এই বড় দুঃখ। শ্রীভগবৎচরণ আশ্রয় না করিয়া দুঃখ পাইতেছে, এইরূপ মলিন জীব দর্শন করিয়া কখন কখন প্রভু ব্যাকুল ও ধৈর্যহারা হইয়া কান্দিয়া উঠেন। যথা প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বাসুর পদ—"কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া। পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া।"

যাহাতে জীব হরিনাম করিয়া সুখী হয় ইহাই প্রভুর নিতান্ত সাধ। একদিন কোন ভদ্রলোক নীলাচলে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন। কৌতুকী প্রভু তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি এই নিয়ম করিয়াছেন,—যে লক্ষেশ্বর নহে, তাহার গৃহে তিনি নিমন্ত্রণ লয়েন না। যে ভাল মানুষ নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন, তিনি ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "প্রভু! লক্ষ কোথা পাবো, সহস্র নাই।" তখন প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "আমি তাঁহাকেই লক্ষেশ্বর বলি, যিনি প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ করেন।" এই কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি সহর্ষে বলিলেন, "প্রভু আমি এই অবধি লক্ষ-নাম জপ করি।" প্রভুও বলিলেন, "তবে আমিও তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।" এইরূপে নীলাচলে নিয়ম হইল যে, লক্ষনাম জপ না করিলে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করা যায় না। কাজেই অনেকে লক্ষ নাম-জপ-রূপ সাধন গ্রহণ করিলেন।

এই হরিনাম বিতরণ অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম প্রচার কার্যে প্রভুর প্রধান সহায় দুইজন,—নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে আচণ্ডালকে কৃষ্ণনাম দিবার আজ্ঞা দিয়া গৌড়ে

পাঠাইয়াছেন। নিতাই নিকটে আছেন, ইহা প্রভুর ভাল লাগিতেছে না। তাঁহার মনের ভাব এই যে, নিজে আনন্দে নৃত্য না করিয়া, দুঃখী জীবকে নৃত্য করান তাঁহার কর্তব্য। একদিনে শ্রীনিতাইয়ের হাত ধরিয়া নিভৃতে বসিয়া প্রভু বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি গৌড়ে যাইয়া জীবগণকে উদ্ধার কর।" শ্রীপাদ বলিলেন, "উহা আমা দ্বারা হইবে না। এখানে যাহা বল তাহাই করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না।" প্রভু সেদিন আর কিছু বলিলেন না। আর এক দিন নিতাইকে লইয়া আবার বসিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাক, তবে আর জীব উদ্ধার হয় না।" নিতাই বলিলেন, "তোমার জীব তুমি উদ্ধার কর, আমি তোমার কাছে থাকিব।" ইহা শুনিয়া প্রভুর নয়নে ধারা বহিতে লাগিলে। তখন নিতাই আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি আবেগভরে বলিলেন, "প্রভু, কি আজ্ঞা বলুন, আমি তাহাই করিব!" প্রভু তখন নিতাইকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছেন, 'শ্রীপাদ! আমার মনে এই সাধ ছিল যে, আমি হরিনাম বিতরণ করিব, কিন্তু তাহা পারিলাম না। নাম বিতরণ করিতে যাইয়া নামের শক্তিতে আমার হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিল। তাই এখন আমাতে আর আমি নাই, ভাসিয়া চলিয়াছি। এখানে প্রভুর হৃদয়ের ব্যথা-বর্ণিত একটি প্রাচীন পদ দিব, যথা—"আমার মন যেন আজ করে রে কেমন, আমায় ধর নিতাই । ধ্রু।

নিতাই, জীবকে হরিনাম বিলাতে উঠিল ঢেউ প্রেম-নদীতে,
সেই তরঙ্গে আমি এখন ভাসিয়া যাই।।
যে ব্যথা আমার অন্তরে, এমন ব্যথিত কেবা—কব কারে,
জীবের দুঃখে আমার হিয়া বিদরিয়া যায়।
আমার সঞ্চিত ধন সব ফুরাইল জীব-উদ্ধার নাহি হলো,
ঋণের দায়ে আমি এখন বিকাইয়া যাই।।"

অর্থাৎ—"আমি যে প্রেম-ধন আহরণ করিয়াছিলাম তাহা সব ফুরাইয়া গেল। আমি যে প্রেম দিব বলিয়া জীবের নিকট সত্যে আবদ্ধ আছি, সে ধার শুধিতে পারিলাম না।"

করুণাময় নিতাইয়ের তখন সমুদয় মনে পড়িল; তাঁহার চাপল্য-চাঞ্চল্য সব গেল, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। শেষ বলিলেন, "প্রভু! যাহা আজ্ঞা কর তাহাই করিব। তুমি প্রাণ, আমি দেহ। তোমার বিরহ আমার সহ্য করিতে হইবে, তাহাই হউক।" তখন প্রভু আবেগভরে বলিলেন, "গৌড় বড় কঠিন স্থান, যেহেতু উহা পড়ুয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক আক্রান্ত। ওরূপ স্থানে ধীশক্তিসম্পন্ন বস্তুর প্রয়োজন। তোমা ভিন্ন আর কেহ সেখানে কৃতকার্য হইতে পারিবে না।"

এখানে একটি নিগূঢ় রহস্য বলিব। প্রভু এইরূপে সমস্ত ভারতবর্ষে আপনার ভক্ত পাঠাইয়া জীব-উদ্ধার করিয়াছিলেন। যিনি যে স্থানের উপযুক্ত, তাঁহাকে সেই স্থানে নিযুক্ত করেন। গৌড় বড়ো জ্ঞানের স্থান, তাই আনন্দের প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দকে সেখানে পাঠাইলেন। ভাবিলেন, জ্ঞান আনন্দের নিকট খর্ব হইবে। আবার যেখানে ভক্ত দ্বারা কার্য না হইত সেখানে আপনি করিতেন।

প্রভু তারপর শ্রীনিত্যানন্দের হাত দুখানি ধরিয়া আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি ভিন্ন আমার হৃদয়ের ব্যথা বলিবার আর কেহ নাই; আর তুমি ভিন্ন, গৌড়দেশ উদ্ধাররূপ দুষ্কর-কার্য সাধন করে এমনও আর কেহ নাই। তুমি উদাসীন ব্রত লইয়া এখানে রহিলে, আর জীব হাহাকার করিতে লাগিল। কাজেই তুমি তোমার ভক্তগণ সহ গৌড়দেশে যাইয়া হরিনাম দিয়া আচণ্ডাল উদ্ধার কর। মূর্খ-নীচ, পণ্ডিত-পড়ুয়া, দুর্মতি-পাপী, সকলে যেন অনায়াসে হরিনাম করিয়া সুখী হইতে পারে।"

নিতাইয়ের সঙ্গে গদাধর দাস গৌড়ে গিয়াছিলেন। প্রভু ও নিতাইয়ের কি কথা হয় তাহা তনি সমুদয় অবগত ছিলেন। সেই দাস গদাধরের পদ শ্রবণ করুন—

বিরলে নিতায়ে পাঞা, নিজ কাছে বসাইয়া, মধুর ভাবে ক'ন ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হয়ে, হরিনাম লওয়াও গিয়ে, যাও নিতাই সুরধনী তীরে।।
প্রভু কহে, "নিত্যানন্দ, সব জীব হৈল অন্ধ, কেহ ত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিয়ে যারে, কৃপা করে লওয়াইবে নাম।।
কৃতপাপী দুরাচার, নিন্দুকে পাষণ্ডী আর, কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি হয়, সুখে যেন হরিনাম লয়।।
কুমতি তার্কিক জন, পড়ুয়া অধমগণ, জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণ-প্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী, খণ্ডাইও সবাকার দুখ।।
জীবে দয়া প্রকাশিয়া, সংসার ধর্ম আচরিয়া, পূর্ণ কর সকলের আশ।"
চৈতন্য আদেশ পাঞা, চলে নিতাই বিদায় হৈয়া, সঙ্গে চলে গদাধর দাস।।

প্রভুর আজ্ঞা এখন বিচার করুন। নিতাইকে বলিতেছেন যে,—"যাহাকে সম্মুখে পাইবে তাহাকে উদ্ধার করিবে।" "আচ্ছা, সে যদি মহাপাপী হয়?" প্রভু বলিতেছেন, "তাহা হউক; যে যত পাপীই হউক, সম্মুখে পাইলেই তাহাকে কৃপা করিবে।" আবার বলিতেছেন, "সমুদায় জীবকেই সদয় হইয়া উদ্ধার করিবে।" ইহাতে বুঝিতেছি, যে যত হৃদয়ে কাঙ্গাল, তাহাকে তত করুণা, এবং যে যত পাপী তাহাকে তত দয়া করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রভুর বিবেচনায় —যে যত অধিক পাপী, সে তত অধিক দয়ার পাত্র।

কোন ধর্ম-পুস্তকে লেখা আছে যে, কোন অবতার তাঁহার শিষ্যগণকে বলিতেছেন, "উহারা মহাপাপী উহাদিগকে এ সকল কথা বলিও না। এ সব কথা শুনিলে উহারা ন্যায্য প্রাপ্যদণ্ড হইতে উদ্ধার হইয়া যাইবে।" আমরা সেই ধর্ম-পুস্তকে উহা পাঠ করিয়া দুঃখ পাইয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের প্রভুর লীলায় সেরূপ দুঃখ পাইবার কোন কথা নাই। প্রভুর বিবেচনায় সকলের প্রতি সমান, বরং পাপীর প্রতি অধিক দয়া করিতে হইবে। প্রভুর আজ্ঞায় আরও বুঝিতেছি যে, যাহারা তার্কিক পড়ুয়া-পণ্ডিত, তাহারা বড় হতভাগ্য। আরও বুঝিতেছি যে, জীবের দুঃখ কেবল তাহারা ভক্তি হইতে বিমুখ বলিয়া। অতএব হরিনাম লইলেই তাহাদের দুঃখের মোচন হইবে ও যমযন্ত্রণা অর্থাৎ পুনর্জন্মের ভয় হইতে তাহারা উদ্ধার পাইবে। প্রভুর আজ্ঞায় আরও বুঝিতেছি যে, প্রভু যাহাই হউন, তিনি আমাদের জাতীয় জীব নহেন। তাঁহার আজ্ঞা কিরূপ তাহা বুঝুন। তিনি বলিতেছেন, "নিতাই যাও, যাহাকে সম্মুখে পাইবে অমনি তাহাকে উদ্ধার করিবে। বাপ রে বাপ!" সম্রাট নেপোলিয়ান তাঁহার সেনাপতিকে জগৎ জয় করিতে বলিতে পারেন, ইহাতে অমানুষিকতা কিছুই নাই। তাঁহার প্রকাণ্ড সতেজ সৈন্যদল থাকায় তাঁহার সেনাপতির জগৎ জয় করা বেশী কথা কি? কিন্তু—যাহাকে সম্মুখে পাইবে, সে পণ্ডিত কি মূর্খ, সাধু কি অসাধু যাহাই হউক, তাহাকেই উদ্ধার করিবে,—এরূপ আজ্ঞা মনুষ্য করিতে পারে না। বিবেচনা করিতে গেলে, এরূপ আজ্ঞা কেবল শ্রীভগবানই করিতে পারেন। যে কোন ব্যক্তির সহিত ধর্ম সম্বন্ধে কথা কহিয়া দেখিবেন যে, লোকের ধর্ম সম্বন্ধীয় মত পরিবর্তন করা কিরূপ অসম্ভব ব্যাপার। তুমি যদি বড় সাধু ও তেজস্বী পুরুষ হও, তবুও তোমার মতে আনিতে, সম্ভবতঃ সমস্ত জীবনে, একটি লোককেও পারিবে কিনা সন্দেহ।

প্রভূব আজ্ঞা পাইয়া নিতাই করজোড়ে বলিলেন, "প্রভু, আমি পুতুল, তুমি সূত্রধর, যেমন নাচাবে তেমনি নাচিব। আমি গৌড়ে চলিলাম, যাইয়া তোমার আজ্ঞা বলিব। জীব হরিনাম গ্রহণ করে কি না অমি জানি না, সে তুমি জান।" তখন প্রভু ও নিতাই গলাগলি

হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি আমাকে কৃতার্থ করিলে। আমার আর এক নিবেদন এই, তুমি এখানে মুহুর্মুহুঃ আসিও না; কারণ তুমি আসিলে অনেক সময় বিফলে যাইবে।" নিতাই ও কথার কোন উত্তর করিলেন না। তখন প্রভু নিতাইকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে কতকগুলি সহচর দিলেন। যথা, খানাকুল-কৃষ্ণনগরের অভিরাম বা রামদাস, পাণিহাটীর গদাধর দাস, পদকর্তা বাসুঘোষ প্রভৃতি। ইহারা সকলেই প্রায় বদ্ধপাগল। আবার গৌড়ে পাঠাইবার সময়, প্রভু তাঁহাদিগকে এমনি শক্তিসম্পন্ন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন যে, সকলেই একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া বাংলায় আসিতে লাগিলেন,—কোন্ পথে আসিতেছেন, কোথা যাইতেছেন, কিছুরই ঠিকানা নাই! কখন পশ্চিম, কখন পূর্ব, কখন উত্তর, কখন দক্ষিণ,—এইরূপ করিয়া কোনক্রমে সুরধুনী তীরে পাণিহাটী গ্রামে আসিলেন—আসিতে আসিতে, রামদাস এক দিবস গোপাল-ভাবে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। এইরূপে সেদিন কাটিয়া গেল। শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ে আসিয়া যে কাণ্ড করিলেন, তাহা এক বৃহৎ ব্যাপার। নিতায়ের পায়ে নূপুর, সুরধুনী-তীর দিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন, আর সুর করিয়া বলিতেছেন—"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ, নাম। যে ভজে গৌরাঙ্গচাঁদ সেই আমার প্রাণ।"

যিনি আনন্দের পরাকাষ্ঠা, তাঁহার দর্শনে লোকে আনন্দে মগ্ন হয়। নিতাইয়ের প্রচার কার্যের বর্ণনাযুক্ত আরও কয়েকটি পদ শুনুন—

১। "অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।।
যে না লয় তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি। আমারে কিনিয়া লহ, বল গৌরহরি।।

২। "হরিনাম দিয়া জগৎ মাতালে, আমার একলা নিতাই।
সঙ্গে গৌর থাকলে কি না হতো।।"

৩। "ধর লও সে কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয়-আয়।
প্রেম কলসে-কলসে বিলায় তবু না ফুরায়।।
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু-ডুবু নদে ভেসে যায়।
প্রেমে দুকূল ভেঙ্গে ঢেউ লাগিল গোরাচাঁদের গায়।।"

৪। "সুরধুনী তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।"

নিতাইয়ের ধর্ম-প্রচার পদ্ধতি অতি মনোহর, আর একটু হাস্য উদ্দীপকও বটে। একজনকে ধরিলেন, ধরিয়া বলিতেছেন, "ভাই শুন নাই? তিনি এসেছেন,—সেই যমের যম। আর ভয় কি, নাচিতে নাচিতে বৈকুণ্ঠে চল।" অবশ্য নিতাইয়ের পক্ষে এ সমুদয় সোজা কথা; কিন্তু যাহাকে বলিলেন, সে হয়ত কিছুই মানে না, এমন কি প্রভুকেও মানে না। কিন্তু তবু নিতাইয়ের সোজা কথা, সেই আকিঞ্চন, সেই প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখিয়া প্রকৃতই লোকে নিতাইয়ের অনুগত হইতে লাগিলেন। আবার কাহাকে বলিতেছেন, "আমি তোমার দাস হইলাম, তুমি গৌর ভজ।" কাহার নিকট দন্তে তৃণ ধরিয়া করযোড়ে কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "তুমি আমাকে কৃপা করিয়া একবার হরি বল।" যদি কেহ হরিনাম না লইল, তবে নিতাই ব্যথিত হইয়া তাহার সম্মুখে পড়িয়া বৃশ্চিকদষ্ট-ব্যক্তির ন্যায় গড়াগড়ি দিয়া কান্দিতে লাগিলেন। সে বেচারি তখন আর কি করেন, কাছে বসিয়া গোসাঞিকে সান্ত্বনা করিতে করিতে আপনিও কান্দিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার মন নির্মল হইল, পরিশেষে তিনি হরি হরি বলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন; কাজেই তিনি গৌরাঙ্গের হইলেন। আবার কাহাকে বলিতেছেন, "জান না, আমি ভাইয়ের আজ্ঞা লইয়া আসিয়াছি? একবারে দেশ সমভূম করিব, পতিত আর একটিও রাখিব না!" এইভাবে "ভজ গৌরাঙ্গ" বলিয়া নাচিতে নাচিতে নিতাই শ্রীনবদ্বীপে প্রভুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিতাইকে পাইয়া শচীরও

পুত্রবিরহ অনেক কমিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে নিতাইয়ের আগে আসিলেন। নিতাই অমনি মাতার চরণ দুখানি ধরিয়া প্রণাম করিলেন। শচীও নিতাইকে কোলে করিয়া বসিলেন ও মাতা-পুত্রে গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মনে রাখিতে হইবে যে, নিতাইয়ের দেহে বিশ্বরূপ বিরাজ করিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও আড়ালে দাঁড়াইয়া সুখে পতির সংবাদ শুনিতে লাগিলেন। শচী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিতাই! নিমাই কি আমার বেঁচে আছে? আমার ননীর পুতলি নিমাই সন্ন্যাসী হয়েছে, মুই অভাগিনী তবু মরি নাই!" যথা পদ—

"নদীয়া নগরে গেল নিত্যানন্দ রায়। দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে শচী মাতার পায়।
তারে কোলে করি শচী কান্দয়ে করুণে। নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের বসনে।।
ফুকরি ফুকরি কান্দে কাতর হিয়ায়! গৌরাঙ্গের কথা কহি প্রবোধয়ে তাঁয়।
নিত্যানন্দ বলে,—"মাতা স্থির কর মন! কুশলে আছয়ে মাতা তোমার নন্দন।
তোমায় দেখিতে মোরে পাঠাইয়া দিলা। তোর পদযুগে কত প্রণতি করিলা।।"
কানুদাস কহে,—'মাতা কহি তোর ঠাঁই। তোমার প্রেমে বাঁধা আছে গৌরাঙ্গ গোঁসাই।

আবার—"কহ কহ অবধৌত নিমাই কেমন আছে।
ক্ষুধার সময়, জননী বলিয়া, তোমারে কখন কিছু যাচে?
যে অঙ্গ কোমল, ননীর পুতুল, আতপে মিলায় যে।
যতির নিয়মে, নানা দেশে গ্রামে, কেমনে ভ্রময়ে সে?
এক তিল যারে, না দেখি মরিতাম, বাড়ীর বাহির দূরে।
সে এখন মোরে, ছাড়িয়া আছয়ে, কোথা নীলাচলপুরে।।
মুই অভাগিনী, আছি একাকিনী, জীবনে মরণ-পারা।
কোথা বা যাইব, কারে কি কহিব, প্রেমদাস জ্ঞানহারা।।"

নিতাই শচীমাতার তৃপ্তার্থে নবদ্বীপে কিছুকাল রহিলেন, এবং নিমাইয়ের কথা বলিয়া মাতা ও শ্রীমতীকে সান্ত্বনা করিলেন। নিমাই কি খায়, কি করে, এ সমুদয় কাহিনী শচীমা একবার, দুইবার, দশবার করিয়া শুনিতেন, আর শ্রীমতী আড়ালে বসিয়া সেই রস আস্বাদন করিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপবাসিগণের সহিত মিলন এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা—

"জননীরে প্রবোধ বচন করি পুন। নিত্যানন্দ করে তাঁর চরণ-বন্দন।
শ্রীবাসাদি সহচরে মিলিলা নিতাই। গৌরাঙ্গের কথা শুনি আকুল সবাই।।
মুরারি মুকুন্দ দত্ত পণ্ডিত রামাই। একে একে সভা সনে মিলিলা নিতাই।।
সকল ভকত মেলি নিতাই লইয়া। গোরা-গুণ-গাথা শুনি স্থির করে হিয়া।।
প্রেমদাস বলে মুঞি কি বলিতে জানি। হৃদয়ে গাঁথিয়া নিতাই-চরণ দু'খানি।।"

পঞ্চম অধ্যায়

"শতবর্ষ তপে যেই ধন নাহি মিলে! পবিত্র আনন্দে মিলে, সেই শিখাইলে।।
সাধন-সঙ্কট-পথে ফুল ছড়াইল। বলাইয়ের সর্বস্ব-ধন তাঁর পদতলে।।"

—বলরাম দাসের অষ্টক।

নদীয়ার ভক্তগণের বিহনে শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপে নীলাচলে দিন কাটাইতে লাগিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।—যথা চৈতন্যভাগবতে—

"পাণিশঙ্খ বাজিলে উঠেন সেইক্ষণ। কপাট খুলিলে জগন্নাথ দরশন।।
জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম। অবোধ্য অদ্ভুত প্রেম নদী বহে যেন।।
দেখিয়া অদ্ভুত সব উৎকলের লোক। কার দেহে আর নাহি রবে দুঃখ-শোক।।
যেদিকে চৈতন্য মহাপ্রভু চলি যায়। সেই দিকে সর্বলোকে হরি হরি গায়।।"

কপাট খুলিলে প্রভু তাঁহার নয়ন শ্রীজগন্নাথের বদনে অর্পণ করেন, অমনি ধারা পড়িতে থাকে। প্রভুর নয়নে পলক নাই, আঁখি রক্তবর্ণ হইয়াছে, নয়নতারা ডুবিয়া অনবরত মৃত্তিকায় ধারা পড়িতেছে, এবং ক্রমে গড়াইয়া নিকটস্থ গর্তে যাইতেছে। প্রভু এইরূপে দুই প্রহর পর্যন্ত শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেছেন, আর শত-শত লোক প্রভুকে দর্শন করিতেছেন। পর-পর নূতন-নূতন ভাব উদয় হওয়াতে প্রভু নব-নব রূপ ধারণ করিতেছেন। সে সমুদায়ই তুল্যরূপে মনোহর। প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নাই। স্বরূপ কি গোবিন্দ কোন ক্রমে তাঁহাকে বাসায় আনিলেন। তৎপরে প্রভু সমুদ্র-স্নানে গেলেন এবং স্নান করিয়া আসিয়া ঘরে পিঁড়ায় সংখ্যা-মালা জপ করিতে লাগিলেন। প্রভুর মালা লইয়া নাম-জপ করা কেবল ধর্ম-শিক্ষা দিবার নিমিত্ত। যেহেতু, তিনি দিবানিশি শ্রীবদনে হরেকৃষ্ণ নাম-জপ করিবার সময় সম্মুখে ভাগে একটি তুলসীগাছ রাখিতেন। তিনি যাহা করিবেন জীবে তাহাই করিবে, সেই নিমিত্ত তাঁহার ভজন-সাধনের সর্ব-অঙ্গ পালন করিতে হইত। সামান্য জীব সাধনের সকল অঙ্গ যাজন করিতে পারে না। কিন্তু প্রভুর,—ভজন সাধনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্যন্ত, তুলসীসেবা হইতে কৃষ্ণবিরহে মূর্ছা পর্যন্ত,—সমুদায় অঙ্গ যাজন করিয়া জীবকে শিখাইতে হইত। কারণ তিনি না করিলে অপর কেহ করিবে না। কিন্তু প্রভুর যে মালাজপ সেও এক অদ্ভুত কাণ্ড। প্রভু মালা জপিবেন কি, মালা হাতে করিয়াই কান্দিয়া আকুল। যথা—"রোই রোই জপে কৃষ্ণ-নাম-মধু। ধ্রু।"

মালা-জপ হইলে প্রভু ভোজনে বসিলেন, ভোজনান্তে একটু শয়ন করিলেন। তখন গোবিন্দ আসিয়া পদ-সেবা করিতে লাগিলেন। প্রভুর একটু নিদ্রা আসিলে গোবিন্দ তখন প্রসাদ পাইতেন। প্রভু প্রায় সারানিশি ভজনে কাটাইতেন, কাজেই দিনের বেলা একটু শয়ন করিতে হইত। প্রভু নিদ্রা যাইতেন, গোবিন্দ পদ-সেবা করিতেছেন আর দেখিতেছেন—

"বাহু পরে শির রাখি মৃত্তিকা-শয়ন। সরল নির্মল মুখ মুদিত নয়ন।।
সুখ স্বপ্ন দেখে প্রভু আপন লীলায় নব নব ভাব মুখে হৈয়াছে উদয়
ধূলা-ধূসরিত সুবলিত হেম দেহে। যেই দেখে তার নেত্রে প্রেমধারা বহে।।
ত্রিভুবন নাথ শুই ধূলার উপরে। বলরাম দাস বসি পদসেবা করে।।"

প্রভু উঠিয়া অপরাহ্নে গদাধরের ওখানে শ্রীভাগবত শ্রবণ করিতে চলিলেন। নীলাচলে প্রভুর চির-সঙ্গী গদাধর। মাধব মিশ্রের তনয় গদাধর গৌরাঙ্গের সহিত পূজিত হইয়া থাকেন। এমন কি, তিনি স্বয়ং শ্রীরাধার প্রকাশ। যখন নিমাই নবদ্বীপে রাসলীলা করেন, তখন গদাধর শ্রীমতী রাধা হইয়াছেন। চন্দ্রশেখরের বাড়ী যে নাটকাভিনয় হয় তাহাতেই প্রথমে গদাধর রাধারূপে প্রকাশ পায়েন। শ্রীনিমাই নৃত্য করিতে গদাধর হাত ধরিয়া উঠিতেন। যথা চৈতন্যভাগবতে—

কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্যটনে। গদাধর প্রভুকে সেবেন অনুক্ষণে।।
গদাধর সম্মুখে পড়েন ভাগবত। শুনি প্রভু প্রেমরসে হন উনমত।।

কাজেই তখন গদাধরের স্থানে প্রভুর গণ সকল উপস্থিত হন এবং প্রভুর সঙ্গে বসিয়া গদাধরের মুখে ভাগবত শ্রবণ করেন। জ্যোৎস্না রজনী হইলে প্রভু সন্ধ্যার সময় সমুদ্রতীরে গমন করেন।

"সর্ব রাত্রি সিন্ধু তীরে পবন বিরলে। কীর্তন করেন প্রভু মহাকুতূহলে।।
চন্দ্রাবতী রাত্রি, বহে দক্ষিণ পবন। বৈসেন সমুদ্র কূলে শ্রীশচীনন্দন।।
সর্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে। নিরবধি হরেকৃষ্ণ বলেন বদনে।।"

অন্ধকার রাত্রে প্রভু বাড়ী থাকেন, এবং প্রায় সমস্ত নিশি স্বরূপ ও রামরায়কে লইয়া রসাস্বাদন করেন। এই যে গম্ভীরায় রসাস্বাদন-লীলা ইহা অতি নিগূঢ় ও অননুভবনীয় বিষয়। যাঁহার ভাগ্যে থাকে তিনি উহা বর্ণনা করিবেন।

শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, সার্বভৌমের ইচ্ছা হইল এখন প্রভু একক

আছেন, এইবার তাঁহাকে ভাল করিয়া ভঞ্জাইবেন। এইজন্য একখানি নূতন ঘরও প্রস্তুত করাইছেন। তাই তিনি প্রভুর কাছে যাইয়া করজোড়ে বলিলেন যে, তাঁহার বাটিতে প্রভুর একমাস নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "তাহা হইবে না, যেহেতু সন্ন্যাসের সে ধর্ম নয়।" তখন সার্বভৌম বলিলেন, "তবে কুড়ি দিন।" প্রভু বলিলেন, "একদিন।" তখন সার্বভৌম প্রভুর শ্রীচরণে ধরিয়া পড়িলেন। তবু প্রভু উহা স্বীকার না করার তিনি দশদিনে নামিলেন। শেষে প্রভু নাচার হইয়া পাঁচদিনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তখন সার্বভৌম বলিলেন, "তুমি একা আসিবে। আর নিতান্ত যদি আবশ্যক হয় তবে স্বরূপকে আনিবে। কারণ তাহাকে আমার সম্মান করিতে হইবে না।" যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"তুমি নিজ ইচ্ছায় আসিবে মোর ঘর। প্রভু সঙ্গে আসিবে স্বরূপ দামোদর।।"

আর .তামার সঙ্গী সন্ন্যাসীদিগকে পরে নিমন্ত্রণ করিয়া এক একজনকে এক একদিন ভুঞ্জাইব।

প্রভুর অনুমতি পাইয়া সার্বভৌম আনন্দে তাঁহার ঘরণীকে আসিয়া সংবাদ জানাইলেন। তখন তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে মহাপ্রভুর সেবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। গৃহে সমুদায় দ্রব্য রহিয়াছে, কেবল তরকারী ও শাক আহরণ করিয়া আনাইলেন। প্রভু যথাসময়ে একক আসিলেন। সার্বভৌম আপনি তাহার পদ ধোয়াইলেন। প্রভু দেখিলেন, ভট্টাচার্য মহা আয়োজন করিয়াছেন। ভক্তগণের আহ্লাদ হইবে বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী এই আয়োজনের এক তালিকা দিয়াছেন। আমি সেই তালিকা উদ্ধৃত করিতেছি। যথা চরিতামৃতে—

"দশ প্রকার শাক নিম্ব-সুকুতার ঝোল। মরিচের ঝাল ছেনাবড়া বড়ী ঘোল।।
দুগ্ধ-তুম্বী দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ডবেশারি লাফরা। মোচা-ঘণ্ট মোচা-ভাজা বিবিধ শাকরা।।
বৃদ্ধ-কুষ্মাণ্ড-বড়ীর ব্যঞ্জন অপার। ফুলবড়ী ফল-মূলে বিবিধ প্রকার।।
নব-নিম্বপত্র সহ ভ্রষ্ট-বার্তাকী। ফুলবড়ী পটোলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।।
ভৃষ্ট-মাস মুদ্গ-সুপ অমৃতে-নিন্দয়। মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।।
মুদ্গবড়া মাসবড়া কলাবড়া মিষ্ট। ক্ষীরপুলি নারিকেল পুলি আর যত পিষ্ট।।
কাঁজিবড়া দুগ্ধচিড়া দুগ্ধলক্লকী। আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি।।
ঘৃত-সিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা বরি। চাঁপাকলা ঘন-দুগ্ধ আম্র তাহা ধরি।।
রসালা-মথিত দধি সন্দেশ অপার। গৌড় উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার।।"

প্রভু আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "দুই প্রহরের মধ্যে এত আয়োজন কিরূপে করিলে?" এক সঙ্গে একশত চুলায় পাক করিলেও এত পাক করা যায় না। তারপর অন্নের উপরে তুলসী-মঞ্জরী দেখিয়া প্রভু বুঝিলেন যে, সমুদয় দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা হইয়াছে। তখন অতি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তুমি বড় ভাগ্যবান্ যে এরূপ ভোগ শ্রীভগবান্‌কে দিয়াছ। নিশ্চয় ভগবান্ ইহা আস্বাদ করিয়াছেন, নতুবা এরূপ সুগন্ধ বাহির হইবে কেন? আমিও ভাগ্যবান্, এই প্রসাদের অংশ পাইব।" আসন দেখিয়া বলিলেন, "এই আসন শ্রীকৃষ্ণের; উহা উঠিয়া রাখ, আমাকে অন্য স্থানে, ভিন্ন পাত্রে কিছু প্রসাদ দাও।" ভট্টাচার্য বলিলেন, "যদি আয়োজন তোমার মন-মত হইয়া থাকে, তবে তোমার ইচ্ছায় সমুদায় হইয়াছে, আমার উহাতে প্রশংসার কিছু নাই। আর আসন উঠাই কেন? তুমি উহাতেই উপবেশন কর।" প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণের আসনে কিরূপে বসিব।" ভট্টাচার্য বলিলেন, "কৃষ্ণের প্রসাদ যেরূপে পাইবে। যদি তাঁহার প্রসাদ পাইতে আপত্তি না থাকে, তবে তাঁহার আসনে বসিতে আপত্তি কি? উহাও কৃষ্ণের প্রসাদ মনে কর।" ঠাকুর বলিলেন, "ঠিক, কৃষ্ণের শেষ তাঁহার দাসের প্রাপ্তি।" ইহাই বলিয়া হাসিয়া হাসিয়া পিঁড়ির উপরে বসিলেন।

সার্বভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বর, কন্যা যাঠী। যাঠীকে মহাকুলীন পাত্রের সহিত বিবাহ দিয়া

জামাতা অমোঘকে গৃহে রাখিয়াছেন। এই বস্তুটি নানা দোষে পূর্ণ। কুলীনব্রাহ্মণ প্রতাপশালী শ্বশুরালয়ে বাস করেন, সুতরাং তাহার পক্ষে মন্দ হওয়া বিচিত্র নহে। সার্বভৌম জামাতাটিকে মনে মনে বড় ঘৃণা করেন। কিন্তু উপায় নাই,—অমোঘ জামাতা; পুত্র হইলে ত্যাগ করিতে পারিতেন। সার্বভৌম প্রভুকে বসাইবার পূর্বে সমুদায় সাজাইয়া রাখিয়াছেন। প্রভু ভোজনে বসিলে সার্বভৌমের ঘরণী অন্তর হইতে দর্শন করিতে লাগিলেন। আর ভট্টাচার্য জামাতা অমোঘের ভয়ে লাঠি লইয়া দ্বারে বসিলেন। পাছে সে আসিয়া প্রভুকে কোন দুর্বাক্য বলে, কি কোন অন্যায় কার্য করে। অমোঘ দ্বারের নিকট আসিতেছে, আর সার্বভৌম লাঠি উঠাইতেছেন, অমনি ভয়ে দৌড় মারিতেছে। হয়ত তাহার গাঁজা খাওয়া অভ্যাস ছিল, নতুবা এরূপ কেন করিবে? এই যে সার্বভৌম তাহাকে মোটে এদিকে আসিতে দিতেছেন না, ইহাতে অমোঘের কৌতূহল আরও বাড়িতেছে। তাই বারে বারে আসিতেছে, আর লাঠি দেখিয়া পলাইতেছে। শেষে অমোঘের শুভদিন উপস্থিত হইল। প্রভুকে কোন ব্যঞ্জন দিবার জন্য সার্বভৌম পার্শ্বস্থ পাকশালায় যেই গেলেন, অমনি অমোঘ ছুটিয়া আসিল। সার্বভৌমও তাহা দেখিয়া ছুটিয়া আসিলেন।

প্রভু ভক্তের অনুরোধে অনেক সময় অমানুষিক ভোজন করিতেন। সার্বভৌম প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া ভুঞ্জাইবেন বলিয়া ১০।১২ জনের অন্ন পাতে ঢালিয়া দিয়াছেন। অমোঘ দ্বারে আসিয়া উহা দেখিয়াই, "বাপরে বাপ! একটা সন্ন্যাসী এত খাবে!" বলিয়াই পলাইল। এই কথা শুনিয়া প্রভু একটু হাসিলেন। তাহা দেখিয়া সার্বভৌম লাঠি লইয়া অমোঘকে তাড়া করিলেন, কিন্তু ধরিতে পারিলেন না। জামাতাকে গালি ও শাপ দিতে দিতে ফিরিয়া আসিলেন। জামাতার রূঢ়বাক্য তাঁহার হৃদয়ে শেলরূপ বিন্ধিল। তিনি জামাতাকে গালি ও শাপ দিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রীও মনে দারুণ ব্যথা পাইয়া বক্ষে করাঘাত করিতে ও বারংবার "যষ্ঠী বিধবা হউক" বলিতে লাগিলেন। প্রভু ইঁহাদের দুঃখ দেখিয়া ভয়ে ভয়ে সার্বভৌমের সাধ পুরাইয়া ভোজন করিলেন। প্রভু আচমন করিলে সার্বভৌম তাঁহাকে তুলসী-মঞ্জরী, এলাচি, লবঙ্গ প্রভৃতি মুখশুদ্ধি দিলেন, শ্রীঅঙ্গে চন্দন মাখাইলেন, গলে মালা পরাইলেন, পরে দুটি চরণ ধরিয়া বলিলেন, "প্রভু ক্ষমা কর, আমি তোমাকে নিন্দা করাইতে বাড়ী আনিয়াছিলাম! আমার গৃহে আমার জামাতা তোমাকে কটু বলিল, ইহা হইতে আমার মরণ শতগুণে ভাল ছিল।" শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন, "অমোঘের একটুও দোষ নাই। সে ন্যায্য কথাই বলিয়াছে। তোমারও উচিত ছিল না যে, এত ভোজন করাইয়া সন্ন্যাসীর ধর্ম-নষ্ট কর, আমারও উচিত ছিল না যে এত ভোজন করি।" ইহাই বলিয়া অমোঘের কার্য্য উড়াইয়া দিয়া প্রভু বাসায় চলিলেন, সার্বভৌম চুপে-চুপে তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। প্রভু বাসায় আসিলে সার্বভৌম আবার তাঁহার চরণ ধরিয়া ক্ষমা মাগিলেন। প্রভু নানারূপে ভট্টাচার্য্যকে বুঝাইয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

ভট্টাচার্য বাড়ী ফিরিলেন, কিন্তু শান্ত হইতে পারিলেন না। প্রভুর কৃপায় এখন বুঝিয়াছেন যে, পূর্বে যখন নাস্তিক ছিলেন তখন বড় দুঃখী ছিলেন। পূর্বে তাহা জানিতেন না, স্বীকারও করিতেন না। পূর্বে ভাবিতেন যে, তিনি তাঁহার নাস্তিকতারূপ জ্ঞান লইয়া বড় আনন্দে আছেন, এবং যাহারা ভগবদ্‌ভক্তি চর্চা করে তাহারা বড় দুঃখী। এখন প্রেম-সুধা আস্বাদ করিয়া ঐশ্বর্যের তাবৎ সুখের উপরে তাঁহার ঘৃণা হইয়াছে। এই অমূল্য সম্পত্তি তাঁহার গৌরাঙ্গ হইতে। তাঁহাকে একটু ভাল করিয়া খাওয়াইয়া, তাঁহার কিছু ঋণ শোধ দিবেন। আবার এই প্রিয় বস্তুটি, তাঁহার বিশ্বাস মত, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি। কাজেই কোনক্রমেই, এমন কি, প্রভুর কথাতেও আপনাকে সান্ত্বনা করিতে পারিতেছেন না। বরং প্রভু যতই অমোঘের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন, তাঁহার ততই ঠাকুরের ঔদার্য্য দেখিয়া আত্মগ্লানি

উপস্থিত হইতেছে। যাঠীর মাতারও সেইরূপ মনের ভাব; নতুবা তিনি আপনার কন্যা বিধবা হউক, এ কথা বলিতেন না। সার্বভৌম গৃহে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "মনের কথা শুন। প্রভুর নিন্দা শুনিলে দুই রকম প্রায়শ্চিত্ত আছে। এক যে নিন্দা করে তাহাকে বধ করা, নতুবা আপনি প্রাণত্যাগ করা। কিন্তু এই দুই কার্য্যই পাপ; অতএব উহা করিব না। তবে উহার মুখ আর দেখিব না, উহাকে আমি ত্যাগ করিলাম। যাঠীকে বল যে তাহার স্বামী মহাপাতকী, এরূপ স্বামীকে ত্যাগ করিতে হয়। যথা পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ,—এই শাস্ত্রের বচন।" হতভাগিনী যাঠী ইহা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিল। অমোঘ ভয়ে সে রাত্রি আর বাড়ী আসিল না। ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার ঘরণী সারাদিনরাত উপবাসী রহিলেন। তাঁহার ভগ্নীপতি গোপীনাথ কতপ্রকার বুঝাইলেন তাহাতেও শান্ত হইলেন না। ওদিকে অমোঘ যেখানে রাত্রিতে ছিল সেখানে তাহার ওলাউঠা হইল, এবং অতি প্রত্যুষে মৃতপ্রায় হইল। ভট্টাচার্য্যের অন্তরে ব্যথা তখনও প্রবল রহিয়াছে। কাজেই তিনি বলিলেন, "ভালই হইয়াছে, বিধি সদয় হইয়া আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। তাহার কর্ম্মফল সে ভোগ করিবে, আমি কি করিব? শ্রীভগবানের নিকটে অপরাধ করিলে তাহার ফল সদ্য ফলিয়া থাকে।" ইহাই বলিয়া শাস্ত্র হইতে দুটি বচন পাঠ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহার মন কোমল হইল, তখন ভাবিলেন, "এ সমুদয় শ্রীভগবানের কার্য্য। আমি ইহার কি করিতে পারি? প্রভুর যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে?" ইহাই ভাবিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া নানাবিধ ভাবে বিলোড়িত হইতে লাগিলেন। তবু অমোঘের নিকট গমন করিলেন না। ভট্টাচার্য অমোঘের কোন সাহায্য করিবেন না বুঝিয়াই গোপীনাথ প্রভুর নিকট দৌড়িলেন। প্রভু গোপীনাথকে দেখিয়াই ব্যস্ত হইয়া সার্বভৌম শান্ত হইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপীনাথ বলিলেন, "সার্বভৌমের মনের দুঃখ এখনও যায় নাই, আর সেই নিমিত্ত তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে দিবানিশি উপবাস করিয়া আছেন। এখন অমোঘ ওলাউঠা হইয়া মরিতেছে, তবু তাহার তল্লাস লয়েন নাই।" প্রভু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সে কি? অমোঘের ওলাউঠা হইয়াছে! সে মরিতেছে! তুমি বল কি? আমাকে শীঘ্র তাহার নিকট লইয়া চল।" ইহাই বলিয়া প্রভু গোপীনাথের সঙ্গে অমোঘের কাছে বিদ্যুৎ গতিতে গমন করিলেন; দেখেন, অমোঘের অন্তিমকাল উপস্থিত! তখন প্রভু কি করিলেন শ্রবণ করুন। যথা চরিতামৃতে—

"শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া। অমোঘের কহে তার বুকে হাত দিয়া।।
সহজে নির্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়। কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয়।।
মাৎসর্য-চণ্ডাল কেনে ইহা বসাইলা। পরম-পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা।।
সার্বভৌম সঙ্গে তোমার কল্মষের ক্ষয়। কলুষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণ নাম লয়।।
উঠহ অমোঘ তুমি লয় কৃষ্ণ নাম। অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান।।"

প্রভু হুঙ্কার করিয়া এই কথা বলিবামাত্র, অমোঘ যিনি মৃতের ন্যায় পড়িয়া মরিতেছিলেন, অমনি উঠিয়া একেবারে দাঁড়াইলেন। মুহূর্তের মধ্যে অমোঘের শরীরে স্বাভাবিক শক্তি উপস্থিত হইল। অমোঘ উঠিয়া দাঁড়াইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে লাগিলেন, অমনি তাঁহার নয়নে ধারা বহিতে লাগিল, অঙ্গ পুলকিত হইল, আর তিনি তখনি দুই বাহু তুলিয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া প্রেমের তরঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভু মধুর হাসিয়া অমোঘের নৃত্য দেখিতে লাগিলেন। অমোঘ একটু নৃত্য করিয়া ভাবিলেন যে, তিনি বড় অপরাধী, তাঁহার নৃত্য করা বিড়ম্বনা। তখন প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু অপরাধীকে ক্ষমা কর।" প্রভু তখনই তাহাকে প্রসাদ করিতেন, কিন্তু অমোঘ সে অবসর না দিয়া আবার উঠিয়া বলিলেন, "এই মুখে তোমার নিন্দা করিয়াছি, এই মুখই অপরাধী।" ইহাই বলিয়া দুই হাতে

দুই গাল চড়াইতে লাগিলেন। ঘোরতর চড়ের প্রতাপে মুখ ফুলিয়া উঠিল। তখন প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া গোপীনাথ অমোঘের হাত ধরিলেন। অমোঘ তখন প্রভুর পানে কাতর বদনে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভু সজল-নয়নে অমোঘের গাত্রে হাত দিয়া বলিলেন, "অমোঘ! তোমার অপরাধ নাই। তুমি সার্বভৌমের জামাতা, সহজে আমার অতি স্নেহের পাত্র। তুমি ত তাঁহার পুত্র সম্বন্ধীয়, কিন্তু সার্বভৌমের গৃহের দাস-দাসী, এমন কি কুক্কুর পর্যন্ত আমার প্রিয়। তুমি স্বচ্ছন্দ হও, কৃষ্ণ-নাম লও।" তারপরে বলিলেন, "চল সার্বভৌমকে সান্ত্বনা করি গিয়া।" প্রভু ইহা বলিয়াই গোপীনাথের সহিত সার্বভৌমের গৃহে চলিলেন। ওদিকে এই সমুদায় কাণ্ড শুনিয়া সার্বভৌম আনন্দ ও বিস্ময়ে জড়বৎ হইয়া আছেন এমন সময় প্রভু যাইয়া উপস্থিত। প্রভুকে দেখিয়াই তিনি গলায় বসন দিয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন; শেষে বলিলেন, "ভট্টাচার্য! অমোঘ বালক, তাহার আবার দোষ কি? তাহার উপর আর রাগ করিও না। শীঘ্র যাও, শ্রীমুখ দর্শন কর, স্নান কর, আহার কর, তবে আমার সন্তোষ।" সার্বভৌম আবার প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "অমোঘ যেমন তোমার চরণে অপরাধী, তেমনি মরিতেছিল, তুমি তাহাকে কেন বাঁচাইলে?" ইহাতে প্রভু ভট্টাচার্যকে উঠাইয়া বলিলেন, "অমোঘ তোমার বালক, তুমি তাহার পিতা, তাহার দোষ লইতে পার না। তাহাতে সে আবার পরম বৈষ্ণব হইয়াছে। এখন তাহার সমুদয় অপরাধ গিয়াছে। তুমি এখন তাহাকে প্রসাদ কর, আমার এই মিনতি।" সার্বভৌম কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "প্রভু আপনি কৃপা দ্বারা সমুদয় জীবকে তোমার চরণে আকর্ষণ করিতেছ। আপনি এখন চলুন, আমি স্নান ও ঠাকুর দর্শন করিয়া আসি, আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিব।" প্রভু তখন গোপীনাথকে বলিলেন, "তুমি এখানে থাক, ভট্টাচার্য প্রসাদ পাইলে আমাকে সংবাদ দিবা।" ইহা বলিয়া প্রভু স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। তাই পূর্বে বলিয়াছিলাম, শুভক্ষণে অমোঘ ঠাকুরের ভোজন-দর্শনের নিমিত্ত এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাঁহার এই দর্শন-ব্যাকুলতার নিমিত্ত উত্তম করিয়া ভোজন হইল, সার্বভৌম আপনার ঠাকুরের চরণে কতটুকু ভক্তি আছে তাহা জীবকে দেখাইতে পারিলেন, আর অমোঘ ভবসাগর পার হইলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত। প্রেমে নৃত্য, কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত।।"

শ্রীকবিকর্ণপুর তাঁহার চৈতন্যচরিত মহাকাব্যের ১৮ সর্গের ৩৮ শ্লোকে বলিতেছেন যে, জীব নানা কারণে প্রভুর অনুগত হইত। কেহ বা তাঁহার মধুর হাস্য দেখিয়াই চিরজীবনের কিঙ্কর হইতেন। শুনিতে পাই, প্রভুর মধুর হাস্য জ্যোৎস্না হইতেও মনোহর ছিল, আর তাঁহার বাক্যও অতিশয় মধুর ছিল,—তিনি কখন অপ্রিয় কথা বলিতেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রেমচক্ষে তিনি সকলেই ভাল ভক্ত ও সাধু বলিয়া জানিতেন। প্রভুর আর এক অচিন্তনীয় শক্তি এই ছিল যে, সকলেই ভাবিতেন যে, তিনি আর প্রভু এই জনে যত প্রীতি, এত আর কাহারও সহিত নহে। শ্রীভগবানের এই এক প্রধান লক্ষণ যে তিনি বহুবল্লভ! ইহা ছাড়া, প্রভু কখন কখন কাহারও মনস্কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত অলৌকিক কার্য করিতেন, কেহ গোপনে পুত্র কামনা করিলেন। প্রভুর সহিত তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ, এমন কি জানা-শুনাও নাই। প্রভু তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "শ্রীজগন্নাথ তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিবেন, তোমার পুত্র হইবে।" এই সমুদয় কার্য প্রায়ই গোপনে হইত; প্রভু জানিতেন, আর বরপ্রার্থী জানিতেন। কিন্তু দুই একটা কার্য গোপনে হইবার সম্ভাবনা থাকিত না, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িত। যেমন অমোঘকে প্রাণদান। আর একটি কাহিনী শ্রবণ করুন।

পরমানন্দপুরী প্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা-স্থানীয়; এমন কি, বিশ্বরূপের এক অংশ তাঁহাতে বিরাজিত, এরূপ কথাও আছে। প্রভু পুরীকে বড়ো মান্য করেন; আবার পুরীর যথাসর্বস্ব-

দন প্রভু। পুরী আপন মঠে বাস করেন সেখানে একটি কূপ খনন করা হইয়াছে। একদা প্রভু সেখানে যাইয়া কূপের নিকট দাঁড়াইয়াছেন। কূপের জল বড় মন্দ হইয়াছে- --ইহা সকলে জানেন, কিন্তু তাঁহার মনে একটা অভিপ্রায় আছে, তাই প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কূপের জল কিরূপ হইয়াছে?" পুরী বলিলেন, "অতি অভাগীয় কূপ, জল অতি মন্দ, কেবল কর্দমময়।" প্রভু বলিলেন, "একি অবিচার? পুরী গোঁসাঞির কূপের জল ভাল নয়, শ্রীজগন্নাথ কি কৃপণতা করিবার আর স্থান পাইলেন না। পুরী গোঁসাঞির কূপের জল স্পর্শ করিলে জীব উদ্ধার হইবে, তাই বুঝি শ্রীজগন্নাথ মায়া করিয়া জল এত মন্দ করিয়াছেন?" ইহাই বলিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে কূপের ধারে দাঁড়াইয়া দুই বাহু তুলিয়া বলিলেন, "হে জগন্নাথ! এই বর দাও যে, তোমার আজ্ঞায় গঙ্গাদেবী এই কূপে প্রবেশ করেন।" প্রভু যেন আমোদ-ভাবে বলিলেন, আর ভক্তগণও সেই ভাবে লইলেন। তবু প্রভুর কথা শুনিয়া সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তৎপরে প্রভু বাসায় গেলেন। পরদিবস প্রাতে পরমানন্দপুরী দেখেন যে তাঁহার কূপ অতি পবিত্র জলে পূর্ণ হইয়াছে।

"আশ্চর্য দেখিয়া হরি বলে ভক্তগণ। পুরী-গোঁসাই হইলা আনন্দে অচেতন।।"

সকলে বুঝিলেন যে, শ্রীগঙ্গাদেবী কূপে আগমন করিয়াছেন। এই সংবাদ প্রভুর নিকট গেল। এদিকে ভক্তগণ সকলে মিলিয়া গঙ্গার স্তব পড়িতে পড়িতে, কূপ প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিলেন। ক্রমে প্রভু আসিলেন, এবং সকলে সেই কূপের জলে স্নান করিলেন।

প্রভু যে সেখানে নিতান্ত একা আছেন তাহা নহে, নবদ্বীপবাসী প্রায় এক শত ভক্ত প্রভুর সঙ্গে আছেন। ইহা ব্যতীত পুরী ও ভারতী প্রভৃতি দশজন অতি প্রধান সন্ন্যাসী প্রভুর পরিবারভুক্ত। ইহাদিগকে প্রভু পালন করেন; অর্থাৎ তাঁহার ভক্তগণ বলিয়া তাঁহারা সমাদরে সেখানে বাস করেন। প্রতাপরুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গের শরণাগত হইলে, উড়িষ্যাবাসী মাত্রই তাঁহাকে শ্রীভগবান্-রূপে পূজা করিতে লাগিলেন। তবুও শিখি মাহাতি নামক একজন প্রভুর বিপক্ষ রহিলেন। এখন তাঁহার অত্যদ্ভুত কাহিনী শুনুন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লেখা আছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যে নিগূঢ়-রস জীবগণকে প্রদান করেন, তাহা সম্যকরূপে আস্বাদন সাড়ে তিন জন মাত্র করিয়াছিলেন,—স্বরূপ-দামোদর, রামানন্দ রায়, শিখি মাহাতি ও মাধবী দাসী। তাঁহার অন্যান্য ভক্তগণ আপনাপন অধিকার অনুসারে এই রস ভোগ করেন। সাড়ে তিন জন বলার তাৎপর্য এই যে, মাধবীদাসী স্ত্রীলোক। শিখি মাহাতি, মুরারি মাহাতি ও মাধবী দাসী তিন ভ্রাতা ছিলেন। মাধবীদাসীকে ভ্রাতা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি পুরুষের ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন, এবং পুরুষের ন্যায় তপস্যা করিতেন। ভ্রাতৃদ্বয়ও তাহাকে ভ্রাতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে শিখি মাহাতি লিখনাধিকারী ছিলেন। শ্রীমন্দিরে এক জন লেখক থাকিবার প্রথা বরাবর চলিয়া আসিয়াছে; এই লেখা পাঠ করিলে উৎকলের প্রাচীন ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে জানা যায়।

প্রথম যখন শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে আসিয়া কিছুকাল থাকিয়া দক্ষিণে গেলেন, তখন নীলাচলবাসীরা শুনিলেন যে, একজন সোনার বরণ নবীন সন্ন্যাসী নীলাচলে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্বয়ং ভগবান বলিয়া জানিয়া তাঁহার চরণে শরণ লইয়াছেন। এইরূপ অন্যান্য নানা-কার্য্য দেখিয়া-শুনিয়া নীলাচলের প্রধান প্রধান যাবতীয় লোক প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, এবং তিনি দক্ষিণ হইতে ফিরিবেন বলিয়া পথ চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় প্রভু দক্ষিণ হইতে নীলচলে আসিলেন এবং সে রাত্রে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়ীতে রহিলেন। পরদিন প্রভাতে সার্বভৌম তাঁহাকে নূতন বাসায় লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া উপবেশন করিলে নীলাচলের প্রধান প্রধান লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন। এক এক জন প্রভুর চরণে প্রণাম করিতেছেন, আর সার্বভৌম তাঁহার

পরিচয় করিয়া দিতেছেন। সেই সময় শিখি মাহাতি ও মুরারি মাহাতি দুই ভাইও প্রভুকে দর্শন করিতে গেলেন, সম্ভবতঃ মাধবী স্ত্রীলোক বলিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া প্রভুকে দর্শন করিতেছিলেন। কারণ তাঁহারা তিন ভ্রাতা সর্বদাই একত্র থাকিতেন। তাঁহারা প্রভুকে প্রণাম করিলে সার্বভৌম তাঁহাদের পরিচয় করিয়া দিলেন। প্রভুকে তাঁহাদের এই প্রথম দর্শন। কিন্তু প্রভুর কি ইচ্ছা বলা যায় না, তিনি এই ভ্রাতাদিগের মধ্যে প্রণয় ভঙ্গের কারণ হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে দর্শন করিবামাত্র, কেহ তদ্দণ্ডে তাঁহাকে প্রাণ সমর্পণ করিতেন, কাহারও কিছু বিলম্ব লাগিত, আবার কাহারও হৃদয়ে দর্শন-ফল কিছুই হইত না। মুরারি ও মাধবী দাসী প্রভুকে দর্শনমাত্রেই কুল-শীল হারাইলেন, কিন্তু শিখি মাহাতি তেমনি রহিলেন। মুরারি ও মাধবী জ্যেষ্ঠ শিখিকে গদগদ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা! প্রভুকে কিরূপ দেখিলে?" শিখি মাহাতি বলিলেন, "পরমসুন্দর, পরমচিত্তাকর্ষক ও পরমভক্ত।" তাহাতে কনিষ্ঠ দুইজন অন্তরে ব্যাথা পাইয়া বলিলেন, "তুমি বল কি? উনি যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। উনি ত জগন্নাথ, তুমি কি তাহা টের পাও নাই?" ইহাতে শিখি একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, "সন্ন্যাসী আমাদের ভক্তিব পাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাকে জগন্নাথ বলিলে আমরা ঠাকুরের নিকট অপরাধী হইব। জীবে ঈশ্বর জ্ঞান মহাপাপ।" ইহাতে কনিষ্ঠ দুইজন মর্মাহত হইয়া জ্যেষ্ঠের চরণ ধরিয়া বলিলেন, "তোমার এরূপ দুর্মতি কেন হইল? শ্রীজগন্নাথ স্বয়ং আসিয়াছেন, তাঁহাকে তুমি চিনিতে পারিতেছ না?" শিখি মাহাতি বড় বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত লোক। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের অবস্থা দেখিয়া ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "হে দুর্বলচেতা ভ্রাতৃগণ! সন্ন্যাসীকে জগন্নাথ বলিতেছিস্? তোদের গতি কি হইবে? এ কি বিড়ম্বনা! আমি কি জগন্নাথের নিকট কিছু অপরাধী হইয়াছি?" ইহাই বলিয়া শিখি রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিল। মাধবী ও মুরারি দিবানিশি গৌরাঙ্গভজন করিতে লাগিলেন, আর শিখিও প্রত্যহ যাইয়া জগন্নাথের নিকট কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ের নিমিত্ত নিবেদন করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ দুইজন শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কিছু বলিতেন না। তাঁহারা ভাবিতেন, সময় হইলে প্রভু আপনা হইতেই তাঁহাদের জ্যেষ্ঠকে কৃপা করিবেন। পাছে শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কোন রূঢ়কথা শ্রবণ করিতে হয়, এই ভয়ে তাঁহারা জ্যেষ্ঠের সঙ্গ একেবারে ছাড়িলেন। শিখি কনিষ্ঠদ্বয়কে অনেক তাড়না করিয়া দেখিলেন যে, তাহাদের গৌর-রোগ মজ্জাগত হইয়াছে; শেষে তাড়না ছাড়িলেন। এমন কি, পরস্পরের মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হইল। ইহাতে অবশ্য শ্রীগৌরাঙ্গের উপর শিখি মাহাতির ভক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে ত লাগিলই না, বরং হ্রাস পাইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন যে, এই সন্ন্যাসী-ঠাকুর আসিয়া তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের সর্বনাশ করিলেন ও তাঁহাদের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটাইলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে চাহিতেনও না, তাঁহার নিকট যাইতেনও না। এমন কি, তিনি প্রভুর মস্ত বিরোধী হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় এক দিন নিশিশেষে শিখি মাহাতি শয়ন-ঘর হইতে চীৎকার করিয়া মুরারি ও মাধবী বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের কাতর-আহ্বান শুনিয়া মুরারি ও মাধবী তৎক্ষণাৎ তাঁহার গৃহে যাইয়া দেখেন, শিখি মাহাতি বসিয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র শিখি বাহু পাসরিয়া তাঁহাদের গলা ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রোদনের বেগ এত অধিক হইল যে, তিনি প্রকাশ করিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। তবে জ্যেষ্ঠের রোদন দেখিয়া বুঝিলেন যে, উহা দুঃখের ক্রন্দন নয়। তখন পূর্বেকার গাঢ়-প্রণয় আসিয়া সকলকে অভিভূত করিল, এবং তিন ভ্রাতা পরস্পরে আলিঙ্গিত হইয়া, বিহ্বল-ভাবে কিছুকাল নিশ্চেষ্ট রহিলেন। ক্রমে শিখি মাহাতি ধৈর্য্য ধরিলেন এবং ধীরে ধীরে গদ্গদ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ তোমাদের অনুরোধে, আজ আমার নিকট প্রকাশ পাইয়াছেন!" ইহাই বলিয়া আবার নীরব হইলেন। বেগ সম্বরণ করিতে তাঁহার আবার কিছু সময় গেল।

তাহার পরে তিনি আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, "আমি এই মাত্র স্বপ্নে দেখিলাম যে, তোমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত্যহ যেরূপ জগন্নাথ দর্শন করিয়া থাকেন, আজও সেইরূপ দর্শন করিতেছেন, এমন সময় তিনি ধীরে-ধীরে জগন্নাথের শরীরে প্রবেশ করিতেছেন এবং তখনই বাহির হইতেছেন। এইরূপ বারম্বার করিতে লাগিলেন। যখন বাহির হন, তখনি আমার দিকে চাহিয়া একটু হাস্য করেন। তাহার পরে আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তুমি, মুরারি ও মাধবীর অগ্রজ, এস তোমাকে আলিঙ্গন করি। ইহাই বলিয়া আমাকে বক্ষে ধরিলেন"। শিখি এই কথা বলিয়াই মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনুজদ্বয়ের সন্তর্পণে চেতন পাইয়া শিখি মাহাতি আবার বলিতে লাগিলেন, "আমি এখন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, কেবল চতুর্দিকে গৌরময় দেখিতেছি। ভাই, আমি তোমাদের অগ্রজ বলিয়া তোমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ আমাকে কৃপা করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমি তোমাদের অগ্রজ, ইহা ব্যতীত আমার আর কোন সম্পত্তি নাই। ভাই, তোমাদের হইতেই আমি গৌরাঙ্গ পাইলাম।" ইহাই বলিয়া শিখি আনন্দাশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তখন মুরারি ও মাধবী বলিলেন, "এই প্রত্যুষে শ্রীগৌরাঙ্গ গরুড়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। চল, আমরা সেখানে যাই।" ইহাই বলিয়া তিন ভ্রাতা শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে গেলেন। যাইয়া দেখেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বিহ্বল হইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। তাঁহার নয়ন দিয়া শত শত প্রেম-ধারা পড়িতেছে। আর গরুড়ের নিকটস্থ গর্তটি নয়ন-জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা একটু দূরে দাঁড়াইয়া, একদৃষ্টে মহানন্দে প্রভুকে দর্শন করিতেছেন; এমন সময় প্রভু যেন হঠাৎ চেতনা লাভ করিয়া তাঁহাদের মুখপানে চাহিলেন, এবং শিখি মাহাতিকে অঙ্গুলি দ্বারা নিকটে আহ্বান করিলেন। ইহাতে তাঁহারা তিনজনে প্রভুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইবেন, এমন সময় প্রভু শিখি মাহাতিকে বলিলেন, "তুমি মুরারি ও মাধবীর অগ্রজ না? এস তোমাকে আলিঙ্গন করি।" এই বলিয়া বাহু দ্বারা শিখি মাহাতিকে হৃদয়ে ধরিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুইজনে অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন; এই অবকাশে শ্রীগৌরাঙ্গ শিখির প্রত্যেক ধমনী দিয়া তাঁহার দেহে প্রবেশ করিলেন। পরে শিখি চেতনা পাইয়া আর কিছু দেখিতে পাইলেন না, কেবল চতুষ্পার্শে গৌরাঙ্গময় দেখিতে লাগিলেন। এই শিখি পরিশেষে রামরায় ও স্বরূপের ন্যায় রসজ্ঞ হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শচীমাতার আজ্ঞা লয়ে, সকল ভকত ধেয়ে, চলিলেন নীলাচলপুরে।
শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস, অদ্বৈত-আচার্য্য পাশ, মিলিয়া সকল সহচরে।।
অদ্বৈত-নিতাই সঙ্গে, মিলিয়া কৌতুক-রঙ্গে, নীলাচল-পথে চলি যায়।
অতি উৎকণ্ঠিত মনে, দেখিতে গৌরাঙ্গচাঁদে, অনুরাগে আকুল-হৃদয়।।
পথে দেবালয় যত, করি দরশন কত, উত্তরিলা আঠারনালাতে।
সকল ভকত মিলে, কীর্তন করিয়া চলে, যায় সবে গৌরাঙ্গ দেখিতে।।
কীর্তনের মহারোল, ঘন ঘন হরিবোল, অদ্বৈত-নিতাই মাঝে নাচে।
গগনে উঠিল ধ্বনি, নীলাচলবাসী শুনি, দেখিবারে ধায় আগে পাছে।।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ হরি, স্বরূপাদি সঙ্গে করি, পথে আসি দিলা দরশন।
মিলিয়া সবার সঙ্গে, প্রেম পরিপূর্ণ অঙ্গে, প্রেমদাসের আনন্দিত মন।।"

নীলাচলে প্রভু দোলযাত্রা-উৎসব করিলেন। শ্রীনবদ্বীপে সেই দিন তাঁহার জন্মোৎসব পূজা হইল। ক্রমে রথের সময় আসিল, নবদ্বীপের ভক্তগণ নীলাচলে আসিতে ব্যস্ত হইলেন। সেবার ঠাকুরাণীরা বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহারাও নিমাইচাঁদকে দেখিতে যাইবেন। যদিও

তখন পথের ভয় অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে, তবু বিংশতি দিনের দুর্গম পথে স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া যাওয়া সোজা কথা নয়। কিন্তু ঠাকুরাণীরা নিতান্ত ব্যস্ত হইলেন। তাঁহাদের পতিরা বৈষ্ণব, ভালমানুষ, তাঁহাদিগকে রোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা—

"যে যে দ্রব্য জানেন প্রভুর বড় প্রীত। সবই লইলা প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত।।"

সুতরাং স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হইয়া তাঁহারা বৃহৎ একদল নীলাচলের যাত্রী হইলেন। যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা দিন স্থির করিবার নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী গেলেন। দিন স্থির হইলে, শচীমাতাকে প্রণাম করিয়া, হরিধ্বনি করিতে করিতে, সকলে নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন। নিত্যানন্দের যাইতে নিষেধ ছিল, কিন্তু তিনি গৌর-বিরহে সে আজ্ঞা পালন করিতে না পারিয়া ভক্তগণসহ চলিলেন। শ্রীবাস তাঁহার গৃহিণী মালিনী সহ এবং আচার্য্যরত্ন তাঁহার গৃহিণী (শচীদেবীর ভগ্নী) সহ চলিলেন। শচী দত্ত নিমাইয়ের প্রিয়বস্তু তাঁহারা সঙ্গে লইলেন। খণ্ডবাসিগণ এবং পট্ট-ডোরী লইয়া কুলীনগ্রামবাসীরা চলিলেন। যাত্রীদিগের প্রতিপালক শিবানন্দ সেন সস্ত্রীক চলিলেন, তিনি প্রত্যহ সকলকে লইয়া যাইবেন বলিয়া পূর্ব হইতে পথের সন্ধান ও বাসস্থান নির্ণয় করিয়া রাখিতেন।

শিবানন্দ সেন গৌরলীলার একজন প্রধান সহায়। তিনি গৌর ব্যতীত আর কোন ঠাকুর জানিতেন না। তাঁহার পুত্র কর্ণপুর চৈতন্যচরিত, মহাকাব্য ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক লিখিয়া জগতে গৌর-লীলা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গোষ্ঠী হইতে যে গৌর কথা লেখা হইয়াছে, সে সমুদয় প্রায় সাক্ষাদ্দর্শন করিয়া। কবিকর্ণপুর গৌরব করিয়া তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এইরূপে তাঁহার পিতা সহস্র সহস্র যাত্রী পথে পালন করিয়া প্রভুর সমীপে লইয়া যাইতেন। তিনি এইরূপে লইয়া না গেলে, বহুতর লোকের সেই দুর্গম ও বহুদূরের পথে প্রভুর নিকট যাওয়া ঘটিত না। শিবানন্দ স্ত্রী-পুত্র সহ এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণ সপরিবারে চলিয়াছেন। এমন সময় পথে এক ঘট্টপালের হস্তে তাঁহারা পড়িলেন। এই ঘট্টপাল রাজার একজন মন্ত্রী ছিল, এখন এই কাটাকাটির সময় ঘাট-রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়াছে। সঙ্গে বহুতর লোক ও সৈন্যসামন্ত আছে। সেই সময় রাজা যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায়, এই ঘট্টপাল বিষম অত্যাচারী হইয়া পড়িয়াছে। গৌড়ীয় ভক্তগণকে পাইয়া সে বলিল, "তোমাদের প্রত্যেক জনের এক-এক মুদ্রা করিয়া পারের কড়ি লাগিবে।" শেষে বলিল, "তোমরা কড়ি না দিয়া পার হইয়া থাক, অতএব এ পর্যন্ত যত ঘাটে বিনামূল্যে পার হইয়াছ, সমুদয় শোধ করিয়া দাও।" ভক্তগণ বলিলেন যে, তাঁহাদের কড়ি নাই। তাঁহারা গৌরাঙ্গের প্রশ্রয়ে কিছু নির্ভিকতা দেখাইলেন। তাঁহারা ঘট্টপালকে বলিলেন যে, তিনি যদি এরূপ উৎপীড়ন করেন তবে গৌরচন্দ্র,—যিনি স্বয়ং জগন্নাথ এবং যিনি তাঁহার কর্তা রাজা প্রতাপরুদ্রের সংত্রাতা—তাহাকে দণ্ড দিবেন। ঘাটপাল ক্রুদ্ধ হইয়া শিবানন্দ সেনকে নিগড়ে বান্ধিয়া কারাগারে পুরিয়া রাখিল। এখন তাঁহার ও সঙ্গের যাত্রীদের এবং ইহাদের সকলের স্ত্রী-পুত্রদিগের অবস্থা কি হইল তাহা অনুভব করুন। সকলে 'প্রভু' 'প্রভু' বলিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন, কাহারও স্নানাহার হইল না; এইরূপে দিন গেল, রাত্রি হইল; কাহারও নিদ্রা নাই। শিবানন্দ গৌরনাম জপ করিতেছেন, এমন সময় দুইজন প্রহরী আসিয়া তাহাকে বলিল, "চল, তোমায় লইয়া যাইতে আজ্ঞা হইয়াছে।" ইহা বলিয়া বন্ধন খুলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ঘট্টপালের নিকট লইয়া চলিল। শিবানন্দ সারাদিন ও অর্ধ-রজনী পর্যন্ত বন্ধন-দশায় উপবাসে ও নানাবিধ চিন্তায় অভিভূত ছিলেন। এখন ভাবিলেন, হয়ত তাঁহাকে, বধ কি প্রহার করিতে লইয়া যাইতেছে। শিবানন্দ সেন গৌর-ভক্ত, তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ঘাটপালের নিকট নির্ভয়ে গেলেন। ঘাটপাল খট্টার উপর বসিয়াছিল। শিবানন্দ আসিলে, সে তাহার পানে রুক্ষভাবে চাহিয়া বলিল,

"তোমরা বলিলে, তোমরা শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ। আরও বলিলে, তিনি শ্রীভগবান্। আমরা উড়িয়া, আমরা জানি শ্রীজগন্নাথই ভগবান্। ভাল, এখন বল দেখি আমাদের জগন্নাথ বড় না তোমাদের গৌর বড়?

শিবানন্দ ভাবিলেন যে, যদি বলেন জগন্নাথ বড় তবে ঘাটপাল সন্তুষ্ট হইবে। আর যদি বলেন গৌরাঙ্গ বড়, তবে সে আরো ক্রুদ্ধ হইবে। শিবানন্দ দেখিতেছেন, তাঁহাদের বড় বিপদ, সকলে স্ত্রী-পুত্র লইয়া দুর্গম পথের মাঝে দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছেন, এখন কোন ক্রমে দুটো মিষ্ট কথা বলিয়া আপদের হাত হইতে উদ্ধার হওয়ার চেষ্টাই বুদ্ধিমানের কাজ, কিন্তু গৌর অপেক্ষা জগন্নাথ বড়, একথা মুখে আইসে না। ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয়ে এক অপরূপ ভাবের উদয় হইল। সে কিরূপ, না,—যাহার শক্তিতে হরিদাস,—যখন তাঁহাকে কাজি ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল,—বলিয়াছিলেন যে,—

"খণ্ড খণ্ড করে দেহ যদি যায় প্রাণ। তবু না বদনে আমি ছাড়ি হরিনাম।।" সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া শিবানন্দ বলিলেন, "শ্রীজগন্নাথ অপেক্ষা আমার গৌর বড়।"

বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে যাঁহারা উভয় গৌর ও জগন্নাথকে ভগবান্ বলিয়া মানেন, সকলেই বলিতেন যে, উভয়েই সমান। কিন্তু শিবানন্দ গৌর-উপাসক তাঁহার কাছে গৌর সর্বাপেক্ষা বড়। তিনি যদি বলিতেন, জগন্নাথ ও গৌর উভয়েই সমান, তবে তাঁহার একটু ভয় করিয়া বলিতে হইত। তাই বলিলেন, "গৌর বড়।" শিবানন্দ যখন এ কথা বলিলেন, তখন তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এ কথা বলিলে,—হয় তাঁহার প্রাণদণ্ড, না হয় অন্য কোন গুরুতর শাস্তি হইবে। কিন্তু তখন তিনি মনুষ্যভাব অতিক্রম করিয়া দেবতা হইয়াছেন। তখন গৌর-প্রেমে অভিভূত হইয়া, তাঁহার নিমিত্ত প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা আর সুখ নাই, ইহা ভাবিয়া বলিলেন, "জগন্নাথ অপেক্ষা আমার গৌর বড়।" যখন তিনি এ কথা বলিলেন তখন তাঁহার বদনের যে অপূর্ব শোভা হইল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

শিবানন্দের এই কথা শুনিয়া ঘট্টপাল এক দৃষ্টে তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে, অভিভূত হইয়া, "আমাকে ক্ষমা কর" বলিয়া, তাঁহার চরণে পড়িল। সে সাধুগণকে দুঃখ দিয়াছে এইরূপ মনের ভাবে ভয়ে-ভয়ে শয়ন করিয়াছিল। ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িয়া স্বপ্নে দেখিল যে, নরসিংহ-আকারধারী এক বস্তু তাহাকে তর্জন করিয়া বলিতেছেন, "তুই আমার ভক্তগণকে বন্ধন করিয়া দুঃখ দিতেছিস্? এখনই তাঁহাদের দুঃখ মোচন কর, নতুবা তুই উপযুক্ত শাস্তি পাবি।" ইহা দেখিয়া ঘট্টপাল জাগিল ও ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া শিবানন্দকে ডাকিতে পাঠাইল। শিবানন্দ সেন আসিলে ঘট্টপাল ভাবিল যে, গৌরচন্দ্র কিরূপ বস্তু অর্থাৎ যিনি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছেন, তিনি গৌরচন্দ্র কি না, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে। কিন্তু শিবানন্দ যখন বলিলেন—গৌর বড়, তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া সে বুঝিল যে, তিনি মহাপুরুষ, এবং স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছে তাহা সত্য। তখন সে অতিশয় ভীত হইয়া শিবানন্দ সেনের চরণে পড়িল।

এখন এই ঘটনাটি লইয়া একটু বিচার করিব। যদি স্বপ্নে ভয় পাইয়া সুদ্ধ সেই ভয়ের জন্য ঘাটোয়াল ভক্তগণকে ছাড়িয়া দিত, কি সম্মান করিত, তবে এই উপলক্ষে ভক্তের মাহাত্ম্য দেখান হইত না। ঘাটোয়াল স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইল বটে, কিন্তু শিবানন্দকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া প্রকৃতপক্ষে তাহার মনের মলিনতা দূর হইল।

দুই জাতিতে যুদ্ধ হইতেছে, মধ্যে ঘাটোয়াল। সে তখন ইচ্ছা করিলে যাহাকে ইচ্ছা অনায়াসে বধ করিতে পারে। সে প্রভু হইয়া শিবানন্দকে বান্ধিয়া রাখিয়াছে। সে জগন্নাথের ভক্ত, গৌরচন্দ্রকে চিনে না। শিবানন্দ এইরূপে নিগড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহার ঘাড়ে বহু ভক্ত এবং তাঁহাদের ও নিজের স্ত্রী-পুত্র। এরূপ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে গৌরচন্দ্র

বড়, এ কথা বলা সহজ নয়। এ কেবল যাঁহারা শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র তাঁহারাই বলিতে পারেন। তখন ঘটোয়াল শিবানন্দের সহিত লোক দিলেন। তাহারা আলো ধরিয়া যেখানে ভক্তগণ পড়িয়া আছেন সেখানে সেন মহাশয়কে লইয়া গেল। যথা, চন্দ্রোদয় নাটকে—"দুই দীপ-ধারী প্রাত কহিল সত্বর। যথা আছে ইহার পুত্রাদি পরিবার।। সেই স্থানে রাখ গিয়া দীপিকা ধরিয়া। প্রণাম করিয়া সেন দিল পাঠাইয়া।। হেনকালে সেন আইল হাসিতে হাসিতে।"

যে সকল বৈষ্ণব গৃহিণীসহ চলিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, কেহ বা অতুল ঐশ্বর্যশালী; কিন্তু তাঁহারা এই দুর্গম পথে বিংশতি দিবস পথ হাঁটিয়া প্রভুকে দেখিতে চলিয়াছেন? যথা "পত্নীপুত্র দাসদাসীগণের সহিতে। চলিলেন পরমানন্দে প্রভুকে দেখিতে।।"

যেখানে ভক্তগণ রাত্রি বাস করিতেছেন, সেই স্থানে তখন যেন বৈকুণ্ঠপুরী বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ সঙ্গে খোল-করতাল রহিয়াছে ও হৃদয়ে তরঙ্গ খেলিতেছে। পথ-গমনে, ক্ষুৎপিপাসায় ও শ্রান্তিতে দুঃখ পাইতেছেন বটে, কিন্তু সঙ্গে ঔষধ রহিয়াছে—শ্রীনামকীর্তন। যে স্থানে রাত্রি রহিতেছে, সেখানে কীর্তন আরম্ভ করিতেছেন এবং চতুষ্পার্শ্বের লোক দেখিতে দৌড়িয়া আসিতেছে। সেখানে সমারোহ হইতেছে, আর কত লোক সেই তরঙ্গে পড়িয়া জন্মের মত কুলের বাহির হইতেছেন। তখন সকলে প্রভুর নাম শুনিয়াছে; এবং তাঁহার কৃপায় নীলাচলের পথ অনেক সুগম হইয়াছে। নিত্যানন্দের সহিতও অনেকের পরিচয় হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা যেখানে যাইতেছেন, সেখানেই প্রায় সমাদর পাইতেছেন। ক্ষীরচোরা-গোপীনাথের ওখানে সেবাইতগণ বারখানি ক্ষীর আনিয়া তাঁহাদের সম্মুখে রাখিলেন। এইরূপে নাচিতে নাচিতে সকলে আঠারনালাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, সেখানে গোবিন্দ প্রভু-দত্ত দুই-ছড়া মালা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তগণ আসিলে, সেই দুই-ছড়া মালা অদ্বৈত এবং নিতাইকে পরাইলেন। প্রভুর আদর ও আহ্বানের নিদর্শন-স্বরূপ মালা পাইয়া তখনই তাঁহারা আনন্দে কীর্তন করিতে করিতে চলিলেন।

সেই দিন নরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীজগন্নাথ নৌকা-বিহার করিবেন বলিয়া বাদ্যের ও অন্যান্য উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। সহস্র সহস্র পতাকা উড়িতেছে। বহুতর লোক নৌকা-বিহার দেখিতে তীরে উপস্থিত হইয়াছে। ওদিক হইতে প্রভুর নবদ্বীপের ভক্তগণ নৃত্য করিতে-করিতে আসিতেছেন, আর এদিকে বহুতর নীলাচলবাসী-ভক্ত সঙ্গে করিয়া প্রভু নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর সঙ্গে গদাধর, স্বরূপ, রামরায়, পুরী, ভারতী, সার্বভৌম, জগদানন্দ, অদ্বৈতপ্রভুর তনয় অচ্যুত, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, পরমানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি অনেকেই আছেন। সংকীর্তনের কোলাহল শুনিয়া প্রভু গণসহ ভক্তগণকে আনিতে অগ্রবর্তী হইলেন। মাঝ-পথে দুই দলে সাক্ষাৎ হইল। তখন—যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে—

"দূরে অদ্বৈতেরে দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ। অশ্রু মুখে করিতে লাগিলা দণ্ডবৎ।।
শ্রীঅদ্বৈত দূরে দেখি নিজ প্রাণনাথ। পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিলা প্রণিপাত।।
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্ছা পুলক হুঙ্কার। দণ্ডবৎ বহি কিছু নাহি দেখি আর।।
এই মত দণ্ডবৎ করিতে করিতে। দুই গোষ্ঠী একত্র মিলিয়া ভাল মতে।।
বৈষ্ণব-গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ। দূরে থাকি প্রভু দেখি করয়ে রোদন।।"

শিবানন্দ সেন তাঁহার পুত্রকে কোলে করিয়া এই বিংশতি দিবসের পথ আসিয়াছেন। পুত্র পিতার কোলে চাপিয়া কোথায় যাইতেছেন? না, প্রভুকে দেখিতে। দুই গোষ্ঠী সাক্ষাৎ হইবামাত্র সকলে "প্রভু" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন পুত্র পিতাকে জিজ্ঞাসা

করিতেছেন, "বাবা, প্রভু কৈ?" শিবানন্দ সেন কোলের পুত্রকে অঙ্গুলির দ্বারা দেখাইয়া বলিতেছেন, "ঐ দেখ দেখ—(যথা শিবানন্দের শ্লোক)

"বিদ্যুদ্দামদ্যুতিরতিশয়োৎকণ্ঠকণ্ঠীরবেন্দ্র-
ক্রীড়াগামী কনকপরিঘদ্রাঘিমোদ্দামবাহুঃ।
সিংহগ্রীবো নবদিন করদ্যোতবিদ্যোতি বাসাঃ
শ্রীগৌরাঙ্গঃ স্ফূরতি পুরতো বন্দ্যতাং ভোঃ।।"

তখন দুই দলে মিলিত হইয়া আনন্দে নৃত্যগীত করিতে করিতে নরেন্দ্রতীরে আসিলেন। প্রভুর এত আনন্দ হইয়াছে যে, তীরে স্থির থাকিতে না পারিয়া সরোবরে ঝাঁপ দিলেন, সেই সঙ্গে ভক্তগণও দিলেন। ইহারা ভব্যলোকের ন্যায় স্নান না করিয়া—

"সকলে বৈষ্ণবগণ এক সঙ্গে মিলি। পরস্পর কর ধরি হইলা মণ্ডলী।।
গৌড়দেশে জলকেলি আছে 'কয়া' নামে। সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলা প্রথমে।।
'কয়া' 'কয়া' বলি করতালি দেন জলে। জল-বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণব-সকলে।।"

তারপর সকলে হাত ছাড়িয়া দিয়া মুখে "কয়া" "কয়া" বলিয়া জলে আঘাত করিয়া জল-বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। ইহাতে বহু তরঙ্গের সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং এই তরঙ্গ ক্রমে বাড়িয়া প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে অতিবৃদ্ধ আছেন, অতিপণ্ডিত আছেন, অতি নিরীহ ভাল-মানুষও আছেন। এখন ভাবিয়া দেখুন, তাঁহাদের মনে কত আনন্দ হইয়াছে। আর বৃন্দাবনের সম্পত্তি কিরূপ তাহাও কিছু ইহা দ্বারা অনুভব করুন। শ্রীবৃন্দাবনে যাহাদের গতি তাঁহাদের সকলেরই এইরূপ বাল্যভাব হয়। কাজেই—

"গোকুল-শিশুর ভাব হইল সবার। প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র-অবতার।।
বাহ্য নাহি কা'র, সবে আনন্দে বিহ্বল। নির্ভয়ে গৌরাঙ্গ দেহে সবে দেন জল।।
অদ্বৈত-গৌরাঙ্গ দুঁহে জল ফেলাফেলি। প্রথমে লাগিল দুঁহে মহাকুতূহলী।।
অদ্বৈত হারেন ক্ষণে, ক্ষণে বা ঈশ্বর। নির্ঘাত নয়নে জল দেন পরস্পর।।"

জলক্রীড়া করিয়া সকলে প্রভুর বাসায় আসিলেন। অদ্য সেখানে মহোৎসব। পূর্বকার বৎসরের ন্যায় সকলে একত্র বসিয়া ও প্রভুকে মধ্যস্থলে করিয়া ভোজন করিলেন। তৎপরে ভক্তগণ প্রভুকে প্রত্যহ নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন।

"যে যে দ্রব্যে প্রভুর প্রীতি শিশুকালে।সকল জানেন সব বৈষ্ণব-মণ্ডলে।।
সেই সব দ্রব্য সবে প্রেমযুক্ত হইয়ে। আনিয়াছেন যত সব প্রভুর লাগিয়ে।।
শ্রীলক্ষ্মীর অংশে যত বৈষ্ণব-গৃহিণী। কি বিচিত্র রন্ধন করেন নাহি জানি।।
পূর্বে ঈশ্বরের প্রীতি যে সব ব্যঞ্জনে। নবদ্বীপের শ্রীবৈষ্ণবী সকলেতে জানে।।"

এইরূপে প্রত্যহ এক-এক ভক্তের গৃহে মহোৎসব হইতে লাগিল। এবার গৃহিণীরা, এমন কি, প্রভুর মাসী স্বয়ং ও মালিনী দেবীও আসিয়াছেন। প্রভুকে লইয়া তাঁহারা নির্জনে ভুঞ্জাতে লাগিলেন। প্রভু মাসীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে সন্ন্যাসীর নিয়ম কিছু রাখিতে পারিলেন না। মাসীকে প্রণাম করিলেন, আর তাঁহার কাছে কথা ও ঘরকন্নার কথা সব শুনিলেন, এবং জননীকে কি-কি বলিতে হইবে, সব বলিয়া দিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে রাস-বর্ণনের মধ্যে একটি কথা আছে যে, শ্রীভগবান গোপীগণকে বলিতেছেন, "হে আমাতে লুব্ধাগণ! তোমরা কি জান না যে, আমার সাক্ষাৎ লাভ অপেক্ষা, আমার লীলাকথা দ্বারা আমার সহিত মিলন আরও মধুর?" কিন্তু গোপীরা তাহা মানিলেন না। ভাগবতের এই সূক্ষ্ম তাৎপর্য, শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা লইয়া একটু বিচার করিব।

মনুষ্যের প্রকৃতি বিচার করিতে গেলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। প্রথম কথা, সুখ-ভোগ অপেক্ষা সুখ-ভোগের আশা ও স্মৃতি অনেক সময় অধিক সুখকর। যে সুখ দুর্লভ, তাহা

সুলভ সুখ হইতে অধিক মিষ্ট। সাক্ষাৎ-দর্শনে অনেক খুঁত দেখা যায়, দূরদর্শনে তাহা দেখা যায় না। এবং সাক্ষাৎ-দর্শন অপেক্ষা দূরদর্শনে বস্তু মনোহর হয়। সাক্ষাৎদর্শন নয়ন দিয়া আর দূরদর্শন (যে বস্তু চক্ষের বাহিরে) মন দ্বারা দর্শন করিতে হয়। মন দ্বারা যে দর্শন সে-ই প্রকৃত-দর্শন। প্রিয়বস্তু সম্মুখে রহিয়াছে, তাহাকে সর্বদা দেখিতেছে, কিছু মাত্র সুখ পাইতেছ না। সে ব্যক্তি বিদেশে গেলে, তাহাকে মন দিয়া দেখিতে হইল, অমনি অতিমধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাই মৃত্যুতে জীবের মহদুপকার করে। যেখানে মৃত্যুই জীবের ঐহিক পরিণাম, সেখানে প্রিয়বস্তুর অগ্রে মরণ ভাল; যেহেতু যে মরে সে বাঁচিয়া যায়। তোমার বিরহে তাহাকে দুঃখ না দিয়া, তোমার বিরহে তুমি দুঃখ ভোগ করিয়া তাহাকে সুখী কর। সে ব্যক্তি পরলোকে যাইয়া তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিবে। তুমি পরলোকে যাইয়া তাহাকে পাইবে; সে তোমার নিমিত্ত বাহু প্রসারিয়া বসিয়া আছে। প্রিয়জনের বিয়োগ না হইলে, পরলোকে তোমাকে কে আদর করিয়া লইবে? যাহাদের প্রিয়জনের বিয়োগ হইয়াছে, তাহারা মরিলে এখানকার প্রিয়সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পরলোক প্রিয়সঙ্গ পায়।

"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সহমস্তস্যাঃ
সঙ্গম সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপিতন্ময়ং বিরহে।।"

অর্থাৎ—বিয়োগে হৃদয় দ্রব হয়, আর হৃদয় কোমল হইলেই উহা বৃদ্ধি পায়। বিয়োগ প্রিয়-জন নয়নের অন্তরে হয়েন বলিয়া তাঁহাকে মন দিয়া দর্শন করিতে হয়। তাঁহার যদি কিছু খুঁত থাকে তাহা আর তখন দেখা যায় না, তাঁহার স্মরণ তখন তাঁহার সাক্ষাৎদর্শন অপেক্ষা মধুর হয়। প্রিয়বস্তু বিদেশে আছেন। যদি সেখান হইতে কেহ আসিয়া বলেন যে, তিনি সেই প্রিয়বস্তুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন,—তবে যিনি বিয়োগী তিনি তাঁহাকে লইয়া নির্জনে বসিয়া সেই দূরস্থিত নিধির কথা শুনেন। স্বামী পরদেশে, তাঁহার সংবাদ লইয়া কোন ব্যক্তি আসিল। স্ত্রী তাঁহাকে লইয়া নির্জনে বসিয়া স্বামীর কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করেন। ইহা স্ত্রীর নিকট তাঁহার স্বামী-সহবাসের ন্যায় অতি মধুর লাগে। যদি শুনেন তাঁহার স্বামী সর্বদা তাঁহার কথা বলেন, সর্বদা তাঁহার প্রেম-সুধা পান করেন, তবে তাঁহার বিয়োগজনিত দুঃখ থাকে না, বরং সেই বিয়োগ মহাসুখের কারণ হয়।

সেইরূপ মালিনী প্রভৃতি বাড়ী আসিয়া যখন দেখা করিতে আসিলেন, তখন শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাদের লইয়া বসিলেন ও নিমাইয়ের কথা শুনিতে লাগিলেন। ইহাই হইল জীবনধারণের উপায়। সে কথা দিবানিশি শুনিয়াও ফুরায় না। মালিনী দেখা করিতে আসিলে শচী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "সই, আমার মাথা খাও, নিমাই আমার বেঁচে আছে ত?" মালিনী তখন নিমাইয়ের কথা আমূল বলিতে লাগিলেন। নিমাইকে নিমন্ত্রণ করা হইল। তিনি কিরূপে আসিলেন, পা ধুইলেন, আসনে বসিলেন, কি কি খাইলেন, পাক কিরূপ হইয়াছিল, শাক কয় প্রকার ছিল, নিমাইয়ের শাকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সেইরূপই আছে। এই সব মালিনী বর্ণনা করিতেছেন, আর শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া একাগ্রচিত্তে শুনিতেছেন; তখন বোধ হইতেছে, যেন তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। এইরূপে মালিনীর নিকট ও প্রভুর মাসীর নিকট একবার নয়, বারে বারে শুনিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়া কেবল যে তাঁহাদের প্রিয়বস্তু বিয়োগজনিত দুঃখ সহ্য করিতে সক্ষম হইলেন তাহা নহে, তাঁহাদের বিয়োগদশা হইতেও নব-নব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা শুনিলেন যে, তাঁহাদের প্রিয়বস্তু ভাল আছেন, আর তাঁহাদের প্রতি তাঁহার মায়া তেমনি আছে, তখন আর তাঁহাদের দুঃখ কি?

শ্রীচরিতামৃত-কার ভক্তগণের সহিত প্রভুর এই চারিমাস বিহার সংক্ষেপে এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন, যথা—

"পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা-কাল যবে আইল। সবা লয়ে গুণ্ডিচা মন্দির প্রক্ষালিল।।"

প্রভু নৃত্য করিয়া উদ্যানের পুষ্করিণীর তীরে ক্লান্ত হইয়া বসিলে শ্রীনিতাইয়ের শিষ্য, কৃষ্ণদাস নামক রাঢ়-শ্রেণীর জনৈক ব্রাহ্মণ, শীঘ্র শীঘ্র ঘট ভরিয়া জল আনিয়া প্রভুকে স্নান করাইলেন। এই সামান্য ঘটনাটি কেন এখানে উল্লেখ করিলাম তাহা বলিতেছি। অবতারদিগের লীলা যাহা গ্রন্থে লেখা আছে, তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ কিছুই নাই। কেবল গৌর অবতারের কাহিনী অতি পরিষ্কাররূপে চাক্ষুষ-দর্শন দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত আছে। এমন কি; কৃষ্ণদাস যে প্রভুকে স্নান করাইয়াছিলেন, তাহাও লিখিত আছে।

প্রভু পূর্ব্বকার বৎসরের ন্যায় এবারও রথাগ্রে নৃত্য ও মন্দির মার্জন করিলেন, এবং লক্ষ্মী বিজয় উৎসবাদি দর্শন করিলেন। কিন্তু এ বৎসর তিনি যত লীলাই করুন, তাঁহার মাসীকে অগ্রে বসাইয়া, তাঁহার হস্তের রন্ধন ভোজন আর তাঁহার সহিত যে সাংসারিক আলাপ করিয়াছিলেন, ইহাই সর্বাপেক্ষা মধুর।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু একদিবস শ্রীগৌরাঙ্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া যতদূর সম্ভব উদ্যোগ করিলেন। প্রভুর যত প্রকার প্রিয়বস্তু, সমুদয় দিয়া ভোগের সামগ্রী প্রস্তুত হইল। তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে যত্ন করিয়া রন্ধন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত স্ত্রীকে বলিতেছেন, "শুন কৃষ্ণদাসের মা, প্রভু যদি একা আসেন তবেই মঙ্গল, আর যদি সহচর-সন্ন্যাসীরা সকলে আসেন, তবে প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া খাওয়াইতে পারিব না।" এই কথা বলিতে বলিতে মহাঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রভুও ঠিক সেই সময় প্রসন্ন বদনে হরেকৃষ্ণ বলিতে বলিতে আসিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসীগণ ঝড়ের উৎপাতে আসিতে পারিলেন না। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত মহানন্দে শ্রীভগবানকে ভুঞ্জাইলেন। যথা—

"দধি দুগ্ধ ঘৃত সর সন্দেশ অপার। যত দেন সব প্রভু করেন স্বীকার।।"

ভোজন শেষ হইলে শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র! তুমি ধন্য। তুমি কৃষ্ণ সেবা জান বটে।" প্রভু হাসিয়া কহিলেন, "কি আচার্য্য ঠাকুর, আজ যে ইন্দ্রকে বড় ভক্তি?" অদ্বৈত বলিলেন, কথার তোমার কাজ কী তখন প্রভু বলিতেছেন "বুঝেছি, এ ঝড়বৃষ্টি তোমার কার্য্য? তা ইন্দ্রেব ভাগ্য ভাল যে তোমার আজ্ঞা পালন করিলেন।"

জন্মাষ্টমী আসিল, আর নীলাচলে নন্দোৎসবের ধূম পড়িয়া গেল। নন্দালয় সুন্দর করিয়া সাজান হইল। অমনি প্রভুর গোপ-ভাব হইল, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণেরাও সেই ভাবে বিভাবিত হইলেন। তখন ভক্তগণ কেহ গোপ কেহ গোপী, কেহ নন্দ কেহ যশোদা হইলেন। যিনি যাহা সাজিলেন তিনি প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইলেন। জগন্নাথ মাহাতি যশোদা সাজিয়া কৃষ্ণমূর্তি কোলে লইয়া বসিয়া একদৃষ্টে নবকুমার পানে চাহিয়া আছেন, আর নয়ন-জলে ভাসিয়া যাইতেছেন। কানাই খুটিয়া নন্দভাবে বিভাবিত হইয়া সদ্যোজাত পুত্রমুখ দেখিয়া মহাব্যস্ত ও আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন। প্রভু স্বয়ং, নিতাই অদ্বৈত প্রভৃতি নবদ্বীপের ভক্তগণ এবং নীলাচলের ভক্তদিগের মধ্যে স্বয়ং প্রতাপরুদ্র, কাশীমিশ্র, সার্বভৌম, পরীক্ষা পাত্র, তুলসী পাত্র প্রভৃতি গোপ সাজিয়া মাথায় পাগ বাঁধিয়া হাতে লাঠি ও কাঁধে দধির ভার লইয়া, আত্মবিস্মৃত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া আঙ্গিনায় আসিলেন। সকলে সুখের সাগরে ভাসিতেছেন। সকলের গাত্র দধি দুগ্ধ ও হরিদ্রা-জলে সিক্ত, আঙ্গিনা দধি-দুগ্ধে কর্দমময় হইয়া গিয়াছে। তখন সকলে সেই কর্দমময় আঙ্গিনায় লগুড় হস্তে করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মনে ভাবুন, এই নৃত্যে আছেন কবি রামরায়, নৈয়ায়িক সার্বভৌম, রাজমন্ত্রী পরীক্ষা, মহারাজ প্রতাপরুদ্র, সন্ন্যাসীপ্রবর পরমানন্দপুরী। তখন আনন্দের বন্যায় সমস্ত সমভূমি হইয়া গিয়াছে। নৃত্যের পরে সকলে লাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত ও নিতাইচাঁদে একটু লাঠালাঠি হইল। শ্রীঅদ্বৈত দুই এক ঘা খাইয়া রাগ করিয়া শ্রীনিতাইকে গালি দিতে লাগিলেন। যথা—

"তবে লগুড় লয়ে প্রভু ফিবাতে লাগিলা।
বার বার আকাশে তুলি লুফিয়া ধরিলা।।
এই মত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুর।
কে বুঝিবে তাঁহা দোঁহার গোপ-ভাব গূঢ়।।"

যদি শ্রীভগবান্ আপনি জীবগণকে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে শিক্ষা না দিতেন তবে জগতে এত বিভীষিকা আছে যে সাধারণ লোকে তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিতেও পারিত না। শ্রীভগবান্ যে সর্বাঙ্গসুন্দর, ইহা আমরা অবতার হইতে জানিতে পারি; আর এই অবতাব দ্বারা শ্রীভগবানের লীলার সৃষ্টি হয়। কেবল এই লীলা দ্বারাই জগতের জীব শ্রীভগবানের সঙ্গসুখ লাভ করিতে পারে, আর শ্রীভগবানের এই লীলারূপ সঙ্গ করিয়া জীব পরিবর্ধিত হয়। নিমিত্ত লীলারূপ ভগবৎসঙ্গ যেরূপ সহজ, সুখকর ও শক্তিসম্পন্ন উপায়, এরূপ যাগযজ্ঞ, মন্ত্র-তন্ত্র, যোগ-তপস্যা কিছুই নয়। পূর্বে বলিয়াছি, ভক্তগণ ভোজনে ও নৃত্যগীতে ভজন করেন। এখন দেখুন, তাঁহারা লগুড় ফিরাইয়াও ভজন করিয়া থাকেন।

ক্রমে প্রভুর শ্রীভগবান্-ভাব হইল। কাজেই তখন কানাই খুটিয়া ও জগন্নাথ মাহাতিকে পিতামাতা জ্ঞান হওয়াতে প্রভু তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারাও নন্দ ও যশোদাভাবে বিভোর হইয়া প্রভুকে আশীর্বাদ করিলেন। সকলেই লীলাবস-সুধা পান করিলেন, কিন্তু নন্দ-যশোদা আরও কিছু করিলেন। যথা চরিতামৃতে—

"কানাই খুটিয়া জগন্নাথ দুইজন। আবেগে বিলান ঘরে ছিল যত ধন।।" ইহাতে বুঝিবেন যে, তাঁহাদের আবেগ কাল্পনিক নয়।

রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর গণকে নূতন বস্ত্র দিলেন। কিন্তু প্রভুকে কি দিবেন? তিনি সন্ন্যাসী, কৌপীন-ধারী, তাঁহার বস্ত্রের প্রয়োজন নাই। অবশ্য প্রভুর জননী আছেন, কিন্তু তাঁহার চারি-পাঁচ হাত লম্বা একখানি মোটা কাপড় হইলেই চলিয়া যায। রাজা পরম-প্রেমে ভাবিলেন যে, প্রভুর যদি বস্ত্রের প্রয়োজন হয়, তবে সে তাঁহার প্রিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিমিত্ত। শ্রীমতী তখন পূর্ণযৌবনা, তাই তাঁহার উপযুক্ত বহুমূল্যের একখানি শাড়ী দিবেন সাব্যস্ত করিলেন; এবং প্রভু যখন গোপালভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন, তখন রাজা তাঁহার মস্তকে সেই শাড়ীখানি বান্ধিয়া দিলেন। এইরূপে মহারাজ প্রতি বৎসর একখানি কবিয়া বহুমূল্য শাড়ী প্রভুকে প্রণামী দিতেন। প্রভু 'মাতাকে দিও' বলিয়া উহা দামোদরের হাতে দিতেন। দামোদর প্রভুর বাড়ীতে তাঁহার জননী ও প্রিয়াকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তিনি প্রতিবৎসর ভক্তগণেব সহিত নীলাচলে যাইতেন ও তাঁহাদের সহিত ফিরিয়া আসিয়া আটমাস প্রভুর বাড়ীতে থাকিতেন। দামোদর আসিয়া এই শাড়ী শচীর হস্তে দিলে, তিনি উহা অবশ্য বধূকে পরিতে দিতেন। বস্ত্র আসিলে শ্রীমতীর বয়স্যাগণ অবশ্য দেখিতে আসিতেন। শচীও অবশ্য শ্রীমতীকে শাড়ী পরাইতেন, তিনি না পরাইয়া ছাড়িবেন কেন? শ্রীমতী হয়ত প্রথমে পরিতে চাহিতেন না, কিন্তু প্রভু যখন শাড়ী পাঠাইয়াছেন, তখন ইহাও তিনি ও অপর সকলে বুঝিতেন যে শাড়ী পরিতে প্রভুর আজ্ঞা। সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে শ্রীমতীর সাধ্য হইত না। ফল কথা তিনি কেন শাড়ী পরিবেন না? তাঁহার স্বামী জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন; তবে স্বামীর সহিত যে দৈহিক সম্বন্ধ তাহাই গিয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দকে পাইয়া প্রভু আবার যুক্তি করিতে বসিলেন। প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি জীবগণকে উদ্ধার করিবে, সে কার্য্য ফেলিয়া এখানে আসিয়া আমাকে দুঃখ দিতেছ।" নিতাই বলিলেন, "বৎসরের মধ্যে একবার আসিয়া তোমাকে দেখিয়া যাইব, তাহা যদি নিষেধ কর তবে আমি শুনিব না। প্রভুর সঙ্গে এরূপ উত্তর করিতে কেবল নিতাই আর

স্বরূপ পারেন। প্রভুর নিতাইকে সন্তোষ রাখিতে হইবে, কারণ তিনি নিতাইকে বধ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। সে বধ কিরূপ তাহা বলিতেছি। প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! এখন আমার মিনতি শুন। তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া আবার গৃহী হও; হইয়া জীবকে হরিনাম বিতরণ কর।"

নিতাই এ কথা প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না; শেষে যখন বুঝিলেন প্রভু তাঁহাকে বিবাহ করিতে বলিতেছেন, তখন তাঁহার সমুদয় আনন্দ ফুরাইয়া গেল। জীব-বন্ধু প্রভু জীবকে ভক্তিপথে আনিয়া সুখী করিবেন, এই তাঁহার অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি বাধ্য হইয়া সন্ন্যাস লইয়াছেন। নিতাই সন্ন্যাস লইয়াছেন, গদাধর ও স্বরূপও সন্ন্যাস লইয়াছেন। কাজেই লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বৈষ্ণব হইতে গেলে উদাসীন হইতে হয়। স্বভাবতঃ লোকে গৃহস্থ-ভক্ত হইতে উদাসীন ভক্তকে অধিক করে। কারণ প্রভু স্বয়ং উদাসীন। কাজেই যিনি বৈষ্ণব, তিনি যদি গৃহস্থ হন, তবে ভাবেন যে, তিনি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি হীন। কুলীনগ্রামাবাসী বসুগণ গৃহস্থ। তাঁহারা প্রত্যহ প্রভুকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব, তাঁহাদের কি কর্তব্য। প্রভু কত প্রকারে বুঝান যে, বৈষ্ণব-ধর্মে সংসার-ত্যাগের প্রয়োজন নাই; তবু লোকে তাহা বুঝে না। লোকে সংসার ত্যাগ করিতে পারে না, শুধু এই নিমিত্ত ভক্তি-ধর্ম প্রচারের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। শ্রীঅদ্বৈতের দুই বিবাহ, তিনিও যদি বলেন যে, সংসার-ত্যাগের প্রয়োজন নাই তবু তাঁর শিষ্যগণও তাহা বুঝেন না। এ দেশীয়দের গার্হস্থ্য-ধর্মের উপর এইরূপ ঘৃণা। প্রভু ভাবিলেন যে, সংসার ত্যাগ না করিলে ভবসাগর পার হওয়া যায় না, এই ভ্রম শ্রীনিত্যানন্দ বিবাহ করিলে লোকের একেবারে যাইবে। একটি পদ আছে,—"সাধে কি আমি গৌরগুণে ঝুরে মরি।" ইত্যাদি।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা সকল শাস্ত্রের বিবাদ ভঞ্জন করিয়াছে। বাসুদেব দত্তকে প্রভু বলিলেন, "তুমি গৃহস্থ, তোমার সঞ্চয় করা কর্তব্য। শ্রীগদাধরের গুরু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কাহিনী আপনারা প্রথম খণ্ডে পাঠ করিয়াছেন। বাহ্যে তিনি মহাভোগী ছিলেন। রামানন্দ রায়ের মহিমার কথা কি বলিব। এই গৌর-অবতারে মোটে সাড়ে তিন জন পাত্র, তাহার মধ্যে রামানন্দ রায় একজন। অথচ তিনি রাজার অধীন রাজা, পরম আরামে দাস-দাসী পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন, দোলায় চড়িয়া ভ্রমণ করেন। শ্রীগৌর-অবতারে চৌষট্টি মহান্ত, তাহার মধ্যে রাজা প্রতাপরুদ্র একজন। ইনি তখন হিন্দু-রাজগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতাপান্বিত, আপন রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত অহরহ মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করিতেন। যিনি বড় শুদ্ধ-বৈষ্ণব, তিনি মক্ষিকার অঙ্গে করস্পর্শ করেন না, কিন্তু প্রতাপরুদ্র প্রতিমাসে সহস্র সহস্র বিপক্ষ-সৈন্য বধ করিয়া ও সহস্র-সহস্র আপন সৈন্যের রক্ত মোক্ষম করিয়া, কিরূপে এত বড় বৈষ্ণব হইলেন যে, তিনি মহান্তের মধ্যে গণ্য হইলেন?

পূর্বে বলিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গের গণ মদনমোহনকে ভজন করেন, মদন ভস্মকারীকে নয়। সন্ন্যাসীগণের রাজা, বৈদান্তিকগণের গুরু, শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত প্রকাশানন্দ সরস্বতী, তাঁহার অদ্ভুত-গ্রন্থ চৈতন্যচন্দ্রামৃতে বলিতেছেন যে, সর্প-বৈদ্যগণ সর্পের বিষদন্ত তুলিয়া তাহাদের লইয়া যেমন খেলা করে, গৌরভক্তও সেইরূপ তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি ধ্বংস না করিয়া তাহারা ক্ষতি করিতে না পারে, এইজন্য তাহাদের বিষ-দন্ত তুলিয়া, অথচ তাহাদিগকে অখণ্ড রাখিয়া, খেলা করেন। ছয়-গোস্বামীর মধ্যে রঘুনাথ দাস একজন, প্রভু তাঁহাকে বলিতেছেন, "যথাযোগ্য বিষয়ে ভুঞ্জ অনাবিষ্ট হয়ে।"

এখন দেখুন ধর্ম কি? ঈশ্বরের সৃষ্টিতে জটিলতা বা নিরর্থক কিছু নাই, সমুদয়েরই প্রয়োজন আছে। আমরা স্পষ্টতঃ দেখিতেছি যে, সকল দ্রব্যেরই সৎ ও অসৎ ব্যবহার আছে। অতএব শ্রীভগবদ্দত্ত কোন দ্রব্য ধ্বংস বা তাহার অসৎ-ব্যবহার করিও না; সমুদয়

ঠিক রাখিয়া উহাদের সদ্ব্যবহার কর। যদি শ্রীভগবান্ জ্ঞানময় ও প্রেমময় হন, তবে ইহা বই অন্য কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। এ সব কথা বলি কেন শ্রবণ করুন। লোকে বলে যে, বৌদ্ধধর্মে ও হিন্দুধর্মে হিন্দুদিগকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে। অহিংসা পরম-ধর্ম যাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের পরাধীনতা কেন না হইবে? উপবাস, মিতাহার, নিরামিষ আহার, বধে বিতৃষ্ণা,—যে ধর্মের প্রধান অনুষঙ্গ, তাহাতে জীবকে নিস্তেজ কেন না করিবে? এ কথা অনেক বিশ্বাস করেন যে, শুদ্ধ হিন্দুগণকে আসুরিকভাব দিবার নিমিত্ত বীরাচার তন্ত্রের সৃষ্টি হইল। বীর কাহারা—না যাহারা মদ্য-মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করে, অর্থাৎ যাহারা অসুর। এখন ইংরাজগণকে দেখিয়া বলিতে পারেন যে, বৈষ্ণবধর্ম লইয়া উপবাস করিয়া-করিয়া কি আমরা আরও নিস্তেজ হইব? একে হিন্দুজাতি ধ্বংসপ্রায়, তাহাতে যেটুকু বাকী আছে বৈষ্ণব হইয়া তাহাও কি খোয়াইব? কিন্তু বৈষ্ণব হইলে কেবল ক্ষতির মধ্যে এই দেখিতেছি যে, মাংস ভক্ষণ করার পক্ষে ব্যাঘাত হয়। কিন্তু শাস্ত্রে দেখিতেছি, শ্রীনিত্যানন্দ গৃহী হইয়া মৎস্য-মাংস ইত্যাদি যত্ন ইচ্ছা ভোজন করিতেন। তাই বলিয়া আমরা মাংস-ভোজনের অনুমোদন করিতে পারি না। ফল কথা, যাঁহার ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে,—তিনি অতি বড় তেজীয়ান না হলে—জীব হত্যার মধ্যে থাকিতে বড় কষ্টকর হইবে। মাংস-ভক্ষণ শারীরিক বলের নিমিত্ত একান্ত প্রয়োজনীয়ও নহে। যাঁহার ভক্তিবৃত্তি উত্তেজিত হইয়াছে, তাহার হৃদয় কোমল হইয়া আপনিই পশুহত্যার প্রতি বিরক্তি জন্মিবে।

স্থূল কথা, শ্রীভগবান্ মানুষকে যতগুলি বৃত্তি দিয়াছেন, সমুদয়ের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি উৎকর্ষিত হইলে, এই বৃত্তিগুলির মধ্যে কেহ যথেচ্ছাচার করিতে পারেন না, সমুদয় বৃত্তি তাঁহাদের নিয়মিত কার্যের অতিরিক্ত করিতে অশক্ত হয়। প্রভু বলিতেছেন, "যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।" ভক্তির উৎকর্ষ করিলে আপনা-আপনি বিষয় হইতে মন অন্তর্হিত করা হয়। মনে রাখিবেন যে, তৃণ হইতে নীচ হইতে হইবে বলিয়া নিস্তেজ কাপুরুষ হইতে হইবে না। ইন্দ্রিয় স্ববশে রাখিতে হইবে বলিয়া শরীর দুর্বল রাখিতে হইবে না। এক আশ্চর্য দেখিবেন যে, শ্রীবৈষ্ণবের যত ভজন সমুদয় স্বাস্থ্য ও মনের তেজ বৃদ্ধিকারক। বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানকে উত্তম দ্রব্য নিবেদন করিয়া উহা উদর-পূর্তি করিয়া প্রসাদ পান; নৃত্য-গীত যাঁহাদের ভজন, তাঁহাদের শরীর কেন ভাল থাকিবে না? এমন কি, বৈষ্ণব শাস্ত্রে এরূপ কথাও আছে যে, যাহার উদরে বায়ু সৃষ্টি হয়, তাঁহার প্রেমভক্তি-চর্চা করা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রেমভক্তি-ভজনের নিমিত্ত উত্তম জীর্ণশক্তি অর্থাৎ উত্তম স্বাস্থ্য প্রয়োজন। সংসার-ধর্ম আচরণ করাই ধর্ম, ইহার বিপরীত কার্যই অধর্ম। তবে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তেজিয়ান লোক সংসার হইতে পৃথক থাকিতে চাহেন। যাঁহাদের কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে, কি যাঁহারা বীর পুরুষ, অসুর দমন করিবেন সঙ্কল্প রহিয়াছে, তাঁহারা কার্য উদ্ধারের সুবিধার জন্য সংসারে আবদ্ধ হইতে চাহেন না; প্রভুও সেইরূপ মহদুদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীনিতাইকে মহাপ্রভু বলিতেছেন, "তুমি মুনি-ধর্ম লইয়া থাকিলে, জীব যে অন্ধ তাহাই থাকিবে। তুমি গৌড়দেশে যাইয়া সংসার কর, করিয়া জীবের প্রকৃত ধর্ম কি তাহা দেখাও"।

প্রভুর আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। গুরু-কূল রক্ষা দুই প্রকারে হইতে পারে। গুরু-বংশদ্বারা ও গুরুর শিষ্য দ্বারা। যাঁহারা উদাসীন, তাঁহারা আপনাদিগের গদি শিষ্যগণের মধ্যে একজন উদাসীনকে দিয়া থাকেন। আবার যে আচার্য্য গৃহী, তাঁহার ঔরস-পুত্র তাঁহার স্থান প্রাপ্ত হন। প্রভুর বিবেচনায় গুরুকূল রাখিতে শিষ্য অপেক্ষা ঔরসপুত্র ভাল। আমরাও দেখিতেছি যে, যেখানে শিষ্য দ্বারা গুরুকূল রক্ষিত হইয়াছে, সেখানে পরিশেষে বিশেষ বিভ্রাট উপস্থিত

হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ আসিয়া সংসারধর্ম আচরণ করিলেন, তাই গুরুকুলের মধ্যে প্রধান এক শাখার সৃষ্টি হইল। কে জানে, শ্রীনিত্যানন্দ সংসার না করিলে বৈষ্ণবধর্মের কি দশা হইত?

শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি প্রভু যে কঠোর-আজ্ঞা করিলেন, তাহা একটু বর্ণনা না করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন না। যে ব্যক্তি কৌপীন পরিধান করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ কবিয়া আবার বস্ত্র পরিধান করিলে তিনি পতিত হন। তাঁহার ছায়া মাড়াইলে অধর্ম হয়। মনে ভাবুন, এরূপ কঠোর নিয়ম না করিলে, যে-সে উদাসীন হইত, আর ভাল না লাগিলে আবার সংসারে আসিত। কঠোর নিয়ম না করিলে উদাসীনের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা থাকিত না। প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনিতাইয়ের এখন কৌপীন ছাড়িয়া পতিত হইতে হইবে। তারপর হিন্দুসমাজ-সম্মত বিবাহ করিতে হইবে। নিতাইয়ের জাত-কূল লইয়া মহাগণ্ডগোল। নিতাইযের অন্নবিচার নাই; তিনি দ্বাদশ-বর্ষ হইতে দ্বত্রিংশৎ-বর্ষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানে তীর্থদর্শন করিয়া বেড়াইতেন। তিনি যদি বিবাহ করিতে চাহেন, তবে ভদ্র-ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কেন কন্যাদান করিবেন?

তাঁহার পর তিনি নিমাইয়ের দাদা। নিমাই নির্মল, পবিত্র, ঘোর তপস্যা করিতেছেন। তিনি নিমাইয়ের দাদা হইয়া ধর্ম ত্যাগ করিবেন, পরিত্যক্ত উপবীত আবার গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিবেন, কাচ্চা-বাচ্চা পালন করিবেন, করিয়া হরিনাম বিতরণ করিবেন। ইহা কিরূপে হইবে? লোকে এত অত্যাচার কিরূপে সহিবে? কিন্তু নিতাই তাঁহার ভক্তিবলে এই সমুদয় কবিয়াছিলেন। নিতাই গৌড়দেশে আসিয়া কি তরঙ্গ উত্থিত করেন, তাহার আভাস পূর্বে একটু দিয়াছি। এখন শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে কয়েক পংক্তি উঠাইয়া দেখাইব যে, নিতাইয়ের আগমনে গৌড়দেশে একেবারে তোলপাড় উপস্থিত হইয়াছিল। নিতাইয়ের—

"কি ভোজন কি শয়নে কিবা পর্যটনে। ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্তন বিনে।।
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ-সংকীর্তন। তথায় বিহ্বল হয় কত-শত জন।।
গৃহস্থের শিশু কোন কিছুই না জানে। তাহারাও মহা-মহা বৃক্ষ ধরি টানে।।
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া। মুঞিরে গোপাল বলি বেড়ায় ধাইয়া।।
হেন যে সামর্থ এক শিশুর শরীরে। শত-জনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ বলি। সিংহনাদ করে হই মহা-কুতূহলী।।
এইমত নিত্যানন্দ বালক জীবন। বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ।।
মাসেকেও এক শিশু না করে আহার। দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার।।
হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ। সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ।।
পুত্র-প্রায় করি কভু সবারে ধরিয়া। করায়েন ভোজন আপন হস্ত দিয়া।।
কাহারে বান্ধিয়া রাখেন নিজ পাশে। বান্ধেন মারেন তবু অট্ট-অট্ট হাসে।।
একদিন গদাধর দাসের মন্দিরে। আইলেন তারে প্রীতি করিবার তরে।।
গোপী ভাবে গদাধর দাস মহাশয়। হইয়া আছেন অতি পরমানন্দময়।।
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস। নিরবধি ডাকে কে কিনিবি গো-রস।।"

অনেকে এখন শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুকে আশ্রয় করিতেছেন। আমরা বলি যে, শ্রীভগবান যে দেশে যাহা প্রয়োজন, সে দেশে তাহাই সৃষ্টি করেন। সুতরাং অবতার যদি লইতে হয়, তবে অন্ততঃ বাঙ্গালীদিগের শ্রীগৌরাঙ্গকে লইতে হইবে। তাহার পর, শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু বাঙ্গালী বলিয়া আমাদের পূজ্য নহেন। তাঁহার মত বস্তু ত্রিজগতে আর খুঁজিয়া পাইবেন না। যদি ভারতবর্ষীয়গণ এইরূপে ভক্তিবারী সিঞ্চন দ্বারা তাঁহাদিগের নির্জীব আত্মাকে সজীব করিতে পারেন, তবেই তাঁহাদের রক্ষা। কোন জাতি মরিয়াই থাকে, কোন জাতি মরিতে-

মরিতে আবার বাঁচিয়া উঠে। ইহার ঔষধ কোন একটি তরঙ্গ। কিন্তু যত রূপ তরঙ্গে মনুষ্য-সমাজ তোলপাড় করে. তাহাব মধ্যে সর্বাপেক্ষা তেজস্কর ও নির্দোষ এই ভক্তির তরঙ্গ। এই ভক্তি তরঙ্গদ্বারা বৌদ্ধগণ নূতন শক্তি পাইয়া পৃথিবীর অনেক স্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানেরাও প্রভূত শক্তিসম্পন্ন হইলেন। ভারতবাসীরা যদি সেইরূপ ভক্তির তরঙ্গ উঠাইতে পারেন, তবে তাঁহারাও পুনর্জীবন লাভ করিবেন। রাজনীতি ভারতবাসীর পক্ষে বলকারী নয়, তাঁহাদের মহত্ত্ব আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। ভারতবাসীগণ তাহাই করিলে পুনরায় জীবনশক্তি লাভ করিতে পারিবেন। আর আধ্যাত্মিক জীবন পবিবর্ধন করিতে হইলে, গৌরাঙ্গের কৃপা ভিন্ন যে আর কোন উপায় আছে তাহা বোধ হয় না। অন্ততঃ ইহার ন্যায় সহজ ও সরল উপায় যদি আর কিছু থাকে, তাহা আমাদের জানা নাই।

কাহার অন্তরে তরঙ্গ উঠিলে. উহা অন্যের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে উত্থিত করা যায়। যদি এইরূপে সমাজে কোন কারণে তরঙ্গ উঠে, তবে সে সমাজ কিছু-না-কিছু উন্নতি লাভ করে। এইরূপে ধনলাভের নিমিত্ত, কি যুদ্ধের নিমিত্ত, কখনও কখনও সমাজে তরঙ্গ উঠিয়া থাকে। প্রায়ই এই সমুদয় তরঙ্গে কিছু-না-কিছু সামাজিক উন্নতি হয়। ইউরোপের যে কিছু উন্নতি, উহা প্রায় ধনলাভে হইয়াছে। বিদ্যালাভে যে তরঙ্গ উঠে, ইহা কেহ কস্মিনকালে দেখেন নাই। ইহা কেবল বাঙ্গালীগণ সৃষ্টি করিয়া দেখাইয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপে বিদ্যার তরঙ্গ উঠে, তাহার চরম ফল হইল শ্রীভগবানের পূর্ণ-অবতার।

কোনক্রমে সমাজে তরঙ্গ উঠিলে উহার গতি-অনুসারে ফল-লাভ হয়। এই তরঙ্গ অর্থ-উপার্জনের জন্য নিয়োজিত হইলে যে ফল হইবে, পরমার্থের জন্য নিয়োজিত হইলে তদপেক্ষা অধিক ফল হইবে। মহম্মদ ভক্তির সাহায্য তরঙ্গ উঠাইলেন। পরে উহা যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত হওয়ায় নির্জীব মুসলমানগণ একেবারে জগৎ জয় করিতে সক্ষম হইলেন। বৌদ্ধগণ জীবকে দয়া-ধর্ম শিখাইবার জন্য এই তরঙ্গ নিয়োজিত করিয়া জাপান পর্যন্ত আপনাদের মতে আনয়ন করিলেন। মনে ভাবুন, কোথা জাপান, আর কোথা মিথিলা; কোথা সংস্কৃতভাষা আর কোথা জাপানী ভাষা; কোথা বাঙ্গালী, আর কোথা জাপানী। কিন্তু ভক্তির তরঙ্গে এই অসাধ্য ও অননুভবনীয় ব্যাপার সুসিদ্ধ হইয়াছিল, অর্থাৎ বাঙ্গালীগণ জাপানে গমন করিয়া তাহাদিগকে স্বমতে আনিয়াছিলেন।

গৌর-অবতার কালে রাজা ছিলেন মুসলমান, বাড়ী গৌড়ে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর রাজধানী ছিল নবদ্বীপে। এই নবদ্বীপ শাসনের ভার অর্পিত হয় রাজার দৌহিত্র চাঁদকাজির উপর। ইনি সহস্র সহস্র পাঠান সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দেশ শাসন করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মুহূর্ত মধ্যে, বিনা অস্ত্র চালনায়, তাঁহাকে কিরূপে দমন করিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক ভক্তিবলে উন্মাদ, তাই যদিচ তাঁহাদের অস্ত্র ছিল না ও কস্মিনকালেও তাঁহারা যুদ্ধ করেন নাই, তবু তাঁহারা সেই মুহূর্তে প্রভূত শক্তি পাইয়া, সেই পাঠান-সৈন্যগণকে ফুৎকার দ্বারা উড়াইয়া দিলেন। মনে ভাবুন, শ্রীগৌরাঙ্গ যদি বৈষ্ণবগণের ঐ ভাব রাখিয়া দিতেন, তবে হয়ত বাঙ্গালীগণ আজ মুসলমানদিগের ন্যায় জগৎ জয় করিতে সক্ষম হইতেন। নির্জীব হিন্দুগণ যদি এখন জীবনী-শক্তির কোন লক্ষণ দেখাইতে পারেন, তবে সে কেবল ধর্ম দ্বারা। যদি এদেশবাসীগণ আবার ভক্তিতরঙ্গে পড়িয়া যাইতে পারেন, তবে আবার তাঁহারা জাতিরূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন।

এইরূপে নীলাচলে চারিমাস মহোৎসব হইল। প্রত্যহ আনন্দ, প্রত্যেক মুহূর্তে আনন্দ। দেহধর্ম পালন করিতে যে সময় প্রয়োজন, উহা ছাড়া আর সকল সময়েই ভক্তগণ আনন্দে

ভাসিতেছেন। ইতিমধ্যে এক দিবস এক ভয়ঙ্কর ঘটনা সঙ্ঘটিত হইল। ভক্তগণ নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় প্রভু অচেতন হইয়া কূপের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে কি হইল তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ভক্তেরা অনেক কষ্ট করিয়া প্রভুর জীবন-শূন্য দেহ কূপ হইতে উঠাইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, প্রভুর হাড়-গোড় বুঝি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু (যথা চৈতন্যভাগবতে)—

"কিছু নাহি জানেন প্রভু প্রেমভক্তি বসে। বালকের প্রায় যেন কূপে পড়ি ভাসে।।
সেইক্ষণে কূপ হইল নবনীতময়। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয়।।"

প্রভুকে কূপ হইতে উঠাইলে ক্রমে তাঁহার চেতন হইল। তখন শুনিলেন যে তিনি কূপের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। প্রভুর এই কার্যে সকলের মহাভয় হইল! প্রভু স্বেচ্ছাময়, কবে ভক্তগণকে ছাড়িয়া যাইবেন কে জানে? তখন অদ্বৈত অতি কাতরভাবে প্রভুর শরণ লইয়া তাঁহার নিকট এই অঙ্গীকার করিয়া লইলেন যে, তিনি অনুমতি না দিলে প্রভু লীলা সঙ্গোপন করিতে পারিবেন না। যথা (চরিতামৃতে)—

"তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন। অঙ্গীকার জানি আচার্য করেন নর্তন।।"

প্রভু সকলের সমক্ষে নিতাইকে আবার বলিলেন—

"প্রতিবর্ষ নীলাচলে আর না আসিবে। গৌড় রহি মোর ইচ্ছা পালন করিবে।।"

কুলীন গ্রামবাসীরা আবার প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব, তাঁহাদের কর্তব্য কি? তাঁহারা কিরূপে শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন? প্রভু বলিলেন যে, নামসংকীর্তন ও বৈষ্ণব-সেবা করিলে তাঁহারা শ্রীপদ পাইবেন। তাহাতে তাঁহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা বৈষ্ণবসেবা করিলেন, কিন্তু বৈষ্ণব কিরূপে চিনিবেন? প্রভু বলিলেন, যাঁহারা বদনে সর্বদা কৃষ্ণনাম তিনিই বৈষ্ণব। কিন্তু তাঁহারা ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। যাহা হউক, শেষে ভক্তগণ দেশে ফিরিলেন; সেই সঙ্গে দামোদর পণ্ডিতও চলিলেন। প্রভু তাঁহার সহিত জননীর নিকট সেই বহুমূল্য শাড়ী ও জগন্নাথের নানাবিধ প্রসাদ পাঠাইলেন।

যতদিন ভক্তগণ নীলাচলে থাকেন, ততদিন প্রভু অনেকটা সচেতন থাকেন। ভক্তগণ বিদায় হইবার সময় প্রভুর মুখ মলিন হইয়া যায়। তাঁহার হৃদয় নবনীত হইতেও কোমল সুতরাং তাঁহার যে চিরদিনের বন্ধুগণকে বিদায় দিতে দুঃখ হইবে, সে আর বেশী কথা কি? সে মলিন মুখ দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। ভক্তগণ বিদায় হইবার পর প্রভুর দুঃখ থাকিত না। কারণ তখন তিনি বাহ্যজগতের সহিত সম্বন্ধ লোপ করিয়া অন্তরে লুকাইতেন। অন্তর্জগতে থাকিয়া প্রভু যাহা বর্ণনা করিতেন, তাহাকে 'মহাপ্রভুর প্রলাপ' বলে। যদি পাষাণ বিগলিত করিতে চাহ, যদি ভক্তিরস আস্বাদ করিতে চাহ, যদি কৃষ্ণ-প্রেম আহরণ করিতে চাহ, তবে প্রভুর এই প্রলাপ-লীলা শ্রবণ ও মনন দ্বারা আপনাকে জর-জর কর।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রলাপ বর্ণনা করিব, আমাদের এরূপ কি সাধ্য আছে? শ্রীকবিরাজ গোস্বামী না পারিয়া ক্ষান্ত দিয়াছেন। জীব মাত্রেই ঐরূপ ক্ষান্ত দিবেন। তবে যতটুকু পারি বলিব। এখন কিছু বলিব, আর পরে সুবিধামত কিছু কিছু বলিব।

শ্রীকৃষ্ণভাবে রাধার নিমিত্ত ও রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের যে বিলাপ, ইহার আভাস পূর্বে দিয়াছি। নবদ্বীপে প্রভু প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণভাবে রাধা বলিয়া, আর নীলাচলে রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বিলাপ করিতেন।

প্রভু নীলাচলে বসিয়া আছেন। মুখখানি মলিন, মাঝে মাঝে অতি বেগে নয়নধারা

পড়িতেছে। ইহাব কারণ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ। প্রভুর শ্রীমুখের বাক্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা—

"কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।।
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুখ। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক।।"

কেহ কাহার বিরহে বিলাপ করে, ইহা সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু পতি বহুদিবস বিদেশে আছেন, সতী-স্ত্রী গোপনে অশ্রুপাত করিতেছেন, ইহা অনুভব করা যায়। ইহাও অনুভব করা যায় যে, সেই সতী-স্ত্রী তাঁহার নিতান্ত কোন মর্মী সখীর নিকট তাঁহার মনোবেদনা উঘাড়িয়া বলিতেছেন, আর কান্দিতেছেন। কিন্তু প্রভুর শুধু ক্রন্দন নয়, তাহা অপেক্ষা অনেক গাঢ়তর উদ্বেগের চিহ্ন;—যথা মূর্ছা ও শ্বাসরোধ, বিবর্ণ ও প্রলাপ-বাক্য।

প্রভুর রাধাভাবে কৃষ্ণ-বিরহ ও কৃষ্ণভাবে রাধা-বিরহ, জীবন্ত সামগ্রী—কল্পনার বস্তু নহে। প্রভুর দেহে শ্রীমতী স্বয়ং যখন প্রকাশ পাইয়াছেন, তখন সে দেহে আর নিমাই কি কৃষ্ণচৈতন্যের কোন ভাব নাই,—প্রভু একেবারে রাধা হইয়াছেন। ভাবিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কি দ্বাবকায়! কৃষ্ণ নাই বলিয়া প্রভু আপনাকে রাধা ভাবিয়া বিহ্বল হইয়া রোদন করিতেছেন, আর নানাবিধ প্রলাপ বকিতেছেন; কখন কখন মূর্ছিত হইতেছেন, কখন বা কৃষ্ণান্বেষণে দৌড় মারিতেছেন। যত সন্ধ্যা হইতেছে, প্রভুর মনের বেগ ততই বাড়িতেছে।

এই প্রভুর মনের ভাব। ইহাতেই মুখ মলিন, ইহাতেই ঝলকে ঝলকে তরঙ্গ উঠিতেছে, আর নয়ন-জলে বদন ভাসিয়া যাইতেছে। কাছে স্বরূপ ও রামানন্দ বসিয়া নানারূপে প্রভুর মন কৃষ্ণ হইতে অন্যদিকে লইবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং নানা বাজে-কথা বলিতেছেন। প্রভু উপরোধে এ-কথার ও-কথার উত্তর দিতেছেন। কখন-বা তাঁহার হাসিবার কথা বলিতেছেন, আর প্রভু হাসিতেছেন। কিন্তু সে কাষ্ঠহাসি—দেখিলে আনন্দ হয় না, বরং হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এমন সময় কেহ আসিলেন, অমনি স্বরূপ বলিতেছেন, "প্রভু, অমুক চরণে প্রণাম করিতেছেন, একবার কৃপা করুন।" এইরূপে স্বরূপ ও রামরায় নানা চেষ্টায় প্রভুকে চেতন ও আনমনা রাখিতেছেন। প্রভু কাতর বদনে ইতি-উতি চাহিতেছেন; থাকিয়া-থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতেছেন; থাকিয়া-থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন। যত বেলা যাইতেছে, ততই কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনা বাড়িতেছে ও ক্রমেই স্বরূপ ও রামরায়ের চেষ্টা বিফল হইতেছে। শেষে সন্ধ্যা হইল, স্বরূপ-রামরায়ও প্রভুকে আর চেতনা রাখিতে পারিলেন না। তিনি বিহ্বল হইয়া অগাধ-বিরহ-সমুদ্রে ডুবিলেন। তখন তাঁহারা প্রভুকে গম্ভীরায় (ভিতরপ্রকোষ্ঠের মধ্যে অতি গুপ্তস্থানে) লইয়া গেলেন।

এই ভিতর-প্রকোষ্ঠে প্রভু ক্রমে চেতন লাভ করিয়া আসনে বসিলেন। সেখানে স্বরূপ ও রামরায় বসিয়া। সম্মুখে একটি প্রদীপ টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা ভাবে বিভাবিত হইয়া স্বরূপকে বলিতেছেন, "স্বরূপ! তুমি আমাকে প্রবোধ দাও, আর প্রবোধ না মানিলে দুঃখিত হও। কিন্তু বল দেখি, এমন হতভাগিনী জগৎমাঝে আর কে আছে? কৃষ্ণ কাল আসিব বলিয়া গেলেন, আর কত যুগ বয়ে গেল! আমি বেঁচে আছি কেবল কঠিন প্রাণ বলিয়া।" তারপর কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি এ-দুঃখ না দিয়া আমাকে বধ কর।"—এই বলিয়া প্রভু ধূলায় পড়িলেন। আর তাঁহারা আস্তে-আস্তে ধরিয়া প্রভুকে উঠাইলেন। তখন রামানন্দ প্রভুর মনোভাব ফিরাইবার নিমিত্ত শ্লোক পড়িলেন যে, "কৃষ্ণ কখন বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যান না।" শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেন শুনিয়া আনন্দে প্রভুর মনের ভাব ফিরিয়া গেল। তখন তিনি বলিতেছেন, "স্বরূপ, আমার কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা কর।" এই বলিয়া নিজেই বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তখন সুধা-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। অতি সরলা বালিকা মনের

ভাব গোপন করিতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গের মনও বালিকার মনে ন্যায় সরল। তাঁহার মনে যখন যে ভাবটি হইতেছে, তাহা তখনই বদনে প্রকাশ পাইতেছে। স্বরূপ ও রামরায় যেমন প্রভুর কথা শুনিতেছেন, অমনি তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্তিত এবং মনোহর দেখিতেছেন। কখন প্রভু একেবারে বিহ্বল হইতেছেন। তখন স্বরূপকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "ললিতা! তোরা কৃষ্ণ-দর্শনে যাবি কিনা বল? আমি এই বেরোলাম।" ইহাই বলিয়া প্রভু উঠিলেন ও দ্রুতপদে গমনোদ্যত হইলেন। তখন তাঁহারা প্রভুকে একটু সচেতন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে বলিলেন, "প্রভু শান্ত হউন, বসুন কোথা যাইবেন? ধৈর্য ধরুন।" কিন্তু ইহাতে প্রভু কর্ণপাত করিলেন না। তখন স্বরূপ মৃদুস্বরে বলিতেছেন, "চুপ কর! জটিলা-বুড়ী এখনও জাগ্রত আছে। সে নিদ্রা যাউক, তবে আমরা যাইব।" অমনি প্রভু ভয়ে চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন ও চুপে-চুপে কথা কহিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে প্রভুর হঠাৎ একটু চেতন হইল; তখন স্বরূপকে বলিতেছেন, "তুমি ত ললিতা নও! তুমি না স্বরূপ? আর আমি না কৃষ্ণচৈতন্য? আমি ত বাধ্য নই! তবে আমি এখন কি প্রলাপ বকিলাম?* আমি যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। দেখিতেছিলাম কি—" বলিতে গিয়া আর বলিতে পারিলেন না, আবার বিহ্বল হইলেন। তখন স্বরূপের গলা ধরিয়া কান্দিয়া বলিতেছেন, "স্বরূপ! যদি আমাকে ভালবাস তবে কৃষ্ণকে আনিয়া আমায় প্রাণে বাঁচাও। আমার প্রাণ যায়, তুমি আমার এই উপকার কর—আমি চিরকাল তোমার হইব।" তারপর "স্বরূপ, আমার প্রাণ গেল"—বলিয়াই প্রভু মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। শেযে অনেক যত্নে চেতন পাইলেন। প্রভু নীলাচলে, আর শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া ও মর্মী-ভক্তগণ নবদ্বীপে; সুতরাং তাঁহার মনে দুঃখ হইবারই কথা। কিন্তু যেই ভক্তগণ নীলাচল ত্যাগ করিলেন, অমনি প্রভু কৃষ্ণবিরহে একেবারে ডুবিলেন। প্রভুর দিবাভাগে কিছু চেতন থাকে বটে, কিন্তু সন্ধ্যা হইলে আর কেহ তাঁহার বিহ্বল-ভাব ভঙ্গ করিতে পারেন না। প্রভু, স্বরূপ ও রামানন্দকে তাঁহার হৃদয়ের ব্যাথা এইরূপে উঘাড়িয়া বলিতেছেন। যথা প্রভু-কৃত শ্লোক—

"প্রাপ্তপ্রণয়ষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা, যযৌ বিষাদোজ্‌ঝিত-দেহগেহঃ।
গৃহীত কাপালিকধর্ম কো মে বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ।।"

উক্ত শ্লোকের অর্থ কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ করিতেছেন, যথা—

"প্রাপ্তরত্ন হারাইঞা, তার গুণ সঙরিয়া, মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হাহা হরি-হরি, ধৈর্য্য গেল হইয়া চপল।।"
শুন বান্ধব, কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন, ছাড়িলেক দেবধর্ম, যোগী হঞা হইল ভিখারী।।ধ্রু।।"

প্রভু কৃষ্ণ-বিরহে কাতর হইয়া স্বরূপকে শ্লোকবন্ধে আবার বলিতেছেন, যথা—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতাম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে।।"

অর্থাৎ—"হে স্বরূপ, কৃষ্ণবিরহে আমার নিমেষ-কাল যুগ বলিয়া বোধ হইতেছে, আমার নয়ন বর্ষার মেঘের ন্যায় ও ভুবন অন্ধকার হইয়াছে।"

এইরূপে প্রভু আমার, "হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! কোথা আমি কৃষ্ণ পাবো? কে আমাকে কৃষ্ণ আনিয়া দিবে? কি করিলে কৃষ্ণ পাবো?"—এইভাবে বিলাপ করিয়া নীলাচলে অষ্টাদশ বর্ষ কাটাইলেন।

---

* বিহ্বল অবস্থায় প্রভু স্বরূপ প্রভৃতির সহিত এইভাবে আলাপ করিতেন, সেইজন্য ইহাকে 'প্রলাপ' বলা হয়।

প্রভু কৃষ্ণ-বিরহে এইরূপে কান্দিতেছেন; আবার স্বরূপ-রামরায়কে বলিতেছেন, "তোমরা আমার কৃষ্ণকে নিন্দা করিও না। তিনি আমাব প্রাণনাথ। তিনি যাহা করেন সবই ভাল।" এখন প্রভুর শ্রীমুখের অদ্ভুত শ্লোক শ্রবণ করুন, যথা—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।।"

প্রভু বলিতেছেন, "স্বরূপ! আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণকে লম্পট বলিতেছ? তাহাই হউক। তিনি আমাকে আলিঙ্গন দিয়া আনন্দ দিয়া থাকেন, কি অদর্শন হইয়া দুঃখ দিয়াও থাকেন। কিন্তু তিনি যাহাই করুন, তবু তিনি অপর নহেন, আমার প্রাণনাথ।" তৎপরে নানারূপ উপায়ে রামরায় ও স্বরূপ প্রভুকে ভুলাইয়া শয়ন কারইলেন ও প্রদীপ নিবাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তৎপরে রামরায় গৃহে গেলেন, আর স্বরূপ ও গোবিন্দ দ্বারদেশে শুইলেন।

সপ্তম অধ্যায়

অপরূপ রথ-আগে

"নাচে গোরারায়, সবে মেলি গায়, যত যত মহাভাবে।।ধ্রু।।
ভাবেতে অবশ, কি রাতি দিবস, আবেশে কিছু না জানে।
জগন্নাথ মুখ, দেখি মহা-সুখ, নাচে গর-গর মনে।।
খোল-করতাল, কীর্তন রসাল, ঘন ঘন হরিবোল।
জয়-জয় ধ্বনি, সুর-নর-মুনি, গগনে উঠয়ে রোল।।
নীলাচলবাসী, আর নানা দেশী, লোকের উথলে হিয়া।
প্রেমের পাথাবে, সভেই সাঁতারে, দুঃখী যদু অভাগিয়া।।"

ভক্তগণ বিদায় লইলে প্রভুর নবদ্বীপ-বিরহ উপস্থিত হইল। একবার শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন ইহা মনের মধ্যে সঙ্কল্প রহিয়াছে। সন্ন্যাস লইয়া সেই দিবস বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়া কাটোযা হইতে ছুটিয়াছিলেন; কিন্তু ভক্তগণ যাইতে দেন নাই। তাহার পর এই চারি বৎসর নানা কারণে যাইতে পারেন নাই। সন্ন্যাসের নিয়মানুসারে, একবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়। তাই ভাবিলেন, জননী-জন্মভূমি ও জাহ্নবী দর্শন করিয়া ঐ পথে বৃন্দাবন যাইবেন, এবং সার্বভৌম ও রামানন্দকে মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। ইহা শুনিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন, এবং রাজাও বড় ব্যাকুল হইলেন। তিনি ভাবিলেন, প্রভু যখন যাইবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে কে রাখে? আর বৃন্দাবনে গেলে কি তিনি আর ফিরিবেন? তিনি স্বেচ্ছাময়, তাঁহার মনে কি আছে কে জানে। যে বৃন্দাবনের নাম করিলে প্রভু মূর্ছিত হয়েন, সেখানে গেলে কি তিনি আর প্রাণে বাঁচিবেন? রাজার ভরসা কেবল সার্বভৌম ও রামানন্দ, তাঁহাদিগকে বলিলেন,—যে প্রকারেই হউক প্রভুর যাওয়া বন্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন। গদাধর ক্ষেত্রে সন্ন্যাস লইয়াছেন, তাঁহার ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইবার অধিকার নাই। প্রভু বৃন্দাবনে গেলে তিনি সঙ্গে যাইতে পারিবেন না। কিন্তু প্রভুকে না দেখিলে তিনি একমুহূর্তও বাঁচেন না। কাজেই তিনিও সেই দলে মিশিয়া গেলেন। তখন সকলে জুটিয়া প্রভুকে নানা কথা বলিয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গদাধর প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিলেন যে, তিনি কেন বৃন্দাবনে যাইবেন? তিনি যেখানে থাকেন সেই তো বৃন্দাবন? প্রভু হাসিয়া বলিলেন যে, তিনি অবশ্য যাইবেন। একটিবার পুণ্যস্থান দর্শন করিয়া আবার সত্বর ফিরিয়া আসিবেন। তখন রামরায় ও সার্বভৌম কাতরভাবে বলিলেন, "প্রভু, পশ্চিম দেশে বড় শীত, শীতের পর যাইবেন।" শেষে তিনি এই প্রস্তাবে স্বীকার করিলেন। ক্রমে ফাল্গুন মাস আসিল, তখন আবার প্রভু

যাইবার কথা বলিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন, "প্রভু, দোল আসিতেছে, দোল দেখিয়া যাইবেন"। দোল হইয়া গেলে প্রভু আবার যাইবার কথা তুলিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন যে, গৌড়ীয় ভক্তগণ রথ-দর্শনার্থে অতি শীঘ্র নবদ্বীপ ত্যাগ করিবেন। তাঁহারা আসুন, তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন। প্রভু করেন কি, তাহাই স্বীকার করিলেন। সার্বভৌম, রাজা ও রামানন্দের এই কার্যে গৌরভক্তগণ মনে একটু ব্যথা পাইতে পারেন। প্রভু বৃন্দাবনে যাউন কি না, সে অল্প কথা। প্রকৃতই, গদাধর যে বলিয়াছিলেন, তিনি যেখানে, সেখানেই বৃন্দাবন; সে ঠিক কথা। কিন্তু প্রভু জননী ও জন্মভূমি দর্শন করিতে একবার যাইবেন, জননীর বয়ঃক্রম সপ্ততি বর্ষ, নিমাই তাঁহার একমাত্র পুত্র। চিরবিয়োগিনী বিষ্ণুপ্রিয়াও এই উদ্যোগে একবার স্বামীর শ্রীমুখ দেখিয়া চিত্ত জুড়াইবেন। এরূপ কার্যে বাধা দিলে কিছু স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়। শচী অতি-বৃদ্ধা, তিনি যে-কোন দিন দেহত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু রামরায় প্রভুর সাড়ে তিনজন পাত্রের মধ্যে একজন। তিনি প্রভুর প্রিয় হইতেও প্রিয়।

"অন্যের কা কথা প্রভু বৃন্দাবন যাইতে। দুই বর্ষ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে চিত্তে।।
আজি রহ কালি রহ, বলে রামানন্দ। দুই বর্ষ রাখিলেন হয়ে প্রতিবন্ধ।।"

তবে যাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস, তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া সোজা কথা নয়। হয়ত রামরায় ভাবিলেন যে, শ্রীভগবান ঘরণী ও জননীকে সামান্য মায়ায় কেন অভিভূত করিবেন? বোধ হয়, তাঁহার মনে দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে, প্রভুর ইচ্ছা না হইলে, শচী কখনও এ-সংসার পরিত্যাগ করিবেন না। বিশেষতঃ প্রভু একবার মাত্র দেশে যাইবেন, সুতরাং যত বিলম্ব করিয়া যাওয়া হয় ততই ভাল। প্রভুকে লোকে স্বেচ্ছাময় বলে, কিন্তু তিনি ভক্তির বশ। যাহা হউক প্রভু তখন গমন করিলেন না, নবদ্বীপবাসীদিগের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

নিত্যানন্দ গৌড়ে আসিয়া সুরধুনীর দুই তীর হরিনামে উন্মত্ত করিলেন; সেই সঙ্গে-সঙ্গে সন্ন্যাসাশ্রমের যত আচার সমুদয় ত্যাগ করিলেন। উত্তম পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন, অঙ্গে আভরণ ধরিলেন, পায়ে নূপুর পরিলেন, সুতরাং তাঁহার বৃহৎ একদল শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। নিত্যানন্দ সুবর্ণবণিকগণকে হিন্দুসমাজভুক্ত করিয়া লইলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান উদ্ধারণ দত্ত; তিনি অতুল ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া ভেক লইয়া নিতাইয়ের পশ্চাদগামী হইলেন। নিতাই কত লক্ষ লোককে উদ্ধার করিলেন, তবু তিনি সমাজকর্তৃক বড় প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। এমন কি অনেক বৈষ্ণব পর্যন্ত তাঁহার বিপক্ষ হইলেন; কেহ তাঁহাকে একেবারে ত্যাগ করিলেন, কেহ বা প্রভুর নিকট কলঙ্ক রটাইতে লাগিলেন। নিতাই সামাজিক উৎপীড়নে জর্জরিত হইয়া কেবল দু'একটি ভৃত্য ও জনকয়েক পারিষদ সঙ্গে করিয়া, শচীর নিকট অনুমতি লইয়া প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে গমন করিলেন। মনে মনে একটু ভয়ও হইয়াছে। যে প্রভু এত কঠোর সন্ন্যাস করিতেছেন, তিনি কি তাঁহার সমুদয় আচার-ত্যাগরূপ কার্য্য অনুমোদন করিবেন?

শ্রীনিত্যানন্দ এইরূপে নীলাচলে আসিয়া, একটি ফুলবাগানে বসিয়া দুঃখে ও ভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। কি ছিলেন কি হইয়াছেন—এই তাঁহার দুঃখ, আর প্রভু কি বলিবেন—এই ভয়। যাঁহার হাস্যময় শ্রীমুখ দেখিলে পুত্রশোকীরও দুঃখ দূর হয়, তাঁহার মুখ দেখিলে এমন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। শ্রীনিত্যানন্দের আর্তনাদ সামান্য কথা নয়। উহা তখনি প্রভুর গোচর হইল। তখনি ভক্ত-বৎসল প্রভু আর তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া একাকী সেই স্থানে ছুটিয়া আসিয়া দেখেন যে, নিতাই জানুর মধ্যে মুখ রাখিয়া অস্ফুট-স্বরে রোদন করিতেছেন।

নিতাইকে প্রভু ডাকিলেন না, কিছু বলিলেনও না, কেবল তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, আর একটি শ্লোক রচনা করিয়া নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "শ্রীনিত্যানন্দ যদি অতি কু-কর্মও করেন, তবু তাঁহার শ্রীপদ স্বয়ং ব্রহ্মার বন্দনীয়।"

এখানে একথা রাখিয়া আর একটি অদ্ভুত কথা বলিব। শ্রীগৌরাবতারের বৈষ্ণবগণ হিন্দুগণের পক্ষে যে সমুদয় অসম্ভব কথা ও কার্য, তাহা বলিতেন ও করিতেন। তাঁহারা গঙ্গাজল ও তুলসী লইয়া প্রভুর চরণ পূজা করিতেন। আবার প্রভু বলিতেছেন যে, নিত্যানন্দের চরণ ব্রহ্মার বন্দনীয়। উহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যাঁহাদের লইয়া গৌর-লীলা, তাঁহাদের গৌর-অবতার সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র ছিল না; অর্থাৎ প্রভু যে শ্রীকৃষ্ণ এবং নিতাই যে বলরাম, উহা কেহ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিতেন না।

নিতাই নয়ন মেলিয়া দেখিলেন যে, প্রভু তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও স্তুতি করিতেছেন। ইহা সহিতে না পারিয়া নিতাই তাড়াতাড়ি উঠিয়া যেমন প্রভুকে অভ্যর্থনা করিতে গেলেন অমনি আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন। প্রভু আছাড় খাইলে, তাঁহাকে তুলিয়া ধরা একমাত্র নিতাইয়ের কাজ। আজ তাহার উল্টা হইল;—প্রভুই যত্ন করিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। একদিন শ্রীঅদ্বৈত কাতরস্বরে শ্রীমহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন, "প্রভু নিত্যানন্দ প্রভৃতি সমুদয় তোমার ভক্তগণকে ভক্তি দিয়াছ, তাঁহারা সেই আনন্দ ভাসিতেছেন। কিন্তু আমাকে খানিকটা রাগ, অহঙ্কার ও অবিশ্বাস দিয়াছ, তাহাতে আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি।" এখন নিত্যানন্দ করজোড়ে প্রভুকে কি বলিতেছেন তাহা শ্রবণ করুন। যথা চৈতন্যভাগবতে—

"অদ্বৈতাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ। সবারেই দিলে প্রেম ভক্তি আচরণ।
মুনি-ধর্ম ছাড়াইয়া যে কৈলে আমারে। ব্যবহারি জনে যে সকলে হাস্য করে।।"

অদ্বৈতাদি শ্রীভগবানের চিদংশ; কাজেই তাঁহাদের অবিশ্বাস, অহঙ্কার ও ক্রোধ থাকিবারই কথা। কিন্তু নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের আনন্দাংশ; তাঁহার পক্ষে জপ তপ ও বিধিপালন কিরূপে সম্ভব হইবে। নিতাই বলিতেছেন, " প্রভু আমি ছিলাম সন্ন্যাসী, আমাকে গৃহী করিলে, এখন লোকে আমাকে দেখিয়া হাস্য করে"।

কোন বা বক্তব্য প্রভু আছে তোমা স্থানে। কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য দরশনে।।
মন প্রাণ সবারি ঈশ্বর প্রভু তুমি। তুমি যে করাহ সেইরূপ করি আমি।।
আপনে আমারে তুমি দণ্ড ধরাইলে। আপনিই ঘুচাইয়া এ সব করিলে।।
প্রভু বলে, "তোমার যে দেহে অলঙ্কার। নববিধ ভক্তি বই কিছু নহে আর"।।

প্রভু, নিত্যানন্দকে শান্ত করিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তোমার দেহে যে অলঙ্কার, উহা শ্রবণ-কীর্তনাদি যে নববিধ ভক্তি তাহারই প্রকাশ। তুমি স্বর্ণবণিকগণকে যে ভক্তি দিয়াছ উহা স্বয়ং মহাদেবও বাঞ্ছা করেন। তোমার সঙ্গীরা সকলেই গোপবালক। গোপবালকের জপ-তপ শোভা পাইবে কেন? শ্রীপাদ! তোমার আবার বিধি কি?"

শ্রীনিত্যানন্দ, প্রভুর এই প্রশ্রয়-বাক্য শুনিয়া পরম আশ্বাসিত হইলেন। ত্রিজগতে তিনি আর কাহারও নয়, কেবল তাঁহার প্রভুর। নিতাইও এইরূপে আপনি গৃহস্থ হইয়া জগতের জীবকে দেখাইলেন যে, গৃহস্থধর্ম বৈষ্ণবাচারের বিরোধী নয়। তাহার পর প্রভু নিজ বাসায় গেলেন, আর নিত্যানন্দ শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া যমেশ্বরের টোটায়, শ্রীগদাধরের স্থানে গমন করিলেন। গদাধর তখন ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দের আগমন বার্তা শুনিয়া দৌড়িয়া আসিলেন।

"নিত্যানন্দ গদাধরের যে প্রীতি অন্তরে। তাহা কহিবার শক্তি ঈশ্বর সে ধরে"।।

এইরূপ প্রীতি হইবারই কথা; কারণ দুইজনেই গৌর-ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। গদাধরের গোপীনাথের নিমিত্ত নিতাই এক মণ অতি শুভ্র সূক্ষ্ম তণ্ডুল ও একখানি রঙ্গিন বস্ত্র আনিয়াছেন।

গদাধর সে দিবস নিতাইকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণের উদ্যোগ এখন শ্রবণ করুন। গদাধর—

"তবে রন্ধনের কার্য করিতে লাগিলা। আপন টোটার শাক তুলিতে লাগিলা।।
কেহ করে নাই, দৈবে হইয়াছে শাক। তাহা তুলি আনিয়া করিল এক পাক।।
তেঁতুল বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল। তাহা আনি বাটি তার দিল লোন-জল।।"

এই গেল নিমন্ত্রণের উদ্যোগ। তাঁহাদের উভয়ের ইচ্ছা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু সাহসে কুলাইতেছে না। তাঁহাদের মন জানিয়া, আপনি আসিয়া—

'গদাধর' 'গদাধর' ডাকে গৌরচন্দ্র। সম্ভ্রমেতে গদাধর বন্দে পদ-দ্বন্দ্ব।।
হাসিয়া বলেন প্রভু, 'শুন গদাধর। আমি কি না হই এই নিমন্ত্রণ ভিতর।।
নিত্যানন্দ দ্রব্য গোপীনাথের প্রসাদ। তোমার রন্ধন ইথে আছে মোর ভাগ'।।

অবশ্য ভাগ আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে। রন্ধন কার্য শেষ হইলে তিনজনে একত্র বসিয়া হাস্য কৌতুকে ভোজন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে নবদ্বীপ-ভক্তগণের শ্রীনীলাচলে আসিবার সময় হইল। এবার তাঁহাদের আসিতে একটু কষ্টও হইল। যেহেতু তখন দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দু-মুসলমান আবার বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, লোক-চলাচলের পথ বন্ধ হইয়াছিল। ভক্তগণ কোনক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই সঙ্গে প্রভুর বাড়ীর রক্ষাকর্তা দামোদর পণ্ডিতও আসিলেন। ভক্তগণের সহিত প্রভুর প্রীতিসম্ভাষণ হইয়া গেলে, তিনি দামোদর পণ্ডিতের দিকে চাহিলেন। অন্য লোক হইলে জিজ্ঞাসা করিত, "মা কেমন আছেন?" কিন্তু প্রভু তাহা করিলেন না। যখন প্রভু সন্ন্যাস লয়েন তখন জননীকে বলেন, "মা, আমার এই ভিক্ষা মনে রাখিও, সদা কৃষ্ণ-নাম লইও।" এখন প্রভু দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "দামোদর। জননীর ত শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি আছে?"

একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীমতীতে কোন্দল হয়, তখন সখীরা রাধার পক্ষ লয়েন। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যশোদার বচসা হইলে ধনিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ না লইয়া যশোদার পক্ষ হয়েন। সেইরূপ দামোদর শচীদেবীর সেবক, তিনি শচীর পক্ষ। প্রভু যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "জননীর কৃষ্ণে ভক্তি আছে ত?" অমনি দামোদর ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বড় রুক্ষ লোক,—কাহাকেও ন্যায্য বলিতে ছাড়েন না।

কি বলিলে গোঁসাই, আইর ভক্তি আছে? শুনি ক্রোধে লাগিলে করিতে উত্তর।।
"পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর। ইহা জিজ্ঞাসহ প্রভু তুমি কোন্ লাজে?
অশ্রু-কম্প-স্বেদ-মুচ্ছ-পুলক-হুঙ্কার। যতেক আছয়ে বিষ্ণু-ভক্তির বিকার।।
ক্ষণেক আইর দেহ নাহিক বিরাম। নিরবধি শ্রীবদনে স্ফুরে কৃষ্ণনাম।।"

দামোদর ক্রোধে আরও বলিলেন, "গোসাঞি, তুমি যে কৃষ্ণভক্তি পাইয়াছ, তাহা সেই জগজ্জননী শচীদেবীর কৃপায়।"

প্রভুও ইহাই শুনিবার জন্য দামোদরকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রভু তখন উঠিয়া দামোদরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিতেছেন,—

"আজ দামোদর তুমি আমারে কিনিলা। মনের বৃত্তান্ত সব আমারে বলিলা।।
যত কিছু কৃষ্ণ-ভক্তি সম্পত্তি আমার। জননী প্রসাদে সব, দ্বিধা নাহি তার।।"

শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে মধুর হাসি এরূপ চিত্ত-বিমোহিত করিত যে অনেক ভক্ত শুধু তাঁহার সেই হাসির দ্বারা চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহার শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইতেন। কিন্তু প্রভুর হাসি যেরূপ মধুর তাঁহার বচনও সেইরূপ। শুধু গলার স্বর বলিয়া নয়, তিনি যখন যাঁহার সহিত কথা বলিতেন, তখন তাহার বোধ হইত যে, প্রভু তাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন। অন্তর্যামী প্রভু সমুদয় জানেন। যদিও তিনি ভাবে বিভোর, তবু যদি গার্হস্থ কথা কহিতে লাগিলেন, তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন যে তিনি বর্হির্জগতের সমুদয়

সংবাদ রাখেন। প্রভু নবদ্বীপের প্রত্যেক ভক্তের নিকট তাঁহার শারীরিক ও পারিবারিক ইত্যাদি সমুদয় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রভু যাহার সহিত কথা বলিতেছেন, সেই বুঝিতেছে যে, তিনি তাঁহার বিষয় দিবানিশি চিন্তা করেন, আর অবগতও আছেন।

"হেন সে তাঁহার রঙ্গ সবেই ভাবেন। আমার অধিক প্রীত কারু না বাসেন।।"

অর্থাৎ সকলেই ভাবেন—প্রভু তাঁহার, আর তিনি প্রভুর। এইরূপ লক্ষ লক্ষ লোকের সহিত প্রভুর সম্বন্ধ। যাঁহারা নীলাচলে আসিতে পারেন নাই, তাঁহাদের কথাও প্রভু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার গৃহে বসিয়া যখন উহা শুনেন তখন ভাবেন যে, প্রভু তাঁহাদিগকে এক বিন্দুও ভুলেন নাই। ইহাতে তাঁহারা প্রভুর সাক্ষাৎদর্শনের ফল পান।

প্রভুর সহিত প্রীতি-সম্ভাষণ হইয়া গেলে, ভক্তগণ স্ব স্ব বাসায় যাইয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিলে, প্রভু বলিলেন, "এবার তোমরা বেশীদিন এখানে থাকিও না, রথ দেখিয়াই ফিরিয়া যাইও। আমি বিজয়াদশমীর দিন শ্রীবৃন্দাবনে যাইব। যাইবার বেলা গৌড়ে শ্রীজাহ্নবী ও শ্রীজননী—এই দুই দয়াময়ীকে দেখিয়া যাইব।" প্রভু দেশে যাইবেন ও মাতার শ্রীচরণে দর্শন করিবেন শুনিয়া ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে প্রভুকে সঙ্গে লইয়া যান, কিন্তু প্রভু তাহাতে সম্মত হইলেন না। ভক্তগণ রথ দেখিয়া গৃহে ফিরিলেন। এমন সময় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এক যুক্তি করিলেন। তিনি বরাবর প্রভুকে সন্দেহ করিয়া ভক্তগণকে দুঃখ দিয়াছেন, আপনিও দুঃখ পাইয়াছেন। তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি একটি সঙ্কল্প করিলেন। লোকে 'কৃষ্ণকীর্তন' করে, তিনি 'গৌরকীর্তন' প্রচার করিবেন মনস্থ করিলেন। নিজে একটি গীতও বাঁধিলেন। কিন্তু কে গাহিবে? ঘরে বসিয়া উদ্দেশ্য সফল হইবে না। ঘরে বসিয়া গৌরগুণ সকলেই গাহিয়া থাকেন। প্রভুকে শুনাইয়া গাহিতে হইবে, কিন্তু প্রভু তাহা করিতে দিবেন কেন? একটি ব্রাহ্মণকন্যা তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন বলিয়া, প্রভু ক্লেশে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন ও দুই দিবস অহরহ ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সহজ অবস্থায় প্রভু দীনের দীন। কিসে কৃষ্ণের দাস হইবেন, কিসে কৃষ্ণ-নামে রুচি হইবে, কিসে কৃষ্ণ তাঁহাকে কৃপা করিবেন,—ইহা দিবানিশি নিজ-জনের গলা ধরিয়া কান্দিয়া-কান্দিয়া বলিতেছেন। কাজেই তাঁহার সম্মুখে একথা বলিতে কাহারও সাহস হইত না যে—তুমি শ্রীকৃষ্ণ, তুমি ভগবান, কি তুমি ঈশ্বর। তবে যখন তিনি ভগবানরূপে প্রকাশ পাইতেন, তখন প্রভু বলিতেন,"আমি শ্রীকৃষ্ণ, ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমার আসিবার বহু কারণ আছে, তাহার মধ্যে এক কারণ জীবকে এই অভয় প্রদান করা যে, তাহারা আমার অতি প্রিয় ও ভক্তি দ্বারা অতি সহজে আমাকে পাইতে পারে।" প্রকাশাবস্থায় ভক্তগণ অনায়াসে চন্দন তুলসী-গঙ্গাজল দিয়া তাঁহার চরণ পূজা করিতেন। শ্রীঅদ্বৈত অনেক বিবেচনা করিয়া এই পদটি রচনা করিলেন। যথা—

"শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা-সাগর। দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর।।"

এই পদটিতে, শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ং ভগবান, তাহা স্পষ্ট না বলিয়া, তাঁহাকে শুধু 'নারায়ণ' বলা হইয়াছে। এখন নারায়ণ সন্ন্যাসী মাত্রকে বলা যায়। অদ্বৈত ভাবিলেন, ইহাতে যদি প্রভু রাগ করেন, তবে বলিবেন যে, তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহাকে নারায়ণ বলিলে তিনি আপত্তি করিতে পারেন না। কারণ সন্ন্যাসীকে 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে হয়। শ্রীঅদ্বৈত ভক্তগণকে তাঁহার পদটি শুনাইয়া বলিলেন, "প্রভুর কৃপায় আমরা সর্বপ্রকার ধন্য হইয়াছি। এস, আমরা প্রভুর যশ-গান করি। প্রভুকে জগতে প্রচার করিতে হইলে তাঁহার গুণ কীর্তন প্রকাশ্যে করিতে হইবে।" ভক্তগণ শুনিয়া বড় আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু প্রভু রাগ করিবেন এই কথাও উঠিল। তখন অদ্বৈত বলিলেন যে, সে ভার তাঁহার

উপর। তখন প্রভুর দুইচারি শত ভক্ত যন্ত্র মিলাইয়া নব-অবতারের কীর্তন আরম্ভ করিলেন।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালীরা এখন প্রধান কিনা, সে সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ আছে। কিন্তু তখন যে তাঁহারা প্রধান ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ভারতের সৌভাগ্য ত্রিহুত হইতে নবদ্বীপে আগমন করিলেন। ত্রিহুতের পণ্ডিতগণ জগতে বৌদ্ধধর্মপ্রচার করিলেন, আর নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ তন্ত্রধর্ম সমুদয় ভারতবর্ষে বিস্তার করিলেন। কাশীতে বেদের প্রাধান্য রহিল বটে, কিন্তু সেইরূপ ন্যায়ের আকর স্থান নবদ্বীপ হইল। চণ্ডীদাস, জয়দেব, উমাপতি, গীতার টিকাকার অর্জুন মিশ্র,—ইঁহারা সকলেই বাঙ্গালী। সেই বাঙ্গালীর মধ্যে প্রধান শ্রেণীর দুইচারিশত লোক, আমাদের ন্যায় একজন দেহধারীকে—যাঁহার ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা আছে, সম্ভ্রম আছে, অচৈতন্য সবই আছে,—তাঁহাদের "জীবন মরণের গতি" স্থির করিয়া তাহার যশ-গান করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই দেহধারী বস্তুটি তাঁহাদের নিকট থাকিয়া অখিলব্রহ্মাণ্ডপতির যে পূজা তাহা লইতে লাগিলেন। পরিষ্কার রজনীতে আকাশের দিকে চাহিলে অসংখ্য নক্ষত্র দেখা যায়। ইহাদের এক-একটি আমাদের পৃথিবীর ন্যায় বহুতর জগতকে, আমাদের সূর্যের ন্যায় আলো দিয়া থাকে। এই ব্রহ্মাণ্ড যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কিরূপ বৃহৎ বস্তু তাহা ইহা হইতে কতক বুঝা যায়। তিনি ব্রহ্মা, তাঁহার যে স্বামী তিনি কাশীমিশ্রের আলয়ে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ শক্তিধর, আর সে শক্তি যে মানুষে সম্ভবে না, তাহাও বুঝিবেন। শ্রীঅদ্বৈতের উক্ত পদ ধরিবামাত্র আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। তখন ভক্তগণের প্রভুর সম্বন্ধে যে কিঞ্চিৎ ভয় ছিল তাহা উড়িয়া গেল। সুতরাং তখন শ্রীগৌরাঙ্গ যে শ্রীহরি, তিনি যে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা নিরুদ্বেগে একবাক্যে সকলে গাহিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া গাহিতে লাগিলেন, "হে হরি! তুমি যে গোলক ত্যাগ করিয়া জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত এখন 'কৃষ্ণ-চৈতন্য'-নামধারী হইয়া বিরাজ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার।" ভক্তগণ গাহিতে গাহিতে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর সেই সুমঙ্গল কীর্তন-ধ্বনি জগদ্ব্যাপিয়া উঠিল। প্রভু তখন বাসায় ছিলেন, এই ধ্বনি তাঁহার কানে গেলে তিনি তৎক্ষণাৎ এই কীর্তনানন্দে যোগদান করিতে আসিলেন। প্রভুকে দেখিয়া কেহ আর ভয় পাইলেন না। তখন আনন্দ ভয়কে একেবারে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছে। প্রভু সহাস্যে আসিলেন; আর সকলে তাঁহার দিকে চাহিয়াও আঙ্গুল দিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া, গাহিতে লাগিলেন,—"তুমি কৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার! তুমি কৃষ্ণ, তোমার জয় হউক!" প্রভু প্রথমে ভাবিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণ-কীর্তন করিতেছেন। কিন্তু একটু পরে প্রভু সমুদয় বুঝিলেন; তখন লজ্জায় তাঁহার চন্দ্রবদন মলিন হইয়া গেল। প্রভু মুখে কিছু বলিলেন না বটে, তবে যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

ভক্তগণ প্রভুর এই ভাব দেখিয়া একটু তটস্থ হইলেন, কাজেই কীর্তন আপনা-আপনি থামিয়া গেল। তখন তাঁহারা সকলে প্রভুর বাসায় আসিলেন। দলপতি শ্রীঅদ্বৈত সর্বাগ্রে, তাঁহার পশ্চাৎ শ্রীবাস, তাঁহার পশ্চাৎ শ্রীবাস, তাঁহার পশ্চাৎ আর সকলে। বাসার নিকটে আসিয়া চুপে চুপে দ্বার রক্ষক শ্রীগোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু কি করিতেছেন? তিনি বলিলেন প্রভু ফিরিয়া আসিয়া নয়ন মুদিয়া শুইয়া আছেন। ইহাতে ভক্তগণ আরো ভীত হইলেন; এবং তাঁহাদের আগমনবার্তা প্রভুকে জানাইলে, তিনি ভক্তদিগকে তাঁহার নিকট আসিতে অনুমতি দিলেন। তখন ভক্তগণ প্রভুর পার্শ্বে যাইয়া চুপ করিয়া বসিলেন। একটু পরে প্রভু উঠিলেন। তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে বড় খাতির করেন, সুতরাং তাহাকে কিছু না বলিয়া, শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! আজ তোমরা ও কি কীর্তি করিলে?" ভক্তগণ দেখিলেন, তাঁহারা যত ভয় করিয়াছিলেন, প্রভুর তত রাগ হয় নাই। তখন আশ্বাসিত

হইয়া শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! কি অকীর্ত্তি করিলাম বলুন"; ইহাতে প্রভু একটু উগ্র হইয়া বলিলেন, "কি অকীর্তি করিলে তাহা বলিতে হইবে? কৃষ্ণ-কীর্তন রাখিয়া, তোমরা কি আরম্ভ কবিলে? ইহাতে পরিণামে তোমাদের ও আমার সর্বনাশ। অগ্রে লোকের উপহাস, পরে পরকালনাশ!" শ্রীবাস এখন অতি নিঃশঙ্ক হইয়াছেন। প্রভু পাছে মনের ক্লেশে মূর্ছিত হইয়া পড়েন, কি নীলাচল ত্যাগ করেন, কি প্রাণে মরেন—এই তাঁহাদের ভয়। কিন্তু প্রভুর সেরূপ কোন ভাব না দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন। তখন শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু. আমি জীবের স্বাধীনতা স্বীকার করি না। তুমি প্রভু, আমরা অধীন। তুমি যেমন বলাইলে, আমরা তেমনি বলিলাম।" ইহাতে প্রভু আরো ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "করিলে তোমরা, অপরাধী হইলাম আমি!" ঠিক সেই সময় শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বহুতর লোক প্রভুর বাসাব দ্বারে আসিয়া, "জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" বলিয়া গৌর-কীর্তন আরম্ভ করিল। কেহ বলে "জয় সচল-জগন্নাথ", কেহ বলে "জয় সন্ন্যাসীরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ!" ইঁহার সকলেই গৌড়বাসী, রথোপলক্ষে নীলাচলে আসিয়াছেন এবং প্রভুর দর্শন-লালসায় তাঁহার বাসায় আসিয়া প্রভুর নাম-কীর্তন করিতেছেন।

সহস্র সহস্র জন, না জানি কোথাকারে।"হেনকালে উদ্ভুত হইল আসি দ্বারে।।
কেহ বা ত্রিপুরা, কেহ চট্টগ্রামবাসী, জগন্নাথ দেখি আইল, প্রভু দেখিবারে।।
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্তন। শ্রীহট্টিয়া-লোক কেহ, কেহ বঙ্গদেশী।।
শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার করিয়া বর্ণন।।"

তখন শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু, আমরা তোমার দাস, তুমি যাহা বল তাহা আমাদের করিতেই হইবে; কিন্তু এখন কি করিয়া ইহাদের মুখ বন্ধ করিবে?" প্রভু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "পণ্ডিত! তুমি কৃষ্ণের কৃপাপাত্র, তোমার শক্তির অবধি নাই। তুমি নিজ-শক্তি বলে এই সমুদয় আনাইয়া আমাকে নিরুত্তর করিতেছ। শ্রীবাস বলিলেন, "তুমি ঘরে লুকাও আর বাহিরে প্রকাশ হও,—এ তোমার কি রীতি? এই সমুদয় লোক, যাহারা তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পূজা করিতেছেন, ইঁহারা তোমাকে সম্ভবতঃ কখন দেখেনও নাই; ইহারা একথা কেন বলেন যে, তুমি ভগবান? তুমি যাই বল, আমরা কিন্তু উঁহাদের শিখাইয়া দিই নাই।" তখন প্রভু বলিলেন, "তোমরা নিজজন, তাই তোমাদের বলি যে, তোমাদের এ সমুদয় লোকদিগকে নিবারণ করা কর্তব্য।" শ্রীবাস সঙ্কেত দ্বারা অনেক সময় মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন। প্রভুর কথা শুনিয়া তিনি সেই কথার উত্তরস্বরূপ দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধ করিয়া, যেন মুষ্ঠির মধ্যে কি পুরিয়া উহা নীচে আনিলেন। প্রভু বলিলেন, "পণ্ডিত! তোমার সঙ্কেত আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না।" শ্রীবাস বলিলেন, "এই হস্তের দ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদিত করিলাম, আর কি?" তৎপরে বলিলেন, "প্রভু। তোমার নির্মল যশ জগৎ ব্যাপিতেছে, উহা রোধ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, আর ইচ্ছাও নাই। তোমার শ্রীচরণ-কৃপাবলে সমুদয় জগৎ উদ্ধার হইয়া গেল। প্রভু, লোকে কি সাধে তোমাকে পূজা করে?" এ কথা বলিতে বলিতে শ্রীবাসের ও অপর সকলের নয়ন দিয়া জল পড়িতে লাগিল। প্রভু তখন নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় বলিতেছেন—

"শ্রীগৌরাঙ্গের রাঙ্গাপদ, যার ধন সম্পদ, সে জানে ভকতি-রস সার।
শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর-লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, নির্মল হৃদয় ভেল তার।।
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তাঁর হয় প্রেমোদয়, তারে মুঞি যাই বলিহারি।'

আবার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন, "গৌর-নাম জপ করিলে সদ্য প্রেমের উদয় হয়।" ইহা আমরাও দেখিয়াছি। ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন "যদি ভক্তি-পথ অবলম্বন

করিতে চাও, তবে শ্রীগৌরাঙ্গের পদ আশ্রয় কর।" ইহা ঠিক। এমন কাণ্ডারী, এমন আশ্রয়, এমন আদর্শ, এমন গুরু, এমন ভজনীয় বস্তু, জগতে আর মিলিবে না। ঠাকুর-মহাশয় আবার বলিতেছেন, "গৌরলীলা হৃদয়ে প্রবেশ করিলে অন্তর নির্মল হয়। ইহাও ঠিক। যাঁহারা ভগবৎ-প্রেম-লোলুপ, তাঁহারা গৌরলীলা আস্বাদ করুন। মন নির্মল ও হৃদয় দ্রব্য করিতে এমন তেজস্কর বস্তু ত্রিজগতে আর নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের নাম তখন সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়াছে। দক্ষিণ-দেশের যত ধর্মাচার্য্য, তাঁহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। পশ্চিম দেশেও তাঁহার গৌরব তখন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সকলে শুনিয়াছে যে, একটি মনুষ্য-দেহধারী বস্তু, যাঁহার সুবর্ণের ন্যায় অঙ্গের কান্তি, এবং পদ্মের ন্যায় লোচন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নবদ্বীপে ও নীলাচলে পূজিত হইতেছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় নীলাচলও একটি সহর। সেখানে সার্বভৌমকে সকলে অতিশয় মান্য করেন। সকলে শুনলেন যে, সেই কৃষ্ণ-বলিয়া-পূজিত বস্তুটি সার্বভৌমকে পাগল করিয়াছেন। আবাব ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ দশসহস্র সন্ন্যাসী লইয়া কাশীতে বিরাজ করেন। ভাবুক-সন্ন্যাসী চৈতন্য সার্বভৌমের ন্যায় প্রবল পণ্ডিতকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার সর্বনাশ করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া তিনি প্রভুকে দণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে নীলাচলে একটি যাত্রী দ্বারা প্রভুর নিকট একটি শ্লোক পাঠাইলেন। সেই ব্যক্তি নীলাচলে আসিয়া, ভক্তগণ দ্বারা ঐ শ্লোকটি প্রভুর হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই শ্লোকটি এই—

"যত্রাস্তে মণিকর্ণিকা মলহরা স্বদীর্ঘিকা দীর্ঘিকা
রত্নাস্তারক মোক্ষদং তনুনৃতেশম্ভুঃ স্বয়ং যচ্ছতি।
এতদতত্ত্বতদ্ভুততধামতঃ সুরুপুরো নির্বণমার্গস্থিতং
মূঢ়োহন্যত্র মরিচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি।।"

অর্থাৎ—"যে স্থানে মণিকর্ণিকা ও পাপনাশিনী মন্দাকিনী দীর্ঘিকা ও যে স্থানে স্বয়ং মহাদেব তারক মোক্ষপ্রদ দেবগণের অগ্রবর্তী নির্বাণপথস্থিত রত্ন প্রদান করেন, মূঢ়গণ সেই প্রকৃত-রত্ন ত্যাগ কবিয়া, পশুরা যেরূপ মৃগতৃষ্ণিকাতে ধাবিত হয়, তদ্রুপ অন্যদিকে ধাবিত হয়।"

প্রভু, প্রকাশানন্দের নাম শুনিয়া ভক্তিপূর্বক পত্র গ্রহণ করিলেন, কিন্তু শ্লোক পড়িয়া সুখ পাইলেন না। তবু প্রকাশানন্দের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত সেই যাত্রীর দ্বারা প্রভু উত্তর-স্বরূপ নিম্নের শ্লোকটি পাঠাইলেন—

"ঘর্মাম্ভোমণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদম্বুভাগীরথী,
কাশীনাম্পতিরর্দ্ধমেব ভজতে শ্রীবিশ্বনাথ স্বয়ং।
এতস্যৈবহি নাম শম্ভুনগরে নিস্তারকং তারকং,
তস্মাৎ কৃষ্ণপদাম্বুজং ভজ সখে শ্রীপাদ নির্বাণদং।।"

অর্থাৎ—"মণিকর্ণিকা ভগবানের ঘর্মজল ও ভাগীরথী ভগবানের চরণাবারি ও কাশীপতি স্বয়ং বিশ্বনাথ যাহাতে বিলীন হইয়া ভজনা করিতেন এবং বারাণসীনগর যাঁহার নাম নিস্তার-তারক। অতএব হে সখে! সেই শ্রীকৃষ্ণের নির্বাণপ্রদ চরণ-কমল—তাহাকে ভজনা কর।"

প্রকাশানন্দ এই শ্লোক পাঠ করিয়া চটিয়া উঠিলেন। তখন প্রভু যে জগন্নাথপ্রসাদকে উপেক্ষা করিতেন না, এই কথা লইয়া গালি দিয়া আর একটি শ্লোক পাঠাইলেন, সেটি এই—

"বিশ্বামিত্রপরাশর প্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশিন
এতে স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্টৈব মোহং গতাঃ।
শালান্নং সঘৃতং পয়ো দধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা
স্তেষামিন্দ্রিয় নিগ্রহো যদি ভবদ্বিন্দুস্তরেৎসাগরং।।"

অর্থাৎ- "বিশ্বমিত্র পরাশর প্রভৃতি মুনিগণ বায়ু জল-পাত্র মাত্র ভক্ষণ করিয়াও মনোহর স্ত্রীমুখ দর্শন করিয়াই মোহ প্রাপ্ত হন, যে মানবগণ ঘৃত-দধি-দুগ্ধ-যুক্ত ধান্যের অন্ন ভক্ষণ করে, তাঁহারাও যদি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কবিতে পারেন, তবে চটক-পক্ষীও সমুদ্র লঙঘন কবিতে পারে।"

এই শ্লোক দেখিয়া প্রভু বলিলেন, ইহাব উত্তর প্রয়োজন করে না। তাই প্রভু আর কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু ভক্তগণ ছাড়িলেন না। প্রভুকে গোপন করিযা তাঁহারা ঐ শ্লোকের একটি উত্তর পাঠাইয়া দিলেন--

"সিংহোবলী দ্বিরদশূকর মাংসাভোগী সংবৎসবেণ কুরুতে রতিমেকবারং।
পারাবত স্তৃণশিখাকণামাত্রভোগী কামীভবেদনুদিনং বদ কোহত্র হেতুঃ।।"

অর্থাৎ—"বলবান সিংহ হস্তী শূকব প্রভৃতি মাংস ভক্ষণ করিয়াও বৎসরে একবার মাত্র ক্রীড়া করে, কপোত সামান্য বস্তুর কণামাত্র ভক্ষণ করিয়াও নিয়ত ক্রীড়া করিতেছে, ইহার কি হেতু বল?"

যেমন কাশীতে প্রকাশানন্দ বেদে, তেমনি পূর্বাঞ্চলে বেদ ও ন্যায়ে সার্বভৌম! সার্বভৌম প্রকাশানন্দের গালিপূর্ণ পত্র দেখিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি প্রভুর নিকট অনুমতি চাহিলেন যে, তিনি বারাণসী যাইয়া প্রকাশানন্দকে নিরস্ত করিয়া ভক্তিধর্ম প্রচার করিবেন। প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য! সে অতি কঠিন স্থান, সেখানে যাইও না, সেখানে তুমি কিছু করিতে পারিবে না।" কিন্তু সার্বভৌম এক শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট খাট হইয়াছেন, প্রকাশানন্দের নিকট কেন হইবেন? বিশেষতঃ তখন তিনি প্রেমে ঢল-ঢল করিতেছেন। মনে ভাবিলেন, প্রভু অতি-প্রেমে তাঁহাকে যাইতে দিতেছেন না। তিনি প্রভুকে গোপন করিয়া যাইবেন। কিন্তু প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতেও পারেন না, কারণ তাঁহার মনের গৌরব এই যে, তিনি প্রভুকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। তখন ভাবিলেন যে, ভক্তগণ নীলাচলে আসিয়া চারিমাস থাকিবেন; সেই সময় প্রভুকে তাঁহাদের হস্তে রাখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বিদেশে থাকিতে পারিবেন; ভক্তগণ আসিতেছেন শুনিয়া, তিনি লুকাইয়া গৌড়ের পথে বারাণসী চলিলেন। পথে অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত দেখা হইলে, তাঁহারা দেখিয়া অবাক হইলেন। হরিদাস গতবার নীলাচল ত্যাগ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে শান্তিপুর গিয়াছিলেন। তিনিও ভক্তদিগের সঙ্গে নীলাচলে আসিতেছেন! সার্বভৌম, শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া শেযে হরিদাসকে এই শ্লোক বলিয়া নমস্কার করিলেন। যথা—"কুল জাত্যানপেক্ষায় হরিদাসয়ে তে নমঃ।"

হরিদাস লজ্জা ও ভয় পাইয়া দৌড় মারিলেন। কিন্তু পাঠক, সার্বভৌম কি ছিলেন আর কি হইয়াছেন, একবার মনে করুন। এখানে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে এই সম্বন্ধে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

"অদ্বৈত গোঁসাই সার্বভৌমে জিজ্ঞাসিলে। শ্রীপ্রভুর পদ ছাড়ি কি লাগি আইলে।।
সার্বভৌম বলে মোর মনে এই লইল। কাশীর সন্ন্যাসী সব ভক্তি না বুঝিল।।
ভাষ্য সহ বেদান্তাদি করয়ে বিচার। কৃষ্ণভক্তি প্রতিপাদ্য অজ্ঞাত সবার।।
তৎ পদার্থ ত্বং পদার্থ ব্যষ্টি ও সমষ্টি। ব্রহ্ম চিদানন্দ স্বরূপ করে হয়ে তুষ্টি।।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ শ্রবণ কীর্তন। গৌরাঙ্গের মত না বুঝিল কোন্ জন্।।"

তাই তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম প্রচার করিতে কাশীতে যাইতেছেন। সার্বভৌম আরও বলিলেন যে, তিনি প্রভুর অনভিমতে যাইতেছেন।

যত অসুর ছিল, তাহার কতক বলরাম নাশ করেন। যাহাদের নাশ বলরামের শক্তির বাহিরে, তাহাদিগকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নাশ করেন। প্রকাশানন্দের ন্যায় মহা-অসুর সার্বভৌমের

বধ্য নয়, ঠাকুরের নিজের। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ সার্বভৌমকে বারাণসী যাইতে নিষেধ করেন। সার্বভৌমও বারাণসী যাইয়া কিছু করিতে পারিলেন না। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং বারাণসী যাইয়া প্রকাশানন্দকে তাঁহার চরণে আনয়ন করেন। প্রকাশানন্দের উদ্ধার-কাহিনী বিস্তারিতরূপে আমার কৃত প্রকাশানন্দের জীবনীতে লেখা আছে।

ভক্তগণ তাহার পরে বিদায় লইয়া বাড়ী চলিলেন। প্রভু বলিলেন যে, তিনি বিজয়া-দশমী দিবসে গঙ্গা ও জননী দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবেন। ভক্তগণের যাইবার বেলায় কুলীনগ্রামবাসীরা আমার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৈষ্ণব কাহাকে বলে?" তখন প্রভু পরিষ্কার উত্তর দিতে বাধ্য হইলেন, তিনি বলিলেন, "বৈষ্ণবগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম। যাঁহাদের দর্শনে মুখে কৃষ্ণনাম আইসে তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবতম বলিয়া জানিবে।"

অষ্টম অধ্যায়

"শ্রীগৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া। প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া।।
তোমার চরিত যত পূরব পিরীত। সোঙারি সোঙারি এবে ভেল মূরছিত।।
সে হেন নদীয়াপুর সে সব সঙ্গিয়া ধূলায় পড়িয়া কান্দে, তোমা না দেখিয়া।।
কহরে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি। তিলেক বিলম্বে আমি আগে যাব মরি।।"

বিজয়া-দশমী আসিতেছে, আর রামানন্দের প্রাণ শুকাইয়া যাইতেছে। সার্বভৌমের এই দশা, রাজারও এই দশা। যাঁহারা গৃহী তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে যাইতে পারিবেন না। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যাঁহাদের শ্রীজগন্নাথের সেবা আছে, তাঁহারাও যাইতে পারিবেন না,—যথা গদাধর। তিনি ক্ষেত্র-সন্ন্যাস লইয়া গোপীনাথের সেবা করিতেছেন, তিনি নীলাচল ত্যাগ করিতে পারিবেন না। রাজার গুরু কাশীমিশ্র জগন্নাথের সেবক, তিনিও যাইতে পারিবেন না। যাহাদের যাইবার কোন বাধা নাই, তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে যাইবেন সঙ্কল্প করিলেন। প্রভুকে ছাড়িয়া তাঁহারা থাকিতে পারেন না, তাঁহারা গৌরশূন্য নীলাচলে কেন বাস করিবেন? প্রভুর সঙ্গে পুরী ও ভারতী এবং আশ্রিত অন্যান্য সন্ন্যাসীগণও চলিলেন, নবদ্বীপের যে সকল ভক্ত তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহারাও চলিলেন; স্বরূপও অবশ্য চলিলেন।

প্রভুর নবদ্বীপের নিজজনের মধ্যে কেবল দুঃখী গদাধর রহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম "গদাধরের প্রাণনাথ"; সেই গদাধরের গৌরশূন্য নীলাচলে একা থাকিতে হইবে। অবশ্য প্রভুর সঙ্গে যাইবার জন্য তিনি অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন। কিন্তু প্রভু ধর্ম সংস্থাপন করিতে আসিয়াছেন, গদাধর ক্ষেত্রের সন্ন্যাসী, তাঁহার ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে নাই, কাজেই প্রভু তাঁহাকে যাইতে দিবেন কেন?

প্রভু জননী ও অন্যান্য প্রধান ভক্তের নিমিত্ত জগন্নাথের নানাবিধ প্রসাদ সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। প্রভু মহাব্যস্ত; একি নিজদেশে নিজজনকে দেখিতে যাইতেছেন বলিয়া, কি বৃন্দাবনে যাইতেছেন বলিয়া—তাহা কে জানে? এ কথার বিচার পরে করিব। প্রভুর মনে একটি খেয়াল হইয়াছে। তিনি ভক্তগণকে লইয়া বাসা হইতে নৃত্য করিতে করিতে নিজ দেশাভিমুখে গমন করিবেন। তিনি নৃত্য করিবেন, আর গাহিবেন—স্বরূপ। প্রভাত হইলে, ভক্তগণ প্রভুর বাসায় আসিলেন এবং প্রভু মন্দিরে যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। মনে মনে স্থির করিয়াছেন স্বরূপ গাহিবেন, আর তিনি নৃত্য করিতে করিতে যাইবেন। কিন্তু স্বরূপ কোথা? তাঁহাকে পাওয়া গেল না। প্রভু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, স্বরূপকে না পাইয়া, নৃত্য করিয়া যাইতে পারিবেন না বলিয়া, বিষণ্ণ বদনে ধীরে ধীরে মন্দিরাভিমুখে

চলিলেন। সিংহদ্বারে যাইয়াও স্বরূপের জন্য অপেক্ষা করিয়া ভাবিতেছেন,—পথে ত নৃত্য করা হইল না, স্বরূপ আসিলে সিংহদ্বার হইতে ঠাকুরের সম্মুখ পর্যন্ত নৃত্য করিতে করিতে যাইবেন। প্রভু এইরূপে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন,—এমন সময় স্বরূপ আসিলেন। স্বরূপকে দেখিবামাত্র প্রভু ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহার হস্তস্থিত গীতাগ্রন্থ দ্বারা সজোরে স্বরূপের পৃষ্ঠে আঘাত করিলেন; শেষে শ্রীচরণ দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিয়া মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। স্বরূপ তখন ভীত হইয়া অন্যান্য ভক্তগণের সহিত কীর্তন ও নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর পশ্চাৎ চলিলেন।

প্রভু শিশুকালে জননীকে একটি ঢিল ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলেন। জননী নিমাইকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত তখন কপট-মূর্ছাভাব অবলম্বন করেন। নিমাই ইহাতে "মা" "মা" বলিয়া ক্রন্দন করিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। তাই প্রভু স্বরূপকে প্রহার করায় তিনি আপনাকে ত্রিজগতের মধ্যে মহাভাগ্যবান ভাবিলেন। স্বরূপের ভাগ্যকে শ্লাঘা করিয়া চৈতন্যচরিতকাব্য-লেখক কবিকর্ণপুর এই দ্ব্যক্ষর-শ্লোক দিতেছেন, যথা—

"ভাবাভাবাভিভাবাভাবাভিভবভাবে বভৌ ভবঃ।
বিভাবেবম্ভাবভাবে বভুব বৈভবং।।" ১৭। ১৯শ সর্গ।

"এইরূপে পূর্বোক্ত প্রহারে স্বরূপের অভাবজনিত বিয়োগে মহাপ্রভু ব্যাকুল হওয়ায়, স্বরূপেরই জন্মশোভা পাইয়াছিল এবং ভূমণ্ডলের মহাগৌরবও হইয়াছিল।" অর্থাৎ মহাপ্রভু যাঁহার বিরহে ব্যাকুল, তাঁহারই জন্ম সফল ও তাঁহারই গৌরব।

প্রভুর গৌড়ে গমন-বৃত্তান্তের আরম্ভ আমরা নানা কারণে, কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচরিতকাব্য হইতে লইলাম। প্রভু দেশে আসিতেছেন, এই আনন্দে কবিকর্ণপুর তাঁহার কাব্যের উনবিংশ সর্গটি নানা ভক্তিযুক্ত কবিতা দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। উপরে একটি দিলাম, পরে আরও দিতেছি। শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া প্রভু ভক্তগণসহ আনন্দে কীর্তন করিতে কবিতে বিদায় মাগিলেন। তখন সেবাইতগণ, প্রভু ও ভক্তগণকে আজ্ঞামালা প্রদান করিলেন। পূর্বে সকলে,—কেহ কীর্তন, কেহ নৃত্য—করিতে করিতে মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। কর্ণপুরের ইহার ভঙ্গিমাবর্ণন শ্রবণ করুন—

'কী র্ত নং চ ক্রি রে কে চ স মুৎ সু ক ম নো ল য়াঃ
× × × × × × × × × × × × × × × ×
ন র্ত্ত নং চ ক্রি রে কে চ স মুৎ সু ক ম নো ল য়াঃ

অর্থাৎ—"অতঃপর কতকগুলি ভক্ত বিশেষ উৎসুক হইয়া কীর্তন করিলেন; এবং কতকগুলি ভক্ত অতীব ঔৎসুক্য সহকারে নৃত্যও করিলেন।"।। ১১।।

স্নান-যাত্রার সময় পঞ্চদশ-দিবস শ্রীজগন্নাথ অদর্শন থাকেন, মন্দিরের কপাট খোলা হয় না। সেই নিমিত্ত জগন্নাথবিরহে প্রভু প্রতি বৎসর মৃতপ্রায় হয়েন। সেই প্রভু এখন কিরূপে শ্রীজগন্নাথকে ত্যাগ করিয়া আনন্দে কীর্তন করিতে করিতে চলিলেন! ফল কথা, সমস্ত ভাবগুলি প্রভুর দাসীর স্বরূপ ছিল। যখন কৃষ্ণ-বিরহ-ভাব প্রভুর শরীরে প্রবেশ করিত, তখন উহা সজীব হইয়া আসিত! প্রভু আপনি মজিয়া, কোন ভাব কিরূপ তাহা জীবকে দেখাইতেছেন। এই তাঁহার অবতারের এক উদ্দেশ্য। যখন জগন্নাথকে দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া প্রভু অনাহারে পড়িয়া থাকিতেন, তখন কৃষ্ণ-বিরহ জীবন্তরূপে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিত এইমাত্র। এখন প্রভু আপন হৃদয়পদ্মাসনে শ্রীনীলাচলচন্দ্রের স্থানে শ্রীবৃন্দাবনকে স্থাপিত করিলেন। কাজেই এখন শ্রীজগন্নাথকে ভুলিলেন, আর "বৃন্দাবন" বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন।

প্রভু যখন নীলাচল ত্যাগ করিয়া চলিলেন, তখন তথায় হাহাকার পড়িয়া গেল,—নীলাচলবাসীগণ প্রভুর সঙ্গ লইলেন। কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি বৃদ্ধ কি বালক, সকলেই চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। এই রোদনের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কাশীমিশ্র, গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণকে প্রভু তাঁহার সহিত যাইতে নিষেধ করিলেন। কাশীমিশ্র আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না; কিন্তু গদাধর সে আজ্ঞা পালন করিলেন না। অন্যান্য সকলকে প্রভু অতি মধুর ও কাতর স্বরে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বারম্বার নিষেধ করিত লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাহা শুনিলেন না। তাঁহারা সকলেই প্রভুর পশ্চাদ্গামী হইলেন। তাঁহাদের সকলের মনের ভাব এই যে, প্রভু যেখানেই গমন করুন, তাঁহারা গৃহ ও নিজজন প্রভৃতি সমুদয় ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবেন। শ্রীভগবানের সর্বপ্রধান নাম কৃষ্ণ, অর্থাৎ জীবের চিত্তাকর্ষক। শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন, বলিয়া, তাঁহাকে জীব শ্রীভগবান বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

প্রভু এই পশ্চাদ্গামী লোকসমূহের হাত ছাড়াইবার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কখন পথ ছাড়িয়া বিপথে চলিলেন, কখন দ্রুতগতিতে যাইতে লাগিলেন, কখন বা লুকাইতে লাগিলেন, অর্থাৎ প্রভু পথাপথ জ্ঞান না করিয়া একেবারে দৌড় মারিলেন। যেমন মধুলুব্ধ-ভ্রমর পুষ্পে বসিতে চায়, কিন্তু বায়ুতে পুষ্প কম্পিত হওয়ায় বসিতে পারে না,—সেইরূপ নীলাচলবাসীগণ চেষ্টা করিয়াও প্রভুকে ধরিতে পারিতেছেন না। এই ভক্তগণের অবস্থা বর্ণনা করিয়া চৈতন্যচরিতকাব্য-লেখক এই একাক্ষর শ্লোকটি দিয়াছেন—

"ললল্লীলো ললল্লীলো লোলো লোলো ললল্ললঃ।
লীলালোলোঽলিলীলালীং লীলালীং লোললাং ললুঃ।। ২৫।।"

অর্থাৎ—"অনন্তর লীলাচল-লীলাকে বিদূরিত করত ব্রজগমনরূপ-লীলাই যাঁহার অভিপ্রেত, সুতরাং তন্নিমিত্তই মহাপ্রভু সতৃষ্ণ ও চঞ্চল হওত সমস্ত ভক্তগণকে ত্যাগ করিয়া বিলাসে চঞ্চলমনা হইলেন। তথা অনুগামী ভক্তগণ যাহাতে সেই চঞ্চলমনা গৌরচন্দ্রকে ধরিতে পারা যায় তাদৃশ ভ্রমরগণের লীলা সমূহের ন্যায় বিবিধ লীলা করিতে লাগিলেন।"

এই সমস্ত লোক প্রভুকে না দেখিয়া, কেহ ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে, কেহ মৃত্তিকায় পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রামানন্দ রায় বাবুলোক, হাঁটিতে পারেন না, প্রভুকে ছাড়িতেও পারেন না। তিনি দোলায় চাপিয়াছেন; কোথা চলিয়াছেন, কতদূর প্রভুর সঙ্গে যাইবেন,—তাহার ঠিকানা নাই। প্রভু হাঁটিয়া, তিনি দোলায়,—ইহা হইতেই পারে না; কাজেই প্রভু অনেক পশ্চাৎ যাইতেছেন। প্রভু রামানন্দকে দেখিয়া তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন, রুক্ষভাবে তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। কিন্তু রামানন্দ গ্রহগ্রস্তের ন্যায় প্রভুর কোন কথা যেন শুনিতে পাইলেন না, দোলায় চড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে চলিলেন। গদাধরকে প্রভু আবার নিষেধ করিলেন। গদাধর এই কথা শুনিয়া প্রভুকে ত্যাগ করিয়া অনেক পশ্চাদ্বর্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন,—যাইতে ছাড়িলেন না। ক্রমে সকলে ভবানীপুরে উপস্থিত হইলেন। দেখেন, সেখানে বাণীনাথ দ্রুতগামী দূত দ্বারা বহুবিধ সদ্য মহাপ্রসাদও পাঠাইয়াছেন। প্রভু সদলে সেখানে উপস্থিত হইলেন, মহাপ্রসাদও আসিল। কবিকর্ণপুর, এই মহাপ্রসাদ যে অল্প নহে তাহা এইরূপে রঙ্গ করিয়া একাক্ষর শ্লোক বলিতেছেন, যথা—

"নানানা নুনি নানেনে নানা নূনন্ননূ ননু।
নানা নূনে নাননান্নোনে নো নানা ননুন্ননু।। ৩৭।।"

অর্থাৎ—"তৎপরে কোন এক মহাত্মা বিবিধপ্রকারের মহাপ্রসাদ অত্যল্প দেখিয়াও, 'ইহা অত্যল্প কিন্তু প্রচুর নহে', এ কথা কেহই বলেন নাই, অর্থাৎ অল্পতর প্রসাদকেও বহুরূপে জানিয়াছিলেন।"

প্রভু একটু বিশ্রাম করিয়া আবার চলিলেন। প্রভু আনন্দে টলমল করিতেছেন। ভক্তগণও সেইভাবে বিভাবিত। কবিকর্ণপুর সেই রসে মুগ্ধ হইয়াছেন, কাজেই তিনি নানা ভঙ্গির কবিতা প্রস্তুত করিয়া প্রভুর গমন বর্ণনা করিতেছেন।

প্রভু চুপ করিয়া চলিয়াছেন; ভাবিতেছেন,—বৃন্দাবনে যাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইবেন। নবদ্বীপে তাঁহার জন্ম ও ভালবাসার স্থান, তাঁহার অতি প্রিয় সেই নবদ্বীপকে ও নিজজনকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, এ সমুদয় কথা জোর করিয়া প্রভুকে মনে না করিয়া দিলে তাঁহার মনে হইত না। প্রভু প্রায় অহরহ রাধাভাবে বিভাবিত, এখন সেই ভাবে মুগ্ধ হইয়া বৃন্দাবন চলিয়াছেন, কাজেই বহির্জগতের সহিত তাঁহার অল্পই সম্বন্ধ। যাইতে যাইতে পথের ধারে একটি বৃক্ষ দেখিয়াই এক দৌড়ে যাইয়া লম্ফ দিয়া তাহার একটি শাখা ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন।

ইহার অর্থ কি? সেই ধীর বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণ, মহামহোপাধ্যায়, বৃক্ষতলবাসী সন্ন্যাসী, সেই জগৎ-পূজ্য ভক্তশিরোমণি প্রতাপরুদ্রের সংত্রাতা, বৃক্ষের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন, তাহার কারণ কি? প্রভু অতি সুস্থকায়, বলবান, বিশেষতঃ তখন যুবাপুরুষ ছিলেন, তাই কি সেই তেজে এইরূপ বালচাপল্য দেখাইলেন? তাহা নয়। কৃষ্ণ-প্রেমে এইরূপ চঞ্চল করে। কৃষ্ণ-প্রেমে আনন্দের উদয় হয়, ও আনন্দে জীবগণকে ব্রজবালকের ন্যায় সবল ও চঞ্চল করে। তাই কি প্রভু লাফ দিয়া বৃক্ষের ডাল ধরিয়া ঝুলিতেছেন? না, তাহাও নয়। প্রভুর মনের ভাব কি, তাহা তাঁহার নিজের কথায় পরে ব্যক্ত হইল। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতকাব্য ১৯ সর্গ—

"অথ বীক্ষ্য দ্রুমং শ্রেষ্ঠং ধাবন্নারাদবারিতঃ।
স্কন্ধমুৎপ্লুত্য ধৃতা চ লম্বমানঃ শ্রিয়ং দধে"।। ৪৩।।

অর্থাৎ—"অনন্তর একটি বৃক্ষকে দেখিয়া নির্বোধ ধাবমান হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্বক ঐ বৃক্ষের স্কন্ধদেশ (মূলশাখা) ধারণ করিয়া লম্বমান হইলেন, এবং তাহাতে বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন।"

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন এই ভাবিতে ভাবিতে প্রভু যাইতেছেন। এমন সময় সেই সুন্দর বৃক্ষটি দেখিয়া প্রভুর শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্তি হইল। প্রভু দেখিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সেই বৃক্ষের উপর বসিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন এবং হাসিয়া যেন তাঁহাকে ডাকিলেন। তখন প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইয়া দৌড়িলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার জন্য সেই বৃক্ষে উঠিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না; ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন। এ দিকে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ যেন রাধা-রূপ প্রভুর সঙ্গে রহস্যভাবে সেই বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য বৃক্ষ অবলম্বন করিলেন। প্রভুও সে বৃক্ষ-শাখা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত বৃক্ষের দিকে দৌড়িলেন। সেখানে যাইয়া দেখেন, কৃষ্ণ অন্য বৃক্ষে গিয়াছেন! এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ এক বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য বৃক্ষ অবলম্বন করিতেছেন, প্রভুও তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ফিরিতেছেন। যে বৃক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন, তাঁহার নিকটে যাইয়া দেখেন যে, কৃষ্ণ অন্য বৃক্ষে গিয়াছেন। তাহাতে সেই বৃক্ষটিতে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার প্রতি অতি প্রেমের উদয় হওয়ায়, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। এই গাঢ় আলিঙ্গনে ক্ষুদ্র বৃক্ষ চূর্ণ হইয়া যাইতেছে; তখন বৃক্ষের কন্টক প্রভুর অঙ্গে আঘাত দিতেছে। কখন এই কারণে বৃক্ষকে চুম্বন করিতেছেন, কখন শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত শাখা অবলম্বন করিয়া বৃক্ষের উপর উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন; কখন কোন বৃক্ষকে

শ্লাঘা মনে করিয়া তাহার ভাগ্যকে প্রশংসা করিতেছেন; কখন বা কোন বৃক্ষকে চুপে চুপে কি বলিতেছেন। প্রভু তখন যে বৃক্ষ পানে চাহিতেছেন, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন। এইরূপে এক বৃক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ধরিয়া যাইতেছেন, সেই সময় দৈবাৎ নয়ন অন্য দিকে অর্পিত হওয়ায় সেখানেও কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন। তখন ভাবিতেছেন যে, কৃষ্ণ তাঁহাকে ধরা দিবেন না বলিয়া অন্য বৃক্ষ অবলম্বন করিতেছেন। তখন কৃষ্ণ-পরিত্যক্ত-বৃক্ষকে গাঢ় আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত অপর বৃক্ষের দিকে ছুটিতেছেন।

প্রভু শত-শত ভক্তের সমক্ষে এই রঙ্গ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রথমে কিছু বুঝিতে পারেন নাই; দেখেন প্রভুর বাহ্যদৃষ্টি নাই, একেবারে দেবচক্ষু হইয়াছে, সর্বাঙ্গ ব্রণের ন্যায় পুলকে আবৃত করিয়াছে। প্রভু আবার কখন স্ত্রীলোকের ন্যায় করুণস্বরে রোদন করিতেছেন, আর শ্রীকৃষ্ণদর্শন লালসায় ঘন-ঘন শ্বাস ফেলিতেছেন। আবার কখন প্রভুর শ্রীঅঙ্গ কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। তবে প্রভু বৃক্ষে আরোহণ করিতে যাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, বরং মৃত্তিকায় পড়িবার সম্ভব হইতেছে। ইহা দেখিয়া পরমানন্দপুরী প্রভৃতি মুখ্য ভক্তগণ তাঁহাকে নীচে হইতে জড়াইয়া ধরিতেছেন, যেন মাটিতে পড়িয়া না যান, কি, আঘাত না পান। যথা চৈতন্যচরিত-কাব্যে—

অধঃকণ্টকসংকীর্ণে নিপতিষ্যন্তমঞ্জস্য।
ভিয়া পুরিপ্রভৃতয়ো জগৃহুর্ববাহুভিঃ।। ৪৭।।

অর্থাৎ "কণ্টকসমাকীর্ণ অধঃপ্রদেশে প্রভু পতিত হইবেন দেখিয়া পরমানন্দপুরী প্রভৃতি ভক্তগণ সভয়ে শীঘ্র স্বীয় বিশাল বাহুদ্বারা তাহাকে ধারণ করিলেন।"

প্রভু কি করিতেছেন তাহার বর্ণনা চৈতন্যচরিত-কাব্যে ১৯শ স্বর্গের ৪৪ ও ৪৬ শ্লোকে এইরূপে বর্ণিত আছে। যথা,—প্রভু প্রেমানন্দ নীরে ভাসিতেছেন; বনমধ্যে বৃক্ষসকলকে আলিঙ্গন করিতেছেন। প্রভু অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া এরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন যে, বৃক্ষ চূর্ণ হইবার সম্ভব হইতেছে। প্রভু খঞ্জনের ন্যায় ফিরিতেছেন কেন, তাহা পরে বুঝা গেল। শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে প্রভু হঠাৎ তাঁহাকে দুই স্থানে দেখিতে পাইলেন। তখন স্থির হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে কোথায় তাহার বিচার করিতে গিয়া হঠাৎ অন্যস্থানে দেখেন শ্রীকৃষ্ণ। তখন কৌতূহলী হইয়া চারিদিকে চাহিলেন, দেখেন আকাশে, কৃষ্ণ, পথে কৃষ্ণ, বৃক্ষে কৃষ্ণ, লতায় কৃষ্ণ, কুসুমে কৃষ্ণ, দক্ষিণে কৃষ্ণ সম্মুখে কৃষ্ণ। অর্থাৎ চারিদিকে কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহার একটু বাহ্য হইল, এবং বিস্মিত হইয়া ভক্তগণ পানে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ! দেখ! শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক বৃক্ষে", পরে বলিলেন, "নানা স্থানে", শেষে বলিতেছেন, "তাহা নয়, শ্রীকৃষ্ণকে সকলদিকেই যে দেখিতেছি, তিনি যে জগৎময়!" যথা, চৈতন্যচরিতকাব্যে— .

"উচ্চৈঽথ পশ্য পশ্যায়ং কৃষ্ণস্তদ্রোঽভিতোঽভিতঃ।
প্রতিদ্রুমং বিলসতি জগত্যেতন্ময়ীক্ষতে"।। ৪৮।।

অর্থাৎ "অনন্তর গৌরচন্দ্র প্রেমে বিহ্বল হইয়া কহিলেন যে, দেখ-দেখ, এই কৃষ্ণচন্দ্র ইতস্ততঃ প্রত্যেক বৃক্ষে বিলাস করিতেছেন, আমি জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেছি।"

তখনই ভক্তগণ বুঝিলেন, কেন প্রভু প্রথমে দৌড় মারিয়া অগ্রবর্তী হইয়া বৃক্ষের শাখা ধরিয়া উহাতে উঠিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কেন চঞ্চল-গতিতে এক বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য বৃক্ষে যাইতেছিলেন, কেন প্রতিবৃক্ষকে আলিঙ্গন ও কোন কোন বৃক্ষকে চুম্বন করিতেছিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, প্রভু ও পর্য্যন্ত এক মনে শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার চেষ্টা

করিতেছিলেন। যখন প্রভু চতুর্দিকে কৃষ্ণময় দেখিতে পাইলেন, তখন মনে একটু সন্দেহ হইল। ভাবিলেন, এই যে আমি কৃষ্ণকে দেখিতেছি, একি সত্য, না ভ্রম? এই সন্দেহের উদয় হওয়াতে অমনি একটু বাহ্য হইল ও ভক্তগণের কথা মনে পড়িল। তখন ভক্তগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?—আমি কি সচেতন, না অচেতন? কেন আমি জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেছি?"

ভক্তগণ এ পর্যন্ত প্রভুর মনের ভাব ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। কাজেই প্রভুর কোন দুঃখ কি বিপদ না হয় তাহারি চেষ্টা দেখিতেছিলেন। এখন প্রভুর মুখে শুনিলেন যে, তিনি প্রতি বৃক্ষে ও চতুর্দিকে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন। তখন তাঁহার সমুদয় কার্য্যের হেতু তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন এবং সেই ভাবে বিভাবিত হইলেন। অর্থাৎ তাঁহাদেরও তখন বোধ হইতে লাগিল যে, তাঁহারা যেন দেখিতে পাইলেন যে, পক্ষিগণ সুখে গান করিতেছে, বৃক্ষ-লতা কুসুমিত হইয়াছে ও সেই কুসুম হইতে মধু ঝরিতেছে। প্রকৃতই তখন পালে-পালে ময়ূর আসিয়া সেখানে বিচরণ করিতে লাগিল। আবার যখন কোন কোন ময়ূর নৃত্য আরম্ভ করিল, তখন ভক্তগণ প্রেমে বিহ্বল হইলেন। একে শরৎকাল তাহাতে এই সমুদয় কাণ্ড, সুতরাং কবিকর্ণপুর ছাড়িবেন কেন? এখন সে স্থানের অবস্থা বর্ণিত তাঁহার অদ্ভুত রঙিন-কবিতা সকল শ্রবণ করুন। যথা—

"লীলা লোলালিলনা ললন্নলিন ললন্নলিন লালনৈঃ।
নলাল ললনালীনাং লীলাং লাননিলো ললন্।।" ৪১।।

অর্থাৎ—"তৎকালে পবনদেবও পদ্ম-সঞ্চালন দ্বারা বিলাসশালিনী অলিমালাকে অভিলাষ করতঃ স্ত্রীবিলাসকে ইচ্ছা করিয়াই যেন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়াছিলেন।" এই শ্লোক দ্ব্যক্ষর। তাহার পর শ্রবণ করুন—

"কা কে নে ব ব নে কে কা, লা ব কে ন ন কে ব লা।
শু দ্ধা সা র র সা দ্ধা শু, নু তি রা সু সু রা তি নু।।" ৪৫।।

অর্থাৎ—"কাননমধ্যে কাকের ন্যায় লাবকনামক পক্ষিগণের ধ্বনির সহিত ময়ূরের উচ্চধ্বনি হইল, এবং প্রকৃতপক্ষে ময়ূর-ধ্বনি বিশুদ্ধ বর্ষাঋতুর সম্বন্ধবশতঃ উৎকৃষ্ট হইয়া যেন মদমত্তব্যক্তিকেও অতিক্রম করতঃ উচ্চ স্তবপাঠের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।" উল্লিখিত শ্লোকটি বাম হইতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ হইতে বামে সমান। তাহার পর আর একটি শ্লোক শ্রবণ করুন—

"সা র সা স র সা সা রং র সা নূ ত ন নূ ত না।
না ত নূ ন ত নূ সা র রং সা সা র স সা র সা।।" ৫৩।।

অর্থাৎ—"যে শরৎ রসা অর্থ পৃথিবীর সরসা উৎকৃষ্ট বস্তুস্বরূপ এবং যে অসার অর্থাৎ বর্ষণ-বিহীন হইয়াও রস অর্থাৎ জলদ্বারা সম্যক প্রকারে উৎকৃষ্ট নূতন হইয়াছিল, এবং যে বহুতর সারস অর্থাৎ তন্নামক জলচর পক্ষিবিশিষ্টা হইয়া নাতনু ও নতুনু (কী শরীরী ও কী অশরীরী) সকলেরই সার তেজঃ বা বল দান করতঃ সে প্রসিদ্ধা শরৎ শোভা পাইয়াছিল (শরীরী বৃক্ষলতাদি, অশরীরী সময় দিক্ প্রভৃতি) শরৎকালে বৃক্ষলতারস বিশেষ বিকাশ হয় এবং শীতঋতুর অংশ থাকায়, সময়ও উত্তম এবং দিক্‌সকল প্রসন্ন হয়।"

প্রভু ক্রমে শান্ত হইয়া আবার চলিলেন। প্রভুর নিমিত্ত মুহুর্মুহুঃ জগন্নাথের প্রসাদ, পানা, পিঠা প্রভৃতি দ্রুতগামী দূত দ্বারা বাণীনাথ কর্তৃক প্রেরিত হইতেছে। এরূপ সুন্দর বন্দোবস্ত যে, প্রভু যেখানে বিশ্রাম করিতেছেন, সেখানে দেখেন প্রচুর পরিমাণে সদ্য ও অতি উত্তম মহাপ্রসাদ প্রস্তুত রহিয়াছে। শুধু তাহা নয়, রামানন্দ রায় প্রয়োজন বুঝিয়া, নূতন গৃহ

নির্মাণ করাইয়াছেন। প্রভু সেই সকল নূতন গৃহে রজনী-বাস করিতেছেন। প্রভু ভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া আবার চলিলেন এবং রাত্রে রামানন্দ নির্মিত গৃহে মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া সারা রাত রামরায়ের সহিত কৃষ্ণ-কথায় কাটাইয়াছেন। প্রভু ও পরমানন্দপুরী নাম জপিতে জপিতে সর্বাগ্রে চলিয়াছেন। রামানন্দ দোলায় সকলের পশ্চাতে আসিতেছেন। যেখানে প্রভু বিশ্রাম করিতেছেন, রামানন্দ দোলা হইতে নামিয়া সেখানে যাইয়া প্রভুর সহিত কৃষ্ণ কথায় যাপন করিতেছেন। প্রভু যাইতে নদীতীরে রামানন্দ নির্মিত অতি-সুন্দর বাসভবন দেখিয়া বড় মুগ্ধ হইলেন। তখন প্রভু মনের আনন্দে শ্যাম-গুণ-গীত গাইতে লাগিলেন। ইচ্ছা হইলে সেখানে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে রসাস্বাদন করেন। তাই পরমানন্দপুরীকে উপলক্ষ করিয়া সকলকে বলিলেন, "আমি এখানে একটু বিশ্রাম করিব, আপনারা অগ্রবর্তী হউন। কটকে গোপীনাথের মন্দিরে আমাকে পাইবেন।" ভক্তগণ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া চলিতে লাগিলেন। আর প্রভু একা রামরায়কে লইয়া সেই নূতন গৃহে কৃষ্ণ-কথায় যাপন করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন রাধা-ভাবে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণ-প্রেমের সূক্ষ্মতর গতি, মন উঘাড়িয়া বলিতে লাগিলেন। প্রভুর শ্রীমুখের সেই সুধা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রস্ফুটিত হইয়াছে ও তাহাই জীবগণ এখন আস্বাদ করিয়া থাকেন।

শ্রীপরমানন্দপুরী প্রভৃতি অগ্রে কটকে যাইয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন যে, প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন চলিয়াছেন। পূর্বে যখন শুনিতেন যে, প্রভু বৃন্দাবন যাইবেন, তখনি রাজা ব্যাকুল হইয়া রামরায় ও সার্বভৌমকে মিনতি করিয়া বলিতেন যে, প্রভুকে যেন যাইতে না দেওয়া হয়। রামরায় ও সার্বভৌম নানা উপায়ে দুই বৎসর যাবৎ প্রভুকে যাইতে দেন নাই। শেষে যাইবার অনুমতি দিতে বাধ্য হন। রাজা এই কথা শুনিয়া সার্বভৌমকে বলিলেন যে, প্রভু গমন করিলে আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? এখানে শ্রীজগন্নাথ বিরাজমান, ইহা সত্য; তবু প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিলে আমার ভুবন অন্ধকার হইবে। যথা, রাজার সার্বভৌমের প্রতি উক্তি (চন্দ্রোদয় নাটকে)—

"যদ্যপি জগদধীশো নীলশৈলস্য নাথঃ প্রকটপরমতেজা ভাতি সিংহাসনস্থঃ।
তদপি চ ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবে, চলতি পুনরুদীচীং হন্ত শূন্যা ত্রিলোকী।।"

ইহার অর্থ—

"রাজা কহে ভট্টাচার্য্য কি কহিব আর। যদ্যপিহ জগন্নাথ সাক্ষাৎ আমার।।
প্রকট পরম-তেজা নীল-শৈলনাথ। সিংহাসনে বসিছেন বলভদ্র সাথ।।
তথাপি চৈতন্যচন্দ্র পুরী ছাড়ি গেলা। এ তিন ভুবন মোরে শূন্য যে হইলা।।"

সার্বভৌম ও রামরায় রাজাকে বলিলেন যে, শ্রীভগবান স্বেচ্ছাময় তাঁহাকে রোধ করা যায় না, তাঁহার সঙ্গে অতি হঠকারিতাও ভাল নয়। তিনি ভক্ত-বৎসল, এই দুই বৎসর ভক্ত-অনুরোধে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন নাই। এখন চলিলেন, আর তাঁহাকে রাখিতে পারা গেল না। প্রভু বিজয়া-দশমী দিনে নীলাচল ত্যাগ করিলেন। তাহার পূর্বেই রাজা নীলাচল ত্যাগ করিয়া কটকে গমন করিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; এখন পরমানন্দপুরী প্রভৃতির নিকট শুনিলেন যে, প্রভু আগতপ্রায়।

রামরায় প্রভুর ভাবি-বিরহে ব্যাকুল। রামরায় প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন। প্রভু প্রত্যেক আড্ডায় রামরায়কে বাড়ী যাইতে বলিতেছেন। রামরায় এ কথা শুনিয়া কান্দিয়া আকুল হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু, আর খানিক যাব।" আর এক আড্ডায় যাইয়া প্রভু রামরায়কে আবার প্রত্যাবর্তন করিতে বলিলেন। আবার রামরায় কান্দিয়া বলিলেন, "আর খানিক যাব।" এইরূপ করিয়া রামরায় প্রভুর সঙ্গে এতদূর আসিয়াছেন।

ভক্তগণ কটকে আসিয়া একেবারে গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কোন একজন ব্রাহ্মণ, পুরী-ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এমন সময় গৌরচন্দ্রের উদয় হইল। প্রভু আসিলে স্বপ্নেশ্বর নামক কোন বিপ্র তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভুর সঙ্গে আর যে শতাবধি ভক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে রামরায় কটকে তাঁহার নিজ বাটীতে আহ্বান করিলেন। রসিক-চূড়ামণি রামরায়ের বাড়ীর নিকটে যে অপরূপ উদ্যান আছে সেখানে ভক্তগণকে লইয়া গেলেন। সেই উপবন মধ্যে এক অতি মনোরম ও প্রকাণ্ড বকুল-বৃক্ষ ছিল। তাহার তলায় ভক্তগণ বিশ্রাম এবং কেহ কেহ রন্ধনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে ভিক্ষা করিয়া গৌরচন্দ্র পরমানন্দপুরী সহ আসিয়া সেই বকুলের মূলে উপবেশন করিয়া সহাস্য বদনে শোভা পাইতে লাগিলেন।

ভক্তগণকে ভোজন করাইয়া রামরায় রাজার নিকট ছুটিলেন। রাজা প্রভুর আগমন-সংবাদ পূর্বে পাইয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এবার রাজা দীনবেশে একমাত্র ধুতি পরিয়া আসিলেন না; রামানন্দের পরামর্শানুসারে রাজবেশ ধারণ করিয়া ও হস্তী ঘোড়া সৈন্য প্রভৃতি লইয়া, অতি সমারোহের সহিত প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন। উপবনের নিকট যাইয়া সকলে দাঁড়াইলেন। যদিও সৈন্যগণ কোলাহল করিতেছে না, কিন্তু হস্তী ও ঘোড়াগুলি চীৎকার করিয়া রাজার আগমন বার্তা প্রচার করিতে লাগিল। রাজা হস্তীর উপর হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং মন্ত্রিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া রামানন্দের হাত ধরিয়া মন্থর গতিতে উপবনে প্রবেশ করিলেন। সে কিরূপে, না,—যেমন শ্রীমতী, ললিতার কর ধরিয়া সখীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, শ্যামা দরশনে বৃন্দাবনে যাইতেন। রাজা প্রভুর শ্রীচরণ অধিকার করিবার জন্য চতুরঙ্গ দল কর্তৃক কিরূপ ব্যূহ নির্মাণ করিলেন, উহা চৈতন্যচরিত কাব্য-লেখক কবিকর্ণপুর মহাসুখে ১৯শ সর্গের ৮৭। ৮৮ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন।

রাজা উপবনে প্রবেশ করিয়া বকুলবৃক্ষমূলে প্রভুকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার আহ্বানসূচক সহাস্য চন্দ্রবদন দেখিয়া অমনি রাজার নয়ন দিয়া আনন্দধারা পড়িতে লাগিল। রাজা নিমিষহারা হইয়া প্রভুর প্রফুল্ল চন্দ্র-বদন দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রূপ দেখিয়া তাঁহার স্বাদ মিটিল না, নয়ন-তারা আনন্দাশ্রুতে ডুবিয়া যাওয়ায়, তাঁহার পথ দেখিবার শক্তি রহিত হইল; কাজেই চলিতে পদস্খলন হইতে লাগিল। তখন রামানন্দের অঙ্গে হেলান দিয়া মন্থর গতিতে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর না হইতেই সেই রাজবেশে রাজমুকুট সহিত তিনি প্রভুর চরণতলে ধূলায় পতিত হইলেন। প্রভু তখন প্রেমার্দ্র হইয়া রাজাকে উঠাইলেন এবং তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া আপাদমস্তক আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর আলিঙ্গন পাইয়া রাজা আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন এবং উপস্থিত সকলেই আনন্দে মুগ্ধ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজা সুস্থির হইলে প্রভু তাঁহার অতিশয় প্রেমভরে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। রাজার মনে তখন প্রতীতি হইল যে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের আর শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার। প্রভু সত্বর ফিরিয়া আসিবেন, এই কথা শ্রীমুখে শুনিয়া রাজা অনেকটা শান্ত হইলেন, রামানন্দও রাজাকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিলেন। প্রভুর নিকট রাজা বিদায় লইবার পর, রাজ-কর্মচারীগণ ও সৈন্যগণ সকলে প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন।

রাজা বাহিরে আসিয়া, কিরূপে প্রভুর গমন সুলভ হয় তাহার উপায় চিন্তিয়া মঙ্গলরাজ ও হরিচন্দন (যিনি শ্রীবাসের হস্তে চপেটাঘাত প্রসাদ পাইয়াছিলেন) নামক তাঁহার দুইজন প্রধান মন্ত্রীকে প্রভুর সঙ্গে গমন করিতে আজ্ঞা করিলেন। এইরূপে রামানন্দ, মঙ্গলরাজ ও হরিচন্দন—রাজার এই তিনজন মহাপাত্র, প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। রাজা আরও আদেশ করিলেন যে, প্রভু যেখানে বাস করিবেন, সেখানে তাঁহার ও ভক্তগণের থাকিবার নিমিত্ত আবশ্যকমত যেন নূতন গৃহ প্রস্তুত, আর নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়।

প্রভুর সঙ্গে পুরী, ভারতী, স্বরূপ প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ আর হরিদাস, জগদানন্দ, মুকুন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর, দামোদর, গোপীনাথ, নন্দাই প্রভৃতি ভক্তগণ চলিলেন। পথে যত প্রধান প্রধান আচার্য্যগণ বাস করেন, তাঁহাদের নিকট রাজা এই পত্র পাঠাইলেন যে, প্রভু যাইতেছেন, যাহাতে তাঁহার কোন অভাব ও কষ্ট না হয়, তাঁহারা যেন সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখেন। সার্বভৌম প্রভুর সঙ্গে আছেন, তিনি একটু হাসিয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, তোমার এ সমুদয় অতি-প্রীতির কার্য্য একটুকু হাস্যকর। তুমি যাঁহার বিপদ আশঙ্কা করিয়া উহা নিবারণার্থে নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছ, যাঁহার নাম স্মরণ করিলেই যখন বিঘ্ন নাশ হয়, তখন তিনি নিশ্চয় তাঁহার নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবেন।" রাজা ইহা শুনিয়া আরও আর্দ্র হইলেন এবং কান্দিতে কান্দিতে পাত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন, "প্রভু যেখানে স্নান করেন সেখানে যেন একটি স্তম্ভ প্রস্তুত করা হয়। সে অতি পবিত্র তীর্থস্থান হইবে; সেখানে আমি প্রত্যহ স্নান করিব। আর যদি প্রভুর চরণে আমার মতি থাকে, তবে সেইখানেই আমার মৃত্যু হইবে।" রাজা আরও আজ্ঞা করিলেন যে, ঘাটে প্রভুর পারের নিমিত্ত যেন নৌকা থাকে। রামানন্দ প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন, সুতরাং রাজার বড় ভরসা যে কোন কষ্ট হইবে না।

বিজয়া-দশমীর দিন প্রভু কটকে আসিলেন। সুতরাং সে শরৎকাল ও জ্যোৎস্নাময় রজনী। প্রভু রাত্রে চলিবেন ইচ্ছা করিলেন। সন্ধ্যাকালে প্রভু চিত্রোৎপল্লা নদীতে স্নান করিয়া সেখানে পার হইবেন। রাজ পরিবারবর্গের নিতান্ত বাঞ্ছা প্রভুকে দর্শন করিবেন। রাজা তাঁহাদের দর্শন-সুলভ-নিমিত্ত হস্তীর উপর তাঁবু খাটাইয়া সেই ঘাটে সারি-সারি হাতী রাখিলেন। সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময় প্রভু গজেন্দ্র গমনে ঘাটে আসিলেন। রাজ পরিবারবর্গ তাঁবুতে থাকিয়া প্রভুকে দর্শন করিলেন। দর্শন মাত্র তাঁহাদের প্রেমের উদয় হইল। যথা—

"প্রভুর দর্শনে সব হইল প্রেমময়। [illegible] কহে অশ্রু নেত্রে বরিষয়।।
এমত কৃপালু নহি শুনি ত্রিভুবনে। কৃষ্ণ-প্রেম হয় যার দূর-দরশনে।।"

গদাধর প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। প্রভু নানা-প্রকারে তাঁহাকে নিবারণ করিতেছেন, কিন্তু তিনি শুনিতেছেন না। প্রভু বলিলেন, "গদাধর। ক্ষেত্র-সন্ন্যাস লইয়াছ, তুমি নীলাচল ত্যাগ করিলে পতিত হইবে।" গদাধর বলিলেন, "প্রভু, তোমার শ্রীচরণে যদি আমার মতি থাকে, তবে আমার কোন বিপদ নাই।" প্রভু ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "গদাধর, এ তোমার নিতান্ত স্বার্থপরতা। নিয়ম বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে তুমি, আর দোষী হইব আমি, একি তোমার ভাল কাজ? তুমি কি শুন নাই যে, শ্রীভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া কোন কুকাজ করিলে তিনি উহা কখনও মার্জনা করেন না? তুমি আমার উপর নির্ভর করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ মহাপাপ করিতেছ, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কেন উহা হইতে অব্যাহতি দিবেন? গদাধরের একমাত্র উত্তর ক্রন্দন। প্রভু যদি বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, তখন গদাধরের কথা ফুটিল। তিনি বলিলেন, "যে দোষ হয় সে আমার। তোমাকে আমি দোষ হইতে অব্যাহতি দিলাম। আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি না, আমি শচী-মাতাকে দেখিতে যাইতেছি।"

গদাধরের কথার তাৎপর্য্য এই যে, "প্রভু, আমি তোমার সঙ্গে যাইব, ইহাতে নরকে যাই সেও স্বীকার।" হে কৃপাময় পাঠক। এই ঘটনা দ্বারা কতক বুঝিবেন যে, ভগবৎ-প্রেম কেন পরকীয়া-প্রেমের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রভু হারিলেন, আর এ পর্যন্ত হারিয়াই আসিতেছেন। এখন কটকের নদী পার হইবার সময় গদাধরকে প্রভু ডাকাইলেন এবং তাঁহার হাত দু'খানি ধরিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া ছল-ছল আঁখিতে বলিতে লাগিলেন, "গদাধর! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিও না, ইহাতে আমি দুঃখ পাই। তুমি কি অকাজ করিতেছ, তাহা শুন। আমার সঙ্গসুখের লোভে প্রতিজ্ঞা ও সেবা ছাড়িতেছ। এ কাজ ভাল নয়। শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া

যাও। আমি সত্বর ফিরিয়া আসিব। তুমি চিরদিন আমার সুখের জন্য নিজে কষ্ট লইয়া থাক। তুমি আমার সঙ্গে গেলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব; আর যদি ফিরিয়া যাও, তবে সুখী হইব। আমাকে সুখ দেওয়া তোমার জীবনের প্রধান সুখ। অতএব তুমি ফিরিয়া যাও। ইহার উপর আর যদি কথা কও, আমার মাথা খাও।" গদাধর তখন মুখ উঠাইয়া প্রভুর পানে চাহিলেন এবং নিমিষহারা হইয়া মুখখানি দেখিলেন। যেন জন্মের মত মুখখানি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইতেছেন। ক্রমে তাঁহার নয়ন-তারা স্থির হইয়া উর্দ্ধে উঠিল, একটু কাঁপিলেন, আর ধপাৎ করিয়া বালুকার উপর পড়িয়া গেলেন। গদাধর পড়িবামাত্র সার্বভৌম তাঁহাকে ধরিলেন।

যেমন বিদ্যুৎ চলিয়া যায়, সেইরূপ প্রভুর অন্তরের তীক্ষ্ণ দুঃখরেখা হৃদয়ের বাহিরে চলিয়া গেল। উহার কিঞ্চিৎ আভা বদনে প্রকাশ পাইয়া লুকাইয়া গেল। প্রভু সার্বভৌমের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, আপনি গদাধরকে সুস্থ করিয়া নীলাচলে লইয়া যাউন।" প্রভু এইরূপে একটি বাঁটুলে দুইটি জীব বধ করিলেন। সার্বভৌম, এমন কি সমগ্র নীলাচলবাসী প্রথমে প্রভুর সঙ্গে আসিতেছিলেন। প্রভু সকলকে নানা উপায়ে নিবৃত্তি করিয়া পথে রাখিয়া আসিয়াছেন। যাঁহারা প্রধান তাঁহাদের মধ্যে সার্বভৌম একজন—তাঁহাদিগকে পারেন নাই। প্রভুর ইচ্ছা সার্বভৌমকে কটকের ওদিকে যাইতে দিবেন না। তাই ছল-ছল নেত্রে মূর্ছিত গদাধরের পানে একবার চাহিয়া ও সার্বভৌমকে ঐ আজ্ঞা দিয়া তূর্ণ-নৌকায় উঠিলেন, আর তখনি উহা ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন।

সার্বভৌম প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন। যখন প্রভু দক্ষিণে যান, তখন সার্বভৌম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "শত পুত্রশোক সহিতে পারি, তবু তোমার বিরহ সহিতে পারি না।" সার্বভৌম নিস্তব্ধ হইয়া প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন, আর গদাধরের গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন। শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, "গদাধর! উঠ, মহাপুরুষদের কার্য্যই এইরূপ, তাঁহাদের হৃদয় স্বভাবতঃ কুসুম হইতে কোমল, কিন্তু কর্তব্যের অনুরোধে উহা বজ্র হইতেও কঠিন হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ তোমার বিরহে দুঃখ পাইতেছেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। যাহাতে তোমার ধর্ম্ম নষ্ট না হয়, সেইজন্য সে দুঃখ স্বেচ্ছায় নিজ-স্কন্ধে লইলেন।" এদিকে নৌকা তূর্ণ-গতিতে এপারে আসিল। অমনি প্রভু নামিলেন, আর পশ্চাতে না চাহিয়া দ্রুতগতিতে চলিলেন। ক্রমে গদাধর উঠিলেন; আর তিনি ও সার্বভৌম সজল নয়নে প্রভুর পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন সন্ধ্যাকাল, কাজেই প্রভু শীঘ্রই অদর্শন হইলেন। তখন তাঁহারা পরস্পরের অবলম্বন হইয়া, ধীরে ধীরে, নীরবে রোদন করিতে করিতে নীলাচলে ফিরিয়া চলিলেন।

ওদিকে প্রভু চতুর্দ্বারে রামরায়ের সহিত কৃষ্ণ-কথায় রজনী যাপন করিলেন। প্রভুর সঙ্গে অসংখ্য লোক, তাঁহারা—যিনি যেখানে পারিলেন সেখানে থাকিলেন। প্রভাতে প্রভু স্নান করিয়া রাজার প্রেরিত বহু প্রকারে সদ্য প্রসাদ সেবা করিলেন। তৎপরে আবার ভক্তগণসহ চলিলেন। একে যাঁহারা প্রভুর নাম শুনিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাকে দেখিতে উৎসুক। আবার শ্রীভগবান্ সন্ন্যাসীরূপে জগতে বিচরণ করিতেছেন, এইরূপ ভাবে যে সন্ন্যাসী পূজিত তাঁহাকে দেখিতে কাহার না সাধ হয়? সুতরাং যিনি শুনিতেছেন যে, এই সন্ন্যাসী গৌড়দেশে চলিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত দৌড়িলেন। যেখানে-যেখানে সহস্র সহস্র লোক দ্বারা সদ্য-সদ্য ঘর প্রস্তুত হইতেছে, সেই-সেই স্থানে লোকের ভিড় অধিক। অনেকে—আপনাপন সাধ্যমত ভেটের সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। যেখানে প্রভু কবে আসিবেন ঠিক নাই, সেখানেও লোক প্রভুর দর্শনের জন্য দুই-একদিন প্রতীক্ষা করিতেছেন। আবার যে পথ দিয়া প্রভু যাইবেন, তাহার দু'ধারে লোক দাঁড়াইয়া যাইতেছে। এইরূপে, কি পথেঘাটে,

কি আরামের স্থানে সর্বদা কেবল লক্ষ-কণ্ঠ উত্থিত হরিধ্বনির কোলাহল হইতেছে।

প্রভু ক্রমে যাজপুরে উপস্থিত হইলেন। যাজপুরে বহু দেবমন্দির ও সে-সব অতি পবিত্র স্থান। সেখানে বহুতর ভদ্রলোকের বাস। প্রধান লোক সকল "কৈ প্রভু কৃষ্ণচৈতন্য কোথায়"? বলিয়া একেবারে প্রভুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। প্রভুর তিনটি ভাব ছিল,—সহজ-ভাব, আবেশ-ভাব ও শ্রীভগবদ্-ভাব। মধে মধ্যে সহজ-ভাব ও মধ্যে মধ্যে ভগবদ্-ভাব হইত, কিন্তু আবেশ-ভাব প্রায় সর্বদা থাকিয়া যাইত। প্রভুর বদনের দিকে চাহিলেই জানা যাইত, যে তিনি আপনাতে আপনি নাই। যেন তাঁহার চিত্ত কে চুরি করিয়া লইয়াছে। প্রভু চক্ষু মেলিয়া এদিকে ওদিকে চাহিতেছেন, কিন্তু বুঝা যাইতেছে যে, বাহ্যজগৎ তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না। এই যে প্রভু আভ্যন্তরিক জগতে বিচরণ করিতেছেন, তবু তিনি কি ভাবিতেছেন, কি দেখিতেছেন, তাহা প্রায় তাঁহার কার্য্য দ্বারা জানা যাইতেছে। অন্ততঃ স্বরূপ প্রভৃতি মর্মী ভক্তগণ উহা বেশ জানিতে পারিতেছেন। প্রভুর এই আবেশ-ভাব আবার তিনরূপ;—উদ্ধবের ভাব, গোপীর ভাব ও রাধার ভাব। যখন উদ্ধবের ভাব, তখন প্রভু দীন হইতেও দীন;—কিসে তাঁহার কৃষ্ণ-নামে রুচি হইবে, কিসে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাইবেন, এই নিমিত্ত কাঁদিয়া ব্যাকুল। যখন গোপীভাব, তখন বাহিরের জগৎ কিছু দেখিতেছেন না, কি অতি অল্প দেখিতেছেন। কেবল নানাবিধ কৃষ্ণ-লীলা তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইতেছে। আর যখন রাধাভাব, তখন একেবারে অচেতন। ঠিক রাধা,—রাধার সহিত কিঞ্চিৎমাত্র বিভিন্নতা নাই। প্রভুর যখন যে ভাব, তাঁহার সঙ্গের ভক্তগণও তখন সেই ভাবে বিভাবিত হইতেছেন।

যখন প্রভুর ভগবান্-ভাব, তখন কাহার সাধ্য তাঁহাকে শ্রীভগবান্ না ভাবিয়া থাকিতে পারে। যাহার যত বড় অবিশ্বাস হউক না কেন, প্রভুকে তখন ভগবান্ ভাবিতেই হইবে। সুখের মধ্যে ভক্তগণ এই ভগবান্-ভাবের কথা মুহুর্মুহুঃ ভুলিয়া যাইতেন, তাহা না ভুলিয়া তাঁহারা অধিকক্ষণ প্রভুর সঙ্গ করিতে পারিতেন না। মহাপ্রকাশের দিন প্রভু সাত প্রহর ভগবানরূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। ভক্তগণ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে আবার মানুষ হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, ইহা আপনাদের অবশ্য স্মরণ আছে।

শ্রীভগবানের সহজ ভাব অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য শূন্য ভাব সর্বাপেক্ষা মধুর। যেখানে যতখানি ঐশ্বর্য্য, সেখানে ততখানি মাধুর্য্যের অভাব। শ্রীনিমাইয়ের যখন সহজ-ভাব, তখন তিনি অতি সুন্দর, ভুবনমোহন, যুবাপুরুষ, অতি লাজুক, অতি দীন, অতি স্নেহশীল, অতি সরল, অতি অনুগত; আবার এই সমুদয় গুণের মধ্যে অতি-বুদ্ধিমান, অতি-পণ্ডিত, অতি-রসিক, অতি-চঞ্চল। যখন প্রভুর সহজ অবস্থা তখন চাঁদ-বদনে মধুর হাসি লাগিয়াই আছে। অন্তরে যে আনন্দ, তাহার অবধি নাই। বদন সেই নিমিত্ত আনন্দে ঝলমল করিতেছে। উহাতে নজর পড়িলে নয়নে আপনা-আপনি আনন্দে জল আইসে। নিমাই তখন সর্বদা হাস্য কৌতুক করিতেছেন, এমন কি নিমাই তখন ব্রজের কৃষ্ণ।

যখন যামপুরের আচার্যগণ ব্যস্ত হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই, প্রভু কোথায়? কই, কৃষ্ণচৈতন্য কোথায়?" তখন প্রভুর সম্পূর্ণ সহজ ভাব। তাই রসিকশেখর প্রভু উঠিয়া অতি গাম্ভীর্য্যের সহিত সেই সমুদয় আচার্য্যগণকে বলিতেছেন, "এই যে প্রভু, ইঁহাকে প্রণাম কর।" ইহা বলিয়া পরমানন্দপুরীকে ধরিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। পুরী-গোঁসাই নিতান্ত ভাল মানুষ; তিনি প্রভুর এই রঙ্গ দেখিয়া দিশেহারা হইয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "না না, আমি প্রভু না।" তখন নিমাইয়ের বদন অতি গম্ভীর। তিনি আবার আচার্য্যগণকে বলিতেছেন, "আপনারা উহার কথা শুনিবেন না। উনিই প্রভু, সকলে উহাকে প্রণাম করুন। এই দেখুন, আমি করিতেছি।" ইহা বলিয়া প্রভু প্রকৃতই পুরীকে প্রণাম করিলেন। পুরী ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন,

"আমি না, আমি না, উনি। শুন নাই কৃষ্ণচৈতন্য সুবর্ণের ন্যায় পুরুষ। ঐ দেখ সত্য কিনা উনি লোক-শিক্ষার নিমিত্ত আমাকে প্রণাম করেন।"

প্রভুর কাণ্ড দেখিয়া প্রথমে ভক্তগণ অবাক। পরে তাঁহার গম্ভীর মুখ ও পুরীর দিশেহারা ভাব দেখিয়া সকলে মহা-কলরব করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয়, তিন দিবস পূর্বে প্রভু প্রতি বৃক্ষে, প্রতি-গুল্মে, প্রতি-লতায়, শ্রীকৃষ্ণকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছিলেন। আজ তাঁহার আর এক মনোহর ভাব দেখুন। প্রভু ও পুরী দুইজনেই দুইজনকে প্রভু বলিয়া দেখাইয়া দিতেছেন।

এখানে প্রভু, মঙ্গরাজ ও হরিচন্দনকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা যাইতে চাহেন না, কিন্তু প্রভু ছাড়িলেন না। তখন অমাত্যের মধ্যে রহিলেন কেবল রামরায়। প্রভু ও তিনি দুই জনে কৃষ্ণ-কথায় সমুদয় সময় যাপন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে সকলে রেমণাতে আসিলেন। রামরায়ের সীমা এই পর্যন্ত; এখান হইতে তাঁহার ফিরিতে হইবে। প্রভু ও রামরায় হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা পরস্পরের নিকট বিদায় লইবেন, কিন্তু কেহ কোন কথা বলিতে পারিতেছেন না। রামরায় প্রভুর মুখপানে চাহিয়া ঘোর মূর্ছায় অভিভূত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। সেই শত-শত দাসদাসী-সেবিত-অঙ্গ এখন ধূলায় পড়িয়া রহিল। প্রভুর দৃঢ়-মন, কিন্তু রামানন্দের নিকট উহা পরাজিত হইল; তাঁহার নয়নে জল আসিল। তখন রায়কে কোলে করিয়া প্রভু রোদন করিতে লাগিলেন। তারপর আপনাকে সামলাইয়া, প্রভু রায়কে ফেলিয়া চলিলেন; রায় মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। প্রভুর ইচ্ছায় রায় প্রাণে মরিলেন না,—মর-মর হইয়া বাঁচিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার রক্ষক ও সেবকগণ তাঁহাকে দোলায় করিয়া কটকে আনিলেন। রামানন্দ সেই পথে রাজদর্শনে চলিলেন। রাজা রায়কে দেখিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। বলিতেছেন, "রামরায়, আমার প্রভু কোথায় গেলেন? কাহার হাতে আমাদের সেই পরম-ধন, জীবনের জীবনকে দিয়া আসিলে?" রামানন্দও কাঁদিতেছিলেন; তিনি বলিলেন, "মহারাজ, জানেন আমি প্রভুকে কেন ফেলিয়া আসিলাম? কেবল আপনার ভয়ে। আমি আপনার সেবক, আপনার অন্নে এ দেহ পালিত। তাই যখন প্রভু আমাকে বিদায় দিলেন, তখন ভাবিলাম যে, আমি কি করি! সেই করুণার সিন্ধু আমার গৌরচন্দ্রকে ছাড়িয়া আমি কোথায় যাইব? আবার ভয় হইল যে, তোমার বিনা আজ্ঞায় কিরূপে যাইব। তখন প্রভুর পায়ে মনে-মনে এই প্রার্থনা করিলাম যে, এখনি আমার মরণ হউক। কিন্তু মহারাজ! তাহা হইল না। এই দেখুন বাঁচিয়া আছি।" আসল কথা, এই রামরায় আপনাকে অপরাধী ভাবিতেছেন। তাই বিষয়ী রাজার ভয়ে হৃদয়ের-রাজা শ্রীগৌরচন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, রামরায়ের মনের এই বিষম অনুতাপ।

নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিতে তিনটি পথ। প্রভুর কি ইচ্ছা বুঝি না; সেই সময় এমন যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছে যে, এই তিন পথই বন্ধ। এই নিমিত্ত ভক্তগণকে এবার শীঘ্র শীঘ্র গৌড়ে পাঠাইয়াছেন। পথ বন্ধ, প্রভু কিরূপে গৌড়ে আসিবেন, ইহা সকলের ভয়। কিন্তু তিনি স্বয়ং সে কথা মুখেও আনেন নাই। ক্রমে সকলে উড়িষ্যা রাজ্যের সীমানায় আসিলেন। ওপারে মুসলমান-ঘাটরক্ষক, অতি প্রবল ও ভয়ানক ব্যক্তি।

উড়িষ্যার অধীনে সেখানকার অধিকারী প্রভুর চরণে আসিয়া প্রণাম করিলেন; তারপর বলিলেন, "প্রভু, এখানে কিছুকাল অপেক্ষা করুন। আমি ওপারের মুসলমান-অধিকারীর সহিত সন্ধি করিয়া আপনাকে ওপারে পাঠাইব।"

প্রভু সে কথা শুনুন বা না শুনুন, তাহার উত্তরে হাঁ কি না কিছুই বলিলেন না। প্রভু আসিলে সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইল; এবং সঙ্গে সঙ্গে গগনভেদী হরিধ্বনি উঠিল। ওপারের অধিকারী এই কলরব শুনিয়া ভাবিল, হয়ত বিপক্ষদের বহুতর নূতন সৈন্য

আসিয়াছে। তখন তথ্য জানিবার নিমিত্ত একজন গুপ্তচর পাঠাইয়া দিল। এই গুপ্তচর মুসলমান, হিন্দুর বেশ ধরিয়া আসিল। সে বেচারি আসিয়াছিল কি করিতে, আর কি তরঙ্গে পড়িয়া গেল। সে আসিয়া দেখে যে চারিদিকেই নৃত্য ও হরিধ্বনি। এইরূপে চারিদিকেই ভক্তির তরঙ্গ। স্বভাবতঃ সেও অভিভূত হইয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিল। সেই তরঙ্গে অনেকক্ষণ হাবুডুবু খাইয়া, শেষে ভাসিতে-ভাসিতে প্রভুর নিকট আসিল। তাহার তখন পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে, সে বাহুতুলে হরিবোল বলে.নৃত্য করিতে লাগিল। যাহা একটু বাকি ছিল, প্রভুর দর্শনে তাহাও গেল। এই অবস্থায় সে মুসলমান-অধিকারীর নিকট ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহার হাস্য. রোদন, নৃত্য, মূর্চ্ছা প্রভৃতি দেখিয়া অধিকারী এত মুগ্ধ হইল যে, প্রথমে সে কিছু বলিতেই পারিল না। তবে তাহার হাব, ভাব, কটাক্ষ, লাবণ্য দেখিয়া মুসলমান-অধিকারী বিস্মিত হইল। প্রভুকে যিনি যাহাই ভাবুন, তাঁহার এই অননুভবনীয় শক্তি ছিল যে, কখন তাঁহার দর্শনে, কখন স্পর্শনে, কখন বা তাঁহার কথা শুনিয়া জীব অভিভূত হইয়া কৃষ্ণ-কৃষ্ণ কি হরি-হরি বলিত, আর নৃত্য করিত। তাহার কৃষ্ণ কি হরি বলিতে আর নৃত্য করিতে অনিচ্ছা থাকিলেও সে আপনাকে সামলাইতে পারিত না। প্রভুর লীলায় এরূপ বহু ঘটনা বর্ণিত আছে যাহা পাঠ করিলেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। তবে লীলালেখকগণ ইহা এতবার ও এতরূপে দর্শন করিয়াছেন যে, ইহাতে যে কোন আশ্চর্য্য আছে, তাহা বর্ণনাকালে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। শুধু যে দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা প্রভু এই শক্তি-সঞ্চার করিতেন তাহা নহে,—লোক-দ্বারাও ইহা প্রেরণ করিতেন। যখন শ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীরাম শ্রীঅদ্বৈতকে ডাকিতে যান তখন তাঁহার সঙ্গে প্রভু ঐরূপ শক্তি পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরাম যেই শ্রীঅদ্বৈতকে প্রভুর সন্দেশ বলিলেন, অমনি শ্রীঅদ্বৈত প্রেমে বিহ্বল হইলেন। সেইরূপ প্রভু এই মুসলমান দ্বারা মুসলমান-অধিকারীর নিমিত্ত শক্তি পাঠাইলেন। মুসলমান-দূতের নৃত্য দেখিয়া ও তাহার মুখে কৃষ্ণ নাম শুনিয়া, অধিকারী একেবারে বিহ্বল হইলেন। দূত বলিলেন, যাঁহাকে দেখিয়া আসিলাম, তিনি মনুষ্য নহেন,—তিনি সেই "তিনি", যিনি হিন্দু-মুসলমান সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ-সুবর্ণের ন্যায়, রূপ অমানুষিক, নূতন যৌবন ও প্রকাণ্ড দেহ, আর পদ্ম-চক্ষু দিয়া অনবরত প্রেমধারা পড়িতেছে; তাঁহাকে দর্শন করিলেই যে আনন্দ হয়, তাহা শত-সহস্র বাদশাহী হইতেও শ্রেষ্ঠ। ভাটমুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ শুনিয়া রাধা যেরূপ উন্মাদগ্রস্তা হইয়াছিলেন, অধিকারীও সেইরূপ হইয়া পড়িলেন। তখন কিরূপে প্রভুকে দর্শন করিবেন, তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইলেন। শেষে সরস্বতী ঠাকুরাণী তাহাকে সদ্‌বুদ্ধি দিলেন। মুসলমান-দূত উড়িয়া-অধিকারিকে বলিল যে, তাহাদের অধিকারী মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছেন, যদি অনুমতি পান তবে আসিয়া দর্শন করিয়া যান। উড়িয়া-অধিকারী মহা-চিন্তিত হইয়াছিলেন, ভক্তগণও কতক বটে, কিরূপে প্রভুকে গৌড়ে পাঠাইবেন। তাঁহারা কোন উপায় না পাইয়া সকলে বসিয়া ভাবিতেছেন। কিন্তু প্রভু গৌড়ে যাইতেছিলেন, পথে আট্‌কা পড়িয়াছেন, এই সমুদয় সংবাদ যে তিনি কিছু রাখেন,—তাহার চিহ্নও তাঁহার কথায়, কার্য্যে কি মুখে পাওয়া যাইতেছে না। তিনি যে চলিতেছিলেন, আর এখন যে মাঝপথে,—তাহাও ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি দুইচারি দিন কেবল প্রেমানন্দে বাহ্য হারাইয়া দিবানিশি বিহ্বল রহিয়াছেন। এমন সময় মুসলমান অধিকারীর চর আসিল। ইহাতে উড়িয়া-অধিকারী ও ভক্তগণ একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহাদের আবার মনে উদয় হইল—প্রভু কি বস্তু, এবং ইহা অপেক্ষাও সহস্র-গুণ অসাধ্য কার্য্য তিনি করিতে পারেন। চরের কথায় উড়িয়া-অধিকারী বলিলেন, এ অতি উত্তম কথা। প্রভুর উপর সকলেরই অধিকার আছে। তিনি পাঁচ-সাত জন সঙ্গী লইয়া নিরস্ত্র হইয়া আসিতে পারেন। তাঁহার সম্মানের ত্রুটি হইবে না। মুসলমান-অধিকারী আসিলেই উড়িয়া-অধিকারী বাহু প্রসারিয়া

তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং প্রভুর নিকটে লইয়া চলিলেন। মুসলমান-অধিকারী প্রভুকে দর্শন করিবামাত্রই বিবশ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। উড়িয়া-অধিকারী তাঁহাকে উঠাইয়া প্রভুর কাছে লইয়া গেলেন। মুসলমান-অধিকারীর মুখে তখন প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণনাম লাগিয়া গিয়াছে। তিনি প্রভুকে জোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "প্রভু, আমি হিংসা করিয়া জীবন কাটাইয়াছি। আমাকে অঙ্গীকার করিয়া উদ্ধার কর।" উড়িয়া-অধিকারীও জোড়হস্তে বলিতেছেন, "প্রভু, যাহার নাম স্মরণ মাত্র ভব-বন্ধন ঘুচিয়া যায়, তাঁহার দর্শনে হিংস্র মুসলমান পবিত্র হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?" কিন্তু প্রভু, কে তাঁহাকে প্রণাম করিল ইহার কিছুই লক্ষ্য না করায়---(যথা চন্দ্রোদয় নাটকে)—

"প্রভু পার্ষদগণ প্রভু প্রতি কন। ইহা প্রতি কর প্রভু কৃপাবলোকন।।
ভক্ত-বাক্য অনুরোধে প্রভু তার প্রতি। কৃপা-দৃষ্টিপাত কৈলা গোলকের পতি।।
প্রভু কৃপা দৃষ্টি পেয়ে সুকৃতি সে জন। প্রেমে মত্ত হৈল যেন গ্রহগ্রস্ত জন।।
পুলকে ব্যাপিল সেই যবন শরীর। গদ-গদ স্বরে নেত্রে বহে অশ্রুনীর।।"

তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, "ওহে অধিকারী, প্রভু গণসহ গৌড়ে যাইবেন, তুমি তাঁহার সহায়তা কর।" অধিকারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু কতদূর যাইবেন?" গোপীনাথ বলিলেন, "পাণীহাটী পর্য্যন্ত।" ইহাতে মুসলমান অধিকারী কৃতার্থস্মন্য হইয়া বলিতেছেন ঃ

"চৈতন্যদেবের আমি সাহায্য করিব। মনুষ্য জনম আইজ সফল হইব।" তখন—"এক নৌকা নবীন অত্যন্ত সুগঠন। তার মধ্যে দিব্য ঘর বসিতে আসন।।"

সেই নৌকা আনিয়া প্রভু ও তাহার নিজজনকে উহাতে উঠাইলেন অধিকারীর প্রভুর সঙ্গ-ত্যাগ করিবার একটুও ইচ্ছা নাই, তাই ছল উঠাইলেন যে, পথে জল-দস্যুর ভয়, অতএব তিনিও যাইবেন। এইরূপে দশ-নৌকা সৈন্য সঙ্গে করিয়া তিনি প্রভুর নৌকার আগে-পাছে চলিলেন। উড়িয়া অধিকারী বিদায় হইয়া তীরে দাঁড়াইয়া কান্দিতে লাগিলেন। এদিকে হরিধ্বনির সহিত প্রভুর নৌকা গৌড়দেশে ছুটিল। মুসলমান অধিকারী প্রভুকে মন্ত্রেশ্বর নামক দুষ্টনদ পার করাইলেন। শেষে পিছলদহ পর্য্যন্ত আসিলেন। সেখান হইতে লোকালয়, সুতরাং আর ভয় নাই। তখন প্রভু মুসলমান-অধিকারীকে ডাকাইলেন। তিনি আসিলে—

"জগন্নাথ প্রসাদ মোদক মনোহরা নাম। আপনার হস্তে করি গৌর-ভগবান।' তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন। ইঁহাতে মুসলমান-অধিকারী—"উচ্চৈস্বরে হরি বলি কান্দে ফুকারিয়া। মহাভাগবৎ হৈল প্রভু-কৃপা পাইয়া। ছাড়িয়া না যায় প্রভু কান্দিতে লাগিলা।"—(চৈতন্য চন্দ্রোদয়)

এইরূপে তিনি শুধু যে প্রভুর গণ হইলেন তাহা নয়, পরম ভাগবত ও জগন্মান্য বৈষ্ণব হইলেন।

নবম অধ্যায়

"শ্যামচাঁদ নেচে নেচে নেচে যায়।। ধ্রু।।
ব্রজ জুড়াল দুঃখ গেল, ব্রজ-জনার প্রাণ এল
তামসী রজনী গেল, শ্যামচাঁদের উদয় হলো, উঠিল প্রেমেরি হিল্লোল।
ফুল ফুটিল, জুটিল পিক শুক অলিকুল।"

নৌকা চলিয়াছে। যাহারা নাবিক তাহারও প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। তাহারাও নৌকা বাহিতেছে ও উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতেছে। নৌকা তীরের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে পাণিহাটী গ্রামে উপস্থিত হইল। প্রভুর এক অদ্ভুত শক্তির কথা, অর্থাৎ, লোক আকর্ষণ করা,

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, পাণিহাটীতে নৌকা লাগিবামাত্র সকলে দেখেন যে, উঠিয়া যাইবার পথ নাই, একেবারে লোকারণ্য হইয়াছে। অবশ্য রাঘব—যাঁহার বাড়ীতে প্রভু উঠিলেন,—জানিতেন যে, প্রভু বিজয়া-দিবসে নীলাচল ত্যাগ করিয়া গৌড়াভিমুখে আসিবেন। প্রভু নৌকাপথে এত দ্রুত আসিতেছেন যে, নৌকার সহিত হাঁটিয়া যাওয়া যায় না। প্রভু কোথাও নামেন নাই, কারণ গ্রন্থে দেখিতেছি যে, পিচ্ছলদহ হইতে একদিনে পাণিহাটী আসিলেন। কিন্তু ঘাটে নৌকা লাগিবামাত্র, সেই স্থান অমনি "অকস্মাৎ কোথা হইতে লোকময় হইল।"

মনে করুন, প্রভুকে সকলেরই প্রয়োজন। কিন্তু পরিমিত দেহধারী প্রভু বাড়ী-বাড়ী যাইতে পারেন না। তাই তিনি জীবগণের সহিত মিশিবার জন্য একস্থানে বসিয়া তাঁহার কার্য্য উদ্ধার করিতেছেন। প্রভুর নীলাচল ত্যাগ করা অবধি পথ লোকারণ্য। যেমন নদী ক্রমে পরিসর হয়, সেইরূপ সেই লোকস্রোতও ক্রমে বাড়িতেছে। পাণিহাটীতে কিরূপ লোকারণ্য হইয়াছিল তাহা চন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপ বর্ণিত আছে ঃ

"গঙ্গাতীর-সীমা প্রভু যেইমাত্র গেল। অকস্মাৎ কোথা হৈতে লোকময় হৈল।।
যত লোক আইল তাহা কহিতে না পারি। এই কথা শুনি মনে বুঝিবে বিচারি।।
ধরণীতে ধুলিরাশি যতেক আছিল। হেন বুঝি সেই সব মনুষ্য হইল।।"

এইরূপে পাণিহাটী হইতে প্রভুর গতির সঙ্গে লোকসংখ্যাও ক্রমে বাড়িয়া চলিল। সেখানে একরাত্রি বাস করিয়া, প্রভু আবার নৌকায় চলিলেন। লোকের আকিঞ্চনে প্রভু বাহিরে আসিয়া বসিয়াছেন। যথা ঃ

সুমধুর কণ্ঠস্বরে প্রসন্ন বদনে হেরে, কৃষ্ণ বলি গৌর-ভগবান।
নৌকাপরে বসি যায় অনিমিখ নেত্রে চায়, দুকুলে যতেক ভাগ্যবান্।
প্রভু চলে গঙ্গাজলে, লোক সব দুই-কূলে উচ্চৈ স্বরে করে হরিধ্বনি।
বাল বৃদ্ধ নর-নারী সবে বলে হরি হরি, ব্যাপিলেক আকাশ-অবনী।।"

প্রভু নৌকায় বসিয়া যাইতেছেন, কখন বা দাঁড়াইয়া বাহু তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরি হরি বলিতেছেন। দুইধারে লোকের অন্ত নাই; নিরপেক্ষ প্রভু তাই পরিসর গঙ্গার ঠিক মধ্যস্থল দিয়া যাইতেছেন। কিন্তু প্রভুর শ্রীবদন দর্শন নিমিত্ত লোকের এরূপ গাঢ়-বাসনা হইয়াছে যে, তাহাদের দীপ্তি স্বভাবতঃ অতি-তীক্ষ্ণ হইয়াছে, এবং সকলেই প্রভুর আপাদমস্তক অতি পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেছেন। কাজেই উভয়কূলের লোকেরাই ভাবিতেছে যে, তাহাদের প্রতি প্রভুর বড় কৃপা, তাই তিনি তাহাদের কূল দিয়া যাইতেছেন।

ক্রমে কুমারহট্টে আসিয়া, প্রভু তীরে নামিলেন ও সেই ভূমিতে প্রণাম করিলেন। শেষে সেখানকার একমুষ্টি মৃত্তিকা লইয়া বহির্বাসে ইহাই বলিতে বলিতে বান্ধিতে লাগিলেন যে, "এই কুমারহট্ট অতি পবিত্র স্থান, এখানকার কুকুর-শৃগালও আমার নমস্য,—এই মৃত্তিকা আমার প্রাণ হইতে প্রিয়। যেহেতু ইহা শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।" এই সময় শ্রীবাস আসিয়া প্রভুকে লইয়া চলিলেন,—কোথায়? না, যেখানে প্রভু আট-নয় মাস নৃত্য করিয়াছিলেন—যাঁহার বাড়ী তাঁহার নিজের বাড়ীর ন্যায়, তাঁহার লীলার স্থান। শ্রীবাসের ন্যায় তখনকার বহুতর লোকের নবদ্বীপে এক বাড়ী, আর অন্যত্র এক বাড়ী ছিল। প্রভুর শুভাগমনে শ্রীবাসের বাড়ীতে, তাঁহার স্ত্রী মালিনী, তাঁহার তিন ভ্রাতা শ্রীরাম, শ্রীকান্ত ও শ্রীনিধি এবং তাঁহাদের পত্নীরা, শ্রীবাসের নয় বৎসরের ভ্রাতৃকন্যা (শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবনদাসের মাতা) নারায়ণী প্রভৃতির মধ্যে কিরূপে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। শ্রীবাসের বাড়ীতে সকলে আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহাদের মনের ভাব এইরূপ, যথা—

"সেই ত প্রাণনাথ হে। আমি পেলাম, আমি পেলাম, হারাণ রতনে।"

সেই সময় জগদানন্দ, প্রভুকে কি অন্য কাহাকে না বলিয়া চুপে-চুপে কাঞ্চনপল্লী শ্রীশিবানন্দ সেনের বাড়ীতে গেলেন। কুমারহট্ট কাঁচড়াপাড়ার অতি সন্নিকট। শ্রীজগদানন্দ উদাসীন। তিনি গৌড়ে এই শিবানন্দ সেনের বাড়ীতে থাকিতেন। শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার ন্যায় প্রভুর সহিত ইঁহার প্রীতি ছিল। প্রভুকে ভাল খাওয়াইবেন ও আরামে রাখিবেন, ইহাই লইয়া প্রভুর সহিত সর্বদা কলহ করিতেন। কিন্তু প্রভু তাহা শুনিতেন না বলিয়া জগদানন্দ রাগ করিয়া উপবাসী হইয়া পড়িয়া থাকিতেন আর প্রভু যাইয়া তাঁহাকে সাধিয়া খাওয়াইতেন।

এখানে একটি কাহিনী বলিব। প্রভু পূর্বে যখন নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন রামরায় ও সার্বভৌমের অনুবোধে উহা হইতে নিরস্ত্র হয়েন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। সেই সঙ্কল্পের সময় শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত সেখানে ছিলেন। কথা এই, ভক্তগণ কার্তিক মাসে চলিয়া আসিলে, শ্রীকান্ত আরও কিছুদিন নীলাচলে ছিলেন। শ্রীকান্ত যখন গৌড়ে আসেন, তখন প্রভু তাঁহাকে বলেন যে, তিনি গৌড়ে যাইবেন ইচ্ছা করিয়াছেন, আর যাইয়া জগদানন্দের হস্তে ভিক্ষা করিবেন। শ্রীকান্ত এই কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে প্রভু শিবানন্দ সেনের বাড়ী যাইবেন, কারণ জগদানন্দ সেই বাড়ীতে থাকেন। ইহা বুঝিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তিনি গৌড়ে ছুটিয়া আসিয়া মাতুল শিবানন্দকে এই শুভসংবাদ দিলেন। তখন অগ্রহায়ণ মাস। এই সংবাদ শুনিয়া শিবানন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া সেই দিন হইতে প্রভুর সেবাবস্তু আহরণ করিতে লাগিলেন। প্রভু বাস্তুশাক ভালবাসেন, কিন্তু শীতকালে উহা হয় না। প্রভু গর্ভ-থোড় ভালবাসেন, কিন্তু শীতকালে উহা সংগ্রহ করা দুষ্কর। তবু শিবানন্দ নানা স্থানে বাস্তুশাকের বীজ রোপণ করিয়া উহাতে জল সিঞ্চন করিতে এবং গর্ভ-থোড়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর তাঁহার চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বলিতেছেন যে, শ্রীকান্ত আসিয়া তাঁহার পিতাকে সংবাদ দিলে "সেই দিন হইতে শিবানন্দ ভাগ্যধর। ভিক্ষার সামগ্রী লাগি হইলা তৎপর।"

এদিকে প্রভু আসিবেন-আসিবেন মনে করিতেছেন, কিন্তু রামানন্দ রায় নানা-ছলে নানা-উপায়ে তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিলেন; কাজেই প্রভু আসিতে পারিলেন না। ইহাতে শিবানন্দ বড় কাতর হইলেন। প্রভুর নিমিত্ত সংগৃহীত দ্রব্য কাহাকে ভুঞ্জাইবেন? নীলাচলের বাস্তুশাক ও গর্ভ-থোড় পাঠাইতে পারেন না। তখন নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক তিনি আশ্বাসিত হইলেন। ইনি বড় তেজস্কর ভক্ত। কথিত আছে, ইঁহার উপাস্য দেবতা শ্রীনৃসিংহঠাকুর ইঁহার সহিত সাক্ষাৎরূপে কথা কহিতেন। এদিকে, তিনি ছিলেন গৌরাঙ্গের পরমভক্ত। তাঁহার নাম ছিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী কিন্তু প্রভু তাঁহার নাম রাখেন নৃসিংহানন্দ। ব্রহ্মচারী শিবানন্দকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তিনি গৌরাঙ্গকে প্রেমডোরে বান্ধিয়া সেন মহাশয়ের বাড়ীতে আনিয়া, সেন-দত্ত সমুদয় সামগ্রী ভুঞ্জাইবেন। ইহাই বলিয়া ব্রহ্মচারী কঠোর ধ্যানে বসিলেন। সারাদিন সারারাত্রি এইরূপে গেল, পরদিবসে তিনি ভোগ দিলেন। কিছুক্ষণ কান্দিলেন, হাসিলেন, নৃত্য করিলেন, আর বলিলেন, গৌরাঙ্গ আসিয়া সমুদয় গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গকে শিবানন্দ দেখিতে পাইলেন না। আর প্রভু যে আসিয়া সেবা করিয়াছেন, তাহারও কিছু প্রমাণ পাইলেন না; ভোগের সামগ্রী যেমন তেমনি রহিল। শিবানন্দ সেন দেহধারী ভগবানকে পূজা করেন, তাঁহার ওরূপ মনে মনে ভোগে তৃপ্তি হইবে কেন। কাজেই ব্রহ্মচারী যে প্রকৃতই প্রভুকে আনিয়াছিলেন আর তাঁহাকে খাওয়াইয়াছিলেন, ইহা শিবানন্দের মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। কিন্তু ইহার পরে ভক্তগণ যখন নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে গমন করিলেন, তখন ইহার তথ্য পাইলেন। প্রভুর সম্মুখে সকলে বসিয়া; শিবানন্দ সেনও আছেন। এমন সময় প্রভু হঠাৎ বলিলেন, "এইবার পৌষমাসে আমি কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দের আলয়ে নৃসিংহানন্দের হাতে অপরূপ বাস্তুশাক খাইয়াছি।"

এইকথা শুনিয়া শিবানন্দ সেনের মনের সন্দেহ গেল। প্রভু যে তাঁহার বাড়ী গমন করিয়া ভোজন করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস হইল।

শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ সত্যভামা, প্রভুর সেইরূপ জগদানন্দ; অর্থাৎ প্রভুর সঙ্গে জগদানন্দের এতই প্রীতি। জগদানন্দ চিরদিন শিবানন্দ কর্তৃক তাঁহার বাড়ীতে প্রতিপালিত। তিনি ভাবিলেন এই উদ্যোগে প্রভুকে সেন মহাশয়ের বাড়ীতে লইয়া যাইয়া, তাঁহার নিকট নিজের সে ঋণ্ তাহার কিছু শোধ করিবেন। তাই প্রভু কুমারহট্টে আসিলে জগদানন্দ গোপনে গোপনে শিবানন্দের বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি নৌকা লইয়া কুমারহট্টে যাও এবং প্রভুকে নিবেদন কর, যেন তিনি তোমার বাড়ী পদার্পণ করেন; আর আমি এদিকে বাড়ী সুসজ্জিত করি।" শিবানন্দ তাই প্রভুকে আনিতে চলিলেন। কুমারহট্টে শ্রীবাসের বাড়ীতে প্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণের নিকট মস্তক রাখিয়া শিবানন্দ কান্দিতে-কান্দিতে বলিলেন, "হে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু! তোমার এই দীন ভক্তের চিরদিনের মনের সাধ এইবার পূর্ণ কর।" প্রভু তখনি বুঝিলেন, শিবানন্দের কি প্রার্থনা। তিনি মধুর হাসিয়া বলিলেন, "শিবানন্দ, তোমার যাহা অভিরুচি।" প্রভুর অনুমতি পাইয়া, শিবানন্দ দ্রুতগামী দূত দ্বারা এই সংবাদ জগদানন্দের নিকট পাঠাইলেন। এই লীলাটি শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর চন্দ্রোদয় নাটকে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা ঃ

"শিবানন্দ সুখী হৈল, ঘাটে নৌকা আনাইল, শেষ-রাত্রে প্রভু যাত্রা কৈল।
অকস্মাৎ লোক সব, করি হরি হরি রব চতুর্দিকে ধাইতে লাগিল।।
কেহবা প্রাচীর পরে, কেহ বৃক্ষডালে চড়ে, কেহ নাচে কেহ গায় পথে।
পৃথ্বী হইল লোকময়, উচ্চ হরিধ্বনি হয়, মহাপ্রভু চলিলা নৌকাতে।।"

মনে ভাবুন, প্রভু লোকের ভয়ে শেষ রাত্রিতে লুকাইয়া যাইতেছিলেন। আবার শুনুন ঃ

"মহাপ্রভু কুতূহলে, কাঞ্চনপাড়াতে চলে, শিবানন্দ সেন সঙ্গে যায়।
গঙ্গার দুকুল ভরি, সবে বলে হরি হরি গঙ্গায় উজান নৌকা বয়।।"

কাঁচপাড়ায় শিবানন্দের ঘাটে নৌকা লাগিল, প্রভু উঠিলেন। দেখেন যে, পথ সুসজ্জিত হইয়াছে। প্রথমে পথের দুইধারে কদলীবৃক্ষ, প্রদীপ, কুম্ভ, ফুলের মালা ও আম্রের পল্লব এবং ঘাট হইতে সেনের বাটি পর্য্যন্ত সমস্ত পথ বস্ত্রদ্বারা সুমণ্ডিত। প্রভু সেই পথে চলিয়াছেন; পশ্চাতে ভক্তগণ, দুইধারে অসংখ্য লোক। পথের সুঁরচনা দেখিয়া প্রভু হাসিয়া শিবানন্দের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এ সমুদয় জগাইয়ের কাজ; না?" তাহা হউক, জগাই আমার (গ্রন্থকারের) মনের মত মানুষ। প্রভু সুখে পথের সজ্জা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন।

"কতদূর গিয়া আগে, দুইপথ দুইদিকে, সমান মণ্ডিত সুরচন।"

দুই দিকে দুইপথ দেখিয়া প্রভু সেখানে দাঁড়াইলেন। তখন মুকুন্দের দাদা বাসুদেব দত্ত তাঁহার চরণতলে পড়িয়া বলিলেন, "এই পথে অধমের বাড়ী যাইতে হয়। আগে শিবানন্দ সেনের বাড়ী গমন করুন, পরে কৃপা করিয়া এ অধমের বাড়ীতে চরণধূলি দিবেন।" এই কথা শুনিয়া প্রভু শিবানন্দ সেনের বাড়ী আগে চলিলেন এবং বহির্বাটিতে মন্দিরের নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। গ্রামের সমস্ত রমণীগণ অভ্যন্তরে আসিয়াছেন। তাঁহারা গগন-ভেদি হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, ঝাঁঝরধ্বনি করিতে লাগিলেন। শিবানন্দ সেন উত্তম আসনে ঠাকুরকে বসাইলেন। জগদানন্দ ঝারিতে জল আনিয়া প্রভুর পদ ধৌত করিলেন; এবং তাঁহার চরণামৃত লইয়া সমস্ত বাড়ী ছিটাইতে লাগিলেন। প্রভু কিয়ৎকাল শিবানন্দের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া বাসুদেবের গৃহে গমন করিলেন। বাসুদেব যদিও গৃহী, তবু প্রভুর বড় প্রিয়। তিনি জগতের জীবের সমুদয় পাপ লইবেন এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রভু বাসুদেবের বাড়ী কিছুকাল বসিয়া নৌকায় উঠিতে গেলেন। ইহাতে—

"শিবানন্দ বাসুদেবে, সগোষ্ঠীতে উচ্চৈঃস্বরে, কান্দেন নৌকাপানে চাঞা।"

প্রভু যে পথে হাঁটিয়া শিবানন্দের ও বাসুদেবের বাটী যান,—

"সে স্থানের ধূলি নিতে, লোক যায় শতে শতে, গর্তময় হয় ক্রমে ক্রমে।"

প্রভুর নৌকা চলিয়াছে, আর দুইধারে অসংখ্য লোক হরি হরি বলে প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছে। যথা—

"প্রভুর চরণ জল লইবার তরে। সহস্র সহস্র লোক জলে আসি পড়ে।।
আকণ্ঠ হইল জল তবু ব্যগ্র হঞা। পাদোদক লাগি লোক চলিল ভাসিয়া।।
লোকের ব্যগ্রতা দেখি করুণা জন্মিল। প্রভুর ইচ্ছায় পাদোদক সর্বলোকে পাইল।।"

তবু লোক ফিরিতেছে না, জনতা ক্রমে বাড়িয়াই যাইতেছে। শেষে প্রভু কোনক্রমে শান্তিপুরে আসিয়া পঁহুছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার প্রাণনাথকে পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভু শীঘ্র বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়া শান্তিপুরে থাকিতে পারিলেন না, নদীয়া অভিমুখে চলিলেন। প্রভুর ইচ্ছা ছিল কয়েকদিন একটু নির্জনে বাস করিয়া শ্রীনবদ্বীপ হইতে বিদায় লইবেন। কিন্তু সেখানে দিবানিশি লোকারণ্য। যাহারা আসিতেছে তাহারা নাচিয়া গাহিয়া সুখে ভাসিতেছে, ভক্তি হইতে উত্থিত এই অভিনব অতি সুস্বাদু স্ফূর্তিকর আনন্দ পাইয়া আর গৃহে যাইতেছে না; সুতরাং প্রভুর সহিত লক্ষাধিক লোক সর্বদা রহিয়া যাইতেছে। তাহাদের অবশ্য দেহধর্মের প্রয়োজন; ভক্তির শক্তিতে তাহারা দেহধর্ম ভুলিয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার বলেন যে, এইরূপে কেহ কেহ ভক্তি-সুখে উন্মত্ত হইয়া এক মাস পর্য্যন্ত উপবাস করিয়াও ক্লিষ্ট হন নাই। প্রভু কিছুকাল নির্জনে একটু আরাম করিবার আশায়, শ্রীনবদ্বীপের এক অংশ বিদ্যানগরে সার্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির গৃহে বাস করিবেন সঙ্কল্প করিলেন, এবং লোকের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত, অতি গোপনে গভীর রজনীতে নৌকায় উঠিয়া অতি-প্রত্যুষে আঁধার থাকিতে থাকিতে বাচস্পতির বাড়ীতে আসিলেন। তিনি তখন নিদ্রিত। মৃদুস্বরে তাঁহাকে ডাকা হইল। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া দেখেন যে, দ্বারে স্বয়ং নবদ্বীপচন্দ্র উদয় হইয়াছেন। তখন তিনি আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু বলিলেন, "আমরা দিন কয়েক গোপনে তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া গঙ্গাস্নান করিব।" বাচস্পতি বলিলেন, "আমার বাড়ী কি ছার, আমরা গোষ্ঠীসমেত আপনাকে মন-প্রাণ সমুদয় সমর্পণ করিয়াছি। আপনাকে গোপনে রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"*

শ্রীনবদ্বীপের যে কোন অংশে প্রভুর লুকাইয়া থাকা সম্ভবপর নহে। বাচস্পতির বাড়ীতে প্রভু আসিবামাত্র এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। কারণ ইহাতে ভক্ত-অভক্ত, শত্রু-মিত্র, সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। যাহারা বিদ্বেষী, তাহারা নিমাইকে হঠাৎ সন্ন্যাসী হইতে দেখিয়া বলিতে লাগিল যে, তাঁহার ন্যায় ভক্ত জগতে কস্মিন্‌কালে হয় নাই। ভক্তির নিমিত্ত মাধবেন্দ্র ভারতপূজ্য ছিলেন। কিন্তু প্রভুর যশে পুরী-গোসাঞির মহিমা মলিন হইয়া গেল। প্রভুকে যাঁহারা পূর্বে নিন্দা করিতেন, প্রভুর কঠোর তপস্যা দেখিয়া তাহাদের কিরূপ ভাব হইল, তাহা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর একটি গীতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"কান্দয়ে নিন্দুক সব করে হায় হায়। এইবার নদীয়া এলে ধরিব তাঁর পায়।।
না জানি মহিমা গুণ কহিয়াছি কত। এবার নাগালি পেলে হব অনুগত।।

* প্রভুর উড়িষ্যা ত্যাগ করিয়া বিদ্যানগর পর্য্যন্ত আগমন-লীলা প্রধানতঃ কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে গৃহীত হইল। পরবর্তী লীলা-সমূহের নিমিত্ত আমরা ভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থের আশ্রয় লইলাম।

দেশে দেশে যত জীব তরাইল শুনি। চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি।
না বুঝিয়া কহিয়াছি যত কুবচন। এইবার পাইলে তাঁর লইব শরণ।।
গৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পারিষদগণ। তারা সব শুনিয়াছি পতিত পাবন।।
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পাইল প্রকাশ। কান্দিতে কান্দিতে কহে বৃন্দাবন সদা।।"

প্রভু, বাচস্পতির বাড়ীতে আসিয়াছেন, একথা-মুখে-মুখে সমস্ত নবদ্বীপে প্রচার হইয়া পড়িল। শ্রীনবদ্বীপ-নগরীতে অন্ততঃ দশ বিশ লক্ষ লোকের বাস। ইহাদের সকলেরই প্রভুকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। আবার ইহার নিকটস্থ গ্রামসমূহও এক একটি বৃহৎ নগর বিশেষ। সে সকল স্থানের লোকও আসিতে প্রস্তুত হইল। প্রথমে ২। ১ জন করিয়া লোক বাচস্পতির গৃহে আসিতে লাগিল; কিন্তু শীঘ্রই বাড়ী লোকে পুরিয়া গেল। শেষে সমুদয় বিদ্যানগর লোকে পরিপূর্ণ হইল। নদীর অপর পারেও অনেক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে, সেগুলিও এক একটি নগর বিশেষ। ওপারেও অসংখ্য লোক পার হইতে না পারিয়া জমা হইল। ওপারে লক্ষ-লোক হরিধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, আবার এপারে লক্ষ-লোক হরিধ্বনি করিয়া তাহার উত্তর দিতেছে। এপারে ওপারে মুহুর্মুহুঃ এইরূপে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতেছে। প্রভু যে গোপনে থাকিবেন, সে কথা তখন আর কাহারও মনে নাই। এদিকে প্রভু ঘরের কোণে লুকাইয়া আছেন। বাচস্পতির গৌরবের সীমা নাই, সকলেই তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছে, "বাচস্পতি ঠাকুর! একবার প্রভুকে দেখাও।" বাচস্পতি প্রভুকে দেখাইবেন কি, তিনি যখন শুনিলেন, ওপারের সহস্র-সহস্র লোক নৌকা না পাইয়া অধৈর্য্য হইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া এপারে আসিতেছে, আর সেই নিমিত্ত লোক ডুবিয়া মরিতেছে। তখন তিনি গঙ্গাতীরে ছুটিয়া যাইয়া দেখিলেন যে, ওপারে অসংখ্য লোক জড় হইয়াছে, আরো অসংখ্য লোক অনবরত আসিতেছে। আরও দেখিলেন, গঙ্গা জুড়িয়া লোকে সাঁতার দিয়া এপারে আসিতেছে। কেহ কেহ সাঁতার দিতেছে, কেহ কেহ আবার কলসী কি কলাগাছের সাহায্য লইয়াছে। গঙ্গায় কেবল মনুষ্যের মাথা ভাসিতেছে।

লোক পার করিবার নিমিত্ত বহুতর নৌকা আপনা-আপনি জুটিয়া গিয়াছে। পারের কড়ি পাঁচ-গণ্ডা অর্থাৎ সিকি পয়সা ছিল; এক রাত্রে উহা এক তঙ্কা (টাকা) হইয়াছে। আবার বহু লোকে একসঙ্গে নৌকায় উঠিতে যাইয়া, কখনও নৌকা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে; আবার কখনও তাহা কূলে, কখনও বা মাঝখানে ডুবিয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রভুর কৃপায় লোক মরিতেছে না। যখন যে নৌকা ডুবিতেছে, তখন সেই নৌকার লোক হরিধ্বনি করিতেছে। আবার অন্যান্য লোকেরাও তাহাই দেখিয়া হরিধ্বনি করিতেছে। শত শত নৌকা ডুবিতেছে দেখিয়াও কেহ সাবধান হইতেছে না। ভরা নৌকা ডুবিয়া যাওয়াও এক আমোদ। সমুদয় গঙ্গায় মানুষের মাথা ভাসিতেছে, তবুও আরও লক্ষ-লোক পার হইবার চেষ্টা করিতেছে। তখন বাচস্পতি ভাবিলেন যে, প্রভুকে দেখিতে সমস্ত লোক তাঁহার বাটিতেই আসিতেছে, সুতরাং ইহাদিগের পারের সুবিধা করিয়া দেওয়া তাঁহার উচিত। তাই তিনি যত্ন করিয়া বহু লোক দ্বারা বহু নৌকা আনাইতে লাগিলেন। বাচস্পতি প্রভুকে গোপনে রাখিবার ভার লইয়াছিলেন; এখন সে আশা ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে প্রভু লোকের দর্শন-সুলভ হন তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাচস্পতির নিজের দেহধর্মের চেষ্টা নাই, আবার গ্রামে লোকদিগের অবস্থাও সেইরূপ। গ্রামের মধ্যে হরিধ্বনি হইতেছে, নৃত্যও হইতেছে।

"পথ নাহি পাই কেহ লোকের গমনে। বন জঙ্গল ভাঙ্গি যায় প্রভুর দর্শনে।।
মনুষ্য হইল পরিপূর্ণ সর্বগ্রাম। নগর প্রান্তরেও নাহিক কিছু স্থান।।
সহস্র লোক এক বৃক্ষের উপরে। গৃহের উপরে বা কত লোকে চড়ে।।"

প্রভু ঘরের কোণে লুকাইয়া আছেন। বাহিরের লোকে "দর্শন দাও" বলিয়া হুঙ্কার

করিতেছে। লোকে জানিতেছে যে, প্রভু সম্মুখের ঘরে লুকাইয়া আছেন, তাহাদের আর্তনাদ তিনি শুনিতেছেন, আর তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম দয়াময়। ভক্তগণ প্রভুকে ডাকিতে লাগিলেন। সুতরাং প্রভুর প্রতিজ্ঞা-শক্তি হ্রাস হইল, তিনি লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন। কথা এই, শ্রীভগবান্ লুকাইয়া থাকেন। তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ও দয়ার্দ্র জানিয়া যদি প্রাণের সহিত ডাকা যায়, তবে তিনি লুকাইয়া থাকিতে পারেন না,—তোমাকে দর্শন দিতে বাধ্য।

যখন প্রভু দেখিলেন, বিদ্যানগর উজাড় হইবার উপক্রম, আর বাচস্পতির গৃহ, দ্বার, বাগান কিছুই থাকে না, তখন স্থির করিয়া শ্রীনবদ্বীপের ওপারে ফুলিয়ায় মাধবদাসের গৃহে গোপনে স্বগণে উপস্থিত হইলেন। এই যে প্রভু গেলেন, ইহা বাচস্পতি জানিতেই পারিলেন না। তিনি নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহাকে লুকাইয়া প্রভুর চলিয়া আসা কঠিন হইল না। বাচস্পতি, প্রভু গিয়াছেন এই দুঃখের জন্য ও লোকের ভয়ে আপনি তখন গৃহের মধ্যে লুকাইয়া থাকিলেন; কিন্তু তাহাতে অধিকক্ষণ পারিলেন না। "দর্শন দাও" বলিয়া লোকের হুঙ্কার-শব্দ তখন শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। বাচস্পতি অগত্যা বাহিরে আসিলেন এবং কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "আপনারা শান্ত হউন। প্রভু আমাকে না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।" এ কথা লোকে বিশ্বাস করিল না। তাহারা বলিল, "প্রভু কিছু পূর্বে এখানে দর্শন দিয়াছিলেন, অতএব এখানেই আছেন।" বাচস্পতি বলিলেন, "প্রভু দর্শন দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার পরেই চলিয়া গিয়াছেন।" লোকে ভাবিল, বাচস্পতি ফাঁকি দিতেছেন। তখন ভাবিল প্রভু হরিধ্বনিতে তুষ্ট, হরিধ্বনি করিলে তিনি নিশ্চয় বাহিরে আসিবেন। তাই লক্ষাধিক লোক 'হরি-হরিবোল', 'হরি-হরিবোল' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বাচস্পতি যদিও বারংবার বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন যে, প্রভু তাঁহার বাড়ীতে নাই, লোকে তবু উহা প্রত্যয় করিল না। তাহারা ভাবিল, বাচস্পতি প্রভুকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তাই বাচস্পতিকে সকলে গালি পাড়িতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল, "বাচস্পতি ঠাকুর! প্রভুকে ঘরে পাইয়া তুমি কৃতার্থ হইয়াছ সত্য, কিন্তু আমরা যদি ভবসাগর পার হইতে পারি, তোমার তাহাতে ক্ষতি কি?" যথা ঃ

"আমরা তরিলে বা উহার কোন দুঃখ। আপনি মাত্র তরি এই কোন সুখ।।
কেহ বলে সুজনের এই ধর্ম হয়। সবারে উদ্ধার করে হইয়া সদয়।।"

বাচস্পতি মহাবিপদে পড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে তখন প্রভুকে ডাকিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "প্রভু? অদ্যকার বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার কর" ইহা বলিতে-বলিতে, একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার কানে কানে বলিল যে, প্রভু ফুলিয়ায় মাধবদাসের বাড়ী গিয়াছেন। তখন বাচস্পতি আনন্দিত হইয়া বাহিরে আসিয়া সকল লোককে বলিলেন, "প্রভু ফুলিয়ায় গিয়াছেন, চল তোমাদের আমি সেখানে লইয়া যাই।" এই কথা শুনিয়া, সকলে তাঁহার কথা প্রত্যয় করিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। সেখানে আসিয়া দেখিল ইহার মধ্যেই সেখানে লোকারণ্য হইয়াছে। এমন কি বাচস্পতির সঙ্গে যাহারা আসিতেছে তাহাদের যাইবার পথ নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবত-কার বলিতেছেন,—প্রভুর ফুলিয়ার জীবের আকর্ষণ এত প্রকাণ্ড ব্যাপার যে, বোধ হইতে লাগিল পৃথিবীর সমস্ত লোক যেন ফুলিয়ায় উপস্থিত হইয়াছে। আবার অনেকে অনুভব করিতে লাগিলেন যে, পৃথিবীতে কখনই এত লোক নাই, কাজেই তেত্রিশ কোটি দেবতা মনুষ্য-আকার ধারণ করিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন যে,—প্রভু যে স্বয়ং শ্রীভগবান্ তাহার অন্য প্রমাণের প্রয়োজন করে না, এই লোকসংখ্যা দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। বিশেষতঃ ইচ্ছামত এত লোক একত্র করিতে কি মনুষ্যে পারে? কে ইহাদের সংবাদ দিল? আর কেনই বা এত লোকে সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক, বিষয়-কর্ম, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল? বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন—যিনি এইরূপে সর্বচিত্ত আকর্ষণ করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

ইহার কিছুকাল পরে, প্রভু যখন লক্ষাধিক লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গৌড়ের এপারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন বাদশাহ্ ওপারে লোকের কলরব শুনিয়া তথ্য জানিবার নিমিত্ত অট্টালিকায় উঠিয়া সেখান হইতে এই লোকসমুদ্র দেখিয়া ও তাহাদের হরিধ্বনি ও আনন্দ-সূচক কলরব শুনিয়া ভাবিলেন, কেহ বুঝি তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। তাই ভয় পাইয়া তাঁহার মন্ত্রী খান কেশবলাল বসুকে ডাকাইয়া ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "একজন ভিক্ষুক-সন্ন্যাসী বইত নয়।" বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লক্ষ-কোটি লোক তাহার সঙ্গে কেন?" কেশব বলিলেন, "ভবসাগর পার হইবার জন্য।" তখন বাদশাহ্ বলিলেন, "এই সন্ন্যাসী আমা অপেক্ষা শক্তিধর সন্দেহ নাই। এতলোক সংগ্রাম করার শক্তি আমার নাই; আর যদি কেহ এইরূপ সংগ্রহ করিতে পারে, তবে সে নিজের স্বার্থের জন্য তাঁহার সেবা করিবে। যিনি বিনা বেতনে লক্ষাধিক লোকের উপর এরূপ আধিপত্য করিতে পারেন, তিনি সামান্য জীব নহেন, তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান।" অতএব বাদশাহও বৃন্দাবনদাসের মীমাংসার অনুমোদন করিলেন।

এই যে লক্ষ-কোটি লোক আসিতেছে, ইহার প্রায় কেহ ফিরিয়া যাইতেছে না। ইহারা কি করিতেছে অগ্রে তাহা শ্রবণ করুণ। তাহার পরে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও বাদশাহ যে তত্ত্বকথা বলিলেন, তাহার বিচার করিব। এই সমস্ত কাণ্ড বৃন্দাবনদাস স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি শ্রীবাসের ভাইঝির পুত্র ও শ্রীনদীয়ায় তাঁহার বাড়ী। সুতরাং এই সমুদয় এক প্রকার তাঁহার স্বচক্ষে দেখা বলা যাইতে পারে। কারণ শত-শত সাধু লোক যাহারা এই সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়া তিনি ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। যথা ঃ

"বাচস্পতি গ্রামেতে যত লোক ছিল। তার কোটি-কোটি গুণেতে সকল বাড়িল।।
ফুলিয়ার আকর্ষণ না যায় বর্ণন। কেবল বর্ণিতে পারে সহস্রবদন।।
লক্ষ-লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে। সবে পার হয়েন পরম কুতূহলে।।
খেয়ারির কত বা হইল উপার্জন। কত হাটবাজার বসায় কত জন।।
সহস্র সহস্র কীর্তনীয়া সম্প্রদায়। স্থানে স্থানে সবেই পরমানন্দে গায়।।"

মাধবদাস প্রভুকে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছেন; কিন্তু এই পরম ধন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যে বিপদ আছে তাহা পূর্বে জানিতে পারেন নাই। বন্যা আসিতেছে শুনিয়া প্রথমে লোকে অগ্রাহ্য করে। ভাবে, ধান্য-ক্ষেত্রে এক আঙ্গুল জল আসিয়াছে বই তো নয়, তাহাতে ভয় কি? অর্ধদণ্ডের মধ্যে দেখে যে হাঁটু-পরিমাণ জল হইল। শেষে, ধান্য-রক্ষা ত পরের কথা, নিজের বাড়ী ও প্রাণ রক্ষাও কঠিন হইয়া পড়ে। জনকয়েক সঙ্গী লইয়া প্রভু আসিলেন। মাধবদাস কৃতকৃতার্থ হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং ভাবিলেন, প্রভু আসিয়াছেন এ সংবাদ তাহার বন্ধু-বান্ধবের নিকট পাঠাইতে হইবে। কিন্তু এক-দণ্ডের মধ্যে সহস্র-লোক, দুই দণ্ডের মধ্যে লক্ষ-লোক হইল! যখন সন্ধ্যা হইল, তখন মাধবদাস প্রভুর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত মহা-ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কারণ যে ঘরে প্রভুর বাস, সে ঘর আর রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। পশ্চাৎ হইতে লোকসঙ্ঘ অগ্রবর্তী হইবার জন্য এরূপ চেষ্টা করিতেছে যে, বাসগৃহের নিকট যাঁহারা আছেন, তাঁহারা গৃহের উপর যাইয়া পড়িতেছেন। প্রভু যে গৃহে রহিয়াছেন, উহা রক্ষা করিতে পারেন না দেখিয়া মাধবদাস সন্ধ্যার সময় সহস্র লোক লইয়া বাঁশ কাটাইয়া প্রভুর রক্ষার নিমিত্ত অতি দৃঢ় করিয়া দুর্গ নির্মাণ করিলেন। প্রাতে দেখা গেল দুর্গ চুরমার হইয়া গিয়াছে। যথা ঃ

"সহস্র সহস্র নৌকা শুনিয়া আইল। তথাপি মনুষ্য পার করিতে নারিল।।
কেহ বলে জন প্রতি কাহনেক দিব। মোরে পার করি দেহ প্রভুকে দেখিব।।
বড়-বড় ধনী-লোক যত ছিল তায়। জন প্রতি তঙ্কা দিয়া পার হইয়া যায়।।

কেহ কলাগাছ বান্ধি গঙ্গা পার হয়। কেহ ঘট ধরি যায়, না করয়ে ভয়।।
আর খেলার সঙ্গী পড়ুয়া সকল। দেখিতে আইলা সবে আনন্দে বিহ্বল।।
ন্যায়শাস্ত্র-অধ্যাপক নবদ্বীপের যত। লোক-দ্বারে শুনি ছিলা চৈতন্য-মহত্ত্ব।।
বাসুদেব সার্বভৌম ন্যায়-টীকাকার। তার মত লঞা তারা করে ব্যবহার।।
হেন সার্বভৌম প্রভু বৈষ্ণব করিলা। ষড় ভুজ ঈশ্বর-মূর্তি তারে দেখাইলা।।
পূর্বে দিগ্বিজয়ী-গর্ব খণ্ডি নদীয়ায়। নবদ্বীপ-মর্য্যাদা রাখিল গৌররায়।।
হেন প্রভু আইলেন ফুলিয়া নগরে। সব অধ্যাপক চলে প্রভু দেখিবারে।।
ফুলিয়া-নগরে সংঘটের অন্ত নাই। বাল বৃদ্ধ নর নারী হৈলা এক ঠাঁই।।
নিশায় মাধবদাস বহু লোক লঞা। বড় বড় বাঁশ কাটি দুর্গ বান্ধে যাঞা।।
প্রাতঃকালে বাঁশ-গড় সব চূর্ণ হয়। লোক-ঘটা নিবারিতে কারো শক্তি নয়।।"

যাহারা আসিতেছে তাহারা আর যাইতেছে না; তাহাদের আহার নিদ্রা নাই, তাহারা নৃত্যগীত করিতেছে; আবার কখনও কান্দিতেছে, কখনও হাসিতেছে। তাহাদের নৃত্য দেখিলে বোধহয় যে, সকলে পরমানন্দে উন্মাদ হইয়াছে। এরূপ শত-কোটি জীবকে, একটি বস্তুর এরূপ ভাবে আশ্রয় লইতে কোন কালে শূনা যায় নাই। মনে ভাবুন, এই যে সমুদয় লোক আসিতেছে; ইহাদের মধ্যে সহস্র সহস্র মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আছেন। কোন-কোনও সাধুর পশ্চাৎ কখন-কখনও বহু-সংখ্যক লোক দেখা যায় বটে, কিন্তু সে স্বার্থের নিমিত্ত। কেহ ঔষধ লইতে, কেহ পুত্র কামনা করিতে, কেহ বা লৌহকে সোনা করিতে শিখিবার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ বেড়াইতেছে।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে এই যে শত-কোটি লোক ফিরিতেছে, ইহা কি নিমিত্ত? ইহাতে স্বার্থ সাধনের লেশমাত্র নাই। শ্রীভগবদ্ভক্তি জীবমাত্রের হৃদয়ে আছে—কখন জাগ্রত ভাবে, কখন সুষুপ্ত ভাবে থাকে। যখন শ্রীভগবদ্ভক্তি আছে, তখন শ্রীভগবানও আছেন। কারণ স্বভাব কখন নিষ্ফল কিছু করেন না। স্বভাব যখন ভগবদ্ভক্তিরূপ ভাব দিয়াছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তাহার তৃপ্তির বস্তুও দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আগমনে সেই ভগবদ্ভক্তিটুকু জাগ্রত হইয়াছে। যেমন লোকের পিপাসা হইলে, যেখানে জল পায় সেখানে দৌড়ায়; সেইরূপ লোকের হৃদয়ে ভক্তিরূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ায়, উহা নির্বাপিত করিবার নিমিত্ত প্রভুর নিকটে দৌড়িয়া আসিতেছে। হৃদয়ে এই ভক্তিরূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় কুজ্ঝটিকারূপে অজ্ঞানতা ও নাস্তিকতা নষ্ট হইয়া জ্ঞানরূপ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। কেহ বলেন জ্ঞান হইতে ভক্তি ও ভক্তি হইতে জ্ঞান। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এখানে অন্ততঃ ভক্তি হইতে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের আগমনে ভক্তির উদয় হইয়াছে। তাহার পরে মনে গুটি কয়েক অতি জাজ্বল্যমান সিদ্ধান্ত আসিয়াছে। তাহা এই যে, এ জীবন পদ্মপত্রের উপর জলবিন্দুর ন্যায়, এই আছে, এই নাই। আমি বৃথা কতকগুলি সামান্য বস্তুর লোভে মুগ্ধ হইয়া পরম-ধন ভুলিয়া আছি। শ্রীভগবানের শ্রীচরণ আশ্রয় করা জীবের পরম-ধর্ম। তাহা না করিয়া আমি কি করিতেছি? হে শ্রীভগবান্; এ অধম তোমাকে তো ভুলিয়া গিয়াছে, তুমি তাই বলিয়া কি আমাকে ভুলিয়া যাইবে? ছি! আমি এ কি করিতেছি! নিজের দোষ তোমার ঘাড়ে দিতেছি! সমুদয় দোষ না আমার? তোমা হইতে উৎপত্তি তোমার কাছে যাইব; কিন্তু এখন আমি তোমাকে ভুলিয়া, নানা অফল বিষয়ে মত্ত হইয়া, নানাদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

এইরূপ মনের ভাব হওয়ায়, ভক্তি-মুগ্ধ ব্যক্তি ভাবিতেছেন যে, তাঁহার ন্যায় নির্বোধ ও অপরাধী জীব জগতে আর নাই। তিনি আপনাকে আপনি নষ্ট করিয়াছেন—আর করিবেন না। তাঁহার দিন প্রায় ফুরাইয়াছে, আর সময় মাত্র নাই। তাই সেই লোক-কলেবরের মাঝে,

হয় চীৎকার করিয়া, না হয় মনে-মনে বলিতেছেন, "হে প্রভু! আমি অপরাধী, আমার দিন ফুরাইয়াছে। তুমি কৃপাময়, দীনজনের বন্ধু, এখন আমাকে কৃপা কর।" মনে ভাবুন যে, একজন অকুল-পাথারে পড়িয়া একবার ডুবিতেছে, একবার আসিতেছে; চারিদিক চাহিয়া দেখে কূলকিনারা নাই, আর তাহার সাঁতার দিবার শক্তিও নাই। তখন সেই ব্যক্তি ঘোর বিপদে পড়িয়া সেই ভব-কাণ্ডারীকে উৰ্দ্ধমুখ হইয়া ডাকিয়া বলিতেছে, "হে দয়াল-কাণ্ডারী! আমি ডুবিয়া মরিলাম, আমাকে চরণতরী দিয়া আশ্রয় দাও।" আবার বলিতেছে, "হে দয়াল-কাণ্ডারী! নৌকা পাইলেও আমার উঠিবার শক্তি নাই, তুমি আমার চুলের মুঠা ধরিয়া তোমার নৌকায় উঠাইয়া প্রাণ-দান কর।" এইরূপে ঘোর বিপদে পড়িয়া ডাকিতে-ডাকিতে যেন শুনিতে পাইল যে, শ্রীভগবান্ অভয় দিয়া বলিতেছেন, "ভয় নাই, এই যে আমি আসিতেছি।" তখন আশার সঞ্চার হইল, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইল।

নিরাশ হইয়া লোকে আর্তনাদ করিতেছে বটে, কিন্তু এ নিরাশ ভাব বহুক্ষণ থাকিতেছে না। দৈন্য ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হইলেই, তাহার পরে আনন্দ আপনা-আপনি উদয় হইতেছে। তখন আপনার দুর্মতির কথা ভুলিয়া শ্রীভগবানের কৃপার কথা ভাবিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে সকলের শ্রীভগবানের করুণার কথা মনে হইতেছে। শ্রীভগবান আমাদের দুর্মতি দেখিয়া, দুঃখিত হইয়া, তাঁহার বংশী ও পীতাম্বর দূরে ফেলিয়া ডোর-কৌপীন পরিয়া আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন। শ্রীভগবান্ এরূপ দীন-অবস্থায় কেন আসিতেছেন? তাহার কারণ এই যে, এবার তাঁহার সুখের অবতার নয়, দুঃখের অবতার! এবার তাঁহার চূড়া ও বংশী শোভা পাইবে কেন? তাই কৌপীন পরিয়াছেন, তাই করোয়া লইয়াছেন, তাই বংশী বাদন ছাড়িয়া হরিধ্বনি অবলম্বন করিয়াছেন। তাই হাস্য-কৌতুক ও ক্রীড়া ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র রোদন সম্বল করিয়াছেন। এই অবস্থায় সেই তিনি আসিয়া অভয় দিতেছেন। বলিতেছেন কিনা,—"ভয় কি? এই যে আমি? যম আমাদের কি করিবে? যম তো আমারি ভৃত্য? তোমরা অপরাধ করিয়াছ? তাহাতে ব্যস্ত কি? আমি তাহার সহজ উপায় বলিয়া দিতেছি। মুখে কৃষ্ণ বল, সমুদয় অপরাধ নষ্ট হইয়া যাইবে। দেখ, তোমরা দুর্বল, সাধন-ভজন করিতে পারিবে না। তাই আমি তোমাদের সুবিধার নিমিত্ত 'হরিনাম' লইয়া আসিয়াছি। ইহা মুখে বল, আর জগতে বিলাও, সমস্ত অপরাধ মোচন হইয়া অন্তিমে আমাকে পাইবে।"

যাঁহারা শ্রীভগবানের দয়ার-সাগরে ডুবিয়াছেন, তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, স্বয়ং সেই পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন তাহাদিগকে গোলকধামে লইবার নিমিত্ত আসিয়া তাহাদের সম্মুখে সন্ন্যাসীর রূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ইহাতে তাহাদের ভয় গিয়াছে, আশা আসিয়াছে; দুঃখ গিয়াছে, আনন্দ আসিয়াছে। তাই লোকের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছে, না,—যে ভাবে প্রভু স্বয়ং রথের সময় জগন্নাথের অগ্রে দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া তাল-ঠুকিয়া ছিলেন। লোকে মনে ভাবিতেছে, "বড়ই আনন্দ।" সহস্র-সহস্র সম্প্রদায় হইয়াছে, আর সেইরূপে লক্ষ লক্ষ লোকের দুই বাহু তুলিয়া, "আর ভয় নাই", "পেয়েছি",—এই ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছে।

পাঠক মহাশয়, আপনি স্থির হইয়া চিন্তা করিলে স্পষ্ট বুঝিবেন যে, এই গৌরলীলার কাণ্ডটি দৈবাৎ হয় নাই, ইহা শ্রীভগবান স্বয়ং পাতাইয়াছেন। এদেশে ব্রাহ্মণ তিন শ্রেণীভুক্ত,—যথা বৈদিক, বারেন্দ্র ও রাঢ়ী; প্রভু স্বয়ং বৈদিক, নিতাই রাঢ়ী, অদ্বৈত বারেন্দ্র। হে পাঠক! এইরূপ আগাগোড়া দেখিবেন যে, এই লীলাটি সেই সর্বশক্তিমান, আপনি পাতাইয়া ইহা চালাইয়াছেন। তখন বুঝিবেন যে, এই খেলার দ্বারা শ্রীভগবান্ জীবকে এই শিক্ষা দিয়াছেন, (১) শ্রীভগবান্ আছেন, (২) পরকালও আছে; আর (৩) শ্রীভগবানের প্রিয় জীব ও জীবের

প্রিয় শ্রীভগবান্।

এখন শ্রীভগবান্, অর্থাৎ একজন সর্বশক্তিমান স্রষ্টা যে আছেন, ইহা সৃষ্টি-প্রক্রিয়া দ্বারা অনুভব করা যায়। কিন্তু তিনি কিরূপ প্রকৃতির বস্তু, ইহা গোপন রাখিয়া শ্রীরসিকশেখর জীবকে বড় ধান্ধায় ফেলিয়াছেন। তবে যিনি মাতৃহৃদয়ে দুগ্ধ দিয়াছেন, তিনি যে দয়াময় তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু এইরূপে বিচারে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, তিনি নিষ্ঠুর, নতুবা সর্পের বিষ কেন দিলেন? তিনি মনুষ্যকে আর এক ধান্ধায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন, অর্থাৎ তাহারা মরিলে কি তাহাদের অস্তিত্ব থাকিবে? যদি থাকে, তবে কিরূপে? আর এক ধান্ধা এই যে, জীবের সহিত শ্রীভগবানের কি সম্বন্ধ? এইরূপ ধান্ধায় পড়িয়া জীব নিরাশ-সাগরে ভাসিতেছিল। মহম্মদকে মুসলমানগণ "রসুল" বলেন, অর্থাৎ তিনি শ্রীভগবানের নিকট হইতে জীবের নিমিত্ত সংবাদ আনিয়াছেন। সেইরূপ যীশুও "সুসমাচার" আনিয়াছেন, ইহা খৃষ্টিয়ানগণ বলেন। ঠিক সেইরূপ ফুলিয়ার অনন্ত-কোটি লোক,—শ্রীগৌরাঙ্গ কেবল যে সুসমাচার আনিয়াছেন তাহা নয়, তাহাদের নিমিত্ত আরো কিছু আনিয়াছেন বলিয়া—আনন্দে নৃত্য করিতেছেন।

মহম্মদ মুসলমানগণের নিমিত্ত সংবাদ আনিলেন যে, শ্রীভগবান্ আছেন, জীবগণ মরিয়াও বাঁচিবে এবং যাহারা শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন করে, তাহারা সুখে ও যাহারা পালন না করে তাহারা দুঃখে থাকিবে। মহম্মদ যে সংবাদ আনিয়াছেন, ইহা কাল্পনিক নহে। ইহা বিশ্বাস করিয়া যে সমস্ত জীব নিরাশ-সাগরে ভাসিতেছিল তাহারা কূল পাইল, পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইল।

জীবমাত্র অকুল-পাথারে ভাসিতেছে। কিন্তু শ্রীভগবানের এরূপ মায়া যে, তাহারা তাহাদের নিজেদের দুঃখ অনুভব করিতে পারে না। যাহার শ্বাস-রোগ আছে, তাহার ক্রমে-ক্রমে বোধ হইবে যে, তাহার পীড়াজনিত বিশেষ কষ্ট নাই। কিন্তু তাহার শ্বাসরোগ আরাম হইলে তখন সে বুঝিতে পারে যে, সে এ যাবৎ কিরূপে দুঃখে কাল কাটাইতেছিল। সেইজন্য মনুষ্য হাসিয়া ফেলিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহার কোন দুঃখ নাই। তাহার যে, যে-কোন মুহূর্তে সর্বনাশ হইতে পারে তাহা তাহার বোধও নাই। যে-কোন জীবের যে-কোন মুহূর্তে দারিদ্র্য, অপমান, পীড়া ও শোক হইতে পারে। কিন্তু লোক মায়ায় মুগ্ধ হইয়া,—যেন তাহার কোন দুঃখ কি চিন্তার বিষয় নাই এইরূপে—জগতে বিচরণ করিতেছে। তবু তাহার অন্তরের অতি গুহ্য-স্থানে, হা-হুতাশরূপে দুঃখের লহরী সর্বদা,—অনেক সময় তাহার অজ্ঞাতসারে,—চলিতেছে। এই অবস্থায় যদি তাহার বিশ্বাস হয় যে, সে মরিবে না, মরিলেও বাঁচিবে এবং তাহার অতি শক্তিসম্পন্ন একজন পরম-সুহৃদ্ আছেন যিনি তাহার সমুদয় দুঃখ মোচন ও সমুদয় আশা পূরণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত,—তখন তাহার পূর্বকার উপায়হীন অবস্থা সূর্য্যের ন্যায় হৃদয়ে প্রকাশ পায়। ইহাতে, যে ব্যক্তি অকূলে ভাসিতেছিল, এখন সে কূল পাইয়াছে,—এই আনন্দে উন্মত্ত হয়।

সেইরূপ যীশুখৃষ্ট "সুসমাচার" আনিলে, তাঁহার ভক্তগণ ঐরূপ আহ্লাদে মাতোয়ারা হইলেন। এই সমস্ত "রসুল" অর্থাৎ শ্রীভগবানের দূতের নিকট সুসমাচার পাইয়া, উহা ঘোষণা করিবার নিমিত্ত জয়-পতাকা উঠাইয়া, দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহারা ভক্তিতে গদগদ্ বলিয়া, অন্য জীবগণকে মুগ্ধ করিতে শক্তি পাইলেন। তাঁহাদের আনন্দ ও বিশ্বাস দেখিয়া, যে সমস্ত জীব অকূলে ভাসিতেছিলেন, তাঁহারাও পালে-পালে আসিয়া তাঁহাদের আশ্রয় লইতে লাগিলেন।

মনুষ্য হৃদয়ে ভগবৎ-কৃপার সহিত গুটিকয়েক শত্রু প্রবেশ করে,—যথা, দম্ভ ও অহঙ্কার। শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গিনী। তিনিও পরম-পুরুষের স্কন্ধে চড়িতে গিয়াছিলেন। অতএব

সামান্য জীবের কথা কি? মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানেরা কৃপা পাইয়া ভাবিলেন যে, তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রিয়-পুত্র, নতুবা তিনি তাঁহাদের নিকট সুসমাচার কেন পাঠাইবেন? তাঁহারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ পাইয়াছেন, অতএব তাঁহাদের কথা যাহারা না শুনে তাহারা শ্রীভগবানের বিদ্রোহী। সুতরাং তাহাদিগকে বধ করিলে পাপ ত নাই-ই বরং শ্রীভগবান্‌কে তুষ্ট করা হইবে। তাঁহারা ইহা ভাবিলেন না যে, যদি শ্রীভগবান্ কোন রসুল পাঠান, তবে তিনি সকল স্থানেই পাঠাইবেন; কারণ সকলেই তাঁহার সন্তান, আর তিনি অতি-মহাশয় লোক।

যে আনন্দে মুসলমানগণ দিগ-বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সমস্ত জগৎ ওলট পালট করেন, ফুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণেরও সেই জাতীয় আনন্দ উপস্থিত হইয়াছে। তবে এই আনন্দে মুসলমানগণ তরবারি ধরিলেন, আর বৈষ্ণবগণ জীবমাত্রকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এই ফুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণ "রসুল" পাইয়াছেন যে, ইনিও গোলক হইতে সুসমাচার আনিয়াছেন। সে সুসমাচার এই যে,—শ্রীভগবান আছেন তোমরাও চিরদিন থাকিবে, আর তিনি মনুষ্যের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত নরলীলা ও নরের ন্যায় বিচার ব্যবহার করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে সুসমাচার আনিলেন, তাহাও লোকে বিশ্বাস করিল। অধিকন্তু তিনি আসিয়া শ্রীভগবানের প্রকৃতি বড় মধুর বলিয়া পরিচয় দিলেন। মহম্মদ ঈশ্বরের যেরূপ বর্ণন করিলেন, তাহাতে লোকে ইহাই বুঝিলেন যে, শ্রীভগবান্ ভয়ঙ্কর হইয়া সিংহাসনে বসিয়া, জীবগণের পাপ-পুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু গৌরাঙ্গ যেরূপ শ্রীভগবানের পরিচয় দিলেন, তাহাতে বুঝা গেল যে, শ্রীভগবান অতি-সুন্দর নবীন-পুরুষ, বসিক চূড়ামণি, বংশীধারী ও নৃত্যকারী। শ্রীগৌরাঙ্গ জীবগণকে অধিকন্তু বুঝাইয়া দিলেন যে, শ্রীভগবান্ অতি প্রেমময়! যথা পদ—"জানি জানি তাঁর মন জানি, প্রেমে গড়া তনুখানি। আর, চিরদিন সে ভালবাসে কাঙ্গালিনী।" কাজেই মুসলমানগণ তরবারি ধরিলেন; আব বৈষ্ণবগণ জীবগণকে আলিঙ্গন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

আবার দেখুন, যীশু সুসমাচার আনিলেন যে, শ্রীভগবান আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে জানা গেল যে, তিনি এবার কাহাকেও প্রেরণ করেন নাই, স্বয়ং আসিয়াছেন। সুতবাং ফুলিয়াবাসিগণের আনন্দের আব সীমা নাই! তাঁহারা অকুলে ভাসিতেছিলেন, এখন কূল পাইলেন। লোকের আনন্দের কারণ একটি উদাহরণ দ্বারা বলিব। একজন নিগড়ে আবদ্ধ আছেন, তাঁহার আশার লেশ মাত্র নাই। এইরূপে তিনি রাত্রি আসিলে কখন দিন হইবে ভাবেন, আর দিন হইলে কখন রাত্রি আসিবে ভাবেন। একদিন তিনি হঠাৎ শুনিলেন যে, তাঁহার বন্ধন কিছু নয়। তাঁহার পিতা রাজরাজেশ্বর। তিনি বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য পুত্রকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন; তিনি যুবরাজ, পিতার সমস্ত ধনের অধিকারী। সেই যুবরাজের অবস্থা একবার অনুভব করুন; তাহা হইলে ফুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণের আনন্দের পরিমাণ কতক বুঝিতে পারিবেন। পাঠকগণের মধ্যে অনেকে হয়ত বুঝিবেন না যে, জীবগণ কেন অকূলে ভাসিতেছে। যাহার উপস্থিত কোন বলবৎ দুঃখ নাই, তিনি হয়ত ভাবিতে পারেন যে, "কই, আমি ত বেশ সুখে আছি।" হয়ত তিনি বড়-জ্ঞানী, মনে ভাবেন তিনি শান্ত, বেশ আছেন। কিন্তু তিনি যে বেশ আছেন, এই জ্ঞানই তাঁহার পতনের মূল। যেই তাঁহার জ্ঞান হইবে তিনি বেশ নাই, অমনি তাঁহার উন্নতি আরম্ভ হইবে।

তিনি বেশ নাই, তাহার প্রমাণ দিতেছি। আমি কেন দিব, তিনি নিজেই তাঁহার রোগ শোক ও অন্যান্য তাপের সময় জানিবেন যে, তিনি বেশ নাই। যে ব্যক্তির ঘোর বিয়োগ হইয়াছে, কি হঠাৎ দারিদ্র চাপিয়াছে, কি কারাগারের ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তিনি সেই সময় বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি বেশ নাই। তিনি যদি একটু ভাবিয়া দেখেন যে, তাঁহার

বিন্দুমাত্র শক্তি নাই। তিনি এখন বেশ আছেন, কিন্তু মুহূর্ত পরে হয়ত তাহার কিছুই না থাকিতে পারে; তখন তিনি বুঝিবেন যে, তিনি বেশ নাই, বরং দিবানিশি অকূল পাথারে ভাসিতেছেন।

"আমি বেশ আছি", "আমি শান্ত, অতএব অন্য অপেক্ষা অনেক উন্নতি করিয়াছি",—মনে এইরূপ গৌরব করিও না। ইহা তোমাব গৌরবের কথা নয়। যখন তুমি জানিবে যে, তুমি ত্রিতাপে জর্জরীভূত, আর সেই দুঃখ ভাবিয়া তোমার নয়নে জল আসিবে, তখনি জানিবে তোমার জ্ঞানের অঙ্কুর হইয়াছে। ফুলিয়াব উপস্থিত জীবগণ ভাবিতেছেন,—"সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। গোলকধামে ল'য়ে যেতে এসেছে পতিত-পাবন।"—কাজেই উন্মত্ত হইয়া এই অসংখ্য লোক নৃত্য করিতেছেন। এদিকে বাচস্পতি আসিয়া লোকের ভিড়ে আর প্রভুর নিকট যাইতে পারেন নাই। কিন্তু অন্তর্য্যামী প্রভু তাঁহার আগমন ও দুঃখ জানিয়া লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন। তিনি আসিয়া শ্লোকবন্ধে প্রভুকে স্তুতি করিলেন; যথা প্রথম শ্লোকেব বৃন্দাবন-দাসের ব্যাখ্যা—"সংসার-উদ্ধার লাগি যে চৈতন্যরূপে। তারিলেন যতেক পতিত ভবকূপে। সেই গৌরসুন্দর-কৃপা সমুদ্রের প্রায়।"

বাচস্পতি বলিলেন, "প্রভু, তুমি চিরদিন স্বেচ্ছাময়; ফুলিয়ায় আসিবে ইচ্ছা হইল আসিলে, কিন্তু তোমার দাস এই ব্রাহ্মণ যে মারা যায়। আমি তোমাকে লুকাইয়া রাখিয়াছি, এই ভাবিয়া লোকে আমার ঘর দ্বার ভাঙ্গিতেছে। আপনি একবার বাহির হউন।" প্রভু হাস্য করিয়া স্বীকার করিলেন। ফল কথা, প্রভু অবশ্য বাহির হইবেন, তবে কখন বাহির হওয়া কর্তব্য তাহা তিনিই ভাল জানেন। এই কথা হইতে-হইতে পণ্ডিত দেবানন্দ আসিলেন। ইঁহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইনি সর্বপ্রকারে বিশেষতঃ ভাগবতে, অদ্বিতীয় পণ্ডিত; অতি স্বচ্চরিত্র ও মহাজ্ঞানী। তবে ভক্তি মানিতেন না, সুতরাং প্রভুর আশ্রয় লয়েন নাই। ভাগ্যবশে বক্রেশ্বর তাঁহার আলয়ে কিছু দিন রহিযাছিলেন। বক্রেশ্বরের নৃত্য দেখিয়া দেবানন্দের ভক্তির উদয় হয়। এখন ফুলিয়ায় আসিয়া, পূর্বে শ্রীবাসের নিকট যে অপরাধ করেন তাহা মনে করিয়া ভয়ে-ভয়ে দূরে-দূরে আছেন। অন্তর্য্যামী প্রভু তাঁহাকেও নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে কি মধুর আলাপ হইল, তাহা মনে করিলে শরীর আনন্দে টলমল করিয়া উঠে।

প্রভু বলিলেন, "দেবানন্দ! তোমার সমুদয় অপরাধ ভঞ্জন হইল।" অমনি দেবানন্দ চরণে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু, আপনার বরে আমার সুখ হইল না। আপনি বড় দিউন যে, যে কেহ অপরাধী হইয়া এই ফুলিয়ায় আসিয়া আপনার নিকট অপরাধ-ভঞ্জনের প্রার্থনা করিবে, আপনি তাঁহারই অপরাধ ভঞ্জন করিবেন।" প্রভু বলিলেন, "তথাস্তু"। এই ফুলিয়ায় এইরূপে 'অপরাধ-ভঞ্জন' পাটের সৃষ্টি হইল। সেখানে সেই অবধি লোকে অপরাধ-ভঞ্জনের নিমিত্ত যাইয়া থাকেন। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত তাঁহারা চিরদিনই জীবের দুঃখে ব্যথিত।

বাহিরে কোটি কোটি লোক কলরব করিতেছে। সহস্র-সহস্র সম্প্রদায় গঠিত হইয়া নৃত্য-গীত করিতেছে। লক্ষ-লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিতেছে। যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি, তিনি সেইরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। চকিতের মধ্যে শত সহস্র দোকান বসিয়া গিয়াছে। দোকান হইতে নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করা হইতেছে,—কিছু প্রভুর জন্য, কিছু বিতরণের জন্য। কেহ মিষ্টান্ন কিনিয়া হরিধ্বনি করিয়া ছড়াইয়া দিতেছেন, আর লোকে হুড়াহুড়ি করিয়া উহা কুড়াইতেছে,—কেহ কাঙ্গালী খাওয়াইতেছেন; কেহ কম্বল বা বস্ত্র কিনিয়া বিতরণ করিতেছেন; কেহ আপন মনে নৃত্য করিতেছেন; কেহ ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন; কেহ প্রণাম কি কোলাকুলি করিয়া, কি পদধূলি লুটিয়া বেড়াইতেছেন; কেহ সর্বাঙ্গে ধূলা মাখিতেছেন। এইরূপে ফুলিয়ায় প্রভাসযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। এখানে গুরুজন রহস্য শিষ্য কুটুম্ব প্রতিবেশী

নিজজন ভক্ত প্রভৃতির সহিত প্রভু মিলিত হইলেন। প্রভু প্রায় জন্মাবধিই শ্রীনবদ্বীপে বিখ্যাত। তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি অন্যান্য মানুষের ন্যায় ছিল না। সুতরাং শিশুবেলায় তাঁহাকে যে দেখিত, তাহারই মনে হইত,—এটি নরশিশু না দেবশিশু? নিমাই যত বড় হইতে লাগিলেন, ততই লোকের নিকট পরিচিত ও সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কি শত্রু, কি মিত্র সকলেরই মনের ভাব এই যে,—এই বস্তুটি কেঁহ একজন হইবেন। এমন কি, একটি প্রবাদ ছিল যে, গৌড়ে ব্রাহ্মণ-রাজা হইবেন। ইহা উল্লেখ করিয়া অনেকে বলিতেন যে, সেই ব্রাহ্মণটি এই জগন্নাথের পুত্র। শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত যদি কাহারও কোন কথা হইত, তাহা লইয়া আলোচনা হইত, এবং সে কথাটি সে গোষ্ঠীতে রহিয়া যাইত। এইরূপ অনেকগুলি কথা অদ্যাপি রহিয়া গিয়াছে। কখন কখন এরূপ হইয়াছে যে কাহার সহিত গ্রন্থকারের কথা হইতেছে, হঠাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের কথা উঠিল। অমনি সেই ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, "এই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর আমাদের গোষ্ঠীর প্রতি বড় করুণা ছিল। কারণ ইনি আমাদের বাড়ীতে বসিয়া ছিলেন, কি গোষ্ঠীর কোন একজনকে এই কথা বলিয়াছিলেন।" নিমাই যখন পাঠ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার সমধ্যায়িগণ সকলেই বুঝিলেন যে, তাঁহার সহিত কাহারও কোন রকম পাল্লাপাল্লি চলিবে না। তখনকার সময় ছাত্রদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান দীধিতি-গ্রন্থকার রঘুনাথ। রঘুনাথের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর বাল্যকালের প্রীতি ও বচসা সম্বন্ধে আমি প্রভুর বাল্যলীলা বর্ণনকালে আভাস দিয়াছি। এই সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে একটি কথা চলিয়া আসিতেছে, এবং ইহা আমরা পণ্ডিত শ্রীল মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত শ্রীরঘুনাথের তর্ক চলিতেছে। সে কখন, না যখন প্রভু কিছুকাল ন্যায়পাঠ করিতেছিলেন। সামান্য লক্ষণা সম্বন্ধে রঘুনাথের মুখে অন্যায় তর্ক শুনিয়া প্রভু বিদ্রূপ করিয়া রঘুনাথকে এই শ্লোকটি বলিলেন,—

"বক্ষোজপানকৃৎ-কাল-সংশয়ো জাগ্রতি স্ফুটম্।
সামান্য লক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে।।"

বলা বাহুল্য যে, এই তর্কে রঘুনাথের অন্যায়। এইরূপে প্রভু তাঁহার জন্মাবধি নবদ্বীপবাসিগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। যদিচ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার দ্বেষ করিতেন, তবু তিনি যে, শ্রীনবদ্বীপের, কি ভারতবর্ষের, কি কলিকালের গৌরব স্বরূপ, ইহা সকলেই স্বীকার করিতেন। তাহার পর, প্রভু সন্ন্যাস লইয়া গমন করিলে তাঁহার প্রতি বিপক্ষদিগের আর দ্বেষ রহিল না। এমন কি, এরূপও ঘটনা হইয়াছিল যে, প্রভু সন্ন্যাসী হইলে তাঁহাকে যিনি যতখানি দ্বেষ করিতেন তিনি ততখানি কান্দিয়াছিলেন। কাজেই প্রভু যখন ফুলিয়ায় গমন করিলেন, তখন শ্রীনবদ্বীপে আর কেহই রহিলেন না, সকলেই প্রভু দর্শন করিতে আসিলেন। এখানে প্রভু সাত দিন থাকিয়া সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন এবং সাত দিন দিবানিশি প্রভুর সহিত এই কোটি-কোটি লোক কেবল নৃত্য করিয়া যাপন করিলেন। প্রভু এই সহস্র সহস্র সম্প্রদায়ে নৃত্য করিলেন এবং প্রত্যেকেই বোধ করিলেন যে প্রভু তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিলেন, তাহার প্রতি বিশেষ কৃপা দেখাইলেন। তখন শ্রীনবদ্বীপে পুরুষ মানুষ প্রায় শূন্য—সকলেই এপারে; আর ওপারে সারি দিয়া লক্ষ-লক্ষ স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছেন; তাঁহারা এপারের কোটি-কোটি লোকের নৃত্য দেখিতেছেন, আর কলরব শুনিতেছেন। সুতরাং মধ্যস্থানে একটি নদী থাকায় তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে না। এপারের লোকদিগের যেরূপ আনন্দ, ওপারের স্ত্রীলোকদিগেরও সেইরূপ আনন্দ। অবশ্য এই স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রভুর বড় ঘনিষ্ঠ দুইজন আছেন—শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া। সেখানে গঙ্গা যেরূপ কম পরিসর, তাহাতে ওপারের লোকে এপারের লোকের সমুদয় কাণ্ড

স্বচ্ছন্দে দেখিতে পাইতেছেন। এমন কি একটু ঠাউরিয়া দেখিলে এক পারেব লোক অপর পারের লোক চিনিতেও পারিতেছেন। আর অন্যের সঙ্গে প্রভুর একটু বিশেষত্ব ছিল। লক্ষ লোকের মাঝে দাঁড়াইলেও, সকলের মস্তকের অন্ততঃ এক-বিঘৎ উপরে প্রভুর মস্তক দেখা যাইত। জীবের দর্শন-সুলভের নিমিত্ত প্রভু এইরূপ দেহ-ধারণ করেন; প্রকৃতই তাঁহার শ্রীঅঙ্গ, মহাপুরুষের ন্যায় সাড়ে-চারি হস্ত দীর্ঘ ছিল। সুতবাং লক্ষ লোকের মাঝে প্রভু দাঁড়াইয়া থাকিলেও দূর হইতে তাঁহাকে বেশ দেখা যাইত। শ্রীশচী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াও ওপার হইতে প্রভুকে বেশ দেখিতে পাইতেছিলেন। শেষে প্রভু এই ফুলিয়ার তিনজনের নিকট জনমের মত বিদায় লইলেন।

দশম অধ্যায়

"আসিবে আমার গৌরাঙ্গ-সুন্দর নদীয়া-নগর মাঝ।
দূরেতে দেখিয়া সচকিত হএগা করব মঙ্গল-কাজ।।
জলঘট ভরি আম্র শাখা ধরি, রাখি সারি-সারি করি।
কদলী আনিয়া রোপণ করিয়া ফুলমালা তাহে ধরি।।
আওল শুনিয়া নদীয়া-নাগরী আওব দেখিবার তরে।
হরি হরি ধ্বনি জয়-জয় বাণী উঠিবে সকল ঘরে।।
শুনিয়া জননী, ধাইবে অমনি করিবে আপন কোরে।
নয়নের জলে, ধুই কলেবরে, তুরিতে লইবে ঘরে।।
যতেক ভকত, দেখি হরষিত, হইবে প্রেম-আনন্দ।
যদুনাথ যাএগা, পড়িবে লোটাএগা, লইবে চরণারবিন্দ।।"

প্রবাসে প্রিয় বহুদিন অদর্শনে আছেন। তিনি গৃহে আসিতেছেন জানিলে, প্রিয়ার যে আনন্দ তাহাকে ভাবোল্লাস বলে। এই ভাবোল্লাসে প্রিয়ার মনে যে সমুদয় ভাবের তরঙ্গ খেলিতে থাকে, তাহার বর্ণনা-মূলক শ্রীবিদ্যাপতির দুইটি পদ পাওয়া যায়। একটি পদের প্রথম চরণ—"আমার অঙ্গনে আওব যব রসিয়া। ধ্রু।" অর্থাৎ প্রিয়া আপনার সখীকে বলিতেছেন, "সখি! আমার প্রিয় যখন আমার আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইবেন, তখন আমি কি করিব বল দেখি?" সখী বলিলেন, "তুমি বল, আমি কি বলিব?" তখন প্রিয়া বলিতেছেন, শুনিবে কি করিব?—"অঙ্গনে আওব যব রসিয়া। পালটি চলব হাম ঈষৎ হাসিয়া।।"

অর্থাৎ "হে সখি, প্রিয় আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইলে, আমি মুখ ফিরাইয়া তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া যাইব।"

হে পাঠক মহাশয়, তুমি প্রবাসী হও, আর তোমার প্রণয়িনীকে বিরহিণীপ্রিয়া কর। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, উপরিউক্ত প্রিয়-প্রিয়ার প্রীতির খেলা কত মধুর। তবু ইহাতে একটু তিক্তরস থাকিবে, যেহেতু এখানে প্রিয় ও প্রিয়া উভয়েই মলিনবস্তু। এই যে মধু-হইতে-মধুর প্রীতির খেলাটি—ইহা এখন শ্রীভগবানে অর্পণ কর। শ্রীভগবান্ এমন সুন্দর এরূপ মধুর; তিনি তোমার এত প্রিয়, তাঁহার তুমি এত প্রিয়,—তোমার কি উচিত নহে যে, যত ভাল দ্রব্য সমুদয় তাঁহাকে অর্পণ কর? অতএব এই যে উপরি-উক্ত মধু হইতে মধুর প্রীতির খেলা রূপ রস—ইহা দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে পূজা কর। তাহা হইলে উহা পবিত্রীকৃত হইবে, উহার আস্বাদ অনন্তগুণে বাড়িবে, আর তুমিও সেই মধু হইতে মধুর রসের প্রসাদ পাইবে। এই হইতেছে শ্রীগৌরাঙ্গদাস-বৈষ্ণবের চরম ভজন। এই রসটি কিরূপে শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করা যায় বলিতেছি। কৃষ্ণ মথুরায়। শ্রীমতীর মনে হঠাৎ উদয় হইল যে, তিনি আসিতেছেন। তাই বলিতেছেন, "ললিতে! শুনিতেছি, বন্ধু শ্রীবৃন্দাবনে আসিতেছেন। বন্ধু

আসিলে আমি প্রথমে কি করিব শুনিবে?" যথা বিদ্যাপতির দ্বিতীয় পদ—

"যব হরি আওব গোকুলপুর। ঘরে-ঘরে বাজাওব জয় তর।।"

অর্থাৎ "ললিতে, বন্ধু শ্রীবৃন্দাবনে আসিলে আমি জয়-তুবি দ্বারা ঘরে ঘরে ঘোষণা করিয়া বেড়াইব যে, আমার বন্ধু শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। পূর্বলিখিত ভাবোল্লাস পদটি এখন সম্পূর্ণ দিতেছি। যথা—

"অঙ্গনে আওব যব রসিয়া। পালটি চলব হাম ঈষৎ হাসিয়া।।
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে। যাওব হাম যতন পঁহু করবে।।
রভস মাগব পিযা যবহি। মুখ বিহসি নহি বোল তবহি।।
কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া। করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া।।
সো পঁহু সুপুরুস্ব ভঁওরা। চিবুক ধরি অধব-মধু পিযব হামারা।।
তৈখনে হরব মঝু চেতনে। বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া-জীবনে।।"

বৈষ্ণবগণ এইরূপ গোপী অনুগত হইয়া রস দ্বারা শ্রীভগবানকে পূজন কি আস্বাদন করিয়া থাকেন। ইহাকে বলে ব্রজের নিগূঢ় রসাস্বাদন। যথা—

"বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সংকীর্তন। অন্তরঙ্গ সঙ্গে কব রস-আস্বাদন।।"

এখন শ্রীকৃষ্ণ বা কোথা? আর, শ্রীমতী রাধা বা কোথা? জীবের ভাগ্যক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের অনেক নিকটে। অতএব হে পাঠক মহাশয়! আসুন, এই যে ভাবোল্লাস-রস, ইহা দ্বারা আমরা শ্রীভগবান্ গৌরচন্দ্রকে সেবা করি। তিনি এখন নদীয়ায় আসিয়াছেন; শচীর দুলাল, বিষ্ণুপ্রিয়ার বল্লভ, শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়নগোচর হইয়াছেন। শ্রীগৌরচন্দ্রকে অবহেলা করিও না। যদি তুমি তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ বলিতে না পাব, তবু তোমাকে বলিতে হইবে যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনের সংবাদ আনিয়া জীবগণকে আশ্বাস আর তাহাদিগকে গোলকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সন্ন্যাসরূপ কঠোর-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। দেখ, মহম্মদের নিমিত্ত মুসলমানগণ, যীশুর নিমিত্ত খৃষ্টানগণ কি না করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে তাঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশে ম্লান নহেন, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রজের নিগূঢ়-রস পূর্বে জীবে "অনর্পিত" ছিল। অতএব হে পাঠক মহাশয়! যদি অপানি শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারেন, তবু তিনি অবতারের শিরোমণি, এ কথা বলিতেই হইবে। সেই আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ এখন আমাদের নদীয়ায় আসিয়াছেন, আসুন আমরা সকলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও সেবা করি। শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগররূপে স্থাপিত করিয়া মহাজন-কৃত ভাবোল্লাসের কয়েকটি পদ পাইয়াছি, কিন্তু একটিও পূর্ণ কি ভাল অবস্থায় পাইলাম না। অতএব মহাজনগণের দ্রব্য লইয়া আমি যোজনা করিয়া এই নিম্নের ভাবোল্লাসের মালাটি প্রস্তুত করিলাম। বিজয়া-দশমী-দিবসে প্রভু দেশাভিমুখে শুভাগমন করিবেন তাহা শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া জানেন; বিষ্ণুপ্রিয়া দিন গণিতেছেন। তাঁহার বল্লভ যে সন্ন্যাসী তাহা মধ্যে-মধ্যে অবশ্য তিনি ভুলিয়া যান। তাঁহার মনের স্বাভাবিক ভাব এই যে, পতি প্রবাসে গিয়াছিলেন, এখন গৃহে আসিতেছেন; মনের সমস্ত দুঃখ উঘাড়িয়া সেই ভাবের কথা তাঁহার প্রিয়-সখী কাঞ্চনাকে বলিয়া আপনার মনকে শান্ত করেন। যথা ঃ

সখি ! কি লাগি বল না, আনন্দ ধরে না, অঙ্গ কাঁপে থর থর।
চারিদিকে সখি, শুভ চিহ্ন দেখি, বুঝি এল প্রাণেশ্বর।।
আঙ্গিনায় দাঁড়াবেন হরি। ধ্রু।
ঘোমটা টানিব, দ্রুত ঘরে যাব, রুণু-ঝুণু রব করি।
ঘরে লুকাইয়া, শ্রীমুখে চাহিয়া, দেখিব পরাণ ভরি।।

দেখিবারে মোরে, উঁকি বারে-বারে, মারিবেন গৌরহরি।।
নয়নে-নয়নে, হইলে মিলন, বল কি করিব সখি।
বলবাম বলে, হইবে তাহলে, লজ্জায় নমিত-মুখী।।

প্রভু বাচস্পতি-গৃহে আসিলে, শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া সংবাদ পাইলেন। কিন্তু যাইবার আজ্ঞা নাই, সময়ও পাইলেন না, কাজেই যাইতে পারিলেন না। প্রভু ফুলিয়া আসিলেন, মধ্যে একটি নদী। সন্ন্যাসীব একবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়। তাই প্রভু হঠাৎ সদলে নবদ্বীপ আসিলেন। অমনি ঘোষণা পড়িয়া গেল। লক্ষ-লক্ষ লোক প্রভুর সহিত চলিলেন, স্ত্রীলোকগণ ছাদে উঠিলেন। প্রভু আপনার ঘাটে নৌকা হইতে নামিলেন,-- সেই ঘাটটিতে, যাহা তাঁহার সন্তরণের, বিকালে ও সন্ধ্যায় বসিবার, বয়স্যগণ সহিত হাস্য-কৌতুক ও বিদ্যাযুদ্ধ করিবার স্থান। প্রভুর পায়ে খড়ম, ধীরে ধীরে নদীর গর্ভ হইতে তীরে উঠিলেন। শুক্লাম্বর আসিয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু নিজ পরিচিত বৃক্ষলতা ঘব প্রভৃতি দেখিতে-দেখিতে চলিলেন; ক্রমে নিজ-গৃহেব সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন-- সেখানে, না যেখানে ছয় বৎসর পূর্বে তিনি গয়ায় গদাধরের পাদপদ্ম বর্ণনা করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শচীর সঙ্গে প্রভুর পরে অন্য স্থানে দেখাশুনা হইয়াছিল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত এই একবার মাত্র দেখা। তিনি কি স্বামীব কাছে যাইবেন? প্রভু স্ত্রীলোকের মুখ দেখেন না, স্ত্রীলোক তাঁহাকে দেখিলে দূরে গমন করেন,—তিনি কোন সাহসে প্রভুর নিকটে যাইবেন? বিশেষতঃ যেখানে লক্ষ লোক; তাঁহাব বয়ঃক্রম ঊনবিংশতি, তিনি কোণের কুলবধূ, সূর্য্যের মুখ দেখেন না। প্রভু প্রকাশ্য স্থানে লক্ষ-লক্ষ-লোক পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া। সেখানে হিন্দুমহিলা পূর্ণ যৌবনা গৌরাঙ্গের ঘরণী কিরূপে যাইবেন?

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বেণী বাঁধেন নাই, বেশভূষা করেন নাই, কারণ তখন তাঁহাব বাহ্যজ্ঞান আছে। শ্রীমতী পতীর নিকট গমন করিবেন কিনা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অন্তরালে দাঁড়াইয়া পতির মুখখানি দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পারিলেন না। কিন্তু মুখখানি জন্মের মত দেখিয়া লইবেন মনে এইরূপ বাসনা। আবার ভাবিলেন, তাঁহাব পতি তাঁহার ইহকাল পরকালের আশ্রয়, তাঁহার নিকট যাইবেন, তাহাতে আবার লোকাপেক্ষা কি? ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল। তখন সেই মলিনবেশে, আপাদমস্তক অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া, দ্রুত-গমনে যাইয়া, তাঁহার গৃহের সম্মুখে রাজপথে, গলায় বসন দিয়া, প্রভুর চরণে একটি কাতর ধ্বনি করিয়া পড়িলেন।

প্রভু স্ত্রীলোক দেখিয়া, "কে তুমি? বলিয়া দুইপদ পশ্চাৎ হটিলেন। প্রভুর প্রশ্নের উত্তর কেহ দিলেন না। প্রভু যখন নিজ গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে প্রাচীন পরিচিত সমস্ত দ্রব্য এ জন্মের মত দেখিয়া লইতেছেন, তখন সকলে অবশ্য নীরবে রোদন করিতেছিলেন। এখন হঠাৎ সম্মুখে এই দৃশ্য দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত ও নীরব হইলেন এবং একচিত্তে পলকহারা হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও সেই সাড়ে-চারি হস্ত পরিমিত সুন্দর সুগঠিত মনুষ্যটি এবং তাঁহার পদতলে মলিন-বস্ত্র পরিধান করিয়া ভূপতিতা পরমা-সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোকটিকে দেখিতে লাগিলেন। কেহ যদি উত্তর না করিলেন, তখন শ্রীমতী স্বয়ংই কথা কহিলেন। তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে আবেগ ভরে বলিলেন, "আমি তোমার দাসীর দাসী।" এই কণ্ঠস্বর শুনিয়া দুঃখে কষ্টে প্রভুর বদন স্থাণু হইয়া গেল। তিনি কষ্টে-সৃষ্টে বলিলেন, "তোমার কি প্রার্থনা?" বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "প্রভু, ত্রিজগৎ উদ্ধার করিলেন, কেবল বিষ্ণুপ্রিয়া দাসী ভবকূলে পড়িয়া রহিল।" এই কথা শুনিবামাত্র ক্রন্দনের রোল উঠিল। সকলেই কান্দিতে লাগিলেন,— কেবল প্রভু ও বিষ্ণুপ্রিয়া ছাড়া। প্রভু মস্তক অবনত করিয়া ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিতেছেন, "তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি তোমার নামের সার্থকতা কর,—তুমি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া হও।"

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি তোমাকে ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাই না।

প্রভু আবার চুপ করিলেন এবং পায়ের দুইখানি খড়ম খুলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলিলেন, "হে সাধ্বি, আমি সন্ন্যাসী, আমার দিবার কিছুই নাই। আমার এই খড়ম লও, ইহার দ্বারা আমাজনিত তোমার যে বিরহ তাহার শান্তি করিও।"

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তখন স্বামীর খড়ম দুই খানিকে প্রণাম করিলেন এবং উঠাইয়া মস্তকে ধরিলেন, তৎপরে উহা চুম্বন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। তখন লক্ষ লক্ষ লোক হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

প্রথম অধ্যায়

বিজয়া দশমী দিবসে প্রভু প্রায় শতাধিক নীলাচলবাসী ভক্তের সহিত শ্রীগৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য জননী ও জাহ্নবী দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবেন। জননীকে দর্শন দিবেন ইহা তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন। বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদিগের নিয়ম যে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া একবার জন্মের মত জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়। যে গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর সহিত নীলাচলে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গদাধর ভিন্ন আর সকলেই তাঁহার সহিত চলিয়াছেন। যে দিন প্রভু বাংলা দেশে শ্রীপাদপদ্ম অর্পণ করিলেন, সেই দিবস হইতে একদিনের জন্যও তিনি একটু আরাম করিতে পারেন নাই। যেখানে উপস্থিত হয়েন সেইখানেই লোকারণ্য। যখন পথ চলিয়াছেন তখনও সঙ্গে সঙ্গে লোক চলিয়াছে। কেবল নবদ্বীপে আসিয়া বাচস্পতির গৃহে দুই এক দিন গোপনে থাকিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর প্রভু আসিয়াছেন এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, আর অমনি লোকারণ্যের সৃষ্টি হইল।

প্রভু জননীর নিকটে বিদায় লইয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিতে চলিলেন সেই সঙ্গে সকলেই চলিলেন। সকলেই যে প্রকৃত বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া চলিলেন, তাহা নহে। প্রভু চলিয়াছেন কাজেই তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। প্রভু চলিতেছেন তাঁহারা থাকিবেন কেন? শ্রীবৃন্দাবন গমন করিতেছেন সেই আনন্দে প্রভু বিহ্বল। সুতরাং তাঁহার সঙ্গে যে অসংখ্য লোক চলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার লক্ষ্য নাই। যেমন নদী যতই সমুদ্রাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে ততই পরিসর হয়, সেইরূপ প্রভু শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যতই গমন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সঙ্গী-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গে কত লোক যে চলিল তাহা ঠিক করা সুকঠিন। সহস্র হইতে পারে, দশ সহস্র হইতে পারে, লক্ষ হইতেও পারে। গৌড়ীয় বাদশা তাঁহার প্রাসাদ হইতে দূরে ইহাদিগের কলরব শুনিয়া বিপদ আশঙ্কা করিয়া ভীত হইলেন। প্রভুর সঙ্গে কত লোক তাহা এই ঘটনা দ্বারা কতক অনুমান করা যাইতে পারে।

সঙ্গে এত লোক, ইহাদিগের আহার কে দিতেছে? অবশ্য ইহাদিগের পথের সম্বল কিছুমাত্র নাই। কিন্তু তাহাতে কাহাকেও উপবাস করিতে হইতেছে না। প্রভু তাঁহার বহু সহস্র পার্ষদ সঙ্গে করিয়া গমন করিতেছেন, এ সংবাদ তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিতেছে। যে গ্রামে প্রভু মধ্যাহ্নভোজন করিবেন, সেই গ্রামস্থ লোক জানিতে পারিয়াই আতিথ্য সমাধান নিমিত্ত যত্নশীল হইতেছেন। একজন কি দুইজনে এ ভার সমাধা করিতে পারেন না। গ্রাম-সমেত লোক একত্রিত হইয়া আতিথ্য ভার লইতেছেন। প্রভু গঙ্গার ধার দিয়া গমন করিতেছেন।

প্রভুর সঙ্গে অন্যান্য ভক্তের সহিত, গোবিন্দ ঘোষও গমন করিতেছিলেন। পথে এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ ভিক্ষা (ভোজন) করিয়া, মুখশুদ্ধির নিমিত্ত হাত বাড়াইলেন। গোবিন্দ ঘোষ নিকটে ছিলেন, তিনি গ্রামের ভিতর ছুটিলেন, আর একটি হরীতকী আনিয়া প্রভুকে তাঁহার এক খণ্ড দিলেন।

পর দিবস প্রভু অগ্রদ্বীপে ভিক্ষা করিলেন। আহার অন্তে আবার হাত পাতিলেন। তখন গোবিন্দ ঘোষ, তাঁহার বহির্বাসে যে হরীতকী খণ্ড বান্ধা ছিল, তাহা খুলিয়া প্রভুর হস্তে দিলেন। প্রভু যেন তখনি নিদ্রোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া গোবিন্দের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কল্য তুমি যখন আমাকে মুখশুদ্ধি দাও তখন অনেক বিলম্ব হইয়াছিল, অদ্য চাহিবামাত্র কিরূপে দিলে?" গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন, "প্রভু, কল্য যে হরীতকী পাইয়াছিলাম তাহার কিছু রাখিয়াছিলাম, অদ্য তাহাই দিলাম।"

প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ! তোমার এখনও সঞ্চয়-বাসনা সম্পূর্ণরূপ যায় নাই, অতএব তুমি আমার সহিত গমন করিতে পারিবে না।" ইহা শুনিয়াই গোবিন্দের মুখ শুকাইয়া গেল। প্রভু বলিতেছেন, "গোবিন্দ, তুমি দুঃখিত হইও না। তোমার দ্বারা আমি বিস্তর কার্য্য সাধন করিব। আমার ইচ্ছায় তোমার সঞ্চয়-বাসনা হইয়াছিল। বস্তুতঃ তোমার হৃদয়ে সে বাসনা নাই। তোমার কর্তব্যকর্ম অচিরাৎ আমি নির্দেশ করিয়া দিব।" গোবিন্দ হাহাকার করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত দিয়া বলিলেন, "তুমি শান্ত হও, আমি আবার তোমার নিকটে আসিব, আর সেইবার তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না। তোমার দ্বারা আমি বহু কার্য্য সাধন করিব, এইজন্য তোমার বিরহজনিত দুঃখ আমি স্ব-ইচ্ছায় স্কন্ধে লইলাম। তুমি এখানে থাক। আমি সত্বর তোমাকে সন্দেশ পাঠাইয়া দিব।"

গোবিন্দ ঘোষ কাজেই অগ্রদ্বীপে রহিয়া গেলেন। প্রভু আবার আসিবেন, আসিয়া আর তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন না, এই আশার উপর নির্ভর করিয়া তিনি মনকে সান্ত্বনা করিলেন ও গঙ্গাতীরে একখানি কুটির নির্মাণ করিয়া সেখানে দিবানিশি ভজন করিতে লাগিলেন। এখানে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের কাহিনী সমাপ্ত করিয়া রাখি।

এক দিবস গোবিন্দ গঙ্গাতীরে শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় গঙ্গার স্রোতে একখানি কি ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিল। তখন তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল, বোধ হইল যেন একখানি পোড়া-কাঠ। শ্মশানের কাঠ ভাবিয়া উহা উঠাইয়া তীরে ফেলিয়া দিয়া আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন। একটু পরে বোধ হইল যেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইয়া বলিতেছেন,

"গোবিন্দ আমি আসিতেছি। তুমি যেখানি পোড়া-কাঠ ভাবিতেছ, উহা যত্ন করিয়া কুটিরে রাখিয়া দাও।" গোবিন্দের ধ্যান ভঙ্গ হইলে ভাবিতে লাগিলেন যে, এ আবার কি ব্যাপার? অনেক ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, সুতরাং কাঠখানা লইয়া কুটিরে রাখিয়া দিলেন।

পর দিবস প্রাতে দেখেন যে, সে পোড়া কাঠ নয়, একখানি কাল পাথর। ইহাতে নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বপ্নকে সত্য মানিয়া লইয়া, প্রত্যহ শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ দলবল লইয়া গোবিন্দের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত। বহুতর লোক সঙ্গে সুতরাং প্রভু ও ভক্তগণের সেবার নিমিত্ত গোবিন্দ অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। এত লোকের আহারীয় কিরূপে সংগ্রহ করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন শুনিয়া গ্রাম হইতে সকলে, যাহার যাহা ছিল, আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রভুর ভিক্ষা হইল, ভক্তগণ প্রসাদ পাইলেন, তৎপরে গোবিন্দও প্রসাদ পাইলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "গোবিন্দ, প্রস্তরখানি পাইয়াছ ত?" গোবিন্দ করজোড়ে বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।" তখন প্রভু বলিতেছেন, "কল্য ঐ প্রস্তর দিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিব।" কিন্তু প্রভুর এ কথা অপর কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

পর দিবস একজন ভাস্কর আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভু তাহাকে শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। সে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিল। তখন প্রভু গোবিন্দের কুটিরে সেই শ্রীমূর্ত্তি নিজহস্তে স্থাপন করিলেন। শ্রীবিগ্রহের নাম রাখিলেন "গোপীনাথ"; আর এইরূপে "অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ" প্রকাশ পাইলেন। ঠাকুর স্থাপিত হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "গোবিন্দ, এই ঠাকুর তোমাকে দিলাম। ইহাকে সেবা কর, আর আমার বিরহজনিত দুঃখ পাইবে না। আমি বলিয়াছিলাম, এবার আসিয়া আর তোমাকে ত্যাগ করিব না। এই আমি তোমার কাছে রহিলাম।"

গোবিন্দের মন শ্রীগৌরাঙ্গে, গোপীনাথে নহে। তিনি প্রভুর এই আজ্ঞা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ, তুমি এখানে থাক, এই ঠাকুর সেবা কর ও বিবাহ কর। তোমার দ্বারা শ্রীভগবানের করুণার সীমা দেখান হইবে। শ্রীভগবান তোমার দ্বারা জীবকে দেখাইবেন যে, তিনি কিরূপ ভক্তবৎসল। এরূপ সৌভাগ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না।" ইহা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দলবল লইয়া চলিয়া গেলেন, আর গোবিন্দ ও গোপীনাথ অগ্রদ্বীপে রহিলেন। প্রভুর আজ্ঞাক্রমে গোবিন্দ বিবাহ করিলেন। স্ত্রী-পুরুষে গোপীনাথের সেবা করেন, আর গোপীনাথের প্রসাদ পাইয়া জীবন ধারণ করেন। কিছুকাল পরে গোবিন্দের একটি পুত্র হইল। কিন্তু পুত্রটি রাখিয়া গোবিন্দের স্ত্রী পরলোক গমন করিলেন। সুতরাং গোবিন্দের ঘাড়ে এখন দুইটি সেবার বস্তু পড়িল,—গোপীনাথ ও নিজের শিশু পুত্র। ইহাতে গোবিন্দ কিরূপ বিব্রত হইলেন, তাহা সহজে অনুভব করা যাইতে পারে। কষ্টে-সৃষ্টে দুই জনকেই সেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে পুত্রের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর হইল। গোবিন্দ গোপীনাথকে পাঁচ বৎসরের শিশু ভাবিয়া বাৎসল্যভাবে সেবা করেন।

তাঁহার মন এখন দুজনেই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে মাঝে মাঝে গোলমাল বাধিতে লাগিল। কখন তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া ভাবেন এই গোপীনাথ, আবার কখনও গোপীনাথকে দেখিয়া ভাবেন এই তাঁহার পুত্র। কখন গোপীনাথের দ্রব্য পুত্রকে দেন, কখন পুত্রের দ্রব্য গোপীনাথকে দেন। কখন গোপীনাথকে দুঃখ দিয়া পুত্রের সেবা করেন, কখন পুত্রকে দুঃখ দিয়া গোপীনাথের সেবা করেন। এই অবস্থায় আছেন, এমন সময় রসিকশেখর শ্রীভগবান গোবিন্দের পুত্রটি লইলেন! তখন গোবিন্দ মর্মাহত হইয়া গোপীনাথকে ভুলিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, প্রাণত্যাগ করিবেন, তবে যেমন তেমন প্রাণত্যাগ নয়, গোপীনাথের ঘরে হত্যা দিয়া উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। প্রকৃত মনের কথা এই যে, তাঁহার গোপীনাথের উপর রাগ হইয়াছে। গোবিন্দ ভাবিতেছেন, "কি অন্যায়! আমি দিবানিশি ঠাকুরের সেবা করি, আর ঠাকুর এমনি অকৃতজ্ঞ যে, স্বচ্ছন্দে আমার পুত্রটি লইয়া গেলেন!"

গোবিন্দ মনোদুঃখে ঠাকুরের আগে পড়িয়া রহিলেন, পার্শ্ব পরিবর্তন পর্য্যন্ত করিলেন না। কাজেই গোপীনাথের কোন সেবা হইল না, তাঁহাকে সমস্ত দিবস উপবাসে থাকিতে হইল। গোবিন্দ ভাবিতেছেন, "যেমন আমার বুকে শেল হানিলে তেমনি খুব হইয়াছে। এখন ঠাকুর উপবাস করিতেছেন, দেখি কে উহাকে খাইতে দেয়। আমিও উঁহাকে অপরাধ দিয়া উঁহার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।" কিন্তু গোপীনাথ, গোবিন্দের এই চরিত্রে রাগ করিলেন না। কারণ গোবিন্দ জীব, ও গোপীনাথ ভগবান। যেমন সন্তান মাকে দুঃখ দিয়া থাকে, সেইরূপ জীব মাত্রেই শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গে প্রহার করিয়া থাকে। মাতা ইহাতে কখন কখন ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু ভগবানের ইহাতে ক্রোধ হয় না, তিনি সমুদয় অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকেন।

যখন নিশি হইল তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, "গোবিন্দ বাপ! ক্ষুধায় মরি, তোমার কি মায়া দয়া নাই? সারাদিন গেল, তবু তুমি জলবিন্দু আমাকে দিলে না? গোপীনাথ ও গোবিন্দে মাঝে মাঝে এইরূপ কথাবার্তা চলিত। যখন গোপীনাথের কথা শুনিতেন, তখন বিশ্বাস করিতেন যে, গোপীনাথ কথা কহিলেন। কিন্তু একটু পরে ভাবিতেন যে, তাঁহার ভ্রম হইয়া থাকিবে। গোপীনাথের কথায় গোবিন্দ একটু লজ্জা পাইয়া বলিতেছেন, "আমার কি আর ক্ষমতা আছে যে তোমার সেবা করিব? আমি চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছি, আমাদ্বারা তোমার আর সেবা হইবে না।" গোবিন্দ শোকে এরূপ অভিভূত যে গোপীনাথ যে তাঁহার সহিত কাতরভাবে কথা বলিলেন, ইহাতেও তিনি কোমল হইলেন না। গোপীনাথ ইহাতে

ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "লোকের যদি একটা ছেলে দৈবে মরে, তবে কি তাহার আর একটা ছেলেকে আহার না দিয়া সেই সঙ্গে বধ করে? তোমার এক পুত্র মরিয়াছে; তাহার নিমিত্ত ক্ষোভ কর, তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু আমাকে অনাহারে কেন বধ কর বাপ?"

তখন গোবিন্দ বলিতেছেন, "ঠাকুর আমার পুত্রটি কাড়িয়া লইলে, তোমার একটু দয়া হইল না? তুমি যে আমাকে বাপ বাপ করিতেছ, সে সমুদয় তোমার বাহ্য।" ইহাতে গোপীনাথ বলিতেছেন, "গোবিন্দ! এরূপ বিপদ যে কেবল তোমার একা হইল তাহা নহে, লোকের চিরকালই এরূপ হইয়া থাকে। দুঃখ সম্বরণ কর। তোমার পুত্রের ভালই হইয়াছে।"

ইহাতে গোবিন্দ কিছু ফাঁপরে পড়িলেন, কি উত্তর করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। শেষে সমস্ত লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, সব বুঝিলাম। আমার পুত্রের উত্তম গতি হইয়াছে তাহা ঠিক। কিন্তু আমাকে তুমি পুত্রশোক দিলে কেন? মাতৃহীন বালকটিকে হঠাৎ আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইয়া গেলে, তোমার একটু দয়া হইল না? তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, "গোবিন্দ, তোমাকে একটি অতি গোপনীয় কথা বলি। যাহার দুই পুত্র, সে পিতার পুত্র আমি হইতে পারি না। তুমি ছিলে পিতা আমি ছিলাম এক পুত্র, সে বেশ ছিল। কিন্তু যখন তোমার আর একটি পুত্র হইল, তখন আমি আর থাকিতে পারি না। আমি যদি যাইতাম তবে তুমি হয়ত তোমার দুই পুত্রই হারাইতে—আমাকেও পাইতে না, আর তোমার পুত্রকেও পাইতে না। তোমার সে পুত্র যাওয়াতে এখন তুমি আমাকেও পাইবে, তাহাকেও পাইবে। গোবিন্দ! দুঃখ সম্বরণ কর, যেমন তোমার এক পুত্র গিয়াছে, তেমনি আমি তোমার পুত্র রহিয়াছি।" গোবিন্দ একেবারে নিরুত্তর, আর কথা কাটাকাটি করিতে পারিলেন না। তখন হঠাৎ একটি কথা মনে আসিল। গোবিন্দ বলিতেছেন, "তুমি ত আমার সর্বাঙ্গসুন্দর পুত্র, সকল প্রকারে ভাল, তাহা বেশ জানি; কিন্তু তুমি কি পুত্রের সব কার্য্য করিবে? তুমি কি আমার শ্রাদ্ধ করিবে?"

অমনি গোপীনাথ মধুর স্বরে বলিতেছেন, "তথাস্তু! গোবিন্দ, তুমি আমার পিতা। যদিও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য রাজসিক, তবু তুমি পিতা যখন আপন মুখে পুত্রের নিকট শ্রাদ্ধের কথা উল্লেখ করিলে, তখন আমি শাস্ত্র মত তোমার শ্রাদ্ধ করিব, আমি প্রতিশ্রুত হইলাম।" তখন গোবিন্দ রোদন করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "বাপ! আমি অপরাধ করিয়াছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার পুত্র মরিয়া গিয়াছে উত্তম হইয়াছে, তোমার বালাই লইয়া গিয়াছে।" ইহাই বলিয়া স্নান করিয়া তখনি গোপীনাথের নিমিত্ত রন্ধন করিতে গেলেন।

ইহার কিছুকাল পরেই গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুর অন্তর্দ্ধান করিলেন। দেহত্যাগের পূর্বে তিনি গোপীনাথের সেবার উত্তম বন্দোবস্ত করিলেন ও আপনার প্রধান শিষ্যের হস্তে গোপীনাথকে সমর্পণ করিলেন। অগ্রদ্বীপেই ঘোষ-ঠাকুরের সমাধি দেওয়া হইল। গোবিন্দ ঘোষের নিমিত্ত শোক করেন এমন কেহ তাঁহার নিকট ছিলেন না। শিষ্যগণ রোদন করিলেন, আর তাঁহার পুত্র রোদন করিলেন। কথিত আছে যে, গোবিন্দ ঘোষের অন্তর্দ্ধানের সময় স্বয়ং গোপীনাথ,—তিনি তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ায়,—রোদন করিয়াছিলেন। তাঁহার পদ্মচক্ষু দিয়া বিন্দু-বিন্দু জল পড়িতে লাগিল। পিতৃ-বিয়োগে রোদন করা কর্তব্য, গোপীনাথ এ কর্তব্যকর্মের ত্রুটি কেন করিবেন?

গোপীনাথ নূতন সেবাইতকে নিশিযোগে বলিতেছেন, "গোবিন্দ ঘোষ আমার পিতা। আমি একমাস অশৌচ ও হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিব। তুমি আমাকে কল্য স্নান করাইয়া সময়োচিত বসন পরাইবা।" তখন সেবাইত এই অলৌকিক ব্যাপারে কিছুকাল স্তম্ভিত থাকিলেন। পরে সাহসী হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, সত্য কি আমার সহিত কথা কহিতেছ? যদি সত্য তুমি কথা কহিয়া থাক, তবে তোমাকে আমি কিরূপে কাচা পরাইব? লোকে আমাকে কি বলিবে?

ঠাকুর, এ লীলা সম্বরণ করুন।" তাহাতে গোপীনাথ বলিলেন, "আমি আমার পিতার নিকট প্রতিশ্রুত আছি যে, তাঁহার শ্রাদ্ধ করিব। মাসান্তে আমি শাস্ত্র মত সর্বসমক্ষে সমুদয় কার্য্য করিব ও নিজহস্তে পিণ্ডদান করিব। তুমি আমার আজ্ঞানুসারে সমুদয় কার্য্য কর, তোমার কোন শঙ্কা নাই।" সেবাইত প্রাতে এই কথা সকলের নিকট বলিলেন। সকলে ভগবানের করুণায় গদ্‌গদ হইয়া বলিলেন যে, তাঁহার সাক্ষাৎ আজ্ঞার উপর আবার কথা কি? তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই করা যাউক। তখন এই কথা সর্বদেশে প্রচার হইল। মধুমাসে কৃষ্ণ-একাদশী তিথিতে গোবিন্দের শ্রাদ্ধ হইল। বহুতর লোকের সমাগম হইল। তখন কাচা গলায় দিয়া গোপীনাথকে শ্রাদ্ধস্থানে আনা হইল। ইহা দেখিয়া সভাস্থ সকলে ভাবে অভিভূত হইলেন। কেহ উচ্চৈঃস্বরে রোদন, কেহ ধূলায় গড়াগড়ি, কেহ আনন্দে নৃত্য, কেহ ভাবে মূর্ছিত হইলেন। ভগবানের কারুণ্যে সকলে উন্মাদ হইলেন। কেহ গোপীনাথকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন, কেহ বা ঘোষ-ঠাকুরকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। বালক বৃদ্ধ, পুরুষ নারী সকলেই বলিতে লাগিলেন, যেমন ভক্ত তেমনি ঠাকুর, যেমন দাস তেমনি প্রভু, যেমন পিতা তেমনি পুত্র। কথিত আছে যে, সর্বসমক্ষে গোপীনাথ নিজ হস্তে গোবিন্দ ঘোষের পিণ্ড দিয়াছেন। শ্রীভগবানের এই অপরূপ লীলা অদ্যাবধি অগ্রদ্বীপে বৎসর হইতেছে। আর এখনও একান্ত ভক্তগণ এই পিণ্ডদানরূপ কার্য্য দর্শন করিয়া থাকেন। যদি গোবিন্দ ঘোষের ঔরস পুত্র বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে বড় না হয় বিংশতি বৎসর পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ করিতেন। কিন্তু গোপীনাথ চারিশত বৎসরের অধিক কাল গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের শ্রাদ্ধ করিলেন। এইরূপ পিতৃভক্ত-পুত্র কেবল গোপীনাথই হইতে পারেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াছেন, "হে গোবিন্দ! তোমা দ্বারা শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হইবে। এরূপ সৌভাগ্য তুমি পরিত্যাগ করিও না।" হায় একথা কাহাকে বলিব? শ্রীভগবান শ্রীগোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ এই চারিশত বৎসরের অধিক কাল করিতেছেন! জয়দের "দেহি পদ পল্লব" পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখনী রাখিলেন। তিনি ভাবিলেন, তিনি কিরূপে লিখিবেন যে, শ্রীভগবান রাধার পায় ধরিলেন। ভগবান স্বয়ং আসিয়া সেই শ্লোক পূরণ করিলেন। কিন্তু ভগবান গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ করিলেন, আর তাঁহার নিমিত্ত গলায় কাচা পরিলেন! জীবগণ কি নির্বোধ! কি মূঢ়মূর্তি! এরূপ প্রভুকে ভুলিয়া থাকে।

প্রভু গঙ্গার ধারে ধারে বৃন্দাবনে চলিলেন। প্রভুর নিত্য সঙ্গী অসংখ্য লোক। প্রভুকে দর্শন করিতেও সহস্রেক লোক আসিতেছে। ইহাতে দিবানিশি তাঁহার চতুষ্পার্শে লোকের কোলাহল হইতেছে। চতুর্দিকে কেবল নৃত্য, গীত ও হরি হরি ধ্বনি। কিন্তু প্রভুর ইহাতে রসভঙ্গ হয় নাই, যেহেতু তিনি আপনার মনের আনন্দে বিহ্বল। সকলের ইচ্ছা প্রভুকে দর্শন করিবে, প্রভুর নিকটে যাইবে, প্রভুর সঙ্গে কথা কহিবে। প্রভুর অপার মহিমা, যদিও লক্ষ লোক তাঁহার দর্শন ও সঙ্গ ইচ্ছা করিতেছে, তবু কাহারও মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রহিতেছে না। এইরূপে মহাকলরব ও হরিধ্বনির সহিত মহাপ্রভু গৌড়নগরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সেখানে বাঙ্গালার মুসলমান রাজার বাসস্থান। রাজা বহু লোকের কলরব শুনিয়া সহজে ভয় পাইলেন। যাহাদের যত বড় সম্পত্তি তাহাদের ভয়ও তত অধিক। তিনি ভাবিলেন, বুঝি কোন বিপক্ষ লোক তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইতে আসিতেছে। রাজারা ভাবেন যে, তাঁহারা বড় ভাগ্যবান ও তাঁহাদের রাজ্যভোগের নিমিত্ত সকলে তাঁহাদিগকে হিংসা করে। কিন্তু এখানকার কয়টি রাজা পরকালে রাজা হইয়াছেন? লোকের কলরব শুনিয়া গৌড়ের রাজা ভয় পাইলেন। তখন সশঙ্কচিত্তে তাঁহার মন্ত্রী কেশব ছত্রিকে ডাকাইলেন। রাজা হোসেন সাহ যদিও মুসলমান, কিন্তু তাঁহার রাজকার্য্য সমুদয় হিন্দুমন্ত্রীগণই নির্বাহ করিতেন। কেশব ছত্রি বলিলেন যে, ব্যাপার কিছু গুরুতর নহে, একজন সন্ন্যাসী জনকয়েক চেলা লইয়া বৃন্দাবন

যাইতেছেন, তাহাতে এই কলরব হইতেছে। কেশব ছত্রির মনের ভাব এই যে, যদি মুসলমান রাজা জানিতে পান যে, প্রভুর সঙ্গে লক্ষলোক, তাহা হইলে হয়ত তিনি প্রভুর উপর বলপ্রয়োগ করিবেন। কেশব ছত্রি যদিচ ব্যাপার কিছু গুরুতর নয় বলিয়া, রাজাকে সান্ত্বনা করিলেন, কিন্তু রাজা উহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলেন না। সেই নিমিত্ত তিনি দবির খাস ও সাকর মল্লিক উপাধিধারী আর দুই জন হিন্দু মন্ত্রীকে ডাকাইলেন। এই দুই জন দাক্ষিণাত্যের কোন রাজবংশীয় ব্রাহ্মণ, দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া, বাংলা দেশে বাস করেন। ইহারা দুই ভাই বিদ্যা বুদ্ধি বলে মুসলমান রাজার মন্ত্রীপদ লাভ করিয়াছেন। মুসলমান রাজার অধীনে কাজ করেন, সুতরাং হিন্দুদের পক্ষে যাহা মহা অকর্তব্য কর্ম এরূপ কাজও তাঁহাদের অনেক করিতে হয়। মুসলমানেরা হিন্দুদেবতার মন্দির ভগ্ন করিতেছে, দেশ উজাড় করিতেছে। এই সমস্ত কার্য্য ইঁহারা দুই ভ্রাতা নিজ হাতে না করুন, ইহাতে তাঁহারা সহায়তা করিতেছেন। ইঁহারা বাহ্যদৃষ্টিতে ঠিক মুসলমান, কার্য্যেও অনেকটা মুসলমানের মত, অথচ অন্তরে ঘোর হিন্দু। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে পালন করেন, পণ্ডিত সাধু বৈষ্ণবগণে তাঁহাদের বাড়ী অহোরাত্র পূর্ণ থাকে। বাড়ী কানাইনাটশালা গ্রামে। এই কানাইনাটশালা প্রভু পূর্বে দেখিয়াছেন।

যখন গয়া হইতে প্রভু প্রত্যাবর্তন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে আগমন করিয়া আলিঙ্গনচ্ছল তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন।*

এই সমগ্র কানাইনাটশালা গ্রামে কৃষ্ণলীলার মূর্তি সংস্থাপিত ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। দেশ বিদেশ হইতে উহা দর্শন করিতে লোক আসিত। এই সকল কীর্তিও সেই দুই ভ্রাতার, যাঁহারা উপরে দবিরখাস ও সাকর মল্লিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। দবিরখাস ও সাকর মল্লিক রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা এই সন্ন্যাসীর কথা আবার তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। এই দুই ব্রাহ্মণ ভ্রাতা যদিও প্রভুকে কখন দর্শন করেন নাই, তবুও তিনি যে শ্রীভগবান তাহা তাঁহাদের মনে এক প্রকার বিশ্বাস হইয়াছে। এই নিমিত্ত তাঁহারা শত মুখে প্রভুর গুণানুবাদ করিলেন। তাঁহারা প্রভুর পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, বোধহয় স্বয়ং শ্রীভগবান জগতে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসীরূপে বিচরণ করিতেছেন। আরও বলিলেন, "মহারাজ, তুমি যাঁহার কৃপায় অধীশ্বর হইয়াছ, তিনি এখন তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

প্রভুর অচিন্ত্য শক্তিবলে মুসলমান রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং অতি নম্র হইয়া বলিলেন, "আমার ঐরূপ কিছু বোধ হয়। আমি রাজা, লোকের জীবন মরণের কর্তা। কিন্তু আমি যদি কাহাকেও বেতন না দিই, তবে ইচ্ছাপূর্বক কেহ আমার কথা শুনিবে না। আমার সৈন্যগণ যদি ছয় মাস বেতন না পায় তবে তাহারা আমাকে বধ করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিবে। কিন্তু এই সন্ন্যাসী দরিদ্র, ইহার কাহাকেও এক পয়সা দিবার সঙ্গতি নাই, তবুও লক্ষ লক্ষ লোক আহার-নিদ্রা-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ইহার সঙ্গে-সঙ্গে আজ্ঞাবহ হইয়া ফিরিতেছে, ঈশ্বরশক্তি ব্যতীত সামান্য জীবের এরূপ শক্তি সম্ভাবিত হয় না।"

রাজা যদিচ এইরূপ ভাল কথা বলিলেন, তবু দুই ভাই ইহাতে সম্পূর্ণ রূপে আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন যে, প্রভুকে এই স্বেচ্ছাচারী মুসলমান রাজার নিকট

* প্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তবে তিনি আপনার হৃদয়ে আপনি প্রবেশ করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? প্রভুর দুই ভাব—ভক্তভাব ও ভগবদ্‌ভাব। অর্থাৎ ভক্তের জীবন কিরূপ হওয়া উচিত তিনি তাহাই দেখাইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই, ভক্ত যখন উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন, প্রভু এই লীলা দ্বারা তাহাই দেখাইয়াছিলেন।

থাকিতে দেওয়া ভাল নয়। তাহার পর তাঁহারা প্রভুকে দর্শন না করিয়াও দূর হইতে তাঁহাকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন। এখন তিনি আছেন ও তাঁহার দর্শন সুলভ হইয়াছে, এরূপ সৌভাগ্য তাঁহারা কেন ছাড়িবেন? সুতরাং নিশীথ সময়ে, তাঁহারা মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, অতি গোপনে প্রভুর নিকট গমন করিলেন। যাইয়া দেখিলেন, যদিও গভীর রজনী হইয়াছে, তবুও কেহ ঘুমান নাই; সকলেই প্রেমের হিল্লোলে আনন্দ-কোলাহল করিতেছেন! অনেক কষ্টে কোন কোন পার্ষদের ও পরে নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন পাইলেন। তখন তাঁহাদের কাছে অতি দীনভাবে প্রভুর দর্শন-ভিক্ষা করিলেন। অবশ্য ইহাদের পরিচয় পাইবামাত্র ভক্তগণ তটস্থ হইলেন। এই দুই ভাই নদীয়া পণ্ডিতগণের প্রতিপালক বলিয়া তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভদ্রলোক মাত্রেই জানেন। বিশেষতঃ তাঁহারা ধনবান ও ক্ষমতাবান বলিয়া আপামর সাধারণের নিকট পরিচিত। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ দুই ভাইকে অতি যত্নে প্রভুর নিকট লইয়া চলিলেন। প্রভু তখন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমরসে নিমগ্ন। শ্রীনিত্যানন্দ চেষ্টা করিয়া তাঁহার আবিষ্টচিত্ত ভঙ্গ করিয়া, দুই ভাইয়ের আগমন-বার্তা তাঁহার গোচর করিলেন। প্রভুও তাঁহাদের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিলেন। তখন দুই ভাই দুই হস্তে দুই গুচ্ছ তৃণ ও মুখে এক গুচ্ছ তৃণ ধারণ করিয়া, গলায় বসন দিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন, আর বলিলেন, "প্রভু", পতিত ও কাঙ্গাল উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তুমি ধরাধামে শুভাগমন করিয়াছ, অতএব আমাদের ন্যায় দয়ার পাত্র আর পাইবে না। তুমি জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছে। কিন্তু তারা নির্বোধ, অজ্ঞানে পাপ করিয়াছ। আমাদের যত পাপ সমস্তই জ্ঞানকৃত, আমাদের ন্যায় অধমের তোমার কৃপা বিনা আর গতি নাই।"

এ কথা পূর্বে বারংবার বলিয়াছি যে, যে ব্যক্তি বলবান্ তাহারই অন্তরে অভিমানের সৃষ্টি হয় এবং যে ব্যক্তি যে বিষয়ে বলবান সে তাহা ত্যাগ না করিলে ভক্তি পায় না, কি পাইলেও উহা তাহার হৃদয়ে পরিস্ফুট হয় না। এই দুই ভাই গৌড়দেশের হর্তাকর্তা-বিধাতাপুরুষ, সুতরাং দীনতাই তাঁহাদের ঔষধ। তাঁহারা দৈন্যের অবতার হইয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। ফলকথা, তাঁহারা যে কৃষ্ণপ্রেম পাইবার পাত্র, অথচ নরকে পড়িয়া আছেন, সে জ্ঞান তাঁহাদের আছে, আবার এ জ্ঞানও আছে যে, এরূপ ভগবৎ-ভাগ্য পাইয়াও তাঁহারা বিষ্ঠার ক্রিমি হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সেই অনুতাপ তখন জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিতেছে। তাঁহারা প্রভুকে যাহা বলিলেন, প্রকৃতই মনে মনে তাঁহাদের ঐরূপ বিশ্বাস ছিল—অর্থাৎ তাঁহারা জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগা। তাঁহারা তখন এক প্রকার বাংলা দেশের অধিপতি। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না, আর তাঁহাদের ক্ষমতা ও পদ বাদসাহের পরেই। তাঁহাদের এইরূপ নিষ্কপট দীনতা দেখিয়া সকলেই মোহিত হইলেন। প্রভু দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বলিলেন, "তোমরা উঠ, দৈন্য সম্বরণ কর। তোমাদের দৈন্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তোমরা আমাকে বারংবার যে দৈন্য-পত্র লিখিয়াছ তাহা দ্বারা তোমাদের মন আমি বেশ জানিয়াছি। তোমাদের কথা ভাবিয়া আমি একটি শ্লোক রচনা করি। ইহাই বলিয়া প্রভু সেই শ্লোকটি বলিলেন। যথা—

"পরব্যসনিনী নারি ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু। তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নং"।

প্রভুর শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে,—"যাঁহাদের অন্তঃকরণে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা বিষয়-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণরস আস্বাদন করিয়া থাকেন। লোকে বলে যে, প্রেমান্ধ কুলটার অবস্থা ও কৃষ্ণপ্রেমে অভিভূত জীবের অবস্থা একই প্রকার। কৃষ্ণপ্রেম যে কি পদার্থ, তাহা পরকীয়া-রস ব্যতীত অন্য উপমার দ্বারা, জীবকে বুঝাইবার যো নাই। নিজে পবিত্র হইলে এ সমুদয় অপবিত্র বোধ হয় না। শ্রীরামানন্দ রায় দেবদাসীদের লইয়া তাঁহার নাটকাভিনয় করিতেন, করিয়া স্বয়ং প্রভুকে দেখাইতেন। কিন্তু যাঁহারা উহা

দেখিতেন, অভিনেত্রী বেশ্যা বলিয়া তাঁহাদের রসাস্বাদনে কোন ব্যাঘাত হইত না। তবে এ সমুদয় বিধি পবিত্র লোকের জন্য।

সে যাহা হউক, প্রভু বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার প্রিয়, এমন কি এই গৌড় সান্নিধ্যে আসিবার আমার যে কি প্রয়োজন, তাহা কেহ জানে না। সে কেবল তোমাদের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, কৃষ্ণ তোমাদিগকে অচিরাৎ কৃপা করিবেন; অদ্য হইতে তোমরা দুই ভাই 'সনাতন ও রূপ' খ্যাত হইবে।"

যখন প্রভু প্রকাশ হইলেন, তখন তাঁহার কথা জগতে সকলে শুনিলেন—কেহ বিশ্বাস করিলেন, কেহ করিলেন না। কিন্তু রূপ ও সনাতন তাহা বিশ্বাস করিলেন, করিয়া প্রভুকে দৈন্য-পত্র লিখিলেন, অর্থাৎ পত্রেই আপনাদের উদ্ধার ভিক্ষা করিলেন। অবশ্য প্রভু উত্তর দিলেন না। রূপ সনাতন আবার লিখিলেন, তবু প্রভু উত্তর দিলেন না। এখন তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে লইতে তাঁহাদের নিকট আসিয়াছেন। কেন না, এই দুই ভাই দ্বারা তিনি জীব উদ্ধার করিবেন।

প্রভুর দুই চারিটি কথায় দুই ভাই চিরদিনের নিমিত্ত শ্রীপ্রভুর দাস হইলেন। এরূপ অচিন্ত্যশক্তি জীবে সম্ভবে না। এই দুই ভাই মহা বিচক্ষণ রাজ্যমন্ত্রী; যুদ্ধপ্রিয় ও স্বেচ্ছাচারী মুসলমান রাজার অধীনে দস্যুবৃত্তি ও নানাবিধ কুকর্ম করিয়া মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন। তাঁহারা প্রভুকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন, আর অমনি তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হইল। যে ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত জীব মাত্রেই কি না করে, যাহার নিমিত্ত তাঁহারা দুই ভাই নানাবিধ কুকর্ম করিয়াছেন, এখন প্রভু-দর্শনে সেই সমুদয় ঐশ্বর্য্য মলের ন্যায় একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। ক্রমে ক্রমে এই দুই ভাই কিরূপ শক্তিসম্পন্ন হইলেন তাহা পরে বলিব। যাইবার সময় জ্যেষ্ঠ সনাতন এই কথা বলিলেন, "প্রভু, এত লোক লইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলে সুখ পাইবেন না।" আর নিত্যানন্দ প্রভুকে গোপনে বলিলেন, "যদিও প্রভু স্বয়ং ভগবান সকলের কর্তা, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র জীব, আমাদের ভয় যায় না। প্রভুকে এ স্বেচ্ছাচারী রাজার নিকটে থাকিতে দেওয়া ভাল নয়। তাঁহাকে এখান হইতে অন্যত্র লইয়া যাওয়া কর্তব্য।"

প্রভাতে প্রভু বলিলেন, "কল্য নিশিযোগে সনাতনের মুখে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ভালরূপ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে যদি যাই তবে একা যাইব। কিন্তু আমি যেন বাজী পাতাইয়া লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গে লইয়া চলিতেছি। শ্রীবৃন্দাবন অতি গুপ্ত ও পবিত্র স্থান। সেখানে কলরব শোভা পায় না। যাঁহারা আমার সঙ্গে চলিতেছেন, আমি তাঁহাদের নিবারণ করিতে পারি না। আমি এখান হইতে নীলাচলে ফিরিব। আর সেখান হইতে বৃন্দাবনে যাইব।" ইহাই বলিয়া প্রভু পূর্বাভিমুখে অর্থাৎ দেশাভিমুখে ফিরিলেন।

ভবভূতি বলিলেন, মহাজনের মন যদিও শিরীষ কুসুমের ন্যায় কোমল, কিন্তু প্রয়োজন হইলে উহা বজ্রের ন্যায় কঠিন হয়। তাহার প্রমাণ এই দেখ। কোথা নীলচল, আর কোথা গৌড়। যে বৃন্দাবনের নামে প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত হয়েন, সেই বৃন্দাবনে যাইবার জন্য, দুই মাস হাঁটিয়া বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া, প্রায় অর্দ্ধ পথ আসিয়াছেন। একটি কথা, যাহা তোমার আমার কাছে সামান্য, তাহা দ্বারা চালিত হইয়া প্রভু এ সমুদয় পরিশ্রম ও কষ্টের ফল ত্যাগ করিলেন। প্রভু যে পথে আসিয়াছেন সেই পথে ফিরিয়া চলিলেন।

প্রভু ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় গঙ্গার পরপারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে "নরোত্তম দাস" বলিয়া কয়েক বার ডাক দিলেন, দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যদি প্রভু শুধু "নরোত্তম" বলিয়া ডাকিতেন, তবে ভক্তগণ ভাবিতে পারিতেন যে, প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেছেন, কারণ তাঁহার এক নাম নরোত্তম। কিন্তু "নরোত্তম দাস" শুনিয়া কেহ কিছু ঠাহরিতে পারিলেন না। তাহার বহু বৎসর পরে সেইস্থানে যখন শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর

মহাশয় উদয় হইলেন, তখনই সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, সর্বশক্তিমান প্রভু "নরোত্তম দাস*" বলিয়া ডাকিয়া তাঁহাকেই আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

প্রভু পথে ভক্তগণকে, যাহার যেখানে বাড়ী, সেখানে রাখিয়া আসিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীখণ্ডের পর অগ্রদ্বীপে আইলেন। সেখান হইতে নদীয়ায় না যাইয়া দ্রুতপদে একেবারে শান্তিপুরে চলিলেন। তাঁহার সঙ্গী ভক্তগণ প্রভুর প্রত্যাগমন সংবাদ, পথ হইতে শ্রীনবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন। শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণ শুনিলেন যে, প্রভু শান্তিপুরে যাইতেছেন ও সেখানে শচীমাতার নিমিত্ত কিছু দিন থাকিবেন। প্রভু যে গৌড় হইতেই দেশে প্রত্যাগমন করিবেন, এ কথা কেহ কোন প্রকারে পূর্বে জানিতেন। সে বড় রহস্যের কথা। বৃন্দাবনে প্রভু হাঁটিয়া যাইতেছেন, এই নিমিত্ত পরম শক্তিসম্পন্ন নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রভুর গমন সুলভের নিমিত্ত, মনে মনে একটি জাঙ্গাল প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই মানসিক পথের দুই ধারে সুগন্ধি কুসুম শোভিত বৃক্ষ সমুদয় রোপন করিলেন, তাহার উপর কোকিল ও ময়ূর বসাইলেন। এইরূপে মনে মনে প্রভুকে প্রত্যহ লইয়া যাইতেছেন। প্রভুর প্রত্যেক শ্রীপদের নিম্নে একটি পদ্মফুল রাখিতেছেন, যেন উহাতে ব্যথা না লাগে। ব্রহ্মচারী এইরূপে প্রভুকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন। কিন্তু আর এই জাঙ্গাল বান্ধিতে পারেন না। বহু কষ্টেও জাঙ্গাল বান্ধিতে না পারিয়া, বুঝিলেন যে প্রভু আর অগ্রবর্তী হইবেন না। তখন তিনি এ কথা প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, প্রভু এবার বৃন্দাবন যাইবেন না, কানাই-নাটশালা হইতে ফিরিবেন। উপরে ব্রহ্মচারীর যে রঙ্গ বলিলাম, ইহাকে বলে "মানসিক-সেবা"। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অতি শীঘ্র লাভ করা যায়। এইরূপ করিয়া শ্রীভগবানের সঙ্গ করাই প্রকৃত ভজন।

শচীমাতার নিকট বিদায় লইয়া প্রভু বৃন্দাবন গমন করিয়াছেন। পুত্রকে বিদায় দিয়া শচী সাধারণের চক্ষে, বড় দুঃখে দিন কাটাইতেন। কিন্তু প্রভুর কৃপায় তাঁহার অন্তরে কোন দুঃখ ছিল না। যেহেতু প্রভু যেই তাঁহার নিকট বিদায় লইতেন, অমনি তিনি কৃষ্ণবিরহে বিহ্বল হইয়া সংসারের সব কথা ভুলিয়া যাইতেন। শচীর মনের ভাব যে, তিনি যশোদা। মনের ভাবত বটেই, প্রকৃতও তিনি তাহাই। আর তাঁহার যে পুত্র কৃষ্ণ, তিনি মথুরায় গিয়াছেন। যে কোন ভাবেই হউক, কৃষ্ণ-সম্বন্ধ থাকিলেই, তাহা আনন্দময় হয়। বিরহ বড় দুঃখের বস্তু, কিন্তু কৃষ্ণবিরহ বড় সুখের সামগ্রী। সুতরাং যদিও শচীর ভাব দেখিয়া লোকের হৃদয় বিদীর্ণ হইত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি আনন্দে বিহ্বল থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীতে কোন লোক আসিল। শচী ভাবিলেন, ইনি বিদেশী, অবশ্য মথুরার সংবাদ রাখেন। শচী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তুমি কি মথুরা হইতে আসিয়াছ, আমার কৃষ্ণের সংবাদ বলিতে পার?" একথা শুনিয়া কেবল তাহার কেন, যে কেহ শুনিত, সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইত। কখন বা শচী, যশোদা যেরূপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ করিয়া কৃষ্ণকে বাঁধিতে চলিলেন, কখন বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এ সমুদয় আর কিছুই নয়, কেবল শ্রীকৃষ্ণ শচীর সহিত এইরূপে খেলা করিতেন। তুমি আমি যাহাই ভাবি না কেন, ভাগ্যবতী শচী শ্রীভগবৎ সংসর্গে অতি আনন্দে দিন কাটাইতেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থাও ঠিক শচীর ন্যায়।

*মহাজন মুখে ইদানীং এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, মহাপ্রভু গঙ্গার পরপারে গঙ্গারই শাখানদী পদ্মার নিকটে ভক্তপ্রবর নরোত্তম দাসের জন্য 'প্রেমভক্তি' গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। এই প্রকার গচ্ছিত রাখিবার কালে 'নরু-নরু' বলিয়া মহাপ্রভু উচ্চৈস্বরে ডাকিতে ডাকিতে ঐ পদ্মানদীতে অবগাহন অবস্থায় মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। 'নরু' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, নরোত্তম দাস বলিয়া মহাপ্রভু ডাকেন নাই।

শচী শুনিলেন, নিমাই শান্তিপুরে যাইতেছেন, সেখানে তাঁহার নিমিত্ত কিছুদিন অপেক্ষা করিবেন। অমনি শচীর আবার জগতের কথা মনে পড়িল, আর তিনি "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। গঙ্গাদাস, মুরারি এবং নদীয়ার অন্যান্য ভক্তগণ শচীমাতাকে লইয়া শান্তিপুরে চলিলেন। এদিকে প্রভু সঙ্গোপাঙ্গ সহিত হঠাৎ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মন্দিরে উদয় হইলেন। হঠাৎ প্রভুর উদয় দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত আনন্দে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। ওদিক হইতে শচী দোলায় চড়িয়া শান্তিপুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শচী দোলায় বাহির হইলে প্রভু অমনি দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। তাহার পর প্রভু উঠিয়া শ্লোক পড়িতে পড়িতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "তুমি যশোদা, তুমি দেবকী, তুমি জীবের বন্ধু, তুমি কৃপাময়ী, স্নেহময়ী, আমার এ দেহ তোমার, তুমি এক তিলে আমাকে যে সেবা করিয়াছ, বহু যুগে আমি তাহা শোধ দিতে পারিব না।" প্রভু জননীকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, স্তুতি করিতেছেন, আর রোদন করিতেছেন। শচী হাঁ করিয়া পুত্রমুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। শচী পূর্বে যাহা একবার বলিয়াছেন, আবার সেই কথা বলিলেন। বলিলেন, "নিমাই, তুমি আমাকে প্রণাম কর, তাহাতে আমার ভয় করে।" প্রভু বলিলেন, "মা, আমি কৃষ্ণভক্তির কাঙ্গাল। যদি আমার কিছু কৃষ্ণভক্তি হইয়া থাকে সে কেবল তোমা হইতে, ইহা আমি সত্য সত্য বলিতেছি।"

শচী অভ্যন্তরে গমন করিলেন, আর অমনি রন্ধনের ভার লইলেন। রন্ধন হইল, নিতাই ও গৌর দুই জনে ভোজনে বসিলেন। প্রভু কি কি ভালবাসেন, শচী তাহা জানেন, তাই সেই সমুদয় সামগ্রী সংগ্রহ করা হইয়াছে। সে সমুদয় সামগ্রীও যে বড় দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান তাহা নহে। প্রভুর শাকে বড় রুচি-বিংশতি প্রকারের শাক রন্ধন করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস প্রভুকে বড় ভালবাসেন, আর প্রভু যাহাকে বা যে দ্রব্য ভালবাসেন তিনিও তাহাকে ও সেই দ্রব্যকে ভক্তি করেন এবং ভালবাসেন। প্রভু শাক ভালবাসেন, তাহাই ঠাকুর বৃন্দাবন দাস আর শাককে শাক বলেন না, শাককে বলেন "শ্রীশাক"। প্রভুদ্বয় ভোজনে বসিলে, ভক্তগণ তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিলেন, আর শচী একটু আড়ালে বসিয়া ভোজন দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রভুর আনন্দের সীমা নাই, কাজেই নানাবিধ রহস্য কথা বলিতে লাগিলেন। সম্মুখে নানাবিধ শাক দেখিয়া, "শ্রীশাক"গণের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি শাকের পক্ষপাতি বলিয়া তোমরা আমাকে অন্তরে অন্তরে বিদ্রূপ কর, কিন্তু শাকের কি মহিমা তাহা শ্রবণ কর। এই যে হেলাঞ্চা শাক, ইনি দেহ রক্ষা করেন, আর পরোক্ষে কৃষ্ণভক্তি দান করেন।" এ কথা শুনিয়া সকলে হাস্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভু ইহাতে নিরস্ত হইলেন না, গম্ভীর ও নিরপেক্ষভাবে অন্যান্য শ্রীশাকের গুণবর্ণনা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "বাস্তুশাক ভোজনে রাধারাণীর কৃপা হয়।" হায়! যদি বাস্তুশাক ভোজনে রাধাকৃষ্ণের কৃপা হইত তবে দুবেলা এই শাক খাইতাম। সে যাহা হউক, এইরূপ হাস্যকৌতুকে ভোজন সমাপ্ত হইল। তখন সকলে সেবার পাত্র লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিলেন।

প্রভুর যদিও সত্বর যাইতে মন, কিন্তু মাধবেন্দ্র-নির্বাণ তিথি সম্মুখে। মাধবেন্দ্র অদ্বৈত প্রভুর গুরু। তাই আচার্য্য তাঁহার বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে সর্বস্বনিক্ষেপ করিয়া থাকেন। প্রভু সেই মহোৎসবের অনুরোধে আর কয়েক দিবস শান্তিপুরে রহিলেন। এই অবকাশে প্রভু গৌরীদাসের স্থানে শান্তিপুরের ওপারে কালনায় গমন করিলেন। তখন শীতকাল প্রায় গত হইয়াছে, ভক্তগণ সকলে রবির তাপে কষ্ট পাইতেছেন। প্রভু তখন কালনায় এই অদ্ভুত কথা বলিলেন, "বড় গ্রীষ্ম হইতেছে, একবার নাম-কীর্তন কর, শরীর জুড়াইয়া যাউক।" তাহাই এই গীতের সৃষ্টি হইল—"হরিবল জুড়াক্ হিয়ারে।" বড় গ্রীষ্ম হইতেছে, হরিনাম কর শরীর শীতল হইবে, এই কথা বলিবার অধিকারী একমাত্র কেবল আমার প্রভু। গৌরীদাসের

ওখানে মহামহোৎসব হইল। গৌরীদাস নিতাই গৌরের চরণে পড়িয়া বর মাগিলেন যে, তাঁহারা দুইজনে তাহার বাড়ীতে থাকুন। যেহেতু তাঁহারা না থাকিলে তিনি প্রাণে মরিবেন। তথাস্তু বলিয়া দুই ভাই ঠাকুর-ঘরে রহিলেন। পাছে প্রভু পলায়ন করেন এই ভয়ে গৌরীদাস ঠাকুর-ঘরে শিকল দিয়া বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখেন যে, গৌর নিতাই দুই ভাই বাহিরে দাঁড়াইয়া। তখন তাড়াতাড়ি ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া দেখেন যে, যে জীবন্ত-ঠাকুর তিনি ঘরে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা বিগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তখন গৌরীদাস বলিলেন, "ও হইল না, যাঁহারা ঘরে আছেন, তাঁহারা যাউন, তোমরা আইস।" ইহাই বলিয়া বাহিরের সেই জীবন্ত ঠাকুরদ্বয়কে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ইহাতে বাহিরের দুই ভাই ঘরে আসিয়া বিগ্রহ হইলেন, আর পূর্বে যাঁহারা বিগ্রহরূপে ছিলেন, তাঁহারা জীবন্ত হইয়া বাহিরে চলিলেন। এইরূপ বার বার হইতে লাগিল, কাজেই নিরুপায় হইয়া গৌরীদাস যা পাইলেন তাহাই রাখিলেন,—ভালই পাইলেন। জনশ্রুতিতে যেরূপ কাহিনী শুনা যায়, তদ্রূপ বলিলাম। কিন্তু পদকল্পতরুতে এই সম্বন্ধে দীন কৃষ্ণদাস বা শ্যামানন্দ (যিনি উৎকল উদ্ধার করেন) রচিত এই তিনটি পদ আছে। যথা ঃ

(১)

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি, নিত্যানন্দ বলে হরি হরি।
কান্দি গৌরীদাস বোলে, পড়ি প্রভুর পদতলে, কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী।।
আমার বচন রাখ, অম্বিকানগরে থাক, এই নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি, রহিব সে নিরখিয়া কায়।।
তোমরা যে দুটি ভাই, থাক মোর এই ঠাঞি, তবে সবার হয় পরিত্রাণ।
পুণ নিবেদন করি, না ছাড়িহ গৌরহরি, তবে জানি পতিত-পাবন।।
প্রভু কহে গৌরীদাস, ছাড়হ এমত আশ, প্রতিমূর্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছিয়ে আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি, সত্য মোর এই বাক্য রাখ।।
এত শুনি গৌরীদাস, ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস, ফুকরি ফুকরি পুন কান্দে।
পুন সেই দুই ভাই, প্রবোধ করয়ে তায়, তমু হিয়া থির নাহি বান্ধে।।
কহে দীন কৃষ্ণদাস, চৈতন্য চরণে আশ, দুই ভাই রহিল তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হৈলা দুইজনে, ভকত বৎসল তেঁঞি গায়।।

(২)

আকুল দেখিয়া তারে, কহে গৌর ধীরে ধীরে, আমরা থাকিলাম তোর ঠাঞি।
নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি, রহিলাম এই দুই ভাই।।
এতেক প্রবোধ দিয়া, দুই খানি মূর্তি লৈয়া, আইলা পণ্ডিত বিদ্যমান।
চারিজনে দাঁড়াইল, পণ্ডিত বিস্ময় ভেল, ভাবে অশ্রু বহয়ে নয়ান।।
পুন প্রভু কহে তারে, তোর ইচ্ছা হয় যারে, সেই দুই রাখ নিজ ঘরে।
তোমার প্রতীতি লাগি, তোর ঠাঞি খাব মাগি, সত্য সত্য জানিহ অন্তরে।
শুনিয়া পণ্ডিতরাজ, করিলা রন্ধন কাজ, চারিজনে ভোজন করিলা।
পুষ্প মাল্য বস্ত্র দিয়া, তাম্বুলাদি সমর্পিয়া, সর্ব অঙ্গে চন্দন লেপিলা।।
নানা মতে পরতীত, করি ফিরাইল চিত, দোঁহারে রাখিলা নিজ ঘরে।
পণ্ডিতের প্রেম লাগি, দুই ভাই খায় মাগি, দোঁহে গেলা নীলাচলপুরে।।
পণ্ডিত করয়ে সেবা, যখন যে ইচ্ছা যেবা, সেই মত করয়ে-বিলাস।
হেন প্রভু গৌরীদাস, তার পদ করি আশ, কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস।।

(৩)

শ্রীবৃন্দাবন নাম, রত্ন চিন্তামণি ধাম, তাহে কৃষ্ণ বলরাম পাশ।
সুবলচন্দ্র নাম ছিল, এবে গৌরীদাস হৈল, অম্বিকানগরে যার বাস।।
নিতাই চৈতন্য যার, সেবা কৈলা অঙ্গীকার, চারি মূর্তি ভোজন করিলা।
পুরুবে সুবল যেন, বশ কৈলা রাম কানু, পরতেক এখানে রহিলা।।
নিতাই চৈতন্য বিনে, আর কিছু নাহি জানে, কে কহিবে প্রেমের বড়াই।
সাক্ষাতে রাখিল ঘরে, হেন কে করিতে পারে, নিতাই চৈতন্য দুই ভাই।।
প্রেমে লম্ফ ঝম্প যায়, পুলকিত হুহুঙ্কার, ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে হাস।
তাঁর পাদপদ্ম রেণু, ভূষণ করিয়া তনু, কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস।।

প্রভু শান্তিপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া মাধবেন্দ্রপুরীর মহোৎসব পর্য্যন্ত রহিলেন। এই মহোৎসবের রন্ধনের ভার সমুদয় শচীদেবীর উপর পড়িল। এই মহোৎসবের সঙ্গে প্রভুর নদীয়া-বিহার ফুরাইল। প্রভু জননীর নিকট বিদায় লইলেন। শচী বুঝিলেন এই শেষ দেখা, অর্থাৎ চর্মচক্ষের এই শেষ দেখা। যেহেতু শচী ইচ্ছা করিলেই দিব্যচক্ষে প্রভুকে সর্বদা আপন ঘরে দেখিতে পাইতেন।

এই সময়ে রঘুনাথ দাস শান্তিপুরে আসিয়া প্রভুর শ্রীচরণে পড়িলেন। সপ্তগ্রামের অধিপতি হিরণ্য ও গোবর্ধন দুই ভাই কায়স্থ, ইহারা বার লক্ষ কাহনের অধিকারী। সেই গোবর্ধনের পুত্র রঘুনাথ। প্রভু সন্ন্যাস করিয়া যখন শান্তিপুরে আইসেন তখন রঘুনাথ বালক; প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ৫। ৭ দিন প্রভুকে দর্শন কবিয়া তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল এবং সংসারে বাস অসহ্য হইয়া পড়িল। প্রভু সেখান হইতে নীলাচল গমন করিলেন। রঘুনাথ বারংবার সেখানে পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করেন, আর ধরা পঁড়েন। এবার প্রভু শান্তিপুরে আসিলে রঘুনাথ পিতার নিকট অনেক মিনতিপূর্বক আজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। প্রভু তাঁহাকে অনেক কৃপা করিয়া উপদেশ দিলেন। বলিলেন, "তুমি বাড়ী যাও, স্থির হইয়া অন্তর নিষ্ঠা কর। সংসারের কাজ সমুদয় করিও, কিন্তু উহাতে অনাবিষ্ট থাকিও, আর লোক দেখাইয়া কপট বৈরাগ্য করিও না। অনায়াসে যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিও, কিন্তু উহাতে মুগ্ধ হইও না। লোক একেবারে সাধু হয় না, তুমি এইরূপ ব্যবহার কর, উপযুক্ত সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবেন।" ইহাই বলিয়া, প্রভু তাঁহাকে গৃহে বিদায় করিয়া দিলেন। হে গৃহী-পাঠক মহাশয়গণ! প্রভুর এই শিক্ষাগুলি পালন করিতে চেষ্টা করুন।

প্রভু সেখান হইতে কুমারহট্টে আসিলেন। শ্রীবাস তখন তাঁহার কুমারহট্টস্থ আলয়ে বাস করিতেছিলেন। শ্রীবাস, শিবানন্দ সেন ও বাসুদেব দত্ত প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর সহিত নিজগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রভু অবশ্য শ্রীবাসের বাড়ী ভিক্ষা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কিরূপে সংসার-যাত্রা সমাধা করেন, যেহেতু তাঁহার পরিবার বৃহৎ ও তিনি কিছুই করেন না। শ্রীবাস ইহাতে হাতে তিন তালি দিয়া বলিলেন, "এই আমার সঙ্কল্প।" শ্রীবাস এই সঙ্কেত দ্বারা ইহাই বলিলেন, "একদিন, দুইদিন, তিনদিন পর্য্যন্ত উপবাস করিব। ইহাতে যদি কৃষ্ণ অন্ন না দেন, তবে গঙ্গায় প্রবেশ করিব। প্রভু ইহাতে হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "শ্রীভগবানে এত বিশ্বাস! আচ্ছা আমি তোমাকে বর দিতেছি যে, যদি লক্ষ্মী স্বয়ং কখনও উপবাস করেন, তবু তুমি কখনও অন্নকষ্ট পাইবে না!" শ্রীবাসের দৌহিত্র শ্রীবৃন্দাবন দাস তাঁহার গ্রন্থে এই কাহিনী বলিয়া গৌরব করিয়া বলিতেছেন—"তাই, সেই বরে আমার দাদার ঘরে অন্ন কষ্ট নাই।" প্রভু সেখান হইতে তাঁহার মাসী ও মাসীপতি চন্দ্রশেখরের বাড়ী গমন করিলেন। প্রভু তাঁহাদের ছেলে, তাই অভ্যন্তরে গমন করিলেন। এমন সময় একটি অবগুণ্ঠনবতী যুবতী স্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রভু আশীর্বাদ করিলেন, "তুমি

পুত্রবতী হও।" একথা শুনিয়া সেই যুবতী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। প্রভু ইহাতে একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "কেন, কি হইল?" তখন শুনিলেন, সেই যুবতী শ্রীখঞ্জ ভগবান আচার্য্যের স্ত্রী। শ্রীভগবান আচার্য্য "প্রভুকে না দেখিলে মরেন।" এই নিমিত্ত বিবাহ করিয়া, স্ত্রীকে শ্রীবাসের বাড়ী ফেলিয়া নীলাচলে প্রভুর নিকট বাস করেন। তাহার পরে ভগবানের স্ত্রী চন্দ্রশেখরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রভু এই সমুদয় কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। পরে বলিলেন, "আমার আশীর্বাদ ব্যর্থ হইবার নয়। তুমি সত্যই পুত্রবতী হইবে।" ইহার পর প্রভু নীলাচলে গমন করিয়া ভগবানকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, তুমি গৃহে গমন কর। তোমার পুত্র সন্তান হইলে তখন তুমি আমার নিকট আগমন করিও। এই আজ্ঞায় শ্রীভগবান দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তাঁহার দুইটি মহাতেজস্বী পুত্র হইল।

প্রভু নীলাচলাভিমুখে দ্রুত চলিলেন। পানিহাটী রাঘবের বাড়ীতে দুই এক দিবস রহিলেন। সেখান হইতে বরাহনগরে শ্রীভাগবতাচার্য্যের নিকট শ্রীভাগবত শুনিয়া অনেক নৃত্য করিলেন। পরে দ্রুতগতিতে নীলাচলে আগমন করিলেন। ধ্বনি হইল, প্রভু আসিতেছেন, আর শ্রীক্ষেত্রের লোক প্রভুকে দর্শন করিতে ধাবিত হইলেন। গদাধরও আইলেন। গদাধর প্রভুর শ্রীমুখ দর্শন করিয়া আনন্দে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। যাঁহার মুখ দেখিয়া কেহ আনন্দে মূর্ছিত হয়েন তিনিও ধন্য, আর যিনি মূর্ছিত হয়েন তিনিও ধন্য। তাই শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম "গদাধরের প্রাণনাথ।"

ভক্তগণ আসিয়াছেন। প্রভু ও ভক্ত সকলে বসিলেন। প্রভু আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন, শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে একটুও আরাম পাই নাই। দিবানিশি লোকের কলরব। লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গে চলিল। কানাই-নাটশালা গ্রামে সনাতন আমাকে উপদেশ দিলেন যে, এত লোক লইয়া বৃন্দাবনে যাওয়ার সুখ পাইবেন না। আমি বুঝিলাম, শ্রীকৃষ্ণ সনাতনের মুখে আমাকে উপদেশ করিলেন। কারণ এত লোক লইয়া বৃন্দাবনে গেলে লোক ভাবিবে যে, আমি বাজিকর সাজিয়া, হৈ হৈ করিয়া, বৃন্দাবনে গমন করিতেছি। সে অতি নিভৃত পবিত্র স্থান, সেখানে একা যাইব, না হয় একজন সঙ্গে থাকিবে। আমি কাজেই সেখান হইতে নিবৃত্ত হইলাম। আমি তখন বুঝিলাম যে, আমি গদাধরের নিকট অপরাধ করিয়াছি, তাই আমার যাওয়া হইল না। গদাধরকে দুঃখ দিয়া গমন করিলাম, আর তাহার ফল এই হইল যে, আমায় ফিরিয়া আসিতে হইল। উহাতে গদাধর কৃতার্থ হইয়া গলায় বসন দিয়া চরণে পড়িলেন; পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু! তোমার বৃন্দাবনে যাওয়া কেবল লোক-শিক্ষার নিমিত্ত। বৃন্দাবন আর কোথা? যেখানে তুমি সেইখানেই বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে যাইবে তাহাতে বাধা কি? সম্মুখে চারিমাস বর্ষা আসিতেছে, ইহার অন্তে আপনি স্বচ্ছন্দে গমন করিবেন।" সকলে ইহাতে বলিলেন, "পণ্ডিতের যে মত ইহাই সর্ববাদিসম্মত।" তখন প্রভু গদাধরকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। সে দিবস প্রভু গদাধরের স্থানে সেবা করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রচার-কার্য্যের জন্য গৌড়ে রহিলেন। প্রভু গৌড়ীয় ভক্তগণকে বলিয়া আসিয়াছেন, আমার সঙ্গে এই দেখা হইল, তাঁহারা এবার যেন আর নীলাচলে গমন না করেন। সুতরাং এবার রথ-যাত্রার সময় প্রভু কেবল নীলাচল-ভক্তগণকে লইয়া এই শুভকার্য্য সম্পাদন করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমায় বলরে, কতদূর বৃন্দাবন। আমায় দিবেন কি কৃষ্ণ দরশন।।

গৌর-উক্তি—প্রাচীন গীত।

প্রভু যখন শান্তিপুরে শচীমাতার নিকট বিদায় হয়েন, তখন বৃন্দাবন যাইবার অনুমতি ভিক্ষা মাগিলেন। বলিলেন, "মা, বার বার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বৃন্দাবনে যাইতে পারিলাম না।

তুমি স্বচ্ছন্দ মনে আমাকে অনুমতি দাও।" শচী ধীরে ধীরে বলিলেন, "দিলাম"; ইহা বলিয়া জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কাঙ্গালিনীর ন্যায় পুত্রের মুখপানে চাহিলেন। প্রভু সে দর্শনে মর্মাহত হইলেন এবং বদন হেঁট করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার পর প্রভু শান্ত হইয়া, একথা-ওকথা বলিয়া জননীর নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন। প্রভু গমন করিলেন কিন্তু শচীর মনে একটি কথা বারংবার উদয় হইতে লাগিল—"নিমাই কান্দিল কেন? যাইবার সময় কান্দিল কেন?" শচী আপনা-আপনি এই কথা প্রথমে ভাবিতে লাগিলেন। পরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে, ক্রমে মুরারিকে, শ্রীবাসকে, এইরূপে জনে জনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"নিমাই যাইবার বেলা এরূপ কান্দিল কেন? তাঁহারা ইহাই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে, কান্দিবার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না। ঠাকুর জননী-বৎসল, তাই বিদায় কালে কান্দিয়াছিলেন। শচী প্রবোধ মানিলেন না। তিনি উত্তরে বলিলেন, "তাহা নয়, তোমরা নিমাইয়ের কি বুঝ? নিমাইয়ের সঙ্গে বিদায়ের বেলা যখন আমার চক্ষে চক্ষে মিলন হইল, তখন সে আমাকে অন্তরে অন্তরে আর একটি কথা বলিয়াছিল। তাহার অর্থ—"মা, এই জন্মের মত দেখা, আর দেখা হইবে না। তা না হইলে, যাইবার বেলা কান্দিবে কেন?" "যাইবার বেলা কেন কান্দিল" বলিতে বলিতে শচী নবদ্বীপে গমন করিলেন, সেখানে যাইয়াও উহাই বলিতে বলিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে প্রভু নীলাচলে কি করিতে লাগিলেন, শ্রবণ করুন।

প্রভুর মুখে এক কথা, আর মনেও সেই এক ভাব যে, "কবে বৃন্দাবন যাইব? কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা নিধুবন, কাঁহা কৃষ্ণ-বিহারের স্থান? কবে আমার বৃন্দাবন দর্শন হইবে? কবে আমি বনস্থলীতে গড়াগড়ি দিব? যমুনায় স্নান করিব?" প্রভুর এইরূপ আক্ষেপ-উক্তিতে ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

প্রভুর ছল-ছল আঁখি ম্লান বদন। স্বরূপকে নিকটে ডাকিলেন। স্বরূপ আসিলে, প্রভু অমনি তাঁহার হাত দু'খানি ধরিলেন, ধরিয়া অতি কাতরভাবে বলিলেন, "স্বরূপ! আমাকে বৃন্দাবনে যাওয়ার সাহায্য কর, তোমায় মিনতি করি।" স্বরূপ আশ্বাস বাক্য বলিতে লাগিলেন। রামরায় আইলেন, তাঁহাকেও প্রভু নিকটে লইয়া বসিলেন। তাঁহার নিকটেও ঐ এক কথা,—"আমার ভাগ্যে কি বৃন্দাবন দর্শন হইবে?" রামরায়ও আশ্বাস বাক্য বলিলেন। প্রভুকে যে কেহ দর্শন করিতে যাইতেছেন, প্রভু তাঁহাকে কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি দর্শন সত্য করিয়া বল, আমার কি শ্রীবৃন্দাবন দর্শন ঘটিবে?" এইরূপে প্রভুর দিবানিশি কাটিতে লাগিল। ভক্তগণের মনে হইল যে, বৃন্দাবন না দেখিলে প্রভু প্রাণে মরিবেন। "বৃন্দাবন, বৃন্দাবন", করিয়া প্রভু রোদন করেন, আর সেই সঙ্গে ভক্তগণও রোদন করেন। জীবশিক্ষার নিমিত্ত প্রভুর অবতার; কিরূপে বৃন্দাবন যাইতে হয়, প্রভু তাহাই শিক্ষা দিলেন।

তখন সকলে যুক্তি করিয়া প্রভুকে বৃন্দাবন পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য একজন ব্রাহ্মণ-ভৃত্য সঙ্গে করিয়া তীর্থ পর্য্যটন আশায় নীলাচল আগমন করিয়াছেন। ভৃত্যের সহিত তাঁহাকে প্রভুর সঙ্গে দেওয়া হইল। প্রভু বনপথে যাইবেন, এই স্থির হইল; দিনও স্থির হইল। প্রভু আবার বিজয়া-দশমী দিনে অতি প্রত্যুষে বৃন্দাবন চলিলেন। লোকসংঘটন ভয়ে প্রভুর গমনবার্তা দুই চারিজন মর্মী-ভক্ত ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারিলেন না। প্রভু কটক ডাহিনে রাখিয়া নিবিড় বনপথে ঝাড়িখণ্ড দিয়া চলিলেন। প্রভুর সঙ্গী-দুইজনের সহিত এই সাব্যস্ত হইয়াছে যে, তাঁহারা বড় একটা কথা বলিবেন না। প্রভু আপন মনে যাইবেন। তাই প্রভু আপনার মনে চলিয়াছেন। অগ্রে বলভদ্র পথ দেখাইয়া চলিতেছেন, প্রভু বিহ্বল অবস্থায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঢলিতে ঢলিতে যাইতেছেন। মধ্যাহ্ন সময়

হইলে সঙ্গীগণ প্রভুকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। প্রভু পুত্তলিকার ন্যায় সেখানে বসিলেন। প্রভু আবিষ্ট চিত্তে স্নান করিলেন, ভোজন করিলেন, বিশ্রাম করিলেন; আবার আবিষ্ট চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। রজনী আসিল, আশ্রয়-স্থান নাই, অমনি বনে রহিয়া গেলেন। শীত উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু বনে কাষ্ঠের অভাব নাই। অগ্নি সম্মুখে রাখিয়া সকলে নিশিযাপন করিলেন।

যে ঝাড়িখণ্ডে এখনও বন্যপশুর ভয়ে দিবাভাগে বিচরণ করা যায় না, তখন সেখানকার কি অবস্থা ছিল, মনে করুন। প্রভু যে পথে চলিলেন, সে পথে কেহ কখন যায় নাই, কাহারও যাইতে সাহসও হয় না। প্রভু নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন, ১০। ১৫ দিনের পথের মধ্যে লোকালয় নাই। অবশ্য ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার তাঁহাদিগকে ঘিরিল। বলভদ্রের ভয় হইল, কিন্তু প্রভুর হিংস্র জন্তুগণের প্রতি, লক্ষ্যও নাই। বন্যপশুও আসিল, প্রভুকে দর্শন করিয়া, হয় ফিরিয়া গেল, না হয় মোহিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। প্রভু স্নান করিতেছেন, এমন সময় হস্তিযুথ জলপান করিতে আসিল। প্রভুকে দর্শন করিয়া তাহাদের হিংসাবৃত্তি অন্তর্হিত হইল। প্রভু গমন করিতেছেন, পথে ব্যাঘ্র শয়ন করিয়া রহিয়াছে। প্রভুর চরণ তাহার গাত্র স্পর্শ করিল। সে কৃতার্থ হইয়া, অতি নম্রভাবে পথ ছাড়িয়া দিল। কখন কখন বা ব্যাঘ্র আকৃষ্ট হইয়া প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মৃগ প্রভৃতিও সেই সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। এই রূপে ব্যাঘ্র ও মৃগে দেখা-সাক্ষাৎ হইতেছে, এমন কি এক সঙ্গে চলিয়াছে। অতি হিংস্র জন্তুগণের মনেও কোমলভাব আছে। দেখ না, ব্যাঘ্র পর্য্যন্তও আপন শাবককে লইয়া পালন করিতেছে, শাবকগণের নিমিত্ত প্রাণ দিতেছে। বন্য কুকুরের হিংস্র ভাব, আর পালিত কুকুরের প্রভুভক্তি দেখ। অবশ্য বন্য কুকুরের হৃদয়ে এই কোমলভাবের অঙ্কুর ছিল, আর উহা, মনুষ্য সহবাসে ক্রমে লালিত-পালিত হইয়া সদ্‌গুণবিশিষ্ট হইয়াছে। যদি ভারি বন্যা হয়, তবে কেহ কাহার হিংসা করে না। সাধারণ বিপদে তাহাদের হিংস্রভাব দূরীভূত হয়। সেইরূপ প্রভুর দর্শনে তাহাদের হিংস্রভাব বিলুপ্ত হইয়া কোমল ভাব উদ্দীপ্ত হইয়াছে। কাজেই ব্যাঘ্র ও মৃগ মুখ শুকাশুঁকি করিতে লাগিল। এই মনোহর দৃশ্য দেখিয়া প্রভুর সঙ্গীগণ অবাক হইলেন এবং প্রভুও সুখী হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। প্রভু গীত ধরিলেন, আর সমস্ত জগৎ সুশীতল হইল। পক্ষী সকল আনন্দে সেই সঙ্গে ধ্বনি করিয়া উঠিল। প্রভু উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিলেন, আর যেন সমস্ত জগৎ এই নামে প্রতিধ্বনিত হইল, বৃক্ষলতা কুসুমিত হইল, পুষ্প হইতে মধু ঝরিতে লাগিল। প্রভু একদিন সহজ অবস্থায় বলভদ্রকে বলিলেন, "কৃষ্ণ কৃপাময়, এই বনপথে আমাকে আনিয়া বড় সুখ দিলেন।" প্রত্যহ বন্য-ভোজন, সর্বদা জনশূন্যতা, পক্ষীর কোলাহল, ময়ূরের নৃত্য, পশুগণের স্বাভাবিক জীবন, বনের শোভা, এই সমুদয় প্রভুকে মোহিত করিল। প্রভু কখন কখন বন ত্যাগ করিয়া গ্রাম পাইতেছেন। কিন্তু লোকসমাজ অতি অসভ্য। তাহারাও তাহাদের সঙ্গী ব্যাঘ্র-ভল্লুকের ন্যায় হিংস্র। কিন্তু তবু প্রভুকে দর্শন করিয়া তাহারা পরিশেষে ভক্তিতে উন্মত্ত হইতেছে। এমন কি, গ্রাম সমেত বৈষ্ণব হইতেছে। এইরূপে প্রভু বারাণসীতে মনিকর্ণিকার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে অনেকে স্নান করিতেছেন। হঠাৎ সকলে দেখিলেন যে, একটি অতি দীর্ঘকায়, পরম সুন্দর, পরম মধুর ও পরম স্নিগ্ধ বস্তু প্রেমে টলিতে টলিতে আসিতেছেন। তিনি বয়সে যুবক, তাঁহার বর্ণ কাঁচা সোণার ন্যায়, তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, তাঁহার চক্ষু কমলদলের ন্যায় করুণা-মকরন্দ পূর্ণ, তাঁহার বদন পূর্ণচন্দ্র হইতেও সুখকর। সকলে দেখিলেন যে, তিনি মস্তক অবনত করিয়া, বিহ্বল অবস্থায় কৃষ্ণনাম জপিতে জপিতে, তাঁহাদের মধ্যে উদিত হইলেন। সেই পরম শুভদর্শন সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিলেন। এই সমুদয় লোকের নয়ন অন্য দিকে আর গেল না, প্রভুর শ্রীমুখে আকৃষ্ট হইয়া রহিল। কেহ বা আকৃষ্ট হইয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন।

সকলে ভাবিতে লাগিলেন,—"ইনি যিনিই হউন, আমাদের জাতীয় মনুষ্য নহেন।"

এই সমুদয় লোকের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি ইতিপূর্বে প্রভুকে দেখিয়াছেন। প্রভুর দোসর জগতে নাই, সুতরাং যিনি একবার তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনি আর ভুলিতে পারেন নাই। এই লোকটিও কাজেই দর্শনমাত্রই প্রভুকে চিনিলেন। তখন তিনি দ্রুতগমনে অগ্রবর্তী হইয়া প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন, "আমি তপন মিশ্র।"

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, প্রভু যখন অষ্টাদশ বৎসর বয়সে পূর্ববঙ্গে পদ্মাপারে গমন করেন, তখন সেই দেশের একজন প্রধান লোক, প্রভুকে শ্রীভগবান জানিয়া, তাঁহার শরণাগত হন। আর প্রভু তাঁহাকে বারাণসী গমন করিতে আদেশ করেন; বলিয়াছেন যে, "তুমি তথায় গমন কর, তোমার সহিত আমার সেখানে দেখা হইবে।" সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী এখন সম্পূর্ণ হইল। তপন মিশ্র প্রভুকে সমাদর করিয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। তখন কাশীতে চন্দ্রশেখর নামক বৈদ্য ছিলেন। ইনি শ্রীনবদ্বীপে প্রভুকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন; তিনিও আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন।

কাশী ও নদীয়া ভারতবর্ষের দুই প্রধান স্থান। নদীয়া ন্যায়ের স্থান; কাশী বেদের স্থান। নদীয়ায় তন্ত্র-চর্চা, আর কাশীতে জ্ঞান-চর্চা বহুল পরিমাণে হয়। নদীয়া গৃহী-পণ্ডিতের এবং কাশী সন্ন্যাসী-পণ্ডিতের স্থান। এই সন্ন্যাসীগণের সর্বপ্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী। পাণ্ডিত্যে ও আধ্যাত্মচর্চার ইনি ভারতবর্ষে অদ্বিতীয়। যদিচ ন্যায়শাস্ত্রে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বড়, কিন্তু সরস্বতী বেদে সার্বভৌম অপেক্ষা বড়। প্রেম ও ভক্তিধর্মের দুই প্রধান কণ্টক—নৈয়ায়িকগণ ও মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ। নৈয়ায়িকের শিরোমণি সার্বভৌম প্রভুর অনুগত হইয়াছেন। এখন মায়াবাদীগণের সর্বপ্রধান প্রকাশানন্দ বাকী আছেন। সেই মায়াবাদীগণের সর্বপ্রধান যে প্রকাশানন্দ, তাঁহার নিকট প্রভু আপনি আসিয়া উপস্থিত।

প্রভুর অবতারের কথা প্রকাশানন্দ পূর্বেই শুনিয়াছেন; শুনিয়া প্রথমে কেবল হাস্য করিয়াছেন। তাহার পর শুনিলেন যে, প্রবল-প্রতাপান্বিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার অনুগত হইয়াছেন। তখন একটু উত্তেজিত হইলেন; ভাবিলেন, এই নব-অবতারটিকে ধ্বংস করিতে হইবে। ইহাই ভাবিয়া একটি তৈথিক দ্বারা প্রভুকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন।* পত্রখানিতে সৌজন্যের লেশমাত্র নাই, বরং বিস্তর অবজ্ঞাসূচক বাক্য ছিল। সেই পত্রখানিতে একটি শ্লোক লেখা ছিল, তাহার অর্থ এই যে, মূঢ়লোকেই কাশী ছাড়িয়া নীলাচলে বাস করে। প্রভুও এই পত্র পাইয়া তাহার উত্তরে একটি শ্লোক পাঠাইলেন। প্রভুর পত্র শিষ্টাচার-পরিপূর্ণ। এই পত্র পাইয়া প্রকাশানন্দ প্রভুকে কেবল গালি দিয়া আর একটি শ্লোক লিখিলেন। তাহার অর্থ এই যে, "যে ব্যক্তি উত্তম আহার করে, সে কিরূপে ইন্দ্রিয় নিবারণ করিবে?" প্রভু এই শ্লোকের কোন উত্তর দিলেন না।

অতএব প্রভু ও সরস্বতীতে বেশ জানাশুনা আছে। প্রভু কাশীতে আসিলে সে কথা প্রকাশ পাইল। সূর্য্যের উদয় হইলে কি লোকের জানিতে বাকী থাকে? সকলে বলিতে লাগিল যে, এক অপূর্ব সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, যাঁহাকে দেখিলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ হয়।

ক্রমে একথা প্রকাশানন্দের সভায় উঠিল। একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কাশীতে বাস করিতেন। তিনি সন্ন্যাসীগণের সহিত সর্বদা ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন। তিনি প্রভুকে দর্শন মাত্র তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া দ্রুতগমনে এই শুভ-সংবাদ কাশীর সর্বপ্রধান যে প্রকাশানন্দ, তাঁহাকে বলিতে চলিলেন। তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন যে, এক মহাপুরুষ আসিয়াছেন।

* প্রভু প্রকাশানন্দকে লইয়া যে লীলা করেন, তাহা বিস্তার করিয়া আমি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিয়াছি ঃ এই কারণে এখানে সংক্ষেপে কেবল মূলঘটনা মাত্র লিখিলাম।

তাঁহার লক্ষণ দেখিলে জানা যায় যে, তিনি মনুষ্য নন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু প্রকাশানন্দ প্রভুকে জানেন ও ঘৃণা করেন। মহারাষ্ট্রীয়ের নিকট তাঁহার গুণ বর্ণনা শুনিয়া মাৎসর্য্যে জ্বলিয়া গেলেন; বলিলেন, "জানি জানি, তাহার নাম চৈতন্য। তাহাকে সন্ন্যাসী কে বলে? সে ঘোর ঐন্দ্রজালিক। শুনিয়াছি তাহাকে যে দেখে, সেই শ্রীকৃষ্ণ বলে। আরও শুনিয়াছি যে, প্রবলপ্রতাপান্বিত পণ্ডিত সার্বভৌমও নাকি তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতেছেন। কিন্তু তাহার ভাবকালি এই কাশীতে বিকাইবে না। তুমি সাবধান হও, সেখানে যাইও না। এ সমুদয় লোকের সঙ্গ করিলে দুই কুল নষ্ট হয়।"

কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় প্রভুকে দেখিয়াছেন এবং দেখিয়া তাঁহাতে চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন। তিনি এ কথায় ভুলিবার নয়। প্রভুর কাছে আসিয়া সমুদয় কথা বলিলেন; বলিলেন, "প্রভু, এই গর্বপূর্ণ সন্ন্যাসী বলে কি যে, তোমার ভাবকালী এই কাশীনগরে বিকাইবে না।" প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ভারি বোঝা লইয়া আসিয়াছি, যদি না বিকায় অল্প মূল্যে ছাড়িয়া দিব, নতুবা একেবারে বিলাইয়া দিব।" মহারাষ্ট্রীয় বলিলেন, "প্রভু, আর এক তামাসা শুনুন। সে আপনাকে বেশ জানে; দেখিলাম আপনার উপর ভারি রাগ, এমন কি আপনার নামটা পর্য্যন্ত করিলে তাহার সহ্য হয় না। সে তিনবার আপনার নাম করিল, তিনবারেই বলে 'চৈতন্য',—'কৃষ্ণ-তৈচন্য' একবারও বলিল না।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "সে রাগের নিমিত্ত নয়। যাহারা কেবল 'আমি ঈশ্বর', 'আমি ঈশ্বর' ইহাই ধ্যান করে, তাহাদের মুখে সহজে কৃষ্ণনাম আইসে না। যাহা হউক, প্রভু পরদিন বৃন্দাবনের দিকে ছুটিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ও চন্দ্রশেখর সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, প্রভু কাহাকেও লইলেন না। প্রয়াগে আসিয়া প্রভু সত্যই যমুনা দর্শন করিলেন। সেবার প্রভু জাহ্নবীকে যমুনা বোধ করিয়া ঝাঁপ দিয়াছিলেন, এবার সত্যই যমুনা প্রভুর সম্মুখে,—যে যমুনাতীরে কৃষ্ণ বিচরণ করিয়াছেন, আর গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত কেলি করিয়াছেন। প্রভু ছুটিলেন এবং যমুনার তীরে আসিয়া অমনি ঝাঁপ দিলেন। বলভদ্র সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া আসিলেন এবং দেখিলেন প্রভু ঝাঁপ দিলেন। শীতকাল, তিনি সেই সঙ্গে ঝাঁপ দিলেন না। কিন্তু প্রভু ঝাঁপ দিয়াছেন, আর উঠিবেন কেন? তখন বলভদ্র ভয় পাইয়া ঝাঁপ দিয়া প্রভুকে উঠাইলেন। প্রভু প্রয়াগে তিন দিন রহিলেন, যমুনা দর্শনে প্রভুর অঙ্গ একেবারে প্রেমে এলাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে প্রভুর আগমনবার্তা প্রয়াগে ছড়াইয়া পড়িল। তখন লক্ষ লক্ষ লোক দেখিতে আসিতে লাগিল, আর প্রেমে পাগল হইয়া প্রভুর নিকটে থাকিয়া গেল। প্রভু যে তিন দিন প্রয়াগে রহিলেন, সে তিন দিন কেবল হরিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুনা যায় নাই। সেখান হইতে প্রভু দ্রুতপদে চলিলেন। ভিক্ষার নিমিত্ত যেখানে রহিতেছেন, সেইখানেই প্রভুর চতুর্দিকে অসংখ্য লোকে হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রভু দক্ষিণ দেশে যেরূপ লীলা করিয়াছিলেন, এখানেও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু (যথা চরিতামৃতে)—

"পথে যাঁহা হয় যমুনা দর্শন। তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন।।"

প্রভু আনন্দে যমুনায় ঝাঁপ দিতেছেন; আর যদিও শীতকাল তবুও উঠিতেছেন না। প্রত্যেক বারে তাঁহাকে উঠাইতে হইতেছে। অবশেষে সত্য সত্যই মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রভুর এক ক্ষোভ ছিল, তিনি বৃন্দাবন দর্শন করেন নাই। এই ক্ষোভ জ্বলন্ত অঙ্গাররূপে হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল, তাই জনা-জনার গলা ধরিয়া এই বলিয়া রোদন করিয়াছেন,—"আমি কবে বৃন্দাবনে যাবো, কবে বৃন্দাবনের ধূলায় ভূষিত হবো।" তখন প্রভু বৃন্দাবনের নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠিতেন, বৃন্দাবন চিন্তা করিলে বিহ্বল হইতেন। শ্রীনবদ্বীপে যে দিবস প্রথমে ভক্তি হইতে প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করেন, সে দিবস ইহাই বলিয়া রোদন

করিয়াছিলেন,—"কাঁহা বৃন্দাবন; কাঁহা বেহুলাবন; কাঁহা আমার ভাণ্ডীরবন; কাঁহা আমার মধুবন; কাঁহা যমুনা-পুলিন; কাঁহা গোবর্দ্ধন; কাঁহা শ্রীদাম সুদাম, কাঁহা নন্দ যশোদা কাঁহা— "বলিতে বলিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম আর মুখে আসিল না, অমনি ঘোর মূর্চ্ছায় ঢলিয়া পড়িলেন। সে ছয় বৎসরের কথা। এই ছয় বৎসর, "কবে বৃন্দাবনে যাইব" দিবানিশি এই চিন্তা, এই যুক্তি করিয়াছেন। একবার চারিমাস বৃন্দাবনে যাইবার পথে ভ্রমণ করিয়াছেন। আজ সত্যই সেই বৃন্দাবনে যাইতেছেন। এখন নিকটে আসিয়াছেন। সঙ্গে ভক্তরূপ কণ্টক কেহ নাই। জগদানন্দ, গদাধর, নিতাই, স্বরূপ প্রভৃতি আপদ-বালাই সঙ্গে থাকিলে, তাঁহাকে নানা কথা বলিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এবার প্রভু একা, আপন মনে যাইতেছেন, সুতরাং বহির্জগতের সঙ্গে তাঁহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই। কেবল বিহ্বল হইয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন। যে বৃন্দাবনের নাম শ্রবণে প্রভু বিহ্বল হইতেন, সেই বৃন্দাবন এখন সম্মুখে।

প্রভু শুনিলেন মথুরায় আসিয়াছেন; অমনি হঠাৎ দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন, এবং উঠিয়া হুঙ্কার করিয়া বিশ্রামঘাটে ঝম্পপ্রদান করিলেন। অবগাহনান্তে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর হুঙ্কারে চারিদিক কম্পিত হইতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে লোক-সংঘট্ট হইতে আরম্ভ হইল। লোকেরা কৌতুক দেখিতে আসিতেছে, আর প্রভুর দর্শনে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য কোলাহল করিতেছে। এইরূপে মথুরায় আসিবামাত্র মহা কোলাহল হইয়া উঠিল। যাঁহারা বিজ্ঞ তাঁহারা একেবারে অবাক হইলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, যাঁহারা দর্শনমাত্র লোকে প্রেমে উন্মত্ত হয়, তিনি তো সামান্য জীব নন! এ বস্তুটি কে? তবে কি আমাদের কৃষ্ণ আবার আসিলেন? কাহার মনে এরূপও উদয় হইল যে,—ভক্তিতে নৃত্য, এরূপ ভজন কেবল মাধবেন্দ্রপুরীর গণ ব্যতীত আর কেহ জানেন না। সকলে হরি হরি বলিয়া কোলাহল করিতেছে, কিন্তু উহার মধ্যে একজন নৃত্য করিতেছেন। প্রভু ঐরূপ নৃত্য করিতে দেখিয়া তাঁহাকে ধরিলেন, ধরিয়া দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দুই প্রহর গত হইল। তখন মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত দেখিয়া এই লোকটি প্রভুকে ধরিয়া আপন গৃহে লইয়া আসিলেন। ইনি ব্রাহ্মণ,—নাম কৃষ্ণদাস। তাঁহার গৃহে আসিয়া প্রভু বাহ্যজ্ঞান পাইলেন। তখন প্রেমে গদগদ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই ভক্তি কোথা পাইলে?" তাঁহার উত্তরে বুঝিলেন যে, এই ব্রাহ্মণ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। প্রভু এই কথা শুনিবামাত্র অতি ভক্তি ভাবে তাঁহার চরণে পড়িলেন। ইহাতে সেই ভালমানুষ ব্রাহ্মণ ভয় পাইয়া প্রভুর হাত ধরিলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি মাধবেন্দ্র-শিষ্য অতএব তাঁহার পূজ্য। তখন কৃষ্ণদাস বুঝিলেন ও পরে শুনিলেন যে, মাধবেন্দ্রের সহিত প্রভুর সম্বন্ধ আছে। কৃষ্ণদাস জাতিতে সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ। সন্ন্যাসীগণ এরূপ ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করেন না। কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহার অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন শুনিয়া, প্রভু তাঁহাকে রন্ধন করিতে অনুমতি করিলেন। ইহাতে কৃষ্ণদাস অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি সনোড়িয়া, প্রভু যদি তাঁহার অন্ন গ্রহণ করেন, তবে লোকে তাঁহাকে নিন্দা করিবে। প্রভু এ কথা শুনিলেন না; বলিলেন, ধর্মপথ ভিন্ন ভিন্ন, ইহার নিমিত্ত এক মীমাংসা আছে। মহাজন যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই ধর্ম। পুরী গোসাঞী তোমার অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব এই আমার ধর্ম।"

প্রভু, কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে চলিলেন। প্রভুর বৃন্দাবন দর্শন বর্ণনা করে ত্রিজগতে এ সাধ্য কাহারও নাই। কেবল "শ্রীবৃন্দাবন" এই নাম শ্রবণে প্রভুর অন্তরে যে রসের উদয় হয় তাহাতে জগত ভাসিয়া যায়, সেই প্রভু আপনি সেই বৃন্দাবনের মাঝখানে! দূরদেশে থাকিয়া প্রভু শ্রীবৃন্দাবনের একমাত্র রজ পাইলে তাহা লইয়া একমাস আনন্দে যাপন করিতেন। এখন প্রভু বৃন্দাবন-ভূমিতে। শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ-মাত্র প্রভুকে আনন্দে

উন্মত্ত করিত; এখন ইহার প্রত্যেক বৃক্ষ, প্রত্যেক লতা, প্রত্যেক গুল্ম, প্রত্যেক পাতা প্রভুর চিত্তকে আনন্দ দিতেছে। প্রভু যমুনার নামে মূর্ছিত হইতেন, অদ্য সেই যমুনা সম্মুখে। প্রভু যমুনার জল পান করিলেন, কিন্তু পান করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন না। দারুণ শীতকাল, কিন্তু যমুনায় অবতরণ করিয়া আর উঠিতেছেন না। প্রভু বৃক্ষ দেখিলেই উহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন; আলিঙ্গন করিয়া, অতি প্রিয়জনের আলিঙ্গনে যে সুখ তাহাই অনুভব করিতেছেন; সুতরাং সে বৃক্ষ ছাড়িতে চাহিতেছেন না। প্রভু এইরূপ লক্ষ লক্ষ বৃক্ষের মাঝে। প্রভুর দুঃখ এই যে,—তাঁহার মোটে দুটি চক্ষু ও দুটি কর্ণ, একটি দেহ ও একটি চিত্ত। প্রভু একটি ছিন্ন-পত্র লইয়া ব্যথিত হইয়া উহাকে বুকে করিয়া রোদন করিতেছেন। যে নিষ্ঠুর সেই পত্রকে ছিন্ন করিয়াছে তাহাকে নিন্দা করিতেছেন, আর সেই পত্রকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বারংবার চুম্বন করিতেছেন। প্রভুর অন্তরে এক একবার আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে, আর অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। এইরূপ মূর্চ্ছা প্রভুর ঘন ঘন হইতেছে। কখন কখন প্রভুর এরূপ ঘোর-মূর্চ্ছা হইতেছে যে, সঙ্গীরা ভীত হইয়া তাঁহাকে সন্তর্পণ করিতেছেন। প্রভু চলিয়াছেন নাচিয়া নাচিয়া। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, বৃন্দাবনের সহজ কথা সঙ্গীত, আর সহজ চলন নৃত্য। শ্রীবৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীবৃন্দাদেবী যেন তখন জানিতে পারিলেন যে, বহুদিন পরে তাঁহার প্রাণনাথ আসিয়াছেন নতুবা সমস্ত বৃন্দাবন প্রফুল্লিত হইবে কেন? লতা বৃক্ষ সজীব হইবে কেন? অকালে বসন্তের উদয় হইবে কেন? যথা পদ—"বৃন্দাবনে উপনীত, তরুলতা কুসুমিত"—ইত্যাদি।

প্রভুর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। বহিরঙ্গ লোকে দেখিতেছে, যেন বায়ুতে সঞ্চালিত হইয়া পুরাতন কুসুম শাখা হইতে আপনা-আপনি ঝরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহা নয়, প্রভুর মস্তকে যে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে, তাহার মধ্যে একটিও পুরাতন নয়। প্রভুর মস্তকে বাসী-ফুল, তাহা কি কখন হইতে পারে? প্রভুর মস্তকে আবার কুসুম-মধু ক্ষরিতেছে, আর কোথা হইতে মধুকর আসিয়া প্রভুকে ঘিরিয়া গুন্-গুন্ শব্দ করিতেছে। কথা কি, তিনি সকলের প্রাণ, আর সকলে তাঁহার প্রাণ।—আজ না, কাল না, চিরদিনের নিমিত্ত। এমত স্থলে যেরূপ প্রেমের তরঙ্গ সম্ভব, তাহাই বৃন্দাবনে হইতে লাগিল। জড় ও জীব বহু-বল্লভকে পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইল। বৃক্ষলতার দশা যখন এরূপ, তখন প্রাণিমাত্রেও কিরূপ, তাহা অনুভব করা যায়। ময়ূর-ময়ূরী প্রভুর অগ্রে নৃত্য করিয়া যাইতে লাগিল। শুক-সারী আসিয়া প্রভুর হস্তে ও মস্তকে বসিতে লাগিল,—উড়িবে না, তাহাদের ভয় নাই। ভৃঙ্গপাল তাঁহাকে ঘিরিয়া তাহাদের ভাষায় তাহার গুণ গান করিতে লাগিল। মৃগযুথ আসিয়া প্রভুর সঙ্গে চলিল। প্রভু মৃগের গলা ধরিয়া মুখ-চুম্বন করিতে লাগিলেন, আর অমনি তাহাদের নয়নে আনন্দধারার সৃষ্টি হইল। প্রভু শুক-সারীর সহিত আলাপ করিতেছেন, ময়ূর-ময়ূরী অগ্রে নৃত্য করিতেছে,—এমন সময় সম্মুখে দেখেন, বহুতর গাভী রহিয়াছে।

অমনি যেন সাক্ষাৎ ধবলী, শ্যামলী, অমলি, বিমলী প্রভৃতি সেখানে আবির্ভূত হইল। প্রভু হুঙ্কার করিলেন; গো-পালও উচ্চপুচ্ছ করিয়া প্রভুর দিকে ছুটিয়া আইল। প্রভু বহু-বল্লভ, সমস্ত গো-পাল প্রভুকে ঘিরিয়া নানা উপায়ে তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। মূর্খ গো-রক্ষকগণ এ সমুদয়ের কোন তথ্য জানে না। তাহারা গরু ফিরাইতে গেল; কিন্তু গো-পাল প্রভুকে ছাড়িয়া যাইবে না। প্রভু চলিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে তাহারা চলিল। প্রভু গো-পালের প্রতি চিরপরিচিতের ন্যায় স্নেহদৃষ্টি করিতে লাগিলেন, আর তাঁহার বদন বাহিয়া আনন্দধারা পড়িতে লাগিল। তাহারাও প্রভুর প্রতি চিরপরিচিতের ন্যায় চাহিতে লাগিল,—তাহাদেরও আনন্দধারা পড়িতে লাগিল।

প্রভু এ-বৃক্ষতল হইতে ও-বৃক্ষতলে, এ-বন হইতে ও-বনে নৃত্য করিতে করিতে

চলিয়াছেন,—তাঁহার সর্বশরীর আনন্দে তরঙ্গায়মান হইতেছে। কখন রাধা-ভাব, কখন কৃষ্ণ-ভাব। মহানন্দে বলিতেছেন, "কৃষ্ণ-বোল।" বৃন্দাবনে হরিবোল নাই। হরি বড় দূরের সমগ্রী। বৃন্দাবনে বুলি "কৃষ্ণবোল।" প্রভু কৃষ্ণ-বোল বলিয়া আনন্দধ্বনি করিতেছেন, আর যেন উহাতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। জড়দেহের প্রাণ—শোণিত, শ্রীবৃন্দাবনের প্রাণ—আনন্দ। শ্রীবৃন্দাবনে যিনি নাগর, তাঁহার নাম কানাইলাল, কৃষ্ণ, নটবর—শুনিলে আনন্দে অঙ্গ পুলকিত হয়। তিনি কি করেন? না—নিধুবন, ভাণ্ডীরবন, মধুবন, তালবন, বেহুলাবন প্রভৃতিতে বিচরণ করেন। তিনি যমুনা-পুলিনে বসিয়া নিজ-মনে বেণুগান করেন। বৃন্দাবনের সম্পত্তি—যমুনা-পুলিন, ধীরসমীর, গোচারণ, গোকুল, মালতীর মালা, ময়ূরপুচ্ছ। হে পাঠক মহাশয়, এই শ্রীবৃন্দাবন তোমাতে স্ফূর্তি হউক, আমি বৃন্দাবন বর্ণনা করিতে পারিলাম না। এই বৃন্দাবনে স্বয়ং বৃন্দাবন-নাথ বিচরণ করিতেছেন। আর অধিক বলিবার ক্ষমতা আমার নাই।

চণ্ডীদাস "পিরীতি" এই তিনটি অক্ষরের পূজা করিয়াছেন, কারণ এই প্রেম শ্রীভগবানের সর্বপ্রধান সম্পত্তি। আর তিনিই এই ধরনের একমাত্র পূর্ণ-অধিকারী, এবং অধিকারী হইতে সমর্থ ও উপযুক্ত। সেই তিনি আজ প্রেমে অভিভূত ও বিদগ্ধ, তাঁহার হৃদয় প্রেমে জ্বর-জ্বর। এই প্রেমধনে ধনী বলিয়া তিনি পরমানন্দময়, এই প্রেম আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার এই বৃহৎ সৃষ্টি। তিনি চিরদিন প্রেমে মজিয়া আছেন। আচ্ছা, শ্রীভগবান কি করেন? কেমন করিয়া তিনি দিবানিশি যাপন করেন? তাঁহার কি বিরক্তি হয় না? এমন কি অবস্থা হয় না, যখন তাঁহার সময় কাটান দুরূহ ব্যাপার হয়?

ইহার উত্তর শ্রবণ করুন। প্রেম আনন্দের প্রস্রবণ। তাহার প্রমাণ এই যে, প্রেমের যে অল্প ছায়া জগতে দেখা যায়, উহা হইতে অজস্র পীযূষ-ধারা বহিয়া থাকে। সুতরাং যাহা প্রেমের ছায়া মাত্র, তাহা হইতে যখন এত আনন্দ, তখন তাঁহার সেই অখণ্ডপূর্ণ ও বিমল প্রেম-প্রস্রবণ হইতে কি আনন্দ না উৎপত্তি হয়? এ জগতে প্রেম নাই, প্রেমের ছায়া আছে। সেই ছায়ায় কি কি আছে দেখুন। জননী শিশুসন্তান লইয়া দিবানিশি যাপন করিতেছেন। দেখিবেন যে, তাঁহার বিরক্তি নাই, তিনি কেবল সেই শিশুসন্তানটি লইয়া অনন্ত জীবন কাটাইতে প্রস্তুত। যখন কোন কার্য্য নাই, তখন শিশুটি কোলে করিয়া তাহার মুখ দেখিতেছেন, আর তাহাতেই সুখে তাঁহার কাল কাটিয়া যাইতেছে। স্ত্রী পৃথিবীর সমুদয় ত্যাগ করিয়া, পতিকে লইয়া জগতের এক প্রান্তভাগে থাকিবেন, তাঁহার আর কোন অভাব বোধ থাকিবে না। বিবাহ হইবে এই কথা শুনিয়া বর ও কন্যা আনন্দে ডগমগ। গর্ভ হইয়াছে জানিয়া গর্ভধারিণী আহ্লাদে আত্মহারা হইয়াছে। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, আর প্রেমের একটি বস্তু পাইয়া জনক-জননী আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। প্রেমের অনন্ত মুখ, এক এক মুখে এক এক অনির্বচনীয় আনন্দের উৎপত্তি হয়। এই প্রেমের সহায়—পূর্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠা, মান, মিলন, বিরহ। এই সমুদয় প্রেমের চিরসঙ্গী, ইহারা প্রেমের পুষ্টিসাধন করে; আর এ সমুদয় একটি আনন্দের অকূল সাগর। এই প্রেমধনে শ্রীভগবান সম্পূর্ণরূপে অধিকারী। যাহার যত প্রেমের বস্তু তাহার ততটি সুখের প্রস্রবণ, তাহার তত সুখ। সুতরাং শ্রীভগবান আনন্দময়।

এই যে প্রভু আনন্দে মগ্ন হইয়া শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ করিতেছেন, ইহার মধ্যেও তাঁহার প্রিয় যে জীবগণ তাহাদিগকে বিস্মৃত হয়েন নাই। মুসলমান রাজার অত্যাচারে বৃন্দাবন ছারখারে গিয়াছে, ভদ্রলোকের বাস উঠিয়াছে, বৃন্দাবন জলমগ্ন হইয়াছে। যে মাসে প্রভু সন্ন্যাস করেন, তাহার কিছু পূর্বে ভূগর্ভে ও লোকনাথকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য যে, তাঁহারা বৃন্দাবন পুনরুদ্ধার করিবেন। তাহারা আসিয়া শুনিলেন, প্রভু সন্ন্যাস করিয়া দক্ষিণে গিয়াছেন। প্রভুকে তল্লাস করিতে তাঁহারা সেই দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন। এইরূপে তাঁহারা প্রভুকে

সমস্ত দক্ষিণ দেশে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছেন। এই অবকাশে প্রভু বৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে প্রভুর দেখা হইল না। প্রভু লোকনাথ ও ভূগর্ত্তকে যে ভার দিয়াছিলেন, আপনি তাহাই করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ বৃন্দাবন উদ্ধার।

প্রভু বনভ্রমণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনে গমন করিলেন। আর অমনি একটি অপরূপ বালক আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িল। বালকটি পাঞ্জাব দেশস্থ লাহোর নগরের এক ব্রাহ্মণকুমার। বয়ঃক্রম যখন সাত বৎসর, তখন এক রজনীতে সে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময় দেখিল যে, একটি পরম সুন্দর গৌরবর্ণ যুবক তাহার প্রতি প্রেমচক্ষে চাহিয়া রোদন করিতে করিতে তাহাকে আহ্বান করিতেছেন। বালক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" তাহাতে তিনি বলিলেন যে, তাঁর নাম গৌরাঙ্গ, এবং তাঁহার সহিত তাহার (অর্থাৎ বালকের) বৃন্দাবনে দেখা হইবে। এই কথা শুনিয়া বালক গৌরাঙ্গ বলিয়া কান্দিয়া উঠিল। তাঁহার পিতা মাতা তাহাকে রাখিতে পারিলেন না। বালক গৌরাঙ্গের নাম করিতে করিতে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিল। সুতরাং ধ্রুবের কাহিনী যে কল্পিত নহে, ইহা সপ্রমাণ হইল। ধ্রুব পদ্মপলাশলোচন বলিয়া ছুটিলেন। এ বালক গৌরাঙ্গ বলিয়া ছুটিল। শ্রীমদ্ভাগবতের কথা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গৌরাঙ্গ অবতার প্রভু আপনি প্রহ্লাদের লীলা করিযাছেন। প্রভু তাঁহার টোলে পাঠ দিতেছেন, কিন্তু পাঠ দিতে পারেন না। কৃষ্ণনাম বিনা তাঁহার মুখে আর কিছু আইসে না। অবশ্য এখানে ষণ্ডামার্কা কেহ ছিলেন না; কিন্তু তাহার থাকিবার প্রয়োজন কি? ষণ্ডামার্কেব অভাব কি? অভাব প্রহ্লাদের। প্রহ্লাদের কাহিনী সপ্রমাণ হইল, ধ্রুবের বাকী রহিল; তাই লাহোর ধ্রুব সৃষ্টি করিলেন। বালক পূর্ব-দক্ষিণ ছুটিল, আর শ্রীভগবান যেরূপ ধ্রুবকে রক্ষা করিয়াছেন, সেইরূপ তাহাকে রক্ষা করিয়া বৃন্দাবনে লইয়া আসিলেন। সেখানে গোবর্দ্ধন পর্বতের নিকট সেই বালক বাস করিতে লাগিল।

বালক বল্লে "আমার গৌরাঙ্গ কোথায়?" লোকে বলে "গৌরাঙ্গ কে? এ কৃষ্ণের স্থান, গৌরাঙ্গের স্থান নয়।" লোক ভাবে, বালকটি অর্দ্ধক্ষিপ্ত। কিন্তু সে অতি ভাল মানুষ, আর তাহাকে অতিশয় সন্তপ্ত দেখিয়া লোকে তাহাকে স্নেহ করে। এইরূপে বহুবৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন নাচিতে নাচিতে গোবর্দ্ধনে আসিলেন, তখন সেই যুবক (কারণ তখন সে যুবক হইয়াছে) দেখিবার প্রভুকে চিনিল; বুঝিল যে, এই তাহার প্রাণনাথ, ইঁহার নিমিত্ত সে দেশান্তরী, ইঁহারাই নিমিত্ত সে বৃক্ষতলবাসী উদাসীন; ইঁনিই তাহাকে পাগল করিয়া—দেশ, আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা হইতে এত দূরে লইয়া আসিয়াছেন।

বালক ভাবিতেছে, "আমি ত প্রাণনাথ পাইলাম, প্রাণনাথ কি আমাকে চিনিবেন?" এইরূপ ভয়ে ভয়ে ব্রাহ্মণযুবক তাঁহার পদতলে পড়িল।

যখন বিদেশিনীরূপে কৃষ্ণ, রাধার সমীপে উদয় হইলেন, এবং তাহার পরে যখন তাঁহার স্ত্রীবেশ ঘুচাইলে দেখা গেল যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ, তখন শ্রীমতী বলিয়াছিলেন—"এই ত আমার প্রাণনাথ হে! আমি পেলাম, আমি পেলাম—হারাধনে!"

আবার যখন বহু বিরহের পর রাধা-কৃষ্ণ মিলন হইল, তখন শ্রীমতী বলিয়াছিলেন—
"বহু দিন পরে, বধূ এলে ঘরে।"

উপরে যে দুইটি মিলনের পদ দিলাম. এই যুবক দুই ভাবে বিভাবিত হইয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। যুবক প্রণাম করিলে, প্রভু অমনি সমুদয় সম্বরণ করিয়া, মধুর হাসিয়া, তাহাকে চিরপরিচিতের ন্যায় হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। যুবক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু যুবককে বলিলেন, তোমার নাম কৃষ্ণদাস। তুমি যাও, পশ্চিম দেশ উদ্ধার কর।"— যুবক প্রভুর সঙ্গ ছাড়িতে চাহিলেন না। ইহাতে প্রভু তাহাকে তিরস্কার করিলেন। তখন কৃষ্ণদাস বলিলেন, "আমি কাঙ্গাল, বিদ্যাবুদ্ধিহীন, আমি কি রূপে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিব?"

প্রভু তাঁহার নিজের গলা হইতে গুঞ্জমালা খুলিয়া তাহার গলায় দিলেন; বলিলেন, "এই মালা ধর, এখন শীঘ্র গমন কর।" ইহাতেই তিনি জীব নিস্তারের শক্তি পাইলেন। কৃষ্ণদাস যেখানে গমন করেন, অমনি লোক আসিয়া তাঁহার শরণ লইতে লাগিল। আবার তাহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, তিনি প্রভুকে অল্পক্ষণ মাত্র দর্শন করিলেন, ইহাতে ভক্তিধর্ম কি সমুদয় তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্তি হইল। প্রভুর গুঞ্জমালা পাইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম হইল "কৃষ্ণদাস গুঞ্জমালী।" তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্যদেশে গেলেন। সেখানে কি করিলেন শ্রবণ করুন, যথা ভক্তমাল গ্রন্থে ঃ

"বড়ই প্রতাপ হইল লোকে চমৎকার। অলৌকিক দরশন আকার প্রকার।।
গৌরাঙ্গ ভজয়ে লোক তাঁর উপদেশে। প্রভুর দোহাই যে ফিরিল দেশে দেশে।।"

গুঞ্জমালী মালাবারে শ্রীগৌর-নিতাই মূর্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র বনোয়ারিচন্দ্রকে আনাইলেন। তাঁহাকে সেই গাদির মহান্ত করিয়া অন্য স্থানে চলিলেন। এইরূপে গুজরাটে যাইয়া আবার গৌর-নিতাই বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। গুঞ্জমালী প্রেমানন্দে গুজরাট মাতাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার যশ শুনিয়া সেখানে গৌড়ীয় শ্রীচক্রপাণি যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। দুইজনে পরস্পরে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। এইরূপে সেখানে দুটি গাদি হইল। গুঞ্জমালীর গাদির নাম বড় গৌড়ীয়, চক্রপাণির গাদির নাম ছোট গৌড়ীয় হইল। যথা ভক্তমালে ঃ

"ছোট গৌড়ীয়া আর বড় যে গৌড়ীয়া। অদ্যাপি আছয়ে খ্যাতি জগত ব্যাপিয়া।।"

সেখান হইতে গুঞ্জমালী নিজদেশে আসিয়া ওলম্বা বা ওলয়া নামক গ্রামে আর এক সেবা প্রকাশ করিলেন। সেখান হইতে সেই তরঙ্গ সিন্ধুদেশে প্রবেশ করিল। যথা ভক্তমালে ঃ

"পাঞ্জাবের পশ্চিমে নাম সিন্দু নাম দেশ। উদ্ধার করিতে জীব করিলা প্রবেশ।।
হিন্দু ত যতেক ছিল বৈষ্ণব করিলা। মুসলমান যত ছিল হরিভক্তি হৈলা।।
গোসাঞির সঙ্কীর্তন শুনিয়া যবন। বৈষ্ণব আচার করে নাম সঙ্কীর্তন।।
যবনের আচার ত্যজিল সর্বজন। হরিনাম জপে মালা তিলক ধারণ।।"

সে কালে ইহা হইয়াছিল, এখন আর তাহা নাই। অন্যত্র দূরের কথা, এখন বাংলায়ও কি আছে? কিন্তু হে ভক্ত, প্রভুর প্রতাপ এবার স্মরণ করুন। শ্রীমদ্ভাগবতের আখ্যায়িকার মধ্যে যাঁহাদের কথা উল্লেখ আছে, শ্রীগৌরলীলায় তাঁহাদের সকলকেই দেখিতেছি। প্রহ্লাদ পাওয়া গেল, ধ্রুব পাওয়া গেল, কৃষ্ণ পাইলাম, বলরাম পাইলাম। এই বলরামের কথা একবার ভাবুন। শ্রীনিতাই ঠিক বলরামের মত। ঠাকুরের দাদা, চঞ্চল, প্রেমে মাতোয়ারা।

ব্রজের নিগূঢ় রস আস্বাদন জীবের চরম সৌভাগ্য। একজন অন্য জনকে নানা উপায়ে বাধ্য করে। কেহ উৎকোচ দিয়া বাধ্য করে। যেমন কালীমার ভক্তগণ কালীমাতাকে ছাগ দান করে। কেহ খোশামোদ করিয়া বাধ্য করে। যেমন কোন ভক্ত শ্রীভগবানকে "তুমি দয়াময়" ইত্যাদি বলিয়া ভুলাইয়া শেষে বলেন, "অতএব আমাকে টাকা দাও, ঐশ্বর্য্য দাও" ইত্যাদি। কেহ জীবের উপকার করিয়া ভগবানকে বাধ্য করে। যেমন লোকে দরিদ্রকে দান অর্থাৎ পুণ্যকার্য্য করিয়া ভাবে যে ভগবানের উপকার করিলাম। আবার কেহ আনুগত্য দেখাইয়াও বাধ্য করে। যেমন প্রভুভক্ত দাস তাহার প্রভুকে কিম্বা প্রজা রাজাকে বাধ্য করে। ইহাকে বলে ভক্তি। ব্রজলীলার রস আর কিছু নয়, শ্রীভগবানকে নিজ-জন বলিয়া ভজনা করা। কিন্তু সর্বজগতে শ্রীভগবান বরদাতা রাজা বলিয়া পূজিত হন। "তিনি আমার, আমি তাঁহার", জীবে ও ভগবানে এই সম্বন্ধ। সুতরাং তাঁহাকে আপন বলিয়া ভজনা করাই শ্রেয়ঃ, অন্য ভজন কেবল বিড়ম্বনা, আর তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা মাত্র। কুরুক্ষেত্র যজ্ঞের সভায় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম আছেন, এমন সময় যশোদা দূর হইতে "গোপাল" বলিয়া ডাকিতে

লাগিলেন। তখন দুই ভাইয়ে কথাবার্তা হইতে লাগিল। "কে ডাকে আমাকে?" শ্রীকৃষ্ণের এই প্রশ্নে বলরাম বলিতেছেন, "যে ডাক শুনিতেছি ও ব্রজের ডাক, অন্য স্থানের নয়; বোধ হয় জননী যশোদা আসিয়াছেন।" ব্রজের ডাক এখন বুঝিলেন কি? 'হে দয়াময়!" মথুরার ডাক, আর "হে গোপাল।" ব্রজের ডাক।

কৃষ্ণলীলা-স্থান এই ব্রজরস প্রস্ফুটিত করে। রাসস্থলী দর্শনে হৃদয়ে রাসরসের উদয় হয়। কিন্তু রাসস্থলী কোথায়? রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড দর্শনে ব্রজলীলার স্ফূর্তি হয়, কিন্তু সে কুণ্ডদ্বয় কোথায় ছিল? সে সমুদয় লুপ্ত হইয়াছিল; কোথা কি ছিল, কেহ তাহা অবগত ছিলেন না। প্রভু এই যে আনন্দে বিচরণ করিতেছেন, ইহার মধ্যে আবার জীবের উপকারের নিমিত্ত তীর্থ উদ্ধার করিতেছেন। এইরূপে তিনি হঠাৎ চেতনা লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড কোথায়?" কিন্তু কেহ বলিতে পারিল না। তখন প্রভু আপনি যাইয়া এক ধান্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তাহাই এখন শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড হইয়াছে।

প্রভু যখন যে দেশে গমন করেন, সেখানে এই কথা আপনা-আপনি প্রচার হয় যে, কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। বৃন্দাবনেও অবশ্য তাহাই হইল। সকলে বলিতে লাগিল, কৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন। যখন কৃষ্ণ আসিয়াছেন জনরব হইল, তখন ভব্য লোকে বুঝিল যে, এই যে কাঞ্চনবর্ণের সন্ন্যাসী যুবক আসিয়াছেন, ইনিই সে কৃষ্ণ। কিন্তু ইতর লোকে কৃষ্ণকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কৃষ্ণ যে তাহাদের সম্মুখে তাহা তাহারা দেখিল না। বৃন্দাবনে যে শ্রীকৃষ্ণ উদয় হইয়াছেন বলিয়া জনরব উঠে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ একটি কাহিনী শ্রবণ করুন।

জনরব উঠিল যে, কৃষ্ণ উদয় হইয়াছেন, আর তিনি প্রত্যহ রজনীতে যমুনায় কালীয় দমন করিয়া থাকেন। এই অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিতে লক্ষ লক্ষ লোক রজনীযোগে যমুনাতীরে দাঁড়াইয়া থাকে। কেহ কিছু-কিছু দেখে, আবার কেহ কিছু দেখিতে পায় না। শেষে প্রকাশ পাইল যে, জালিকগণ মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত আলো জ্বালিয়া নৌকায় বিচরণ করে। তাহাই দেখিয়া মূর্খ লোক উপরোক্ত জনরব তুলিয়াছেন। কিন্তু এরূপ দীপ জ্বালিয়া জালিকগণ চিরদিন মৎস্য ধরিতেছে, কিন্তু এরূপ জনরব পূর্বে কখনও হয় নাই কেন? কথা এই, শ্রীভগবান আসিয়াছেন, এ কথা লোকের মনে আপনি উদয় হইয়াছে। শ্রীভগবান ছদ্মভাবে আছেন, সুতরাং সকলে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু ভক্ত ব্যতীত আর কেহ ধরিতে পারিতেছেন না। ভক্তগণ প্রভুকে ধরিলেন, আর সাধারণে তল্লাস করিয়া আর কাহাকে না পাইয়া জালিকের কার্য্য কৃষ্ণের কার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন।

এদিকে প্রভু ক্রমেই বিহ্বল হইতেছেন। দিবানিশি নৃত্য করিতেছেন ও মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যাইতেছেন। প্রভু কোথায় আছেন, কোথায় যাইবেন, তাহা কেহ জানে না। প্রত্যহ বহুলোক আসিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে, ইহার তথ্য প্রভু অবশ্য কিছু জানেন না। এ সমস্ত নিমন্ত্রণের কথা তাহাদের ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে হয়। এই সমস্ত নিমন্ত্রণের মধ্যে ভট্টাচার্য্য একটি মাত্র গ্রহণ করেন। ইহাতে বহুলোক বঞ্চিত হইয়া যায়। এইরূপ প্রত্যহ বহুলোক প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত ভট্টাচার্য্যবে অনুনয় বিনয় করে। এদিকে দিবানিশি কোলাহল, কোথা হইতে যেন লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারা একেবারে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য-কীর্তন ও হরিধ্বনি করিয়া দেশ তরঙ্গায়মান করিল। প্রভুর কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই, যেহেতু তিনি আপন প্রেমে বিহ্বল। কিন্তু ভট্টাচার্য্য সামান্য জীব। এই অবস্থা ক্রমে ভট্টাচার্য্যের অসহ্য হইয়া উঠিল। আবার প্রভুকে লইয়া সর্বদা তাঁহার ভয়। কখন কোথায় তিনি যমুনায় ঝাঁপ দিবেন তাহার ঠিক নাই, আর ঝাঁপ দিয়া উঠিবেন কিনা তাহারও ঠিকানা নাই। একদিন প্রভু এইরূপে যমুনায় ঝম্প দিয়া আর উঠিলেন

না। তখন ভট্টাচার্য্য ও প্রভুর অন্যান্য ভক্তগণ হাহাকার করিতে করিতে তাঁহাকে জলে তল্লাস করিতে লাগিলেন। অনেক তল্লাসের পর তাঁহাকে পাইলেন ও তাঁহাকে তীরে উঠাইলেন। ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন যে, প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণের কর্তা তিনি মহামূল্য ধন তাঁহার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। প্রভু দিব্যোন্মাদে দিবানিশি বিচরণ করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে কোন ক্রমে বৃন্দাবনের বাহির করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই।

ইহাই সঙ্কল্প করিয়া ও অন্যন্য ভক্তগণের সঙ্গে যুক্তি করিয়া একদিন করযোড়ে প্রভুকে নিবেদন করিলেন। প্রভু ভট্টাচার্য্যের আকিঞ্চনে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন, করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চাও কি?" ভট্টাচার্য্য তখন করযোড়ে বলিলেন, "মকর সংক্রান্তি সম্মুখে, এখন যদি গমন করেন তবে সময়ের মধ্যে আমরা প্রয়াগে উপস্থিত হইতে পারি। এখন প্রভুর যেরূপ আজ্ঞা।"

ঠাকুর বলিলেন, "তাহাই হউক। তুমি আমাকে কৃপা করিয়া বৃন্দাবন দর্শন করাইলে, সুতরাং আমার এ দেহ এখন তোমার। তুমি যখন যেখানে আমাকে লইয়া যাইবে, আমি সেখানে যাইব।" এই মধুর-বাক্যে ভট্টাচার্য্যের নয়ন দিয়া ঝর ঝর জল ঝরিতে লাগিল। তখন সাব্যস্ত হইল, পরদিন বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া দেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিবেন।

প্রিয়স্থান বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া প্রভু অত্যন্ত বিকল হইলেন; কিন্তু মায়া তাঁহার অধীন। মায়া তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তিনি ইচ্ছা মাত্র মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া, বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। যেমন নৌকা দক্ষিণাভিমুখে চলিতেছে; কিন্তু কর্ণধার হাল ফিরাইয়া দিবামাত্র উহা আবার যেরূপ উত্তরমুখে চলে সেইরূপ যেই বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন, অমনি প্রভু তাঁহার চিত্তকে নীলাচলচন্দ্রের দিকে প্রয়োগ করিলেন। তখন নীলাচলচন্দ্র বলিয়া পূর্বদিকে ছুটিলেন। প্রভু যে বৃন্দাবন ত্যাগ করিতেছেন, ভট্টাচার্য্য এ কথা গোপন রাখিলেন; যেহেতু উহার প্রচার হইলে লোকের সংঘট্টে তাঁহাদের যাওয়া যাইবে না। তবে পথে সহায়তার নিমিত্ত কৃষ্ণদাসকে ও প্রভুর একটি রাজপুত ভক্তকে সঙ্গে লইলেন। সাকুল্যে তাঁহারা এই পাঁচজন,—যথা, প্রভু, ভট্টাচার্য্য, ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মণ ভৃত্য, কৃষ্ণদাস ও রাজপুত ভক্ত।

প্রভু আপন মনে চলিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোন একদিন পথে কোন গোপবালক বেণু বাজাইল। অমনি প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় সেই স্থানে পড়িলেন। এমন সময় কি কেহ বাঁশী বাজায়? কিন্তু এই যে বংশীধ্বনি, সেও রাখালের ইচ্ছায় হয় নাই। প্রভু অপরূপ লীলা করিবেন বলিয়া সে এই বংশীধ্বনি করিয়াছিল।

প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন, ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া সন্তর্পণ করিতেছেন, এমন সময় একজন পরম সুন্দর পাঠান যুবক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজার পুত্র, নাম বিজলী খাঁ। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মগুরু আছেন। তিনি পরম গম্ভীর ও ধার্মিক; আর কতকগুলি সৈন্যও আছে, সকলেই অশ্বারোহী। প্রভুর রূপ ও তেজ দেখিয়া তাহারা অবশ্য কৌতূহলী হইয়া তথায় অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। চঞ্চল যুবক মুসলমান রাজপুত্রের মনে সন্দেহ হইল যে, এই সন্ন্যাসীর নিকট ধন ছিল, আর এই সঙ্গীগণ উহা অপহরণ করিবার নিমিত্ত উহাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অচেতন করিয়াছে। ইহাই ভাবিয়া সে তখনি প্রভুর ভক্তগণকে বন্ধন করাইল। অবশ্য তাঁহারা কতরূপ বলিলেন, কিন্তু কিছুতেই অব্যাহতি পাইলেন না। কথা এই, বালকের হস্তে ছুরিকা ও জীবের হস্তে ক্ষমতা, ইহাতে সর্বদা অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে। পাঠান রাজপুত্রের যথেচ্ছাচার করিবার শক্তি আছে। পথিকগণ দুর্বল, সুতরাং বলপ্রয়োগের এমন সুযোগ ছাড়িবে কেন? জীব নাকি বড় দুর্বল, তাই বল প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা তাদের বড় প্রবল।

ভক্তগণ কত বলিলেন যে তাঁহারা প্রভুর দাস, ও প্রভু প্রেমে অচেতন হইয়াছেন, কিন্তু পাঠানগণ তাহা শুনিল না। সেখানেই তাহাদিগকে বধ করিবে ইহাই উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু ইহা হইতে পারে না যে, প্রভুর সেবা করিতে করিতে তাঁহার দাসগণ প্রাণ হারাইবেন। কাজেই প্রভু চেতন পাইলেন, চেতন পাইয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া হরিধ্বনি ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া তাহারা মুগ্ধ হইল, কিন্তু প্রভুর হুঙ্কারে তাহাদের মনে ভয়ের উদয় হইল। তখন তাহারা বুঝিল যে, নৃত্যকারী বস্তুটি মহাপুরুষ; আর ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদিগের সর্বনাশ করিতে পাবেন। অতএব তাহারা ভয়ে ভয়ে ভক্তগণের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। ইহাতে ভক্তের বন্ধন প্রভুর দেখিতে হইল না। তখন নানা উপায়ে প্রভুর শান্তি করিয়া ভট্টাচার্য্য তাহাকে বসাইলেন। এ পর্য্যন্ত প্রভু পাঠানগণকে লক্ষ্য করেন নাই।

পাঠানগণের অবশ্য ভক্তির উদয় হইয়াছে। প্রভু বসিলে তাহারা এরূপ আকৃষ্ট হইল যে, সকলে আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিল। পাঠান রাজপুত্র বলিতে লাগিলেন, "ইহারা কয়েক জন তোমাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অচেতন করিয়াছিল। ইহারা চোর, তোমার ধন-লোভে তোমাকে প্রাণে মারিতেছিল।" প্রভু বলিলেন, "তাহা নয়, ইহারা আমার সঙ্গী; আমি কাঙ্গাল, আমার ধন নাই। আমার মূর্চ্ছার পীড়া আছে, আর ইহারা কৃপা করিয়া আমাকে সন্তর্পণ করিয়া থাকেন।"

বিজলী খান তখন অপ্রতিভ হইলেন; তাঁহার গুরু তখন ধর্মের কথা তুলিলেন। প্রভু কৃপা করিয়া তাহার সহিত কথা কহিলেন। তাহার পরে যাহা হইবার তাহাই হইল। রাজকুমার, তাঁহার গুরু, আর তাঁহাদের সৈন্যগণ সকলে প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। স্থূল কথা, ভাগ্যবান পাঠানগুলিকে কৃপা করিবেন বলিয়া প্রভু তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই মুসলমান ধর্মগুরু তখন "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া বিহ্বল হইলেন, প্রভু তাঁহার নাম রাখিলেন রামদাস। যথা চরিতামৃতে ঃ

"তা সবারে কৃপা করি প্রভু ত চলিয়া। সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা।।
পাঠান-বৈষ্ণব বলি হইল তার খ্যাতি। সর্বত্র গাইয়ে বেড়ায় মহাপ্রভুর কীর্তি।।
সে বিজলী খান হৈল মহাভাগবত। সর্বতীর্থে হৈল তাহার পরম মহত্ত্ব।।"

এইরূপ শক্তিসম্পন্ন অবতার জগতে কে কোথা দেখিয়াছেন? এক ঘণ্টা পূর্বে যে ব্যক্তি অস্ত্র দ্বারা নিরপরাধ তৈথিক বধ করিতেছিল, এক ঘণ্টা পরে সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নৃত্য করিতেছে! ইহারা কাহারা ইহারা মুসলমান, হিন্দুধর্মের পরম বিদ্বেষী।

প্রভু তাঁহার বৃন্দাবনের সঙ্গীগণকে বিদায় দিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন না; তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহারা প্রয়াগ পর্যন্ত অবশ্য প্রভুর সহিত যাইবেন। প্রভুর সহিত তাঁহারা চলিলেন। ক্রমে সকলে নির্বিঘ্নে প্রয়াগে পৌছিলেন। সেখানে প্রভুর যমুনার নিকট বিদায় লইতে হইবে, কাজেই হঠাৎ প্রয়াগ ত্যাগ করিতে না পারিয়া প্রভু কিছুকাল সেখানে রহিয়া গেলেন। ইহাতে এই হইল যে, বৃন্দাবনে যেরূপ কলরব হইয়াছিল, প্রয়াগেও সেইরূপ হইল। কোথা হইতে লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য ও হরিধ্বনি করিতে লাগিল। প্রয়াগ লোকারণ্য হইল। যথা—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ঃ

"গঙ্গা যমুনা নারিল প্রয়াগ ডুবাইতে। প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ-প্রেমের বন্যাতে।।"

প্রেমকে বন্যার সহিত তুলনা কেবল প্রভুর অবতারে হইয়াছিল। এমন সময় রূপ গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্বে বলিয়াছি, দবির খাস ও সাকর মল্লিক উপাধিধারী দুই ভাই, গৌড়-রাজ্যেশ্বরের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহারা দক্ষিণের ব্রাহ্মণ, বাংলা দেশে বাস করেন। স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধি বলে মুসলমান রাজার মন্ত্রী ও মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন। তাঁহাদের আর

এক ভাই ছিলেন, তাঁহার নাম অনুপম, তিনি বাড়ী থাকিতেন। বাড়ী রামকেলী গ্রাম, গৌড়ের নিকট, যাহা কানাইয়ের নাটশালা বলিয়া অভিহিত। মুসলমান রাজার কার্য্য করেন বলিয়া তাঁহাদের জাতি গিয়াছে, অৰ্দ্ধেক মুসলমান হইয়াছেন। যখন মুসলমানগণ হিন্দুগণের দেব-দেবী কি মন্দির ভগ্ন করেন, তখন তাহার মধ্যে তাঁহাদের থাকিতে হয়। না থাকিলে চাকুরী থাকে না। কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত টান হিন্দুধর্মে, তবু ঐশ্বর্য্যলোভে চাকুরী ত্যাগ করিতে পারেন না। করেন কি, না, এদিকে যদিও তাঁহারা সমাজে স্থগিত, তবু নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লইয়া সর্বদা গোষ্ঠি করেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণও এরূপ লোকের সহিত সঙ্গ করিতে আপত্তি করেন না। প্রথম কারণ, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী, জলের ন্যায় অর্থ বিতরণ করেন; দ্বিতীয় কারণ, তাঁহারা প্রকৃত হিন্দু অথচ পরম জ্ঞানী, বাড়ীতে বার মাসে তের পার্বণ, দিবানিশি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মেলা; এমন কি, সেকালে রামকেলী গ্রাম একটি অতি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত।

এমন সময়ে প্রভুর প্রকাশ হইল। এই দবির খাস ও সাকর মল্লিক এক প্রকার বৈষ্ণব, অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, এই সমুদয় দেবতা মানেন। প্রভু অবতীর্ণ হইবামাত্র তাঁহাদের প্রভুতে অনেকটা বিশ্বাস হইল, আর তখন প্রভুকে গোপনে পত্র লিখিতে লাগিলেন। পত্রের তাৎপর্য্য এই, "প্রভু, তুমি পতিত উদ্ধার করিতে আগমন করিয়াছ, আমাদের ন্যায় পতিত আর পাইবে না, আমাদিগকে উদ্ধার কর।" প্রভু এ সমুদয় পত্রের উত্তর দিলেন না; তবে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে একেবারে রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর সহিত তাঁহাদের মিলন পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। ইঁহারা সনাতন এ রূপ নামে পরিচিত হইলেন। সনাতন, প্রভুকে বলিলেন যে "বৃন্দাবন যাইতে হইলে একা গমনও করিলে ভাল হয়।" প্রভু বলিলেন, "রামকেলি গ্রামে আমার আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, তোমাদের সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছি।" তাহার পরে প্রভু আবার বলিলেন, তোমরা গৃহে যাও, কৃষ্ণ অচিরাৎ তোমাদিগকে কৃপা করিবেন।" ইহা বলিয়া প্রভু বৃন্দাবনে না যাইয়া সেখান হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তাহার পর শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া এই প্রয়োগে আসিয়াছেন। এই দুই ভাই, যদিও পূর্বে প্রভুর কথা-মাত্র শুনিয়া, তাঁহাকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এখন প্রভুর দর্শনে তাঁহাদের সেই বিশ্বাস শতগুণ বদ্ধমূল হইল। শুধু তাহা নয়, তাঁহাদের ঘোর বৈরাগ্যের উদয় হইল। আর চাকরী করিতে পারেন না, এমন কি, ঘরে থাকিতেও পারেন না। তবে রাজার ভয়ে দুই ভাই একেবারে চাকুরী ছাড়িতে সাহসী হইলেন না। রূপ কনিষ্ঠ, তিনি গৃহে আসিলেন, আসিয়া রহিয়া গেলেন, রাজসভায় গমন করেন না। সনাতন গৌড়ে রহিলেন, কিন্তু রাজকার্য্য আর করেন না, বাসায় বসিয়া থাকেন। রাজা সনাতনকে বারবার ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু তিনি পীড়ার ভাণ করিয়া রাজসভায় আইসেন না। রাজা তাহার পরে চিকিৎসক পাঠাইলেন। তিনি যাইয়া রাজাকে বলিলেন যে, সনাতনের পীড়া নহে। রাজা তখন স্বয়ং সনাতনের নিকট আসিয়া উপস্থিত। রাজা বলিলেন, "তোমাদের দুই ভাইকে লইয়া আমার সকল কার্য্য, এক ভাই দরবেশ হইল, তুমি কার্য্য করিবে না, আমার কার্য্য চলে কিরূপে?" সেদিন সনাতন একরূপ রাজাকে বুঝাইয়া বিদায় করিয়া দিলেন। এমন সময় রাজা উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে চাহিলেন, আর সনাতনকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। তখন প্রভুর কৃপায় সনাতন বলিলেন যে, তিনি যাইবেন না। এরূপ দুঃসাহসের কার্য্য সহজ জ্ঞান থাকিতে কেহ করে না, কারণ এরূপ কার্য্যের ফল তখনি প্রাণদণ্ড! কিন্তু সনাতনের তখন প্রাণের মমতা ছিল না যেহেতু প্রভুর সহিত মিলনে তাঁহার ঘোরতর বিরাগ ও অনুতাপ হইয়াছে। তখন সনাতনের আপনাকে এরূপ ঘৃণা হইয়াছে যে, প্রাণবধ যে একটা দণ্ড, তাহা তাঁহার আর বোধ নাই। তখন তাঁহার হৃদয় কেবল অনুতাপানলে

দিবানিশি দগ্ধ করিতেছে, তিনি মরিলেই বাঁচেন। যেরূপ শূলরোগী কি মহাব্যাধিগ্রস্থ লোক ভাবে যে, "মরিলেই বাঁচি", সেইরূপ সনাতনের তখন অন্তরে শূলরোগের ও মহাব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে। প্রভুর কৃপায় রাজা সনাতনকে বধ করিলেন না, তবে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া, যুদ্ধ করিতে চলিয়া গেলেন। সনাতন ঘোর নরকসদৃশ স্থানে কেবল মহাপ্রভুর চরণ ধ্যান করিয়া প্রাণে বাঁচিয়া রহিলেন।

রূপ পূর্বেই গৌড় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি আর কারাবদ্ধ হইলেন না। তিনি বাড়ী আসিয়া, তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য লইয়া কি করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। যে ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত লোকে অনায়াসে পরকাল নষ্ট করে, এখন ইহারা কয়েক ভাই কিরূপে সেই ঐশ্বর্য্যের হাত হইতে উদ্ধার পাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। রূপ ও সনাতনের সন্তান নাই, তবে কনিষ্ঠ অনুপমের একটি পুত্র আছেন, নাম শ্রীজীব। তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য দিয়া গদিতে বসাইলেন। আর যত ধন ছিল, তাহা বিলাইয়া দিবেন মনস্থ করিলেন। ইহারা জানিতেন যে, প্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবেন। কবে যাইবেন তাহা জানিবার নিমিত্ত সেখানে দুইজন চর পাঠান হইল। প্রভু যেই নীলাচল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন, অমনি তাহারা আসিয়া বলিল যে, প্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। তখন রূপ ও অনুপম, কারাগারে সনাতনকে লিখিলেন যে, তাঁহারা দুই ভাই প্রভুর উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন চলিলেন, তিনি যে গতিকে পারেন খালাস হইয়া আসিতে থাকুন। আরও লিখিলেন, তাঁহার খালাসের নিমিত্ত দশ সহস্র মুদ্রা মুদিখানায় গচ্ছিত রহিল। এইরূপে পত্র লিখিয়া রূপ ও অনুপম তাঁহাদের বহুমূল্য বসন-ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া, ছেড়া কান্থা ও কৌপীন অবলম্বন করিয়া, বিনা সম্বলে, কাঙ্গালের কাঙ্গাল হইয়া প্রভুর চরণ ধ্যান করিতে করিতে বৃন্দাবনাভিমুখে চলিলেন। তখন এক চিন্তা,—এক কথা ভাবেন। যাঁহারা চিরদিন সুখে কাটাইয়াছেন, কখনও কষ্ট পান নাই, তাঁহারা যে পথে পথে, অনিদ্রায় অনাহারে, রৌদ্রে বৃষ্টিতে কষ্ট পাইতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের কোন দুঃখ কি কষ্ট নাই। সঙ্গে কপর্দকমাত্র নাই। যাহা আপনি আইসে, তাহা দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্ত করেন। উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য এক, আশা এক— কিরূপে প্রভুর চরণ দর্শন করিবেন। তাঁহাদের পাপ বৃহৎ, প্রভুর কৃপা ব্যতীত তাঁহাদের উদ্ধার হইবার আর উপায় নাই। প্রভুকে ধ্যান করিতে করিতে পাগলের ন্যায় চলিয়াছেন। প্রয়াগে যাইয়া দেখিলেন যে, লক্ষ লক্ষ লোকে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, ধূম দেখিলে অগ্নি নির্দেশ করা যায়। সেইরূপ যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, লক্ষ লক্ষ লোক হরি বলিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে, তখন নিশ্চয় প্রভু সেখানে আছে। শেষে অনুসন্ধানে জানিলেন যে, প্রকৃতই প্রভু সেখানে। মধ্যাহ্নের সময় প্রভু নিভৃতে উপবেশন করিলে, দুই ভাই অতি দীনভাবে দন্তে তৃণ ধরিয়া দীনের দীন হইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, কান্দিতে কান্দিতে উঠিতে পড়িতে প্রভুর নিকটস্থ হইলেন। বলিলেন, "হে দীনদয়াময়! হে পতিতপাবন, তোমা ব্যতীত আমাদের ন্যায় পতিতকে আর কে আশ্রয় দিবে?"

প্রভু রূপকে রজনীতে একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সর্বজ্ঞ নাথ তাঁহাকে দর্শন মাত্র চিনিলেন। তখন সহাস্যে বলিতেছেন, "উঠ রূপ। দৈন্য সম্বরণ কর। কৃষ্ণের কৃপা অপার। তিনি তোমাদিগকে বিষয়-কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" ইহাই বলিয়া আবেগভরে দুই ভাইকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তারপরে তাঁহাদিগকে নিকটে বসাইয়া তাঁহাদের বৃত্তান্ত সমুদয় শুনিলেন। রূপ যখন বলিলেন যে সনাতন বন্দী আছেন, তখন সর্বজ্ঞ প্রভু বলিলেন, "না, তিনি আর বন্দী নাই, আমার এখানে আসিতেছেন।" প্রভু রূপকে পাইয়া কিছুকাল তাহাকে নিজের কাছে রাখিলেন, কারণ রূপের সহিত তাহার অনেক কার্য্য ছিল।

প্রভু ভুবনবন্ধু, যত প্রেম-পাগলামি করুন না কেন, জীবের প্রতি মমতা, জীবের মঙ্গল

কামনা, সর্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়াছেন। বৃন্দাবন যাইবার ছল করিয়া পদব্রজে নীলাচল হইতে গৌড়ের নিকট রামকেলী-গ্রামে গেলেন। আর রূপ সনাতনকে আপনার রূপ ও গুণ দেখাইয়া ভুলাইয়া কুলের (ঘরের) বাহির করিলেন। কেন না, তাঁহার নিজের কার্য্য উদ্ধার করে, তাঁহাদের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আর কেহ তখন ছিলেন না। সে কার্য্য কি?—না বৃন্দাবনের কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ এবং পশ্চিমে পতিত জীবগণের উদ্ধার করা।

মনে ভাবুন, বৃন্দাবন কৃষ্ণ-লীলার স্থান। শ্রীপ্রভু জীব-হৃদয়ে সেই বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে চেতন করাইতেছেন। তাঁহার প্রবর্তিত যে ধর্ম, তাহার প্রধান অঙ্গ কাজেই বৃন্দাবন। সেখানে এইরূপ শক্তিসম্পন্ন সেনাপতিগণের প্রয়োজন যে, তাঁহারা সেইস্থান বিপক্ষগণ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। প্রভুর ভক্তের মধ্যে যাঁহারা বৃন্দাবন শাসন করিবেন, তাঁহাদের কার্য্য পশ্চিমদেশে প্রভুর ধর্ম প্রচার ও জঙ্গলময় শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করা। আরও এক কার্য্য বলিতেছি। বৃন্দাবন ভারতে যত সাধু ও জ্ঞানীর বিচরণের স্থান। কাজেই এই সেনাপতিকে এইরূপ হইতে হইবে যে, যে কোন সাধু কি জ্ঞানী সেখানে গমন করুন না কেন, তাঁহাদের সকলকেই সেই গৌর-ভক্তগণের নিকট মস্তক নত করিতে হইবে। এইরূপ দুরূহ কার্য্য যিনি করিবেন, তাঁহার প্রভুর শক্তিসম্পন্ন হওয়া চাই। এতদিন তাঁহাদের আর একটি প্রধান কার্য্য ছিল। প্রভুর শক্তিতে তখন দেশে প্রবল এক বৈষ্ণবদল সৃষ্টি হইয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীবাস যে প্রার্থনা করেন, "আমাদের গোষ্ঠী বৃদ্ধি পাউক", তাহা হইয়াছে। তাঁহাদের শাসনের নিমিত্ত নিয়মাবলীর প্রয়োজন নানা শাস্ত্র মন্থন করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম ও ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করা কর্তব্য। বৈষ্ণব-ধর্ম অবতারের ধর্ম। ইহা নূতন কাণ্ড, ইহার ঘোর বিরোধী অদ্বৈতবাদী ও জ্ঞানী-পণ্ডিতগণ আর তাঁহারাই হিন্দুগণের নেতা। অতএব ভক্তি বলিয়া একটি নূতন শাস্ত্র করিতে হইবে। তাহার পরে নূতন সমাজ করিতে হইলে যেরূপ নিয়মাবলীর প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে। এ সমুদয় করে এমন শক্তি কাহার? করিলেই বা জগতে মানিবে কেন?

তাই প্রভু স্বয়ং রূপ সনাতন দুই ভাইকে আনিতে রামকেলীতে গিয়াছিলেন। এখন তাঁহার এক ভাই সম্মুখে, সুতরাং তাঁহাকে লইয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শ্রীরূপ-সনাতনকে বৈষ্ণবধর্ম শিক্ষা দিয়া প্রভু তাঁহাদের দুই ভাইকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছেন। সেখানে দুই ভাই যাইয়া যে সমুদয় অদ্ভুত কাণ্ড করেন, তাহাতে আবার প্রতিপন্ন হইবে যে, সর্বজ্ঞ প্রভু লোক চিনিতেন। "আবার" বলি কেন, না প্রভুর লীলা মনোনিবেশপূর্বক পাঠ করিলে জানা যায়, তিনি সর্বজ্ঞ। কোথা কোন ভক্তি-আচার্য্য গোপনভাবে বাস করিতেছেন, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনিতেন, যেমন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। আবার কাহার নিকটে আপনি যাইতেন, যেমন রূপ-সনাতন।

এই প্রয়াগে দুইজন মহাজনের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। ইহাদের একজন বল্লভ ভট্ট। এক শ্রেণীর বৈষ্ণব আছেন, ইনি তাঁহাদের নেতা। ইনি কয়েকখানি বৈষ্ণব-গ্রন্থ লিখিয়াছেন, শ্রীধর-স্বামীকে অবজ্ঞা করিয়া ভাগবতের টীকা করিয়াছেন। ইনি বাল-গোপাল উপাসক। বল্লভ ভট্টকে অদ্যাপিও তাঁহার দলস্থগণ পূজা করিয়া থাকেন। ইহার বাড়ী প্রয়াগের নিকট আন্ধুলি বা আউলি গ্রামে। মহাপ্রভুর আগমনে প্রয়াগের নিকটস্থ দেশসমূহ তরঙ্গায়মান হয়। সুতরাং বল্লভ ভট্ট ভাবিলেন, এই গৌড়ের বস্তুটি কি একবার দেখিয়া আসি। তাই প্রয়াগে আসিলেন, এবং শ্রীপ্রভুকে দর্শন করিবামাত্র ভক্তিতে গদ গদ হইলেন। তখন অনেক মিনতি করিয়া, প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনি বাড়ী লইয়া চলিলেন। সর্বজ্ঞ প্রভু বেশ জানেন যে, ভট্টের মনে গর্ব রহিয়াছে, আর তিনি মনে মনে প্রভুকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেন। কিন্তু প্রভুর জীবের প্রতি স্নেহ ও প্রেম ব্যতীত, দ্বেষ কি হিংসা সম্ভব হয় না। প্রভু ভট্টের সহিত নৌকা করিয়া তাঁহার বাড়ী চলিলেন।

ভট্টের বাড়ী যমুনার তীরে, সুতরাং যমুনা দিয়া নৌকা চলিল। বোধ হয় সেই লোভেই-বা প্রভু ভট্টের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যমুনা দেখিয়া প্রভু হুঙ্কার করিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন, সকলে তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইলেন। তাহাতেই বা রক্ষা কি? কারণ প্রভুকে নৌকায় উঠাইলে তিনি নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাহাতে নৌকায় ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে লাগিল। এই যে প্রভু প্রেমের তরঙ্গে নানাবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছেন, তবু ভট্টের নিকট বলিয়া প্রভু অনেক ধৈর্য্য ধরিয়াছেন। কারণ ভট্ট বহিরঙ্গ লোক, বহিরঙ্গ সঙ্গে প্রেম প্রস্ফুটিত হয় না। যথা চরিতামৃতে ঃ

"যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভু ধৈর্য্য মন। দুর্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ।।"

শ্রীরূপগোস্বামী যখন প্রভুকে প্রথমে দর্শন করেন, তখনই প্রভুতে বিশ্বাস হইয়াছে; কিন্তু একটু বাকী আছে। তখন ভাবিতেছেন, "কি আশ্চর্য্য!" শ্রীকৃষ্ণের চরণজ্যোতি ধ্যান করিবেন আশা করিয়া যোগীগণ সহস্র বৎসর যাপন করেন, অথচ কৃতকার্য্য হয়েন না। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ-কুমার, যাঁহাকে বালক বলিলেও হয়, তিনি কিনা প্রাণপণে শ্রীকৃষ্ণের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। শ্রীমতী শাশুড়ী ননদীর নিকট আছেন! এমন সময় বংশীধ্বনি হইল, রাধাঠাকুরাণীর অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। মনে মনে বলিতেছেন, "বন্ধু অসময়ে বাঁশী বাজাইয়া কেন আমাকে লজ্জা দাও?" আর নানা চেষ্টা করিয়া শাশুড়ী-ননদীর নিকট প্রেম গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু "দুর্বার উদ্ভট প্রেম নহে নিবারণ।" প্রভু যত্ন করিয়া ধৈর্য্য ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু অবাধ্য প্রেম কথা শুনে না।

প্রভুর সঙ্গে ভট্টের বাড়ী চলিয়াছেন—কৃষ্ণদাস প্রভৃতি, যাঁহারা বৃন্দাবন হইতে তাঁহার সহিত আসিয়াছেন, আর রূপ ও অনুপম। প্রভু আউলি গ্রামে গমন করিলে, অনেকে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন কিন্তু ভট্ট তাহা শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি গোসাঞিকে আনিয়া অকার্য্য করিয়াছি। ইনি যমুনা দেখিলে জলে ঝাঁপ দেন, আর উঠেন না। আমি প্রয়াগ হইতে উহাকে আনিয়াছি, সেখানে রাখিয়া আসিব, তোমাদের যাহার ইচ্ছা হয় সেখান হইতে তাঁহাকে আনিও।" ভট্ট নিমন্ত্রিতগণকে সেবা করাইয়া আবার নৌকা করিয়া প্রয়াগে রাখিয়া গেলেন। ভট্ট ইহার কিছুকাল পরে নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে গমন করেন ও সেখানে গদাধরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন, কিন্তু সে পরের কথা।

ভট্টের ওখানে প্রভুর নিকট রঘুপতি উপাধ্যায় আগমন করিলেন। ইনি ত্রিহুতের পণ্ডিত, পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত। ইহার কৃত কবিতা পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত আছে। প্রভু প্রয়াগে প্রত্যাবর্তন করিয়া রূপকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। যদিও সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার লুকাইতে যাওয়া বিফল চেষ্টা, তথাপি একটি নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রহিবার চেষ্টা করিলেন এবং এইরূপে দশ দিবস শ্রীরূপকে শিক্ষা দিলেন। প্রভু রূপকে যে শিক্ষা দিলেন, তাহার সংক্ষেপে বর্ণনা শ্রীচরিতামৃতে আছে। তৎপরে প্রভু বারাণসী চলিলেন। রূপ সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, আর বলিলেন "তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারি না।" ইহাতে প্রভু কিছুমাত্র কোমল না হইয়া রুক্ষ্মভাবে বলিলেন, "সে কি? আমার আজ্ঞা পালন কর, কাজ কর, জীবের মঙ্গল সাধনার চেষ্টা কর, আপনার সুখ-আশা বিসর্জন দিয়া বৃন্দাবনে যাও। তাহার পরে ইচ্ছা হয় আমার সহিত নীলাচলে দেখা করিও।" ইহা বলিয়া প্রভু তাঁহাকে ফেলিয়া চলিলেন আর—"মূর্চ্ছিত হইয়া রূপ রহিল পড়িয়া।।" (চরিতামৃতে)

এখানে শ্রীরূপের কথা আর একটু বলি। রূপ ও অনুপম শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া দেখেন যে সেখানে সুবুদ্ধি রায়। প্রভুর কি ভঙ্গী! এই শ্রীরূপ গৌড়ীয় পাতসার মন্ত্রী। সুবুদ্ধি স্বয়ং গৌড়ের পাতসাহ ছিলেন। রূপ হোসেন সাহর চাকুরী করিতেন, আবার হোসেন সাহ তাহার

পূর্বে স্বয়ং সুবুদ্ধি রায়ের চাকুরী করিতেন। কারণ সুবুদ্ধি গৌড়ের রাজা ছিলেন। রূপ প্রভুর কৃপায় রাজা ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে, আর সুবুদ্ধি রায়ও প্রভুর কৃপায় বৃন্দাবনে। হোসেন সাহ যখন গৌড়ের রাজা সুবুদ্ধি রায়ের ভৃত্য ছিলেন, তখন তিনি দিঘি খনন করিবার ভার প্রাপ্ত হয়েন। তাহাতে অপরাধ পাইয়া রাজা সুবুদ্ধি হোসেনকে চাবুক মারেন, আর তাহার দাগ অঙ্গে রহিয়া যায়।

কিছুকাল পরে এই হোসেন সুবুদ্ধিকে বিতাড়িত করিয়া আপনি রাজা হইলেন। কিন্তু সুবুদ্ধিকে, পূর্বে প্রতিপালক ভাবিয়া, বধ না করিয়া, বরং অতি আদরের সহিত রাখিলেন। দৈবাৎ হোসেনের স্ত্রী জানিতে পারিল যে, তাহার স্বামীর গাত্রে যে চাবুকের দাগ ইহা সুবুদ্ধি রায় কর্তৃক হইয়াছে। তখন সে তাহার স্বামীকে বাধ্য করিয়া, সুবুদ্ধির মুখের মধ্যে জোর করিয়া জল ঢালিয়া দেওয়াইল। এই জন্য সুবুদ্ধি রায়ের জাতি গেল। তিনি ইচ্ছা করিয়া এই জল পান করেন নাই। কিন্তু সমাজ তাহা শুনিলেন না, তাহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন। সেখানে পণ্ডিতগণ বলিলেন যে, তাঁহার তপ্তঘৃত পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। অবশ্য সুবুদ্ধি ইহাতে সম্মত হইলেন না। সেই সময় প্রভু বৃন্দাবন যাইবার পথে সেখানে উপস্থিত হন। সুবুদ্ধি, প্রভুর কথা শুনিয়া, তাঁহার নিকট যাইয়া আশ্রয় লইলেন ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলেন। প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণনাম সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত।" সুবুদ্ধি সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন, রূপ যাইয়া তাঁহাকে পাইলেন। তাই, প্রভুর কৃপায় গৌড়ের বাদসাহ ও মন্ত্রী উভয়ে এই সময় এক সঙ্গে বৃন্দাবনে মিলিত হইলেন।

এদিকে প্রভুও প্রয়াগ ত্যাগ করিয়া বারাণসী আসিলেন। পথে দেখেন চন্দ্রশেখর দাঁড়াইয়া তাঁহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। চন্দ্রশেখর প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন যে, তিনি পূর্ব রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, প্রভু আসিতেছেন, তাই তাঁহার অপেক্ষায় পথে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রভু তাঁহার পুরাতন বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন; তপন মিশ্রের বাড়ী ভিক্ষা করেন, চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে বাস করেন। ইহার দুই এক দিন পরেই একদিন সর্বজ্ঞ মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, "দ্বারে যে বৈষ্ণব বসিয়া আছেন তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আইস।" চন্দ্রশেখর প্রভুর আজ্ঞানুসারে গমন করিলেন, কিন্তু কোন বৈষ্ণব না পাইয়া প্রভুকে যাইয়া বলিলেন, "কৈ, দ্বারে কোন বৈষ্ণব তো দেখিলাম না।" প্রভু বলিলেন, "তুমি দ্বারে কি কাহাকেও দেখিলে না?" তাহাতে চন্দ্রশেখর বলিলেন, "দ্বারে একজন দরবেশকে দেখিলাম।" তখন প্রভু বলিলেন, "তাহাকেই লইয়া আইস।" এই দরবেশই সনাতন।

ইনি কারাগারে তাঁহার কনিষ্ঠ রূপের পত্র পাইয়া, কারা-রক্ষককে উৎকোচ দিয়া বাহির হইলেন। সে ব্যক্তি সপ্ত সহস্র মুদ্রা পাইয়া তাহাকে লইয়া রজনীতে গঙ্গা পার করিয়া দিল। সনাতন, ঈশান নামক ভৃত্যের সহিত গঙ্গা পার হইলেন। পার হইয়াই বৃন্দাবনাভিমুখে ছুটিলেন। সম্বল মাত্র নাই, পরিধানে একবস্ত্র। তবে আহার কি আরামের ভাবনা তখন তাঁহার নাই,—কিরূপে প্রভুর নিকটে যাইবেন ইহাই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছেন। দিবানিশি চলিয়া পাতড়া পর্বতে আসিলেন। কোন ভূমিকের সাহায্যে সেই পর্বত পার হইয়া আবার চলিলেন। তাঁহার সঙ্গী ঈশানের নিকট অষ্ট-মোহর ছিল, তাহা সনাতন জানিতেন না। সেই স্থানে জানিতে পারিয়া ভূমিককে সপ্ত-মোহর দিলেন, আর একটি ঈশানকে দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। ঈশান বাড়ী ফিরিয়া একজন মহাতেজস্বী প্রচারক হইলেন। ঈশানের বহুগণ এখনও বর্তমান। প্রভুকে একবার মাত্র দর্শন করিয়াছেন, সনাতনের এই শক্তি। আর সনাতনের সঙ্গে কেবল দুই দিবস ভ্রমণ করিয়াছেন, ঈশানের এই শক্তি। আর ইহাই এত তেজস্কর হইল যে, তাঁহার পশ্চাৎ শত শত শিষ্য গুরু বলিয়া তাঁহাকে প্রাণ সমর্পণ করিলেন।

সনাতন দিবানিশি চলিয়া হাজিপুরে আসিলেন। সেখানে সন্ধ্যার সময় বিশ্রাম করিতেছেন, আর উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণ নাম জপিতেছেন। এ জগতে কে কার তল্লাস লয়? এক শ্রীভগবান আমার, আর আমি তাঁহার। তিনি ছাড়া আর কে-জানে যে সেখানে সনাতনের ন্যায় জীব বিরাজ করিতেছেন? এমন সময় সনাতনের ধর্ম-ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত সেই হাজিপুরে, গৌড়ের বাদসাহের নিমিত্ত ঘোড়া কিনিতে আসেন। তিনি উচ্চ টুঙ্গির উপর বসিয়া আরাম করিতেছিলেন, এমন সময় যে ব্যক্তি নাম জপিতেছিলেন, তাঁহার গলার স্বর শুনিয়া সনাতনের স্বরের মত বোধ হইল। তখন শ্রীকান্ত সন্দিগ্ধ হইয়া টুঙ্গি হইতে নামিয়া, সেই ব্যক্তির নিকট আসিয়া দেখেন সনাতনই বটে, তবে মুখে দাড়ি, ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র পরিধানে, দেহ জীর্ণ শীর্ণ, আর বদনে উদাস ও বৈরাগ্যভাব। ইহাতে শ্রীকান্ত একেবারে অবাক হইলেন। একটু স্থির হইয়া বলিলেন, "একি, এই বেশে তুমি এখানে?" তিনি গৌড়ের সংবাদ কিছুই জানিতেন না। তখন সনাতন সংক্ষেপে আপনার কাহিনী বলিলেন। শ্রীকান্ত বলিলেন, "বাড়ী চল।" সনাতন বলিলেন, "আমার বাড়ী কোথা? আমার বাড়ী আমি যাইতেছি।" শ্রীকান্ত বুঝাইতে গেলেন, কিন্তু মুখে উপদেশ আসিল না। যেখানে ঘোর বৈরাগ্যের তরঙ্গ, সেখানে বিষয়-রূপ কুঠা স্থান পাইবে কেন? শ্রীকান্তের কথা সনাতনের হৃদয়ে স্থান পাইল না, ভাসিয়া গেল। শ্রীকান্ত বুঝিলেন, সনাতন যাইবেন, ফিরিবেন না। শ্রীকান্ত অর্থ দিলেন সনাতন লইলেন না। দারুণ শীত দেখিয়া শ্রীকান্ত একখানা শাল দিলেন, তাহাও তিনি লইলেন না। শ্রীকান্ত কান্দিতে লাগিলেন, পরে একখানা ভোটকম্বল দিলেন। নিতান্ত অনুরোধ ও শ্রীকান্তের দুঃখ হইবে ভাবিয়া সনাতন তাহা লইলেন, লইয়া আবার অনন্ত পথে চলিলেন। শ্রীকান্ত দাঁড়াইয়া কান্দিতে লাগিলেন।

শচী মাতার একটি গীতের কিয়দংশ পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, যথা--

"তোমরা কেউ দেখেছ যেতে,
আমার সোণার বরণ গৌর-হরি জনেক সন্ন্যাসী সাথে। ধ্রু।
তাহার ছেঁড়া কাঁথা গায়, প্রেমে ঢলে পড়ে যায়, যেন পাগলের প্রায়,
মুখে হরেকৃষ্ণ বলে, দণ্ড-করোয়া হাতে।।"

শচীমাতা ইহাই বলিয়া নিমাইয়ের সন্ন্যাসের পরে নদীয়া নগরে, তাঁহার পুত্রকে তল্লাস করিতেছেন। এই গেল গানের ভাব। গৌড় হইতে বৃন্দাবন চারি মাসের পথ। গৌড় হইতে বৃন্দাবনে যাইবার নানাবিধ পথ। সনাতন কি প্রভুকে ইহাই বলিয়া তল্লাস করিতে করিতে যাইতেছিলেন? যথা—"তোমরা কি এই পথে একজন সন্ন্যাসী যাইতে দেখিয়াছ? তাঁহার কচি বয়স, বর্ণ কাঁচা সোণার ন্যায়। তিনি প্রেমে উন্মত্ত, তাই ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার পরিধান কৌপীন, গাত্রে ছেঁড়া কাঁথা, আর তাঁহার মুখে কেবল হরেকৃষ্ণ নাম।" না,—সনাতন কিছুই করেন নাই। তিনি একমনে গিয়াছিলেন। কাহারও নিকট এক বারও প্রভুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন নাই। কারণ সনাতন জানিতেন যে, সূর্য্য উদয় হইলে লোক আপনি জানিতে পায়। প্রভু যেখানে আছেন, সেখানে লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিতেছে, সেখানে লোকে তাঁহার কথা ভিন্ন অন্য কথা বলিবে না। কোথাও যদি বৃহৎ ঝড় হয়, তাহার নিদর্শন বহুদূর হইতে পাওয়া যায়। প্রভু যেখানে উদয় হইয়াছেন, সে দেশ আর এক আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং সনাতন জানিতেন যে, প্রভুর অবস্থিতি বহুদূর হইতেও তিনি জানিতে পারিবেন যে, প্রভু জীবের প্রতি কৃপা করিয়া নৃত্য করিতেছেন। প্রভু যে গ্রাম দিয়া গমন করেন সেখানে ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে তাঁহার গমনের সাক্ষী থাকে। তিনি যে পথ দিয়া গিয়াছেন, তাহার দুধারে তাঁহার গমনের সাক্ষী রাখিয়া যান। প্রভু যখন যে দিকে যাইতেছেন, বা যে দিকে আসিতেছেন, এই সংবাদ তাঁহার বহু অগ্রে চলিয়া যায়।

সনাতন যেইমাত্র বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন, সেই জানিতে পারিলেন যে প্রভু ওই নগরে আছেন। তাঁহার কি বাড়ীর নম্বর তল্লাস করিতে হইল? তাহা নয়। প্রভু কোথা আছেন, না চন্দ্রশেখরের বাড়ী। চন্দ্রশেখরের বাড়ী কোথা? না, যে দিকে লক্ষ লক্ষ লোক হরিধ্বনি করিতেছে। সনাতন এই সংবাদে অতিশয় আশ্বাসিত ও পুলকিত হইয়া আস্তে আস্তে চন্দ্রশেখরের বাড়ীর দ্বারে যাইয়া বসিলেন। অভ্যন্তরে প্রভু, দ্বারে সনাতন। সনাতন প্রভুর চরণ ধ্যান করিতেছেন। সনাতন প্রভুর চরণ ধ্যান করিতে করিতে প্রায় দুই মাস হাঁটিয়া আসিয়াছেন। সনাতন প্রভুকে সম্মুখে পাইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতে আশ্বাসিত হয়েন নাই। কারণ তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপ তাহাতে বিন্দুমাত্র কপটতা নাই। ভাবিতেছেন, প্রভু কি তাঁহাকে কৃপা করিবেন? তিনি না ঘোর নারকী? এই যে সনাতন আপনাকে ঘোর নারকী ভাবিতেছেন, ইহা তাঁহার অটল বিশ্বাস। তাঁহার যে হৃদয়ের অনুতাপ সে কাল্পনিক নয়, সে প্রকৃত। তাই প্রভুর নিকট যাইতে ভয় হইতেছে। অনুতাপ কাল্পনিক হইলে সে অনুতাপে বিশেষ কোন লাভ নাই। কারণ শ্রীভগবানকে বঞ্চনা করা যায় না।

ওদিকে সর্বজ্ঞ প্রভু জানিতে পারিয়াছেন যে, সনাতন আসিয়াছেন; তাই চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, "দ্বারে যে বৈষ্ণব আছেন তাঁহাকে ডাকিয়া আন।" চন্দ্রশেখর আজ্ঞা শুনিয়া বাহিরে যাইয়া দেখিলেন, দ্বারে কোন বৈষ্ণব নাই। তবে একজন অতি মলিন, জীর্ণ, শীর্ণ অবস্থায় বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখে দাড়ি, বেশ ঠিক দরবেশের ন্যায়। তাই প্রভুর কাছে বলিলেন যে, কোন বৈষ্ণবকে দেখিতে পাইলেন না। কেবল একজন দরবেশ বসিয়া আছেন। প্রভু বলিলেন, "তাঁহাকেই লইয়া আইস।" চন্দ্রশেখর তো অবাক। যাহারা দরবেশ তাহাদের উপর সাধারণতঃ লোকের কি বৈষ্ণবগণের বড় শ্রদ্ধা নাই। তাহাদের যে সমুদয় ক্রিয়া আছে, তাহা অনুমোদনীয় নহে। প্রভুকে রাজরাজেশ্বরগণ চেষ্টা করিয়া দর্শন পান না। আজি প্রভু এই দরবেশকে আপনি ডাকিতেছেন, ইহাতে সেই দরবেশ চন্দ্রশেখরের নিকট "আপনি" হইয়াছেন।

তখন হর্ষে আশায়, চিন্তায়, ভয়ে, ভক্তিতে, সনাতনের অঙ্গ তরঙ্গায়মান হইল। তিনি চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাঁগা মহাশয়, প্রভু কি আমাকে ডাকিতেছেন? আপনার ভুল হয়েছে, প্রভু আমাকে ডাকিবেন কেন? প্রভু হয়তো আর কাহাকে ডাকিতেছেন।" চন্দ্রশেখর বলিলেন, "হাঁ, আপনাকেই ডাকিতেছেন।" তবু সনাতনের সন্দেহ গেল না। তিনি ভাবিতেছেন,—প্রভু তাঁহাকে চকিতের ন্যায় একবার দেখিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ ভূবনপাবন ভক্ত প্রভুর সেবা করিতেছেন, তিনি (সনাতন) অস্পৃশ্য পামর; প্রভুর তাঁহার কথা মনে থাকিবে কেন? থাকিলেই বা এমন নরাধমকে তিনি ডাকিবেন কেন? তাই চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, "ঠাকুর আপনার ভুল হইয়াছে, আপনি কৃপা করিয়া ভিতরে গমন করুন, আর ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন যে, কাহাকে ডাকিতেছেন।" সনাতন আবার বলিতেছেন যে, তিনি যে আসিয়াছেন এ সংবাদ তো প্রভুর নিকট তিনি পাঠান নাই? এই সমুদয় আলাপ শুনিয়া চন্দ্রশেখর বলিলেন, আপনাকেই ডাকিতেছেন, অতএব আপনি চলুন। তখন সনাতন (যথা ভক্তমালে)—

দুই গোচ্ছা তৃণ করে, এক গোচ্ছা দন্তে ধরে, পড়িল গৌরাঙ্গ-রাঙ্গাপায়।
দু'নয়নে শতধারা, রাজদণ্ডি-জন পারা, অপরাধি আপনা মানয়।।
"তোমার চরণ নাহি, ভজি মোর গতি এহি, সংসার-ভ্রমণে সদা ফিরি।
কদর্য্য বিষয়ভোগ, কামাদি ষড়ঙ্গ রোগ, তাহে ভ্রমি সুখবুদ্ধি করি।।
নীচসঙ্গে সদা স্থিতি, নীচ-ব্যবহারে মতি, নীচকর্মে সদাই উল্লাস।
এ হেন দুর্লভ জন্ম পাইয়া কি কৈনু কর্ম, কেবল হইল উপহাস।।

শরণ লইনু প্রভু, হে নাথ গৌরাঙ্গ বিভু, করুণা-কটাক্ষ মোরে কর।
ও রাঙ্গাচরণে মতি, ত্রৈলোক্যের সারগতি, এ অধম জনারে বিচার।।"
সনাতনের আর্তনাদ, শুনিয়া দৈন্য-বিষাদ, ছল ছল প্রভুর নয়ন।
আলিঙ্গন দিতে চায়, সনাতন পাছে ধায়, কহে "মোরে না কর স্পর্শন।।
তোমা স্পর্শযোগ্য প্রভু, মুঞি ছাড়া নাহি কভু, ঘৃণাস্পদময় এই দেহ।
পাপময় সুকদর্য্য, সাধুর সভায় বর্জ্য মোরে স্পর্শ প্রভু না করহ।।"
প্রভু কহে, "সনাতন, দৈন্য কর সম্বরণ, তোর দৈন্যে ফাটে মোর বুক।
কৃষ্ণ যে দয়াল হয়, ভাল মন্দ না গণয়, হইল যে তোমার সম্মুখ।।
কৃষ্ণকৃপা তোমা পরি, যতেক কহিতে নারি, উদ্ধারিলা বিষয় কূপ হতে।
নিষ্পাপ তোমার দেহ, কৃষ্ণভক্তি মতি অহো, তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।।"

প্রভু পূর্বে রূপকে প্রয়াগে শিক্ষা দিয়াছেন, এখন সনাতনকে শিক্ষা দিবার জন্য কাশীতে রহিলেন। দুই ভাইকে বৃন্দাবনে রাখিয়া তাঁহাদের দ্বারা জীবকে বৈষ্ণব-ধর্মের তত্ত্ব শিক্ষা দিবেন। এই শিক্ষাকার্য্য সমাধা করিতে প্রভুর দুই মাস লাগিয়াছিল। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে এ সমুদয় তত্ত্ব বিবৃত আছে।

প্রভু যখন বৃন্দাবন যাইবার জন্য কাশী ত্যাগ করেন, তখন প্রকাশানন্দ বড় খুসি হইলেন এবং তখন যেখানে-সেখানে যখন-তখন বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মূর্খ সন্ন্যাসী, আপনার ধর্ম জানে না, বেদবেদান্ত পাঠ ত্যাগ করিয়া নৃত্য-গীত করে, ভাবকালি দ্বারা ইতর লোককে ভুলায়। আবার মহাঐন্দ্রজালিক, নানারূপ আশ্চর্য্য দেখাইয়া বড় বড় লোককেও মুগ্ধ করে। বাসুদেব সার্বভৌম নাকি তাহাকে কৃষ্ণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এমন কি, তাহাকে নাকি যে দেখে সেই কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু এ সমুদয় ভাবকালি কাশীনগরীতে চলিবে না। প্রকাশানন্দ যখনই প্রভুর প্রভাব শুনিতেন, তখনই উল্লখিত ভাবে প্রভুকে নিন্দা করিতেন। কাশী ত্যাগ করিয়া প্রভু বৃন্দাবন গমন করিলে, প্রকাশানন্দ বলিতে লাগিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছি ঠিক তাহাই হইয়াছে। ভয়ে চৈতন্য আমাদের নিকট আসে নাই, পলাইয়া গিয়াছে। দেখিও এ নগরে সে আর আসিবে না।" কিন্তু প্রভু যখন ফিরিয়া আসিলেন এবং নগরে আবার কোলাহল আরম্ভ হইল, তখন প্রকাশানন্দের পূর্বকার কথা রহিল না। তখন সে কথা একটু পরিবর্তন করিয়া বলিলেন, "চৈতন্য আবার আসিয়াছে? তা আসুক, দেখিও সে দূরে দূরে থাকিবে, আমাদের এদিকে কখনও আসিবে না। তবে তোমরা তাহার নিকট যাইও না। তাহার বড় শক্তি, সার্বভৌমের ন্যায় প্রচণ্ড লোককে যে ভুলায়, সে তোমাদের ভুলাইবে বিচিত্র কি? তাহার যে মত তাহা পালন করিলে ইহকাল পরকাল দুই-ই নষ্ট নয়।"

প্রকৃত কথা প্রকাশানন্দের যে বিশ্বাস তাহাতে তিনি বৈষ্ণবগণের মতে এক প্রকার নাস্তিক। কাজেই প্রভুর ধর্মে ও প্রকাশানন্দের ধর্মে সম্প্রীতির সম্ভাবনা নাই। প্রকাশানন্দের নিকট এই নিন্দা শুনিয়া যে প্রভুকে কখন দেখে নাই সে প্রভু দর্শনে নিরস্ত হইতে পারিত, কিন্তু যে একবার চাঁদমুখ দেখিয়াছে, সে আর তাহা শুনিবে কেন? যাহা হউক, প্রকাশানন্দ প্রভুর এই উপকার করিলেন যে, তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্জনে সনাতনকে শিক্ষা দিবার অবকাশ করাইয়া দিলেন।

এদিকে প্রভুর ভক্তগণ মহাক্লেশে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের প্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহারা প্রভুকে প্রকৃতই প্রাণাধিক ভালবাসেন, সুতরাং প্রভুর নিন্দা শুনিয়া তাঁহারা মর্মাহত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের দুঃখ প্রভুর নিকট জানাইতে লাগিলেন। প্রভু শুনিতেন আর ঈষৎ হাস্য করিতেন, কিছু বলিতেন না। তখন

ভক্তগণ এক পরামর্শ করিলেন। সেখানে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি বড় লোক। তিনি প্রভুকে দর্শন মাত্রে তাঁহার চরণে চিত্তসমর্পণ করিয়াছেন। প্রকাশানন্দ একপ্রকার কাশীর রাজা। তাঁহার প্রতি এই ব্রাহ্মণের বড় ভক্তি ছিল, কিন্তু প্রভুকে দর্শন করা অবধি তিনি প্রভুর চরণ আশ্রয় করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে প্রকাশানন্দও তাহাই করেন। তাই তাঁহাকে প্রভুর চরণে আনিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রভুর গুণানুবাদ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন সুফল হইল না। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন যে, প্রকাশানন্দ সরল চিত্ত সাধু। প্রভুকে যে তিনি নিন্দা করেন তাহার কারণ প্রভুকে তিনি কখনও দেখেন নাই। একবার যদি তিনি প্রভুকে দেখেন তবে তাঁহার দুর্মতি ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু প্রকাশানন্দ প্রভুর নিকট আসিবেন না, প্রভুকেও তাঁহার নিকট যাইতে বলিতে পারেন না। ইহার উপায় কি? তখন তিনি প্রভুর ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া এক পরামর্শ করিলেন। ভাবিলেন যে কাশীর সমুদয় সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিবেন, করিয়া প্রভুকে মিনতি করিয়া সেখানে লইয়া যাইবেন। এই পরামর্শ সাব্যস্ত হইলে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ দশ সহস্র সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ করিলেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত প্রকাণ্ড আয়োজন করিলেন। তাহার পর, সকলে ভক্তগণ জুটিয়া প্রভুর নিকট গমন করিয়া নিমন্ত্রণের কথা বলিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু আমরা জানি সন্ন্যাসী-সমাজে আপনি গমন করেন না; কিন্তু আমার বাড়ী আপনার পবিত্র করিতে হইবে।" প্রভু সর্বজ্ঞ, তাই এ সমুদয় ষড়যন্ত্রের মর্ম বুঝিলেন। দেখিলেন যে, তাঁহার ভক্তগণ সকলে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসীগণের উদ্ধার সকলের উদ্দেশ্য। তখন প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমাদের যাহা অভিরুচি।" তখন সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

প্রকাশানন্দ শুনিলেন যে, "চৈতন্য" নিমন্ত্রণে আসিতেছেন, আর এ কথা এই দশ সহস্র নিমন্ত্রিত সন্ন্যাসী শুনিলেন। অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ বড় কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন, কিন্তু প্রকাশানন্দ সম্ভবতঃ একটু চিন্তিত হইলেন। এই "চৈতন্য", যাঁহাকে তিনি প্রকাশ্যে বহুবার নিন্দা করিয়াছেন, এখন অনায়াসে তাঁহার স্থানে,—তিনি যেখানে সর্ববলে বলীয়ান সেখানে—স্বেচ্ছাপূর্বক আসিতেছেন! ইহার উদ্দেশ্য কি? সার্বভৌমের ন্যায় তাঁহাকেও ভুলাইবেন নাকি?

সমর মত সন্ন্যাসীগণ সভায় আসিলেন এবং প্রভুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিবেন, যাঁহাকে লোকে শ্রীভগবান বলিয়া পূজা করে সে সন্ন্যাসী না জানি কেমন! এমন সময় প্রভু, সনাতন প্রভৃতি চারিজন ভক্ত সঙ্গে করিয়া ধীরে-ধীরে নাম জপিতে-জপিতে উপস্থিত হইলেন। এখানে আমি আমার "প্রবোধানন্দের জীবন-চরিত" গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব।

প্রভু আসিলে সন্ন্যাসী-সভায়, "ঐ চৈতন্য আসিতেছেন" বলিয়া একটি ধ্বনি হইল। সকলে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতেছেন যে, সাড়ে চারি হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ, কাঁচাকাঞ্চন বর্ণের একটি যুবা পুরুষ, অতি মন্থর গতিতে, অবনত বদনে আগমন করিতেছেন। মুখের এরূপ কমনীয় ভাব যে, স্ত্রীলোকের মুখ বলিয়া ভ্রম হয়। প্রসন্ন বদন, উন্নত ললাট ও কমল নয়ন। প্রভু মস্তক অবনত করিয়া যেন সশঙ্ক ও সলজ্জ ভাবে ধীরে-ধীরে আসিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার চারিজন ভক্ত। সন্ন্যাসীগণ বৃহৎ চন্দ্রাতপতলে বসিয়া আছেন। প্রভু অগ্রে আসিয়া মুখ উঠাইয়া যোড়করে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন। পরে বাহিরে পাদ প্রক্ষালনের যে স্থান ছিল সেখানে পাদ প্রক্ষালন করিয়া সেইখানেই বসিলেন।

সন্ন্যাসীগণ এ পর্য্যন্ত তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন; দেখিতেছেন তাঁহার বয়ঃক্রম অতি অল্প, এমন কি বালক বলিলেও হয়। প্রভুর বয়ঃক্রম তখন একত্রিশ, কিন্তু দেখিতে

তাহা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক বলিয়া বোধ হইত। মুখে ঔদ্ধত্যের চিহ্নও নাই। বরং দেখিলে বোধ হয় এরূপ সরল নিরীহ ভাল মানুষ ত্রিজগতে কেহ নাই। বদন মলিন অথচ প্রফুল্ল, যেন অন্তরে দুঃখময় আনন্দ রহিয়াছে।

প্রভুর মুখ দেখিয়া প্রকাশানন্দের চিরকালের শত্রুতা মুহূর্ত মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় হইল। বরং সেই মুখ যেন তাঁহার প্রাণকে টানিতে লাগিল। প্রকাশানন্দ সদাশয় মহাজন। তাঁহার সভাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আসিয়া অপবিত্র স্থানে বসিলেন, ইহা সামান্যতঃ তিনি করিতে দিতেন না। তাহার পরে প্রভুর উপর যত রাগই থাকুক, তিনি যে একজন প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা তখন বেশ বুঝিয়াছেন। আবার প্রভুর বদন দর্শনেও তাঁহার দীনতায় মুগ্ধ হইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার সঙ্গে সেই সহস্রাধিক সন্ন্যাসী সকলেই দাঁড়াইলেন। তখন প্রকাশানন্দ, প্রভুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! সভার মধ্যে আসুন। অপবিত্র স্থানে বসিয়া কেন আমাদিককে ক্লেশ দিতেছেন?"

ইহাতে প্রভু করযোড় করিয়া বলিলেন, "আমার সম্প্রদায় অতি হীন, আপনার সম্প্রদায় অতি উচ্চ, আপনাদের সভার মধ্যে আমার বসা কর্তব্য নয়।" ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রভু ভারতী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যত সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে সরস্বতী, তীর্থ, পুরী প্রভৃতি উচ্চ এবং ভারতী নীচু। এ কথা শুনিয়া ও প্রভুর দৈন্যে মুগ্ধ হইয়া, সরস্বতী আপনি উঠিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া একেবারে সভার মধ্যস্থানে লইয়া বসাইলেন।

মহানুভব সরস্বতীর তখন শত্রুতা প্রায় গিয়াছে, বরং সেই স্থানে বাৎসল্য স্নেহের উদয় হইয়াছে। প্রভুর সরল ও সুন্দর মুখ, দীনভাব ও চরিত্র দেখিয়া সরস্বতী বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার প্রভুর প্রতি ক্রোধ ছিল বটে, কিন্তু প্রভুর তাঁহার প্রতি ক্রোধ মাত্র নাই। ইহাতে মনে একটু অনুতাপের উদয় হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আমি শুনিয়াছি, আপনার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং আপনি শ্রীকেশব ভারতীর শিষ্য! কিন্তু আমাদের মনে একটি দুঃখ আছে। আপনি এই স্থানে থাকেন, আমরা আপনার এক আশ্রমের, অথচ আমাদিগকে দর্শন দেন নাই কেন?"

প্রভু এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় অবনত মুখে রহিলেন।

তখন সরস্বতী ঠাকুর সরল ভাবে তাঁহাকে সমুদয় মনের কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনার তেজ ও ভাব দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া বোধ হয়। আপনাকে সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাদের সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসীর যে প্রধান ধর্ম বেদপাঠ তাহা আপনি করেন না। আবার সন্ন্যাসীর পক্ষে নিতান্ত দূষণীয় কার্য্য, নৃত্য-গীত প্রভৃতি ভাবকালিতে আপনি নিমগ্ন থাকেন। আপনি সুবোধ, আমাদের সম্প্রদায় মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। আপনি ও সমস্ত ধর্মবিরুদ্ধ কার্য্য ও হীনাচার কি কারণে করেন তাহা কৃপা করিয়া বলুন।"

সরস্বতীর প্রকৃতই তখন বিদ্বেষ ভাব গিয়াছে। আবার, প্রভুর নিকটে বসিয়া ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি যাহা পূর্বে ভাবিয়াছিলেন এ ব্যক্তি নিতান্ত তাহা নয়। এই জন্য, আপনি যে পূর্বে প্রভুকে নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই দোষ খণ্ডন করিবার নিমিত্ত ও কতক কৌতূহল তৃপ্তি করিবার নিমিত্ত আত্মীয়তা ভাবে, প্রণয়-বিরক্তির সহিত উপরোক্ত কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু কি উত্তর করেন, ইহা শুনিবার নিমিত্ত সভাস্থ সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

কথা এই, প্রভুকে দেখিয়া সরস্বতী ও তাঁহার সহস্রাধিক শিষ্যের মন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে বুঝিলেন যে, এ বস্তুটি হয় সিদ্ধপুরুষ, নয় কোন দেবতা ছলনা করিয়া মনুষ্যসমাজে বেড়াইতেছেন।

সরস্বতী যেরূপ বাৎসল্য ভাবে বলিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সেইরূপ গুরুবুদ্ধিতে উত্তর দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মস্তক অবনত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শ্রীপাদ! আমি আমার কথা আমূল আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি। আমি যখন গুরুর আশ্রয় লইলাম, তখন তিনি দেখিলেন যে, আমি মূর্খ। ইহাতে তিনি বলিলেন, 'বাপু, তুমি মূর্খ, তুমি বেদান্ত পড়িতে পারিবে না। কিন্তু তাহাতে তুমি দুঃখিত হইও না। তাহার পরিবর্তে আমি তোমাকে অতি উত্তম দ্রব্যই দিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি বলিলেন, এই শ্লোকটি তুমি কণ্ঠস্থ কর ঃ

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।"

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর কণ্ঠস্বর সঙ্গীত হইতেও মধুর। তিনি যখন মলিন মুখে ধীরে ধীরে আপনার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সকলে নীরব হইয়া শুনিতে লাগিলেন। প্রভু যে শুদ্ধ এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন তাহা নয়, উহার ব্যাখ্যাও করিলেন। সে ব্যাখ্যা অদ্ভুত। এই ক্ষুদ্র শ্লোকের মধ্যে যে এরূপ অর্থ আছে তাহা পূর্বে কেহ জানিতেন না। প্রভু শ্লোকের অর্থ করিয়া পরে বলিতেছেন,—গুরুদেব আমাকে বলিতে লাগিলেন, 'এই দেখ বাপু, কলিকালে নাম ব্যতীত আর গতি নাই; অতএব তুমি শুদ্ধ কৃষ্ণ নাম জপ কর, তোমার আর কোন কার্য্য করিতে হইবে না; ইহাতে তোমার কর্মবন্ধ ক্ষয় পাইবে, অধিকন্তু ব্রহ্মা প্রভৃতির যে দুর্লভ ধন 'কৃষ্ণপ্রেম', তাহাও লভ্য হইবে।"

সন্ন্যাসীরা ও প্রকাশানন্দ নানা কারণে প্রভুর কথা শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রভুর নিকট হরের্নাম শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া বুঝিলেন যে, বালক-সন্ন্যাসী একজন প্রবল পণ্ডিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন, "আমি গুরুদেবের আজ্ঞা পাইয়া মন দৃঢ় করিয়া কৃষ্ণনাম জপিতে লাগিলাম। জপিতে জপিতে আমার মন ভ্রান্ত হইল, ক্রমে আমার সব প্রকৃতি পরিবর্তিত হইল। তখন আমি কখন হাসিতে, কখন কান্দিতে, কখন নাচিতে, কখন বা গাহিতে লাগিলাম; তখন ভাবিলাম, আমার একি দশা হইল? এ ত উন্মাদের অবস্থা! তবে কি সত্যই আমি পাগল হইলাম? এইরূপ ভাবিয়া, ভীত হইয়া, আবার গুরুর শরণাপন্ন হইলাম, এবং তাঁহার চরণে এই নিবেদন করিলাম যে, "প্রভু, আপনি আমাকে কি মন্ত্র দিলেন? ইহার এ কি প্রকার শক্তি? আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি কৃষ্ণনাম জপিতেছিলাম। জপিতে জপিতে আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়া গেল। এখন নাম জপিতে জপিতে আমি হাসি, কাঁদি, নাচি, গাই, এমন কি, নাম জপিয়া আমি পাগলের মত হইয়াছি। এখন ইহা হইতে কি করিয়া উদ্ধার হইব, তাহা কৃপা করিয়া বলিয়া দিন।"

আমার এই কথা শুনিয়া গুরুদেব হাস্য করিয়া বলিলেন, "এ তোমার বিপদ নয়,—সম্পদ। তোমার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে, কারণ কৃষ্ণনামের শক্তিই এইরূপ। উহাতে হৃদয় ঐরূপ চঞ্চল করে,—কৃষ্ণের চরণে রতি উৎপাদন করে। জীবের যে পরম পুরুষার্থ, যাহা হইতে অধিক সৌভাগ্য আর হইতে পারে না, তাহাই অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম, তুমি লাভ করিয়াছ।" ইহাই বলিয়া গুরুদেব আমাকে কয়েকটি শ্লোক শুনাইলেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হাসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।"

অর্থাৎ—"এই প্রকারে যিনি অনুরাগ-বিগলিতচিত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনার প্রিয় কৃষ্ণনাম লইয়া হাস্য রোদন হুঙ্কার গীত ও নৃত্য করেন তিনি সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া জীবগণকে রক্ষা করেন।"

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।

সকৃদপিপরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।।"

অর্থাৎ—"যে কেহ হউক না কেন, যদি পরম মধুর মঙ্গলের মঙ্গলকর সকল নিগমের সুফল-স্বরূপ চিন্ময় কৃষ্ণনাম একবার হেলায় বা শ্রদ্ধায় গান করে, তাহা হইলে হে ভৃগুবর, সেই কৃষ্ণের নাম তাহাকে উদ্ধার করেন।"

"তৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তোমহামুদঃ।
কুর্বন্তি কৃতিনোঽকৃচ্ছং চতুর্বর্গং তৃণোপমং।।"

অর্থাৎ—"যে কৃতি ব্যক্তিরা মহানন্দে কৃষ্ণকথামৃত-সাগরে বিহার করেন, তাঁহারা কৃচ্ছলভ্য চতুর্বর্গকে অনায়াসে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারেন।"

তদন্তর গুরুদেব বলিলেন, "তুমি কৃষ্ণপ্রেম পাইয়াছ, আমি তোমার গুরু, তোমার নিমিত্ত আমিও কৃতার্থ হইলাম।" গুরুর এই আজ্ঞা, শুনিয়া আমার শঙ্কা দূর হইল। আমি তাঁহার আজ্ঞা দৃঢ় করিয়া কৃষ্ণনাম জপিতে থাকি। ইহাতে আমি যে ক্রন্দন হাস্য প্রভৃতি করি, তাহাতে আমার হাত নাই। ইহা আমি নামের শক্তিতে করিয়া থাকি, ইচ্ছা করিয়া করি না।" শ্রীগৌরাঙ্গ যখন দৈন্যের শক্তিতে কথা কহিতে লাগিলেন, তখন যেন মধু বর্ষণ হইতে লাগিল। তাঁহার বাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসীদিগের চিত্ত কোমল হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশানন্দের প্রশ্নগুলির উত্তর ক্রমে দিলেন। প্রথম বেদ পাঠ কর না কেন? দ্বিতীয় নৃত্য গীত কর কেন? তৃতীয় সন্ন্যাসীদিগের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী কর না কেন? প্রভু ইহার উত্তরে বলিলেন, বেদান্ত না পড়িলেও চলে, হরিনামই যথেষ্ট। আবার বলিলেন, বেদান্ত পড়িলে, কোন ফল হয় নাই। বিশেষতঃ কলিকালে, হরিনাম ব্যতীত আর গতি নাই—নাই—নাই। আর নৃত্য গীত সম্বন্ধে বলিলেন, তিনি যে নৃত্য-গীত করেন, সে আপনার ইচ্ছায় নহে। নাম করিতে করিতে, তাঁহার শক্তিতে প্রেমোদয় হয়, আর তখন নৃত্য-গীত আপনিই আসে। সন্ন্যাসীদিগের সহিত কেন মিলিতে যান না, তাহার কোন কারণ দেখাইলেন না।

প্রকাশানন্দের চিত্ত তখন প্রভু কর্তৃক কতকটা আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তখনও তাঁহার অভিমান আছে। তখনও তিনি ভাবিতেছেন,—"এ যুবক একটি সুন্দর বস্তু, ইহার কথা অতি মিষ্ট, এ অতি সুবোধ, তবে একটু চঞ্চল। যদি আমার কাছে কিছু দিন থাকে, তবে এই কৃষ্ণচৈতন্য একটি অপূর্ব সামগ্রী হইবে। ইহার কৃষ্ণপ্রেম হইয়াছে, ইহা ভাল, তবে বেদান্তের প্রতি ভক্তি নাই, অবশ্য দোষের কথা।" প্রকাশানন্দ এইরূপ চিন্তা করিয়া পরে বলিতেছেন,— "এ অতি উত্তম কথা। ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কৃষ্ণনাম লও, ইহাতে সকলেরই সন্তোষ, আর কৃষ্ণপ্রেম হওয়া বড় ভাগ্যের কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে বেদান্তের উপর অশ্রদ্ধা কেন?" প্রভু বলিলেন, 'শ্রীপাদ আমাকে যে প্রশ্ন করিলেন, তাহার যদি উত্তর না দিই, তবে অপরাধ হইবে। আবার উত্তর দিলে, তাহা যদি আপনাদের তৃপ্তিকর না হয়, তাহা হইলেও আপনারা বিরক্ত হইতে পারেন। অতএব আপনারা যদি আমার অপরাধ না লয়েন, তবে আমি সরলভাবে বলিতেছি, কেন আমি বেদান্ত পড়ি না।"

ইহাতে প্রকাশানন্দ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "শ্রীপাদ, আপনি কি বলিতেছেন? আপনার কথা শুনিয়া আমরা বিরক্ত হইব, ইহা হইতেই পারে না। আপনার মুখে সুধা ক্ষরিত হইতেছে। আপনার মাধুরীপূর্ণ বিগ্রহ দেখিলে আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া প্রতীতি হয়। আপনি অন্যায় বলিবেন, ইহা হইতেই পারে না। আপনি স্বচ্ছন্দে বলিয়া আমাদের কর্ণ পরিতৃপ্ত করুন।"

প্রভু বলিলেন, "বেদান্ত ঈশ্বরের বচন। ইহাতে ভ্রম-প্রমাদ সম্ভবে না। বেদান্তসূত্রের যে মুখ্য অর্থ তাহা অবশ্য মানিব। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন তাহা শঙ্করের বাক্য,

ঈশ্বরের বাক্য নহে। সূত্রের যে অর্থ তাহা পরিষ্কার লেখা আছে। সুতরাং সূত্র থাকিতে ভাষ্যে যাওয়ার প্রয়োজন কি? ব্যাখ্যার তখনি প্রয়োজন, যখন সূত্র বুঝিতে কষ্টকর হয়। আমরা দেখিতেছি, সূত্রের অর্থ বেশ সরল, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা বুঝা কষ্টকর। আপনারা দেখিবেন সূত্রের অর্থ একরূপ, কিন্তু শঙ্কর কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহার অর্থ অন্যপ্রকার করিয়াছেন। ফলকথা, সূত্র যে সরল তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু শঙ্কর যে ভাবে তাহার অর্থ করিয়াছেন তাহা তাঁহার মনঃকল্পিত,—সূত্রের অর্থের সহিত তাহা মিলে না।"

প্রভুর এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসীরা একটু বিরক্ত ও চকিত হইলেন,—শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে যে বিপরীত অর্থ থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের মনে স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। কারণ শঙ্করাচার্য্যকে তাঁহারা জগদ্‌গুরু বলিয়া মান্য করেন, সুতরাং তাঁহার ভাষ্যে দোষারোপ করায়, তাঁহারা বলিলেন. "শ্রীপাদ, আপনার এত বড় কথা বলিবার কি হেতু আছে? শঙ্করাচার্য্য জগতের নমস্য। তাঁহাকে সকলেই গুরু বলিয়া মান্য করেন। আপনি যে তাঁহার ভাষ্যে দোষারোপ করিতেছেন, ইহা বড় সাহসিকতার কথা!"

প্রভু বলিলেন, "শঙ্করাচার্য্য যে জগতের গুরু তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ঈশ্বর সকল অপেক্ষা বড়, বেদ তাঁহার শ্রীমুখের আজ্ঞা। এ সূত্রের যে সরল অর্থ তাহা ঈশ্বরের বাক্য। কিন্তু শঙ্কর যে অর্থ করিয়াছেন উহা সরল নহে। আপনাদের আজ্ঞাক্রমে আমি দেখাইতেছি যে, শঙ্করাচার্য্যের উদ্দেশ্য নিজ মত স্থাপন করা ও তাঁহার ভাষ্য মনঃকল্পিত।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের দোষ দেখাইতে লাগিলেন, আর সন্ন্যাসীরা স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ বক্তৃতা করিতেছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই বিচারের কথা তাঁহার মুখে বৃন্দাবনের ভক্তগণ শ্রবণ করেন। তাঁহাদের কাহারও কাছে শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী শ্রবণ করিয়া শ্রীচরিতামৃতে সেই বিচারের সার সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সন্ন্যাসীরা প্রভুর অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা কেবল পড়িয়া যাইতেন আর গুরু যেরূপ বুঝাইতেন সেইরূপ বুঝিতেন। এখন প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহাদের চক্ষু ফুটিল, তখন পরস্পরে এইভাবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন যে, কৃষ্ণচৈতন্য শুধু যে পরমসুন্দর ও পরমভক্ত তাহা নহেন,—পরম পণ্ডিতও বটেন! প্রকাশানন্দের অভিমানই ছিল যে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত আর নাই। এই পাণ্ডিত্যাভিমানই তাঁহার যত অনর্থের মূল। এখন শ্রীগৌরাঙ্গ সেই অভিমান হরণ করিতেছেন।

প্রকাশানন্দ মায়াবাদী, 'সোহং' ধর্ম্ম মানেন। তিনি ঘোর অদ্বৈতবাদী সুতরাং ভক্তির বিরোধী। তাঁহার মতে আমিও যেই, ঈশ্বরও সেই। ভক্তি আর কাহাকে করিব? কিন্তু হিন্দুগণ বেদের অধীন। বেদ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যাইতে পারেন না। শঙ্করাচার্য্য স্বীয় মত চালাইবার জন্য, সূত্রের মনঃকল্পিত অর্থ করিয়াছেন। স্বীয় মত চালাইবার নিমিত্ত তাঁহার দেখাইতে হইয়াছে যে, সূত্র তাঁহার মতের পোষণ করিতেছে। তাই তিনি আপন মনের মত সূত্রের অর্থ করিয়াছেন। সাধারণ লোকে সূত্রের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা চেষ্টা করিয়া না বুঝিয়া শঙ্কর যেরূপ বুঝাইয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ বুঝিয়া আসিতেছেন। প্রভু এইরূপে দেখাইলেন যে, বেদের অর্থ অতি সরল, তাহার টীকার আবশ্যক করে না। সেই সরল অর্থের সঙ্গে শঙ্করের মতের কিছুমাত্র মিল নাই, বরং সম্পূর্ণ অমিল।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, "আপনি যেরূপ ভাষ্যের দোষ দিলেন তাহা শুনিলাম। আপনার কথার প্রতিবাদ করিতেও আমার ইচ্ছা হইতেছে না, কারণ আপনি ন্যায্য কথাই বলিতেছেন। আপনি পরমপণ্ডিত তাহাও জানিলাম। আপনি যে শঙ্করের মত খণ্ডন করিলেন, ইহা

আপনার অসীম শক্তির পরিচয় সন্দেহ নাই। এখন আর কিছু শক্তির পরিচয় দিউন। সূত্রের মুখ্য অর্থ করুন, দেখি আপনি কিরূপ বুঝিয়াছেন।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ একটি সূত্র বলিতে লাগিলেন, আর তাহার মুখ্যার্থ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি অর্থ করিলেন যে, শ্রীভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। ভক্তি ও প্রেম দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। ভগবানে প্রেম, জীবের পরম-পুরুষার্থ। অর্থাৎ বেদ বৈষ্ণবধর্মকে পোষকতা করিতেছে। অগ্রে শ্রীগৌরাঙ্গ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য দুষিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার তাঁহার নিকট ভাষ্যের অর্থ শুনিয়া সন্ন্যাসীগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শুদ্ধ ভাবুক-সন্ন্যাসী নহেন, বয়সে বালক হইলেও ক্ষমতায় শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা অনেক বড়।

প্রকাশানন্দের তখন একপ্রকার পুনর্জন্ম হইল। প্রথমে প্রভুর উপর তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ, দ্বেষ ও ঘৃণা ছিল। কারণ কৃষ্ণচৈতন্য জগতে অনেকের নিকট তাঁহার অপেক্ষা পূজিত। এখন দেখিলেন যে, কৃষ্ণচৈতন্য কেবল পরমভক্ত, পরমপণ্ডিত এবং সর্বপ্রকারে পরমসুন্দর নহেন, তাঁহার প্রকৃতিও বড় মধুর। আরও দেখিলেন, ভক্তি বস্তুটি অতি সুস্বাদু। আর এই মহাতত্ত্ব সেই বালকের নিকট তিনি শিখিলেন। এই সকল কারণে, প্রভুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় মমতা ও শ্রদ্ধার উদয় হইল। তখন মনে হইল যে, তিনি এই সুন্দর প্রকাণ্ড বস্তুটিকে অন্যায় করিয়া নিন্দা করিয়াছেন এবং ইহা মনে উদয় হওয়াতে তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

প্রকাশানন্দ মহাশয়-ব্যক্তি। তিনি তখন অতি কাতর হইয়া প্রভুকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনি জানেন, আমি আপনাকে বরাবর নিন্দা ও ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি। তাহার কারণ, আমি তখন দম্ভে উন্মত্ত ছিলাম ও আপনাকে জানিতাম না। এখন আপনাকে জানিলাম এবং দেখিলাম আপনি স্বয়ং বেদ ও নারায়ণ। আপনার নিকট এতদিনে বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিলাম। আর ভক্তি যে কি পদার্থ তাহা পূর্বে জানিতাম না, পরন্তু ঘৃণা করিতাম। অদ্য আপনার শ্রীমুখে উহা যে কি তাহা শুনিলাম। আপনিই আমার প্রকৃত গুরু। অদ্য বুঝিলাম শ্রীকৃষ্ণই সত্য, সর্বজীবের প্রাণ। তাঁহার শ্রীচরণ সেবাই জীবের পরমধর্ম। আপনার সহিত শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন!" তখন সন্ন্যাসীগণ ভক্তিতে গদগদ হইয়াছেন। তাঁহাদের গুরু প্রকাশানন্দের নিকট ভক্তি সম্বন্ধে উপরিউক্ত সুললিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিলেন।

পাঠক মহোদয়গণ! প্রভু 'হরিনাম' শ্লোকের কিরূপ অর্থ করিলেন, তাহা অনুভব করুন। শ্লোকের অর্থ এই,—"এই কলিকালে হরিনাম ব্যতীত আর গতি নাই। 'হরিনাম ব্যতীত, অর্থাৎ কেবল হরিনাম ব্যতীত, গতি আর নাই, আর নাই, আর নাই।' অর্থাৎ যোগ, যোগ, তপস্যা, পূজা-অর্চনা,—ইহার কিছুতেই গতি হইবে না। কেবল হরিনামে হইবে। অন্য কোন সাধনের প্রয়োজন নাই,—দেবদেবী পূজা পর্য্যন্ত বিফল।"

পরে সন্ন্যাসীরা ভোজনে বসিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গকে আদর করিয়া বসাইলেন। ভিক্ষা অন্তে প্রভু বাসায় চলিয়া আসিলেন। তখন সন্ন্যাসীদের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ যাহা বলিলেন, তাহা লইয়া মহা আন্দোলন ও আলোচনা হইতে লাগিল। প্রকাশানন্দের প্রধান প্রধান শিষ্যেরা বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখে অমৃত বর্ষণ হইল, এতদিন পরে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম। কলিকালে সন্ন্যাস করিয়া সংসার জয় করা যায় না। সংসার জিনিবার একমাত্র উপায় হরিনাম। অতএব এতদিন যে পণ্ডশ্রম করা গিয়াছে, তাহাতে আর প্রয়োজন নাই। এখন সকলে হরি হরি বল। শঙ্করাচার্যই হউন, আর যিনিই হউন, কাহারও উপরোধে পরকাল নষ্ট করা যায় না। তখন প্রকাশানন্দ বলিলেন, "শঙ্করাচার্য্যের ইচ্ছা

অদ্বৈত-মত স্থাপন করা। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি আপন মনের মত সূত্রের বিকৃত-অর্থ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অর্থ যখন পড়িতাম, তখন মুখে হয় হয় বলিতাম, কিন্তু মনে প্রতীত হইত না। এখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সরল অর্থ শুনিয়া অমনি তাহা হৃদয়ে প্রতীত হইল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখ দিয়া সারতত্ত্ব নির্গত হইয়াছে। আমি সব জানিয়াছি। আর আমার জানিবার কিছু নাই।"

প্রকাশানন্দের সভায় এইরূপ বাকবিতণ্ডা হওয়ায়, সমগ্র কাশীনগরীতে এই কথা লইয়া মহা আন্দোলন আলোচনা চলিতে লাগিল। প্রকাশানন্দ নবীন গৌড়ীয়-সন্ন্যাসীর মত গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া হুলুস্থূলু পড়িয়া গেল। তখন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃগণ, এবং অন্যান্য সাধু ও পণ্ডিতগণ আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তখন প্রভুর বিশ্রামের মুহূর্তও সময় রহিল না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা প্রভুর নিকট আসিয়া,—কেহবা দর্শনে, কেহবা স্পর্শনে, কেহবা বচনে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণনাম করিতে করিতে প্রভুর নিকট বিদায় লইতে লাগিলেন। তখন সমস্ত বারাণসীতে কৃষ্ণনামের কোলাহল, হরিবোল ধ্বনি ও নাম-সংকীর্তন হইতে লাগিল, এবং লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া প্রভুর দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

প্রভুর সঙ্গে প্রকাশানন্দের সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার বজ্রের ন্যায় দৃঢ় মনও নম্রীভূত হইল। বয়োজ্যেষ্ঠা কোন নারী যদি প্রেমে আবদ্ধ হন, তবে তিনি একেবারে পাগলিনী হইয়া পড়েন। যিনি শিক্ষাদ্বারা হৃদয় কঠিন করিয়াছেন, যদি কোন কারণে উহা দ্রবীভূত হয়, তবে তাঁহার প্রস্তরবৎ হৃদয় হইতে হুহু করিয়া জল নির্গত হইতে থাকে। প্রকাশানন্দ স্বভাবতঃ সহৃদয় লোক। তিনি রাধার গণ, অর্থাৎ—প্রেম-উৎকর্ষই তাঁহার প্রকৃতির অনুমোদনীয়। দৈববশতঃ তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন। যেমন বাঁধ দ্বারা নদীর স্রোত বদ্ধ করা হয়, তিনি সেইরূপ তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনে তাঁহার সেই বাঁধ অল্প ভাঙ্গিয়া যায়। তখন তাঁহার হৃদয় যাহা তিনি শুখাইয়া ফেলিয়াছিলেন,—আর্দ্র হইল। শ্রীভগবানের সৌরভ তাঁহার ইন্দ্রিয়গোচর হওয়ায় তিনি এক অভিনব অতি সুস্বাদু আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন এবং শেষে ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভক্তবৎসল শ্রীভগবানকে ভক্তি করা কেবল বেদের উপদেশ নহে, মানবের পরমপুরুষার্থ বটে। কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে আর একটি চিন্তার উদয় হইল। সেই চিন্তাটি তিনি তাঁহার নিজকৃত শ্লোকদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। তদ্ যথা—

> "সান্দ্রানন্দোজ্জ্বল-রসময় প্রেমপীযূষসিন্ধোঃ।
> কোটিং বর্ষেৎ কিমপি করুণাস্নিগ্ধনেত্রাঞ্জনেন।
> কোঽয়ং দেবঃ কনক-কদলী-গর্ভগৌরাঙ্গ যষ্টি-
> শ্চেতঃ কস্মান্মম নিজ-পদে গাঢ়যুক্তশ্চকার।।"

অস্যার্থ—"যাঁহার অঙ্গযষ্টি কনক-কদলীর গর্ভের ন্যায় গৌরবর্ণ এবং যিনি করুণরসসিক্ত অঞ্জনপূর্ণ নেত্রদ্বারা নিবিড় উজ্জ্বল রসময় প্রেমরূপ সুধাসিন্ধু কোটিকে বর্ষণ করিতেছেন, ইনি কে এবং কেনই-বা আমার চিত্তকে নিজ চরণারবৃন্দে দৃঢ়রূপ নিযুক্ত করিলেন।"

সরস্বতী-ঠাকুর ভক্তি হইতে উত্থিত অভিনব সুখ অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন—তিনি যে কঠোর জীবন যাপন করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে এমন আনন্দ তাহাকে কে আনিয়া দিল? সে এই নবীন সন্ন্যাসী! ভাবিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট তাঁহার যে ঋণ তাহা শুধিবার নহে।

যাঁহারা মহাসন্ন্যাসী কি মহানাস্তিক, তাঁহারাও ভক্তিরূপ সুধা আস্বাদন মাত্র মুক্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ একটি সাধুর কথা আমি শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে

লিখিয়াছি। তিনি আকাশ ভজন করিতেন। কিন্তু যেই একটি পূর্ব-রাগের কীর্তন শুনিলেন, অমনি অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভুর কথা ভাবিতে ভাবিতে অমনি শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি সরস্বতীর হৃদয়ে স্ফূর্তি পাইল, তাই মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া উপরের লিখিত শ্লোকটি রচনা করিলেন। সরস্বতী ঠাকুর তখন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন,—এই যে সুবর্ণকান্তি-বিশিষ্ট নবীন পুরুষটি. ইনি কে? ইনি প্রেমপূর্ণ নয়নে আমার পানে চাহিলেন কেন? ইনি আমার কাছে চান কি? ইনি আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন কেন? আর চিত্ত আমার কথা না শুনিয়া উহার চরণপ্রান্তে ধাবিত হইতেছে কেন? এ বস্তুটি কে? এটি কি মনুষ্য, না কোন অনির্বচনীয় দেবতা?

এই যে সরস্বতী ঠাকুরের মনের ভাব, ইহাকে বলে রতি, ইহাই প্রেমের বীজ। কৃষ্ণপ্রেমে ও সামান্য প্রেমে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। কোন রমণী, কোন পুরুষকে দেখিয়া, তাঁহাকে চিত্ত অর্পণ করেন। সেই রমণীর নিকট তাঁহার প্রিয়জন একটি অনির্বচনীয় দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হন। সেই রমণী তাঁহার নিমিত্ত জাতিকুল সমুদয় বিসর্জন দিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও সেইরূপ প্রেমোদয় হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনার দেহদ্বারা জীবকে সেই সমুদয় শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের গয়াধামে শ্রীকৃষ্ণে রতি হইল। তাহার পরে কানাই-নাটশালায় শ্রীকৃষ্ণদর্শনে প্রেমের উদয় হইল। এইরূপ শ্রীবিগ্রহের চিত্রপট দর্শনে, কি স্বপ্নে, প্রেমের উদয় হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎদর্শনে প্রকাশানন্দের রতি হইয়াছে। নিজে বেশ বুঝিতেছেন যে, তিনি প্রকৃতিস্থ নাই, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার চিত্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত আর কিছু ভাবিতে পারিতেছেন না, কেবল তাঁহাকেই ভাবিতেছেন,—ভাবিতেছেন তিনি কে? কখনও আপনার উপর কখনও তাঁহার উপর ক্রোধ হইতেছে; ভাবিতেছেন, কেন তিনি আমার মাথা খাইতেছেন? আমি এখন কি করিব? তাঁহার কাছে কি যাইব? না যাইয়া তো থাকিতে পারিতেছি না! কিন্তু যাইতে যে লজ্জা করে, লোকে কি বলিবে? সরস্বতীর হৃদয়ে এই আন্দোলন চলিতেছে, এমন সময় তিনি কোলাহল শুনিতে পাইলেন।

যে দিবস প্রভু প্রকাশানন্দের সহিত মিলিত হইলেন, সেই দিন হইতে প্রভুর বাসায় লোকের সংঘট আরম্ভ হইয়াছে, এ কথা উপরে বলিয়াছি। তিনি যখন স্নান করিতে যাইতেন তখন পথের দুইধারে লক্ষ লক্ষ লোক দাঁড়াইয়া থাকিত, সকলে হরিধ্বনি করিত ও তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিত। সরস্বতীর সহিত মিলনের পরে প্রভু মোটে ৪। ৫ দিন কাশীতে ছিলেন। সুতরাং এই সকল ঘটনা এই কয়দিনের মধ্যে হয়। প্রভু প্রত্যহ স্নান করিয়া ঐ পথে বিন্দুমাধব-হরি দর্শন করিয়া এবং আপনার অনিবার্য্য প্রেম সম্বরণ করিয়া চুপে চুপে গৃহে যাইতেন।

এই মিলনের দুই-তিন দিন পরে প্রভু একদিন পঞ্চনদে স্নান করিয়া বিন্দুমাধব-হরি দর্শন করিতে গমন করিলেন। অন্যান্য দিনের ন্যায় সে দিনও চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র, পরমানন্দ ও সনাতন সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু সে দিন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বিন্দুমাধবকে দর্শন করিয়াই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণও উন্মত্ত হইলেন এবং হাতে তালি দিয়া এই পদ গাহিতে লাগিলেন, যথা—"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।।" প্রভুকে দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক সঙ্গে চলিত ও কলরব করিত। সেদিন প্রভুর প্রেমভাব ও নৃত্য দেখিয়া তাহাদের কলরব শতগুণ বৃদ্ধি পাইল।

অদ্যকার এই যে কাণ্ড বর্ণনা করিতেছি, ইহার দুই-তিন মাস পূর্ব হইতে, অর্থাৎ প্রভুর

আগমনাবধি কাশীধামে লোকের মন কর্ষিত হইতেছিল। তথাকার আধ্যাত্মিক রাজ্যের নেতৃগণ ভক্তি মানেন না। তাঁহারা জানেন বেদাভ্যাস, যোগসাধন প্রভৃতি বড়লোকের ধর্ম। তাই, তাঁহারা সেইরূপ সাধন-ভজন করেন। শ্রীভগবদ্ভক্তির নামমাত্র শুনিয়াছেন কিন্তু সে যে কি বস্তু তাহা তাঁহারা জানেন না। একটি ভক্তিবিমুখ স্থানে হঠাৎ ভক্তিবীজ বপন করিলে অঙ্কুরিত হইবে না, আর হইলেও তাহা জীবিত থাকিবে না, শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইবে; ইহা প্রভু জানিতেন। আর তাঁহার কৃপায় তাঁহার ভক্তগণও বেশ জানিয়াছেন। তাই বোধ হয়, প্রভু পূর্বে কাহারও সহিত মিশেন নাই। কিন্তু তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নগরে ভক্তির উদয় হইয়াছে। আর তাঁহার দূরদর্শনে ও হাবভাব কটাক্ষে এবং তাঁহার ভক্তগণের চরিত্রে, নগরে একটি জনরব উঠিয়াছে যে, একটি অলৌকিক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। কেহ বলিতে লাগিলেন, ইনি বড় মহাজন, কেহ বা বলিলেন, ইনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

প্রভুর লীলায় এই একটি অদ্ভুত ঘটনা বরাবর লক্ষিত হয় যে, তিনি যখন যেখানে উপস্থিত হইতেন, সেখানে তখনই লোকের মনে হইত যে, হয় শ্রীভগবান আসিয়াছেন, কি আসিতেছেন। শ্রীনবদ্বীপে তাঁহার প্রকাশ হইবার পূর্বে লোকে তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেছিল। দক্ষিণদেশে যখন যেখানে গিয়াছেন, তখনই সেখানে লোকের মনে ভাব হইয়াছে ঐরূপ। যখন তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন সেখানে জনরব হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের উদয় হইয়াছে। বারাণসীতে লোকের মনের ভাব হইয়াছিল যে, কি একটা বৃহৎ বস্তু হইবে তাহার উৎযোগ হইতেছে। তাহার পরে যখন সন্ন্যাসী-সভায় প্রভু জয়লাভ করিয়া আসিলেন, তখন সমুদয় বারাণসী প্রভুকে লইয়া উন্মত্ত হইল।

এইরূপ যখন সকলের মনের ভাব,—যখন কাশীবাসীগণের মন কর্ষিত ও দ্রবীভূত হইল, তখন ভক্তিবীজ রোপণ করার সমস্যা হইল; আর তাই প্রভু উহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং এই নিমিত্ত প্রকাশানন্দের সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, আর অমনি তরঙ্গ উঠিল। সেই তরঙ্গে প্রথমে ভক্তগণ এবং ক্রমে লক্ষ লক্ষ দর্শক আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ভাসিয়া চলিলেন!

তখন,—শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন, এই কথা মুখে মুখে শহরময় প্রকাশ হইয়া পড়িল, এবং দেখিতে দেখিতে সেই স্থান লোকে পরিপূর্ণ হইল। প্রভু নৃত্য করিতে করিতে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, আর সহস্র সহস্র লোক গগন ভেদ করিয়া সেই সঙ্গে হরিধ্বনি করিতে লাগিল, এবং উহাতে অত্যন্ত কলরব হইল। প্রকাশানন্দ যে সময় বাসায় বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বস্তুটি কি, তখন এই কলরব তিনি শুনিতে পাইলেন। আর ঠিক সেই সময় একজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার সভায় সংবাদ দিল যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নৃত্য করিতেছেন, আর তাহাই দেখিয়া সহস্র সহস্র লোক হরিধ্বনি করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া প্রকাশানন্দ ব্যস্তসমস্ত হইয়া সভা সমেত উঠিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য দেখিতে ধাইলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়াছেন, তাঁহার নয়নবাণের শক্তিও অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রেমভাব, কি তাঁহার নৃত্য কখনও দেখেন নাই। আজ বিধি সেই শুভদিন মিলাইয়া দিলেন। যে নৃত্য দর্শন করিয়া সার্বভৌম প্রভৃতি বিগলিত হইয়াছেন, আজ তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সেই ভুবনমোহন নৃত্য দর্শন করিতে যাইতেছেন। জগৎমান্য, গম্ভীর প্রকৃতি, বিজ্ঞোত্তম, জ্ঞানময়, কৌপীনধারী সন্ন্যাসীঠাকুর ধৈর্য্যহারা হইয়া দণ্ডকমণ্ডলু ফেলিয়া দিয়া, বালকের মত সন্ন্যাসীদিগের ঘৃণার সামগ্রী নৃত্য দেখিতে দৌড়াইলেন।

এখন আসল কথা শুনুন। সরস্বতী তখন ভিতর-বাহিরে কেবল গৌরময় দেখিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা, তিনি প্রভুর নিকট যান, তাঁহার কাছে বসেন, তাঁহার সুধামাখা মধুর মধুর কথা শুনেন, অন্ততঃ একবার উঁকি মারিয়া তাঁহার চন্দ্রবদনখানি দেখিয়া আসেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত

কিছুতেই সে সুযোগ উপস্থিত হইতেছে না। কারণ প্রভু আসেন না, আর তিনিও অভিমান ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না। তিনি একরূপ কাশীর রাজা, ভারতের সর্বপ্রধান সন্ন্যাসী। তিনি চঞ্চল বালকের ন্যায় বালক চৈতন্যকে দেখিতে যাইবেন, ইহা কি করিয়া হয়! দারুণ কুলের দায়, তাই উহা পারিতেছেন না। এখন একটি সুযোগ পাইলেন; অমনি প্রিয়তমকে দেখিতে ছুটিলেন। তাঁহাকে ও তাঁহার সভাসদগণকে দেখিয়া সকলে পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ নৃত্যকারী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন। প্রকাশানন্দ যাইয়া কিরূপ দেখিলেন, তখন তাঁহার নিজকৃত শ্লোকে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"উচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং করচরণমহো হেমদণ্ডপ্রকাণ্ডৌ
বাহু প্রোদ্ধৃত্য সত্তাণ্ডবতরলতনুং পুণ্ডরীকায়তাক্ষম্
বিশ্বস্যামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরি হরীতুন্মদানন্দনাদৈ-
র্বন্দে তং দেবচূড়ামণিমতুলরসাবিষ্টচৈতন্যচন্দ্রম্।।"১০।।

অর্থাৎ—যিনি নৃত্য করিতে করিতে চতুর্দিকে করচরণকে আস্ফালন করাইতেছেন, যিনি সুবর্ণদণ্ড সদৃশ বাহুদ্বয় উর্দ্ধ করিয়া আপনার শরীরকে তরঙ্গায়মান করিতেছেন এবং যিনি উন্মত্তের ন্যায় হরি হরি এই আনন্দজনক ধ্বনি দ্বারা জগতের অশুভ ধ্বংস করিতেছেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠ অতুল রসমুগ্ধ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে বন্দনা করি।"

প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভুকে দেখিলেন, যেন সোনার পুত্তলি ইতস্ততঃ নৃত্য করিয়া বিচরণ করিতেছেন। প্রেমে অঙ্গ গলিয়া পড়িতেছে। আনন্দে চন্দ্রমুখ প্রফুল্ল হইয়াছে। কমললোচন দিয়া পিচকারীর ন্যায় ধারা ছুটিতেছে এবং সেই নয়নের জল দ্বারা চতুস্পার্শ্বস্থ সমস্ত লোকের অঙ্গ বিধৌত হইতেছে। সরস্বতী সম্মুখে এক অপরূপ অনির্বচনীয় ছবি দর্শন করিলেন। দর্শন করিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন, যেন মূর্চ্ছিত হয়েন। পরে একটু সম্বিৎ পাইয়া তিনি কোথায়, কি দেখিতেছেন, ইহা অনুভব করিলেন। এইরূপ একটু নৃত্যমাধুরী দর্শন করিয়া, প্রকাশানন্দের হৃদয় দ্রবীভূত হইল ও বহুকাল পরে নয়ন হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই ধারা নিবারণ করিতে পারিলেন না।

বিজ্ঞলোকের পক্ষে নয়নজল নিক্ষেপ করা বড় লজ্জার কথা। সরস্বতীর পক্ষে ত বটেই! সেই শত সহস্র লোকের মধ্যে সরস্বতী রোদন করিবেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? কিন্তু তিনি দুর্বার নয়নধারা নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে আনন্দধারার সৃষ্টি হইল ও উহা মুখ-বুক বাহিয়া পড়িতে লাগিল। ধারা পড়িতে পড়িতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান অন্তর্হিত হইল। তখন দেখিতেছেন, যেন একটি তেজোমণ্ডিত সুবর্ণের পুত্তলি নৃত্য করিতেছেন। হয় জ্ঞান হইতে ভক্তি, কিম্বা ভক্তি হইতে জ্ঞানের উদয় হইল। তখন দেখিলেন যে, যে নবীন সন্ন্যাসী নৃত্য করিতেছেন, তিনি সন্ন্যাসী নহেন, স্বয়ং শ্রীহরি, সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া লোকের নিকট লুকাইয়া আছেন। সরস্বতী প্রভুকে চিনিতে পারিলেন। বুঝিলেন যে, শ্রীহরি কপটসন্ন্যাসী-রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। তিনি তখন কিরূপ দেখিতেছেন, তাহাও তাঁহার নিজ-কৃত আর একটি শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। সে শ্লোকটি এই—

"প্রবাহৈরশ্রূণাং নবজলদকোটি ইব দৃশৌ
দধানং প্রেমর্দ্ধ্যা পরমপদকোটি প্রহসনম্।
বমন্তঃ মাধুর্য্যৈরমৃতনিধিকোটিরিব তনু-
চ্ছটাভিস্তং বন্দে হরিমহহ সন্ন্যাসকপটম্।।" ১২।।"

অস্যার্থ—"যিনি কোটি নবমেঘসদৃশ অশ্রুধারাপূর্ণ নয়নযুগল ধারণ করিতেছেন, যিনি প্রেম-সম্পত্তি দ্বারা বৈকুণ্ঠাদি অবজ্ঞা করাইতেছেন এবং যিনি অঙ্গলাবণ্য ও মাধুর্য্য দ্বারা

কোটি অমৃতসিন্ধু উদগর করিতেছেন, অহো! আমি সেই কপট-সন্ন্যাসী শ্রীহরিকে বন্দনা করি।"

সরস্বতীর নয়নধারা বহিতেছে, আর অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ উঠিতেছে! দেখিতেছেন, জগৎ একেবারে সুখময়, এখানে দুঃখের লেশমাত্র নাই। অন্তরে এত আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে যে, বৈকুণ্ঠে গমন পর্য্যন্ত তুচ্ছ হইতেছে! গৌরাঙ্গের রূপ চুমুকে চুমুকে পান করিতেছেন, আর যেন ক্রমে উন্মত্ত হইতেছেন। নয়নের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। ইচ্ছা হইতেছে প্রভুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করেন, আর মনে মনে যেরূপ ইচ্ছা হইতেছে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সেইরূপ অভিনয় করিতেছেন। তখন তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভুতে লীন হইয়া গেল। প্রভু যেরূপ নৃত্য করিতেছেন, তাঁহারও পদ সেইরূপ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। প্রভুর অঙ্গ যেরূপ তরঙ্গায়মান হইতেছে, তাঁহার অঙ্গও সেইরূপ হইতে লাগিল। সরস্বতী ঠাকুর প্রভুর ভুবনমোহন নৃত্য দেখিয়া কিরূপ মুগ্ধ হয়েন তাহা তিনি নিজে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা অবলম্বন করিয়া আমি এই গীতটি রচনা করিয়াছিলাম, যথা—

প্রেমেতে বিবশ অঙ্গ, কি ক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গ, নাচিলেন কটি দোলাইয়া।
কি ক্ষণে ও নয়নে, চাহিলেন মোর পানে, অঙ্গ মোর উঠিল কাঁপিয়া।।
আহা আহা মরি মরি, হরি হরি বোল বলি, গলিয়া গলিয়া যেন পড়ে।
কঠিন হইয়া ছিনু, নিবারিতে না পারিনু, প্রবেশিল হৃদয় মাঝারে।।
হাম চির কুলবালা, নাহি জানি প্রেমজ্বালা, আজ একি দায় হ'ল মোরে।
গৌরবর্ণ চৌর এলো, যাহা ছিল সব নিল, নিয়ে গেল কুলের বাহিরে।।
নিরমল কুলখানি, সন্ন্যাসীর শিরোমণি, কলঙ্ক ভরিল ত্রিজগতে।
বলরাম বলে শুন, সন্ন্যাসে কি প্রয়োজন, পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রীতে।।

প্রভু দুই বাহু তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন, বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। লোকে যে কলরব করিতেছে তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। প্রকাশানন্দ যে আসিয়াছেন, আর তাঁহার নৃত্য দর্শন করিতেছেন, তাহাও প্রভু জানেন না।

লোকের অতিশয় কলরবে পরিশেষে প্রভুর চৈতন্য হইল ও তখনি নৃত্য সম্বরণ করিলেন। দেখেন, প্রকাশানন্দ সম্মুখে দাঁড়াইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার নৃত্য দেখিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশানন্দকে দেখিয়া লজ্জা পাইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তখনি প্রকাশানন্দ প্রভুর দুটি পদ ধরিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ আস্তে ব্যস্তে প্রকাশানন্দকে উঠাইলেন। উঠাইয়া কহিলেন, "হে শ্রীপাদ! কেন আমাকে অপরাধী করেন? আপনি জগদ্‌গুরু, আমি আপনার শিষ্যের উপযুক্ত নহি। অবশ্য আপনার কাছে ছোট বড় সমান, আর লোকশিক্ষার নিমিত্ত আপনি আমাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু আপনার এই কার্য্যে আমি বড় ক্লেশ পাইলাম!"

প্রভু যে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন ইহা সরস্বতী জানিতে পারিলে করিতে দিতেন না। তাঁহার মনোমধ্যে প্রতীত হইয়াছে যে, প্রভু স্বয়ং তিনি। এমন বস্তুকে তিনি ইচ্ছাপূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিতে দিতেন না। প্রকাশানন্দ অত্যন্ত অভিমানী, কিন্তু ভগবানের কাছে তাঁহার আর অভিমান রহিল না। প্রকাশানন্দ বলিলেন, "শ্রীভগবান! আপনি আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আপনার চরণ আমি কেন ধরিলাম তাহার শাস্ত্র আপনাকে বলিতেছি। যথা শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে 'স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ। তেজেসর্পব পুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চিতং।।' পূর্বে আমি আপনার নিন্দা করিয়া আপনার চরণে অপরাধী হইয়াছি, কিন্তু শাস্ত্রে জানি যে, ভগবানে অপরাধ ভগবানের চরণ স্পর্শ করিলেই ক্ষয় হয়। আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিলাম, এক্ষণে আমাকে কৃপা করুন।" তখন শ্রীগৌরাঙ্গ জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন,

"শ্রীবিষ্ণু! শ্রীপাদ বলেন কি? আমি ক্ষুদ্র জীব। ক্ষুদ্র জীবকে ভগবান বোধ করায়, আমারও অপরাধ, আপনারও অপরাধ। আমি ভগবানের দাস বই নহি। এরূপ বাক্য আর মুখে আনিবেন না।" সরস্বতী বলিলেন, "আমি জানিয়াছি আপনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান। কিন্তু যদি আপনাকে গোপন করিবার নিমিত্ত আপনাকে ভগবানের দাস বলিয়া পরিচয় দেন তবুও আমি পাষণ্ড, আর আপনি ভক্ত, কাজেই আমার পূজ্য। আপনার কৃপা পাইলে আমি কৃতার্থ হইব।"

যেরূপ কথা হইতে লাগিল উহা সাধারণের শুনিবার উপযুক্ত নহে বলিয়া প্রভু চুপ করিলেন, এবং উঠিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। প্রকাশানন্দও তখন ধীরে ধীরে আপন বাসায় গমন করিলেন।

জীবকে দুই রূপে বিভক্ত করা যায়, -যাঁহারা পরকাল মানেন, আর যাঁহারা মুখে বলেন যে, পরকাল মানেন না। যাঁহারা পরকাল মানেন, তাঁহারা পাঁচটি রসের, কি উহার একটির কি কয়েকটির, আশ্রয় করিয়া মহাপথের "সম্বল" করিয়া থাকেন। সেই পাঁচটি রস, যথা— শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্ত কাহারা? না যাঁহাদের হৃদয়ে কোন উদ্বেগ নাই। তাঁহারা নানারূপ সাধনাদ্বারা আপনার আত্মাকে পবিত্র করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিজের,—অপর কাহারও বস্তু নন। যতগুলি ইন্দ্রিয় ও বাসনা মনকে দুঃখ দিতে সক্ষম, সেগুলি তাঁহারা উৎপাটন করিবার চেষ্টা করেন। সুতরাং ইন্দ্রিয় ও বাসনা হইতে যে সুখোৎপত্তি তাহাতে যদিও তাঁহারা বঞ্চিত থাকেন, কিন্তু ইন্দ্রিয় ও বাসনাজনিত দুঃখ হইতেও অব্যাহতি পান। শান্ত-রস আশ্রয় করিয়া যে যে সম্প্রদায় সাধন করেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি, যথা—বৌদ্ধ, যোগী, মায়াবাদী, ইত্যাদি। তাঁহারা নানা কথা বলেন, যথা—"শ্রীভগবান যে, আমিও সে।" শ্রীভগবান থাকিতে পারেন, কিন্তু আমার ভাল কি মন্দ করিতে পারেন না। আমি নিজেই আমার ভাল মন্দের কর্তা, অর্থাৎ আমি আমার কর্মফল ভোগ করিব। কাজেই ইঁহারা স্বভাবতঃ ভগবদ্ভক্তিকে ততটা শ্রদ্ধা করেন না।

যাঁহারা দাস্য-রসের সাধনা করেন, তাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীভগবান হইতে পৃথক বস্তু ভাবেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট আধ্যাত্মিক কি বিষয়-ঘটিত বর প্রার্থনা করিয়া থাকেন যথা —"হে আমার সৃষ্টি ও পালন-কর্তা, আমি দরিদ্র ও অক্ষম, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে ইহা দাও।" এই প্রার্থনাই তাঁহাদের সাধনা। এই দাস্য রস দ্বারা হিন্দুদিগের মধ্যে শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান ভজনা করিয়া থাকেন। দাস্য-রস ও ভগবদ্ভক্তি এক-জাতীয় বস্তু। যাঁহারা দেবীকে 'মা' বলিয়া ও শঙ্করকে 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করেন, তাঁহাদের ভজন দাস্যভক্তির অনুগত। দাস্যের পরে আর তিনটি রস, অর্থাৎ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভক্তির বাহিরে, ইহা প্রেমের অন্তর্গত। এই তিনটি রস ভগবদ্ভক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীভগবানকে আত্মীয়-জ্ঞান ব্যতীত, তাঁহাকে সখা, পতি, কি পুত্র বলা যায় না। কিন্তু শ্রীভগবান ঐশ্বর্য্যময়,—এই জ্ঞান থাকিলে তাঁহার সহিত এইরূপ আত্মীয়তা হয় না। কেবল বৈষ্ণবগণ এই তিনটি রস দ্বারা ভজন করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবধর্ম ব্যতীত এই রস অন্য কোন ধর্মে নাই।

অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে, শ্রীভগবানকে সখা, কি পুত্র, কি প্রাণনাথ ভাবে ভজনা করা মনুষ্যের অসাধ্য। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহারা কেবল কতকগুলি বাক্য ব্যয় করেন মাত্র; তাঁহারা বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ়-তত্ত্ব বিচার করেন নাই। সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীভগবানকে সখা, কি পুত্র, কি প্রাণনাথ বলা যায় না, ইহা সত্য; এবং বৈষ্ণবগণও তাহা স্বীকার করেন। সেইজন্য তাঁহারা গোপী-অনুগত হইয়াই এ সমুদয় রসের পুষ্টি করেন। সে কিরূপে? না—বৈষ্ণব স্বয়ং শ্রীভগবানকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিবেন না,—তবে যশোমতীর কি শচীর দ্বারা

সম্বোধন করাইবেন। তিনি আপনি শ্রীভগবানকে প্রাণনাথ কি বন্ধু বলিয়া ডাকিবেন না,—শ্রীমতীর দ্বারা ডাকাইবেন। যথা গোপী-অনুগত শ্রীবৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে কিভাবে নিবেদন করেন শ্রবণ করুন,—

বধু! কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে, জীবনে মরণে, প্রাণনাথ হৈও তুমি।।
বহু পুণ্যফলে, গৌরী আরাধিয়ে, পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি ক্ষণে, দেখা তব সনে, তেঞি সে পরাণে মরি।।
বড় শুভক্ষণে, তোমা হেন ধনে, বিধি মিলাওল আনি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে, অধিক করিয়া মানি।।
গুরু গরবেতে, তারা বলে কত, সে সব গরল বাসি।
তোমার কারণে, গোকুল নগরে, দুকুলে হইল হাসি।।
চণ্ডীদাস বলে, শুনহ নাগর, রাধার মিনতি রাখ।
পিরীতি রসের চূড়ামণি হয়ে, সদা অন্তরেতে থাক।।

এই যে উপরে শ্রীভগবানকে অতি মধুর সম্বোধন করা হইল, ইহা চিত্তকে আনন্দে পরিপ্লুত করে। কিন্তু কোন্ জীব শ্রীভগবানকে এরূপ সম্বোধন করিবার শক্তি ধরেন? যদি কেহ এরূপ সম্বোধন করেন, তবে তিনি হয় দাম্ভিক, নয় বাতুল। তাই বৈষ্ণবগণ শ্রীমতী রাধার দ্বারা শ্রী·. 'বানকে এরূপ নিবেদন করাইতেছেন।

প্রকাশানন্দ বাসায় আসিলেন। তিনি এক প্রকার ছিলেন, দুই তিন দিবস মধ্যে তাহার ঠিক বিপরীত হইলেন। পূর্বে ছিলেন মায়াবাদী-সন্ন্যাসী, এখন হইলেন কুলটা প্রেমপাগলিনী। কয়েকদিনের মধ্যে ভজন পথের এক-সীমা হইতে অন্য-সীমায় আসিয়াছেন। পূর্বে ছিলেন তেজস্কর স্বাধীন-পুরুষ, এখন হইলেন যেন প্রেমভিখারিণী অবলা। সৌভাগ্যের মধ্যে তাঁহার মনের মধ্যে সমুদয় ভাব-তরঙ্গের খেলা খেলিয়াছিল, তাহা তিনি জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত, তাঁহার নিজ গ্রন্থে অতি জীবন্তরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমে প্রকাশানন্দ অনুভব করিলেন যে, তিনি নিষ্পাপ হইয়াছেন। তিনি মনে মনে বুঝিলেন তাঁহার হৃদয়ে মলামাত্র নাই, উহা পবিত্র হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইলেন। ফল কথা, পাপ দুই প্রকারে ধ্বংস করা যায়,—এক অনুতাপ দ্বারা দগ্ধ করিয়া; আর ভগবৎপ্রেমে ও ভক্তি দ্বারা ধৌত, কি উহার গুণ পরিবর্তিত করিয়া অর্থাৎ তাঁহার পাপরূপ যে অঙ্গার, তাহাতে একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দ্বারা উহার মলিনত্ব ঘুচাইয়া; এইরূপে অন্তরের কুপ্রবৃত্তিগুলি ভক্তি কর্তৃক শোধিত হইলে উহা সুন্দর আকার ধরে। তখন সেই সেই কুপ্রবৃত্তি মহা উপকারী ও প্রার্থনীয় বস্তু হয়। যেমন আলকাতরা হইতে ম্যাজেণ্টা, সেইরূপ পাপকে ভক্তির শক্তিতে মহা-উপকারী কোন বস্তুরূপে পরিণত করা যাইতে পারে। আর যাঁহারা অনুতাপনলে আপনাদিগকে পরিশুদ্ধ করেন, তাঁহারা শ্রীভগবানকে বিচারপতি ভাবে ভজনা করেন। যাঁহারা তাঁহাতে ভক্তি অর্পণ দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, তাঁহারা শ্রীভগবানকে স্পর্শমণিরূপে ভজনা করেন।

প্রকাশানন্দ তাঁহার চৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে শ্রীভগবানকে বন্দনা করিয়া দ্বিতীয় শ্লোকে বলিতেছেন—

ধর্মাস্পৃষ্টঃ সততপরমাবিষ্ট এবাত্যধর্মে
দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং সৃষ্টিষু ক্বাপি নো সন্।
যদ্দত্ত শ্রীহরিরসসুধাস্বাদুমত্তঃ প্রনৃত্য-
ত্যুচ্চৈর্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশম্।।

অর্থাৎ--"যে ব্যক্তিকে ধর্ম কখন স্পর্শ করে নাই, যে সর্বদা অধর্মে আবিষ্ট, যে কখন পাপপুঞ্জ-নাশক সাধুজনের দৃষ্টিপথে ও সজ্জন-রচিত স্থানে গমন করে নাই,—সে ব্যক্তিও যদ্দত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসুধার আস্বাদনে মত্ত হইয়া নৃত্য-গীত ও ভূমিতে বিলুণ্ঠন করে, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার।"

আবার বলিতেছেন, (যথা ৭৮ শ্লোকে)—"অতি পাতকী, নীচজাতি দুরাত্মা, দুষ্কর্মশালী, চণ্ডাল, সতত দুর্বাসনারত, কুস্থানজাত, কুদেশবাসী অর্থাৎ কুসংসর্গী ইত্যাদি সমস্ত নষ্টব্যক্তিদিগকে যিনি কৃপা করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীগৌরহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।"

আবার ১১১ শ্লোকে--"অকস্মাৎ সহৃদয় শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলে যাহাদিগকে যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, দান, ব্রত, বেদাধ্যয়ন, সদাচার প্রভৃতি কিছুমাত্র ছিল না, পাপকর্মের নিবৃত্তির কথা আর কি বলিব, এই সংসারে তাঁহারাও হৃষ্টচিত্ত হইয়া পরমপুরুষার্থ-শিরোভূষণ প্রেমানন্দ লাভ করিতেছেন, যাহা আর কোন অবতারে হয় নাই।"

সরস্বতী বলিলেন যে, এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ কর্তৃক জীবগণ অনায়াসে উদ্ধার পাইতেছে। কিরূপে এরূপ মহাপাপী পবিত্রকৃত হইতেছে? যথা চতুর্থ শ্লোক—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্তিতঃ সংস্মৃতো বা দূরস্থৈরপ্যানতোবদৃতোবা।
প্রেমঃ সারং দাতুমীশো য একঃ শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম।।

অর্থাৎ—"যিনি একমাত্র দৃষ্ট, আলিঙ্গিত, বা কীর্তিত অথবা রূপ-লাবাণ্যাদি দ্বারা বশীভূত হইলে কিম্বা দূরস্থ ব্যক্তিগণ কর্তৃক নমস্কৃত বা আদৃত হইলেই প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করেন, সেই পরম দয়ালু শ্রীচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি।"

সরস্বতী ভাবিতেছেন, তিনি যে নিষ্পাপ হইয়াছেন, নির্মল হইয়াছেন, অর্থাৎ শীতল হইয়াছেন, তাহার ত আর কোন কারণ নাই; কেবল প্রভু গৌরাঙ্গ তাঁহার দিকে একবার চাহিয়াছিলেন, আর একবার তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। যদি এখানে কেহ বলেন যে, সরস্বতী পূর্বে নির্মল ছিলেন না? তাহার উত্তরে বলিব যে,—না। যেহেতু তাঁহার ঈর্ষ্যা, ক্রোধ, নীচত্ব, অভিমান প্রভৃতি নানা দোষ অধিক পরিমাণে ছিল। এ সমুদয় থাকিতে পবিত্র হওয়া যায় না। এখন শীতল হইয়াছেন, জ্বালা মাত্র নাই, বুঝিতেছেন যে, নীরোগ অর্থাৎ নির্মল হইয়াছেন। যে রোগী ও যে সুস্থ সে আপনা-আপনি তাহা বুঝিতে পারে।

পূর্বরাগ উদয় হইবামাত্র প্রথমেই যেরূপ বোধ হয় তাহা শ্রীমতীর উক্তি এই পদে ব্যক্ত। যথা—"সখি! বন্ধুয়া পরশমণি। ধ্রু। সে অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার, সোণার বরণখানি।।" অতএব পাপ মোচনের নিকৃষ্ট উপায় আত্মগ্লানি, উৎকৃষ্ট উপায় শ্রীভগবানের নাম কি গুণ-সুধারসে হৃদয়কে ধৌত কি সিক্ত করা।

এখানে সরস্বতী-ঠাকুর প্রভু গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ এক অপরূপ সাক্ষ্য দিতেছেন, অর্থাৎ তাঁহার এরূপ অমানুষিক শক্তি ছিল যে, তাঁহাকে শুদ্ধ দর্শনে এমন কি দূর-দর্শনে, অতি যে মহাপাপী সেও নির্মল হইত এবং অতি উপাদেয় ব্রজের নিগূঢ় রস পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিত। এরূপ শক্তি কোন জীব, কি কোন অবতার, কখন প্রকাশ করিতে পারেন নাই; তাই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান বলিয়া পূজিত।

তাহার পরে সরস্বতী দেখিতেছেন যে, তাঁহার প্রকৃতি, রুচি, বিশ্বাস ও জ্ঞান সমুদয় পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কি হইয়াছে,—না যাহার উপর ঘৃণা ছিল তাহাতে রুচি, যাহাতে রুচি ছিল তাহার উপরে ঘৃণা হইয়াছে। তাঁহার এখনকার মনের ভাব শ্রবণ করুন। যথা তাঁহার শ্লোক--

ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্
ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ধিগ্বিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ।

কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশূ-
ন্ন কেষাঞ্চিল্লেশোঽপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ।।৩২।।

অর্থাৎ—"আমি ব্রহ্ম এই মাত্র তত্ত্ব-জ্ঞান প্রফুল্লবদনবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ধিক্, নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মসমূহতে সর্বদা আগ্রহযুক্ত ব্যক্তিগণকে ধিক্, উৎকটতপস্যাকারি ব্যক্তিদিগকে ধিক্, এবং যে সকল ব্যক্তি সমুদয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে বশীভূত করিয়াছে সেই সকল সংযমীগণকেও ধিক্, অর্থাৎ এই সকল বিষয়রসে প্রমত্ত নরপশুগণ শোচনীয়, যেহেতু ইহাদিগের মধ্যে কেহই শ্রীগৌর-পদাম্ভোজের মধু লেশমাত্রও প্রাপ্ত হয় নাই।"

তিনি যাহা চিরদিন করিয়া আসিয়াছেন, এখন তাহা যাহারা করে তাহাদ্দিগকে তিনি "নরপশু" বলিতেছেন। অর্থাৎ উপরের শ্লোকে প্রকারান্তরে তিনি স্বীকার করিতেছেন যে, পূর্বে তিনি নিজেই নরপশু ছিলেন। আবার বলিতেছেন, যথা ২৬ শ্লোক—

আস্তাং বৈরাগ্য-কোটির্ভবতু শমদমক্ষান্তিমৈত্র্যাদিকোটি-
স্তত্ত্বানুধ্যানকোটির্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী ভক্তিকোটিঃ।
কোট্যংশোঽপ্যশ্য নস্যাত্তদপি গুণগণো যঃ স্বতঃ সিদ্ধ আস্তে
শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্র-প্রিয়চরণ-নখজ্যোতিরামোদভাজাম্।।

অর্থাৎ—"বৈরাগ্য-কোটিতেই বা কি হইবে, শম দম ক্ষান্তি ও মৈত্র্যাদি অর্থাৎ শুচিত্বাদি-কোটিতেই বা কি হইবে, নিরন্তর "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্য-বিষয়ক চিন্তা-কোটিতেই বা কি হইবে, আর বিষ্ণুসম্বন্ধীয় ভক্তি-কোটিতেই বা কি হইবে—শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয় ভক্তগণের চরণনখ-জ্যোতি দ্বারা হর্ষপ্রাপ্ত মানবদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ গুণসমূহ বর্তমান আছে, তাহার কোট্যংশ্রের একাংশও অন্যেতে নাই।"

যাঁহারা নিরাকারবাদী, শ্রীভগবানকে জ্যোতিস্বরূপ ভাবিয়া যোগসাধন করেন, তাঁহাদের ফল 'ব্রহ্মানন্দ'। যাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম পাইয়াছেন, তাঁহাদের ফল—'প্রেমানন্দ'। সরস্বতী ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। যাঁহারা যোগ করেন তাঁহারা এই আনন্দের আস্বাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু এখন প্রেমানন্দের আস্বাদ পাইয়া সরস্বতী বলিতেছেন যে, প্রেমানন্দে যে হর্ষ আছে, ব্রহ্মানন্দে তাহার কোটি অংশের এক অংশও নাই।

সরস্বতীঠাকুর তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন যে (সপ্তম শ্লোক) অবতারশিরোমণি নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ। কপিলদেবও অবতার, যিনি জীবকে যোগশিক্ষা দেন। কিন্তু ইঁহারা যে কার্য্য করিয়াছেন ইহার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের যে মহৎকার্য্য অর্থাৎ জীবকে প্রেম-ভক্তি শিক্ষা দেওয়া, তাহার তুলনাই হয় না। জীব-রক্ষার নিমিত্ত দৈত্যনাশ। যোগ-শিক্ষা দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, উহা দ্বারা জীব উন্নতি করিবে। কিন্তু প্রেমধন যিনি দান করিলেন, তিনি জীবকে শ্রীভগবানের নিজ-জন করিলেন। এই সকল জীবের যোগের প্রয়োজন নাই, দৈত্যের কি অন্য কাহারও ভয় নাই। অর্থাৎ যাহারা ভগবৎপ্রেম পাইয়া শ্রীভগবানের নিজ-জন হইল, সুতরাং তাহাদের আর শ্রীরামের কি শ্রীনৃসিংহের দত্ত আশীর্বাদের প্রয়োজন নাই।

সরস্বতী মনে বিচার করিতেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ অবশ্য সেই শ্রীহরি, সামান্য জীব নহেন। যেহেতু যাঁহার দর্শনমাত্রে মহাপাপীও মহাপ্রেমী হয়, তিনি যে সামান্য জীব ইহা হইতেই পারে না, তিনি অবশ্যই সেই শ্রীভগবান। কখন সরস্বতী ইহাও ভাবিতেছেন যে, তিনি না হয় মূর্খ, নির্বোধ, কি মুগ্ধ। কিন্তু বাসুদেব সার্বভৌম, যিনি ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত, তিনি ত আর মূর্খ কি নির্বোধ নহেন? সার্বভৌম যখন শ্রীপ্রভুকে শ্রীভগবান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন সেই যথেষ্ট প্রমাণ যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কপটবেশধারী শ্রীহরি,—সামান্য জীব নহেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে জীব কি সম্পত্তি পাইয়াছে, তাহা সরস্বতী ঠাকুর,—যিনি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী,—নানা স্থানে বিচার করিয়াছেন। পাঠক মহাশয়! এখানে আপনাকে একটি বিষয় নিবেদন করিতেছি। যোগ ভাল, কি প্রভুর মত অর্থাৎ ভক্তি ভাল, তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ যোগ সাধন করা তোমার আমার সাধ্যাতীত। কাজেই সেখানে প্রভুর চরণাশ্রয় ব্যতীত আর আমাদের গতি কি আছে? যদি বল তিনি কে? তাঁহার পদে অবনত হইলে, যদি আমার সর্বনাশ হয়? কিন্তু সরস্বতীর ন্যায় মহাজন, যিনি যোগী, পরম জ্ঞানী, সন্ন্যাসীর শিরোমণি, তিনি যোগের পথ পরিত্যাগ করিয়া যে পথ অবলম্বন করিলেন, আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা কেন করিতে পারি না?

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে আমরা স্বচক্ষে দর্শন করি নাই, কি তাঁহার সহিত সহবাস ও ইষ্টগোষ্ঠী করি নাই। কিন্তু তিনি শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত। কাজেই তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি বিচারে অবশ্য লাভ আছে। অতএব সূক্ষ্মদর্শী সরস্বতী, তাঁহার সহিত সহবাস করিয়া, তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি কিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার পর্য্যালোচনা করিব। সরস্বতী বলিতেছেন, প্রভুব "প্রকাণ্ড বাহুদ্বয় হেমদণ্ডের ন্যায়"; তাঁহার "হাস্য চন্দ্রকিরণের ন্যায় মনোহর"; তাঁহার "কপোল-দেশের প্রান্তভাগ মধুর-মধুর হাস্যসমন্বিত"; তাঁহার "শ্রীমুখ প্রণয়াকুল"; তাঁহার "শ্রীমুখ ঈষৎ হাস্যশোভিত"; তাঁহার "স্নিগ্ধ-দৃষ্টি"; তাঁহার "করুণাসিন্ধু অঞ্জনপূর্ণ নেত্র"; তাঁহার "নয়নপদ্ম হইতে নিঃসৃত মনোহর মুক্তাফল সদৃশ অশ্রুবিন্দু এবং উদ্গত রোমাঞ্চ দ্বারা অলঙ্কৃত শ্রীঅঙ্গ"; তাঁহার "মুখসৌন্দর্য্য কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও সুদৃশ্য"; তিনি "প্রফুল্ল কনককমলের কেশর অপেক্ষা মনোহর কান্তিধাবী"; তাঁহার "জপমালা-শোভিত প্রেমে-কম্পিত কর" তাঁহার "শ্রীমূর্তি লাবণ্য দ্বারা কোটি-অমৃত-সমুদ্রকে উদগার করিতেছেন।" এখন প্রভুর ভাব, সরস্বতী কিরূপ বর্ণনা করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করুন। তিনি "করতলে বদরফলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ কপোলদেশ অর্পণ করিয়া নয়নজলে সম্মুখস্থ ভূমি পঙ্কিল করিতেছেন"; তিনি "নয়নবারিধারায় পৃথ্বীতল পঙ্কিল করিতেছেন"; যিনি "নবীন মেঘ দেখিয়া উন্মুক্ত হয়েন", "ময়ূর চন্দ্রিকা দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হয়েন", "গুঞ্জাবলী দর্শনে কম্পিত কলেবর হয়েন"; যিনি "শ্যামকিশোর পুরুষ দর্শনে ব্যথিত হয়েন।"

প্রভুর রূপ ও গুণ চিন্তা করিতে করিতে যেমন মনে এক একটি ভাবের উদয় হইত, সরস্বতী অমনি উহা শ্লোকরূপে প্রকাশ করিতেন। কোন একদিন বা প্রভুর রূপ কি গুণ লিখিতে অপারগ হইয়া এই শ্লোকটি করিলেন, যথা ১০১ শ্লোক ঃ সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজনসমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি

বাৎসল্যে মাতৃকোটি স্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে।
গাম্ভীর্য্যেঽম্ভোধিকোটির্মধুরিমনি সুধাক্ষীরমাধ্বীককোটি
গৌরোদেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ।।

"যিনি কোটিকন্দর্পের ন্যায় পরমসুন্দর, কোটিচন্দ্রের ন্যায় সকলের আহ্লাদজনক, কোটিমাতৃসদৃশ স্নেহবান, কোটিকল্পবৃক্ষসদৃশ দাতা, সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর-স্বভাব, অমৃতের ন্যায় মধুর এবং কোটি কোটি বিচিত্র প্রণয়রসের প্রদর্শক, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব জয়যুক্ত হউন!" বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া দেখিলেন ভাষায় কুলায় না। তাই লিখিলেন—"মধুরং মধুরং মধুরং" ইত্যাদি। এইরূপ মধুরং মধুরং বলিয়া শ্লোক সাঙ্গ করিলেন। সেইরূপ সরস্বতীঠাকুর প্রভুর রূপ গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া ভাষায় উহা না কুলাইতে পারিয়া—"কোটি" "কোটি" "কোটি" বলিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন।

সরস্বতীর তখন পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। তিনি যাহা ছিলেন, তখন আর তাহা নাই। তাঁহার

যে সমস্ত বিষয়ে রুচি ছিল তাহাতে অরুচি হইয়াছে,—এমন কি কাশীনগরীতে বাস পর্য্যন্ত। আবার যে সমস্ত সঙ্গী ও শিষ্যগণকে সহচর ভাবিয়া শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিতেন, তাহাদের সহিত এক প্রকার সম্বন্ধ রোধ হইয়া গিয়াছে। শিষ্যগণ পড়িতে আসিলে পড়ান না, পলায়ন করেন। লোকে দেখিতে আসিলে লুকাইয়া থাকেন, কি তাহাদের সহিত আলাপ করেন না। কাশীবাসী বা কেহ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন কি না, সে বিষয়ে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। এ যাবৎ বহুতর কঠোর নিয়ম পালন করিয়া আসিয়াছেন। অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান, আর অধিক নিশিতে শয়ন করিতেন। এখন সে সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। পাঠ করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। তবে এখন কি করিতেছেন, তাঁহার গ্রন্থেই তাঁহার হৃদয়-তরঙ্গের পরিস্ফুট বর্ণনা আছে।

তিনি করিতেছেন কি,—না, একটু গীত গাইতেছেন, আর প্রভু যেমন করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহাই অনুকরণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার চেতনা হইতেছে, আর তখন আপনার মনকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু পাইতেছেন না। আর যে স্থানে তাঁহার মন ছিল, সে স্থানে দেখিতেছেন—সোণার বরণ নৃত্যকারী গৌরাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। সরস্বতী বলিতেছেন, "কি সুন্দর মুখশ্রী! কি মধুর নৃত্য!" আবার বলিতেছেন,—"হে মনোচোর, তুমি আমার সমুদয় হরণ করিলে? সরস্বতী বলিতেছেন—

নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততির্লৌকিকী বৈদেকী যা।
যা বা লজ্জা প্রহসন-সমুদ্গান-নাট্যোৎসবেষু।
যে বা ভুবন্নহহ সহজপ্রাণদেহার্থ ধর্ম্মা,
গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোঽপি যে তীব্রবীর্য্যাঃ।।৬০

অর্থাৎ—"অতিশয় বলবান কোন গৌরবর্ণ চোর আসিয়া আমার নিষ্ঠা-প্রাপ্ত লৌকিকী ও বৈদেকী যে ব্যবহারশ্রেণী, আর প্রহসন উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্তন নাট্যাদি যে বিষয়ক লজ্জা, আর প্রাণ ও দেহের কারণ-স্বরূপ যে স্বাভাবিক ধর্ম, এই সমস্ত অপহরণ করিল।"

এখন দেখুন, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও সামান্যপ্রেম এক জাতীয় দ্রব্য। কুলটাগণ কাহারও প্রেমে আবদ্ধ হইয়া কুলশীল স্বামীসন্তান সমুদয় বর্জন করে। তাহারা অবশ্য কুল রাখিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। সরস্বতীর ঠিক সেই দশা হইয়াছে। তিনি দেখিতেছেন, তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভু তাঁহার চিত্ত অপহরণ করিতেছেন। তিনি যে জপ তপ প্রাণায়াম প্রভৃতি নিত্যকর্ম করিতেন তাহা গিয়াছে, আহার নিদ্রা প্রভৃতি দেহ-ধর্ম গিয়াছে, নৃত্যগীত প্রভৃতিতে যে ঘৃণা তাহা গিয়াছে। কেন না, একজন বলবন্ত গৌরবর্ণ চৌর তৎসমুদয় হরণ করিয়া লইয়াছেন! প্রকাশানন্দ ভাবিতেছেন, ঐ নবীন সন্ন্যাসী কি শক্তিধর পুরুষ! তখন আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে প্রকাশানন্দ! তুমি না বড় তেজস্কর পুরুষ ছিলে? একটি গৌরবর্ণ যুবা আসিয়া তোমার দশা কি করিল?" ইহাই বলিয়া হো হো করিয়া পাগলের ন্যায় হাস্য করিতেছেন। আবার ভাবিতেছেন—"আমি প্রকাশানন্দ, আমি নৃত্য করিতেছি, আমার লজ্জা হইতেছে না। হে গৌরবর্ণ কৃষ্ণ! আমি এমন গম্ভীর অটল ছিলাম, আমাকে পাগল করিলে? আমার নৃত্য দেখিয়া কাশীবাসিগণ কি বলিবে? ছি! আমি যে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি।" রজনী যোগে প্রকাশানন্দ প্রভুর নিকট গমন করিলেন। যাইয়া তাঁহার চরণে পড়িতে গেলেন। কিন্তু প্রভু বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিলেন, ধরিয়া দুজনে অচেতন হইয়া পড়িলেন। এই অবসরে প্রভু প্রকাশানন্দের হৃদয় একেবারে অধিকার করিলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী চেতন পাইলে আবার প্রভুর চরণে পড়িলেন।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, "জীবের এইরূপ পদে পদে বিপদ। এ সময় যদি তুমি এইরূপ করুণা না করিবে তবে তোমার জীবের আর কি উপায় আছে? প্রভু এখন আমাকে সঙ্গে

লইয়া চলুন।" প্রভু বলিলেন, "তুমি বৃন্দাবন যাও, সেই তোমার বাসের উপযুক্ত স্থান।" ইহাতে প্রকাশানন্দ কাতর হইয়া বলিলেন, "প্রভু, আমি তোমার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না।"

প্রকাশানন্দ তাঁহার গ্রন্থে আপন মনোভাব যেরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা আশ্রয় করিয়া আমি এই গানটি করিয়াছিলাম--

কি হলো, কি হলো প্রাণনাথ, একি করিলে। ধ্রু।
চিত্ত হরে নিলে, বাউল করিলে, এখন তুমি আমায় ফেলি চলিলে।
ছিলাম প্রবীণ, অটল গম্ভীব, টলিত না মন কোন কালে।
নাথ! করিলে কি কাজ, গেল ভয়-লাজ, বালকের মত চপল করিলে।
সংসার বন্ধন, করিয়া ছেদন, সকল ত্যজি সন্ন্যাসী হ'লাম।
আমি কাটিলাম বন্ধন, একি বিড়ম্বন, আবার তুমি প্রেম-ফাঁদে ফেলিলে।"

প্রভু অনেক প্রবোধ দিলেন। পরিশেষে বলিলেন, "বৃন্দাবনেই তুমি আমাকে দর্শন করিতে পারিবে।" প্রকাশানন্দ বলিলেন, "তুমি ত আমাকে বৃথা প্রবোধ দিতেছ না?" প্রভু কহিলেন, "সত্যই, স্মরণ করিলেই আমাকে দেখিতে পাইবে।" সরস্বতী কহিলেন, "আপনার প্রবোধে আমি আনন্দিত হইলাম।" প্রভু কহিলেন, "এই আনন্দ তোমার ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকুক, আর অদ্যাবধি তোমার নাম হইল 'প্রবোধানন্দ'।"

প্রভু এক পথে নীলাচলে ফিরিলেন, আর প্রবোধানন্দ অন্য পথে বৃন্দাবনে গেলেন।

প্রবোধানন্দ পূর্বে যদিও সন্ন্যাসী ছিলেন, তবু দশ-সহস্র শিষ্য সহিত সহবাস ও জগতের পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ, তর্ক, বিচার করিতেন। এখন বৃন্দাবনে নন্দকূপে একাকী বাস করিতে লাগিলেন। অগ্রে মহাপ্রভুকে পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, মূঢ় জনেই কাশীত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করে;—এখন আপনিই কাশী ত্যাগ করিলেন। পূর্বে ভক্তি ও প্রেমধর্ম কাপুরুষের আশ্রয় ভাবিতেন;—এখন অন্য ধ্যান ও চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যখন এই তরঙ্গ খেলিতেছিল, তখনই "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত" গ্রন্থ লিখিলেন। এই অমূল্য গ্রন্থখানির দ্বারা জীবগণ এই কয়েকটি মহা উপকার পাইতেছেন। প্রথমতঃ, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু কিরূপ বস্তু ছিলেন তাহা আমরা প্রকাশানন্দের ন্যায় সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী ব্যক্তির নিকট জানিতে পারিতেছি। মহাপ্রভু সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন ইহা তাঁহার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া লেখা। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীভগবানের অবতারে বিশ্বাস লোকের সহজে হয় না, প্রকাশানন্দের কাহিনী শ্রবণে সে বিশ্বাস সুলভ হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, আমরা জানিতেছি যে, প্রকাশানন্দের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসী,—যিনি চিরদিন প্রেম ও ভক্তিকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছিলেন,—এখন প্রেম ও ভক্তির আস্বাদন পাইয়া, পূর্বে যে ব্রহ্মানন্দ জ্ঞান হইতে যে আনন্দ (উত্থিত হয়) ভোগ করিতেন,—তাহাতে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলতঃ সেই পর্যান্তই জ্ঞান-যোগে শ্রদ্ধা থাকে, যে পর্য্যন্ত তুলসী ও চন্দনের গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ না করে। অর্থাৎ অহৈতুকী-ভক্তির সুধা যিনি পান করিয়াছেন, তিনি জ্ঞান-যোগে মুগ্ধ হয়েন না।

ফলকথা, অনেক যোগী ও জ্ঞানী আপনাদিগের ভাগ্য, ভক্তের ভাগ্য অপেক্ষা বড় ভাবেন, তাঁহারা ভাবেন যে, সামান্য ভক্তের কোন অলৌকিকী শক্তি নাই। তাঁহার অপেক্ষা, যাঁহার মস্তকে পিঁপীড়ার ঢিবি হইয়াছে, তিনিই বড় লোক। কিন্তু সরস্বতী ঠাকুর শেষোক্ত (তাঁহার পরীক্ষিত) পদ্ধতি ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিলেন এবং ভক্তের যে প্রেমানন্দ তাহাই লইলেন।

প্রবোধানন্দকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়া, প্রভু দেশাভিমুখে চলিলেন। সনাতন প্রভৃতি

ভক্তগণ সঙ্গে আসিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভু অনুমতি দিলেন না। প্রভু চলিলেন, আর ভক্তগণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

প্রভু যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথে আবার সেইরূপ বন্যপশুদিগের সহিত খেলা করিতে করিতে চলিলেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে, মুরারির কড়চা অনুসারে, এই সময়কার একটি মধুর কাহিনী বর্ণিত আছে। প্রভু একটু অগ্রবর্তী হইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গী দুইজন বলভদ্র ও তাঁহার ভৃত্য, একটু পশ্চাতে। একটি গোপযুবক ঘোলের কলস লইয়া বিক্রয় করিতে চালিয়াছে। প্রভু তৃষ্ণার্ত গোয়ালার নিকট সেই তক্র চাহিলেন। তখন গোয়ালা প্রভুর সম্মুখে কলস রাখিল, আর প্রভু কলসস্থ সমুদয় ঘোল পান করিলেন। গোপযুবক প্রভুকে বলিল, "ঠাকুর, ইহার মূল্য দিতে আজ্ঞা হয়।" তখন প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ মূল্য লইয়া কি করিবে? গোপ বলিল যে, তাহার স্ত্রী ও বৃদ্ধা-মাতা আছে, তাহাদিগকে পালন করিবে। প্রভু তখন, বলভদ্র ও তাঁহার ভৃত্য, যাঁহারা পশ্চাতে আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন যে, উহাদের নিকট তক্রের উচিৎ মূল্য পাইবে। গোপযুবক তাই বলভদ্রের অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে প্রভু ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। প্রভু ভাবিতেছেন, "গোপযুবকের স্ত্রী ও বৃদ্ধামাতা আছে। আমারও ত স্ত্রী ও মাতা আছেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে ভুলিয়া রহিয়াছি।" এই ভাবিয়া প্রভু তাঁহাদের নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন, ও তখনি অন্তরীক্ষে এক দেহ লইয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন, হইয়া জননী ও ঘরণীর সহিত মিলিত হইলেন। এই বলিয়া ঠাকুর লোচন দাস তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল গীত সমাপন করিলেন।

ওদিকে গোপযুবকের কথা শ্রবণ করুন। বলভদ্র আসিলে গোপ ঘোলের মূল্য চাহিল। বলিল, "ঐ যে আগের ঠাকুর যাইতেছেন, তিনি আমার এক কলস ঘোল সমুদয় পান করিয়াছেন; মূল্য চাহিলে বলিলেন, আপনারা দিবেন।" বলভদ্র প্রভুর ভঙ্গী দেখয়িা অবাক! গোপকে মিনতি করিয়া বলিলেন, "গোপ! যিনি তোমার ঘোল পান করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার অর্থ কোথা? আর আমরা তাঁহার ভৃত্য, আমাদেরও অর্থ স্পর্শ করিতে নাই। ঠাকুর তোমার ঘোল পান করিয়াছেন, তোমার খুব ভাল হইবে।" গোপ এই কথা শুনিয়া সুখীই হউক আর দুঃখীই হউক, আর কিছু বলিল না, ঘোলের কলস লইয়া বাড়ী যাইবে ভাবিল। কিন্তু কলস তুলিতে গিয়া দেখে, উহা এত ভারি যে তাহা তুলিতে পারা যায় না। তখন উঁকি মারিয়া দেখে যে কলস স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ! গোয়ালার উহা দর্শন মাত্র জ্ঞানোদয় হইল। তখন সে কলস ফেলিয়া দৌড়িল, দৌড়িয়া প্রভুর লাগ পাইয়া তাঁহার চরণে পড়িল। বলিল, "প্রভু, আমি মূর্খ গোয়ালা, আমাকে ভুলান কি আপনার উচিৎ? আমি বৃথা ধন চাই না, আপনার শ্রীচরণে আমার মতি দান করুন।" প্রভু তাহাকে আশ্বাস বাক্য বলিয়া বিদায় করিলেন। গোপযুবক সামান্য অর্থ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভুর কৃপায় অর্থ ও পরমার্থ দুইই পাইলেন। মুরারিগুপ্তের কড়চায় প্রভুর তক্রপানলীলা এইরূপ বর্ণিত আছে—

এবং স ভগবানই কৃষ্ণঃ পথিগচ্ছন্ কৃপানিধিঃ।
দৃষ্ট্বা গোপমুবাচেদং সতক্রকলসং প্রভুঃ।।
পিপাসিতোঽহং তক্রং মে দেহি গোপ যথাসুখং।
শ্রুত্বা পরমহর্ষেণ সম্পূর্ণকলসং দদৌ।।
হস্তাভ্যাং কলসং ধৃত্বা সতক্রং ভক্তবৎসলঃ।
পিত্ত্বা গোপকুমারায় বরং দত্ত্বা যযৌ হরিঃ।।

অর্থাৎ "এই প্রকারে প্রভু পথে গমন করিতেছেন, জনৈক গোপ তক্রকলস সহ যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে বলিলেন,—ওহে গোপ, আমি পিপাসিত হইয়াছি, আমাকে তক্র প্রদান

কর। গোপ তাহা শুনিয়া অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া সেই তক্র-কলস প্রভুকে প্রদান করিল। ভক্তবৎসল প্রভু দুই হস্ত দ্বারা সেই তক্র কলস ধারণ-পূর্বক পান করিলেন এবং সেই গোপকুমারকে বরদান করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন।"

প্রভু দ্রুতগতিতে বন্যপশুদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশেষে পুরী নগরীর সন্নিকট আঠারনালায় আসিয়া ভক্তগণের নিকটে তাঁহার আগমনবার্তা পাঠাইলেন। এই সংবাদ শুনিয়া ভক্তগণ আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিলেন। ইহা কিরূপ তাহা বলিতেছি। অতি রৌদ্র তাপে জীবমাত্র হাহাকার করিতেছে ও মৎস্যগণ জল না পাইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে, এমন সময় অতি শীতল ও প্রচুর পরিমাণে এক পশলা বৃষ্টি হইল। অমনি সকলে নবজীবন পাইয়া দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। সেইরূপ ভক্তগণ প্রভুর বিরহে মরিয়া ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার সংবাদ শুনিয়া প্রাণ পাইয়া প্রভুর নিকটে দৌড়িলেন। তাঁহারা প্রভুর সহিত মিলিত হইলে, প্রথমে ভারতীকে প্রভু প্রণাম করিলেন, স্বরূপ প্রভৃতি সন্ন্যাসী ও গৃহী-ভক্তগণ সকলে প্রভুকে প্রণাম করিলেন, এবং সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া প্রভুকে লইয়া জগন্নাথমন্দিরে শ্রীমুখ দর্শনে চলিলেন। সে দিবস সার্বভৌম প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু বলিলেন যে, অদ্য তিনি কোথাও যাইবেন না, সকলের সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিবেন। বহুদিনের পরে ভক্তগণ ও প্রভু একত্রে বসিয়া মহানন্দে ভোজন করিলেন। আসুন ভক্তগণ, এই প্রভু-ভক্তে মিলন ও ভোজন, আমরা অন্তরে দাঁড়াইয়া দর্শন করি।

প্রভুর সন্ন্যাসের পরে ছয় বৎসর গত হইল। নবীন যুবাকালে অর্থাৎ যখন উনবিংশতি বৎসরের, তখন তিনি পূর্ববঙ্গে গমন করেন, আর সেখানে "হরিনামের নৌকা সাজাইয়া জীবগণকে পার করিয়াছিলেন।" সন্ন্যাসের কিছু পূর্বে প্রভু ন'দে হইতে মন্দার দিয়া গয়াধামে গমন করেন। সন্ন্যাসের পরে রাঢ়দেশে তিন-দিবস ভ্রমণ করেন। তাহার পরে নীলাচলে, এবং নীলাচল হইতে সমস্ত দক্ষিণদেশ শ্রীপদ দ্বারা পবিত্র করেন। নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়া, বৃন্দাবন যাইবেন উপলক্ষ করিয়া, গৌড়দেশ দিয়া গৌড়নগর পর্য্যন্ত গমন করেন। আবার সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নীলাচলে পুনরায় আগমন করেন। শেষে বনপথে বারাণসী হইয়া বৃন্দাবন গমন করেন। তথা হইতে ফিরিয়া নীলাচলে আইসেন। এইরূপে ভ্রমণে প্রভুর সন্ন্যাসের পর ছয় বৎসর কাটিল। প্রভুর বয়স তখন ৩০ বৎসর। প্রভু তাহার পরে অষ্টাদশ বৎসর প্রকট ছিলেন এবং বরাবর নীলাচলে বাস করেন। শেষ ১৮ বৎসরের মধ্যে যে কয়েকটি প্রধান ঘটনা হয় মাত্র তাহাই এখন বর্ণনা করিব। প্রভু বনপথে বৃন্দাবন হইতে আসিবামাত্র স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপে সংবাদ পাঠাইলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত তিনি স্থির করিলেন ও শিবানন্দ পথের ব্যয়ের ভার লইলেন। তারপর ভক্তগণ প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ভক্তগণ আসিয়া পূর্বের ন্যায় চারিমাস প্রভুর নিকট রহিলেন এবং পূর্বের ন্যায় মহোৎসব, জলক্রীড়া, কীর্তন, মন্দিরমার্জন, রথাগ্রে নৃত্য, বন্যভোজন ইত্যাদি এবং নন্দোৎসব হইল। এইরূপে চারিমাস সেখানে থাকিয়া ভক্তগণ দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

হরিদাসের কাহিনী পূর্বে কিছু কিছু বলিয়াছি। তিনি এখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। প্রভুর ঘরের নিকট তাঁহার বাসা, প্রভু প্রত্যহ স্নান করিয়া একবার তাঁহাকে দেখা দিয়া যান, আর প্রত্যহ গোবিন্দ তাঁহাকে প্রসাদ দিয়া আইসেন। প্রভুর বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার কিছুকাল পরে শ্রীরূপ নীলাচলে আসিলেন। তিনিও জাতিভ্রষ্ট; তাই আর কোথায় যাইবেন, হরিদাসের বাসায় যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। হরিদাস তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। রূপ শুনিয়া আশ্বস্ত

হইলেন যে, প্রভুর তখনি সেখানে আসিবার কথা। এই কথা হইতে হইতে চন্দ্রবদন হরেকৃষ্ণ-নাম জপ করিতে করিতে সেখানে আসিলেন। তখন প্রভু হরিদাসকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং হরিদাস ও রূপ উভয়ে প্রভুকে প্রণাম করিলেন। হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, দেখুন রূপ আপনাকে প্রণাম করিতেছেন।" প্রভু তখন সহর্ষে শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন। রূপ হরিদাসের বাসায় থাকিয়া গেলেন। ভক্তগণ দেশে যাইবার পরও রূপ রহিলেন। কারণ, প্রভু তাঁহাকে আপনার কার্য্যের উপযোগী করিবার নিমিত্ত যত্ন করিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। প্রভুর কৃপায় শ্রীরূপ ক্রমে ক্রমে শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। সেই বৎসর প্রভু রথাগ্রে নৃত্য করিবার সময় একটি শ্লোক বলেন। শ্লোকটি কাহার রচিত, তাহা জানা নাই, তবে কাব্যপ্রকাশে উদ্ধৃত আছে। শ্লোকটি এই ঃ

যঃ কৌমারহরঃ সঃ এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে।।

শ্লোকটির ভাবার্থ এই—কোন নাগরী তাঁহার পতিকে বলিতেছেন, "হে নাথ! সেই তুমি আমি। সেই আমরা মিলিত হইয়াছি। কিন্তু তবু আমাদের সেই যে প্রথম নিভৃত স্থানে মিলন হয়, তাহাতে যে সুখ হইয়াছিল, তাহা আর এখন পাইতেছি না।"

শ্লোকটি যে অদ্ভুত তাহা রসজ্ঞ মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু জগন্নাথ রথে চড়িয়া সুন্দরাচলে চলিয়াছেন, প্রভু সেই রথাগ্রে নৃত্য করিতেছেন। সে অবস্থার সহিত আদিরস ঘটিত নায়িকার উক্তি এই শ্লোকের কি সম্পর্কে আছে যে প্রভু রথাগ্রে নৃত্যের সময় উহা আস্বাদন করিবেন? প্রভু ঐ শ্লোক পড়িতেছেন, আর কেবলমাত্র স্বরূপ উহার ভাব বুঝিয়া আস্বাদন করিতেছেন, অপর কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু ভাগ্যবান রূপ ইহা বুঝিলেন, বুঝিয়া আপনি ঐ ভাবের একটি শ্লোক করিলেন। সে শ্লোকটি এই—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।।

রূপ এই শ্লোকটি তালপত্রে লিখিয়া চালে গুজিয়া রাখিয়াছেন। প্রভু স্নান করিয়া ফিরিবার সময় প্রত্যহ রূপ ও হরিদাসকে দর্শন দিয়া যান। সেই নিয়মানুসারে এক দিবস সেখানে আসিলেন, কিন্তু তখন রূপ স্নানে গিয়াছেন। প্রভু সেখানে কাহাকে না দেখিয়া বাসায় যাইবেন এমন সময় ঘরের চালে তালপত্র দেখিয়া উহা লইলেন এবং উহাতে লিখিত শ্লোকটি পড়িলেন; এমন সময় রূপ সমুদ্রস্নান করিয়া আসিলেন। প্রভু রূপকে দেখিয়া সহর্ষে তাঁহাকে চাপড় মারিয়া বলিলেন, "তুমি আমার মনের কথা কিরূপে জানিলে?" শ্রীরূপ এ কথায় কৃতার্থ হইলেন। প্রভু কিছুক্ষণ পরে স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "রূপ আমার মন কিরূপে জানিল?" স্বরূপ বলিলেন, "ইহাতে বুঝা গেল যে, তিনি তোমার কৃপাপাত্র।"

এখন সংক্ষেপে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বলিতেছি। শ্রীরাধার ভজন মধুররস লইয়া। রাধাকৃষ্ণ ভজনের উপকরণ আদি-রস অর্থাৎ মধুর-রস। এ সম্বন্ধে অনেক কথা পূর্বে বলিয়াছি, আরো পরে বলিব। প্রভুর মনের ভাব কি, তাহা, যখন তাঁহার রথাগ্রে নৃত্য বর্ণনা করি, তখন কতক লিখিয়াছি। শ্রীজগন্নাথ রথে, নানা কোলাহল হইতেছে, বাদ্য বাজিতেছে, কিন্তু তাঁহার রাধা কোথায়? প্রভু তখন রাধা ভাবে বিভাবিত হইয়া আপনাকে রাধা বলিয়া

সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি রাধা, দূরে দাঁড়াইয়া, আর জগন্নাথ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রথের উপর ভিন্ন লোকের মধ্যে রহিয়াছেন। রাধার তাহা সহ্য হইবে কেন? প্রভু মনে মনে রথের উপরিস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "বন্ধু, তুমি এখানে এত লোকের মাঝে কেন? ওরা তোমার কে? চল, তুমি ও আমি দুইজনে নিভৃত স্থানে গমন করি,—করিয়া প্রাণ জুড়াই।" ফল কথা, রথাগ্রে নৃত্য করিতে গিয়াই প্রভু বাহ্য হারাইয়াছেন। তখন রাধা হইয়াছেন। ভাবিতেছেন, তিনি (রাধা) কুরুক্ষেত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে লইতে আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যাইতে স্বীকৃত হইয়া রথে উঠিয়াছেন, এবং তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইতেছেন। এই আনন্দে প্রভু রাধাভাবে নাচিতে নাচিতে শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন লইয়া যাইতেছেন। কাজেই কাব্যপ্রকাশের শ্লোক প্রভুর হৃদয়ে তখন উদয় হয়, আর সেই শ্লোক শুনিয়া রূপগোস্বামী বুঝিলেন যে, প্রভুর মনের ভাব কি। রূপ কাব্যপ্রকাশের ভাব লইয়া রাধাকৃষ্ণ-লীলায় আরোপ করিয়াছেন, করিয়া শ্রীমতী দ্বারা ইহাই বলাইতেছেন যে—'হে কৃষ্ণ! যদিচ তুমি আর আমি দুইজনেই এখানে, তবুও সেই বৃন্দাবনের কথা—যেখানে নিধুবনে তোমায় আমায় প্রথম মিলনে যে সুখ হয় তাহাই মনে পড়িতেছে। সে মিলনের সুখ এ মিলনে আমি পাইতেছি না।"

শ্রীরূপকে দশমাস নিকটে রাখিয়া সর্বশক্তিমান্ করিয়া প্রভু তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বলিলেন, "একবার সনাতনকে এখানে পাঠাইয়া দিও।" রূপ গৌড়পথে, এ জীবনের মত, বৃন্দাবন গমন করিলেন। কিন্তু সনাতনে ও রূপে, প্রভুর ইচ্ছায়, দেখা শুনা হয় নাই। প্রয়াগে রূপ ও অনুপমকে বিদায় দিয়া, প্রভু বারাণসী আসিলেন এবং সেখানে সনাতনকে পাইলেন। রূপ ও অনুপম বরাবর বৃন্দাবনে গমন করিলেন, এবং কিছুদিন পরে আবার দেশে আসিলেন। এদিকে সনাতন প্রভুর নিকট বারাণসীতে বিদায় লইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন। এমত অবস্থায় রূপ ও অনুপমের সহিত সনাতনের পথে দেখা হইবার কথা, কিন্তু তাহা হইল না। কারণ, একজন রাজপথে ও আর একজন নির্জন পথে গিয়াছিলেন। রূপ ও অনুপম বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া গৌড়ে আগমন করেন। সেখানে অনুপমের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। তখন রূপ একক প্রভুর নিকট গমন করিয়া কি কি করিলেন তাহা উপরে বলিয়াছি।

এদিকে সনাতন বৃন্দাবনে যাইয়া শুনিলেন যে, রূপ দেশাভিমুখে গমন করিয়াছেন। তখন তিনি ফিরিলেন, কিন্তু আর দেশে না যাইয়া ঝাড়িখণ্ড দিয়া, নীলাচলে গমন করিলেন। পথে তাঁহার গাত্রে কণ্ডু হইল। কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে, ঝাড়িখণ্ডের বারি পান করিয়া তাঁহার এই ব্যাধি হইয়াছিল। তাহাই হউক, কিম্বা পূর্বে যে নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই পাপের নিমিত্তও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারেন। সে যাহা হউক, ব্যধি হওয়ায় সনাতনের বিন্দুমাত্রও দুঃখ হইল না। পূর্বে লোকে তাঁহাকে সম্রাটের প্রধান অমাত্য বলিয়া বহু মান্য করিত, এখন ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া সকলে অস্পৃশ্য ভাবিবে, কেহ নিকটে আসিবে না, ইহাতেই সনাতনের মহা আনন্দ। সনাতনের এরূপ মনের ভাবের কারণ বলিতেছি। প্রভুর সংসর্গে সনাতনের পূর্ণ মাত্রায় চৈতন্যের ও বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। তখন জগতের আদর ও ঘৃণা উভয়েই তাঁহার নিকট সমান হইয়াছে। পূর্বে যে সমুদয় পাপ করিয়াছেন, তৎসমুদয় এখন জ্বলন্ত-অঙ্গারের ন্যায় হৃদয়ে ক্লেশ দিতেছে। কিসে এই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের চরণ প্রাপ্তি হইবে সেই চিন্তা দিবানিশি করিতেছেন। প্রভুর চরণে আশ্রয় লইয়া নিতান্ত আশান্বিত হইয়াছেন বটে, এবং পরকালে যে উদ্ধার পাইবেন সে বিষয়েও আর সন্দেহ নাই;—কিন্তু তাহাতে মনে গৌরবের সৃষ্টি হয় নাই। প্রভু তাঁহাকে বড় আদর করেন বটে, একথাও বলেন যে, তাঁহার স্পর্শ দেবগণও বাঞ্ছা করেন;—কিন্তু সনাতনের

মনে সে সব কথা স্থান পায় না। তিনি ভাবেন, প্রভু করুণাময়, পাপী উদ্ধারের নিমিত্ত গোলক ত্যাগ করিয়া ধরাধামে আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ন্যায় অধম-জীব লইয়াই প্রভুর ঠাকুরালী;—সুতরাং সনাতনকে যে তিনি আদর করিবেন, সে আর বিচিত্র কি? কিন্তু তাহাতে তাঁহার (সনাতনের) কোন গৌরব নাই,—গৌরব প্রভুরই। বরং প্রভু যে তাঁহাকে এত আদর করেন, তাহাতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, তিনি অতি-অধম, কারণ অধম উদ্ধারের নিমিত্তই প্রভুর অবতার। আবার ইহাও ভাবেন ও দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, যে পরিমাণে তিনি এ জগতে দণ্ড পাইবেন সেই পরিমাণে তাঁহার পাপক্ষয় হইবে। যে পরিমাণে লোকে তাঁহাকে ঘৃণা করিবে সেই পরিমাণে প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিবেন। সুতরাং এই যে তাঁহার কুষ্ঠ হইয়াছে, ইহাতে সনাতনের মন কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তিনি ভাবিতেছেন যে, প্রভুকে দর্শন করিয়া রথচক্রের নীচে অপবিত্র-দেহ নষ্ট করিবেন। ইহাই ভাবিতে-ভাবিতে সনাতন নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। আপনি এক প্রকার জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন। আর কাহারও নিকট যাইতে অধিকার নাই। তাই তল্লাস করিয়া হরিদাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং আসিয়াই হরিদাসের চরণ বন্দনা করিলেন। হরিদাসও উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর কখন দর্শন পাইবেন, সনাতন এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে, স্বয়ং শ্রীপ্রভু ভক্তগণ সহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি হরিদাস ও সনাতন তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। হরিদাস বলিলেন, "প্রভু দেখিতেছেন না, সনাতন আপনাকে প্রণাম করিতেছেন!" প্রভু সহর্ষে সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে দুই বাহু প্রসারিত করিলেন। কিন্তু সনাতন পশ্চাৎ হটিয়া বলিতেছেন, "প্রভু করেন কি? আমাকে ছুঁইবেন না। আমি একে ঘোর পাপী অস্পৃশ্য পামর, আবার তাহার ফল স্বরূপ সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হইয়াছে ও তাহা হইতে ক্লেদ পড়িতেছে।" প্রভু সে সব শুনিলেন না। বল দ্বারা তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন, আর প্রকৃতই সনাতনের কুষ্ঠের ক্লেদ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিয়া গেল। প্রভু তখন সনাতনকে ভক্তগণের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। সনাতন সকলের চরণে পড়িলেন। প্রভু ও ভক্তগণ পিঁড়ায় বসিলেন, সনাতন ও হরিদাস দুইজনে পিঁড়ার তলে বসিলেন। তখন সকলে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন।

প্রভু বলিলেন, "তোমার কনিষ্ঠ রূপ এখানে দশ মাস ছিলেন। কিন্তু অনুপমের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে।" ইহাই বলিয়া প্রভু অনুপমের ভক্তির প্রশংসা করিলেন। সনাতন ভ্রাতৃবিয়োগের কথা পূর্বে শুনেন নাই; এখন শুনিয়া একটু কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, যত প্রকার অন্যায় ও অধর্ম, আমাদের কুলধর্ম। ইহা সত্ত্বেও তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছ। সুতরাং আমাদের সমস্তই মঙ্গল। অনুপম ভাই আমার, বড় ভক্ত ছিলেন। প্রভুর শ্রীমুখ হইতে আমার ভাইয়ের ভক্তির যে প্রশংসাবাদ শুনিলাম তাহার পোষকতায় এক কাহিনী বলিতেছি। আমার ভাই অনুপম রঘুনাথ উপাসক। আমি আর রূপ, তাঁহাকে বলিলাম, "যদি রসের ভজন করিতে চাহ, তবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কর।" অনুপম আমাদের অনুরোধে তাহাই স্বীকার করিলেন। কিন্তু সমস্ত রজনী কাঁদিয়া কাটাইলেন। প্রাতে আমাদের চরণ ধরিয়া বলিলেন, "রঘুনাথকে ছাড়িতে পারিলাম না।" ইহাতে তাঁহার ভজনের দার্ঢ্য দেখিয়া আমরা তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া আলিঙ্গন করিলাম।"

প্রভু বলিলেন, "মুরারিকেও আমি ঐরূপ পরীক্ষা করিতেছিলাম। মুরারি রঘুনাথ ছাড়িয়া কৃষ্ণ-ভজন করিবেন স্বীকার করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। শেষে আমার কাছে রঘুনাথ ভজন শিক্ষা করিলেন।" তাহার পর প্রভু একটি অদ্ভুত কথা বলিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "আমরা এখানে ভক্তের গুণানুবাদ করিতেছি, কিন্তু ভক্তের যে ঠাকুর শ্রীভগবান্ তিনিও সেইরূপ মহাশয়—বন্ধু। ভক্ত সেবক, ঠাকুরকে ছাড়েন না সত্য, আবার সেবক যদি দৈব

দুর্বিপাকে বিপথে যায়, তবে ঠাকুরও তাহাকে চুলে ধরিয়া সৎপথে আনেন।"* প্রভু বলিলেন, "সনাতন, তুমি এখানে হরিদাসের সহিত কৃষ্ণকথায় যাপন কর। তোমরা দুইজনে কৃষ্ণপ্রেমে প্রধান। কৃষ্ণ তোমাদিগকে অচিরাৎ কৃপা করিবেন।"

সনাতন হরিদাসের ওখানে থাকিলেন। গোবিন্দ প্রত্যহ উভয়ের নিমিত্ত প্রসাদ আনয়ন করেন। সনাতন ভয়ে কোথাও যান না, কারণ একে তিনি নীচজাতি (অর্থাৎ তাঁহার জাতি গিয়াছে), তারপর তিনি কুষ্ঠগ্রস্ত। হরিদাসের ন্যায় তিনিও শ্রীজগন্নাথ পর্য্যন্ত দর্শন করিতে যান না, দূর হইতে চক্র দেখিয়া প্রণাম করেন। সনাতনের মনে সঙ্কল্প রহিয়াছে, তিনি রথের চক্রে প্রাণ দিবেন। আবার প্রভু প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দেন, আর আলিঙ্গন করেন, ইহাতে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে সেই ক্লেদ লাগিয়া যায়। ইহা সনাতন সহ্য করিতে পারেন না। কাজেই শীঘ্র শীঘ্র প্রাণত্যাগ করিতে পারিলেই যেন অব্যাহতি পান, এইরূপ তাঁহার মনের ভাব হইল।

সনাতনের এরূপ মনের ভাব সর্বজ্ঞ প্রভুর অবশ্য অগোচর নাই। তিনি এক দিবস আসিয়া বলিতেছেন, "সনাতন! একটি কথা বলিব, শুন। যদি দেহত্যাগ করিলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, তবে আমি এক মুহূর্তে কোটিবার দেহ ত্যাগ করিতে পারি।" এই কথা শুনিয়া সনাতন চমকিত হইলেন। প্রভু বলিতেছেন, "ধর্মের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করা প্রকৃত ধর্ম নয়,—উহা তমোধম! যে ব্যক্তি কোন কারণে স্বহস্তে আপনার প্রাণত্যাগ করে, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস, ভক্তি কি প্রীতি অতি অল্প। সে তো নিতান্ত স্বার্থপর। সেরূপ ব্যক্তি মনে ভাবে যে, আপনাকে দুঃখ দিয়া কৃপা আহরণ করিবে। কিন্তু কৃষ্ণ ত নিষ্ঠুর নহেন। তবে কেহ-কেহ শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রাণ দিতে চাহেন বটে, সে, তাঁহারা কৃষ্ণের বিরহ সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া মরিতে চাহেন। কিন্তু সেরূপ লোক অতি-বিরল, আর তাঁহাদের নিয়মও অন্যরূপ। যদি কেহ কৃষ্ণ বিরহে মরিতে চাহেন, তবে কৃষ্ণ অমনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, হইয়া তাঁহাকে মরিতে দেন না। কিন্তু যাঁহারা আপন প্রাণ দিয়া কৃষ্ণকে জব্দ করিতে চাহেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে জব্দ করিতে পারেন না। অতএব সনাতন, তোমার আত্মহত্যারূপ এই কুবাঞ্ছা ছাড়, কীর্তন ও ভজন কর, তবে শ্রীকৃষ্ণ পাইবে। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে জাতিবিচার নাই,—বরং যাহারা হীনজাতি,-তাদের ভজন সুলভ হয়। যেহেতু যাহারা জাতিতে শ্রেষ্ঠ, তাহারা বড় অভিমানী, আর অভিমানিগণ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অধিকারী নহে।"

প্রভুর শিক্ষাগুলি পাঠক মনে রাখিবেন। শুধু এই দেশে নয়, সর্ব স্থানেই দেখা যায় যে, লোকের বিশ্বাস, আপনাকে দুঃখ দিয়া শ্রীভগবানের কৃপালাভ করা যায়। কিন্তু প্রভু বলিতেছেন যে, শরীরের কষ্ট অল্প-কথা, আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করা যায় না, কারণ তিনি মঙ্গলময় বন্ধু। তিনি নিষ্ঠুর নন যে, তুমি কষ্ট পাইলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীভগবানের কৃপালাভের নিমিত্ত যতই কঠোর কর সে বিফল। প্রবোধানন্দ সরস্বতী সন্ন্যাসীদিগের মাননীয়। এদেশে বিশ্বাস যে, সন্ন্যাসীর ন্যায় প্রধান-আশ্রয় আর নাই। কিন্তু প্রবোধানন্দের দ্বারা প্রভু জীবকে শিক্ষা দিলেন যে, সন্ন্যাস করিলে কৃপা লাভ করা যায় না। প্রভু নিজেও সর্বদা বলিতেন যে "প্রেমেই জীবের প্রয়োজন, সন্ন্যাস লইয়া আমি কিছু লাভ করি নাই। বেদবিধি ধর্মের দাস।" এদেশের প্রধান নৈয়ায়িক শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম নিদ্রা হইতে উঠিয়াই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এরূপ কার্য্য করিতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতে প্রাণ গেলেও পারেন না। যখন সার্বভৌম প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, তখন প্রভু

* প্রভু! এই আশ্বাসবাক্য তোমার শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, অতএব তোমার যেন সে কথা মনে থাকে।

আনন্দে তাঁহাকে লইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর বলিলেন,—"তুমি বেদবিধি লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে, আজ তুমি প্রকৃত কৃষ্ণ-দাস হইলে।" ইহাতে মনে হয় যে স্মার্ত-ভট্টাচার্য্যের মত পালন করিলে মনকে বিধির অধীন করিয়া জড় করিয়া ফেলে। অতএব এই বেদবিধিগুলি জগতের অন্যান্য ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহার ভজন-সাধন পদ্ধতি বালক বৃদ্ধ সকলেই বুঝিতে পারেন।

প্রভুর কথা শুনিয়া সনাতন চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন, "আমার সংকল্প প্রভুর গোচর হইয়াছে। আবার আমার সংকল্প, প্রভুর অভিমত নহে। প্রভুর ইচ্ছা নহে যে, আমি প্রাণত্যাগ করি। প্রভুর আমার উপর এত স্নেহ কেন?" এই সকল কথা মনে উদয় হওয়ায় তিনি দ্রবীভূত হইলেন, হইয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিতেছেন, "প্রভু তুমি অন্তর্য্যামী ভগবান, কৃপালু, সর্ব্বজীবের প্রাণ, আমাকে মরিতে দিবে না। কিন্তু প্রভু, তুমি আমাকে বাঁচাতে চাও কেন? আমার ন্যায় ছারের দ্বারা তোমার কি লাভ হইবে?" প্রভুও তখন দ্রবীভূত হইলেন। কারণ তিনি কাহার চক্ষে জল দেখিতে পারেন না। প্রভু বলিলেন, "সনাতন বল কি? তোমার দ্বারা আমার কোন কার্য্য হউক আর না হউক, সে আমার বিচারের বিষয়। তোমার তাহাতে কোন কথা কহিবার অধিকার নাই। তুমি তোমার এই দেহ আমাকে দিয়াছ, ইহা আমার, তোমার ইহাতে কোন অধিকার নাই। তুমি পরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাও, এ তোমার কি বিচার?" একটু থামিয়া প্রভু আবার বলিতেছেন, "তোমার দেহকে তুমি ছার বল, কিন্তু আমি ঐ দেহ দ্বারা অনেক কার্য্য সাধন করিব। বৃন্দাবন ও মথুরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-স্থান। সেখানে জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত উপযুক্ত ভক্তের প্রয়োজন। তোমাকে সেখানে রাখিব। তুমি বলিতেছ তোমার দেহ কি কাজে আসিবে? তোমার ঐ দেহ দ্বারা কোটি কোটি জীব উদ্ধার পাইবে। তাহার পর হরিদাসকে বলিতেছেন, "হরিদাস, অন্যায় দেখ; সনাতন তাঁহার দেহটি আমাকে দান করিয়াছেন, এখন উহা নষ্ট করিতে চান। জীবের মঙ্গলের জন্য ঐ দেহ দ্বারা আমি নানা কার্য্য করিব, তাহাই তিনি অতি নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া দিতে চান, ইহা কিরূপে সহ্য করিব?"

সনাতন তখন গদগদ হইয়া বলিলেন, "প্রভু, তোমার হৃদয় আমরা কিছু জানি না। তুমি যাহাকে যেরূপ নাচাও, সে সেইরূপ নাচে। যদি তোমার এরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে যে, এই ছার-দেহ দ্বারা কোন কার্য্য করিবে, তবে তাহাই হউক। আমার উহাতে কথা কি?" কিন্তু প্রভু ইহাতেও সম্পূর্ণ আশ্বাসিত হইলেন না। তিনি সনাতনের হাত ধরিয়া সাশ্রুলোচনে বলিলেন, "বল সনাতন, আমার মাথার দিব্য, তুমি তোমার দেহ নষ্ট করিবে না?" সনাতনও তখন অঝোর-নয়নে ঝুরিতেছেন। তিনি সম্মত হইয়া বলিলেন, "প্রভু, তোমার যে আজ্ঞা তাহাই পালন করিব।" প্রভু ইহাতে মহা আনন্দিত হইলেন। হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, তুমি মনে কি কর, তাহা আমরা ক্ষুদ্র জীব কিরূপে বুঝিব? ইহারা কয়েক ভ্রাতা কোথায় ছিল, কি ছিল? ইহাদিগকে আনয়ন করিলে। এখন বলিতেছ, ইহাদিগের দ্বারা অতি মহৎ কার্য্য সাধন করিবে। তোমার এ ভঙ্গী আমরা কিরূপে বুঝিব?"

সনাতন বৈশাখ মাসে আসিয়াছেন, প্রভুর সঙ্গে আছেন, নিতি নিতি তাঁহার ভক্তি ও প্রেম বাড়িতেছে। প্রভুর সহিত দিনের মধ্যে একবার মাত্র দেখা হয়, আর প্রভু প্রত্যহই তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, আর প্রত্যহই প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ক্লেদ লাগিয়া যায়। ক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাস আসিল, গৌড়ীয় ভক্তগণ শচীমাতার আজ্ঞা লইয়া প্রভুকে দর্শন নিমিত্ত নীলাচলে আসিলেন। অন্যান্য বারের ন্যায় প্রত্যহ মহোৎসব হইতে লাগিল। একদিন যমেশ্বর টোটায় মহোৎসব হইল। প্রভু সেখানে সনাতনকে না দেখিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্র, তাহাতে বেলা দুই প্রহরের অধিক, সূর্য্যতেজে সকলে ম্রিয়মান। সনাতন প্রভুর আহ্বান

জানিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। তখন তাঁহাকে প্রসাদ দেওয়া হইল, এবং তিনি প্রসাদ পাইয়া প্রভুর নিকটে আসিলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন পথে আসিলে?" তিনি বলিলেন, "সমুদ্র পথে।" প্রভু বলিলেন, "সেকি! সমুদ্রপথ বালুকাময়, সে পথে এ রৌদ্রে চলাফেরা যায় না। পায়ে নিশ্চয় ব্রণ হইয়াছে। তুমি কেন মন্দিরের শীতল-পথে আসিলে না?" সনাতন বলিলেন, "কই আমি তো কোন কষ্ট পাই নাই!" প্রকৃত কথা এই যে, প্রভু ডাকিতেছেন, এই আনন্দে তপ্ত-বালুকায় পায়ে যে ব্রণ হইয়াছে তাহা সনাতন জানিতেও পারেন নাই। সনাতন বলিলেন, "মন্দির-পথে আসিতে আমার সাহস হইল না, কারণ আমি নীচ, কি জানি হয়তো কাহাকে স্পর্শ করিব, করিয়া অপরাধী হইব।" প্রভু ইহাতে গদগদ হইয়া বলিলেন, "তুমি যে ইহা করিবে তাহা জানি। তুমি তোমার স্পর্শদানে ভুবন পবিত্র করিতে পার। তোমার যদি এরূপ দৈন্য না হইবে তবে তোমার এরূপ ভক্তি কিরূপে হইবে? আমি এরূপ দৈন্য চিরদিন বড় ভালবাসি। তাহার পরে, যে প্রকৃত মহান্, তাহার যে দৈন্য সে আরো মধুর। ভক্তগণকে তোমার চরিত্র দেখাইবার নিমিত্ত আমি তোমাকে এই দুইপ্রহর বেলায় ডাকিয়াছিলাম। এরূপ সময়ে সমুদ্রপথে কেহ ইচ্ছাপূর্বক আসে না। কিন্তু তুমি আসিবে তাহা জানিতাম।" ইহাই বলিয়া প্রভু সেই শত শত লোকের সম্মুখে তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। আর ইহাও সকলে দেখিলেন যে, সনাতনের অঙ্গের ক্লেদ প্রভুর অঙ্গে লাগিয়া গেল।

সনাতন যদিও দিন দিন প্রেম ও ভক্তিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, তবু তাঁহার মনে দুইটি ক্ষোভ রহিয়া গেল। তিনি ব্যাধিগ্রস্থ; তিনি যে মহাপাপী তাহার সাক্ষী তাঁহার এই রোগ, সুতরাং তাঁহার দ্বারা জগতে কি উপকার হইবার সম্ভাবনা? লোকে তাঁহাকে মানবে কেন? বরং কুষ্ঠগ্রস্থ বলিয়া সকলে ঘৃণা করিয়া নিকটেও আসিবে না। যে ব্যক্তি মহাপাপী ও সেই নিমিত্ত শ্রীভগবানের দণ্ড পাইয়াছে, তাহার নিকট লোক ভক্তি কেন শিখিবে? তাহাকে লোকে কেন ভক্তি করিবে? তাহার পর, প্রভু তাঁহাকে প্রত্যহ আলিঙ্গন করেন, সেই তাঁহার মহাদুঃখ। পাছে কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করে, এই ভয়ে তিনি রাজপথে গমন করেন না। প্রভু তাহাকে স্বয়ং বুকে করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করেন, তাঁহার ইহা কিরূপে সহ্য হইবে? ইহাও হইতে পারে যে, প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া অঙ্গ ক্লেদময় করিতেন, ইহাও তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে কাহারও ক্লেশের কারণ হইত। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে যে সনাতনের কণ্ডুরস লাগে, ইহা যে ভক্ত দেখিতেন তাঁহারই মনে অবশ্য ক্ষোভ হইত। অবশ্য সনাতনের ইহাতে কোন অপরাধ ছিল না। যেহেতু প্রভু তাঁহাকে জোর করে আলিঙ্গন করিতেন। তবু সনাতন আপনাকে ভক্তগণের নিকট অপরাধী ভাবিয়া সর্বদা কুণ্ঠিত থাকিতেন। প্রভু অন্যান্য সময় সনাতনকে গোপনে আলিঙ্গন করিতেন, কিন্তু সেদিন সর্বভক্ত সমীপে আলিঙ্গন করিলেন। পূর্বে সনাতন মরিতে চাহিয়াছিলেন, এখন বুঝিয়াছেন, তাহা হইবে না। কারণ যে কার্য্যটা পাপ, আর ইহাতে প্রভুর ইচ্ছা নাই। তবে কি করিবেন? অতএব শীঘ্র শীঘ্র শ্রীবৃন্দাবনে গমন করাই কর্তব্য, ইহাই স্থির করিলেন। সেই নিমিত্ত সনাতন একদিবস জগদানন্দকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! এখানে দুঃখ খণ্ডাইতে আসিলাম; ভাবিলাম রথের চাকায় প্রাণ দিব, কিন্তু তাহা হইল না, প্রভু তাহা করিতে দিলেন না। প্রভু আমাকে বল দ্বারা আলিঙ্গন করেন। কত নিষেধ করি, কোন মতে শুনেন না, আমার গাত্রের ক্লেদ তাঁহার অঙ্গে লাগে, ইহা আমার কি কাহার সহ্য হয়? কিন্তু করি কি, প্রভু স্বেচ্ছাময়। এখন আমাকে পরামর্শ বল, আমি কি করিব?"

জগদানন্দ, প্রভু ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। ভাল মানুষ, বুদ্ধি তত সূক্ষ্ম নহে। সনাতনের ক্লেদ যে প্রভুর অঙ্গে লাগে, ইহাও তাঁহার ভাল লাগে না। তাই উপদেশ

করিতেছেন, "সনাতন, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, তোমার এখানে আর থাকা উচিত নয়। প্রভু তোমার গোষ্ঠীকে বৃন্দাবন দিয়াছেন, অতএব তুমি এই রথযাত্রা দেখিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যাও।" সনাতন বলিলেন, "এই বেশ যুক্তি, তাহাই আমার করা উচিত।" জগদানন্দের সঙ্গে আলাপে সনাতন স্পষ্ট বুঝিলেন যে তাঁহাকে যে প্রভু আলিঙ্গন করেন, ইহা অন্ততঃ কোন কোন ভক্তের সুখকর নহে। ইহাতে তিনি শীঘ্র নীলাচল ত্যাগ করিবার সংকল্প দৃঢ় করিলেন; আর ইহাও সংকল্প করিলেন যে, প্রভুকে আর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে দিবেন না। জগদানন্দের সহিত এই কথাবার্তা হইবার পরে প্রভু আসিলেন। সনাতন আর প্রভুর নিকটে গমন করিলেন না, দূর হইতে প্রণাম করিলেন। প্রভু ডাকিতেছেন, "সনাতন, নিকটে এস।" সনাতন বলিতেছেন, "নিকটে আর না, এখান হইতেই ভাল।" প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রবর্তী হইলেন, আর সনাতন পশ্চাতে হটিতে লাগিলেন; প্রভু মহা বিপদে পড়িলেন। কিন্তু প্রভুর সহিত সনাতন পারিবেন কেন? তিনি সনাতনকে তাড়াইয়া ধরিলেন, ধরিয়া বলদ্বারা হৃদয়ে আনিলেন এবং গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পরে হরিদাসকে ও সনাতনকে লইয়া পিঁড়ায় বসিলেন। প্রভু পার্ষদগণসহ আসিয়া সনাতনের সহিত মিলিত হইলে, তখন হরিদাস ও সনাতন পিঁড়ার নীচে, আর প্রভুর সহিত ভক্তগণ পিঁড়ার উপরে বসিতেন। কিন্তু সেখানে অন্য কেহ নাই, কাজেই মর্য্যাদা রাখার প্রয়োজন নাই; তাই তিনজনে একত্রে বসিলেন।

এ কিরূপ শ্রবণ করুন। বহিরঙ্গ সম্মুখে স্ত্রী স্বামীকে সমীহ করেন, স্বামীর অতি-নিকটে গমন করেন না। নির্জনে শয়নাগারে তাঁহার সে ভাব কিছুই থাকে না। তাই শ্রীভগবানের সঙ্গে এক সম্বন্ধ, আর ভক্তের সঙ্গে অন্য সম্বন্ধ। ভক্ত সম্মান চান, যেহেতু তিনি জীব। শ্রীভগবানের সম্মানের প্রয়োজন কি? তিনি না অনন্তগুণে প্রকাণ্ড? তিনি চান ভালবাসা। যদি স্ত্রী স্বামীর কোলে বসিয়া থাকেন, আর সেখানে কোন বহিরঙ্গ লোক আইসে, তবে তিনি লজ্জা পাইয়া দূরে যান। সেইরূপ যখন শ্রীভগবান হরিদাস ও সনাতনকে লইয়া পিঁড়ার উপর একত্র বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছিলেন, তখন যদি কোন ভক্ত সেখানে যাইতেন, তবে হয়তো হরিদাস ও সনাতন তখন পিঁড়ার নীচে যাইতেন। শ্রীভগবান নিজ-জন, হৃদয়ের ধন। শ্রীভগবান স্ত্রী ও স্বামী হইতেও অন্তরঙ্গ। আর এই জ্ঞান কথায় ও কার্য্যে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রভু জগতে আবির্ভূত হয়েন।

সনাতন তখন সকাতরে মনের সমুদয় কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "আমি আমার হিত দেখিতেছি না। আসিলাম উদ্ধারের নিমিত্ত, কিন্তু আমার পদে-পদে অপরাধ হইতেছে। একে আমি নানা প্রকারে নীচ, আমাকে কেহ যে স্পর্শ করে তাহার যোগ্য আমি নই, তাহাতে আবার আমার অঙ্গে কুষ্ঠ। কোথা আমি জীবগণ হইতে দূরে থাকিব, না আমি তোমা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইতেছি! লোকে তোমার শ্রীপাদপদ্মে তুলসী চন্দন দিয়া পূজা করে, কিন্তু আমার অঙ্গের দুর্গন্ধময় ক্লেদ তোমার অঙ্গে লাগে। ভক্তগণ ইহাতে অবশ্য ক্লেশ পাইবেন। পাইবারই কথা। আবার আমারও কি ইহা ভাল লাগে যে, আমার অঙ্গের ক্লেদ তোমার শ্রীঅঙ্গে লাগিবে? কিন্তু কি করি? তুমি পতিতপাবন, পরম-দয়াল, চন্দন-বিষ্ঠায় তোমার সমান দৃষ্টি, তুমি ঘৃণা না করিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর। প্রভু, তোমার হৃদয় আমি একটু বুঝি। তুমি যে এইরূপ দুর্গন্ধ ক্লেদ পর্য্যন্ত অঙ্গে মাখিতে কুণ্ঠিত হও না, তাহার কারণ এই যে, ঐরূপ না করিলে পাছে আমি মনে ক্লেশ পাই। কিন্তু প্রভু, স্বরূপ বলিতেছি, তুমি যে আমাকে স্পর্শ কর ইহাতে আমি মর্মান্তিক ব্যথা পাই। তুমি যদি আমাকে আলিঙ্গন কি স্পর্শ না কর, তাহা হইলেই আমার সুখ। তুমি আমাকে মরিতে দিবে না, তোমার সে আজ্ঞা পালন করিব। এখন তুমি আমাকে বিদায় দাও। তুমি আমাকে বৃন্দাবনে যাইতে বলিয়াছ, আমি সেইখানে যাই, আর যে কয়েকদিন বাঁচি,

সেইখানেই যাপন করি। এ বিষয়ে আমি পণ্ডিত জগদানন্দের নিকট পরামর্শ চাহিয়াছিলাম। তিনিও বলিলেন যে, আমার এস্থান শীঘ্র ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গমন করাই কর্তব্য।" সনাতনের কথা শুনিয়া, প্রভু প্রথমে জগদানন্দের প্রতি উগ্র হইয়া বলিলেন, "বটে! তাহার এত বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে যে তোমাকে উপদেশ দেয়? সেকি তাহার নিজের মূল্য জানে না? কি ব্যবহারে, কি পরামর্শে, তুমি তার গুরুর তুল্য।"

সনাতনের মনে পূর্ব হইতে ক্ষোভ রহিয়াছে। সে ক্ষোভের কারণ পূর্বে বলিয়াছি। তিনি প্রভুর এই গৌরবজনক কথা শুনিয়া কোমল হইলেন না, বরং ব্যথা পাইলেন। তখন প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "আজ আমি কে তাহা জানিলাম, আর পণ্ডিত জগদানন্দের সৌভাগ্যও জানিলাম। প্রভু, তুমি আমাকে ভিন্ন ভাব, তাই আমাকে সম্মান ও স্তুতি কর; আর পণ্ডিত তোমার নিজ-জন তাই তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর। আমারও এ বড় দুর্ভাগ্য যে, আজও আমাকে তোমার আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান হইল না? কিন্তু করি কি, তুমি স্বতন্ত্র ভগবান!"

যদিও আমার সরল-প্রভুকে এ কথা বলা সনাতনের পক্ষে অন্যায়। কারণ প্রভু যে তাঁহাকে স্তুতি করিয়াছিলেন, সে তিনি বহিরঙ্গ বলিয়া নয়, প্রকৃতই স্তুতির উপযুক্ত বলিয়া। তবু কিন্তু রাজমন্ত্রীর বাগ জালে সরল-প্রভু একটু অপ্রতিভ হইলেন। তখন তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, "সনাতন, তুমি আমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিতেছ। আমি যে তোমাকে স্তুতি করি, সে তুমি বহিরঙ্গ বলিয়া নহে, তোমার গুণে তোমাকে স্তুতি করায়। জগদানন্দ আমার নিকট তোমা অপেক্ষা প্রিয় নহে। কোথায় তুমি, আর কোথায় জগদানন্দ! তুমি শাস্ত্রে ও সাধনে সর্বাংশে প্রবীণ, আর সে বালক। তুমি আমার উপদেষ্টা, কত সময় উপদেশ দিয়াছ, আর উহা আমি পালন করিয়াছি। সেই বালক তোমাকে উপদেশ দিতে চাহে, ইহা আমি কিরূপে সহ্য করি? মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি সহ্য করিতে পারি না। তার পরে, সনাতন! তোমার দেহ তুমি বীভৎস জ্ঞান কর, কিন্তু সরল কথা শুনিবে? আমার কাছে তোমার দেহ অমৃত সমান লাগে। তুমি বল, তোমার গাত্রে দুর্গন্ধ, কিন্তু কই আমার কাছে তাহাতো বোধ হয় না? আমার নাসিকায় তোমার গাত্রের গন্ধ যেন চন্দনের গন্ধ বলিয়া বোধ হয়।" এ কথা ঠিক। যেদিন প্রভু সনাতনকে প্রথম আলিঙ্গন করেন, সেই দিন সেই মুহূর্তে সনাতনের অঙ্গের দুর্গন্ধ দুরীকৃত হইয়া সুগন্ধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সনাতন তাহা জানিতে পারেন নাই। অন্য সকলে উহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তারপর প্রভু বলিতেছেন, "সনাতন। তোমার দেহ তুমি অতি ঘৃণার দ্রব্য বলিয়া ভাব, কিন্তু প্রাকৃত তাহা নহে, উহা অপ্রাকৃত। ওরূপ পবিত্র-দেহে মন্দ স্পর্শ করিতে পারে না। আমি সন্ন্যাসী, আমার এখন বিষ্ঠা ও চন্দনে সমান দৃষ্টি হওয়া উচিত। আমি কিরূপে তোমার দেহকে ঘৃণা করিব? তোমার দেহকে ঘৃণা করিলে আমি কৃষ্ণের স্থানে অপরাধী হইব।" সনাতন তখন একটু কোমল হইয়া বলিতেছেন "প্রভু তাহা নয়। তুমি যত কিছু বলিতেছ এ সমুদয় বাহ্য প্রতারণা; উহা আমি মানিব না। তুমি যে আমাকে ঘৃণা না করিয়া গ্রহণ করিয়াছ তাহার কারণ এই যে, তুমি দীনদয়াল। তোমার কার্য্য আমার ন্যায় অধমকে কৃপা করা, আর তোমার ঠাকুরালী আমার ন্যায় পতিত লইয়া।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "যদি স্বরূপ কথা শুনিতে চাও, তবে বলিতেছি। আমি আমাকে তোমাদের লালকরূপ অভিমান করিয়া থাকি,—যেন আমি তোমাদের মাতা। এমন স্থলে মাতা কি সন্তানের কোন মন্দ কাজ মন্দ বলিয়া দেখে? সন্তানের লালা প্রভৃতি মাতার সর্বাঙ্গে লাগে, তাহাতে কি দুঃখ কি ঘৃণা হয়? বরং মহা সুখ হয়।"

হরিদাস বলিতেছেন, "সে যাহা হউক, প্রভু তোমার গভীর-হৃদয় আমরা কিছুই বুঝি না। কাহাকে, কি নিমিত্ত, কিরূপ কৃপা কর, তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত! বাসুদেব তোমার

অপরিচিত, অপিচ তাহার গাত্রে যে কুষ্ঠ তাহা অতি ভয়ঙ্কর। তাহার গলৎকুষ্ঠে তাহার অঙ্গ কীড়াময় হইয়াছিল। তাহাকে একবার মাত্র দর্শন দিয়া ও আলিঙ্গন করিয়া পরমাসুন্দর করিলে। অথচ সনাতন তোমার"—ইহা বলিয়া হরিদাস নীরব হইলেন।

হরিদাস ভঙ্গীতে এত দিনে তাঁহার মনের ভাব বলিলেন। প্রভু স্বয়ং ভগবান, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। সনাতন তাঁহার প্রিয়, এমন কি সনাতনের দেহ তাঁহার নিজের, ইহা বারবার বলিয়াছেন। আরো বলিয়াছেন উহার দ্বারা তিনি অনেক কার্য্য করিবেন। সে দেহ তিনি অনায়াসে ভাল করিলেই পারেন, অথচ ইহা করেন না কেন? এই সকল কথা হরিদাস পূর্বে মনে মনে ভাবিতেন, এখন সাহস করিয়া প্রকারান্তরে প্রভুকে উহা জানাইলেন। হরিদাস যদিচ একথা বলিলেন, কিন্তু সনাতন আপনার পীড়ার আরোগ্য সম্বন্ধে কোন কথা ভাবে কি ভঙ্গীতে এ পর্য্যন্ত একবারও প্রভুকে বলেন নাই। তুমি আমি এই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলে, শ্রীভগবানকে সম্মুখে পাইলে প্রথমেই বলিতাম, "প্রভু, আগে আমার রোগটি আরাম করিয়া দাও, পরে আর কথা।" যখন হরিদাস স্পষ্টাক্ষরে প্রভুর নিকট সনাতনের নিমিত্ত বলিলেন, তখন প্রভু উহা মোটে বুঝিলেন কি না, তাহা জানা গেল না। অর্থাৎ বাসুদেব বলিয়া কোন এক অপরিচিত ব্যক্তির গলৎকুষ্ঠ ছিল এবং তাহাকে তিনি আলিঙ্গন মাত্র আরোগ্য করিয়াছিলেন; অথচ পরিচিত সনাতনকে সেরূপ কৃপা করেন নাই,—এ সমুদয় কথা তিনি যে বুঝিয়াছেন কি শুনিয়াছেন, তাহা সনাতন কি হরিদাসকে বুঝিতে দিলেন না। তিনি পূর্বকার কথা লইয়া বলিলেন, "ভক্তের দেহ অপ্রাকৃত, উহাতে মন্দ স্পর্শ করিতে পারে না।" তারপর বলিলেন, "সনাতনের দেহে এই যে ব্যাধি উহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পরীক্ষা করিলেন। কারণ যদি আমি এই ব্যাধি দেখিয়া ঘৃণা করিতাম, তবে শ্রীকৃষ্ণের স্থানে অপরাধী হইতাম।" তারপর সনাতনকে বলিলেন, "তুমি দুঃখ করিও না। আমি যে তোমাকে আলিঙ্গন করি, তাহার কারণ এই যে, উহাতে আমি বড় সুখ পাইয়া থাকি। এ বৎসর তুমি আমার এখানে থাকো। বৎসরান্তে তোমাকে বৃন্দাবন পাঠাইব। "এত বলি পুন তারে কৈল আলিঙ্গন। কণ্ডু গেল অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম।"—চরিতামৃত।

এখন আপনারা বিচার করুন, প্রভু কেন কয়েক মাস সনাতনকে এরূপ দুঃখ দিলেন? তিনি তো দর্শনমাত্র তাঁহাকে আরাম করিতে পারিতেন? সনাতনের মনে যেটুকু দুঃখ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। তাঁহার ব্যাধি হয়েছে বেশ, তিনি মহাপাপী অবশ্য তাহার উপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে মরিতে দিবেন না, অথচ ব্যাধি আরাম করিবেন না। অধিকন্তু, প্রভু তাঁহাকে সর্বসমক্ষে মহাসম্মান করিবেন; এমন কি, তাঁহার অঙ্গের ক্লেদ লক্ষ করিয়া আলিঙ্গন পর্য্যন্ত করিবেন,—ইহাতে ভক্তগণ প্রভুকে কিছুই না বলিয়া, নিরপরাধ সনাতনকে নিন্দা করেন। কাজেই সনাতন সঙ্কল্প করিলেন, এখানে তিনি থাকিবেন না, শীঘ্র বৃন্দাবনে যাইবেন। তাঁহার মনে এ দুঃখ উদয় না হইলে তিনি প্রভুকে ছাড়িয়া ওরূপ করিয়া বৃন্দাবনে যাইতে চাহিতেন না। তবে তিনি কখনও মুখে বলেন নাই যে, "প্রভু, আমার ব্যাধিটি ভাল করিয়া দাও।"

প্রভু সনাতনের দ্বারা জীবকে অনেকগুলি উপদেশ শিক্ষা দিলেন। প্রথম দেখাইলেন কুকর্ম করিলে ফল ভোগ করিতে হয়। তারপর দেখাইলেন যে, ভক্ত কখন নীচ হইতে পারেন না, তাঁহার অঙ্গে যদি কুষ্ঠও হয়, তবুও তিনি পূজার পাত্র। প্রভু যেমন করিয়া সনাতনকে আলিঙ্গন করিতেন, তুমি আমি কি সেরূপ ভাবে কোন ব্যাধিগ্রস্থ ভক্তকে করিতে পারি? তৃতীয় দেখাইলেন যে, যদিও তিনি সনাতনকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন, তবু তাহাতে সনাতনের দৈন্য হ্রাস না হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছিল। চতুর্থ দেখাইলেন যে, যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা জানেন যে, শ্রীভগবান জীবের মঙ্গলময় পিতা। তাঁহার নিকট কোন বিষয় চাহিতে

নাই, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। তাই সনাতন, স্বয়ং শ্রীভগবানকে সম্মুখে পাইয়া, একদিনও প্রভুর নিকট আপনার রোগের কথা বলেন নাই। এই সমুদয় দেখাইবার নিমিত্ত প্রভু সনাতনকে দর্শন মাত্র আরোগ্য করেন নাই। সনাতনের আর এখন কোন কষ্ট নাই, এখন আর প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু প্রভুর গণের নিজ-সুখ অনুসন্ধানের অনুমতি নাই। বৃন্দাবনে যাও যাইয়া জীব উদ্ধার কর, আপনার আরামের নিমিত্ত এখানে থাকিবে না,--ইহাই প্রভুর আজ্ঞা। সনাতন আর কিছুকাল থাকিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন,—কোন পথে, না, যে পথে প্রভু গিয়াছিলেন। সেই পথের ও যেখানে তিনি যে লীলা করিয়াছেন তাহার বিবরণ প্রভুর সঙ্গী বলভদ্রের নিকট লিখিয়া লইলেন। বিদায়ের সময় হইলে, প্রভু ও সনাতন রোদন করিতে লাগিলেন। যথা—দুই জনের বিচ্ছেদ দশা না যায় বর্ণন।"

এই বিচ্ছেদে প্রাণ বিকল হইয়াছে,--তবু প্রভুর ক্ষমতা নাই যে, সনাতনকে রাখেন, আর সনাতনেরও ক্ষমতা নাই যে থাকেন। কারণ তাহা হইলে জীবের উদ্ধার হয় না। অতএব গৌরভক্তের কর্তব্য জীবের সুখ বর্দ্ধনের নিমিত্ত জীবন যাপন করা। সনাতন বৃন্দাবনে যাইবার পর শ্রীরূপ গৌড় হইতে সেখানে আসিলেন। তাহার অনেক পরে তাঁহাদের কনিষ্ঠ অনুপমের পুত্র শ্রীজীব যাঁহাকে তাঁহারা রাজপাটে রাখিয়াছিলেন, আর দেশে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল এবং তিনিও বৃন্দাবনে দৌড়িলেন। পূর্বে সনাতন, সনাতনের পরে রূপ, রূপের পর জীব বৃন্দাবনের কর্তা হইলেন। এই গোষ্ঠী বৃন্দাবন পুনরুদ্ধার করিলেন—যে বৃন্দাবন কেবল জঙ্গলময় ছিল, যেখানে প্রভুর চর, লোকনাথ ও ভূগর্ভ, প্রথমে যাইয়া, কোথা রাসস্থলী খুঁজিয়া পান নাই, সে স্থল ক্রমে সাধুময় হইল। ইহার এক একজন সাধু ভুবন পবিত্র করিতে সক্ষম।

এই তিন গোস্বামীর কার্য্য বর্ণনা করিয়া শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। যথা ঃ

"দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল। প্রভুর যে আজ্ঞা দুঁহে সব নির্বাহিল।।
নানাশাস্ত্র আনি লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধারিল। বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিল।।
সনাতন গ্রন্থ কৈল ভগবতামৃতে। ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে।।
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্পনি। কৃষ্ণলীলা প্রেমরস যাহা হৈতে জানি।।
হরিভক্তিবিলাস কৈল বৈষ্ণব আচার। বৈষ্ণবের কর্তব্য যাহা পাইয়ে পার।।
আর যত গ্রন্থ কৈল কে করে গণন। মদনগোপাল গোবিন্দের-সেবা প্রকাশন।।
রূপগোঁসাই কৈল রসামৃতসিন্ধুসার। কৃষ্ণভক্তি-রসের যাহা পাইয়ে নিস্তার।।
উজ্জ্বলনীলমণি নাম গ্রন্থ আর। কৃষ্ণধারা-লীলারস তাঁহা পাইয়ে পার।।
দানকেলিকৌমুদী আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল। সে সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিল।।
তাঁর লঘু ভ্রাতা শ্রীবল্লভ অনুপম। তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব নাম।।
সর্বত্যাগি তিঁহ পাছে আইলা বৃন্দাবন। তিঁহ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ।।
ভাগবতসন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থ সার। ভাগবত সিদ্ধান্তের তাহে পাই পার।।
গোপালচম্পূ নাম আর গ্রন্থ কৈল। ব্রজপ্রেম-লীলারস সার দেখাইল।।
ষটসন্দর্ভ কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব প্রকাশিল। চারি লক্ষ গ্রন্থ দুহে বিস্তার করিল।।"

শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ দুই ভাই কাঁথা ও করা সম্বল করিয়া বৃন্দাবনে সম্ভবে? তিনি বলিলেন, "সনাতন, বৃন্দাবনে যাও, যাইয়া উহা উদ্ধার কর।" গমন করেন। সেখানে যাইয়া দেখেন যে, বৃন্দাবনে স্থান ব্যতীত আর কিছু নাই। মুসলমান-দস্যুর উৎপাতে এই পবিত্র-স্থান উজাড় হইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোক মাত্র নাই, কোন দেবালয় নাই, তীর্থস্থানের কোন চিহ্ন

নাই। থাকিবার মধ্যে আছে কেবল অসভ্য বনবাসিগণ, যাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন-ধর্ম কিছুই নাই। এই উজাড়-বৃন্দাবন উদ্ধার করা প্রভুর আজ্ঞা। সেই আজ্ঞা পালন করেন এরূপ ধন-জন কিছুই তাঁহাদের নাই। ছিল কেবল প্রভুদত্ত-শক্তি। ইহাই ধন-জন হইতে তাঁহাদের অধিক সহায়তা করিল। তাঁহাদের বৈরাগ্য এরূপ যে, পাছে মায়ায় আবদ্ধ হন, তাই দুই ভাই এক স্থানে থাকিতেন না; এক বৃক্ষতলে দুই রাত্রি বাস করিতেন না, পাছে—সে বৃক্ষের উপর মমতা হয়। শীতে-বৃষ্টিতে বৃক্ষতলে বাস; উপবাস করেন, তবু ভিক্ষা করিতে যান না। কিন্তু গীতার শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়াছেন তাহা তো জানেন? তিনি বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি আমার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, আমি তাহার অন্ন আপন স্কন্ধে করিয়া বহিয়া লইয়া যাই।" অর্জুন মিশ্র পাকামী করিয়া এই শ্লোক কাটিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, "আমি বহিয়া লইয়া যাইব" এ কথা কখনো হইতে পারে না। কৃষ্ণ আপনি তাঁহার সুকুমার স্কন্ধে করিয়া অন্ন বহিয়া লইয়া যাইবেন, ইহা কি ভাল কথা? ভক্ত একথা কিরূপে লিখিবে? তাই ভক্তপ্রবর অর্জুন মিশ্র ঐ শ্লোক কাটিয়া লিখিলেন, "আমি বহাইয়া লইয়া যাই।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "বটে? তুমি বুঝি আমার পদ বাড়ালে? আমার এমন ভক্ত, যে আমার উপর নির্ভর করিয়া উপবাস করে, আমি তাহার নিমিত্ত অন্ন লইয়া যাই, ইহাতে যে সুখ তাহা অন্যকে দিয়া আমি কেন বঞ্চিত হইব?" ইহাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন মিশ্রকে দণ্ড করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই স্বভাব। সেখানে রূপ-সনাতন কেন অনাহারে থাকিবেন?

দুই ভাই ছেঁড়া কান্থা স্কন্ধে করিয়া সেই জঙ্গলে গমন করিলেন। ক্রমে দুই এক জন করিয়া লোক আসিতে লাগিল। ক্রমে উদিত দিবাকরের ন্যায় তাঁহাদের তেজ প্রকাশ হইতে লাগিল। পরিশেষে স্বয়ং সম্রাট আক্‌বর তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আসিলেন। আক্‌বর শুধু যে আগমন করিলেন তাহা নয়,—ভারতবর্ষের সেই দোর্দণ্ড-প্রতাপান্বিত সম্রাট তাঁহাদের চরণে শরণ লইলেন। আক্‌বর ধন দিতে চাহিলেন। সনাতন বলিলেন, "আমরা কৃষ্ণের দাস, আমাদের ধনের অভাব কি?" অমনি আক্‌বর দর্শন করিলেন যে, সমগ্র শ্রীবৃন্দাবন রত্নমাণিক্য-খচিত! তখন তিনি গদ্গদ ভাবে বলিলেন,—অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা করুন। আমি সামান্য রাজা, যিনি রাজার রাজা তিনি তোমাদের অধীন।"

যখন এই দুই ভিক্ষুক বৃন্দাবনে গমন করিলেন, তখন সেই জঙ্গলময় স্থানে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিচরণ করিত। ক্রমে সেখানে মন্দিরের সৃষ্টি হইতে লাগিল। গোবিন্দদেবের মন্দির হইল, মদনমোহনের মন্দির হইল। গোবিন্দের মন্দিরের ন্যায় সুন্দর দেবস্থান জগতে আর নাই। উহা নির্মাণ করিতে কোটি টাকার কম ব্যয় হয় নাই। গোস্বামীগণ বৃক্ষতলবাসী হইয়া এই টাকা সংগ্রহ করেন। আপনারা বলিতে পারেন, সেই ভিক্ষুকগণ এত টাকা কোথায় পাইলেন? ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু আমাদের জাতীয় বস্তু নহেন,—তিনি স্বয়ং ভগবান। স্বয়ং তিনি ব্যতীত এত শক্তি আর কাহার তখন সনাতনের গাত্রে একখানি ভোটকম্বল দেখিয়া, প্রভু ইঙ্গিতে বলিলেন, "অগ্রে এই তিনমুদ্রার কম্বলখানি পরিত্যাগ কর, তারপর বৃন্দাবনে আমার আজ্ঞা পালন করিতে যাইও।" কাজেই সনাতনের নিঃসম্বল হইয়া যাইতে হইল। রূপ-সনাতনের যে অতুল-ঐশ্বর্য্য ছিল, তাহা দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে অনেক মন্দির হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইবে না। প্রভু সে অতুল-ঐশ্বর্য্যের এক কপর্দকও লইয়া যাইতে দিলেন না। তাঁহাদিগকে কাঙ্গালের কাঙ্গাল করিয়া শেষে বলিলেন, "যাও, এখন বৃন্দাবন উদ্ধার কর গিয়া।" তাঁহারা সেই অবস্থায় বৃন্দাবনে যাইয়া শত-শত মন্দির করিলেন। তার মধ্যে এমন মন্দির ছিল যাহা প্রস্তুত করিতে কোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

কেন এই দুইজন অতুল-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া, রত্নখট্টা ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলে শয়ন করেন? কেন ইঁহাদের কথা লোকে এরূপ মান্য করিতে লাগিল?—তাঁহাদের চরণে যথাসর্বস্ব

দিতে প্রস্তুত হইল? কেন একজন সম্রাট, যিনি অনায়াসে তাঁহাদিগকে বধ করিতে পারিতেন, তাঁহাদের অধীন হইলেন? কিরূপে এই দুই ব্যক্তি বিনা-সম্বলে জঙ্গলের মধ্যে মহানগরী সৃষ্টি করিলেন? কিরূপে ইহাঁরা সহস্র সহস্র পণ্ডিত-সাধু-সন্ন্যাসীকে প্রতীতি করাইয়া দিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু (যাঁহাকে ঐ সমস্ত লোক কখনও দেখেন নাই) স্বয়ং শ্রীভগবান? ইহার উত্তর এই যে,—আমাদের শ্রীপ্রভু সত্য-বস্তু, তাঁহার মধ্যে কিছুমাত্র ভেলকী নাই, সমুদয় খাঁটি। তাই কেবল তাঁহার ইচ্ছা মাত্র রূপ-সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ, মনুষ্যে যে শক্তি সম্ভবে না, তাহা পাইয়াছিলেন। প্রভুর মধ্যে কিছু ভেলকী থাকিলে, তিনি সনাতনকে সেই কম্বলখানি ফেলিয়া দিতে ইঙ্গিত করিতেন না। তাহা হইলে তিনি রূপ-সনাতনকে অতুল-ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইতেন না। তিনি বঞ্চক হইলে রূপ-সনাতনের ঐশ্বর্য্যদ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে মন্দির স্থাপন করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গদাসের কি শক্তি তাহা অনুভব করুন। এই দুই কাঙ্গাল দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু বৃন্দাবনের জঙ্গলে এক প্রকাণ্ড নগর সৃষ্টি করাইলেন।

এখন রামানন্দ রায়ের মহিমা কিছু বলিব। প্রভুর জ্ঞাতি শ্রীহট্টবাসী শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। ইচ্ছা যে, প্রভু তাঁহার সহিত কথা বলেন, কারণ তিনি কুটুম্ব, প্রভুর উপর তাঁহার অধিকার আছে। কিন্তু প্রভু কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত আর কিছু বলেন না। প্রভুর কাছে যাইয়া তিনি বলেন, "প্রভু, আমাকে কৃষ্ণ-কথা শুনাও।" প্রভু বলিলেন, "আমি কৃষ্ণ-কথা বলিতে পারি না, উহা রায় রামানন্দ জানেন, আমি তাঁহার কাছে শুনিয়া থাকি। তোমার কৃষ্ণ-কথা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে বড় ভাগ্যের কথা, তাঁহার কাছে যাও।" ইহাই বলিয়া প্রভু সেই সরল পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণটিকে বিদায় করিয়া তাঁহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

প্রদ্যুম্ন করেন কি, তিনি রামানন্দ রায়ের নিকট চলিলেন, যাইয়া ভৃত্য মুখে শুনিলেন যে, তিনি ব্যস্ত আছেন, একটু পরে সভায় আসিবেন। ভৃত্য যত্ন করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। মিশ্র মহাশয় কিছুক্ষণ বসিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "রামানন্দ রায় এখন কি করিতেছেন?" ভৃত্য কহিলেন, "তিনি দেবদাসীকে অভিনয় শিখাইতেছেন।" প্রদ্যুম্ন ইহার কিছুই বুঝিলেন না। তখন ভৃত্য তাঁহাকে সমুদয় বুঝাইয়া দিলেন। ভৃত্য বলিলেন যে, রায়ের নিজকৃত নাট্যগীতি আছে, তাহার নাম "জগন্নাথবল্লভ"। শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে এই নাটকের অভিনয় হয়। সেই নিমিত্ত, মন্দিরে যে দেবদাসীগণ আছে, তাহাদের মধ্যে বাছিয়া-বাছিয়া সুন্দরী ও যুবতীগণকে লইয়া রামরায় তাঁহার নিভৃত-নিকুঞ্জে, তাহাদিগকে অভিনয় শিক্ষা দেন। সে দিবস দুইজন দেবদাসীকে লইয়া অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন। তিনি কিরূপে শিক্ষা দিতেছেন, তাহা চৈতন্য-চরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইলা। গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইলা।।
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক, স্থায়ী ভাবের লক্ষণ। মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন।।"

রায় নিভৃতস্থানে এই সমুদয় কাণ্ড করিতেছেন শুনিয়া মিশ্রঠাকুর অবাক হইলেন। ইহাতে অবশ্য রায়ের প্রতি মনে মনে তাঁহার একটু অশ্রদ্ধা হইল। কিছুক্ষণ পরে রামরায় আসিলেন এবং আসিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া মিশ্রের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। কিন্তু রামরায়ের কাণ্ড শুনিয়া মিশ্রের আর তাঁহার নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে রুচি হইল না। তিনি দুই-চারিটি বাজে-কথা বলিয়া পলায়ন করিলেন।

প্রদ্যুম্ন আবার প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষ্ণ-কথা শুনিলে?" প্রদ্যুম্ন বলিলেন যে তাঁহার ভাগ্যে উহা ঘটে নাই। তাহার পরে আস্তে-আস্তে প্রকারান্তরে রামরায়ের কুৎসা গাইতে লাগিলেন; বলিলেন, "প্রভু, তোমার রামরায়কে তুমি জানো, আমাদের কিন্তু তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সব ভাল লাগে না। বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী যুবতী

লইয়া, নির্জনে তাহাদিগকে স্নান করান, অঙ্গ মার্জনা করান, আর অভিনয় শিক্ষা দেওয়া—এসব কি বড় ভাল কাজ হইল?" প্রকৃত বলিতে কি, পৃথিবীর মধ্যে প্রভুর কৃপাপাত্র ব্যতীত অপর কেহই বুঝিবে না যে, কিরূপে নাটক অভিনয় করিতে হয়, তাহা দেবদাসীদিগকে শিক্ষা দেওয়া শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনার একটা অঙ্গ। স্থূল কথায় ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছি। লোকে নাট্যশালা করে, করিয়া উহা হইতে আনন্দ অনুভব করে। সঙ্গীত-দ্বারাও উহাই করে। লোকে পুষ্প সঞ্চয় করিয়া তাহা হইতে আনন্দ সংগ্রহ করে। যাঁহাদের কৃষ্ণগতপ্রাণ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহ মমতা কি প্রীতি করেন, তাঁহাদের ইচ্ছা করে যে তাঁহাকে এই সমুদয় আনন্দের আস্বাদন করান। যত ভাল-ভাল দ্রব্য আছে, স্ত্রী তাহা স্বামীকে দিতে চাহেন। তাই রামরায় কবি, কৃষ্ণ তাঁহার প্রাণ, আপনি নাটক রচনা করিয়া, নাট্যশালা করিয়া, কৃষ্ণকে উহা দেখাইবেন, শুনাইবেন—সেই নিমিত্ত, রসাভাস না হয়, অভিনয় বিশুদ্ধ হয়, তাই দেববাসীগণকে শিক্ষা দিতেছেন। সুন্দরী ও যুবতী কেন বাছিয়া লইয়াছেন, না—তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া-গোপী সাজিতে হইবে। তাঁহাদিগের রূপ না থাকিলে কি সে রসাভাস হইবে? যিনি কুরূপা, তিনি কি শ্রীমতী রাধিকা সাজিতে পারেন? রামানন্দের এই যে ভজন, ইহা সর্বোত্তম; ইহা হইতে সূক্ষ্ম সুপবিত্র ভজন আর হইতে পারে না। এ ভজন জগতে আর কোথাও নাই, কোথাও ছিল না; কেবল বৈষ্ণবগণের মধ্যে আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে এই কবিতাটি আছে, যথা—

পূর্ণচাঁদ আলা, বনফুলে মালা, বাতাবী ফুলের গন্ধ।
শিশির দুর্বার, রস কবিতার, পদ্ম-ফুল মকরন্দ।।
সুস্বর সুরাগ, নৃত্য ও সোহাগ, সতৃষ্ণ নয়ন-বাণ।
প্রেমানন্দ ধার, মধু-হাসি আর, লজ্জা, আলিঙ্গন, মান।।
এই আয়োজনে, পূজে গোপীগণে, সর্বাঙ্গসুন্দর বরে।
বলরাম দীন, নীরস কঠিন, কি দিয়া তুষিবে তারে।।

জীব আপন প্রকৃতি ও শিক্ষা অনুসারে শ্রীভগবানকে ভজন করে। কেহ একটি জীব হত্যা করিয়া তাহার রুধির দিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিতে চান। কেহ তাঁহাকে তোষামোদ করিয়া ভুলাইতে চান, বলেন—"তুমি বড় দয়াল, তুমি বড় মহাজন" ইত্যাদি! কেহ বা আপনার পাপের নিমিত্ত কান্দিয়া আকুল হয়েন; মনে ভাবেন, তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া ভগবান তাঁহার দোষ ভুলিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন। যেমন ভগবান তেমন তাঁহার ভজন। যে প্রভু লোভী মাংসাশী, তাঁহাকে রুধির দিতে হইবে। যে প্রভু দাম্ভিক, অহঙ্কারী, স্বেচ্ছাচারী ও নির্বোধ তাঁহাকে তোষামোদ ও নানারূপ বঞ্চনা করিয়া ভজন করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি আর একরূপ। তিনি সরল, সুবোধ, সুরসিক, দয়াল, অক্রোধ, পরমানন্দ, স্নেহশীল, স্বার্থশূন্য। এরূপ বস্তুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা একটু ভাবিলেই স্থির করা যায়;—আর সেই ব্যবহারই আমাদের ভজন। গোপীগণ করেন কি?—না, তাঁহাদের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকে কবিতার রসদ্বারা এবং স্নেহ, আলিঙ্গন, মান প্রভৃতির দ্বারা ভজন করেন। তাঁহারা শ্রীভগবানকে গীত শ্রবণ করান, কবিতার রস আস্বাদন করান। সুতরাং রামানন্দ রায় যে শ্রীকৃষ্ণকে নাটকাভিনয় দেখাইবেন, তাহার বিচিত্র কি? তাই রামানন্দ বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী-যুবতী ও রসিকা-দেবদাসী সংগ্রহ করিয়াছেন, কেন-না তাঁহাদিগকে ব্রজগোপী, অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রণয়িনী সাজিতে হইবে। কৃষ্ণের প্রণয়িনী যদি কুরূপা, কুশীলা কি কঠিনা হয়েন, তবে সে বড় অস্বাভাবিক হয়। রামরায়ের নিজের কিছু স্বার্থ নাই, তিনি কৃষ্ণসেবা করিতেছেন, তাই এই সেবাটি যাহাতে সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়, সেজন্য নাটক রচনা করিয়া ইহা বিশুদ্ধভাবে অভিনয় করিতেছেন।

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কথা শুনিয়া প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি কি শুন নাই যে, যাঁহারা বৃন্দাবনের ভজন করেন, তাঁহাদের হৃদ্‌রোগ কি কামরোগ থাকে না? রামরায় নির্বিকার. তাঁহাব হৃদয়ে বিকার নাই। তুমি আবার যাও, যাইয়া বল যে আমি তোমাকে কৃষ্ণ-কথা শুনিতে পাঠাইয়াছি।" প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া দ্রুতপদে রামরায়ের নিকট আবার যাইয়া উপস্থিত হইলেন; এবং বলিলেন, আমি প্রভুর নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, 'আমি উহা জানি না, তবে রামরায়ের কাছে শুনিয়া থাকি।' আপনার এত বড় মহিমা। আমাকে কৃষ্ণ-কথা শুনিতে আপনার নিকট প্রভু পাঠাইয়া দিলেন।"

রামরায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "প্রভু আমার নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনেন বটে, কিন্তু তিনিই আমার মুখে বক্তা। যাহাহউক, প্রভুর আজ্ঞা পালন করিব, আমি যাহা জানি আপনাকে বলিব। এখন আপনি বলুন, আপনি কি কৃষ্ণ-কথা শুনিবেন?" ব্রাহ্মণ ইহার কি উত্তর করিবেন। তিনি কৃষ্ণ-কথা বলিয়া একটা কথা শুনিয়াছেন মাত্র, কিন্তু বস্তু কি তাহা কিছুই জানেন না। তাই দীনভাবে বলিলেন, "আমি প্রশ্ন করিতে জানি না। আপনিই প্রশ্ন করুন, আর আপনিই উত্তর দিউন।" তখন রামরায় একটু ভাবিয়া কৃষ্ণ-কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কথায়-কথায় রস উঠিল, রামরায় ভাসিয়া চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণঠাকুরও চলিলেন। রসপান করিতে উভয়েরই বাহ্যজ্ঞান রহিত হইল। শেষে বেলা যায় দেখিয়া ভৃত্য আসিয়া রামরায়কে একপ্রকার বলপূর্বক উঠাইয়া লইয়া গেল।

কৃষ্ণ-কথা কি, ব্রাহ্মণঠাকুর তাহা জানিতেন না। কিন্তু পাঠক, আপনি কি উহা জানেন? কৃষ্ণ-কথায় এমন কি আছে যে উহা বলিতে কি শুনিতে জীব বিহ্বল হয়? শ্রীভগবান "পুরুষোত্তম", "নরোত্তম" "সর্বাঙ্গসুন্দর।" তাঁহার সকল গুণই আছে,—আর ইহা আছে পূর্ণ মাত্রায়, অথচ দোষের লেশমাত্র নেই। এরূপ বস্তু লইয়া আলোচনা করিবার বিষয়ের অভাব নাই। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখা যায় যে, চক্ষুর অগোচরে কীট কেমন সুন্দর খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার একটি দেহ আছে, ঘর আছে স্ত্রী-পুত্র আছে, অথচ সে বস্তুটি নয়নের অগোচর! ইহা দেখিলে, যে কারিগর উহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার প্রতি ভালবাসার ন্যায় অনির্বচনীয় একটি ভাবের উদয় হয়। আবার এই জগৎ নিরীক্ষণ কর; দেখিবে—তিনি যেমন কীটাণু সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি অননুভবনীয় প্রকাণ্ড বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, সকলেই স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে,—কাহার সাধ্য তাহা অন্যথা করে। যখন এই সমুদয় মনে চিন্তা করা যায় তখন এই সমুদয় বস্তুর স্রষ্টার উপর আর এক প্রকার ভালবাসার ন্যায় ভাবের উদয় হয়। আবার কবিকর্ণপুর বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের সৃষ্টি-প্রক্রিয়াদি বিচারে তত সুখ নাই, যত তাঁহার হৃদয়-বিচারে সুখ। সুতরাং শ্রীভগবান যে খুব ক্ষমতাবান এ তাঁর বড়-মহিমা নহে,—তাঁহার বড়-মহিমা এই যে, তিনি অতি মধুর-প্রকৃতি। একজন দিব্য কারিগর, বেশ পুতুল গড়িতে পারেন। কিন্তু তিনি আর এমন দয়ালু যে পরদুঃখ দেখিলে আমার প্রভুর মত উচ্চৈস্বরে কান্দিয়া উঠেন। এখন বিবেচনা করুন, সেই ব্যক্তির কোন্ গুণ বিচারে অধিক সুখ। তাঁহার কারিগরি- বিচারে, না তাঁহার হৃদয়-বিচারে? শ্রীকৃষ্ণের কারিগরি আলোচনাকে যদিও 'কৃষ্ণ-কথা' বলে, কিন্তু সে নিকৃষ্ট। প্রকৃত 'কৃষ্ণ-কথা' কি,-না কৃষ্ণের অন্তর বিচার ও চর্চা করা; কারণ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর পবিত্র, সরল, সমুদয় উচ্চভাবে পরিপূর্ণ।

আমার ভালবাসার অনেকগুলি বস্তু, আর তাহাদের নিমিত্ত আমি অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে পরি। কিন্তু তাহারা সকলেই স্বার্থপর ও মলিন, কেবল আমার শ্রীকৃষ্ণ নিঃস্বার্থ নিজ-জন। আমার কৃষ্ণ আমায় প্রতিপালন করেন, অথচ তাঁহার ভাব যেন,—আমিই তাঁহার প্রতিপালক। আমি তাঁহার নিকট সকল বিষয়েই ঋণী, কিন্তু তাঁহার ভাব যেন তিনিই আমার

কত ধার ধারেন। আমার কৃষ্ণকে যদি আমি একবার স্মরণ করিলাম, তবে যেন তিনি কৃতকৃতার্থ হইলেন। অথচ তিনি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলেন না। আমি শ্রীকৃষ্ণের একটি চিত্র দেখিয়াছিলাম। বদন নিরীক্ষণ করিতে-করিতে, আমার বোধ হইল যেন তিনি অন্যমনস্ক রহিয়াছেন। আমি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছি, তিনি যেন আমার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মনে কি প্রগাঢ় চিন্তা করিতেছেন। আমি স্বার্থপর-জীব আমার মনে একটু কষ্ট হইল। ভাবিলাম যে, আমি তাঁহার শ্রীবদন এক মনে দর্শন করিতেছি, কিন্তু তিনি তাহা লক্ষ্য করিতেছেন না—আপনার মনে কি ভাবিতেছেন। তথন হঠাৎ একটি কথা মনে হইল। মনে হইল যে—বটে, শ্রীকৃষ্ণের অন্যমস্ক হইবারই ত কথা। কারণ তাঁহার ঘাড়ে কত বড় সংসার! এ ত্রিজগতে ত পালন করিতে হইবে? এইরূপে যখন আমার হৃদয়ে "অন্যমনস্ক কৃষ্ণ" উদয় হয়েন, তখন আমি তাঁহাকে আর বিরক্ত করি না, পাছে তাঁহার বৃহৎ পরিবারের হিত ভাবিবার ব্যাঘাত হয়। আবার ইহাও কখন বোধ হয় যে, যেন শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবিতেছেন, আর ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়ন ছল-ছল করিতেছে, তখন মন কি করে একবার ভাবিয়া দেখুন!

শ্রীনন্দনন্দনে, ভজিনু কি ক্ষণে, কান্দি কান্দি মনু।
তাঁর দুঃখ দেখি, মোর দুঃখ সখি, সকলি ভুলিয়া গেনু।।

মনে ভাবুন, "শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-জল", ইহা কে সহ্য করিতে পারে? তখন ইচ্ছা করে, তাঁহার জলপূর্ণ রাঙ্গা-আঁখি মুছাইয়া দিই। আবার ভাবি,—না, তাহাতে রসবঙ্গ হইবে। এই যে গোপনে রোদন করিতেছেন, হয় ত আমি কাছে গেলে তিনি লজ্জা পাইবেন। এইরূপ ভাবিতে ভবিতে মনে হইল যেন শ্রীকৃষ্ণ বদন উঠাইলেন, উঠাইয়া দেখিলেন যে, আমিও রোরুদ্যমান অবস্থায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছি। তখন শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় লজ্জা পাইলেন, পাইয়া পীতাম্বর দিয়া তাড়াতাড়ি আপন নয়ন মুছিলেন, আর আমার দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত বদনে মধুর হাসি আনিলেন!

ফল কথা শ্রীকৃষ্ণের সবই সুন্দর। তাঁরে সম্বন্ধে যাহা আলোচনা কব তাহাই মধুর। তাঁহার দর্শন মধুর, গন্ধ মধুর, তাঁহার চরিত্র মধুর। তাই কবি বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন ঃ

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধিমৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।।"

সখীরা শ্রীরাধার মুখে কৃষ্ণ-কথা শুনিতেন। চণ্ডীদাসের প্রথম পদই এইরূপ কৃষ্ণ-কথা। যথা "কেবা শুনাইল" গীতের অনুবাদে রাধা বলিতেছেন, "সখি! শ্যাম-নাম আমাকে কে শুনাইল? কত কথা, কত নাম শুনি, এক কানে শুনি অপর কান দিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু ঐ শ্যাম-নামের কি অদ্ভুত শক্তি! যেই নামটি শুনিলাম, অমনি উহা আর এক কান দিয়া বাহির না হইয়া হৃদয়ে বসিয়া গেলেন। না হয়, সেই নাম হৃদয়ে চুপ করিয়া থাকুন; কিন্তু তাহা নয়, হৃদয়ে যাইয়া আমাকে অস্থির করিলেন। এখন আমার মুখে কৃষ্ণ-নাম ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। নামে এত মধু যে বদন ছাড়িতে চাহে না।" রাধা এইরূপে কৃষ্ণ-কথা বলিতেছেন, আর আনন্দে গলিয়া পড়িতেছেন; আর যাঁহারা শুনিতেছেন, তাঁহারাও ঐরূপ রসে পরিপ্লুত হইতেছেন। ইহাকেই বলে প্রকৃত কৃষ্ণ-কথা।

এই গেল প্রভুর শ্রীরামানন্দ রায়ের প্রতি ব্যবহার। এখন ছোট হরিদাসকে প্রভুর দণ্ড করিবার কথা শ্রবণ করুন। প্রভুর নিকট দুই হরিদাস বাস করেন,—ছোট ও বড়; বড় হরিদাসকে সকলে চিনেন। ছোট হরিদাস উদাসীন, কীর্তনিয়া,—প্রভুকে কীর্তন শুনাইয়া থাকেন। একদিন শ্রীভগবান আচার্য্য, প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু ভিক্ষায় বসিয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ সূক্ষ্ম-তণ্ডুল কোথায় পাইলে?" আচার্য্য বলিলেন, "মাধবী

দাসীর নিকট মাগিয়া আনিয়াছি।" প্রভু বলিলেন, "কে আনিল?" আচার্য্য বলিলেন, "ছোট হরিদাস।" প্রভু তখন আর কিছু বলিলেন না; তবে বাসায় আসিয়া গোবিন্দকে বলিলেন যে, "ছোট হরিদাসকে আর আমার নিকট আসিতে দিও না।" ইহাতে ছোট হরিদাস মর্ম্মাহিত হইলেন। অন্য সকলেও ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তখন প্রভুর কাছে সকলে তাঁহার ক্ষমার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। হরিদাস মাধবী দাসীর নিকট তণ্ডুল মাগিয়া আনিয়াছে, প্রভু সেই উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে,—"সে উদাসীন, তাহার প্রকৃতি-সম্ভাষণ নিষেধ, অতএব সে দণ্ডার্হ।" ঠিক কি ঘটনা হয় তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আমি এখানে শ্রীচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

তিন দিন হরিদাস করে উপবাস। স্বরূপাদি সবে পুছিলেন প্রভু পাশ।।
কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস। কি লাগিয়া দ্বারমানা, করে উপবাস।।
প্রভু কহে, বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।।
ক্ষুদ্র-জীব মর্কটবৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি-সম্ভাষিয়া।।

এখন এপর্য্যন্ত সমুদয় বুঝা গেল, কিন্তু মাধবী দাসীতো প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি নহেন। তিনি যদিও স্ত্রীজাতি; কিন্তু একে বৃদ্ধা, তাহাতে রমণীর শিরোমণি। এ মাধবীর মহিমা শ্রবণ করুণ—

"মাহিতির ভগিনীর নাম মাধবীদেবী। বৃদ্ধ তপস্বিনী আর পরমাবৈষ্ণবী।।
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ। জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন।।
স্বরূপগোঁসাই, আর রায় রামানন্দ। শিখিমাহিতি তিন, তার ভগ্নী অর্দ্ধ।।"

হরিদাস মাধবীর নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার এত কি অপরাধ? মাধবী দাসী যদিও স্ত্রীলোক, তবু বৃদ্ধা আবার এদিকে পরমা-পণ্ডিতা। এমন কি, লোকে তাঁহাকে এক প্রকার পুরুষ বলিয়া মানিত। তাঁহাদের কাহিনী চতুর্থ খণ্ডে, পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। তাঁহার নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করায় এমন কি অপরাধ হইল? অবশ্য, সন্ন্যাসীর প্রকৃতি দর্শন কি সম্ভাষণ নিষেধ, কিন্তু তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে প্রকৃতি দর্শন কি সম্ভাষণ কোন কুকার্য্য হইতে পারে না। এটি কেবল শাসন-বাক্য, আর কিছুই নয়। রামরায় যুবতী স্ত্রীলোক লইয়া নিভৃতে অনেক সময় বাস করেন, তাহাতে দোষ হয় না। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা মাগিয়া হরিদাসের কি এত অপরাধ হইল? বিশেষতঃ প্রভু স্বয়ং প্রকৃতি দর্শন ও সম্ভাষণ যে একেবারেই না করিতেন, এরূপ নহে। তাঁহার মাসী কি অদ্বৈত-গৃহিণীর নিকট এ সমুদয় নিয়ম বড়-একটা পালন করিতেন না। সেখানে হরিদাসকে একেবারে ত্যাগ করেন কেন? যাহাহউক, প্রভু হরিদাসকে ত্যাগ করিলে, সকলে তাঁহার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে আর গ্রহণ করিলেন না। এইরূপে এক বৎসর গেল। তখন হরিদাস নীলাচল হইতে প্রয়াগে গেলেন, এবং গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এ সমুদয় কাহিনী পড়িলে মনে হয় যে, প্রভু ছোট-হরিদাসকে যে দণ্ড করেন, উহা একটু অধিক হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা কি তাহা বলিতেছি। প্রভুর সঙ্গে বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী, ইঁহাদের ভালমন্দের নিমিত্ত প্রভু দায়ী। ইঁহাদের মধ্যে যদি কেহ পতিত হন, তবে তিনি বা তাঁহারাই যে শুধু মারা যান এরূপ নহে, জীব উদ্ধারেরও ব্যাঘাত ঘটে। তখন প্রভুকে লইয়া ভারতবর্ষময় চর্চা চলিতেছে। প্রভুর ভক্তগণকে লইয়াও সেইরূপ। হরিদাস অল্প-বয়স্ক যুবক; ঝোঁকের উপর সন্ন্যাসী হইয়াছেন, অথচ চরিত্র বিষয়ীর মত। প্রভুর উহা সহ্য হয় না, তাই তিনি ধর্ম্ম-স্থাপন ও জীব-উদ্ধারের নিমিত্ত হরিদাসকে দণ্ড করা কর্তব্য ভাবিলেন। অবশ্য তাঁহার প্রতি দণ্ড গুরু কি লঘু হইয়াছিল তাহা তাঁহার অপরাধ না জানিলে নির্ণয় করা কঠিন। তিনি যে

মাধবীর নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করেন, সে অবশ্য উপলক্ষ্য মাত্র, অপরাধ অবশ্য আরও কিছু ছিল। কারণ প্রভুর শ্রীমুখের বাক্যে তাহাই বোধ হয়। হরিদাসের "মর্কট-বৈরাগ্য", তিনি "ইন্দ্রিয়-চরাঞা" বেড়ান, ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্বজ্ঞ-প্রভুর কোন-বিষয় অগোচর ছিল না। হরিদাস দৌর্বল্যবশতঃ সন্ন্যাসী হইয়াও "ইন্দ্রিয় চরাইতেন", তাই দণ্ড পাইলেন,—মাধবীর নিকট যে তণ্ডুল ভিক্ষা উহা উপলক্ষ্য মাত্র। হরিদাস নিজে তাহা বুঝিয়াছিলেন, আর সেই অনুতাপানলে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এ সম্বন্ধে আমার অধিক বলিবার ইচ্ছা নাই। ছোট হরিদাস সাধু, মহাপ্রভুর পার্ষদ, তাঁহাকে লইয়া আমি বিচার করিতে পারি না। তবে মহাপ্রভুর এই লীলার তাৎপর্য্য বিচার করিতেছি। ঠাকুর দেখিলেন যে, এই যুবক-সন্ন্যাসী তাঁহার নিত্য পার্ষদ। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য হয় নাই ও তিনি ইন্দ্রিয়সুখভোগাভিলাষী হইয়া তাহার চর্চা করিয়া থাকেন। তাই তাঁহাকে দণ্ড করিলেন। আর হরিদাস মনস্তাপে দেহত্যাগ করিলেন। প্রভুর বৈরাগী-ভক্তগণের মধ্যে ইহাতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল, যথা,—"দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে। স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে।।"

ফল কথা, সংসার ত্যাগ করিতে না পার, করিও না,—সংসারে থাকিয়া কৃষ্ণ-ভজন কর। কিন্তু যদি সংসার ত্যাগ কর, তবে আর মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া আপনাকে, অন্য জীবকে ও শ্রীভগবানকে বঞ্চনা করিও না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং উদাসীন, প্রভু তাঁহাকে বলপূর্বক সংসারে প্রবেশ করাইলেন। কারণ, দেখিলেন যে, তাহা না হইলে লোকে আর বৈষ্ণবধর্মে প্রবেশ করিবে না। আবার, হরিদাস বৈরাগী হইয়া প্রকৃতি সম্ভাষণ করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিলেন। কারণ দেখিলেন যে, বৈরাগীগণের মধ্যে যে কঠোর নিয়ম তাহা শিথিল হইয়া পড়িতেছে। মনে ভাবুন, হরিদাসকে দণ্ড করিলেন; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দকে কৌপীন ছাড়াইয়া আবার পট্টবস্ত্র পরিধান করানো, সেও এক প্রকার দণ্ড। এই দুই কার্য্যের এক উদ্দেশ্য, অর্থাৎ জীবের মঙ্গল। শ্রীনিত্যানন্দের সংসার-প্রবেশে জীবে বুঝিল যে, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে সংসার-ত্যাগের প্রয়োজন নাই। হরিদাসের দণ্ডে লোকে বুঝিল যে, কৃষ্ণ-ভজনে প্রবঞ্চনা চলিবে না।

এখন হরিদাসের প্রতি প্রকৃত দণ্ড হইল, কি অনুগ্রহ হইল, তাহা শ্রবণ করুন। হরিদাস গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন, তাহার লাভ বই ক্ষতি হইল না। পাঠক মহাশয়, প্রভুর সহিত ভারতী গোসাঞির প্রথম-মিলন স্মরণ করুন। ভারতী গোসাঞি চর্মাম্বর পরিধান করিয়া প্রভুকে প্রথমে দেখিতে আসিলেন। প্রভুর উহা ভাল লাগিল না। কৃষ্ণ-ভজনে এ সমুদয় প্রতারণা কেন? প্রভুর সম্মুখে ভারতী গোসাঞি চর্মের অম্বর পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া। প্রভু বলিতেছেন, "কৈ, ভারতী গোসাঞি কোথায়?" ভক্তগণ বলিতেছেন, "ঐ যে তোমার আগে।" প্রভু বলিলেন, "ইনি কখনো ভারতী গোসাঞি হইতে পারেন না। ভারতী গোসাঞি কেন চর্মাম্বর পরিধান করিবেন? কৃষ্ণ-ভজনে বাহ্য প্রতারণা নাই।" এই কথা শুনিয়া ভারতী তাড়াতাড়ি চর্মাম্বর ত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করিলেন। যেরূপ প্রভু ভারতী গোসাঞির চর্মাম্বররূপ বাহ্য-প্রতারণা ঘুচাইলেন, সেইরূপ ছোট হরিদাসের বাহ্য-প্রতারণা স্বরূপ যে মলিন-দেহ তাহা ঘুচাইলেন, দিব্য-দেহ দিলেন।

ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছি। হরিদাস দেহত্যাগ মাত্রই দিব্য পবিত্র ও চিন্ময় দেহ পাইলেন; পাইয়া, অমনি প্রভুর নিকটে আসিলেন এবং পূর্বের ন্যায় প্রভুর পার্ষদ হইলেন, হইয়া তাঁহাকে কীর্তন শুনাইতে লাগিলেন।

হরিদাস প্রভুকে দিব্যদেহে কীর্তন শুনাইতেন, আর উহা ভক্তগণ পর্য্যন্ত শুনিতেন। যথা চরিতামৃতে—"হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে।" "মনুষ্য না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে।" "আকারে না দেখি মাত্র শুনি তার গান।"

ফল কথা, হরিদাস দেহত্যাগ করিয়াছেন, কি কোথা গিয়াছেন, তাহা কেহ জানিতেন না। হঠাৎ ভক্তগণ অন্তরীক্ষে গীত শুনিতে পাইলেন। স্বর শুনিয়া বুঝিলেন, হরিদাস গাহিতেছেন। কেহ তাঁহাকে দেখিতে পান না, কেবল তাঁহার কণ্ঠ-সঙ্গীত শুনিতে পান। সুতরাং প্রভু যেরূপ হরিদাসকে ভক্তগণ-সমক্ষে দণ্ড করিলেন, আবার তাঁহাদিগকে দেখাইলেন যে, তিনি তাঁহাকে মার্জনা করিয়া আবার কৃপাপাত্র করিয়াছেন, আর নিজের গায়করূপে-মহাপদ দিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছিলেন,—"ছোট হরিদাস আপনার কর্ম-ফল ভোগ করিতেছে।"

প্রভু তো ছোট-হরিদাসকে দণ্ড করিলেন। এখন, স্বয়ং প্রভুকে দামোদর পণ্ডিত যে দণ্ড করিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। ইহারা পঞ্চ ভ্রাতা সকলেই উদাসীন। তাহার মধ্যে দামোদর ও শঙ্করকে আমরা ভালরূপে জানি। শঙ্কর, প্রভুর শেষ লীলায়, তাঁহার পদদ্বয় হৃদয়ে ধরিয়া নিদ্রা যাইতেন। দামোদর প্রভুর অতি নিজ-জন; এমন কি, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অভিভাবক। আবার জীব দামোদরের নিকট যে ঋণে আবদ্ধ তাহা অপরিশোধনীয়। মুরারির কড়চা, (যাহার দ্বারা প্রধানত আমরা প্রভুর লীলা জানিতে পারি) দামোদরের লেখা। মুরারি ঘটনাগুলি বলেন, আর দামোদর উহা শ্লোকবদ্ধ করিয়া লেখেন। তাহার এক প্রধানগুণ যে, তিনি স্পষ্টবাদী। প্রভুকে পর্য্যন্ত স্পষ্ট-কথা বলিতে ছাড়িতেন না। একটি উড়িয়া ব্রাহ্মণশিশু প্রভুর নিকট আইসে, তাহার স্বভাব বড় মধুর। প্রভুর স্বভাব চিরদিন বালকের ন্যায়, কাজেই তিনি বালকের সঙ্গ বড় ভালবাসেন। সে আসিলে তাহার সঙ্গে দুই একটি মধুর কথা বলেন। বালক প্রভুর প্রীতিবাক্য পাইয়া তাঁহার প্রতি এরূপ অনুরক্ত হয় যে, অবকাশ পাইলেই তাঁহার নিকট দৌড়াইয়া আসে। কিন্তু দামোদরের ইহা ভাল লাগে না। কারণ বালকটি পিতৃহীন, ও তাহার মাতা অল্পবয়স্কা। দামোদর চুপে-চুপে চোখ পাকাইয়া বালকটিকে বলেন, তুই এখানে প্রত্যহ আসিস্ কেন? আর আসিস্ না।" কিন্তু সে বালক তাহা শুনিবে কেন? প্রভুর মাধুর্য্য ও মিষ্টিকথা তাহাকে আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ প্রীতি করেন যে পিতা, তাহা তাহার নাই। কাজেই দামোদরের কথা না শুনিয়া সে আসিতে লাগিল। দামোদরের অন্তরে এইজন্য মহাকষ্ট, কিন্তু প্রকাশ করিয়া কিছু বলিতে পারেন না। তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন বালক উঠিয়া গেলেই প্রভুকে বলিতেছেন, "গোসাঞি! এই অবধি সমস্ত পুরুষোত্তমে তোমার যশ প্রচার হইবে।" প্রভু দেখেন যে, দামোদর রাগে গরগর। ইহা দেখিয়া সরল-প্রভু বলিতেছেন, "কিহে দামোদর, তুমি রোষ করিয়াছ বোধ হয়। আমার অপরাধ কি?"

তখন দামোদর বলিতেছেন, "তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমার আবার বিধি নিষেধ কি? তবে জগৎ বড় মুখর। এই যে বালকটি উঠিয়া গেল, উহার চরিত্র বড় মধুর। উহাকে যে তুমি কৃপা কর ইহাতে তোমার দোষ নাই। কিন্তু বালকের একটি মহৎ দোষ আছে, যেহেতু তাহার মাতা বিধবা, যুবতী ও সুন্দরী। আর তোমার একটি দোষ যে, তুমি যুবা ও পরম সুন্দর। এরূপ কার্য্য করিতে নাই, যাহাতে লোকে কাণাকাণি করে।"

প্রভু এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, আর মনে মনে আপনার অপরাধ মানিয়া লইলেন। তাহার কিছুকাল পরে, প্রভু দামোদরকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দামোদর! তোমার ন্যায় নিরপেক্ষ সুহৃদ আমার আর নাই। আমার মাতাকে রক্ষা করার তুমিই উপযুক্ত পাত্র। তুমি নবদ্বীপে যাও, যাইয়া মাতার নিকটে থাকিও, থাকিয়া আমার কথা তাঁহাকে বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিও।"

শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দুইজনে প্রভুর বাটিতে থাকেন। তাঁহাদের রক্ষাকর্তা বংশীবদন ঠাকুর ও ভৃত্য ঈশান। প্রভুর ইচ্ছা যে, আর একজন লোক এরূপ থাকেন যিনি তাঁহার সংবাদ

বাড়িতে ও বাড়ির সংবাদ তাঁহার নিকট দিতে পারেন। তখন সাব্যস্ত হইল যে, দামোদর শ্রীনবদ্বীপে প্রভুর বাড়ি যাইয়া থাকিবেন। যখন ভক্তগণ রথ উপলক্ষে নীলাচলে আসিবেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে আসিবেন। আর যখন তাঁহারা দেশে ফিরিবেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন। যাইবার সময় দামোদরের সহিত প্রভুর জননীর নিমিত্ত প্রসাদ পাঠাইলেন, ও আরও নানা কথা বলিয়া দিলেন। কয়েক মাস পরে আবার যখন দামোদর নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন, তখন শচীমাতা প্রভুর নিমিত্ত নানা সামগ্রী পাঠাইলেন, আর কত কথা বলিয়া দিলেন। এইরূপে দামোদর দ্বারা প্রভু তাঁহার জননী ও ঘরণীর সহিত সম্পর্ক রাখিতেন। যখন দামোদর আসিতেন, তখন শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া উভয়ই নিমাইয়ের আগমনের সুখ অনুভব করিতেন। তাঁহাদের অর্থ-কড়ির প্রয়োজন ছিল না, বহুতর ভক্ত তাহা যথেষ্ট পরিমাণে যোগাইতেন। প্রভু পাঠাইতেন—প্রসাদ, প্রসাদী-বস্ত্র ও দেবীর নিমিত্ত সেই রাজদত্ত বহুমূল্য শাড়ী। দামোদর সেই সমুদয় উপঢৌকন লইযা আসিতেন, শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ইহার প্রত্যেক বস্তুতে প্রিয়জনের মিলন-সুখ পাইতেন। শচী প্রায় প্রত্যহ দামোদরকে লইয়া বসিয়া নিমাইয়ের কথা শুনিতেন, আর শ্রীমতীও আড়ালে থাকিয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। এইরূপে নিমাইয়ের কথায় তাঁহাদের দিবানিশি সুখে যাইত। আবার দামোদর নীলাচলে ফিরিয়া গেলে প্রভু তাঁহাকে লইয়া নিভৃতে বসিয়া বাড়ীর সমুদয় কথা শুনিতেন। শ্রীভগবানের নরলীলার মধ্যে সাংসারিক লীলা সর্বাপেক্ষা মনোহর। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ পুত্রগণ লইয়া বিব্রত, সকলে একসঙ্গে তাঁহার কোলে উঠিতে চাইতেছে। কেহ কান্দিতেছে, আর শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছেন; কাহাকেও কোলে লইয়া বেড়াইতেছেন, বা কোলে ঘুম পাড়াইতেছেন। ইহা স্মরণ করিলে কাহার না বিস্ময় ও আনন্দ হয়? আমাদের প্রভুর স্ত্রী ও জননীর সহিত গোষ্ঠী করা, ইহাও সেইরূপ তাঁহার ভক্তগণের বড় সুখকর।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রভুর লীলায় ছয়জন গোস্বামী। তাঁহারা বৃন্দাবনে বাস করেন। ইহাদের মধ্যে সনাতন ও তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব,—এই তিন-জনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। আর একজন কিরূপে গোস্বামী হইলেন, তাহা শুনুন। রঘুনাথ দাসের পিতা বারলক্ষের অধিকারী, আম্বুয়া পরগণায় কৃষ্ণপুর গ্রামে* তাঁহার বাস। তিনি বড় জমিদার, নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক। তাঁহার পুত্র রঘুনাথের যৌবনকাল উপস্থিত না হইতেই, প্রভুর অবতারের কথা শুনিয়া বৈরাগ্যের উদয় হয়। পিতামাতা অনেক যত্ন করিলেন, পুত্রকে অতি সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই রঘুনাথের হৃদয় বিষয়ে মুগ্ধ হইল না। শেষে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। চারিদিকে প্রহরী, পলাইবার যো নাই। তবুও রঘুনাথ সুযোগ পাইয়া বারেবারে পলায়ন করেন, কিন্তু ধরা পড়েন! পরিশেষে একবার আর ধরা পড়িলেন না। প্রথম দিবসে ১৫ ক্রোশ হাঁটিয়া এক গোয়ালার বাথানে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে ক্ষুধার্ত দেখিয়া গোয়ালা দুগ্ধ পান করিতে দিল। রঘুনাথ আবার চলিলেন। পাছে ধরা পড়েন বলিয়া রাজপথ ত্যাগ করিয়া একরূপ অনাহারে অরণ্য-পথে দৌড়াইতেছেন। বড় মানুষের ছেলে, পদতল শিরীষ-কুসুমের ন্যায় কোমল, হাঁটিতে পারেন না, তবু ভয়ে-ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ১৮ দিনের পথ ১২ দিনে আসিয়া উড়িষ্যাদেশে পৌঁছিলেন। পথে কেবল তিন দিন আহার জুটিয়াছিল। প্রভু বসিয়া আছেন, এমন সময় রঘুনাথ যাইয়া দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। মুকুন্দ সেখানে ছিলেন, তিনি প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু, ঐ দেখুন রঘুনাথ আপনাকে প্রণাম করিতেছে।' রঘুনাথ বড় মানুষের ছেলে, তাঁহাকে সকলে চিনিতেন।

* এই কৃষ্ণপুর বর্তমান হুগলীর নিকটবর্তী।

ঠাকুর, রঘুনাথকে বড় কৃপা করিলেন, কারণ সেই যুবককে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। সেই যুবক আলিঙ্গন পাইবাব উপযুক্ত বটে। যে ব্যক্তি প্রভুর নিমিত্ত পিতা, মাতা, স্ত্রী, অতুল ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি জগতের যত সুখ ত্যাগ করিল, সে অবশ্য কৃপাপাত্র হইবার দাবী রাখে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে যে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আমার অনুগত হইয়াছ, অতএব আমি তোমাদের নিকট চিরঋণী। রঘুনাথকে প্রভুর কৃপা দেখিয়া ভক্তেরাও তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "কৃষ্ণ কৃপাময়, তোমাকে এতদিনে বিষয় হইতে উদ্ধার করিলেন। তুমি খুব ভাগ্যবান।" প্রভু দেখিলেন যে, সেই বড়মানুষের ছেলে অনাহারে অনিদ্রায়, পরিশ্রমে অস্থিচর্মসার হইয়াছে। তখন কৃপার্ত হইয়া স্বরূপকে বলিতেছেন, স্বরূপ! আমার এখানে পূর্বে দুই রঘু ছিলেন এখন তিন রঘু হইলেন। এই রঘুকে তোমাকে দিলাম, তুমি ইহাকে গ্রহণ কর। আমি এই অবধি এই রঘুকে স্বরূপের রঘু বলিয়া জানিব।" ইহা বলিয়া প্রভু রঘুনাথের হাত ধরিয়া স্বরূপের হাতে দিলেন, আর অমনি রঘু স্বরূপের চরণে পড়িলেন। তখন স্বরূপ "তোমার যে আজ্ঞা" বলিয়া রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাৎ করিলেন। প্রভু, রঘুকে আবার বলিলেন, "তুমি শীঘ্র যাও, স্নান করিয়া শ্রীমুখ দর্শন করিয়া এস,—গোবিন্দ তোমাকে প্রসাদ দিবে।" রঘুনাথ স্নান করিয়া আসিলেন, এবং প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র পাইলেন। এখানে প্রিয়দাসের "ভক্তমাল" গ্রন্থ হইতে রঘুনাথের সম্বন্ধে একটি কাহিনী বলিব। উপবাসে ও পথশ্রমে রঘুনাথের জ্বর হইল। অষ্টাহ লঙ্ঘন করিয়া জ্বর ত্যাগ হইলে ক্ষুধা হইয়াছে। জ্বরান্তে যেরূপ রোগীর হইয়া থাকে, রঘুনাথের তাহাই হইয়াাছে,—একটু লোভও হইয়াছে। নানারূপ আহারীয় বস্তুর কথা মনে হইতেছে। কিন্তু প্রভুর প্রসাদ ব্যতীত মনে মনেও কিছু জিহ্বাগ্রে দিতে পারেন না। তাই সেই গভীর রজনীতে মনে মনে প্রভুকে ভুঞ্জাইতে লাগিলেন। মনে মনে অতি সূক্ষ্ম সুগন্ধ চাউল সংগ্রহ করিলেন, আর মনে মনে চর্বচোষ্য-লেহ্য-পেয় বিবিধ আহারীয় প্রস্তুত করিয়া, মনে মনে আসন পাতিয়া প্রভুকে বসাইয়া, আকণ্ঠ পুরিয়া খাওয়াইলেন। ইহা এক প্রকার সাধনা। পরে আপনিও প্রসাদ পাইলেন! পরদিন মধ্যাহ্নে ভিক্ষার সময় হইলে প্রভু স্বরূপকে বলিতেছেন, "আমার আহারে রুচি নাই। রঘুনাথ অসময়ে আমাকে এরূপ গুরুতর আহার করাইয়াছে যে, আমি এখন আহার করিতে পারিব না।" এ কথার তাৎপর্য্য স্বরূপ অবশ্য বুঝিলেন না, পরে রঘুনাথকে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি নাকি প্রভুকে অসময়ে বড় ভোগ দিয়াছ? প্রভু বলিতেছেন, তাঁহার অজীর্ণ হইয়াছে।" রঘুনাথ তো অবাক্! তখন তিনি সমুদয় কথা খুলিয়া বলিলেন।

এই রঘুনাথের কথা কিছু বলিব, কারণ ইঁহার দ্বারা প্রভু অনেক কার্য্য সাধন করেন। প্রথমতঃ ইঁহার দ্বারা দেখাইলেন যে, মনুষ্য কতদূর বৈরাগ্য করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণও ভক্তিবলে আচার্য্য হইতে পারেন। এখন রঘুনাথের বৈরাগ্য কিরূপ শ্রবণ করুন। ১২ লক্ষের অধিকারী হইয়া তিনি নীলাচলে প্রভুর অতিথি। পাঁচ দিন প্রভুর প্রসাদ পাইবার পরে, উহা ছাড়িয়া দিলেন। তখন সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া হরেকৃষ্ণ-নাম জপ করেন। নিশিযোগে যখন জগন্নাথের দ্বার বন্ধ হয়, তখন যদি দ্বারে কোন বৈষ্ণব উপবাসী থাকেন তবে বিষয়ী লোক, কি জগন্নাথের সেবকগণ, তাঁহাকে আহার দেন। এইরূপে রঘুনাথ দ্বারে যাহা পান তাহা দ্বারা জীবনধারণ করেন। কিছু দিন পরে উহাও ছাড়িয়া দিলেন। প্রভু রঘুনাথের সমুদয় কার্য্য শ্রবণ করিতেছেন। যখন শুনিলেন যে, রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িয়াছেন, তখন প্রভু একটি শ্লোক পড়িলেন, যথা, "অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি" ইত্যাদি; বলিলেন, "রঘু, বেশ করিয়াছ। সিংহদ্বারে আহারের নিমিত্ত দাঁড়াইয়া থাকা বেশ্যার আচার।" তাহার পরে, রঘুনাথ জীবন-রক্ষার নিমিত্ত আর এক উপায় করিলেন। দোকানী-

দিগের প্রসাদান্ন যাহা বিক্রয় না হয়, তাহা পচিয়া গেলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। রঘুনাথ সেই সমস্ত পরিত্যক্ত অন্ন সংগ্রহ করেন, করিয়া জল দ্বারা ধৌত করেন। এইরূপ মাজিতে মাজিতে মধ্যে যেটুকু মাজ-অন্ন পাওয়া যায় তাহাই রাত্রে লবণ দিয়া ভোজন করেন। প্রভু এই কথা শুনিলেন; শুনিয়া সেই অন্ন দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া, উহার এক গ্রাস মুখে দিলেন। আর একগ্রাস লইতে গেলে স্বরূপ হাত ধরিলেন; বলিলেন, "আমাদের সমক্ষে তুমি ইহা বদনে দাও, এ তোমার বড় অন্যায়।" প্রভু স্বরূপের কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ, তুমি প্রত্যহ এরূপ উপাদেয় বস্তু খাও! এমন সুস্বাদু প্রসাদ আমি কখনো খাই নাই।"

রঘুনাথের পিতামাতা পুত্রের সংবাদ পাইয়া মুদ্রার সহিত নীলাচলে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু রঘুনাথ উহা লইলেন না। অবশ্য গৃহেও প্রত্যাবর্তন করিলেন না, সেইরূপ ঘোর বৈরাগ্য করিতে লাগিলেন ও প্রভুর সহিত অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে যাপন করিলেন। প্রভুর অপ্রকটে রঘুনাথ শূন্য নীলাচলে তিষ্ঠাতে না পারিয়া ছুটিয়া বৃন্দাবনে পলায়ন করিলেন। মনের ভাব ভৃগুপাত করিয়া অর্থাৎ পর্বত হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় তাহা ঘটিল না। কিছুকাল পরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ আসিয়া তাঁহার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে মিলিত হইলেন। রঘুনাথের নিকট প্রভুর লীলকথা শুনিয়া তিনি অন্তলীলার অনেকাংশ লিখেন। এই রঘুনাথের প্রতি-মুহূর্তের সঙ্গী কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ

"অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাথরের রেখা।।
সাড়ে সাত প্রহর যায় শ্রবণে কীর্তনে।
সবে চারিদণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে।।
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পন্দন।।"

এই বৃন্দাবনে রঘুনাথ দাস বহুকাল জীবিত থাকেন। প্রভুর কার্য্য করিবার নিমিত্ত যত ভক্ত তাঁহা কর্তৃক নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই দীর্ঘকাল জগতে বিচরণ করেন। কেহ নব্বই, কেহ একশত, কেহ-বা একশত পঁচিশ বৎসর জীবিত থাকেন। অদ্বৈতপ্রভু এই শেষোক্ত বয়সে ধরাধাম ত্যাগ করেন।

রঘুনাথ ক্রমে অতি বৃদ্ধ হইলেন, চক্ষু কর্ণ গেল, এদিকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিরহে এক প্রকার পাগল হইলেন; চলিতে পারেন না, তবু হামাগুড়ি দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণকে তল্লাস করিয়া বেড়ান। কখনো যমুনাপুলিনে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে "রাধে, রাধে" বলিয়া ডাকেন, কখনো নিকুঞ্জের মধ্যস্থানে তাঁহারা আছেন ভাবিয়া সেখানে নয়ন মুদিয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহার শেষজীবন দর্শন করিয়া অনেক ভক্তও উহা বর্ণন করিয়াছেন। দাস গোস্বামীর উক্তি এই গীত সকলে অবগত আছেন, যথা—"রাধে রাধে, তুমি কোথা লুকাইয়া আছ? গোসাঞি, একবার ডাকে যমুনা-তটে, আবার ডাকে বংশীবটে, রাধে রাধে ইত্যাদি।"

কেহ হয়ত বলিতে পারেন, দাস গোস্বামীর এই যে এত কষ্টের জীবন ইহাতে সুখ কোথায়? রাধাকৃষ্ণ ভজনের কি এই ফল? তাহার উত্তর এই যে, তিনি বারলক্ষের অধিকারী, তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ও স্ত্রী বর্তমান। কৈ তিনি তো এই কষ্টের জীবন ত্যাগ করিয়া বাটী গেলেন না? কথা কি, কৃষ্ণবিরহে যে সুখ তাহা অন্তরে, বাহিরের লোকে তাহা কিরূপে বুঝিবে?

দাস গোস্বামী যখন নীলাচলে কেবল নূতন আসিয়াছেন, তখন এক দিন তিনি সাহস

করিয়া প্রভুর নিকটে একটি নিবেদন করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'প্রভু, আমি কি করিব? আমাকে একটু উপদেশ দিতে কৃপা হয়।'' প্রভু বলিলেন, "আমি তোমাকে স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। আমি যত না জানি তিনি তাহা জানেন। তবে যদি আমার কাছে কিছু জানিতে চাও, তবে বলিতেছি। তুমি বৈরাগ্য করিয়াছ, সুতরাং শারীরিক সুখ ত্যাগ কর। গ্রাম্যকথা বলিও না, বা শুনিও না। দীন-ভাবে মানসে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনা কর। এখনকার লোকে অনেকে বিগ্রহ পূজার বিরোধী। তাঁহারা বলেন, 'পুতুল পূজা কেন করিব। মনে মনেই পূজা করিব।' কিন্তু এই যে মহাপুরুষ দাস গোস্বামী 'মানসে" শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন করিতে প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইলেন, তবু তিনি তাহা পারিলেন না। কারণ সে ভজনে তখনও তাঁহার অধিকার হয় নাই, কাজেই প্রভুর আজ্ঞা সত্ত্বেও বিগ্রহ সেবা আরম্ভ করিলেন। অগ্রে বিগ্রহ সেবা করিয়া, ক্রমে মানসে সেবা করিতে শিখিলেন, শেষে মানস-সেবাও ছাড়িয়া দিয়া বিরহে ব্যাকুল হইয়া বৃন্দারণ্যে রাধাকৃষ্ণকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন রাধাকৃষ্ণ তাঁহার সহিত লুকোচুরি খেলা আরম্ভ করিলেন!

রাঘুনাথের ন্যায়, ভগবান আচার্য্যও বিষয়ত্যাগী। তাঁহার পিতা শতানন্দ খান্ ধনবান লোক। কিন্তু শ্রীভগবান আচার্য্য সেই অতুল বিষয় ত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণে রহিলেন। প্রভুর কাছে থাকেন, প্রভুকে না দেখিলে মরেন। তাঁহার কনিষ্ঠ গোপাল কাশীতে বেদ পাঠ করিয়া মহাপণ্ডিত হইলেন। তিনি আপন বিদ্যাবুদ্ধি দেখাইবার নিমিত্ত নীলাচলে দাদার নিকটে আসিলেন। তখন প্রভুর সঙ্গীরা সকলেই যেমন জগৎ-বিজয়ী ভক্ত, তেমনি জগৎ-বিজয়ী পণ্ডিত। কেহ পণ্ডিত হইলে প্রভুর সভায় যাইয়া তাঁহার বিদ্যার পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু প্রভু বাজে-কথা শুনেন না,—পাণ্ডিত্যে তাঁহার মন নাই। যদি ভক্তিবিষয়ক কোন প্রস্তাব হয়, তবে নিতান্ত অনুরোধে হয়তো তাহা শ্রবণ করেন। কিন্তু সেও অগ্রে নহে। যিনি যে কোন পুস্তকে প্রণয়ন করেন, কি শ্লোক লিখেন, তাহা স্বভাবতঃ প্রভুকে শুনাইতে ইচ্ছা হয়। আর প্রভুর যদি এরূপ লোকের গ্রন্থ কি শ্লোক শুনিতে হয়, তবে আর তাঁহার দিবা রাত্রি অবকাশ থাকে না। তাই প্রভুর নিকটে কোন গ্রন্থকার কি কবি অগ্রে যাইতে পারেন না। যদি কেহ প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র থাকেন, তবে তিনি অগ্রে স্বরূপ গোস্বামীর কৃপাপাত্র হয়েন। স্বরূপ যদি দেখেন যে পুস্তক কি শ্লোকে প্রভুকে শুনাইবার উপযুক্ত হইয়াছে, তবে প্রভুর নিকট তাহাকে লইয়া যান। গোপাল বেদান্ত পড়িয়া তাহার বিদ্যা দেখাইতে নীলাচলে গিয়াছেন, কিন্তু শ্রোতা পান না। ভগবান গোপালকে প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন। প্রভু, ভগবানের সম্বন্ধে তাহাকে বিস্তর আদর করিলেন। তাহার পরে ভগবান গোপালকে স্বরূপের কাছে লইয়া গেলেন। স্বরূপের সহিত তাঁহার অতি সখ্যভাব। স্বরূপকে বলিতেছেন, "এসো ভাই, গোপাল পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার নিকট বেদান্তভাষা শুনা যাউক।" তখন,

> "প্রেম-ক্রোধ করি স্বরূপ বলয়ে বচন।।
> বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
> মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে।।
> বৈষ্ণব হইয়ে যেবা শারীরিক-ভাষ্য শুনে।
> সেব্য সেবক ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর করি মানে।।"

স্বরূপ বলিলেন, "ভাই, তোমার একি কুবুদ্ধি হইল? আমরা এখন কি তাই শুনিব যে, "আমিও যে, কৃষ্ণও সে?" ভগবান আচার্য্য বলিলেন, "আমাদের বেদান্তে করিবে কি? আমার কৃষ্ণের দাস। আমাদের কৃষ্ণনিষ্ঠ-চিত্ত, বেদান্ত কি আমাদের মন ফিরাইতে পারে?" স্বরূপ বলিলেন, "তবুও বেদান্তে যাহা শ্রবণ কর তাহাতে ভক্তের হৃদয় ফাটে। সমুদয় মায়া,

ঈশ্বর কেহ স্বতন্ত্র নাই, মুক্তিই মনুষ্যের চরম ফল, ইত্যাদি কথা শুনিতে পারিব কিরূপে?" অতএব গোপালের বেদান্ত পড়াইয়া শুনান হইল না। তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

জ্যৈষ্ঠ মাসে ভক্তগণ নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলচলে আসিয়াছেন, এমন সময় আউলির বল্লভভট্টে আসিয়া উপস্থিত। আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, ইনি প্রভুকে প্রয়াগ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। ইনি একজন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ও অন্যান্য গ্রন্থও লিখিয়াছেন। অতি স্বাধীন-প্রকৃতি; এমন কি, শ্রীধরস্বামীর টীকাকে দুষিতে তাঁহার কোনরূপ আশঙ্কা হয় না। প্রভুকে প্রথম-দর্শনে চমকিত হয়েন, কিছুকাল সে চমক থাকে, এখন তাহার অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রভুকে প্রয়াগে দর্শন করিয়া বুঝিলেন—ইনিই শ্রীকৃষ্ণ। তখন হৃদয়ে যে ঈর্ষার উদয় হইয়াছিল তাহা লোপ পাইল। প্রভুকে ভট্ট-ঠাকুর ঘরে লইয়া গেলেন। বল্লভ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের একটি নিয়ম আছে যে, ঠাকুর-ঘরে যে সকল দ্রব্য থাকে তাহা ঠাকুর-সেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে প্রযুক্ত হয় না, হইলে উচ্ছিষ্ট হইয়া যায়,—সুতরাং ঠাকুরসেবার অযোগ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু তখন প্রভুতে ভট্টের ঈশ্বরবুদ্ধি হইয়াছিল, তাই তিনি সেবার দ্রব্যাদি দ্বারাই প্রভুর ভিক্ষা সম্পন্ন করিলেন। প্রভু নীলাচলে আসিলে ক্রমে ভট্টের পূর্ব্বকার চমক ভাঙ্গিয়া গেল,—ঈর্ষার সৃষ্টি হইল। এখন নীলাচলে প্রভুর সহিত এক প্রকার পাল্লা দিতে আসিয়াছেন। "চৈতন্য" একজন বৈষ্ণব ধর্ম-প্রচারক, তিনিও তাহাই। অধিকন্তু তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, "চৈতন্য" তাহা করেন নাই। প্রভুকে মনে মনে খুব শ্রদ্ধা করেন, তবে আপনাকেও কম শ্রদ্ধা করেন না। তিনি সংসারী, আর প্রভু সন্ন্যাসী, কাজেই তাঁহার প্রভুকে প্রণাম করিতে হইল। প্রভু, বল্লভভট্টকে খুব আদর করিলেন। তখন ভট্ট বক্তৃতা করিতে লাগিলেন; বলিতেছেন, "তোমাকে দর্শন করিবার বড় সাধ ছিল, অদ্য জগন্নাথ তাহা পূর্ণ করিলেন। তোমার দর্শন বড় ভাগ্যের কথা। তোমার স্মরণে লোক পবিত্র হয় । এমন কি, তুমি যেন সাক্ষাৎ ভগবান, তোমার শক্তিও সেইরূপ প্রবল। জগৎকে তুমি কৃষ্ণনাম লওয়াইয়াছ, প্রেমে ভাসাইয়াছ। এ সমুদয় কি কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত হইতে পারে?" এই যে ভট্ট বক্তৃতা করিতেছেন, ইহার মধ্যে একটি কথাও অন্যায় নয়, কিন্তু তবু অক্ষরে অক্ষরে বুঝা যায় যে, তিনি বক্তৃতা-মাত্র করিতেছেন, আর তাঁহার হৃদয় গর্ব্বে পরিপূর্ণ। সে যাহাহউক, প্রভু উত্তরে বলিলেন, "আপনি বলেন কি? আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আমি ভক্তির কি বুঝি? তবে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে সৎসঙ্গ দিয়াছেন, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এক সঙ্গ অদ্বৈত আচার্য্য। তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সর্বশাস্ত্রে কেবল কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করেন। আর একজন শ্রীনিত্যানন্দ, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত। আর একজন সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তিনি ন্যায় বেদান্ত প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ। রস কাহাকে বলে, তাহা শ্রীরামানন্দ রায় আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আর একজন স্বরূপ দামোদর, তিনি মূর্ত্তিমান ব্রজরস। আর একজন শ্রীহরিদাস, যাঁহার নিকট নামের মহিমা শিখিলাম। তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম লয়েন।

ভট্ট বলিলেন, "এ সমুদয় ভক্তগণ কোথায়? আমি তাঁহাদিগকে দেখিতে বাসনা করি।" প্রভু বলিলেন, "তাঁহাদিগকে এইখানেই পাইবানে। তাঁহারা রথোপলক্ষে এখানে আসিয়াছেন।" ভট্ট মহাপণ্ডিত লোক, নিজ দেশে তাঁহার সমকক্ষ লোক পান নাই, তাই নীলাচলে আপনার পাণ্ডিত্য দেখাইতে আসিয়াছেন। এই যে নীলাচলে ভক্তির্ব সাগরে পড়িয়া গিয়াছেন, ইহাতেও তাঁহাকে ভক্তি স্পর্শ করিতে পারে নাই। হে দম্ভ! তোমাকে বলিহারি যাই! দম্ভ এইরূপ বিষবৎ

সামগ্রী! মহাপ্রভুকে দর্শন করিলেন, তাঁহার সহিত সঙ্গ করিলেন, বথাগ্রে তাঁহার নৃত্য দেখিলেন, ইহাতেও মন দ্রব্য হইল না। কেবল তর্ক করিয়া করিবেন, তর্ক করিয়া জয়লাভ করিবেন,---এই মনের একমাত্র সাধ। প্রত্যহ প্রভুর সভাতে আগমন করেন; সেখানে শ্রীঅদ্বৈত, সার্বভৌম, স্বরূপ প্রভৃতি মহাপণ্ডিত পার্ষদগণও থাকেন। ভট্ট আসিয়াই নানা তর্ক উত্থাপন করেন। ভট্ট নানা বাজে-কথা বলিয়া প্রভুকে বিরক্ত করেন দেখিয়া, প্রভুকে কোন কথা কহিতে অবকাশ না দিয়া, শ্রীঅদ্বৈত আপনি তাঁহার কথার উত্তর দিতেন কিন্তু ক্রমে তিনিও আর পারেন না। কারণ ভট্টের যে সমুদয় কথাবার্তা, সে ফল্গু, অর্থাৎ রসশূন্য কি পদার্থশূন্য। তাঁহার একটি প্রশ্ন শুনিলেই বুঝিলেন যে, তাঁহার কথা কিরূপ অসার। বলিতেছেন. "আমি দেখি, তোমরা সকলে কৃষ্ণনাম লও, আবার কৃষ্ণকে প্রাণপতি বল, ইহা কিরূপে হয়? যে পতিব্রতা হয় তাহার আর তো পতির নাম লইতে নাই?" এখন যাহারা দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে, কি বিরহে কি হরিভজনে মুগ্ধ, তাঁহাদের নিকট এ সব কথা ভাল লাগিবে কেন?

ভট্ট বালগোপাল উপাসক, আর প্রভুর গণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসক। অর্থাৎ বল্লভ বাৎসল্য রসে, আর প্রভুর গণ মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করেন। তাই, বল্লভ মধুর রসের ভজনাকে দুষিবার নিমিত্ত ছল উঠাইলেন যে, "তোমরা কৃষ্ণকে প্রাণনাথ বল, আবার তাঁহার নাম লও কিরূপে?" যদি সেখানে ঐরূপ তর্কিক কেহ থাকিত, তবে সেও বলিতে পারিত, "আচ্ছা তুমি তো শ্রীকৃষ্ণকে আপনার পুত্র বলিয়া ভজনা কর, তবে তাঁহাকে প্রণাম কর কিরূপে?" ভট্টের জ্বালায় প্রভু ও প্রভুর গণ একেবারে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া গেলেন।

একদিন বল্লভ বলিতেছেন, "শ্রীধর-স্বামীর টীকায় অনেক দোষ আছে, আমি সে সমুদয় দেখাইয়া দিয়াছি।" কিন্তু প্রকৃত-কথা,—এই শ্রীধর স্বামীর নিমিত্ত জীবে শ্রীভাগবত জানিয়াছে। শ্রীধরস্বামী না হইলে শ্রীভাগবত কেহ বুঝিতে পারিত না। সেই শ্রীধরকে ভট্ট বলিতেছেন, "আমি স্বামীকে মানি না।" এখন ভট্ট নীলাচলে মাসাধিক বাস করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গ কেবল প্রভুর গণ লইয়া, আর কোথাও স্থান নাই; তাঁহার এই সকল তর্কে লোকে অস্থির হইয়া গিয়াছে। প্রভুর সভায় যাইয়া আস্ফালন করেন। প্রথমে শ্রীঅদ্বৈত কিছু কিছু উত্তর করিতেন, এখন তিনিও তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্রভু কখনও কিছু বলেন না, চুপ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি দেখিলনে যে, ভট্টের শাসন প্রয়োজন। তাই যখন ভট্ট বলিলেন, "আমি স্বামীকে মানি না" তখন প্রভু বলিলেন, "স্বামীকে যে না মানে, সে বেশ্যার মধ্যে গণ্য।" প্রভু রহস্য করিয়া বলিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে এ কথা ঘোর দণ্ডের স্বরূপ হইল। ভট্ট অপ্রতিভ হইয়া ঘরে গেলেন।

ভট্ট রজনীতে ভাবিতেছেন, "পূর্বে গোঁসাই আমার সহিত সস্নেহে ব্যবহার করিতেন। এখানে আসিলেও প্রথমে সেইরূপ ছিল। আমি নিমন্ত্রণ করিলে গ্রহণ করিতেন। এখন ক্রমে ক্রমে আমি সকলের অপ্রিয় হইয়াছি। সকলেই আমাকে দেখিলে দূরে যায়। প্রভুর সভায় আমার কথা কেহ গ্রাহ্যও করেন না। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোঁসাই আমাকে একটু কৃপা করেন দেখিয়া, প্রভু তাঁহাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার অর্থ কি? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার সুবুদ্ধি আসিল। তখন আবার ভাবিতেছেন, "আমি এখানে আসিলাম কেন? জয়লাভ করিতে? জয়লাভ করিয়া কি হইবে? এই যে বৈষ্ণবগণ এখানে দেখিলাম, ইঁহারা সকলেই আমা হইতে ভাল,—কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিতেছেন। অমি সে ধন হইতে বঞ্চিত, আমি বৃথা-জয়ের আশায় সে মহাধন পরিত্যাগ করিয়াছি। প্রভু আমাকে দণ্ড করেন, তাহার কারণ কেবল আমার অভিমান। এই অভিমান গেলেই তিনি অমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন।"

পরদিন প্রভাতে প্রভুর নিকটে যাইয়াই ভট্ট তাঁহার চরণ ধরিয়া পড়িলেন, আর সরল ভাবে সকল কথা বলিলেন;---বলিলেন, "প্রভু, বুঝিয়াছি তুমি আর পরমবন্ধু। তুমি আমার

গর্ব দেখিয়া, কৃপার্ত হইয়া, উহা হইতে আমাকে অব্যাহতি দিবার নিমিত্ত, আমাকে দণ্ড করিতেছ। পূর্বে এই দণ্ডে আমার ক্রোধ বোধ হইত। এখন বুঝিলাম যে, এ দণ্ড নয়,—তোমার মহাকৃপা।" প্রভু অমনি দ্রবীভূত হইয়া বলিলেন, "তোমার দুইটি গুণ আছে, তুমি পণ্ডিত, আর তুমি ভাগবত। যাহাদের এই দুই গুণ আছে, তাহাদের গর্ব থাকিতে পারে না। তুমি ঠিক বুঝিয়াছ,—গর্ব ত্যাগ কর তবেই কৃষ্ণ কৃপা করিবেন।"

ভট্ট তখন প্রভুর মুখ-পানে চাহিয়া দেখেন যে, তাঁহার সেই প্রণয়াকুল নয়ন স্নেহভরে তাঁহার পানে চাহিতেছে। তখন বুঝিলেন যে তাঁহার প্রতি প্রভুর আবার কৃপা হইয়াছে। তাই সাহস করিয়া বলিতেছেন, "প্রভু তুমি যে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ তাহার প্রমাণ-স্বরূপ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর, তাহা না হইলে আমি আর এখানে তিষ্ঠিতে পারিব না।" প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া স্বীকার করিলেন। ভট্ট তখনি মহাসমারোহ করিয়া প্রভুকে গণসহ নিমন্ত্রণ করিলেন,—নিমন্ত্রণে অনুপস্থিত রহিলেন কেবল শ্রীপণ্ডিত গদাধর গোঁসাঞি। পণ্ডিত গোঁসাঞির ন্যায় নিরীহ ভালমানুষ জগতে আর কেহ নাই, হইবারও নয়। যকন ভট্ট প্রভুর গণের অপ্রিয় হইলেন, তখন তিনি গদাধরের শরণ লইলেন। গদাধর নিষেধ করেন, কিন্তু ভট্ট শুনেন না। ভট্টের তখন মন ফিরিয়াছে। তিনি এ পর্য্যন্ত বালগোপাল উপাসনা করিয়া আসিতেছিলেন। এখন প্রভুর গণের প্রেম দেখিয়া মাধুর্য্য অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাই তিনি গদাধরের নিকট যুগল-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চাহিলেন। গদাধর বলিলেন, "আমার দ্বারা তাহা হইতে পারে না, কারণ আমি প্রভুর দাসানুদাস, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কিছু করিতে পারি না। প্রভুকে আমি ভয় করি না, তবে তুমি আমার এখানে আসিয়া থাক বলিয়া, তাঁহার গণ আমাকে এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছেন। তুমি প্রভুর শরণ লও, তবেই তোমার মঙ্গল।" সম্ভবতঃ গদাধরের উপদেশেই ভট্টের প্রথম জ্ঞানোদয় হয়। এই কথার পরে ভট্ট প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। যেদিন ভট্ট সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন, সে দিন গদাধর সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারেন নাই। প্রভু সভায় যাইয়া গদাধরকে না দেখিয়া স্বরূপ, জগদানন্দ ও গোবিন্দ—এই তিন জনকে তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। গদাধর মহাহর্ষে আসিতেছেন। পথে স্বরূপ তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার কোন অপরাধ নাই, তবে তুমি কেন প্রভুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে সব বলিলে না?" গদাধর বলিলেন, "প্রভুর সহিত শঠতা করা ভাল বোধ করি না। প্রভু অন্তর্যামী, আমি যদি নির্দোষ হই, তবে তিনি আমাকে আপনা আপনি কৃপা করিবেন।" তাহার পরে সভায় যাইয়া গদাধর রোদন করিতে করিতে প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন; তারপর বলিতেছেন, "তুমি আমার উপর আদপে ক্রোধ কর না, কিন্তু তোমার ক্রোধ দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা করে; তাই তোমাকে চালাইবার নিমিত্ত আমি তোমার উপর কপট ক্রোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু কোন মতে তোমার ক্রোধ জন্মাইতে পারিলাম না। কাজেই আমি তোমার নিকট বিক্রীত।"

ইহার কিছুদিন পরে, প্রভুর অনুমতি লইয়া গদাধরের নিকট ভট্ট যুগলভজনের মন্ত্র লইলেন। এখন ইহার রহস্য শ্রবণ করুন। ভট্ট নিজের দেশে অনেক শিষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বাল-গোপাল উপাসক। এদিকে তাঁহাদের গুরু সে পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া যুগল-ভজন আরম্ভ করিলেন। এই বাল-গোপাল উপাসকভক্তের গোষ্ঠী এখন ভারতবর্ষের অনেক স্থলে, এমন কি শ্রীবৃন্দাবনে পর্য্যন্ত, বড় প্রবল।

হরিদাস অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তবুও তাঁহার সাধনার আগ্রহ কমে নাই। প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম উচ্চৈঃস্বরে জপ করেন। মনে বিশ্বাস, এই হরিনাম যে শুনিবে, কি স্থাবর কি জঙ্গম, সকলেই উদ্ধার হইয়া যাইবে। বৈষ্ণব-শাস্ত্রবেত্তারা বলেন যে, হরিদাসের দ্বারা প্রভু

জীবের নিকট নামের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। কিন্তু হরিদাস জীবকে আর একটি প্রধান শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ দীনতী। হরিদাসের ন্যায় দীন ত্রিজগতে হয় নাই ও হইবে না। হরিদাসের দীনতা দেখিলে প্রভু বিকল হইতেন। হরিদাস কোথাও গমন করেন না, পাছে কোন সাধু মন্থান্তকে স্পর্শ করিয়া অপরাধী হয়েন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার স্পর্শ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত বাঞ্ছা করেন। হরিদাস প্রভুদত্ত কুটীরে দিবানিশি বাস করেন এবং জপ করেন। প্রভু প্রত্যহ সমুদ্র হইতে স্নান করিয়া প্রত্যাগমনকালে একবার হরিদাসকে দর্শন দিয়া যান। কখন-বা পার্ষদ্‌গণ সহ হরিদাসের কুটীরে যাইয়া ইষ্টগোষ্ঠী করেন। গোবিন্দ প্রত্যহ তাঁহাকে প্রসাদ দিয়া যান।

এক দিবস গোবিন্দ যাইয়া দেখেন যে, হরিদাস শয়ন করিয়া মন্দ মন্দ জপ করিতেছেন, উচ্চৈঃস্বরে জপিবার শক্তি নাই। গোবিন্দ বলিলেন, "উঠ, প্রসাদ গ্রহণ কর।" হরিদাস গাত্রোত্থান করিলেন, তারপর বলিতেছেন, "অদ্য আমি লঙ্ঘন করিব। যেহেতু আমার সংখ্যা-নাম-জপ এখনও হয় নাই।" আবার বলিতেছেন, "মহাপ্রসাদ উপেক্ষা করিতে নাই। সুতরাং কি করিব ভাবিতেছি।" ইহা বলিয়া মহাপ্রসাদকে বন্দনা করিয়া একটি অন্ন বদনে দিলেন। হরিদাসের এইরূপ অবস্থা শুনিয়া প্রভু পরদিবস তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। হরিদাস অমনি উঠিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাস, তোমার পীড়া কি?" হরিদাস বলিলেন, "আমার শারীরিক পীড়া কিছু নাই। তবে মন অসুস্থ, কারণ আমি আর সংখ্যা-নাম-জপ করিয়া উঠিতে পারি না।" প্রভু বলিলেন, "বৃদ্ধ হইয়াছে, এখন সাধনে এত আগ্রহ কর কেন? সংখ্যা কমাইয়া দাও। তুমি জগতে নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে আসিয়াছ, তোমার কৃপায় জীবে উহা বেশ জানিয়াছে। তোমার দেহ পবিত্র, এরূপ করিয়া শরীরকে আর দুঃখ দিও না।"

তখন হরিদাস অতি কাতরে ও করজোড়ে বলিতেছেন, "প্রভু ও সব কথা এখন থাকুক। আমাকে একটি বর দিতে হইবে। তুমি অবশ্য লীলাসম্বরণ করিবে বুঝিতেছি। সেটী আমাকে দেখিতে দিও না। দোহাই প্রভু, যাহাতে আমি শীঘ্র-শীঘ্র যাইতে পারি সেই অনুমতি কর।"

এই কথা শুনিয়া প্রভুর আঁখি ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "হরিদাস, তুমি বল কি! তুমি ছাড়িয়া গেলে আমি কাহাকে লইয়া এখানে থাকিব? কেন তুমি নির্দয় হইয়া তোমার সঙ্গ-সুখ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে চাও? তোমার ন্যায় ভক্ত ব্যতীত আমার আর কে আছে?

হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, আমাকে এ সব কথা বলে ভুলাইও না। কত কোটী মহান্-ব্যক্তি তোমার লীলার সহায় আছে। আমি ক্ষুদ্র-কীট মরিয়া গেলে তোমার অভাব হইবে, এরূপ অন্যায় কথা তুমি কেন বল? আমাকে ছেড়ে দাও প্রভু, আমি যাই।" ইহা বলিয়া রোদন করিতে করিতে হরিদাস প্রভুর পায়ে ধরিয়া পড়িলেন। আবার বলিতেছেন, "আমার স্পর্দ্ধার কথা শুন। আমি যাইব,—তোমার শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে রাখিয়া, তোমার চন্দ্রবদন দেখিতে-দেখিতে, আর তোমার নাম উচ্চারণ করিতে-করিতে। বল প্রভু, আমাকে এই বর দিবে?"

যেমন অভ্র-মেঘে পূর্ণচন্দ্র আবরণ করে, সেইরূপ দুঃখে প্রভুর শ্রীবদন অন্ধকার হইয়া গেল, উত্তর করিতে পারিলেন না;—অনেকক্ষণ মলিনবদনে ও অবনত-মস্তকে নীরব হইয়া রহিলেন। পরে ধীরে-ধীরে বলিলেন, "তুমি যাহা ইচ্ছা কর, কৃষ্ণ তাহাই পালন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই; তবে আমি তোমা-বিহনে কি-কষ্টে থাকিব তাহাই ভাবিতেছি।" ইহা বলিয়া বিমর্ষ-চিত্তে প্রভু উঠিয়া গেলেন।

পরদিবস প্রাতে প্রভু স্বগণ সহিত হরিদাসের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। বলিতেছেন,

"হরিদাস, সমাচার বল।" হরিদাস বলিতেছেন, "প্রভু, তোমার যে আজ্ঞা তাহাই হউক।" হরিদাস বুঝিয়াছেন যে, প্রভু তাঁহার প্রার্থিত বর প্রদান করিয়াছেন। ইহাই বলিতে-বলিতে হরিদাস কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া ধীরে ধীরে আঙ্গিনায় আসিয়া প্রভুর ও ভক্তগণের চরণে প্রণাম করিলেন। হরিদাস দুর্বল হইয়াছেন, দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। তখন প্রভু তাঁহাকে যত্ন করিয়া বসাইলেন, আর তাঁহাকে বেড়িয়া সকলে নাম-সংকীর্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাস মধ্যস্থলে রহিয়াছেন,—কেন, না মরিবার জন্য! ভক্তগণ নৃত্য করিয়া বিচরণ করিতেছেন, আর হরিদাস সুবিধামত তাঁহাদের পদধূলি লইয়া সর্বাঙ্গে মাখিতেছেন। এইরূপে হরিদাস পদধূলিতে ধূসরিত হইলেন। নৃত্য করিতেছেন স্বরূপ ও বক্রেশ্বর, আর গাইতেছেন কে, না স্বয়ং প্রভু, স্বরূপ, রামরায়, সার্বভৌম ইত্যাদি। পরে প্রভু কীর্তন রাখিয়া ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া হরিদাসের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। অদ্য বক্তা স্বয়ং প্রভু, আর বর্ণনীয় বিষয় হরিদাসের গুণ। ভক্তগণ হরিদাসের গুণ শ্রবণ করিতে-করিতে বিহ্বল হইয়া, তাঁহার চরণে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

হরিদাস তখন ধীরে-ধীরে সেখানে শয়ন করিলেন। তাঁহার মস্তক ও সর্বাঙ্গ ভক্ত-পদধূলায় ভূষিত। আর মুখে বলিতেছেন, "দয়াময় প্রভু! শ্রীগৌরাঙ্গ! এ দীনকে চরণে স্থান দিও।" পরে প্রভুকে তাঁহার নিকট বসাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তিনি বসিলেন। আর হরিদাস অমনি প্রভুর চরণ ধরিয়া আপনার হৃদয়ে স্থাপিত করিলেন। প্রভু আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। তিনিই না হরিদাসকে বর দিয়াছেন? তাহার পরে হরিদাস তাঁহার নয়নদ্বয় প্রভুর মুখচন্দ্রে অর্পিত করিয়া সুধাপান করিতে লাগিলেন। ইহাতে হইল কি, না তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া প্রেমধারা পড়িতে লাগিল। তখন হরিদাস, প্রভুর নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, আর, (যথা চৈতন্য-চরিতামৃত) "নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রামণ।"

দুই দিবস পূর্বে হরিদাসের সামান্য কিছু অসুখ হইয়াছিল, তাহার পরদিন তিনি প্রভুর নিকট বর প্রার্থনা করেন, আর তৃতীয় দিনের দিন আপনি কুটীরের বাহিরে আসিলেন, বসিলেন, শয়ন করিলেন, নানারূপে চিরদিনের মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে চলিয়া গেলেন! হরিদাস যে যাইবেন, ভক্তগণ তাহা মনেও ভাবেন নাই। হরিদাসের অসুখ হইয়াছে, তাই তাঁহার বাড়ী কীর্তন করিতে আসিয়াছেন। হরিদাসের সহিত প্রভুর যে গোপনে কথা হইয়াছে তাহা ভক্তগণ জানিতেন না। এ গোপনীয় কথা ভক্তগণ তখন জানিলেন, যখন প্রভু হরিদাসের গুণ বর্ণনাকালে বলিলেন যে, "হরিদাস যাইতে চাহিলেন, আমি রাখিতে পারিলাম না। হরিদাস আমাকে সম্মুখে রাখিয়া গোলোকে যাইবেন এই প্রার্থনা করিলেন, আর কৃষ্ণ তাহাই করিলেন।" ভক্তগণ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। হরিদাস যে গিয়াছেন কেহ ইহা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কিন্তু পরে দেখিলেন যখন হরিদাস প্রকৃতই অন্তর্ধান করিয়াছেন, তখন সকলে গগন ভেদিয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রভু তখন হরিদাসের মৃতদেহ কোলে করিয়া উঠাইলেন ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু আনন্দে বিহ্বল। প্রভুর আনন্দ কেন? না, হরিদাসের জয় দেখিয়া, আর ভক্তের প্রতাপ দেখিয়া। তখন ভক্তগণও প্রভুর আনন্দের তরঙ্গে পড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানের পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কিছুই নাই,—ভক্তই শ্রীভগবানের পরিবার। আপনারা কি এমন কাহাকে দেখিয়াছেন, যাঁহার ত্রিজগতে কেহ নাই, অথচ তাহাতে তাঁহার অভাব বোধ নাই? তাঁহার নিজের পুত্র নাই, তিনি সকল বালককে আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। সকল স্ত্রীলোকই তাঁহার মা। তাঁহার সম্পত্তিতে সকলের অধিকার আছে। কেহ মরিয়াছে, তাহার নিমিত্ত তিনি রোদন করিতেছেন। অর্থাৎ অন্যের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইতেছেন। শ্রীভগবান সেই প্রকার,—তাঁহার কেহ নহে, তিনি সকলের। হরিদাসের মৃতদেহ

কোলে করিয়া প্রভু দেখাইলেন যে, ভক্তে ও ভগবানে কত প্রীতি। যেমন ঠাকুর আমার শ্রীপ্রভু, তেমনি ভক্ত আমার হরিদাস। হরিদাস যেমন ভক্ত, তাঁহার অন্তর্দ্ধানও সেইরূপ! প্রভু বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় স্বরূপ তাঁহাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা জানাইলেন। তখন একখানা গাড়ী আনা হইল, ও তাহার উপর হরিদাসের মৃতদেহ স্থাপিত করিয়া সকলে কীর্তন করিতে করিতে সমুদ্রের দিকে গমন করিলেন। গাড়ী চলিতেছে, প্রভু অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, আর পশ্চাতে ভক্তগণ কীর্তন ও নৃত্য করিতে করিতে, আর সঙ্গে বহুতর লোক হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিয়াছেন। সমুদ্রতীরে যাইয়া মৃতদেহ নামাইয়া স্নান করান হইল। প্রভু বলিলেন, "অদ্যাবধি সমুদ্র মহাতীর্থ হইল।" তখন ভক্তগণ বালুকার মধ্যে সমাধি খনন করিলেন। তৎপরে হরিদাসের অঙ্গে মাল্যচন্দন দিলেন, আর ভক্তগণ তাঁহার পাদোদক পান করিলেন। পরে সকলে কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার দেহকে সেই সমাধিতে শয়ন করাইলেন। যথা—চৈতন্য-চরিতামৃতে—

"চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন।।
হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়। আপনি শ্রীহস্তে বালু দিলেন তাঁহার গায়।।"

তৎপরে কবর বালুদ্বারা পূর্ণ করিয়া তাঁহার উপর দৃঢ় করিয়া বাঁধা হইল। তখন আবার নর্তন ও কীর্তন আরম্ভ হইল। শেষে সকলে ঝাঁপ দিয়া আনন্দে হরিধ্বনির সহিত জলকেলি করিতে লাগিলেন।

স্নানান্তে সকলে উঠিয়া হরিদাসের কবর প্রদক্ষিণ করিলেন। তাহার পর কাহাকে কিছু না বলিয়া প্রভু ঐ পথে একেবারে মন্দিরের দিকে যাইতে লাগিলেন, কাজেই সকলে তাঁহার অনুগমন করিলেন। প্রভু মন্দিরে কেন যাইতেছেন, কেহ স্বপ্নেও তাহা ভাবেন নাই। সকলে ভাবিতেছেন প্রভু দর্শনে চলিয়াছেন। কিন্তু তাহা নয়। যেখানে পসারীগণ পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবার নিমিত্ত বসিয়া আছে, প্রভু সেখানে যাইয়া কাপড় পাতিলেন; বলিলেন, "আমার হরিদাসের মহোৎসবের নিমিত্ত ভিক্ষা দাও।" প্রভুর কথা শুনিয়া ভক্তগণ হাহাকার করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। পসারীগণ সকলে তটস্থ হইয়া ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হইল। স্বরূপ তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন, আর প্রভুকে নিবেদন করিলেন "আপনি বাসায় চলুন, আমরা ভিক্ষা লইয়া যাইতেছি।" প্রভু ভক্তগণের সহিত বাসায় গমন করিলেন। স্বরূপ চারিজন বৈষ্ণব রাখিয়া ভিক্ষা আরম্ভ করিলেন; বলিলেন, তোমরা প্রত্যেকে এক একটি দ্রব্য দাও।" এইরূপে চারিটি বোঝা করিয়া তিনি বাসায় আসিলেন।

এদিকে হরিদাসের অপ্রকট সংবাদে মহা কোলাহল হইয়া নগরময় হরিধ্বনি আরম্ভ হইয়াছে। নীলাচলে মুসলমানের আসিতে নিষেধ। যখন প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিলেন, তখন হরিদাস রোদন করিয়া বলিলেন যে, কিরূপে প্রভুকে দর্শন করিবেন, যেহেতু তাঁহার নীলাচলে যাইবার অধিকার নাই। তখন প্রভু প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—'আমি তোমাকে সেখানে লইয়া যাইব।" আজ সেই হরিদাসের অন্তর্দ্ধানে বাল বৃদ্ধ যুবা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলে আনন্দে ও ভক্তিতে গদগদ হইয়া হরিধ্বনি করিতেছেন। তাই বলি, ভক্তি জাতির উপরে, সকলের উপরে।

স্বরূপ গোঁসাই যে চারি বোঝা ভিক্ষা লইয়া আসিলেন তাহাতে আর মহোৎসব হইত না। কারণ হরিদাসের ক্রিয়াতে প্রসাদ পাইতে নগর সমেত লোকের সাধ হইল। তবে রামানন্দের ভাই বাণীনাথ বহু প্রসাদ আনিলেন, আর আনিলেন কাশীমিশ্র,—যিনি মন্দিরের কর্তা।

বৈষ্ণবগণকে প্রভু সারি সারি বসাইলেন, আর চারিজন সহায় লইয়া নিজে পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। যেন মহাপ্রভুর পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, তাঁহার সেই ভাব।

"মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে। এক পাত্রে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে।।"

স্বরূপ, প্রভুকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিলেন; করিয়া তিনি স্বয়ং, আর বলবান কাশীশ্বর, জগন্নাথ ও শঙ্করকে লইয়া পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। প্রভু ভোজন না করিলে কেহ ভোজন করেন না, কিন্তু সে দিবস কাশীমিশ্রের বাটীতে প্রভুর নিমন্ত্রণ ছিল। এমন কি, হরিদাসের অন্তর্দ্ধানের অতি অল্প পূর্বেও প্রভু ব্যতীত আর কেহ জানিতেন না যে, হরিদাস তখনি নিত্যধামে গমন করিবেন। কাশীমিশ্র প্রভুর ভিক্ষার সামগ্রী সেখানে লইয়া আসিলেন। প্রভু সন্ন্যাসীগণ লইয়া বসিলেন, আর যত্ন করিয়া সকল বৈষ্ণবকে আকণ্ঠ পূরিয়া ভোজন করাইলেন। কারণ পূর্বে বলিয়াছি যে,—প্রভুর যেন এ নিজের কাজ, যেন তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ!

ভোজনান্তে প্রভু সকলকে মাল্যচন্দন পরাইলেন। তার পরে বলিতেছেন—

"হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন। যেই তাহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্তন।।
যেই তাঁরে বালু দিতে করিল গমন। তাঁর মহোৎসবে যেবা করিল ভোজন।।
অচিরে হইবে সবার কৃষ্ণ প্রেম-প্রাপ্তি! হরিদাস দরশনে হয় ঐছে শক্তি।।
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ।।
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে। আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে।।
ইচ্ছামাত্রে কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রমণ। পূর্বে যেই শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ।।
হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি। তাঁহা বিনা রত্নশূন্যা হইল মেদিনী।।
জয় হরিদাস বলি কর হরিধ্বনি। ইহা বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি।।
সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস। নামের মহিমা সেই করিলা প্রকাশ।।
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিলা। হর্ষ বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা।।

প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সঙ্গ দিয়াছিলেন, কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আবার তাঁহাকে লইয়া গেলেন।" বস্তুতঃ হরিদাসের অন্তর্দ্ধানে প্রভুর প্রাত্যহিক একটি সুখের কার্য্য কমিয়া গেল, অর্থাৎ প্রত্যহ সমুদ্র-স্নানের পর হরিদাসকে দর্শন দেওয়া যে কার্য্য ছিল তাহা আর রহিল না। হরিদাস যে বর মাগিলেন, তাহা পাইলেন। এই, প্রেমের হাট ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। প্রভু যে লীলা সম্বরণ করিবেন, তাহার সূচনা আরম্ভ হইল। হরিদাসের অন্তর্দ্ধান তাহার প্রথম লক্ষণ।

লোকে বলে যে মায়া ত্যাগ কর, করিয়া সাধু হও। কিন্তু মনুষ্য যদি মায়া ত্যাগ করিল, তবে তাহার রহিল কি? যাহার মধ্যে মায়া নাই সে তো অসুর। মায়া, মোহ, ইত্যাদি বড় ঘৃণার বস্তু বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মায়ামোহ বলে কারে? স্ত্রীকে ভালবাসা, সন্তানকে স্নেহ করা, পিতামাতাকে কি শ্রীভগবানকে প্রেমভক্তি করা,—এ সমুদয় উপরোক্ত শাস্ত্রের হিসাবে "মায়া"। কিন্তু এ সমুদয় যদি পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কিছুমাত্র থাকিবে না। মায়া-শূন্য যে মনুষ্য—সে অসুর, রাক্ষস, অপদেবতা, ভূত, পিশাচ, ইত্যাদি। আমাদের যিনি ভগবান তিনি মায়াময়, আমরা কিরূপে ও কেন মায়া ত্যাগ করিব? কৃষ্ণের চক্ষে কথায়-কথায় জল, শ্রীকৃষ্ণ দীনদয়ার্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ বিরহে-কাতর, প্রেমে-পাগল,—তবে মনুষ্য কিরূপে মায়ামোহশূন্য হইবে? এই যে নীলাচলে আমার প্রাণগৌরাঙ্গ প্রেমের হাট বসাইয়াছেন, ইঁহারা সকলে মিলিয়া এক বৃহৎ পরিবার-স্বরূপ বাস করিতেছেন। এই পরিবারের মধ্যে গৃহী আছেন,—যেমন রামানন্দ; সন্ন্যাসী আছেন,—যেমন পুরী, ভারতী; উদাসীন আছেন,—যেমন হরিদাস। হরিদাস যখন অন্তর্দ্ধান করিলেন, সেই পরিবার মধ্যে একজন অদর্শন হইলেন। হরিদাসের অভাব সকলে, এমন কি প্রভু পর্য্যন্ত, অনুভব করিতে লাগিলেন। "এমন সঙ্গ আমি আর কোথায় পাইব?" হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুর এই কথা।

হরিদাসের স্বচ্ছন্দ মরণ, ইহার নিমিত্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইবার কারণ নাই। ঠাকুর মহাশয়, রসিকানন্দ প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্যরূপে অকপট হয়েন। প্রকৃত কথা, ভক্তি-চর্চার ন্যায় শক্তিসম্পন্ন যোগ আর নাই। এই যোগের কথা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রভুর রাঢ় দেশ ভ্রমণকালীন কিছু বর্ণনা করিয়াছি। শরীররূপে উপপতির সহিত জীবত্মারূপ রমণীর প্রীতি ধ্বংস করিয়া, তাহার পরমাত্মারূপ পতির সহিত মিলন সংঘটনের নামই "যোগ"। জীব "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া যতই সাধনা করেন, ততই তাঁহার শরীররূপে উপপতির প্রতি প্রীতি লঘু হইতে থাকে। তাহার পর ভক্তের এরূপ একটি অবস্থা হয় যে, তাঁহার শরীরের সহিত জীবাত্মার যে বন্ধন, তাহা অতিজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন জীব,—ভক্তিযোগীই হউন, কি জ্ঞানযোগীই হউন,—আপনার শরীর হইতে অনায়াসে আপনার জীবাত্মা নিষ্ক্রামণ করিতে পারেন। সুতরাং এরূপ অধিকারী-জীব অনায়াসে ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারেন। হরিদাস অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়াছে; তাই ভাবিলেন যে, আর এখানে থাকা ভাল নয়। তখন প্রভুর নিকট বর মাগিলেন। প্রভু দেখিলেন যে, হরিদাসের এরূপ অবস্থায় যাওয়াই ভাল, তাই বর দিলেন। আর হরিদাস হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

যীশুখ্রীষ্ট যে অবতার, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিতে রক্তপিপাসু জাতি সমুদয় অনেক পরিমাণে শান্ত হইয়াছে। এই যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার হত্যাকারিগণের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, "প্রভু ইহাদিগকে ক্ষমা করুন।" এ কথা যখন আমরা প্রথম বাইবেল গ্রন্থে পাঠ করিলাম, তখন আমাদের বিস্ময়ে আনন্দের উদয় হইল। তখন মনে এই ক্ষোভ হইল যে, আমাদের মধ্যে এরূপ উদাহরণ দেখাইবার কিছু নাই। খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিগণ ঐ কথা লইয়া আমাদিগকে চিরদিন লজ্জা দিয়া আসিতেছেন; বলিতেছেন, "দেখাও দেখি, এরূপ মহত্ত্ব কোথায়, কোনও কালে কেহ দেখাইতে পারে কি না।" আমরা মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া থাকিতাম। কেন না, আমরা তখন প্রভুর লীলা জানিতাম না। "আমরা" মানে—এদেশে যাঁহারা ভদ্রলোক বলিয়া অভিহিত। কারণ প্রভুর ধর্ম সাধারণতঃ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যে অপ্রচারিত থাকে; আর নবশাখগণ প্রভৃতি যাহাদের মধ্যে প্রচারিত ছিল, তাহারা বিদ্যাচর্চা করিত না। কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণবগোস্বামী তাঁহারা কেন প্রভুর লীলা জগতে প্রচার করেন নাই, সে কথা উত্তর আমরা কি দিব? তবে এই বলিতে পারি যে, যখন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের প্রভুর অপরিসীম কৃপায়, শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা হইল, তখন অনেকের চরণে তাহার শরণাগত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারিলেন না। যাঁহারা গোস্বামী, পণ্ডিত, তাঁহারা শ্রীভাগবত পড়িয়াছেন, গোস্বামী-গ্রন্থ পড়িয়াছেন, কিন্তু প্রভুর লীলা কেহ জানেন না। যিনি বড় জানেন, তিনি শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন। সেও যেখানে লীলাকথা আছে সেখানে নয়, যেখানে যেখানে তত্ত্বকথা আছে সেখানে। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বলিয়া যে একখানা গ্রন্থ আছে, অনেকেই তাহার সংবাদ রাখিতেন না। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম কি, প্রভু কে, তিনি কি করিয়াছেন, ইহা প্রায় কেহই জানিতেন না।

তাহার পরে প্রভুর লীলা পাঠ করিয়া দেখি যে, যীশু যেরূপ মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন, হরিদাস তাহা অপেক্ষাও অধিক মহত্ত্ব দেখান। যীশু তাঁহার হত্যাকারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "পিতা! ইহাদিগকে আমার হত্যারূপ অপরাধ হইতে মার্জনা কর।" আর হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, ইহাদিগকে উদ্ধার কর!" আমার নিতাইয়ের মস্তক দিয়া রুধির পড়িতেছে, আর তিনি মাধাইয়ের নিমিত্ত প্রভুর চরণ ধরিয়া মিনতি করিতেছেন। এ সমুদয় কেবল গৌরাঙ্গ-লীলায় পাওয়া যায়, অন্য কোথাও নাই।

অপর, আমাদের দেশে, সমাজে ও সাধন-ভজনে, অনেক বাহ্যক্রিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

ইহা দেখিয়া বিদেশী লোক হাস্য করেন ও আমাদের দেশের বুদ্ধিমান লোকেরা ক্ষুব্ধ হয়েন। মনে করুন, এক জাতির সহিত অন্য জাতির বিবাহ হইবে না। শুধু তাহা নয়, এক জাতির দুই শ্রেণী আছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হইবে না। দেখুন, বারেন্দ্র ও রাঢ়ী উভয়েই ব্রাহ্মণ, অথচ ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হইবে না। ইহার ফলে হিন্দুকূল নির্মুল হইতেছে। কিন্তু মহাপ্রভুর বিচারে জাতি, কি বিদ্যা, কি ধন কি পদ লইয়া ছোট বড় বিচার নহে,—ইহা কেবল ভক্তি লইয়া। হরিদাস মুসলমান, তাঁহার পাদোদক মহাকুলীন ব্রাহ্মণ পান করিলেন। ইহা সামাজিক নিয়মের ঘোর বিরোধী কার্য্য। কিন্তু প্রভুর ধর্মে এ সমস্ত বাহ্যক্রিয়া কিছু নাই। আবার হরিদাস বৈষ্ণব, তাঁহার দেহ দাহ না করিয়া কবরে প্রোথিত করা হইল কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বৈষ্ণব-ধর্মে এই সমুদয় ছাই-মাটির কথা লইয়া কচকচি নাই। যখন দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া গেল, তখন উহা ভস্মসাৎ কর কি মৃত্তিকায় প্রোথিত কর, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। বুদ্ধিমান্ পাঠক একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই সমুদয় অনর্থক সামাজিক নিয়মের নিমিত্ত হিন্দু-সমাজে একতা নাই, আর উহা ছারেখারে গেল।

ভবানন্দের পাঁচ পুত্র, সকলেই প্রভুর দাস। রামানন্দ প্রভুর বামবাহু-বিশাখার অবতার, বাণীনাথ প্রভুর সেবায় নিযুক্ত, গোপীনাথ বিষয়কার্য্য করেন। ইহাদিগের দুইজন,—রামানন্দ ও গোপীনাথ, প্রতাপরুদ্রের সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্য শাসন করেন। ইহাদিগকে অধিকারীও বলে, রাজাও বলে। ইঁহারা রাজার যে কার্য্য তাহাই করিতেন, তবে মাসিক বেতন পাইতেন। এই রাজ্যর রাজা যদি অসন্তুষ্ট হইতেন তবে চাকুরি যাইত। এইরূপ গোপীনাথ মালজ্যাঠার অধিকারী। তাঁহার নিকট মহাজনের লক্ষ কাহন পাওনা হয় গোপীনাথ চিরদিন বড় বাবু-লোক, অপব্যয়ে সমুদয় উড়াইয়া দেন। মহারাজ-সরকারে দেনার টাকা দিতে পারেন না। সেই ঋণ-শোধের প্রস্তাবে বলিলেন, "আমার ১০। ১২টি ঘোড়া আছে, তাহাই মূল্য করিয়া লও। আর যাহা কিছু বাকি থাকে, অন্যান্য দ্রব্য বেচিয়া দিব।" প্রতাপরুদ্রের কুমার, পুরুষোত্তম জানা, সেই ঘোড়াগুলির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন, তাঁহার এ বিষয়ে বুৎপত্তি ছিল। তিনি অল্প মূল্য বলিতেছেন দেখিয়া গোপীনাথ ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "আমার ঘোড়া তোমার মতন ঘাড় ফিরাইয়া এদিক ওদিক চাহে না, তবে এত কম মূল্য কেন বল?" সেই রাজপুত্রের রোগ ছিল, তিনি ঐরূপ ঘাড় ফিরাইতেন। কাজেই গোপীনাথের কথায় তিনি আরও চটিয়া গেলেন। গোপীনাথের ভরসা এই যে, তাহারা কয়েক ভাই রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রিয়পাত্র। সেই বলে রাজার পুত্রকে পর্য্যন্ত দুর্বাক্য বলিতে সাহসিক হইয়াছিলেন। রাজপুত্র কাজেই রাজার কাছে গোপীনাথের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিলেন। এইরূপে প্রতাপরুদ্রের নিকট কোনক্রমে অনুমতি লইয়া গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইল। চাঙ্গ মানে এই যে, নিম্নে খড়্গ পাতিয়া উপরে অপরাধীকে রাখা হয়। সেখান হইতে অপরাধীকে এরূপ ভাবে ফেলিয়া দেওয়া হয় যে, সে দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। গোপীনাথকে যখন চাঙ্গে চড়ান হইল, তখন নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল। প্রতাপরুদ্রের নীচেই ভবানন্দ-পরিবারের মান। তাঁহার পুত্রকে চাঙ্গে চড়ান হইল, ইহাতে নগরে অবশ্য গোল হইবার কথা। কয়েকজন আসিয়া প্রভুর স্মরণ লইয়া বলিল, "প্রভু রামানন্দের গোষ্ঠী তোমার দাস; তাহাদিগকে রক্ষা কর।"

এখন রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর দাস। প্রতাপরুদ্র আপনি প্রভুর নাম রাখিয়াছেন, "প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা।" প্রভু একটি কথা বলিলে গোপীনাথের প্রাণরক্ষা হয়। প্রভুর একটি কথা বলাও কর্তব্য, যেহেতু ভবান দ গোষ্ঠীসমেত তাঁহার অনুগত, আর রামানন্দ তাঁহার প্রাণ বলিলেও হয়। কিন্তু প্রভু কোমল হইলেন না; বলিলেন, "গোপীনাথ রাজার নিকট প্রকৃতই ঋণী। সে যে বেতন পায় তাহাতে অনায়াসে সুখে কাল কাটাইতে পারে। তাহা না

করিয়া সে চুরি করিবে, করিয়া কেবল কুকার্যে রাজার অর্থ ব্যয় করিবে। সেত অবশ্য রাজার নিকট দণ্ডার্হ। আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না।"

প্রভু এই কথা বলিতেছেন এমন সময় সংবাদ আসিল যে গোষ্ঠীসমেত ভবানন্দকে রাজা বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছেন। পরে জানা গেল যে, কথাটি অলীক। যাহা হউক, ভক্তগণ প্রথমে শুনিয়া ব্যথিত হইলেন, এমন কি, স্বরূপ পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন; বলিলেন, "প্রভু রামানন্দ সবংশে বিপদে পড়িয়াছেন, তাঁহারা তোমার দাস, তাঁহাদিগকে রক্ষা কর।"

মনে ভাবুন, রাজা প্রতাপরুদ্র স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী রাজা। তাঁহার উপর কেহ কর্তা নাই। তিনি যদি কোন আজ্ঞা করেন, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, অবশ্য পালন করিতে হইবে। কাহারও এমন সাধ্য নাই যে তাহাতে দ্বিরুক্তি করে। প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশীমিশ্র অবশ্য অনেক ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু বিষয়কার্য্যে গুরুর পরামর্শ কি আদেশ সকল সময় শুনিলে রাজ্য-শাসন চলে না। আবার কাশীমিশ্র অন্যের ন্যায় রাজার অধীন, তিনিই বা সাহস করিয়া রাজ্যসংক্রান্ত কোন অনুরোধ রাজাকে কিরূপে করিবেন? তবে তখন পুরীতে কেবল একজন ছিলেন, যাঁহার আজ্ঞা রাজা অবহেলা করিতে পারিতেন না। তিনি আমাদিগের প্রভু। রাজার ক্ষোভ যে, প্রভু তাঁহাকে কোন আজ্ঞা করেন না। ভবানন্দ-পরিবারের বিপদ হইলে, সকলে প্রভুর শরণ লইলেন। কিন্তু যখন স্বরূপ প্রভৃতি এইরূপ অনুরোধ করিলেন, তখন প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমরা বল কি? আমি সন্ন্যাসী হইয়া কি আমার ব্রত ভঙ্গ করিব? তোমরা কি বল যে, আমি এখন রাজার কাছে যাই, যাইয়া আঁচল পাতিয়া কৌড়ি ভিক্ষা করি? আচ্ছা তাহাই না হয় করিলাম; কিন্তু তাহা হইলে, আমি একজন পাঁচ গণ্ডার সন্ন্যাসী, আমাকে দুই লক্ষ কাহন ভিক্ষা রাজা কেন দিবেন?"

এই কথা হইতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল যে গোপীনাথকে খড়্গের উপর ফেলিতেছে। এইবার দিয়া চারিবার এইরূপ সংবাদ বধ্যস্থল হইতে আসিল। প্রভু তবু প্রতিজ্ঞা ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমরা যদি এত ভয় পাইয়া থাক, শ্রীজগন্নাথের আশ্রয় লও, তিনি যাহা ভাল হয় করিবেন।" রামানন্দের ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রকৃত বিষয়ী এই গোপীনাথ। তিনি যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন বাঁদরামী করিয়া তাহা উড়াইয়া দেন। কিন্তু যখন তাঁহাকে চাঙ্গে চড়ান হইল, তখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে. এ পর্য্যন্ত তিনি বিফলে কাটাইয়াছেন। তখন জগতের সমুদয় মায়া ত্যাগ করিয়া একমনে শ্রীকৃষ্ণের নাম জপিতে লাগিলেন।

যখন মহাপ্রভুর নিকট গোপীনাথের প্রাণদানের নিমিত্ত ভক্তগণ প্রার্থনা করিতেছেন, তখন সেখানে মহাপাত্র হরিচন্দন ছিলেন। তিনি একেবারে রাজার নিকট গমন করিলেন; করিয়া বলিতেছেন, "মহারাজ! গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইয়াছে। তাহার নিকট টাকা পাওনা থাকে, তাহাকে বধ করিলে কি ফল হইবে? বিশেষতঃ ভবানন্দ পরিবার কেবল তোমার কৃপাপাত্র নহে, মহাপ্রভুর কৃপাপাত্রও বটে। এই কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "সে কি! আমি তাহাকে বধ করিতে ত বলি নাই। আমাকে সকলে বলিল, ভয় না দেখাইলে টাকা আদায় হইবে না, তাহাই করিতে বলিয়াছিলাম।" রাজা তৎপরে হরিচন্দনকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র যাও, যাইয়া তাহাকে চাঙ্গ হইতে নামাও গিয়া।" ফল কথা, গোপীনাথ মহাপ্রভুর প্রিয় এই কথা মনে হওয়ায় রাজা একটু ভীত হইলেন।

ইহার পরে রাজা তাঁহার চিরপ্রথানুসারে, তাঁহার গুরু কাশীমিশ্রের পদসেবা করিতে আসিলেন। তখন কাশীমিশ্র বলিতেছেন, "দেব, আর এক কথা শুনিয়াছেন? মহাপ্রভু আর এখানে থাকিবেন না।" অমনি প্রতাপরুদ্রের মুখ শুখাইয়া গেল; বলিতেছেন, "সে কি? সব খুলিয়া বল।" তখন কাশীমিশ্র বলিলেন, "গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইলে, নগর সমেত লোক

যাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, 'আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, আমার নিকট বিষয়-কথা কেন? রাজা ভয় পাইয়া বলিলেন, তিনি ইহার কিছুই জানেন না। তখন কাশীমিশ্র রাজার নিকট বলিলেন, "আপনার উপর ঠাকুরের কোন ক্রোধ নাই। তিনি বরং গোপীনাথকে নিন্দা করিলেন, বলিলেন, যে ব্যক্তি রাজার দ্রব্য অপহরণ করে সে দণ্ডার্হ, আর তাহাকে দণ্ড করিয়া রাজা তাঁহার কর্তব্য কার্য্যই করিয়াছেন। মহাপ্রভুর বিরক্তির কারণ এই যে, তাঁহার বিষয়-কথা শুনিতে হয়। তাই তিনি সংকল্প করিয়াছেন যে, এ স্থান হইতে আলালনাথে গমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবেন।"

রাজা বলিলেন, "কি ভয়ঙ্কর সংবাদ! মহাপ্রভু গেলে আমরা কিরূপে বাঁচিব? আমি গোপীনাথের সমুদয় ঋণ মাপ করিলাম।"

তখন কাশীমিশ্র আবার বলিতেছেন, "আপনি গোপীনাথের ঋণ মার্জনা করিলে যে মহাপ্রভুর সন্তোষ হইবে তাহা বোধ হয় না। তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা নয় যে, আপনার ন্যায্য যাহা পাওনা, তাহা আপনি পরিত্যাগ করেন। আপনি মহাপ্রভুর জন্য আপনার পাওনা ত্যাগ করিলেন, ইহা শুনিলে মহাপ্রভু ক্ষুব্ধ ভিন্ন সুখী হইবেন না।" রাজা বলিলেন, "তবে তুমি তাঁহাকে এ কথা বলিও না। কথা এই যে, ভবানন্দের গোষ্ঠীকে আমি নিজ-জন বলিয়া বোধ করি। তাহারা অর্থ অপহরণ করে জানি, কিন্তু আমি কিছু বলি না। তাহার পর, তাহারা গোষ্ঠীসমেত এখন মহাপ্রভুর প্রিয়, কাজেই আমার আরও প্রিয় হইয়াছে। আমি তাহাকে আবার মালজ্যাঠার অধিকারী করিয়া পাঠাইতেছি। সে যে অর্থ অপহরণ করিত, তাহার কারণ বোধহয় তাহার বেতন অল্প ছিল। এখন তাহার বেতন দ্বিগুন করিয়া দিব, তাহা হইলে আর চুরি করিবে না।"

গোপীনাথ আবার অধিকারী হইলেন। রাজা তাঁহাকে নেতধটি অর্থাৎ অধিকারী সাজ পরাইলেন। তখন গোপীনাথ সেই রাজবেশে ভ্রাতাগণ ও পিতাসহ আসিয়া প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

প্রভুর লীলার মধ্যে এই একটি মাত্র বিষয়-কথা আছে। তবু ইহাতে কয়েকটি মহা-উপদেশ পাওয়া যায়। মহাপ্রভু একটি কথা বলিলে গোপীনাথের প্রাণ বাঁচে, কিন্তু তিনি তাহা বলিলেন না। তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার পক্ষে রাজার নিকট অনুরোধ করা কর্তব্যকর্মের ক্রটি হইত। যখন গোপীনাথের নিমিত্ত সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন, তখন প্রভু বলিলেন যে তাঁহারা যদি গোপীনাথের নিমিত্ত প্রাণভিক্ষা চাহেন, তবে তাঁহাদের শ্রীজগন্নাথের শরণ লওয়া কর্তব্য।

শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতের প্রথম খণ্ডে "আমি ও গৌরাঙ্গ" শীর্ষক কবিতায় এই পদটি আছে ঃ "(জীব) বিপদে পড়িলে স্বভাব দিয়াছ সহজে তোমারে ডাকে।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "হে প্রভু, আমি যে তোমার নিকট দুঃখ পাইয়া আর্তনাদ করি, ইহাতে আমাকে দোষ দিও না। তুমি জীবের যেরূপ স্বভাব দিয়াছ, তাহাতে তাহারা বিপদে পড়িলে সেই স্বভাবানুসারে তোমাকে ডাকিয়া থাকে।"

এখানে এই কথার একটু বিচার করিব। শ্রীভগবান্ মঙ্গলময় ও সর্বজ্ঞ। তাঁহার নিকট আবার প্রার্থনা কি? যাঁহারা বিশুদ্ধ-ভক্ত, তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা জানেন যে, যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহার অন্ন তিনি মস্তকে করিয়া বহিয়া তাহার নিকট লইয়া যান। ইহাই যখন ভক্তের কর্তব্য-কর্ম, তখন সেখানে স্বয়ং শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ এ কথা কেন বলিলেন যে, যদি তোমরা গোপীনাথের প্রাণভিক্ষা চাও, তবে শ্রীজগন্নাথের নিকটে প্রার্থনা কর? কথা এই, ভক্ত দুই প্রকার আছেন। কেহ শ্রীভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন, যেমন শ্রীবাস। তিনি মহাপ্রভুকে

বলিয়াছিলেন যে, তিনি অন্ন সংগ্রহের নিমিত্ত কোথাও গমন করেন না, শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ ভক্তের সংখ্যা অতি বিরল। তাহার কারণ উপরের কবিতায় প্রকাশ। অর্থাৎ জীবের স্বভাব এই যে, বিপদে পড়িলে শ্রীভগবানকে ডাকে। সামান্য বিপদে পড়িলে আপনা আপনি উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু গুরুতর রকমের বিপদ হইলে, তখন আর তাহা পারে না;—তখন বলিয়া উঠে "হে ভগবান! রক্ষা কর।" কেহ কেহ এমন আছেন, যাহারা আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়া অভিমান করেন। নাস্তিক বলিয়া অভিমান করেন, এ কথা বলি কেন,—না প্রকৃতপক্ষে ইঁহারাও ভগবানে নির্ভরতা হৃদয় হইতে উৎপাটন করিতে পারেন না। এই নাস্তিকগণও বিপৎকালে বলেন, "হে ভগবান, যদি তুমি থাক, তবে রক্ষা কর।"

স্বভাবের ভুল নাই, এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে মানুষের বিপদে এই কয়েকটি অতি নিগূঢ় তত্ত্ব জানা যায়। বিপদ হইলে যখন জীব স্বভাবতঃ শ্রীভগবানকে ডাকে, তখন এই সপ্রমাণ হয় যে, (১) শ্রীভগবান্ আছেন, (২) তিনি সুহৃৎ ও (৩) তিনি জীবের আর্তনাদ শ্রবণ করেন। যদি ভবানন্দের গোষ্ঠী শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিতেন, তবে তাঁহারা বিপদে ভীত হইতেন না; তাঁহারা নির্ভর করিতে পারিলেন না, তাই প্রভু বলিলেন,— "শ্রীজগন্নাথের নিকট ক্রন্দন কর।"

শ্রীভগবানের নৌকাখণ্ড-লীলায় আছে যে, যখন শ্রীভগবান কাণ্ডারী হইয়া গোপীগণকে পার করিতেছেন তখন তিনি মধ্য-নদীতে নৌকা দোলাইতে লাগিলেন। ইহাতে গোপীগণ ভয় পাইয়া তাঁহার নিকট যাইতে লাগিলেন। জীব যখন ভবসাগর পার হয়, তখন শ্রীভগবান্ নৌকা দোলাইয়া থাকেন। ইহাতে এই মহৎ উপকার হয় যে, তাহার উহাতে শ্রীভগবানের অভয় পদাশ্রয় করিতে বাধ্য হয়; বিপদ না হইলে আর তাহা করিতে চাহে না। প্রভুর কথা, "সদানন্দ রাজ্যে পূর্ণানন্দ সন্ধানে" বিপদ সম্ভবে না। যে সমুদয় বিপদ দেখা যায়, সে সমুদয় মায়া; পরিণামে সকলে সদানন্দ রাজ্যে বাস করিবে, এই শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞা। দেখুন শ্রীভগবান আমাদের কি রকম নিঃস্বার্থ বন্ধু!

ষষ্ঠ অধ্যায়

জগদানন্দ সত্যভামার প্রকাশ। শিবানন্দ সেন কর্তৃক প্রতিপালিত। প্রাণটি একেবারে শ্রীগৌরাঙ্গের পদে অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত এক তিল বাঁচেন না। বুদ্ধি তত প্রখর নহে। কিন্তু অন্তরটি অতিশয় সরল। প্রভুর নিকট নীলাচলে থাকেন, মধ্যে মধ্যে প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনবদ্বীপে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রভুর সংবাদ দিতে গমন করেন। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া আবার প্রত্যাগমন করেন। এবার দেশে আসিয়া মনে মনে একটি সংকল্প স্থির করিয়াছেন। প্রভুর কৃষ্ণবিরহ ক্রমেই প্রবল হইতেছে, দিবানিশি 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া রোদন করিতেছেন। তাহা জগদানন্দ দর্শন করেন, আর তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তাই মনে ভাবিলেন, যদি কিছু শীতল সুগন্ধি তৈল সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে আপন হস্তে প্রভুর মস্তকে উহা মাখাইবেন। মস্তিষ্ক শীতল হইলে অন্তরও শীতল হইবে, প্রভুও আর ঐরূপ হা কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিবেন না। এইরূপ যুক্তি করিয়া, এক কলস অতি উত্তম চন্দনাদি তৈল প্রস্তুত করাইয়া, একটি লোকের মাথায় দিয়া একেবারে কাঁচরাপাড়া হইতে নীলাচলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর অগ্রে যাইয়া একটু ভয় হইয়াছে, তাই চুপে-চুপে তৈলের কলস গোবিন্দের নিকট দিয়া বলিলেন, "তুমি ইহা রাখিয়া দাও, প্রভুকে মাখাইব।"

গোবিন্দ বুঝিলেন যে, জগদানন্দের পণ্ডশ্রম হইয়াছে মাত্র, প্রভু সে তৈল কখনও ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু জগদানন্দের অনুরোধে তিনি অতি নম্র ভাবে প্রভুকে বলিতেছেন,

"জগদানন্দ অনেক কষ্ট করিয়া এক কলস চন্দনাদি তৈল আনিয়াছেন। সে তৈল অতি উপকারী, বায়ু ও পিত্ত উভয়ই শান্ত করে। তাঁহার ইচ্ছা আপনি উহা মস্তকে দেন।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন "সন্ন্যাসীর তৈলে অধিকার নাই, বিশেষতঃ সুগন্ধি তৈলে। জগদানন্দ পরিশ্রম কবিয়া তৈল আনিয়াছেন, জগন্নাথের মন্দিরে উহা দাও প্রদীপে জ্বলিবে, তাহা হইলে তাহার পরিশ্রম সফল হইবে।" গোবিন্দ আবার অনুরোধ করিলেন, প্রভু তবুও শুনিলেন না।

কিছুদিন গত হইলে জগদানন্দ আবার গোবিন্দের শরণ লইলেন। বলিলেন, "তুমি আবার প্রভুকে বল।" গোবিন্দ তাহাই করিলেন, বলিলেন, "পণ্ডিত (জগদানন্দ) বড় দুঃখিত হইবেন, তিনি বড় পরিশ্রম করিয়া বহুদূর হইতে তৈল আনিয়াছেন।" প্রভু ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিযা বলিলেন, "হইল ভাল, সুগন্ধি তৈল আসিয়াছে, এখন তৈল মাখাইবার জন্য একজন ভৃত্য রাখ, তাহা হইলে তোমাদের মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইবে। তোমাদের এ বিবেচনা নাই যে, আমি সুগন্ধি তৈল মাখিলে লোকে আমাকে ও তোমাদিগকে পরিহাস করিবে?" গোবিন্দ চুপ করিলেন।

পর দিবস প্রাতে জগদানন্দ প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। প্রভু বলিলেন, "পণ্ডিত তৈল আনিয়াছ, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, ইহা মাখিতে পারি না। জগন্নাথকে ঐ তৈল দাও, প্রদীপে জ্বলিবে, তোমার শ্রমও সফল হইবে।" জগদানন্দ বলিলেন, "আমি তৈল আনিয়াছি, এ মিথ্যা কথা তোমাকে কে বলিল?" আর সে যে মিথ্যা কথা ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত, দ্রুতবেগে ঘর হইতে তৈলের কলস আনিয়া, প্রভুর সম্মুখে বলপূর্বক আছাড় মারিয়া ভগ্ন করিলেন; তাহার পর, দ্বিরুক্তি না করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন, এবং দ্বারে খিল দিয়া শুইয়া থাকিলেন।

• জীব মাত্রই অজ্ঞ, সুতরাং শ্রীভগবানের চিরদিনই এইরূপ অবুঝ পরিবার লইয়া সংসার। বালক বলিতেছে, "মা, আমাকে চাঁদ ধরিয়া দাও।" আর চাঁদ না পাইয়া ধুলায় লুণ্ঠিত হইতেছে। বালক বলিতেছে, "আমি ঘোড়ায় চড়িব।" জনক সন্তানের মঙ্গল নিমিত্ত তাহা করিতে দিতেছেন না, আর সন্তান মহাদুঃখে আর্তনাদ করিতেছে। এইরূপে জীবগণ যদিও কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়, কিছু বুঝে না; তবু দিবানিশি ইহা দাও, উহা দাও, বলিয়া আর্তনাদ করিতেছে, আর না পাইয়া শ্রীভগবানের উপর রাগ করিতেছে।

জগদানন্দের এইরূপে দুই দিবস গেল, তিনি খিল খুলিলেন না, হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিলেন। প্রভু নিরুপায় হইয়া তিন দিনের দিন প্রাতে জগদানন্দের কুটীরে উপস্থিত হইলেন, এবং দ্বারে আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "পণ্ডিত উঠ, শীঘ্র উঠ। আমি দর্শনে গেলাম, এখানে আসিয়া মধ্যাহ্নে ভিক্ষা করিব।" জগদানন্দের অমনি সমুদয় রাগ গেল। তখন তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভিক্ষার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। যেখানে যাহা পাইলেন আনিয়া বিলক্ষণ আয়োজন করিলেন। জগদানন্দ বড় একখানি কলার পাতা পাতিয়া তাহাতে অন্ন রাখিলেন, ও তাহার উপর ঘৃত ঢালিয়া দিলেন; কলার দোনায় নানাবিধ ব্যঞ্জন পিঠা পানা পুরিলেন, আর সকলের উপর তুলসীর মঞ্জরী দিলেন। শেষে প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইয়া, করযোড়ে আহার করিতে প্রার্থনা করিলেন। প্রভু বলিলেন, "আর একখানা পাতা পাত, তোমায় আমায় একত্রে ভোজন করিব।" ইহা বলিয়া হাত তুলিয়া বসিয়া রহিলেন।

তখন জগদানন্দের সমুদয় রাগ গিয়াছে, প্রেমে হৃদয় টলমল করিতেছে; গদগদ হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু আপনি প্রসাদ লউন, আমি পরে বসিব।" প্রভু তাহাই করিলেন। মুখে অন্ন দিয়াই বলিতেছেন, "রাগ করিয়া রান্ধিলে কি এরূপ উত্তম আস্বাদ হয়? না কৃষ্ণ আপনি ভোজন করিবেন বলিয়া, তিনি স্বয়ং তোমার হস্তে এই পাক করিয়াছেন? তাহা না হইলে

অন্নব্যঞ্জন এরূপ সুস্বাদ কিরূপে হইল? জগদানন্দের মুখে তখন হাসি আসিল। তিনি বলিলেন, "যিনি খাইবেন তিনিই পাক করিয়াছেন তাহার সন্দেহ কি? আমি কেবল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র।" এ দিকে যখন যে ব্যঞ্জন ফুরাইতেছে, অমনি জগদানন্দ সেই ব্যঞ্জন আনিয়া দোনা পূর্ণ করিতেছেন। প্রভু ভয়ে ভয়ে খাইতেছেন, পাছে জগদানন্দ আবার রাগ করেন। মধ্যে মধ্যে ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন, "আর না," কি "আর পারি না।" কিন্তু জগদানন্দ তাহাতে কর্ণপাতও করিতেছে না, ব্যঞ্জন ফুরাইলেই ব্যঞ্জন, অন্ন ফুরাইলেই অন্ন দিতেছেন। শেষে প্রভু কাতর হইয়া বলিলেন, "যাহা ভোজন করি তাহার দশগুণ খাওয়াইলে, আর পারি না, আমাকে ক্ষমা দাও।" তখন জগদানন্দ নিরস্ত হইলেন। ইহাকেই বলে শ্রীভগবানকে জব্দ করিয়া বাধ্য করা। এরূপ ভজন বেশ সন্দেহ নাই, তবে গোড়ায় প্রেমের প্রয়োজন। জগদানন্দ রাগ করিয়া প্রভুকে জব্দ করিলেন না, করিতে পারিতেনও না, প্রেম দ্বারা করিলেন।

ভিক্ষান্তে প্রভু বলিলেন, "পণ্ডিত, এখন তুমি ভোজন কর, আমি বসিয়া দেখি।" জগদানন্দ বলিলেন, "প্রভু, আপনি যাইয়া আরাম করুন, আমি এখনই বসিব। তবে যাহারা আমার সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলিয়াছি; তাঁহারা আসিলে সকলে একত্রে বসিব।"

জগদানন্দের বড় ইচ্ছা একবার বৃন্দাবনে যান। কিন্তু নানা কারণে প্রভুর তাহাতে মত নাই। প্রথমতঃ জগদানন্দ সরল, ভাল মানুষ, পথে মারা যাইবেন। দ্বিতীয়তঃ সকলেই জানে তিনি প্রভুর পার্ষদ। হয়ত, কি বলিতে কি বলিবেন, কি করিতে কি করিবেন, শেষে আপনাকে, প্রভুকে ও তাঁহার প্রচারিত ধর্মকে হাস্যস্পদ করিবেন। তাই, যখনই জগদানন্দ বৃন্দাবনে যাইবার অনুমতি চাহেন তখনই প্রভু বলেন, "তুমি আমার উপর রাগ করে দেশান্তরি হইবে, আমি কি করে অনুমতি দিই।" প্রকৃত কথা, জগদানন্দের কেবল চেষ্টা কিসে প্রভুকে আরামে রাখেন। কিন্তু প্রভু সে সমুদয় অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন না, কাজেই সর্বদাই প্রভু ও জগদানন্দে কলহ বাঁধে, আর জগদানন্দের বৃন্দাবনে যাওয়া হয় না।

জগদানন্দ তখন স্বরূপের আশ্রয় লইলেন। স্বরূপ প্রভুকে ধরিলেন ও সম্মত করাইলেন। তখন প্রভু জগদানন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন, "নিতান্তই যাইবে তবে যাও, কিন্তু সেখানে বেশীদিন থাকিও না। কাশী পর্য্যন্ত কোন ভয় নাই, তাহার ওদিকে একা গৌড়ীয়া পাইলে দস্যুগণ অত্যাচার করে, সুতরাং সেই দেশীয় ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে যাইবে। বৃন্দাবনে যাইয়া সনাতনের সঙ্গে থাকিবে, তাঁহাকে ছাড়িয়া এক পদও কোথায় যাইবে না। সেখানে যে সমুদয় সাধু আছেন, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইও না, তাঁহাদিগকে দূর হইতে প্রণাম করিবে; আর সনাতনকে বলিবে, আমিও সত্বর বৃন্দাবনে যাইতেছি। কিন্তু প্রভু বৃন্দাবনে আর গমন করেন নাই, সুতরাং তিনি কি ভাবে কি বলিয়াছিলেন, হয় জগদানন্দ তাহা বুঝিতে পারেন নাই, নয় কি বলিতে কি বলিয়াছেন।

যাহা হউক, প্রভু যে পথ দিয়া গিয়াছিলেন, জগদানন্দ সেই বনপথে কাশী যাইয়া তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন। সেখান হইতে বরাবর বৃন্দাবনে সনাতনের নিকট গমন করিলেন। সনাতন একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, যেন স্বয়ং প্রভুকে পাইয়াছেন। সনাতন দিবানিশি তাঁহার নিকট প্রভুর কথা শুনেন, আর আপনি ভিক্ষা করিয়া জগদানন্দকে ভিক্ষা দেন। একদিন সনাতনকে ভিক্ষা দিবেন মনে করিয়া জগদানন্দ দুই জনের পাক চড়াইলেন। সনাতন যমুনায় স্নান করিয়া ভিক্ষার্থে আগমন করিলেন। তাঁহার মাথায় একখানা রাঙ্গা বহির্বাস বান্ধা দেখিয়া জগাই ভাবিলেন, সেখানি অবশ্য প্রভুদত্ত, তাই গদগদ হইয়া সেই বহুমূল্য সামগ্রীটি একদৃষ্টে দর্শন করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানি প্রভু তোমার কবে দিলেন?" সনাতন গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এখানি

প্রভু-দত্ত ধন নহে; এখানি মুকুন্দ সরস্বতী আমাকে দিয়াছেন।" তখন জগদানন্দ যে হাঁড়িতে পাক চড়াইয়াছিলেন, উহা চুল্লি হইতে উঠাইয়া সনাতনের মস্তকে মারিতে চাহিলেন। ইহা দেখিয়া সনাতন মৃদু হাসিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত, যেমন অপরাধ, তাহার উপযুক্ত দণ্ডই এই, সন্দেহ নাই। কিন্তু এবার আমাকে ক্ষমা কর, এরূপ আর কখন করিব না।" সনাতনের হাসি দেখিয়া, জগদানন্দের চেতনা হইল। তিনি লজ্জা পাইয়া আবার চুলায় হাঁড়ি রাখিয়া বলিতেছেন, "গোসাঞিও, আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া, আপনাকে ভুলিয়া তোমার ন্যায় ভক্তকে মারিতে যাইতেছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু ইহা কে সহ্য করিতে পারে? তুমি প্রভুর প্রধান পার্ষদ, তোমার ন্যায় তাঁহার প্রিয় আর কয়জন আছে? তুমি কিনা অন্য এক সন্ন্যাসীর বস্ত্র মস্তকে বান্ধ!" সনাতন হাসিয়া বলিলেন, "আমরা দূরদেশে থাকিয়া জগদানন্দের গৌরাঙ্গ-প্রেমের কথা শুনি, চক্ষে দেখিতে পাই না। তাই দেখিবার জন্য মাথায় অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র বান্ধিয়াছিলাম। যাহা দেখিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা এখন চক্ষে দেখিলাম। ধন্য তুমি জগদানন্দ!" প্রকৃতই, জগদানন্দের পক্ষে প্রভুর মান্য দ্বিজোত্তম সনাতনকে (যিনি তাঁহার আমন্ত্রিত) মারিতে উদ্যত হওয়া যেমন তেমন প্রেমের কথা নয়। সনাতনের কথা শুনিয়া জগাই কান্দিয়া উঠিলেন, এবং উভয়ে উভয়ে গলা ধরিয়া গুণময় প্রভুর কথা কহিতে কহিতে তাপিত হৃদয় শীতল করিতে লাগিলেন। প্রেমচর্চায় জীবগণকে অর্দ্ধ ক্ষিপ্ত করে, আর সেই ক্ষিপ্ততায় অপরূপ মাধুর্য্য রহিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রভুর লীলার সহায় ছয়জন গোস্বামী। চারিজনের নাম পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, যথা, সনাতন, রূপ, জীব ও রঘুনাথ দাস। এখন রঘুনাথ ভট্টের কথা কিছু বলিব। প্রভু যৌবনের প্রারম্ভে পূর্ব-বঙ্গে গমন করেন, এবং সেখানে তপনমিশ্রকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে সস্ত্রীক বারাণসী যাইয়া বাস করিতে বলেন। তপন, সেই অষ্টাদশ বর্ষ-বয়স্ক শিশু অধ্যাপকের আজ্ঞায় দেশত্যাগ করিয়া, সস্ত্রীক বারাণসীতে যাইয়া বাস করেন। প্রভু তপনকে বলিয়াছিলেন যে, পরে ঐ স্থানে অর্থাৎ কাশীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এবং সে মিলন যে হইয়াছিল, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। তপনমিশ্র কেন যে ঐ বালক-অধ্যাপকের কথায় দেশত্যাগ করিয়া বারানসীতে গমন করেন, তাহার কারণ গ্রন্থে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে। তিনি স্বপ্নে জানিয়াছিলেন যে, এই বালক-অধ্যাপক আর কেহ নয়, অখিল-ব্রহ্মাণ্ডের পতি। কিন্তু প্রভু কেন তপনকে দেশত্যাগ করাইয়া বিদেশে প্রেরণ করেন, ইহার কারণ বুঝা বড় কঠিন। তবে ইহা আমরা জানি যে, তপন হইতে রঘুনাথ ভট্ট, এবং রঘুনাথ ভট্ট হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও গোবিন্দদেবের মন্দির। আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ হইতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ। আবার এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, বৃন্দাবন ও কাশী এই দুইই ভারতের প্রধান স্থান। বৃন্দাবনে প্রভু লোকনাথ ও ভূগর্ভকে পাঠাইয়াছিলেন। কাশীতেই বা একজন দূত না পাঠাইবেন কেন?

তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ যৌবনের প্রারম্ভেই প্রভুকে দর্শন করিতে কাশী হইতে নীলাচল আগমন করিলেন। প্রভু রঘুনাথকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন, রঘুনাথও পিতামাতার প্রণাম জানাইলেন। প্রভুর নিকট বাস করিয়া রঘুনাথ ক্রমেই প্রেমধনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতামাতা বর্তমান ও বৃদ্ধ; পিতামাতার সেবা ত্যাগ করিয়া রঘুনাথ যে প্রভুর চরণে থাকিবেন, ইহা প্রভুর ইচ্ছা নহে। সেইজন্য প্রভু তাঁহাকে আট মাসের অধিক নিকটে রাখিলেন না; বলিলেন, "কাশী যাইয়া পিতামাতার সেবা কর। তাঁহাদের অন্তর্ধান হইলে আবার আসিও।" প্রভু আরও আজ্ঞা করিলেন, "বিদ্যাধায়ন কর

এবং বৈষ্ণবের নিকট ভাল করিয়া ভাগবত অভ্যাস কর।" প্রভু আরও একটি আজ্ঞা করিলেন যে, তিনি যেন বিবাহ না করেন।

প্রভু যন্ত্রী, আর সকলেই যন্ত্র। কাহারে কি নিমিত্ত কোথায় নিয়োজিত করিবেন তাহা কেবল তিনিই জানেন। শ্রীনিত্যানন্দ উদাসীন ছিলেন। প্রভু তাঁহাকে বাধ্য করিয়া সংসারী করিলেন। রঘুনাথ ভট্ট যুবক, গৃহী ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন শুনিয়া, রঘুনাথ বুঝিলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রভুর কিছু বিশেষ অভিপ্রায় আছে; তবে সে যে কি, তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিলেন না।

অল্প দিনের মধ্যেই রঘুনাথ স্বাধীন হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার পিতামাতার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইল। তখন তিনি নিশ্চিত হইয়া আবার নীলাচলে গমন করিলেন। রঘুনাথ সর্বদাই প্রভুর সঙ্গে থাকেন, তিনি তাঁহার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। কখন বা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন। রঘুনাথ পাক করিতে বড় সুনিপুণ। প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া ফল এই হইতেছে যে, ক্রমে তিনি প্রেমে উন্মত্ত হইতেছেন। এইরূপে আবার আট মাস গত হইল। তখন জীববন্ধু প্রভু আর তাঁহাকে নিকটে রাখিতে পারিলেন না, কারণ বৃন্দাবনে তাঁহার প্রয়োজন। তাই বলিলেন, "তুমি বৃন্দাবনে গমন কর, সেখানে সনাতন ও রূপের আশ্রয়ে বাস করিও।" রঘুনাথ অগত্যা তাহাই করিলেন। প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার একটুও ইচ্ছা নাই। কাহারই বা হয়? কিন্তু এই অবতারে জীবগণকে ভক্তিধর্ম শিক্ষা দেওয়া যে এক প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা প্রভুর সমুদয় কার্য্যে বুঝা যায়। প্রভু মহোৎসবে চৌদ্দহাত লম্বা তুলসীর মালা আর ছুটা পানের বীড়া পাইয়াছিলেন, তাহাই রঘুনাথকে দিলেন। রঘুনাথ এই দুই দ্রব্য চিরদিন নিকটে রাখিয়াছিলেন ও পূজা করিতেন।

ভট্ট রঘুনাথ বৃন্দাবনে যাইয়া সেখানকার প্রধান ভাগবতী হইলেন। একে ভাগবতে অগাধ বিদ্যা, তাহাতে কণ্ঠ অমৃতের ধার, সঙ্গীতে বিশেষ নৈপুণ্য, অন্তর ভাবে দ্রবীভূত। যেখানে শ্রীভগবানের মাধুর্য্য বর্ণনা, সেখানে এলাইয়া পড়েন, প্রেমধারা পড়িতে থাকে, স্বর ভঙ্গ হইয়া অতিশয় মিষ্ট হয়। রঘুনাথের ভাগবত-পাঠ শ্রবণ বৃন্দাবনের একটি প্রধান সম্পত্তি হইল। রূপ-সনাতনের সভায় ভাগবত পাঠ হইতেছে, জগতের মধ্যে যত শ্রেষ্ঠ ভক্ত সকলেই উপস্থিত। কথা কৃষ্ণের, বর্ণনা ভাগবতের, পাঠ রঘুনাথের, আর ভাব সুর ও সঙ্গীত শ্রীল মহাপ্রভু দ্বারা সৃষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত। সে দৃশ্য স্মরণ করিলেও জীব পবিত্র হয়।

এইরূপ বৃন্দাবনে তিন গোসাঞী বিরাজ করিতে লাগিলেন—যথা, সনাতন, রূপ ও রঘুনাথ ভট্ট। তাহার পরে গোপাল ভট্ট, তাহার পরে রঘুনাথ দাস এবং সর্বশেষে শ্রীজীব আসিলেন। এই রঘুনাথ দাসের কাহিনী পূর্বে কিছু বলিয়াছি। রূপ ও সনাতন গম্ভীর, অটল, শাস্ত্র লইয়া বিব্রত। তাঁহারা প্রভুর আজ্ঞায় বৈষ্ণবশাস্ত্র লিখিতেছেন, বাহিরের লোকের সহিত আলাপের, এমন কি তাঁহাদের ভজনানন্দের অবসর পর্য্যন্ত নাই। বাস, হয় কুটীরে, না হয় বৃক্ষতলায় কি গোফায়। গোফা কি না, একটি গর্ত। ভল্লুকের গোফা আছে, তাহাতে ভল্লুক বাস করে। সেইরূপ ভক্তগণ, যেখানে মৃত্তিকার স্তম্ভ আছে, তাহাতে গহ্বর করিয়া একটু আশ্রয় স্থান করিয়া লইতেন। প্রভুর গণ কাষ্ঠাকরঙ্গধারী, তাঁহাদের আর কোন সম্পত্তি নাই। বৃন্দাবন জঙ্গলময়, সেখানে অল্প সংখ্যক অসভ্য লোকের আর হিংস্র জন্তুর বাস। সেখানে আহার্য্য সংগ্রহ করাই দায়। রূপ সনাতন প্রভৃতির নিজেদের, আর যাঁহারা যখন আসিতেছেন তাঁহাদিগের, আহার্য্য-দ্রব্য ইঁহাদিগের সংগ্রহ করিতে হইতেছে। তাঁহাদিগের প্রধান কার্য্য শাস্ত্রপ্রচার করা। শাস্ত্র কি না ভক্তিশাস্ত্র, অর্থাৎ যাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভক্তির ন্যায় সহজ ও শক্তিশালী ভজন আর নাই। এ শাস্ত্র তখন ছিল না। শাস্ত্রের মধ্যে এখানে ওখানে ভক্তির মাহাত্ম্য মাত্র দেখান হইত বটে কিন্তু তাহাও পণ্ডিতগণ কুটার্থ দ্বারা

অন্যরূপ বুঝাইতেন। বেদ, বেদান্ত, গীতা, এমন কি শ্রীভাগবত পর্য্যন্ত, পণ্ডিতগণ জ্ঞানের শাস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। জগত মায়া, তুমি মায়া, শ্রীকৃষ্ণ মায়া; তিনিও যেই, আমিও সেই; মরিলে আবার জন্মিতে হয়; মোক্ষ অর্থাৎ নাশ, জীবের একমাত্র মঙ্গল, ইত্যাদি নাস্তিকের মত তখন ভারতে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রবল ছিল।

আবার যাঁহারা অল্প-স্বল্প মানেন তাঁহারা শ্রীভগবানকে পিশাচ সাজান, মদ্য-মাংস রুধির দিয়া শ্রীভগবানকে পূজা করেন। পূজা করেন কেন? হয় শত্রুদমনের কি পুত্রলাভের নিমিত্ত, অথবা ধন ও যশ প্রার্থনা করিয়া। যাঁহারা ভগবানের আকৃতি প্রকৃতি রাক্ষস ও পিশাচের ন্যায় করেন, তাঁহারা নিজে কি রাক্ষস ও পিশাচ? শ্রীভগবান্ কি তাহাদিগের হইতেও মন্দ? তাঁহারা নিজে কি রুধির পান করিতে পারেন? কিন্তু তাঁহারা শ্রীভগবানকে তাহাই দিতেছেন, না হয় গাঁজা খাওয়াইতেছেন! যদি শ্রীভগবান্ জ্ঞানময় হয়েন, তবে তিনি সৌন্দর্য্যময় নয় কেন? সকল বিষয়ে তিনি পুরুষোত্তম—জ্ঞানে ও প্রেমে। দেখিতে তাঁহাকে পিশাচের মত কেন হইবে? সমুদয় শুভের আকর তিনি। সৌন্দর্য্যও একটি শুভ; তবে তিনি কেন সৌন্দর্য্যের আকর না হইবেন? অতএব শ্রীভগবান যেমন গুণে ভুবনমোহন, রূপেও সেইরূপ ভুবনমোহন।

এইরূপে ভারতের বিজ্ঞ জ্ঞানবান লোকে কিছু মানেন না। আবার যাঁহারা কিছু মানেন, তাঁহারা শ্রীভগবানকে দৈত্য, অসুর, পিশাচ সাজাইয়া পূজা করেন। এইরূপ যখন সমাজের অবস্থা, তখন প্রভুর নিয়োজিত গোস্বামিগণ সমগ্র শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ইহাই স্থাপিত করিতে লাগিলেন যে, শ্রীভগবান পৃথক বস্তু, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাঁহাকে প্রেম ও ভক্তিতে পাওয়া যায়, তাঁহাকে ভক্তি করিলে জীবের আর জন্ম হয় না, নাশও হয় না, ভক্ত শ্রীভগবানের নিকট বাস করে,—এই সমুদয় তত্ত্ব, তাঁহাদিগকে বেদ বেদান্ত স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতে হইতেছে, তাহা না করিলে তাঁহাদের কথা কেহ মানিবেন না।

কিন্তু এই গোস্বামিগণের কত বাধা দেখ। প্রথমতঃ গৃহে একটি তণ্ডুলও নাই; রৌদ্র বৃষ্টি ঝড়ে আশ্রয় নাই; শীতের বস্ত্র নাই। কিন্তু সর্বাপেক্ষা দুর্লভ দ্রব্য—গ্রন্থ। এইরূপ লক্ষ গ্রন্থের প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যে অমূল্য গ্রন্থ "চৈতন্য-চরিতামৃত" লিখিলেন, তাহাতে সাতশত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থ বৃন্দাবনে বসিয়া সংগ্রহ করিতে হইতেছে। তখন মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না। একখানি বড় গ্রন্থ লিখিতে একজনের এক বৎসর লাগে। লিখিতে হইবে এইরূপ এক সহস্র গ্রন্থ। হস্ত লিখিত গ্রন্থগুলি তন্নতন্ন করিয়া পড়িতে হইবে, পড়িয়া তাহা হইতে শ্লোক লইয়া, মত স্থাপন বা খণ্ডন করিতে হইবে। এখন বুঝিয়া দেখুন, গোস্বামিদিগের কার্য্য কতদূর কঠিন ও গুরুতর।

বৃন্দাবন জঙ্গলময়। নিকটে মথুরা নগর আছে বটে, কিন্তু সে নগর ছারেখারে গিয়াছে। মুসলমানগণ মুহুর্মুহুঃ নগর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতেছে, কাজেই ভদ্রলোকে প্রায় ধনোপার্জন একেবারে ছাড়িয়া দিয়া, কেবল কুস্তী করিয়া গুণ্ডা হইয়াছেন, নহিলে জাতি ও মান থাকে না। নিকটে আর এক নগর আগ্রা। সেখানে মুসলমান আধিপত্যে রাজকার্য্য হইয়া থাকে। কাজেই সে দিক হইতেও কোন সাহায্যের প্রত্যাশা নাই। গোস্বামিগণ বিনয়ের খনি, কেহ যদি প্রণাম করেন, অমনি তাঁহাকে প্রতিপ্রণাম করেন। কাহাকেও নিরাশ, অপ্রতিভ, অপদস্থ কি অনাদর করিতে জানেন না। গোস্বামিগণ গ্রন্থ লিখিতেছেন এমন সময় একজন পণ্ডিত আসিলেন এবং অসার শাস্ত্রের বিচার আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের দশ দিন সময় নষ্ট করিলেন। কোন গোস্বামী গ্রন্থ লিখিতেছেন, এমন সময় ঝড় উঠিল, অমনি গ্রন্থ লেখা বন্ধ হইল। তবুও এই গোস্বামিগণ সহস্র গ্রন্থ লিখিলেন। ইহার এক-একখানি গ্রন্থ এক-একখানি বহুমূল্য রত্ন। ইহা কি শ্রীভগবানের শক্তি ভিন্ন হইতে পারে?

গোস্বামিগণ জঙ্গলময় বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সুযশঃ ভারতবর্ষের সর্বত্রই ব্যাপ্ত হইল। কাঙ্গাল ভক্তগণ বৃন্দাবনে গমন করিয়া গোস্বামিদিগের আশ্রমে রহিয়া গেলেন। চারিদিক হইতে সাধু, পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিগণ গোস্বামিদিগকে দর্শন কি তাঁহাদের সহিত বিচার করিতে আসিলেন। ধনী লোক, মহাজন ও রাজগণ এইরূপে গোস্বামীগণের নিকটে যাইয়া আপনাদের দেহ স্বজন সম্পদের সহিত অর্পণ করিলেন। এমন কি দিল্লীর বাদশাহ আকবর, কুতূহল তৃপ্তির নিমিত্ত, রূপ সনাতনকে দর্শন করিতে আসিলেন। যখন সনাতনের সম্মুখে আকবর জোড়করে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন গোস্বামীর বড় বিপদ হইল। বাদসাহকে নিবারণ করেন এমন সাধ্য নাই। যমুনার তীরে বৃক্ষতলায় একক উপবিষ্ট আছেন, বাদসাহ আসিলে মস্তক নত করিলেন, যেহেতু উদাসীনের রাজদর্শন নিষেধ। কিন্তু আবার বিনয় করিতে লাগিলেন। আকবর, মহাশয় লোক তাঁহার সম্বন্ধে "রাজদর্শন যে নিষেধ" এ কেবল শাসন বাক্য বই নয়, ইহা বুঝিয়া সনাতন অগত্যা কথা কহিলেন। যাত্রাকালীন আকবর বলিলেন, "গোসাঞিও, আমি আপনাকে কিছু সাহায্য করিতে চাই।" সনাতন কাতর হইয়া বলিলেন যে, তিনি উদাসীন, তাঁহার লইবার কিছুই নাই। কিন্তু আকবর ছাড়েন না। তখন (যথা ভক্তমাল গ্রন্থে)—

"একান্ত যদ্যপি রাজা পুনঃ পুনঃ কহে। তবে সনাতন কিছু ভঙ্গি করি চাহে।।
ওই যে যমুনাতীরে আমার আশ্রয়। ভাঙ্গিয়া পড়িল জলে অল্প স্থল হয়।।
এই স্থানটুকু মোরে বান্ধাইয়া দেহ। তব স্থানে মুঞিও আর কিছু নাহি চাহ।।

আকবর তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি আপনার ভৃত্যগণকে কি কি করিতে হইবে তাহা আজ্ঞা করিলেন। এমন সময় বাদসাহের বাহ্যদৃষ্টি গেল, এবং নয়নে আধ্যাত্মিক জগতের উদয় হইল। তখন—"দেখে নানা মণিমুক্তা পরম রতন। মনোহর অলৌকিক পরম মোহন।। শোভা দেখি রাজা তবে বিহ্বল হইল।" আকবর দেখিলেন যে, যমুনাকূল অমূল্য রত্নে খচিত। তখন চেতন পাইয়া জোড়হাতে সনাতনকে বলিতেছেন,—"এবে বুঝিলাম, তুমি এই ত্রিজগতে মহা আঢ্য, ধনিগণ নাই তোমা হ'তে।"

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসিয়া একখানি গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থখানি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে, সুতরাং উহা প্রামাণিক। ঐ গ্রন্থে তিনি আপনার জীবন-কাহিনী লিখিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায় যে, জাহাঙ্গীর একজন হিন্দু-বিদ্বেষী গোঁড়া-মুসলমান ছিলেন। তিনি আপন গ্রন্থে কি বলিতেছেন শুনুন।

তিনি শ্রবণ করিলেন যে, বৃন্দাবনে একজন গোস্বামী আছেন, তিনি যখন পূজা করেন তখন মোহর-বৃষ্টি হয়। অবশ্য ঐ কাহিনী শুনিয়া সম্রাট হাস্য করিলেন। কিন্তু পরে এই কথা বহুজনের মুখে শুনিলেন শেষে কৌতূহল তৃপ্তির নিমিত্ত প্রকৃতই গোস্বামীকে দর্শন করিতে গেলেন। মোহর-বৃষ্টি হয় আরতির সময়। সেই সময় পাতসহ মন্দিরের বাহিরে নিজ-জন সহ দাঁড়াইলেন। দেখেন গোসাঞী তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া আরতি করিতেছেন, আর শত-শত ভক্ত মন্দিরের বাহিরে ভক্তিপূর্বক দর্শন করিতেছেন। আরতি অন্তে প্রকৃতই মোহর-বৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন গোসাঞী উহা ভক্তদের নিকট বিতরণ করিতে দিলেন, আর উহার কতক পাতসাহকে দিতে ইঙ্গিত করিলেন। পাতসাহ ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া ধীরে-ধীরে চলিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার মনে উদয় হইল যে, তিনি প্রণাম না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করা ভাল করেন নাই। ইহাতে ভীত হইয়া যেমন প্রত্যাগমন করিবেন অমনি গোসাঞীর লোক আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, "তিনি যে প্রণাম না করিয়া যাইতেছিলেন, আর তাহাতে তিনি আপনাকে অপরাধী ভাবিতেছিলেন, ইহা গোস্বামীঠাকুরের গোচর হইয়াছে। গোস্বামী বলিয়াছেন যে, আর তাঁহার আসিতে হইবে না। তিনি যে মনে মনে অনুতপ্ত হইয়াছেন, ইহাতেই সে অপরাধ ক্ষালন হইয়াছে। পাতসহ তখন বলিতেছেন যে, "গোসাঞীকে যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম তিনি ভগবানের ভক্ত,

সেই নিমিত্ত তাঁহার ধনের অভাব নাই, আর তিনি অন্তর্যামী।" তখন পাতসহ বুঝিলেন যে, শ্রীভগবান কেবল তাঁহাদের নন। তিনি তাঁহারি, যিনি তাঁহার ভক্ত।

অতএব গোস্বামীদের পরিণামে এরূপ খ্যাতি হয় যে, হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষী মুসলমান সম্রাট পর্য্যন্ত তাঁহাদের চরণে শরণ লইয়াছিলেন। পূর্বে বলিয়াছি যে, দু-একটি করিয়া ভক্ত ও সাধু কেহ বা বহু চেলা কি বহুজন সহ আসিতে লাগিলেন। এই সকল লোকের থাকিবার নিমিত্ত কুটিরের প্রয়োজন, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল পরিষ্কৃত হইতেছিল। তাহার পর দু-একটি করিয়া মন্দির হইতে লাগিল। ক্রমে ধনী লোকে বড় বড় মন্দির স্থাপন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বৃন্দাবন একটি প্রকাণ্ড শহর হইয়া উঠিল। এ সমস্ত করিলেন কে? না, দু-চারটি কন্থা-কয়ঙ্কধারী গৌরাঙ্গ-ভক্ত! তাঁহারা কি জঙ্গল কাটিতেন? না। তাঁহারা কি নিজ হস্তে কোন কার্য্য করিতেন? না। তাঁহারা কি ধন দ্বারা মনুষ্য বশ করিতেন? না,—তাঁহাদের কপর্দকও ছিল না। তাঁহাদের কি নিজ-নিজ কেহ ছিল? না—তাঁহারা উদাসীন। তবে কোন্ শক্তিতে তাঁহারা জঙ্গল কাটিয়া প্রকাণ্ড নগর করিলেন, আর সে স্থান সুন্দর প্রকাণ্ড মন্দির ও অট্টালিকা দ্বারা শোভিত করিলেন? তাঁহাদের শক্তি কেবল প্রভুর কৃপা। সেই প্রভু কোথা? তিনি তখন তিন মাসের পথ দূরে, কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেছেন!

রঘুনাথ ভট্ট বৃন্দাবনে কিছু আরাম লইয়া গেলেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ, সুকণ্ঠ, ভাবুক, প্রেমে পাগল। যিনি তাঁহার ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিতেন, তিনিই আনন্দে উন্মত্ত হইতেন। অনেক লোকে তাঁহার চরণাশ্রয় করিলেন। তাহার মধ্যে একজন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পূর্বে বলিয়াছি, রঘুনাথ ভট্টের দুইটি প্রধান কীর্তি আছে, তাহার মধ্যে একটি কৃষ্ণদাস কবিরাজ।* অনেকের মনে বিশ্বাস, আমাদেরও ছিল যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের গুরু রঘুনাথ দাস; কিন্তু একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিলাম, প্রভু হইতে রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট হইতে কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণদাস হইতে মুকুন্দদাস। তাঁহার আর একটি কীর্তি গোবিন্দদেবের মন্দির। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, সে অমূল্য ধন। গোবিন্দদেবের মন্দির পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথ ভট্টের বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন ঃ

রূপ গোসাঞীর সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রে[illegible] এলায় তার মন।।
অশ্রু কম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র রোধ করে বাষ্প না পারে পড়িতে।।
পিকস্বর-কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ।।
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমেতে বিহ্বল হয় কিছু নাহি জানে।।
গোবিন্দচরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দচরণারবৃন্দ যার প্রাণধন।।
নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দমন্দির করাইল।
বংশী মকর কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল।।
গ্রাম্যবার্তা নাহি শুনে না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণ কথা পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়।।

---

* কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থের ভনিতায় লিখিয়াছেন ঃ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।।

রঘুনাথের এ শিষ্যটি কে? ইনি রাজা মানসিংহ, যে মানসিংহ বাঙ্গালা ও বিহার জয় করেন এবং যিনি আকবরের সর্বপ্রধান কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পদস্থ, কি হিন্দু কি মুসলমান, আর কেহ ছিলেন না।

গোস্বামীগণের মহিমা আমি কি বর্ণনা করিব। যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহাদের কথা বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারাই করুন। নিম্নলিখিত এই প্রাচীন পদ কয়েকটি পাঠ করিলে পাঠক মহাশয় কতক বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহারা কি প্রকাণ্ড বস্তু ছিলেন। এ সমুদয় পদকর্তা, গোস্বামীগণ সম্বন্ধে স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

রূপের বৈরাগ্যকালে, সনাতন বন্দিশালে, বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
"রূপের করুণা করি, ত্রাণ কৈল গৌরহরি, মো অধমে না কৈলা স্মরণে।।
মোর কর্মদোষ-ফাঁদে, হাতে পায়ে গেলে বেন্ধে, রাখিয়াছ কারাগারে ফেলি।
আপনি করুণা পাশে, দৃঢ় করি ধরি কেশে, চরণ নিকটে লহ তুলি।।
পশ্চাতে অগাধ জল, দুই পাশে দাবানল, সম্মুখে পাতিল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে, এইবার কর পরিত্রাণ।।
জগাই মাধাই হেলে, বাসুদেব অজামিলে, অনায়াসে করিলা উদ্ধার।
এ দুঃখ-সমুদ্র ঘোরে, নিস্তার করহ মোরে, তোমা বিনা নাহি হেন আর।।"
হেন কালে এক জনে, অলখিতে সনাতনে, পত্রী দিলে রূপের লিখন।
এ রাধাবল্লভ দাসে, মনে হৈল আশ্বাসে, পত্রী পড়ি করিলা গোপন।।
শ্রীরূপের বড় ভাই, সনাতন গোসাঞী, পাতশার উজীর হৈয়া ছিলা।
শ্রীরূপের পত্রী পাঞা, বন্দী হৈতে পলাইয়া, কাশীপুরে গৌরাঙ্গে ভেটিলা।।
ছেঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি, হাতে নখ মাথে চুলি, নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করি, এক গুচ্ছ দন্তে ধরি, পড়িলা গৌরাঙ্গ পদতলে।।
দরবেশ রূপ দেখি, প্রভুর সজল আঁখি, বাহু পসারিয়া আইসে ধাঞা।
সনাতনে করি কোলে, কাতরে গোসাঞী বলে, "মো অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া।।
অস্পৃশ্য পামর দীন, দুরাচার মতি হীন, নীচ সঙ্গে নীচ ব্যবহার।
এ হেন পামর জনে, স্পর্শ প্রভু কি কারণে, যোগ্য নহি তোমা স্পর্শিবার।।"
ভোট কম্বল দেখি গায়, প্রভু পুনঃ পুনঃ চায়, লজ্জিত হইল সনাতন।
গৌড়ীয়ারে ভোট দিয়া, ছেঁড়া এক কান্থা লৈয়া, প্রভু স্থানে পুন আগমন।
গৌরাঙ্গ করুণা করি, রাধা-কৃষ্ণ নাম মাধুরী, শিক্ষা করাইলা সনাতনে।
প্রভু কহে রূপ সনে, দেখা হবে বৃন্দাবনে, প্রভু আজ্ঞায় করিলা গমনে।।
কভু কান্দে কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে, কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।
ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণগুণ গাথা, পরিধান ছেঁড়া বহির্বাস।।
গিয়া গোসাঞী সনাতন, প্রবেশিলা বৃন্দাবন, রূপ সঙ্গে হইল মিলন।
ঘর্ম অশ্রু নেত্রে পড়ে, সনাতনের পদে ধরে, কহে রূপ গদ্‌গদ্ বচন।।
গৌরাঙ্গের যত গুণ, কহে রূপ সনাতন, হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে।
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে, এইরূপে কত দিন থাকে।।
তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে, ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে, ফল মল করয়ে ভক্ষণ।
উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদে, রাধা-কৃষ্ণ বলি কাঁদে, এইরূপে থাকে কতদিন।।
কতদিন অন্তর্মনা, ছাপান্ন দণ্ড ভাবনা, চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
স্বপ্নে রাধা-কৃষ্ণ দেখে, নাম গানে সদা থাকে, অবসর নাহি এক তিলে।।
কখন বনের শাক, অলবণে করি পাক, মুখে দেন দুই এক গ্রাস।

ছাড়ি ভোগ বিলাস, তরুতলে কৈলা বাস, এক দুই দিন উপবাস।।
সূক্ষ্মবস্ত্র বাজে গায়, ধূলায় ধূসর কায়, কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ।
এ রাধাবল্লভ দাস, বড় মনে অভিলাষ, কবে হব তাঁর দাসের দাস।।

জয় সাধু শিরোমণি সনাতন রূপ। যো দুঁহু প্রেম-ভকতি রসকূপ।।
রাধা-কৃষ্ণ ভজনক লাগি। শ্রীবৃন্দাবন ধামে বৈরাগী।।
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ। মিলল সকল ভকতগণ সাথ।।
সবে মিলি প্রেম ভকতি পরচারি। যুগল ভজন ধন জগতে বিথারি।।
অনুখণ গৌরচন্দ্র গুণগান। ভরল প্রেমে ওর নাহি পান।।
কতিহুঁ না হেরিয়ে ঐছে উদাস। মনে হর সতত চরণে করু আশ।।

জয় ভট্ট রঘুনাথ গোসাঞী।
রাধা-কৃষ্ণ লীলাগুণে, দিবানিশি নাহি জানে, তুলনা দিবার নাহি ঠাঞি।। ধ্রু
চৈতন্যের প্রেমপাত্র, তপন মিশ্রের পুত্র, বারাণসী ছিল যার বাস।
নিজগৃহে গৌরচন্দ্রে, পাইয়া পরমানন্দে, চরণ সেবিলা দুই মাস।।
শ্রীচৈতন্য নাম জপি, কত দিন গৃহে থাকি, করিলেন পিতার সেবনে।
তাঁর অপ্রকট হৈলে, আসি পুন নীলাচলে, রহিলেন প্রভুর চরণে।।
মহাপ্রভু কৃপা করি, নিজ শক্তি সঞ্চারি, পাঠাইয়া দিলা বৃন্দাবন।
প্রভুর শিক্ষা হৃদি গণি, আসি বৃন্দাবন-ভূমি, মিলিলেন রূপ সনাতন।।
দুই গোঁসাঞী তাঁরে পাঞা, পরম আনন্দ হৈয়া, রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমরসে ভাসে।
অশ্রু পুলক কম্প, নানা ভাবাবেশে অঙ্গ, সদা কৃষ্ণ-কথার উল্লাসে।।
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে, যমুনাপুলিনে রঙ্গে, একত্র হইয়া প্রেমসুখে।
শ্রীভাগবত-কথা, অমৃত সমান গাথা, নিরবধি শুনে যার মুখে।।
পরম বৈরাগ্য-সীমা, সুনির্মল কৃষ্ণপ্রেমা, সুস্বর অমৃতময় বাণী।
পশু-পক্ষী পুলকিত, যার মুখে কথামৃত, শুনিতে পাষাণ হয় পানী।।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, সর্বারাধ্য দুই জন, শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।
এ রাধাবল্লভ বোলে, পুড়িলুঁ বিষম ভোলে, কৃপা করি কর আত্মসাথ।।
শ্রীচৈতন্যকৃপা হৈতে, রঘুনাথদাস চিতে, পরম বৈরাগ্য উপজিলা।
দারা গৃহ সম্পদ, নিজ রাজ্য অধিপদ, মল প্রায় সকল ত্যজিলা।।
পুরশ্চর্য্য কৃষ্ণ-নামে, গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে, গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ, পুনঃ রঘুনাথ দাস, নয়ন গোচর কবে হবে।।
গৌরাঙ্গ দয়াল হৈয়া, রাধা-কৃষ্ণ নাম দিয়া, গোবর্দ্ধন শিলা গুঞ্জাহারে।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে, সমর্পণ করিল তাঁহারে।।
চৈতন্যের অগোচরে, নিজ কেশ ছিড়ি করে, বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।
দেহ ত্যাগ করি মনে, গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে, দুই গোসাঞী তাঁহারে দেখিলা।।
ধরি রূপ সনাতন, রাখিলা তাঁর জীবন, দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোসাঞীর আজ্ঞা পাঞা, রাধাকুণ্ড তটে গিয়া, বাস করি নিয়ম করিলা।।
ছেঁড়া কম্বল পরিধান, বনফল গব্য খান, অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি, স্মরণ কীর্তন করি, রাধা-পদ ভজন যাঁহার।।
ছাপান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে, রাধাকৃষ্ণ গুণ-গানে, স্মরণেতে সদাই গোঙায়।
চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে, এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়।।
গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে, রাখে মনোভৃঙ্গরাজে, স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়।

অভেদ শ্রীরূপ সনে, গতি যার সনাতনে, ভট্টযুগ প্রিয় মহাশয়।।
শ্রীরূপের গণ যত, তাঁর পদে আশ্রিত অত্যন্ত বাৎসল্য যার জীবে।
সেই আর্তনাদ করি, কাঁদে বলে হরি হরি, প্রভুর করুণা হবে কবে।।
"হে রাধার বল্লভ, গান্ধর্বিকা বান্ধব, রাধিকা রমণ রাধানাথ।
হে বৃন্দাবনেশ্বর, হাহা কৃষ্ণ-দামোদর, কৃপা করি কর আত্মসাথ।।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, যবে হৈল অদর্শন, অন্ধ হৈল এ দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি, বৃথা প্রাণ দেহে রাখি, এত বলি করয়ে ক্রন্দন।।
শ্রীচৈতন্য শচীসুত, তাঁর গণ হয় যত, অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব দল, সবারে করয়ে পরণাম।।
রাধাকৃষ্ণ বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে, শুখরুখ অন্নমাত্র সার।
শ্রীগৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিল আগে, ফল গব্য করিল আহার।।
সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি সেই দিনে, কেবল করয়ে জলপান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে, রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ।।
শ্রীরূপের অদর্শনে, না দেখি তাঁহার গণে, বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কাঁদে।
কৃষ্ণ-কথা আলাপন, না শুনিয়া শ্রবণ, উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আর্তনাদে।
হাহা রাধাকৃষ্ণ কোথা, কোথা বিশাখা ললিতা, কৃপা করি দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু, হাহা প্রভু রূপ সনাতন।।
কান্দে গোঁসাঞী রাত্রিদিনে, পুড়ি যায় তনু মনে, ক্ষণে অঙ্গ ধুলায় ধূসর।
চক্ষু অন্ধ অনাহার, আপনার দেহ ভার, বিরহে হইল জর জর।।
রাধাকুণ্ডতটে পড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি, মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেমে অশ্রু নেত্রে পড়ে, মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ।।
সেই রঘুনাথ দাস, পুরহি মনের আশ, এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভ দাস, মনে বড় অভিলাষ, প্রভু মোরে কর পরসাদ।।

অষ্টম অধ্যায়

পাণিহাটী গ্রামে রাঘবের বাস। তিনি ধনবান্ ব্যক্তি, প্রভুর একান্ত ভক্ত। শ্রীনিতাই যখন গৌড়ে ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার বাটীতেই প্রথমে আড্ডা করেন। যখন নিত্যানন্দ সে স্থান মাতাইয়া তুলিলেন, তখন রঘুনাথ দাস বাটীতে আছেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কোথাও যাইতে দেন না, কিন্তু তিনি অনেক মিনতি করিয়া পিতার নিকট বিদায় লইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে দর্শন মানসে পাণিহাটী আসিলেন। নিতাই তাঁহাকে বড় আদর করিলেন; পরে বলিলেন, "রঘুনাথ, তুমি ধনী, আমাকে ও আমার ক্ষুধিত ভক্তগণকে একবার উদরপূর্তি করিয়া ভোজন করাও।" এই-আজ্ঞা পাইয়া রঘুনাথ আহ্লাদে পুলকিত হইলেন, ও মহা উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন দেশময় এ কথা প্রচার হইল ও পাণিহাটীতে যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সবারই নিমন্ত্রণ, যিনি আসিবেন, তিনিই প্রসাদ পাইবেন। যিনি যাহা আনিবেন তাহাই ক্রয় করা হইবে। এই কথা প্রচার হওয়ায় চিপিটক, দধি, খই, মিষ্টান্ন, আম্র, কাঁটাল, চাঁপাকলা প্রভৃতি ভারে ভারে আসিতে লাগিল। আষাঢ় মাস আরম্ভ, সুতরাং ফলের কোন অভাব নাই। যে স্থানে মহোৎসব হইবে, সে স্থানটি অতি মনোহর; গঙ্গার ধারে বটবৃক্ষচ্ছায়ায় ভক্তগণ বসিলেন। যিনি যাহা বিক্রয় করিতে আনিতেছেন, তাহাই ক্রয় করিয়া তৎদ্বারা তাঁহাকে ভুঞ্জান হইতেছে।

মধ্যস্থলে দুইখানি পাতা পড়িল,—একখানি স্বয়ং মহাপ্রভুর জন্য, অপরখানি নিতাইয়ের

নিমিত্ত। মহাপ্রভু যদিও তখন নীলাচলে, কিন্তু নিতাইয়ের আকর্ষণে তিনি আসিলেন। তখন সহস্র সহস্র লোকের সাক্ষাতে নিতাই মহাপ্রভুকে অতি আদরের সহিত ভুঞ্জাইতে লাগিলেন। লোকে আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ কৃতকৃতার্থ হইলেন। অদ্যাপি সেই স্থানে প্রতি-বৎসর চিড়া-মহোৎসব হইয়া থাকে।

রাঘবের বিধবা-ভগ্নী দময়ন্তী অতি শুদ্ধা, পবিত্রা ও মহাপ্রভুর ভক্ত। তাঁহার এক অধিকার ছিল, তিনি "রাঘবের ঝালী" প্রস্তুত করিতেন। মহাপ্রভু নীলাচলে প্রকট, সুতরাং হৃদয়ে তাঁহাকে পূজা করিয়া ভক্তগণের তৃপ্তি হইত না। তাই নীলাচলের ভক্তগণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, আর দূরের ভক্তগণ ভোগের দ্রব্য সঙ্গে করিয়া সেখানে লইয়া যান। কেবল শচী আর বিষ্ণুপ্রিয়া যে এইরূপ ভোগ পাঠান তাহা নয়, ভক্তমাত্রেই পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু দময়ন্তীর সেবা অন্য প্রকার। প্রভু সারা বৎসর ভোগ করিবেন, এইরূপ দ্রব্য তিনি প্রস্তুত করেন। ইহা করিতে বিস্তর কারিগরির প্রয়োজন। যেহেতু আহারীয় বস্তু মাত্রেই অতি সত্বর পচিয়া যায়। তাই তিনি এইরূপ সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত করেন যাহা সত্বর নষ্ট না হয়, কি পাকের গুণে এক বৎসর উত্তম অবস্থায় থাকে। এই সমুদয় স্থায়ী স্বাদু দ্রব্য দিয়া ঝালী সাজান হয়। তাহার পরে তাহাতে মোহর মারা হয়, এবং উহা মকরধ্বজ করের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। যখন যখন ভক্তগণ নীলাচলে গমন করেন সেই সঙ্গে তিনিও গমন করেন। ঝালী মুটিয়াগণের মাথায় থাকে, আর মকরধ্বজ আপনার প্রাণ দিয়া উহা রক্ষা করেন। ইহাই "রাঘবের ঝালী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীচরিতামৃতে ঝালীর দ্রব্য এইরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। যথা—আম্র-কাসন্দি আদা-কাসন্দি ঝাল-কাসন্দি আর নেম্বু-আদা আম্রকলি বিবিধ প্রকার।

আমসী আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমতা। যত্ন করি দিল গুণ্ডা পুরাণ শুকুতা।।
শকুতা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিতে। শুক্তায় যে সুখ তাহা নহে পঞ্চামৃতে।।
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়। শুক্তাপাতা কাসন্দিতে মহাসুখ হয়।।
ধনিয়া মৌরীর তণ্ডুল গুণ্ডি করিয়া। লাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া।।
শুণ্ঠিখণ্ড লাড়ু আর আমপিত্ত-হর। পৃথক পৃথক বান্দি বস্ত্রের কুথলী ভিতর।।
কলিশুণ্ঠি কলিচূর্ণ কলিখণ্ড আর। কত নাম লব, আর শত প্রকার আচার।।
নারিকেল-খণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজল। চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল।।
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার। অমৃতকর্পূর আদি অনেক প্রকার।।
শালিকাচুট ধান্যের আতপচিড়া করি। নূতন বস্ত্রের বড় কুথলীতে ভরি।।
কতক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া। চিনিপাকে লাড়ু কৈলা কর্পূরাদি দিয়া।।
শালিতণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া। ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া।।
কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস। চূর্ণ দিয়া লাড়ু কৈলা পরম সুবাস।।
শালিধান্যের খৈ ঘৃতেতে ভাজিয়া। চিনিপাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া।।
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল। চিনি কর্পূর দিয়া তায় লাড়ু কৈল।।
কহিতে না জানি নাম এজন্মে যাহার। ঐছে নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহস্র প্রকার।।
রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী। দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম ভকতি।।
গঙ্গার মৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছাঁকিয়া। পাঁপড়ি করিয়া নিল গন্ধদ্রব্য দিয়া।।
পাতাল মৃতপাত্রে সোন্দাইয়া দিল ভরি। আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলি।।

জীবের বড় সাধ শ্রীভগবানকে সেবা করেন, আর তাঁহাদের সেই সাধ মিটাইবার নিমিত্ত শ্রীভগবানের মায়া অবলম্বন করিতে হয়। যদি শ্রীভগবান পূর্ণ হইয়া, বসিয়া থাকেন তবে আর জীব তাঁহাকে সেবা করিতে পারে না। তাই সকলের ইচ্ছা প্রভুকে খাওয়াইবেন। রাঘব যে ঝালি সাজাইয়া পাঠাইতেন, তাহা সারা বৎসরের নিমিত্ত রাখা হইত। কিন্তু অন্যান্য

ভক্তগণও ঐরূপ প্রভুকে উপহার দিতেন। শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া, মালিনী এবং বহুতর ভক্তগণ প্রভুর নিমিত্ত যে উপহার দিতেন, তাহা গোবিন্দের হাতে রাখা হইত। "গোবিন্দ, প্রভুকে দিও" সকলেরই এই কথা। গোবিন্দ বলেন, "আচ্ছা"। কিন্তু প্রভুকে ঐ সমুদয় ভুঞ্জান কঠিন ব্যাপার। প্রথমতঃ ঐ যে সাতশত ভক্ত প্রদত্ত উপহার, ইহা একত্র করিলে প্রকাণ্ড একটি যজ্ঞ হয়। তার পরে, ভক্তগণ নীলাচলে আসিলে প্রত্যহ মহোৎসব হয়। প্রভুর কোন কোন দিন বহুবার নিমন্ত্রণে যাইতে হয়। সুতরাং তাঁহার ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্য আস্বাদনের সময় থাকে না। সকল ভক্তেই জিজ্ঞাসা করেন, "গোবিন্দ প্রভুকে দিয়াছ?" "গোবিন্দ উত্তরে বলেন, "না, পারি নাই, অপেক্ষা কর।" এইরূপ প্রত্যহ শত শত ভক্ত আসিতেছেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "গোবিন্দ, আমার দ্রব্য দিয়াছিলে?" গোবিন্দ বলিতেছেন, "না, সুবিধা পাই নাই।" ভক্ত মাত্রেই গোবিন্দকে মিনতি করিয়া বলিতেছেন, "গোবিন্দ, অবশ্য অবশ্য আমার দ্রব্য অগ্রে দিও।" গোবিন্দ করেন কি, বলেন "আচ্ছা"।

এইরূপ প্রত্যহ প্রাতে শত শত ভক্ত গোবিন্দের নিকট আগমন করেন। ভক্ত আসিতেছেন দেখিলে গোবিন্দের মুখ শুকাইয়া যায়। পলাইতে পারিলে পলাইতেন, কিন্তু তাহার সুবিধা নাই। প্রভুর নিকট সর্বদা থাকিতে হয়। পরিশেষে গোবিন্দ প্রভুর শরণ লইলেন; বলিলেন, "প্রভো! দাসকে রক্ষা কর।" প্রভু বলিলেন, "কি? তোমার আবার দুঃখ কি?" গোবিন্দ বলিলেন, "সকলে উপহার দিয়াছেন, সকলের ইচ্ছা তুমি আস্বাদ কর। আমি তোমাকে ভুঞ্জাইতে পারি না। সকলে প্রত্যহ আইসেন, আসিয়া আমাকে মিনতি করেন। যখন শুনেন যে আমার দ্বারা তাঁহাদের কার্য হয় নাই, তখন আমার মাথা খান।"

প্রভু হাস্য করিয়া বলিলেন, "এই কথা? কে কি উপহার আনিয়াছেন লইয়া আইস।" এই কথা বলিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর মূর্তি ধারণ করিয়া জলযোগে বসিলেন। গোবিন্দ এক এক জনের দ্রব্য আনিতেছেন আর বলিতেছেন, "ইহা মা জননীর"। প্রভু হাত পাতিয়া বলিলেন "দাও"। ভোজন করিয়া প্রভু আবার হাত পাতিতেছেন। গোবিন্দ বলিতেছেন, "ইহা শ্রীবাসের"। এইরূপ গোবিন্দ এক-একজন ভক্তের দ্রব্য প্রভুর হাতে দিতেছেন, এবং কাহার দ্রব্য তাহা বলিতেছেন, আর প্রভু আহার করিতেছেন। এইরূপে অল্পক্ষণের মধ্যে এক যজ্ঞের উপযুক্ত সমুদয় সামগ্রী প্রভু আহার করিলেন; করিয়া বলিতেছেন, "আর আছে? তখন গোবিন্দ বলিলেন, "রাঘবের ঝালী ছাড়া আর কিছু নাই।" প্রভু বলিলেন, "তাহা অদ্য থাকুক।" পূর্বে বলিয়াছি, ভগবানের কাচ-কাচা সহজ নহে,—মনুষ্যে পারে না।

শিবানন্দ সেন, কাঞ্চনপাড়ায় বাড়ী, প্রভুর বড় প্রিয়ভক্ত। যাঁহারা প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে যান, তাঁহাদের পাথেয়াদি দিয়া তিনি সঙ্গে লইয়া যান,—এমন কি, কুক্কুর পর্য্যন্ত। প্রকৃতই একটি কুক্কুর যাত্রিগণের সঙ্গে চলিয়াছেন। কাজেই এই জন্মে কুক্কুর হইলেও, তিনি ভক্তির পাত্র। শিবানন্দ প্রত্যহ সেই কুক্কুরকে ডাকিয়া আহার দেন। পথে এক নাবিক কুক্কুরকে পার করিতে অস্বীকার করিল। শিবানন্দ অনুনয় বিনয় করিলেন, নাবিক শুনিল না। তখন তিনি দশ পণ কড়ি দিয়া কুক্কুরকে পার করিলেন। একদিন প্রভাতে শিবানন্দ কুক্কুরকে দেখিতে পাইলেন না। তখন সেবকের মুখে শুনিলেন যে, সে গত রজনীতে তাহাকে আহার দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। শিবানন্দ দুঃখিত হইয়া কুক্কুর তল্লাস করিতে দশজন লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কুক্কুর পাওয়া গেল না। শিবানন্দ উহাতে আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। এমন কি, উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিলেন। ফল কথা, শিবানন্দ সেনের মনে বিশ্বাস যে, এই কুক্কুর সামান্য বস্তু নহেন, কোন মহাজন হইবেন, নতুবা বাঙ্গলা ত্যাগ করিয়া ভক্তগণের সঙ্গে প্রভুর নিকট কেন যাইতেছেন। শিবানন্দ সেন শান্ত হইয়া স্নানাহার করিলেন, এবং ভক্তগণ সহ নীলাচলে প্রভুর ওখানে গমন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ভক্তগণ একদিন

প্রভুকে দর্শন করিতে গিয়া দেখিলেন যে, সেই কুক্কুর প্রভুর অল্প দূরে বসিয়া আছেন, আর প্রভুর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। সে কিরূপে? না, প্রভু নিজ হস্তে তাঁহাকে নারিকেল-শস্যখণ্ড ফেলিয়া দিতেছেন, আর কুক্কুর তাহা ভক্ষণ করিতেছেন। আবার প্রভু বলিতেছেন, "কৃষ্ণ বল", আর কুক্কুর প্রকৃতই "কৃষ্ণ" বলিতেছেন। শিবানন্দ সেন অমনি কুক্কুরকে প্রণাম করিয়া আপনার শত অপরাধ জানাইলেন। সেই দিন হইতে আর তাঁহাকে দেখা গেল না।

শ্রীকান্ত শিবানন্দের ভাগিনা। প্রভুর নিকট একক গমন করিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে দুই মাস নিকটে রাখিয়া দিলেন। শিবানন্দ তাঁহার নিয়ম মত যাত্রী লইয়া নীলাচলে যাইতেছেন। এবার তাঁহার সঙ্গে স্ত্রী পুত্র ও অন্যান্য বৈষ্ণব-গৃহীণীরাও আছেন। তাঁহার স্ত্রীকে কেন সঙ্গে লইলেন তাহার কারণ বলিতেছি। তিনি ৭। ৮ বৎসর পূর্বে প্রভুকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তখন প্রভু শিবানন্দকে বলিয়াছিলেন যে, তোমার এবার একটি পুত্র হইবে, পরমানন্দপুরী গোসাঞীর নামে তাহার নাম রাখিবে। তাঁহার স্ত্রী অন্তঃস্বত্বা ছিলেন শিবানন্দ সেন বাড়ী যাইয়া দেখিলেন তাঁহার একটি পুত্র হইয়াছে। প্রভুর আজ্ঞাক্রমে এই পুত্রের নাম পরমানন্দ দাস রাখিলেন।

শিবানন্দের বড় সাধ, পুত্রটিকে লইয়া গিয়া প্রভুকে দেখাইবেন। কিন্তু শিবানন্দ সেনের এই শেষ পুত্র। তাঁহার গর্ভধারিণী পুত্রটিকে অত দূরদেশে যাইতে দিতে চাহেন না। কাজেই শিবানন্দ তাঁহার ঘরণীকে সঙ্গে করিয়া, আর শিশু-পুত্রটিকে নিজে কোলে করিয়া, নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন। পথে যাইতে স্থানে স্থানে ঘাটিতে দান দিতে হয়। একটি ঘাটিতে কয়টি ভক্ত গণিয়া শিবানন্দ সেন তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া ওপারে পাঠাইয়া দিলেন, আর আপনি ঘাটিতে দান বুঝিয়া দিতে জামিন স্বরূপ রহিলেন। তাঁহার আসিতে বিলম্ব হওয়ায় ভক্তগণের বাসা হয় নাই। শ্রীনিত্যানন্দ ক্ষুধায় কাতর হইয়া শিবানন্দ সেনের তিনটি পুত্রকে শাপ দিতেছেন, বলিতেছেন, যেমন শিবা আমাকে ক্ষুধায় ক্লেশ দিতেছে, তেমনি তাহার তিনটি ছেলে মরে যাক। কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, শিবার কোন অপরাধ নাই। অপরাধের মধ্যে শত শত ভক্তগণকে পালন করিয়া বাংলা দেশ হইতে পুরী নগরীতে লইয়া যান। তাহার পর, ভক্তগণকে যে বাসা দিতে বিলম্ব হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার দোষ নাই। ঘাটীরক্ষক তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি সকলকে ছাড়াইয়া, তাহার প্রাপ্য দিবার নিমিত্ত সেখানে ছিলেন। অতএব শিবার কোন দোষ নাই। যত অপরাধ সমুদয় আমার ঠাকুর নিতাইয়ের। তাহার পরে শুনুন। নিতাই শিবানন্দের ঘরণীকে শুনাইয়া তাঁহার পুত্রকে শাপিয়াছেন, ঘরণী ইহাতে ভয় ও দুঃখে অতি কাতর হইয়াছেন। শিবানন্দ ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পত্নী ভয় পাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন যে, গোসাঞী 'তিন পুত্র মরুক' বলিয়া শাপ দিয়াছেন। শিবানন্দ হাসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি কাঁদ কেন? আমার তিন পুত্র মরিবে মরুক, গোসাঞীর বালাই লইয়া মরিয়া যা'ক"। ইহাই বলিয়া নিতাইয়ের নিকট গেলেন। নিতাই শিবানন্দকে পাইয়া অমনি উঠিয়া এক লাথি মারিলেন। শিবানন্দ লাথি খাইয়া আর কিছু না বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র বাসা করিয়া ঠাকুরকে সেখানে লইয়া গেলেন। সেখানে স্নানাহার করিয়া সকলে শান্ত হইলেন।

তখন শিবানন্দ সেন গদগদ হইয়া নিতাইকে বলিতে লাগিলেন, "আজ আমার দিন সুপ্রভাত। তোমার চরণরেণু ব্রহ্মার দুর্লভ ধন। আমি তাহা অনায়াসে পাইলাম। আজ আমার জন্ম সার্থক হইল, দেহ পবিত্র হইল।" নিত্যানন্দ অগ্রে চঞ্চলতা করিয়াছেন, কিন্তু বাসা পাইয়াই একটু অনুতাপের উদয় হইয়াছে। তাহার পর শিবানন্দ যখন আবার স্তব আরম্ভ করিলেন, তখন "অভিমানশূন্য, অক্রোধ পরমানন্দ" নিতাই নিজে উঠিয়া তাঁহাকে গাঢ়

আলিঙ্গন করিলেন। অবশ্য ঠাকুরের অন্যায়, কিন্তু অদ্বৈতের কি নিতাইয়ের ক্রোধ কেবল "হাস্যময়"। সকলেই জানে "নিতাই মার খাইয়া দয়া করেন।" যে ঠাকুর মার্ খাইয়া দয়া করেন, তিনি অবশ্য মারিয়াও দয়া করেন। শিবানন্দ তাহা জানিতেন, আর জানিয়াই লাথি খাইয়া নিত্যানন্দের পায়ে ধরেন। কিন্তু শ্রীকান্ত অল্প-বয়স্ক। তাহার মাতুল পিতৃসম্পর্কীয়, বেশ গণ্যমান্য। তিনি তিন শত ভক্তের সম্মুখে লাথি খাইলেন, ইহাতে শ্রীকান্তের ক্রোধ হইল। তাই বলিলেন, "গোসাঞী যাহাকে লাথি মারিলেন, তিনি সামান্য লোক নহেন, তিনিও মহাপ্রভুর একজন পার্ষদ। ঠাকুরালী করিবার বুঝি আর স্থান পাইলেন না? আমি যাই, প্রভুর নিকট এ সমুদয় কথা নিবেদন করিব।" এই ভয় দেখাইয়া শ্রীকান্ত সমস্ত সঙ্গী ছাড়িয়া অগ্রবর্তী হইলেন। শ্রীকান্ত যাইয়া একেবারে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। গোবিন্দ সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন, বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন, "তুমি কর কি? গায়ের পেটাঙ্গি না খুলিয়াই ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছ?" কথা এই, অতি বড় গুরুজনকে প্রণাম করিবার আগে যেমন জুতা খুলিতে হয়, তেমনি অঙ্গরক্ষক বা পেটাঙ্গি খুলিতে হয়।

প্রভু বলিলেন, "গোবিন্দ! শ্রীকান্তকে কিছু বলিও না। মনে বড় দুঃখ পাইয়া আসিয়াছে। উহার যাহাতে সুখ হয় তাহাই কর।" এই কথা শুনিয়া শ্রীকান্ত বুঝিলেন যে, সর্বজ্ঞ প্রভু তাহার মনে কি দুঃখ তাহা বলিবার অগ্রে আপনিই অবগত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি যাহা বলিবেন মনে করিয়া আসিয়াছেন তাহা আর বলিলেন না। বিশেষতঃ অন্তরে যে একটু মলিনতা হইয়াছিল, প্রভুর দর্শনে তাহাও তখন অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রভু বলিতেছেন, "শ্রীকান্ত, কে কে আসিতেছেন?" শ্রীকান্ত নাম বলিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নাম শুনিয়া প্রভু বলিতেছেন, "আচার্য্য এখানে কি তামাসা দেখিতে আসিতেছেন?" এ কথা শুনিয়া সকলে চমকিত হইলেন। প্রভুর মুখে কর্কশ বাক্য কেহ কখনও শুনিতে পান না। তাহার পরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে যত ভক্তি করেন, এমন আর কাহাকেও করেন না,—এমন কি, পুরী ভারতীকেও নহে। স্বরূপ প্রভৃতি যাহারা উপস্থিত ছিলেন, এই কথা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে প্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সম্বন্ধে ঐরূপ কর্কশ কথা কেন বলিলেন। কিন্তু প্রভু আপনিই তাঁহাদের মনের তর্কের মীমাংসা করিলেন। কারণ প্রভু কর্কশ বাক্য বলিয়াই আবার বলিতেছেন, "শ্রীকান্ত, বলিতে পার, আচার্য্যের এবার রাজার নিকট কিছু প্রাপ্তির আশা আছে না কি?" শ্রীকান্ত এ কথার কোন উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। "রাজার নিকট কিছু প্রাপ্তির আশা আছে" প্রভুর এই কথার তাৎপর্য্য ক্রমে বলিব।

শিবানন্দ সেন ইহার পরে পুত্রকে কোলে করিয়া শত শত ভক্তের সহিত নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহার শত শত ভক্তগণ সহ তাঁহাদিগকে অগ্রবর্তী হইয়া লইতে আসিলেন। যখন দুই দলে মিলিত হইল, তখন মহাকলরব উঠিল। পরমানন্দের বয়স তখন সাত বৎসর। তিনি শুনিয়াছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে দেখিতে যাইতেছেন। আবার পিতার কোলে থাকিয়া শুনিলেন যে, অগ্রে যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রভু আছেন। তখন তিনি ব্যগ্র হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাবা, গৌরাঙ্গ কৈ? আমায় দেখাইয়া দাও।" তাহাতে শিবানন্দ সেন কি উত্তর দিলেন, তাহা পরমানন্দ পরে তাঁহার 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে' লিখেন। তাহার একটি শ্লোক এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ বিদ্যুদ্দামদ্যুতিরতিশয়োৎকণ্ঠিরবেন্দ্র।

ক্রীড়াগামী কনকপরিঘদ্রাঘিমোদ্দামবাহুঃ।।
সিংহগ্রীবো নবদিনকরদ্যোতবিদ্যোতিবাসাঃ,
শ্রীগৌরাঙ্গঃ স্ফুরতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ।।

যখন পরমানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা গৌরাঙ্গ কই?" তখন শিবানন্দ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখাইয়া ক্রোড়স্থিত পুত্রকে বলিতেছেন, "হে বালক, আমাদের প্রভু কে, তাহা কি দেখাইয়া দিতে হয়? ঐ যে সোণার বরণ, দীর্ঘ তেজোময় বস্তুটি, যাঁহার কমলনয়ন দিয়া অবিরত প্রেমধারা পড়িতেছে, উনিই শ্রীগৌরাঙ্গ। হে পুত্র, উঁহাকে প্রণাম কর।" ইহা বলিয়া কোল হইতে পুত্রকে নামাইলেন, ও পিতাপুত্রে দূর হইতে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করিলেন।

পুত্রটিকে লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে কিরূপে উপস্থিত করিবেন, শিবানন্দ ইহাই ভাবিতেছেন। যেহেতু প্রভুর বাসায় সর্বদা লোকে পূর্ণ। কয়েক দিন পরে একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। যেখানে তিনি তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া বাসা করিয়াছিলেন, তাহার নিকট দিয়া এক দিবস প্রভু তিনটি ভক্ত সহ যাইতেছিলেন। শিবানন্দ সেন ও তাঁহার ঘরণী ইহা দেখিয়া অগ্রবর্তী হইয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়া শিবানন্দ করজোড়ে বলিলেন, "ভগবান্! একবার দাসানুদাসের বাটিতে পদধূলি দিয়া যাইতে আজ্ঞা হয়।" ইহা শুনিয়া প্রভু "তোমার যাহা অভিরুচি" বলিয়া স্বীকার করিলেন। এখানে আর একটি কথা বলা কর্তব্য। প্রভু কখনও স্ত্রীলোকের মুখ দেখিতেন না কিন্তু যাঁহাদের উপর বাৎসল্য ভাব, কি যাঁহারা গুরুজন, এরূপ স্ত্রীলোকের সহিত তিনি সেইরূপ ব্যবাহার করিতেন না। শিবানন্দের পত্নীকে তিনি কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং শিবানন্দ সেনের বাড়ীতেও পূর্বে গিয়াছেন। প্রভুকে বাসায় আনিয়া সেন মহাশয় সেই সপ্তবর্ষীয় পুত্রকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "ভগবান! এই তোমার সেই বরপুত্র। ইহার নাম আপনার আজ্ঞাক্রমে 'পরমানন্দ দাস' রাখিয়াছি, আর আপনি ইহাকে কৃপা করিবেন বলিয়া এতদূরে শ্রীচরণে আনিয়াছি।" ইহাই বলিয়া পুত্রকে বলিলেন, "পুত্র, শ্রীভগবানকে প্রণাম কর।" বালক পরমানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু বলিলেন, " তোমার দিব্য পুত্র হইয়াছে।" ইহাই বলিয়া স্নেহার্ত হইয়া তাহার মস্তকে চরণ দিতে গেলেন। শিশু পরমানন্দ ইহার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া মস্তক নত করিলেন না, বরং মুখব্যাদান করিলেন। বাল্যস্বভাবশতঃই হউক, বা প্রভুর ইচ্ছাক্রমেই হউক, এইরূপে মুখব্যাদন করিলে, প্রভু তাঁহার চরণাঙ্গুষ্ঠ বালকের মুখে দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, বালক ইহাতে বিরক্ত না হইয়া, কি কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, যেমন শিশুসন্তান স্তনপান করে, সেইরূপ দুই হস্তে শ্রীপদ ধরিয়া, অতি সতৃষ্ণ মনে সেই অঙ্গুষ্ঠ চুষিতে লাগিলেন।

প্রভু যখন এই চরণাঙ্গুষ্ঠ সেই বালকের মুখের মধ্যে দিলেন, তখন কি বলিলেন তাহা এই পরমানন্দ দাসের "বৃন্দাবনচম্পূতে" লিখিত আছে। (স্মরণ থাকে যেন, এই পরমানন্দ প্রভুর বরে দৈববিদ্যা পাইয়া কবিরূপে জগতে বিদিত হইলেন। তিনি চৈতন্যচরিত, বৃন্দাবনচম্পূ ওচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থ লিখেন। অতএব এই যে কাহিনী বলিতেছি ইহা তিনি স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।) যথা-

বৎসাস্বাদ্য মুহুঃস্বয়া রসনয়া প্রাপষ্য সৎকাব্যতাং,
দেয়ং ভক্ত জনেষু ভাবিষু সুরৈর্দুষ্প্রাপ্যমেতত্ত্বয়া।

"হে বৎস্য! দেবদুর্লভ বস্তু স্বয়ং আস্বাদন করিয়া ভাবি ভক্তগণকে প্রকাশ করিবে।" পরমানন্দ বলিতেছেন, 'ইহা বলিয়া প্রভু তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ আমার মুখে দিয়াছিলেন।"

পরমানন্দ পদাঙ্গুষ্ঠ চুষিতেছেন, প্রভু উহা বালকের মুখ হইতে আনিয়া বলিলেন, "বৎস, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ।" পরমানন্দ কিছু বলিলেন না। তখন আবার বলিলেন, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।" তবু পরমানন্দ দাস কিছু বলিলেন না, তখন বালকের পিতামাতা ব্যগ্র হইয়া, পুত্রকে কৃষ্ণ বলাইবার নিমিত্ত অনুনয় তাড়না ভয়-প্রদর্শন প্রভৃতি নানা মত উপায় করিতে লাগিলেন,

কিন্তু বালক কিছুতেই তাহা বলিলেন না। ইহাতে বালকের পিতামাতা মর্ম্মাহত ও যেন প্রভু পর্য্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন।

তখন প্রভু যেন বিস্ময়ভাব দেখাইয়া ক্ষোভ করিয়া বলিতে লাগিলেন, " হায়! আমি বিশ্ব- সংসারকে কৃষ্ণ- নাম বলাইলাম, কিন্তু এই বালককে পারিলাম না?" প্রভুর সঙ্গে স্বরূপ দামোদর ছিলেন, তিনি বলিলেন, "প্রভু, আপনি কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র এই বালককে দিলেন। বালক মনে ভাবিতেছে যে, সে উহা কিরূপে প্রকাশ করিয়া উচ্চারণ করিবে। এই বালক যে নীরব হইয়াছে সে সেই নিমিত্ত, আমার ইহাই নিশ্চয় বোধ হয়।"

তখন প্রভু বলিলেন, "তাই কি হবে? ভাল তাই যদি হয়, তবে, হে বৎস! যাহা কিছু হয় বল।"

ইহাতে বালক উঠিয়া দাঁড়াইয়া করজোড়ে একটি শ্লোক প্রস্তুত করিয়া বলিল। (মনে থাকে, তাহার তখন ক খ পাঠ হইয়াছে কিনা সন্দেহ।) পরমানন্দের শ্লোক যথা ঃ

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনতরুণীনাং মণ্ডলমখিলং হরির্জয়তি।।

অর্থাৎ "যিনি ব্রজযুবতীগণের কর্ণে কর্ণোৎপল, নয়নে সুরস অঞ্জন, বক্ষঃস্থলে নীলকান্তমণিময় হারের স্বরূপ ও তাঁহাদিগের সর্বাঙ্গের অথবা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভূষণ সেই শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন।"

ইহাতে শিবানন্দ, তাঁহার পত্নী ও প্রভুর সঙ্গী যে দুইজন ভক্ত ছিলেন সকলে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

তখন প্রভু বলিলেন, "বৎস! তুমি উত্তম কবি হইবে। তুমি এই শ্লোকে প্রথমে ব্রজাঙ্গনাদিগের কর্ণভূষণের বর্ণনা করিয়াছ বলিয়া তোমার নাম অদ্যাবধি 'কবিকর্ণপুর' হইল। পূর্বে বলিয়াছি, এই কবিকর্ণপুর কৃত পুস্তক এখন বৈষ্ণবজগতে অনন্ত দিতেছে। তাঁহার কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা বর্ণনা করিয়া পরে তিনি বলিতেছেন—

শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাবর্ণিতং
জগ্রন্থে কিয়তী তদীয় কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া।
এতাং তৎপ্রিয়মণ্ডলে শিব শিব স্মৃত্যেকশেষং গতে।
কো জানাতু শৃণোতু কস্তদনয়াঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাম্।।

ইহার ভাবার্থ এই, "আমি অজ্ঞান বালক শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা (অর্থাৎ পদাগুষ্ঠের রজ) পাইয়া যাহা লিখিলাম, ইহা সত্য কি মিথ্যা তাহা তাঁহার ভক্তগণ বলিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকলে অন্তর্ধান হইলেন। সুতরাং আমি সত্য লিখিলাম, কি মিথ্যা লিখিলাম তাঁহারা ব্যতীত আর কে বলিবে? তবে হে কৃষ্ণ! তুমি অন্তর্যামী, তোমাকে আমি সাক্ষী মানিলাম। আমি যদি সত্য লিখিয়া থাকি, তবে তুমি অবশ্য আমার প্রতি তুষ্ট হইবে, (এবং যদি মিথ্যা লিখিয়া থাকি তবে দণ্ড করিবে।)

জগতের যত অবতারের কথা শুনা যায়, তাঁহাদের অনেকের সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু গৌরাঙ্গের লীলার যে সমুদয় প্রমাণ রহিয়াছে তাহা অকাট্য। সেই প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, তিনি কি বলিয়াছেন ও কি করিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে মহাপ্রভু যে কর্কশবাক্য বলেন, এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত যখন নীলাচলে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রভু তাঁহার সহিত পূর্বের ন্যায়ই ব্যবহার করিলেন। তিনি যে কোন কারণে শ্রীঅদ্বৈতের উপর বিরক্ত হইয়াছেন তাহা তাঁহাকে জানিতেও দিলেন না। একদিন বাউল বিশ্বাস প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি উঠিয়া গেলে প্রভু গোবিন্দকে আজ্ঞা করিলেন যে, "বাউল বিশ্বাসকে আমার এখানে আসিতে দিও না।" এই

বাউল বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য ও তাঁহার বাড়ীর প্রধান কর্মচারী। অদ্বৈতপ্রভুর বৃহৎ পরিবার,—ছয় পুত্র ও দুই স্ত্রী। শ্রীঅদ্বৈতের ভাণ্ডার যেন অক্ষয়, তিনি এইরূপ ভাবে অর্থ ব্যয় করেন। সংসারে সেই নিমিত্ত চিরদিন অনটন। বিশ্বাস মহাশয় দেখিলেন যে, উড়িষ্যার রাজা গৌড়ীয়গণের নিতান্ত ভক্ত হইয়াছেন। তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অচলসংসার কুলাইবার নিমিত্ত তিনি এক উপায় সৃজন করিলেন। তিনি রাজার নিকট এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে লেখা ছিল যে, শ্রীঅদ্বৈত স্বয়ং ঈশ্বর, তবে তাঁহার কিছু ঋণ হইয়াছে। মহারাজের নিকট সেই ঋণ শোধের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এই পত্র কেমন করিয়া মহাপ্রভুর হাতে পড়িল। তাহাতে প্রভু ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে প্রত্যক্ষ্যে কিছু বলিলেন না, তবে "বাউল বিশ্বাস" মহাশয়কে তাঁহার নিকট আসিতে নিষেধ করিলেন। যখন বিশ্বাস মহাশয়ের উপর ঐ দণ্ড হয়, তখন প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "রাজার নিকট বিশ্বাস যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে ঈশ্বরের সাব্যস্ত করিয়াছেন। এ ঠিক, যেহেতু তিনি প্রকৃতই ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরের ঋণ হইয়াছে, এ কথা বলা বড় অপরাধের কথা; এই জন্যই তিনি দণ্ডার্হ, অতএব তিনি যেন আমার এখানে না আইসেন।"

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ইহার কিছুই জানেন না। এই যে রাজার নিকট পত্র লেখা হইয়াছে, ইহা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অজ্ঞাতসারে। তিনি যখন বিশ্বাসের প্রতি প্রভুর দণ্ডের কথা শুনিলেন, তখন নিতান্ত লজ্জা পাইয়া প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "তুমি বিশ্বাসকে দণ্ড করিয়াছ, কিন্তু তাহার অপরাধ কি? আমাকে দণ্ড করা কর্ত্তব্য, যেহেতু সে যাহা করিয়াছে, সে আমারই জন্য।" প্রভু তখন হাসিয়া বিশ্বাসকে নিকটে ডাকিলেন, ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কার্য্য ভাল কর নাই। এরূপ কার্য্য আর করিও না।" প্রকৃত কথা, যদি প্রভুর পার্ষদগণ রাজার দ্বারস্থ হয়েন, তবে প্রভুর ধর্মের প্রতি লোকের অনাদর হয়।

শিবানন্দ সেন শুনিলেন যে, অম্বিকা কালনার নকুল ব্রহ্মচারীর শরীরে মহাপ্রভু প্রকাশ হইয়াছেন। প্রভুর লীলালেখকগণ বলেন যে, প্রভু জীবনিস্তারের বহুবিধ উপায় করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ আচার্য্য সৃষ্টি, যেমন কৃষ্ণদাস গুঞ্জমালী। আপনি তিন প্রকারে জীবকে শিক্ষা দিতেন, প্রথমতঃ—সাক্ষাদ্দর্শন দিয়া। শ্রীক্ষেত্রে জগতের লোক গমন করেন; করিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া ভক্তিলাভ করেন। দ্বিতীয়তঃ—আবির্ভূত হইয়া। যেমন শচীর বাড়ীতে জননী প্রদত্ত অন্নব্যঞ্জন আহার। শচী অন্নব্যঞ্জন রাখিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "আমার নিমাই বাড়ী নাই, আমি ইহা কাহাকে দিব?" ইহা বলিতে বলিতে তিনি বিহ্বল হইলেন, দেখিলেন যেন নিমাই আসিলেন। তখন বসিয়া নিমাইকে যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। পরে যখন চেতন পাইলেন, তখন ভাবিলেন, "এই সমুদয় স্বপ্ন হইবে। কারণ নিমাই ত আমার এখানে নাই, নিমাই শ্রীক্ষেত্রে।" ইহাকে বলে আবির্ভাব। এইরূপ শচীর গৃহে সর্বদা হইত। আর এক উপায়ে প্রভু জীব উদ্ধার করিতেন, সে "আবেশ"। প্রভু নকুল ব্রহ্মচারীর শরীরে প্রবেশ করিয়া ভক্তি-ধর্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নকুলের বয়ঃক্রম অল্প, বর্ণ গৌর, অঙ্গের শোভা চমৎকার। প্রভু সেই শরীরে প্রবেশ করাতেই নবীন ব্রহ্মচারী গ্রহগ্রস্ত প্রায় হইয়া নাচিতে কাঁদিতে হাসিতে লাগিলেন। আর সকলেই বলেন, "কৃষ্ণ বল"। চারিদিকে প্রচার হইল যে, নকুলের দেহে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া শিবানন্দ তথ্য জানিবার জন্য সেখানে চলিলেন। তিনি যাইয়া দেখেন অসংখ্য লোক জুটিয়াছে, ব্রহ্মচারীর দর্শন পাওয়া দুর্ঘট। তখন শিবানন্দ মনে মনে প্রভুকে বলিতেছেন, "যদি সত্যই আমার প্রভু তুমি নকুলের দেহে প্রবেশ করিয়া থাক, তবে আমি যে আসিয়াছি, তাহা অবশ্য তুমি জান, এবং তাহা হইলে তুমি আমাকে নিশ্চয় ডাকিবে, এবং আমার ইষ্টমন্ত্র কি তাহা বলিবে। প্রভু, তাহা হইলেই আমার মনের সন্দেহ যাইবে।"

শিবানন্দের মনে অবশ্যই গৌরব আছে যে, তিনি প্রভুর উপর দাবি রাখেন। অতএব, সত্য যদি প্রভু নকুলের দেহে প্রবেশ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে জানিবেন ও তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিবেন। শিবানন্দ লোক-সংঘটের বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রভুর নিকট মনে মনে এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে দুই চারি জন লোক দৌড়িয়া আসিয়া "শিবানন্দ সেন কে? তাঁহাকে ঠাকুর ডাকিতেছেন" বলিয়া খুঁজিতে লাগিল। একথা শুনিয়াই শিবানন্দ দৌড়িয়া ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারি বলিলেন, "তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে চাও? উত্তম। তোমাব চারি অক্ষরের "গৌরগোপাল মন্ত্র"।* এই আখ্যায়িকাটি শিবানন্দের পুত্র তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

এইরূপে নকুল ব্রহ্মচারী প্রভুর ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। চরিতামৃত বলিতেছেন,— "এই মত আবেশে তারিল ভুবন। গৌড়ে দেহে আবেশের দিগ্‌দরশন।।" অর্থাৎ গৌড়ে যেরূপ ব্রহ্মচারীর শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রভু ভক্তিধর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেইরূপ তিনি নানাস্থানে নানাদেহে প্রবেশ করিয়া জীবকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত প্রভুর প্রকটকালেই কোটি কোটি ভক্ত তাঁহার পদাশ্রয় করেন। আর এই নিমিত্ত, যদিও তিনি পূর্ববঙ্গদেশে মোটে আট মাস ছিলেন, এবং সেও অধ্যাপক ভাবে ভক্ত বা আচার্য্য ভাবে নয়,—তবুও সে দেশ ভক্তিতে প্লাবিত হইয়াছিল। শিবানন্দ সেন সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা বলিব। প্রভু পৌষ মাসে বঙ্গদেশে আসিবেন, এ কথা শিবানন্দ শ্রীকান্তের মুখে শুনিলেন। শুনিবামাত্র শাকের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, এবং প্রভুর পথ পানে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু প্রভু আসিলেন না। পৌষমাসে সংক্রান্তির দিবস জগদানন্দ ও শিবানন্দ দুই জনে প্রভুকে অপেক্ষা করিয়া "ঐ এলো" ভাবে, কি "পড়ে পাতার উপরে পাত, ঐ এল প্রাণনাথ", ভাবে কাটাইলেন। কিন্তু প্রভু আসিলেন না। তখন দুই জনে হাহাকার করিতে লাগিলেন। এমন সময় সেখানে নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী আসিলেন। ইঁহার পূর্বে নাম ছিল 'প্রদ্যুম্ন', প্রভু তাঁহার নাম বাখেন নৃসিংহানন্দ, যেহেতু ব্রহ্মচারী প্রহ্লাদের ঠাকুরের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন।

ঐ ব্রহ্মচাবীর ভজন ছিল 'মানসিক'। যোগশাস্ত্রের নামে অনেকে উন্মত্ত হয়েন। কিন্তু যেমন জ্ঞানযোগ, তেমনি ভক্তিযোগ বলিয়া আর একপ্রকার যোগ আছে। সে অতি মধুর সামগ্রী। জ্ঞানযোগে যেরূপ সমাধি আছে, ভক্তিযোগেও সেইরূপ সমাধি আছে। প্রভু সন্ন্যাসের পরে চারি দিবস পর্য্যন্ত সমাধিস্থ ছিলেন। এ যোগের বিশেষ লাভ এই যে, ইহাতে যোগীর যে প্রাপ্তি তাহার সহিত কৃষ্ণপ্রাপ্তিও হয়।

এই নৃসিংহানন্দ মনে মনে প্রভুর ভজনা করিতেন। প্রভু যে বার গৌড় হইয়া বৃন্দাবন যাইতেছিলেন, কিন্তু কানাইয়ের নাটশালা হইতে ফিরিয়া আসেন। প্রভু ফিরিয়া আসিবার পূর্বে ব্রহ্মচারী এই কথা প্রকাশ করেন। এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি ইহা কিরূপে জানিলেন? তাহাতে নৃসিংহ বলেন যে, প্রভু যেমন বৃন্দাবনে গমন করিতেছিলেন, তিনি (নৃসিংহ) মনে মনে তাঁহার পথ-যোজনা করিতেছিলেন। নৃসিংহ ভাবিলেন, পথ হাঁটিয়া যাইতে প্রভুর কষ্ট হইবে, তাঁহাকে ভাল পথে লইয়া যাইবার জন্য মনে মনে যোজনা করতেছিলেন। সে পথে কঙ্কর ও ধুলা নাই, আর পথের দুধারে ফুলের গাছ, তাহার উপরে বসিয়া পক্ষীগণ গান গাইতেছে। কুসুমের শোভায় ও সুগন্ধে দিক্ আমোদিত করিতেছে। এই পথ মনে মনে যোজনা করিয়া প্রভুকে মনে মনে সেই পথে লইয়া যাইতেছেন। আর প্রভুর অগ্রে মনে মনে ফুল ছড়াইতেছেন, যাহাতে তাঁহার শ্রীপদে

---

*একবার একটি কথা উঠে যে "গৌর-নামের মন্ত্র নাই।" কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে শিবানন্দের মন্ত্র "গৌরগোপাল।"

চলিতে ব্যথা না লাগে। প্রত্যহ প্রভুকে মনে মনে দুইবার ভোগ দিতেছেন, সন্ধ্যায় উত্তম কুটিরে শয়ন করাইতেছেন ও পদসেবা করিয়া ঘুম পাড়াইতেছেন। এইরূপ করিতে করিতে নৃসিংহ মনে মনে প্রভুকে কানাইয়ের নাটশালা পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন; কিন্তু আর পারেন না, আর কোন ক্রমে মনে মনে পথ বান্ধিতে পারেন না। তাই তিনি তখন বলিয়াছিলেন, "প্রভু আর অগ্রবর্ত্তী হইবেন না।"

এই নৃসিংহ, শিবানন্দ ও জগদানন্দের দুঃখের কারণ শুনিয়া দন্ত করিয়া বলিলেন, "এই কথা? আমি প্রভুকে আনিতেছি, আনিয়া তোমার এখানে তাঁহাকে ভুঞ্জাইব।" ইহা বলিয়া নৃসিংহ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। তিনি নয়ন মুদিয়া চিত্ত সংযম করিয়া এবং উহা বাহ্য জগৎ হইতে পৃথক করিয়া প্রভুর নিকটে লইয়া চলিলেন। চিত্ত কখন আত্মবিস্মৃত হইয়া, তাঁহার যে কার্য্য তাহা ভুলিয়া, অন্যদিকে যাইতেছেন, নৃসিংহ তাঁহাকে চাবুক মারিয়া আবার ঠিক পথে আনিতেছেন। এইরূপে বহু কষ্টে চঞ্চলচিত্তকে প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন, এবং প্রভুর চরণে পড়িয়া, অনুনয় বিনয় করিয়া প্রভুকে সম্মত ও সঙ্গে করিয়া শিবানন্দ সেনের বাড়ী আনিতে লাগিলেন। আনিবার সময় আবার তাঁহার চিত্ত ঐরূপ চাঞ্চল্য করিতেছেন। কখন নিজ কার্য্য ভুলিয়া গিয়া প্রভুকে একেবারে হারাইতেছেন, আবার তল্লাস করিয়া ধরিতেছেন। কখন পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। এইরূপে প্রভুর নিকট যাইতে ও তাঁহাকে আনিতে তাঁহার চিত্তের দুইদিন গেল। ইহাকে বলে 'ভক্তিযোগ'। যাহা হউক তিন দিনের দিন নৃসিংহ, প্রভুকে শিবানন্দের বাড়ী আনিয়া উত্তমরূপে ভুঞ্জাইলেন।

কিন্তু দুঃখের মধ্যে এই, প্রভু যে আসিয়া সমুদয় আহার করিলেন নৃসিংহের মুখের কথা ব্যতীত ইহার আর কোন প্রমাণ রহিল না। প্রভু কিন্তু ইহার প্রমাণ পরে দিয়াছিলেন। তিনি এক দিবস নীলাচলে, কথায় কথায় এই সমুদয় কথা (অর্থাৎ যেরূপে নৃসিংহ তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলেন) বলিলেন। প্রভু আরও বলিলেন যে, সমুদয় দ্রব্যই অতি চমৎকার পাক হইয়াছিল। এই কথা শুনিয়া তখন শিবানন্দের বিশ্বাস হইল যে, প্রকৃতই প্রভু তাঁহার বাটী যাইয়া তাঁহার দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন।

ইহাকে ব'লে "আবির্ভাব"। অর্থাৎ প্রভু উদয় হইয়াছেন, ইহা কেহ কেহ দেখিতে পাইতেছেন,—সকলে নহে। এইরূপ প্রভুর আবির্ভাব শচীর মন্দির প্রভৃতি নানাস্থানে হইত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শিবানন্দের সঙ্গে তাঁহার পত্নী ও পুত্র এবং অন্যান্য ভক্ত-গৃহিণীরা চলিয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর মোদক ও তাঁহার ঘরণীও চলিয়াছেন। ভক্তগণ নীলাচলে গমন করিলে প্রভু সচেতন হয়েন, আর যত দিন তাঁহারা সেখানে বাস করেন ততদিন সেই রূপ থাকেন, থাকিয়া তাঁহার দেশীয় ও গ্রামস্থ সঙ্গীগণের সহিত আলাপনাদি করেন। পরমেশ্বর যাইয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ করিলেন। ইনি শুদ্ধ যে নবদ্বীপবাসী তাহা নহে, প্রভুর এক পাড়ায়, এমন কি তাঁহার বাড়ীর নিকট বাস করেন। কাজেই ছোট বেলা পরমেশ্বরের নন্দন মুকুন্দের সহিত প্রভু খেলা করিতেন। আর পরমেশ্বর প্রভুকে অনেক সন্দেশ খাওয়াইছিলেন। এই পরমেশ্বর যখন আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "আমি পরমেশ্বর", তখন প্রভু আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে সহাস্যে আদর করিলেন; বলিতেছেন, "শ্রীমুখ দেখিতে আসিয়াছ, বেশ করিয়াছ।" তখন পরমেশ্বর আহ্লাদে আর থাকিতে না পারিয়া বলিতেছেন, "আমি আসিয়াছি, মুকুন্দের মা-ও আসিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া প্রভু একটু শঙ্কিত হইলেন; ভাল মানুষ পরমেশ্বর হয় ত "মুকুন্দের মাকে" প্রভুর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে। কিন্তু পরমেশ্বর শুনিয়াছেন যে, প্রভুর নিকট "প্রকৃতির" যাইবার অধিকার নাই, তাই স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যান নাই। যখন পরমেশ্বর ছোটবেলায় প্রভুকে সন্দেশ খাইতে দিতেন, তখন আর জানিতেন না যে কিছুকাল পরে সেই সন্দেশপ্রিয়-

বস্তুকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার তিন সপ্তাহের পথ হাঁটিয়া যাইতে হইবে।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অনেক শিষ্য; যেখানে তাঁহার শিষ্য সেইখানেই প্রেম। কেবল সেই প্রেমে একজন বঞ্চিত হইলেন, তিনি রামচন্দ্রপুরী। ইনি যদিও মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য,—যে মাধবেন্দ্রপুরী মেঘ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইতেন, যে মাধবেন্দ্র "অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ" শ্লোক প্রস্তুত করিয়া উচ্চারণ করিতে করিতে অন্তর্ধান করেন, যে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি,—তাঁহার শিষ্য হইয়াও রামচন্দ্র চিন্ময় নিরাকার ব্রহ্ম উপাসক! তিনি সোঽহং অর্থাৎ 'সেই আমি' বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং কৃষ্ণ কি কৃষ্ণপ্রেম, এ সমুদয় তাঁহার নিকট আমোদের সামগ্রী। যখন মাধবেন্দ্র তাঁহার অপ্রকটকালে কৃষ্ণ পাইলাম না বলিয়া রোদন করিতেছিলেন, তখন রামচন্দ্র সেখানে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। উপদেশ দিবার এমন সুবিধা পূর্বে কখন পান নাই। মাধবেন্দ্রের তেজে ও ভয়ে তাঁহার নিকটে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, কাজেই বড় সুবিধা পাইয়া বলিতেছেন, "গুরো। তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া রোদন কর? কাহার জন্য রোদন কর? তুমি যাহাকে কৃষ্ণ বল তুমিই না সেই কৃষ্ণ? তোমার কি বালকের মত বিচলিত হওয়া উচিত! রোদন না করিয়া সেই তোমার ব্রহ্মকে ধ্যান কর।" তখন মাধবেন্দ্র ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "তোর উপদেশের প্রয়োজন নাই। একে কৃষ্ণ পাইলাম না সেই জালায় আমি জর্জরিত, তাহার উপরে তুই আসিয়া আমায় বাক্য-যন্ত্রণা দিতে লাগিলি? তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ। তোর ও সমুদয় নাস্তিক-বাদ শুনিলে আমার পরকাল হইবে না।"

রামচন্দ্রপুরী তাঁহার গুরুর সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলেন, কিন্তু ঈশ্বরপুরী গুরুর প্রকট সময়ে তাঁহার মলমূত্র পরিষ্কার করা পর্য্যন্ত অতি যত্ন করিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তাহাতে তুষ্ট হইয়া মাধবেন্দ্র তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত কৃষ্ণপ্রেম দিয়া যান। সে যাহা হউক, সেই রামচন্দ্রপুরী ক্রমে এক অপরূপ সামগ্রী হইলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, সুতরাং কোন কার্য্য নাই,—কেবল ভ্রমণ; একস্থানে বহুদিন থাকিতে পারেন না। আপনার ভরণপোষণের কোন ভাবনা নাই, উহা সমাজের উপর ভার। দেশ, মন্দির ও অতিথিশালায় পূর্ণ, সেখানে গেলেই অন্ন ও দুগ্ধ মিলিবে। সকল স্থানেই আদর। ভ্রমিতে ভ্রমিতে নীলাচলে প্রভুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত। অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ, এমন কি প্রভুর গুরুস্থানীয় পুরী ভারতী পর্য্যন্ত আসিলেও তাঁহারা প্রভুর সম্মুখে নম্র থাকেন, কিন্তু রামচন্দ্রের সে ভাব নয়। প্রভু উঠিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, কারণ তিনি প্রভুর গুরুস্থানীয়, স্বয়ং পুরী গোসাঞিও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের ভাব যেন তিনি স্বয়ং মাধবেন্দ্র। প্রভু যখন প্রথমে পুরী ও ভারতী গোসাঞিকে প্রণাম করেন, তখন তাঁহারা ভয় পাইয়াছিলেন, রামচন্দ্র সে ধা'তের লোক নহেন। জগদানন্দ তাঁহাকে যত্ন করিয়া ভিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। ভয়ে ভয়ে জগদানন্দ রামচন্দ্রকে বড় যত্ন করিলেন। রামচন্দ্রও উদর পুরিয়া ভোজন করিলেন। শেষে জগদানন্দকে সেই পাতে বসাইলেন, বসাইয়া যত্ন করিয়া, অনুরোধ করিয়া খুব ে: পেট খাওয়াইলেন। আহার সমাপ্ত হইলে বলিতেছেন, "জগদানন্দ! তোমার রীতি কি? আমি সন্ন্যাসী, আমাকে এত যত্ন করিয়া খাওয়াইলে কেন? আমার ধর্ম কিরূপে থাকিবে? তোমাদের চৈতন্যের গণের কি ভয় নাই যে, সন্ন্যাসীগণকে অধিক খাওয়াইয়া তাঁহাদের ধর্ম নষ্ট কর? আর নিজেরাও এত খাও? আমি শুনেছি যে, তোমরা চৈতন্যের গণ বড়ই খাওয়ায় মজবুত, আজ তাহা চক্ষে দেখিলাম।"

ফল কথা, "চৈতন্যের গণ" খাওয়ায় মজবুত তাহার সন্দেহ নাই। কারণ চৈতন্যের গণের শুষ্ক-ভজন নয়। তাঁহাদের দেহ ক্লিষ্ট করিয়া ইন্দ্রিয় বারণ করিতে হয় না। যাহারা দেহকে দুঃখ দিয়া ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বারণ করেন, তাহাদের কয়লা ধুইয়া উহাকে পরিষ্কার

করার মত কার্য্য করা হয়। মাথা কুটিয়া উপবাস করিয়া ও দেহে কষ্ট দিয়া, পবিত্র হওয়া যায় না। পবিত্র হইতে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। উদাহরণ দেখুন, ব্রজগোপী, কি ব্রজগোপীর শিরোমণি রাধা, রাধা কিরূপে সুন্দরী হয়েন তাহা ত জানেন? তিনি বলিয়াছেন, "ও অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার সোনার বরণ খানি।" শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম ও ভক্তিতে জাগরিত কর, করিয়া তাঁহার স্পর্শ সুখ অনুভব কর, তখন তোমার সোণার বরণ হইবে।

রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে আসিয়াছেন। তাঁহার এক প্রধান উদ্দেশ্য প্রভুকে কোনরূপ জব্দ করা। প্রভুর মহিমা জগৎ ব্যাপি হইয়াছে; যাহারা তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া না মানে, তাহারাও বলে যে তিনি পরম মহাজন। রামচন্দ্রপুরী হিংসুক, তাঁহার এ সব সহ্য হয় না। নীলাচলে আসিয়া প্রভুর নিকটে রহিলেন, প্রভুর গণ কর্তৃক সেবিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্য হইল প্রভুর ছিদ্র অন্বেষণ করা। প্রভু কি ভোজন করেন, কিরূপে শয়ন করেন, কিরূপে দিনযাপন করেন,—ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করেন, আর প্রকারান্তরে প্রভুর উপর বিদ্বেষ ভাব ব্যক্ত করেন। এইরূপে প্রভুর নিত্য সঙ্গীদিগের নিকট যাইয়া প্রভু সম্বন্ধে সমুদয় গুপ্তকথা বাহির করার চেষ্টা করেন। কিন্তু গুপ্তকথা কিছু নাই তাই পান না। তিনি ভক্তগণের নিকটে প্রভুর নিন্দা করেন; বলেন যে, "চৈতন্যের ইন্দ্রিয়-বারণ কিরূপে হইবে, মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিলে কি ইন্দ্রিয়-বারণ হয়?" ভক্তগণ নিতান্ত প্রভুর দিকে চাহিয়া সহ্য করিয়া থাকেন। প্রভু রামচন্দ্রের ব্যবহার যদিও সব জানিতেছেন, তবুও তিনি উপস্থিত হইলে, প্রভু অতি নম্র হইয়া তাঁহার সহিত ব্যবহার করেন।

ফল কথা, প্রভু জীবকে তাহাদের কর্তব্য কর্ম শিক্ষা দিতেছেন। রামচন্দ্র সম্বন্ধে গুরুস্থানীয়, তাই তাঁহাকে বাহ্যে ভক্তি করেন; কিন্তু অন্তরে তাঁহার কার্য্যকে ঘৃণা করেন। রামচন্দ্র প্রথমে ভয়ে ভয়ে প্রভুর সহিত ব্যবহার করিতেন, তাঁহার সম্মুখে কিছু বলিতে সাহস হইত না। পরে দেখিলেন যে, প্রভু নিরীহ, কিছু বলেন না। কাজেই ক্রমে ভয় ভাঙিতে লাগিল, শেষে প্রভুর সম্মুখেই তাঁহার নিন্দা করিলেন। একদিন প্রভুর সম্মুখে বলিতেছেন, "এখানে পিঁপীড়া বেড়ায় কেন? অবশ্য এখানে মিষ্টান্ন ব্যবহার হয়।" আর কোন দোষ না পাইয়া বলিলেন যে, প্রভুর বাড়ীতে পিঁপীড়া, অতএব প্রভু মিষ্টান্ন ভোজন করেন, যদিচ সন্ন্যাসীর মিষ্টান্ন ভোজন করিতে নাই। রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া উঠিয়া গেলেন। তখনই প্রভু গোবিন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন, "পূর্বাবধি আমার ভিক্ষার নিয়ম ছিল চারি পণ, তা হাতে তোমার আমার আর কাশীশ্বরের হইত, অদ্যাবধি তাহার সিকি আসিবে। ইহার যদি অন্যথা কর, তবে আমাকে এখানে পাইবে না।"

প্রভু যদি আহার প্রায় ত্যাগ করিলেন, ভক্তগণ মাত্রও তাহাই করিবেন। প্রভু অনশনে থাকেন, তাঁহারা কিরূপে ভিক্ষা করিবেন? সকলের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। তখন তাঁহারা যাইয়া প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, আপনি রামচন্দ্রপুরীর কথায় আপনাকে ও আমাদিগকে কেন বধ করিতেছেন? তিনি হিংসুক, আপনার কিম্বা জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি আপনার ভিক্ষাপদ্ধতি দুষেন না, কেবল নিজের কুপ্রবৃত্তির নিমিত্তই ঐরূপ করেন। কিন্তু প্রভু জীবকে শিক্ষা দিতে এই জগতে আসিয়াছেন, আর সেই শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তৃণাদপি শ্লোক করিয়াছেন; তিনি আর কি কবিবেন? যখন ভক্তগণ রামচন্দ্রপুরীকে গালি দিতে লাগিলেন, তখন প্রভু তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন; বলিলেন, পুরী গোসাঁইর দোষ কি? তিনি সহজধর্ম বলিয়াছেন; সন্ন্যাসীর জিহ্বা-লালসা থাকা ভল নয়।

এদিকে পুরী গোসাঁই মহাখুসি। এতদিন কিছু করিতে পারেন নাই, এখন খানিক অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা যে তাঁহার আছে তাহা দেখাইতে পারিয়াছেন। প্রভুর নিকট আসিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "শুনিলাম তুমি নাকি অর্দ্ধাশন কর? সে ভাল নয়; যাহাতে

দেহরক্ষা হয়, এরূপ আহার করা কর্তব্য। শরীর ক্ষীণ হইলে ভজন করিবে কিরূপে? প্রভু অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, আমি আপনার বালক, আপনি যে আমাকে শিক্ষা দেন, এ আমার পরমভাগ্য।" যাহা হৌক রামচন্দ্রপুরী প্রভুর ছিদ্রান্বেষণ করিয়া কিছু পাইলেন না; এমন কি, প্রভুর চিত্তচাঞ্চল্য পর্য্যন্ত জন্মাইতে পারিলেন না।

এখন অবস্থা বিবেচনা করুন। তুমি রামচন্দ্র প্রভুর পিতৃস্থানীয়। পুত্রের যেরূপ পিতাকে করা উচিত, তিনি তোমাকে সেইরূপ ভক্তি করেন। যে প্রভু তোমাকে এত ভক্তি করেন তিনি জগৎপূজ্য। কিন্তু তুমি কর কি? না, তাঁহার দোষ অনুসন্ধান কর। প্রভুর প্রকাণ্ড দেহ। যেরূপ দেহ সেইরূপ ভোজন চাই, কারণ তুমি নিজেই বলিতেছ যে দেহ ক্ষীণ করিলে ভজন চলে না। অথচ তুমি তাঁহার ভোজন কমাইয়া তাঁহাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। শুধু তাহা নয়, তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে পর্য্যন্ত বধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তোমার এইরূপ কুচরিত্র যে, প্রভুর আর কোন ছিদ্র না পাইয়া, বাড়ীতে পিঁপীড়া বেড়ায় এই কথা তুলিয়া, তাঁহাকে দূষিতে ছাড় নাই। কিন্তু ইহার কিছুতেই প্রভুর চিত্ত বিচলিত হইল না। বরং ভক্তগণ যখন রামচন্দ্রকে দূষিলেন, তখন প্রভু রামচন্দ্রের পক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন। এরূপ সহিষ্ণুতা জীবে দেখাইতে পারে না।

একবার শ্রীল নারদ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া দেখেন যে, দ্বারে একজন দাঁড়াইয়া, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পরম সুন্দর, ঠিক ঠাকুরের মত। ঠাকুর ভাবিয়া নারদ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সেই ভদ্রলোক তটস্থ হইয়া নারদকে প্রতিপ্রণাম করিয়া বলিলেন যে, তিনি ঠাকুর নন, তাঁহার দাসানুদাস। নারদ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "তবে তোমার বপু ঠাকুরের ন্যায় কেন?" তিনি বলিলেন যে, ঠাকুর কৃপা করিয়া তাঁহাকে ঐরূপ করিয়াছেন, কারণ তিনি একজন পিপাসাতুরকে জল দিয়াছিলেন। তখন নারদ অগ্রবর্ত্তী হইলেন, দেখেন সকলই ঐরূপ চতুর্ভুজ; ঠিক ঠাকুরের মত। ভয়ে আর কাহাকেও প্রণাম করেন না। তবে আরও দুই চারিজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা কি পুণ্যে ঠাকুরের বপু পাইয়াছেন? সকলেই অতি সামান্য কারণ বলিলেন। কেহ বটবৃক্ষে জল দিয়াছিলেন, কেহ তাঁহার কৃষ্ণনামা পুত্রকে কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেন। এই সমুদয় সামান্য কারণে তাঁহারা এত কৃপা পাইয়াছেন। শ্রীনারদ তল্লাস করিতে করিতে শেষে ঠাকুরকে পাইলেন। নারদ বলিলেন, "ঠাকুর! একি ভঙ্গি? ইহাদের প্রতি এত কৃপা কেন?" ঠাকুর বলিলেন, "ইহারা নিজ গুণে আমাকে ক্রয় করিয়াছেন, তাই আমার বপু পাইয়াছেন।" নারদ একটু ভাবিয়া বলিলেন, "ইহাদের সঙ্গে কি আপনার কোন বিভিন্নতা নাই?" ঠাকুর বলিলেন, "কই, বিশেষ কিছু নাই।" তখন নারদ বলিলেন, "তবে বিশেষ কিছু আছে, সেটুকু কি?" তখন ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া আপনার দেহের ভৃগুপদচিহ্ন দেখাইলেন। বলিলেন, কেবল "এইটি উহারা পান নাই।"

ইহার তাৎপর্য্য পাঠক অবশ্য বুঝিয়াছেন। মুনিদের মধ্যে বিচার হইতেছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—ইহাদের মধ্যে কে বড়? ইহা সাব্যস্ত করিবার ভার ভৃগু পাইলেন। তিনি প্রথমে ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তাঁহাকে গালি দিলেন। ব্রহ্মা তাহাতে ক্রোধ করিয়া ভৃগুকে বধ করিতে আসিলেন। তাহার পরে শিবের নিকট গেলেন। তিনিও গালি সহ্য করিতে পারিলেন না। পরে বৈকুণ্ঠে গেলেন, যাইয়াই কিছু না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে পদাঘাত করিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ তটস্থ হইয়া ভৃগুকে অনেক স্তুতি করিলেন। ভৃগু তখন কৃষ্ণের চরণে পড়িলেন, পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "অদ্যাবধি তোমার এই পদচিহ্ন আমার প্রধান ভূষণ হইল।" কথা এই, ভগবানের যে দীনতা ও সহিষ্ণুতা তাহা জীবে অনুকরণ করিতে পারে না।

রামচন্দ্রপুরী পরে নীলাচল ত্যাগ করিলেন, কারণ যাহাদের কোন কার্য্য নাই তাহারা

একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারে না। তিনি এক কার্য্য করিয়া গেলেন, প্রভুর ভোজন অর্দ্ধেক কমাইলেন। পূর্ব নিয়ম ছিল চার পণ, সে অবধি নিয়ম হইল দুই পণ। ইহাতে প্রভুর আহার লঘু হইল, কাজেই দেহ শীর্ণ হইতে লাগিল। প্রভু এ লীলা করিলেন কেন? বোধহয় জীবের কঠিনহৃদয় দ্রব করিবার নিমিত্ত। কারণ সেই পরম সুন্দর যুবাপুরুষ অনাহারে ক্রমে জীর্ণ হইতেছেন, ইহা যে দেখিত তাহারই হৃদয় ফাটিয়া যাইত।

নবম অধ্যায়

প্রভুর দেহ কৃষ্ণবিরহে জর-জর, রোদনে প্রত্যহ শত-শত কলস নয়ন-জল ফেলিতেছেন। শত কলস বলিলাম, ইহা অত্যুক্তি নয়। প্রভু যখন নৃত্য করেন, তখন তাঁহার নয়ন দিয়া যেন বর্ষার ধারা উপস্থিত হয়। সুতরাং তাঁহার চতুঃপার্শ্বে যাঁহারা থাকেন, মহাবৃষ্টিতে যেরূপ হয়, তাঁহারা সেইরূপ আর্দ্র হয়েন। প্রভু একটু নৃত্য করিলে সেই স্থান কর্দমময় হয়। একটি প্রাচীন ছবিতে দেখিয়াছিলাম যে, প্রভু সমুদ্রতীরে ভক্তগণ সহিত নৃত্য করিতেছেন, আর সে স্থান যদিও বালুকাময়, তবু কর্দমময় হইয়াছে। ইহাতে হইয়াছে কি না, সেই কর্দমে প্রভুর নৃত্যকালীন পায়েব দাগ পড়িয়া গিয়াছে। পায়ের দাগ দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সেখানে শত শত কলস নয়ন-জল ফেলা হইয়াছে। প্রভু ক্রমে ক্ষীণ হইতেছেন। সেই পরমসুন্দর দেহে ক্রমে অস্থি প্রকাশ পাইতেছে। প্রভু কঠিন মৃত্তিকার উপর একখানি শুষ্ক কলার পাতায় শয়ন করেন। ইহাতে অঙ্গে ব্যথা লাগে।

জগদানন্দ ইহাতে একটি উপায় ভাবিলেন, প্রভুর পরিত্যক্ত বহির্বাস দ্বারা একটি ক্ষুদ্র বালিশ, আর একটি তোষক করাইলেন। এই দুই দ্রব্য স্বরূপকে দিয়া বলিলেন, "প্রভুকে ইহার উপরে শয়ন করাইও।" স্বরূপ ইহাতে অতি সন্তুষ্ট হইলেন। কারণ প্রভু যে কষ্টে শয়ন করেন, ইহা তাঁহার কি কাহারও প্রাণে সহ্য হয় না। প্রভু শয়ন করিতে যাইয়া দেখেন যে, তোষক ও বালিস। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং বালিস ও তোষক দূরে ফেলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে করিল?" স্বরূপ বলিলেন, "জগদানন্দ।" তখন প্রভু একটু ভয় পাইলেন। কারণ যদি প্রভু বাড়াবাড়ি করেন তবে জগদানন্দ উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিবেন। কাজেই প্রভু আস্তে আস্তে বলিতেছেন, "এ জগদানন্দের বড় অন্যায়। আমাকে তিনি বিষয় ভুঞ্জাইতে চাহেন। যদি তোষক বালিস আনিলে, তবে একখান খাট আনো, পা টিপিবার ভৃত্য আনো, তাহা হইলে তোমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।" স্বরূপ জগদানন্দের উপর দোষ দিয়া বলিতেছেন, "আপনি উপেক্ষা করিলে জগদানন্দ বড় দুঃখিত হইবেন।" কিন্তু প্রভু শুনিলেন না। তখন স্বরূপ ভক্তগণের সহিত পরামর্শ করিয়া আর একরূপ শয্যা প্রস্তুত করিলেন। শুষ্ক কলার পাতা আনিয়া তাহা অতি সূক্ষ্ম করিয়া চিরিলেন, এবং এই সমুদয় প্রভুর বহির্বাসে পুরিলেন; এইরূপে তোষক ও বালিস হইল। ভক্তগণ তখন প্রভুকে ধরিয়া পড়িলেন। প্রভু ভক্তের অনুরোধে এই শয্যায় শয়ন করিতে সম্মত হইলেন।

এদিকে প্রভু ক্রমেই বিহ্বল হইতেছেন। প্রভুর দেহ নীলাচলে, হৃদয় ব্রজে। প্রভু বাহিরে, অন্যে যাহা দেখে, তাহা দেখিতে পান না। আবার প্রভু যাহা দেখেন তাহা অন্যে দেখিতে পায় না। ইহাকে বলে দিব্যোন্মাদ। সম্মুখে নারিকেলের গাছ, প্রভু দেখিতেছেন সেটি কদম্ব বৃক্ষ। লোকে দেখিতেছে বৃক্ষে ফল ঝুলিতেছে, প্রভু দেখিতেছেন শ্যামসুন্দর কদম্ব-বৃক্ষে শ্রীপাদ ঝুলাইয়া বেণুগান করিতেছেন। জগদানন্দ গৌড়ে গিয়াছেন। যথা পদ ঃ—

"নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে, আইসে জগদানন্দ।
রহি কতদূরে, দেখে নদীয়ারে, গোকুলপুরের ছন্দ।।
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়। ধ্রু।

পাই কি না পাই, শচীরে দেখিতে, এই অনুমানে যায়।।
লতা তরু যত, দেখে শত শত, অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ, না হয় স্ফুটন, মেঘগণ দেখে রাতা।।
ডালে বসি পাখী, মুদি দুটি আঁখি, ফল জল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকরি, ডুকরি ডুকরি, গোরাচাঁদ নাম লৈয়া।।
ধেনু যুথে যুথে, দাঁড়াইয়া পথে, কার মুখে নাহি রা।
মাধবী দাসের, ঠাকুর পণ্ডিত, পড়িল আছাড়ে গা।।
ক্ষণেক রহিয়া, চলিল উঠিয়া, পণ্ডিত জগদানন্দ।
প্রবেশি নগরে, দেখে ঘরে ঘরে, কাহার নাহিক স্পন্দ।।
না মেলে পসার, না করে আহার, কারো মুখে নাহি হাসি।
নগরে নাগরী, কান্দয়ে গুমরি, থাকয়ে বিরলে বসি।।
দেখিয়া নগর, ঠাকুরের ঘর, প্রবেশ করিল যাই।
আধমরা হেন, ভূমে অচেতন, পড়িয়া আছেন আই।।
প্রভুর রমণী, সেহো অনাথিনী, প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন, মলিন বসনে, মুদিত নয়নে ধারা।।
দাসদাসী সব, আছয়ে নীরব, দেখিয়া পথিক জন।
শুধাইছে তারে, কহ মো সবারে, কোথা হৈতে আগমন।।
পণ্ডিত কহেন, মোর আগমন, নীলাচলপুর হৈতে।
গৌরাঙ্গসুন্দর, পাঠাইলা মোরে, তোমা সবারে দেখিতে।।
শুনিয়া বচন, সজল নয়ন, শচীরে কহিল গিয়া।
আর একজন চলিল তখন, শ্রীবাস মন্দিরে ধাঞা।।
শুনিয়া উল্লাস, মালিনী শ্রীবাস, যত নবদ্বীপবাসী।
মরা হেন ছিল, অমনি ধাইল, পরাণ পাইল আসি।।
মালিনী আসিয়া, শচী বিষ্ণুপ্রিয়া, উঠাইল ত্বরা করি।
তাদেরে কহিল, পণ্ডিত আইল, পাঠাইলা গৌরহরি।।
শুনি শচী আই, চমকিত চাই, দেখিলেন পণ্ডিতেরে।
কহে তার ঠাঁই, আমার নিমাই, আসিয়াছে কতদূরে।।
দেখি প্রেমসীমা, স্নেহের মহিমা, পণ্ডিত কান্দিয়া কয়।
সেই গৌরমণি, যুগে যুগে জানি, তুয়া প্রেমে বশ হয়।।
গৌরাঙ্গ চরিত, হেন রীত নীত, সভাকারে শুনাইয়া।
পণ্ডিত রহিলা, নদীয়া নগরে, সভাকারে সুখ দিয়া।।
এ চন্দ্রশেখর, পশুর দোসর, বিষয় বিষেতে প্রীত।
গৌরাঙ্গ-চরিত, পরম অমৃত, তাহাতে না লয় চিত।।

এইরূপে জগদানন্দ মাঝে মাঝে গমন করেন, পূর্বে বলিয়াছি। তিনি শচীমাতার নিকট যাইয়া প্রভুর নাম করিয়া প্রণাম করিলেন, আর সেই রাজদত্ত বহুমূল্য শাটী ও মহাপ্রসাদ দিলেন। এইরূপে নিমাইয়ের কথা আরম্ভ হইল। বক্তা জগদানন্দ শ্রোতা শচী, আর একটু অন্তরালে প্রিয়াজী ঠাকুরাণী। পণ্ডিত বলিতেছেন, "মা, শ্রবণ কর, প্রভু কি বলিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ আসিয়া তোমার চরণ বন্দনা করেন। আর যে দিন নিতান্ত তুমি তাঁহাকে ভুঞ্জাইতে ইচ্ছা কর, সেই দিনই তিনি আসিয়া ভোজন করিয়া থাকেন।" শচী বলিলেন, "সে ঠিক কথা, কিন্তু নিমাই কি সত্যই আইসে? আমার স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। আমি নানাবিধ শাক,

মোচার ঘণ্ট প্রভৃতি রন্ধন করিয়া বসিয়া রোদন করি। এমন সময় দেখি নিমাই আসিয়া বসিল, আর আমি যত্ন করিয়া তাহাকে খাওয়াইলাম। তাহার পরে যেন চেতন লাভ করি, তখন সমুদয় স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। জগদানন্দ বলিলেন, "প্রভু তোমাকে তাহাই বলিতে আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। তিনি তোমার সেবা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মনে বড় দুঃখ পাইয়াছেন। কিন্তু যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন তাহাতে আর উপায় নাই। তবে এখন যত দূর পারেন তোমার দুঃখ নিবারণ করিবেন; সেই নিমিত্ত তিনি সত্যই আসেন এবং তোমার সম্মুখে বসিয়া আহার করেন।" এইরূপে কখন জগদানন্দ, কখন বা দামোদর, প্রভুর সন্দেশ আনিয়া শচীমাতাকে ও প্রিয়াজী ঠাকুরাণীকে সান্ত্বনা করেন।

পরিশেষে জগদানন্দ ভক্তদিগের বাড়ি বাড়ি যাইতে লাগিলেন। প্রভু সকলের নিমিত্ত কিছু কিছু মহাপ্রসাদ পাঠাইয়াছিলেন। পুরীর মন্দিরের মহাপ্রসাদ মহাপ্রভুর প্রতাপের এক সাক্ষী, এবং পুরীর ঠাকুর তাঁহার আর এক সাক্ষী। ঠাকুর কে, না জগন্নাথ, অর্থাৎ জগতের নাথ, জীব মাত্রেরই ঠাকুর; ব্রাহ্মণ শুদ্র হিন্দু মুসলমান বর্বর, সকলেরই ঠাকুর। অতএব একমেবাদ্বিতীয়ং, ঈশ্বর এক, তাঁহারই দ্বিতীয় নাই। তিনি সকলের নাথ বা পিতা। তাই তাঁহার নাম জগন্নাথ, জগতের নাথ।

অতএব মনুষ্য মনুষ্যের ভ্রাতা। মনুষ্যের মধ্যে পদে ছোট বড় নাই, সকলেই সমান, সকলেই তাঁহার দাস,—তাঁহার ইচ্ছার একান্ত অধীন। অতএব আমি ব্রাহ্মণ এ দম্ভ বিড়ম্বনা মাত্র, আর আমি মুচি এ ক্ষোভ স্বপ্ন বই আর কিছু নয়। জীব মাত্রেই সমান,—ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া যে ভেদ ইহা মনের ভ্রম, ভগবানের নিকট ইহা বিষম অপরাধ। শ্রীজগন্নাথ ঠাকুর জগতে দুই সাক্ষী দিতেছেন। অতি তেজস্বী যে ব্রাহ্মণ তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইবে যে ঈশ্বর এক, জীবমাত্রই তাঁহার সন্তান, আর তাঁহার চক্ষে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে ভেদ নাই।

অতএব, হে ব্রাহ্মণ, শূদ্রের অন্ন তুমি কেন গ্রহণ করিবে না? ব্রাহ্মণঠাকুর ইহার নানা কারণ দেখাইলেন, কিন্তু কোন কারণই টিকিল না। শেষে বলিলেন, "শূদ্রের অন্ন যে গ্রহণ করি না তাহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল তাহাদের আচার বিচার ভাল নয়।" কিন্তু শূদ্রও যখন শ্রীকৃষ্ণের জীব তখন শূদ্র যদি তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) অন্ন দেয় তবে তিনি কি তাহা গ্রহণ করেন না? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, "যিনি বিদূরের খুদ খাইয়াছিলেন, যিনি সকলের পিতা, তিনি অবশ্য শূদ্রের দত্ত অন্ন খাইবেন।" তাহা যদি হইল, অর্থাৎ শূদ্রের দত্ত অন্ন সেই পবিত্রের পবিত্র শ্রীভগবান যখন গ্রহণ করেন, তখন তুমি মানব, ব্রাহ্মণ হইলেও তবু কৃষ্ণের দাস, ক্ষুদ্রকীট, তুমি তাহা কেন গ্রহণ করিবে না? এই কথায় ব্রাহ্মণ নিরস্ত হইলেন। আর ঠাকুরের মহাপ্রসাদ প্রচলিত হইল,—শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণকে খাইতে হইল।*

মহাপ্রভু এ লীলা কিরূপে করিলেন, তাহা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতের পণ্ডিত, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, তাঁহার কর্তব্যে নাস্তিকতা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভক্ত হইলেন, প্রভুর নিকট প্রেম ও ভক্তি পাইলেন, তবুও বৈষ্ণব হইতে পারিলেন না,—পূর্বকার যে ব্রাহ্মণ তাহাই রহিলেন, মনের জাড্য গেল না। ব্রাহ্মণঠাকুরেরা শত সহস্র নিয়ম করিয়া তাঁহাদের শিষ্যগণকে ও সেই সঙ্গে আপনাদিগকে, বন্ধন করিয়াছেন। আপনারা সে নিয়ম পালন না করিলে অন্যে করে না। কাজেই আপনাদের সে সমুদয় নিয়ম পালন করিতে হয়। এইরূপে আপনারা সামাজিক নিয়মের এরূপ দাস হইয়াছেন যে, সে সমুদয় বাহিরের নিয়ম পালন করিতেই তাহাদের চিরজীবন যায়, প্রকৃত সাধন ভজন হয় না। কিন্তু প্রভুর সরল

*একজন খৃষ্টিয়ান মহাপ্রসাদ কিনিয়া একটি ব্রাহ্মণের হস্তে দিল। মনে ইচ্ছা ব্রাহ্মণঠাকুরকে জব্দ করা। কিন্তু ব্রাহ্মণঠাকুর কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া উহা বদনে দিলেন। এ কথা, হণ্টর সাহেবের গ্রন্থে লিখিত আছে।

ধর্মে সে সমুদয় বন্ধন থাকিল না। যে প্রকৃত বৈষ্ণব তাঁহার "বাহ্য-প্রতারণা" নাই। ভারতী ঠাকুর চর্মের বহির্বাস পরিধান করিয়াছিলেন, তাই প্রভু তাঁহাকে প্রণাম করেন নাই। এমন কি, বৈষ্ণবের সন্ন্যাস পর্য্যন্তও নাই। তাই প্রভু আপনার সন্ন্যাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"কি কাজ সন্ন্যাসে মোর, প্রেম নিজ ধন।"

কথাটি মনোযোগ দিয়া বিচার করুন। অবতার বলিতে জগতে শ্রীভগবানের, কি তাঁহার অংশের উদয়। অবতার আর শাস্ত্র, ইহার মধ্যে অবতার বড় যেহেতু যদিও শাস্ত্রজ্ঞা ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া গৃহীত হয়, তবু সে আজ্ঞা প্রত্যক্ষ নয়। অবতার-বাক্য ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আজ্ঞা। অতএব শাস্ত্র অপেক্ষা অবতার বাক্য বড়। হিন্দুগণ যে শাস্ত্র মানেন, সার্বভৌমও সেই শাস্ত্র মানিতেন। কিন্তু মনের জড়তা থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম উদয় হয় না, তাই প্রভু প্রত্যুষে তাঁহার হাতে "মহাপ্রসাদ" অর্থাৎ শুষ্ক গোটা কয়েক পক্কান্ন দিলেন, দিয়া বলিলেন, "গ্রহণ কর।" মনে ভাবুন, ভট্টাচর্য্য ব্রাহ্মণ নিদ্রা হইতে উঠিয়া, মুখ না ধুইয়া বস্ত্র ত্যাগ না করিয়া, কি কখন মুখে অন্ন দিতে পারেন? লক্ষবার মারিলেও নয়। কিন্তু মহাপ্রভু যখন সার্বভৌমের হস্তে মহাপ্রসাদ দিলেন, তখন সার্বভৌম উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, প্রাপ্তিমাত্রই ভক্ষণ করিলেন। তখন মহাপ্রভু সার্বভৌমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজি আমার সমুদয় সাধ পূর্ণ হইল, যেহেতু মহাপ্রসাদে তোমার বিশ্বাস হইল। আজি তুমি প্রকৃতই কৃষ্ণের আশ্রয় লইলে। আজি তোমার বন্ধন ছিন্ন হইল। আজি তোমার মন শুদ্ধ হইল। যেহেতু আজি বেদ-ধর্ম লঙ্ঘন করিয়া তুমি মহাপ্রসাদে বিশ্বাস করিলে।" অতএব বৈষ্ণবধর্মে বৈদিক নিয়ম নাই, বৈষ্ণবধর্মে সন্ন্যাস নাই, কঠোরতা নাই, খুঁটিনাটি নাই।

সনাতন সংসার ত্যাগ করিলেন, করিয়া বারাণসীতে প্রভুর নিকট গমন করিলেন। প্রভু তাঁহার গাত্রে, তাঁহার ভগ্নিপতি শ্রীকান্ত প্রদত্ত ভোটকম্বল দেখিয়া, বারংবার তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিলেন। সনাতন প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া, আপনার ভোটকম্বল একজন কাঙ্থাধারীকে দিয়া তাহার কাঙ্থা আপনি লইলেন। প্রভু, সনাতনের গাত্রে কাঙ্থা দেখিয়া বড় সুখী হইলেন। আবার রামানন্দ রায় বাবু লোক, দোলায় উঠিয়া বেড়ান। তিনি সাড়ে তিনজনের মধ্যে একজন। অতএব এই দুইটি উদাহরণ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, বৈষ্ণব বেদ-বিধির বাহিরে।

যখন এই ধর্ম সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইবে, তখন ভারতে জাতি-বিচার, বর্ণ-বিচার ছোটবড়-বিচার থাকিবে না। হে গৌরভক্তগণ! তোমাদের কর্তব্য কর্ম কর। ভারতের উন্নতি কর। বৈষ্ণবধর্ম ব্যতীত সে উন্নতির উপায় নাই। তাই মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েন। ভারতবর্ষীয়গণের এক ঠাকুর লইয়া এক জাতি হওয়া উচিত। তবেই তাঁহারা সজীব হইবেন।

নীলাচলে মহাপ্রসাদকে কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারে না, তবে অন্য স্থানে ইহার অনাদর কেন? যদি ঠাকুরকে নিবেদন করিলে সে দ্রব্য পবিত্র হইল, তবে এরূপ বস্তু সর্বত্রই সেইরূপ পবিত্র হওয়া উচিত। কিন্তু বৈষ্ণবগণ তাহা করেন না, করিতে পারেন না,—কারণ সমাজের ভয় করেন, তাঁহাদের মনের জড়তা যায় না। মহাপ্রসাদের গেল এই আদর, আবার মহাপ্রসাদ অপেক্ষাও অধিক শ্রদ্ধার দ্রব্য আছে, (যথা চরিতামৃতে) "কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম। ভক্তশেষ হৈলে মহা-প্রসাদাখ্যান।"

ভক্ত, মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট যাহা রাখেন, তাহা মহাপ্রসাদ অপেক্ষা আরো পবিত্র। কবিরাজ গোস্বামী, কালিদাসের কাহিনী বর্ণনা করিয়া এই বাক্য সপ্রমাণ করিতেছেন। ইনি কায়স্থ, পরম বৈষ্ণব, বৈষ্ণবমাত্রেরই উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন,—ক্ষুদ্রজাতি বলিয়া উপেক্ষা করেন না। ঝড়ু ঠাকুর জাতিতে ভূমিমালী, পরম বৈষ্ণব। কালিদাস তাঁহার নিকট প্রসাদ চাহিলেন। তিনি দিলেন না। পরে ঝড়ু ঠাকুর আম্র ভক্ষণ করিয়া যে আঁটি ফেলিলেন,

কালিদাস তাহা গোপনে চুষিয়া খাইলেন। কেবল মাত্র বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করাই তাহার সেবা। কালিদাস যখন মহাপ্রভুকে দর্শনার্থে নীলাচলে আসিলেন, তখন মহাপ্রভু তাহাকে বড় কৃপা করিলেন। যদি জগন্নাথের প্রসাদ পবিত্র বস্তু হয়, তবে গোপীনাথ কি মদনমোহন ঠাকুরের প্রসাদ উচ্ছিষ্ট কেন হইবে। যদি ঝড়ু ঠাকুরের প্রসাদ মহাপ্রসাদ হইল, তবে আর জাতিভেদ কোথায় থাকিল?

জগদানন্দ শ্রীনবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচল অভিমুখে যাইতে অদ্বৈতের নিকট চলিলেন। সেখান হইতে বিদায় হইয়া মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণের সংবাদ সমুদয় বলিলেন। তাহার পরে বলিতেছেন, "শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আপনাকে একটি তরজা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, সে তরজাটি এই—প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।

এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার।।
"বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।।
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।।"

জগদানন্দ এই তরজা বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। যাঁহারা শুনিলেন তাঁহারাও হাসিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং ঈষৎ হাসিলেন; হাসিয়া বলিলেন, "তাঁহারা যে আজ্ঞা।" সকলে ভাবিলেন, এই একটি রহস্য বাক্য বই নয়। কিন্তু স্বরূপ তাহা ভাবিলেন না। তিনি একটু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু এ তরজার কিছু অর্থ বুঝিতে পারিলাম না, আপনি বুঝাইয়া বলুন।" মহাপ্রভু বলিলেন, "অদ্বৈত-আচার্য্য আগম-শাস্ত্রে পন্ডিত। সেই শাস্ত্রবিধি অনুসারে অগ্রে দেবতাকে আহ্বান করা হয়, করিয়া তাঁহাকে কিছুকাল পূজা করা হয়, পূজা সমাপ্ত হইলে তাঁহাকে বিসর্জন দেওয়া হয়। আচার্য্য বোধ হয় তাহাই বলিতেছেন, আর কিছুই নয়। তবে আমিও তাঁহার মন বুঝিতে পারি নাই।" এই কথা শুনিয়া সকলে, বিশেষতঃ স্বরূপ, অবাক হইলেন; যেহেতু তিনি বুঝিলেন যে, এই তরজার মধ্যে "সর্বনাশ" রহিয়াছে।

এই তরজার অর্থ লইয়া মহা-মহা পন্ডিতগণ অনেক বিচার করিয়াছেন। আমার পান্ডিত্য নাই তবে আমি ইহার সহজ কি মানে বুঝিয়াছি বলিতেছি। শ্রীমহাপ্রভু এক বাউল-মহাজন, আর শ্রীঅদ্বৈত আর এক বাউল, উপরিউক্ত মহাজনের অধীন। শেষোক্ত বাউল অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত পূর্বোক্ত মহাজন, মহাজন অর্থাৎ মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিতেছেন, "হাটে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত চাউল আনা হইয়াছিল। লোকে চাউল পাইয়া আউল হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের অভাব পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং আর চাউল বিক্রয় হইতেছে না" এখন ইহার বিচার করুন।

"মহাপ্রভু-মহাজন" তদীয় সাঙ্গোপাঙ্গাদি লইয়া জীবের যে আহার চাউল অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি তাহাই বিক্রয় করিতে ভবের হাটে আসিয়াছিলেন! তিনি কেন আসিয়াছিলেন? যেহেতু দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, লোকের গৃহে তন্ডুলমাত্র ছিল না, জীব হাহাকার করিতেছিল। অর্থাৎ জগতে কৃষ্ণভক্তি ছিল না, সেই নিমিত্ত মহাপ্রভু-মহাজন, ভবের হাটে সাঙ্গোপাঙ্গাদি সহ আসিয়া অতি অল্পমূল্যে চাউল অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি বেচিতে লাগিলেন। কোথাও বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন, কোথাও বা বুভুক্ষুলোক চাউল ক্রয় করিতে লাগিল। লোকের গোলাপূর্ণ হইল, আর চাউল বিকাইতেছে না। তাই, যিনি দুর্ভিক্ষের সংবাদ দিয়া মহাজন-মহাপ্রভুকে ভবের হাটে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত, মহাজনকে অর্থাৎ প্রভুকে সমাচার দিতেছেন যে, চাউল আর বিকাইতেছে না, লোকের ঘর পুরিয়া গিয়াছে, এখন যাহা কর্তব্য তাহা করুন, অর্থাৎ এখানে আমাদের থাকিবার আর প্রয়োজন নাই।

এই তরজাটি শ্রীচরিতামৃতে আছে। আর একটি ঘটনা পাঠক মনে করুন। প্রভু উপবীত-কালে এক দিবস একটি সুপারী খাইয়া অচেতন হইয়া পড়েন। তাহার পরে তেজস্কর দেহ ধরিয়া জননীকে বলেন যে, "আমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিলাম।" তাহার পরে প্রভু, প্রকাশ পর্যন্ত এইরূপ মুহুর্মুহুঃ লীলা করিয়াছেন। শ্রীভগবান প্রকাশ হইলেন, পরে বলিলেন, "আমি চলিলাম", বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আর দেখা গেল যে, নিমাইয়ের দেহে ভগবানের প্রকাশ নাই, তিনি অভ্যন্তরে লুকাইয়াছেন। লীলা-লেখক মহাশয়গণ উপরে যে সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে অবিশ্বাস আইসে না। তাহার এক প্রধান কারণ যে, এই প্রকার ঘটনার কথা কেহ সাজাইতে পারে না; সাজান হইলে ইহা আর এক প্রকার হইত। সুপারী চিবাইতে চিবাইতে অচেতন হইলেন, এইরূপ বর্ণনা শুনিলেই বোধ হয় লীলা-লেখক প্রত্যক্ষ দেখিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতের তরজাটিও তদ্রূপ। উহা একটি কল্পিত কথা নয়। পড়িলে বোধ হয়, উহা প্রকৃত ঘটনা। জগদানন্দ বলিলেন ও হাসিলেন। প্রভু ব্যাখ্যা করিলে স্বরূপ বিমনা হইলেন। এই সমুদয় যে কল্পনা নয়, তাহা পড়িলেই মনে আপনি উদয় হয়।

শ্রীরামমোহন রায়ের সহিত খৃষ্টিয়ান মিশনারীদিগের যে বিচার হয়, তাহাতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলেন যে খৃষ্টিয়ানদিগের ধর্মশাস্ত্রে, যীশু যে শ্রীভগবান কি ভগবানের "বিশেষ" কেহ, একথা মোটেই পাওয়া যায় না। "ঈশ্বরের পুত্র" যীশু আপনার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সকলেই ঈশ্বরের পুত্র। রামমোহন রায় এই এক তর্ক দ্বারা সাব্যস্ত করিলেন যে, যীশু যে অবতার তাহা তিনি স্বয়ং কোথাও স্বীকার করেন নাই। অতএব যীশু অবতার নহেন। কিন্তু এইরূপ তর্কে আমার প্রভু কোথায় থাকেন, এখন দেখা যাউক। প্রথমতঃ প্রশ্ন এই,—প্রভু যদি স্বয়ং ভগবান হইতেন, তবে তিনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন কেন করেন, বা ঈশ্বরের দাস বলিয়া কেন অভিমান করেন?

ইহার উত্তর এই—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু প্রকাশ হইয়া বলিলেন যে, তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, জীবকে ভক্তি-ধর্ম শিক্ষা দিবেন। কিন্তু কেবল মুখে শিক্ষা দিলে জীব উহা হৃদয়ঙ্গম, কি উহার অনুকরণ, কি উহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ শিক্ষার যে কয়েকটি মোটা কথা তাহা চিরদিনই আছে, তবে মুখে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আচরণে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানরূপে প্রকাশ হইয়া বলিলেন, "আমি আদি, আমি অন্ত, আমা ব্যতীত জগতে কিছুই নাই। আমি তোমাদের হৃদয়ে বাস করি। আমি জীবের মলিন দশা দেখিয়া তোমাদের মধ্যে তোমাদের সকলের নিমিত্ত আসিয়াছি। আমি তোমাদিগকে প্রেম ও ভক্তিধর্ম শিক্ষা দিব। সেই ধর্মই ধর্মের সার, অন্য-ধর্ম ধর্ম নয়। কিন্তু ইহা মুখে শিক্ষা দিলে তোমরা উহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। তাই আপনি ভক্তভাব ধরিয়া, আমাকে কিরূপ ভক্তি করিতে হয় তাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দিব। আমি এখন এই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিলাম। আমি লুকাইলে এই দেহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে, তখন তোমরা উহাকে সন্তর্পণ করিও।"

এই কথাগুলি বলিয়া প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চেতনা লাভ করিলেন, করিয়া বলিলেন, "আমি এখানে আসিলাম কেন? এ কি দিবস, না রাত্রি? আমি কোথায়? আমি কি, কিছু প্রলাপ করিয়াছি?"ভক্তগণ সমুদয় গোপন করিলেন, করিয়া বলিলেন, "তুমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে, তাই তুমি এখানে।"

এতএব শ্রীগৌরাঙ্গের দুই ভাব,—ভক্তভাব ও ভগবদ্ভাব; বা শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ মিলিত, কি তাঁহার অন্তরে কৃষ্ণ বাহিরে গৌর। তাহার পরে পূর্বের কথা মনে করুন। যীশু কখন আপন মুখে স্বীকার করেন নাই যে, তিনি কোন বিশেষ বস্তু। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ কি কখন স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি শ্রীভগবান? তিনি শত বার তাহা স্বীকার করিয়াছেন। "প্রকাশ" মানে

তাই, আর কিছুই নয়। সেই "প্রকাশ" অবস্থায় সরল ভাবে ভক্তগণকে বলিতেন যে, 'তিনি সেই শ্রীভগবান, জীবের হৃদয়ে বাস করেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী।" যিনি সন্ধিগ্ধচিত্ত, তিনি বলিতে পারেন যে, সে "তাঁহার প্রলাপ বই নয়। তিনি যে কৃষ্ণ, ইহা তিনি অধিরূঢ় ভাবে বলিতেন। অধিরূঢ় ভাবে গোপীগণ অভিমান করিতেন যে তাঁহারাই কৃষ্ণ। সেইরূপ প্রভু অধিরূঢ় ভাবে বলিতেন যে, তিনিই কৃষ্ণ। কিন্তু "মহাপ্রকাশ" বর্ণনা পাঠ করিলে জানা যায় যে প্রভুর যে "প্রকাশ" উহা প্রলাপ নয়। তাহার পর মহাপ্রকাশের দিনে প্রভু কি করিলেন? ঠাকুর বৃন্দাবন বলিতেছেন, "অন্য দিন প্রভু বিষ্ণুখট্টায় এইরূপ ভাবে উপবেশন করেন,—যেন না জানিয়া। অগ্রে অচেতন হয়েন, তাহার পরে খট্টায় উপবেশন করেন। কিন্তু মহাপ্রকাশের দিনে সে সমুদয় মায়া করিলেন না, সহজ অবস্থায় খট্টায় বসিলেন।"

প্রকাশাবস্থায় তিনি বলিতেন "আমি সেই"; আর ভক্তগণ বিশ্বাস করিতেন যে "তিনি সেই।" "আমি সেই' এ-কথা বলা সহজ, কিন্তু এ-কথায় উপস্থিত জনগণের বিশ্বাস জন্মান অসম্ভব, কেহ পারে না।

একটু চিন্তা করিলে জানা যাইবে যে যদি শ্রীভগবান মনুষ্যের মধ্যে আগমন করেন, তবে তাঁহার এই সংসার তদণ্ডে ধ্বংস হয়। শ্রীভগবান যদি তাহাদের মধ্যে আগমন করেন, তবে জীবগণ কিছু করিবে না—খাইবে না, শুইবে না, ঘুমাইবে না, নিশ্চল হইয়া থাকিবে। তাই ভগবানের আসিতে হইলে তাঁহাকে গোপনে আসিতে হয়। মহাপ্রকাশের দিন প্রভু সাত প্রহর শ্রীভগবদ্ভাবে প্রকাশ ছিলেন। তাহাতে কি হইল, না ভক্তগণ শেষে কাতর হইয়া চরণে পড়িয়া বলিলেন, "তুমি যাও, আমরা তোমার তেজ সহ্য করিতে পারিতেছি না।" তাই ভগবান লুকাইলেন। সেই নিমিত্ত প্রভু ক্ষণমাত্র শ্রীভগবদ্ভাবে প্রকাশ হইতেন, এবং সেই নিমিত্ত ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেন। অন্যান্য সময় তিনি ভক্তভাবে থাকিয়া, ভক্তের কি আচরণ তাহা পালন করিয়া, জীবকে শিখাইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে অবতার গোটাকতক প্রমাণ দিতেছি ঃ

১। দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ—শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীসার্বভৌম, শ্রীপ্রবোধানন্দ প্রভৃতি—তাঁহাকে শত শত বার পরীক্ষা করিয়া উহা মানিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা মহাহিন্দু, তাঁহারা তাঁহার চরণ গঙ্গাজল তুলসী দিয়া পূজা করিতেন।

২। প্রভু যে অবতার ইহা তিনি প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে চিরদিন আপনি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজ মুখে স্বীকার করিতেন যে, তিনি শ্রীভগবান, আর আপনার চরণ গঙ্গাজল-তুলসীদলে পূজা করিতে দিতেন। তিনি তাঁহার ভক্তগণ সম্বন্ধে যাহা বলিতেন তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি যে শ্রীভগবান তাহা তিনি জানিতেন। যথা—যখন শ্রীনিত্যানন্দ আগমন করিবেন, তাহার পূর্বে তিনি বলিলেন যে, তিনি বলরাম। নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বলিলেন যে, যদি নিত্যানন্দ অতি মন্দকার্য্যও করেন তবু তাঁহার চরণকমল স্বয়ং ব্রহ্মারও বন্দ্য।" শ্রীঅদ্বৈত সম্বন্ধে বলিলেন, "তিনি অতি প্রাচীন ভক্ত, প্রহ্লাদ প্রভৃতির পূর্বেও তিনি ভক্ত, অতএব তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা বড়।" এখন দেখুন যে, সেই অদ্বৈত প্রভু তরজা পাঠাইতেছেন আর প্রভু সহজ অবস্থায় তাহার অর্থ কি করিতেছেন।

তরজার অর্থ এই যে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু জীবের মধ্যে প্রেমভক্তি বিতরণের নিমিত্ত ঠাকুরকে আহ্বান করেন, সেই নিমিত্ত তিনি ধরাধামে আগমন করিয়াছেন। প্রভুর বয়ঃক্রম যখন ২৪বর্ষ, তখনি তিনি প্রকাশ হইলেন। ইহার পূর্বে যদিও তিনি ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকাশের পর হইতেই কার্য্যারম্ভ হইল। দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রভু প্রচার করিলেন—সিন্ধু হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ প্রেমের বন্যায় ডুবিয়া গেল, লক্ষ লক্ষ আচার্য্য সৃষ্ট হইল, কোটি কোটি লোক প্রেমে নৃত্য করিতে লাগিল। প্রভুর বয়ঃক্রম যখন ৩৬ বৎসর তখন

অদ্বৈত এই তরজা পাঠাইলেন এবং প্রভুকে জানাইলেন যে, "প্রভু, আমাদের কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে। যে জন্য আপনাকে আহ্বান করিয়াছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ ফল পাইয়াছি। এখন আপনি স্বচ্ছন্দে স্বস্থানে গমন করিতে পারেন।" প্রভু উত্তরে বলিলেন, "তাঁহার যে আজ্ঞা।" এই তরজার দ্বারা সহজে বিশ্বাস হয় যে, গৌরলীলা শ্রীভগবানের কার্য্য। অতএব হে জীব, তোমার সৌভাগ্যের আর সীমা নাই।

এই সুযোগে একটি কথা বলিয়া রাখি। প্রকাশাবস্থায় শ্রীপ্রভু বৃদ্ধ জননীর মস্তকে পদার্পণ করেন, এ কথা পূর্বে লিখিয়াছি ও ইহার প্রমাণ দিয়াছি, অর্থাৎ বলিয়াছি যে, এ কথা আমি শাস্ত্রে পাইয়াছি,—আমার মনগড়া কথা নয়। প্রভুর লীলায় যাহা পাইয়াছিলাম তাহাই আমি বলিয়াছি। তবু ইহাতে অনেকে আমার প্রতি বিরক্ত হয়েন। তাঁহারা বলেন, "প্রভু এমন মাতৃভক্ত, তিনি জননীর মাথায় পদার্পণ করিলেন, ইহা কি হইতে পারে? আর তুমিই বা এরূপ কথা লিখিলে কিরূপে? কিন্তু আমার অপরাধ কি? আমি লীলা-সংগ্রাহক, প্রামাণিক যাহা পাইব তাহাই লিপিবদ্ধ করিব,—ইহা ভাল কি মন্দ অর্থাৎ প্রভুর গৌরবপোষক কি নিন্দাবর্দ্ধক তাহা বিচার করিবার অধিকার আমার নাই। তাহা যদি করিতাম, তবে আমার পুস্তক পড়িয়া জীবের কোন লাভ হইত না। প্রভুর লীলাকাহিনী যেরূপে পাইয়াছি, ঠিক সেইরূপ দিয়াছি। যাহার ইচ্ছা হয় তিনি ইহা গ্রহণ করুন, না হয় না করুন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রভু যে জননীর মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম অর্পণ করেন, ইহাতে তোমার আমার ক্লেশের কি কোন কারণ আছে? আমার মনে হয় ইহাতে ক্লেশের কিছুই নাই, বরং অতুল আনন্দের কারণ আছে। যখন অদ্বৈত শুনিলেন যে, নিমাইপন্ডিত শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশ হইয়াছেন, তখন বলিলেন, "নিমাই যে প্রভুর শক্তিসম্পন্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে শ্রীভগবান বলা যায় না। নিমাই পন্ডিতকে আমি তখনই মানিব যখন তিনি আমার মস্তকে পদার্পণ করিতে সাহসী হইবেন।" শ্রীঅদ্বৈতের বয়ঃক্রম তখন ৭৬ বৎসর। তিনি বৈষ্ণবের রাজা, জগতে তিনি ঋষির ন্যায় মান্য। তাঁহার মাথায় পা দেন, এরূপ সাহসী তাঁহার গুরু শ্রীভগবান ভিন্ন অপর কেহ হন না। এই অদ্বৈতের মস্তকে ২৪ বৎসরের নিমাই, যদি তিনি মনুষ্য হন তবে পা দিবেন ইহা হইতে পারে না। লোকের মনে বিশ্বাস যে, লঘুজন গুরুজনের মস্তকে পা দিলে তাহার সে পা খসিয়া পড়ে, কি তাহার কুষ্ঠ হয়। কিন্তু নিমাই অদ্বৈতের মস্তকে পা দিয়াছিলেন। আবার কোন হিন্দুসন্তান, যতই মন্দ হউক না কেন, জননীর মস্তকে পা দিতে পারে না। নিমাই পন্ডিতের বয়ঃক্রম ২৪ বর্ষ ও তাঁহার মাতার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। এরূপ বৃদ্ধা জননীর মস্তকে পদার্পণ করিতে নিতান্ত যে পাষণ্ড সেও পারে না। এইরূপ অবস্থায় নিমাই পণ্ডিতের যেরূপ ভক্তিবৃত্তি তাহাতে তাঁহার মত বস্তু জননীর মস্তকে যে পদার্পণ করিবেন তাহা একেবারে অসম্ভব। সুতরাং নিমাই পন্ডিত যখন জননীর মস্তকে পদার্পণ করেন, তখন তিনি নিমাই পন্ডিত ছিলেন না। ঘটনা এই, শ্রীভগবান প্রকাশ হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "আমি আদি, আমি সকলের পিতা।" শচী সম্মুখে করযোড়ে কাঁপিতেছেন। শ্রীবাস বলিলেন, "জননী। কর কি? প্রণাম কর। উনি তোমার পুত্র নন, জগতের পিতা।" শচী প্রণাম করিলেন, আর শ্রীভগবান তাঁহার মস্তকে শ্রীপাদ অর্পণ করিলেন। যদি শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান না হইবেন তবে জননী প্রণাম করিলে, ভয় পাইয়া তিনি বলিতেন;—"মা! কর কি, উঠ, অকল্যাণ কেন কর?" তাহা হইলে মনে সন্দেহ হইতে পারিত যে নিমাই পণ্ডিত প্রকৃত শ্রীভগবান কি না। কিন্তু তখন নিমাইয়ের প্রকাশ অবস্থা, তখন তাহাতে নিমাই-পণ্ডিতত্ব নাই। তখন তিনি জগতের আদি, সকলের কর্তা, শচীরও পিতা। তাই তিনি অনায়াসে শচীর মাথায় পা দিলেন। যখন প্রভু ভয় না পাইয়া শচীর মাথায় পদার্পণ করিলেন, তখন ইহাই প্রমাণিত হইল যে, তিনি সত্য সত্যই শ্রীভগবান। নিমাই পণ্ডিত যে স্বয়ং ভগবান, এই লীলাই তাহার এক প্রধান প্রমাণ। প্রভু জননীর

মস্তকে পা দিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা ক্লেশ পান, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, তিনি শ্রীভগবান। যদি শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবানের কাজ করিতেন, তবে জননী তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি তখনই জিহ্বা কাটিয়া শ্রীবিষ্ণু বলিয়া তাঁহার চরণতলে পড়িতেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ সত্য বস্তু, তিনি কেন তাহা করিবেন? তিনি ঐ অবস্থায় যাহা কর্তব্য তাহাই করিলেন, আর জগতকে দেখাইলেন যে, যে ব্যক্তি শচীর তনয় বলিয়া জগতে বিচরণ করিতেছেন, তিনি শচীর ও জগতের পিতাও বটে।

যখন শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীভগবান-গৌরাঙ্গকে তরজার দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন যে, তাহার কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে, এখন তিনি স্বধামে গমন করিতে পারেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তাঁহার যে আজ্ঞা।" আবার প্রভু যখন শ্রীস্বরূপকে তরজার অর্থ শুনাইলেন, তখন তিনি বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন; ভাবিতে লাগিলেন যে এ লীলাখেলা কি এতদিনে ফুরাইল! হায়! এতদিন পরে কি ন'দের প্রেমের হাট ভাঙ্গিল? স্বরূপের যেরূপ মনের ভাব হইল আমাদেরও তাহাই হয়। শ্রীঅদ্বৈতের উপর ক্রোধ হয় যে, তিনি কেন প্রভুকে এত শীঘ্র বিদায় দিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্বৈত কি ইচ্ছা করিয়া প্রভুকে বিদায় দিয়াছিলেন, না ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন? যাঁহার ইচ্ছায় তিনি ঠাকুরকে আহ্বান করেন, তাঁহারি ইচ্ছায় তিনি ঠাকুরকে বিদায় দিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত এক বুঝেন যে-জীবের উদ্ধার। জীব উদ্ধারের নিমিত্তই তিনি শ্রীভগবানকে আহ্বান করিয়াছিলেন। জীব উদ্ধার হইল, প্রেমে ভক্তিধর্ম প্রচারিত হইল, বাকি যে কার্য্য রহিল তাহা আচার্য্যগণ কর্তৃক সাধিত হইবে, এখন ঠাকুর স্বধামে গমন করুন,—এই অদ্বৈতের মনের ভাব। কিন্তু ঠাকুরের মনের ভাব অন্যরূপ। যদিও শ্রীঅদ্বৈত ঠাকুরকে বিদায় দিলেন, তবু ঠাকুর তাহার পরে দ্বাদশ বৎসর ধরাধামে ছিলেন। কেন? না, তখনও তাঁহার একটি উদ্দেশ্য সাধিত হইতে বাকি ছিল। সেটি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুও জানিতেন না। প্রভু প্রথমে ভক্তির চর্চা আরম্ভ করিলেন। তাহা শেষ হইলে প্রেমের চর্চা আরম্ভ হইল। জীবকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দেওয়া হইলেও, প্রভু আরও দ্বাদশ বৎসর রহিলেন। কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য রসাস্বাদন দ্বারা জীবকে রসশিক্ষা দেওয়া। হৃদয়-কূপ হইতে রাধাকৃষ্ণ-লীলারস অবিশ্রান্ত উত্থিত করা যাইতে পারে। সামান্য কূপ খনন করিলে জল উঠিবে, কিন্তু তাহা তত পরিষ্কৃত নয়। তদপেক্ষা গভীর করিলে, পূর্বাপেক্ষা ভাল জল উঠিবে। আরো গভীর করিলে, আরো পবিত্র জল উঠিবে। এইরূপে জীবশিক্ষার নিমিত্ত প্রভু শেষ দ্বাদশবর্ষ রাধাকৃষ্ণ-লীলারূপ-কূপ হইতে সুধা উঠাইতে লাগিলেন। ইহার এক উদ্দেশ্য, আপনি আস্বাদ করিবেন, অপর উদ্দেশ্য উদাহরণ দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিবেন। অদ্বৈতের তরজার পর হইতে প্রভু ক্রমেই আভ্যন্তরিক জগতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। পূর্বে ক্ষণেক উদ্ধবের ভাব, ক্ষণেক রাধার ভাব গ্রহণ করিতেন, ক্ষণেক-বা সচেতন থাকিতেন। কিন্তু এখন প্রভুর অন্য সকল ভাব যাইয়া ক্রমে রাধাভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর সে ভাব রহিয়া যাইতে লাগিল। পূর্বে রাধাভাবে কৃষ্ণকথা কহিতে কহিতে, কি কৃষ্ণের সঙ্গ করিতে করিতে, হঠাৎ চেতনা পাইতেন, আবার তখন চেতনা হারাইতেন। কিন্তু যখন প্রভু গম্ভীরালীলা আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার রাধাভাব প্রায় সর্বদা থাকিত, আর যাইত না। প্রভু রাধাভাবে স্বরূপের গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "ললিতে, আমাকে কৃষ্ণের ওখানে লইয়া চল। তিনি আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন।" প্রভুর তখন আপনাকে রাধা বলিয়া সম্পূর্ণরূপে বোধ হইতেছে, আর সেইরূপ স্বরূপকেও ললিতা বলিয়া বোধ হইতেছে,—তাই ঐরূপ বলিতেছেন। কিন্তু রাধাভাবে কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে হঠাৎ চেতন হইল, তখন বিস্মিত হইয়া স্বরূপকে বলিতেছেন,—স্বরূপ, আমি এইমাত্র কি প্রলাপ করিতেছিলাম? আমার বোধ হইতেছিল যে আমি রাধা। কিন্তু আমি'ত রাধা নই, আমি কৃষ্ণচৈতন্য। ইহা বলিতে বলিতে আবার বিহ্বল হইলেন, আবার রাধাভাবে "প্রলাপ" করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখন এই রাধাভাব রহিয়া

যাইতে লাগিল, চেতনা-ভাব ক্রমে কমিতে লাগিল। পূর্বে সন্ধ্যা হইলে রাধাভাব হইত, আর যতক্ষণ নিদ্রা না যাইতেন ততক্ষণ সেভাব থাকিত। এখন দিনের বেলাও রাধাভাব দেখা যাইতে লাগিল। এমন কি, কখন কখনও রাধাভাব পাঁচদিন দশদিন পর্য্যন্ত ক্রমে মাসেক পর্য্যন্ত এবং শেষে বৎসরেক পর্য্যন্ত থাকিতে লাগিল। অর্থাৎ যখন ভক্তগণ রথের সময় নীলাচলে আসিতেন, কেবল তখনই চেতনা লাভ করিতেন, আর ভক্তগণকে বিদায় দিয়া আবার ভাবসাগরে ডুবিতেন। এ কথা অনেকবার বলা হইয়াছে যে, শ্রীমদ্ভাগবতের লীলাকে পুনর্জীবিত করা গৌরলীলার এক প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন বিহার করিয়া মথুরায় গেলেন, তখন রাধা গোপীগণ সহিত কৃষ্ণ-বিরহে বিহ্বল হইলেন এবং তখন রাধা এই বিরহে যে সমদুয় রস আস্বাদন করেন, প্রভু তাহাই করিতে ও জগতকে আস্বাদন করাইতে লাগিলেন।

পাঠকমহাশয় অবগত আছেন, প্রেমিক-ভক্তের তিনভাব,—যথা, পূর্বরাগ, মিলন ও বিরহ। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চভাব বিরহ। আর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টভাব মিলন। মিলন অপেক্ষা পূর্বরাগ ভাল। সেই প্রকার জীবেরও তিন ভাব, আনন্দের আশা, আনন্দ ভোগ আর পূর্বের আনন্দ স্মরণ। আনন্দের আশাকে বলে পূর্বরাগ, আনন্দ ভোগকে বলে মিলন, আর পূর্বের আনন্দ স্মরণকে বলে বিরহ। ইহার মধ্যে শেষোক্তটি সর্বাপেক্ষা মধুর। মিলন হইতে যে বিরহ মধুর, একথা হঠাৎ লোকে বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু যাঁহাবা রসাস্বাদন করিযাছেন, তাঁহারা আমরা কি বলিতেছি, তাহা বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ শ্রীমতীর শ্লোক শ্রবণ করুণ—"সঙ্গম-বিরহঃ বিকল্পে বরমিহ বিরহ ন সঙ্গমস্তস্যাঃ। সঙ্গমে সর্বৈথেকা বিরহে তন্ময় ভূলোকং।" অর্থাৎ যে পরিমাণে বিরহ সেই পরিমাণে আনন্দ আর যে পরিমাণে বিরহ সেই পরিমাণ মিলনে আনন্দ। প্রভুর কি ভাব তাহা কতক শ্রীভগবতের ভ্রমরগীতা পড়িলে জানা যায়। অনেকে অবগত আছেন যে, রাই-উন্মাদিনী বলিয়া একটি গীতের পালা সৃষ্টি হয়, জীব উহার অভিনয় দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া পবিত্র হয়। এ "রাই উন্মাদিনী"প্রভুর পূর্বে জগতে কিয়ৎ পরিমাণে ছিল, আর যাহা ছিল তাহা কথায়। কিন্তু "রাই-উন্মাদিনী" কি, তাহা প্রভু নিজে আচরিয়া দেখাইলেন। তিনি কার্য্যে যাহা দেখাইলেন, তাহা কবিগণ অনুভবও করিতে পারেন নাই। একটি পদের বিচার করিব। যথা—"রাই কৃষ্ণ কথা কইতে ছিল। কথা কইতে কইতে নীরব হল।" প্রভু কৃষ্ণকথা কহিতে গেলেন, অমনি ভাবের তরঙ্গ উঠিল, উঠিয়া কণ্ঠরোধ ও নিশ্বাস বন্ধ হইল, ও অমনি নয়নতারা স্থির হইয়া গেল। এরূপ দৃশ্য কোথা ছিল? কে কোথা দেখেছেন বা শুনেছেন? প্রভু আপনি আচরণ করিয়া ইহা দেখাইয়াছিলেন। প্রভু সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু নয়ন মুদিয়া; যেহেতু হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন। তাই নয়ন মেলিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। কিন্তু নয়ন মুদিয়া চলিয়াছেন। তাই পদস্খলন হইতেছে, আর ভক্তগণ দুঃখ পাইতেছেন। বলিতেছেন, প্রভু নয়ন মেলিয়া চলুন, পড়িয়া যাইবেন।" সেই হইতে রাইউন্মাদিনীর গীত হইল;—"অমন করে যা'স না, ধীরে চল। তুই নয়ন মুদে চলে যাবি, প্রেমের দায়ে কি প্রাণ হারাবি?"

প্রভুর কার্য্যের সহায়তার নিমিত্ত, তাঁহার আগমনের পূর্বে "জয়দেব", "বিদ্যাপতি", "চণ্ডীদাস" ও "বিল্বমঙ্গল" উদিত হয়েন। এই উপরি উক্ত প্রেমিকভক্ত কবিগণ যেরূপ কথার দ্বারা প্রেমের সূক্ষ্ম-কথা লইয়া খেলা করিয়া গিয়াছেন, প্রভু আপনার আচরণের দ্বারা উহা জীবের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই জীব এখন সেই "প্রেমের সূক্ষ্ম" তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছেন। জয়দেবের নায়ক 'বনমালী-রাখাল।' তাহার নায়িকা সেইরূপ 'বনচারিণী-রাধা'। উভয়ে জগতের কুটিলতার কোন ধার ধারেন না,—তাঁহারা প্রেমের পাগল। আবার ইঁহারাই শ্রীভগবান, ঐশ্বর্য্য-বিবর্জিত। জয়দেব ইহাদের প্রেমের খেলা সুললিত কবিতায় বর্ণনা করিয়া উহাতে অতি মিষ্ট সুর দিলেন। সহজে লোকে সেই গীত শুনিলে পাগল হয়।

কিন্তু শ্রীজগন্নাথদেবকে এই সকল গীত আরও ভাল করিয়া শুনান হইত। দেবদাসীরা এই সকল গীত অভ্যাস করিত, করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে গান করিত ও নৃত্য করিত। এই দেবদাসীরা দক্ষিণদেশের মন্দিরে প্রতিপালিত হইত। ইহাদিগকে "মুরারী" বলে। আর দক্ষিণদেশের এক মন্দিরে যত মুরারী ছিল, প্রভু সমুদয় উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু যদিও কোন কোন স্থানের দেবদাসীদিগের চরিত্র মন্দ, তবু তাহারা যখন সুস্বরে ঠাকুরের নিকট গীত গাহিত, তখন শ্রোতা ও দর্শকগণকে মোহিত করিত।

প্রভু বিরহ-বিহ্বল অবস্থায় জলেশ্বর টোটায় গমন করিতেছেন, সঙ্গে গোবিন্দ। এমন সময় তাঁহার কর্ণে গীতধ্বনি প্রবেশ করিল। বুঝিলেন, জয়দেব কবিতা গীত হইতেছে, রাগিণী গুর্জরী। তখন তিনি আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, গীতধ্বনি লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। গোবিন্দ পশ্চাৎ যাইতেছেন, হঠাৎ প্রভুর এরূপ দ্রুতগতি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। প্রথমে প্রভুর দ্রুতগমনের কারণ বুঝিতে পারেন নাই। পরে যখন বুঝিলেন, তখন অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কারণ যিনি গীত গাহিতেছেন, তিনি দেবদাসী—স্ত্রীলোক। প্রভু সন্ন্যাসী, মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চলিয়াছেন, কেন না তাহাকে আলিঙ্গন করিতে। প্রভু যদি বিহ্বল অবস্থায় তাহাকে আলিঙ্গন করেন, তবে চেতন অবস্থায় নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিবেন। তাই গোবিন্দ তাঁহাকে নিবারণ করিতে, তাঁহার পশ্চাৎ ধাইলেন। প্রভুর সহিত দৌড়িয়া কেহ পারে না, গোবিন্দও পারিতেন না, কিন্তু প্রভুর অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইতেছে। কারণ পথে সিজের কাঁটা দিয়া অনেক বাগান ঘেরা, সুতরাং যাইতে অনেক বাধা পাইতেছেন, গাত্রে কণ্টক ফুটিতেছে, অঙ্গ রক্তময় হইতেছে; কিন্তু তাহাতে প্রভুর ব্যথা বোধ নাই। প্রভু কেবল দৌড়িয়াছেন। এমন সময় গোবিন্দ প্রভুকে ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, "প্রভু করেন কি? যিনি গাহিতেছেন তিনি স্ত্রীলোক।" স্ত্রীলোকের নাম শুনিবামাত্র অমনি প্রভুর বাহ্য হইল; তখন ফিরিলেন, আর বিহ্বল মনে গোবিন্দকে বলিলেন, "আজ তুমি আমাকে ক্রয় করিলে। আমি যদি প্রকৃতি স্পর্শ করিতাম, তবে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমার প্রাণ দিতাম। গোবিন্দ, তুমি আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।" প্রকৃত কথা, এই ঘটনায় ভক্তগণ বড় ভীত হইলেন; বুঝিলেন যে, প্রভুকে সতত নানা প্রকারে রক্ষা করিতে হইবে।

প্রভু দিবাভাগে রাধাভাবে জগৎ কৃষ্ণময় দেখেন, আর জগতের সমুদয় কার্য্যে কৃষ্ণলীলা অনুভব করেন। আবার রজনীতেও বটে এবং স্বপ্নেও তাহাই। কোন কোন দিন স্বপ্নে এরূপ নিমগ্ন হয়েন যে, বেলা হইলেও উঠেন না। একদিন স্বপ্নে রাসলীলা দেখিতেছেন, শয্যা হইতে উঠিতেছেন না। বিলম্ব দেখিয়া গোবিন্দ প্রভুকে ডাকিলেন। প্রভু উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বপ্নের আবেশ গেল না। মনে করুন, প্রভুর মনের ভাব দিবানিশি এই যে, কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, আর তিনি রাধা, বৃন্দাবনে একাকিনী পড়িয়া আছেন। যখন স্বপ্নে রসারসে নিমগ্ন হইলেন, তখন "কৃষ্ণ-বিয়োগিনী" ভাব গিয়াছে; বোধ হইতেছে, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন। তাই প্রভাতে গোবিন্দ যখন তাঁহাকে উঠাইলেন, তখন প্রভুর হৃদয় আনন্দে টলমল করিতেছে, বদন প্রফুল্ল হইয়াছে। প্রভুর আনন্দ ও বিরহ-বেদন এত অধিক যে, তাঁহার বদনে তাঁহার মনের ভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইত। প্রভু দর্শনে চলিলেন, যাইয়া জগন্নাথকে দেখিতে পাইলেন না; দেখিলেন, ত্রিভঙ্গ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ। যেহেতু প্রভু তখন বৃন্দাবনে, আর সেইভাবে মন তাঁহার গরগর। প্রভু গরুড়ের স্তম্ভে হস্ত দিয়া দর্শন করিতেন, এই তাঁহার নিয়ম; আর অগ্রবর্তী হইতেন না। প্রথমে যে দিবস শ্রীজগন্নাথ দর্শন করেন, সেই দিন ঠাকুরকে হৃদয়ে ধরিয়াছিলেন বলিয়া, পাছে আবার সেইরূপ করেন, সেই ভয়ে অনেক দূর হইতে, অর্থাৎ গরুড়ের স্তম্ভের নিকট হইতে দর্শন করেন। প্রভু স্বপ্নাবেশে গরুড়ের স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া, জগন্নাথ না দেখিয়া মুরলীধর কালাচাঁদকে দেখিতেছেন। এমন সময় কোন একটি স্ত্রীলোক দর্শন করিতে না পারিয়া গরুড়ে উঠিয়া দর্শন করিতেছে,—এক পা গরুড়ের উপর, আর এক পা মহাপ্রভুর স্কন্ধে দিয়াছে। প্রভু বিহ্বল, অবশ্য

তাঁহার জ্ঞান নাই। কিন্তু গোবিন্দ ইহা দেখিলেন, দেখিয়া স্ত্রীলোকটিকে তিরস্কার করিলেন। স্ত্রীলোকটি তাহার অপরাধ জানিয়ে ভয়ে ভয়ে নামিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে জানিতেন, লোকের ভিড়ে, না জানিয়াই মহাপ্রভুর স্কন্ধে পা দিয়াছিলেন। কথা এই, প্রভু গরুড়ের নিকট, গরুড় পক্ষীর ন্যায়, আপন মনে দাঁড়াইয়া থাকেন। তিনি যে সেখানে আছেন তাহা বিদেশীয় যাত্রীগণ জানিতেই পারিত না। স্বদেশীয় যাহারা, তাহারাও অনেক সময় তাহা লক্ষ্য করিতে পারিত না, সেই নিমিত্তই এরূপ সম্ভব হইত যে, প্রভু দর্শন করিতেছেন, আর তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়া অন্য লোক দর্শন করিতেছেন।

যখন গোবিন্দ স্ত্রীলোকটিকে তিরস্কার করিলেন, তখন প্রভু কতক বাহ্য পাইলেন; পাইয়া বলিতেছেন, "গোবিন্দ, কর কি? উনি স্বচ্ছন্দে দর্শন করুন।" কিন্তু স্ত্রীলোকটি গোবিন্দের তিরস্কার শুনিয়া, প্রভুকে দেখিবামাত্র, আস্তে আস্তে নামিলেন; নামিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিলেন যে, তিনি না জানিয়া এরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, আর ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু বলিতেছেন, "আহা মরি মরি, আর্ত্তি! জগন্নাথকে দর্শন করিবার জন্য আমি যদি এই আর্ত্তি পাইতাম তবে কৃতার্থ হইতাম। জগন্নাথে এ স্ত্রীলোকটির মন এরূপ নিবিষ্ট যে আমার স্কন্ধে যে পা দিয়াছে, তাহা ইহার জ্ঞান নাই।" সে যাহাহউক, প্রভু এ পর্য্যন্ত, পূর্ব্বনিশির স্বপ্ন প্রভাবে, শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিতে যাইয়া, বনমালী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছিলেন। এখন এই স্ত্রীলোকের কাণ্ডে কতক বাহ্য পাইয়া আর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না;—দেখিতেছেন, জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা! তখন সন্তাপিত হইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। মনের ভাব যে, শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া পাইয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে আবার হারাইয়াছেন। বাসায় বসিয়া বামহস্তে বদন রাখিয়া নয়ন মুদিয়া অঝোর-নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন; কখন বা নয়ন উন্মীলন করিয়া নখ দিয়া মৃত্তিকায় ত্রিভঙ্গাকৃতি লিখিতে লাগিলেন, আর নয়ন-জলে উহা ধৌত হওয়ায় পুনঃ পুনঃ এই চিত্র লিখিতে লাগিলেন। আহা! যদি প্রভুর তখনকার মুখের এই ছবির একটা ফটোগ্রাফ পাইতাম, তবে জীবন সুখে কাটাইতে পারিতাম। প্রিয়জনের বিরহ বহুদেশে কবিগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রভু যেরূপ কৃষ্ণ-বিরহরস প্রকাশ করিলেন, ইহা জগতে কেহ কখন স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই। এই অবস্থায় প্রভুর সমস্ত দিবা গেল। ক্রমে সন্ধ্যা আসিতে লাগিল, আর সেই সঙ্গে প্রভুর বিরহ-বেদনা বাড়িতে লাগিল। বিরহ-বেদনার কথা সকলে শুনিয়াছেন, কিছু কিছু আপনা-আপনিও ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু বিরহ-বেদনায় কে কোথায় বাণবিদ্ধ মনুষ্যের ন্যায় "উহুঃ মরি, উহুঃ মরি" বলিয়া সন্তাপ করে? বৃশ্চিক দংশনে মনুষ্যকে অস্থির করে, দষ্ট-ব্যক্তি জ্বালায় গড়াগড়ি দিয়া থাকেন; কিন্তু কে কোথা বিরহ-বেদনায় ধূলোয় গড়াগড়ি দেয়? ভারি শোক পাইলে লোকে গড়াগড়ি দিয়া থাকে, মূর্চ্ছিতও হয়। অবশ্য শোক কেবল বিরহ হইতে উৎপত্তি। কিন্তু শোকের প্রধান কারণ বিরহ নহে,—নিরাশ বিরহ। প্রিয়জনকে হারাইয়াছেন; আর যিনি শোকী, তিনি ভাবিতেছেন, শুধু যে তাঁহাকে হারাইয়াছেন তাহা নয়, তাঁহাকে চিরজীবনের মত হারাইয়াছেন। সেই নিমিত্ত শোক এত দুঃখকর হয়। যদি শোকীব্যক্তি জানিতে পারে যে, তাহার প্রিয়জনকে পরকালে আবার পাইবে, তবে অমনি শান্তিলাভ করে।

আমেরিকা দেশে একটি অদ্ভুত ঘটনা লইয়া সংবাদপত্রের মধ্যে বিপুল বিচার হয়। একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী মরিয়াছেন; আর তাহার আত্মীয়গণ তাহার মৃতদেহ লইয়া সে দেশের নিয়মানুসারে নিশিতে জাগরণ করিতেছেন। তাঁহারা জনকয়েক স্ত্রীপুরুষে মৃতদেহের নিকট আছেন; এক একজন করিয়া জাগিতেছেন, আর সকলে ঘুমাইতেছেন। ইহার মধ্যে একজন দেখিতেছেন যে, সেই মৃতদেহের নিকট মৃত যুবতীটি দাঁড়াইয়া যেন ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। তখন তিনি ভয়ে চীৎকার করিলেন, আর সেই শব্দ শুনিয়া সকলে জাগিয়া উঠিলেন। তখন

তাঁহারা দশজনেই সেই বালিকার পরকালের জন্ম দেখিলেন। যুবতীর জন্য তাঁহার জননী শোকে পাগল হইয়াছেন। তিনি দূরে অন্য স্থানে ছিলেন, কাজেই তাঁহার কন্যার আত্মাকে দেখিতে পান নাই; কিন্তু দর্শকগণের মুখে শুনিলেন, বিশ্বাসও করিলেন। তখন শোক ভুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, তাঁহার কন্যা মরে নাই, জীবিত। তখন পুনর্মিলনের আশা হইল, তাই শোক গেল।

বিরহ-বেদনা পূর্ণরূপে উদয় হইলে "দশ-দশা" উপস্থিত হয়। শ্রীরূপ তাঁহার রস-শাস্ত্রে "দশ-দশার" এই সমুদয় লক্ষণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন; যথা,—"চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা। প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদৌ মোহো মৃত্যুর্দশাদশঃ।" অর্থাৎ (১) চিন্তা, (২) জাগরণ, (৩) উদ্বেগ, (৪) কৃশাঙ্গতা, (৫) অঙ্গের মালিন্য, (৬) প্রলাপ, (৭) ব্যাধি, (৮)উন্মাদ, (৯) মূর্চ্ছা (১০) প্রায় মৃত্যু;—কি মৃত্যু; বিরহে এই দশটি দশা উপস্থিত হয়। জীব ইহা পূর্বে জানিতেন না। মহাপ্রভুর ভাব দেখিয়া ইহা জানিলেন। প্রভুর কৃষ্ণবিরহে এরূপ নয়টি দশা প্রত্যহই হইত, আর দশমী-দশা মাঝে মাঝে হইত। রজনী উপস্থিত হইলে প্রভু নয়টি দশায় অভিভূত হইয়া ছটফট করিতেছেন, শেষ-দশাটি অর্থাৎ মৃত্যু-দশাটি কেবল বাকী রহিয়াছে। স্বরূপ রামরায় চেষ্টা করিয়া প্রভুকে নানা উপায়ে সান্ত্বনা করিতেছেন। প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণযাত্রার সৃষ্টি ও পরিবর্দ্ধন হইল। মনে ভাবুন, বদন অধিকারী যেন রাধাকে লইয়া কৃষ্ণযাত্রা করিতেছেন। সে কিরূপ, না যেরূপ স্বরূপ ও রামরায় প্রভুকে লইয়া গম্ভীরা-লীলা করিতেন। তবে স্বরূপ রামরায় প্রকৃতই রাধাকে লইয়া কৃষ্ণযাত্রা করিতেন, বদন সেই দেখাদেখি প্রকৃত রাধাকে না পাইয়া, কাহাকে রাধা সাজাইয়া, তাহাকে প্রভুর উক্ত কথা শিখাইয়া, কৃষ্ণযাত্রা করিতেন। প্রভু ঘনঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন, প্রলাপ বকিতেছেন, কখন বা নিজেই বাহ্যজ্ঞান লাভ করিতেছেন। যখন ক্ষণিক চেতনা-লাভ করিতেছেন, তখন স্বরূপ ও রামরায়কে বলিতেছেন, "উপায় কি বল, আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। রামরায় একটি শ্লোক পড়, দেখি যদি আমার শরীর শীতল হয়।" কখন বা স্বরূপকে বলিতেছেন, "একটি কৃষ্ণমঙ্গল গীত গাও, দেখি যদি প্রাণে বাঁচি।" রামরায় শ্রীমতীর পূর্বরাগ বর্ণনা করিয়া, তাঁহার নিজকৃত একটি শ্লোক সুস্বরে পাঠ করিলেন। আর স্বরূপ জয়দেবকৃত রসের একটি পদ গাইলেন। ক্রমে প্রভুর মনের ভাব ফিরিল, হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ আসিল, এবং ক্রমে প্রভু দিশেহারা হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অধিক রজনী হইতেছে দেখিয়া স্বরূপ ও রামরায় অনেক যত্ন করিয়া, কতক-বা বল দ্বারা, প্রভুকে শয়ন করাইলেন। তারপর প্রদীপ নির্বাণ করিয়া, বাহির হইতে শিকল দিয়া, দ্বারে গোবিন্দ, কি স্বরূপ, কি উভয়ে শয়ন করিলেন। প্রভু শয়ন করিয়া কোনদিন নিদ্রা গেলেন, কোন দিন বা উচ্চৈস্বরে নাম জপিতে লাগিলেন।

প্রভু একদিন প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেহের সমুদয় কার্য্য অভ্যাসবশতঃ করিয়া সমুদ্র-স্নানে গমন করিলেন, পরে দর্শনে দাঁড়াইলেন। কখন একেবারে বিহ্বল অবস্থায় আপনার ভাবে আছেন; কখন-বা লোকের সহিত কথা বলিতেছেন। সে কথা কি তাহা বুঝুন। বলিতেছেন, "কে গা তুমি বাপ, কে গা আমার বাপের ঠাকুর, কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন বলিতে পার?" সে চুপ করিয়া থাকিলে, তখন আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি বলিতে পার, তিনি কোথা গেলেন?" কেহ-বা বলিল, "পারি, আইস আমার সঙ্গে, আমি দেখাইয়া দিব।" ইহা বলিয়া সে অগ্রে অগ্রে চলিল। প্রভু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সে মন্দিরের মধ্যে যাইয়া প্রভুকে সিংহাসনের অগ্রে রাখিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া শ্রীজগন্নাথকে দেখাইয়া বলিল,"ঐ যে তোমার কৃষ্ণ।" ঠাকুরও কৃষ্ণকে পাইয়া মহাসুখী। যে দিবস প্রভু স্বপ্নে কৃষ্ণকে পাইয়া গরুড়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণকে দেখিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার স্কন্ধে আরূঢ় স্ত্রীলোকের স্পর্শে চেতন পাইয়া আবার কৃষ্ণকে হারাইয়া, সমস্ত দিন-রাত্রি রোদন করিতেছিলেন, সেই রজনীতে

এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। অধিক রাত্রি দেখিয়া স্বরূপ ও রামরায় প্রভুকে কতক বল দ্বারা ও কতক বুঝাইয়া শয়ন করাইলেন। রামরায় গৃহে গেলেন, কিন্তু স্বরূপ নিজ কুটীরে না যাইয়া প্রভুর দ্বারে শয়ন করিলেন; কারণ দেখিলেন, প্রভু যদিও শুইলেন তবু ঘুমাইলেন না,—উচ্চ করিয়া নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। নামকীর্তন করিতে করিতে প্রভু হঠাৎ নীরব হইলেন। প্রভু ঘুমান নাই বলিয়া স্বরূপও জাগিয়া আছেন। প্রভুকে নীরব দেখিয়া ভাবিলেন তিনি নিদ্রা গিয়াছেন। ইহা ভাবিয়া বাহির হইতে শিকল খুলিয়া অভ্যন্তরে যাইয়া দেখেন,—সর্বনাশ! গৃহ শূন্য! প্রভু নাই!!!

প্রভু কিরূপে কোথায় গেলেন? সদর দরজায় যেরূপ শিকলি দেওয়া ছিল সেইরূপ আছে। সেখানে আবার গোবিন্দ ও স্বরূপ শয়ন করিয়া। গৃহের মধ্যে তিন দিকে তিনটি দ্বার আছে, তাহাতেও খিল দেওয়া;—তবে প্রভু কিরূপে বাহির হইলেন? কিন্তু সে সামান্য কথা। প্রধান কথা, প্রভু কোথায় গেলেন?

তখন কলরব হইল, সকলের নিকট সংবাদ গেল, সকলে তল্লাসের নিমিত্ত দৌড়িয়া আসিলেন। দীপ জ্বালিয়া তল্লাস করিতে করিতে দেখিলেন যে শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তরদিকে প্রভু পড়িয়া আছেন। প্রভুকে পাইয়া সকলে আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দশা দেখিয়া মহাভীত ও চিন্তিত হইলেন। দেখিলেন, হস্ত পদ কটি ও গ্রীবার যত অস্থিসন্ধি আছে, সমুদয় শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রভুর হস্ত পদ ও দেহ অতি দীর্ঘ হইয়াছে। প্রভুর দেহ তখন আর মনুষ্যের দেহ বলিয়া বোধ হইতেছে না, উহা ৫।৬ হস্ত লম্বা বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাতে আবার উত্তান নয়ন। মুখ দিয়া ফেন পড়িতেছে। প্রভুর দশা দেখিয়া সকলের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ ও ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। স্বরূপ প্রভুর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে করিতে প্রভুর কর্ণে নাম প্রবেশ করিল। তখন প্রভু "কাঁহা কাঁহা" শব্দ করিতে লাগিলেন, ও পরে "হরিবোল" বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিয়া বসিলেন। আর অস্থিসন্ধি সমুদয়, যাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ যথা স্থানে আসিয়া জোড়া লাগিল। প্রভু উঠিয়া নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। শেষে স্বরূপের মুখপানে চাহিয়া বলিতেছেন, "ব্যাপার কি?" স্বরূপ বলিলেন, "আগে ঘরে চলুন, সেখানে বলিব।" বাসায় আসিয়া স্বরূপ সমুদয় কথা বলিলেন। প্রভু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমার কিছুই মনে নাই, কেবল এইটুকু মনে আছে যে, চঞ্চল কৃষ্ণ আমাকে দর্শন দিয়া অদর্শন হইলেন, আর আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে পশ্চাৎ যাইতেছিলাম।"

এই লীলাটি রঘুনাথ দাস তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন। তিনি তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। তিনি প্রভুকে তল্লাস করিতে গিয়াছিলেন। যখন গ্রন্থকার এই লীলা প্রথম অবগত হইলেন, তখন তাঁহার মনে একটি কথা উদয় হইয়াছিল। প্রভুর দেহে যখনই কোন অলৌকিক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিপরীত ভাব দেখা দিয়াছে। অর্থাৎ যেমন প্রভু কান্দিতেছেন, তাহার পরেই নিশ্চিত তিনি হাসিবেন। এই প্রভুর শ্বাসরুদ্ধ হইল, পরক্ষণেই এরূপ জোরে নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল যে কাহার সাধ্য সম্মুখে উপবেশন করে। এই দেখা গেল প্রভুর অঙ্গ লৌহ-দণ্ডের ন্যায় শক্ত, আবার পরক্ষণেই উহা এত কোমল হইল, যেন উহাতে অস্থিমাত্র নাই। এই প্রভু এত ভারি হইলেন যে, তাঁহাকে ক্রোড়ে করে কাহার সাধ্য; আবার তখনই এরূপ লঘু হইলেন যে, যে কেহ তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইতে পারে। এ সমুদয় অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, যখন প্রভুর অস্থিগ্রন্থি শিথিল হইয়া হস্ত পদ দীর্ঘ হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিপরীত ভাবও প্রকাশ পায়। আর একদিনের অদ্ভুত কাণ্ড শ্রবণ করুন। প্রভু, স্বরূপ ও রামরায়ের সঙ্গে নিশিযাপন করিতেছেন। কখন স্বরূপ গীত গাহিতেছেন, কখন রামরায় শ্লোক বলিতেছেন ও তাহার অর্থ করিতেছেন। নিশি দুই প্রহর হইলে, তাঁহারা প্রভুকে সান্ত্বনা করিয়া, শয়ন করাইয়া,

গৃহে গেলেন। কেবল গোবিন্দ দ্বারে প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত রহিলেন। প্রভু শয়ন করিয়া উচ্চৈস্বরে নামকীর্তন করিতে করিতে হঠাৎ নীরব হইলেন। তখন গোবিন্দ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন পূর্বকার একদিনের ন্যায় তিন দ্বারে কপাট কিন্তু প্রভু ঘরে নাই। তখন তিনি দৌড়িয়া গিয়া স্বরূপকে সংবাদ দিলেন। ইহা শুনিয়া ভক্তগণ দৌড়িয়া আসিলেন, আর প্রদীপ জ্বালিয়া প্রভুকে তল্লাস করিতে লাগিলেন। গতবার প্রভুকে শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তর দিকে পাওয়া গিয়াছিল, তাই প্রথমে সেখানে গেলেন। কিন্তু ঠিক সেখানে পাইলেন না; পরে দেখেন যে, সিংহদ্বারের দক্ষিণ দিকে প্রভু পড়িয়া আছেন। প্রভুর ঘরে তিন দ্বার, তাহা খোলা হয় নাই, অথচ প্রভু ঘরে নাই। যেখানে প্রভুকে পাওয়া গেল তাহাতে বুঝা গেল যে, প্রভু তিনটি অনুন্নত প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছেন। রঘুনাথ দাস এবারও তল্লাসকারীর মধ্যে ছিলেন। তিনি তাঁহার স্তবাবলীতে এই ঘটনা লইয়া বলিতেছেন, যথা—

"অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরুচ ভিত্তিত্রয়মহো-
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎ সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি।।"

সকলে দেখেন যে প্রভু পড়িয়া আছেন, আর তৈলঙ্গী গাভীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে, আর তাঁহার অঙ্গ শুঁকিতেছে। তাহারা যেন অতি যত্নের সহিত প্রভুর অঙ্গ রক্ষা করিতেছে, প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছে না। ভক্তগণ যাইয়া কিরূপ দেখিলেন? না—"পেটের ভিতরে হস্তপদ কূর্মের আকার।

মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার।।
অচেতন পড়িয়াছেন যেন কুষ্মাণ্ডফল।
বাহিরে পড়িয়া অন্তরে আনন্দে বিহ্বল।।"

পূর্বে যখন প্রভুর দেহ দীর্ঘতা লাভ করে, তাহার বর্ণনা চরিতামৃতে এইরূপ আছে,—

"প্রভু পড়িয়া আছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয়।।
একেক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন হাত।
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন চর্ম আছে তাতে মাত্র।।
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত।।"

এখন উপরের লিখিত দেহের দুই অবস্থা দেখিলে জানা যায়, উহা পরস্পর বিপরীত। প্রভু এইরূপে পড়িয়া আছেন, প্রভুর চতুস্পার্শে গাভী, তাহারা প্রভুকে ছাড়িয়া যাইবে না।

"গাভী সব চৌদিকে শুঁখে প্রভুর অঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গ গন্ধ।।"

ভক্তগণ প্রভুকে, চেতন করাইবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলেন। কিন্তু কিছুই হইল না। পরে প্রভুকে সেই অবস্থায় গৃহে লইয়া আসিলেন। সকলে চিন্তিত; মনের ভাব, এইবার বুঝি প্রভুকে হারাইলেন। গৃহে সকলে উচ্চ করিয়া নামকীর্তন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে প্রভুর কর্ণে নাম প্রবেশ করিল। তিনি হুঙ্কার করিয়া "হরিবোল" বলিয়া গর্জিয়া উঠিলেন, পরে উঠিয়া বসিলেন। প্রভু যেই মাত্র চেতনা লাভ করিলেন, অমনি তাঁহার দেহ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থে 'অষ্টসাত্ত্বিক' ভাবের কথা লেখা আছে। কিন্তু প্রভু দেখাইলেন, অষ্ট কেন প্রেমভক্তির চর্চাতে কত অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। যোগসাধনে যে ফল, প্রেমভক্তির

চর্চাতে তাহা সমুদয় লাভ হয়, অধিকন্তু ভগবানকেও পাওয়া যায়। প্রেমভক্তি চর্চাকেই বলে 'ভক্তিযোগ-সাধনের প্রধান উপায় নাম-কীর্তন।

প্রভু চেতনা পাইয়া এদিকে ওদিকে চাইতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহাকে দেখিতে চাহেন, তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, অতি দুঃখে ও ক্লেশে স্বরূপকে বলিতেছেন, "তোমরা আমাকে সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া এখানে আনিলে কেন? স্বরূপ বলিলেন, "প্রভু, স্পষ্ট করিয়া বলুন, আমরা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" প্রভু বলিলেন, "আমি বেণুর গীত শুনিয়া বৃন্দাবনে গেলাম। দেখি, কানাই গোষ্ঠে বেণুবাদন করিতেছেন। তাঁহার পরে বেণুসঙ্কেত শুনিয়া শ্রীমতী রাধা নিভৃত-নিকুঞ্জে আগমন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে প্রবেশ করিলেন, আর আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কৃষ্ণের শ্রীপদে মঞ্জীর ও কটিতে কিঙ্কিণী বাজিতে লাগিল। সে মধুর ধ্বনিতে আমার কর্ণ মুগ্ধ হইল। গোপী, রাধা, কৃষ্ণ সকলে হাস্যপরিহাস, নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। আমি সুখে এই সমুদয় দর্শন করিতেছি, এমন সময় তোমরা আমাকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিলে। এ কাজ কি ভাল করিলে?" প্রভু ইহা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে প্রভুর অনেক বাহ্য হইল। তখন বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাহাতে একটু লজ্জিত হইলেন। কিন্তু মনের বেগ একেবারে গেল না; বলিলেন, "স্বরূপ! তাপিত অঙ্গ জুড়াও জুড়াও; আমার প্রাণ অস্থির হইয়াছে।" স্বরূপ প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া এই শ্লোক পড়িলেন, যথা শ্রীভাগবতে কৃষ্ণের প্রতি গোপীর উক্তি,—"কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণু গীতং সম্মোহিতাচার্য্য-চরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্। ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রম্।" অর্থাৎ "হে অঙ্গ! (শ্রীকৃষ্ণ!) আপনার কলপদ অমৃতায়মান বেণুগীত সম্মোহিত হইয়া ত্রিলোকী মধ্যে কোন্ স্ত্রী নিজ ধর্ম হইতে বিচলিত না হয়? অধিক কি, তোমার এই ত্রৈলোক্য-সৌভগ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া গাভী পক্ষী বৃক্ষ এবং মৃগগণও পুলক সমূহ ধারণ করিয়াছে।"

শ্লোক শুনিবার পর প্রভু শ্লোক-বর্ণিত রসে নিমগ্ন হইলেন। অর্থাৎ যে গোপী উপরের কথাগুলি কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, প্রভু সেই গোপী হইলেন, হইয়া উপরের শ্লোকের ভাব লইয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—কৃষ্ণ রাসের নিশিতে বেণুগান করিলেন। গোপীগণ আসিলে, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিলেন; বলিলেন, "তোমরা বাড়ী যাও, পতিসেবা কর গিয়া।" সেই কথার উত্তর এক গোপী দিলেন, তাহার ভাব "কাস্ত্র্যঙ্গ-তে" শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। প্রভু এখন সেই গোপী হইয়া কৃষ্ণের সেইরূপ উত্তর দিতেছেন। গোপী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ত বলিলেন, আর সেই ভাব লইয়া উহা প্রস্ফুটিত করিতে লাগিলেন। ইহাকেই বলে "প্রলাপ"। প্রভু বলিতেছেন, আর স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ মুগ্ধ হইয়া সেই প্রলাপ শুনিতেছেন। প্রভু সেই গোপীভাবে, কি সেই গোপী হইয়া, বলিতেছেন (যেন কৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে) "হে কৃষ্ণ! এই কি তোমার উচিত? আমরা কুলবালা, খুঁটিনাটি জানি না। গৃহধর্ম করিতেছিলাম, এমন সময় তোমার বেণুগীত কর্ণে প্রবেশ করিল। তোমার বেণুকে উপেক্ষা করে ত্রিজগতে এরূপ সাধ্য কাহারও নাই। সেই বেণুধ্বনি যাইয়া আমাদের চিত্তকে বন্ধন করিল; করিয়া তোমার চরণে আনিল। আমাদের, স্ত্রীলোকের লজ্জা, কুলের ভয়, সংসারের মমতা, সমুদয়ই অন্যের ন্যায় ছিল; কিন্তু তোমার বেণুগীতে সমুদয় নষ্ট করিল। আমরা এখন জগতে আমাদের যাহা কিছু প্রিয় ছিল সমুদয় তোমার নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া, পথে ভিখারী হইয়া তোমার চরণে আশ্রয় লইলাম। এখন তুমি আমাদিগকে বল, 'বাড়ী যাও, অধর্ম করিও না!" একথা কি উচিৎ?" বলিতে বলিতে প্রভুর মুখে ক্ষোভের চিহ্ন আসিল; আবার বলিতেছেন, "তুমি বল বাড়ী যাও। আমরা কোথায় যাবো? আমাদের বাড়ী কোথায়, আমাদের কি আর বাড়ী আছে? আমরা সমুদয় বিসর্জন দিয়া আসিয়াছি, আর বাড়ী গেলেই-বা তাহারা লইবে কেন? তোমার নিমিত্ত

তাহাদিগকে ছাড়িলাম, এখন তুমি ছাড়িলে কোথা যাইব? তুমি ব্যতীত আমাদের আর কেহ নাই। তোমা ব্যতীত আমাদের আর কিছু ভাল লাগে না। হে বন্ধো! হে প্রাণ! আমরা উপায়হীন অবলা, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না।" প্রভু গোপীভাবে এইরূপে কৃষ্ণকে প্রেম-তিরস্কার করিতেছেন, ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ বাহ্য হইল। তখন স্বরূপ ও রামরায়ের বদন নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, "তোমরা ত স্বরূপ আর রামরায়, আমি ত কৃষ্ণ-চৈতন্য! আমি এখন কি প্রলাপ করিলাম? আমরা বোধ হইতেছে যেন আমি সেই গোপী, যিনি রাসের রজনীতে কৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। আমি সেই গোপীর ন্যায় তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছিলাম। একি প্রলাপ করিলাম?" ইহা বলিতে বলিতে আবার বিহ্বল হইলেন।

এইরূপে প্রভু যখন তাঁহার কৃষ্ণচৈতন্যত্ব সম্পূর্ণভাবে লোপ করিয়া গোপীভাবে কৃষ্ণের চর্চা করিতেন, তাহাকে 'প্রলাপ' বলে। যেহেতু তিনি তাহাকে প্রলাপ বলিতেন। আর এই প্রলাপে তাঁহার প্রকটের শেষ দ্বাদশ বর্ষ গিয়াছিল।

পরে শুনুন, প্রভু আবার বিহ্বল হইলেন, আবার গোপী কি রাধা হইলেন, তবে ভাব একটু পরিবর্তিত হইল। তখন পূর্বের কৃষ্ণকে যে ওলাহন দিতেছিলেন, তাহা ছাড়িয়া স্বরূপ রামরায়কে সখী বোধ করিয়া, তাহাদিগকে, মন উঘাড়িয়া মনের দুঃখে বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে ছাড়িয়া সখীগণকে সম্বোধন করার মানে আছে। তখন মনের মধ্যে যে ভাব উদয় হইল, তাহা কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলা অপেক্ষা সখীগণকে বলাই স্বাভাবিক। বলিতেছেন, "সখি! দেখ কৃষ্ণের মুখের কথা অমৃত, আমাদিগকে কুলের বাহির করিয়া এখন পরিত্যাগ করিতে চাহেন। আমরা যে কুলের বাহির হই, সে কি সাধে? কৃষ্ণের মুখের কথা অমৃত হইতেও মধু কৃষ্ণের কণ্ঠের স্বর কোকিলকে লজ্জা দেয়, কৃষ্ণের গীতে শ্রোতা মূর্চ্ছিত হয়, আবার বেণুগানে জগতের চিত্ত এলাইয়া পড়ে। এই কৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে না পারিয়া লক্ষ্মীগণ তপস্যা করিতেছেন। যে কর্ণ কৃষ্ণের অমৃতভাষা শুনিল না সে কর্ণ বধীর।

প্রভু যত বলিতেছেন, ততই হৃদয়ের তরঙ্গ বাড়িতেছে। "সে কর্ণ বধির"এ কথা বলিতে বলিতে মনে উদয় হইল যে, কৃষ্ণ ত সেখানে নাই! তখন বিরহিণী ভাবে কৃষ্ণকর্ণামৃতে হইতে এই শ্লোক পড়িলেন,—"কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রমঃ কৃতং কৃতমাশয়া,

কথয়তঃ কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ
মধুর মধুর স্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে,
কৃপণ কৃপণ কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বতলম্বতে।।" অঙ্ক ১৭।৫১

শ্লোকের বিচার দুই প্রকারে করা যায়। পণ্ডিত-কবিগণ রাধার উক্তি একটি শ্লোক আওড়াইয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন, সে একরূপ। আর একরূপ প্রভু আপনি রাধা হইয়া বিচার করিতেছেন। প্রভু রাধা হইয়া কৃষ্ণবিরহে মৃতবৎ হইয়া সখীগণকে বলিতেছেন ঃ

"সখি! উপায় বল কি করি, কি করিয়া কৃষ্ণকে পাই? এদিকে তোমরাও আমার মত কাতরা আছ। আবার, আমার দুঃখ তোমাদের ছাড়া আর কাহাকে বলি? কৃষ্ণের নিমিত্ত যাহা করিলাম সেই ভাল, আর তাঁরে ভাবনা করিব না। সখি, কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত অন্য কথা বল।"

বিল্বমঙ্গল উপরি উক্ত শ্লোকে রাধার বিরহ বর্ণনা করিলেন। সেই শ্লোক পড়িবামাত্র প্রভু আপনি রাধা হইলেন, হইয়া শ্লোক বিচার আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত-কবি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়া থাকেন, "শ্রীমতী কৃষ্ণ বিরহে কাতরা হইয়া ইহাই বলিলেন" ইত্যাদি। আর আপনি রাধা, সুতরাং তিনি আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। তাই প্রভু বলিতেছেন, "সখি! আমার অবস্থা শ্রবণ কর" ইত্যাদি। এখন বিল্বমঙ্গলের "কিমিহ কৃণুমঃ" শ্লোকের ব্যাখ্যা

প্রভু রাধা হইয়া কিরূপ করিলেন, তাহার আভাস বলিতেছি।

প্রভুর মনের ভাব, তিনি আপনি রাধা, আর স্বরূপ রামরায় কাজেই তাঁহার সখী। কৃষ্ণকে হারাইয়াছেন, হারাইয়া সকলে বলিয়া হাহাকার করিতেছেন। প্রভুর মনে আশা ও নিরাশা উভয়ই খেলা করিতেছে। যখন আশা আসিতেছে তখন সখীগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, যথা—

"তোমার আমার প্রিয়সখী উপায় বুদ্ধি বল না।
তোমরা জান মন প্রাণে, প্রবোধ সে মানে না।।"

বলিতেছেন, "তোমরা নিজ-জন, আমার মন জান, তোমাদের আর খুলিয়া কি বলিব? তোমাদের প্রবোধ বাক্যে আমার কোন লাভ হইতেছে না, প্রবোধে শান্ত হইতে পারিতেছি না। এখন উপায় বল কি করি? কোথা যাব, কি করিব, কারে মনের ব্যথা বলিব, কিরূপে কৃষ্ণ পাব তাই বল।"

আবার এই ভাবের আর একটি পদ শ্রবণ করুণ। শ্রীমতী সখীগণ লইয়া বসিয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন,—

"ধৈর্য্য ধরি, রোদন সম্বরি, শুন আমার বচন শুন।" অর্থাৎ শ্রীমতী আপনি সখীগণকে বলিতেছেন, "চুপ কর, আর কেঁদো না, এখন আমার পরামর্শ শ্রবণ কর।" বিল্বমঙ্গলের শ্লোক আওড়াইয়া প্রভু চুপ করিলেন। কৃষ্ণের উপর একটু ক্রোধ হইয়াছে; বলিতেছেন, "আমি দেখিতেছি আমার পক্ষে কৃষ্ণকে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। কৃষ্ণের নিমিত্ত বিস্তর করিয়াছি, আর আমাদের যাহা কিছু আছে সমুদয় তাঁহাকে দিয়াছি, তবু তাঁহার কৃপা পাইলাম না। অতএব নিষ্ঠুর কৃষ্ণকে ভজনা না করাই ভাল।"

হে কৃপাময় পাঠক, আপনি কি মানভঞ্জন গীত শ্রবণ করিয়াছেন? সেই গীতে দেখিবেন, শ্রীমতীর কৃষ্ণেব উপর ক্রোধ হইয়াছে, তাই বলিতেছেন, "কৃষ্ণনাম আর করিব না।"

সখী। কৃষ্ণ ভজিবে না, তবে কাহাকে ভজিবে?

রাধা। সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন তাঁহাকে ভজিব। কি ভোলা দয়াময় মহেশ আছেন তাঁহাকে ভজিব। কৃষ্ণ কুটিল চঞ্চল নিষ্ঠুর; তাঁহাকে কি আমাদের ন্যায় অবলার সম্ভব হয়? কৃষ্ণ ভজিব না, যাহাতে কৃষ্ণনাম স্মরণ করায় তাহাও নিকটে রাখিব না।

সখী। তোমার কেশ লইয়া কি করিবা? কেশে যে কৃষ্ণনাম স্মরণ করায়?

রাধা। কেশ মুণ্ডন করিব।

সখী। তোমার কৃষ্ণবর্ণ শ্যামা সখীর কি করিবা?

রাধা। তাহাকে কুঞ্জ হইতে তাড়াইয়া দাও।

কৃষ্ণযাত্রায় মানভঞ্জন পালায় এইরূপে রাধা ও সখীতে কথাবার্তা দেখিবেন। এ কোথা হইতে আসিল? ইহা মহাপ্রভুর প্রলাপ হইতে মহান্তগণ পাইলেন।

তাহার পরে প্রভু বলিলেন যে, 'কৃষ্ণকে বিস্তর করা হইয়াছে, তাঁহাকে আর ভজিব না।" প্রভু ইহা বলিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে তাঁহার হৃদয় মধ্যে যেন কে একজন আছেন। তিনি কে জানিবার জন্য প্রভু নয়ন মুদিলেন, মুদিয়া ঠাউরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখেন যে, যে কৃষ্ণকে তিনি ত্যাগ করিবেন বলিতেছিলেন, সেই কৃষ্ণই তাঁহার হৃদয় মধ্যে আছেন, আর তিনি পরিত্যক্ত না হয়েন, ইহার নিমিত্ত ক্ষুব্ধ-বদনে মধুর হাস্যের সহিত তাঁহার পানে চাহিতেছেন। অর্থাৎ যেন রাধা কৃষ্ণকে ত্যাগ না করেন, এই নিমিত্ত কৃষ্ণ রাধাকে অনুনয় বিনয় করিতেছেন।

প্রভু ইহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "কি সর্বনাশ! কৃষ্ণের ত ছাড়া হইল না, হইল না। তিনি যে আমার হৃদয় মধ্যে স্বচ্ছন্দে আছেন। তাঁহাকে হৃদয় হইতে কিরূপে অবসর করিব? হইল না হইল না!" প্রভু একটু চুপ করিলেন, গদগদ হইয়া বলিতেছেন "সখি!

আবার ও কি হইল? আমার প্রাণ যে কৃষ্ণের নিমিত্ত আবো কান্দিয়া উঠিতেছে। কৃষ্ণ! আমি তোমাকে ত্যাগ কবিব না, কখনই না, কখনই না। আমি যে বলিয়াছিলাম তোমাকে ত্যাগ করিব, সে মনোগত নয়. রাগ করিয়া। তাহাও নয়, ক্ষুব্ধ হইয়া। তাহাও নয় তোমার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া। তাহাও নয়, পাগল হইয়া প্রলাপ বকিতেছিলাম। আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি? তাহা কি কখন হয়? তুমি আমার ও সব কথা কেন বিশ্বাস কর? তোমাকে ত্যাগ করিলে আমার রহিবে কি? তোমা ছাড়া আমার আর কে আছে, বা কি আছে? তুমি না আমার নয়নরঞ্জন, তুমি না আমার প্রাণধন, তুমি না আমার প্রাণের প্রাণ? তুমি যেও না, যেও না।" ইহা বলিতে বলিতে প্রভু মূর্চ্ছিত হইলেন। কিন্তু এ মূর্চ্ছা দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। অতি অল্পক্ষণ পরে সম্বিত পাইলেন; তখন দেখিলেন, কৃষ্ণ নাই। ইহা দেখিয়া আবার সখীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "কে, কোথা গেলেন? এই যে এখানে ছিলেন! হা পদ্মপলাশলোচন! হা শ্যামসুন্দর! হা অলকাবৃত! আমাকে ছাড়িও না। কোথায় তুমি? কোথায় গেলে তোমাকে পাইব? এই আমি এলাম! ইহা বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিলেন, উঠিয়া কৃষ্ণের অন্বেষণে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। কিন্তু পারিলেন না, মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া সেখানেই পড়িয়া গেলেন।

এই গেল প্রলাপের পর দিব্যোন্মাদ,—অগ্রে প্রলাপ, পরে দিব্যোন্মাদ। রাধাভাবে যে সমুদয় কথা কহিলেন সে "প্রলাপ", আর রাধাভাবে যে কার্য্য করিলেন সে "দিব্যোন্মাদ"। যখন রাধাভাবে মনের ভাব হৃদয় উঘাড়িয়া বলিতেছিলেন, তখন "প্রলাপ" করিতেছিলেন। আবার যখন কৃষ্ণের অন্বেষণে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন,—সে প্রভুর "দিব্যোন্মাদ"। প্রভু চেতন পাইয়া কৃষ্ণকে ধরিতে যেই দৌড়িলেন অমনি স্বরূপ উঠিযা তাঁহাকে ধরিলেন, এবং কতক বলপ্রকাশ করিয়া, কতক নানারূপ ছলনা করিয়া, আপনার ক্রোড়ে বসাইলেন। ইহাতে প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হইল। তখন প্রভু বিষণ্ণ মনে বলিতেছেন, "স্বরূপ, মধুর গীত গাহিয়া আমার শরীব শীতল কর।" তখন স্বরূপ গাইলেন,—"হামার আঙ্গিনা আওব যবে রসিয়া। পালটি চাহব হাম ঈষৎ হাসিয়া।।"

প্রভুর হৃদয়ে সেই ভাব তৎক্ষণাৎ স্পর্শিল, আর তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রভু দিব্যোন্মাদের বশীভূত হইয়া ভক্তগণকে অনেক সময় ভয় দিতেন। প্রভু সমুদ্রস্নানে যাইতেছেন, ইহার মধ্যে হঠাৎ অতি দূরে চটক পর্বতের ছায়া দেখিতে পাইলেন। তখন কাজেই প্রভুর বোধ হইল যে সে গোবর্দ্ধন পর্বত! প্রভু কেবল এক পর্বত জানেন,—তিনি শ্রীগোবর্দ্ধন। তখন গোবর্দ্ধনের স্তুতিজনক শ্রীভাগবতের একটি শ্লোক পাঠ করিয়া সেই চটক পর্বত লক্ষ্য করিয়া দৌড়িলেন। দৌড়িলেন কিরূপে, না বিদ্যুৎ গতিতে। গোবিন্দ চীৎকার করিতে করিতে পশ্চাৎ দৌড়িলেন। সেই ধ্বনি কেহ কেহ শুনিলেন। একেবারে প্রচারিত হইল যে, প্রভুর সমুদ্রস্নানে যাইতে পথে কি একটা মন্দ-ঘটনা হইয়াছে। সুতারং যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় সমুদ্র-স্নানের স্থানে ছুটিলেন। এইরূপে স্বরূপ, জগদানন্দ, গদাধর, রামাই, নন্দাই, নিতাই, শঙ্কর, পুরী, ভারতী, এমন কি খঞ্জ ভগবান, পর্য্যন্ত চলিলেন। তাঁহারা আসিয়া প্রভুর লাগ পাইলেন। তাহার কারণ, দৈব তাঁহাদের সহায় হইয়াছেন, নতুবা তাঁহাদের তাঁহাকে পাওয়া দুর্ঘট হইত। যে বায়ুগতিতে প্রভু প্রথমে দৌড়িয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে কাহারও ধরিবার সাধ্য হইত না। কিন্তু প্রভু এইরূপে যাইতে যাইতে স্তব্ধভাবে অভিভূত হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত অঙ্গ অবশ হইল। তখন চলিতে পারিলেন না, এক স্থানে দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে, এমন কি এক একটি পুলকে ব্রণের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা হইতে রুধির নির্গত হইতেছে। বর্ণ হইয়াছে শঙ্খের ন্যায়, যেন শরীরে শোণিত মাত্র নাই। কণ্ঠ হইতে ঘর্ঘর শব্দ হইতেছে, আর নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত ধারা পড়িতেছে। ভক্তগণ প্রভুকে

ধরিতে দৌড়িয়াছেন, এমন সময় প্রভু কাঁপিতে কাঁপিতে মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। গোবিন্দ সর্বাগ্রে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং করঙ্গে জল পূরিয়া প্রভুর গাত্রে সিঞ্চন করিয়া, বহির্বাস দ্বারা বায়ুবীজন করিতে লাগিলেন। এমন সময় স্বরূপ রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কাঁদিতে লাগিলেন। অনেক সন্তর্পণে প্রভুর চেতন হইল, তিনি "হরিবোল" বলিয়া উঠিয়া বসিলেন; আর সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

প্রভু বসিয়া বিহ্বলের ন্যায় এদিক ওদিক চাহিতেছেন। যাহা দেখিতে চান, তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমাকে কেন ধরিয়া আনিলে? আমি গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলাম. যেয়ে দেখি, কৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন। তাহার পর কৃষ্ণ বেণু বাজাইলেন। বেণু শুনিয়া রাধাঠাকুরাণী আসিলেন। তাঁহার যে রূপ তাহা আমি কি বর্ণনা করিব। কৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া নিভৃত স্থানে গেলেন, তখন সখীগণ কুসুম চয়ন করিতে লাগিলেন। এমন সময় তোমরা কোলাহল করিয়া আসিলে, আর আমাকে বলদ্বারা ধরিয়া আনিলে। কেন দুঃখ দিতে আনিলে? সুখে কৃষ্ণলীলা দেখিতেছিলাম, তাহা দেখিতে দিলে না।।" ইহা বলিয়া মহাদুঃখে প্রভু আবার রোদন করিতে লাগিলেন।

এমন সময় পুরী ও ভারতী আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রভু একটু বাহ্য পাইলেন, এবং তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা প্রভুকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। তখন প্রভু নিপট্ট-বাহ্য লাভ করিয়া বলিতেছেন, "আপনারা এতদূর কেন আসিয়াছেন?" তখন সকলের মনে আনন্দ হইয়াছে, তাই পুরী সহাস্যে বলিলেন, "এতদূর আসিলাম তোমার নৃত্য দেখিব বলিয়া।" প্রভু তখন লজ্জা পাইলেন। পরে প্রভু সমুদয় ভক্তগণের সহিত সমুদ্র-ঘাটে আসিলেন, আসিয়া স্নান করিলেন।

ব্রজলীলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মধুর ও শ্রীভগবানের প্রেমপরিচায়ক লীলা—রাস। শ্রীভাগবতের রাসলীলা লক্ষবার পাঠ করিলেও জীবের তৃপ্তি হইবে না। শ্রীভগবান পরমসুন্দর, প্রেমপাগল। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গোপীগণকে বেণুবাদন করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবন কি, না,—প্রেমের হাট; সেখানে প্রীতি বিকিকিনি হয়। আপনি "মদনমোহন গ্রাহক, তাহে পসার যৌবন।" অর্থাৎ রাসের হাটে গোপীগণ তাঁহাদের যৌবন বিক্রয় করিতে বসিয়াছেন, আর মদনমোহন কৃষ্ণ তাহা ক্রয় করিতেছেন।

শরৎপূর্ণিমা রাত্রি, বন কুসুমে সুশোভিত; কুসুমের সুগন্ধে অটবী আমোদিত। কৃষ্ণ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া করুণস্বরে বেণুবাদন করিতেছেন। বাঁশী শুনিয়া শ্রীমতী বলিতেছেন—

"মন্দ মন্দ মধুর তান, শুন ঐ বাজে তান তরঙ্গ।
ঐ শুন শ্যামের বাঁশী বাজে বাজে ওই। শ্যামের বাঁশী বাজে—কোথা প্যারী।
আমি একা কুঞ্জে রইতে নারি।। শ্যামের বাঁশী বাজে—এসো রাই!
(তোমা বিনা) আমার বৃন্দাবনে শোভা নাই।।"

গোপীগণের কর্ণে সেই মন্দ মন্দ তান প্রবেশ করিল। তখন তাঁহারা উন্মাদিনী হইয়া, কৃষ্ণাভিমুখে ছুটিলেন। যাঁহারা সন্তানকে স্তন পান করাইতেছিলেন তাঁহারা সন্তান ফেলিয়া, যাঁহারা দুগ্ধ জ্বাল দিতেছিলেন তাঁহারা সেই কটাহ নামাইয়া, দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিলেন। তাঁহাদের অভিভাবকেরা শাসন করিলেন, কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন না। কোন কোন গোপীকে তাঁহাদের স্বামীরা বন্ধন করিয়া রাখিলেন। তাহাতে এই ফল হইল যে, তাঁহাদের চিত্ত তদ্দণ্ডেই শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মে উপস্থিত হইল। কেহ বা ভাবিলেন, কৃষ্ণের নিকট সুবেশ করিয়া যাইবেন কিন্তু বিহ্বল অবস্থায় কর্ণের ভূষণ হস্তে; হস্তের ভূষণ কর্ণে পরিয়া চলিলেন। যথা পদ—

"আরে এ কুঞ্জে বাজিল মুরলী। ধ্রু।
বাঁশীর গান, মধুর তান, শুনে ব্রজাঙ্গনা।

সুখে চলে, পড়ে ঢলে, না জানে আপনা।
গোপনারী, সারি সারি, (চলে) শ্যাম দরশনে।।"

তাঁহারা উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাসিয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি নিমিত্ত আসিয়াছ? ভয় পাইয়া? বল, আমি ভয় দূর করিব। কিম্বা বৃন্দাবনের শোভা দেখিতে? বেশ, দেখ স্বচ্ছন্দে, আমার বৃন্দাবনের শোভা আস্বাদন কর।

ফল কথা, জীব দুই কারণে শ্রীভগবানকে চায়। হয় ভয় পাইয়া, না হয় স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত। শ্রীভগবান জীবকে দর্শন দিয়াছেন, এরূপ কথা বহুস্থানে শুনা যায়। কিন্তু যেখানে জীব ও ভগবানে এরূপ সাক্ষাৎ, সেখানে উদ্দেশ্য কেবল স্বার্থ-সাধন। জীব বলে 'আমাকে বর দাও' আর শ্রীভগবান বর দিলেন। কিন্তু গোপীদের নিস্বার্থে ভালবাসা; তাঁহারা বর চাহিলেন না; তাঁহারা বলিলেন, "আমরা তোমার পাদপদ্মে আশ্রয় লইলাম; আমরা কিছু চাহি না, আমরা তোমাকে চাই।" তখন তাঁহাদের পরীক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "তোমরা পতি ত্যাগ করিয়া আমাকে উপপতিরূপে গ্রহণ করিবে? এত সাধু অর্থাৎ প্রচলিত পথ নয়? ইহাতে তোমাদের সর্ব মতে স্বর্গের হানি হইবে। তোমাদের দিবার মত কোন সম্পত্তি আমার নাই। আমার সম্পত্তির মধ্যে আছে মাত্র বেণু। অতএব যাহার কাছে বর পাইবার (অর্থাৎ স্বার্থ সিদ্ধির) আশা থাকে সেখানে যাও। তাই বলি সর্বজন-অবলম্বিত পথ ত্যাগ করিও না।" এই সর্বজন-অবলম্বিত পথ কি? না,—সংসার-ধর্ম, পূজা-অর্চনা, জীবে দয়া, পুষ্করিণী খনন, মন্দির স্থাপন ইত্যাদি করা। আর যদি বড় সাধুপথ অবলম্বন করিতে চাও, তবে বনে যাও, চিত্ত-সংযম যোগ, তপস্যা ইত্যাদি কর, করিয়া অষ্টসিদ্ধি লাভ কর। কিন্তু গোপীগণ ইহার কিছুই করিলেন না, তাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত প্রীতি করিতে চাহিলেন। গোপীগণ একরূপ উদাসীন। তাঁহাদের দান, ধর্ম, পূজা, অর্চনা, তপস্যা, যোগসিদ্ধি,—এ সমস্ত কিছুই নাই; অথচ সংসারী হইয়াও কোন কার্য্য করেন না। তবে কি করেন? না,—কৃষ্ণের বেণুগান শুনিয়া ও তাঁহার রূপে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন। আর যখন কৃষ্ণ বলিলেন, "তোমরা যে নূতন পথ অবলম্বন করিতেছ, ইহাতে তোমাদের লাভ হইবে না, হয়ত নরকে যাইবে"; তখন তাঁহারা কৃষ্ণের নিমিত্ত নরকে যাইতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। মনে ভাবুন, শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করা সাধারণের মতে সাধু পথ নয়। বড়লোকে বলেন, "সোহহং"—অর্থাৎ তিনিও যে আমিও সে, "আমি আমার ভাল মন্দ করি।" "আমি আমার কর্মফল ভোগ করি", "আমার ভাল-মন্দ অপর কেহ করিতে পারে না।" যাহারা কৃষ্ণের রূপ আস্বাদন করিয়া আনন্দাশ্রু পাত করেন, তাঁহারা সাধারণের মতে উন্মাদ। কেহ তান্ত্রিকগণের ন্যায় মন্ত্রৌষধি দ্বারা শ্রীভগবানকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। কেহ বনে গমন করিয়া, চিত্ত-সংযম করিয়া, বর প্রর্থনা করিয়া, শ্রীভগবানকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত তপস্যা করেন। এই সমুদয় হইতেছে—সর্ববাদিসম্মত সাধুপথ। ইহা ত্যাগ করিয়া গোপীগণ কি করিতেছিলেন,—না, স্বামী ত্যাগ করিয়া উপপতি-ভজন করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন, "আমার জন্য তোমরা কি এই সাধু-পথ ত্যাগ করিয়া, কুলের অবলা হইয়া, সমাজের বিড়ম্বনা সহ্য করিবে?" তাহাতে গোপীগণ অম্লানবদনে বলিলেন, "তথাস্তু", অর্থাৎ তাহাই হইবেক। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে গোপীগণ দ্বারা দেখাইলেন যে তাঁহারা প্রেমের উপাসক। আর কি দেখাইলেন তাহাও বলিতেছি। জগতে সকলেই শক্তির বা ঐশ্বর্য্যের উপাসক। শ্রীভগবান কীটাণু হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়াছেন দেখিয়া লোকে ভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়। কিন্তু ভগবানের আর একটি গুণ আছে। তিনি যে শুধু সর্বশক্তিমান্ তাহা নহেন, তিনি মাধুর্য্যময়,—শ্রীকৃষ্ণ তাহাই দেখাইলেন। জগতের সকলে ঐশ্বর্য্যের উপাসক, কেবল বৈষ্ণবগণ মাধুর্য্যের উপাসক।

শ্রীভাগবত-গ্রন্থ শিক্ষা দিলেন যে, কৃষ্ণপ্রেম জীবের প্রধান আশীর্বাদ। শ্রীমহাপ্রভু সেই

কৃষ্ণপ্রেম কি, তাহা দেখাইবাব জন্য অবতীর্ণ হইলেন। এরূপ পবিত্র মধুর ধর্ম জগতে ছিল না। এই প্রেমধর্মের মর্ম এই যে, "কৃষ্ণ! আমি তোমার, তুমি আমার।" "আমার এক কৃষ্ণ আছেন আর কৃষ্ণের এক আমি আছি।" রাসে যত গোপী তত কৃষ্ণ বর্ণিত আছে। "হে কৃষ্ণ আমি আর কাহাকে জানি না, তুমিও আর কাহাকে চাও না। তোমায়-আমায় চিরদিন প্রেমানন্দে কাটাইব।" "আমি তোমার, তুমি আমার"—এই মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ রাসের রজনীতে শিক্ষা দিলেন; কিরূপে বলিতেছি—

- যখন গোপীগণ সমুদয় ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লইলেন, তখন তিনি "তাহাই হউক" বলিয়া তাহাদেব সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে বিপরীত ফল হইল, যেহেতু গোপীগণের মনে দম্ভ হইল। যেই মাত্র গোপী হৃদয়ে দম্ভের সৃষ্টি হইল, অমনি কৃষ্ণ অদর্শন হইলেন। তখন কৃষ্ণ-বিরহে উন্মত্ত হইয়া গোপীগণ অচ্যুতকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বৃক্ষ লতা মৃগ প্রভৃতিকে শুধাইতে লাগিলেন যে, তাহারা কৃষ্ণকে কি দেখিয়াছেন? পাঠক মহাশয়, রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিবেন; যতই পড়িবেন ততই রস পাইবেন।

মহাপ্রভু এইরূপে গোপী অনুসরণ করিয়া একদিন কৃষ্ণ অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন। তাহার বিবরণ শ্রবণ করুণ—

প্রভু সমুদ্র যাইতে পুষ্পোদ্যান দেখিলেন, অমনি তাঁহার বৃন্দাবন ও রাসের রজনীর কথা মনে পড়িল। একে সর্বদা কৃষ্ণবিরহে অভিভূত; তাহাতে রাসের রজনীর কথা মনে হইলে, স্বভাবতঃ কৃষ্ণ-বিবহে গোপীগণ বৃন্দাবনে যে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রভুর মনে পড়িল। তাহাতে প্রভু সেই কুসুমকাননে প্রবেশ করিয়া অদ্ভুত লীলা আরম্ভ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করিয়াছেন, কিরূপে গোপীগণ কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন। প্রভু কার্য্যে তাহাই করিতে লাগিলেন। প্রথমে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া বড় বড় বৃক্ষগণ দর্শন করিতে লাগিলেন। তখনই সেই বৃক্ষগণকে বলিতেছেন, "হে চ্যূত, হে পিয়াল, হে পনস (দশম স্কন্দে, ত্রিশ অধ্যায়ে, নবম শ্লোকে দেখ) হে কোর্বিদার, হে অর্জুন, হে জম্বু, হে অর্ক, হে বিল্ল, হে বকুল, হে আম্র, হে কদম্ব, হে অন্যান্য তরুগণ! তোমরাও এই যমুনাকূলে থাক, অতএব তোমার দুঃখী-জন প্রতি দয়ালু। আমরা কৃষ্ণবিরহে কাতর, তোমরা বলিতে পার, কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন?"

হে পাঠক, একদিন চেষ্টা করিয়া বৃক্ষগণকে এইরূপে সম্বোধন করিয়া দেখিবেন। এরূপ সম্বোধন করিতে রাধা ব্যতীত অন্য কোন জীব পারে না। গোপী-ভাব না পাইলে, বা গোপী না হইলে, অর্থাৎ কৃষ্ণ-প্রেমে আত্মহারা না হইলে, নাটকাভিনয় ব্যতিরেকে, প্রকৃতপক্ষে জীব এইরূপে বলিতে পারে না।

ভাগবতে গোপীগণের কৃষ্ণান্বেষণ যেরূপ বর্ণিত আছে, প্রভু কার্য্যে তাহাই করিতে লাগিলেন। কোন কোন বৃক্ষের শাখা মৃত্তিকায় স্বভাবতঃ সংলগ্ন হইয়া আছে। প্রভু ইহা দেখিয়া ভাবিতেছেন, "কৃষ্ণ অবশ্য এই পথে যাইতেছেন দেখিয়া, বৃক্ষগণ প্রণাম করিয়াছিলেন; বোধ হয় আশীর্বাদ পায় নাই, আর সেই আশায় মস্তক না উঠাইয়া পড়িয়া আছে।" প্রভুর মনের ভাব অবশ্য এই যে, জগতের স্থাবর অস্থাবরের আর কোন কার্য্য নাই, তাহারা সকলেই কেবল শ্রীকৃষ্ণ উপাসনাতেই রত! প্রভুর যখন ভাবগত-বর্ণিত কৃষ্ণান্বেষণের সমস্ত কার্য্য করা হইল, তখন কৃষ্ণকে দেখিবার সময় হইল; আর দেখিলেন যে, যমুনা-পুলিনে শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন রূপ ধরিয়া অলকাবৃত মুখে বেণু-বাদন করিতেছেন। প্রভু ইহা দেখিলেন, আর তদ্দণ্ডে ঘোরমূর্চ্ছায় অভিভূত হইলেন। ভক্তগণ দেখেন যে, প্রভুর বদন আনন্দময়, দেহ পুলকাবৃত, নয়নে আনন্দাশ্রুর স্রোত চলিতেছে। সকলে চেষ্টা করিয়া তাঁহার চেতন করাইলেন। তখন প্রভু এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন; শেষে বলিতেছেন, "কৃষ্ণকে এইমাত্র দেখিলাম, তিনি কোথায় গেলেন? কৃষ্ণ চঞ্চল, আমাকে দর্শন দিয়া পাগল করিয়া আবার ফেলিয়া গিয়াছেন! স্বরূপ! বল আমি এখন কি করি? তখন

স্বরূপ গাইলেন—

"রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং। স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্।।"

জয়দেবের এই পদ শুনিয়া প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু "গাও" "গাও" বলিতেছেন, আর নৃত্য করিতেছেন। প্রভুর নৃত্যে বিরাম নাই, স্বরূপকেও থামিতে দিতেছেন না। পরে যখন প্রভু নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলেন, তখন স্বরূপ চুপ করিলেন,—প্রভু বলিলেও গাহিলেন না; কাজেই প্রভু থামিলেন। তখন ভক্তগণ প্রভুকে স্নান করাইয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

শ্রীভগবানের মাধুর্য্য বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের অবতীর্ণ। শ্রীভগবানের ইচ্ছা ভক্তকে তাঁহার রাজ্যের পরমাধিকারী করিবেন। কিন্তু ভক্তের যে অধিকার, তাহা প্রচুর কিনা, জানিবার নিমিত্ত তিনি ভক্তভাব গ্রহণ করিয়া, ভক্তের যে সম্পত্তি তাহা ভোগ করিতে লাগিলেন। ভগবানের যে মাধুর্য্য, তাহা প্রভু জীবকে অতি অল্প পরিমাণে দেখাইতে পারিলেন বটে; তবে তিনি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন যে, শ্রীভগবানের যে অধিকার, ভক্তের অধিকার তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে। যথা, চরিতামৃতে—"ভক্তের প্রেমবিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার। কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত অন্য কেবা আর।।"

শ্রীমতী কৃষ্ণকে ভালবাসিয়া যে সুখ অনুভব করেন, তাহা কত মধুর, তাহা আস্বাদ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাব ধারণ করিলেন। দেখিলেন যে,—কৃষ্ণ হইতে রাধা যে সুখ ভোগ করেন, কৃষ্ণ যে পরমানন্দময় তিনিও তত সুখ ভোগ করেন না। শ্রীভগবানের মাধুরী প্রভু দুই রূপে জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন;—আপনি আচরিয়া, আর তাহার যেখানে সম্ভাবনা নাই, সেখানে বর্ণনা করিয়া। প্রভু এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য দেখাইবার নিমিত্ত একদিন তাঁহার অধরামৃতের শক্তি দেখাইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঠাকুর-দর্শন করিতেছেন। হেনকালে গোপালবল্লভ-ভোগ দেওয়া হইল, আর দ্বার বন্ধ হইল। ভোগ দেওয়া হইলে, দ্বার খুলিয়া জগন্নাথের সেবকগণ তাহার কিঞ্চিৎ প্রভুকে আনিয়া দিলেন। প্রসাদ দিয়া সেবকগণ অনেক যত্ন করিয়া প্রভুকে তাহার কিছু সেবা করাইলেন। ইহা আস্বাদ করিয়া প্রভু বলিতেছেন, "সুকৃতি লভ্য ফেলালব।"

সেবকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার অর্থ কি? ঠাকুর বলিলেন, "ফেলা মানে কৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ। ইহা পরম-ভাগ্যে মিলে, আর এই যে তোমরা আমাকে প্রসাদ দিলে ইহা ফেলা, যেহেতু ইহাতে কৃষ্ণের অধরামৃত স্পর্শ করিয়াছে।

সেই প্রসাদ ঠাকুর নিজে কিছু আস্বাদ করিলেন, আর কিছু গোবিন্দের দ্বারা বাড়ী আনিলেন। তবে সে যে কৃষ্ণের প্রসাদ, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে, সেই প্রসাদের অলৌকিক গন্ধ ও অলৌকিক আস্বাদ। প্রভু ইহা আস্বাদ করিলেন, আর আনন্দে তাঁহার নয়নধারা পড়িতে লাগিল। প্রভু সেই প্রসাদ আনিয়া প্রধান ভক্তগণকে ডাকাইয়া তাহার কিছু কিছু বণ্টন করিয়া দিলেন। সকলেই দেখিলেন, জগতে সেরূপ দ্রব্য হয় না। যদিও ইহা সামান্য বস্তু দ্বারা প্রস্তুত, কিন্তু ইহার গন্ধ ও আস্বাদ এ জগতের নয়।

প্রিয়-বস্তুর অধর-রস অতি মধুর। শ্রীভগবান প্রিয় হইতেও প্রিয়, সুতরাং তাঁহার অধর-রস অমৃত কেন না হইবে। সুগন্ধ আমাদের নাসিকায় কেন আনন্দ দেয়, তাহা আমরা জানি না। কোন কোন দ্রব্য জিহ্বায় দিলে কেন সুখের উদয় হয়, তাহাও আমরা জানি না। আমরা জানি না বটে, কিন্তু "তিনি জানেন। তাই যখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট চর্বিত তাম্বুল ভিক্ষা করিলেন, তখন তিনি উহাতে নাসিকার ও জিহ্বার আনন্দপ্রদ শক্তি দিয়া প্রদান করিলেন। তাই যখন প্রভুর ইচ্ছা হইল যে, একদিন ভক্তগণকে কৃষ্ণের অধর-রসের মাধুরী দেখাইবেন, তখন গোপালভোগ প্রসাদে সেই শক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণের কোন কোন মাধুরী

প্রত্যক্ষ দেখাইবার যো নাই। সে সমুদয় প্রভু বর্ণনা দ্বারা ভক্তগণকে দেখাইতেন। যেমন কৃষ্ণের জলকেলি-লীলা।

শরৎকাল, শুক্লপক্ষ, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় চন্দ্রোদয় হইতেছে। প্রভু রাসরসে বিভোর। প্রভু রাসের এক একটি শ্লোক পড়িতেছেন, আর তাহা কি, কার্য্য দ্বারা দেখাইতেছেন। এইমাত্র একদিনকার লীলা বলিলাম। তখন প্রভু আইটোটায় বিচরণ করিতেছিলেন। হঠাৎ সমুদ্র দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন জ্যোৎস্নায় উহার জল ঝলমল করিতেছে। তখন প্রভু রাসের জলকেলির শ্লোক পড়িলেন। সেই শ্লোক পড়িয়া, জলকেলি কি, তাহা আস্বাদিতে, কি জীবগণকে শিখাইতে সমুদ্রে ঝম্প দিলেন। প্রভু এরূপ দ্রুতগতিতে সমুদ্রদিকে গমন করিলেন যে, ভক্তগণ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। দেখেন প্রভু এই ছিলেন, আর নাই। সকলে তল্লাস করিতে লাগিলেন। প্রথমে তাচ্ছিল্যের সহিত, পরে মনোযোগের ও আশঙ্কার সহিত তল্লাস করিলেন। কোথা গেলেন। চারিদিকে ভক্তগণ ছুটিলেন, যখন রজনী তৃতীয় প্রহর তখনও প্রভুর উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই; কাজেই সকলে চিন্তায় মৃতবৎ।

আমার স্বরূপের প্রাণ অবশ্য ওষ্ঠাগত হইয়াছে। হঠাৎ দেখেন, একজন ধীবর গীত গাইতে গাইতে আসিতেছে। আর দেখেন যে, সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নৃত্য করিতেছে। বুঝিলেন, এ প্রভুর কার্য্য। স্বরূপ বলিতেছেন, "ধীবর, তোমাকে এরূপ বিহ্বল কেন দেখিতেছি?" ধীবর বলিল, "এতদিন এখানে মৎস্য-শিকার করিতেছি, কিন্তু কখনও ভূত দেখি নাই। অদ্য জালে একটি মৃতদেহে উঠিল। জাল হইতে দেহ ছাড়াইতে উহা স্পর্শ করিতে হইল। স্পর্শমাত্র আমার নয়নে জল, চরণে নৃত্য, আর বদনে কৃষ্ণনাম আসিল। এই দেখ আমার বদন কৃষ্ণনাম আর ছাড়ে না।"

ধন্য আমার প্রভু! তখন স্বরূপ সমুদয় বুঝিলেন, এবং জেলের সঙ্গে যাইয়া দেখেন যে, প্রভুর সেই লক্ষ্মীর সেবিত-দেহ, সমুদ্রতীরে বালুকার উপরে পড়িয়া আছেন; তাহাতে জীবনের চিহ্নমাত্র নাই! তখন তাঁহার কর্ণে হরিনাম করিতে লাগিলেন। কর্ণে হরিনাম করিতে করিতে, অনেক পরে প্রভুর চেতন হইল। তাহার পরে অর্দ্ধ-বাহ্যদশা আসিল। তখন তিনি কৃষ্ণের জলকেলি বর্ণনা করিতেছেন; বলিতেছেন, "কৃষ্ণ গোপীগণ সহ যমুনার স্বচ্ছজলে ঝগড়া করিতে লাগিলেন। দেখিলাম যে, গোপীগণের বদন পদ্মপুষ্পরূপে পরিণত হইল, আর শ্রীকৃষ্ণের মুখও পদ্ম হইল। তবে গোপীগণের বদন লাল, আর শ্রীকৃষ্ণের নীল। দেখিলাম, এইরূপে অসংখ্য লালপদ্ম ও নীলপদ্ম যমুনায় ভাসিতে লাগিল; আর এই নীলপদ্ম লালপদ্মকে ও লালপদ্ম নীলপদ্মকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে ভাসিতে ভাসিতে নীল ও লাল পদ্মে মিলন হইল।

বৃন্দাবন-মাধুরী আমি কি বর্ণনা করিব। উহা ব্রহ্মা, শিব, শুক, নারদেরও অগোচর। আমার যাহা সাধ্য, আমি "শ্রীকালাচাঁদ গীতায় ইহার কিছু আভাষ দিয়াছি। তাহা পাঠ করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় কেহ কেহ গৌরভক্ত হইয়াছেন।

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত।। ষষ্ঠ খণ্ড

উৎসর্গ-পত্র

শ্রীমান্ পয়স্‌কান্তি

এই গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ড আমি তোমার হস্তে দিলাম। আমার বয়ঃক্রম সত্তর, তোমার পঁচিশ, এইরূপ সময়ে তুমি আমাকে হঠাৎ একদিনের পীড়ায় ছাড়িয়া গেলে। আমি তোমার বিরহ যে সহ্য করিতে পারিব ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, কিন্তু তবু সহ্য করিতেছি। ইহা কিরূপে করিলাম?

তুমি আমার নিত্য সঙ্গী ছিলে। অতি বৃদ্ধ জীর্ণ রুগ্ন, আমার দ্বারা ভজন-সাধন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তুমি আমার সে অভাব পূরণ করিতে। তুমি বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য ছিলে, তোমার কণ্ঠে মধু-বর্ষণ হইত। তুমি আমাদের কীর্তন, কি শ্রীতানসেনের ভজন, যখন গাহিতে তখন পশুপক্ষী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইত। তুমি আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে অনুক্ষণ ভগবৎ-গুণসুধা পিয়াইতে। সুতরাং তুমি যখন আমাকে ছাড়িয়া গেলে, তখন বিরহের সঙ্গে সঙ্গে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। আমার ভজন এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। তবু, তুমি যখন আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে, তখন আমি শ্রীভগবান্‌কে মনের সহিত ধন্যবাদ দিয়াছি। যদিও শুনিলে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু তিনি (শ্রীভগবান্) জানেন ইহা সত্য কি না। তানসেনের ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞ জগতে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি যে পদ প্রস্তুত করেন তাহা ভাবে ও তাল-লয়ে অদ্বিতীয়। তাহা লোপ হইয়া যাইতেছিল। যাহা কিছু এখন আছে, তাহা রঙ্গপুরের শ্রীমান্ রামলাল মৈত্রের কণ্ঠে। তুমি তাহার নিকট এই তানসেনের পদগুলি অভ্যাস করিয়াছিলে। তুমি সর্বদা বলিতে, "কবে আমি তানসেনের নিকট যাইব, যাইয়া তাঁহার সমুদয় পদ শিখিব।" এখন তোমার সেই সুযোগ হইয়াছে।

তুমি প্রভুর কৃপায় ভক্তিধন পাইয়াছিলে, এখন মহানন্দে শ্রীভগবানের ভজন করিতেছ, সুতরাং তোমার অভাবের নিমিত্ত আমি স্বার্থপর হইয়া কেন দুঃখ করিব? বিশেষতঃ সংসারে তোমার কোন বন্ধন ছিল না, তুমি চিরদিন মুক্ত ছিলে।

তুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে, তোমার একখানি ছবি আমার আনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। মার্কিন দেশের এক বিখ্যাত মিডিয়াম আমার সে মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছেন। চিত্রখানি ২০ মিনিটে দিবাভাগে লোকের সাক্ষাতে অদৃশ্য হস্তে চিত্রিত হয়। সে এত চমৎকার যে ও জড়জগতে বোধ হয় এইরূপ সূক্ষ্ম কারিগরি হইতে পারে না, অন্ততঃ কোন কারিগর এক মাসের কমে ওরূপ সম্পূর্ণ ছবি আঁকিতে পারেন না। এই ছবিখানি সর্বদা আমার সম্মুখে থাকে।

আমি এই ছবি দেখি, আর আমার মনে উদয় হয় যে আমাদের জীবনদাতা আমাদিগকে জীবন দিয়া একেবারে ভুলিয়া যান নাই। আমাদের কথা তাঁহার মনে থাকে। কারণ তিনি ভালবাসার আকর, তিনি জীবন দিয়া এ জগতে কিছুকাল রাখিয়া, পরে মৃত্যু-অন্তে আমাদিগকে আর এক জগতে লইয়া যান।

সেখানে শোক তাপ মৃত্যু রোগ কি অন্ধকার নাই, সেখানে আমরা আমাদের প্রীতির বস্তু লইয়া চিরদিন বাস করিব। যখন ইহা মনে উদয় হয়, তখন সেই যে ভগবান্ আমাদের জীবনের জীবন, তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভজনা করিতে পারি না বলিয়া মাথা কুটিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। তুমি সুস্বরে গীত গাহিয়া তাঁহাকে অর্চনা কর, আর আমার যাহাতে শীঘ্র মোচন হয়, সে নিমিত্ত তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিও।

বাগবাজার — শিশিরকুমার ঘোষ।

৪২৫।২৫ পৌষ

ভূমিকা

পাঠকগণ দেখিবেন যে এই খণ্ডে এরূপ অনেক লীলাকথা লেখা আছে যাহা পূর্বে একবার বলা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহারা কৃপা করিয়া আমার উপর বিরক্ত হইবেন না। প্রভুর নিস্ফল লীলা একটিও নাই, সকল লীলারই মহৎ তাৎপর্য্য আছে। তাহা বুঝিতে অনেক পরিশ্রম, সাধনা, জ্ঞান ও গুরু-উপদেশের প্রয়োজন। কেবল পড়িয়া গেলে, সকল লীলার উদ্দেশ্য বুঝা না গেলেও পারে। পূর্বে আমি প্রভুর লীলা বর্ণনা করিয়াছি, এখন তাহার মধ্যে কয়েকটি প্রধান লীলার তাৎপর্য্য বিচার করিব ইচ্ছা করিতেছি। সুতরাং পূর্বে যে উদ্দেশ্যে লীলা লেখা হইয়াছে, এবার অন্য উদ্দেশ্যে লিখিতেছি। কোন একটি লীলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে হইলে বলিতে হয় অমুক খণ্ডে যে লীলার কথা লেখা হইয়াছে, পাঠক আমি এখন তাহার তাৎপর্য্য বিচার করিতেছি। ইহাতে পাঠকের কথায় কথায় সেই সমুদয় লীলা তল্লাস করিতে অন্যান্য খণ্ড খুলিতে হইবে। আমি তাহা না করিয়া পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত ইহাই করিয়াছি যে, যে লীলাটির তাৎপর্য্য বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, পরে তাহার যে উদ্দেশ্য তাহাই বলিয়াছি। কোন কোন লীলা দুইবার বর্ণনা করিবার ইহাই কারণ।

অপর, আমি যে বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি ইহা মনে করিলে ভয়ে হতজ্ঞান হইতে হয়। এই পৃথিবী বহু সহস্র কি লক্ষ বৎসর সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে কত জাতির উৎপত্তি ও কত জাতির লোপ হইয়াছে, কত বড় বড় সাধু আবির্ভূত হইয়াছেন ও তাঁহারা অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, কিন্তু দুই একটি তত্ত্বের বিষয় এ পর্য্যন্ত কেহ কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সে তত্ত্বগুলি অতি প্রধান, অতি প্রয়োজনীয়। ইহার মধ্যে একটি তত্ত্ব এই যে—শ্রীভগবান যে আছেন ইহা অনেকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাহার কি কোন প্রমাণ আছে?

ইহার উত্তর এই যে, ইহার কিছু মাত্র প্রমাণ নাই। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, তিনি আছেন এইমাত্র; কিন্তু কেন বিশ্বাস করেন, এবং তাহার কোন প্রমাণ আছে কি না, তাহা কেহ বলিতে পারিবেন না। কেহ কেহ নাকি শ্রীভগবানের দর্শন পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাকে প্রমাণ বলে না। যিনি দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট এ প্রমাণ বলবৎ হইতে পারে, কিন্তু অন্যের নিকট নহে। অতএব ইহা নিশ্চিত—শ্রীভগবান্ যে আছেন, তাহার প্রকৃত প্রমাণ নাই।

দ্বিতীয় বিচারের তত্ত্ব এই যে, যদি শ্রীভগবান্ থাকেন, তবে তিনি কিরূপ বস্তু? শ্রীভগবান্ যে আছেন, তাহার কোন প্রমাণ যখন নাই, তখন দ্বিতীয় তত্ত্বটি জানিবারও কোন সুযোগ নাই। অতএব জগতের যে দুইটি সর্বপ্রধান সমস্যা, অদ্যাপি তাহার মীমাংসা হয় নাই। সে দুটি এই—

(১) শ্রীভগবান যে আছেন, তাহার প্রমাণ কি?

(২) যদি তিনি থাকেন, তবে তিনি কিরূপ?

এই দুইটি সমস্যার মীমাংসা করিবার যে বিষম ভার, তাহা আমি গ্রহণ করিলাম। পাঠকগণ, আমাকে দাম্ভিক ভাবিবেন না। পড়িলে বুঝিবেন যে আমার দম্ভ করিবার কিছু নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারি তবে জগতের মঙ্গল হইবে। না পারি আমার লজ্জার কি ক্ষোভের বিষয় কিছুই থাকিবে না। কারণ যাহা কেহ পারেন নাই, আমিও তাহাই পারিলাম না, এই মাত্র।

উপক্রমণিকা

যখন এই গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড শেষ হইল, তখন ভাবিলাম যে, আর লিখিব না, কি লিখিতে পারিব না। তখন আপনার অবস্থা ভাবিয়া এই পদটি রচনা করিয়াছিলাম। যথা—

গোরা জানা নাহি ছিল, তখনি আছিনু ভাল,
কাল কাটাতাম আমি সুখে।

গৌরনাম কানে গেল, কেবা সেই মন্ত্র দিল,
হুতাশে পিয়াসে মরি দুঃখে।।
যারা গুণের সঙ্গী ছিল, তারা ফেলে পলাইল,
কাহাকে কহিব মনো-ব্যথা।
কেবা দুঃখ ভাগ নিবে, সঙ্গে সঙ্গে কে কান্দিবে,
কে শুনাবে মনোমত কথা।।
হৃদয়ে গৌরাঙ্গ ছিল, এবে কোথা পলাইল,
আগে মোর চিত্ত করি চুরি।
আপনি মোরে ডাকিল, মন মোর ভুলি গেল,
এবে করে মো সনে চাতুরী।।
আমি পাছে পাছে যাই, মোরে দেখিয়া পলায়,
এবে মোর শক্তি নাই অঙ্গে।
রোগে শোকে অভিভূত, ক্রমেতে আত্মবিস্মৃত,
ক্লান্ত-চিত বিশ্রাম সে মাগে।।
আর তো চলিতে নারি, লহ মোর হাত ধরি,
যদি কেহ থাক নিজ-জন।
এই ছিল মোর ভাগ্যে, ধরণী বিদায় মাগে,
বলরাম দাস আকিঞ্চন।।

তার পর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। অনেকে কৃপা করিয়া আমাকে প্রভুর শেষ-লীলা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সে এত জন যে, আমি তাহার সংখ্যা করিতে পারি না। অনেকে আমাকে বলেন যে, তাঁহারা এই পাঁচ খণ্ড আমূল পাঠ করিয়াছেন, তবুও তাঁহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় নাই!

আমি তাঁহাদের সকলকে একরূপ উত্তর দিই নাই। কাহাকে বলিয়াছি যে, আমি বৃদ্ধ, রোগে ও পরিশ্রমে অক্ষম হইয়াছি, এ কার্য্য আমার দ্বারা হইবে না। কাহাকেও বলিয়াছি যে, প্রভুর লীলা-লেখক মহাজনগণ— যাঁহাদের উচ্ছিষ্টই আমার কেবল মাত্র শক্তি,—তাহারা প্রভুর শেষ-লীলা লিখেন নাই, সুতরাং আমার লিখিতে সাহস হইবে কেন? মহাজনেরা বলিয়া গিয়াছেন,— "অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌর-রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।।" অর্থাৎ প্রভুর লীলার আবার শেষ কি? উহার শেষ নাই। যাহারা বড় নিজ-জন, তাহাদের নিকট আর এক কথা বলিয়া অব্যাহতি লইয়াছি। প্রভুর লীলা ইচ্ছা করিলেই লেখা যায় না, তাহার নিমিত্ত শক্তি চাই। সে শক্তি ইচ্ছা করিলেই এ জগতে মিলে না। আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা কেবল বাধ্য হইয়া। আমি কখন বাঙ্গলা লিখিতে অভ্যাস করি নাই। আমার এই সমস্ত অত্যুচ্চ বিষয় লিখিতে কখনও সাহসও হইত না। যখন প্রভুর লীলা লিখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলাম, তখন আপনাকে অপারগ জানিয়া, যাহারা খুব ভাল বাঙ্গলা লিখেন বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহাদিগকে লিখিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা কেহ লিখিতে স্বীকার হইলেন না, অথচ লীলা না লিখিলেও নয়। আবার কেহ যেন আমার দ্বারা ইহা লিখাইবার নিমিত্ত আমার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। কাজেই আমার লিখিতে হইয়াছিল। তাই লিখিয়াছিলাম এবং এক নিঃশ্বাসে প্রথম হইতে পঞ্চম খণ্ড পর্য্যন্ত লিখিয়া শেষ করিয়াছি। আর আমার লিখিবার শক্তি নাই, আর লিখিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর অনুজ্ঞাও অনুভব করিতেছি না।

ইহা ছাড়া আরও একটি কারণ ছিল; এবং কেন প্রভুর শেষ-লীলা লিখিতে সাহস হইল না,

বলিতে গেলে সেইটিই প্রকৃত কারণ। কিন্তু এ কথা সকলকে বলিতে আমি সাহস পাই নাই। তবে তাঁহাকেই বলিয়াছি যিনি, আমি জানিতাম, আমার সহিত সহানুভূতি করিবেন। সেইরূপ একজন ভক্তের সহিত আমার দেখা হয়, তিনিও ষষ্ঠ খণ্ড লিখিতে আমাকে অনুরোধ করেন। তাঁহাকে আমি তখন যে উত্তর দিয়াছিলাম, এক্ষণে উহা কৃপাময় পাঠকগণকে বলিতেছি। প্রভুর প্রধান প্রধান লীলাগুলি যতদূর জানিয়াছি তাহা লিখিয়াছি, তবে একটি বাকি আছে,—সেটি গম্ভীরা লীলা। শেষ দ্বাদশ বৎসর প্রভু এই লীলা করেন। এই লীলা এত নিগূঢ় যে বাহিরের লোকে কেহ উহা জানিতে পারে নাই। কেবল মাত্র সাড়ে তিনজন পাত্র এই লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ (১) স্বরূপ, (২) রামরায়, (৩) শিখি মাহিতী, আর (অর্দ্ধজন) মাধবী দাসী। মাধবী দাসী শিখি মাহিতীর ভগিনী। ইহারা সাড়ে তিন জন মহাপাত্র বলিয়া বিখ্যাত। সাড়ে তিনজন, কেন না, মাধবী দাসী স্ত্রীলোক বলিয়া অর্দ্ধজন।

অধিকার সকলের সমান হয় না। কারণ সকল হৃদয় একরূপ প্রশস্ত নহে। যেমন জলপাত্রের মধ্যে ছোট বড় আছে, কোন পাত্রে অধিক এবং কোন পাত্রে অল্প জল ধরিতে পারে, সেইরূপ সেই গোলোকের সুধা কাহারও হৃদয়ে অল্প আবার কাহারও হৃদয়ে অধিক পরিমাণে ধরে।

গম্ভীরা-লীলা দ্বারা প্রভু যে নিগূঢ়-রস জীবের আয়ত্ত্বাধীন করিয়াছিলেন, তাহা এই সব পাত্র লইয়া প্রভু নিভৃতে আস্বাদন করেন। এই নিগূঢ়-রস বিস্তার করিতে প্রভুর দ্বাদশ বৎসর লাগে। এই যে মহাধিকারী কয়জন পাত্র, ইঁহাদিগকে এই রস বুঝাইবার নিমিত্ত প্রভুকে অনেক কষ্ট করিতে হইয়াছিল; প্রভু এই দ্বাদশ বর্ষ আবিষ্ট অর্থাৎ অচেতন অবস্থায় ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি অহোরাত্র রোদন করিয়া, ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইয়া, ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া, তবে এই নিগূঢ়-রস বুঝাইতে পারিয়াছিলেন। শুধু উপদেশ দিয়া সম্যকরূপে উহা বুঝাইতে পাবিতেন না। কেন পারিতেন না, তাহা বলিতেছি। মনে ভাবুন, দুইজন ভক্ত শ্রীভগবানের রূপ আস্বাদন করিতেছেন। একজন ইহা বর্ণনা করিতে কাব্যের সহায়তা লইয়া, বাছিয়া বাছিয়া ছন্দ ও উপমা প্রয়োগ করিয়া, অসীম ক্ষমতা দেখাইলেন। আর একজন সামান্য কথায় বর্ণনা করিলেন, কি করিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না, কথা জড়াইয়া আসিল, তাই পারিলেন না, কি "কথা কহিতে কহিতে মুরছিল", তাই পারিলেন না। ইহার মধ্যে কাহার বর্ণনা অধিক হৃদয়গ্রাহী হইবে? অবশ্য শেষোক্ত জনের।

এই গম্ভীরা-লীলা শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা লইয়া। এই লীলাদ্বারা প্রভু সেই সম্বন্ধ পরিস্ফুটিত করেন। শ্রীমতী রাধা কে? না—তিনি ঐশ্বর্য্যবিবর্জিত মাধুর্য্যময় ভগবান যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রধানা প্রেয়সী। ইহার অর্থ এই যে. শ্রীমতী রাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অনুগত আর কেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই রাধার কি ভাব, প্রভু গম্ভীরা-লীলায় তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের মনের ভাব কি, তাহা জীবে অতি অল্প জানিতে পারে। কিন্তু শ্রীভগবানের যিনি প্রেয়সী কি ভগবান্ যাঁহার প্রাণ, তাঁহার মনের ভাব, জীব সাধন করিলে, অনেকটা কি প্রায় সবই জানিতে পারে। এই গম্ভীর-লীলায় শ্রীপ্রভু, সেই রাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিরূপ ভাব, তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন;— কেন না, জীবকে শিখাইবার নিমিত্ত, এবং জীব উহা হৃদয়স্থ করিয়া শ্রীভগবানের সর্বোচ্চ ভজন শিখিবে বলিয়া। যেহেতু রাধার ভজন সর্বাপেক্ষা উচ্চ, সুতরাং যাঁহার উচ্চাধিকারী হইবার বাসনা থাকে, তাঁহার গোপীর অনুগত, কি গোপীর প্রধানা যে রাধা তাঁহার অনুগত হইয়া, কি অনুকরণ করিয়া, ভজন করিতে হয়।

এই রাধার ভাব জানে কে? বুঝে কে? জানিলেও কাহার সাধ্য উহা প্রকাশ বা আস্বাদন করে। তাহাই প্রভু বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ কয়েক জন পাত্র লইলেন, যাঁহারা ইহা বুঝিতে বা ধারণা করিতে পারিবেন। ইহাদের বুঝাইলেন কিরূপে? প্রভু কি প্রস্তাব লিখিয়া ও পরে উহা

পাঠ করিয়া, কি বক্তৃতা করিয়া, কি কবিতা লিখিয়া—ইহা শিখাইলেন? তিনি ইহার কিছুই করিলেন না। তবে তিনি কিরূপে এই সমুদয় অতি-নিগূঢ়, অতি গুহ্য, অতি-পবিত্র, অতি-দুর্বোধ্য (অনর্পিত) ভজন প্রকাশ করিলেন, তাহা এখন সংক্ষেপে বলিতেছি।

প্রথমে প্রভু শ্রীরাধা হইলেন। সে কিরূপে, তাহা পরে বিবরিয়া বলিব। তখন সে দেহে প্রকাশ্যে আর শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীপ্রভু থাকিলেন না, কি অতি গুপ্তভাবে অভ্যন্তরে রহিলেন। তখন সেই দেহ সম্পূর্ণরূপে শ্রীমতী রাধার হইল।* অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধার কিরূপ ভাব, উহা উপযুক্ত অধিকারী দ্বারা জগৎকে বুঝাইবার নিমিত্ত, স্বয়ং শ্রীমতী আসিলেন, আসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। প্রভু এই রাধাভাবে এক-একটি মনের কথা বলেন, আর বিচলিত হয়েন। যথা, শ্রীমতী রাধা বলিতেছেন, "আমার প্রাণের প্রাণ যে কৃষ্ণ"—ইহা বলিতেই, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিতেই, তাঁহার সর্বাঙ্গ পুলকাবৃত হইল। তুমি আমি হইলে, শুধু কথাদ্বারা কৃষ্ণ কত প্রিয় বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু প্রভু রাধা হইয়া কথা দ্বারা বেশী বুঝাইলেন না, তিনি প্রায় ভাবের দ্বারা বুঝাইলেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার কিরূপ ভাব তাহা—'আমি তাহাকে বড় ভালবাসি'— ইহা বলিয়া না বুঝাইয়া, শ্রীমতী দেখাইলেন যে সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম করিবামাত্র তিনি পুলকাবৃত হয়েন। শ্রীমতী কৃষ্ণকথা বলিতে যেরূপ বিভাবিত হইতেন, বাধা স্বয়ং আসিয়া এই গম্ভীরা-লীলায় দর্শককে তাহা দেখাইতেছেন। কাজেই যাহারা দর্শক কি শ্রোতা, তাহাদের হৃদয় সে ভাবটি একেবারে বিঁধিয়া যাইতেছে। কথায় বলিলে এরূপ হইত না।

কথায় বলিতেছেন, "সখি, অদ্য শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন।" বলিতে বলিতে আর বলিতে পারিলেন না, আবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কি আনন্দে গলিয়া পড়িতে লাগিলেন। যখন এইরূপে কোন সুখের কথা বলিতেছেন, তখন নানা প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। আবার যখন কৃষ্ণবিরহ প্রভৃতি দুঃখের কথা বলিতেছেন, তখন সেইরূপে নানাপ্রকার দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন,—অর্থাৎ ক্রন্দন করিতেছেন, ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন, হৃদয়ে করাঘাত করিতেছেন, কি ঘন-ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন। কেহ শ্রীমতী রাধা সাজিয়া অভিনয় করিতে পারেন, কিন্তু স্বয়ং শ্রীমতী রাধা আসিয়া দেখাইলে, উহা যেরূপ স্বাভাবিক হয়, অভিনয় দ্বারা তাহা হয় না।

ইহাকে গম্ভীরা-লীলা বলে। এই গম্ভীরা-লীলা, যাহা বুঝাইতে প্রভুর দ্বাদশ বৎসর লাগিয়াছিল, শত-শত কলসী নয়নের জল ফেলিতে হইয়াছিল, ধূলায় গড়াগড়ি দিতে, কি মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যাইতে হইয়াছিল, যাহা জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত উপযুক্ত পাত্র,—তাহার লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে, —মোটে সাড়ে তিনজন পাইয়াছিলেন, এরূপ যে নিগূঢ় লীলা, তাহা আমার ন্যায় কোন ক্ষুদ্র-জীব, শুধু বাক্যের দ্বারা কি বর্ণনা করিতে পারে? যদি কেহ পারেন, তবে স্বয়ং শ্রীমতী রাধা। অতএব এ লীলা প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত। সেই লীলা আমি এখন লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কেন হইলাম তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে আশা করি, প্রভু কৃপা করিয়া আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। যদি তিনি শক্তি দেন তবেই পারিব, নতুবা নয়।

গম্ভীরা-লীলা লিখিতে হইবে মনে করিয়া যেরূপ ভয় হইত, আবার আরও কয়েকটি বিষয় লিখিবার নিমিত্ত আমার ইচ্ছা সেইরূপ বলবতী হইত। এই সকল বিষয় আমি পূর্বে লিখিতে পারি নাই। পূর্বে কেবল লীলা লিখিয়াছি মাত্র, কিন্তু কোন্ লীলার কি উদ্দেশ্য তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিবার অবকাশ পাই নাই। এই শ্রীগৌরাঙ্গের লীলায়, অর্থাৎ তাঁহার কার্য্যে ও বাক্যে, এত নিগূঢ় ও গুরুতর তত্ত্ব সকল নিহিত আছে, যাহা পূর্বে জগতে কেহ জানিতে পারেন নাই,

*এই "আবেশ তত্ত্ব" পরে বিবরিয়া লিখিত হইয়াছে, পাঠক দেখিবেন।

আর উহা জানিলে জীবের মহৎ উপকারের সম্ভাবনা। শুধু লীলা পড়িয়া গেলে অনেকের মনে নিগূঢ় তত্ত্ব উদয় হয় না। লীলা মনোযোগের সহিত চিন্তা করিতে হয়, করিতে করিতে মনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সমস্যার মীমাংসা আইসে।

বিবেচনা করুন, প্রভুর সচরাচর দুই ভাব ছিল,— এক সহজ ভাব, আর এক আবেশিত ভাব। সহজ ভাবে তিনি যেরূপ থাকিতেন, আবেশিত ভাবে অন্য প্রকার হইতেন। অনেক সময় এমনও দেখা যাইত যে, সহজ সময়ের ভাব আবেশিত সময়ের ঠিক বিপরীত। বৃন্দাবন দাস এক স্থানে বলিতেছেন যে, প্রভু এই এক জনের নিকট দীন হইতে দীন হইয়া ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন, আবার একটু পরেই তাহার মস্তকে শ্রীপাদ দিতেছেন। ইহার অর্থ কি? প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে জর্জরীভূত, মুহুর্মুহুঃ প্রলাপ করিতেছেন। তিনি কি বিচার করিয়া সমুদয় কার্য্য করিতেন, না বিকল অবস্থায় লোকে যেরূপ করে, অর্থাৎ যাহা মনে উদয় হইত, তাহাই করিতেন?

একদিন প্রভু শ্রীবাসকে বলিতেছেন যে, "আমি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখাইব? ইহা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব?" শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু, ও কথা আমরা শুনিব না। আপনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট স্বীকার করেন যে, তাঁহাকে শ্যামসুন্দর-রূপ দেখাইবেন, এখন এ প্রকার কথা বলিতেছেন কেন?" প্রভু উত্তরে বলিলেন, "আমি কি বলিয়াছিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখাইব? যদি বলিয়া থাকি, সে হয়ত উন্মাদ অবস্থায়। পণ্ডিত, তুমি ত জান অনেক সময় আমাতে আমি থাকি না। ইহাও আমি শুনিয়াছি যে, সে অবস্থায় আমি নানাবিধ প্রলাপ করিয়া থাকি, এমন কি অনেক অসম্ভব কথাও বলি। কিন্তু আপনারা আমার বন্ধু আপনাদের কি উচিত যে, উন্মাদ অবস্থায় আমি কি বলিয়াছিলাম, তাহার নিমিত্ত সহজ অবস্থায় আমাকে পেষণ করা?"

শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু, তুমি যাহাকে উন্মাদ অবস্থা বলিতেছ, সেই অবস্থায় তুমি যাহা বল, সেই তোমার মনোগত কথা, আর সহজ অবস্থায় যাহা বল, সে সমুদয় তোমার বাহ্য।" অতএব প্রভুর এই দুইটি অবস্থা- -আবেশিত ও সহজ,—সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহা যদি হইল, তবে এই আবেশিত অবস্থাই বা কি, আর সহজ অবস্থাই বা কি? আর, ইহার কোন অবস্থার কথা কি কার্য্য আমাদের কতদূর মান্য করিতে হইবে? আমরা প্রভুর লীলায় দেখিতেছি যে, অনেক স্থানে এরূপ লেখা আছে, যথা—"প্রভুর তখন আবেশিত চিত্ত"; কি প্রভু "ক্ষণে বাহ্য পাইয়া"; কি প্রভু বলিতেছেন, "বন্ধুগণ, এইমাত্র কি প্রলাপ করিলাম?" আবার প্রভুর কাণ্ড দেখুন। প্রভু করিতেছেন কি, না আপনার শ্রীপদ ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিতেছেন ও উহাতে ঘন ঘন চুম্বন দিতেছেন, আবার কখন বা,— আপনার কেশ দ্বারা আপনার শ্রীপদ বন্ধন করিতেছেন। প্রভু কিছুকাল এত বিহ্বল অবস্থায় ছিলেন যে, তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া তাঁহার নিজ-জন তাঁহাকে বন্ধন করিতে গিয়াছিলেন। ইহা প্রভুর কিরূপ লীলা? আর "প্রভুর রাধাভাবে গড়া তনু"—এই যে ভক্তগণ গাহিয়া থাকেন, ইহার অর্থ কি? প্রভুর "প্রকাশ", বা প্রভুর "মহাপ্রকাশ"—ইহার অর্থ কি? আর প্রভুর সেই সময় বালকের ন্যায় ব্যবহার করার অর্থই বা কি?

আবার দেখিতেছি, প্রভুর দেহে নানাবিধ লক্ষণ দেখা যাইত। কখন তিনি আপন দেহদ্বারা চক্র হইয়া আঙ্গিনায় ঘুরিতেন, আবার কখন আর্দ্র দেহ, কখন শুষ্ক দেহ হইত, ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ের তাৎপর্য্য কি? আবার কখনও প্রভু কৃষ্ণের নিকটে অতি কাতরে পাপ মার্জনার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন। ভাল, এ বেশ কথা, ভক্তরা ইহা করিয়া থাকেন, ও প্রভু অনেক সময় ভক্ত-ভাবে থাকিতেন। কিন্তু একটু পরে প্রভু আবার তিনিই কৃষ্ণ, ইহাই বলিয়া অন্যের পাপ মার্জনা করিতেছেন। অতএব তিনি ভক্ত, না কৃষ্ণ? প্রভু রাধাভাবে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন

করিতেছেন। বলিতেছেন, "আমার কৃষ্ণকে কুমতি কুব্জা ভুলাইয়া রাখিয়াছে," কি "তিনি কত কাল হইল মথুরায় গিয়াছেন আর ত আইলেন না।" তখন সকলে বুঝিলেন ইনি রাধা। আবার একটু পরে "রাধা রাধা" বলিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতেছেন, "কোথা আমার প্রাণপ্রেয়সী রাধা, তোমার বিবহে আমার মথুরার রাজ্য ভাল লাগিতেছে না।" তখন বোধ হইল তিনি কৃষ্ণ। অতএব তিনি ভক্ত, না রাধা, না কৃষ্ণ। প্রভুর কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ প্রথমে বড় ধান্ধায় পড়েন। প্রভু এরূপ করেন কেন? পরিশেষে স্বরূপ গোঁসাই ইহার একটি সিদ্ধান্ত করেন, তাহা এই শ্লোকে ব্যক্ত, যথা—শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়াচায়াম্—

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যাং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।।৫।।
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।৬।।

প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, রাধাকৃষ্ণ পূর্বে পৃথক ভাবে বিরাজ করিতেন, এখন তাঁহারা এক দেহ লইয়াছেন। অর্থাৎ গৌরাঙ্গ বস্তুতঃ রাধা ও কৃষ্ণ মিলিত, তাই কখনও রাধা প্রকাশ হইয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত রোদন, আবার কখনও কৃষ্ণ প্রকাশ হইয়া রাধার নিমিত্ত রোদন করেন। এই মীমাংসায় একটি অভাব রহিল। যদি গৌরাঙ্গ রাধা-কৃষ্ণ হইলেন, তবে ভক্ত-গৌরাঙ্গ, যিনি পাপ মার্জনার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, তিনি কে? দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ বুঝা একটু কষ্টকর। শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করিলেন যে, তিনি রাধাপ্রেম আস্বাদন করিয়া যত আনন্দলাভ করেন, শ্রীমতী রাধা তাঁহার কৃষ্ণ-প্রেমাস্বাদন করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ অনুভব করেন। ইহাতে রাধার যে আনন্দ তাহা কিরূপ, ইহা শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদন করিতে ইচ্ছা হইল, এবং সেইজন্য দুইজনে মিলিলেন। ইহাতে, রাধার যে আনন্দ, শ্রীকৃষ্ণ তাহার অংশীদার হইলেন। এরূপ মীমাংসা ভক্তগণের নিকট বড় মধুর। কিন্তু আর এক জাতীয় মনুষ্য আছেন, যাহারা একেবারে নাস্তিক। প্রধানতঃ তাহাদিগের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত হইতেছে। আমি এই তত্ত্ব লইয়া বিচার করিব ও ইহার সর্বাদিসম্মত কোন মীমাংসা আছে কিনা, দেখিব। প্রভুর লীলার মধ্যে এইরূপ নানাবিধ সমস্যা আছে, ইহা লইয়া বিচার করা আবশ্যক, আর আমি তাহাই করিব। এই নিমিত্ত শেষ খণ্ড লিখিতে পারিলাম না বলিয়া আপনাকে হতভাগ্য ও অপরাধী ভাবিতাম।

যেমন গম্ভীরা লিখিতে ভয় হইত, তেমনি লীলার রহস্য বিচার করিতে বড় ইচ্ছা হইত। কিন্তু এ লীলা-বিচার অপেক্ষা আর একটি বলবৎ কার্য্য হস্তে লইতে আমার বরাবর অতি গাঢ় ইচ্ছা ছিল, এই সুযোগে তাহাই করিব। বিশ্বাস ও জ্ঞান দুটি পৃথক বস্তু। শ্রীভগবান্ বলিয়া যে এক বস্তু আছেন, তিনি বিশ্বাসের বস্তু, জ্ঞানের বস্তু নহেন; অর্থাৎ ভগবান্ যে আছেন এ পর্য্যন্ত ইহা কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই, কেবল অনেকে ইহা মনে মনে বিশ্বাস করেন। সুতরাং তিনি কিরূপ বস্তু, ভাল কি মন্দ, তাহার প্রকৃত মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। আমাদের হৃদয় বলে যে, তিনি ভাল,—এই মাত্র। কিন্তু একজন নাস্তিক যদি বলে,—তিনি যে ভাল তাহার প্রমাণ কি? তখন ইহার প্রমাণ দিতে পারিব না। শুনিতে পাই ভগবদ্দর্শন কোন কোন সাধুর ভাগ্যে ঘটিয়াছে, কিন্তু সে প্রমাণ নয়। যেমন শাস্ত্রে দেখি যে, শ্রীল নারদ শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেন। কিন্তু যে অবিশ্বাসী, সে তাহা মানিবে

কেন? নারদ বলিয়া যে কোন মুনি ছিলেন, তাহা সে স্বীকারই করিবে না। শ্রীভগবান্ আছেন, ইহা যদি প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত হয়, আর ইহাও যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি মনুষ্যকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন, এবং মরণের পরে মনুষ্যকে চির-জীবন দিয়া থাকেন, তবে আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকিবে না। এ জগতে জীবের যে দুঃখ, তাহার প্রধান কারণ, মধুময় ভগবানে ও পরকালে তাহাদের বিশ্বাস নাই। যদি প্রমাণ হয়—শ্রীভগবান্ আছেন, তিনি অনন্ত-গুণময় বস্তু, মনুষ্যকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন, আর মৃত্যুর পরে তাহাদিগকে অনন্তজগতে লইয়া পরম সুখে রাখেন, তবে সমস্ত পৃথিবী আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে; শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ দিবানিশি নৃত্য কবিতেন, নৃত্যই তাঁহাদের প্রধান ভজন হইয়াছিল। কারণ প্রভুর সহবাসে তাঁহারা জানিয়াছিলেন যে, অতি স্নেহশীল ভগবান্ আছেন ও পরকাল আছে, তাই তাঁহারা নৃত্য করিতেন।[১]

যদি আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিতে পারি যে, প্রেমময় ভগবান্ আছেন ও মনুষ্যের অনন্ত-জীবন আছে, তবে জগতে দুঃখ প্রায় থাকিবে না। ইহা প্রভুর লীলা দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিব বলিয়া আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। এই জনাই আমরা ষষ্ঠ খণ্ড লিখিতে পারিলাম না বলিয়া ব্যাকুল হইতাম। ভগবান্ যে আছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই প্রমাণ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলায় পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, প্রভুর লীলায় যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, শ্রীভগবান্ চব্বিশ বৎসর ধরিয়া জীবের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়াছেন,—আর তাহা দুই চারি জনের সঙ্গে কিম্বা মূর্খ ও নির্বোধ লোকের সঙ্গে নয়—সমাজের ও দেশের শীর্ষস্থানীয় সহস্র-সহস্র লোকের সঙ্গে।

সুতরাং তিনি কিরূপ বস্তু তাহা আর এখন তর্কের বিষয় নয়,—তিনি স্বয়ং তাহা বিবরিয়া বলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ গৌরাঙ্গ-লীলার আর এক মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, এই উপলক্ষে কৃপাময় শ্রীভগবান্ আপনার পরিচয় তাঁহার সন্তানগণকে দিয়া গিয়াছেন। কোন কোন পাঠক হয়ত ভাবিতে পারেন যে, আমার এ সমুদয় কথা অতিরঞ্জিত। তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি এই সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ দিব, তাহা যেন তাঁহারা করুণ চক্ষে না দেখেন। তাঁহারা আমার এই প্রমাণ সমুদয় অতি নির্দয়তার সহিত পেষণ করুন, তাহাতে আমি বাধিত ভিন্ন বিরক্ত হইব না। কারণ মিথ্যা কথা পেষণে নষ্ট হয়, আর সত্য কথা পেষণে বর্দ্ধিত হয়। তবে আমার এই নিবেদন যেন তাঁহারা আমার এই অকাট্য প্রমাণগুলিকে অন্যায় করিয়া ছেদন করিতে চেষ্টা না করেন। আর যে প্রমাণগুলি দুর্বল, তাহাও একেবারে উড়াইয়া না দেন। কারণ দুর্বল প্রমাণগুলি ক্রমে একত্রিত করিলে তাহাও অকাট্য কি অচ্ছেদ্য হয়। যখন আমার

---

[১] অনন্ত-জীবন কাহাকে বলি? কেহ বলেন, মনুষ্য মরিয়া আবার এই জগতে আর একজন হইয়া আসিবে। ইহাকে অনন্ত-জীবন বলিতে পারি না, কারণ যে মরিল সে ত আর জন্মিল না, জন্মিল আর একজন। "লয়" কি "নির্বাণ",—ইহাও অনন্ত-জীবন নয়। অনন্ত-জীবন কাহাকে বলে তাহা বেদে বর্ণিত আছে। আমাদের দেশে পুনর্জ্জন্মের তত্ত্ব প্রবেশ করিয়াছে। ইহা যে কোথা হইতে আসিল, তাহা নির্দ্দেশ করা দুর্ঘট। বোধহয় বৌদ্ধধর্ম হইতে আসিয়াছে; কারণ পুনর্জ্জন্ম তাহাদের ধর্মের জীবন। যাহারা হিন্দু, তাহারা পুনর্জ্জন্ম মানিতে পারেন না। কারণ শাস্ত্রে আছে যে, শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণে মতভেদ হইলে বেদই প্রমাণ। তাহা যদি হইল, তবে বেদের পরকাল-তত্ত্ব কি তাহা প্রমাণ করুন। বেদের মতে মানুষ মরিলে যেমন তেমনি থাকে, থাকিয়া তাহাদের মৃত আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হয়, এবং প্রিয়জন লইয়া চিরজীবন যাপন করে। আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে, বেদের এইরূপ সুন্দর পরকালতত্ত্ব আর কোন দেশে, কোন ধর্মে নাই! ইউরোপের অনেক মহাপণ্ডিত বেদের এই পরকালতত্ত্ব দেখিয়া পুলকিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন।

মনে এরূপ বিশ্বাস রহিয়াছে, তখন বুঝিতে পারেন যে, এই লীলা লিখিবার নিমিত্ত আমার প্রাণ কতদূর ব্যাকুল হইয়াছিল। এই সমস্ত কথা আমি পূর্বে লিখিবার অবকাশ পাই নাই, যেহেতু তখন লীলা বর্ণনা করিতে বিব্রত ছিলাম। তাহার পরে ক্রমে রূগ্ন ও বৃদ্ধ হইতে লাগিলাম, পুস্তক শেষ করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ গম্ভীরা-লীলা লিখিতে হইবে মনে করিলে হৃদয় কম্পিত হইত।

পাঠকগণ! এখন বিবেচনা করুন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা জীবের বহুমূল্য ধন কি না; আর, এ ধনেব সহিত অন্য কোন ধনের তুলনা হয় কি না। কারণ এই ধর্মের যেরূপ দৃঢ় ভিত্তিভূমি আছে, এরূপ আর কোন ধর্মের নাই।

প্রথম অধ্যায়

আশীর্বাদ

শুদ্ধ বেলোয়ালী—চৌতাল।

কোটি যুগ চিরজীবী রহো আমার—প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর,
জগন্নাথ সুত, গৌরাঙ্গ পতিতপাবন।।
শচীর কুল-তারণ, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণধন,
দুঃখী জনে দয়া কর হে, তারণ শরণ।
প্রেমেব বন্যায় জগৎ ভাসালে আপনি কান্দি কান্দাইলে,
মধুর মধুর লীলা করিলে;
বলরাম দাসের নাথ, জীবে কর আর্শীবাদ,
দাও দাও দাও দীনহীন জীবে অমূল্য চরণ।।

শ্রীগৌরাঙ্গ অনেক সময় বিহ্বল অবস্থায় থাকিতেন, শেয-লীলায় তাঁহার আবেশ প্রায় ভাঙ্গিত না। হঠাৎ দেখিলে মনে হইত, যেমন নদীতে কোন ভাসমান দ্রব্য জোয়ার-ভাটায় একবার এদিকে একবার ওদিকে চালিত হয়, তিনি সেইরূপ চালিত হইতেছেন। তিনি কি সেইরূপ দৈবের অধীন ছিলেন? না, তাহা নয়। তাহার বিহ্বলতা বাহ্য। তাঁহার সমুদয় কার্য্য দেখিলে বোধ হইবে যে তিনি কি কি করিবেন, তাহা তাঁহার জগতে উদয় হইবার পূর্বে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কাহার দ্বারা? না—এক অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু দ্বারা। এ খেলা তাঁহার জন্মিবার পূর্বে পত্তন হয়, আর যিনি ইহা করিয়াছেন তাঁহার ভূত ভবিষ্যৎ সমুদয় গোচর ছিল। আবার তাঁহার এ শক্তিও ছিল যে, তিনি পূর্বে আপনার মনোমত খেলা পাতাইয়া কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে পারিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এই নিমিত্ত অবতারের পদ প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার এই পদ প্রাপ্তিতে তাঁহার অমানুষিক অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে। এ "অবতার" তত্ত্বটি ও এই কথাটির ইতিহাস বিচার করুন। যখন এই কথাটি সৃষ্ট হয়, সেই সঙ্গে তখন তাহার কার্য্যও স্থির করা হয়। কথা হয় যে, শ্রীভগবান্ মনুষ্য-সমাজে বিচরণ করিয়া থাকেন, আর তখন তাঁহাকে অবতার বলা যায়। ঐ সঙ্গে আরও কথা হয় যে, এইরূপে অমুক অমুক অবতার হইয়াছেন, আরও একটি হইবেন, তাঁহাকে বলে কল্কি-অবতার। সুতরাং এই শব্দটি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, উহার যে কার্য্য তাহাও স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছিল। এই শব্দের ও তত্ত্বের সহিত মনুষ্যের আর কোন সম্বন্ধ ছিল না।

কিন্তু নবদ্বীপে এই কথা ও তত্ত্ব আবার উত্থিত হইল। যখন নবদ্বীপের লোকেরা দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বস্তুটি একটি কার্য্য করিতেছেন, যে কার্য্যের ভ্রমশূন্য মানচিত্র পূর্বে অঙ্কিত হইয়াছে, তখন তাহারা আবার অবতার কথাটা উঠাইলেন। তখন তাঁহারা দেখিলেন যে, অসীম শক্তিসম্পন্ন একটি বস্তু পূর্বে একটা খেলা পাতাইয়া এবং পরে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া তাঁহার সেই

শক্তির পরিচয় দিতেছেন, তখন তাঁহারা বলিলেন যে, এই বস্তুটি আমাদের ন্যায় মনুষ্য নহেন; ইঁহার যে শক্তি উহা ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারও সম্ভবে না। তাই লোকে লুপ্ত অবতার-তত্ত্ব বস্তুটি আবার সজীব করিলেন।

মনে করুন, কোন এক অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু সাব্যস্ত করিলেন যে, জীবকে অতি নিগূঢ় প্রেমধর্ম অর্পণ করিবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে হইবে। তিনি স্থির করিলেন যে, এই নিমিত্ত প্রথমতঃ একটি অবতারের আবশ্যক, তাঁহার অমুক স্থানে অমুক সময় জন্মগ্রহণ করা উচিত, এবং তাহার পরে তাঁহার এই সমুদয় কার্য্য করিতে হইবে। সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু পূর্বে এই সমুদয় সাব্যস্ত করিলেন, পরে সেই সমুদয় প্রস্তাবিত ঘটনা কার্য্যে পরিণত হইল।

উপরে যাহা বলিলাম, প্রভুর লীলা মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলে তাহাই বোধ হইবে। সে সময়ে শ্রীনবদ্বীপ বিদ্যা ও বুদ্ধি-চর্চায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব-প্রধান স্থান ছিল। সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু স্থির করিলেন যে, এই নবদ্বীপেই এই অবতারের উদয়ের উপযুক্ত স্থান। শ্রীগৌরাঙ্গ অকুতোভয়ে সেখানে জন্মগ্রহণ করিলেন। শুনিতে পাই, যীশুর সঙ্গীগণ ছিলেন জালিয়া প্রভৃতি নীচ লোক। এই জগতে সামান্য যে যে অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই সঙ্গী ঐরূপ মূর্খ অজ্ঞ লোক ছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ উদয় হইলেন কোথা, না—পণ্ডিত সমাজে, যেখানে সে সময় অতিসূক্ষ্মবুদ্ধি-সম্পন্ন লক্ষ লক্ষ পণ্ডিত বিরাজ করিতেছেন। তিনি জন্মিলেন কিরূপ সময়, না—যখন সেই নবদ্বীপ উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, অর্থাৎ যখন মিথিলার ন্যায়শাস্ত্র নিজ জন্মস্থানে দুঃখ পাইয়া এই নবদ্বীপনগরে আশ্রয় লইয়াছেন; যখন বাসুদেব সার্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি ঐ নগর অলঙ্কৃত করিতেছেন; যখন স্মার্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন তাঁহার স্মৃতি, ও আগমবাগীশ তাঁহার তন্ত্রসার লিখিতেছেন; এবং যখন কমলাক্ষ ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিতেছেন। সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু ভাবিলেন যে, সেই ভাবী অবতার জগতের প্রধান স্থানে প্রধান লোক সমাজে জন্মিলে কার্য্যের সুবিধা হইবে,—আর প্রকৃত তাহাই হইল। যেহেতু সেই বস্তু বুঝিয়াছিলেন যে, এই ভাবী অবতার নবদ্বীপ জয় করিতে পারিলে, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান আপনা আপনি তাঁহার বশীভূত হইবে।

আমাদের দেশে বৎসরের মধ্যে সর্বপেক্ষা মনোহর সময় ফাল্গুন মাস; অবতার সেই মাসে জন্মগ্রহণ করিলেন। আবার ফাল্গুন মাসের সর্বাপেক্ষা মনোহর সময় পূর্ণিমা-সন্ধ্যা; কাজেই যেমন ফাল্গুনী-পূর্ণিমার চন্দ্র উদয় হইলেন, অমনি গৌরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। এই স্থান ও এই সময় অবতারের জন্মগ্রহণের উপযুক্ত।

প্রভুর লীলায় দেখিবেন যে, তিনি বরাবর হরিনাম বড় ভালবাসিতেন। এমন কি, তিনি যখন যেখানে উদয় হইতেন, তখন তাহার চতুর্দিকে হরিধ্বনি হইত। ইহার অনেক উদাহরণ পরে দেখাইব। বলিতে কি, বহিরঙ্গগণের নিমিত্ত হরিনামই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। প্রভু এরূপ সময় জন্মগ্রহণ করিলেন, যখন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে—প্রভুর মনের অভিপ্রায় তিনি হরিনামের সহিত জগতে উদয় হইবেন, তাই গ্রহণের সময় জন্মগ্রহণ করিয়া সেই ইচ্ছা পুরাইলেন।

পরে দেখাইব যে, এই যে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেহ, ইহা সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার প্রয়োজন ছিল। তাই প্রভু বার মাস উদরে রহিলেন,—কেন, তাহা বলিতেছি। সাধারণতঃ সন্তান দশ মাস গর্ভে থাকে, প্রভু আরও পূর্ণ দুই মাস থাকিলেন। যদি তিনি দশ মাসে জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে এই দুই মাস শচীর দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন। কিন্তু তিনি গর্ভের বাহিরে আসিয়া দেহটি শচীর হস্তে ন্যস্ত না করিয়া, গর্ভের অভ্যন্তরে থাকিলেন, সুতরাং স্বভাব কর্তৃক প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। শচীর সেই দেহ পালন করিতে অনেক ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল ও তাহাতে দেহটি আঘাত

পাইতে পারিত,—কিন্তু স্বভাবের ভুল হয় না। কাজেই পূর্ণ দ্বাদশ মাস গর্ভে থাকিয়া প্রভু ভূমিষ্ঠ হইলেন। তখন সে দেহ দেখিয়া লোকে চমকিত হইল। ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহাকে যেন এক বৎসরের শিশু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আবার ভূমিষ্ঠ হইলেন অতি অপূর্ব লগ্নে। এরূপ শুভলগ্নে কেবল শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, অর কাহাকেও এরূপ সুসময়ে জন্মিতে দেখা যায় নাই। ইহাও যে দৈব হইয়াছে, তাহা উপরের ঘটনা দেখিলে বোধ হয় না, অর্থাৎ বোধ হয় যে, তিনি যেন ইচ্ছা করিয়াই সেই সময় জন্মগ্রহণ করেন।

শিশুবেলা নিমাইয়ের চাঞ্চল্যের অবধি ছিল না। তাঁহা অপেক্ষা অনেক বড় মুরারি, বড় জ্ঞানী ছিলেন, অর্থাৎ তিনি যোগবাশিষ্ট পড়িতেন, বড় একটা ভগবান্ মানিতেন না। এক দিবস তিনি বয়স্যদিগের সহিত যোগবাশিষ্ট বিষয়ক কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছেন; মনের ভাব বুঝাইবার নিমিত্ত হাত চালাইতেছেন, মাথা নাড়িতেছেন, অঙ্গভঙ্গী করিতেছেন। পঞ্চমবর্ষের নিমাই বয়স্য বালকদিগের সঙ্গে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাকে ভেংচাইতে ভেংচাইতে চলিয়াছেন। মুরারি ইহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া জগন্নাথের পুত্রকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরে যখন আহারে বসিয়াছেন, তখন নিমাই তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার থালে মূত্রত্যাগ করিলেন, আর বলিলেন, "মুরারি, হাত নাড়া মুখ নাড়া ছাড়, জ্ঞান ছাড়, বক্তৃতা ছাড়, ছাড়িয়া ভগবান্‌কে ভজনা কর। যে ব্যক্তি বলে যে সে নিজে ভগবান্ তাহার থালে আমি প্রস্রাব করি।" অবশ্য কাহারও থালে প্রস্রাব করা অন্যায়, কিন্তু ভাবুন নিমাই কি বলিয়া উহা করিয়াছিলেন। যোগবাশিষ্ট নাস্তিকতা শিক্ষা দেয়। সে পুস্তকের মর্ম এই যে, ভগবান্ বলিয়া আর কোন পৃথক বস্তু নাই, মানুষই ভগবান্। মুরারি তাহারই চর্চা করিতেছিলেন।

প্রেমভক্তি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গৌরাঙ্গ-অবতার। সুতরাং যোগবাশিষ্টের শিক্ষা আর তাঁহার শিক্ষা একেবারে বিপরীত। ভক্তিধর্মে বলে—ভগবান মনুষ্যের কর্তা, আর মনুষ্য তাঁহার দাসানুদাস। তাই বালক নিমাই মুরারিকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিলেন,—এমন করিয়া, যে তিনি তাহা চিরকাল মনে রাখিয়াছিলেন, আর আমরাও সে শিক্ষার ফলভোগ করিতেছি।

আপনারা নিমাইয়ের এই কাণ্ডকে অবশ্য কৃপা করিয়া পাগলামি বলিবেন না। ইহা একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ লীলা। আবার আর এক লীলা শ্রবণ করুন। নিমাই গয়া হইতে আসিয়া যে সংকীর্তন রচনা করেন, ঠিক সেইরূপ সংকীর্তন পূর্বে এক দিবস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বয়স সবে পাঁচ ছয় বৎসর! বয়স্য বালকগণকে নিমাই বনমালা পরাইয়াছেন, মধ্যস্থানে আপনি নৃত্য করিতেছেন, আর সঙ্গীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ঐরূপ নৃত্য করিতেছে। যে বালক নাচিতেছে না, তাহাকে নিমাই আলিঙ্গন করিতেছেন, আর সেই স্পর্শ শক্তি পাইয়া সে তখন নৃত্য করিতেছে। সেই সময় সেই পথে কয়েকজন পণ্ডিত যাইতেছিলেন, তাঁহারা কৌতুক দেখিতে দাঁড়াইলেন। একটু পরে আবেশিত হইয়া তাঁহারা চৈতন্য হারাইলেন, এবং বালকগণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথা—

"চৌদিকে বালক বেড়ি হরি হরি বলে। আনন্দে বিভোর গোরা ভূমে গড়ি বুলে।।
বোল বোল 'বলি ডাকে মেঘ-গম্ভীর স্বরে। আইস আইস বলি বালক কোলে করে।।
শ্রীঅঙ্গ পরশে বালক পাশরে আপনা। আশ্চর্য্য ঘটনা এই বালক কাদে না।।
হেনকালে সেই পথে চলিছে পণ্ডিত। বিশ্বম্ভরের খেলা দেখে আচম্বিত।।
আপনা পাসরি পণ্ডিত সান্ধাইল মেলে। করতালি দিয়া নাচে হরি হরি ব'লে।।
হরি বোল শুনি শচী আইলা ত্বরিত। দেখে পুত্র নাচে যত পণ্ডিত সহিত।।
পুত পুতবলি শচী নিমাই কৈল কোলে। সভারে দেখিয়া সে নিষ্ঠুর বাণী বলে।।
এমত ব্যাভার ভেল পণ্ডিত সভায়। পরপুত্র পাগল করি উন্মত্তে নাচায়।।"

(চৈতন্য-মঙ্গল)

অর্থাৎ শচী গোল শুনিয়া ধাইয়া আসিলেন এবং পুত্রকে কোলে করিলেন। তখন পণ্ডিতগণের আবেশ ভাঙ্গিল, তাঁহারা লজ্জায় মরিয়া গেলেন। তাঁহারা না রাজপথে সর্বলোক সম্মুখে নৃত্য করিতেছিলেন। নিতাই যখন এই লীলা করেন, তখন তিনি মায়েব কোলের ছেলে। এটি নিমাইয়ের বাল্য-চাপলতা, না লীলাখেলা?—কি বলেন?

নিমাই পাঠারম্ভ করিলেই দেখা গেল যে, বিদ্যাবুদ্ধির আকর—স্থান যে নবদ্বীপ, সেখানেও তিনি শীর্ষস্থানের উপযুক্ত পাত্র। সেখানে তখন সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান রঘুনাথ শিরোমণি। তাঁহা অপেক্ষা বুদ্ধিমান জগতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। সেই রঘুনাথ নিমাইয়ের বুদ্ধিতে প্রতিভা-শূন্য। নিমাই ও রঘুনাথে অনেক দ্বন্দ্বেব কথা জনশ্রুতিতে জানা যায়। আর সকল দ্বন্দ্বেই নিমাই জযলাভ করিতেন। রঘুনাথের দীধিতির ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ লিখিত হইত না, যদি নিমাই আপনার ন্যায়গ্রন্থ রঘুনাথের সান্ত্বনার নিমিত্ত ছিঁড়িয়া না ফেলিতেন। তখন দেখা গেল যে, তিনি নিতান্ত উদ্দেশ্যশূন্য ছিলেন না। তিনি যে দৈবের দাস ছিলেন না, তাহা দিগ্বিজয়ীকে জয় করিয়া নবদ্বীপের ও জগতের পণ্ডিতগণকে দেখাইয়াছিলেন। নিমাই যখন বালক, তখন তিনি নবদ্বীপের ন্যায় বিদ্বজন সমাজে টোল স্থাপন করেন। আর সে টোলে বহু সহস্র পড়ুয়া বিদ্যা শিক্ষা করিত। যথা চৈতন্য-ভগবান—

"কত বা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই। কত বা মণ্ডলী হয়ে পড়ে নানা ঠাই।।
"সহস্র সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ। অবাক হইল সবে শুনিয়া বর্ণন।।"

আবার চৈতন্য-ভাগবতে দেখি যে, প্রভু যখন বঙ্গদেশে যান, তখন সেখানেও তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্য হয়, ও তাহারা তাঁহার সঙ্গে নবদ্বীপে আসিয়াছিল। সেই বালক-কালে তিনি ব্যাকরণের একখানি টিপ্পনী করেন, তাহা তখন নবদ্বীপেব ন্যায় সমাজে চলিত হইয়াছিল।

নিমাই পূর্বাঞ্চলে কেন গমন করিলেন? তখন তিনি কেবল যৌবনে পদার্পণ করিতেছেন। তিনি জননীকে বুঝাইলেন যে, অর্থ উপার্জন করিতে যাইতেছেন। কিন্তু অর্থ উপার্জনে যে তাঁহার কখনও বাসনা ছিল, তাহা তাঁহার লীলা পড়িলে বোধ হয় না। তিনি কেন পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কার্য্য দ্বারা কিছু কিছু জানা যায়। তিনি অবতাররূপে প্রকাশ হইয়া পূর্ববঙ্গে যাইবেন না, তাহা তিনি জানিতেন, অথচ পূর্ববঙ্গে ভক্তিধর্ম প্রচার করা প্রয়োজন। তাই পদ্মাবতী তীরে গেলেন। তিনি পূর্ববঙ্গে কিরূপে ধর্ম প্রচার করেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই, কেহ তাঁহার সেখানকার প্রচার প্রণালীর কথা কোন লীলা-গ্রন্থে বলেন নাই। যখন পূর্বাঞ্চলে যান, তখন তিনি একজন বিখ্যাত শিশুপণ্ডিত মাত্র। তাঁহাকে যে ধর্মের কিছু ভাব আছে তাহাও লোকে জানিত না, বরং লোকে তাঁহাকে এক প্রকার নাস্তিক ভাবিত। আবার যখন তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন, তখনও সেইরূপ বড়পণ্ডিত, কেবল বিদ্যাচর্চা করেন। তখন তাঁহার হৃদয়ে যে কোন ধর্মভাবের লক্ষণ আছে তাহা বোধ হইত না। অথচ তখন তিনি পূর্ববঙ্গে একটি ভক্তির তরঙ্গ উঠাইয়া আসিলেন। যথা চৈতন্য-মঙ্গলে—

"সেই পদ্মাবতী-তটবাসী যত জন। বিশ্বম্ভর দেখি শ্লাঘ্য করয়ে নয়ন।।
পদ্মাবতী তীরে-তীরে ফিরে গৌরহরি। সে দেশ ভকত কৈল শ্রীচরণ ধরি।।
চণ্ডাল পতিত কিবা দুর্জন সজ্জন। সভারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম।।"

আবার চৈতন্য-ভাগবতে—

"এই মতে বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের পতি। বিদ্যারসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি।।
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথায়। হেন নাহি জানি কে পড়ে কোন ঠাঞি।।
সেই ভাবে অদ্যাপিও এই বঙ্গদেশে। শ্রীচৈতন্য-সংকীর্তন করে স্ত্রী ও পুরুষে।।"

এইরূপে নবদ্বীপবাসীকে জানিতে না দিয়া প্রভু লুকাইয়া বঙ্গদেশ উদ্ধার করিলেন। বঙ্গদেশে যাইবার আর একটি কারণ—রঘুনাথ ভট্টকে সৃষ্টি করা। কারণ গোস্বামী রঘুনাথ

তাঁহার লীলাখেলার এক অঙ্গ। সে কিরূপে বলিতেছি। একদিন প্রাতে সে দেশের অতি প্রধান লোক তপনমিশ্র আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন। ইহাতে প্রভু জিভ কাটিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তপন বলিলেন, "আমাকে বঞ্চনা করিবেন না, আমি গতরাত্রে স্বপ্নে জানিয়াছি, আপনি স্বয়ং ভগবান্। এখন আমাকে উদ্ধার করুন।" প্রভু বলিলেন, "তুমি সস্ত্রীক বারাণসী গমন কর, সেখানে তোমার সহিত আমার দেখা হইবে। এই কথা শুনিয়া তপনমিশ্র তদ্দণ্ডে সস্ত্রীক বারাণসী চলিয়া গেলেন, আর একাদশ বৎসর পরে সেখানে প্রভুর দর্শন পাইলেন। অতএব এই লীলাখেলা যিনি পাতাইয়াছিলেন তিনি তাঁহার খেলায় লিখিয়াছিলেন যে, তপনমিশ্রের বারাণসী যাইতে হইবে, সেখানে অবতারের সহিত তাঁহার দেখা হইবে, আর সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু তাঁহার খেলা কার্য্যে পরিণত করিতে শক্ত হইবেন। অতএব প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলি তাঁহার অধীন ছিল। কি ঘটনা হইবে তাহা তিনি অগ্রে সাব্যস্ত করিতেন, পরে সেগুলি ঘটাইতেন।

সেই বারাণসীতে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী—যাঁহাকে প্রভুর প্রয়োজন—তপনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাই প্রভু তপনমিশ্রকে আজ্ঞা করেন তুমি সস্ত্রীক বারাণসী গমন কর।" এইরূপে প্রভুর লীলার প্রধান সঙ্গীগুলির মধ্যে অনেককেই তিনি নিজে সংগ্রহ করেন।

নিমাইমণ্ডিত গয়াধামে যাইবেন। ইহার পূর্বে তিনি নদীয়ায় কিরূপে জীবনযাপন করিয়াছেন স্মরণ করুন। তাঁহার গঙ্গায় সন্তরণে ভব্যলোক অস্থির হইতেন! ঘাটে লোকে পূজা করিতে আসিয়াছে, তিনি পুরুষের ও মেয়ের কাপড় বদলাইলেন। বালিকারা ব্রত করিতেছে, তিনি নৈবেদ্য কাড়িয়া খাইলেন। একটু বড় হইলে সে সব ছাড়িলেন, কিন্তু তবু তাঁহার গাম্ভীর্য্যের লেশমাত্র ছিল না। শ্রীধরের সহিত কলাপাতা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেন, মুকুন্দকে "বাঙ্গাল" "বাঙ্গাল" বলিয়া অস্থির করিয়া তুলিতেন, বঙ্গদেশে বাঙ্গালিয়া কথা শিখিয়া আসিয়া তাহার দিব্য অনুকরণ করিয়া বয়স্যগণকে হাসাইতেন। পড়ুয়া দেখিলেই তিনি ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহার ফাঁকির ভয়ে অধ্যাপক পর্য্যন্ত অস্থির হইতেন। তাঁহার পিতৃবন্ধু শ্রীবাসপণ্ডিত তাঁহাকে কৃষ্ণভজন করিতে উপদেশ দিলে, তিনি সেই গর্বিত গুরুজনকে ঠাট্টা করিলেন। তবে যখন তিনি টোলে বসিতেন, তখন কাহার সাধ্য যে চপলতা করে। যখন পূর্ববঙ্গে গমন করেন, তখনও কয়েক মাস একটু স্থির ছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপে জন্মাবধি এই চতুর্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত কেবল চাপল্য, কেবল উদ্ধতপনা, কেবল পড়ুয়ার দাম্ভিকতা করিয়াছেন। সেই চঞ্চলশিরোমণি, সেই উদ্ধত নবীন-অধ্যাপক, এখন গয়ায় চলিলেন। যথা চৈতন্য-ভাগবতে—

"গয়াতীর্থরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া। নমস্কারিলেন প্রভু শ্রীকর জুড়িয়া।।"

এই যে দুই কর জুড়িলেন, ইহা চিরজীবন জোড়াই থাকিল। পরে চক্রবেড়ে গধাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিলেন। ইহাতে হইল কি, না—

"অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্মনয়নে। রোমহর্ষ কম্প হৈল চরণ দর্শনে।।"
অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে।" "আত্ম প্রকাশের আসি হইল সময়।
দিনে দিনে বাড়ে প্রেমভক্তির বিজয়।।"

পরে রোদন করিতে লাগিলেন—

"কৃষ্ণরে বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি। কোন দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি।।
আর্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে। কোথা গেল বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া মোহরে।।
গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে। ভাসিলেন নিজ ভক্তি বিরহ সাগরে।।"

যে নিমাই নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া গয়ায় গমন করিলেন তিনি আর ফিরিলেন না, যিনি আসিলেন তিনি আর এক বস্তু। যথা—

"তিলার্দ্ধেক উদ্ধতের নাহিক প্রকাশ। পরম বিরক্ত রূপ সকল সম্ভাষ।।
শেষ প্রভু হইলেন বড় অসম্বর। কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর।।

ভবিল পুষ্পের বন মহা প্রেমজলে। মহাশ্বাস ছাড়ি প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।।
পুলক পূর্ণিত হৈল সর্ব কলেবরে।"

এইরূপে দিবানিশি ক্রন্দন চলিল, আর নয়নজলে সে স্থান কর্দমময় হইতে লাগিল। আবার ইহার সঙ্গে ঘন-ঘন মূর্চ্ছাও হইতে লাগিল। প্রাতে স্নান করিতে গেলেন, অনেক কষ্টে, ধৈর্য্য ধরিয়া চলিলেন; ক্রন্দন আসিতেছে, কিন্তু বহিরঙ্গ লোক দেখিয়া সম্বরণ করিতেছেন। যথা—
"প্রাতঃকালে যবে প্রভু চলে গঙ্গাস্নানে। বৈষ্ণব সবার সঙ্গে হয় দরশনে।।
শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্কারে। প্রীতি হয়ে ভক্তগণ আশীর্বাদ করে।।"

গয়া হইতে প্রত্যাগত নিমাই বৈষ্ণবগণকে বলিতেছেন—
তোমা সবা দেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই। এত বলি কারু পায় ধরে সেই ঠাঁই।।"

সেই সঙ্গে তিনি ভক্তের সেবা আরম্ভ করিলেন—
নিঙ্গড়ায়েন বস্ত্র কারু করিয়া যতনে। ধুতি বস্ত্র তুলি কারু দেন সে আপনে।।
কুশ গঙ্গা-মৃত্তিকা কাহার দেন করে। সাজি বহি কোন দিন চলে কারু ঘরে।।"

পরে অধ্যাপক-শিরোমণি পড়াইতে গেলেন. পারিলেন না। পড়ুয়ারা প্রশ্ন করে, ধাতুতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে; তিনি বলেন "কৃষ্ণ বল।" এইরূপে সাত দিন গেল. কাজেই পড়ান বন্ধ হইল। যাঁহার মুখে দিবানিশি হাসি ছিল, এখন তাঁহার দিবানিশি ক্রন্দন। যিনি এত দাম্ভিক ছিলেন, তিনি এখন যাহার-তা হার চরণ ধরিয়া, যাহাকে তাহাকে প্রমাণ করিয়া, দাস্যভক্তি ভিক্ষা করেন। যিনি দিবানিশি বিদ্যাচর্চা লইয়া নিমগ্ন থাকিতেন, এখন তিনি কেবল চতুর্দিকে কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। যথা—
"যে যে জন আইসেন প্রভু সম্ভাষিতে। প্রভুর চরিত্র কেহ না পারে বুঝিতে।।
পূর্ব বিদ্যা ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন। পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্বক্ষণ।।"

শচী পুত্রকে সুস্থ করিবার নিমিত্ত বধূকে পুত্রের সমীপে আনয়ন করেন; যথা—
"লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়। দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়।।"

পরে কীর্তন আরম্ভ হইল। নিমাইয়ের এই কীর্তনে উত্তম ভাবঘটিত কি রাগরাগিণীযুক্ত পদ ছিল না। তবে কি ছিল, না—মুখে কেবল হরিবোল বলা, আর মৃদঙ্গের সহিত নৃত্য। ইহাতে সকলে আনন্দে মাতোয়ারা হইতেন ও আনন্দে মূর্চ্ছা যাইতেন। ক্রমে কীর্তনের তেজ বাড়িয়া চলিল, ক্রমে নূতন নূতন লোক এই কীর্তনে যোগ দিতে লাগিলেন। অগ্রে রজনীতে সামান্য কীর্তন হইত, পরে দিবানিশি হইত ও ইহাতে নদে টলমল করিত। বাসুঘোষের পদ যথা—
"চাঁদ নাচে সূর্য্য নাচে, আর নাচে তারা। পাতালে বাসুকী নাচে বলি গোরা-গোরা।।"

তথা—ত্রিলোচন দাসের পদ—

অরুণ কমল আঁখি, তারক ভ্রমরা পাখী,
ডুবু ডুবু করুণা মকরন্দে।
বদন-পূর্ণিমাচান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে,
তাহে নব প্রেমার আরম্ভে।।
আনন্দ নদীয়াপুরে ঢলমল প্রেমের ভরে,
শচীর দুলাল গোরা নাচে।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, শুনিয়া চমক লাগে,
মদনমোহন নটরাজে।।
পুলকে ভরল গায়, ঘর্ম বিন্দু বিন্দু তায়,
রোম-চক্রে সোনার কদম্ব।

প্রেমার আরম্ভে তনু, যেন প্রভাতের ভানু,
আধ-বাণী কহে কম্বুকণ্ঠ।।
শ্রীপাদ-পদুম গন্ধে, বেঢ়ি দশনখ চান্দে,
উপরে কনক-বঙ্করাজ।
যখন ভাতিয়া চলে, বিজুরী ঝলমল করে,
চমকয়ে অমর-সমাজ।।
সপ্তদ্বীপ-মহী মাঝে, তাহে নবদ্বীপ সাজে,
তাহে নব-প্রেমার প্রকাশ।
তাহে নব-গৌরহরি, গুণ সঙ্কীর্তন করি,
আনন্দিত এ ভূমি আকাশ।।
সিংহের শাবক যেন, গভীর গর্জন হেন,
হুঙ্কার হিল্লোল প্রেমসিন্ধু।
হরি হরি বোল বলে, জগৎ পড়িল ভোলে,
দুকুল খাইল কুলবধূ।।
অঙ্গের ছটায় যেন, দিনকর প্রদীপ হেন,
তাহে লীলা বিনোদ-বিলাস।
কোটি কোটি কুসুম-ধনু জিনিয়া বিনোদ-তনু
তাহে করে প্রেমের প্রকাশ।।
লাখ লাখ পূর্ণিমাচান্দে, জিনিয়া বদন-ছান্দে,
তাহে চারু-চন্দন-চন্দ্রিমা।
নয়ান অঞ্চল ছলে, ঝর্ ঝর্ অমিয়া ঝরে,
জনম-মুগ্ধ পাইল প্রেমা।।
কি কব উপমা তার, করুণা বিগ্রহসার,
হেন রূপ মোর গোরারায়।
প্রেমায় নদীয়ার লোকে, তাহে দিবানিশি থাকে,
আনন্দে লোচন্যদাস গায়।।”

শ্রীনিমাই বিজয়ার দিন গয়াযাত্রা করেন, আর চারি মাস পরে পৌষ মাসে শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন। আসিয়াই সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। তিন-চার সপ্তাহের মধ্যে নদের আকার পরিবর্তিত হইল। সেই প্রকাণ্ড নগরে কিরূপ তরঙ্গ উঠিল, তাহা উপরে লোচনের প্রলাপে কতক প্রকাশ পাইবে। ভারতবাসীরা—কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি যোগী, কি দেবোপাসক—সকলেই শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু নদীয়ায় এমন একদল হিন্দুর সৃষ্টি হইল, যাহাদের হুঙ্কারে, গর্জনে নর্তনে, মৃদঙ্গের বোলে ও কীর্তনের রোলে, ভব্য নগরবাসিগণ একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন, সমাজের বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইল, কাজেই নিমাইয়ের বড় বড় শত্রুর সৃষ্টি হইল। ইহার মধ্যে একজন কমলাক্ষ। ইঁহার নাম পূর্বে করিয়াছি। ইনি তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রধান। ইনি পরমপণ্ডিত তাপস ব্রাহ্মণ, দিবানিশি ভজন লইয়া থাকেন। ইঁহার বিষয় সম্পত্তির ও সম্মানের অবধি ছিল না। শ্রীহট্টের রাজা, কৃষ্ণদাস নাম লইয়া, শান্তিপুরে থাকিয়া ইঁহার চরণসেবা করিতেছেন। এই কমলাক্ষ অদ্বৈত আচার্য্য নামে বিখ্যাত। ইনি যদিও বৈষ্ণব, তবু তাঁহার বৈষ্ণবতায়, ও নিমাই যে বৈষ্ণবতা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে অনেক প্রভেদ। বলিতে কি, তাঁহার বৈষ্ণবতার সহিত অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দুধর্মাবলম্বীদিগের মতেব বড় একটা বিভিন্নতা ছিল না। তবে তাহাদের ঠাকুর শিব দুর্গা কি কালী, আর ইঁহার ঠাকুর বিষ্ণু অর্থাৎ

গদাপদ্মাদিধারী চারি হস্তের নারায়ণ। কিন্তু নিমাইয়ের ভজনীয় দ্বিভুজ মুরলীধর। নিমাই নবদ্বীপে এক প্রকাণ্ড বৈষ্ণবদল সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারা ও অদ্বৈত আচার্য্যের দলস্থ সকলে, অদ্বৈতের শীর্ষস্থানীয় পদে নিমাইকে বসাইলেন, ক্রমে নিমাইকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

অদ্বৈতের এ সব ভাল লাগে না। তিনি বলেন, ভজনে নাচন আর গায়ন কেন? আবার বলেন, কলিকালে অবতার কি? শাস্ত্রে ইহার কোন আভাস নাই। একি সামান্য রহস্যের কথা যে, জগন্নাথের বেটা কি না আজ আবার ঠাকুর হইয়া বসিল? যখন অদ্বৈত আচার্য্যের এরূপ ভাব, তখন কাজেই নিমায়ের এক প্রধান কাজ হইল, এই অদ্বৈত আচার্য্যকে বশীভূত করা। ওদিকে অদ্বৈতের সংকল্প যে তিনি তাঁহার শীর্ষস্থানীয় পদ ত্যাগ করিয়া কখন জগন্নাথের বেটার অধীন হইবেন না। কিন্তু প্রভু পরিশেষে আচার্য্যকে বশীভূত করিলেন।*

নিমাইয়ের আর এক শত্রু জগাই মাধাই। ইঁহারা শাক্ত ছিলেন, কিন্তু ধর্মের কোন ধার ধারিতেন না। মদ্য পান করিতেন, আর নদেবাসীর উপর বড় অত্যাচার করিতেন। কারণ ইহারা নগরে কোটাল ছিলেন, অস্ত্রধারী সৈন্য কি দস্যু তাহাদের সহায় ছিল, কাজেই নিরীহ বিদ্যাব্যবসায়ী নগরবাসীরা তাহাদের নামে কাঁপিয়া উঠিতেন। ইহাদের কথা এইরূপ লেখা আছে। "হরিনাম দুই ভাই সহিতে না পারে।"

প্রভুর আজ্ঞাক্রমে নিতাই ও হরিদাস নগরে ভক্তিধর্ম প্রচার করিতেছিলেন। একদিন তাঁহারা জগাই মাধাইয়ের নিকট গমন করেন, জগাই "মার" "মার" করিয়া তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া আইসে। ইহাতে নগরের লোকের বড় আমোদ হয়। তাহারা বলিতে লাগিল, নিমাইপণ্ডিত বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছিলেন, বেশ হইয়াছে। এদিকে নিতাই, প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন যে তিনি আর প্রচার করিতে যাইবেন না। তিনি বলিলেন, "প্রভু, সাধুকে সকলেই তরাইতে পারে, তুমি জগাই মাধাইকে আগে উদ্ধার কর, তাহা হইলে তোমার প্রচারিত ধর্ম লোকে শীঘ্র গ্রহণ করিবে।" প্রভু দেখিলেন, এই দুইটি মাতালকে বশীভূত করিতে না পারিলে তাঁহার কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না।

তৃতীয় শত্রু চাঁদকাজী, গৌড়ের ও নদের অধিকারীর অর্থাৎ রাজার প্রতিনিধি, রাজা হোসেন শাহার দৌহিত্র। কিন্তু বলিতে ঘৃণা হয়, নিমাইয়ের বিপক্ষগণ হিন্দু হইয়া এই মুসলমান কাজীর নিকট নিমাই ও তাঁহার দলস্থগণের নামে নালিশ করিল। বলিল যে, ইহারা দেশের সর্বনাশ করিতেছে, যেহেতু ইহারা ভগবানকে মনে মনে না ডাকিয়া চেঁচাইয়া ডাকে ইত্যাদি। কাজীর বহুতর সৈন্য ছিল। তিনি হিন্দুতে হিন্দুতে এইরূপ বিবাদ দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইয়া কীর্তন

*শ্রীঅদ্বৈত তপস্যা করিয়া শ্রীভগবান্‌কে আনিলেন। গৌরি-নিতাই যেরূপ ঠাকুর, তিনি সেইরূপ উপাসকদিগের প্রতিনিধি। এই লীলার পুষ্টির নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈতের ন্যায় একজন তেজস্কর ব্যক্তিকে প্রভুর প্রতিদ্বন্দ্বী করার প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই নিমিত্ত যদিও তিনি এক প্রকার জানিতেন যে, শ্রীভগবান্ মনুষ্য-সমাজে আসিবেন, কিন্তু তাঁহার এই ভ্রম হয় যে, সে তিনি কে? তিনি কি আসিয়াছেন, না আসিতেছেন? যদি আসিয়া থাকেন তবে তিনি যে জগন্নাথের বেটা তাহার প্রমাণ কি? আবার ইহাও বলিতেন যে, ভগবান্ যে সত্য আসিবেন তাহার শাস্ত্র কৈ? সেই নিমিত্র বৈষ্ণবদিগের প্রধান শ্রীঅদ্বৈত পদে পদে প্রভুকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং সকল পরীক্ষাতেই প্রভু উত্তীর্ণ হয়েন। কাজেই শ্রীঅদ্বৈত তখন মহাপ্রভুর শরণাগত হইলেন। যদি অদ্বৈত প্রথমেই তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন, তবে এই কঠোর পরীক্ষা আর হইত না। তাই আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, হে সন্দিগ্ধচিত্ত পাঠক, তুমি যদি প্রভুকে পরীক্ষা করিতে চাও, তবে দেখিবে তুমি তাঁহাকে যেরূপ কঠোর পরীক্ষা করিতে, অদ্বৈত তাহা তোমার পূর্বেই করিয়াছেন।

বন্ধ করিতে লাগিলেন। যেখানে কীর্তন হয়, তিনি সেখানেই যাইয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে ও ভয় দেখাইতে লাগিলেন। বিস্তর খোল ভাঙ্গিলেন, কাহারও ঘর ভাঙ্গিলেন, কাজেই কীর্তন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। তখন এরূপ হইলে যে, কাজীকে রোধ করিতে না পারিলে আর নিমাইয়ের ধর্মপ্রচার হয় না। সুতরাং নিমাইয়ের এই জন্যে বলবান কাজীকে দমন করিতে হইয়াছিল। কিরূপে তিনি ইহা করিলেন তাহা পূর্বে বলিয়াছি।

প্রভু প্রথমে গোপনে শ্রীবাসের প্রাচীরবেষ্টিত মন্দিরে কীর্তন করিতেন। জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিতে প্রথমে বাহিরে প্রকাশ হইলেন। জগাই মাধাই এক প্রকার নদীয়ার রাজা, অথচ অত্যন্ত অত্যাচারী, তাহাদিগকে চরণতলে আনয়ন করায় প্রভুর নিজ আধিপত্য অনেকটা স্থাপিত হইল। যাহা বাকী ছিল তাহা নগরকীর্তন করিয়া ও কাজীকে উদ্ধার করিয়া পূর্ণ করিলেন। নদীয়ার লীলা সাঙ্গ হইলে, প্রভুর নদীয়ার বাহিরে দৃষ্টি পড়িল, আর তাই সন্ন্যাস লইলেন।

নদীয়ায় গোপনে আর একটি বলবৎ কার্য্য করিলেন। নদীয়ানগরে যতদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ছিলেন, সেখানে তাঁহার মুহুর্মুহুঃ শ্রীভগবান্‌-ভাব হইত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বৃন্দাবনে ছিলেন, তিনি সেইরূপ নদীয়ায় প্রেমের বস্তু ভগবান্‌-ভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন। যখন তিনি সন্ন্যাস লইলেন, তখন তিনি ভক্তির বস্তু,—প্রভু কি মহাপ্রভু হইলেন। নদীয়ায় তিনি "প্রাণনাথ", বলিয়া পূজিত হইতেছিলেন। যখন সন্ন্যাস লইয়া বাহিরে আসিলেন, তখন হইলেন, 'গুরু' 'পতিত-পাবন' 'অগতির গতি' ইত্যাদি।

শ্রীবৃন্দাবনের কথা স্মরণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে নন্দ, যশোদা, বলরাম, রাখালগণ ও গোপীগণের প্রিয় বস্তু ছিলেন। যখন তিনি মথুরায় গেলেন, তখন আর 'প্রাণনাথ' থাকিলেন না, তখন হইলেন ভক্তের শিরোমণি যে উদ্ধব ও কুব্জা তাহাদের প্রভু বা কর্তা। শ্রীপ্রভু নবদ্বীপকে নব-বৃন্দাবন করিলেন, তথায় আপনি কৃষ্ণ হইলেন, শচী ও জগন্নাথ, যশোদা ও নন্দ হইলেন, নিতাই প্রভৃতি সখা হইলেন, এবং বিষ্ণুপ্রিয়া ও নদীয়া নাগরীরা হইলেন তাঁহার প্রেয়সী। শ্রীভগবান্‌কে দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও কান্তভাবে ভজনা করা যায়। তন্মধ্যে ব্রজের ভজন (অর্থাৎ কান্তভাবে ভজন) সর্বোত্তম। এই প্রেমভজনা কৃষ্ণলীলার সাহায্যে অতি সহজে করা যায়। অতএব প্রভু গোপনে গোপনে জীবের ভজন সুলভ করার নিমিত্ত নদীয়ায় এক পৃথক নিগূঢ় লীলার সৃষ্টি করিলেন। এই ভজনের নাগর তিনি স্বয়ং, আর বিষ্ণুপ্রিয়া ও নদীয়া-নাগরীরা রাধা ও গোপী। নদীয়ার ভক্তগণ এই ভজনে একেবারে মজিয়া গেলেন, গিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ভুলিলেন। এই ভক্তগণের মধ্যে কয়েকটি পদকর্তার নাম করিতেছি; যথা—গোবিন্দ, মাধব, বাসুঘোষ, নরহরি, ত্রিলোচন, নয়নানন্দ, বলরাম, শেখর ইত্যাদি। আর একজন পূর্বে এই ভজনের বিরোধী ছিলেন, পরে অনুগত হয়েন। তিনি বৃন্দাবন দাস। সে কথা পরে বলিব। এখন এই পদকর্তাদিগের কয়েকটি পদ নিম্নে দিতেছি। পদগুলি সম্পূর্ণরূপে দিলে অনেক স্থান লইবে, সেই জন্য স্থানে স্থানে বাদ দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহাদের এইরূপ পদ দেখিতে লোভ হয়, তাঁহারা পদসংগ্রহ গ্রন্থে এইরূপ অনেক পদ দেখিতে পাইবেন। লোভের কথা বলিলাম তাহার কারণ এই যে, যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে চিত্ত দিয়াছেন, তাঁহার এই সমুদয় পদ পড়িয়া পুলকিত হইবেন সন্দেহ নাই। যথা পদ—

ধানশ্রী

"মো মেনে মনু মো মেনে মনু। কি খনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইনু।।
সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে। শচীর দুলাল দেখি আইনু বাটে।।
চাঁদ ঝলমলি বদন ছাঁদে। দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কাঁদে।।
চাঁচর কেশে ফুলের ঝুটা। যুবতী উমতি কুলের খোটা।।
তাহে তনু সুখ বসন পরে। গোবিন্দ দাস তেই সে ঝুরে।।"

উপরের পদটি পূর্বরাগের। রাধাকৃষ্ণ লীলায় পূর্বরাগের বিস্তর পদ আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে একটিও উপরের পদ অপেক্ষা ভাল পাইবেন না। আবার দেখুন এইরূপ পদ যে দুই একজন বচনা করিয়াছিলেন তাহা নয়। নদীয়ায় তখনকার কি তাহার পরের যত প্রধান পদকর্তা, সকলেই রাধাকৃষ্ণ ভজন ছাড়িয়া গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বা গৌর-নদেনাগরী ভজন আরম্ভ করিলেন। নিম্নের পদটি বলরাম দাসের,—নব্য বলরাম দাস নহেন, আসল বলরাম দাস। যথা পদ—

ধানশ্রী

"গৌর বরণ, মণি আভরণ, নাটুয়া মোহন বেশ।
দেখিতে দেখিতে, ভুবন ভুলল, ঢলিল সকল দেশ।।
মনু মনু সই দেখিয়া গোরাঠাম।
বাঁধিতে যুবতী, গঢ়ল কো বিধি, কামের উপরে কাম।। ধ্রু।।
ওরূপ দেখিয়া নদীয়া-নাগরী, পতি উপেখিয়া কাঁদে।
ভালে বলরাম, আপনা লিছিল, গোরা পদ-নখ ছাঁদে।।"

ধানশ্রী।

"আর একদিন, গৌরাঙ্গসুন্দরে, নাহিতে দেখিনু ঘাটে।
"কোটি চাঁদ জিনি, বদন সুন্দর, দেখিয়া পরাণ ফাটে।।
অঙ্গ ঢলঢল, কনক কষিল, অমল কমল আঁখি।
নয়ানের শর, ভাঙ ধনুবর, বিধয়ে কামধানুকী।।
কুটিল কুন্তল, তাহে বিন্দু জল, মেঘে মুকুতার দাম।
জলবিন্দু তল, হেমমোতি জনু, হেরিয়া মুরছে কাম।।
মোছে সব অঙ্গ, নিঙ্গাড়ি কুন্তল, অরুণ বসন পরে।
বাসুঘোষ কয়, হেন মনে লয়, রহিতে নারিবে ঘরে।।"

এইরূপ পদকর্তাদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান এই কয়েকজন, যথা—নরহরি, বাসু মাধব, গোবিন্দ ঘোষ ও লোচন। লোচনের ধামালি প্রসিদ্ধ ও উপাদেয়।

বিভাস

"সো বহুবল্লভ গোরা, জগতের মনচোরা,
তবে কেন আমায় করিতে চাই একা।
হেন ধন অন্যে দিতে, পারে বল কার চিতে,
ভাগাভাগি নাহি যায় দেখা।।
সজনি লো মনের মরম কই তোরে।
না হেরি গৌরাঙ্গ মুখ, বিদারিয়া যায় বুক,
কে চুরি করিল মনচোরে।। ধ্রু।।
লও কুল লও মান, লও শীল লও প্রাণ,
লও মোর জীবন যৌবন।
দেও মোরে গোরানিধি, যাঁহে চাহি নিরবধি,
সেই মোর সরবস ধন।।
নতু সুরধুনী নীরে, পশিয়া তেজিব প্রাণে,
প্রাণের পরাণ মোর গোরা।
বাসুদেব ঘোষে কয়, সে ধন দিবার নয়,
দণ্ডে দণ্ডে তিলে হই হারা।।"

এই পাদে বাসু বলিতেছেন, "তোমরা আমার সমুদয় লও, কিন্তু আমার সর্বস্ব-ধন, পরাণের পরাণ গৌরাঙ্গকে দাও।

বিভাস।

"করিব মুই কি করিব কি?
গোপত গৌরাঙ্গের প্রেমে ঠেকিয়াছি। ধ্রু।।
দীঘল দীঘল চাঁচর কেশ রসাল দুটি আঁখি।
রূপে গুণে প্রেমে তনু মাখা জনু দেখি।।
আচম্বিতে আসিয়া ধরিল মোর বুক।
স্বপনে দেখিনু আমি গোরাচাঁদের মুখ।।
বাপের কুলের মুই ঝিয়ারী।
শ্বশুর কুলের মুঞি কুলের বৌহারি।।
পতিব্রতা মুঞি সে আছিনু পতির কোলে।
সকল ভাসিয়া গেল গোরাপ্রেমের জলে।।
কহে নয়নানন্দ বুঝিলাম ইহা।
কোন পরকারে এখন নিবারিব হিয়া।।"

সুহই?

"সই, দেখিয়া গৌরাঙ্গচাঁদে।
হইনু পাগলি, আকুলি ব্যাকুলি, পড়িনু পীরিতি ফাঁদে।।
সই, গৌর যদি হৈত পাখী।
করিয়া যতন, করিতু পালন, হিয়া পিঞ্জিরায় রাখি।।
সই, গৌর যদি হৈত ফুল।
পরিতাম তবে, খোপার উপরে, দুলিত কাণেতে দুল।।
সই, গৌর যদি হৈত মোতি।।
হার যে করিতু, গলায় পরিতু, শোভা যে হইত অতি।।
সই, গৌর যদি হৈত কাল।
অঞ্জন করিয়া, রঞ্জিতাম আঁখি, শোভা যে হইত ভাল।।
সই, গৌর যদি হৈত মধু।
জ্ঞানদাস কহে, আস্বাদ করিয়া, মজিত কুলের বধূ।।"

কিন্তু হে গৌরগত-প্রাণ জ্ঞানদাস। গৌর পাখী কি ফুল না হইয়া যাহা আছেন, তাই কি ভাল না?

কামোদ

"সখি গৌরাঙ্গ গড়িল কে?
সুরধুনী তীরে, নদীয়া নগরে, উয়ল রসের দে।।"
পীরিতি পরশ, অঙ্গের ঠাম, ললিত লাবণ্যকলা।
নদীয়ানাগরী, করিতে পাগলী, না জানি কোথা না ছিলা।।
সোনার বাঁধল, মণির পদক, উর ঝলমল করে।
ও চাঁদমুখের, মাধুরী হেরিতে, তরুণী হিয়া না ধরে।।
যৌবন তরঙ্গ, রূপের বাণ, পড়িয়া অঙ্গ যে ভাসে।
শেখরের পঁহু, বৈভব কো কুহুঁ, ভুবন ভরল যশে।।"

উপরে কেবল দুই একটি পূর্বরাগের পদ উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু মহাজনগণ গৌরাঙ্গকে

নাগর করিয়া মাথুর প্রভৃতি সকল রসের পদ করিয়াছিলেন। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ গোটা কয়েক মাথুরের পদ দেওয়া গেল, যথা—

করুণ।

"গেল গৌর না গেল বলিয়া।
হাম অভাগিনী নারী অকূলে ভাসাইয়া।। ধ্রু।।
হায় রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর।
জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর;
হায় রে দারুণ বিধি কি বাদ সাধিলি।
প্রাণের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়া দিলি।।
আব কে বহিবে মোর যৌবনের ভার।
বিরহ অনলে পুড়ি হব ছারখার।।
বাসুঘোষ কহে আর কারে দুঃখ কব।
গোরাচাঁদ বিনা প্রাণ আর না রাখিব।।"

ভূপালী।

"হেদে রে পরাণ নিলাজিয়া। এখন না গেলি তনু তেজিয়া"।।
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর। আর কি গৌরব আছে তোর।।
আর কি গৌরাঙ্গচাঁদে পাবে। মিছে প্রেম-আশ-আশে রবে।।
সন্ন্যাসী হইয়া পঁহু গেল। এ জনমের সুখ ফুরাইল।।
কাঁদি বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বাণী। বাসু কহে না রহে পরাণি।।"

পাহিড়া।

"অবলা সে বিষ্ণুপ্রিয়া, তুয়া গুণ সোঙরিয়া,
মুরছি পড়ল ক্ষিতিতলে।
চৌদিকে সখীগণ, ঘিরি করে রোদন,
তুলা ধরি নাসার উপরে।।
তুয়া বিরহানলে, অন্তর জর জর,
দেহ ছাড়া হইল পরাণি।
নদীয়ানিবাসী যত, তারা ভেলমূরছিত,
না দেখিয়া তুয়া মুখখানি।।
শচী বৃদ্ধা আধমরা, দেহ তার প্রাণছাড়া,
তার প্রতি নাহি তোর দয়া।
নদীয়ার সঙ্গীগণ, কেমনে ধরিবে প্রাণ,
কেমনে ছাড়িলা তার মায়া।।
যত সহচর তোর, সবাই বিরহে ভোর,
শ্বাস বহে দরশন আশে।
এ দেহে রসিকবর, চলে হে নদীয়াপুর,
কহে দীন এ মাধব ঘোষে।।"

শ্রীরাগ

"গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া। প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া।।
তোমার পুরব যত চরিত পীরিত। সোঙরি এবে ভেল মুরছিত।।

হেন নদীয়াপুর সে সব সঙ্গিয়া ধূলায় পড়িয়া কান্দে তোমা না দেখিয়া।।
কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি। তিলেক বিলম্বে আমি আগে যাই মরি।।"

এইরূপ মান খণ্ডিতা প্রভৃতি অনেক রসের পদ আছে। নীচের পদটিতে প্রভুকে ধৃষ্ট-নাগর সাজান হইয়াছে।

"অলসে অরুণ আঁখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি
রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে।"
"নদীয়া-নাগরী সনে, রসিক হৈয়াছ বটে,
আর কি পার ছাড়িবারে।
সুরধুনী তীরে গিয়া, মার্জনা করহে হিয়া,
তবে সে আসিতে দিব ঘরে।।"

এ পদটি বৃন্দাবন দাসের। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "কি গো ঠাকুর, তোমার চক্ষু ঢুলু ঢুলু ও অরুণ বর্ণের কেন? বুঝেছি, নদীয়া-নাগরীর সহিত মজিয়াছ, কিন্তু আমাকে ছুঁইও না।" ইত্যাদি। এই বৃন্দাবন দাস তাঁহার গ্রন্থে পূর্বে লিখিয়াছেন যে, এ অবতারে "শ্রীগৌরাঙ্গ নাগর" বলিয়া আর কেহ ভজনা করিবে না। কিন্তু পরে আপনি স্রোতে পড়িয়া গেলেন, যাইয়া তাহাই করিতে লাগিলেন। তাহার প্রমাণ উপরের পদ।

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ানগরে ভগবানরূপে মুহুর্মুহুঃ প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, তখন নদেবাসী ভক্তগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে একেবারে না ভুলিলেও তাঁহাদিগকে আর ভজনের নিমিত্ত প্রয়োজন বোধ করিলেন না। শ্রীবাস বলিলেন, "আমাদের গৌরাঙ্গরূপই ভাল।" শ্রীধর প্রার্থনা করিলেন "প্রভু, তুমি গৌররূপে আমার হৃদয়ে থাক।" শিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামরায়-বিগ্রহ স্থাপন করায়, তিনি পুত্রকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "এত কষ্ট করিয়া আমরা কালকে গৌর করিলাম, তুমি আবার গৌরকে কাল করিলে?"

ইহার মধ্যে একটি বড় রহস্য আছে। যখন পণ্ডিত মহাশয়গণ আপত্তি তুলিলেন যে, কলিকালে অবতার নাই, তখন ভক্তগণ শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, আছে ও তাঁহার বর্ণ সোণার ন্যায়। অতএব কলির কৃষ্ণ হইতেছেন গৌর। তাহা যদি হইল, তখন ভক্তগণ বলিতে লাগিলেন, "দ্বাপরের কৃষ্ণ কাল ছিলেন, আর সে যুগের লোকেরা কৃষ্ণকে ভজন করিয়া আসিয়াছেন। আমরা কলির লোক, আমাদের দ্বাপরের ঠাকুরকে ভজনা না করিয়া কলির যে সোণার ঠাকুর গৌর, তাঁহাকে ভজনা করাই উচিত ও প্রসিদ্ধ।"

অনেকে এ কথাও তুলিলেন, "যেমন কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় যাইয়া সেখানে নারায়ণ মাত্র হইলেন, সেইরূপ গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইয়া যেই কৃষ্ণচৈতন্য হইলেন, সেই নারায়ণ অর্থাৎ গুরু হইলেন, আমাদের কান্ত আর রহিলেন না, আমাদের কান্ত নদের নিমাই।"

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপীদিগের সহিত লীলা করিয়া বহিরঙ্গ লোকের চক্ষে অসুর দমন করিতে মথুরায় গমন করিলেন, সেইরূপ নদেবাসী, যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে কান্তভাবে ভজনা করেন, তাহারা বলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়া নগরে নদীয়ানাগরীর সহিত বিলাস করিয়া, বহিরঙ্গ লোকের চক্ষে সন্ন্যাসী হইয়া, নদের বাহিরে পাষণ্ড দলন করিতে গমন করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবন ত্যাগ করেন নাই। তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া এক পদও গমন করেন নাই, বৃন্দাবনে গোপন ভাবে রহিলেন। সেইরূপ গৌরাঙ্গ নদীয়া ত্যাগ করিলেন না, গোপন ভাবে সেখানে রহিলেন। যথা বৃন্দাবন দাসের পদ—"অদ্যাপি সেই লীলা করে গোরারায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।।"

এ ভাগ্যবান কাহারা? ইহারা নদীয়ানাগরী। এই নদায়ানাগরী কি ভদ্রলোকের স্ত্রী ও কন্যা গৌরাঙ্গের সহিত কুলটা হইয়াছিলেন?—না, তাহা নয়। নদীয়ানাগরী তাঁহারা, যাঁহারা

গৌরাঙ্গকে নাগরভাবে অর্থাৎ কান্তভাবে ভজনা করেন। এই নদীয়ানাগরীদের নাম শুনিবেন? একজন নরহরি, একজন বাসুঘোষ, একজন ত্রিলোচন ইত্যাদি।

কান্তভাবে ভজনা কি? কান্ত মানে স্বামী, স্বামীর নিকট তাহার স্ত্রী কি প্রার্থনা করেন? ভালবাসা। শ্রীভগবান্‌কে যদি ভালবাসিতে চাও, তবে তাঁহাকে "কান্ত" বলিয়া, কি "প্রাণনাথ" বলিয়া বোধ করিও। কিন্তু যদি তোমার অন্য প্রার্থনা থাকে, যথা—ভবনদী পার হওয়া, কি পাপ মার্জনা, তবে তাঁহাকে "প্রভু" বলিয়া ভজনা করিতে হইবে। অতএব এইরূপ যে সব নাগরী তাঁহাদের গৌরাঙ্গের নিকট কেবল এই প্রার্থনা যে, তাঁহার সহিত তাঁহাদের প্রীতি হয়। অতএব তাঁহাদের যোগ্য প্রার্থনা এই, "হে নাথ, হে প্রাণ, আমি তোমার বিরহে যন্ত্রণা পাইতেছি। আমার হৃদয়ে এসো, প্রাণ ভরিয়া তোমার চন্দ্রবদন হেরি।"

অতএব গৌরাঙ্গ অবতার যদি নদীয়ায় সমাপ্ত হইত, তবুও যে জন্য প্রভু আসিয়াছিলেন তাহা রাখিয়া যাইতে পারিতেন। জীবকে এই কয়েকটি বিষয় জানাইবার নিমিত্ত তাঁহার অবতার। যথা—(১) শ্রীভগবান্ কিরূপ বস্তু, (২) তাঁহাকে কিরূপে পাওয়া যায়; (৩) প্রেম কি ও কিরূপে উহা আহরণ করা যায়। শ্রীনবদ্বীপে এ সমুদয় প্রচুররূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং তিনি যদি নদীয়ায় লীলা সমাপ্ত করিতেন তাহা হইলেও জগতে প্রেমধর্ম থাকিয়া যাইত।

যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলেন, তখন এতদিন তিনি রাধার বিরহে অস্থির হইয়া সেখানে থাকিতে না পারিয়া, প্রিয়াকে দর্শন দিতে বৃন্দাবনে আসিলেন। আসিবার সময় রাজবেশে আসিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীমতী ঘোমটা দিলেন। তিনি বলিলেন, ইনি অতি ঐশ্বর্য্যশালী রাজা, ইহাকে আমি ভজনা করি নাই। আমি যাঁহাকে ভজনা করিয়াছি তিনি আমারি মত মাধুর্য্যময়, ঐশ্বর্য্য বিবর্জিত। গৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র লইলেন। প্রভু সন্ন্যাস লইলে পুরী গোসাঞি আর তাঁহাকে দেখিলেন না। বলিলেন, আমার সেই প্রিয়তম বস্তু গৌরাঙ্গ,—তিনি নাগর। তাঁহার সন্ন্যাসী-রূপ আমি দেখিব না। ঐরূপ পুরুষোত্তম আচার্য্য, প্রভুর অতি মর্মীভক্ত। প্রভু সন্ন্যাসী হইলে, তিনি রাগ করিয়া কাশীতে গমন করিয়া সন্ন্যাস লইলেন, নাম পাইলেন স্বরূপ,—সেই স্বরূপ, যিনি গম্ভীরার সাক্ষী। তিনি প্রভুর সন্ন্যাস-মূর্তি দেখিতে চান নাই বলিয়া প্রভুকে ত্যাগ করেন। কিন্তু পরে আর থাকিতে পারিলেন না, ফিরিয়া আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। রাধাকৃষ্ণবাদীরা তখন আর এক কথা উঠাইলেন। তাহারা বলিতে লাগিলেন যে, পরকীয়া ভজন সর্বাপেক্ষা উচ্চ, কিন্তু তাহা গৌর-লীলায় নাই। গৌরবাদিরা উত্তর দিলেন, অবশ্য আছে, যেহেতু প্রভু সন্ন্যাস লইলে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তখন পরকীয়া হইলেন।

এইরূপে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন ক্রমে চলিতে লাগিল। নরোত্তম ঠাকুর গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ স্থাপন করিলেন এবং বক্রেশ্বর নিমানন্দ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের প্রতাপে সে ভজন ক্রমে উঠিয়া গেল। ভজন ত গেল; এমন কি; স্বয়ং গৌরাঙ্গ পর্যন্ত যাইবার উপক্রম হইয়াছিলেন।

কিন্তু আবার সেই ভজন প্রচলিত হইতেছে। সে বড় আশ্চর্য্য কথা। মনে ভাবুন এ সন্দেহের যুগ। এ সন্দেহ ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে আসিয়া এ দেশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন, কি রাধাকৃষ্ণ ভজন, ত পাছের কথা, ভজন পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছিল। অনেকে নাস্তিক হইয়া রহিলেন। যাহাদের এতদূর পতন হয় নাই, তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে একটা কল্পনার বস্তু বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ বলিয়া যে কেহ ছিলেন তাহার প্রমাণ কি? সুতরাং রাধাকৃষ্ণ লীলারও কোন প্রমাণ নাই। এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা,—যাহা গুপ্ত ছিল,—জগতে প্রকাশ হইল। যিনি গৌর-লীলা পাঠ করেন, তিনি প্রভুর পক্ষপাতী হয়েন। পরে অনেকে তাঁহার লীলা পড়িয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বেরও কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু

শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাখেলার প্রচুর প্রমাণ আছে। তাহাতে জানা যায় যে, তিনি স্বয়ং ভগবান্। আর তিনি যখন বলিতেছেন, "শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন কর", তখন সেই যথেষ্ট প্রমাণ যে, সে ভজন শ্রীভগবানের অনুমোদনীয়। তাঁহারা তাই রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ উভয় ভজনই করিতে লাগিলেন।

কিন্তু আর একদল বলিতে লাগিলেন যে, রাধাকৃষ্ণ ভজনের আর প্রয়োজন কি? তাঁহারা নরহরি ও বাসুর পথ ধরিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভজন ত আমাদের সম্মুখে। রাধাকৃষ্ণ অনেক দিনের কথা, কিন্তু গৌরলীলা যে আমরা এক প্রকার চক্ষে দেখিতেছি। অতএব গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন যেরূপ আমাদের জীবন্ত সামগ্রী হইবে, রাধাকৃষ্ণ ভজন কখনও সেরূপ হইবে না।

তাই এখন গৌরবাদীর দলের বড় প্রতাপ। ইহারাই এখন প্রকৃত পক্ষে প্রভুর ধর্ম্মের প্রতিনিধি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে শ্রীভাগবতভূষণ, জিয়ড় নৃসিংহ ও চৈতন্যদাস বাবাজী গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন পুনর্জীবিত করেন। এই তিনজনে প্রথমে গৌর-নিতাইকে দাস্য-ভাবে ভজনা আরম্ভ করিলেন। পরে জিয়ড় নৃসিংহ ও সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী শ্রীগৌরাঙ্গকে কান্তভাবে ভজন করিতে লাগিলেন। ভাগবতভূষণ ইহাতে যোগ দিতে পারিলেন না। তিনি তখন শ্রীনিত্যানন্দের পথ অবলম্বন করিয়া প্রচার করিতেছিলেন,—দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, দলবল লইয়া "ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ"গাহিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি তাঁহার দুই প্রিয় বন্ধুকে বলিলেন যে, যাঁহারা নির্জনে ভজনা করেন, তাঁহারা মনের সাধ মিটাইয়া প্রভুকে আস্বাদ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি প্রচারক, বহিরঙ্গ লোক লইয়া তাঁহার ইষ্টগোষ্ঠী, তাঁহার অতি নিগূঢ় ভজনা প্রচার করিলে বিষম অনিষ্ট হইবে। ভাগবতভূষণের এই কথা আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। তাঁহার দেহ রাখিবার কিছুদিন পূর্বে তিনি পার্ষদগণকে বলিলেন, "আর কেন, যে কয়েক দিন বা কয়েক মুহূর্ত বাঁচিব, এখন গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন করিব" ও তাহাই করিতে লাগিলেন।

এই তিন মহাত্মার বিবরণ আমরা তাঁহাদের পার্ষদ শ্রীল লক্ষ্মণচন্দ্র রায়ের নিকট শ্রবণ করি। শ্রীভাগবতভূষণের শ্রীগৌরাঙ্গে এতদূর বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি বলিতেন যে, গৌরমন্ত্র না হইলে কোন ভক্তের মন সিদ্ধ হইবে না। তাহাই বলিয়া যিনি কৃষ্ণমন্ত্র লইয়াছেন, তাঁহাকেও তিনি আবার গৌরমন্ত্র দিতেন।

ভাগবতভূষণের এক রহস্যজনক কীর্তি আমরা শ্রীলক্ষ্মণ রায় মহাশয়ের মুখে শ্রবণ করি। তাঁহারা প্রচার কার্য্যের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে করিতে এক সময় পদ্মার ধারে এক সাহু জমিদারের বাড়ীতে— তাহাকে বৈষ্ণব জানিয়া—অতিথি হইলেন। জমিদারের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, তাঁহার ভয়ে সকলে কম্পিত-কলেবর হইতেন। বাবুটি ভাগবতভূষণকে প্রণাম করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ভাগবতভূষণ বসিয়া দেখিলেন একখানা খাঁড়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া জমিদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বৈষ্ণবের বাড়ী খাঁড়া কেন? তাহাতে জমিদার একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আমাদের গোঁড়ামি নাই। আমরা বৈষ্ণব বটে, কিন্তু দুর্গোৎসবও করি, বলিদানও করি। আপনি কি জানেন না যে, যে দুর্গা, সেই কৃষ্ণ?"

ভাগবতভূষণ অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "বেটা পাষণ্ড অস্পৃশ্য পামর! আবার দেখি রসিকতাও আছে। বের হ আমার এখান হইতে,—বের হ, বের হ।" অতি ক্রোধের সহিত ইহা বলিতে বলিতে ভাগবতভূষণের মনে পড়িল যে, সে বাড়ী ঐ জমিদারের, আর সে যত অপরাধীই হউক, তাহার নিজ বাড়ী হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিবার অধিকার কাহারও নাই। তখন ঠাকুর উঠিয়া দলবল লইয়া গ্রামের অন্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

জমিদার অন্য লোককেই ধমকাইয়া থাকেন, নিজে কখনও ধমকানি খান নাই,—বিশেষতঃ নিজের বাড়ীতে এবং একজন অতিথি দ্বারা। সুতরাং তিনি একেবারে মরমে মরিয়া গেলেন।

একটু পরে গ্রামের মধ্যে ভাগবতভূষণ যেখানে ছিলেন সেখানে যাইয়া জমিদার তাঁহার চরণে পড়িয়া ক্ষমা মাগিলেন, আর অতি দীনতার সহিত তাঁহাকে গৃহে আনিবার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। ভাগবতভূষণ বলিলেন, "তাই হবে, তবে তোমার এক কার্য্য করিতে হইবে। কল্য প্রাতে এক শত ঢাক আনাইবা, আর তুমি খাঁড়াখানি মস্তকে করিয়া সেই ঢাকের বাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে পদ্মায় যাইবা, যাইয়া মধ্য-নদীতে উহা নিক্ষেপ করিবা। ইহা যদি কর, তবে আমি তোমার বাড়ী পুনরায় যাইব।" জমিদার তাই স্বীকার করিলেন, আর সেই অবধি জমিদার বাবুটি পরম ভক্ত হইলেন।

প্রথম প্রচারক নিত্যানন্দ। তাঁহার প্রচার-পদ্ধতি অতি সুন্দর। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, "ভাই তোমাদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব 'ভজ গৌরাঙ্গ ইত্যাদি।' ইহার রহস্য পরে বলিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভুর লীলার উদ্দেশ্য

সন্ন্যাস করিয়া নিমাই, শান্তিপুরে রহে যাই,
মিলিতে জননী ভক্তগণে।
নদেবাসীগণ ধায়, আগে করি শচীমায়,
শান্তিপুরে মিলে গৌরসনে।।
নিশিতে করে কীর্তন, সঙ্গে নাচে ভক্তগণ,
পিড়ায় বসি শচী হেরে দুঃখে।
শচীর দেখিয়া দুঃখ, মুরারির ফাটে বুক,
কীর্তন ছাড়ি শচী কাছে থাকে।।
শচী বলে শুন গুপ্ত, যাও কর গিয়া নৃত্য,
এ সুখ ছাড়িবে কেন তুমি।
গৃহ ছাড়ি যায় নিমাই, তুমি নৃত্যে কর যাই,
তাঁর মাতা কান্দি বসি আমি।।
যুবা পুত্র দণ্ডধারী, কালি যাবে দেশ ছাড়ি,
মোর পুত্রে তোমরা বাস ভাল।
কালি দেশ ছাড়ি যাবে, বৃক্ষতলে পড়ে রবে,
এল তোদের নাচিবার কাল।।
নিমাই তাদের প্রাণের প্রাণ, বলে থাকে ভক্তগণ,
চোখে দেখি যত ভালবাসা।
নিমাই যায় গৃহ ছাড়ি তারা নাচে ধিং ধিং করি,
আমি ভাবি বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা।।
দেখ না চাহি মুরারি, নাচে কত ভঙ্গি করি,
কেহ বা দিতেছে হুহুঙ্কার।
আনন্দের ত সীমা নাই, সন্ন্যাসী হয়েছে নিমাই,
তোদের ভালবাসায় নমস্কার।।
জিজ্ঞাস ওদের কাছে, কি সুখেতে ওরা নাচে,
একে আমি মরি নিজ দুঃখে।

দুই বাহু তুলে নাচে, পায়েতে নূপুর বাজে,
নৃত্য যেন শেল হানে বুকে।।
ইহা বলি শচীমাতা, উচ্চৈস্বরে কহে কথা,
বলে "তোরা কীর্তনে দে ভঙ্গ।
সকলে মিলে জুটিয়া, মোর খ্যাপা ছেলে নিয়া,
তোদের লাগিয়াছে বড় রঙ্গ।।"
ক্রোধে শচী যেতে চায়, মুরারি ধরিল তাঁয়।
তবে শচী নাম ধরে ডাকে।
"শুন নিতাই অদ্বৈত, শ্রীবাস আর যত ভক্ত
রাখ কীর্তন মাগি এই ভিক্ষে।।
পুনঃ পুনঃ খায় আছাড়, ভাঙ্গিল বাছার হাড়,
কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
বাছারে ছাড়িয়া দাও, তোমরা নাচ আর গাও,
রাত্রি গেল দাও ঘুমাইতে।।"
বলরাম বলে মাতা, তোমার স্বতন্ত্র কথা,
নিমাই তোমার চিরদিনের ছেলে।
ভক্তগণ বাসে ভাল, ঐশ্বর্য্য তাহে মিশাল,
তোমার প্রেম কাহাতে কি মিলে।।"

প্রভুর যখন জগতের সমস্ত কার্য্য শেষ হইল, তখন তিনি গম্ভীরায় প্রবেশ করিলেন। জ্ঞানাভিমানী মূঢ় পণ্ডিতগণ প্রভুকে কিরূপ দেখিত, না—অবশ্য একজন ভক্ত দিবানিশি প্রেমে উন্মত্ত, কিন্তু তাঁহাতে যে কোন বিবেচনা কি বিচারশক্তি আছে, ইহা তাহারা বিশ্বাস করিত না। কিন্তু প্রভু যদিও প্রেমে মাতোয়ারা, যদিও তিনি ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন, যদিও তাঁহার বাক্য প্রলাপপূর্ণ, তবু তাঁহার অন্তরে সম্পূর্ণ চেতনা থাকিত। তাহার কত প্রমাণ দেখ।

প্রভু কাজি দমন করিবেন বলিয়া, নগর-কীর্তনে বাহির হইলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া সকলে আনন্দে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। প্রভু আনন্দে বিহ্বল, কিন্তু তবু কাজির বাড়ীর দিকে যাইতেছেন, এবং যেই কাজীর বাটীর নিকট আসিলেন, অমনি সেই পথ ধরিলেন। তখন দেখা গেল যে, তিনি কি জন্য আসিয়াছেন, তাঁহার কি করিতে হইবে, তাহা সমস্তই তাঁহার হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে, তাহা এক মুহূর্তেরও জন্য ভুলেন নাই।

প্রভু কেন মনুষ্যসমাজে আসিলেন, মহান্তগণ তাহার নিগূঢ় কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ভগবানের নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধানে আমাদের প্রয়োজন নাই। অবতার হইয়া প্রভু জীবের নিমিত্ত কি করিলেন তাহাই আমাদের সমালোচ্য। তাঁহার অবতারের এক কারণ, শ্রীভগবান্ কি প্রকৃতির, জীবকে তাহার পরিচয় করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয় কারণ, জীবকে শিক্ষা দেওয়া কিরূপে ভজন সাধন করিতে হয়। তৃতীয় কারণ, প্রেমধর্ম—যাহা পূর্বে জগতে ছিল না—তাহার প্রচার করা। আর জীবকে সর্বোচ্চ শিক্ষা অর্থাৎ রাধার প্রেম কি, তাহাই দেখান তাঁহার শেষ কার্য্য।

আর সেই নিমিত্ত তিনি গম্ভীরায় প্রবেশ করিয়া আপনি আচরিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, দিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন। যখন সন্ন্যাস করিতে গৃহের বাহির হইলেন, তখন এইরূপ দেখাইলেন যে, কেবল বৃন্দাবন গমন করিবেন বলিয়াই ঐ আশ্রয় গ্রহণ করেন। যথা, চৈতন্য-মঙ্গলে—"নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি। দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবন ভূমি।।"

আবার যখন ভক্তগণকে বলিলেন—
"কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন। যখন সন্ন্যাস লইলাম ছন্ন হইল মন।।"

তখন স্পষ্টাক্ষরে দেখাইলেন যে, তিনি সন্ন্যাস লইয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু বৃন্দাবন দর্শন একটি উপলক্ষ মাত্র। তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার ভিতরে একটি মহৎ কারণ ছিল; সেটি এই যে,--কঠিন জীবের হৃদয় কোমল করা। তিনি কাঙ্গাল না হইলে, জীবে আর হরিনাম লইবে না, এইজন্য কাঙ্গাল হইলেন। কিন্তু একথা একবারও মুখে আনেন নাই, মনের কথা মনেই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ভক্তগণ তাহা জানিতে পারিলেন, যথা বৃন্দাবন দাসের পদ—

"শুষ্ক হিয়া জীবের দেখিয়া গৌরহরি। আচণ্ডালে দিলা নাম বিতরি বিতরি।।
অফুরন্ত নাম প্রেম ক্রমে বাড়ি যায়। কলসে কলসে ছেঁচে তবু না ফুরায়।।
নামে-প্রেমে তরি গেল যত জীব ছিল। পড়ুয়া নাস্তিক আদি পড়িয়া রহিল।।
শাস্ত্র মদে মত্ত হৈয়া নাম না লইল। অবতার-সার তারা স্বীকার না কৈল।।
দেখিয়া দয়াল প্রভু করেন ক্রন্দন। তাদের তরাইতে তাঁর হইল মনন।।
সেই হেতু গোরাচাঁদ লইলা সন্ন্যাস। মরমে মরিয়া রোয়ে বৃন্দাবন দাস।।"

প্রভু কৃষ্ণ-বিরহে জর-জর, বৃন্দাবন দেখিতে যাইবেন ইহা বলিয়া তিনি গৃহত্যাগ করিলেন, করিয়া সন্ন্যাস লইলেন। ইহাতে তাঁহার দুটি কার্য্য সুসিদ্ধ হইল। যখন বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া ছুটিলেন তখন দেখাইলেন,—কৃষ্ণের নিমিত্ত কিরূপ ব্যাকুল হইতে হয়, কি বৃন্দাবনে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া যাইতে হয়। আবার সন্ন্যাস লইলেন ধর্ম্ম-প্রচারের সুবিধা হইবে বলিয়া। হৃদয়ের অভ্যন্তরের ইচ্ছা ছিল যে, জীবকে কাঁদাইয়া তাহাদের হৃদয় তরল করিবেন, আর তখন তাহারা হরিনাম লইতে আপত্তি করিবে না। পূর্বে এ-কথা কেহ জানিতে পারে নাই, কিন্তু যেই প্রভু সন্ন্যাস লইলেন, অমনি, চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনের রব উঠিল, আর কঠিন লোকের হৃদয় তরল হইল। তখন সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য সকলে বুঝিল। যথা, বৃন্দাবন দাসের আর একটি পদ—

নিন্দুক পাষণ্ডীগণ প্রেমে না মজিল। অযাচিত হরিনাম গ্রহণ না কৈল।।
না ডুবিল শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের বাদলে। তাদের জীবন যায় দেখিয়া বিফলে।।
তাদের উদ্ধার হেতু প্রভুর সন্ন্যাস। ছাড়িলা যুবতী ভার্য্যা সুখের গৃহবাস।।
বৃদ্ধ জননীর বুকে শোক-শেল দিয়া। পরিলা কৌপিন-ডোরে শিখা মুড়াইয়া।।
সর্বজীবে সম দয়া দয়াল ঠাকুর। বঞ্চিত দাস বৃন্দাবন বৈষ্ণব-কুকুর।।

হায়! হায়! কি দয়া! এরূপ দয়া অননুভবনীয়! ইঁহার আর একটি পদ শুনুন—

কান্দয়ে নিন্দুক সব করি হায় হায়। আবার নদীয়া এলে ধরিব তাঁর পায়।।
না জানি মহিমা গুণ বলিয়াছি কত। লাগাল পাইলে এবার হব অনুগত।।
দেশে দেশে কত জীব তরাইলা শুনি। চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি।।
না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন। এইবার পাইলে তাঁর লইবে শরণ।।
গৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পরিষদগণ। তাঁরা সব শুনিয়াছি পতিতপাবন।।
নিন্দুক পাষণ্ডী যত দেখিল প্রকাশ। কান্দিয়া আকুল ভেল বৃন্দাবন দাস।।

আবার--

নিন্দুক পাষণ্ডী আর নাস্তিক দুর্জ্জন। মদে মত্ত অধ্যাপক পড়ুয়ার গণ।।
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি কান্দিয়া বিকলে। হায় হায় কি করিনু আমরা সকলে।।
লইয়া হরির নাম জীব শত শত। কেবল মোদের হিয়া পাষাণের মত।।
যদি মোরা নাম-প্রেম করিতু গ্রহণ। না করিতে গৌরহরি শিখার মুণ্ডন।।
হায় কেন হেন বুদ্ধি হৈল মো সবার। পতিত-পাবনে কেন কৈল অস্বীকার।।
এইবার যদি গোরা নবদ্বীপে আসে। চরণে ধরিব কহে বৃন্দাবন দাসে।।

প্রকৃতই যখন সন্ন্যাস লইয়া প্রভু রাঢ়দেশে চারিদিন ভ্রমণ করিয়া নিতাই কর্তৃক শান্তিপুর আনীত হইলেন, তখন নদীয়া মনুষ্যশূন্য হইল। যথা মুরারির পদ—

চলিল নদের লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে। আগে শচী আর সবে চলিল পশ্চাতে।।
হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ সবাকার মুখে। নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে দুঃখে।।
গৌরাঙ্গ বিহনে ছিল, জিয়ন্তে মরিয়া। নিতাই বচনে যেন উঠিল বাঁচিয়া।।
দেখিতে গৌরাঙ্গ মুখ মনে অভিলাষ। শান্তিপুরে ধায় সবে হয়ে উর্দ্ধশ্বাস।।
হইল পুরুষশূন্য নদীয়ানগরী। সবাকার পাছে চলে দুঃখিয়া মুরারি।।

অতএব পদকর্ত্তা মুরারি এই সঙ্গে ছিলেন। সন্ন্যাস লওয়া অবধি প্রভু ঘোর অচেতন ছিলেন। পাঁচদিনের দিন শান্তিপুর আসিয়া তাঁহার সহজ জ্ঞান হইল। তখন যেন জানিতে পারিলেন যে, তিনি মনের আবেগে সন্ন্যাসী হইয়াছেন, হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন। জননীর মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। জননী কেন, সকলই যেন মরিয়া গিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধ-মাতা, যুবতী-ভার্য্যা ও সংসারের সমুদয় সুখ ত্যাগ করিয়া, দুঃখের বোঝা ঘাড়ে করিয়া, ঘরের বাহির হইয়াছেন। তাঁহাকে ভক্তগণ সান্ত্বনা করিবেন, তাহাই উচিত। কিন্তু তাহা হইল না, তিনিই ভক্তগণকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কাহাকে আলিঙ্গনে, কাহাকে চুম্বনে কাহাকে কাহাকে মধুর বাক্যে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা সংকল্প করিলেন, প্রভুকে ছাড়িবেন না। তাঁহারা না সকলে এক দিকে? তাঁহার মা না তাঁহাদের সহায়? যেমন শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাইবার সময় গোপীরা তাঁহাকে আগুলিয়া কান্দিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রভু শান্তিপুর ত্যাগ করিবার উদ্‌যোগ করিলে, সমস্ত লোক তাঁহার পথ আগুলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভুকে তাঁহার সংকল্প হইতে বিরত করে ইহা মনুষ্যের সাধ্য নয়; তিনি অবিচলিত চিত্তে চলিলেন। কিন্তু অদ্বৈত যখন বড় অধীর হইলেন, তখন প্রভু একটু ফাঁপরে পড়িলেন। কারণ তিনি পুরী, ভারতী ও অদ্বৈত এই তিনজনকে পিতার ন্যায় সন্মান করিতেন। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত অধীর হইলে, প্রভু গুপ্তকথা ব্যক্ত করিলেন। যথা—

অদ্বৈত-বিলাপে প্রভু হইলা বিকল। শ্রাবণের ধারা সম চক্ষে ঝরে জল।।
কহেন "অদ্বৈতাচার্য্য এত কেন ভ্রম। তুমি স্থির করিয়াছ মোর লীলাক্রম।।
নীলাচলে নাহি গেলে পন্ড হবে লীলা। বিফল হইবে সব তুমি যা চাহিলা।।
কিরূপেতে হরিনাম হইবে প্রচার। কিরূপে ভুবনের লোক পাইবে নিস্তার।।
প্রকৃত-লোকের ন্যায় শোক কেন কর। সঙ্গে সদা আছি আমি এ বিশ্বাস কর।।"
প্রভু-বাক্যে অদ্বৈত পাইলা পরিতোষ। জয় গৌরাঙ্গের জয় কহে বাসুঘোষ।।

বাসুঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাহা তাঁহার অন্যান্য পদে জানা যায়। অতএব প্রভু অদ্বৈতকে কি বলিয়া নিরস্ত করিলেন বুঝা যায়। বলিলেন, "তুমি বিষয়ী লোকের মত শোক করিতেছ কেন? জীব কি উদ্ধার হইবে না? তুমি কি এই অবতারটা বিফল করিবে? নীলাচলে না গেলে আমার সব কার্য্য নষ্ট হইবে। তুমি ত নিজেই এ খেলা পাতাইয়াছ, আবার তুমিই বাধা দিতেছ? আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাই।" পূর্বে বলিয়াছি, প্রভু সহজ অবস্থায় কখনও স্বীকার করিতেন না যে, তিনি অবতার। আবার ইহাও বলিয়াছি যে, যখন নিজ-জনের সঙ্গে থাকিতেন, তখন কখন কখন স্পষ্ট করিয়া আপনার প্রকৃত পরিচয় দিতেন; যেমন উপরে ভক্তগণ সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈতকে বলিলেন,—নীলাচলে না গেলে তিনি যে জন্য আসিয়াছেন তাহা সফল হইবে না; আর অদ্বৈত তখন সব কথা স্মরণ করিয়া শান্ত হইলেন। বহিরঙ্গ লোকের নিকট প্রভু বলিয়াছেন— "কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন। যখন সন্ন্যাস লইনু ছন্ন হলো মন।।" কিন্তু নিজ-জনের নিকট বলিতেছেন, সন্ন্যাস করার সময় তাঁহার মতিচ্ছন্ন হয় নাই। তাঁহার সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, কেবল জীব-উদ্ধার।

প্রভু শান্তিপুর হইতে বৃন্দাবনে যাইতে নীলাচলে গমন করিলেন, কেন? বৃন্দাবনে তাঁহার প্রাণ ছুটিয়াছে বলিয়াছেন, সন্ন্যাস করিয়া "কোথা বৃন্দাবন"•"কোথা বৃন্দাবন" বলিয়া চারি

দিবস কেবল ছুটাছুটি করিলেন। যমুনায় স্নান করিতেছেন ভাবিয়া সুরধুনীতে ঝাঁপ দিলেন আর সেখান হইতে শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। কিন্তু যখন শান্তিপুর ত্যাগ করিলেন, তখন নীলাচলে চলিলেন, বৃন্দাবনের কথা আর মুখেও আনিলেন না। ইহার মানে কি? কথা এই, প্রভু ভক্তভাবে বৃন্দাবন ছুটিলেন। কিন্তু ভক্তকে শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত প্রভুর আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল,— সেটি জীব উদ্ধার করা। তখন বৃন্দাবনে গেলে তাহা হইত না। তাঁহাব বাসের একমাত্র উপযুক্ত স্থান তখন নীলাচল, তাই নীলাচলে চলিলেন ও বৃন্দাবন ভুলিলেন। কারণ শ্রীবৃন্দাবনে তখন গমন করিলে সকল কার্য্য সফল হইত না কেন, তাহা বলিতেছি। প্রথমত বৃন্দাবন তখন জনশূন্য, দ্বিতীয় উহা আগ্রার অর্থাৎ মুসলমান-সম্রাটের রাজধানীর নিকট। সেখানে তখন নিশ্চিন্ত হইয়া জীবোদ্ধার, কি তাহাদিগকে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার সম্ভাবনা হইত না। তখন নীলাচল ভারতের একটা প্রধান তীর্থস্থান এবং উহা হিন্দুরাজার অধীনে ছিল। বিশেষতঃ তাঁহার লীলার সহায় জন্য সার্বভৌম ও রামানন্দ রায়কে প্রয়োজন। সার্বভৌম পন্ডিতগণের প্রধান, তাঁহার দর্পচূর্ণ না করিলে পড়ুয়া পন্ডিতগণের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারিবেন না, আর রামানন্দকে কেন প্রয়োজন, তাহা আপনারা অবগত আছেন।

বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া নীলাচল ত্যাগ করিয়া বাংলা ঘুরিয়া প্রভু আবার একেবারে গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে রূপ সনাতনকে শক্তি সঞ্চার করিয়া নীলাচলে ফিবিলেন। সুতরাং বৃন্দাবন যাওয়া একটি উপলক্ষ মাত্র। প্রকৃত উদ্দেশ্য রূপ সনাতনকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করা। এই রূপে যদিচ প্রভু সর্বদা বিহ্বল থাকিতেন, তবু উদ্দেশ্য সব ঠিক ছিল।

প্রভু কোন পথে নীলাচল গমন করেন তাহা লইয়া গন্ডগোল ছিল, কারণ লীলা-গ্রন্থে যে পথের কথা আছে, তাহা এখন পাওযা যায় না। ইহার কারণ ভাগিরথী পূর্বে যে পথে সাগরে মিলিত হন, পরে সে পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করেন। সারদাচরণ মিত্র মহাশয় পরে সাবেক পথ আবিষ্কার করেন।* যাঁহারা এই পথের গতি উত্তমরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সারদাবাবুর গ্রন্থ পাঠ করিবেন। কথা কি, প্রভু যখন রামচন্দ্র খাঁয়ের সাহায্যে নীলাচলে গমন করেন, তখন আর কেহ হইলে সে পথে যাইতে পারিতেন না। কারণ সে পথ একপ্রকার সমুদ্র দিয়া। আবার উহা তখন সৈন্য কর্তৃক রক্ষিত ও দস্যু কর্তৃক উৎপীড়িত। রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা প্রভুকে পাঠাইবেন। তিনিই অধিকারী, আর তাঁহার অসীম ক্ষমতা; তাই তিনি প্রভুকে ঐ পথে পাঠাইতে পারিয়াছিলেন। প্রভুর এই লীলা-খেলা যে পূর্বে পাতান হয়েছিল তাহার এক প্রধান প্রমাণ, তাঁহার নীলাচলে গমন। তখন যুদ্ধের নিমিত্ত এই পথ বন্ধ বলিয়া কাহারও যাইবার সাধ্য ছিল না। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় স্বয়ং অধিকারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কারণ তিনিই কেবল প্রভুকে পাঠাইতে পারিতেন।

. প্রভু মন্দিরের নিকট যাইয়া ভক্তগণকে বলিলেন, "হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমি আগে যাই।" পূর্বে ভক্তগণের মনে মহা ভয় ছিল যে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রভু আদৌ নীলাচলে যাইতে পারিবেন না। আবার মন্দিরের নিকট যাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, শ্রীজগন্নাথের দর্শন লাভ কি প্রকারে হইবে, কারণ তখন যাত্রীদিগের পক্ষে উহা বড় কঠিন ছিল। যথা পদ,—
"কলহ করিয়া ছলা, আগে প্রভু চলি গেলা, ভেটিবারে নীলাচল রায়।"

রহস্যের বিষয়, ভক্তগণ কথায় কথায় ভুলিয়া যাইতেন যে প্রভু কি বস্তু; তাঁহারা সর্বদা

*গোবিন্দের কড়চার প্রথম কয়েক পত্র প্রক্ষিপ্ত, কল্পনাদেবীর সৃষ্ট। তাই তাহাতে লেখা আছে যে, প্রভু মেদিনীপুর পথে গমন করেন। তাহা যদি হয় তবে আমাদের যতগুলি লীলা-গ্রন্থ আছে সমুদয় ফেলিয়া দিতে হয়। গোবিন্দের কড়চায় প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা যে কল্পিত, তাহা "গোবিন্দদাসের কড়চা রহস্য" নামক গ্রন্থে প্রমাণ করা হইয়াছে।

তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। পূর্বে বলিয়াছি যে, ভগবানের সঙ্গ অধিকক্ষণ করা যায় না। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্ এ কথা সর্বদা মনে থাকিলে ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গ করিতে পারিতেন না। কিন্তু প্রভু কিরূপে শ্রীমূর্তি দর্শন করিবেন, ও পড়ুয়াগণের স্কন্ধে চড়িয়া (স্মরণ থাকে যেন, প্রভুর এই নিয়ম ছিল যে, যখন কোন নূতন স্থানে উদয় হইতেন তখন হরিনামের সহিত হইতেন) হরিনামের সহিত সার্বভৌমের বাড়ী যাইবেন, এই সমুদয় পূর্বে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই প্রভু কলহ-ছলা করিয়া অগ্রে গেলেন। ভক্তগণ সঙ্গে গেলে তাহা হইত না।

সার্বভৌমকে কৃপা করিবার নিমিত্ত প্রভুর কয়েক সপ্তাহ নীলাচলে থাকিতে হইল। যে মাত্র এই কার্য্য শেষ হইল, অমনি তিনি দক্ষিণ দেশে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দক্ষিণে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি?" প্রভু বলিলেন, "দাদা বিশ্বরূপকে অন্বেষণ করা।" প্রভুর দক্ষিণদেশে যাইবার প্রকৃত উদ্দেশ্য জীব উদ্ধার করা, বিশ্বরূপের অনুসন্ধান একটা ছল মাত্র। কারণ তিনি জানিতেন যে, ইহার বহু পূর্বে বিশ্বরূপ অদর্শন হইয়াছেন। যদি বিশ্বরূপের অনুসন্ধানই উদ্দেশ্য হইত, তবে নিতাইকে সঙ্গে লইতেন।

প্রভু দক্ষিণে যাইয়া নূতন এক মূর্তি ধরিলেন। তিনি জীবের হৃদয় দ্রব করিবেন বলিয়া সন্ন্যাস লইলেন। এত দিন তিনি নিজ-জনের মধ্যে ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার নিমিত্ত শতবার প্রাণ দিতে পারিতেন। তাঁহাদের নিকট প্রভু কোন কঠোর করিলে তাঁহারা প্রাণে মরিতেন। এখন একেবারে অপরিচিত লোকের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তাহারা প্রভুর নাম পর্য্যন্তও শুনে নাই। সুতরাং তিনি দুঃখ লইলে তাহা নিবারণ করে, কি সহানুভূতি দেখায়, এমন লোক আর কেহ তাঁহার সহিত রহিল না। প্রভু নিশ্চিন্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারিবেন বলিয়া শ্রীনিতাই কি অপর কাহাকে সঙ্গে লয়েন নাই। যাহাকে লইলেন, তিনি প্রভুর সঙ্গে মাথা তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করেন না। এইরূপ সঙ্গী লইয়া ও সম্বলহীন অবস্থায় প্রভু আলালনাথ ত্যাগ করিলেন। অমনি দহি আজানুলম্বিত বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া কৃষ্ণকে ডাকিতে ডাকিতে চলিলেন। আপনি পবিত্র হইব বলিয়া সেই শ্লোকটি আবার বলিতেছি। যথা—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং।।"

প্রভু আপনি আচরিয়া ভক্তকে ভক্তিধর্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। তাই দেখাইলেন যে, যখন বিপদ সম্ভব, তখন শ্রীভগবানের আশ্রয় কিরূপে লইতে হয়। তিনি ডাকিতেছেন, "কৃষ্ণ রক্ষ মাং", কি "কৃষ্ণ পাহি মাং", বলিয়া, আর সে এরূপ ঐকান্তিক ভাবে যে,— যে শুনিতেছে তাহারই মনে হইতেছে যে, কৃষ্ণ যেন তাঁহার সম্মুখে। সে আরও বুঝিতেছে যে, এরূপ প্রাণভরা ডাক উপেক্ষা করিতে কৃষ্ণ কখনই পারিবেন না। বস্তুতঃ প্রভু আপনাকে বিপদ-সাগরে লইয়া চলিলেন। চিরদিন তিনি অন্য দ্বারা রক্ষিত, যেহেতু তিনি প্রেম ও ভক্তিতে বিহ্বল। দিবানিশি শত শত লোক তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছে। অদ্য তিনি বিদেশে একা। সে দেশ জানেন না, সেখানকার কাহাকেও জানেন না, সে দেশের ভাষা পর্য্যন্ত জানেন না, বিশেষত সঙ্গে কপর্দক মাত্রও নাই। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হিন্দীভাষা অনেকটা সংস্কৃত ও বাংলার মত, কিন্তু দক্ষিণ দেশের ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

তিনি কোথা যাইতেছেন তাহা কেহ জানে না; এমন কি তিনি যেন আপনিই জানেন না। তবে কোথা যাইতেছেন, না—যেখানে কৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন! রাত্রি হইল, একটি বৃক্ষতলে বৃক্ষ হেলান দিয়া বসিলেন। প্রভাত হইলে আবার চলিতে লাগিলেন। কি আহার

করিবেন, আব কোথা আহার পাইবেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোন চিন্তা নাই। এদিকে প্রভু বিভোর, ভাবে মুহুর্মুহুঃ ডাকিতেছেন,—"কৃষ্ণ পাহি মাং।" কৃষ্ণ করেন কি, কাজেই তাঁহার আহার যোগাইতে হইতেছে, তিনি না যোগাইলে আর কে যোগাইবে? না যোগাইলে, গীতায় কৃষ্ণ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা যে বিফল হয়। সম্মুখে ব্যাঘ্র পড়িলে, প্রভু লক্ষ্যও করিলেন না। কেন? তিনি না ভক্ত? ভক্তভাবে "কৃষ্ণ রক্ষ মাং" বলিয়া, আপনার রক্ষার দায় কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইলেন। প্রভু পাছে মূর্চ্ছিত হইয়া আছাড় খা'ন, সেইজন্য নিতাই, অদ্বৈত, নরহরি, স্বরূপ প্রভৃতি শত শত ভক্ত সর্বদা দুই বাহু প্রসারিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেন এখন তিনি শত আছাড় খাইলেও তাঁহাকে রক্ষা করে, এমন কেহ, নাই। প্রভু কূর্মক্ষেত্রে বাসুদেবকে কুষ্ঠারোগ হইতে মুক্ত করিয়া ও ভক্তি দিয়া গোদাববী তীরে রামরায়ের নিকটে আসিলেন, এবং সেখানে অদ্ভুত সাধ্যসাধন-নির্ণয়রূপ বিচার উঠাইলেন। এ সমুদয় লীলা তৃতীয় খণ্ডে পাইবেন। প্রভু সেখান হইতে বিদায় হইবার সময় রামরায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। প্রভু বলিলেন, "তুমি অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে যাইব।" দক্ষিণ দেশে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য শেষ করিতে হইবে বলিয়া, প্রভু সে দেশে অসীম-শক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজনকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। সে ব্যক্তি এরূপ শক্তি পাইলেন যে, তিনিও শক্তিসঞ্চার করিতে লাগিলেন। আবার তিনি যাঁহাদিগকে শক্তি-সঞ্চার করিলেন, তাঁহারাও শক্তিসঞ্চার করিবার শক্তি পাইলেন। এইরূপে প্রভু এক একজনকে আলিঙ্গন করিয়া দেশকে দেশ ভক্তিতে ভাসাইতে লাগিলেন। এ কথা বিস্তার করিয়া পূর্বে বলিয়াছি।

প্রভুর দক্ষিণদেশের লীলা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছি। এখন উহা বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিতেছি। কাজেই ইহাতে মধ্যে মধ্যে এক কথা দুইবার বলিতে হইতেছে। বোধ হয়, পাঠক সে নিমিত্ত আমাকে ক্ষমা করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

দক্ষিণে গমন

কি করিব কোথা যাবো কি কর্তব্য মোর। না জানিয়া বসে ছিনু চাই মুখ তোর।।
এক বছর গেল পহুঁ আর বছর এলো। আশাপথ চেয়ে চেয়ে আঁখি আন্ধা হলো।।
নব অনুরাগ-কালে পানু কিছু সুখ। সে সব স্মরিয়া এবে বিদরয়ে বুক।।
চুরণী নদীর ধারে কৃষ্ণচূড়া তলে। বান্ধা ঘাটে বসে ছিনু একলা বিকালে।।
এই ত ফাগুনে তোমা সনে পরিচয়। ভুলিলাম দেহ গেহ তোমার চিন্তায়।।
কি দেখিনু কি শুনিনু নাহি মনে হয়। সেই হতে প্রাণ কাড়ি নিলে প্রেমময়।।
পানু নব জন্ম, দেখি সব সুখময়। রসেতে পুরিল চির-নীরস হৃদয়।।
একা ছিনু ভব মাঝে না ছিল দোসর। রসে ডগমগ তনু আনন্দে বিভোর।।
হিয়া আশাশূন্য ছিল, ভুবন আ ধার। পহিলা জানিনু তুমি আছহ আমার।।
তোমা কথা শুনি শুনি ভাবিয়া ভাবিয়া সুখের তরঙ্গে চলি ভাসিয়া ভাসিয়া।।
এবে কোথা গেলে, কেন গেলে প্রাণনাথ। আমারে না নিয়া গেলে করি তোমা সাথ।।
এখানে থাকিয়া আমি কি কাজ করিব। হেন শক্তি নাই লীলা আবার লিখিব।।
বলরামের মনে বিন্ধি আছে এই শেল। তুমি কি পরম-বস্তু জীবে না জানিল।।

প্রভু দক্ষিণে এরূপ কঠিন জীবসকল পাইলেন, যাহাদের উদ্ধার করিতে নব নব পন্থা অবলম্বন করিতে হইল। প্রভু পথে যাইতে ত্রিমন্দ নগরে উপস্থিত হইলেন। দেখেন, সেখানে

শুধু যে অনেক বৌদ্ধ বাস করে তাহা নয়, সেখানকার রাজাও বৌদ্ধ। আমাদের হিন্দুশাস্ত্র মতে বৌদ্ধগণের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিতে নাই, তাহাদের সহিত কথা কহিতে নাই, তাহাদের মুখ দর্শনও করিতে নাই। কিন্তু প্রভুর সে মত নয়, তাহা আপনারা বেশ বুঝিতে পারেন। তাঁহার মত এই যে,—যে যত অধিক পতিত, সে তত অধিক কৃপাপাত্র। প্রভু চিরদিন তাহাই শিখাইয়া আসিয়াছেন, এবং কর্তব্যেও তাহাই করিয়া আসিয়াছেন। বৌদ্ধগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল, এবং তাঁহাকে ইহাতে অনিচ্ছুক না দেখিয়া মহা আনন্দের সহিত বিচার আরম্ভ করিল। একজন পদস্থ হিন্দুকে তাহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহারা অতিশয় আনন্দিত হইল। শেষে রাজা স্বয়ং এবং বৌদ্ধগণের কর্তা রামগিরি সেই বিচারে যোগ দিলেন। প্রভু সেই নাস্তিকগণের নিকট ভগবানের কথা বলিতে আরম্ভ করিবা মাত্র আপনি পুলকিত হইলেন, ও তাহা দেখিয়া রামগিরির অঙ্গ আনন্দে পুলকাবৃত হইল। অমনি প্রভু বলিলেন, "হে ভক্তবর! তোমার সহিত কি তর্ক করিব? তুমি পরম কৃপাপাত্র, কারণ দেখিতেছি হরিকথায় তুমি মুগ্ধ হও।" প্রভু বলিলেন—"হরি বলি পুলকিত হয় যেই জন। মাথার ঠাকুর সে এই ত কথন।।" ইহা শুনিয়া রামগিরি অতিশয় বিচলিত হইলেন। যথা—"শুনিয়া প্রভুর কথা রামগিরি রায়। অমনি আছাড় খাএগ্রা পড়িল ধরায়।।" তারপর প্রভুর চরণ ধরিয়া রামগিরি বলিলেন,— "সর্বজীবে থাক তুমি দেখিছ সকল। দয়া করি রাঙ্গা পায় দেহ মোরে স্থল।।" মনে করুন ইঁহারা মহাপন্ডিত লোক। পান্ডিত্যের আশ্রয় লইলে ইঁহাদিগকে বিচারে নিরস্ত করা কখনই সহজ হইত না, কেবল কচকচি বাধিয়া যাইত। কিন্তু প্রভু সে পথে না যাইয়া ভগবানের মাধুর্য্যরূপ যে মধু তাহার একবিন্দু, তাঁহার বদনে দিলেন, আর অমনি রামগিরি ধরা পড়িলেন। যিনি যত বড় নাস্তিক হউন, সকলের হৃদয়েই ভক্তির বীজ আছে। কোনক্রমে উহা একবার জাগরিত করিতে পারিলে তাহাদের নাস্তিকতা দুর্বল হইয়া পড়ে। রামগিরি প্রভুর শ্রীপদে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। ইহাতে—"পন্ডিতের শিরোমণি যত বৌদ্ধগণ। রামগিরি পথে সব করিল গমন।।"

গোবিন্দের কড়চায় যে ত্রিমন্দ নগরের কথা লেখা আছে, শ্রীচরিতামৃতে তাহাকে ত্রিমট বলা হইয়াছে। বৌদ্ধগণের সহিত প্রভুর বিচার উহাতে এইরূপে বর্ণিত আছে—

বৌদ্ধচার্য্য মহাপন্ডিত বিজন-বনেতে। প্রভু আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিল বলিতে।।
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে। তথাপি মিলিলা প্রভু তাদের উদ্ধারিতে।।

বৌদ্ধগণের উদ্ধার শুনিয়া ঢুন্ডিরাম-তীর্থ বিচার করিতে গেলেন। সেই স্থানের নিকট ঢুন্ডিরামের আশ্রম আছে। এই আশ্রমের যিনি গুরু তিনি ঢুন্ডিরাম খ্যাতি পাইয়া থাকেন। ঢুন্ডিরাম এবং অন্যান্য পন্ডিতগণ সম্বন্ধে চরিতামৃত বলেন—

তার্কিত মীমাংসক মায়াবাদিগণ। সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ অগণন।।
হারি হারি প্রভু মতে করেন প্রবেশ। এই মত বৈষ্ণব প্রভু কৈল দক্ষিণদেশ।।

গোবিন্দের কড়চায় ঢুন্ডিরাম সম্বন্ধে এইরূপ আছে—

"অহংকারে সদা মত্ত পন্ডিতাভিমানি।"

সর্ব-শাস্ত্রে পন্ডিত, কাহাকে ভয় নাই, জীবনের একমাত্র সুখ বিচার করা ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজয় করা। এই ইহাদের চরিত্র। প্রভুকে অতি উত্তম একটি শিকার পাইয়াছেন ভাবিয়া "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া সম্মুখে বসিলেন। কিন্তু প্রভুর বদনপানে চাহিয়া এরূপ বিচলিত হইলেন যে, তাঁহার মুখে বিচার করিবার স্পৃহা আর হইল না। প্রভুর বদন মলিন ও নয়ন করুণায় পূর্ণ দেখিয়া ঢুণ্ডিরাম কান্দিয়া ফেলিলেন, পরে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন—

প্রভু কহে শুন শুন ঢুন্ডিরাম স্বামী। তোমার সহিত তর্কে হরিলাম আমি।।
জয়পত্র আমি লিখে দিব সঙ্গোপনে। হারিল চৈতন্য এবে তোমার সদনে।।
বাণীর কৃপায় তুমি পন্ডিত গোসাঞিঃ। কার সাধ্য তর্কে শাস্ত্রে জিনে তব ঠাঞিঃ।।

ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল বেদান্তদর্শন। সর্ব শাস্ত্রে অধিকারী তুমি গো সুজন।।
মূরখ সন্ন্যাসী মুই কিছু নাহি জানি। বার বার তোমার নিকট হার মানি।।
আগেকার ঢুণ্ডি চেয়ে তুমি সুপন্ডিত। তোমার পান্ডিত্য হয় ভুবন বিদিত।।

প্রভু করজোড়ে বলিলেন, "আমি মূর্খ সন্ন্যাসী, আমি তোমায় পারিব না। আপনি আপনার আশ্রমে গমন করুন, আমি আপনাকে জয়পত্র লিখিয়া দিতেছি।" কিন্তু—"যাইতে নাহি চাহে ঢুন্ডি, চারিদিকে চায়।" ঢুণ্ডিরাম গেলেন না, কান্দিতে লাগিলেন, পরে প্রভুর চরণে আশ্রয় লইলেন। ঢুণ্ডিরামের ঢুণ্ডিরামত্ব গেল, তাঁহার আশ্রম গেল ও তাঁহার নাম হইল "হরিদাস"। ঢুণ্ডিরামের উদ্ধারের পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গ যে যে তীর্থ দর্শন করেন, তাহা চরিতামৃত এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

প্রভু গৌতমী গঙ্গায় স্নান করিয়া মল্লিকার্জুন তীর্থ দেখিলেন ও মহেশকে প্রণাম করিলেন; সমুদ্রতীর ত্যাগ করিয়া কিছুদূর পশ্চিমে অহোবলের নৃসিংহ ঠাকুরকে দর্শন করিলেন, এবং সেখান হইতে সিদ্ধবট গেলেন। সেখানে এক পরমভক্ত বিপ্র দিবানিশি রামনাম জপিতেন, তাহার ঘরে প্রভু ভিক্ষা করিলেন, করিয়া পরে সকলে দর্শনে গমন করিলেন। সেখান হইতে সিদ্ধিবটে ফিরিয়া সেই ব্রাহ্মণবাড়ী আবার আগমন করিলেন, দেখেন যে সেই ব্রাহ্মণ রামনাম ছাড়িয়া কেবল কৃষ্ণনাম জপিতেছেন। প্রভু ইহাতে হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি? রামনাথ ত্যাগ করিয়া এখন কৃষ্ণনাম ধরিয়াছ?"তাহাতে "বিপ্র কহে, এই তোমার দর্শন প্রভাবে।"

প্রভু দক্ষিণে যে সমুদয় অদ্ভুত কান্ড করেন, তাহা বর্ণনা করিবার অগ্রে তিনি কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দক্ষিণদেশ উদ্ধার করেন, তাহার কিছু আভাস দিতে হইতেছে। প্রভু রাধার ঋণ শোধ দিতে অর্থাৎ জীবকে ভক্তিপথে লইতে আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার শুধু নদীয়া কি শ্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবন লইয়া থাকিলে চলিবে না। তাঁহার সমস্ত ভারতবর্ষ উদ্ধার করিতে হইবে। তাই দক্ষিণাভিমুখে দৌড়িলেন, সময় অল্প অতএব শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। সুতরাং মাঝে মাঝে তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি অবলম্বন করিতে হইতেছিল। যথা, এক জনকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহার দ্বারা বহু জনকে উদ্ধার করা।

ঐশ্বরিক শক্তি ছাড়া অনেক স্থানে প্রভু অন্য উপায় অবলম্বন করিতেন। যথা, তর্কে পরাজয় করিয়া। তবে তাঁহার তর্কে এই গুণ ছিল যে, তাঁহার প্রতিপক্ষ পরাজিত হইয়া অপমানিত বোধ না করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া অনুগত হইত। কাহাকে আপনার দৈন্যে, কাহাকে আপনার ঔদার্য্যে, কাহাকে আপনার মধুর চরিতে বশীভূত করিতেন, কাহাকে বা দুই একটি শ্লেষবাক্য বলিয়া উদ্ধার করিতেন। কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা একটি অতি বলবৎ যন্ত্র ছিল, যাহা দ্বারা তিনি জীবকে মোহিত করিতেন,—অর্থাৎ "জীবে দয়া" ও "ভগবানে প্রেম" দেখাইয়া। তাঁহার ঔদার্য্যের কথা কি বলিব। তিনি এক গালে চপেটাঘাত খাইয়া অন্য গাল ফিরাইয়া দিতেন না। সে তাঁহার পক্ষে সামান্য কথা। তবে কেহ এমত ব্যবহার করিলে তিনি তাহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিতেন। তিনি পরের দুঃখ দেখিলে কান্দিয়া উঠিতেন। তাঁহার আপনার জয়-পরাজয় বোধ ছিল না। সর্বদাই আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া অন্যকে মান দিতেন। যে যত অপরাধী তাহাকে তিনি তত বেশী কৃপা করিতেন। এই যে সমুদয় বলিলাম ইহা যে অত্যুক্তি নয়, তাহা তাঁহার কার্য্য দেখিলে সকলেই স্বীকার করিবেন।

প্রভু দক্ষিণে যে কাণ্ড আরম্ভ করিলেন তাহা স্মরণ করিলে পাষাণ গলিয়া যায়। প্রভু মনুষ্যের দেহ ধারণ করিয়াছেন সুতরাং সে দেহ স্বভাবের নিয়মের অধীন। উপবাসে ও অনিদ্রায় দেহ ক্ষীণ ও দুর্বল হয়, অধিক পথশ্রমেও কষ্ট হয়। প্রভুর এ সমুদয় হইতেছে, তাহাতে হইয়াছে কি, না সেই প্রকাণ্ড দেহ অস্থিচর্মসার হইয়াছে, যেন চলিতে পারেন না, চলিতে অতিশয় কষ্ট

হয়। সোনার অঙ্গ সর্বদা ধূলায় ধূসরিত। প্রভু সিদ্ধবটেশ্বর গেলেন, যাইয়া সেখানকার শিবকে প্রণাম করিলেন। সে রাত্রি আর আহার জুটিল না। পর-দিবস প্রাতে যাহা জুটিল তাহাই সেবা করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, যেন কাহাকে অপেক্ষা করিতেছেন।

পাঠককে বলিয়া রাখি, প্রভুর এরূপ অবস্থায় সচরাচর পড়িতে হইত না। কারণ যখন সেখানে যাইতেছেন সেখানে অমনি লোকের কলরব ও হরিধ্বনি হইত এবং প্রভুর ভিক্ষার সামগ্রী ও রাশি-রাশি বস্ত্র প্রভৃতি দানের সামগ্রী আসিয়া উপস্থিত হইত। কিন্তু এখানে একটি লীলা করিবেন মনে আছে, তাই চুপে চুপে আসিয়া সামান্য অবস্থায় রহিলেন। ঠিক যেন একটি সামান্য সন্ন্যাসী। সেখানে তীর্থরাম আসিলেন। তিনি সওদাগর, অভক্ত, খুব ধনবান। সেই সামান্য নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাহার একটু আমোদ করিবার ইচ্ছা হইল। একে যৌবনমদে ও ধনমদে মত্ত, আবার চরিত্র অতি-মন্দ, সুতরাং মন্দ কার্য্যেই আনন্দ। তাহার ইচ্ছা হইল যে নবীন সন্ন্যাসীর ধর্ম নষ্ট করিবেন। আর সেই অভিপ্রায়ে দুইটি বেশ্যা আনিয়া উপস্থিত করিলেন; তাহাদের নাম—সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই। যথা—

"সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়। প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয়।।"

বেশ্যাদিগের কি কি করিত হইবে, তাহা তীর্থরাম তাহাদিগকে শিখাইয়া আনিয়াছেন। আর সেখানে যাহারা ছিলেন তাহাদিগকে বলিতেছেন যে, মজা দেখ, সন্ন্যাসীর যত ভারিভুরি সব এখানে বাহির হইবে। এখন বেশ্যাগণের কাণ্ড শুনুন—

"কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী, সত্যবাই হাসে। সত্যবাই হাসি মুখে বসে প্রভু পাশে।।"

প্রভু চুপ করিয়া বসিয়া আছেন কিছুই বলিতেছেন না। তাহাতে সত্য একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। যেন অন্যমনস্ক হইয়া সে অঙ্গের আবরণ ফেলিয়া দিল। ঐরূপ নির্লজ্জ ব্যবহার করিলে, প্রভু তখন তাহার দিকে চাহিলেন। সে চাহনীতে সত্যবাই বিচলিত হইল, দেখিল যে প্রভুর চক্ষু দিয়া কারুণ্যরস ও দয়া চোয়াইয়া পড়িতেছে। সেরূপ দৃষ্টি সে আর কখনও দেখে নাই,—সে অতি পবিত্র। দেখিয়া বুঝিল যে ইঁহার বিকার নাই, যেন ইনি মনুষ্য নহেন—দেবতা। প্রভু তাহার দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "কি মা, তুমি কি চাও?" প্রভুর সেই দৃষ্টির পর যখন তিনি সত্যবাইকে "মা"বলিয়া ডাকিলেন, তখন বেশ্যার হৃদয় হইতে রঙ্গরস দূরে পলাইল। সে কাঁপিতে লাগিল। লক্ষ্মীও বড় ভয় পাইল। তাহারা প্রভুর মুখ দেখিয়া বেশ বুঝিয়াছে যে—"কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে।" আর কি কি দেখিল তাহা তাহারাই জানে। তখন সত্যবাই, যে লক্ষ্মী অপেক্ষা অধিক অপরাধী, একেবারে প্রভুর চরণে পড়িল।

তখন প্রভু তটস্থ হইয়া বলিলেন, "আমি তোমার পুত্র, তুমি আমার মা, আমার চরণে পড়িয়া,"কেন অপরাধী কর আমারে জননি!" প্রভু আর বলিতে পারিলেন না, কথাগুলি বলিয়াই অমনি "পড়িলা ধরণী"।

সব এলো থেলো হলো প্রভুর আমার। কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখে আর।।
নাচিতে লাগিল প্রভু বলি হরি হরি। রোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি।।
হরিনামে মত্ত হয়ে নাচে গোরা রায়। অঙ্গ হতে অদভূত গন্ধ বাহিরায়।।

তীর্থরাম সব দেখিতেছেন। প্রথমে সত্যকে যখন প্রভু মা বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন প্রভুর মুখ দেখিয়া, মদমত্ত যুবকের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া গিয়াছিল। সন্ন্যাসীকে লোকে সচরাচর ভয় করে, সেকালে আরো করিত। তীর্থরামের তখন বেশ বোধ হইয়াছে যে, সন্ন্যাসী ত ভণ্ড নয়, বরং বড় ক্ষমতাশালী, তাই ভয় পাইয়া সহজ যে উপায় তাহাই অবলম্বন করিলেন, অর্থাৎ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভুর চরণতলে পড়িয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু প্রভু তখন একেবারে অচেতন। তীর্থ যে চরণে পড়িলেন তাহা তাঁহার গোচর হইল না, তাই ধনবান যুবক প্রভুর চরণে দলিত হইতে লাগিলেন। যদিও প্রভু তীর্থরামকে লক্ষ্য করিলেন না, কিন্তু সত্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি

রহিযাছে। সেই অচেতন অবস্থায় প্রভু সত্যকে উঠাইলেন, আব তাহাকে বাহুতে ছাঁদিয়া বলিতেছেন, "কৃষ্ণ বল, মুকুন্দ মুরারিকে ডাকো।"

হরিনাম মন্ত্র প্রভু নাই বাহ্যজ্ঞান। ঘাড়ি ভাঙ্গি পড়িতেছে আকুল পরাণ।।
আছড়িযা পড়ে, নাহি মানে কাঁটা খোঁচা। ছিড়ে গেল কণ্ঠ হাতে মালিকার গোচা।।

আর, পিচকারি সম অশ্রু বহিতে লাগিল।

তখন ষড়যন্ত্রকারী তিনজনে, অর্থাৎ তীর্থ ও বেশ্যাদ্বয় মৃতপ্রায় হইয়াছে। তীর্থরামের অবস্থা দেখিয়া, তখন অতি কঠিন যে, তাহারও দ্রব হইবার কথা। যাহারা সেখানে ছিলেন তাহারা তীর্থরামের কার্য্যকে ঘৃণা করিয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই জন্য যখন অচেতন প্রভুর পদাঘাতে তাহার দেহ চূর্ণ হইতে লাগিল, তখন তাহারা ভাবিতে লাগিলেন বেশ হইয়াছে। কিন্তু সে ভাব তাহাদের বেশীক্ষণ রহিল না, তীর্থরামের কাতরোক্তি শুনিয়া এবং তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতেছেন দেখিয়া, তাহার প্রতি তাহাদের দয়া হইল।

এদিকে প্রভুর ভাব শুনুন। প্রভু একটু পরে চৈতন্য পাইলেন, এবং তীর্থরামকে উঠাইয়া অতিপ্রেমে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। পূর্বে বলিয়াছি, প্রভু এক গালে মার খাইলে আর এক গাল ফিরাইয়া দেওয়া অপেক্ষাও অধিক করিতেন, তাহার নিদর্শন পূর্বে দেখুন। তীর্থরামকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলে, তিনি ভয় পাইয়া বলিলেন, "প্রভু করেন কি, আমি অপবিত্র অস্পৃশ্য, আমাকে স্পর্শ করিলেন!" প্রভু উত্তরে বলিলেন—"পবিত্র হইনু আমি পরশি তোমারে।"

ঐশ্বর্য্যে তীর্থরামের সর্বনাশ ঘটিতেছিল। কারণ স্বভাবতঃ তিনি ভক্তিমান ব্যক্তি, তাই অন্তর্যামী প্রভু তাহাকে কৃপা করিবেন বলিয়া এত ভঙ্গী উঠাইলেন। তৎপরে প্রভু তাহাকে কিছু উপদেশও দিলেন। যখন তীর্থরামের বিষয়ে একেবারে বিরক্তি হইল, তখন বিষয় ছাড়িলেন। তিনি উদাসীনের পথ অবলম্বন করিতেছেন শুনিয়া, তাহার অতি সুন্দরী ভার্য্যা কমলকুমারী ছুটিয়া আইলেন. এবং পতির চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "বাড়ী চল, আমাকে ত্যাগ করিও না।" ইহাতে—

কমলে বলিলা তীর্থ, কর ধরি করে। বিষয় সম্পত্তি সব দিলাম তোমারে।।
নরক হইতে ত্রাণ পাইয়াছি আমি। বিষয় বৈভব সব ভোগ কর তুমি।।

তীর্থরাম আর বিষয়ে মুগ্ধ হইলেন না; সেই হইতেই পথের ভিখারী হইলেন। তাহার পরে, আহারীয় দ্রব্যের সহিত—

কত লোকে কত বস্ত্র আনি জুটাইল। কিন্তু এক খণ্ডও প্রভু হাতে না ছুঁইল।।

সেখান হইতে প্রভু নন্দীশ্বর চলিলেন। পথে দশ ক্রোশ ব্যাপী জঙ্গল পার হইয়া প্রভু মুন্নানগর পাইলেন; কিন্তু নগরে প্রবেশ না করিয়া, উহার নিকটে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া তাঁহারা দুজনে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এমন সময় দুইটি নগরবাসী সেখানে আসিলেন এবং প্রভুকে দেখিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন সন্ধ্যা হইতেছে। কিরূপে কে জানে, ইহার মধ্যে নগরে ধ্বনি হইয়াছে যে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গের তেজ আগুনের ন্যায়। ইহা শুনিয়া নগরবাসী দলে দলে আসিতে লাগিল, এবং ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রভু কিন্তু একেবারে নীরব। এত লোক যে একত্র হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা তিনি একেবারে লক্ষ্যই করিলেন না। সকলে তখন বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল, "স্বামী নগরে চলুন।" কিন্তু "প্রেমে মত্ত মোর প্রভু শুনে নাহি কথা।"

এই যে সেই স্থান লোকারণ্য হইল, প্রভু কি কোন চর পাঠাইয়া তাহাদিগকে ডাকাইয়াছিলেন? ডাকাইলেই বা তাহারা আসিবে কেন? লোক আইল কেন, না—প্রভুর অনিবার্য্য আকর্ষণে। ক্রমে যখন কলরব অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, তখন প্রভু আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না—

"অমনি উঠিয়া প্রভু নাচিতে লাগিলা।"

তখন সমুদয় লোক সেই সঙ্গে করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল এবং সেই বৃক্ষতল শ্রীবাসের আঙ্গিনায় পরিণত হইল। এইরূপে সমস্ত লোকে সমস্ত নিশি আনন্দে প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিয়া কাটাইল। প্রভাত হইলে প্রভু চলিলেন, আর সেই সকল লোক প্রভুকে থাকিতে মহা জিদ করিতে লাগিল। কিন্তু—"প্রভু মোর কোন উপরোধ না শুনিল।"

সেই সময় এক ভিখারী রমণী প্রভুর নিকট কান্দিয়া ভিক্ষা মাগিল। সে ভক্তি-ভিক্ষা নয়, অন্ন-বস্ত্রের ভিক্ষা, যাহা প্রভুর দিবার শক্তি ছিল না। দরিদ্র রমণীর পরিধান জীর্ণবাস, আর অনাহারে দেহ শীর্ণ। কিন্তু দারিদ্র্যের নিমিত্ত এরূপ জ্ঞানশূন্য স্বার্থপর নীচ হইয়াছে যে, যদিও দেখিতেছে প্রভু একজন কাঙ্গাল সন্ন্যাসী, তাঁহার দিবার কিছু নাই, তবু তাঁহার কাছে হাত পাতিতে ছাড়িল না। আমরা হইলে তাহাকে দূর-দূর করিতাম, কিন্তু প্রভু আমার তাহা করিলেন না। তাঁহার দয়া হইল, কিন্তু আপনার ত কপর্দক মাত্র নাই, দিবেন কি? তাই প্রভু ঈষৎ হাসিয়া মুন্যাবাসিগণের নিকট ভিক্ষা মাগিলেন। ইহাতে—

মুন্যাবাসী নরনারী আনন্দে ভাসিয়া। রাশি রাশি অন্ন বস্ত্র দিলেক আনিয়া।।
সবে বলে পথের সম্বল তরে চায়। সে কারণে রাশি রাশি আনিয়া জোগায়।।
সকলে ব্যাকুল বস্ত্র প্রভু হস্তে দিতে। গণ্ডগোল দেখি প্রভু লাগিল হাসিতে।।

সকলেই প্রভুকে তাহার দ্রব্য লইতে আগ্রহ করিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছে, "আমার এই বস্ত্রের অনেক মূল্য, ইহা আগে গ্রহণ কর।" প্রভু বলিলেন, "আমি তোমাদের ভিক্ষা গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, আমার তো কাপড় পরিতে নাই, আর একমুষ্টি অন্ন পাইলে আমার যথেষ্ট। তোমরা এত অন্ন দিলে আমি লইয়া যাইব কিরূপে? এক কাজ কর, আমি ভিক্ষা পাইলাম, আমি আশীর্বাদ করিতেছি ভগবান তোমাদের ভাল করিবেন। তোমরা এই সমুদয় অন্নবস্ত্র এই দুঃখিনীকে দাও।" তাহারা তাহাই করিল, আর আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন প্রভু দ্রুত চলিলেন। বহুতর লোক সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ফিরাইবার নিমিত্ত চলিল, কিন্তু প্রভু কাহারও কথা শুনিলেন না। পরদিন দুই প্রহরে বেঙ্কটনগরে পৌছিলেন।

পূর্বদিন উপবাসে গিয়াছে, রজনীতে আহার নিদ্রা কিছুই হয় নাই, পরদিবস দুইপ্রহর পর্য্যন্ত হাঁটিলেন, কাজেই প্রভুর প্রকাণ্ড দেহ এইরূপে কঠোর জীবন-যাপনে দুর্বল হইতেছে। বেঙ্কটনগরে প্রভু তিন দিবস থাকিলেন। সেই নগরে অতিবড় একজন বেদান্ত-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া প্রভুকে আক্রমণ করিলেন। প্রভু বলিলেন, "আমি হারিলাম, তুমি খুব বড় পন্ডিত।" কিন্তু পন্ডিত ছাড়েন না। তখন প্রভু তাহার সহিত ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। তাহার তত্ত্বগুলি যে সারহীন ইহা সেই ব্যঙ্গতে বুঝা যাইতে লাগিল। প্রভু রহস্য করিতেছেন, আবার হাস্যও করিতেছেন। যদিও প্রভু ব্যঙ্গছলে কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু পন্ডিত তাহাতেই নিরুত্তর হইতে লাগিলেন। শেষে এই পন্ডিত,—ইনি সন্ন্যাসী, নাম রামানন্দ স্বামী,—প্রভুকে আত্মসমর্পণ করিয়া দীক্ষিত হইলেন। তিনি ও তাঁহার সকল শিষ্য হরিনাম লইলেন। কাজেই—

"মাতিল নগর পল্লী বালক বালিকা। কত লোক আসে যায় কে করে তালিকা।।"

শ্রীচরিতামৃত সংক্ষেপে বলিতেছেন—

মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী ত্রিমল্লে। চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখি বেংকটায়ে চলে।।
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরাম দর্শন। রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম স্তবন।।
স্বপ্রভাবে লোক সবে করিয়া বিনয়। পানানৃসিংহে আইল প্রভু দয়াময়।।

পানানৃসিংহে আসিবার পূর্বে প্রভু কতকগুলি অতি মধুর লীলা করেন। বৌদ্ধগণের উদ্ধার সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে, সেটি আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কাহিনী এই যে, বৌদ্ধগণ বিচারে পরাস্ত হইলে, তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভুকে পতিত করিবার ও কষ্ট দিবার

নিমিত্ত একটী ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা একখানি অপবিত্র অন্নপূর্ণ থালি আনিয়া প্রভুকে বলিল, "ইহা বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণ করুন।" প্রসাদ লইতে প্রভু হাত পাতিলেন, কিন্তু সেই সময় একটি পক্ষী আসিয়া ঠোঁটে করিয়া ঐ থালি লইয়া উড়িল, পরে উহা এরূপ ভাবে ত্যাগ করিল যে, উহা তেরচা হইয়া বৌদ্ধগণের যে আচার্য্য তাহার মাথায় পড়িল। তাহাতে তাহার মাথা কাটিয়া গেল ও আচার্য্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তখন বৌদ্ধগণ প্রভুর শরণ লইল। প্রভু বলিলেন, তোমরা কীর্তন কর, তাহা হইলে উনি বাঁচিবেন। এইরূপে সকলে বৈষ্ণব হইল।

কিন্তু এ কাহিনী আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। গোবিন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও এ লীলা উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ প্রভুর লীলায় এরূপ অলৌকিক ঘটনা পাইবেন না। শুনিলেই বুঝা যায় এরূপ দৈববলের সহায়তা গ্রহণ করা প্রভুর লীলার অনুমোদিত নয়। বিশেষতঃ এ অবতারে দন্ড নাই, দৈব-বল প্রয়োগ নাই, ভয়-প্রদর্শন নাই। গোবিন্দের কড়চায় দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধগণ প্রভুর সহিত বিচার প্রার্থনা করে, প্রভু কোন কথা না বলিয়া কেবল "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া ডাকিতে থাকেন, পরে ভাবে উন্মত্ত হন। বৌদ্ধগণ সেই তরঙ্গে পড়িয়া গেল এবং প্রভুর চরণে আশ্রয় লইল। তাহাদের সেই মুহূর্তের বৈষ্ণবতা দেখিয়া প্রভু পুলকিত হইলেন ও তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। "পক্ষিচঞ্চুচ্যুত ভাণ্ডে মস্তক ভঙ্গ হওয়ায় বৌদ্ধগণ বশীভূত হইলেন", ইহা অপেক্ষা, 'প্রভু তাহাদিগের হৃদয় বিগলিত করিয়া ভক্তিদান করিলেন', এরূপ প্রথা প্রভুর যে অনুমোদনীয় তাহা সকলে স্বীকার করিবেন। প্রভু তিন দিবস বেঙ্কটনগরে ছিলেন, থাকিয়া নগরবাসীদিগকে হরিনামে উন্মত্ত করিলেন। সেই সময় প্রভু শুনিলেন যে নিকটে বগুলার বন আছে, সেখানে দস্যু পন্থভীল বাস করে। সে পথিক পাইলে তাহাকে সর্বস্বান্ত এবং কখন কখন বধ করে। প্রভু শুনিবামাত্র সেখানে চলিলেন। তখন নগরের প্রধান লোক সকল প্রভুকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে—"পাপাচারী ভীল অজ্ঞান, আপনার মহিমা কিছু বুঝিবে না, আপনার অনিষ্ট করিতে পারে। আপনার সেখানে যাওযা বিবেচনাসিদ্ধ নয়।" কিন্তু প্রভু কাহারও নিষেধ শুনিলেন না, সেই বনপানে চলিলেন। গোবিন্দ করেন কি, ভয়ে ভয়ে তাহার যে সম্পত্তি—বহির্বাস, কৌপীন, করোয়া ও খড়ম, ইহা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভু সেখানে তিন রাত্রি বাস করিলেন, এবং ভীলপতির সঙ্গে মিষ্টালাপ আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন,—"তুমিই প্রকৃত সাধু। সাধুগণ বনে থাকেন, তুমিও বনে থাক। সাধুগণের সংসারে কি পুত্র কন্যা নাই, তোমারও তাহা নাই। অতএব তুমিই সাধু, তোমার দর্শনে পাপক্ষয় হয়।"পন্থভীল প্রভুর কথা শুনিল, প্রভুর কথার ভঙ্গি বুঝিল ও ভক্তিপূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিল। প্রভু তখন কীর্তন আরম্ভ করিলেন। পন্থভীলের ভক্তি উথলিয়া উঠিল, সেও সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিল, শেষে সমুদয় দস্যুগণ সেই নৃত্যে যোগ দিল।

সেই দিন হইতে পন্থ পরিল কৌপীন। হইল সাধুর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেতে প্রবীণ।।
লইতে হরির নামে অশ্রু পড়ে আসি। হরিনামে মত্ত হয়ে যত দস্যুগণ।
সেই বন করিলেক আনন্দ-কানন।।

দস্যু দমনের এই এক নূতন পদ্ধতি। ফল কথা, প্রভু চিরদিন এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই জীবকে সুপথে লইয়া গিয়াছেন। "পক্ষী থালি লইয়া বৌদ্ধচার্য্যের মাথা ভাঙ্গিয়া দিল", এইরূপ ভাবে দুষ্ট দমন তাঁহার অনুমোদিত নয়। যখন মাধাই নিত্যানন্দকে প্রহার করে, তখন পাছে প্রভু ক্রোধ করিয়া মাধাইকে শারীরিক দন্ড করেন, সেই ভয়ে নিতাই বলিয়াছিলেন "প্রভু , যে অপরাধ করে তাহাকে যদি দন্ড দিবা তবে কৃপা কাহারে করিবা? প্রভু, আমি তোমায় স্মরণ করাইয়া দিই যে, এ অবতারে তোমার দণ্ড করিবার অধিকার নাই। তুমি না বারবার বলিয়াছ যে এ অবতারে দণ্ড দিবা না, কেবল কৃপা করিবা?" প্রভু কি ভাবে দক্ষিণে ভ্রমণ করেন, তাহার সেই বর্ণনাটি অতি উপাদেয় বলিয়া, এখানে গোবিন্দের কড়চা হইতে উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

পঙ্কভীলে এইরূপে পবিত্র করিয়া। চলে মোর ধর্মবীর আনন্দে ভাসিয়া।।
অনাহারে শীর্ণ দেহ চলিতে না পারে। তবে প্রভু হরিনাম দেন ঘরে ঘরে।।
সে দেশের লোক সব করে কাই-মাই। তথাপি বিলান নাম চৈতন্য-গোঁসাই।।
কোন অভিলাষ নাই আমার প্রভুর। যখন যেখানে যান সামগ্রী প্রচুর।।
যেই জন প্রভুরে দেখয়ে একবার। ছাড়িয়া যাবার শক্তি না হয় তাহার।।
এমনি প্রভুর শক্তি কি কহিব আর। ভক্তি-সাগরে বাঁধ কাটিল আবার।।
উথলিয়া ভক্তি-সিন্ধু ডুবাইল দেশ। কেহ বা সন্ন্যাসী কেহ হৈল দরবেশ।।
বিরক্ত বৈষ্ণব কেহ হৈলা সেইখানে। আউল-বাউল হয়ে নাচিছে প্রাঙ্গণে।।
এইভাবে নামে মত্ত হয়ে প্রভু মোর। গড়াগড়ি দেন প্রভু হইয়া বিভোর।।
জড় সম কখন না থাকে বাহ্যজ্ঞান। পুলকিত কলেবর কদম্ব সমান।।
আধ নিমীলিত চক্ষু যেন মৃতদেহ। এমন আশ্চর্য্য ভাব না দেখেছে কেহ।।
কাঁটা-খোঁচা নাহি মানে পড়ে আছাড়িয়া। কিভাবে কখন মত্ত না পাই ভাবিয়া।।
ত্রিরাত্রি কাটিয়া গেল গাছের তলায়। অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায়।।
বহিছে হৃদয়ে দরদর অশ্রুধারা। শত ডাকে কথা নাই পাগলের পারা।।
চতুর্থ দিবসে এক রমণী আসিয়া। আতিথ্য করিল তবে আটা-চুণা দিয়া।।

এ সমুদয় কেন? না, জীবকে হরিনাম দিয়া পবিত্র করিতেছেন। যাহারা এরূপ উপকৃত হইতেছে, তাহারা জানিতেছে না যে, তিনি কে? তৎপর সেখানে হইতে তিন ক্রোশ দূরে গিরীশ্বর মন্দিরে গমন করিলেন। কথিত আছে যে, উহা স্বয়ং বিশ্বকর্মা নির্মিত, আরাশিবের বিগ্রহ স্বয়ং ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাপিত।

"বড় এক বিল্ববৃক্ষ আছে সেইখানে। পোয়া পথ জুড়িয়াছে শাখার বিথানে।।"

এই মন্দিরের তিন দিক পর্বত কর্তৃক বেষ্টিত। এখানে একটি সন্ন্যাসীর সহিত প্রভুর মিলন হয়, যাহা শুনিলে বুঝা যায় যে শাস্ত্রে যে যোগীদের কথা বর্ণিত আছে তাহা কল্পিত নয়। সামান্য-সন্ন্যাসী ও ভন্ড-সন্ন্যাসী দেখিয়া-দেখিয়া এখন লোকে আর যোগশাস্ত্র বিশ্বাস করিতে চাহে না। প্রভু এই মন্দিরে দুই দিবস কাটাইলেন,—কিরূপে, না—প্রেমেতে বিভোর হয়ে—

"আছাড়িয়া বিছাড়িয়া পড়েন ধরায়। কভু হাসি কভু কান্না পাগলের প্রায়।।
দরদরে অশ্রু পড়ে ধারা অবিরত।"

দুই দিবস এইরূপ ঘোর অচেতন অবস্থায় প্রভুর কাটিয়া গেল, মোটে চেতন হইল না। তিন দিনের দিন একটি জটাধারী সন্ন্যাসী পাহাড় হইতে নামিলেন। তিনি একেবারে উলঙ্গ। তিনি আসিয়া আপন মনে শিবকে পূজা করিয়া, কাহারও সহিত কোন কথা না বলিয়া, যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া আবার পর্বতোপরি গমন করিলেন। সন্ন্যাসীর দেহটি যেন একখানি "পোড়া-কাঠ"। প্রভু যেই চেতন পাইলেন, তাঁহার সঙ্গী সাহস করিয়া প্রভুকে সেই সন্ন্যাসীর কথা বলিলেন। শুনিবামাত্র প্রভু সেই পর্বতোপরি চলিলেন। প্রভু সচরাচর এক দিনের অধিক কোন স্থানে থাকেন না, এই নির্জন স্থানে যে তিন দিন ছিলেন বোধ হয় সন্ন্যাসীর সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিবেন বলিয়া। প্রভু চলিলেন। ক্রমে পর্বতোপরি যাইয়া দেখেন যে সন্ন্যাসী উলঙ্গ, বৃক্ষতলে বসিয়া, একেবারে ধ্যান মগ্ন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই।

প্রভু প্রথমে সন্ন্যাসীকে বিনয় করিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না। তখন প্রভু দাঁড়াইয়া জোড়হস্তে তাঁহাকে স্তব আরম্ভ করিলেন। ইহাতে সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মীলন করিলেন, করিয়া প্রভুর পানে চাহিলেন। চাহিয়া যেন অতি আনন্দের সহিত হাসিয়া উঠিলেন। এই পোড়াকাষ্ঠের মুখে হাসি, ইহাও এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। কেন হাসিলেন তাহা কে বলিতে পারে? প্রভু বসিলেন। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, "এখানে আতিথ্য গ্রহণ করুন।" প্রভু

কৃষ্ণকথা আরম্ভ করিলেন, এবং ভাবে বিভোর হইলেন,—তাঁহার সর্বাঙ্গ পুলকিত হইল। এবং "চরণে চরণ বান্ধি পড়িল তখন।।"

প্রভু সেই পাথরের উপর পড়িয়া গেলেন—

কপাল ফাটিয়া গেল পাথরের ঘায়। রুধিরের ধারা কত পড়িল ধরায়।।
মুখে লালা বহে কত জল নাসিকায়। জড়ের সমান পড়ি রহে গোরারায়।।

সন্ন্যাসী তখন এক নূতন জগত দেখিলেন। প্রভু আত্মারাম শ্লোক লইয়া কত কাণ্ড করেন, তাহা আপনারা জানেন। এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে, যে সমুদয় আত্মারামগণ সমস্ত গ্রন্থি ছেদন করিয়াছেন তাহারাও তুলসীর গন্ধে আকৃষ্ট হয়েন, অর্থাৎ ভক্তিতে লোভ করেন। এই তত্ত্বটি পূর্বে কেবল শ্লোকে আবরিত ছিল, এখন প্রভু তাহার সারত্ব দেখাইলেন। এই সন্ন্যাসীটি আত্মারাম ও নির্গ্রন্থি বটে। এখন তুলসীর গন্ধ পাইয়া— প্রভুর চরণে পড়ি কান্দিতে লাগিল।।
পোড়াকাষ্ঠ সম দেহ অঙ্গে নাই বাস। খুলিল জটার ভার বহিল নিশ্বাস।।
শ্মশ্রু বহি অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। প্রেমে সেই পোড়াকাষ্ঠ ফুলিয়া উঠিল।।

জ্ঞান হইতে আনন্দ হয়, প্রেম হইতেও আনন্দ হয়। যাঁহারা মনের সমুদয় কমনীয় ভাব নষ্ট করিয়া শুধু যোগ দ্বারা আত্মার পরিবর্দ্ধন করেন, তাঁহারা জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন। তাঁহারা একা, তাঁহাদের সঙ্গী নাই; এমন কি ভগবানও তাঁহাদের সঙ্গী নন। তাঁহারা আপনার আত্মার সহিত রমণ করেন। আর যাঁহারা অন্তরের কমনীয় ভাবগুলি বর্দ্ধন করিতে থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গী জীব মাত্রেই এবং স্বয়ং ভগবান। তাঁহারা ক্রমে প্রেম লাভ করেন, ও শেষে প্রেমানন্দ ভোগ করেন। যাঁহারা জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন, তাঁহারা এক প্রকার গুলিখোর, আনন্দ লইয়া পড়িয়া থাকেন, কিন্তু প্রেমানন্দ হইতে বঞ্চিত। যাঁহারা প্রেমানন্দ ভোগ করেন, জগৎ তাঁহাদের আর জগতের তাঁহারা,—ভগবান তাঁহাদের আর তাঁহারা ভগবানের। তাঁহারা উভয় প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন। প্রেমানন্দ বলিয়া যে কোন বস্তু আছে তাহা জ্ঞানানন্দীরা অবগত নহেন।

এখন সন্ন্যাসী ঠাকুর একবিন্দু প্রেমসুধা আস্বাদ করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু এই সন্ন্যাসী দ্বারা দেখাইলেন যে, যাহারা আত্মারাম ও গ্রন্থি শূন্য, তাঁহারাও তুলসীর গন্ধতে লোভ করেন। পোড়াকাষ্ঠ এখন সরস হইল। রূপ-গর্বিতা স্ত্রী অহঙ্কারে মৃত্তিকায় পা দেন না। কিন্তু তাঁহার রূপে ভাল লোকের আনন্দ হয় না, বিরক্তি হয়। যদি তিনি দৈবাৎ প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া গেলেন, তখন তিনি দীন হইতে দীন হইলেন, আর তাঁহার দর্শন ও ভাব অতি মধুর হইল, তাঁহার হৃদয়ের কমনীয় ভাবগুলি যাহা শুকাইতেছিল তাহা আবার সজীব হইল, আর তাঁহার সৌন্দর্য্য-শক্তি বাড়িয়া উঠিল। সন্ন্যাসীরও ঠিক তাহাই হইল। তখন—

"ছটফট করিতে লাগিল সন্ন্যাসীবর। প্রভুরে নেহারি বলে তুমি সে ঈশ্বর।।"

এই নির্গ্রন্থি আত্মারাম সন্ন্যাসীবরকে শ্রীভগবানের চরণে আনিয়া, প্রভু দ্রুতগতিতে ত্রিপদীনগরে গেলেন। চরিতামৃত সংক্ষেপে এইরূপে প্রভুর ভ্রমণ বর্ণনা করিতেছেন। প্রভু বেঙ্কট হইতে ত্রিপদী আসিয়া শ্রীরাম দর্শন করিলেন। পরে—পানানরসিংহে আইল প্রভু দয়াময়।।

নৃসিংহে প্রণতি স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল। প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল।।
শিবকাঞ্চি আসি কৈল শিব দরশন। বিষ্ণুকাঞ্চি আসি দেখে লক্ষ্মী-নারায়ণ।।
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত বহুত করিল। দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল।।
ত্রিমল্ল দেখি গেল ত্রিকালহস্তি স্থান। মহাদেব দেখি তারে করিল প্রণাম।।
পক্ষতীর্থ যাই কৈল শিব দরশন। বৃদ্ধকোল তীর্থে তবে করিল গমন।।
শ্বেতবরাহ দেখি তারে নমস্কার করি। পীতাম্বর-শিব স্থানে গেলা গৌরহরি।।
শিয়ালী-ভৈরবী দেবী করি দরশন। কাবেরী-তীরে আইল শচীর নন্দন।।

এখন উপরি-উক্ত তীর্থস্থান গুলিতে কি কি লীলা করিলেন বলিতেছি। ত্রিপদী নগরে শ্রীরাম দর্শন করিয়া প্রভু ধূলায় পড়িয়া গেলেন। সেখানে রামায়ৎগণের বাস। সর্বপ্রধান মথুরা-রামায়েত ভারি পন্ডিত। তখনকার দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, সেই সময় দেশে পরম-পন্ডিতের ছড়াছড়ি হইয়াছিল। পূর্বে একস্থানে বলিয়াছি যে, যখন ভারতবাসী বিদ্যাচর্চা ও অধ্যাত্মচর্চা করিতে করিতে চরম সীমায় উপস্থিত হয়েন, প্রভু সেই সময়ে আসিয়া উদয় হইলেন। আমরা দেখিতে পাই যে, সেই সময় কি বাংলা কি পশ্চিম কি উত্তর কি দক্ষিণ, ভারতবর্ষের সকল স্থানেই মহামহপাধ্যায় পন্ডিত কর্তৃক অলঙ্কৃত হইয়াছিল, আর প্রায় সকলেই শঙ্করের ভাষ্য দ্বারা—হয় প্রত্যক্ষে নয় পরোক্ষে—চালিত হইতেছিলেন। মথুরা—"বড়ই তার্কিক বলি নগরে বিদিত।"

তিনি কাজেই প্রভুর নিকট 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে বড়ই মধুর সম্ভাষণ করিলেন। বলিতেছেন—

"মথুরা ঠাকুর, আমি বিচার না জানি। তোমার নিকটে শতবার হারি মানি।।

তিনি বলিতেছেন, "তুমি শ্রীরামের ভক্ত, অবশ্য তোমার নিকট সব তত্ত্ব নিহিত আছে, তুমি কেন আমাকে তাহার কিছু শিক্ষা দাও না? ইহাতে আমার উপকার হইবে, আর শ্রীরামচন্দ্রও তোমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন। বিচারে আমাকে জয় করিবে ভাল, কিন্তু ইহাতে তোমার কি লাভ হইবে? শুষ্ক তর্কে কিছু লাভ নাই। তুমি পরমভক্ত, তোমার জিগীষা শোভা পায় না। ইহা কেমন—না, যেমন শুভ্রবস্ত্রে কালির দাগ। তুমি বরং কিছু ভগবৎ-কথা বল আমি শুনি।" শ্রীভগবানের নাম করিবামাত্র প্রভু আবিষ্ট হইলেন।

"বলিতে বলিতে প্রভু হরিবোল বলি। মাতিয়া উঠিল নামে হয়ে কুতুহলি।।
আছাড় খাইয়া তবে পড়িল ধরায়। অচেতন হইল প্রভু যেন জনপ্রায়।।"

সেই সঙ্গে রামায়তগণ—"নাচিতে লাগিল সবে প্রভুরে বেড়িয়া।"

প্রভু সেখানে অধিকক্ষণ রহিলেন না, উঠিয়া চলিলেন। তখন মথুরা আর তাঁহার পশ্চাৎ ছাড়েন না, তবে সেবার আর যুদ্ধ করিতে নয়। প্রভু অনেক প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। এই ত্রিপদী সেই অবধি অতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ হইল। শেষে প্রভু পানানরসিংহ গমন করিলেন। এই ঠাকুর প্রহ্লাদের প্রভু। সেই ভাবে বিভোর হইয়া প্রভু ঠাকুরকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন নৃসিংহের অধিকারী মাধবেন্দ্র ভূজা প্রভুর গলায় তুলসীর মালা পরাইয়া দিলেন, আর পূজারী দ্রুতগতিতে প্রসাদ আনিয়া প্রভুর সম্মুখে রাখিলেন। প্রভু তাহার কণামাত্র লইয়া "বহুস্তব" করিলেন। স্তব করিতে করিতে তাঁহার দুই পদ্মচক্ষু দিয়া অবিরত আনন্দধারা পড়িতে লাগিল। এখানকার প্রধান ভোগ—চিনিপানা, তাই ঠাকুরের নাম পানানৃসিংহ। প্রভু সেখান হইতে, শিবকাঞ্চি ও বিষ্ণুকাঞ্চি আইলেন। বিষ্ণুকাঞ্চির ঠাকুর লক্ষ্মী-নারায়ণ। তাহার অধিকারী ভবভূতি, ইনি শেঠী,—যেমন ধনবান তেমনি ভক্ত। ইঁহারা সস্ত্রীক ঠাকুরের সেবা করেন। সেবার নিমিত্ত প্রত্যহ দুই মণ ক্ষীরের পায়েস হয়। তাঁহারা ভোগের নিমিত্ত বৎসরে বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন। তাঁহার স্ত্রীর সেবা আরো চমৎকার। তিনি প্রত্যহ সহস্তে মন্দির ধৌত করেন।

বিষ্ণুকাঞ্চি হইতে ছয়ক্রোশ দূরে চারি হস্ত পরিমিত গৌরিপট্টশিব। সেখান হইতে পক্ষগিরি দেখা যায়। তার নীচে পক্ষতীর্থ, ভদ্রা-নদীর ধারে। প্রভু সেই নদীতে স্নান করিলেন, আর সেবা করিলেন—চাম্পি ফল। সে ফল কিরূপ? সেখানে বৃক্ষতলে প্রভু ভৃত্য রজনী বঞ্চিলেন। সে রজনীতে প্রভু এক লীলা করেন। রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় একটি ব্যাঘ্র গর্জন করিতে করিতে তাঁহাদের আক্রমণ করিল। ইনি বোধ হয় পক্ষগিরিতে বাস করিতেন। প্রভু হাস্য করিলেন, ও হরিধ্বনি করিলেন।

"হরিধ্বনি শুনি ব্যাঘ্র লেজ গুটাইয়া। পিছাইয়া গেল এক বনে লম্ফ দিয়া।।"

সেখান হইতে পঞ্চক্রোশ দূরে বালতীর্থ। (চরিতামৃত বলেন "কেবল" তীর্থ)। এখানে বরাহদেবের মূর্তি দর্শন করিয়া প্রভু পুলকিত ও দরদরিতধারা হইলেন।

"পিচকারি সম অশ্রু বহিতে লাগিল। ফুলে ফুলে কান্দি প্রভু আকুল হইল।।"

সেখান হইতে পঞ্চক্রোশ দক্ষিণে সন্ধিতীর্থ, যেহেতু সেখানে নন্দী ও ভদ্রা দুই নদীর সঙ্গম। সেখানে সদানন্দপুরী বাস করেন। তিনি প্রভুর ভক্তি দূষিলেন, আর তিনি বড়-পন্ডিত ও 'সোঽহং—এই গর্ব করিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে তুলসীর গন্ধ শুকাইলেন। অমনি তাঁহার "সদানন্দত্ব" ফুরাইয়া গেল,—তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। ফল কথা, যে ব্যক্তি বলে আমি ঈশ্বর, অথচ একটি পিঁপীড়া দংশন করিলে "বারা-রে মা-রে"করিয়া গড়াগড়ি দেয়, তাহার মত হতভাগ্য জগতে কি কেহ আছে? সদানন্দ বুঝিলেন, অর্থাৎ প্রভু তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ভগবান্ অতি প্রকান্ড বস্তু, আর তিনি কীটাণু; কাজেই আপনি ভগবান্ না হইয়া ভগবান্কে ভজন করাই ভাল। সদানন্দ প্রভুর পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। সেখান হইতে প্রভু চাঁইপল্লী তীর্থে গমন করিলেন। এখানে সিদ্ধেশ্বরী নাম্নী অতি তেজস্বিনী একটি সন্ন্যাসিনী বিল্ববৃক্ষের তলায় বসিয়া একেবারে ধ্যানস্থ। বয়স যেন এক শত বৎসর হইয়াছে। সেখানে শৃগালী বা শেয়ালী বিগ্রহ আছেন। অর্থাৎ এখানে শৃগাল পূজার বস্তু, তাহার নাম "শৃগালী-ভৈরবী"। প্রভু তাহার পর কাবেরী তীরে ও সেখান হইতে নাগর নগরে গমন করিলেন। এই কয়েকটি তীর্থে প্রভু কি কি লীলা করেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থে নাই।

নাগর নগরে বহুতর লোকের বাস। সেখানকার ঠাকুর রামলক্ষ্মণ। প্রভু সেখানে তিন দিবস অনবরত নৃত্যগীত ও নামবিতরণ করেন। ইঁহাতে কি হইল, না—গ্রাম সমেত ভক্তিতে পাগল হইল। অধিকন্তু দশ ক্রোশ হইতে লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। প্রভুর প্রতাপ দেখিয়া সেখানকার একজন ব্রাহ্মণের ঈর্ষা হইল। সে আসিয়া প্রভুকে গালি দিতে লাগিল। বলে, "তুই ভণ্ড সন্ন্যাসী, গ্রামের নির্বোধ লোককে ভুলাইতেছিস, তোকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিব।" প্রভু যখন নদীয়ায় ছিলেন তখন প্রহারের ভয়ে সন্ন্যাসী হয়েন, কিন্তু এখানে দেখিতেছি সন্ন্যাসী হইয়াও নিস্তার পাইলেন না। তবে তিনি ব্রাহ্মণের বাক্যে হাসিতে লাগিলেন। আর সহাস্যে বলিলেন, "তুমি আমাকে মারিবে সে সোজা কথা, কিন্তু অগ্রে তোমায় হরি বলিতে হইবে।" তখন গ্রামের লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে, তাহারা ইহা কিরূপে সহিবে? তাহারা ব্রাহ্মণকে প্রহার করিবে এইরূপ উদ্যোগ করিল। প্রভু তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। তখন সকল লোকে প্রভুর এরূপ বশীভূত হইয়াছে যে, তাঁহার সামান্য ইচ্ছা তাহাদের কাছে ভগবত-আজ্ঞা স্বরূপ অলঙ্ঘ্য হইয়াছে। তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া প্রভু ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন, "শুন দয়াময় ঠাকুর, এ সমুদয় কাজ ভাল নয়, বরং হরি বল, বলিয়া অনন্ত সুখ আহরণ কর। তুমি প্রকৃতপক্ষে ভক্ত, তাহার সন্দেহ নাই; তবে তোমার এরূপ প্রবৃত্তি কেন?

"আমারে আঘাত কর তাতে দুঃখ নাই। প্রাণ ভরে হরি বল এই ভিক্ষা চাই।।"

সকলে দেখিল প্রভুর ক্রোধ নাই, কোন বিকার নাই, বরং যেন হৃদয় দয়াতে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণ বিনা অপরাধে তাঁহাকে যথেষ্ট অপমান করিল, এমন কি অন্যে প্রভুকে রক্ষা না করিলে সত্যই তাঁহাকে সে প্রহার করিত। ইহাতে প্রভু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। বরং পাছে অন্যে বিপ্রকে প্রহার কি অপমান করে, এই জন্য ব্যস্ত হইয়া অতি প্রেমের সহিত সেই ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইহাতে সকলে মুগ্ধ হইল, কিন্তু সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ হইল এই "দয়াময়" ঠাকুর। সে আর থাকিতে পারিল না, "প্রভু, রক্ষা-কর রক্ষা-কর, আমার একি দুর্মতি!" বলিয়া—"প্রভুর চরণতলে পড়িল ধরায়।। এইরূপে ব্রাহ্মণে কৃতার্থ করিয়া। চলিলা চৈতন্যদেব নগর ছাড়িয়া।।"

তথা হইতে সাত ক্রোশ দূরে তাঞ্জোরে গেলেন। যথা, চৈতন্য-চরিতামৃত সংক্ষেপে বলিতেছেন—"শিয়ালি ভৈরবী দেবী করি দরশন। কাবেরী তীরে আইলা শচীর নন্দন।।"

সেখানে গো-সমাজ শিব ও কুম্ভকর্ণের মাথার সরোবর দেখিয়া, প্রভু পরিশেষে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিলেন। তঞ্জোর-নগরে ধলেশ্বর নামক এক ব্রাহ্মণ রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সেবা করেন। তিনি সেই ঠাকুর-বাড়ীর আঙ্গিনায় এক প্রকাণ্ড বকুলবৃক্ষতলে থাকেন, আর অনেক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী সেখানে বাস করেন। গো-সমাজ শিব তাহার বামভাগে থাকেন। ধলেশ্বর প্রভুকে কুম্ভকর্ণ সরোবর দেখাইতে লইয়া গেলেন। এইরূপ প্রবাদ যে, এই সরোবরটি কুম্ভকর্ণের মাথা, আর কিছু নয়। কুম্ভকর্ণ লঙ্কায় মরেন, তাহার অত বড় মাথা তাঞ্জোরে কে বহিয়া আনিল? সেখান হইতে অতি সুন্দর চন্ডালু-পর্বত দেখা যায়। দেখিতে যেন একখানা সুন্দর চিত্র। সেখানে বিস্তর গোফা আছে, আর উহাতে অনেক সন্ন্যাসী থাকিয়া তপস্যা করেন। এইরূপে ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র পর্বতে লক্ষ লক্ষ গোফা ছিল ও এখনও আছে। তবে তখন সেখানে সন্ন্যাসীরা বাস করিতেন, এখন সে সমুদয় ব্যাঘ্র ভল্লুকের বাসস্থান হইয়াছে। দক্ষিণদেশে মুসলমান উপদ্রব তখনও প্রবেশ করে নাই। কাজেই মুসলমানেরা আসিবার পূর্বে ভারতবর্ষের কি অবস্থা ছিল, তাহা তখনকার দক্ষিণদেশ দেখিলে বুঝা যাইত। এই যে প্রভু চলিয়াছেন, ইহাতে প্রতি পদে তীর্থস্থান পাইতেছেন, আর সকল স্থানেই সাধু-সন্ন্যাসী কর্তৃক অলঙ্কৃত। নিকটে একটি ক্ষুদ্র বনে সুবেশ্বর নামক এক সন্ন্যাসী দশজন শিষ্য লইয়া বাস করেন। বনটি অতি মনোহর, বড় বড় গাছ ও একটি ঝরণার দ্বারা শোভিত। সাধু-সন্ন্যাসীরা এইরূপ সুন্দর স্থানে থাকেন। নিকটস্থ গ্রাম হইতে লোকে তাঁহাদের ভিক্ষা যোগাইয়া থাকে। পূর্বে ভারতবর্ষের সকল স্থানে এইরূপ আশ্রম ছিল। প্রভু সেখানে কয় দিন থাকিয়া সন্ন্যাসী কয়েকটিকে প্রেমে উন্মত্ত করিলেন, শেষে সেই বৈকুণ্ঠতুল্য স্থান ত্যাগ করিয়া পদ্মকোটে গেলেন। সেখানে অষ্টভুজা দেবী থাকেন। প্রভুকে দেখিতে বহুলোক আসিল। তাহাদের সহিত দুই এক কথা বলিতে বলিতে এক আশ্চর্য্য অলৌকিক ভাব হইল। প্রভু হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, আর চারিদিকে তাহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। দেবী যেন দুলিতে লাগিলেন, আর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, এবং পদ্মগন্ধে সেই স্থান ভরিয়া গেল, যথা—

বালক যুবক সবে ক্ষেপিয়া উঠিল। অষ্টভুজা দেবী যেন দুলিতে লাগিল।।
পদ্মগন্ধ চারিদিকে লাগিল বহিতে। সেইখানে পুষ্পবৃষ্টি হইল আচম্বিতে।।

পশ্চাতে রমণীগণ ছিলেন, তাঁহারা সেই ফুল কুড়াইয়া কেলি করিতে অর্থাৎ পরস্পরের গাত্রে ফেলিতে লাগিলেন।

এই সমুদয় অলৌকিক কান্ড হইতেছে। সকলে যেন আবেশিত, তাহাদের সম্পূর্ণ চেতন নাই। এমন সময় একটি অন্ধ সাধু ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে আসিয়া প্রভুর পদ-দুখানি জড়াইয়া ধরিলেন, এবং কাতর-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হে জগদীশ্বর, কৃপা কর।" প্রভু বলিলেন, "এখানে জগদীশ্বর কোথা? সম্মুখে জগদীশ্বরী আছেন বটে।" অন্ধ বলিলেন, "প্রভু, আমাকে দয়া কর, আমি চক্ষুভিক্ষা করি না, আমি কেবল একবার তোমার রূপ দেখিব।" প্রভু বলিলেন, "তোমার চর্মচক্ষু নাই, তুমি কিরূপে দেখিব? তবে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সমুদয় দেখিতে পার বটে।" কিন্তু অন্ধ পা ছাড়েন না। তিনি শেষে বলিলেন, "তবে শুনিবে? আমি বহুকাল ভগবতীর আশ্রয়ে এই মন্দিরে পড়িয়া আছি। কল্য নিশিতে আমাকে ভগবতী স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিয়াছেন যে, তুমি আসিতেছ, আর তুমিই অগতির গতি। তাই তোমার চরণে আশ্রয় লইয়াছি। জীব তোমাকে 'দয়াময়' বলে। তুমি তোমার দয়ার গুণে আমাকে তোমার রূপটি একবার দেখাও, আমি আর কিছুই চাই না।" প্রভু অগ্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আবার বলিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, "আমি সামান্য মানুষ, তবে এক হিসাবে আমি ভগবান্, কারণ জীবমাত্রের হৃদয়ে ভগবান্ বাস করেন। কিন্তু তুমি আমাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া অপরাধী করিতেছ।"

অন্ধ বলিলেন, "ও সব কথা থাকুক; আমাকে তোমার রূপ দেখাও।" ইহাই বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তখন প্রভু অস্থির হইলেন। কারণ প্রভু বরাবর একটি বিষয়ে "দৌর্বল্যের" পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, অর্থাৎ লোকের আর্ত্তি শুনিলে অস্থির হইতেন, লোকের আর্ত্তি দেখিতে পারিতেন না। যাহা হউক পরে অন্ধের হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর স্পর্শ পাইবামাত্র অন্ধ শিহরিয়া উঠিলেন, আর তখনি নয়ন মেলিলেন এবং স্থির-নয়নে প্রভুর চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিলেন, এবং তাহার মুখ অতিশয় প্রফুল্ল হইল, আর অমনি অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাহার আর জ্ঞান হইল না, প্রভুকে দর্শন করিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রভু সেই মৃতদেহ বেড়িয়া কীর্তন ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন মহা কলরব হইল, প্রভু অমনি লোকের আগোচরে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তাই তথা হইতে দ্রুতপদে ত্রিপাত্র নগরে গেলেন। ত্রিপাত্র কাবেরীর দক্ষিণে সমুদ্র হইতে একটু দূরে। ইহা চণ্ডেশ্বর শিবের স্থান। সে মন্দিরে একবার ববম্ শব্দ করিলে একদণ্ডকাল পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়। আঙ্গিনায় এক প্রকাণ্ড বিল্ববৃক্ষ আছে, সেখানে অনেক শৈব পণ্ডিত বাস করেন। তাঁহাদের প্রধান পণ্ডিতপ্রবর অতিবৃদ্ধ ভর্গদেব বসিয়া ছিলেন। প্রভু উপস্থিত হইলে অমনি চিনিলেন। প্রভুর যশ প্রভুর আগে আগে চলিতেছে। ভর্গদেব তাঁহার অনুগত জনকে বলিতেছেন, "তোমরা চৈতন্যের কথা শুনিয়াছ, যাঁহার প্রতাপে দেশে আর পাপী রহিল না। যিনি হরিনামে জগৎ মাতাইতেছেন, তিনি স্বদেশ ছাড়িয়া এ দেশ উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। যেমন শুনিয়াছে তাই বটে, এমন সুন্দর চিত্তাকর্ষক বিগ্রহ তোমরা কি কখন দেখিয়াছ?" প্রভু অগ্রে দাঁড়াইয়া আছেন, আর ভর্গ তাঁহাকে শুনাইয়া এই সব কথা বলিতেছেন। পরে বলিলেন, "না হবে কেন, উনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার। এস আমরা সকলে উহাকে প্রণাম করি।" ইহাই বলিয়া সকলে প্রণাম করিলেন। প্রভু অমনি প্রতিপ্রণাম করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিতেছেন, "ভর্গদেব, আপনি আমাকে বড় অপরাধী করিতেছেন। আমার নাম চৈতন্য বটে, আমার বাড়ী বঙ্গদেশে নদীয়ায়। আমি অতি ক্ষুদ্র জীব।" তখন ভর্গ বলিতেছেন, "আমি অতি বৃদ্ধ, আমাকে উদ্ধার করিতে এখানে আসিয়াছ, আমার সঙ্গে লুকোচুরি ভাল নয়। আমি তোমাকে চিনেছি, আমার মাথায় চরণ তুলিয়া দাও। কি সৌভাগ্য! কি তোমার কৃপা!" ইহা বলিয়া ভর্গ ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। প্রভু আর করেন কি,—সেখানে তাঁহার সাত দিন থাকিতে হইল। সমুদয় শৈবগণকে মালাধরণ এবং কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করাইয়া তবে তাহাদিগকে ছাড়িলেন। গোবিন্দ তাঁহার কড়চায় বলিতেছেন যে, প্রভুকে দেখিবামাত্র যে লোকে আকৃষ্ট হয়, তাহার অনেক কারণ ছিল। যথা—

আমার প্রভুর কথা কি কহিব আর। আশ্চর্য্য প্রভাব তার বিচিত্র আকার।।
দিনান্তে সামান্য ভোজন করে গোরারায়। না খাইয়া দেহ ক্ষীণ যষ্টির প্রায়।।
অস্থি চর্ম অবশিষ্ট হইয়াছে তাঁর। তথাপি দেহের জ্যোতি অগ্নির আকার।।
মোহিত সকলে হয় অঙ্গের আভায়। অহেতুক পদ্মগন্ধ সদা তার গায়।
যে জন তাঁহার প্রতি আঁখি মেলি চায়। তেজের প্রভাবে চক্ষু ঝলসিয়া যায়।।

ভর্গদেব প্রভুর সঙ্গে আসিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভু অনেক বিনয় করিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন।

লক্ষ লক্ষ লোকে আসে প্রভুকে দেখিতে। কাতর না হয় প্রভু কৃষ্ণনাম দিতে।।
ক্ষেপা হরিবোলা বলে প্রভুকে সকলে। খেপাইতে কত লোক হরিবোল বলে।।
হরি বলি কত লোক পিছু পিছু ধায়। নাম শুনি প্রভু মোর ধূলি মাখে গায়।
কেহ বলে ওরে ভাই সেই ক্ষেপা যায়। হরি হরি বলি সবে খেপাও উহায়।।
আরম্ভিল খেপাইতে সব শিশুগণ। সেই সঙ্গে নাচে প্রভু শচীর নন্দন।।

বালকগণ প্রভুকে কিরূপে হরি বলে খেপাইত পূর্বে তাহা বলিয়াছি। তাহারা প্রভুর নাম

"খেপা হরিবোলা" দিয়াছিল। বালকগণ বলে "হরি হরি বোল", আর পরস্পর বলাবলি করে, "এই দেখ পাগল খেপে আর কি।" প্রভু তাহাদের ভাব বুঝিয়া বসিয়া গায়ে ধূলা মাখেন, কখন নৃত্য করেন, কখন ধূলায় গড়াগড়ি দেন। আমার প্রভু যখন এই চপল ও সরল বালকের ন্যায় হয়েন, তখনই সর্বাপেক্ষা মনোহর হয়েন।

সেখান হইতে প্রভু পঞ্চাশ-যোজন ব্যাপী একটি মহাবনে প্রবেশ করিলেন। আহার কেবল বনফল, তাহারও অভাব ছিল না! তিন দিবস মনুষ্যের মুখ দেখা গেল না, পরে এক সন্ন্যাসীর দলের সহিত দেখা হইল। তখন সকলে একত্রে চলিলেন, আর বন পার হইয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এই নগরে আমরা প্রকাশানন্দ ও গোপালকে পাই। সমুদ্রতীর ত্যাগ করিয়া পঞ্চদশ দিবস বন পার হইয়া সকলে শ্রীরঙ্গক্ষেত্র পঁহুছিলেন।

সেইখানে ভট্ট নামে এক বিপ্রবর। প্রভুরে লইয়া গেল আপনাঁর ঘর।।
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে। তাহা দেখি ব্রাহ্মণ পুলক অন্তরে।।

ইঁহার নাম বেঙ্কট ভট্ট। ইহার পুত্র গোপাল ভুট্ট, বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর একজন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী এই বেঙ্কট ভট্টের সহোদর, যাহার প্রভুদত্ত নাম প্রবোধানন্দ। গোপাল ভট্ট ও প্রবোধানন্দ—এই দুইজনের অদ্ভুত জীবন আমি যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিয়াছি। তাহাতে লেখা আছে যে, প্রভু বেঙ্কটের বাড়ীতে চাতুর্মাস্য করেন। আমি যেমন পড়িয়াছিলাম, তেমনি লিখিয়াছিলাম, এখন আমার বোধ হইতেছে সেটি ভুল। প্রভু বৈশাখে নীলাচল ত্যাগ করিয়া মাঘ মাসে প্রত্যাগমন করেন। যে বৎসর গমন করেন, সেই বৎসর যদি প্রত্যাগমন করেন, তবে তিনি মোট দশ মাস দক্ষিণে ছিলেন। তাহার মধ্যে চারিমাস যদি বেঙ্কটের বাড়ীতে অতিবাহিত করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সমুদয় দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া পরে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন কি এত অল্প সময়ে সম্ভব হয়? তাহা হয় না। তিনি কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত যাইয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম ধার দিয়া ঘুরিয়া দ্বারকায় গমন করেন। সেখান হইতে নীলাচল প্রত্যাবর্তন করেন। সুতরাং তিনি দক্ষিণে অষ্টাদশ মাস ছিলেন। যদি চাতুর্মাস্য নিয়ম তিনি পালন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার আর একবার উহা পালন করিতে হইয়াছিল। সে কোথা? যদি কোথাও করিয়া থাকেন তবে এই দুইবার চাতুর্মাস্য করিতে তাঁহার আট মাস লাগিয়াছিল। তিনি কি তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে ছাড়িয়া অষ্ট মাস দক্ষিণে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন? তিনি কি চুপ করিয়া থাকার বস্তু? তিনি চলিয়াছেন—দৌড়িয়া; তাঁহার ক্ষুধার ভয় নাই, অনিদ্রার ভয় নাই, ব্যাঘ্রের ভয় নাই, তবে বৃষ্টি কি তাঁহার এত ভয়ের কারণ হইয়াছিল? আসল কথা, তাঁহার চাতুর্মাস্যের কথা কেহ বলেন নাই।

প্রভু বেঙ্কটের বাড়ীতে অবশ্য কিছুকাল ছিলেন, আর বালক গোপাল তাঁহার সেবা করিতেন। যখন প্রভু সেই স্থান ত্যাগ করেন, তখন বেঙ্কট ও গোপাল দুই জন প্রভুর পিছু লাগিলেন, কিন্তু প্রভু উভয়কে নিরস্ত করিলেন। গোপালকে বলিলেন, "তোমার পিতামাতার অদর্শন ঘটিলে তুমি বৃন্দাবনে গমন করিও। সেখানে আমি তোমার সংবাদ লইব। তাই ইহার কয়েক বৎসর পরে গোপাল বৃন্দাবনে গমন করেন। চরিতামৃত বলেন যে, সেই তীর্থে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করিতে বড় ভালবাসিতেন। কিন্তু নিজের বিদ্যা অধিক ছিল না, তাই অশুদ্ধ পড়িতেন, লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত। তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইতেন না, কারণ—

আবিষ্ট হইয়া পড়ে আনন্দিত মনে। পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠনে।।

মহাপ্রভু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আমি শুনিতে চাই, গীতার কোন্ অর্থে আপনার এত সুখ হয়?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি মুর্খ, অর্থ কিছু বুঝি না। তবে যখন আমি পড়ি, তখন দেখি অর্জুনের রথে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন। তাহাই দেখিয়া

আমার এত আনন্দ হয় যে, গীতা না পড়িয়া থাকিতে পারি না।" প্রভু তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তোমারি গীতা-পাঠে অধিকার আছে। তুমিই ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝ।" তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বুঝেছি, তুমিই ত সেই কৃষ্ণ।" গোবিন্দের কড়চায় এই কাহিনীটি এইরূপে বর্ণিত আছে। অর্জুনমিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ গীতা পাঠ করেন, অথচ আনন্দে বিচলিত হয়েন। যথা—

প্রভু বলে কেন কান্দ ব্রাহ্মণ-ঠাকুর। বিপ্র বলে গীতা পড়ি আনন্দ প্রচুর।।
অর্জুনের রথে কৃষ্ণে দেখিবারে পাই। সেই লোভে গীতা পড়ি সন্ন্যাসী গোসাঞি।।
প্রভু বলে কৃষ্ণ তুমি পাও দরশন। তবে মোরে দয়া করি দাও আলিঙ্গন।।
বিপ্র বলে তুমি কৃষ্ণ কৃতার্থ করিলা। এত বলি পদযুগ সাপটি ধরিলা।।

সেখানে প্রভু শুনিলেন যে—বৃষভ পর্বতে থাকে পরমানন্দপুরী। তাঁহাকে দেখিতে প্রভু হৈলা আগুসারি।। পুরিসহ কৃষ্ণ-কথা বহুত কহিলা।

চরিতামৃতে পুরী গোসাঞির সম্বন্ধে আছে—

"তিন দিন প্রেমে দোহে কৃষ্ণ-কথা রঙ্গে। এক বিপ্র-ঘরে দোহে রহে এক সঙ্গে।।
তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয়। নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয়।।

অর্থাৎ প্রভু আর পরমানন্দপুরী তিন দিবস এক ব্রাহ্মণের বাড়ী থাকিয়া কৃষ্ণ-কথায় বিহ্বল ছিলেন। প্রভু বলিলেন, "চলুন, নীলাচলে একত্র থাকিব।"পরমানন্দপুরী অবশ্য এই প্রস্তাবে কৃতার্থ হইলেন।

এই পরমানন্দপুরীর প্রতি প্রভু এত সদয় কেন? তাহার কারণ—ইনি ও প্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরী ধর্ম্মভাই। তাঁহারা মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, আর উভয়ই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। তাই পরমানন্দপুরীকে প্রভু প্রণাম করিলেন, আর নীলাচলে যাইতে অনুরোধ করিলেন। এই পুরী-গোসাঞি চিরদিন প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস করেন। ভক্তগণ ভাবিতেন যে, বিশ্বরূপের তেজ তাঁহাতে ছিল। অর্থাৎ পুরী-গোসাঞির হৃদয়ে প্রভুর দাদা বিশ্বরূপ প্রবেশ কবিয়া, কনিষ্ঠ নিমাই-র কার্য্যের সহায়তা করেন।

প্রভু সেখান হইতে কামকোটি, এবং তথা হইতে দক্ষিণ-মথুরা আইলেন। কৃতমালা নদীতে স্নান করিয়া এক রামভক্ত ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণে তাঁহার বাড়ী প্রভু উপস্থিত হইলেন। ইনি শুধু রামভক্ত নন, রামের নামে একেবারে পাগল। ব্রাহ্মণ কিছু পাক করিতেছেন না দেখিয়া প্রভু বলিলেন, "কি ঠাকুর, আমার ভিক্ষা কই, পাক করিতেছেন না কেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "পাক কি করিব? এ বনে সামগ্রী কোথায়? লক্ষ্মণ বনে গিয়াছেন। তিনি যাহা কিছু আনিতে পারেন তাহা সীতা পাক করিবেন।" প্রভু দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ আপনাকে শ্রীরাম ভাবিতেছেন। সে যাহা হউক, ক্রমে ব্রাহ্মণের চেতন হইল, তিনি পাক করিয়া তৃতীয় প্রহরে প্রভুকে ভিক্ষা দিলেন। সেই ব্রাহ্মণ উপবাস করেন, তাঁহার দুঃখ যে, রাবণ সীতাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। প্রভু তৎপরে রামেশ্বর তীর্থে আসিলেন। সেখানে একখানি পুঁথিতে দেখিলেন, রাবণ যে সীতা হরণ করে সে মায়া সীতা। প্রভু সেই পাতা নকল করিয়া, এবং সেই সঙ্গে সেই পুরাতন পাতাখানা সেই ব্রাহ্মণকে আনিয়া দিয়া তাঁহার দুঃখ মোচন করিলেন।

প্রভু রামনদে আসিয়া, সেখানে রামের চরণ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পরে রামেশ্বরে শিবদর্শন করিলেন। বহুতর পণ্ডিত উদাসীন সেখানে বাস করেন। তাহার মধ্যে যিনি বড় পণ্ডিত তিনি অবশ্য 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু তখনি পরাজয় স্বীকার করিয়া বলিলেন, "তোমার সহিত বিচারে আমি পারিব কেন? তুমি আমাপেক্ষা খুব বড় পণ্ডিত।" প্রভুর এইরূপ বিনয় দেখিয়া সে একটু স্তম্ভিত হইল, হইয়া ভাবিতে লাগিল। প্রভু তাহা দেখিয়া বলিতেছেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর ভাবিতেছ কি? বিচার ছাড়, যাহাতে ভগবৎ-চরণে

প্রীতি হয় তাই কর। বিচারে অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়, আর অহঙ্কার বৃদ্ধি হইলে, দর্পহারী ভগবান্ আছেন, বুঝিলে ত?" বলিতে বলিতে, প্রভু আবেশিত হইলেন, আর সেই অবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে—

পড়িলে চৈতন্য প্রভু আছাড় খাইয়া। পাথরের ধারে গেল থুতনী কাটিয়া।।
দরদর রক্তধারা পড়িতে লাগিল। যতনে পণ্ডিতবর মুছাইয়া দিল।।

সেখানে তিন দিন থাকিয়া তাহাদিগকে ভক্তি দিয়া, প্রভু মাধিবনে গমন করিলেন। শুনিলেন, সেখানে একজন উচ্চশ্রেণীর সন্ন্যাসী আছেন। প্রকৃতই তিনি যোগসিদ্ধ ও অতিবৃদ্ধ, শ্বেত-শ্মশ্রুতে তাঁহার হৃদয় আবৃত ও তিনি ধ্যানস্থ। তাঁহার মুখে কোন শব্দ নাই। তিনি বসিয়া আছেন বৃক্ষতলে, সেই তাঁহার ঘর। প্রভু তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন দিন ধ্যানস্থ থাকিবার পরে সন্ন্যাসী সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কিঞ্চিৎ ফলমূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন। সন্ন্যাসী যে দিন প্রথম ধ্যানস্থ হয়েন, সেইদিন প্রভু গিয়াছিলেন। তাই তিনি তিন দিন রহিলেন। সন্ন্যাসী চেতন পাইলে, অমনি প্রভু কথা কহিতে লাগিলেন। কি যে কথা হইল, তাহা কোন গ্রন্থে নাই।

দুই চারি কথা কহি যোগী মহাজন। "চাম্পনি শিউড়ি" বলি হাসিল তখন।।
চাম্পনি শিউড়ি বলি অতি শুদ্ধ মনে। হাসিয়া প্রণাম করে প্রভুর চরণে।।
প্রতি-নমস্কার করি মোর গোরারায়। আনন্দে ভাসিয়া তবে কৃষ্ণগুণ গায়।।

তিনি প্রভুকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিলে অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও তটস্থ হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু সেখানে সাত দিন ছিলেন, কিন্তু কি করিলেন, কি বলিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই। তখন মাঘ মাস। প্রভু বৈশাখে নীলাচল ত্যাগ করেন, দশ মাস পরে রামেশ্বরে আইলেন, তাহার প্রমাণ এই যে, মাঘীপূর্ণিমায় তাম্রপর্ণীর মেলায় প্রভু স্নান করেন। তাঁহার পরে চৈতন্য-চরিতামৃতকার সংক্ষেপে এইরূপ প্রভুর তীর্থদর্শন বর্ণনা করিতেছেন। যথা—

তথা আসি স্নান করি তাম্রপর্ণী তীরে। নব ত্রিপদী দেখি বুলে কুতুহলে।।
চিয়ড়তলা তীর্থে দেখি শ্রীরামলক্ষ্মণ। তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন।।
গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্তি। পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখি সীতাপতি।।
চাম্‌তাপুর আসি দেখি শ্রীরামলক্ষ্মণ। শ্রীবৈকুণ্ঠে আসি কৈলা বিষ্ণু দরশন।।
মলয় পর্বতে কৈল অগস্ত্য-বন্দন। কন্যাকুমারী তাহা কৈল দরশন।।

তাহার পরে আম্‌লকিতলাতে রাম দেখিয়া পরে পয়স্বিনী তীরে, আর তথা হইতে আদিকেশব মন্দিরে গেলেন। সেখানে সেই অমূল্য গ্রন্থ "ব্রহ্মসংহিতা" পাইলেন। আবার বলিতেছেন— "পয়স্বিনী আসিয়া দেখে শঙ্কর-নারায়ণে। শৃঙ্গেরিমঠে আইলা শঙ্করাচার্য্য স্থানে।। মৎসতীর্থে দেখি কৈলা তুঙ্গভদ্রায় স্নান।"

গোবিন্দের কড়চায় আছে, প্রভু পয়স্বিনীতে শিব-নারায়ণ দেখিয়া, শঙ্করাচার্যের মঠে শঙ্করের শিষ্যাগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, মৎস্যতীর্থে, তথা হইতে কাচাড়ে, তাহার পরে নাগপঞ্চনদীতীরে, ও চিতোলে, পরে তুঙ্গভদ্রীতীরে ও কোটিগিরিতে, শেষে চণ্ডপুরে গেলেন।

প্রভু কন্যাকুমারীতে সমুদ্র-স্নান করিয়া বড় একদল সন্ন্যাসীর সহিত পঞ্চদশ ক্রোশ হাটিয়া সাঁতাল পর্বতে গমন করিলেন। সেখানে একজন শেঠি আসিয়া সকল সন্ন্যাসীকে দুগ্ধ আটা দিলেন। সে এক দিন ছিল যখন দেশের প্রত্যেক শতের মধ্যে পঁচাত্তর জন পরিশ্রম করিত, আর পঁচিশজন তাহাদের দ্বারা পালিত হইয়া ধর্মযাজন করিতেন। এই সন্ন্যাসীদিগের সহিত প্রভু মিলিত হইলেন না, তবে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ত্রিবাঙ্কুর দেশে প্রবেশ করিলেন। সে দেশবাসীরা পরম হিন্দু, তাঁহারা অতিথিকে অভ্যর্থনা না করা মহাপাপ মনে করিতেন। তথাকার রাজার নাম রুদ্রপতি। তিনি ভারি ঐশ্বর্য্যশালী, বদান্যতাও তাঁহার সেইরূপ। দেশে অতিথির ত কোন দুঃখ

নাই। আবার নগরের তিন স্থানে রাজার ব্যয়ে তিনটি অন্নছত্র আছে। সেখানে যে যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারে। সকলেই রাজার সুখ্যাতি করে, বলে রাজা যেমন প্রজাপালক তেমনি ভক্ত। সন্ধ্যাকালে প্রভু ত্রিবাঙ্কুরে গমন করিলেন, যাইয়া এক বৃক্ষতলে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখনি একজন ভাগ্যবন্ত লোক আহারীয় আনিয়া দিল।

প্রাতে প্রচার হইল যে, এক অপরূপ সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। ক্রমে লোক জুটিতে লাগিল, আর তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া জোড়হস্তে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রভু ভাবে গরগর হইয়া সেখানে বসিয়া রহিলেন। "নয়নের কোণ বাহি অশ্রুধারা পড়ে। রোমাঞ্চিত কলেবর পুলক অন্তরে।।"

ক্রমে গ্রাম্যলোক স্তবস্তুতি আরম্ভ করিল, আর তাঁহাকে বাড়ী লইবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। কেহ বা সেইখানেই আহারীয় দ্রব্য আনিয়া দিল। কিন্তু প্রভু তখন ভাবে বিভোর, নয়ন মেলিলেন না। শেষে তর্কপ্রয়াসী একজন আসিলেন; তিনি অবশ্য ব্রহ্মবাদী। ক্রমে রাজাও ইহা শুনিলেন এবং প্রভুকে আনিতে দূত পাঠাইলেন। রাজদূত প্রভুকে ধরিয়া লইয়া যাইবে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিল। কিন্তু প্রভু যাতে অস্বীকার করিলেন। রাজদূত বলিল, "সন্ন্যাসী, তুমি বড় নির্বোধ, রাজা ডাকিতেছেন, তোমার ভাগ্য। তুমি গেলে প্রচুর অর্থ পাবে।" প্রভু বলিলেন, "আমার অর্থের প্রয়োজন নাই। আমি সন্ন্যাসী, আমার বিষয়ীর সহিত সংসর্গ করিতে নাই।" দূত প্রভুকে সরলভাবে ভাল পরামর্শ দিতে গিয়াছিল। তাহাতে ধন্যবাদ পাইল না, বরং রুক্ষ কথা শুনিল, কাজেই ক্রুদ্ধ হইল। শেষে দূত বলিল, "বটে! তোমার মজা দেখাইতেছি।"

"এই কথা বলি তবে দূত করি ক্রোধ। রাজদ্বারে চলি গেল দিতে প্রতিশোধ।।"

দূত যাইয়া প্রভুর নামে নানা কথা বলিল। এমন কি, যাহা প্রভু বলেন নাই তাহাও বলিল। কিন্তু রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। সন্ন্যাসীর সম্বল কৌপিন, আর তিনি রাজা; কিন্তু সন্ন্যাসী তাহাকে গ্রাহ্য করিল না, এরূপ তিনি ত কখনও দেখেন নাই। এরূপ সন্ন্যাসী যে আছেন তাহা তাঁহার বিশ্বাসও ছিল না।

"সন্ন্যাসী হেরিতে চলে রাজা রুদ্রপতি। ভক্তিভরে বাহিরিয়া আসে শীঘ্রগতি।।
হস্তী অশ্ব তেয়াগিয়া অতি দূরদেশে। সন্ন্যাসীর কাছে আসে অতি দীন বেশে।।
দুই চারি মন্ত্রী সহ রাজা মহাশয়। প্রভুর নিয়ড়ে আসি ভক্তিভরে কয়।।
জোড়হস্তে রুদ্রপতি কহে বার বার। দয়া করি অপরাধ ক্ষমহ আমার।।
না বুঝিয়া ডাকিয়া ছিলাম আপনারে। সেই অপরাধ মোর ক্ষম কৃপা করে।।
জ্ঞান শিক্ষা দেও মোরে অধম-তারণ।"

রাজার সঙ্গে আবার ধর্মশাস্ত্রবেত্তাও দুইচারি জন পণ্ডিত ছিলেন। রাজা বৈষ্ণব এবং ভাগবতে পণ্ডিত। প্রভু বলিলেন, "রাজা, তুমি বড় ভাগ্যবান, আমার নিকট কি জ্ঞান চাও? আমি জ্ঞান জানি না, আমি জানি কেবল—রাধাকৃষ্ণ।" যেই প্রভু "রাধাকৃষ্ণের" নাম লইলেন, অমনি যাহা হইবার তাহা হইল—অর্থাৎ

"লইতে কৃষ্ণের নাম প্রেম উপজিল। দরদর অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত প্রভু অমনি উঠিয়া। নাচিতে লাগিল দুই বাহু পসারিয়া।।
হরিবোল বলে গোরা অজ্ঞান হইয়া। নাচিতে নাচিতে পড়ে আছাড় খাইয়া।।
পাছাড়িয়া রাজা তবে প্রভুরে তুলিলা। সেই সঙ্গে মহারাজ মাতিয়া উঠলা।।
হরি বলি মহারাজ নাচিতে লাগিল। নয়নের জলে তার হৃদয় ভাসিল।।
রোমাঞ্চিত কলেবর পুলকে পূরিল। ধূলায় পড়িয়া অঙ্গ ধূসর হইল।।
দেখিয়া রাজার ভক্তি আমার নিমাই। কোল দিয়া রাজারে বলেন এস ভাই।।

হরি নামে যার চক্ষে বহে অশ্রুধারা। সেই জন হয় মোর নয়নের তারা।।
দেখিয়া তোমার ভক্তি রাজা মহাশয়। জুড়াল আমার প্রাণ জানিহ নিশ্চয়।।"

প্রভু সেখান হইতে শীঘ্র বিদায় লইলেন, কারণ রুদ্রপতি রাজা। প্রতাপরুদ্র নীলাচলে এইরূপ প্রভুকে একবার স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাই প্রভু বলিয়াছিলেন, "ছি! আমার বিষয়ীর স্পর্শ হইল!" কিন্তু রুদ্রপতির সহিত আর এক ভাব কেন? ইহার কারণ; প্রতাপরুদ্রের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা প্রয়োজন ছিল, কারণ সেখানে তাঁহাকে থাকিতে হইবে।

পূর্বে বলিয়াছি, প্রভু কোটগিরি ত্যাগ করিয়া চন্ডপুরে গমন করিলেন। বামে সত্যগিরি পর্বত রাখিয়া প্রভু নগরে প্রবেশ করিলেন, আর এক বটবৃক্ষতলে বসিলেন। কারণ সেখানে একজন বড় সন্ন্যাসী আছেন। অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিয়েছেন, ও তাঁহাকে কৃপা করার ইচ্ছা হইয়াছে। সেই সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হইল। তাহার এক কর্ণে সোণার কুণ্ডল, সন্ন্যাসীর নাম ঈশ্বর ভারতী। তিনি আসিয়া প্রভুর নিকট মায়াবাদ-তত্ত্ব কহিতে লাগিলেন। লোকটি সরল। তাঁহার ইচ্ছা প্রভুর কি মত শ্রবণ করেন। কিন্তু প্রভুকে দর্শনমাত্র তাহার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। তাহা এই যে, নূতন সন্ন্যাসী তাঁহা অপেক্ষা অনেক উন্নত। আবার প্রভু যেমন যাইতেছেন, তাঁহার সুখ্যাতি তেমনি অগ্রে অগ্রে চলিতেছে। সুখ্যাতি এইরূপ যে, সন্ন্যাসী একজন পরম রূপবান, পরম পন্ডিত ও পরম ভক্ত। তিনি দেশ সমেত লোককে হরিবোলা করিতেছেন, তাঁহার প্রতাপে দেশে আর পাপী তাপী থাকিতেছে না। অতএব তাঁহার নিকট তাঁহার এরূপ শক্তির কারণ জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য। সে কথা সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলে পারিতেন। কিন্তু মনে অভিমান থাকায় তাহা পারিলেন না। তাই তর্ক উঠাইয়া প্রকারান্তরে প্রভুর সাধন ভজন কি, ও তাহার ভিত্তিভূমি কি ইত্যাদি জানিয়া লইবেন এই ইচ্ছা। অবশ্য প্রভু সন্ন্যাসীর মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারিলেন, তাই সন্ন্যাসীর কথায় কোন উত্তর না দিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পাঠকের মনে আছে যে, একদিন শচীজননীর ইচ্ছা হইল যে, নিমাইকে কথা বলাইয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত করিবেন, কারণ তাহার কথা মধু হইতে মধু। কিন্তু ধূর্ত নিমাই তাহা বুঝিতে পারিয়া মোটে কথা বলিলেন না। এই সম্বন্ধে আমার একটি কবিতা আছে। বড় পীড়াপীড়ি করিলে নিমাই কেবল মাথা নাড়িতে ও হাসিতে লাগিলেন। তখন শচী রাগ করিযা হাতে ঠেঙ্গা ধরিলেন, আর নিমাই দৌড় মারিলেন।

এখানেও প্রভু সন্ন্যাসীঠাকুরের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, ও অল্প অল্প হাসিতে লাগিলেন। তখন শচী যেরূপ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসীও তাই করিলেন; অবশ্য ঠেঙ্গা ধরিলেন না, তবে ক্রোধ করিলেন, করিয়া প্রভুকে নানা মন্দ বলিতে লাগিলেন। এই সম্বন্ধে কড়চার বর্ণনা অতি সুন্দর, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

"অল্প হাসিল প্রভু মুখ ফিরাইয়া।।
ভাল মন্দ নাহি কহে প্রভু বিশ্বম্ভর। বিরক্ত হইয়া অবশেষে সন্ন্যাসীবর।।
প্রভুকে কহেন তুমি নাহি কহ বাণি। সুপন্ডিত বলিয়া তোমারে নাহি মানি।।
সর্বলোকে বলে তুমি বড়ই পন্ডিত। মুহি দেখি জ্ঞান নাহি তোমার কিঞ্চিত।।
দেশে শুদ্ধ হরিবোলা করিয়াছ তুমি। তোমার কিঞ্চিৎ গুণ নাহি দেখি আমি।।
শুনেছি শাস্ত্রজ্ঞ, কিন্তু মুখে নাহি কথা ভ্রমিয়া বেড়াও ভিক্ষা করি যথাতথা।।
বিদ্যা নাহি জ্ঞান নাহি বিচার করিতে। তবে কেন মূর্খ লোকে ভোলে আচম্বিতে।
কি জানি কেমন ছলে কৌশল করিয়া। সৃষ্টিতত্ত্ব সর্বলোকে দেও দেখাইয়া।।
এ দেশের মূর্খলোকে হরিবোলা করি। কেমনে যাইবে তুমি বুঝিব চাতুরী।।
শক্তি যদি থাকে তবে করহে বিচার। এইবারে বুদ্ধিশুদ্ধি বুঝিব তোমার।।
এত বলি ভারতী গোসাঞি দৌড় দিল। তিন সঙ্গী সহ পুনঃ আসিয়া মিলিল।।

চারিজনে বসিল প্রভুর চারিভিতে। এই বঙ্গ দেখি প্রভু লাগিল হাসিতে।।
ভারতী বলিল তুমি উড়াও হাসিয়া। মুহি যাহা বলি তাহা দেহ আলোচিয়া।।"

ভারতী বলিতেছেন, "এই তিন জন মধ্যস্থ রহিলেন। তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও যে আমাদের উপাস্য কে?"

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রভু কখন বা কাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বশীভূত করিতেন, তাহার উদাহরণ এই একটি দেখুন। প্রভু তখন রহস্য ভাব ছাড়িয়া দিলেন, দিয়া গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "হে পন্ডিত! আমি বিচার জানি না. তাহাতে আবার তুমি অত বড় পন্ডিত, তোমার নিকট আমি শত বার হার মানিলাম। তদ্ যথা -"চাহ যদি জয়পত্র লিখে দিতে পারি। তোমার বিচারে আমি মানিলাম হারি।।"

যোগীর বিচার ইচ্ছা নয়, জয়ও ইচ্ছা নয়। তাঁহার প্রার্থনা জ্ঞান উপার্জন, তাই কাতর ভাবে প্রভুর পানে চাহিতে লাগিলেন। তখন প্রভুর দয়া হইল। প্রভু বলিলেন,"আমি ভগবান্, আমিও যে তিনিও সে—এ সমুদয় দম্ভ ত্যাগ কর। করিয়া সেই মধু হইতে মধু যে ভগবান্ তাঁহাকে ভজনা কর। তাহা হইলে শান্ত হইবে, সুখও পাইবে।" ইহা বলিয়া প্রভু কৃষ্ণকথা, অর্থাৎ কৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। একে কৃষ্ণের কথা, তাহাতে আবার প্রভুর মুখে, কাজেই সুধাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভক্তগণ অবশ্য জানেন যে, যাহার ভক্তি উদয় হয় তাহার সমুদয় লাবণ্যময় হয়, স্বরও মধুর হয়। আবার এরূপ অবস্থাপন্ন ভক্তের মুখে কৃষ্ণনাম কি মধুর তাহা যিনি শুনিয়াছেন তিনিই জানেন। তাই পদে আছে, "কেবা শুনাইল শ্যাম নাম?" তাই পদে আছে "লইতে কৃষ্ণ-নাম জিহ্বা নাচে অবিরাম।" প্রভু কৃষ্ণকথা কহিতে আরম্ভ করিয়া ভাবে একেবারে বিভাবিত হইলেন। যেমন প্রাচীন পদে আছে—

"রাইধনী কৃষ্ণকথা হইতে ছিল। কথা কইতে কইতে মুরছিল।" সেইরূপ কৃষ্ণকথা কইতে কইতে প্রভুর কথা ঘন হইয়া আসিল, তিনি গদগদ হইলেন, কথা বলিতে যান বলিতে পারেন না, শেষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কাজেই কৃষ্ণকথা বন্ধ হইল।

পড়িতে লাগিল অশ্রু হৃদয় বহিয়া। কৌপিনের গ্রন্থি ক্রমে যাইল খসিয়া।।
থর থর হৃদ্‌কম্প শরীর ঘামিল। কৃষ্ণ বলি ডাক দিয়া ঢুলিতে লাগিল।।
কৃষ্ণ হে কোথায় আছ প্রভু দয়াময়। ভক্তি বিতরিয়া কর বিশুদ্ধ হৃদয়।।
এই কথা বলি প্রভু কান্দিতে লাগিল। মনের আবেগ ক্রমে দ্বিগুণ বাড়িল।।
ভাল মন্দ কথা নাহি শুনে বিশ্বম্ভর। ফুলে ফুলে কান্দিতে লাগিল নিরন্তর।।
তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া। কৃষ্ণ বলে ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয়া।।

তখন যাহা হইবার তাহাই হইল—যোগী প্রভুর চরণে পড়িলেন। বলিতেছেন, "আমি বিচার চাই না, আমি জয় চাই না, আমি চাই ভক্তি। কিন্তু প্রভু তখন সে সমুদয় কিছু শুনিতে পাইতেছেন না। তবে,—

অশ্রুজলে প্রভু মোর পৃথিবী ভিজায়।।
মহা ভাবাবেশে অঙ্গ স্তম্ভিত হইল। সোণার দোসর দেহ ধূলায় পড়িল।।
কৃষ্ণ বলি পৃথিবীতে প্রভু গড়ি যায়। ধূলায় ধূসর অঙ্গ বিন্ধিল কাটায়।।"

অল্প বাহ্য হইলে প্রভু দেখিলেন, সন্ন্যাসী ব্যাকুল হইয়া কান্দিতেছেন। তখন তাঁহার পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করুণ।"প্রভু সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করিয়া এই কথা বলিতেই তাঁহার প্রেমোদয় হইল। "কেমন প্রভুর কৃপা কহনে না যায়। প্রেমে মত্ত হয়ে যোগী ধূলায় লুটায়। যোগী বলে তুমি আমার কৃষ্ণ হবে।"

মহাত্মাদিগকে ভক্তেরা ইহাই বলিয়া স্তুতি করেন যে, তুমি পরম ভক্ত, তুমি ভগবানের কৃপার পাত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রভুকে এরূপ স্তুতি কেহ করিতেন না। যিনি স্তুতি করিতেন,

তিনিই বলিতেন, "তুমিই সেই কৃষ্ণ, তুমিই সেই ভগবান।" কারণ তাঁহার সঙ্গলাভ করিলেই মনে এই ভাব হইত যে, ইনি মনুষ্য নহেন, তাহা চেয়ে বড়। প্রভু সেই স্থান ত্যাগ করিবেন, কিন্তু ঈশ্বর ভারতী যাইতে দিবেন না; তিনি বলিতেছেন, "আমি তোমায় ভক্তিডোরে বাঁধিয়া রাখিব, যাইতে দিব না।" তদ্‌যথা—"ঈশ্বর-ভারতী তবে এতেক বলিয়া। জোরে টানাটানি করে খড়ম ধরিয়া।। প্রভু বলেন, কৃষ্ণে তোমার এতেক বিশ্বাস। আজি হতে তব নাম হইল কৃষ্ণদাস।।"

প্রভুর আশ্রয় লইলেই, যে এরূপ ভাগ্যবান তাহার নাম পরিবর্তিত হয়। এই নাম প্রভু স্বয়ং রাখেন, আর নাম প্রায়ই "কৃষ্ণদাস, কি হরিদাস"—এইরূপ হয়। প্রভুর ভক্তের মধ্যে হরিদাস ও কৃষ্ণদাস নামধারী অসংখ্য ছিলেন। তবে বিশেষ বিশেষ লোকের বিশেষ বিশেষ নাম রাখা হইত,—যেমন রূপ আর সনাতন, এই নাম প্রভু দুই ভাইকে, দর্শন মাত্রেই অর্পণ করেন। প্রভু চন্ডীপুর ত্যাগ করিয়া, দুই দিবস জনমানবশূন্য পর্বত দিয়া চলিলেন। "কেবল কদম্ববৃক্ষ দেখি সারি সারি" তাঁহারা চলিয়াছেন, ইহার মধ্যে দেখেন ব্যাঘ্র জলপান করিতেছে। গোবিন্দ উহা দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া প্রভুর নিকট ঘনাইয়া গেলেন ও শব্দ না করিয়া প্রভুকে ইঙ্গিত দ্বারা উহা দেখাইয়া দিলেন। গোবিন্দ লিখিয়াছেন—"মোর ভাব দেখি প্রভু ঈষৎ হাসিয়া। বলে তুমি ভয় কর কিসের লাগিয়া।। হরিনাম বলিলে না রহে যম ভয়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাক না কর সংশয়।।"

গোবিন্দ বলিতেছেন, "প্রভুর মুখে ইহা শুনিয়া আমি নির্ভীক হইলাম।" ব্যাঘ্র কিন্তু তাঁহাদিগের দিকে না আসিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। পরে তাঁহারা এক দরিদ্র পল্লীতে গমন করিলেন। প্রভু এক বৃক্ষতলে বসিলে, গোবিন্দ এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর বাড়ী ভিক্ষা করিতে গেলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার দিবার কিছুই নাই, কিন্তু তাই বলে অতিথি ফিরাইতে পারি না, আপনি অপেক্ষা করুন।" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বাহির হইলেন। একটু পরে দুটা নারিকেল আনিয়া দিলেন, তাহাই সেদিনকার আহার হইল। সন্ধ্যাকালে প্রভু তাঁহাদের বাড়ীতে গমন করিলেন, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী উভয়ে করযোড়ে প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,—"আমরা অতি দরিদ্র, আমাদের ঠাকুর গোপাল আছেন, ভিক্ষা করিয়া তাঁহার সেবা করি। আমি এরূপ দরিদ্র যে বসিতে আসন দিব, তাহাও আমার নাই।" হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, প্রভু জানিয়া শুনিয়া এরূপ দরিদ্রের বাড়ী কেন গমন করিলেন? কিন্তু তাহার কারণ ছিল। ব্রাহ্মণ যখন বলিলেন যে, বসিতে দিবার আসনখানি পর্য্যন্ত নাই।" তখন ব্রাহ্মণী বলিতেছেন, "ঠাকুর। তুমি আসন আর কি দিবে, মাথা পেতে দাও, দেখিতেছ না স্বয়ং গোপাল আসিয়াছেন। আর ভোগ কি দিবে, শ্রীপাদপদ্মে তুলসী চন্দন দাও।" ব্রাহ্মণ তাহাই করিতে গেলেন। কিন্তু প্রভু করিতে না দিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, —"দেখি, আমি সামান্য মানুষ, এই তুলসী চন্দন গোপালকে দাও।" বিপ্র বলিলেন, "ভাল, তুমি না হয় আমাদের ন্যায় মানুষ, কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে বল দেখি,—"তব অঙ্গে সৌদামিনী খেলা করে কেন? তব দেহে পদ্মগন্ধ অনুমানি হেন।। তুমি যদি ভগবান নহ দয়াময়। তবে কেন তব অঙ্গে পদ্মগন্ধ পাই।।"এই যে প্রভুর অঙ্গে সর্বদা পদ্মগন্ধের কথা ও সৌদামিনী খেলার কথা, ইহা গোবিন্দ বারম্বার বলিয়াছেন। পদ্মগন্ধ সর্বদাই, এবং সৌদামিনী মাঝে মাঝে প্রকাশ পাইত। যেখানে প্রভুর আপনাকে লুকাইবার কোন কারণ থাকিত না, সেখানে ঐ বিদ্যুল্লতা অতি জাজ্জ্বল্যরূপে প্রকাশ পাইত।

প্রভু ত্রিবাঙ্কুর ত্যাগ করিয়া ক্রমে মহারাষ্ট্রীয় দেশে প্রবেশ করিলেন। সেখানে অনেকগুলি অদ্ভুত লীলা করেন। প্রভু গুর্জরীনগর ছাড়িয়া পুনা যাইবেন মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাহা না করিয়া একবার বিজাপুরে গেলেন। সেখান হইতে পাড়ুপুরে বা পান্ডারপুরে গমন করিলেন।

এই স্থানে তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপ অতি আশ্চর্য্যরূপে নিত্যধামে চলিয়া যান। শিবানন্দ সেন তখন সেখানে ছিলেন। তিনি দেখিলেন, বিশ্বরূপের আত্মা দেহ ছাড়িয়া সহস্র সূর্য্যের ন্যায় চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া শিবানন্দ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

বহুকাল হইল যখন আমরা বোম্বাইনগরে থিওসোফিষ্টগণের অতিথি হইয়া, তাঁহাদের সাধনপদ্ধতি শিখিতেছিলাম, তখন সবে তাঁহারা সেখানে আসিয়াছেন। সে সময় একটি পার্সি ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ হয় নাই। একদিন তাঁহাদের প্রাচীর পরিবেষ্টিত একটা বাংলার বারান্দায় আমি ও অলকট সাহেব একটি মাদুরে শয়ন করিয়া গল্প করিতেছিলাম। ইহার মধ্যে শুনিলাম যে কীর্তন হইতেছে। "কীর্তন" হইতেছে কেন বলিলাম? কারণ খোল-করতাল বাজিতেছিল, আর কীর্ত্তনের সুরে গীত গাওয়া ও আখর দেওয়া হইতেছিল। মোটামুটি আমাদের দেশে যেরূপ কীর্তন হয়, ঠিক সেইরূপ শুনিলাম। প্রথমে লক্ষ্য করি নাই, পরে যেন কর্ণে নিতাই-গৌরের নাম শুনিলাম। শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলাম, এবং ভাবিলাম এ আবার কি ব্যাপার। অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখি তাহারা চলিয়া গিয়াছে, আর তাহাদের ঠিকানা পাইলাম না, ইহাতে একটু বিমর্ষ হইলাম, কিন্তু এ কথাটি বরাবর মনে রহিয়া গেল।

শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগচী (তিনি দেহ রাখিয়াছেন) কিরূপে গৌরভক্ত হইয়াছিলেন তাহা তিনি এইরূপে বর্ণনা করেন। তাঁহার বাটী শ্রীনবদ্বীপে, কিন্তু ইংরাজী পড়িয়া পন্ডিত হইয়া কিছু মানিতেন না। একবার তাঁহার দক্ষিণাদেশে ইলোরার গহ্বর দেখিতে ইচ্ছা হয়। এই গহ্বরের মধ্যে প্রাচীন নানাবিধ ভগ্নপ্রায় মন্দির আছে। ইহা দেখিতে পৃথিবীর অনেক স্থানের লোকে সেখানে গিয়া থাকেন। প্রভু এই ইলোরার নিকট পান্ডুপুরে গিয়াছিলেন। রামযাদব বাবু কষ্টে-সৃষ্টে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। দেখেন কি, সেখানে একটি শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে, আর সন্ধ্যার সময় সেই মন্দিরে আরতি হইতেছে। কিন্তু আর এক কাণ্ড দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, সেই বিগ্রহের সম্মুখে আমাদের দেশীয় খোল-করতাল লইয়া ঐ দেশীয় কয়েকজন বৈষ্ণব সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। আমাদের সংকীর্তন বলার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও সে কীর্তনের ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু উহার ভাব ও অন্যান্য বিষয় ঠিক আমাদের সংকীর্তনের মত। রামযাদব বাগচী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কীর্তন শুনিতে লাগিলেন। এমন সময় সেই কীর্তনের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিলেন। ইহাতে তাঁহার শরীর বিস্ময়ে কাঁপিয়া উঠিল। এই বহুদূরদেশে, নিবিড় জঙ্গলে, এই খোল-করতাল, এই কীর্তন, আর আমাদের নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণকুমারটির নাম কিরূপে আইল, ইহা ভাবিতে ভাবিতে রামযাদব বাবু বিভোর হইলেন। কীর্তনান্তে তিনি বৈষ্ণবগণের নিকট ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাহারা কিছুই বলিতে পারিল না। তখন রামযাদব বাবুর সংকল্প হইল যে, ইহার তথ্য না জানিয়া তিনি যাইবেন না। এই উদ্দেশ্যে সেখানে রহিয়া গেলেন। দুই দিবসের অনুসন্ধানের পর একটি প্রাচীন বৈষ্ণব পাইলেন। তিনি বলিলেন, "তোমাদের বাড়ী যে বঙ্গদেশে, সেখান হইতে এই খোল-করতাল ও এই কীর্তন আসিয়াছে।" কিরূপে আসিল জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "তোমাদের দেশের চৈতন্যদেব এই মন্দিরের সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই হইতে এই বঙ্গীয়-কীর্তন ইত্যাদি এখানে হইতেছে।

চারি শত বর্ষ পূর্বে পথে যাইতে যাইতে ইলোরার মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিয়াছিলেন, আর সেই তরঙ্গ অদ্যাপি সেখানে আছে, এই অদ্ভুত কাণ্ড একবার ভাবিয়া দেখুন। তাহা হইলে বুঝিবেন যে, রামযাদব বাবু কি ভাবে মোহিত হইলেন। "এখানে তোমাদের শ্রীচৈতন্যদেব নৃত্য করিয়াছিলেন"—বৈষ্ণব ইহাই বলিলেন। কেবল নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ধর্মের বীজ বপন করা হইয়াছিল। তখন রামযাদব বাবু ভাবিলেন, তাঁহার বাড়ী শ্রীনবদ্বীপে, তিনি গৌরাঙ্গের তথ্য কিছুই জানেন না; আর এই ইলোরায় তাঁহাকে পূজা করে। ইহাই ভাবিয়া

তাঁহার নিজের উপর ধিক্কার হইল, আর তখন তিনি গৌরাঙ্গ প্রভুকে তল্লাস করিতে লাগিলেন। তল্লাস করিতে গিয়া প্রায় যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইল, তিনি বান্ধা পড়িলেন। প্রভু পাণ্ডুপুর বা পাণ্ডারপুর গেলেন। এ অতি পবিত্র স্থান, ভীমা নদীর ধারে,—যাহাকে ঐ দেশীয় লোকে গঙ্গা বলেন। এখানে অনেক সন্ন্যাসীর বাস ও আসা-যাওয়া আছে। এখানে তুকারামের বাস ছিল। ইনি মহারাষ্ট্রীয় দেশ ভক্তিতে প্লাবিত করেন। এখন এই তুকারামের কাহিনী শ্রবণ করুন। বহুদিন হইল যখন আমি পুনা নগরে গমন করি, তখন কথায় কথায় এক ভদ্র-মজলিসে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করিয়াছিলাম। তাহাতে বম্বে প্রদেশের অতি প্রধান পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান শ্রীযুক্ত মহাদেব রাণাডে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের যেমন চৈতন্য আছেন, আমাদেরও তেমনি তুকারাম আছেন। সকলেই আপন আপন দ্রব্য বড় দেখে। তুকারামের মাহাত্ম্যের কথা যদি তুমি জানিতে, তবে আর তোমার চৈতন্য বড় বলিতে না।"

তুকারামের কথা আমি সেই প্রথম শুনিলাম এবং অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, তিনি অতি নীচ জাতীয়, এবং সাতারা ও পুনার নিকট ভীমা-নদীর তীরস্থ পাণ্ডুপুরবাসী ছিলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। সেখানে বিট্‌ঠলদেব নামক শ্রীকৃষ্ণের এক মূর্তি আছে, তাঁহাকে পূজা করিতেন। তাঁহার প্রেম অকথ্য, আর শিষ্য অগণন; তিনি বিট্‌ঠলদেবের সম্মুখে গীত গাহিতেন ও নৃত্য করিতেন। তিনি যেমন গীত গাহিতেন, অমনি তাঁহার ভক্তগণ উহা লিপিবদ্ধ করিতেন। উহা ক্রমে তুকারামের আভঙ্গ বলিয়া একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয়। আরও শুনিলাম, তুকারাম ভজন করিতে করিতে সশরীরে রথে আরোহণ করিয়া সর্বসমক্ষে বৈকুণ্ঠ আরোহণ করেন। অদ্যাপি পুনা-দেশের পণ্ডিতগণ ব্যতীত, অপর প্রায় সকলেই তাঁহার শিষ্য। ইহার কয়েক বৎসর পরে ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন। তাঁহার নিকট আমি তুকারামের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। পণ্ডিত বিশ্বনাথ ইংরাজী ও সংস্কৃতে পরম পণ্ডিত। তিনি তুকারামের সংবাদ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তবে তিনি কৃপা করিয়া তুকারামের একখণ্ড আভঙ্গ আমাকে আনাইয়া দিলেন। এখানি বড় গ্রন্থ, মুদ্রিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহারা বুঝেন, তাঁহাদের নিকট আভঙ্গের অর্থ করিয়া লইতে লাগিলেন। দেখিলাম যে, তুকারাম আমাদেরই গোষ্ঠী, এবং ব্রজের নিগূঢ় রসের অধিকারী, ইহাতে নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। তখন ভাবিলাম তুকারাম এ রস কোথায় পাইলেন? এ ত শ্রীগৌরাঙ্গের পথ, "ইহা ত অনর্পিত," ইহা ত অন্য স্থানের লোকদিগের জানা নাই, তবে তুকারাম কি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাপাত্র? তাহার পরে তুকারামের আভঙ্গে তিনি কিরূপে গুরুর নিকট কৃপা লাভ করেন, তাহা দেখিতে পাইলাম। সেটি এই,—

সদগুরু রায়েন কৃপা মুঝো কলি। পারি নাহি ঘটলি সে ওয়া কাঁহি।।
সাপড় বিলে ওষাটে যাতা গঙ্গাস্নান। মস্তকি তুজান ঠেকাইল কর।।
ভোজন মাগতি তুপ পাওসের। পড়িল বিসর স্বপ্না মাজি।।
কাঁহি করে উপজলা আগুরায়। মনোনিয়া কাজ তরা গাজি।।
রাঘব চৈতন্য কেশব চৈতন্য। সাঙ্গতলি খুন মাড়ি কেচি।।
বাবাজি আপনে সঙ্গিতলে নমোঙ্গ। মন্ত্র দিলা রাম কৃষ্ণ হরি।।
মাঘ শুক্র দশমী পাহুনী গুরুবার। কেলা অঙ্গিকার তুকা ভনে।।

এই আভঙ্গের মোটামুটি বঙ্গানুবাদ করিতেছি—

প্রভু গুরু তিনি আমায় করিলেন কৃপা। কিন্তু আমাহতে তাঁহার নাহিক হলো সেবা।।
আমি যেতেছিনু করিবারে গঙ্গাস্নান। মোর শিরে প্রভু কর করিলা প্রদান।।
প্রভু মোরে চেয়েছিল ঘৃত আর অন্ন। আমি দিতে নারিনু হয়ে ছিনু অচেতন।।
কিছু নাহি জানি পরে কিবা ঘটেছিল। কোন কার্যের তরে প্রভু কোথা চলি গেল

রাঘব চৈতন্য আর কেশব চৈতন্য। তাঁর কথা বলি দেখাইল এক চিহ্ন।।
বাবাজী বলিয়া বলিল নিজ নাম। রাম-কৃষ্ণ-হরি নাম করিলেন প্রদান।।
মাঘ শুক্ল দশমী গুরুবার দিনে। প্রভু কৃপা মোরে কৈল তুকারাম ভনে।।

এখন ইহার পরিষ্কার অর্থ করিতেছি। তুকা নিজের কাহিনী এইরূপ বলিতেছেন,—"মাঘ মাসে এক বৃহস্পতিবারে শুক্ল-দশমী তিথিতে আমি গঙ্গা (ভীমাকে পাণ্ডুপুরে গঙ্গা বলে) স্নানে যাইতেছিলাম। ইহার মধ্যে প্রভু দর্শন দিলেন এবং আমার মাথায় হস্ত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তাহাতে আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম। আমাকে রাম-কৃষ্ণ-হরি এই তিনটি নাম দিলেন, আর কি সঙ্কেত করিলেন, ও রাঘব-চৈতন্য কেশব-চৈতন্য বলিলেন। আর আপনাকে "বাবাজী" বলিলেন। প্রভু আমার নিকট তাম্বুল ও ঘৃত চাহিলেন। কিন্তু তিনি আমার মস্তকে হাত দিবামাত্র আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম। চেতন পাইয়া দেখি যে, স্বেচ্ছাময় প্রভু নিজের কার্য্যের নিমিত্ত কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না।" তুকারাম যে প্রভুর সেবা করিতে পারেন নাই, তণ্ডুল ও ঘৃত দিতে পারেন নাই, সেই ক্ষোভ চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় ছিল। তুকারাম বলিতেছেন যে, তাঁহার প্রভু হরি কৃষ্ণ রাম এই তিনটি নাম দিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, শ্রীগৌরাঙ্গের মহামন্ত্র যাহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জপ করেন, সেটী এই—

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে।।"

প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গের মহামন্ত্র হরি কৃষ্ণ ও রাম—এই তিনটি নাম। তুকারাম যেরূপ কৃপা প্রাপ্ত হন, শ্রীগৌরাঙ্গ ঐরূপে অনেক সময় ভক্তগণকে কৃপা করিতেন তাহা সকলেই জানেন। বিশেষতঃ দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিবার সময় প্রভু কেবল স্পর্শ করিয়াই জীবকে সমুদয় শক্তি সঞ্চার করিতেন। যথা, চরিতামৃতে—"নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশ। সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারি দক্ষিণদেশ।।

কৃপাময় পাঠক দেখিবেন যে, প্রভু এইরূপে কৃপা করিতে করিতে চলিয়াছেন। ক্রমে পাণ্ডুপুর তুকারামের স্থানে আসিলেন। এইরূপে যে সকল মহাভাগবত সৃষ্টি করিতে করিতে তিনি যাইতেছেন, তাঁহারা অনেকেই, তিনি যে কে, কোথা বাড়ী, কি নাম, তাহা কিছুই জানিতে পারেন নাই। প্রভু "কৃষ্ণ-কেশব পাহি মাং, রাম-রাঘব রক্ষ মাং" বলিতে বলিতে যাইতেছেন, এমন সময় ভীমানদীর তীরে তুকারামকে দেখিলেন। প্রভু তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মাথায় হস্ত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন ও কর্ণে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র দিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে ভক্তটি ছিলেন, হয়ত তিনি তণ্ডুল ও ঘৃত চাহিয়া থাকিবেন। আর সেই ভৃত্য হয়ত বলিয়া থাকিবেন যে, প্রভুর নাম, "কৃষ্ণচৈতন্য"। কিন্তু প্রভু যখন তুকারামকে স্পর্শ করিয়া কর্ণে মন্ত্র দিলেন, তখন তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। ভৃত্যের কাছে শুনিলেন, প্রভুর নাম কৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভুর মুখে "রাম-রাঘব কৃষ্ণ-কেশব" শ্লোক শুনিলেন। ইহাতে তিনি বাবাজীর নাম,—হয় 'কেশবচৈতন্য' নয় 'রাঘবচৈতন্য' এইরূপ কিছু হইবে সাব্যস্ত করিলেন। বস্তুত এক সন্ন্যাসীর দুই নাম হইতে পারে না। কাজেই তুকারাম অচেতন অবস্থায় যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে সাব্যস্ত করিলেন যে তাঁহার প্রভুর নাম, হয় রাঘবচৈতন্য, নয় কেশবচৈতন্য হইবে। বিশেষতঃ সাধুগণের "বাবাজী" আখ্যা কেবল বাংলায় প্রচলিত আছে, আর কোথায়ও নাই।

আর একটু বিস্তার করিয়া বলি। তুকা বলিতেছেন যে, "গুরুর সহিত পথে দেখা হয়। দেখা হইলে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করেন তাহাতেই আমি অচেতন হই।।" এই গুরু কে? এ শক্তি একমাত্র মহাপ্রভুই জগতে দেখাইয়া গিয়াছেন। গুরুর কাছে তুকা কি তত্ত্ব শিখিলেন? শিখিলেন, 'ব্রজের নিগূঢ় রস, যাহা জগতে পূর্বে ছিল না।' বৈষ্ণবগণের মধ্যে

শ্রীরামানুজ প্রভৃতি চারি সম্প্রদায় আছে। এই রস অপর কোন সম্প্রদায়ে নাই; কেবল আছে, মহাপ্রভু সম্প্রদায়ে। সুতরাং তাঁহার গুরু—"হয় মহাপ্রভু স্বয়ং না হয় তাঁহার কোন ভক্ত।" কিন্তু তিনি কে? তুকারাম বলিতেছেন "তাঁহাকে চিনি না, একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম, দেখিয়াই অচেতন হই। এমন কি তিনি যে চাউল আর ঘৃত চাহেন তাহাও দিতে পারি নাই।" তখন তাঁহাকে বলিলাম, "একটু ঠাহরিয়া দেখ দেখি, তিনি কে বলিতে পার কি না?" তুকারাম বলিলেন,—"তিনি আমাকে তিনটী নাম দেন,—কৃষ্ণ হরি ও রাম।"(এ তিনটি নাম মহাপ্রভুর বহিরঙ্গের পক্ষে মূলমন্ত্র, ইহাতে মানে হয় তাঁহার গুরু শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং।) তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর কিছু কি মনে পড়ে?" তিনি বলিলেন, "তাঁহার নাম শুনিলাম যেন কি চৈতন্য,—হয় কেশবচৈতন্য, কি রাঘব-চৈতন্য।"

(মহাপ্রভুর নাম কৃষ্ণচৈতন্য, সুতরাং নাম শুনিলেও বোধ হয় যে, তুকারামের গুরু আর কেহ নহেন,—মহাপ্রভু স্বয়ং। তাহা যদি না হইবে তবে তুকা "কেশব," "রাঘব" এ কথা কোথা পাইলেন? তাহার উত্তর এই যে, মহাপ্রভু "কৃষ্ণ-কেশব পাহি মাং", "রাম-রাঘব রক্ষ মাং" বলিতে বলিতে পথে যাইতেন।)

তাহার পরে তুকা বলিলেন,—যেন তাঁহার আর এক নাম শুনিলাম, "বাবাজী"।

(এই বাবাজী শব্দ কেবল বাংলায় প্রচলিত,—বৈষ্ণব ভক্তগণকে বুঝায়। সুতরাং তুকারামের এই গুরু যে বাঙ্গালী, তাহাতে সন্দেহ নাই।)

তখন প্রশ্ন হইল,—"ভাল, তোমরা কোন্ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব?" তুকারাম বলিলেন, "আমরা চৈতন্য-সম্প্রদায়ের।"

এখন দেখুন জগতে চৈতন্য এক বই দুইজন নাই। আমরা দেখিতেছি যে, মহাপ্রভু সেই সময় এই পান্ডারপুর গিয়াছিলেন। আমরা আরও দেখিতেছি যে, তিনি এইরূপে "আচার্য্য" সৃষ্টি করিতে করিতে যাইতেছিলেন।

কেহ কেহ বলেন যে, তুকা মহাপ্রভুর পরে প্রকাশ হয়েন, খুব সম্ভব ইহা ভুল। আর যদি ভুল না হয়, তবে তুকার সেই গুরু যে প্রভুর কোন ভক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে তুকা চৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত হইতেন না। তুকারাম দিবানিশি প্রেমানন্দে মত্ত থাকিতেন, আর সেই অবস্থায় বিট্ঠলদেবের অগ্রে নৃত্য করিতেন ও তখনি রচনা করিয়া গীত গাহিতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ দ্রুতবেগে অগম্য দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। যেখানে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়াছেন, সেখানেই তাহাতে কৃপা করিতেছেন। আর যদি পথের মাঝে সে ব্যক্তি না থাকে, তবে প্রভু পথ ত্যাগ করিয়া বিপথ দিয়া তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে কৃপা করিতেছেন। প্রভুর সময় অতি অল্প, দুই এক বৎসরের মধ্যে সমুদয় দক্ষিণদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। তাই যখন অন্তর্য্যামী প্রভু জানিলেন যে, কোন স্থানে একটী বিষবৃক্ষ আছে, অমনি সেই স্থানে যাইয়া, সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষটী কর্ত্তন করিয়া সেই স্থানে একটী অমৃতবৃক্ষ রোপণ করিতেছেন। প্রভু শিশুবৃক্ষ ত্যাগ করিয়া, যাহাতে বীজ হইয়াছে এইরূপ বড় বৃক্ষের নিকট যাইতেন। কারণ শিশুবৃক্ষতে বীজ ফলে না, বর্দ্ধিত বৃক্ষেই ফলে। উপযুক্ত পাত্র পাইলে তাহাকে আশ্চর্য্য শক্তি দিতেছেন। এইরূপে ভুবন-পাবন প্রভু আশ্চর্য্য শক্তি সৃষ্টি করিতে করিতে দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। প্রভু কেবলমাত্র স্পর্শ করিয়া হৃদয়ে যে ব্রজের রস প্রবেশ করাইতেন, ইহা অমানুষিক শক্তি। মূর্খ নীচজাতি তুকারাম প্রভুর স্পর্শ পাইল, আর তাহার হৃদয়ে উজ্জ্বল-নীলমণির সমস্ত রস স্ফুরিত হইল, ইহা অমানুষিক শক্তি সন্দেহ নাই।

পাণ্ডুপুর হইতে অল্প দূরে ইলোরায় প্রাচীনমন্দির সমূহ। সেখানে রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে, প্রভু সেখানে গমন করেন। রামযাদববাবুও সে মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। আর সেখানে কি জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। চরিতামৃত সংক্ষেপে এইরূপ বলিতেছেন, যথা—

"কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর ভগবতী। লাঙ্গাগণেশ দেখি চোরাপার্বতী।।
তথা হইতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র। বিঠ্‌ঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ।।"

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, তুকারাম যেরূপ পুনর্জন্ম লাভ করিলেন, তাহা শুনিলেই মনে হয় যে, এ প্রভুর নিজের কার্য্য, অপর কেহ এরূপ শক্তি দেখাইতে পারেন নাই। ভক্তিভাজন বৃন্দাবনের পরমপন্ডিত ও পরমভক্ত শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী আমাকে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন,—"আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু কখন কি করিতেন তাহা কাহাকেও বলিতেন না, আর কোথায় কি করিয়া আসিয়াছেন তাহাও বলিতেন না। সুতরাং তাঁহার অনেক লীলা অপ্রকাশ আছে। আমাদের এই পশ্চিমদেশে মহাপ্রভুর একটী শাখা আছে। তাঁহারা আপনাদিগকে থানেশ্বরী-শ্রীজগন্নাথের পরিবার বলিয়া থাকেন। এই থানেশ্বরী গ্রামটী কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী। থানেশ্বরী-জগন্নাথের বংশধরেরা এই আখ্যায়িকা প্রসঙ্গে বলিয়া থাকেন যে, শ্রীমহাপ্রভু থানেশ্বর যাইয়া শ্রীজগন্নাথ পন্ডিতের দরজার সম্মুখে একটী বৃক্ষমূলে তিনদিন দিবারাত্র উপবেশন করিয়াছিলেন। জগন্নাথ শঙ্কর মতানুযায়ী বেদান্তের পন্ডিত ছিলেন। তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় ও বাড়ী আসিবার সময় প্রভুকে দেখিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া যাইতেন। শ্রীপ্রভুও নেত্র নিমীলন করিয়া হরিনাম করিতেন, কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। গ্রামের সহস্র সহস্র লোক প্রভুকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকিত ও সঙ্গে সঙ্গে নাম করিত, তাহা দেখিয়া পন্ডিতের আরও হাসি পাইত। পন্ডিতপ্রবর যখন প্রভুকে দেখিয়া হাসিয়া যাইতেন, প্রভুও সেই সময় পন্ডিতের দিকে সজলনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেন। পন্ডিত যদিও বিদ্যাদর্পে হাসিতেন, কিন্তু প্রভুর দৃষ্টিপাতের সময় তাঁহার মন কেন যে অস্থির হইত, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। তবে তিনি যাইবার সময় প্রভুকে হাসিয়া একটী কথা বলিয়া যাইতেন, সেটী এই,—"অহং ব্রহ্মোঽস্মি।" তিন দিনের মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকবার প্রভুর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া ও শ্রীমুখের হরিনাম শ্রবণ করিয়া, চতুর্থ দিবস প্রাতঃকালে তাঁহার পূর্ব্বকার যে বাক্য "অহং ব্রহ্মোঽস্মি" উহা পরিত্যাগপূর্বক জোড়হস্তে ক্রন্দন করিয়া, "তত্ত্বমসি", "তত্ত্বমসি" বলিতে বলিতে প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলেন। প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। পন্ডিতও প্রভুর বিরহে কাতর হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন এবং তথায় শ্রীমৎরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর আশ্রমে রহিলেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ পশ্চিমোত্তর প্রদেশের নানাস্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দোহাই দিয়া জীবোদ্ধার করিতেছেন।

এইরূপ জীবোদ্ধার পদ্ধতি দেখিলেই প্রভুর কথা মনে পড়ে। প্রকৃতই এই কাহিনী তুকারামের কাহিনীর সহিত অনেক ঐক্য। তুকারামের গণ দক্ষিণে, আর থানেশ্বরী-জগন্নাথের গণ উত্তরে। তুকারামের গণেরা বলেন, তাঁহারা চৈতন্য-সম্প্রদায়। জগন্নাথের গণেরাও তাহাই বলেন। তুকারামকে প্রভু অন্যের অগোচরে কৃপা করেন, জগন্নাথকেও তাহাই করেন। ফল কথা, আবার বলি, ঐ কৃপা-পদ্ধতি দেখিলে বোধ হয় যে ইহা মহাপ্রভুর কাণ্ড। তবে প্রভু যে থানেশ্বর গিয়াছিলেন কোন গ্রন্থে তাহার প্রমাণ নাই। হয়ত ইহা হইতে পারে, জগন্নাথকে (তাঁহার নিজগ্রামে নয়,) বৃন্দাবনের পথে কোন স্থানে কৃপা করিয়া থাকিবেন।

প্রভু যুবতী ভার্য্যা ও বৃদ্ধা মাতা ছাড়িয়া শ্রীভগবানের পদ পরিত্যাগ করিয়া কৌপীন পরিয়া রাজরাজেশ্বরের সেবা ছাড়িয়া এখন দক্ষিণদেশে হাঁটিয়া চলিয়াছেন। উপবাসে, অনিদ্রায়, পথশ্রান্তে তাঁহার দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। যখন দক্ষিণে গমন করেন, তখন ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করেন, সেখানে কেন যাইতেছেন? প্রভু বলিলেন, "আমার দাদার তল্লাসে।" কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল জীবের মঙ্গল। সেই জীব তাঁহাকে আদর করিতেছে না, তাহাতেও তাহাদের প্রতি তাঁহার মমতা কমিতেছে না। তিনি কৃপা করিলেন, করিয়া পাছে তাঁহাকে তাহারা জানিতে পায়, তাই তথা হইতে দৌড় মারিয়া পলাইলেন। তাঁহার বড় ভয়, তিনি যে কে, পাছে তাহা জানিতে

পারিয়া কেহ তাঁহাকে ধন্যবাদ দেয়, কি তাঁহার প্রতিষ্ঠা করে, এই সকল ভাবিয়া,—"সাথে কি তার লাগি ঝুরে মরি। না জানি কত তার ধার ধারি।।"

অনেক সময় প্রভুর এই কৃপাপদ্ধতিতে একটু রহস্য-রস দেখা যাইত। এইরূপে তিনি শিখিমাহিতীকে কৃপা করেন। শিখি স্বপ্নে দেখিলেন যে, প্রভু তাঁহাকে দেখিয়া হাসিলেন। এইরূপে তুকারামের মাথায় হাত দিয়া তাহাকে পাগল করিয়া প্রভু পলায়ন করিলেন। তুকারাম চেতন পাইয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু পান্ডুপুর আসিবার পূর্বে প্রভু অনেক মধু হইতেও মধুর লীলা করেন। প্রভু গুর্জরীনগরে আসিয়া দেখিলেন সেখানে বহু অট্টালিকা ও অসংখ্য কুণ্ড। সেখানে স্নান করিয়া একটী কুণ্ডতীরে বসিয়া তিনি হরিগুণ গাহিতে লাগিলেন। লোক জুটিতেছে, দাঁড়াইয়া শুনিতেছে, মোহিত হইতেছে, আর বলিতেছেন "কি মধুর! কৃষ্ণনাম এত মধুর! সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার মুখে হরিনাম বড়ই মধুর!" কিন্তু প্রভুর মুদিত নয়ন, বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই।

চক্ষু মুদি গোরাচাঁদ দুলিতে লাগিলা। নয়ন ফাটিয়া অশ্রু আসি দেখা দিলা।।
লোকজন নাহি দেখে মোর গোরারায়। কৃষ্ণহে বলিয়া কান্দি মৃত্তিকা ভিজায়।।
রোমাঞ্চিত কলেবর কান্দিয়া আকুল। আলুথালু বেশে প্রভু কহে নানা ভুল।।
কভু প্রভু মত্ত হয়ে গড়াগড়ি যায়। আছাড়ি বিছাড়ি কভু পড়য়ে ধরায়।।
ঐ মোর প্রিয়সখা মুকুন্দ মুরারি। এই বলি ধেয়ে যান চৈতন্য ভিখারী।।
কখন বলেন এসো প্রাণ নরহরি। কৃষ্ণনাম শুনি তোরে আলিঙ্গন করি।।
এইভাবে নানা কথা কহে গোবারায়। ভাবে মত্ত হয়ে প্রভু ছুটিয়া বেড়ায়।।
আশ্চর্য্য প্রভাব শুনি যত মহাজন। প্রভুর সমীপে সব করে আগমন।।

অর্জুন নামক একজন মহাপন্ডিত সেখানে বসিয়া সব দেখিতেছেন। কিন্তু তবু তাঁহার কঠিন মন বিন্দুমাত্র অবশ হইল না, তিনি যুদ্ধ চাহিতে লাগিলেন। প্রভু তাহাকে কৃপা করিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, শুষ্ক বিদ্যা ফেলিয়া ভগবানের ভজন করিলে তাহার প্রকৃত মঙ্গল হইবে। ইহা বলিয়া প্রভু কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। এমনি ভাবে ডাকিলেন যেন কৃষ্ণ সম্মুখে, আর সে ভাবে কেবল তিনিই ডাকিতে পারেন। এই ডাক শুনিয়া সকলে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলেন।

সে স্থান তখন যেন বৈকুণ্ঠ হইল। দলে দলে গ্রাম্যলোক আসি দেখা দিল।।
শত শত লোক চারিদিকে দাঁড়াইয়া। হরিনাম শুনিতেছে নিঃশব্দ হইয়া।।
নাম শুনিবারে, যেন স্বর্গে দেবগণ। মাথার উপরে আসি করিছে শ্রবণ।।
ছুটিল পদ্মের গন্ধ বিমোহিত করি। অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌরহরি।।
প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন। ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ।।
বড় বড় মহারাঠী আসি দলে দলে। শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে।।
পশ্চাৎ ভাগেতে মুই দেখি তাকাইয়া। শত শত কুলবধূ আছে দাঁড়াইয়া।।
অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া। হরিনাম শুনিতেছে বিহ্বল হইয়া।।
এইরূপে হরিনাম করিতে করিতে। অজ্ঞান হইয়া প্রভু লাগিলা নাচিতে।।

তখন হুঙ্কার গর্জনে সকলকে বিমোহিত করিয়া প্রভু অচেতন হইয়া পড়িলেন। আর সকলে তাঁহাকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। এরূপ তরঙ্গ উঠিল যে সকলেই তাহাতে ডুবিয়া গেলেন; তখন অর্জুনের আর বিচার-ইচ্ছা রহিল না।

সেখান হইতে প্রভু গুর্জরী, আর গুর্জরী হইতে বিজয়পুরে এবং তথা হইতে পান্ডুপুর বা পান্ডারপুরে বিট্‌ঠল দর্শন করিতে গেলেন। এই তুকারামের স্থান। সেই পর্বত হইতে নামিয়া তিনি কুলাচলে উঠিলেন এবং অবশেষে পুণানগরে প্রবেশ করিলেন। বাংলায় যেমন নবদ্বীপ,

দক্ষিণে সেইরূপ পুণা। সেখানে অচ্ছসর সরোবরের তীরে একটি বৃহৎ বকুলতলায় প্রভু বসিলেন। নবদ্বীপে গঙ্গাতীরের ন্যায় সেখানেও অধ্যাপক ও পড়ুয়ার মেলা হয়। প্রভুকে দেখিয়া সেখানেও বিস্তর লোক জুটিতে লাগিল। প্রভুর পরিধান কৌপীন, গাত্র ধূলায় ধূসরিত, উপবাসে শরীর শীর্ণ। আবার তাঁহার সৌন্দর্য্য অমানুষিক, তাঁহাকে দেখিলে লোকের মনে কারুণ্যরসের উদয় হয়, নয়নে জল আইসে, আর এই গোলকের বস্তুটীকে কুসুমাসনে যত্নপূর্বক বসাইয়া সেবা করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ইহার অবস্থা অতি শোচনীয়, দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রভু নয়ন মুদিয়া বসিয়া আছেন আর আপনাব মনে কৃষ্ণের সহিত কথা বলিতেছেন, "কৃষ্ণ দেখা দাও, আমি বাঁচি না। আমি কোথায় গেলে তোমায় পাব....." প্রভুর সেই আবেগপূর্ণ কথা শুনিয়া ও তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া পণ্ডিতগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, এই সময় হঠাৎ একজন বলিয়া উঠিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর! তুমি কেন ব্যাকুল হইতেছ? তোমার কৃষ্ণ এই জলে লুকাইয়া আছেন।" "এই বাণী শুনি প্রভু চমকি উঠিল। রোমাঞ্চিত কলেবরে উঠে দাঁড়াইল।। এমন অশ্রুর বেগ কভু দেখি নাই।"

তখন প্রভু এরূপ করুণ কণ্ঠে কান্দিতে লাগিলেন যে, উপস্থিত সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সেই পণ্ডিত আবার ঐ কথা বলিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর কেন কান্দ, তোমার কৃষ্ণ এই সরোবরেই আছেন।" আবার প্রভু আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, হুহুঙ্কার করিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন।

লোক তখন প্রভুর ভাব দেখিয়া এত আকৃষ্ট হইয়াছেন যে, তাঁহার জলে ঝাঁপ যে তাহার মনোগত কার্য্য, কাচপনা নয় তাহা সকলে বুঝিলেন। কাজেই বহুতর লোক সেই সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিলেন; এবং প্রভুকে উঠাইয়া সকলে সেই পণ্ডিতকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন চেতনা পাইয়াছেন। সেখান হইতে প্রভু ভোলেশ্বর গেলেন। প্রকাণ্ড পর্বতের উপরে এক মন্দির, তাহার মধ্যে মহাদেব। সেখান হইতে দেবলেশ্বরে এবং তথা হইতে জিজুরিনগরে খাণ্ডবাকে দর্শন করিতে চলিলেন। এখানে মুরারিগণ প্রতিপালিত হয়েন। ইহাদের দুর্দশার কথা পূর্বে বলিয়াছি। যে কন্যার বিবাহ না হয়, তাহার বিবাহ খান্ডবার সঙ্গে হয়,—ইহারাই মুরারি। খাণ্ডবা মন্দির তাহাদিগকে পালন করেন। আর সেই মুরারিগণ ঠাকুরের সম্মুখে নৃত্যগীত করেন। এই মহৎ উদ্দেশ্যে এই প্রথা প্রচলিত হয়। ইহারা যেন খৃষ্টিয়ানদিগের "নন"। ননদিগের ন্যায় মুরারিগণেরও পতন হইয়াছে, প্রায় সকলেই বেশ্যাবৃত্তি করেন। এমন কি, তাহাদের এক পাড়া হইয়াছে, সেখানে ভদ্রলোক যায় না। ইহাদের কথা শুনিয়াই প্রভুর দয়া উপজিল। দেখুন, প্রভুকে যে সকলে দয়ার-ঠাকুর বলে, সে সাধে নহে। দুঃখ তিনি দেখিতে পারিতেন না, দুঃখ দেখিলে কান্দিয়া উঠিতেন। মুরারিগণের কথা শুনিবামাত্র প্রভুর হৃদয় ব্যথিত হইল। প্রভু ভারতবর্ষের চারিদিকে নগ্নপদে, অনাহারে অনিদ্রায় হাঁটিতেছেন কেন? কেবল জীবের প্রতি দয়ার নিমিত্ত। প্রভুর কি ইহাতে কিছু স্বার্থ আছে? কিছুই না। বরং তিনি যদি দেখেন যে, কোন স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, অমনি সেখান হইতে পলায়ন করেন। যদি লোকে বলে "তুমি ভগবান," অমনি জিভ কাটেন। যদি রাজা পদতলে পড়েন, অমনি তাহাকে দূর দূর করেন। যে তাঁহাকে প্রহার করিতে আইসে, আগে তাহাকে আলিঙ্গন করেন। তাই বাসুঘোষ প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া। পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া।।"

গোবিন্দ ভয়ে আকুল; "প্রভু, করেন কি, সেখানে যাবেন না; লোকে কি বলিবে?"প্রভু সে কথা শুনিলেন না,—একেবারে মুরারিপাড়ায় প্রবেশ করিলেন। কাজেই মুরারিগণ অপরূপ সন্ন্যাসীকে দেখিতে আসিলেন। প্রভুর নির্মল পবিত্র বদন, ও অরুণ করুণ নয়ন দেখিয়া মুরারিগণের হৃদয় ভক্তি ও কারুণ্যরসে দ্রবীভূত হইল; আর তাঁহারা অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, তোমাদের কৃষ্ণ, "তোমাদের আর ভাবনা কি? তবে পতিকে বিশুদ্ধ মনে ভজিতে

হইবে।" ইহা বলিয়া প্রভু কীর্তন আরম্ভ করিলেন। শেষে যাহা হইবার তাহাই হইল,—মুরারিগণ তাঁহাদের পাপ স্মরণ করিয়া অস্থির হইলেন, আর উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। সকলের প্রধান অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ও ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দিরা বলিলেন—"বৃদ্ধ হইয়াছি মুই কুকর্ম করিয়া। উদ্ধার কর হে মোরে পদধূলি দিয়া।। ইহা বলি ইন্দিরা ধূলায় লুটি যায়।" এখন প্রভুর কাণ্ড শ্রবণ করুন। মুরারিরা সকলেই ভেক লইলেন, হরিনামে মত্ত হইলেন, একজনও আর কুপথে রহিলেন না।—এত দিনে প্রকৃতই তাহারা দেবদাসী হইলেন।

সেখানে হইতে প্রভু চোরানন্দী চলিলেন। এখানে ডাকাতের বাস, তাহারা বড় বলবান। সকলে প্রভুকে সেখানে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। রামস্বামী বলিলেন, "স্বামিন, অবশ্য তোমার কোন ভয় নাই কিন্তু তুমি সেখানে কেন যাও? সে ত তীর্থস্থান নয়, তুমি যেও না। কারণ—"যদি কোন অমঙ্গল করে দস্যুগণ। তোমার বিরহে লোক ত্যজিবে জীবন।"

প্রভু অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "প্রয়োজন আছে, তাই যাইতেছি।" তাঁহার কি প্রয়োজন, পরে জানা গেল। সেখানে, প্রকাণ্ড বিষবৃক্ষ আছে, সেটী ছেদন করিতে হইবে, এই তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রভু গ্রামে প্রবেশ করিতেই একটী বৃক্ষ দেখিলেন, দেখিয়া যেন বিশ্রাম করিতে তাহার তলে বসিলেন। তখন বেলা আন্দাজ এক প্রহর। দস্যুগণ সর্বদা সতর্ক থাকে, কেহ যেন তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের গ্রামে প্রবেশ করিতে না পারে। এই জন্য প্রহরী নিযুক্ত আছে। তাহারা প্রভুকে দেখিলে, দেখিয়া নিকটে আসিল। সেই সঙ্গে আরও দুই এক জন আসিল। তাহারা আসিয়া প্রভুকে সেখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর না পাইয়া বলিল যে, তিনি সেখানে বসিতে পারিবেন না। তাহাদের সর্দারের নিকট তাঁহার যাইতে হইবে। প্রভু মাথা নাড়িয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু প্রহরীরা জিদ্ করিতে লাগিল, ইচ্ছা যেন বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু প্রভুকে যে জোর করিয়া লইয়া যাইবে, সে সাহসও হইতেছে না, কারণ প্রভুকে দেখিয়াই তাহাদের একটু নরম হইতে হইয়াছে। পরে তাহারা অভ্যন্তরে যাইয়া সর্দারকে সংবাদ দিল, সর্দারের নাম নারোজী। সে অতিশয় বলবান, ভারি যোদ্ধা, বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর, কিন্তু দেখিতে তাহা অপেক্ষা অনেক কম। সর্দার একটী সন্ন্যাসী আগমনের কথা শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল, এবং প্রভুকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের যুবক। তাঁহার বর্ণ কাঁচা-সোনার ন্যায়, অঙ্গ দিয়া লাবণ্য চোয়াইয়া পড়িতেছে, বদন সুন্দর, নির্মল ও চিত্তাকর্ষক। নারোজীর যাহা কখন হয় নাই, এখন তাহাই হইল,—অর্থাৎ হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইল। তখন সে সাষ্টাঙ্গে প্রভুকে প্রণাম করিল, এবং তাহার দেখাদেখি সমুদয় দস্যুগণ তাহাই করিল।

প্রভু হাঁ না কিছু না বলিয়া নয়ন মুদিয়া বসিয়া আছেন। তখন নারোজী করযোড়ে ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি আমার সঙ্গে ভিতরে আসুন, আপনার সেবা করিব।" প্রভু উত্তর করিলেন যে, তিনি কোথাও যাইবেন না, এই বৃক্ষতলেই থাকিবেন। দস্যুপতির ইহাতে ক্রোধ করা উচিত ছিল, কারণ তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কেহ যে পারে, ইহা তাহার জানা ছিল না। কিন্তু ক্রোধ করিল না, অনুচরগণকে গোঁসাইয়ের নিমিত্ত দুধ আটা চিনি ইত্যাদি আনিতে বলিল। অনুচরগণ ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহাদের কর্তার কাহাকেও এরূপ আদর করা অভ্যাস ছিল না, সুতরাং তাহারা নানা জনে নানারূপে আহারীয় দ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রভু তখন নয়ন মুদিয়া আছেন, আর নারোজী স্থিরনেত্রে তাঁহার চন্দ্রবদন দেখিতেছেন। যত দেখিতেছেন ততই বিচলিত হইতেছেন। ক্রমে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান প্রায় গেল। তখন মনের ভাব আর গোপন করিতে পারিতেছেন না, যাহা মনে আসিতেছে তাহাই বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "কত পাপ করিয়াছি। কেন পাপ করিয়াছি? লোকের দ্রব্য অপহরণ করিয়াছি, কত মনুষ্য এই হস্তে বধ করিয়াছি, কেন? স্ত্রী-পুত্রের নিমিত্ত? আমার ত স্ত্রী-পুত্র নাই। আপনার

উদয়ের জন্য? আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, ভিক্ষা করিয়া দুটা অন্ন সংগ্রহ করিতে পারিতাম। পাপ করিয়া করিয়া জীবন কাটাইলাম, এখন দণ্ড লইবার সময় হইয়াছে। আমি এই যে দণ্ড পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা প্রাণের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিতেছে। আর একি বিপদ? আমার হৃদয়ে দয়ামায়া নাই। কিন্তু-সন্ন্যাসী দেখিয়া আমার প্রাণ কান্দে কেন?"

প্রভু নয়ন মুদিয়া আছেন, পরে উহা হইতে দরদরিত ধারা পড়িতে লাগিল। ক্রমে প্রভু বিহ্বল হইলেন, এবং উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে আহারীয় দ্রব্য সাজান রহিয়াছে, প্রভু তাহার মধ্যস্থানে অচেতন হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাহাতে জিনিষ সব নষ্ট হইতে লাগিল। তদ্ যথা—

'দুই চারি জন বলে কেমন সন্ন্যাসী। ইচ্ছা করি নষ্ট করে খাদ্যদ্রব্যরাশি।।'

নারোজী বলিলেন—

"নষ্ট হৈল সব দ্রব্য নাহি কর ভয় পুনঃ যোগাইব আমি এই দ্রব্যচয়।।"

এইরূপে— "অপরাহ্নকালে মোর গোরাগুণমণি। প্রেমে মুরছিত হইয়া পড়িলা ধরণী।।"

তখন নারোজী প্রভুর চরণে পড়িলেন, পড়িয়া আশ্রয় চাহিলেন। অগ্রে হাতে যে অস্ত্র ছিল, তাহা টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। বাকি ছিল কৌপীন-পরিধান, তাহাও করিলেন; করিয়া সেই প্রকাণ্ড দেহধারী যোদ্ধা, দীনের দীন হইয়া, প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইয়া করযোড়ে বলিতেছেন—

"এই দিন চক্ষু অন্ধ ছিল ভ্রান্তিধূমে। আজি হইতে অস্ত্রশস্ত্র ফেলিলাম ভূমে।।
এই মুখে কত জনে কটু বলিয়াছি। এই হস্তে কত নরহত্যা করিয়াছি।।"

নারোজী তাহার দলস্থগণকে বিদায় দিয়া বলিলেন, "তোমরা যাও, সুপথে গমন কর, আর কুকার্য্য করিও না।।" ইহা বলিয়া প্রভুর পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভু চলিলেন, পশ্চাতে নারোজীও চলিলেন, প্রভু নিষেধ করিলেন না। নারোজী ছায়ার মত প্রভুর পশ্চাতে চলিলেন, মুখে বাক্য নাই। নারোজী যে পশ্চাতে আসিতেছেন তাহা প্রভু জানিলেন কি না তাহাও বুঝা গেল না। সেই দিন হইতে তাঁহারা তিন জন হইলেন। সেই চৌরানন্দি, যেখানে নারোজী ছিলেন, এখন উহা "কিরকি" উপনগর, সেখানে বম্বের লাটসাহেব বাস করেন। সেখান হইতে খণ্ডলা যাইয়া প্রভু মূলানদীতে স্নান করিলেন। খণ্ডলাবাসিগণ আতিথ্যধর্মের অত্যন্ত পক্ষপাতী। তদ্‌যথা—

"বড় আতিথ্যেয় হয় যত খণ্ডলিয়া। টানাটানি করে সবে প্রভুকে লইয়া।।
অবশেষে সকলে বিবাদ বাধাইল। খুনাখুনি করিবারে প্রস্তুত হইল।।

প্রভু বলিলেন, "আমার সঙ্গীরা ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে। আমাদের যাহা প্রয়োজন তাহার অধিক লইবার অধিকার নাই। অতএব আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।" এত বলি প্রভু আর বাক্য না কহিল।। নয়ন মুদিয়া হরি বলিতে লাগিল।।

পরে প্রেমে বিভোর হইয়া সমস্ত রজনী প্রভু নিত্য করিয়া কাটাইলেন। এই এক রজনীর মধ্যে উপস্থিত সমস্ত লোককে হরিনাম বিতরণ করিতে হইবে। সেখানে বহুলোকে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই রজনীতে প্রচুর ভজনের ফল-লাভ করিয়া চিরজীবন, এমন কি পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে, ভোগ করিতে লাগিলেন। যাঁহার দর্শনে মন পবিত্র হয়, তাঁহার সঙ্গে এক রজনী যাপন করিয়া ফল কি হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। গৌরাঙ্গ প্রভুর পবিত্র বায়ু অঙ্গে লাগিলে যে ফল হয়, খণ্ডলাবাসিগণের তাহাই হইল। নারোজী সঙ্গে থাকিয়া প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। সে কিরূপে না—"কাছে বসি স্বেদবারি নারোজী মুছায়।"

প্রভু সেখান হইতে নাসিক, নাসিক হইতে দমনগরে ও তৎপরে পঞ্চদশ দিবস পথ চলিয়া সুরাটে উপস্থিত হইলেন। সুরাট হইতে বরোচ, বরোচ হইতে বরদায় গেলেন। সেখানে গোবিন্দের মন্দিরের সম্মুখে বিপদ ঘটিল। এ পর্য্যন্ত আন্দাজ দেড়মাসকাল নারোজী প্রভুর পশ্চাৎ ছায়ার

মত চলিয়াছেন। নারোজী প্রভুর সঙ্গে আসিতেছেন, ইহাতে প্রভু আপত্তি করেন নাই। তাহার কারণ এই বোধ হয় যে, নারোজী ভেক লইয়াছেন, তাহার পরে তাহার যে যাইবার সময় হইয়া আসিয়াছে, তাহাও প্রভু অবশ্য জানিতেন। নারোজী প্রভুর নানা সেবা করিতে করিতে যাইতেছেন, যথা—পাদসম্বাহন, বায়ুবীজন, মূর্চ্ছার সময় সন্তর্পণ ইত্যাদি।

বরদায় গোবিন্দের মন্দিরের সম্মুখে নারোজীর জ্বর হইল, এবং তিন দিন পরে—"জ্বররোগে নারোজীর মরণ ঘটিল।।

মৃত্যুকালে সম্মুখে বসিয়া গোরারায়। পদ্ম হস্ত বুলাইয়া নারোজীর গায়।।
নারোজী মরণকালে জোড়-হাত করি। চাহিয়া প্রভুর পানে বলে হরি-হরি।।
যেই কালে নারোজী নয়ন মুদিল। আপনি শ্রীমুখে কর্ণে কৃষ্ণনাম দিল।।
নারোজীরে কোলে করি প্রভু বিশ্বম্ভর। তমালের তল হৈতে করে স্থানান্তর।।"

আপনারা এখন বলুন—মৃত্যুর পরে নারোজীর কি গতি হইল? যদি কেহ অন্যের এক কপর্দক হরণ করে, তবে সে দণ্ডার্হ হয়। নারোজী বহুতর লোকের সর্বস্বান্ত করিয়াছেন। যদি কেহ কাহাকে অকারণে আঘাত করে, তবে সে দণ্ডনীয় হয়। নারোজী বহু লোকের প্রাণবধ করিয়াছেন। অতএব নারোজীর কি গতি হইল? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার তাৎপর্য শ্রবণ করুন।

যাঁহারা মহাজ্ঞানী, তাঁহারা বলেন যে, কর্মফল ভোগ করিতেই হইবে, তাহা হইতে কাহারও অব্যহতি পাইবার যো নাই। অর্থাৎ তুমি তোমার ভাল-মন্দের কর্তা। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে ভাল ফল আহরণ করিতে পারিবে, কিম্বা যদি ইচ্ছা কর আপনার সর্বনাশ করিতে পারিবে। তাহা যদি হইল, তবে ভগবান কোথা থাকিলেন? বরং লোকে ভগবান্‌কে অবহেলা করিয়া বলিবে,—"আমি যদি ভাল হই, তবে তুমি ভগবান ক্রোধ করিয়াও কিছু করিতে পারিবে না। আর যদি মন্দ হই, তবে তুমি ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিতেও পরিবে না।" তাহা যদি হইল, তবে ভগবানকে উপাসনা কেন করিব? এই সমুদয় জ্ঞানীলোক প্রকারান্তরে বলেন যে, আমাদের কর্তা অপর কেহ নাই, আমাদের কর্মই আমাদের কর্তা। সুতরাং ভগবদ্‌ভজনের প্রয়োজন নাই। যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা বলেন,—"শ্রীভগবানের আশ্রয় লইলে তিনি কর্ম ধ্বংস করেন।" ইহার মধ্যে কোন্‌টা ঠিক? এই তত্ত্ব নারোজীর জীবনী হইতে মীমাংসা হইবে।

নারোজী ঠাকুরের ভাব দেখুন। ঠাকুর হরিদাস চিরজীবন কঠোর ভজন করিয়া আসিয়াছেন, এবং তাঁহার হত্যাকারীদের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছেন। আর নারোজী ঠাকুর চিরদিন অর্থের নিমিত্ত মনুষ্য বধ করিয়া আসিয়াছেন। হরিদাসের দেহ লইয়া প্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে দেহটী তখন মৃত। আর নারোজী জীবিত থাকিতেই প্রভু তাঁহার দেহ কোলে লইলেন, তাঁহার গাত্রে পদ্মহস্ত বুলাইলেন, আর তাঁহার কর্ণে কৃষ্ণনাম দিলেন। প্রভুর দয়া ও শক্তি প্রবোধানন্দ এই শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"ধর্মাস্পৃষ্টঃ সততপরমাবিষ্ট এবাত্যধর্মে
দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং সৃষ্টিষু ক্বাপি নো সন্।
যদ্দত্তং শ্রীহরিরসসুধাস্বাদুমত্তঃ প্রনৃত্য-
তুচ্চৈর্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশং।।"

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তিকে ধর্ম কখন স্পর্শ করে নাই, যে সর্বদা অধর্মে আবিষ্ট, যে কখনও পাপপুঞ্জ-নাশক সাধুজনের দৃষ্টিপথে ও সজ্জন-রচিত স্থানে গমন করে নাই, সেই ব্যক্তিও যদ্দত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস-সুধার আস্বাদনে মত্ত হইয়া নৃত্যে, গীত ও ভূমিতে বিলুণ্ঠন করে, সেই গৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার।

প্রভু জগাই-মাধাইকে নিমেষ মধ্যে জীবাধম হইতে ভক্তশিরোমণি করিলেন। নদীয়ার লোক তাহাতে কি প্রভুকে দুষিয়াছিল? মনে ভাবুন, জগাই মাধাই কর্তৃক অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে

এমত লোক নদীযায় বিস্তর ছিল। তাহারা জগাই মাধাই-র উদ্ধার শুনিয়া প্রতিশোধের ইচ্ছায় মনের আনন্দে জগাই মাধাইকে দেখিতে গিয়াছিল। মনে ভাবিয়াছিল যে, যাইয়া তাঁহাদিগকে বলিবে, "কেমন রে ডাকাত, এখন কেমন?" কিন্তু যাইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া তাহাদের প্রতিশোধের ইচ্ছা একেবারে লোপ পাইল। যিনি ঘাটে যাইতেছেন, জগাই মাধাই অমনি তাঁহার চরণে পড়িতেছেন, বলিতেছেন, জানিয়া বা না জানিয়া যদি আমরা তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকি তবে আমাদের মাপ কর।" যাহাদের কাছে ইহারা প্রকৃত অপরাধ করিয়াছেন তাহারা তাঁহাদের তখনকার দশা দেখিয়া আর তাঁহাদের প্রতি কৃপার্ত না হইয়া পারিতেছেন না, পূর্বকার শত্রুতার নিমিত্ত যে প্রতিশোধের ইচ্ছা তাহা লোপ হইয়া যাইতেছে। মাধাই যাঁহার অনিষ্ট করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাঁহার পূর্বকার প্রতাপ ও এখানকার দৈন্য ও দুর্দশা দেখিয়া যখন তাঁহার প্রতি কৃপার্ত হইতেছেন, তখন ভগবান কেন হইবেন না? যাহাকে দণ্ড করিবে সে যদি সেই দণ্ড প্রার্থনা করে, তবে তাহার প্রতি ক্রোধ আর থাকে না।

বিদ্যাপতি প্রার্থনা করিলেন যে, "হে প্রভু, যখন তুমি বিচার করিবে তখন আমার গুণলেশ পাইবে না, অতএব আমি বিচার চাহি না, আমি করুণা চাই। আবার বড়লোকেরা ভগবানের ন্যায়পরতার বড় পক্ষপাতী। তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিৎ, যদি ভগবান বিচারপতি হয়েন, তবে তাঁহাদের নিজের কি দশা হইবে? ভগবান যদি বিচারপতি হইয়া বসেন তবে আমাদের কাহারও অব্যাহতি নাই, তুমি যে এতবড় লোক তোমারও অব্যাহতি নাই। অতএব "আমি আমার ভালমন্দের কর্তা, শ্রীভগবান নহেন," ইহা বাতুলের কথা, প্রকৃত জ্ঞানীর কথা নয়।

পূর্বে বলিলাম, প্রভু নাসিক নগরে গিয়াছিলেন। এখানে সূর্পনখার নাসিকা ছেদন করা হয় বলিয়া ইহা তীর্থস্থান। সেখানে রামের কুটীর ও তাঁহার চরণচিহ্ন আছে। প্রভু সেখানে গিয়া—
কোথা মেরি রাম বলি উঠিল কান্দিয়া।।

পদ্মগন্ধ বহিতেছে প্রভুর শরীরে। সমীরণ বহিতে লাগিল ধীরে ধীরে।।
কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই। এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখি নাই।।
কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায়। পাগলের ন্যায় কভু ইতি-উতি চায়।।
কি জানি কাহাকে ডাকে আকাশে চাহিয়া। কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া।।
উপবাসে কেটে যায় দুই এক দিন। অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ।।

সেখানে লক্ষ্মণ স্থাপিত গণেশ আছেন। সেই নিবিড় জঙ্গলের গুহায় প্রভু একা বসিয়া আছেন। গোবিন্দ ভিক্ষার নিমিত্ত গিয়াছেন, নারোজী দূরে ফল আহরণ করিতেছেন।

গোবিন্দ ফিরিয়া আসিয়া দূর হইতে জঙ্গলে আলো দেখিতে পাইলেন। ইহাতে তিনি নিঃশব্দে প্রভুর নিকটে আসিতে লাগিলেন। দেখেন কি—

ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে বনের ভিতর। চক্ষু মুদি কি ভাবিছে শ্রীগৌরসুন্দর।।
অঙ্গ হতে বাহির হতেছে তেজোরাশি।

তেজ দেখিয়া গোবিন্দের নয়নে ধাঁধা লাগিল। তিনি গুটি গুটি আরো নিকটে যাইয়া এক ধারে দাঁড়াইলেন। পদ শব্দ পেয়ে প্রভু যেন আচম্বিতে। সব ভাব সম্বরিল দেখিতে দেখিতে।।

শ্রীনবদ্বীপ প্রভু মুহুর্মুহুঃ প্রকাশ হইতেন, তখন তাঁহার শরীর সহস্র সূর্য্যের তেজ ধরিত। নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া সর্বসমক্ষে আর প্রকাশ হইতেন না।

সেখান হইতে দামন নগরে আসিলেন। সে স্থান ত্যাগ করিয়া ও পঞ্চদশ দিবস হাঁটিয়া সুরাটে গেলেন। প্রভু আজ সমুদ্রধারে আসিয়াছেন, এবার পশ্চিমধারে। সেখানে সুরাট রাজার প্রতিষ্ঠিত অষ্টভুজাদেবী আছেন। প্রভু সেখানে তিন দিবস ছিলেন। একজন ভালমানুষ সন্ন্যাসী প্রভুর নিকট সাধন-ভজনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু তাহার সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ একটি ছাগ বলি দিতে আসিল। প্রভু তাহা দেখিয়া মনে ব্যথা পাইয়া

তাহাকে বলিলেন, "দেবী বৈষ্ণবী, তিনি মাংস আহার করেন না। তাঁহার ঘাড়ে দোষ দিয়া তোমরা মাংস ভক্ষণ করিবে? জীবটা পরিত্যাগ কর।"ব্রাহ্মণ তাহাই করিল। তাহার পরে প্রভু তাপ্তা-নদীতে স্নান করিতে চলিলেন। সেখানে বলি-স্থাপিত বামন আছেন, আর সেই নিমিত্ত সেই নদী তীর্থরূপে পরিগণিত। সেখান হইতে যজ্ঞকুণ্ড দেখিবার নিমিত্ত বরোচ নগরে নর্মদার তীরে গমন করিলেন। সেখান হইতে বরোদা নগরে যাইয়া ডাঁকরজী দেখিতে চলিলেন। ডাঁকরজী দেখিয়া আবার বরদায় ফিরিয়া আসিলেন। বরদার রাজা পরম বৈষ্ণব। সেখানে মন্দিরে শ্রীগোবিন্দবিগ্রহ আছেন। প্রতাপরুদ্রের ন্যায় স্থানীয় রাজা স্বহস্তে মন্দিরে পরিষ্কার করেন, স্বহস্তে তুলসীমঞ্জরী তুলিয়া গোবিন্দের পাদপদ্মে দিয়া তাঁহার পূজা করেন। প্রভু সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের মন্দিরে যাইয়া প্রেমে অধীর হইলেন। ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ। সদা উনমত প্রভুর কৃষ্ণের আবেশ।।

এখানে নারোজী এক তমাল-তলায় প্রভুর কোলে শয়ন করিয়া তাঁহার চন্দ্রবদন দেখিতে দেখিতে দেহত্যাগ করিলেন। এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। প্রভু অমনি তমাল-তলা হইতে নারোজীর দেহ স্থানান্তরিত করিলেন ও ভিক্ষা করিয়া তাঁহার সমাধি দিলেন। পরে যেরূপ হরিদাসের অন্তর্ধানের সময়ে করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই সমাধি বেড়িয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। মহা-কলরব হইল, শেষে রাজা আসিলেন। রাজার ইচ্ছা প্রভুকে ভিক্ষা দিবেন। প্রভু বলিলেন যে, বিলাসীর ভিক্ষা লয়েন না। কিন্তু রাজা ছাড়েন না। তখন প্রভুর ইঙ্গিতক্রমে গোবিন্দ মুষ্টিভিক্ষা লইলেন। প্রভু বরদা ত্যাগ করিয়া মহানদী (যাহা মানচিত্রে মাহি বলিয়া পরিচিত) পার হইলেন। পরে আহাম্মা দাবাদে যাইয়া প্রভু প্রথমে মুসলমানরাজ্যের নিদর্শন পাইলেন। বাংলা ত্যাগ করিয়া আর উহা দেখেন নাই। প্রতাপরুদ্রের সাম্রাজ্য গোদাবরীর ওপার পর্যান্ত। সেখান হইতে যত দেশ গিয়াছেন, সমুদয় হিন্দুশাসনাধীনে। আহাম্মাদাবাদে কোন মুসলমানকে দেখিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন উল্লেখ নাই। নগর অতি জাঁকের, বড় বড় অট্টালিকা কর্তৃক শোভিত। নগরবাসীরা অতিথি-সেবায় অনুরক্ত। প্রভুকে সকলে লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। প্রভু গৃহস্থের বাটী যাইতে অস্বীকার করিলেন। বহুতর লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। একজন পণ্ডিত শ্রীভাগবতের কথা উঠাইয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহার সহিত প্রভুর একটু কথা হইল। পরে লোক-কলরব, কীর্তন, প্রভুর নৃত্য। তাহার পরে যাহা হয় তাহা হইল,—প্রভু বহুলোকের হৃদয়ে ধর্মের বীজ বপন করিলেন।

তাহার পরে শুভ্রামতী নদী পার হইয়া প্রভু নদীতে স্নান করিতে গেলেন। এমন সময় গোবিন্দ দেখিলেন কয়েকজন লোক দ্বারকা-তীর্থে গমন করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী আছেন মনে হওয়ায় গোবিন্দের তাহাদের সহিত আলাপ হইল। গোবিন্দ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাহাদের মধ্যে কুলীন-গ্রামের বসু-পরিবারের একজন আছেন, নাম রামানন্দ, অপরের নাম গোবিন্দ চরণ। রামানন্দ গোবিন্দের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন যে, তিনি প্রভুর সঙ্গে যাইতেছেন। ইহা শুনিয়া রামানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! তিনি কোথা?" গোবিন্দ বলিলেন, "ঐ যে তিনি নদীতে (শুভ্রামতী) স্নান করিতেছেন।" রামানন্দ অমনি দ্রুতপদে গিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু বলিলেন, "তুমি আমাকে দেশের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে।" নিত্যানন্দ প্রভৃতি দুই শত জনে নীলাচলে প্রভুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, প্রভু তাঁহাদের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। বাংলায় লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার অদর্শনে রোদন করিতেছেন, তাঁহার অভাবে শ্রীনবদ্বীপ অন্ধকার। যথা, প্রেমদাসের গীত—

নীলাচলপুরে, গতায়াত করে, যত বৈরাগী সন্ন্যাসী।
তাহা সবাকারে, কান্দিয়া সুধায়, যত নবদ্বীপবাসী।।
তোমরা কি এক সন্ন্যাসী দেখিয়াছ? ধ্রু।

বয়স নবীন, গলিত কাঞ্চন, জিনি তনুখানি গোরা।
হরেকৃষ্ণ নাম, বলয়ে সঘন, নয়নে গলায়ে ধারা।।

আর প্রভুর নিজ বাড়ী, তাঁহার জননী ও তাঁহার ঘরণী, কোথায় তাঁহারা? আর কোথায় আমাদের প্রভু? সকলকে ছাড়িয়া, সংসার ত্যাগ করিয়া, ছিন্ন কৌপীন পরিয়া প্রভু কৃষ্ণনাম বিলাইয়া বেড়াইতেছেন! সকলে একত্র হইয়া বাংলায় কথা কহিতে কহিতে দ্বারকায় চলিলেন। দুই গোবিন্দ মিতালি পাতাইয়াছেন। প্রভু গোবিন্দকে ও গোবিন্দচরণকে বলিতেছেন, "তোমরা যদি মিতা হইলে, তবে রামানন্দও আমার মিতা।" রামানন্দ ইহাতে লজ্জা পাইয়া করজোড়ে যেন অনুনয় করিতে লাগিলেন। রামানন্দকে কে না জানে? ইনি বিখ্যাত পদকর্তা। প্রভু সমুদয় ভুলিয়াছেন, কেন? তাহার হৃদয়ে কেবল ইচ্ছা রহিয়াছে—জীবোদ্ধার, তাই রামানন্দ ও গোবিন্দচরণকে দেখিয়া বলিতেছেন, "আমার যে একটা দেশ আছে, তাহা তোমরা স্মরণ করাইয়া দিলে।" রামানন্দ নিজ পদে বলিয়াছেন—

"রামানন্দের বাণী, দিবা নিশি জানি, গৌর আমায় পাগল করিলে।'

পরে সকলে ঘোগা নগরে গমন করিলেন। এ নগর সমুদ্রের ধারে ও পুরবন্দর রাজধানী হইতে সেখানে এখন রেলপথ গিয়াছে। এখানে বারমুখী নামক বেশ্যা বাস করে। তাহার ন্যায় রূপবতী পৃথিবীতে আর নাই, তাহার ঐশ্বর্য্যেরও সীমা নাই। যথা—

"বেশ্যাবৃত্তি করি সাধিয়াছে বহুধন। বহুমূল্য হয় তার বসন ভূষণ।।
বহু দাস দাসী লয়ে থাকে সেইখানে। জাঁক পসারের কথা সব লোক জানে।।
"প্রকাণ্ড বাগিচা—নামে পিয়ারা-কানন। কাননের ধারে প্রভু করেন গমন।।
অতি বড় নিম্ববৃক্ষ আছে সেইখানে। কি ভাবিয়া প্রভু গিয়া বসিলা সেখানে।।"

বারমুখীর প্রকাণ্ড বাড়ী। প্রভু তাহার বাড়ীর পার্শ্বে প্রকাণ্ড বাগানে, এমন স্থানে বসিলেন যে, বারমুখী জানালায় বসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পায়। প্রভু বাগানে, বারমুখী দোতালার জানালায় বসিয়া প্রভুকে দর্শন করিতেছে, অথচ প্রভুর তাহাকে দেখিবার কোন সুবিধা নাই। তবু ঠিক জানিবেন যে, প্রভু জানিতেছেন যে, বারমুখী তাঁহাকে দেখিতেছে। বারমুখী তাঁহাকে দেখিবে না, তবে তিনি সেখানে গিয়াছেন কেন? বারমুখী যেমন পৃথিবীর মধ্যে সুন্দরীর শিরোমণি, প্রভুও তেমনি সুন্দরের শিরোমণি। প্রভু ও তাঁহার তিনজন ভক্ত সেখানেই সেবা করিলেন। সেখানে যে লোক জুটিতেছে তাহা বলাই বাহুল্য।

পিচকারী সম অশ্রু বহিতে লাগিল। তাহা দেখি ঘোগাবাসী আশ্চর্য্য হইল।।
দেখিয়া প্রভুর সেই হরি-সংকীর্তন। মাতিয়া উঠিল প্রেমে দুই চারিজন।।
গ্রাম্যলোক-জনের নয়নে বহে বারি। বহুলোক আসি দাঁড়াইল সারি সারি।।
কেমন ভক্তির ভাব কহনে না যায়। অনিমিষে প্রভুর বদন পানে চায়।।
কখন হাসিছে প্রভু কখন কান্দিছে। কখন বা বাহু তুলি নাচিছে গাইছে।।
থর থর কাঁপে কভু ঘর্ম-বারি বহে। কখন বা প্রেমাবেশে চুপ করি রহে।।
কখন টলিছে রোমাঞ্চিত কলেবরে। প্রাণকৃষ্ণ বলি কভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।।
কৃষ্ণ প্রেমে সদা মত্ত নবীন-সন্ন্যাসী। এই কথা কানাকানি করে ঘোগাবাসী।।
হরি হরি বলিতে আনন্দ-ধারা বহে। পুতুলের প্রায় সবে দাণ্ডাইয়া রহে।।
"কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ" এই বলি ডাকে। কখন বা হাত তুলি উর্দ্ধমুখে থাকে।।
একবার ঐ যে বলি ধাইয়া চলিলা। বাহু পসারিয়া নিম্বে জড়ায়ে ধরিলা।।
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মত্ত হইল নিমাই। এমন উন্মাদ মুঞি কভু দেখি নাই।।
প্রকাণ্ড এক গর্ত সড়কের ধারে। আবেশে গড়ায় পড়ে তাঁহার ভিতরে।।

বারমুখী আপনার রূপ দেখাইয়া অন্যকে বরাবর মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছে। এখন প্রভু

আপনার রূপ দেখাইয়া তাহাকে মুগ্ধ করিতেছেন,—দেহের রূপ নয়, ভিতরের রূপ। বারমুখী তখন এরূপ হইয়াছে যে, প্রভুর চরণে আসিয়া পড়ে আর কি,—কিন্তু ভয় করিতেছে। ভাবিতেছে, প্রভু তাহার উপর কৃপা কেন করিবেন? সে না নগরের অথবা জাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম? বারমুখীর সেই ভ্রম প্রভুর ঘুচাইতে হইতেছে। ভ্রম এই যে,—সে অতি অধম সেই নিমিত্ত কৃপা পাইবার অনুপযুক্ত। এইরূপে প্রভু তাহার ভ্রম ঘুচাইলেন।

বালাজী বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ সেখানে ছিল, প্রভুর উপর তাহার ক্রোধ হইয়াছে। কেন হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করা কঠিন, তবে ভালর প্রতি মন্দের চিরকাল ঐরূপ শত্রুতা। প্রভু যত উন্মত্ত হইতেছেন, তাঁহার প্রতি বালাজীর দ্বেষ তত বৃদ্ধি পাইতেছে। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া প্রভুর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। বলিতেছে,—"তুই ভণ্ড, তোর ভণ্ডামি ভাঙ্গিতেছি, এখানে ভণ্ডামি চলিবে না...।" কেন যে ভণ্ডামি চলিবে না, তাহা আর বালাজী খুলিয়া বলিল না। বোধহয় মনের ভাব এই যে, আমি বালাজী যেখানে আছি, সেখানে অন্যলোকে ভণ্ডামি করিয়া কি করে উহা জীর্ণ করিবে? শেষে প্রভুকে মারিবে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহার উদ্যোগও করিল। অবশ্য বালাজী ভাবিতেছে যে, এ তাহার স্থান, আর সন্ন্যাসী বিদেশী, তাহার বলে সন্ন্যাসী পারিবে কেন? কিন্তু বলপ্রয়োগ করিতে গিয়া বালাজী একটু ফাঁপরে পড়িল। সকলে হাহাকার করিয়া, তাহাকেই আক্রমণ করিল। ইহাতে প্রভুর বাহ্য হইল। কাজেই তিনি বালাজীর পক্ষ হইলেন। তাহাকে বলিতে লাগিলেন, "ছি! এ সমস্ত প্রবৃত্তি কেন পোষণ করিতেছ? উহা পোষণ করিয়া তোমার লাভ কি? এসো তোমাকে পরম-ধন দিতেছি।" ইহাই বলিয়া প্রভু তাহাকে বাৎসল্যভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তখন বালাজী দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না, গ্রহগ্রস্তের ন্যায় শুনিতে লাগিল। যেহেতু প্রভু তখন তাহার স্বাতন্ত্র্য হরণ করিয়াছেন। তাহার পরে তাহার কর্ণে হরিনাম দিলেন, অমনি বালাজী শক্তি পাইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়া গেল। বালাজীর উদ্ধার কার্য্য সমাধা হইল। কেন না সে অহেতুক প্রভুকে প্রহার করিতে গিয়াছিল। বোধহয় প্রভুর ইচ্ছাক্রমেই বালাজীর ঘাড়ে দুষ্ট-সরস্বতী আশ্রয় করেন। প্রভু বালাজীকে দেখাইলেন যে, ভগবানের দয়া মনুষ্যের দয়ার জাতীয় নয়-সে আর এক প্রকার, অনেক বড়। বালাজীর উদ্ধার দেখিয়া বারমুখী আশ্বাসিত হইল। তখন আপনার গণকে এই কথা বলিল যে, উদাসিনী হইব, ঠাকুরের আশ্রয় লইব, সেই নিমিত্ত যাইতেছি। তাহারা মুখ দেখিয়া বুঝিল যে, বারমুখী সঙ্কল্প দৃঢ়। তাহারা রোদন করিতে লাগিল। বারমুখী অগ্রবর্তী হইলে, তাহার অধীনা-সহচরী মীরা ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। বারমুখী তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল,—"আমি নরক হইতে উদ্ধার হইব, তাই পতিতপাবন সন্ন্যাসীর স্মরণ লইব, তুমি আমার ধন ভোগ কর। কিন্তু কেবল সৎকার্য্যে ব্যয় করিও। আমি অবশ্য কৃপা পাইব। বালাজি, ঠাকুরকে প্রহার করিতে গিয়াছিল, প্রভু তাহাকে কৃপা করিলেন। আমার তাই দেখিয়া ভরসা হইয়াছে।"

বারমুখী আসিতেছে, এবং কি জন্য আসিতেছে, তাহাও তখন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কারণ বারমুখীর আসিবার সময় একটা প্রকাণ্ড গোল হইয়াছে। লোকে একেবারে বিস্ময় ও আনন্দে বিভোর হইয়াছে। বারমুখী আসিতেছে দেখিয়া লোকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে। প্রভু নয়ন মুদিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বারমুখী আসিয়া পদতলে পড়িল, আর—"তিন চারি পদ প্রভু অমনি হটিল।" তখন সে উঠিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া আপনার কেশ এলাইয়া দিল। সে কেশ তাহার গৌরবর্ণের নিকট কিরূপ দেখাইতেছিল, না—"বিদ্যুতের পাশে যেন মেঘ রাশি রাশি।" তারপর সে করজোড়ে বলিতেছে, "প্রভু, আমি আর পাপ করিব না। আমাকে চরণে স্থান দাও।" মীরাদাসী সঙ্গে একখানি কাঁচি ও বসন আনিয়াছিল, সেই কাঁচিখানা লইয়া বারমুখী আপনার দীর্ঘ-কেশ কচ্‌কচ্ করিয়া ছেদন করিল। পরে সেই মলিন বসন পরিয়া জোড়হস্তে

প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। ইহাতে দর্শকগণের কিরূপ মনের ভাব হইল বিচার করুন।

প্রভু বারমুখীকে চুপে চুপে কৃপা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া কি করিলেন? না--- সেই পরমাসুন্দরী ধনশালী বেশ্যাকে সহস্র লোকের সম্মুখে দাঁড করাইয়া তাহার কচচ্ছেদন (কেশচ্ছেদন) করাইলেন ও কৌপিন পরাইলেন,—পরাইয়া তাহাকে কৃপা করিলেন। উদ্দেশ্য যে. বারমুখীর উদ্ধারের সঙ্গে এই সহস্র লোক পবিত্র হউক।

বারমুখীকে প্রভু আশ্বাস দিলেন, দিয়া বলিতেছেন,-- "তুমি তুলসী-কানন করিয়া এখানে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কর।"বারমুখী পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী। অনেকে তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইত, আবার ভাল লোক উহা দেখিয়া ভয়ে ও ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিতেন। এখন তিনি চুল কাটিয়াছেন, ভূষণ ছাড়িয়াছেন, মলিন-বসন পরিয়াছেন, ইহাতে কি তিনি পূর্বাপেক্ষা কুৎসিত হইয়াছেন? ঠিক তাহা নয়,—বারমুখীর এক নূতন সৌন্দর্য্য হইল। পূর্বের রূপে কেবল মন্দ-লোকে মুগ্ধ হইত, কিন্তু বারমুখীর এখন যে রূপ হইল, তাহাতে ভাল মন্দ সকল লোকেই মোহিত হইতে লাগিলেন। বারমুখীর সৌন্দর্য্য ক্রমে এখন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু—এই যে বলিলাম,—সে আর একরূপ সৌন্দর্য্য, পূর্বকার সৌন্দর্য্য নয়।

বিবেচনা করুন নারোজী প্রথম-শ্রেণীর ডাকাইত, বারমুখী প্রথম শ্রেণীর বেশ্যা। প্রভুকে দর্শন মাত্র ইহাদের পুনর্জন্ম হইল। ইহাতে প্রভুর অবতারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিবেন। সহচরী মীরাবাঈ অনেক কান্দিল। কিন্তু বারমুখী কিছু গ্রাহ্য করিল না; বরং মীরাকে উপদেশ দিল,—"ভাই, আপনার পথ দেখ, আর কুকর্ম করিও না।"

সেখান হইতে প্রভু ছয় দিন হাঁটিয়া সোমনাথে গেলেন,---এই সোমনাথ মুসলমান কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। মন্দিরের অবস্থা দেখিয়া প্রভু দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভু ক্রন্দন করিতেছেন, ইহার মধ্যে ঝড় উঠিল। প্রভু বসিয়া কীর্তন করিতেছেন, এমন সময় দুই চারিজন পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত, বলিল---"টাকা দাও।" প্রভু বলিলেন, "আমরা সন্ন্যাসী, টাকা কোথা পাব?" ইহাতে গোবিন্দচরণ দুটি মুদ্রা দিলেন। এই পাণ্ডার উৎপাতে আমাদের দেবস্থানগুলির দশা এইরূপ হইয়াছে। সেখান হইতে জুনাগড়ে গেলেন। দেখিলেন, ইহা একটি খুব বড় সহর। সেখানকার ঠাকুর রণছোড়জী। সেখানে গির্ণার পাহাড়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণচিহ্ন আছে, তাহাই দেখিতে প্রভু পাহাড়ে উঠিলেন। পথে দেখেন দ্বাদশ জন সন্ন্যাসী দুঃখ-মনে বসিয়া আছেন। তাহার কারণ তাঁহাদের বৃদ্ধ-গুরু ভার্গদেব পীড়িত। প্রভু অমনি যাইতে নিরস্ত হইলেন, হইয়া ভার্গদেবকে রোগমুক্ত করিলেন। তাহাতে—"রোগ হইতে ভার্গদেব পেয়ে অব্যাহতি। প্রভুর চরণে করে অসংখ্য প্রণতি।।

ভার্গদেব বলিতেছেন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। তাহাতেই আমার চক্ষুরোগ হইয়াছে বোধহয়। কারণ আমি ত তোমাকে কৃষ্ণবর্ণ দেখিতেছি। প্রভু ইহা শুনিয়া জিভ কাটিলেন। তাহাতে ভার্গব স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, "আমি তোমায় চিনেছি। কার কাছে ফাঁকি দেহ নবীন সন্ন্যাসী?" প্রভু তাঁহাকে নয়ন ভঙ্গিতে কি বলিলেন। যথা—"কি কহিলা ভার্গদেবে প্রভু আঁখি ঠারি।

অমনি তাহার চক্ষে বহে অশ্রুবারি।।"

পরে সকলে মিলিয়া গির্ণার পাহাড়ে শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিলেন। সেখানে প্রভু অকথ্য প্রেম-তরঙ্গ উঠাইলেন। তখন রামানন্দ ও গোবিন্দ দুইজন প্রভুর চরণে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভদ্রানদী-তীরে রজনী কাটাইলেন। সম্মুখে ধবিধরঝারি নামক বিখ্যাত জঙ্গল। এখানে অদ্যাপি সিংহ পাওয়া যায়। এই জঙ্গল পার হইতে সাত দিন লাগিয়াছিল। কিন্তু তখন তাঁহারা ষোলজন। বোধহয় এই বন পার হইতে প্রভুর সাহায্য করিতে হইবে বলিয়া ভার্গদেব পীড়িত হইয়া পড়েন। সুঁড়ি পথ দিয়া যাইতে হয়, দুই প্রহর হইলে সূর্য্য দেখা যায়। তবে মাঝে মাঝে কাষ্ঠের দুর্গ আছে, সেখানে যাত্রীগণ রজনীতে বাস করেন. আহার বৃক্ষের ফল; এত ফল যে—

সহস্র লোকের খাদ্য পথে পড়ে থাকে। ঈশ্বরের কত দয়া কহিব কাহাকে।। তাহার একপ্রকার ফল কামরাঙ্গার মত।

চৌশিরা সিজ সম যেই গাছ শোভে। আশ্চর্য তাহার ফল খাই অতি লোভে।।
টুপ টুপ খায় ফল গোবিন্দচবণ। রামানন্দ ধীরে ধীরে করে আস্বাদন।।"

গোবিন্দ নিজে কিরূপে খান তাহা বলেন নাই, তবে এইটুকু বলিলেন—"উদর পুরিয়া ফল যত পারি খাই।"

মধ্যে মধ্যে এই নিবিড় জঙ্গলে প্রভু গান ধরিতেছেন ঃ—

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।"

যখন তখন প্রভু এই নামগান করেন, আর এই ষোলজন সঙ্গে তান ধরেন। এইরূপে কীর্তন করিতে করিতে তাঁহারা প্রভাসতীর্থে আসিলেন। প্রভু অবশ্য যদুকূলের দুর্দশার কথা মনে করিয়া খুব কান্দিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই,—

"কান্দিয়া এতেক হর্ষ কেহ নাহি পায়। কান্দিয়া আনন্দ প্রভু ধরায় ছড়ায়।।"

পরিশেষে প্রভু দ্বারকায় গমন করিলেন। কৃষ্ণের দুই স্থান,—বৃন্দাবন ও দ্বারকা। বৃন্দাবনে প্রভু গমন করিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা জানেন। এখন দ্বারকার সেই প্রকার লীলা আরম্ভ হইল। প্রভু সেখানে এক পক্ষ ছিলেন, দ্বারকানগরে একেবারে উন্মত্ত হইল। যথা—

"ধর্মের ভারেতে পুরী করে টলমল। সকলের চিত্ত যেন হইল নির্মল।।
মন্দ মন্দ বায়ু সদা বহিতে লাগিল। পুষ্প গন্ধে সব বাড়ী যেন আমোদিল।।
যেইখানে মরুক্ষেত্র, কিছুমাত্র নাই। সেখানে বহাল নদী চৈতন্য-গোঁসাই।।
সমস্ত দেশের মধ্যে পাপী না রহিল।

পাণ্ডাগণ প্রভুর আগমন উপলক্ষে একদিন মহোৎসব করিলেন, সকলের নিমন্ত্রণ, প্রভু নিজে এক ভার লইলেন, যথা—"পঙ্গুদেব মধ্যে গিয়া গোরামণি। প্রসাদ বণ্টন প্রভু করেন আপনি।।"

দ্বারকা দেখা হইল। তাহার ওদিকে আর তীর্থস্থান নাই। অমনি প্রভু বলিলেন,—"চল নীলাচলে যাই।" দ্বারকা ত্যাগ করিবার সময় বহুলোক প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। তাহাদিগকে বিদায় দিয়া, পুনরায় বরদায় আসিলেন। আর সেখানে হইতে চলিয়া আসিয়া, ষোল দিনে নর্মদায় স্নান করিলেন, সেখানে প্রভু ভার্গদেবকে বিদায় দিয়া নর্মদায় ধারে ধারে চলিলেন। প্রভুর দক্ষিণভ্রমণ সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছে, এখন আমরা অবশিষ্ট লীলাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

দেহদ বা ধীনগর হইয়া তাঁহারা কুক্ষী আসিলেন। এখানে অনেক বৈষ্ণবের বাস। এখানে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা আছে। প্রভু সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ অতি কাতর হইয়া বলিলেন, "আমি দরিদ্র, আতিথ্য করিবার শক্তি আমার নাই।" প্রভু বলিলেন, "তাহাতে ব্যস্ত কি, যিনি জীব করিয়াছেন, তিনিই আহার দিবেন।" ব্রাহ্মণ ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে একজন বৈশ্য দুগ্ধ চিনি আটা আনিয়া উপস্থিত করিল। সে বলিল, "ব্রাহ্মণ ঠাকুর। তোমার লক্ষ্মীনারায়ণ বড় জাগ্রত। কল্য নিশিতে তিনি নবরূপ ধরিয়া আমাকে স্বপ্নে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বড় পায়স খাইতে সাধ গিয়াছে, তাই আমাকে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া তোমার নিকট আনিতে বলিয়াছেন। এই আমি আনিয়াছি, গ্রহণ করিয়া পায়স রান্ধিয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে দাও।" ব্রাহ্মণ ত কাঁন্দিয়া আকুল। তখন প্রভুকে বলিতেছেন,—"ঠাকুর, এ তোমার লাগিয়া, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" তখন বৈশ্য প্রভুর পানে চাহিয়া একেবারে বিভোর হইল, এবং এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,—"কি হে বণিক। তুমি কি দেখিতেছ?" তখন বণিক গদ্‌গদ্ হইয়া বলিলেন,—"কি আর দেখিব, যিনি নবরূপ ধরিয়া আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন,

তিনি ঠিক ইঁহার মত, তিনিই এই।" প্রভু ইহাতে বৈশ্যকে একটা ধমক দিলেন, দিয়া বলিতেছেন,—"আচ্ছা লোক ত তুমি! আমি ক্ষুধার্ত হইয়া এই ব্রাহ্মণেব বাড়ী আসিয়াছি, ইহার মধ্যে তুমি আমাকে স্বপ্নে দেখিলে?" বৈশ্য ভয়ে আর কিছু বলিল না। প্রভু তখন দুগ্ধ দিয়া পায়স রান্ধিলেন, এবং সকলে প্রসাদ পাইলেন। প্রভু আপনি বৈশ্যকে ও আর সকলকে পরিবেশন করিলেন। প্রাতে প্রভু যাইতেছেন, সেই সময় বৈশ্য আসিয়া প্রভুর চরণতলে পড়িল। সে প্রভুকে ধরিবে বলিয়া পথে লুকাইয়া ছিল। বলিতেছে, "তুমি সেই তিনি, আমি চিনিয়াছি। নিতান্ত যাবে ত, আমাকে কৃপা করিয়া যাও।" প্রভু তখন ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে উঠাইলেন, এ কর্ণে হরিনাম দিযা বলিলেন,—"সব ত্যাগ করিযা তুলসী কানন কর, করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কর।" ইহার পরে সম্মুখে আবার জঙ্গল। দুইদিন হাঁটিয়া গম্ভীর জঙ্গল পার হইয়া সকলে আমঝোড়ে নগরে পঁহুছিলেন। সেখানে যে লীলা করিলেন, তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। গোবিন্দ বলিতেছেন—

"ক্ষুধার জ্বালায় মোরা ছটফট করি। নির্ব্বিকার প্রভু মোর বলে হরি হরি।।"

পরে গোবিন্দ দুই সের আটা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া ষোলখানা রুটী করিলেন, সকলের চারিখানা করিয়া হইল। সকলে সেবা করিতে বসিয়াছেন—

"হেনকালে এক নারী বালক লইয়া। বলে কিছু দেহ মরি ক্ষুধায় জ্বলিয়া।।
শুনিয়া তাহার বাণী প্রভু-দয়াময়। আপনার ভাগ তুলি দিলেন তাহায়।।"

দুঃখিনী খুসি হইয়া চলিয়া গেল। প্রভু এই স্থানে যে দয়া দেখাইলেন তাহা আমার ভাল লাগিল না। দুঃখিনী খুসি হইলেন বটে, কিন্তু যে সব নিজ-জন ভক্ত সেখানে ছিলেন, তাহারা মর্মে মরিয়া গেলেন। তাহাদের আহারীয উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, কাজেই প্রভুকে আর দিতে পারিলেন না। রজনীতে প্রভু কিছু ফল আহার করিয়া রহিলেন।

পথে এক কুণ্ড পাইলেন। কথিত আছে, সীতা পিপাসাতুর হইলে লক্ষ্মণ বাণদ্বারা সেই কুণ্ড খনন কবিয়া জল আহরণ করেন। সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া সকলে বিন্ধ্যগিরি গেলেন। তাহার উপরে মন্দুরা নগরে যাইয়া এক যোগীর কথা শুনিলেন। তিনি গুহায় থাকিয়া তপস্যা করেন, দেখিতে সুন্দর কাঞ্চনবর্ণ। ইনি প্রকৃত একজন যোগসিদ্ধ। তারপর—

"মহাপ্রভু সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলা। তপস্বী ভাঙ্গিয়া ধ্যান চাহিতে লাগিলেন।।
যেইক্ষণে চারিচক্ষে হইল মিলন। অমনি তপস্বীবর হাসিল তখন।"

তপস্বীর সঙ্গে প্রভুর যে কি কথা হল, তাহা গোবিন্দ বুঝিতে পারিলেন না। সেখান হইতে সকলে মণ্ডলনগরে গেলেন, ও তথা হইতে দেবঘর নগরে যাইয়া আদিনারায়ণের কুষ্ঠ আরাম করিলেন। আদিনারায়ণ একজন ধনী বণিক, অথচ পরমবৈষ্ণব,—কিন্তু কুষ্ঠারোগগ্রস্ত, সর্বদা অসুখী। প্রভু গ্রামের বাহিরে এক বটতলায় বসিলেন। সেখানে ভোগকার্য্য সমাধা করিলেন। তাহার পরে কীর্তন আরম্ভ হইল। কাজেই লোককলরব হইল, সেই সঙ্গে আদিনারায়ণও আসিলেন। তিনি আসিয়া "নিস্তার কর প্রভু" বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে তাঁহার ভোগের কিঞ্চিৎ প্রসাদ ছিল, তাহা গ্রহণ করিতে দিলেন।

"ভক্তিসহ প্রসাদ করিয়া উপভোগ। তখনি তাঁহার দূর হৈল কুষ্টরোগ।।"

তখন বহু রোগী আসিবে এই ভয়ে সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। আদিনারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, কিন্তু প্রভু তাঁহাকে সংসার ত্যাগ করিবার আজ্ঞা দিয়া ফিরাইয়া দিলেন।

তাহার পরে শিবানী (শিউনি) নগর, মালয় পর্বত, চণ্ডীপুর, রায়পুর অতিক্রম করিয়া পরিশেষে প্রভু বিদ্যানগরে রামানন্দের বাড়ী আসিলেন। এতদিন পরে প্রভু নিজ ভক্তগণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন দুইজনে গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "রামরায় আমার সঙ্গে চল, দুইজনে কৃষ্ণ-কথায় সুখে দিন কাটাইব। রামরায় একটি রাজ্যে

রাজত্ব করিতেছেন। তিনি যখন স্নান করিতে যান, তখন বাদ্য বাজাইয়া সঙ্গে সহস্র লোক যায়। তিনি ইহা ফেলিয়া কুটীরে বসিয়া কৃষ্ণ-কথা কহিতে কেন যাইবেন? কিন্তু রামরায় তাহা ভাবিলেন না, প্রভুর আজ্ঞায় আপনাকে কৃতকৃতার্থ মানিলেন। শেষে বলিলেন, "আপনাকে দর্শন করা অবধি এই রাজ্যশাসন আমার বিষের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমি রাজাকে লিখিলাম যে, আমা হইতে আর তাঁহার কাজ হইবে না, তিনি অন্য লোক নিযুক্ত করুন। তোমার নিকট থাকিব—এই নিমিত্ত এই প্রার্থনা করিতেছি, তাহা রাজা জানিতেন, তাই তিনি তদ্দণ্ডে ছুটি দিলেন। তিনি তোমাকে দর্শন করিবেন বলিয়া নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া আছেন। তুমি অগ্রে যাও। আমার সঙ্গে সৈন্য-সামন্ত যাইবে, কাজেই তোমার আমার একত্র যাওয়া সুবিধা হইবে না।" তাই প্রভু রামানন্দকে ছাড়িয়া নীলাচলে চলিলেন। প্রভু নাম বিলাইতে বিলাইতে যাইতে লাগিলেন। পুনরুক্তির ভয়ে সে সব কথা আর উল্লেখ করিলাম না। তবে এক মাড়ুয়া ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয়, সেটা বলিতে হইতেছে। সেরূপ কয়েকটী লীলা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। অর্থাৎ প্রভুর মারখেয়ে দয়া করা। কিন্তু এই মাড়ুয়া সম্বন্ধে যে লীলা তাহাতে একটু বিশেষত্ব আছে। তাই উহা একটু বিবরিয়া বলিব। এই লীলা রসালকুণ্ডে হয়। সেখানে এই মাড়ুয়া ব্রাহ্মণ কাহাকে গ্রাহ্য করে না। আর মনেও খুব অভিমান আছে যে, সে স্বাধীন প্রকৃতির লোক, কাহাকে ভয় করে না ইত্যাদি—অর্থাৎ সে একটি বর্বর, মনুষ্যের হৃদয়ে যে সমুদয় কমনীয় ভাব আছে, তাহা তাহার কিছুই নাই, যাহা ছিল, সব উৎপাটন করিয়াছে, আর তাহার হৃদয়ে কোন কমনীয় ভাব নাই বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে।

এই ব্রাহ্মণের একটি প্রহ্লাদ জন্মিয়াছে। কাজেই সে প্রভুর চরণে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে বসিয়া আছে,—সেখান হইতে নড়িতেছে না, কি নড়িতে পারিতেছে না। প্রভুও তাহার প্রতি স্নেহ নয়নে দৃষ্টি করিতেছেন। ব্রাহ্মণ পুত্রকে না পাইয়া তল্লাস করিতে করিতে শুনিল যে, সে প্রভুর কাছে আছে। সুতরাং ক্রুদ্ধ হইয়া সেখানে আসিল, আসিয়া দেখিল যে প্রকৃতই তাহার পুত্র করযোড়ে প্রভুর সম্মুখে বসিয়া আছে। ইহা দেখিয়া সে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল, "তুই এখানে কি করিতেছিস?" বালক বলিল, "এই ঠাকুরের কাছে আছি, ইনি বড় দয়াময়।" বালকের মুখে প্রভুর স্তুতিবাণী শুনিয়া মাড়ুয়ার যে ক্রোধ পুত্রের প্রতি হইয়াছিল, তাহা সমুদয় প্রভুতে নিয়োজিত হইল। অবশ্য তাহার হাতে একখানা যষ্টি ছিল, আর উহা পুত্রের পৃষ্ঠে প্রয়োগ করিবে বলিয়াই আনিয়াছিল। এখন উহা হস্তে করিয়া প্রভুকে মারিতে চলিল। আর মারিবার, আগে প্রভুকে গালি দিতে লাগিল। যাহারা কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া যাইয়াই প্রহার করে, তাহারা লোক মন্দ নহে, তবে কিয়ৎ পরিমাণে পাগল, নিজ কার্য্যের নিমিত্ত সম্পূর্ণ দায়ী নহে। কিন্তু যাহারা কুটীল, তাহারা অগ্রে গালি দেয়, দিয়া ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া লয়, ক্রোধ হইলে কুকর্ম করিতে আর বাধা থাকে না। এই জন্য ব্রাহ্মণ অগ্রে গালি দিতে লাগিল, কি গালি দিল, তাহা অনুভব করা যায়। অর্থাৎ বলিতেছে,—"তুই ভণ্ড জুয়াচোর সন্ন্যাসী, আমার পুত্রকে নষ্ট করিলি। অদ্য তোকে প্রহার করিয়া তোর ভণ্ডাম ঘুচাইব।"

ইহাতে বালকের মনে কি ভাব হইল তাহা বেশ বুঝা যায়। তাহার পিতা পাষণ্ড, সে নিজে অতি স্নেহশীল, পিতাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। সেই পিতা, তাহার বিবেচনায় একেবারে আপনার সর্বনাশ করিতেছে। অবশ্য সে পিতার চরণ ধরিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারিত, কিন্তু সে বেশ জানিত যে, তাহাতে কোন ফল হইবে না। কাজেই সে পিতাকে ছাড়িয়া প্রভুকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। যাহা বলিল, তাহার ভাবার্থ এই—"প্রভু, উনি আমার পিতা আমার নিমিত্ত পিতার অপরাধ না লইয়া উঁহাকে মাপ কর।" ইহাতে প্রভুর উপর তাহার পিতার ক্রোধ আরো বাড়িয়া গেল। যদি পুত্র তাহার সহিত জুটিয়া প্রভুকে আক্রমণ করিত, তবে সে পুত্রকে হৃদয়ে ধরিয়া মুখচুম্বন করিত। কিন্তু পুত্র সন্ন্যাসীর দিকে যাইয়া

প্রকারান্তরে বলিতে লাগিল যে, তাহাব পিতা পাষণ্ড, প্রভুর দয়ার উপযুক্ত পাত্র। সুতরাং পুত্রের ব্যবহারে ব্রাহ্মণ আরও জ্বলিয়া উঠিল। ইহার পরে আর এক কাণ্ড হইল, যাহাতে ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দেওয়া হইল। অর্থাৎ সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা ব্রাহ্মণকে কটু বলিতে লাগিল। প্রভুও ব্যঙ্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"মারিবে কিন্তু তাহার মূল্য চাই।" যথা---"যতবার হরিনাম মুখে উচ্চারিবে। ততবার যষ্টিঘাত করিতে পারিবে।।"

প্রভুর এই ব্যঙ্গোক্তিতে ব্রাহ্মণের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন বালক, পিতার চরণ ধরিয়া বলিল,---"বাবা দেখিতেছেন না, উনি স্বয়ং জগন্নাথ।" তাহাতে সে পিতার পদাঘাত খাইল। তখন বালক প্রভুর চরণে পড়িল। এইরূপে একবারর প্রভুকে, একবার পিতাকে অনুনয় করিতে লাগিল। তখন প্রভু ব্রাহ্মণের দিকে অরুণ করুণ চক্ষে চাহিলেন, সে চাহনির তুলনা নাই। চাহিয়া বলিতেছেন,--"তোমার যে কঠিন মরুভূমির ন্যায় হৃদয়, তাহা কৃষ্ণের কৃপায় রসাল হউক।"

যে মাত্র প্রভু এই বর দিলেন, অমনি ব্রাহ্মণ কাঁপিতে লাগিলেন। তখন—

"ভয়ে জড়সড় বিপ্র দেখিতে না পায়। কাঁদিয়া আকুল হয়ে পড়িল ধরায়।।
প্রভুর প্রভাবে বিপ্র আকুল হইয়া। দুই হাত দুই পদ ধরে জড়াইয়া।।
অপরাধ করে বড় পাইয়াছি ভয়। কৃপা করে অপরাধ ক্ষম দয়াময়।।"

প্রভু যখন ব্রাহ্মণকে বর দিলেন, তখন তাহার পুনর্জ্জন্ম হইল। তাহার কি কৃষ্ণপ্রেম হইল? না তাহার ভক্তির উদয় হইল? ইহার কিছুই তাহার হয় নাই, তাহার হইল ভয়। ইহার নিগূঢ় অর্থ পরিগ্রহ করুন। সকল আধার একরূপ নয়, সকলের পীড়া একরূপ নয়, সকল পীড়ার ঔষধও একরূপ হইতে পারে না। তবে কিনা বিষস্যবিষমৌষধি। যাহা হইতে তাহার পীড়া উৎপত্তি, তাহাকে তাহাই দিয়া আরাম করিতে হইবে। সার্বভৌমের পীড়ার কারণ বিদ্যা, তাহাকে বিদ্যাদ্বারা আরোগ্য করিতে হইবে। চাঁদকাজির পীড়া লোকবল, তাহাকে লোকবল দিয়া সুস্থ করিতে হইবে। জগাই মাধাই নিঠুর অত্যাচারী, তাহার ঔষধ—চক্র। সুতরাং ব্রাহ্মণ ভক্তি কি প্রেম পাইলেন না, পাইলেন কেবল ভয়, সে এত ভয় যে বস্ত্রখানি নষ্ট করিলেন, এবং এই ভয় হইতে পরিণামে তাহার ভক্তির উদয় হইল।

পুরীধামের নিকট আসিয়া প্রভু আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। তখন নিতাই, সার্বভৌম প্রভৃতি এক দৌড়ে আসিয়া আলালনাথে প্রভুর দেখা পাইলেন।*

---

*"গোবিন্দের কড়চা" বলিয়া যে পুস্তক ছাপা হইয়াছে, তাহার প্রথম অংশ ও শেষ কয়েক পত্র প্রক্ষিপ্ত। প্রভুর সঙ্গে রামানন্দের মিলনের পূর্বে এই মুদ্রিত কড়চা গ্রন্থে যাহা আছে তাহা অলীক। আবার, আলালনাথে আসিয়া প্রভুর যে বহু ভক্তের সহিত মিলন হইল, সেখান হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই কড়চায় যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সমস্তই অলীক। গ্রন্থখানি প্রামাণিক করিবার নিমিত্ত—গোবিন্দের দ্বারা লেখান হইয়াছে যে, "আমি ও কালা কৃষ্ণদাস চলিলাম।" অথচ হস্তলিখিত কড়চায় কালা কৃষ্ণদাসের নামগন্ধও নাই। যে কড়চা গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে তাহাতে রামানন্দ রায়ের মিলন হইতে আলালনাথে প্রভুর সহিত ভক্তদিগের মিলন পর্যন্ত প্রামাণিক। অবশিষ্ট সমস্তই প্রক্ষিপ্ত। প্রকাশক মহাশয় এইরূপ অন্যায় কার্য করিয়া পরে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েন। তাহার পর তিনি তাঁহার দোষ অপনয়নের নিমিত্ত যতদূর সম্ভব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া একখানি পত্র লিখেন। "গোবিন্দ দাসের কড়চা রহস্য" পুস্তক পড়িয়া দেখিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রভু দক্ষিণে যাইয়া কি কি কার্য্য সাধন করিলেন, তাহার অল্প কিছু বিচার করিব। জীবকে ভক্তিধর্ম শিক্ষা দেওয়া যে এই অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য, প্রভু একমুহূর্তের নিমিত্তও তাহা ভুলেন নাই। প্রভুর ইচ্ছা ছিল যে, যতদূর সম্ভব এই ধর্ম সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচার করিবেন। বিশেষতঃ দক্ষিণ দেশে এই ধর্ম প্রচার করা বড় প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহার এক কারণ, তখন ভারতবর্ষের দক্ষিণেই বিশুদ্ধ হিন্দুদেশ ছিল, অন্যান্য অংশের ন্যায় দক্ষিণে মুসলমান-আধিপত্য প্রবেশ করিতে পারে নাই। আর এক কারণ দক্ষিণ-অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম এক প্রকার ছিল না। বৌদ্ধধর্ম উত্তর-ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণ-অঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের উৎপত্তি স্থান দক্ষিণে, সেখানে তাঁহার প্রবল প্রতাপ। উদাসীন, সাধু, সন্ন্যাসীগণ ঐরূপে মুসলমান উৎপাতে দেশে স্থান না পাইয়া কতক হিমালয়ের গহ্বরে, আর অবশিষ্ট দক্ষিণদেশে পলায়ন করিলেন। অনেকে আধ্যাত্মিক উন্নতির অর্থাৎ প্রেম ও ভক্তির নিমিত্ত, যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তবু বৈষ্ণবধর্ম হইতে তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন। আপনারা দেখিবেন যে, দক্ষিণে প্রভু সন্ন্যাসী ও যোগীদিগকে যেন তল্লাস করিয়া কৃপা করেন।

দক্ষিণে সাধারণ হিন্দুগণের মধ্যেই বেশী শৈব ও শাক্ত ধর্মাবলম্বী, বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি অল্প ছিল, সেখানে অনেক রামায়ত অর্থাৎ রামোপাসক বাস করিতেন। অবশ্য ইহাদিগকেও একশ্রেণীর বৈষ্ণব বলে। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব তাঁহারা নহেন। তবে রামানুজ দক্ষিণে ধর্মের জয়পতাকা লইয়া ধর্ম-প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম ও প্রচলিত শাক্তধর্ম—প্রায় এক প্রকার। উভয়ের মধ্যে মুখ্য বিভিন্নতা এই যে, শাক্তগণের উপাস্য দেবতা শিব ও দুর্গা, আর রামানুজের উপাস্য দেবতা কৃষ্ণ,—কিন্তু সে কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য-বিবর্জিত দ্বিভুজ-মুরলীধর নহেন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ। সুতরাং দক্ষিণে প্রকৃত বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল।

প্রভুর দক্ষিণে যাইবার আর এক কারণ, রামানন্দ রায়কে সংগ্রহ করা। প্রভু যে ব্রজের নিগূঢ়রস জীবকে শিক্ষা দেন, রামানন্দকে অধিকারী জানিয়া, তাঁহার হৃদয়ে, সেই রসের বীজ বপন করিলেন। এই নিগূঢ়-রস কি, যদি প্রভু শক্তি দেন তবে পরে বিস্তার করিয়া লিখিব। যাঁহারা লীলার সহায় ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রভুর নিকট আপনি আসিলেন, কাহাকে আনিতে প্রভুর 'তাঁহার কাছে যাইতে হইয়াছিল। রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামী ছয় গোস্বামীর একজন, ইনি তপনমিশ্রের তনয়। প্রভু তপনমিশ্রকে কাশীতে পাঠাইয়া এই রঘুনাথের সৃষ্টি করেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপ ডাকাইয়া আনিলেন। পরে একবার, কেশে ধরিয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে আনিয়াছিলেন। হরিদাস আপনি আসিলেন। আর যদিও নিত্যানন্দ, প্রভুর আকর্ষণে আপনি আসিয়াছিলেন, তবু তাঁহাকে নন্দন আচার্য্যের বাড়ী হইতে প্রভুর ধরিয়া আনিতে হইয়াছিল। উপরে যাঁহাদের নাম করিলাম, ইঁহারা সকলেই লীলার সহায়। অদ্বৈত বৈষ্ণব-ধর্মের জ্ঞানাংশ, নিতাই আনন্দাংশ, আর হরিদাস নাম-সংকীর্তনের প্রতিনিধি।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ যাঁহাদের ভজনীয় বস্তু, তাঁহাদের পীঠস্থান বৃন্দাবন। কিন্তু বৃন্দাবন কোথায়? বৃন্দাবন তখন জঙ্গলময়। সেই জঙ্গলে বৃন্দাবন সৃষ্টি করিতে হইবে, সেই বৃন্দাবন গঠন করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত পাত্র সংগ্রহ করিতে হইবে, আর বড় বড় মন্দির করিতে হইবে। অথচ প্রভুর এক কপর্দকও নাই। কাহার সাধ্য এই বৃন্দাবন সৃষ্টি করে? তাহাই উপযুক্ত পাত্রের প্রয়োজন।

আবার কোন নূতন-ধর্ম প্রচার করিতে হইলে, তাহার একটি লিখিত শাস্ত্র চাই। কারণ ধর্মের উপদেশগুলি মুখে-মুখে থাকিলে সত্বর কলঙ্কিত হয়। কিন্তু এই শাস্ত্র গ্রন্থিত করিবার জন্য উপযুক্ত লোকের আবশ্যক। প্রভু এই সমুদয় কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কোন বড় সম্রাট, কি অতি বড় কোন পণ্ডিত করিতে পারিতেন না। কিন্তু আমার

কৌপীনধারী প্রভু, ধন-জন-সহায়শূন্য একক সমুদয় করিয়াছিলেন। এই সমুদয় কার্য্য যাঁহাদিগের দ্বারা করাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে গোস্বামী বলে। এইরূপ ছয় গোস্বামী বৃন্দাবনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি, সেখানে এই ছয় গোস্বামী সেনাপতিরূপে রহিলেন। অন্তর্যামী প্রভু দেখিলেন যে, গৌড়ীয় পাতসাহেব পরমপণ্ডিত ও বিচক্ষণ মন্ত্রীদ্বয়, রূপ ও সনাতনই কেবল এই সমুদয় বৃহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ। তাঁহারা গৌড়ে, আর প্রভু নীলাচলে। প্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবার পথে গৌড়ে গেলেন এবং সেখানে তাঁহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। যত পণ্ডিত যুদ্ধ করিতে আসেন, তাঁহারা এই গোস্বামীগণের, বিশেষতঃ রূপসনাতনের নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হন।

দক্ষিণে যাইবার আর এক কারণ কোপালভট্টকে শক্তিসঞ্চার করিয়া বৃন্দাবনে আনয়ন করা। ইনি ছয় গোস্বামীর একজন। প্রভু বারাণসীতে যাইয়া প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে আহরণ করেন। সরস্বতী ঠাকুরের অমূল্য "চৈতনাচন্দ্রামৃত" যিনি পাঠ না করিয়াছেন তিনি অতি হতভাগ্য। মহাপ্রভু যে কি তত্ত্ব, তাহার অতি প্রধান সাক্ষী প্রবোধানন্দ। ইহার সাক্ষ্য অমান্য করিবার একেবারে যো নাই। যখন বৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের যশ ভারত ব্যাপিল, তখন রূপসনাতন ও জীব নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় পশ্চিমদেশীয় লোকদিগকে দীক্ষা দেওয়ার ভার গোপালভট্ট গোস্বামীর উপর ন্যস্ত হয়।

প্রভু দক্ষিণে ভ্রমণ করিতে করিতে ফলবান বিষবৃক্ষ পাইলেই তাহা ছেদন করেন। আবার স্থানে স্থানে অমৃতবৃক্ষ রোপণও করিয়াছেন। এইরূপে বেশ্যা, দস্যু ও মায়াবাদী প্রভৃতি বহুবিধ বিষবৃক্ষ নষ্ট করিলেন, আর তুকারামের ন্যায় ফলবান্ অমৃতবৃক্ষ রোপণ করিলেন। প্রভু উন্মাদের মত যাইতেছেন বটে, কিন্তু কাজের কোন ভুল হইতেছে না। সমুদ্রধার দিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে অভ্যন্তরেও যাইতেছেন। কেন যাইতেছেন, তাহা তাঁহার কার্য্যের দ্বারা পরে প্রকাশ পাইতেছে---অর্থাৎ আচার্য্য সৃষ্টি করিবার জন্য।

কোন মহাপুরুষ কি অবতার যদি কোন নূতন ধর্ম প্রচার করেন, তবে কিছুকাল সেই অবতারের শক্তিতে উহা বৃদ্ধি পায়। পরে মনুষ্যের দুর্মতিতে আবার উহার শক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে। ধর্মের এইরূপ গ্লানি হইলে, শ্রীভগবান্ সেখানে অবতীর্ণ হইয়া, আবার সেই ভক্তিধর্ম স্থাপন করেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাক্য। তাই প্রভু যখন ধর্মপ্রচার করিলেন, তখন এই ধর্ম ভারতবর্ষের সমুদয় ধর্মকে দুর্বল করিয়া ফেলিল। এই বাংলায়, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সময়, শাক্তধর্ম প্রায় যায় যায় হইয়াছিল। কিন্তু গৌড়ে ব্রাহ্মণের আধিপত্য আবার ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, এবং তাহার ফলে এখন বৈষ্ণব ধর্মের ছায়ামাত্র আছে।

সেইরূপ প্রভু যদিও সমুদয় দক্ষিণদেশে নব-জাগরণ আনিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে আবার ধর্মের নির্জীব ভাব উপস্থিত হইয়াছে। তবু দক্ষিণে প্রায় সমুদয় স্থানে, বৈষ্ণবধর্মের আর এক আকার হইয়াছে। তুকারামের শিক্ষা গুলি ঠিক আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মত। আমি বোম্বাই সহরে আমাদের গৌড়ীয় কীর্তন শুনিয়াছি। বিখ্যাত ইতিহাস-লেখন সত্যচরণ শাস্ত্রী বম্বে পরিভ্রমণকালীন সমুদ্র-তীরে শ্রীবর্দ্ধন নামক স্থানে একটি বৈষ্ণবের মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন যে, উহা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অবধূতের মঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ; শুনিলেন যে, খ্যাতনামা গৌরভক্ত পরমপণ্ডিত বিশ্বনাথ তাঁহার শেষজীবন শ্রীবর্দ্ধনে যাপন করেন। তবে হয়ত স্বয়ং বিশ্বনাথ সেখানে গমন করেন নাই, তাঁহার শিষ্য দ্বারা ঐ মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। তত্রাচ, মহাপ্রভুর একজন গৌড়ীয় ভৃত্য কর্তৃক ঐ মঠ যে স্থাপিত হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। রামযাদব বাগচি ইলোরা নগরে যাইয়া রাধাকৃষ্ণমূর্তি দেখিলেন। পূর্বে বলিয়াছি, অগ্রে দক্ষিণে বৈষ্ণবগণ দ্বিভজ মুরলীধর, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ভজনা করিতেন না। তাঁহাদের সেবার বস্তু ছিলেন লক্ষ্মী-জনার্দন—অর্থাৎ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ আর লক্ষ্মী। শ্রীকৃষ্ণের

অন্যান্য মূর্তিও দক্ষিণে পূজিত হইত,—যেমন বিঠলদেব। দক্ষিণে বৈষ্ণবগণের সর্বপ্রধান মন্দির,—শ্রীরঙ্গপত্তন। সেখানে ভজনীয় বস্তু—লক্ষ্মী-জনার্দন। তবে দক্ষিণে যে একেবারে রাধাকৃষ্ণ ভজন ছিল না, তাহা বলা যায় না। থাকিলেও সে অতি বিরল। মহাপ্রভু যাইয়া রাধাকৃষ্ণ ভজন প্রচলিত করিলেন। অতএব দক্ষিণে যেখানে রাধাকৃষ্ণের মন্দির দেখিবেন তাহার প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ উৎপত্তির কারণ যে মহাপ্রভু, তাহার সন্দেহ নাই। রামযাদব শুনিলেন যে, সেই রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের সম্মুখে প্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন।

আপনারা অগ্রে পাঠ করিয়াছেন যে, মহাপ্রভু ত্রিপতিনগরে গমন করেন। ইহা আরকট জেলায়, মাদ্রাজ হইতে বহুদূরে নয়। সেখানে সাহিত্যসেবী শ্রীমান গোপাল শাস্ত্রী অল্পদিন হইল গিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া একটী তৈলঙ্গিপদ শুনিলেন। যথা—

"চেয়ে দেখ দুলু গোসাঞি বীর।
আর কোথায় কে দেখেছ এমন খোলা শির?"

অর্থাৎ ভারতবর্ষের অপর সমস্ত স্থানে লোক মাথায় আবরণ দিয়া থাকে, "লাঙ্গাশির" কেবল বাংলায়। ঐ সকল স্থানের লোকের বিশ্বাস যে, যদি কোন স্ত্রীলোক লাঙ্গাশির দেখেন তবে সে দিন তাহার উপবাস থাকিতে হয়। দুলু গোসাঞি বাঙ্গালী, কাজেই তাঁহার মাথার কোন আবরণ ছিল না। তাহা হইতেই ঐ তৈলঙ্গি কবিতাটি হইয়াছে। সে যাহা হউক, দুলু গোসাঞি কে? তিনি যে বাঙ্গালী, তাহা জানা গেল, তিনি তবে যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ তিনি ঐ ত্রিপতিতে অবশ্য খ্যাতাপন্ন ছিলেন, তাহা না হইলে গ্রাম্যকবি তাঁহাকে একটী কবিতার নায়ক করিবে কেন? শ্রীল গোপাল শাস্ত্রী অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, তিনি একজন বৈষ্ণব-মহান্ত, সেখানে ছিলেন এবং তাঁহার সমাধিও সেখানে পর্বতের উপরে আছে। এই কথা শুনিয়া গোপালবাবু প্রভৃতি অনেকে পদব্রজে অতি উচ্চ গোকর্ণগিরির উপর উঠিলেন। দেখেন যে, পর্বত নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ। পর্বতে বহুতর গুহা আছে, তাহার মধ্যে সাধু বাস করিয়া ভজন করিতেন, হয়ত এখনও করেন। তাঁহারা একটি গুহায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, অভ্যন্তরে মন্দির, মনোহর কূপ, পুষ্পোদ্যান ও বাসের নিমিত্ত ছোট ছোট কুটীর। এই ত্রিপতিতে এখনও গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্য আছেন। এই গোকর্ণগিরি বৈষ্ণবগণের একটী মহাপীঠ বলিয়া বিখ্যাত। তিনি পরে জানিতে পারেন, দুলু গোসাঞির নাম দুর্লভচন্দ্র সেন, পরে ভেক লইয়া দুলু গোসাঞি হন। তাঁহার সমাধি অদ্যাপি সেখানে পূজিত হইতেছে। দুর্লভ গোসাঞির আশ্রমে মহাপ্রভু পূজিত হইতেন, গোসাঞির অন্তর্দ্ধানের পর সেই বিগ্রহ কম্বোকাননের একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়াছেন ও সেই শ্রীবিগ্রহ এখনও সেখানে পূজিত হইতেছেন। কম্বোকানন কুম্ভকর্ণের সরোবর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। দুর্লভ গোস্বামীর পাঠ্যগ্রন্থের মধ্যে চৈতন্যচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা এখনও সেখানকার বৈষ্ণবগণের মধ্যে রক্ষিত আছে।

মনে করুন, এই ত্রিপতিনগরে, প্রভু সেখানে যাইবার পূর্বে একটীও বৈষ্ণব ছিলেন না, ছিলেন কেবল রামায়তগণ। তাঁহারা শ্রীরামের উপাসক। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান মথুর স্বামী। তিনি প্রভুর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া, পরে তাঁহার চরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

প্রভুর ধর্ম কিরূপে উত্তর-পশ্চিমে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিতে গঞ্জমালী, চক্রপাণি প্রভৃতি প্রচারকদিগের নাম করিয়াছি। এইরূপ সুরাট, গুজরাট, মালাবার, লাহোর ও সিন্ধুদেশে, প্রভুর ধর্ম প্রচারিত হয়; পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস ধর্ম-প্রচারার্থ দেরাগাজিখায় গিয়াছিলেন। তিনি সিন্ধু নদী পার হইয়া দেখিলেন, সেখানে একটি মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছেন। আর, দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন যে, মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের ৫০।৬০ জন বৈষ্ণবও সেখানে আছেন।

মহাপ্রভুর লীলাকথা এখনও বাহিরে প্রকাশ হয় নাই। যত প্রকাশ পাইবে ততই তাঁহার নূতন নূতন কীর্তি জানা যাইবে। প্রভুর লীলা যখন তেলুগু তৈলাঙ্গ, ও মহারাঠি ভাষায় প্রকাশ হইবে,

তখন উহা সর্বসাধারণে জানিবেন। আমার বিশ্বাস যে, অনুসন্ধান করিলে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে প্রভুর অসংখ্য কীর্ত্তি পাওয়া যাইবে এবং এই সমুদয় ক্রমে প্রকাশ হইবে, তবে আমাদ্বারা অবশ্য হইবে না। পূর্বে লিখিয়াছি যে সম্রাট আকবর তানসেনকে সঙ্গে করিয়া সনাতন গোস্বামীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এ কথা কোন গ্রন্থে পাই নাই, তবে একটি পদে পাইয়াছি, যথা—

"জিউ জিউ মেরে মনচোরা গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা।।
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া।
ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া।।
পদ দুই চারি চলু নট নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়া।।
ঐছন পহুঁকে বাহু বলিহারি।।
সাহ আকবর তেরে প্রেমাভিকারী।।"

তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর যে বৃন্দাবনে গোস্বামী দর্শন করিতে আইসেন আর তাঁহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হয়েন, তাহা তিনি তাঁহার আত্ম-জীবনী গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রভু দক্ষিণে আর এক মহৎ কার্য্য করেন। সেখানে বিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণ-কর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা এই দুইখানি পুস্তক সংগ্রহ করেন। যদিও ব্রহ্মসংহিতা অমূল্য গ্রন্থ, তবে সেরূপ গ্রন্থ লেখা একেবারে অসম্ভব নয়, কিন্তু কর্ণামৃত লিখে কাহার সাধ্য? কেবল তাঁহারি সাধ্য যিনি কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপাপাত্র। তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এত কৃপা কেন হইল? কারণ তাঁহার নয়ন রমণীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহাই বেলের কাঁটা দিয়া সে দুটী নয়ন ধ্বংস করেন। কাজেই কৃষ্ণের কৃপাপাত্র হইলেন। প্রভুর প্রকাশের পূর্বে মাধুর্য্য ভজন যাহা কিছু ছিল, তাহা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব, রামরায়, বিল্বমঙ্গল জগতে দিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রভু ২৪ বৎসর বয়সে অবতাররূপে প্রকাশিত হয়েন। সেই হইতে তাঁহার প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ। তবু ইহার চারি বৎসর পূর্বে তিনি পূর্ববঙ্গে নাম প্রচার করেন। তাঁহার প্রকৃত কার্য্য কি বলিতেছি। তাঁহার এক কার্য্য অন্তরঙ্গের সহিত, ও আর এক কার্য্য বহিরঙ্গের সহিত। অন্তরঙ্গের সহিত তাঁহার যে কার্য্য সে কথা পরে বলিব। বহিরঙ্গের সঙ্গে তাঁহার কার্য্য— শ্রীভগবানের প্রকৃতি ও ভজন কিরূপ, তাহা শিক্ষা দেওয়া। যে অবধি মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে, সেই অবধি জীব শ্রীভগবানকে একটী অসুর সাজাইয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে গিয়া কেবল তাঁহার গ্লানি করিয়াছে। প্রভু শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগবানের প্রকৃতি কিরূপ ও তাঁহার ভজন কিরূপ।

ধর্মপ্রচারকার্য্যও অন্যান্য মহাপুরুষেরা পূর্বে করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রচারপদ্ধতি ও প্রভুর প্রচারপদ্ধতি একরূপ নহে। যীশুখৃষ্ট চারি বৎসর পরিশ্রম করিয়া মূর্খ লোকের মধ্যে মোটে দ্বাদশটি শিষ্য পাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একজন তাঁহার সহিত ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। মহম্মদ মদিনা সহর হইতে অনুগত লোক সংগ্রহ করিয়া মক্কা জয় করিলেন, করিয়া এক দিনে নগরে সমুদয় লোককে তাঁহার মতে আনিলেন। কারণ তিনি এই নিয়ম করিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিতে অস্বীকার করিবে, তাঁহাকে তিনি বধ করিবেন। কাজেই এক মুহূর্তে নগর সমেত লোক তাঁহার অনুগত হইল। কিন্তু প্রভুর প্রচার-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। তিনি প্রায় সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া, তাঁহার অনুমোদিত ধর্ম প্রচার করিলেন। তিনি জীবকে বক্তৃতা কি তর্ক করিয়া বুঝাইলেন না,—বুঝাইলেন আপনি আচরিয়া। সহস্র লোকের মধ্যে আপনি কৃষ্ণপ্রেমে অভিভূত হইয়া দেখাইলেন যে কৃষ্ণপ্রেম কি। আর তাহা দেখিয়া তাহাদের

প্রায় সকলেরই সেই পরমধন লাভ করিতে প্রগাঢ় লোভ হইল। তিনি মাত্র ৪/৫ বৎসর প্রচার করিয়া দেশের শীর্ষস্থানীয় লক্ষ লক্ষ লোককে বৈষ্ণবধর্মে আনয়ন করিলেন। এইরূপে নবদ্বীপের প্রধান অধ্যাপক সার্বভৌম, সন্ন্যাসীর প্রধান প্রকাশানন্দ, বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রধান অদ্বৈত, স্বাধীন ভূপতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সম্রাট প্রতাপচন্দ্র, গৌড়ের রাজার মন্ত্রী প্রভৃতিকে বৈষ্ণবধর্মে আনিয়া প্রচারের সুবিধা করিলেন। অন্যান্য ধর্মপ্রচারকগণ আপনারা বড় অধিক প্রচার করিতে পারেন নাই। প্রকৃত প্রচার তাঁহাদের শিষ্যদিগের দ্বারা হইয়াছিল। যীশু যখন প্রাণত্যাগ করেন, তখন তাঁহার মাত্র একাদশটী শিষ্য ছিল। প্রভু কিন্তু স্বয়ং যত প্রচারকার্য্য করেন, ভক্তগণ দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও হয় নাই। এই শিষ্যগণের মধ্যে প্রধান নিতাই, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। পূর্বে বলিয়াছি, প্রভুর ধর্ম দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে হইলে একটী শাস্ত্রের প্রয়োজন। খৃষ্টীয়য়ানদের ম্যাথিউ প্রভৃতি ২/৪ খানি খৃষ্টের লীলাগ্রন্থ যদি না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের ধর্ম অতি অল্প দিনের মধ্যে লোপ পাইত। মুসলমানদের কোরান না থাকিলে তাঁহাদের ধর্মেরও সেই অবস্থা হইত। প্রভু সেই নিমিত্ত বৈষ্ণবদের একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রয়োজন বোধ করিলেন।

প্রভু রূপকে প্রয়াগে দশ দিন ও সনাতনকে কাশীতে দুই মাস শিক্ষা দিলেন। প্রভু আমাদের সমুদয় শাস্ত্র ফেলিয়া দিয়া, নূতন একটি করিতে পারিতেন। একেবারে চুরমার করিয়া সেই দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া পুনর্বার গ্রন্থন করার পদ্ধতি প্রভুর অনুমোদনীয় নহে। তিনি সমুদয় শাস্ত্র রাখিলেন। এমন কি, তিনি তেত্রিশ কোটী দেবতা ও জ্ঞানবাদীদিগের তত্ত্বকথাও রাখিলেন। সে সমুদয় রাখিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্রের ভিত্তিভূমি করা প্রভুর মনের ইচ্ছা। মনে ভাবুন, এ অতি অসম্ভব ব্যাপার। শিব থাকিবেন, কালী-দুর্গা থাকিবেন, অথচ শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাস রাখিবেন। এই সমুদয় দেবদেবী উপাসনা, আর ব্রজের নিগূঢ় রসের সামঞ্জস্য করা ত বহু-দূরের কথা, বিচার করিলে দেখা যায়, ইহারা পবস্পরের ধ্বংসকারী। রস-বিচারের সময় পাঠক দেখিবেন, কালীপূজা ও রাধাকৃষ্ণ-ভজন পরস্পর ঘোর বিরোধী। দ্বৈতবাদে ও অদ্বৈতবাদে সেইরূপ অহীনকুলতা সম্বন্ধ, কিন্তু প্রভু এইরূপ সকল বিবাদ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।

আবার বেদ হিন্দুদিগের সর্বপ্রধান সম্মানের বস্তু। এই বেদ কি বৈষ্ণবধর্মের পোষকতা করে? যদি না করে তবে হিন্দুরা এই ধর্ম লইবেন না; আর যদি পোষকতা করে, তবে বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি দৃঢ়তম হইবে। অতএব এই অসম্ভব কার্য্য,—বেদের দ্বারা বৈষ্ণবধর্মের পোষকতা করা,—তাহাও প্রভু করিলেন। দ্বিতীয় কার্য্য ন্যায়শাস্ত্র অর্থাৎ শুদ্ধ বিচার দ্বারা বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য স্থাপন করা। বিচারে এরূপ দেখাইতে হইবে যে, শ্রীভগবান আছেন, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যময়, আর তাঁহার ভজন করিতে হইলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য অংশ বর্জন না করিলে উহা সম্ভব হয় না। ইহার মধ্যে শেষ তত্ত্বটী কেবল বৈষ্ণবগণ মান্য করেন, আর কেহ করেন না। আর এক কাজ রসবিস্তার। বৈষ্ণবদিগের সর্বপ্রধান ভজন ব্রজের রস লইয়া। সে রস কি, তাহার একটি নূতন শাস্ত্র করা আবশ্যক। এই রস পূর্বে জগতে ভজনের নিমিত্ত কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত। চতুর্থ বৈষ্ণবদিগের স্মৃতি করা। ইহারা সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিবে, কাজেই নিয়মের আবশ্যক। আবার, নিয়মগুলি এরূপ হওয়া চাই যাহা বৈষ্ণব মাত্রেই মান্য করিতে বাধ্য হইবে। এই সমস্ত শাস্ত্র কিরূপ ভাবে লিখিত হইবে, ইহার বিন্দুবিসর্গও কেহ জানিতেন না। প্রভুরই এই সমুদয় অমানুষিক কার্য্য করিতে হইবে। আর তিনি ইহা কি ভাবে করিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি। নূতন বৃন্দাবন সৃষ্টি ও বৈষ্ণবশাস্ত্র সৃষ্টি, এ উভয় কার্য্যই তিনি প্রধানতঃ রূপ ও সনাতন দ্বারা সমাধা করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনকালীন প্রয়াগে, রূপ ও অনুপমের সহিত প্রভুর দেখা হইল। অমনি প্রভু সেখানে রহিয়া গেলেন—কেন না, রূপকে শিক্ষা দিবার জন্য। দশ মাস, শ্রীরূপকে

শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইলেন; বলিলেন, "যাও যাইয়া কার্য্য উদ্ধার কর।" প্রভু তথা হইতে কাশীতে গমন করিলেন। সেখানে সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ হইল, এবং তাঁহাকে দুই মাস শিক্ষা দিলেন। সুতরাং যদিও প্রভু প্রেমে উন্মত্ত, তবু জীবের মঙ্গলকামনা সর্বদা মনে জাগরূক রাখিতেন; প্রভু জননী, স্ত্রী ও বন্ধুগণ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে ছিলেন, সেখানে অনেকের সহিত প্রীতি হইয়াছিল। এখন আবার তাঁহাদের ত্যাগ করিয়া কাশী ও প্রয়াগে যাইয়া নির্জন কুটিরে বসিয়া সনাতন ও রূপকে আড়াই মাস যাবৎ তত্ত্বকথা শিক্ষা দিলেন। ইঁহাদের কি শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহার আভাস পূর্বে দিয়াছি। অর্থাৎ যে সমুদয় লোক তাঁহার ধর্ম অবলম্বন করিবে, তাহাদের নিমিত্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন। তাই, সে সমুদয় শাস্ত্র কি এবং তাহাতে কি কি থাকিবে তাহা শিখাইলেন। এই সমুদয় শাস্ত্র পরিশেষে গোস্বামীরা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহারা কি লিখিবেন কিছুই জানিতেন না। সে সমুদয় প্রভুর নিকট শিক্ষা করিলেন, করিয়া—যথা চরিতামৃতে—

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া। নিবেদন করে দন্তে তৃণগুচ্ছ লৈয়া।।
নীচ জাতি নীচসেবী মুঞি ত পামর। সিদ্ধান্ত শিখাইলা এই ব্রহ্মার অগোচর।
তুমি যে কহিলা এই সিদ্ধান্তামৃত সিন্ধু। মোর মন ছুঁতে নারে ইহার এক বিন্দু।।
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন। বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ।।
"মুই যে শিখাইনু তোরে স্ফুরুক সকল।' এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল।।
তবে মহাপ্রভু তার শির ধরি করে। বর দিল এই সব স্ফুরুক তোমারে।।

পূর্বে বলিয়াছি, প্রেম ভক্তির মত যে বেদসম্মত, ইহা না দেখাইলে হিন্দুগণ উহা লইবে না। কিন্তু জগতে সকলেই জানিত যে বেদ প্রেম ভক্তিধর্মের বিরোধী। তাই সার্বভৌম, প্রভুকে তাঁহার নাচন, গায়ন ছাড়াইবার নিমিত্ত বেদ পড়াইতে চাহেন। প্রভু প্রথমে সার্বভৌমের সহিত বিচারে দেখাইলেন যে, বেদ প্রেমভক্তি ধর্মের বিরোধী নয়, বরং পক্ষপাতী। তাই সার্বভৌম বলিলেন, "প্রভু, তুমি স্বয়ং বেদ!" ঠিক এই লীলা কাশীতে হয়। তখনকার সন্ন্যাসীর স্থান কাশী, আর কাশীর প্রধান সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী। প্রভু বেদের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তাঁহাকে বুঝাইলেন অর্থাৎ দেখাইলেন যে, বেদ প্রেমভক্তি-ধর্ম অনুমোদন করিয়াছেন। পূর্বে যে সরস্বতী ঠাকুর প্রভুর ভাবকলিকে দূষিয়াছিলেন, প্রভুর কৃপা পাইলে তাঁহার মত কিরূপ পরিবর্তিত হয়, তাহা তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে দেখা যাইবে।

এই প্রথম প্রভু দেখাইলেন যে, বেদ তাঁহার ধর্মের পক্ষপাতী। তাহার পরে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এ সম্বন্ধে বৃহৎ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তাঁহার সে কাহিনী অতি অদ্ভুত। তাঁহার পরে প্রভু—শ্রীভগবানের প্রকৃতি কিরূপ, ভজন সাধন কিরূপ, প্রেমভক্তি কিরূপ ইত্যাদি সমুদয়, বিস্তার করিয়া শিক্ষা দিলেন, আর শিক্ষা দিলেন যে, প্রেমভক্তি-রস দিয়া যে ভজন করিতে হইবে, সে সমুদয় রস কি।

তাহার পরে কিরূপে বৈষ্ণব-স্মৃতি করিতে হইবে, তাহাও শিখাইলেন। যেমন রঘুনন্দনের স্মৃতি শাক্তদের নিমিত্ত, সেইরূপ বৈষ্ণবদের স্মৃতি 'হরি-ভক্তি বিলাস'। গোস্বামী গোপাল ভট্ট, গোস্বামী সনাতনের নিকট এই সমস্ত তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া এই বৈষ্ণব-স্মৃতি প্রকাশ করেন। এইরূপে বৈষ্ণব শাস্ত্রের সৃষ্টি হইল। এই সমুদয় বৈষ্ণব গ্রন্থের তালিকা দিতে অনেক স্থান লাগিবে, তবে প্রধান কয়েকখানির নাম ক্রমে করিতেছি। প্রভুর লীলালেখক শ্রীকবিরাজ গোস্বামী মোটামুটি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা লক্ষ গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন।

এখন বৃন্দাবন গঠন করিতে হইবে। যখন প্রভু প্রথমে লোকনাথ ও ভূগর্ভকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন, তখন তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন যে, বৃন্দাবনে কিছু নাই, কেবল আছেন—যমুনা ও গোবর্দ্ধন। তাহার পরে প্রভু গেলেন। যাইয়া শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিলেন। তাহার পরে রূপ সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন।

সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রবোধানন্দ সরস্বতীকেও সেখানে প্রেরণ করিলেন। ইহারা কেহই প্রভুকে ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইতে চাহেন নাই, কিন্তু প্রভু তাঁহাদিগকে আপনার নিকটে থাকিতে দিলেন না। বলিলেন "বৃন্দাবনে সত্বর যাইয়া আমার কার্য্য উদ্ধার কর"। অতএব সেই করঙ্গ, কৌপীন এবং কাঁথাধারী দুই চারি মূর্তি বৃন্দাবন স্থাপন করিতে প্রেরিত হইলেন,—ইঁহারা সকলেই প্রভুর শক্তিতে বলীয়ান।

তপন মিশ্রের আলয়ে তাঁহার পুত্র রঘুনাথ ভট্টকে প্রভু বলিলেন. "পিতা-মাতার সেবা কর। তাঁহাদের অন্তর্ধানে আমার এখানে আসিও, আর বিবাহ করিও না।" রঘুনাথ ভট্ট তাহাই করিলেন। তখন প্রভু তাঁহাকে কিছুদিন সঙ্গে রাখিয়া শক্তিসঞ্চার করিয়া বলিলেন,—"এখন বৃন্দাবনে যাও।" রঘুনাথ কান্দিতে লাগিলেন, যাইতে চাহিলেন না। কিন্তু তাহা হইল না, তাঁহার যাইতেই হইল। রঘুনাথকে যে আজ্ঞা করেন, শ্রীরঙ্গপত্তনে বালক গোপালকেও ঠিক তাহাই করিলেন। পিতামাতা গোলোকগত হইলে, গোপাল আজ্ঞা নাই বলিয়া নীলাচলে যাইতে পারিলেন না, একেবারে বৃন্দাবনে গেলেন। জীব এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী সর্বশেষে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বৃন্দাবন গঠনের ভার, প্রধানতঃ রূপ-সনাতন ও প্রবোধানন্দের উপর ন্যস্ত হইল। প্রবোধানন্দের তত নাম নাই, কারণ রূপ-সনাতনের সহিত তাঁহার মতের একটু পার্থক্য ছিল। সে আর কিছু নয়,—রূপ-সনাতনের কার্য্য রাধাকৃষ্ণের ভজন প্রচলন করা, আর প্রবোধানন্দের ভজনীয় শ্রীগৌরাঙ্গ,—শ্রীকৃষ্ণ নহেন।

প্রবোধানন্দের শ্রীনবদ্বীপে আসা উচিত ছিল। বোধ হয় তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া, প্রভু তাঁহাকে শঙ্করীয় মায়াবাদীগণ হইতে ভক্তিধর্ম রক্ষা করার নিমিত্ত বৃন্দাবনে রাখেন। শ্রীজীব গোস্বামী রূপ এবং সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও রূপের শিষ্য। তিনি রূপ-সনাতনের ছোট ভাই অনুপমের পুত্র। অনুপম অদর্শন হইলে, রূপ-সনাতন উদাসীন হইলেন। রূপ বাড়ী আসিয়া অতুল সম্পত্তি নানা ভাল ভাল কার্য্যে নিয়োগ করিয়া, তাঁহাদের রাজসিংহাসনে শ্রীজীবকে বসাইলেন। তখন নিঃসম্বল হইয়া তিনি একেবারে বৃন্দাবনে গমন করিলেন।

শ্রীজীব কিছুকাল রাজত্ব করিলেন, কিন্তু উহা তাঁহার ভাল লাগিল না। শেষে তিনি শ্রীনবদ্বীপে গমন করিয়া নিতাই-র স্মরণ লইলেন। বলিলেন, "আমি সংসারে থাকিতে পারিতেছি না, অথচ পিতৃব্যের ইচ্ছায় আমি রাজত্ব করি।" নিতাই বলিলেন, "প্রভু শ্রীবৃন্দাবন তোমাদের গোষ্ঠীকে দিয়াছেন। তোমার পিতৃব্যদ্বয় বৃদ্ধ হইলে তখন বৃন্দাবন কে রক্ষা করিবে? তুমি বৃন্দাবনে যাও।" এই আজ্ঞা পাইয়া শ্রীজীব বৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নিতাইয়ের আজ্ঞা লইয়া আসিয়াছেন, কাজেই পিতৃব্যদ্বয় তাঁহাকে রাখিলেন।

শেষে রঘুনাথ দাস আসেন। প্রভু ইঁহাকে গোস্বামী পদ দিয়া কাছে রাখিয়াছিলেন। প্রভুর অন্তর্ধানের পর তিনি বৃন্দাবনে গমন করিয়া সেখানে রহিলেন,—এই হইলেন ছয় গোস্বামী।

নূতন যে বৈষ্ণব-সাহিত্য হইল, তাহাতে বেদের আকার পরিবর্তিত হইল। সে হিসাবে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে একজন ব্যাস বলা যায়। বৈষ্ণব-স্মৃতি যেরূপ সংস্কৃত ও পূর্ণ, সেরূপ রঘুনন্দনের স্মৃতি নয়।

ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে জীব গোস্বামী যেরূপ সন্দর্ভ লিখিয়াছেন, এরূপ গ্রন্থ জগতে নাই। ইহা অনুবাদ করিলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেখিবেন যে, ঐ গোস্বামীগণ আধ্যাত্মিক জগতের কত অভ্যন্তরে গিয়াছেন। বাংলা-সাহিত্যের সৃষ্টি, একপ্রকার বৈষ্ণব-ধর্ম হইতে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রভুর শেষ লীলা

হৃদয়েরি বাজা প্রাণায়াম! অনাথিনী করি,
কোথা গেলে প্রাণনাথ। তোমা বিনা ভুবন আন্ধার। ধ্রু
কবে তোমা পাব চাঁদ, আমার চাঁদ চাঁদ।
আমি তোমার চিরদিনের, হে পরাণের ফাঁদ।।
গৌরচন্দ্র নাম আমার কর্ণে প্রবেশিল।
সেই হতে মতি গতি সব ফিরে গেল।।
অলক্ষিতে তুমি আমার হিয়ায় প্রবেশিলে।
কিছু নাহি জানি আমার কাছে কেন এলে।।
বড় বড় কত লোক ছিল এ জগতে।
তাহা সব ছাড়ি কৃপা করিলে আমাতে।।
তুমি জান তোমার মন আমি কিবা জানি।
আমারে মেরো না প্রাণে শুন গুণমণি।।
তুমি ছাড়া মোর আর কেবা কোথা আছে।
তুমি তেয়াগিলে বল যাই কার কাছে।।
আমি তোমায় খুঁজে বেড়াই হতভাগা অন্ধ।
দরশন দিয়ে আমার ঘুচাও মনের ধন্দ।।
দেখা দিয়ে প্রাণ জুড়াও কোথা মোর যাদু।
মধুময় তুমি নাথ মধু মধু মধু।।
অনন্ত ভকত তোমায় ঘিরিয়া রয়েছে।
অতি ক্ষুদ্র বলরামে মনেতে কি আছে?
আমি চাতকিনী তুমি নবজলধর।
তুমি পূর্ণচন্দ্র আমি চকোর কাতর।।
আগে আসি বস প্রভু মুখখানি দেখি।
এ দীন বলাই দুঃখী কর নাথ সুখি।।

প্রভু দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া নদীয়া হইতে দুই শত ভক্ত নীলাচলে দৌড়িলেন। হাঁটিয়া যাইতে অন্ততঃ তিন চারি সপ্তাহের পথ, আবার সেখানে রাসের দিন পর্য্যন্ত থাকিবেন। অতএব ৪/৫ মাসের সম্বল লইয়া, আর ৪/৫ মাসের সম্বল বাড়ীতে রাখিযা, ভক্তগণ নীলাচল [illegible]লেন। যখন প্রভু দক্ষিণে ছিলেন, তখন নদীয়ার কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বাসুঘোষ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

গোরা বিনা প্রাণ কান্দে কি বুদ্ধি করিব।
সে হেন গুণের নিধি কি সাধনে পাবো।।
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া।।
গোরা বিনা শূন্য ভেল নদীয়া-নগরী। ইত্যাদি।

এই দুই বৎসর নদীয়া, শান্তিপুর, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি স্থানের ভক্তগণ রোদন করিয়া কাটাইয়াছিলেন। প্রভুর যেরূপ আকর্ষণ এরূপ জীবে সম্ভবে না।

তাঁহাবা প্রভুকে দেখিতে যাইতেছেন। এদিকে প্রভু তাঁহার নিজের কার্য্য উদ্ধারের পথ পরিষ্কার

করিতেছেন। তিনি নীলাচলে থাকিবেন, কেন না উহা হিন্দুর রাজ্য। কিন্তু সে রাজ্যের রাজা যদি পাষণ্ড হয়েন, তবে সেখানে কিরূপ ধর্মপ্রচার করিবেন? অতএব অগ্রে তাঁহাকে ভক্তিধর্ম অর্পণ করা প্রয়োজন। তুমি আমি হইলে ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব ভাবিতাম। প্রতাপরুদ্র বস্তুটী কি একবার দেখুন। তিনি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের যথেচ্ছাচারী সম্রাট। তাঁহার রাজ্য এক সময় ত্রিবেণী হইতে গোদাবরীর ওপার পর্য্যন্ত ছিল। একবার ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলিয়া দেখিবেন, সে রাজ্য কত বড়। এইরূপ রাজাকে করায়ত্তে আনিতে হইবে, নতুবা সব কার্য্য পণ্ড হইবে।

প্রভু রাজাকে কিরূপে চরণানুগত করিলেন তাহা আপনারা জানেন। রথাগ্রে প্রভু মূর্চ্ছা গিয়াছেন। রথ আসিতেছে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে আঘাত লাগিবে সকলের এরূপ ভয় হইল। রাজা সেখানে দাঁড়াইয়া। তাই তিনি প্রভুকে ধরিলেন,—অভিপ্রায়, স্থানান্তরিত করিবেন। কিন্তু রাজার স্পর্শ মাত্র প্রভুর চেতন হইল, অমনি সেই লক্ষ লোকের সম্মুখে প্রভু তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিলেন; বলিলেন,—"ছি! বিষয়ী লোকে আমায় স্পর্শ করিল?" রাজা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রভু লক্ষ লোকের সম্মুখে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। সে বেচারী কি অস্পৃশ্য, হাড়ি না চামার? তা নয়,—তিনি ক্ষত্রিয়, জগন্নাথের সেবক ও সাম্রাজ্যের অধিপতি, ভারতবর্ষের মধ্যে ঐশ্বর্য্য হিন্দুদিগের সর্বপ্রধান। তাঁহাকে এইরূপ অহেতুক অপমান! তাহাও নয়, তিনি প্রভুকে বাঁচাইতে গিয়াছিলেন, আর তাঁহাকে অপমান!

প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রভু এইরূপ ব্যবহার করিলেন, অথচ ত্রিবাঙ্কুরের ও বরদার রাজার সহিত বিনা আপত্তিতে ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। আবার তাঁহার প্রধান কার্য্য পতিত ও অস্পৃশ্য পামরকে আলিঙ্গন দান করা। অতএব প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে স্পর্শ করায় দোষ কি হইল? কিন্তু প্রভুর নিগূঢ় অভিপ্রায় কি শ্রবণ করুন। তিনি যথেচ্ছাচারী সম্রাটকে চরণতলে আনিবেন, তাই তাঁহাকে প্রথমে দেখাইলেন যে, যদিও তিনি রাজা, তবু পাষণ্ড অতএব অস্পৃশ্য। বস্তুতঃ রাজা অপমানিত হইয়া প্রভুর কৃপা আহরণের নিমিত্ত প্রাণপণ করিলেন।

তাহার পরে প্রভু উদ্যানে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। রামরায়ের পরামর্শ অনুসারে রাজা তাঁহার পদতলে বসিয়া সেবা করিতে করিতে রাসের শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। প্রভু চেতন পাইয়া উঠিয়া ইহাই বলিয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন—"কে গা তুমি আমাকে সুধা পিয়াইলে?" ইহা বলিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় পড়িয়া গেলেন। সেই আলিঙ্গনের দ্বারা প্রভু রাজার শরীরে প্রবেশ করিলেন, আর তখন প্রতাপরুদ্র চারিদিকে গৌরময় দেখিতে লাগিলেন। সেখানে ভক্তগণ বসিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাদের মধ্য দিয়া যাইবার সময় সকলকে প্রণাম করিতে করিতে চলিলেন। এইরূপে প্রভুর সহিত রাজার গোপনে মিলন হইল।

তাঁহার কিছুকাল পরে প্রভু যখন গৌড়ে আগমন করেন, তখন কটক অর্থাৎ প্রতাপরুদ্রের রাজধানী—হইয়া আইলেন। সেই সময় প্রকাশ্যে প্রভুতে ও রাজাতে মিলন হইল। প্রভু বকুলতলায় বসিয়া। রামরায় প্রভুকে রাখিয়া রাজাকে আনিতে গিয়াছেন। রসিক রামরায় রাজাকে এবার সাজাইয়া আনিলেন। রাজা আসিতেছেন কিরূপে,—না রাজবেশে, রাজসজ্জায়। রাজা হস্তীর উপরে, মন্ত্রীগণ হস্তীর উপরে, সহস্র সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সমভিব্যাহারে ও ব্রণবাদ্যের সহিত প্রতাপরুদ্র আইলেন।

দূর হইতে হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া রাজা যোড়-করে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছেন। প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই বাহু পসারিয়া রাজাকে আলিঙ্গন দিবেন এই ভাব করিলেন। কিন্তু তাহা হইল না,—রাজা দীঘল হইয়া প্রভুর শীতল চরণে মস্তক রাখিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন, আর সেই মণিমুক্তা খচিত মুকুট শ্রীপদ স্পর্শ করিল।

রামরায় রসিক লোক। তিনি এইরূপ মিলনে দেখাইলেন যে, প্রতাপরুদ্র শ্রীভগবানকে জয় করিয়াছেন; আর যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ, তিনি প্রতাপরুদ্র রাজার রাজা।

যুদ্ধের নিমিত্ত পথ বন্ধ ছিল, অথচ ভক্তগণ আসিতেছেন। প্রভুর ইচ্ছায় অনায়াসে পথ পরিষ্কার হইয়া গেল, আর পথের ভয় রহিল না। ভক্তগণ পুরীধামে আসিয়া দেখিলেন যে, রাজা প্রজা, ও মন্দিরের সেবক অর্থাৎ সমগ্র পুরীবাসী প্রভুর চরণাশ্রয় করিয়াছেন।

প্রভু নিত্যানন্দকে দ্বাদশজন ভক্ত সঙ্গে দিয়া গৌড়দেশে প্রচার করিতে পাঠাইলেন। নিতাই গৌড়ে কি করিলেন, তাহা একটু পরে বলিতেছি।

প্রভু স্বয়ং বৃন্দাবনে গমন করিলেন, আর সেই জঙ্গলময় স্থানে কয়েকদিন মাত্র ছিলেন। ইহার মধ্যে প্রধান প্রধান যে সকল লুপ্ততীর্থ তাহা তিনি উদ্ধার করিলেন, আর প্রত্যাবর্তন সময় প্রবোধানন্দ ও রূপ-সনাতনকে শক্তি সঞ্চার করিয়া উজাড় বৃন্দাবন ও ভক্তিশাস্ত্র গঠন করিতে পাঠাইলেন। এইরূপে প্রভুর জগতের সমুদয় বাহিরের কার্য একরূপ শেষ হইয়া গেল। আর তখনি শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার নিকট "বাউলকে কহিও বাউল" তর্জা পাঠাইলেন।

সপ্তম অধ্যায়

মূল ঘটনার মূলোৎপাটন

এই প্রস্তাবে জীবের—বিশেষতঃ ভারতবাসীর—দুর্দশার কথা কিছু বলিব। ১৪০৭ শকে শ্রীভগবান ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার পরে লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাঁহার আশ্রয় লইলেন। তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল বৃন্দাবন সৃষ্টি হইল, বৈষ্ণবশাস্ত্র রচিত হইল, বড় বড় গ্রন্থ প্রণীত হইল, বেদ সংস্কৃত হইল, গোপী-অনুগা-ভজন প্রচলিত হইল ইত্যাদি। ইহার মধ্যে মূলঘটনা কি?

ইহার মধ্যে মূলঘটনা প্রভুর অবতার, অর্থাৎ শ্রীভগবানের মনুষ্য-সমাজে উদয় হওয়া। আর অন্যান্য ঘটনা সেই মূলঘটনার ফল বড় নয়। ষট্সন্দর্ভ বড় গ্রন্থ সন্দেহ নাই, তবু সে মূলঘটনা নয়,—মূলঘটনার ফল মাত্র। মূলঘটনা—শ্রীভগবানের মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করা।

এই মূলঘটনা যে কি প্রকাণ্ড ব্যাপার, তাহা আরো বিস্তার করিয়া বলিতেছি। সেটী এই যে,—সেই মায়াতীত জ্ঞানাতীত অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের—যাঁহার নখচ্ছটা সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াও যোগিগণ দেখিতে পান না, তাঁহার মনুষ্য-সমাজে উদয় হওয়া। শুধু উদয় হওয়া নয়, পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্যন্ত মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করা, তাহাদের সহিত হাস্য ক্রন্দন শয়ন ভোজন ইত্যাদি করা। এরূপ ঘটনা জগতে কখনও হয় নাই। যদি বল শ্রীকৃষ্ণ কি শ্রীরামচন্দ্র উদয় হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কার্য ও উপদেশ কুজ্ঝটিকায় আবৃত। তাঁহাদের লীলা যে সত্য তাহার প্রমাণ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা যে সত্য তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে, যিনি তল্লাস করিবেন তিনিই দেখিতে পাইবেন। তিনি কি বলিয়াছেন, কি করিয়াছেন, তাহা সমুদয়—পাথরে খোদিতের ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান—মনুষ্যের চক্ষের উপরে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

আমি একজন ক্ষুদ্র লোক, শুনিলাম (সে ত্রিশ বৎসরের কথা) যে শ্রীগৌরাঙ্গ যখন জগতে বিচরণ করেন, তখন বহুতর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া মানিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া আমি অতিশয় আগ্রহের সহিত তাঁহার লীলা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। হইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে ক্লেশে মরিয়া গেলাম,—কেন, বলিতেছি। আচার্যগণের নিকট গেলাম, যাইয়া বলিলাম যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুর কথা আমাকে বলুন। দেখিলাম, তাঁহারা প্রভুকে ভগবান বলিয়া মানেন। অথচ তাঁহার কথা কিছুই জানেন না। তাঁহারা আমার নিকট বড় বড় শ্লোক আওড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু আমি শ্লোক লইয়া কি করিব? আমার পিপাসায় প্রাণ যাইতেছিল, আমাকে এক অঞ্জলি মোহরে কেন শান্তি দিবে?

কেহ কেহ বলিলেন, তুমি চৈতন্যচরিতামৃত পড়। তাই সেই গ্রন্থ পড়িতে গেলাম। দেখি,

সেই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা, সেই অবতারের কথা, সেই মনুষ্য-দেহধারী ভগবানের কথা অতি অল্প আছে, তবে আছে কি না সাত শত সংস্কৃত শ্লোক। একজন অতি পণ্ডিত গোস্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনি কে?" তিনি তাহা জানিতেন না, আমার নিকট প্রথম জানিলেন, তিনি কে।

অনেকে তল্লাস করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ পাইলাম। কোথা? না-বটতলায়। বহুদিন কদর্যরূপে ছাপা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, কেহ কিনে না। যাঁহারা ক্রয় করেন, তাঁহারা শ্রীচরিতামৃত লয়েন, চৈতন্য-ভাগবতের সংবাদও রাখেন না। সেই পুস্তক পাইবামাত্র আমি ভাল করিয়া উহা ছাপাইলাম। সেই প্রথমে, সেই পুস্তকখানি ভদ্রলোকের হাতে গেলেন। দেখিলাম যে, তাহাতে সেই মূল ঘটনাটীর কথা অর্থাৎ প্রভুর লীলা-কথা আছে। কাজেই সে গ্রন্থ কেহ ক্রয় করে না, কেহ পড়ে না, কেহ জানে না!

পরে মুরারির করচার কথা শুনিলাম? সেই প্রভুর লীলার আদিগ্রন্থ। মুরারি চক্ষে দেখিয়া প্রভুর সব লীলা লিখিয়াছেন। সে গ্রন্থ তখন এখখানিও পাইলাম না। ভাবিলাম, প্রভুর ভক্তগণ বোধহয় উহা পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন, কি জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন। এই যে শ্রীভগবান্ ২৫ বৎসর মনুষ্য সমাজে বিচরণ করিলেন তাহার নিদর্শন কি ছিল?—কিছুই না। তবে ছিল হরিভক্তি বিলাস, প্রেমের রত্নাবলী, যট্‌সন্দর্ভ ইত্যাদি, আর দশ সহস্র উত্তম দুর্বোধ্য শ্লোক! কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া কি বস্তু ইত্যাদি সংবাদ তাহাতে ছিল না। যাহা কিছু ছিল চৈতন্যভাগবতে। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ আমাদিগের মধ্যে আইলেন, তাঁহাকে লোকে টানিয়া ফেলিয়া দিল, তবে তাঁহার পরিবর্তে বুকের মধ্যে গোটা কয়েক তত্ত্বকথা যত্ন করিয়া রাখিল। যদি বটতলায় দৈবাৎ একখণ্ড চৈতন্যভাগবত না পাওয়া যাইত, যদি উহা ভাল করিয়া ছাপা না হইত, যদি বাংলায় আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে, প্রভুর লীলা ধারাবাহিক না লেখা হইত, তবে এত দিন প্রভুর নিদর্শন পাওয়া দুর্ঘট হইত। প্রভু জগৎ হইতে "এবলিস" হইয়া যাইতেন।

আমাদের ঐ দুর্দশার কারণ, শ্রবণ করুন। প্রভু যখন প্রকাশ হইলেন তখন ভক্তগণ বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ ভুলিয়া গৌর-নদিয়ানাগরীর ভজন আরম্ভ করিলেন। ইহা পূর্বে বিস্তার করিয়া দেখাইয়াছি। তাহার পরে গোস্বামীগণ বৃন্দাবনে যাইয়া মন্দির গঠন, বিগ্রহ স্থাপন ও শাস্ত্রলিখন কার্য সমাধা করিলেন। তাঁহাদের প্রধান শত্রু ছিলেন পড়ুয়া পণ্ডিতগণ। তাঁহারা ভাবিলেন, এই পড়ুয়া পণ্ডিতদিগকে নিরস্ত করা তাঁহাদের প্রধান কার্য। পড়ুয়া পণ্ডিতগণকে নিরস্ত করিতে হইলে পাণ্ডিত্যের সাহায্য চাই। ইহা ভাবিয়া তাঁহার লীলাকথা ত্যাগ করিয়া তত্ত্বের জটিল রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তাই বড় বড় গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া মূলঘটনা (অর্থাৎ ভগবানের অবতার) ও লীলা (মনুষ্যের সহিত তাঁহার ইষ্টগোষ্ঠী করা) ভুলিয়া গেলেন।

তাহার পরে এই মূলঘটনা বিবর্জিত যে বৈষ্ণবশাস্ত্র তাহা তাঁহারা শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সঙ্গে গৌড়ে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে প্রধান প্রধান ঘটনাশূন্য ও শ্লোকপূর্ণ বৈষ্ণবশাস্ত্র এখানে আসিল। কাজেই প্রভুর বাংলায় ভক্তগণ (যাহারা রাধাকৃষ্ণ ভজনের পরিবর্তে গৌর-নদীয়া-নাগরীয় ভজন করিতেছিলেন) আবার উহা ত্যাগ করিয়া রাধাকৃষ্ণের ভজন আরম্ভ করিলেন। তাই গৌরকথা ক্রমে উঠিয়া যাইতে লাগিল। উহা উঠিয়া যাইতে যাইতে আমি যখন অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন দেখিলাম যে, একজন অতি প্রধান বৈষ্ণবাচার্য জানেন না যে, বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী কে? প্রধান আচার্য বৈষ্ণবশাস্ত্রের সমুদয় জানেন, কেবল জানেন না প্রভুর কথা,—মূল ঘটনার কথা।

প্রভু যখন নীলাচলে গমন করিলেন, তখন সেইস্থান এই প্রধান ঘটনার কেন্দ্র হইল। প্রভুর অদর্শনে এই কেন্দ্র বৃন্দাবনে সরিয়া গেল, আর বৃন্দাবন হইতে এই মূলঘটনা উৎপাটিত হইতে আরম্ভ হইল। যখন শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ে প্রচারের নিমিত্ত আইলেন, তখন গোস্বামীগণ তাঁহাদের

আসনে উপবেশন করেন নাই। তখনকার এই যে মূলঘটনা উহা জাজ্জ্বল্যরূপে সমাজের চক্ষের উপরে ছিল।

আমার দয়াময় প্রভু কি বলিয়া নিতাইকে গৌড়ে পাঠাইলেন, তাহা স্মরণ করুন। তিনি বলিলেন—"শ্রীপাদ, প্রাণ সর্বদা কান্দিতেছে। জীবকে হরিনাম দিতেছিলাম, কিন্তু কৃষ্ণনামের শক্তিতে আমি পাগল হয়েছি, আমা দ্বারা আর হইবে না। জীবগণের নিকট আমি ঋণী, আমি সেই দায়ে বিকাইয়া যাইতেছি। আমার যে সম্বল ছিল তাহা ফুরাইয়াছে। তুমি আমার ব্যথার ব্যথী, তোমা ছাড়া আমার হৃদয়ের এই ব্যথা আর কাহাকে বলিব? তুমি আমাকে জীবের ঋণ হইতে মুক্ত কর—গৌড়দেশে গমন করিয়া ছোট বড় ভাল মন্দ সকলকে উদ্ধার কর। যদিও পড়ুয়া পণ্ডিতগণ তোমার বিশেষ কৃপার পাত্র, তবে দেখিও যেন কেহ বাদ না যায়।"*

নিতাই গৌড়ে যাইয়া কি ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, তাহা বহুতর পদে বর্ণিত আছে। আমরা সেই সমুদয় পদ হইতে প্রধানতঃ এই বিবরণ লিখিতেছি, ইহাতে আমাদের মনগড়া কথা একটীও নাই। যথা একটী পদ --

গজেন্দ্র গমনে নিতাই যায়। যারে দেখে তারে প্রেমেতে ভাসায়।।
অধম পতিত পাপীর ঘরে গিয়া। ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিতেছে যাচিয়া।।
যে না লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি। আমারে কিনিয়া লও ভজ গৌরহরি।।
তো সবার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার। শুন নাই গৌরাঙ্গসুন্দর নদিয়ার?

নিতাই আপনার পার্ষদগণ সঙ্গে লইয়া পায়ে নূপুর দিয়া, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে কীর্তন করিয়া বেড়াইতেছেন আর বলিতে বলিতে যাইতেছেন—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গচাঁদ সেই আমার প্রাণ।।
কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু অবতার।
খেলা কৈলেন জীবসনে গোলোকের ঈশ্বর।।
গোলোকের যে সম্পত্তি যতনে আনিয়া।
ঘরে ঘরে বিলাইতেছেন আপনি যাচিয়া।। ইত্যাদি

এই গেল নিত্যানন্দের প্রচার-পদ্ধতি। যেখানে অনেক লোক সমবেত হইয়াছে, সেখানে নিতাই তাহাদিগকে বলিতেছেন—"ভাই, তোমরা কি নদীয়ার অবতারের কথা শুন নাই? তোমরা কি শুন নাই যে, সেই গোলকের পতি জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া, আপনি ভক্ত হইয়া, ধরাধামে আসিয়া জীবগণকে উদ্ধার করিতেছেন। তিনি কেবল তোমাদের জন্যই আসিয়াছেন। আর ভয় কি? তিনি তোমাদিগকে কোলে করিয়া গোলোকে লইয়া যাইবেন। বলিতে বলিতে—

গৌর-প্রেমের ভরে মাতিল নিতাই। জোড়ে জোড়ে লম্ফ দেয় ধরা নাহি যায়।।

আর বক্তৃতা চলিল না, নিতাই উন্মাদ হইলেন, কাজেই সেই সঙ্গে শ্রোতা ও দর্শকবৃন্দও উন্মাদ হইলেন। নিতাই সম্মুখস্থ সকলকে ডাকিতেছেন, আর বলিতেছেন, "ভাই সকল, এসো তোমাদের জনা জনা কোলে করি। তোমরা আমার কোলে বসিয়া গৌর গৌর বল। ভাই, তোমাদের আর কিছু করিতে হইবে না। দেখিতেছ না, ঐ তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, তোমাদের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন, তোমাদের গোলোকধামে লইয়া যাইবেন তাই দাঁড়াইয়া আছেন।"

নিতাই বড় পাষণ্ডের দলে পড়িয়া গিয়াছেন। তাহারা কোন ক্রমেই দ্রব হইতেছে না, তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেছেন। তিনি তখন দুই হস্তে ও দন্তে তৃণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন,—"ভাই সকল, আমাকে কিনিয়া লও, আমি তোমাদের দাসের দাস হইলাম,

*এই যে কথাগুলি হইতেছে এ সমুদয় প্রভুর নিজ মুখের কথা, কল্পিত একটিও নয়।

তোমরা মুখে একবার গৌর গৌর বল।"

হয়ত ইহাতেও হইল না। তখন নিতাই "ভাই" বলিয়া চীৎকার করিয়া কান্দিতে লাগিলেন, আর বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তখন এমন হইল যেন তাহারা নাম না লইলে নিতাই প্রাণে মরিবেন। শেষে একজন দ্রবীভূত হইয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া বলিতেছে, "ঠাকুর শান্ত হও, আমি বলিতেছি। কি দয়া! কি দয়া!" ইহা বলিয়া যেই সে মুখে নাম বলিল, আর নাম তাহার মুখে লাগিয়া গেল, সে আর উহা ছাড়িতে পারিল না, আর সেই সঙ্গে সে নাচিতে লাগিল। তাহার বায়ু অন্যের অঙ্গে লাগিল, সেও দ্রবীভূত হইল।

গোস্বামীদের প্রচার-পদ্ধতি ও নিতাইয়ের প্রচার-পদ্ধতি কত বিভিন্ন দেখ। গোস্বামী তর্ক করিয়া বুঝিতে লাগিলেন, আর নিতাই কান্দিয়া কান্দাইলেন। কাজেই সোস্বামীগণ কতকগুলি নিরস কঠিন পণ্ডিত-বৈষ্ণব, আর নিতাই কতকগুলি সরল প্রেমিক-বৈষ্ণব সৃষ্টি করিলেন। গোস্বামী অকাট্য তর্কের দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, ভগবান আছেন; আর নিতাই অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন আর বলিতেছেন—, ঐ দেখ তিনি! গোস্বামী বিচার করিয়া সাব্যস্ত করিতেছেন যে, ভগবান প্রেমময়। কিন্তু নিতাই আপনি প্রেমে মাতিয়া ভগবানের প্রেম দেখাইতেছেন, আর স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গও নয়ন-জল দেখাইয়া ভগবানের কত প্রেম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছেন।

গোস্বামীগণ সমুদয় শাস্ত্র মন্থন করিয়া বৈষ্ণবধর্মের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, অতি সূক্ষ্মতত্ত্বকে কোটি ভাগে বিভাগ করিয়া তাঁহাদের সতেজ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন; যাঁহারা পাঠ করেন তাঁহারা স্তম্ভিত হয়েন। আর নিতাই আবেগভরে বলিয়া বেড়াইতেছেন—

"দেখ, তোদের সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
তোদের গোলোকধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিতপাবন।।"

কাহার শিক্ষার শক্তি অধিক?—গোস্বামীদের না নিতাইয়ের? আমরা শতবার বলিব যে, নিতাইয়ের যে শিক্ষা ইহা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। নিতাই শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগবান জীবের দুঃখে গোলোকে রইতে না পারিয়া ধরাধামে আসিয়া মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়াছিলেন, কেন না, ইহাতে তাহারা অনায়াসে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। শ্রীভগবান সম্বন্ধে যাহা কিছু তত্ত্ব আছে অগ্রে তাহা লোকে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এখন তাঁহার অভ্যুদয়ে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় তাঁহারা "জানিলেন।" অতএব নিতাইয়ের শিক্ষায় জীবগণ কি জানিলেন?

(১) আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর যে ব্রহ্মাণ্ড, ইহার কেহ স্রষ্টা আছেন কি না, ইহা জানিবার নিমিত্ত জীবগণ জন্মাবধি চেষ্টা করিয়াও কিছুই জানিতে পারে নাই। এখন নিতাই তাহাদিগকে সেই শ্রীভগবানকে দেখাইয়া দিতেছেন।

(২) যাহারা মনে মনে ভাবেন যে, ভগবান থাকিলেও থাকিতে পারেন, তাহাদের মধ্যে তাঁহার প্রকৃতি লইয়া চিরদিন বিবাদ চলিতেছে। কেহ তাঁহার গলায় মুণ্ডমালা দিয়াছে, আবার কেহ তংাহার হস্তে বাঁশী দিয়াছে। এখন সে বিবাদ আর রহিল ন।

(৩) তিনি মনুষ্যকে কিরূপ চক্ষে দেখেন, ইহা লইয়াও চিরদিন বিবাদ চলিয়াছে। কেহ বলেন যে, জীব আপনার কর্মের ফল ভোগ করে, ভগবানের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কেহ বলেন, ভগবান বিচারক, অপরাধ হইলে তিনি দণ্ড করেন, আর সে দণ্ড এমন যে পাপীকে চিরদিন নরকের অগ্নিকুণ্ডে থাকিতে হয়। নিতাই দেখাইয়া দিলেন যে সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু, যিনি এই বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন—"তিনি তোমার" আর "তুমি তাঁহার"; বলিতে কি, তাঁহাতে ও তোমাতে যেরূপ গাঢ় সম্বন্ধ, এরূপ তোমাতে আর তোমার স্ত্রীতেও নাই। অর্থাৎ জীবের সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন শ্রীভগবান্। নিতাই এ সমুদয় দেখাইয়া দিলেন, অথচ আগম পুরাণ বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের নাম পর্যন্তও করিলেন না।

এখন আচার্যগণের শিক্ষা দেখুন। তাঁহারা শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগবান অবশ্য আছেন এবং

তাহার নানাবিধ কারণ দেখাইলেন। তাঁহাকে কিরূপে ভজনা করিতে হয় তাহাও তাঁহারা দেখাইলেন। তাঁহারা বলিলেন---যেহেতু বিচারে দেখি এই গোপী-অনুগা ভজন সর্বাপেক্ষা ভাল। "তিনি আমাদের" আর "আমরা তাঁহার" সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাই বলিয়া তাঁহারা এক এক করিয়া সমুদয় কারণগুলি বলিলেন। কিন্তু নিতাইয়ের শিক্ষায় জীব জানিলেন যে, ভগবান আছেন, আর "তিনি তোমার" ও "তুমি তাঁহার।" বৈষ্ণবশাস্ত্রের শিক্ষায় জীবকে বুঝাইতে চেষ্টা হইয়াছে যে, ভগবান বড় ভাল ইত্যাদি। কিন্তু নিতাই ইহা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। কাজেই শাস্ত্রের উপদেশে জীব কতকগুলি উপদেশ পাইলেন মাত্র, কিন্তু তিনি যেমন তেমনই থাকিলেন। নিতাইয়ের শিক্ষায় জীবের পুনর্জন্ম হইল তাঁহার প্রকৃতির পরিবর্তন হইল অর্থাৎ তিনি 'কৃষ্ণপ্রেম' পাইলেন। ইহাদের উভয়ের শিক্ষার মোটামুটি ফল এই—

শাস্ত্রের শিক্ষায় জীবগণ জ্ঞান পাইলেন, আর নিতাইয়ের শিক্ষায় প্রেম পাইলেন। কাজেই এই পদটির সৃষ্টি হইল—

ধর লও সে কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয়।
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু, ডুবু নদে ভেসে যায়।।

অতএব যাঁহারা নিতাইয়ের শিক্ষা পাইলেন, তাঁহাদের শাস্ত্রের শিক্ষার কিছু প্রয়োজন রহিল না। যাঁহারা শাস্ত্রের শিক্ষা পাইলেন, অথচ নিতাইয়ের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইলেন, তাঁহাদের বিশেষ কিছুই লাভ হইল না।

এমন সময় কথা উঠে যে, বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের নিমিত্ত পাশ্চাত্যদেশ বৈষ্ণব-প্রচারক পাঠাইতে হইবে। তখন এমন কথাও হয় যে, গৌরগতপ্রাণ পরম পণ্ডিত বৃন্দাবনের রাধারমণ-সেবাইত শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী মহোদয় প্রচার করিতে পাশ্চাত্যদেশে যাইবেন। আর তখন ইহাও সাব্যস্ত হয় যে, যিনি যাইবেন তাঁহাকে নিতাইয়ের প্রচারপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ— "কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু অবতার। খেলা কৈলেন জীবের সনে গোলোকের ঈশ্বর।।" এই ভাবে প্রচার করিতে হইবে।

জীব গৌরাঙ্গকে গ্রহণ করিলে শাস্ত্র আপনি আসিবেন, রাধাকৃষ্ণ আপনি আসিবেন,—অর্থাৎ গোস্বামীগণ যাহা যাহা শিক্ষা দিয়াছেন সব আপনি আসিবেন। আর তাহা না করিয়া যদি ইহার উল্‌টা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তবে আর কেহ আসুন না আসুন, প্রভু যে আসিবেন না, তাহা নিশ্চয়।

অতএব বাসুঘোষ, নরহরি প্রভৃতির নদিয়ানাগরী-অনুগা ভজন, আর নিতাইয়ের (ভজ গৌরাঙ্গ) প্রচার-পদ্ধতি উঠাইয়া দেওয়াতে জীবের সর্বনাশ হইয়াছে। কারণ আগে গৌর— আগে মূলঘটনা; অপর সমুদয় পরে আপনিই আসিবে।

অতএব হে জীবের দুঃখ কাতর ভক্তগণ! জীবকে শ্রীগৌরাঙ্গ শিখাও, সর্বদেশে ইহা প্রচার কর যে,--১৪০৭ শকে এই দেশে শ্রীভগবান আসিয়া ৪৮ বৎসর মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করেন। আর ইহাও জানাও যে—একথা যে সত্য তাহা যিনি অনুসন্ধান করিবেন তিনিই জানিতে পারিবেন। ইহা যদি কর, তবে নিতাই যেমন ভগবানকে ক্রয় করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ তাঁহাকে ক্রয় করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়

প্রভুর দৌর্বল্যের কথা কয়েকবার বলিয়াছি। শুধু যে আহার অল্প হওয়াতে তাঁহার প্রকাণ্ড শরীর দুর্বল হইয়াছিল তাহা নহে,—সাধন ভজন করিলেও শরীর এইরূপ ক্ষীণ হয়। কিন্তু ইহাতে যদিও শরীর ক্ষীণ হয়, তত্রাচ আভ্যন্তরিক তেজ বাড়িতে থাকে। প্রভুর ব্যবহৃত কোন দ্রব্য কেহ স্পর্শ করিলে তাহার হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইত। এমন কি, তাঁহার বায়ু কাহারও গাত্রে লাগিলে, তাহার হৃদয়ে ঐরূপ ভক্তিভাবের উদয় হইত। প্রভু নৃত্য করিতেছেন, আর

তাঁহার মুখ দিয়া লালা পড়িতেছে। ভাগ্যবান শুভানন্দ সেই মৃত্তিকায় পতিত ফেনের এক বিন্দু লইয়া পান করিলেন, আর তদ্দণ্ডে প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। প্রভুর দেহের অলৌকিক তেজের কথা আর কি কহিব। ধীবর তাঁহার মৃতপ্রায় দেহ সমুদ্র হইতে উঠাইতে উহা স্পর্শ করিল, আর তৎক্ষণাৎ সে উন্মত্ত হইল, এবং কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে নাচিতে গৃহে চলিল। তাহার ভাব দেখিয়া স্বরূপ জানিতে পারিলেন যে, সে প্রভুকে স্পর্শ করিয়াছে, আর প্রকৃতই সেই প্রভুর ঠিকানা বলিয়া দিয়াছিল।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ও মহাপ্রসাদ এই নিমিত্ত ভক্তদিগের নিকট এত বহুমূল্য দ্রব্য। রঘুনাথ দাস গোসাঞির খুড়ো কালিদাসের প্রধান ভজন ছিল উচ্ছিষ্ট-সেবন। তাহাই সেবন করিবার জন্য তিনি দেশে দেশে বেড়াইতেন। তিনি কোন বৈষ্ণবের বাড়ী গমন করিতেন, করিয়া প্রসাদ চাহিতেন। অবশ্য প্রথমে পাইতেন না। তখন ধন্না দিতেন, এবং প্রসাদ সেবন না করিয়া আসিতেন না। যেখানে কোন ক্রমে কৃতকার্য হইতে না পারিতেন, সেখানে আস্তাকুঁড়ের পরিত্যক্ত পাত্র চাটিতেন। এ কাহিনী সংক্ষেপে পূর্বে কতবার বলিয়াছি।

এইরূপে কালিদাস একদিন ঝড়ুঠাকুরের কাছে প্রসাদ ভিক্ষা করিলেন। ঝড়ুঠাকুর জাতিতে ভুঁইমালী, অতএব অতি নীচ; কিন্তু বৈষ্ণবগণের এ মহিমা অতি বড় যে, তাঁহারা ভক্তি দেখিয়া ছোট বড় বিচার করেন, জাতি দেখিয়া নয়। ঝড়ু যদিও ভুঁইমালী, তবু তিনি বৈষ্ণবদের মধ্যে ঠাকুর হইলেন। কালিদাস পাতার দোনা করিয়া পাকা আম আনিয়া ঝড়ুকে দিলেন, ঝড়ু আম লইলেন, কিন্তু প্রসাদ দিতে চাহিলেন না। পরে যখন ঝড়ু সেই আমের আঁটি চুষিয়া ফেলিয়া দিলেন কালিদাস গোপনে তাহা কুড়াইয়া লইয়া পুনরায় চুষিলেন,—এই তাঁহার ভজন।

কালিদাস নীলাচলে গিয়াছেন; কি জন্য?—না, তাঁহার চিরদিনের সাধ মিটাইবেন, অর্থাৎ প্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করিবেন বলিয়া। বৈষ্ণবেরা কাহাকেও ইচ্ছা করিয়া যে প্রসাদ দেন না, তাহা কালিদাসের কাহিনীতে বুঝা যায়। কোন বৈষ্ণবের নিকট প্রসাদ চাহিলে তিনি দৈন্য করিয়া দিতে অস্বীকার করেন। আর এক কথা, প্রসাদ তাহাকে দিতে নাই যাহার উহাতে নিতান্ত বিশ্বাস বা ভক্তি না থাকে। সেই নিমিত্ত স্বয়ং প্রভুও উপযুক্ত লোক ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রসাদ দিতেন না। প্রভু অন্তর্যামী, কাজেই জানিতেন—কে উপযুক্ত কে অনুপযুক্ত। কালিদাস যে উপযুক্ত পাত্র তাহা অবশ্য প্রভু জানিতেন। কালিদাস প্রভুর প্রসাদ আহরণ করিতে নীলাচলে গিয়াছেন, প্রভুর পশ্চাতে পশ্চাতে আছেন। প্রভু মন্দির দর্শনে গমন করিতেছেন, কালিদাস পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছেন। প্রভুর নিয়ম আছে, তিনি পাদপ্রক্ষালন না করিয়া ঠাকুর দর্শন করেন না। সিংহদ্বারের উত্তর দিকের কপাটের আড়ালে বাইশ পশারের তলে একটী গর্ত আছে, প্রভু প্রত্যহ সেখানে পদধৌত করেন। প্রভুর আজ্ঞায় কেহ সেই জল লইতে পারেন না। প্রভু পদ বাড়াইয়া দিয়া থাকেন, আর গোবিন্দ জলদ্বারা উহা প্রক্ষালন করেন। আজও প্রভু তাহাই করিলেন, আর কালিদাস অগ্রবর্তী হইয়া তাহার নীচে অঞ্জলি করিয়া হাত পাতিলেন। মহাপ্রভু ইহা দেখিলেন, দেখিয়া কিছু বলিলেন না। তাহা দেখিয়া গোবিন্দও কিছু বলিলেন না। এইরূপে কালিদাস অঞ্জলি অঞ্জলি শ্রীপদ-ধৌত জল পান করিতে লাগিলেন। তিনবার এইরূপ পান করিলে প্রভু নিষেধ করিলেন; বলিলেন,—"আর নয়, ঢের হয়েছে।"

পরে কালিদাস প্রভুর বাসায় আসিলেন, প্রসাদ চাহিতে সাহস হইতেছে না, বসিয়া আছেন। প্রভু সেবা করিতেছেন, অন্তর্যামী প্রভু আপনার সেবা হইলে, গোবিন্দকে ইঙ্গিত করিলেন, আর সেই প্রসাদ তিনি লইয়া কালিদাসকে দিয়া তাঁহার জন্ম সার্থক করিলেন। বৈষ্ণবধর্মে প্রসাদের বড় মাহাত্ম্য। মহাপ্রসাদ মানে শ্রীভগবানের ভুক্তাবশিষ্ট। অতএব ভক্তের প্রসাদে যদি ভক্তি উদ্দীপনা করে, তবে শ্রীভগবানের প্রসাদে উহা আরও বেশী করিবে। কিন্তু কথা এই, ভগবানকে অর্পণ করিলেই তিনি ভোগ করেন না; আর যদি ঠিক ভক্তি-পূর্বক দেওয়া যায়, তবে তিনি তাহা উপেক্ষাও করিতে পারেন না।

মনে ভাবুন ভক্তের ইচ্ছা ভগবানকে সেবা করিবেন। শ্রীভগবান সে ইচ্ছা পূরণ করিতে বাধ্য, নতুবা তাহার ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু নাম বৃথা হয়। ভক্ত পায়স রন্ধন করিয়া, একটি অতি পরিষ্কার পাত্রে রাখিয়া, করযোড়ে বলিতেছেন,—"শ্রীভগবান, এই পায়সের গন্ধে আমার প্রাণ মাতিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আমি উহা মুখে কিরূপে দিব? তুমি যদি একটু মুখে দাও, তবেই আমার পায়স সুস্বাদ হইবে।" ইহাই বলিয়া প্রাণের সহিত "খাও, খাও" বলিয়া ভগবানকে মিনতি করিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন,—"আমার সম্মুখে সেবা করিবে না? আচ্ছা তাহাই হইবে, আমি এই প্রসাদ আবরণ করিতেছি।" ইহা বলিয়া বস্ত্র দ্বারা উহা আচ্ছাদন করিলেন, করিয়া তিনি করযোড়ে বসিয়া থাকিলেন। যদি কেহ এরূপ একান্ত মনে ইচ্ছা করেন, তবে নিশ্চয়ই সেই মহাপ্রসাদ শ্রীভগবানের অধরামৃত দ্বারা পবিত্রীকৃত হয়। শ্রীখণ্ডের মুকুন্দের তনয় (নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র) রঘুনন্দনের ঠাকুরকে নাড়ু খাওয়াইবার কথা, বৈষ্ণবমাত্রে জানেন। মুকুন্দ স্থানান্তরে যাইবেন, তাই তাঁহার পুত্র রঘুকে বলিয়া গেলেন যে, সে যেন ঠাকুরের সেবা করে। রঘু সেই পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে ঠাকুরের কাছে সেবাদ্রব্য লইয়া যাইয়া বলিলেন,—"ধর খাও।" বালকের মনে বিশ্বাস ঠাকুরকে দিলেই তিনি খাইবেন। কিন্তু কৈ তাহা ত নয় বরং ঠাকুর খাইতেছেন না। রঘু কান্দিয়া আকুল। তিনি কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন,—"তুমি খাবে না, বাবা আমাকে মারিবেন; বলিবেন, তুই দিস নাই, আপনি খেয়ে ফেলেছিস।" ইহা বলিয়া বালক রঘু ভূমে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ঠাকুর করেন কি, দস্যুহস্তে পড়িয়াছেন, কাজেই সব খাইতে হইল। মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিলে রঘু বলিল,,—"প্রসাদ সমুদয় ঠাকুর আপনি খাইয়া ফেলিয়াছেন।" রঘুর মুখ দেখিয়া মুকুন্দ বুঝিলেন, সে মিথ্যা কথা বলিতেছে না। তবে উহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তাই পুত্রকে বলিলেন,—"তুই আবার খাওয়া দেখি।" তাহাই ঠিক হইল, রঘু আবার খাওয়াইবে। রঘু তাই করিল, আর ঠাকুর হাতে নাড়ু লইয়া নিতান্ত লোভীর ন্যায় খাইতে লাগিলেন। তখনি চেঁচাইয়া রঘু বলিতেছেন, "বাবা, দেখে যাও ঠাকুর খাইতেছেন।" মুকুন্দ দৌড়িয়া আইলেন আর অমনি খাওয়া বন্ধ হইল। তবে যে নাড়ুটি মুখে দিতে যাইতেছিলেন সেইটি ঠাকুরের হাতে রহিল। অদ্যাপি সেই নাড়ু-হাতে ঠাকুর, শ্রীখণ্ডে ভক্তের সুখ দিতেছেন।

প্রভু মহাপ্রসাদকে কিরূপ ভক্তি করিতেন শ্রবণ করুন। পানা নরসিংহে প্রভু গমন করিলে, অধিকারী মাধবভুজা কিছু প্রসাদ আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন। যথা—

পূজারি প্রসাদ কিছু আনিল তুরিতে।
কণামাত্র প্রসাদ লইয়া প্রভু হাতে।।
হাতে করি প্রসাদের বহু স্তব করে।
প্রসাদ পাইতে দুই চক্ষে জল ঝরে।।

প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন, এমন সময় গোপালবল্লভ-ভোগ আরম্ভ হইল, দ্বারে কপাট পড়িল, শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। ভোগ সমাপ্ত হইলে, সেবকগণ প্রভুর নিকট প্রসাদ লইয়া আসিল। প্রভুকে দিলে তিনি এক কণা জিহ্বাগ্রে দিলেন, দিয়া বলিলেন,—"সুকৃতি লভ্য ফেলা লব।" ইহা বলিয়া আনন্দে পুলকাবৃত হইলেন, আর নয়নজলে ভাসিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন—"প্রভু আপনি বারে বারে 'সুকৃতি লভ্য ফেলা লব' কেন বলিতেছেন?" প্রভু বলিলেন,—"কৃষ্ণের যে ভুক্তাবশেষ তাহাকে 'ফেলা' বলে।" আর 'লব' মানে অল্প অংশ। ইহার অর্থ এই যে, যিনি সুকৃতি তিনি এইরূপ মহামূল্য দ্রব্য লাভ করেন। এই যে ভোগ, উহাতে কৃষ্ণের অধরামৃত স্পর্শ করিয়াছে। দেখ, ইহার গন্ধে মন মোহিত হইতেছে। আশ্চর্য দেখ, যদিও এ সামান্য ও প্রাকৃত দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত, কিন্তু আস্বাদ ইহার অপ্রাকৃত। জগতের কোন দ্রব্যে এইরূপ আস্বাদ মিলে না।"

প্রকৃতই ভক্তগণ উহা আস্বাদ করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। প্রভুর সারাদিন এই ভাবেই গেল। পরে সন্ধ্যাকৃত্য করিয়া ভক্তগণ লইয়া আবার বসিলেন, আবার প্রসাদ আস্বাদ করিলেন, আর পুরী ভারতীকে কিছু পাঠাইয়া দিলেন।

পুরীধামে প্রভুর অসীম শক্তিতে প্রসাদ অতি পবিত্র বস্তু, উহা অপবিত্র হয় না। উহা যিনি স্পর্শ করেন, তিনিই পবিত্র হয়েন, আর সেখানে অন্নে দোষ নাই। কিন্তু বাহিরে উহা কেন অপবিত্র হয়? তাহার কারণ, বেদবিধির শাসন। বহুদিন হইল, একদা আমার দেওঘরের বাটিতে প্রায় পঞ্চাশ মূর্তি বৈষ্ণব শুভাগমন করিয়া আমার স্থান পবিত্র করিলেন। সে বাসাবাড়ী, কাজেই তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত কিছু ব্যস্ত হইলাম। এমন সময় সর্দার পাণ্ডা এই সংবাদ পাইয়া আপনি আতিথ্যের ভার লইলেন। তাঁহার শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে সেবা আছে তাঁহার প্রসাদ পাঠাইয়া দিবেন এই কথা সাব্যস্ত হইল, এবং প্রকৃতই মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণগণ ভারে ভারে প্রসাদ আনিয়া আমার ঘর পূরিয়া ফেলিলেন। সকলে আনন্দে উন্মত্ত। বৈষ্ণবগণ সেবায় বসিলে আমার পরিবেশন করিতে ইচ্ছা হইল, তাহাই মনন করিয়া আমি প্রসাদ স্পর্শ করিতে হস্ত বাড়াইলাম। এমন সময় আমার মনে পড়িল আমি শূদ্রাধম, আর ভক্তগণ প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণঠাকুর; তখনই স্তম্ভিত হইলাম, হইয়া জিজ্ঞেস করিলাম,—"প্রভুসন্তান ও ভক্ত মহাশয়গণ! আমি পরিবেশন করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু আপনাদের অনুমতি না পাইলে করিতে পারি না, কারণ আমি শূদ্রাধম। এই মহাপ্রসাদ অতি পবিত্র বস্তু, ইহা আমি স্পর্শ করিলে উহা অপবিত্র হইবে না, বরং আমি পবিত্র হইব। আপনারা বলেন কি?" দেখিলাম সকলে চিন্তাকুল হইলেন,—কারণ 'হাঁ' বলিতে পারেন না, আবার 'না'ও বলিতে পারেন না। এই তাঁহাদের অবস্থা, কাজেই আমি ক্ষান্ত হইলাম। যখন সার্বভৌম প্রাতে মুখ ধৌত না করিয়া প্রথমে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন, তখন প্রভু বলিলেন—

আজই নিষ্কপটে তুমি লইলে কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে হইলা তোমারে সদয়।।
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন।
আজি-কৃষ্ণ-প্রাপ্তি-যোগ্য হইল তোমার মন।।
বেদ-ধর্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ।।

কথা এই, কুল ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের আশ্রয় না লইলে কৃষ্ণ তাহাকে গ্রহণ করেন না, আর বেদ-ধর্ম মানিয়া বৈষ্ণব হওয়া যায় না,—প্রভুর শ্রীমুখের বাক্য। তাহার প্রমাণ—উপরে শ্রীমুখের আদেশ।

অগ্রে বলিয়াছি যে, যদিও শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে বিদায় দিলেন, তবু সে বিদায়ের পরে আর দ্বাদশ বৎসর তিনি ধরাধামে ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত ভাবিলেন, প্রভু যে জন্য আসিয়াছেন সে কার্য হইয়া গিয়াছে। অতএব আবার তিনি কেন এ মলিন জগতে থাকিবেন, তাঁহার যাওয়াই উচিত। কিন্তু প্রভুর কিছু কাজ বাকি ছিল, তাহা শ্রীঅদ্বৈতও জানিতেন না। সে কাজ কি? না—আপনি আচরিয়া জীবকে সর্বোত্তম ভজন শিক্ষা দেওয়া।

এই ভজন ব্রজের নিগূঢ়-রস দিয়া করিতে হয়। ব্রজের সেই রস কি, আর রসদ্বারা কিরূপে ভজন করিতে হয়, তাহা জগতে অনর্পিত ছিল, প্রভু আপনি আচরিয়া তাহা জগৎকে শিখাইলেন। রস-বস্তু কি তাহার একটু আভাস এখানে দিব। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, রস একাদশ প্রকার, তাহার মধ্যে সাতটি গৌণ ও চারিটি মুখ্য। গৌণরস কি? না—হাস্য, অদ্ভুত, ইত্যাদি সাত প্রকার। মুখ্যরস কি? না—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। গৌণরসের ভজন কিরূপ তাহার বিচার এখন থাকুক।

তবে গৌণ ও মুখ্য রসের বিভিন্নতা বলিতেছি। ভগবানকে নিজ-জন বলিয়া ভজন করিতে

হইলে যে রস প্রয়োজন, তাহাকে বলে মুখ্য রস। নিজ জন কাহারা? নামাতা, পিতা, স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা, সখা, ইত্যাদি। অতএব ভগবানকে ইহাদের মধ্যে কাহারও স্থানে বসাইয়া, "পিতা" কি "নাথ" বলিয়া ভজনা করা মুখ্য রস দ্বারা হয়।

আবার যে রসে শ্রীভগবানকে স্পষ্টরূপে নিজ-জন বুঝায় না, তাঁহাকে বলে গৌণরস। যেমন শ্রীভগবানকে "শক্তিধর", বা "করুণাময়" বলিয়া ভজনা করা। কোন বস্তু নিজ-জন না হইলেও তাঁহাকে "শক্তিধর" বা "করুণাময়" বলিয়া ভজন করা যায়। যেমন শুম্ভ নিশুম্ভ বধ করিয়াছেন বলিয়া কালীকে ভজনা করা। এ ভজনা "বীররস" দ্বারা করিতে হয়, এই বীররস গৌণরসের মধ্যে গণনীয়।

মুখ্য রস চারিটি এখন অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। শ্রীভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধে পাতাইয়া চারি ভাবের ভজনা করা যায়। যথা, কর্তা বা পিতা ভাবে, মাতা বা ভ্রাতা ভাবে, বাৎসল্য বা সন্তান ভাবে, আর কান্তা বা পতি কি উপপতি ভাবে। শ্রীদাম সুবলের ভজন সখা ভাবে, যশোমতির ভজন বাৎসল্য ভাবে ও গোপীগণের ভজন কান্তা বাবে। জগতে শেষের তিনটা রসের কথা কেহ স্পষ্ট জানিতেন না, তাঁহাদের ভজন কেবল দাস্য-শক্তি লইয়াই ছিল। তাঁহারা এ পর্যন্ত ভগবানকে পিতা বা প্রভু বলিয়া ভজনা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এরূপ ভজনা অতি স্থূল। এইরূপ ভজনে হৃদয়ের ধনকে দূরে রাখিতে হয়। সর্বোচ্চ ভজন কান্তা ভাবে।

কান্তা ভাবে শ্রীভগবানকে কিরূপে ভজনা করিতে হয় তাহার আভাস এখন সংক্ষেপে দিতেছি। অবশ্য এই রসের ভজনের কথা শ্রীভাগবত গ্রন্থে আছে, কিন্তু প্রভু উহা আপনি আচরিয়া জগতে দেখাইলেন। অর্থাৎ উহা শ্রীভাগবত গ্রন্থে ভাষায় ছিল, কিন্তু প্রভু উহা আচরিয়া দেখাইলেন। কান্তা ভাবে শ্রীভগবানকে ভজনা মানে এই যে, যেমন স্ত্রীলোক পতির কি উপপতির প্রতি প্রীতি আরোপ করে, সেইরূপ আপনাকে স্ত্রীলোক অর্থাৎ প্রকৃতি ভাবিয়া ভগবানকে পতি বা উপপতি ভাবে ভজনা করা।

এই কান্তাভাবে ভজন দুই প্রকারে হয়—প্রত্যক্ষ ও অনুগা ভাবে। প্রত্যক্ষ ভজন এই যে, আপনাকে গোপী ভাবিয়া শ্রীভগবানের সহিত প্রীতিসংস্থাপন করা। আর "অনুগা-ভজন" মানে আপনি মধ্যস্থ হইয়া গোপীর সহিত শ্রীভগবানের প্রীতি সম্পাদন করিয়া, আপনার ভগবৎ-প্রেম বৃদ্ধি করা। একটি প্রত্যক্ষ ভজনের নিবেদন শ্রবণ করুন। যথা—নিশিদিন তোমার বিরহে ব্যাকুল প্রাণ। হে মোর হরি, তৃষিত চাতকী-সমান।।

এই গীতে সাধক তানসেন বলিতেছেন যে, "হে ভগবান! যেমন চাতকিনী দিবানিশি জল জল করে, তেমনি আমার প্রাণ দিবানিশি তোমার লাগি ব্যাকুল!" ভগবানে এত পিপাসা অবশ্য গাঢ়-প্রেম হইতে হয়, আর যাঁহার এরূপ পিপাসা আছে, তিনি তাহা শ্রীভগবানকে নিবদেন করিতে পারেন, অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ ভজনের অধিকারী। কিন্তু এতখানি পিপাসা যাঁহার নাই, তিনি যদি ঐরূপ বলেন, তবে তাঁহার ভজন হয় না, ভণ্ডামি হয়, সেই জন্য কান্তা-ভাবে প্রত্যক্ষ ভজন, বলিতে কি, একবারে উঠিয়া গিয়াছে। এই প্রত্যক্ষ ভজন করিতে গিয়া আউল-বাউলের কদর্য পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে কোন কোন বৈষ্ণব শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহারা গোপীর প্রেম পাইলেন না, সুতরাং গোপীর দেহ অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণলীলার রস প্রত্যক্ষরূপে আস্বাদ করিতে গিয়া আপনারা রাধা-কৃষ্ণ সাজিলেন, সাজিয়া আপনারা রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। ইহাতেই ভাগবত-সেবা স্থানে ইন্দ্রিয়-সেবা প্রবেশ করিল।

প্রত্যক্ষ-ভজনের পরিবর্তে গোপী-অনুগা-ভজন প্রবর্তিত হইয়াছে। গোপী-অনুগা-ভজন কিরূপ বলিতেছি। কৃষ্ণ মথুরায় যাইতেছেন, গোপীরা যাইতে দিবেন না বলিয়া কেহ কেহ বা অশ্বের সম্মুখে শয়ন করিয়া আছেন। আর বলিতেছেন, "নাথ! যাবে ত আমার বুকের উপর দিয়া যাও।" এইরূপে গোপীরা প্রাণপণ করিয়া কৃষ্ণকে যাইতে দিতেছেন না। এই যে চিত্রটি তোমার হৃদয়পটে

অঙ্কিত করিলে, ইহাতে তুমি কেহ নহ, একজন দর্শক মাত্র। কিন্তু তবু তুমি সম্যকরূপে সেই গোপীদের যে প্রেম তাহার আস্বাদ পাইতেছ। এ চিত্র হৃদয়ে দেখিলে তুমি বিগলিত হইবে। মনে ভাব, তুমি মাথুরের গীত শুনিতেছ, ইহাতে শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বেদনা বর্ণিত আছে। তাহা শুনিয়া তোমার নয়নে জল আসিবে কেন? তুমি ত রাধা নও, তুমি ত আর কৃষ্ণ-বিরহ প্রপীড়িত নও, তবু তুমি বিগলিত হইবে কেন? মনে ভাব, তুমি প্রভাসের গীত শুনিতেছ, যশোমতী বলিতেছেন, "আয় গোপাল, দেখা দিয়ে প্রাণে বাঁচা।" তাহা শুনিয়া তোমার চক্ষে জল আসিবে কেন? তুমি ত যশোমতী নও। ইহাকে বলে গোপী-অনুগা-ভজন। তুমি রাধার কান্তাভাবে ভজন ধ্যান করিতে করিতে সেই কান্তভাবের আস্বাদ পাইবে। তুমি যশোদার বাৎসল্য প্রেমের চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া সেই বাৎসল্য-প্রেমের কিছু ভাব আহরণ করিবে। এইরূপে গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি আহরণ করাকে গোপী-অনুগা-ভজন বলে। বৈষ্ণবগণ এইরূপে গোপী অনুগা-ভজন করিয়া তাঁহাদের প্রেম ও ভক্তি অর্জন করিয়া থাকেন। এরূপ ভজন আর কোন ধর্মে নাই।

মনে ভাব, অতি রসাল একটী প্রেমঘটিত গল্প যোজনা করিতে হইবে। তাহা হইলে কি কি প্রকরণ প্রয়োজন?

ইহার প্রকরণ একটী সুন্দর নাগর ও সুন্দরী নাগরী, একটী সঙ্কেত স্থান, একটী মিলন স্থান, ইত্যাদি। একটী নাগর ও একটী নাগরীর হঠাৎ এক স্থানে দেখা হইল, হইয়া উভয়ের হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর হইল। তখন দূতি যাইয়া মধ্যস্থ হইলেন, ক্রমে তাঁহারি সাহায্যে উভয়ের মিলন হইল। হয়ত তখন আর একটী প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হইলেন। তাহাতে ঈর্ষার সৃষ্টি হইল, পরে মান হইল, মানের পর কলহ, কলহের পরে অনুতাপ ও আবার মিলন হইল। এইরূপে সেই গল্প নানা রস দ্বারা সুস্বাদু করা যায়।

আরো শুনুন। তাহার পরে বিচ্ছেদ ঘটিল। পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হইল, তখন নাগর ক্রন্দন করেন, নাগরী ক্রন্দন করেন, শেষে আবার উভয়ের মিলন হইল।

মনে করুন, শকুন্তলার কাহিনী। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার দেখা সাক্ষাৎ হইল, সখিগণ দৌত্য করিলেন, ক্রমে মিলন হইল বিচ্ছেদ হইল, ঘোর বিরহ উপস্থিত হইল, পরে আবার মিলন হইল। এই কাহিনী পড়িতে পড়িতে পাঠক, নাগর ও নাগরীর সহিত সহানুভূতি করিয়া কান্দিবেন, হাসিবেন ইত্যাদি। পাঠকের নাগর ও নাগরীর প্রতি অনিবার্য আকর্ষণ হইবে, অনেক দিন তাহাদিগকে ভুলিতে পারিবেন না। এইরূপ যদি শকুন্তলার কাহিনী লইয়া চর্চা করিতে থাক, তবে ক্রমে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা তোমার হৃদয় কিয়ৎপরিমাণে অধিকার করিবেন।

দুষ্মন্ত রাজার স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে ও শকুন্তলার স্থানে শ্রীরাধাকে স্থাপিত কর, তাহা হইলে কৃষ্ণলীলা হইল। এই লীলা আস্বাদন করিতে করিতে সাধক কৃষ্ণপ্রেম আহরণ করিবেন, এবং তাঁহার রাধাকৃষ্ণের প্রতি অনিবার্য আকর্ষণ হইবে। এইরূপে করিতে করিতে রাধাকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রেমের সঞ্চার হইবে। মহাজনগণ জীবের নিমিত্ত বহুতর শ্রীকৃষ্ণলীলা রাখিয়া গিয়াছেন। তুমি ইচ্ছা করিলে কল্পনার দ্বারা ইহা পরিবর্তন করিতে, কি কল্পনার দ্বারা নূতন কৃষ্ণলীলা গঠন করিতে পার। তুমি যদিও কল্পনা করিয়া লীলা সাজাইবে, কিন্তু তুমি উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ফলভোগী হইবে। যেমন, যদিও শকুন্তলার কাহিনী কল্পনার সৃষ্টি, তবু উহার আলোচনায় উহার নাগর-নাগরীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। শ্রীকালাচাঁদ গীতা'য় শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিতেছেন—

তথাস্তু তথাস্তু বলিলা মাধবে।
যে খেলনা খেলিবে মোদের পাইবে।।
খেলিবে তোমরা যাহা হয় মনে।
নিশ্চয় তাহাতে রব দুই জনে।।
কল্পনা করিয়া খেলা সাজাইবে।
আমার বরেতে সব সত্য হবে।।

অর্থাৎ "কালাচাঁদ ভক্তগণকে এই বর দিতেছেন যে, তোমরা আমাকে ও শ্রীমতী রাধাকে লইয়া খেলা করিও। এই খেলা তোমরা কল্পনা বলে প্রস্তুত করিও, কিন্তু যদিও তোমরা কল্পনা দ্বারা খেলা সাজাইবে, তবু আমি আর শ্রীমতী সেই খেলায় থাকিব।" মনে ভাব তুমি গ্রীষ্মকালে মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে কুসুমাসনে বসাইলে, বামে শ্রীমতীকে বসাইলে, সম্মুখে নৃত্যকারী ময়ূর রাখিলে, রাখিয়া উভয়কে বায়ুব্যজন করিতে লাগিলে। কালাচাঁদ বলিতেছেন, এরূপ যদি তোমরা কর, তবে এই ছবিটী আমরা সত্য করিব। অর্থাৎ আমরা প্রকৃতই সাধকের সম্মুখে কুসুমাসনে বসিয়া তাহার বায়ু-ব্যজন রূপ উপহার গ্রহণ করিব। এই যে কালাচাঁদ গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বর, ইহার ভিত্তিভূমি, গীতা—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "আমাকে যে যেরূপ ভজনা করে, আমি তাহাকে সেইরূপ ভজনা করিয়া থাকি।" যদি শ্রীভগবান থাকেন, আর ভজন থাকে, তবে এ তত্ত্বটী সত্য। যদি তুমি শ্রীদুর্গা বলিয়া শ্রীভগবানকে ভজনা কর, তবে তিনি তোমার নিকট দুর্গা হইবেন। যদি তুমি নিরাকার উপাসনা কর, তবে তোমরা নিকটে তিনি নিরাকার হইবেন। তুমি নাস্তিক হইলে, তোমার কাছে তিনি নাই। তুমি রাধাকৃষ্ণরূপে যুগল উপাসনা কর, তিনি তোমার কাছে রাধাকৃষ্ণ হইয়া তোমাকে ভজনা করিবেন। গীতার বাক্যের তাৎপর্য এই।

এইরূপে ভক্তগণ, এই যে বিশ্বস্রষ্টা ভগবান যিনি অপরিমেয়, তাঁহার সঙ্গ করিয়া থাকেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের লোভের সৃষ্টি হয় ও পরিশেষে তাঁহারা কৃষ্ণ-প্রেম আহরণ করেন। যখন আমরা ব্রাহ্ম ছিলাম, তখন ঈশ্বরকে ইহা বলিয়া নিবেদন করিতাম যে,—"হে ঈশ্বর, আমি পাপী, তুমি দয়াময়, তুমি আমার পাপ মার্জনা কর।" এইরূপ প্রার্থনা প্রত্যহ করিতাম, কারণ আমাদের আর কোন কথা কহিবার ছিল না। খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্ম-যাজকগণ এই একরূপ প্রার্থনা চিরদিন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মুখে ঐ এক কথা, কারণ আশাতীত জ্ঞানাতীত নিরাকার ঈশ্বরের সহিত আর কোন কথা হইতে পারে না। কিন্তু যিনি প্রকৃত সাধক, তিনি ভগবানের নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন না, তিনি কেবল তাঁহাকেই চান। 'শ্রীকালাচাঁদ-গীতা'য় এক গোপী শ্রীভগবানকে বলিতেছেন—

মোদের সবারে পুতুল গড়িয়া।
খেল কর তুমি যা তোমার হিয়া।।
কখন ভাঙ্গিছ কখন গড়িছ।
এই মত দিবা- রজনী খেলিছ।।
এই মত মোরা তু দুহারে লয়ে।
খেলিব সকলে যাহা চাহে হিয়ে।।
কখন মিলাব কখন ছাড়াব।
কখন দুজনে কলহ করাব।। ইত্যাদি

অর্থাৎ ভক্তের প্রার্থনা এই যে,—আমরা তোমাকে দেখিব, দিবানিশি তোমার সঙ্গে থাকিব, তোমার সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিব, তোমার কাছে শিখিব, তোমার সহিত কথা কহিব, আমোদ করিব, কলহ করিব ইত্যাদি। অর্থাৎ—তোমাকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদ করিব,—তাহা হইলেই আমাদের অনিবার্য পিপাসা মিটিবে। তাই শ্রীভগবান উত্তরে বলিলেন যে,—"তুমি আমাকে যেরূপ ভজনা করিবে, আমিও তোমাকে সেইরূপ ভজনা করিব। তুমি আমার সঙ্গে সর্বদা থাকিতে চাও, আমিও তোমার সঙ্গে সর্বদা থাকিব। তুমি ইষ্টগোষ্ঠী করিবে, আমিও করিব"। ইত্যাদি।

এইরূপ ভজনে ভক্তগণ সেই মাধুর্যময় শ্রীভগবান, সেই শ্যামসুন্দর, সেই বনমালী, সেই নটবর সেই রসরাজকে খেলার সঙ্গী করতে পারেন। যাঁহারা ওতপ্রোত ভাবে জগদ্ব্যাপী নিরাকার

পরমেশ্বরকে ভজনা করেন, তাঁহারা বড়লোক, তাঁহাদের স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু—মূর্খ গোপীগণ বলেন যে—হৃদ-সিংহাসনে রসের বালিস। শুয়ে তাহে নাথ ঘুচাও আলিস।।

অর্থাৎ তোমাকে হৃদয়ে করিয়া শয়ন করিব, যেমন স্ত্রীলোক পতিকে কি উপপতিকে লইয়া করিয়া থাকে। পূর্বে বলিয়াছি, রস গৌণ সাত ও মুখ্য চারি প্রকার। গৌণ সাত, যথা—হাস্য প্রভৃতি। এই সমুদয় রস দ্বারা কিরূপে ভজনা করা যায়, পরে বলিতেছি। মুখ্য যে চারি রস অর্থাৎ দাস্য সখ্য ইত্যাদি, ইহার আভাস পূর্বে দিয়াছি। আর বোধ হয়, ইহার তথ্য ভক্তগণ বেশ বুঝিয়াছেন।

রস উদ্দীপনের নিমিত্ত দুইটি বস্তুর প্রয়োজন, যথা—নায়ক ও নায়িকা, বা ভগবান ও ভক্ত। আপনারা জানেন, নায়ক নায়িকা কত প্রকারের আছেন। নায়ক সুন্দর আছেন, কি ধীর আছেন, কি পণ্ডিত আছেন ইত্যাদি। কেহ নায়িকার বশ, কেহ স্বাধীন প্রকৃতির ইত্যাদি। এখন শ্রীকৃষ্ণকে ইহার একটি নায়ক করিয়া বিচার করা হউক।

যদি শ্রীকৃষ্ণ নায়ক হইলেন, তবে আদৌ আমরা তিন প্রকারের শ্রীকৃষ্ণ পাইতেছি, যথা—প্রথম বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ। ইনি কিরূপ, না—বনমালী, সরল, প্রেমভিখারী, প্রেমিক ইত্যাদি। দ্বিতীয় মথুরার শ্রীকৃষ্ণ। ইনি মহাজ্ঞানী, ক্ষমতাশালী, দণ্ডধারী, শাসনকর্তা, রাজা। তৃতীয় দ্বারকার কৃষ্ণ। ইনি মহাসংহারী,—স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, পিতা, মাতা, ভগিনী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত। যদিও তিন জনেই শ্রীকৃষ্ণ, তথাচ তাঁহাদের প্রকৃতি অনেক বিভিন্ন। কাজেই ইঁহাদের ভজনও সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্। শ্রীরাধিকার ভজনীয় যে ব্রজের কৃষ্ণ, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম দিয়া প্রেমভিক্ষা করেন। ইহার আর কোন সাধ নাই, ভজন নাই। তিনি কৃষ্ণকে কি বলিয়া নিবেদন করিতেছেন, শ্রবণ কর—

দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, চাঁদমুখ না দেখিলে,
মরমে মরিয়া আমি থাকি।।
দুই বাহু প্রসারিয়া, হৃদি মাঝে আকর্ষিয়া,
নয়নে নয়নে তোমায় রাখি।।

শ্রীমতী রাধা যেরূপ নায়ক প্রার্থনা করেন, বনমালী কি কালাচাঁদ ঠিক তাই, ইহার হাতে দণ্ড নাই, আছে বাঁশী; মাথায় পাগ নাই, আছে চূড়া। অর্থাৎ বনমালী, শাসন কি দণ্ড করেন না, মুগ্ধ করেন; তাঁহার আর কোন কাজ নাই, কেবল গোপীগণ লইয়া প্রেমানন্দ ভোগ করা।

শ্রীমতীর মনে বিশ্বাস হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন। এই ভাব মনে উদয় হওয়ায় উল্লাসে বলিতেছেন—আমার আঙ্গিনায় আওবে যবে ও রসিয়া। পালটি চলব হাম ঈষৎ হাসিয়া।। অর্থাৎ শ্রীমতী, শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন এই আনন্দে সখীকে বলিতেছেন, "সখী! কৃষ্ণ যখন আমার আঙ্গিনায় আসিবেন, তখন আমি কি করিব বল দেখি? আমি একবার তাহার প্রতি চাহিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া যাইব।" এখন পরাৎপর পরমেশ্বর সম্বন্ধে কি ঐরূপ ভজনা করা যায় যে, সেই নিরাকার পরম-ঈশ্বর যখন আমার বাড়ী আসিবেন, তখন আমি ঈষৎ হাসিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া যাইব? তা হইবে না, সে একেবারে বাতুলের কার্য হইবে। আমরা এখনি দেখাইব যে, এরূপ ভাবোল্লাস কুব্জার সম্ভবে না, রুক্মিণীরও সম্ভবে না,—এই রস দ্বারা কেবল ব্রজের কৃষ্ণকে ভজনা করা যায়। অতএব যেরূপ নায়ক হইবেন, তাঁহার ভজন-প্রণালীও তাহার উপযোগী হওয়া চাই,—নতুবা সে ভজন ভণ্ডামি হইবে। যাঁহারা পরাৎপর পরমেশ্বরকে নিবেদন করিবেন, তাঁহাদের উহা আর এক রসের সাহায্যে করিতে হইবে। মথুরায় কি দ্বারকায় শ্রীমতী নাই।

তাহার পরে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ। ইনি রাজেশ্বর, ইঁহার ঐশ্বর্যের সীমা নাই। ইঁহার নিকটে যদি কিছু চাহিতে হয়, তবে মথুরাবাসীরা ঐশ্বর্য চাহিবেন,—প্রেম নহে; আর ঐশ্বর্যই তিনি দিয়া থাকেন, মথুরাবাসীরা প্রেমের ধার ধারেন না। আর কি, না—তিনি অপরাধীকে দণ্ড বা মার্জনা

করিতে পারেন। ব্রজের গোপীর প্রার্থনা বা নিবেদন উপরে দিয়াছি। এখন মথুরাবাসীর প্রার্থনা শ্রবণ করুন। এই বিদ্যাপতির গীত—

মাধব হে, বহুত মিনতি করি তোয়।
আমি, দিয়ে তুলসী তিল, এ দেহ সমর্পিল
দয়া করি না ছাড়িবে আমায়।।
গইতে দোষগুণ, গুণলেশ না পাওবি,
যবে তুমি করিবে বিচার।
তুমি জগন্নাথ, জগতে বলাইয়াছ,
'জগ ছাড়া নহি মুই ছার।।'

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ! আমি তুলসী তিল দিয়া আমার এই দেহ তোমার পাদপদ্মে একেবারে সমর্পণ করিলাম, আমাকে ত্যাগ করিও না। অবশ্য যখন তুমি দোষগুণ বিচার করিবে, তখন আমার কোন গুণ পাইবে না। কিন্তু তুমি জগতের নাথ, আমি তোমার সেই জগতে বাস করি, আমাকে তুমি একেবারে ত্যাগ করিতে পার না।"

উপরে দুই প্রকার কৃষ্ণ দেখাইলাম, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণ দুই প্রকার নহেন। শ্রীকৃষ্ণ মোটে এক প্রকার, তবে সাধক ভেদে তিনি পৃথক হয়েন। যিনি বলেন, "হে কৃষ্ণ আমার পাপ মার্জ্জন কর," তাঁহার কৃষ্ণ দণ্ডধারী, তিনি বংশীধারী হইলে চলিবে না। আর যিনি বলেন, "তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া নয়নে নয়নে রাখি," তাঁহার কৃষ্ণ আর ঐশ্বর্যশালী পাগবান্ধা হইতে পারেন না, তাঁহার কৃষ্ণ রাখাল-রাজা ইত্যাদি।

যাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট কেবল প্রেম-ভক্তি ভিক্ষা করেন, তাঁহারা ব্রজবাসী। তাঁহাদের লীলাময় সুন্দর ঠাকুরের প্রয়োজন। যাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট পাপ-মার্জনা, মুক্তি প্রভৃতি, কি কোন আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য, যথা অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি কামনা করেন, তাঁহারা মথুরার লোক। তাঁহাদের ঠাকুর সুন্দর হউন, কি কুৎসিত হউন, নিরাকার হউন কি তেজোময় হউন, ইহাতে আইসে যায় না। যাঁহারা শুদ্ধ সাংসারিক উন্নতি কি বিপদ হইতে উদ্ধার বাসনা করেন, তাঁহারা দ্বারকার লোক। তাঁহাদের ঠাকুরও যেরূপই হউন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

শাক্ত মহাশয়গণের শ্রীদুর্গা যেরূপ, বৈষ্ণবগণের দ্বারকার কৃষ্ণ সেইরূপ। দুর্গা-পূজাতে সাধক প্রার্থনা করেন, ধনং দেহি, পুত্রং দেহি ইত্যাদি। দ্বারকার কৃষ্ণও সেইরূপ, ধনবর, পুত্রবর ইত্যাদি দিয়া থাকেন। অতএব যাঁহারা নিরাকার-বাদী, অথচ বলেন, ঈশ্বরের প্রেম সর্বোচ্চ সাধনা, তাঁহাদের কথার মিল নাই। কারণ ঠাকুর লীলাময় বিগ্রহ না হইলে, সাধকের প্রেম হইতে পারে না ও ভগবানের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী চলে না। অনেকে এই শেষের তত্ত্ব না মানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। তবে এই মাত্র বলি যে, কোনও সময়ে আমরা সরল ভাবে নিরাকার ঈশ্বরকে ভজনা করিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার নিকটে ঘেঁষিতে পারি নাই, তিনি চিরদিন সমান দূরে ছিলেন।

আবার নাগর উপরি-উক্ত তিন প্রকার কেন, বহুপ্রকারের হইতে পারেন। এমন কি ব্রজের, কি মথুরার, কি দ্বারকার কৃষ্ণেরও নানা রূপ আছে, ইহা ক্রমে দেখাইতেছি।

সাতটি গৌণ রস, যথা—হাস্য, বীর, করুণ, অদ্ভুত, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক।

১। হাস্য। ইহার অবলম্বন শ্রীকৃষ্ণ, উদ্দীপক কৃষ্ণের বিদূষক। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে মধুমঙ্গল নামক একটি বিদূষক দিয়াছেন। ইনি একটী ব্রাহ্মণ যুবক, অত্যন্ত পেটুক, দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষুধার যন্ত্রণার কথা বলেন। বড়াইকে দেখিয়া ডাকিনী ভাবিয়া মূর্চ্ছিত হয়েন। কখন বা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিদূষক হয়েন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে বিদূষক সাজাইয়া তাঁহার ভক্তগণ আনন্দে আকুল হয়েন।

২। বীর। বৈষ্ণবগণের মধ্যে যাঁহারা বীররস দ্বারা ভজন করেন, তাঁহাদের ঠাকুর সাধারণতঃ নৃসিংহ বা রামচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া কখন কখন ভক্তগণ বীররসে মোহিত হয়েন, কিন্তু যাঁহারা শক্তি-উপাসক তাঁহাদের বীররসই প্রধান অবলম্বন। যেমন শুম্ভ-নিশুম্ভ কাহিনী ইত্যাদি।

৩। করুণরস। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে কান্দাইয়া থাকেন, কখনও দয়াতে আর্দ্র করিয়া থাকেন। দুই একটি উদাহরণ শ্রবণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন, আর বৃন্দাবনে আসিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলেই যশোমতী নানা কুচিন্তায় ব্যাকুলিত হইতে লাগিলেন। তিনি ধনিষ্টা সখীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যথা পদ—

দুদিনের তরে, যাবে মথুরানগরে,
যাবার বেলা কেন কান্দিল?

তিনি বলিতেছেন, "সখি! মথুরায় কৃষ্ণ গেল, কালি আসিবে বলিয়া গেল, তবে যখন আমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হয়, তখন কান্দিল কেন?" কথা এই, শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে, তিনি আর আসিবেন না, আর এই কথা জননীর নিকটে গোপন রাখিয়াছেন। কিন্তু যখন জননীর নিকট বিদায় হয়েন, তখন ধৈর্য ধরিতে পারিলেন না, কান্দিয়া ফেলিলেন। অবশ্য ভক্তগণ এই লীলা মনে করিয়া দ্রবীভূত হয়েন।

শ্রীভগবান কিরূপ স্নেহশীল, প্রেমকাঙ্গাল, তাহার আর একটি কাহিনী শ্রবণ করুন। ভক্তেরা এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের করুণ হৃদয় বর্ণনা করিয়া ভক্তিতে গদগদ হয়েন। দেবকী কৃষ্ণকে বাড়ীর ভিতর ডাকাইয়া আনিয়াছেন। কৃষ্ণ অন্তঃপুরে আসিয়া একটি আসনে বসিলেন। তাঁহার সম্মুখে, পাত্রে যথেষ্ট ননী আছে। দেবকী তাহার একটু ননী হাতে লইয়া বলিতেছেন, "কৃষ্ণ! আমি শুনিয়াছি যে সেই গোয়ালা যশোদা নাকি তোমাকে ননী খাওয়াইত। আর তুমি নাকি তাহা বড় ভালবাসিতে। আজ আমি তোমাকে সেইরূপ ননী খাওয়াইব।" এই কথা বলিয়া, ননী লইয়া, কৃষ্ণের মুখে দিতে গেলেন, আর শ্রীভগবানের বদন একেবারে আন্ধার হইয়া গেল। কারণ তখন তাহার দুঃখিনী জননীর ও তাঁহার প্রেমের কথা মনে পড়িল। শ্রীকৃষ্ণের কোমল হৃদয় ও ঔদার্য দেখাইবার আর একটি মাত্র কাহিনী বলিব।

মুনিগণের মধ্যে বিচার হইতেছে, কে বড়— মহাদেব, ব্রহ্মা, না কৃষ্ণ? ইহা সাব্যস্ত করার ভার পাইলেন ভৃগুমুনি। তিনি অগ্রে ব্রহ্মার ওখানে গেলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে আদর করিলেন, আর ভৃগু তাঁহাকে গালি দিতে লাগিলেন। ইহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে আসিলেন, পরে নারদের অনুরোধে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। ভৃগু পরে মহাদেবের ওখানে গমন করিলেন, যাইয়া "তুমি ভাঙ্গখোর, উলঙ্গ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য" ইত্যাদি বচনে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহাদেব ত্রিশূল লইয়া ভৃগুকে বধ করিতে আসিলেন। আর ভগবতী তাঁহার হাত ধরিলেন।

পরে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ওখানে গেলেন। যাইয়াই তাঁহার হৃদয়ে পদাঘাত করিলেন। অমনি শ্রীকৃষ্ণ অতি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ভৃগুর হাত দুইখানি ধরিয়া অতি নম্র হইয়া বলিতে লাগিলেন, "মুনিবর! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, অবশ্য তোমাকে আমি উপযুক্ত সমাদর করি নাই। আমার কঠিন হৃদয়ে তোমার কোমল পদ অতিশয় ব্যথা পাইয়াছে।" ইহা বলিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া লক্ষ্মীর সঙ্গে সেবা করিতে লাগিলেন। সেই ভৃগুপদচিহ্ন শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে একটি অতি সুন্দর শোভা হইল। ভক্তগণ গদগদ হইয়া বলিয়া থাকেন যে, শ্রীকৃষ্ণের যত ভূষণ আছে, তাহার মধ্যে ভৃগুপদচিহ্ন সর্বপ্রধান।

৪। অদ্ভুত। এই রসের দ্বারা প্রধানতঃ নিরাকারবাদিগণ ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিরাকারবাদী তাঁহারা নাস্তিক হইতে এক সিঁড়ি উপরে। তাঁহাদের ভগবানের সহিত যে ইষ্টগোষ্ঠী, তাহা কেবল তাঁহার সৃষ্টি-প্রক্রিয়া লইয়া, সুতরাং তাঁহারা অদ্ভুতরসের সাহায্যে ভগবানকে উপাসনা করিয়া থাকেন। একটি কীট এত ক্ষুদ্র যে, চক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু যন্ত্রে

দেখা গেল যে, যদিও এত ক্ষুদ্র তবু তাহার জীবনযাত্রা দিব্য চলিতেছে। অমনি ভক্ত বলিবেন,—অদ্ভুত! বিজ্ঞানবিদ্ বলিবেন, এক সেকেন্ডে একটি ধূমকেতু সহস্র ক্রোশ ভ্রমণ করে। অমনি ক্ষুদ্র জীব শ্রীভগবানের শক্তি দেখিয়া একেবারে মোহিত হইলেন।

গৌণ-রসের মধ্যে বীর, রৌদ্র, বীভৎস, অদ্ভুত দ্বারা শক্তি-উপাসকগণ (যাঁহারা কালী, তারা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি শক্তির উপাসনা করেন) এইরূপে শ্রীভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানের মাধুর্য-উপাসক, সুতরাং তাঁহাদের গৌণরসের মধ্যে হাস্য আর করুণ ব্যতীত অন্য রসের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। শক্তি-উপাসকগণ শ্রীভগবানকে ভজনা করিতে এ সমুদয় অভদ্র রসের কেন আশ্রয় লয়েন, তাহা ঠিক আমরা বলিতে পারি না।* মনে ভাবুন ভক্তেব শ্রীভগবানের গলে মুণ্ডমালা, শিরোভূষণ সর্প ইত্যাদি। বীভৎস রস শ্রীভগবানের ভজনায কিরূপে প্রবেশ করিল বলিতে পারি না। বীভৎস কি রৌদরস দ্বারা যে শ্রীভগবানের ভজনা হইতে পারে, উহা আপাততঃ মনে ধরে না। কিন্তু আমরা চক্ষে দেখিতেছি, ভগবানের গলায় মুণ্ডমালা, গাত্রে মনুষ্যরক্ত ইত্যাদি। তবে বীবৎস-রস দ্বারা প্রকৃত ভজনা হয় না সে ঠিক। যাঁহারা এইরূপ ভজনা করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ভগবদ্-প্রেম আহরণ নয়—শক্তি কি সিদ্ধিলাভ করা। বোধ হয় সেই নিমিত্ত তাঁহাদের ভদ্র কি অভদ্র রস বিচারের প্রয়োজন হয় না।

ফলে এ প্রস্তাব বাড়াইবার আর আমাদের ইচ্ছা নাই। রসশাস্ত্রের মর্ম আমরা ভাষা-কথায় প্রকাশ করিতেছি। যাহারা ইচ্ছা করেন শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল নীলমণি পড়িতে পারেন। আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, প্রভু গম্ভীরালীলায় যে সমুদয় রসের চর্চা করেন, তাহারই আলোচনা করা। এখানে মাথুরের পালা দিব, যাহার দ্বারা অনেকগুলি রসের মর্ম প্রকাশ পাইবে।

ভক্তগণের ভজন সুবিধার নিমিত্ত কৃষ্ণলীলা দ্বারা অনেকটী পালা বিভক্ত হইয়াছে। যথা—পূর্বরাগ, মিলন, মান, মাথুর, নৌকাখণ্ড, দানখণ্ড। এই সমুদয় প্রভু আপনি আচরিয়া জীবকে দেখাইয়াছেন;—কতক নদীয়ায়, কতক নীলাচলে ও কতক গম্ভীরায়। নদীয়ায় মাথুর, দান ও নৌকাখণ্ড, নীলাচলে রাস ও নন্দোৎসব এবং গম্ভীরায় প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণবিরহ ও মান। দানখণ্ড চন্দ্রশেখরের বাড়ী কৃষ্ণযাত্রার দিবস দেখান হয়, নৌকাখণ্ড তাহার পরে ও মাথুর সন্ন্যাসের কিছু পূর্বে আপনার বাড়ীতে। নীলাচলে যে রাস-রস প্রকাশ করেন, তাহা পাঠক পূর্বে অবগত হইয়াছেন। তবে এ সমুদয় আবার গম্ভীরায় আরো পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছিলেন। এখন মাথুরের পালা একবার আলোচনা করুন। শ্রীনবদ্বীপে প্রভু মাথুরের পালা আরম্ভ করেন;—তাহার পর শ্রবণ করুন—

অক্রূর অক্রূর বলি পুন পুন ধাবই
ভাবই পূরত পীরিত।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ লই যাও হে
ডারি মোরে শোকের কূপে।
কো পুন বারণ, বোলে নাহি ঐছন,
সব জন রহল নিচুপে।। ইত্যাদি

অর্থাৎ প্রভু অক্রূর এসেছেন বলিয়া কান্দিয়া আকুল। বলিতেছেন, "হে অক্রূর, আমার প্রাণনাথকে কোথায় লইয়া যাও আমাকে শোকে ডুবাইয়া?" আবার সঙ্গীগণকে বলিতেছেন, "তোমরা যে চুপ করে রইলে, কথা কও না, কৃষ্ণকে যে নিয়া গেল, দেখছ না?" ইত্যাদি।

এইরূপ নৌকাখণ্ডের ও দানখণ্ডের পদ দ্বারা জানা যায়, প্রভু ঐ সমুদয় কিরূপে প্রকাশ

*শক্তি-উপাসকগণ সাধনদ্বারা কুলকুণ্ডলিনী- -যিনি নিদ্রিত আছেন—তাঁহাকে জাগরূক করেন। বৈষ্ণবগণ ইহাকে বলেন শ্রীমতীর কৃপালাভ করা, কি প্রেমলাভ করা যাঁহারা কুলকুণ্ডলিনী জাগরূক করেন তাঁহারা অষ্টসিদ্ধ পান, আর যাঁহারা শ্রীমতীর কৃপালাভ করেন তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম পান।

করেন। রাখালরাজ মথুরার রাজা হইয়াছেন, সেখানে তাঁহার নিকট ব্রজের গোপীগণ গিয়াছেন। দেখেন কৃষ্ণ রাজা হইয়া বসিয়া আছেন। গোপীগণ বলিতেছেন, যথা গীত—

রাজসেবা বাস ভাল ব্রজ ভাল লাগে না।
(আমরা) অবোধিনী গোয়ালিনী ভজন সাধন,
(শ্লোক শাস্ত্র) (তন্ত্র মন্ত্র) জানি না।

অর্থাৎ হে ভগবান, তুমি কি রাজসেবা ভালবাস, তাহা যদি হয়, তবে আমাদের উপায় কি? আমরা মূর্খ, কাঙ্গাল, আমরা রাজসেবা কোথা পাব? আমরা বক্তৃতা দ্বারা, কি শ্লোক দ্বারা, কি রাজভোগ অর্থাৎ ভাল বসনভূষণ দ্বারা কিরূপে তোমার সেবা করিব? পরে শুনুন—

রতনে জড়িত তুমি কি দিব তার তুলনা।
(আমরা) কাঙ্গালিনী বনে থাকি হীরা মতি চিনি না।।
আমাদের রাজপাট কদম্বতলা, সে বনের রাজা চিকণকালা,
রসসিংহাসনে রসের বালিস, শোয়াতাম তাকি জান না।
ব্রজে আমরা সবাই সরল, আমরা লৌকিকতা জানি না।।

এই গেল শ্রীভগবানকে রসের দ্বারা ভজন করা। গোপীরা বলিতেছেন, "ছি! তোমার চরিত্র কি? লোকে তোমার খোসামোদ করে, তাই তুমি ভুলে যাও? তোমাকে হীরামুক্তা দেয়, আর তাই তুমি আদর করে লও? কিন্তু আমাদের যে সরল ভালবাসা, তাহা তোমার ভাল লাগে না? ছি।

ইহা শুনিয়া সভাসদ্গণ হাসিলেন, কৃষ্ণও সুখে মধুর হাসিলেন, কারণ তিনি সভাসদ্গণকে গোপীর মহিমা দেখাইতেছেন। এই স্বার্থপর অসরল সভাসদ্গণ স্তুতিবাক্যে বড় মজবুত। স্বার্থসাধন নিমিত্ত মুখে কেবল 'দয়াময় দয়াময়' বলিতেছেন। মুখে 'পাপ পাপ' বলিয়া দৈন্য দেখাইতেছেন, কেন না রাজাকে তুষ্ট করিয়া কিছু স্বার্থসাধন করিবেন।* গোপীগণ ঠিক ইহার বিপরীত, তাঁহারা ইহার কিছুই করেন না। পরে তাঁহারা আবার বলিতেছেন, যথা পদ—

দে দে দে মোদের চূড়া দে।
(চূড়া ত মথুরার নয়) (চূড়া ত আমাদের দেওয়া)
(চূড়ায় মথুরা ভুলবে না।)
(চূড়া দে মুরলী দে) (শুন রাজেশ্বর হে)
আমাদের পিরীতে ফিরায় দে।

জীব চিরদিন শ্রীভগবানকে রাজরাজেশ্বর বলিয়া ভজনা করিয়াছে। ব্রজগোপীগণ প্রথমে তাঁহার রাজমুকুট কাড়িয়া লইলেন, লইয়া চূড়া দিলেন, হাতের দণ্ড কাড়িয়া লইয়া মুরলী দিলেন। এখন মথুরায় তাঁহাকে রাজবেশে রাজ-পদে দেখিয়া গোপীগণ কাজেই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছেন; বলিতেছেন, "তুমি যদি রাজা হবে, তবে চূড়া, মুরলী আর আমাদের পিরীতি ফিরায়ে দাও। কারণ উহাতে ত তোমার আর প্রয়োজন নাই। যেহেতু মথুরার লোক বাঁশীতে ভুলিবে না। তাহারা প্রেম চাহে না।" যাহাদের সর্বদা ভয়, ভগবান তাহাদের উপর রাগ করিবেন তাঁহার বিগ্রহ করিলে তিনি রাগ করিবেন, তাঁহার বিগ্রহ আছে বলিলে তিনি রাগ করিবেন, করযোড় করিয়া কথা না বলিলে রাগ করিবেন, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবানকে একটু প্রীতি করেন, তাঁহারা তাঁহার বদনে গাম্ভীর্য দেখিলে সেটা অস্বাভাবিক ভাবিয়া বড় ক্লেশ পান। কারণ তাঁহাদের ভগবান *হাস্যময়, রসিক, করুণাময়, স্নেহশীল, প্রেমের কাঙ্গাল।*

এখন শ্রবণ করুন, গোপীগণ তাহার পরে শ্রীভগবানকে কেমন বিদূষক সাজাইলেন। ব্রজগোপীগণ আবার বলিতেছেন,—"হে রাজ-রাজেশ্বর! আমরা তোমাকে ব্রজে ধরিয়া লইয়া যাইব। কারণ আমরা বুঝিতেছি যে, এই অসরল স্বার্থপর স্থানে তোমার একটুও আরাম নাই।

সভাসদগণ। তোমরা পল্লীগ্রামের লোক, তায় আবার তোমরা মূর্খ। তোমরা বলিতে পার যে ত্রিলোকের অধিপতিকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু তোমাদের প্রাণে কি ভয় নাই? যাঁহার ইচ্ছায় এই ত্রিলোক নষ্ট হয়, তাঁহাকে এরূপ অপমান বাক্য বলিতেছ?

গোপী। আপনারা রাজাকে ভয় করেন, আমরা ভয় করি না, কারণ আমাদের কোন প্রার্থনা নাই। আমরা জানি উহার যে ক্রোধ সে হাস্যময়, তাহাতে ধার নাই। বিশেষতঃ উনি নিজ হাতে এক দাসখত লিখিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে যে, আমাদের যে প্রধান শ্রীমতী, তাঁহার নিঃস্বার্থ প্রেমের জন্য উনি তাঁহার দাস হইলেন। সেই খতের বলে, আমরা শ্রীমতীর দাসকে ধরিয়া লইয়া যাইব।

কৃষ্ণ। বোধহয় এ তোমরা মিথ্যা কথা বলিতেছ। আমি দাসখত লিখিয়া দিয়াছি, ইহা ত আমার স্মরণ হয় না।

গোপী। এই দেখ তোমার দাসখত। ইহাতে তোমার স্বাক্ষর আছে।

কৃষ্ণ। তোমরা যে মিথ্যাবাদী তাহা এই এক কথায় ধরা পড়িয়াছে। কারণ আমি আদৌ দস্তখত করিতে জানি না। সে অতি লজ্জার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু লেখাপড়া শিখিতে আমার সুবিধা হয় নাই। বৃন্দাবনে গরু রাখিতাম, পাঠশালায় যাইবার সময় কোথা? তবু একবাব গিয়াছিলাম, বেশী দূর শিখিতে পারি নাই। প্রথম আখর "ক" হইতে বেশ লিখিলাম। তাহার পর যখন ধ-এ আসিলাম, তখন গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। একটাব আঁকড় ডাহিনে, অপরটার বাঁয়ে,—এই আমার গোল বাধিয়া গেল। কোন ক্রমে ঠিক করিতে পারি না, কোনটা "ক" আর কোনটা "ধ"। তাহার পরে এখন রাজা হইয়াছি, লেখাপড়া শিখিবার আর এখন প্রয়োজন নাই।

উপবে কৃষ্ণ-যাত্রার যে কাহিনী বলিলাম, তাহার অভিনয় হইয়া থাকে। কৃষ্ণ উপরের কথাগুলি অতি গাম্ভীর্যের সহিত বলেন। তিনি বলেন কিনা, "আমি শ্রীভগবান, ক আর ধ ঠিক করিতে না পারিয়া বর্ণমালা শিখিতে পারিলাম না।" আর তখন দর্শক সভাসদগণ হাস্যরসে ও ভক্তিতে মুগ্ধ হয়েন, অথচ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহাদের অতিশয় আকর্ষণ বাড়ে।

এই কাহিনীর শেষ পর্যন্ত বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। গোপীগণের সহিত মথুরার রাজা শ্রীকৃষ্ণের যখন এইরূপ বাকবিতণ্ডা হইতেছে, তখন তাঁহার রাণী কুব্জা তাঁহার বামে বসিয়া এ সমদয় শুনিতেছেন। তিনি আপনাকে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী ভাবিতেন। কারণ তিনি রাজ-রাজেশ্বরের পত্নী, সুতরাং যখন মলিনবসনা গোপীগণ আসিয়া কৃষ্ণের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি আশ্চর্য হইলেন। ভাবিলেন, মহারাজের এই সমুদয় নীচ লোকের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করা তাঁহার উচ্চপদের উপযোগী নয়। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় যে, মথুরাবাসীগণকে গোপীগণের মহিমা দেখাইবেন। প্রকৃতই কুব্জা উহা দেখিয়া একেবারে মোহিত হইলেন, এমন কি তাঁহার পুনর্জন্ম হইল। তখন তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া অগ্রে দাঁড়াইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, যথা পদ—

এই নিবেদন, শ্রীনন্দের নন্দন, ও বংশীবদন।
যে ধনে পিয়াসী আমি, সে ধন কর বিতরণ।।
কিবা তন্ত্র কিবা মন্ত্র, জানি না হে রাধাকান্ত,
এ দাসীরে না হইও ভ্রান্ত।
কোরো না হে অন্য যুক্তি, চাই না কিছু মোক্ষ-মুক্তি,
ও চরণে থাকে ভক্তি সেবাতে নিযুক্ত মন।।

যেন, জন্ম হয় গোপকুলে বৃন্দাবনে বসতি।
রাধাকৃষ্ণ মনাভীষ্ট হয় না যেন বিস্মৃতি।।
কিঞ্চিৎ করি যাচিঞা তব নেত্র ভ্রুভঙ্গে। চির দিন থাকি যেন সঙ্গে।।
শ্রীরাধারে লয়ে বামে, বসবে যখন নিধুবনে,
কৃপা করি এ অধনীর মাথায় দিও শ্রীচরণ।।

মথুরার রাজা, কৃষ্ণ দৈবকীনন্দন, দণ্ডধারী বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু কুব্জা তাঁহাকে তখন নন্দের নন্দন বংশীবদন বলিয়া নিবেদন করিতেছেন, অর্থাৎ কুব্জা সম্মুখের কাণ্ড দেখিয়া একেবারে ব্রজের গোপীভাব পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ একটু হাসিয়া বলিতেছেন, "তুমি বৃন্দাবনে থাকিতে চাও, সেখানে ত বসন ভূষণ নাই, তাহারা সকলে অতি দরিদ্র। বিশেষতঃ দেখিলে ত তাহারা পল্লীগ্রামের লোক, তাহাদের জ্ঞানের লেশ মাত্র নাই।"

কুব্জা। আমাকে আর বঞ্চনা করিবেন না। আমি বুঝিয়াছি আমি হতভাগ্য, আর তাঁহারা ভাগ্যবতী। আমি যথেষ্ট ধন পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহারা ধনীকে পাইয়াছে। আমি ধন পাইয়াছি, ধনীকে পাই নাই,—পাইবার চেষ্টাও করি নাই।

উপরের কাহিনীতে অনেক তত্ত্ব নিহিত আছে। যথা—প্রথমে তত্ত্ব এই যে, রসাশ্রয়ে কিরূপ শ্রীভগবানকে ভজনা করা যায়? দ্বিতীয়, ভজনা মানে কি? তৃতীয়, মথুরার ও ব্রজের ভজনের বিভিন্নতা কি? ইত্যাদি।

নবম অধ্যায়

মান

এইরূপ মানের পালা আলোচনা করিলে নানা রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। উহা এখন বর্ণনা করিব। শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ, তাঁহার অনুগত নাগরী অগণন। আর তাঁহাদের সকলের সর্বস্ব তিনি, কাজেই মান হইবার কথা। মনে ভাবুন, শ্রীকৃষ্ণের উপর মান করায় গোপীগণকে তত অপরাধ দেওয়া যায় না। কারণ, মানের ভিত্তিভূমি প্রেম। যেখানে প্রেম সেখানে মান। না, ভাল বলিলাম না, যেখানে মান সেখানে প্রেম জানিবেন। যে নায়িকা কৃষ্ণের উপর ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে চাহেন, কি তাঁহাকে কটু বলেন, তাঁহার এইরূপ ব্যবহার প্রমাণ করে যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিতান্ত অনুগত, কি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রাণ।

গম্ভীরায় প্রভু বসিয়া আছেন, বদন অতি প্রফুল্ল। স্বরূপ রামরায় মনে মনে ভাবিতেছেন যে, না জানি প্রভু কি ভাবে বিভাবিত। এমন সময় প্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া বলিলেন, "সখি! বড় শুভ সংবাদ, অদ্য শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, শীঘ্র তাহার আয়োজন কর।" এখন, 'প্রিয়তম', রজনীতে নায়িকার মন্দিরে আসিতেছেন, তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন কি? তাহার আয়োজন শয্যা প্রভৃতি। প্রভু বলিতেছেন, "শীঘ্র কুসুমচয়ন কর, চন্দন চুয়া সংগ্রহ কর, মালতীর মালা গাঁথ। দেখ সখী! শ্রীকৃষ্ণ বড় পাখীর গীত ভালবাসেন, বৃন্দাবনে শুকসারিকে সংবাদ দাও। তাহারা এই কুঞ্জ ঘিরিয়া বসুক। বন্ধু আইলে তাহারাই অগ্রে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিবে। আর ময়ূরময়ূরীর নৃত্য নিতান্ত প্রয়োজন।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া প্রভু আবার বলিতেছেন, "আমি আর তোমাদিগকে কি বলিব, তোমরা ত জানো। কৃষ্ণ আসিতেছেন, তাঁহার উপযুক্ত বাসক-সজ্জা কর।" ইহাকে বলে 'বাসক-সজ্জা'। ইহার একটি গীত শ্রবণ করুন। শ্রীমতী বলিতেছেন—

সুখের রাতি, জ্বালহে বাতি, মন্দির কর আলা।
কুসুম তুলিয়া, বোটা ফেলি দিয়া, গাঁথহে মালতী মালা।।

অগুরু চন্দন, কুসুম আসন, সপুষ্প লবঙ্গ ডাল।
শুভ আলিপনা, কুসুম বিছানা, গাঁথহে কদম্ব মাল।।
যমুনারি বারি, পুরি হেম ঝারি রাখহে শীতল করি।
পিক শুক সারী, ডাক ত্বরা করি, নিকুঞ্জে বসুক ঘেরি।।

হে কৃষ্ণ-প্রাণ গোপীভাবে অভিভূত পাঠক! এইরূপ হৃদয় মাঝারে বাসক-সজ্জা করিয়া, বন্ধুর নিমিত্ত বসিয়া থাকিও। তিনি আইলেও পারেন, না আইলেও পারেন। কিন্তু আসুন আর না আসুন, উভয়েতেই তুমি আনন্দ পাইবে, এবং কিছু প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে।

স্বরূপ, প্রভুর ভাবের সহানুভূতি করিয়া বলিতেছেন, "বেশ! আমরা বীণার সুর বান্ধি। কিন্তু শ্রীমতী! সর্বাগ্রে তোমার বেশভূষা করা উচিত। তোমাকে এমন ভুবন মোহিনীরূপে সাজাইব যে বন্ধু একবারে মোহিত হইবেন।" প্রভু (রাধাভাবে), "না না, সাজাইতে হইবে না। আমার ত সর্বাঙ্গে ভূষণ রহিয়াছে, আর ভূষণের স্থান কোথা? ভূষণে আদৌ আমার প্রয়োজন নাই।" যথা পদ—

শ্যাম পবশমণি সখি তা কি জান না।
সে অঙ্গ পরশে আমার এ অঙ্গ সোণা।।

প্রভু বলিতেছেন, "যাঁহার পরশমণির পরশ হয়েছে, তাহার আবার ভূষণের কি প্রয়োজন? তোরা ত জানিস আমি ছিলাম লোহা, আর তিনি পরশ করিযা আমাকে সোণা করিয়াছেন।" স্বরূপ বলিলেন, "তবু নয়নে, হস্তে, কর্ণে, বদনে, সকল স্থানে ভূষণ দিয়া তোমাকে সাজাইব।" প্রভু বলিতেছেন, "আমাব গলার ভূষণ ত আছে, সে শ্যাম-নামের হার।" যথা পদ—

আমি পরেছি শ্যাম-নামের হার।
হস্তের ভূষণ আমার চরণ সেবন।
বদনের ভূষণ আমার শাম-গুণ-গান।।
কর্ণেব ভূষণ আমার সে নাম-শ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার রূপ-দরশন।।
যদি তোরা সাজাবি মোরে।
কৃষ্ণনাম লেখ আমার অঙ্গ ভরে।।*

প্রভুর মুখে একটু দুঃখের ছায়া দেখিয়া স্বরূপ বুঝিলেন যে, কৃষ্ণের আসিবার বিলম্ব তাঁহার আর সহিতেছে না। তাই প্রভুর সে ভাব ফিরাইবার নিমিত্ত স্বরূপ এই গীতটী গাহিলেন।—

আমার আঙ্গিনায় আওবে যবে রসিয়া। পালটী চলব হাম ঈষত হাসিয়া।।

স্বরূপ প্রভুকে বলিতেছেন, "কেমন সখি, তাহাই করিতে পারিবে তো?"

প্রভু প্রকৃতই একটু মধুর হাসিলেন, বলিতেছেন, "ভাই! ও সব তোমাদের কাজ, আমার চপলতা ভাল আইসে না। আমি— গাঢ় আলিঙ্গনে, ঘন ঘন চুম্বনে, ঘুচাইব হৃদয়ের তাপ।"

"কৃষ্ণ এখনি আসিবেন, ব্যস্ত হইও না"—এই যে সখীর আশ্বাসবাক্য, ইহাকে বলে 'বিপ্রলব্ধা'। কিন্তু প্রভুর মুখে আবাব দুঃখের ছায়া দেখা দিল। শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন না; প্রভু ক্রমে ক্রমে উদ্বিগ্ন হইতেছেন; শেষে মৃদুস্বরে "উহু উহু" আরম্ভ করিলেন। এই "উহু উহু" ক্রমেই ফুটিতে লাগিল। শেষে নানা প্রকারে আপনার ক্লেশ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, স্বরূপ ধরিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। প্রভু বলিতেছেন, "সখি! কই, কই তিনি?" স্বরূপ বলিতেছেন, "ধৈর্য ধর, এই এলেন বলে।"

* এই পদটী প্রভুর নিজেব বলিয়া খ্যাত।

প্রভু বলিলেন, "তবে আমি একটু নিদ্রা যাই", ইহা বলিয়া স্বরূপের জানুতে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু আবার তখনি উঠিলেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন,—"সখি! কই? কই? তিনি কই? তিনি কি আসিবেন না? সখি! আমার সেই চন্দ্রবদন কোথা সখি! কোথা আমার চিত্তচোর, কোথা আমার রাসবিহারী, কোথা আমার নৃত্যকারী? ইহাই বলিতে রোদন করিতে লাগিলেন। স্বরূপ নানারূপে প্রবোধ দিতেছেন। প্রভু একবার উঠিতেছেন, একবার বসিতেছেন, একবার শয়ন করিতেছেন, একবার উঁকি মারিতেছেন, একবার বাহিরে যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। পরিশেষে সহস্র সহস্র বৃশ্চিক কর্তৃক দুষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। হে গোপীভাবে অভিভূত পাঠক মহাশয়! কৃষ্ণের আসিতে বিলম্ব হইলে ঐরূপ অধৈর্য্য হইও, তাহা হইলে তিনি আর বিলম্ব করিবেন না। ইহাকে বলে 'উৎকণ্ঠিতা'। প্রভুর তখন কি দশা হইয়াছে; না,—পড়ে পাতের উপরে পাত, ঐ এল প্রাণনাথ—বলিয়া চমকাইয়া উঠিতেছেন। কোন একটি শব্দ হইলেই অমনি "ঐ বুঝি এলেন," বলিতে লাগিলেন। পরে কৃষ্ণ আসিবার আশা ভরসা গেল, তখন, যথা চণ্ডীদাসের পদ—

দুকান পাতিয়া, ছিল এতক্ষণ, বঁধু পথ পানে চাই।
পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি, চমকি উঠিল রাই।।
পাতায় পাতায়, পড়িছে শিশির, সখীরে কহিছে ধনি।
বাহির হইয়া, দেখলো সজনি, বঁধুর শব্দ শুনি।।
পুন কহে রাই, না আসিল বঁধু, মরমে রহিল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব, পাষাণে ধরিয়া, ভাঙ্গিব আপন মাথা।।
ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা, শেষ বিছাইনু ফুলে।
সব হইল বাসি আর কেন সই, ভাসাগে যমুনা জলে।।

তুমি শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত আয়োজন করিয়া, পরে যখন তিনি আইলেন না দেখিয়া রাগ করিয়া বাসি ফুল ফেলিয়া দিতে পারিবে, তখন রসিকশেখর শ্রীমতীকে যাহা কহিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে স্তুতি বাক্য বলিয়াছিলেন, তোমাকে ততদূর না করুন, সেইরূপ কিছু করিবেন।

হে পাঠক! রসের ভজন শিক্ষা কিরূপ তাহা প্রভু আপনি আচরিয়া দেখাইয়াছেন। ক্ষুদ্র জীব শ্রীভগবানকে "রক্ষ মাং পাহি মাং" বলিয়া ভজন করিয়া থাকে। এখন দেখুন, সেই জীব আপন ভাবিয়া তাঁহার প্রতি ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে কিরূপ ভজন করিতেছেন! প্রভু তখন সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন, দেখিয়া বলিতেছেন—"ঐ দেখ আসিতেছেন", অমনি বদন প্রফুল্ল হইল; মনে ক্রোধ ছিল, আনন্দে উহা ভাসিয়া গেল। তখন প্রভু চুপে চুপে স্বরূপকে বলিতেছেন, "ঐ দেখ, বন্ধু বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া ভয়ে ভয়ে আসিতেছেন; আসিতে সাহস হইতেছে না।" তখন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"এসো বন্ধু, তুমি স্বচ্ছন্দে এসো, আমি রাগ করিব না। যে দুঃখে রজনী কাটাইয়াছি তাহা আমার প্রাণ জানে। বল দেখি রজনী কোথা বঞ্চিলে?" আবার বলিতেছেন, "একি! তোমার বদনে তাম্বুলের দাগ কেন? ওমা, এ আবার কি ভয়ানক! তোমার বদনে দংশনের দাগ কেন? বুঝেছি, তুমি আমাকে বঞ্চিয়া আর কোথায় ছিলে। আর সেই পাপীয়সী আপনার সুখের নিমিত্ত তোমার বদনে দন্তাঘাত করিয়াছেন। ছি!" ইহা বলিয়া প্রভু মুখ ফিরাইয়া বসিলেন, অর্থাৎ রাধা 'মান' করিলেন।

এখানে চণ্ডীদাসের যে পদ আছে, তাহা দিতে ইচ্ছা করিতেছে। ইহাতে সখিগণ শ্রীভগবানকে কিরূপে বিদ্রুপ করিতেছেন তাহা বর্ণিত আছে। এই রসকে 'খণ্ডিতা' বলে।

ছাড়হে চাতুরী ও নাগর রতিচোর।
জানি জানি জানি তুমি মদনে বিভোর।।

কোন ধনি উঠাইল নব অনুরাগ।
চুম্বন দেওল (চাঁদ বদনে) তাম্বুল দাগ।।

তাহার পরে বিদ্রূপের ছটা দেখুন। তাই চণ্ডীদাস প্রভুর এত প্রিয়, তাই অনেকে বলেন, জগতে চণ্ডীদাসের ন্যায় কবি আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।

শুন শুন বঁধু তোমায় বলিহারী যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদমুখ চাই।।
আই আই পড়েছে মুখে কাজলের শোভা।
ভালে সিন্দুর বিন্দু মুনি মনলোভা।।
হ্যাদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী, কোন লাজে এস।।
সাধিলে মনের সাধ, যে ছিল তোমারি।
দূরে রহ দূর রহ প্রণাম হামারি।।
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি।
কে কোথা শিখালে তারে, এ হেন পীরিতি।।
বড় দুঃখ পাইয়াছ, যামিনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া।।

দেখুন, পরাৎপর-পরমেশ্বর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় অধীশ্বরের, লাঞ্ছনা দেখুন। ভাল, তিনি কি এইরূপ বিদ্রুপে রাগ করেন? আপনি বলেন কি? চণ্ডীদাস শেষে এই অতুল কবিতার অতুলন সমাপ্তি করিযাছেন। যথা—বড় দুঃখ পাইয়াছ রজনী জাগিয়া। চণ্ডীদাসের হিয়ায় শোও হে আসিয়া।।

চণ্ডীদাস বড় চতুর, এই উদ্‌যোগে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে পুরিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "সখি, উহাকে যেতে বল, আমি উহাকে চাহি না।" প্রভু রাধাভাবে মান করিয়া ক্রোধে কৃষ্ণের কথা বন্ধ করিয়া সখীকে বলিতেছেন, "আমি উহাকে চাহি না। আমি তাহা হইলে মরিব, বলিতেছ? বেশ, তা মরি মরিব, সেও ভাল, এরূপ নাগর আমি চাই না।" প্রভু তখন দেখিতেছেন, যেন কৃষ্ণ জয়দেবের শ্লোক, অর্থাৎ 'মুগ্ধময়ীমানমনিদানং' পড়িয়া তাঁহাকে তুষিতেছেন। তখন কৃষ্ণকে বলিতেছেন এই জয়দেবের শ্লোক "তুমি যেখানে রজনী বঞ্চিয়াছ সেখানে যাইয়া পড়, এখানে কেন?"

পরে কৃষ্ণ কোন ক্রমে শ্রীমতীর ক্রোধ শান্তি করিতে না পারিয়া কান্দিতে কান্দিতে চলিয়া গেলেন, তখন "কলহান্তরিতা" রসের সৃষ্টি হইল। কৃষ্ণ গেলে তখন শ্রীমতী অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, যথা—"সখি, যাবার বেলা কেন্দে গেল। আর ত ফিরে নাহি এলো।।"

পূর্বে মাথুর-লীলার কথা বলিয়াছি। এখন মান-লীলার কথা বলিলাম। ইহা ব্যতীত অন্যান্য লীলার আভাস দিতেছি, যথা—আপনি কাণ্ডারী হইয়া ব্রজগোপীকে পার করিতেছেন। গোপীগণ কূলে দাঁড়াইয়া কাণ্ডারীকে বলিতেছেন—

আমাদিগে পার করে দে। ও সুন্দর নেয়ে হে। ধ্রু।
আমাদের বেলা গেল সন্ধ্যা হলো, আমাদের বিকি কিনি সারা হলো,
মোদের পারের কড়ি দিবার নাই। পার কর বাড়ী যাই।। ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীনিতাই যখন গৌড়ে প্রচার করেন, তখন বলিয়া বেড়াইতেন, "আমাদের গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়া বয়।"

অর্থাৎ হে জীব! আমাদের প্রভুর ঘাটে দান অর্থাৎ পারের কড়ি লাগে না।

আর একটি লীলা—'দানখণ্ড'। গোপীগণ বৃন্দাবনে যাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন। বলিতেছেন, "তোমরা বৃন্দাবনে যাইবে, তোমাদের দান কই? দান না দিলে বৃন্দাবনে যাওয়া যায় না।"

গোপীগণ। আমাদের দান দিবার মত কিছুই নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, বৃন্দাবনে যাইতে হইলে অগ্রে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। এইরূপে কীর্তন করিয়া, ভক্তগণ নানা রসে শ্রীভগবানের সঙ্গ করিয়া থাকেন। কখন কাণ্ডারী ভাবে, কখন মহাদানী ভাবে, কখন নানাবিধ নাগরভাবে তাঁহাকে ভজন করেন। ভক্ত, সঙ্গীতজ্ঞ-কারগণ এই সমুদয় চিত্তহরণ-কীর্তন সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই বলরাম দাস শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিয়াছেন—সাধন-কণ্টকী পথে ফুল ছড়াইলে।

অর্থাৎ মহাপ্রভু ভজন-সাধন অতি সুখকর করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলার কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। এসব কি সত্য হইয়াছিল, না কল্পনার সৃষ্টি? যে ভাগ্যবানেরা শাস্ত্র মানেন, তাঁহারা বলেন,—সব সত্য হইয়াছিল। যাঁহারা না মানেন, তাঁহারা বলেন,—এ সমুদয় কল্পনার সৃষ্টি। কিন্তু পূর্বের কথা স্মরণ করুন। এই সমুদয় লীলা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত, তাঁহার সহিত সঙ্গ করিবার নিমিত্ত। অতএব ইহা সত্য কি কল্পিত তাহাতে আসে যায় না। বিবেচনা করুন মান-লীলা। যাহা আলোচনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে নানা ভাবে সাজাইয়া তাঁহার সহিত বহুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করা যায়। আর ওরূপ ইষ্টগোষ্ঠী করার ফল—কৃষ্ণপ্রেম, যাহা জীবের পরমপুরুষার্থ। সব লীলারই উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করা, আর ভগবান লীলাময় না হইলে তাঁহার সহিত এরূপ ইষ্টগোষ্ঠী করা যায় না।

কিন্তু যদি প্রকৃতই এই সমুদয় লীলা ভক্তগণের সৃষ্টি হয়, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ, প্রভু সমুদয় কৃষ্ণলীলায় সাক্ষী দিয়া উহা সত্য করিয়াছেন।

দশম অধ্যায়

প্রভুর অবস্থা

গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায় জাগিয়া রজনী পোহায়।
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাঁপ।
খেনে ভিতে মুখ শির ঘসে কই নহি রহু পহু পাশে।
খেনে কান্দে তুলি দুই হাত, কোথায় আমার প্রাণনাথ।
নরহরি কহে মোর গোরা, রাইপ্রেমে হলো মাতোয়ারা।।

শ্রীভগবানের প্রেম জীবের সর্বাপেক্ষা বহুমূল্য ধন। শাস্ত্রে দেখি যে, সে প্রেম কেবল শ্রীমতী রাধার আছে, আর শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি আচরিয়া জীবকে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। সার্বভৌম প্রথমে যখন প্রেমে অচেতন অবস্থায় প্রভুকে দেখিলেন, তখন মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন—"শাস্ত্রে যে ভগবৎপ্রেমের কথা শুনিয়াছি তাহা তবে সত্য।" প্রভু এ পর্যন্ত যে কঠোর জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শরীর দুর্বল হইয়াছিল, কিন্তু তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলে আর তাহা রহিল না। যখন প্রভু দক্ষিণ হইতে নীলাচলে আইলেন, তখনও তাঁহার পদতল পদ্মফুলের মত, আর তাঁহার অঙ্গ দিয়া চিরদিন যেমন হইত, সেইরূপ পদ্মগন্ধ বাহির হইতেছিল। রামচন্দ্রপুরী আসিয়া প্রভুর ভোজন কমাইয়া দিলেন। প্রভু অগ্রে একপ্রকার উপবাস করিতেছিলেন, ভক্তগণের অনুরোধে তাহা ছাড়িয়া অর্ধভোজন আরম্ভ করিলেন। প্রভু অর্ধভোজন করিয়া প্রাণ রাখিলেন বটে, কিন্তু অতিশয় দুর্বল হইলেন। বাসুদেবের এই সম্বন্ধে একটী পদ আছে, যথা—

সিংহদ্বাব ছাড়ি গোরা সমুদ্র-পথে ধায়।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সবারে শুধায়।।
অতি দুর্বল দেহ ধরা নাহি যায়।
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।।
দীঘল শরীর গোরা পড়ে মুরছায়।
উত্তান নয়ন মুখে ফেন বহি যায়।।
চৌদিকে ভকতগণ কান্দিয়া ভাসায়।
বাসুদেব ঘোষের হিয়া বিদরিয়া যায়।।

এই একটি পদ বিচার করিয়া দেখুন, তাহা হইলে ভগবৎপ্রেম কাহাকে বলে, তাহা কতক বুঝা যাইবে। মন্দিরেব সিংহদ্বার ছাড়িয়া প্রভু সমুদ্র-পথে চলিলেন। যাইতে সম্মুখে একজনকে দেখিলেন। দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই, কৃষ্ণ কোথা বলিতে পার?" সে প্রথমে অবাক, পরে কান্দিয়া ফেলিল। কান্দিল কেন বলিতেছি। প্রভুর মুখের ভাব দেখিয়া তাহার একটি অবস্থার কথা মনে পড়িল। পুত্র এই মাত্র মরিয়াছে, জননী পাগলিনী হইয়া ছুটাছুটি করিতেছেন, আর যাহাকে পাইতেছেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আমার অমুক কোথায় বলিতে পার?" তাহার মুখে যেরূপ অবর্ণনীয় দুঃখের চিহ্ন দেখা যায়, প্রভুর মুখও সেইরূপ দুঃখে ছায়াবৃত। সেই পুত্রশোকাকুলিত মাতার প্রশ্নে লোকে যেরূপ কান্দিবে, এ স্থলেও সেই লোকটি প্রভুর প্রশ্নে সেইরূপ কান্দিল। একটু পরে প্রভু সম্মুখে আর একজনকে দেখিয়া তাহাকেও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেও ঐরূপ কান্দিল। প্রভু এইরূপে লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ও কান্দাইতে কান্দাইতে চালিয়াছেন। প্রভুর বদনে ঘোর বিয়োগের রেখা পড়িয়াছে, গলা শুষ্ক হইয়াছে, কথা বলিতে পারিতেছেন না।

এদিকে শরীর অতিশয় দুর্বল, এমন দুর্বল যে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে হয়। অতি দীর্ঘকায়, তাহাতে অতি দুর্বল, হাঁটিতে পা কাঁপিতেছে। হৃদয়ে বিষের ন্যায় জ্বালা, কাজেই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, মূচর্ছায় অভিভূত হইয়া লম্বা হইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন তাঁহার দেবচক্ষু হইয়াছে, নয়নতারা ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস একপ্রকার নাই, হৃদয়ে স্পন্দন নাই, মুখ দিয়া ফেনা বাহিয়া পড়িতেছে, আর কণ্ঠে ঘরঘর শব্দ হইতেছে। বাসুদেব বলিতেছেন, সে দৃশ্য দেখিয়া সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। হইবার কথাই বটে। পূর্বে বলিয়াছি যে কৃষ্ণপ্রেম কাহাকে বলে, তাহা আমাদের প্রভু জগতে দেখাইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ উপরে ঐ চিত্রটি দিলাম।

বিবেচনা করুন যাঁহার ভগবানে এত প্রেম, ভগবান যদি নিতান্ত নিষ্ঠুর না হয়েন, তবে তিনি এরূপ ভক্তের অনুগত হইবেন। এইরূপ আর একটি লীলার আভাস পূর্বে দিয়াছি, এখানে উহা বিবরিয়া বলিতেছি। রঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁহার স্তবাবলীতে উক্ত লীলাটি এইরূপ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একদিন প্রভু মন্দির দর্শনে গিয়াছেন। দ্বারী আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিল। অমনি প্রভু তাহাকে বলিতেছেন, "হে সখে! আমার প্রাণকান্ত কৃষ্ণ কোথা, তাঁহাকে আমায় শীঘ্র দেখাও।" প্রভু উন্মাদের ন্যায় এই কথা বলিলে, মূর্খ দ্বারীর হৃদয়ে সরস্বতী প্রবেশ করিয়া, তাহার দ্বারা এইরূপ বলাইলেন, যথা—"প্রভু আপনি আসুন, আপনার প্রিয়তমকে শীঘ্র দর্শন করাইতেছি।" দ্বারী ইহা বলিলে, প্রভু অমনি হাত ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, "তবে আমাকে লইয়া চল, তাঁহাকে দেখাও।" দ্বারী তাঁহাকে জগন্নাথের সম্মুখে লইয়া চলিল, যাইয়া বলিল "ঐ দেখুন আপনার প্রাণকান্ত।"

পুত্র যাহার প্রাণ, এরূপ জননী, তাহার সেই পুত্র জীবন ত্যাগ করিলে ক্ষণকালের নিমিত্ত উন্মাদ হইতে পারেন, এমন কি তাঁহার এমন ভ্রমও হইতে পারে যে, নিকটস্থ কাহাকে জিজ্ঞাসা

করিতে পারেন যে, "আমার পুত্র কোথা, তাহাকে কি দেখেছ?" এমন শোকাকুলা জননীও শোকের কিছুকাল পরে সান্ত্বনা লাভ করিবেন, করিয়া সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। প্রভুর এই যে "আমার কৃষ্ণ কোথা"—এই অন্বেষণে প্রভুর চিরজীবন গিয়াছে, আর যতই অন্বেষণ করিয়াছেন, ততই এই তল্লাসস্পৃহা বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহাকে বলে 'কৃষ্ণপ্রেম'। প্রভু যেরূপ কৃষ্ণপ্রেম দেখাইয়াছেন এমন প্রেম কেহ কোন কালে কাহারও নিমিত্ত দেখাইতে পারেন নাই। স্ত্রী স্বামীর নিমিত্ত নয়, জননী পুত্রের নিমিত্ত নয়, আর কোন কবিও এরূপ প্রেম কল্পনা করিতে সমর্থ হন নাই।

উপরে দেখিবেন, নরহরির পদে, ভিতে মুখ ও শির ঘষার কথা আছে। এই শির-ঘষা লীলা ভক্তগণ ভালবাসেন না। তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে, প্রভু এ লীলা না করিলেই পারিতেন। যাহা হউক, এ লীলার কিরূপে সৃষ্টি হয় শ্রবণ করুন। স্বরূপ একদিন প্রাতে দেখেন যে, প্রভুর নাসিকা ক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতেছে। তখন ব্যথিত হইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহা কি? ইহা কিরূপে হইল?" ইহাতে প্রভু একটু লজ্জিত হইলেন, আর স্বরূপের ভাব দেখিয়া ভয়ও পাইলেন; শেষে বলিলেন, "উদ্বেগে গৃহের বাহিরে যাইতে চেষ্টা করি, কিন্তু যাইতে পারি না, দ্বার তল্লাস করিয়া বেড়াই, কিন্তু অন্ধকারে দ্বার পাই না; তাই নাসিকাতে আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইয়াছে।"

কথা এই—প্রভু কৃষ্ণবিরহে জরজর। তিনি স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। ঘরের মধ্যে অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন। কোথা যাইবেন, কি করিবেন, কোথা যাইয়া বিরহ যন্ত্রণা হইতে শান্তি পাইবেন, এই তখনকার চেষ্টা ও মনের ভাব। চরিতামৃত বলেন—

এই মত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ। মনেতে শূন্যতা বাক্য হাহা হুতাশ।।
কাঁহা করো কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।।
কাহারে কহিব কথা কেবা জানে দুঃখ। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক।।

এই গেল প্রভুর সহজ অবস্থার কথা। দিবানিশি হা হুতাশ, দিবানিশি অস্থির, শান্তিহীন। রাত্রিতে তাঁহাকে শয়ন করাইয়া ভক্তগণ নিজ নিজ স্থানে গিয়াছেন। ভক্তগণ তাঁহাকে রাখিয়া চলিয়া গেলে, হঠাৎ তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণবিরহানল জ্বলিয়া উঠিল, অমনি প্রভু উঠিয়া বসিলেন। ইচ্ছা হইতেছে বাহিরে গমন করেন। সেই চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দ্বার পাইতেছেন না। ইহার ফলে নাসিকায় আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইয়াছে।

এখন অগ্রে বিচার করুন, প্রভুর এই যে কৃষ্ণবিরহ ইহা সত্য না কাল্পনিক? যদি তাঁহার কৃষ্ণবিরহ প্রকৃত না হইয়া অভিনয় হইত, তবে নাসিকায় আঘাত লাগিত না। যেরূপ কোন রঙ্গ ভূমিতে প্রভু-সাজিয়া কৃষ্ণবিরহ দেখাইবার নিমিত্ত যদি কেহ ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইত, তবে তাহার নাসিকায় কখন আঘাত লাগিত না। কিন্তু যদি সত্য কৃষ্ণবিরহ হয় তবে ত নাসিকায় আঘাত লাগিবারই কথা, আঘাত না লাগাই আশ্চর্য। কথা এই, নাসিকায় আঘাত লাগিয়াছিল ইহাই অব্যর্থ প্রমাণ যে প্রভুর কৃষ্ণবিরহ সত্য, কাল্পনিক নয়, আর এই আঘাত একটি পরিমাপক যন্ত্রেরও কার্য করিতেছে, অর্থাৎ প্রভুর কৃষ্ণবিরহ কতখানি, এই ক্ষত দ্বারা তাহার কতক পরিমাণ পাওয়া যাইতেছে।

যখন স্বরূপ নাসিকা ক্ষত হইবার কারণ শুনিলেন, তখন উপায় স্থির করিলেন। সেই অবধি প্রভুকে আর একাকী শয়ন করিতে দেওয়া হইত না। প্রভুর পদতলে শঙ্কর সেই গম্ভীরায় শয়ন করিতেন। প্রভু একখানি পাথরে শয়ন করিতেন। আর শঙ্কর প্রভুর পদ দুখানি আপনার হৃদয়ে রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন। সেই শঙ্করের একটি পদ শ্রবণ করুন।*

* কৃষ্ণবিরহে প্রভুর কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা এই ভক্তগণ যাহারা দিবানিশি সঙ্গে থাকিতেন, তাহাদের দ্বারা জানা যায়।

সে যে মোর গৌরকিশোর। মুরছি মুরছি পড়ে ভকতের কোর।।
সোনার বরণ তনু হইল মলিন। দেখিয়া ভকতগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ।।
বচন না নিকসয়ে সে চাঁদবদনে। অবিরল ধারা বহে অরুণ-নয়নে।।
কান্দে সহচরগণ গৌরাঙ্গ বেড়িয়া। পাষাণ শঙ্কর দাস না যায় মরিয়া।।

একাদশ অধ্যায়

গম্ভীরা লীলার পূর্বাভাস

রজনি জাগিয়া গোরা থাকে। হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে।।
প্রভাতে উঠিয়া গোরারায়। চঞ্চল লোচনে সদা চায়।।
নমিত বদনে মহী লিখে। আঁখি-জলে কিছুই না দেখে।।
লোচন বলে এই রস গূঢ়। বুঝয়ে রসিক না বুঝয়ে মূঢ়।।

রথ উপলক্ষে যখন নদীয়ার ভক্তগণ নীলাচলে আসেন তখন প্রভু সম্পূর্ণ চেতন থাকেন। কিন্তু তাঁহারা দেশে প্রত্যাগমন করিলে প্রভু আবার বিহ্বল হইয়া পড়েন। তাঁহার এই অবস্থা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। দিনের বেলা যে চেতনটুকু থাকে, সন্ধ্যা হইলে সেটুকু যায়। সন্ধ্যার বিহ্বলতা, রজনী বৃদ্ধির সহিত ক্রমে বাড়িতে থাকে। স্বরূপ ও রামরায় প্রত্যহ ভাবেন যে, অদ্য রাত্রি কি করিয়া কাটাইবেন। গম্ভীরায় প্রভু না জানি কি হৃদয়বিদারক লীলা করেন। উভয়ের, বিশেষতঃ স্বরূপের চেষ্টা এই যে, প্রভুকে সচেতন রাখিবেন, সেই জন্য নানা কথা বলিয়া প্রভুকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রভু উপরোধে দুই এক কথার উত্তর দিতেছেন বটে, কিন্তু প্রাণ মন শ্রীকৃষ্ণে। সন্ধ্যা যত ঘনাইয়া আসিতেছে, প্রভুর বিহ্বলতা ততই বাড়িতেছে। আর স্বরূপ কি রামরায় নানা উপায়ে প্রভুকে অচেতন হইতে দিতেছেন না। যাহারা অহিফেন সেবনে প্রাণে মরে, তাহাদিগকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় তাহাদিগকে অচেতন হইতে না দেওয়া। তাই রোগীকে শুইতে কি বসিতে দেওয়া হয় না—হাঁটাইয়া লইয়া বেড়ান হয়। এইরূপ নানা উপায় তাহাকে চেতন রাখিবার চেষ্টা করা হয়।

স্বরূপ ও রামরায় প্রভু সম্বন্ধে তাহাই করিতেছেন। প্রভুর যে কথায় রুচি আছে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিয়া, প্রভু যাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলেন তাহার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রভুর হৃদয়ে যতই প্রবেশ করিতেছেন, প্রভুর বাহ্য-জগতের সহিত সম্বন্ধ ততই লোপ পাইতেছে। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারেন, স্বরূপ তাহার চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ চেষ্টা করিয়া স্বরূপ কিছুকাল প্রভুকে সচেতন রাখিলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ পারিলেন না। পরিশেষে না পারিয়া ক্ষান্ত দিলেন, আর প্রভু একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

আবার যখন প্রভু একান্তই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহাদের চেষ্টা হইল প্রভুর হৃদয়ে দুঃখ-রস আসিতে না দিয়া, বরং যাহাতে আনন্দ-রস আইসে তাহার নানা উপায় উদ্ভাবন করা।

প্রভুর বিহ্বলতা কিরূপ, বলিতেছি। তিনি স্বরূপকে ভাবিতেছেন সখী ললিতা, আপনাকে ভাবিতেছেন রাধা, সম্মুখে একটি বৃক্ষ দেখিয়া ভাবিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন ইত্যাদি।

পূর্বে বলিয়াছি এই লীলা অতি গোপন হয়। সুতরাং উহার বিবরণ সংগ্রহ করা বড় কঠিন। তবু ইহা বিবরিয়া লিখিতে আমার অসাধ্য বোধ হইতেছে না, কারণ প্রভুর অনেক সঙ্গী-মহাজনের পদের সাহায্য পাইতেছি, স্বরূপের করচার সাহায্য পাইতেছি, আর রঘুনাথ দাসের বর্ণনা হইতে কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে যে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহাও পাইতেছি। চরিতামৃত এই করচার কথা এইরূপ বলিতেছেন—"স্বরূপ গোসাঞি মত, রঘুনাথ জানে যত, তাহা লিখি নাহি মোর দোষ।"

আমারও সেই কথা। আমি এই ভুবনপাবন ভক্তগণের পদধূলি মস্তকে দিয়া লিখিতেছি, আমারও কোন দোষ নাই। আর এক কথা জানিবেন, ঐকান্তিক চেষ্টা থাকিলে প্রভুর কৃপায় তাহার হৃদয়ে নানা গূঢ় কথার স্ফূর্তি হয়। যখন প্রভু একবার অচেতন হইলেন, তখন তাঁহাকে ধরিয়া গম্ভীরায় ভিতরে অর্থাৎ কুটিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে লইয়া যাওয়া হইল। অতি মলিন আসনে প্রভুকে বসাইলেন, আর সম্মুখে স্বরূপ ও রামরায় বসিলেন। প্রদীপ টিপ্ টিপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রভু এই প্রদীপের সাহয্যে স্বরূপের ও রামরায়ের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছেন। যেন চেন চেন করিতেছেন, কিন্তু চিনিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা প্রভুর মুখ দেখিয়া বুঝিতেছেন যে, বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ একেবারে লোপ পাইয়াছে। প্রভুর হৃদয়ে বিরহ-বেদনা সর্বদা জাগরুক রহিয়াছে, আর তিনি সর্বদা তাহাই আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু প্রভু সেই ভাবের কথা বলিতে গেলেই, স্বরূপ ও রামরায় সে ভাব ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিরূপে বলিতেছি। প্রভু ধীরে ধীরে আপন মনে কথা বলিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে যে দুইজন বসিয়া আছেন, তখন তিনি আর তাঁহাদের দেখিতে পাইতেছেন না, যেন আপন মনে বলিতেছেন, "ছি! ছি! এমন পিরীত কি কেহ কখন করে? আমি যমুনায় ঝাঁপ দিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত কবির। হায়! হায়! আমি অবলা এত কি জানি!" এই "প্রলাপ" বাক্য শুনিবামাত্র স্বরূপ বুঝিলেন যে, প্রভুর বিরহ-বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। তাই প্রভুর হৃদয়ে সেই রস না আসিতে পারে ও প্রভুর মন হইতে দুঃখ-রস বিতাড়িত হয়, এই নিমিত্ত স্বরূপ পূর্বরাগের একটি গীত ধরিলেন। স্বরূপের ন্যায় গায়ক জগতে কাহারও হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, প্রভু গোলোক হইতে যে "অনর্পিত ভাব" আনিয়াছেন, তাহা তিনি সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করিতেন। আর সেই হইতেই আমাদের দেশে অপূর্ব কীর্তন সৃষ্টি হইয়াছে। স্বরূপ পূর্বরাগের গীত ধরিলেন, তাহাতে শ্রীমতী রাধা কিরূপে প্রথমে প্রেমডোরে আবদ্ধ হয়েন তাহা বর্ণিত আছে। মনে থাকে যেন,—বিরহে দুঃখ, মিলনে সুখ; কিন্তু পূর্বরাগে মিলন-সুখ হইতেও অধিক আনন্দ। স্বরূপ পূর্বরাগের গীত আরম্ভ করিলেন। যথা পদ—

"আমি কি হেরিলাম নীপমূলে। আমার মন প্রাণ কাড়ি নিলে গো।।
হিয়ায় আমার রূপ জাগে। সংসারে না মন লাগে গো।।"

এই গীত শুনিবামাত্র প্রভু অমনি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনের ভাব ফিরিতে লাগিল। ক্রমে পূর্বরাগে বিভাবিত হইয়া তাঁহার বদন প্রফুল্ল হইল। তখন স্বরূপ গান রাখিয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার যে প্রীতি ইহা কিরূপে হইল বল দেখি?" তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, প্রভুকে উত্তপ্ত বিরহ-বালুকা হইতে শীতল পূর্বরাগ-রূপ সরোবরে লইয়া যাইবেন।

অমনি প্রভু বলিতেছেন, "আহা, কি সুখের দিন। আর কি সে দিন আসিবে! আমি জল আনিতে যমুনায় যাইতেছি, তা কি জানি যে, আমার সম্মুখে এই ঘোর বিপদ? দেখি কি যে, একজন পরম সুন্দর পুরুষ কদম্ব তলায় দাঁড়াইয়া!" বলিতে বলিতে প্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণের রূপ স্ফূর্তি হইল, তাঁহার বদন আনন্দে ডগমগ করিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া স্বরূপ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"তাঁহার কি প্রকার রূপ ভাল করিয়া বল।" তখন প্রভুর সহস্র জিহ্বা হইল। কৃষ্ণের আপাদমস্তক বর্ণন করিতে লাগিলেন। আর ঝলকে ঝলকে আনন্দ উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন, আর সেই আনন্দে তাঁহারা তিন জন ভাসিয়া চলিলেন। স্বরূপ ও রামরায় তখন ভাবিলেন যে, প্রভুকে এ রজনীর বিরহ-যন্ত্রণা হইতে বাঁচাইয়াছেন। প্রভু রূপ বর্ণনা করিতেছেন, তাঁহার নয়নে আনন্দধারা পড়িতেছে, আর মুখে এরূপ কমনীয় ভাব প্রকাশ পাইতেছে যে, উহা দেখিলে ভুবন মোহিত হয়। এইরূপে নিশি যখন দ্বিপ্রহর হইল, তখন নানা

উপায়ে প্রভুকে শয়ন করাইয়া রামরায় বাড়ী গমন করিলেন, আর স্বরূপ প্রভুর নিকটে তাঁহার আপন ঘরে শয়ন করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

নায়ক বর্ণনা

পূর্ব্বরাগ রসাস্বাদন করা সকলের পক্ষেই সম্ভব। এমন কি, জীবনে কোন না কোন এক সময়ে জীবমাত্রই এই রস আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়েন। মিলন-সুখ-রসাস্বাদন করাও অনেকের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু কৃষ্ণ-বিরহ-রসাস্বাদন করা (যাহা জীবের সর্বপ্রধান ভজন) মানুষের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। অন্ততঃ একমাত্র প্রভুই এই রসাস্বাদন করিয়াছেন দেখা যায়, আর কেহ যে ইহা করিতে পারিয়াছেন তাহা জানা যায় না। এই কৃষ্ণ-বিরহ সর্বাপেক্ষা দূরারাধ্য ও কুটিল গতি বলিয়া প্রভু প্রায় দ্বাদশ বৎসর ইহাতে নিমগ্ন ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার গম্ভীরা লীলা বলিতে, কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনা নানাপ্রকারে প্রকাশ করা।

পূর্বে বলিয়াছি যে নায়ক বহু প্রকার আছে, কিন্তু সে সমুদয়ের সহিত আমাদের প্রয়োজন অতি অল্প। আমাদের কার্য ব্রজের নায়ক লইয়া, অর্থাৎ যিনি প্রেম বিকিকিনি করেন; আবার ইহাও বলিয়াছি যে, এই ব্রজের নায়ক একপ্রকার নহেন। এই ব্রজের নায়ককে নানা ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহার একরূপ নায়কের ভজন অন্য নায়কের ভজন হইতে পৃথক। সুতরাং এক ব্রজের নায়কেরই ভজন বহু প্রকারের আছে। এই সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন ব্রজের নায়কের ভিন্ন ভিন্ন ভজন প্রণালী প্রভুর আস্বাদ করিতে, কি স্বরূপ ও রায়কে দেখাইতে, যে দ্বাদশ বৎসর লাগিয়াছিল, সে জন্য বিস্ময়াবিষ্ট হইবার কোন কারণ নাই।

এই ব্রজের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির নায়কগণের প্রত্যেকের কিরূপ ভজন তাহা আমাদের বর্ণনা করিবার স্থান নাই, শক্তি নাই, এক প্রকার প্রয়োজনও নাই। আমরা এইরূপ দুই চারিটি নায়কের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বর্ণনা করিব, যাঁহাদের প্রকৃতি সর্বসাধারণের বোধগম্য হওয়া সম্ভব। যাঁহারা আরো বেশী জানিতে চাহেন, তাঁহারা উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ পড়িবেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটী নায়কের কথা বলিতেছি, যথা —অনুকূল, দক্ষিণ, ললিত, ধীরোদ্ধত, ধীরশান্ত, শঠ, ধৃষ্ট ইত্যাদি।

অনুকূল নায়ক ঃ ইনি প্রেয়সীর নিতান্ত বাধ্য। ইহার মন অন্য কোন রূপবতী কি গুণবতী বিচলিত করিতে পারে না।

দক্ষিণ্ নায়ক ঃ সকল নায়িকার প্রতি ইহার সমান ভাব। মনে ভাবুন, রাসের রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীর সহিত সমানভাবে বিহার করিতেছেন। তখন তিনি 'দক্ষিণ শ্রেণীর নায়ক'। তাহা দেখিয়া শ্রীমতীর মান হইল। পরে সকল গোপী ত্যাগ করিয়া যখন শ্রীমতীকে লইয়া অন্তর্ধান করিলেন, তখন তিনি অনুকূল নায়কের কার্য করিলেন।

শঠ নায়ক ঃ শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রেয়সী রাধা। কারণ রাধার প্রেমে মলিনতা নাই, আর তাঁহার প্রেমে শ্রীভগবান্ স্বয়ং পাগল। মনে ভাবুন, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর কুঞ্জে চলিয়াছেন। পথে চন্দ্রাবলী ধরিলেন; ধরিয়া "কোথায় যাও, আমার কুঞ্জে এস" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে টানিয়া লইযা চলিলেন। তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণ কত প্রকার চাতুরী করিলেন, কিন্তু পারিলেন না,—চন্দ্রাবলী তাঁহাকে ধরিয়া নিজ কুঞ্জে লইয়া চলিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ করেন কি, বলিতেছেন, "তুমি আমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছ কেন? তোমার ন্যায় প্রেয়সী আমার কে আছে বল? আর যত দেখ তাহাদের সকলের সহিত যে প্রণয় সে বাহ্য। তোমার প্রতি আমার যে প্রেম তাহার তুলনা নাই।" শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর মনুস্তুষ্টির নিমিত্ত এই সমুদয় কথা বলিতেছেন, আর অনেক চেষ্টা করিয়া মুখে আনন্দ দেখাইতেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, নাগর

একেবারে মর্মাহত হইয়াছেন। ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীমতীর বিশুদ্ধ প্রেম-সুধা ভোগ করিবেন, আর সেই আনন্দে যাইতেছিলেন; কিন্তু তাহাতে ব্যাঘাত ঘটিল। তবু চন্দ্রাবলীর হৃদয়ে পাছে ব্যথা লাগে বলিয়া চাটুবাক্যে তাহার মনস্তুষ্টি করিতেছেন। এইরূপ যিনি নাগর তিনি "শঠ"। তাহার পরে—

ধৃষ্ট নাগর ঃ ইনি অন্য কোন রমণীর কুঞ্জে নিশি যাপন করিয়া, পরে প্রেয়সীর নিকট গমন করিয়াছেন। সেখানে যাইয়া, তিনি যে অন্য রমণীর সহিত নিশি যাপন করিয়াছেন এ কথা একেবারে গোপন করিতেছেন। কিন্তু গণ্ডদেশে তাম্বুলের চিহ্ন রহিয়াছে, সুতরাং ধরা পড়িয়া গেলেন। যদিও হাতে হাতে ধরা পড়িয়াছেন, তবু ছল করিতে ছাড়িতেছেন না। এই নাগর আপনার দোষ কোনক্রমে স্বীকার করিবেন না,—ইনি "ধৃষ্ট"।

কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নায়কের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র বর্ণনা না করিয়া, তাহাদের ভজন কিরূপ তাহা বলিলে একরূপ আমার কার্য সিদ্ধ হইবে। যাঁহাদের নিকট এ সমুদয় কথা একেবারে নূতন, তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিই যে, এক শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, আর জীব মাত্রেই প্রকৃতি। কাজেই কৃষ্ণ বহুবল্লভ অর্থাৎ বহু নায়িকার বল্লভ। গোপী-অনুগা ভজনে আমরা কেহ প্রধান নহি, আমরা কেবল যোজকতা করি। যদি কৃষ্ণ শঠ বলিয়া বিদ্রূপিত হয়েন সে আমাদের দ্বারা নয়, সে গোপীগণ দ্বারা। আর কৃষ্ণের প্রেয়সী যাঁহারা, তাঁহাদের পক্ষে তাঁহাকে শঠ বলা অস্বাভাবিক নয়। সম্রাটের যিনি প্রেয়সী, তিনি তাঁহার কান্তকে অবশ্য তিরস্কার করিবার অধিকার রাখেন।

আর এক কথা স্মরণ করাইয়া দিই। শ্রীভগবানের দুই ভাব আছে;—ভগবত্ত্ব আর মনুষ্যত্ব। মনুষ্যের সহিত তাঁহার সঙ্গ করিতে হইলে তাঁহাকে বিশুদ্ধ মনুষ্য হইতে হইবে। তাঁহার যে পরিমাণে ভগবত্ত্ব থাকিবে, সেই পরিমাণে তিনি মনুষ্যের আয়ত্তের অতীত হইবেন। যে পরিমাণে তিনি মনুষ্যভাব গ্রহণ করিবেন, সেই পরিমাণে তিনি মাধুর্যময় হইবেন—মায়াতীত জ্ঞানাতীত হয়ে বসে রবে। কেমনেতে বলরাম তোমা লাগ পাবে।।

শ্রীভগবান জ্ঞানময় ভ্রমপ্রমাদশূন্য, কিন্তু এরূপ ভগবানের সহিত মনুষ্য ইষ্টগোষ্ঠী করিতে পারে না। এরূপ ভগবানের এক বিন্দু রস থাকিবে না, তিনি এক প্রকার শুষ্ক কাষ্ঠ। যিনি জ্ঞানাতীত মায়াতীত ভগবান্, তাঁহার হাসি অস্বাভাবিক, ক্রন্দন অস্বাভাবিক, রসিকতা অস্বাভাবিক,--তাঁহাকে আদৌ ভজনা করা চলে না। তাঁহাকে নাগররূপে ভজনা করিতে হইলে, তাঁহার ঠিক মনুষ্যের ন্যায় নাগর হইতে হইবে। অতএব যেমন মনুষ্য মধ্যে নাগরভেদ, তেমনি কৃষ্ণের মধ্যে নাগরভেদ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শেষ দ্বাদশ বৎসর

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর। কৃষ্ণের বিরহ-স্মৃতি হয় নিরন্তর।।
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে। এই মত দশা প্রভুর হয় রাতি দিনে।।
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ। ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাত।।
রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে। ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ হালে।।

—চরিতামৃত।

গম্ভীরায় আজ প্রভুর এইরূপ অবস্থা যে তিনি আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, অথচ তিনি যে কে তাহাও ঠিক করিতে পারিতেছেন না। তবে দাস্যভাবে অভিভূত হইয়াছেন। দৈন্যতার খনি। মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া একটি শ্লোক পড়িলেন, সেটি তাঁহার নিজের। যথা—

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপায় তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়।।"

প্রভু বলিতেছেন,—"আহা! আমি ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য অনুভূত করিতে পারি না, সেই ভাগ্য কিনা, আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের ধূলার সমান হইয়া তাঁহার পদসেবা করিব।" তখন তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বরূপ ও রামরায়ের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "রামরায়! স্বরূপ! জগতে কত জনে কত প্রার্থনা করে, কেহ ধন চায়, কেহ কবিত্ব চায়, কেহ সুন্দরী-ভার্য্যা চায়। আমি সরল মনে বলিতেছি, আমার এ সমুদয় বিষয়ে কিছু মাত্র লোভ নাই। তবে আমি চাই কি শুনিবে?" ইহা বলিয়া নিজ কৃত আর একটি শ্লোক পড়িলেন। যথা—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং করিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্‌ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।"

অর্থাৎ—"হে জগদীশ্বর! আমাকে তোমার অহৈতুকী ভক্তি দাও। কিন্তু রামরায়! ভক্তি তত দুর্লভ নয়, কিন্তু অহৈতুকী ভক্তি অতি দুর্লভ। জগতে কি উহা আছে? হে নাথ! সে ভাগ্য আমার কবে হবে? কবে তোমাতে আমার স্বার্থশূন্য ভক্তি হবে? কবে (এটিও তাঁহার নিজকৃত শ্লোক)—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।।"

"হে নাথ! কবে তোমার নাম শ্রবণ করিবামাত্র আমি বিগলিত হইব।"—ইহা বলিতে বলিতে প্রভু কান্দিয়া আকুল হইলেন; একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতেছেন,—"কি আশ্চর্য্য! নাথ, তোমাকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা বিফল, কারণ তুমি অন্তর্যামী। এই আমি ক্রন্দন করিতেছি সত্য, কিন্তু কেন? রামরায়। আমি যে ক্রন্দন করিতেছি, ইহা কি কৃষ্ণের নিমিত্ত, না আমার কোন স্বার্থ-সাধনের নিমিত্ত? কৃষ্ণের নিমিত্ত একটুও নয়, শুধু আমার নিজের নিমিত্ত। আমি ক্রন্দন করিতেছি কেন, না আমি ভক্তি হইতে বঞ্চিত। অতএব আমি আমার দুঃখের নিমিত্ত কান্দিতেছি, ইহাতে কৃষ্ণের নাম-গন্ধও নাই, সবই আমি, এই আমি আমি করিয়া আমার জীবন বিফলে গেল।"

ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর কৃষ্ণপ্রেম স্ফূর্তি হইল। তখন পূর্বে যে সমুদয় কথা বলিয়াছেন তাহা একেবারে ভুলিয়া এই নিজকৃত শ্লোক পাঠ করিলেন, যথা—

"যুগোয়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্‌।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে।।"

তখন অতি কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট "আমাকে দর্শন দাও, দর্শন দাও," বলিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। আবার হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। পূর্বে বিচার করিয়াছিলেন যে—তিনি যে রোদন করিয়াছিলেন, সে কৃষ্ণের নিমিত্ত নহে, আপনার নিমিত্ত। এখন সেই ভাব আবার মনে উদয় হইল। তখন আর একটি অপরূপ শ্লোক পড়িলেন। যথা—

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি যে হরৌ ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্‌।।
বংশী বিলাস্যানবলোকনং বিনা বিভর্ম্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্‌ বৃথা।।"

প্রভুর এ পর্যন্ত বরাবর অর্ধ বাহ্যদশা রহিয়াছে, ঠিক সহজ জ্ঞান হইতেছে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই, তবে সম্পূর্ণ বিহ্বল ভাবও নয় শ্লোক পড়িয়া বলিতেছেন—

"স্বরূপ! রামরায়। তোমরা মনে করিতে পারো যে, আমার কৃষ্ণপ্রেম আছে, কারণ তোমরা দেখিতেছ, আমি "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাতে কৃষ্ণপ্রেম আদপে নাই। কৃষ্ণপ্রেম যদি থাকিত তবে আমি পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়া মরিয়া যাই না কেন? যেহেতু আমি কৃষ্ণের বংশীবদন দেখিতেছি না, কৃষ্ণকে দেখিতেছি না, অথচ আমি মরিতেছি না,— ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে আমার কৃষ্ণপ্রেমের গন্ধমাত্র নাই। শ্রীভাগবত ইহার সাক্ষী দিতেছেন। যথা —

"কৈ অবরহিতং পেম্মংণহি হোই মানুষে লোএ।
জোই হোই কসস বিরহো না বিরহে হোশুম্মি নকো জিঅই।।"

"মনুষ্যের এরূপ প্রেম হয় না, যাহাতে প্রতিদানের ইচ্ছা না থাকে। একবারে বিশুদ্ধ অকৈতব প্রেম, যাহা একেবারে কিছুমাত্র প্রার্থনা করে না, তাহা হইতেই পারে না। আর যদি বড় ভাগ্য বলে কখন এরূপ হয়, তাহা হইলে তাঁহার আর কৃষ্ণবিরহ হইতে পারে না। কৃষ্ণ এমন অনুগত জনকে কখন ত্যাগ করেন না, আর যদিও কোন কারণে ত্যাগ করেন তবে সে ব্যক্তি তদ্দণ্ডে মরিয়া যায়। অতএব স্বরূপ। রামরায়। আমাতে কৃষ্ণপ্রেম নাই। যদি আমার প্রেম থাকিত, তবে কৃষ্ণ আমার নিকটেই থাকিতেন। আর যদি কোন কারণে আমার প্রেম সত্ত্বেও কৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করিতেন, তবে আমি তদ্দণ্ডে পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়া মরিতাম। কিন্তু কই আমি ত মরিতেছি না?

"তবে আমার চক্ষে জল দেখিতেছ বটে, উহা দেখিয়া তোমরা ভুলিও না। এ চক্ষের জল কৃষ্ণবিরহের নিমিত্ত নয়, কারণ তাহা হইলে মরিয়া যাইতাম। এ চক্ষের জল লোককে কেবল আপনার সৌভাগ্য দেখাইবার জন্য, যে আমি খুব ভাগ্যবান, আমাতে কৃষ্ণপ্রেম আছে।

ইহা বলিয়া অতি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে প্রভু বলিলেন—"এই আমি কৃষ্ণের সহিত সর্বদা কপটতা করিতেছি। অথচ কৃষ্ণ যদি আমাকে কৃপা না করেন, তবে তাঁহার প্রতি দোষারোপ করি।"

প্রভুর কথাগুলি দ্বারা বুঝা যায় যে, শ্রীভগবানের প্রীতি কি এবং তাঁহার ভজন জীবের পক্ষে কতদূর কঠিন ব্যাপার। অনেক কষ্টে চক্ষে দু ফোঁটা জল আহরণ করিল। আর অমনি মনে দম্ভের সৃষ্টি হইল যে আমি বড় ভক্ত হইয়াছি। তাহার ফল এই হইল যে, পূর্বের যে ভক্তিটুকু ছিল, তাহাও হারাইতে হইল। এ দিনকার লীলায় প্রভু ভক্তি ও প্রেমতত্ত্বের যেরূপ সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া বিচার করিলেন, তাহাতে মনে নির্ভরতার উদয় হয়।

জীবের উপায় কি? তুমি মনে বুঝিতেছ যে, তোমার শ্রীভগবানে একটু প্রেম হইয়াছে, কারণ তাঁহার কথা তোমার নিকট মিষ্টি লাগে। আর হৃদয়- মন্দিরে তাঁহার অদর্শনে তুমি ব্যথিত হইতেছ। 'তুমি ব্যথিত হইতেছ' বলিলাম, কিন্তু ব্যথিত হইতেছে তাহার প্রমাণ নাই, বরং তোমার ব্যথা যে সামান্য তাহার প্রমাণ আছে। তুমি কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেছ সত্য, এ তোমার প্রেমের ক্রন্দন নয়। কারণ শাস্ত্র বলেন কৃষ্ণবিরহ হইলে জীব মরিয়া যায়। কিন্তু তুমি বেশ আছ, মরিতেছ না ত? তবে কান্দিতেছ বটে। কিন্তু সে কি জন্য? কৃষ্ণপ্রেমে—না প্রতিষ্ঠার লোভে? অর্থাৎ লোকে তোমাকে বড় ভক্ত বলিবে সেই নিমিত্ত? কৃষ্ণপ্রেমের নিমিত্ত তুমি কান্দিতেছ না, কারণ তাহা হইলে তুমি বাঁচিতে না। কৃষ্ণপ্রেম-মুগ্ধ জীব তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে পারে না, অর্থাৎ—বিশুদ্ধ কৃষ্ণবিরহ হইলে, তিনি তদ্দণ্ডে উপস্থিত হয়েন। যখন কৃষ্ণ আইসেন না, তখন জানিও তোমার যে মনের দুঃখ উহা ঠিক কৃষ্ণপ্রেম হইতে নহে।

প্রভু যখন গম্ভীরা-লীলায় একেবারে দিব্যোন্মাদভাবে আক্রান্ত হইতেন, তাঁহার তখনকার ভাব বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। প্রভু তখন নানা ভাবে বিভাবিত হইতেন। মনে ভাবুন, একখানি নৌকা স্রোতের বেগে চলিয়াছে, বায়ু তাহাকে বিপরীত দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, আর নাবিক তাহাকে এপারে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। এই নৌকার যেরূপ অবস্থা, প্রভুর মনের ভাব সেইরূপ।

কৃষ্ণকে আদর করিয়া "আমার চাঁদ," "আমার নয়নানন্দ," "আমার হৃদয়ের রাজা," বলিতে বলিতে কৃষ্ণকে না দেখিতে পাইয়া প্রভুর একটু ক্রোধ হইয়াছে, তখন বলিতেছেন,—তুমি নিষ্ঠুর, তুমি না পুরুষ? পুরুষ না চিরদিন কঠিন জাতি? তুমি প্রেমের কি জানো না, কারণ

প্রেমের ব্যথা কখন ভোগ কর নাই। যে বহু নায়িকার বল্লভ তাহার আবার প্রেম কিরূপে সম্ভব? এরূপ নাগরের সহিত কি প্রেম করিতে আছে?"

ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর মনে উদয় হইল যে, তিনি কৃষ্ণকে নিন্দা করিতেছেন। তখন ভাবিতেছেন,---"কি করিলাম, এমন মধু হইতে যে মধু যে কৃষ্ণ তাঁহার নিন্দা করিলাম? তখন কাতর ভাবে বলিতেছেন,—"বন্ধু! তোমার নিন্দা করি নাই, তোমার মহিমাই বর্ণনা করিয়াছি। তোমা ব্যতীত ত্রিজগতে এরূপ আর কে আছেন, যিনি এত নায়িকার প্রেমপিপাসা নিবৃত্তি করিতে পারেন। আমি তাই বলিতেছিলাম, তোমার নিন্দা করি নাই।"

প্রভু পরে স্বরূপ ও রামরায়কে বলিতেছেন---"সখি! কৃষ্ণপ্রেমের সীমা নাই, ঠাই নাই— উহা অতলস্পর্শী। আমরা একজনের সহিত প্রেম করিয়া অস্থির হই, কিন্তু ইঁহার প্রেমের বস্তু অসংখ্য, সকলেরই প্রতি তাঁহার প্রেমভাব, সকলেই তাঁহার প্রাণ, সকলেরই সহিত তাঁহার মধুর ব্যবহার, সকলেই তাঁহার ব্যবহারে কৃতার্থ। এমন নাগবকে যে ভজনা না করে তাহাকে ধিক্! শত ধিক্।।

পরে আপনা আপনি বলিতেছেন, "প্রেম যেরূপ সুধাস্বরূপ, বিরহ সেইরূপ সতেজ কালকূট। কৃষ্ণের বিরহে আমার দিবানিশি যন্ত্রণা। সখি, তোমরা স্বপ্নেও ভাবিও না যে, কৃষ্ণের নিমিত্ত আমি যে এত দুঃখ পাই ইহাতে আমার মনে কিছু ক্ষোভ আছে।" ইহা বলিয়া একটি নিজকৃত শ্লোক পড়িলেন। যথা—"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করতু বা।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাগরঃ।।"

ইহার অর্থ এই—"শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আলিঙ্গন দান করিয়া কৃতার্থ করুন, কিংবা সেই আলিঙ্গনের পেষণে আমাকে প্রাণে বধ করুন, ইহা উভয়ই আমার পক্ষে সমান। যেহেতু তিনি আমার পর নহেন, তিনি আমার প্রাণনাথ।" প্রভু বলিতেছেন,—"তিনি আমাকে মারুন কি আশীর্বাদ করুন, উভয়ই আমার নিকট অমৃত। তিনি যে আমাকে তাঁহার বিরহ-জনিত ক্লেশ দিয়া থাকেন, তাহাও আমি পরম সৌভাগ্য মনে করি।"

আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, সরল ভাবে এরূপ কথা শ্রীভগবানকে কেহ বলিতে পারে না যে,—"হে বিভু! তোমার আশীর্বাদ ও দণ্ড আমার নিকট সমান।" তবে তিনিই পারেন যাঁহার শ্রীভগবানে নিঃস্বার্থ প্রীতি হইয়াছে। অর্থাৎ এরূপ কথা শ্রীমতী রাধা বলিতে পারেন বা শ্রীপ্রভু রাধাভাবে বলিয়া গিয়াছেন। আমরা পূর্বে তানসেনের গীতের উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন যে, "হে কৃষ্ণ আমি নিশিদিন তোমার বিরহে ব্যাকুল, কেমন, না জলের নিমিত্ত যেমন চাতক।" আমরা তখন বলিয়াছি যে তানসেনেরও এ সরল প্রার্থনা নয়, কেবল কবিতা। এই ক্ষুদ্র লীলা-লেখকও একদিন এরূপ ভণ্ডামি করিয়াছিল। আমার একটি গীতে আছে। যথা—"ও বাপ, জেনো আমার কাছে তোমার প্রহারও মিঠে লাগে।"

গীতে আমি ইহা বলিলাম, কিন্তু ইহা কি সত্য? ইহা সত্য নয়,—কবিতামাত্র। কারণ প্রহার তাঁহারি হউক বা আর কাহারও হউক আমার কাছে মিঠা লাগে না। আমার আর একটি গীতে আছে—

"যত অত্যাচার তোমার, অঙ্গের ভূষণ আমার, সব সুধা বরিষণ।
প্রেমঙ্কুরে শিশির সিঞ্চন।।

অর্থাৎ "হে ভগবান! তুমি যে আমার প্রতি অত্যাচার কর, ইহা আমার অঙ্গের ভূষণস্বরূপ। ইহা আমার অতি মিষ্ট লাগে, আর ইহাতে তোমার প্রতি আমার প্রেম অঙ্কুরিত হয়। এ নিবেদন কে করিতেছে? যদি আমি করিতাম তবে সম্পূর্ণ ভণ্ডামি হইত। কিন্তু এ নিবেদন যিনি করিতেছেন তিনি একজন গোপী। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এরূপ নিবেদন আর ভণ্ডামি হইল না।

প্রভু দুই প্রকারে উপদেশ দিতেন---এক কথা দ্বারা, আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের

ভঙ্গী, কি অন্যান্য বহুবিধ উপায় দ্বারা। এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। ভাবদ্বারা কিরূপে উপদেশ দিতেন তাহার উদাহরণ দিতেছি। তাঁহার উৎকণ্ঠা বর্ণনা করিব। মানের মধ্যে উৎকণ্ঠা-রস একবারে। পরিষ্কাররূপে টলটল করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, একথা ঠিক আছে। আর তাঁহার নিমিত্ত বাসক-সজ্জা করিয়া শ্রীমতী (অর্থাৎ গম্ভীরায় প্রভু) বসিয়া আছেন।

প্রভু তাঁহার উৎকণ্ঠা কত প্রকারে দেখাইতেছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। সে এত প্রকারে যে, আমরা তাহা কল্পনায় আনিতে পারি না, তবু কিছু বলিতেছি। প্রভুর মুখ একটু মলিন হইয়াছে, ক্রমে কষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি অল্প অল্প দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। পরে মৃদুস্বরে "উহু উহু" করিতেছেন, আবার এদিকে ওদিকে উঁকি মারিতেছেন।

আমার একটি আত্মীয় একটু অধিক পরিমাণে স্ত্রীর বশীভূত ছিলেন। তিনি আমাকে উৎকণ্ঠা-লীলা দেখাইয়াছেন, আর তাহা এখনও আমার হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। তাঁহার সুন্দরী স্ত্রী সংসারের গৃহিণী; রজনীতে সকলের আহারাদির পরে তিনি স্বামীর নিকট শয়ন করিতে আইসেন। স্বামী অগ্রে আহার করিয়াছেন, করিয়া শয্যায় শয়ন করিতে গিয়াছেন; কিন্তু শয়ন করিতে পারিলেন না, উঠিলেন; উঠিয়া স্ত্রীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একবার রন্ধন-ঘরের দ্বারে যাইতেছেন, যাইয়া সেখানে বসিতেছেন; আবার উঠিয়া শয়নগৃহে আসিতেছেন;—এইরূপে স্থির হইতে পারিতেছেন না। তিনি আমাকে বলিতেছেন (আমি তখন অতি বালক) "যাও তাঁকে ডাকিয়া আন গিয়া।" আমি সেই গরবিনী স্ত্রীর কাছে যাইয়া তাঁহার স্বামীর সন্দেশ বলিলাম। তিনি বলিলেন, "আমার কাজ সমাধা হয় নাই, আমি যাই কিরূপে? তাঁহার ত লজ্জা ভয় কি কাণ্ডজ্ঞান নাই। আমি বধূ, আমি কিরূপে নিলজ্জের ন্যায় ব্যবহার করি?" "ভাল, কার্য সমাধা হইলে আসিও"—ইহা বলিয়া আমি তাঁহার স্বামীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে বসিলাম। পরে সেই গরবিনীর কার্য সমাধা হইল, সকলে শয়ন করিতে গেলেন, তখন তিনি স্বামীর নিকট আসিলেই পারেন; কিন্তু তাহা না আসিয়া রন্ধন-ঘরের দাওয়ায় চুল কুলাইতে বসিলেন।

তখন আমি বুঝিলাম, তিনি যে হঠাৎ আসিবেন এ ইচ্ছা তাঁহার নয়। তাঁহার স্বামী যে তাঁহার নিমিত্ত "উৎকণ্ঠা রস" ভোগ করিতেছেন, ইহাতে তিনি বড় সুখী আছেন। সুতরাং স্বামীকে শান্তিদান করায় তাঁহার স্বার্থ নাই।

সেই উৎকণ্ঠা রসের খেলা দেখিয়াছিলাম। আর একটু বড় হইলে যখন প্রভুর গম্ভীরা-লীলা পাঠ করিলাম, তখনি আবার দেখিলাম। দেখিলাম, প্রভুর যে উৎকণ্ঠা তাহা উপরে বর্ণিত স্বামীর উৎকণ্ঠা হইতে অনেক বিভিন্ন ও অনেক প্রবল।

কোন একজন আসিতেছেন না, তাহাতে তোমার মনে উৎকণ্ঠার ভাব উদয় হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, তাহাতে এমন কিছু আছে যে জন্য তোমার লোভ হইয়াছে ও তখনি তাহা তোমার প্রয়োজন হইয়াছে, আর সেই নিমিত্ত তুমি তাহাকে চাহিতেছ। কিন্তু তুমি এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? তিনি তখনি আসিতেন, না হয় কিছু পরে আসিবেন। তখনি তাঁহার না আসাতে এরূপ অধৈর্য কেন? এ অধৈর্যের কারণ দেখাইতেছি। তোমার পিপাসা কি ক্ষুধা হয়েছে, তুমি জল কি আহারীয় দ্রব্য চাও, কাজেই তোমার বিলম্ব সহিতেছে না,—তোমার জলের কি আহারীয় বস্তুর তখনি প্রয়োজন। আবার দেখ, তোমার প্রিয়জনকে সর্পে দংশন করিয়াছে, রোজা আনিতে লোক গিয়াছে, কাজেই তুমি উৎকণ্ঠায় প্রপীড়িত হইয়াছ। তুমি দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে রোজাকে প্রতীক্ষা করিতেছ, সে কতদূর আসিয়াছে তাহা উঁকি মারিয়া দেখিতেছ। আমার সম্পর্কীয় যাঁহার কথা উপরে বলিলাম তিনি কেন উৎকণ্ঠায় অভিভূত? তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সম্মুখে,—কেবল একটু দূরে। তাঁহাকে দেখিতেছেন, তাঁহার কথা শুনিতেছেন, ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারেন, তবে তাঁহার উৎকণ্ঠা কেন? অবশ্য কোন ক্ষুদ্র কারণ ছিল,

আর সেই নিমিত্ত তাঁহার শরীরে উৎকণ্ঠার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে—তবে, সেও সামান্য। তিনি একবার শয়ন করিতেছেন, কি একবার এখানে ওখানে বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু প্রভু কি করিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর। প্রভু উহুঁ উহুঁ করিতেছেন, প্রথমে মৃদুস্বরে, পরে অতি স্পষ্ট করিয়া "গেলাম-মলাম" বলিতেছেন। আবার কখন "প্রাণ যায়, প্রাণ যায়," বলিতেছেন। একবার বলিতেছেন, "আচ্ছা আমি একটু শয়ন করি," কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে আবার উঠিয়া বসিতেছেন। উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেন? না, বন্ধুর তল্লাসে যাইবেন এই নিমিত্ত। কিন্তু স্বরূপ তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন, কাজেই তিনি আবার বসিলেন; বসিয়া বলিতেছেন,—"যাও না একটু এগুইয়া দেখ।" তারপরেই বলিলেন,—"কি শব্দ শুনিলাম যে? বোধ হয় তিনি আসিয়াছেন।" কখন বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় গড়াগড়ি দিতেছেন, আর পরিশেষে সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইতেছেন।

এই গেল প্রভুর উৎকণ্ঠা, আর স্বরূপ রামরায় উহা দেখিতেছেন। কৃষ্ণের আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে তাহাতে প্রভু কিরূপ ছট্ ফট্ করিতেছেন, স্বরূপ ইহা দেখিলেন। আর তাই এখন শ্রীমতী রাধার উৎকণ্ঠা বলিয়া কৃষ্ণলীলায় অভিনীত হইয়া থাকে। যথা পদ—
"ও ললিতে, সে কই গো? বুঝি এলোনা, এলোনা, নিশি পোহাইল!" রাধা একবার উঠে, একবার বসে, কেন্দে বলে—"উদয় দিননাথ্ অনুদয় দীননাথ।" কি সনাতন গীতায়—"সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরং।"

কৃষ্ণের নিমিত্ত প্রকৃত যে উৎকণ্ঠা, সে আমার আত্মীয়ের যেরূপ হয়েছিল ঠিক সেরূপ নহে,—সে অন্য জাতীয় রস। শ্রীমতী বলিতেছেন,—"বন্ধুর সর্বাঙ্গ লাগি কান্দে সর্ব অঙ্গ মোর।" শ্রীমতী পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় ও পঞ্চ অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানকে আস্বাদন করেন। কথা কি, জীবে ও শ্রীভগবানে যেরূপ গাঢ় সম্বন্ধ, এরূপ জীবে জীবে সম্ভবে না,—এ সম্বন্ধে পুত্রবৎসল জননী ও মাতৃভক্ত পুত্রে নাই, এবং পতিব্রতা স্ত্রী ও স্ত্রীপ্রাণ স্বামীতেও নাই। প্রভু গম্ভীরা-লীলা দ্বারা তাই জীবকে দেখাইতেছেন।

হে জীব! এই তত্ত্বটি বিচার ও ধ্যান কর। কথা এই যে, তোমাতে আর শ্রীভগবানে যেরূপ গাঢ় ঘনিষ্ঠতা, এরূপ আর কাহারও সঙ্গে তোমার নাই। এ কথা হঠাৎ শুনিলে কবিতার বাণী বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে, প্রভুর গম্ভীরা-লীলা বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে প্রধানতঃ এই তত্ত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্তই প্রভু এই লীলা করেন।

স্বরূপ প্রভুর সম্বন্ধে একটি স্তুতি-শ্লোক বলেন, সেটি এই—

"হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া।
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মদয়া।।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া।
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।।"

"হে দয়ানিধি শ্রীচৈতন্য, তোমার যে দয়ায় অনায়াসে সকলের দুঃখ দূরীভূত হইয়া চিত্ত নির্মল হয় এবং প্রেমানন্দের বিকাশ হয়, তোমার যে দয়ার প্রভাবে শাস্ত্রাদির বিবাদ উপশম প্রাপ্ত হয়, যে দয়া চিত্তে রসসঞ্চার করিয়া দিয়া প্রগাঢ় মত্ততা উৎপাদন করে, যাহা হইতে নিরন্তর ভক্তি সুখ ও সর্বত্র সমদর্শন সংঘটিত হয়, এবং যে দয়া সকল মাধুর্যের সার, তুমি করুণা করিয়া সেই দয়া আমাতে প্রকাশিত কর।"

শ্লোকের প্রকৃত অর্থ এই যে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া শাস্ত্রে বিবাদ মীমাংসা করিয়াছেন। ইহা স্তুতিবাক্য নয়,—প্রকৃত কথা।

জগতে বিবাদ দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী লইয়া, বিবাদ নাস্তিক ও আস্তিক লইয়া। কেহ বলেন ভগবান আছেন, কেহ বলেন নাই। তিনি যে আছেন তাহার কি প্রমাণ? তাঁহার কোন প্রত্যক্ষ

প্রমাণ নাই। মনে কেবল আশা মাত্র যে তিনি আছেন। আবার তিনি যে নাই তাহারও কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। মনুষ্যের মধ্যে এই এক ঘোর বিবাদ চিরদিন চলিতেছিল। আর এক বিবাদের কারণ ভগবানের প্রকৃতি লইয়া। কেহ তাঁহার হাতে বংশী দেন, কেহ দেন অসি। আরও এক বিবাদ শ্রীভগবানে ও জীবে সম্বন্ধে লইয়া। কেহ বলেন শ্রীভগবান জীব হইতে পৃথক, আবার কেহ বলেন সোঽহং—আমিই সেই। এই সকল তত্ত্ব লইয়া চিরদিন এই ভারতবর্ষে বিবাদ চলিতেছে। ভারতবর্ষ কোথা, না পৃথিবীর সেই স্থানে, সেখানে কেবল আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের চর্চা হইয়া থাকে।

কেহ বলেন ভগবান নাই, কেহ বলেন তিনি আছেন। কেহ বলেন তিনি খড়্গধারী, কেহ বলেন তিনি বংশীধারী। কেহ বলেন তিনি নির্গুণ, তাঁহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, আমরা আমাদের কর্ম্মের দাস। কেহ বলেন ভগবান কর্তা, আমরা তাঁহার দাস। আবার কেহ বলেন ভগবানও যে আমিও সে।

প্রভু অবতীর্ণ হইয়া চিরদিনের এই বিবাদ মীমাংসা করিলেন;—কিরূপে? না, আপনি আসিয়া দেখাইলেন—আমি ভগবান, আমি আছি। আর আপনি আসিয়া মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া দেখাইলেন,—তাঁহার প্রকৃতি ও তাঁহার ভজন কি? শ্রীভগবানের অস্তিত্বের ও প্রকৃতির এরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পূর্বে ছিল না। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ গৌর-অবতারে জীব প্রথমে পাইল।

শঙ্করের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গদাসদিগের এই বিবাদ। প্রবোধানন্দের সঙ্গেও প্রভুর এই বিবাদ। প্রভু এই বিবাদ মীমাংসা করিলেন। দুঃখের বিষয়, এত বড় একটি ব্যাপার তাঁহার ভক্ত কি অপর কেহ উল্লেখ মাত্র করেন নাই, এমন কি তাঁহারা ইহা লক্ষ্যও করেন নাই।

গম্ভীরা-লীলার উদ্দেশ্য কি? গম্ভীরা-লীলার উদ্দেশ্য জীবের নিকট শ্রীভগবানের পরিচয় করিয়া দেওয়া। কিন্তু এ কথা এ পর্যন্ত কেহ লক্ষ্য করেন নাই, আর যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন ত প্রকাশ করেন নাই।

প্রভু অদ্বৈতবাদীতে ও দ্বৈতবাদীতে কিরূপে বিবাদ মীমাংসা করিলেন তাহা বলিতেছি। তিনি বলিলেন,—জীব ও ভগবান যে পৃথক এ কথা ঠিক, আর সোঽহং এ কথাও ঠিক। অদ্বৈতবাদীতে ও দ্বৈতবাদীতে প্রকৃতপক্ষে কোন বিবাদ নাই,—কেন তাহা বলিতেছি।

আমরা বার বার বলিয়াছি যে, প্রভু যেরূপ কৃষ্ণবিরহ দেখাইয়াছেন, এরূপ বিরহ কোন জননী তাঁহার পুত্রের নিমিত্ত, কি কোন স্ত্রী তাঁহার স্বামীর নিমিত্ত দেখাইতে পারেন নাই। প্রভু চব্বিশ বৎসর পর্যন্ত কৃষ্ণের বিরহে অন্ততঃ প্রত্যহ একবার মূর্চ্ছা যাইতেন, এবং গম্ভীরায় একাদিক্রমে বার বৎসর জাগিয়া রজনী পোহাইয়াছেন। কোথায় কোন বিরহিনী নারী তাঁহার প্রিয়তমের নিমিত্ত এরূপ কঠোর করিয়াছেন, না করিতে পারেন? কোথা কোন রমণী তাঁহার প্রিয়তমের নিমিত্ত দণ্ডে দণ্ডে মূর্চ্ছা গিয়াছেন? প্রভু আপনি আচরিয়া জীবকে ধর্ম শিক্ষা দিতেছেন। তিনি শিক্ষা দিলেন যে, কৃষ্ণপ্রেম, দাম্পত্য-প্রেম কি বাৎসল্য-প্রেম হইতে অনন্ত গুণে গাঢ়।

এখন বিবেচনা করুন লোকে স্ত্রীকে বলে অর্ধাঙ্গী। প্রকৃত পক্ষে যেখানে দাম্পত্য-প্রেম বিশুদ্ধ, সেখানে স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গী ও স্বামী স্ত্রীর অর্ধাঙ্গ সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম, দাম্পত্য-প্রেম হইতে কত গাঢ় তাহা প্রভুর কৃষ্ণবিরহ দেখিলে কতক বুঝা যায়।

তাহা যদি হইল, তবে জীব ভগবানের প্রায় পূর্ণাঙ্গ, অতএব 'সোঽহং' তত্ত্ব ঠিক। অথচ জীব ও ভগবান যে পৃথক এ কথাও ঠিক। এই তত্ত্ব শিখাইবার নিমিত্ত, এই বিবাদ মীমাংসা করিবার নিমিত্ত, প্রভুর অবতার; আর এই তত্ত্ব প্রস্ফুটিত করিবার নিমিত্ত প্রভুর গম্ভীরা-লীলা। গম্ভীরা-লীলা সম্বন্ধে আর অধিক না বলিয়া ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ভগবান তোমার যত ঘনিষ্ঠ এত আর কেহই নয়; তিনি তোমাকে লইয়া আর তুমি তাঁহাকে লইয়া, তাঁহার জগৎ তুমি ও তোমার জগৎ তিনি,—ইহাই প্রকাশ করা এ লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহা যদি তুমি ধারণা করিতে

পার, তাহা হইলে তুমি শ্রীভগবানের সম্পত্তি লাভ করিলে, তোমার আর কোন অভাব থাকিল না। তোমার স্ত্রী তোমার অর্ধাঙ্গ, কিন্তু শ্রীভগবান তোমার পূর্ণাঙ্গ। তুমি যখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কি গৌর গৌর বলিয়া নাম জপ কর, তখন মনে ভাবিতে পার যে, তুমি "আমি আমি" অর্থাৎ নিজের নাম জপিতেছ।

তবে তুমি আর ভগবান এক, অথচ তিনি সম্পূর্ণ পৃথক,—ইহা কিরূপে হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার। আমি তাহার উত্তর দিতে পারি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রভু দেখাইয়া গিয়াছেন যে স্ত্রী ও স্বামীতে যেরূপ ঘনিষ্ঠতা, ইহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে গাঢ় ঘনিষ্ঠতা জীবে ও ভগবানে। তাহার অর্থ এই যে,-- তিনি আর তুমি এক। তিনি ও আমি পৃথক অথচ এক,—ইহা কিরূপে হয়? তুমি আর তোমার স্ত্রী পৃথক, অথচ তোমরা পরস্পরে অর্ধাঙ্গ,—ইহা কিরূপে হয়? যদি স্ত্রী পৃথক হইয়াও অর্ধাঙ্গ হইতে পারেন, তবে স্ত্রী হইতে কোন ঘনিষ্ঠতর বস্তু প্রায় পূর্ণাঙ্গ হইবার বিচিত্র কি? কিরূপে কি হয় জানি না, তবে প্রভু যে ২৪ বৎসর প্রত্যহ কৃষ্ণবিরহে মূর্চ্ছিত হইতেন ইহা জানি।

যাঁহারা জোর করিয়া মুখে বলেন সোঽহং, অর্থাৎ যাঁহাদের ভগবত-প্রেমের লেশ মাত্র নাই, তাঁহাদের জানা উচিত যে, ভগবান জ্ঞানময় ও আনন্দময়, কিন্তু তুমি ভ্রমময় ও দুঃখময়। তবে তুমি যে সোঽহং বল, তোমার লজ্জা করে না? তুমি এই মাত্র জানিলে যে ভক্তগণ যে বলিয়া থাকেন—"তিনি আমার, আমি তাঁহার" তাহাও ঠিক নয়, ঠিক হইতেছে "আমি তিনি, তিনি আমি।" এই আমার অধিকার, এই আমার জীবনের শেষ সীমা; তাঁহার অনন্ত জীবন, আমারও অনন্ত জীবন; তিনি আর আমি চিরদিন ঘনিষ্ঠতা করিব, ক্রমে এ ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া যাইবে। এমন কি, শেষে প্রায় এক হইয়া যাইব, তবুও পৃথক থাকিব, আর ইহাকে বলে 'অধিরূঢ় ভাব'।

চতুর্দশ অধ্যায়

গম্ভীরা লীলায় শ্রীমতীর প্রকাশ

যিনি শ্রীকৃষ্ণবিরহের আস্বাদ পাইয়াছেন, তিনি সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান। এইজন্য প্রভু গম্ভীরায় দ্বাদশ বৎসর প্রধানতঃ এই বিরহরস প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন। এই সমুদয় অতি সূক্ষ্ম রস, ইহা কেবল ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করা অসম্ভব। প্রভু স্বয়ং নানা উপায় অবলম্বন করিয়া ইহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এমন কি, এই রস সমুদয় বুঝাইতে ও প্রস্ফুটিত করিতে স্বয়ং শ্রীমতীর আসিতে হইয়াছিল। তিনি প্রভুকে আশ্রয় করিয়া স্বরূপ রামরায়কে এই নিগূঢ় অনর্পিত রস সমুদয় বুঝাইয়াছিলেন।

শ্রীমতী স্বয়ং না আসিলে কাহার সাধ্য এ রস প্রস্ফুটিত করে। তিনি তাঁহার কৃষ্ণের সহিত যে খেলা খেলিয়াছেন, কি খেলিয়া থাকেন, তাহা দেখাইতে আসিয়াছিলেন। যখন শ্রীরাধা প্রভুতে প্রকাশ পাইলেন, তখন প্রভুর স্বাভাবিক কমনীয় দেহ লক্ষ গুণ কমনীয় হইল,—মনে হইল যেন তিনি একটি ভুবনমোহিনী স্ত্রীলোক। যখন কথা কহিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার স্বর হইল স্ত্রীলোকের ন্যায়। তিনি বলিতেছেন, "সখি! আমার ভাগ্যের কি সীমা আছে? দেখ, কৃষ্ণকে ভাল না বাসে জগতে এমন কেহ নাই। আমি তাঁহাকে যেমন ভালবাসি, এই ব্রজে কে না তাঁহাকে সেইরূপে ভালবাসে? আবার ইহাও কে না জানে যে, এই ব্রজে আমার ন্যায় রূপসী রমণী কত শত আছে? কিন্তু তিনি আমা ছাড়া আর কাহাকেও জানেন না। তাঁহার ভালবাসার হৃদয়, তিনি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং ব্রজগোপীরা সকলে তাঁহাকে যেমন ভালবাসে, তিনিও তাহাদিগকে সেইরূপ ভালবাসেন। কিন্তু তবু আমার প্রতি তাঁহার যে টান দেখা যায়, এ প্রকার টান আর কাহাতেও নাই। এখানে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে অনুকূল-নাগরের পদ

দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,"আমার এ ভাগ্য কেন? আমি কি ব্রত করিয়াছিলাম?" তখন তিনি দুই হাত জুড়িয়া উর্ধ্বে চাহিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—"নাথ! তুমি বড় করুণ, তোমার গুণ আমি কিরূপে শোধিব? আমি শ্রীমতী দুর্গার নিকট কামনা করি যে, তুমি চিরদিন সুখে থাক, আর আমার যত মঙ্গল সব তুমি লও।" প্রভু রাধাভাবে এইরূপ বলিতেছেন। এতদূর কষ্টে সৃষ্টে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আঁখি দিয়া অবিরত ধারা পড়িতেছে, কথাক্রমে ঘন হইয়া আসিতেছে। তখন স্বরূপের গলা ধরিলেন, ধরিয়া অঝোরে ঝুরিতে লাগিলেন,—কণ্ঠরোধ হওয়ায় মুখে আর কথা সরিতেছে না।

এইরূপ কিছুকাল থাকিয়া হঠাৎ প্রভু চমকিয়া উঠিলেন। মনে হইল, বিহুল ছিলেন, এখন সম্পূর্ণ বাহ্য পাইলেন। তাই বলিতেছেন, "সখি! ঐ কৃষ্ণ আসিতেছেন, শুনিতেছ না? আমি যেন নূপুরের রুনুঝুনু শব্দ শুনিতেছি। দেখছ না সমস্ত আকাশ পদ্মগন্ধে ভরিয়া গিয়াছে" ইহা বলিয়া তিনি উঁকিঝুকি মারিতে লাগিলেন। মনের ভাব এই যে, কৃষ্ণ কতদূর আসিয়াছেন তাহা দেখিতেছেন। বদন চিন্তাকুল ছিল, তদ্দণ্ডে প্রফুল্ল হইল, আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া সম্মুখে নিমিষহারা নয়নে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—"এসেছো বন্ধু এসেছ, আমি তোমারই কথা বলিতেছিলাম। আর কাহার কথাই বা বলিব? আর কি কথাই বা আমি জানি?" ইহাই বলিতে বলিতে প্রভু উঠিতে গেলেন। মনোগত ভাব, অগ্রবর্তী হইয়া কৃষ্ণকে আলিঙ্গন বা আহ্বান করিবেন। কিন্তু উহা বুঝিতে পারিয়া প্রভুকে উঠিতে দিলেন না; বলিতেছেন, "তুমি উঠিতেছ কেন? তোমার বন্ধুকে তোমার কাছে আসিতে বল।" প্রভু উঠিতে না পারিয়া তাই স্বীকার করিয়া বলিতেছেন— "এসো বন্ধু এসো, আমি আঁচল পাতিয়া দিতেছি। তুমি বসো, আমার আধ অঞ্চলে বসো।"

ইহা বলিতে বলিতে আঁচল পাতিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিতেছেন, "তুমি আমার আঁচলে বসো, আমি নয়নভরে তোমায় দেখি। তোমার মুখখানি দেখিতে আমার কি সুখ হয় তাহা আর কি বলিব, আমার প্রাণ তার সাক্ষী।" সেই প্রলাপ হইতে এই বিখ্যাত পদ সৃষ্ট হইয়াছে, যাহা বৈষ্ণব মাত্রেই কীর্তনে অপরূপ সুরে গাহিয়া থাকেন—

"এসো বন্ধু এসো এসো, বসো আধ অঞ্চলে,
(আমি) দুটি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
দেখিতে তোমার মুখ, উপজয়ে কত সুখ,
সেইতো পরাণ আমার সাক্ষী।।"

এই যে কীর্তন, এই যে সহস্র সহস্র মহাজনের পদ সৃষ্টি হইল, ইহার প্রায় সকলেরই ভাব প্রভু আপনি রাধা হইয়া প্রকাশ করেন। প্রভুর ভাব মহাজনগণ কবিতার সুর তালের সাহায্যে প্রকাশ করিলেন। প্রথম দেখুন, এই উপরের লীলায় কৃষ্ণ হইতেছেন অনুকূল-নাগর। শ্রীমতী রাধা স্বয়ং আসিয়াছেন, তিনি অনুকূল-নায়ককে কিরূপ ভজনা করিলেন, তাহা স্বরূপ প্রভৃতি দেখিলেন। আবার গোপী-অনুগা ভজন কি, তাহাও ভক্তগণ এই লীলা দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। শ্রীমতী রাধা ও শ্রীকৃষ্ণে খেলা হইতেছে, স্বরূপ ও রামরায় কিছু করিতেছেন না, কেবল চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই দেখার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে ভজন হইতেছে। শ্রীমতী স্বয়ং যতখানি রস আস্বাদন করিতেছেন, তাঁহারা ততখানি না হউক, কিয়ৎ পরিমাণেও সেই রসই আস্বাদন করিতেছেন।

স্বরূপ ও রামরায় এই লীলা চক্ষে দেখিলেন। হে ভক্ত! তুমি ইহা চক্ষে দেখিলে না সত্য, কিন্তু তুমি এখন ধ্যান-চক্ষে এই লীলা অনায়াসে দেখিতে পার। উপরে যাহা যাহা বর্ণনা করিলাম, ইহা সমুদয় হৃদয়ে দেখিতে চেষ্টা কর, তুমিও দেখিতে পাইবে।

দ্বাদশ বৎসর, প্রধানতঃ কৃষ্ণ-বিরহ লইয়া, প্রভু গম্ভীরা-লীলা করেন। এ কৃষ্ণ-বিরহ কিরূপ? অতি প্রিয়জন দেহত্যাগ করিলে যে দুঃখ হয়, তাহাকে শোক বলে। তিনি অদর্শন হইলে প্রিয়জন

কিছু দিনের জন্য দুঃখ ভোগ করেন তাহাকে বিরহ বলে। মনে ভাবুন, পতি দূরে আছেন, তাহার প্রেমে অভিভূতা পত্নী, গৃহে তাঁহার নিমিত্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন,—এই যন্ত্রণাকে বলে বিরহ। প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ, এইরূপ রমণীর পতি-বিরহের ন্যায় নহে। পতি দূরে থাকায় তাহার অদর্শনজনিত দুঃখ ছাড়া রমণীর আরো কিছু আছে। মনে ভাবুন, পতি কাছে না থাকায় পত্নী সাংসারিক অনেক দুঃখ (যেমন শাশুড়ির যন্ত্রণা জনিত বা অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়ের নিমিত্ত দুঃখ) ভোগ করিতে পারেন। সুতরাং পতিবিরহে রমণীর দুঃখ, আর কৃষ্ণবিরহে প্রভুর দুঃখ অনেক বিভিন্ন। প্রভু যে কৃষ্ণকে না দেখিয়া প্রাণে মরিতেছেন, সে কেবল কৃষ্ণ-প্রেমের নিমিত্ত; কিন্তু পত্নী পতিবিরহে যে দুঃখ পান, সে শুদ্ধ পতির নিমিত্ত নয়। কাজেই পতিবিরহে পত্নীর যে দুঃখ, তাহা প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-জনিত দুঃখের সহিত তুলনাই হয় না।

প্রভু কৃষ্ণের নিমিত্ত যে বিরহ দেখাইয়াছেন, ইহা জগতে কেহ কাহারও নিমিত্ত কখন দেখাইতে পারেন নাই। এই পদটি দেখুন—

বিরহ ভাবে মোর গৌরাঙ্গসুন্দর ভূমে পড়ি মুরছয়।
পুন পুন মুরছি অতি ক্ষীণ শ্বাস। দেখিয়া লোকের মনে হয় কত ত্রাস।।
উচ্চ করি ভকত বলে হরিবোল। শুনিয়া চেতনা পাই আঁখি ঝরু লোর।।

আপনারা বিরহে এরূপ কাতর হইতে কাহাকেও কি দেখিয়াছেন? কাহারও কথা কি শুনিয়াছেন? কোন কবিতায় বা নাটকে কি পড়িয়াছেন? বিরহে মূর্চ্ছা যায় এরূপ কখন কি শুনিয়াছেন বা দেখিয়াছেন? শোকে মূর্চ্ছা যায় সত্য, কিন্তু সে প্রথম প্রথম, পরে উহা সরিয়া যায়। আর শোকে মূর্চ্ছা যাওয়ার অনেক কারণ থাকিতে পারে, যাহা বিরহে নাই। কিন্তু পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত প্রভু প্রত্যহ এইরূপ মূর্চ্ছা যাইতেন।

প্রভু গম্ভীরায় বসিয়া আছেন, সম্মুখে রামরায় ও স্বরূপ। যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী, তিনি ক্রমে শ্রীমতী রাধা হইলেন,—কিরূপে তাহা পরিশিষ্টে বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছি। অর্থাৎ গৌরাঙ্গের দেহে শ্রীমতী প্রবেশ করিলেন। তাহাতে কি হইল, না—স্বরূপ ও রামরায়ের সম্মুখে শ্রীমতী রাধা বসিলেন। সে কেমন, না—একদিন যেমন শ্রীবাসের বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণ সকলের সম্মুখে ঐ গৌরাঙ্গ-দেহ আশ্রয় করিয়া প্রকাশ হয়েন। তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথা কহিয়াছিলেন, এখনও স্বরূপ ও রামরায় সেইরূপ শ্রীমতীর সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেন আসিয়াছিলেন, না—তিনি কিরূপ বস্তু, তিনি চান কি, ও তাহাকে কিরূপে পাওয়া যায়,—তাহাই জীবকে জানাইতে।

তুমিও স্বরূপ ও রামরায়ের ন্যায় এই রস—ততখানি না হউক—কতক আস্বাদন করিতে পারিবে। তবে অবশ্য ধ্যানে ইহা দর্শন করিতে অভ্যাস হওয়া প্রয়োজন, তাহাতে ক্রমে ধ্যান স্ফূর্তি হইবে। তখন, স্বরূপ ও রামরায় যতখানি আস্বাদ করিলেন,—তুমিও প্রায় ততখানি আস্বাদ করিতে পারিবে। ইহাকে বলে—গোপী-অনুগা ভজন।

এখন গম্ভীরা-লীলায় "প্রতিকূল" নায়ক সম্বন্ধে কিছু বলিব। প্রভু, শ্রীমতী রাধা হইয়া গম্ভীরায় বসিয়াছেন; আর ভাবিতেছেন যে, তিনি চঞ্চল ও নিঠুর কৃষ্ণের সহিত প্রেম করিয়া বড়ই অকাজ করিয়াছেন। মনে এইরূপ ভাবিতেছেন, আর তাহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত জগন্নাথবল্লভ নাটকের এই শ্লোকটি বলিলেন—

"প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা।
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্বলাঃ।।"

ইহার অর্থ এই—রাধিকা সখীকে বলিতেছেন,—"সখি। এই হরি, প্রেমভঙ্গজনিত পীড়া যে কত গুরুতর তাহা জানেন না। প্রেমও স্থানাস্থান জানে না, মদনও জানে না যে আমরা দুর্বল ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই,—শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রেমের ক্লেশ বলিতেছেন, তাই কৃষ্ণকে নিন্দা করিতেছেন।

বলিতেছেন, "হে নাথ! প্রেম-ভঙ্গ যে কি হৃদয়বিদারক দুঃখ তাহা তুমি জান না। আমরা তোমাকে ভাল বাসিয়া মরি, তুমি ফিরেও চাও না।" এই গেল প্রতিকূল নাগরের মধুর ভজন।*

স্বরূপ ও রামরায়কে সখী ভাবিয়া প্রভু বলিতেছেন,—সখি! কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করিয়া কি অকাজ করিয়াছি। তিনি ত প্রেমভঙ্গের যে বেদনা তাহা জানেন না, তাঁহার কি? সখি! আমাকে দুষিতে পার যে, এমন প্রেম তুমি কর কেন? ভাই, প্রেম কি কথা শুনে? স্থানাস্থান মানে? প্রেম যদি সে বিচার করিত তবে কৃষ্ণকে ধাবিত কেন হইবে? আমি যে এই দিবানিশি পুড়িতেছি তাহা কি তিনি জানেন? আমি পুড়িতেছি তাহাতে তাঁহার কি? সখি, তুমি আমাকে বারবার বল যে ধৈর্য ধর, কিন্তু জাতিতে অবলা, স্বভাবে অখলা, হায়-বিধি! এমন জীবকে কি প্রেম দিয়া দগ্ধ করিতে হয়?"

পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন, প্রভু যে অভিনয় করিয়াছিলেন তাহা নয়। প্রভু ঠিক রাধা হইয়াছিলেন, আর তাঁহার প্রকৃত মনের ভাব উঘাড়িয়া বলিয়াছিলেন। এই পদটি কীর্তনীয়া মাত্রেই গাইয়া থাকেন, যথা—আঁধল প্রেম পহিলা না জানি হাম। ইত্যাদি।

প্রভু বলিতেছেন,—"সখি, প্রেম যে অন্ধ তাকি আগে আমি জানি? আমি দারুণ প্রেম করিয়াছি, ইহার আর ঔষধ নাই। সখি! যৌবন দুই দিনের নিমিত্ত। আমার যৌবন আমি যাচিয়া কৃষ্ণের কাছে ভিখারি হইলাম। কিন্তু তাহার যে নাগরালি তাহা বাহিরের, অন্তরের নয়। সখি! কি করি, কি করি। এরূপে দিবা নিশি কত সহিব?"

প্রভু একটু চুপ করিয়া কর্ণামৃতের এই শ্লোকটি পড়িলেন—

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রুমঃ কৃতং কৃতমাশয়া কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ!
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বতলম্বতে।।

বলিতেছেন, "সখি! আমার অন্যায়, আমি তোমাদের কাছে প্রবোধ ভিক্ষা করিতেছি। যেহেতু তোমরাও ত আমার মত ব্যথিত? তোমাদের কাছে এসব কথা বলিয়া তোমাদের হৃদয়ের ব্যথা আরো বাড়াইয়া দিতেছি। তোমরা আমাকে প্রবোধ দিতেছ, কিন্তু তোমাদের প্রবোধ কে দিবে? আবার সখি! না বলিয়াই বা কি করি? তোমরা ছাড়া আর কাহাকে বলি, আমার আর কে আছে?"

প্রভু আবার একটু চুপ করিলেন, করিয়া বলিতেছেন,—"সখি, এক কাজ কর। আমরা কৃষ্ণের জন্যে যতদূর করিতে হয় করিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না। এসো আমরা এখন কৃষ্ণ-কথা ছাড়িয়া অন্য কথা বলি। এসো আমরা সকলে প্রাণপণ করিয়া কৃষ্ণকে ভুলিয়া যাই।" ইহা বলিয়া নয়ন মুদিলেন, উদ্দেশ্য কৃষ্ণকে তাড়াইয়া হৃদয়ে অন্য কথা, ভাব ও ছবি আনিবেন। একটু নয়ন মুদিয়া থাকিয়া বলিতেছেন,—"সখি। এ কি হইল? হইল না। হইল না। আমি কৃষ্ণকে ছাড়িতে পারিলাম না। শুন, সে বড় আশ্চর্য কথা। আমি কৃষ্ণকে ছাড়িব বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প করিলাম, প্রাণপণ করিয়া নয়ন মুদিয়া বসিলাম,—সঙ্কল্প এই যে, কৃষ্ণকে আর হৃদয়ে

*এক গোস্বামীর এক ঠাকুর ছিলেন, তাঁহাকে তিনি যত্নপূর্বক সেবা করিতেন। তাঁহার শিশুপুত্র মরিতেছে, দেখিয়া তাঁহার সেই ঠাকুরকে আঙ্গিনায় ফেলিয়া হস্তে দা লইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই তোমার কৃতজ্ঞতা?" আমি তোমার ভজন করি, আর তুমি আমার পুত্র নিতেছ? এই দা দিয়া তোমায় খণ্ড খণ্ড করিব।" এখানেও প্রতিকূল নায়ক লইয়া কাণ্ড। কিন্তু গোস্বামী ঠাকুর তাহার কার্যে দেখাইতেছেন যে, তিনি ঠাকুরকে ভজনা করিতেন না, ভজন করিতেন আপনাকে, অর্থাৎ তাঁহার কৃষ্ণ মানে আপনি সুখে থাকিবেন। কিন্তু প্রভুর প্রতিকূল নাগর-ভজন অতি মধুর—উচ্চ হইতে উচ্চতম। ইহা আর এক প্রকার—ইহার ভিত্তি শুদ্ধ প্রেম।

আসিতে দিব না। ওমা! দেখি কি, যাহাকে ছাড়িব বলিতেছি, তিনি আমার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছেন। শুধু তাহাও নয়, সেই ভুবন-মোহনিয়া আমার পানে চাহিয়া আমাকে বিনয় করিতেছেন, ইঙ্গিত অনুনয় করিতেছেন,—যেন আমি তাঁহাকে না ছাড়ি।"

আমরা প্রাণপণ করিয়াও এই অবাধ্য চিত্ত একবারও কৃষ্ণের দিকে লইতে পারি না। কিন্তু প্রভুর মহাবিপদ এই যে, তিনি কৃষ্ণকে ছাড়িতে ভারি উদ্যোগী, কিন্তু কৃষ্ণ কোন ক্রমে যাইতে চাহেন না।

প্রভুর ভাব এখন একেবারে পরিবর্তন হইয়া গেল। তিনি সখীদের ছাড়িলেন, আর একেবারে অধীর হইয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—"বন্ধু। তুমি আমার দিকে অমন করে কাতরভাবে চাহিও না, আমি সহ্য করিতে পারি না। তোমাকে ছাড়িব? তোমাকে আমি ছাড়িব? তোমাকে আমি,—যাহার জগতে তুমি ছাড়া আর কেহ নাই, সেই হতভাগিনী রাধা ছাড়িবে? আমি তোমাকে ছাড়িব, তবে আমার কি থাকিবে? আমি তোমাকে ছাড়িব এ কথা বলিয়াছি সত্য, কিন্তু তুমি কি তাই বিশ্বাস কর? এ সব মিথ্যা কথা, এসব আমার চাতুরী, তাও নয়, আমার প্রলাপ। তোমাকে না দেখিয়া পাগল হইয়াছিলাম, তাহাই প্রলাপ বকিতেছিলাম।"

প্রভু পূর্বে কৃষ্ণকে মন্দ বলিয়াছিলেন, তাই এখন কৃষ্ণের নিকট করুণ স্বরে ক্ষমা চাহিতেছেন। সে এরূপ করুণ-স্বর যে, শুনিলে প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়। বলিতেছেন,—"আমি কি তোমার নিন্দা করিতে পারি? তাকি কখন হয়? তবে অবলা বলিয়া, কি উন্মাদ হইয়া, যদি কিছু বলি, তবে আমি তোমাকে স্বরূপ বলিতেছি, সে মনে নয়, মুখে।" এখানে প্রতিকূল-নাগরের ভজন অনুকূলে পরিণত হইল।

কখন বা বিরহ-বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া, প্রভু শ্রীকৃষ্ণের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিতেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণকে ভজিয়া কি কুকাজই করিয়াছি। হায়! হায়! আর না, আমি আর কৃষ্ণকে ভজিব না।" যেন প্রভু ইহা রহস্য ভাবে বলিতেছেন, সেই ভান করিয়া স্বরূপ বলিলেন,—"কৃষ্ণকে ছাড়িয়া তবে কাহাকে ভজিবে?" প্রভু বলিলেন, "কেন গণেশকে ভজিব। তিনি সিদ্ধিদাত্য, যাহা চাহিব তাহা পাইব। না হয় সদাশয় সরল মহাদেবকে ভজিব, তিনি শত্রু কর্তৃক বিল্বডালে প্রহৃত হইয়াও তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন। তাও না হয়,—মা দুর্গা আছেন, কালী আছেন, তাঁহাদের পূজা করিব। যাহাই হউক, স্বরূপ। তাঁহাদের ভজনে প্রেম-বেদনা নাই। জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে না,—আমি যে দিবানিশি পুড়িতেছি।"

ইহা বলিতে বলিতে হৃদয়ে কৃষ্ণস্ফূর্তি হইল, আর কৃষ্ণপ্রেমে অভিভূত হইলেন। তখন অতি কাতরস্বরে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সে কাতরোক্তিতে পাষাণ বিদীর্ণ হয়।

কৃষ্ণ তাঁহার কিরূপ সর্বনাশ করিয়াছেন, প্রভু গম্ভীরায় হৃদয় উঘাড়িয়া তাহা বলিতেছেন,—"সখি! কৃষ্ণকে ভজিয়া আমার একি হইল? কৃষ্ণকে ভজিয়া দেখিতেছি আমি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছি। সে কিরূপ শুনিবে? মেঘ দেখিলে আমার প্রাণ কান্দিয়া উঠে। তোমরা ময়ূরকে নয়ন-সুখকর ভাব, কিন্তু আমার হৃদয়ে তাহার কৃষ্ণকণ্ঠ যেন কালফণীর ন্যায় বোধ হয়। সখি! বলিব কি, কৃষ্ণবর্ণ কোন মনুষ্য দেখিলে আমার দেহে আর প্রাণ থাকে না। এ সমুদয় ত উন্মাদের অবস্থা। আমি কাল দেখিলে বিচলিত হই কেন? যাহা হউক আমি কাল আর দেখিব না। সখি! দেখিও যেন আমার কুঞ্জে কৃষ্ণবর্ণ কিছু না থাকে। দেখিলেই কৃষ্ণ স্ফূর্তি হইবে, আর বিরহে পুড়িয়া মরিব। তার কি করিব?

স্বরূপ—তোমার কেশ?

প্রভু—মস্তক মুণ্ডন করিব।

স্বরূপ—তোমার শ্যামা সখি

প্রভু—তাহাকে তাড়াইয়া দাও।

প্রকৃতই প্রভুর অকথ্য প্রেমের আর কি বর্ণনা করিব, মেঘ কি কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দেখিলে তাঁহার কৃষ্ণ-স্ফূর্তি হইত, আর তিনি অচেতন হইতেন। অন্যের মনের ভাব দুইরূপে জানা যায়,—ভাষা দ্বারা আর নানা উপায় দ্বারা। এইরূপে মনের ভাব ভাল করিয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কেহ স্বর বিকৃতি করেন, অঙ্গভঙ্গি করেন, কবিতার সাহায্য লয়েন ইত্যাদি। একজন মুখে একটি ভাব প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি সেই ভাবটি তাঁহার শ্রোতার ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত হাত কি মাথা চালাইতে লাগিলেন, কি চক্ষের ভঙ্গী করিলেন, কি নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন, কি ওষ্ঠ দুটি দৃঢ় করিয়া সংলগ্ন করিলেন।

আর এক উপায় কণ্ঠস্বর বিকৃত করা। যেমন একজন সহজ সুরে বলিলেন, "তুমি যাও", সে একরূপ। কিন্তু "তুমি যাও" এই কথাটি এরূপ কঠিন ভাবে জোরের সহিত বলা যায়, যাহা শুনিলে শ্রোতা ভাবিবে বক্তার নিতান্ত ইচ্ছা যে, সে ঐ স্থান হইতে চলিয়া যায়।

আর একটি উপায় কবিতা দ্বারা। প্রকৃত কবিত্বের সাহায্যে কোন ভাব বর্ণনা করিলে তাহা যেরূপ হৃদয়ে প্রবেশ করে, সামান্য ভাষায় তাহা হয় না।

অপর উপায় সঙ্গীত দ্বারা। টড্ সাহেব বলিতেছেন,—ভারতবর্ষীয় যে সঙ্গীত, তাহা দ্বারা মনুষ্যকে নানা ভাবে বিভাবিত করা যায়, অর্থাৎ হৃদয়ে দুঃখ কি আনন্দ উত্থিত করা যায়।

আর এক উপায় আছে, যাহাকে শাস্ত্র অষ্টসাত্ত্বিক ভাব বলে। কিন্তু প্রভু দেখাইলেন যে তাঁহার শরীরে অষ্ট কেন বহু-অষ্ট-সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ পাইত। যথা হাস্য, রোদন, কম্প, স্বেদ, পরে মূর্চ্ছা ইত্যাদি।

প্রভুর যে মনের ভাব তাহা, উপরে যতগুলি উপায় বলিলাম ইহার সাহায্যে তিনি ব্যক্ত করিতেছেন। কিন্তু আমার, ভাষা কি বর্ণনা ছাড়া অন্য উপায় নাই। সুতরাং প্রভুর যে মনের ভাব, ইহা আমি কিরূপে অবিকল ব্যক্ত করিব? তবে স্বরূপের কৃপায় জগৎ এই ভাবের আভাস কিছু পাইয়াছেন। অর্থাৎ মহাপ্রভু যে রস দ্বারা জগৎ প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন, সঙ্গীত ও কীর্তন দ্বারা তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। আপনারা ভক্তের মুখে কৃষ্ণনাম শুনিবেন সে একরকম, তাহার তুলনা নাই। আমি দেখিয়াছি, একটি ভক্ত হাতে তালি দিয়া শুধু হরেকৃষ্ণ বলিয়া পদ গাইতেছেন, আর শ্রোতাগণ—কি ভক্ত কি অভক্ত—সকলেই বিগলিত হইতেছেন। কেন না, তাঁহার স্বরেতে তখন কি এক শক্তি প্রবেশ করিয়াছে।

প্রভু স্বরূপের পানে চাহিয়া, আপনার বুকে হাত দিয়া দেখাইলেন যে, তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ আর নাই। কথা এই, প্রভু স্বরূপকে বলিলেন যে, "কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে না, কণ্ঠ রোধ হইয়াছে, কি বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। পুত্র মরিয়াছে, এ কথা জননী মুখে আনিতে পারেন না, তাই যদি তাঁহার পুত্র মরিয়াছে এ কথা বলিতে হয়, তবে হাত নাড়িয়া দেখান যে সে চলিয়া গিয়াছে। জননীর নিকট পুত্র মরা সংবাদ যেরূপ হৃদয়বিদারক, শ্রীপ্রভুর নিকট "শ্রীকৃষ্ণ নাই" এই কথা বলা তদপেক্ষা অনন্ত গুণে ক্লেশকর। তাই কৃষ্ণ আমার নাই, ইহা তাঁহার মুখে আসিতেছে না, তাই আপনার হৃদয়ে হাত দিয়া সঙ্কেত দ্বারা জানাইতেছেন যে, কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয় শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রভু সন্ন্যাস লইয়া গৃহত্যাগ করিলে, মহান্তগণ সকাল বেলা গঙ্গাস্নান-করিয়া প্রভুর বাড়ী আসিয়া শুনিলেন, প্রভু কোথা চলিয়া গিয়াছেন। আর দেখেন যে, বাহির দুয়ারে মা শচী ঈশানের গাত্রে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। তাহার পরে বাসু ঘোষের পদ শ্রবণ করুন—

বাসুদেব ঘোষ ভাষা শচীর এমন দশা
মরা হেন রহিল পড়িয়া
শিরে করাঘাত করি, ঈশানে দেখায় ঠারি,
গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া।।

অর্থাৎ শচী মুখে বলিতে পারিতেছেন না যে, নিমাই তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাই ঈশানকে সঙ্কেত দ্বারা শুধু হাত নাড়িয়া আর মুখে বিষাদ মাখা লক্ষণ প্রকাশ করিয়া বলিলেন। সেইরূপ প্রভু কৃষ্ণ নাই, দেখাইলেন। স্বরূপ তাহাতে যেরূপ প্রভুর মনের হা হুতাশি ভাব বুঝিলেন, পাঠক আমি তাহা কথায় কিরূপে তোমাকে বুঝাইব? কৃষ্ণ সম্মুখে আর তিনি রাগ করিয়াছেন, ইহাই ভাবিয়া প্রভু যখন বলিতেছেন,—বন্ধু, আমি তোমাকে দুটা মন্দ বলিয়াছি, সে মনে, মুখে নয়, তাহাতে রাগ করিও না, আমি কি তোমাকে রূঢ় কথা বলিতে পারি? প্রভু ইহা যেরূপ স্বরে ও মুখের ভঙ্গীতে বলিলেন, আমি তাহা কেবল 'ক' 'খ'য়ের সাহায্যে কিরূপে প্রকাশ করিব? তবে পাঠক! আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করুন, অর্থাৎ সাধন-ভজন করুন, তাহা হইলে আপনাদের আস্বাদ-শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে এবং তখন ক্রমে বুঝিবেন যে প্রভুর গম্ভীরা-লীলায় যে সুধা আছে, তাহা জগতে আর কোথাও নাই। মহাপ্রভু শুধু কথা দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করেন নাই, করিতেও পারিতেন না। তাঁহার হৃদয়ে যে তরঙ্গ, যাহাতে তিনি নিজে এবং যাঁহারা নিকটে আছেন তাঁহারা ভাসিয়া গিয়াছেন, আর অদ্যাবধি ভাগ্যবান্ ভক্তগণ ভাসিয়া যাইতেছেন,—তাহাতে ক খ গ-এর সমষ্টি ঠাঁই পাইবে কেন? তিনি সেই তরঙ্গ বুঝাইবার নিমিত্ত নানাবিধ হৃদ্‌বিদারক উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়েন, যে সমুদয় ভাব ব্যক্ত করিতে প্রভু সহস্র কলসী আনন্দ-জল ফেলিয়াছেন, সমস্ত নিশি আনন্দে নৃত্য করিয়াছেন, কি ক্লেশে, সহস্র বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছেন, মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা গিয়াছেন, আর প্রত্যেক মূর্চ্ছায় তাঁহার জীবনসংশয় বোধে ভক্তগণ হাহাকার করিয়াছেন,—আমি তাহা শুধু কথা দ্বারা কিরূপে সম্যক প্রকারে ব্যক্ত করিব।

পাঠক মহাশয়! উপরের কথাগুলি মনে রাখিয়া, আমার এখন বাক্য দ্বারা যে গম্ভীরা বর্ণনা তাহা বিচার করুন। দিগ্দর্শন স্বরূপ আমরা এক নিশির গম্ভীরা-লীলায় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব। ইহাতে পাঠক এই কয়েকটি বিষয় জানিতে পারিবেন। (১) সাধন-ভজনের আরম্ভই বা কি, আর শেষই বা কি? (২) প্রভু আপনি আচরিয়া জীবকে ধর্মশিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার অর্থ কি? (৩) প্রভু গম্ভীরায় যেরূপ জীবকে শিক্ষা দিলেন, তাহা কি উপায়ে স্বরূপ ও রামরায়ের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করেন। প্রথমতঃ পূর্বে বলিয়াছি, প্রভু বক্তৃতা কি কথা দ্বারা মনের ভাব বড় ব্যক্ত করিতেন না,—অতি গূঢ় যে রস তাহা ভাব দ্বারা ব্যক্ত করিতেন। যেমন নয়নজল ফেলিয়া সহজে কোন কথা বলিলে এক ফল হয়, আর কান্দিয়া বলিলে আর এক ফল হয়। এখন প্রভুর এ ক্রন্দন কেমন?

প্রভুর জীবনে যে ভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইত তাহা সৃষ্টিছাড়া। তোমার আমার কোন কারণে নয়নে জল উদয় হইতে পারে, কিন্তু প্রভুর যে নয়নজল সে আর এক কাণ্ড। ভক্তগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রভু এক একবারে শত কলসী নয়নজল ফেলিতেন।

অবশ্য একথা শুনিলে সকলেরই মনে হইবে যে ইহা অত্যুক্তি, কিন্তু তাহা বড় একটা নয়। প্রভুর নয়ন দিয়া যে জল পড়িত সে পিচকারীর ন্যায়। প্রভু যেখানে থাকিয়া রোদন করিতেন উহা কর্দমময় হইত। একটি চিহ্ন দ্বারা প্রভুর নয়নে কত জল পড়িত তাহা পরিষ্কার জানা যায়। সমুদ্রতীরে প্রভু ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর ভক্তগণ দর্শন করিতেছেন ও হস্তে তালি দিতেছেন। সে বালুকাময় ভূমি, কিন্তু সেখানেও কর্দমের সৃষ্টি হইয়াছে—এমন কি চিত্রের দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় যে, প্রভুর শ্রীপদ নৃত্য করিতে করিতে কর্দমে ডুবিয়া যাইতেছে, আর সেই নিমিত্ত সেখানে পায়ের দাগ পড়িয়া যাইতেছে।

হৃদয়ে অধিক পরিমাণে আনন্দ কি ভক্তির উদয় হইলে, নয়নজলের সহিত সর্বাঙ্গে পুলকের সৃষ্টি হয়। সচরাচর সে পুলক যেন ঘামাচির মত। কিন্তু প্রভুর যে পুলক তাহার এক একটি

বদরী ফলের ন্যায়। অধিকন্তু প্রত্যেক পুলকের উৎপত্তি স্থান হইতে রক্তোদ্গম হইত।

প্রভু যখন মূর্চ্ছা যাইতেন, তখন ভক্তগণ হাহাকার করিয়া রোদন করিতেন। কারণ কাহারও জানিবার উপায় ছিল না যে, তিনি তখন দেহে আছেন কি ছাড়িয়া গিয়াছেন। কোন এক ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে কিনা, উহা জানিবার এক উপায় নাসিকায় তুলা ধরিয়া দেখা, উহা চলে কি না। কিন্তু ঘোর মূর্চ্ছার সময় নাসিকায় তুলা ধরিলে উহা চলিত না। প্রভু এইরূপে কখন তিন প্রহর পর্যন্ত মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিতেন।

প্রভুর আনন্দে যে নৃত্য তাহা অবর্ণনীয়; সে নৃত্য দেখিলে ভক্তির উদয় হয়, নয়নে জল আইসে, ও আনন্দে সর্বশরীর তরঙ্গায়িত হয়। প্রভু যখন হাস্য করিতেন, তখন কখন কখন এক প্রহরেও তাহা থামিত না। প্রভুর হাস্য চন্দ্র-কিরণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অতএব প্রভু আপনার মনের ভাব শুধু কথার দ্বারা ব্যক্ত করিতে যাইতেন না। করিতে গেলে ফল তেমন হইত না। প্রভু আপনার মনের ভাব হাসিয়া, কান্দিয়া, নাচিয়া, মরিয়া প্রকাশ করিতেন।

কৃষ্ণ-বিরহে তাঁহার যে কি ক্লেশ হইত, তাহা তাঁহার মূর্চ্ছায় জানা যাইত। সেইরূপ কৃষ্ণ-মিলনের দ্বারা তাঁহার যে কি সুখ, তাহা তাঁহার নৃত্যে, প্রফুল্ল বদনে, চক্ষের ভঙ্গিতে ও হাস্যে প্রকাশ পাইত।

প্রভুর শিক্ষায় আর এক বিশেষত্ব এই ছিল যে, প্রভু যাহা শিক্ষা দিবেন সেই রসে যে রসিক তাহাকে আনিতেন; আনিয়া তাহার দ্বারা শিক্ষা দিতেন। যদি প্রভুর ইচ্ছা হইত যে সখ্যরস সম্বন্ধে শিক্ষা দিবেন, তবে তাহা আপনি না দিয়া ঐ রসের রসিক যে শ্রীদাম তাহাকে আপনার দেহে আনিয়া তাহার দ্বারা শিক্ষা দিতেন। অর্থাৎ তখন তিনি শ্রীদাম হইতেন, মহাপ্রভু থাকিতেন না।

পূর্বে বলিয়াছি এই রূপে গম্ভীরায় ভজন-সাধন প্রণালী প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আপনি আচরিয়া জীবগণকে দেখাইতেন। প্রভু যেন একজন অতিশয় অনুতপ্ত বিষয়-মুগ্ধ জীব হইয়া স্বরূপ ও রামরায়ের নিকট এই নিজকৃত শ্লোকটি পড়িলেন, যথা—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়।।

ইহার ভাবার্থ এই—"হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমার নিত্যদাস, ভবার্ণবে হাবুডুব, খাইতেছি, কৃপা করিয়া আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলি সদৃশ মনে কর।"

জীবের এইরূপ ভজন-পথ প্রথম পথ হিসাবে অবলম্বন করিতে হয়। প্রভু ইহা কেন করিলেন? তিনি ত বিষয়ে মগ্ন নন, কৃষ্ণকেও ভুলেন নাই? তবে, করিলেন কেন? না, আপনি আচরিয়া জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত।

আর একটি শ্লোকে প্রভু এই ভাবটি ও ঐ প্রার্থনাটী প্রস্ফুটিত করিলেন, যথা—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।

ইহার ভাবার্থ এই, একজন বিষয়মুগ্ধ জীবভাবে প্রভু বলিতেছেন, "আমি ধন জন ইত্যাদি চাই না, তবে এই চাই যে আমার জন্মে জন্মে তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি হউক।"

প্রভু দেখাইলেন যে সাধক এইরূপে আর একটু অগ্রবর্তী হইলেন। তাঁহার পরে আর এক শ্লোকে প্রভু বলিতেছেন, যথা—নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি স্তত্রার্পিতা, নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। ইত্যাদি।

প্রভুর প্রার্থনা এই যে,—"হে ভগবান তোমার বহু নাম আছে, আর সকল নামে তোমার শক্তি; এ নাম লইতে কোন নিয়ম কি বাধা নাই, অথচ আমার ইহাতে রুচি হইল না!"

এখানে সহজ ভজন কি তাহা প্রভু আপনি আচরিয়া দেখাইতেছেন,—অর্থাৎ সহজ ভজন

হইতেছে—শ্রীনাম গ্রহণ করা মাত্র; তাহা করিলে ক্রমে কৃষ্ণ-প্রেম হইবে। অবশ্য যখন কৃষ্ণপ্রেম হইবে তখন সে ভজন আর এক প্রকার, সে ভজনে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইবে। নামের যে কি শক্তি তাহা প্রভু এই শ্লোকে বিবরিয়া বলিতেছেন—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি,

অর্থাৎ "হে ভগবান। কবে তোমার নাম শ্রবণ করিতে করিতে আমার নয়নে জল, অঙ্গে পুলক, কণ্ঠরোধ প্রভৃতি হইবে।"

এই সমস্ত কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ। প্রভু দেখাইতেছেন, নাম গ্রহণ করিলে এই সমুদয় ভাব হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম হয়। তাহার পরে, যিনি কৃষ্ণপ্রেমরূপ মহাধন লাভ করিয়াছেন তাহার কি কথা, তাহা প্রভু এই শ্লোকে ব্যক্ত করিতেছেন—

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে।।

এই অদ্ভুত শ্লোকের যে ভাব তাহা প্রকাশ করিতে গম্ভীরায় প্রভুর সর্বাপেক্ষা অধিক সময় যাইত। এই বিরহ-বেদনা উঘাড়িয়া বলিতে যাইয়া প্রভু প্রত্যেক নিশিতে শতবার প্রাণে মরিতেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রভুর অপ্রকট

এই মতে মহাপ্রভুর উৎকল বিহার।
উৎকল বিহার কথা অনেক বিস্তার।। চৈতন্য-মঙ্গল।

ইহার বহুদিন পূর্বে শচীদেবী অদর্শন হইয়াছেন। প্রভুর তখন বয়ঃক্রম আট চল্লিশ বৎসর, শক ১৪৫৫। তাহার পরে শ্রবণ করুন, যথা চৈতন্য-মঙ্গলে—

হেনকালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘরে। বৃন্দাবন কথা কয় ব্যথিত অন্তরে।।

সে আষাঢ় মাস। নবদ্বীপের ভক্তগণ নীলাচলে যাইয়া থাকেন, সেইরূপ গিয়াছেন। প্রভু নিজ ভবনে বসিয়া, ও তাঁহাকে বেড়িয়া সকল ভক্তগণ বসিয়াছেন। দুঃখের সহিত বৃন্দাবনের কথা বলিতে বলিতে প্রভু নীরব হইলেন। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিলেন। প্রভু যদি উঠিলেন, সেই সঙ্গে ভক্তগণও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরে প্রভু চলিলেন, কোন্ দিকে না মন্দিরের দিকে। কাজেই ভক্তগণ তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন।

নিশ্বাস ছাড়িয়া সে চলিলা মহাপ্রভু। এমত ভকত সঙ্গে নাহি হেরি কভু।।
সম্ভ্রমে উঠিলা জগন্নাথ দেখিবারে। ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে।
সঙ্গে নিজ-জন যত যেমতি চলিল। সত্বরে মন্দির ভিতরেতে উত্তরিল।।

এইরূপে প্রভু যখন মন্দিরে চলিলেন, ভক্তগণও তখন নীরবে পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। কারণ প্রভু এরূপ ভাবে ভক্তগণ ছাড়িয়া মন্দিরে কখন যাইতেন না, সুতরাং ভক্তগণ চিন্তিত হইয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। প্রভু মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পর (চৈতন্য-মঙ্গলে)—

নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়। সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিলা উপায়।।
তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট। সত্বরে চলিল প্রভু অন্তরে উচাট।।

প্রভু দ্বারে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিতে লাগিলেন যেন জগন্নাথের বদন ভাল দেখিতে পাইতেছেন না, আর যেন এই নিমিত্ত জগন্নাথের সম্মুখে অগ্রবর্তী হইবার জন্য ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

প্রভু অভ্যন্তরে কখনও যাইতেন না, গরুড়-স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেন। সে

দিবস মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া উঁকি মারিতে লাগিলেন, যেন ভাল দেখিতে পাইতেছেন না, পরে একেবারে অভ্যন্তরে জগন্নাথের সম্মুখে গমন করিলেন।

এরূপ প্রভু কখন করেন নাই, সুতরাং ভক্তগণ প্রভুর কাণ্ড একটু বিস্ময় ও চিন্তার সহিত দর্শন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের বিস্ময় একটী কারণে অনন্ত গুণ বাড়িয়া গেল। অর্থাৎ প্রভু যেই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনি দ্বার আপনি বন্ধ হইয়া গেল। ভক্তগণ অবাক্ হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আষাঢ় মাস, সপ্তমী তিথি রবিবার, বেলা তৃতীয় প্রহর। প্রভু অভ্যন্তরে জগন্নাথ সম্মুখে, আর ভক্তগণ বাহিরে। প্রভু যে কি করিতেছেন, তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না, কারণ কপাট বন্ধ রহিয়াছে। ভক্তগণ চিন্তিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় অভ্যন্তরে হঠাৎ গোলমাল শুনিতে পাইলেন। সে শব্দ শুনিয়া সকলে বুঝিলেন, কি একটা মহাসর্বনাশ হইয়াছে।

গুঞ্জাবাড়ীতে তখন একজন পাণ্ডা ছিলেন। যদিও ভক্তগণ বাহির হইতে কিছু দেখিতে পাইতেছেন না, কিন্তু সেই পাণ্ডাঠাকুর গুঞ্জাবাড়ী হইতে প্রভুকে বেশ দেখিতে পাইতেছেন। ইহার মধ্যে প্রভু একটি কাণ্ড করিলেন, কি কাণ্ড তাহা পরে বলিতেছি। সেই কাণ্ড দেখিয়া পাণ্ডাঠাকুরটী দৌড়িয়া আসিলেন, আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই চীৎকার শুনিয়া বাহিরের ভক্তগণ তাঁহাকে দ্বার উন্মোচন করিতে বলিলেন। দ্বার খোলা হইলে সেই পাণ্ডাঠাকুর নিম্নোক্ত কাহিনী বলিলেন।

তিনি বলিলেন,—প্রভু ভিতরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে—

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে। নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে।।

অর্থাৎ প্রভু মন্দির অভ্যন্তরে জগন্নাথের সম্মখে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া, কাতর স্বরে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। প্রভু কি বলিলেন শ্রবণ করুন। যথা, চৈতন্য-মঙ্গলে—

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগ আর। বিশেষতঃ কলি যুগে সংকীর্ত্তন সার।।
কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন। কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ।।

প্রভু বলিতেছেন,—"সত্য ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি,—এই কলিযুগের একমাত্র ধর্ম সংকীর্তন। হে জগন্নাথ! তুমি পতিতপাবন। এই কলিযুগ আসিয়াছে। এখন তুমি কৃপা করিয়া জীবকে আশ্রয় দাও!" প্রভু তখনও জীবের কথা ভুলেন নাই। এই কথা বলিয়া প্রভু কি করিলেন শ্রবণ করুন, যথা চৈতন্য-মঙ্গলে—

এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত-রায়! বাহু ভিড়ি আলিঙ্গনে তুলিল হিয়ায়!

অর্থাৎ পাণ্ডাঠাকুর দেখিতেছেন যে, প্রভু জগন্নাথকে এই নিবেদন করিয়া তাঁহাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। পরে শ্রবণ করুন, যথা চৈতন্য-মঙ্গলে—

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে।।

পাণ্ডাঠাকুর সম্বন্ধে চৈতন্য-মঙ্গল বলিতেছেন, যথা—

গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ। কি কি বলি, সত্বরে সে আইল তখন।।
বিপ্রে দেখি ভক্তে কহে শুন হে পড়িছা। ঘুচাও কপাট, প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা।।

উপরে যে "বিপ্রে দেখি" কথা আছে উহার অর্থ যে, বিপ্রকে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন এমন নয়, কারণ বিপ্র মন্দিরের মধ্যে। ইহার অর্থ এই যে, বিপ্রের চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া ভক্তগণ বলিলেন,—"পড়িছা-ঠাকুর শীঘ্র দ্বার উন্মোচন কর, প্রভুকে দেখিব।"

তখন পড়িছা, দ্বার খুলিয়া বলিতেছেন, যথা চৈতন্য-মঙ্গলে—

ভক্ত আর্তি দেখি কহে পড়িছা তখন। গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভু হৈলা অদর্শন।।
সাক্ষাতে দেখিনু গৌর প্রভুর মিলন। নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন।।

অর্থাৎ গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে থাকিয়া আমি সমুদয় দেখিলাম, প্রভুকে দেখিলাম ও স্বচক্ষে তাঁহাকে জগন্নাথের সহিত মিলিত হইতে দেখিলাম। 'এ বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার।'

এ কথা শুনিয়া সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। এই নিদারুণ আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ কেহ মরিলেন, কেহ কেহ বা মরিতে মরিতে বাঁচিয়া উঠিলেন। যাঁহারা বাঁচিয়া উঠিলেন, তাঁহারা আর সেখানে তিষ্ঠাইতে না পারিয়া নীলাচল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন।

প্রভুর সঙ্গোপন জানিয়া ভক্তগণের কি দশা হইল তাহা বিস্তার করিয়া আর বলিব না, বলিবার সাধ্যও নাই। আমাদের প্রভু যাইবার বেলা আমাদিগকে জগন্নাথ দেবের হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছেন। সঁপিয়া দিয়া আবার নিজে সেই জগন্নাথের হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। আমাদের প্রভু কি সত্যই চলিয়া গিয়াছেন? তিনি যাবেন কোথায়? গেলে আমাদের উপায়? আমরা যে বড় বড় পরমেশ্বর, বড় বড় দেবদেবী ত্যাগ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে মাথা বেচিয়াছি। তিনি যদি চলিয়া যান তবে আমরা কোথায় যাইব? জীবনে অনেক সুখভোগ করিয়াছি, দুঃখও পাইয়াছি অনেক, দুঃখও মনে নাই সুখও মনে নাই। মরণ সময় নিকটবর্তী, এখন শ্রীগৌরাঙ্গ তুমি যদি যাবে তবে আমাদের কি থাকিবে?*

ষোড়শ অধ্যায়

ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রাদুর্ভাব

ভারতবর্ষে যেরূপ অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চা হইয়াছে, এরূপ আর কোথাও হয় নাই। ইহা কেবল ব্রাহ্মণ দ্বারা হইয়াছে, সুতরাং ব্রাহ্মণগণের নিকট ভারতবর্ষীয়গণের ও জগতের যে ঋণ তাহা অশোধনীয়। তাঁহাদের সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল। তাঁহারা সকলের জন্য জ্ঞান ও ধর্ম চর্চা করিবেন, অন্যান্য সকলে তাঁহাদিগকে পালন করিবেন। ইহাতে এই হইল যে, ব্রাহ্মণগণ উন্নতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্যান্য জাতীয়গণ উন্নতি না করিয়া পড়িয়া রহিলেন, বরং ক্রমেই অধঃপাতে যাইতে লাগিলেন।

মহাপ্রভুর পরে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বৈষ্ণবধর্মের উন্নতি করিতে লাগিলেন। তখন বৈষ্ণবগণ শাক্তদের অপেক্ষা প্রবল হইয়াছেন, কারণ তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র ভাল, ও নূতন জীবন! কিন্তু আবার বৈদিক ধর্মের আধিপত্য বৃদ্ধি ও বৈষ্ণবধর্মের পতন হইয়াছে। যখন গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রবল হইল, তখন অবশ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বড় ভয় পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন সমাজে তাঁহাদের যে পদ ছিল, তাহা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ যে ধর্ম শিক্ষা দিলেন, বাক্যজালে যিনি তাহার যতদূর আবরণের সৃষ্টি করিতে পারেন করুন কিন্তু তাহার স্থূলমর্ম এই যে, শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান জীবের একমাত্র উপাস্য, অন্যান্য দেবদেবী ভজনে জীবের পুরুষার্থ লাভ হয় না, বরং এই শ্রীভগবানকে পাইবার একমাত্র উপায়—প্রেম ও ভক্তি; মন্ত্র তন্ত্র, যাগ ও যজ্ঞে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ জীবকে যে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, তাহা অন্য রকম। তাঁহারা বলিলেন—যাগ যজ্ঞ কর শীতলা মনসা প্রভৃতির পূজা কর। আর সমুদয় কার্য ব্রাহ্মণ দ্বারা করাইও, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কেহ ইহাতে অধিকারী

* কোন স্থানে দেখিতে পাই যে, ভক্তগণ সকলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সকলে ক্রমে চেতন পাইলেন, কেবল স্বরূপ নয়। দেখা গেল তাহার হৃদয় ফাটিয়া প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। আমাদের কঠিন হৃদয় ফাটিবার নয়।

নয়। এইরূপে ব্রাহ্মণকে কর দেওয়াই হইল অপর সকলের ধর্মচর্চার প্রধান অঙ্গ। আর এইরূপে ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য জাতির নিকট তাহাদের ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব হইতেই কর আদায় করিতে লাগিলেন। সন্তান গর্ভে প্রবেশ করিলে পঞ্চামৃত, তার পরে জন্ম হয়। জন্ম হইলে ষষ্ঠীপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে কর দিতে হয়। মরিয়া গেলেও কর দেওয়া স্থগিত হইল না। তারপর বার্ষিক শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডকরণ আছে। এইরূপে অন্যান্য জাতি জন্মের পূর্ব হইতে মরণের পর বহুদিন পর্যন্ত কর দিতে লাগিলেন। এইরূপে অদ্ভুত কর স্থাপন জগতে আর কোথাও দেখা যায় না।

অতএব জীবের ধর্ম কি রহিল, না—ব্রাহ্মণকে কর দেওয়া। দোল, দুর্গোৎসব ত আছেই, ইহা ছাড়া তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা—পূজা কিনা ব্রাহ্মণকে কিছু দেওয়া; উত্তম আহার, দক্ষিণা, কাপড় ইত্যাদি।

আবার গুরুরূপে ব্রাহ্মণগণ কর্ণে মন্ত্র দিলেন এবং সেই হইতে শিষ্য তাঁহার চিরকালের সম্পত্তি হইল। তখন হইতে গুরুর আর কিছু করিতে হয় না। শিষ্যবাড়ী গমন করিলে শিষ্যের গোষ্ঠীবর্গ তাঁহার চরণে মস্তক কুটিবে, তাহার অর্থ থাকুক বা না থাকুক, গুরুকে দিতেই হইবে। এই যে নানাবিধ উৎসব ও দেবদেবীর পূজা, ইহা সমুদয় ব্রাহ্মণগণের হস্তে, অন্যান্য জাতি কেবল তাহার ব্যয় বহন করিবে মাত্র।

যখন হিন্দুগণের এইরূপ অবস্থা—যখন আচার্যগণ এইরূপ বিষয়লোভে জ্ঞানশূন্য হইয়া শিষ্যগণের বিত্ত অপহরণ করিতে লাগিলেন—যখন গুরুগণ পরকালে ভাল হইবে, এই স্তোক-বাক্য বলিয়া নানাবিধ উৎসব সৃষ্টি করিয়া, শিষ্যের নিকট অর্থ লইতে লাগিলেন,—যখন এইরূপে ভগবানের নাম লইয়া, "আমি পতিতপাবন" এইরূপ ভান করিয়া আচার্যগণ স্বচ্ছন্দে বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন,—যখন ব্রাহ্মণগণ নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের পাদোদক পানে পাপের শান্তি হয়,—তখনই শ্রীভগবান নবদ্বীপে উদয় হইলেন।

যদি আচার্য ভাল হন, তবে শিষ্য মন্দ হইলেও তত ক্ষতি হয় না। কিন্তু যখন বিষয়-লোভে আচার্যগণ, শিষ্যকে গলায় বান্ধিয়া আপনারা নরককুণ্ডে ঝম্প দিতে লাগিলেন, তখন শ্রীভগবান আর থাকিতে না পারিয়া, কৃপার্ত হইয়া, আচার্য ও সাধারণ জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীভগবান স্বয়ং প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে জীবগণকে ধর্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু সে ধর্ম ব্রাহ্মণগণের ভাল লাগিল না।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মের সারমর্ম পূর্বে বলিয়াছি, আবার বলিতেছি। শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাঁহাকে কেবল প্রেমভক্তিতে পাওয়া যায়। অতএব শ্রীভগবদ্ভক্তি ও প্রেমই পরমপুরুষার্থ, আর শ্রীভগবদ্ভক্তই মুক্ত জীব।

এখন প্রেমভক্তি যদি শ্রীভগবচ্চরণ লাভের একমাত্র উপায় হইল, তবে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি নানাবিধ উৎসব-পার্বণ সমুদয় গেল। কারণ সে সমুদয়ে প্রেমভক্তি নাই। আর তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ যে অনায়াসে অর্থ উপার্জন দ্বারা দিন যাপন করিতেছিলেন, তাহা সমুদয় গেল।

কাজেই ব্রাহ্মণগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ আচার্যগণ যে, এইরূপে আপনাদের ও তাহাদের সর্বনাশ করিয়া শুধু অর্থ উপার্জন করিতেন এরূপ নয়, সমাজে অপরিসীম সম্মানও লাভ করিতেন। তাঁহারা অন্যান্য বর্ণের নিকট কিরূপ সম্মান দাবী করিতেন, তাহা সকলেই জানেন। যিনি ব্রাহ্মণ তিনিই গুরু, বিপ্র-পাদোদক পান করিলে সমস্ত আপদ নষ্ট হয়। ব্রাহ্মণকে মারিতে নাই, ব্রাহ্মণ অবধ্য। ব্রাহ্মণকে উপবাসী রাখিয়া আপনারা ভোজন করিতে নাই।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মে ব্রাহ্মণগণের শুধু উপার্জনের পথ গেল তাহা নহে, সমাজে সম্মান যাইবার যো হইল,—যেহেতু ব্রাহ্মণগণ চিরদিন শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মণই গুরু।

আবার গৌরাঙ্গের উপদেশ হইল—যে ভক্ত সেই কেবল পূজ্য। ভক্ত যদি চণ্ডাল হয় তবু সে অভক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—এই আমাদের প্রভুর শিক্ষা। কাজেই ব্রাহ্মণগণ একেবারে মারমার কাটকাট করিয়া উঠিলেন।

স্বার্থ লইয়া যেখানে এইরূপ টানাটানি, সেখানে একটী ব্রাহ্মণেরও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ না করিবার কথা। কিন্তু তবু অনেকে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। মনে ভাবুন, ঠাকুর মহাশয় নরোত্তম বাড়ী প্রত্যাগমন করিলে, বলরাম মিশ্র তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইলেন। এরূপ সমাজবিরোধী কার্য তিনি কেন করিলেন? ঠাকুর মহাশয় কায়স্থ, তাঁহার নিকট বলরাম মিশ্র মন্ত্র লইলে সমাজে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। এইরূপ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ছিলেন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তিনিও ঠাকুর মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। ইহাতে সমাজে তিনি, তাঁহার স্ত্রী ও বিধবা কন্যা বহুতর উৎপীড়িত হইলেন। সমাজ-সম্মত পথসকল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা ঐরূপ ঘোর বিপরীত পথে কেন চলিলেন?

কেন চলিলেন তাহার কারণ বলিতেছি। শেষ ভালই ভাল,—পরকালের ভালই প্রকৃত ভাল, ইহকালের সম্পত্তি কিছুই নহে। তাঁহারা দেখিলেন, যদিও তাঁহারা ব্রাহ্মণ, তবুও তাঁহারা পতিত। অন্যকে পথ দেখান অনেক দূরের কথা, আপনারাই পথ না পাইয়া গর্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। আপনারা গর্তে হাবুডুবু খাইতে খাইতে অন্যকে উদ্ধার করিতে যাওয়া যেরূপ হাস্যকর, তাঁহাদের পক্ষে আপনারা অসিদ্ধ সত্ত্বেও, কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া শিষ্যের উদ্ধারের ভার ঘাড়ে লওয়া, সেইরূপ হাস্যকর। তাঁহারা ভাবিলেন, এইরূপে অন্য জীবকে ষষ্ঠী-মাকালী পূজা করাইয়া অর্থ উপার্জন করা ঘোর বঞ্চনা ভিন্ন আর কিছু নহে। এই সমস্ত ভাবিয়া, অন্যকে বঞ্চনা করিয়া অর্থ উপার্জনের পথ ছাড়িয়া দিয়া আপনারা যাহাতে উদ্ধার হয়েন তাহাই তাঁহারা করিলেন। এইরূপে সমাজবিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করায়, তাঁহাদের প্রতি সমাজে উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। কিন্তু সে কয়দিনের জন্য? অন্তিমে নিত্যধামে সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে চিরদিনের জন্য পাইবেন, এই আশায় তাঁহারা সমুদয় সহিয়া থাকিলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম প্রচার আরম্ভ হইলে, যাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন তাঁহারা জয় জয় করিয়া উঠিলেন; কারণ তাঁহারা ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পদতলে দলিত হইতেছিলেন। আবার ব্রাহ্মণেরাও মার মার করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম-ভীরু, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের মত অবলম্বন করিলেন। বলা বাহুল্য, এরূপ ধর্মভীরু লোকের সংখ্যা অতি অল্প।

যত দিন বৈষ্ণবগণ দুর্বল ছিলেন, ততদিন শাক্তগণ ঘৃণা করিয়া তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু বৈষ্ণবগণ ক্রমে যখন প্রবল হইতে লাগিলেন, তখন তাহাদিগকে জব্দ করিবার যতরূপ পথ আছে ব্রাহ্মণগণ ক্রমে ক্রমে সমুদয় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। আর কায়স্থ ও বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণগণের সহিত রহিয়া গেলেন। এইরূপে দুইটি দল হইল। বৈষ্ণবগণের দলে রহিলেন, অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বৈদ্য এবং সমুদয় নবশাখগণ। আর, শাক্তগণের দলে রহিলেন প্রায় সমুদয় ব্রাহ্মণ, প্রায় সমুদয় কায়স্থ, আর প্রায় সমুদয় বৈদ্য।

নবশাখগণ ব্রাহ্মণের প্রধান সহায় এবং তাঁহারা নিরীহ ভালমানুষ ও ব্যবসা করিয়া জীবিকানির্বাহ করেন। যে সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য তাঁহাদের নেতা, তাঁহারা সাধু ভক্ত। "তৃণাদপি" শ্লোকের দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃতি গঠিত। তাঁহারা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও সমাজে অসীম পদস্থ ব্রাহ্মণগণের সহিত পারিবেন কেন? সুতরাং রাজদ্বারে বৈষ্ণবগণ উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন; এবং ব্রাহ্মণগণ জমিদারগণ দ্বারা এমন কি কাজীকে হাত করিয়া "বৈরাগী বেটাদের" টিকি কাটিতে লাগিলেন।

এইমাত্র বলিলাম, বৈষ্ণবগণের অস্ত্রশস্ত্র ভাল ছিল, সেই জন্য তাঁহাদের দল ক্রমে বাড়িয়া চলিল। ইহার ফলে ক্রমে দেশে দুইটি পৃথক দল হইল। এখন বৈষ্ণবগণ এরূপ প্রবল হইয়াছেন

যে, "বৈরাগী বেটারা" বলিয়া তাঁহাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করিবার পথ রহিল না। কারণ বৈষ্ণবগণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ প্রবেশ করিতে লাগিলেন। যাঁহাদিগকে শাক্তগণ পূর্বে সম্মান করিয়াছেন, তখন তাঁহারা বৈষ্ণব হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে "বৈরাগী বেটারা" বলিতে পারিলেন না। ক্রমে কিরূপ অদ্ভুত পরিবর্তন হইল শ্রবণ করুন। বৈষ্ণবগণ ক্রমে ব্রাহ্মণের "ঠাকুর" উপাধি কাড়িয়া লইলেন, আর আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব ঠাকুর' বলিতে লাগিলেন। এ পর্যন্ত কেবল ব্রাহ্মণগণ যে পতিতপাবন ছিলেন, তাহা বৈষ্ণবগণ স্বীকার করিতে চাহিলেন না,—তাঁহারা আপন উদ্ধারের নিমিত্ত 'বৈষ্ণব-গোসাঞির' নিকটই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যথা পদ—আজ মোরে কৃপাকর বৈষ্ণব-গোসাঞি। তোমা বিনা গতি নাই—ইত্যাদি। ঝড়ু ঠাকুর ভূঁয়েমালি, অস্পৃশ্য জাতি, ভক্তির বলে তিনি রইলেন 'ঝড়ু ঠাকুর', আর বড় বড় ভক্তগণ তাঁহার প্রসাদ পাইতেন।

যখন রামচন্দ্র কবিরাজ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিলেন, তখন শাক্তগণ বড় ক্লেশ পাইলেন। কারণ রামচন্দ্র কবিরাজ একজন পদস্থ ব্যক্তি, অতি অল্প বয়সে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হওয়ায় সমাজে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছেন। সেখানে শাক্ত পণ্ডিতগণও গিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন,—"কবিরাজ! শিবকে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কিন্তু জান না কি যে, তোমার কৃষ্ণ শিবকে পূজা করেন? তাহাতে রামচন্দ্র দুটি শ্লোক পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নীরব করিলেন, যথা।—

> শৈবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিনোঽপি শৈব স্বয়ং।
> তথা সমতয়াথবা বিধিহরাদিমূর্ত্তি ত্রয়ং।।
> বিলোক্য ভব বেধসোঃ কিমপি ভক্তবর্গ ক্রমং।
> প্রণম্য শিরসাহিতৌ বয়মুপেন্দ্র দাস্যং শ্রিতাঃ।।

এই শ্লোকের অর্থ এই—শিব বিষ্ণুর উপাসক বিধায় বিষ্ণু জগদুপাস্য হউন, কিম্বা বিষ্ণু শিবের উপাসক বিধায় শিবই জগদুপাস্য হউন, অথবা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনই সমভাবে জগদুপাস্য হউন, আমরা মহাদেব এবং ব্রহ্মার ভক্তবৃন্দের শাস্ত্র অবলোকন করিয়া তাঁহাদের উভয়কে মস্তকের দ্বারা প্রণাম করিয়া উপেন্দ্রের অর্থাৎ ভগবানের দাসত্ব আশ্রয় করিয়াছি। আবার—

> প্রহ্লাদ ধ্রুব রাবণানুজ বলি ব্যাসাম্বরি যাদয়োঃ-
> স্তে বিষ্ণুপরায়ণা বিধিভব শ্রেষ্ঠা জগমঙ্গলাঃ।
> যেঽন্যে রাবণ বাণ বৌণ্ড্রবৃক কোঞ্চ! অহো
> যদ্ভক্তা ন চ তৎপ্রিয়াং ন চ হরে স্তস্মার্জ্জগদ্বৈরিণঃ।

প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ প্রভৃতি বিষ্ণু-পরায়ণ, এ কারণ তাঁহারা মহাদেব ও ব্রহ্মার পরম প্রিয় ও জগন্মঙ্গলকারক।

রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রবৃক প্রভৃতি অসুরগণ ব্রহ্মা এবং মহাদেবের ভক্ত হইয়াও তাঁহাদের প্রিয় হয় নাই ও হরিরও প্রিয় হয় নাই, সুতরাং জগদ্বৈরী হইয়াছিল। ইত্যাদি।

রামচন্দ্র কবিরাজের অপূর্ব উত্তর বিচার করুন। রামচন্দ্র বলিতেছেন, "আমরা দেখিতেছি শ্রীকৃষ্ণকে প্রহ্লাদ ধ্রুব প্রভৃতি ভজন করিয়া জগতে ও দেব-গণের মান্য হইয়াছেন। কিন্তু শিব ও ব্রহ্মার ভক্তগণ—যথা রাবণ বাণ প্রভৃতি—জগতের বৈরী ও দেবগণের অপ্রিয় হইয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করাই শ্রেয়ঃ, মহাদেবকে নয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মের এই স্বাভাবিক চরম। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মের বীজ একটি। সেটি এই যে,—শ্রীপূর্ণব্রহ্ম সনাতন, জীবের প্রতি কৃপার্দ্র হইয়া নবদ্বীপে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবকে উপদেশ দিয়া জীবেব সঙ্গে আত্মীয়তা করিয়া শেষে জীবের মুখচুম্বন পর্যন্ত করিয়াছিলেন। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বীজ। ইহাতেই চৌষট্টি রস আছে। যাঁহার হৃদয়ে এই

বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে তাঁহার আর কোন শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই।

এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, মধু হইতেও মধু সরল হইতেও সরল, এই অভিনব ধর্মের সৃষ্টি হইল। ইহাতে যাগ, যজ্ঞ, দেবদেবী পূজা, কিম্বা কৌলিন্যের, জাতীয় ও বংশের গৌরব কিছুই থাকিল না।

এইরূপে পরিশেষে শাক্তগণ আলোচাল ও কলা লইয়া, আর বৈষ্ণবগণ প্রেমভক্তি লইয়া থাকিলেন। অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের সম্পূর্ণ জয় হইল।

কিন্তু এখন আবার বৈদিক-ধর্মের সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে। এখন আর সেই নয়নধারা নাই, বাহু তুলে নৃত্যে নাই, ধূলায় গড়াগড়ি নাই। প্রভুর অবতারের পূর্বে সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল আবার তাহাই হইয়াছে। এখন আর শাক্ত-বৈষ্ণবের বড় প্রভেদ নাই। শাক্তধর্মের সাব আলোচাল-কলা, বৈষ্ণবধর্মের সারও প্রায় তাহাই হইয়া দাঁড়াইতেছে, বৈষ্ণবগণও ক্রমে কর্তব্যে শাক্ত হইতেছেন।

বৈষ্ণবগণ প্রবল হইলে শাক্তগণের সহিত তাঁহাদের বিবাদ আরম্ভ হইল। পূর্বে বৈষ্ণবগণ দুর্বল ছিলেন বলিয়া সমুদয় সহিয়া থাকিতেন। শেষে বলবান হইলে, ক্রমে তাঁহারা দুই একটী কথা বলিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে এই বিবাদ হাস্যরসের প্রস্রবণ হইল। হিন্দু ও মুসলমানের বিবাদের কথা সকলে জানেন। হিন্দুরা কলা-পাতার যে পৃষ্ঠে ভোজন করেন, মুসলমানেরা তাহা উল্টাইয়া লইলেন। হিন্দুরা গাড়ু মুসলমানের বদনা। হিন্দুরা গোফঁ রাখেন দাড়ি ফেলেন, মুসলমানেরা গোঁফ ফেলেন দাড়ি রাখেন। এইরূপে বৈষ্ণব বলেন তরকারী বানান, শাক্ত বলেন তরকারী কুটা। দাশরথী রায় আমোদ করিয়া এই কোন্দল বর্ণনা করিয়াছেন। যথা, বৈষ্ণব কালীতলার হাটে যান না, শাক্ত কৃষ্ণনগরের বাজারে যান না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সময়কার একটী ঐতিহাসিক কাহিনীর দ্বারা প্রকাশ পাইবে যে, প্রভুর ধর্ম তখন ভারতবাসীর চিত্ত কিরূপ অধিকার করিয়াছিল। জয়পুরের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পরকীয়া রসতত্ত্ব আক্রমণ করিলেন; করিয়া স্বকীয় মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেন। বিচারে পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট পরাস্ত হইলেন। কিন্তু জয়পুরের রাজা ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে বঙ্গে পাঠাইলেন। আসিবার সময় তিনি পথে প্রয়াগ ও কাশীর বৈষ্ণবগণকে পরাস্ত করিয়া পরে শ্রীনবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণদেব নবদ্বীপে জয়পত্র চাহিলেন, কিন্তু বিনাবিচারে নদীয়াবাসীরা উহা দিতে সম্মত হইলেন না। পরে তখনকার নবাব জাফর খাঁর আনুকূল্যে এক প্রকাণ্ড সভা হইল; সেই সভায় কৃষ্ণদেব রাধামোহন ঠাকুরের নিকট পরাস্ত হইলেন। ইনি আচার্য প্রভুর প্রপৌত্র,—বিখ্যাত পদকর্তা ও পদসংগ্রাহক।

এ সম্বন্ধে যে দলিল প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শান্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, বর্ধমান, কাটোয়া, কানাইডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের গোস্বামীদিগের স্বাক্ষর দৃষ্টি হয়। তাঁহারা বলিলেন—"আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মতাবলম্বী, অতএব বিচারে যে ধর্ম স্থায়ী হয়, তাহাই লইব,—এইমত প্রতিজ্ঞা করিলাম।" এই মর্মে শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খাঁ সাহেবের নিকট দরখাস্ত হইল।

তিঁহো কহিলেন, ধর্মাধর্ম বিনা তজবিজে হয় না। অতএব বিচার কবুল করিলেন। সেই মত সভাসদ হইল। শ্রীপাট নবদ্বীপের কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য, তৈলঙ্গদেশের রামজয় বিদ্যালঙ্কার, সোনগর গ্রামের রামরায় বিদ্যাভূষণ ও লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য, গয়রহ, কাশীর হরানন্দ ব্রহ্মাচারী ও নয়নানন্দ ভট্টাচার্য্য সাং মইনা।*

তখনকার বিবাদের অবস্থা আর একটা কাহিনী দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে। পুঁটিয়া রাজধানীতে

*শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রকাশিত প্রতিলিপি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ফাল্গুন ১৩০৬।

রাজা রবীন্দ্রনারায়ণের বাড়ীতে দুইজন বৈষ্ণব অতিথি হইলেন। রাজা ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য মহাশয়গণের শিষ্য ঘোর শাক্ত। বৈষ্ণবগণ অতিথি হইলে পূজারি ব্রাহ্মণ দুই থালা ভরিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন আনিয়া দিল। বৈষ্ণবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কাহার প্রসাদ? পূজারি বলিলেন, "কালীর প্রসাদ।"

অমনি বৈষ্ণবগণ বলিলেন যে, তাঁহারা বিষ্ণুর প্রসাদ ব্যতীত গ্রহণ করেন না।

এই কথা রাজার কর্ণে গেল। বৈষ্ণবগণের আর রাত্রে আহার হইল না। প্রাতে যখন তাঁহারা চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন প্রহরীরা তাঁহাদিগকে আটক করিল। তারপর রাজা আসিলেন, "বৈরাগী বেটাদের" ডাকাইলেন তর্জন গর্জন করিলেন। শেষে কয়েক দিবস অবধি পুঁটীয়ার ঘর পরম বৈষ্ণব হইলেন।

পূর্বে বলিয়াছি, বৈষ্ণবগণের অস্ত্র শস্ত্র ভাল ছিল। কাজেই শাক্তগণ যুদ্ধে হারিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবধর্ম স্বাভাবিক ধর্ম, উহা মাধুর্যময়। বৈষ্ণব-গণের অপূর্ব ভজন-পদ্ধতি দেখিয়া লোক আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা ব্রজরস আস্বাদন করিয়া মোহিত হইলেন। শাক্তগণের উহা কিছু ছিল না। তাঁহাদের সাধন-ভজন কেবল যোগ প্রক্রিয়া লইয়া। তাহাতে প্রেম কি ভক্তি, কি কোন রসের সংস্রব ছিল না। দশ ঘড়া ঘৃত পোড়াও, কি দশ শত পশু বধ কর, তাহাতে হৃদয় দ্রব কি উন্নত হইবে না। কিন্তু বৈষ্ণবেরা দাস্য হইতে শুরু করিয়া ক্রমে মধুর-রসের আশ্রয় লইয়া অনায়াসে রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন। শাক্তগণ প্রথমে এই রসাস্বাদন প্রথাকে ঠাট্টা করিতেন। তাঁহারা বৈষ্ণবগণকে "ভাবুক বেটারা" বলিয়া গালি দিতেন। রসকে "ভাবকালি" বলিয়া বিদ্রুপ করিতেন। কিন্তু মুখে ঠাট্টা করিলে কি হয়, প্রেম ও ভক্তি সহজেই মিষ্টি জিনিষ। প্রায় জীবমাত্রেই উহা আস্বাদ করিয়া পুলকিত হয়েন। শাক্তগণ দেখিলেন যে, বৈষ্ণবগণের রসাস্বাদন স্বরূপ যে সুখের প্রস্রবণ আছে, তাহা তাঁহাদের নাই। আর সেই রসে আকৃষ্ট হইয়া অনেক শাক্ত বৈষ্ণব হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারাও আপনাদের মধ্যে রসের সৃষ্টি করা প্রয়োজন বোধ করিলেন।

রসের সৃষ্টি করিতে গেলে, নায়ক-নায়িকার প্রয়োজন। কাজেই তাঁহাদের নায়ক হইলেন মহাদেব। কিন্তু মহাদেবকে লইয়া মধুর-রস উঠাইতে পারিলেন না। যেহেতু মহাদেবের আকার সন্ন্যাসী ও সাধুর মত,—নাগরের মত নয়। মধুর-রসের নাগর যদি ভস্মাবৃত সন্ন্যাসী হয়েন, তবে রসভঙ্গ হয়। আর পার্বতী সখী নহেন, তিনি জননী। বাবা-সন্ন্যাসী ও মা-জননীকে লইয়া মধুর রস হয় না। শাক্তগণ সখ্য-রসও সৃষ্টি করিতে পারিলেন না, কারণ মহাদেবের সখা কেহ নাই।

সুতরাং তাঁহাদের দাস্য ও এক প্রকার "কাল্পনিক" বাৎসল্য রস লইয়া সন্তুষ্ট হইতে হইল। এইরূপে আগমনী ও বিজয়ার সৃষ্টি হইল। গিরি হইলেন নন্দ, গিরিরাণী যশোদা, উমা হইলেন কৃষ্ণ। উমা শ্বশুর বাড়ী গিয়াছেন। গিরিরাণী কান্দিতে লাগিলেন,—যেমন যশোদা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কান্দিয়াছিলেন। যশোদা বলেন,—"নন্দ, আমার গোপালকে কোথা পাঠাইয়া দিলে; তাহাকে আনিয়া দাও।" গিরিরাণী বলিলেন,—"গিরিরাজ, আমার উমাকে আনিয়া দাও।"

বৈষ্ণবেরা গান করেন "দেখে এলাম চিকন কালা" ইত্যাদি ইত্যাদি। শাক্তেরা গায়েন "গিরি যাও আন গিয়া আমার উমারে।" এইরূপে শাক্তগণ তাঁহাদের ধর্মে কিঞ্চিৎ রস প্রবেশ করাইলেন। আমরা শাক্তগণকে উমার কথা লইয়া রোদন করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু বৈষ্ণবগণের যে নন্দ-যশোদা লইয়া বাৎসল্য রস ইহা স্বতন্ত্র জিনিস। এই বাৎসল্য রস গিরিরাজ ও উমার দ্বারা সৃষ্ট বাৎসল্য রস হইতে আকশ-পাতাল পৃথক।

আবার বৈষ্ণবগণের যুগলমিলন আছে, যাহা জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ। শ্রীভগবানের পার্শ্বে শ্রীমতী রাধাকে রাখিয়া তাঁহারা যে ভজনা করেন, সে মাধুর্যরস বর্ণনাতীত। কিন্তু শাক্তগণের

সেরূপ কিছু ছিল না। সেই শাক্তগণের এইরূপ একটী দৃশ্যের দরকার হইল। কিন্তু হরপার্বতীকে লইয়া যুগলমিলন করিতে পারিলেন না, যেহেতু পার্বতী হইতেছে মা, আর হর পিতা এবং তাহার রূপ নাগরের মত নয়। তখন তাহারা বৈষ্ণবের মিলন-গীতের স্থানে, আর একরূপ দৃশ্য সৃষ্টি করিলেন। বৈষ্ণবগণ গায়েন "কি শোভা শ্যামের বামে" ইত্যাদি; শাক্তগণ তাহার পরিবর্তে গাহিতে লাগিলেন, "কেগো কালাঙ্গি উলঙ্গি বামা নাচিছে।"

শাক্তগণের এই যে কালী উলঙ্গ, হইয়া মনুষ্যরক্তাবৃত স্থানে নৃত্য করিয়াছেন এরূপ চরম দৃশ্য উপযুক্তই হইয়াছে। কারণ বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানের 'সৌন্দর্য', ও শাক্তগণ শ্রীভগবানের 'বিভীষিকা' পূজা করেন, তাঁহাদের দর্শনীয় বস্তু, সেই নিমিত্ত কি হইলেন, না—"বিকট দশনা, রুধির মগনা, বামা-বিবসনা ইত্যাদি।" কাজেই শাক্তের ভজনে আদৌ প্রেমভক্তি ছিল না, থাকিতে পারে না। সেই ভজনে ছিল কি না—সাধনা দ্বারা বা শক্তি আহরণ করা। সুতরাং উহার সহিত রসের কোন সংস্রব ছিল না। তান্ত্রিক মতানুসারে একটি দেববিগ্রহ স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে মন্ত্র ও প্রক্রিয়া দ্বারা বাধ্য করিয়া সিদ্ধি আহরণ করাই এই শাক্তধর্মের উদ্দেশ্য।

বৈষ্ণবেরা কুঞ্জভঙ্গের সময় গাইয়া থাকেন, "এমনি ভাবে থাকুক মোদের যুগলকিশোর ইত্যাদি।" শাক্তেরা দেখাদেখি নবমী-নিশিতে গাইতে লাগিলেন. "নিশি তুমি প্রভাত হইও না, তুমি পোহাইলে উমা না রহিবে ঘরে" ইত্যাদি।

আগমনী ও বিজয়াতে কিছু রস আছে বলিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। রামপ্রসাদের ভক্তি-অঙ্গের গীতগুলিও মধুর, কিন্তু এ সমুদয় বৈষ্ণবগণের সামগ্রী, বৈষ্ণব-ধর্ম হইতেই এই সমুদয় গীতের বীজ লওয়া হইয়াছে—ইহা পূর্বে ছিল না।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে ভক্তির তরঙ্গ জগতে আনেন, তাহারই ছায়া লইয়া শাক্তগণ নিজ নিজ দেবতাগণের উপাসনায় সন্নিবেশ করেন। রঙ্গ দেখুন, রামপ্রসাদ শক্তিকে বলিতেছেন,—"মা তোর মায়া নাই" ইত্যাদি। এখন শ্রীভগবানকে তুই মুই করা, কি এরূপ নিজ-জন ভাবিয়া ভজন করা, শ্রীগৌরাঙ্গই জীব সাধককে শিক্ষা দেন। কালী কি দুর্গাকে "তুই মুই" করার নিয়ম পূর্বে ছিল না। কালী বা দুর্গার সহিত আত্মীয়তা করিতে যাইয়া এরূপ "তুই মুই করিতে" পূর্বে কাহারও ইচ্ছা বা সাহস হইত না, প্রয়োজনও হইত না। শাক্তগণ কালী কি দুর্গাকে মন্ত্র ও প্রক্রিয়া দ্বারা বশীভূত করিয়া "আমাকে ইহা দাও, তাহা দাও", বলিতেন,—তাঁহাদের সহিত শাক্তগণের সহিত শাক্তগণের ভালবাসা কি ভক্তির বড় একটা সম্বন্ধ ছিল না।

সেই নিমিত্ত রামপ্রসাদ যখন বৈষ্ণবগণের ভাব লইয়া কালী ঠাকুরাণীকে বলেন,—"মা! আমায় কোলে নে" তখন রসভঙ্গ হয়,—ঠিক ভাবশুদ্ধ হয় না। যাঁহার হাতে খাঁড়া, গলায় নরমুণ্ড, লাল জিহ্বা দিয়া মনুষ্যের রক্ত পড়িতেছে তাঁহাকে ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া ভয় ও পূজা করা যায়,—মা বলা যায় না। যেমন সরস্বতীকে গোঁফ দিলে রসভঙ্গ হয়, শিবের স্তন দিলে রসভঙ্গ হয়, সেইরূপ নরমুণ্ডমালিনীকে 'মা' বলিলে রসভঙ্গ হয়। মনে ভাবুন, যে স্ত্রীলোকের এমন বেশ, গলায় মুণ্ডের মালা ঝুলিতেছে, তাহার স্তন্যদুগ্ধ কি পান করা যায়?

তাই রামপ্রসাদ বৈষ্ণবগণের প্রেমভক্তির ভাব লইয়া ভয়ঙ্করে যোগ দিতে গিয়াছেন, কাজেই রসভঙ্গ হইয়াছে। "তুই মা কোলে নে", শাক্তগণের ইহা নিজস্ব ভাব হইলে, তাঁহারা মাতার গলায় নরমুণ্ডমালা, হাতে খাঁড়া দিতেন না, তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবার মত আকার ও বেশভূষা দিতেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে শাক্তধর্ম বৈষ্ণবধর্ম, আচার্য প্রভু ও ঠাকুর মহাশয়ের সময়ে, সম্পূর্ণ পৃথক আকার ধারণ করিল। ঠাকুর মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন "নাহি মানি দেবী দেবা।" ঠাকুর মহাশয়ের সময়ে বৈষ্ণবগণের মধ্যে কোন কোন স্থানে যাগ যজ্ঞ, দেবী-দেবার পূজা, এমন কি জাতিবিচার পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়

অবতার তত্ত্ব

আমরা চারিটি নূতন ধর্ম-প্রচারের কথা শুনিয়া থাকি, যাহাদিগকে মোটামুটি লোকে অবতার বলে। প্রথম বুদ্ধ, দ্বিতীয় যীশু, তৃতীয় মহম্মদ ও চতুর্থ গৌরাঙ্গ। শেষোক্ত বস্তুটি যে অবতাররূপে পূজিত তাহা বিদেশীগণ জানিতেন না। বিবি ব্লাভাট্স্কিই প্রথম তাঁহার গ্রন্থে গৌরাঙ্গকে শেষ অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিলাম, কারণ তিনি লীলাময় ঠাকুররূপে অবতীর্ণ হয়েন,—ধর্ম প্রচারক ছিলেন না।

প্রচারকার্যে বুদ্ধ ও তাঁহার গণ সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছিলেন; যেহেতু এই বৌদ্ধধর্ম আমেরিকা পর্যন্ত গিয়াছিল। আমরা শুনিয়া থাকি কলম্বস প্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করেন কিন্তু বৌদ্ধধর্মের চিহ্ন আমেরিকায় অনেক স্থানে দেখা যায়। তাহাতে বোধ হয় বৌদ্ধগণ তাহার পূর্বে আমেরিকায় গমন করেন।

বৌদ্ধগণ শ্রীভগবানকে স্বীকার করেন না। অপর কয়েকটি অবতার ভগবানে ভক্তি-শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ানগণ বলেন যে, যীশু শ্রীভগবানের একমাত্র পুত্র। মহম্মদ বলেন যে, যীশুও অবতার, তিনিও অবতার, তবে তিনি যীশু অপেক্ষা বড় আর তিনিই শেষ অবতার, ভগবান পৃথিবীতে আর অবতার পাঠাইবেন না। কিন্তু বৈষ্ণবগণ বলেন (গীতায় "যদা হি" শ্লোক দেখ) যে, যেখানে ধর্মের গ্লানি হয় সেখানে অবতার যাইয়া অধর্মকে পদচ্যুত করিয়া ধর্মকে স্থাপন করেন।

আমরা দেখিতেছি গীতার যে উক্তি ইহাই ঠিক। কারণ যদি খৃষ্ট অবতার হয়েন, তবে অবশ্য মহম্মদ অবতার, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার। ইহাতে খৃষ্টিয়ানদিগের মত—যীশুই কেবলমাত্র অবতার,—ইহা থাকে না। আর মহম্মদ বলেন যে, তিনিই শেষ অবতার,—ইহাও মনে ধরে না। কারণ ইহা অস্বাভাবিক,—ক্রমোন্নতিই স্বভাবের নিয়ম। অতএব মহম্মদ যাহা শিক্ষা দিবেন, তাহার পরে মনুষ্য আর কিছু শিখিবে না—ইহা অস্বাভাবিক।

আমরা উপরে বলিলাম যে, শেষোক্ত তিনটি অবতারই ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। তবে খৃষ্টিয়ান ধর্মে ভক্তির কথা অতি অল্প, নীতির কথাই অধিক। ইহা করিও না দণ্ড পাইবে, ইহা করিও পুরস্কার পাইবে,—ইহাই খৃষ্টিয়ান ধর্মের প্রধান শিক্ষা। মহম্মদীয় ধর্মে ভক্তির কথা বেশ আছে, কিন্তু মহম্মদ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য-পূজার বিধি দিয়া গিয়াছেন। শ্রীভগবানের মাধুর্য পূজা কেবল বৈষ্ণবধর্মেই আছে, আর কোন ধর্মেই নাই।

কথা এই, আমরা শুনিয়া থাকি যে শ্রীভগবানকে জ্ঞানে পাওয়া যায়, আবার ইহাও শুনি যে, তিনি জ্ঞানাতীত ও মায়াতীত। তাহা যদি হইল, তবে শ্রীভগবানকে আর পাওয়া গেল না। প্রকৃতই তিনি এত বড় যে জ্ঞান দ্বারা তাঁহার পরিমাণ করা যায় না। তবে মানুষের উপায় কি? তাঁহাকে কি রূপে পাইবে? তাই বৈষ্ণবগণ বলেন যে, যদিও তিনি জ্ঞানময়, তবু তিনি প্রেমময় বটেন। প্রেমময় কেন?

আমরা দেখি তাঁহার সৃষ্টি যে মনুষ্য তাহাতে প্রেম আছে। যাহা তাঁহার সৃষ্টবস্তুতে আছে, তাহা তাঁহাতে নাই, ইহা হইতে পারে না। অতএব তাঁহার যদি প্রেম না থাকিবে, তবে তিনি মনুষ্যকে প্রেম কিরূপে দিলেন?

অতএব তাঁহার প্রেম আছে। তবে কতখানি? অবশ্য অপরিমেয়, অর্থাৎ তিনি প্রেমময়। তাহা যদি হইল, তবে তুমি যদি তাঁহাকে ভালবাস, তবে তিনি তোমাকে অবশ্য ভালভাসিবেন। এই কৃষ্ণপ্রেমের নাম মাত্র অন্যধর্মে শুনা যায়। কিন্তু বৈষ্ণবধর্মে এই প্রেম—প্রথমে, মধ্যে ও শেষে।

খৃষ্টিয়ান-ধর্মের ভিত্তিভূমি য়ীহুদীর ধর্ম। সে ধর্মের যিনি ঈশ্বর, তিনি তাঁহার দলস্থ জীবের পক্ষপাতী, অন্যান্য জীবের ঘোর শত্রু। অথচ তাঁহারা ইহা বলেন যে, তিনি এক, তিনি সব মনুষ্য সৃষ্টি করেছেন ও সকলের পিতা। এই য়ীহুদীদিগের ঈশ্বর স্ত্রী পুরুষ বধ করিতে, স্ত্রীলোকের ধর্ম নষ্ট করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

মহম্মদীয় ধর্মের ভিত্তিভূমি কি তাহা ঠিক বুঝা যায় না। যাঁহারা মহম্মদীয় গণের ভয়ে পলায়ন করিয়া ভারতে আশ্রয় লয়েন, তাঁহারা সূর্য-পূজা করিয়া থাকেন। তবে ইহা ঠিক যে. মহম্মদের যিনি ঈশ্বর তিনি সেই দলস্থ লোকের পক্ষপাতী। তিনি নাকি, যে তাঁহাকে না মানে তাহাকে বধ করিতে বিধি দিয়াছেন। তাই লোকে বলে যে, মহম্মদ বাহুবল দ্বারা ধর্ম প্রচার করিয়াছেন।

বৈষ্ণবধর্ম বৈদান্তিক ধর্মের উপর স্থাপিত। যাহা পাঠ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ একেবারে বিস্মিত হইয়াছেন।

যীশু দ্বাদশজন মূর্খ শিষ্য রাখিয়া যান। মহম্মদ অনেক শিষ্য করিয়া যান বটে, কিন্তু তাঁহার প্রচার-পদ্ধতি এক নূতন প্রকারের। তিনি মক্কা অধিকার করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে তাহাকে ঈশ্বরের দোস্ত না বলিবে তিনি তাহাকে বধ করিবেন। তাই একদিন মক্কার অধিবাসীরা মুসলমান হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ কোটী, কোটী শিষ্য রাখিয়া যান। তাঁহার প্রচার পদ্ধতি কি তাহা এই পুস্তকে বিবৃতি আছে। তিনি জীবকে দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা সমস্ত দেশ উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন।

গৌরলীলায় যে একটি ঘটনা আছে, তাহার ন্যায় ঘটনা জগতে আর কোথাও শুনা যায় না, তাহার মত ঘটনা অনুভব করাও যায় না, আর সে ঘটনা যে সত্য তাহার অকাট্য প্রমাণও রহিয়াছে। সেটি এই যে,—এই অবতারের শ্রীভগবান জীবের সহিত এক প্রকার প্রত্যক্ষরূপে ইষ্টগোষ্ঠী ও কথাবার্তা কহিয়াছেন। অতএব গৌর-লীলা যিনি না পড়িয়াছেন তিনি হতভাগ্য।

এক্ষণে বৈষ্ণব ধর্মের কয়টি সার তত্ত্ব এই স্থানে বলিব।

প্রথম। গীতায় শ্রীভগবান বলেন যে—"যদা যদা হি ইত্যাদি।" অর্থাৎ যেখানে যেখানে অধর্মের প্রাবল্য হয়, সেইখানেই ধর্ম স্থাপনের নিমিত্ত অবতার উদয় হয়েন। শ্রীকালাচাঁদ গীতা গ্রন্থে এই তত্ত্বের বিচার আছে।

দ্বিতীয়! শ্রীভগবানের উক্তি, যথা—"যিনি আমাকে যেরূপ ভজনা করেন, আমি তাহাকে সেইরূপ ভজনা করিয়া থাকি।"

তৃতীয়। তিনি বলিয়াছেন যে,—"যিনি আমাকে স্বার্থের নিমিত্ত ভজনা করেন, তিনি আমাকে ভজনা করেন না, তিনি আপনাকেই ভজনা করেন।'

চতুর্থ। সাধারণ জীবের প্রতি উপদেশ এই যে, "ভগবৎ-কীর্তনের ন্যায় ভগবানের চরণ প্রাপ্তির সহজ ও নিশ্চিত উপায় আর নাই।

অবশেষে শ্রীবৈষ্ণবগণ পাপ-পুণ্য একপ্রকার মানের না। তবে কি মনুষ্য বধ করিলে তাহার দণ্ড নাই.? আছে। এক্ষণে বৈষ্ণবতত্ত্ব অর্থাৎ মহাপ্রভুর আজ্ঞা বিচার করুন। তাঁহার এক আজ্ঞা—"কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম-আয়োজন।"

অর্থাৎ ভগবৎপ্রেম আহরণ করাই জীবের প্রধান কার্য। যিনি ইহাতে প্রসিদ্ধ হন, তাঁহার আর কিছু করিতে হইবে না—এমন কি, এরূপ লোকের পক্ষে সন্ন্যাসও নিষ্প্রয়োজন।

বৈষ্ণব ব্যতীত অপর সকলে বলেন যে, কর্মফল সকলকেই মানিতে হইবে, যাহা হইতে কাহারও বাঁচিবার যো নাই। বৈষ্ণব জিজ্ঞাসা করেন, কর্ম ও ভগবান—উহার বড় কে? কর্ম না ভগবান? যদি বল কর্মফল এড়াইবার কাহার যো নাই, তবে ভগবান কেহ নহেন, তিনি আমাদের ভাল মন্দ করিতে পারেন না, কর্মই আমাদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তাহা হইলে নাস্তিকতা আসিল।

বৈষ্ণব বলেন, ভগবান বড়, কর্ম তিনি ইচ্ছা মাত্র ধ্বংস করিতে পারেন। জগতের সর্বাপেক্ষা পাপী জগাই মাধাই—বিস্তর স্ত্রী-পুরুষ বধ করিয়াও—

ভগবদ্ ইচ্ছা মাত্র পবিত্রতা লাভ করিয়া মহান্তদলে স্থান পাইলেন।

ফল কথা, যাঁহার প্রেম কি ভক্তি হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে জ্ঞানাকৃত পাপ এক প্রকার অসম্ভব। মহাপ্রভু তাই বলিয়াছেন, "কি কাজ সন্ন্যাসে মোর" ইত্যাদি।

অষ্টাদশ অধ্যায়

নদীয়া পথিকের রোদন

লহ মোর গোষ্ঠীগণ
নাহি একজন?
পথে কত লোক করিছে গমন।
গৌরনাম নাহি বলে একজন।
হেন কেন নাহি বলে দুটা কথা।
কেহ নাহি বুঝে মোর মনোব্যথা।।
আমার গৌরাঙ্গ ভারত ভ্রমিল।
গৌরাঙ্গ গোষ্ঠীতে ভুবন ভরিল
দক্ষিণ প্রদেশ আপনি তারিল।
কোন স্থান ভক্ত- দ্বারা উদ্ধারিল।।
রামেশ্বর হতে ভোট দেশ করি।
মূলতান গুজরাট কিবা কাশীপুরী।।
সিন্ধুদেশে ভক্ত যত্নে পাঠাইল।
শ্রীগৌরাঙ্গ নাম তাহা প্রচারিল।।
এত বড় গোষ্ঠী আছিল আমার।
এখন হয়েছে সব ছারখার।।

গৌরাঙ্গে গণ ভারতে কি আছে।
যদি কেহ থাকে কেবা কারে পুছে।।
যদি কেহ থাকে চেনা নাহি যায়।
সেও নাহি জানে নিজ পরিচয়।।
কেহ বা পশ্চিমে কেহ বা দক্ষিণে।
কে তাদের প্রভু কিছু নাহি জানে।।
পশ্চিমা জানে না গৌড়ীয় কি জানে?
এক গৌড় মাঝে জানে কয়জনে?
কেহ গোষ্ঠী থাকে দেহ পরিচয়।
মিলিয়া তা সনে জুড়াই হৃদয়।।

প্রান্তরে দাঁড়ায় চারিদিকে চাই।
নিজ-জন কেহ দেখিতে না পাই।
এই কি প্রভুর মনেতে আছিলা।
যাইবার কালে সব নিয়া গেলা।।
কি ভাণ্ডার পূরি প্রভু রাখি গেল।
ভাণ্ডারীর দোষে জীবে না পাইল।।
শুন হে ভাণ্ডারি কহি জোড় করে।
প্রভুকে নিকাষ দিতে হবে পরে।।
প্রভু-ধন নষ্ট করে থাক তুমি।
প্রভু বুঝে নিবে বলে খালাস আমি।।

যাহারা আচার্য ধন লোভী হলো।
শ্রীগৌরাঙ্গ আজ্ঞা সব ভুলি গেল।।
মহা-বংশ বলি করে অভিমান।
কিন্তু ভক্তি বিনা কারু নাহি ত্রাণ।।
শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্মে নাহিক কুলীন।
যেই ভক্তিমান সেই ত প্রবীণ।।
দীক্ষা দান করা হয়েছে ব্যবসা।
জীবে দয়া মিথ্যা শুধু ধন আশা।।
মহা-বংশ যেই তার বড় দায়।
সবা হতে ভালো তার হতে হয়।।
নিজ কর্ম ভোগ করিতে হইবে।
বংশ দায় দিয়া এড়াতে নারিবে।।
পরকীয়া রস আস্বাদিবার তরে।
কোন কোন জন পরনারী হরে।।
কেহ বা গৌরাঙ্গ বিগ্রহ করিয়া।
বাবুগিরি করে তাঁর দায় দিয়া।।

একা থাকিবারে নারি গৌরহরি।
সঙ্গী মিলাইয়া দেহ কৃপা করি।।

প্রেমানন্দে যেই নদে ভেসে যায়।
আজ সেই নদে মরুভূমি প্রায়।।
আমাদের নদে সুখের পাথার।
আজি পুণ্যভূমি হয়েছে আঁধার।।
নদীয়া আইনু সুখের লাগিযা।
এবে ফিরি যাই কান্দিয়া কান্দিয়া।।
কোথায় নদীয়া কোথায় গৌরাঙ্গ।
কোথায় কীর্তন প্রেমের তরঙ্গ।।
কোথায় শ্রীবাস কোথা বক্রেশ্বর।
কোথা রামানন্দ কোথা দামোদর।।
এসো ভক্তগণ পুন ধরাধামে।
জীব দুঃখ হর গৌরহরি নামে।।

এরা সব দেয় গৌর-পরিচয়।
বলে তারা সব গৌরগোষ্ঠী হয়।।
কুটুম্ব হইয়া মোর স্থানে আসে।
আমি তাদের দেখি পালাই তরাসে।।

হাহা শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া নাথ।
জীব প্রতি কর শুভ দৃষ্টিপাত।।
প্রভু তোমা বিনা সব অন্ধকার।
জীবে ভক্তি দিয়া করহ উদ্ধার।
কাঁহা গদাধর মুরারী মুকুন্দ।
কাঁহা নরহরি হে জগদানন্দ।।
তোমাদের প্রভু তোমাদের কাজ।
মুই'ত কীটাণু বৈষ্ণব সমাজ।
তোমাদের নিজ কাজ কর এসে।
কেন কান্দি মরে বলরাম দাসে?

তোমাদের প্রভু তোমাদের দায়।
কেন বলরাম কান্দিয়া বেড়ায়।।

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত